চিঠিপত্র

পৌরাণিক মনে কাম

দেশ পত্রিকার গত ১৩ই এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় শ্রীঅশোক রুদ্র তাঁর প্রবন্ধে রাবণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে—সংযমের জন্য রাবণের যে প্রশংসা প্রাপ্য ছিল, প্রাচীন সাহিত্যে বা আধুনিক সাহিত্যে সেই দিকে নজর দেওয়া হয় নাই। এই প্রবন্ধের উপর আলোচনা করতে গিয়ে পত্রলেখক শ্রীসান্ত্বনা সেনগুপ্ত প্রকারান্তরে শ্রীরুদ্রের মন্তব্য সমর্থন করেছেন এবং শ্রীবুদ্ধদেব বসুর একটি রচনার কতকাংশ উদ্ধৃত করেছেন।

ইদানীং প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেক স্থলেই তথ্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে পল্লবগ্রাহী জ্ঞানের ভিত্তিতে আলোচনা করা হচ্ছে। বাল্মীকি প্রণীত মূল রামায়ণ মনোযোগের সাথে পাঠ করলে দেখা যাবে যে সীতার সম্পর্কে রাবণের যে 'প্রশংসাযোগ্য সংযম' পূর্বোক্ত লেখকরা পাঠকদের সমক্ষে উপস্থিত করতে চেয়েছেন সেটা অবাস্তব কল্পনা-বিলাস মাত্র। বাল্মীকির লেখনী রাবণের যে চরিত্র অঙ্কিত করেছে তার মধ্যে রাবণের 'প্রশংসাযোগ্য সংযমের' কোন ছায়া খুঁজে পাওয়া যায় না। সীতাকে চাক্ষুষ দর্শনের সাথে সাথেই রাবণ কামোন্মত্ত হয়েছিলেন এবং সীতার দেহসম্ভোগের লালসা তৃপ্তকরণের জন্য তিনি উন্মত্তের ন্যায় বিবিধ প্রয়াসে রত হয়েছেন—এই কথাই বাল্মীকি বলেছেন। সীতা হরণের সংকল্প গ্রহণের সময়ে হয়ত খর ও দূষণের হত্যা এবং শূর্পনখার নিগ্রহ—এই দুই ব্যাপারের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাই রাবণকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। কিন্তু সীতাকে দর্শনমাত্রেই রাবণ কামার্ত হয়ে পড়েন। এবং যোগীবেশী রাবণ সীতার রূপের প্রশংসার ছলে তাঁর উরু, স্তন, জঘন প্রভৃতি প্রত্যঙ্গসমূহের প্রশস্তিকীর্তন শুরু করে দেন।

"বিশালং জঘনং পীনমূরূ

করিকরোপমৌ।

এতাবুপচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ

সম্প্রগল্ভিতৌ॥

পীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ

স্নিগ্ধতালফলোপমৌ।

মণিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তৌ

পয়োধরৌ॥

অরণ্যকাণ্ড। ৪৬ সর্গ।

সীতাকে রথে তুলবার পূর্বেই রাবণ তাঁর লালসা ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন—"আমি রাক্ষসরাজ রাবণ। তোমাকে দেখে আমার নিজ ভার্যাগণের প্রতি অনুরাগ শিথিল হয়েছে। আমি নানা স্থান থেকে অনেক সুরূপা নারী সংগ্রহ করেছি। তুমি তাদের প্রধানা হবে; তুমি আমার পত্নী হবে—পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্যা করবে।" (ঐ ৪৭ সর্গ)। রাবণের কুপ্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে সীতা কঠোর ভাষায় রাবণকে তিরস্কার করলে রাবণ কিছুক্ষণ তাঁর শৌর্য বীর্য ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা করে বামহস্তে সীতার কেশ ও দক্ষিণ হস্তে তাঁর উরু ধারণ করে তাঁকে রথে তুলে নেন। বাল্মীকি স্বয়ং ঐরূপ অবস্থাপন্ন রাবণকে "কামোন্মত্ত" বলে উল্লেখ করেছেন। (ঐ ৪৯ সর্গ)

অতঃপর লংকায় উপনীত হয়ে রাবণ সীতাকে আপন ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিয়ে শৌর্য বীর্যের কাহিনী শোনায়। "তুমি আমার পত্নী হও—আমার যে সকল উৎকৃষ্ট নারী আছে তুমি তাদের অধীশ্বরী হয়ে থাকবে। যৌবন অনিত্য, যৌবন থাকতে থাকতে সুখভোগ করে লও'—ইত্যাদি বাক্যে রাবণ সীতাকে প্রলোভিত করবার নানা চেষ্টা করলেন। প্রত্যুত্তরে সীতা রাবণকে নানা কটূবাক্য প্রয়োগ করেন। তখন রাবণ বললেন—"তুমি যদি এক বৎসরের মধ্যে আমার অনুগতা না হও তবে আমার পাচকেরা তোমার দেহ খণ্ড খণ্ড করে তোমার মাংস আমার প্রাতরাশের জন্য পরিবেশন করবে।" এবং তিনি রাক্ষসীগণকে আদেশ দিলেন—"তোমরা যে-কোন উপায়ে এই নারীর দর্প চূর্ণ কর"। (ঐ ৫৬ সর্গ)।

কিন্তু কামপীড়ায় কাতর রাবণ এক বৎসর অপেক্ষা করতে পারলেন না। দশমাস অতীত হতেই তিনি অশোকবনে রাক্ষসী পরিবেষ্টিতা সীতার সমক্ষে উপস্থিত হলেন, এবং পূর্বের ন্যায় নানা বাক্যে তাঁকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলেন। রাবণ বললেন—"তুমি কেন আমাকে দেখেই তোমার স্তন ও উদর আবৃত করলে? এই অশোকবনে অন্য কোন পুরুষ নাই। পরস্ত্রীগমন ও পরস্ত্রীহরণ রাক্ষসের ধর্ম—তথাপি তুমি অনিচ্ছুক বলে আমি তোমার অঙ্গস্পর্শ করছি না। আমি তোমার প্রণয়ভিক্ষা করছি—" ইত্যাদি। সীতা কটূবাক্যে তিরস্কার করলে রাবণ তাঁকে ভয় দেখিয়ে পূর্বের মতই বললেন—"তোমাকে অবশ্যই আমার পালংকে আরোহণ করতে হবে। আর দুই মাসের মধ্যে তুমি আমার অনুরাগিনী না হলে আমার পাচকেরা তোমার মাংস আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য পরিবেশন করবে।" সীতা পুনরায় তিরস্কার করলে রাবণ ক্রোধে অধীর হয়ে বললেন—"তোমাকে এখনই আমি বধ করব।" পরে বধ না করে বিকটদশনা রাক্ষসীদের বললেন—"তোমরা অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোন উপায় প্রয়োগের দ্বারা এঁকে আমার অনুরাগিণী তোলা" (সুন্দরকাণ্ড ২১—২৩ সর্গ)

অতঃপর, যখন রাম সমুদ্রবন্ধন ও লঙ্কা আক্রমণের উদ্যোগ করছেন, ঐ সময়ে রাবণও যুদ্ধের আয়োজন সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে সচিবগণ ও সুহৃদগণকে আহ্বান করে রাজসভায় তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেই সভায় তিনি সভাসদবৃন্দকে বলেন—

"আমি রামের ভার্যা জানকীকে হরণ করেছি। তাঁকে দেখা অবধি আমি বিমোহিত হয়েছি। আমার অন্তরে ক্রোধ ও হর্ষকে অতিক্রম করে কাম আমাকে নিরন্তর পীড়িত করছে, তার ফলে আমার লাবণ্য ম্লান হচ্ছে, মনের মধ্যে ... সন্তাপ বেড়ে যাচ্ছে।" বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণ উভয়েই রাবণকে বলেন—"আপনি ঘোর অন্যায় কার্য করেছেন"। (লংকাকাণ্ড, ১২ সর্গ)

দেখা যাচ্ছে—এই রাজসভাতেও রাবণ এমন কথা বলেন নি যে তিনি

সম্মানের জন্য সীতাকে হরণ করেছিলেন। তিনি অসংকোচে স্বীকার করেছেন যে কামলালসা চরিতার্থ করবার জন্যই তিনি সীতাকে আটক রেখেছেন।

এই পর্যন্ত পাঠ করে অনেকের মনে হতে পারে যে অমিতবলশালী রাবণ ত অনায়াসেই বলাৎকারের দ্বারা সীতার দেহসম্ভোগ করতে পারতেন। সেটা ত তিনি করেননি। সেখানেই রাবণের সংযম। কিন্তু রাবণ যে কি কারণে বলপ্রয়োগের দ্বারা সীতার সতীত্বহরণ করেন নাই তার গূঢ় রহস্য রামায়ণেই লিপিবদ্ধ আছে। পূর্বোক্ত রাজসভায় রাবণ বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণ কর্তৃক তিরস্কৃত হওয়ার পর রাবণের সেনাপতি মহাপার্শ্ব তাঁকে বলেন— "আপনি রামের মাথায় পা রেখে তাঁর ভার্যাকে ভোগ করুন। আপনি কুক্কুটবৃত্তি অবলম্বন করে তাকে পুনঃপুনঃ আক্রমণ করুন।" এই কথা শুনে রাবণ তাঁকে গোপন কাহিনী বলেন এবং জানান যে তাঁর উপর ব্রহ্মার এইরূপ অভিশাপ আছে যে তিনি কোন অকামা নারীকে ভোগ করবার জন্য তার প্রতি বলপ্রয়োগ করলেই তৎক্ষণাৎ তাঁর মস্তক শতখণ্ডে বিদীর্ণ হবে। (লংকাকাণ্ড, ১৩ সর্গ)

সুতরাং মৃত্যুভয়বশত রাবণ সীতাকে বলপূর্বক ভোগ করতে পারেন নাই। ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে অথবা সীতার মনের উপরে প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাঁর সম্মতি আদায় করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। রাবণ সেইজন্য নিজে এবং তাঁর অনুচরী রাক্ষসীদের মাধ্যমে নিরন্তর সীতার উপরে মানসিক নির্যাতন চালিয়েছেন।

রাবণের সংযম একটা অবাস্তব কল্পনা। বুদ্ধদেব বসু নিরর্থক প্রশ্ন তুলেছেন, সম্ভোগ কোথায়? জবাবে আমরা প্রশ্ন করছি, কোথায় সংযম?

তারাপদ লাহিড়ী
কলকাতা-৪৭

লোকায়ত রাষ্ট্র, ধর্মনির্ভর রাজনীতি

সাপ্তাহিক দেশের ১২ মে-র সংখ্যায় ভোলা চট্টোপাধ্যায় "লোকায়ত রাষ্ট্র, ধর্মনির্ভর রাজনীতি" প্রবন্ধে সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তাকে একদেশদর্শী, ধর্মান্ধ আখ্যা দিয়েছেন। এক কথায় তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী আর এস এস ভারতবর্ষের সংবিধানসম্মত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপন্থী কাজ করে চলেছে।

এ প্রসঙ্গে শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে বিনীতভাবে জানাই হিন্দুরাষ্ট্রচিন্তা কোনও সাম্প্রদায়িক চিন্তা নয়। যে ভূভাগে এক বিশিষ্ট জাতির, এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও পরম্পরাসম্পন্ন ও বিশিষ্ট চিন্তাধারার লোক বাস করে সেই ভূভাগকেই রাষ্ট্র বলে। এরূপ লোকেদের হিতাহিত কল্পনা এক হওয়ায় তাদের মধ্যে একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র কল্পনার এই ধারণাকে স্তা হিন্দুসমাজই। বলা যায়— বিশাল হিন্দুসমাজ হাজার হাজার ব[illegible] ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছে।

হিন্দু কোনও ধর্মের নাম নয়, এক জাতির নাম। ভারতীয়রা মুসলি[illegible] খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, বৈষ[illegible] শাক্ত, শৈব প্রভৃতি ধর্মীয় হলেও জা[illegible] ও সংস্কৃতিতে সকলেই কি হিন্দু নয়? মুসলমান আমলে নবাব বাদশাহ[illegible] এদেশকে হিন্দুস্থান বলেছেন। পরবর্তীকালে প্রধানতম মুসলিম ক[illegible] সকল দেশের সেরা বলে এই হিন্দুস্থানকেই বলেছিলেন "হমারা"। তবে আজ এদেশকে হিন্দুস্থান বা হিন্দুরাষ্ট্র বলাটা ধর্মান্ধতা হয়ে যায় কি করে?

শ্রীগোলওয়ালকরের বক্তব্য যা তুলে ধরে শ্রীচট্টোপাধ্যায় আর এস এস-কে অ্যানটি-সেক্যুলার প্রমাণিত করতে চেয়েছেন সেই বক্তব্যের মূল কথা তিনটি: (১) এদেশের প্রতিটি মানুষ হিন্দু। (২) হাজার হাজার বছরের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রত্যেক হিন্দুরই শ্রদ্ধার ভাব রাখা উচিত। (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতি পৃথক হতে পারে কিন্তু এদেশে জন্মে, এ মাটির জল-হাওয়ার মানুষ হয়ে এদেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অসহিষ্ণু হওয়া অবাঞ্ছনীয়।

শ্রীগোলওয়ালকরের এই চিন্তাধারা যা ঋষি অরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বরেণ্য ভারতীয়ের চিন্তারই দ্যোতক—তাকে যদি শ্রীচট্টোপাধ্যায় সাম্প্রদায়িক বলেন তবে আধুনিক-কালের দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যকে তিনি কি আখ্যা দেবেন জানি না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত [illegible]রিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন [illegible]য়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু [illegible]র শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাত প্রতিঘাত পরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টান হইয়াছেন বলিয়াই এই সুগভীর ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কি করিয়া? জাতি জিনিষটা মতের চেয়ে অনেক বড় এবং অনেক অন্তরতর; মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না। (রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড। পৃঃ ৪৬৪)।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘও এই জাতি অর্থাৎ হিন্দু জাতির উত্থানের জন্যেই কাজ করে চলেছে। প্রাদেশিকতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠে এই বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে এক জাতি, এক প্রাণ, একতার মনোভাব

গড়ে তোলাই এর ব্রত। এ প্রসঙ্গে সঙ্ঘের বর্তমান সভাপতি শ্রীদেওরসের বক্তব্য, "আমাদের সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয়তা এক। আর এই সত্য স্বীকার করলেই হিন্দুত্বের ব্যাপক কল্পনার মধ্যে সকলেই এসে যাবে। এদেশের মুসলমান খৃষ্টান সমাজ একথা উপলব্ধি করলেই সবই পরিপাটি হয়ে যাবে। (সমসাময়িক পরিস্থিতি ও সঙ্ঘ। পৃঃ ৩০)

শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের ১৯৬৮ সালের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এখানে জয়প্রকাশজীর ১৯৭৭ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত একটি ভাষণের অংশ তুলে ধরছি। শ্রীচট্টোপাধ্যায় ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও সঙ্ঘ সম্বন্ধে জয়প্রকাশজীর বর্তমান মতামতটাও জানতে পারবেন। জয়প্রকাশজী বলছেন,

.........the followers of other religions, especially of those religions which were not born in India, such as Islam and Christianity, but are Indians in the same way as Hindus are. Their forefathers were also Hindus and conversion led to increase in their numbers and also to a feeling of separatism which was exploited by British imperiolism".

ঐ একই ভাষণে তিনি সঙ্ঘ সম্বন্ধে বলেছেন,

"I have great expectations from this revolutionary organisation (R.S.S.) which has taken up the challenge of creating a new India".

এর পরেও আশা করি শ্রীচট্টোপাধ্যায় আর এস এসের হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তাকে নিছক ধর্মনির্ভর রাজনীতি বলে ভুল করবেন না।

বিকাশ ভট্টাচার্য
কলকাতা-৫৩

বেতারের স্মৃতি

বিনোদন সংখ্যা দেশে নলিনীকান্ত সরকারের "বেতারের স্মৃতি" লেখাটি থেকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অনেক নতুন কথা জানতে পারলাম। কিন্তু দু-একটি বিষয়ে কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের আদিযুগের কয়েকজন ব্যক্তির দেওয়া বিবরণের সংগে নলিনীবাবুর বিবৃতির কিছু গরমিল দেখছি। ১৯৭৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বেতার জগৎ পত্রিকায় হীরেন বসু 'ভারতে বেতারের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি' প্রবন্ধে লিখেছেন—"হাইকোর্টের সামনে টেম্পল চেম্বার ভবনের ওপরতলায়" একটি বেতার-কেন্দ্র ছিল। "এই প্রতিষ্ঠান যখন পাকাপাকিভাবে কলকাতায় ব্যবসা করতে সুরু করে তখন ১ নং গারষ্টিন প্লেসে এটি স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৭ সালে ২৬শে আগস্ট এই কোম্পানি ইন্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস নামে অভিহিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।" নলিনীবাবু বলেন অন্য কথা। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়—১৯২৭ সালের ২৬শে আগস্ট তারিখে ১ নং গারষ্টিন প্লেসে যে বেতার কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রতিষ্ঠাতা ইন্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানি লিমিটেড। এটি ঐ লিমিটেড কোম্পানির দ্বিতীয় স্টেশন। প্রথম স্টেশনটি মাসখানেক পূর্বে বোম্বাই শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হীরেন বসুর প্রবন্ধটি প্রথমে কলকাতা কেন্দ্রের 'শ্রবণী' অনুষ্ঠানে পড়া হয়েছিল। প্রবন্ধের শেষে তার উল্লেখ আছে। শ্রবণী সম্পাদক ও বেতার জগৎ সম্পাদক—দুজনেরই অনুমোদিত বলে হীরেন বসুর উক্তিকেই প্রামাণিক বলে মনে করা উচিত। এ সম্বন্ধে নলিনীবাবুর বক্তব্য জানতে ইচ্ছা হয়।

কলকাতার বেতারে পংকজকুমার মল্লিকের যোগদান সম্বন্ধে নলিনীবাবুর বেতারের স্মৃতি থেকে আমরা জানতে পারি সে সময় চিত্রা সংসদ নামে যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল; সেই প্রতিষ্ঠানটি থেকে এসে পংকজকুমার কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে যোগদান করেছিলেন। পংকজকুমারের 'গানের ঝরনাতলায়' শীর্ষক আত্মজীবনী থেকে আমরা জানতে পারি—রামস্বামী আয়েঙ্গার নামে একজন ডাক্তার তাঁকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রোগ্রাম পরিচালক, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে ১৯২৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর পরিচয় করিয়ে দেন।* সেইদিনই তাঁর গান ব্রডকাষ্ট করা হয়। এ বিষয়ে নলিনীবাবুর কিছু বক্তব্য আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ যে গারষ্টিন প্লেসের বেতার কেন্দ্রে ব্রডকাষ্ট করবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, তার কোন উল্লেখ নেই নলিনীবাবুর বেতারের স্মৃতিতে। রবীন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ ব্যক্তি নলিনীবাবুর স্মৃতি থেকে মুছে গেলেন কেমন করে? পংকজবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে কলকাতা বেতারকেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের যাবার এক চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন—"এক নম্বর গারষ্টিন প্লেসের বেতার অফিসের প্রবেশদ্বার থেকে একটু ভিতরে প্রবেশপথের উপরে একটি বৃত্তের মধ্যে সবুজ সিমেন্টের একটি রেখাচিত্র ছিল। চিত্রটি ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র। মাসটা ঠিক মনে নেই, ১৯৩৭ সালের কথা। বেতারের ডাইরেকটর জেনারেল, এ এস বোখারি ও কলকাতা স্টেশন ডাইরেকটর অশোক সেন মহোদয়দের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ একদিন বেতার অফিসে পদধূলি দান করেছিলেন। কবি যেদিন এলেন সেদিন অন্যান্য কর্মী ও শিল্পীদের সংগে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

"কবিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন বোখারি সাহেব ও সেন মহাশয়। তাঁরা দুজনে এগোতে এগোতে অনায়াসেই ভারতবর্ষের মানচিত্রটি মাড়িয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁদের পরেই মানচিত্রটির সামনে এসেই কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইলেন, ভারতজননীর সিমেন্ট রচিত রেখাচিত্রটি আনত মস্তকে নিরীক্ষা করলেন এবং প্রশান্ত ভঙ্গিতে মানচিত্রটি না মাড়িয়ে একটু ঘুরে গিয়ে পথপ্রদর্শকদের অনুসরণ করলেন। তাঁর এই সশ্রদ্ধ আচরণ দেখে বেতারের কর্তা দুজন লজ্জায় মাটিতে মিশে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভিতরে ঢুকে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলেন—'ও আমার দেশের মাটি তোমার প'রে ঠেকাই মাথা।' মাটি শব্দটি কবি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন—মা-টি। যেন বলতে চাইলেন মাটি হচ্ছে মা-টি। তাঁর অংগে পা দেব কি করে?"

নলিনীবাবু কি এ দৃশ্য দেখেন নি?

অমলকুমার গুপ্ত
বৈদ্যবাটি, হুগলী।

প্যারীচরণ সরকার

২১শে এপ্রিলের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের 'একটি রেলওয়ে দুর্ঘটনা ও সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার' নিবন্ধটির জন্য লেখক ও পত্রিকা সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই। গত শতকের বিস্মৃতপ্রায় মনীষী প্যারীচরণ সরকারের জীবন ও চরিত্রের এক অত্যুজ্জ্বল অংশ এতে তুলে ধরা হয়েছে।

তবে আমার সামান্য দুটি কথা বলবার আছে।

১। প্রবন্ধের একস্থলে লেখক বলেছেন 'প্যারীচরণের চেষ্টায়......এব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই, বারাসাতের কালীকৃষ্ণ ঘোষ, নিমাইচরণ সিংহ ও নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়।'

এখানে উল্লিখিত কালীকৃষ্ণ ঘোষ—এই নামটির স্থলে হবে কালীকৃষ্ণ মিত্র। (দ্রঃ প্যারীচরণ সরকার (জীবনবৃত্ত)/নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ প্রণীত/পৃঃ ৫০, পৃঃ ৫১, পৃঃ ৬০/৬৩ ইত্যাদি। সাহিত্য সেবক সমিতি হইতে প্রকাশিত/কলিকাতা, ২৯নং বিডন স্ট্রীট, এলম্ প্রেসে শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সাহা দ্বারা মুদ্রিত/প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩০৯।।

২। উজ্জ্বলবাবুর আলোচ্য প্রবন্ধের সমস্ত তথ্যই নবকৃষ্ণ ঘোষের উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। ঐ গ্রন্থের 'এডুকেশন গেজেট সম্পাদনে' নামক 'নবম অধ্যায়' (পৃঃ ১২৮—১৪০ পৃঃ) সমস্ত তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে যা উজ্জ্বলবাবুর নিবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত রেল-দুর্ঘটনা-সম্পর্কিত সংবাদের উদ্ধৃতি পর্যন্ত।

উজ্জ্বলবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক। এ প্রবন্ধের সমস্ত তথ্য যে তিনি নবকৃষ্ণ ঘোষের গ্রন্থ থেকে আহরণ করেছেন তার স্বীকৃতি বা ঋণ স্বীকার করা হলে উজ্জ্বলবাবুর গৌরব কিছুমাত্র কমত না, আমাদের অর্থাৎ পাঠকদেরও কিছু বলার থাকতো না।

অজয়কুমার ঘোষ
কলকাতা—১

প্যারীচরণ : লেখকের উত্তর

গত ২১শে এপ্রিলের সংখ্যায় 'একটি রেলওয়ে দুর্ঘটনা ও সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার' নামে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ওই প্রবন্ধে একটি তথ্যগত ত্রুটি ঘটেছে আমারই অসাবধানতাবশত। যে কালীকৃষ্ণ মিত্র প্যারীচরণকে গেজেট সম্পাদনায় সাহায্য করেছিলেন তিনি নবীনকৃষ্ণ মিত্রের ছোট ভাই। অসাবধানতাবশত প্রবন্ধে 'কালীকৃষ্ণ ঘোষ' লিখেছি। এ ব্যাপারে তাঁর আত্মীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দাঁস যে চিঠি দিয়েছেন (দেশ, ১৯ মে-র সংখ্যা) তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। প্রকাশিত প্রবন্ধে আমি নবীনকৃষ্ণ মিত্রের নামও করেছি এবং তাঁর কন্যা কুন্তীবালার গেজেটে কবিতা প্রকাশের কথাও আমি উল্লেখ করেছি।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ একটি চিঠিতে লিখেছেন যে, এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'সমস্ত তথ্যই' যখন নবকৃষ্ণ ঘোষের লেখা প্যারীচরণ সরকারের জীবনীগ্রন্থ থেকে নেওয়া তখন ঋণ স্বীকার করলেই হতো। তাতে আমার গৌরব কমতো না। উত্তরে দুটি কথা জানাই। প্রথমত নবকৃষ্ণ ঘোষের লেখা জীবনীই আমি পড়েছি এবং সেই বই পড়েই প্যারীচরণের জীবনকাহিনীর মধ্যে গেজেট সম্পাদকের পদ-পরিত্যাগের ঘটনাটুকুই আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে ফার্স্টবুকের লেখকরূপে পরিচিত প্যারীচরণ সরকারের জীবনের ওই অংশটুকু আকর্ষণীয় মনে হবে বলেই গল্পচ্ছলে লেখার চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত তথ্য কিছু নেই, সে দাবিও করিনি। মাঝে মাঝে প্যারীচরণের রিপোর্টের আংশিক উদ্ধৃতিও দিয়েছি, কিন্তু সূত্রনির্দেশ করিনি। ঘটনাটিকে সূত্রনির্দেশে গবেষণার রূপ দিতে চাইনি। কারণ ঘটনাটুকুতেই আমার আকর্ষণ—অন্য কোনো দাবি আমার নেই। প্যারীচরণ সম্পর্কে যিনি-ই একটু তথ্যানুসন্ধান করবেন তাঁকেই নবকৃষ্ণ ঘোষের বই পড়তে হবে এবং এই ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে তিনি জানতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, 'সমস্ত তথ্য' নবকৃষ্ণের জীবনী থেকে নেওয়া নয়। মূল ঘটনাটুকু নবকৃষ্ণ ঘোষের বই থেকে নেওয়া বটে, কিন্তু আনুষঙ্গিক দু একটি ছোটখাটো তথ্য নবকৃষ্ণ ঘোষের বইতে নেই। যেমন, নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনীতে যে প্যারীচরণের গেজেটে তাঁর কবিতা প্রকাশের কথা আছে তা নবকৃষ্ণ ঘোষের জীবনীটিতে নেই। 'আমার জীবন' বইতে সেই কবিতা প্রকাশের গল্প একটু বড় করেই বলা আছে—আমি সেই তথ্যটির কথা তিন লাইনে সংক্ষেপে সেরেছি। কারণ সম্পাদকের পদত্যাগের ঘটনাটিই আমার মূল লক্ষ্য ছিল। তাছাড়া প্রবন্ধের শেষে প্যারীচরণের পদত্যাগের পর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদক হবার খবরটি নবকৃষ্ণের লিখিত জীবনীতে আছে ঠিকই, কিন্তু ভূদেব যে সম্পাদকের তিনশো টাকা বেতনকে 'গ্র্যান্ট-ইন-এড' করিয়ে এবং এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্ব নিয়ে আটঘাট বেঁধে সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন সে তথ্যও নবকৃষ্ণের লিখিত জীবনীতে নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জীবনীতে আছে। সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ 'ভূদেব চরিত' থেকে গেজেট-সম্পাদনার অন্য অনেক তথ্যের

সঙ্গে এই তথ্যটুকুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাই হোক, এই প্রসঙ্গে যেটুকু 'গবেষণা' করলাম তা করার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই এই তথ্যগুলির কোনো সূত্র-নির্দেশই আমি করিনি। কারণ, আমি গবেষণাপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা আনবার চেষ্টা এক্ষেত্রে করিনি। প্রচলিত জীবনী থেকেই সৎ রিপোর্টিং এবং মহৎ উদ্দেশ্যকে আঁকড়ে থেকে প্যারীচরণ যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন সেই-টুকুই আমি সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম; তথ্যের সূত্র নির্দেশ আমার উদ্দেশ্য ছিল না। নিজের গৌরব বৃদ্ধি তো নয়ই।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

আজকের জাপান

১২ মে তারিখে প্রকাশিত শ্রীসুখরঞ্জন দাশগুপ্তের "আজকের জাপান" প্রবন্ধটি একটু বিলম্বে চোখে পড়ল।

প্রয়াত ডঃ এ এম ও গনির পুত্র যিনি টোকিওতে আছেন তাঁর নাম শহীদ আসাদ। সুখরঞ্জনবাবু কি উপায়ে নামটি সৈয়দ হাসান শুনলেন জানি না। যিনি লেখকের সঙ্গে সাগ্রহে গিয়ে আলাপ করেছিলেন, স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে রাত দুটো পর্যন্ত একসঙ্গে কাটিয়েছেন, তারপর সরস্বতী পুজোর নিমন্ত্রণ করেছেন, তাঁর নামটিও ভালো করে মনে রাখেন নি লেখক। দেখে দুঃখ হোলো।

গৌরী আইয়ুব
কলকাতা-১৭

॥ ২ ॥

'দেশ' পত্রিকার ১২ মে সংখ্যায় শ্রীসুখরঞ্জন দাশগুপ্তর "আজকের জাপান" নিবন্ধটি পড়লাম। লেখাটিতে তথ্যগত একটি ত্রুটি থেকে গেছে। লেখক টোকিও শহরে যাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন এবং জাপান প্রবাসী বাঙালী সমাজের মধ্যমণি হিসেবে যাঁকে দেখেছেন, তাঁর নাম সৈয়দ হাসান নয়, তাঁর নাম শহীদ আসাদ। যাঁকে আমরা শহীদদা বলে ডেকে থাকি। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি সি পি আই-এর প্রয়াত সদস্য এ ও আর গনি সাহেবের পুত্র এবং বিখ্যাত প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। জাপান যাত্রার পূর্বে দীর্ঘদিন ইনি বম্বে প্রবাসী ছিলেন। এই মানুষটি তাঁর নির্ভেজাল, নিরহংকারী, আড্ডাবাজ চরিত্র এবং উদার হৃদয়ের জন্য বম্বের বাঙালী সমাজেও সকলের ভীষণ প্রিয়-পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

অশোক দত্তচৌধুরী
কলকাতা-২০

॥ ৩ ॥

গত ১৩-৫-৭৯ তারিখে দেশে প্রকাশিত বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীসুখ-রঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের সুলিখিত প্রবন্ধ "আজকের জাপান"-এর সামান্য একটি ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমেরিকার লকহীড এয়ার-ক্রাফট করপোরেশনের কাছ থেকে বিমান কেনা ব্যাপারে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাকিও ফাকুদা নয়, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকা এবং আদালতের রায়ে তাঁকেই জেল খাটতে হয়। শ্রীফাকুদাকে নয়। তাকিও ফাকুদার পদত্যাগের কারণ "লকহীড কেলেংকারী" নয়, দলের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের তীব্রতা এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের তাঁর প্রতি আস্থা হারানোই তাঁর পদত্যাগের প্রধান কারণ। আর একটা কথা, ফাকুদার পরে তানাকা প্রধানমন্ত্রী হননি। কাকুই তানাকার পরে প্রধানমন্ত্রী হন তাকিও মিকি (১৯৭৬) তার পরে তাকিও ফাকুদা (১৯৭৬)। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফাকুদা পদত্যাগ করলে জাপানের প্রধানমন্ত্রী হন শ্রীমাসাওশী ওহিরা।

বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়
কুলটি (বর্ধমান)

ভাষার আত্মমর্যাদার প্রশ্ন

এই শিরনামায় প্রথমে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ, এবং তার বেশ কিছুদিন পরে শ্রীমতী কুন্তলা দত্ত-র একটি চিঠি দেশ-এ ছাপা হয়েছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে, প্রধানত, বাংলায় ইংরেজী শব্দের অকারণ অনুপ্রবেশের কথা বলা হয়েছিল; শ্রীমতী কুন্তলা দত্ত, মুখ্যত, বাংলায় অকারণ ইংরেজীয়ানার দিকে লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন এবং তাঁদের ভাবতে বলেছেন, এ অন্ধ অনুকরণ কেন, যার ফলে বাংলা ভাষাকে খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে।

অনেকদিন ত হয়ে গেল, লেখকরা যে এই বিষয়টি নিয়ে কিছু ভেবেছেন তার কোনো প্রমাণ চোখে পড়েনি। যাই হোক, আমি একজন পাঠক হিসাবে বিষয়টি নিয়ে কিছু ভেবেছি, এবং কয়েকটি কথা নিবেদন করছি।

To bury the hatchet বলে একটা কথা অনেককাল থেকেই ইংরেজীতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কথাটার নিরলংকার অর্থ ঝগড়া মিটিয়ে ফেলা। আমেরিকার আদিম অধিবাসী-দের একটি সম্প্রদায়ের ভাষার ঐ অর্থবহ বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের ইংরেজী অনুবাদ এটা, টুপি খোলা যেমন নতশির হওয়া অর্থে ব্যবহৃত একটি ইংরেজী বাগ্‌বৈশিষ্ট্য। মনে রাখতে হবে যে বাঙালীরা যেমন টুপি পরেন না, ইংরেজী ভাষাভাষীরাও তেমনি কুড়ুল কাঁধে করে পথে পথে ঘুরে বেড়ান না। তবু, 'আপনি যে বীভৎস রসকে কেন্দ্র করে কলম ধরার হিম্মৎ রাখেন, শুধু এজন্যে আপনার উদ্দেশ্যে পাঠক মাথার টুপি খুলবে, এই কথাটা আমারও ভালো লাগেনি। কিন্তু ভালো যে লাগেনি তার কারণ কি এই যে ইংরেজী ভাষাভাষী পাশ্চাত্ত্য মানুষেরা অত্যন্ত সাধারণ সৌজন্য প্রকাশের জন্যে শির নত না করেও মাথার টুপি অল্পাধিক খুলে থাকেন? তার চেয়ে আরও কম ভালো লেগেছে 'উদ্দেশ্য' কথাটা। ন বাধতে তথা স্কন্ধে যথা বাধতি বাধতে। কারণ, কথাটা হবে 'উদ্দেশে'। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৭৯ মাঘ-চৈত্র সংখ্যায়

বিস্তারিতভাবে আমি লিখেছি। যদি কারও কৌতূহল হয়, আমার যুক্তিগুলি খণ্ডন করার জন্যেও পড়ে দেখতে পারেন।

শ্রীমতী কুন্তলা দত্তকে আমি দুটি কথা মনে রাখতে অনুরোধ করব। এক, ইংরেজী বাগ্‌ধারা ও প্রবাদবাক্যের অনুসরণ বাংলায় খুব ব্যাপকভাবে হচ্ছে না। দুই, তাদের মধ্যে কয়েকটিকে শুনতে কিছু খারাপও লাগছে না। এমন কি, এগুলি যে ইংরেজী থেকে নেওয়া তাও আমরা ভুলে যেতে বসেছি। যেমন ধরুন, 'এ বিষয়ে কিছু করা আমার হাতে নেই', 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি', 'চোখে ধুলো দেওয়া', 'আমাদের চোখ খুলে গিয়েছে', 'পরস্পরের পিঠ চুলকনো', 'পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেওয়া', 'এই রঙের সঙ্গে এই রঙটা যাবে না', প্রভৃতি ।

অর্থাৎ আসল কথা হচ্ছে, বিলাতী জুতোই হোক আর চীনে জুতোই হোক, যদি ঠিক মাপে মাপে হয়, মানানসই হয়, তাহলেই আর চলতে গেলে পায়ে লাগে না, খুঁড়িয়ে চলতে হয় না।

কিন্তু তর্ক করতে উঠে অশ্রু-ভারাক্রান্ত চোখে বসে পড়তে হয়, যখন শুনি বা পড়ি 'কুম্ভীরাশ্রুপাত'। ইংরেজীতে কথাটার অর্থ কী হয় যারা জানে না তারা এর থেকে কী বুঝবে? শ্রীমতী কুন্তলা দত্ত-র দেওয়া উদাহরণ 'ঝুলির ভিতর থেকে বিড়াল বের করা'-র চেয়েও এটি আরও উঁচুদরের ইংরেজীয়ানা। 'সিংহভাগ' (সিংহের ভাগ নয় কেন? সমাসবদ্ধ হলে কি কথাটার জোর বাড়ে?) ঠিক এতটা না হলেও বেশ উৎকট একটি ইংরেজীয়ানা। 'অর্ধেক বাঁটিয়া দেন বীর বৃকোদরে', —বৃকোদরের ভাগ বা ভীমসেনের ভাগ বলতে অসুবিধা আছে কিছু?

এবারে একটু তালগোল পাকানো ইংরেজী জ্ঞানের পরিচয়বাহী কয়েকটি ইংরেজীয়ানার উদাহরণ দেব।

'তিনি ইস্কাপনকে ইস্কাপন বলতেই ভালোবাসতেন।' ইংরেজী spade কথাটার যে ইস্কাপন ছাড়া আরও অর্থ থাকতে পারে সেটা হয় লেখকের জানা নেই নয়ত তিনি সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিলেন।

'পার্টি যিনি ছুঁড়েছেন।' এক্ষেত্রেও উপরের মন্তব্যগুলি প্রযোজ্য। Throw মানেই ছোঁড়া নয়। Concise Oxford Dictionary -তে পাচ্ছি:

"Throw....10. Have (a fit); give (a party).'

এরপর কোনদিন হয়ত কেউ লিখবেন 'দুঃসংবাদ শুনে তিনি একটা মূর্চ্ছা ছুঁড়লেন।'

এবারে moment—মুহূর্ত। 'এই মুহূর্তে যে চিঠিটি লিখছি।' এক মুহূর্তে কি একটি চিঠি লেখা যায়? ইংরেজীতে I am busy at the moment বলা চলে, কারণ at the moment-এর অর্থ 'এখন'; কিন্তু 'এখন' কথাটার মধ্যে সময়ের যে ব্যাপ্তির ইংগিত, 'এই মুহূর্তে' কথাটার মধ্যে তা নেই। ব্যাপ্তি আদৌ কিছু থাকলেও তা এতই অল্পযে, তার মধ্যে একটি খুব ছোট চিঠি লিখে শেষ করাও অসম্ভব।

"একটু উষ্ণতার জন্য' 'উষ্ণ অভ্যর্থনা'। ইংরেজী warm, warmth কথাগুলিতে উত্তাপ যেমন বোঝায় তেমনি তারা সহমর্মিতা, দরদ প্রভৃতি অর্থও বহন করে। কিন্তু সেটা করে এইজন্যে যে, কথাগুলির উৎপত্তি শীত-প্রধান দেশে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাদের রূপকার্থ একেবারে উল্টো। জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাসের অভিধানে 'উষ্ণ—যে দাহ জন্মায়, তপ্ত, গরম; তীব্র; উত্তেজিত ক্রুদ্ধ।' রাজশেখর বসুর চলন্তিকায় 'উষ্ণ—গরম, তপ্ত, তীব্র; ক্রুদ্ধ।' হরি-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে 'উষ্ণ—উত্তপ্ত, গরম। তীব্র, তীক্ষ্ণ; কড়া। ক্রোধন, কোপন; রাগী।'

এবারে যে উদাহরণগুলি দেব তা পড়ে যদি কেউ বলেন, বাংলা ভাষাকে 'গ্রহণী' রোগে ধরেছে ত আমি প্রতিবাদ করব না।

রোগটার সূচনা দিল্লীর একজন বাঙালী ভদ্রলোকের বাংলা বার্তাপাঠের মধ্যে। শোনা গেল, সরকার বা কোনো পদস্থ ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে 'পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন'। কিন্তু মুশকিল হল এই, ক্ষেপণ এবং গ্রহণ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কর্ম। সামান্য সময়ের ব্যবধানে বল্ নিয়ে লোফালুফি খেললে ওটা করা যায়, আর খুব ছোট শিশুরা পা ছুঁড়ে গুটিয়ে নিয়ে বুকে বা চিবুকে হয়ত ঠেকাতে পারে। অন্য কোনো উপলক্ষে আর কেউ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন শুনলে জানতে কৌতূহল হয়, কার পদক্ষেপ এবং কে সেটা গ্রহণ করেছেন। বস্তুত Taking a step-এর রূপকার্থ 'measure taken, especially in a series of a course of action.' কারও অংগপ্রত্যংগের সংগে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

তারপর রেডিওর বার্তাপাঠক-পাঠিকারা বলতে আরম্ভ করলেন, 'নির্বাচন গ্রহণ'। আমরা ভোট গ্রহণ করি, যার ফলে নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনটাকে গ্রহণ বা বর্জন, অর্থাৎ স্বীকার বা অস্বীকার করা চলে, কিন্তু সে অর্থে এঁরা গ্রহণ শব্দটা ব্যবহার করেন না।

এর পর এঁরা বলতে শুরু করলেন 'সাক্ষাৎকার গ্রহণ।' সাক্ষাৎকার—সাক্ষাৎ করা (চলন্তিকা)। সাক্ষাৎ করা গ্রহণ, অর্থ হয় কিছু? যাঁর সংগে সাক্ষাৎ করা হবে (সম্ভবত কোনো বিষয়ে তাঁর বক্তব্য শুনবার জন্যে) তাঁর নামটা বলে, যিনি সাক্ষাৎ করবেন তাঁর নামটা বলাই ত যথেষ্ট হওয়া উচিত।

অতঃপর সার বেঁধে এসেছে উদ্যোগ গ্রহণ, শপথ গ্রহণ, যত্ন গ্রহণ; বিশ্রাম গ্রহণ। শপথ করা, বিশ্রাম করাটাই কি যথেষ্ট নয়? উদ্যোগ (উদ্‌যোগ-আয়োজন। চলন্তিকা।) গ্রহণ, আয়োজন গ্রহণ আমরা বলি কেউ? যত্ন গ্রহণ যদি চলে ত চেষ্টা গ্রহণ কেন চলবে না? পদক্ষেপ গ্রহণ যদি চলে ত হস্তক্ষেপ গ্রহণকেও চলতে দিতে হবে।

চিঠি অনেক বড় হয়ে গেল। অলমিতি-বিস্তরেণ। (অলমিতি নয়, ও কথাটার অর্থ জানি না।)

সুধীরকুমার চৌধুরী
কলিকাতা-২৯

বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্র

৭ই এপ্রিল 'দেশ' সংখ্যার চিঠিপত্রে কল্যাণকুমার দত্ত (কল্যাণী) মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র' প্রসংগে চিঠিটি পড়ে আশ্চর্য হলাম। উনি লিখেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও অপ্রকাশিত পত্রের লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় যে চিঠিগুলির উল্লেখ করেছেন তার এগারখানি নাকি বঙ্কিম রচনা-বলীতে (সাহিত্য সংসদ) আগেই প্রকাশিত হয়েছে। কথাটি মিথ্যা নয়। কিন্তু আমার কিছু বলবার আছে।

প্রথম কথা হচ্ছে যিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রায় গুলে খেয়েছেন বলা যেতে পারে তিনি কি বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ) একবারও খুলে দেখেন নি? —এই কথাই কি কল্যাণবাবু বলতে চান?

দ্বিতীয়ত উনি বলেছেন যে, চিঠি-গুলির এগার খানি আগেই ছাপা হয়েছে। এতে গোপালবাবুর অক্ষমতা বা ঐ জাতীয় কিছুর ওপর তিনি কি ইঙ্গিত করেছেন! কিন্তু আমার মনে হয় চিঠিগুলির ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি একথা অস্বীকার করেন নি যে চিঠি-গুলি আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। একথা তিনি খোলাখুলিভাবে বলেছেন ৩১শে মার্চ 'দেশ' সংখ্যায়, অর্থাৎ যে সংখ্যায় রচনাটি সমাপ্ত হয়। দেশ—৩১শে মার্চ সংখ্যায় (পৃঃ—৫৮) তিনি বলেছেন—"এই ধারাবাহিক রচনার উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্রের আরও ক'টি অপ্রকাশিত পত্র উদ্ধৃত করেছি। এগুলি বহু পূর্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় আজকের প্রায় সকল পাঠক-পাঠিকার কাছেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপ্রকাশিতেরই মত।"

শুধু উপসংহারেই নয় সমস্ত রচনাটির ক্ষেত্রেই এই কথাটি সম্পূর্ণ-ভাবে প্রযোজ্য।

তবে কিছু কিছু জায়গায় সামান্য বৈষম্য আছে—একথাও একেবারে অনস্বীকার্য নয়। সমস্ত রচনাটি আদ্যোপান্ত পড়লে আশা করি কল্যাণ-বাবু এ জিনিসটি লক্ষ করতে পারবেন।

এছাড়া সার্থক কোনকিছু রচনার খাতিরে অনেক প্রসঙ্গই এসে পড়ে। তাই এসেছেও। এটা তো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নয় যে, যে কাঁটায় কাঁটায় ফর্মুলা মেনে চলতে হবে। তবে অপ্রকাশিত বলতে কল্যাণবাবু যদি অন্য আর কিছু ভেবে থাকেন তবে সেটা আলাদা কথা।

অরুণাংশু ভট্টাচার্য
মহানাদ: হুগলী।

বিজ্ঞাপনে প্রতারণা

'দেশ' ১৯মে '৭৯ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে লেখা শ্রীঅনিলকুমার রায়ের বক্তব্যের সংগে আমি সম্পূর্ণ একমত। এভাবে প্রতারণা করা আজকাল বাংলা সাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে ছত্রাকের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে।

গত '৭৫ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া মহাশয় 'ভারত কথা'সহ অন্যান্য বহু বই সর-বরাহের নিমিত্তে গ্রাহক সংগ্রহ করতে থাকেন। আমি ও আরও তিনজন গ্রাহক হওয়ার জন্য দশ টাকা করে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু অদ্যাবধি সে সমস্ত বই-এর কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তিও এসম্পর্কে তারা করেন নি? 'গ্রাহক করে বই সরবরাহ করব' আজ এক লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। 'পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা' কত সোজা, তা এই গ্রাহক করে পুস্তক সরবরাহের নীতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। বড়ুয়া সাহেব কি বইগুলো আদৌ প্রকাশ করবেন? 'অখিল ভারত জনশিক্ষা প্রচার সমিতি'র বক্তব্য কি।

প্রভাস রায়
শিলিগুড়ি

অগ্নিযুগ

জনৈক বিপ্লবী বন্ধু ১৩ই মে সংখ্যা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার সম্পাদিত 'অগ্নিযুগ' সংকলন গ্রন্থটির সমালোচনার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমার নিজস্ব কোন গ্রন্থ কোনদিনই আমি সমালোচনার জন্য পাঠাইনে। অগ্নিযুগও আমার গ্রন্থ হলে কোনদিনই পাঠানো হতো না। কারণ, আমি মনে করি, এ সব গ্রন্থের সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে কিছুতর অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, যা কোন মামুলী সমালোচকের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

যেমন, বর্তমান সমালোচক সূর্য সেন এবং আরো কয়েক জনের ফাঁসির তারিখ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর চোখে না পড়লেও উৎসাহী পাঠকদের নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয় গণেশ ঘোষের 'মাস্টারদা' নামক লেখাটি এবং তৃতীয় খণ্ডের ২৫৭ পাতায় সূর্য সেনের ফাঁসি সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকার বিবরণটি চোখে পড়েছে। জানি না, আনন্দ-বাজারের বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য কিনা। তবে গত পয়তাল্লিশ বছর ধরে ঐ তারিখটিই সূর্য সেন দিবস হিসেবে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে জানি।

ছাপার ভুলে ১৯৩৩ সালে মতি মল্লিকের ফাঁসির কথা বলা হয়েছে। উৎসাহী পাঠকরা এটাও লক্ষ্য করে থাকবেন যে তৃতীয় খণ্ডের ২৫০ পাতায় আবার সেই ভুলটি সংশোধন করে ১৯৩৪ সাল করা হয়েছে।

সমালোচক মশাই এ প্রসংগে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'হু'জ হু অব ইণ্ডিয়ান মারটার্স' বইটিকে সাক্ষী মেনেছেন। ভারত সরকার তো দু-দুবার মেরে ফেলেছেন লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণকে। তাই কি বিশ্বাস করতে হবে নাকি মানবো কে? পরিশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে, ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটির বহু তথ্যই অসত্য এবং উদ্দেশ্যমূলক।

শৈলেশ দে
কলিকাতা-১৯

প্রকাশিত হল

বুদ্ধদেব গুহর

মহত্তম উপন্যাস

দু নম্বর দাম—৭·০০

সন্দেহ নেই, দু নম্বর বুদ্ধদেব গুহর মহত্তম উপন্যাসরূপে স্বীকৃতি পাবে। এতকাল যাবৎ যা ছিল তাঁর প্রিয় বিষয় এবং যে-বিষয় নিয়ে লেখা আশ্চর্য সজীব সব রচনারাজি তাঁকে দিয়েছে অটল প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি, সেই বিষয় ছেড়ে তিনি সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ নিয়ে এই প্রথম লিখলেন। জঙ্গল নয়, শিকার নয়, প্রেম নয়, এই নতুন বিষয়টি হল দু নম্বরী পৃথিবী। আমাদের চেনা পরিমন্ডলের সমান্তরাল এক জগৎ এই দু নম্বর জগৎ। সেই জগতে যাদের নিত্য আনাগোনা তারা কেউই আমাদের অচেনা নয়। কিন্তু দু-নম্বর কারবারে তাদের ভূমিকাটি কী সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে তেমন স্পষ্ট ছিল না, এই উপন্যাস পড়লেই সে কথা জানা যাবে। বুদ্ধদেব গুহ খুব কাছ থেকে এই পৃথিবীর লোক-জনদের দেখেছেন এবং আমাদেরও নিয়ে গেছেন তাদের একেবারে কাছাকাছি। সেই জগতে শুধু টাকার গোপন লেনদেনই যে দু নম্বর খাতায় হয় এমন নয়, সামাজিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, প্রেম, প্রতিষ্ঠা, মূল্যবোধ—সব-কিছুতেই, সমস্ত কিছুতেই দু-নম্বর দৃষ্টি-ভঙ্গি। সেই জগতের এমন নিখুঁত, নিশ্ছিদ্র চলচ্ছবি বাংলা সাহিত্যে এর আগে কেউ কখনও ফুটিয়েছেন বলে মনে পড়ে না।

প্রফুল্লকুমার সরকারের

অনবদ্য উপন্যাস

ভ্রষ্টলগ্ন দাম ২·৫০

মাতৃভূমির মুক্তিকামনায় গুপ্তবিপ্লবের পথ গ্রহণ করেছিলেন বাংলার একদল আত্মভোলা যুবক। সুখ, ঐশ্বর্য, স্নেহ, প্রেম, মমতা—কোনও কিছুর আকর্ষণই তাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারেনি। তাদের নিয়েই রচিত এই অনবদ্য উপন্যাস।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ

প্রবন্ধ সংগ্রহ ৫·০০ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ৪·০০ শ্রীগৌরাঙ্গ ৬·০০ জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০ লোকারণ্য (উপন্যাস) ৪·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

করুণ রঙীন উপন্যাস

স্মরগরল দাম ৮·০০

অলঙ্ঘ্য এক বিস্মৃতির দুর্ভেদ্য দেওয়াল দিয়ে সম্পূর্ণ বিভক্ত একই মানুষের সংঘাতে উত্তাল দুটি বিপরীত জীবনের এক করুণ ট্র্যাজেডি 'স্মরগরল'। যেমন আকর্ষণীয় কাহিনী, তেমনই আকর্ষণীয় এর রচনাভঙ্গি।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ

আঁধার পেরিয়ে ৫·০০

কিশোর সাহিত্য : ভয়ের মুখোশ ৫·০০ পাথরের চোখ

অষ্টাদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রপুরস্কার-প্রাপ্ত উপন্যাস

তুঙ্গভদ্রার তীরে

দাম ৮·০০
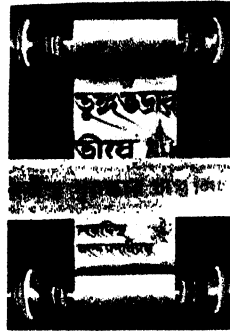
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে সব থেকে বর্ণাঢ্য রচনা 'তুঙ্গভদ্রার তীরে।' দক্ষিণ ভারতের তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিজয়নগরের মহিমান্বিত রাজা দ্বিতীয় দেবরাজ আর তাঁর বাগদত্তা কলিঙ্গ রাজ-কুমারী রূপসী বিদ্যুন্মালাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই রুদ্ধশ্বাস উপন্যাসের কাহিনী। কলিঙ্গ-রাজকুমারী আসছিলেন সমুদ্র পথে বিজয়নগরে, বিজয়নগরের অধিপতিকে পতিত্বে বরণ করবেন বলে। পথে আকস্মিকভাবে পরিচয় এক ক্ষত্রিয়কুমারের সঙ্গে। মুসলমান শাসকের অত্যাচারে দেশত্যাগী হয়েছিলেন সেই ক্ষত্রিয়কুমার। সেই পরিচয় থেকেই কাহিনী বাঁক নিয়েছে এক নতুন পথে। বহু অকল্পনীয় ঘটনা, জটিল রহস্য, বীরত্বের উপাখ্যান, কৃতঘ্নতা, বিদ্বেষ, বিশ্বাস-ঘাতকতা, প্রেম-প্রণয়, যুদ্ধবিগ্রহের উত্তাল ঘটনাতরঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছে তুঙ্গভদ্রার এই ঊর্মিমুখর ইতিহাস। ইতিহাস? নাকি স্মৃতিকথা। সব ইতিহাসের পিছনেই স্মৃতিকথা আছে লুকিয়ে। যেখানে স্মৃতি নেই, সেখানে ইতিহাসও নেই।

ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও মলয় দাশগুপ্ত

প্রণীত

ফুলের বাগান

রাজনৈতিক বই

বরুণ সেনগুপ্তের

পালাবদলের পালা

দাম ১২·০০

বিপাক-ই-স্তান

দাম ৬·০০

নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য

দাম ৭·০০

ইন্দিরা একাদশী

দাম ১০·০০ (শোভন)
৫·০০ (পেপার ব্যাক)

রাজ্য ও রাজনীতি

দাম ৮·০০

এম. ও. মাথাই-এর

নেহরুর সঙ্গে

দাম ১৫·০০

জয়প্রকাশ নারায়ণের

কারাবাসের কাহিনী

দাম ৫·০০

জনার্দন ঠাকুরের

ইন্দিরা এণ্ড কোং

দাম ৮·০০

সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের

সিদ্ধার্থশংকর : সিদ্ধি ও নির্বাণ

দাম ৬·০০

মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র

দাম ৮·০০

শ্যামলকুমার চক্রবর্তীর

ছাত্র-যুব কংগ্রেস : কীর্তি ও কেলেঙ্কারি

দাম ১৫·০০

বিধান সিংহের

শাহী কেচ্ছা

দাম ৮·০০

রূপদর্শীর

আমাকে বলতে দাও

দাম ৭·০০

রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য

দাম ৮·০০

প্রকাশিত হল

কণা বসুমিশ্রের

অনন্য গল্প-সংকলন

তুলির কিছু সময়

দাম ১২·০০
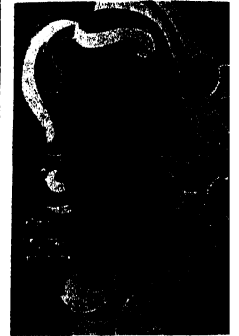
লেখিকা হিসেবে কণা বসু-মিশ্রের আত্মপ্রকাশ বেশি দিনের ঘটনা নয়। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। সন্দেহ নেই, তাঁর প্রধান পরিচয় গল্পকার-রূপে। এমন কয়েকটি গল্প তিনি লিখেছেন যা তাঁকে একইসঙ্গে দিয়েছে পরিচিতি, খ্যাতি, জনপ্রিয়তা এবং প্রতিষ্ঠা। সেই সমস্ত গল্প একত্র করে প্রকাশিত হল তাঁর অনন্য গল্প-সংকলন—'তুলির কিছু সময়।'

কণা বসু মিশ্রের গল্পের মুখ্য বিষয় প্রেম। প্রেমের বিচিত্র রূপ এবং মানুষের মনের গভীরে মিশে-থাকা রহস্য আশ্চর্য সংক্ষ্যতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন তিনি তাঁর গল্পাবলীতে মেয়েরাই তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পের নায়িকা। তারা কখনো স্ত্রী, কখনো প্রেমিকা, কখনো জননী। কণা বসুমিশ্র নিজেই লিখেছেন—"আমি জানি আমরা মেয়েরা মেয়েদের কথা যেভাবে বলতে পারবো, একজন পুরুষ লেখকের পক্ষে সেভাবে বলা সম্ভব নয়।" তাঁর গল্পেও এই আত্মবিশ্বাসেরই সমর্থন ছড়ানো। সত্যিই মেয়েদের কথা যেভাবে তিনি লিখেছেন, সেভাবে কোনও পুরুষ লেখকের পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। তাব'লে ভাষা ব্যবহারে তিনি কিন্তু মোটেই রক্ষণশীল নন। "প্রয়োজনবোধে কোনো কথা লিখতেই আমার কলমে বাধে না"—কণা বসুমিশ্রের এই দুঃসাহসিক স্বীকারোক্তির পরিচয়ও তাঁর গল্পের মধ্যে

দেশ ৪৬ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা
৮ আষাঢ় ১৩৮৬

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : নীরদ মজুমদার অংকিত তৈলচিত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

অশোক রুদ্রের প্রবন্ধ
পৌরাণিক মনে স্ত্রী বিদ্বেষ
দুলাল চৌধুরীর রচনা
রবীন্দ্র-অনুলেখক : প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত
সমীর মুখোপাধ্যায়ের গল্প
আমরা, যুবকরা

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদলচন্দ্র বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

সম্পাদকীয়

'মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে'

মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে! মিত্রের চক্ষু নিয়ে দৃষ্টিপাত করবার জন্য প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানীর বাণীতে যে অনুজ্ঞা নিহিত আছে, সেটা বর্তমান কালের মানবিক আদর্শেরও একটি গূঢ় নীতি। অত্যন্ত বস্তুবাদী চিন্তার প্রবক্তা যাঁরা, এবং সশস্ত্র বাহুবলের দ্বারা পরজাতির জীবনের উপর উদ্ধত আধিপত্য স্থাপিত করা যাঁদের কাছে ঐতিহাসিক গৌরবের নির্মাণ বলে বোধ হয়েছে, এমনতর মনীষীও (যথা নীৎসে) মিত্রতা ও মৈত্রীভাবনাকে একটি মহৎ সামাজিক অভিরুচির নির্দেশ বলে মন্তব্য করেছেন।

স্বাধীন ভারতের বিদেশ-নীতির তত্ত্বে শুরু থেকেই মিত্রতা ও মৈত্রীভাবনার মুক্তকণ্ঠ ঘোষণা শুনতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু খুবই দুর্বোধ বিস্ময়ের বিষয় অথবা রহস্য এই যে, আন্তর্জাতিক হৃদয়টি ভারতের প্রতি মৈত্রীভাবনার রসে অভিষিক্ত হয়ে ওঠেনি। মিত্রতার বিনিময়ে মিত্রতা পাওয়া যায়, স্বাধীন ভারতের একত্রিশ বৎসরের রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতায় এমনতর নীতির বিশুদ্ধ সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। রূঢ় ঘটনার আকস্মিক সম্পাতে হতচকিত হয়ে ভারতীয় জাতি অনেকবার দেখতে পেয়েছে যে, তথাকথিত বন্ধুদেশের মনোবৃত্তি সহসা বৈরি-ভাবনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এবং সৌহার্দ্যের সম্ভার যতই অকৃত্রিম হোক না কেন, তার তুলনায় বেশী মূল্য ও মর্যাদা লাভ করে থাকে সামরিক শক্তিমত্তার সম্বল। চীনের সঙ্গে ভারতের সামরিক সংঘর্ষে (১৯৬২) ভারতীয় প্রতিরক্ষার শক্তি নেফা রণাঙ্গনে নির্জিত হবার পর, ভারতের প্রধান প্রধান প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মনোভাবে ও আচরণে ভারত সম্পর্কে সহসা অদ্ভুত এক অশ্রদ্ধার উদ্ভব হয়েছিল। ভারতের মিত্রতায় তাদের জাতিক স্বার্থ পরিপুষ্ট হলেও তাদের চিন্তায় ও আচরণে ভারতের প্রতি বেশ বড় রকমের অভক্তি এবং চীনের প্রতি বেশ বড় রকমের ভক্তির অভ্যুদয় দেখা দিয়েছিল, যদিও চীন তাদের জাতির স্বার্থকে কোন বদান্য সাহায্যের দুগ্ধ ও মধু দিয়ে পরিপুত করে তোলেনি। শ্রীজওহরলাল নেহরুও একাধিক বিষাদ-ব্যঞ্জক মন্তব্যে তাঁর এই উপলব্ধির আভাস দিয়েছিলেন যে, ভারতের বিদেশ-নীতি মৈত্রীভাবনার শত অঙ্গীকার বহন করলেও সেটা ভারতের জাতিক জীবনকে নির্বৈর করবার অথবা বিদেশের দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করবার বড় সম্বল নয়।

আজ কিন্তু একটি খুবই চমকপ্রদ পরিতৃপ্তির নির্ঘোষ বর্তমান ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশ-মন্ত্রীর নানা মন্তব্যে ও বিবৃতিতে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের প্রতি বিদেশ-গুলির মিত্রতা ও সৌহার্দ্যময় সম্পর্ক নাকি অনেক প্রশস্ত হয়েছে, যেটা আগে কখনও সম্ভব হতে পারেনি। বিদেশে-বিদেশে ভারতের মর্যাদা বেড়েছে। বিদেশমন্ত্রী শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ীর কণ্ঠে এরকম পরিতৃপ্তির ঘোষণা অনেক সময় বস্তুত রাজনৈতিক অহমিকার এক-একটি উদ্গারের মতো ধ্বনিত হতে শোনা যায়। এটা বর্তমান সরকারী নেতৃত্বের উন্নততর যোগ্যতা ও কৃতিত্বের প্রচারণার মত একটা বাচিক আতিশয্য বলে অনেকের মনে হয়েছে। কোন বিদেশের সঙ্গে দুটো-একটা বাণিজ্যিক চুক্তি সম্ভব হলেই কি এই আহ্লাদে গলে যেতে হবে যে, ভারত ও সেই বিদেশের মধ্যে মিত্রতার একটি সুবর্ণসেতু নির্মিত হয়ে গিয়েছে?

বাস্তবতার দ্বারা বিচারিত একটি প্রশ্ন : দুই দেশের মধ্যে সরকারী পর্যায়ে সৌহার্দ্যের কিছু সুশ্রাব্য বচন ভাষিত হলেই কি দুই দেশের মধ্যে মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে বলে মনে করা হবে? বলা বাহুল্য, দুই দেশের মন্ত্রীতে-মন্ত্রীতে, অথবা প্রেসিডেন্টে- প্রেসিডেন্টে আনুষ্ঠানিক সজ্জনতা ও সৌজন্যের কোন সমারোহ দুই দেশের মধ্যে মিত্রতা নির্ণয় করবার মানদণ্ড হতে পারে না। দুই দেশের জনসাধারণের মনে ও আচরণে মিত্রতার সঞ্চার সম্ভাবিত হলে তবেই বুঝতে হবে যে, সার্থক মৈত্রী সুসম্পন্ন হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী কি বলতে পারেন, কোন বিদেশে ব্যক্তি-ভারতীয়ের মর্যাদা আগের তুলনায় এখন বেশী স্বীকৃত হয়েছে? ব্রিটেনে ভারতীয় ব্যক্তির উপর বর্ণবিদ্বেষের প্রকোপ কি সামান্য একটুও প্রশমিত হয়েছে? চীনে কি ভারতীয় ব্যক্তির প্রবেশ ও অবস্থানের সুযোগ আগের তুলনায় একটুও প্রশস্ত হতে পেরেছে? এমন কি, নেপালের মতো নিকট প্রতিবেশী-রাষ্ট্রেও কি ভারতীয়ের মর্যাদা আগের তুলনায় কিছু বেশী স্বচ্ছন্দ হয়েছে? বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সম্পর্কেও এই প্রশ্ন করতে হয়। শ্রীলঙ্কাতে ভারতীয় বংশোদ্ভব তামিল জনতাকে ভারতে অপসারিত করবার কঠোর স্পৃহা একটুও সংযত হয়নি। বর্মাতে বিতাড়িত ভারতীয়ের ছেড়ে-আসা সম্পত্তিকে আধ-পয়সা মূল্য ধরে দিতেও সে-দেশের সরকার সম্মত হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার রেগুলেটরী কমিশন ভারতকে চুক্তিগত বরাদ্দের গুণান্বিত ইউরেনিয়াম (১৯.৬ টন) ভারতকে প্রদান করবার কর্তব্য সম্বন্ধে যে-রকম নির্বাক হয়ে রয়েছে, সেটা লক্ষ করে কারও পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত করা কি উচিত যে, দুই দেশের মধ্যে মিত্রতার ভাব আগের তুলনায় বেশী ঘনীভূত হয়েছে? সৌদি আরবে ভারতীয় শিখ ব্যক্তির প্রবেশই নিষিদ্ধ। সুতরাং, শ্রীবাজপেয়ী সৌদি আরবের সরকারী কেতায় আপ্যায়িত হলেও এমন ধারণা করবার কোন যুক্তি নেই যে, সে-দেশে ভারতীয়ের প্রতি মিত্রতার ও মর্যাদার ভাব আগের তুলনায় বেড়েছে। তবু এরকম ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে হয় যে, বিশ্বজীবনের পক্ষে মৈত্রীভাবনার প্রয়োজন ও গুরুত্ব একটুও খর্ব হয়নি।

এ চেয়ার ওঠান
যাবে না বৎস!
Kutty

রবীন্দ্ররচনায় বঙ্কিম প্রশস্তি

চিত্তরঞ্জন দেব

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র ভবনে সংরক্ষিত তিন শতাধিক পৃষ্ঠার যে বাঁধানো ডায়রি জাতীয় খাতায় রবীন্দ্রনাথের সেঁজুতি, প্রহাসিনী, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, সানাই প্রভৃতি বইয়ের বহু কবিতার মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তারই এক-ফাঁকে দুটি পৃষ্ঠায় চোখে পড়ে নিম্নে উদ্ধৃত ৩০ পঙ্‌ক্তি সংবলিত ছন্দোবন্ধটি :

আপন অশ্রান্ত বেগে সৃষ্টি চলিয়াছে যাত্রা করি
    নিরন্তর দিবা বিভাবরী।
স্তব্ধ যাহা পথপার্শ্বে অচৈতন্য যা রহে না জেগে
    ধূলি বিলুণ্ঠিত হয় কালের চরণাঘাত লেগে।
নদী যদি ক্লান্ত হয় মহাসমুদ্রের অভিসারে
    অবরুদ্ধ হয় পঙ্কভারে।
নিশ্চল গৃহের কোণে নিভৃতে স্তিমিত যেই বাতি
দরিদ্র আলোক তার লুপ্ত হয় না ফুরাতে রাতি।
যাত্রীর মশাল জ্বলে দীপ্ত আলো জাগ্রত নিশীথে
    জানে না সে আঁধারে মিশিতে।
যাহার অন্তরে নাই অনাগত যুগের পাথেয়
    জানি সে কালের কাছে হেয়।
কীর্তিনাশা স্মৃতিনাশা নির্মম স্রোতের ধারে ধারে
পড়ে আছে অতীতের পরিত্যক্ত খ্যাতি সারে সারে।
আপনার অর্থ তারা হারায়েছে হারায়েছে গতি
    অন্ধরাতে হারায়েছে জ্যোতি।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি ধ্বনিছে প্রার্থনা
যাহা নহে মুষ্টিভিক্ষা যাহা নহে জীর্ণ শস্যকণা
উঠেনা অঙ্কুর যার দিনান্তের অবজ্ঞার দান
    আজ গেলে কাল অবসান।
পেয়েছে তোমার হাতে তব দেশ কালের যে বর
    হে বঙ্কিম নহে সে স্থাবর।
নব সাহিত্যের উৎস উৎসারিত মন্ত্রস্পর্শে তব
চির চলমান গতি, জাগাইয়া প্রাণ অভিনব।
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলে স্রোত সম্মুখের টানে
    ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই নিত্য ধ্বনিতেছে সে বাণীর তরঙ্গ হিল্লোলে
হে বঙ্কিম তব নাম, তব খ্যাতি তারি স্রোতে দোলে
বঙ্গ ভারতীর সাথে মিশায়ে তোমার আয়ু গণি
    তাই মোরা করি জয়ধ্বনি।

উপরে উদ্ধৃত ছন্দোবন্ধের ২২ ও ২৮ সংখ্যক পঙ্‌ক্তিতে 'বঙ্কিম' শব্দের উল্লেখ নিঃসন্দেহে নির্দেশ করে যে রচনাটি একটি বঙ্কিম প্রশস্তি। কিন্তু এই

প্রশস্তি রচনার উপলক্ষ এবং স্থান ও কাল সম্বন্ধে প্রশস্তির গায়ে কিছু লেখা নেই।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে এবং বিশ্বভারতী প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক পুস্তিকায় সংকলিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটির প্রতি :

বঙ্কিমচন্দ্র

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থাবির কীর্তিরে চলে নাশি,
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি,
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অংকুর ওঠেনা যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
 আরম্ভেই যার অবসান।
সে প্রার্থনা পুরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নব যুগসাহিত্যের উৎস উঠি মন্ত্রস্পর্শে তব
চির চলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিশায়ে তোমার আয়ু গণি,
 তাই তব করি জয়ধ্বনি।

উল্লিখিত দুটি ছন্দোবন্ধের পরস্পরের পাঠ মিলিয়ে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে দুটি রচনাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধাপ্রসূত। প্রথমোক্তটির সঙ্গে শেষোক্তটির ভাব ও ছন্দের মিলও লক্ষ করার মতো। শুধু তাই নয়, প্রথমোক্ত ছন্দোবন্ধের কয়েকটি শব্দ, বাক্যাংশ এবং পঙ্‌ক্তির সঙ্গেও শেষোক্ত ছন্দোবন্ধের কয়েকটি শব্দ, বাক্যাংশ এবং পঙ্‌ক্তির হুবহু মিল রয়েছে। কাজেই অনুমান করা অসংগত হয় না যে প্রথমোক্ত ছন্দোবন্ধটি শেষোক্ত মুদ্রিত কবিতারই প্রাথমিক খসড়ালিপি যা এতকাল অপ্রকাশিত থেকে গিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক মুদ্রিত কবিতার পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রজীবনী চতুর্থখণ্ডে) জানিয়েছেন,

'কবি যখন কালিম্পঙে সেই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বঙ্কিম-জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ; তদুপলক্ষ্যে কবি পূর্বাহ্নে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ১০ আষাঢ় (১৩৪৫। ১৯৩৮ জুন ২৫) সভায় পঠিত হয়। সুতরাং কবিতাটি নিশ্চয়ই কয়েকদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল।'

উল্লিখিত কবিতার প্রাথমিক খসড়ালিপিরূপে অনুমিত রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপিধৃত কবিতাটিতে যে রচনার স্থান ও কালের উল্লেখ নেই সে কথা আগে বলা হয়েছে। তবু, উক্ত কবিতা সংবলিত খাতায় অন্যত্র যে স্থান ও কালের উল্লেখ লক্ষ করা যায়, সে অনুসারে অনুমান করা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক মুদ্রিত কবিতার সম্প্রতিপ্রাপ্ত উল্লিখিত প্রাথমিক খসড়ালিপির রচনাস্থলও সম্ভবত কালিম্পঙ এবং এর রচনার তারিখ আনুমানিক ১৩৪৫ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়।

বঙ্গদর্শন পত্রিকার আবির্ভাবকাল (১৮৭২) থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের সূত্রপাত। সেই শুভসূচনাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার সূচনা। বন্দেমাতরম মন্ত্রের ঋষি সাহিত্যগুরু বঙ্কিমের জীবনাবসানের (১৮৯৪) পরেও তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার অবসান হয়নি। প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে, ভাষণে, বিবিধ প্রসঙ্গে। 'বঙ্কিমচন্দ্র' কবিতাটি রচনা করেছেন বঙ্কিম-জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে। উক্ত মুদ্রিত কবিতার যে একটি প্রাথমিক খসড়ালিপিও আছে, সে সংবাদ গত চল্লিশ বছর যাবৎ রবীন্দ্রানুরাগী বিদ্বজ্জনের অগোচর ছিল। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করে সেই বঙ্কিমপ্রশস্তির প্রাথমিক রূপটি বর্তমান নিবন্ধে এই প্রথম প্রকাশ করা গেল।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র'-কবিতা এবং বর্তমান নিবন্ধে প্রকাশিত উক্ত কবিতার প্রাথমিক খসড়ালিপি রূপে অনুমিত 'বঙ্কিমপ্রশস্তি'—এই দুটি রচনা যে একই কবিতা নয়, এবং এই দুটি রচনার প্রত্যেকটিরই যে স্বতন্ত্র সাহিত্য মূল্য আছে, সাহিত্যসেবীমাত্রেই আশা করি সে-কথা অস্বীকার করবেন না।

রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি এবং পাণ্ডুলিপিচিত্র ব্যবহারের অনুমতিদানের জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য এবং রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ মহোদয়গণের নিকট নিবন্ধলেখক কৃতজ্ঞ।

সুধাসাগর তীরে

সুরেশ চক্রবর্তী

॥ ৭ ॥

শেঠ দুলীচাঁদজীর মৃত্যুর পরে বদল খাঁ সাহেব কলকাতার বিশিষ্ট সংগীত রসিকদের আসরে যোগ দিলেন এবং কতকটা আর্থিক প্রয়োজনেই বিভিন্ন শাগির্দদের তালিম দিতে আরম্ভ করেন। তাঁর নিকট সাক্ষাৎ তালিমপ্রাপ্ত সংগীতজ্ঞের তালিকায় আছেন—স্বর্গত অমিয়নাথ সান্যাল, অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, ধ্রুপদী ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জমিরুদ্দীন খাঁ, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, শচীন দাস (ওরফে মতিলাল), বিভূতি দত্ত, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জীবন উপাধ্যায়, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, আর সর্বোপরি আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, যিনি শুধু শিষ্য বা শাগির্দ ছিলেন না,— খাঁসাহেব তাঁকে নিজের পুত্রের চাইতে বেশী স্নেহ করতেন ও কিশোর বয়স থেকেই তাঁকে একেবারে নিজের হাতে গড়ে, পিটে তৈরি করেছিলেন। বদল খাঁ সাহেব অনেক অনুরোধ-উপরোধে মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে একখানা সারেঙ্গীর রেকর্ড করেছিলেন, সেটি আজ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু সুহা ও ভৈরো বাহারের গান দুটি বাজালে শ্রোতৃবর্গ স্পষ্টই বুঝতে পারবেন, বদল খাঁ সাহেবের গায়নশৈলী, তান, ছন্দের কর্তব ও "কারচোব" ভীষ্মদেবের গানের মধ্যেই সবচাইতে বেশী প্রকাশ পেয়েছে।

যাঁদের নাম উপরে লিখলাম, তাঁরা ছাড়াও আরো বহু শাগির্দ ছিলেন খাঁ সাহেবের, কিন্তু আমি শুধু আমাদের সমসাময়িককালে যাঁরা এই সংগীতের বিদগ্ধ পুরুষ থেকে জ্যোতিঃকণা আহরণ করে কৃতার্থ ও তৃপ্ত হয়েছেন, তাঁদের কথাই বলছি, সকলের কথা সব বলতে পারিনি, তাঁরা আমার অজ্ঞানতা-দোষ মার্জনা করবেন।

একটু আগে যে ধীরেন ভট্টাচার্যের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁর সঙ্গে আমার অকস্মাৎ এক সংগীতের আসরে আলাপ হয়েছিল ও বেশ ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের বিপরীত দিকে বোধ হয় ভীম ঘোষের লেনে থাকতেন। এক সন্ধ্যায় তাঁর গৃহে আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন,—অত্যন্ত অমায়িক ও পরিচ্ছন্ন রুচির ধ্রুপদ-গায়ক। কিন্তু ঘরে ঢুকেই দেখি দেওয়ালে রয়েছে বেশ বড় করে বাঁধানো খলিফা বদল খাঁ সাহেবের ছবি। আমি বিস্মিত হলাম ও প্রশ্ন করলাম,—এ ছবি আপনার ঘরে কেন? তিনি বললেন আমি তো শেষকালে খাঁ সাহেবের কাছে গাণ্ডা বেঁধেছিলাম আর কীসব অমূল্য, পুরানো খেয়াল ও ধ্রুপদ আমাকে দিয়েছেন, তা স্মরণ করে এখন মনে হয় কেন আরো আগে ওঁর কাছে যাইনি। কী তার বন্দিশ, কী অদ্ভুত, সুরেলা তার চলন, মুস্কিলয়াৎ তান যেন পুষ্পমঞ্জরীর মতো গানের অঙ্গে অঙ্গে ঝরে পড়ছে। তোমরাই ভাগ্যবান, প্রথম থেকেই ওই ঘরানার তালিম পেয়েছ, তাই তোমাদের কাছে যেসব ফান্দা সহজ মনে হয়েছে আমার ধ্রুপদ সাধা কণ্ঠে তা তো সম্যকরূপে বিকশিত হয়নি। কিন্তু আমার তা নিয়ে দুঃখ নেই,—কেবল মনে হয় এই আকাঙ্ক্ষা আরো বহু পূর্বে হলে আমার সংগীতজীবন পূর্ণতর হতে পারত। ধীরেনবাবু অল্প কিছুদিন আগে স্বর্গত হয়েছেন, কলকাতার সংগীতামোদীরা অনেকেই তাঁর গান নানা ঘরোয়া মহফিলে শুনে থকবেন। অত্যন্ত শান্ত, বিদগ্ধ সংগীতজ্ঞ তাঁকে অজাতশত্রু হিসেবেই জেনেছিলাম।

স্বর্গত অমিয়নাথ সান্যাল সম্বন্ধে পূর্ণ এক পরিচ্ছেদ লিখতে হবে, কারণ দীর্ঘ এগারো বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে কতদিনের কত কথা, মধুময় স্মৃতি মনের গভীরে সঞ্চিত হয়ে আছে, পুরানা জমানার কত রসাল কাহিনী ও ইতিহাস শুনে মন ভরে গিয়েছে, তা কি অত সংক্ষেপে বলা যাবে? শ্রদ্ধেয় রবিশংকর তাঁর "রাগ-অনুরাগ" রচনায় সান্যাল মশাই-এর খুব উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে বলেছেন,—তিনি যে "কেন রিটায়ার করে কৃষ্ণনগরে চলে গেলেন," তা তিনি জানেন না। এই অপ্রকাশিত ইতিহাসও (দেশ ২৩-৯-৭৮) আমি একটু বিশদভাবেই লিখতে চাই, কারণ সান্যাল মশাই-এর সংগীতের উপর প্রবল অনীহা কেন জন্মেছিল, সেটার হদিশও পাওয়া যাবে।

ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবকেও আমি প্রথম বদল খাঁ সাহেবের কন্সু গৃহে দেখেছি ও পরে পরিচয় গভীরতর হয়েছিল। তাঁর পুত্র—ডাকনাম "বালি", —সেও খুব মিষ্টি গাইত—পিতাপুত্রের অকালমৃত্যু বাংলাদেশের সংগীত জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। জমীরুদ্দীন খাঁয়ের খেয়াল তালিম ছিল, বদল খাঁ সাহেবের কাছে আর নিজস্ব ঘরোয়ানায় বহু প্রাচীন ও মধুর ঠুমরী তার মুখে আমরা শুনেছি। জমীরুদ্দীন খাঁ H M V-র সংগীতশিক্ষক ছিলেন আর বেশ ভালো বাংলা বলতে পারতেন—তাঁর বোধহয় দু'একখানা বাংলা গানের রেকর্ডও আছে। তাছাড়া সেই সময় কাজী নজরুল-ও H M V-র সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাঁর ক্ল্যাসিক্যাল-ধর্মী বহু বাংলা গান জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে শোনা হিন্দি খেয়াল/ঠুমরী ভাঙা। দুজনার বন্ধুত্ব মৃত্যুকাল পর্যন্ত অটুট ছিল। বদল খাঁ সাহেব কারুকে ঠুমরী শিখিয়েছেন বলে তো শুনিনি এবং কোনও শাগির্দ ঠুমরীর তালিম চাইলে তাঁকে জমীরুদ্দীন খাঁয়ের কাছেই পাঠাতেন।

নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও কঠোর শাস্ত্রীয় পদ্ধতির অনুসারী বদল খাঁ সাহেব কিন্তু এক বিষয়ে জমীরুদ্দীন খাঁকে পরোক্ষে তিরস্কার করেছেন বহুবার। গোলাপী নেশায় মস্ত্ হলে জমীরুদ্দীন খাঁ-য়ের পদস্খলন হতে বিলম্ব হতো না, বিশেষত রেকর্ড জগতের শিল্পী মহলে। আমাদের কাছে আক্ষেপ করে বদল খাঁ সাহেব বলতেন, "উস্‌কা সব কুছ্ ঠিক হৈ, লেকিন শাগির্দ আপনা বেটীকা শামিল হোতী হৈ, উসকী সাথ ফাঁস জানা গওয়েয়াকো হোনা নহী চাহিয়ে।" চরিত্রের দৃঢ়তা ও সংযম থেকে বিচ্যুত হলে গায়ক বা শিল্পীর পতনের বেশী বিলম্ব হয় না। এ-কথাটা বারংবার আমাদের বলে খাঁ সাহেব সাবধান করে দিতেন ও আমরা যেন আমাদের

ভীষ্মদেব ও অন্যান্য বহু সংগীতশিল্পীর প্রথম গুরু নগেন্দ্রনাথ দত্ত

খলিফা বদল খাঁ ও গণপৎ রাও শ্যামলাল ক্ষেত্রীর শিষ্য আধুনিক সমাজে ঠুংরী ও খেয়াল গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী

গুরুদেব ভীষ্মদেবকে সর্বরকমে অনুকরণ করি, এই উপদেশই করতেন।

এখানে একজন মহিলা-শাগির্দের কথা উল্লেখ না করলে আমার বিশেষ ত্রুটি হবে। তিনি বর্তমানে সংগীতের ক্ষেত্র ত্যাগ করে সংসার ক্ষেত্রে হাতা-বেড়ি-খুন্তি নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু এক সময়ে তিনি কলকাতার সংগীত জগতে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর তালিম বেশিদিনের ছিল না, কিন্তু তারই মধ্যে বদল খাঁ সাহেব যে দীপশিখাটি জ্বেলে দিয়েছিলেন, তার দীপ্তি ও চমকে সংগীতজ্ঞেরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে বন্ধুবর কানাইলাল মুখোপাধ্যায়—ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় নামে পুস্তক প্রকাশক সংস্থার মালিকের সহধর্মিণী—সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। প্রাক-বিবাহ যুগে তাঁর নাম ছিল শ্রীমতী শোভনা রায় এবং এই নামেই তিনি ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট-এ সংগীত প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলেন। সংগীতবিদ বন্ধু সুখেন্দু গোস্বামীর ভাগিনেয়ী এবং সুখেন্দুই মাঝে মাঝে বদল খাঁ সাহেবকে রিকশা করে হ্যারিসন রোড থেকে ডিকসন লেন-এ নিয়ে আসত। এই প্রতিযোগিতার পরীক্ষকেরা একবাক্যে তখন বলেছিলেন এ এক আশ্চর্য শিক্ষা। তাঁরা আশাই করেননি যে এ রকম একজন প্রতিযোগীর সম্মুখীন হতে হবে। আজ শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় সেই পুরানো দিনের স্মৃতিমন্থন করে নিশ্চয়ই মানসিক তৃপ্তি লাভ করেন, আর সংগীতের ক্ষেত্রে এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বুজুর্গের তালিমে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন হয়েছিল তার সাক্ষী হিসাবে আজো বর্তমান রয়েছেন।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি ভীষ্মদেবের প্রথম সংগীত গুরু), তিনিও বদল খাঁ সাহেবের কাছে বহুদিন তালিম পেয়েছেন, অবশ্য তার পূর্বে রাণাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছেও খেয়াল ও টপ্পা শিখেছিলেন। এঁর শিষ্য বিভূতি দত্ত ও শৈলেশ দত্তগুপ্ত পরে বদল খাঁ সাহেবের শাগির্দ হন। বিভূতিবাবু ও খাঁ সাহেবের অন্যতম শিষ্য শ্রীশচীন দাস (ওরফে মতিলাল) একই গৃহে থাকতেন—সেই বিখ্যাত কানাই ধর লেনে। মির্জাপুর স্ট্রীট থেকে এই ছোট্ট রাস্তাটি ও শচীনবাবুদের বৈঠকখানা বাংলাদেশের তখনকার সংগীত জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল বহু গুণিজন সমাগমস্থল হিসেবে। ওখানে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই সংগীতের মহ্‌ফিল বসত আর ওখানেই প্রথম শুনি পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র বালীর গান আর পণ্ডিত মূলের জবরদস্ত খ্যাল, যা শুনে খুব চমকে গিয়েছিলাম। তাছাড়া খলিফা বদল খাঁ, জমীরুদ্দীন খাঁ, সেতারী মুশতাক আলী খাঁ, শ্রদ্ধেয় গিরিজাশংকর চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে প্রায়ই এই আসর আলো করে বসতেন। সংগীতের ঐতিহ্যের পীঠস্থানরূপে এই গৃহটি রক্ষণ করা যায় কিনা, তা সংগীতরসিক ও রইস-সমাজের বিচার্য,—কারণ পূর্ব-মালিকেরা এই বাসস্থান ত্যাগ করে গিয়েছেন। তবে মনে হয় যেভাবে হ্যারিসন রোডের শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাসগৃহ যেমন দিকচিহ্নহীন হয়ে হারিয়ে গিয়েছে, এটার ভাগ্যেও তার চাইতে অন্যরকম হবে না।

শ্রদ্ধাস্পদ গিরিজাশংকর চক্রবর্তী তৎকালীন বাংলাদেশের সংগীতজগতে একটি প্রসিদ্ধ নাম—আজো বহুলোক কলকাতায় ও বাইরে রয়েছেন, যাঁরা গিরিজাবাবুর গানের স্মৃতি মনে করে বিহ্বল হয়ে যান। তিনি ধ্রুপদ-ধামারও শিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর খ্যাল শিক্ষা মূলত বদল খাঁ সাহেবের কাছেই প্রথমে তিনি শ্যামলাল ক্ষেত্রীর গৃহের সান্ধ্য মহ্‌ফিলে প্রায় প্রত্যহই উপস্থিত থাকতেন আর খাঁ সাহেব, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, গণপত রাও ভাইয়া সাহেব ও মোজদ্দীনের গানের রসে মজে গিয়েছিলেন। এ ধরনের মহ্‌ফিল আজ কোথাও হয় বলে জানি না—কারণ, আর্থিক ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে দেশের শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকেরা প্রায় সর্বক্ষণই বিদেশের দিকে পা

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

ফটো : অজিত সেন

বাড়িয়েই আছেন—যেসব প্রতিভাশালী ও উদীয়মান সংগীতপিপাসু শিক্ষার্থী "সাচ্চা" তালিমের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন, তাঁদের দিগদর্শন করাবে কারা? কদাচিৎ কোনও শিল্পী স্বল্পদিনের জন্য দেশে ফিরে এলেও এত এনগেজমেণ্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, যে শিষ্য বা শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিশ্চিন্তচিত্তে ও গভীর অনুধ্যানের সঙ্গে রাগ-রাগিণীর তালিম বা তরীকা বাতাবার অবসর মোটেই মেলে না। গিরিজাবাবুরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে ঐ সব সংগীতের মহাপুরুষদের কাছ থেকে শুধু তালিমই লাভ করেননি, যখনি সংগীতের বা রাগ-রাগিণীর মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে,—তাঁরা দীপ্ত ও প্রখর প্রতিভায় সেই সব অন্ধকার দূর করেছেন। যে-কোনও শিক্ষার্থীর জীবনে রিওয়াজ করতে করতে নানা অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দেয়, ঐ সময় একমাত্র উপযুক্ত গুরুই তার "চক্ষুরুন্মীলিত" করতে সমর্থ হন।

গিরিজাবাবুর শিষ্য ও প্রশিষ্যবর্গও বেশ নাম করেছিলেন, যাঁদের গান শুনেছি ও ব্যক্তিগতভাবে জেনেছি, তাঁরা হলেন, যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, রথীন চট্টোপাধ্যায়, সুশীল বসু, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সুখেন্দু গোস্বামী, গীতা দাস (বর্তমানে মিত্র), ইভা গুহ (বর্তমানে দত্ত), আরতি (মালা) দাস, উমা মিত্র (এখন উমা দে—ইনি কিশোরী বয়সে আমার গুরুদেব ভীষ্মদেবের কাছে শিখেছিলেন, পরে তিনি পণ্ডিচেরী চলে গেলে গিরিজাবাবুর কাছে তালিম নেন) এবং আরো অনেকে। কিন্তু একটা কথা এখানে বলতে চাই যে খ্যাল গানের যে সংগ্রহ এঁরা করেছেন, তা প্রধানত বদল খাঁ সাহেবের তালিম থেকে—ভায়া গিরিজাবাবু।

গিরিজাবাবু অবশ্য খুব ভালো ঠুমরী গাইতেন ও শেখাতেন—কিন্তু বদল খাঁ সাহেব কাউকে ঠুমরী তালিম দিয়েছিলেন বলে জানি না। ঠুমরীর উৎস ছিল শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও গণপত রাও ভাইয়া সাহেব এবং বেনারসী চালের ঠুমরীর প্রবর্তন এঁদের মাধ্যমেই হয়। 'ওয়ৈঠে সৌচি বৃজবাম', 'নহী' মানে জিয়ারা হামারে', 'জাওয়ো মোরী বহিয়াঁ না মড়োরো গিরিধারী', 'আরে রাম কহি' মুরলী', 'সাঁচি কহো মোসে বাতিয়াঁ', 'শ্যাম মধুবন গইলোনা'—ইত্যাদি বিখ্যাত ও রসালো ঠুমরী এই আড্ডা থেকেই বেরিয়েছিল। অমিয় সান্যাল মশায়ের কাছে বহু ঠুমরীর সংগ্রহ ছিল এবং তাঁর বন্ধু কান্তিবাবু (প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও শ্রীমতী আলপনা-র পিতা) অনেক ঠুমরী ও খ্যাল নানা শিক্ষার্থীদের শিখিয়েছেন। তিনি আমাদের গৃহে-ও কবার এসেছেন—অত্যন্ত অমায়িক ও সংবেদনশীল মন, বলেছেন—অমিয়-ই আমাকে এই সুরের স্রোতোধারায় অবগাহন করিয়েছে—তাই এখন এটাই আমার জীবনের ধর্ম হয়ে উঠেছে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন যথার্থ সংগীতরসিক বিদগ্ধচিত্ত লোককে হারালো।

আজ বাংলাদেশে যে মধুর ঠুমরী গানের প্রচলন হয়েছে বিশেষত উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ও ভদ্রমহিলা সমাজে, তার পুরোধা হিসেবে গিরিজাবাবুর দান ও শিক্ষা অনস্বীকার্য। বনারসী ঢংয়ের লচাও ঠুমরী এঁরা শিখেছিলেন প্রধানত স্বর্গত গণপত রাও ভাইয়া সাহেবের ঘরানায় এবং সেই অপূর্ব রসে বাংলার শিক্ষিত ও রইস মহলকে তাঁরা নানাদিক থেকে অভিষিক্ত করেছিলেন। এঁদের পূর্বে যে ঠুমরীর প্রচলন ছিল, তা বহুল পরিমাণে "ঘনাক্ষরী" ধরনের যাতে কথার বাহুল্য থাকত যাতে দ্বিগুণ চৌগুণ বাট তিহাই করা চলে। সুরের "ভাও বতানার" চাইতে লয়কারী ছিল মুখ্য এবং তখনকার খেয়াল ও কতকটা কঠিন লয়ের কাজকর্ম দেখাবার একটা বাহন বলে মনে করা হত। আমাদের কলকাতা বাসের পূর্বে একবার খান সাহেব আবদুল করিম এখানে গান করে গেছেন—তাঁকে এনেছিলেন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়। কিন্তু শুনেছি তাঁর গান মুষ্টিমেয় লোক ও রসিক ব্যক্তিরাই উপভোগ করেছিলেন—অর্থাৎ সর্বসাধারণের মধ্যে তার বিশেষ প্রশংসা বা কদর লাভ করেনি। কারণ লোকের রুচি ও লক্ষ্য ছিল, ছন্দ ও লয়কারীর দিকে—কোন ওস্তাদ কত কঠিন তানকর্তব করে দুরূহ চক্করের মধ্য দিয়ে সমে স্থিতি লাভ করেন, সেটাই ছিল দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য। আরো শুনেছি পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্রের পিতা ও পিতৃব্য—শিবসেবক ও পশুপতিসেবক মিশ্র ভ্রাতৃদ্বয় এই লয় ও ছন্দের কারুকার্য নিয়ে নানারকম ক্রিয়া দেখাতেন, আর বলতেন যে তাঁরা ভারতবর্ষের যে কোনও তবলীয়া বা পাখোয়াজীকে বলে বলে বেতালা করতে পারেন। অবশ্য অত তালবাজী হলে সুরের নিশ্চিত সমাধি ঘটে—এটা সকল সংগীত রসিকই জানেন ও বলে থাকেন।

এই রকম পরিবেশে ও রুচির আওতায় বাংলাদেশের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় যে সুরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, তার মধ্যে সব চাইতে বেশী প্রভাব পড়েছিল ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের ও তাঁর শিষ্যবর্গের, কারণ যে সব "আনোখে" ও সুরীলা চীজ পূর্বতন ওস্তাদেরা কলকাতার আসরে শুনিয়ে গিয়েছেন কিন্তু কাউকে তালিম দেননি, সেই সব অপূর্ব বন্দিশের গান খাঁ সাহেব তাঁর শাগির্দদের মাধ্যমে সারা বাংলায় ছড়িয়ে দিলেন। উচ্চ-সংগীতের গুপ্ত ও সঞ্চিত অমৃত-ভাণ্ড যেন তিনি খুলে দিলেন—যার যতখানি কামনা ও ক্ষমতা, সেই অনুযায়ী পান করে যাও, সব ফান্দা, সিলসিলা, বন্দিশ সবার জনাই উন্মুক্ত—এই রসে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হয়ে যাও। (ক্রমশ)

এক অবিস্মরণীয় চরিত্র

ওঙ্কার গুপ্ত

এসেছিস? বোস। বড্ডো ভালো দিনেই এসেছিস রা। আজকের রান্না দেখিস।

—কী রান্না হচ্ছে, দাদা?

আরে, বোস না। দেখতেই পাবি। তুই অনেক দিন পর এলি। একটা টেলিফোনও তো করতে পারিস। যাক, এই যে ক'টা দিন আছি। তারপর এ শহরে আর কেউ তোদের এতো আগ্রহ করে ডাকবে না, বুঝলি। পাঁড়ু, দ্যাখ, কে এসেছে। একটা গেলাস দে। হ্যাঁ, আর ও ঘরে যা। বড়ো সায়েবকে স্কচ দিবি জামাই-বাবুকে হেনেসি, মুকুন্দকে জিন আর ফ্রেশ লাইম—হ্যাঁ, চামচে চিনি দিয়ে—অনেকটা বরফ দিবি। একেনে একটা সোডা দে। হ্যালো কে? ও, বোস সায়েব। দেরি হচ্ছে কেন, চলে আসুন। আবার কতা! আজ তো সব কিছু আপনার অনারে। সবাই এসে গ্যাচে। হ্যাঁ, মেহতা আসচে, কতা হবে। চলে আসুন। ক'জন বন্ধুকে আনবেন নিশ্চয়। এ তো আপনারই বাড়ি। আসুন, চলে আসুন।

নে, খা। কেমন আচিস, বল! তোদের আপিসের খবর কী? বাড়িশুদ্ধ কেমন আচে? আর, শোন, ঐ ব্যাটার কাজটা হলো? ঐ যে রে, ঐ মড়াখেগো। ওর প্রতি আমার কোনো সীমপ্যাথি নেই। ও মড়ুক! তবে, জানিস তো—বউ, ছেলেমেয়ে একগাদা। ওরা খাবে কোত্থায়? যা পারিস করে-দে। চাকরিটা থাকে যেন, দেকিস।

হ্যালো, কে? কী হলো রা? কোত্থেকে বলচিস? এয়ারপোর্ট? কেন, আসতে দেরি হবে? হোক। পারবিনে? ঠিক আচে। ক'জনের খাবার? চারজনের? ঠিক আচে। এক্ষুনি পাটাচ্চি। চলে যাবে আটটার মধ্যে।

সুধীর! কাবাব নিয়ে আয়। পাঁড়ু! ও ঘরে দিয়েচিস সব। গুহকে কি দিলি? কোকা কোলা? ঠিক আচে। ভুবনেশ্বরকে ডাক। ...আরে, আসুন, আসুন রায় সায়েব। কী সৌভাগ্য। কতো দিন পরে। পাঁড়ু, গেলাস দে। আর ঐটে দে। আরে, ওটা না, ওটা না—ঐটে। হ্যাঁ। সোডা দে। বসুন রায় সায়েব।

কই রে, সুধীন, হারামজাদা! কাবাব নিয়ে আয়। কাবাব হয়নি এখনও। তবে, বেটের ফ্রাই দে। দোলমাটা হয়েচে?

—আজকে ভেটকি ফ্রাই নেই বুঝি, দাদা?

আচে, আচে। ভেটকি ফ্রাই থাকবে না? সব আচে। আজকে কিন্তু পালাবি নে। সেদিন না খেয়ে চলে গেলি কেন? সেদিনের সেই চাটগেঁয়ে রান্নাটা খেলিনে। খেলে বুঝতিস। নে, খা, বেটের ফ্রাই। রায় সায়েব, নিন। ইট গোজ ওয়েল উইথ ড্রিংক।

হ্যালো, কে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। সায়েব আচেন। চলে এসো। কতা হবে। তুমি এলেই হবে। কী? মোজেক। এলে কতা হবে। না, টেলিফোনে নয়। ছাড়!

কই রে, খাচ্চিস নে? খা! কে আচিস, স্যালাড নিয়ে আয়। পাঁড়ু, একটা সোডা! রায় সায়েবকে ঠান্ডা জল। ও ঘরে দেকিস।

ভুবনেশ্বর, দুটো টিপিন-বাটিতে চিকেন, একটায় ফ্রাই, আর একটায় ফ্রায়েড রাইস—পাটিয়ে দে ভটচাজকে। আর চারজনের মতো সব খাবার পাটাবি চৌধুরী সায়েবের বাড়িতে। আটটার ভেতরে গিয়ে পৌঁচয় যেন। ছোটো গাড়িতে করে যাবে—ড্রাইভার দিয়ে আসবে। আইয়ে, আইয়ে, মেহতা সাব! নমস্তে, নমস্তে। চলিয়ে উধর। আপকে লিয়ে আজ এক ভেজিটেরিয়ান—।

—কই, বললেন না তো আজকের স্পেশাল রান্না কী?

বললুম তো, খেতে বসলেই দেখতে পাবি। যাক, শুনতে যখন চাইচিস তো শোন। মাশরুম সুপ, ভেটকি ফ্রাই, রাশ্যান স্যালাড, নিয়াপলিটান চিকেন। চিকেনটা খেয়ে দেকিস। আমি নিজে রেঁধেছি—দুটি ঘণ্টা ধরে দমে সেদ্ধ হয়েছে। ওদিকে মাটন বড়া কাবাব, নান, পটলের দোলমা, কচুরি, লেমন রাইস সায়েবের পছন্দ পুডিং। মধুপুর থেকে আলাদা মিষ্টিও এসেচে।...হ্যালো, কে? ভাই! বলো, মন্ত্রী। অসুখ? কী করতে হবে? ডাক্তার পাঠাবো? টাকা? এখনি কাউকে পাটিয়ে দেবো। না, না, সে হয় না। আমি গাড়ি পাটাচ্চি, বড়ো গাড়ি দিয়ে সরকারকে পাটাবি। এক্ষুনি যাচ্ছে। কোনো চিন্তা নেই।...

কী, রা, দেবু, তুই কখন এলি? কবে মধুপুরে যাবি, বল! পরশু? বেস। চলে যাও। আমি কাল সকালে টেলিফোন করে দেবো। সব ব্যবস্থা তো হয়েই আচে। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। ওখানে বিশটা লোক রয়েচে। হ্যাঁ, 'মাতৃকায়' থাকবে। একটা ফ্যামিলি রয়েচে, তাতে অসুবিধে নেই। কানো, তুই 'মাতৃকা' দেখিসনি? 'সাধুসংঘ' এখন ভর্তি। ঠিক আচে। তুই চলে যা। বউমা যাবে তো? হ্যাঁ, সবাইকে নিয়ে যা। আবার কতা! ভাগ্।

কই রা, খাচ্চিস নে, খা! পাঁড়ু এদিকে আয়। সুধীর, ফ্রাই দে। ভুবনেশ্বর, খাবার পাটা। ওরে, আর কে আচিস! ও ঘর দ্যাখ।...

ষাট-সত্তর দশকের যে-কোনো একটি সন্ধ্যায় ভবানীপুর পদ্মপুকুরের একটি বাড়িতে গৃহকর্তার একতলার ঘরের দৃশ্য এটি। অপটু লেখনীতে পুরো সিনারিও তৈরি করতে পারলাম না, হয়তো। সে এক বিচিত্র জগৎ। কিন্তু একবার সে জগতে উপস্থিত

থাকলে মনের উপরে যে ছাপ পড়তো তা কোনো সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়।

গৃহকর্তার নাম বিভিন্ন মহলে বহুশ্রুত। অনাথনাথ সাধু।

অনাথ সাধু কোন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। ছিলেন না বড়ো ব্যবসায়ী। প্রচলিত অর্থে বড়ো চাকুরেও ছিলেন না। বড়ো ব্যারিস্টার কি ডাক্তারও নন। তবু, ওঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক বিরাট আড্ডা। মজলিস বলাই শ্রেয়। রোজ সন্ধ্যায় ওঁর বাড়ির সামনে একগাদা গাড়ি ভিড় করতো, ভেতরে জমায়েত হতেন এ মহানগরীর নানান মহলের বহু কৃতী পুরুষ। দিল্লি-বোম্বাইয়ের কেষ্টবিষ্টুরাও থাকতেন অনেক সময়। রাত দশটা বা তারও বেশী সময় অবধি চলতো পান-ভোজন-কথোপকথন। এরই এক ফাঁকে সামান্য কিছু আহার করে নিদ্রামগ্ন হতেন গৃহস্বামী।

সারা দিন লোকের আনাগোনার কমতি ছিল না। টেলিফোনও বাজতো মুহুর্মুহু। তবে, দিনের বেলায় থাকতো অর্থ-প্রার্থীর ভিড়। রাতের বেলায়ও অর্থ-প্রার্থী আসতো, কিন্তু সংখ্যাগুরু ছিল অভ্যাগতেরাই। শুধু পান-ভোজন নয়, অনাথনাথের সঙ্গ ছিল যথেষ্ট আকর্ষক। চতুর্দিকে আলোর রোশনাই, কেউকেটা চেহারা, দামী পানীয়, আহা মরি খাদ্য-সম্ভার, পোশাক-পরিচ্ছদের জৌলুস—আর মধ্যখানে শীর্ণকায় গৃহকর্তা তাঁর ডিভানে অর্ধশয়ান আদুর গায়ে বা ফতুয়া পরে, মুখে বিড়ি। কিন্তু কী ব্যক্তিত্ব! আর কতো স্মার্ট কথাবার্তা। কতো বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ। ব্যান্ধ উকীল কি কুশল সলিসিটরের সঙ্গে যেমন আইন নিয়ে কথা বলছেন, আর্কিটেক্ট বা ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলছেন গৃহনির্মাণ নিয়ে; বড়ো ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার ব্যবসা নিয়ে।

কী ছিলেন অনাথ সাধু? চোরবাগানের সাধু পরিবারের সন্তান, রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধুর বড়ো ছেলে। ম্যাট্রিকে বাংলায় ফার্স্ট হয়েছিলেন (আরে, ধুৎ! কত্তা মাস্টার রেখেছিলেন রাজেন বিদ্যাভূষণকে—উনি সোনার মেডেল পাইয়ে দিয়েছিলেন।); উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত গিয়েছিলেন, ফিরলেন বিলেতী পোশাক ও রান্নায় বিশারদ হয়ে। যোগ দিলেন এক বীমা কম্পানিতে, কালক্রমে সেই কম্পানির অনেকখানি কর্তৃত্ব হাতের মুঠোয় এলো। এজেন্সী শুরু করে যথেষ্ট ব্যবসা করলেন, রেজেস্ট্রার করলেন, ভোগবিলাসে ব্যয় করলেন। পৈতৃক সূত্রে অনেক সম্পত্তি পেয়েছিলেন, নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতায় তা আরও বাড়িয়ে ফেললেন। শেষ জীবনে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন পদ্মপুকুরে। এর মধ্যে মধুপুরে পৈতৃক বাড়ি 'সাধুসংঘ'র কাছে নিজের বাড়ি 'মাতৃকা' তৈরি করলেন। সেখানে সারা বছর অতিথির ভিড়।

সফল, সচ্ছল ব্যক্তি কলকাতা শহরে অনেক ছিলেন, আজও আছেন। কিন্তু অনাথনাথ ছিলেন একজনই, সত্যিকার অনাথের নাথ। সর্বজনীন 'দাদা' সর্বজনের বিপত্তারণ। মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়াশুনোর অনাথদার সাহায্য; চাকরি পাওয়া, চাকরিতে প্রোমোশন,—অনাথদাকে ধরো। জমি-বাড়ি কিনবে—অনাথদাকে বলো। মামলা রুজু করাতে চাও—অনাথদার শরণ নাও। ভালো উকীল-ব্যারিস্টার চাই—দাদা ব্যবস্থা করবেন। আইন-পুলিসের ঝামেলা—দাদা রয়েছেন।

অনাথনাথকে 'না' বলতে শোনেনি কেউ। "দেখি, কী করা যায়।" না, কমরাজের মতো শুধু 'পারকলাম' বলে শেষ করতেন না সব। প্রাণপণ চেষ্টা করতেন কিছু একটা করার। রামের কাজ শ্যামকে দিয়ে, শ্যামের কাজ যদুকে দিয়ে, যদুর কাজ মধুকে দিয়ে আবার মধুর কাজ রামকে দিয়ে। এ ছাড়া, সবার কাজে নিজে তো রয়েইছেন। নিন্দুকের দল এর মধ্যে স্বার্থ খুঁজে বার করার চেষ্টা করতো, কিন্তু সেটা নিছক তাদের চরিত্র-ধর্ম বজায় রাখার জন্যে। তাঁর দানের কাহিনী গেজেটে ওঠার মতো ছিল না হয়তো, কিন্তু উপচিকীর্ষায় তাঁর জুড়ি এ যুগের কলকাতায় মেলা ভার।

বহু সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কিন্তু নিজে ছিলেন প্রচার-বিমুখ। ভালোবাসতেন মানুষ—সব রকমের মানুষ। দুর্মুখ ছিলেন, ছিলেন স্পষ্টবাদী এবং বেপরোয়া। সব কিছুর আড়ালে লুকিয়ে ছিল একটি কোমল, মহৎ প্রাণ—অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, প্রাচুর্যে লালিত, সমবেদনায় সিঞ্চিত।

১৯৪৮ সাল থেকে চিনতাম ওঁকে। অনেকবার পৈতৃক আবাস চোরবাগানে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু ও'র চেহারা, পোশাক (কোঁচা-দোলানো ধুতি, গলাবন্ধ চায়না কোট, সোনায় নাম লেখা বোতাম) আর আমি কলকেতিয়া ভয়া প্রথম বয়েসে মনের মধ্যে বিরূপতার সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে ও'র পারিবারিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত উদারতার বহু কাহিনী শুনে ব্যক্তিটি সম্পর্কে আগ্রহ জন্মেছিল খুবই। দীর্ঘদিন পরে তখন কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার মুখে উনি, হঠাৎ একটি ছোট্টো ঘটনা ঘটলো। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার গুটি কতো অকিঞ্চিৎকর ব্যঙ্গগল্প পাঠ করে উনি প্রায় জোর করেই ওঁর পদ্মপুকুরের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এবং প্রথম দিনেই বুঝতে পারলাম উনি প্রকৃত সাহিত্যরসিক। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন না কেবল, সমালোচনায়ও দারুণ দড়। তারপর বহুদিন গিয়েছি ওঁর মজলিসে; প্রত্যক্ষ করেছি কর্মকলাপ; আলোচনা করেছি দেশী-বিলাতী রান্না নিয়ে; তর্ক করেছি সাহিত্য নিয়ে; দুচোখ ভরে দেখেছি বিচিত্র মানুষের সমাগম। আর ওঁর দরবারে হাজির করেছি দু'চারজন সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রসিকজনকে যাদের সঙ্গে এক লহমাতেই স্থাপিত হয়েছে ওঁর এক আত্মিক মেল-বন্ধন। সে-সব বন্ধন ছিন্ন করে গত পঁচিশে বৈশাখ ওপারে চলে গেলেন অনাথদা—এ-কালের কলকাতার এক অবিস্মরণীয় চরিত্র।

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৪৯ ॥

রাইমোহন ও তার দলবল চন্দ্রনাথকে উদ্ধার করলো নিমতলার শ্মশানঘাট থেকে। তিনদিন ধরে ওরা সারা কলকাতা শহর চষে ফেলেছিল। হীরা বুলবুলের প্রায় অর্ধোন্মাদিনীর দশা। হিন্দু কলেজ থেকে চন্দ্রনাথ বিতাড়নের সংবাদ ছাপা হয়েছিল সংবাদ পত্রে, এমনকি বাগবাজারের বোসেদের বাড়িতে চন্দ্রনাথই যে বাবুদের এক শ্যালককে পাথরের চাঙড় ছুঁড়ে মেরে মাথা ফাটিয়েছে, সে খবরও গোপন থাকেনি।

রাইমোহন বুঝেছিল, বাবুদের পাইক বরকন্দাজরা চন্দ্রনাথকে একবার ধরতে পারলে হাতে নাতে মেরেই ফেলবে। কোতোয়ালির সাহায্য নিয়েও তারা ওকে ধরবার চেষ্টা করবে। তার আগেই চন্দ্রনাথকে কোথাও সরিয়ে ফেলা দরকার।

চন্দ্রনাথকে প্রথমে চিনতেই পারেনি রাইমোহন। শ্মশানে ডোমেদের পাশে সেও ডোম সেজে ছিল। পরনে শুধু মালকোচা মারা ধুতি, সারা গায়ে কালি-ঝুলি মাখা, মুখখানাতেও ছাই মেখেছে, চুলগুলো আঠার মতন। নিজের চেহারার চেয়েও বড় একটা বাঁশ নিয়ে সে চুল্লি খোঁচায়, আর শ্মশান-যাত্রীরা যে ভিজে আতপ চাল ও কলা বাতাসা ফেলে যায়, সেইগুলি খেয়ে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

রাইমোহন চেনার আগেই চন্দ্রনাথ তাদের চিনতে পেরে হাতের বাঁশটি ফেলে মেরেছিল এক দৌড়; তখন হারাণচন্দ্র চেঁচিয়ে উঠেছিল, ঐ তো চাঁদু।

রাইমোহনের বয়েস হয়েছে, এত তাজা বয়েসী কিশোরের সঙ্গে সে দৌড়ে পারবে কী করে। তার সঙ্গীরাও মাতাল ঝাঁতাল মানুষ, দৌড় ঝাঁপে বিশেষ দড় নয়। তবু সবাই মিলে ধর্ ধর্, ছোঁড়াটাকে ধর, বলে ছুটেছিল। কলকাতার মানুষ হুজুগে, একটা কোনো উপলক্ষ পেলেই হলো। শ্মশান-মশানে অনেক পরগাছা ধরনের মানুষ থাকে, মড়াদের ওপর নির্ভর করেই তারা জীবন কাটায়। তারা অধিকাংশ সময়ই শুয়ে থাকে অথবা ইটের টুকরো দিয়ে বাঘবন্দী খেলে, হরিধ্বনি দিয়ে কোনো মড়া দাহের দল এলে তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এখন একটি জ্যান্ত ছেলেকে তাড়া করার দৃশ্য দেখে তারাও মজা পেল এবং অনুসরণকারীদের দলে যোগ দিল। নিশ্চয়ই কোনো চোর ধরার ব্যাপার, আর চোর ধরাতে সকলেরই, এমনকি অন্য চোরেদেরও বিশেষ উৎসাহ থাকে।

এক সঙ্গে অনেকের তাড়া খেয়ে চন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুক্ষণ ভীত ইঁদুরের মতন এদিক ওদিক করলো, তারপর দিশাহারা হয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো গঙ্গায়।

সে সাঁতার জানে না, কিন্তু ডুবে যাবার সুযোগ ঘটার আগেই শ্মশানের পরগাছারা কয়েকজন একসঙ্গে নেমে জল দাপিয়ে তুলে আনলো তাকে। এরা গঙ্গার জলের তলা থেকে শ্মশানবন্ধুদের ছুঁড়ে দেওয়া তামার পয়সা পর্যন্ত তুলে আনে, আর একজন মানুষকে তোলা তো এদের কাছে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের যোগ্য কাজ।

ভিড় ঠেলে কাছে এগিয়ে এলো রাইমোহন, সে দারুণ ভাবে হাঁপাচ্ছে। চন্দ্রনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে আকুলভাবে বললো, চাঁদু চাঁদু বাপ আমার, একি কাণ্ড তুই! তোর মা যে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে রে!

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ছটফট করছে চন্দ্রনাথ। তার চোখ বোঁজা, মুখখানা কুঁকড়ে আছে।

রাইমোহন বললো, ডোম চাঁড়ালদের সঙ্গে ছিলি তুই, ওরে তোর কি একটু ঘেন্নাও নেই। সোনার বর্ণ একেবারে কালি হয়ে গেচে! বাপ আমার চল, ঘরে চল।

এক ঝটকা মেরে রুক্ষ কণ্ঠে চন্দ্রনাথ বললো, ছাড়ো আমাকে। আমি যাবো না, বাড়ি যাবো না! আমি তোমাদের চিনি না!

তখন তিন চারজনে মিলে জোর করে চ্যাংদোলা করে তুলে ওকে চাপানো হলো একটি কেরাঞ্চি গাড়িতে। গাড়োয়ানকে রাইমোহন বললো, একটু শিগগির শিগগির চল বাবা! বখশিস পাবি! গাড়ির মধ্যে তারা চন্দ্রনাথকে চেপে ধরে রইলো। রাইমোহন পেছন ফিরে আড়াল করে রাখলো গাড়ির দরজাটি, যাতে পথের লোক কেউ দেখতে না পায়।

একখানা সাদা থান পরে দোতলার ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল হীরা বুলবুল। এই তিনদিন সে এক কণা অন্ন মুখে তোলেনি। কেঁদে কেঁদে তার সুন্দর ডিমছাঁদের মুখটি এখন ফুলে যেন বাতাপি লেবুর মতন হয়ে গেছে।

রাইমোহন ঘরে ঢুকে বললো, ও হীরে, ওঠ্, চোখ মেলে দ্যাখ কাকে এনিচি!

হীরা বুলবুল মুখ ফিরিয়েই চন্দ্রনাথকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পক্ষিমাতার মতন ঝাঁপিয়ে পড়লো চন্দ্রনাথের ওপর।

কিন্তু চন্দ্রনাথের কাছে মাতৃস্নেহের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সে মায়ের আলিঙ্গনে ধরা দিল না, তার আগেই এমন এক ধাক্কা দিল যে হীরা বুলবুল ঘুরে গিয়ে পড়লো দেয়ালে, ঠক্ করে তার মাথা ঠুকে গেল।

তারপর চন্দ্রনাথ তীব্র গলায় বললো, তুই আমার মা না রাক্ষুসী? আমায় কেন গর্ভে ধারণ করিছিলি? আর যদি ধারণ করেইছিলি, আতুর ঘরে আমার গলা টিপে মেরে ফেলিস নি কেন?

মাত্র এই তিনদিনেই চন্দ্রনাথের শুধু যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাই-ই নয়, তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত বদলে গেছে। সে এখন বয়স্কদের ভঙ্গিতে বয়স্কদের ভাষায় কথা বলে।

হীরেমনি ভেউ ভেউ করে কান্না জুড়ে দিল।

রাইমোহন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, কাঁদিস নি হীরে, এই কি কাঁদবার সময়! ছেলে ফিরে পেয়িচিস, ভগবানকে পেন্নাম জানা। মায়ে-ছেলেতে এমন আথান্তর হয়ই, ছেলের কতা গায়ে মাকতে নেই।

তারপর সে চন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললো, চাঁদু সোনা, বাপ আমার, অমন কটু কতা বলিসনি! তোর অপমানে কি আমাদেরও কম অপমান হয়েচে? তোর মা একেবারে মরমে মরে আচে। কাটা ঘায়ে এখুন আর নুনের ছিটে দিসনি!

চন্দ্রনাথ বললো। তুমি আমায় বাপ বলবে না! তুমি কে? তুমি আমার কিসের বাপ? কাঁদানের বাপ? তুমি আমায় কেন জোর করে ধরে এনোচো?

রাইমোহন বললো, সব কতার উত্তর দেবো। এখুন একটু ঠাণ্ডা হ! হাত মুক ধুয়ে কিছু পেটে দে।

চন্দ্রনাথ বললো, না!

হীরা বুলবুল বললো, ওরে চাঁদু রে, আমায় তোর যত ইচ্ছে বকিস; আমি আর পাপ করবো না কক্ষণো। আমি প্রাচিত্তির করবো। তোকে নিয়ে আমি তীত্থে যাবো! পুরীর জগন্নাথের সোনার মুকুট গড়িয়ে দেবো। বেন্দাবনে কৃষ্ণের হাতে সোনার বাঁশী তুলে দোবো। তাতেও আমার পাপ ধুয়ে যাবে না?

চন্দ্রনাথ বললো, তুই মর। তুই যা খুশী কর। আমি তোদের কেউ না।

চন্দ্রনাথকে জোরজার করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তার ঘরে। সেখানেও চন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ সজারুর মতন রইলো রোঁয়া ফুলিয়ে। ঘরে তার বইপত্র যা ছিল সব ছিঁড়ে একেবারে ধ্বংস করে ফেললো। খাবারের থালা সে ছুঁড়ে মারলো দেয়ালে। তার উগ্র উন্মাদের মতন মূর্তি দেখে কেউ ঘরে ঢুকতে সাহস পেল না।

সেই ভোর রাতেই চন্দ্রনাথ আবার পলায়ন করলো বাড়ি থেকে।

অনুসন্ধান পার্টি নিয়ে রাইমোহন আবার ঘুরতে লাগলো কলকাতার পথে পথে। সবকটি শ্মশান ঘুরে দেখা হলো, চন্দ্রনাথ এবার ওসব দিকে যায়নি। কালীঘাটের মন্দিরের কাছে শয়ে শয়ে কাঙালী ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্রনাথ সেখানে ওদের মধ্যে মিশে থাকতে পারে ভেবে রাইমোহন সারাদিন ওৎ পেতে রইলো, কিন্তু চন্দ্রনাথের সন্ধান মিললো না। বার সিমলেতে অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তন উপলক্ষে ভিখারীদের ফুটকড়াই ও আধলা বিলোনো হচ্ছে কিংবা পাথুরেঘাটার ঠাকুরদের বাড়িতে এক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী দরিদ্রনারায়ণ সেবা হচ্ছে, সেসব জায়গাতেও খোঁজ করে দেখলো রাইমোহন। চন্দ্রনাথ নেই।

পাঁচ দিনের মাথায় তাকে পাওয়া গেল মেটেবুরুজে। সেখানে পর পর কয়েকটি পুকুর ভরাট করে রাস্তা তৈরি হবে, জনা পঞ্চাশেক মজুর খাটছে তাদের মধ্যে চন্দ্রনাথ একজন।

এবার রাইমোহনকে দেখে চন্দ্রনাথ পালাবার চেষ্টা করলো না; একখানা লোহার শাবল তুলে সে তাকে মারতে তেড়ে এলো। আঘাতটা ঠিক মতন লাগলে তার মাথাটা চৌচির হয়ে যেত। ঠিক সময় রাইমোহন শরীরটা বাঁকিয়ে নিয়েছিল। শাবলের ঘা লাগলো তার কাঁধে, তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে সে দু'হাতে চন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরে বললো আর তোকে ছাড়চিনি, বাপ আমার! এবার সর্বক্ষণ তোকে বুকে আগলে রাকবো।

এক ফিরিঙ্গি ঠিকাদার সেখানকার কুলিদের কাজ দেখাশুনো করছিল, সে এই বিচিত্র ঘটনায় আকৃষ্ট হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, এসব কী হচ্ছে ?

রাইমোহন বললো, মাই চাইল্ড, স্যার ! ভেরি ম্যাড, স্যার। পাগলা কুকুরে বাইট করেছেল স্যার। সেই থেকে মাথা ট্রাবলসাম, স্যার।

ফিরিঙ্গিটি আর কোনো বাক্য ব্যয় না করে ডান হাতের পাঞ্জাটি দুবার এমনভাবে নাড়ালো, যার অর্থ, নিয়ে যাও।

আবার জোর করে চন্দ্রনাথকে তোলা হলো গাড়িতে। এবার বাড়িতে এনে তাকে একটি ঘরে বন্ধ করে শিকলি তুলে দেওয়া হলো।

হীরা বুলবুলকে রাইমোহন বললো, আমি বলি কী হীরে, এ পাড়া থেকে এবার বাস তুলে দে। তুই তো বাবু-বসানো ছেড়েই দিতে চাইচিস, তবে আর এ পাড়ায় থেকে লাভ কী। শহর ছেড়ে চল খিদিরপুরের দিকে চলে যাই। কিংবা রসাপাগলায় বন কেটে অনেক বসত বাড়ি হচ্চে সেখেনে একটা বাড়ি কিনে তোতে আমাতে স্বোয়ামী স্ত্রী সেজে থাকবো। ছেলের মাতা গরম হয়েচে, ওকে নিয়মিত ক'দিন মকরধ্বজের সঙ্গে মধু-তুলসীপাতা মেড়ে খাওয়ালেই আবার ঠিক হয়ে যাবে।

হীরা বুলবুল বললো, আমার ওতে কাজ নেই। তুমি ব্যবস্থা দ্যাকো, আমি তিত্থি যাত্রায় বেরুবো। আমার পাপের প্রাচিত্তির করতে হবে।

রাইমোহন বললো, পাপ আবার কী ? তুই কোন পাপ করিচিস ? মেয়ে মানুষে কখনো একলা একলা পাপ করতে পারে না। তোর সঙ্গে যে-সব বড় মানুষরা পাপ করেচে, তারা কি তীর্থযাত্রা করে পাপ ধুতে যাচ্ছে ? প্রতিশোধ নিতে হবে, বুঝলি ? যে বড়মানুষগুলোনের জন্য চাঁদুকে হিন্দু কালেজ থেকে তাড়ানো হয়েচে, সেই সব ব্যাটাদের দেকে নোবো। এর শোধ যদি না তুলি তাহলে আমার নাম রাইমোহন ঘোষাল নয়। না পারলে রুপো বাঁদরটার নামে আমার নাম রাকিস।

হীরা বুলবুল বললো, অত বড় বড় কতায় আমার কাজ নেই। ঐ ছেলে বৈ আমার আর কেউ নেই এ সংসারে।

রাইমোহন বললো আর কেউ নেই ? আমি তোর কেউ নই ? এতদিন লাথি ঝ্যাটা খেয়ে তোর পায়ের কাচে রইলুম, এখন বলচিস, আমি তোর কেউ নই !

—ওমা, সে কতা কখন বল্লুম ! আমি তিত্থি করে গেলে তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে। তবে আর এখেনে কখনো ফিরচিনি। সে কতা আমি আগেই বলে দিলুম। ঘেন্না ধরে গ্যাচে এই কলকেতা শহরের ওপর।

—সে যে পালানো হবে রে। আমরা ভয় পেয়ে পালাবো কেন ?

—তা হলে তুমি থাকো। আমরা মায়ে পোয়ে বেরিয়ে পড়বো।

—কোতায় যাবি ?

—যেদিকে দুচোক যায়।

—এই জন্যেই না বলে মেয়ে মানুষের বুদ্ধি। বেরিয়ে পড়বা বললেই হলো। বেরুতে গ্যালে অনেক বন্দোবস্ত লাগে।

—আমার কিছু লাগবে না। ছেলের হাত ধরে আমি চলে যাবো, কে আমায় কী কর্বে।

—অমনি বললেই হলো। ওরে তোর এখনো গতর আচে, চাঁদপানা মুখ আচে, ঢলো ঢলো যৌবন আচে, তোকে কেউ নির্ঝঞ্ঝাটে যেতে দেবে ? পথের বাঁকে বাঁকে বাঘ নেকড়েরা ওঁৎ পেতে রয়েচে, তোকে ছিঁড়ে খাবে।

—সেইজন্যেই তো বলচি, তুমি চলো। তুমি আমাদের চোকে চোকে রাকবে। তোমায় ছেড়ে কি কোতাও যেতে পারি।

রাইমোহন নিজের পোড় শরীরখানির দিকে তাকিয়ে ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমার কি আর সে তাগদ আচে রে। কোনোদিন লাঠি বন্দুকও ধরতে শিকিনি !

তারপর নিজের ললাটে দুটি টোকা দিয়ে বললো, আমার জোর এখেনে। এই বুদ্ধির জোরে কলকেতার বাবুদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারি কিন্তু ঠ্যাঙাড়ে-বোম্বেটেদের কাচে সুবিধে করতে পারবো না। তাই তো বলচি, পালাবি কেন ? আমরা এই খেনে থেকে লড়বো।

এই সময় বাড়ির সম্মুখস্থ পথে কয়েকটি ভারি পায়ের লোহা বাঁধানো জুতোর শব্দ হলো। জানলার খড়খড়ি সামান্য ফাঁক করে উঁকি মেরে রাইমোহন দেখলো, কয়েকজন সরকারী সেপাই এদিকেই আসছে। রাইমোহনের মুখ শুকিয়ে গেল।

সেপাইরা অবশ্য এ গৃহে প্রবেশ করলো না, তারা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। খড়খড়ি বন্ধ করে হাঁপ ছেড়ে ফিরে এসে রাইমোহন বললো, বাপরে বাপ ! পিলে চমকে গিয়েছেল একেবারে। আমি ভাবলুম বুঝি সেপাইরা চাঁদুকেই ধরতে আসচে !

হীরা বুলবুল বললো, ওমা, চাঁদুকে ধরবে কেন ? চাঁদু তো কারুর পাকা ধানে মই দেয়নি।

—বাগবাজারের বোসবাবুদের এক শালার মাতা ফাটিয়ে দিয়েচে না চাঁদু ? তারা সহজে ছাড়বে ভাবিস। পুলিশ ঠিক এ বাড়ি খুঁজে বার করবে একদিন না একদিন।

হীরা বুলবুল অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে বললো, ওগো আর এ বাড়িতে থেকে তবে কাজ নেই। তুমি আজই তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করো। ওগো বজরায় গেলে হয় না ? যদি কয়েকজন পাইক ভাড়া করা যায় ?

—তারপর রক্ষকই যদি ভক্ষক হয় ? পাইকরাই যদি মাঝপথে মেরেকুটে সব কিছু নিয়ে চম্পট দেয় ? ডাঁড়া, একটু চিন্তা করতে দে !

—তুমি যাই বলো, আমি তীত্থে যাবোই।

—কালীঘাটও তো তীর্থ, সেখেনে গিয়ে থাক তবে। একটা বাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে, দু'একদিনে হবে না।

—না, কালীঘাটে না, এমন জায়গায় যাবো, যেখেনে কেউ আমাদের চেনে না।

—আঃ ডাঁড়া না, একটু ভাবতে দে। ও, এক কাজ করলে হয়। আজই এ বাড়ি থেকে সরে পড়া দরকার। এই তো কাচেই কমলা থাকে, ওর সঙ্গে আমার বেশ চেনা আচে। আমি বললে সে কয়েক রাত খুব আহ্লাদের সঙ্গে তোদের থাকতে দেবে। তারপর কটা দিন কাটলে অন্য একটা ব্যবস্থা।

—কার বাড়ি ?

—জানবাজারের কমলার।

আহত দলিতা ফণিনীর মতন ফোঁস করে উঠলো হীরা বুলবুল। সে এবং কমলাসুন্দরী দুজনেই এই শহরের দুই ডাক সাঁইটে বারাঙ্গনা। হীরা বুলবুলের খ্যাতি যেমন সঙ্গীতে, কমলা-সুন্দরীর তেমনি নৃত্যে। এরা পরস্পরের প্রতিপক্ষ। তার বাড়িতে আশ্রয়ের প্রস্তাব এনে রাইমোহন হীরা বুলবুলের একেবারে আঁতে ঘা দিয়েছে।

হীরা বুলবুল বললো, কী, আমি কমলির বাড়িতে গিয়ে নুকোবো ? তার আগে তুই আমায় থুতু ফেলে ডুবে মত্তে বললি না কেন ? ড্যাকরা, খালভরা ! এই তোর মনে ছেল। হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও নাতি মারে। আজ আমার এমন বিপদ বলেই তুই এমনধারা কতা বলতে পারলি। কমলি যদি তোর এত পেয়ারের নাঙী হয় তবে তুই যা না সেখেনে। এখুনি যা। বিদেয় হ। দূর হ। ডরপুক্ কাঁহিকা। এই জন্যেই আমার সঙ্গে তিত্থি করতে যেতে তোর এত ভয়। কমলি মাগীটা পাঁচজনের সামনে উলঙ্গ হয়, ছোট জাতের মেয়ে, তাকেই তোর মনে ধরেচে। নিমকহারাম, এতকাল আমি দুধে কলা দিয়ে সাপ পুষচি....

হীরা বুলবুল একবার গালাগালির স্রোত বহাতে শুরু করলে তাকে থামায় কার সাধ্যি। রাই-মোহন দুহাত তুলে অসহায়ের মতন তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো, তারপর হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলো, শেষ পর্যন্ত তার পায়ে পড়লো। তবু হীরা বুলবুল থামে না।

রাইমোহন সবলে হীরা বুলবুলের মুখ চেপে ধরে বললো, ওরে কমলি তোর অত শত্তুর বলেই তো তার কথাটা মনে এলো। সেখেনে তুই বা চাঁদু লুকোলে পুলিশ কেন, পুলিশের বাপের সাধ্য নেই সন্দেহ করে। সবাই জানে, হীরে বুলবুল আর যে-জায়গাতেই লুকোক, মরে গেলেও সে কমলির কাচে আশ্রয় চাইবে নাকো। আমি বলি কি, ডাঁড়া, ডাঁড়া, বলতে দে আগে আমাকে, তোর যাবার দরকার নেই, তুই কেন যাবি, পুলিশ তো তোকে ধরতে আসবে না। চাঁদু বরং দু'চারদিন ওখেনে থাক। পুলিশও ওর খোঁজ পাবে না। চাঁদুও ওখেন থেকে সহজে পালাতে পারবে না।

মুখখানা একটু ছাড়া পেতেই হীরা বুলবুল বললো, সে মাগী আমার ছেলেকে নুকিয়ে রাকবে ? তোর মাতায় কি শোঁয়া পোকা ঢুকেচে। সে রাক্কুসী আরও সেপাই ডেকে চাঁদুকে ধরিয়ে দেবে।

রাইমোহন বললো, কক্খনো না। তুই নিজের কতাই একবার ভেবে দ্যাখ। কমলির যদি কোনো ছেলে থাকতো, আর সে যদি তোর কাচে আশ্রয় চাইতো, তুই থাকতে দিতিস নি ? বিপদের দিনে নিজের জাতের লোকদের কি কেউ পায়ে ঠেলে দেয় ?

—নিজের জাত ? সে মাগীর জাতের কোনো ঠিক আচে ? দ্যাখ গিয়ে, সে কোন্ মুদ্দোফরাসের মেয়ে। রঙের কী চেকনাই, কাঠ কয়লা বল্লে মরি মরি।

—আহা-হা, তোর থেকে তো সে নীচু জাতের বটেই। তবু বলচি, সেও তোর মতন পাঁচজন বড় মানুষের সঙ্গে ওঠা বসা করেচে, মনটা একটু খোলা মেলা হয়েচে।

অনেক বোঝাবার পর এবং চন্দ্রনাথের আশু বিপদের সম্ভাবনায় শেষ পর্যন্ত রাজি হলো হীরা বুলবুল।

কিন্তু চন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। সে কারুকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। কেউ তাকে ধরতে গেলেই ক্ষিপ্ত পশুর মতন দুহাত চালায়। শেষ পর্যন্ত তিন চারজনে মিলে চন্দ্রনাথের হাত, পা ও মুখ বেঁধে মধ্যরাত্রে একটি গাড়িতে তোলা হলো।

নিশুতি রাত, পথে লোক নেই, যাবার পথে গাড়িতে চন্দ্রনাথকে অনবরত বোঝাতে লাগলো রাইমোহন। চন্দ্রনাথ যদি বাড়ির সঙ্গে কোনো সংস্রব না রাখতে চায়, বেশ তো, কয়েকদিন পর তার যেখানে খুশী চলে যাবে। আগে হাঙ্গামাটা মিটুক। সবাই এসব কথা ভুলে যাক। এখন বোসবাবুদের লোকদের হাতে ধরা পড়লে চন্দ্রনাথ যে আরও বিপদে পড়বে। তাছাড়া, হিন্দু কলেজ ছাড়া কি পড়াশুনো করা যায় না ? রাইমোহন তার জন্য সাহেব শিক্ষক রেখে দেবে বাড়িতে। কিংবা এমনিতেই চন্দ্রনাথ ঢের লেখা পড়া শিখেছে, এখনি সে কোনো হৌসে চাকরি জুটিয়ে বাবু শ্রেণীতে

উত্তীর্ণ হতে পারে। চন্দ্রনাথ যদি রাইমোহনকে পিতা বলে মেনে নেয় তাহলে সে ঘোষাল পদবী নিতে পারে, তারপর এই সমাজে তাকে অবজ্ঞা করে কার সাধ্য?

সেই রাত্রেও কমলাসুন্দরীর বাড়িতে একটি মজলিস বসেছিল। সুরার নেশায় কমলার নয়ন দুটি ঢুলুঢুলু। ঘাঘড়া ও কাঁচুলি পরা। বয়সের ফলে কমলাসুন্দরী এখন অনেকটা পৃথুলা হয়েছে, কোমরে মেদের স্তর, তবু সে এখনো নাচের ঠমকে শহরের অনেক বাবুরই হৃদয় আন্দোলিত করতে পারে।

রাইমোহন মজলিশ ঘর থেকে বাইরে ডেকে কমলাসুন্দরীকে সব বৃত্তান্তটি জানালো। কমলাসুন্দরী প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতেই পারে না। নেশায় মগজ আচ্ছন্ন, সে বারবার বলতে লাগলো, কার ছেলে? বাপের নাম কী? শুধু হীরের ছেলে, হি-হি-হি-হি। হি-হি-হি-হি। হীরের ছেলে! কী করেচে সে, ডাকাতি? ফেরেববাজি তা থাকো না বাবা, থাকো। যতদিন ইচ্ছে থাকো। তুমি যখন বলচো, তাতে আর আপত্তি কি। তা এতদিন কেন আসোনি, নাগর? কতদিন তোমার চাঁদ মুখ দেখিনি।

এ বাড়ির ছাদে একটি চিলে-কোঠা আছে, অনেকদিন ব্যবহৃত হয়নি। কোনোরকমে সেটিই সাফ সুতরো করে সেখানে এনে শোয়ানো হলো চন্দ্রনাথকে। তার মুখ ও হাত পায়ের বাধন খুলে দিয়ে রাইমোহন বললো, তুই আমায় মারতে চাস, মার, যত খুশী। এই আমি দোর গোড়ায় বসে রইলুম। আমাকে একেবারে মেরে না ফেলে তুই যেতে পারবি নি।

কোণঠাসা বিড়ালের মতন দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কতক্ষণ, কতদিন আমায় পাহারা দেবে?

হাই তুলে রাইমোহন বললো, এই ধর, আট দিন, কি দশ দিন, তারপর সবাই তোর কথা ভুলে যাবে। তখন তুই যা খুশী করিস।

চন্দ্রনাথ বললো, আমি আর এক দণ্ডও তোমাদের কাচে থাকতে চাই না! তোমাদের দেকলেই আমার গা জ্বালা করে।

—আমি পিঠ ফিরিয়ে বসি, আমায় দেকিস নি!

—তুমি দূর হয়ে যাও।

—কেন মিছে এত রাগ করচিস, চাঁদু? মহাভারত পড়িস নি? কর্ণ কি বলেছেল। দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম! মানুষ কোন কুলে, কোথায় জন্মায়, সেটা দৈব ঘটনা, তার ওপর তো কারুর নিজের হাত নেই। দ্যাক, সমাজের পাঁচজনের মধ্যে তুই যাতে মাতা তুলে দাঁড়াতে পারিস, তার জন্য আমরা কম চেষ্টা করিনি। একবার হারবি, পাঁচবার হারবি, তা বলে তো ভেঙে পড়লে চলবে না! আত্মোন্নতির চেষ্টা কক্ষণো ছাড়তে নেই!

—আঃ, চুপ করো, আমার বকবকানি ভালো লাগে না।

—শোন্ চাঁদু, তুই আমার ওপর রাগ করতে পারিস, তোর মায়ের ওপর রাগ করতে পারিস, কিন্তু আমরা কখনো তোর গায়ে কোনো ময়লা লাগতে দিইনিকো!

চন্দ্রনাথ একদলা থুতু থুঃ করে ছিটিয়ে দিল রাইমোহনের দিকে। সেই থুতু রাইমোহনের গালে লেগে গড়িয়ে পড়লো ঘাড়ে, রাইমোহন মুছলো না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রনাথের দিকে। সে দৃষ্টিতে রাগ নেই, বরং একটু পরে তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রু। কতদিন পর, বোধহয় পঁচিশ, তিরিশ, চল্লিশ বছরের মধ্যেও রাইমোহন কখনো কাঁদেনি। এ বোধহয় বার্ধক্যের ফল!

চন্দ্রনাথ খর চোখে চেয়ে রইলো, কারুর কান্না দেখে তার মন আর দুর্বল হবার নয়।

দোতলায় নাচ-গানের জড়িত হল্লা তখনো চলেছে, ওপরে দুজন সম্পূর্ণ নীরব। এরকমভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়। এক সময় চন্দ্রনাথ ঘুমে হেলে পড়লো। তারও পর অনেকক্ষণ জেগে বসে থেকে ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো রাইমোহন। দরজার চৌকাঠের কাছে আড়াআড়িভাবে শুয়ে।

রাইমোহনের ঘুম ভাঙলো বেশ বেলায়। ধড়ফড় করে উঠে বসেই সে দেখলো ঘর শূন্য। রাইমোহন একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। চন্দ্রনাথকে আর খুঁজে লাভ নেই। তাকে আটকে রাখতে গেলে হাত পা বেঁধে রাখাই উচিত ছিল। মানুষকে মানুষ ডিঙিয়ে যায় না, চন্দ্রনাথ সেই সৌজন্যটুকুও মানে নি, সে নিশ্চয়ই রাইমোহনকে ডিঙিয়ে লাফিয়ে চলে গেছে। চন্দ্রনাথ সাবালক হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তি আছে, তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কী ভাবে আর আটকে রাখা যায়। চন্দ্রনাথের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসার চিহ্ন কখনোই তেমন দেখা যায় নি, এখন সে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেছে। হীরেমনিকে এই বাস্তব মেনে নিতেই হবে। এখন ছেলেটা বেঘোরে মারা না যায়! রাইমোহন নিজে অনেক গলাধাক্কা অপমান সহ্য করেছে, কিন্তু চন্দ্রনাথের মনের কোন তন্ত্রীতে ধাক্কা লাগায় সে এমন বিগড়ে গেল তা সে বুঝতে পারলো না।

সারা বাড়ি এখনো প্রায় ঘুমন্ত। হীরা বুলবুল এবং কমলাসুন্দরী দুজনেরই প্রতিপত্তি এখন পড়ন্ত এর মধ্যে কমলাসুন্দরী আরও কয়েকটি যুবতীকে নিজের কাছে রেখে তালিম দিচ্ছে, যাতে তার পসার বজায় থাকে। সেই দু-তিনটি মেয়ে স্নান সেরে ঘোরাঘুরি করছে অলিন্দে। রাইমোহন এদের চেনে না, এরাও চেনে না রাইমোহনকে। সে একবার ভাবলো ওদের কাছে চাঁদুর কথা জিজ্ঞেস করবে কি না। পরক্ষণেই মনে হলো, কোনো লাভ নেই। দ্বারবানদের প্রশ্ন করেও কোনো সুসার হবে না।

ভারাক্রান্ত মনে সে চলে এলো গৃহের পশ্চাদ্বর্তী বাগানে। এখন একটি কঠিন কাজ বাকি আছে, হীরা বুলবুলের কাছে সংবাদটি প্রকাশ করতে হবে। অবুঝ হীরা বুলবুলকে সামলানো যে কী প্রাণান্তকর ব্যাপার হবে, তা ভেবেই শিউড়ে উঠলো রাইমোহন। এক্ষুনি সে হীরার সম্মুখীন হতে চায় না। কোনো সন্দেহ নেই যে হীরা রাইমোহনকেই সম্পূর্ণ দায়ী করবে। এখানে চন্দ্রনাথকে নিয়ে এসে কি ভুল করলো সে? জীবনে এতবড় ভুল আর তার হয়নি। ঘরে শিকলি তুলে দিয়েই বা একটি সোমত্থ ছেলেকে কদিন আটকে রাখা যায়। তা ছাড়া পুলিসের হাতে পড়ার ভয়টি তো মিথ্যে নয়।

রাইমোহন আপনমনে বাগানে ঘুরছিল, এমন সময় কেউ একজন তাকে ডাকলো, ওহে, এদিকে একবার শোনো তো!

রাইমোহন চমকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলো, পার্শ্ববর্তী উদ্যানে ফেজ পরা খানদানী চেহারার একজন মুসলমানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ধুতি চাদর পরা এক বৃদ্ধ। সেই বৃদ্ধকে চিনতে পেরে রাইমোহন দ্বিতীয়বার চমকিত হলো। বিধুশেখর মুখুজ্যের এই চেহারা হয়েছে! বাঁ চোখের ওপরে একটা কালো ঢাকনা দেওয়া, শরীরটা শুকিয়ে গেছে, হাতের ছড়ির ওপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে।

রাইমোহন কাছে আসতেই বিধুশেখর বললেন, তুমি রাইমোহন না?

রাইমোহন বিনয়ে গলে গিয়ে বিগলিত হাস্য বললো, প্রণাম মুখুজ্যে মশাই। এতদিন পরেও ঠিক চিনেছেন। তা আপনি সর্বজ্ঞ ব্যক্তি, আপনার কখনো ভুল হতে পারে। আপনি এখেনে?

বিধুশেখর বললেন, তার আগে বলো, তুমি এখেনে কী করচো?

রাইমোহন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে একেবারে নুয়ে গিয়ে বললো, আজ্ঞে, আমরা শখের পায়রা, যখন যেখানে দানা ছড়ানো থাকে সেখানে খুঁটে খেতে যাই।

—তা আপাতত কার দানা খাচ্চো?

—দানা পাচ্চি, খাচ্চি, মালিকের খোঁজ রাখি না। আর সেরকম মালিকই বা কোথায়? রামকমল সিংগী মশাই মারা গিয়ে আমাদের একেবারে অনাথ করে দিয়ে গ্যালেন। বড় বৃক্ষের ছায়ায় থাকা আমাদের অভ্যেস।

—শোনো, ঝড় উঠবার উপক্রম হলে পিঁপড়েরা নড়বড়ে বাড়ি ছেড়ে সার বেঁধে চলে যায়, দেকোচো? তুমিও ও বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও সটকাও। ও বাড়ির মাগীটার ভিটে মাটি চাঁটি করবো এবার। মামলা দায়ের হয়েচে।

মুনসী আমীর আলী বিধুশেখরকে ফার্সীতে প্রশ্ন করলেন এই চিড়িয়াটি কে?

বিধুশেখর বললেন, আপনি ঠিক চিনতে পারবেন না। আমাদের শাস্ত্রে এই পাখির উল্লেখ আছে, তার নাম গরুড়। দেখছেন না সব সময় হাত জোড় করে আছে।

রাইমোহন সেই মুহূর্তে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। হীরা বুলবুল তার পেশা ছেড়ে দিতে চাইছে, কিন্তু রাইমোহন তার পুরোনো পেশাটিকে আবার চালু করবে। তবে, এই বুড়োকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না, এ একেবারে ছিবড়ে হয়ে গেছে, নওজোয়ান ছোকরা চাই। চন্দ্রনাথের ওপর অবিচারের শোধ নিতে হবে তো।

বেড়া টপকে এদিকে এসে সে বললো, হুজুর আপনি কমলিকে তাড়াবেন। সে তো বেশ ভালো কত্তা। আপনি ইচ্ছে করলে কী না পারেন! আমরা একটু আশ্রয় পেলেই হলো।

তারপর হেঁট হয়ে বিধুশেখরের পায়ের ধুলো নিয়ে সে আবার বললো, হুজুর, আশীর্বাদ করুন, কোনোরকমে যেন বেঁচে বর্তে থাকি।

(ক্রমশ)

নিবেদন : এই উপন্যাসের নানান ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন বা সন্দেহ প্রকাশ করে অনেকে পত্র লেখেন, সকলকে ব্যক্তিগত ভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। তা ছাড়া উপন্যাস সমাপ্ত হবার আগে পদে পদে কৈফিয়ৎ দেবার প্রথাও নেই। তবে একটি ব্যাপারে অনেকে দুঃখ বা মনে আঘাত পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর মাকে 'তুই' সম্বোধন করেছেন, এটা অনেকের মনে হয়েছে অসত্য এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সম্মান হানিকর। সুপণ্ডিত ও সুলেখক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রপ্রতিম শিষ্য। তিনি তাঁর স্মৃতি কথায় স্পষ্ট বলেছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর মায়ের সঙ্গে 'তুই তুকারি' করতেন। বিপিনবিহারী গুপ্ত সম্পাদিত "পুরাতন প্রসঙ্গ" এর উল্লেখ আছে। বিধবা বিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মায়ের সঙ্গে যে সংলাপ আমি ব্যবহার করেছি, তা প্রায় হুবহু ইন্দ্রমিত্র রচিত 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে ব্যবহৃত একটি উদ্ধৃতির উদ্ধৃতি। —লেখক

বনবাস

অভ্র রায়

এ কাহিনীর আসল চরিত্র বলতে দুজন। রঘুবাবু আর ফুলমোতি। আর, আর একজন হল রাজেন। এ ছাড়া আর একজনও আছে। তাকে ঠিক চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বোঝা যায় সে আছে। একে বরং একটি নেপথ্য-চরিত্র বলে ধরে নেওয়া যাক

রাজেনের বয়েস অল্প, এখানকার নতুন পেপার মিলে একটা চাকরি জুটিয়ে হালে এসেছে। রঘুবাবুর ডেরাতেই আপাতত তার আস্তানা। এই ব্যবস্থাটা তাকে চন্দ্রবাবু করে দিয়েছিলেন। চিঠি লিখে দিয়েছিলেন একটা তাতেই কাজ হল। চিঠিটা পড়ে রঘুবাবু মৃদু হেসে বললে, বেশ তো থাক না যতদিন ইচ্ছে। না না, পেইং গেস্ট টেস্ট চলবে না, এই বন-জঙ্গলের মধ্যে ওসব আবার কি। যদি ভাল লাগে, নিজেই এদের একজন হয়ে থাক। মাটির ঋণ কি বাপু, টাকা ফেললেই শোধ হয়ে যায়?

রাজেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কী করা উচিত। কিন্তু প্রতিবাদও করে না। কলকাতা ছেড়ে এই নির্বান্ধব নির্জন পরিবেশের মধ্যে এসে বেশ মুষড়ে যায়। মাঝে মাঝে প্রায়ই ভাবে, চলে যাক। এখান থেকে চলে যাব।

কিন্তু চাকরির জন্যে এটুকু স্বীকার করতে হয়। রাজেন তাই মানিয়ে নিতেও চেষ্টা করে।

অবশ্য এ গল্পের প্রধান চরিত্র রঘুবাবু নিজে। তার জন্যেই সব। সত্যি বলতে লোকটার চাল-চলন চেহারা সবই যেন একটা দেখবার জিনিস। নায়ক হবার মতো পযুক্ত চেহারা বটে।

লালচে আর রুপোলি রঙ মেশা চুল-দাড়ি, দীর্ঘ ঋজু দেহ, তামাটে রঙ, দাস দৃষ্টি—দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় আহা। এই জংলী দেশে এমন ঋষিকল্প সাধক চেহারার মানুষটি এল কোথা থেকে। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেদিকে তেমন কোন উৎসাহ দেখায় না লোকটা। চোখ কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সামান্য হাসে, মাথা নেড়ে।

এমনি সব সময়। বুলবুলি ডাকছে জারুলের ডালে, বাঁশ ঝাড়ে কট কট বাতাসের শব্দ, ফুলমোতির গুন গুন করা গান, ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ—কান পেতে এই সব শুনতেই বেশি ভালবাসে। কথা টথার খুব মানে নেই যেন। তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অর্থবহ এই সব শব্দগুলো। এর মধ্যে থেকেই এখন অনেক কিছু শুনতে পারে রঘুবাবু।

চারদিকে ঘন জঙ্গল। কাছাকাছি বাড়িঘর দোকানপাট প্রায় কিছুই নেই। অনেকটা দূরে এগিয়ে সদর রাস্তা। সেখান থেকে এগোলে দু পাশে শালের জঙ্গল। তার মধ্যে দিয়ে লালরঙের কাঁকর মাটির রাস্তাটা এঁকে বেঁকে রঘুবাবুর বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়েছে। বিকেল হয়ে আসতেই কেমন থমথম করে ওঠে চারদিক। সেগুন গাছের প্রকান্ড প্রকান্ড পাতাগুলো যেন নিস্তব্ধতায় জমাট বেঁধে যায়। ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে শুরু করে চারদিকের জঙ্গল থেকে। প্রায় একই ধরনের রোজ।

এর মধ্যেই রঘুবাবুর পুরোনো আমলের শৌখিন বাড়িটা। চারদিকে এই রকম অন্ধকার ঘন হয়ে আসে যখন রঘুবাবুকে তখন দেখা যায় ঘরের মধ্যে তার ঘড়ির ট্রে-টা নিয়ে বসেছে। এই একটা অদ্ভুত খেয়াল আছে লোকটার। চোখে ঠুলি, হাতে সন্না, মাথার কাছে শেড লাগানো টেবিল ল্যাম্প। মোড়ক, প্লাস্টিকের খাপ ছোট বড় রকমারী কল-কবজায় একেবারে ছত্রখান চারদিক। তার ওপর সেই উপুড় হয়ে আছে রঘুবাবু।

চেহারা দেখে বয়েস আন্দাজ করার উপায় নেই। এই যে শিরদাঁড়াটা বেঁকে ধনুকের মতো হয়ে আছে সিধে হয়ে দাঁড়ালে পলকে সেইটেই টান টান হয়ে উঠবে। চাই কি হাতের গুলিটুলিগুলোও এখনো পাকিয়ে ওঠে বেশ। অথচ পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে অনেকদিন। নিজের মুখে না বললে, কে বুঝবে সেটা।

জীবনে অনেক- ভাল-মন্দ অনেক কিছু করেছে রঘুবাবু। নামকরা ফার্মের মোটা মাইনের ইঞ্জিনীয়ার এক সময়, তারপর সেটা ছেড়ে নিজের কোম্পানী, আবার চাকরি, আবার চাকরি ছাড়া। ধরে, ছাড়ে, ধরে, এই রকম ধাত আর কি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন বিছানায় শুয়ে পড়ল লোকটা। সামান্য উপসর্গ থেকে একেবারে রাজব্যাধি। ডাক্তার পরামর্শ দিল, শুধু ওষুধে হবে না, এবার বিশ্রাম চাই—নিরিবিলি কোন পরিবেশে গিয়ে। শরীর ও মনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

সেই থেকে শুরু এই বনবাস পর্ব। আশ্চর্য অল্প দিনের মধ্যেই এই প্রাকৃতিক

পরিবেশে কেমন বদলে গেল লোকটা। দেখতে দেখতে সেরে উঠল শরীর, স্বাস্থ্যও ফিরে গেল—কিন্তু নিজে আর ফিরতে পারল না। বলল, ছুটোছুটি আর নয়, এই ভাল। এই গাছপালা পাখি-পতঙ্গের সংসারে এদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা নির্বাসন নিয়ে কেউ ঠাট্টা করতে এলে বলে, বাঁচা তো অনেক রকম। কিন্তু নিজের মতো বাঁচতে হলে চাই একটা পরিবেশ, উপকরণ নয়। বলেই হাসে, এক মধুরে চোখ জুড়োনো হাসি।

বউ তো অনেকদিন হল নেই। এক ছেলে, সে থেকেও কোন খোঁজ খবর রাখে না। অনেকদিন হল, পছন্দমতো এক ভিনদেশী মেয়েকে নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে সংসার পেতেছে নিজের। বিয়ের পর সেই একবার যা এসেছিল। সেই শেষ। বাবার এখানে এভাবে পড়ে থাকাতে কোথাও যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগে ছেলের। এ নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটি ভুল বোঝাবুঝিও। তারপর থেকে বাবাকে নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চায় না। যে যার মতো চলে।

রঘুবাবুও যেমন আছে নিজের খেয়াল খুশি নিয়ে। এই ফল ফসলের খেত, গাছগাছালির বাগান, তার পরিচর্যা আর বংশবিস্তারের দায়িত্ব নিয়ে। জায়গাটা এক বুড়ো সাহেবের কাছ থেকে খুব সস্তায় পেয়ে গিয়েছিল তখন। চারদিকে সুন্দর শালের জঙ্গল, উজ্জ্বল নীল আকাশ, রকমারী পাখি আর বুনো ফুলের শোভা—খুব পছন্দ হয়েছিল দেখে। এখন সেটা আরও গুছিয়ে নিয়েছে চাষ আবাদ করে। বড় ফলের বাগান, বছর ভরা শাকসবজি আনাজের চাষ—নিজের হাতে ফসল তুলে, বেচে খেয়ে দিব্যি চলে যায়।

এর মধ্যে আবার পুরোনো ঘড়িটড়িগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা হল শখের ব্যাপার। ওগুলোতে যে কী মাহাত্ম্য আছে! বলে, জীবনকে কাঁটায় কাঁটায় মাপা এমন করে। চেন ঝোলানো লম্বা পেণ্ডুলামের যে মস্ত দেয়াল ঘড়িটা—ওটা কলেজ লাইফে অকশানে কেনা। বরাবর সঙ্গে আছে। ঘণ্টা বাজে ডিং ডং ডিং—টং... টং...। দেখতেও তেমনি জমকালো। তার বয়েস কালটাই নাকি জড়িয়ে আছে ওর শব্দের মধ্যে। রঘুবাবু শুনতে পায়।

বউয়ের ফটোর নিচে যেটা, ওটা জাপানী ঘড়ি। সোনালী সূর্যের নকশা অবিকল। খুব সুন্দর দেখাতে মাধবীকে উপহার দিয়েছিল রঘুবাবু। সোনালী রঙটা অবশ্য এখন জ্বলে গেছে। এদেশের জল হাওয়ায় যা হয়। ভেতরে মৃদু ঝুম ঝুম শব্দ। মাধবী আর নেই। কান পাতলে, এখনো-নাকি তার চলাফেরার শব্দ। এলোমেলো ছবি টুকরো টুকরো। এক প্যাকেট তাস শাফল্ করলে যেমন। রঘুবাবু দেখতে পায়। „

ফটোটা অনেক ঝাপসা হয়ে এসেছে এখন। তবু মাধবীর সেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর দৃপ্ত ভঙ্গিটা তাকে ঠিক চিনিয়ে দেয়। ভঙ্গিটাই ছিল শুধু, মুখে কিছু বলতে পারত না। বড় যে চাপা স্বভাবের মেয়ে। কল্যাণীর সঙ্গে তার স্বামীর গোপন সম্পর্কের কথাটা জানতে পেরেও মুখে কিছু বলেনি। অথচ এটা জানার পর থেকেই নাকি তার শরীর ও মন ভেঙে পড়েছিল। আশ্চর্য, এমন তো কখনো মনে হয়নি রঘুবাবুর! নিদারুণ অভিযোগটা, এই জীবনের অপরাহ্নে এসে, তাকে ছেলের মুখেই শুনতে হল অবশেষে। বাপের মুখের ওপর আঙুল তুলে কি জেদী ভঙ্গিতে সে অনায়াসে বলে গেল,

—এটা তো এক ধরনের স্লো পয়জনিং! আমি কি কিছু জানি না মনে কর?

রঘুবাবু অবাক হয়ে শোনে। প্রতিবাদ করে না। করতে চায়ও না। জঙ্গলে হাওয়ার শব্দ, পাতা ঝরছে। মনের মধ্যে টন টন করে কথাটা—সত্যিই কি? সত্যিই কি? চোখে মুখে এক চাপা কষ্ট, বিমর্ষ অসহায়তা। অনেক দূরে কোথায় একটা হটিটি পাখি ডাকছে—হট্টি-টি! হট্টি-টি! যেন তার মনের কথাটি মুখে নিয়ে আকাশময় প্রতিধ্বনি করে বেড়াচ্ছে পাখিটা।

রঘুবাবু সহসা নিস্পন্দ হয়ে যায়। ছেলের কোন কথাই তার কানে পৌঁছোয় না আর......।

সন্ধে হতেই খেত-খামারের কাজ শেষ করে বংকু, মাম্নি, ধারু, ওরা যে যার ঘরে চলে যায়। পাখিদের চিৎকার চেঁচামেচিও ক্রমশ নিশ্চুপ। জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটা উদাস হাওয়া ভেসে আসে ঝির ঝির করে। বুনো গন্ধের হাওয়া। পিয়াশালের মাথায় নাইটজার ডাকে—হুরু রুরু...। তার সঙ্গে একটা চাপা নিস্তব্ধতা যেন ঘন হয়ে আসে। রঘুবাবু তখন একা। বাগান থেকে বরান্দায় উঠে চুপচাপ বসে আছে।

রাজেনের ফিরতে রাত হয়। বাড়ির মধ্যে এক ফুলমোতি। রান্নাঘরে তার চলাফেরার টুং টাং শব্দ। চা তৈরি করছে, রান্নার যোগাড় করছে রাতের। তার মধ্যে ইনিয়ে বিনিয়ে কখনো এক টুকরো গান। বড়ো করুণ লাগে সুরটা। কথাগুলো স্পষ্ট নয়, তবু বোঝা যায় কোনো দুঃখের গান।

ফুলমোতিও সেই আগের মতো নেই আর। অনেকটাই বদলে গেছে থেকে থেকে। রঘুবাবু যত্ন করে নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছে তাকে। ঘরের কাজ, গাছগাছালির কাজ। খুবই চটপটে স্বভাবের মেয়ে। মুখে একটা সরল হাসির ঝিলিক মাখানো উৎসাহ লেগেই আছে। রঘুবাবু তাকে ঘড়ি দেখতে শিখিয়েছে, একটা ঘড়ি বেঁধেও দিয়েছে হাতে। এখন ঠিক ন'টা বাজতে না বাজতেই রাতের খাবার সাজিয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ায়। রঘুবাবু হয়তো তখন গাছপালার রঙিন ছবি আঁকা মোটা বইটার মধ্যে ডুবে আছে। খেয়াল নেই। ফুলমোতির ডাকে চমক ভেঙে তাকায়। জ্বলজ্বলে কালো মুখের দু পাশে পাতা কাটা চুলের বাহার, মাথায় রঙিন ফুল। রঘুবাবু তাকিয়ে মৃদু হাসে,

—বাঃ চমৎকার। এর মধ্যে হয়ে গেল!

—হাঁ তো, ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু তোলে ফুলমোতি। ঘাঁড় দেখিয়ে বলে, দেখ্ নোটা কাজল নাকি?

—ঠিক, ঠিক। কোন ভুল নেই—

এই উৎসুক চোখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর ভঙ্গিটা যেন সহসা বড় চেনা চেনা লাগে। আশ্চর্য! কোন মিল নেই, তবুও। ফুলমোতির উদ্দত বন্য চেহারার আড়াল থেকে যেন সেই গোপন বিষণ্ণ মুখের আদল। কিন্তু না, কোন অভিযোগ নেই। কখনো তো করেনি। রঘুবাবু আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে থাকে খানিক। তারপর এক সময় জোর করে মন থেকে এই অসংগত চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে।

ফুলমোতি থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে খানিক। তারপর ধীরে ধীরে টেবিলে খাবার সাজায়। রঘুবাবুর মুখে হাসি ফোটে। স্বাভাবিক হয়ে ঘর সংসারের দরকারী-অদরকারী কিছু কথা বলে তখন। নিছক বলার জন্যেই বলা। কিন্তু ঘোর লাগা গুমগুমে গলা রঘুবাবুর। চারদিকের নির্জনতা কাঁপিয়ে যেন বুকের মধ্যেও কাঁপন ধরায়। বলতে বলতে মৃদু হাসে। চমক ধরানো মধুর হাসি।

বাইরে ঘন অন্ধকার, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ফুলমোতির চোখ দুটো যেন ঝলসায় তার মধ্যে।

অন্ধকার ফুড়ে এক সময় এক ফালি চাঁদ ওঠে আকাশে। চৌকো উঠোনের মধ্যে ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় রান্নাঘরের চালের ছায়া হেলে পড়েছে। রঘুবাবু তখন নিজের মনে একা একা পায়চারি করছে সেখানে। পিছনে একটা টিক্ টক্ টিক্ টক শব্দ। বড় ঘড়িটার তীক্ষ্ণ জোরালো আওয়াজ।

রাজেনের ফিরতে ফিরতে আরও রাত। গঞ্জের হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে, গল্প-গুজবে সময় কাটিয়ে কোন কোন দিন তো প্রায় মধ্য রাতে ফেরে। বিছানায় শুয়ে কতদিন তার সাইকেলের আওয়াজ পায় রঘুবাবু। বাতাসের মধ্যে কাঁকর মাড়িয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে। সাধ আহ্লাদের বয়েস। দোষ তো দেওয়া যায় না। যদি এই বন-জংগলের থমথমে পরিবেশটা থেকে একটু দূরে দূরে থাকতে চায়।

ফুলমোতির খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতেও তা বেশ রাত। বড়োবাবুর টেবিল পরিষ্কার করে, রাজুবাবুর ঘরে জলটল রেখে সে নিজেও খেয়ে নেয়। তারপর ধীরে সুস্থে টুকটাক কাজ সারে ঘরের। তার মধ্যেই কানে আসে বড়োবাবুর ঘড়ির টিক টক, রাজুবাবুর সাইকেলের ঘণ্টা, জাম গাছের মাথায় পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে—এই সব শুনতে শুনতে সে নিঃশব্দে রাতের কাজ সারে। সব শেষ হলে তার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। জংগলের মানুষ রাত বিরেতে জংগল ভেঙে এটুকু পথ পাড়ি দিতে কিছু আটকায় না। আবার কখনো ইচ্ছে না হলে, রান্নাঘরের এক পাশেই রাতটা কাটিয়ে দেয়।

বোঝা তো যায় না, কী খেয়াল কখন!

এই ফুলমোতিকে নিয়েই যা ফিসফাস পাঁচ কথা বলে লোকে। লোকের যা স্বভাব। কিন্তু ফুলমোতি কোনদিন পারোয়াই করে না ওসব। অনেক হয়েছে। কত ঠেঁয়ে না ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে এই এতদিন পর সে এখানে এসে পড়েছে। পরের কথায় আর নেচে ওঠে না। মাঝে মাঝে মনটা কী রকম যেন করে। তবু এই ভাল। এখানে অনেক সুখ। আর ভুল করবে না সে।

প্রথমবার তো কিছু বোঝার মতো হুঁশেই ছিল না। উঃ সেই পোষ পরবের বিহান রাতে বটে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা খেতে খেতে পালিয়েছিল চেমরুর সংগে। বাপ তো হাঁড়িয়া টেনে টেনে বেহুঁশ, মা জংগলে জংগলে লকড়ি ঢুঁড়ছে। কে আর আটকায় তাকে। কিন্তু ঘর করল কদিন। বছর দুয়েক কাটতে না কাটতেই তো ফিরতে হল। অন্য এক ছাঁড়ীকে দেখে তখন মজে গেছে চেমরু। বড় শয়তানী করল যে মরদটা তার সংগে।

বাড়িতে ফিরেও শান্তি নেই। মুখ বুজে নিজের মনে পড়ে থাকতে চায়। কিন্তু আবার যে লোভ দেখায় মরদগুলো। ভেবেছিল এবার আর ভুলবে না ওদের কথায়। কেবল দু একদিন মেলায় গিয়ে নেশা টেশা খুব হলে হয়তো হুটহাট কারো সংগে চলে যায়। এর মধ্যেই একজন এসে তার বাপকে ধরে পড়ল। সে-না-ভাওার জনাই মোড়ল। আর একটা বিয়ের সাধ হয়েছে এই বয়েসে। ফুলমোতির জন্যে বাড়িতে হাঁড়িয়া মহুয়ার বান ডাকিয়ে দেয় মোড়ল।

বয়েস হলে কি হবে, জোয়ান মরদের মতো তেজ ধরতো লোকটা। সেই আর একবার। সাধ আহ্লাদের নেশায় নতুন ঘরে গিয়ে উঠল ফুলমোতি। মোড়ল অবশ্য কথার খেলাপ করেনি। প্রথম পরিবারের চেয়েও সুখে রেখেছিল তাকে। কিন্তু কপালে যে সুখ নেই তার।

তিনটে বছরও কাটল না পুরো, সেই ভেদবমি লেগে গাঁ উজাড় হতে লাগল সবার, চোখের সামনেই জলজ্যান্ত মানুষটা ছেড়ে গেল তাকে। বুক চাপড়ে খুব কাঁদল দুদিন। কিন্তু যে গেল, সে তো গেল। সংগে সংগে মোড়লের ঘরে থাকার দিনও ফুরোলো। তার বউ ছেলেরাই পিছনে লেগে গাঁ ছাড়া করল তাকে। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারেনি সে। কী হবে। মানুষটাই যখন চলে গেল তখন কিসের আশায় এখানে পড়ে থাকা।

চোখের জল মুছে আবার এসে বাড়িতে উঠল শেষে। দেশে আকাল ঘরে খাবার নেই বাপ তো সেই নেশায় বেহুঁশ। তবু তার মধ্যেই মুখ গুঁজে পড়ে রইল। কিন্তু কতদিন থাকতে পারে এভাবে মানুষ। বাঁচতে তো হবে। বুদ্ধিটা তাকে জুগিয়ে দিল তখন। তারপর পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল একদিন এই বড়োবাবুর দরজায়।

শশি কিরণ বিচ্ছুরিত জলধর সুন্দর সকুসুম কেশম - জয়দেব

OBM-6141A/1 BEN

খুরপি হাতে উবু হয়ে গাছের গোড়া সাফ করছিল বাবু। তার গলা পেয়ে উঠে দাঁড়াল। গোরাপানা সুন্দর মুখটা রোদে টকটকে লাল, ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। হঠাৎ বড় শরম লাগে। তবুও আবার বলল,

—একটা কাজ দিবি, বাবু?

বাবু হাসল তেমনি তাকিয়ে থেকে—কী কাজ করবি তুই এখানে?

সে আর কিছু বলতে পারে না। কেমন একটা কাঁপন লাগে শরীরে। বঙ্কু বুড়োই এগিয়ে এসে বাবুকে বলে তার কথা। কিন্তু সে কিছুই শোনে না। পা দুটো কাঁপছে, মনে হচ্ছিল এক ছুটে পালিয়ে যায় এখান থেকে। যেদিকে দু চোখ যায়।

কিন্তু যাওয়া আর হল না। এক কথায় বড়োবাবু ঠাঁই দিল তাকে। কপাল ভাল, না হলে সেই আকালের বছরেই শেষ হয়ে যেত পরাণটা। বাবুর দয়াতেই সে বাঁচল। এমনি মানুষ বটে বড়োবাবু। যেমন দেবতার মতো রূপ, তেমনি দেবতার মতো দয়া। যে তাকে জানে সেই বোঝে কেবল।

মহুয়ার ডাল থেকে একটা শালিখ ছানা পড়েছে মাটিতে। বাবুর কী যত্ন তাকে নিয়ে। রক্তমাখা পায়ে চুন হলুদ লেপে তুলোর মধ্যে বসিয়ে রাখে সারা সকাল। যেন নজর ছানাটা। বার বার বলে তাকে—দেখ তো ও বাঁচবে কি না। ঝিম ধরে নেতিয়ে থাকা ছানাটা—পেটটা খালি টুকুস টুকুস করে একটু। বলল, ঘরের ভিতর বাঁচবে নাই গ বাবু—মায়ের কাছে ডালে উঠিয়ে দে।

বাবু তাকিয়ে দেখে। মুর্মু ওরা সব বাজারে। বঙ্কু বুড়ো আর গাছে উঠতে পারে না। বাবু শেষে নিজেই এগিয়ে গেল ছানাটা নিয়ে। কান্ড দেখে তো ফুলমোতি হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে। বাবুকে সরিয়ে শেষে এক লাফে নিচু ডালটায় উঠে বসে। তারপর ডালটা হাঁটুতে আঁকড়ে কাত হয়ে শূন্যে হাত বাড়ায়—দে বাবু, আমার হাতে দে এবার।

বাবুর কেবল ডর লাগে দেখে। বলে, সাবধান, সাবধান—পড়বি, পড়বি—এই ই—।

ফুলমোতি তো হেসেই খুন। হাসতে হাসতেই হাতটা বাড়িয়ে একবার শূন্যে দোল খায়। পলকা ডালটা উথালপাথাল নাচে তার শরীরের দোলায়। ভয় পাওয়া মুখে—এই এই, করতে করতে বাবু শেষে তার মুঠোয় ধরিয়ে দেয় পাখিটা।

মাথার ওপর পাখিগুলো চিৎকার করতে করতে তেড়ে আসে। ফুলমোতি রাগ করে ডাকে হাত বাড়িয়ে আয় আয়, চু চু—আয়। তারপর আচমকা ঝাপটা মেরে উড়িয়ে দিয়ে হাসে খিল খিল করে। বাবুর ভয় পাওয়া মুখেও হাসি ফোটে দেখে।

দু দিন পরে আবার উঠে দেখেছিল। তাজা হয়ে উঠেছে ছানাটা। কিচমিচ করে তেড়েই এল তাকে। বড়োবাবু কি খুশি শুনে।

মুখে তো কথা বলবে না বেশি, কিন্তু নজর সব দিকে। ভোর বেলা নকড়ির ঝোপ থেকে সাপ বেরিয়েছে একটা। মোটা লাঠিটা নিয়ে পেছন পেছন ছেঁচতলায় গিয়ে যায় ফুলমোতি। মারবে বলে লাঠি তুলেছে যেই, সাঁই সাঁই করে কুঁদরু মাচার নিচে ঢুকে গেল সাপটা। এদিক ওদিক ঘাই মেরেও আর খোঁজ পায় না। ওধারে খেতের মধ্যে ভিণ্ডি তুলছে বড়োবাবু একবার ডাকবে মনে করে মাথা তুলতেই দেখে কখন এসে নিজেই দাঁড়িয়েছে পিছনে। মিঠে হাসিতে ভরা মুখ, মাথা নেড়ে বলল, পারলি নে তো! ছেড়ে দে, ওর বিষ নেই। হেলে একটা, আমি দেখেছি।

লাঠি হাতে মারমুখী সে নিজেকে সামলায়। অপ্রস্তুত হয়ে বলে,

—সাপ তো বটে।

বাবু হাসি মুখে আবার মাথাটা নাড়ল, হ্যাঁ তা তো বটে—না হলে তোকে দেখে এমন পালায়।

মজার কথাটা শুনে সে হেসে ফেলে এবার। লাঠিটা ফেলে আবার রান্নাঘরে ঢোকে। দেখতে পায় বাবু এদিক ওদিক তখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে সাপটাকে। কোথাও না পেয়ে শেষে চলে যায় খেতের মধ্যে।

তারপর এই তো সেদিন। মেলায় গিয়ে একপেট মহুয়া খেয়ে এসে কী কান্ডটা করে বসল। ভাবলে শরম লাগে বড়। এমন দেবতার মতো মানুষটার মুখের দিকে তাকাতে পারে না আর।

এমনিতেই দলে পড়ে গিয়ে সেদিন একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিল। তারপর কি হল, ফেরার মুখে হঠাৎ রাজুবাবুর সঙ্গে দেখা। কতদিন হয়ে গেল তবু তাকে দেখে শরম ভাঙে না এ বাবুটার। আজ সোজা সামনে গিয়ে দাঁড়াল—এ বাবু, তুই এখানে! আমাদের মেলা দেখবি বটে।

কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল। কোমরে হাত দিয়ে তাকিয়ে দেখল বাবুকে। বাবু তো অবাক হয়ে যায়। পরে সব বুঝে একটু হাসল,

—হ্যাঁ দেখবো তো। তা তুই কি কিনলি মেলায়—

—কি কিনবো, পয়সা নাই, বাবু।

—নেই?

বাবু টাকা বার করে হঠাৎ, এই নে আমি দিচ্ছি।

—কেনে লিব, তোর পয়সা?

চোখ ঘুরিয়ে সে তাকায়। বাবু চুপ হয়ে গেল একেবারে। মুখটা দেখে সে খিল খিল করে হেসে ফেলে তখন।

সাহস পেয়ে রাজুবাবু একেবারে হাতের মধ্যে গুঁজে দেয় টাকাটা এবার। বলে—নে, কেন নিবি না? তোর পরবের দিনে আমি দিচ্ছি খুশি হয়ে। নিতে হয়।

লাল চোখে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—তুই বড় ভালোরে, বাবু। তারপরই এক ছুটে আবার মেলার মধ্যে ঢুকে যায়। জিনিস কেনে এটা ওটা। তারপর আবার মহুয়ার দোকানে বসে পড়ে।

বেলা ডুবে সন্ধে হয়ে গেল। তারপর টলতে টলতে এক সময় উঠে দাঁড়াল। ভেবেছিল বড়োবাবুর কাছে এভাবে যাবে না আর। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে অন্ধ-

ঝরঝরে তরতাজা হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril

কারের মধ্যে কখন যে সেখানেই এসে পড়ল, তা কিছুই জানতে পারেনি। হুঁশ হল বড়োবাবুকে সামনে দেখে।

আবছা আলোর মধ্যে বড়োবাবুর গোরাপনা লম্বা শরীরটা একটা গাছের মতো দাঁড়িয়ে। একটুও নড়ে না। চুল দাড়িগুলো উড়ছে হাওয়ায়। তার মুখের দিকে নজর। চোখ দুটো কী ঠান্ডা আর শান্ত বাবুর। বাগানে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, পাখি ডাকছে কত টাক টুম টাক টুম। মাথাটা কিছুতেই যেন সোজা রাখতে পারে না সে। হঠাৎ মোচড় কেটে ঘুরে দাঁড়ায়। কাপড়ের পুঁটলি থেকে এক ঠোঙা মেঠাই বার করে বলে—লে বাবু, তোর জন্যে আনলাম। কিন্তু তুলতে গিয়ে কোঁচড় ভরা জিনিসগুলো হুড়মুড় করে ছড়িয়ে পড়ে পায়ের কাছে। বেসামাল হয়ে যায় গোটা শরীরটা। পাগল করা এক হাসি দাপিয়ে ওঠে কোথা থেকে। হাসতে হাসতে মাটিতেই গড়াগড়ি খায় কতক্ষণ। তারপর আর মনে করতে পারে না। সেখানেই অচৈতন্য হয়ে পড়ল কখন।

সকালে ঘুম ভেঙে দেখে ঘরের মধ্যে পাতা বিছানায় সে শুয়ে। কী করে হল? বুকের মধ্যে ডিম ডিম করে কাঁপে কেবল। চোখ বন্ধ করে সব মনে করতে চেষ্টা করে।—হেই মা! শরমে কাঁটা দিয়ে ওঠে যে শরীরটা।

সকালে চা নিয়ে গিয়ে বড়োবাবুর সামনে মুখ তুলতে পারে না আর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নখ খোঁটে। বাবু হাসে, কোন রাগ নেই মুখে। বলল—বিকেলে কাঁচা আমের শরবৎ করবি আজ। আমায় দিবি, তুইও খাবি, বুঝলি তো।

লজ্জায় হেসে ফেলে সে ঘাড় নেড়ে ছুটে পালায় সুমুখ থেকে।

এমনি মানুষটা। কথাটা না বলেও সব বুঝিয়ে দেয়। কখনো কখনো অবশ্য বোঝা যায় না। তবু বড় মায়া জাগায় মনে। বড়ো আপনার বলে মনে হয়। লোকে কি বুঝবে এসব কথা। না বুঝুক।

হোলি এসে চলে গেল। এখনো দূরে দূরে মাদলের শব্দ। জংগলে বসন্তের হাওয়া। ঝড়ের মতো ফুঁসে ফুঁসে উঠছে সারাদিন। রাজেন বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছিল। ভাল লাগছে না তার।

আজ চারদিন হল কাজে যায়নি। বাড়ির বাইরেও না। বিছানায় পড়ে পড়ে কাটাচ্ছে। মাঝরাত্তিরে বাড়িতে এসে কুয়োর জলে খুব করে চান করে এই কান্ড। ঘুমে জ্বর একেবারে। রঘুবাবুর হোমিওপ্যাথিতে এখন জ্বরটা ছেড়েছে বটে, কিন্তু সারা শরীরে অসম্ভব দুর্বলতা, মাথার মধ্যে একটা ঝিমঝিমে অস্বস্তি। তবু তার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। বাইরে গোঁ গোঁ করা একটা ডাক কেবলই আছাড়ে পড়ছে। জঙ্গল ভেঙে কতদূরে থেকে ছুটে আসছে শব্দটা। একবার ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয় রাজেনের।

রঘুবাবু সকালেও এক পুরিয়া ওষুধ খাওয়াল। মাথায় হাত রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পাশে। মৃদু হেসে একবার বলল, কী রাজুবাবু কষ্ট হচ্ছে?

রাজেন জ্বালা ধরা ঝাপসা চোখে তাকাল। ফুলমোতি এক বাটি মুড়ি নিয়ে এসেছে। কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। রাজেন নিঃশব্দে মাথা নেড়ে দু'জনকেই যেন জবাবটা দেয়। —না, কোন কষ্ট নেই তার।

ফুলমোতির মাথায় এক থোকা সাদা ফুল। শিরীষ কি গন্ধরাজ কিছু। নেশার মতো উগ্র গন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘর। রাজেন চোখ বন্ধ করে। হু হু করা বাতাসে বনের মধ্যে থেকেও এই রকম একটা ঘ্রাণ ভেসে আসে যেন।

রঘুবাবু বলছিল, এই পূর্ণিমাটা কেটে গেল, এইবার দেখবে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে উঠবে। আসলে এই ঋতু পরিবর্তনের সময়টা একটু সাবধান সতর্ক হয়ে থাকতে হয়। এড়ানো যায় না পুরোপুরি, তবু যতটা সম্ভব। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকলে তো আরো একটু বেশি সতর্ক হতে হয়। দেখছ না জংগলের চেহারাটা, কী ভীষণ টালমাটাল এখন চারিদিক। রাজুবাবু, এও এক বিপ্লব—মানুষ পশু পাখি অরণ্য সবাই মিলে যায় এখানে—আমরা কল্পনাও করতে পারি না কী ভীষণ শক্তি এর...

মৃদু গলায় গুম গুম করে একটানা বলে যায় রঘুবাবু। জামরুল গাছে বুলবুলির ঝাঁক। ডাকছে দল বেঁধে শুনতে শুনতে তন্দ্রা এসে যায় কখন।

সেঁকা রুটি, তরকারি আর এক গ্লাস হরলিকস। টেবিলে সাজিয়ে তাকে ডাকে ফুলমোতি। কিন্তু কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না রাজেনের। ফুলমোতি দাঁড়িয়ে দেখছে সব। নীল রঙের নতুন কাপড়, দু হাত ভর্তি নীল চুড়ি। হোলির পরবের আমেজটা কাটেনি এখনো। মৃদু হাসল রাজেন। ফুলমোতির মুখেও একটা চাপা হাসির আভা। বলল, খেতে ভাল লাগছে না, বাবু?

রাজেন হাসল—খুব ভাল লাগছে। কিন্তু তোর যে খুব কষ্ট হচ্ছে।

ফুলমোতি ভুরু বাঁকাল—কেনে বাবু?

—আমার জন্যে। কত কাজ বেড়েছে না তোর—এই সব খাবার দাবার, গরম জল—

—হেই বাবু, কী বলছিস রে তুই।

চোখ দুটো লাফিয়ে কেমন টল টল করে ওঠে তার। মুখে হাসির আভা ফুটিয়ে বলল—তুই একটা খোকাবাবু বটে।

একটু চুপচাপ থেকে আবার বলল—তোর বাড়িতে কে কে আছে বাবু?

—আমার? বাবা মা, ঠাকুমা, আমার বোন, ছোট ভাই...।

ফুলমোতি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে। রাজেন হঠাৎ বলল তুই যাবি আমাদের বাড়িতে। চল, তোকে নিয়ে যাব।

ফুলমোতি লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে যায়। মুখ নামিয়ে বলল—না বাবু।

দমকা হাওয়াটা মরে গিয়ে একটা গুমোট ছড়াল কখন। চারদিকে হঠাৎ কেমন একটা ঝিমধরা নিঃঝুম ভাব। ওদিকে ঘরের মধ্যে রঘুবাবুর অস্পষ্ট গলা। ফুলমোতি হেসে উঠল কী কথায়। ঝিমধরা অলস দুপুরের মধ্যে রিন রিন করে কাঁপতে থাকল হাসিটা। তারপর আর কোন সাড়া নেই। ঘড়ির ঘণ্টা বাজল ডিং ডং ডিং। রঘুবাবুর গুমগুমে গলা। আবার সব চুপ।

কাঠঠোকরা কোন গাছের ডাল ঠুকরে যাচ্ছে জংগলে। ঘরের মেঝেয় ঝন করে কী গড়িয়ে গেল রঘুবাবুর। তার স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে ধাক্কা খেয়ে মাথার ভিতরই ঘুরতে থাকে শব্দটা। রাজেন খালি এ-পাশ ও-পাশ করে বিছানায়। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। জ্বর জ্বর অনুভূতিটা তার রক্তের মধ্যে, শিরা উপশিরায় মধ্যে যেন ছড়িয়ে পড়ছে আবার।

সন্ধের মুখে ঝড় উঠল। আচমকা। দুপুর থেকেই একটু একটু মেঘ জমছিল। এখন আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে। মুহূর্তে কী দারুণ প্রলয় কান্ড। গোটা জংগলটায় যেন এক খ্যাপা জানোয়ারের মাতামাতি মেঘের গর্জন—সংগে মুষলধারে বৃষ্টি। ঘোর লাগা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা ভেঙে যায় রাজেনের। চমকে সে উঠে বসে। ঘোরবর্ণ আকাশের নিচেয় কী ভয়ংকর ভাবে হুটোপাটি খাচ্ছে গাছপালাগুলো। কেমন ভয় ভয় করে হঠাৎ। তবু ভাল লাগে।

বাতাসের ঝাপটায় জানলা দরজার কপাট আছড়ে পড়ছে, জলের ছাঁট লেগে টেবিলটা ভিজছে—তবু তার উঠতে ইচ্ছে করে না। চুম্বকের মতো দৃষ্টিটা আটকে আছে বাইরে। অপূর্ব এক গা ছমছম করা নাচের দৃশ্য শালের জংগলে। কার নির্দেশে সারি সারি গাছগুলো কোমর ভেঙে নুয়ে পড়ছে হাওয়ায়—মাথা খুঁড়ছে এক দুর্বোধ্য বিলাপ ধ্বনিতে—তারপর আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে ঘাড় ফিরিয়ে। রহস্যভরা ইঙ্গিতে আকাশে দু-হাত বাড়িয়ে যেন হাতছানি দেয় কাকে। পরক্ষণেই আবার হা-হা আর্তনাদে ভেঙে পড়ে। আশ্চর্য এক লয় বাঁধা দৃশ্য।

রাজেন তন্ময় হয়ে দেখে। হঠাৎ সেই গর্জনের মধ্যে তীক্ষ্ম গলায় কে তার নাম ধরে ডেকে উঠল। —এ রাজুবাবু-উ...উ...।

ফুলমোতি। ঝড়ের মধ্যেই ছুটতে ছুটতে আসছে। বৃষ্টিতে ভিজে এলোমেলো উদভ্রান্ত চেহারা। একলাফে ঘরের মধ্যে ঢুকে হাঁপায়। লম্বা নিশ্বাসের দমকে ঢেউয়ের মতো উঠছে নামছে শরীরটা। উত্তেজিত গলার স্বর—হেই মা, তোর যে সব ভিজল গো বাবু। সর সর তোর খাটিয়াটা সরিয়ে দি—।

বলতে বলতে ঝুঁকে পড়ে শক্ত দু হাতে খাটিয়াটা টানে।

—দাঁড়া-দাঁড়া, রাজেন তাড়াতাড়ি নেমে হাত লাগাতে চেষ্টা করে সংগে। কিন্তু টাল সামলাতে পারল না। পায়ে পা বেধে পড়ে যায়। ফুলমোতি সংগে সংগেই ধরে ফেলে হাত বাড়িয়ে—হায় হায়। তুই পারবি কেনে—।

ঝোড়ো হাওয়ার মতো তীব্র শরীর। একটা উগ্র বুনো গন্ধের ঝাঁজ। উত্তেজনায় কাঁপছে এখনো। রাজেন ঘাবড়ে যায় ভীষণ। তবু অসহায়ের মতো তাকেই আঁকড়ে ধরে। ফুলমোতি সহসা স্থির হয়ে যায়। চাপা স্বরে বলে—কষ্ট হচ্ছে রাজুবাবু! তারপর হঠাৎ পাগলের মতো হেসে ওঠে অকারণ। হাসতে হাসতে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। ঘরময় ছুটে ছুটে জিনিস-গুলো সামলায়। জানলা দরজা বন্ধ করে এদিকে ওদিকে। পশ্চিমের জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল খানিক। খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

জামগাছের বড়ো ডাল ভেঙেছে একটা। রান্নাঘরের চালা দুমড়ে ছিঁড়েই ঢুকেছে তার একটা দিক। ফাঁকা আকাশটায় কেমন আগুনের রঙ। ফুলে ফেঁপে উঠছে ধোঁয়াটে রঙের মেঘগুলো। বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। ঝড়েরও না। হু হু করে এদিক থেকে ওদিক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কেবল।

রঘুবাবুকে দেখা যায় যেন। ঝাপসা লম্বা শরীরটা। কী ভেবে ঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে ঘর ছেড়ে। মাথায় একফালি ভাঁজ করা চট না ত্রিপল। বর্ষাতির মতো জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে। সেই ভাবেই ছায়ামূর্তিটা সঁপ সাঁ করে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। বোধ হয় ভাঙা ঘরটাকে ঝড়ের দাপট থেকে বাঁচাতে চায়। একাই বুঝি লড়বে রঘুবাবু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংগে। কড়কড় করে ডেকে ওঠে আকাশ। চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের ঝলক মাথার ওপর। তবুও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

দৃশ্যটা চোখে পড়তে ফুলমোতি ঘুরে দাঁড়াল। চোখে মুখে ছটফটে অস্থিরতা। বাইরে বেরোবার জন্য পা বাড়াল আবার। রাজেন তার হাত দুটো টেনে জড়িয়ে ধরল—যাসনে এখন ফুলমোতি। কোথায় যাবি এর মধ্যে, পাগল নাকি! আর একটু বসে যা, বলছি, আর একটু...।

প্রায় মিনতির মতো শোনায় রাজেনের দুর্বল কণ্ঠস্বর।

কিন্তু ফুলমোতির কানে যেন কিছুই যায় না। উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করছে মুখ। বিড়বিড় করে নিজের মনে বলে—হেই মা—সনঝে বেলায় ঘরের চালটা ভাঙল...বড়োবাবু তোর ডর নাই গ...ই বাদলে কোথায় যাচ্ছিস বটে ...।

মেঘ ডেকে বিদ্যুৎ চমকাল। ফুলমোতির চোখ দুটোও যেন ঝলসে ওঠে সংগে। বৃষ্টির ধারালো ফলাগুলো ঝিলমিল করে নাচছে তেমনি। তার মধ্যেই সে—হেই আ—, বলে একটা অদ্ভুত আওয়াজ তুলে লাফিয়ে পড়ে। তারপরই সেই ঝড় তুফানের অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে মিলিয়ে যায়। আর ফেরে না।

রাজেন কতক্ষণ অপেক্ষা করে। বাইরে তখনো ঝড়বৃষ্টির অবিরাম মাতামাতি। মেঘের ডাক। পরে এক সময় ঝড় থেমে শুধুই ধারাবর্ষণ। অবিশ্রান্ত কান্নার মতো। রাজেন আচ্ছন্নের মতো শুয়ে শুয়ে শব্দটা শোনে।

এমনি করেই একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ফুলমোতি। কেউ জানে না, কেন? সেই পাগল হয়ে বেরিয়ে গেল কি আবার? কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু কে এমন কান্ডটা করল। সরল মেয়েটাকে খেপিয়ে মাতিয়ে ঘরছাড়া করল একেবারে? রঘুবাবু নিরুত্তর। কোন কিছুই বলতে চায় না এ সব নিয়ে। কথাটথাগুলোই যেন সব অর্থহীন তার কাছে। তেমনি নির্বিকার উদাসীন ভঙ্গি। কাজ করে যায় নিজের মনে। কখনো বা চুপচাপ বসে থাকে। পাখির ডাক বা হাওয়ার শব্দ শোনে। সেই অদ্ভুত দৃষ্টি দু চোখে।

বংকু বুড়োই মাঝে মাঝে এদিক ওদিক খোঁজ করে। কেউ বলে, একাদশ নাকি দেখা গেছে তাকে। পিয়ালডাঙার মেলায় উদ্দণ্ড মাতাল হয়ে ঘুরছে একটা মরদের সংগে। কেউ বলে, যাবে কোথায়—দেখ গিয়ে সেমরুর ঘরেই উঠেছে আবার। কিন্তু সব উড়ো খবর। কোথাও তার হদিসও পায় না বংকু। বড় [illegible] লাগে। দুখী মেয়েটাকে কে ফের ফুসলাল বটে।

রাজেন ভাবে, এইবার সে চলে যাবে। প্রায়ই ভা[illegible] কথাটা। কিন্তু রঘুবাবুকে ঠিক বলা হয়ে উঠছে না। আগের মতোই সে ভোর ভোর বেরিয়ে যায়। ফেরে রাত্তির করে। নিস্তব্ধ জংগলের মধ্যে একবার মুখোমুখি দেখা হয়। একা দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। কারও পথ চেয়ে আছে যেন। কে সে? ফুলমোতি? রাজেন? না অন্য কেউ?

উথাল পাথাল হাওয়া বয় পিয়াশালের জংগলে। পাখি ডেকে ওঠে আচমকা। রঘুবাবু ফিরে তাকায়। হাসিমুখ, দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত সম্মোহন। রাজেন অভিভূত হয়ে পড়ে। কথাটা বলতে গিয়েও বলা হয় না।

রঘুবাবু সেই গভীর রাত পর্যন্ত পায়চারি করে উঠানে। প্রায় রোজই। মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়ায়। জ্যোৎস্নার আলোয় নিজের ছায়াটা দেখে। অবিশ্বাস্য এক প্রতিমূর্তির মতো থমকে আছে। হা-হা শব্দে বাতাস বয়ে যাচ্ছে জংগলে। যেন বয়েস নেই, বাঁধন নেই, অর্থ নেই কোনো। বড় ঘড়িটার টিক টিক শব্দ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে সেই উদ্দাম স্রোতে। এর টানেই কি মানুষের সব হিসেব বিপর্যস্ত হয়ে যায়। বিপুল এক শূন্যতার অনুভূতিতে জেগে ওঠে মানুষ? রঘুবাবু নিজের প্রতিমূর্তির দিকে চেয়ে কথাটা ভাবে।

জ্যোৎস্নার আলোছায়া মুখে রাজেন কখন সামনে এসে দাঁড়ায়। রঘুবাবু মৃদু হেসে তাকিয়ে দেখে। সহসা অনেকদিন পর নিজের ছেলের কথা মনে হয়। রাজেনও কি তেমনি কোন অভিযোগ নিয়ে আসে। কিছু কি বলতে চায় সে? জ্যোৎস্নার আকাশে গলা ফাটিয়ে চাতক ডেকে চলেছে একটা। কান পেতে শুনলে অবিকল মনে হবে—ডিডিট ডিট্ ডিউড্ যুইট——ডিউয় ডুইট—...।

রঘুবাবু নিঃশব্দে হাসল মাথা নেড়ে। পিছনের জংগল থেকে কখন এক রাতচরা নাইটজার তার প্রতিধ্বনি শোনাল—ট্রু-র্-র্-র্ ট্রু...ট্রু—। গা ছমছম করা ডাক।

দুজনে সেই অলৌকিক শব্দ ও দৃশ্যের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে

॥ চার ॥

এই শীতে অন্ধকার বারান্দায় মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিলু। গলি থেকে চোখ তুলে দৃশ্যটা দেখে দীপ। নিঃঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিলু, যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিছু শুনতে পাচ্ছে না। ঘর থেকে আবছা আলোর আভা এসে পড়েছে ওর গায়ে। আবছা দেখাচ্ছে মূর্তিটা। দোতলার ঐ বারান্দায় উত্তরের বাতাস হু-হু করে বয়ে আসে। বিলুর শীত-বোধও কমে গেছে বুঝি।

বিলু গলির আবছা আলোতেও দীপকে দেখতে পেয়েছিল ঠিকই। দীপ দোতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসতেই দরজা খুলে পর্দা সরিয়ে দেয় বিলু।

আজকাল বিলুর কথা কমে এসেছে খুব। দরজা খুলে একবার ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। চলে যাচ্ছিল ভিতরের দিকে। দীপ বাইরের ঘরের সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে খুব সাবধানে মৃদু স্বরে বলল—এখন খুব হিম পড়ে। বাচ্চাটাকে নিয়ে বারান্দায় যাস কেন?

বিলুর সঙ্গে সবাই আজকাল সতর্কভাবে কথা বলে। কখন বোমা ফাটবে তার কিছু ঠিক নেই। সামান্য কথাতেই কখনো খুব রেগে যায়, কখনো ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

বিলুর চুল রুক্ষ, ম্যাড়ম্যাড়ে হলুদ রঙের শাড়িটা রং-চটা ময়লা। গায়ের চামড়ায় খড়ি উড়ছে, ঠোঁট দুটো ভীষণ শুকিয়ে মামড়ি দেখা যাচ্ছে। দীপের কথার জবাব না দিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেল।

দীপ একটা ঠোঙায় মহার্ঘ কাঠ-বাদাম, কিছু মুসুম্বি আর আপেল এনেছে। কাঠ-বাদাম খুব ভালবাসে প্রীতম।

জুতো খুলে মেঝেয় দাঁড়াতেই মেজার ভিতর দিয়ে ডিসেম্বরের ঠান্ডা উঠে এল শরীরে। এই কয়েকটা দিনই যা একটু শীত কলকাতায়। শীতের শিহরণটুকু শরীরে স্রোতের মতো বয়ে যেতেই মনের মধ্যে একটি দৃশ্যান্তর ঘটে গেল। মনে পড়ল, হাকিম পাড়ার মস্ত কাঁচা ড্রেনের পাশে দীপের হাতে অকারণে মার খেয়ে মাটিতে গড়াচ্ছে আর প্রাণপণে চেঁচিয়ে কাঁদছে। দীপের সমান গায়ের জোর ছিল না প্রীতমের, বয়সেও অনেকটা ছোটো। রাগে দুঃখে অপমানে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ ভরা জল আর শরীর-ফেটে-পড়া রাগ নিয়ে প্রীতম চিৎকার করে দীপকে বলেছিল—আমার বাঁ হাতটা খা। আমার বাঁ পাটা খা। তখন খুব হেসেছিল দীপ। আজকাল যতবার মনে পড়ে ততবার হাসির বদলে চোখে জল আসতে চায়।

দীপ ভিতরের ঘরের পর্দা সরাতেই দেখল, প্রীতম প্রাণপণ চেষ্টায় একা একাই উঠে লেপটা সরিয়ে পাজামা পরা পা দুটো খাট থেকে নামানোর চেষ্টা করছে। কাঠির মতো শুকিয়ে এসেছে পা, হাত দুটোও কম-জোরী হয়ে আসছে ক্রমে। শরীরটা এখন ভারী বে-ঢপ দেখায়। আচমকা দেখলে লোকে ভাববে মানুষটা বেঁচে আছে কি করে?

শুধু মুখটাতে এখনো অসুস্থতা স্পর্শ করেনি প্রীতমকে। চোখের দৃষ্টি এখনো সজীব। পা ঝুলিয়ে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতো বসবার চেষ্টা করতে করতে প্রীতম তার ব্যথা-ভরা সুন্দর মুখ-টেপা হাসিটা হাসে।

টিনের চেয়ার বিছানার ধারটিতে টেনে নিয়ে বসে দীপ জিজ্ঞেস করে, আকুপাংচারের তারিখ কবে ছিল?

আজই। এই তো ঘণ্টা দুয়েক আগেই ফিরেছি আমরা।

ডাক্তার কী বলল?

ভাল। অনেক ইমপ্রুভমেণ্ট হয়েছে। আজ ছ'টা কি সাতটা ছুঁচ দিয়েছিল। তাই না বিলু? বলে বিলুর দিকে একবার ফিরে তাকানোর চেষ্টা করল প্রীতম। বিলু পিছন দিকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে খুব দ্রুত তার রুক্ষ চুলে চিরুনি চালাচ্ছিল। কিন্তু জটধরা চুলে চিরুনি চলতে চাইছে না। বিলুর রাগের হাত জটসুদ্ধ চুল ছিঁড়ে আনছে মাথা থেকে। প্রীতমের কথার জবাব দিল না বিলু।

প্রীতমের বালিশের পাশে ফলের ঠোঙাটা রেখে দিয়েছিল দীপ। প্রীতম তার সরু একখানা হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা ছুঁল, তৃপ্তির চোখে চেয়ে দেখল একটু। তারপর লাজুক গলায় বলে—এসব এনেছো কেন? আমি কি এখন আর আগের মতো খেতে পারি, বলো! আজ অরুণবাবুও ডাক্তারের কাছ থেকে আসার সময় একগাদা ফল কিনে আনলেন। কত বারণ করলাম।

বিলু ঘর থেকে চলে গেল রান্নাঘর আর ডাইনিং স্পেসের দিকে। খুব সতর্ক নীচু গলায় দীপ জিজ্ঞেস করল—আজ কি তুই অরুণের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলি? বিলু সঙ্গে যায়নি?

প্রীতম মাথা নাড়ে। যায়নি। মুখে সেই অসম্ভব ভালমানুষের হাসি। দুটো হাতের পাতা কোলের ওপর জড়ো করা। হাড়ের ওপর চামড়া বসে যাচ্ছে খাঁজে খাঁজে। আঙুলের গিঁট জেগে উঠেছে, কংকালসার হয়ে যাচ্ছে হাতের পাতা। সেদিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে প্রীতম। নিজের কররেখা দেখে। তার পর মুখ তুলে বলে—অরুণ বড় ভাল ছেলে। ও এলে বাড়িটা জমজম করে। বিলুরও মনটা ভাল থাকে।

এ কথায় দীপ খুব কূট চোখে প্রীতমের মুখখানা দেখে। না, প্রীতমের মুখে কোনো ছায়া নেই। দরজার ওপরে সাঁইবাবার একটা ছবি টাঙানো, সেই দিকে চেয়ে আছে।

অরুণ হয়তো ভালই। তবে একটু আবেগহীন, বাস্তববাদী। প্রীতমের এই অসুখটা আজ পর্যন্ত কোনো ডাক্তার ধরতে পারেনি ঠিক মতো। প্রথম দিকে একজন বড় ডাক্তার ভুল চিকিৎসা করে রোগটাকে আরো গাঢ়িয়ে তোলে। পরে অন্যান্য ডাক্তার বিস্তর কসরৎ করার পর হাল ছেড়ে দিয়ে বলছে, এক ধরনের ইন্টার-ন্যাল ইনফেকশন। এ রোগের পরিণতি কী হতে পারে তা তারা কেউ স্পষ্ট করে বলেনি। তবে বুঝে নেওয়া যায় সবার আগে সেটা বুঝেছিল অরুণ। সে উপযাচকের মতোই প্রীতমকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোম্পানি থেকে ভলান্টারি রিটায়ার করাল। তাতে এক কাঁড়ি টাকা পেয়ে গেল প্রীতম। এল আই সি-র একজন চেনা এজেন্টকে ধরে করে অরুণ প্রীতমের একটা সত্তর হাজার টাকার পলিসি করিয়ে দিয়েছে। ব্যাংকে প্রীতমের অ্যাকাউন্টকে বিলুর সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করিয়েছে। আত্মীয়-স্বজন যখন রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তখন ঠান্ডা মাথায় এই জরুরী কাজগুলি সেরে রেখেছে অরুণ। সে লোক ভাল হতে পারে, তবে তার মনে কোনো ভাবাবেগ নেই। পরোক্ষে সে কি প্রীতমকে তার পরিণতিটা জানিয়ে দিতে সাহায্য করেনি?

দীপ অন্য একটা কথাও মাঝে মাঝে ভাবে অরুণ কি এসব প্রীতমের জন্যই করেছে? না কি বিলুর জন্য? এখনো বিলু অরুণকে ডাকনামে বুধু বলে ডাকে। বিলুর পোশাকী নাম অনন্যা। অরুণ ওকে ডাকে অনন্যা বলে। এই বুধু ও অনন্যার রহস্য বিলুর দাদা হয়ে ভেদ করতে চায় না দীপ।

দীপ ভাবে, প্রীতমের মনে যখন পাপ নেই তখন তার মনেই বা থাকবে কেন?

পাশের ডাইনিং স্পেসে অনেকক্ষণ ধরে সরু গলায় লাবু ঝিয়ের কাছে কী একটা বায়না করছিল। মেয়েটা এমনিতে মিষ্টি, ভীতু, ঠান্ডা, কিন্তু কখনো কখনো খুব ঘ্যানায়। আর যখনই ঘ্যানায় তখনই ধৈর্যহীন বিলু নির্মম হাতে মেরে মেয়েটাকে পাট-পাট করে দেয়। বিলুর ভয়ে মেয়েটা সব সময় কেমন বিবর্ণ হয়ে থাকে। লাবুর সবচেয়ে বড় আশ্রয়টা সরে গেছে। শরীরের কারণেই বাবার কাছে আসা তার বারণ।

প্রীতম খুব উৎকর্ণ হয়ে মেয়ের গলার স্বর শোনে আর কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করে। আচমকাই পর্দার ওপাশে বিলুর চাপা গর্জন শোনা যায়, চুপ করলি অলক্ষ্মী মেয়ে? গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই চটাস পটাস চড় চাপড়ের শব্দ হতে থাকে। বিলুর শ্রান্ত গলা শোনা যায় আমাকে শেষ না করে ছাড়বি না তোরা! প্রীতম কেমন কুঁজো হয়ে চোখ বুজে সিঁটিয়ে থাকে। যেন মারটা তার পিঠেই পড়ছে।

আরো মারের ভয়ে লাবু কাঁদতে পারে না। কাঁদা বারণ, বারণ না মানলে বিলু আরো মারবে। তাই প্রাণ-পণে কান্না চেপে রাখার চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে হেঁচকী উঠছে লাবুর। পর্দার ওপাশ থেকে সেই হেঁচকীর শব্দ এসে এ ঘরে হাতুড়ির ঘা মারে। প্রীতম বিবর্ণ মুখে চেয়ে থাকে দীপের দিকে। খুব চেষ্টা করে একটু হাসে। মাথা নেড়ে বলে, বিলুর দোষ নেই। ও পেরে উঠছে না। সারা দিন ঘরে আটকে থাকে, ওর মেজাজ খারাপ তো হতেই পারে।

অজুহাতের দরকার ছিল না। দীপ সবই জানে। এও জানে লাবু হচ্ছে প্রীতমের প্রাণের প্রাণ। সেই লাবু পাশের ঘরে মার খেয়ে কাঁদছে এটা শরীর বা মন দিয়ে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না প্রীতম। কিন্তু এই একটা জায়গা ছাড়া প্রীতমের আশ্চর্য সহনশীলতার কোনো তুলনা নেই। নিজের বোন হলেও বিলুকে কোনোদিন তেমন পছন্দ করে না দীপ। ওর ধৈর্য বলতে কিছু নেই, অল্প কারণেই ভয়ংকর রেগে যায়, তা ছাড়া অলস, অগোছালো এবং বেশ কিছুটা স্বার্থপর। অরুণের সঙ্গে ও বহুকাল ধরে একটা ব্যাখ্যাহীন রহস্য-ময় সম্পর্ক রেখে চলেছে। এসব মিলিয়ে প্রীতমের বিবাহিত জীবনটা খুব সুখের নয় নিশ্চয়ই। তবু প্রীতমকে কদাচিৎ দুঃখিত বা বিষণ্ণ দেখেছে দীপ।

বিলু ঘরে নেই, তাই ফাঁক বুঝে দীপ চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, শিলিগুড়িতে যাবি প্রীতম?

প্রীতম উদাস চোখে তাকিয়ে বলে, গিয়ে কি হবে?

তোর ইচ্ছে করে না যেতে?

আগে করত। এখন ইচ্ছে টিচ্ছে কিছু নেই। বিলু বলে, কলকাতা ছাড়া চিকিৎসা ভাল হবে না।

আমি আসার আগে শতমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ও। বলে চুপ করে থাকে প্রীতম। দীপের কথায় ওর মন নেই। পর্দার ওপাশ থেকে এখনো লাবুর হেঁচকি তোলার শব্দ আসছে। কান খাড়া করে সেই শব্দ শুনছে প্রীতম। যেন কিছুক্ষণ চুপ করে শুনে প্রীতম আস্তে করে বলল, আমি যে ভাল হয়ে উঠব এটা ওরা বিশ্বাস করে না।

কারা? দীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

আমার বাড়ির সবাই। ওদের ধারণা আমি শিগগিরই মরে যাবো। তাই আমাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যেতে চায়। বিলুকে এরকম ধরনের চিঠিও লিখেছিল বাবা। আবার তুমিও শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা বলছ।

দীপ একটু মুশকিলে পড়ে গিয়ে বলে, দূর বোকা! তোর অসুখ সারবে না বলে শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা বলেছি নাকি? আসলে ওখানকার জল হাওয়া তো ভাল, আত্মীয়স্বজনদের কাছে মনটা ভাল থাকে।

খুব যেন অভিমানভরে মাথা নাড়ে প্রীতম। বলে, ওসব কথার কথা। আসলে তোমরা বিশ্বাসই করো না যে, আমি আর বেশীদিন বাঁচব।

প্রীতমকে এ ধরনের কথা কোনোদিন বলতে শোনেনি দীপ। তাই অবাক হয়ে কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকে। বিলু নিঃশব্দে ঘরে এসে দীপের

হাতে এক কাপ চা দিয়ে চলে যায়।

ধীরে ধীরে প্রীতম শুয়ে চোখ বুজল।

দীপ চায়ে চুমুক দিয়েই হরিণঘাটার স্টান্ডার্ড দুধের বোঁটকা গন্ধ পায় এবং মুখ বিকৃত করে। সে প্রাণপণে প্রীতমের অসহায়তা, তার রোগভোগের যন্ত্রণা, মৃত্যুচিন্তা এবং বেঁচে থাকার ইচ্ছের অহর্নিশ লড়াই, লাবুর প্রতি তার প্রগাঢ় ভালবাসা ইত্যাদি বুঝবার চেষ্টা করতে থাকে। ভাবতে গেলে প্রীতমের সমস্যার শেষ নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, মরবার আগে প্রীতম কিছুতেই নিশ্চিন্তে জেনে যেতে পারবে না যে, বিলু শেষ পর্যন্ত বিধবা থাকবে, না কি অরুণকে বিয়ে করে বসবে। যদি তাই হয় তবে লাবুর দশা কী হবে! ভেবে চিন্তে প্রীতমের জন্য এক বুক দুঃখ উথলে উঠেছিল দীপের। তাই সে চায়ে দুধের বোঁটকা গন্ধটা আর তেমন টের পেল না।

পর্দা সরিয়ে মেয়ে কোলে বেরিয়ে এসে বিলু বলল, তুমি একটু বোসো মেজদা। আমি পাশের ফ্ল্যাট থেকে ঘুরে আসছি।

বিলু চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ বাদে প্রীতম চোখ খুলে বলে, মেজদা, আমি খুব বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি।

দীপ আত্মবিশ্বাসহীন গলায় বলে, তুই বাঁচবি নাই বা কেন?

খুব কষ্টে প্রীতম উঠে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে। বলে, এগুলো খুব বাজে ব্যাপার। এই অসুখ-টসুখ মোটেই ভাল জিনিস নয়। মন দুর্বল হয়ে যায়, মাথার ঠিক থাকে না। এই সময়ে তোমরা আমার কাছে এসে এমন কোনো কথা বোলো না যাতে মরবার কথা মনে হয়। আমি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকার চিন্তা করি। কাজটা সোজা নয়, তবু করি।

দীপ একটা ঢোঁক গিলে বলে, আমি তোর অনেক ইমপ্রুভমেণ্ট দেখছি প্রীতম।

প্রীতম বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, ইচ্ছাশক্তিকে খুব কম জিনিস বলে মনে কোরো না। উইল পাওয়ার অনেক অঘটন ঘটাতে পারে।

নিশ্চয়ই। দীপ তেমনি আস্থাহীন গলায় বলে।

আমি কখনো কাউকে বলিনি যে, আমি মরে গেলে লাবু আর বিলুকে দেখো। কেন বলব? ওসব তো হাল ছেড়ে দেওয়ার কথা! আমার তো মনে হয় না কখনো যে, আমি মরে যাবো!

সে কথা কেউই ভাবছে না। তুই অকারণে সবাইকে সন্দেহ করিস।

তবে বাড়ির লোক আমাকে শিলিগুড়ি নিয়ে যেতে চায় কেন? ওরা কি জানে না, সেখানে কলকাতার মতো চিকিৎসা হবে না? এ কথাটা প্রীতম খুব আস্তে করে গাঢ় স্বরে বলল। কোনো রাগ বা অভিমান নিয়ে নয়। নিষ্পলক কয়েক সেকেণ্ড দীপের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কয়েক পর্দা নীচু স্বরে বলে, শোনো মেজদা, আমি শিলিগুড়ি গেলেও বিলু কিছুতেই যাবে না। শ্বশুরবাড়ির কাউকেই ও দু'চোখে দেখতে পারে না। জানো তো!

জানি।

কিন্তু আমি বিলুকে কলকাতায় একা রেখে যেতে ভয় পাই।

দীপ জহুরীর মতো মুখের ভাব ঢেকে রাখার চেষ্টা করে বলে কেন?

কেন তা আর বলল না প্রীতম। সামান্য একটু বিচিত্র সুন্দর হাসি হাসল মাত্র। দীপ জানে, মরে গেলেও কথাটা আর প্রীতমের মুখ দিয়ে বেরোবে না। ও কেবল সুন্দর করে হাসবে।

দীপ তাই চাপাচাপি না করে বলল, ইচ্ছে না হলে যাবি না। কেউ তো জোর করছে না!

তা ঠিক। তবে জোর করছে আমার ভিতরের একটা ইচ্ছে। মাঝে মাঝে আমি ডানপাশের ঐ জানালাটা দিয়ে শিলিগুড়ির পাহাড় দেখতে পাই। প্রায় ডাকঘরের অমলের অবস্থা। কিন্তু জানি শিলিগুড়িতে গেলে আমি আর বাঁচব না। চিকিৎসার অভাবে নয়, শিলিগুড়িতে গেলেই আমার মন নরম হয়ে গলে যাবে ইচ্ছার শক্তি যাবে কমে।

দূর পাগল!

প্রীতম হাসছেই। এতটুকু সিরিয়াস ভাব নেই মুখে, বিষণ্ণতাও নেই। যেন ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে এমনি ভাবে বলে, ওখানে গেলেই সেই ছেলেবেলার সব কথা এসে ঘিরে ধরবে। সে ভারী সুখের ব্যাপার, কিন্তু ওগুলো মনকে দুর্বল করে দেয়। তার ওপর সকলে বুক বুক করে যত্ন আত্তি শুরু করবে, সিমপ্যাথি দেখাবে। ব্যস অমনি আমার লড়াইয়ের মনটাই যাবে নষ্ট হয়ে। এখানে তো তা নয়। এখানে প্রতি মুহূর্তেই রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে লড়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু এটাই আমার পক্ষে ভাল কেন জানো? আমাকে প্রতি মুহূর্তে জাগিয়ে রাখছে, সাবধান রাখছে, হাল ছাড়তে দিচ্ছে না জেদ ধরিয়ে দিচ্ছে। যদি আমাকে বাঁচাতে চাও মেজদা কখনো শিলিগুড়ির কথা বোলো না।

দীপের স্বভাব হল যখনই কেউ কোনো কথা আন্তরিকভাবে বলে তখনই সে তা গভীরভাবে বিশ্বাস করে ফেলে। শিলিগুড়িতে গেলে প্রীতম কেন মরে যাবে তার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাক বা না থাক দীপ তা বিশ্বাস করল এবং শিউরে উঠে বলল না না ওসব আর বলব না প্রীতম। তোর যাওয়ার দরকার নেই!

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে দুজন। প্রীতম তার দুর্বল হাত চোখের সামনে ধরে চেয়ে থাকে, যেন আয়নায় নিজের মুখ দেখছে। অনেকক্ষণ বাদে বলল, তুমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছো না মেজদা

দীপ একটু অবাক হয়ে বলে, হ্যাঁ। অনেকদিন।

বেশী দিন নয়। মাত্র দু তিন মাস বোধ হয়।

তাই হবে। দীপ বলে, কেন বল তো।

আগে তুমি অনেক সিগারেট খেতে। দিনে অন্তত চল্লিশটা।

হুঁ। দীপ বুঝতে পারে না প্রীতম কী বলতে চায়।

অত সাংঘাতিক নেশা ছাড়লে কি করে?

দীপ উদাস হয়ে বলে, ছেড়ে দিলাম।

কষ্ট হয়নি?

খুব। ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। পাগলের মতো লাগত।

প্রীতম তার সুন্দর হাসিটা মুখে মেখে বলে, তোমার ভীষণ রোখ আছে মেজদা। সাংঘাতিক রোখ।

দীপ ম্লান একটু হাসে। ছিল, কোনোদিন তার মধ্যে একটু ইস্পাতের মিশেল ছিল। একটু ছিল হয়তো বিলুর মধ্যেও। ছিল বড়দা মল্লিনাথেরও। কিন্তু দীপের ভিতরকার সেই ইস্পাত জীর্ণ হয়ে গেছে আজকাল। বিকেলেই মিসেস বোস তাকে বলছিলেন, আপনার আত্মমর্যাদাবোধ নেই কেন?

প্রশ্নটা এখনো পাথরের মতো বুকের ভিতরে ঝুলে আছে।

দীপ ছটফট করে উঠে বলে, বিলু কোথায় গেল বল তো।

পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটার আজ জন্মদিন। এক্ষুনি এসে পড়বে। বোসো।

দীপ ঘড়ি দেখে। সাতটা। তার কোথাও যাওয়ার নেই। এখান থেকে সে সোজা মেসবাড়িতে ফিরে যাবে। কারো সঙ্গেই কোনো কথা বলবে না। চুপচাপ খেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়বে সিঙ্গল বেডের বিছানায়। জীবনে অনেককাল কিছু ঘটেনি।

সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, না রে, অনেক রাত হয়ে গেল।

প্রীতম করুণ মুখ করে চেয়ে বলে, চলে যাবে? রাতে খেয়ে যাও না। মেসে তো বিচ্ছিরি খাবার খাও রোজ।

দীপ মাথা নেড়ে বলে, আজ নয়।

তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে একটু জোর দিয়ে যেও। তোমার মনের জোরটা আমাকে দিতে পারো না?

দীপ খুব গম্ভীর মুখে বলে, তোর মনের জোর আমার চেয়ে কিছু কম নয় রে প্রীতম!

প্রীতম মুখ তুলে বলে, শোনো, শতম কলকাতায় এলে যেন আমার সঙ্গে দেখা না করে। ওকে দেখলেই সেইসব পুরোনো কথা, মায়াটায়া এসে পড়ে। আমার পক্ষে ওগুলো ভাল নয়। ও যেন ভুল না বোঝে। ওকে বারণ করে দিও।

দীপ মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

প্রীতম এমন কাঙালের মতো চেয়ে আছে যে, দীপ চট করে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে পারছিল না। তার বড় মায়া, তার বড় ভালবাসা এই ছেলেটির প্রতি।

দীপ তাই নিঃশব্দে আবার বসে। বলে, মেজদা বা সোমনাথ তোকে দেখতে আসে?

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, না। সোমনাথ একবার এসেছিল বহুদিন আগে। শ্রীনাথদা আসেনি।

দীপ গম্ভীর হয়ে বলে, আসা উচিত ছিল।

প্রীতম ক্লান্ত স্বরে বলে, তুমি মাঝে মাঝে এসো, তাহলেই হবে। আর কেউ না এলেও ক্ষতি নেই। বরং আত্মীয়দের আহা উঁহু শুনলে আমার খারাপ রি-অ্যাকশন হয়। সিমপ্যাথি দেখানোর লোক আমি চাই না।

দীপ একটু হেসে বলে, তবে কী চাস? সেই পুরু রাজার মতো বীরের প্রতি বীরের ব্যবহার?

প্রীতম ক্ষীণ হাসে। বলে, ঠিক তাই।

দীপ শ্বাস ছেড়ে বলে, আমার রোখের কথা বলছিলি প্রীতম, কিন্তু তুই রোখা কিছু কম নোস। তুই পারবি মনের জোরে এসব কাটিয়ে উঠতে।

প্রীতম চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, শিলিগুড়িতে নয়, কিন্তু অন্য কোথাও গাছ-পালার মধ্যে, নদীর ধারে আমাকে কিছুদিন নিয়ে যেতে পারো না? বিলুকে বলেছি, কিন্তু ও তেমন গা করে না। বলে, বাইরে চিকিৎসা হবে না।

দীপ গম্ভীর হয়ে বলে, মেজদার ওখানে গিয়েই তো অনায়াসে থাকতে পারিস।

শ্রীনাথদা? ও বাবা, শ্রীনাথদার বউ ভারী কড়া লোক শুনি। সোমনাথ বিলুকে বলেছিল, বউদিই নাকি গুন্ডা ভাড়া করে ওকে মার দিয়েছে।

বাজে কথা। বউদি তেমন লোক নয়। বরং মেজদাই কিছু কাছাছাড়া লোক, তাই বউদি সম্পত্তি আগলে রাখে। তুই গেলে কত যত্ন করবে দেখিস।

তুমি কখনো গেছ ওখানে?

অনেকবার। বড়দা তখন বেঁচে। আমি গেলেই মুরগী কাটা হত। শ্রীনাথদার আমলেও গেছি। আরো সম্পত্তি বেড়েছে। ওরা বেশ ভাল আছে। তুই যাবি?

প্রীতম ম্লানমুখে বলল, কিন্তু ওরা না ডাকলে যাই কি করে? বিলু চিঠি লিখেছিল, শ্রীনাথদা জবাব দেয়নি। এখানেই তো রোজ চাকরি করতে আসে, একবার দেখাও তো করতে আসতে পারত। সেধে যেচে যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে?

দীপ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ভাই কত পর হয়ে যায়। রক্তের সম্পর্ক কথাটাই কি তাহলে এক বিকট ভুল?

মনটা খারাপ ছিলই তার। আরো একটু খারাপ হল মাত্র।

(ক্রমশ)

পুনশ্চ পারী

নীরদ মজুমদার

॥ তেইশ ॥

তাঁবু পড়েছিল এক এক জায়গায়। তাঁবু ইয়েরে। তাঁবু মাৎএ। তাঁবু স্যোভিলে। অতঃপর তাঁবু কাঁতেইন স্রোতে।

পূবদিকের আকাশে করমচা রঙের ঈষৎ আলো। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। চোখে কোনো পাখি পড়ে না বটে, কিন্তু তাদের ডাক কানে এসে পৌঁছচ্ছিল। ওদের ডানায় ব্যস্ততার শব্দ। আর শোনা যাচ্ছিল অন্যান্য পাখির স্বরের কয়েক গ্রাম উঁচুতে চড়াইদের কিচির মিচির, হয়তো ওরা "বোঁজুর" "শুভদিন" সম্ভাষণে পরস্পর পরস্পরকে আপ্যায়িত করছিল।

তাঁবুর বাইরে চামচ কাপ প্লেটের টুংটাং শব্দে বেশ বোঝা যায় মার্গারীট "পতিৎ দেজুনে" বা সকালের খাবার প্রস্তুত করছে—আর বেশী দেরি নেই।

মার্গারীট হাঁক দিল, "আতাব্‌ল্‌" অর্থাৎ টেবিলে এসো। খানা প্রস্তুত।

চৌকো সাদা হলদে চেককাটা একটা টেবিলক্লথ ঘাসের উপর পেতে টেবিল হয়েছে। "পতিৎ দেজুনে" স্বভাবতই খুব হালকা। রুটি, মাখন এবং মার্মালেদ, সঙ্গে গরম কফি।

ধীরে নীল আকাশে আলো আলুলায়িত হলো। সামনে প্রশান্ত এক দৃশ্য। ওঠানামা বিচিত্র রেখা বিচিত্র রঙ। গাছের গায়ে, পাতায় পাতায় অনুজ্জ্বল সোনালী আলো। দূরে দেখা যায় সবুজ উপত্যকার মত মাঠ ঘিরে ছায়ার জংগল তখনও যেন ঘুমন্ত!

নিকটের সব ঝোপ-ঝাড় কাঁচা আলোয় পুলকিত, কত কত সবুজ, শ্যাওলা, কলা পাতা, ডাবের সবুজ, তারপর পান্না সবুজ আরটুলটুলি পাখিও নবীনত্বের সবুজ যে সবুজ বসন্তকালে কাঁচ আমপাতায় তাঁবা রঙের সোহাগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। এদিক ওদিক দৃষ্টি সাঁতরে বেড়ায়। উড়ে বেড়ায়।

মার্গারীট, বলল, আঃ কি সুন্দর!

আশেপাশে ঘাসের মধ্যে শুষ্ক পাতার রঙের কী বাহার। হলদে, সোনালী পাততে বাদামী ছাপ, জাম রঙের প্রলেপ। তাতে আবার কখনো কালো শিরা উপশিরা! এই পাতাগুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে চড়াইরা হেঁটে এসে মার্গারীটের হাতে ছড়ানো "নিয়েৎ" (রুটির গুঁড়ো) ঠোঁটে তুলে পালাচ্ছে।

সকাল যেন ধীরে হইছিল।

এমতসময়ে সব লক্ষ করে বড় নিশ্বাস নিয়ে মার্গারীট বললে, হয়তো "জীতান্‌"-দের (অর্থাৎ যাযাবরদের) জীবন আরো সুন্দর। আকাশ বাতাস মাটি ঝরনা সবই ওদের আমাদের কেবল জানলা আর জলের কল।

বলেছো ঠিক, ঐ সব যাযাবরদের ঘরে যারা জন্মায় তারা কপাল নিয়েই জন্মায়। ভাগ্যবান তারা। খোলা আকাশের তলায় শুধু জীবনযাপনই তাদের দর্শন।

ওদের জীবন সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু পড়েছি। মার্গারীট বলল, ওরা নাকি মূলত ভারতীয়, পরে ছড়িয়ে পড়েছে নানা দেশে।

হ্যাঁ, আমার বন্ধুর কাছে আমিও শুনেছি যে হাঙ্গেরীয়ান যাযাবররা যখন কোন কিছু গণনা করে ওদের সংখ্যাগুলো শুনতে না-কি একেবারে ভারতীয় সংখ্যাবাচক শব্দেরই মত। হয়তো এ রকম মিল আরো আছে। বস্তুত ওদের সঙ্গে আমাদের যে পার্থক্য, তা না-কি সব কিছুর শুরুতেই প্রকট ছিল। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোর দুটি তত্ত্বগত দিক আছে। একটা যাযাবর, অন্যটা গৃহী—এ দুয়ের জীবনদর্শনই বলো, জীবন-তত্ত্বই বলো ভিন্ন। আমরা বলি যাযাবররা সন্ন্যাসী এবং গৃহী—যেন পরস্পর পরিপূরক। এই উভয় জীবনতত্ত্ব মানবলীলায় ভারসাম্য এনেছে। এই যাযাবর ও গৃহীর জীবনদর্শনের কথা ভাবতে বসলে তুমি দেখবে কোথাও একটি প্রধান অন্যটি অপ্রধান। কোথাও ঠিক তার উলটোটা। আর্য সভ্যতার মূলে যাযাবর মনোভাব মূর্ত বলেই আমাদের দেশে যাযাবর জীবনতত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। পরে অবশ্য ভারতের প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্পর্শে গৃহীর জীবনতত্ত্বের সমন্বয়ে আর্যভাষগোষ্ঠীর যাযাবর জীবনাদর্শ সুসংগত হয়েছে। গ্রীকসূত্রে তোমাদের দেশে প্রবল গৃহী ভাবেরই প্রাধান্য, ঠিক এইখানেই এক মস্ত সমস্যার সম্মুখীন আমি।

মার্গারীট কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বলে চললাম, তোমাকে বলেছি হয়তো, সেদিন আমাদেব লুভর-এর শিক্ষক-এর কথা আমাকে আরো গভীরভাবে নাড়িয়েছে কারণ তিনি অধুনা শিল্পকলার নামী সমালোচক। আমার ছবি দেখে উনি মন্তব্য করলেন, ভারতীয় হিসাবে তোমার উচিত ইদানীং এখানকার রূপরীতির প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা, এবং আমার মনে হয় তা খুবই সম্ভব। তোমাদের এতবড় পুরনো সভ্যতা। তার অনবদ্য আর্টের ঈক্ষণ, যা হয়তো অন্য কোন দেশে বেশ বিরল, তা থেকে কি তুমি নিজেকে তুলে ধরতে পার না। বুঝেছ মার্গারীট, আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই উনি বললেন, মূল কথা টেকনিক! তোমার ছবিতে তুমি বেশ পরিচিত আধুনিক টেকনিকের সঙ্গে চেষ্টা কর তোমাদের ধ্যান ধারনায় নিজেকে মূর্ত করতে। এই দেখ না মাতিস পারসিক, পিকাসো নিগ্রো আর্ট আত্মস্থ করেই নিজেদের মহিমান্বিত করেছেন। ওঁর এইসব কথা আমি ভেবেছি! কিন্তু কোন উপায়ে তা করব? এই ভাবনা আমার মাথার চুলের শিকড়ে শিকড়ে। কিন্তু একদিন, একটা বই থেকে একটা ছবি আঁকলাম। দাঁড়াও তোমায় দেখাচ্ছি। তাঁবুর ভিতর থেকে আমার ড্রইং খাতা বার করে খুলে ওকে একটা ছবি দেখালাম। মৌর্য যুগের।

"মেয়ে আমার সামান্য মেয়ে নয়"—রামপ্রসাদের গান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নীরদ মজুমদার এঁকেছিলেন

পোড়ামাটির ভাস্কর্যে ডানাওয়ালা দেবীর ছবিটা পেয়েছি স্বনামধন্য কোতোনোর লেখা "লাজি আভেরিঙ্কর" বইতে।

মার্গারীট বললে, মৌর্যযুগের অনেক কাজ আমি দেখেছি অবশ্য, এটা কিন্তু দেখিনি। মৌর্য যুগ ও তার আগের বৈদিক, তারও আগেকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাজের সঙ্গে সুমেরীয় শিল্পকলার বেশ একটা সম্পর্ক রয়েছে তাই না। বৈদিক ও পরবর্তী মহাকাব্যের যুগেও—ভারতবর্ষের কাজের সঙ্গে যেন প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের কাজের মিল রয়েছে বলে মনে হয়। এমন অনেক সময় মনে হবে, মেসোপটেমিয়া, ভারত, ইরানের সভ্যতা যেন এক উৎস হতে নির্গত।

আমি বললুম, ভারতের মাটির যোগসূত্রে অবশ্যই ভারতের ঐ সব যাযাবরীয় মনোভাব আরো পুষ্ট, আরো বিকশিত হয়েছে। আর সে কারণে মনে হয় আরো উন্নত ও বিস্তৃত। আরো চূড়ান্ত ধীশক্তি ভারতের শিল্পকলাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছে সম্পূর্ণ এক আধিবিদ্যক মার্গে। তোমাকে আমি এই যে ছবি দেখাচ্ছি তার টীকাভাষ্যে সেকথা মহাশয় কোতোনো প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়েছেন। বলেছেন "হেলেনিজম্-এর দাপট আমরা দেখতে পাই বিস্তারিত ভূমধ্যসাগর থেকে ভারত অবধি।" মার্গারীট, তোমার হয়তো মনে আছে, আলেকজান্ডার দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁদের কাল্পনিক ডায়োনিসিউসের প্রতিপত্তির প্রসার। প্রাচ্যে, পূর্বে ব্যাকট্রিয়া, এবং পরে উত্তর ভারতে ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। আলেকজান্ডার ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ ব্যাবিলোনে দেহত্যাগ করেন, তার অসমাপ্ত কার্য সম্পাদনায় নিযুক্ত হলেন অধস্তন সেলুকাস নীকাটর। সেই সময়ে জনৈক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বেশ কিছু 'কুদতায় দখলে আনেন প্রাচীন মগধ থেকে প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত। দখল করে নেন বিরাট অঞ্চল। হঠাৎ মনে হলো এসব কচকচি মার্গারীটের ভাল লাগছে না। এসব কথায় তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে না তো, মার্গারীট ?

ও বললে, না না খুব ভাল লাগছে, এসব কথা কবে ভুলে গেছি—যদিও একসময় এইসব পড়েছি।

তা হলে এবার তোমায় বলি, যুদ্ধ-বিগ্রহে নয় আর্টে আমরা কি ভাবে শমুক্ত হলাম। এই প্রসঙ্গে মহাশয় কোতোনোর কথা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ঐ পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ের ফলে প্রাচ্য যখন নিশ্বাসবন্ধ অবস্থা ঠিক তখন থেকেই সেই সংঘাতের শুরু। গত দুই শতাব্দীর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার বহু আগেই এর সূত্রপাত। দুটি ভিন্নমুখী ধারা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভিন্ন মনোবৃত্তির পরস্পরবিরোধী কবল থেকে ভারতীয় শিল্পকে মুক্ত করতে চেয়েছে। পাশ্চাত্য শিল্পকলা মূলত দেহকেন্দ্রিক। প্রাচ্যের শিল্পকলার প্রবণতা মস্তিষ্ক সঞ্জাত। প্রতীচ্য যেখানে গৃহীস্বভাবসিদ্ধ তাদের উত্তরণ যা কিছু স্থাবর সে সব রচনা করেই গেছে তারা। আর যাযাবররা অস্থাবরে রচনায় সিদ্ধহস্ত এবং তাদের কাজ প্রায়শ প্রতীকমূলক এবং গূঢ় সূক্ষ্ম। এই মৌর্য চিত্রেই তুমি সে-কারণে দেখবে কী-

পাখাওয়ালা মৌর্য আমলের শিল্পকলা থেকে নীরদ মজুমদারের আঁকা খসড়া

ভাবে প্রতীকের সূত্র ধরে প্রাচ্য নিজেকে মুক্ত করতে শুরু করেছে। দম নিয়ে আমি মার্গারীটকে বললাম, আমিও ভাবছি ঐ ধরনের কাজ করে আমাকে ফিরে পেতে হবে নিজেকে, আমার পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যকে। ধর তোমাকে— তোমাকেই যদি আমি ভাবি মহাজাগতিক মাতার অনুকল্পে ক্ষুদ্র জাগতিক মাতা, ঐতিহ্যগত ধারণা হলেও জগৎ হতে মহাজগতে পৌঁছান যাবে। ধর তোমার উদর হলো লক্ষ্মী-নারায়ণের বেদী, এবং বক্ষঃস্থল হল স্বয়ং ব্রহ্মার অধিষ্ঠান—আর তোমার মাথায় শিব ও শিবানী—কাল ও মহাকালের খেলা ; —বললাম তুমি বসো আমি কয়েকটা ড্রইং করি। তুমি পারবে ভারতীয় কায়দায় পদ্মাসনে বসতে ?

মার্গারীট অনেক চেষ্টা করল। চেয়ারে বসায় অভ্যস্ত পা দুখানি ভীষণ বেয়াড়া! কিছুতেই বেঁকে না। ডান পা অন্য পায়ের উপরে তোলে তো বাঁ দিকে কাত হয়ে হেলে পড়ে, আর বাঁ পা অন্য দিকে তোলাতে অন্য দিকে হেলে পড়ে। প্রায় একটা হাস্যকর পরিস্থিতি।

মার্গারীট খুব হেসে, খুব প্রাণপণ চেষ্টা করে বললে, "বৌ দিও"—ভগবান কি মুশকিল। ত্রিলোক-মাতা হতে যাওয়া সহজ নয়।

আমি বললাম ঠিক আছে—তোমায় অতখানি পা ভাঙ্গ করতে হবে না, তুমি যতটা পার ততটা কর—বলে ওকে বললাম একটা হাত এইভাবে ধর আর একটা হাত এইভাবে, 'অভয়' ভঙ্গিতে বস। মুদ্রা দেখিয়ে বললাম, মনে কর তোমার দুই স্তনের একটি চন্দ্র আর অন্যটি সূর্য। তেমনি তোমার দুই নয়নের উপরে কপালে আর একটি তৃতীয় নয়ন, যেটির মণি কালো—তমোগুণের রঙ। ডান চোখের রঙ সাদা—সত্ত্ব গুণান্বিত। বাঁ চোখ রক্ত লাল রজো গুণের প্রতীক। কল্পনা কর তুমি ত্রিগুণময়ী। ও বেশ গাম্ভীর্য সহকারে সোজা হয়ে বসল। খুব মজা লাগছিল, প্যান্ট, পুলোভার পরে দেবীর ভঙ্গীতে ওর বসার দৃশ্য। ভাবছিলাম কেনই বা হবে না আজকের জগৎ আধুনিক, সুতরাং মহাজগৎও আধুনিক হতে বাধ্য। ত্রিলোকমাতা হয়তো আজকাল প্যান্ট পুলোভার পরেন।

কেনই বা না? আজকালকার জগতের হিন্দু ঘরের মা-রা যখন প্যান্ট পুলওভার পরেন তখন মহাজাগতিক মা-ইবা কেন তা পরবেন না ?

আমি বললাম, বেশ হয়েছে মার্গারীট, বেশ সৌম্য ভাব এনেছ। তুমি দেখবে এই সব ড্রইং থেকে আমি ছবি আঁকবো। এবার তুমি একটু করাল বা ভীষণ ভাব নিয়ে বসো দু হাত তুলে, যেন কাউকে এক্ষুনি ধ্বংস করতে পার।

ও তাই চেষ্টা করল কিন্তু ওর মধ্যে ভীষণভাব প্রায়শ স্নিগ্ধভাবে ডুবে যায়। খুব চেষ্টা করলো মার্গারীট—তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো, আঙুলে নখর ভঙ্গীতে নৃশংসতার ভাব আনতে চাইল থাবা উঁচিয়ে।

আমি বললাম ঠিক আছে—দুই হাত ঐভাবে তুলে থাকো। আমি তখন খাতায় ড্রইং করছি—এমন সময় ও হঠাৎ প্রশ্ন করলো এখানে গৃহী-সন্ন্যাসীর সম্পর্কটা কি?

সম্পর্ক মিলিত ওতপ্রোত। যন্ত্রে ও মন্ত্রে। তোমার ছবি যে আঁকছি এটা সবকিছুর পরিণতি। তুমি তো জানই আমরা মানুষেরা সীমায়িত, অসীমকে ধরবার এ এক সীমায়িত ছলাকলা—অব্যক্তকে ব্যক্ত পরিণত করা। কিন্তু তা বোঝার এক প্রচ্ছন্ন কাঠামো তুমি পূজাকালে দেখতে পাবে। ধর দুর্গাপূজা, দশ হাত, দশ আয়ুধ নিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর বিজয়িনী দেবী। অজ্ঞানতা দমন করেন। নবরাত্রির পর সবশেষে, সম্পূর্ণ ভরে, মহিষাসুরমর্দিনীরূপে জ্ঞানরূপিণী তিনি প্রকটিতা। তার আগে প্রথম বিন্দু, নয় ত্রিকোণ জ্যামিতিকরূপে তিনি প্রকাশ লাভ করেন। তারপর নবরত্ন-নবঘটের ভিতর। তার উপর নয় পদ্ম, তাতে প্রোথিত নবপতাকা, তারপর দেবী নবপত্রিকায়—তারপর দুর্গা—এই জ্যামিতিক ও আকৃতিক নকশা সকলই মিলিত মন্ত্রতনু। আমি বলে চললাম, এই পরস্পর

চণ্ডমারী—নীরদ মজুমদার অঙ্কিত রেখাচিত্র
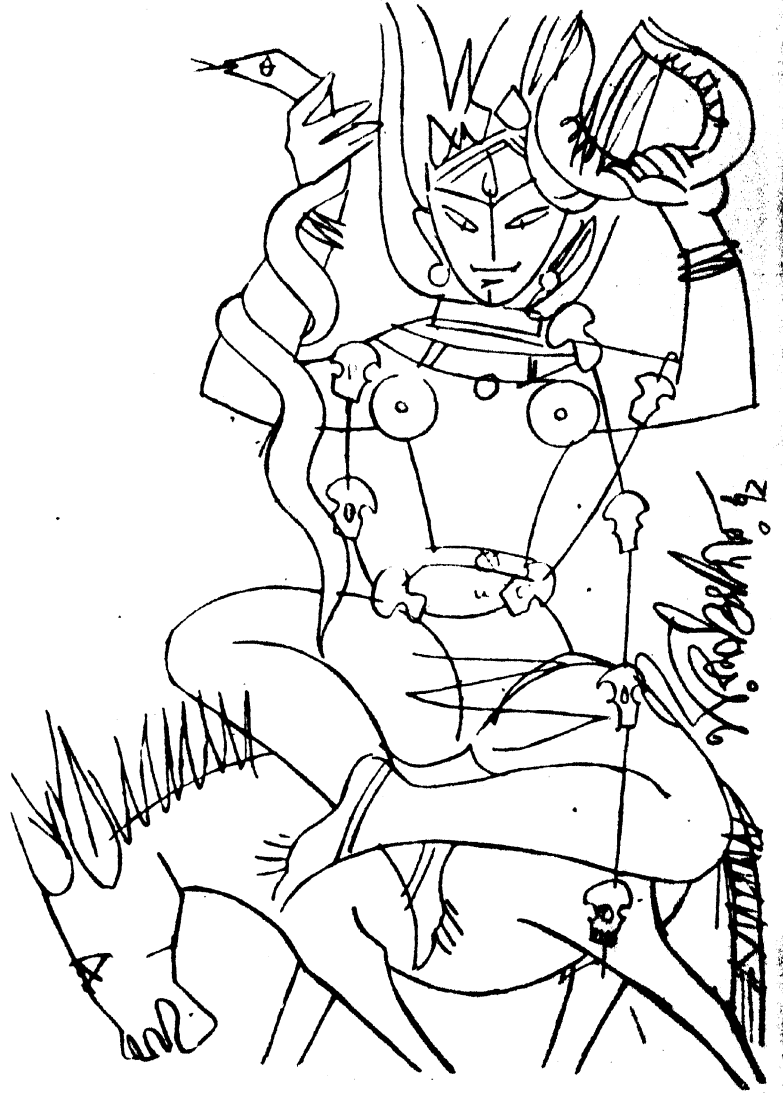
পরিপূরকের রহস্য সত্যই চমকপ্রদ, তুমি তোমার ওল্ড টেস্টামেন্টের কইন ও আবেলের গল্পের ব্যাখ্যা পড়েছো ?

না তো, মার্গারীট উত্তর করলো।

আমি বললাম, সত্যই বিস্ময়কর ওঁর ভাষ্য। ধর উনি বলেছেন যে, গৃহী যারা ক্ষেত্রে নিয়োজিত, তারা প্রকাশিত হয় জ্যামিতিক ক্ষেত্রে, কিন্তু তাদের কাজ দিন রাত বৎসর সংবৎসর বিধৃত—তারাই যুগপৎরূপে রচনা করে দেশগত রূপ, মন্দির মূর্তি চিত্র ইত্যাদি যন্ত্রে। আর যারা যাযাবর তাদের যথার্থ ক্ষেত্র হল দেশ, সদা সর্বদা যারা ভ্রাম্যমাণ কিন্তু পরিবর্তে তারাই তাদের মূর্ত করে কালে, নিজেকে বিকশিত করে মন্ত্রে, সঙ্গীতে, কাব্যে ইত্যাদিতে। প্রথম দলটি হল চক্ষু ইন্দ্রিয়ের মানুষ, দৃষ্টিগত দেশের ক্ষেত্রে হলেও তাদের কাজে কিন্তু কালগত যাদের অস্তিত্ব, তারা তাদের মূর্ত করে দেশে। আর যাযাবর কর্ণেন্দ্রিয়ের মানুষ। তাদের রচনায় ক্রমান্বয় কালে যারা নিজেদের মূর্ত করে তাদের ক্ষেত্র হল প্রসারিত—দেশ যা চক্ষুইন্দ্রিয় সম্পর্কে সম্পর্কিত। পরস্পর ঠিক উলটো তাদের ধ্যান ধারণা। কালের ক্রমান্বয়তায় যাযাবররা রচনা করে মন্ত্র ইত্যাদি—বেশ মজার, তাই না ? এই পরস্পর পরিপূরকেই সব কিছুর গূঢ় অর্থ বিদ্যমান দেখা যায়। তবে এ সব কথা, ভাবপ্রবণতা দিয়ে বোঝা শক্ত বা একেবারে জড়বাদীর মাথার বাইরে। বুঝতে হলে বুঝতে হবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, অধিবিদ্যক ধারণায়—। আসলে, এই আমাদের জগৎ সার্বিক মহাজাগতিকএর সম্পর্কে মিলিত, এ কথা এখনও যথার্থ ভারতীয়ের কাছে সত্য। আধুনিকরা তোমাদেরই নকলনবিস করে চলে এবং অনেকক্ষেত্রে বুঝতেই পারে না তার মর্ম। আসলে হিন্দু ধর্ম তোমাদের "ডক্‌ট্রিনগত" ধর্মের সংজ্ঞায় খাপ খায় না। এ-কারণে অনেক পণ্ডিতই পাকের দুর্বিপাকে পড়ে মন্তব্য করতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়েছেন।

মার্গারীট, সেদিন এক রঙ্গালয়ে গিয়েছিলাম।

ত্রিপুরেশ্বরী চিত্রমালার অন্তর্গত একটি চিত্র—নীরদ মজুমদার অঙ্কিত। ত্রিনয়নী দক্ষিণ স্তন সূর্য; বাম স্তন চন্দ্র; উদরে লক্ষ্মীনারায়ণ, মস্তকে শিব ও শিবানী, বুকে ব্রহ্মা, জানুতে মনু এবং বাণ। অত্যাধুনিক পরিকল্পনা।

"ইন্দ্রাণীর"—নীরদ মজুমদার অঙ্কিত চিত্রের অংশ

নীরদ মজুমদার অঙ্কিত [illegible]

নীরদ মজুমদার অঙ্কিত রঙীন রেখাচিত্র। পরবর্তীকালে অংকিত চিত্রের খসড়া

চিত্রের খসড়া

"গরুড় ও মাতা বিনতা"—নীরদ মজুমদার অঙ্কিত "অশেষ ডানা" চিত্রমালার একটি চিত্র। পক্ষী বিষয়ক গবেষণার ফলশ্রুতি

আমাকে ক্যাথরীন নিয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি দুটো নাটক। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর, ও দ্বিতীয়টি আঁদ্রে জিদের লেখা। ভয়ানক ভাল লেগেছিল। প্রথমত, ডাকঘরের যদিও বেশভূষা আমরা যা দেখে অভ্যস্ত তা নয়। কিছুটা যেন রাজস্থানের পট-ভূমিকায় মঞ্চ, নটনটীদের সজ্জিত করা হয়েছিল। সুন্দর, ভারি ছিমছাম প্রযোজনা। অমল, সুধা এদের কথা আমি ভুলতে পারিনি, আর পারিনি পরিবেশের কথা। মুমুক্ষুতার জন্য উৎকণ্ঠা। এক ভারতীয় আত্মার কথা করুণ তুলিকায় কবি চিত্রিত করেছেন। আর একটা কথা ফরাসী ভাষায়, যেন পুরাতন প্রেম, নূতনত্বে মহিমান্বিত—অমলের মধ্যে অস্তিত্বের ক্ষত, তার জ্বালা "অন্য কোথাও" পৌঁছনোর জন্যেই তার মনের ডানার ঝটপট করার অত্যুগ্র বাসনা মুক্তির জন্য। বেশ এক চূড়ান্ত সংশয়ে নিয়ে যায়। তার পরের নাটক "ল্যা ফা প্রদিগ' যাকে ইংরেজীতে বলে প্রডিগাল সান্। খৃষ্টের উপমা-কাহিনী অবলম্বনে জিদের রচনা। অনবদ্য প্রযোজনা। আধো আলো আধো অন্ধকারে বাইবেলের গাম্ভীর্য বিধৃত। রহস্যময় নাটক—অনুতপ্ত পলাতক পুত্রের প্রত্যাবর্তন। কোথায় ? সেই সত্যে, পিতার সত্যে। যে সত্যে পিতার বক্ষে অপার করুণা। সুন্দর—! দুটি নাটক পাশাপাশি দেখলাম। দুই ঈক্ষণ—পূর্ব ও পশ্চিমের। মনোমুগ্ধকর।

কথা বলতে বলতে আমরা তন্ময়।

তারপর সূর্য আমাদের সচেতন করলো। তল্পি-তল্পা গুটোও—ফিরতে হবে না? কাজ নেই? এই এক ঝঞ্ঝাট! কাজ, কাজ আর কাজ। আমরা জন্মগত ক্রীতদাস। কিন্তু কার? আমরা জানি না। হয়তো আমাদের নিজেদের—।

আমরা আবার চাকার পাকে পাকে রাস্তা গুটিয়ে এগোতে থাকলাম পারীর দিকে। পাহাড়ী দেশ। বেশ চড়াই উৎরাই কোথাও উঠে গেছে, কোথাও নেমেছে প্রায় কিলোমিটার—সেখানে গড়িয়ে গড়িয়ে এগোন যায়।

মার্গারীটকে বললাম, তুমি একটা গান গাও—চলো গাইতে গাইতে ফিরি।

বেশ তবে একটা পুরনো গান শোনো :

লা ফি দুরোয়া এতে তা সা ফিনেত্রে,
(ও সুন্দর ঢাকী যুদ্ধ হতে ফিরেছে) (আবার)
এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপাতাপ্ল্যা
(যুদ্ধ হতে ফিরেছে।)
(রাজকন্যা ছিল তার জানালায়) (আবার)
এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপাতাপ্ল্যা
(ছিল তার জানালায়।)
(ও সুন্দর ঢাকী, তোমার গোলাপটি আমাকে দাও)
(আবার)

এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপাতাপ্ল্যা!
(তোমার গোলাপ আমায় দাও।)
(মহাশয়, রাজা, তোমার কন্যাকে আমায় দাও)
(আবার)

এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপাতাপ্ল্যা!
(তোমার কন্যাকে আমায় দাও।)
(ও সুন্দর ঢাকী, তুমি যথেষ্ট ধনী নও) (আবার)
এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপাতাপ্ল্যা।
(তুমি যথেষ্ট ধনী নও।)
(আমার তিনটে জাহাজ সুন্দর সাগরে ভাসে) (আবার)
এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপাতাপ্ল্যা!
(জলে সুন্দর সমুদ্রে।)
(একটায় ভরা সোনা, অন্যতে মণিমাণিক্য) (আবার)
এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপাতাপ্ল্যা!
(অন্যতে মণিমাণিক্য।)
(এবং তৃতীয় জাহাজ আমার বান্ধবী নিয়ে বিহারের জন্য)

এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপাতাপ্ল্যা!
(বান্ধবীকে নিয়ে বিহারের জন্য।)

গানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্যাডেল করে চলেছি আমি গলা দিচ্ছিলাম ধুয়োয় এবং এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপতাপ্ল্যা...

তারপর :

(ওহে সুন্দর ঢাকী, তাহলে তুমি আমার মেয়ে পাবে) (আবার)

এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপাতাপ্ল্যা!
(তাহলে তুমি আমার মেয়ে পাবে।)
(মহাশয়, রাজা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই) (আবার)
এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপাতাপ্ল্যা!
(তোমাকে ধন্যবাদ।)
(আমাদের দেশে এর থেকেও সুন্দর রাজকন্যা আছে)
(আবার)

এ র‍্যা এ র‍্যা র‍্যাপাতাপ্ল্যা!
(এর থেকেও সুন্দরী।)

র‍্যা প্ল্যা প্ল্যা...করতে করতে, সারের ভাঁজে ভাঁজে আমরা পারী এসে পৌঁছলাম। প্ল্যা। (ক্রমশ)

[illegible]

ুমান্ত

দবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

াজা চুন বালি সিমেণ্টের গন্ধে গন্ধে উড়ে এসেছে দুর্লভ ভ্রমর...
তুন গ্রিলের গায়ে রঙ দিয়ে উঠল মউল। ঘরে কেউ নেই।
রো শেষমাঘের মতন উড়তে উড়তে ভেসে চলেছে অলক্ষণ দিন...
পচে খয়েরের দাগ কথার কলছোপ মেটেরঙের পিচ্‌বোর্ড বাকস,
ভতরে আঁধার হয়ে শুয়ে আছি—কলতলার নীলআঁধার শেওলা।
াবান ফেনায় ভেসে ভেসে ওঠে ঘুমান্তের ছবি, রুপোলাগা।
াখ চাইতে ভালো লাগে না। প্লাস্টার ছবির গায়ে বনগুল্মে ঘেরা মেয়েমুখ
ুলো আর বর্ষার রেণু তার মধ্যে উড়ে বসল শিলাপাথরের সুপর্ণ পাখিঃ
াগো—জেগে ওঠো—তীক্ষ্ম কুহুডাক এফোঁড় ওফোঁড় দিয়ে বেরিয়ে এল—
াটা ছবির গায়ে গায়ে রেশমিরুপোর লুতাপাক—
কনাগাড় ঘুরছে ঘর দালানের বন্ধ বাতাস, কেউ ঘরে নেই।

এখানে

শ্যামলকান্তি দাশ

এখানে দেশ, অনেক মহাদেশ
পাহাড় ছোট পাহাড়ে ঢেকে আছে
এখানে গান গানের চেয়ে একা
এখানে চুপ, একটি কথা নয়!

এখানে আমি আমার মতো আর
সকাল থেকে জানলা দুটি খোলা
এখানে তুমি তোমার মতো আর
সকাল থেকে জানলা দুটি খোলা!

এখানে ভূত ভূতের চেয়ে ফাঁকি
আবছা জল, জলের কাছে হাঁটে
এখানে চুপ, একটি কথা নয়!
কাগজ ভাঙে, কাগজ ভেঙে পড়ে।

গদ্যের সড়কে

সাধনা মুখোপাধ্যায়

সকলেই পারে না তো
কবিতার আঁকাবাঁকা নদী থেকে
চলে যেতে গদ্যের সড়কে
কবিতা তো অপ্রয়াস
মনের গুঞ্জরন
ভাব ফুটি-ফুটি হলে
স্বগত উচ্চারণ
ভাষাময় কিছু কথা বকে
আর গদ্য
ভাবনার কাটাছেঁড়া ব্যবচ্ছেদ
নির্বাচিত বাক্যাবলী
শব্দের নিপুণ প্রয়োগ
হাতুড়ি পেটায় মস্তকে
কবিতা পাপড়ির ফুল
প্রাকৃতিক স্বতঃবিকশিত
গদ্য যেন শ্বেত পাথরের পদ্ম
ছেনি দিয়ে কুঁদে কুঁদে গড়া
স্তবকে স্তবকে
তা ছাড়া নদীর
সুখদ ও স্নিগ্ধ স্নান ছেড়ে
ইচ্ছে করে না কারও কারও
চলে যেতে
গদ্যের সুপ্রশস্ত রাজপথে শখে

"রচনা" (২৬″×২৪″ টেম্পেরা)—দীপালী ভট্টাচার্যের আঁকা। উচ্চমাধ্যমিকে চারুকলা নিয়ে প্রথম বিভাগে তৃতীয় হন (১৯৬৭)। বি এ (কলকাতা '৭২)। সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক (১৯৭৪)। জাতীয় জলপানি (৭৬-৭৮)। শুয়ে স্মৃতিচারণ করছে একজন। নানা বর্ণের বাহারে বোঝা যায় স্মৃতি নিয়তই সুখের।

হাসপাতালের দরজাতেও এই চিহ্ন ছিল!
বটে?

গাড়িটাকে সেইজন্যেই কোথাও লুকিয়ে ফেলা দরকার!
তারপর জঙ্গলে পড়ে থাকব?
তুমি একটি আস্ত পাগল!

জ্যাক, এই দরজাটা দ্যাখো!
হীরে - ডাকাত!

ওরেব্বাবা, এ-গাড়িতে ঘোরা তো বিপজ্জনক!
ঠিক কথা! আগে দেখিনি! এখুনি অন্য গাড়ি জোগাড় করতে হবে!

বাচ্চাদের জন্যে একটা আলাদা বাড়ি করে দেব ভেবেছিলাম! তা আর হল না!
মাগো!
মেয়েটাকে জেরা করুন, ডঃ অ্যাবেল!

হ্যাঁ, বেন যে হীরে নিয়ে যাচ্ছে, এ-খবর আমিই নুরিকে দিয়েছি...
কে নুরি? সে কোথায়?
...মানে জোর করে আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে...

নুরি... জেল-ফেরত ডাকাত! বলেছিল, ভাল হবে। কিন্তু তার স্বভাব শোধরায়নি।
তোমার দোষ নেই!
আমাকে ক্ষমা করুন ডঃ অ্যাবেল!

ডাকাতরা কোথায় হীরে বিক্রি করবে? শহরে নিশ্চয়...!
শহরে তাদের খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। দেখি কী করা যায়?
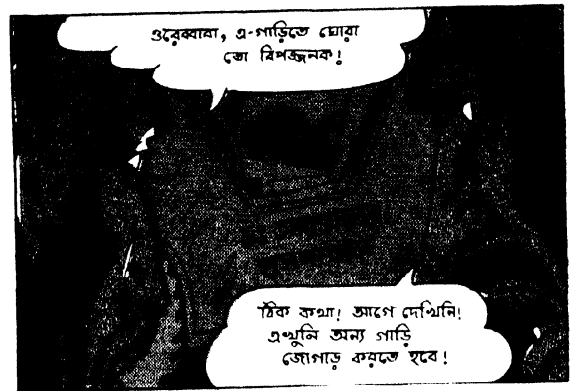
এডেলেড-এ বিশ্ব আরট কংগ্রেস

অহিভূষণ মালিক

॥ তিন ॥

কুইজ কনটেস্ট-এ যদি প্রশ্ন করা হয় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মদ্য তৈরী হয় কোথায়? সাউথ অসট্রেলিয়ার লোকেরা বলবে—বারোসাভ্যালিতে। বারোসাভ্যালি নেহাত ছোটখাট জায়গা নয়, খোঁজ নিয়ে জানলাম লম্বায় উনত্রিশ কিলোমিটার আর চওড়ায় আট কিলোমিটার। লোকে বলে—এ যেন ইউরোপের রাইন ভ্যালি তুলে নিয়ে গিয়ে বসান হয়েছে অসট্রেলিয়ায়। মোটরগাড়িতে এডেলেড শহর থেকে ঘণ্টা দেড়েকের পথ। ইউরোপের প্রুসিয়া, সিলেসিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে কিছু লোক বারোসাভ্যালিতে বাসা বাঁধে। বারোসাভ্যালির চালচলনে সেই আদি প্রুসিয়ান বা জারমন ভাব থেকে গেছে আজও। আশেপাশে প্রচুর আঙুরের ক্ষেত। বাড়ি ঘরের চেহারা সেই সেকালের জারমানির মত। বারোসাভ্যালির বাসিন্দারা জানে আজ যদি তারা ঐ সব প্রাচীন গৃহাদি ভাঙচুর করে স্কাই-স্ক্রেপার তুলে ফেলে, পর্যটকেরা আর ওদিক মাড়াবে না। টুরিস্টদের কাছ থেকে বারোসাভ্যালির কম আয় হয়! ভ্যাঁ রুজ আর ভ্যাঁ ব্লাঁ—রক্তসুরা এবং শ্বেত-সুরা দুইই সেখানকার বিখ্যাত, তা ছাড়া পোরট শেরী প্রভৃতি মদ্যও নেহাত কম অভীষ্ট নয়। আধা শহুরে গ্রাম ছড়িয়ে আছে সারা বারোসাভ্যালিতে। ঐ সব গ্রাম থেকেই আসে এডেলেড শহরে নানা রিসেপসন আর লাঞ্চ পারটির জন্য পানীয়।

অন্য সময়ে বারোসাভ্যালির মেজাজ থাকে খুব শান্ত, দীর্ঘস্থির কিন্তু শরৎকালে চেহারাই আলাদা। কর্মব্যস্ততায় সারা উপত্যকাটি, চালু মেশিনের মত চঞ্চল। ছোটখাট চোলাইখানা এবং বড় বড় ওয়াইনারী সব জায়গায় পূর্ণোদ্যমে চলে কাজ। শুধু অসট্রেলিয়ার রসিকদের জন্যেই নয়, বিশ্বের নানা স্থানের সুরা-অনুরাগীদের তৃষ্ণা মেটাতে হবে যে, সারা দিন রাতই কাজ। সুন্দরীরা ক্ষেত থেকে আঙুর তুলল, গাড়ি বোঝাই হল, কারখানায় রস নিঙড়ে নেবার পর সযত্নে তা সরিয়ে রাখা হল। বেশ পেকে গেলে বোতলে ভরে চালান হল বাজারে এবং বিদেশে।

বারোসাভ্যালির আরেক আকর্ষণ সেখানকার খাঁটি জারমন খানাপিনা। যা নামের বহর—আমার পক্ষে মনে রাখা অসম্ভব। সাজে পোশাকেও বারোসার লোকেরা বেশ সেকেলে। সারা ভ্যালিতে অনেক ছোট ছোট মিউজিয়াম। উৎসবের সময় নাচ গান বাজনায় মুখর হয়ে ওঠে উপত্যকা। ইনসিয়া ডেলিগেটদের কপালে উৎসব আর দেখা হয়নি। ইউরোপ-এ আজ প্রুসিয়ার প্রাণ কতটুকু জানি না, কিন্তু অসট্রেলিয়ার বারোসাভ্যালিতে তা টগবগে।

এডেলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন বিল্ডিং, আরট কংগ্রেসের অস্থায়ী কার্যালয়

বারো তারিখ থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, আঠার তারিখে বক্তৃতা করার পরও আমার কাছে পরিষ্কার নয়, এ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কী, এবং ইনসিয়ার ইতিহাসই বা কী? উনিশ তারিখে শেষ প্রবন্ধ পাঠ করবেন অধ্যাপক স্যাম ব্লাক। অধ্যাপক ব্লাক কানাডায় ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরট এডুকেশন বিভাগের শিক্ষক। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু—পঁচিশ বছর পর ইনসিয়া—কেন? এই বক্তৃতার মাধ্যমে আমার জিজ্ঞাস্যের উত্তর মিলবে। বেলা আড়াইটায় ফেসটিভ্যাল থিয়েটারে বক্তৃতা শুরু হবার কথা, আমি বেশ কিছুটা আগেই উপস্থিত হলাম এবং কাগজ কলম বাগিয়ে সামনের দিকে গিয়ে বসলাম। শ্রোতারা পাশ্চাত্তেরই হোক বা প্রাচ্যেরই হোক, সময় সময় অহেতুক গোলমাল সৃষ্টি করে, কংগ্রেসেও দেখেছি জনৈক বক্তাকে ঘন ঘন হাততালি দিয়ে থামিয়ে দিতে।

রসিক লোক স্যাম ব্লাক। বললেন, অসট্রেলিয়ানদের আতিথেয়তায় তিনি অভিভূত, এমন কি এডেলেড চিড়িয়াখানার এক কাকাতুয়াও তাকে বলেছে, (অবশ্য অসট্রেলিয়ান উচ্চারণে) "উড ইউ লাইক এ ড্রিংক?" কিছু হালকা কথাবার্তা না বললে আলোচনা জমে না, আরও কিছু রসিকতা করে অধ্যাপক ব্লাক জানালেন কেন ইনসিয়া শুরু হয়েছিল এবং কেনই বা তার প্রয়োজনীয়তা আজও।

১৯৫১ সালে, ব্রিস্টল শহরে, আরট সম্বন্ধে ইউনেসকো আয়োজিত এক আলোচনা সভায় ইনসিয়ার গোড়াপত্তন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, পৃথিবী তখন ঘৃণা, ধ্বংস, তিক্ততা প্রভৃতি থেকে ক্রমশ আরোগ্য লাভ করতে শুরু করেছে, বিশ্ববাসী বুঝতে পেরেছে পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা এবং সৌহার্দ্য ব্যতীত সুস্থ সবল ভবিষ্যৎ সম্ভব নয়। প্রায় কুড়িটি দেশ, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল কিছু দিন আগেও পরস্পরের পরম শত্রু, খোলসা মনে আগ্রহ নিয়ে বসে একই টেবিলে ইনসিয়ার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য খসড়া করতে।

সে মিটিং-এ যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা হল :

১। সৃজনশীল শিল্পকর্ম মানুষের অবশ্য প্রয়োজন।

২। আরট মাধ্যমে শিক্ষা হল সর্বাপেক্ষা সহজ এবং স্বাভাবিক পন্থা ব্যক্তিত্ব গঠনের সব অবস্থাতেই।

৩। আরট মাধ্যমে শিক্ষায় লিপ্ত ব্যক্তিদের একটি বিশ্বব্যাপী সংঘ গড়ে তোলা দরকার।

৪। যাঁদের কাজ ভিন্ন তাদেরও সহযোগিতা একান্ত কাম্য, তাতে দু-তরফেরই লাভ।

৫। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং নানা জাতির মধ্যে সুস্থতর সমঝোতা বাড়িয়ে তোলা দরকার, পরস্পরের সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যে যোগদান ও নানা আরট-এর উৎকর্ষ উপভোগ করা জীবন্ত বাস্তব হয়ে উঠবে।

জ্যাক কনডুস

জন স্কাল

লী গ্রাসটেন

শিলিনর হাই স্কুলের ছাত্রী মডেল তৈরির কাজে ব্যস্ত

উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যগুলি আজও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের এখন উচিত নতুন করে সক্রিয় হয়ে ওঠা যাতে 'আরট মাধ্যমে শিক্ষা' বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করতে পারে।

এই সংস্থার সৃষ্টির সময় এর সঙ্গে জড়িত বহু বিদগ্ধেরই নাম ছিল, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সার হারবার্ট রীড, ডঃ এডওয়ার্ড জিগফিলড এবং ডাঃ ডাডলী গেইটস্কিল। হারবার্ট রীড অনরারী প্রেসিডেনট হয়ে ইনসিয়ার হাল ধরেছেন এবং তাঁর চিন্তা, বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে বেশ কিছুকাল পাল উড়িয়ে তরী এগিয়ে দিয়েছেন।

ইনসিয়া নির্বিঘ্নে যেমন এগিয়েছে তেমনি আবার ঝঞ্ঝা ঝটিকার মুখেও পড়তে হয়েছে এই সাতাশ বছরে বহুবার। কেন ইনসিয়ার সৃষ্টি সে কথা ভুলে গিয়ে অনেকে রাজনীতির মঞ্চ হিসেবে একে দেখেছেন, কেউবা আবার ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এখানে অনুপ্রবেশ করেছেন। সুতরাং কিছুটা বদনাম হয়েছে নিশ্চিত। কিন্তু ইনসিয়া আজও জীবিত।

পলকা কাঠ আর চামড়া দিয়ে তৈরী কানাডার আদিবাসীদের জলযান, পাহাড়ী খরস্রোতা নদীবক্ষে, সুনির্মিত মূল্যবান নৌকো অপেক্ষা যেমন বেশী কার্যকরী ঠিক তেমনই নানান অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে ইনসিয়ার এগিয়ে চলার ক্ষমতা অবশ্যই আছে। ইনসিয়ার দপ্তর এখন পারী, দ হাগ, ম্যানিলা, মনট্রিল, প্রাগ নিউ ইয়র্ক জাগরেব স্যাভর এবং এডেলেড-এ, সুতরাং সত্যিকার এ এক আন্তর্জাতিক সমাজ। ইউনেসকো থেকে এখন ইনসিয়ার কাছে পরামর্শ নেওয়া হয় শিক্ষা বিষয়ে। এরই প্রভাবে আজ নানা দেশে আরট মাধ্যমে শিক্ষা প্রচারের জাতীয় সমিতি গঠিত হয়েছে। তিন বছর পর পর ইনসিয়ার উদ্যোগে বিশ্ব আরট কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা বিনা সংকোচে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় এবং ভাব বিনিময় করে ইনসিয়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেন। অবশ্য একথাও ঠিক, যে দেশে কংগ্রেস বসে সেই দেশেরই আরট এবং আরট শিক্ষকরা লাভবান হন এই ভাব লেনদেন-এ সর্বাপেক্ষা বেশী।

অধ্যাপক স্যাম ব্ল্যাক-এর কাগজ পড়া চলল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারপর সারা মঞ্চ জুড়ে চেয়ার পাতা হল এবং গুটি গুটি একেকজন করে এসে আসন দখল করতে লাগলেন, ইনসিয়ার সদস্যবৃন্দরা। দেখি হংকং-এর সেই লিউ-ও একটি চেয়ার-এ বসে গেছে। আমাদের দু-একজনের কৌতূহল, লিউ ওখানে গেল কী করে! প্রত্যেকের পরিচিতি পেশ করার পর জ্যাক কনস্ত্রুস লিউ-এর দিকে তাকিয়ে বলল, ইনি লিউ কু সুং, ইনসিয়ার সদস্য নন, কিন্তু উনি এসিয়া-ইনসিয়ার সভাপতি। লিউ টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে মাথা নিচু করল। এলিনর হিপওয়েল ঘোষণা করলেন, "ইনসিয়ার পরবর্তী সভাপতি—জ্যাক কনস্ত্রুস।" হাততালির আওয়াজে সারা হল গমগম করছে। শ্রীমতী হিপওয়েল উঠে গিয়ে কনস্ত্রুসকে চুম্বন করলেন। পাশ্চাত্য প্রথা। কনস্ত্রুস বেশ ঘাবড়ে রয়েছে, তাকে হাত ধরে টেনে এনে ডঃ স্কাল মাইক-এর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল প্রেসিডেনট নির্বাচিত হয়ে তাঁর কেমন লাগছে তা প্রকাশ করার জন্যে। জ্যাক কনস্ত্রুস ইনসিয়ার পরবর্তী কমিটির কাছে প্রস্তাব রাখলেন তিনটি। ইনসিয়ার জার্নাল, ছাত্রদের আরট-এর আন্তর্জাতিক লেনদেন, এবং পৃথিবীর শিল্পশিক্ষাব্রতীদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা।

সভাপতিত্বের ভার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ায় ছোকরা কনস্ত্রুস খুশী হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু ভয়ও পেয়েছে বেশ, তা তার কথাবার্তা বলার ভঙ্গী আর আটকে যাওয়া গলার স্বর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। ভয় পাবারই কথা, কারণ হারবার্ট রীড-এর মত ব্যক্তিত্ব যে ভার বহন করেছে, ডাঃ জিগ ফলড যে দায়িত্ব পালন করেছেন এতদিন, সে দায়িত্ব গ্রহণ করার মত যোগ্যতা কী আছে? অভিজ্ঞতায় সে তো ঐ মহা পন্ডিতের কাছে নগণ্য! কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত ইনসিয়ার ২৩তম বিশ্ব কংগ্রেস-এর পরিকল্পনা সভার সে ছিল সভাপতি। সম্ভবত এমন সুপরিকল্পিতভাবে এর আগে কোথাও ইনসিয়া কংগ্রেস হয় নি। সেই কারণেই আজ তাকে গোটা ইনসিয়ারই সভাপতি মনোনীত করা হল।

ইনসিয়ার নতুন কমিটির মধ্যে নাম আছে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে করণ ...-এর। কিন্তু কে এই করণ ব্যাস? আমরা এঁর নাম আগে শুনিনি।

ইনসিয়ার পরবর্তী কংগ্রেস বসবে হল্যাণ্ডের রটারড্যাম বন্দরে। আগামী ১৯৮১ সালের কংগ্রেস উপলক্ষে ইতিমধ্যেই একটি পুস্তিকা ছাপা হয়ে গেছে। হল্যাণ্ডের প্রতিনিধি মঞ্চে উঠলেন। তাঁর নামটা লিখে নিতে ভুলে গেছি; আর, যা উচ্চারণ তা বাংলা হরফে প্রকাশ করা খুবই দুরূহ।

বক্তৃতা শুরু হতেই হলের মধ্যে হাসির হর্‌রা পড়ে গেল। ভদ্রলোক একটু চটে গিয়েই বললেন, 'আমার ইংরেজী উচ্চারণে আপনারা আজ হাসছেন, রটারডাম-এ গেলে আপনাদের কথা শুনে আমরা হাসব।' হাসির দমক আরও বেড়ে উঠল। ভদ্রলোক বেপরোয়া ডাচ উচ্চারণে ইংরেজী বলে যেতে লাগলেন। ইংরেজী উচ্চারণে ভুল হতে পারে ভেবে ইংরেজী নবীশ দেশী ইনটেলেকচুয়ালদের সামনে আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি। কিন্তু অন্য দেশের লোকেরা নির্ভুল ইংরেজী বলতে না পারলেও কিছু মাত্র লজ্জা পায় না! কথা প্রসঙ্গে রেসপনসিবিলিটি শব্দটি বক্তার টাকরায় অর্ধেক উচ্চারিত হয়ে আটকে গেল। একটু দম নিয়ে তিনি বললেন, 'ডোণ্ট ওআরি, আই উইল কম টু দ্যাট।' অসম্পূর্ণ বাক্যটি গোড়া থেকে শুরু করে খুব সন্তর্পণে রে-স-প-ন-সি-বি-লি-টি

মাস্টারমশাই ধাতু ঢালাই-এর প্রণালী শেখাচ্ছেন স্কুলের ছাত্রীকে

শব্দ উচ্চারণ করে বিজয়ের হাসি হেসে বললেন 'ইউ সী আই থ্যাঙ্ক ডন ড্যাট!' ভদ্রলোক জানালেন দেখা গেছে এই কংগ্রেস এবং জনসাধারণের মধ্যে খুব একটা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় না। রটারডাম-এর ব্যাপারই আলাদা, সেখানকার লোকেরা গায়ে পড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবেই। চারটি মিউজিয়াম ভার নিচ্ছে কংগ্রেস চলাকালে বিশেষ স্কুল চালু করার। সেই স্কুলের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর লোক জানতে পারবে কংগ্রেসের কার্যকলাপই বা কী আর উদ্দেশ্যই বা কী। সমবেত ডেলিগেটবৃন্দকে তিনি মৌখিক আমন্ত্রণ জানালেন রটারডাম-এ। সন্ধ্যা তখন প্রায় ৬টা। সভাভঙ্গ হবার পর ইনসিয়া এসিয়ার সভাপতি সেই লিউ-কে ধরলাম, বুঝলাম গেটওয়ে ইন হোটেলের সেই মিটিং-এর কথা, কলকাতায় ইনসিয়া এসিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাব, অত কাণ্ড কিছুই তার মনে নেই। এল এস ডি-র প্রতিক্রিয়া হতে পারে। রাত্রি আটটায় কংগ্রেস ডিনার, বিনি-পয়সায় নয়, ডিনার খেলে মূল্য দিতে হবে ২০ ডলার। ডিনারের পর বল নৃত্য। আমার দুটোর কোনটিই পছন্দ নয়। জয়াদির সঙ্গে দেখা হল উনি বললেন 'আমি ডিনারে আসব না, কিন্তু বল-এ আসব।' জয়াদির বয়স ষাটোর্ধে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি কিন্তু জয়াদি ক্লান্ত হননি। শুনলাম, বল নৃত্য হয়েছিল সেদিন রাত্রি বারোটা পর্যন্ত। জয়াদি শেষ অবধি ছিলেন।

সেই দিনই যে মর্মন্তুদ ঘটনাটি ঘটে, আমরা এডেলেড-এ থাকাকালে সে খবর পাইনি। এই কদিন আগে লী এর চিঠিতে জানলাম, কংগ্রেস সমাপ্তির দিন, মোটর দুর্ঘটনায় স্থানীয় কমিটির এক সদস্যা কংগ্রেস ফটোগ্রাফারের স্ত্রী, নিহত হয়েছেন। সেই কারণেই নিশ্চয় ২০ তারিখে এডেলেড ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে দেখি কংগ্রেস কার্যালয় ফাঁকা কেউ নেই সেখানে কোনও খোঁজ খবর দেবার।

ডাচ ভদ্রলোক যে বললেন কংগ্রেস এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, সেটা এডেলেড-এ বেশ বোঝা গেছে। ডেলিগেটদের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি অবশ্যই ছিল না, স্বয়ং গভর্নর রিসেপশন পার্টি দিলেন, লর্ড মেয়র রিসেপশন দিলেন, ডিরেকটর জেনেরাল অব এডুকেশন লাঞ্চ-এ নিমন্ত্রণ করলেন, রয়াল ওভারসীজ লীগ ডিনার খাওয়ালেন—কিন্তু এডেলেড-এর জনসাধারণের সঙ্গে ডেলিগেটদের পরিচয় ঘটাব কোনও সুযোগ ঘটল না, এডেলেড-এর সব মানুষ জানতেও পারল না শহরে কত ব্যাপারটাই না ঘটে গেল। প্রাত্যহিক সংবাদপত্রগুলিও উপযুক্ত প্রচারে বিমুখ হয়ে রইল। পেঙ্গুইন পাখির সেক্স চিন্তায় পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা এডেলেড-এর বৃহৎ কলেবর, সর্বাধিক প্রচারিত 'অ্যাডভারটাইজার' সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু ইনসিয়া ওয়ার্ল্ড আরট কংগ্রেস-এর প্রতিদিনের খবরাখবর প্রকাশ করা যুক্তিসংগত মনে করেন নি ওখানকার বার্তা সম্পাদকেরা। অবশ্য সুন্দরী নাসীম খানের ইন্টারভিউ তাঁর বক্তৃতা দেবার আগেই ফটো সমেত প্রকাশিত হল এবং উইটকিন সাহেবের লিখিত প্রবন্ধ চারিয়ে ফেলার সংবাদটি বেশ মুখরোচক ভাবেই পরিবেশিত হয়েছিল পরের দিনের কাগজে। কোনও

রেশমের এমব্রয়ডারি করা কাউবয়ের মাথা যেটি উপহার দিয়েছিলেন আমাকে সেই মেক্সিকান মহিলা।

কোয়ালা বিয়ার। ক্যাঙ্গারুর থেকে বেশী প্রিয় অস্ট্রেলিয়ানদের কাছে

ব্যাপারে জনসাধারণকে সজাগ করে তোলার সবচেয়ে বড় মাধ্যম সংবাদপত্র, সেই সংবাদপত্র যদি উদাসীন থাকে তাহলে বলতে হবে কংগ্রেসের প্রচার বিভাগ গলদ।

কংগ্রেস-এ মোট চোদ্দটি কী নোট বক্তৃতা হয়, আমি উল্লেখ করেছি বারোটি সম্বন্ধে কারণ একদিন দু জায়গায় প্রাতঃকালীন অধিবেশনের ব্যবস্থা হওয়ায় আমার পক্ষে দুটি প্রবন্ধের টীকা নেওয়া সম্ভব হয়নি। দু ভাগে ভাগ হব কী করে? দু ভাগ কেন, কংগ্রেস-এর সব পেপার শুনতে হলে নিজেকে অন্তত ২৫ ভাগে ভাগ করতে হত ইউনিভারসিটির বিভিন্ন লেকচার থিয়েটারে একই সঙ্গে কম করেও ২৫টি প্রবন্ধ পাঠ চলত। আপন কৌতূহল অনুযায়ী বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে শ্রোতারা পৌঁছতেন সেই সেই বক্তৃতা কক্ষে। কলকাতায় ঐ রকম একটা অনুষ্ঠান করতে হলে মনে আসবে, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের মত বিরাট প্যাণ্ডালের কথা। ওরা আট দিনে যে ব্যাপারটি সেরে ফেলল, সেরকম অনুষ্ঠান এখানে হবে কম করেও মাস তিনেকের ধাক্কা। প্রতিদিন বেলা ১২-৩০ মিনিটে সব বক্তৃতা শেষ, তারপর একসঙ্গে বিচিত্র সব অনুষ্ঠানের পালা, চিত্রপ্রদর্শনী, ডেমনসট্রেশন, ওয়ার্কশপ, ক্লাশ ইত্যাদি। তারপর আবার চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা। ইচ্ছে থাকলেও একজনের পক্ষে সব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া যাবে না। সাত সমুদ্র না হলেও বঙ্গোপসাগর ডিঙিয়ে, ভারত মহাসাগর হয়ে দক্ষিণ সাগর লাগা এডেলেড-এ পৌঁছেছিলাম, কটা নদীর ওপার দিয়ে উড়ে গেছি গুনিনি তবে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকায় অনেক নদী দেখতে পেয়েছি অর্থ ব্যয় হয়েছে প্রচুর, কিন্তু ফিরে আসতে হয়েছে আংশিক অভিজ্ঞতা নিয়ে। দুঃখের কথা বটে!

এডেলেড-এ বিশ্ববিদ্যালয় আছে দুটি এবং ইউনিভারসিটির পূর্ণ মর্যাদা না পেলেও ডিগ্রী বিতরণকারী শিক্ষাকেন্দ্র যাদের বলা হয় কলেজ অব অ্যাডভান্সড এডুকেশন, ঐ শহরে আছে একাধিক। প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই রয়েছে বিশেষভাবে আরট ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা। এবং প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ বড়সড় আকারের নিজস্ব-সংরক্ষনাগারের অধিকারী। কংগ্রেস চলাকালে ইনসিয়া অতিথিদের কাছে ছিল এদের অবারিত দ্বার। চাইলে তাঁরা হাতেনাতে কাজ করতেও পারতেন। আমরা সেখানকার ছোটখাট

ক্যাঙ্গারু—অবরিজিন আরট
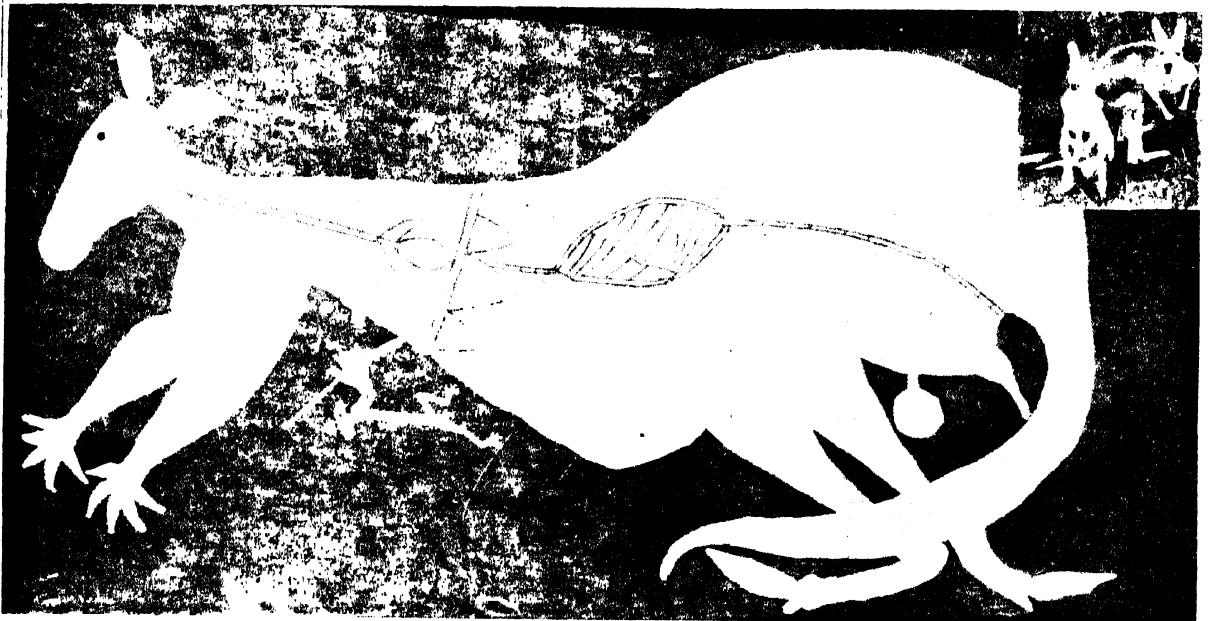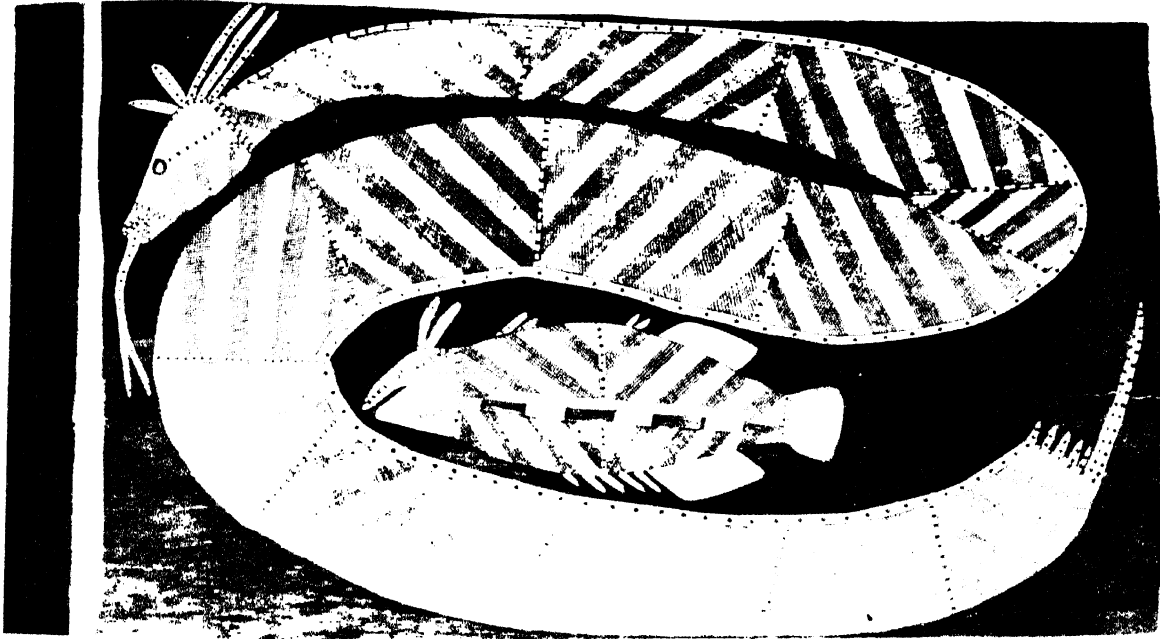
রাজধনু সর্প—অবরিজিন আরট

কয়েকটি প্রাইমারী স্কুলও দেখেছি। সত্যেন ঘোষাল মশাই এক স্কুল দেখে মন্তব্য করলেন, 'ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হাতে গোনা যায়, কিন্তু তাদের আরট ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা দেখলে মাথা ঘুরে যাবে! কত সুযোগ পাচ্ছে এরা! আমার ছাত্র-ছাত্রীদের এদের তুলনায় কী বা সাহায্য করতে পারি! এমন জিনিসপত্র হাতে পেলে আমাদের দেশের মাথাওয়ালা ছেলে-মেয়েগুলো ভেল্কি দেখাতে পারত মশাই।' এ তো গেল সাধারণ প্রাইমারী স্কুলের কথা। আমি দেখেছি সলসাবরী কলেজ অব অ্যাডভান্সড এডুকেশনের আরট ওয়ার্কশপ। সিরামিকস, স্কালপচার, পেইন্টিং, গ্রাফিকস ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার বিরাট ব্যবস্থা। সবরকমের আধুনিক হাতিয়ার নাগালের মধ্যে। মালমশলার কমতি নেই। ডিপার্টমেন্ট-এর বাজেট কম, সব জিনিস মজুত রাখা সম্ভব হয়নি, যা আছে তাই দিয়েই কাজ চালাও এমন কথাটি শোনা যাবে না। ছাত্রছাত্রীরাও যখন কাজ করে, ইয়ার্কি ফাজলামির কথা একেবারে ভুলে যায়। হ্যাঁ, কলেজ ক্যানটিন অবশ্যই আছে, কিন্তু ক্যানটিন-এ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে গালগল্প করতে কোনও শিক্ষার্থীকে দেখা যাবে না। শিক্ষককে খাটিয়ে নিতেও জানে ওরা। দু দণ্ড ঘর বন্ধ করে বসে থাকা বা বন্ধুর সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলার অবকাশ নেই, পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পর পরই দরজায় ঘা টকু টকু টকু! মাস্টার মশাই-এর ব্যাজার হওয়া চলবে না, ছাত্র এসেছে কিছু জানতে, সব কথা রেখে, তার প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দিতেই হবে। মাস্টার মশাই কেবল প্রশ্নই করবেন উত্তরের বেলায় মুখবন্ধ, সেটি ও-দেশের রীতি নয়। ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। শিক্ষকের কাছে ছাত্রীকে ব্যক্তিগত সমস্যাও বিনা সংকোচে উপস্থাপিত করতে দেখেছি। সদ্য স্বামী পরিত্যক্তা সুগঠনা এক তরুণী অশ্রুসজল নয়নে মানসিক অশান্তির কথা ব্যক্ত করে আবেদন করল পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে তার আরও কিছু সময় দরকার। পরীক্ষার নিয়ম এদেশের মত নয়, ফাঁকি দিয়ে বা টুকে কিংবা অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ হয়ে যে-কোনও বিষয় পাস করলে সে যে তার কর্মজীবনে প্রতি পদে পদে বাধা পাবে সে কথা ও-দেশের ছেলেমেয়েরা বোঝে। পরীক্ষাও খুব কড়া। শিক্ষকদের সদা চিন্তা ক্লাশ-এ ছাত্রসংখ্যা কী করে বাড়িয়ে রাখা যায়, শিক্ষার্থী পড়া ছেড়ে চলে গেলে বদনাম তো বটেই, শিক্ষকদের আয়ও যাবে কমে। কলেজ-এর পাশের মাঠে দেখলাম কয়েকশো মোটর গাড়ি। কৌতূহল হল—এ কলেজে এত অধ্যাপক? জবাব পেলাম ওগুলি সবই ছাত্রছাত্রীদের। [illegible] যায় না।

আরট-এর ছাত্ররাও 'ফুটি' খেলে। আমাদের দেশে ফুটির চলন নেই। ফুটি হল ফুটবল। আদরের ডাক ফুটি। এখানে যাকে ফুটবল বলা হয় সেটা ওখানে 'সকার'। সকার কথাটা অবশ্য ভারতেও প্রচলিত। কিন্তু ফুটি জিনিসটি কী কলকাতার একজন অতি পরিচিত স্পোরটস প্রতিবেদকও বলতে পারেন নি। মতামতি দেখে বুঝলাম অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট অপেক্ষা ফুটি বেশী জনপ্রিয়। ফুটবল চলেও প্রচলিত ফুটবল খেলার নিয়ম মেনে ফুটি খেলা হয় না। ফুটি খেলা দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। কতকটা রাগবি খেলার মতই। কিন্তু ফুটি রাগবি নয়। রাগবি খেলোয়াড়দের মত এতে শিরস্ত্রাণ, জার্সির নিচে রক্ষাপোশাক—এসব পরার নিয়ম নেই। কিন্তু মারাপিটটা রাগবির থেকেও যেন সাংঘাতিক। রাগবির মতই কুমড়াকৃতি বল, কখনও হাতে ছোঁড়া হয়, কখনও পায়ে করে মারা হয়। আরজেনটিনায় গত বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল-এ দু পক্ষের মিলিয়ে তিনটি গোল হয়েছিল। এক ক্রীড়ামোদী তিনটি গোলের আনন্দে তিনবার তার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিল বাইরে। আসামীর বিচার করার সময় স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেছিলেন 'ভাগ্যিস খেলাটা অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলের নিয়মে হয় নি!' অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলের নিয়মে দু পক্ষের মিলিয়ে অনায়াসেই ষাট সত্তর গোল হতে পারে। ওখানে শৈশবাবস্থা থেকেই যেমন রঙ তুলি কাগজ নিয়ে ক্লাশ ঘরে বসিয়ে দেওয়া হয় তেমনই ফুটি বল ধরিয়ে দিয়ে ছেলেদের মাঠেও নামিয়ে দেওয়া হয়, সুতরাং অস্ট্রেলিয়ানদের স্বাস্থ্য ভাল হবে না কেন আর কেনই বা তারা ছবি আঁকতে শিখবে না?

অস্ট্রেলিয়া বলতেই ক্যাঙ্গারুর কথা ওঠে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্তুত পোশাক পরিচ্ছদের ট্রেড মার্ক থাকে ক্যাঙ্গারুর ছাপ। এমন কি অস্ট্রেলিয়ার

মেলবর্ন ন্যাশনাল আরট গ্যালারিতে দর্শকদের স্বাগত জানায় দেবী সিরস-এর ব্রোঞ্জমূর্তি।

আপনি কি দৈনন্দিন কাজ-কর্ম
শুরু করার জন্যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব?

গ্ল্যাক্সোজ-ডি® নিমেষে শক্তি
যুগিয়ে আপনার সব ক্লান্তি দূর করবে!

dCA/GL/54/BN/Rev

কনটাজ এয়ারওয়েজ-এর উড়োজাহাজের ল্যাজেও ছবি আছে ডানা বিশিষ্ট ক্যাঙ্গারুর। ছবি মাধ্যমে শিক্ষা—অস্ট্রেলিয়া ক্যাঙ্গারুর দেশ। চিড়িয়াখানায় কলকাতাতেও ক্যাঙ্গারু দেখা যায়, এডেলেড-এর চিড়িয়াখানায় ক্যাঙ্গারু দেখা যাবে সেটা আর আশ্চর্যের কী? কিন্ত স্বাধীন ক্যাঙ্গারু দেখা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েও ভাগ্যে জুটল না। ক্যাঙ্গারু আইল্যান্ডে না গেলে ওদের ঘর সংসার দেখা যাবে না। এডেলেড থেকে ক্যাঙ্গারু আইল্যান্ড বেশ দূর। ক্ষোভ মিটল আরেকটি অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীকে অবলোকন করে। কোয়ালা বিয়ার। ছোট্ট ছোট্ট ছাই-রঙের ভল্লুক। কী মিষ্টি চেহারা। ভয় পায় না। ভয় না পেলে তারা দিব্যি ঘাড়ে চড়ে বসে। একটু যা গায়ে বুনো গন্ধ। ঘাড় থেকে তিনি নেমে পড়লেও বেশ কিছুক্ষণ পোশাকে গন্ধ থেকে যায়। আর দেখেছি পাখি। কত রকম! গৃহস্থের বাড়ির গাছে, ফুর ফুর করে উড়ে এসে, লাভ বার্ডেরা কনফারেন্স করে। এদিকে ওদিকে মাঝে মাঝে প্যারাকীটদেরও দেখা যায়, ও-দেশের মানুষের মতই ওদের প্রকাশ্য প্রেমালাপে কোনও সংকোচ নেই। আর ম্যাকাও কিংবা কাকাতুয়া, একেবারে শহরের মধ্যে ঘোরাফেরা না করলেও, গ্রামাঞ্চলে তাদের দর্শন মেলা অসম্ভব নয়। সংরক্ষিত পার্ক-এর উঁচু গাছের নিচু ডালে নেমে এসে তারা কত কথাই না বলে যায় আগন্তুকের সঙ্গে। কিন্তু শ্রীযুক্ত বায়সের কোথাও দেখা মিলল না। শালিককে দেখলাম চড়ুইকে দেখলাম, কালো কিংবা খেসকুটে কিংবা সাদা রঙের পাতি হাঁসের নিনাদ শোনা যায় টরেন্স-এর ধারে হামেশাই, কিন্তু কোথায় সেই তিন তালে বাঁধা কা-কা-কা শব্দ? ওদেশ কী বায়স জন্মগ্রহণ করে না? নাকি, ওদেশ থেকে কোনও উপায়ে তাকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে? এডুকেশন থ্রু আর্ট ছাড়া কোনও গতি নেই; অস্ট্রেলিয়ার ছেলেমেয়েদের তাহলে বায়স সম্বন্ধে বুঝতে হলে, জানতে হলে, সে যে কত বুদ্ধি ধরে এবং সময় বিশেষে সে যে কত ভয়ংকর হতে পারে তা অনুধাবন করতে হলে, আলফ্রেড হিচকক-এর বার্ড ছবি দেখতেই হবে।

আমি যে গৃহস্থের অতিথি ছিলাম, তাদের বাড়ির পিছনের বাগানে দুটি মাত্র গাছ, একটি কমলা লেবুর, আরেকটি পাতি লেবুর। ওখানকার পাতি লেবু একটু লম্বাটে ধরনের। কী অবিশ্বাস্য রকম ফলন। ছোট্ট খাট গাছ দুটিতে কয়েক শ' করে ফল। খাবার লোক নেই। ফলছে, পড়ছে, ঝরছে পচছে। পরিষ্কার করার লোক পাওয়া যায় না, কিন্তু নোংরা থাকলে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে পেয়াদা এসে জরিমানা উশুল করবে। অগত্যা গৃহস্বামীকে তাঁর মোটর গাড়ির ক্যারিয়ারে নিজে হাতেই জঞ্জাল বোঝাই করে ময়লা পোড়াবার কলে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। পোড়াবার জন্যে গাঁট থেকে পয়সাও দিতে হয় নেহাত্ত কম নয়। ছুটির দিনে গৃহস্বামী নিজেই লেগে যান বাগানের ঘাস কাটতে, অবশ্য ঘাস কাটার মেশিন আছে।

১৭ বছরের ছাত্রী ট্রৈভর ডানরবের ভাস্কর্য 'ওয়েভ ফরম'

নিম্ন হাইস্কুলের স্টোন কার্ভিং

চউ কেং বেঙ-এর ড্রইং

কংগ্রেস শেষ হয় ২১ আগস্ট। এডেলেড ত্যাগ করতে আমার ২৪ তারিখ হয়ে গেল। এডেলেড-এর ভারতীয়রা ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করলেন ২০ আগস্ট-এ। সে দিনটা ছিল রবিবার। নাচ, গান, বাজনা, মদ্যপান, ভোজ ইত্যাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হল। ভালই আছেন এডেলেড-এ ভারতীয়রা। ভারতীয় মশলাপাতি জোগাড় করতে যা একটু বেগ পেতে হয়। অনেকে অবশ্য খানা-অভ্যাস পালটে ফেলে ওদেশের মত রোলস অ্যান্ড বাটার অরেঞ্জ অ্যান্ড টোমাটো সালাদ উইথ থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড ড্রেসিং, রোস্ট লেগ অব ল্যাম্ব উইথ মিন্ট জেলি কিংবা রোস্ট বীফ অ্যান্ড প্রূন ইত্যাদি খাওয়া রপ্ত করেছেন। কেউবা শুধু একখানা বিরাট হামবুর্গার উদরস্থ করে লাঞ্চ সেরে ফেলেন।

আমি নিশ্চয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে বসিনি। আরট কংগ্রেস-এ যোগ দিতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে সামান্য যা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছি তার কয়েকটি উল্লেখ না করলে আমার বলা অসমাপ্ত থেকে যাবে। এডেলেড থেকে গিয়েছিলাম ফিরে মেলবর্ন-এ। দেখলাম ভিক্টোরিয়ার জাতীয় চারুকলা সংরক্ষণাগার। আমার ভাগ্য ভাল, রদাঁ-র ভাস্কর্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হচ্ছে ওখানে শীঘ্রই. মৌলিক ভাস্কর্যগুলি ইউরোপ থেকে এসে জমা হয়েছে গ্যালারীর মধ্যে ফাঁকা এক জায়গায়। সেই 'চিন্তাশীল ব্যক্তিটি'ও থুতনিতে হাত দিয়ে বসে আছেন তাদের মধ্যে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি মূর্তি দেখে নিলাম। রদাঁর কাজ দেখতে আমাকে প্যারী যেতে হল না। রদাঁকৃত 'বালজাক' জাতীয় আরট গ্যালারীর স্থায়ী বাসিন্দা। দ্বিতীয় তলে দু হাত তুলে 'সিরুস' স্বাগতম জানায় আগন্তুককে। দেশ-বিদেশের মাস্টার শিল্পীদের চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যে ঠাসা ভিক্টোরিয়ার ন্যাশনাল আরট গ্যালারী প্রকাণ্ড। সিঁড়ি ভাঙ্গার দরকার হয় না, আধুনিক এসকেলেটর ওঠাবে নামাবে। পিকাসো আর তুলুজ লোত্রেক-এর প্রচুর গ্রাফিক আরট আর ড্রইং দেখতে পেলাম। মানের আরট, মনের আরট পিসারোর আরট দেগার আরট ফান খখ্-এর আরটও সংরক্ষিত হয়েছে, সেই সঙ্গে ওলড মাস্টাররা তো আছেনই। অস্ট্রেলিয়ান শিল্পীদের জন্যে আলাদা ঘর। আলংকারিক শিল্প, প্রাচীন শৌখীন সামগ্রী এবং এশিয়ার শিল্পকলা সযত্নে সংরক্ষিত। কিন্তু একটা জিনিস বুঝি না, ইদানীং আরট গ্যালারীর বাহ্যিক রূপে কলকারখানার নকশা অবলম্বন করা হচ্ছে কেন? প্যারীর সমকালীন আরট সংরক্ষণাগারের ফটো দেখেছি, কতকটা তৈল শোধনাগারের মত। মেলবর্ন-এর ন্যাশনাল আরট গ্যালারী অব ভিক্টোরিয়ায় প্রবেশ করার সময় মনে হয়েছিল যেন কোনও বরফ কলে ঢুকেছি। সুকুমার রস উপভোগ করার আগে, ক্ষুধা বাড়িয়ে তোলার জন্যেই কী ঐ বিরস রূপের অবতারণা? না, আধুনিক স্থপতিরা মনে করেন ও রূপের মধ্যেও সুকুমার রসের কিছু কমতি নেই? সত্যিই তো যদি স্কেল দিয়ে চতুষ্কোণ ত্রিকোণ সরল রেখা এবং কমপাস-এর সাহায্যে বৃত্ত এঁকে আরট করা যেতে পারে, তা হলে কলকারখানা কিংবা যন্ত্রপাতির নকশা কী দোষ করল?

প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি আর হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে দেখতে দেখতে কটা দিন কেটে গেল। মেলবর্ন-এ এডেলেড-এর থেকেও বেশী শীত। একদিন অ্যাবরিজিনদের সঙ্গে আলাপ করব ঠিক করলাম. যেতে হবে শহর থেকে অনেক দূরে, প্রাতরাশ সেরে গাড়িতে উঠলাম, গাড়ি চালাবেন এক মহিলা, গাড়ি স্টার্ট নিল না। আগের রাতে শূন্য ডিগ্রীর নিচে তাপমাত্রা নেমে যাওয়ায় ব্যাটারি ডাউন। ফিরে আসতে হল ঘরের ভেতর. পরের দিন রওনা হলাম সিডনী। সিডনীতে নাইট ক্লাব বিখ্যাত, কিন্তু ওদিকে আমার আগ্রহ নেই। এক রাত্রি হোটেল বাস, তারপর দেশে ফেরা।

নটে গাছটি এখনও মুড়োয় নি। বলি, আমাদের দেশের শিক্ষাবিদরা কী ভাবছেন? মাধ্যমিক স্কুলের কারিকুলাম থেকে আরট তুলে দেওয়া হল, শিক্ষায় যে বিরাট ঘাটতি থেকে যাবে। আরট-এর মাধ্যমে শিক্ষার চিন্তায় এত বিরাট কংগ্রেস বসল এডেলেড-এ! আবার বসবে রটারডাম-এ ১৯৮১ সালে। এদেশের শিক্ষাকর্তাদের কাছে আরট শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণীয় নয়। কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় শিক্ষাবিদদের চিন্তায় আরট-এর মূল্য সবার ওপরে, তাঁরা মনে করেন আরট-এর মাধ্যমেই ঘটে প্রকৃত শিক্ষা। ডঃ আইজনের বলেন, মানুষের মনকে গড়ে তোলার পিছনে আরট-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ডঃ উইকিনের মতে সব শিক্ষার সেরা শিক্ষা আরট শিক্ষা। ওঁদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আমাদের বিদ্যাসাগর মশাই-এর বর্ণপরিচয়ে অজগর সাপটির ছবি না থাকলে 'অ'-এর পরিচয় পাওয়া যেত কী? কিছু শিখতে গেলেই আরট-এর সাহায্য নিতেই হবে এবং আরট না শিখলে না বুঝলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব, বিশেষভাবে স্কুলের শিক্ষায়, যদি ছেলেমেয়েদের যথার্থই কাজের মানুষ তৈরি করতে হয়, আরট অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। শিক্ষাকর্তাদের কাছে কথাটি একটু ভেবে দেখার অনুরোধ রাখি।

॥ সমাপ্ত ॥

রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রচলিত পাঠ কতখানি রবীন্দ্র অনুমোদিত

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

"বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা।"

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে তাঁর উপন্যাসগুলি পরিমার্জন-কালে যে সকল অংশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, সেই সকল বর্জিত পরিত্যক্ত পাঠ কবির অনুমোদন ব্যতিরেকে তাঁর উপন্যাসের অভ্যন্তরে সংযুক্ত করে দেবার অধিকার কি আমাদের আছে?

রবীন্দ্রনাথের সকল উপন্যাস প্রথমে সাময়িকপত্রে ধারাবাহিক মুদ্রিত হয়, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ মুদ্রণকালে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই সাময়িকপত্রের পাঠ সর্বাংশে গ্রহণ করেননি। কখনো আবার প্রথম সংস্করণের বহু পাঠ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল সংক্ষেপণের দিকে। তাঁর নিজের লেখা উপন্যাসের অনেক অংশ তাঁর নিজের চোখেই পরে অনাবশ্যক অপ্রয়োজনীয় এবং বাহুল্য বলে বোধ হয়েছে, এবং সে সকল অংশ বর্জন করতে তিনি কখনো দ্বিধা বোধ করেননি। নিজের রচনাকে অধিকতর সুন্দর করে প্রকাশ করার ব্যাপারে তিনি সর্বদাই সচেতন ও সতর্ক ছিলেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলির দিকে তাকালেও দেখব, তিনি সমগ্র জীবনে যা লিখেছেন, কেটেছেন তার তুলনায় কিছু কম নয়। অর্থাৎ বর্জনে তাঁর কখনো কার্পণ্য ছিল না—নিজের সৃষ্টিকে সুন্দরতর করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর উপন্যাসের বিশুদ্ধিসাধনের জন্য যে-সকল পাঠ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁর বিনা অনুমোদনে সেই সকল পরিত্যক্ত পাঠ মূল কাহিনীর মধ্যে পুনরায় সন্নিবেশিত করে আমরা কবি এবং বিশ্বজোড়া তাঁর বৃহৎ পাঠকমণ্ডলী, উভয়ের প্রতিই অন্যায় ও অবিচার করেছি।

রাজর্ষি উপন্যাস বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়। এই খণ্ড ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের পৌষে প্রকাশিত হয়।

কবির জীবৎকালে পুস্তকাকারে রাজর্ষির শেষ সংস্করণ ছাপা হয় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্র রচনাবলীতে কবির জীবৎকালের শেষ সংস্করণ গ্রহণ করা হয়নি। রচনাবলীর 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' বলা হয়েছে—

"বিভিন্ন সংস্করণে রাজর্ষির অনেক অংশ বর্জিত হয়, চত্বারিংশ ও এক-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ বর্জিতও হইয়াছিল। ১৩৩১ সালে প্রকাশিত বিশ্বভারতী সংস্করণে ঐ দুইটি পরিচ্ছেদ ও অন্যান্য অনেক বর্জিত অংশ পুনঃসংকলিত হয়। রচনাবলী সংস্করণ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের সহায়তায় নূতন প্রস্তুত হইল, ইহাতে উক্ত বর্জিত পরিচ্ছেদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে অন্যান্য বর্জিত অংশ প্রয়োজনমত সংকলিত হইয়াছে, এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও আধুনিক সংস্করণের সহায়তায় পাঠ সংশোধন করা হইয়াছে।"

একদা বর্জনের পর যে-দুটি পরিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ ১৩৩১ সালের সংস্করণে গ্রহণ করেছিলেন, তা পরবর্তী কালে তিনি আর কখনো পরিত্যাগ করেননি। ১৩৩১ সালের সংস্করণের পর রাজর্ষি কবির জীবৎকালে পুনর্মুদ্রিত হয় ১৩৩৮, ১৩৪০ এবং ১৩৪৪ সালে।

রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে যে, রচনাবলী সংস্করণে 'উক্ত বর্জিত পরিচ্ছেদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে'। এতে স্বভাবতই মনে হবে, রাজর্ষির চল্লিশ ও একচল্লিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ ১৩৩১ সালের সংস্করণে পুনঃসংকলিত এবং পরবর্তী সংস্করণগুলিতে পুনরায় বর্জিত হয় এবং রচনাবলী সংস্করণে পুনরায় 'উক্ত বর্জিত পরিচ্ছেদগুলি সংগৃহীত' হয়। গ্রন্থ-পরিচয়ের এই মন্তব্য পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকর।

তবে আমাদের মুখ্য প্রশ্ন সেখানে, যেখানে বলা হয়েছে, 'অন্যান্য বর্জিত অংশ প্রয়োজনমত সংকলিত হইয়াছে।'

আমাদের প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বর্জিত পাঠ তাঁর রচনাবলীতে কে 'প্রয়োজন মত' যুক্ত করে দিলেন? রবীন্দ্রনাথ যা প্রয়োজন বোধ করেননি, কে তা প্রয়োজন বোধ করলেন? কবি নিজেই কি এ-সব বর্জিত পাঠ রচনাবলী-সংস্করণে সংকলন করে গিয়েছেন এমন কোনো উল্লেখ গ্রন্থ-পরিচয়ের মধ্যে কোথাও নেই, এবং গ্রন্থ-পরিচয়ের ওই অংশটুকু পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় এ সব পাঠ-পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ আদৌ করেননি সম্পাদকেরাই করেছেন।

এই পাঠ-পরিবর্তন বা পাঠ-সংযোজন যে রবীন্দ্রনাথ-কৃত নয়, তার প্রথম প্রমাণ, রাজর্ষির গ্রন্থ-পরিচয়ে কোথাও সম্পাদকেরা বলেননি—এই পাঠ-পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ-কৃত বা রবীন্দ্র-নির্দেশিত বা রবীন্দ্র-অনুমোদিত। যদি কেউ বলেন, এই পাঠ-পরিবর্তনে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের উল্লেখ না থাকলেও যেহেতু কবি তখনো জীবিত, সুতরাং এই পাঠ-পরিবর্তন কবির অনুমোদিত বলে ধরে নিতে আপত্তি কি? আমাদের বক্তব্য, আমরা এই পাঠ-পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলে ধরে নিতে পারছি না এই কারণে যে, রবীন্দ্র-রচনাবলীতে যে-সব বইয়ে রবীন্দ্রনাথ পাঠ-পরিবর্তন করেছেন, রচনাবলীতে সেই সব বইয়ের গ্রন্থ-পরিচয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, রচনাবলীতে অমুক গ্রন্থে কবি পাঠ-পরিবর্তন করেছেন, কিংবা রচনাবলীতে অমুক গ্রন্থে যে-সকল পাঠ পরিবর্তন করা হল, তা কবির অনুমোদনক্রমে। এই অবস্থায়, রচনাবলীতে যে-সকল গ্রন্থে পাঠ-পরিবর্তন করা হয়েছে অথচ রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের কোনো উল্লেখমাত্র নেই, সেখানে এ-কথাই ধরে নিতে হবে যে, সেই সকল গ্রন্থে যে পাঠ-পরিবর্তন ঘটেছে তা রবীন্দ্রনাথ-কৃত নয় বা তৎকর্তৃক অনুমোদিত নয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়ে কোন্ কোন্ গ্রন্থের পাঠ-পরিবর্তন প্রসঙ্গে কবির অনুমোদনের উল্লেখ করা হয়েছে? কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

সন্ধ্যাসংগীত সংকলিত হয় রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে। এই খণ্ডের প্রকাশ কাল ১৩৪৬ আশ্বিন। সন্ধ্যাসংগীতের গ্রন্থ-পরিচয় থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—

"'বিষ ও সুধা' কবিতাটি, এবং প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত কেন গান গাই, ও 'কেন গান শুনাই' কবিতা দুইটি পরবর্তী কালে বর্জিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের অন্য কবিতাগুলি, সন্ধ্যাসংগীতের বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণে (বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র, ১৩৩৪) অল্পবিস্তর খণ্ডিতভাবে মুদ্রিত আছে। এই শেষোক্ত সংস্করণ হইতে 'ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে' (সন্ধ্যা) কবিতাটি 'পুনরাবৃত্তি' বলিয়া বর্তমান রচনাবলীতে কবি বর্জন করিয়াছেন, অন্য অনেক কবিতারও কোনো কোনো অংশ বর্জিত হইয়াছে।"

প্রভাতসংগীত সংকলিত হয় রচনাবলীর ওই প্রথম খণ্ডেই। রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয় থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

"এই শেষোক্ত সংস্করণ ['বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণ,' অগ্রহায়ণ ১৩৩৫] হইতে কবি, বিসর্জন, তারা ও আঁখি, সূর্য ও ফুল (চারিটিই ভিক্টর হ্যুগোর অনুবাদ) ও 'সম্মিলন' (শেলির অনুবাদ) বর্তমান রচনাবলীতে বর্জিত হইয়াছে। অন্য কোনো কোনো কবিতারও অল্পবিস্তর পরিবর্তন কবি বর্তমান রচনাবলীতে করিয়াছেন।"

সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের প্রসঙ্গ থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন বা নির্দেশক্রমেই পাঠ-পরিবর্তন হয়েছিল। আমরা এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করব, রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির যে পাঠ-পরিবর্তন ঘটেছে তা রবীন্দ্রনাথ-কৃত বা রবীন্দ্র অনুমোদিত কি না?

চোখের বালি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ১৩০৮ বৈশাখ থেকে ১৩০৯ কার্তিক পর্যন্ত। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালে।

চোখের বালি বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। এই তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল ২৫ বৈশাখ ১৩৪৭। এই খণ্ডের শেষে গ্রন্থ-পরিচয় অংশে চোখের বালি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"প্রথম সংস্করণের শেষ অংশ ('তখন ঘোমটা-মাথায় আশা....ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন।'—পৃঃ ৪৯৯-৫১০; রচনাবলী) বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণে বর্জিত হইয়াছিল, রচনাবলী-সংস্করণে তাহা যোগ করিয়া দেওয়া হইল।"

চোখের বালির যে-শেষাংশ প্রথম সংস্করণে ছিল, তা ১৩৩৩ সালের সংস্করণে কবি পরিত্যাগ করেন, ১৩৪৪ সালের সংস্করণেও সে-অংশ কবি আর গ্রহণ করেননি। কিন্তু কবির মৃত্যুর মাত্র এক বৎসর পূর্বে যে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত হল—তাতে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বর্জিত অংশ অকস্মাৎ গ্রহণ করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর পুস্তকে যে-অংশ বর্জন করেছেন, তাঁর রচনাবলীতে সেই পরিত্যক্ত অংশকে গ্রহণ করলেন? রবীন্দ্রনাথ কি? রবীন্দ্রনাথ যে পুনরায় এই অংশ গ্রহণ করেছেন এমন কোনো স্বীকৃতি সম্পাদিত রচনাবলীতে কোথাও নেই।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও তাঁর উপন্যাস 'পুনর্মুদ্রিত' না হয়ে 'সংস্করণ' হয়েছিল দেখা যায়। ১৩৮২ সালে মুদ্রিত চোখের বালি পুস্তকের আখ্যাপত্রের পিছনের পাতায় গ্রন্থ প্রকাশের সন-তারিখ যেখানে দেওয়া আছে, সেখানে আছে—

গ্রন্থ প্রকাশ : ১৩০৯, পুনর্মুদ্রণ : ১৩১০, ১৩১৩, ১৩১৭; ১৩২৭, ১৩৩৩, মাঘ ১৩৪৪, চৈত্র ১৩৫১, সংস্করণ : চৈত্র ১৩৫৪, পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৫৮, পৌষ ১৩৬১, শ্রাবণ ১৩৬৫, শ্রাবণ ১৩৬৭, শ্রাবণ ১৩৭৩, আশ্বিন ১৩৭৬, অগ্রহায়ণ ১৩৮২।

উপরের বিবরণ থেকে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ছয় বৎসর পর নূতন করে তাঁর উপন্যাসের 'সংস্করণ' হয়েছে। এই সংস্করণ শব্দটি গ্রন্থমধ্যে মুদ্রণ অর্থে নয়, সংস্কার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এবং এই সংস্কার মানে বানানশুদ্ধি বা অনুরূপ কোনো গৌণ পরিবর্তন নয়—এই ১৩৫৪-র সংস্করণে কবি কর্তৃক বর্জিত অংশ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ একটি পরিচ্ছেদ উপন্যাসের অভ্যন্তরে সংযোজিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে চোখের বালির শেষ সংস্করণ ছাপা হয় ১৩৪৪ মাঘে। উক্ত সংস্করণে চোখের বালির পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছিল ৫২ আর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৩৫৪ সালে চোখের বালির যে-সংস্করণ প্রকাশিত হল তার পরিচ্ছেদ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৫। আর রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এই উপন্যাসের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছিল ৫৪। ১৩৫৪-র সংস্করণের শেষে বিনা শিরোনামে এবং স্বাক্ষরে শুধু এইটুকু লেখা আছে—

"নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রে ১৩০৮-০৯ সালে চোখের বালি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকা হইতে চোখের বালি চৈত্র ১৩৫৪ সংস্করণে একটি অংশ (বর্তমান গ্রন্থের ৮২-৮৪ পৃষ্ঠা) গৃহীত হইয়াছে; ফলে ইহার পর হইতে একটি অধ্যায় সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। এই সংস্করণের ৯২ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে যে আছে 'তখন বিহারী যাহা দেখিয়াছিল তাহা আগাগোড়া বলিল', বঙ্গদর্শন হইতে সংকলিত অংশে তাহারই বিবরণ পাওয়া যায়।"

এই বিবৃতি কিন্তু প্রচলিত সংস্করণে আর দেওয়া নেই; যদিও কবির মৃত্যুর পর চোখের বালিকে যেভাবে পরিবর্ধিত করা হয়েছিল আজও চোখের বালি সেইভাবে ছাপা চলছে।

চোখের বালির প্রচলিত সংস্করণের (১৩৮২) আখ্যাপত্রের পিছনে যেখানে এই গ্রন্থের বিভিন্ন মুদ্রণ ও সংস্করণের সন-তারিখের উল্লেখ আছে, সেখানে কিন্তু রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণের কোনো উল্লেখমাত্র নেই। সেখানে মাঘ ১৩৪৪-এর পরেই চৈত্র ১৩৫১ মুদ্রণের উল্লেখ আছে। অথচ এর মাঝে ১৩৪৭-এ চোখের বালি রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ছাপা হয়েছিল এবং সেখানেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বর্জিত চোখের বালির বৃহৎ অংশ রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের উল্লেখ ছাড়াই রচনাবলীর সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক সংযোজিত হয়েছিল।

আমি আবার বলছি, রবীন্দ্র-রচনাবলীতে চোখের বালি উপন্যাসের শেষের যে অনেকটা অংশ প্রথম সংস্করণ থেকে নূতন করে যুক্ত করে দেওয়া হয়, তা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত বলে স্বীকার করে নেবার মত কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। রচনাবলীতে যে-খণ্ডে চোখের বালি ছাপা হয় সেই খণ্ডেই চিত্রাঙ্গদা নাটক ছাপা হয়েছে। সেখানেও কোনো কোনো স্থানে পূর্ববর্তী সংস্করণের সঙ্গে পাঠভেদ আছে। কিন্তু রচনাবলীতে চিত্রাঙ্গদার পাঠ যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিবর্তিত, তা 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। চিত্রাঙ্গদার পূর্ববর্তী তিনটি সংস্করণের উল্লেখ করে সম্পাদকমণ্ডলী গ্রন্থ-পরিচয়ে লিখছেন, "উল্লিখিত সংস্করণগুলির পাঠ তুলনা করিয়া তাহা হইতে কবির নির্দেশানুযায়ী পাঠ রচনাবলীতে গ্রহণ করা হইয়াছে।" অথচ চোখের বালি প্রসঙ্গে গ্রন্থ-পরিচয়ে লেখা হল, "প্রথম সংস্করণের শেষ অংশ ('তখন ঘোমটা-মাথায় আশা...ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন।'—পৃঃ ৪৯৯-৫১০, রচনাবলী) বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণে বর্জিত হইয়াছিল, রচনাবলী-সংস্করণে তাহা যোগ করিয়া দেওয়া হইল।" কবি যদিও তখন অসুস্থ কিন্তু তবুও তো তিনি জীবিত—তারই রচনাবলীতে তাঁর অনুমতিটুকু নেবারও কি কোনো প্রয়োজন বোধ হল না।

গোরা উপন্যাস রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত হয় ১৩৪৭ শ্রাবণে। চোখের বালির মত গোরা উপন্যাসেও সম্পাদক মহাশয়গণের হস্তক্ষেপ ঘটেছে।

গোরা প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় ১৩১৪ ভাদ্র থেকে ১৩১৬

ফাল্গুন পর্যন্ত। প্রবাসীতে প্রকাশিত পাঠের বহু অংশ প্রথম সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়। ১৩৩৪ সালের সংস্করণে দেখা যায়, প্রথম সংস্করণে পরিত্যক্ত কিছু কিছু অংশ কবি পুনরায় গ্রহণ করেন। তারপর ১৩৪০-এ ১৩৩৪-এর সংস্করণটি পুনর্মুদ্রিত হয়। অতঃপর ১৩৪৭-এ রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে গোরা ছাপা হয়। গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে, "১৩৩৪ সালে প্রকাশিত বিশ্বভারতী সংস্করণে প্রবাসী হইতে অনেক অংশ গৃহীত হয়। বর্তমান সংস্করণে প্রবাসী হইতে আরও কিছু অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে।" চোখের বালির মত গোরাতেও দেখছি নূতন নূতন পাঠ সংযোজনের ব্যাপারে কবির অনুমোদন বা সম্মতিসূচক কোনো মন্তব্যের উল্লেখমাত্র নেই।

সম্পাদকবর্গের উদ্দেশ্য কি এই যে, কবি একদা যা লিখেছেন তা কবি কর্তৃক পরে বর্জিত হলেও, আমাদের নিকট তা বর্জনীয় নয়। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে আমরা সকলেই সাধুবাদ জানাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের উন্নতি-সাধনের জন্য যদি উপন্যাসের মধ্য থেকে তাঁর মতে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি পরিত্যাগ করে থাকেন তবে সেখানে তাঁর বিনা অনুমতিতে সেই বর্জিত পরিত্যক্ত অংশগুলি উপন্যাসের মধ্যে সংযোজিত করার অধিকার আমাদের থাকতে পারে না। আমরা কেবল উপন্যাসের শেষে সেই পরিত্যক্ত অংশগুলি একত্রে সংকলন করে বলে দিতে পারি যে, এই-এই অংশ প্রথম সংস্করণে ও এই-এই অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে কবি বর্জন করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কবি কর্তৃক বর্জিত পাঠ কবির সম্মতিসূচক কোনো উল্লেখ ব্যতিরেকে মূল উপন্যাসের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গোরার গ্রন্থ-পরিচয়ে গোরার পাঠ-পরিবর্তন বা সংযোজনে কবির অনুমোদনের কোনো উল্লেখ নেই বলেছি; কিন্তু তার বদলে যা আছে তা বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। গ্রন্থ-পরিচয়ে লেখা আছে—

"১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত 'প্রভাত-রবি' প্রবন্ধে কবির কথোপকথনের যে অনুমোদিত প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে কবির মন্তব্য আছে, '...যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম। যে-সব অংশ, বাহুল্য মনে করতুম, কালির রেখায় কেটে দিতুম, সে-সব অংশের পরিমাণ অল্প ছিল না। নিজের লেখার প্রতি অবিচার করা আমার অভ্যাস। তাই ভাবি সেই বর্জিত কাপিগুলি আজ যদি পাওয়া যেত তবে হয়তো সেদিনকার অনাদরের প্রতিকার করতুম।'"

আমার প্রশ্ন, এই অংশ গ্রন্থ-পরিচয়ের মধ্যে কোন্ প্রয়োজনে উদ্ধার করা হল? রবীন্দ্রনাথ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্তকে কথা-প্রসঙ্গে বলেন, গোরা রচনাকালেই পাণ্ডুলিপিতে যে-সকল অংশ বাহুল্য বোধ করেছিলেন তা তিনি কেটে দিয়েছিলেন। সেই কাটা পাঠের মধ্যে বর্জনীয় নয় এমন কিছু পাঠও হয়তো থেকে গেছে। কবির এই মৌখিক একটি বিচ্ছিন্ন মন্তব্য থেকে এ-কথা প্রমাণিত হতে পারে না যে, কবি স্বহস্তে একদা যা বর্জন করেছেন তা পুনর্গ্রহণে সর্বদা অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখার যে অংশ বর্জনীয় মনে করেছেন তাকে পরিত্যাগ করতে কখনো দ্বিধাবোধ করেননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি লিখিত মন্তব্য উদ্ধার করি। নৌকাডুবির বর্জিত পাঠ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনকে কবি লিখছেন, "নৌকাডুবিকে নানা স্থানে খর্ব করিয়া তাহাকে বেশ একটু আঁট-সাঁট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ স্থলে তাহার অনেক সুরচিত সুপাঠ্য অংশও নিশ্চয়ই বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বাগান সাফাই করিতে হইলে আবশ্যক মত অনেক ভাল গাছও ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়—এ সকল কাজ নিপুণভাবে করিতে হইলে নিষ্ঠুরভাবেই করিতে হয়। নিজের লেখার সম্বন্ধে সুবিচার করা শক্ত—তাহার কারণ, অন্ধ মমত্ব বাধা দেয়—কিন্তু ছাঁটিবার বেলায় সেই মমত্ব অতিচ্ছেদনের হাত হইতে রক্ষা করে। আমি যদি লেখক না হইয়া সমালোচক হইতাম হয়ত আরো অনেক বেশি কাটিতাম।"

রবীন্দ্রনাথ যা-ই বর্জন করুন না কেন, আমরাও বলি, তাঁর সমস্ত বর্জিত পাঠ ধীরে ধীরে সংগ্রহ করা উচিত এবং আমরা সকলেই জানি যে এই সংগ্রহের পরিমাণও আয়তনে কিছু কম হবে না। কিন্তু এই সঙ্গে এ-কথাও বলব যে, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে বলেই যে তা আমরা নিজেরাই কবির মূল রচনার মধ্যে যোগ করে দেব—তা কখনই হতে পারে না। মূল গ্রন্থের শেষে 'পরিশিষ্টে'র মধ্যে সেগুলি যথাযথ ভাবে সংকলন করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।

ঠিক এইভাবে একবার কাজ হয়েছিল চতুরঙ্গের একটি মুদ্রণে। চতুরঙ্গ ১৩২১ সালে সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়, ১৩২২ সালে চতুরঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়. সবুজ পত্রে প্রকাশিত ও প্রথম সংস্করণে বর্জিত অনেক অংশ ১৩৪১ সালের সংস্করণের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়। উক্ত সংস্করণে 'চতুরঙ্গের পরিশিষ্ট'-এ 'প্রকাশক'-এর মন্তব্যে বলা হয়েছে, "চতুরঙ্গ গল্পটি সর্বপ্রথম বাংলা ১৩২১ সনের সবুজ পত্রের চারটি সংখ্যায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার সময় উহার যে অংশগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবার তাহা সংগ্রহ করিয়া নিম্নে পরিশিষ্টরূপে দেওয়া গেল।/প্রকাশক।"

এই হল যথার্থ কাজ। এই ধরনের কাজ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলীতে করে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীতেও এই ধরনের কাজ অতি অবশ্য হওয়া প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য, ১৩৪১-এ চতুরঙ্গের যিনি প্রকাশক ছিলেন তাঁর নাম কিশোরীমোহন সাঁতরা।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে চতুরঙ্গ সংকলিত হয় ১৩৪৮ সালের আষাঢ় মাসে, অর্থাৎ কবির মৃত্যুর আগের মাসে।

রচনাবলীতে চতুরঙ্গের গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে, "পরিবর্জিত অংশ হইতে কয়েকটি বাক্য, সংগতি রক্ষার জন্য রচনাবলী-সংস্করণে গ্রন্থমধ্যে (পৃঃ ৪৬৭, ৪র্থ—১৪শ পংক্তি) মুদ্রিত হইয়াছে।"

১৩৪১-এ প্রকাশক মহাশয় পরিশ্রম করে চতুরঙ্গের যে 'পরিশিষ্ট' প্রস্তুত করেছিলেন, তা ১৩৪৮ সালে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হল; এবং ১৩৪১ সালের সংস্করণের পরিশিষ্টের মধ্য থেকে একটি অংশ 'সংগতি রক্ষার জন্য' রচনাবলীতে মূল গ্রন্থেই মুদ্রিত করে দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ যা বর্জন করেছেন, তা বর্জন করা সংগত হয়েছে কি না—সে বিচার স্বতন্ত্রভাবে করতে বাধা নেই। কিন্তু কেউ যদি সংগতি বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনার উপরেই হাত দেন তবে সে কাজকে কখনই সংগত বলে মনে করতে পারি না।

তবু তো রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয় থেকে এই সংবাদ জানা গেল যে সম্পাদকেরা 'সংগতি রক্ষার জন্য' কিছু অংশ মূল উপন্যাসে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত স্বতন্ত্র পুস্তকে এই সংযোজন বিষয়ক মন্তব্যটুকুও সম্পূর্ণ পরিহার করা হয়েছে, কিন্তু সংযোজিত অংশটি গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে যুক্ত রয়েছে।

চতুরঙ্গের প্রচলিত স্বতন্ত্র পুস্তকে আখ্যাপত্রের পিছনের পাতায় বইয়ের সব কয়টি মুদ্রণের সন-তারিখ দেওয়া আছে, কিন্তু রচনাবলী-সংস্করণের কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। কেন নেই? দেশে বা বিদেশে যত মানুষ রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র বইগুলি নিয়ে পড়াশুনা করবেন, তাঁরা দেখবেন, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উপন্যাসের পাঠের পরিবর্তন ঘটেছে—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরবর্তী কালের এডিসনগুলিতে। আর তাঁর মৃত্যুর বৎসরে বা তার পূর্ব বৎসরে রচনাবলীর যে-সকল খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে যে-সব গ্রন্থে পাঠ পরিবর্তন ঘটেছে তার কোনো কোনোটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত, আবার অনেকগুলিই রবীন্দ্র-অনুমোদিত নয়।

ঘরে-বাইরে উপন্যাসটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে সংকলিত হয়। এই খণ্ড রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে ঘরে-বাইরে উপন্যাসটির গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে, "ঘরে-বাইরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার সময়, সবুজ পত্রে প্রকাশিত অনেক অংশ বর্জিত হয়। পরবর্তী একটি সংস্করণে এই সকল বর্জিত অংশ পুনরায় গৃহীত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ঘরে বাইরে সবুজ পত্রের সহিত মিলাইয়া ছাপা হইয়াছে।"

এই গ্রন্থ-পরিচয়ের মধ্যে সম্পাদক ঠিক কি বলতে চাইছেন এবং কি বলতে চাইছেন না—তা বোঝা কঠিন। প্রথম প্রশ্ন হল, 'পরবর্তী একটি সংস্করণে' বর্জিত অংশ গৃহীত হয় বলা হয়েছে; সেটি কোন্ সংস্করণ তা উল্লেখ করা হল না কেন? দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে যে সংস্করণ প্রচলিত ছিল তাকে অনুসরণ না করে পুরাতন সবুজ পত্রের পাঠ গ্রহণ করা হল কেন? কবির যেখানে কোনো অনুমতি আমাদের কাছে নেই, সেখানে তাঁর জীবৎকালের শেষ সংস্করণটিকে গুরুত্ব না দিয়ে মাসিক পত্রের পুরাতন পাঠকে আদর্শ ধরব কেন?

রবীন্দ্রনাথ যে সংস্করণে ঘরে-বাইরের বর্জিত অংশ গ্রহণ করেন সেটি ওই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ, ১৯২০ সালে প্রকাশিত। অতঃপর কবির জীবৎকালের মধ্যে ঘরে-বাইরে উপন্যাসের আরও দুটি মুদ্রণ (১৯২৬; ১৯৩৭ খৃ) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কবির জীবৎকালের শেষ সংস্করণকে অগ্রাহ্য করে কেন যে সাময়িকপত্রের পাঠকে আদর্শ বলে গ্রহণ করা হল, তার কোনো সূত্র আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

যদি কেউ বলেন যে, ঘরে-বাইরের শেষ সংস্করণ ও সবুজ পত্রের পাঠ একরূপ, সুতরাং এখানে সবুজ পত্রের পাঠ অনুসরণে বাধা কোথায় এবং সে-ক্ষেত্রে কবির অনুমোদনের কোনোরূপ প্রয়োজনেরই বা কি আছে? একথা ঠিক যে, গ্রন্থ-পরিচয়ের ওই দুটি ছত্র পাঠ করে সাধারণভাবে মনে হয়, ঘরে-বাইরের শেষ সংস্করণের পাঠ ও সবুজ পত্রে প্রকাশিত ঘরে-বাইরের পাঠ সম্পূর্ণ এক রূপ। কিন্তু বস্তুত তা নয়। উভয় পাঠের মধ্যে সামান্য হলেও নানা স্থানে প্রভেদ আছে। এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ঘোষণা সত্ত্বেও সবুজ পত্রকে সর্বদা অনুসরণ করা হয় নি। দু-চারটি নমুনা এখানে দেওয়া যেতে পারে।

১। **সবুজ পত্র**, ১৩২২ **শ্রাবণ**, পৃ. ২০৮॥

'এখানে কোনো বাধা পথ নেই।' এর পর নূতন অনুচ্ছেদের শুরু—'এই পথহীন শূন্যের ভিতর দিয়ে...' ইত্যাদি।

ঘরে-বাইরের প্রথম সংস্করণ: পৃ. ৫৩॥

এই দুই বাক্যকে অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয় নি।

জীবৎকালের শেষ সংস্করণ, পৃ. ৭৯॥

এই দুই বাক্যকে অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে।

রচনাবলী; **অষ্টম খণ্ড**, পৃ. ১৮৪॥

এই দুই বাক্যকে অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয় নি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, রচনাবলীতে সবুজ পত্রের অনুচ্ছেদ বিভাগ অনুসরণ করা হয় নি। কবির জীবৎকালের সর্বশেষ সংস্করণকেও অনুসরণ করা হয় নি। আকস্মিকভাবে ঘরে-বাইরের প্রথম সংস্করণকে এখানে অনুসরণ করা হয়েছে।

২। **সবুজ পত্র**; ১৩২২ **ভাদ্র ও আশ্বিন**, পৃ. ২৮৮॥

সেই ঘরের সমস্ত দেয়াল ছাদ মেজে আজ আমার মুখের দিকে চেয়ে আজ অবাক্ হয়ে আছে।

প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৮৮॥

সেই ঘরের সমস্ত দেয়াল ছাদ মেজে আমার মুখের দিকে চেয়ে আজ অবাক্ হয়ে আছে।

জীবৎকালের শেষ সংস্করণ, পৃ. [illegible]॥

ঐ।

রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২০৮॥

ঐ।

এখানে দেখা যাচ্ছে, সবুজ পত্রের পাঠ অশুদ্ধ। সেখানে 'আজ' শব্দটা দুবার বসেছে, একবার হওয়াই স্বাভাবিক। গ্রন্থভুক্ত পাঠ শুদ্ধ। রচনাবলীতে গ্রন্থভুক্ত শুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ রচনাবলীতে বলা হয়েছে ঘরে-বাইরে সবুজ পত্রের সংগে মিলিয়ে ছাপা হয়েছে।

৩। **সবুজ পত্র, ১৩২২ পৌষ, পৃ. ৫৭২॥**

এমন হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কি করে।

প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৮০॥

এমন সময় হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কি করে।

জীবৎকালের শেষ সংস্করণ, পৃ. ২৩৭॥

এখন হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কী করে।

রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৭০॥

এখন হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কী করে।

এখানেও দেখছি রচনাবলীতে সবুজ পত্রের পাঠ গ্রহণ করা হয় নি।

৪। **সবুজ পত্র, ১৩২২ পৌষ, পৃ. ৫৮৪॥**

আজ ঠাকুরপোকে বলছিলুম তোমার শরণাপন্ন হতে।

প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৯৩॥

আমি ঠাকুরপোকে বলছিলুম তোমার শরণাপন্ন হতে।

জীবৎকালের শেষ সংস্করণ, পৃ. ২৫০॥

ঐ।

রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৭৭॥

ঐ।

এখানেও দেখা গেল, সবুজ পত্রের পাঠ ও গ্রন্থভুক্ত পাঠ এক নয়। রচনাবলীতে এখানেও সবুজ পত্রের পাঠের সংগে মিল নেই। কিন্তু রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে, ঘরে-বাইরে সবুজ পত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ছাপা হয়েছে।

ঘরে-বাইরে উপন্যাসটিতে কোনো পরিচ্ছেদসংখ্যা নেই। উপন্যাসে প্রতিটি পরিচ্ছেদের মাঝে কিছুটা করে ফাঁক দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রচনাবলীতে এমন কয়েকটি স্থলে ফাঁক দেওয়া হয়েছে—সবুজ পত্রে যে-স্থলে ফাঁক নেই।

আমাদের প্রশ্ন হল, রচনাবলীর পাঠ যদি সবুজ পত্রের সংগে মিলিয়ে ছাপা হয়ে থাকে, তবে সবুজ পত্রের সংগে রচনাবলীর পাঠের মিল নেই কেন? আর তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল, কবির বিনা অনুমোদনে কবির জীবৎকালের শেষ সংস্করণকে মর্যাদা না দিয়ে পুরাতন সাময়িকপত্রের পাঠকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করবার পরিকল্পনাই বা কেন?

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে যে সকল পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে তার সব যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত নয় তা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে স্বীকার করে গিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি, এই সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৮ আষাঢ়ে। কবির মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সপ্তম খণ্ডের প্রথমেই এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, "বিভিন্ন সংস্করণে কবি অনেক রচনার পাঠ-পরিবর্তন করিয়াছেন। পাঠকেরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী এক-একরূপ পাঠের অনুরাগী ও সেই পাঠ রক্ষা ও প্রবর্তনের পক্ষপাতী। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে যে-সকল পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা কবির নির্দেশানুগ বা অনুমোদিত।"

এই বিবৃতি থেকেও স্পষ্ট জানা যায়, রচনাবলীতে যে পাঠ গৃহীত হয়েছে তার সবটাই রবীন্দ্রনাথের নির্দেশানুগ বা অনুমোদিত নয়, অধিক অংশই তাঁর নির্দেশানুগ বা অনুমোদিত। আর এই 'অধিক' শব্দটারই বা অর্থ কি? এক শতর মধ্যে একান্ন হলেই তাকে অধিক অংশ বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উনপঞ্চাশ ভাগই কবির অননুমোদিত ধরা যেতে পারে। তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্য বিতর্ক সৃষ্টি করা নয়। আমাদের বিনীত বক্তব্য হল, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই (তিনি, তখন যতই অসুস্থ হোন না কেন) তাঁর অনুমোদন ছাড়া তাঁর রচনার পাঠে হাত দেওয়া কখনই যুক্তিসংগত হয় নি। এতে স্রষ্টার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে-পাঠ নিজে বর্জন করেছিলেন এবং যে-পাঠ তিনি আর কখনো গ্রহণ করেন নি, সেই পাঠ অবিলম্বে রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে এবং রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র গ্রন্থগুলি থেকে পরিহার করা উচিত। রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল। তাঁর রচনায় যদি কোনো ত্রুটি বা অসংগতি থাকে তবে সে দায়িত্ব তো তাঁর। বিশ্বকবির রচনাকে 'শোধন' করার অধিকার কোনো প্রকাশক বা সম্পাদকের কখনই থাকতে পারে না।

পরিশেষে আর একটি কথা। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে জানিয়েছিলেন, "বিভিন্ন রচনার বিভিন্ন সংস্করণে কবি যে-সকল পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন রবীন্দ্র-রচনাবলীর সর্বশেষ খণ্ডে সেগুলি মুদ্রিত হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ যখন মৃত্যুশয্যায়, এ-কথা তখন সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে একটি বিজ্ঞপ্তিতে। হয়তো কবিও যাবার আগে জেনে গিয়েছিলেন এই ঘোষিত বৃহৎ পরিকল্পনার কথা। কিন্তু কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য, তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় চার দশক কাল অতিক্রান্ত হতে চলল, কিন্তু আজও পর্যন্ত আমরা সে-কাজে হাত দিলাম না। হায়, রবীন্দ্র-রচনাবলীর সেই 'সর্বশেষ খণ্ড' কবে বেরবে? শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?

বিজ্ঞান

একটি ওষুধ, মা, সন্তান এবং একটি সামাজিক প্রশ্ন

ভদ্রলোকের বিয়ে হয়েছিল বছর পাঁচ আগে। ছোট এবং সচ্ছল পরিবার। সংসার বলতে তিনি, তাঁর বাবা, মা এবং প্রাণবন্ত স্ত্রী।

বিয়ের পর প্রথম বছর তিন যে কী আনন্দে আমরা কাটিয়েছি, আপনাকে কী বলবো। আমার স্ত্রী বেড়াতে ভালবাসেন। ওঁকে নিয়ে কাশ্মীর কুমারিকা বাদ দিই নি। ওঁর ব্যবহারে বাবা মা'ও আনন্দিত। পরিবারকে যেন মাতিয়ে রেখে ছিলেন উনি। হ্যাঁ, ওই প্রথম তিন বছর। ভদ্রলোক বললেন।

তারপর ? আমার প্রশ্ন।

তারপর শুরু হলো আসল গোলমাল। পরিবারের উচ্ছলতা এবার কমতির দিকে। বাবাকে দেখলাম তিনি দিন দিন কেমন যেন উদাস হয়ে যাচ্ছেন। মা গম্ভীর। অন্তত তাঁর সেই বউমা ডাকের মধ্যে আগের সেই উচ্ছ্বাস অনেকটা কমে গেছে। আমার স্ত্রী আমাকে এড়িয়ে চলছেন তাও লক্ষ করলাম।

তারপর ?

তারপর আবার কি—একদিন স্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার ? এর মধ্যেই জীবনে ভাঁটার টান শুরু হয়ে গেল ?

রসিকতা থাক। মা বলছেন, এতদিন আমাদের বিয়ে হয়েছে, অথচ নতুন মুখ এলো না কেন ?

বিয়ের তিন বছর পর এই প্রথম আবিষ্কার করলাম, আমার স্ত্রীও সিরিয়াস গলায় কথা বলতে পারেন।

প্রথমটায় আমি বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। আর জানেন তো, এসব নিয়ে মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরা ভাবে কম? তবু গোড়ায় ব্যাপারটা হাল্কা করার চেষ্টা করলাম আমি। বললাম, বেশ তো আছি। সংসারে ছেলেপিলে মানেই তো ঝঞ্ঝাট। খরচের ধাক্কা। বরং এখন কেমন কেয়ার ফ্রি লাইফ।

না। বললেন আমার স্ত্রী।

এই প্রথম আবিষ্কার করলাম, আমার স্ত্রী সংযতবাক-ও হতে পারেন।

এবার সত্যিসত্যিই আমাকে স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হলো। কী বলব মশায়, গোড়ায় ব্যাপারটা যত সহজ বলে ধরে নিয়েছিলাম, এবার দেখলাম, তা খুবই গোলমেলে। আমার স্ত্রীকে পর পর কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে দেখালাম। এবং শেষ পর্যন্ত জানা গেল, যে সব কারণে মেয়েরা সাধারণত সন্তান ধারণ করতে পারেন না, সে সব কোন কারণই আমার স্ত্রীর মধ্যে নেই। তবে মোক্ষম একটি ত্রুটি ধরা পড়েছে। আর সেই ত্রুটিটি হলো, আমার স্ত্রীর শরীরে ডিম্বাধার থেকে নিয়মমাফিক ডিম্বাণু বের হচ্ছে না। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ওভিউলেশন। এর জন্যেই এতদিন তিনি সন্তান ধারণ করতে পারেননি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সন্তান ধারণে অসমর্থ হওয়ার পেছনে নানা রকম কারণ থাকলেও, স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ওভিউলেশনের অভাব তাদের মধ্যে একটি বড় রকমের কারণ। আমাদের মস্তিষ্কের নিচে থাকে এক ধরনের গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড। নাম পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। এই গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত হয় নানা রকম অন্তঃস্রাবী রস বা হরমোন। শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মে যাদের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ভূমিকা থাকে। এই হরমোনগুলির মধ্যে থাকে বিশেষ এক শ্রেণীর হরমোন। নাম গোনাডোট্রফিক হরমোন। যাদের একটি হলো ফলিকল স্টিমিউলেটিং হরমোন বা সংক্ষেপে এফ এস এইচ (FSH), অপরটি লিউটি-নাইজিং হরমোন বা সংক্ষেপে এল এইচ (LH)। এই গোনাডোট্রফিক হরমোনই স্ত্রী এবং পুরুষের যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি এবং তাদের শারীরবৃত্তীয় কাজ-কর্মকে সার্থক করে তোলে। মেয়েদের দেহে এরাই ডিম্বাধার তৈরি করতে সাহায্য করে; ডিম্বাধার থেকে ডিম্বাণু যথাসময়ে বেরিয়ে এসে যাতে ডিম্বনালী বা ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে যেতে পারে সে কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্বও এদের ওপর ন্যস্ত। এ ছাড়া এই দুটি হরমোনের প্রভাবেই মেয়েদের শরীর নিঃসৃত হয় দুই শ্রেণীর মূল্যবান এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোন—ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন। মেয়েদের দৈহিক এবং মানসিক ভারসাম্য রাখার ব্যাপারে যাদের ভূমিকা অপরিসীম। পুরুষের দেহে গোনাডোট্রফিনের কাজ মুখ্যত পুরুষ যৌন অঙ্গের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা। যার মধ্যে অন্যতম, টেস্টোস্টেরন নামে এক ধরনের হরমোন উৎপাদন। এই হরমোন পুরুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত করে এবং সেই সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখে তার মানসিকতায়।

আসলে সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম। মেয়েদের ওভিউলেশনের সময় ডিম্বাধার থেকে ডিম্বাণু এসে উপস্থিত হয় ডিম্বনালীর মধ্যে। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের পর পুরুষ জনন-কোষ বা শুক্র-কোষ গিয়ে হাজির হয় সেখানে। অতঃপর ডিম্বাণু এবং শুক্র-কোষের মিলন—যাকে বলা হয় নিষিক্ত হওয়া বা ফার্টিলাইজেশন। নিষিক্ত হওয়ার চার পাঁচ দিনের মধ্যে তারা আশ্রয় করে নেয় জরায়ুর মধ্যে। প্লাসেন্টা বা যাকে আমরা বলি 'ফুল' তার ডগায়। এখানেই নিষিক্ত ডিম্বাণু ক্রমে মানব শিশুতে রূপান্তরিত হয়।

যা বলছিলাম। হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোকটি। বিশেষজ্ঞ তাঁকে বললেন, আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে যে গোলমালটি দেখছি, সেটা হরমোনের ব্যাপার। মুখ্যত 'এল এইচ' হরমোন। তাঁর পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে সম্ভবত উপযুক্ত পরিমাণ 'এল এইচ' বেরোচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে তাঁর ওভিউলেশন হচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞের কথায় ভদ্রলোক এবার হতাশ হয়ে পড়লেন। প্রায় ভেঙে পড়ার মত অবস্থা। কারণ তিনি জানতেন, শরীরে কোন হরমোন যদি নিঃসৃত না হয়, তা হলে সেটা সম্ভব শারীরবৃত্তীয় ত্রুটির দরুন। আর তা নানা কারণে হতে পারে। বংশগত কারণেও হওয়া অসম্ভব নয়।

বিশেষজ্ঞ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আপনি ভেঙে পড়বেন না। ওষুধ একটি আছে। যা ওই 'এল এইচ'-এর মতই ওভিউলেশন করানোর ব্যাপারে সমান সক্রিয়। এটাও এক ধরনের হরমোন। নাম 'হিউম্যান কোরিয়োনিক গোনাডোট্রফিন।' বা সংক্ষেপে 'এইচ সি জি' (HCG)। এ ওষুধ এদেশে পাবেন না, আপনাকে বিদেশ থেকে আনাতে হবে।

বিশেষজ্ঞের উপদেশ মত ভদ্রলোক প্রচুর খরচ করে বিদেশ থেকে 'এইচ সি জি' আনালেন। ওষুধটি তাঁর স্ত্রীর শরীরে প্রয়োগ করা হলো। এবং সুখের কথা তার ওভিউলেশনও হলো এর পর। এখন তিনি মা। একটি সুন্দর শিশুর জননী। তাঁদের সংসারে আগের প্রাণবন্ত ভাব আবার ফিরে এসেছে।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, শুধু মেয়েদের অভিউলশন করানোর ব্যাপারেই নয়, পুরুষের উপরও এইচ সি জি-র প্রভাব কাজ করে। অনেক সময় দেখা যায় মেয়েদের কোন ত্রুটি নেই, ত্রুটি পুরুষের দেহে। কোন পুরুষ হয়ত উপযুক্ত পরিমাণ শুক্র-কোষ উৎপাদন করতে পারছেন না বলেই মেয়েদের ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সন্তান ধারণ করতে অসমর্থ হন। এক্ষেত্রে অনেক সময় এইচ সি জি প্রয়োগ করে পুরুষের এই ত্রুটি দূর করা সম্ভব হয়।

দেখুন, পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে কী বিরাট অভিযানই না সারা দেশ জুড়ে গত কয়েক বছর ধরে আমরা চালিয়ে আসছি। নানা ভাবে দেশের সর্বসাধারণকে আমরা এটাই বোঝাতে চেষ্টা করছি, ছোট পরিবার, সুখী পরিবার।' যে করেই হোক জন-সংখ্যার বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। হ্যাঁ, আমরা সবাই তাই চাই—সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে। আমরা সবাই চাই, একটি বা দুটির বেশি সন্তান কোন সংসারেই না আসুক। তাই বলে কোন সংসারে একটিও ছেলেমেয়ে থাকবে না, কোন মা বাবা সেটা চান, বলুন ? এ মন্তব্য আর একজন বিশেষজ্ঞের। তাঁর বক্তব্য এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। এক, যেসব মেয়ে সন্তান ধারণ করতে পারেন না, তাঁদের যাতে সন্তান হয় সে ব্যাপারেও চেষ্টা করা দরকার। দুই, কোন মেয়ে গর্ভধারণ করেছেন কী না, সেটা যাতে তড়িঘড়ি জানা যায় তার জন্যেও তৎপর হতে হবে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত এই দিকটি পরিবার পরিকল্পনার দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারেও 'এইচ সি জি' হরমোন যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

যেমন ধরুন কোন মেয়ে গর্ভধারণ করলেন। গর্ভধারণ করার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না সত্যিই তিনি গর্ভধারণ করেছেন কী না। প্রথম মাসিকের পর যখন নির্দিষ্ট সময়ে দ্বিতীয় মাসিক হলো না, তিনি মনে করলেন, হয়ত তিনি গর্ভধারণ করেছেন। কখনও বা ভাবেন, না না হয়ত ব্যাপারটা সত্যি নয়। কখনও তথাকথিত লজ্জা প্রভৃতির দরুন গোড়ার দিকে এসব ঘটনা তিনি কারোর কাছে বলতে পারেন না। এমন কি স্বামীর কাছেও না। তারপর শেষ পর্যন্ত যখন প্রকাশ করেন, তখন তিন থেকে চার মাসের মত সময় কেটে গেছে।

এই বিলম্বের দরুন কী ধরনের অসুবিধে হওয়া সম্ভব ?

একটি নয় অসুবিধে হতে পারে অনেক। যেমন ধরুন, পেটে বাচ্চা আসা মানেই তো মায়ের শরীরের উপর চাপ। পেটের শিশু যাতে ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে তার জন্যে গর্ভধারণের অব্যবহৃতি পর থেকেই মায়ের খাওয়া দাওয়া এবং স্বাস্থ্যসম্পর্কিত কতক-গুলি বিশেষ ধরনের ব্যবস্থার দরকার হয়। দেরিতে গর্ভাবস্থার কথা প্রকাশ পেলে এসব ক্ষেত্রেও বিলম্ব ঘটে। কখনও বা মার শরীর সন্তান ধারণের ব্যাপারে অনুকূল নয়, অথবা তাঁর ইতিমধ্যেই দু তিনটি সন্তান হয়ে গেছে, তিনি আর বাচ্চা চান না। এক্ষেত্রে তিনি গর্ভপাত করাতে চান, গর্ভপাত এখন আইন-সিদ্ধ। অতএব এতে কেউ আপত্তিও করবেন না নিশ্চয়।

কিন্তু মুশকিল এই গর্ভবতী হওয়ার পর যত বেশি সময় যাবে, কৃত্রিম উপায়ে গর্ভপাত করানোর কাজটিও হবে ততই জটিল। এই সঙ্গে মায়েদের জীবনের উপরও ঝুঁকি নিতে হয়। এছাড়া ইদানীং প্রচলিত সামাজিক অবস্থায় অনেক কুমারী মেয়েও কখনও কখনও অন্তঃসত্ত্বা হন। অনিবার্য কারণে এসব ঘটনা সব সময় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। এসব ক্ষেত্রেও গর্ভপাতের প্রয়োজন হয় কখনও কখনও।

'এইচ সি জি'র ভূমিকা এমন ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আশাব্যঞ্জক। কারণ, প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্যে কেউ অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন কী না, তা পরীক্ষা করতে সময় লাগে প্রচুর। খরচও বেশি। এর জন্যে ধাত্রী-বিশেষজ্ঞদের সাহায্য দরকার। অনেক সময় এ ধরনের বিশেষজ্ঞকেও হাতের কাছে পাওয়া যায় না। একথা ভেবেই ইদানীং পৃথিবীর বহু দেশে এইচ সি জি-র সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। কোন কোন কোম্পানি এই কাজের জন্যে এক ধরনের 'কিট' তৈরি করছেন। এই কিট-এ থাকে একখণ্ড ফিল্ম-এর মত বস্তু। এই ফিল্মের উপর দেওয়া হয় সামান্য 'এইচ সি জি'। 'এইচ সি জি'র সঙ্গে মেশানো হয় যিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন কী না পরীক্ষা করবেন, তাঁর এক বিন্দু প্রস্রাব। মিশিয়ে ছোট একটি কাঠির সাহায্যে তা ফিল্মের উপর অবিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে দিন। এবং অপেক্ষা করুন মিনিট দুই। যদি দেখা যায় ওই প্রলেপ সমানভাবে ছড়িয়েই রইল, তাতে কোন ফাটল দেখা গেল না, বুঝতে হবে, আপনি গর্ভবতী হয়েছেন। যদি ফাটল দেখা যায়, বুঝতে হবে, আপনি গর্ভবতী হননি। বলা বাহুল্য, কোন চিকিৎসকের সাহায্য না নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষা বাড়িতে বসে আপনি নিজেই করে নিতে পারেন। এতে খরচও কম। বিদেশ থেকে এ ধরনের সরঞ্জাম

আনার দরুন এখন খরচ পড়ে প্রায় কুড়ি টাকার মত। তবে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এ দেশে যদি প্রয়োজন মত 'এইচ সি জি' উৎপাদন করা যায়, তা হলে খরচ পড়বে মাত্র দু এক টাকা।

এ ধরনের পরীক্ষায় সবচেয়ে বড় লাভ এই, গর্ভবতী হওয়ার মাত্র দশ দিন পরেই এই পরীক্ষাটি চালানো সম্ভব। অন্য কোন প্রচলিত ব্যবস্থায় এত কম সময়ে কেউ সন্তান ধারণ করেছেন কী না, জানা সম্ভব হয় না। এর ফলে দরকার হলে গর্ভবতী হওয়ার অব্যবহিত পরেই অতি সহজে এবং বিনা ঝুঁকিতে গর্ভপাত করানো সম্ভব হয়।

*

মুশকিল এই, 'এইচ সি জি' এমন একটি হরমোন যাকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা এখনও সম্ভব হয়নি। এর একমাত্র উৎস অন্তঃসত্ত্বা মায়ের প্লাসেণ্টা বা 'ফুল'। কোন মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টা পর থেকে তার 'ফুল' 'এইচ সি জি' হরমোন নিঃসরণ করতে থাকে। গোড়ার দিকে কবে কম। দশ সপ্তাহের কাছাকাছি এই পরিমাণটি সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। ষোল সপ্তাহের পর অনেক কমে আসে। তবে নিঃসরণ চলতে থাকে প্রসব মুহূর্ত পর্যন্ত।

ব্যাপার হলো 'ফুল' থেকে নিঃসৃত হওয়ার পর এইচ সি জি-র কিছু অংশ গিয়ে মেশে রক্তে। অবশিষ্ট অংশ গর্ভবতী মায়ের প্রস্রাবের মধ্যে পরিত্যক্ত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রস্রাব থেকেই এইচ সি জি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

'আমাদের দেশে কেউ গর্ভবতী হয়েছেন কী না, সেটা জানার জন্যে প্রচুর 'এইচ সি জি' দরকার। আমরা এই উদ্দেশ্যে গবেষণায় হাত দিয়েছি। মন্তব্য করেছেন কলকাতার ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অব একসপেরিমেণ্টাল মেডিসিনের ডাইরেকটর ডঃ বিমল বাচোয়াত। ইসপিটাল ওয়েস্ট—অর্থাৎ মেয়েদের প্রস্রাব, ফুল প্রভৃতি সংগ্রহ করে আপাতত এই পরীক্ষা চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন তাঁরা।

ইতিমধ্যে 'অরগ্যানন' নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও এই কাজে হাত দিয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে তাঁরা কলকাতা এবং কলকাতার শহরতলী থেকে গর্ভবতী মেয়েদের প্রস্রাব সংগ্রহ করে 'এইচ সি জি' সংগ্রহে হাত দিয়েছেন তাঁরা।

'তবে এক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধের সামনেও পড়তে হচ্ছে আমাদের', বলেছেন ওই প্রতিষ্ঠানের জনৈক বিশেষজ্ঞ। তাঁর বক্তব্য, 'গর্ভবতী মায়ের প্রস্রাব থেকে যে পরিমাণ 'এইচ সি জি' পাওয়া যায় তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। প্রতি লিটারে পাঁচ থেকে সাত মিলিগ্রামের মত। আর এই পরিমাণও পেতে গেলে দরকার গর্ভবতী হওয়ার পর ষোল সপ্তাহ পর্যন্ত যে প্রস্রাব করা হয়, সেই প্রস্রাব। এর পরের প্রস্রাবে 'এইচ সি জি'র পরিমাণ এত কম থাকে যার থেকে 'এইচ সি জি' সংগ্রহ করলে খরচে পোষায় না।'

অর্থাৎ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে 'এইচ সি জি' উৎপাদন করতে চাই সেই প্রস্রাব যা গর্ভবতী মায়েরা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর ষোল সপ্তাহ পর্যন্ত করে থাকেন। এবং দৈনিক তার পরিমাণ হওয়া উচিত কম করেও পাঁচ থেকে ছয় হাজার লিটারের মত। উল্লেখ্য, ভোরের দিকের প্রস্রাবেই 'এইচ সি জি'র পরিমাণ বেশি থাকে।

এইচ সি জি সংগ্রহ করার ব্যাপারে আরও একটি অসুবিধে আছে। এই রাসায়নিক যৌগ অতিরিক্ত তাপমাত্রায় ভেঙে যায়। এতে শীতপ্রধান দেশে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতিরিক্ত উত্তাপ বাঁচিয়ে সংগ্রহ করতে গিয়ে এই অপচয় কিছুটা মেনে নিতেই হয়।

এবং আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই, যেহেতু প্রস্রাব সংগ্রহ করতে হয় অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর ষোল সপ্তাহের মধ্যে, অতএব যিনি তাঁর প্রস্রাব দান করবেন, তিনি যে গর্ভবতী হয়েছেন, সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রমাণিত হওয়া দরকার। অরগ্যানন অবশ্য বিনা খরচে এই পরীক্ষা কাজটির দায়িত্বও নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের রক্তে এবং প্রস্রাবে এই 'এইচ সি জি' হরমোনটি প্রথম আবিষ্কার করেন অ্যাসসাইম এবং জোনডেক নামে দুজন বিজ্ঞানী ১৯২৭ সালে। পরে আবিষ্কৃত হয় 'এল এইচ' হরমোনের বিকল্প হিসেবে সন্তান ধারণের ব্যাপারে 'এইচ সি জি' কাজ করতে পারে। তারপর থেকেই বিদেশে অনেকে মেয়েদের প্রস্রাব থেকে এই হরমোনটি সংগ্রহ করার ব্যাপারে হাত দেন। এ কাজে গোড়ার দিকে বাধা ছিল অনেক। নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, লজ্জা এবং নানা রকম কুসংস্কারের দরুন গোড়ায় অবশ্য সাড়া পাওয়া গিয়েছিল কম। সে বাধা এখন অনেকটা দূর হয়েছে। অনেকেই এখন বুঝতে পেরেছেন একজনের হৃৎপিন্ড, কিডনি, করনিয়া এবং অস্থি যখন অপরের প্রয়োজনে দান করা যায়—করছেনও অনেকে; একজনের রক্ত যখন অপরকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে, তখন একজনের প্রস্রাব অপরের প্রয়োজনে দান করতে বাধা কোথায়? বিশেষ করে এটি এমন একটি সামগ্রী যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেহ থেকে পরিত্যক্তই হয়। সেটা নেহাৎ নর্দমায় নিক্ষেপ না করলে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় কত পুরুষ এবং মেয়ের সন্তান জুগিয়ে মুখে হাসি ফোটাতে পারে; গর্ভাবস্থার ব্যাপারে আশু এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ জুগিয়ে কত মা এবং তাদের সন্তানদের জীবনই না নিরাপদ করতে পারে। বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা ভেবে দেখা দরকার।

সমরজিৎ কর

ব্যাডমিণ্টনে ইন্দোনেশিয়ার আধিপত্য

লিয়েম সুই কিং

ভারত টমাস কাপ পাবে সেটা ছিল আকাশ-কুসুম কল্পনা। তবু আশা করা গিয়েছিল এশীয় জোন ফাইনালে ব্যাডমিণ্টনের এক বড় শক্তি মালয়েশিয়াকে হারাবার পর মূল প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে ডেনমার্কের সঙ্গে অন্তত লড়াই করে হারবে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার ডেনমার্কের কাছে হেরে গেল ২—৭ খেলায়, রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে। সেই ডেনমার্ককে আবার ফাইনালে ৯—০ খেলায় হারিয়ে টমাস কাপ দখলে রাখল ইন্দোনেশিয়া। তার আগে ইণ্টার-জোনালের কোয়ার্টার ফাইনালে জাপান ৮—১ খেলায় হারায় কানাডাকে। জাপানকে ৯—০ খেলায় হারিয়ে ফাইনালে ওঠে ইন্দোনেশিয়া।

টমাস কাপ জয় হচ্ছে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনে দেশগত খেলায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। টেনিসে ডেভিস কাপেরই মতো। আগে দুই প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। যে দেশ জয়ী হত পরের প্রতিযোগিতায় তাদের শুধু ফাইনালে খেলতে হত। অর্থাৎ আগের বারের বিজয়ী দেশ চ্যালেঞ্জার হয়েই বসে থাকত। আঞ্চলিক ভিত্তিতে সারা বিশ্বে খেলার পর যে দেশ ফাইনালে উঠত তার লড়াই কেবল চ্যালেঞ্জার দেশের সঙ্গে কাপ দখলের প্রশ্নে। টেনিস এবং ব্যাডমিণ্টন দুটি প্রতিযোগিতা থেকেই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড ব্যবস্থা বিলোপ হয়ে গেছে। টমাস কাপে বিলোপ হয়েছে '৭৬-এর প্রতিযোগিতায়। এখন বিজয়ী দেশকেও আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা করতে হয়। টেনিসে ডেভিস কাপের খেলা হয় প্রতি বছর, ব্যাডমিণ্টনে টমাস কাপের খেলা হয় তিন বছর অন্তর। ১৯৪৯ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ১১ বার টমাস কাপের খেলা হয়েছে। তার মধ্যে মালয়েশিয়া জিতেছে ৪ বার, ইন্দোনেশিয়া জিতল ৭ বার। পৃথিবীর আর কোনো দেশ ব্যাডমিণ্টনের শ্রেষ্ঠ সম্মানের এই প্রতীকটি পায়নি।

ডোয়াই, ওং পেং সুন এবং এডি চুংয়ের মতো সব অসাধারণ প্রতিভাধর খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-দক্ষতায় প্রথম তিনবার (৪৯-৫২-৫৫) টমাস কাপ দখলে রাখে মালয় (মালয়েশিয়া নাম হয়েছে পরে)। পরের তিনবার (৫৮-৬১-৬৪) বিজয়ী হয় ইন্দোনেশিয়া। ৬৭ সালে আবার মালয়েশিয়া সেমিফাইনালে ডেনমার্ককে ৭—২ এবং ফাইনালে ইন্দোনেশিয়াকে ৬—৩ খেলায় হারিয়ে কাপ ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু তারপর চারবারই (৭০-৭৩-৭৬-৭৯) পর পর জিতল ইন্দোনেশিয়া। সুতরাং বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনে ইন্দোনেশিয়ার পর্যাপ্ত প্রাধান্য প্রশ্নাতীত। বিশেষ করে, এ বছর যেভাবে জাপানকে এবং নামী খেলোয়াড়পুষ্ট ডেনমার্ককে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে তার দৃষ্টান্ত বিরল। অনেকেই আশা করেছিল ডেনমার্ক দলে যখন দুই প্রাক্তন অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ন স্বেন প্রী এবং ফ্লেমিং ডেলফস আছেন, আছেন গত অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের তিনজন সেমিফাইনালিস্ট তখন নিশ্চয়ই এমন লড়াই হবে, যা এ যাবৎ ব্যাডমিণ্টনে কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় হয়নি। কিন্তু ফাইনালে সেই ডেনমার্কের ০—৯ খেলায় হার একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ফাইনালের আলোচনা পরে করছি। তার আগে ভারতের খেলা সম্পর্কে দু'-চার কথা বলে নিই।

এর আগে কোনোবার ভারত টমাস কাপের খেলায় মালয়কে হারাতে পারেনি। ডোয়াই, ওং পেং সুন, এডি চুংয়ের পর প্যাং গনেসন, তান ই খান, নাগ আন বী, ইউ চেন্দ হো, গোলডরাজ প্রভৃতি খেলোয়াড়কে নিয়ে মালয়েশিয়া ছিল দারুণ শক্তিশালী। ৬৪-র প্রতিযোগিতায় নিউজিল্যাণ্ডের ওয়েলিংটনে মালয়েশিয়া ৮—১ খেলায় হারায় ভারতকে, ৬৭ সালে কুয়ালালামপুরে হারায় একই ফলে। তারপর ৭০-এর প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়া খেলতে আসে ভারতে। খেলা হয়েছিল লুধিয়ানায়। সবাই জানে টমাস কাপে ৯টি ম্যাচ খেলতে হয়—৫টি সিঙ্গলস ও ৪টি ডাবলস। প্রথম দিন হয় দুটি সিঙ্গলস ও দুটি ডাবলসের খেলা। দ্বিতীয় দিন তিনটি সিঙ্গলস ও দুটি ডাবলসের খেলা। লুধিয়ানায় ভারত প্রথম দিন ৩—১ খেলায় এগিয়ে থেকেও ম্যাচ জিততে পারেনি। মালয়েশিয়া দ্বিতীয় দিনের ৫টির মধ্যে ৪টি খেলায় জিতে ভারতকে ৫—৪ খেলায় পরাজিত করে। এবারই ভারত গত ফেব্রুয়ারী মাসে কুয়ালালামপুরে আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম জয়ী হয়। ফল ছিল ভারতের অনুকূলে ৫—৪।

বলা বাহুল্য জাতীয় চ্যাম্পিয়ন প্রকাশ পাড়ুকোনের ক্রীড়া-দক্ষতায় ভারতের এই জয়। দুটি সিঙ্গলস এবং উদয় পাওয়ারকে জুড়ি করে খেলে একটি ডাবলস জেতে প্রকাশ। একটি সিঙ্গলস জেতে ভারতের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন সৈয়দ মোদি এবং আর একটি ডাবলস জেতে প্রদীপ গান্ধে ও সঞ্জয় শর্মা।

গত বছর আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টনে প্রকাশের দুটি বড় গৌরব আছে। এক, কমনওয়েলথ ব্যাডমিণ্টনে স্বর্ণপদক জয়। দুই, লণ্ডনে ওয়েম্বলিতে 'ইভনিং অব চ্যাম্পিয়নশিপ' ডেনমার্কের অসাধারণ খেলোয়াড় ফ্লেমিং ডেলফসকে ফাইনালে হারিয়ে বেসরকারীভাবে বিশ্বজয়ীর খেতাব অর্জন। ডেলফস শুধু ৭৭-এর চ্যাম্পিয়নই নয়, ওই বছর সুইডেনের মালমোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী খেলোয়াড়। সম্ভবত ডেলফসকে পরাজিত করার সুবাদেই প্রকাশ গত অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষ বাছাইয়ের সম্মান পেয়েছিল। বিলিয়ার্ডস খেলায় ছাড়া ভারতের অন্য কোনো খেলোয়াড় প্রকাশের আগে আন্তর্জাতিক বড় প্রতিযোগিতায় শীর্ষ বাছাই হয়নি। বাঁ পায়ের গোড়ালির ব্যথার জন্য প্রকাশকে অবশ্য অল ইংল্যাণ্ডের প্রথম খেলার পরই প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিতে হয়। তবু প্রকাশকে কেন্দ্র করেই ক্ষীণ আশা জেগেছিল ভারত ডেনমার্ককে হারালেও হারাতে পারে।

গত মাসে ইন্দোনেশিয়ার টমাস কাপের শেষ

[illegible] আগে [illegible]কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় ৮ বারের অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ন রুডি হরতনোও অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন—ভারত দারুণ বেগ দেবে ডেনমার্ককে, যদিও ডেনরাই ফেভারিট। খেলার আসর ইন্দোনেশিয়ায় হওয়ায় ভারতের কিছু সুবিধাও ছিল। কারণ শীতপ্রধান দেশের খেলোয়াড়, বিশেষ করে একটু বেশী বয়সের খেলোয়াড় স্বেন প্রী এবং ফ্লেমিং ডেলফসের গ্রীষ্মপ্রধান শহর জাকার্তায় কাহিল হয়ে পড়ার কথা। আর স্বেন প্রীর তো গৌরবের দিন প্রায় শেষ। বয়স ৩৩। এটাই ছিল টমাস কাপে তাঁর শেষ খেলা। সব দিক বিবেচনা করে ভারতের জয়-সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়নি।

টমাস কাপে ভারত ও ডেনমার্কের এটি ছিল তৃতীয় লড়াই। আগের দুটি লড়াইয়ে একবার জিতেছে ভারত, একবার ডেনমার্ক। ৫২ সালে টমাস কাপের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় ডেনমার্ক ৬—৩ খেলায় হারায় ভারতকে। খেলা হয়েছিল কুয়ালালামপুরে। ৫৫ সালের তৃতীয় প্রতিযোগিতায় সিংগাপুরে আন্তঃআঞ্চলিক ফাইনালে একই ফলে ভারত হারায় ডেনমার্ককে। এবার আবার ডেনমার্ক জিতল ৭—২ খেলায়। ভারতের পক্ষে একটি সিংগলস জিতেছে প্রকাশ পাড়ুকোন ডেনমার্কের এক নম্বর খেলোয়াড় মর্টেন ফ্রস্ট হ্যানসেনকে হারিয়ে, ফ্লেমিং ডেলফস ও স্টেন স্কোভার্ডকে হারিয়ে একটি ডাবলস জিতেছে পার্থ গাঙ্গুলী ও প্রদীপ গান্ধে। বাকি ৭টি খেলায় জয় ডেনমার্কের।

সন্দেহ নেই, ডেনমার্ক এখন বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনে দ্বিতীয় শক্তি। স্বেন প্রী এবং ফ্লেমিং ডেলফসের অনেক ক্যাত। কিন্তু ওদের নতুন তারকা ৭৮ এবং ৭৯ সালের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন একুশ বছর বয়সী মর্টেন ফ্রস্ট। অল ইংল্যাণ্ডের সেমিফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যায় ইন্দোনেশিয়ার চ্যাম্পিয়ন লিয়েম সুই কিংয়ের কাছে। ফ্রস্ট জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বলেই ক্রমপর্যায়ে স্বেন প্রী ও ফ্লেমিং ডেলফসের উপরে এক নম্বরে স্থান পেয়েছে। সেই ফ্রস্টকে প্রকাশ হারায় ১৫-১০ ও ১৮-১৫ পয়েণ্টে। কিন্তু ৩৩ বছর বয়সী খেলোয়াড় স্বেন প্রীর কাছে ২৪ বছর বয়সী প্রকাশের হার একেবারেই অপ্রত্যাশিত। জাকার্তার গ্রীষ্মতাপ, বয়স ৯ বছর বেশী তবু স্বেন প্রী যেভাবে প্রকাশকে হারিয়েছে তা কল্পনাতীত। প্রথম গেমে প্রকাশ এগিয়ে যায় এইভাবে : ১০—২, ১১—৫, ১৪—৭, ১৪—৮। ১৪—৮এ দাঁড়িয়ে থেকে ৪ বার গেম পয়েণ্টের জন্য সার্ভ করে। চারবারই স্বেন প্রী প্রকাশকে বিমুখ করে এবং ডিউস করে গেম পায় ১৭—১৫ পয়েণ্টে। এই গেমে শরীর ও মনের উপর কতখানি চাপ পড়ে সহজেই অনুমেয়। তারপর প্রীরই কাহিল হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু কাহিল হয়ে পড়ে প্রকাশ। যার ফলে দ্বিতীয় গেমে প্রীর সহজ জয় ১৫—৫ পয়েণ্টে। প্রকাশের পরাজয়ের চেয়েও বেশ বিস্ময়কর ব্যাপার সেমিফাইনালের প্রথম সিংগলসে প্রীর কাছে তার অর্ধেক বয়সী ভারতের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন সৈয়দ মোদীর স্ট্রেট গেমে হার। মোদী আরও শোচনীয়ভাবে ফ্রস্টের কাছে হারে ৬—১৫ ও ৭—১৫ পয়েণ্টে। পার্থ গাংগুলী চতুর্থ সিঙ্গলসে অবশ্য সংগ্রাম করে হেরেছে ফ্লেমিং ডেলফসের কাছে, ১০—১৫, ১৫—১০ ও ৫—১৫ পয়েণ্টে।

ফাইনালে এই ডেনমার্ক দলকেই নাস্তানাবুদ করে, এক কথায় বলা যেতে পারে নাচিয়ে নাচিয়ে খেলে ৯টি খেলাতেই হারিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার ইন সুমিরাত, রুডি হরতনো, লিয়েম সুই কিং, জনে জনে, ওয়াজদি ও ক্রিশ্চিয়ান কোম্পানী। ৯টি ম্যাচের একটিও তিন গেম পর্যন্ত চলেনি। সব খেলারই মীমাংসা হয়েছে স্ট্রেট গেমে। ডেনমার্কের মতো শক্তিশালী দলকে যে দল এত অনায়াসে হারাতে পারে সেই দলের শক্তি সহজেই অনুমেয়। তার চেয়েও বড় কথা ইন্দোনেশিয়ার দুই বর্ষীয়ান খেলোয়াড় ইন সুমিরাত এবং রুডি হরতনো যে এখনো বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনের দুই নিপুণ শিল্পী তার প্রমাণ মিলল ওদের সহজ জয়ে। পর পর দুবারের অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ন লিয়েম সুই কিং নিঃসন্দেহে এখন ব্যাডমিণ্টনের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। স্বেন প্রীর মতো খেলোয়াড়কে দুটি গেমে হারাতে তার সময় লেগেছে মাত্র ১২ মিনিট।

ব্যাডমিণ্টন দুনিয়া এখন দু' ভাগে বিভক্ত। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন আর চীনকে কেন্দ্র করে ওয়ার্লড ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন। ব্যাডমিণ্টনে চীনও দারুণ শক্তিশালী। ৭৪-এ তেহেরান এশিয়ান গেমসে ইন্দোনেশিয়াকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল চীনের কাছে। অবশ্য ইন্দোনেশিয়া তেহরানে পুরো শক্তি নিয়ে খেলেনি। ব্যাংককে চীনকে নতি স্বীকার করতে হয় ইন্দোনেশিয়ার কাছে। মনে হয় বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনে ইন্দোনেশিয়ার আধিপত্য বজায় থাকবে আরও বহু দিন।

মুকুল

ফুটবলে নতুন চিন্তার প্রয়োজন

সুপ্রিয় সেন

শ্রদ্ধেয় তিমিরবরণের কাছে একদিন গুরু আলাউদ্দীনের কথা শুনছিলাম। তাঁর সব কৃতী শিষ্যদের বাজনার ভঙ্গীতে প্রত্যেকেরই একটা স্বকীয়তা আছে। রবিশংকর বা নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সেতার বাজান অথবা সরোদ বাজান আলী আকবর কিংবা বাহাদুর খাঁ—প্রত্যেকেই স্ব-মহিমায় মণ্ডিত। গুরু তাঁদের একটাই ছাঁচে ঢালাই করেননি। বরং যাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই আরো বিকশিত করে দিয়েছেন মাত্র। অর্থাৎ নিখিলকে তিনি রবিশংকর বানাতে চাননি; আলী আকবর হোক আরেকজন আলাউদ্দীন, এ তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। এজন্যেই আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব গুরুর গুরু।

মানুষের যে কোন শিল্পসাধনার ক্ষেত্রেই এটা একটা মূল সত্য। নকলনবিসী করে, নিজের ব্যক্তিত্বকে চেপে দিয়ে একটা আদর্শ ছকে ফেলে দিতে গেলে সর্বক্ষেত্রেই সেটা হয় প্যারডি। কিংবা বড়োজোর অন্য কারো অস্পষ্ট ছায়ামাত্র। যার যার স্টাইল থাটো করে অন্য কেউ হতে গেলেই তার নাম ফ্যাশন।

তার মানে অবশ্যই এ নয় যে ভুল-ত্রুটিগুলোকেও বৈশিষ্ট্য হিসেবে রক্ষা করতে হবে।

অর্থাৎ যে কোন শিল্প বা বিদ্যাচর্চার একেবারে মূল কয়েকটি রীতি মেনে তারপর যে যার নিজস্বতাকে অবলম্বন করে সাধনা করতে থাকুন, এইটেই সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে স্বীকৃত। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে খেলাধুলোও একটা বিদ্যার চর্চা তো বটেই, রসিকরা জানেন জাত খেলোয়াড়ের যাদুস্পর্শে সেই খেলা অবশ্যই শিল্পের পর্যায়ে উঠে যায়। কাজেই শিল্পসাধনার মূল সত্যটি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যদিও খেলার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ব্যাপার আছে যেটা ছবি আঁকা বা গান গাওয়ার মধ্যে নেই। শুধু ভালো ফুটবল খেললেই চলবে না, অন্যের চেয়ে আরো ভালো খেলতে হবে যাতে বিজয়ী হওয়া যায়। ব্যাপারটা আধুনিক যুদ্ধের মত। মারণাস্ত্রগুলি যাতে বিপক্ষের চেয়ে নিকৃষ্ট অন্তত না হয়, সৈন্যবাহিনীতে থাকে শৃংখলা, মর‍্যাল হয় উঁচু—এগুলো জয়লাভের জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজন। তারপরে আসে স্ট্র্যাটেজি—অর্থাৎ কী পন্থায় আমার সৈন্যরা যুদ্ধ করবে।

আমাদের ফুটবলকে যদি সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে হয় তবে সখেদে বলতে বাধ্য হবো যে দলবাজ, অকর্মণ্য, ক্ষমতালিপ্সু এবং স্বজনপোষণকারী অধিকাংশ কর্মকর্তার হাতে পড়ে তা আজ পৃথিবীর একেবারে নীচের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের কোন অস্ত্রই নেই, শৃংখলা প্রায় অন্তর্হিত এবং মর‍্যাল অদৃশ্য। এসব মোটামুটি সকলেরই জানা। স্বয়ং ফিল্ডমার্শাল মানেক'শ ফিল্ডে নেমেই যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে দক্ষ সেনাপতি হিসেবে একটি ব্যাধি তিনিও ধরে ফেলেছেন। 'ভাই বন্ধুকে' জোর করে দলে ঢোকানো যে হয়—এতদিনে উচ্চতম আসন থেকে স্বীকৃতি ও সতর্ক বাণীটি অন্তত আমরা পেলাম। আশা করি এই আস্তাবল সাফ করে একটু নির্মল বিশুদ্ধ হাওয়া তিনি ক্রীড়াজগতে বইয়ে দিতে পারবেন। তা তিনি করুন।

কিন্তু এই দরিদ্র দেশের বর্তমান সমাজব্যবস্থার ফলে যে সামগ্রিক অবক্ষয়, সেটা তো আর ফিল্ড মার্শাল পাল্টাতে পারবেন না। এই লেখার উদ্দেশ্যও নয় এ কথা প্রমাণ করা যে সর্বস্তরে অগ্রগতির জন্যে সবার আগে সামাজিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আমূল পরিবর্তন দরকার। তা অবশ্যই দরকার, কিন্তু ফুটবলের উন্নতি বিষয়টি বোধহয় তাছাড়াও সম্ভব, নইলে আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি, ব্রাজিল টিউনিসিয়া বা ইরান ভাল ফুটবল খেলছে কী করে?

আমাদের প্রশ্ন অন্যত্র। বর্তমানে ভারতীয় ফুটবল যে পথে যেতে চাইছে—সেই পথটা অর্থাৎ যে পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করতে চাইছি সেটা আমাদের পক্ষে কতটা যুক্তিসংগত, মনে হয় এ প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে।

একথা আজ প্রায় সর্ববাদীসম্মতভাবে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যে পা দুটো ভারতের মাটিতে থাকলেও আমাদের চোখ নিবদ্ধ থাকবে হয় ল্যাটিন আমেরিকা অথবা ইউরোপের ফুটবল মাঠে। হাংগেরী যদি নতুন প্রথা সৃষ্টি করে কিংবা ব্রাজিল অথবা হল্যাণ্ড খেলে নতুনতর কোন প্রকরণে সংগে সংগে আমরা তার অনুকরণ করতে শুরু করি। যেন পাঠশালার নামতা শেখার মত। গুরুমশায় বললেন ৪—৩—৩, আমরা সমস্বরে বললাম ৪—৩—৩; গুরুমশায় শেখালেন ৪—২—৪, আমরা চেঁচালাম ৪—২—৪। গুরুমশায় হঠাৎ মাথা চুলকে বললেন, 'এবার বল টোট্যাল ফুটবল।' ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল।

কিন্তু তোতাপাখির মত এত নামতা শিখেও পাঠশালার ছাত্ররা যোগ বিয়োগ পর্যন্ত কেন ভুলতে বসেছে, এই প্রশ্ন নিয়ে কয়েকজন পুরোনো মাস্টার মশাইদের কাছে যাওয়া ঠিক করলাম। তাঁদের একজন থাকেন লেক মার্কেটের কাছেই। এককালে যিনি ঘুরে ঘুরে ছাত্র সংগ্রহ করে আনতেন যাঁরা ফুটবলের বিশ্ববিদ্যালয়ে টকাটক শুধু পাশই করতেন না, গোল্ড মেডেল টেডেলও অনায়াসে পেয়ে যেতেন।

জানি পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, তবু জ্যোতিষচন্দ্র গুহ সম্পর্কে আর একটু বলে নেওয়া দরকার। কেননা জে. সি. গুহ নামক বিতর্কিত ব্যক্তিটির কথা উঠলেই যে চিত্রকল্পটি অনেকের মনে ভেসে ওঠে তা দৃঢ়, কিছুটা একনায়কোচিত অনমনীয়তাসম্পন্ন এক বড়ো ক্লাবের প্রধান কর্মকর্তা যিনি দাপটের সংগে একদা রাজত্ব করে গেছেন। যেটা অনেকেই জানেন যে, এই কর্মকর্তাটি ১৯৩৩ সালে ভারতীয় দলের অন্যতম গোলকীপার ছিলেন শ্রীলংকা সফরে। এই ব্যক্তিটি তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে ফোর্ট উইলিয়মে তৎকালীন বড়ো বড়ো অনেক বৃটিশ খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলেছেন এবং তখন থেকেই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে খেলা ফুটবলের সংগে তাঁর পরিচয়। এই মানুষটি ইংলণ্ডের 'আর্সেনাল' নামক জগদ্বিখ্যাত ফুটবল দলটিতে তিন বছর—তিন মাস করে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। এই রত্নচেনার জহুরীটি ইস্টবেংগল দল নিয়ে পৃথিবীর কয়েক জায়গায় খেলিয়েছেন, খেলা দেখেছেন এবং সারাজীবন খেলার জন্যে নিজেকে আহুতি দিয়েছেন। পৃথিবী জুড়ে আধুনিক ফুটবল নিয়ে যে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা—সেদিকে বরাবর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো এবং শারীরিক বহু বিপর্যয় সত্ত্বেও আজো তা সজাগ।

কাজেই সর্বজনবিদিত, যা আগেই বলা হয়েছে,

সেসব কারণগুলো বাদ দিয়ে আর কি জন্যে আমাদের খেলার এই ক্রমাবনতি ঘটছে—অধিকারী হিসেবেই তাঁর কাছে এ জিজ্ঞাসা রেখেছিলাম।

মানুষটি সম্ভবত এখনো অনুক্ষণ ফুটবল নিয়ে চিন্তা করেন। তাই একটি ব্যাখ্যা সংগে সংগেই তাঁর কাছে পেলাম—ভাবতে হয়নি তাঁর।

বললেন, 'এ কথা তো সকলেই জানে যে ভালো ফুটবল খেলোয়াড় সেই হয় যার চারটে 'S' আছে। Skill, Speed, Stamina আর Strength।

"জলবায়ু এবং নৃতত্বগত কারণে ভারতীয়রা একটি 'S' অর্থাৎ স্ট্রেংথের ব্যাপারে কোনদিন ইউরোপ বা ল্যাটিন আমেরিকা এমনকি ইরান ইজরায়েলের সংগেও পাল্লা দিতে পারবে না। ভারতীয় ফুটবল যতদিন আন্তর্জাতিক আসরে অথবা এশিয়াতেও মোটামুটি একটি স্থান দখল করে ছিল, ততদিন তার প্রধান সহায় ছিল দুটি 'S' অর্থাৎ স্কিল আর স্পীড্। এইটেই আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য—এবং এই দুটোই আমাদের প্রধান মূলধন। কাজেই আমাদের ক্রীড়া-কৌশলকে এই দুই অস্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। সংগে বাড়াতে হবে তৃতীয় 'S' অর্থাৎ স্ট্যামিনা।

"শুধু ফুটবলেই নয়, ভারতীয় এই বৈশিষ্ট্যের দিকটা হকি বা ক্রিকেটেও প্রকাশ। ভারত যখন হকিতে দিগ্বিজয়ী ছিলো তখন বেশির ভাগ খেলোয়াড় আসতো ইউ পি, মধ্য প্রদেশ আর বাংলা থেকে। তখন হকিতেও আমাদের সেই দুই অস্ত্র, স্কিল মানে স্টিকওয়ার্ক আর তীব্রগতি। তখন পাঞ্জাবী খেলোয়াড় ক'টি ছিলো টীমে? খেলার ধারা পালটে যেই ইয়োরোপীয়দের মত পাওয়ার হকি খেলা শুরু হল, তখন থেকেই অধঃপতন। ধ্যানচাঁদের সংগে এই নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সেও একমত। আমাদের সময়ে ভবানীপুর ক্লাবে যে স্ট্যান্ডার্ডে হকি খেলা হত—এখন ভারতীয় একাদশের খেলায়ও সে মান নেই। পাকিস্তান তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, শিল্পীর সুষমা বজায় রেখেছে—তাই তারা বিশ্বজয়ী।

"ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও দলীপ সিংজী বার বার বলতেন, ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রধান সম্বল তিনটি—আই-সাইট, ফুটওয়ার্ক আর কবজির কাজ—তা ব্যাটসম্যানই বলো আর বোলারই বলো। এখনো ভারতীয় ক্রিকেটের প্রধান অস্ত্র তার স্পিন, কবজির মোচড় আর আঙুলের যাদু। এগুলিই আমাদের জন্মগত বিশেষত্ব।

"কাজেই এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে ভুলে গিয়ে যেদিন থেকে অন্ধের মত আমরা প্রতীচ্যের ফুটবলকে নকল করা শুরু করলাম—সেদিন থেকে আমাদের স্কিল হারিয়ে যাচ্ছে। স্ট্যামিনা আর স্ট্রেংথ বাড়াবার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে, কেননা ফুটবল মরদের খেলা। তবে স্ট্র্যাটেজি তৈরি হবে স্কিল আর স্পীডকে অবলম্বন করে। টোট্যাল ফুটবল? এই স্বাস্থ্য নিয়ে? অসম্ভব।

"আসল কথা বিদেশী পত্রপত্রিকা—কিছু বই অথবা সিনেমা বা টি ভি-তে ওদের খেলার পদ্ধতি দেখেই আমরা লাফিয়ে উঠি। ভারতীয়দের দিয়ে সেটা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই একটা আধা খ্যাচড়া ছক করে ফেলা হয় এবং অসহায় ছেলেগুলি পরম বিশ্বাসে 'মডার্ন ফুটবল' খেলছি ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তারপর এশিয়ান বা মারডেকা খেলতে গিয়ে দশ গোল, বার গোলের মালা পরে ভাবে ব্যাপারটা কী হোল! আত্মবিশ্বাস ধ্বংস হয়ে যায়, ফ্রাসট্রেশান আসে।

"ব্যাপারটা কী রকম জানো? সোনা দিয়ে যদি তলোয়ার বানাতে যাও তবে সে তলোয়ারে কোন কাজ হবে না, কিন্তু সূক্ষ্ম কারুকাজের গয়না বানাতে পারতে যার তারিফ করতো সকলেই। ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় পাস করা কিছু কিছু চাইল্ড স্পেশালিস্ট আছেন। তাঁরা ডাক্তারী শেখার সময় সেসব দেশের গাবদা গোবদা বাচ্চাদের দেখেছেন; তাদের জন্মকালীন ওজন, গ্রোথ, জেনেটিক্স্, সেখানকার আবহাওয়া তা তো আর এদেশের পাঁচ ছ পাউন্ড শিশুর মত নয়। কিন্তু সেই ডাক্তাররা এখানে এসে বাচ্চাদের খাবার যে চার্ট করে দেন, দেখেছ? ওই বাচ্চা তো দূরের কথা তাদের বাবারাও সেই খাবার হজম করতে হিমসিম খেয়ে যাবে।"

প্রশ্ন করলাম, "এই অনুকরণের ধারাটা চালু হলো কবে থেকে?"

জ্যোতিষদা পুরোনো কোন স্মৃতি মনে করে হাসলেন, বললেন, "গল্পটা গোড়া থেকেই শোন তবে।

"১৯৫২ সালে অলিম্পিক টিম হেলসিংকি যাবে, কোচের পদে দুজন দাবিদার। একজন ব্রাহ্মণ বাঙালী, শ্রদ্ধেয় লোক। অপরজন হায়দ্রাবাদী মুসলিম; রহিম। বাঙালী কোচের পক্ষে পঙ্কজ গুপ্ত, এম দত্তরায় আর জিয়াউদ্দীন। রহিমকে সমর্থন করছি একা আমি। কিন্তু ফেডারেশনে আমার তখন এরকম প্রভাব যে রহিমই কোচ নির্বাচিত হল। অপর দাবিদার সেই বাঙালী ব্রাহ্মণ সর্বসমক্ষে পৈতে ছিঁড়ে আমাকে অভিশাপ পর্যন্ত দিলেন।

"রহিম কোচ হবে, এরকম কোন আশাই তার নিজের ছিল না। চীৎপুরে একটা ছোট্ট ঘরে সে থাকে তখন। আমার কাছে খবরটা পেয়ে খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তারপর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো রাস্তা দিয়ে। ভাবলাম বুঝি খুশীর চোটে মাংস পরোটা টরোটা খাওয়াবে। তা না, নিয়ে হাজির করলো একেবারে নাখোদা মসজিদের ভেতরে। ভেবে দ্যাখো একবার, আমি ধুতি পাঞ্জাবি পরা কাফের; আমাকে নিয়ে ঢুকিয়েছে মসজিদে। আমি তো ভয়ই পেয়ে গেছি—কেটে ফেটে ফেলবে নাকিরে বাবা।

জ্যোতিষচন্দ্র গুহ

"দেখি সামনে বসে নমাজ পড়ছে আর কাঁদছে রহিম। নমাজ শেষ করে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলো, বললো, 'আল্লাহ্‌র কাছে তোমার নামে মোনাজাত করলাম গুহাসাব, তোমার এ ঋণ কোনদিন শোধ হবে না।'

"সেই রহিম ১৯৫৬ সালে আবার কোচ হলো রোম অলিম্পিকে। এবং ভারতীয় ফুটবলের সর্বনাশের সূচনা হলো।"

বিস্মিত আমি প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু জ্যোতিষদা, সেবার তো আমরা—"

"হ্যাঁ, ফোর্থ প্লেস পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা ভালো খেলার জন্যে নয়। বরং তার তুলনায় ১৯৬০ অলিম্পিকে আমরা আরো ভালো খেলেছিলাম। যুগোশ্লাভিয়ার সংগে রহিম কী করলো জানো? পাঁচ ফরোয়ার্ড, প্রদীপ, বদরু, নেভিল ডিসুজা, বলরাম আর নিখিল নন্দী—এদের মধ্যে থেকে ডিসুজা আর নিখিলকে পিছিয়ে এনে করলো হাফ। অর্থাৎ তিনটে ফরোয়ার্ড, চারটে হাফ আর তিনটে ব্যাক। আমাদের আক্রমণ বলে কিছুই রইলো না। সারাক্ষণ খেলা হলো আমাদের ডিফেন্ডিং জোনে। ৪—১ গোলে আমরা হারলাম।

"অর্থাৎ সেই প্রথম আমাদের স্বাভাবিক ক্রীড়াধারা থেকে আমরা সরে এলাম। পরে রহিমকে বললাম, দলের যেখানে জোর সে জায়গাটাই দুর্বল করে দিলে তুমি। ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলতে গেলে যা দরকার, সেই অস্ত্রগুলো আমাদের খেলোয়াড়দের নেই। রহিম যদিও সে কথা মানেনি। কিন্তু তারপর থেকেই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত হতে লাগলো—শুরু হলো অক্ষম অনুকরণ।"

বললাম, "কিন্তু চুণীর অধিনায়কত্বে আমরা যেবার এশিয়াতে কোরিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলাম—"

জ্যোতিষদা বললেন, "সকলে পিছিয়ে থেকে ওদের ডিফেন্স সুদ্ধু টেনে এনে হঠাৎ বল লব করে ওদের এরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া আর তারপর জার্নালের দৌড়ে গিয়ে গোল করা—এই তো? এই ট্যাকটিক্স একবারই সম্ভব হয়—বারবার হয় না।"

আমি আমার মনের সরব প্রতিবাদ এবং অসংখ্য প্রশ্ন বহু আয়াসে একপাশে সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলাম, "আজ আন্তর্জাতিক ফুটবল যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তাতে আপনার মতে, আমাদের কর্ম কী হওয়া উচিত?"

বিনা দ্বিধায় জ্যোতিষদা বললেন, "আবার ফিরে যাওয়া। স্কিল আর স্পীডের দিকে নজর রেখে, স্ট্যামিনা বাড়িয়ে আক্রমণকে জোরদার করা। স্কিল দিয়ে বিপক্ষের রক্ষণভাগকে ভেদ করা। বড়ো জোর একটি ফরোয়ার্ড উইথড্রল হিসেবে মধ্যমাঠে আত্মরক্ষায় নামবে।"

তারপরে ফুটবলের দুরূহ ব্যাকরণ নিয়ে ব্যাখ্যা হলো যেটা প্রদীপ ব্যানার্জী, অমল দত্ত, অরুণ ঘোষ বা অচ্যুত ব্যানার্জী উপস্থিত থাকলে একটি অতি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্রে পরিণতি লাভ করতে পারতো।

আমার মত অনধিকারী গড়পড়তা দর্শকের পক্ষে বোবার মত সে বিশ্লেষণ শুনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

ফুটবলের সূক্ষ্ম স্ট্র্যাটেজী সম্পর্কে যেহেতু কোন ধারণাই নেই তাই জ্যোতিষদার প্রস্তাব অনুযায়ী খেলতে গেলে আটটি বা দশটি প্লেয়ার যখন আমাদের গোলে হানা দেবে তখন তাদের কে রুখবে এসব আমি বুঝিনি। আর আমাদের পাঁচটি ফরোয়ার্ডই বা বিপক্ষের আটজনের রক্ষণব্যূহ কীভাবে ভেদ করবে তাও আমার বুদ্ধির অগম্য।

কিন্তু মূল কথা যেটি, অর্থাৎ আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আধুনিক ফুটবলে আমাদেরই উপযোগী নতুন কোন প্রকরণ সৃষ্টি করার কথা ভাবা উচিত—এ যুক্তিকে যেন উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল।

অর্থাৎ আমাদের স্বীকৃত কোচরা এ সম্পর্কে একটু নতুন করে ভাবুন। অথবা আসুন নতুন কোন কোচ, যিনি তৈরি করবেন নতুন স্ট্র্যাটেজী। তাঁকে খুব উঁচুদরের খেলোয়াড় হতে হবে তার কোন মানে নেই। মিনোত্তি বা কুটিনহো—এঁরা তো একজন গড়পড়তা খেলোয়াড় ছিলেন, অপরজন তাও নন, অ্যাথলীট মাত্র। আসল কথা তাঁর চাই ফুটবল সেন্স, দক্ষ সেনাপতির গুণ। পরীক্ষামূলকভাবে কিছু খেলোয়াড় নিয়ে নতুন পদ্ধতিতে হোক না অনুশীলন। যাঁরা বড়ো বড়ো নামকরা প্লেয়ারদের নিয়ে ট্রফি জিতছেন, সত্যি কথা অপ্রিয় ঠেকবে, তাঁরা কি সত্যি উল্লেখযোগ্য স্ট্র্যাটেজী কিছু দেখিয়েছেন?

কিছু কিছু প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের সংগে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। অবাক হয়ে দেখছি—মূল কথাটাতে তাঁরাও একমত। কাজল মুখার্জী তাঁর দেখা ইরান আর কুয়েইতের একটি খেলার কথা বলছিলেন। পাওয়ার ফুটবল কাকে বলে তার চরম উদাহরণ ঐ খেলাটি। এলোমেলো খেলা নয়, পরিকল্পিত সুসংবদ্ধ আক্রমণ, প্রতি আক্রমণে বল এ মুহূর্তে এ গোল থেকে পর মুহূর্তে অপর গোলের সামনে চলে যাচ্ছে। আর ডিফেন্ডিং জোনে গেলে যেভাবে চার্জ করা হচ্ছে—তা ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে অকল্পনীয়। কাজল মুখার্জীর ভাষায়—"সাড়ে ছ' ফুট লম্বা এক একটি দৈত্যের সেই ট্যাকলিংয়ে আমরা মরেই যেতাম।"

তাহলে সেরকম খেলতে যখন পারবোই না, আমরা কি ফুটবল খেলা ছেড়ে দেব? তাছাড়া আমরা কি আগে টাফ্ টিমের বিরুদ্ধে খেলিনি না তখন ফুটবল খেলা বিনম্র বৈষ্ণবজনোচিত ছিলো? বিপক্ষের গায়ের

জোর আমাদের ভয়ের কারণ ছিলো না তো। ফুটবল মরদের খেলা হলেও সেটা ফ্রি স্টাইল কুস্তি নয় আর মাঠে রেফারীও থাকেন। স্কিলের জোরেই আমাদের খেলোয়াড়েরা শক্তিকে পরাভূত করেছে, অন্তত পাল্লা দিয়েছে সম্মানজনকভাবে। আজ অনুকরণের নেশায় মেতে আমরা সে স্কিল হারাতে বসেছি। এ কথা অনস্বীকার্য যে পঞ্চাশের দশকে যে স্কিল ছিলো, ষাটের দশকে তা কমেছে এবং সত্তরের দশকে তা প্রায় বিলুপ্ত। কতজনের নাম করবো, দশ বিশ বছর আগেকার সেই প্রাণমাতানো খেলোয়াড়রা আজ কোথায়? জায়েন্টরা সব পিগ্‌মী হয়ে যাচ্ছে।

কাজেই নতুন চিন্তা করার সময় এসেছে। উমাপতি কুমার, বাঘা-দা, জ্যোতিষদারা তো আছেন এখনো; বসুন না চুণী প্রদীপ অমল অরুণরা তাঁদের সংগে। ভারতীয় দলের কোচ কেউ না কেউ তো হবেন অবশ্যই। কিন্তু কী কোচ করবেন, কী হবে আমাদের যুদ্ধনীতি—সে সম্পর্কে একটা সর্বভারতীয় আলোচনার ব্যবস্থা করা কি একেবারে অসম্ভব। সুস্থ একটি বিতর্কের মাধ্যমে নতুন কোনো রাস্তা কি বেরিয়ে আসতে পারে না?

নাকি প্রথিতযশারা পারস্পরিক বিভিন্ন ভুল বোঝাবুঝিতে এত দূরে সরে গিয়েছেন যে জাতীয় স্বার্থেও কাছে আসা হয়ে উঠবে না?

ফিল্ড মার্শাল কী বলেন?

ফ্রিস্টাইল কুস্তি না ক্লাউন কুস্তি

সমর বসু

দু'বছর পর গত ২৯ এপ্রিল থেকে কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রতি রবিবারে ফ্রী স্টাইলের নামে আবার সেই ক্লাউন কুস্তির হুল্লোড়বাজি দেখলাম। কলকাতার মতো এমন বিরাট কস্‌মোপলিট্যান শহরে সামান্য একটা বাঁদর নাচ দেখতেও যখন ভিড় জমে যায়, তখন এই হুল্লোড় দেখতেও কিছু লোক অবশ্যই যাবে। কারণ দেশ-বিদেশ থেকে সমাগত এতে যোগদানকারীদের নামের বাহারও কম নয়। —টাইগার লায়ন, গরিলা, বিয়ার কিং, জায়েন্ট ইত্যাদি থেকে স্করপিয়ন পর্যন্ত কী নেই? তার ওপর তারা নাকি আবার এক-একটা দেশের চ্যাম্পিয়ন! অবশ্যই, এসব বিষয়ে গত ৯ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে প্রশ্নগুলি ছাপা হয়েছে তাতেই এ হুল্লোড়বাজির আসল উদ্দেশ্য প্রায় পরিষ্কার। সুতরাং সেসব বিষয়ে কোন কথা না বলে আমি এখানে কেবল এ বস্তু প্রথম কেন, কীভাবে এবং কোথায় উদ্ভূত হয়েছিল সে কাহিনী সংক্ষেপে উপস্থিত করতে চাই।

আগেই বলে নিই, এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দেশে এবং বিদেশে ভারতীয় মল্লদের একটানা জয়ের মধ্য দিয়ে বারংবার প্রমাণিত হয়েছিল কুস্তিতে ভারতের সমকক্ষ কেউ নেই। তাই কিছু সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ ঈর্ষান্বিত হয়ে কৌশলে ভারতীয় কুস্তিকে ধ্বংস করবার জন্য প্রথম ১৯৩৭-এর নভেম্বরে ভারতবর্ষে এই রংদারি হুল্লোড়ের আমদানি করে। তারপর নানা কায়দায় দীর্ঘ ৪০ বছরেরও বেশি সময়ে তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হয়েছে। কারণ ভারতীয় কুস্তির বদলে এই রংদার খেলাই এখন এদেশে চলছে এবং সহজ পয়সার লোভে ভারতীয়দের মধ্যেই একদল এর ব্যবস্থাপনায় মত্ত হয়েছে। অথচ এরা কেউ যথার্থ কুস্তিগীর নয়। কুস্তি তারা জানেও না। তাদের 'লড়াই' ও 'চ্যাম্পিয়নশিপ' সবই সাজানো এবং ঠিক যাত্রা থিয়েটারের মতোই চুক্তিবদ্ধ বা পূর্ব নির্দিষ্ট।

॥ প্রথম নাম 'অল-ইন' স্টাইল ॥

মার্কিন মুলুকে মুষ্টি যুদ্ধের মতোই যখন কুস্তিও খুব জনপ্রিয় তখন ১৯৩০ নাগাদ ওখানকার কিছু সংখ্যক কুস্তিগীর বড় বড় আসরে অপাংক্তেয় হয়ে পয়সা রোজগারের ফন্দি হিসাবে স্থির করে—এমন ঢংয়ের একটা চমকপ্রদ খেলা দেখাতে হবে যাতে কুস্তি এবং মুষ্টি—দুটোরই কিছু কিছু ক্রিয়া থাকে। তার ওপর যদি লাথি, চড় এবং চুল টানা ইত্যাদি গোছের কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে সে খেলা হবে আরো চমকপ্রদ এবং উদ্দীপনাময়। তবে হ্যাঁ, খৃষ্টপূর্ব যুগে গ্রীস দেশে প্রচলিত 'প্যাংক্রাশন' কুস্তির মতো এ খেলা হলেও এতে যথার্থ আঘাত করলে চলবে না। অর্থাৎ ঘুষি বা লাথি চড় সবই হবে কৃত্রিম লোক দেখানো, ঠিক যাত্রা থিয়েটারে অভিনয়ের মতো। এ লড়াই দেখাতে হবে ভয়ংকর অথচ খেলোয়াড়দের কোন ক্ষতি হবে না। পক্ষান্তরে পয়সা আসবে প্রচুর।

প্ল্যানটি ভালই হল। কিন্তু এ খেলার নাম হবে কী? তারা জানত ডেমোনস্ট্রেশনে কখনো কম্পিটিশানের মতো মাদকতা বা আকর্ষণ থাকে না। সে বস্তু দেখতে কেউ বেশি পয়সা ফেলতেও রাজি থাকে না। সুতরাং একে 'রিয়েল ফাইট' বলেই চালাতে হবে। অথচ 'ফাইট' কথাটা দিলেও চলবে না,—প্রশ্ন উঠবে কিসের ফাইট? এ কুস্তিতে যখন কিল, ঘুষি, চড়, লাথি সবই চলবে, তখন 'সবই চলে' (All Allowed) গোছের কুস্তি নাম দিলে কেমন হয়? স্থির করা হল এর নাম হবে 'অল-ইন' স্টাইল।

১৯৩০ থেকে আমেরিকায় এইভাবে অল-ইন স্টাইল শুরু হল। কেবল তাই নয়, এর প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলবার জন্য তারা কিছু সংখ্যক নামজাদা ব্যক্তিকেও টাকা দিয়ে এর মধ্যে ভিড়িয়ে দিল। এই ভাবেই ১৯৩২-এর গোড়ায় ইতালিয়ান মুষ্টিক প্রিমো কার্নেরা অ্যামেরিকা থেকে হঠাৎ এই 'অল ইন' স্টাইলে ভারতের গামার উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসলেন এবং দাবি করলেন এ 'যুদ্ধের' জন্য তাঁকে এক লক্ষ ডলার দিতে হবে!

আসল কথা, প্রিমো কার্নেরা এবং তাঁর সাংগোপাঙ্গরা জানতেন কার্নেরার মতো ব্যক্তির এ ধরনের চ্যালেঞ্জে গামার মতো প্রখ্যাত এবং সুবিদিত মল্ল হয়তো আমলই দেবেন না। কিন্তু এরূপ চ্যালেঞ্জে একটা যে স্টান্ট সৃষ্টি হবে, তাতে তো সন্দেহ নেই। এবং তাতে করে 'অল-ইন' কুস্তির প্রতি কিছু লোকের বিশ্বাস বাড়বেও বটে। এটাই কি কম লাভ?

এরূপ নানা প্রচারকৌশলে ঐ বছরেই অল-ইন কুস্তি বিলাতে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু এ ঝুটা কুস্তিতে খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা সাধারণ সমঝোতা থাকলেও সময়ে সময়ে খেলোয়াড়দের মনে মত্ততা ও উন্মাদনাও এসে যেত। যার ফলে যথার্থ আঘাত-প্রত্যাঘাতও দেওয়া হত। তাতে কারো কারো দৈহিক ক্ষতি পর্যন্ত হত। সুতরাং স্বভাবতই ইংল্যান্ডের কুস্তি বিশেষজ্ঞরা এ কুস্তির ওপর বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা এর বিরুদ্ধে তীব্র মতামত দিতে থাকেন। প্রখ্যাত কুস্তিবিশেষজ্ঞ পার্সি লংহার্স্ট অল-ইন রুইনস লাইফ শিরোনামায় দীর্ঘ প্রবন্ধে এর যৎপরোনাস্তি নিন্দাও করলেন।

১৯৩৬-৩৭ নাগাদ অল-ইন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আরো কোনো কোনো দেশে প্রচলিত হলেও বিলাতে এর আসর খুবই সংকুচিত হয়ে যায়। তখন অল-ইনওয়ালাদের ভারতের দিকে নজর পড়ে। কারণ ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে ভারতীয়দের সংগে যত বিদেশী পালোয়ানের কুস্তি হচ্ছিল তাতে বিদেশীরা কোথাও দাঁড়াতে পারছিল না। এই বিদেশীদের মধ্যে একজন ছিলেন রুমানিয়ার মল্লবীর জর্জ ইওনেস্কো।

প্রকৃতপক্ষে ইওনেস্কোর মতো প্রগল্‌ভ ও মিথ্যাবাদী খুব কমই দেখা যেত। ইউরোপে তিনি কিছুকাল কুস্তি লড়ে এক সময়ে ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি এখানে একটি কুস্তিও লড়েননি, যদিও তিনি একদা বলেছিলেন, গামার সংগে তিনি লড়তে চান। তিনি প্রায়শ বলতেন, আসল কুস্তি হচ্ছে অল-ইন, ভারতীয় কুস্তি তার কাছে কিছুই নয়। সে যাই হোক, ইওনেস্কো তখন এদেশের কুস্তি সংগঠক মার্টিরোজ মার্টিনের সংগে মিলে ১৯৩৭ সালে বোম্বাইতে এক কুস্তি দংগলের ব্যবস্থা করেন। এবং তাতে ভারতীয় স্টাইল ক্যাচ অ্যাজ ক্যাচ ক্যান এবং গ্রীকো রোমান স্টাইলের সংগে অল-ইন স্টাইলেও কিছু কিছু কুস্তির ব্যবস্থা হয়। অনেক নামজাদা বিদেশীর আগমন হবে বলে ঘোষিত হয়েছিল যাঁদের মধ্যে হুলাদেক জুবিস্কো ও চার্লস ক্লিগলতের নামও ছিল। তবে তাঁদের কেউ আসেননি।

॥ ভারতে প্রথম "অল-ইন" আমদানি ॥

বস্তুত ১৯৩৭-এর ৩ নভেম্বর থেকে বোম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভ স্টেডিয়ামে যে কুস্তির দংগল হয়, তাতে কিছু কিছু অল-ইনয়ের লড়াই হলেও তাতে কোনো ভারতীয় অংশ নেয়নি। ওগুলির সবই বিদেশীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অল-ইনে চীনের ওয়াং বক চিয়ং এবং ভারতীয় ধারাগ হরবংশ সিং জয়ী হওয়ায় এঁদের মধ্যে পরবর্তী ১০ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের ইন্টার ন্যাশন্যাল রেসলিং স্টেডিয়ামে একটা পরীক্ষা হিসাবে অল-ইন কুস্তি হয়। তাতে হরবংশ জয়ী হয়েছিল।

মোটকথা, বিদেশীরা এমনভাবেই অল-ইনের টোপ ফেলছিলেন যে তাতে এত বড় দেশে টোপ গিলবার লোকের অভাব হয়নি। বোম্বাইয়ের পর ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর কলকাতার গ্লোব থিয়েটারেও আবার অল-ইনের শো হয় এবং তা দেখে অনেক ভারতীয় প্রলুব্ধ হয়। কলকাতায়, তথা বাংলাদেশে অল-ইনের আমদানি সেটাই ছিল প্রথম।

এর পর জানুয়ারি মাসে কলকাতায় মার্টিরোজ মার্টিনের উদ্যোগে এক দীর্ঘস্থায়ী কুস্তি দংগলের ব্যবস্থা হয় এবং ২২ জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত প্রতি শনি ও রবিবারে সে লড়াই চলেছিল যাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অনেক ভারতীয় নেমেছিল। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এদেশে অনেক অল-ইন কুস্তি হয় যার অধিকাংশ আপোষমূলক থাকলেও কোনো কোনোটি আবার ভয়ংকর মারামারির মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল।

॥ "অল-ইনে"র সাইনবোর্ড বদল ॥

ইতিমধ্যে অল-ইন যে সমঝোতামূলক ঝুটা ও ফাটকা খেলা, তা অনেকেই বুঝেছিল। তাই, এই চতুর ব্যবসায়ীদের আবার নতুন প্ল্যান [illegible]। যুদ্ধের পর বিশ্ববিখ্যাত ক্যাচ-অ্যাজ ক্যাচ-ক[illegible] ধারার নাম 'ফ্রী স্টাইল' করা হলে অল-ইনওয়ালারা সর্বসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অল-ইনের সাইনবোর্ড বদল দিয়ে তার নতুন নাম দিল 'আমেরিকান ফ্রী স্টাইল' এবং এর ডেমোনস্ট্রেশন কোনরূপেই যাতে রেষারেষি সৃষ্টি না হয়ে যথার্থ থিয়েটারি লড়াই হয়, সেই উদ্দেশ্যে যোগদানকারীদের যথোপযুক্ত অর্থ দ্বারা পর্যায়ক্রমে জয়-পরাজয়ে চুক্তিবদ্ধ করে নেয়। ফলে, ১৯৪৮-এ প্রথম কলকাতার ইডেন গার্ডেনের খেলায় দীর্ঘদিন যাবৎ যে আমেরিকান ফ্রী স্টাইল হয়, তাতে দেশী ও বিদেশী বহু লোক অংশ নেয়। এমন কি তাতে কয়েকজন বিদেশী মহিলাও নেমেছিল। কারণ থিয়েটার করতে কায়িক শক্তির দরকার হয় না, দরকার হয় শুধু অভিনয় নৈপুণ্য।

এর পর বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি বড় বড় শহরেও এই খেলা চলতে থাকে। ফাঁকিবাজিটা অনেকের চোখেই ধরা পড়তে থাকে। তখন আবার গণেশ ওল্টানোর মতোই পুনরায় এর সাইনবোর্ড পাল্টিয়ে করা হয়েছিল—'ইন্টারন্যাশন্যাল ফ্রী স্টাইল' এবং তাতেও খুশী হতে না পেরে আরো পরে করা হয় সরাসরি 'ফ্রী স্টাইল'।

এইভাবে চারবার সাইনবোর্ড পাল্টিয়ে যে 'ফ্রী স্টাইল' হল, তা যে ফ্রী স্টাইল নয়, তা যে-কোনো মূর্খও বুঝতে পারে। কারণ অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত ফ্রী স্টাইলের সংগে এর প্রভেদ আকাশ-

পাতাল। এটি এখন প্রকৃতপক্ষে ক্লাউন-কুস্তি হিসাবেই অনেকের জানা হয়ে গিয়েছে।

॥ ক্লাউন কুস্তির স্বরূপ ॥

যাঁরা এই ক্লাউন কুস্তি ছাড়া অন্য যথার্থ কুস্তি অর্থাৎ ওলিম্পিকের ফ্রী স্টাইল, গ্রীকো-রোমান বা ভারতীয় কুস্তি দেখেছেন, তাঁরা সহজেই ক্লাউন কুস্তির ধাপ্পাবাজি বা অসারতা বুঝতে পারেন। কারণ—

১। যথার্থ কুস্তিতে একজন মধ্যস্থ, বিচারক এবং সময়রক্ষক থাকে এবং প্রতিযোগীকে সেই মধ্যস্থের নির্দেশ মান্য করতে হয়। নির্দেশ কেউ অমান্য করলে তাকে সতর্ক করা হয়, তার পরেও সতর্ক না হলে তাকে বাতিল ও পরাজিত গণ্য করা হয়।

ক্লাউন কুস্তিতে প্রায়শ মধ্যস্থের নির্দেশকে অমান্য করা হয়। এমন কি মধ্যস্থের নির্দেশে ক্ষিপ্ততার ভঙ্গি দেখিয়ে মধ্যস্থকে আক্রমণ করা হয়। মধ্যস্থকে কখন কখন রিংয়ের বাইরেও ফেলে দেওয়া হয়। অথচ এজন্য শাস্তি হয় না।

২। যথার্থ কুস্তিতে প্রতিযোগীরা নিঃশব্দে লড়ে, হাঁক-ডাক, চিৎকার বা গালাগালি চলে না। তা করলে তাকে বাতিল এবং পরাজিত গণ্য করা হয়।

ক্লাউন কুস্তিতে এটাই নিয়মিত ঘটনা। এজন্য শাস্তি হয় না।

৩। যথার্থ কুস্তিতে লাথি, চড়, ঘুষি বা চুল টানা চলে না; তা করলে শাস্তি পেতে হয়।

ক্লাউন কুস্তিতে এগুলিই আসল। অথচ এগুলি যথার্থ আঘাত নয়, আঘাত করার ভান মাত্র।

৪। যথার্থ কুস্তিতে মুখোশ পরে নামা যায় না।

ক্লাউন কুস্তিতে সেটা হয় কেবল দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। যেখানে বৈজ্ঞানিক ট্রিক টেকনিক নেই, সেখানে এরূপ আকর্ষণ সৃষ্টি ক্লাউন কুস্তির বৈশিষ্ট্য।

৫। যথার্থ কুস্তিতে 'ট্যাগ ফাইট' অর্থাৎ প্রতিপক্ষ এক জোড়া করে একসঙ্গে দুই জোড়া লোকের কুস্তি হয় না।

ক্লাউন কুস্তিতে হই-চই বাড়িয়ে তুলবার জন্য এই হাটুরে ব্যবস্থা হয়।

লাথি, চড়, ঘুষি, চুল টানা ছাড়াও ক্লাউন কুস্তিতে আরো কতকগুলি দৃশ্য সর্বদা দেখা যায়। তা হচ্ছে কথায় কথায় ডিগবাজি খাওয়া, রিং থেকে প্রতিযোগীকে এমন কি, কখনো কখনো মধ্যস্থকেও রিংয়ের বাইরে ছুঁড়ে মারা, পার্শ্ববর্তী দড়িতে প্রতিপক্ষের গলায় ফাঁস লাগানো ইত্যাদি। দর্শকদের মনে তাক লাগানোর জন্যই এগুলি করা হয়।

যথার্থ কুস্তির শক্তি ও অতি উন্নত কলা-কৌশলের বদলে সাধারণ দর্শকদের কাছে ক্লাউন কুস্তির এইসব সস্তা ভাঁড়ামি হয়তো খুব মন্দ নয় এবং চিত্তাকর্ষকও বটে, কিন্তু এই ভাঁড়ামির অন্তরালে আর যে-সব ফাঁকিবাজি আছে, তা সাধারণ দর্শকদের জানা নেই। অথচ সেগুলিই এ ব্যবসার বৈশিষ্ট্য। এই ফাঁকিবাজির অন্যতম হল চুক্তিবদ্ধ জয়-পরাজয়।

এই উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পূর্বেই শর্ত করা থাকে, কে কোন্ দিনে কার কাছে হার মানবে অথবা জয়ী হবে এবং তাকে মোট কয়টি কুস্তি লড়তে হবে। কেবল তাই নয়, এজন্য তার প্রাপ্য টাকার পরিমাণও স্থির করা থাকে এবং তদনুযায়ী তাকে টাকা দেওয়াও হয়। পয়সা লোটাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে লোক-দেখানো হার-জিৎ মেনে নিতেও কারো আপত্তি থাকে না। যথার্থ কুস্তিতে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ কিংবা অযোগ্য, অপদার্থ বা অপাংক্তেয় মল্লদের এ শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য পন্থাও থাকে না। যথার্থ কুস্তি তারা লড়তে পারে না বলেই তাদের এই নির্দিষ্ট বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ক্লাউন কুস্তিতে নামতে হয়।

ক্লাউন কুস্তিতে বহু সময়ে একের প্রতি আর একজনের চ্যালেঞ্জ বা পাল্টা চ্যালেঞ্জ করতেও দেখা যায়। তদনুযায়ী লড়াই'ও হয়। কিন্তু সেগুলিও
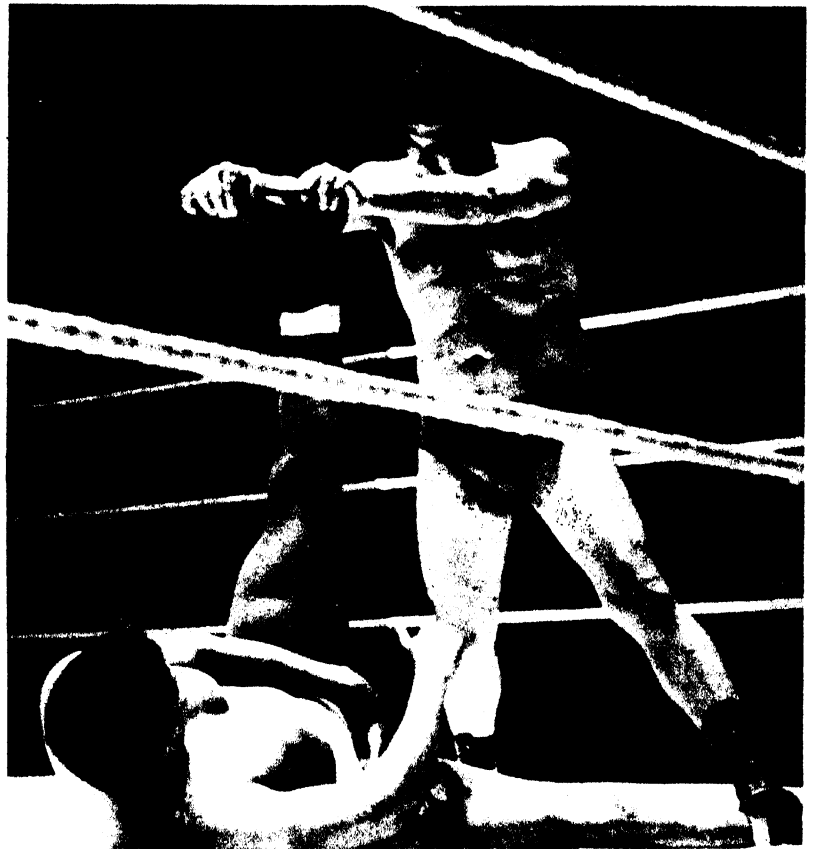
পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী হয়। অথচ ক্লাউন কুস্তির গোষ্ঠীবহির্ভূত কেউ তাদের কাকেও চ্যালেঞ্জ করলে নানা অজুহাতে সে চ্যালেঞ্জকে পরিহার করা হয়। কারণ ক্লাউনরা যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় পায়।

ক্লাউন কুস্তির কোনো কোনো ফাঁকি সাধারণ দর্শকদের পক্ষে বোঝা সহজ নয়। সমঝোতামূলক লাথি, চড়, ঘুষিগুলিকে কেউ কেউ বুঝে ফেলতেও পারেন। কারণ লাথি খাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই লাথির বেগে অপর লোকটি ডিগবাজি খায় বটে, কিন্তু সে কাজটিতে ত্রুটি-বিচ্যুতিও প্রায়ই বোঝা যায়। পেটে বা বুকে ভয়ানক আঘাত লাগার ভান করে যখন কেউ হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায় এবং মুখ দিয়ে রক্ত বমনও দেখায়, তখন সাধারণ দর্শকরা বিস্মিত ও ভীত না হয়ে পারেন না। কারণ তাঁরা ধারণাও করতে পারেন না যে, যাত্রা থিয়েটারের মতোই এরাও মুখে আগে থেকে লাল রংয়ের ক্যাপসুল রেখেছিল এবং তাকে চিবিয়েই রক্ত বমন দেখাচ্ছে। এই ক্লাউনরা এরূপ আরো যে-সব বুজরুকির আশ্রয় নেয়, তার বিবরণ দেওয়া এ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়।

বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, সমাগত এসব ক্লাউনদের অনেকেই এক-একটা দেশের চ্যাম্পিয়ন। আর সেই চ্যাম্পিয়নরা সবাই এসে ভারতীয়ের কাছে হার মানে। বলাই বাহুল্য, এখানকার দর্শকরা কেউ বিদেশের কোন খবর রাখেন না। সুতরাং বিদেশের যে-কোন ব্যক্তিকে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে দাঁড় করালেও তাঁদের কিছু বলবার থাকে না।

॥ ক্লাউন কুস্তি কি ভাবে চলছে ? ॥

সমস্ত ব্যবসাতেই যেমন প্রথমেই কিছু অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়, পাবলিসিটি এবং প্রপাগান্ডা চালাতে হয়, নানা ধরনের কিছু নামজাদা বা বড়-লোককে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে দাঁড় করাতে হয় এবং নানা কায়দায় কিছু দালাল নিযুক্ত করতে হয়, ক্লাউনদের এ জালিয়াতি ব্যবসাতেও তার ব্যতিক্রম নেই। আগে যেমন এরা প্রখ্যাত রাজা-মহারাজাকে দিয়ে এদের হুল্লোরবাজির উদ্বোধন করত, তেমনি আবার ইদানীং তারা কোনো কোনো মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে সে কাজ করিয়ে নেয়। তাতে অনেকের ধারণা হয়, বিষয়টা হয়তো কিছু গুরুত্বপূর্ণ।

খেলাধুলা বা ব্যায়াম মার্কা অনেক ছোট ছোট পত্র-পত্রিকাগুলিকে তারা ভিক্ষার সামিল সামান্য অর্থযোগে হাত করে। ফলে তারাও এ বস্তুর প্রচার চালায়, এর অসারতা বা ধোঁকাবাজি না বুঝেই। কেবল তাই নয় কেউ এ জালিয়াতির বিরুদ্ধে কিছু লিখলে তাও ছাপে না,—অর্থাৎ অনেকেই শুধু ঘুষের গুণে দুর্নীতির সমর্থক হয়।

কখনো কখনো ক্লাউন কুস্তির পরিচালকরা সত্যিকার মল্ল কিংবা কুস্তির বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরও নানা কায়দায় তাদের পথে আনবার চেষ্টা করে। তারা একবার গোবরবাবুকেও তাদের এই রংতামাশার রিঙের পাশে বসে থাকবার জন্য ২০০০ টাকা দিতে চেয়েছিল। গোবরবাবু তাতে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, দু হাজারের বদলে দু লাখ টাকা দিলেও তিনি এ হুল্লোড়বাজি আর জালিয়াতি দেখতে প্রস্তুত নন।

বলা বাহুল্য, কুস্তির নামে তাদের এই জালিয়াতি ইতিমধ্যে অনেকে বুঝে ফেলেছে তাই, ১৯৭৭-এর মার্চ মাসে উত্তরপ্রদেশের আমেঠিতে ক্ষিপ্ত জনসাধারণের হাতে এইসব কুস্তিগীর ও তাঁর দলবলকে মার খেয়ে পালাতে হয়েছিল। সেই বছরই জয়পুরেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এমন কি, এ বছর ১৮ মার্চ দিল্লির নিকটবর্তী গাজিয়াবাদেও সদলবলে এরা দর্শকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পালিয়েছিলেন। অথচ আশ্চর্য, বাংলাদেশে এবং কলকাতার বুকে এখনও এই জালিয়াতি বিনা বাধায় চলছে।

মনপছন্দ ১০১ টি নানান ধরনের ডিজাইন, সুপার কটন ও ব্লেণ্ডেড শার্টিং, স্যুটিং, ড্রেস মেটিরিয়াল ও শাড়ী।

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বই**

চিত্রকর। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রকাশক, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস। লেন, কলকাতা-৬ পনেরো টাকা।

এতদিন পর্যন্ত বাংলাভাষায় শিল্পীর লেখা আত্মচরিত বলতে, আপন কথা, ঘরোয়া আর জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্রনাথের এই তিনখানা বইই ছিল আমাদের কাছে হীরে-মানিকের চেয়ে দামী। এতদিন পরে আর একজন বড়ো-মাপের শিল্পী কালি-তুলির বদলে কলমে এঁকে, ভাষায় বুনে আমাদের হাতে তুলে দিলেন এমন এক শিল্পকর্ম, যার দিকে তাকিয়ে আমরা আবার উপলব্ধি করলাম ভিন্ন এক রঙের দ্যুতি। তিনটি দীর্ঘাবয়ব এবং একটি ক্ষুদ্রাকার রচনার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই বইটিকে সামগ্রিকভাবে আত্মচরিত উপাধি দেওয়াটা হয়তো সঠিক নয়। মাঝখানে ভাগাভাগির কোন থাড়া দেওয়াল চড়াই আমরা বুঝতে পারি এর এক অঙ্গে দুই রূপ। বুঝতে পারি এতে জড়ে গেছেন অথবা জড়িয়ে আছেন দুই বিনোদবিহারী। একজন যিনি জীবনের এবং নির্মাণের। অপরজন যিনি অভিজ্ঞতার এবং ব্যাখ্যার। প্রথম দুটি রচনায় যিনি উপস্থিত, তিনি শিল্পী। অপর দুটিতে শিল্পশাস্ত্রী। আর এই দুদিকেই রাঙা আলোর আকাশ। এবং খোলা হাওয়া।

এতকাল পর্যন্ত ইতস্তত ছড়ানো কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ আর একটিমাত্র মুদ্রিত বই ই ছিল বিনোদবিহারীকে জানার যৎসামান্য অবলম্বন। মাত্র কয়েক বছর আগে সত্যজিৎ রায়ের অসামান্য তথ্যচিত্রের জানলা দিয়ে আমাদের দৃষ্টি পৌঁছতে পেরেছিল তাঁর জীবন ও জীবন-যাপনের দুরূহ রণক্ষেত্রের বেশ কিছুটা কাছাকাছি। এখন তিনি নিজের হাতে খুলে দিলেন এমন এক দরজা, যার ভিতর দিয়ে আমরা সোজাসুজি পৌঁছে যেতে পারবো তাঁর জীবনের মর্মমূলে, তাঁর আরম্ভ ও উত্তরণের দৃশ্য-দৃশ্যান্তরে, তাঁর দৈনন্দিন এবং অনন্ত দুয়েরই নিবিড়তম নিকটে।

একেবারে আরম্ভে, নিবেদন অংশে তিনি জানিয়েছেন, 'বৃদ্ধের জীবনের এই অভিজ্ঞতা যুবকের কাছে প্রায় সময়ই অর্থহীন'। ভাগ্যিস এই নেতিবাচক মনে-প্রাণে বিশ্বস্ত করে নিয়ে তিনি নিরত হননি এমন ঐশ্বর্যময় সব রচনা থেকে। দেশের সব যুবকের কথা জানি না। কিন্তু যুবকের পক্ষ নিয়ে বলতে পারি, আমরা শ্রদ্ধায় নতজানু। অন্ধত্ব তাঁর জীবনে অভিশাপ। কিন্তু আমাদের জীবনে আশীর্বাদ হয়ে উঠলো তাঁর এই রুদ্ধ যন্ত্রণার ভাষা ও ভাষ্য। তিনি আমাদের সামনে স্থাপন করলেন দৃষ্টান্তের মত বলবান এক দৃষ্টান্ত, যিনি অনির্বাণ জ্বলতে জানেন তিনিই চক্ষুষ্মান।

একান্তভাবে আত্মচরিত বলতে বই-য়ের প্রথম রচনাটিই। যার নামে এই বইয়ের নাম। পড়তে পড়তে মনে হয়, অক্ষরে লেখা নয় যেন। যেন তুলির গোনাগুন্তি আঁচড় এক-একটা জলজ্যান্ত স্কেচ। অক্ষরে আঁকা চলচ্চিত্র বলতেই বা দ্বিধা করবো কেন?

"কলকাতার ছোট বাড়ি, ভিজে উঠোন, চৌবাচ্চা, সকালবেলা রক ধোয়া হয়েছে, তরিতরকারীর ঝুড়ি; মাছের থলে, ভাঁড়ার ঘরের সামনে বঁটিতে তরকারি কোটা হচ্ছে।" এ যেন সেকেলে এক মধ্যবিত্ত বাড়ির উঠোনের উপর দিয়ে প্যান করে গেল ক্যামেরা।

"হরেনবাবুর খাটের তলায় এক-জোড়া চকচকে বার্নিশ করা পাম-স্যু জুতো, জুতোর ওপরে চওড়া ফিতে বাঁধা, যেন ডানা মেলা প্রজাপতি। কালো জুতো, কালো বাঁশি, কালো চামড়ায় ঢাকা হরেনবাবু—কেবল বাঁশির বাক্সের ভেতরটা টকটকে লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা।"

যেন খাটের তলার জুতোর ফিতে থেকে জুম-ব্যাক করল ক্যামেরা।

"সকাল থেকে ফেরিওয়ালা ডেকে যায়। গলির উল্টোদিক থেকে আসে

কত্তামশাই

কাঁসি বাজাতে বাজাতে বাসনওয়ালা। কাঁসির শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই চুড়িওয়ালার হাঁক শোনা যায়। মেয়েরা চুড়িওয়ালার কাছ থেকে চুড়ি পরে। ....তিনটে বাজে, নাপতেনি আসে মেয়েদের আলতা পরাতে। সেই সঙ্গে শোনা যায় গলির মোড়ে ক্ষীরের লেডিকেনি। চারটে বেজে যায়, স্কুল, কলেজ, অফিস থেকে দাদা বাবা ভাইরা ফিরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে ধোপানি। ....সন্ধ্যাবেলা ঘুঘনি-ওয়ালা যায়। তারপর আসে গ্রীষ্মের দিনে কুলফিওয়ালার ডাক।...."

এক স্তবক পরেনো কলকাতার একটা গোটা দিনের তথ্যচিত্র। ঘটনার ছবিকে ছেড়ে যখন মুখ ঘুরিয়েছেন মানুষের দিকে, তখনও দেখি কত অল্প কথায় এক একটি ঝলমলে ছবি, উজ্জ্বল ক্লোজআপ।

"....বীরভদ্র রাও চিত্রা—বেঁটে-খাটো, রবারের বলের মতো সর্বদাই লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন। ....ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ আসেন ফিনফিনে পাঞ্জাবি, কোমরে রিয়া বাঁধা, হাতে এসরাজ, ওয়াশের কাজ করেন, কাগজ ভিজিয়ে বোর্ডের ওপর রেখে কিছুক্ষণ এসরাজ বাজান, গান করেন, আর একদিকে অর্ধেন্দু-প্রসাদ—চোখে পাঁশনে, পাঁশনের ফিতে রোজই বদলান, খুব ঝাঁঝালো সেন্ট ব্যবহার করেন। ক্রামরিশ তাঁকে বলতেন,

'a youngman, with strong scent'."

এ বইয়ে জোড়াসাঁকো কিংবা শান্তিনিকেতনের যে-ছবি, সেও স্বাদে-গন্ধে আলাদা। দক্ষিণের বারান্দায় বিখ্যাত তিনভাই। বিনোদ-বিহারীর ছবি সম্বন্ধে তিনভায়ের তিন রকম মন্তব্য। তাঁদের তিন রকম সংলাপের এই দৃশ্যটি যেন চোখের পর্দায় চলচ্চিত্রের মত ফুটে ওঠে। শুধু মাত্র সংলাপের জোরে জীবন্ত দেখা যায় রবীন্দ্রনাথকেও। সেই যে-দৃশ্যে তিনি তাঁরই প্রতিকৃতি রচনায় মগ্ন শিল্পী অতুল বসুকে বলছেন :

"তুমি কি করছ খুটখুট করে? ছবির পেছনটা লাল করে দাও আর জোব্বা কালো করে দাও।"

তারপরে আরও উত্তেজিত হয়ে—

"তুমি আর্টিস্ট, একটা কালো জোব্বা মন থেকে করতে পারবে না।"

এ-বইয়ে টুকরো টুকরো অনেক রবীন্দ্রনাথ। সেই রবীন্দ্রনাথ, যাঁর সম্পর্কে বিনোদবিহারীর অকপট শ্রদ্ধার্ঘ খোদিত হয়েছে এইভাবে :

"নন্দলাল ভাবতে পারেননি যে আমি কোনদিন ছবি আঁকতে পারবো। সোজা কথায়, তিনি বলেছিলেন যে যার চোখ নেই সে ছবি আঁকবে কি করে? রবীন্দ্রনাথের কাছে আমি আর কিছু যদি না পেয়ে থাকি তবু আমি বলব তিনিই আমার নবজন্মদাতা।"

চিত্রকর-এ এমনি অগণন খ্যাতনামা সব মানুষ, স্বদেশের, বিদেশের। এমনি অনেক স্মরণীয় মুহূর্তে আলোর, অন্ধকারের। একটা সুদীর্ঘ জীবনের সারাৎসার। একবার পড়া শেষ করে আবার পড়তে আকাঙ্ক্ষা জাগে। পড়া শেষ হলে, খেদ জাগে, আরও নেই কেন? চিত্রকর নামের রচনার একেবারে শেষ লাইনটি হল :

"আজ আমি আলোর জগতে অন্ধকারের প্রতিনিধি"

যাকে আমরা পড়বো

"আজ তিনি অন্ধকারের জগতে আলোর প্রতিনিধি"

এবার আসি দ্বিতীয় রচনাটির প্রসঙ্গে। কর্তামশাই। এ বইয়ের শ্রেষ্ঠতম রচনা। এ রচনার জায়গায় জায়গায় এক আক্রান্ত হৃদয়ের আর্তনাদ। জায়গায় জায়গায় আত্মস্থ হৃদয়ের কবিতা। জায়গায় জায়গায় মৃত্যু-উত্তীর্ণ হৃদয়ের মন্ত্রোচ্চারণ। এই রচনাটিকে ধারালো করেছে শকুনের ঠোঁটের মত সুতীক্ষ্ণ ভাষা, সমুদ্রের মত গম্ভীর অথচ অশান্ত করেছে অন্তর্লীন ট্র্যাজিক অনুভূতি। সাধারণ ঘটনার গায়ে রূপকের রাজপোশাক ঝলমলিয়ে উঠেছে এখানে। পরিহাস-মুখর দৃশ্য উত্তীর্ণ হয় গেছে দার্শনিক সত্যে, আমরা অনুভব করতে পারি সেই প্রবল চাপ,

আগ্নেয়াগারের অভ্যন্তরের নিস্তারহীন সেই অগ্নিদাহ, যা তাঁর হাতের কলমকে যুগিয়েছে বজ্রের শক্তি। উদাহরণ পাতায় পাতায়। আমি শুধুমাত্র বেছে নিলাম একটি স্তবক, আলোড়িত জলোচ্ছ্বাস থেকে মাত্র এক অঞ্জলি জল। "এবার শুরু হবে জাদুকরের অত্যাশ্চর্য তাসা পরীক্ষার খেলা। সম্ভবত জাদুকরের মন্ত্রবলে ঢুকে পড়েছে চৈত্র-মধ্যাহ্নের ঘূর্ণি হাওয়া। তাসের রূপে তাস উড়ে চলেছে। শুকনো পাতার মতো ছড়িয়ে পড়ছে মাটিতে—আবার উড়ে যাচ্ছে উপরে।.... তাসের সঙ্গে ঘূর্ণী হাওয়ার বেগে মানুষগুলো দৌড়ে চলেছে চারিদিকে। চলন্ত ইঞ্জিনের মতো মানুষগুলো গরম হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় রুদ্রনারায়ণের জিহ্বাগ্র থেকে ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে এসেছে। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। লাফিয়ে উঠে একখানা তাস খপ করে ধরে ফেললেন। উল্টে দেখেন টেক্কা, সাদা কাগজের বুকে লাল ফোঁটা? ...বিস্মিত হয়ে রুদ্রনারায়ণ দেখছেন লাল ফোঁটা টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সাদা কাগজের জমির উপর। রক্তের বিন্দুর মতো ছোট বড়ো চিহ্নগুলি ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে। ক্রমে দেখা দিয়েছে এক পীতাভ ম্লানিকর পরিবেশ—যেন অনেকগুলো জণ্ডিস রোগী তাঁর গা ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছে।.... আত্মরক্ষার জন্য তিনি এখন উদ্বিগ্ন। কিছু একটা অবলম্বনের জন্য অগ্রসর হতে গিয়ে তিনি কঠিন ধারালো এক অবস্থার মধ্যে এসে পড়লেন। অন্ধকার যেমন তাঁর কাছে নতুন—অন্ধকারের এই অভিব্যক্তিও তাঁর কাছে তেমনি অপরিচিত।

"কোথায় তিনি? পথ কোথায়! এই প্রশ্নের জবাব পাবার পূর্বেই তিনি ছিটকে এসে পড়লেন ঐ হাতলওয়ালা গদি আঁটা কুর্সিখানার উপর। চোখে তখন কালো চশমা। গুহাভ্যন্তরস্থিত দীপশিখার মতো তিনি স্থির।"

এই রচনাটিরও শেষ দুটি লাইন অপূর্ব। তাকেই অনুকরণ করে বলতে ইচ্ছে করে 'কর্তামশাই' বুকের মধ্যে বাজিয়ে চলেন ডমরুর শব্দ। নির্বাচিত শব্দের সম্ভারকে অবলম্বন করে 'কর্তামশাই' ভাসিয়ে নিয়ে যান তুলনাহীন এক অভিজ্ঞতার মধ্যে, যার পর্বে পর্বে পরাজয়হীন সংগ্রামের পতাকা উড়ছে পত-পতিয়ে।

ছোট্ট 'কীর্তিকর' নামের গল্পটা একই সঙ্গে গাছের গল্প, মানুষের গল্প, শিল্পতত্ত্বের গল্প। এর পরেই দীর্ঘ প্রবন্ধ, শিল্পজিজ্ঞাসা।

কী আশ্চর্য খোলা-মনের মানুষ শিল্পী বিনোদবিহারী। জিজ্ঞাসারও অন্ত নেই তাঁর। জানার জন্যে দেশ-দেশান্তর, কাল-কালান্তরের শিল্পকলাকে ঘাটাঘাটিরও অন্ত নেই। তার ফলে শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর প্রতিটি উচ্চারণই অমোঘ, এবং আলোকিত। "মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যেমন আছে, তেমন তার হৃদপিণ্ডেরও কিছু প্রয়োজন আছে। শরীরের অভ্যন্তরে এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটিকে যদি ছুঁড়ে ফুটিয়ে দেওয়া যায় তবে মানুষের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য সমগ্রভাবে সমাজের হৃদযন্ত্ররূপে কাজ করছে। এগুলিকে নষ্ট করে দিলে সমাজজীবনে মনুষ্যত্ব লোপ পাবে। ব্যক্তিজীবন মমত্বহীন যন্ত্রে পরিণত হবে।"

এই দীর্ঘ প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে আমরা শুনতে পাই এক সচল এবং সজাগ হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি। আদিম গুহার চিত্রকলা থেকে নিগ্রো আর্ট, মহেনজোদারো থেকে ভারতশিল্পের সমস্ত রকমের বিবর্তন, চীনের সুপ্রাচীন 'তাও' শাস্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েটের স্বভাবনিষ্ঠ রিয়ালিস্টিক শিল্প আদর্শ সেজান থেকে সুররিয়ালিজম, তুলি কালি থেকে কম্পিউটার, ফেল্ট পেন, ক্যামেরা সমস্ত কিছুকেই ছুঁয়েছেন, নেড়ে-চেড়ে, চেখে-চিবিয়ে, জিজ্ঞাসার ধূসরপ্রান্ত থেকে এগিয়ে চলছেন উত্তরের উজ্জ্বল দিগন্তে।" শিল্পকলা বিষয়ে এমন আধুনিক, বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন, পূর্ব-সংস্কারহীন, তাজা প্রাণের উত্তাপ লাগা প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। গোটা বইটিতে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে তাঁর আঁকা সাদা-কালো রেখাচিত্র। সেও ভিন্ন রকম। যেন একালের গুহাচিত্র। গোটা বইটা শেষ করার পর প্রত্যেক পাঠকই প্রার্থনা করবেন, বিনোদবিহারীর তুলি-ধরা হাত আরও দীর্ঘদিন কলম ধরে থাকুক।

পূর্ণেন্দু পত্রী

অবশেষ : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ; নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ ; দাম ছয় টাকা।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নতুন গল্পগ্রন্থ 'অবশেষ'-এ মাত্র দুটো গল্প। দুটো গল্পই বড়, দুটোরই আলাদা কোন নাম নেই। আমরা তাদের অবশেষ—১ এবং অবশেষ—২ বলে পড়তে পারি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অনুরাগী পাঠক তাঁকে ... নতুন চেহারায় আবিষ্কার করবেন 'অবশেষ' বইয়ে। আজকের দিনের সব চেয়ে বড় হাসির লেখক (আমি শিবরামবাবুকে ধরছি না) সঞ্জীব কিন্তু এই গল্প দুটোতে হাসিকে যেভাবে এড়িয়ে গেছেন সেভাবে তাঁর হাসির গল্পে তিনি কান্নাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। সম্ভবত এখানে একটা অন্যতর মাধ্যম খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা ছিল লেখকের। হাসির শূন্য স্থানগুলো তিনি ভরে দিয়েছেন রিফলেকশনে, ভাবুক কথাবার্তায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি হাসি খুঁজিনি এই গল্প দুটোতে, বিশেষ করে নগেনের কাহিনীতে। কিন্তু নগেনের অনেক স্মৃতি, অনেক ভাবনার বিরুদ্ধে আমার আপত্তি আছে। নিয়মিতভাবে বর্তমান ঘটনার অনুষঙ্গে অনুষঙ্গে স্মৃতিতে ফিরে যাওয়ার মধ্যে স্মৃতির রহস্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা দেয়। কারণ স্মৃতি জটিল। স্মৃতিতে ফেরার পথও জটিল। যদি স্ট্রীম অফ কনশাসনেসের প্রকৃতিকে মেনে

নেওয়া হয় তাহলে বর্তমানের অভিঘাতে নগেনের পক্ষে অনেক উদ্ভট স্মৃতিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল।

সঞ্জীবের লেখার জোর তাঁর ডিটেলের ব্যবহারে। সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের ডিটেল সৎ ভাবে সাজিয়ে তোলা কঠিন কাজ। উপরন্তু বিধ্বস্ত বাঙালী জীবনের নিত্যকার কলহ-বিদ্বেষ, নোংরামি-ছিঁচকেমিকে জীবনের মতন করে গল্প বলাও ভারী দুষ্কর। কারণ জীবনের অনেক কিছুই গল্পে বিশ্বাসযোগ্য নয়। ক্ষমাহীনভাবে লেখেন বলে সঞ্জীব গল্পেও এই জীবনকে বাস্তবায়িত করতে পারেন, অধিকাংশ বাঙালী লেখক পারেন না। তবে এই পথের চরম কাঁটা এক ধরনের এক-ঘেয়েমি। তাঁর হাসির গল্পে হাসির ঔষধে সঞ্জীব এই এক-ঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে পারেন। 'অবশেষ'-এর সবখানে পারেননি।

প্রেম সম্পর্কে সঞ্জীবের একটা অর্থনীতি সমাজবোধ বিজড়িত তীক্ষ্ণ ধারণা আছে। আধো-আধো প্রেম-প্রেম গল্প তিনি লেখেন না। মল্লিকা-নগেনের প্রেম কিংবা পার্থ-অপর্ণার প্রেম আজকালকার উপন্যাসের অনিবার্য রোমান্টিক প্রেম নয়। সঞ্জীব তাঁর গল্পে প্রেমের সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন। হয়ত এই সমস্যার আরো বিস্তার ছিল, হয়ত পার্থ-অপর্ণার প্রেম আরো তলিয়ে দেখা যেত। কিন্তু যেটুকু আছে তাতেই অনেক ভরসা পাবেন পাঠক। নগেনের অতিরিক্ত সাধু স্মৃতিমন্থন, কিংবা পার্থর নীতিময় বিবেকবোধ আরো স্বাভাবিক হলে উভয়ের প্রেমই আরো বাস্তব হত। আমার ধারণা হাসির লেখকরা মূলত নীতিপরায়ণ হন। সঞ্জীব তার ব্যতিক্রম নন। সিরিয়াস লেখাতেও তার আভাস পেলাম। তবে এই মুহূর্তে বহির্বিশ্বে যে-সব লেখক হাসি-হাসি ভাব দেখিয়ে অনেক গভীরে চলে যান তাঁদের কলাকৌশল সম্পর্কে আমরা অবহিত না হয়ে পারি না। যেমনটি ধরা যাক "পোর্টনয়েজ কমপ্লেন্ট"-এর লেখক ফিলিপ রথের কথা, কিংবা 'দি সিঙ্গুলার ম্যান'-এর লেখক জন ডনলিভির কথা। যেহেতু উপন্যাস অত্যন্ত চতুর ক্র্যাফটের পরিণতি আমাদের কলকাতারও জটিল জীবনের জন্য বড় বেশি প্রয়োজন একটা ইনফরমড ক্র্যাফট। আমাদের কি অস্বীকার করার উপায় আছে যে আজকের বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা কতকগুলো অসার মনস্তাত্ত্বিক সংলাপেই সীমায়িত? যে সংলাপ জীবনে কোন সুস্থ লোক উচ্চারণ করে না। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় চাইলে এই মান্ধাতার আধুনিকতার ঘূর্ণী থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন। কারণ তাঁর একটা মস্ত হাতিয়ার আছে। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখতে পারেন, বর্ণনা করতে পারেন। উপরন্তু তিনি কোন ঘটনাক্রমের ব্যঙ্গ, রসিকতার ব্যঞ্জনাগুলো ফুটিয়ে তুলতে পারেন। 'অবশেষ' গল্পগুলোয় সেই রসিকতা নেই, আমি খুঁজিনি সেটা অন্য কথা। দমচাপা আবেগ এবং দুঃখ দমচাপাভাবে লেখার দায়িত্ব অপরিণত লেখকদের। সঞ্জীব তাদের থেকে আলাদা।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গদ্য স্বচ্ছ, সরল, সাবলীল। তাঁর হাসির গল্পে নানান আশ্চর্য উপমা এবং রূপক থাকে। 'অবশেষ' বইতে কিন্তু সেই কল্পনা অনেক পরিমিত।

চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য

লর্ড জিম। যোশেফ কনরাড। অনুবাদ: উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। কল্পনা সাহিত্য মন্দির। ১৮ রজনী গুপ্ত রো। কলকাতা-১। তিন টাকা।

গল্পায় বাঘ। শিশির কর। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা-৯। চার টাকা।

অশরীরী। কার্তিক মজুমদার। পত্রলেখার পক্ষ থেকে ৮৯ নারকেল ডাঙ্গা মেন রোড, নমিতা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত। পাঁচ টাকা।

সে এক অদ্ভুত দ্বীপ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। পত্রলেখার পক্ষ থেকে...সাড়ে পাঁচ টাকা।

ইদানীংকালে শিশুসাহিত্য রচনার ভাণ্ডারে কেন কিছু মন্দা দেখা যাচ্ছে। বড়োদের জন্যে যাঁরা লেখেন শিশু-সাহিত্যের লেখক হিসাবে তাঁরা কিছু কিছু দায়সারা কাজ সারেন। সেগুলো অনেক সময়ই মনঃপূত হয় না। বিগতকালের ছোটদের লেখার তুলনায় একালের ছোটদের জন্য লেখা বই তেমন আর জমাটি? এ প্রসঙ্গে মনে হওয়া স্বাভাবিক, তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে আমাদের শিশুসাহিত্যের যে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বা গৌরব ছিল, তিরিশ-চল্লিশ বছর পরে আজ আর তেমন কি আছে! অবশ্য হাল আমলের অনেক নবীন লেখক শিশুসাহিত্যের ঘাটতি পূরণে উদ্যোগী হয়েছেন। আন্তর্জাতিক শিশু-বর্ষে একসঙ্গে চারখানা কিশোরপাঠ্য বই আলোচনার জন্য হাতে পেয়ে স্বভাবতই কৌতূহলী হলাম।

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় নামটি নানামুখী রচনার লেখক হিসাবে ইদানীংকালে প্রায়ই চোখে পড়ে। 'লর্ড জিম' নামে যে বইটি তিনি লিখেছেন,—তার মলাট দেখলেই ছোটরা পড়ার জন্য উৎসুক হবে। কিন্তু ভিতরের ছাপা অত্যন্ত খেলো, অযত্নপ্রসূত, বাঁধাইও তাই। আগাগোড়া বইটি মনকে আকৃষ্ট রাখে এটাই লাভ। যোশেফ কনরাড জাতে ইংরেজ না হয়েও তাঁর কালে ইংরেজী ভাষার একজন কৃতী লেখক। তাঁর রচনা সমুদ্র-বিষয়ক। তারই একটি গল্পের ছায়াবলম্বনে উষাপ্রসন্ন 'লর্ড জিম' বইটি লিখেছেন। এক নিশ্বাসে বইটি ছোটরা পড়ে ফেলবে।

শিশির কর একাধারে সাংবাদিক এবং লেখক। 'গল্পায় বাঘ'—বইয়ের এই নামটিই রীতিমত চমৎকৃত করে। কেবলই প্রশ্ন জাগে ব্যাপারটা সত্যি কি না? আর তা নির্ধারণ করতে হলে বইটিকে আগাগোড়া একবার এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা দরকার। একদিন জঙ্গলের একটি বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রেলের খালি ওয়াগনে এসে নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোবার সময় অজান্তে বন্দী হল। আর যারা বন্দী করল তারাও জানল না একটি আস্ত জ্যান্ত বাঘ তারা ওয়াগনে করে হাওড়ার রেলওয়ে ইয়ার্ডে নিয়ে যাচ্ছে। ওয়াগন খুলতে গিয়েছিল যারা তাদের চক্ষুস্থির—ভিতরে এক মস্ত 'হালুম'। ওরে বাবা! কি কাণ্ড! সারা হাওড়া শহরে হুলুস্থূল আর হই হই। গল্পটি বেশ জমে ওঠে। রোমাঞ্চ লাগে। শেষ পর্যন্ত একগণ্ডা কাণ্ডকারখানা গঙ্গা নদী আর কলকাতা-হাওড়ার বুকে। বাঘকে বাগে আনা। বন্দী করা। তুলকালাম ক্যাপার স্যাপার। ভিতরের লাগসই একাধিক স্কেচ মদন সরকারের। বইখানা চটি। তবে পড়াতে দারুণ।

তিন নম্বর বই—মন খারাপকরা, ভয়-ভয় ভাব ধরানো, অবাস্তব ভূতের গল্প। ভূতের গল্পে অপরিণতদের মনের স্বাস্থ্য কি ভাল হয়! অবশ্য কিছু অবুঝ নাবালক পাঠক আছে তারা ভূত-প্রেতের গল্পেই বেশী রস পায়। আকৃষ্ট হয়। রহস্য, আতঙ্ক, অবাস্তব কিছু ঘটনার মিশেল না থাকলে তাদের মন খুশি হয় না। লেখক যে-কটি কাহিনী উপহার দিয়েছেন তাদের বয়ান আমাদের দুবেলার চোখে দেখা জীবনের অধ্যায় থেকেই তুলে নেওয়া—কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা খুঁজিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। এইসব খুঁটিনাটি অনির্দেশ্য ঘটনায় জটপাকানো কাহিনীর একটা গোপন নেশা অবশ্যই আছে—এ বইয়ের গল্পগুলিতে সে আকর্ষণ পুরো মাত্রায় বজায় থেকেছে। গল্পগুলির সঙ্গে স্কেচ আছে। ভূতের গল্পের আকর্ষণ যাদের খুব বেশী তাদের বইটা কাজে লাগবে।

শেষ বইটি সবচেয়ে পরে নিয়েছি এইজন্য যে, বইটির লেখক অধুনাতন সাহিত্যের একজন কৃতী লেখক। তাঁর লেখার স্টাইল ইত্যাদি সম্পর্কে বলা নিষ্প্রয়োজন। বড়োদের এবং অ-বড়োদের—সবার জন্য বই লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত। যাঁরা ডকটর জেকিল এবং মিস্টার হাইড পড়েছেন, ওয়েলসের 'আইল্যান্ড অব ডকটর মরো'—তাঁরা নিশ্চয়ই বাংলায় এই ধরনের কাহিনীর অবতারণায় আনন্দিত হবেন। সাহিত্যে যতই বিষয়-বৈচিত্র্য বাড়ে ততই মঙ্গল। কল্পনার বিস্তার যতই সমুদ্রপ্রসারী হয়—ততই আমাদের সাহিত্যের সীমানার বিস্তার। 'গ্যালিভর্স ট্রাভেলস' পৃথিবীতে একবারই লেখা হয়ে আছে। পৃথিবীতে শিশু-কিশোর মনকে এ বই চিরকাল সম্মোহিত করবে। সিরাজ তাঁর এই বইটি পরিপাটি ভাষায়, খুবই পারম্পর্য বহুলে ঘটনা-বিন্যাসে ছোটদের উপযোগী করে রচনা করেছেন। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের, এমন মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, বিজ্ঞানের পটটিকে এমন কায়দায় কাজে লাগিয়েছেন যে গল্পগুলি বিচিত্র এক অভিজ্ঞতার খোরাক হয়ে ওঠে। আলোচিত চারখানি কিশোরপাঠ্য বইয়ের মধ্যে এই বইটিই পড়তে সবচেয়ে ভাল লাগল।

সুজিত বসু

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

নির্বাচিত রচনা

কিছু কিছু ঘটনা, দৃশ্য, চাক্ষুষ দেখা, মনের ভেতরে আবছা হয়ে থেকে যায়। তারপর সময় এবং সুযোগ পেলে এইসব ম্লান স্মৃতি হানা দেয়। বহুকাল আগে অবনী সেনের কাজ দেখেছিলাম—ক্যালকাটা গ্রুপের বা অবনী সেনের প্রদর্শনী—আজ মনে করতে পারছি না কোথায়। এক জোড়া মুখ-ফেরত ঘোড়া বুঝি। তেলরঙে আঁকা। আমি ভীষণ নাড়া খেয়েছিলাম। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের কাজ, যামিনী রায়ের লৌকিক কাজের মহিমা, রামকিংকর, বিনোদবিহারীর ভিন্ন রাস্তার পরীক্ষামূলক কাজ, এমন কী রবীন্দ্রনাথের পৌরুষ— সেইসময় নন্দনভাবনা তো এমনি ছিল। আর কিছু ছবি দেখতাম পত্রিকায় মুদ্রিত। অকস্মাৎ অবনী সেনের আঁকা দুটি জোড়া ছপ্পড় বা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। ধাক্কা। প্রবল ভূমিকম্পের পরে আশ্বস্ত হলাম—বুঝলাম গগনচুম্বী স্বর্গের তলাকার সব কিছুই আঁকার অধিকার শিল্পীর আছে। স্বর্গের শুধু নয়, মর্ত্যের বেশ্যা, দরকার হলে নগ্ন নারী পুরুষের সুঠাম দেহ। আমাদের মহান পূর্বপুরুষেরা নর-নারীর অন্তরঙ্গ মুহূর্ত ছেনী হাতুড়ি দিয়ে ধরেছেন। ছিলেন না তাঁরা মধ্যবিত্ত বাবু বাঙালী। ব্রাহ্ম ভিক্টোরীয় শুচিবাই তাঁদের তো ছিল না। সেদিন একজন বাঙালী প্রকাশক উত্তেজিত হয়ে বললেন, জনগণের সরকার আসলে কোনারক ভেঙে ফেলা হবে, ডিনামাইট দিয়ে

'অশ্বকটি ঘোড়া'—অবনী সেন

ওড়ানো হবে খাজুরাহো। হায়! এ সবকেও তিনি ভাবেন "অপসংস্কৃতি"। মানেন না মার্কসও প্রতি বছর নিয়ম করে এসকাইলাসের বিয়োগান্ত নাটক পড়তেন। যাঁরা ঝি-চাকর কাচ্চাবাচ্চা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রতি সপ্তাহে হিন্দী সিনেমা টি ভিতে দেখেন, তাঁরাই শিল্পকলার কালোত্তীর্ণ কাজের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট গল্প বলব। ইংলন্ডের ন্যাশনাল গ্যালারীতে রেমব্রাঁর কাজের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বললেন, বাঃ, বেড়ে কাজ তো! সেই ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ যিনি করতেন, তিনি বরফ ঠান্ডা গলায় বললেন, ছবিটার বয়স হয়েছে শতাব্দী তিনেক। বোম্বা, বোম্বা, রানী মেথরাণী সবাই কাজটির গুণ স্বীকার করেছে নতজানু হয়ে। কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এখন ছবিটি আপনাকে পরীক্ষা করছে। অবনী সেন (১৯০৫-১৯৭২) ছিলেন 'ক্যালকাটা গ্রুপের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, প্রদোষ দাশগুপ্ত, প্রাণকৃষ্ণ পাল, পরিতোষ সেন প্রমুখ শিল্পী-বন্ধুদের সহায়তায় এক ধরনের বড় মোড় ফেরালেন সাম্প্রতিক চিত্রকলায়। এঁরা ইম্প্রেসনিস্ট পরবর্তী সকল

শিল্পান্দোলন এবং নাগরিক প্রাসঙ্গিকতা ছবিতে ভাস্কর্যে অঙ্গীকার করলেন। এইবার অবনী সেনের পূর্বাপর কাজের প্রদর্শনী সেই কারণে খুবই তাৎপর্যময় মনে হল। পরবর্তীদের কাজের গতিপ্রকৃতির ওপর তাঁর প্রভাব স্পষ্ট হল (আকাদমী অব ফাইন আর্টস ৪—১০)।

তৈলচিত্র, জলরঙ টেম্পেরা তৈলাক্ত খড়ি, কালি-কলম সব রকম কাজই ছিল। প্রচুর ছবি রেখে গেছেন। নির্বাচন খুব সুষ্ঠু হয়েছে বলব না, সেই কারণে সব কাজই যে ভাল লেগেছে তা নয়। কিন্তু কিছু কাজ ছিল দারুণ। মূলত রঙই তাঁর আবেগের বাহন এবং রেখা তাঁর বন্ধন এবং সংযমের ভিত্তি। যেমন "সাদা পাল" জলরঙে নদী আর হাওয়ার পরিবেশটা মূর্ত করেছে। "মেলার পথে"-র মানুষগুলোর মতো তিনি "পানশালার" মাতাল মানুষগুলো এঁকেছেন। "রেসে"-র ছবিগুলো তিনি পটুয়াদের মতো করে আঁকলেও, রঙের ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক। রূপবন্ধ এবং বর্ণিক ভঙ্গে এতরকম পরীক্ষা করেছেন। ভেতর থেকে বাঁধাধরা গতের বাইরে একটা নতুন জগতের দ্বারপ্রান্তে তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন। ইহবাদী, কাব্যময় অথচ একজন নাগরিকের আঁকা। নগরবাসীর নৈরাশ্যযন্ত্রণা তাঁর ছবিতে এসেছে। আবার দৃশ্য জগতের রূপাবেশে তন্ময় হয়ে গেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের অনুসন্ধানের প্রাথমিক খসড়া তাঁর ছবিতে ছিল। ঘোড়া বা ফুটপাতে শুয়ে থাকা, মা এবং শিশু বা ঐ ধরনের অন্য ছবিতে ইদানীন্তন কিছু শিল্পীদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। একদিকে লৌকিক ধারা অন্য দিকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ছবির ভাবধারাকে মেলাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছেন। সব সময় সফল হয়েছেন তা নয়। কিন্তু তাঁর দুঃসাহস এবং আত্মবিশ্বাস পরবর্তীদের পথ দেখিয়েছে। আধুনিকতার প্রথম ফসল তিনি ঘরে তুলেছেন এবং সেই দিক দিয়ে তিনি আমাদের নমস্য।

দিবানিশি

বহু দিন পরে মার্চ মাসে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের দিবা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাজ দেখলাম। এর আগে অবশ্য নৈশ বিভাগের কাজ বছর খানেক বা দুয়েক আগে দেখেছিলাম। সে তুলনায় দিবা বিভাগের কাজ ম্লান লাগল। আর্ট কলেজের প্রদর্শনীতে অনুশীলন পর্যবেক্ষণ, স্থিরবস্তু-চিত্র, প্রতিকৃতি, জলরঙের ছবি, তৈলাক্ত খড়ি, নগ্ন মূর্তি—এ সব দেখা যায়। প্রদর্শনীতে কিন্তু তেমন কিছু ভাল কাজ নজরে পড়ল না। রচনাধর্মী কাজও খুব সুবিধার ঠেকল না। সব চেয়ে ভাল কাজ ছিল বাণিজ্যিক শিল্পকলা বিভাগে—মোটামুটি বাজারের যে-কোনো বাণিজ্যিক শিল্পীর কাজের মহড়া নিতে পারে। অধ্যক্ষ কাশীবাবু এবং বন্ধুবর শ্যামল চক্রবর্তী খুবই ধৈর্য সহকারে এবং সযত্নে কাজ শিখিয়েছেন। আর ভাল কাজ ছিল ভাস্কর্য বিভাগে—অধ্যাপক সুভাষ রায় ছাত্রদের ভালই কাজ শিখিয়েছেন। বিশেষত শিমুল ঘোষের "ভারোত্তোলন" পাথরের কাজটি ব্যঞ্জনাধর্মী এবং খুঁটিনাটি ছেঁটে সরাসরি মূর্তির উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করার সুন্দর নিদর্শন। তেমনি ছিমছাম সুশান্ত রায়ের "চিন্তা"—কাঠে করা দণ্ডায়মান নারীমূর্তি—শুধু পেটের কাছে ফোলাটা একটু বেশী। প্লাস্টারে করা জুতো আর ছাতাটা আমার জঘন্য লেগেছে।

যে ছবিগুলো আমাকে ত্রুটি সত্ত্বেও মুগ্ধ করেছে সেগুলি হল—বিপ্লব বিশ্বাসের কালি-কলমের নিসর্গচিত্র—নদীর ধারের পুরনো ভিকটোরীয় ধরনের বাড়ি। দৃশ্যটির কাব্য রেখার লেখায় এনেছে মন্দ নয়। বিশ্বজিৎ মণ্ডলের "শর্বরীর নগর"-এ রাতের আলোছায়ার ভাবটি জমাট। ইন্দ্রজিৎ কুমারের ঝিরিঝিরি রেখা দিয়ে আঁকা বটগাছের বিশালত্ব। মনীষা ভট্টাচার্যর গ্রামের বাড়িতে একটা মেয়ে আরেকটি মেয়ের চুল আঁচড়ে দেবার ব্যাপারটা তেলরঙে সযত্নে ধরেছে। মালা সেনের দুই কারিগর মিলে জগন্নাথের পট আঁকার দৃশ্যটির রচনা এবং বর্ণকাসঙ্গ মন্দ

শিমুল ঘোষের "ভারোত্তোলন" (পাথর)

না হলেও, কারিগর দুজন এমনই রীতিনিবদ্ধ বাস্তব পদ্ধতিতে আঁকা যে, ঠিক মন ভরে না—জগন্নাথের পটের রূপারোপের সঙ্গে খাপ খায় না। সন্দীপ ...সের দুটি জলরঙের কাজ—একটিতে ওয়ার্ক-সাইটে বুলডোজার আছে, অন্যটি বস্তির নির্জন কোণ—মন্দ নয়। শিবব্রত রায়ের নিসর্গচিত্রে জলরঙের ব্যবহার চোখে ধরে, বিশেষত "কুয়াশামাখা সকাল" কাজটি বেশ।

কিন্তু অধ্যাপক গোপাল সান্যালের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ তৈলচিত্রকর থাকা সত্ত্বেও খুব মনে রাখার মতো কাজ দেখলাম না তৈলচিত্রে। বিশেষত নৈশ বিভাগের তুলনায়। রাধাবিনোদ মণ্ডল, দীপক দাস, শৈবাল মিত্র—ইতিমধ্যে নৈশ বিভাগ থেকে কয়েকজন ছাত্র দর্শকের দৃষ্টি স্বকীয়তা দেখিয়ে আকৃষ্ট করেছে। তেমন কাজ—স্মরণীয় কাজ—দিবা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেখলাম না। প্রদর্শনী আমার কাছে মোটামুটি মানের মনে হলো।

রোহাতগীর কৌম জগৎ

সমালোচকের ভাগ্য আদৌ ঈর্ষণীয় নয়, মোটামুটিভাবে তাকে অভিশাপ আর গালাগাল কুড়োতে

য়। জীবনানন্দ তাকে একটা কবিতা লখার উপদেশ দিয়েছিলেন। বেশ কছুদিন আগে একটা লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা পড়েছিলাম (কবির নাম নে নেই বলে ক্ষমাপ্রার্থী) :—

যবনিকার পতন হলে
মহাশয় সমালোচকের প্রস্থান।
কলম ধরেই বোঝেন
নেমেছেন ঢেউ-এর জলে।
মগজের অলিগলি খোঁজেন
করেন স্মৃতির শর সন্ধান।
দেখেননি তবে কি নাটক আদৌ ?
চেয়ারে সটান ন যযৌ ন তস্থৌ,
কলম কামড়ান
মাথা চুলকান।
নিজস্ব প্রতিক্রিয়ায় ছিলেন
মশগুল ?
নট নাট্যকারের মাসুল—
তীক্ষ্ণ শূল!

সমালোচকের কাজ শিল্পীকে ূলে চড়ানো নয় অবশ্যই। কিন্তু াকে কর্তব্য কর্ম করতে হলে ঠিন কথা বলতে হয়। তাতে যদি ক্তিগত সম্পর্কে চিড়ও ধরে তা হলে া ঝুঁকি নিতে হয়। এমন ক্ষেত্রে মালোচক নিরুপায়।

আমার একসময় সন্তোষ াহাতগীর কাজ মন্দ লাগতো না, ন্তু তাঁর সাম্প্রতিক প্রদর্শনী দেখে শ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে ফিরেছি। কারণ, ান পরিণত শিল্পীর কাজ দেখছি া বেশির ভাগ ছবি দেখেই মনে হল (বিড়লা আকাদমী ৩—৮ এপ্রিল)। ল্পকলা সম্বন্ধে গভীরতর আসক্তি বং বোধের কোন চিহ্নই খুঁজে াইনি। অথচ সন্তোষ রোহাতগী লেন সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যা- য় শান্তি বর্মন, গোপাল সান্যাল, ণেশ হালুই, সত্যেন্দ্রনাথ পোদ্দার ুখ বাঘা বাঘা ছাত্রের সহপাঠিনী। তরাং তাঁর সতীর্থদের উত্তরণ তাঁর জেও থাকার কথা।

রোহাতগীর স্বামী রাসায়নিক াবিশারদ। কর্মসূত্রে মৈত্র মশাই য়েছিলেন কিনিয়ায়। সস্ত্রীক। ফ্রিকান আদিম বিষুবীয় নিসর্গ, াম সমাজের সংগে রোহাতগীর রচয় হয়। এই সব নিয়ে ছবি আঁকার বাসনা প্রবলভাবে তাঁকে পেয়ে বসে।

তিনি তেলরঙে উপজাতি নর-নারীর রেখাচিত্রধর্মী প্রতিকৃতি এঁকেছেন কিছু। চাপিয়ে জলরঙ বা তেলরঙে যেভাবে প্রতিকৃতি আঁকা হয় তাঁর পদ্ধতিটা তা থেকে অন্য-রকম। মুখের আদল এসেছে বটে তবে চরিত্রের বিশ্লেষণ নেই। ক্যামেরার মতো যান্ত্রিক প্রতিকৃতি।

রচনাধর্মী কাজগুলি নৃতাত্ত্বিক সচিত্রকরণ (ইলাস্ট্রেশন)। কারণ, ছবির রূপবন্ধ, নির্মাণ, বর্ণকাভঙ্গোর বিষয় বিশেষ কিছু রোহাতগী ভাবেননি। যা দেখেছেন তা নিয়ে রঙ এবং বুনোটের কিছু খেলা খেলেছেন। তেলরঙের গূঢ় সমাচার আদপেই ছবিতে বর্তায়নি। এর মধ্যে "লামুরের মেয়েমানুষ" ছবিটাই আমার ভাল লেগেছে খুব। আদিম নক্সা করা মাথা ঢাকা তিনটে উপজাতি রমণী—স্থাণু কিন্তু মহিমময় তাঁদের দাঁড়ানোর ভংগী। বর্ণ আর রূপারোপ বেশ ভাল।

আফ্রিকার কৌম জগৎ তিনি দেখেছেন, কিন্তু যেরকম নন্দনভাবনা এবং রূপবন্ধ সম্বন্ধে পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল তা তাঁর কাজে নেই। সাদামাঠা সাধারণ কাজ। আসক্তি বা অনুরক্তি নেই, এমন কি তৈলচিত্রের বিশেষত্বটুকু অনুপস্থিত। তিনি এখনও আঁকতে পারেন কিন্তু ছবির মধ্যে দাহ্যবস্তুর বড় অভাব। এগুলো ছবি নয়, ছবির খসড়া। হয়তো এ সব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করলে ভাল ছবি আঁকতে পারবেন।

পুণ্য কর

বিমূর্ত (অ্যাবস্ট্রাকট) এবং নিরাবয়ব (নন-ফিগারেটিভ) চিত্র-কলার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তফাৎ খুঁজে বার করা যায়। পল ক্লীর অনেক ছবি বিমূর্ত—যেমন ছোট ছোট অনুভূমিক এবং খাড়া রঙের চৌকো সাজিয়ে তুলতে তুলতে তিনি হঠাৎ একটা ত্রিভুজ এনে ফেললেন, ফলে চোখের সামনে ছবিটা পুরচিত্রে (সিটিস্কোপ) রূপান্তরিত হয়েছে। যেন ওপর থেকে দেখা সারি সারি বাড়ি। বা এইভাবে চৌকো রঙ লাগিয়ে তিনি ওপরে ক'টি অর্ধবৃত্ত আঁকায় ফলে ছবিটা মুরদের দেশের গম্বুজ খিলান দেওয়া নগর দৃশ্যে রূপান্তরিত। অর্থাৎ দৃশ্য জগতের অভিজ্ঞতার সারমর্ম বিমূর্ত করেছেন। কিন্তু মেলাভিচ, ডেলুনি, কান্দানস্কী, মন্দ্রিয়ান থেকে জ্যাকসন পোলক পর্যন্ত ধারাকে নিরবয়ব অশরীরী বলা যেতে পারে—কারণ দৃশ্যজগতের সাদৃশ্য কিছুতেই তাঁরা ছবিতে আসতে দিতে চাননি। আমি নিজে এঁদের আসল ছবি দেখিনি, আর আসল ছবি দেখার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, প্রতিচিত্র বা অনুকারীদের ছবি দেখে বড় শিল্পীর কাজ বিচার করা যায় না। মার্চ মাসে বিড়লা আকাদেমীতে সেজার ডোমেলার প্রদর্শনী দেখেছি, তাঁর কথা শোনা এবং স্লাইড দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে। ফলে নতুন করে ভাবনা-চিন্তার সুযোগ পেয়েছি।

আমাদের জীবনে শিক্ষায় শিল্প-কলার কোনো স্থান নেই। তাই ছবির মধ্যে সাহিত্য খুঁজি—মানে খুঁজি। কিন্তু ছবির আবেদন মস্তিষ্কের কাছে নয়, চোখের কাছে, বোধের (সেনসিবিলিটির) কাছে। সুরস্রষ্টা যেমন বিমূর্ত সুর রচনা করেন—নানা বিপরীতমুখী স্বর সাজিয়ে ঐক্য আনেন, তখন তা আমরা বুঝতে পারি। তাতে কথা নেই কেন? এ প্রশ্ন অযৌক্তিক আমরা বুঝি। তেমনি "জমাট সংগীত" স্থাপত্যকে 'ফ্রজেন মিউজিক'—বলেছিলেন গ্যেটে কেন নিসর্গের মতো নয়, এ প্রশ্ন আমরা করি না। জমাট এবং তরল দু রকম সংগীত ছবির ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা। দেহমনের নানা রকম অনুভূতি এবং ভাষাতীত অনুভবকে রঙে রেখায় নিরবয়ব এবং বিমূর্ত শিল্পীর এঁকেছেন। দৃশ্যজগতের জতুগৃহ ছেড়ে সুড়ংগপথে পালিয়ে আসার মতো। বা দৃশ্যজগতের অনুক্রমাত্রা খুঁজে বার করা। এ এমন এক সাধনতত্ত্ব যে ভন্ড সে সাধুদের দলে ভিড়ে যেতে পারে। কিন্তু সিদ্ধিলাভ এমনই কঠিন যে ভন্ড সে শেষে ধরা পড়ে। কারণ সাদৃশ্য বাদ দিয়ে ছবির শর্ত পালন খুবই কঠিন।

বিমূর্ত নিরাবয়বী ছবি উৎপত্তির পেছনে সমাজ ইতিহাসের দু ধরনের কারণ আছে। এক-দিকে ১৯০৫ উত্তর রাশিয়ার বিস্ফোরক পরিস্থিতির নিহিত আশাবাদ, অন্যদিক পশ্চিম ইউরোপের মানবতাবাদ সম্পর্কে নৈরাশ্যজনিত অধ্যাত্ম সংকট। ফলে মেলাভিচ, কান্দানস্কী, টেটলিন, রডচেংকো, পেভসনার, গাবোর ১৯২১ পর্যন্ত কাজের সংগে হল্যান্ডের "দ্য স্টিল" (শৈলী) গোষ্ঠীর নিরবয়ব-বাদের কোথায় একটা পার্থক্য রয়েছে। শুদ্ধ জ্যামিতিক রূপবন্ধের প্রতি মন্দ্রিয়ানের আসক্তি তাঁকে বহির্জগৎকে মায়া বলে ত্যাগ করতে বলে বাধ্য করেছিলেন। কেউ তাঁকে ফুলের তোড়া দিলে সেটা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে চালান দিতেন। টেবিলের ওপর বিশেষভঙ্গীতে সাজানো দেশলাইয়ের খোলটা অন্যভাবে ঘুরিয়ে দিলেই তিনি আগের মতো রাখতেন। তবু এঁদের কিন্তু অন্য গ্রহের জীব বলে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় একনায়কেরা ভয় পেয়েছেন—প্লেটো যেমন কবিদের নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন তাঁর সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র থেকে, তেমনি স্বদেশ থেকে শীতের হাওয়ার তাড়া খেয়ে তাঁরা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। বৃদ্ধ মন্দ্রিয়ান পৌঁছেছেন মার্কিন মুলুক। আমেরিকায় এই সব শিল্পীদের সাগ্রহে গ্রহণ করা হল। অল্প সময়ের মধ্যে পলাতক শিল্পীদের নব্য ধারা মার্কিন সরকারী ছত্রছায়ার মধ্যে এল। সোভিয়েত সরকার যেমন পুরাতন প্রথানুগ পদ্ধতির (একাডেমিক) শিল্পকলাকে সরকারী অনুগ্রহ এবং সমর্থন দান করল এও তাই। বিমূর্ত শিল্পকলার প্রতি রাষ্ট্রানুগ্রহের পূর্বে যাঁরা এ ধারায় ছবি এঁকেছেন তাঁরা দেব-তুল্য এবং সন্তসদৃশ, কিন্তু রাষ্ট্র-ছত্রছায়ার আশ্রয় পাবার লোভে এলেন অনেকেই যাঁরা আসলে স্বার্থান্বেষী।

"ডোমেলার ছবি"

বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং সাম্যবাদের বেলায়ও এমন ঘটনা ঘটেছে।

ডোমেলা "দ্য স্তিল" গোষ্ঠীর সদস্য এবং মন্দ্রিয়েনের স্নেহধন্য। এ বছর তাঁর আশী বছর পূর্ণ হলো। কলকাতায় তাঁর চিত্রকলা দেখে নিরবয়ব ছবির পক্ষে কী সাধ্য এবং অসাধ্য সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিত ধারণা হয়েছে—কারণ ডোমেলা ইউরোপীয় চৌহদ্দির মধ্যে যতদিন ধারাটা ছিল তখনকার মানুষ। ভেতরের তাগিদে ছবি এঁকেছেন ফ্যাশন বলে করেননি। তাঁর ছবির সংগে মন্দ্রিয়েনের মিল আছে আবার নেইও। কারণ মন্দ্রিয়ানের ধ্যান ছিল স্থাণু জ্যামিতিক আকারে সমতল এবং বিশুদ্ধ রঙ [illegible] প্রতিষ্ঠিত করা—তিনি লাল, নীল, হলুদ এবং কালো এবং সাদা ব্যাপার করতেন। কিন্তু ডোমেলার আকার সচল এবং তিন প্রাথমিক বর্ণের মিশ্রণ উদ্ভূত মাধ্যমিক

বর্ণ সম্বন্ধে তাঁর অনীহা দেখাননি। ফলে তাঁর কাজে দৃশ্য-সাংগীতিক গুণের অন্য এক মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ডোমেলা মন্দ্রিয়ানের নির্দেশিত সরণীতে, কিছু দূরে গিয়ে অবাধ্য ছেলের মতো ভিন্ন এক পন্থা ধরেছেন। তাঁর ছবিতে সাত্ত্বিকতার সংগে কিছু-মাত্রায় রাজসিক ভাবও যুক্ত হয়েছে। পেছনে একটি সমতল রঙ রেখে মধ্যস্থলে মূল রচনার রূপবন্ধকে—যা মূলত জ্যামিতিক হলেও গতিসম্পন্ন—স্থাপন করে বর্ণযোজনা করেছেন এবং নৃত্যশীল রেখা দিয়ে বেঁধেছেন। রেখার এই বন্ধন চলিষ্ণু এবং শক্তিশালী।

কিন্তু প্রকৃতি এবং মানুষের সাদৃশ্য না থাকায় কি অমানুষিক (ডি হিউম্যান) হয়নি ছবি? যন্ত্র সভ্যতার করালগ্রাসে মানবিক মূল্যবোধ হ্রাস-জনিত যে অধ্যাত্ম সংকট তা কি পট থেকে লোকজন এবং নিসর্গ বাদ দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া যায়? এ সম্বন্ধে ডোমেলার ছবি আমাকে নিঃসন্দেহ করতে পারেনি। যদিও তার হিমেল সাত্ত্বিকতার মধ্যে এমন একটা কিছু পাওয়া গেছে যার অস্তিত্ব আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

পরিচয়

পুজোর কটা দিনের ছুটি কাটাতে সাত বন্ধু এলো হাজারিবাগে (আরতি ভট্টাচার্য, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, সন্তু মুখোপাধ্যায় এবং মহুয়া রায়চৌধুরী)। হাজারিবাগের পথে আলাপ হলো এক প্রৌঢ় দম্পতির সঙ্গে—বসন্ত চৌধুরী এবং রুমা গুহঠাকুরতা। হাজারিবাগেও আর একটি মেয়ের কাছে কিছুক্ষণের বন্ধুত্ব, এবং দুটি গান জুটে গেলো উপরি পাওনার মতো। এই দশজনের মেলামেশা কিছু ঘনিষ্ঠ আবিষ্কারের মুহূর্ত, আলাপ এবং পরিচয়ের খণ্ড-খণ্ড দিগন্ত নিয়ে গড়ে উঠেছে নির্মল মিত্র পরিচালিত বিমল করের কাহিনী-ভিত্তিক এই চলচ্চিত্রটি। টুকরো-টুকরো মুহূর্ত এবং ঘটনার ছবি অবলম্বনে তৈরী চলচ্চিত্রটিকে ক্যামিও-ধর্মী বলা যেতে পারে। এই ধরনের ছবি তৈরিতে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমগ্র ছবিটি দানা বেঁধে ওঠে না। যেহেতু ছবিটি কোনো গল্প বলছে না, যেভাবে কাহিনী-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে একটি ছবি ধীরে ধীরে তার আবহ ও মেজাজ গড়ে তোলে এবং দর্শকের মনোযোগ দাবি করে সে-সুযোগ এ-ছবিতে নেই। এইখানেই এই ধরনের ছবির মূল বিপদ। এই বিপদ অবশ্যই কাটিয়ে ওঠা যায়। এবং তার জন্যে প্রয়োজন সাহিত্য-নির্ভরতা থেকে ছাড়িয়ে এনে ছবিটিকে নিছক ভিশুয়াল-মিডিয়াম-এর ধর্মানুসারে চালনা করার প্রণোদনা এবং প্রতিভা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নিছক ভিশুয়াল-মিডিয়াম-এর ধর্ম বলতে

আরতি ভট্টাচার্য

আমি কি বুঝি? এক্ষেত্রে, আমি যা বোঝাতে চাইছি তা হলো নির্মল মিত্রর ছবিটি বিমল করের কাহিনীটি যেভাবে দানা বেঁধে উঠেছে সেই বিশেষ সাহিত্যিক ধরন থেকে নিজেকে আলগা করে নিয়ে নিজস্ব প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেনি। মূল কাহিনীটিকে কতটা অদলবদল করা হয়েছে কিংবা তার পটভূমিকার কতখানি পরিবর্তন করা হয়েছে সেটা বড় কথা নয়। জরুরী প্রশ্নটি হলো, বিমল করের কাহিনী যতখানি সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি, ততোখানি শৈল্পিক সার্থকতা নির্মল মিত্রর ছবিতে পাওয়া গেল না, কেন? তার কারণ, একটি তার স্বীয় ধর্মের মধ্যে অধিষ্ঠিত, অন্যটি নয়।

বিমল করের কাহিনীটি ধীরে-ধীরে দানা বেঁধে ওঠে ছোটো-ছোটো ভাবনার আঁচে। 'পরিচয়' কোনো বিশাল গল্প ফাঁদে না। শুধু কিছু-কিছু টুকরো, মুহূর্তের সমন্বয় কয়েকটি পরিচয়ের সূত্রপাত করে মাত্র। কিন্তু এই আপাত-সামান্য সাহিত্য-শিল্পকে ধারণ করে থাকে লেখকের স্টাইল, তাঁর অসামান্য ভারসাম্যবোধ। নির্মল মিত্রর ছবির সবচেয়ে বড় অভাবটা হলো এই স্টাইলের, যা আসতে পারতো ঝকঝকে পালিশ, সুঠাম এডিটিং, দৃশ্যভাবনার মৌলিকতা এবং ডেনসিটির মধ্য দিয়ে। যে ছবি কোনো গল্প বলে না, তার চিত্রনাট্য প্রতিভার কাছে দাবি করে সবচেয়ে বেশি। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচালক সে-দাবি মেটাতে অক্ষম। এ ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। পরিচয়ের চিত্রনাট্যে—কিছুটা সিনেমা-সচেতনতা সত্ত্বেও—অপটু ফাঁকি এবং ইচ্ছাকৃত ব্যবসায়িক খাদ মিশেছে বিপজ্জনক পরিমাণে। প্রথমত, চিত্রনাট্যটি সিনেমা-ধর্মী হয়ে উঠতে পারেনি বলেই, তার ক্রমশ আলগা হয়ে আসা ফাঁকগুলিকে গান দিয়ে ভর্তি করতে প্রচেষ্ট হয়েছেন পরিচালক। রজনীকান্তর গান, রবীন্দ্রসংগীত, চটুল আধুনিক—ব্যবসায়িক ছকে কোনো চালই বাদ পড়েনি। গানে-গানে হোঁচট খেতে-খেতে চিত্রনাট্য ক্রমশ ঝুলে যেতে থাকে। এবং এই গানের জন্যে যে বিশেষ পরিবেশ তৈরি করতে হয় পরিচালককে, তার মধ্যেও কোনো শৈল্পিক অপরিহার্যতা অনুভূত হয় না কখনো। সন্তু মুখোপাধ্যায় দু-হাত তুলে অদৃশ্য বাজনার সঙ্গে 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' গানটি গাইবেন বলেই একটি দৃশ্যের অবতারণা—এ বস্তু চলচ্চিত্রশিল্পের ব্যাকরণে গৃহীত নয়। জানি, এ-জিনিস বাংলা ছবিতে প্রতিনিয়ত ঘটছে। ঘটছে তার কারণ, সার্থক চিত্রনাট্যের বড় অভাব। দ্বিতীয় দুর্বলতা, ছবিটির সংলাপ। দীপঙ্কর, সুমিত্রা, সন্তু, মহুয়া—এঁরা প্রত্যেকেই অজস্র কথা বলেন। মূল কাহিনীতে যাই থাক না কেন, ছবিতে এতো বেশি কথার প্রয়োজন একেবারেই নেই। কথা যেখানে শুধু কথার জন্যেই বলা হয়, সংলাপ ও ছবি যেখানে পরস্পরের পরিপূরক নয়, সেখানে সংলাপের কোনো প্রয়োজন নেই। পরিচয়ের স্থূল চিত্রনাট্যের আর একটি কারণ সংলাপের বাড়াবাড়ি। ছবির আর একটি মারাত্মক দুর্বলতা, কোনো কোনো চরিত্রের মেকআপ, বিশেষ করে সুমিত্রা এবং মহুয়ার। সুমিত্রা কি খোঁপার এক্জিবিশন করতে হাজারি-বাগ গেছিলেন? এবং পরিচালকের নিজের চোখে কি মহুয়াকে স্কুল গার্ল হিসেবে বিশ্বাস্য মনে হয়েছে?

'পরিচয়ের' একমাত্র সম্পদ অভিনয়। বিশেষভাবে ট্রেনে রুমার সঙ্গে আলাপের দৃশ্যে আরতি; আরতির সঙ্গে কিছু কিছু স্বল্পবাক দৃশ্যে অনিল; পাহাড়ি সিঁড়ি ওঠার দৃশ্যে শুভেন্দু; ভোরবেলার বেড়াতে যাওয়ার দৃশ্যে সন্তু-মহুয়া; আর ছবির অন্তিম কিছু দৃশ্যে বসন্ত-রুমা—এঁরা প্রত্যেকে মনে রাখার মতো ভালো। ছবির একেবারে শেষে বসন্ত যখন রুমাকে বলেন, সান্ধ্য দিগন্তের তলায় দাঁড়িয়ে, "সুখ, বাড়ি চলো, সন্ধ্যে হয়ে এলো", হঠাৎ চমকে উঠতে হয় আমাদের। মনে হয়, পরিচালক নিজেকে খুঁজে পেলেন ছবির একেবারে শেষ দৃশ্যে।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নব জীবনের পথে

রুশ দেশে যৌথ খামার প্রথা প্রতিষ্ঠা কল্পে সদ্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষকদের সমুদয় জমি অধিগ্রহণ সময়কার একটি কাহিনী। প্রধান চরিত্র স্তেশা (মারিনা নেয়েলোভা) ভালবাসে তারই প্রতিবেশী এবং কম্যুন প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গপ্রাণ ইভানকে (স্তানিস্লাভ বোরোজোফিন)। কম্যুনের বিরোধী ফিয়োদোর

মারিনা নেয়েলোভা

(ইওজাস বুদরাইতিস) স্তেশাকে ভালবাসে। এবং একদিন বলপূর্বক স্তেশাকে সে অপহরণ করে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ফিয়োদোর-স্তেশার বিবাহ হয়। প্রায় একঘরে অবস্থায় থাকলেও ওরা সুখেই দিন কাটাচ্ছিল ওদের জমি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণের সমন পাবার পর ফিয়োদোর ওদের যাবতীয় পার্থিব সম্পদ লুকিয়ে ফেলে। স্তেশা তার সন্ধান পায় এবং এই ব্যাপারেই ওর মন ফিয়োদোরের কার্যকলাপে বিরূপ হয়ে ওঠে। ফিয়োদোরের সংসার ত্যাগ করে নতুন ভাবে জীবনযাপনের পথে স্তেশা পা বাড়ায়।

মসফিল্ম তোলা ছবিখানিতে পরিচালক রোদিওঁ নাকাপেতভ কৃষকদের এবং গ্রাম্যজীবনের সুখ ও দুঃখের নানা ঘটনা শিল্পোচিত চিত্রকল্পের সাহায্যে পরিস্ফুট করেছেন। স্তেশা ফিয়োদোর ও ইভানের অন্তর্দ্বন্দ্বও ফুটিয়ে তুলেছেন নাটকীয়ভাবে। বিভিন্ন চরিত্রের মনোজ্ঞ অভিনয় এবং সেই সঙ্গে ঘটনার পরিবেশকে দৃষ্টিতে চমক ধরিয়ে দেবার মত নিসর্গ দৃশ্যের উপস্থাপনে আলোকচিত্রী সারগেই জাইতাসেভ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিখানি উপভোগ্যতায় মাঝে মাঝে চিড় ধরে বাংলা শব্দের উচ্চারণ বিকৃতির জন্য। ডাব করা হয়েছে বোম্বাইতে এবং বিশেষ করে ফিয়োদোরের বাচনের ক্ষেত্রে মনে হয় কোন অবাঙালীর কণ্ঠ ব্যবহৃত হয়েছে, বাক্যের গ্রন্থনেও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

এসরাজে অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী সঙ্গীতভবনের অধ্যাপক অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে এসরাজবাদন-শৈলীর প্রতীকরূপে স্বীকৃত। এই অসাধারণ গুণী ব্যক্তি তাঁর সুদৃশ্য এসরাজটি নিয়ে একান্ত অনাড়ম্বরভাবে অবতীর্ণ হলেন কলামন্দির মিনিয়েচার প্রেক্ষাগৃহে পঁচিশে মে-র সান্ধ্য অনুষ্ঠানে। সম্প্রতি এইচ এম ভি ও ইন্দিরা শিক্ষায়তনের সহযোগিতায় তাঁর প্রথম যে লং-প্লে রেকর্ডটি প্রস্তুত করেছেন—সেটি তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করবার জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। রেকর্ডটি অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিলেন সত্যজিৎ রায় এবং প্রারম্ভে একটি ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে ছিল একটি তানপুরা এবং সংগত করেছিলেন তরুণ প্রতিভাসম্পন্ন তবলিয়া শ্রীস্বপন চৌধুরী। কারও পরিচ্ছদে বা আকৃতি-প্রকৃতিতে কোনও স্বাতিসমাপ্তির প্রয়াস নেই, কোথাও কোনও বিস্ময় সৃষ্টির অবকাশও ছিল না; কিন্তু বিস্ময় সৃষ্টি করলেন অশেষবাবু তাঁর ছড়ির প্রথম টানেই। রাগ বাগেশ্রী ধরলেন তিনি সমাহিত-ভাবে। একের পর এক রাগের বৈশিষ্ট্য

উন্মোচিত হতে লাগল ছড়ির মসৃণ টানে। কী মাধুর্যপূর্ণ ললিত সৃষ্টি। কোথাও মৃদু, কোথাও বলিষ্ঠ, তিন সপ্তকে অনায়াসে লীলায়িত হতে লাগল একটির পর একটি বিস্তার। মন্দ্রসপ্তকেও বেশ খানিকক্ষণ বাজালেন—যা এসরাজে বেশ কঠিন ব্যাপার। সেই বিস্তারে কোথাও বিশেষ একটি আঙ্গিক নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই, প্রত্যেকটি বিস্তার তার ভারসাম্য বজায় রেখে যাচ্ছে সমানভাবে তিনটি সপ্তক জুড়ে। প্রতিটি পর্দা তার যথাযথ শ্রুতিটিকে প্রস্ফুটিত করে তুলছে অনুপমভাবে। আবার তানের ফুলঝুরিও ফুটিয়ে দিলেন মাঝে মাঝে ওই তিন সপ্তক জুড়ে। কী সুচারু সংগঠন। এইখানেই সঙ্গীতের এস্থেটিকস সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। একটা অখণ্ড, সুঠাম রাগরূপ গড়ে তুললেন তিনি যার সুষমা বর্ণনা করা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়। তার পরে একটু জোড়ের কাজ এবং অপরাপর এসরাজের বাদনশৈলী প্রদর্শিত হল, যেন সেই সম্পূর্ণতার বলয়ে দামী হীরেমুক্তোর দ্যুতির মত। বেশীক্ষণ বাজালেন না, কিন্তু সেই রাগের অলঙ্কারটি আমাদের উপহার দিয়ে গেলেন এই আচার্য, যা আমাদের স্মৃতির সঞ্চয় প্রকোষ্ঠে অক্ষয় হয়ে রইল। এর পর তিলককামোদে একটু আলাপ করে বাজালেন একটা গৎ। একজন শ্রোতার অনুরোধে বাজালেন খাম্বাজে টপ্পা, সম্পূর্ণ নিধুবাবুর টপ্পার আদল। মনে হল যেন গান মূর্ত হয়ে উঠেছে তান জমজমা সমেত ওই এসরাজটুকুর মধ্যে। এ বোধ হয় এক এসরাজ ছাড়া আর কোথাও সম্ভব হয় না, সারেঙ্গী ভিন্ন। তবে, সারেঙ্গী থেকে আভিজাত্য ছাড়ানো যায় না, যেটা সম্ভব হয় এসরাজের পক্ষে। তারপর বাজালেন একটি রবীন্দ্রনাথের গান। এইবার তিনি শ্রোতাদের স্মৃতিতে একটা আবেদন জাগিয়ে তুললেন, যার ফলে অনুরোধ রক্ষার জন্য তিনি বাজালেন চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের একটা অংশ। এখানেও কী বিচিত্র দক্ষতার স্বাক্ষর রাখলেন তিনি; চিত্রাঙ্গদার অংশটি যেন তাঁর হাতে অভিনয়ের সমস্ত আঙ্গিক নিয়ে একটি চেম্বার মিউজিকে রূপান্তরিত হয়ে গেল। মনে হল, রবীন্দ্রনাথের এই নৃত্যনাট্য নিয়ে একটা অপূর্ব সিমফনি গড়ে তোলা যায়, হতে পারে একটা অনবদ্য স্ট্রিং ট্রায়ো বা কোয়ার্টেট, যদি উপযুক্ত পরিচালকের প্রেরণা এর পিছনে থাকে। এর আগে আর এ কথা মনে হয়নি অথচ রোজই তো হয় গিটারে নয় বেহালায় শুনছি তথাকথিত রবীন্দ্রসংগীত।

স্বপন চৌধুরীর তবলায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পেয়েছি। গোড়াতেই নানারকম বোল তুলে বাজনাকে জমিয়ে দেবার যে রীতি আজকাল দেখা যায়, তা তিনি সযত্নে পরিহার করলেন। পরিচ্ছন্ন সুস্পষ্ট ঠেকার মাধ্যমে কিন্তু তাঁর চাতুর্যের সব স্বাক্ষরই রেখেছেন। এই অত্যন্ত রীতিসম্মত অনুসরণকে সংযত বাজনা বলে লঘু না করাই ভাল। যেখানে প্রয়োজন সেখানে তিনি ছোট ছোট টুকরোয় চমৎকারভাবে সমে এসে পৌঁছেছেন। বাজাতে অনেকেই পারেন, কিন্তু মনোরম ঠেকা দিয়ে সাবলীল ছন্দের গতিস্রোতে প্রতিটি তালের দ্যোতনাকে শ্রোতার মর্মে একটির পর একটি ঢেউ-এর মত পৌঁছে দিতে পারেন খুব কম বাদক। কখনও সেই ঢেউ মাঝপথে ভেঙে যাচ্ছে, কখনও বা একটু বেশী উদ্বেলিত হয়ে উঠছে; সেই বৈচিত্র্যগুলিও তাঁর বাজনায় একইভাবে ফুটে উঠছে এবং সব তিনি চুকিয়ে দিতে পেরেছেন সমে এসে।

এসরাজ যন্ত্রটি আজ আর তার পূর্বের মহিমায় বিরাজিত নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বল্প কয়েকজন ব্যতীত এই যন্ত্রকে আজ আর কেউ স্মরণ করেন না। একক অনুষ্ঠানে এসরাজ তার উপস্থিতিকে অভিমানের সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছে। অশেষবাবুর মধ্যেও সেই চাপা অভিমান ছিল। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসে প্রকাশ্য একক অনুষ্ঠানে বাজাতে রাজী করানোই কঠিন ব্যাপার। এইচ এম ভি ও ইন্দিরার যৌথ উদ্যোগে এটি সম্ভব হয়েছে এজন্য তাঁরা অবশ্যই কৃতজ্ঞতাভাজন। বিষ্ণুপুরের প্রথিতযশা সংগীতাচার্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অশেষচন্দ্র তাঁদের ঘরের যে অপূর্ব নিদর্শন এই অনুষ্ঠানে প্রচার করলেন এতে আমরাও পরিতৃপ্ত।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

নজরুল জন্মোৎসবের তিন সন্ধ্যা

এবার নজরুল জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রসদন (২৬—২৮ মে) তার প্রথম দিনটি ছিল কিছুটা অবহেলিত। একক সংগীতে কোনো নামী শিল্পী ছিলেন না। দুটি ডায়াস করা হয়েছিল নিয়মমাফিক। একটি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রইল। ফলে অযথা সময়ক্ষেপ ঘটেছে দুজন শিল্পীর মধ্যবর্তী অবসরে। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মেলন-এর সম্মেলক সংগীত দিয়ে সূচিত হল প্রথম দিনের অনুষ্ঠান। দেখা গেল, এই সংস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই গান করেন। সকলের গলা মেলে নি। কিন্তু মেজরিটির নিশ্চিত মিলেছে, এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে হল। সম্মেলক সংগীতের আসরে ভাল পরিবেশন ক্রান্তি শিল্পীসংঘের। খুব ভাল পরিবেশন 'সঙ্গীতা'র। দুশো-শিল্পী গোষ্ঠীর 'গঙ্গা-সিন্ধু-নর্মদায় সুরের ঐকতান সুপ্রযুক্ত। একক শিল্পীদের মধ্যে নমিতা দাশ নতুন, কিন্তু খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ দক্ষতায় গান করেছেন। নারেন মুখোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে খোলা গলায় গান শোনালেন। তাঁর দৃপ্ত পৌরুষময় কণ্ঠ এবং অভিব্যক্তি ভাল লেগেছে। মৃদুলা মুখোপাধ্যায়ের গলা ধরা ছিল, তদুপরি উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ। 'আঁখিজল' চন্দ্রবিন্দুহীন হয়ে উঠেছিল তাঁর উচ্চারণে। কল্যাণী কাজীর গান মনকে স্পর্শ করে নি। 'বাসন্তী বিদ্যাবীথি' নিবেদন করলেন 'কাবেরী তীরে' নামে একটি নৃত্যনাট্য। নৃত্যনাট্যরূপ তপন সেনের পরিচালনাও তাঁরই। প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম নাচে নিশ্চিত বজায় ছিল। কিন্তু গানগুলি কাঁচা গলায় গাওয়া। এ দিনের অনুষ্ঠানে বর্ষীয়সী রেণু ভৌমিক একক গানের আসরে গান শোনালেন। তাঁর কণ্ঠ কিছুটা জীর্ণ, তবু শিক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর নাম যে কেন স্যুভেনির-এ ছাপা হয়নি, বোঝা গেল না। এ ব্যাপারে একটু সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। রেণু ভৌমিক এর আগেও আসরে গান গেয়েছেন, তাঁর নাম সেক্ষেত্রে তিন দিনের কোথাও নেই কেন? প্রথম দিনে নজরুলের কবিতা শোনালেন সুমিত দে নামে এক নতুন আবৃত্তিকার। সহজ, ভাবহীন ভঙ্গি তাঁর, উচ্চারণ স্পষ্ট। আস্থা জাগাতে সমর্থ হয়েছেন প্রথম আবির্ভাবেই। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ দিন দারুণ মেজাজে ছিলেন। 'অভিশাপ' যেমন নির্বাচন হিসেবে সুষ্ঠু, পরিবেশনও তেমনই জমজমাট। 'ক্ষুদিরামের মা'—এই গদ্য রচনাটিও তিনি বিরল আবেগের সঙ্গে পড়লেন। আরও ভাল লাগল এই দেখে যে, তিনি অক্লেশে 'একবার বিদায় দাও মা' গেয়ে উঠতে পারতেন (যেমন রেওয়াজ হয়েছে এখন!) কিন্তু সে লোভ সংবরণ করেছেন। চর্ব্য-চুষ্যের ভুলও শুধরে নিয়েছেন এবার। আবৃত্তিকার হিসেবে তিনি যে সচেতন ও দায়িত্ববান শিল্পী তার নিঃসংশয় প্রমাণ রেখে গেলেন।

দ্বিতীয় দিনের আসর শুরু করলেন সুপ্রভা সরকার। বয়স-জয়-করা কণ্ঠ তাঁর। তিনটি গানেই আসর ভরিয়ে গেলেন। পরবর্তী শিল্পী শক্তি ঠাকুরের ভঙ্গিটি বেশ খোলামেলা। অনিতা মজুমদারের কণ্ঠটি সুন্দর। ইলা বসুর 'রুমঝুম রুমঝুম নূপুর' প্রাণবন্ত পরিবেশন। ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এলেন এর পরই। সঙ্গতে রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গী করে এনেছিলেন। প্রেক্ষাগৃহে সূচীপতন স্তব্ধতা সঞ্চার করে প্রবীণ এই শিল্পী অবশ্য মেজাজে চারখানি গান শুনিয়ে গেলেন। নূপুর সেনের গানের নিষ্প্রাণ অভিব্যক্তি, পিন্টু ভট্টাচার্যের প্রকট আধুনিকতা, রবীন ভট্টাচার্যের ভাবাবেগবর্জিত যান্ত্রিক ভঙ্গি বহুক্ষণ আসরকে ম্রিয়মাণ করে রেখেছিল। চিত্রিতা দাশগুপ্ত নতুন শিল্পী হয়েও বরং স্বচ্ছন্দ সপ্রাণ সনিষ্ঠ গায়কীতে রেশ রেখে যেতে সমর্থ হলেন। ধীরেন বসুকে এবার খুবই স্ফূর্তিময় ও সজীব মুডে পাওয়া গেছে। 'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়' গানটির শুরু থেকেই তিনি অক্ষরকে করে তুললেন শরীরী। এই আসরে বহুদিন তাঁকেও এমন জমাটি মেজাজে পাওয়া যায়নি। এবার গেল। বোঝা গেল, চিরদিন সত্যিই কারো সমান যায় না। শ্রোতাদের অনুরোধে শোনানো 'যেদিন লব বিদায়' গানটিতে তাঁর কৌতুকময় ও চপলতাময় বিস্তার

দারুণ উপভোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। প্রসঙ্গত বলি, 'যেদিন লব বিদায়' গানটিতে ফুটবলের ভাষায় হ্যাটট্রিক করলেন ধীরেন বসু। রবীন্দ্রসদনের এই নজরুল জন্মোৎসবের আসরে ৭৭-এ গেয়েছেন, ৭৮-এ গেয়েছেন, ৭৯ সালেও গাইলেন এই গানটি। সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও রামানুজ দাশগুপ্তের পর আসরের শেষ শিল্পী অধীর বাগচী আবার নতুন করে আসর জমিয়ে তুলেছিলেন এদিন। বেশ রাত হয়েছিল, তবু অধীর বাগচীকে শ্রোতারা অনুরোধে-অনুরোধে চারখানি গান গাইতে বাধ্য করলেন। এ-দিন দু-জন ছিলেন আবৃত্তিতে। প্রদীপ ঘোষ এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন, তাঁর পাঠে শারীরিক

অসম্পূর্ণতার ক্লান্তি ছায়া ফেলেছিল। রবীন মুখোপাধ্যায়ের গোটা-গোটা উচ্চারণ কিছুটা অপরিণত ও শিশুসুলভ করে তুলেছিল তাঁর পরিবেশনকে।

তৃতীয় ও শেষ দিনের আসর শুরু থেকেই জমজমাট। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নিষ্ঠাময় পরিবেশন ও অনুপ ঘোষালের রেওয়াজী কণ্ঠের নিবেদন প্রথম থেকেই আসরের মান উঁচু জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'গভীর রাতে জাগি' ও অনুপ ঘোষালের 'মধুর নূপুর রুমঝুম বাজে' অনবদ্য পরিবেশনের অনুপম দৃষ্টান্ত। পূরবী দত্ত এখন যে-কোনও নজরুলগীতির আসরে এক পরমপ্রিয় নাম। নজরুলের গানের কাব্যমূল্য তাঁর গায়কীতে কখনোই ঢাকা পড়ে যায় না, অথচ তান ও অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগও একই সঙ্গে গানের মধ্যে তুলে ধরেন তিনি। তাঁর গানে যেমন আশ্চর্য পরিমিতিবোধ, কণ্ঠের লাবণ্য ও মাধুর্য তেমনই একইভাবে আকর্ষণ করে। এ-দিনের আসরে তিনখানি গানেই সর্বময় সার্থকতার এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন পূরবী দত্ত। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় নজরুলগীতির কয়েকটি বিশেষ দিক নিয়ে উদাহরণসহ স্বল্প আলোচনা দিয়ে শুরু করে টপ্পাঙ্গ নজরুলগীতি শোনালেন। কালিদাস নাগ বিশেষত্বহীন। প্রজ্ঞাপারমিতা রায়ের কণ্ঠ সুরেলা, গায়কী পরিচ্ছন্ন। দিলীপ চক্রবর্তী এবার যেন গলা চেপে গান শোনালেন। সত্য চৌধুরী শুধু যে খোলা গলায় শোনালেন তা নয়, সঙ্গে দুটি ছোট মেয়ে গলা মেলানোয় 'দুর্গম গিরি' বা 'জাতের নামে বজ্জাতি'তে মাঝে মাঝে সম্মেলক গানের পরিবেশ ফুটে উঠেছিল। অনুরোধে একটি অতিরিক্ত গানও শোনাতে হয়েছিল তাঁকে। অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের গানে রেওয়াজী কণ্ঠের পরিচয় যতটা ছিল, উচ্চারণের পরিচ্ছন্নতা ততটা ছিল না। অনুরোধে শোনানো 'ফুলের জলসায়' গানটিতে মন্দিরার প্রয়োগও কানে লাগছিল। নজরুলের গানে কথার সৌন্দর্যও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ এ-কথা ভুললে গান হয়ে ওঠে বেশী কালোয়াতী। এই কথাটাই সেদিনের শেষ শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গানেও একই-ভাবে মনে পড়ছিল। নজরুলের ছয় ঋতুর ছটি গান নির্বাচন করে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেমন বিশিষ্টতা দেখিয়েছিলেন, গায়নভঙ্গিতে কিন্তু তেমন সচেতনতার পরিচয় রাখেননি। কথা ঢেকে গিয়েছিল গায়নভঙ্গির অতিরিক্ত কারুকার্যে। আলোর রঙ পালটে ঋতু-বদলের আভাস আনার প্রয়াসও গানের সঙ্গে কতটা সম্পর্কিত, তা ধরা যায় নি। রীতা বিশ্বাস নতুন শিল্পী, তাঁর গানেও ওস্তাদী ঢঙ বেশী মাত্রায়। সুকুমার মিত্র বরাবরই মেজাজ লাগিয়ে গান শোনান। এবারেও তাঁর গানে পরিমিত মেজাজের প্রয়োগ ছিল। দুটি গানই তাই চমৎকারভাবে পরিবেশিত। শশাংক গঙ্গোপাধ্যায় এ-দিনের একক আবৃত্তিকার। কিন্তু স্বরচিত যে কবিতা দিয়ে তিনি নজরুল-বন্দনা শুরু করলেন তা অতি অন্তঃসারশূন্য রচনা। 'আমার কৈফিয়ৎ' বরং মোটামুটি। নবীন শিল্পীদের মধ্যে এবার অবাক করে দেবার মতো গান করেছেন ইন্দ্রাণী সেন। রবীন্দ্রসংগীতে নয়, বোঝা গেল, নজরুল-গীতিতেই নিজের ভূমিটি খুঁজে পাচ্ছেন এই সমৃদ্ধ কণ্ঠের অধিকারিণী শিল্পী। তাঁর দক্ষতা ও দাপট শ্রোতৃমণ্ডলীকেও দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। তৃতীয় গানের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত অনুরোধ ছিল। কিন্তু প্রশংসনীয় সংযম দেখিয়ে দু-খানি গানের অনবদ্য রেশ রেখে উঠে এসেছেন ইন্দ্রাণী সেন। তৃতীয় দিনের আরেকটি চূড়ান্ত আকর্ষণ ছিলেন আঙুরবালা দেবী। এই বয়সেও তাঁর কণ্ঠে গান শোনাটা এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। সে-অভিজ্ঞতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত না করে জীর্ণ শরীর এবং অজীর্ণ কণ্ঠ নিয়ে এখনও যে তিনি আসরে নিয়মিত উপস্থিত হন এ-জন্য কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

গানের তরী দিলেম খুলে

ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র দেখে মনে হয়েছিল, অনুষ্ঠানটির প্রধান আকর্ষণ হবে চিত্রলেখা চৌধুরীর একক সংগীত, সঙ্গে থাকবে উত্তরায়ণের ছাত্রছাত্রীদের সম্মেলক। শেষ পর্যন্ত হল উলটোটাই। উত্তরায়ণের ছাত্রছাত্রীদের নিবেদন 'গানের তরী দিলেম খুলে' পরিবেশিত হল প্রধানতম আকর্ষণ হিসেবে। দ্বিতীয়ার্ধে শোনা গেল ঝড়ের গতিতে চিত্রলেখা চৌধুরীর একক কণ্ঠের আটখানি গান। অবশ্য সমগ্র অনুষ্ঠানটিই এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিপর্যস্ত অবস্থায় নিবেদিত। অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা ছিল সন্ধ্যা ছটায়। কিন্তু গোর্কি সদন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, অনুষ্ঠানটি আদৌ হবে কি হবে না—এ নিয়েই বহুক্ষণব্যাপী সংশয় দেখা দিয়েছিল। হবে না হবে না করে ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট পার হয়ে গেল। ছটার নির্ধারিত অনুষ্ঠান যখন শুরু হল, ঘড়িতে তখন পৌনে আটটা। মেজাজ কোনো তরফেরই থাকার কথা নয়। না শিল্পীদের না শ্রোতৃমণ্ডলীর। কিন্তু গানের তরী সত্যি যখন খুলে গেল, রবীন্দ্রনাথের নিরক্ষর অমোঘ প্রবন্ধ সব ছাপানো টানে ভেতর থেকেই আরেক ধরনের মেজাজ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল প্রেক্ষাগৃহের এক কোণ থেকে অন্য কোণে। ভুলিয়ে দিল যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝির এবং কালক্ষেপের ক্লান্তি।

শুরু যেহেতু দেরি করে, সেই জন্যেই বোধ করি প্রথমার্ধের অনুষ্ঠান-সূচী [illegible] কিছুটা সংক্ষেপিত করা হল। কিছু গান বাদ গেল। প্রথম পর্বের সম্মেলক অংশ প্রায় সব ক্ষেত্রেই সার্থক। একক সংগীতে বিশেষভাবে মনে দাগ কাটে শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তের 'আজি মম মন'। নিবেদিতা মুখোপাধ্যায়ের 'বাণী তব ধায়' এবং তৃপ্তি সাহার 'হে নিখিলভার'-এ প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়েছে। বিদিশা চৌধুরীর কণ্ঠ এখনও অপরিণত। শেষ সম্মেলক গানটিতে ঈষৎ দ্বিধা গানের গতিকে হঠাৎ [illegible] করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে চিত্রলেখা চৌধুরী। মেজাজ হারিয়ে যাও[illegible] কথা নিজেই জানালেন তি[illegible] কিন্তু সৌভাগ্য, গানে সেই মে[illegible] হারানোর ছাপ ততখানি পড়েনি। ত[illegible] গলা ইদানীং বেশী তীক্ষ্ণ লা[illegible] মাধুর্য কিছুটা কম মনে হয়, কি[illegible] দক্ষতা প্রশ্নাতীত। প্রথমেই ত[illegible] দ্বিধা প্রকাশিত হল 'কী গাব আ[illegible] কী শুনাব' গানের নির্বাচনের [illegible] দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা গাইলে[illegible] যা শোনালেন তার রেশ নিয়েই ফি[illegible] এসেছেন সেদিনের শ্রোতৃমণ্ডলী। '[illegible] বসিল আজি', 'এ মোহ আবরণ' [illegible] 'এ পরবাসে রবে কে'—এই জাতীয় দুরূহ গানেও যেমন, তেমনই 'তুমি যে সুরের আগুন', 'তোমার খোলা হাওয়ায়' এবং 'প্রাণের মানুষ আছে প্রাণের মতো ক্ষিপ্রগতি ও ঝংকারময় গানেও একই রকম নৈপুণ্য তাঁর। 'কৃষ্ণকলি' গানটি চিত্রলেখা চৌধুরীর কণ্ঠে আলাদারকমের আকর্ষণ হয়ে যায় হয়, অন্য আসরেও তার প্রমাণ পেয়েছি। এ-দিনও সেই আকর্ষণ অম্লান ছিল। শুধু সব গানেই যা বেশী ছিল তা হল গতি। আসরের গতিতে নয়, রেকর্ডের গতিতে গীত হল সব ক'টি গান।
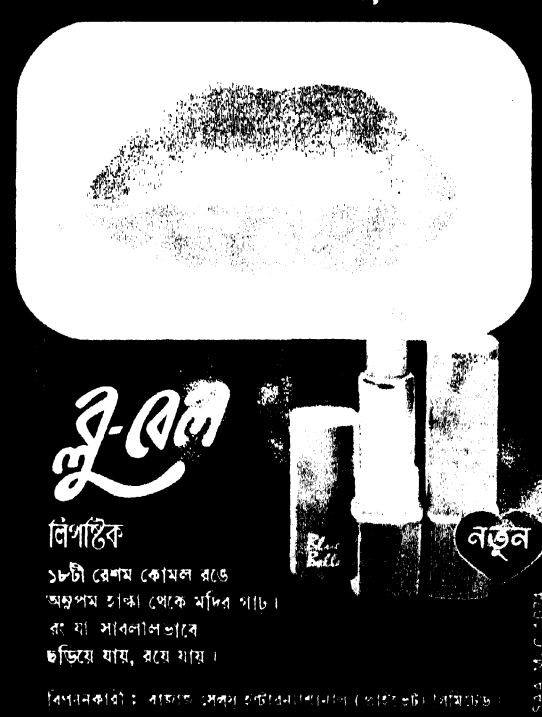
প্রণব মুখোপাধ্যায়

সুরের দীক্ষা

"আমি গুরুর (গিরিজাশংকর চক্রবর্তী) কাছ থেকে যা পেয়েছি তা বিলিয়ে দিয়েছি—তার সঙ্গে এক জায়গায় বাঁধা না থেকে সংগীতের নানা শাখায় যে ঐশ্বর্য আছে তাকে বুঝবার চেষ্টা করে অর্জিত শিক্ষাকে পল্লবিত করার চেষ্টা করেছি"—আকাদেমিতে সঞ্চারিণীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনার উত্তরে সুখেন্দু গোস্বামী এই উপলব্ধির কথা জানান। প্রধান অতিথি শ্রীজ্ঞান-প্রকাশ ঘোষও সুখেন্দু গোস্বামীর এই সত্য উপলব্ধিকে সমর্থন করেন।

এই আসরে সুরের দীক্ষা কার কতখানি সম্পূর্ণ হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সুখেন্দু গোস্বামীর শঙ্করা রাগে সুরারোপিত সরস্বতী বন্দনা গেয়ে আসরের উদ্বোধন করলেন কালিদাস নাগ। শান্তি ঠাকুর নজরুল-গীতি এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'সুখের কথা বোলো না আর' গান দুটিতে, রাগ সংগীতে তাঁর দক্ষতার সাক্ষ্য রাখলেন। অন্য আসরে তিনি এই ধরনের গান গাওয়ার সুযোগ পান না—চটুল গান গেয়ে তাঁকে আসর জমাতে হয়। জনপ্রিয়তার এই এক অভিশাপ। জীবনানন্দের কবিতা 'আবার আসিব ফিরে' গানে তাঁর কণ্ঠের কারুকার্য মর্যাদা পেলেও [illegible] বাংলার কবিতার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। নটভৈরব রাগে খেয়াল শোনালেন গৌতম গোস্বামী। রেওয়াজী [illegible]। অল্পসময়ে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণভাবে খেয়ালের দক্ষতা প্রকাশ পায়নি—তবু বলা যায় শিল্পীর মন্দ্রসপ্তকে গলা খুবই কমজোরী—যার জন্য নটভৈরবের আলাপ অংশ খুবই ম্রিয়মাণ। ভজন বা নজরুলগীতি কোন গানেই মঞ্জু মৈত্র সার্থক নন। তাঁর

...নপ্রকাশ ঘোষ ও সুখেন্দু গোস্বামী　　ছবি : অজয় দত্তগুপ্ত

...ান এখনও সেই শিক্ষার্থির স্তরে—...া শুধু নিয়মবন্ধ-স্বীকরণে প্রবন্ধ ...য়। কালিদাস নাগ গায়ক হিসাবে ...ারাপ নন, কিন্তু সার্থক শিল্পী নন। ...য়েকটি নজরুলগীতি দিয়ে তিনি ...দবারাত্রির মালা রচনা করেন। কিন্তু ...ানগুলির নির্বাচন শুধুই গান ...াওয়ার জন্য। 'শাওন রাতে যদি ...ানে লয় কম না হলে কাব্য ক্ষুণ্ণ হয় —তবলার সহযোগিতায় গান গাইতে ...জো লাগলেও। দ্বিতীয়ত রজনীর ...শষ যামে ঈপ্সিত শান্ত রসটিও ক্ষুণ্ণ ...য়। সব শেষে আসরে আসেন স্বপন ...প্ত। অনেক দিন পরে স্বপন গুপ্তের ...াল গান শুনলাম। 'চাহিয়া দেখো ...সের স্রোতে' কিংবা 'বৈশাখ হে ...ৌনীতাপস' গানে অনেকক্ষণ বাদে ...তিনি শান্তরসের প্রতিষ্ঠা করেন। এর ...ে কতকগুলি গানে সামান্য সুর কম ...াগলেও শেষ গান 'আমি চঞ্চল হে' ...ন প্রমাণিত হয়, তাঁর সুরের দীক্ষা ...নেকাংশেই সার্থক হয়েছে।

কালিদাস নাগ শিল্পী হিসাবেই ...তিষ্ঠা পেতে পারেন সে ক্ষমতা তাঁর ...াছে। এর জন্যে অবান্তর প্রচার হয়ত ...াঁকে পিছিয়ে দেবে। এই দিন আসরে ...রবার নানা ভাবে তাঁর প্রচার বিরক্তি-...র। বিরক্তিকর ঘোষকের বিভিন্ন ...বশেষণ প্রয়োগ এবং কাব্য করার ...চেষ্টাও। সব শেষের ঘোষণা 'এইবার ...াসরে আসছেন স্বয়ং কালিদাস'—...ংবর্ধনার বিনম্র সকালটিকে কলুষিত ...রে—হাস্যকর প্রচেষ্টা।

...দবাশিস দাশগুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

মহাকালীর বাচ্চা

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত ...বরল নয়; এই বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও ...মন দু-একজন প্রতিভাবান লেখকের ...থা আমরা জানি যাঁদের কোনো বিশেষ ...লখা সব-মিলিয়ে হয়তো তেমন ...তরায়নি, কিন্তু সেই লেখাতে তা ...ও বাংলাসাহিত্য কোনো-না-কোনো ...ক থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। ভাষা ...বহারে কি চিত্রকল্প নির্মাণে ...শিল্পকের কোনো পরীক্ষায় বা বর্ণনায় ...থবা উপস্থাপনায় ফুটেছে এমন-এক ...তনত্বের স্বাদ যা সাহিত্যের গতিকে নিশ্চিতভাবে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। নাটকের ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে বিভাস চক্রবর্তী তেমনিই আশাব্যঞ্জক একটি নাম। তাঁর যে-কোনো প্রোডাকশনই বাংলা নাটকের পক্ষে জরুরী একটি শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে—এ-অভিজ্ঞতা এর আগে বহুবার হয়েছে। অনেক অনুল্লেখ্য, কাঁচা এবং স্থূল রচনাকেও নির্দেশনার নৈপুণ্যে তিনি অপরিহার্য নাট্যকর্মে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। বাংলা নাটকের প্রয়োগগত দিকটিকে কোনো-না-কোনো ভাবে সব-সময়ই তিনি করে তোলেন সমৃদ্ধতর।

বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনা-ধন্য থিয়েটার ওয়ার্কশপের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'মহাকালীর বাচ্চা' দেখতে-দেখতে সেই কথাটাই বারবার মনে পড়ছিল। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এই নতুন নাটক শুরু হয়েছিল এক আশ্চর্য সম্ভাবনাময় নাটকীয় পরিস্থিতিতে, কিন্তু শেষরক্ষা করা যায়নি। হারান মিস্ত্রির পাগল বউ খিদের জ্বালায় মহাকালীর ছদ্মবেশে ভোগ খেয়ে গেল দেবীমূর্তির গয়নাগাটি নিয়ে গেল উধাও হয়ে, সেই মহাক্ষুধার দৃশ্য দেখে দেবী জাগ্রত হয়েছেন ভেবে প্রবল পরাক্রান্ত ইন্দুশেখর ও তার স্ত্রী পদ্ম উন্মত্ত লোভে-লালসায় মাথা ঠুকে প্রার্থনা জানাচ্ছেন মায়ের উদ্দেশে, এইরকম একটা অসামান্য পরিবেশ থেকে যে-নাটকীয় সম্ভাবনাময় কাহিনীর শুরু হতে পারত তা সম্ভাবনার স্তরেই রয়ে গেল। কাহিনীর মোড় ক্রমশ ঘুরল সম্পূর্ণ অন্যদিকে। একটি মহাকালীর বাচ্চা অবধি কাহিনীর গতি ছিল তবু কিছুটা তীব্র এবং আলাদা-রকমের। কিন্তু এক মহাকালীর বাচ্চার পর আরেক মহাকালীর বাচ্চার জন্ম, কমিশন বসানো, গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি ঘটনা কাহিনীকে নিয়ে গেছে অতি মামুলি পথে; মামুলি শ্লেষ-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গে ভরা সাধারণ কৌতুককাহিনী হয়ে উঠেছে এক দুরন্ত সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি। সত্যি বলতে কী, এই নাটক শেষ হয়েছে তিনবার। এক, প্রথম মহাকালীর বাচ্চার উপাখ্যান যখন শেষ; দুই কেতু যখন থুথু ছেটাল ইন্দুশেখরের মুখে। এই দ্বিতীয় উপসংহারের পরও নাটকটিকে যখন আরও বিস্তৃত করে তৃতীয় সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হল তখন আর নাটকের ভিতর একেবারেই কোনো স্থিতিস্থাপকতা ছিল না। প্রায় টেনে-হিঁচড়ে বাড়ানো। আরেকটি দুর্বলতা গানের ব্যবহার। ভালো কবিতার সংগে ফুটনোট কিংবা মানে বই যেমন উপভোগের হানি ঘটায়, এ-নাটকে গানের ভূমিকা কিছুটা সেইরকম ক্ষতিকর। সুরের দিক থেকে সম্পদ, পরিবেশনের দিক থেকে সমৃদ্ধ এই নাটকের গান। দুটি নামকরা শিল্পী দেবশ্রী দাশগুপ্ত ও দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত তো চমকে দিয়েছেন তাঁদের অনবদ্য কণ্ঠসুষমায়, প্রধান কোরাসের রাম মুখোপাধ্যায়ও অত্যন্ত সুন্দর গান করেন, কিন্তু নাটকের এক স্তরের গূঢ় রূপক অন্য-স্তরে গানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত হালকা-ভাবে হাজির হয়েছে। কোরাসের চরিত্ররা অন্দরমহলের খিলান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই দৃশ্য অত্যন্ত নয়নহরণ। কিন্তু একটা-দুটো প্রশ্ন থেকে যায়। এক, ভেতরমহলের দরজা একেকবার একেক-রকম; কেন? চরিত্ররা প্রতিকী দরজার মধ্য দিয়ে যেভাবে যাতায়াত করেছেন তাতে কোনো নির্দিষ্ট প্রতীক রক্ষিত হয়নি। দুই, সাধুচরণ যখন নিরুদ্দিষ্ট তখনও খিলেন হয়ে তাঁকে দাঁড়াতে দেখা গেছে। এর অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবন করতে পারিনি। তবে রণজিত চক্রবর্তীর মঞ্চ-পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে উঁচুদরের। অভিনেতা হিসেবেও তিনি দারুণ সার্থক। তেমনই সার্থক শরদিন্দু রায়ের কৈলাস চরিত্রটি। 'নরকগুলজার' দেখে যাঁকে আদ্যন্ত অবাঙালী বলে ভুল হয়, তিনি যে যথার্থ বাঙালী এক শক্তিমান অভিনেতা—এ-নাটকে তার প্রমাণ পেয়ে অবুক লাগল। তবে সব-ছাপানো অভিনয় এ-নাটকে অশোক মুখোপাধ্যায়ের। তিনি যে কত বড় শিল্পী, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একইরকম দাপট ও দক্ষতায় তার প্রমাণ রেখে গেলেন। বাচনভঙ্গিতে একটি বিশিষ্টতা তিনি স্ফূর্ত স্বাভাবিকতায় ফুটিয়েছেন। জয়ন্তী ঘোষের 'পদ্মবউ', অঞ্জন দেবের 'কেতু', মানিক রায়চৌধুরীর 'অফিসার' যেমনটি হওয়া উচিত তেমন। বেশী কিছু নয়, কমও নয়।

নাটকের গল্পের আকর্ষণ ও কৌতূহল, আগেই বলেছি, দ্বিতীয় অংক থেকে একেবারেই প্রায় ছিল না। কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তা সত্ত্বেও যে বসে দেখতে হয়, দেখে ভাবতে হয়, ভেবে বিস্মিত হতে হয়, হতে হয় পুলকিত ও রোমাঞ্চময়, তার মূলে নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তীর প্রযোজনাগত নৈপুণ্য। কোরাসে পাখির ডাক, প্রতিধ্বনি হাসির শ্লেষ বিদ্রূপ যেমন প্রয়োগ হিসেবে অসামান্য তেমনই আগাগোড়া প্রয়োগগত বহু সূক্ষ্ম কাজ মুগ্ধ করে রাখে। রেডিও-টিভির সংবাদ-পাঠ, কমিশনে তর্কাতর্কি; ফোটো-গ্রাফারের ক্যামেরার সামনে নিশ্চল অভিব্যক্তি দান, শুধু কোরাসের অবস্থান বদলে দিয়ে ভেতরের মহলের আভাস আনা মহাকালীর বাচ্চার পিছনে পদ্ম-বউয়ের দৌড়—এমন বহু জায়গা মনে গেঁথে আছে। শুধু একটি অনুযোগ, তিনি নিজে কেন অনুপস্থিত অভিনয়-ক্ষেত্রে? 'চাকভাঙা মধু'র দুর্মর স্মৃতি হয়েই কি তিনি থেকে যাবেন?

রঞ্জিত চক্রবর্তী অশোক মুখোপাধ্যায় ও শরদিন্দু রায়　　ফটো : অজয় দত্তগুপ্ত

যৌবন-ঝঞ্ঝা

ছটায় নয়, ছটা পাঁচে শুরু। এইরকম যাঁরা লেখেন, মনে হয় সময়ানু-বর্তিতার এক চরম পরাকাষ্ঠা নিজেদের ক্ষেত্রে তুলে ধরবেন তাঁরা। হায়, এ-ধারণা যে কত ভুল তা বোঝা গেল সেদিন বাসুদেব মঞ্চে, শরতায়তনের ষষ্ঠ নিবেদন 'যৌবন-ঝঞ্ঝা' নাটক দেখতে গিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ের চল্লিশ মিনিট পার করে শুরু হল নাটক, এবং শুরুতেই গেল থেমে। সব-কিছুর পিছনেই অনিবার্য কারণ থাকে। দেরিতে শুরু ও শুরুতে থামা—এর পিছনেও নিশ্চিত অনিবার্য কারণ ছিল। নাটক দেখে যে এসব তুচ্ছ ত্রুটি ভুলে যাওয়া যাবে, তাও হল না।

কে বলবে এটি ষষ্ঠ নিবেদন। অপটু গল্প, অপটু অভিনয়, অপটু পরিচালনা। গ্রুপ থিয়েটার যে কত এগিয়ে এসেছে, বাংলা মঞ্চে যে কত সাবলীলতার সঞ্চার ঘটেছে, এ-তথ্য এখনো এই গোষ্ঠীর অজানা। স্টেজ-ক্র্যাফট সম্পর্কে ধারণাহীন এঁরা মঞ্চ অন্ধকার করে বহু সময় ধরে বারবার সেট সরান, সেট লাগান। টাব নামক বস্তুটি অকেজো অবস্থায় ঝুলে থাকে মাথার ওপরে। নামিয়ে নিলেই সামনের জোনে অভিনয় চলাকালীন পরবর্তী দৃশ্যের নেপথ্যপ্রস্তুতি

চালানো যেত। তবে অভিনয়ও চলেনি, চালানো হয়েছে মাত্র। যৌবন রয়েছে, অভাব অভাবও পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু সে-অভাব শেষে সরল শারমল রসবর্ষণ ঘটেনি। বাসুদেব মঞ্চের সামনের আসনে পাখার ব্যবস্থা নেই। সিনেমার যেমন সামনের আসন কম দামী ও কম আরামপ্রদ, স্টারের বাসুদেব মঞ্চেও তেমনই সামনের দিকের আসন অস্বাচ্ছন্দ্যকর। তার ওপর মঞ্চে অরাজকতাময় গল্প ও অভিনয় সংলাপ ভুলে যাবার রেষারেষি। শেষ হবার আগেই ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে বাইরে।

আলিবাবা

গত ২ মে রবীন্দ্রসদনে 'শুভ্রার' নাট্যগোষ্ঠীর পরিবেশনায় যে-নাটকটি মঞ্চস্থ হল, তার নাম-ভূমিকায় ছিলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। নাটকটি পরিচালনাও করেছেন তিনি। 'শুভ্রার' নতুন নাট্যগোষ্ঠী। প্রথম নাটক হিসেবে যে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' বেছে নিয়েছেন তাঁরা, এতে আপত্তি করার বা অবাক হওয়ার মতো কিছু ছিল না। কেননা, এটি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। শিশু একটি নাট্য গোষ্ঠী সেক্ষেত্রে যদি আলিবাবার মতো দীর্ঘ আশি বছর ধরে জনপ্রিয় নাটক ঠিক মতো পরিবেশন করতে পারেন, তাহলে এ-হেন নির্বাচন সহজেই প্রশংসনীয় ব্যাপার হয়ে ওঠে। সেদিন রবীন্দ্রসদনে দর্শক-আসনে শিশুদের প্রাধান্যও এই প্রত্যাশাকেই জোরালো করে তুলেছিল। কিন্তু নাটকটির প্রথম অংক শেষ হতেই বোঝা গেল, এটি যদি শিশু নাটক হয় তাহলে শিশুদের বড়ো ভাবা হয়েছে। এও বোঝা গেল যে, এটি যদি বড়োদের নাটক, তাহলে তাদেরও ছোট করে দেখা হয়েছে। এ-নাটকের প্রযোজনায় যত না হাস্য, তার থেকে বেশী লাস্য। যত না লাস্য, তার থেকে অনেক বেশী তান্ডব।

ছাপানো প্রোগ্রাম-এ চোখ পড়ল। শুভ্রার এর সম্পাদকীয় নিবেদনে জানানো হয়েছে—"এই সংস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্প-কলা ও সংস্কৃতির প্রসার লাভ।" দু-বার পড়তে হল, 'লাভ' কী করে হবে, নিশ্চিত অভিপ্রেত শব্দটি হবে 'ঘটানো'। কিন্তু না, স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'লাভ'। বাকিটুকু তখনই স্পষ্টতর হল। হ্যাঁ, লাভই বোধ হয় এই নাট্যগোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য। শিল্পকে কলা দেখিয়েও যদি টিকিট ঘরে ভিড় বাড়ানো যায়, নামী তারকার সমাবেশ ঘটিয়ে যদি মহড়ার খরচ বাঁচানো যায়, নতুন আঙ্গিকের নাম করে যদি পুরনো ঐতিহ্য ভেঙে চুরমার করা যায়, তাহলে যা যা হয়, হতে পারে, তাই ঘটেছে 'শুভ্রার'-এর এই প্রযোজনায়।

গোলমাল এ-নাটকের আদ্যন্ত। প্রথম গোলমাল, নাটকের সম্পাদনায়। কতটুকু থাকবে আর কতটুকু বর্জিত হবে তা নিয়ে কোনো স্থির চিন্তা কাজ করেছে, এ-কথা মনে হয়নি। তাছাড়া ঊনিশ শতকের শেষ দশকে এই নাটক দর্শকদের কাছে যে-যে-কারণে সমাদৃত হয়েছিল সেইসব কারণ এখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফলে, এখনকার দর্শকের জন্য প্রত্যাশিত ছিল কোনো নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে এই নাটকের পরিবেশন। তা পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত নাটকটি অত্যন্ত কাঁচাভাবে হাজির করা হয়েছে। অভিনয়ও বিশেষভাবে দুর্বল। একমাত্র ব্যতিক্রম বাসবী নন্দী সনাতন ঘোষ এবং সতীন্দ্র ভট্টাচার্য। বাসবী নন্দী যে কত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তার প্রমাণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একইভাবে পাওয়া গেল। সনাতন ঘোষের কণ্ঠটি সবল, অভিনয়ও সপ্রতিভ। সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'মুস্তাফা' আকর্ষণীয় টাইপ-চরিত্র। কিন্তু 'আলিবাবা' চরিত্রে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় কী করলেন?

মূল নাটকের সবটুকু নেই, তাই সব গানও নেই। যেটুকু আছে, সেখানেও গান কমানো হয়েছে। 'আমার কেমন কেমন করছে যেন মন' এবং 'ভালবেসে তাই ভালবাসিতে আসে' বনশ্রী সেনগুপ্তের নেপথ্য-কণ্ঠে ভাল লেগেছে। কিন্তু মঞ্চে কল্যাণী মন্ডলের ওষ্ঠ সঞ্চালন ত্রুটিপূর্ণ। মর্জিনার ভূমিকায় কল্যাণী মন্ডলের অভিনয়ও দাগ কাটল না। তেমনই দাগ কাটেনি আবদাল্লার রূপায়ণে উজ্জ্বল সেনগুপ্তর অভিনয়।

আসলে গ্রুপ থিয়েটারের মনোভঙ্গিই কোথাও ছিল না শুভ্রার এর এই প্রয়াসে, ছিল অসফল এক ব্যবসায়িক থিয়েটারের।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

দুঃস্বপ্ন

আপনি যদি গ্রুপ থিয়েটারের নিয়মিত দর্শক হন সে ক্ষেত্রে 'শপথ'-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'দুঃস্বপ্ন' বিষয়ের দিক থেকে আপনার মনে ক্লান্তি এনে দেবে। বিন্যাসে এর যে যে চমৎকারিত্ব তাতেও মুগ্ধ হবার সুযোগ নেই আপনার, কারণ সেসব কিছুই আপনার অদৃষ্টপূর্ব নয়। উপরন্তু কিছু কিছু অংশে কায়িক অভিনয়ের ব্যবহার এত স্থূল যে মুহুর্মুহু এই প্রযোজনা আপনার বিরক্তিভাজন হবে।

'দুঃস্বপ্ন' নাটকের আখ্যানটি এই রকম : সমাজের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার অতীন নেতৃত্ব লাভের স্বপ্নে একদিন সকলের 'রাজা' বনে যায়। ধীরে ধীরে সে উপলব্ধি করে ক্ষমতালোভীদের প্রচলিত সিস্টেমে 'প্রতিশ্রুতি' প্রতারণার উপায় মাত্র, এই স্বৈরাচারের রূপ ও তার পরিণতি দর্শকের সামনে তুলে ধরতে নাট্যকার শ্যামল ভট্টাচার্য যে সকল চিত্র ব্যবহার করেছেন নির্দেশনা কিংবা অভিনয়ে অভিনবত্ব থাকলে হয়তো সে সব এই নাটকে সপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো, কিন্তু চিত্রগুলোর সবই কম বেশি অনেক 'জনপ্রিয়' প্রযোজনার নিষ্ফল অনুকরণ মাত্র যা দর্শকদের ক্লান্ত করে, কোনো কোনো অংশে বিরক্ত। পুরোহিত চরিত্র দুটির প্রবেশ-প্রস্থান, সংলাপ প্রক্ষেপণ, সহায়কের অভিনয়ভঙ্গি, মায় সাংবাদিকের ফটো তোলা ইত্যাদি সব কিছুই উপস্থাপনার ব্যাপ্তি বারবার নষ্ট

দুঃস্বপ্ন নাটকের একটি দৃশ্যে রাজা ও শেখর

করেছে। কেন করেছে তার উত্তরে বলি এদের চারিত্রিক দুর্বলতা, যা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নাট্যকারের অভিপ্রায়, তা তারই চপল নির্দেশনায় বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। এসব চরিত্রে অভিনেতারাও খুব একটা পোক্ত ছিলেন না ঠিক, কিন্তু রাজা বেশে মোহন ব্যানার্জী, যুব নেতার ভূমিকায় শ্রীকান্ত চ্যাটার্জী ও বণিজ্য প্রধান রূপে রঞ্জিত চ্যাটার্জী স্ব স্ব চরিত্রে উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে সার্থক হন না তা অনেকটা এই কারণেই। তুলনায় সংলাপ উচ্চারণে দু-একবার হোঁচট খেলেও বলাই মালের রূপদানে 'শেখর' চরিত্রটি কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতা দাবি করতে পারে। নির্দেশনার চাপল্য একমাত্র তাঁকেই বিশেষ স্পর্শ করেনি। অবশ্য মূক অভিনয়ে তিনিও কিছুটা মাত্রা ছাড়িয়ে যান।

নাটকে ব্যবহৃত শ্যামল ভট্টাচার্যের সুর ও কমল মল্লিকের আবহ অন্যান্য সহযোগিতার তুলনায় গভীর, দায়িত্ববাহী

দোহাই! হাসবেন না

রূপনায় রতনকুমার ঘোষের 'দোহাই! হাসবেন না' নাটকটি সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন প্রেরণা নাট্যগোষ্ঠী। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলার নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় নাটকটির বিষয়। নগরকেন্দ্রিক এই নাটকে নাগরিক শোষক ও শোষিতদের মধ্য থেকেই এর চরিত্রগুলো এসেছে। সমাজের এক শ্রেণীর শক্তিশালী শঠ ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধিতে শিকার হিসেবে তাদেরই গ্রহণ করে যারা জীবনে বাঁচতে চায় শিক্ষা ও ভব্যতা অবলম্বন করে।

এই শিক্ষা সেই শিক্ষা যা যুবক-সম্প্রদায়কে শান্তজীবন থেকে পলায়নমুখী করে তোলে। এই ভব্যতা সেই ভব্যতা যাতে মেরুদন্ড সবল হয় না। নাট্যকারের এই বক্তব্যটি প্রক্ষিপ্ত হয়ে আছে পিসীমা চরিত্রে। বয়স যাকে ন্যুব্জ করেছে কিন্তু চেতনা রেখেছে ঋজু।

যেহেতু তাৎক্ষণিক বাস্তবতা কোনো শিল্পকেই কালোত্তীর্ণ করে না, তাই আপাতদৃষ্টিতে রতনকুমার ঘোষের বাস্তববাদী কিংবা সমাজ সচেতন নাটক 'দোহাই! হাসবেন না' বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা ম্রিয়মান এবং মামুলী ঠেকে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে, নাটকে এমন কোনো চরিত্র পাই না ঘটনাবিন্যাসে যা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে; নাটকে এমন কোনো সংলাপ পাই না যা বুদ্ধি-প্রধান চেতনায় আঘাত হানে। নাটকের এই দুটি প্রেক্ষাপটে উপস্থাপনা ও অভিনয়ের শিল্পচাতুর্য হয়তো ঢাকা থাকা যেত, কিন্তু সংলাপ প্রক্ষেপণ ও অভিব্যক্তিতে এর সরূপ যতটা বাস্তবিক হওয়া দরকার, স্বীকার করতে পারছি না 'প্রেরণার' নাট্যকর্মীরা এখনো সেই মানে পৌঁছতে পেরেছেন। বরং একদিকে বৈশিষ্ট্যহীন নির্দেশনা, অন্যদিকে বিস্তৃতিহীন কণ্ঠে শিল্পীদের ক্লান্তিকর পাঠ নাটকটিকে আগাগোড়া পানসে ও বাসী করে তোলে। অনিল মুখার্জী নির্দেশকের মঞ্চপরিকল্পনা সামগ্রিক উপস্থাপনায় যে ডায়মেনশন আনতে চেয়েছিল শিল্পীদের দুর্বল অভিনয়ে তার মর্যাদা রক্ষা হয়নি। এরই মধ্যে পিসীমা চরিত্রে শীলা চক্রবর্তী কিছুটা ব্যতিক্রম ছিলেন, অন্তত দুটি ক্ষেত্রে তিনিই নাটকে দুটি উজ্জ্বল মুহূর্ত রচনা করেন। মালার ভূমিকায় পর্ণা চক্রবর্তী ও ভোলা রূপে জয়দেব সেনগুপ্ত আরেকটু মনোযোগী হলে ভালো অভিনয় করতে পারেন, অন্তত সে সম্ভাবনা তাঁদের মধ্যে রয়েছে। এদিন অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচাইতে অনুপযুক্ত চন্দন সেন।

কোলকাতায় গোপাল ভাঁড়

'ভাবনা' প্রযোজিত 'কোলকাতায় গোপাল ভাঁড়' নাটকটি এক কথায় বলতে গেলে জনৈক নাট্যকারের (বা... ভট্টাচার্য) এক অতি কষ্ট-কল্পনা। পেশাদারী কি অপেশাদারী আপনি থিয়েটারেরই দর্শক হন না কেন এ 'প্রগতিশীল' (?) নাট্যপ্রয়াস আপনাকে খুশী করবার ফিকিরে বিভ্রান্ত করে দেবার বহুমুখী কারবার ফেঁদেছে। বিনোদন, নীতিবাক্য, ভাঁড়ামো ও আবেগের সংমিশ্রণে তৈরী এ 'ভেলপুরী' হয়তো আপনার পছন্দ উপাদেয় ঠেকত যদি এর উপকরণগুলো হত টাটকা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে স্বর্গপ্রাপ্ত গোপাল ভাঁড়ের মর্ত্য ভূমিতে পুনরাবির্ভাব। গোপাল বাঙালী ছিল বলেই সম্ভবত তার এই মরলোক 'পুণ্যদর্শন' কোলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবতাররূপী এই গোপাল সারা নাটকে তার যে লীলা প্রদর্শন করেছে (মায় ভুঁড়িতে হস্তলেপন অবধি) তাতে আপনার মনে হতে পারে সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে গান্ধীবাদ বা মার্কসবাদ ইত্যাদির তুলনায় গোপালবাদই শ্রেষ্ঠপথ। অন্যদিকে নাটকের শেষ দৃশ্যে একটি ছিনতাইকারী পরিবারের যে শাপমোচন ঘটে এবং তার জন্য কৃতজ্ঞতাবশত সেই পরিবারের সকলে গোপালের পাদমূলে বসে যে ভাবে আশীর্বাদপুষ্ট হয় তাতে অবতারপ্রিয় বঙ্গনারীরা যদি গোপাল ভাঁড়ের নামে মাসের আরেকটি দিন উপোসের জন্য ধার্য করেন তাহলে তার সমস্ত কৃতিত্বই সেদিন স্টার থিয়েটারে উপস্থিত 'ভাবনা' নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যকার নির্দেশক ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রাপ্য।

রাধা দাস

আপনি কি একটি সকেটে অনেকগুলো প্লাগ লাগান?

লাগাবেন না!

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির অপব্যবহার থেকে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সম্ভব। এ থেকে আপনার ঘর ও পরিবারের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে!

বিদ্যুতশক্তিকে আপনার সেবায় নিযুক্ত করুন, আপনার ক্ষতির জন্যে নয়।

২. একই ইলেকট্রিক পয়েন্টে অনেকগুলো সরঞ্জাম লাগাবেন না। অত্যাধিক বোঝা বা 'ওভারলোডের' জন্যে আগুন ধরতে পারে।

১. সকেটে কখনও খোলা তার গুঁজে লাগাবেন না। প্লাগ ব্যবহার করুন।

৩. কেবল আনুপাতিক হারের ক্ষমতা অনুযায়ী ফিউজ-ই ব্যবহার করবেন।

৪. 'নিজে-হাতে-করা'র জন্যে ইলেকট্রিশিয়ান হবেন না। মেরামতের জন্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ান ডাকুন.।

৫. ক্ষয়ে যাওয়া তার বা ভাঙা প্লাগ আর সুইচ-বদলে নিন।

৬. গরম হয় এমন সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে কাপড় টাঙান।

কেটে নিয়ে রেখে দিন

এল পি এ সব-সভ্যবাদী লোকেদের সঙ্গে কাজ করতে চায় এবং চায় আপনিও এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুগ্রহ করে বিস্তারিত বিবরণের জন্যে লিখুন।

ক্ষতি নিবারণ করুন। সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলুন।

লস প্রিভেনশন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ,

ওয়ার্ডেন হাউস, ফিরোজশা মেহতা রোড, বম্বে ৪০০ ০০১।

CASLPA-8-244 BN
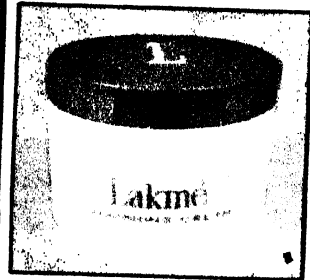
হরলিক্‌স

রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্‌স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে।

হরলিক্‌স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু, যে আপনাকে এত বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্‌স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সদ্‌গুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্‌সকে। সে জানে, হরলিক্‌স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্‌স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

"হরলিকস পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

হরলিক্‌স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্‌স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।
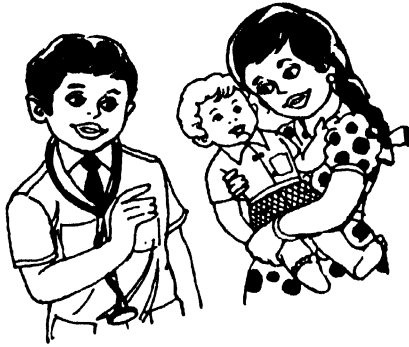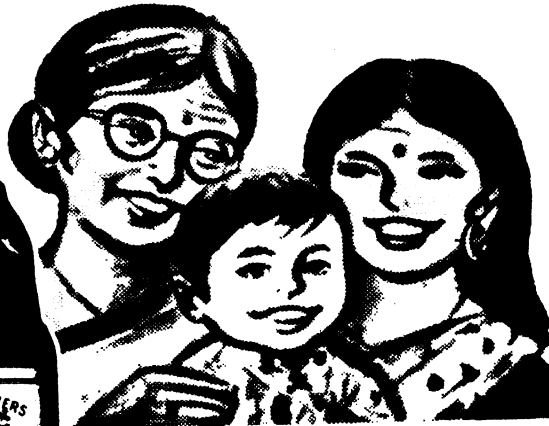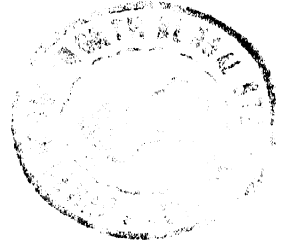
উডওয়ার্ডস্
গ্রাইফ ওয়াটার

শতাধিক বছর ধরে বিচক্ষণ মায়েরা নির্ভর করে আসছেন।

পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, বদহজম, উদরাময় এবং দাঁত ওঠবার সময়ে অস্বস্তি হলে উডওয়ার্ডস্ খাওয়ালে বাচ্চারা এ সব থেকে আরাম পায়।

CAS OPPL.1.77 BN

চিঠিপত্র

া সাহিত্যে মুসলমান

১শে বৈশাখ ১৩৮৬ সংখ্যার
-এ রশীদ আল-ফারুকীর
নিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান :
ঐতিহাসিক সমস্যা" শীর্ষক
ট যেমন মনোজ্ঞ তেমনি যুক্তিপূর্ণ
। লেখকের সত্যানুসন্ধানের নিষ্ঠা
নীয়। এ-বিষয়ে দু'একটি
সা আছে।

ধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী
মানদের কৃতি সম্পর্কে শ্রীফারুকী
বা করেছেন তা অগ্রাহ্য করা সম্ভব
তবে তাঁর উক্তি "একথা তো কোনো
ায় অস্বীকার করা যায় না যে,
কয়েক শতাব্দী আগে যে-সম্প্রদায়
আগমন করেছেন এবং এদেশকে
করে নিতে চেষ্টা করছেন তাঁদের
এ জাতীয় অবদান অভূতপূর্বই"
তথ্যসন্ধানে সমর্থিত বলে আমার
হয় না। লেখক তাঁর প্রবন্ধের
ধ্যে 'আসরাফ' এবং 'আতরাফ'
দুই উচ্চাবচ শ্রেণীর উল্লেখ
ছেন অবশ্য। আলাওলের পদ্মাবতী
দু'একখানা আরাকানী সভা-
ত কাব্য অবশ্য আসরাফী অনুগ্রহ-
, কিন্তু লোকায়ত গীতিকবিতার
ভার ময়মনসিংহ গীতিকা এবং
ন্য সংগ্রহে জড়ো হয়েছে, তা
ন্দেহে একান্তই আতরাফী।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই আতরাফদেরাই
জী কী? এ'দের কেউ কি কোনো-
ইরান-তুরান-আরব দেশ থেকে
বাঙলার গ্রামাঞ্চলে চাষের হাল
ছলেন? না, এ'রা হিন্দু নামের
ক বেড়ায়-ঘেরা একটি নানা ধর্ম-
াসের নানা জাতি বর্ণের সমাজ-
বেশের একটি বিদ্রোহী অংশ।
ত, বাঙালীর হিন্দু ধর্ম
সমাজের গঠন ও রূপ
াবর্তের হিন্দুদের থেকে এত ভিন্ন
যে "বিশুদ্ধ" আর্য ধর্মের নিষেকের
য় গৌড়াধিপ বল্লাল সেন কনৌজ
ক পঞ্চকুলীন ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ
স্থকে আমদানি করেছিলেন।

তারিখের নিরিখে দেখা যায়,
লাদেশে বৌদ্ধ পাল রাজবংশের লোপ
১১৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি
য়ে। তারপর সেনবংশের রাজত্বকালের
শতবর্ষ পার হবার আগেই বখতিয়ার
লজির গৌড় অধিকার এবং তুর্কী-
ান রাজত্বের শুরু। আর্যধর্ম বাঙালী
কিক হিন্দুসমাজে প্রবেশ করার
সর পেল কই? কিম্বদন্তীতে গুপ্ত
ার (পঞ্চম শতাব্দীর শেষপাদ
ন্ত) এবং তার পরবর্তী শশাঙ্ক
া (অষ্টম-নবম শতাব্দীতে) কিছু
ুদ্ধ" আর্যধর্মীদের আগমন সত্ত্বেও
া বৃহৎ সমাজের অংশীভূত হনান,
া হয়েছিলেন তাঁরা লৌকিক হিন্দু-
বিশ্বাসের সঙ্গে আপস-রফা করে
ালী মার্কা হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন—
া উচ্চবর্ণের এবং বিদ্যার উৎকর্ষের
রাজার অনুগ্রহভাক। গৌড়াধিপ
সন শাহ-র সমকালে এ'দের রচিত
লকাব্যগুলিতে এর প্রমাণ মেলে।

কিন্তু গ্রামীণ হিন্দু সমাজে প্রচলিত
ধর্মের রূপ ছিল একেবারেই ভিন্ন। পাথর, গাছ, সাপ, মারী, ভূত—এসব আদিম বিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন শাক্ত, ভক্তিবাদী বিশ্বাসের কিছু কিছু উপাদান মিলে একটি বিশিষ্ট ধর্ম-বিশ্বাসের নকশীকাঁথার উদ্ভব হয়েছিল যা অঞ্চল থেকে অঞ্চলে একটু একটু ভিন্নরূপের ছিল। এই বিরাট গ্রামীণ সমাজ—একে কোন অর্থে হিন্দু বলা যায় তা পণ্ডিতজনের বিচার্য। অবিসংবাদিত তথ্য এই যে, এরা "অস্পৃশ্য" শূদ্র এবং ক্ষমতাসীন উচ্চ-বর্ণোদ্ভবদের পদদলিত ছিল। এই অস্পৃশ্যতারও স্তরভেদ ছিল (এখনও আছে)।

আমার বক্তব্য, এই "অস্পৃশ্য" শ্রেণীর লোকরাই বাঙালী মুসলমানদের শতকরা নব্বইজনেরও বেশী ছিল। এরা ইসলামী ধর্মমত মেনে নিলেও আরব-তুরানের ইসলামী সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেনি, লৌকিক ধর্মবিশ্বাসগুলিকেও বর্জন করেনি। রাজসভার আওতায় রচিত কাব্যের ভাষাতে সংস্কৃত এবং আরবী-ফার্সির নিষেক থাকলেও লোক-সাহিত্যে গ্রামীণ কথ্য ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে; এবং ষাট বছর আগেও (তার কিছুকাল পরেই আমার মহানগরে নির্বাসন হল) ভৈরব-পসরের নৌকোর মাঝিকে কাছি খোলার সময়ে গংগা জরিয়া, পাঁচপীর এবং বদরুদ্দিন গাজীর দোয়া মানত করতে দেখেছি।

আমার মোট বক্তব্য এই, আতরাফ-দের মানসে লৌকিক হিন্দু এবং ইসলামী বিশ্বাসের যে অনস্তুষ্টিকর পাঁচন—একে সমন্বয় বলা ঠিক হবে কিনা বলতে পারি না—গোড়া থেকেই বর্তমান ছিল, মধ্যযুগীয় বাঙালী লোকসাহিত্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে। একমাত্র আরাকান রাজসভার প্রাংগণ ছাড়া অন্যত্র আশরফী কাব্যপ্রতিভা স্ফূর্তি পায়নি। মুসলিম লোকসাহিত্যে হিন্দু বিদ্বেষের শুরু কবে থেকে হয়েছে আমি জানি না, এ নিয়ে কোনো অনু-সন্ধান হয়েছে কিনা তাও জানি না। এই সময়টির হদিশ পেলে এর মূলগত কারণগুলি মোটামুটি নির্দেশ করা সম্ভবপর হবে মনে হয়। আসরাফ শ্রেণী ভিন দেশী সংস্কৃতির পরিপোষক ছিলেন এবং বাংলা ভাষা ব্যবহারও করতেন না। তাঁরা হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের চেষ্টা বলতে গেলে আদৌ করেন নি। রাজশক্তি সর্বদাই গণশক্তি থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে। আরব-তুরানের গৌরবকে জনগণের মধ্যে প্রচলনের কাজ তাঁরা মোল্লা-মৌলবীদের দিয়ে করাতেন। ফলে এমন একটি কাল্পনিক, ধর্মভিত্তিক "আরব" উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল যার তুলনা পাওয়া কঠিন। শ্রীফারুকী ঠিকই লিখেছেন, রাজশক্তি হারানোর পর শত বর্ষাধিক কাল বাঙালী আশরাফরা মোহ্যমান হয়েছিলেন, তবে খানদানি সংস্কৃতি বজায় রেখে চলেছেন সাধ্য-মতো। সমন্বয়-চেষ্টা না করার জন্য অবশ্য একা তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। দিল্লীর নামকাওয়াস্তে সাম্রাজ্যের পতনের পরেই বাঙালীমার্কা ন্যাশনালি-জম ছিল একেবারে রিফর্মড হিন্দুবাদের গোত্রান্তর। কিন্তু সেসব কথা থাক। লক্ষণীয় বিষয়ের একটির উল্লেখ করে

শেষ করি।

"বিষাদসিন্ধু"। লেখক জন্মসূত্রে আশরাফ, কিন্তু তাঁর বাঙলাভাষায় সাহিত্যকৃতি অতুলনীয়। তেমনি স্বদেশী যুগে জনৈক শিরাজী-উপাধিভূষিত বাঙালী আশরাফের হিন্দুদের বিরুদ্ধে কুৎসাসর্বস্ব উপন্যাসগুলি মুসলিম শিক্ষিত সমাজে বেশ চলেছিল। আমার সহপাঠী এক মুসলমান বন্ধু বলেছিলেন, তোদের বঙ্কিমবাবুর থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে। এই বিদ্বেষের কারণ কি শুধু রাজনৈতিক? শুধু ধর্মভিত্তিক? প্রশ্নটা এসে পড়ে, কারণ সাহিত্য তো সর্বাঙ্গীণ জীবনের একটি বিশেষ প্রকাশমাত্র।

শচীন্দ্রলাল ঘোষ
নয়াদিল্লী

॥ ২ ॥

রশীদ আল ফারুকী লিখিত একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষায় (দেশ ৫ই মে '৭৯) সাহিত্যে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণগুলো সবিস্তারে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রবন্ধের শেষে বলা হয়েছে বাঙলা সাহিত্য চর্চায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার জন্যে সমসাময়িক হিন্দু ও মুসলমান কেউ কারুর চেয়ে কম দায়ী নন। বিচারকের ন্যায়দণ্ড হাতে নিয়ে যাঁদের দায়ী করা হলো তাঁরা সত্য সত্যই কতখানি দায়ী ছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে।

মুসলমানরা তথাকথিত ঐতিহ্য-চেতনা পরিত্যাগ করে যদি ইংরাজী শিক্ষায় পণ্ডিত হতে পারতেন এবং হিন্দুদের সহানুভূতিযুক্ত উৎসাহ পাওয়া যেত তা হলে কি আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় মুসলমান সাহিত্যিকদের দেখা পেতাম? সমীক্ষায় এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার প্রশ্রয় আছে বলেই মনে হয়। বাঙলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্যায়ন কি ভিন্ন-ভাবে হতেই হবে?

সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষার নাড়ীর যোগ অত্যন্ত সুগভীর হলেও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যিক জন্ম নেন এরকম খবর অন্তত আমাদের জানা নেই। বাঙলা সাহিত্যাকাশে চিরভাস্বর রবি, চন্দ্র সেরকম কোন কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিতেন তাহলে আমরা কি কেশী করে গর্ব অনুভব করতাম? আমি যদি সত্যিকার মনে-প্রাণে বাঙালী হতে পারি তা হলে বাঙলা সাহিত্য-ভাণ্ডার যাঁদের অবদানে পরিপূর্ণ তাঁদের নিয়ে গর্ব করার অধিকার থাকবে না?

সমগ্র আলোচনায় সাহিত্যচর্চায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার ঐতি-হাসিক কারণগুলো আলোচিত হলেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সত্যকে স্বীকার করা হয়নি। সেই বাস্তব সত্যটি হলো, বাঙালী মুসলমান-দের পূর্বপুরুষগণ যাঁরা ধর্মত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন নিম্নবর্ণের হিন্দু অথবা বৌদ্ধ। তখনকার দিনে বর্ণ... হিন্দুদের (বুদ্ধিসম্পন্ন, ঐশ্বর্যশা... কিছু সংখ্যক যদি মুসলমান হ... তা হলে তাঁদের ঘরে কি কিছু বি... সাহিত্যিকের দেখা পাওয়া যেতো না?

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগেও নিম্ন... বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে বাঙালী মুস... মানদের শিক্ষা সাহিত্য আর্থিক ব্যবধ... চোখ পড়ার মত?

প্রবন্ধকার সেই সব দিনের দ... অশিক্ষিত মুসলমানদের সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন, বর্তমান ব... নিরক্ষর দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান সম্প... তা সবিশেষ প্রযোজ্য।

নজরুল ইসলাম
হাওড়া

সিলভিয়া প্ল্যাথ

সিলভিয়া প্ল্যাথের অকালমৃত্যু... যে-কাহিনী কেতকী কুশারী ডাইসনে... রচনার (১৭-২-৭৯), এবং পত্রলেখকদ... পত্রের বিষয় (২৪-৩, ৫-৫, ১২-৫) তাতে সকলে ঐ মহিলা-কবির আত্ম-হত্যার ব্যাপারে একটি যে সম্ভাব্য দিক নিয়ে চিন্তা করতে ভুলে গেছেন, আমি সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীমতী কুশারী ডাইসন লিখছেন—"মনোরোগবিশারদদের হস্তক্ষেপ তাঁর পক্ষে শুভ হয়নি" (১৭-২); "মনো-রোগ বিশেষজ্ঞকে সিলভিয়ার পছন্দ হয়নি"; শক "থেরাপির সময় অরেলিয়াকে কিছুতেই রোগীর কাছে থাকতে দেওয়া হয়নি" (১২-৫) ইত্যাদি। এসব থেকে কি মনে হয় না যে, মহিলা-কবির যন্ত্রণার পিছনে মনোচিকিৎসকদের তাড়না থাকতে পারে?

শ্রীমতী কুশারী ডাইসন গ্রন্থ-সূচীতে মহিলা-কবিটির "Schizoid" অবস্থার বিশ্লেষণের জন্য R. D. Laing-এর প্রথমকালের গ্রন্থ "The Divided Self"-এর উল্লেখ করলেও নিজে মনঃ-চিকিৎসক হয়েও পরবর্তী কালে Laing ঐ চিকিৎসার অন্তর-শায়ী ধর্ষকামের (Sadism) স্বরূপটি যে তাঁর বিভিন্ন রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন, সেইসব রচনার সঙ্গে লেখিকার নিজের পরিচয় আছে কিনা জানাননি। Laing এবং Szasz ও Cooper ইত্যাদি অনেকেই একদা "অ্যান্টি-সায়াকায়াট্রি" বলে একটি কথা ও আন্দোলন চালু করেন। লেইং লিখছেন যে, মনঃ-চিকিৎসায় সাধারণত যা চাওয়া যায়, তার ঠিক উল্টোটাই পাওয়া যায় ("The Example of Pschiatry" অংশ; "The obvious" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) প্রশ্ন থাকে যে, রোগিণীকে বাঁচাবার নাম করে মনঃ-চিকিৎসকেরা তাঁকে আবার, আরো জোর করে, আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেননি তো?

এ বিষয়ে তথ্যাদি জানালে কেতকী কুশারী ডাইসনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

দীপক ভট্টাচার্য
রাজপুর, ২৪ পরগনা

যুগ ঃ সমালোচকের

তিবাদ পত্রটির প্রথম অনুচ্ছেদে বাবু কিছু অবান্তর কথা ন। ব্যাপারটিকে তিনি যেভাবে ত পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন তাতে পর্কে কোন বাদানুবাদে যেতে স্পৃহা নাই। (দ্রঃ দেশ, ২৩ জুন) আমার সমালোচনায় তিনটি মূল ছিল। প্রথমত, "অগ্নিযুগ" গ্রন্থে মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য রচনা অন্তর্ভুক্ত সম্পাদককে প্রশংসা করা হল। দ্বিতীয়ত, শহীদদের মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাঁর সূত্র া জানাননি কেন? তৃতীয়ত. সাহিত্যিক চিন্তানায়কদের তে অগ্নিযুগ" অংশের লেখাগুলি সম্পাদিত "সর্বদলীয় সংকলন -এ স্থান পেল কোন কারণে? প্রতিবাদ পত্রে প্রথম প্রসঙ্গ কে স্বাভাবিকভাবে তিনি কিছু নি। শেষ প্রসঙ্গ নিয়েও তিনি উচ্চবাচ্য করেননি। বোধ হয়, র বক্তব্যের যৌক্তিকতা তিনি ার করে নিয়েছেন।

তারিখগুলি তিনি কোন সূত্র থেকে য়েছেন তা জানানো থাকলে পাঠক নিতে পারতেন যে তারিখগুলি রযোগ্য কি না। বিশেষত শহীদ লাল মল্লিকের মৃত্যুদিন উল্লেখ ত গিয়ে শৈলেশবাবু নিজে যেখানে করছেন। হ্যাঁ, ভুলটি তাঁরই— াখানার নয়। দ্বিতীয় খন্ডের ৩-৫৫ পৃষ্ঠায় তিনি যে চাল্লশজন দের নামোল্লেখ করেছেন সেগুলিকে র মৃত্যুদিনের ক্রমানুসারে সাজিয়ে। শহীদ মতিলাল মল্লিকের সঠিক রখটি (১৫-১২-১৯৩৪) সম্পর্কে শবাবু সচেতন থাকলে তা ঐ কায় ক্রমানুসারে ১৯ নম্বরে খিত না হয়ে ২৮ নম্বরে অর্থাৎ ঞ্জীবন ঘোষের (মৃত্যু ঃ -১০-৩৪) নামের পর ছাপা হত ঃ সেক্ষেত্রে যদি সালটি ১৯০০ বলে া হত তবেই তা "ছাপার ভুল" বলে হত। শৈলেশবাবুর "ভারতবর্ষের ধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তর ভজ্ঞতা থাকা"র জন্যই শহীদ লাল মল্লিকের নামটি কালীপদ াজীর (মৃত্যু ঃ ১৬-২-১৯৩০) র পর এবং সূর্য সেনের (মৃত্যু ঃ -১-১৯৩৪) নামের পূর্বে স্থান করেছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, 'ছাপার ভুল'টি নাকি দ্বিতীয় খন্ডের ০ পৃষ্ঠায় আবার সংশোধন করা য়েছে। এটি তিনি মোটেই ঠিক ননি। ২৫০ পৃষ্ঠায় মোট উনিশটি ক্তি আছে। তার কোথাও ভুল সংশো-র কথা লেখা নেই এবং সেই লেখাটি লেশবাবুরও নয়—তা অন্য এক র রচনা! এবং এটা ভবও নয়। ২৫৪ পৃষ্ঠার র সংশোধন ২৫০ পৃষ্ঠায় া সম্ভব কি করে? পরের কোন পৃষ্ঠায় সংশোধন করা সম্ভবপর, তু তাই বলে চার পৃষ্ঠা পূর্বে! শেষত, ২৫৪ এবং ২৫০—উভয় পৃষ্ঠা যেখানে একই ফর্মার অন্তর্গত (ফর্মা নং ১৬)। এও প্রায় শহীদ মতিলাল মল্লিককে ১৯৩৪ সালের "অপরাধের" জন্য ১৯৩০ সালে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝোলানোর মত ব্যাপার।

পুস্তক সমালোচনায় বলা হয়েছিল যে, শৈলেশবাবুর উল্লিখিত তারিখ-গুলির সংগে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত "হুজ হু অব ইন্ডিয়ান মারটারস" গ্রন্থে উল্লিখিত তারিখগুলির অসংগতি আছে। ভুল-নির্ভুলের কোন প্রশ্ন তোলা হয়নি। এতে শৈলেশবাবুর এত বিচলিত হবার কি আছে? "হুজ হু অব ইন্ডিয়ান মারটারস" গ্রন্থে এমন অনেক তথ্য এবং কিছু শহীদের ছবি প্রকাশিত হয়েছে যা ইতিপূর্বে অন্য কোথাও দেখা যায়নি। ভুল-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বইটির প্রয়োজনীয়তা গবেষকদের কাছে এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে—শৈলেশবাবু তাকে যতই 'উদ্দেশ্যমূলক' বলুন না কেন।

শেষ করার আগে মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। চিঠিতে শৈলেশবাবু অনেক কথাই বলেছেন কিন্তু আসল প্রশ্নের ধারে কাছেও যাননি। তারিখগুলির সূত্র কি? সূত্র জানাতে তাঁর এত দ্বিধা, সংকোচ ও জড়তা কেন? ব্যাপারটি সত্যই রহস্যজনক।

পরিশেষে নিবেদন, এই জাতীয় বই সম্পাদনার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তার একান্ত অভাব বইটির প্রায় সর্বত্র। সম্পাদনা কার্যে কেমন যেন একটা ঢিলেঢালা ভাব। এই ঢিলেঢালা ভাব তাঁর প্রতিবাদ পত্রেও বর্তমান। যেমন, তিনি তাঁর চিঠিতে দু' জায়গায় "তৃতীয় খন্ডের অত পৃষ্ঠায়', 'তৃতীয় খন্ডের তত পৃষ্ঠায় বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি "তৃতীয় খন্ড"কে পেলেন কোথায়? তাঁরই সম্পাদিত 'অগ্নিযুগ' গ্রন্থটির সূচীপত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে তিনি দেখতে পাবেন প্রথম খন্ড (পৃষ্ঠা ১—২৮৩) এবং দ্বিতীয় খন্ডের (পৃষ্ঠা ১—৩৮৭) কথা। "তৃতীয় খন্ড"টিকে তিনি আমদানি করলেন কোথা থেকে! আবার, তিনি চিঠি শুরু করেছেন ঃ "...১৩ই মে সংখ্যা দেশ পত্রিকায় ইত্যাদি।" ওটি ১২ই মে সংখ্যা—১৩ই মে নয়। সত্যি, সন-তারিখের ক্ষেত্রে শৈলেশবাবু বড়ই উদার!

অশোক দাস

কণ্টকল্পিত

৫ই মে দেশ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের 'কণ্টকল্পিত' প্রবন্ধে মাদক বর্জন সম্বন্ধে পাঠ করিলাম। এই সূত্রে মনে পড়ে মণ্টফোর্ড রিফর্মস জাত প্রথম বিহার ব্যবস্থা পরিষদে (লেজিসলেটিভ অ্যাসেমবলিতে) ১৯২০-২১ সালে (সঠিক মনে নাই) মন্ত্রী স্যার গণেশ দত্ত সিং বলিয়াছিলেন (Toddy is a food) (তাড়ি আহার্য বিশেষ)। গরিব লোকেরা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তাড়ি খাইয়া সারা বছরের জন্য দৈহিক শক্তি সঞ্চয় করে। ইহা খুবই সত্য। অবশ্য সব মত্যন্তমু গর্হিতম।

বনবিহারী বসু, পাটনা-৩

প্রকাশিত হল

ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও মলয় দাশগুপ্ত

রচিত

পুষ্পচর্চা-বিষয়ক অনন্য গ্রন্থ

ফুলের বাগান

দাম ২০.০০

সাইত্রিশটি সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বইটি বাংলা সাহিত্যের বহু-অনুভূত একটি বড়ো অভাব পূরণ করবে। ব্যবহারিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ফুলের চাষ করতে যাঁরা উৎসাহী তাঁরাও যেমন, তেমনই নিছক সৌন্দর্য-পিপাসু মন নিয়ে পুষ্পচর্চায় যাঁরা আগ্রহী তাঁরাও একই রকমভাবে উপকৃত হবেন এ-বই পড়ে। এই বইয়ের অন্যতম লেখক ভিক্ষু বুদ্ধদেব ব্যক্তিগতভাবে ফুলের চাষ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সম্পৃক্ত, তাঁর উৎপাদিত ফুলের গাছ প্রতিযোগিতাতেও পুরস্কৃত। ...ঘ কালের অভিজ্ঞতাকে ... লাগিয়ে এই ব্যাপক, ... স্বয়ংসম্পূর্ণ ...ষয়ক বইটি ...নি। অনভিজ্ঞ ...ী মানুষও ...র পছন্দমতো ... ফুলের চাষ ...রবেন। অভিজ্ঞরাও খুঁজে পাবেন বহু নতুন তথ্য, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সঠিক সহায়তা। বাহারি পাতার গাছ, লন, ফুলের বাগানের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সেই পাখি—এ-সব নিয়েও আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই বইতে। দেওয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক নাম, বাংলা পরিভাষা ও প্রচলিত নাম, বাছাই প্রজাতির তালিকা। অজস্র সাদা-কালো ছবি ও মহার্ঘ বহুবর্ণ প্রতিচিত্র সংযোজিত হওয়ায় বইটির আকর্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুবোধ ঘোষের

নতুন স্বাদের উপন্যাস

কালকেতু দাম ৭.০০

সমকালের তারুণ্যকে লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন অস্থিরতার শিকার হতে দেখে এ কালকে ব্যথিত লেখকের মনে হয়েছে অভিশাপের কাল। তাঁর সেই বেদনা এক চিরায়ত শিল্পসৃষ্টির রূপ পেয়েছে এই উপন্যাসে। ব্যতিক্রমচিহ্নিত এই উপন্যাস সুবোধ ঘোষের সৃষ্টিসম্ভারে এক উজ্জ্বল সংযোজন।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ:

বাসরদত্তা ৪.০০ বন উপবন ৬.০০ জিয়া ভরলি ৮.০০ বসন্ততিলক ৫.০০ ভারত প্রেমকথা ১৫.০০ সেই অদ্ভুত অভ্রর্থনি (কিশোর-উপন্যাস) ৫.০০

গৌরকিশোর ঘোষের

অসাধারণ উপন্যাস

গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দু'জনে

দাম ৪.০০

উনিশ শো একাত্তরের মাঝামাঝি। সন্ত্রাস আর আতঙ্কের এক দুর্ভেদ্য বাতাবরণে মোড়া কলকাতার নাগরিক জীবনের নাভিশ্বাস শোনা যাচ্ছে তখন। সেই ভয়ংকর দিনগুলির অনবদ্য চিত্র এই উপন্যাস।

এই লেখকের অন্য কয়েকটি গ্রন্থ:

জল পড়ে পাতা নড়ে ১৫.০০ আমরা যেখানে ৫.০০ সাগিনা মাহাতো ৫.০০ লোকটা ৩.০০

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

শৈলেন ঘোষের

ছোটদের অপরূপ-কথা

বাজনা দাম ৬.০০

ছোট্ট একটি ছেলে। আদর করে মা নাম রেখেছেন—বাজনা। উফ্! কী দুষ্টু, কী দুষ্টু! ছেলে নয় তো, দস্যি। ছেলের জন্য মা একেবারে জ্বালাতন-পোড়াতন। এমন যে দুষ্টু বাজনা, তার হঠাৎ কী হল শোনো। সবাই বলল, তার নামটা নাকি বিচ্ছিরি। বৃষ্টির ফোঁটা বলল, দমকা হাওয়া বলল, বলল সোনা ব্যাঙ আর রাজহাঁস। বলল নদীর জলে সাঁতার কাটা মাছের দল। নামটা বিচ্ছিরি বলেই নাকি বাজনার দেহের মধ্যে ঢুকে গেছে বিচ্ছিরি একটা অসুখ। নামটা পালটে নিলেই নাকি সে অসুখ সেরে যাবে, ভালো হয়ে যাবে বাজনা। লক্ষ্মী হবে, শান্ত হবে, সোনা হবে। কী আর করা! বাজনা অগত্যা বেরুল তার নামের অসুখ সারাতে। সঙ্গী তার কাঠের ঘোড়া। তারপর কী হল? সেই দুঃসাহসিক অভিযাত্রারই এক মনোরম রূপকথা শৈলেন ঘোষের এই আশ্চর্য বই—'বাজনা'।

শৈলেন ঘোষের আরও বই:

আমার নাম টায়রা ৫.০০ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫.০০ ছোট্ট সোনার গল্প শোনো ৬.০০। শীগ্‌গিরই নতুন করে ছেপে বেরুচ্ছে—অরুণ বরুণ কিরণমালা এবং মিতুল নামে পুতুলটি।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সন্তোষকুমার ঘোষের

নতুন গল্প-সংগ্রহ

সন্ধ্যা-সকাল

বিমল মিত্রের

নতুন উপন্যাস

যা ইতিহাসে নেই

দাম ১২.০০

বিমল মিত্র এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কথাকার। তাঁর খ্যাতি আজ উভয় বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা ভারতে প্রসারিত। জনপ্রিয় এই লেখকের নতুন উপন্যাস প্রকাশের খবর তাই পাঠক-মহলে আলোড়ন তুলবে।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ:

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন ১২.০০ পতি পরম গুরু ৩৫.০০ রাগভৈরব ৭.০০ রাজাবদল ১০.০০ নিশিপালন ৬.০০ প্রেম পরিণয় ইত্যাদি ৭.০০ হাতে রইলো তিন ৬.০০ চলো কলকাতা ৮.০০ বেগম মেরী বিশ্বাস ৪০.০০ নিবেদন ইতি ৮.০০ রং বদলায় ৫.০০ রাজা হওয়ার ঝকমারি (কিশোর সাহিত্য) ৮.০০

বিশিষ্ট বই

কিশলয় ঠাকুরের

পথের কবি

বহু অজ্ঞাত তথ্যে সমৃদ্ধ বিভূতিভূষণের অসামান্য জীবনী

দাম ২০.০০

রানী চন্দের

পথে ঘাটে

'পূর্ণ কুম্ভ'-খ্যাত লেখিকার সাম্প্রতিকতম ভ্রমণ কাহিনী

দাম ১৫.০০

মৈত্রেয়ী দেবীর

অচেনা চীন

নতুন চীনের পরিবর্তনের বহু অন্তরঙ্গ ও বিতর্কমূলক বিবরণী

দাম ১৫.০০

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দেখা হয় নাই

বাংলার মন্দির নিয়ে মনোজ্ঞ ও সরস আলোচনা

দাম ২০.০০

প্রকাশিত হল

বুদ্ধদেব গুহর

মহত্তম উপন্যাস

দু নম্বর দাম ৭.০০

সন্দেহ নেই, দু নম্বর বুদ্ধদেব গুহর মহত্তম উপন্যাসরূপে স্বীকৃতি পাবে। এতকাল যাবৎ যা ছিল তাঁর প্রিয় বিষয় এবং যে-বিষয় নিয়ে লেখা আশ্চর্য সজীব সব রচনারাজি তাঁকে দিয়েছে অটল প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি, সেই বিষয় ছেড়ে তিনি সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ নিয়ে এই প্রথম লিখলেন। জঙ্গল নয়, শিকার নয়, প্রেম নয়, এই নতুন বিষয়টি হল দু নম্বরী পৃথিবী। আমাদের চেনা পরিমণ্ডলের সমান্তরাল এক জগৎ এই দু নম্বর জগৎ। সেই জগতে যাদের নিত্য আনাগোনা তারা কেউই আমাদের অচেনা নয়। কিন্তু দু নম্বর কারবারে তাদের ভূমিকাটি কী সে-সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে তেমন স্পষ্ট ছিল ... এই উপন্যাস পড়লেই ... কথা জানা যাবে বুদ্ধদেব গুহ খুব কাছ থেকে এই পৃথিবীর লোক-জনদের দেখেছেন এবং আমাদেরও নিয়ে গেছেন তাদের একেবারে কাছাকাছি সেই জগতে শুধু টাকার গোপন লেনদেনই যে দু নম্বর খাতায় হয় এমন নয়, সামাজিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, প্রেম, প্রতিষ্ঠা, মূল্যবোধ—সব-কিছুতেই, সমস্ত কিছুতেই দু নম্বর দৃষ্টি-ভঙ্গি। সেই জগতের এমন নিখুঁত, নিশ্ছিদ্র চলচ্ছবি বাংলা সাহিত্যে এর আগে কেউ কখনও ফুটিয়েছেন বলে মনে পড়ে না।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

৪৬ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা
১৫ আষাঢ় ১৩৮৬

চীপত্র

রবর্তী আকর্ষণ

ম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
নন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
প্রাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
লকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
নন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
দ্রিত।
ম এক টাকা
মান মাশুল : ত্রিপুরা ১৭ পয়সা
াঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

বিচিত্র সরকারী ভাষাতত্ত্ব

সম্পাদকীয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেপালী ভাষাকে ভারতীয় ভাষা নয় বলে কেন যে মন্তব্য করলেন, সেটা অনেকের কাছে অত্যন্ত জটিল এক রহস্যের প্রশ্ন বলে বোধ হবে। অকাট্য যুক্তির জোর দিয়ে মন্তব্য করতে পারেন বলে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের একটা খ্যাতি রাজনৈতিক মহলে প্রচলিত আছে। কিন্তু সম্প্রতি দার্জিলিং-এ গিয়ে তিনি নেপালী ভাষার গোত্রটাকেই অভারতীয় বলে যে মন্তব্য করলেন, সেটা তাঁর অকাট্য যুক্তিবাদিতার সুনাম বাড়িয়ে তুলবে না। সিকিমের ভারতভুক্তি অসংগত হয়েছে, একদা এই মর্মের উক্তি করে তিনি আবার সেই উক্তির একটা সুভাষিত ব্যাখ্যা নিজেই করেছিলেন। অর্থাৎ সিকিমের ভারতভুক্তি অসংগত পন্থায় নিষ্পন্ন হয়েছে, যদিও এখন আর সিকিমের পক্ষে ভারতভুক্তির বাস্তবতা ছিন্ন করা সম্ভব নয়। লক্ষ করা গিয়েছে যে, তাঁর এই উক্তিটি দেশের দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির প্রসন্নচিত্ত সমর্থন পায়নি। এবং বস্তুত সারা দেশে তাঁর এই উক্তির বিরুদ্ধে সর্বজনীন প্রতিবাদ নীরবে অভিব্যক্ত হয়েছিল।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সহসা একদিন বিশ্ব জনমতের গায়ে পড়ে পরমাণুশক্তির চর্চা সম্বন্ধে ভারতীয় আদর্শের এক বিরাট সংযমাচারের নীতি শুনিয়ে দিলেন, ভারত 'শান্তিপূর্ণ' কাজের প্রয়োজনেও পরমাণু বিস্ফোরণের পরীক্ষা সম্পন্ন করবে না। এই সেদিন তিনি আর-এক ঔদার্যের উচ্চ নীতি ঘোষণা করে বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন যে, পাকিস্তান যদি পরমাণু-বোমা নির্মাণ করে, ভারত তবুও তার অর্জিত পরমাণু-শক্তিকে নির্দোষ ও নিরীহ শান্তিপূর্ণ কর্মোদ্যমের প্রয়োজনে নিয়োজিত করে রাখবে। যোগ্যতা ও সম্বল থাকতেও পরমাণু-অস্ত্র কখনই নির্মাণ করবে না। বিস্মিত ও বিরক্ত দেশবাসীর প্রশ্ন, এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদেরও প্রশ্ন : প্রধানমন্ত্রী কেন গায়ে পড়ে এইসব অংগীকার ঘোষণা করছেন? ভবিষ্যতের ঘটনা কোন্ দাবি নিয়ে এবং কী রকমের সমস্যার রূপ নিয়ে ভারতের জাতীয় জীবনের সম্মুখে পরীক্ষা প্রমূর্ত করে তুলবে, সেটা আজ কারও পক্ষে একেবারে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে অংগীকার উচ্চারিত করবার কোন অর্থ হয় না। প্রধানমন্ত্রীর এই ধরনের উক্তির আত্যন্তিক অসার্থকতার প্রমাণ এই যে, পরমাণু-শক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে সংযমাচারের এরকম উদাত্ত নির্ঘোষ শুনেও কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র এমন বিশ্বাস কোন মুহূর্তেও ব্যক্ত করেননি যে, ভারতের সুমতি সম্বন্ধে সন্দেহ করবার আর কিছু নেই।

নেপালী ভাষার দাবির প্রসংগে অনেক কিছু বলবার আছে। সংবিধানের অষ্টম তপশীলের অন্তর্ভুক্ত না হলে নেপালী ভাষার পক্ষে সমুচিত স্বাচ্ছন্দ্য সম্মান ও সার্থকতা লাভ করতে কী অসুবিধা আছে, সেটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। একদা এই পশ্চিমবঙ্গেরই বাঙালী রাজ্যপাল, শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় নিজের অর্থ ব্যয় করে নেপালী কবি ভানুভক্তের রামায়ণের সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত ও প্রচারিত করেছিলেন। আশা করতে ইচ্ছা করে, আজকের ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেপালী ভাষার প্রতি হরেন্দ্রকুমারের সেই সদিচ্ছার অনুরূপ সদিচ্ছা পোষণ করবেন। নেপালী ভাষাকে যথাসংগত অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করবার পদ্ধতি উদ্ভাবিত প্রচলিত হতে পারে। নেপালী ভাষার ভারতীয় আঞ্চলিক আয়তনের মধ্যে প্রশাসনিক কাজে এবং শিক্ষায় নেপালী ভাষার স্বচ্ছন্দ অধিকার ও প্রতিষ্ঠা চাই।

সিন্ধী ভাষা ভারতের কোন আঞ্চলিক ভাষা নয়। দেশ খণ্ডিত হবার পর সিন্ধু প্রদেশ হতে ভারতে সিন্ধীভাষী হিন্দু জনতার আগমন ঘটেছে। সিন্ধীভাষীরা ভারতের বিভিন্ন কয়েকটি অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমাজ হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে বসতি লাভ করেছেন। তাই ভারত সরকারের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার দায়িত্ব আছে যে, নির্দিষ্ট কোন আঞ্চলিক সীমায়তন নেই এবং সামান্যসংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা ভাষিত, এ-হেন সিন্ধীভাষাকে কেন অষ্টম তপশীলের অন্তর্ভুক্ত করা হলো? দুঃখের সংগে বলতে হয়, প্রধানমন্ত্রী মহাশয় নেপালী ভাষার দাবীকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডিত না করে, কিংবা করতে না পেরে নেপালী ভাষার জাত ধরে নিন্দাবাদ করেছেন। নেপালী ভাষা নাকি অভারতীয় ভাষা। কোন যুক্তিতে? নেপাল নামক এক বিদেশের ভাষা নেপালী, তাই কী? তাহলে তো বলতে হয় যে, ভারতে প্রচলিত বাংলা ভাষাও অভারতীয় ভাষা, কারণ বাংলা দেশ নামক একটি বিদেশের ভাষা বাংলা। সুইজারল্যান্ডে প্রচলিত ফরাসী ভাষাকে সে দেশের জনগণ এবং সরকার কি বিদেশীয় ভাষা বলে মনে করেন? প্রধানমন্ত্রীর উক্তি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং জাতীয় সংহতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। দেশবাসী লক্ষ করেছে যে, তাঁর এক-একটি শিথিল ও অসতর্ক উক্তি নানা বিক্ষোভের ও ক্ষতির হেতু হয়েছে। স্মরণ করা চলে, কয়েকমাস আগে পণ্ডিচেরীর প্রশাসনিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছার বাণী জনসভার ভাষণে ধ্বনিত করে পণ্ডিচেরীর জনজীবনকে বিক্ষুব্ধ করেছিলেন। পণ্ডিচেরীকে তামিলনাড়ুর অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য ভারত সরকার চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। এটা শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের ব্যক্তিগত একটি ঈপ্সা। হতে পারে, এটা ভারতের আরও অনেকজনের ঈপ্সা হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বিনা প্রয়োজনে এবং অপ্রাসংগিকভাবে তামিলনাড়ুর সংগে পণ্ডিচেরীর অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা ঘোষণা করে পণ্ডিচেরীর জনচিত্ত এমনই উত্তেজিত করলেন যে, দাংগাহাংগামায় অনেক সরকারী সম্পত্তি বিনষ্ট হলো এবং পুলিসের গুলিতে চার ব্যক্তির প্রাণও গেল। অকাট্য যুক্তিবাদিতার সুনাম আছে, তবু প্রধানমন্ত্রীর উক্তি কখনও যে যুক্তিহীন হয়ে বিপর্যয়কর অস্বস্তি ও বিক্ষোভ উৎপন্ন করবে, সেটা দেশবাসীর চিন্তার বিশেষ একটি ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কালকাতা আছে কলিকাতাতেই

আমিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা

সর্বেশ্বর
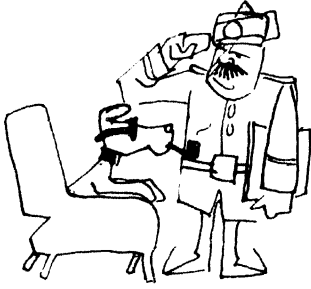
আমি সর্বেশ্বর রায়। আমার মত আরও অনেক সর্বেশ্বর হিদার অ্যান্ড দিদার ছড়িয়ে আছে।

আমার বাইরেটা ন্যাশান্যালিস্ট ভেতরটা ইমপিরিয়্যালিস্ট। নিজের কেরিয়ার ছাড়া আমি আর কিছুই বুঝি না, বুঝতেও চাই না। আমি সর্বেশ্বর। নিজেই নিজের ঈশ্বর।

আমার কাজই হল ডাণ্ডা ঘোরান। আমি জানি মীরজাফরের সঙ্গে জগৎ শেঠের হাত মিললে সব সিরাজকেই ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হবে। আমার স্বরূপ সকলে ধরে ফেললেও আমাকে বা আমার জাতভাইদের ফেলে দেওয়া সম্ভব হবে না কারণ আমরা হলুম গিয়ে বাই-প্রডাকট অফ ইন্ডিপেন্ডেনস। এদেশে প্রডাকটের তেমন মূল্য নেই বাই-প্রডাকটই সর্বত্র জ্বলজ্বল করছে। মলের চেয়ে চুটকি ভারি। মালের চেয়ে পয়মালেরই কদর বেশী।

আমি এইভাবেই তৈরি। যে দেশে যেমন মালের প্রয়োজন। অহমিকা, পন্ডিত মূর্খতা, স্বার্থপরতা, অন্ধতা, নিষ্ঠুরতা, সংকীর্ণতা, মধ্যবিত্তের নীচতা, অ্যামবিসান প্রভৃতি চোলাই করে যে নির্যাস, সেই বস্তুটিই হল 'আমি'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটা ছাপ আমি সংগ্রহ করেছি। বিদেশেও গেছি। কান্ট, হেগেল, হিউম, রাসকিন, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, শেলি, কিটস বায়রন, হোমার পড়েছি, কপচেছি, এখনও কপচাই, কিন্তু যখন চেয়ারে বসি তখন আমি সর্বেশ্বর রায়। তখন আমার মনে হয়, আমি মধ্যযুগের দাস-ব্যবসায়ী। আমি নরমের যম, যমের নরম। আমি সিন্নি দেখে এগোই কোঁতকা দেখে পেছোই। আমি সামনাসামনি লড়িনা। আমার নীতি হল 'ডগবাইট'। পেছন দিক থেকে ঘ্যাক করে কামড়ে দাও। কামড়ে যেন সাফিসিয়েন্ট বিষ থাকে। ঢোঁড়া বা হেলের কামড় নয়। পাগলা কুকুরের মত সাংঘাতিক কামড়। যাকে কামড়াব, সেই আক্রান্ত ব্যক্তি জলাতংকে না মরলেও আতংকে যেন আধমরা হয়ে থাকে।
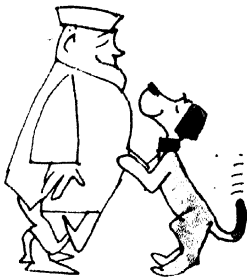
॥ সর্বেশ্বরাতঙ্ক ॥ আমার ভয়ে আতংকে উঠুক। একমাত্র আমার স্ত্রীর কাছে ছাড়া আমি সর্বত্রই ভীষণ গম্ভীর। আমি হাসলে আমার পার্সোন্যালিটি লিক করবে। ভালবাসা বড় দুরূহ অভ্যাস, ঘৃণা অনেক সহজ ব্যায়াম, সহজেই ছড়িয়ে দেওয়া যায়, অভ্যাস করা যায়। অর্থ আর ক্ষমতা ছাড়া আমার কাছে সব কিছুই ঘৃণার বস্তু। সোস্যালিজম, ডেমোক্রেসি এ সব আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি পৃথিবীতে মানুষের শ্রেণীবিন্যাস এইভাবে হয়েছে এবং হবে—ক্ষমতাশালী, আরও ক্ষমতাশালী, আরও আরও ক্ষমতাশালী। আমি জানি তৈলেই সর্বসিদ্ধি। তৈল বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। আমার জনৈক পূর্বপুরুষ বড় খাঁটি কথা বলে গেছেন : তৈল এক প্রকার স্নেহজাতীয় পদার্থ। বাঙালীর শরীর তেল আর জল। তুমি আমাকে স্নেহ কর আমি তোমাকে স্নেহ করি। আমাকে যারা তেল মারে আমি তাদের জন্যে অল্পস্বল্প করে থাকি। অধিকাংশ সময়েই বলি, আচ্ছা, দেখব, দেখব, হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। আশার

পরে তারও ঘাড়ে চড়ি

সরু সুতোয় উমেদারদের ঝুলিয়ে রাখি। আমার চারপাশে তারা থলবল করতে থাকে। একে বলে জিইয়ে রাখা। আমি তো জানি, কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। যতদিন আশায় আশায় রাখব ততদিনই আমার লাভ। আশা চেয়ে থাকা ভাল হেয়ে গেল তো হেয়ে গেল। আমার চারপাশে সব সময় একদল স্তাবক থাকবে, কলাটা মুলোটা দেবে। সেই পরিচিত দৃশ্য, বসে বসে বিস্কুট খাচ্ছি, চারদিকে ঘিরে বসে আছে সারমেয়ের দল। জিভ বের করে হ্যা, হ্যা করছে। কখনও এর দিকে, কখনও ওর দিকে একটা দুটো টুকরো ছুঁড়ে দেবো। লোভে লোভে সব পটাক পটাক করে ন্যাজ নাড়বে, ন্যাজ নাড়ার দল। কিছু সর্বেশ্বর আর কিছু ন্যাজ নাড়া জীব, এই তো ভারত। ভোগা দিয়ে কাগা মারা।

আমার অস্ত্র হল আতংক। স্বাধীনতা আবার কি। জন্মেই তো অর্থনীতির দাস। টাকা যার মোকদ্দমা তার। প্রভু আর দাস, মানুষে মানুষে এই তো চিরকালের সম্পর্ক। মাঝখানে আমরা হলুম গিয়ে ফিলটার পেপার। আমাদের তেল দাও মাগছেলে নিয়ে কিছুদিন টিঁকে থাকবে, আমাদের ন্যাজে
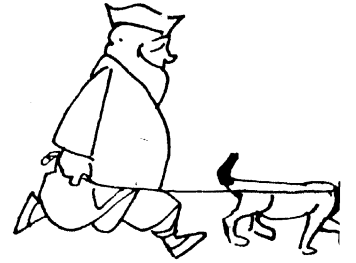
আমি পথ দেখাই

পা দাও ধনে-প্রাণে মরবে। সব সংসারেই এ ছায়া লুটিয়ে আছে।

নব্য যুবক বাড়ির খানা-টেবিলে ব হেসে হেসে মুরগির ঠ্যাং চিবোচ্ছিল। তার হাসি ফিউজ হয়ে গেল। ঠ্যাঙের আর দুরত্ব ক্রমশই বাড়ছে। কি হল তোমার ?

কিছু না, মনের জানালা ধরে দাঁড়িয়ে সর্বেশ্বর।

নতুন সংসার। ছোট ফ্ল্যাট। স্ত্রীর হা খোঁপা, দুল, হার, খানাপিনা, উন্নতি, আমার হাতের মুঠোয়। স্যার, স্যার করবে স্যার পিছে স্যার, সর্বেশ্বর সারাৎসার, সর্বেশ্বর। উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে যেদিকে চালাব সেদিকে চলবে। আমা প্রোমোশান আমার হাতেই ডিমোশান, ট্রা পোস্টিং।

কেমন যেন ভয় ভয় করছে, তাই করবেই তো। শয়নে, স্বপনে সর্বেশ্বর। তিনি তো! তিনি বিরূপ হলেই আমি গন। গ দি উইন্ড।

ফিজিক্যাল টর্চারের চেয়ে মেণ্টাল টর্চার কার্যকরী। মন বস্তুটিকে মেরে ফেল। হলুম মানুষের জায়গিরদার। আমাদের বেব মানুষের সুখের পুডিং তৈরি হচ্ছে। তাল তা দু হাতে চটকাচ্ছি। ভয় দেখাতে বেশ সুটেড-বুটেড একটা জ্যান্ত বুদ্ধিঅলা ম ধমকধামক দিতে বেড়ে মজা। মুখটা কেম যায়। তালু শুকিয়ে গিয়ে জিভে কেম

প্রথমে লেজ নাড়ি

অবনত বিশ্ব আমার দ্বারে
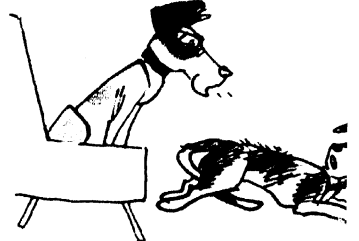
যায়। চোখ দুটো কেমন পাঁঠার চোখের
াকা বোকা, ফ্যাল-ফ্যলে হয়ে যায়।

চাকরিজীবী মানুষ কত ভীতু। ভীতু মানুষ-
ম্যাজে খেলাবার মত আনন্দ দ্বিতীয় আর কি
। চাকরি আছে বেশ আছে। চাকরি গেল
াতে হারিকেন। যাদের কিছুই নেই তারা তো
রা। নেঙটার নেই বাটপারের ভয়। যারা
থেই জন্মাচ্ছে, ফুটপাথেই মরছে তাদের আর
য় দেখাব। আমার খেলা মধ্যবিত্তদের নিয়ে,
। কিছু আছে, আরও কিছু পাবার বাসনা
পেয়ে হারাবার আতঙ্ক আছে। থাক কুকুর
ড়ের আশে। মাড় দিব তোর পৌষ মাসে।

॥ লাগ লাগ লাগ লাগিয়ে বসে আছি ॥ আমরা
র পেছনে সেনকে লাগাই, সেনের পেছনে
ক, চাটুজ্জের পেছনে বাঁড়ুজ্জেকে, বাঁড়ুজ্জের
ন ভটচাযকে। হ্যাঃ দেশ আবার কি। প্যান
ম। গুলি মার। গৌরী সেনের টাকায় গাড়ি
ছ, মোটা মাইনে পাচ্ছি, ট্যুরে যাচ্ছি, উপরি
ছে, তবে আবার কি। দেশ চলবে ট্যাক্সের
য়। স্বদেশের মাঠে ফসল নাই বা ফলল,
শের সাহায্যে পেট ভরবে। যে দলই ক্ষমতায়
ক, আমরা ঠিক লাইনে ফেলে দিয়ে, লাগিয়ে
থাকব। আমরা ম্যাজিক জানি।

॥ সর্বেশ্বরের কেরামতি ॥ আমাদের নীতিই
। ম্যানেজমেণ্টের নামে মিস ম্যানেজমেণ্ট। আমরা
ানুষকে প্রতিদিন টেনেটুনে রাস্তায় নামাব, ফির
ার কোনও ব্যবস্থা রাখব না। পথঘাট, যান-
হন, শান্তি, নিরাপত্তা, জীবিকার ব্যবস্থা সব কিছু
ছেড়ে, এলোমেলো করে রেখে দেব। নিজেদের
বন ছাড়া সকলের জীবনে একটা ঘিনঘিনে অনু-
তি ছড়িয়ে দেব। বেঁচে থাকার চেয়ে মরে
ওয়াটাই হবে সকলের কাছে পরম শান্তির।
মাদের অনুচ্চারিত স্লোগান—জ্বলছে জ্বলবে।
মরা সর্প হয়ে দংশন করব ওঝা হয়ে ঝাড়বার
ন করব। আমরা হলুম কেতু। ছোট ছোট
চকে সমস্যার পিন ফোটানোয় মানুষকে জেরবার
দেব। বড় কিছু, সুন্দর কিছু, মহৎ কিছু
বার অবসর যেন না থাকে। মানুষ ভাববার
বকাশ পেলেই আমাদের আসন টলে যাবে।
সিসটেম', হ্যাঁ, 'সিসটেম', এ দেশ এমনভাবে এমন
টা ভাগ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে যেখানে চক্রাকের মত
মরা গজাবই, কুরে কুরে খেতে থাকব আবহমান
ল ধরে। দার্শনিকদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে
টি শ্রেণী—খাদ্য আর খাদক। জীব, জীবাহার।
জনীতি। রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতির কভি
ালাকত নহি হোগি। 'সাদ' কি বলেছিলেন মনে
ই. Politics teach men to deceive their
...als without being deceived themselves

এক একটা নির্বাচন আসে, জমানা পালটায়, মানুষের
ভাগ্য বদলায় না, শুধু কিছু অজগরের সৃষ্টি হয়।
বাড়ি হয়, গাড়ি হয়, ব্যবসা হয়, পারমিট হয়, ব্যাঙ্ক-
ব্যালেনস হয়। উদাস দার্শনিকের মত পলিটি-
সিয়ান বলেন, খুব হয়েছে এনাফ এবার নেকসট
গ্রুপ কিছুদিন লুটেপুটে নিক। ছেলেবেলায়
সিগারেট কম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখতুম, মেন মে
কাম, মেন মে গো....টেনর কনটিনিউ ফর এভার।
রেজিম উইল কাম, রেজিম উইল গো, সর্বেশ্বরস
উইল কনটিনিউ ফর এভার।

ভাই সকল, দুঃখ কর না, জগতের নীতিই হল—
কিল অর বি কিলড। পরিস্থিতিই মানুষকে রাজা
করে, পরিস্থিতিই মানুষকে প্রজা করে। লুট্‌ লে,
লুট্‌ লে। তোমাদের ক্ষমতা থাকে চলে এস
আমাদের ব্যান্ডওয়াগনে।* আমরা হলুম স্বার্থ
পার্সোনিফায়েড। সর্বেশ্বর হল সেই জাতের প্রাণী
যাদের সম্পর্কে জীববিদ্যার বইতে এইভাবে একটি
অনুচ্ছেদ লেখা যেতে পারে :

মধ্যবিত্ত হইতে উদ্ভূত এক ধরনের প্রাণী।
আকৃতিতে মানুষ, প্রকৃতিতে সরীসৃপ। স্পর্শকাতর,
পরমুখাপেক্ষী অথচ অহংসর্বস্ব। ঘৃণাপ্রবণ
স্বদেশী। অসম্ভব বিদেশপ্রীতি। বিদেশের কুকুর
ধরে, স্বদেশের ঠাকুর ফেলে। বাইরেটা কালো,
ভেতরে পরিপূর্ণ সাহেব। মিস্টার রায় কিংবা
সর্বেশ্বরদা বললে রেগে পাইপ কামড়ায়। রায় সাহেব
না বললে অধস্তনের চাকরি খায়। এরা প্রায়শই
অন্ধ হয়। দৃশ্য জগৎটাকে নিজেদের মত করে দেখে।
অন্যের দেখা দেখা নয়, নিজের দেখাটাই দেখা। [ঠিক
সময়ে অপিসে আসবেন। আজ্ঞে, বাস নেই, ট্রাম
থাকে না, জ্যাম, রাস্তাঘাট কোদলান। সো হোয়াট।
আসতে না পারেন চাকরি ছেড়ে দিন। রিমেমবার
গোপাল ভাঁড়, দ্যাট ফেমাস ম্যান, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে
বলেছিলেন—রোজ সকালে একটা করে সন্দেশ মুখে
ফেলে জল খাওয়া আমার অভ্যাস। সে থাকলেও
খাই, না থাকলেও খাই। কিছু থাক, না থাক নিয়ম
ইজ নিয়ম। আমি গাড়িতে আসি, সো হোয়াট।
একদল গাড়ি চাপবে আর একদল চাপা পড়বে।
একদল খাবে আর একদল উপোস করবে। একদল
প্রাসাদ বানাবে আর একদল থাকবে।]

বিপদে পড়লে প্রভুপত্নীর পা-চাটি

এই প্রজাতির প্রাণীর এই ধরনের জীবনদর্শন।
এরা ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ। ড্রাগন কাল্পনিক
জীব। এরা মানুষের খোলে ড্রাগন। নিঃশ্বাসে
আগুনের হলকা, প্রশ্বাসে বিষ। এরা আদর্শের
কথা, সুব্যবস্থার কথা, সুশাসনের কথা মুখে বলে,
কাজে করে অন্য। সৃষ্টিতত্ত্বে এরা একটি
প্রহেলিকা।

সমাজশরীরে আমি ক্যানসারের কোষ। বিন্দুর
মত ফুটে উঠি তারপর মালটিপ্লাই অ্যান্ড মালটি-
প্লাই। পায়ের কড়ার মত। প্রথমে আঙুলের মাথায়
সামান্য শক্তভাব। ক্রমে ক্রমে গ্যাজ। যতই কাট বৃদ্ধি
রোধ করার ক্ষমতা কারুর নেই। কোন ওষুধও নেই।
সমাজশরীরে আমরা সেই পদকর্ণ। ভেতরে বাড়ি,
বাইরেও বাড়ি। আঙুল থেকে পথ করে করে হাটু
বেয়ে, তলপেট ফুঁড়ে, ওপর পেট হয়ে, ফুসফুস
হৃদয়, গলনালী।

আমাকে শিক্ষায় পাওয়া যাবে, শিল্পে পাওয়া
যাবে, সংস্কৃতিতে পাওয়া যাবে। আমি অর্থনীতিতে
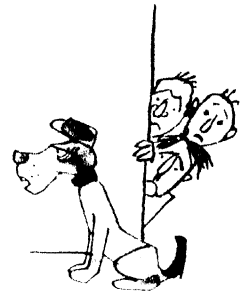
প্রভুর সম্পর্ক পাহারা দিই

কলকাটি নাড়ি, আমি কৃষিতে বেড়ে ওস্তাদি দেখাই,
বিজ্ঞানীদের ডেকে কেতাবীবুলি কপচাই। পদাধিকার
বলে বিশাল রঙ্গমঞ্চের সর্বত্র আমরা গদা ঘোরাই।
কেউ যদি প্রশ্ন করে, ওহে সর্বেশ্বর আর কতকাল!
আমরা বলি, সবুরে মেওয়া ফলে। যদি আবার
বলে, সবুরে সবুরে কটা স্বাধীনতা দিবস গেল ?
আমরা বলি, শাটআপ, দুশো বছরের পরাধীনতার
গ্লানি পাঁচশো বছরের আগে যাবে না। জন্মচক্রে
বারছয়েক পাক মেরে আসুন তখন দেখবেন,
দেখবেন তখন সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং।
এইসব বলি, আর মনে মনে হাসি, অনেক অনেক
বছর আগে এক উর্দু কবি বলেছিলেন—বুন্দুকা
দেশমে ধুর্তকা রাজ।

এইভাবে গ্র্যাজুয়েলি আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে
মেরে ধসে যাওয়া সমাজে সারি সারি কবর তৈরি
করব। চিৎপুরের দোকান থেকে মার্বেল কিনে তার
ওপর চিৎ করে রাখব। লেখা হবে এপিটাফ :

॥ এপিটাফ ॥ হিয়ার লাইজ এ সর্বেশ্বর।
এ'র মনে ছিল একটি বাঁশঝাড়। ইনি স্বদেশের
পশ্চাদ্দেশটিই কেবল দেখেছিলেন। বাঁশের যেমন
স্বভাব। কোনও এক জন্মে স্বদেশের মুখ দেখার
আশায় ইনি শায়িত। ইনি জন্মে দুঃখ দিয়েছেন,
মরে শান্তি দিলেন। তবে শোনা যায়, অক্টোপাসের
বাহু কেটে দিলেও সঙ্গে সঙ্গে গজায়।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিশেষ আদালত
শ্রীমতীর
দুঃস্বপ্ন

সুধাসাগর তীরে

সুরেশ চক্রবর্তী

॥ ৪ ॥

বদল খাঁ সাহেবের জ্যোতির্মণ্ডলে যে কয়টি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক পরিভ্রমণ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন সম্প্রতি স্বর্গত অমিয়নাথ সান্যাল। কোন দিক থেকে যে তাঁর চরিত্র বর্ণনা আরম্ভ করব, তা ভেবে পাই না। বিশেষত ইং ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত, দীর্ঘ এগারো বৎসর তিনি সপ্তাহে দু দিন করে কলকাতায় আসতেন আর আমার সংকীর্ণ গৃহেই অবস্থান করতেন। তাঁর বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাঃ হরিচরণ দত্ত (বাসগৃহ ছিল রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর পাশের রাস্তায়) বহুদিন তাঁর সঙ্গ করেছেন ও সংগীত বা শাস্ত্রালোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন, কিন্তু আমাকে পরোক্ষে বলতেন—'আমি নুড়ি কুড়িয়েই গেলাম, —অমিয়দা আমায় কিছু শেখালো না।' আমার সঙ্গে হরিচরণ কাকার প্রথম সাক্ষাৎপর্ব বেশ অভিনব। আমি তখন থাকি বালীগঞ্জ একডালিয়া রোডে, সামান্য একটা ফ্ল্যাটে। সন্ধ্যায় কর্মস্থল থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে এক কাপ চা নিয়ে বসেছি—অকস্মাৎ এত জোরে কড়া নড়ে উঠল যে মনে হল সমস্ত পাড়াটাই জেগে উঠবে! আমি নিজেই দরজা খুলে দেখি দীর্ঘদেহ, প্রবীণবয়সী এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করছেন—এটা কি সুরেশবাবুর বাড়ি? আমি সবিনয়ে স্বীকার করে জানালাম যে এই অধমের নামই সুরেশ—তখন তিনি বলে উঠলেন যে—আরে তুমি তো আমার চাইতে অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ,—তাই আর আপনি বলব না। আমি সবিনয়ে বললাম—আপনি 'তুই'তে নেমে এলেও কিছু মনে করবার নেই—কিন্তু আমি আপনার কোন্ কাজে লাগাতে পারি? হরিচরণবাবু উচ্চৈঃস্বরে ছাড়া কথা বলতেন না,—তাঁর আওয়াজ বহু দূর থেকেই শোনা যেত। বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন—"তোমাকে দেখতে এলুম।" আমি আবার বিনীতভাবে জানালাম যে আমার বহুদিন বিবাহ হয়ে গিয়েছে—সন্তানাদিও বর্তমান। তিনি এবার স্পষ্ট করে বললেন—কেষ্ট-নগরের অমিয় সান্ডেল নিজে গাড়ি ভাড়া দিয়ে তোমার বাড়িতে এসে দু' দিন থাকছেন আর গানবাজনার তালিম হচ্ছে—এটা তো বিশ্বাস করতে পারিনি তাই স্বচক্ষে দেখতে এলুম। অমিয়দা তো বারেন্দ্র বামুন, বারেন্দ্রের পুরো চরিত্র ওর মধ্যে আছে—ওকে যে নরম করে আনতে পেরেছে, তাকে দেখবার খুব আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। তোমরা তো জানো না, কত সংগীত-পিপাসু ও শিক্ষার্থী এঁর কাছে ঘুরে ঘুরে হতাশ্বাস হয়ে ফিরে গিয়েছে,—দু-চারখানা মুড়কী তান, ও ফান্দা-চক্করের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে হস্তাখানেকের মধ্যেই পালিয়েছে। তুমি ওকে বাঁধতে পেরেছ জেনে বড়ো ভাল লাগছে।

এই ছিল হরিচরণবাবুর প্রথম আলাপের সূত্রপাত—অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, স্নেহমায়াহীন সমালোচক, সংগীতের গভীর রসগ্রাহী বিদগ্ধচিত্ত। M. B. পাস করে ডাক্তারী প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে শুরু করলেন নিজের হাতে কাঁচ ঘষে ঘষে Telescope প্রস্তুত করতে—বেশ বড় একটা তৈরি করে University College of Science-এ দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অকুণ্ঠ সাহায্য ও ভালোবাসা পেয়েছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে। সত্যেনবাবুও বহু রাগ-রাগিণীর খবর রাখতেন,—ভালো এসরাজ বাজাতেন আর সব চাইতে আনন্দের ছিল তাঁর মজলিসী গল্প। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান ও কৃতার্থ যে তিনি আমার ক্ষুদ্র গৃহেও কয়েকবার এসেছিলেন ও আনন্দের হাট বসিয়েছিলেন। বুক-কোম্পানীর মালিক গিরীন মিত্র মশায়ের বাড়িতে সত্যেনবাবু আমাকেও সান্যাল মশায়ের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেখানে ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থাও ছিল, কিন্তু সব চাইতে উপভোগ্য ছিল সান্যাল মশায়ের সঙ্গে সত্যেনবাবুর রাগ-রাগিণীর গতিবিধি, রহস্যময় অন্তর্মুখী ভাব নিয়ে প্রগাঢ় আলোচনা,—সেসব তো ভুলতে পারি না। বিজ্ঞানী মন কীভাবে যে সুরের ঝরনায় অবগাহন করছেন, তা দেখবার মত ছিল। এক সময় বলেছিলেন, আমাদের সংগীতে "সপ্তসুর"—কিন্তু বাইশটি শ্রুতি হবার মূলে তথ্য কেউ কি ঠিক বিচার করতে পেরেছে? এই সাতটি সুর তিন গ্রামে চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ, অঙ্কের হিসাবে তো Circle-এর সঙ্গে π (গ্রীক "পাই")-এর সম্বন্ধ রয়েছে। যা-র মূল্য 22/7, সুতরাং এই দিক থেকে আলোচনা করে দেখো, অনেক সন্দেহ, রহস্য ভঞ্জন হয়ে যাবে।

আবার একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন—"ঘেরাও"-এর আবিষ্কর্তা কে জানো? শ্রীচৈতন্যদেব। নবাবের আদেশে হরিনাম করা বন্ধ হলে তিনি কয়েক সহস্র খোল-করতাল নিয়ে নবাবের প্রাসাদের চারদিক ঘিরে ফেলেন আর সেই হরিনামের ঠেলায় নবাব তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। সুতরাং "বামপন্থীদের" কোনও কৃতিত্ব নেই। এটা সম্পূর্ণ বৈষ্ণবজনোচিত বিধি।

হরিচরণবাবুর নভোদর্শনের নেশা কেটে গেলে তিনি ব্যস্ত হলেন নিজের হাতে "বীণ" তৈরি করতে এবং একটা অপূর্ব বীণ তিনি সান্যাল মশায়কে উপহার দেন আর অন্য আরেকখানা বীণ বিখ্যাত বীণকার সাদিক আলী খাঁকে নজরানা দেন। একটা ছোট্ট এসরাজ তিনি তৈরি করেছিলেন ঠিক সারেঙ্গীর সাইজ—কী অপূর্ব তার জোয়ারী ছিল, আমি নিজে বাজিয়ে দেখেছি। এই বীণ-এসরাজ প্রস্তুত করবার আগে তিনি নানারকম কাঠ ও তাদের চরিত্র নিয়ে খুব পড়াশুনা করেছিলেন। আন্দামান থেকে Padauk নামে একরকম সাদামতন কাঠ তিনি আনিয়েছিলেন, বলতেন এ কাঠ কোনরকমেই বিকৃত, সংকুচিত হয় না, একবার কোনও আসবাব বা যন্ত্র তৈরি করলে তার জোড় আলগা হবে না। আমি কাষ্ঠতত্ত্ব বা কাষ্ঠচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নই, কিন্তু হরিচরণবাবুর উদ্যম ও উৎসাহ অপরিসীম, যতদিন বেঁচে ছিলেন, এই কাঠ পালিশ, জোয়ারী করা নিয়েই সময় কাটাতেন।

কিন্তু যতই বিনয় প্রকাশ করুন, হরিচরণবাবু কিন্তু সংগীতের অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম সমালোচক ছিলেন—তানবাজি, কণ্ঠবাদন সব কিছুই সুরে না ভিড়লে তাঁর কাছে পাত্তা পাওয়া মুশকিল ছিল। কোনো গাইয়ে বা বাজিয়ে সংগীতের আসরে গাইতে বা বাজাতে বসলে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে শুনতেন, যদি কানে পাকা সুর না লেগে থাকে,—মৃদুস্বরে তো কথা বলবার অভ্যাসই ছিল না,—বেশ জোরেই বলে উঠতেন—"দেখো বাপু, আরো কিছুদিন সুরে গাইবার রিওয়াজ করো,—এখনো তোমার মহফিলে বসে গাইবার ইলম্ হয়নি,—মিছামিছি সবার অমূল্য সময় নষ্ট করছ।" আবার সুরের নেশায় মত্ত হওয়ার গল্প বলেছিলেন, শ্রদ্ধেয় রাইচাঁদ বড়ালের বাড়ি মুশতরী বাঈয়ের গান শুনে সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসেছিলেন, হাতের সিগারেট পর্যন্ত টানবার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আমার অসীম দুর্ভাগ্য যে এই গান্ধর্বিকার গান শোনার সুযোগ হয়নি, কিন্তু পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত তিন/চারজন লোকের কাছে একই ইতিহাস শুনেছি। সত্যিকার সুরে পরিণতি ও সিদ্ধিলাভ করলে যে সংগীতরসিককে সুরের অতীন্দ্রিয় লোকের পরম আস্বাদে সবকিছু ভুলিয়ে দেওয়া যায়,—এটা তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা থেকে এটাও বলতে পারি, যে আধার বা দেহ প্রস্তুত না থাকলে, অথবা পদস্খলন হলে এই সুরের সাধনা ও সিদ্ধি জীবন-সূত্র অকালে ছিন্ন করে দিতে পারে,—কারণ আমাদের সংগীতসাধনা ও পদ্ধতি একরকম প্রাণায়াম ও যোগ-সাধনার অঙ্গ বলেই বিবেচিত হয়। মুশতরী বাঈ এর পরে বেশী দিন বাঁচেননি, জানি না পরম স্বরসিদ্ধি তার কারণ কিনা।

আমার গৃহের প্রত্যহ অতিথি অন্য একজন রস-সচেতন সংগীতকুতূহলীর কথাও উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ তিনি উদ্যোগী না হলে এই সপ্তাহে দুদিন করে অমিয়নাথ সান্যালকে আমরা কলকাতায় পেতাম না। ইনি হলেন স্বর্গত ব্রজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী,—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, আবার সেতারে স্বর্গীয় জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শাগির্দ। ব্রজেনবাবু নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে অমিয়নাথের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তিনিই বহু চেষ্টাচরিত্র করে কেয়াতলায় টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে তাঁকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। আমরা সকলেই ব্রজেনবাবুর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তিনি পর্বতকেই মহম্মদের কাছে এনেছিলেন,—নইলে অমিয়নাথের সাহচর্য ও শিক্ষা দুর্লভ ছিল। ঘটনাচক্রে আমাদের ক্ষুদ্র গৃহে ঐ সময় অবস্থান করেছিলেন, এটা আমরা সর্বক্ষণ স্মরণ করে কৃতার্থম্মন্য বোধ করি। অমিয়নাথের বিশাল গবেষণা-গ্রন্থ, Ragas & Raginis নামে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হল সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে—এটাও ব্রজেনবাবুর কীর্তি-ই বলব, কারণ সেই সময় তিনি শিক্ষা বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন ও তাঁর প্রচেষ্টা ভিন্ন এই অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তিনি অকস্মাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, এই ক্ষতি অপূরণীয়,—তাঁর শিক্ষা ভদ্ররুচি ও রসবোধ আমাদের ছোট্ট মহফিলের আলোচনাচক্র অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিদান করেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়,—মহফিলটা বোধ হয় ওপারেই ভালো জমেছে—মধ্যমণি বদল খাঁ সাহেব,—প্রাণপ্রিয় শাগির্দ ভীষ্মদেব, অমিয়নাথ, হরিচরণবাবু, ব্রজেনবাবু—এঁরা বেশ আসর জমাচ্ছেন। তর্কালয়া কেরামত, কানাই দত্ত এঁরাও ওখানে নিশ্চয়ই যোগ দিয়েছেন,—আমরা এপারে শূন্য আসরে সেইসব মধুর স্মৃতিচারণ করে ব্যাকুল, উদাস হয়ে যাচ্ছি। জীবন কতো সংক্ষিপ্ত—আবার কতো বড়ো!

অমিয়নাথ সান্যালের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের কাহিনী বড়ো বিচিত্র ও রসমধুর—কিন্তু এখানে তার বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক। ইতিপূর্বে আমি তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করি ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তির গৃহে দেখা করতে যাই—ওঁরা তখন চিন্তামণি দাস লেনে "দিলীপের জর্দা"-র বাড়িতে দোতলায় থাকতেন। এর পরের শনিবার আমি সকাল-বেলার ট্রেনে কৃষ্ণনগরে গিয়ে হাজির হলাম—পকেটে ছোট্ট একটি খাতাও লুকিয়ে নিয়েছিলাম, সময় ও সুযোগ পেলে তাকমাফিক ওটা বার করে এক-আধখানা গানের আস্থায়ী বা ঠুমরীর মুখ যদি আদায় করতে পারি। High Street,—বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোডে "বল্লভ স্টুডিয়োর" ঠিক উল্টোদিকে বেশ বড় পুরানো ধরনের বাড়ি—ভেতরে অনেকটা জমি,—নানা-রকম ফল-ফুলারীর গাছ রয়েছে,—মনে হল কেউ না কেউ ওগুলির নিশ্চয়ই পরিচর্যা করে। আমার আগমনে উনি

খুব খুশী মনে, সরবে ও সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা/এগারোটা হবে। ওঁর দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া কন্যাদ্বয়কে তালিম দিচ্ছিলেন। প্রথমা কন্যা অনেক আগেই বিবাহিতা,—রেবা মুহুরী নাম,—এখন কলকাতাতেই থাকে,—গজল ও ঠুমরী গানেও বেশ নাম করেছে। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া—বৈজয়ন্তী (বৈজু) ও জয়জয়ন্তী (মঞ্জু) ওরা দুজনেই বাবার কাছে ভালোভাবে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল. —রেবা (ডাকনাম বেটন) বাবার সাংগীতিক সংগ খুব বেশী পায়নি,—কিন্তু রসালো উচ্চাঙ্গ সংগীতের. পরিবেশে তো ওদের জন্ম ও বিবর্ধন, তাই ভালো গান যেন মজ্জাগত হয়েই আছে। বৈজু-মঞ্জুর গান শুনে খুব ভালো লেগেছিল, বিশেষ করে মৌজুদ্দীনের ঢং-য়ে গাওয়া মিঞাকী টোড়ীর অপূর্ব খ্যাল—"সংগর কা করিয়ে"—দুজনেই বেশ সাবলীল কণ্ঠ ও লয়ও পাকা হিসাব রেখে চলেছে। বৈজু এখন দিল্লী রেডিয়োতে গান করে এবং উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। মঞ্জুর গান-বাজনা বিবাহের পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—এখন আবার পুনরুদ্যমে আরম্ভ করার চেষ্টা করছে। ছোট মেয়ে গোপা,—ডাকনাম গোপুলী—একটু ভীরু-ভীরু, ছোট-খাটো মেয়েটি, স্কুলে পড়ে তখন, ফ্রক পরে ঘুরেঘুরে করছে। গানবাজনার আসর ভাঙ্গলে একসঙ্গে বসে সবাই খেলাম। সান্যাল মশাই বললেন, তিনি দুপুরে নিদ্রামগ্ন হন না, কিছু লেখার কাজ বাকী আছে; তিনটের সময় উনি চা খাবেন, সেই সময় আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন। আমি বিশ্রাম করবার ছলে ভেতরের অংশে গিয়ে কাকীমার সঙ্গে একটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম,—দেখি সেই চিরন্তন অভিযোগ,—"উনি তো কোনও লোককে শেখাতে চান না,—কতো লোক এসে এসে ফিরে গিয়েছে! কতো সভা বা অনুষ্ঠান থেকে আহ্বান আসে,—উনি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তোমার সম্বন্ধে কিন্তু খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবার এসে —যাক্ তোমরা যদি একটু ওঁকে বাইরে বের করতে পারো, তা হলে তো আমরা খুশীই হব।" বলা বাহুল্য, আমাদের একান্ত ও সাগ্রহ চেষ্টায় অমিয়নাথকে আমরা খানিকটা জনসমাজের মধ্যস্থলে টেনে আনতে পেরেছিলাম, কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার "কূর্মপ্রবৃত্তি" দেখা দিল এবং ধীরে ধীরে তিনি আপনাকে এক কঠিন বর্মে আচ্ছাদিত করে নিয়ে কলকাতা থেকে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

তিনটের সময় বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি ধূমায়মান দু' কাপ চা নিয়ে উনি বসে আছেন আমার প্রতীক্ষা করে,—সামনে প্রকাণ্ড এক পাণ্ডুলিপির ফাইল। তখন তাঁর Ragas & Raginis বইটা Orient Longmans থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, তারই প্রুফ দেখছেন বসে বসে। সেই প্রকাণ্ড পাণ্ডুলিপি,—প্রায় পাঁচশ' পৃষ্ঠার ওপর টাইপ করা manuscript; তার থেকে সংক্ষিপ্ত করে এই গ্রন্থখানি ছাপা হচ্ছে। ওরকম কঠোর হস্তে সংক্ষেপ করার ফলে প্রকাশিত গ্রন্থখানি সর্বসাধারণের বোধগম্য হতে কষ্ট হবে,—এটা দেখেই বুঝলাম। অবশ্য গ্রন্থের বিষয়-বস্তু যা ছিল, তাও সাধারণ সংগীতশিল্পীর পক্ষে সহজবোধ্য হবে না,—তার জন্য প্রচুর টীকাটিপ্পনী প্রয়োজন—কে সেই কষ্ট স্বীকার করবে? আমার মনে আছে American এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন গবেষক ও Hawaii থেকে অন্য আরেকজন শিক্ষার্থী ওঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমাদের বাড়ি এসেছিল। তারা তাদের Universityতে এই বইটা পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, কিন্তু স্থানে স্থানে কঠিন বোধ হওয়াতে লেখকের কাছে উপদেশ চাইতে এসেছিল। অবশ্য আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি ও তারাও মনে হল উপকৃতই হয়েছে। অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তারা বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে আবার চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিল। এই ছাত্রদের মধ্যে যে অনুসন্ধিৎসা, একনিষ্ঠতা ও কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব লক্ষ করেছিলাম, তার সঙ্গে আমাদের দেশের সংগীতপিপাসুদের আলস্য, অনীহা ও ঔদাসিন্য তুলনা করে মনে মনে দুঃখই পেয়েছি। আমরা রাগ-রাগিণীর মূল সূত্রানুসন্ধানে সকলকমের সংগীত, তা সে উচ্চাঙ্গই হোক, গ্রাম্যই হোক, কীর্তন, বাউল, যায় রবীন্দ্রনাথ কিছুই বিশ্লেষণ করতে বাকী রাখিনি—এটা অমিয়নাথেরই শিক্ষা,—ছাই উড়াতে গিয়ে রত্নের সন্ধানলাভ করা বিচিত্র নয়।

কলকাতায় যখন প্রথম সান্যাল মশায়ের সঙ্গে দেখা করি, ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, আমার কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য। উনি শুনে খুব আশ্চর্যবোধ করেছিলেন, তখন বললাম যে এই কথাটা আমি খুব শুনেছি আমার এক বয়স্ক বন্ধুর কাছে, সে ছিল বদল খাঁ সাহেবের শাগির্দ। আমহার্স্ট স্ট্রীট ও কেশব সেন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে, ডাঃ কার্তিক বোসের ল্যাবরেটোরীর উল্টোদিকে একটা ছোট্ট মসজিদ এখনো আছে। তার মতেওয়াল্লী (Trustee) ছিলেন খালেক মিঞা নামে একজন বৃদ্ধ ও সংগীতরসিক নিরহংকার লোক,—তিনি সেতার বাজাতেন আর খাস-তালিম নিয়েছিলেন ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবের কাছে। তিনিও এনায়েৎ খাঁ সাহেবের কাছে এই কথাটি শোনেন, আর কিছু বিচিত্র তানের প্যাটার্ন বাজিয়ে বললেন যে এনায়েৎ খাঁ এই তানগুলো রিওয়াজের জন্য দিয়েছেন—নাম "মীড়খণ্ডী" তান, কিন্তু এ অলংকার বা রিওয়াজের পদ্ধতি অত্যন্ত গোপনীয় বলে মনে করা হয়। নিজস্ব ঘরানা ও বিশ্বাসী শাগির্দদের ছাড়া অন্য কাউকে এই রীতিতে তালিম দেওয়া নিষেধ। আমার বন্ধুর বাড়িও কাছে ছিল বলে সেখানেই প্রথম শুনি এই খাস ও নিরালা তালিমের গল্প। আমার বন্ধু চুপ করে না থেকে পরদিনই বদল খাঁ সাহেবকে এই মীড়-খণ্ডীর রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। খাঁ সাহেব অমনি বললেন,—"হাঁ, হাঁ, ওয়হ তো বিলকুল ঘরানা তালিমকে লিয়ে হৈ।" বলেই বেশ কতকগুলি তানের গুচ্ছ শোনাতে থাকেন,—আমার বন্ধু যতখানি [...] লিখে নিয়ে আসে। কিন্তু এঁরা কেউ-ই [...] প্যাটার্নের গুপ্ত রহস্য বা কী করে, কোন রী[...] এই গুচ্ছ তৈরি করতে হয়, তা বলে দেননি। খা[...] মিঞাও এনায়েৎ খাঁর কাছে রহস্যের গ্রন্থিমোচন [...] চাবিকাঠি চাইবার সাহস করেননি, কারণ দ্বিতী[...] প্রশ্ন করলে মূল শিক্ষাই বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা [...] এই কৌতূহল কারো কাছে মিটাতে পারিনি।

সান্যাল মশায় আমার কথা শুনে আশ্বাস [...] বললেন, এই কথাটা "মীড়খণ্ডী" নয়, "খণ্ডমে[...] এবং মুসলমান ওস্তাদেরা চলতি কথায় একে "মী[...] খণ্ডী" বানিয়ে নিয়েছে। তুমি তো কৃষ্ণনগর যা[...] তখন একথার মূল অর্থ ও গতি-প্রকৃতি নিয়ে [...] আলোচনা করা যাবে—তবে পদ্ধতিটা বেশ প্রাচী[...] কিন্তু এই ঘরানার গায়কী গুপ্ত রাখার চেষ্টায় ক্রম[...] বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।" সুতরাং সেই অপরাহ্ণে [...] আলোচনা শুরু হল "খণ্ডমেরু" বা মীড়খণ্ডীকে নিয়ে [...] কথায় কথায় জানতে পেলাম এর হদিস তিনি প্রথ[...] লাভ করেন শ্যামলাল ক্ষেত্রীর কাছে, তিনি আবার [...] সম্পূর্ণ তালিম পেয়েছিলেন মথুরার বিখ্যাত সঙ্গীত[...] ও শাস্ত্রবিদ গণেশীলাল চৌবের কাছে। এই গু[...] গণেশীলালকে তৎকালীন সংগীতশিল্পীরা বুজু[...] বলে মনে করতেন তাঁর সঙ্গীতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যে[...] জন্য। কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে নানা র[...] প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিয়েছিলেন বদল খাঁ সাহেব স্ব[...] পরবর্তী কালে এটাও শুনেছিলাম যে ওস্তাদ ইনায়ে[...] হোসেন খাঁ, সংগীতসম্রাট আল্লাদিয়া খাঁ, মুশতা[...] হোসেন খাঁ, গণপতরাও ভাইয়াসাহেব, সকলেই এ[...] খণ্ডমেরুর নকশার রহস্য জানতেন এবং তার মাধ্য[...] রাগের বিশিষ্ট রূপ ও সত্তা প্রকাশিত করার রীতি[...]

পেশায় চিকিৎসক, নেশায় বাঁশিপ্রস্তুতবিশেষজ্ঞ, স্বরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুতকারী, বীণাবিনোদকুতূহলী হরিচরণ দত্ত। বাঁশের সুরে মস্ত হয়ে যাওয়া মুদিত নয়ন লক্ষণীয়

বা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। আমি যে সময়ে
ল খাঁ সাহেবের ডেরাতে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম,
ন তিনি প্রায়ই বলতেন, "মওকা মিলে তো
ল্লাদিয়াকো গানা সুন লেনা—খ্যালকী বঢ়িয়া
রকাকো পতা মিল জায়েগা।" বদল খাঁ আল্লাদিয়া
সাহেবের থেকে অল্প জ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু আমি
জে কলকাতায় আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের গান শুনে
য় হয়েছি, সেই নবতিবর্ষ বয়স্ক সংগীতসম্রাটের
নের ঐশ্বর্যে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। সে একদিন
য়েছে—কাকে ফেলে কাকে শুনি—এখন তো দীর্ঘ-
শ্বাস ফেলবার দিন এসে গিয়েছে—
তাহি নো দিবসাঃ গতাঃ।"

এই "খণ্ডমেরু" নিয়ে বিশদ আলোচনার সূত্র-
তেই সান্যাল মশায় আমাকে তাঁর যন্ত্রস্থ পুস্তক,
Ragas & Raginis"-এর কথা বলেন এবং স্পষ্ট
রেই জানান যে "খণ্ডমেরু"র বিচিত্র গঠন ও প্রকৃতি
ই বইতে তিনি সর্বসাধারণের বোধসৌকর্যার্থে লিখে
য়েছেন। যাঁরা সংগীত নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করেন,
দের পক্ষে এর পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ খুবই সহজ
বং রাগ ও রাগিণীর মূল রহস্য উদ্ঘাটন করাও
ষ্টকর হবে না। তাঁর মতে প্রাচীন কাল থেকে যে
গ ও রাগিণী নামে সুরের ভেদ রয়েছে, সেটা মোটেই
রো মনঃকল্পিত নয়, বরং অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক রীতিতে
জানো এবং একই স্বরসমষ্টি দ্বারা নির্মিত বা সৃষ্ট,
গ ও রাগিণীর বিভিন্নতা প্রকাশ করতে এ ছাড়া আর
কানও পরিষ্কার নিয়ম (Process) নেই। উদাহরণ
রূপ বলতে পারি মেঘ, মধমাধবী সারং (মদমাদ
রং) ও সুহা-র স্বরগুচ্ছ একই, অথচ কীভাবে এদের
ধ্যে পার্থক্য রেখে বিস্তার ও তান করা চলে, যাতে
াগভ্রষ্ট হবে না, তার হিসেব এর মধ্যেই রয়েছে। বহু-
চলিত মালকোশ ও কৌসী একই পর্দায় ঘোরাফেরা
রছে, অথচ তাদের স্বাতন্ত্র্য আগাগোড়া বজায় থাকে
ধু এই "খণ্ডমেরু" বিচারের সাহায্যে।

সা, জ্ঞা, মা, দা ণা,—এই পাঁচটি সুরের দ্বারা
(Vertebral coloum) দুই
ণ্ড ভাগ করলে দাঁড়াবে : দা সা জ্ঞা ও মা দা র্সা,
-কী করে এই ভাগ বা খণ্ড করা হবে, তার নির্দেশ
ই গ্রন্থে রয়েছে। যদি "দা সা জ্ঞা"কে প্রধান স্থান
major impingement) দেওয়া হয়, তা হলে
কৌসী" হবে আর "মা দা র্সা" প্রধান হলে
মালকোশ" দাঁড়াবে। মালকোশ সকলেই শুনে
াকবেন, কিন্তু বদল খাঁ সাহেবের একটা "কৌসীর"
মান্য নমুনা পেশ করছি :

I জ্ঞা জ্ঞা সা ণ্‌া । দ্‌া ণ্‌ণ্‌া সা জ্ঞা । সা জ্ঞজ্ঞা
া দা । -া ণণা দা ণা । র্সা -া -া র্জ্ঞর্জ্ঞা । র্সা না
দা ণা ।
া মমা জ্ঞজ্ঞা মমা । জ্ঞা সা -া সা । দ্‌া ণ্‌ণ্‌া সসা
মমা । জ্ঞা সা -া সা । মজ্ঞা দমা জ্ঞা সা ।
া জ্ঞজ্ঞা ণ্‌া সা । দ্‌া ণ্‌ণ্‌া সা জ্ঞা । মা দা ণা
র্সা । -া র্সা জ্ঞজ্ঞা মমা । জ্ঞা ণ্‌া -া সা II

এই অংশটুকু কেউ গাইলে বা বাজালেই মালকোশের
ঙ্গে এর পার্থক্য ধরা পড়বে, কারণ "মধ্যম"কে খুব
ল্পস্থান দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বহু গায়কের
ণ্ঠে প্রাচীন বিখ্যাত গান "পগ লাগন দে" মালকোশের
থাল ঘুরে ঘুরে উদারার কোমল ধৈবতে দাঁড়াচ্ছে,
যমন জ্ঞা, সা, ণ্‌া দ্‌াণ্‌া দ্‌া -া -া, অথচ তাতে যে
কৌসীকে" করজোড়ে আহ্বান করা হচ্ছে, সেটা
উপলব্ধি করেন না। প্রাচীন বন্দিশ ছিল : মা, জ্ঞা,
া, ণ্‌া, সা, দ্‌া, ণ্‌া, সা, মা -া -া ॥ কে বা কারা নূতনত্ব
া চমক সৃষ্টি করতে গিয়ে মূল ন্যাস স্বর ধৈবতে
ামিয়ে নিয়ে এলেন, তা তো জানি না, কিন্তু এতে
াগের চরিত্র (character) বিকৃত হয়ে গেল! পুরানা
মানার গুণিগণ রাগ-পহচানের সূত্র হিসাবে শেখাতেন,
জান, মকান, ডৌল।" এই ডৌল-টাই সুরের
তাকার চেহারা, সেটা ঠিক থাকলেই সাধারণ লোকেও
ঝতে পারেন এটা মালকোশ, এটা ভৈরবী, এটা
বহাগ, এটা বাগেশ্রী, কিন্তু তাঁরা হয়তো কী কী পর্দা
াগছে তা বলতে পারবেন না। রাগের ডৌল বিগড়ে
দয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে হতভম্ব করা চলে, কিন্তু সুর তো
রাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়!

আত্রোলী ঘরানার শ্রেষ্ঠ পুরুষ, কেসরবাই, মধুবাই ইত্যাদি গুণিজনের গুরু সংগীতসম্রাট আল্লাদিয়া খাঁ সাহেব

উচ্চাংগ সংগীতের আধুনিক শিল্পীরা সকলেই প্রাণপণে নানা "ভড়কীলা" রাগ সৃষ্টি করে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন, কিন্তু রাগের কাঠামো বা রাগসৃষ্টির মূল রহস্য না জানলে সেই সব রাগ জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা কম, কারণ কী কী স্বর-সংবাদে রাগের মাধুর্য আসে, সেটা না জানা থাকলে রঞ্জনা হবার কথা নয় এবং রঞ্জনা না হলে তো "রাগ" বলা যাবে না। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিরকালই হয়ে এসেছে, এবং হওয়াও দরকার, তা হলে সুরের পরিধি আরো বিস্তৃত হতে পারে। তবু এর মধ্যে অকস্মাৎ যে দু' একটা রাগ ভালো লেগে যায়, তার কারণ হল, অপ্রত্যাশিতভাবে হয়তো রাগরচনার নিয়মেই সেটা তৈরী হয়ে গেল! একটা ইঁদুর সারাদিন পিয়ানোর চাবির ওপরে দৌড়াদৌড়ি করলে অকস্মাৎ কোনও সুরের বিশিষ্ট গঠন দেখা দিতে পারে,—সেটা তো বৈজ্ঞানিক রীতিতে গ্রাহ্য হবে না।

একটা সহজ ও সরল সত্য কথা বলতে চাই এখানে—আমরা অত প্রয়াস করে, বুদ্ধি খরচ করেও আজ পর্যন্ত পাঁচ স্বরের রাগ ভূপালী, মালকোশ, হিন্দোল—সৃষ্টি করতে পারিনি, কারণ পরবর্তীকালে এই রাগরচনার মূলে সূত্রগুলো গুপ্ত ছিল বলেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সান্যাল মশায় তাঁর এই গ্রন্থে একটা রাগের নমুনা দিয়েছেন, (ষাড়ব বর্গের) :

সা রা গা ক্ষা দা ণদ র্সা

অঙ্কের হিসেবে তো এটা ষাড়ব রাগ বলেই পরিচিত হতে পারে, কিন্তু কেউ একটু চেষ্টা করলেই দেখবেন এর মধ্যে কোনও সুর বা রাগ সম্ভব নয়, কারণ রাগের musicalityকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এটা গঠন করা হল। কোনও গায়ক এতে সপাট তান বা স্বরগুচ্ছ তৈরি করে দেখতে পারেন, আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য। Ragas & Raginis গ্রন্থেই প্রথম লেখা হয়েছে, কেন পাঁচসুরের কমে রাগ রচনা হয় না, হলেও স্থায়িত্ব বা প্রসার থাকে না। সমস্ত পাঠ্যপুস্তকেই লেখা আছে "পাঁচ সুরের কমে রাগ হবে না,"—কিন্তু কেন এবং কী হিসেবে, তার বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা নেই। গ্রন্থ স্বল্পকায় হলেও এতে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, কী করে পূর্বতন গুণীরা রাগ তৈরি করতেন, যেগুলি শাশ্বত ও মধুর রূপের আকর হিসাবে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। এই চিরায়ত সুধাভাণ্ডের রহস্য উন্মোচন করবার প্রয়াস না করে আমরা যেন অগাধ জলে হাবুডুবু খাচ্ছি!

Ragas & Raginis গ্রন্থে যদিও খণ্ডমেরুর বিচিত্র রহস্য ও তার চাবিকাঠি কী করে সন্ধান করা যাবে, এই নিয়েই মূলত লেখা, এর পাতায় পাতায় ধরা আছেন, ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, মৌজুদ্দিন বা ফিদা হুসেন খাঁ, ফিরোজখানী গতের প্যাটার্ন, ইত্যাদি। সব সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধানেই আছেন বদল খাঁ—অমিয়নাথ এই অত্যাশ্চর্য গবেষণা অথচ রসনির্ঝরিণীর ধারায় সিক্ত গ্রন্থে তাঁর পরমপূজ্য গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করেছেন,—আমাকে সব সময়েই বলতেন কী সহজভাবে প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়ে বদল খাঁ সাহেব সব সন্দেহ ও কৌতূহলের নিরসন করেছেন!

(ক্রমশ)

ল্যাণ্ডের রাজপরিবার

নীলরঞ্জন দত্ত

দি কিং ইজ ডেড্, লং লিভ্ দি রাজতান্ত্রিক দেশে এটা একটা লিত প্রথা. তবে এর যে ব্যতিক্রম না এমন নয়. ইতিহাস ঘাটলে তার ড় ঝুড়ি প্রমাণ পাওয়া যায়। ল্যাণ্ডের বর্তমান রানী জুলিয়ানা মা রানী উইলহেলমিনার জীবিত থাতেই সিংহাসনে বসেছিলেন। শ বছরের মধ্যে হল্যাণ্ডের ইতিহাসে প্রথম এমন ঘটনা ঘটল। কিন্তু ী জুলিয়ানার জীবিত অবস্থায় মান ক্রাউন্ প্রিন্সেস বেয়াট্রিকস-পক্ষে রানী হওয়া একটা প্রচণ্ড নশ্চয়তার দোলায় দুলছে। ট্রিকস্ এর বয়স এখন ৪১ বছর, চেয়ে দু বছর কম বয়সে তাঁর মা লিয়ানা সিংহাসনে বসেছিলেন. তখন ন চারটি কন্যা সন্তানের জননী, কন্যা বেয়াট্রিকস্-এর বয়স তখন ইরিনার নয় আর তৃতীয় রাজকন্যা গ্রিট-এর পাঁচ। তৃতীয় রাজকন্যার জুলিয়ানার জীবনে একটা উল্লেখ-গ্য ঘটনা। সময়টা ছিল ১৯৪৩। তখন হিটলারের পদানত। জার্মান ন্যার শক্ত বুটের আঘাতে দেশের ট ক্ষতবিক্ষত। হল্যাণ্ডের দেশত্যাগী জ-পরিবার ক্যানাডায় আশ্রিত। লিয়ানা তখন তৃতীয়বার সন্তান-ভাবা। তাঁর ইচ্ছে নয় বিদেশের টতে তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। নাডায় এক বন্দরে তখন হল্যাণ্ডের খানা জাহাজ অবস্থান করছিল। ঐ হাজেই রাজকন্যা মারগ্রিট্ পৃথিবীর ম আলো দেখলো।

জুলিয়ানা যখন রানী হলেন সর্ব-নষ্ঠ রাজকন্যা ক্রিস্টিনার বয়স তখন বছর। সেই থেকে দীর্ঘ তিরিশ র ধরে রানী জুলিয়ানা নিষ্ঠার সঙ্গে জ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এখন ন সত্তর বছরের এক বৃদ্ধা রমণী। জ-পরিবারের ১২টি সন্তানের মাতা-ী। তাঁর স্বামী প্রিন্স বার্নাড্ যিনি হিতে জার্মান তাঁর থেকেও তিনি দু বছরের বড়। সাধারণত এ বয়সের বছর আগেই হল্যাণ্ডবাসীরা কর্ম-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে। এখন ক্রাউন প্রিন্সেস্ বেয়াট্রিকস্কে রানী হিসেবে দেখার আগ্রহটা অনেক হল্যাণ্ড-বাসীর মনে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। জুলিয়ানা যদি আমৃত্যু সিংহাসন অধিকার করে থাকেন তাহলে বেয়াট্রিকস্-এর রানী হবার সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হতে পারে। তার কারণ কয়েক বছর পর বেয়াট্রিকস্-এর প্রথম পুত্র উইলিয়ম আলেকজাণ্ডারের যা বয়স হবে সে বয়সে ইউরোপের বহু দেশের ক্রাউন্ প্রিন্সরা সিংহাসনে বসে ছিলেন। কাজেই এরকম এটা আশংকা করা অমূলক নয় যে বেয়াট্রিকস্-এর সুযোগ আসার আগেই তাঁর পুত্র সরাসরি সিংহাসনে উপবেশন করবেন। হল্যাণ্ডের সিংহাসন বহুদিন ধরে নারীর অধিকারে রয়েছে। উইলিয়াম্ আলেকজাণ্ডারের জন্ম সেই প্রকৃতিদত্ত প্রথাকে ভেঙ্গে দিল। তবে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার যদি তেমন কোন পরিবর্তন না হয় এবং রানী জুলিয়ানা যদি তাঁর মত পরিবর্তন না করেন তা হলে হয়তো, এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে বেয়াট্রিকস্ রানী হয়েও যেতে পারেন। কয়েকটি বিশেষ কারণের জন্য রানী জুলিয়ানা এতো দিন অবসর গ্রহণের কথা ভাবতে পারছিলেন না। এর মধ্যে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ যে কারণ সেটি হলো রাজনৈতিক। এ কারণটির জন্য রানী জুলিয়ানা খুবই উদ্বিগ্ন। বর্তমানে হল্যাণ্ডের পার্লা-মেণ্টের প্রধান বিরোধী দল হলো "সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক দল", এ-দলের বহু দিনের একটি পরিকল্পনা রয়েছে রানী জুলিয়ানার অবসর গ্রহণের পরেই রাজারানীর অধ্যায় শেষ করে দেশকে "প্রজাতন্ত্র" রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা। আগামী নির্বাচনে যদি শ্রমিকদল আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে তা হলে হয়তো তাদের এ দাবিটা আরো জোরদার আকার ধারণ করবে। তবে শ্রমিক দলের নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী "ডেন আউল" ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান রানীর খুবই অনুগত। ডেন্ আউল বেসরকারীভাবে জানিয়েছেন যে তিনি রাজপরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই রানী জুলিয়ানা ডেন্ আউলের পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করে রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখতে চাইছেন, যদি তিনি দেখতে পান তাঁর অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিবারের বিলুপ্তি ঘটবে তা হলো মৃত্যুর পূর্বে অবসর গ্রহণের প্রসঙ্গ আর তিনি তুলবেন না। তবে রানী জুলিয়ানার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে দেশের জনসাধারণ তাঁর পিছনে। বিলাসবিমুখ এই রানীকে দেশবাসী জাতির মা হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। সুখে দুঃখে তারা রানীকে তাদেরই একজন হিসেবে অনেক কাছে পেয়েছে। "অরেঞ্জ রাজপরিবারের" মধ্যে রানী জুলিয়ানাই সম্ভবত জন-সাধারণের মন এমন করে জয় করতে পেরেছেন। আর যে একটি কারণের জন্য রানী জুলিয়ানা এতদিন অবসর গ্রহণের কথা ভাবছিলেন না সে কারণটি হলো আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বেয়াট্রিকস্-এর রানী না হবার অনিচ্ছা। সকলেরই জানা আছে হল্যাণ্ডের রাজ-পরিবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজ-পরিবারের মতন বিলাসী নয়। এমন কি রানীর জন্মদিনের মতন একটা গুরুত্ব-পূর্ণ দিনেও রানীর পরিবারের প্রতিটি মানুষ আর দশজন হল্যাণ্ডবাসীর মতনই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে দেশবাসীর সামনে এসে দাঁড়ান। এদের মধ্যে আবার রাজকন্যা বেয়াট্রিকস্ বেশী রকম ঘরোয়া প্রকৃতির। তাঁর তিনটি পুত্র এখন নিম্ন স্কুলের ছাত্র। বেয়াট্রিকস্-এর ইচ্ছে সন্তানদের দেখা-শোনার ভারটা তিনি নিজেই গ্রহণ করেন। রানীর গুরুদায়িত্ব তাঁর মাথায় এসে পড়লে তাঁর সন্তানরা মায়ের আদর-যত্ন থেকে বঞ্চিত হবে, এটা বেয়াট্রিকস-এর ইচ্ছে নয়। ইতিমধ্যে রানী জুলিয়ানা যদি অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা হলে অবশ্য বেয়াট্রিকস্ কোন রকম আপত্তি করবেন না। তবে বেয়াট্রিকস্ রানী জুলিয়ানার মতন জাতির মা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জনের সুযোগ একেবারেই পান নি। তাঁর সুন্দর মুখে মিষ্টি হাসি মেখে মনে জুলিয়ানার মতন দাগকাটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। তা ছাড়া বেয়াট্রিকস্-এর জার্মান স্বামী প্রিন্স ক্লসও নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে আছেন লকিড্ কেলেংকারির জন্য জুলিয়ানার স্বামী প্রিন্স বার্নাড-এর জনপ্রিয়তা কিছুটা নষ্ট হলেও প্রিন্স ক্লস্-এর চেয়ে অনেক সহজেই তিনি হল্যাণ্ডবাসীর মন জয় করেছেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে বেয়াট্রিকস রানী জুলিয়ানাকে অতিক্রম করেছেন। গত কয়েক বছরের মধ্যে তিনি রাশিয়া, চীন, ইজ্রায়েল, আরব এবং আফ্রিকার অনেক গুলি দেশ ঘুরে আসার ফলে দেশের বাইরেও হল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ রানীর নামটি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন, রাজনৈতিক কারণে ঐসব দেশে জুলিয়ানার পক্ষে কোন দিনই ভ্রমণ করা সম্ভব হয়নি।

বেয়াট্রিকস্ যদি এ বছর রানী হতে পারেন তাহলে আমস্টারডাম্ রাজ-প্রাসাদের গা ঘেঁষে "নিউ ক্যারক্" গির্জায় রাজ্যাভিষেকের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। ঐ গির্জাতেই ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁর মা রানী জুলিয়ানার অভিষেক কার্য সম্পন্ন হয়েছিল। এ ছাড়া ঐতিহাসিক প্রাসাদ "নরড্ এনডি"তে তিনি তাঁর রাজ-দপ্তর স্থাপন করবেন যেখানে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মাতামহী রানী উইলহেলমিনা প্রথম রাজসরকার গঠন করে-ছিলেন। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে রানী জুলিয়ানার অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তের উপর। বেয়াট্রিকস্ রানী হলে এটাই প্রমাণিত হবে যে হল্যাণ্ড-বাসীরা এখনও "অরেঞ্জ" রাজপরিবারের উপর কতটা আস্থাশীল। এর ফলে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বেশ কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে যেতে বাধ্য। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক দলের দাবির উপরও একটা প্রচণ্ড রকমের ঘা পড়বে এবং অদূর ভবিষ্যতে এ দলের রাজ-নৈতিক ভাবধারা স্বাভাবিক কারণেই

হল্যাণ্ডের বর্তমান রানী জুলিয়ানা

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫০ ॥

কাশী শহরে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। সকাল কেই লোকের মুখে মুখে একটি কাহিনী নানান-বে পল্লবিত হতে লাগলো। ত্রৈলঙ্গ স্বামী আর কটি কাণ্ড করেছেন। ভোরবেলা তিনি মণিকর্ণিকার টে নেমে ভুস্ করে এক ডুব দিয়ে বেশ খানিকপরে ঠেছেন আর এক ঘাটে, তারপর কী খেয়াল হয়েছে, ন থেকে উঠে এসে সামনের এক কালী মন্দিরে কে মূর্তির গায়ে প্রস্রাব করে দিয়েছেন।

কেউ বলে মন্দিরে তখন আর কেউ ছিল না, উ বলে পুরোহিত ছিল, আবার কেউ বলে সেখানে ল এক বাঙালী সাধক। সে যাই হোক, পুরোহিত বাঙালী সাধকটি এই কাণ্ড দেখে আঁতকে উঠে লছিল, আরে রাম রাম। স্বামীজী, ইয়ে আপ য়া করতা।

কয়েক বৎসর ধরে ত্রৈলঙ্গ স্বামী সম্পূর্ণ নী, কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি সেই কার্যটি মাপ্ত করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর মন্দিরের ঝেতে গড়ানো প্রস্রাবের ধারার ওপরেই আঙুল য়ে লিখলেন, 'গঙ্গোদকং'।

বারাণসীর জনসাধারণ এই ঘটনায় দুটি দলে ভক্ত হয়ে তর্ক বিতর্কে মেতে উঠলো। তবে ত্রৈলঙ্গ ামীর পক্ষপাতীরাই দলে ভারী। তাদের মতে লঙ্গস্বামী স্বয়ং চলন্ত শিব, তিনি যা করবেন, টাই তাঁর পূজা। তিনি লোকাচারের অতীত, র্বসমক্ষে উলঙ্গ থাকতেও তাঁর কোনো দ্বিধা নেই। ার কাছে চন্দন আর বিষ্ঠা সমান, সুতরাং গঙ্গাজল স্বমূত্রতেই বা প্রভেদ থাকবে কেন? গঙ্গা তাঁর রীরের মধ্যে প্রবাহিত।

দলে দলে লোক ছুটে চলেছে সেই কালী ন্দরের দিকে।

গঙ্গানারায়ণ বসে ছিল দশাশ্বমেধ ঘাটের ঠায়, যথাসময়ে সেও সংবাদটি শুনলো। কালী র্তির গায়ে প্রস্রাব ছিটানোর কাহিনী শুনে সে ৌতুক বোধ করলো খুব। এখন আর সে চক্ষু দলে সেই স্বর্ণজিহ্ব, স্বর্ণনয়না মূর্তিটি দেখতে য় না। শপথ ভঙ্গের কোনো গ্লানি তার নেই। খন দেব দেবীর মূর্তি তার কাছে নিছকই প্রস্তর রূ মূর্তি।

অবশ্য শপথ ভেঙেই বা কী লাভ হলো। বিন্দুবাসিনীর কোনো সন্ধান সে পায়নি। বোধকরি পাওয়ার আর কোনো আশাও নেই। ছাড়দার, মনসারামের পিছন পিছন সে অনেক ঘুরেছে। যে লালাজীর কাছে বিধুশেখর টাকা পাঠাতেন, তাকেও সে খুঁজে বার করেছে, এরা দু'জনেই বলতে চায় যে বিন্দুবাসিনী আর বেঁচে নেই। কিন্তু সে কথা গঙ্গানারায়ণ বিশ্বাস করতে পারেনি পুরোপুরি। বিন্দুবাসিনী কোন্ রোগে মরলো, কোথায় তাকে দাহ করা হলো, সে বিষয়ে ঐ দু'জনেই অস্পষ্ট উত্তর দেয়। কেমন যেন এড়িয়ে যেতে চায়। উদাসীনভাবে বলে, আর সে সব কথা শুনে কী হবে, বাবুজী! যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আপনি ঘরে ফিরে যান। কাশীতে একা একা এমন দেওয়ানা হয়ে ঘুরবেন কেন? কিন্তু গঙ্গানারায়ণের ফিরে যাওয়ার কথা একবারও মনে আসে না। কাশীর জীবন-যাত্রায় সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

কোনোই কাজ নেই, তাই গঙ্গানারায়ণ ভিড়ের স্রোতের সঙ্গে মিশে দেখতে গেল ত্রৈলঙ্গস্বামীকে।

সেই কালী মন্দিরের চাতালে গঙ্গামুখী হয়ে স্থির ভাবে বসে আছেন সেই মানুষ পাহাড়টি। শত শত লোক তাঁর কাছে গিয়ে গড় করছে, বহু লোক আকুল চিৎকার করে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে, কিন্তু স্বামীজীর কোনো হুঁশ বোধই নেই। তিনি যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি ভক্তি চটে গেছে গঙ্গানারায়ণের, কিন্তু ত্রৈলঙ্গস্বামীর দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, এই মানুষটি কিছু অসাধারণ নিশ্চিত। এত লোকের ব্যাকুলতার মধ্যে ঐমন অনড় অটল হয়ে বসে থাকা যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু এই যে ভক্তের দলবল, এরা কি মানুষ, না পোকামাকড়? এদের কি নিজস্ব চিন্তা-শক্তি বলে কিছু নেই? ওরই মধ্যে অনেক লোক আবার সেই প্রস্রাব হাতে মেখে সেই হাত জিভে ছোঁয়াচ্ছে। ঘৃণায় গঙ্গানারায়ণের মুখ কুঞ্চিত হলো।

গতকাল সন্ধ্যাতেই কাশীতে একটি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেছে। 'শিশমহল' নামে একটি বাড়িতে একদল দুর্বৃত্ত তলোয়ার বন্দুক নিয়ে হানা দিয়েছিল। সে বাড়ি ভর্তি অনেক লোক, এমনকি বাড়ির কর্তার একটি বন্দুকও ছিল, কিন্তু কেউ বাধা দিতে পারেনি, দুর্বৃত্তরা দু'জনকে হত্যা করেছে, সব অর্থ-স্বর্ণালংকার লুণ্ঠন করেছে এবং একজন সুন্দরী রমণীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এতবড় একটা নৃশংস ঘটনা সম্পর্কেও কাশীর লোকদের তেমন মাথা ব্যথা নেই। অথচ একজন সাধু কালী-মূর্তির গায়ে অপকর্ম করেছে, তা নিয়েই সবাই উন্মত্ত।

সেদিন অপরাহ্নে গঙ্গানারায়ণ নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে ওপারের রামনগরে গেল বেড়াতে। কাশী ও রামনগরের মধ্যে খেয়া আছে, কিন্তু সে আগে এদিকে আসেনি। রামনগরের দিকে ঠিক শহর গড়ে ওঠেনি, কাশীর রাজার প্রাসাদ এবং তাঁর লোক লস্করের বাসস্থান, আর খানিক দূরে দূরে এক একটি ধনী ব্যক্তির অট্টালিকা। এদিকে তেমন লোক চলাচল করে না। গঙ্গাতীরের বিস্তীর্ণ ফাঁকা জমিতে সে একা একা পরিভ্রমণ করতে লাগলো।

গঙ্গানারায়ণের এখন প্রায়ই কলকতার কথা মনে পড়ে। একমাত্র জননী বিম্ববতীর জনাই তার বক্ষে মোচড় লাগে। আর কারুর প্রতি তার টান নেই। নিজের স্ত্রীর কথা স্মরণে এলে তার একটুও মমতা জাগে না। তাঁর স্ত্রীকে সে নিজের মনোমত গড়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেছিল, পারেনি। কুন্দমালা শুধু তার শয্যাসহচরী হতে পারে, তার জীবন সঙ্গিনী হবার ক্ষমতা কুন্দমালার নেই। অথচ গঙ্গা-নারায়ণের তো আর কেউ নেই, তার বুক ভরা নিঃসীম একাকিত্ব, সে একজন সঙ্গিনীকেই চেয়েছিল। কুন্দমালা বিন্দুবাসিনীর স্থান নিতে পারলো না। এখন কুন্দমালার যা ঘটে ঘটুক, সে জন্য গঙ্গানারায়ণ দায়ী নয়।

আর মনে পড়ে কলেজ জীবনের বন্ধুদের কথা। কলেজ পরিত্যাগ করার পর থেকে আস্তে আস্তে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মধু, রাজনারায়ণ, ভূদেব, বঙ্কু, গৌর সবাই এক একদিকে ছড়িয়ে গেছে। গঙ্গানারায়ণের মনে হয়, ঐসব বন্ধুরা সকলেই স্বেচ্ছামত নিজের জীবন গড়ে নিয়েছে, শুধু গঙ্গানারায়ণই কিছু পারলো না। তার জীবনের কোনো স্থির লক্ষ্য ছিল না। বৃথাই সে ঘোরাঘুরি করলো এদিক ওদিক। বিধুশেখরের স্বৈরাচার দমন করতে গিয়েও ব্যর্থ হলো সে। এখন সে কোন্ মুখে আর ফিরে যাবে দেশে? ব্যর্থ, পরাজিত ভাবে তার প্রত্যাগমনে সবাই উপহাস করবে না, বিরাহিমপুর পরগণা পরিদর্শন করতে গিয়ে অকস্মাৎ বজরা থেকে তার উধাও হয়ে যাওয়ার কোন্ কারণ সে দর্শাবে? কারণটি তো সে নিজেই এখনো জানে না। বিন্দুবাসিনী নেই, তবু এই বারাণসীতেই সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

ফেরার জন্য গঙ্গানারায়ণ তীর ধরে ধরে খেয়া ঘাটের দিকে আসছে, পথে অন্য একটি ঘাট পড়লো। তখন প্রায়ান্ধকার হয়ে এসেছে, আকাশে ফিকে জ্যোৎস্নার আভা, বাতাস বইছে মন্দ মন্দ। গঙ্গা-নারায়ণ দেখলো, নদী থেকে উঠে আসছে এক রমণী। সিক্ত বসন শরীরের সঙ্গে সাঁটা, পিঠের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ কেশভার, চক্ষু দুটি নিমীল।

তৎক্ষণাৎ গঙ্গানারায়ণের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, তার হৃদয়ে সংশয়ের অবকাশ মাত্র হলো না। এক পলক দেখেই সে অস্ফুট কণ্ঠে বললো, বিন্দু।

ঘাটের কাছে দু'জন স্ত্রীলোক একটি লাল বনাত মেলে ধরে আছে, যাতে সম্মুখ থেকে অন্য কেউ স্নানরতাকে দেখতে না পায়। কিন্তু গঙ্গা-নারায়ণ আসছিল নদীর ধার ঘেঁষে, তার চোখ চলে গিয়েছিল হঠাৎ সেদিকে।

দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করেই গঙ্গানারায়ণ আবার জোরে ডেকে উঠলো, বিন্দু! তারপরই দৌড়োলো সেদিকে।

গঙ্গানারায়ণ ঘাটের কাছে গিয়ে পৌঁছোতেই সেই বনাত ধরে থাকা স্ত্রীলোক দুটি চিৎকার করে উঠলো দুর্বোধ্য ভাষায়। অমনি কোথা থেকে দু'জন ভীমকায় প্রহরী এসে গঙ্গানারায়ণের হাত চেপে ধরে কর্কশ স্বরে বললো, বেওকুফ, বেহুদা কাঁহিকা—

গঙ্গানারায়ণ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেই যমদূত সদৃশ প্রহরীদের সঙ্গে শারীরিক শক্তিতে সে পারবে কেন? তারা তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল খানিক দূরে। গঙ্গা-নারায়ণ প্রবলভাবে ছটফটিয়ে বিন্দু, বিন্দু বলে চিৎকার করলে তারা তার ঘাড়ে ও উদরে দুটি কোঁৎকা কষালো সজোরে, তাতে তার যেন দম বন্ধ হয়ে এলো।

গঙ্গানারায়ণ দেখলো, পথের ওপরে নামানো রয়েছে একটি তাঞ্জাম, সেখানে আরও সাত আটটি প্রহরী মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে। গোলমাল শুনে তারা কয়েকজন কাছে এগিয়ে এলো, তাদের হাতে বর্শা।

অনেকদিন চুল কাটেনি, দাড়ি মুণ্ডন করেনি, তাই গঙ্গানারায়ণকে তারা পথের বেওয়ারিশ উন্মাদ বলেই ধরে নিল। নইলে হয়তো সেখানেই তার জবলীলা সাঙ্গ হতো। প্রহরীরা তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে ও মারতে মারতে টেনে হিঁচড়ে খানিক দূর নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল কাঁটা-ঝোপ ভরা মাঠের মধ্যে।

গঙ্গানারায়ণ সংজ্ঞা হারায়নি। শারীরিক [illegible] বেদনার চেয়েও অসম্ভব এক বিস্ময়বোধ [illegible] বিমূঢ় করে দিল। তার চিনতে কিছুতেই ভুল [illegible] কিন্তু বিন্দুর সঙ্গে এত সব প্রহরী [illegible] বিন্দু কি তার ডাক শুনতে পায়নি [illegible] তার একখানি দৃষ্টি [illegible] ছাড়া আর কে!

একটু পরেই হুম হাম শব্দে সে আবার

সচকিত হলো। তাঞ্জামটি চলতে শুরু করেছে। গঙ্গানারায়ণ টলতে টলতে উঠে এলো পথের ওপর। তাঞ্জামের দু'পাশে পর্দা ফেলা, ভিতরের আরোহিণীকে দেখা যায় না। দুজন মশালধারী ছুটেছে তাঞ্জামের সঙ্গে সঙ্গে।

মরীয়া হয়ে ছুটে এসে গঙ্গানারায়ণ তাঞ্জামের পর্দা সরিয়ে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে বললো, বিন্দু! আমি গঙ্গা, চিনতে পারিস না? তুই কোথায় চলেছিস?

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তার মধ্যেই একজন মশালধারী ধাক্কা মেরে ফেলে দিল তাকে। এবং পরপর কয়েকজন প্রহরী মাড়িয়ে চলে গেল তার দেহ। ভলকে ভলকে রক্ত বেরুতে লাগলো তার মুখ দিয়ে। সেই অবস্থায় সেখানেই বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো গঙ্গানারায়ণ। তার মস্তিষ্ক তখনো একেবারে স্বচ্ছ। চক্ষু মুদে সে শুধু দেখতে লাগলো তাঞ্জামের মধ্যে দেখা কয়েক মুহূর্তের সেই দৃশ্যটি। রাজরাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গিতে বসে ছিল বিন্দুবাসিনী। তার সর্বাঙ্গে কত রকমের বহু মূল্য অলঙ্কার। তার রূপ যেন আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিল বিন্দুবাসিনী. মুখের একটি রেখা কাঁপেনি. চোখের পলক পড়েনি। সকালে ত্রৈলঙ্গস্বামীর যেমন দৃষ্টি দেখেছিল গঙ্গা-নারায়ণ, বিন্দুবাসিনীর দৃষ্টিও যেন ঠিক সেই রকম। কোনো আর্ত রবেই ভ্রূক্ষেপ হয় না। ঠিক যেন প্রাচীন পাথরের মূর্তির জীবন্ত চক্ষু, কী কঠিন, কী অস্বাভাবিক!

প্রহরীদের প্রহারের জন্য নয়, বিন্দুবাসিনীর সেই দৃষ্টির জন্যই গঙ্গানারায়ণের ভয় করতে লাগলো। এ কোন্ বিন্দুকে দেখলো সে?

ছড়িদার মনসারাম পরিত্যক্ত ফুল বেলপাতা। তৈজসপত্র ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে সবে মাত্র বাড়ি ফেরার উপক্রম করছে, এমন সময় সেখানে ধূলি ধূসরিত, রক্তাক্ত, ছিন্ন-বসন গঙ্গানারায়ণ এসে উপস্থিত হলো তার সামনে। মনসারামের কাঁধ খামচে ধরে সে হিংস্র কণ্ঠে বললো, তুমি কেন আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলে?

মনসারাম সচকিতে এদিকে ওদিকে তাকালো. তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, বাবুজী. আমার ডেরায় চলুন।

গঙ্গানারায়ণ আবার চিৎকার করে বললো, না, আগে বলো, কেন মিথ্যে কথা বলে আমায় ধোঁকা দিয়েছিলে?

মনসারাম হাত জোড় করে কাতর গলায় বললো, বাবুজী আমি সব বলবো। তবে এখানে বলা যাবে না, হাওয়া বহুৎ খারাপ, আপনি আমার ডেরায় চলুন আগে।

মনসারাম প্রায় টানতে টানতে গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে চললো। কাছেই তার বাড়ি। বারাণসীর বড় বড় পাথরের বাড়ির একতলায় সাধারণত মানুষ থাকে না, সেরকমই একতলার দুটি ঘরে মনসারামের সংসার। তার দুই পত্নী ও তিনটি সন্তান। নিছক ফুল-বাতাসা বিক্রয় করে ও পুণ্যার্থীদের চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সে তার সংসারের অনটন ঘোচাতে পারেনি। মাঝে মাঝে দালালি করে কিছু উপরি জুটে যায়।

অতিশয় যত্নে সে গঙ্গানারায়ণের ক্ষতস্থান মুছে দিল। একটা নতুন কোড়া ধুতি এনে বললো বাবুজী. আপনার পোষাক ছেড়ে এটা পরে নিন।

ঘরে জ্বলছে রেড়ির তেলের সেজবাতি। তার দুই পত্নী দ্বারের কাছে এসে কৌতূহলী হয়ে দেখছে আগন্তুককে। মনসারাম তাদের তাড়া দিয়ে বললো, এই যা, যা, উধার যা! বাবুজীর জন্য পানি নিয়ে আয়। আর এক বর্তন দহি আর নিমক আন—

তারপর সে কোমলকণ্ঠে বললো, বাবুজী, একটু দহি খেয়ে নিন, শরীর ঠাণ্ডা হবে। আজ শুয়ে যান আমার এই গরীবখানায়।

গঙ্গানারায়ণের কোটরগত চক্ষু দুটি জ্বলছে সে যেন মনসারামকে দগ্ধ করে ফেলতে চায়।

মনসারাম ধীর স্বরে বললো, বাবুজী, আ গরিবলোক, সিংহ কিংবা শেরের সঙ্গে কি আ বিবাদ করতে পারি। দেবী সিং-এর নামে এ তল্লা সবাই ডরে কাঁপে। তার যেমন ধনদৌলত, তে লাঠির জোর। তার সঙ্গে টক্কর দেওয়া, আমি তে দূরের কথা, আপনারও সাধ্য নয়। সেইজন বলেছিলাম, আপনি মুলুকে ফিরে যান।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুমি কেন বলেছিলে মেয়েটি মরে গেছে? আমি আজ নিজে তা দেখলাম।

—ঠিকই তো বলেছিলাম, বাবুজী। হি ঘরের মেয়েকে যদি পরপুরুষে একবার নিয়ে যা তাহলে তাকে তো মরাই বলে। যমের হাত থে যেমন কারুকে ছিনিয়ে আনা যায় না, তেমনি হি রমণীকেও পরপুরুষের ঘর থেকে ফিরিয়ে আ যায় না।

—উঃ, কী পাষণ্ড তোমরা! সে বেঁচে আ জেনেও তার মৃত্যুর খবর রটিয়ে দিলে বাড়িতেও সেই খবর পাঠিয়েছো, ঐ লালাজী তোমার মতন চশমখোর।

—আরে সীয়া রাম, সীয়া রাম! লালাজী ধরম প্রাণ মানুষ। কখনো অন্যায় করেন না। উনি আপনাদের বাঁচাবার জন্য ঐ খবর ইচ্ছে ক রটিয়েছেন। নইলে, ভালো করে ভেবে দেখু আপনারা জাতে পতিত হয়ে যেতেন না? যে বংশের মেয়েকে, তাও কিনা বিধবা, ভিন জাতে লোক লুঠ করে নিয়ে যায়, সে বংশই পতিত হ যায় না? বিধুবাবু বামুন তাঁর বংশে কল লেগে যেত না এই কথা জানাজানি হলে? আ জানি, বাবুজী, বঙ্গালদেশে মগ্-সংসর্গে

রামভজন বংশ পতিত হয়ে গেছে।

—কী হয়েছিল আমায় খুলে বলো।

—নতুন তো কিছু না। এখানে এমন হামেশা হয়। খাপসুরত জেনানা দেখলেই তার পেছনে লোক লেগে যায়। প্রথমে লোভ দেখিয়ে ভোলাতে চায়। সোজা পথে কাম হলে তো ভালোই, নইলে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। দিনের বেলা, সকলের সামনে দুশমনরা এসে তুলে নিয়ে যায় সুন্দর মেয়েদের। আপনাদের ঐ মেয়েটিকে যেদিন নিয়ে যায়, সেদিন আমি নিজে ঘাটে ছিলাম। সবাই হায় হায় করলো, ব্যাস, আর কি, দশ পনেরো জন দুশমনকে কে আটকাবে?

—এ দেশে কি কোতোয়ালী নেই? পুলিশ নেই? আমি কালই পুলিশ নিয়ে গিয়ে ওকে উদ্ধার করে আনবো।

—বাবুজী, এখন রাবণের রাজত্ব, রামজীর দেখা নেই। আপনাদের কলকাতার মতন এখানে কথায় কথায় পুলিশ দৌড়োয় না। পুলিশের সাধ্য কি দেবী সিং-এর মহাল থেকে কোনো আওরৎকে বার করে আনে। আপনি কি ভাবছেন দেবী সিং নিজে ধরে নিয়ে গেছে। না না, সে এমন নোংরা কাজে নিজে হাত লাগায় না। এখানে মেয়ে বিক্রির ব্যবসার ধুম চলছে। আপনারা বাঙালীরা বিধবাদের এই কাশীধামে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন. ব্যাস। তার মধ্যে কতজন যে রেণ্ডি পাড়ায় যায় আর কতজন বিক্রি হয়ে চালান হয়ে যায় তার খবর কে রাখে। সুরাট বন্দর দিয়ে আরব দেশেও কত লেড়কি চালান যায়।

—বিন্দুকে গুণ্ডারা বিক্রি করেছে?

—বিলকুল ঠিক ধরেছেন।

—ক্যা বলে আমরা মেনে নেবো?

—তাছাড়া আর কী করবেন?

—আমি নিজের চোখে তাকে দেখেছি....দেবী সিং যদি তাকে আটকে রেখে থাকে আমরা সেখান থেকে উদ্ধার করবোই। দেশ এখন অরাজক নয়. কোম্পানির আমলে আইন আছে. আইনের জোরে দেবী সিং-এর মতন গুণ্ডাদের শাস্তি দেওয়া যায়।

—বাবুজী, আজ রাতটায় ভালো করে নিদ যান, কাল মাথা ঠাণ্ডা হবে, তখন সব বুঝবেন। লেখনী পুস্তিকা ভার্যা পর হস্তং গতা গতাঃ— কলম কেতাব আর কামিনী একবার পরের হাতে গেলে আর ফিরে আসে না। সেই জনাই তো বলছিলাম, মনে করে নিন, ও জেনানা পরলোকে চলে গেছে। ওকে ফিরিয়ে এনে আপনি কী করবেন?

—কী করবো মানে? কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

—আপনার মাথা গরম হয়ে আছে, তাই বুঝছেন না। লুঠ করার পর কটা জানোয়ার ঐ খাপ্সুরীর ধরম নাশ করেছে কে জানে। তারপর পড়েছে দেবী সিং-এর খপ্পরে, শুনেছি, তার মহালে এমন বিশ ত্রিশটা জেনানা আছে। আপনি যদি ঐ মাঈজীকে বার করে আনতেও পারেন, তারপর কে তাকে স্থান দেবে? ওনার পিতাজী দেবেন? আপনি দেবেন? আপনি চাইলেও সমাজ দেবে না। কোনো উপায় নেই। ঐসব জেনানাদের শেষ পর্যন্ত স্থান হয় রেণ্ডি পাড়ায়। আপনি ওর কথা ভুলে যান। কেন শুধু শুধু এক ধরম ভ্রষ্টা, জাতি ভ্রষ্টা আওরতের জন্য নিজের বিপদ ডেকে আনবেন।

গঙ্গানারায়ণের মনে পড়লো বিরহামপুর পরগনায় মুসলমান চাষীটির বিবিকে নীলকর সাহেবরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তার সম্পর্কেও তার খাজাঞ্চি সেন মশাই ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। এরা একই কথা বলে। অন্য পুরুষে একবার ছুঁলে সেইসব মেয়েদের আর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করাও অর্থহীন তাদের আর কেউ ঘরে স্থান দেবে না।

গঙ্গানারায়ণের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। বিন্দু তাকে কোনোদিন তার শরীর স্পর্শ করার অধিকার দেয়নি। সূক্ষ্ম, অনুভূতিপ্রবণ তার মন, ধর্মনীতি, শাস্ত্রনীতির ওপর অভিমান করে সে ভয়ংকর কঠোর ব্রতচারিণী হয়েছিল. সেই বিন্দুকে কয়েকটা নরপশু মিলে....। গঙ্গানারায়ণ আর ভাবতেও পারে না। বিন্দু কেন একটাও কথা বললো না তার সংগে। কেন অমন হিমশীতল, নিস্পন্দ চোখে চেয়েছিল?

মনসারাম বললো, লুঠ করা লেড়কিদের ফিরিয়ে এনে আরও বেশী ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয় বলে আংরেজ পুলিশও আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। কোথায় রাখবে সেই লেড়কিদের? একবার বে-ইজ্জত হলে হিন্দু ঘরের জেনানার মরণই ভালো।

কথা বলতে বলতে সে দেখলো, গঙ্গানারায়ণ অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ছে। মেঝেতে মাথা ঠুকে যাবার আগেই সে ধরে ফেললো, তারপর শুইয়ে দিল যত্ন করে। মনসারাম অনেক কিছু দেখেছে, জীবন কত কঠোর, কত বিচিত্র, সে জানে। কিন্তু এই ছোকরা-বাবুটি বড় ঘরের ছেলে, মন নরম, হয়তো জীবনে এই প্রথম আঘাত পেল, তাই সহ্য করতে পারছে না।

এরপর কয়েকদিন গঙ্গানারায়ণ থেকে গেল মনসারামের বাড়িতে। মনসারামের দুই স্ত্রী পালা করে সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ করে তুললো তাকে। মনসারামের স্ত্রী দুজন এক হিসেবে বড় অদ্ভুত। এরা পাশাপাশি দুটি ঘরে থাকে, এখন গঙ্গানারায়ণ একটা ঘর জুড়ে থাকায় ওরা দুজনেই একঘরেই এক সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু ওদের কক্ষনো ঝগড়া বিবাদ করতে শোনা যায় না। পরস্পরের মধ্যে খুব ভাব, যেন দুই ভগিনী কিংবা দুই সখী।

একদিন ওদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিল গঙ্গানারায়ণ। মনসারাম বারবার বলে দিল, গঙ্গানারায়ণ যেন কাশী ছেড়ে চলে যায়। এখানে থাকা তার পক্ষে বিপজ্জনক। দেবী সিং-এর অনুচরেরা চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করে, তারা যদি জানতে পারে যে এই ছোকরাটি দেবী সিং-এর কেনা আওরতের দিকে নজর দিয়েছে, তাহলে তারা সেদিনই গঙ্গানারায়ণকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে।

গঙ্গানারায়ণ মনসারামের কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। কিন্তু বারাণসী ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে তার একটুও নেই। সে সাধুদের এক আখড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিল, মিশে রইলো চ্যালাদের মধ্যে। খঞ্জনী বাজিয়ে যখন গান হয়, সেও গান ধরে, অন্যরা তার দিকে গাঁজার কল্কে এগিয়ে দিলে সেও দু-এক টান মারে। আর প্রায়ই সন্ধের দিকে একটা ছোট নৌকো ভাড়া নিয়ে সে রামনগরে যাতায়াত করে।

তারপর এলো বৈশাখী পূর্ণিমার রাত। এ রাতে গংগাতীরবর্তী বারাণসী আর তীর্থক্ষেত্র থাকে না হয়ে ওঠে একটি প্রমোদ নগরী। এ শহরে মন্দির, সাধুদের আখড়া যত আছে, সে তুলনায় সঙ্গীত, নৃত্যের মজলিসও কিছু কম নেই। এই রাতে রেণ্ডিপাড়া খালি করে তারা সবাই চলে আসে গঙ্গার ধারে। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ থেকেও বাঈজীরা আসে এখানে।

কথায় বলে, যদি ভোর দেখতে চাও তো যাও বারাণসীতে, সন্ধ্যা দেখতে চাও তো যাও লক্ষ্ণৌতে আর যদি রাতের সুস্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করতে চাও তো চলে যাও মালোবে। কিন্তু বৈশাখী আর কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বারাণসী লক্ষ্ণৌকেও টেক্কা দেয়। গঙ্গাবক্ষে ভাসে শত শত বজরা, দূরে থেকে মনে হয় যেন শত রাজহংসী, আলোকমালায় সজ্জিত। বজরার ছাদ থেকে ভেসে আসে সারেঙ্গী, তবলা বাদ্যের ধ্বনি আর নূপুরের নিক্কণ অথবা ঠুংরির সুমিষ্ট সুর। এই উপলক্ষে বড় বড় রইস ব্যক্তিদের মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা। বিশাল বিশাল পাত্রে গোলা হয় সিদ্ধি, সুরার বোতলও কম থাকে না, যার যেমন রুচি।

উৎসব শুরু হয় সন্ধ্যার সংগে সংগেই, উদ্দেশ্য থাকে একইভাবে নিশিভোর করে দেবার। কিন্তু বেশীর ভাগ বজরাতেই দেখা যায়, মধ্যরাত্রির পর নর্তকী নেচে চলেছে, বাঈজী গেয়ে চলেছে কিন্তু দর্শক বা শ্রোতারা নিঃশব্দ। বাবু তাঁর ইয়ারবক্সী

নিয়ে সংজ্ঞাহীন। দাঁড়ি, মাঝি, প্রহরীরাও সিদ্ধির নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে।

দেবী সিং-এর বজরা চারখানি এক সঙ্গে। সন্ধ্যে থেকেই দাপটে ফূর্তি শুরু করে দেবী সিং চালালো অনেকক্ষণ। পঞ্চাশোর্ধ বয়েস দেবী সিং-এর, টকটকে ফর্সা রং, গোলমরিচ রঙের মস্ত বড় গোঁফ, মুখখানি ঠিক যেন বাঘের মতন। এখনো সে নর্তকীদের সঙ্গে নিজে উঠে নাচতে পারে, তবে নেশার ঝোঁকে যখন তার চোখ দুটি ঘোলাটে হয়ে আসে, তখন তার পরিহিত বস্ত্রও খসে পড়ে।

শেষ রাতের দিকে যখন সব নিঃসাড় হয়ে এলো, তখন একটি ছোট ডিঙি এসে লাগলো দেবী সিং-এর একটি বজরার গায়ে। সেই ডিঙি থেকে গঙ্গানারায়ণ সঠিক গবাক্ষটিতে উঁকি দিল।

ধবল জ্যোৎস্নায় কামরার ভিতরটি দেখতে অসুবিধে হয় না। শয্যায় পাশ ফিরে, পা দুটি গুটিয়ে ঘুমিয়ে আছে বিন্দুবাসিনী। জড়ির চুমকি বসানো রক্তবর্ণের রেশমী শাড়ী পরে আছে সে, গলায় একটি গোড়ের মালা, সুগন্ধে ঘরটি আমোদিত।

গঙ্গানারায়ণ ফিসফিস করে দু-বার ডাকলো, বিন্দু, বিন্দু!

বিন্দুবাসিনী চোখ মেলে তাকালো। সিদ্ধির নেশায় তার চোখ দুটি টকটকে লাল। সে চমকে উঠলো না। মাথাটি সামান্য তুলে, একটুখানি বাঁকিয়ে কৌতূহলী ভাবে চেয়ে রইলো। গঙ্গানারায়ণের মাথায় সন্ন্যাসীদের মতন বড় বড় চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, তাকে সহজে চিনতে পারার কথা নয়।

বিন্দুবাসিনী শাড়ী-গয়নার শব্দ করে উঠে বসলো। তারপর হাত দুটি সামনের দিকে বাড়িয়ে খুব নরম গলায় বললো, কে, গঙ্গা? আয়—

গঙ্গানারায়ণ এক লম্ফে কামরার মধ্যে প্রবেশ করে ছুটে গিয়ে বিন্দুবাসিনীকে আলিঙ্গন করলো।

তারপর যেন কত যুগ যুগান্ত কেটে গেল। কেউ আর একটিও কথা বললো না। শুধু বাইরে জলের ছলছল মধুর শব্দ। দুটি তপ্ত প্রাণ অনেকদিন পর এক সঙ্গে জুড়োচ্ছে। গঙ্গানারায়ণের পিঠে বিন্দুবাসিনীর দুই হাত, শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে সে, যেন আর কিছুতেই ছাড়বে না।

গঙ্গানারায়ণই এক সময় ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। ব্যস্ত হয়ে বললো, আর একটুও দেরি নয়, আমি নৌকো এনিচি, তুই চল আমার সঙ্গে!

বিন্দু সারা মুখে চন্দ্রকিরণের মতন হাসি ফুটিয়ে বললো, কোথায়

—চল, আমরা চলে যাবো, অনেক দূরে, বহু দূরে, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না—

বিন্দু আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করলো, আগে বল, সেই জায়গাটা কোথায়?

গঙ্গানারায়ণ বললো, সে জায়গা আমরা খুঁজে নেবো, যেখানে আর কেউ নেই, কোনো বনের মধ্যে, নদীর ধারে, একটা কুঁড়েঘর বেঁধে, শুধু তুই আর আমি।

বিন্দুবাসিনী হঠাৎ যেন খুব উৎসাহিত হয়ে বললো, সে রকম জায়গা আছে? চল, এখুনি চলে যাই!

—চল, আমার হাত ধর।

—ওমা, আমার গয়নার বাক্স যে আনিনি!

—কী?

—গয়নার বাক্স আমার....একবার রামনগর ঘুরে যেতে হবে।

—গয়নার বাক্স দিয়ে কী হবে? ওসবের কিচ্ছু দরকার নেই।

—সে কি, আমার অত গয়না, সেগুলো ফেলে যাওয়া যায় নাকি।

গঙ্গানারায়ণ আহতভাবে বললো, বিন্দু, তুই গয়নার কথা ভাবচিস? গয়না দিয়ে আমাদের কী হবে?

বিন্দুবাসিনী যে নেশার ঝোঁকে কথা বলছে, তা বুঝতে পারলো না গঙ্গানারায়ণ। বিন্দুবাসিনী দিকে স্থাপন করে ফিক করে হেসে বললো, তুই সত্যি গঙ্গা? আমার সেই ছেলেবেলার খেলুড়ি? যাঃ, আমি স্বপন দেখচি! আমার স্বপন দেখতে ভাল্লাগে না!

গঙ্গানারায়ণ ব্যাকুল হয়ে বললো, বিন্দু, আর একটুও দেরি করার সময় নেই। এক্ষুনি যদি কেউ জেগে ওঠে।

বিন্দুবাসিনী সঙ্গে সঙ্গে বললো, ওমা, তাই তো! তুই এলি কী করে? দেবী সিং-এর লোকেরা যে তোকে দেখলে একেবারে কেটে ফেলবে। তুই শিগগির চলে যা—

—তুই আমার সঙ্গে যাবি না?

—আমি? আমি কোথায় যাবো?

—বিন্দু, দেরি করিস নি, এই পাপের জায়গায় আর এক মুহূর্ত থাকা নয়, আয় আমার সঙ্গে।

—কিন্তু আমার ছেলে?

—ছেলে

—বিন্দুবাসিনী এবার গঙ্গানারায়ণের বুকে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে ফেললো। বিমূঢ় হয়ে বসে রইলো গঙ্গানারায়ণ। এ কী শুনলো সে বিন্দুবাসীর মুখে?

আবার মুখ তুলে বিন্দুবাসিনী একটু সামলে নিল নিজেকে। আঁচলে চোখ মুছে সে শান্ত গলায় বললো, তুই জিজ্ঞেস করলি না, আমি কেন এতদিনে মরিনি?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আগে এখেন থেকে চলে যাই, তারপর সব কথা শুনবো।

—তুই আমার ছেলেকে এনে দিতে পারবি?

—তুই কি বলছিস, আমি বুঝতে পাচ্ছি না, বিন্দু!

—ইস, আমায় বড্ড বেশী খাইয়ে দিয়েচে, আমি তোকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। ইস্, এ কী চেহারা হয়েচে তোর, এত রোগা হয়ে গেচিস।

—বিন্দু তুই আমার সঙ্গে যাবি না? আর দেরি করলে দুজনেই বিপদে পড়বো।

—শোন, মরা তো সহজ, আমি কি মরতে পারতুম না? ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, মা মা বলে কত চ্যাঁচালুম, কেউ বাঁচাতে এল না....তার আগে কখনো পাপ করিনি, তবু দেবতারাও বাঁচালো না আমায়, দেবী সিং-এর বাড়িতে হাত পা বেঁধে রেকেচিল, খাবার খেতে চাইনি, জোর করে মুখে দুধ ঢেলে দিয়েচে....আমার ওপর কত অত্যাচার করেচে, তবু ঠাকুরকে ডেকিচি, ঠাকুর আমায় মরণ দাও! আমার ডাক শুনে ঠাকুর কী দিল জানিস? আমার পেটে বাচ্চা এলো। পেটে বাচ্চা নিয়ে কি কেউ মরতে পারে বল, তুই বল?

আবার ফিক করে হেসে ফেলে বিন্দুবাসিনী বললো, তুই আমায় চিনলি কী করে, গঙ্গা? বিধবা ছিলুম, এখন দ্যাখ আমার কেমন ঝলমলে রঙীন শাড়ি, গায়ে গয়না, দাসীরা দুধের স্বর আর হলুদ বাটা দিয়ে আমার গা মেজে দেয়।

গঙ্গানারায়ণ নিরসভাবে জিজ্ঞেস করলো, তোর ছেলে হয়েচিল?

বিন্দুবাসিনী বললো, হ্যাঁ রে, ফুটফুটে ছেলে, ঠিক যেন রাজপুত্তুর!...ঠাকুরের কী খেলা ভেবে দ্যাখ, বিধবার পেটে ছেলে! চাইলুম মরণ, দিল ছেলে! তারপর আবার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেল?

—কে?

—ওরা! তিনমাসের বাচ্চা, তাকে কেড়ে নিয়ে গেল আমার কোল থেকে। কোথায় রেখেচে জানি না! ওদের কাচে ভিক্ষে চাই, ওগো, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। সেইজন্যই তো ওদের সব কথা শুনি, ওরা নাচতে বললে নাচি, হ্যাঁরে, আমি নাচতে শিখিচি, ওরা সিদ্ধি খেতে বললে সিদ্ধি খাই, যদি ছেলেকে ফিরিয়ে দেয়। আগে তো কখনো ভাবিনি যে আমি মা হবো। ওরে, মা হওয়া যে কী কষ্টের, কী সুখের।

গঙ্গানারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। জীবনে কোনো একটা ব্যাপারেও সার্থক হওয়া তার কল্পনা করে সে এসেছে বিন্দুবাসিনীর ব্যা... তারপর যে এমন ঘটবে, তা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

—তুই ফিরে যা, গঙ্গা।

—তুই যাবি না

—না রে, আমি কি যেতে পারি? আমি নষ্ট আমার এ শরীর অপবিত্র। তুই যে বিন্দুবাসিনী চিনতিস, সে তো আমি নয়। আমি তো এক কাশীর রেণ্ডি।

—ছিঃ বিন্দু! তুই এখনো যদি আমার সঙ্গে যেতে চাস, আমরা দুজনে কোনো দূরে দেশে চ... যেতে পারি।

—আমি বিচ্ছিরি, পোকায় খাওয়া, আম... নিয়ে তুই কী করবি, গঙ্গা উঃ, বড্ড মাথার যন্ত্রণা একটু মাথা টিপে দিবি।

—আয়।

—না না, আমি কী পাগলের মতন ক... বলচি। তুই চলে যা, ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে।

—আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে চাই বিন্দু!

—ওরে, সে আর আমার ভাগ্যে নেই। তুই যা আমার মাথার দিব্যি, তুই চলে যা, চলে যা, চলে যা।

বিন্দুবাসিনী এমন এক স্বরে চলে যাওয়ার কথা বলতে লাগলো যে গঙ্গানারায়ণ আর স্থির থাকতে পারলো না। সে চলে যাওয়াই ঠিক করলো। বিন্দু যাবে না, সে বুঝতে পেরেছে। ছেলেকে ছেড়ে কোন্ মা যায়? হোক না পাপের সন্তান, তবু তো নিজের গর্ভের ফল।

কোনো রকম বিদায় না নিয়ে গঙ্গানারায়ণ আবার গবাক্ষ দিয়ে বেরিয়ে এসে ডিঙি নৌকোয় উঠলো। অন্য মাঝি আনেনি, সে নিজেই দাঁড় বাইবে। এত বড় একটা দুঃসাহসী কাজ যে সে জীবনে কখনো করেনি, তবু সব বৃথা গেল। দাঁড়টা তুলে নিয়ে সে দেখলো বিন্দু গবাক্ষ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুল ভাবে চেয়ে আছে। পরিপূর্ণ আলোয় এবার গঙ্গানারায়ণ বুঝতে পারলো, বিন্দুর মুখখানি অস্বাভাবিক নেশাগ্রস্ত।

বিন্দু প্রায় কেঁদে উঠে বললো, তুই চলে যাচ্চিস গঙ্গা? আমায় নিয়ে যাবি না।

গঙ্গানারায়ণ এক হাত বাড়িয়ে বললো, আয়।

বিন্দু সঙ্গে সঙ্গে নৌকোয় নেমে এলো!

গঙ্গানারায়ণ রুদ্ধশ্বাসে বললো, মাথা নীচু করে বসে পড়, কেউ যেন দেখতে না পায়।

বজরা থেকে খানিকটা দূরে নৌকো নিয়ে সরে আসার পর বিন্দুবাসিনী খানিকটা জল মাথায় চাপড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চুল খোলা জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে শরীরের অলংকার। দুদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে যেন আপন মনে বললো, আঃ, বড় সুন্দর, বড় সুন্দর এই পৃথিবী।

গঙ্গানারায়ণ বললো, বিন্দু, বসে পড়, কেউ দেখতে পাবে!

বিন্দুবাসিনী সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে হঠাৎ নিজের গলা চেপে ধরে অসম্ভব তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলো, ওহ্ হো হো হো, আমায় দিলে না, আমায় কেউ দিলে না—

হঠাৎ আবার পরিষ্কার কণ্ঠে বললো, নীচে মা গঙ্গা, মাথার ওপরে আকাশে রয়েচেন দেবতারা, সবাইকে বলে গেলাম, যদি পরজন্ম থাকে, তবে পরজন্মে যেন তোকে আমি পাই। এ জন্মে আমার সব নষ্ট হয়ে গেল রে।

গঙ্গানারায়ণকে প্রস্তুত হবার কোনো সুযোগ না দিয়ে বিন্দুবাসিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। ডিঙি নৌকোটা প্রচণ্ডভাবে দুলে ওঠায় গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণের জন্য দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। তারপর সেও ঝাঁপ দিল।

জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে সব দিক। গঙ্গানদীকে সেই জ্যোৎস্নায় মনে হয় যেন এক প্রশস্ত পথ। সেই পথ চলে গেছে কোন্ নিরুদ্দেশের দিকে।

একটু পরেই শুরু হলো জোয়ার। সব বজরাগুলো একসঙ্গে দুলে উঠলো। (ক্রমশ)

ামরা, যুবকরা

ীর মুখোপাধ্যায়

আমার নাম গৌতম, বয়েস বাইশ তেইশ, ঠিকানা, আমার ঠিকানা... বলছি ছ, ভাবছেন ছোকরার হল কি, সামান্য একটা ঠিকানাও তাও মনে রাখতে পারে পাগলটাগল নয় তো? আমার কথাটা শুনলে অবশ্য আমাকে ওইরকম করা আশ্চর্য কিছু নয়, পাগলই তো...পাগল ছাড়া...আমার ঠিকানাটা, কি ন তো, আমার ঠিকানা...

আপনারা যাঁরা চাকরি করেন তাঁরা ভাবেন ছোঁড়াগুলোর শুধু একটাই কাজ, দের দেখে 'টোন' কাটা। আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের কি চমৎকার ধারণা ন। বেকার যারা, যারা চাকরি করি না, তাদের 'ছোঁড়াগুলো' এই শব্দটা দিয়ে কে একধারসে একই ক্যাটিগরিতে ফেলা, বেশ আছেন আপনারা, নয় কি? া সহজে আমাদের সম্বন্ধে অ্যাসেসমেন্ট হয়ে গেল! তা যা ইচ্ছে করুন, ল একটি কাজ করবেন না, দয়া করে আমাদের ভালো করার জন্যে মুখিয়ে বন না, একটু উঁচু জায়গা পেলে তার ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা মারবেন না, সব সহ্য হবে, কেবল বক্তৃতা, উপদেশ, ওরে বাবা, শুনলেই গলায় আঙুল ...মাইরি, আপনার দিব্যি। আপনারা যাঁরা চাকরি করেন, আমাদের সম্বন্ধে আরো কি ভাবেন আমরা তা সব জানি। আপনারা ভাবেন, সকাল নেই, র নেই, সন্ধে নেই, ছোঁড়াগুলো চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে াত গ্যাঁজাচ্ছে! 'গ্যাঁজাচ্ছে'—আহা, কি ওয়ানডারফুল ভাষাজ্ঞান আপনাদের, একটা শব্দ এমন ফিট করে যায় যে বলবার নয়।

আপনারা আরও বলেন, আহা বলবেন বইকি, বলবার হক আপনাদেরই আছে, নারা যে চাকরি করে দেশের মহা উপকার করেন। আপনারা বলেন, ছোঁড়া-া হয় তাস পিটছে পয়সা ফেলে, তাও নিজের পয়সা নয়, বাপের মারা পয়সা। য় ট্রানজিসটার নিয়ে রাস্তার ওপরই গোল হয়ে বসেছে, সবাই মহা সমঝদার, এক একজন গাভাসকর, বেদী, পাকা নেশাখোরের মত গোঁজ হয়ে বসে হঠাৎ এক একটা এমন হল্লা তুলছে যে ভড়কে যেতে হয়। মোহনবাগান, বেঙ্গলের ফ্ল্যাগ বাঁধা আছে লাইটপোস্টের সঙ্গে। যখন যে জেতে তার হয়ে রাস্তা থেকে গলিঘুঁজি, গলিঘুঁজি থেকে বড় রাস্তায় মিছিল করে। কিপ্টেমি যারা চাঁদা দেয় না অথবা যাদের ওপর কোন কারণে খার আছে তাদের দোরের ন পিলে চমকানো এক একটি 'চকলেট' ছাড়ে। দোল খেলেও সোয়াস্তি খেলার শেষে নানা রঙে রঙীন ছেঁড়া ছেঁড়া জামা, প্যান্টগুলো রাস্তা

ঠিক ধরেছেন, এসবই আমরা করি। আমরা থিয়েটার টিয়েটারও করে থাকি দাদা। এই শম্ভুবাবু, উৎপলদা, অজিতেশের গলাটলা নকল করে কিছু একটা খাড়া করি, তারপর রেস্তাতে কুলোলে এলাহাবাদ টেলাহাবাদের একাঙ্ক নাটক কমপিটিশানে যাই। সব সুবিধের যেমন কোন না কোন অসুবিধে আছে, তেমনি এইসব এলাহাবাদ পার্টিটার্টিতেও সেই একই সুবিধে আর অসুবিধে।

এলাহাবাদওয়ালারা ফি পার্টিকে একপিঠের ভাড়া আর খাওয়াদাওয়ার খরচ দেয়। বড়দা, আপনারা ভাবছেন ভালোই তো, কেমন ফোকটে দেশ দেখে বেড়ানোও হচ্ছে আবার আর্টফার্ট দেখিয়ে ওখানকার মেয়েদের মজিরে দিব্বি ফুর্তি লুটে নিচ্ছে ছোঁড়াগুলো। আজ্ঞে না স্যার, আমি যে আগেই বলেছি সুবিধে যতো ধুরন্ধরই হোক, সব সুবিধের পেছনে থাকতেই হবে এক একটি জলজ্যান্ত অসুবিধে, এখানেও ঠিক তাই।

অসুবিধেটা হচ্ছে আরেক পিঠের ভাড়া জোগাড় করা, আমাদের তো মরা বাপ, সেই মরা বাপকে আর কত মারবো, এ তো আর আপনাদের ডানলাপ, রেমন্ডের বোনাসের পয়সা নয় যে হাত ঝাড়লেই পর্বত, ওই আরেকপিঠের ভাড়া জোগাড় করতে জিভ বেরিয়ে যায় দাদা, বুঝলেন। আমার ঠিকানাটা অবশ্য...আমাদের এ তল্লাটে মানে টাওয়ার ক্লক প্রদক্ষিণ করে তো আপনাকে যেতে হয়, কোর্টই হোক কি জোড়ামন্দিরই হোক মানে যে দুটি সিনেমা হাউস গায়ে গায়ে লেগে আছে তাদের কথাই বলছি, অথবা মার্কেটিংএ যখনই যান তখন তো রিকশায় চেপে? যদিও বয়েস চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, জুলপিতে পাক ধরিয়ে ফেলেছেন, তবু রিকশার ডানপাশে বসে বাঁ হাতখানি বেশ একটু টেকসাস হিরোর মত বেড় দিয়ে বৌদিকে ঘিরে বসেন, আহা চটছেন কেন, বসবেন বইকি, বসবেন বইকি, ভাবখানা হচ্ছে এই, আমাকে এখনো যথেষ্ট ইয়ং দেখাচ্ছে, তাই নয় কি! তা সে যাকগে, মরুগ্যে। টাওয়ার ক্লক প্রদক্ষিণ করার সময় যদি একটু কুইক গ্লানস ছুঁড়ে দেন টাওয়ার ক্লকের আশেপাশে। ওই দুটি বড় বড় রেস্টুরেন্টের দিকে, বিশেষ করে রাত্রে যখন রেস্টুরেন্ট দুটিকে নিয়নের আলোয় বিশাল আর ঝলমলে আর অলৌকিক মনে হয় তখন দেখবেন যতো ছেলে দোকানের ভেতর, তার ডবল ছেলে দোকানের বাইরে, সাইকেল স্ট্যান্ডে প্রত্যেকের সাইকেল যেন দাঁড় করানো আছে, তেমনি আমরাও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। আমি, গৌতম, জয়ন্ত, মধু, নিমাই মানে আমাদের গ্যাং, কেউ ঠাকুর গলি, কেউ বলরাম গলি, কেউ খাগড়া জোল বা আরো উত্তরে পাল গলি, কানি গলি, দত্ত গলি আমরা সব চাক বেঁধে দাঁড়িয়ে আছি, ধোঁয়া ওড়াচ্ছি মনের ফুর্তিতে, দোকানের ভেতর বড় একটা যাচ্ছি না।

যাবো কি করে বড়দা? কেন জানেন? জানেন না? জানবেন কি

দেখুন, আপনারা যতোই কংগ্রেস কম্যুনিস্ট নিয়ে গলা ফাটান, যাতোই গ
বড়লোক নিয়ে ক্লাস স্ট্রাগল করুন, আমরা জেনে গেছি এ জগতে, দূর
গুলি মারুন জগতে, মানে চুঁচড়োতে, আমাদের এই চুঁচড়োর জগতে, আমা
কাছে চুঁচড়োটাই জগত, এখানে অন্যান্য জায়গার মতই দুটো জাত, এক
চাকরি করে, আর যারা চাকরি করে না। চাকরি করি না তাই জানি
মনে করলেই রেস্টুরেন্টের ভেতর ঢুকতে পারি না। শুনুন বলি। এই
আমি একটা চা খেলাম। কতো দাম? না বিশ পয়সা। চা খেলেই সিগার
খেতে হয়। কি করবো? সেই ছোটকাল থেকে নেশাটি খেতে শিখে
সিগারেটের দাম দশ। কতো হল? না ত্রিশ পয়সা। এবেলা ওবেলা হলে
পয়সা। এর পর জয়ন্ত বা মধু বা নিমাই জুটে গেলো, ওরা এমনি, কেউ না
জুটে যাবেই, যাবেই বা কোথায়, ওদেরো যে সকাল, দুপুর, রাত ঠিকানা
একটাই, এই রেস্টুরেন্টের সামনের দিকের জায়গাটুকু, কেউ না কেউ জুটে যা
তাহলে দাঁড়ালো গিয়ে এক টাকা বিশ পয়সা। এখন পয়সাটা আসে কোথে
আপনি আপনার জেব থেকে হাওলাৎ দেবেন? অতএব গো অ্যাহেড, ওয়
গাই! ওয়ার্ক ইয়োর ওন...।

এইবার আপনি থাকতে না পেরে, কেননা অনেকক্ষণ আমার জ্যাজারং জ্য
শুনে ধৈর্য হারিয়েছেন, বলবেন, 'এ তো দেখছি ধান ভানতে শিবের গীত। তে
এক্সপ্রেসটি একটু থামাও গৌতম। আমরা যে অনেকক্ষণ প্ল্যাটফর্মে দাঁ
আছি। একটু লোকাল করে দাও ভাইটি।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিচ্ছি। বলছি যা বলতে চাইছিলাম, তবে কি জানেন,
সামান্যই, তেমন কিছু টেকনিকালার নয়...নেহাত শাদাকালো। তবে—

...কতো আর রাত হবে তখন? এই আটটা টাট্‌টা, না, তাও হয়নি বোধ
সিনেমা ভাঙা ভিড়ে বোঝাই দু' নম্বর আর চার নম্বর রুটের বাস একটু অ
চলে গেছে। বেশ একটু শীত পড়ছে, যদিও চাদর টাদর দেখা যাচ্ছে না রা
তবু বুড়ো লোকেরা আর কেশোরুগীরা গলায় একটা করে মাফলার জ
খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে যাচ্ছে, পাশের পাঞ্জাবীর দোকান থেকে চম
মেটে চচ্চড়ির গন্ধ আসছে, এদিকে টলতে টলতে বার-লাইব্রেরীর ঘুপচি
জায়গা থেকে দুজন একেবারে মস্তু হয়ে 'চুন চুন পেয়ারে' এই টাট্‌কা গ
গানটি গাইতে গাইতে যাচ্ছে, কংগ্রেস অফিসের ছেলেরা ইন্দিরা গান্ধী জিন্দ
বলে মিছিল, ডিজেল আর কাদায় মাথামাখি একেবারে কালো হয়ে যাওয়া জায়
যেখানে বাসগুলো এসে দাঁড়ায়, সেইখানে পট্‌কা ফাটাচ্ছে ধুম করে, অ
সলিলদা মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন, একটু দূরে রবীন ছেলেদের কি সব বোঝাচ্ছে, অ
অমিত, লাবলু 'টাওয়ার ভিউ' রেস্টুরেন্টের দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে না
হঠাৎ তখনই আমার মনে হল, আজ, এখনই টুনটুনির ব্যাপার নিয়ে হেস্ত
একটা করতেই হবে। আমি পা বাড়াতেই জয়ন্তটা রাসকেলের মত জিগ্যেস ক
'কি রে, কাটছিস? এর মধ্যে? ঘরেতে তোর মাগছেলে আছে নাকি?'
এ কথার কি জবাব দেব? মুখে একটা বিচ্ছিরি গালাগাল এসে গেছলো।
দাঁত বার করে হেসে বললাম, 'মাইরী।' বলে ওষুধের দোকানটার পাশে
পানবিড়ির দোকানের আয়নায় চুলটা ঠিক করে নিলাম। মনে একটু
পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। ড্যানি ছাঁটের চুলগুলো ঠিক দুপাশের কান ঢেকে,
বসছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন ম্যাজিক, চুঁচড়োর এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাগড়াছে
টুনটুনির পায়ের শব্দ বেজে ওঠা শুনতে পেলাম। আহা, পায়ের শব্দ,
রাত্রির পায়ের শব্দ, বাজে বাজো। ঝনন্ ঝনন্ বাজো। এই শেষবারের
বাজো। কেননা, আর একটু পরেই আমার শেষ বোঝাপড়া। টুনটুনি,
জানো, আমিও জানি, এ অসহ্য।

অসহ্য এই চুরি চুরি খেলা। সেরিমোনিয়াল ম্যারেজ হয়নি ঠিকই,
রেজেস্ট্রী ম্যারেজ তো হয়ে গেছে। তবু তোমার বাড়িতে আমি যেতে পারি
তুমিও আসতে পারো না আমার বাড়িতে। আর কতো দিন এইরকম চলবে?
কতো দিন এসব সহ্য করবে? চাকরি যদি এ জীবনে আর নাই জোটে তা
কি এই চুরি চুরি খেলা চালিয়ে যেতে হবে?

'টুনটুনি', 'টুনটুনি'—আমি গম্ভীর, গাঢ় স্বরে যেন ঘুমের মধ্যে থেকে
জেগে উঠে পাশে দেখতে না পেয়ে পাগলের মত মনে মনে চীৎকার করে উঠ
আমার ঠোঁট, শরীর আগুনের আঁচে ঝলসে যাচ্ছে। আর, আর কতোদিন অ
আর কতোদিন এই হীন খেলা? কেন, কোন্ চোরের দায়ে ধরা পড়েছি?

তোমার বাবা, কি আর এখন করবেন, তুরুপের তাস তো আমাদেরি
বিয়েটা স্বীকার করেন, জামাইকে স্বীকার করেন না, বলেন, স্কাউন্ড্রেলটা যে
কি? চাকরি করে না অথচ বিয়ে করার শখ। যতোসব ইরেস্পন্সিবল।
হবার মুরোদ নেই, প্রেমিক সেজেছেন।'

আমার মাও তেমনি, মাও বলে, 'ওসব এখেনে চলবে না। বুড়ো বাপের
আর কতো জুলুম করবে? বলে নিজে খেতে পায়না আবার শংকরাকে জো
ঝাঁটা মারো।' পাড়াপ্রতিবেশী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'এরই নাম পেরেম। খা
কি?'

'খাওয়াবে কি'—কি খাওয়াবো? কত্তো মাথাব্যথা! কেন, ভালো
খাওয়াবো। ভালোবাসা কি খাওয়া নয়? কলেজে যখন মঞ্জুকে খুঁজতা
সেসব একদিন আমার গেছে, যখন 'মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জুরে' বলে মঞ্জুকে পাগলের
খুঁজতাম, খুঁজতাম অথচ যখন পেতাম না, আমার এই হাড়হাভাতে বন্ধুদে
বুঝতো ও নিশ্চই পার্টটাইম আর একটা প্রেমের ফাঁদে ধরা দিয়েছে আর গ
'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের ও পাখি', তখন একদিন জয়ন্তকে জি
করলাম, 'হ্যাঁরে, মঞ্জু কোথায়?'

'কেন, নিয়ম।'

'ধুৎ! ইয়ার্কী করিস না। মঞ্জুকে আমার কি যে ভীষণ দরকার।'

'মঞ্জুকে খুঁজছিস? কি আশ্চর্য, এতো সবাই জানে রে। মঞ্জু এখন মনগর' পার্কে বসে আসিকের ভালোবাসা খাচ্ছে।'

হাঃ হাঃ হাঃ, বেড়ে কথাটি। বেড়ে বলেছিলো জয়ন্ত। মঞ্জু এখন প্রেম-রে আসিকের ভালোবাসা খাচ্ছে। কিউটি। আহা, মঞ্জুটার বেশ গার্লি গার্লি ছিলো। এ ফেস, ইয়াং ফেস। খুব ইন্টারেস্টিং বডি। হাসিটা ক্রুয়েল চ স্যুইট যাকে বিউইচিং বলে, তাই না?

অনেক বড় বড় ডায়লগ, কাজে স্ক্রীন পেলে বোম্বাই পনেরো রিলের ছবি যা য়াসেই দশ রিল করা যায়. তেমনি মেয়ে ছিলো না মঞ্জু।

সে যাক। ভালোবাসা খাওয়ানোর কথাটা তখন থেকে শিখেছি। আমার মঞ্জু ছ. টুনটুনি এসেছে, আমার রেস্টুরেন্টের টেবিল কখনো ফাঁকা যায় না. কেউ কেউ এসে বসবেই। রেস্টুরেন্টবাজীতে আমি কি এক্সপার্ট? কে জানে শালা। মঞ্জু যদি ভালোবাসা খেতে পারে টুনটুনি কেন ভালোবাসা খেতে পারবে না? লাবাসা খেয়ে তার পেট কেন ভরে যাবে না? না, ইয়ারকী নয়, আমি তো টুনিকে জড়াতে চাইনি, ছাড়াতেই চেয়েছিলাম। টুনটুনি জড়িয়ে গেল অদ্ভুত। জড়ানো মেয়েটাকে আমারও ভালো লেগে গেল খুব, মাইরী। ওরও এমন গল, আমার মধ্যে যে ও কি পেলো! সুন্দর সুন্দরকে টানে, এ তো হতেই পারে, তু সুন্দর অসুন্দরকে টানে, এ ভারি অদ্ভুত, জীবনের এও এক ধারা। কে যে মধ্যে কি খুঁজে পায়! মেয়েটা একদম পাগল। একদম অবুঝ। আব তই এই কান্ড, আমার একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়..., ভেল্কি আর কাকে !!

...হ্যাঁ বাই। কতোক্ষণ তোকে দেখিনিরে টুনটুনি। তোকে কতোক্ষণ ছুঁইনি। া, কি সেই ছোঁওয়া। যেন স্বর্গসুখ? এদিক ওদিক তাকিয়ে সে আসছে পায়ে গলির অন্ধকারে, তারপর একথা সেকথা, ওরি মধ্যে কতো মান ভমান, কেউ দেখছে কিনা ভালো করে আন্দাজে দেখে নিয়ে তারপর আহা ু এক মিনিটের স্বর্গ। কতো শঙ্কা! কতো ভয়! কেউ এসে গেল নাকি রে! এই গলির মধ্যে! খড়খড়ি খুলল কেউ বাড়ির?

আমি যেন দু' চোখ ভরে দেখতে পেলাম, টুনটুনি এতোক্ষণে গলির মাঝা-ঝ এসে দাঁড়িয়েছে, অপরূপ তার ভঙ্গী, চলনে বলনে গড়নে নদী যেন উপচে ছে, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, সখা ধরো ধরো মালা রা গলে! উঃ, আর তো পারা যায় না। অপেক্ষা আর অপেক্ষা। আর তাক্ষণ অপেক্ষা? আমি ওকে সজোরে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আমার রের সমস্ত নিষিদ্ধ আগুন ঢেলে দিলাম। নে, এই নে, এই বিষ নে। নে. আগুন নে, এইবার জ্বল। মদের মত জ্বলা। কিন্তু এই বিষাক্ত আনন্দ, এর মানে? এ তো শুধু এক মিনিটের জন্যে। এই এক মিনিটের মধ্যেও বার সেই ধুকপুকুনি, 'এই, কেউ দেখে ফেললে না তো!'

'ঠিক, কেউ দেখেনি?' এইসব হতভাগা প্রশ্ন।

কেন এই সব? না, আমার একটা চাকরী নেই বলে। আমার চোখে জল স গেল। জলটা মুছে আমার এই মুহূর্তে গলা ফাটিয়ে চুঁচড়োর লোকদের নিয়ে শুনিয়ে যেন বলতে ইচ্ছে করলো, 'ওই, তোমরা যারা চাকরি দেনেওয়ালা, কে মেরা তা জানি না। দেশের সরকারই হও আর যেই হও, তোমাদের যে রাজই াক, গোরুয়াই হও আর লালই হও, ওসব পঞ্চাশ টাকার বেকার ভাতার ধাপ্পাবাজিতে ড়ো। যদি তোমরা ভালোয় ভালোয় আমার টুনটুনিকে আমার কাছে আসতে দাও, তাহলে আমি তোমাদের শেষবারের মত সতর্ক করে দিচ্ছি, "আমার গায়ের ই বারুদমাখানো সার্টে আমি দাউ দাউ করে আগুন জ্বালিয়ে শুধু একা একা ড়ে মরবো না, সবাইকে পুড়িয়ে মারবো, তোমাদের সুখে থাকতে দেবো না নদিন। তোমাদের ভিটেতে ঘুঘু চরাবোই চরাবো। "আমার ভালোবাসার য়ে যদি আমার কাছে আসতে না পারে তবে আমি ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তোমাদের চিড়ে কামড়ে টুকরো টুকরো করে দোব। সাবধান।' আর সঙ্গে সঙ্গে, একটু াগে যা ভেবেছিলাম, মন্ত্রোচ্চারণের মত আবার সেই ধুয়োটাই ফিরে ফিরে মনের ধ্য বেজে উঠলো, আজই, এখনই একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। এরকম রের মত বাঁচা আর নয়। যা হয় হোক। আমি, এখনই সরাসরি ওদের বাড়ি বই। টুনটুনির হাত ধরে ওর বাপের সামনে, পাড়াপ্রতিবেশীর ড্যাবডেবে াখের সামনে দিয়েই ওকে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে নিয়ে এসে আমার এই যাকেলে, হতচ্ছাড়ী মায়ের কাছে এনে ফেলে দেব, যদি না করি, তবে আমি ৌতম রায়ই নই, তোমরা আমার নামে কুকুর পুষো। না হয় মুটেগিরিই করবো। হয় বর্ধমান থেকে মুড়ি কিনে এনে চুঁচড়োর দোকানে দোকানে ফেরি করবো। টো পেট একরকম চলে যাবে। চুরি চুরি আর চলবে না। আর বরদাস্ত রা যাচ্ছে না।

...টাইম অফিসের ঝুলন্ত দাঁড়টায় সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে যখন নিজের জীবনের একমাত্র বেপরোয়া সিদ্ধান্তে শান দিচ্ছি, এমন সময় 'এলবার্ট' ক্লাক-মের পাশাপাশি গলি থেকে ভূতের মতন বেরিয়ে এলো সুকুমার, যেন একখানা মড়ানো কাগজ, এসেই হন্তদন্ত হয়ে আমার হাত দুখানি ধরলো।

'সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে গৌতম। বাবা বোধ হয় আর বাঁচবে না রে। বাবার ট্রোক। আমাদের হাউস ফিজিসিয়ান বলল, এক্ষুণি বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে ও। দেরী কোরো না। কি করবো গৌতম? আমি যে হাসপাতালে কোথায় করতে হয় জানি না রে। একটু সাহায্য দে। তুই সাহায্য না দিলে'—

অপরিসীম বিরক্তিতে মন ভরে গেল। মনে হল সুকুমারকে টেনে এক লাথি মাই।

'বাবা তোর। তোর বাবা তো আমার বাবা নয়। খুব করে ভাব। ভেবে তক্ষোক্ষণে তোর বাবা পটল তুলুক। আমরা ধুম করে পুড়িয়ে আসবো 'খন।'

রলে আমি ইচ্ছে করে সুকুমারকে খোঁচা দিলাম। খোঁচা খাক। একটু চেতন হোক। কি পরিমাণ কাকে তেলমবিল খাইয়ে চাকরী আদায় করতে হয় সে ব্যাপারে বেশ টনটনে বুদ্ধি, খুব জানো কাকে ক' গ্যালন খাওয়াতে হয়, আর হাসপাতাল জানো না? জন্মেছো হাসপাতালে আর হয়তো মরবেও হাসপাতালে, ডিস্ট্রীকের একটাই হাসপাতাল, হদ্দো হদ্দো লোক চেনে আর তুমি জানো না? না জানো তো জেনে নাও। বাবার স্ট্রোক হয়েছে, ভালোই তো, হাসপাতাল জানার অমূল্য সুযোগ পেয়ে গেলে। এ সুযোগ কখনো হাতছাড়া করে? শালা, আমি তোমাকে সাহায্য দেবো? একটা চাকরি জোটাতে পারিনি বলে টুনটুনিকে... আমার চোখ গরম জলে ভরে গেল, ভীষণ একটা রাগ পাক খেয়ে পাক খেয়ে ভেতরে ভেতরে গুমরে গুমরে উঠলো।

সকাল, দুপুর, সন্ধে, এই কিছুক্ষণ আগেও যেমন দাঁড়িয়েছিলাম, সেইরকম সুকুমারও আমাদের সঙ্গে দাঁড়াতো, কি আর করবে, চাকরী তো নেই, তাই দাঁড়িয়ে থাকা, চাকরী থাকলে চলতো, ছুটতো, ধাক্কা মেরে চলে যেতো। পর্ট-টু দিয়ে একটা কি ট্রেনিং নিতে দুর্গাপুরে ছুটেছিলো, তারপর কি হল জানি না, আবার যে কে সেই, আমাদের মত এই রেস্টুরেন্টের সামনে দেখছি ও দাঁড়িয়ে আছে।

শালা, যাবে কোথায়? ঘুরে ফিরে এইখানে এসে দাঁড়াতেই হবে। মাঝে মাঝে এরকম ঘটে। কেউ না কেউ বেপাত্তা হয়ে যায়। যেমন জয়ন্ত ঐখানে, এই রেস্টুরেন্টের ধারে দাঁড়াতে দাঁড়াতে, বেশ কদিনের জন্যে ডুব, কে যেন বলল, মধুই বোধ হয়, ও 'ইনকাম'এ চাকরী করছে। দশ হাজার টাকার শেয়ার কিনে বেশ দামী, চোস্ত একখানি চাকরী। মাঝে মাঝে চলন্ত বাস থেকে ওর মুখের একপাশ দেখা যায়। ও হাসে। অবাক হয়ে দেখি, মুখে বেশ আত্মপ্রত্যয় এসে গেছে, অনেকটা যেন দিগ্বিজয়ীর হাসি। নিমাইটা মহা ঠেঁটা। ও বলতো, 'গৌতম, ঘাবড়াস না! ও দেখিস ঠিক ঘুরে ফিরে আবার দাঁড়াতে আসবে।' হলও তাই। বছর না ঘুরতে জানা গেল কোম্পানীটি জাল। জয়ন্ত একদিন পাগলের মত হাসতে হাসতে খানিকটা ছেঁড়া তুলো এনে দেখালো।

বলল, 'চলে আসবার আগে ব্লেড দিয়ে আমরা সবাই গদীগুলো ফালা ফালা করে চিরে দিয়েছি। এই নে তুলো। বলে তুলোটা উড়িয়ে দিয়ে কেমন অদ্ভুত কান্না জড়ানো গলায় বলল, 'এই সঙ্গে জীবনের সব চাকরী উড়িয়ে দিলাম।' এমনি করে করে মধুও আসে না একদিন। মধুর কি হল? বুকটা ধড়াস করে উঠলো। চাকরী পেয়ে গেল নাকি? শুনলুম, লুকিয়ে লুকিয়ে নাকি টিসুর সাপ্লায়ার ছিলো, তারপর কোম্পানী ওকে এবসরভ করে নিয়েছে। এমনি করে করে নিমাইও একদিন বেপাত্তা। কি হল নিমাইএর? চাকরী পেয়ে গেল নাকি? বুকটা ধড়াস করে উঠলো। আর তাহলে রেস্টুরেন্টের সামনে ও

কে না আমাদের মত ? ও তাহলে বাসে, ট্রেন ছুটবে ? এও শোনা কথা। কি কোন কোম্পানীর স্যালাইনের সেলসম্যান হয়েছে। শুনলাম দু' চার মাস সে চাকরীটিও গেছে, পরে কিছুদিন 'সিভিল কণ্ট্রাক্টরের ভূমিকা. তারপর ক সেই, কি জানি কি হল, বড় আনন্দ পেলাম, দেখলাম, মধু নিমাই ওরা এসেছে, এসে কখন আমার পাশে রেস্টুরেন্টের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছে, থেকে সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধে, রাত দশটা পর্যন্ত শুধুই দাঁড়ানো. অভিজাত, গ্রীল দিয়ে ঘেরা রেস্টুরেন্টের সামনে শুধুই দাঁড়িয়ে থাকা, আর মাযাহী, রাজহাঁসের মত ভেসে যাওয়া, রূপের বালিকাদের দিকে হাঁ করে থাকা...

এইভাবেই চলছিলো। হঠাৎ দেখি সুকুমার আসে না। এদিকে এলাহাবাদে কম্পিটিশানের ডেট ক্রমশই এগিয়ে আসছে। কি করি, ওর একটা ইমপরট্যান্ট রয়েছে, ও তো আর প্রক্সি দিয়ে চলবে না, কি জানি কোলকাতায় গেল না থিয়েটার পাড়ায় ? এর তার মেরে আমাদের তাক লাগিয়ে দেবে স্টেজে ? অথবা ও যা বলতো, 'শালা, এরকম করে তাপ্পি মেরে আর চলে না। সরকারই তাপ্পিবাজ। সব শালা নকশাল হয়ে যাবো গৌতম। হাতে স্টেন ফাইট দেবো। মধু তুই ঋত্বিকের 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' দেখেছিস ? উঃ, মধ্যে, একদিকে মানে, সেই সিনটা রে, সেইসব হচ্ছে, কি যেন শীৎকার কি, আর একদিকে পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা স্টেন হাতে, শালা, রিয়েল হচ্ছে এই !'

আমরা ওসব রাস্তা অনেক দেখেছি, নেহাত পাগল না হলে জমানা পাল্টানোর বাব দেখো ! বেটা বাইশ বছর বয়েস হতে চলল, এখনো নাবালক। ওকে তে হাসতে বলতাম, 'নে, মাথায় বিপ্লব চড়ে গেছে। একটা ডাব কিনে তোর টাকে ঠান্ডা কর।'

...ও কি শেষ পর্যন্ত তাই করলো নাকি ? বিপ্লব করতে নেবে গেল ? সুকুমার, ওর সম্বন্ধে তো ওসব ভাবাই যায় না, পেটি বুর্জোয়ার বাচ্চার বিপ্লব। মুখে বিপ্লবের চোঁয়াঢেঁকুর আর বিয়ের সময় বাপের সুপুত্তুরটি মেয়ের বাপের গলায় আঁকিস দিয়ে মোটা টাকা কবলানো, বিপ্লব কা বাচ্চে সব শালাকেই জানি ! কিন্তু সুকুমারটা গেল কোথায় ? একদিন ওরও পাওয়া গেল। কারখানার ইউনিয়ন বাবারা (নেতারা), কাকা ছাড়া কি, কি একটা 'কল' বার করেছে, ওয়ান ফর ওয়ান, সে তোমার যোগ্যতা চাই নাই থাকুক, বাপের বদলে ছেলে, ওয়ান ফর ওয়ান...একটা চাকরী যাবেই, পেছনে অবশ্য ইউনিয়নের ব্যাকিং চাই। এইরকম করেই নাকি মারের চাকরিটা জুটে গেল। সুকুমারের বাবা ইউনিয়নের পান্ডা, স্টীম সানের ফোরম্যান, রিটায়ারমেন্টের আর বছরখানেক বাকি, চালু পুরিয়া এক-ন, প্ল্যান এঁটেছিলেন ছেলে যদি একে ওকে ধরে আপনাআপনি চাকরী একটা তে পারে তাহলে উনি হাজার দশেক টাকায় ওঁর চাকরীটা বেচে দিয়ে সাট্টার হয়ে যাবেন, কি আর করবেন, কোয়ালিফিকেশান বলতে তো ওই ওয়ান মর্নিং আই মেট এ লেম ম্যান ক্লোজ টু মাই ফার্ম...কিন্তু সে গুড়ে বালি গেল, ছেলে এখানে ওখানে তল্লাশ করেও কিছু একটা জোটাতে পারলো না। কে রিটায়ারমেন্টের টাইম এসে যাচ্ছে, চাকরী থাকতে থাকতে ছেলেকে যদি ক্টরীতে ঢোকাতে পারেন তাহলেই ঢুকবে, না হলে চাকরী চলে গেলে কে কাকে পোঁছে, অতএব ওয়ান ফর ওয়ান উনি রিটায়ার করলেন, সুকুমার টানতে ঢুকলো, আর স্ট্রোকটা বোধ হয় এই জন্যে, আহা হাজার দশেক টাকা গে লাগবো লাগবো করেও ভোগে লাগলো না, এই শোক কি কম ! পুত্রশোকও কাছে কিছু নয় ! বেশ হয়েছে স্ট্রোক হয়েছে। আমাদের বাপঠাকুরদা কেউ খানায় ঢোকেনি কোনদিন, বড় বড় ইজ্জতদার লোক, বলতো, কারখানায় ঢুকলে ইজ্জত থাকে না, আজীবন তেলচিটে কেরানী, (সেটা খুব ইজ্জতদার কাজ !) দের জন্যে কে আর খুলে দেবে ওয়ান, ফর ওয়ান-এর চিচিংফাক ! কোথায় হানা দিয়েছি আমরা বগলে এক গাদা সার্টিফিকেট ঝুলিয়ে ! কেউ কেউ সাফ বলে দেয় 'আমার দ্বারা কিছু হবে না', এদের আমরা বুঝি, কিন্তু কেউ আবার অন্যরকম। গম্ভীর, সিরিয়াস মুখে বলে, 'দেখি কি করতে র !' ঢাড়িশ, করবি কি তা আমরা জানি। এই করে করে ছ' মাস একবছর লয়ে রাখবি। তারপর খুব ধরাকরা করলে গাল ফুলিয়ে বলবি, 'থানায় মার নামে রিপোর্ট আছে। চাকরি দিলেও চাকরি রাখতে পারবে না। পুলিস ফিকেশনে আটকে যাবে।'

এইসব শুনে মাথায় যদি খুন চাপে, যদি হারামীর কলার চেপে ধরি, যদি দি, সেটা কি খুব অন্যায় হবে ?

বলবো, 'তোমার বাবার রিপোর্ট ভালো ছিলো ? তোমার ? তোমার ছেলের ? আমায় রিপোর্ট দেখাচ্ছ ? মুখ খুলবো ? আরে, কোন জগতে বাস করিস পশ্চিম বাংলায় এরকম সময় আমাদের বয়েসী এমন একটা ছেলেও কি আছে একটা না একটা কেস নেই ? একটা রিপোর্ট নেই ? চাকরী তাদের হচ্ছে আরে, জেল থেকে তুলে এনে চাকরী হয়ে যাচ্ছে ফ্যাক্টরীতে, এরকম কতো পার্ট চাস ?'

এইসব লোকগুলো, মুখে অমায়িক, সিল্কের মত হাসি তেল চুকচুকে, খুবই মাপা মাপা কথাবার্তা, দেখবামাত্র মাথায় খুন চাপে, আমি বোধ হয় কে বলে দিতে পারি, কে কি রকম 'বস্তর' এক একখানি !

আবার 'ইংরিজী' বলা চাই। কোনরকমে, চোতা-টোতা করে আই এ, বি তরে গিয়ে, তারপর মাস কয়েকের জন্যে স্পোকন ইংলিশের ক্লাসে পাঠ নিয়ে, আউরী ভুল ইংরেজী হোসপাইপের মত হড় হড় করে বলে কেউ চার্জহ্যান্ড, উ ম্যানেজার, কেউ সুপারিনটেণ্ডেনট, যতো সব ফোরটোয়েণ্টি, খুল মাল এক একখানি, বেঁচে থাক ইউনিয়ন বাবারা (নেতারা), বেঁচে থাক ওয়ান ফর ওয়ান, চুঁচড়োয় বাবা ষণ্ডেশ্বর আর তুমিই সত্য, আর সব বিলকুল ঝুট। এ জন্মে আর হল না, আসছে জন্মে যদি মোকা পাই তবে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা হবেই। কিন্তু ধরো, আসছে জন্মে যদি কুকুর হয়ে জন্মাই, তব্বে ? তবে তো চিত্তির। লাও শালা, এ লাইনে তো ভাবিনি কোনদিন।

'মাইরী গৌতম। এ যাত্রাটা তুই বাঁচিয়ে দে মাইরী। তোকে 'মিলন'-এ 'আজাদ' দেখাবো। মাইরী বলছি ফার্স্ট ক্লাসে। আপন গড বলছি। একটু সাহায্য দে মাইরী। তুই তো বসেই আছিস ?'

'এই বে, তুই থামবি ? বসে আছিস, ফের এই সব বললে, আর একবার বললেই ঝাঁপড় খাবি।'

'হ্যাঁ, মাইরী। আমার অন্যায় হয়েছে। তাহলে তোকে আমি সঙ্গে পাচ্ছি তো ?'

দ্যাখো কান্ড ! আমি কি অদ্ভুত ! এই এক্ষুনি যাচ্ছিলাম টুনটুনির ব্যাপারে শেষ ফয়সালা করতে। প্ল্যানট্ল্যান সব একদম ছকা। ওর বাবা যদি বাধা দেয় তাহলে কি বলবো, আমার মা যদি পাড়া মাথায় করে তাহলে কি বলবো, সে সব একদম মুখস্থ। প্রত্যেকটি কথা বেশ শান দিয়ে নিয়ে বুক ফুলিয়ে তৈরী হয়েছিলাম. মনে বেশ জোরও পাচ্ছিলাম, তারপর. তারপর হঠাৎ কি হল রে গৌতম ? এ যে মনে হচ্ছে তুই নিমরাজী হয়ে গেলি ? অ্যাতো করে শানানো প্ল্যানটা ফুটো হয়ে গেল ? কিন্তু প্ল্যানটা ফুটো করলো কে ? আমি, আমার ভেতরের ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে সুকুমারের দিকে কটমট করে তাকালাম। কিন্তু ঠিক তখনি পাশ দিয়ে একটা মোটর সাইকেল উল্কার বেগে ছুটে গেল। আমার অজান্তে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'অকসন'। সুকুমারও সেটা লক্ষ্য করেছে। ও তাড়াতাড়ি বলল, 'কি করে বললি ?' আমি তাচ্ছিল্য সহকারে একটু মুখ বেঁকিয়ে বললাম, 'মিলিটারী অকসন। টায়ার দেখলেই চেনা যায়।' সুকুমারও ধাবমান মোটর সাইকেলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। আর আমি নিশ্চিত জানি ও আর আমি এই মুহূর্তে কি ভাবছি। আমরা. আমাদের মত এই বয়েসের ছেলেরা ঠিক যা ভাবে তাই : আমাদের যদি একটা মোটরসাইকেল থাকতো !

'অ্যাম্বুলেন্সকে একটা খবর দোব ?' সুকুমার আমার সঙ্গে চলতে চলতে বলল। 'অ্যাম্বুলেন্স।' আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। সত্যি ? আজব চিড়িয়া এক একটি। হাসপাতালে তিন তিনটি অ্যাম্বুলেন্স, তার মধ্যে দুটো সব সময়ই লঝঝড়, আর একটা শুধু আস্তো। আহাম্মক ছাড়া আর কেউ কি ভাবে সে অ্যাম্বুলেন্স পাবেই ? আহা খোকন, খোকন একেবারে, কিছুই জানে না, হাঁটছে কিন্তু কোথা দিয়ে হাঁটছে তা জানার দরকার নেই ! আরে, তুমি, ডি এম ও কে ধরেই এসো না, দেখি তোমার মুরোদ, অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার, তুমি খবর দেবার আগেই সে ঠিক খবর পেয়ে গেছে, গাছতলায় দাঁড় করানো গাড়িটার বনেট তুলে তার মধ্যে মাথা গলিয়ে কি সব ঠুকঠাক করতে আরম্ভ করেছে। তুমি বললে, 'দাদা, একটু শুনুন, ডি এম ও বললেন—'

বনেট থেকে অসীম দয়ায় মাথাটা তুলে ড্রাইভারটি এইবার বড় সদয় চোখে তোমাকে অবলোকন করবে, করে বলবে, 'দাদু, দেখতেই তো পাচ্ছেন, গাড়ি ব্রেকডাউন। গাড়ি তো আমার বাপের চাকর নয় যে ছোট্ বললেই ছুটবে। আপনি বরং অন্য ব্যবস্থা করুন।'

অথচ পার্টি ঠিক ঠিক ফিট করলে মানে কিছু একটা হাতে গুঁজে দিলে তখন মরা গাড়িই আবার এক মুহূর্তে জ্যান্ত হয়ে ভেল্কি দেখাবে। কিছুই জানি না। হুঃ, যতো সব—

'না। ও সব হবে না।'

সংক্ষেপে এ কথা বলে আমি চলতে লাগলাম। হুস করে দুধের গাড়িটা চলে গেল। হরিণঘাটার দুধ। কিন্তু এখন, এ সময়ে এই গাড়ি এখানে কেন ? গাড়ি তো আসে সকাল সাড়ে সাতটায় বাজারের পাশে দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রে, যেখানে বেগুন মার্কা শুঁটকে শুঁটকে মেয়েগুলো বোতল বেচে। কে জানে, কি সব কারবার হচ্ছে ! ঐ যে নিতুদা, দোকান থেকে বেরিয়েছে, আটটা বেজে গেল। আজ বেশ একটু আর্লি হয়ে গেল, কে জানে কি ধান্দা। নিতুদা দোকানটায় বেশ বড় বড় তিনটে সাতমণই তালা ঝুলিয়ে, কানে মুখে হাত ঢুকিয়ে কি সব বিড়বিড় করে বলছে, এই দ্যাখো কান্ড। দোকানের ঠিক তলায় যে নর্দমা সেই নর্দমার ধারেই সোপাটে বসে গেল। কেন, অন্য জায়গায় সরে গিয়ে বসলেই হত না। এখন নাও, খাড়া পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকো, নিতুদার সবি বেশি বেশি, পাঁচ মিনিটের কম কি হবে ! স্বনামে একটি মাত্র বউ, আচ্ছা, একটিই সই, কিন্তু নিতুদা যখন রিকশা সাজিয়ে কোথাও যায়, সেও একটা দেখার ব্যাপার, তিন তিনটে রিকশা বোঝাই, নিতুদার সবি বেশি বেশি, ছেলেপিলেও, তা কম করে এক ডজন তো হবেই। এ ওর ঘাড়ে ঠেসাঠেসি করে বসে এক ডজন বেলুন ওড়াতে ওড়াতে চলছে, সব শেষে নিতুদার রিকশা, কর্তা-গিন্নী বসে আছেন, সন্তানগর্বে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, একে ওকে ধমকাচ্ছেন, আর অনর্গল হাসি। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছেন ! সে একটা দৃশ্য ! তা হোক, এখন পাঁচ মিনিট হয়ে গেল, নিতুদা কি নর্দমার ধার থেকে আর উঠবেই না। কি এতো ভাবছে ! কাকে ফাঁসানোর মতলব বাবা !

'নিতুদা !'

'কে রে !' নিতুদা যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠলো।

'আমি গৌতম।'

'হ্যাঁ। তা কি করতে হবে ? গা থেকে ক' কিলো মাংস দিতে হবে ?'

'ওই তো মাইরী। তোমাকে আমরা কতো শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, আর তুমি মাইরী এমন সব কথা বল, এমন দুঃখু দাও—'

বলে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসলাম।

'আর দাঁত বার করে হাসিস না। দ্যাখ, কতো রোগা করে দিয়েছিস। বিজনেস আর করবো না। গা থেকে অনবরত মাংস কাটলে কি আর বিজনেস করা যায়। এমনিতেও যা ডাল যাচ্ছে—'

'তোমার মাইরী সব সময়ই ডাল। একদিনও শুনলাম না দিনকাল তোমার ভালো যাচ্ছে। এদিকে তিন তিনটে লরী মগরা টু বড়বাজার করছে। ব্যান্ডেলে দুটো স্ক্রাপ্পি'র দোকান। খবর আছে আমাদের রুটে মিনিবাস চালু করার পারমিট পেয়েছো।'

'ঐ তো শালা! খালি হিংসে! খালি মনে মনে জপ করছিস নিতুদা কখন ভাগাড়ে যাবে। নিতুদা কখন পথের ভিকিরি হবে। যাক, সোজা কথায় বল, কতো চাই?'

'কিছু চাই না।'

'তবে?' এবার নিতুদার অবাক হবার পালা।

'তোমার মোটরটা দাও। সুকুমারের বাবার স্ট্রোক।'

'কেন রে? নিতুদা তো খুব খারাপ। নিতুদা গরীবের রক্ত চোষে। তোদের এম এল এ তো এই সব বলে বলে জেলার মাথা হল। তার কাছে যা না?'

'মাইরী, কিসে আর কিসে? ধানে আর তুষে। আমরা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে রেয়াৎ করি কোনদিন দেখেছো? এই সেবার যখন বেবিফুডের ব্ল্যাক করতে নাবলে, তখন আর কাকে আমরা সাহারা দিয়েছি বল, তুমি ছাড়া!'

'থাক থাক। খুব সেয়ানা হয়েছিস। ব্যাটা তোকে হতে দেখলাম, তোর বাপকে সেদিন বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলাম টোপন পরিয়ে। আর এর মধ্যেই এতো বড়ো ছেলে। যাক গে। যা, গোডাউনে যা। গাড়ি তো তোদের ভাড়া খাটবার জন্যেই বেকার দাঁড়িয়ে আছে। দারোয়ানকে আমার নাম করে বলে নিয়ে ভাগ শালা।'

'মাইরী তুমি দেবতা। পায়ের ধুলো, একটু পায়ের ধুলো।'

'বলছিস।' নিতুদা দু পা ফাঁক করে দাঁড়ালো। মুখে যাই বলুক, নিজে বিজনেস চালাতে একে ওকে পাম্প দেয়, নিজেও কম পাম্প খায় না। নমস্কার নিলো অম্লানবদনে।

দু পা এগোতে না এগোতেই লোড-শেডিং। যাঃ, কেবল বার্স্ট করলো থারমসের। চারিদিক এক মুহূর্তে অন্ধকারে ডুবে গেল। এই এক আপদ জুটেছে এ রাজত্বির। যখন তখন লোড-শেডিং।

'নিতুদা, কেবল বার্স্ট করলো থারমসের।'

'হ্যাঁ। এবার বাংলা বার্স্ট করতেই যা বাকি। এদেশের আর কিস্যু হবে না।'

'নিতুদা, তুমি খুব দেশ নিয়ে ভাবো।'

'ন্যাক শালা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দারোয়ানকে গিয়ে বলবি সে যেন গোডাউনের ম্যানেজারকে বলে, জেনারেটারটা চালু করে দিতে। খালি গচ্চা, খালি গচ্চা। এদিকে তোর বউদি তো একখানি যন্তর। বলে খালি লোড-শেডিং খালি লোড-শেডিং। টিভিটা কিনে ইস্তক এই হচ্ছে।'

গোডাউন থেকে গাড়িটা নিয়ে সুকুমারের বাবাকে তুলে সোজা হাসপাতাল। এমন কিছু রাত নয়। সাড়ে আটটা টাট-টা হবে। হাসপাতালের সামনে ত্রিভুজটার সামনে গাড়িটাকে দাঁড় করালাম। ড্রাইভারটা শ্যামি, মানে নিতুদার এমনি ট্রেনিং, ও সুকুমারের বাবাকে এমার্জেন্সীতে চালান করে দিয়েই আমাদের কোন কিছু না বলেই হাওয়া। পাছে আবার বেগার দিতে হয়, পাছে পেট্রল বাড়তি এক কাচ্চা খরচ হয়। শালা চশমখোর!

গাড়োয়ান হলে ঠিক মানাতো, হুমদো মত ঘাড়েগর্দানে ডাঃ সান্যাল টেবিলে শোয়ানো সুকুমারের বাপকে পরীক্ষা করে কাগজে ঘসঘস করে কি সব লিখে দিয়ে বলল, 'স্ট্রেচারে করে দোতলার নোতুন ওয়ার্ডে নিয়ে যান। বেশ কিছুদিন থাকতে হবে।'

আমি কাগজটা নিয়ে আগে আগে যাচ্ছি, স্ট্রেচারে সুকুমারের বাপকে চাপানো হয়েছে, সুকুমার পিছু পিছু আসছে, প্রকান্ড প্রায়ান্ধকার হলঘর পেরিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে। সকাল, দুপুর, বিকেল এখানে এ রকম সময় কতো কান্নাকাটি, কতো শাপমন্যি, কতো লাইন, কতো টিকিটের জন্যে হল্লা, এখন কিছু নেই, সব ফাঁকা, নিস্তব্ধ, কেমন ভয় ভয় লাগে, তার ওপর ওই ঘড়ঘড় শব্দ, চাকা লাগানো টিনের স্ট্রেচারটা ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, নিস্তব্ধ, প্রায়ান্ধকার হলঘরটা যেন গোটাটাই ঘড়ঘড় শব্দে ভরে গেছে, হঠাৎ মনটা বেজায় দমে যায়, এ পৃথিবীতে, এই মুহূর্তে ঘড়ঘড় এই ভয়ানক দানব শব্দটাই যেন সত্য, বাকি সব মিথ্যে।

এর মধ্যেই সুকুমার দু একবার বলবার চেষ্টা করেছে, 'মাইরী, তোর যা স্যাক্রিফাইস, তুই যা করলি—'

আমি আমল দিইনি ওকে। কোন উত্তর দিইনি। কিন্তু কেন যে ও ও সব বলছে তখন বুঝতে পারিনি। দু-তিন মিনিট পর কিন্তু বুঝে গেলাম। দোতলায় নোতুন ওয়ার্ডে ভর্তি টর্তি করে দিয়ে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, ডিউটি শেষ। অনেকটা পুণ্য করা গেছে। আর নয়, এবার টুনটুনির ব্যাপারটা একটু......এখনও সময় আছে, ঘড়ির দিকে তাকালাম। নটাও বাজেনি এখনও। এখনো মনে করলে টুনটুনিকে নিয়ে....আমার ব্যাপারটা হয়েছে তাই, সেই যে কোথায় একটা গান শুনেছিলাম না, সে ভালো

পুনশ্চ পারী

নীরদ মজুমদার

পারীর প্রদর্শনীতে নীরদ মজুমদার, তাতিঅঁচ, মার্গারীট এবং জাভিয়ে

॥ চল্লিশ ॥
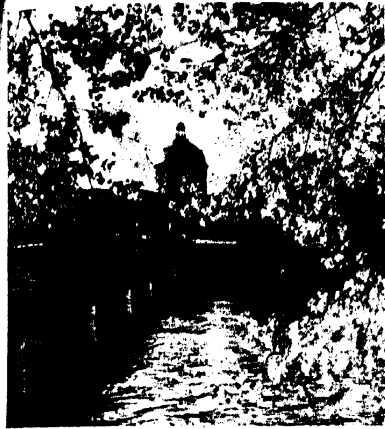
১৯৭৭ সালে পারীতে যে শুধু বেড়াতে এসেছিলাম তা নয়, প্রদর্শনী করার সংকল্প নিয়ে পুরাতন কিছু ড্রইং এবং নতুন ছবি সঙ্গে করে পারীতে উপস্থিত হয়েছিলাম বিশ বছর বাদে। কি ভাবে করবো, কোথায় করবো, আমার ছবির পক্ষে কোন গ্যালারী যুক্তিযুক্ত হবে কিছুই জানা ছিল না।

একপ্রকার অবস্থায় একমাত্র সহায় বন্ধু বুভিয়ে। ও-ই ঠিক করে দিল প্রদর্শনী হবে বুলভার রাসপাই-এ গ্যালারী ট্রান্সপজিশনে। গ্যালারীর কর্ত্রী মাদাম কাপিতেন খুবই সজ্জন মহিলা।

শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থা ঠিক। কিন্তু মুশকিল হল আমার ছবি নিয়ে। প্লেনে হালকা হবে বলে সব ছবি স্ট্রেচার থেকে খুলে নিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম স্ট্রেচার ওখানে জোগাড় হয়ে যাবে। ঝামেলায় পড়তে হল। কারণ যেসব ছবি আমি নিয়ে গিয়েছি, তাদের মাপের কোন বালাই নেই। এক একটা এক এক মাপের। এদেশে সব ছবির চলতি একটা মাপ থাকে।

পারীতে ছবির যে মাপ চালু তা দৃষ্টিবিজ্ঞান-সম্মত। মাপ মাফিক ছবিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন "ফিগুর" (আকৃতিচিত্র), "পেইসাজ" (দৃশ্যচিত্র) এবং "মারিন" (সমুদ্রচিত্র)। এই তিনেরই আলাদা একটা সাধারণ চালু মাপ আছে। যেমন ১ ফিগুর-এর মাপ হলো ২২ × ১৬, ১ পেইসাজ-এর মাপ হলো ২২ × ১৪, মারিন-এর মাপ হলো ২২ × ১২ সেন্টিমিটার। ক্রমান্বয়ে মাপ অনুযায়ী বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে যায় ১২০ পর্যন্ত। ফিগুর বেড়ে হয় যদি ১৯৫ × ১৩০ সেন্টিমিটার তাহলে এ পেইসাজ হবে ১৯৫ × ১১৪ এবং ঐ মারিন ১৯৫ × ৯৭ ইত্যাদি। সবই দৃষ্টিবিজ্ঞানগত আইনানুযায়ী ক্রমশ পরিবর্ধিত হয়ে থাকে। সুতরাং এই ধরনের যাবতীয় স্ট্রেচার সব শিল্পীদের বাড়িতেই পাওয়া যায়। তাই নিয়ে সহজেই প্রদর্শনী করা সম্ভব হয়। না হলো নতুন মাপে নতুন করে স্ট্রেচার করতে হয়। বড় কথা হল ঐ বাঁধাধরা মাপের পটে আঁকতে অভ্যস্ত হলে চিত্রকররা পরিচিত পটভূমিগত সংস্থানে অনায়াসে রঙ তুলির খেলা খেলতে পারে, পরিচিত জমিতে খেলা দারুণ জমে। অতএব আমি নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন।

অতগুলো ছবির স্ট্রেচার দোকানে করাবার সময় নেই। আমার সঙ্গে ছিল বুভিয়ে এবং দনিসের মেজ ছেলে ফ্রাঁসিস। ইঞ্জিনিয়ার সে এবং আর জে মেতিয়ের-এর প্রফেসর এবং তদুপরি আমার "ফিয়ল" বা আমার ধর্মপুত্র। বুভিয়ে এবং ফ্রাঁসিস দুজনেরই পরিষ্কার মাথা এবং তাদের হস্তদ্বয়ও চতুর। লেগে গেল তারা যন্ত্রপাতি নিয়ে। স্ট্রেচার ভেঙ্গে জুড়ে নতুন করে ছবি খাড়া করতে তাদের খুব একটা সময় লাগল না: ও-ছবির ফ্রেম করতেও তেমন বেগ পেতে হল না। পোস্টার ছাপা, নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপার জন্য বুভিয়ে গাড়ি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। প্রয়োজন ছুটল শত কিলোমিটার দূর অবধি।

দনিসের কনিষ্ঠ পুত্র জাভিয়ে সেসব পোস্টার পারীর "স্তাঁজেরমাঁ" অঞ্চলে ছড়িয়ে দিল—রেস্তোরাঁ কাফেখানা, রঙতুলির দোকানে। চারিধারে। নানা জায়গায়। জাভিয়ের বয়স পনের। দেবদূতের মত মুখ। সপ্রতিভ চালচলনের দরুন কেউই না বলতে পারতো না। সবাই অন্যান্য পোস্টারের পাশেই কাঁচের গায়ে লাগিয়ে দিল। একটি পোস্টারে দেবী আঁকা ছিল সাদাকালোয়। তলায় লেখা ঐতিহ্যগত হিন্দু শিল্পী নীরদ মজুমদারের চিত্র। গ্যালারী ত্রাঁসপোজিসিওঁ। ভেরনিসাজ; বৃহস্পতিবার ৯ই জুন—উদ্বোধন সন্ধ্যা পাঁচটায়। ১৩২ বুলভার রাসপাই, পারী।

নিমন্ত্রণপত্রে ছোট্ট করে লেখা—"চিত্রকর নীরদ মজুমদার মূলত হিন্দু প্রতীকধর্মী চিত্রকর। তাঁর ছবি শ্রীচক্র অনুযায়ী ক্রমবর্ধিত হয়ে বিকশিত হয়। মুখ্যত প্রথম বিন্দু হতে ত্রিকোণ, পরে আকৃতি বহুধা বর্ধিত হয়ে হয়ে উঠে পদ্ম। শেষে বাহিরাকৃতিতে পৌঁছয় হিন্দু আর্টের "আর্কেটেপ" (ইং আর্কিটাইপ অর্থাৎ আদিরূপ) অনুযায়ী। বিষয়বস্তু ক্রমবর্ধিত হয় ছবি হতে ছবিতে। জ্যামিতিক স্থান পরিবর্তন করে ও সঙ্গতভাবেই রঙ তার গভীর অর্থ জোরদার করে। এখানে যে সব ছবি উপস্থিত করা হয়েছে তা প্রধানত চন্দ্রকলার প্রতীকরূপে মূর্ত সৃষ্টি। আকৃতি, যন্ত্র ও মন্ত্র বিজড়িত রচনা।"

ছবির উদ্বোধন দিনকে বলে 'ভেরনিসাজ' অর্থাৎ যেদিন ছবিতে ভার্নিস দেওয়া হয়। কারণ ছবি আঁকার

প্রবহ পাত্র (১)—নীরদ মজুমদারের তৈলচিত্র। বিমূর্ত নয়, কিন্তু জ্যামিতিক। আধ্যাত্মিক অংশও রয়েছে

নরকং পায় (৩)—ভিন্ন ভিন্ন কলায়

নরকং পায়—ভিন্ন ভিন্ন কলায়

পর ভার্নিস লাগানো হয় সব শেষেই এ এক প্রচলিত অর্থেই এ দিনের নামকরণ। ভের্নিসাজ কিন্তু বেশ ঘনঘটা করে হয়। আমন্ত্রিতরা আসেন তাঁদের "ত্রাতে'য়া" বেশভূষায়, বা ৩১ নম্বরের বেশভূষা পরে, অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে সেজেগুজে। প্রদর্শনীর মধ্যেই বহু স্যাম্পাইনের বোতোলের ছিপি উচ্ছ্বসিত হয়ে অবকাশে কামান দাগে। আমার প্রদর্শনীতেও রীতিমত ব্যবস্থা হয়েছিল। অতিথি নতুনত্ব ছিল নিজের এবং জানা-শুনো বাড়ির মেয়েরা সকলেই এসেছিল ঝলমলে শাড়ি পরে। প্রদর্শনী কানায় কানায় ভরা। যেসব ছবি উপস্থিত করেছিলাম সেগুলির বিক্রয় বিনয় সহকারে বললেও বলবো তুরুপের তাসের মত চূড়ান্ত। একক প্রদর্শনীতে এরকম ছবি দেখার অভ্যাস পারীর দর্শকেরও নেই। তবে ওদের খোলামেলা মন থাকায় প্রায় সকলেরই চোখে কিছু তৃপ্তি পৌঁছেছিল। তার সাক্ষ্য রয়েছে প্রদর্শনীর মন্তব্য লেখার খাতার পাতায় স্বাক্ষর করা। তার বেশী আমি আশা করি না। কারণ বোজার (শিল্পকলা) নেমে এসেছে ল'আর ব্রুতে (জানোয়ার শিল্পকলা)। —আসিন্ধ আলুনী তাজা আর্টে। অজানা ছাড়াও বহু পরিচিত মানুষ এসেছে পারী বা ফ্রান্সের অন্য জায়গা থেকে, যেমন বুভিয়ে পরিবার, মাদাম রীদ্, মাদমোয়াজেল ওবেরাইয়ে, আমার বাড়ির সকলে, তা ছাড়া বন্ধু প্রসিদ্ধ ফোটগ্রাফার রঘুবীর সিং, সস্ত্রীক কলকাতার আর পি গুপ্ত, উঠতি সেতারী কিশোর ঘোষ, আর প্যারীর বাসিন্দা চিত্রকর শক্তি বর্মণ। আরো অনেকে এসেছে দূর দেশ থেকে, যেমন ধরা যাক আমার বন্ধু এতিয়েন ও তার প্রণয়িনী ফ্রুস। বুলোইন থেকে জেনভিয়েভ আর ওর স্বামী লুসিয়া মিলার এবং ওদের ছেলেমেয়ে আর এসেছেন আমাদের মামী—এবং বন্ধু রেজীনদারিক নিয়ে।

প্রদর্শনীর আগে ঠিক যোগাযোগ করতে পারিনি আমার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে। করতে পারলে বড় ভাল হতো। হয়তো, আসতো এলিয়ান! এখন সে কত বড় হয়েছে, সংসারী হয়েছে দেখলে বড় ভাল হতো। ভাল লাগতো যদি আসতো, ফ্রাঁসোয়াজরা। কিন্তু, পঁচিশ বছর আমরা সবাইকে হারিয়েছি। "আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি!" তা ছাড়া কত জনের কথাই মনে পড়ছে! মার্সেলন, মিরেই, স্যাতমল, ক্যাথরীন, নোয়েমী, রাস্লানীস্ক—এ দুনিয়ার সবাই, কে কোন কোণে ছড়িয়ে গেছে জানি না। চেষ্টা করলেও ঠিকানার সন্ধান পাব না।

আর একজনের কথা বার বার মনে হচ্ছিল। জাঁ কোকতোর কথা। তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশ দশকের আগে বহুবার দেখা হয়েছে ওঁর প্রকাশকের বাড়িতে। প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ করেছি। একদিন ওঁর বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই সাক্ষাৎ হল, একটি সুন্দর পুরুষের সঙ্গে। ত্বরিৎ গতিতে নামছিলেন তিনি।

ওঁকে বললাম, মহাশয়, কোকতোর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওঁর বড় বড় চোখ দুটো দেখে মনে হল চিনি চিনি। ঠিক কথা! চকিতে মনে পড়ল সেদিন এক সান্ধ্য আসরে পরিচয় হয়েছিল খ্যাতনামা অভিনেত্রী ইভন দবের-র সঙ্গে। এই চোখ, সেই চোখ বটে। তাঁরই পুত্র ইনি। ইনিই সেই জাঁ মারে। আমি ভুল করিনি। ইনিই কোকতোর অনুগত এবং চিত্র ও মঞ্চ-শিল্পী।

জাঁ মারে দয়া পরবশ হয়ে একটি দরজায় বোতাম টিপতেই এক মহিলা দরজা খুলে তাঁকে প্রশ্নসূচক ভ্রূ উত্তোলন করাতে তিনি মহিলাকে বললেন, ইনি এক হিন্দু চিত্রকর মহাশয়—কোকতোর পরিচিত। মহাশয় মজুমদার সাক্ষাৎ করতে চান মহাশয় কোকতোর সঙ্গে।

একথা এক নিশ্বাসে বলেই ক্ষমা চেয়ে ত্বরিৎ গতিতে হুড়মুড় হুড়মুড় করে সিঁড়ি ভেঙে সিঁড়ি লাফিয়ে দুদ্দাড় শব্দে অদৃশ্য হল জাঁ মারে।

ভদ্রমহিলা আমাকে একটি ঘরে নিয়ে বসালেন। অভিনব ঘর। ঘন লাল ওয়াইন রঙের ভেলভেটে মোড়া কিছু বসবার আসবাবপত্র। একটা টেবিলে রাখা ফুল-দানে একগুচ্ছ নানাবর্ণের গ্লাইয়ল, আমরা যাকে বলি গ্ল্যাডিওলী। পিছনে একটা বড় ব্ল্যাকবোর্ডে তারা জুড়ে জুড়ে নানান নকশা কোকতোর স্বহাতে খড়ি দিয়ে আঁকা কেমন আনন্দে উৎফুল্ল সব নকশা। মনে পড়ল র‍্যাবোর ওষ্ঠপ্রসূত সেই কয়েকটা অনবদ্য উচ্চারিত ভাষা; "জে তাঁদ্যু দে কর্দ দ্য ক্লোশে আঁ ক্লোশে; দে গীর্লান্দ দ ফিনেত্র আ ফিনেত্র; দে শেন দ'র দে তোয়াল আন এতোয়াল, এ জে দাঁস,—সহজ বাঙলায় অনুবাদ করলে এর অর্থ হবে: আমি দড়ি টেনে বেঁধেছি (গির্জার) ঘণ্টার সঙ্গে অন্য ঘণ্টা, ফুলের মালা বেঁধেছি আমি জানালা হতে জানালায়, আর সোনার হার তারা হতে তারায় বেঁধে আমি নাচি আনন্দে আত্মহারা। খুব গভীরতর কথাই বলেছেন র‍্যাবো। হয়তো কোকতোর মনের কথা। এ লাইটার মত একটা পাখা। ব্ল্যাকবোর্ডের পাশেই একটা টেবিল। হয়তো কোকতোর কাজকালের টেবিলের উপরে লাল মলাটের একটা বই "লেনিন"। হয়তো ওটা রাখা হয়েছে ঘর সাজাবার কথা মনে রেখেই!
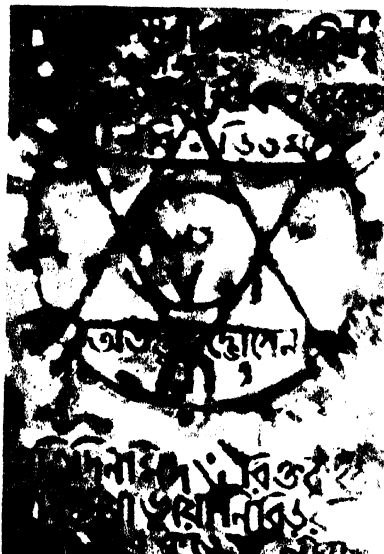
জাঁ কোকতো ঘরে প্রবেশ করলেন। বেশ বিচক্ষণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ঋজু তীক্ষ্ণ মুখে স্বনাল, দুটি চোখ, টানা নাকের তলায় ক্ষুর দিয়ে ফালি করা সরু ফরাসী ঠোঁট। মাথায় কাল সাদা চুলের ঝোপ।

বোঁ জুর বলে, হাতে হাত মেলালেন। ঋজু দেহ। অভিব্যক্তিতে মনে হয় বিদ্যুৎ প্রবাহিত। ও'র ফিল্ম প্রসঙ্গে নানা আলোচনা হল।

ও'কে বললাম আপনার অর্ফেউস ছবি সত্যাই মনোমুগ্ধকর অনবদ্য ছবি।

উনি বললেন, তুমি জান, এখানে ও ছবি কেউ বুঝবে না। হিন্দুরা আমার ও ছবি বুঝবে ভালভাবে। মনে হল মহাশয় কোকতো বেশ, প্রিয়ংবদ মানুষ—তা হলেও শুনতে ভাল লাগল।

ওঁকে বললাম, আপনার ঐ ছবিতে ... শট-ই মনে হয় ছবির সংস্থানগতভাবে বিরচি... দুর্লভ। আর একটা জিনিস অন্তরীক্ষের স্তব্ধতার মোহজালে মনে হয় আপনি ওলন্দাজ কলমের গুহাভ্যন্তর দৃশ্যের ছবির ভক্ত, তাই না?

ঠিক তাই! উনি উত্তরে বললেন, ঐসব দৃশ্য আমাকে তাড়না করে। তা ছাড়া তারা-ভরা রাত। সত্যাই! আমি যোগ করলাম, আপনার ছবিতে দস্তানা কাচ, আয়না, ভাঙা প্রাচীন দেয়াল, অজানা সিঁড়ি, ব্যালকনি সবই যেন জাদুকাঠির স্পর্শে রূপান্তরিত। আপনার 'লা বেল এ্যাবেত', 'সাঁদ পোয়েৎ' সবই আমার সুন্দর লাগে। আপনি সহজেই আমাদের অন্যত্র নিয়ে যেতে পারেন। আপনার অরফেউস ছবিতে অন্ধকার তোরণ হতে আলোয় আবার অন্ধকার তোরণে সোনালী চুলের মেয়েটিকে অদৃশ্য হতে দেখে আমি সত্যাই হতবাক হয়েছি। কবির চোখ দিয়ে আপনি ছবি রচনা করেন। আপনি আসলে এক জাদুকর। হাঁ, আমি বিশ্বাস করি, জান, রূপকথা ও পুরাণ—মিথ; আর সব বাজে। আর সব থেকে বাজে হল বাস্তবতার ভ্রম। নিছক গাদাক ব্যাপার!

আমি আবার বললাম, আপনার ছবি দেখে আমার মনে হয়, প্রথমে আপনি কবি, দ্বিতীয় দফায় চিত্রকর, তৃতীয় দফায় নাট্যকার এবং অবশেষে জগদ্বিখ্যাত ফিল্মমেকার। ধরুন, আপনি যদি ছবি আঁকতেন—তাহলে কি হতো?

উনি উত্তরে বললেন, আমার উৎসাহ, প্রবল ইচ্ছা,

নরকং পায় (২)—পটে শ্লোক লিপিবদ্ধ

মরকত পাত্র—ভিন্ন ভিন্ন কলায়

আঁদ্রে ব্রেতোঁ
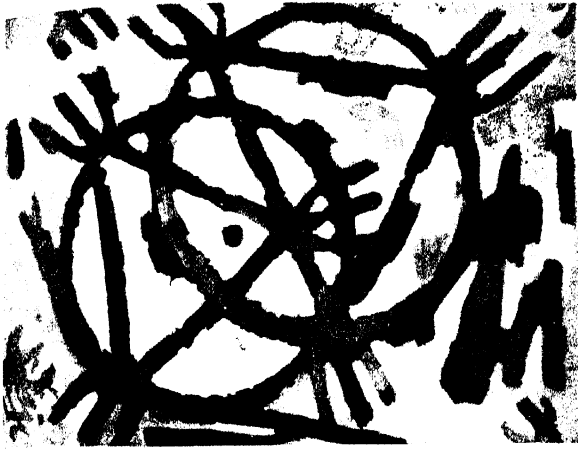
ঝোঁক আমাকে একটা থেকে আর একটায় নিয়ে যায়। তার কৈফিয়ত আমি নিজেই দিতে পারি না, নিজেই বুঝে উঠতে পারি না কেন?

ঠিকই বলেছেন, আমি বললাম, কবিতা প্রসঙ্গে যে-কথা উচ্চারণ করেছেন পল ভালেরী সে-কথা বোধহয় জীবনের পক্ষেও সত্য—"প্রমীয় লীন ভিয়া দা সিয়েল এ রেস্ত আ ভু ফ্যাসনে"—অর্থাৎ প্রথম লাইন আসে স্বর্গ থেকে, বাকিটা তুমি গড়ে তোল। সত্যই কৈফিয়ত দেওয়া বড় শক্ত।

উনি বললেন, খুব খাঁটি কথা, সত্য কথা।

তারপর নানান কথায়, আমরা এসে পৌঁছলাম 'ফ্লরডোয়ার'এ বিদায়ের মুহূর্তে। ফিরবার পথে ওঁর তারা-ভরা রাতের কথায় ওঁর লাইনটা ওঁকে বলেছি যেটা বার বার ঘুরে ফিরে আসছে, কবিতার লাইন।

তারা-ভরা রাতের দিকে চেয়ে মনে পড়,—স্বর্গের গোলাজাত তারারা সব মার্গারীট ফুল—এখনও।

সেই প্রদর্শনীর সূত্রেই আমার আলাপ হয়েছিল আঁদ্রে ব্রেতোঁর সঙ্গে কাফে দ্য দেমাগোতে। আঁদ্রে ব্রেতো হলেন, সুররিয়ালিস্টদের প্রধান পুরোহিত। গুরুমশাই।

আগেভাগেই বলে রাখা ভাল যে প্রকৃত পক্ষে এ জগৎ মধ্যস্থায় তিনটি দৃষ্টিকোণ দিয়ে তিনটি দর্শন প্রতীয়মান হয়। একটি অতিবাস্তব: অন্যটি বাস্তব এবং আর একটি হল অধোবাস্তব। এই অধোবাস্তবই সুররিয়ালিজমের ক্ষেত্র। এরা সকলেই পরস্পরবিরোধী। একজন না গেলে আর একজন টেঁকে না। কেবল অতিবাস্তব অর্থাৎ আধিদৈবিক দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে বাস্তব ও অধোবাস্তবতা গ্রহণ করতে সক্ষম: যতটুকু এই দুয়ের সত্য অতিবাস্তবতার পক্ষে সমন্বয় সম্ভব। নিছক অধোবাস্তববাদ সত্যই এক গেঁজেলী মস্তিষ্কপ্রসূত। মনস্তত্ত্ব ভিত্তিক। কোন সমালোচক দেখিয়েছেন যে মনস্তত্ত্ব যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি এক ইংরেজ পন্ডিত। কিন্তু অভিনব পন্থায় গবেষণা চালিয়ে ছিলেন তিনি! একটি ইংরেজ পুরুষ ও একটি ফরাসী পুরুষ চূড়ান্ত উদাহরণ হিসাবে, নমুনা হিসাবে নিয়ে বিশ্বের সমস্ত মানুষের মনোবিজ্ঞান আলোকিত করেছেন। সত্যই চক্ষু কপালে তোলার মতই বিস্ময়কর ব্যাপার। এ নিয়ে অনেকদিন আমি ভেবেছি; কি করে সম্ভব? কিন্তু পরে ঐ পন্ডিতের বুদ্ধিমত্তার বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি দেখে যে সব দেশে এবং আমাদের দেশেরও চিত্র, কাব্য সাহিত্যে প্রমাণ যে সকল মানুষের মন প্রতিবিম্বিত করার জন্য উপরিউক্ত দুই ব্যক্তি, একটি ইংরেজ ও একটি ফরাসী মহোদয়েরই যথেষ্ট। মনস্তত্ত্বের যুক্তি হল সব মানুষের মন যখন আছে তখন তার আদল ধরন-ধারণ সবই একরকম। দুঃস্বপ্নও একই রকম। সর্বত্র মানুষের মন এক। আসলে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে অধোবাস্তবের স্ফূর্তি। তখন সুররিয়ালিজমের ঢেউ ছিল সাহিত্যগত এক অভিযানমাত্র। এ-কথা অবশ্য অনেকেই মানেন না। এবং সম্ভ্রান্ত সব নামী চিত্রকলা আন্দোলনের সঙ্গে সুররিয়ালিজমকে একাকার করা হয়। মূল্যবোধের খাতিরে। সাফাই গাইবার জন্য সুররিয়ালিস্তরা তোলেন কবি বোদলেয়ারের কথা "ও ফোঁ দ্য লাঁ আঁ কনু পুর ত্রুভেদ্ নুভো"। অর্থাৎ অজানার অতলে সন্ধান পেতে হয় নতুনত্বের। যুক্তির জাল বুনতে তা ছাড়া যোগ করা হয় র‍্যাঁবো এবং মালার্মেকে এবং টানা হয় উইলিয়াম ব্লেকের উদাহরণ। অবশ্য যদিও কতক অংশে এ-কথা সত্য এবং যথাযথ যে জেরার দ্য নের্ভালের ওরেলিয়ার লেখায় এবং লোত্রেয়ামোর রচনা সুররিয়ালিজমের পূর্বাভাষ। কিন্তু এই দুইয়েরই কোন এক মধ্যবর্তী স্থানে জাঁ কোকতোর রুক্ষ রহস্যের দুর্ঘটনা হল স্বর্গীয়, গার্হস্থিক ভ্রান্তি—আমি স্বীকার করতে বাধ্য, আমি ঐ দুই-এর মূল্য ফা করে থাকি।

প্রথম মহাযুদ্ধের কালে, কিউবইজম এবং এরীক সাতির সংগীত জয় করে নেয় সাংস্কৃতিক জগতকে। এই সাতির বলেছেন আমি সংগীতের অনেক কিছু শিখেছি সঙ্গীতের পরিবর্তে ছবি থেকেই। তার পর্বে এলো দাদা অসাদলনের উদ্ভবৃত্তি সুররিয়ালিজম এবং এ সবই মূত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই। কিন্তু এখনও বিস্ময়করভাবে মড়া ঘোড়ায় চাবুক মেরে অনেকেই পুষ্পক রথ হাওয়ায় চালাচ্ছেন এদেশে। এবং ওদেশেও। এই সব কথা ভেবেই আমি আঁদ্রে ব্রেতোঁর সঙ্গে কথা বলার সময় উল্লেখ করলাম, প্যারীতে সবেমাত্র প্রকাশিত একটি পুস্তকের কথা। বইটার লেখক খুব নিষ্ঠুর নির্মমভাবে কালি-কলমে ব্রেতোঁকে পূর্ণরূপে এঁকেছেন।

ব্রেতো উত্তরে শ্লেষ ভরে বললেন, 'ও একটা

জাঁ ককতো

খ্রীস্টানমাত্র!'

আমাদের কথোপকথন এইখানেই শেষ। ধর্ম টিকলে ওঁরা উদ্বাস্তু!

যাই হোক এইবার ১৯৭৭ সালে ওঁদের আর প্রশ্নই উঠে না। সুররিয়ালিজমের জন্মভূমিতে সে মৃত। আমি বরং প্রদর্শনীর সময় কিছু কিছু বুদ্ধি-দীপ্ত নবীন ছেলেমেয়েদের সাক্ষাত পেয়ে খুশি হয়েছি। এদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল, ভারতীয় ভাবধারার অনেক কথাই এরা জানে।

আমায় প্রশ্ন করলো, তোমার চন্দ্রকলার প্রতীকের যে-সব চিত্র, মনে হয় যন্ত্র সংবলিত, ওর তাৎপর্য কি?

আমি বললাম, খুব সহজ কথায়, আমাদের কাছে সব কিছুই দেশ ও কালে বিধৃত নাম-রূপজগৎ। সার্বিক যে আকার-বিকার আমরা ধারণা করি তা সবই পুরুষ ও প্রকৃতির সংমিশ্রণে সজ্জিত। তোমাদের পন্ডিত ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় বলা হয় 'এ্যাক্ট' এবং 'পুইসাঁস' আরো খোলামেলা অর্থে তোমরা যাকে বল 'ফর্ম' ও 'মাতিয়ের'; খুব পরিষ্কার করে বোঝা উচিত নিছক 'এ্যাক্ট' বা 'এসেন্স' বা নিছক পুইসাঁস (বা সাবসট্যানস) বলতে কিছু নেই। তার মতে নিছক পুরুষ ও নিছক প্রকৃতি বলতে কিছু নেই। পুরুষ স্বয়ং প্রকৃতির সঙ্গে অংশগ্রহণ করেই পুরুষ, ঠিক তেমনি এরিস্টোটলিয়াস ব্যাখ্যায় প্রকৃতি স্বয়ং পুরুষের অংশে অংশীদার হয়েই হয়ে উঠে প্রকৃতি। বা সাবসটানস। কোথাও এদের মিশ্ররূপ বহির্ভূত কিছু নেই—এইসব ছবি দুই ত্রিকোণ এক চন্দ্রকার মন্ডলে দেখান হয়েছে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কালের রূপে। তারই যোগফল হ'ল, অনাদি অনন্তকালের চক্রকার রূপ। এখানে আমি নিয়েছি শংকরাচার্যের অতীব কাব্যিক অভিব্যক্তি. তোমাদের এবস্ট্রাক্ট থেকে কত দূরের কথা ওঁর চিত্রকল্পে বুঝতে পারবে. এই বলে আমি ওদের আমার ছবির লিপি পড়লাম—'মরকত পাত্রের' কথা। ছবিতেই পুরুষ প্রকৃতির যন্ত্রের মন্ডলে বাঙলা হরফে লেখা আনন্দ লহরীর কয়েকটি লাইন: 'বিশ্বজননী! আমার বোধহয়, বিধাতা তোমার পূজার জন্য চন্দ্রমন্ডলরূপ মরকতমণিময় অমৃতপাত্র প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ অমৃতপূর্ণ করিয়া অর্পণ করিতেছেন। এই পাত্রে রশ্মিপুঞ্জই অমৃত স্বরূপ ও কলংকই সুগন্ধিদ্রব্য কস্তুরীস্বরূপ। ইহা কলারূপ কর্পূরখন্ড দ্বারা পরিপূরিত হইয়া থাকে। মাতঃ! তোমার ভোগ দ্বারা এই পাত্র যেমন শূন্যগর্ভ হয়, বিধাতা অমনই তোমার পূজার নিমিত্ত তাহা অমৃতপূর্ণ করিয়া থাকেন।' এই হলো প্রতীক রূপে দিবারাত্রের কালক্রমের চিত্ররূপ পুরুষ ও প্রকৃতির খেলা। এই সমস্ত প্রতীকই ঐতিহাগতভাবে স্বীকৃত রূপ। এতে কোথাও উদ্ভট কল্পনার পরিসর নেই। আধিক্যক রূপায়ণ।

তাতে দুই একজন প্রশ্ন করল, কিন্তু এভাবে ছবি আঁকলে দর্শকের পক্ষে কিছুটা বোঝা দুঃসাধ্য নয় কি?

বুলেভার মোপার্নাসের ফুলের দোকান

তোমার কথায় উত্তরে বলতে হয়, ঐতিহ্যগত রূপের বিন্যাস আমার নিজের সংবেদন হল আমার আঁকা ছবি।

আমার খুব ভাল লাগছিল ওদের প্রশ্ন এবং ওদের কথা দিলাম তোমরা যদি আবার আসো আমি আরো বিশদ আলোচনা করবো। ওরা রাজী হল। তবে যাবার আগে একটি ছেলে বেশ মজার প্রশ্ন করল। তুমি কি আধুনিক বস্তুনিরপেক্ষ চিত্রে কোন অর্থ খুঁজে পাও? এ এক ধরনের আধ্যাত্মিক, না?

উত্তরে বললাম, বিন্দুমাত্র না। শেষে যোগ করলাম, তুমি কি বলতে চাও, এসবের ব্যতিক্রম হল একসময় বা কুপির 'প্রডিগাল সান', এ ছাড়া আর সব কাজই প্রায় নিঃস্ব। আর্প ও ভোগিস প্রথমে ভগবদ্গীতার উপর তাদের বস্তুনিরপেক্ষ কোলাজ করেন যার শিরোনামা পরে হয় 'প্রাগ্‌জন্মচিত্র', তারপর ১৯১৭-১৮ সালে মনদ্রেইন আধ্যাত্মিক সহায়তার কল্পে ডাচ দার্শনিক সোহেনমেকার-এর সঙ্গ পেয়ে উদ্বুদ্ধ হন রহস্যময় গাণিতিক তত্ত্বে যা না-কি হিন্দু তত্ত্বের মধ্যে নিহিত এবং ঐ সঙ্গে জোর পান অ্যানি বেশান্তের 'ভালের দলা সিরাস (১৯০৬) তত্ত্ব। ও'র লেখায় বোঝা যায় একটা কথা, হিন্দুরহস্য নিশ্চিহ্ন: যেমন সংবেদন আসলে 'অপ্রেরণ' সম্ভব নয়, তারা নিছক গুণবাচক যাহা অপ্রেরণযোগ্য......নিছক, বস্তুনিচয় আপেক্ষিক সাপেক্ষ একটা কিছু। মনে হয় হিন্দুতত্ত্ব ভদ্রলোক কিছুই বোঝেন নি। বস্তুত সংবেদন ধারণা বিধৃত

আমি বললাম, একটা কিছু বুঝে সৃষ্টি করাই আসল কথা, কতখানি প্রতিফলিত হবে ভাবা শক্ত। তবে যারা যারা ঐতিহ্যর কথা বোঝে তাদের কাছে এইসব প্রতীক বা যন্ত্র কবিতার মতই সহজবোধ্য। আমরা যদি কোন ভাষা ভুলে যাই সেখানে অবশ্য আমি নিরুপায়।

তখন একটি মেয়ে প্রশ্ন করল, তোমাদের মূর্তির কথা যেমন কিছুটা বুঝি, বুঝি কে কোন গুণবাচক। তার অ্যাট্রিবিউট বা আরোপ করা বিভূতিবাচক ইঙ্গিত সত্ত্বেও বুঝি। তা তোমার ছবিতেও আছে। তা হলেও পুরোতন কাজ থেকে তোমার কাজে নতুনত্ব অনেক। মনে হয় নতুন ধরনের মূর্তি। কেন?

ওখানে অনেক লোকের ভীড় থাকাতে আমি বললাম, তার যথার্থ কারণ হ'ল, প্রচলিত ধ্যান, সকল জীবনে এনে ফেলি তাতে আসে নতুন রস। সব মূর্তির যে যে ভঙ্গী এবং চিহ্ন সেইভাবে মডেল বসিয়ে প্রাথমিক ভাবে আঁকি তারপর তাকে মার্জিত, পরিবর্ধিত, পরিশোধিত করে তবে তার চিত্ররূপ আনি। আমি তোমাদের ক্রমান্বয়ে ছবি দেখাব একদিন।

বিনিয়েল-প্রদর্শনীতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে

বুলেভার মোপার্নাসের চৌরাস্তা

উপলক্ষে বন্ধু এবং বান্ধবীর জমায়েত

র জন্য দৃশ্য

হয়েই হয়ে উঠ একটা সার্বিক রূপে অতি সংবেদ
প্রতীক। যে-কথা আমরা ব্যক্ত করতে চাই আমা
সে-কথাই অব্যক্ত, অতএব আমরা সীমায়িত. অ
তা সাধারণ দর্শন থেকে উচ্চাংগের জটিল কথা, অতএ
ওদের নিছক জ্যামিতিক আকৃতি নিছক নকশা, য
সম্ভবং নয়। এই পর্যন্ত বলে ওদের চেষ্টা করলা
সমগ্র কথা বোঝাবার। আশ্বাস দিলাম আরো ক
পরে হবে।

ওরা খুব উৎসাহিত হল এবং আমাকে জানাে
অনেক ধন্যবাদ'। ওরা বিদায় নেওয়াতে আমি অব
আমার দর্শকের মধ্যে ভিড়ে গেলাম।

আমার সব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন নি
প্রদর্শনীর শেষে রাস্তায় নামলাম। সামনে একফা
বাগান ভাগ করেছে পথটিকে। পথের মধ্যে ঠি
প্রদর্শনীর সামনেই প্রোথিত রোদ্যাঁর করা বিশ্ববিখ্যা
বালজাকের প্রতিমূর্তি।

ডাইনে, আবার ডাইনে বাঁক নিতেই বুলভা
মোঁপার্নাস। রাস্তার আলো ও কাফে টেরাসে
আলো, দোকানপাটের আলোয় ঝলমল করছে। সমস্ত
বুলভারটাই যেন লাল কার্পেটে মোড়া। আমরা এ
বিরাট দল গৃহ অভিমুখে, যেখানে আমাদের ভুক
মকত হবে। সারা পথ হেঁটেছি সকলকে সচকিত কর
কারণ আমার সঙ্গে সব মহিলারা শাড়ির বর্ণ
ভারতীয় বর্ণে পথচারীর দৃষ্টি স্তম্ভিত করেছে। ম
হয় না কখনও একসঙ্গে অত ভারতীয় এবং ফরা
মেয়ে একসঙ্গে ভারতীয় সাজসজ্জায় ওপথে এর আগে
হেঁটেছে। তা ছাড়া ছেলেরা অনেকে গায়ে পাঞ্জা
ও কাশ্মীরের আলোয়ান ঝুলিয়ে গর্বিত পদক্ষে
পার হয়েছে মোঁপার্নাসের চৌরাস্তা—লোকে লোকারণ
অনেকে দাঁড়িয়ে পড়ে ফিরে ফিরে দেখেছে দূরে দ
অবধি।

রুভোজিরার পার হয়ে আমরা বাঁ-হাতে বাঁ
নিলাম রু সার্চস্মিদি।

জুনের এক রাত্রিতে

নন্দনীল গঙ্গোপাধ্যায়

।১।

ন্যে বাজে পাগল ডমরু
গল দিন, সবুজ দ্বীপের প্রিয় দিন
এত মায়া, এত পথ দিগন্তে বিলীন
মনমনস্কতা মাখা মরু
এই আলো, ছুটে যায় ছায়ার হরিণ
এই ছায়া, অনিকেত তরু
গল দিন, সবুজ দ্বীপের প্রিয় দিন
নে বাজে পাগল ডমরু।

।২।

স এসেছিল, দেখা হলো না, ফিরে গেল
ঠক সে সময়, সেই মুহূর্তে, আয়ুর বিন্দু, রুপালি ঝলক
আমি গেলাম, দেখা হলো না, ফিরে এলাম।

।৩।

ঝড়ের ঝাপটায় উল্টে গেল একটা ঘুঘু পাখি
স ঝড়কে ভালোবেসেছিল
ঝড়ের ঝাপটায় জেলেদের গ্রামটিতে আছড়ে পড়লো সমুদ্র
সমুদ্র ঝড়কে ডাকে
পার্কের পাথরের মূর্তি অন্ধকারে দু' হাত তোলে
কেনো পাতারা জড়ো হয় তার পায়ের কাছে
নাকড়ির মতন পথের শিশুরা এদিক ওদিক দৌড়ে যায়
মাটি কাঁপে, মাটি কাঁপে
মাটি ফিসফিস করে কথা বলে, ঘুমন্ত ভিখারিণীটি শুনতে পায়
ফুলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অভিভূত কীট
কেউ বাজায় না, তবু বেজে ওঠে বাঁশী
রবীন্দ্রনাথের ছবি ঝনঝন করে ছিটকে পড়ে মোজাইক মেঝেতে
তিনি ঝড়ের গান গেয়েছিলেন।

।৪।

মনে পড়ে সেই গান নিরঞ্জনা নদী-তীরে, এপারে ওপারে
সেই গান, এপারে ওপারে নিরঞ্জনা নদী-তীরে, মনে পড়ে
পাতা ছোঁয়া জল, চাপা জ্যোৎস্নায় ভাঙা সুর, অলীকের ছবি
মনে পড়ে, এই জন্মে, নিরঞ্জনা নদী-তীরে এপারে ওপারে
মনে পড়ে, কুহেলি নিশীথে মনে পড়ে।

।৫।

মানুষের মুক্তি চাই, মুক্তিও মানুষকে খুঁজছে
যমন শ্রদ্ধা খোঁজে শ্রদ্ধেয়কে, প্রেম খোঁজে প্রেমিককে
মার মমতা এখনো খুঁজে খুঁজে মরছে,
কারুকে পায় নি।

।৬।

তোমার শরীরের উত্তাপ
আমার শরীরের উত্তাপ
এই ভাবে পুণ্য বিনিময় হলো
আমরা স্বর্গ থেকে এসেছি, সেখানেই ফিরে যাবো।

লেবু ফুল

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালবাসব না আর, ঘৃণা করব না আর, বুকে চাপা
রোষ চেপে দাঁড়াব না আর... প্রদোষের ছায়া
হর্ম্যবনের ফাঁক গলে এল, দু চোখ ধাঁধিয়ে
ছায়ার বিস্ফার — দেখব না আর, কালো দীর্ঘ দূরে
দুলে ওঠে অকূল সম্মুখ ভরে... আধাআধি হয়ে
সুখ আর শয়তানের ভাগ হয়ে গেছে, আমায়ও কি
বেঁটে নেবে? অন্তহাওয়ায় ধুঁইয়ে ওঠে লেবুর মঞ্জরী
উঠোনভিটের মূল মজে যায় অফুল বিষাদে
আমারও বুজিয়ে দেবে পাতালতা কাঠকুটো ঢেকে?
ছায়া বেয়ে ওঠে—দেখব না আর, কাঁকরজুড়োনো অন্তছায়া,
ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে ওঠে লেবুফুল পাথরকুলুপে,
একলা আমার একা রুষে রাখা একলা আমার
সব ভোলবার সব ঘরছে আমায় ঘিরে ঘিরে
দু পরত ছায়া — কেউ জানতে আমায়? কোনোদিন
বন্ধুর মুখটুকু পরে এসেছিলে — দু কাঁধ জড়ানো
হাতে ফুটে উঠেছিল হরিদ্রার কুঁড়ি হরিদ্রার
গূঢ় মূল থেকে ফুটে উঠেছিল বিষের মউল বিষ ভরে
উঠেছিল সুখ আর শয়তানের মায়ামুখ — দেখব না আর,
দু পরত স্বপ্ন ঘুরে ঘুরে যায় অন্তছায়ার
ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে ওঠে লেবুফুল পাথরকুলুপে...

উজ্জ্বল প্রহার

ব্রততী বিশ্বাস

স্বেচ্ছানির্বাসন আমার অভিপ্রেত নয়
উজ্জ্বল প্রহার চাই।
শখের বাগান চেনা হয়ে গেছে শৌখিন সকালে
সূর্যের উত্তাপ সীতাহার
অন্তরাগ কঙ্কণধ্বনি
চন্দ্রালোক ফুটে আছে নখাগ্রকণায়
সমগ্র প্রসাধন ফিরিয়ে নাও
বিনিময় কাম্য বলে অন্য দক্ষিণা শ্রেয়
তবু স্বেচ্ছায় যাবো না অচিন নগরে
অলংকার ভুলেছি যখন
ষড়যন্ত্র প্রাচীর তুলে করুক আড়াল
অখ্যাতি কুরে খাক আমার বসতি

অমোঘ প্রহার চাই
স্বেচ্ছানির্বাসন আমার অভিপ্রেত নয়।

এগিয়ে আসছে

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

তোমার স্বর, তোমার চোখ এবং আমাদের নিস্তব্ধতা,
আমাদের কথা—
যে আলো চলে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে, যে আলো
ফিরে আসছে আবার,
একটা মাত্র হাসি যা ঝুলে আছে দু'জোড়া ঠোঁটের মাঝখানে, দেখলুম ;
দেখলাম কি ভাবে রাত্রি আসে, আস্তে আস্তে ভেঙে গিয়ে
আর একটা রাত্রির জন্য তৈরী হয়, তবু বদলে যায় না মুখ।
যখন কথা বলো না
চিবুকের চারপাশে সুখের অস্পষ্ট চেহারা ফুটে ওঠে।
ঘৃণা ফিস ফিস করে বলে দূরে সরে যাবার কথা,
ভালবাসা পোঁছে দেয় কাছে। পুরোনো দিনের খোলস ছেড়ে
আমরা বেরিয়ে এসেছি আজ। মনে পড়ে, ফুসফুস তখন
শুধুই ফুসফুসিয়ে উঠতো, হঠাৎ হঠাৎ সবকিছু ঘটতো,
টুপির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতো কথা ; সেই অদ্ভুত শহরে
চোখের জল ছিলো মার্বেলের মত শক্ত আর খচ্চরের পিঠে মানুষ
মানুষের পিঠে খচ্চর এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তা
বন বন করে ঘুরে বেড়াতো।
এখন বারবার মনে হয় সেই খোলস তৈরী করার বছরগুলো
আমাদের ফিরে পাওয়া উচিত, কেননা খোলসের ভেতরে থেকে
সেটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবতেই অনেক সময় গেল।
যে আলো চলে যাচ্ছে, যে আলো ফিরে আসছে আবার,
তার মাঝখানের সময়টুকুতে তোমার লম্বা হাত এগিয়ে আসছে
কুয়াশার ভেতর থেকে, অন্ধকারের ভেতর থেকে,
তোমার হীরের নখ এগিয়ে আসছে
এই পুরোনো কাচের শরীর ভেঙে নতুন আমির কাছে।

এক তুমি ছাড়া

সুখেন্দু মল্লিক

কেউ অপেক্ষা করে থাকেনি আমার শান্তির জন্যে,
কেউ আলো তুলে দেখেনি আমার ঘরে অন্ধকার
আক্রমণোদ্যত হয়ে আছে কি না, কেউ আমার
উপবাসের অন্নজল নিবিড় করেনি স্নেহ করুণার
প্লাবিত মমতায়, এক তুমি ছাড়া এক তুমি ছাড়া
এক তুমি ছাড়া।
বড়ো দেরীতে ভালোবাসলাম ওই মুখ। বড়ো দেরী
হলো তোমাকে ভালোবাসতে। দেরী হলো দেখতে
কেমন করে ভোরের আলো কাঁপছে জীর্ণ গাছের
ছিন্নপ্রায় পাতায় বুড়ো ছেলের ঘুমন্ত মুখে
মায়ের ব্যাকুল চাহনির মতো।

এবার ডানা ছিঁড়ে গেছে কাঁটায় আর তপ্ত
বৃষ্টিতে। বুকের হাড় থেকে গলায় শুধু নিঃশব্দ
নামের হাহাকার। হয়তো আর কোনদিন
উড়বো না শাদা মেঘের ওপারে নিঃসংকোচ
প্রসারিত সমর্পণে। জানতাম না তো আমাকে
গ্রহণ করবে বলে আমি তিলে তিলে
বেড়ে উঠেছিলাম অরণ্যলতার মতো। জানতাম না
কেন জেগেছিলাম! কেন ঘুমিয়ে ছিলাম!

বড়ো দেরী হলো। মেঘ করার কতো পরে চমকালো
তোমার আর্দ্রমুখ। তুমি না নেওয়া পর্যন্ত
আমি গুনে চলেছি প্রতিটি নিঃশ্বাস নিঃসঙ্গ
একক। দেদীপ্যমান আমার শ্রবণহীন মূক স্বপ্ন।
কেমন করে বলবো তুমি কোন্ মন্দির
উপেক্ষা করে ধরবে আমার হাত, কেমন করে
বলবো কি শ্যামল কমনীয় তুমি, কি প্রসন্ন
মহিমায় ব্যাপৃত হয়ে আছো তৃণ হতে তারায়,
কেমন করে এতো বড়ো কথা বলবো
আমি তোমার।

সেই রাখালের

সুচেতা মিত্র

বহুদিন প্রবাসী বিকেলে
ভুল করে সে রাখাল উঁকি মারে
যে একদা মধ্যদিনেই একা একা
বাজাতো নিমগ্ন বাঁশি।

সে আজ বালক নয়। এই
সাদা কুয়াশাকে ছিঁড়ে
চলে গেছে—সে গেছে অস্থির পায়ে।
সশব্দ শার্সিকে তার অভিমান
জানানো গেলো না।
খেদ রয়ে গেলো শুধু
যখনি বিপন্ন স্মৃতি হাতড়ে ফিরি
পরিত্যক্ত চৌকাঠে দেয়ালে
সেই রাখালের আর কোনো চিহ্ন নেই।

"নৈশ মহানগর" (কালি কলম ১৬"×১২")—তাপস বসুর আঁকা। জন্ম ১৯৪২। সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে তিন বছর পড়ে অর্থনৈতিক কারণে ছেড়ে দেন (১৯৬৭)। ছাপা শাড়ির দোকান আছে। রাতের শহরের আলোছায়ার রহস্যময়তা ধরেছেন এই ছবিতে।

চাকার দাগ! মিলিয়ে যায় নি!
ডাকাতরা কাছেই আছে...

?

গাড়ি বিগড়েছে? সাহায্য চাই? আঃ!
খ্যটাস!
তোর গাড়িটা চাই...
হীরে-ডাকাত।

ব্যাটাকে খতম করে দেওয়াই ভাল!
আগেরটাকেও খতম করে দিলে ভাল হত!

?
উঃ...

তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি...
আঃ...
তোমার গাড়ি যারা নিয়েছে, তারা তোমাকে খুন করতেই চেয়েছিল...

COUNTY HOSPITAL
গুলি লেগেছে... জখম... সারিয়ে তুলুন... পুলিসকে জানান...
!!
কে ইনি?

লোকগুলো শুধু লুটেরা নয়, খুনীও!
ওদের খুঁজে বের করতেই হবে!
9/10

য়েছে ভাসিয়ে' আমার হয়েছে তাই, টুনটুনিকে ভালোবেসে আমি ভেসে গেছি কিন্তু ভালোবাসায় এতো জ্বালা শালা কে জানিত আগে, আমি তাড়াতাড়ি কুমারকে বললাম, 'তাহলে চলি। তোর সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। দরকার হলে খবর টবর দিস।' বলে একটু চুপ করে থেকে ফের বললাম 'আমাদের ড্রেস রিহার্সাল। জানিস তো টিম এবারেও এলাহাবাদ যাচ্ছে?'

সুকুমার সেসব শুনছিলো কি শুনছিলো না। ও হঠাৎ হাউ হাউ করে দে ফেলল।

'মাইরী গোতম। এইবারটা তুই উদ্ধার করে দে। আমি 'মিলন' এ তোকে জাদু দেখাবো মাইরী মাইরী। তুই শ্লেফ এইবারটা'—

আমি ঠিক তখনো বুঝিনি সুকুমার অতো 'মাইরী মাইরী' করছে কেন? তো ন্যাকামো করে কাঁদছেই বা কেন? আমি হতবাক হয়ে ওর দিকে লাম। ও কাঁদো কাঁদো মুখে নিতান্ত কাঁচুমাচু হয়ে বলল, নতুন চাকরী নস তো। আজ নাইট ডিউটি। এখনো ছ'মাস পেরোয়নি। ছুটি নেওয়া যায় তুই নিজেই ব্যাপারটা বোঝ।

[illegible] তাহলে এই জন্যে এতো কান্নাকাটি! এই জন্যে এতো উদার হয়ে ক্রিফাইস-এর সার্টিফিকেট বিলোনো! বটে! ছুটি নেওয়া যায় না? নতুন [illegible] নাইট সীফট আজ? দশটায় জয়েন? মুহূর্তে মাথার মধ্যে ভূমিকম্প [illegible] হাতের কাছে এই মুহূর্তে যদি একটা থান ইঁট থাকতো আমি শালা [illegible] ঠিক ঝেড়ে দিতাম। শালা! আমি তোমাকে নাবালক ভেবেছিলাম। [illegible] তোমাকে 'খোকন' বলে ঠাট্টা করেছিলাম? এখন সুকুমার শালাই তো [illegible] 'খোকন' করে দিলে। 'নাবালক' করে দিল কি রে, গোতম! আমি জেকেই প্রশ্ন করলাম। কিন্তু বলছিস না কেন রে। একবারে যে বমকে [illegible]। বলি, ব্যাপারটা কি।

'তাহলে তুই মাইরী আজকের রাতটা একটু ম্যানেজ করে দে। মাইরী তুই [illegible] তা কেউ করে না। আমি যাচ্ছি নিশ্চিন্ত হয়ে। তোর যা স্যাক্রিফাইস—'

[illegible] মাথার মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছিলো, তবু ওই 'চুপ' শব্দ ছাড়া আমার [illegible] গলা দিয়ে আর কোন আওয়াজ হল না। আমি [illegible] সুকুমারকে ব্যস্ত হয়ে সামনে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সেই [illegible] দেখলাম, হয়তো আরো কিছুক্ষণ ওইভাবে [illegible] আপনি চলে [illegible] আক্রোশ [illegible] বললাম, [illegible] নিজের মনের ব্যাপারটা একটু বোঝো। [illegible] না মাইরী। [illegible] গেল না। লোকে বলে পরাচিত্ত অন্ধকার। নিজচিত্ত আরো বেশী অন্ধকার। [illegible] আমাকে [illegible] করে দিয়ে চলে গেল। আর আমি [illegible] চুপ' দমকের সুরে বলে থেমে গেলাম। এখন সারারাত [illegible] করে। উঃ, যা খিদে একখানা পাচ্ছে না? বাড়িতে একবার ঘুরে আসতে বা। একবারে তো আউট হয়ে যাইনি। তাড়াতাড়ি নার্সকে বলে গেটম্যানকে পথে বেরিয়ে পড়লাম। সংগে সংগে বাস পেয়ে গেলাম। এটাই লাস্ট বাস। বো হাসপাতালে কেমন করে? বাবু তো বেশ টুপি পরিয়ে ফ্যাকটরীতে করে সীফট ডিউটি করতে চলে গেল। ডিউটি না ছাই, গিয়ে তো লোফেন জড়িয়ে ঘুমোবে নাক ডাকিয়ে। ওর বুড়ো বাপকে নিয়ে তুমি এখন গে জেগে রাত কাবার করো। বাস থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতে য়াকের সামনে উবু হয়ে বসে থাকা এজমা রুগী, মাই ওল্ড গুড ফাদার [illegible], 'কি ব্যাপার গোতমবাবু? সো আর্লি? কোন নতুন প্রোগ্রাম? নাইট [illegible]?'

বাবা অদ্ভুত, সব বাবারাই ওইরকম বোধ হয়, নিজেদের কোনকিছু করে বার মুরোদ নেই, সম্বলের মধ্যে ওই খোঁচাটুকু, ওটুকু দিতে ছাড়েন না।

বললাম, সারা জীবন ধরে কি করলেন, না ছাত্র ঠেঙিয়ে গেছি। এসব না রে আমাদের এখানে এতো যে কারখানা, রেমন, ডানলপ, থারমল, টিসু এর কটাতেও যদি ঢুকে ইউনিয়ন করতে পারতেন তাহলে একটা কাজের কাজ রতেন।'

ফাদার মুখখানাকে কদর্য করে বললেন, 'ওসব পলিটিক্স। ওসব খুব [illegible]।'

লোকে ছেলের জন্যে কতো কি করে। না হয় নোংরামোই করতেন। [illegible], আমার সংগে যে সুকুমার ঘোরে, তার বাবা তাকে'—

ফাদার হাত তুলে থামিয়ে দিলেন।

থাক, থাক। সুকুমারের বাপকে আমার চেয়ে বেশী চেনো না। দেড় হাজার কা মাইনে পেতো। তবু এখানে ওখানে দেনা। আমাকে ছিরু নাপতে বলেছে, বু, এখনো একশো টাকা পাই। একবার মারও খেয়েছিলো, সেসব বাপ হয়ে তোমাকে'—

বলতে পারেন না? তাই না? যদি সুকুমারের বাপের মত মার খেয়েও আমার একটা গতি করতে পারতেন তখন আপনার খোঁচা কেন থুতুও হজম রতাম। এবার থেকে ওসব আর করবেন না। যেমন কেশে যাচ্ছেন তেমনি শে যান। দেড় হাজার টাকা মাইনে পাওয়া বাপকেই আমরা বেশী শ্রদ্ধা করি। কপ্পো খেল কি কোথায় গেল এসব আমরা গ্রাহ্যই করি না।' যাঃ চলে। আসলে কার ওপর রাগ, কে 'ঝাড়' খেল। মনের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। আরো ক সব বলে ফেলবো তাই ভয়ে ভয়ে ভেতরে চলে গিয়ে আলনা থেকে জামা নিয়ে গায়ে গলালাম।

'মা ভাত দাও।'

... রান্নাঘর থেকে বলল, 'হোটেল খোলাই আছে। তা' আজ এ তো
...ল।' হাসপাতালে যা মশা, একখানা চাদর টেনে নিয়ে মায়ের মুখের
তাকালাম। সকলের মুখে একই কথা, 'সো আর্লি', 'এতো সকাল সকাল',
...ন নাও হিসেব দাও।

'দেশোদ্ধার ?'

'না বাবা উদ্ধার। সুকুমারের বাবার স্ট্রোক। হাসপাতালে যেতে হবে।'

'তোমার বাবা যে সকালে বলেছিলো হেম মেডিকেল থেকে একটা ট্যাবলেট এনে দিতে ?'

'সে আসছে কাল হবে। তোমার খোকন এতো তাড়াতাড়ি কাটবেন না।'

'ছিঃ ছিঃ। দিনকে দিন ইতর হয়ে উঠছিস। আর হবে নাই বা কেন ? কাঁধে পেত্নী ঝুললে যা হয়। যতোসব ছোটলোকের মেয়ে।'

'মা থামবে ? না ভাত খেতে খেতে উঠে যাবো ?'

'ভয় দেখাচ্ছিস ? খেতে হয় খা না খাস তো উঠে যা। ভয় দেখাস না।' খানিকক্ষণ চুপচাপ। আমিও কথা বলছি না, মাও কথা বলছে না। হঠাৎ হাঁড়িটা উনুনে ঠক্ করে বসিয়ে মা বলল, 'তোর সংগে টুনটুনিও যাচ্ছে নাকি হাসপাতালে ?'

আমি চমকে উঠলাম। দেখ, মায়েরা কোন্ অ্যাংগেল থেকে ঘটনাকে দেখে। আমি ঘুণাক্ষরে টুনটুনির হাসপাতালে যাবার কথা ভাবতেই পারি না, বিশেষত এই অবস্থায়। ও যাবেই বা কি করে ? ও একটা মেয়ে। তাছাড়া সুকুমারের বাপ ওর কেউ নয়। হাসপাতালে যাওয়ার ও কোন ছুতো তৈরী করবে ? অথচ মা, মায়েরা কি অদ্ভুত।

'মা, টুনটুনি ছাড়াও চুঁচড়োতে আমার অনেক কাজ আছে।'

'টুনটুনিই তো তোর চুঁচড়ো।'

গায়ে চাদর চাড়িয়ে রাস্তায় বের হলাম। কি যে বোকামি, কিছু টাকাও তো সুকুমারের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারতাম। তাও চাইতে ভুলে গেলাম। এখন এতোখানি রাস্তা যাই কি করে ? একটা রিকশা করে অনায়াসে যাওয়া চলতো, কিন্তু তার ভাড়া গুনতে হবে তো নিজের ট্যাক থেকে। ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ।

গেল মাসে বেকারভাতা পেয়েছিলাম একশো পঞ্চাশ। তিন মাসেরটা এক মাসে। কিন্তু সে সব কি আর আছে ? বেঁচে থাকতে হলে এটা ওটা কত কি দরকার। এটা ওটা কিনতেই হল ধার গেঁথে গেঁথে। এখন ধার শোধ করতে করতে হাতে কিছুই নেই। জেবে মাত্র পাঁচ টাকা পড়ে রয়েছে। ওটা এমার্জেন্সির জন্যে, ওতে হাত দেওয়া চলবে না। সুকুমারের বাপ উদ্ধার পায়দলেই হোক, আর রিকশার-বাবুয়ানী করা নয়।

মাও ইদানীং পালিটিক্স শিখেছে। একটা বেশী দামের কিছু কিনতে দেয়, কিনতে দেবার আগে বলে, 'তুই এখন তোর থেকে আনিয়ে দে। পরে দোব। দেখছিস তো হাতজোড়া।'

জিনিসটা এনে দেবার পর মা আর হাত উপুড় করে না। এটা ওটা বলে কাটিয়ে দেয়। কতো আর চাওয়া যায়। প্রত্যেকবারই মনে করি এবার মা চাইলে আর দোব না। কিন্তু প্রত্যেকবারই দিয়ে ফেলি। এ তো আর আমার রোজগারের টাকা নয়। এ সরকারের টাকা। এতে একটু উদার হওয়া যায়।

সেই উদারতার খেসারত দিতে এখন হণ্টন দাও। নাঃ। বোকামির আর শেষ নেই। রাত কত হবে ? দশটা ? তাই হবে বোধ হয়। বেশ একটু শীত শীত করছে। কোন একটা ব্যাপারে একটু যদি শক্ত হতে পারি। কি যে হয় ভেতরে ভেতরে ! এই একটু আগে একটা শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, প্রায় করেই ফেলতাম ব্যাপারটা। মাঝখান থেকে সুকুমারের বাপ জুটে গেল।

সুকুমারও দিব্যি তার বাপকে আমার কাঁধে ফেলে দিয়ে পালালো। তাকে পালাতে দেখেও চুপ করে রইলাম। মনে মনে রেগে গেলাম। কিন্তু এই পর্যন্তই। একটি কথাও বলতে পারলাম না। কেন এমন হয় ? এসব হয় কেন ? আমার কি কোন অসুখ করেছে ?

আরে রাস্তার মধ্যিখানে ওটা আবার কি ? মোটা বটগাছটাকে বেষ্টন করে কার দুখানা হাত যেন বেরিয়ে আছে ? আরে, পর পর গাছগুলোর গায়ের পাশ থেকে, এ যে দেখছি ভূতুড়ে কাণ্ড, হাত বেরিয়ে আছে দুখানা করে। হাতগুলো কি যেন পাকাচ্ছে। এমন সময় রাতটাকে খান্ খান্ করে চিরে বুম্ বুম্ করে বোমার শব্দ হল। ও হরি ! তাই বলো ! আই টি আইতে ছেলেরা আজ জিতেছে না ? তাই বিজয় উৎসব করছে বোমা ফাটিয়ে। ওই হাতগুলোর আড়ালে আছে এক একজন। কাছে গিয়ে দেখি সত্যিই তাই। যখন যে সরকার থাকে তার ছেলেরা তখন আই টি আই-তে জেতে। এখন জিতেছে নতুন সরকারের ছেলেরা। তারাই মহা আনন্দে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বোমা বাঁধছে। বোমা যদি বার্স্ট করে তবে তা হাত বা হাতের আঙুলের ওপর দিয়েই যাবে। গাছের গুঁড়ির আড়াল আছে অতএব মুখ, বুক মাথা বেঁচে যাবে। চমৎকার। এটাও মন্দ ফিকির নয়।

নে, নে, মজা লুটে নে।

এরপর তো ব্যানার্জি কেবিনের গ্রীলের সামনে এসে দাঁড়াতে হবেই। যাবি কোথায় ? এখন বোমা ফাটিয়ে ফুর্তি লুটে নে।

এই যে এসে গেছি হাসপাতাল। নাও, এখন সারারাত বুড়োর হেঁপা পোহাও। কপাল কপাল একখানা।

রাতটা কোনক্রমে তা না না করে কাটিয়ে দিলাম। ওরই মধ্যে এক... নেমেও এলাম রাস্তায়। এতো রাতে, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ, কেবল ভূতের ম... চারপাশের আলোগুলো জ্বলছে, কেউ কোথাও নেই, কেবল একটি দোকা... খোলা, ওটা নাকি হাসপাতালের জন্যেই সারারাত খোলা থাকে, ওখান থে... কুঁজো আর গ্লাস কিনলাম, দোকানীটা কি ভাবলো কে জানে, ভাবলো নিশ্চ... টুপভুজঙ্গ মাতাল একখানি অথবা চোস্ত পাগল, নাহলে কুঁজো, গ্লাস কে... টাইম পেলো না। কুঁজোটা জলে ভরে রুগীর শিয়রে জানলায় রেখে বসে ব... মশা তাড়াতে লাগলাম। নার্স এসে বলল, 'যদি দেখেন রুগীর অবস্থা এ... তখন, তাহলে নীচে একটু খবর দেবেন।' তারপর চলে যেতে যেতে একটু হে... বলল, 'দেখবেন, ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।' গা জ্বলে গেল। কার বাপ... পাহারা দিচ্ছে। সুকুমারের বাপ খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে যাক না মাটিতে, আ... কি, আমি মড়ার পাশেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রাত ভোর করে দেব। আমা... সে বান্দা পাওনি যে জেগে জেগে পাহারা দোব। আমার নার্সটাকে ভাগাতে ই... করলো 'দেখবেন, ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।' আহা কত ঢংই জানো, ঢং ঢং... তেলাকুচো সঙ্।

সকালবেলা চা খাবার জন্যে নীচে নেমেছি অপেক্ষা করছি, এই... সুকুমারটা নিশ্চয়ই এসে পড়বে, ওর তো সীফট ডিউটি সাড়ে ছটায় খ... সাইকেল চালিয়ে এখানে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে, বড় জোর আধঘণ্টা। এ... পড়লো বলে, একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়া যাক, হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দে... সুকুমার নয়, সুকুমারের ছোট ভাই হন্ হন্ করে লীফট্-এর দিকে যা... আমাকে দেখতে পায়নি। আমি ওকে ডাকলাম।

'যাক, আপনি আছেন।' সুকুমারের ভাই যেন বেশ ভরসা পেল। ওর ম... বেশ নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত ভাব।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে, কিছু একটা আশংকা করে বলল... 'মানে ?' 'মানে দাদা কোথায় পাচ্ছেন ? তার তো আবার আজ থেকে না... ডিউটি। নতুন চাকরী। ফোরম্যানকে যে বলে আসবে সে উপায় নেই। আর দ... একটা হোপলেস। ওকে দিয়ে কোন কাজই হয় না। ওর আসা বা না আ... সমান।'

যাক। সুকুমারের ব্যাপারটায় একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ও আজ ... নয় কোনদিনই আসছে না হাসপাতালে। কেননা ওর আসা বা না আসা সমা... ও একটা হোপলেস। আমি একটুও না রেগে, যেন কৌতুক করে ওকে জিজ্ঞে... করলাম, 'তাহলে তুমি ? তোমাকে তো পাচ্ছি।'

'আমি ? আমি এসবের কি বুঝি ? ওসব আমার দ্বারা হবে না। আপনি... সব দেখাশুনো করাবেন।' দিব্যি ফরফর করে সুকুমারের ছোট ভাই ফরমাশ দি... গেল।

যাক। ঈশ্বরের অসীম করুণা। সুকুমারের ছোট ভাই, সেও সুকুমা... মত, সেও হাসপাতালের কিছু বোঝে না। কি করতে হবে, কখন করতে হ... তার জানা নেই। এদিক দিয়েও বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এও এ... হোপলেস। ওর কাছ থেকে কোন সাহায্য চাওয়াই বৃথা। আমি এবারেও না রে... যেন কৌতুক করে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার মা ?'

'মা আসবেন। আমাদের দুবেলার পিণ্ডির জোগাড় করে এগারোটা বা... নাগাদ চলে আসবেন। মা আসবেন না, কি যে বলেন, মায়েরই তো সব....'

হ্যাঁ, মায়েরই সব। ওদের, মানে সুকুমার আর সুকুমারের ভাই-এর ... কে, জন্মদাতা বাপ এই পর্যন্ত। সব দিকটা জেনে আরও বেশ নিশ্চিন্ত হ... গেল।

এইসব কথা শুনে রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে যাওয়া উচিত, কি ... কই, তে... রাগতে পাচ্ছি কই ? আমার সেই চণ্ডাল রাগ, তার কি হল ? হঠাৎ সে ... কোথায় ? না, মনের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। আমার যেন খানিকটা ... লাগছে। ছেলেটা পাশে পাশে চলছে। আপনমনে বক্ বক্ বক্ বক্ করে... তারপর একসময় দোতলার কেবিনে এসে দাঁড়ালো। গভীর কর্তব্যবোধ, অত... বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কিছু একটা বলতেই হয়, অতএব গম্ভীর ... বলল, 'এসব এই বয়েসেরই রোগ। ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমার তো আ... গো। শুধু শুয়ে থাকা। আর মাঝেমধ্যে এটা ওটা ভালোমন্দ খাওয়া। খা... আর ঘুমোনো সেই শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের মত। এটুকু পারবে না ? ... আমি যদি এরকম শুয়ে থাকতে পারতাম। আচ্ছা গৌতমদা, আমার কেন স্ট্রো... হয় না ? স্ট্রোক হলে বেশ হত তাই না ?'

'হ্যাঁ, বেশ হত।' অন্যমনস্কের মত আমি জবাব দি। তারপর আমা... উঠতে হল, কেননা নার্সকে একবার ডেকে আনা দরকার। উনি মানে সুকুমা... বাবা আবার অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন।

'এইরে, সেরেছে।' বলে ও পাশে দাঁড়ানো নার্সের সুডৌল বুকের দি... চোরাচোখে ছুরি চালিয়ে 'মা এক্ষুনি এসে পড়লো বলে, বাড়িটা আবার ফাঁ... থাকবে, যা দিনকাল' বলে আমার দিকে তাকালো।

'আসি। আমাকে দিয়ে তো আর—'

'এসো।' সংক্ষেপে আপদ বিদায় করে আমি নার্সের দিকে তাকালাম।

ঠিক দশটার সময় মা এলো, মানে সুকুমারের বাবার সহধর্মিণী। মোটাসো... মানুষ। কোমরে বাত। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে সর্বাগ্রে ওই কথা... জানালেন। আমিও খুব সমবেদনা জানালাম।

রুগীর সামনে টুলের ওপর বসে বললেন, 'তুমিই ভরসা'। আমি ত... একথা বললাম না যে আপনার ছেলেও এই কথা বলে গেছে। স্টাকে যদি ত...

কোন কথা থাকে তবে বলুন। এটা বাদ দিন। ও আমি বুঝে গেছি।

'সুকুমারের ওপর তো কোন ভরসাই নেই।'

এটিও বহুবার উচ্চারিত। এসব ক্ষেত্রে, যেখানে আমার মত মোট বইবার সর্বক্ষণের একটি লোক পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কোন সুকুমারের ওপরই কোন সুকুমারের মা ভরসা রাখতে পারেন না।

'তার উপর আবার ডে ডিউটি পড়লে'

এটাও খুব পুরোন কথা। ফ্যাকটরী যে[illegible] থেকে তৈরী হয়েছে [illegible] সেদিন থেকেই নাইট সীফটের প[illegible] ডে সীফট চালু হয়েছে। আমার বেশ কৌতুক লাগছে। দেখছি সুকুমারের মা একটিও নতুন কথা বলছেন না। যা বলছেন সব পুরোন।

তা ছাড়া ও তো এখনো পার্মেণ্ট হ[illegible]

ওই তো ইংরেজীর দৌড় তবু ইংরেজী বলা চাই।

আরে এ আবার কি, এটার সঙ্গে ঠিক পরিচিত নই, উনি হঠাৎ কেঁদে আকুল হলেন কেঁদে কেঁদে বললেন, 'তোদের মত ছেলে না থাকলে ওরে আমি কি করতাম। ভগমানই জুটিয়ে দেন। দেখিস তোর ভালো হবে।'

হ্যাঁ, ভালো হবেই মিসেস, আপনি যখন অতো করে চাইছেন। ভালো হওয়া তো শুরু হয়েই গেছে। সত্যি রেগে উঠতে পারছি না। আমার রাগটা কোথায় গেল। উনি চলে গেলেন একসময় যাবার সময় আমি বেশ মিষ্টি করে হেসে বললাম, 'আবার আসবেন।' উনি যেন সুকুমারের বাবার কেউ নয়, সহধর্মিণী নয়, যেন অন্য কোন রঙ্গিনী একসময়কার, উনিও মধুর হেসে বললেন, 'আসবো' তারপর মাথায় ঘোমটা টেনে ভারী ভারী সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগলেন। আর তারপর থেকেই রুগী যেন আমায় নিয়ে চরকি নাচন শুরু করে দিলো।

এমনি করে কেটে গেল বেশ ক'টা দিন।

কোথা দিয়ে যে হুশ করে কেটে গেল এক একটা দিন টেরও পেলাম না। এক একসময় জয়ন্ত, মধু, নিমাই ওরা যেন সামনে এসে দাঁড়াতো। ম্লান, ছলছল চোখে যেন বলতো, 'আমাদের তুই কেন বর্জন করলি বলতো! আমরা কি করেছি।' আমি যেন হেসে ওদের কথার জবাব দিতাম, 'তোরা কি করবি। তোদের কোন অপরাধ নেই। তোরা দাঁড়িয়ে থাক ব্যানার্জি কেবিনের ধারে সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত চিরকাল। ওখান থেকে, ওই দাঁড়িয়ে থাকা থেকে এখন আমার ছুটি। এখন যে আমি চাকরী করছি, আমার কাজ জুটে গেছে অনেক, আমার নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। তোরা এখন যা। সস্নেহে বলি, 'এখন আর আসিস না। এতে কাজের বড় ক্ষতি হয়।'

টুনটুনিও আসে। বলি, 'এই যে মহারানী। কি মনে করে? তোমার জন্যই তো তৈরী হচ্ছি গো। দেখতে পাচ্ছো না? এখন ডিস্টার্বড্ কোরো না প্লিজ। এখন কাজের সময়। চাকরীর সময়। এখন কি আমার নাইবার খাবার সময় আছে? মহারানী, তুমি আমাকে যা দিয়েছিলে, এই নশ্বর জীবনে তা পরম রতন, সে সব সোনার কৌটোয় তোলা আছে। সুন্দরী, তবে কি জানো, কাজের চেয়ে আর কিছু বড় নয়। এমনকি অমন যে প্রেম সেও বড় নয়। তোমাকে ভুলিনি বটে, ভোলা যায় না সেই একমিনিটের স্বর্গসুখ। তবু কাজ অনেক অনেক বড়। এখন তুমি যাও। একদিন শপথ করেছিলাম তোমাকে সকলের চোখের সামনে দিয়ে হিড়হিড় করে তুলে নিয়ে আসবো আমার বাড়িতে, সেসব ভুল, তাই অস্পষ্ট ব্যথার মত সে কথা একটু একটু মনে পড়লো, সেসব এখন ছায়া হয়ে গেছে। জানো না তো এখানকার চাকরীর কি ভীষণ খাটুনি। দিনরাত রুগীকে চোখে চোখে রাখতে হয়। নার্সরা তো ডিউটি মাফিক কাজ করে যায়। কিন্তু সে সব তো ডিউটি। কিন্তু আমার যে প্রাণের দায়। সবরকম রুগীকে চোখে চোখে রাখা, কখন কি দরকার হয়, অমন ভারী রোগ, বোঝই ত'!'

ওই সকাল দশটার সময় নাইতে যেতে বাড়ি আসতে হয়। কোনরকমে চোখেমুখে গুঁজে আবার যাই হাসপাতালে। সন্ধের দিকে আসি আরো একবার। সেও খাবার জন্যে। কোনরকমে ভাত ক'টা গিলে আবার হাসপাতাল। কেননা, ওদিকে যে বড় দায়। রুগীর কখন কি হয়! বলা তো যায় না! সব সময় চোখে চোখে রাখা।

মা এক একদিন দুঃখ করে বলে, 'ওরে এ যে হোটেলখানার চেয়েও বেশী। বলি, ব্যাপার কি। বাড়িতে শুতে আসিস না যে বড়।'

মাকে মিথ্যে করে বলি, 'আমি আর সুকুমার রাতটা পালা করে জাগি। ও ক'ঘন্টা ঘুমোয়। আমি জেগে থাকি। আমি ক'ঘন্টা ঘুমোই। ও জেগে থাকে। জানোই তো ওর বাবার কী ভীষণ অসুখ!'

সুকুমারের নাম করে এটুকু মিথ্যে বলতেই হয়, নাহলেই মা ফোঁস করে উঠবে। বলবে, 'এতো কি তোর মাথাব্যথা! তোর কিসের দায়?' হেন তেন ... সাত সতেরো কথা।

প্রথম প্রথম এ ধরনের মিথ্যে বলতে খুব খারাপ লাগতো। আশ্চর্য এখন আর মিথ্যে বলতে একটুও কষ্ট হয় না। মনে হয় মিথ্যে বলছি না একদম, এ সব একদম সত্যি বলছি, নির্জলা সত্যি।

শুধু কাজই নয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে কতো বিচিত্র ব্যাপার দেখি। দোতলা থেকে রাতের দিকে এক একদিন গেটম্যানের কাছে চলে আসি। মনটা অবশ্য পড়ে থাকে রুগীর কাছে। গল্প হয় ডাক্তাররা কে কি রকম। কোন ডাক্তারবাবু গরীবের মা-বাপ। কেন মা-বাপ খাইটা কাদের বেশী, ডাক্তারবাবুদের, না ডাক্তারবাবুদের বউদের।

কোন কোনদিন নিশুতি রাতে নীচেকার হলঘর থেকে হল্লা ছুটে আসে দোতলায়। নীচে না নেবেও বুঝতে পারি, আজ নিশ্চয়ই নৈহাটি পার্টি এসেছে। হুল্লোড় হবে সারারাত। নিশ্চয়ই একটা কোন রুগী নিয়ে এসেছে। জাগতে হবে তাই একটু ফুর্তি করে নিচ্ছে। পয়সা ফেলে তাস খেলা চলছে টুইস্ট চলছে শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে। আর সেই সব বুলেটের মত গান ই বোম্বাই নগরিয়া তু দেখ বাবুয়া। আহা........আমার নিজেরই যে নাচতে ইচ্ছে করছে। আহা...ই বোম্বাই নগরিয়া...

কোন কোনদিন ওয়ার্ড মাস্টার [illegible] ল, 'বুঝলে, আশী ডলা শ'তালা, তব খৈনি কা হাল?'

আমি কৌতূহলী চোখে তাকাই, জিগেস করি, 'ইসকো মতলব?'

ও বলে, 'তব [illegible] বেটা। আজকাল বাঙালী আদমী ভি খৈনী খুব পেয়ার করে [illegible] লোগ সব জানেনা খৈনী কেমন করে পিতে হয়। দেখ, গুনে গুনে আশীবার চুর্ণটি ডলবে তবে টেস হবে। ডলা দেতে দেতে তালি মার একশো। তবেই আসল খৈনীর পাত্তা মিলবে, সমঝা, খাবি, কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করবে। বক্ত ছুটবে শরীরে শন শন করে। মনে হবে গালে কানে বেশ কড়া দেখে কেউ যেন ঝাঁপড় লাগিয়েছে। কেঁও সমঝে।'

এমনি করে একে একে দশ দশটা দিন উড়ে গেলে দশ দিনের দিন রাত্রে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনি কাল রুগী নিয়ে যেতে পারেন। রুগী এখন একদম ফিট। তবে অত্যাচার করলে হিতে বিপরীত হবে। রুগীকে সাবধানে থাকতে হবে।'

শুনে প্রথমটায় মনে খুব আনন্দ হল তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এমন কি এও ভাবলাম, এতো তাড়াতাড়ি সুকুমারের বাবার রোগ সেরে গেল! মনে মনে খুব ক্ষুন্ন হয়ে তারপরের দিন সকালবেলা নয়, শেষ বিকেলের দিকে, একটা রিক্সায় বসিয়ে সুকুমারের বাবাকে সুকুমারদের বাড়িতে নাবিয়ে দিয়ে একেবারে সোজা চলে এলাম আবার আমাদের সেই পুরোন ব্যানার্জী কেবিনের গ্রীলের ধারে যেখানে আমার পুরোন বন্ধুরা অনাদিকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

তখন সন্ধের সময়। ফট ফট করে আলোগুলো জ্বলে গেছে। নিয়নে উদ্ভাসিত বড় বড় দুটি অভিজাত রেস্টুরেন্ট। কাতারে কাতারে মানুষ ছুটছে টাওয়ার ক্লকটিকে বেষ্টন করে। সকলের মুখে খই ফুটছে। সকলের মুখই আলোকিত। গোটা শহরটা যেন উত্তেজনায় টগবগ টগবগ করে ফুটছে।

মধু, নিমাই, জয়ন্ত ওরা দেখবামাত্র হই হই করে উঠলো।

নিমাই বলল, 'কি করে এলি? খুব ট্র্যাপে পড়েছিলি যা হোক।'

মধু বললে, 'তোর চেহারাই পালটে গেছে। হ্যাঁ রে, বল না, লুকিয়ে লুকিয়ে কি খেতিস? কি করে এতো মোটা হলি?'

জয়ন্ত বলল, 'আবার আমরা সবাই এক জায়গায়। এটা ভাবাই যায় না। দশ দশটা দিন তুই ব্যানার্জী কেবিনের ধারে এসে দাঁড়াসনি। তারপর ইয়ার্কি করে বলল, 'কোথায় ছিলি রে এতোদিন?'

সুকুমারও এসে গেল এক সময়। আমাদের গ্যাংটার সামনে দাঁড়ালো না। একটু দূরে, একটু গা বাঁচিয়ে, যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছে এমনভাবে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো।

আমি মিষ্টি হেসে বললাম ওকে দেখেই, 'কি রে নেমোকহারাম। "আজাদ" দেখাবার কথা ভুলে মেরে দিয়েছিস? বলেছিলি না "মিলন"-এ হচ্ছে, তুই দেখাবি'

'মাইরী! আমাকে আর লজ্জা দিস না। আমি জানি আমি একজন কত বড় সীনার। তোর ঘাড়ে দায়িত্ব ফেলে দিয়ে আমি কেবল ফাক্তরী করেছি। তোর আত্মত্যাগ, তোর স্যাক্রিফাইস......'

আমি হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে ফেললাম। অন্য সময় এইসব বড় বড় কথা, এইসব 'আত্মত্যাগ', 'স্যাক্রিফাইস' কথাগুলো শুনলে পায়ের চটি খুলে ওকে মেরে দিতাম, কিন্তু এই প্রথম আমি চটলাম না। উল্টে ওর বোকামি দেখে হাসলাম।

সুকুমার জানে না গত দশ দশটা দিন ও কিভাবে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমি খুব জানি, আমারই বলা উচিত, 'সুকুমার তোর স্যাক্রিফাইস, তোর আত্মত্যাগের তুলনা হয় না। বন্ধুর জন্য এমনটা কেউ করে না।' কিন্তু উল্টে সুকুমার আমাকে বলছে, আমার স্যাক্রিফাইস, আমার আত্মত্যাগ........ইডিয়টটা পাগল হয়ে গেল নাকি!

সুকুমারকে হাত তুলে কিছু একটা বলতে গেলাম। দেখি সুকুমার পালিয়ে গেছে। যাক, কিন্তু এখন আমি কি করি? এর পর আমি কি করবো?

নাঃ। খুব তাড়াতাড়ি আর একজন রুগী আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে। এবার আর দশটা দিন নয়, আরো অনেকদিন অনেক অনেক দিন যাতে হাসপাতালে কাটানো যায় সে রকম কোন ব্যবস্থা করতে হবে।

আঃ, কি সুন্দর সময়টাই না কাটালাম এই কটা দিন। কেবল দুঃখ ছিল এই, টুনটুনির দেখা পেতাম না। তা না পাই, জীবনে সব সুখ কি পাওয়া যায়। না কেউ পেয়েছে!

'এই, কোথায় যাচ্ছিস, গৌতম?'

সুন্দর মিথ্যে করে বললাম, 'দেখি সুকুমারকে খুঁজে। "মিলন"-এ 'আজাদ' দেখতে হবে না?'

আসলে, এই প্রথম আমি ব্যানার্জী কেবিনের গ্রীলের ধারে আর দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলাম না। ভূতের মতন হন হন করে হেঁটে, যে হাসপাতালে সুকুমারের বাবা এখন আর নেই, হাসপাতালের দিকেই চলতে লাগলাম।

“আইসক্রীম বলতে কোয়ালিটি”

দেখা যাক আপনিও একমত কিনা

১ এগিয়ে থাকার কোয়ালিটি

কত ব্র্যাণ্ড তো বাজারে এলো গেলো। সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু একমাত্র Kwality এবং ৩৫ বছর ধরে এর নাম আইসক্রীমের জগতে প্রথম সারিতে রয়েছে। এখন কলকাতায় দশটি আইসক্রীমের মধ্যে কম-সে-কম সাতটি'ই Kwality-র।

২ উপাদানের কোয়ালিটি

অগ্রণী হতে গেলে অনেক কিছুর উপর নজর রাখতে হয়। এই কারণেই Kwality আইসক্রীম তৈরী হয় সেরা উপাদান দিয়ে। এতে আছে দুধ, মাখন, চিনি, ফল, বাদাম এইসব। মেশানো থেকে প্যাকেটে ভরা পর্যন্ত সবটাই হয় অটোমেটিক মেশিনে, তাই কোথাও হাতের ছোঁওয়াটুকু পর্যন্ত লাগেনা। Kwality আইসক্রীম সম্পূর্ণভাবে পাস্তুরাইজড অর্থাৎ বীজাণুমুক্ত। সবসময়ে টাটকা ও মজাদার। প্রতি চামচেই ঘন মোলায়েম ক্রীম...জিভে ঠেকালেই—আহা কী দারুণ স্বাদ!

এছাড়া প্রত্যেকটি ব্যাচ যাচাই করে দেখা হয় যতটা পরিমাণে থাকার কথা ঠিকঠিক আছে কিনা ... আর খাদ্যগুণ ঠিক আছে কিনা।

৩ বিভিন্ন স্বাদের কোয়ালিটি

কোন্ বা স্টিক্, কাপ্ বা ব্রিক্ যাই হোক না কেন, Kwality মানেই উৎকৃষ্ট কোয়ালিটি। খেতে মজা, গুণে রাজা—Kwality। ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি, চকোলেট...কেসর পেস্তা, কাসাটা, কেসর পেস্তা মালাই ...চক্-ও-নাট্ এবং টু-ইন্-ওয়ান্ ...টোস্টেড আমণ্ড—এমনি আরো কত দারুণ স্বাদের মজা!

৪ আরেকটি গুণ সহজে পাওয়ার কোয়ালিটি

সবাই পছন্দ করেন Kwality। তাই আমাদের দায়িত্ব সবার কাছে Kwality পৌঁছে দেওয়া। নীল-সাদা-ডোরা আঁকা Kwality আইসক্রীমের গাড়ি হরদম রাস্তায় টহল দিচ্ছে। তাছাড়া নানান হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, দোকান, চিড়িয়াখানায় Kwality-র প্রায় শ-তিনেক খুচরো বিক্রির ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও সারা দেশে ছড়ানো আছে Kwality রেস্তোরাঁ। অর্থাৎ আপনি যেখানেই যান, সেখানেই পাবেন Kwality-র কোয়ালিটি।

আইসক্রীম বলতে কোয়ালিটি

Kwality

টা সরল নেই আর। শ্রীনাথ আসছে অ.স.ক। তার
?

সজল দাঁড়িয়ে ছিল পুকুরের ধারে। দু পকেটে পাঁচটা ডিম। লম্বালম্বি একটা ডিমকে দু হাতের ম কিছুতেই ভাঙা যায় না, বলেছিল ছোটন নন্দী। ন সে ডিম নিয়ে পরীক্ষাটা করছিল। তার শরীর নেই। জ্বর থেকে উঠে খুব একটা জোর পাচ্ছে না পায়ে। তবু প্রাণপণে ডিমে চাপ দিয়ে দেখছিল, টকেই ভাঙে না। ইলিপস বা উপবৃত্তে যে-কোনো ই কাটাকুটি হয়ে যায়, বিজ্ঞানের বইতে সে এমন পড়েছে। তবু বইতে যা লেখা থাকে তার সবই সত্যি না হতে পারে! তাই সে পরীক্ষা করে ছিল। আসলে সকালে এক ঝুড়ি ডিম চোখের ন দেখলে আজকাল তার ভারী রাগ হয়। এত মর কোনো মানেই হয় না। রোজ সকালে বিকেলে খেয়ে খেয়ে এখন ডিম দেখলে তার ঘেন্না হয়। এত অফুরন্ত ডিম দেখলে কার না ইচ্ছে করে চারটে নষ্ট করতে?

ডিমগুলো হাতের চাপে ভাঙল না ঠিকই, তবে ল একটার পর একটা ডিম বড়ো একটা মহানিমের য় ছুঁড়ে মারল। ফনাক করে ফেটে কুসুম আর কাথ ড়য়ে পড়ছে কাণ্ড বেয়ে। দু তিনটে কাক তাই দেখে ফয়ে কাছে এসে 'খা খা' করতে থাকে। পুকুরে গুলো ভ্যাক ভ্যাক করছিল, তাদের দিকেও একটা ম ছুঁড়ে দিল সে। ডিমটা ভাসল, ডুবল, ভাসল এবং গেল।

তারপর হঠাৎই বাবাকে দেখতে পেল। উসকো কো চুল, বাসি দাড়ি, তুসের চাদর গায়ে বলা বাড়ির তরে ঢুকছে। সজল চট করে সরে আসে একটা গাছের ডালে। সাবধানে দেখে। কিছুই দেখার নেই অবশ্য। বাড়ি ফিরছে, এইমাত্র ঘটনা। এত বেলায় যখন রল, তখন আজ আর অফিসে যাবে না। তার মনে দিনের মতো একটা দুশ্চিন্তা, ভয় আর অস্বস্তি সজলের। তাকে বাবা দু চোখে দেখতে পারে না।

ঘুরতে ঘুরতে সজল ক্যাপা নিতাইয়ের ঘরে এসে না দেয়। নিতাই নেই। ইস্পাতকে নিয়ে কোথায় ছে। ঘরের দরজা হাঁ হাঁ করছে খোলা। চুরি যাওয়ার তো কিছুই নিতাইয়ের নেই। তবু অনেক কিছু আছে। শের মাচানে একটা কম্বলের বিছানায় সে শোয়। ার কাছে একটা কুলুঙ্গিতে কালীমূর্তি তেল-দুরে বীভৎস নোংরা হয়ে আছে। মেঝেয় এক ধারে মুণ্ডির আসন। সামনে মাটিতে একটা চক্র আঁকা। তাই কামারের তৈরী কাঠের বাঁটওলা পাকা লোহার একটা ছুরি পাড় আছে পাশে। নিতাই রোজ রাতে ভিন্ন লোককে বাণ মারে। সবচেয়ে বেশী মারে তার পুতুলরানীকে উদ্দেশ করে।

এ সবই সজল জানে। নিতাই একদিন তাকে খুব মোর করে বলেছিল, তোমার যদি কাউকে বাণ মারার কে তো আমায় বোলো। মেরে দেবো।

সজল সঙ্গে সঙ্গে অকপটপকা বলে ফেলেছিল, ছে। মারবে?

বলো। ঠিক মেরে দেবো। লোকটা কে?

লোভী মুখে সজল বলেছিল, বাবা।

শুনে নিতাই খুব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, ছিঃ ছিঃ। দাঁড়াও, বাবাকে বলে দেবো।

তখন খুব নিতাইয়ের হাতে পায়ে ধরেছিল সজল।

এখন নিতাইয়ের ঝোপড়ায় সে একা পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে ছুরি কাটা হাতে তুলে নেয় এবং মন দিয়ে কটা দেখতে থাকে। মংলু, লক্ষ্মণ, রামুনাদ, বৃন্দা কলেরই বিশ্বাস ক্যাপা নিতাই মারণ উচাটন বশীকরণ নে। আবার মদনকাকা বলে, ওটা একটা ফ্রড। পাঠ লা নিয়ে গণ্ডগোলের সময় ক্যাপা নিতাইয়ের কুকুর ইস্পাত একটা ছেলেকে কামড়ে দিয়েছিল। কোথায় তার ন্য ক্ষমা চাইবে, বরং উল্টে সেই ছেলেটার ওপর গিয়ে ম্বী করে এল। ফলে শুভংকরদা খুব মেরেছিল নিতাইকে। তারপর সেই রাতেই ক্যাপা নিতাই শুভংকরদাকে বশীকরণ বাণ মারে। বাণের গুণ কিছু আছেই। নইলে তার পর থেকেই শুভংকরদা ওরকম মনা মানুষ হয়ে গেল কেন?

বাণ মারা না জানলেও সজল আপনমনে ছুরিগুলো একটার মধ্যে সজোরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে গাঁথতে লাগল। আপনমনে বলতে লাগল, মর, মর, এ বাড়ির সবাই মরে যা।

দূর থেকে খুব চেঁচিয়ে ভীষণ রাগের গলায় বাবা ডাকছে, সজল! এই সজল!

সজল নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ঐ ডাককে অগ্রাহ্য করতে খুব একটা সাহস পায় না সে। ইচ্ছে করছিল দৌড়ে পালিয়ে যেতে। কিন্তু এখন এই দুর্বল বুকে অতটা দম নেই।

সে একটা ছুরি প্যান্টের পকেটে নিয়ে উঠে পড়ে।

বেরিয়ে দূর থেকেই দেখতে পায়, বাবা ভাবন-ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। গালে দাড়ি কামানোর সাবানের ফেনা, হাতে খোলা জার্মান ক্ষুর। দৃশ্যটা দেখেই সে বুঝতে পারে, কেন তাকে এই তলব।

জড়ানো পায়ে ধীরে ধীরে কাছে যেতেই শ্রীনাথ গলা ফাটিয়ে বলে ওঠে, কে আমার ঘরে ঢুকেছিল?

সজল জবাব দিতে পারে না। বুক ধুকপুক করছে।

কে আমার ক্ষুরে হাত দিয়েছিল?

সজল চুপ করে থাকে। মিথ্যে কথা বলতে পারে বটে, কিন্তু ঐ বিকট রাগের মুখে সেটুকুও সাহস হয় না।

বলো, কে হাত দিয়েছিল?

আমি জানি না। কোনো রকমে বলল সজল।

জানো না! জানো না! বলতে বলতে শ্রীনাথ বারান্দা থেকে দু ধাপ সিঁড়ি নেমে এসে প্রকাণ্ড একটা চড় আকাশ সমান তুলল।

উঠোনের দিক থেকে মা আসছে, টের পাচ্ছিল সজল। চড়টা পড়ার আগেই বৃথা একটু তফাত থেকে চেঁচিয়ে বলল, খবরদার! রোগা ছেলেটাকে মারবে না।

চড়টা পড়ল না। কেমন একটু নিবে গেল শ্রীনাথ। কোনো জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে গেল ঘরে। তবা কলাঝোপ পর্যন্ত এসেছিল। তারপর আর এগিয়ে এল না।

সজল মার খেল না। বুঝতে পারল, মা বাবার মধ্যে আবার একটা ঘোরালো ঝড় পাকিয়ে উঠছে বোধ হয়। যদি কিছু হয় তবে সজল বাবাকে ছাড়বে না। যতই ভয় পাক সে, একদিন কিন্তু ঠিক প্রতিশোধ নিয়ে নেবে।

বাবা ঘরে গেল। মাও ফিরে গেল উঠোনে। একা সজল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীরে জ্বরের কাঁপুনি টের পেতে লাগল।

ভাবন-ঘর সম্পর্কে তার অগাধ কৌতূহল। ঘরে বই আছে, পুরোনো দেরাজ আছে অনেক টুকিটাকি জিনিস, আছে ভাঙা দূরবীন একটা বহু পুরোনো ইনজিনিয়ারিং টুল বকস, আছে জমি-জরিপের যন্ত্রপাতি মাপজোখ করার জন্য গোল চামড়ার খাপে ইস্পাতের লম্বা ফিতে, লোহা কাটার করাত, বৈদ্যুতিক তুরপুন, আরো কত কী। বেশীর ভাগই জেঠুর জিনিস, এখন আর কেউ ব্যবহার করে না।

শ্রীনাথের শাসনের ভয় সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সে চুরি করে ঢোকে সেই ঘরে। জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে। করাত দিয়ে লোহা কাটে, ডেসকের পায়া কাটে। জরীপের যন্ত্রপাতি বের করে বাগানটা মাপবার চেষ্টা করে। কাল সন্ধের কিছু আগে সে ঘরে ঢুকে বাবার ক্ষুর দিয়ে হাতের নরম লোম চেঁচেছিল। তারপর ধার পরীক্ষা করতে কয়েকটা ফুল গাছের ডাল কেটে দেখেছিল। গাছের কষে ক্ষুরটার ছোপ ধরতেই সে ধার দেওয়ার চামড়ার টুকরোয় অনেকক্ষণ ঘষেছিল বটে, কিন্তু দাগ ওঠেনি।

এ বাড়ির মধ্যে ভাবন-ঘরটাই তার সবচেয়ে প্রিয়। পুরোনো জিনিস তো আছেই। তা ছাড়া চারদিকে নিবিড় সবুজ গাছপালার ঘেরাটোপের মধ্যে নিঃঝুম ঠাণ্ডা ঘরখানি। ভারী খোলামেলা। সারাদিন পাখির ডাক ঝরে পড়ে, সারাদিন নিবিড় হাওয়া খেলা করে। খুব স্পষ্ট শোনা যায় ট্রেনের আওয়াজ।

একদিন সে এই ঘরখানা দখল করে থাকবে।

মনে মনে সে জানে, বাবা এই সংসারে বেশীদিন থাকতে পারবে না। এসব জিনিসপত্র, বাড়ি ঘর সব মায়ের। বাবা বসে বসে খায়। বাবাকে দু চোখে দেখতে পারে না মা। আর মা যা চায় তাই হয়। মা বাবাকে ইচ্ছে করলেই বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারে। দেবেও একদিন। মাকে সে বাবার অনেক খবর দেয়, যাতে মা চটে যায় লোকটার ওপর। অনেক কথা সে বানিয়েও বলে। মা সব কথা বিশ্বাস করে না, কখনো চুকলির জন্য বকে, কিন্তু তবু বাবার ওপর মা চটেও যায় ঠিকই।

সজল এসে পুকুরের ধারে দাঁড়ায়। কালো গভীর জলের দিকে চেয়ে থাকে। হাঁসগুলো উঠে গেছে। জল এখন নিথর। ভারী ভাল লাগে এই পুকুরের ধারটা। চারদিকে ঝোপঝাড়ে একটা বুনো গন্ধ উঠছে রোদের তাপে। এই পুকুরটার ধারে এসে দাঁড়ালে তার মনে হয়, কেউ তাকে ডাকছে, টানছে। নইলে আর কারো টান সে কখনো টের পায় না।

বাবা মা দিদিরা কাউকেই তেমন গভীরভাবে ভালবাসে না সে। মাকে একটু। আর কাউকে এক বিন্দুও নয়। সবচেয়ে দূর আর পর হল বাবা।

বাবা? সজল মুখ টিপে আপনমনে হাসে। সে শুনেছে শ্রীনাথ তার বাবাও নয়। তার আসল বাবা হল জেঠু।

জেঠুই বাবা? ভাবতে এক রকম রোমহর্ষ আর আনন্দ হয় তার। লম্বা চওড়া হুল্লোড়বাজ ঐ লোকটার কথা মনে হলেই তার ভাল লাগে।

হে ভগবান, জেঠুই যেন তার আসল বাবা হয়।

(ক্রমশ)

ছবি ■ দেবাশীষ দেব

Savlon
liquid antiseptic
ICI
Savlon
antiseptic cream

পৌরাণিক মনে স্ত্রী বিদ্বেষ

অশোক রুদ্র

একটি গল্প দিয়ে শুরু করি। গল্পটা কল্পনা করা নয়। একেবারেই নিরেট সত্য। গল্পের নায়ক নায়িকারা সকলেই পাঠকদের অতি পরিচিত। বছর কয়েক আগে শান্তিনিকেতনে এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় দুই কবির যাঁরা আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে সাহিত্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে। কথায় কথায় আমি কোন এক বিশেষ নারী কবির নাম করে জিজ্ঞাসা করি তাঁর কবিতা সম্বন্ধে এঁরা কি মনে করেন। এঁদের একজন বল্লেন, "ও তো কবিতা লিখতেই পারে না। কোন মেয়েই পারে না।" অপরজন বল্লেন, "কোনপ্রকার সৃষ্টিশীল প্রতিভাই মেয়েদের মধ্যে কখনও থাকে না। এটা একটি শোচনীয় সত্য। আমি নারী জাতিকে খুবই ভালবাসি। কিন্তু শয্যায় ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থাতেই নারীর অবদান অকিঞ্চিৎকর।" কথাগুলি এমনই একেবারে ছাঁচ ঢালা, প্রায় কপি বইয়ের ধরনের, নারীবিদ্বেষের আদর্শ উদাহরণ যে আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে সত্যিই এই দুইজন সংবেদনশীল কবিমনের অধিকারী ব্যক্তি এইরকম চূড়ান্ত রকমের অযৌক্তিক ও অন্যায় চিন্তা মনে পোষণ করতে পারেন। কিন্তু খানিক পরেই দেখলাম যে এই ব্যাপারে তাঁদের বিচারে তাঁরা অটল। বিশ্বের সাহিত্যের ইতিহাসে কয়জন নারী কবি কয়টি ভাল কবিতা লিখেছেন? তাঁদের এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে আমি অনেক প্রসংগ তুলতে পারতাম। আমি বলতে পারতাম, আধুনিক কালের আগে পর্যন্ত সমাজে নারীরা লেখাপড়ার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত থাকতেন। সে অবস্থায় কি করে নারীদের কাছ থেকে সাহিত্য-অবদান আশা করা যেতে পারে? তেমনি গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন প্রভৃতিরা সকলেই পুরুষ কেন, নারী নন কেন, সে প্রশ্নের উত্তরেও আমাকে ঐ একই দিকে যেতে হোত। আমি এও বলতে পারতাম যে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন এঁদের কেউ যেমন নারী ছিলেন না, এঁদের কেউই কৃষ্ণচর্ম-বিশিষ্ট পুরুষও ছিলেন না। সুতরাং, তার থেকে কি এই প্রমাণ হয় যে শ্বেতচর্ম-বিশিষ্ট ইউরোপীয় না হলে প্রতিভার অধিকারী হওয়া যায় না? শ্বেতকায় ব্যক্তিরাও আজকাল আর কৃষ্ণকায় ব্যক্তিমাত্রই স্বভাবতই নিম্নস্তরের জীব এ জাতীয় ধারণা পোষণ করেন না। কিন্তু এঁদের মত এত গোঁড়া নারীবিদ্বেষীরা এ জাতীয় ঐতিহাসিক যুক্তি মানবেন বলে মনে না হওয়ায় আমি অন্য এক যুক্তির দিকে গেলাম যা দিয়ে মনে করেছিলাম মোক্ষমভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারব। আমি বললাম, নারীদের মধ্যে ভাল কবি, সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক হয় নি একথা বলতে চান বলুন। কিন্তু কোনপ্রকার সৃষ্টিশীল প্রতিভাই নারীদের থাকে না একথা বললেন কি করে? সংগীত ও নৃত্য এই দুই কলার ক্ষেত্রে আমরা কি নারীর মধ্যে অত্যুচ্চ শ্রেণীর প্রতিভার নিদর্শন পাই নি? কেশরবাঈ কেরকার কি আমীর খাঁর সমপর্যায়ের শিল্পী নন? ভরতনাট্যমে বাল সরস্বতীর সংগে তুলনা করার মত নৃত্য-প্রতিভা সমগ্র দুনিয়ায় কয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে? কিন্তু এত করেও আমি আমার দুই প্রতিপক্ষের মত পরিবর্তন করতে পারলাম না। তাঁরা বললেন, সংগীত বা নৃত্য পরিবেশন করায় নাকি সৃজনশীল প্রতিভা লাগে না। তাঁরা সৃজনশীলতার একটি অভিনব সংজ্ঞা দিয়ে বসলেন। তাঁদের মতে গল্প লেখা, কবিতা লেখা সৃজনশীল কর্ম। কিন্তু সংগীত পরিবেশন তা নয়, নৃত্যও নয়। সেখানে সৃজনশীলতা নাকি নূতন রাগ সৃষ্টি করা বা নূতন নৃত্য রচনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁরা বললেন, যাঁরা নাচেন তাঁরা আমাদের দেশে সবাই নারী সন্দেহ নেই, তাঁদের নাচ শিখিয়েছেন যে গুরুরা তাঁরা বেশির ভাগই পুরুষ। তাঁদের কথায় এক ফুৎকারে হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক সংগীত জগতের জগৎবরেণ্য রথীমহারথী কণ্ঠ ও যন্ত্র শিল্পীরা সৃজনশীল প্রতিভার গণ্ডির বাইরে নিক্ষিপ্ত হলেন। কেশরবাঈ কেরকারের সঙ্গে আমীর খাঁও। আর গণ্ডির ভিতরে পড়ে রইল বাংলা দেশের সেই তাবৎ তরুণ সম্প্রদায় যারা সকলেই দশ-ছত্র কবিতা লিখতে পারে।

এই দুই বিশিষ্ট কবির এই যে ইতিহাসবোধহীন যুক্তিহীন অনপনেয় নারীবিদ্বেষ তাতে সত্যি আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যদি একথা মেনে নিই যে আমাদের আজকের দিনের আধুনিকতম ভারতবাসীর মনও প্রাচীনতম হিন্দুভাবধারার দ্বারা অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। এই হিন্দুভাবধারার জনক ও বাহক যে শাস্ত্রকারেরা তাঁরা যে সাংঘাতিক রকমের স্ত্রীবিদ্বেষী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। আধুনিককালে আমরা স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসীরা আমাদের অতীত নিয়ে প্রায়শই গর্ব প্রকাশ করে থাকি। গর্ব করার মত অনেক সম্পদই আমাদের প্রাচীন সভ্যতায় ছিল এবং সে গর্ব প্রকাশ করাও স্বাভাবিক। বিশেষ করে যেহেতু আধুনিক জগতে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের স্থান বেশ খানিকটা নীচের দিকেই বটে। যার ফলে হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হওয়াও আমাদের পক্ষে সহজ। কিন্তু অতীত নিয়ে গর্ব করতে গিয়ে আমরা যখন মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি দুএকটি নাম উচ্চারণ করে অতীতের ভারতবর্ষে সমাজের নারীর স্থান কতটা মর্যাদাসম্পন্ন ছিল প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করি তখন সত্য থেকে বিচ্যুত হই। একেবারে বৈদিকযুগে নারীর স্থান সমাজে কতটা উঁচুতে ছিল বা নীচুতে ছিল তা আপাতত আলোচনা করব না। তার পরবর্তী যুগ—যখন থেকে জাত প্রথার প্রচলন কায়েম হয়েছে এবং যে সময়ে আধুনিক ভারতবর্ষে যেসব দেবদেবীরা হিন্দুধর্মে প্রধানতম স্থান অধিকার করে আছেন তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে যুগে রামায়ণ মহাভারত ও প্রধান প্রধান পুরাণগুলি রচিত হয়েছে—আমি সেই যুগের কথা আলোচনা করব। এই যুগ যে ঐতিহাসিক তারিখের বিচারে অতিশয় বিস্তীর্ণ তা ভুলে যাচ্ছি না। ভুলে যাচ্ছি না যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলি একদিনে এমন কি এক শতাব্দীতেও রচিত হয় নি। অনেক শতাব্দী ধরে এবং অনেক অনেক লেখকের লেখনীর দ্বারা পরিকল্পিত পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হ... যে আকার সে আকার পেয়েছে। এই বিস্তীর্ণ কালের উপর দিয়ে ধীরে ধ... নৈতিক ধারণাপুঞ্জ দানা বেঁধেছিল সেই ধারণাপুঞ্জই পরবর্তী সবকালের হিন্দু সমাজকে ধর্মের আধারে ধারণ করে রেখেছে। আমার মতে আজকের দিনের আমরাও ঐ একই আধারে ধৃত হয়ে আছি। এই কারণেই বৈদিক যুগের চেয়ে বেদ পরবর্তী যুগই আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের শাস্ত্ররচয়িতা মুনিঋষিরা যে অবিশ্বাস্য রকমের স্ত্রীবিদ্বেষী ছিলেন তা অনুমান করতে হয় না। বিচার বিশ্লেষণ করে প্রতিপন্নও করতে হয় না। তাঁরা নিজেরাই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের বক্তব্য রেখে গেছেন—ভূরি ভূরি পরিমাণে। এই বক্তব্য কোন ব্যতিক্রম নয়, বরং বলা যেতে পারে এই বক্তব্য ব্যতিক্রমবিহীন। বস্তুত রামায়ণ মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের মহাসাগর মন্থন করেও নারী চরিত্র সম্বন্ধে প্রসংশাসূচক বাক্য প্রায় কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরদিকে নারীনিন্দায় একেবারে ছড়াছড়ি। নারী চরিত্র যে কত খারাপ তা বলে বলেও যেন শেষ করা যায় না। সংগীতের ওস্তাদেরা যেমন একটা রাগের স্বরূপকে নিংড়ে বার করে দেখাতে একের পর এক তানের খেলা দেখিয়েই যান, শাস্ত্রকারেরাও সহস্র সহস্র বাক্যে একই নারীনিন্দা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেই যান ক্লান্তিহীন উৎসাহে।

কিছু উদাহরণ দেওয়ার আগে এইটুকু লক্ষ করে নেওয়া যাক যে এই চূড়ান্ত নারীবিদ্বেষের ব্যাপারটা তৎকালীন হিন্দুমনের অন্যান্য অভিব্যক্তির সংগে সম্পূর্ণভাবেই সংগতিসম্পন্ন। নরনারীর মধ্যে যে বৈষম্য তা একক কিছু নয় সামাজিক অন্যান্য অনেক বৈষম্যের মধ্যে তা একটি মাত্র। সমাজে নানারকমের শ্রেণীবিভাগ ও স্তরভেদ আছে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে শাসন ও শোষণের সম্পর্ক রয়েছে, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আয়, সম্পদ ও সামাজিক সুখ সুবিধার বণ্টনবিন্যাস খুবই অসম। নারী নির্যাতন ও ঐ সামগ্রিক নির্যাতন নিপীড়ন দমন ও শোষণের অংশ বিশেষ। দেশকাল নির্বিচারে সর্বত্রই, সমাজ মাত্রেই, মানুষে মানুষে এই সংঘাতের সম্পর্ক থেকে গেছে, এবং নারীর নির্যাতনও সর্বত্রই ঘটেছে। কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে মানুষ দ্বারা মানুষের অপমানের পর্যায় যে অতল গভীর স্পর্শ করেছে তার তুলনা বোধহয় বিশ্বের ইতিহাসে নেই। গ্রীক ও রোমক সভ্যতায় দাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। দাসেদের জন্তুজানোয়ারের মত ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব জাতিপ্রথার দ্বারা, বিশেষ করে অস্পৃশ্যতা ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের উপর যে নৈতিক অবিচার করা হয়ে এসেছে তার সংগে তুলনীয় কোন অত্যাচার অবিচার দাসেদের উপর করা হয় নি। দাসেরা সুযোগ পেলেই পালাবার চেষ্টা করত। তাদের ধরে বেঁধে পাহারা দিয়ে রাখতে হোত। তা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে দাসেরা বিদ্রোহে ফেটে পড়ত। কিন্তু আমাদের দেশের অস্পৃশ্যদের ধরে বেঁধেও রাখতে হোত না, তারা অতীতকালে বিদ্রোহ কখনও করেনি। তারা তাদের অস্পৃশ্য দশাকে ধর্মের বিধান বলে মেনে নিয়েছিল। অর্থাৎ দুনিয়ায় কোন দেশেই কোন নির্যাতিত শ্রেণীর লোকেদের মনটাকেও এমনভাবে বিজিত করা সম্ভব হয়নি যেমন আমাদের দেশের সমাজকর্তারা পেরেছিলেন করতে আমাদের সমাজের অন্ত্যবাসীদের মনকে।

ঠিক তেমনি সবদেশেই সবকালেই নারীদের পুরুষেরা অনেকভাবেই বঞ্চিত করে এসেছে। কিন্তু নারীজাতি সম্বন্ধে যে সীমাহীন ঘৃণা আমাদের দেশের সমাজ-শাসক পুরুষেরা পোষণ করতেন এবং যে ঘৃণাকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে নারী সম্পর্কিত সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তার তুলনা অন্য কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর নারীরা তাদের এই অবস্থানকে যেভাবে মেনে নিয়ে এসেছেন তাও তুলনাবিহীন।

নারীদের তো প্রাচীনকালে মানুষ বলেই গণ্য করা হোত না। আজকাল পাশ্চাত্ত্যজগতে নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রতিবাদ এই যে পুরুষের নারীদের সংগে ব্যবহার করে যেন তারা কন্তুপিণ্ড মাত্র। তাদের নিজেদের যেন কোন ব্যক্তিত্বও নেই, নিজস্ব কোন সত্তাও নেই। কোন পুরুষ মানুষের অন্য অনেক সম্পত্তির মধ্যে এক বা একাধিক নারীও সম্পত্তিবিশেষ। আধুনিককালের সমাজে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি যে এই প্রকারের তা একটি তত্ত্বের ব্যাপার। তথ্য দিয়ে এই তত্ত্বের সমর্থন করতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কিন্তু আমাদের পুরাণ ও মহাকাব্যের যুগে এই ব্যাপারটি কোন তত্ত্বের বিষয়ই ছিল না। নিতান্তই দৈনিক জীবনের অতি সাধারণ সত্য ছিল। যেমন ধরুন মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, "ধর্মরাজ সমস্ত নিমন্ত্রিত জনগণকে পৃথক পৃথক গো সমূহ, শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ ও দিব্যাভরণভূষিতা রূপযৌবনবতী সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন।" (১) গো এবং সুবর্ণ যে স্তরের বস্তু রমণীগণকেও ঠিক সেই স্তরের বস্তু হিসাবেই এখানে দেখানো হয়েছে। এটি কোন ব্যতিক্রম নয় এরকম উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে রাশি রাশি পাওয়া যায়। যেমন কর্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে ধনঞ্জয় কোথায় আছেন যে দেখিয়ে দেবে তার পুরস্কার হিসাবে ঘোষণা করেন, "ছয় মাতঙ্গ, সুবর্ণ নির্মিত রথ ও নিষ্ককণ্ঠ, গীতবাদ্যনিপুণ অজাতপুত্র একশত কামিনী প্রদান করিব।" (২) এখানেও দেখুন, কামিনীদের কি ভাবে মাতঙ্গ ও রথের সমতুল্যভাবে দেখানো হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবৎ-এ কোন বিবাহের যৌতুকের বিবরণে পাই, "চারিশত গজ, সার্দ্ধ অজুত অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ এবং বিবিধ ভূষণে ভূষিত দুই শত সুকুমারী দাসী।" (৩) এরকম আরো উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। গজ, রথ, গো, সুবর্ণ প্রভৃতি যেরকম সম্পূর্ণভাবে পুরুষের করায়ত্ত সম্পত্তি, যাকে যথেচ্ছ দান করে দেওয়া যায়, রমণীরাও ছিল ঠিক সেই রকমেরই দানের উপযোগী সামগ্রী ও সম্পত্তি।

উপরে যে কয়টি গো, গজ প্রভৃতির সংগে নারীদান করার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঐসব নারীরা ছিল দাসী বা গণিকা শ্রেণীভুক্ত। অনেক জায়গাতেই পরিষ্কার করেই তাদের গণিকা বা বারবণিতা

বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবেও যে কোন রমণীকেই যে পুরুষের সম্পত্তি হিসাবে মনে করা হোত তারও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির যে দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন সেখানে কি খুব স্পষ্টভাবেই দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই দেখানো হয়নি? কৌরব সভায় সকলেই বিনা দ্বিধায় এই সম্পর্ক মেনে নিয়ে ছিলেন। দ্রৌপদীকে যখন প্রকাশ্য সভায় চূড়ান্ত অপমান করা হোল তখনও প্রপিতামহ ভীষ্ম, যাঁর মুখ দিয়ে মহাভারতের অধিকাংশ ধর্মকথা বলা হয়েছে, তিনিও মেনে নিলেন যে সম্পত্তি দখল করার পর সেই সম্পত্তির বস্ত্রহরণ করার অধিকার কৌরবপক্ষের আছে। কিন্তু দুর্যোধন, দুঃশাসন, এমন কি যুধিষ্ঠিরও পত্নীর প্রতি আনুগত্যের আদর্শ ছিলেন না। এই আনুগত্যের চূড়ান্ত আদর্শ হয়ে রয়েছেন যে একপত্নীক শ্রীরামচন্দ্র, যাঁর সীতার প্রতি একনিষ্ঠতা ও প্রেমের ভাব নিঃসন্দেহে খুবই উচ্চস্তরের পরিশীলিত মনের পরিচয় দেয়, তিনিই বা কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, "ভরত কর্তৃক প্রার্থিত হইলে আমি নিজেই রাজ্য স্ত্রী প্রিয়জীবন এবং ধন সকলই ভরতকে প্রদান করিতে পারি।" (৪) দেখা যাচ্ছে আদর্শপতি শ্রীরামচন্দ্র তাঁর আদর্শ পত্নী সীতাকে ভরতকে দিয়ে দিতে রাজী ছিলেন, ঠিক যেমন ভালবাসার পরাকাষ্ঠা হিসাবে কেউ তার প্রিয়তম বস্তুকে দান করে দিতে পারে। সীতা যে রামের প্রিয় ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং রামচন্দ্রের বাক্যে যা প্রতিপন্ন হয় তা এই যে, সীতা রামের কাছে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন প্রিয় বস্তু বিশেষ। এই ধারণাটা তো এখনও সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত হয় নি। হিন্দুবিবাহে এখনও কন্যাকে সম্প্রদানই করা হয়ে থাকে, হিন্দু বিবাহের মন্ত্র এখনও একটি সম্পত্তির হস্তান্তর করার দলিল বিশেষ।

নারী যেহেতু পুরুষের সম্পত্তি বিশেষ সুতরাং নারী যে সম্পূর্ণভাবেই পুরুষের অধীন হবে তা খুব সহজ যুক্তিসূত্রেই প্রতিপন্ন হয়। নারীর এই পুরুষের অধীনতা সম্পর্কে শাস্ত্রকারেরা সংশয়ের কোন অবকাশই রাখেন নি। মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিম্ন লিখিত উক্তিটি খুবই সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিদিত : "ত্রিলোক মধ্যে কোন স্ত্রীরই স্বাধীনতা নেই।...দেখ, কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রী জাতীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং স্ত্রীজাতীর কখনই স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই।" (৫) এর সঙ্গে তুলনীয় একই বক্তব্যবাহক উক্তি অজস্র পাওয়া যায়। কিন্তু এই ব্যাপারটি এতই সর্বজনস্বীকৃত যে আর কোন উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না।

সাধারণভাবে পুরুষের অধীন থাকা এবং বিশেষ করে কুমারী অবস্থায় পিতার অধীন থাকার নির্দেশ থাকলেও সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্বামীর অধীন থাকার উপর। "একমাত্র ভর্তার উপভোগের নিমিত্তই স্ত্রীদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা না হইলে নারী আর কোন কাজে লাগে?" (৬) শিবপুরাণের এই উক্তির প্রতিধ্বনি প্রাচীন সাহিত্যে সহস্র বার পাওয়া যায়। যেমন, "স্বামী ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকদের অন্য দেবতা নাই।" (৭) "স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উহাদিগের স্বামী ও শুশ্রূষাই পরম ধর্ম।" (৮) এই শেষ উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয় কিভাবে নারীর পরাধীন অবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়াকেই তার পরমধর্ম করে দেখানো হয়েছে। অধীনতার প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে এই পরমধর্মের উপর জোর দিয়ে বাণী প্রচার করা হয়েছে আরও অন্য অজস্র জায়গায়। যেমন, "স্বামী সেবানুরতা পতিব্রতা স্ত্রীকে ইহলোকে ও পরলোকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। পতিব্রতা ও ধর্মআচরণরতা কামিনী সকল মঙ্গল লাভ করে তাহাতে সংশয় নাই।" (৯) "পতিপরায়ণা স্ত্রী পতির হিতসাধন করিয়া যাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হয় যজ্ঞ, তপ, দান ও নিয়মাদি দ্বারা কদাচ তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে না।" (১০)

পাতিব্রত্যের এই আদর্শ প্রচার এতটা সফল হয়েছিল যে এর প্রচার শুধু পুরুষেরা করে যাননি, নারীরাও এই আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। রাম যেমন বলেছিলেন, "স্বামী নারীর দেবতা, স্বামীই ঈশ্বর।" (...) তেমনই সীতাও বলেছিলেন, "সাধ্বী রমণীদিগের গতি পিতা নহে, পুত্র নহে, আত্মা নহে, সুহৃজ্জন নহে, একমাত্র পতিই পরম গতি।" (১২) পাতিব্রত্যের আদর্শ হিসাবে একথাও বলা হয়েছে যে, "পুরুষদিগের বহু বিবাহ দোষাবহ নহে, কিন্তু নারীদিগের পত্যান্তর স্বীকারে মহান ও অধর্ম জন্মে।" (১৩) কিন্তু এই আদর্শের চূড়ান্ত উদাহরণ হিসাবে প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানেই সেই নারীর উপাখ্যান পাওয়া যায় যাঁর স্বামী কুষ্ঠরোগে বীভৎসাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও যিনি তাকে দেবতার ন্যায় পূজা-অর্চনা করতেন এবং একদা সেই স্বামী বেশ্যাগৃহে গমন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে যে পত্নী তাকে নিজের স্কন্ধে বহন করে বেশ্যাগৃহে নিয়ে যান। কারণ তিনি, "মহাভাগা ও পতিব্রতা ছিলেন এবং সৎকুলে জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং স্বামীর মনস্তুষ্টি বিধান করাই একমাত্র কর্তব্য।" (১৪) এই আখ্যানটির ঝাঁজ বেশী, ঝাল বেশী, কিন্তু এর মধ্যে সার বক্তব্য যা আছে তাতে একেবারেই অভিনবত্ব নেই। নারী এতই পরাধীন যে, "যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ধর্মাচরণ করে, সে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যুত পাতকিনী হয়।" (১৫) অপরদিকে ঐ একই পরাধীনতার কারণে, "স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই, প্রত্যুত স্ত্রী ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইলে তাহার স্বামীকেই সেই বিষয়ে অপরাধী বলিয়া স্থির করা উচিত। ভর্তা স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। স্ত্রীলোক পুরুষেরই একান্ত অধীন বলিয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধী হইতে পারে না।" (১৬)

নারীর এই পরাধীনতার বিপরীত কোন ধারণার চিহ্নটুকুও প্রাচীনসাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। এর ব্যতিক্রম তখনই মাত্র পাওয়া যায় যখন কোন পুরুষ কোন নারীকে ছলেবলে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগে লাগাবার চেষ্টা করছে। যেমন দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে বলেন, "তোমার আপন শরীরের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ হিতৈষিত্ব ও কর্তৃত্ব আছে। অতএব তুমি স্বয়ংই আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করো।" (১৭) তখন তিনি নিতান্তই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলেন। শাস্ত্রে কোথাও নারীকে তার নিজ শরীরের বা আর কিছুর উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয় নি। একই কথা

প্রযোজ্য সূর্যদেব সম্বন্ধে যখন তিনি কুন্তীকে বলেন, "তোমার পিতা, মাতা বা অন্যান্য গুরুজন তোমার প্রভু নহেন, অবিবাহিতা নারীগণ যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া উহাদিগকে কন্যা কহে। হে নিতম্বিনি! কন্যা স্বতন্ত্রা, পরতন্ত্রা নহে, অতএব তুমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কদাপি অধর্মাচারণ হইবে না। আর আমি কি নিমিত্তই বা কামপরতন্ত্র হইয়া অধর্মাচারণ করিব? হে ভাবিনি। স্বেচ্ছানুসারে কার্য করাই স্বভাবসিদ্ধ, বৈবাহিকাদি নিয়ম কেবল মানবগণের কল্পনা-মাত্র, অতএব তুমি অবিশঙ্কিত চিত্তে আমার সহিত সঙ্গত হও।" (১৮) দেখুন কত সহজেই এককথায় বৈবাহিকাদি নিয়মটিয়ম সব উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কত সহজে কুমারী মেয়েকে কৌমার্যহানিতে দোষ নেই বোঝান হয়েছে, যদিও নারীর সতীত্ব কুমারীর কৌমার্যকেই আমাদের শাস্ত্রের সর্বত্র নারীধর্মের একমাত্র স্তম্ভ হিসাবে ব্যতিক্রমবিহীন ভাবে দেখানো হয়েছে। সূর্যদেবের কথাগুলি কামুক ব্যক্তির নির্লজ্জ ছলচাতুরী ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ করে না। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই কারণে সূর্যদেবের এতটুকুও নিন্দা করা হয়নি।

নারী কেন এত পরাধীন হবে? স্ত্রী কেন হবে স্বামীর এত বশংবদ? এর উত্তর শাস্ত্রকারদের জিভের ডগায় তৈরীই আছে। নারীরা যে অবলা, নারীরা যে দুর্বল। শুধু শরীরে নয়। অনেক বেশী যা গুরুত্বপূর্ণ, তাদের চরিত্র দুর্বল। শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে অযোধ্যাবাসীদের কুশল জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "রমণীগনকে উত্তমরূপে রক্ষা করো তো? তাহাদিগকে বিশ্বাস করো না তো?" (১৯)

কিন্তু নারীদের সাধারণভাবে পুরুষের এবং বিশেষভাবে স্বামীদের অধীন করে রাখাতেই আমাদের প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় না। নারীরা নানাপ্রকার দোষের আকর এই ভাবনাটাও বিভিন্ন যুগের ও দেশের সভ্যতায় বেশ সাধারণ। আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে সত্যিই বৈশিষ্ট্য প্রদান করে যা তা নারীচরিত্র সম্বন্ধে সমাজকর্তাদের এমন এক চূড়ান্ত মাত্রার ঘৃণা যা কিনা সত্যিই তুলনাবিহীন। যেমন ধরুন, মহাভারত থেকে নেওয়া এই উক্তিটি, "তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করিলে স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না।" (২০) তেমনি শিবপুরাণে নারীদের দোষেদের এভাবে ফর্দ করা হয়েছে, "মিথ্যা, সাহস, মায়া, মূর্খত্ব, অত্যন্ত লোভ, অপবিত্রতা, দয়াশূন্যতা এ সাতটি স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক দোষ।" (২১) মহাভারতের শান্তিপর্বে রাজধর্ম আলোচনাকালে বলা হয়েছে রাজা যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ করবেন তখন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি বর্জনীয়, "বামন, কুব্জ, অন্ধ, খঞ্জ, ক্ষীণকায় ব্যক্তি, নপুংসক; বুদ্ধিহীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোক।" (২২) স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, নারীদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবেই গণ্য করা হত না, বিকলাঙ্গদের সঙ্গে এক করে দেখা হত! নারীদের বুদ্ধিবৃত্তিকে এতই হীন চোখে দেখা হত যে মনু বিধান দিয়েছিলেন কোন বিচারে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

নারীদের চরিত্রের দুর্বলতার যতদিক শাস্ত্রকারেরা আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাদের কাম ব্যাপারে সংযমের অভাব অথবা তাদের অত্যধিক রতিপ্রিয়তা। এই বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা নারীচরিত্রকে এমনই ঘৃণাভাবে বর্ণনা করেছেন যে ঐ শাস্ত্রকারেদেরই মনের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ না জেগেই পারে না। নিম্নে উদ্ধৃত নারীচরিত্র বর্ণনাগুলি থেকে পাঠকেরা নিজেরাই বিচার করে দেখুন আমার কথাটা ঠিক কিনা।

"স্ত্রীজাতি স্বভাবত নিরন্তর অভিলাষিণী—কামচারিণী, কামের আধারস্বরূপা ও মনোহারিণী হইয়া থাকে। তাহারা অন্তরের কামলালসা ছলক্রমে গোপন করে। নারী প্রকাশ্যে অতি লজ্জাশীলা কিন্তু গোপনে কান্তকে পাইলে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। রমণী কোপশীলা, কলহের অঙ্কুর স্বরূপ ও মৈথুনা-ভাবে সর্বদা মানিনী এবং বহু সম্ভোগে ভীতা ও অল্প সম্ভোগেও অত্যন্ত দুঃখিতা হয়। স্ত্রীজাতি সুমিষ্টান্ন ও সুশীতল জল অপেক্ষাও সুন্দর সুরসিক গুণবান ও মনোহর যুবা পুরুষকে সর্বদা মনে মনে ইচ্ছা করে। তাহারা রতিদাতা পুরুষকে স্বীয় পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ করে এবং সম্ভোগ পারদর্শী পুরুষই তাহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম"(২৩)।

"স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই রতিপ্রিয়। পুরুষ সংসর্গ উহাদের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহেন। দেখুন, সমস্ত স্ত্রীলোক মধ্যে কথঞ্চিৎ একটি পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কর্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে।" (২৪)

"কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসরপ্রাপ্ত হইলেই ধনবান ও রূপবান পতিদিগকে পরিত্যাগ-পূর্বক পরপুরুষ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্মভয় নাই।" (২৫)

"উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক পরপুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রী সম্ভোগে অভিলাষী হইয়া তাহার নিকট গমনপূর্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়।" (২৬)

"কামিনীগণ জলৌকার ন্যায় সতত পুরুষের শোণিত পান করিয়া থাকে, তাহা মূর্খেরা বুঝিতে পারে না, কারণ তাহারা রমণীগণের হাবভাবাদি দর্শনে মোহিত হইয়া পড়ে। পুরুষ যাহাকে কান্তা বোধ করে সেই কান্তা সম্ভোগ সুখ প্রদানে বীর্য, এবং কুটিল প্রেমালাপে মন ও ধনাদি সর্বস্বই অপহরণ করে, অতএব রমণীর তুল্য তস্কর আর কে আছে?........রমণীগণ

কখনও সুখের নয়, কেবল দুঃখেরই কারণ।" (২৭)

"আপনি কি জানেন না যে, বৃকগণের ন্যায় রমণীগণেরও কাহারও সহিত অকৃত্রিম ভালবাসা হয় না? এজন্য পার্থিবগণের স্ত্রীলোক ও তস্করের প্রতি কদাচ বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।" (২৮)

"রমণীগণ যে পর্যন্ত কোন নির্জন স্থান না পায় এবং যে পর্যন্ত কোন পুরুষের সহিত বিশেষ আলাপ করিতে না পায় সে পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সতীত্ব থাকে। সেইহেতু ভদ্রমহিলাগণের বন্ধুবান্ধবগণ কর্তৃক সর্বদা রক্ষা বিধান করা উচিত।" (২৯)

"সতীগণের মর্যাদা, মৃণাল সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং বুদ্ধি ক্ষণকাল বায়ুর ভারও সহিতে পারে না, তাই অল্প চাঞ্চল্যেই বিনষ্ট হয়।" (৩০)

একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, এই অবিশ্বাস্য রকমের নোংরা নারীনিন্দার অনেকাংশই করা হয়েছে নারীদেরই মুখ দিয়ে। শেষ দুইটি উদ্ধৃতির বক্তা অরুন্ধতী। অরুন্ধতীকে সর্বত্রই দেখানো হয়েছে সতীত্বের চূড়ান্ত আদর্শ হিসাবে। অনেক উপাখ্যানে দেখা যায় কোন উপায়েই কেউই কখনো তাঁকে সতীত্ব থেকে ভ্রষ্ট করতে পারেনি। অন্য পরে কা কথা, সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের মধ্যে অন্য ছয় জনকেই তাঁর তুলনায় সতীত্বের ব্যাপারে কম শক্তিশালিনী বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই অরুন্ধতীকে দিয়েই সতীগণের মর্যাদা সম্বন্ধে কি ধরনের কথা বলানো হয়েছে দেখুন। তেমনি রমণীগণকে বৃকগণের সঙ্গে তুলনা করে যে নিন্দা করা হয়েছে তার বক্তা উর্বশী। যাঁকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে তিনি রাজা পুরূরবা। অন্যান্য উদ্ধৃতিদের মধ্যে কয়েকটির বক্তা অপ্সরা পঞ্চচূড়া। এই অপ্সরাকে একবার নারদ মুনি বলেন, "সুমুখি আমি তোমার নিকট হইতে স্ত্রীগণের স্বভাব জানিতে বাসনা করি।" অপ্সরা শ্রেষ্ঠ পঞ্চচূড়া বলিলেন, "দেবর্ষি, আমি স্ত্রী হইয়া স্ত্রীগণের নিন্দা করিতে পারিব না।" দেবর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, "সুমধ্যমে তুমি সত্য কথা বলো। মিথ্যা বলিলে পাপ হয়, সত্য কথা বলিলে কোন দোষ হইবে না। এরপর সুহাস্যময়ী অপ্সরা বলিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করতঃ স্ত্রীগণের সত্য স্বাভাবিক দোষসমূহ বর্ণনা করিলেন।' মহাভারতের এই বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে পঞ্চচূড়া অপ্সরা হলেও তাঁরও আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল। সহজে সে নারীনিন্দা করতে চায়নি। সে যেসব কথা বলে তা বলতে তাঁকে 'দৃঢ়নিশ্চয়' হতে হয়েছিল। দেবর্ষি নারদ যে ধরনের কথা শুনলে খুশী হবেন অথবা দেবর্ষি নারদ নিজেই নারীচরিত্র সম্বন্ধে যা মনে করেন পঞ্চচূড়া তাঁকে তাই শুনিয়ে খুশি করেছিল।

কাউকে জোর করে পায়ের তলায় চেপে রাখাতেই তার সব চেয়ে বড় পরাজয় হয় না। সেই পরাজয় হয় যখন সে মেনে নেয় সেই পায়ের তলাই তার যোগ্য স্থান। আমাদের সভ্যতার এই এক বৈশিষ্ট্য যে আমাদের সমাজে যাদের পায়ের নীচে চেপে রাখা হয়েছিল যেমন নারীরা বা অস্পৃশ্যরা তারা ঐ পায়ের নীচে পড়ে থাকাকেই তাদের ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিল।

নারীনিন্দার বিপরীত বা ব্যতিক্রম হিসাবে নারীর স্তুতির কোন উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে পাই না। কিন্তু স্থান-বিশেষে গৃহিণীকে বেশ মাথায় তোলা হয়েছে। যেমন মহাভারতে বলা হয়েছে, "ভার্যাই পুরুষের ধর্মার্থ কামসাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশ গমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্যার তুল্য পরম ধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকযাত্রা সম্পাদান করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ত ব্যক্তির ভার্যাই মহৌষধ। ভার্যার তুল্য পরম বন্ধু আর নাই।" (৩১) তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতে কাশ্যপমুনি দিতিকে উদ্দেশ করে বলেন, "যাহা হইতে ত্রিবর্গ সিদ্ধি হয় কে তাহার কামনাপূর্ণ না করে? জলযানে যেমন সমুদ্র পার হওয়া যায় সেইরূপ গৃহিণী-বিশিষ্ট গৃহী অপর আশ্রমের দুঃখনাশক হয় এবং অন্যআশ্রমে দুঃখজলধি পার হয়।" (৩২)

প্রাচীন সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নারীদের সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া গেল তার প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন মনে না উঠেই পারে না। প্রথম প্রশ্ন কেন এই প্রচণ্ড স্ত্রীবিদ্বেষ? এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে কোন সমাজেই যদি একগোষ্ঠীর মানুষ অপর কোন এক মানুষের গোষ্ঠীকে অবদমন করে রেখে নিজেরা সুখ-সুবিধা করে নেয় সেখানেই সেই প্রথম শ্রেণীর মানুষরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের সম্বন্ধে নানান তত্ত্বের উদ্ভাবন করে। যার দ্বারা প্রতিপাদন করা হয় যে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা নানান রকম দোষে দুষ্ট সেই কারণেই তারা বঞ্চিত। আমাদের দেশের নিম্ন বর্ণের মানুষেরা বিশেষ করে অস্পৃশ্যরা যে উচ্চবর্ণের মানুষদের তুলনায় নানানভাবে বঞ্চিত তার কারণ দেখানো হয়েছে এই যে নিম্ন বর্ণের মানুষেরা আগের আগের জন্মে অনেক পাপ করেছিল। উচ্চ বর্ণের মানুষদের সেবা করাকেই তাদের ধর্ম বলে প্রচার করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের যে চূড়ান্ত অপমানকর আচরণ তাকেই তত্ত্ব দিয়ে সাজিয়ে করা হয়েছে ধর্মের অংশভূত।. অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যারা নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের শোষণের উপর ভিত্তি করে নিজেদের সমৃদ্ধির সৌধ গড়ে তোলে তারা ঐ নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে নানাবিধ দোষের অস্তিত্ব তত্ত্বগতভাবে আবিষ্কার করে। শ্রমিকরা কম খেতে পায় তার কারণ ধনিকদের মতে শ্রমিকেরা অলস, কর্ম বিমুখ, দক্ষতাহীন ইত্যাদি। শ্বেতকায় ব্যক্তিরা যতদিন দুনিয়াময় কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের প্রাণভরে শোষণ করতে পেরেছিল ততদিন প্রচার করেছিল কৃষ্ণকায় ব্যক্তিরা সভ্যতায় অনগ্রসর, বুদ্ধিতে খাটো নিজেদের দেশ শাসন করা নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করার যোগ্যতাই তাদের নেই। একইভাবে দুনিয়ায় প্রায় সব সমাজেই সভ্যতার আদিকাল থেকে পুরুষেরা

স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব করে গেছে, তাদের অবদমন করে রেখেছে, সামাজিক সুখসুবিধার অধিকাংশ থেকে তাদের বঞ্চিত রেখে নিজেরা ভোগ করেছে। এবং একইকালে প্রচার করেছে নারীরা অক্ষম, তাদের চরিত্র দুর্বল, তাদের প্রতিভা নেই ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্যান্য শোষক ও শোষিত, শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ককে যেভাবে কুযুক্তির দ্বারা সমর্থন করা হয়ে থাকে এখানেও তাই করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য যে কোন সমাজ বা সভ্যতার তুলনায় হিন্দু সমাজের ধারায় নারীনিন্দা যে অনেক বেশী উচ্চগ্রামের তার কারণ কি হতে পারে? আমরা দেখেছি যে আমাদের শাস্ত্রকারদের নারীনিন্দার প্রধান সূত্রই হল নারীদের অত্যধিক কামপরায়ণতা। পৌরাণিক সাহিত্যে ও মহাকাব্যে কিন্তু নারীদের এই অত্যধিক কামপরায়ণতার সমর্থনসূচক কাহিনী খুবই কম পাওয়া যায়। কাম সম্পর্কিত অধিকাংশ কাহিনীতেই পুরুষকেই অধিকতর পরিমাণে কামাসক্ত দেখানো হয়েছে। আমার সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় এ আর কিছু নয়, নিজেদের দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেওয়ার সততা নেই—সেই দোষ চাপানোর জন্য কাউকে খুঁজে বার করা। যাকে ইংরেজীতে বলে 'স্কেপ গোট'। যুধিষ্ঠির বলেছেন কোন এক জায়গায় "আমরা শুনিয়াছি যে স্ত্রীরূপিণী প্রজাগণ অতিশয় ধার্মিক হয় যেমন সাবিত্রী প্রভৃতির জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। তথাপি এই স্ত্রীগণ সম্মানিত হউক বা অসম্মানিত হউক সদাই পুরুষের মনে বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে।" (৩৩) যুধিষ্ঠির যেহেতু একটু বোকা ভালমানুষ গোছের ছিলেন তাঁর মুখ দিয়ে সত্য কথাটা ফাঁস হয়ে গেছে। ধার্মিক এবং সম্মানিত মহিলাদের দেখে যদি পুরুষের মনোবিকার দেখা দেয় তো সেই পুরুষের কাছে মনে হয় নারীরা দুষ্টস্বভাবের দ্বারা ঐ বিকার উৎপাদন করছে! বলাই বাহুল্য ঘটনাটা অন্যভাবে দেখা যায়। যার মনে বিকার দেখা দেয় চারিত্রিক দুর্বলতার কথা বলতে হলে তারই কথা বলা উচিত। যাদের উপলক্ষ্য করে ঐ বিকারের জন্ম তাদের দায়ী করাটা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। কেউ অন্য কারো মনে বিকার উৎপাদন করতে পারে না। যার মনে বিকার দেখা দেয় তার মনই সেই বিকারের জন্য দায়ী।

আর এক প্রশ্ন যা ওঠে তা এই। এই ব্যাপক নারীনিন্দার মধ্যে মাঝে মাঝে যে ভার্যাদের প্রশংসা পাওয়া গেছে তার কারণ কি হতে পারে? নারীচরিত্র সম্বন্ধে যেখানে এতই বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সেখানে এই গৃহিণীর গুণকীর্তন শুধুই কি সঙ্গতির অভাব সূচনা করে? না কি আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে? থাকতে তো পারেই। একটা ব্যাখ্যা যা হতে পারে তা এই। একদিকে গৃহিণী না হলে চলে না, সংসার চালাবে কে? রেঁধে খাওয়াবে কে? অসুখ হলে সেবা করবে কে? অপরদিকে নারীদের কামোদ্রেকের ক্ষমতা সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ। নারী এমনই এক সম্পত্তি যার সম্বন্ধে সবসময়ই হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়। পাপেদের ফিরিস্তির মধ্যে যে পরিমাণে গুরুপত্নীগমন নামক পাতকের উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় শাস্ত্রচরিতা মুনি-ঋষিরা সবসময়েই ভয়ে ভয়ে থাকতেন যে তাঁদের তরুণী ভার্যারা সুযোগ পেলেই তাঁদের শিষ্যদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবে, হয়তো বা ঘটনা ফষ্টিনষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আরও বেশীদূর গড়িয়ে যাবে।

তা ছাড়া শুধু তো সংসারের যাবতীয় কাজ করে দেওয়া নয় গৃহিণীদের প্রয়োজন বংশরক্ষার জন্যেও। এবং বংশের ধারার হিসেব যদি রাখতে হয় তাহলে পুরুষেরা যাই করুক স্ত্রীদের হতে হয় স্বামীদের প্রতি একনিষ্ঠ। কিন্তু বিবাহ প্রথাটাকে পুরুষের সুবিধেমত গড়েপিটে তৈরী করে নিতে বেশ সময় লেগেছিল। মহাভারতের মধ্যেই কতপ্রকার বিবাহপ্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর একাধিক পুরুষের পত্নী হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল তা থেকেই দেখা যায় যে স্ত্রীদের বহুবিবাহ প্রথা হিসাবে অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত হলেও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। মহাভারতের অধিকাংশ নায়কের জন্মই তো হয়েছিল বিবাহবহির্ভূত সংসর্গের ফলে। পঞ্চপাণ্ডবেরা তো বটেই, বস্তু কৌন্তেয় কর্ণওতো বটেই, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং মহাভারত-রচয়িতা স্বয়ং ব্যাসদেবও ছিলেন জারজ সন্তান। এই ব্যাপারে শাস্ত্রকারেরা সমাজকে যত বজ্র আঁটুনে বাঁধতে গেছেন ততই গেরো হয়েছে ফস্কা। আরও প্রাচীনকালে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের ইনসেসট যেমন ভ্রাতাভগিনীর বিবাহ (উদাহরণ, যোগ্য ও দক্ষিণা, দম্ভ ও মায়া, পৃথু ও অর্চি) মনে হয় রামায়ণ মহাভারত ও প্রধান পুরাণগুলি রচনার সময়ে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বামীরা বহুবিবাহ করবেন, যত্রতত্র যেমন তেমন অবস্থায় নারীদের ইন্দ্রিয় ভোগে লাগাবেন, কিন্তু স্ত্রীরা একমাত্র স্বামীর প্রতি আজীবন একনিষ্ঠ থাকবেন এই আদর্শকে রামায়ণ মহাভারতের কালে মনে হয় সমাজে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অবিরত ছিল। সেই চেষ্টা তখনও সম্পূর্ণ সফল হয়নি। হতে আরও অনেককাল লেগেছিল। এই অবস্থায় একই কালের স্ত্রী চরিত্রের নিন্দা এবং গৃহিণীর ভূমিকার পঞ্চমুখে প্রশংসা বেশ ভালোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ।

আমার তৃতীয় প্রশ্নটি খুবই গোলমেলে ধরনের। এরও উত্তর আমার জানা নেই, উত্তর কি হতে পারে তা নিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে পারি মাত্র। অন্য যে কোন দেশের তুলনায় মনে হয় বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনে নারীরা অধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছেন। সমস্ত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কোন দেশে এই প্রথম ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডে একজন নারী প্রধানমন্ত্রী হলেন। এতদিন যাবৎ এবং এখনও এইসব দেশে প্রধানমন্ত্রী হওয়া দূরে থাকুক কোনপ্রকার উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ পদেই নারীদের দেখা যায়নি বললেই চলে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইন্দিরা গান্ধীই যে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তা নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গভর্নর মুখ্যমন্ত্রী বৈদেশিক দূতাবাসের উচ্চপদ আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি এই

জাতীয় নানান রকম দায়িত্বপূর্ণ পদে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও জাতীয় আন্দোলনে একাধিক নারী উচ্চতম স্তরের নেত্রীর স্থান অধিকার করেছেন। স্পষ্টতই পাশ্চাত্ত্যদেশের তুলনায় ভারতবর্ষের পুরুষ জনগণ স্ত্রীলোকের নেতৃত্ব অনেক বেশী সহজে বিনা দ্বিধায় বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে। একদিকে নারীদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত অবজ্ঞা নারীদের বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ। অপরদিকে একইকালে নারীদের নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজী হওয়া, এই ব্যাপারটা কি অসঙ্গতিপূর্ণ নয়? এর থেকে একটা কথা যা প্রতিপন্ন হয় তা এই যে হিন্দু পুরুষ নারীকে কখনই নিজের সঙ্গে সমানভাবে দেখতে সক্ষম নয়। হয় সে নারীকে মনে করবে তার চেয়ে অনেক অধম। তা নয়তো সে নারীকে মনে করবে তারচেয়েও অনেক বেশী উত্তম। হিন্দু পরিবারে ছেলের কাছে মায়ের স্থান অনেক সময়েই খুবই উঁচুতে। বয়স্ক ছেলেও মায়ের কথায় ওঠে বসে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আধুনিক অনেক ভারতবাসী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে হিন্দু সমাজে নারীর স্থান নিম্ন এই ধারণাটা ভ্রান্ত। কিন্তু ঐ একই হিন্দুপরিবারে বাড়ির মেয়েদের ও বৌদের স্থান যে খুব উঁচুতে তা তাঁরাও বলবেন না। অর্থাৎ একইকালে জননী বা শাশুড়ী হিসাবে নারী পূজিত হন এবং কন্যা ও বধূ হিসাবে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ভোগ করেন।

নারীদের সম্বন্ধে হিন্দু পুরুষের মনে এই যে দ্বৈতভাব তার উৎপত্তি সম্পর্কে আমার কোন ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু একটা আবছা ধারণা আছে। হিন্দুর ধর্মজীবনে দেবীদের যে প্রাধান্য তার সঙ্গে তুলনীয় কোন ভূমিকা অন্য কোন প্রধান ধর্মের কোন নারীদেবতা পালন করেন না। মুসলমানদের আল্লা, ইহুদীদের জেহোভা, খৃষ্টানদের ঈশ্বর সকলেই পুরুষ এবং পিতৃস্থানীয়। ঈশ্বরের সন্তান যীশুখৃষ্টও পুরুষ। জননী মেরী অবশ্য নারী কিন্তু খৃষ্টানদের চোখে তাঁর স্থান কোনক্রমেই হিন্দুদের চোখে দুর্গা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতির মত চূড়ান্ত পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নয়। একদিকে বলা হচ্ছে নারীরা অবলা অপরদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শরণ নিতে হয় চণ্ডীর চামুণ্ডার দুর্গার কালীর। একদিকে বলা হচ্ছে নারীরা বুদ্ধিহীন প্রতিভাহীন। অপরদিকে পণ্ডিতেরা আশীর্বাদ ভিক্ষা করছেন যে সরস্বতীর কাছে সেই দেবতা নারী। অবশ্য একথা বলা যাবে না যে হিন্দুধর্মে দেবীদের প্রাধান্য থাকাটাই নারীদের সম্বন্ধে হিন্দু পুরুষের দ্বৈত মনোভাবের কারণ। এই দ্বৈতমনোভাবই হিন্দুধর্মে দেবীদের প্রাধান্যকে সম্ভব করেছে তা বললেও আপত্তি করা যাবে না। ধর্মে দেবীদের প্রাধান্য এবং সমাজজীবনে নারীদের সম্বন্ধে দ্বৈতভাব এই দুইটির উন্মেষ ও বিকাশ একই ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে ঘটেছে এই পর্যন্ত দেখা যায়। কোনটি কার্য কোনটি কারণ তা বোধ হয় জোর করে বলা যায় না।

পাঠসূচী

১। মহাভারত, সভাপর্ব, অধ্যায় ৩২।
২। মহাভারত, কর্ণপর্ব, অধ্যায় ৩১।
৩। শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, অধ্যায় ১।
৪। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৬।
৫। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ২০।
৬। শিবপুরাণ, বায়বীয়সংহিতা, পূর্বভাগ, অধ্যায় ২১।
৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অধ্যায় ২২।
৮। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৪৬।
৯। কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ, অধ্যায় ৩৩।
১০। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১৫৮।
১১। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ২৩।
১২। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ২৭।
১৩। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১৫৮।
১৪। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অধ্যায় ১৬।
১৫। শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা, অধ্যায় ২৬।
১৬। মহাভারত, শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৬৬।
১৭। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৭৩।
১৮। মহাভারত, কর্ণপর্ব, অধ্যায় ৩০৬।
১৯। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১০৯।
২০। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৩৮।
২১। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, অধ্যায় ৪৪।
২২। মহাভারত, শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৮৩।
২৩। দেবীভাগবত, নবম স্কন্ধ, অধ্যায় ১৮।
২৪। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৯।
২৫। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৩৮।
২৬। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৩৮।
২৭। দেবী ভাগবত, নবম স্কন্ধ, অধ্যায় ১।
২৮। দেবী ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, অধ্যায় ১৩।
২৯। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, অধ্যায় ৪৪।
৩০। কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ২৩।
৩১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১৪৪।
৩২। শ্রীমদ্ভাগবৎ, তৃতীয় স্কন্ধ, অধ্যায় ১৪।

বীন্দ্র-অনুলেখক ঃ দ্যোতকুমার নগুপ্ত

দুলাল চৌধুরী

িধাতা যার অন্তরে ভাবের আগুন য়েছেন, তার নিদ্রাহীন রজনী কাটে। প্রদ্যোত- সেনগুপ্ত কবিতা লেখেননি বটে ; কিন্তু কে ভালবাসতেন কবির মতই। কবিতা তাঁর সী ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অন্তর- অবাধে সন্তরণ করেছিলেন। রবীন্দ্র-রচনার লেখকদের মধ্যে প্রদ্যোতকুমার ছিলেন অন্যতম। তাই নয় রবীন্দ্রনাথ প্রদ্যোতকুমারকে স্নেহ ন অপ্রতুল। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত 'রবিচ্ছবি' গ্রন্থে খেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের মৌখিক ভাষণের নোট অনুলেখন লিখতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন াতকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়।' এ ব্যাপারে কলমকে তিনি বশ করে নিয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন 'নোটবিহারী'। তাঁর আরো নাম ছিল 'কলমবশ'। শুধু দ্রুত লিখনের ই তাঁর কৃতিত্ব নয়, তাঁর হাতের লেখা ছিল দর ঝকঝকে।

১৩২৯-৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের অনুরোধে াকা' কাব্য পাঠ ও আলোচনা করেছিলেন। াতকুমার তখন অবশ্য কলকাতার একটি কলেজে তেন। তাঁর মা স্নেহলতা সেন ছিলেন বিশ্ব- তীয় সুযোগ্যা শিক্ষিকা। প্রদ্যোতকুমার যখন তে পারলেন রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' পড়াবেন তখন প্রদ্যোতকুমার কবির অনুমতি নিয়ে 'বলাকা' আলোচনার ধারাবাহিক নোট নিয়েছিলেন। প্রথম চারদিনের আলোচনা লিখেছিলেন, াত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। ক্ষিতিমোহন ও দ্যোতকুমারের নেওয়া নোটের রবীন্দ্র-সংশোধিত

রূপটি 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। [মাঘ ১৩২৯]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কখনও তাঁর আলোচনার নোট নিতে কাউকে প্রলুব্ধ করতেন না। যাঁরা অনুলেখক হিসেবে রবীন্দ্রভাষণের শ্রুতিলিপি নিয়েছেন, তাঁরা বরং স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়েই এই কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যদুনাথ সরকার, ক্ষিতিমোহন সেন, অমিয় চক্রবর্তী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রদ্যোত- কুমার সেনগুপ্ত ও বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমুখ।

নোট নেওয়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। তিনি বলেছেন, 'আমার বক্তৃতার নোট নেওয়া বড় শক্ত—আমি তড়বড় করে বলে যাই— তাছাড়া আমার ভাষা একটু বিশেষভাবে আমারই— যারা নোট নেয় তাদের পেন্সিলের ঠোকরে ওর চেহারা একেবারে বদলে যায়—বসন্তরোগের ঠোকর- মারা মুখের চেয়েও বেশি। তাছাড়া এসব বিচ্ছিন্ন বাক্যকে প্রবন্ধের রূপ দেবে কে? [চিঠিপত্র/৫ খণ্ড]

শুধু 'বলাকা'র আলোচনার অনুলিপি নয়, আরো কয়েকটি মূল্যবান রবীন্দ্র-ভাষণের অনুলিপি গ্রহণের সৌভাগ্য প্রদ্যোতকুমারের হয়েছিল। তাদের মধ্যে 'বিশ্বভারতীর ছাত্রদের প্রতি' (২০ ফাল্গুন/ ১৩২৮), বিশ্বভারতী সম্মিলনী (প্রাথমিক অধি- বেশনে ভাষণ, ২৬ চৈত্র/১৩২৮), প্রাক্তন ছাত্র সম্মিলনীতে ভাষণ, 'জীবন দেবতা' (দেশ পত্রিকা/

পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন: "১৯২১ সালের ৩ অক্টোবর শান্তিনিকেতনে এই [জীবন দেবতা] আলোচনার অনুলিপি শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের সৌজন্যে আমরা পাইয়াছি, তিনিই ইহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রচর্চায় যাঁহারা নিবিষ্ট, শান্তিনিকেতনে বলাকার ক্লাস লইবার সময় রবীন্দ্রনাথ ওই কাব্যগ্রন্থের যে ধারাবাহিক ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন সেগুলি লিখিয়া লইবার জন্য তাঁহারা চিরদিন শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন ; এগুলি প্রথমে কবির জীবিতকালে শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে বলাকা গ্রন্থের পরিশেষে সন্নিবিষ্ট হইয়া রবীন্দ্র- সাহিত্য পাঠকের বিশেষ সহায়রূপ হইয়াছে। প্রদ্যোত- কুমার রবীন্দ্রনাথের আরও বহু উল্লেখযোগ্য ভাষণের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিমার্জিত হইয়া তাহার অনেকগুলি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থে (যথা বিদ্যাসাগর চরিত, বিশ্বভারতী) সংকলিত হইয়াছে।"

প্রদ্যোতকুমার ঢাকার বিক্রমপুরের স্বর্ণগ্রামে জন্মেছিলেন। ১৮৯৮ সালের ১ নভেম্বর। তাঁর মা স্নেহলতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্রী। ১৩২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ স্নেহলতাকে লিখেছিলেন :

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তুমি ছুটির পরে শান্তিনিকেতনে আসচ শুনে খুব খুসি হয়েছি। আমি নিশ্চয় জানি তুমি যদি ছেলেদের পড়াবার ভার নেও তাহলে, খুব ভালই

...থেকেই ইচ্ছা ছিল তোমাদের ... কলকাতার চেয়ে এখানে তুমি ... তার সন্দেহ নেই। আমার খুব ...কার কাজ তোমার ভাল লাগবে। ...নে আমাদের কয়েকজন অতিথি এসেছেন ...নিয়ে ব্যস্ত আছি। ইতি ২৩ আশ্বিন, ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্নেহলতা ছিলেন বিদুষী মহিলা। সুলেখিকা। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন :

As a short story writer Mrs Snehalata Sen has lcng marked high among Indian authors : [Preface : Nehal the musician/ Madras : 1923]

কর্মসূত্রে প্রদ্যোতকুমার বহুদিন অতিবাহিত করেছিলেন ভাগলপুরে, গয়ায়। আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি শুধু সরকারী দলিলের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন নি। সময় ও সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন প্রকৃতির কাছে। পাখির গান ও ডানার রঙ প্রদ্যোতকুমারের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 'বনফুলে'র সঙ্গে তাঁর ছিল বন্ধুত্ব। 'বনফুল' তাঁর 'ডানা' গল্পে প্রদ্যোতকুমারকে অমর এক চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। কলকাতার চিড়িয়াখানার সম্পাদক রূপেও তিনি পশু-পক্ষিপ্রেমের যথার্থ পরিচয় দিয়েছিলেন। শুধু পশু-প্রকৃতি নয়, বাংলার তথা ভারতের মানুষকেও তিনি ভালোবাসতেন। ১৯৬১ সালে চৈত্র মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'লোকসাহিত্য' বিশেষ পত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রথম যে ক্ষেত্র সমীক্ষার আয়োজন করেছিলেন পুরুলিয়া জেলার 'অযোধ্যা' পাহাড়, সেই দলে প্রদ্যোতকুমার যোগদান করেছিলেন। তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। পাখির ডানা ও গানের প্রতি তাঁর যে কত দরদ ছিল, তার

...,
একদা অযোধ্যার
শালবনের পথে যেতে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগেছিল,
কান পেতে চোখ মেলে ধরণীর
দিকে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে
প্রাণে সাড়া জেগেছিল, গান
জেগেছিল কণ্ঠে [illegible]
[illegible]
[illegible]

পরিচয় পেয়েছি ঐ পাহাড়ের আরণ্য-জনপদে। 'বাইনোকুলার' গলায় নিয়ে তিনি ছুটেছেন বনে বনে ; শাল-মহুয়া-পলাশ গাছের গহনে। আমাদের তরুণ মনকে তিনি সেদিন করে তুলেছিলেন প্রকৃতি-অভিসারী। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ১৯০৯ সালে "ব্রহ্মচর্য আশ্রমে" থাকার ফলে প্রকৃতির প্রতি তাঁর মনে গভীর অনুরক্তি জন্মে। শুধু তাই নয় গানের প্রতি অনুরাগ ও মানবপ্রেমের সঞ্চার হয় বিশ্বভারতীর উদার সান্নিধ্যে ও প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে।

সাহিত্যের প্রতি প্রদ্যোতকুমার ছিলেন গভীর-ভাবে অনুরক্ত। 'অরণ্য বাংলার বিহঙ্গ বিচিত্রা' 'লিমারিক স্রষ্টা লিয়রের পরবর্তী যুগ' প্রভৃতি রচনা অনবদ্য সাহিত্য রস-সম্পৃক্ত। 'দেশ' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল এগুলি। রবীন্দ্রনাথ ১৩৪২ সালে প্রদ্যোৎকুমারের অটোগ্রাফ খাতায় লিখেছিলেন :

> কোন্ বাণী মোর জাগল যাহা
> রাখবে স্মরণে,
> পলে পলে দলিত সে
> কালের চরণে।
> তাদের নিয়ে সারাবেলা
> চলচে রাখা, চলচে ফেলা,
> খেলার শেষে বাঁচবে যা তাই
> বাঁচবে মরণে॥

৭ পৌষ ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'নোট বিহারী' প্রদ্যোতকুমার আজ 'গগন বিহারী'। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর কলকাতায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। (১৪ এপ্রিল ১৯৭৯) কিন্তু তাঁর স্নেহনির্ঝর-কণ্ঠ আজও প্রেরণা জোগায়। একটি পত্রে লেখককে লিখেছিলেন :

"একদা অযোধ্যার শালবনের পথে যেতে যেতে ফুলের গন্ধে চমক লেগেছিল, কান পেতে চোখ মেলে ধরণীর দিকে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে প্রাণে সাড়া জেগেছিল, গান জেগেছিল কণ্ঠে—তার স্মৃতি মধুর হয়ে জীবন সংগ্রামে প্রেরণা জাগাক্, অমলিনভাবে ক্ষণে ক্ষণে।" (বৈশাখ/১৩৬৯)।

প্রদ্যোতকুমার মুক্তি খুঁজেছিলেন 'ঘাসে ঘাসে এই আকাশে'। কারণ পাখি দেখতে গিয়ে তিনি আকাশকেও দেখেছেন। তাঁর হৃদয়ের বিশাল আকাশেরই প্রতিমা। আনন্দের ডানায় আজ তিনি অমৃতলোকে পৌঁচেছেন।

পর্বতারোহণ স্পোর্টঃ পশ্চিমবঙ্গে

প্রাণেশ চক্রবর্তী

হকি, ফুটবল, ক্রিকেটের মত না হলেও পর্বতারোহণ (mountaineering) আজ এ রাজ্যের এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণীদের অত্যন্ত প্রিয় খেলা। যত দিন যাচ্ছে ততই এর প্রতি সাধারণের আগ্রহ বাড়ছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আজ ত্রিশটিরও বেশী পর্বতারোহণের ক্লাব বা সংস্থা আছে। বেশ কিছু অভিজ্ঞ ও ট্রেনড পর্বতারোহী ছাড়াও বহু অ্যাডভেঞ্চারপিপাসু মানুষ এই সমস্ত সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। এঁরা প্রতি বছর হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান, অভিযান করেন শিখর থেকে শিখরে। অন্যান্য খেলাধুলোর মত যেহেতু এই স্পোর্টের সংবাদ দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে বের হয় না সেজন্য জনসাধারণও পর্বতারোহণ স্পোর্ট সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে যে সমস্ত পর্বতারোহী পর্বত-গাত্রে অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে আসেন তাঁদের কথা খুব কম লোকেরই জানা আছে।

আজ থেকে মাত্র আঠারো বছর আগে নন্দাঘুণ্টি (২০,৭০০′) অভিযানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম পর্বতারোহণ স্পোর্টের সূচনা হয় এ রাজ্যে। অনেকেরই হয়ত স্মরণ নেই ১৯৬০ সালে সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে সফল ঐ অভিযানটি সারা ভারতবর্ষে প্রবল এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে যুবগোষ্ঠী। বলতে গেলে নন্দাঘুণ্টি অভিযানই ছিল ভারতের প্রথম বেসরকারী পর্বত অভিযান। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের বদান্যতা এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যদি সে সময় তাঁর অকৃপণ সাহায্যের হাত না নিয়ে এগিয়ে আসতেন তাহলে আজ এ রাজ্যে পর্বতারোহণ স্পোর্টের এতখানি প্রসার হত কি-না সন্দেহ।

সত্যি কথা বলতে কি ঐ অভিযানের পরেই বাংলাদেশের যুবসম্প্রদায় পর্বতারোহণের প্রতি আকৃষ্ট হন। আজ এ রাজ্যের প্রায় হাজার দুয়েক তরুণ-তরুণী এই স্পোর্টে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এত বিপুল সংখ্যক পর্বতারোহী ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে নেই। বর্তমানে সারা বছর এখানে পর্বতারোহণের যে ব্যাপক চর্চা হয়ে থাকে তা আর অন্য কোথাও হয় না। প্রতি বছর এখান থেকে হিমালয়ের দুর্গম শিখরে যত অভিযান চালানো হয় তত আর অন্য কোনও রাজ্য থেকে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের পরেই হচ্ছে মহারাষ্ট্রের স্থান।

বিগত আঠারো বছরে বাঙালী পর্বতারোহীরা কুড়ি হাজার ফুটের ওপরে পঞ্চাশটিরও বেশী পর্বতশৃঙ্গ আরোহণের দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। ভারতের পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তাই একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এগুলির মধ্যে বিশ্বদেব বিশ্বাসের নেতৃত্বে কামেডোম (২১,৬৫০′) ও মানা (২৩,৮৬০′), অমূল্য সেনের নেতৃত্বে গাড়োয়াল হিমালয়ের নীলগিরি পর্বত (২১,২৬৪′), চঞ্চল মিত্রের নেতৃত্বে ত্রিশূলী (২৩,২১০′), অনিল দেবের নেতৃত্বে কামেট (২৫,৪৪৭′), বিজয় দত্তের নেতৃত্বে ত্রিশূল (২৩,৩৬০′), নিমাই বসুর নেতৃত্বে লাম্পাক (২০,২৮০′) সুনীল চৌধুরীর নেতৃত্বে বিধান পর্বত (২১,৩৯০′), সুজিত বসুর নেতৃত্বে ভাগীরথী (২১,৩৬৪′), প্রদীপ্ত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে স্বর্গারোহিণী (২০,৭৪৭′) শিখর আরোহণ খুবই উল্লেখযোগ্য।

পর্বতারোহণে এই রাজ্যের মেয়েরাও পেছিয়ে নেই। তাঁদের প্রথম অভিযান ছিল গাড়োয়ালের রোন্টি পর্বত (১৯,৮৯৩′)। ১৯৬৭ সালে দীপালী সিনহার নেতৃত্বে সংগঠিত এই অভিযানটিও সে সময় সাধারণে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম দিকে এই স্পোর্টের প্রতি মেয়েদের তেমন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু পরে ক্রমশ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। বর্তমানে সা... ঘরের বহু মেয়েই পর্বতারোহণের প্রতি আকৃষ্ট এগিয়ে এসেছেন। আজ কলকাতায় তাঁদেরই শুধু একান্ত নিজস্ব দুটি সংস্থা আছে। বেশ কয়েকটি অভিযানও ইতিমধ্যে তাঁরা পরিচালনা করেছেন। বিগত দশ বছরে মেয়েরা যে কটি পর্বতশৃঙ্গ আরোহণের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে দীপালী সিনহার নেতৃত্বে বড়াশীগুরী (২১,৮৬৮′), সুজয়া গুহর নেতৃত্বে ললনা (২০,১৩০′), রমা সেনগুপ্তার নেতৃত্বে কেদারনাথ ডোম (২২,৪১০′) এবং স্বপ্না চৌধুরীর (মিত্র) নেতৃত্বে মৃগথুনি (২২,৪১০′) অন্যতম।

পশ্চিমবঙ্গের আঠারো বছরের পর্বতারোহণের ইতিহাসে '৭৮ সালেই সর্বাধিক পর্বতাভিযান হয়েছে। সারা ভারতবর্ষ থেকে সংগঠিত অভিযানের সংখ্যা ছিল তেত্রিশ। সেখানে পশ্চিমবাংলা থেকে হয়েছে আঠারোটি অভিযান। এত বেশী অভিযান ইতিপূর্বে আর কখনও কোন রাজ্য থেকে করা সম্ভব হয়নি। প্রায় দুশো পর্বতারোহী এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। খরচ হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। বিভিন্ন ক্লাবের তরফ থেকে যে সমস্ত পর্বতশৃঙ্গে এই সমস্ত অভিযানগুলি করা হয় সেগুলি হচ্ছে—বার্নপুরের ইসকো স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মাতৃ—২২,০৫০′ (দলনেতা—জিতেন মিত্র), আসানসোলের মাউন্টেন লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের শ্রীকান্ত—২০,১২০′ (দলনেতা—মিলন সেনগুপ্ত) ও মান্দা—২১,৫৪৭′ (দলনেতা—তুষার সরকার), দুর্গাপুরের মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের সিকিম হিমালয়ের পান্দিম হিমবাহের নিকটস্থ অনামা শিখর—১৯,৩৭৩′ (দলনেতা—প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়), ইঃ রেল স্কাউট-এর বান্দরপুঞ্ছ—১৯,৫৮৭′ (দলনেতা—অমিয় মুখার্জী), কলকাতার দিগন্ত পর্বতারোহী সংস্থার গঙ্গোত্রী অঞ্চলের শ্বেতবরন ও রক্তবরন হিমবাহের সংলগ্ন অনামা শিখর—২০,২১৪′ (দলনেতা—অশোক রায়চৌধুরী), ক্লাইম্বার্স সার্কেলের মানালী—১৮,৬০০′ এবং সিংধর—১৭,৩৫৮′ (দলনেতা—বনভূষণ

"বিকজ ইট ইজ দেয়ার"

আইস-ওয়াল টপকানোর একটি কৌশল

নায়ক), যাদবপুর ইউনিভার্সিটি মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের লায়ন—২০,১০০´ ও বড়াশীগুরী হিমবাহ সংলগ্ন অনামা শিখর—১৯,৭৫০´ (দলনেতা—অনুপ বণিকচৌধুরী), মাউন্টেনিয়ার্স ইয়ুথ রিং-এর সংকল্প—২০,০৩০´ (দলনেতা—অধ্যাপক মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়), হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত মেয়েদের ধর্মাসুর—২১,১৪৮´ (দলনেত্রী—রমা সেনগুপ্ত), চন্দননগরের গিরিদূত সংস্থার ফ্রেন্ডশিপ—১৭,৩০০´ (দলনেতা—দীপক বসাক), দুর্গাপুরের মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের পান্দিম—২১,৯৫২´ (দলনেতা—প্রশান্ত চক্রবর্তী), চিত্তরঞ্জনের হিমালয়ান এনজয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেদারনাথ—২২,৭৭০´ (দলনেতা—শম্ভুনাথ দাস), শ্রীরামপুরের ক্লাইম্বার্স গ্রুপের গঙ্গোত্রী—২১,৫৭৮´ (দলনেতা—সনাতন ভট্টাচার্য), পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের মন্দির—২১,৫১৬´ (দলনেতা—শিশির ঘোষ), এবং ট্রেকার্স ও ক্লাইম্বার্স-এর কালিন্দী শিখর—২০,০২০´ (নেতা—শ্রীকণ্ঠ মিত্র)। প্রতিকূল আবহাওয়া ও অন্যান্য কারণে শেষোক্ত সাতটি অভিযান সফল হতে পারেনি। বাদবাকি এগারোটি অভিযানই সাফল্যের শেষ লক্ষ্যে পৌঁছুতে সমর্থ হয়। এবং মোট চৌদ্দটি পর্বতশৃঙ্গে আরোহণের কৃতিত্ব অর্জন করেন পর্বতারোহীরা। ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে এরকম সাফল্যের আর দ্বিতীয় কোন নজির নেই।

পর্বত অভিযানের মূল লক্ষ্য শীর্ষারোহণ সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র এটাকেই প্রাধান্য না দিয়ে অভিযাত্রীরা নানা রকম বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অভিযাত্রীদের অনেকেই ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, আবহাওয়াতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব প্রাণীতত্ত্ব ইত্যাদি নানান বিষয়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের কাজ করেন। মানবকল্যাণের খাতিরে সেজন্য এই সমস্ত পর্বতাভিযানগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—সংকল্প অভিযানের নেতা অধ্যাপক মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় হিমবাহের গতি-প্রকৃতি নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রাথমিক রিপোর্ট-এ বলেছেন—কুমায়ুনের ঐ অঞ্চলের হিমবাহগুলি বিস্ময়করভাবে 'রিসিড' করছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ওপর এর যথেষ্ট প্রভাব পড়তে বাধ্য।

যাদবপুর ইউনিভার্সিটির অভিযাত্রীদলের বিশেষজ্ঞরা হিমাচল প্রদেশের লাহুল-স্পিতি জেলার কয়লা, সীসা ও তামার সন্ধান পেয়েছেন। 'দিগন্তের' সহনেতা—সমর ধর গঙ্গোত্রী অঞ্চলের বিশেষ করে শ্বেতবরন-রক্তবরন হিমবাহ অঞ্চলের নতুন করে আবার সার্ভে হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন। কেননা ঐ অঞ্চলে অভিযানে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বর্তমান ম্যাপের সঙ্গে উক্ত অঞ্চলের 'টপোগ্রাফি'র কেনও মিল নেই।

এখনও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বহু মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করা যায় সেগুলি প্রকাশিত হলে হিমালয় সম্পর্কে অনেক কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাবে, জানা যাবে বহু অজানা জিনিস।

স্বভাবতই এসব থেকে বলা যায় বাংলাদেশের পর্বতারোহীরা পর্বতারোহণকে আজ শুধুমাত্র খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। পাশ্চাত্যের দেশগুলির মত তাঁরাও পর্বতারোহণকে বিজ্ঞানবিদ্যার গবেষণার অন্যতম মিডিয়াম হিসেবে প্রাধান্য দিচ্ছেন। কারণ একথা তো অস্বীকার করবার জো নেই মানুষের অভ্যস্ত বাতাবরণ পরিবেশ ইত্যাদির তুলনায় পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ করে উচ্চতর হিমালয়ের অবস্থা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। সেখানে জীবনধারণ ও চলাফেরা করার উপায় উদ্ভাবনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার তাই একান্ত প্রয়োজন। সেদিক থেকে বাঙালী পর্বতারোহীদের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। বিগত কয়েক বছর ধরেই তাঁরা এজাতীয় মানবকল্যাণমূলক গবেষণার কাজে উদ্যোগী রয়েছেন। সীমায়িত সাধ্যের মধ্যে এ রনের প্রয়াসকে অব্যাহত রাখা বড় কম কথা নয়।

দিল্লীতে প্রতিরক্ষাদপ্তরের অধীনে ভারতীয় পর্বতারোহণের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা আছে। নাম—ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন। সম্প্রতি সেখান থেকে 'ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ার' নামে একটি জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেশের পর্বতারোহী ও পর্বতারোহণ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে। বইটিতে মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। এডিটর্স নোটবুকের এক জায়গায় বলা হয়েছে.................

One thing we would like to mention is that Bombay and Calcutta form the real Base Camp for various mountaineering activities in the Himalayas. Youths of these two big cities are doing real big job in taking mountaineering.

ইত্যাদি (পৃঃ ১০৬)। বলা বাহুল্য, এটা যে নিছক প্রশস্তির কথা নয় তা উল্লিখিত বিষয়বস্তুর আলোচনা থেকেই অনুধাবন করা যেতে পারে।

পর্বতারোহণের অভিধানে একটি কথা প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত আছে। সেটা হল—নিরাপদ আরোহণ ও প্রত্যাবর্তন। প্রত্যেক অভিযাত্রী দলই সেজন্য অভিযানকালে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন যাতে কোন রকম দুর্ঘটনা না ঘটে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অনেক সময়েই কিছু না কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যায়। গত বছরেও এরকম দুটি ঘটনা ঘটে যা নাকি খুবই মর্মবিদারক। মানা-কামেট অভিযানের অন্যতম সদস্য কৃষ্ণচন্দ্র দে হঠাৎ Pulmonary oedema-তে আক্রান্ত হয়ে মূল শিবিরে মারা যান। আর মেয়েদের অভিযানের বেথ মুখার্জি নামে জনৈকা ইংরেজ মহিলা রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন। অনেক চেষ্টা করেও তাঁর কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

ইতিপূর্বে এ রাজ্যের আরো পাঁচটি অমূল্য প্রাণ পাহাড়ে বিনষ্ট হয়েছিল। অমর রায়, গোরাংগসুন্দর চৌধুরী, অণিমা সেন, কমলা সাহা, সঞ্জয় গুহ বিভিন্ন অভিযানকালে আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন—একথা বোধ করি আজও অনেকেরই স্মরণে আছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে—প্রতি পদক্ষেপে জীবন যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পর্বতারোহীরা পাহাড়ে উঠতে যান কেন?

আসলে এ পৃথিবীতে যা কিছু দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় তাই-ই অ্যাডভেঞ্চারপিপাসু মানুষকে আকৃষ্ট করে। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নটি সেখানে তাই নিতান্ত তুচ্ছ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

পর্বতারোহীদের সরাসরি এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে তাঁদের অনেকে একটু ঘুরিয়ে জবাব দেন লক্ষ করেছি। প্রখ্যাত ইংরেজ পর্বতারোহী ম্যালোরীর কথার প্রতিধ্বনি করে তাঁরা বলেন— Because it is there অর্থাৎ কি-না যেহেতু পাহাড়টা ওখানে রয়েছে তাই তাঁরা যান।

সে যাই হোক, চলতি বছরে পাহাড়ে ওঠার খেলা শুরু হতে আর বিশেষ দেরী নেই। এপ্রিল-মে মাস নাগাদ শুরু হয়ে চলবে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কলকাতা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন সংস্থাগুলিতে সেজন্য ইতিমধ্যেই নানারকম আলাপ-আলোচনা চলেছে। এবারের মরসুমে কোন্ টিম হিমালয়ের কোন অঞ্চলে যান, আপাতত সেটাই এখন লক্ষ করার বিষয়। [ফটো : লেখক কর্তৃক গৃহীত]

পর্বতারোহীর মূল লক্ষ্য পর্বতশিখর

অনেক দিন পরে এক দিন

অলক সান্যাল

কথা বলছিল প্রসূন। পূর্ণ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'এই, দ্যাখ তো ওকে চিনতে পারিস কি না?'

'কাকে?' প্রসূন চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে পূর্ণর দিকে তাকায়।

'ওই যে ওখানে, দোতলার ব্যালকনির দিকে চেয়ে দ্যাখ্।'

দোতলার বারান্দায় এক দঙ্গল মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, এদিকে ওদিকে আরও অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে; পূর্ণ ঠিক কাকে দেখাচ্ছে ও বুঝতে পারল না। বলল, 'তুই কার কথা বলছিস?'

'ওই তো রে ডান দিকের থামের পাশে, রেলিঙে বুক দিয়ে ঝুঁকে নীচে কি যেন দেখছে। তুঁতে রঙের শাড়ি পরা—'

'ও হ্যাঁ বুঝেছি!'

প্রসূনের দৃষ্টি একবার ঠিক জায়গায় আটকে যায়। চোখে প্রচ্ছন্ন মুগ্ধতা নিয়ে পূর্ণর দিকে ফিরে শুধোয়, 'কে রে?'

'চিনলি না?'

'না তো, কি করে চিনব, তোদের এখানে কাকেই বা চিনি আমি। সেই তো একবার এসেছিলাম মাত্র।'

'আর একবার দ্যাখ্ ভাল করে।'

'যাঃ, একটা মেয়ের দিকে বার বার তাকিয়ে থাকা যায় নাকি, কি ভাববে।'

'কিস্সু ভাববে না। তুই যতবার খুশি তাকা না—ও চেনে তোকে।'

প্রসূন কিছু বলল না। নিঃশব্দে অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

পূর্ণ তাতে দমে না গিয়ে আরো জোর দিয়ে বলল, 'চেনে। আমি বলছি। তুইও চিনিস।'

'ইয়ারকি মারছো, শালা!'

'মাইরী না! সিন্সিয়ারলি বলছি তুই চিনিস, একটু মনে করে দেখ।'

'মনে করার আর কি আছে, তোর বাবা মা তো কবেই গুজরাই করেছেন, এখন এখানে চেনা বলতে—'

প্রসূন ভুরু কোঁচকায়, 'নুনু! অসম্ভব!'

'সে কি রে! মনে পড়ছে না, সেই যেবার এসেছিলি?'

'হ্যাঁ, তো কী? সেই তো একবারই এসেছিলাম। বোধ হয় তিনচারদিন ছিলাম তার বেশী না। এর মধ্যে এ রকম কোনও সুন্দরী মেয়েটেয়ে—'

প্রসূন কেমন ফোটানায় পড়ে যায়, 'উঁহু, মনে পড়ছে না।'

'দূর্ বোকা!' পূর্ণ হাসির মুখ করে, 'ও কি অনন্ত যৌবনা যে তখনও এই একই রকম থাকবে, সে তো বছর বারো আগের কথা, তখন ওকে ছেলেমানুষই বলা যায়, কিশোরী।'

বলতে বলতে পূর্ণ বেশ জোরে হেসে ওঠে, 'আরে ও হচ্ছে টুনি, টুনি! মনে পড়ছে? সেই যে খুব ছটফটে আর স্মার্ট, সারাক্ষণ আমাদের পেছনে লেগে থাকত, খুনসুটি করত, আমরাও খুব রাগাতাম ওকে। মার মাসতুতো বোন সুধামাসীর মেয়ে রে, বাঁচিতে বাড়ি!'

পূর্ণ একটু থেমে একবার সময় দিল প্রসূনকে ভাববার তারপর আবার বলল, 'সেবার ছুটিতে আমার সঙ্গে তুইও এলি ক'দিনের জন্যে, এসে দেখি বাড়ি জমজমাট—ওরাও এসেছে, মনে পড়ে?'

'আশ্চর্য!'

প্রসূন আর একবার ব্যালকনির দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে অবাক চোখে তাকায়, 'সেই টুনি এত বড় হয়ে গেছে, বলিস কি!'

'আশ্চর্যের কি, বড় হবে না ছোটই থেকে যাবে চিরটাকাল? তুই বড় হোস নি? বয়সে, দেহে মনে, পদমর্যাদায়, যশোগরিমায়—'

'রাখ্ রাখ্!' প্রসূন ওকে থামিয়ে দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করে। পূর্ণকে দেয়। নিজেও নেয়। গ্যাসলাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে বলে, 'আসলে কি জানিস, মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়সের একটা স্টেজ থেকে আর একটা স্টেজের মধ্যে পার্থক্যটা বোধ হয় খুব বেশী। টুনির সেই পাতলা ছিপছিপে কিশোরী চেহারাটাই চোখের সামনে ভাসছে এখনো। ও-ই যে টুনি কে বলবে বল্, কী করে হঠাৎ চিনতে পারব এতদিন বাদে? তবে, মনে আছে ঠিকই, ভুলি নি!'

পূর্ণ হাসে, সিগারেট টানতে টানতে। আঙুলের টোকায় ছাই ঝেড়ে ফেলে। 'হাসলি যে। মনে নেই ভাবছিস?'

'না, একটা কথা মনে পড়ে গেল, তাই। মনে আছে তোর, সেই বাগানে! টুনিকে ভূত সেজে ভয় দেখাতে গিয়ে—'

প্রসূন হঠাৎ থমকে যায়। দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, 'হ্যাঁ, মনে আছে। তোর কিন্তু উচিত হয়নি ওভাবে—'

'আমার কি দোষ, ও বারে বারে চ্যালেন্‌জ করতে গেল কেন ওকে নাকি কে-উ ভয় দেখাতে পারবে না, এত সাহস ওর।'

প্রসূন হাসল, 'সে তো ও সব তাতেই চ্যালেন্‌জ করে বসত। সেই মনে আছে পূর্ণ, আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছি পেছনের ঘরে বসে, খুঁজে খুঁজে ও গিয়ে হাজির, ওকেও দিতে হবে না হলে বাড়িতে বলে দেবে! মাছ ধরতে যাব দুজনে মিলে তো ওরও যাওয়া চাই, এই রকম কত কি। সেই টুনি, আশ্চর্য!'

প্রসূন আর একবার ব্যালকনির দিকে তাকায়।

'বাড়িতে ওর বয়সী কোন মেয়েটেয়ে ছিল না তো, ছেলেও না। পাড়াতেও ওই ক'দিনে আর কে বন্ধু জুটবে অই আমাদের পিছু ছাড়ত না। আমরাই ওর বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম এক রকম, তাই না?'

'তা ঠিক, তবে সম্পর্কটা ছিল যেন প্রতিপক্ষের মত!' প্রসূন হা হা করে হেসে ওঠে, 'সে সব কথা মনে আছে ওর, পূর্ণ?'

'নিশ্চয়। কেন থাকবে না! কালকেই তো সে সব কথা হচ্ছিল রে, বহুক্ষণ

ধরে। টুনি জানে তোর আসার কথা আছে, বলছি। সকালে ও জিজ্ঞেস করছিল কখন আসবি। এখন যে এসে পড়েছিস, জানে না। জানতে পারলে ঠিক চলে আসত। আমরা আড়ালে দাঁড়িয়ে গল্প করছি বলে ও আমাদের দেখতে পায়নি।'

পূর্ণ দু পা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দাঁড়া, ডাকি ওকে—'

পূর্ণ বলল, 'কি রে, চিনতে পারিস?'

টুনি চোখে খুশি নিয়ে একবার পূর্ণর দিকে তাকাল একবার প্রসূণের দিকে। তারপর হেসে বলল, 'প্রসূণদা না!'

'চিনতে পেরেছো!' প্রসূণও হাসল।

টুনি বলল, 'না পারার কি আছে, সেই একই রকম আছেন তো। পাতলা ছিপছিপে, লম্বা, চোখে চশমা, মাথায় বড় বড় এলোমেলো চুল আর—'

'আর? সেই রকমই কালো তো!'

টুনি মাথা নাড়িয়ে বলে, 'না না, আর সেই রকমই হাসি! মাঝখানে যে বারোটা বছর চলে গেছে মনেই হয় না দেখে, যেন কালকেও দেখেছি। সত্যি বলছি প্রসূণদা, কাল থেকে শুধু আপনার কথাই হচ্ছে, আপনার কথাই ভাবছি।'

'তাই নাকি।' প্রসূণ সিগারেটের টুকরোটা উঠোনের ধারে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, 'তুমি কিন্তু আগাগোড়া পালটে গেছ টুনি, পূর্ণ বলে না দিলে চেনাই মুশকিল হত।'

'পালটে গেছি! যাঃ, কে বলল পালটে গেছি? একটুও না।'

'সে তো তুমি বলবেই, তোমার চ্যালেনজ করা স্বভাব।'

'ই-স্!' টুনি ঠোঁট টিপে হাসে। কিছু বলতে যায়। পূর্ণ ওকে বাধা দেয়।

'এই টুনি, তোরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্ক করবি নাকি, ওকে ওপরে নিয়ে যা না। অনীশ কোথায় রে, ওরা সব?'

'সবাই বেড়াতে গেছে। পদ্মা দেখতে।'

'ফিরলে সবার সংগে আলাপ করিয়ে দিস ওর। বুঝলি প্রসূণ, সবাই তোর সম্পর্কে ইনটারেসটেড। কাগজে লিখিসটিখিস তো, তা ছাড়া ফরেন-টরেনেও ঘুরেছিস।'

'সব চেয়ে ইনটারেসটেড কিন্তু রীণা, পূর্ণদার শালী, তাই না পূর্ণদা! টুনি ঝির ঝির করে হাসে।

পূর্ণও হেসে সায় দেয়, 'ওসব পরে হবে! তুই বরং ওকে নিয়ে যা এখন, ঘরটা দেখিয়ে দে—খানিক বিশ্রাম-টিশ্রাম করুক। সবে জার্নি করে এসেছে, টায়ার্ড।'

যেতে যেতে প্রসূণ শুধোয়, 'অনীশ কে, টুনি?'

টুনি চকিতে ওর দিকে তাকায়, মুচকি হাসে, 'কে বলুন তো!'

'বুঝেছি!' একটু হেসে প্রসূণ প্রসঙ্গ পালটায়, 'আচ্ছা, পূর্ণটা কী বল তো, এতদিন বাদে এলাম, কোথায় দুটো কথাবার্তা বলব তা না নীচেই থেকে গেল। কী কাজ এত ওর?'

'কী কাজ মানে? আজ পূর্ণদার বিয়ের প্রীতিভোজ না, অনেক কাজ এখন পূর্ণদার, কতো দায়দায়িত্ব জানেন?'

প্রসূণ শুনল। কিছু বলল না।

কয়েক পা নিঃশব্দে এগিয়ে যায় টুনির পাশে পাশে। পরে কি ভেবে হাসির মুখ করে টুনির দিকে তাকায়, 'তা অবিশ্যি ঠিক, পূর্ণর দায়দায়িত্বজ্ঞানবোধটা বরাবরই কিছু বেশী। সেই ছাত্রজীবন থেকে দেখে আসছি। হস্টেলে আমরা একঘরে থাকতাম। নিজের পড়াশোনা ভালমন্দ ছাড়াও আমার সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার দায়িত্বটাও যেন ছিল ওর ঘাড়ে। পড়াশোনা থেকে শুরু করে সব ব্যাপারেই আমার ওপর গার্জেনি চালাত। আমি ওর নাম দিয়েছিলাম, পূর্ণজ্যাঠা!'

'ও মা, তাই বুঝি!' টুনি খিলখিল করে হাসে, 'কই এখানে তো বলতে শুনিনি।'

'তখন তো আমি ফ্রি—ছুটির মেজাজ। পূর্ণ ছিল আমার হস্টেলের গার্জেন। কিন্তু, তোমার অত দিনের কথা মনে আছে?'

'না থাকার কি আছে, বারো বছর এমন কি সময়।'

'সব কথা?'

'স-ব। কেন?'

প্রসূণ আনমনে নিঃশব্দে হাসে একটুখানি।

'আমি এখানে ক'দিন ছিলাম বল তো?'

'উ', দাঁড়ান বলছি—'

টুনি মনে মনে হিসেব করে, 'পুরো চারদিন, তাই না? ফিফথ ডে-তে চলে গেলেন। ফোর্থ ডে-তেই কিন্তু যাবার কথা ছিল আপনার, আমি আটকে দিই।' টুনি ফিক করে হাসে, 'আপনার একপাটি জুতো লুকিয়ে রেখেছিলাম। চোর কিন্তু ধরা পড়ল শেষ পর্যন্ত—আপনিই ধরলেন, মনে আছে? আপনার সে কী অনুনয় বিনয়—'টুনি, লক্ষ্মীটি, দিয়ে দাও। কোথায় নাকি ইন্টারভিউ ছিল আপনার কদিন বাদে, বাড়ি থেকে জরুরী চিঠি এসেছে—না গেলেই নয়। সবাই খুব বকতে লাগল আমাকে, এমন কি পূর্ণদাও। কি করব, বের করে দিলাম। নইলে কিন্তু কিছুতেই ছাড়তাম না।'

ঘটনাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি কিন্তু প্রসূণের মনে পড়েনি এতদিন। এ সব তুচ্ছ ঘটনা কে-ই মনে করে রাখে বেশি দিন ধরে, অজান্তে কখন হারিয়ে যায় মন থেকে। টুনি তাও মনে করে রেখেছে আশ্চর্য। প্রসূণ অবাক হয়ে তাকায় ওর দিকে, 'তোমার স্মরণশক্তি তো দারুণ, একটুও ভোলনি। আমি তো কবেই ভুলে গেছি। তুমি বললে, তাই।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে টুনি দাঁড়িয়ে পড়ে। পিছন ফিরে তাকিয়ে বলে, 'তাই বুঝি।' আবার উঠতে শুরু করে।

'রিয়্যালি বলছি। আমি ঠাট্টা করছি না।'

প্রসূণ দু ধাপ লাফিয়ে টুনির পাশে চলে যায়।

'বিশ্বাস কর—খুব শার্প মেমারি তোমার, টুনি। সকলের হয় না।'

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে খোলা বারান্দায় এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া লাগে। অঘ্রানের মাঝামাঝি। সন্ধ্যের হাওয়ায় সিরসির ঠান্ডার আমেজ। কপালের চুল উড়ছিল, হাত দিয়ে সরাতে সরাতে টুনি বলে, 'কি জানি, হতেও পারে।'

একটু থেমে আবার বলে, 'বেশী স্মরণশক্তি কিন্তু ভাল নয়, প্রসূণদা। কিছু কিছু ভুলে যাওয়া ভাল।'

'কেন?'

'অনেক দুঃখের ঘটনা মনকে কষ্ট দেয়। কিছুতেই তাড়ানো যায় না।'

'অনেক সুখের স্মৃতিও তো থাকে।'

'কি জানি।' আত্মমগ্ন হয়ে বলে টুনি, 'কোনটা যে সুখের স্মৃতি আর কোনটা দুঃখের, কে বলবে।'

'প্রসূণ রেলিঙের ধারে থামের আড়ালে গিয়ে সিগারেট ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'এই, তোমার মনে আছে—সেই সিগারেট খাওয়া।'

'কি?'

একটু থেমে মনে পড়তেই ফিক করে হেসে ফেলে টুনি, 'যাঃ। আবার ওই কথা। পূর্ণদাও কাল সকলের সামনে বলছিল।...সে কী বাবা। কাশতে কাশতে আমার প্রাণ যায় আর কি। আপনারও দেখছি মনে আছে ঘটনাটা।'

'মনে পড়ে গেল। ভাবতেই পারিনি যে কোনদিন মনে পড়বে। আসলে, এমন এক-একটা ঘটনা থাকে মানুষের জীবনে যা অন্য কোন সময় কিছুতেই মনে পড়ে না কিন্তু বিশেষ একটা সিচুয়েশনে বা বিশেষ কাউকে দেখলেই ঝটপট ছবির মত সব ভেসে ওঠে। এটাও সেই রকম, তোমাকে না দেখলে হয়তো—'

টুনি বাধা দিয়ে চাপা অভিমানের গলায় বলে, 'আপনি তো আমাকেও ভুলে গিয়েছিলেন প্রসূণদা, চিনতেই পারেননি।'

'তাই কি, হঠাৎ চিনতে না পারাটা কি ভুলে যাওয়া? তখন কত ছোট ছিলে বল তো, সেই ছিপছিপে পাতলা ফ্রকপরা ক্লাশ সেভেন কি এইটের ছাত্রী—'

'এই মোটেও না। সব ভুলে গেছেন। ক্লাশ নাইনের পরীক্ষা দিয়েছি সেবার, টেন-এ উঠব। রীতিমত শাড়ি পরি। মাঝে মধ্যে এক-আধবার করে ফ্রক পরেছি কি না পরেছি, আপনারা ধরে নিয়েছেন খুব ছেলেমানুষ—পাত্তা দিতে চাইতেন না, তাই না।'

'না না, তা হবে কেন।' প্রসূণ হাসে, 'তা হলে তো ধরো, বড় বড় মেমদেরও পাত্তা দেওয়া যায় না। আসলে, আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়তাম তো, আমি আর পূর্ণ, তাই মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ইউনিভার্সিটির নানা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতাম, এতেই তুমি রেগে যেতে।'

'আহা তাই বুঝি। আমি কাছে গেলেই তো আপনাদের সব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়ে যেত আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে, রাগ হবে না? শেষে মা-মাসীরা যখন বলত, ওকে নিয়েও একটু-আধটু বেড়াতে টেড়াতে যা তখন বাধ্য হয়ে—'

প্রসূণের ঝট্ করে মনে পড়ে যায় সুধামাসীর কথা।

'সুধামাসী কেমন আছেন টুনি, ভাল আছেন তো? এলেন না কেন?'

'মা এখন বড়দার কাছে, মাইশোরে। অতদূর থেকে আসা ঝামেলা দু-দিনের জন্যে। শরীরও খুব একটা ভাল যাচ্ছে না আজকাল মার। বয়সও তো হল।'

'সুধামাসীর বোধ হয় আমাকে আর মনে নেই। দেখলে চিনতেই পারবেন না।'

'কে বলল, তা হলে আমি চিনলাম কি করে?'

'তোমার চোখটা বোধ হয় বেশী তীক্ষ্ণ। কিংবা আন্দাজে।'

প্রসূণ হাসতে লাগল।

'আন্দাজে।' টুনি সরু চোখে তাকিয়ে বলে, 'বেশ বললেন যা হোক।'

প্রসূণ কোন উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যায়।

যেতে যেতে টুনিই আবার বলে, 'জানেন প্রসূণদা, মনে থাকা না-থাকাটা সম্পূর্ণ মনেরই ব্যাপার। জোর করে কাউকে মনে রাখা যায় না। ভোলাও যায় না।'

প্রসূণ প্রসঙ্গ পাল্টায়, 'সেবার আমার একটা আপসোস থেকে গিয়েছিল টুনি, মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। তোমাদের এখানে রেখে উনি যেন কি কাজে কলকাতা চলে যান, আমি থাকাকালীন আর ফিরলেন না, তার আগেই আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হয়। ইনটারভিউটা না থাকলে হয়তো দেখা হত। পূর্ণর কাছে শুনেছি খুব আমুদে লোক ছিলেন তিনি।'

'সেই আপনিও গেলেন আর বাবাও এল। বাবাও খুব আক্ষেপ করেছিল, 'ইস, ছেলেটিকে দেখা হল না।' টুনি ঠোঁট টিপে হাসে একটুখানি, 'জানেন, আপনি চলে গেলে বাড়িটা কী ভীষণ খাঁ-খাঁ করত। পূর্ণদাও তেমন হই চই করত না আর। তারপর আমরা এখানে আর দুদিন ছিলাম মাত্র। রাঁচীতে ফিরেও খুব খারাপ লাগত।'

'জান টুনি, এত জায়গা ঘুরলাম কিন্তু আজ পর্যন্ত রাঁচীটাই দেখা হল না। এবার যেতে হবে।'

'থাক, এতদিনেও যখন হয়নি তখন আর গিয়ে কাজ নেই। সেবার কত করে বলেছিলাম আপনার সময়ই হল না। এখন কার কাছে যাবেন, বাবা নেই, মা-ও দূরে—'

প্রসূণ চুপ করে থাকে। কিছু বলে না।

কিছু সময় চুপচাপ কাটিয়ে টুনি আবার বলে, 'বাবা মারা গিয়ে আমাদেরও শখ আহ্লাদ সব মিটে গেছে। বাবাই মাঝে মধ্যে মাকে আর আমাকে নিয়ে নানা জায়গায় বেরিয়ে পড়ত ছুটি-ছাটায়। এই তো দেখুন না, বাবা মারা যাওয়ার পর এই প্রথম আসছি পূর্ণদাদের এখানে। সেই যে গেছি তারপর আর আসাই হয়নি। এর মধ্যে দেখতে দেখতে বারোটা বছর কেটে গেছে। পূর্ণদার বিয়ে না হলে হয়তো আর আসাই হত না।'

'তোমরা কবে এসেছ এখানে?'

'কাল দুপুরে। এসেই পূর্ণদার কাছে শুনলাম আপনি আসবেন লিখেছেন, চিঠিও দেখলাম। কাল অনেক রাত অব্দি কেবল আপনার গল্পই করেছে পূর্ণদা। সককলের কাছে।'

'সককলের কাছে মানে—কার কার কাছে?'

'তেমন বাইরের কেউ না—আমাদের ভেতরেই, নিজেদের মধ্যে। বৌদি, মানে পূর্ণদার নতুন বউ আর ওর ভাই-বোনরা ছিল, আমি ছিলাম, আর—ও ছিল।'

'ও মানে—ওহো, বুঝেছি। পূর্ণ তো বলছিল তখন—অনীশ, অনীশই তো, আলাপ করিয়ে দেবে—না?'

'দেব। এখন না, পরে। ওরা তো বেড়াতে গেছে, পদ্মা দেখতে। বললাম তো তখন।'

'ও তাই তো, তুমি গেলে না? অবিশ্যি না গিয়ে ভালই করেছ, আমি একা একা বোর হতাম, পূর্ণ তো ব্যস্ত।'

'ওরা বলেছিল। আমিই যাইনি। আমার ওই ভীড় সঙ্গল ভাল লাগে না। আর, পদ্মা তো সেবার দেখেইছি, মনে নেই—সেই যে, আপনি আমি পূর্ণদা মা মাসী সবাই মিলে?'

প্রসূণ একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। পরে বলে, 'আচ্ছা টুনি, সেবার কি আমরা নদীর জল পর্যন্ত যেতে পেরেছিলাম? আমার যতদূর মনে পড়ছে, কেবল বালি আর বালি, চারিদিকে বিরাট বালির চড়া—সমুদ্রের মত। তুমি বোধ হয় ছুটতে শুরু করে দিলে বালির ওপর দিয়ে, দেখাদেখি পূর্ণ আর আমিও—সে কী মজা। ভুস ভুস করে কেবলই পায়ের তলা থেকে বালি সরে সরে যায় আর ধপাস ধপাস করে পড়ি আর ছুটি, পড়ি আর ছুটি, ছুটতে ছুটতে—'

'বেশ তো মনে আছে দেখছি। ছুটতে ছুটতে আমরা বহুদূর চলে

গিয়েছিলাম, বহু দূরে। মা মাসী তখন অনেক পেছনে, বালিয়াড়ির ওপর বসে পড়েছে। আমরা ফিরে আসতেই কী বকুনি, সন্ধ্যে হয়ে আসছে তোদের খেয়াল নেই, কাছেই বর্ডার—যদি ধরে নিয়ে যেত ওপারে। তো, আমরা অত দূরেও গিয়েও কিন্তু নদীর কাছে যেতে পারিনি, দূর থেকেই জল দেখেছিলাম। শীতের মুখ তখন, এই রকম অঘ্রান মাস, নদী দূরে সরে গেছে। বর্ষাকালে নাকি বালির চড়া-টরা সব জলে জলাকার হয়ে যায়, সবটাই তখন নদী, পদ্মা।'

'নদী সম্পর্কে তোমার অনেক কিছু জানা আছে দেখছি।' প্রসূণ হাসে।

'নদী সম্পর্কে নয়, পদ্মা সম্পর্কে। আপনার বুঝি মনে নেই সেই যে ফেরার পথে মাসী বলেছিল, ক-তো কথা। আগেকার দিনে বাপ-মা'রা নাকি সহজে পদ্মাপারে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে চাইত না—কেন বলুন তো কি কারণে, মনে আছে?'

প্রসূণ সে কথায় না গিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'টুনি, তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?'

প্রসূণের আচমকা প্রশ্নে টুনি থমকে যায়। কথায় কথায় অনেক বছর পিছনে চলে গিয়েছিল টুনি, প্রসূণ হঠাৎ ঝট্‌কা-টানে ওকে আবার চলতি সময়ের মধ্যে এনে ফেলবে তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। টুনি একটু থাতস্থ হয়ে নেয়। প্রসঙ্গটা এমন কিছু না, তবু, টুনির কেন জানি একটু লজ্জা লজ্জা করে। একটু ক্ষুন্নও হয় মনে মনে। ঠিক এভাবে প্রশ্ন করা যেন প্রসূণের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। সে অন্য ধরনের মানুষ, অনুভূতির সূক্ষ্মতায় আর পাঁচজনের থেকে আলাদা, এমন একটা স্থূল ব্যবহারিক প্রসঙ্গ তার মাথায় এল কি করে? টুনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নীচু সুরে বলে, জামসেদপুর—টাটা।'

'তাই নাকি। তা হলে তো বেশ কাছাকাছি বলতে হবে। জামসেদপুর টু রাঁচী—ইচ্ছে করলেই যখন খুশী বাপের বাড়ি বেড়িয়ে আসা যায়, কি বল?'

টুনি ঠোঁট ওলটায়, 'হুঁ, ইচ্ছে করলেই যেন সব কিছু হয়!'

'হয় না?' গলার স্বরে সামান্য ঠাট্টা মিশিয়ে প্রসূণ বলে, 'কেন, অনীশ বুঝি খুব পজেসিভ, সহজে মালিকানা ছাড়তে চায় না।'

কথাটা বলে টুনির দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে প্রসূণ, সামান্য হাসে, তারপর আবার বলে, 'তা অবিশ্যি দোষের কিছু না, এমন মালিকানা কে ছাড়তে চায় বলো?... বিয়ে হল ক বছর?'

টুনি মুখ নামিয়ে নেয়। একটু সময় ছেড়ে দিয়ে বলে, 'বছর দুই।'

'ইয়ে, মানে—বাচ্চ-কাচ্চা?'

টুনি আবার মুখ তোলে। প্রসূণের চোখে চোখ রেখে ভুরু কোঁচকায়, ঠোঁটে মিয়ান হাসি এনে বলে, 'না, কিছু না—আর কিছু জানার নেই, প্রসূণদা?'

'রাগ করছো! অনেক দিন পর চেনা-জানা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে সব কিছু জানতে ইচ্ছে করে যে। অবিশ্যি, তুমি বলেই জিজ্ঞেস করছি।.... তোমার ইয়ে, মানে—অনীশবাবু কোন ডিপার্টমেন্টে—'

ধরে ...য়ে দিয়ে মাঝখান থেকে বলে ওঠে, 'আপনার ...ই মাত্র দেখা, তাই না? ধরুন, আর যদি কখনো ...এই জানার ইচ্ছেগুলো কোথায় থাকত, প্রসূণদা?'

...না। নিঃশব্দে ঠোঁটে হাসি রাখল। পরে বলল, 'দেখ ...মানুষের প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের ওপর বোধ হয় অনেক কিছু ...জানি, হয়তো ভুলও বলতে পারি, সবটাই তো মনের ব্যাপার। তে. ...স হয়?'

...র?' টুনি রেলিঙের গায়ে আদরের মত করে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, 'কি জানি ভেবে দেখিনি। আপনার মত লেখক-কবি তো নই, সাধারণ মানুষ, মানুষের মনের ওপর অত গভীর জ্ঞানও নেই আমার।'

প্রসূণ হাসে। হাসতে হাসতে বলে, 'আরে এতে গভীর জ্ঞান-ট্যানের কি আছে, সব মানুষেরই তো একটা করে মন আছে, তোমারও আছে, সেটার খবর তো রাখ, নাকি তাও রাখ না।' প্রসূণ আরও একটু জোরে হেসে ওঠে।

টুনির চঞ্চল হাত নিমেষের জন্য থমকে দাঁড়ায়। ঠোঁট কামড়ে ধরে। আস্তে করে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে, 'প্রসূণদা, এ সব প্রসঙ্গ এখন থাক। অনেক দিন পর দেখা, কী হবে এত সব গুরুগম্ভীর কথায় সময় নষ্ট করে। বেশ তো সাদামাটা কথা হচ্ছিল হোক না। কি যেন জানতে চাচ্ছিলেন, ও হ্যাঁ, ও কি করে—এই তো?' একটু থেমে হেসে বলে, 'কারখানার বড় মিস্তিরি, মানে—ফোরম্যান। শুনলেন তো?'

'ফোরম্যান! সে তো চাট্টিখানি কথা নয়, দারুণ ব্যাপার।'

'তাই বুঝি?' টুনি ঠোঁট টেপে, 'হ্যাঁ তা বটে, দারুণ ব্যাপার। অনেক টাকা। এ-হাতে ও-হাতে।' বলতে বলতে খিল খিল করে ওঠে, 'যাঃ, সব ফাঁস করে দিলাম যে, ঘরের কথা। ভুলেই গেছি আপনি তো আবার খবরের কাগজে লেখেন-টেখেন। কি একটা বড় চাকরি ছেড়ে দিয়ে নাকি পুরোপুরি জার্নালিস্ট হয়ে গেছেন।'

'কে বলল, পূর্ণ নিশ্চয়। পূর্ণ ছাড়া আর কে বলবে।'

'বললাম তো, কাল সারাক্ষণ পূর্ণদা কেবল আপনার গল্পই করেছে। মাঝে ক' বছর বিদেশে ছিলেন তাও বলেছে। দেশ-বিদেশ ঘুরেটুরে ইণ্ডিয়ায় ফিরে সাহেব কোম্পানীতে বড় চাকরিতে ঢুকলেন। কয়েক বছর চাকরি করে শেষে মাথায় কি খেয়াল চাপল অত বড় কাজটা ছেড়ে দিয়ে খবরের কাগজে কাজ নিলেন। আপনি নাকি বরাবরই এই রকম, একসেনট্রিক টাইপের। যখন যা খুশি তাই করে বেড়ান—সত্যি?'

'তাই নাকি? পূর্ণ বলছিল?' প্রসূণ হাসে হা হা করে, 'পূর্ণটা যেন কি।'

হাসি থামলে বলে, 'তবে এইটেই আমার ঠিক লাইন, বুঝলে টুনি, এই জার্নালিজম। এত দিন বে-লাইনে চলছিলাম, আর এগুনো গেল না, সরে এলাম। জীবনটা তো টাকা কামানোর যন্ত্র নয় কেবল, জীবনটা জীবন। যতদিন আছে তাকে বাঁধন-ছাঁদন না দিয়ে যেমন চায় তেমনি করে চলতে দাও, অন্তত আমি তাই বুঝি।'

টুনি স্থির দাঁড়িয়ে থাকে, দু হাতে রেলিঙ ধরে, সামান্য মাথা নুইয়ে।

নীচের বিরাট উঠোনের খানিকটা জায়গা ঘিরে চাঁদোয়া ঢাকা। লোকজন এসে বসবে সেখানে। অনেকে এসেও পড়েছে। একটু বাদে চক-মেলানো বারান্দায় খাওয়া দাওয়া শুরু হবে। আয়োজন প্রায় শেষ, হঠাৎ আলো নিবে যায়। চারদিকে অন্ধকার নেমে আসে। লোকজন হইহই করে ওঠে।

প্রসূণ পাশে দাঁড়ানো টুনির দিকে তাকায়। আবছা ছায়ামূর্তির মত টুনি স্থির দাঁড়িয়ে। অঘ্রানের শীত-ধরানো হাওয়া বয়ে আসছে মাঝে মাঝে। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকে। প্রসূণ হাত দুখানা আড়াআড়ি বুকের কাছে রেখে শক্ত করে নিজের দুই কাঁধ চেপে ধরে ঠান্ডা তাড়ায়। দূরে দৃষ্টি ফেলে কুয়াশা-মাখা ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় আলো-ফোটা আকাশ দেখে। শুক্লপক্ষের কোনও তিথি-টিথি হবে আজ, তৃতীয়া কি চতুর্থী। চাঁদের আলোর এমনিতেই ধার কম তাতে কুয়াশা। তবু বারান্দা পেরিয়ে বড় দালানের ছাদে গেলে সেই প্রচ্ছন্ন জ্যোৎস্নাটুকুও পাওয়া যায়, আলো নিবে যাওয়ার চাপ বাঁধা জমাট অন্ধকার এখানে। নীচে পূর্ণর গলা পাওয়া যায়, কাকে যেন জেনারেটর চালাতে বলছে। আলোর এই অসুবিধের কথা ভেবেই পূর্ণ আগে থেকে জেনরেটারের ব্যবস্থা রেখেছে। তখন বলছিল।

পূর্ণ সব ব্যাপারেই বেশ হিসবী ভেবেচিন্তে কাজ করে। বিয়েও করল নাকি অনেক দেখে শুনে যাচাই করে। প্রসূণ হাসে মনে মনে।

একটা পেট্রোম্যাকস এসে পড়ে নীচের উঠোনে। অন্ধকার একটু হালকা হয়ে আসে, কাটে না।

প্রসূণ সিগারেট ধরায়। গ্যাসের আলোতে টুনির মুখের একটা পাশ কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভেসে উঠে আবার হারিয়ে যায়।

ঘোলাটে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রসূণের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায়, বলে, 'আচ্ছা টুনি, সেদিনও এই রকম হালকা জ্যোৎস্না ছিল বোধ হয়, তাই না? অথচ বাগানের একেকটা জায়গায় বড় বড় গাছপালার নীচে কী ঘুটঘুটে অন্ধকার, বাব্বা! মনে পড়ে, সেই যে, ভূত সেজেছিল পূর্ণ?'

'হুঁ'।

'তুমি চ্যালেনজ করেছিলে তুমি নাকি কিছুতেই ভয় পাও না। ভূত-টুত

সব মিথ্যে।' হেসে ওঠে প্রসূণ, 'মিথ্যে হোক আর সত্যি হোক শেষ পর্যন্ত সেই ভূত দেখেই কেঁপে-টেপে অস্থির—কাল এ সব গল্প করেনি পূর্ণ ?'

'করেছিল।'

'পূর্ণ তা হলে কিছু বাদ রাখেনি।'

জেনারেটারের শব্দ পাওয়া যায়। আলো জ্বলে ওঠে। চারিদিক আবার ঝলমলে আলোয় ভরে যায়।

টুনি হাঁফ ছেড়ে বলে, 'বাঁচা গেল। এতক্ষণ যেন দম আটকে আসছিল।'

'অন্ধকারে তোমার দম আটকায় ?'

'হ্যাঁ, ভীষণ বাজে লাগে, অস্বস্তি হয়।'

'ভাগ্যি তা হলে জেনারেটার ভাড়া করেছিল পূর্ণ, হিসেবী লোক, নইলে, কী যে হত।'

প্রসূণের গলার সূক্ষ্ম রসটুকু আলগোছে ঠোঁটে তুলে নেয় টুনি, 'কী আবার হত! বড়জোর দমটুকু আটকে যেত—বেঁচে যেতাম।'

'এত তাড়াতাড়ি ? জীবন তো এখনো পড়েই আছে।'

'আমার জীবন তো আপনার মত না, যেমন খুশি বাঁধন-ছাদন খোলা। পড়ে থাকলেই বা কি।'

প্রসূণ হাসে, 'তা হলে তোমার জীবনটা কি রকম, পোশাকী বেনারসী শাড়ির মতন—খুব দামী আর ঝলমলে, ইচ্ছে মতন পরে থাকা যায় না ?'

টুনি উত্তর করে না। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বলে, 'ওই ওরা আসছে বোধ হয়, গলা পাচ্ছি। চলুন, ঘরে নিয়ে যাই আপনাকে। এতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছি দেখলে পূর্ণদা আমাকেই বকবে। আপনার যে বিশ্রামের দরকার ভুলেই গেছি।'

'কিছু দরকার নেই। এই তো বেশ আছি। ওরা আসুক না, আলাপ করা যাবে ?'

'সে হবেখন পরে। ওরা পালিয়ে যাচ্ছে না। চলুন, ঘরে স্যুটকেশটাও তো রাখতে হবে।'

প্রসূণ হাসে, 'দূর, তোমরা কী বলতো, এক রাতের জন্যে আবার ঘর-ফর, সকালে উঠেই তো চলে যাব। রাত্তিরটা দিব্যি আড্ডা মেরে গল্প-টল্প করেই কাটিয়ে দেওয়া যায়, যায় না ? তুমি আছ, পূর্ণ আছে—'

'সকলেরই ঘর আছে, কার সঙ্গে জাগবেন ? তাছাড়া পূর্ণদার তো আজ ফুলশয্যা, জানেন না ?'

'তাই নাকি! পূর্ণ তো তখন বলল না।'

পূর্ণদের বাড়ীটা সেই আগের মতই আছে। পুরনো জমিদারদের বাড়ী যেমন হয়, টানা লম্বা বারান্দা চারধারে, বড় বড় থাম, সারি সারি ঘর, এত যে লোক তবু মনেই হয় না এত লোক, এত বড় বাড়ী।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে প্রসূণ বলে, 'এসব বাড়ী আজকাল মেনটেইন করা চাট্টিখানি কথা নয়। এ দিকটা তো দেখছি চূণবালি খসে টসে প্রায় জরা জীর্ণ হতে চলেছে। কেউ থাকে না বোধ হয় আর, কেমন ফাঁকা ফাঁকা!'

ঘরে এসে প্রসূণ খাটের এক ধারে বসে হাঁটুর ওপর পা তুলে নিয়ে জুতোর ফিতে খুলতে থাকে।

টুনি সামনের টেবিলে চামড়ার স্যুটকেশটা রেখে দেয়। বারান্দা দিয়ে আসবার সময় প্রসূণকে ও কিছুতেই আর ওটা নিতে দেয়নি, নিজেই বয়ে নিয়ে এসেছে।

'আপনি গরম কিছু আনেননি, প্রসূণদা ? ওই একটা হাফ সোয়েটার ? এখানে কিন্তু বেশী রাত্রের দিকে আরো ঠাণ্ডা পড়বে, কাল দেখেছি।' স্যুটকেশ রেখে টুনি বলে।

'আছে, ওই স্যুটকেসে।' পকেট থেকে চাবির রিং বের করে দেয় প্রসূণ 'এই নাও, চাবিটা নিয়ে খোলো তো।'

টুনি চাবি হাতে করে কয়েক সেকেণ্ড থাকে, প্রসূণকে দেখে। প্রসূণ মুখ নীচু করে জুতো খুলতে খুলতে বলে, 'এইসব বাড়ী ঘর দোর বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে পূর্ণটা আর কোনদিনই বাইরে বেরোতে পারল না। বন্ধন!'

টুনি স্যুটকেশের ডালা তুলে কোটটা বার করে নিয়ে চাবি লাগাতে লাগাতে বলে, সবাই কি সবকিছু পারে, প্রসূণদা। ছেলেবেলায় অনেকেই তো অনেক-কিছু ভাবে, বলে কয়, পরে কেমন ওলট-পালট হয়ে যায়।' টুনি একটু থেমে ঝির ঝির করে হেসে নেয়, 'সেই যে—স্কুলে রচনা লিখতে দেয় না—'তোমার জীবনের লক্ষ্য' কতজন কতরকম লেখে। ডাক্তার, ইনজিনিয়ার থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক কবি দার্শনিক—মন্ত্রীটন্ত্রীও বাদ যায় না!'

'শেষ পর্যন্ত আর কিছুই হয়ে ওঠা যায় না, তাই না ?' হেসে ওঠে প্রসূণ। পরে হাসির রেশ মিহি করে নিয়ে বলে, 'আমি তো সেইজন্যে জীবনের কোন লক্ষ্যই ঠিক করিনি কোনদিন। আপসে আপ ছেড়ে দিয়েছি লাইফটাকে, স্রোতের টানে যেমন নৌকো ভেসে যায়। জানি তো বাপু যা খুশি তাই হওয়া যায় না, অন্তত আমাদের এদেশে। পরে অবাঞ্ছিত অতৃপ্তির অভিজ্ঞতাই আমাকে আমার লাইনে এনে ফেলেছে। অনেকের হয়তো তাও হয় না।'

'পূর্ণদার জীবনের কি লক্ষ্য ছিল ? আপনার তো অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ; জানার কথা।'

টুনি ওর শাড়ীর আঁচল দিয়ে প্রসূণের কোট ঝাড়ে হালকা হাতে।

'জানি না, প্রফেসারী না টিচারী, না ফুড সাপ্লাই ইনসপেকটর। আগের দুটো তো শুনেছি দু'তিন মাস করে ছেড়ে দেয়, শেষেরটায় টিকে গেল। চিঠিও লেখে আজকাল কখনো সখনো তাতে যেটুকু বুঝতে পারি, ভালই আছে পূর্ণ

চাকরি-বাকরি নিয়ে। এবার সংসারীও হল।... পূর্ণ বলত কি জান! কি জানি, সেটাই ওর অল্প বয়সের জীবনের লক্ষ্য ছিল কিনা। বলত, লাইফে কোনদিন বিয়ে করব না শালা, বাবা মরলেই বিষয় সম্পত্তি সব গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিয়ে ডিক্লাশড্ হয়ে যাব।...মানুষ কতো কি ভাবে।'

টুনি মুখে আঁচল চেপে হাসে। প্রসূণকে কোটটা দিয়ে দেয়, বলে, 'পরে নিন, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

প্রসূণ কথার ঝোঁকে ছিল। বলে, 'থাক পরে পরব। ঘরে তেমন ঠাণ্ডা নেই এখন।'

'বলছি পরে নিন। কথা শুনতে হয়।'

'বাব্বা!'

প্রসূণ আর আপত্তি না করে কোটটা গলিয়ে নিতে নিতে হাসে, 'বেশ তো গিন্নী-বান্নি হয়ে গেছ দেখছি—অর্ডার চালাচ্ছো!'

টুনি হাসে না। একটু দূরে গিয়ে আঁচল দিয়ে আলমারির কাঁচ মুছতে মুছতে বলে, 'হ্যাঁ। না হয়ে উপায় কি।'

তারপর জানলার কাছে সরে যায়, ছিটকিনি খুলে দিয়ে আবার লাগিয়ে দেয়। টুকিটাকি কয়েকটা অকারণের কাজে এলোমেলোভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'আপনার তো অর্ডার করার কেউ নেই—আনবেন না ?'

একটু থেমে সরু চোখে তাকায়, 'নাকি—এটাও বন্ধন ?'

প্রসূণ সহসা হাসতে গিয়ে হাসির মুখ করে থমকে যায়। দু মুহূর্ত নিঃশব্দে যেতে দিয়ে সামান্য হালকা গলায় শুধোয়, 'পূর্ণ বুঝি তাও বলেছে ?'

টুনি এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ায় সামান্য ঘাড় হেলিয়ে। হাত দুখানা পিছনে রাখায় ওর উদ্ধত যুবতী শরীর থমকানো জিজ্ঞাসার মত দেখায়। মুখে কিছু বলে না, চোখে জানিয়ে দেয়, হ্যাঁ।

প্রসূণ একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে ভ্রূকুটি করে, 'পূর্ণ সব বলেছে —স-ব ?'

'বলেছি তো, পূর্ণদা আপনার কোন কথা বাকি রাখেনি।'

'কিন্তু, পূর্ণ তো সবকিছু জানে না টুনি—বল, জানে ?'

টুনি প্রথমটা না বোঝার মত করে তাকায়, পরক্ষণেই সহসা চমকে যায়। প্রসূণের চোখে চোখ রাখে। ছায়াচ্ছন্ন শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে প্রসূণ। টুনিও স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে, চোখ নামায়। কথা আসে না সহসা। আড়ষ্ট দাঁড়িয়ে থেকে দুপাশে ক্ষীণভাবে মাথা নাড়ে একটুখানি ; ঈষৎ ঠোঁট কেঁপে যায়।

'তুমি বন্ধনের কথা কি যেন বলছিলে তখন ?'

প্রসূণ ঘরের থমথমে পরিবেশে স্বাভাবিক হাওয়া এনে দেবার চেষ্টা করে, 'না, আমার সেরকম কোন সন্ন্যাসী-সুলভ আধ্যাত্মিক জীবন দর্শন নেই টুনি, ছিল না কোনকালে। পূর্ণর ব্যাপারে ঠাট্টা করেছিলাম মাত্র। জীবন তো জীবনের মতই চলবে তাকে জোর করে অস্বীকার করে লাভ কি। কটা বাঁধন কাটা যায় বল, খুঁজে পেতে দেখতে গেলে সেখানে ছোট বড় হাজার রকমের গিঁট, হাজার বন্ধন।'

টুনি যেমন ছিল আচ্ছন্নের মত তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু বলে না।

বারান্দায় অনেকগুলো পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। পূর্ণ প্রসূণের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আসছে।

টুনি আচ্ছন্নতা ভেঙে জেগে ওঠে, 'ওই ওরা আসছে। প্রসূণদা, আপনার তো একটুও বিশ্রাম হল না।'

'তাতে কি।'

প্রসূণ জুতো পরে নেয় আবার; দু হাতের চেটো আলতো করে মাথায় বুলিয়ে নিতে নিতে বলে, 'চল।'

টুনি বলে, 'আপনারা যান। আমি পরে যাচ্ছি।'

ওরা চলে গেলে টুনি বারান্দার রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। একা দাঁড়িয়ে থাকে।

পূর্ণ হাঁকডাক করে বাড়ীর লোকজনদের নিয়ে খেতে বসার আয়োজন করছিল।

টুনি বারান্দার আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে নীচের আলোকিত উঠোন, বারান্দা, লোকজনদের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। বাইরের লোকজন এখন আর নেই বললেই চলে, যারা আছে তারা নিজেদের মধ্যেই ধরা যায়; আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আর পরিবেষ্টার দল। পূর্ণকে এখন সামান্য পরিশ্রান্ত দেখালেও খুশি মনে আজকের শেষ দায়িত্বটুকু পালন করে যাচ্ছে। আজ ওর ফুলশয্যা! টুনির ঠোঁটে এক চিলতে হাসি দেখা দেয়, আবার ধীরে ধীরে মুছেও যায়।

এই পূর্ণই একদিন ভূত সেজেছিল!....

টুনি ওর সঙ্গে তর্ক করে সাহস দেখাবার জন্য খিড়কি দরজা খুলে একা একা বাগানের ধারে চলে গিয়েছিল। বাড়ীতে মা মাসীরা তখন কেউ ছিল না, সাহাবাদ না শ্রীমন্তপুরে কোথায় যেন কীর্তন শুনতে গিয়েছিল, ফিরতে অনেক রাত। থাকলে নিশ্চয় যেতে দিত না।

প্রসূণও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, টুনি একা একা ওই বাগানের অন্ধকারে সত্যি চলে যেতে পারবে। পরে ওকে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে দেখে পিছন থেকে ওর হাতটা ধরে ফেলেছিল প্রসূণ; বলেছিল, 'এই টুনি, পাগলামি হচ্ছে নাকি। একা একা এখন বাগানের মধ্যে গেলে কত বিপদ হতে পারে, ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পার খেয়াল আছে? ছেলেমানুষী করো না।'

টুনি শাড়ীর আঁচলটাকে শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে হিলহিলে শরীর ঘুরিয়ে বলেছিল, 'আমি গেঁয়ো ভূত নাকি যে ভূত দেখে ভয় পাব?'

পূর্ণ হেসেছিল, ছেড়ে দে না প্রসূন, দেখাই যাক না ওর বাহাদুরী। দুপা গিয়েই তো আবার ফিরে আসবে!'

'মোটেও না। এই তো নিয়ে যাচ্ছি রুমালটা, পুঁতে রেখে আসব। সকালে গিয়ে দেখে নিও।'

টুনি হালকা-পায়ে ছুটতে ছুটতে ক্ষীণ জ্যোৎস্না-ফোটা অঘ্রানী কুয়াশায় মিশে গিয়েছিল।

'টুনি! এই টুনি-ই!' প্রসূণ ডাকছিল দূর থেকে।

টুনি একবারও দাঁড়ায়নি, ছুটতে ছুটতে বলেছিল, 'আসবেন না প্রসূণদা, একদম না—'

প্রসূণ তাও শোনেনি। এসেছিল। টুনি জানতেও পারেনি।

জানল যখন, তখন ও কাঁপছে।....

জঙ্গলের মধ্যে জ্যোৎস্নার পাতলা সরটুকু সব জায়গায় ছিল না। কোথাও জমাট অন্ধকার কোথাও ঘন ঝোপের আড়ালে জোনাক-লাগা সাদা কুয়াশার কুণ্ডলী ভেসে বেড়াচ্ছিল। ঝিঁঝিঁ ডেকে যাচ্ছিল সারাক্ষণ। একজোড়া কুতকুতে জ্বলন্ত চোখ একবার ঝোপের ফাঁকে ভেসে উঠেই আবার হারিয়ে গেল। ঠিক তখনই দূরে আর একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সেই জিনিসটা, সাদাটে শরীর, মানুষ না কিন্তু যেন মানুষের মত, দুহাত আকাশের দিকে তুলে নাচের ভঙ্গীতে তালে তালে দুলতে দুলতে কাছে আসতে লাগল....

চীৎকার করে উঠেছিল কি টুনি....হ্যাঁ, চীৎকার করেছিল মনে আছে কিন্তু গলায় শুধু একটা অস্পষ্ট গোঙানি ছাড়া ভাষা ছিল না। পা টলছিল। সারা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন অপার্থিব এক ভয়ের শিহরণ ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাঁচার কোন পথ নেই, কোথাও আশার আলো নেই, নিটুট অন্ধকার মৃত্যুর মত ঝুলে রয়েছে চারিদিকে।

সহসা, টুনির যেন মনে হল, সেই শ্মশানের নির্জনতায় চকিতে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওর বুকের অভ্যন্তরে, 'টুনি, মাই চাইলড—'

বহুদূর থেকে ভেসে আসছে যেন ফাদার যোশেফের কণ্ঠস্বর। রাঁচীর আদিবাসী সাঁওতাল আর মুণ্ডা ক্রীশ্চান ছেলেমেয়েদের কাছে যিনি বাইবেলের গল্প বলেন, যীশুর অত্যাশ্চর্য মহিমার কথা বর্ণনা করেন, ব্যাপটিস্ট চার্চের দেওয়ালে দেওয়ালে যাঁর কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়, 'যীশুই সর্বজীবের পরিত্রাতা। তিনি সর্বত্র সমস্ত মানুষের দুঃখ কষ্ট যাতনা ভয়ভ্রান্তির—'

'যীশু, যীশু, যীশু!'

চোখ বন্ধ করে কাঁপতে কাঁপতে অস্ফুট উচ্চারণ করে ওঠে টুনি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, দুহাত বাড়িয়ে ওকে যেন কে টেনে নেয়।

'কে?' আঁৎকে ওঠে টুনি।

'আমি। আমি প্রসূণ। টুনি, তুমি ভয় পেয়েছো?'

'প্রসূণদা!'

দুহাত দিয়ে প্রাণপণে ওকে আঁকড়ে ধরে টুনি। থর থর করে কাঁপে।

'কাঁপছো কেন, ও তো পূর্ণ, গায়ে সাদা কাপড় জড়িয়ে দুষ্টুমি করছিল। তুমি সত্যি করে ভয় পেয়েছো বুঝতে পেরে এখন ও নিজেই ভয় পেয়ে ছুট দিয়েছে বাড়ীর দিকে, কাপড়-টাপড় খুলতে। মাসীমারা জানতে পারলে কিন্তু এক চোট বকুনি খাবে আজ পূর্ণ।'

'আপনি কোথায় ছিলেন, প্রসূণদা।'

প্রসূণের বুকে মুখ গুঁজে অস্ফুট করে জিজ্ঞেস করে টুনি।

'ঠিক তোমার পেছনেই।'

'কেন?'

'যদি তুমি ভয় পাও।'

টুনি আর কিছু বলতে পারেনি। একটা উদ্‌গত কান্না এসে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রসূণের উষ্ণ বুকে।

বোবা হয়ে প্রসূণ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বুঝতে পারে না কী করা উচিত। পরে বুকে লেপটে-থাকা টুনির পিঠে হাত রেখে বলে, 'দূর বোকা মেয়ে, কাঁদছো কেন? আচ্ছা ছেলেমানুষ তো—ভয় যেন কেউ পায় না! চল, বাড়ী চল।'

টুনি মুখ তোলে না। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'না না—'

'না না মানে, যাবে না? এই বনে জঙ্গলে থেকে যাবে?' হাসে প্রসূণ। দুমুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলে, 'সত্যি যাবে না?'

টুনি তবু কিছু বলে না।

'ঠিক আছে থাকো তাহলে। আমি গিয়ে বরং বাড়ী থেকে তোমার লেপ তোশক এনে দিই, কেমন?'

টুনির কান্নার রেশ কমে এসেছিল, এবার খুক করে হাসে একটুখানি। প্রসূণের বুকে আলতো-নখে চিমটি বসিয়ে দিয়ে বলে, 'অসভ্য কোথাকার!'

'এই তো বেশ নর্মাল হয়ে গেছ দেখছি, বাঁধা বুলিগুলো বেরিয়ে আসছে। এবার তা হলে ফেরা যাক, বেশ? দেখি, কান্না-টান্না আর নেই তো চোখে?'

টুনির মুখখানা দুহাতে তুলে ধরে প্রসূণ আবছা চাঁদনীর আলোয় মেলে ধরে।

'বাঃ! কাঁদলেও তো তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায়।'

দুহাতের ঝটকা মেরে প্রসূণের হাত সরিয়ে দেয় টুনি। এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'মিথ্যে কথা। সুন্দর না ছাই।'

তারপর পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করে।

'কি হল, এই টুনি, আশ্চর্য তো! দাঁড়াও, আবার যাচ্ছ একা একা। সাহস থাকা ভাল কিন্তু দুঃসাহস ভাল নয়, টুনি কষ্টটা তো তুমিই পেলে—'

পূর্ণ কি জানে সে কথা? না জানে না, প্রসূণ ওকে বলেনি। বললে পূর্ণ হয়তো আভাসও জানাত কোন-না কোনদিন চিঠি লিখে। কেন বলল না প্রসূণ কেন, কী ভেবে?....

আজ যদি আবার ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে না যেত তা হলে তো টুনি জানতেও পারত না কোনদিন ওর সেই প্রথম আবেগের কম্পনটুকু প্রসূণ আজও মনে রেখে দিয়েছে।

পূর্ণ ডাকছিল নীচের বারান্দা থেকে। টুনি উত্তর করে না। একাকী নিরালায় আত্মমগ্ন হয়ে ভাবে....

প্রসূণ তখন বলছিল, জীবন তো জীবনের মতই চলবে তাকে জোর করে অস্বীকার করে লাভ কি....হয়তো কিন্তু জীবন কি এইরকম, শুধু গ্লানিময়, অযথা কিছু অন্তঃসারশূন্যতা দিয়ে ঠাসা? আগে কখনো এমন করে ভেবে দেখেনি টুনি, আজ প্রসূণের এই কথার পর সহসা একটি ভাবনার অঙ্কুর জীবনের মূলটুকু ধরে টান দিয়েছে যেন; বস্তুত, জীবন আসলে কী? শুধুই কি তাড়া তাড়া নোটের বিনিময় মূল্যে বিলিয়ে যাওয়া একটি স্থূল অস্তিত্ব? শুধুই কি অর্থহীন খানিকটা স্ফূর্তির সুখে রক্তে উত্তেজনা ঢেলে নিয়ে বেহুঁস বিভোর এক তরল ক্লীবত্ব? এবং, প্রেমের মাধুর্যে নয়, কেবল অতৃপ্ত জৈব কামনায় কাতর হয়ে নিয়ত নগ্নতার কাছে নগ্নতাকে সমর্পণ করার মত এক ঘৃণ্য পশুত্ব? না আরো কিছু—অন্য কিছু? অন্য কোনও গভীর [illegible] মূল ভূমি থেকে লালিত হয়ে উঠে আসে এই জীবন—জীবনের নিগূঢ় [illegible] হয়ে, এবং ক্রমশ তা পল্লবিত হয়, হয়েই যায়—আ-মৃত্যু।

টুনি থামের গায়ে মাথা রেখে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ নিজের মনের দ্বন্দ্বে নিজেই চমকিত হয়, কেঁপে ওঠে ভেতরে ভেতরে।

নীচের থেকে পূর্ণরা ডাকছিল বার বার। টুনির গলা দিয়ে স্বর ফোটে না। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনটাকে হঠাৎ আজ শূন্যের ওপর দাঁড় করানো ছক-কাটা প্রাসাদ বলে মনে হয় ওর, যার কোন ভিত নেই, ফাঁকা, ওপরের কাঠামোটার সঙ্গে চাসাকরভাবে সঙ্গতিহীন। প্রসূণ এসে না পড়লে এই ফাঁকিটুকু হয়ত সারাজীবন অনাবিষ্কৃত থেকে যেত, চোরা অসুখের মত। হয়তো সে-ই ভাল ছিল....কেন এল সে আজ?

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ। টুনি ফিরে তাকায়।

অস্পষ্ট অনুভূতিতে বুক কেঁপে ওঠে, প্রসূণ উঠে এসেছে ওপরে।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে হাসছে সে, 'এত করে ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না, কি ব্যাপার বলতো? আসবে না?' প্রসূণ বলছিল।

টুনি দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, প্রসূণকে জিজ্ঞেস করবে কি, কেন এতদিন পরে আবার ঝড় হয়ে এল সে?...কেন?

কিন্তু পারল না। বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রসূণ আবার বলে উঠল, 'না এলে অবিশ্যি বলার কিছু নেই। এখন তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, জোর করে ধরে নিয়ে যাব না সেই বাগানের মত। আমি শুধু জানতে এলাম—'

টুনি চমকে চোখ তুলে তাকায়। একটু দূরে প্রসূণ ওর জন্য অপেক্ষা করছে, বাকিটুকু কি ওকেই এগিয়ে যেতে হবে?

দ্বিধা সংকোচ ভয় বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে টুনি স্মিত হেসে অস্ফুট করে বলে, 'যাচ্ছি।'

কেউ শুনতে পায় না। শুধু প্রসূণ শোনে।

স্টার ফুটবলারদের ঔজ্জ্বল্য কেন ম্লান

ফুটবলপ্রেমী নিত্যদিনের এক ময়দানযাত্রী বেশ উষ্মা নিয়ে বললেন—"কথাটা এবার ফিরিয়ে নিন।"

"কোন কথাটা ?"

"আপনি দেশ পত্রিকায় লিখেছিলেন না, ফুটবল এবার ভাল জমবে। এই কি ভাল জমার নমুনা ? আগে কী ফুটবল দেখেছি, আর এখন কী দেখছি।"

ভদ্রলোককে বললাম হ্যাঁ লিখেছিলাম, ফুটবল এবার ভাল জমবে। তার সঙ্গে যোগও করেছিলাম, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হবে। সেটা কি হচ্ছে না ? সিনিয়র ডিভিসনের ছোট দলগুলি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বলেই তো নামী দলগুলির খেলা আপনাদের চোখে লাগছে না। আপনারা চান মাখনের মধ্য দিয়ে ছুরি চালাবার মত আপনাদের প্রিয় দলের ফরোয়ার্ডরা প্রতিপক্ষ ডিফেন্সের মধ্য দিয়ে ঢুকে গিয়ে গোলের পর গোল করবে আর আপনারা আনন্দে হাততালি দেবেন।

বহুকাল ময়দানের রোদ-জলে পোড় খাওয়া খেলা-পাগল ভদ্রলোক বললেন—না, আমরা তা চাই না। অবশ্যই চাই আমার দল জিতুক কিন্তু সেই সঙ্গে চাই ভাল খেলা দেখতে। ভাল মুভমেন্ট হবে, গোলে হবে জোরালো শট, গোলকিপার অবধারিত গোল বাঁচিয়ে দেবে, আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ছন্দে খেলা জমে উঠবে তবেই না খেলা দেখে সুখ। সেই খেলা দেখতেই তো এত কষ্ট করে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বাসে-ট্রামে বাদুড়ঝোলা হয়ে মাঠে আসি। কিন্তু কী দেখছি ? মশাই, মাঠে আসছি পঁয়তাল্লিশ বছরের উপর। আপনারও তো বহু বছর হয়ে গেল। সত্যি করে বলুন তো এ বছরের মতো এমন নিকৃষ্ট-মানের ফুটবল আর দেখেছেন কি ?

এ বছরের ফুটবল খেলা নিয়ে ভদ্রলোকের যখন এই আক্ষেপ তখন বড় দলগুলির গোটা পাঁচেক করে খেলা হয়ে গেছে। মাঝারি ও ছোট দলগুলি খেলেছে সাত-আটটি করে ম্যাচ। সত্যিই ক্রীড়া-সৌকর্যে কোনো দলই তখন পর্যন্ত দর্শকদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেনি। সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী করে দল গড়েও মহামেডান স্পোর্টিং প্রথম ম্যাচে গত বছরের লীগে কুড়িতম স্থানাধিকারী ক্যালকাটা জিমখানার কাছে একটি পয়েন্ট হারিয়ে কোনোভাবে পরের ম্যাচগুলি জিতেছে। স্টার স্টাডেড ইস্টবেঙ্গল প্রথম ম্যাচে হিমসিম খেয়েছে পুলিশ দলকে হারাতে যে পুলিশ দল গত বছর দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যাবার অমর্যাদা থেকে বেঁচে গিয়েছিল, বাটা স্পোর্টস ক্লাবের চেয়ে মাত্র এক পয়েন্ট বেশি সংগ্রহ করে। পরিকল্পনাহীন খাপছাড়া অসংলগ্ন ফুটবলে ইস্ট-বেঙ্গল পরের ম্যাচগুলিতেও তাদের বিপুল দর্শক সমর্থককে খুশি করতে পারেনি, গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানও কি প্রথমদিকে ভাল খেলতে পেরেছে ? লক্ষ্যছাড়া উদ্দেশ্যহীন ফুটবলে মোহন-বাগানও সমর্থককুলকে নিরাশ করেছে। ভ্রাতৃসংঘের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচে মালুম হয়নি যে গতবারের লীগের উনিশতম স্থানাধিকারীর সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন দল খেলছে। তিন প্রধানের পরে সাম্প্রতিককালের শক্তিশালী দল জর্জ টেলিগ্রাফ। গতবার লীগে পেয়েছিল চতুর্থ স্থান। শক্তিশালী দল বলেই এ মরসুমে জর্জ টেলিগ্রাফকে প্রথম প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার সম্মান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রথম সাতটি ম্যাচে সংগ্রহ করে মাত্র ৬ পয়েন্ট, তিনটিতে হেরে গিয়ে এবং চারটি ম্যাচ ড্র করে। মোটের উপর ব্যক্তিগতভাবে দু-চারজন খেলোয়াড় দক্ষতার

প্রথমদিকের খেলাগুলিতে দর্শক মনে ছাপ আঁকতে পারেনি।

অথচ একাধিক কারণে এ বছরের ফুটবলে শুরু থেকেই উচুমানের খেলার প্রত্যাশা ছিল। প্রথম কারণ, ভিন রাজ্য থেকে যত স্টার ফুটবলার এবার কলকাতায় এসেছেন কোনোবার এত ফুটবলার আসেননি। দ্বিতীয় কারণ, এই স্টার ফুটবলারদের বেশির ভাগই কলকাতায় ৭৮-এর গোড়ায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবলে উন্নতমানের খেলায় দর্শকদের মন মাতিয়ে গিয়েছিলেন। কয়েকজনের কথা বলছি। ধরুন পাঞ্জাবের হরজিন্দার সিং ও গুরদেব সিং। হরজিন্দার সত্যিকারের শিল্পী ফুটবলার। খেলার মধ্যেও বুদ্ধির সংমিশ্রণ। গুরদেবের খেলায় সিংহ বিক্রম দেখেছি বাংলারই বিরুদ্ধে। জাতীয় ফুটবলে পাঞ্জাব দলে না খেললেও মনজিত সিংয়ের দক্ষতা নৈপুণ্য এবং শুটিং-শক্তি সর্বজনবিদিত। ফুটবলের রাজা পেলের কাছ থেকে তালিম নেওয়া নাইজিরিয়ার ডেভিড উইলিয়াম ছিলেন তামিলনাড়ু দলের সবচেয়ে ট্যালেণ্টেড স্টার। দারুণ খেলে গিয়েছিলেন সন্তোষ ট্রফিতে। সমান দক্ষতায় সুনাম অর্জন করেছিলেন কেরালার নাজিব ও পায়াস। ওই রাজ্যের প্রেমনাথ ফিলিপ, কর্ণাটকের টমাস ম্যাথুজ ও দেবরাজ নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার হিসাবেই দর্শকদের দৃষ্টি কেড়েছিলেন। কলকাতার নামী খেলোয়াড়দের ঝাঁকে এদের সমাবেশ স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলের রমরমা আসরের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল। অনেকে এমনও আশা করেছিলেন, ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ড-লাইন বিখ্যাত ভেঙ্কটেশ-আপ্পারাও-ধনরাজ-আমেদ-সালের ক্রীড়াদ্যুতি দেখাতে পারবে। কিন্তু সেই রঙীন আশার বেলুনটা চুপসে যেতেই দর্শকদের হতাশা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এক সদস্য তো সংবাদ-পত্রে চিঠি লিখে বলেছেন—ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, আমেদ, সালের মনমাতানো খেলা দেখেই তিনি ইস্টবেঙ্গলের প্রেমে পড়েছিলেন। সেই অনুরাগ বিরাগে পরিণত হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের এখনকার খেলা দেখে।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অতীতে মহমেডান স্পোর্টিং ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ক্লাবের গৌরব অধ্যায়েও ছোট দলগুলি এদের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম করেছে। খেলায় জিতে মাঝেসাজে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর জার্সির রংও সাময়িকভাবে ফিকে করে দিয়েছে। কেননা এই বড় তিনটি দলের সঙ্গে খেলাকে কেন্দ্র করেই ছোট দলগুলির যা কিছু উৎসাহ এবং প্রেরণা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বড় ক্লাবগুলির পর্যাপ্ত প্রাধান্য এবং ক্রীড়াকীর্তির ভাবমূর্তিতে টান পড়েনি।

ফরোয়ার্ডদের খেলার কথা বলছি। ৩৪ থেকে ৩৮ পর্যন্ত পরপর পাঁচ বছর মহমেডান স্পোর্টিংয়ের যে দল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় সেই দলের পুরোভাগের পাঁচ তারকা ছিলেন ছোট নুর মহম্মদ, রহিম, রসিদ, রহমৎ ও আব্বাস। খেলার মধ্যে যেন ফুটে উঠত পাঁচ তারে বাঁধা সুললিত সিম্ফনির আমেজ। দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। পঞ্চাশের দশকে একই ধরনের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে 'প্যাডাস'-এর পায়ে পায়ে। 'প্যাডাস' কথাটির সৃষ্টি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের পাঁচ ফরোয়ার্ডের নামের ইংরেজী আদ্যাক্ষর নিয়ে। অর্থাৎ পদ্মোত্তম ভেঙ্কটেশের 'পি' আপ্পারাওয়ের 'এ', ধনরাজের 'ডি', আমেদের 'এ' এবং সালের 'এস' নিয়ে "PADAS"।

মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইস্টবেঙ্গলের ওই সময়ের ফরোয়ার্ড লাইনের মত কোনোদিন দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে না পারলেও বিক্ষিপ্ত সময়ে মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডদের খেলাও দর্শকদের মন মাতিয়েছে। যে বছর (১৯৪০) আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহন-বাগান অপ্রত্যাশিতভাবে ১—৪ গোলে হেরে যায় এরিয়ানের কাছে সে বছরও মানা গুঁই ল্যাংচা মিত্র, এ রায়চৌধুরী, অমিয় ভট্টাচার্য ও নির্মল মুখার্জিকে নিয়ে মোহনবাগানের ফরোয়ার্ড লাইন ছিল খুবই ভাল। হার জিত বা গোল করে জিতে যাওয়াই বড় কথা নয়, খেলা দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেওয়া বড় ফুটবলারের প্রথম শর্ত। সেদিক দিয়ে মরসুমের প্রথমদিকে ব্যর্থ হয়েছেন বড় দলগুলির বড় বড় খেলোয়াড়রা। শুধু বাইরের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতাই নয় আমাদের লোকাল স্টাররাও কি উজ্জ্বল হতে পেরেছেন? কোনো সন্দেহ নেই, সুরজিত সেনগুপ্ত অসাধারণ ট্যালেণ্টেড ফুটবলার এবং ভারতের এক নম্বর উইংগার। সেই সুরজিত প্রথমদিকে কি ভাল খেলতে পেরেছেন? মোটেও নয়। সামগ্রিকভাবে ইস্টবেঙ্গলই বা কী খেলেছে? গতবারের লীগে ১৪টি দলের পরে স্থান পাওয়া টালীগঞ্জ অগ্রগামীর সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের খেলার শেষে ইস্টবেঙ্গলেরই এক অতীত নায়ক বলে উঠলেন, লাল-হলুদ জার্সিগুলি টালীগঞ্জ অগ্রগামীর ছেলেদের গায়ে চাপিয়ে দিলেই ভাল হত। ওই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল খারাপ খেলে জিতে গেছে বললে ঠিক হবে না। বলা উচিত পরিকল্পনা মাফিক অনেক ভাল খেলে হেরে গেছে টালীগঞ্জ।

এখন প্রশ্ন নামী দামী স্কিলফুল ট্যালেণ্টেড স্টারদের কেন এই ব্যর্থতা? আমার ধারণা, ছোট দলগুলির মরিয়া সংগ্রামই বড় দলগুলির সহজাত নৈপুণ্য প্রকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খেললে তার ফল কি হতে পারে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি পেলের কসমস ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগানের এবং শীল্ডে গতবার রাশিয়ার আরারাত ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ও মোহন-বাগানের খেলায়। ছোট ক্লাবগুলিতে এখন প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়ের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক বেশি। অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং কোচিংয়ের ফলে তাদের দক্ষতাও দিন দিন বাড়ছে। শুধু অভাব সমর্থকের। তিন প্রধানের পেছনে যে বিপুল জনসমর্থন তার আংশিক সমর্থন পেলে এদের পক্ষে খেলার ফলাফলে অঘটন ঘটানো অসম্ভব নয়। তাই বলব প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র ক্রমেই প্রশস্ত হচ্ছে। আর যেখানে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানে স্কিলফুল খেলোয়াড়ের পক্ষেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা শক্ত।

মুকুল

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

গদ্য কবিতা ও তার বিবর্তন : রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরসূরিগণ। সুশীলকুমার গুপ্ত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৭০০০০৬। মূল্য ২৫/০০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার চারখানি বই 'পুনশ্চ' 'শেষ সপ্তক', 'শ্যামলী' 'পত্রপুট' ১৯৩২-১৯৩৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত। গদ্যছন্দ, গদ্য-কবিতা বিষয়ে কবি অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। 'লিপিকা'য় (১৯২২) তার প্রকাশ ছিল। কিন্তু ১৯৩২-এর কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার যথার্থ সূত্রপাত। রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহের এই পালাবদল কোন্ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কারণে ঘটল সে কৌতূহল পাঠকমাত্রেরই আছে, সুশীলবাবু সে সময়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের রূপরেখার পরিচয় দিয়ে আমাদের কৌতূহল তৃপ্ত করতে অগ্রসর হয়েছেন তাঁর 'গদ্য-কবিতা ও রবীন্দ্রকাব্যের পালাবদল' প্রবন্ধে। কল্লোল-কালিকলম গোষ্ঠী যে অস্থিরতায় পথ সন্ধান করছিলেন অথবা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে বৈফল্যে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন সে-সব কথা উক্ত প্রবন্ধে শ্রীগুপ্ত সন্নিবেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এসব উত্তেজনা এবং অস্থিরতায় বিচলিত বোধ করছিলেন নিশ্চয়ই। পাশ্চাত্য সমকালীন কাব্য সম্বন্ধেও তিনি ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন এই সময়ে। সুশীলবাবু খুব সংক্ষেপে সে-কথা গদ্য কবিতার রূপ ও রীতিতে সে পর্বের কিছু ইতিহাস বিস্তৃত হয়ে আছে। সুশীলবাবু খুব সংক্ষেপে সে কথা বলেছেন।

'গদ্য-কবিতার স্বরূপ' অধ্যায়ে শ্রীগুপ্ত রবীন্দ্রবচন উদ্ধার করেছেন বারংবার। রবীন্দ্রনাথের গদ্য এবং পদ্যরচনা থেকে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে সুশীলবাবু গদ্য-কবিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এই অধ্যায়টিতে পুনবার রবীন্দ্রনাথ পড়ার স্বাদ পাওয়া গেল। একই বিষয় এবং একই ভাবনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্য দুই-ই লিখেছেন। ভাষা, উপমাও উভয় ক্ষেত্রে প্রায় এক। যদি গদ্য-কবিতা পদ্য সমিল কবিতা থেকে আলাদা হয়, তবে এ কি করে সম্ভব? রবীন্দ্রনাথের রচনায় এ সম্ভাব্যতা কতটা হাস্য এবং মনোহর হয়েছে—এ সম্বন্ধে গভীর আলোচনার অবকাশ ছিল। সে আলোচনার সূত্রপাত আছে মাত্র এই অধ্যায়ে।

'গদ্য-কবিতার ছন্দ' অধ্যায়ে সুশীলবাবু বিশ্ব-সাহিত্যে গদ্যকবিতার লেখকবৃন্দের কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে ছন্দ-প্রকরণ বুঝিয়েছেন। ফরাসী, জর্মন ইত্যাদি ভাষার কবিতার চেহারা দেখলাম। এ-ভাষা সকলে জানেন না। এই সব কবিতার ছন্দ-বিশ্লেষণও তিনি করেন নি। অনেক সময় ছান্দসিক পাঠকের বিচারের উপর নির্ভর করেছেন লেখক। ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাস প্রদানও অযথা জায়গা জুড়েছে। মুষ্টিমেয় পাঠকের কাছে এই জাতীয় বিবরণের সার্থকতা থাকতে পারে। বাংলা কবিতায় ছন্দ-মুক্তির ইতিহাসও এ-গ্রন্থে অনেকটা স্থান পেয়েছে। বিশেষত গদ্য-ছন্দের বিবর্তন দেখাতে লেখক উৎসাহ বোধ করেছেন। কিন্তু এই আলোচনাও অভিনবত্বহীন এবং ইতিপূর্বে কেউ কেউ মোটামুটি এভাবেই বিবর্তনের রেখাটি স্পষ্ট করেছিলেন। হুইটম্যানের কবিতার ছন্দ-বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথ হুইটম্যানের কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন। গদ্য-কবিতা রচনায় হুইটম্যানের ছন্দ-চর্চা তাঁর কতটা সহায়ক হয়েছিল এই বিচার আমরা চাই। বলা বাহুল্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের দ্বারা সে বিচারকর্ম হয় না। 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা' অধ্যায় চারটি গদ্য-কবিতাগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার সার সংকলন করেছেন সুশীলবাবু। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতার সঙ্গে গদ্য কবিতার ভাবনার যোগ দেখিয়েছেন লেখক। 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির সঙ্গে টি এস এলিয়টের 'Journey of the Magi' কবিতার সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। এ অধ্যায়টি রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্ত করবে। রবীন্দ্রনাথ গদ্য-কবিতায় কত বিচিত্র বিষয় গ্রহণ করেছিলেন তার একটা পরিচয় এখানে লভ্য। সব বিষয়ই গদ্য-কবিতার উপযুক্ত কিনা এ প্রশ্নের সমাধান থাকলে রচনাটি সারগর্ভ হতে পারত। গদ্য-কবিতার শিল্পসৌন্দর্য বিচারে সুশীলবাবু ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র অনুযায়ী শব্দালংকার ও অর্থালংকারের কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। আধুনিক শিল্পচর্চাকে অনুসরণ করে কবিতার 'ইমেজ' বিষয়ে তত্ত্ব আলোচনা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সুশীলবাবু গদ্য-কবিতায় এগুলিকে ভাবরূপচিত্র আখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা থেকে বিস্তর উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। ইংরেজ কবি ওয়েন এবং এলিঅটের প্রতিমান রবীন্দ্রকাব্যে অনুকৃত হয়েছে এরকম অনুমান শ্রীগুপ্ত করেন। কিছু সাদৃশ্য তিনি দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যে এগুলি আকস্মিক, না কবির সচেতন অনুকরণ এই আলোচনা থেকে তা বোঝা গেল না। 'গদ্য-কবিতার প্রকৃতি ও কলাকৃতি' অধ্যায়ে 'রিদ্‌মিক প্রেজ'-এর সন্ধানে সুশীলবাবু উৎসাহী হয়েছেন। অন্য অধ্যায়ে ব্রাউনিং-এর স্প্রাং রিদমের প্রসঙ্গ আলোচনাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু এসব আলোচনা মূল আলোচনার সঙ্গে আলগাভাবে যুক্ত। আমরা হঠাৎ অন্য দ্বীপে চলে যাই। এই দ্বীপান্তর বাস খুব সুখকর নয়।

এ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরীদের গদ্য-কবিতার চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। কিছু সুন্দর বিশ্লেষণ আছে। চমৎকার উদাহরণও আছে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্য, গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য গ্রন্থটির মর্যাদা বাড়িয়েছে।

হিমালয়ের পথে ভিলাংগনা ও পাঁওয়ালী কান্থা। সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৬। মূল্য সাড়ে বারো টাকা।

সৌম্যেন্দ্রবাবু সাহিত্যরসিক ব্যক্তি। সংগীতবিদ্যায়ও যে তিনি অভিজ্ঞ কিছুদিন আগে তাঁর একটি বইয়ে সেকথা জানতে পারি। ফটোগ্রাফি তাঁর নেশা। হিমালয় ভ্রমণও সৌম্যেন্দ্রবাবুর নেশা। অনেকদিন ধরেই তিনি হিমালয় ভ্রমণ করছেন। এবারে তিনি ভ্রমণকথা লিখলেন। ভ্রমণকর্ম আর রচনাকর্ম এক নয়। সৌম্যেন্দ্রবাবু তাঁর লেখায় ভ্রমণের আনন্দ পাঠককে দিতে পেরেছেন। তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ঘোরার তৃপ্তি পাঠকও খানিকটা পেয়ে যান। লেখায় সজীবতা এবং আন্তরিকতা আছে বলেই সৌম্যেন্দ্রবাবুর ভ্রমণকাহিনী এমন নির্ভেজাল এবং অকৃত্রিম। বাংলায় লেখা কিছু ভ্রমণকাহিনী নগদ বিদায়ের প্রত্যাশায় পাঠককে শৌখিন মজদুরি দিয়ে ভুলিয়েছে। সৌম্যেন্দ্রবাবুর লেখা সে জাতের নয়।

সৌম্যেন্দ্রবাবু হিমালয় ভ্রমণের একটি দুরূহ পথ বেছে নিয়েছিলেন। সে পথে ভ্রমণপিপাসুদের যাতায়াত কম। এই দুরূহ পথকে অপথও বলা যায়। অসলে সেখানেই ভ্রমণকারীর আনন্দ সঞ্চিত হয়ে আছে। হিমালয়ের পথে পথে সৌন্দর্য, মাধুর্য আবার পদে পদে বিপদ ও ভয়াবহতা। দেখা এবং অনুভব করার নেশা এঁদের উত্তেজিত করে। লেখক বেছে নিয়েছিলেন ভিলাংগনা যা ভিল গংগার উৎসমুখে যাবার পথ। খাটলিং হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়েছে ভিলাংগনা। গাড়োয়ালের পথে কিছুটা বাস এবং জিপে গিয়ে বাকিটা হাঁটাপথে সেখানে পৌঁছান যায়। সেই সংগে পাঁওয়ালী কান্থা অঞ্চলটিও লেখক ঘুরে এসেছেন।

চড়াই উৎরাই ভাঙার কাহিনী সৌম্যেন্দ্রবাবু বিস্তৃত করেননি। কেননা, পাহাড়ের পথের এসব বর্ণনা সব বইতেই পাওয়া যাবে। সৌম্যেন্দ্রবাবু টেহরি, দেওট, ঘুট্টু, গাংগি ইত্যাদি অঞ্চলে যে সব পাহাড়ী মানুষের আতিথেয়তা, সহৃদয়তা এবং সহানুভূতি পেয়েছিলেন তাদের কথা বেশী করে বলেছেন। পার্বত্য গদ্দি এবং হুজার সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বিস্তৃত করেছেন। এবং সেখানকার সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। কুলি এবং পথপ্রদর্শকদের বিভ্রাট এবং তাদেরই কথায় প্রায় উন্মত্ত প্রান্তরে রাত্রিবাসের যে ভয়াবহ বর্ণনা এ গ্রন্থে পাই তাতেই বুঝতে পারি উজ্জ্বল স্বাস্থ্য এবং দুর্মর মানসিক ইচ্ছা না থাকলে যথার্থ হিমালয়ভ্রমণ সম্ভব নয়। সৌম্যেন্দ্রবাবুর ভ্রমণকাহিনী বারংবার উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনীর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। খাটলিং হিমবাহ থেকে পাঁওয়ালী কান্থায় লেখক গিয়েছিলেন সে অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যদর্শনে। বিদেশীরা এই অঞ্চলকে বলেছেন স্বপ্নরাজ্য। অজস্র রঙবেরঙের ফুলের শোভা এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। এর প্রকৃতি অকৃপণ হলে দেখা যায় কেদারনাথ, কামেট, শতোপন্থ ইত্যাদি গিরিশৃঙ্গ। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় প্রকৃতির এই সৌন্দর্য যতটুকু দেখতে পেয়েছিলেন তাতেই মুগ্ধ হয়েছেন। পাঠকের চলিষ্ণু

মনকে উৎসুক করেও দিয়েছেন। হিমালয়কে সৌম্যানন্দবাবু ভালোবেসেছেন এবং এখানে তিনি বিরাটের উপলব্ধি করেছেন। ভারতবর্ষের মর্ম তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে এইখানে এসে।

গ্রন্থটিতে লেখকের নিজের তোলা কয়েকটি অনবদ্য ফটো সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কারণে এ রচনাকর্মের মূল্য আরও বেড়ে গিয়েছে।

বিজিতকুমার দত্ত

অমরাবতী আসাম। শংকু মহারাজ। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। আঠার টাকা।

বাংলা ভাষায় ভ্রমণকাহিনীর রচয়িতা হিসেবে শংকু মহারাজের যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থেও তিনি নতুন করে আমাদের সেই প্রত্যাশার পূর্তি ঘটিয়েছেন। ১৯৭৬ সালে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জোড়হাট শাখার অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে জোড়হাট শিবসাগর ডিব্রুগড় গৌহাটি কামাখ্যা ইত্যাদি স্থান দর্শন করে কলকাতায় ফিরে আসেন। অভিজ্ঞতা হিসেবে এই ভ্রমণ নিশ্চয়ই খুব সুদীর্ঘ নয়। তবে, এই স্বল্পাবকাশের মধ্যেই লেখক মোটামুটিভাবে আসাম সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে একটি পরিচ্ছন্ন ব্যাপকতার স্তরে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন। সন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেই জানেন দেশ-পরিচয় দিতে গিয়ে শঙ্কু মহারাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনায়াসভঙ্গীতে একটি ভূখণ্ডের অনুপুঙ্খ পরিচয়কে কত জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আসামের সাংস্কৃতিক জীবন, সাহিত্য-প্রয়াস, পুরাকাহিনী, ইতিহাস, ধর্ম, নিসর্গপরিবেশ, অরণ্যপ্রকৃতি, স্থান-বিশেষের বৈশিষ্ট্য, পথপরিচয়, মন্দির-পুরাকীর্তি সমীক্ষা, লোকসংস্কৃতি, আতিথ্যপরায়ণতা, বিশিষ্ট মানুষের পরিচয়—এক কথায় কোন প্রসঙ্গই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকে নি। 'অমরাবতী আসাম'-এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে—গ্রন্থটিতে আসামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার টুকরো টুকরো স্মৃতিকে লেখক অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ফলে, অভিজ্ঞতার উষ্ণতায় গ্রন্থটি আদ্যন্ত গতিশীল। প্রচ্ছদ শোভন এই গ্রন্থের অন্তর্গত আলোকচিত্রগুলিও পাঠকের প্রশংসা কুড়োবে।

প্রণয় সেন

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

বিনোদবিহারীর প্রদর্শনী

বহুদিন পর কলকাতার শিল্পামোদীদের শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কিছু শিল্পকর্ম দেখবার সৌভাগ্য হল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করবার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ। রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস তাঁদের সংগৃহীত বিনোদবিহারীর চব্বিশটি নানা ধরনের চিত্র নিচের প্রদর্শনী গৃহে দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন ১ মে থেকে। চিত্রগুলির ২টি শ্রীমতী রাণু মুখার্জী অ্যাকাডেমীকে উপহার দিয়েছেন। বাকীগুলির ২০টি দিয়েছেন বিনোদবিহারীর উপযুক্ত ছাত্র শ্রীঋতেন্দ্র মজুমদার, ১টি স্বর্গতা সুচেতা কৃপালনী এবং ১টি দিয়েছেন শ্রীমতী সুধারানী দাস।

ভারতবর্ষের শিল্পকলা নিয়ে যাঁরা গভীরভাবে চর্চা করেন তাঁদের কাছে শিল্পী বিনোদবিহারীর নতুন করে পরিচয় দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজকের যুগের নবীন শিল্পীদের বা শিল্পরসপিপাসুদের বোধ হয় তাঁর এবং তাঁর কাজ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা এবং চর্চার প্রয়োজন হয়েছে।

দীর্ঘ চারদশক ধরে আমাদের দেশের শিল্প প্রচেষ্টা মোটামুটি পশ্চিম ইউরোপের আধুনিক শিল্প আন্দোলনের পেছন পেছন চলে আজ হঠাৎ দ্বিধাভরে থমকে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমী আন্দোলনের মোড় নিচ্ছে বিমূর্ত শিল্প থেকে নানা ধরনের বাস্তবানুগ রূপ-রেখার পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকে।

গত কদশকে এদেশে প্রতিষ্ঠাবান আধুনিক শিল্পীদের কিছু পশ্চিমী আন্দোলনের সঙ্গেই মোড় নিচ্ছেন—কিন্তু বহু শিল্পীই আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক নতুন শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলেছি যাঁরা পশ্চিমী প্রভাবের বাইরে নিজস্ব আধুনিকতার খোঁজেও সচেষ্ট রয়েছেন। স্বাধীনতার পর স্বদেশী আন্দোলনের ইউরোপ বিমুখ মনোভাব থেকে সদ্যমুক্ত শিল্পীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে পশ্চিমী শিল্প প্রভাবকে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ এতোদিন পর বিশেষ করে নতুন শিল্পীরা সে মোহ থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসে আধুনিকতার নিজস্ব ভূমি খুঁজছেন। বিনোদবিহারীর কাজ তাঁদের একটা পথের ইশারা দেবে।

শিল্পী বিনোদবিহারী বেশীর ভাগ কাজ করেছেন স্বাধীনতা পূর্ব যুগে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের তৈরী পরিবেশে শিক্ষা পেয়ে, কলাভবনের অপূর্ব গ্রন্থাগারটি গড়ে তুলে এবং দেশবিদেশের বহু জ্ঞানীগুণী ও শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে (যা সে যুগে শান্তিনিকেতনেই সম্ভব ছিল), তাঁর অসাধারণ শিল্পবোধ সমস্ত গণ্ডিবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। সৃষ্টিশীল আবেগ, বিচারবুদ্ধি এবং মেধার এরকম অপূর্ব সমন্বয় খুবই কচিৎ দেখা যায়।

এ কথা আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে ভারতবর্ষে যুদ্ধ পূর্ব-যুগেই এই বাংলা দেশে শান্তিনিকেতনের পরিবেশে বসে—ইউরোপের প্রত্যেকটি আধুনিক শিল্প আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন (যা তখন দেশের খুব অল্প শিল্পীই ছিলেন) বিনোদবিহারী পশ্চিমী আন্দোলনের সঙ্গে সম্বন্ধহীন সার্থক 'ভারতীয়' আধুনিক শিল্প সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তারপর বেশীর ভাগ শক্তিশালী ও প্রতিভাবান শিল্পীরাই ইউরোপীয় আধুনিকতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই রসের নদী পার হবার চেষ্টা করেছেন। অজানা স্রোত বা চোরাবালির ভয়ে নিজস্ব রাস্তা খোঁজবার চেষ্টাই করেননি। দু'চারজন যাঁরা করেছেন তাঁরা ধন্য। চোরাবালি বা স্রোতে আটকে গেলেও তাঁরা পরের যাত্রীদের জন্য কিছু নিরিখ রেখে যেতে পারছেন।

রবীন্দ্রনাথকে না ধরলে বিনোদবিহারী বোধহয় এখন পর্যন্ত একমাত্র চিত্রশিল্পী যাঁকে রসোত্তীর্ণ আধুনিক ভারতীয় শিল্পী বলা যায়। তাঁর কাজের আঙ্গিক সম্পূর্ণ নিজস্ব—

এবং যা পূর্বেই বলেছি—সৃষ্টিশীল আবেগ, বিচারবুদ্ধি ও মেধার সমন্বয়ের প্রকাশ। তিনি কখনও কোন ঘরানা তৈরী করতে চাননি এবং সেটি সৃজনক্ষমভাবে সম্ভব নয়। যখন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অধ্যাপক ছিলেন, ছাত্রদের মনের দরজা জানলাগুলি যথাসাধ্য খুলে দিতে চেষ্টা করতেন, সাহায্য করতেন তাদের হাতকে আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত করে দিতে এবং চোখের দৃষ্টি খুলে দিতে চেষ্টা করতেন যাতে ধার করা চোখে দেখতে না হয়। এখনকার নবীন শিল্পীরা এবং প্রবীণেরাও যাঁরা পশ্চিমী সংস্কৃতির চাপ থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছেন তাঁরা বিনোদবিহারীর কাজগুলি ভাল করে দেখলে এবং তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে চর্চা করলে উপকৃত হবেন বলে মনে হয়।

প্রদর্শনীতে সবকটি কাজই উচ্চ স্তরের শিল্পকর্ম। একটি সংগ্রহ হিসাবে বিনোদবিহারীর কাজের অসাধারণত্বের কিছু আভাস দেয়। কিন্তু প্রদর্শনীটি দেখবার পর শিল্পী ও রসজ্ঞ দর্শকদের মনে তাঁর আরও কাজ দেখবার জন্য আগ্রহ দেখা দেবে।

শান্তিনিকেতন কলাভবনে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্পকর্মগুলি রাখবার জন্য একটি সংগ্রহশালা তৈরী হয়েছে। যতদূর জানি সেখানে এখনও তাঁদের কাজ জনসাধারণের জন্য সাজান যায়নি। যখন সাজান যাবে—অল্প কটি কাজই সেখানে একসঙ্গে দেখান সম্ভব হবে। বিনোদবিহারীর কাজ দেখাবার কোন গ্যালারী বা সংগ্রহশালা কোথাও হয়েছে বলে জানি না। বিনোদবিহারী শিল্পীর শিল্পী। কলকাতা শহরে দশহাজারের উপর শিল্পীর বাস শুনেছি। বিনোদবিহারীর সর্বপ্রকার কাজের একটি ব্যাপক সংগ্রহ এই শহরে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে যত্নের সঙ্গে প্রদর্শন করা উচিত।

শহরের সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নতির সহায়ক হওয়া ছাড়াও তার কাজের প্রদর্শনী পশ্চিমবঙ্গে সুস্থ শিল্পী আন্দোলনেও সহায়ক হবে।

অ্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে বিনোদবিহারীর দুই যুগের করা দুটি তেল রং-এর ছবি আছে। যাদের আঙ্গিক তাঁর নিজস্ব। অপেক্ষাকৃত পূর্বের কাজ একটি দৃশ্যচিত্র—বাস্তব এবং দু'ধারে গাছপালাময় শান্তিনিকেতনের দৃশ্য। নানা ধরনের বাদামী, ধূসর এবং সবুজের ঐকতান। তথাকথিত বাস্তবানুগ ছবি মোটেই নয়। কিন্তু দর্শক যেন ঐ রাস্তা দিয়ে গাছপালার রূপ, গন্ধ, স্পর্শ অনুভব করতে করতে চলছেন মনে হবে। অন্যটি শাল-বিক্রিওলার দোকানের চিত্র। ৪৮ সালে আঁকা। তিনটি মানুষ ও শাল নিয়ে অনবদ্য রচনা। রেখা, আকার, রূপ ও রং-এর ছন্দময় পরিবেষণ। রেশমের কাপড়ের উপর আঁকা টেম্পারা রঙের 'পদ্ম' নিচু সুরে বাঁধা রং-এর সাবলীল আকারের ছোপের উপর অসাধারণ মুন্সীয়ানার ক্যালিগ্রাফিক রেখার কাজ যা আমাদের দেশে একমাত্র বিনোদবাবুর পক্ষেই করা সম্ভব। টেম্পারা রং-এ আঁকা সাঁওতালদের ছবিটি একেবারে অন্য আঙ্গিকে আঁকা। সমতল পটভূমির উপর কয়েকটি ভাগে সাঁওতালদের একটি মণ্ডলী, গাছপালা ও বাড়িঘরের পরিবেশ ছন্দোবদ্ধভাবে উপস্থাপন করে সাঁওতাল জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। কাঠখোদাই থেকে ছাপা-চিত্রগুলি প্রায় সবই ১৯৪৮ সালে করা। প্রত্যেকটিই রসোত্তীর্ণ কাজ। শিল্পীর নিজস্ব দৃঢ় এবং জোরালো আঙ্গিকে কাটা। এগুলির ভিতর বিশেষ করে মনে থাকে ছাগল, শুয়োর, কুকুর এবং কাঠখোদাইএর ছাপার কাজে মগ্ন বালিকার ছাপাচিত্রগুলি।

শিল্পীর ইদানীংকালের কাজ একটি ড্রইং এই প্রদর্শনীতে আছে। অতি সুন্দর ক্যালিগ্রাফিক লাইনের কাজ। লাল ও বাদামী ফেল্ট কলমে আঁকা।

প্রদর্শনীটি কতদিন চলবে কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাগজপত্রে তার কোনও হদিস পাওয়া গেল না। নিচের প্রদর্শনী গৃহ থেকে সরান হলেও ছবিগুলি অ্যাকাডেমিতেই থাকবে। কর্তৃপক্ষ আশাকরি ছবিগুলি উপরের স্থায়ী প্রদর্শনশালায় রাখবেন। শিল্পীবন্ধুদের, বিশেষ করে নবীন শিল্পীরা, যাঁরা শিল্পী বিনোদবিহারীর কাজ দেখেননি তাঁদের অনুরোধ করবো তাঁর এই সংগৃহীত ছবিগুলি দেখতে।

প্রবাল সেন

জলরঙের বিশাল প্রদর্শনী

বিড়লা অ্যাকাডেমী-তে, চুয়াত্তর জন শিল্পীর জলরঙের ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেলো। প্রত্যেক শিল্পীর একটি

রূপে ছবি টাঙানো হয়েছে (সম্ভবত স্থানাভাবে)। সুতরাং সর্বমোট চুয়াত্তরটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে আকাডেমী-তে। বিখ্যাত প্রবীণ শিল্পী থেকে শুরু ক'রে নবীনতম শিল্পী, সবাই স্থান পেয়েছেন এই প্রদর্শনীতে, যদিও কোনো কোনো শিল্পী, যাঁরা জলরঙের ছবির জন্যে খ্যাতিমান, তাঁরা উপস্থিত নেই এই প্রদর্শনীতে—যেমন গণেশ হালই। এক হিসেবে, প্রদর্শনীটি কথঞ্চিৎ "চরিত্রহীন"—কোনো থীম বা ঐক্যসূত্র নেই ছবিগুলিতে, শুধু কয়েকটি সুন্দর ছবি টাঙানো হয়েছে দেয়ালে, এবং সেইসঙ্গে অনেকগুলি অসুন্দর, অসার্থক ছবি।

প্রবীণদের মধ্যে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিংকর, গোপাল ঘোষ, সুনীলমাধব সেন, ইন্দ্র দুগার, রথীন মৈত্র প্রভৃতির ছবি আছে। পরিতোষ সেনেরও একটি ছবি আছে —"স্মোকিং ইন দ্য মুনলাইট"—জনৈক চন্দ্রাহত, আত্মবিহ্বল, ধূমপানরত লোকের ছবি—কিন্তু ছবিটি দেয়ালে টাঙানো নেই, দেয়ালের নিচে পেছন ক'রে রাখা। এর কারণ বুঝতে পারলাম না। ছবিটি সুন্দর। যিনি প্রায় কখনই জলরঙে ছবি আঁকেন না, সেই সুনীলমাধব সেনের জলরঙে আঁকা "নৌকাবিহার" দেখে ভালো লাগলো। রাধাকৃষ্ণ এবং পৌরাণিক অনুষঙ্গ, যা ওঁর একাধিক তৈলচিত্রের বিষয়বস্তু, এই ছবিটিরও বিষয়সূত্র তা-ই—শুধু সুনীলমাধব এখানে তাঁর মাধ্যম পাল্টেছেন। বিনোদবিহারীর ছোটো নিসর্গচিত্রটি অত্যন্ত সুন্দর—বারবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। রামকিংকরের "মানুষ ও ঘোড়া" ছবিটি প্রথম শ্রেণীর ছবি—সাবলীল রেখা ব্যবহারের জন্যে বিশেষত। গোপাল ঘোষের পাহাড়ী বনপথে ভ্রাম্যমান লোকের ছবিটি অত্যন্ত নয়নরঞ্জন। ইন্দ্র দুগারের "মাউন্টেনস"ও তা-ই।

সানু লাহিড়ীর "টয়লেটে" জলরং-কে একটু পুরুভাবে ব্যবহার করা হয়েছে—ব্রাশের ব্যবহারও অত্যন্ত দ্রুত এবং দক্ষ, প্রসাধনরতা মহিলার মুখটিকে কোনো পশুর মুখের সাদৃশ্যে আঁকা হয়েছে। সব মিলিয়ে, ছবিটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। করুণা সাহার "নীল নন্দিকা" আকর্ষণীয় ছবি, যদিও নন্দিকার মাথাটি তুলনামূলকভাবে হ্রস্বকায়। মীরা মুখোপাধ্যায়-কে আমরা ভাস্কর বলেই জানি, সুতরাং প্রায় তিরিশ বছর আগে আঁকা তাঁর বিশাল, শঙ্খপাণি, শঙ্খবলয়িত মূর্তির "কনস্টেলেশন" ছবিটি দেখে রোমাঞ্চিত হলাম।

অপেক্ষাকৃত তরুণতরদের মধ্যে, গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, সুনীল দাস, শ্যামলদত্ত রায়, লালুপ্রসাদ সা, সুহাস রায় এবং অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গণেশ পাইনের ছবি বলতেই আমরা অতি-পরিচ্ছন্ন, শান্ত, বর্ণিল, এবং ব্যঞ্জনাময় ছবির কথা ভাবি এবং এই ধরনের ছবি এঁকেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন—কিন্ত এই প্রদর্শনীতে তাঁর "চ্যালেঞ্জার" ছবিটি ঈষৎ অন্যরকম মনে হলো। রক্তচ্ছটাময় পরিবেশে, আক্ষরিত অর্থে একটি স্থূল লোকের ছবি এঁকে তিনি প্রমাণ করলেন যে কুৎসিত বা আপাত-কুৎসিত বিষয়বস্তুকেও তিনি প্রথমশ্রেণীর শিল্পে উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন। বিকাশ ভট্টাচার্য, পক্ষান্তরে, তাঁর নির্দিষ্ট রীতিসম্মত ছবি এঁকেছেন—লালচেলি-পরা একটি নববধূর ছবি কিন্তু শাড়ির লালরঙের সঙ্গে যেন রক্তক্ষরণের বর্ণিমা মিশে গেছে, এবং চোখদুটি যন্ত্রণাবিদ্ধ দুটি মার্বেলের মতো। এমন ত্রাসসঞ্চারক ছবি আমি খুব কম দেখেছি—এবং জীবনের অন্তর্নিহিত যে ভয়াবহতাকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আসছেন, তারই একটি সফলতম চিত্ররূপ এই "ব্রাইড" ছবিটি। বিকাশ ভট্টাচার্যের জন্যে আমার অভিনন্দন রইলো। প্রায় যে কোনো জিনিস বা বিষয়সূত্রকেই যিনি দর্শনযোগ্য এবং রসোত্তীর্ণ একটা কিছুতে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন সেই সুনীল দাস এই সত্যকে আবার প্রমাণ করেছেন তাঁর "ইউ অ্যান্ড আই" ছবিটিতে। দুটি রেখাদীর্ণ বিরাট মাথার চারপাশে লালরঙের স্রোত যেন অবিরলভাবে বয়ে চলেছে (মনে হয়, তিনি জলরঙের সঙ্গে আলতাও ব্যবহার করেছেন), এবং অনেক জোড়া চোখ সূক্ষ্মভাবে উঁকি দিচ্ছে ওপরে নিচে। খুবই আকর্ষণীয় ছবি। শ্যামল দত্ত রায়ের "ভাঙাপাত্র" ইতিমধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে—তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই

এই প্রতীকটি উঁকি দিচ্ছে আজকাল। এই প্রদর্শনীতে তাঁর যে ছবিটি টাঙানো হয়েছে, তাতেও এই পাত্রটিকে দেখা গেলো, যার পাশে একটি জৃম্ভনরত ছাগল। ছবিটি আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। একরঙে-আঁকা সুহাস রায়ের "মনোক্রোমের" কম্পোজিশন এবং বর্ণব্যবহার খুবই উল্লেখযোগ্য। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সেপ্টেম্বর-২৭" ছবিটি সার্থক তল বিভাগের জন্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —ছবিটির পশ্চাৎভূমি ঘেঁষে একটি বিছানা এবং শায়িত রমণীর ছবি, এবং সামনের অংশটি অনেকটাই ফাঁকা। সনৎ করের ছবির, বিশেষত সাম্প্রতিক ছবির, আমি খুবই অনুরাগী—কিন্তু এই প্রদর্শনীতে তিনি যে ছবি দিয়েছেন, তা যেন বহুলাংশেই হেলাফেলায় আঁকা। লালুপ্রসাদের "চ্যারিয়টে" পুরু জলরঙের ব্যবহার অত্যন্ত সার্থক। অন্যান্য সার্থক ছবির মধ্যে রণেন আয়ান দত্তর "দার্জিলিং", রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সঙ্গী" দীপালি ভট্টাচার্যের "মিরর", গীতা ভট্টাচার্যর "বিয়ণ্ড দ্য ওয়াল" (এই ছবিটিতে অর্ধ-বিমূর্ত কম্পোজিশনের রীতি বাস্তবনিষ্ঠ বিষয়বস্তুতে খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে), গোপীনাথ দাসের "ল্যান্ডস্কেপ", শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের "ইল্যুসন" (সার্থক কম্পোজিশন এবং ড্রইং-এর জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয়), শৈবাল ঘোষের "গ্যাংটক বাজার" অসিত পালের 'স্নেক ট্রি' রেবা হোড়ের 'ওয়াটার কালার', দীনকর কৌশিকের "ফিগার", বি আর পানেসরের 'ইমেজ-১' এবং অনিমেষ সেনগুপ্ত "মাই ডার্লিং মাই বসন্ত" উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ছবিটিতে শ্রীসেনগুপ্ত যেভাবে গাঢ় লাল রং-কে ব্যবহার করেছেন, এবং নন্দিকা রমণীর পিঠের ওপর হলুদ পত্রমালাকে আভাসিত করেছেন তা আমাদের কল্পনাকে খুবই উদ্দীপ্ত করে।

দু'একটি ছবি ছাড়া, অধিকাংশ ছবিতেই কোনো তারিখ নেই। অথচ পুরনো ছবিগুলি তারিখচিহ্নিত হ'লে বিশেষভাবে তাৎপর্যময় হতো।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগ

আকাদমী অব ফাইন আর্টসে (মে ৪—১০) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের কাজ গত বছরের কাজের চেয়ে উন্নত মনে হলেও সামগ্রিকভাবে আমাকে নিরাশ করেছে। সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয় (আমি এখানকার অধ্যাপক ছিলাম বলে বলছি না) বা ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের দিন এবং রাত্রির ছাত্রছাত্রীর কাজের চেয়ে রবীন্দ্রভারতীর ছাত্রছাত্রীর কাজ যে নিম্ন মানের সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে ভরসার কথা, শানু লাহিড়ী এই বিভাগে যোগদান করেছেন, সুতরাং এতদিনে এখানে পেনটিং শেখাবার মত যোগ্য অধ্যাপিকা এলেন। পরে এমন আরও যোগ্য সৃজনশীল শিল্পী যদি নিযুক্ত হন, তবেই ছাত্রছাত্রীরা কাজ শিখবে। এবারে নিকৃষ্ট মানের কাজ ঝুলিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সমালোচকদের সাজেনীর আক্রমণ করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। সমালোচকরা ভাল কাজ দেখলে এ-দেশে নয়, ও-দেশেও কাব্য করেন। তবে খারাপ কাজ দেখলে রুষ্ট হন। সুজেনীরে এমন উষ্মা প্রকাশ করার মতো কোন শিল্পীর কাজ প্রদর্শনীতে ছিল না। বস্তুত তেলরঙ, জলরঙ, প্যাস্টেল, ছাপাই ছবি প্রচুর ছিল। কিন্তু বেছে নেওয়া হয়নি। বহু কাজেরই অংকন দুর্বল। রঙ চাপাতে জানেন না অনেকেই, রচনার মধ্যে জোর নেই। কলকাতার আর্ট কলেজগুলির সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো কাজ ছিল

"ঝাড়ি হাতে নারী"

না। তবে যাঁদের শেখালে এখনও কিছু হতে পারে তাঁদের বিষয়ে কিছু বলব। কারণ ছাত্রছাত্রীদের কাজের নিন্দা করতেও আমার বাধো-বাধো ঠেকছে।

সুধীরঞ্জন মুখার্জীর "ল্যান্ডস্কেপ" সমীর গুপ্তের "মিউজিক", সোমেশ্বর রায়ের "ডেলি প্যাসেঞ্জার" প্রভৃতি কাজে যা একটু মুনশীয়ানার প্রকাশ পেয়েছে। বাদবাকী কাজ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

রথীন মৈত্র

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

হীরে মানিক

ছোটদের জন্য ছবি তৈরির উদ্দেশ্য থাকলেও (সম্ভবত বক্স অফিসের দিকটা ভোলা যায় না বলে) বড়দেরও প্রেক্ষাগৃহে টানবার উপকরণ না সন্নিবেশিত করলে নির্মাতার মন ভরে না। তাই দেখা যায় ছোটদের ছবি আখ্যাত অনেক চিত্রেরই অধিকাংশভাগই বড়দের উপভোগ্যতার দিকে দৃষ্টি রেখে বিন্যস্ত হয়। মদনমোহন পিকচার্সের এই ছবির কাহিনী (রচনা : সমীর ঘোষ) হীরে ও মানিক নামক দুটি বালকের জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে ছোটদের মনে অ্যাডভেঞ্চারের চেতনা জাগাবার কথা ভূমিকাতে বলা হয়েছে। বড়দের কথাটাও চিত্রনির্মাতার চিন্তা থেকে অপসারিত হয়নি।

হীরে (বাপ্পা চক্রবর্তী) ও মানিক (সৌম্য চট্টোপাধ্যায়) এক দুর্ঘটনায় একসঙ্গে বাবা ও মাকে হারাবার পর বহু লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারী হলেও লোভী ও খল প্রকৃতির কাকা বরেনের (বিকাশ রায়) আশ্রয়ে ভৃত্যের জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। ওদের ওপর অত্যাচার বাড়িয়ে তোলে বরেনের শ্যালক রবি (চিন্ময় রায়)। অতিষ্ঠ হয়ে হীরে ও মানিক সে আশ্রয় ত্যাগ করে গল্পে-পড়া চাঁদের পাহাড়-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথে মুখাত পরিচালকদের পৃষ্ঠপোষিত এক হোটেলে কাজ পায়। কিন্তু সেখানেও টিকতে পারল না। আবার চাঁদের পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা। এবার ওদের পিছু ধাওয়া করল রবি তার গুন্ডা সাকরেদ সঙ্গে নিয়ে। রবির ভয়ে ওরা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল।

ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, রুগ্ন হীরে ও মানিককে উদ্ধার করল রেঞ্জারসাহেব প্রশান্তর (অনিল চট্টোপাধ্যায়) স্ত্রী মণি (সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়)। শেষে কাকা বরেন ও তস্য শ্যালক রবির ছলচাতুরি ধরা পড়ে এবং পিতৃবন্ধু ও হীরে এবং মানিকের সম্পত্তির অছি অ্যাডভোকেট অসীমের (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) সহযোগিতায় ওরা স্থায়ীভাবে রেঞ্জার-সাহেবের বাংলোতে আশ্রয় লাভ করে।

টাইটেলে চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ছাড়া সলিল দত্তর নামের সঙ্গে কাহিনী বিন্যাস শব্দটিও যুক্ত রয়েছে। কাহিনী পর্দার উপযোগী বিন্যস্ত করাটা কি চিত্রনাট্যকারের কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়? খলপ্রকৃতির বরেনের আশ্রয়ে ছেলে দুটিকে পাঠানো কি ওদের চাঁদের পাহাড় অভিযানে ব্রতী করে তোলার একটা ছুতো নয়? ওরা অগাধ সম্পত্তির মালিক অথচ ওদের অছি অ্যাডভোকেট অসীম নিজে ওদের দেখাশুনো করতে অপারগ হলেও ওদের তো যে কোন প্রথম শ্রেণীর আবাসিক স্কুলে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারতো। মৃত সন্তানের শোক ভোলবার জন্য রেঞ্জারসাহেবের স্ত্রী মণি ওদের প্রতি মমতাময়ী হয়ে ওঠে—ঘটনাটি সাবলিল মনে করা যায় কি? খল চরিত্র বরেন ও রবির ভাঁড় সদৃশ আচরণ ছোট ও বড় উভয় শ্রেণীর দর্শককে হাসবার সুযোগ দেয় বেশ—কিন্তু স্বাভাবিক মনে করা যায় কি? রবির খপ্পর থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য হীরে ও মানিক গহন জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং সে সময় জঙ্গলে একটি খরগোসও ওদের পথে পড়ে না। কিন্তু মণিমার ওপর অভিমান করে ওরা

বাপ্পা ও সৌম্য

রেঞ্জারসাহেবের বাংলো থেকে চলে আসার পর সেই একই জঙ্গলে বাঘ, সিংহ, ময়াল ও শাবকহারা পাগলা হাতী ইত্যাদির দৌড়ঝাঁপ কাহিনীর পরিসমাপ্তি অতিনাটকীয় করে তোলার কৃত্রিম প্রয়াস বলেই প্রতীয়মান হবে। ঘটনার পর ঘটনা বয়ে চলে কিন্তু মনে সাড়া জাগাবার, চমক সৃষ্টি করার মতো বিন্যাস কৃতিত্বের কোন পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না।

বিবিধ ত্রুটি ও গোঁজামিল সত্ত্বেও বাপ্পা ও সৌম্য দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। অনিল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালকের চরিত্রে সত্য বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অভিনয় ভাল লাগবে। কাহিনীর পরিবেশ গড়ে তোলায় কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ক্যামেরার কাজ সহায়ক হয়েছে। সুরযোজনায় মৃণাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কাজ প্রশংসনীয়।

পঙ্কজ দত্ত

বনবাসর

একটি আনকোরা নতুন খাতা। প্রথম পাতায় লেখা হলো বনবাসর। পাতা উল্টোলো। সেখানে একটিও আঁচড় পড়ে নি তখনো। ক্যামেরা খাতা থেকে পিছিয়ে এসে আবিষ্কার করলো সমিত ভঞ্জকে। বুঝলাম তিনিই লেখক। সবে একটি উপন্যাসে হাত দিয়েছেন। প্রথমেই ভেবে নিয়েছেন যুৎসই একটি নাম—বনবাসর—এবং প্রথম পাতাতেই সেটি মনোহর অক্ষরে লিখে ফেলেছেন। টেবিলের ডান ধারে একটি ছাইদান, যেটি কোনোদিন ব্যবহার হয়েছে বলে মনে হয় না, সারা ছবিতে সমিত কি একবারও ধূমপান করেছে? ছাইদানের পাশে একটি ফুলদানি, যেটিতে এই মুহূর্তে একটি ফুলের কুঁড়ি কুঁকড়ে রয়েছে। পিছনে একটি প্রায়-খালি আলমারি, যার মাঝের র‍্যাকে কয়েকটি ছায়া-ছায়া বই। অর্থাৎ ছবির একেবারে প্রথম দৃশ্যেই সিনেম্যাটিক ডিটেলস্‌-এর দিকে একেবারে কোনো নজর দেয়া হয়নি। লেখকের চরিত্র ও মানসিকতার অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো তাঁর ঘরের রিয়েলিস্টিক ডিটেলস্‌-এর মাধ্যমে। এবং সেটাই হতো একান্তভাবে সিনেমার ভাষা। পরিচালক সুশীল মুখো-পাধ্যায়ের অনুপুঙ্খের প্রতি কতটা অমনোযোগ সেটি একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। প্রথম দৃশ্যে সমিত ভঞ্জ যে-টেবিলে বসে লিখছেন সেটি ঘরের ঠিক কোন্ জায়গায় তা বোঝা যায় কি? সাধারণত লেখার টেবিল, বিশেষ করে সেটি যদি এই টেবিলের মতো ক্ষুদ্রাকৃতি হয়, তাহলে সেটি দেয়াল বা জানলার সঙ্গে লাগোয়া থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু ক্যামেরা টেবিলের একেবারে সামনে থেকে দৃশ্য-টিকে ধরেছে, আমরা মানতে বাধ্য যে, টেবিলের সামনে কোনো দেয়াল নেই। তবে টেবিলটি ঘরের ঠিক কোথায়? আসলে সুশীলবাবু দৃশ্যটিকে একেবারে থিয়েটারি ঢঙে [illegible], এবং থিয়েটারের স্টেজে যেমন চতুর্থ দেয়ালটি থাকে না তেমনি এই দৃশ্যেও নেই। আর একটি মস্তবড় গোলমাল একেবারে প্রথমেই প্রকট হয়ে দেখা দিল—যে-মুহূর্তে লেখক সমিত ভঞ্জ 'বনবাসর' নামটি খাতায় লিখলেন। পরিচালক সেই মুহূর্তে হয়তো অজান্তেই ঘোষণা করলেন, তিনি সিনেমা তৈরি করছেন না, তিনি একটি সচিত্র 'বই' বানাচ্ছেন মাত্র। তাঁর মিডিয়াম 'সাহিত্য'—ভিসুয়ালস্ নয়। আর একটা ছোট গণ্ডগোল হচ্ছে, ছবিটি তৈরি হয়েছে সুশীল রায়ের 'মধুগাউলী' গল্পটি অবলম্বনে। যে-মুহূর্তে এই ছবির লেখক বনবাসরের লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন, মধুগাউলীর লেখকের সঙ্গে তাঁর আইডেন্টিফিকে-শনের মূলে আঘাত করা হলো, এবং তাতে যে ছবিটি লাভবান হলো সেকথা বলা যায় না।

সুশীল রায়ের ছোট গল্পকে টালি-গঞ্জের মালমশলা দিয়ে বেশ করে কষে নিয়েছেন চিত্রনাট্যকার গোবিন্দ দে। ফলে, ব্যাপারটা কেমন দাঁড়িয়েছে তা দু-একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে

পারবেন। ছবির একেবারেই প্রাথমিক সিকোয়েন্সে-এ ট্রেন থেকে এক ঝাঁক পাখি দেখে গান ধরলেন সমিত ভঞ্জ! হঠাৎ গান কেন? গান এখানে কিভাবে 'ছবি'কে সাহায্য করছে? গান ছাড়া কি দিলীপ রায়ের (সোমনাথ) সঙ্গে সমিতের আলাপ হতে পারতো না? আসলে ট্রেনজার্নির সময়টা পূরণের জন্যে গোবিন্দবাবু গান ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারলেন না। কেননা ওটাই তো টালিগঞ্জের ফরমুলা। এবং পরিচালক একবার ভেবে পর্যন্ত দেখলেন না যে, ট্রেনের আওয়াজ এবং কামরার বিভিন্ন শব্দকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে গান কখনো নিটোলভাবে পরিবেশিত হতে পারে না। পরিচালক কি হলফ করে বলতে পারেন যে ট্রেনের মধ্যে এই গানের সিকোয়েন্স-এর সাউন্ডট্র্যাক একেবারে বাস্তবধর্মী? অবিশ্যি গোবিন্দবাবুর চিত্রনাট্যে বাস্তবতার আগাগোড়াই অভাব, এবং সবচেয়ে বিরক্তিকর (নাকি হাস্যকর?) গান দিয়ে বড় বড় ফাঁক পূরণের চেষ্টা। ভোরবেলা সুঠাম মসৃণ কণ্ঠে সাঁওতাল মেয়ে মহুয়া রায়চৌধুরী গান গাইছেন তাঁর দূরের কুটিরে, এবং সেই গান একেবারে কানের গোড়ায় গীত মনে হচ্ছে সমিতের ঘর থেকে! এ-ছবিতে যদি একটিও গান না থাকতো (বলেন কি, গান ছাড়া ছবি?) তাহলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। সেক্ষেত্রে গোবিন্দবাবু এতগুলো গানের কথা ভাবলেন কোন্ যুক্তিতে?

আর গানটান যদি বাদ দেন, তাহলে এ-ছবিতে থাকেই বা কি? বনবাসরের লেখক-নায়ক যাযাবর—অর্থাৎ তাঁর দৌড় শিমুলতলা পর্যন্ত। কিন্তু পরিচালকমশাই শিমুলতলা বলে তাঁকে আসলে নিয়ে এলেন মাসাঞ্জোরে, এবং মাসাঞ্জোরের একটি টুরিস্ট লজকে সোমনাথের (দিলীপ রায়) বাড়ি বলে চালিয়ে দেয়া হলো! এই বাড়িতে সোমনাথের সঙ্গে নতুন গজিয়ে ওঠা বন্ধুত্বের দাবিতে লেখক থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ছবির কোথাও এদের বন্ধুতা বা ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু দেখছি প্রতি রাত্রে সোমনাথ একটি করে সাঁওতাল মেয়েকে ধর্ষণ করে (বিশেষ উৎসাহের কোনো কারণ নেই, কেননা এইসব ধর্ষণ দৃশ্যে সেক্স ছাড়া আর সবকিছু আছে। এবং লেখক কোনো প্রতিবাদ করে না। টালিগঞ্জের সাঁওতালবেশী এক্সট্রারাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না। অথচ সমিত বেচারা মহুয়ার সঙ্গে একটু ভাব করতেই সাঁওতালবেশী সন্তু মুখোপাধ্যায় চাকতে তৎপর হয়ে উঠলো! আসলে সেই অরণ্যের দিন রাত্রির সময় থেকেই সাঁওতাল মেয়েদের ব্যাপারে সমিত ভঞ্জের ভাগ্য বিপরীত। যাই হোক, ছবির শেষে দিলীপ রায় আত্মহত্যা করছেন। সন্তু-মহুয়ার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে প্রায় বাঙালী প্রথায়, এবং সমিত কলকাতায় ফিরে বনবাসর উপন্যাসটি শেষ করছেন। উপন্যাসটি লেখার পরিশ্রমে শেষ দৃশ্যে লেখকের পাঞ্জাবি ঘর্মসিক্ত। এবং প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্যের সময়ের ব্যবধানে সূর্যমুখীটি কুঁড়ি থেকে ফুলে পরিণত। ভালো

সন্তু ও মহুয়া

কথা, এ-ছবিতে অভিনয়ের জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি সমিত, সন্তু এবং বিশেষভাবে মহুয়াকে। এবং হরিধনবাবু একটি ছোট্ট সিকোয়েন্স-এ চমৎকার। কিন্তু এ-ছবির অন্তিম দর্শনের জন্যে অভিনন্দন জানাবো কাকে? সমিত লেখক-নায়কের প্রশ্ন—সোমনাথ কি পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল? আমাদের প্রশ্ন—প্রায়শ্চিত্ত প্রতিরাতের পাপাচারে, না পালাবার পথ না পেয়ে কাপুরুষের মতো আত্মহত্যায়? ছবিতে সোমনাথকে যেভাবে আনা হয়েছে তাতে অন্তত তার প্রতি আমাদের কোনো রকম সহানুভূতি জাগার কথা নয় এবং শেষ দৃশ্য তাকে ট্র্যাজিক হিরো বানাবার প্রচেষ্টা আমাদের নৈতিক মূল্যবোধে কুঠারাঘাত করে। তবে একটি ব্যাপারে সোমনাথকে বাহাদুরি দিতেই হবে—নিজের গলায় রিভলবার ঠেকিয়ে গুলি করেও সে গোবিন্দবাবুর চিত্রনাট্যের সংলাপ বলে যেতে পারে!

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যাসাইলাম

সাইকো যিনি লিখেছিলেন সেই রবার্ট ব্লচেরই লেখা অ্যাসাইলাম। সাইকো পড়েছিল বিখ্যাত পরিচালক হিচককের হাতে। অ্যাসাইলামের পরিচালক বেকার।

চারটি কাহিনী উৎকণ্ঠার সুতোয় বাঁধা। চাপা উত্তেজনা, আতঙ্ক, কি হয়, কি হয় গোছের একটা উদ্বেগ অবশ্যই তৈরি হয়েছে। গল্প শুরু হয়েছে একটি অ্যাসাইলামে। তরুণ একজন মনস্তত্ত্ববিদ গাড়ি চালিয়ে কুয়াশার ভেতর দিয়ে আসছেন। আসছেন ভিকটোরিয়ান আমলের একটি বাড়িতে। কোনও একটি অ্যাসাইলামের পূর্বতন পরিচালককে তিনি খুঁজে বের করবেন অন্যান্য উন্মাদের ভিড় থেকে। শুরু হল গল্প। ফ্ল্যাশব্যাকে এক একজনের কাহিনী আসছে, চলে যাচ্ছে।

প্রথম গল্পে অবৈধ প্রেম, স্ত্রীকে খুন। স্ত্রীর খণ্ড বিখণ্ড দেহ ভুডুর প্রভাবে জীবন্ত হয়ে ডিপফ্রিজ থেকে বেরিয়ে এল একে একে। ব্রাউন পেপারে মোড়া নিহত স্ত্রীর মুণ্ডু মদ্যখেকো স্বামীর সামনে পাতাল ঘর থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। সাসপেনস বেশ জমছিল তবে ওই ভয়কে খুব বেশি টানাটানি করলে ভয়ের দাঁত আর তেমন ধার থাকে না।

দ্বিতীয় গল্পটি একজন দরজীর। লেখক এবং পরিচালক পরিবেশটি বেশ তৈরি করেছিলেন। ম্যাজিক প্রেততত্ত্ব সব মিলিয়ে বেশ জমছিল। উপসংহার কিন্তু দুজনেরই হাতের বাইরে চলে গেল।

তৃতীয় গল্পটি সর্বোত্তম। এবং বিশ্বাসযোগ্য। এক তরুণীর দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের ঘটনা। ব্রিটঅ্যাকল্যাণ্ড তরুণীটি শেষ পর্যন্ত খুন করল অনেকটা আত্মবিস্মৃত ভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের প্ররোচনায়। এই অংশটি অত্যন্ত সুন্দর, যেমন অভিনয়, তেমনি সম্পাদনা।

সবচেয়ে দুর্বল শেষের অংশটি। পিটারকুশিং যে ধরনের হিসটিরিক অভিনয় পছন্দ করেন সেই ধরনের অভিনয় করার সুযোগ করে নিয়েছেন। উন্মাদ বলেই মনে হবে। সমস্ত কিছু

মাঠে মারা গেছে কাহিনীর দুর্বলতার জন্যে। না ভূতুড়ে, না আধ্যাত্মিক। অদ্ভুতুড়ে বললে মন্দ হয় না।

একেবারে শেষ পর্যায়ের খুনখারাপী প্রথাগত ব্যাপার। রাখতেই হবে। তরুণ ডাক্তার যাকে খুঁজতে এসেছিলেন তাঁর হাতেই নিহত হলেন। খুনে শুরু, খুনে শেষ।

সময় কাটাবার মত ছবি। বুদ্ধির ওপর চাপ দেয় না। আতঙ্কে পাগল করে না। পরিষ্কার অভিনয়, পরিষ্কার ফটোগ্রাফি। এক একটি জায়গা প্রকৃত সুন্দর। স্মার্ট এডিটিং।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

রাত্রিব্যাপী সংগীতানুষ্ঠান

নর্থ ক্যালকাটা মিউজিক সারকেলের তৃতীয় বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলন আয়োজিত হয় মহাজাতি সদনে গত ১৪ই এপ্রিল। আসরের প্রথম শিল্পী ছিলেন কিশোর সেতারবাদক পার্থ দেবরায়। ইনি বাজিয়েছিলেন ইমন। এঁর মীড়ের কাজে এখনও যথেষ্ট দক্ষতা না আসলেও পর্দার উপরে বাজানো কাজগুলিতে খানিকটা প্রতিশ্রুতির আভাস পাওয়া গেল। পরের শিল্পী তন্দ্রা দাসের ভিন্ন ষড়জ রাগে খেয়ালগুলিতে এটুকুও পাওয়া গেল না। আসরের তৃতীয় শিল্পী ছিলেন বোম্বাইয়ের তরুণ সেতারবাদক শাহিদ পারভেজ এবং এঁর বাগেশ্রী রাগে আলাপটি স্বরমাধুর্য ও ধ্বনি বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় জ ম র স পদের বহুল ব্যবহারে নষ্ট হয়ে যায়। ব্যাপারটি সত্যিই দুঃখের কারণ স্বরপ্রগতিতে বিচক্ষণতা ও শিল্পবোধ দুইই ছিল। বিলম্বিত ও মধ্যলয় তিনতাল গৎদুটিতে (বলাবাহুল্য গতের বন্দেশগুলিতে জ ম র স পদ ছিল না—ম জ র স পদই ছিল) ভাল ছন্দের কাজ ও তানকারি ছিল। কুমার বোসের তবলা সঙ্গতও হয়েছিল চমৎকার। সাহানা রাগে দ্রুত গৎ দুটির বিস্তার, তানকারি ও ঝালার কাজ সবই ভাল হয়েছিল।

পরের শিল্পী ছিলেন সুভাষ চাকলাদার এবং ইনি যোগ রাগে বিলম্বিত একতাল, মধ্যলয় ঝাঁপতাল ও দ্রুত তিনতাল খেয়াল ও তারানা গেয়ে শোনান। বিস্তারের কাজে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল এবং শিল্পী প্রায়ই কোমল গান্ধার স্বরটিকে দুর্বল করে ফেলায় রাগের রূপও একটু বিকৃত হয়ে পড়ে। তানের কাজে খানিকটা বৈচিত্র্য থাকলেও দানার অভাব ছিল। একটি খাম্বাজ ঠুংরী (অন্তরাহীন) গেয়ে শিল্পী তাঁর বৈঠক শেষ করেন। এরপরে শোনা যায় বোম্বাইয়ের তরুণ সরোদবাদক ব্রিজনারায়ণের সরস্বতী রাগে অতি উচ্চাঙ্গের আলাপ ও জোড়। আলাপের প্রথম টোকা থেকেই রাগটির সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে একটি আলীআকবরী প্রাণবন্ততা ও মাদকতা স্থাপন করা হয় এবং শিল্পী রাগটি থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বরসমষ্টি আদায় করেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। সুরেলা ছন্দের কাজ ও বলিষ্ঠ বেলকারি জোড়টিকে জমজমাট করে রাখে।

মালকোষ রাগে বিলম্বিত গৎটির বিস্তারের কাজ কিন্তু তুলনায় অনেক নিম্ন মানের হয়েছিল— ছন্দের কাজও তাই। তবে এই গৎটির শেষ অংশে ও দ্রুত গৎটির বোলতান-তোড়ার কাজ ভাল হয়েছিল। স্বপন চৌধুরীর দক্ষ তবলা-সঙ্গত গতকারির মান বাড়িয়ে দেয়।

অনেকদিন পরে শুনলাম পরের শিল্পী গুলাম মুস্তাফা খাঁর গান। এবং তাঁর বিলাসখানি টোড়ী রাগে বিলম্বিত খেয়ালটি বিস্তারের কাজ শুনে খানিকটা হতাশও হলাম। কারণ বিস্তারের কাজ কেবল একঘেয়ে ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বরপ্রগতিহীনই ছিল না, নিবিদ্ধ ন্যাস বিন্যাসও এতে ব্যবহার হয়েছিল বার বার—ফলত রাগরূপও বিকৃত হয়েছিল। ঢিমে সরগমের কাজও একই মানের হয়েছিল তবে শেষাংশে এক পশলা ভাল মধ্যলয় গমক-সরগমের কাজ ছিল। দ্রুত তিনতাল খেয়ালটির দ্বিতীয়ার্ধের বিস্তৃত দুনি তানকারিতে আমরা পুরানো গুলাম মুস্তাফাকে খানিকটা ফিরে পেলাম। গুরজারী টোড়ী রাগে দ্রুত খেয়ালটিও ভালই হয়েছিল।

এরপর শোনা যায় শিশিরকণা ধরচৌধুরীর বেহালায় বসন্ত মুখারি

রাগে আলাপ ও জোড়। আলাপটি শিল্পীর নিজ মানের হয়নি এবং স্বরপ্রগতিতে বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য দুয়েরই অভাব ছিল। তা ছাড়া বসন্ত মুখারি তো খালি পূর্বাঙ্গে ভৈরব ও উত্তরাঙ্গে ভৈরবী নয়—একটা আলাদা রাগও বটে। কাজেই যে কোন সচেতন শিল্পীর দেখা উচিত যে রাগটি যেন কোন সময় কেবল ভৈরব বা ভৈরবী না হয়ে পড়ে—শিশিরকণা ধরচৌধুরী গ ম দ প ও গ ম প দ প জাতীয় পদে কোমল নিষাদের ছোঁয়া না লাগানোয় রাগটি জায়গায় জায়গায় অবিকল ভৈরবের মত শোনায়। বিলম্বিত ও মধ্যলয় জোড় একই শ্রেণীর হলেও দ্রুত জোড় অংশ তুলনায় খানিকটা ভাল হয়েছিল।

নট্ ভৈরব রাগে বিলম্বিত তিনতাল গৎটি শিল্পী নিজ মানেই বাজান এবং এতে স্বরমাধুর্য বৈচিত্র্য ও আকর্ষণীয়তা সবই ছিল। বক্রগতি ছন্দের কাজে প্রথমদিকে একটু সুরের অভাব থাকলেও পরে সুর ও ছন্দের মিলন যথাযথ হয়। চৌগুণ তানের কাজও ভাল হয়। মধ্যলয় ও মধ্যদ্রুত অংশে মহাপুরুষ মিশ্রর উৎকৃষ্ট তবলা সহযোগিতায় শিল্পী কিছু অসাধারণ নকশা রচনা করেন।

সুনন্দা পট্টনায়কের কণ্ঠসংগীত দিয়ে আসরটি শেষ হয়।

ভ্রম সংশোধন : (১) গত ২৮শে এপ্রিলের দেশে আমার লিখিত পিয়াসী আয়োজিত 'মিউজিক অফ দি ড্রামস্' অনুষ্ঠানের সমালোচনার (পৃঃ ৬৭ কলম ৪) শিরোনামা ভ্রম বশত 'আনন্দ সংগীত' মুদ্রিত হয়েছে। এটি হওয়া উচিত ছিল 'আনন্ধ সংগীত'। সমালোচনার দ্বিতীয় ও আঠারতম লাইনেও একই ভ্রম হয়েছে। (২) গত ১২ই মের দেশে 'সুরদাস সংগীত সম্মেলন' নামক সমালোচনাটিতে (পৃঃ ৬৮ কলম ২) চিন্ময় লাহিড়ীর গানের আলোচনা অংশে ভ্রম বশত স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাগ্‌দেশ্বরী রাগটি 'বাগেশ্বরী' মুদ্রিত হয়েছে। আশা করি বোদ্ধা পাঠকের এই ভ্রমগুলির জন্যে আমার বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

নীলাক্ষ গুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

রং করা মুখ

শীর্ণকায় অস্থিসার একপাল ছেলেমেয়ে, হাতে ব্যান্ড আর বিউগল, দুপুরের গনগনে রোদ্দুরে মিছিল করে চলেছে একটুকরো রুটি আর অল্পের দমের লোভে, ক্ষিধের-তৃষ্ণায় শরীর টলছে তাদের, কারও-বা কোমরের বাঁধন যাচ্ছে আলগা হয়ে, কেউ-বা মাটিতে পড়ছে বসে, ব্যান্ডে তখনও উচ্চকিত সুরে বাজছে সকল দেশের সেরা এক দেশের প্রশস্তিগাথা, এই অসহায় বৈপরীত্যের শোভাযাত্রার পিছনে চলেছেন এক বিপন্ন মানুষ, দুর্বার বাৎসল্যে এবং দুঃসহ উপহাসে তাঁর

সমীর দাস, সোমনাথ চৌধুরী ও দেবব্রত বসু ফটো : কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শাণিত মুখের রেখায় স্নেহময় গ্লানির এক দুর্লভ প্রতিচ্ছবি, আলো-অন্ধকারে চাবুকে চকিত বিদ্যুতের মত বার বার ঝলসে উঠছে সেই মুখ, দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মুদ্রায় রূপায়িত হচ্ছে 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'-র নিষ্ঠুর অসংগতি, পিছনে সিলুএটের ফ্রেমে নিশ্চল কয়েকটি চরিত্র—দৌড়ে-আসা মালতী, বিহ্বল সুনীল, বিপর্যস্ত সন্তু। প্রেক্ষাগৃহের এ-কোণে ও-কোণে সামনে-পিছনে দীর্ঘ করতালির ঝড়। হঠাৎই ক্ষিপ্ত, আহত গলায় সন্তুর বুক-ফাটা চিৎকার—"সব ঝুট হায়।" বিপন্ন মানুষটির দুটি হাত তখন মালতী আর সন্তুর কাঁধে, মঞ্চের আলো ক্রমশ উজ্জ্বলতর, অপস্রিয়মান ক্লিষ্ট মুখে তখনও ক্ষীণ এক টুকরো তিযক হাসি। সেই হাসির বাক্যহীন অভিব্যক্তিতে সন্তুর আর্তনাদের মূর্ত প্রতিধ্বনি। "সব ঝুট হায়।"

অথচ মঞ্চে কোথাও ছিল না সেই অস্থিসার ছেলেমেয়ের দল। ব্যান্ডের সুর বাজছিল নেপথ্যে, তবু তাদের দেখা যাচ্ছিল যেন চাক্ষুষ। তাদের মিছিল, টলে-পড়া শরীর, স্বেদ-শ্রম-ক্ষুধা-কাতরতা — সব-কিছু, সমস্ত কিছুই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ঘটোৎকচ বসু বি-এ এল-এল-বি নামক বিপন্ন চরিত্রটির দুরন্ত মূকাভিনয়ে। নাট্যকার-নির্দেশক সমীর মজুমদারের কুশাগ্র কল্পনা, তাপস সেনের কুহকী আলো এবং বিমল দেবের কুশলী অভিনয়ের ত্রিবেণী-সঙ্গমে সাম্প্রতিক বাংলা মঞ্চে পবিত্রতম অভিজ্ঞতাময় অবগাহন ঘটল থিয়েটার ক্যাম্পের নতুন প্রযোজনা 'রং করা মুখ'-এ।

শুধু এই একটি দুর্লভ দৃশ্যের জন্যই নয়, আরও বহুবিধ কারণে তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় প্রযোজনারূপে চিহ্নিত হবে থিয়েটার ক্যাম্পের 'রং করা মুখ'। শন ও'কেসির 'শ্যাডো অফ এ গানম্যান'-অনুপ্রাণিত এই নাটকে শক্তিশালী এক আইরিশ নাট্যকারকে বাংলা মঞ্চের পাদপ্রদীপে যেমন প্রথম তুলে ধরা হল, তেমনই আইরিশ বিপ্লবের পট-ভূমিকার সঙ্গে সত্তর দশকের প্রথমার্ধের কলকাতার এক অন্তর্লীন আশ্চর্য সাযুজ্য নতুন করে প্রমাণ করল যে, সৎ সাহিত্য দেশ-কালের আয়তন ছাপিয়ে মহত্তর সত্যের দিকে ধাবিত, সাম্প্রতিকতা থেকে উত্তীর্ণ চিরন্তনতায়।

'রং করা মুখ'-এ সমীর মজুমদার 'শ্যাডো অফ এ গানম্যান' থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন মাত্র, আক্ষরিক রূপান্তর ঘটাননি। প্রয়োজনে তৈরি করেছেন নতুন চরিত্র, নতুন মাত্রা যোজনা করেছেন বহু ক্ষেত্রে। কিন্তু মূল সত্য থেকে সরে আসেননি। সত্তর দশকের কলকাতা তাই চালচিত্র হয়ে থেকেছে এ-নাটকে, প্রতিমার মুখের উদ্ভাসিত চিরন্তনতাকে আচ্ছন্ন করেনি।

চরিত্র-কল্পনা ও নাটকের বিস্তার সম্পর্কে দু-একটি প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে। যেমন, ইন্সিওরেন্সের টাকা নিয়ে কাকিমার দুশ্চিন্তা কতটা রংকরা মুখের অন্তরাল, কতটা কনভেনশন-বিরোধী চরিত্রচিত্রণ—এ-নিয়ে দ্বিধার অবকাশ রয়েছে। হলধর সামন্তর প্রথম আবির্ভাবের অমন সরস পদ্য-বাঁধা সংলাপ দ্বিতীয়ার্ধে পুরোপুরি উধাও কেন, অথবা জন ব্রাউনের প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে উপস্থিত কিনা কিংবা প্রশান্তর মুখে বাল্যকাহিনীর দীর্ঘ বর্ণনা নাটকের গতিকে মন্থর করে তুলেছে কিনা—এ-নিয়েও তর্ক চলতে পারে। কিন্তু সব-মিলিয়ে 'রং করা মুখ'-এর অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ এতে যে ক্ষুণ্ণ হয়নি, এ-কথা মানতেই হবে। দুর্মর কৌতূহল ও দুর্ধর্ষ সংলাপ মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হতে দেয় না।

প্রযোজনাগত বহু নিপুণ ও সূক্ষ্ম কাজ অভিভূত করে। তাপস সেনের আলো দিনরাত্রির প্রতিটি মুহূর্তের মেজাজকে অসামান্যতায় মূর্ত করে রেখেছে। টাইটেল মিউজিকে চারপাশের বস্তি-এলাকা জ্যান্ত হয়ে ধরা পড়েছে। তিনতলা থেকে মালতীর খোলা গলায় ভেসে-আসা গান আর তারই মধ্যে সুনীল-প্রশান্তর সংলাপ, সুনীল-মালতীর গল্প-বলার মুহূর্ত, টেবিল-ল্যাম্পকে সপ্রাণ চরিত্রের মতো অস্তিত্বপূর্ণ করে তোলা, সমৃদ্ধ কয়েকটি কম্পোজিশন, পেঁচার ডাক ও লক্ষ্মীর পাঁচালীতে অশুভ আর মঙ্গলের দ্যোতনা, মঞ্চ ভরে-তোলা কৌশলী সেট (তাপস বসু ও বিদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়)—স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। 'রং করা মুখ'এর আরেকটি সব-ছাপানো সম্পদ—দলগত অভিনয়-নৈপুণ্য। বিমল দেবের 'ঘটোৎকচ বসু' তাঁর শিল্পী-জীবনের অপ্রতিম দিকচিহ্ন। তাঁর চলা-ফেরা-কথা-বার্তায় গোপনতম বেদনাকে আড়াল-করা এক স্নেহাতুর অসহায় পিতা বাবুতীর মাতলামির মুখোশ ছিঁড়ে বারবার উঁকি মেরেছে। এর পরই নাম করতে হয় সমীর দাসের। তাঁর 'হলধর সামন্ত' একইরকম দক্ষ ও জীবন্ত। 'প্রশান্ত'র ভূমিকায় সোমনাথ চৌধুরী সহজ, সজীব, স্ফূর্তিময়। কবি সুনীল যখন অভিনেতা সুনীলে রূপান্তরিত, সেই দুরূহ সত্তায় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন দেবব্রত বসু। এমনই দুষ্কর দ্বৈধ ব্যক্তিত্বে অভিনয়ক্ষমতায় চমকে দেন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ও তাঁর সহকারী 'জাম্বো' (শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) বিচিত্র সম্বোধনের ও উত্তরের যে নমুনা রেখে যান, তার রেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। তাপস বসুর 'সন্তু' উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিস অফিসার ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রায়ণ। অজিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ধরণী' চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম। সন্ধ্যা দে 'মালতী'র রুক্ষতা চমৎকার ফুটিয়েছেন, গানও গেয়েছেন অসামান্য কণ্ঠে। নীলিমা চৌধুরীর 'কাকিমা' অনবদ্য।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **রেকর্ড**

মরন হতে যেন জাগি

ইনরেকোকে ধন্যবাদ তাঁদের সাহসী পরীক্ষার জন্য। রবীন্দ্র জন্মোৎসবে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে কয়েকটি গান প্রকাশ করা নয়, তাঁরা এবার এমন কয়েকটি রেকর্ড বের করেছেন যার ঐতিহাসিক মূল্য অসীম—রেকর্ড না হলে ইতিহাস বিলুপ্ত হত। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যধন্য পাঁচজন শিল্পীর গান তাঁরা 'পঞ্চকন্যা' নামে প্রকাশ করেছেন। শাস্ত্রে যেমন নিত্য স্মরণীয়া পাঁচজন দেবীর কথা আছে, রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে ভাবতে হলে, এই পাঁচজন প্রথম যুগের শিল্পীর উল্লেখ অনিবার্য। এই পঞ্চকন্যা হলেন অমিয়া ঠাকুর, মেনকা ঠাকুর, মালতী ঘোষাল, রাজেশ্বরী দত্ত, অমিতা ঠাকুর। এঁরা প্রত্যেকেই গান গেয়েছেন দিনান্তবেলায়। কিন্তু বয়সকে অতিক্রম করে এঁদের প্রত্যেকেই অনেক নতুন শিল্পীকে লজ্জায় ফেলবেন—সে লজ্জা সাবলীলতা এবং জোরালো কণ্ঠসম্পদের অভাবের জন্য। রাজেশ্বরী দত্ত বা মালতী ঘোষালের গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতানুরাগীদের পরিচয় অনেক দিনের কিন্তু অন্য তিনজনের গান শোনার সুযোগ খুব কম লোকই পেয়েছেন। মেনকা ঠাকুরের শুধু কণ্ঠমাধুর্য অনেককেই চমকিত করবে—এত সুরেলা কণ্ঠ বয়সের সঙ্গে সমতা রেখে চলেনি, অমিতা ঠাকুরের গানের প্রাণময়তা অনেকেই একালে বর্জন করেছেন—আর অমিয়া ঠাকুরের 'তবু মনে রেখো' গানের শেষে অনেকেই আনমনা হবেন, নব প্রেমজালে পুরাতন প্রেমকে কিছুতেই ঢাকা যাচ্ছে না। গানগুলিতে কাশির শব্দ, শ্বাসের শব্দ শিল্পীদের উপস্থিতিকে সজীব করেছে—এইসঙ্গে রেকর্ড কভারে প্রেক্ষাগৃহের যে ছবি আছে, তাঁদের হর্ষধ্বনি

থাকলে রেকর্ডটি আরও প্রাণবন্ত হ'ত।

আর একটি লংপ্লেইং রেকর্ডে প্রকাশিত শান্তিদেব ঘোষের বারোখানি গান। ঘটনা অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের কিছু গান আছে। এই রেকর্ডে শান্তিদেব ঘোষ সেই ভূমিকাটুকু দিয়ে গান গেয়েছেন ফলে শ্রোতাদের উপলব্ধির সীমানা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। এই জাতীয় পরীক্ষারও ভারতীয় কোন রেকর্ড কোম্পানী কর্তৃক সম্ভবত সূত্রপাত। তুচ্ছ ঘটনাকে অতিক্রম করে গান কিভাবে সাম্প্রতিক থেকে চিরকালীন হয়ে যায় এই গানগুলি তারও উদাহরণ। একালের নৃত্যনাট্যের বিপরীত, নৃত্যনাট্যে শুধু গানের কথাগুলিকে একঘেয়ে মুদ্রা দিয়ে অভিব্যক্ত করে তাৎক্ষণিক আবেদন সৃষ্টি করা হয়। অনুরূপভাবে শান্তিদেব ঘোষের গানও চলতি ধারণার বিপরীত। প্রতিটি গানে যখন সুরেলা আধো-আধো উচ্চারণে গদগদ গায়কী অনসৃত হয়—শান্তিদেব ঘোষ তখন বেপরোয়াভাবে গানের যথার্থ ছন্দ প্রকাশেই তন্ময় হন—যেমন থামাও রিমিকি ঝিমিকি গানের প্রথম 'থামাও' কথাটি—যেটা শুধু সুরেলা আবৃত্তিতে সম্পূর্ণ হত না কিংবা কাটা কাটা উচ্চারণে 'সে কোন বনের হরিণ' গানে যখন সা গা বলা হয় তখন অনুষঙ্গ স্পষ্ট হয়—অনেকেই মীড় দিয়ে চড়ার সুর থেকে শুদ্ধ গান্ধারে আসেন। এই অভিজ্ঞতা ঘটে 'ওলো সই ওলো সই, এবং 'সর্ব খর্ব তারে দহে' গানেও। বাউলাঙ্গ গান শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে সবচেয়ে বেশি প্রাণবন্ত হয়—তাই ব্যক্তিগতভাবে আমার 'দুঃখ রাতে হে নাথ' কিংবা 'সময় কারো যে নাই', গানের থেকে অনেক ভাল লাগে 'আমার কণ্ঠ হতে' অথবা 'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে'। 'মেমোরেবল টেগোর সঙস' নামে আর একটি লংপ্লেইং রেকর্ডে কে এল সায়গল, পংকজকুমার মল্লিক, দেবব্রত বিশ্বাস, সুবিনয় রায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ বিশ্বাস, রাজেশ্বরী দত্ত ও চিত্রলেখা চৌধুরীর স্মরণীয় গান পুনঃ সংকলিত, তবে আবারও সেই একই ভুল 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানে সুরকার হিসাবে পংকজকুমার মল্লিকের উল্লেখ নেই (যেটা কবিতায় সুর করার উজ্জ্বল উদাহরণ)।

আর একটি লং প্লেইং রেকর্ডে দেবব্রত বিশ্বাসের বারখানি গানের সংকলন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কীর ক্ষেত্রে যাঁর ব্রাহ্মণত্বের অধিকার—জানি না তিনি আজ কোন অভিমানে ব্রাত্য হয়ে রইলেন। এই সংকলনে সেই ব্রহ্ম সংগীতের ঝরনা ধারা। দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে 'ওরে যায় না কি জানা' গানে খাদের কোমল ধৈবত যেভাবে আসে, সেটি খুব সুলভ নয়। গানের প্রকাশভঙ্গীতে তিনি যখন 'কাজ করে সব সারা/ওই এ নিয়ে গেল কারা' লাইনে 'ওই' শব্দটি উচ্চারণ করেন বা 'আমার যেদিন' গানে 'হায় হায়' শব্দটি প্রি-ভিবাইব্রেশন টেকনিককেই উজ্জ্বল করে। গানের নাটকীয়তার পরীক্ষায় দেবব্রত বিশ্বাস সব সময় সফল। 'অকারণে অকালে মোর' গানটিতে 'ঘরের লোকে কেমন কইলো মোরে'/আঁধারে পথ চিনবে কেমন করে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে কথা কয়টি একজন মহিলা শিল্পী গেয়ে ওঠেন আঁধারে পথ চিনবে কেমন করে (অনুরূপ পরীক্ষা 'জানি নাইগো সাধন তোমার বলে কারে' গানটিতেও আছে) সঞ্চারীর আগে সেতারের ঝালা তারপর 'হঠাৎ শিরে লাগল আঘাত বনের শাখাজালে' এবং শেষে লয় ছাড়া 'এসেছে মোর চির পথের সাথী' গানটির বক্তব্য শ্রোতার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দেবব্রত বিশ্বাসের গানে সঙ্গীতানুষঙ্গের একটি বিশেষ মূল্য আছে যা শুধু গান অনুসৃতি নয়। এই লং প্লেইং-এ 'তার হাতে ছিল' এবং 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়' গানের প্রিলিউড প্রায় এক, শুধু যন্ত্রের বিভিন্নতা আছে। যা একটি রেকর্ডে শুনলে কানে লাগে। 'আমার যেদিন ভেসে গেছে' গানে 'ছায়া' শব্দে তিনি দুবার দম নিয়েছেন—এটা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। ভি বালসারার পরিচালনায় রবীন্দ্রসংগীতের অর্কেস্ট্রা এবং একক যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। অর্কেস্ট্রায় ভায়োলিন-এর প্রাধান্য। এই প্রাধান্য 'রোদন ভরা এ বসন্ত' গানে যতটা ভাল লাগে 'মনে রবে কি না রবে আমারে' গানে সেরকম লাগে না। 'আলো আমার আলো' গানে পার্টগুলি সুসংবদ্ধ—বিশেষভাবে ভাল লাগে ম্যাণ্ডোলিন-এর অংশ। বাল্মীকী প্রতিভায় গানের টোটাল অর্কেস্ট্রীয় আশ্চর্যভাবে ভায়োলিন কাজ করছে 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে' গানে। একক যন্ত্রসংগীতের মধ্যে সলিল মিত্রের ভায়োলিন—(এসো শ্যামল সুন্দর) নির্মল বিশ্বাসের এসরাজে 'দিনগুলি (মোর সোনার খাঁচায়' এবং চন্দ্রকান্ত নন্দীর বাঁশিতে 'গ্রামছাড়া ওই রাংগা মাটির পথ' ভাল লাগল। ভাল লাগে নি বিন্যুৎ বোসের গীটার, ইউনিভক্সে ভি বালসারার 'তোমার সাজাব যতনে' অন্য স্টাইলে বাজালে ভাল হত, তাঁর মত শিল্পী শুধু স্টোক্যাটোতে বাজানোর জন্যে শুধু উজ্জ্বলতাই আভাসিত হয়—অন্য ভাবটি অস্পষ্ট থেকে যায় (সাজাবো সকরুণ বিরহ বেদনায়/সাজাব অক্ষয় মিলন সাধনায়)।

ইপি রেকর্ডে সুবিনয় রায় চারখানি গান গেয়েছেন। 'সুধা সাগর তীরে' গানে তিনি অনন্য এবং 'এ কি সুগন্ধ হিল্লোল' গানে সেই পরিচিত মর্যাদাবান গায়কী। এবং 'মধুররূপে বিরাজো' গানে শান্ত সমাহিত সৌন্দর্য [illegible] কুঞ্জে' গান ততটা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী নয়। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি গানের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগে 'ঘোর দুঃখে জাগিনু', বিভাস রাগে ত্রিতালে নিবদ্ধ এই গানটি গেয়েছেন তিনি স্বচ্ছন্দে প্রচলিত রাবীন্দ্রিক আড়ষ্টতাকে বর্জন করে সম্পূর্ণ মার্গসঙ্গীতের ঢংয়ে। 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' গানের আবেদনও তিনি যথার্থ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একই কথা বলা যায় 'আজি যে রজনী যায়' গানটি সম্পর্কেও। কিন্তু তাঁর গানে চলে পড়া ভাবে যে অনাস্বাদিত মাধুর্য আছে—সেটা মাঝে মাঝে বিপত্তি ঘটায়—যেমন 'যাই যাই ছেড়ে দাও' গানে 'ছিল যত সহিবার—সয়েছি তো অনিবার' লাইনে গানের সঙ্গে সঙ্গীতানুষঙ্গও বিপথগামী হতে হতে বেঁচে যায় কোনরকমে। রঞ্জন ঘোষ নতুন শিল্পী—তাঁর চারটি গানের অনেক সম্ভাবনাই চাপা পড়ে যায় হারমোনিয়মের দাপটে—শিল্পীর কণ্ঠ সম্পদ থাকলেও সেই কণ্ঠ মার্জিত নয়। একটি রেকর্ডে তিনজন শিল্পী ছয়টি গান গেয়েছেন। সুবীর সেন গেয়েছেন ভালই কিন্তু এত পরিচিত গান এবং এতবার রেকর্ড হওয়া যে তুলনামূলক আলোচনা আসবেই, তখন ত্রুটিই বড় হয়ে দেখা দেবে। 'রোদন ভরা এ বসন্ত' গানে তিনি অবশ্য জিতে গেছেন। সবচেয়ে ভাল লেগেছে ইন্দ্রাণী সেনের গান। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলা দরকার—ইন্দ্রাণী সেনের রবীন্দ্রসঙ্গীতে অন্য একজন শিল্পীর প্রভাব আছে অথচ ওঁর আধুনিক বা অন্যান্য গানে গলা অন্যরকম হয়ে যায়—একজন উজ্জ্বল সম্ভাবনার শিল্পী বলেই এটা উল্লেখ করা দরকার। কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ জোরালো, সেই তুলনায় অভিব্যক্তি জোরালো নয়। এই রেকর্ডে যন্ত্রানুষঙ্গ খুব দায় সারা ভাবে করা হয়েছে—এমনকি 'দীপ নিভে গেছে মম' গানে পারো লাইনটিও বাজেনি, দুবার পা মা গা বাজিয়ে সুর ধরানো হয়েছে।

পথেপ্রান্তরে

এইচ এম ভি রেকর্ডে রঞ্জনপ্রসাদ নিজের লেখা সুরে এবং গীটার বাজিয়ে চারটি গান গেয়েছেন। গানগুলি ব্যালাড জাতীয়। এরমধ্যে ভাল লাগে প্রচলিত অসমীয়া গান 'চল এখনি আসাম যাব' এবং ক্যালিপসো সঙ্গীত অবলম্বনে 'পথের প্রান্তে ঐ সুদূর গাঁয়'। নিজস্ব গানের মধ্যে 'জনহীন জাতীয় সড়ক' লেখা ও গাওয়া ভাল—কিন্তু 'বন নয় শুধু বনতল' গানে বারে বারেই জ্ঞা মা পা মা জ্ঞা সা বেসুরো লাগে। রঞ্জনপ্রসাদের গান যথার্থভাবেই আধুনিক কিন্তু স্বাবলম্বী নয়—অবলম্বিত আধুনিক। ক্যালিপসো গান অবলম্বনে একই সুরে সলিল চৌধুরীর গান 'জানি না জানি না কোন' (স্টীল গুপ্ত) শুনলেই এই মন্তব্যের সত্যতা বোঝা যাবে—তবু রঞ্জনপ্রসাদ নিশ্চিতভাবেই আধুনিক গানে অন্যতর আস্বাদ আনেন—নিয়মিত শিল্পী হলে হয়ত ফল অন্যরকম হ'ত।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

পঞ্চকন্যা

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি

বিবিধ

লণ্ডনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

লনডনে ময়ারা গান্ধী হলে সাগর পারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করা হয় ২৬শে মে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী এন জি গোরে।

"হে নূতন দেখা দিক আর বার

এই রবীন্দ্রসংগীতের কনসার্ট বাজিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন। ভারতের রাষ্ট্রদূত রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মালা পরিয়ে দেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যে কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি শুধু কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিল্পী, দার্শনিক, শিক্ষক, দেশপ্রেমিক। ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান। তাঁর সাহিত্য শুধু বাঙালী নয় সমগ্র ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুস্মিতা ভট্টাচার্য ও গোপা বোস সুললিত কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। তবলা সংগত করেন গোলকমোহন চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন সংগীত' আবৃত্তি করে শোনান ডাঃ সুচেতা রায়।

এ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ঋতুরঙ্গের ওপর কনসার্ট এবং ব্যালে। এ এক নতুন পরীক্ষা। প্রথমে হয় নববর্ষের সংবর্ধনা 'এসো হে বৈশাখ' তারপর ছটা ঋতুর ছটা গান বাজান হয়। আশ্চর্য লাগে ইংরাজ ছেলেমেয়েরা বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত বাজিয়ে চলছে। তাদের বয়স তেরো থেকে সতেরো। বয়েস কম কিন্তু সুরের কাজ চমৎকার। ভায়োলিন বাজায় নীলাদ্রি ভট্টাচার্য, ডেবরা রেনলডস, নফিসা মাসানি। ক্লারিয়োনেট বাজায় ক্যারল বেণ্ট, ওবো বাজায় নভরোজ মাসানি, ট্রাম্পেট কেভিন কুক। তিনটে গানের সঙ্গে ব্যালে নাচের ব্যবস্থা ছিল। তার মধ্যে সব চেয়ে আকর্ষণীয় হয় "হিমের রাতে ওই গগনের "দীপগুলি রে" গানের সঙ্গে নাচ। ব্যালে নাচে অংশ গ্রহণ করে ক্রয়া স্মিথ, রেবেকা ফেভার ও জেনি ডেসবারা। প্রদীপ হাতে ব্যালে নাচ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের এক অভিনব সম্মেলন। কোরিওগ্রাফি শ্রীমতী বাণী ভট্টাচার্যের।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

মাধবী পারেখ (১৯৪২—)

মাধবী পারেখের আত্ম-আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠার কাহিনী স্বশিক্ষিত শিল্পীদের মধ্যে তাঁকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে। শিল্পকলা বিদ্যালয়ে যাননি বলেই তাঁর কাজ লোকশিল্পীদের মতো স্বতঃস্ফূর্ত। বাঁধাবাঁধি নিয়মকানুনের ফাঁদে তিনি পড়েননি। তিনি চিত্ররচনা করা শুরু করেন ১৯৬৪-তে—প্রধানত তৈলাক্ত খড়ি (প্যাস্টেল) এবং তেলরঙের মিশ্র মাধ্যমে ক্যানভাসের ওপর। তাঁর কাজ করার উৎসাহ তাঁর চিত্রকর স্বামী মনু পারেখের সাহচর্যে শতগুণ বর্ধিত হয়।

মাধবী গুজরাতের সঞ্জয় গ্রামে লোকায়ত পরিবেশে বড় হন। গ্রামের মানুষজন, পশু-পাখি, আকাশ-আলো তাঁর শৈশব-কৈশোরকে ধুলিমাটির স্পর্শ দিয়েছিল। মাঠে চাষ, জল-সেচ, হুঁকো হাতে বৃদ্ধ, নবান্ন উৎসবের গান, মাটির হাঁড়িবাসন, মাটির দেওয়ালের চিত্রাঙ্কন, কাঁথা—গ্রামীণ জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে দিকটা তাঁর শিল্পসত্তাকে ক্রমে গড়ে তুলেছিল। পরম্পরাগত শিল্পকলা তাঁর হাতে রূপান্তরিত হয়ে নতুনতর তথা আধুনিক চিত্রভাষায় পটে উপস্থিত হলো। সাধারণ অভিজ্ঞতা তাঁর কল্পোল-কল্পনায় খুবই ব্যক্তিগত রূপকল্প নিয়ে হাজির হলো।

প্রচ্ছদ-চিত্রটি অবলোকন করুন। একরঙা হালকা পটভূমির ওপর একটি লোকায়ত রূপারোপিত (স্টাইলাইজড) মূর্তি এঁকেছেন। গুজরাতী লোকশিল্পের সূচীকাজের মতো করে বর্ণলেপন এবং বুনোটের কাজ। মুখের ওপর দিকটা নীল। নাক থেকে নীচের অংশ হলুদ। সমস্ত দেহে নীল সবুজ নানা রঙের বাহার। আর দেহের মধ্যে মণ্ডনধর্মী প্রতীকের (মোটিফের) মতো গাছপালা, মানুষ, জীবজন্তু। সমস্ত ছবিতে কাঁথার মতো, বা আলপনার মতো সারল্য আছে। বর্ণের এখানে আলাদা মাত্রা থাকলেও মূলত কাজটি রৈখিক এবং সুস্পষ্টভাবে রেখা দিয়ে বর্ণকে ভাগ করা হয়েছে। অথচ বর্ণানুরাগ এমনই তীব্র যে সমস্তটা মিলে ছবিতে প্রবলভাবে একটা প্রাণপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অথচ লোকধর্মের যাদুবিশ্বাসের একটা ছাপও যেন পড়েছে। মাধবীর ছবিতে আশ্চর্য সরস একটা জগৎ উঁকি মারে।

অন্যান্য ছবিতেও মাধবী আঁকেন আত্ম-অচেতন মানুষজন, পোকামাকড়, মাছ, পাখি, অদৃষ্ট সব জীবজন্তু। তারা জীবন-নৃত্যে হাত ধরাধরি করে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। সর্বেশ্বরবাদের মায়াবন্ধনে সব কিছু প্রসারিত হয়ে যেন আপন আদি রূপে প্রত্যাবর্তনের খেলায় জড়াজড়ি করে সংকুচিত হয়। শৈশবের স্বপ্নজগৎকে নারীত্বের পরিণতি দিয়ে দেখেন।

শিশুর দেখা পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতা ভিন্ন অর্থ পায়।

ষাট দশকের গোড়ায় মনু আর মাধবী যখন ত্রিকোণ পার্কের একটি চিলেকোঠায় থাকতেন, তখন থেকেই এই গুজরাতী দম্পতি আমার বন্ধু ও প্রতিবেশী ছিলেন। মনু শিক্ষিত চিত্রকর। মাধু স্বামীর সাহচর্যে নিজের ইচ্ছায় নিজের সহজাত অংকনক্ষমতাকে ক্রম আয়ত্ত করলেন। পরে রাজপুতনা এবং অধুনা দিল্লিতে শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের জাগরণ ঘটে কলকাতায় বিরাট ছাদের ওপর একটি চিলেকোঠায়।

যৌথ প্রদর্শনী : কলকাতা (জোফিন মুচ্ছালা, এবং মনু রাথোড়ের সঙ্গে) ১৯৬৮, ১৯৭১। (মনু পারেখের সঙ্গে) বোম্বাই ১৯৭১। তৃতীয় ত্রিয়েনালে, নতুন দিল্লি (১৯৭৫)। ললিতকলার বার্ষিকীতে নিয়মিত অংশ গ্রহণ। ললিতকলার জাতীয় পুরস্কার (১৯৭৯)। একক প্রদর্শনী ১৯৭২ (কলকাতা), ১৯৭৭ বোম্বাই এবং নয়াদিল্লি। বড় ছবি আঁকেন অনায়াসে, কিন্তু অনুচিত্র সমান ভাল হাত।

মাধবীর অংকনের সাদাসিধে সারল্যের সঙ্গে হয়তো কোথাও তুর্কির রুশোর মিল আছে। আবার নেইও। কারণ, রুশোর যে ক্ষেত্রে শহুরে হয় আদিম হতে চান, সে ক্ষেত্রে শহরে এসে মাধবী বাল্যলীলার ক্ষেত্র হিসাবে গ্রামের জীবনের কথা ভাবেন। ছবিতে লেখেন কোনো ভয়াবহ আদিম বনের কথা নয়, কিন্তু গাঁয়ের রূপকথা। তাঁর মনের অবচেতন অংশ ভেসে ওঠে পটে। কিন্তু তার মধ্যে সকল কালের কিংবদন্তি গাথার অংশটুকু ছায়া ফেলে। খুবই যা ব্যক্তিগত তা সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

Regd No. WB|CC|184|74

অবাঞ্ছিত লোম দূর করুন বাঞ্ছিত ক্রীম অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার দিয়ে!

মেয়ে হয়ে আপনি ক্ষুর দিয়ে কি করছেন ?
কামাচ্ছেন ? কিন্তু সে তো পুরুষদেরই সাজে !

ক্ষুর দিয়ে শুধু চামড়ার ঠিক ওপরের স্তরের লোমটুকুই কামানো যায় — তাই লোমের গোড়াগুলো খরখরে খোঁচা হয়ে থাকে ··· এমনকি কেটে ছড়েও যায় !
আপনার দরকার মেয়েদের যা মানায় তাই — কোমল অ্যান ফ্রেঞ্চ — হেয়ার রিমুভার।

এটি চামড়ার গভীরে গিয়ে কাজ করে, যেখানে ক্ষুর পৌঁছতেই পারে না।
তাছাড়া, ব্যবহার করাও খুব সহজ।

শুধু ক্রীম লাগান ··· একটু অপেক্ষা করুন ··· তারপর মুছে ফেলুন — অবাঞ্ছিত লোমও উঠে আসবে !

এবার দেখুন—আপনার রূপের বাহার—হাতপা থাকবে রেশমের মত মোলায়েম — সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার

এখন ২টি সুগন্ধে।

200-HR-244 BEN

ক্লোজ-আপ-তাজা নিঃশ্বাস, আর
ক্লোজ-আপ-সাদা দাঁতের জন্যে চাই
স্বচ্ছ লাল
ক্লোজ-আপ
একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ
Close-up
Close-up
Close-up
এমন নিবিড় মুহূর্তের জন্যে আপনার প্রয়োজন নতুন
ক্লোজ-আপ—এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের টুথপেস্ট।
এর শক্তিশালী মাউথওয়াশ আপনার নিঃশ্বাসকে করবে
ক্লোজ-আপ-তাজা, এর বিশেষ দুটি উপাদান আপনার
দাঁতকে করবে ক্লোজ-আপ-সাদা।
কোলকাতায় এবং মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট,
গোয়া, পশ্চিম বঙ্গ, তামিল নাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্র
প্রদেশের বাছাই করা শহরে পাওয়া যায়।

Regd No. WB|CC|184|74

চিঠিপত্র

তাম্বুল বিলাস

২৮শে এপ্রিলের দেশে অমিয়বাবুর 'তাম্বুলবিলাস' পড়ে ভাল লাগল। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা নিবেদন করছি। আনুমানিক ২০০ খৃীঃ পূর্বাব্দ থেকে তাম্বুল সেবন প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত হলেও সুপ্রাচীন কাল থেকে তাম্বুল সমাজজীবনে স্থান করে নিয়েছিল। শুধু বৈদিক সাহিত্যে কেন, রামায়ণ, মহাভারত, মনুস্মৃতিতেও এর উল্লেখ নেই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাম্বুল শব্দের ব্যবহার থাকলেও তাম্বুল সেবনের কথা বলা নেই। বাৎস্যায়নের কামসূত্র ও বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতা পাঠে অনুমিত হয় যে, গুপ্ত যুগে তাম্বুল সেবনের প্রচলন ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে। অমিয়বাবু মার্কোপোলোর সাক্ষ্য হাজির করেছেন। অথচ হিউয়েন সাঙ যে প্রতিদিন রেশন হিসেবে ১২০টি পান পাতা ও ২০টি সুপারি পেতেন তার উল্লেখ করেন নি।

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, তাম্বুল ও গুবাক শব্দদ্বয় অস্ট্রিক। কেউ কেউ একে জাভা থেকে আমদানি বলে মনে করেছেন। পানের অপর নাম 'নাগপত্রী'। সেকারণে সাপ ও হাতীর দেশ অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতকে তাম্বুলের জন্মস্থান বলে নির্ণয় করতে চেয়েছেন J S Pade। তিনি আবার তাম্বুল-গ্রহণকে বলেছেন তান্ত্রিক রীতি। পুরাকালে শূদ্রদের কাছ থেকে প্রথমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা একে গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরা তাম্বুল সেবনকে সমাজে চালু করে তান্ত্রিক আচার বলে।

প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী
মেদিনীপুর

বিস্মৃত নগরী লুম্বিনী ও কপিলাবস্তু

গত ২৮ এপ্রিল সংখ্যায় আশিস আচার্য লিখিত "বিস্মৃত নগরী লুম্বিনী ও কপিলাবস্তু" প্রবন্ধে শ্রীআচার্য কানিংহাম সাহেবের মত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, "লুম্বিনী থেকে কপিলাবস্তুর দূরত্ব ফা হিয়েন এবং হিয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ৯ মাইল এবং ১৪/১৫ মাইল। দুজনের বর্ণনায় দুরকম পার্থক্য লক্ষ করে কানিংহাম সাহেব অনুমান করেছেন ফা হিয়েন এবং হিয়েন সাঙ দুজনে কপিলাবস্তু বলে দুটো আলাদা স্থান ভ্রমণ করেছেন। বস্তুত ফা হিয়েন বর্ণিত নগরটি 'ককুচ্ছবুদ্ধ' বুদ্ধের জন্মস্থান। এবং হিয়েন সাঙ বর্ণিত নগরটিই গৌতম বুদ্ধের শাক্য রাজবংশীয়দের কপিলাবস্তু। এই হিসাবে হিয়েন সাঙই প্রকৃত কপিলাবস্তু নগরটি প্রথম দর্শন করেন।" কানিংহাম সাহেবের পরবর্তীকালে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদদের অনুসন্ধান ও মতানুসারে এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধানে ফা হিয়েন বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী পিপরাওয়া সন্নিহিত এলাকা যে কপিলাবস্তু নগর সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ফা হিয়েনের বিবরণলিপি খুঁটিয়ে দেখে বিজ্ঞজনরা যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা হলো ফা হিয়েন লিখেছেন লুম্বিনী থেকে কপিলাবস্তুর দূরত্ব নয় মাইল। আর হিয়েন সাঙ লিখেছেন ষোল মাইল। দূরত্বের এই ফারাক দেখে বিজ্ঞজনেরা ভ্রমণলিপিতে দেখেন হিয়েন সাঙ কপিলাবস্তু পরিভ্রমণ করেন ঘুরপথে, সোজা পথে নয়। ফা হিয়েন ভ্রমণ করেন সোজা পথে। হিয়েন সাঙ বর্ণিত ভ্রমণলিপিতে দেখা গেছে তিনি 'শরকূপ' নামক এক জায়গা অতিক্রম করে কপিলাবস্তু এসেছিলেন, ফলে ছয় সাত মাইল পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তাই অনেকেরই ধারণা দুজনে একই জায়গা ভ্রমণ করেছিলেন কি না। আর এই "শরকূপ" স্থানটি কোথায় তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্বীকৃত এবং ফা হিয়েন বর্ণিত কপিলাবস্তু তথা পিপরাওয়া যে কপিলাবস্তু নগর তা আরও দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেওয়া চলতো যদি হিয়েন সাঙ বর্ণিত ভ্রমণ বিবরণলিপিতে ঘুরপথের দূরত্বের হদিস মেলানো যায়। এ বিষয়ে বিজ্ঞজনদের আলোচনার আশা রাখি।

চঞ্চল সিংহরায়
রোহিয়া, (গড়াপ)

'পৌরাণিক মনে কাম'

'দেশ' পত্রিকায় গত ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅশোক রুদ্রের 'পৌরাণিক মনে কাম' রচনাটি আগ্রহ সহকারে পাঠ করেছি। শ্রীরুদ্র বিভিন্ন পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পৌরাণিক মনে কামের যে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য। তবে রুদ্র মহাশয়ের আলোচনার যেটি মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় তার সঙ্গে হয়তো অনেক পুরাণ-পাঠক একমত হতে পারবেন না। অন্তত আমার পুরাণ-পাঠের অভিজ্ঞতা রুদ্র মহাশয়ের সিদ্ধান্তের বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। শ্রীযুক্ত রুদ্র তাঁর আলোচনার শেষে বলেছেন, 'হিন্দু ধর্মাদর্শে কামকে সহজ সরল, সুন্দরভাবে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।' এই প্রস্তাবটা একেবারেই মানা যায় না। তিনি তার পরেই বলেছেন 'হিন্দু সভ্যতা কামের ব্যাপারে এক 'মনোবৈকল্য' দ্বারা আক্রান্ত যে বৈকল্যের ইংরেজী নাম অবসেশন।' আমার বক্তব্য হলো কাম ভাবনার মধ্যে যে ধরনের 'অবসেশন', উত্তেজনা এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট মনোবিকলন আমরা আমাদের আধুনিক সভ্যতা ও আধুনিক সাহিত্যে অবিরাম দেখতে পাই—প্রাচীন হিন্দু পুরাণ সেই ধরনের কামজ মনোবৈকল্য থেকে মুক্ত ছিলো। ফ্রয়েডীয় অর্থে 'লিবিডো-ভারাতুর' কোনো দেবতার মূর্তি বোধ হয় আমরা শ্রীরুদ্র কথিত দেবতাদের ব্যভিচার বা 'লাম্পট্যের' লীলার মধ্যে খুঁজে পাবো না।

'পুরাণ' কথাটির নিহিত অর্থই হলো তা একাধারে পুরাতন ও 'চিরন্তন' অতএব আধুনিক অর্থে যা কামের বিকার তাও যে প্রাচীন হিন্দু পুরাণে খুঁজে পাওয়া যাবে, এমন কি পূজনীয় দেবতাদের মধ্যেই তার সাক্ষাৎ

ব্যাপার—কারণ দেবতার সৃষ্টির মূল তো সেই একাধারে 'আদিম' এবং 'চিরন্তন' মানুষের কল্পনাই কাজ করছে, কিন্তু তাই বলে 'কামের প্রভাবে দেবতা ও ঋষিরা এমন কাজ করে বসতেন যার শত ভাগের এক ভাগ করলেও আজকালকার দিনের সভ্য সমাজের ছাত্রছাত্রীদের কান ধরে কলেজ থেকে বার করে দেওয়া হবে'......এই ধরনের উক্তি কেবল লঘু নয়, বিশেষ-ভাবে ভ্রমাভাস-সৃষ্টিকারী। কারণ যে কোনো নিবিষ্ট পাঠক আমাদের পুরাণে দেবতাদের কামলীলার কাহিনী পাঠ করলে অনুভব করতে পারেন যে একটি তাৎক্ষণিক এবং ইন্দ্রিয়গত উত্তেজনার ভাব নিয়ে দেবদেবী বা মুনি ঋষিদের জীবনের কামজ-নাটকটি শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত সেই নাটকটিকে প্রসারিত করে বিশ্ব প্রকৃতি, বিশ্ব নিয়তি এবং বৃহত্তর অর্থে ধর্মবোধের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। অর্থাৎ কামকে 'রিরংসার' সমগোত্রীয় রূপে না দেখে, তাকে জীবনের এবং জগতের এক 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' এবং 'আদিশক্তি' বলেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

শ্রী রুদ্র পুরাণের কামভাবনার প্রসঙ্গে 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত'-এ কথিত স্ত্রী পুরুষে ভেদজ্ঞানহীন ঋষ্য-শৃঙ্গের উদাহরণ দিয়েছেন। শ্রী রুদ্র মুনিপুত্রের প্রথম 'নারী পরিচয় লাভ' এবং প্রথম কামোদ্দীপনের 'আনন্দের' কথা বলেছেন—কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে লোমপাদের বন্ধ্যা নগরীতে বৃষ্টিপাতের বিষয়ে নীরব থেকেছেন। কিন্তু প্রথম নারী সমাগমে ঋষ্যশৃঙ্গের ব্রহ্মচর্য নাশ এবং তাঁর আগমনে বন্ধ্যা-নগরীতে বৃষ্টিপাতের প্রসঙ্গটি যদি ভেবে দেখা যায়—তাহলেই হয়তো আমরা আমাদের পুরাণে কামের 'বিশ্ব-রূপ' দর্শন করতে পারবো। পুরুষের বীর্য এবং আকাশের বৃষ্টিকে সমন্বিত করে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনীতে 'উর্বরতা'র যে চেতনা গড়ে তোলা হয়েছে—তার ভিতর দিয়েই হয়তো আমাদের পুরাণে কামচেতনা বা দেহ-কামনার সহজ সরল সুন্দর এবং চিরন্তন রূপটি চিনে নেওয়া সম্ভব।

পরিশেষে বলি, শ্রীযুক্ত রুদ্রের রাবণ সম্পর্কিত উক্তিকে সমর্থন করেও রাবণ বিষয়ক তাঁর 'দাবী'টিকে মানা গেল না।

কমলেশ চট্টোপাধ্যায়
বর্ধমান।

ভিকটোরিয়া ওকাম্পো

শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানির লেখা "ভিকটো-রিয়া ওকাম্পো : 'ভালোবাসা'" প্রবন্ধটি পড়লাম। রবীন্দ্রনাথের পেরু যাত্রার সংকল্প যে বাতিল করতে হয়েছিল তার একমাত্র কারণ হৃদ্‌যন্ত্রের দৌর্বল্য নয়। তার হয়তো কিছু নিহিত কারণ ছিল, সেগুলি জানা যায় প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্রজীবনী' থেকে, কাইজারলিঙের স্মৃতিচর্চা এবং রোম্যাঁ রলাঁর ভারত-বিষয়ক জার্নাল থেকে।

আমার একটি প্রশ্ন আছে। রবীন্দ্র-নাথ বিষয়ে ভিকটোরিয়া ওকাম্পোর স্পেনীয় ভাষায় লেখা বই, যেটি ওকাম্পোর ম্যাশ্রুনাথ[?] নামে অনুবাদ করেছেন শ্রীশঙ্খ ঘোষ, সেই বই শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানির আগ্রহেই লিখেছিলেন ভিকটোরিয়া। "কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, শতবার্ষিক সংগ্রহে মুদ্রিত হয় এর আংশিক অনুবাদ। আরো খানিকটা অংশ পাওয়া যায় ১৯৬১ সালের 'ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' পত্রিকার এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সংখ্যাটিতে। কিন্তু এ সব অংশেও ইংরেজী আর স্পেনীয় পাঠ সবত্র একরকম নয়। ইংরেজী পাঠ বিষয়ে ভিকটোরিয়ার মনে হয়েছে যে 'দেয়ার আর মোর থিংস মিসিং ইন ইট'।" কেন ওকাম্পোর বইয়ের পূর্ণাঙ্গ স্প্যানিশ ভার্সন-এর যথাযথ অনুবাদ রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর সময় প্রকাশিত হলো না, কেন ওকাম্পোর বিনা-অনুমতিতে সেই বইয়ের অংশ-বিশেষ এখানে-ওখানে ছাপা হলো সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে, ইংরেজী ও স্পেনীয় পাঠের তারতম্য ঘটতে পারলো কার নির্দেশে? শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানি সাহিত্য আকাদেমির সেই সময়কার সম্পাদক। তিনিই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, জবাব দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর।

অশ্রুকুমার সিকদার
শিলিগুড়ি

বরাবর যাত্রায় ভীষণ বিপদ

"দেশ" সাপ্তাহিকের আমি নিয়মিত পাঠক। এই সংখ্যার (১৯ মে, ১৯৭৯—৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬) "দেশ"-এ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুজিত-কুমার সেনগুপ্ত বিরচিত রবীন্দ্র-জীবনীমূলক প্রবন্ধ "বরাবর যাত্রায় ভীষণ বিপদ" আগ্রহ সহকারে আরম্ভ করে পূর্বপঠিত মনে হল। অনুসন্ধা-নান্তে বহু পুরাতন ১৩২১ সালের মাঘসংখ্যা "মানসী"র (নাটোরাধিপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত) কলেবরে 'রবীন্দ্র-সম্পদে' নামে উক্ত প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ চিহ্নিত করলাম। লেখক শ্রীস[?]শচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়।

"মানসী"র প্রবন্ধ আদ্যন্ত সাধু-ভাষায় লিখিত লেখকের জবানী। "দেশ"-এর প্রবন্ধ চলতি ভাষায় লেখা, সতীশচন্দ্র এখানে এই ব্যর্থ অভিযানের একজন চরিত্র মাত্র। কিছু কিছু বিস্তৃতি আছে, সেখানে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত উৎস-নিহিত ক্ষীণ সূত্রপথে স্বাবলম্বী। মানসীর"—বাবা দেশে 'ক'বাবু। পেয়াদার পাগড়ী বন্ধক থেকে শুরু করে যাবতীয় খুঁটিনাটি উপাদান অক্ষত রূপে সংরক্ষিত। ইতস্তত সন্নিবিষ্ট সকল তথ্য লেখক নিপুণ হস্তে কখনও বা স্বীয় সুবিধা হেতু অনত্র প্রক্ষিপ্ত করেছেন, কিন্তু মূলত দুইটি লেখাই এক। ওইদিনে রচিত রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য গানগুলিও যথাযথ মুদ্রিত হয়েছে। অবশ্য ওগুলির নিম্নে মূল প্রবন্ধের প্রথায় তারিখ ও স্থান দেওয়া থাকলে গবেষকের অধিক আনন্দ বর্ধন করা যেত।

দীর্ঘ চৌষট্টি বৎসর পূর্বে প্রকাশিত রচনার কপিরাইটের প্রশ্ন ওঠে না সত্য, কিন্তু মূল লেখককে বিলুপ্ত করে নূতন স্বরচিত প্রবন্ধ হিসাবে মুদ্রণের

...কারণ, লেখক আমাদের জানাবেন কি? একটি দুর্লভ প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে "মানসী" থেকে নিজরূপে সমগ্র লেখাটি উদ্ধার করে দিলেও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বঙ্গসাহিত্যের সমূহ উপকার সাধিত করতে পারতেন।

বাণী রায়
কলকাতা-২৯

নাস্তিকের ধর্ম জিজ্ঞাসা

বহুকাল বাদে অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ পাওয়া গেল ("নাস্তিকের ধর্মজিজ্ঞাসা"—দেশ, ৩১ মার্চ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আফসোসের কথা এই যে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক রায় প্রশ্নটির গভীরে যাননি, এবং শেষ পর্যন্ত নিজের বক্তব্য নিজেই খণ্ডন করে কিছু বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে আমরা আরও গভীর ও চিন্তাপূর্ণ আলোচনা আশা করেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি বিষয়টি নিয়ে "ইন্টেলেকচুয়ালিজম" করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

ধর্ম মানব অস্তিত্বের এক বৈচিত্র্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। পণ্ডিতপ্রবর শিবনারায়ণ রায়কে আমার সচেতন করে দেওয়া সাজে না যে আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ধর্ম মানুষের বেঁচে থাকায়, সমাজজীবন যাপনে, যুদ্ধবিগ্রহে, শান্তিস্থাপনে, শিল্পসভ্যতা সংস্কৃতির প্রসারে, ধ্বংসে, সৃষ্টিতে, সেবায়, স্বার্থান্বেষী বৃদ্ধিতে এক অনন্য ভূমিকায় রত। ধর্মবোধ এক অদ্ভুত শক্তি এবং আশ্চর্য যে, এর মধ্যে একটা পরস্পর বিরোধিতাও রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দকে উল্লেখ করে বলা যায়, "মানব অভিজ্ঞতায় প্রেমের চরম অভিব্যক্তি ধর্ম থেকেই সঞ্জাত... তেমনি মানব জীবনে জঘন্যতম বিদ্বেষও ধর্ম থেকেই উদ্ভূত।" (বৈদিক ধর্মের আদর্শ: স্বামী বিবেকানন্দ: রচনা সংগ্রহ)। একমাত্র ধর্মের এই বিচিত্র শক্তি রয়েছে।

অধ্যাপক রায় কথান্তরে সেকথা স্বীকারও করেছেন এবং জেনে খুশি হলাম ধর্মকে তিনি আফিম গাঁজা বা বিকৃত মোহকারী শক্তিমাত্র মনে করেন না কারণ তিনি এমন ব্যক্তি দেখেছেন যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও উচ্চতম নৈতিক ও মানবিক গুণে দীপ্ত। কী ভাগ্য যে তাঁর অভিজ্ঞতায় এরকম ব্যাপার আছে; আমি দেখেছি বললে তাঁর মত আকৈশোর জিজ্ঞাসু নাস্তিক কি আর সেকথা বিশ্বাস করতেন? ভূত দেখার মত সেটা মানসিক বিভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দিতেন। উড়িয়েই দিতেন, কারণ যাঁরা প্রকৃতিবাদী, লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন এবং নাস্তিক তাঁরা অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রামাণ্য মনে করেন না যদি না সেটা যাচাই করা যায়। কিন্তু সবরকম জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সব সময়ে নিরঙ্কুশ যাচাই করা যায় না। মুশকিল এইখানে।

যাই হোক, অবাক কাণ্ড এই যে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপক রায় 'বানপ্রস্থের বয়সের' কোঠায় পৌঁছেও ধর্মের শুধু "লোকসমর্থনের" দিকটুকু এবং "অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ যাকে ধর্ম আখ্যা দিয়ে থাকেন" (দ্রঃ উল্লিখিত প্রবন্ধ) ধর্মের সেই চেহারাটুকুর সমালোচনা করেই (যা বিশের কোঠার বয়সের যুবকেরা করে থাকে) ধর্মকে খারিজ করে দিলেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে বহু পান্ডা, ধর্মধ্বজী, ব্যবসাদার, জমিদার, ধনবান, সাম্রাজ্যলিপ্সু প্রভৃতিরা ধর্মের নাম করে বহুৎ কুকীর্তি করেছে। কিন্তু সেজন্য ঈশ্বর বেচারাকে ফাঁসি দিয়ে লাভ কি? গণতন্ত্র এবং জনগণের নাম নিয়ে আধুনিককালে বহু রাজনীতিক-মাতব্বর, ধনী, রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতিরা মানুষের উপর অকথ্য নিপীড়ন-অত্যাচার চালিয়েছে ও স্বার্থসিদ্ধি করেছে। তার জন্য শিববাবু কি গণতন্ত্র-ফণতন্ত্র সব "বোগাস" ধাপ্পা বলে খারিজ করে দেবেন?

জানি না উনি কি করবেন; তবে নাস্তিকবাদীর ধর্মজিজ্ঞাসা সম্পর্কে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যদিও ধর্ম, ঈশ্বর, অতিপ্রাকৃত, পুরাণ, কুসংস্কার, অতিকথা, এসব হাত ধরাধরি করে চলে তবুও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এইগুলো সব—বিশেষ করে, ধর্ম এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন দুটি—আলাদা করে দেখা উচিত। কারণ এই দুটির স্বীকৃত উৎস যদি ফিরে যাই (সেটা কল্পনাশক্তি বা ভয়-প্রত্যাশার মানসিকতা হোক—তুঃ শিববাবু—অথবা সন্দিগ্ধ মনের প্রতিক্রিয়াই হোক) তা হলে কি আমরা নিশ্চিত হতে পারবো যে, আদিতে ঈশ্বর-জিজ্ঞাসা ও ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানাদি ও আধিদৈবিক প্রত্যয়ের ব্যাপার একসঙ্গেই শুরু হয়েছিল? কালক্রমেই এইগুলো সব কি জড়িয়ে যায়নি? এবং লোকসমর্থন তথা সমাজ-বন্ধনের খাতিরে (এবং অবশ্যই স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে) ঈশ্বরের সঙ্গে ইনসটিটিউশনাল (প্রাতিষ্ঠানিক) ধর্ম বলা যায়, জড়িয়ে রাখা হয়েছে?

তাই-ই যদি হয় (না হলেও যদি এই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই থাকে) তা হলে ধর্ম ও নাস্তিকবাদের প্রশ্ন দুটি আলাদা করে বিশ্লেষণ করাই সংগত মনে হয় নাকি? না করলে, আমার আশংকা, শক্তি হিসেবে ধর্মের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতার প্রশ্ন অস্বচ্ছই থেকে যাবে।

আরও একটি জিজ্ঞাসা হলো, ঈশ্বর অস্তিত্বের প্রশ্নটি কি শেষ পর্যন্ত এপিসটেমোলজিকাল নয়? কোনও কিছুর অস্তিত্বের স্বীকৃতি যদি জ্ঞানের ওপরই নির্ভর করে তা হলে ঈশ্বর অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের প্রশ্নটিও তাই। তবে মুশকিল হচ্ছে, নাস্তিকের কাছে স্ব-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুই প্রামাণ্য নয়। নাস্তিক কোনও আপ্তবাক্য বা অপর কোনও সাধকের অভিজ্ঞতা স্বীকারে ও গ্রহণে নারাজ। কিন্তু যেহেতু স্ব-অভিজ্ঞতায় নেই, সেহেতু ব্যাপারটাই নেই, এটা কি যুক্তি হলো? মহাকাশে যে নক্ষত্রের আলো আজো বিজ্ঞানীর জ্ঞানে বা যন্ত্রে ধরা পড়েনি, তা কি নেই? এটা কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হবে? কি জানি, বলতে পারি না। আমার জ্ঞান-গম্যি কম, তবে যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয় সংশয়বাদের মত নাস্তিকবাদ কোন কিছুই প্রমাণ করে না, কোন সিদ্ধান্তেই [illegible] "সিদ্ধান্ত হয় না"—এই সিদ্ধান্ত ছাড়া। সুতরাং এই সব বন্ধ্যা তত্ত্ব নিয়ে সময় নষ্ট না করে নিষ্ঠাবান তত্ত্বজিজ্ঞাসু হিসেবে আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে ধর্মের প্রকৃত চরিত্র ও ভূমিকা কি?

আরও মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে: ধর্মবোধ ব্যাপারটা কি? এটা কি নেহাতই সাইকোলজিকাল, না এর মধ্যে স্পিরিচুয়াল প্রশ্ন কিছু জড়িত আছে? কল্পনাশক্তি বা ভয়-প্রত্যাশার মানসিকতা অথবা সন্দিগ্ধ মনের প্রতিক্রিয়া থেকেই ধর্ম ও ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়েছে? না, ঈশ্বর আছেন বলেই এই সব চেতনা ও কাণ্ডকারখানা ঘটছে? অন্য কথায়, মানুষই সব কিছু সৃষ্টি করেছে না মানুষ আবিষ্কার করছে মাত্র? আবহাওয়ার নানান প্রতিক্রিয়া ঘটছে। কারণ খুঁজতে খুঁজতে আমরা হিমালয় বা সমুদ্রকে পেলাম। তা হলে সেটা তো আগে থেকেই ছিল, আমরা আবিষ্কার করলাম মাত্র। তবে কিনা হিমালয়ের ক্ষেত্রে একটা কংক্রিট প্রমাণ পাওয়া গেল, যেটা অহরহ যাচাই করা যাবে। জিজ্ঞাস্য, নিঃসংশয়। কিন্তু নির্জ্ঞান মন, বিবেক বোধ, কল্পনা প্রভৃতির কংক্রিট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অবজেকটিভ প্রমাণ কি? জ্ঞান সংক্রান্ত এই সব প্রশ্নের নিঃসংশয় উত্তর কে দেবে?

সর্বশেষে একটা মন্তব্য না করে পারছি না: কর্মফল, জন্মান্তর নিয়ে অনেক বক্তব্যই বাকী রইলো। এখন জিজ্ঞাস্য যে, ধর্ম কি কেবল লোভ, আসক্তি ও প্রত্যাশা করতেই শিখিয়েছে? প্রাচ্য-বিদ্যার অধ্যাপনায় রত শিববাবুর পক্ষে এই সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর! খৃষ্টানের সেবা-প্রেম ও আত্মত্যাগ, বৌদ্ধের অহিংসা ও অষ্টাঙ্গ ব্রত এবং হিন্দুর জ্ঞান ও নিরাসক্তির সাধনা—এগুলো কোন্ প্রত্যাশা ও লোভ জাগিয়ে তোলে বুঝলাম না।

সোমেন বন্দোপাধ্যায়
মজদিয়া : নদীয়া

কণ্টকল্পিত

গত ১৯ মে-র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের "কণ্টকল্পিত" লেখায় কিছু তথ্যগত ভ্রম আছে মনে হল। আশা করি আমার সংশয় নিরসনে সাহায্য করবেন।

১৯৫৭ সালের সংবর্ধনার তালিকায় আছে অধুনা স্বর্গত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম "ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে বহু বছর সংগীতচর্চা ছেড়ে কেষ্টনগরে ছিলেন। আমরা সংবর্ধনা দেবার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসি।"

এটা প্রায় সব বাঙালীরই জানা যে ভীষ্মদেব সংগীতচর্চা ছেড়ে দিয়ে পণ্ডিচেরীতে ছিলেন, "কেষ্টনগরে" যাওয়ার কথা তো আমরা জানি না। তা ছাড়া তিনি স্বেচ্ছায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কংগ্রেসী মহল থেকে তাঁকে আনানোর কোনো প্রয়াস তো কখনোই হয়নি। এ সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য জানবার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম। আরেকজন শিল্পীকে ঠিক [illegible] মহাশয় সম্বন্ধে একটু বিশদ পরিচয় পেলে ভালো হয়। "কণ্টকল্পিত" নিশ্চয়ই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে কোনও দিন। এটা একটা রাজনৈতিক দলিল তার মধ্যে অসংগতি বা ভ্রমপূর্ণ তথ্য সংযোগ হলে পুস্তকের মূল্য বহুগুণে হ্রাস পাবে।

সুরেশ চক্রবর্তী
কলকাতা-২৯

॥ ২ ॥

'দেশ'-এর ২৬শে মে, ১৯৭৯ সংখ্যায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ 'কণ্টকল্পিত ॥ ৯৭ ॥'-তে প্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য করেছেন, 'ওড়িয়া লিপির সঙ্গে বাংলা লিপির কোনও যোগাযোগ নেই।' বক্তব্যটি সঠিক নয় বলেই মনে হয়। প্রখ্যাত লিপিতত্ত্ববিদ-ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Origin of the Bengali Script' প্রকাশিত গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, In the south the Bengali script was used throughout Orissa. We find the proto-Bengali script in the Ananta-Vasudeva temple-inscriptions of Bhatta Bhabadeva at Bhuvaneswara and the modern Bengali alphabet in the grants of the Ganga Kings, Nrisingha Deva II, and Nrisingha Deva IV. The modern cursive Odiya script developed out of the Bengali after the 14th century A.D. like the modern Assamese.

দীনেশচন্দ্র সেনও তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (ষষ্ঠ সংস্করণ) মন্তব্য করেছেন: উড়িয়া লিপি ও বঙ্গীয় লিপি অনেকটা একই প্রকারের। প্রভেদ এই যে, উড়িয়া অক্ষরগুলির মাত্রা গোলাকার। উৎকলবাসিগণ তালপাতের উপর 'খন্তি' নামক লৌহ-শলাকা দ্বারা লিখিতেন; সূক্ষ্মাগ্র খন্তির দ্বারা অক্ষরের শিরোভাগে সরল রেখার ন্যায় মাত্রা টানিতে গেলে, তালপত্র ছিন্ন হইয়া যাইত, এইজন্য তাঁহারা গোলাকৃতি মাত্রা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালা দেশে বাঁশের কলমের অগ্রভাগ তির্যকভাবে কাটা হইত, এইরূপ লেখনীদ্বারা প্রাচীন বর্ণমালার বক্রাকার অক্ষরগুলি অঙ্কিত করা সুকঠিন; কলমের টানে অক্ষরের কোণগুলি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠে; এবং অতি সহজে ও অনায়াসে সরলরেখায় মাত্রা টানা যায়। [পৃঃ ১১-১২]

একটু ভালভাবে বাংলা ও ওড়িয়া লিপি তুলনা করলে লেখক নিজেও এই সাদৃশ্য দেখতে পাবেন আশা করি।

নীলরতন সেন
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গ : উত্তরাধিকার

সমরেশ মজুমদারের 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসটি প্রতি সপ্তাহে সাগ্রহে পাঠ করিতেছিলাম। লেখার মাধুর্য মনকে খুবই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ মাঝপথে উপন্যাসের ছেদরেখা

Regd No. WB|CC|184|74

...লেখাতে ... প্রথম বোধ করিতেছি। মনে হইতেছে অনেক কিছু তাঁহার লেখার ছিল কিন্তু কে যেন তাঁহার হাত হইতে কলম কাড়িয়া লইয়া গেল। অনিমেষের ভাবনা-চিন্তা ও কর্মধারা কোন পথে প্রবাহিত হইবে এ বিষয় সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। বিশেষ করিয়া দেশের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিকায় অনিমেষের চিন্তাধারা কিরূপ পরিবর্তন লাভ করিবে তাই লক্ষ করিতেছিলাম। কিন্ত একি হইল? মাঝপথে কেন ছেদ টানা হইল বুঝিলাম না!

আমার মনে হইতেছে যে লেখক বোধহয় পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছ হইতে কোন বাধা পাইয়াছেন, তিনি যাহা বলিতে চাহিতেছেন তাহা বোধহয় কর্তৃপক্ষের মনঃপূত নয়।

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লাভপুর, বীরভূম

॥ ২ ॥

উত্তরাধিকার-এর অনিমেষকে এই-ভাবে হঠাৎ আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেবার রাইট লেখককে কে দিল তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। কোলকাতার রাস্তায় কোলকাতার জীবনে সে কিভাবে থাকবে তা নিয়ে যে অনেক কল্পনার জাল বুনেছিলাম। তাই দ্বিতীয় অধ্যায় করে অনিমেষকে আমাদের উপহার দেবেন এই অনুরোধ জানাই। অনিমেষকে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন।

সুবীর কুমার কুণ্ডু রাঁচি

॥ ৩ ॥

লেখকের কাছে আমার জিজ্ঞাসা সত্যিই কি উত্তরাধিকার উপন্যাস সমাপ্ত, না প্রথম পর্ব সমাপ্ত। যদি সমাপ্ত না হয়ে থাকে তা হলে আমি দেখতে চাই অনিমেষকে একজন পূর্ণ মানুষরূপে এবং তার পরিণতি।

অতসী রায় কলকাতা

লেখকের উত্তর

কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই, 'উত্তরাধিকার' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় এত ভালবাসা পেয়েছি এবং প্রকাশের শেষে এত অভিযোগ ও অভিমান জেনেছি—আমি তার কতখানি উপযুক্ত জানি না। স্বাধীনতার কিছু আগে জন্মেছে এমন একটি ছেলেকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে গিয়ে দেখলাম সাতচল্লিশ থেকে সাতষট্টি এসে তার চিন্তাভাবনা আমূল পাল্টে গেল। যে বন্দেমাতরম ধ্বনি তার রক্তে টোকা মারত সেটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না সে। শরীরে বুলেট চিহ্ন নিয়ে পরবর্তী সময় সে পা বাড়ালো।

কিন্তু সেটা অন্য কথা। স্বাধীনতার পরবর্তী পঁচিশ বছরকে আমি দুটো অধ্যায়ে ভাগ করেছি। একটানা দীর্ঘ উপন্যাস লেখার এলেম আমার নেই, তাই প্রকাশিত উপন্যাস অবশ্যই প্রথম খণ্ড।

বিভিন্ন চিঠিতে একটি অভিযোগ শুনেছি, দেশ-কর্তৃপক্ষ এই উপন্যাস আর আমাকে লিখতে দেননি। এই ধরনের হাস্যকর ধারণার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। দেশ পত্রিকার সম্পাদকের অনুপ্রেরণায় এই উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম এবং কোন নির্দেশ দূরের কথা একটি শব্দ কখনও বাদ পড়তে দেখিনি। আমি যতটুকু প্রয়োজন মনে করেছি ততটুকু লিখেছি।

কিন্তু অনিমেষকে নিয়ে 'উত্তরাধিকারের' দ্বিতীয় খণ্ড লেখার জন্য এখন আমি নিজের কাছেই দায়বদ্ধ। সময় এবং সুযোগ এলে অবশ্যই দায়মুক্ত হব। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণাতে একটু বিভ্রম থেকে গেছে বলে আমি দুঃখিত।

সমরেশ মজুমদার

কলকাতার ফুটবলার

গত ২রা জুন দেশ সংখ্যায় শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত মহাশয় লিখিত "কলকাতার ফুটবল" প্রবন্ধটি পড়ে অবাক হলাম। প্রবন্ধটির মধ্যে শ্রীদাশগুপ্ত এমন কতকগুলি অসত্য এবং হাস্যকর তথ্য পরিবেশন করেছেন যাতে পত্রিকার অগণিত পাঠক ভুল পথে পরিচালিত হবেন।

প্রবন্ধটিতে ফুটবলার দের (অবশ্যই কলকাতার) সমর্থন করার মহৎ (?) উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে বসে তিনি ভিন্ রাজ্যের ফুটবলার, কর্মকর্তা থেকে শুরু করে দর্শকদের পর্যন্ত একহাত নিয়েছেন। তিনি ভুলে গিয়েছেন যেসব দর্শকদের জোরে বিদেশে গণ্ডা গণ্ডা গোল খাওয়া ফুটবলাররা আজ তারকায় পরিণত হয়েছেন সেইসব দর্শকদের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনাগুলোও কিছুটা হজম করা দরকার।

সত্যি কথা বলতে কি অশোকবাবু, যতই শুনো যুক্তি তুলে ধরুন না কেন যে কলকাতার ফুটবলাররা সর্বদাই ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকেন, শুধুমাত্র রেফারী কর্মকর্তা কিংবা দর্শকদের জন্যই তারা মেজাজ হারাতে বাধ্য হন; একটি পাঁচ বছরের শিশুও জানে কলকাতার তথাকথিত তারকাদের মেজাজ অনেক থার্মোমিটারে কত উঁচু ... ছুঁয়ে থাকে (অবশ্যই কয়েকজন ব্যতিক্রম)। সামান্য কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

১৯৭৪ সালে ইস্টবেঙ্গল বনাম খিদিরপুরের লীগের খেলায় অন্যতম তারকা হাবিবকে রেফারী ন্যায্য কারণে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে বলায় শ্রীমান হাবিব রেফারীর সঙ্গে যা ব্যবহার করেছিলেন সেটা কোন্ ভদ্রতার উদাহরণ? তারও বেশ কিছুকাল আগে তৎকালীন মহমেডান অধিনায়ক লতিফ রেফারীর পেটে ঘুষি মেরে ছিলেন। মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের এক খেলায় সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার রেফারীর নাকে ঘুষি মেরে যে উদাহরণ স্থাপন করেছেন ভারতের ফুটবল ইতিহাসে তা বিরল। বোধ হয় গত বছর কি তার আগের বছর কোনো এক ছোটো টীমের গোলকীপারকে তৎকালীন মোহনবাগান খেলোয়াড় সুভাষ ভৌমিক চড় পর্যন্ত মেরেছিলেন। এ সমস্তই কি কলকাতার ফুটবলারদের ভদ্রতার নিদর্শন। এ ধরনের উদাহরণ আরও এত আছে যে

…দিয়ে মহাভারত লেখা চলতে পারে। সবচেয়ে মজার কথা, এইসব অপরাধের জন্য কলকাতার বড় ক্লাবের ফুটবলাররা তারকা হবার সুবাদে প্রায় কোনো শাস্তিই পান না। যেমন উপরোক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে প্রথমটির জন্য হাবিবকে আই এফ এ কমিটি লীগ বন্ধ হবার পর থেকে সুপার লীগ শুরু হবার মধ্যে একুশ দিন সাসপেণ্ড করেছিলেন, যে সময়ের মধ্যে কোনো খেলাই ছিল না। এখন কলকাতার ফুটবলার এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে কার দরের কি রকম তা নিয়ে অশোকবাবুর জাজমেন্ট সত্ত্বেও কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়।

আর গত দু বছর ডুরাণ্ডের দুটি ঘটনা সম্বন্ধেও শ্রীদাশগুপ্ত সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। রেফারী ইন্দর পাল্ল হুন্ডার বাঙ্গালী বিদ্বেষ সুবিদিত হলেও তার এবং সুরজিতের ধাক্কা লাগার ঘটনাটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধকারের মস্তিষ্ক প্রসূত। সুরজিৎ জেনে শুনেই রেফারীকে লাথি মেরেছিলেন। বর্তমান পত্রলেখক সমেত সেদিনের সমস্ত দর্শকই এর সাক্ষী আছেন। আর দ্বিতীয় ঘটনায় রেফারী সুব্রতকে লাল কার্ড দেখানো পর্যন্ত ঠিক লিখলেও, এর পর সুব্রত রেফারীকে যে লাথি মেরেছিলেন সে খবরটা বেমালুম চেপে গেছেন। যত অবিচার আর অন্যায়ই হক না কেন ফুটবল মাঠে রেফারীকে লাথি মারা নিশ্চয়ই চরম অপরাধ।

ফুটবলারদের আয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অশোকবাবু একজন কৃতী ইঞ্জিনিয়ারের আয় সম্বন্ধে কেতাবী বিচার করেছেন। আমাদের দেশের একজন কৃতী ইঞ্জিনিয়ারের তিরিশ বছরের কর্মজীবনে প্রতি মাসে গড়ে আড়াই হাজার টাকা পান এরকম হাস্যকর তথ্য তাঁকে কে দিল। আর ফুটবলারদের আয় বিচারের সময় তিনি 'ধরা যাক চার লাখ' বলে মোহনবাগানের আয় সম্বন্ধে একটা চিত্র এঁকে দেন। যাতে আমরা কোনরকম যুক্তির গন্ধ না পেয়ে বিভ্রান্ত হই।

জয়দীপ বসু
নয়া দিল্লী-২১

॥ ২ ॥

২ জুনের 'দেশ' পত্রিকায় অশোক দাশগুপ্তর প্রবন্ধ 'কলকাতার ফুটবলার'-এ গতবারের বরবদলই ট্রফি ফাইনাল সম্পর্কে কিছু উল্লেখ দেখলাম। অশোকবাবুর লেখায় গৌহাটির দর্শককেই ভিলেন করা হচ্ছে, ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা ভগবানের নিষ্পাপ শিশু। এ সম্পর্কে আমি আগে কয়েকবার ঘটনার প্রকৃত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু কলকাতার প্রেস, আমার চিঠি প্রকাশ করেনি।

এটা ঠিক যে গৌহাটির দর্শক বিরুদ্ধ চিৎকার ও গালাগালি দিয়ে ইস্টবেঙ্গল দলের মাথা গরম করে দিয়েছিল। কিন্তু প্রোভোকেশানের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল কি সেদিন ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলের পরিচয় দিয়েছিল? না, আচরণ আর মনোবৃত্তিতে সেদিন দলের সবকটি নামী-দামী খেলোয়াড় ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাস কলুষিত করেছিল।

টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই দর্শনীয় খেলায় আর বিনম্র ব্যবহারে থাই টীমটিকে দর্শকের প্রিয় করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই সেদিন ফাইনালে বেশিরভাগ দর্শক তাদের প্রিয় দলটির স্বপক্ষে ছিল। আবার এটাও সত্য যে কলকাতার ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কলকাতার যে কোন ফুটবল দল অন্য জায়গার দর্শকের ঈর্ষার পাত্র। এছাড়া দর্শকদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাপন্থী বিদ্বেষে একাংশ দর্শক তো নিশ্চয় শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গলের বিরোধী ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইস্টবেঙ্গল দলের উচিত ছিল হাজার প্রোভোকেশানের মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলা এবং আচরণ দ্বারা দর্শককে কাবু করে রাখা। সেটাই হতো তাদের শ্রেষ্ঠ জিত, অন্তত পক্ষে মরাল ভিকট্রী।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঘটল বরং উলটো। থাই দল ২—১ গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় ইস্টবেঙ্গল দলের এক নামী ফুটবলার একজন থাই খেলোয়াড়কে আঘাত করল। একই ঘটনা কয়েক মিনিট পরে যখন পুনর্বার ঘটল তখন ইস্টবেঙ্গল দলের দোষী খেলোয়াড়টিকে ৬।৭ জন থাই খেলোয়াড় ঘিরে নিয়ে প্রায় কুংফু কায়দায় প্রত্যাঘাত করল। খেলা গরম হয়ে উঠল। দর্শকের সেন্সিটিভ অংশটা ক্ষিপ্ত হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে চিৎকার-গালাগাল করতে শুরু করল। মন্ত্রী দুলাল বরুয়া এবং পুলিস অফিসারদের মধ্যস্থতা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গল প্রথম অবস্থায় খেলা চালিয়ে যেতে অসম্মত হয়। এ সময়ে ইস্টবেঙ্গল দলের এক কর্মকর্তার ভূমিকা সত্যিই নিন্দনীয়। পুলিসের কর্তব্যরত কর্মী অফিসার অসীম রায় ইস্টবেঙ্গলের হাতে প্রহৃত হন।

এর পরে যে ফুটবল খেলা চলল তাকে অন্তত খেলা বলা যায় না। বাইরে মারমুখো দর্শক, ভিতরে শারীরিক যুদ্ধে রত দু পক্ষের খেলোয়াড়। তার মধ্যেই দেখা গেল ভারতের প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন খেলোয়াড় কোমর থেকে প্যান্ট নামিয়ে দর্শকদের প্রতি অশোভনতা প্রদর্শন করেছেন, ভাস্কর রেফারীকে দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরেছেন, উলগা চেয়ার তুলে দর্শকের গায়ে তেড়ে ছুঁড়েছেন আর চাগিয়ে তোলা বাঘের মতো ক্ষিপ্ত দর্শক চিৎকার, গালাগালি, ঢিল ছোড়া—সব কিছু করে যাচ্ছে। এ খেলায় দুই প্রতিপক্ষ ছিল দর্শক আর ইস্টবেঙ্গল। বুয়েনস আয়ার্স থেকে গৌহাটি পর্যন্ত ফুটবল-দর্শক সারা পৃথিবী জুড়েই পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। এবং প্রকৃত খেলোয়াড়ের বীরত্ব প্রমাণিত হয় বিরুদ্ধ দল ও বিরুদ্ধ দর্শকের সম্মিলিত শক্তিকে ব্যর্থ করে বিজয়ী হওয়াতে। ইস্টবেঙ্গল সেদিন আর যাই হক বীরের দল ছিল না। আমার মনে কেবল প্রশ্ন জাগছিল, এতগুলো প্রতিভাধর খেলোয়াড়, দু পায়ের প্রতিভা ছাড়া ওদের কি শিক্ষিত ও সংস্কৃত মন বলে কিছুই নেই? কতগুলো ইতর দর্শকের সঙ্গে এই ভাবে শ্রেষ্ঠদের ইতরামি করা ছাড়া উপায় ছিল না?

সেদিনের ইস্টবেঙ্গল দলের ব্যবহার 'দর্শকের দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছিল' বলে চেপে যাওয়া যায় না। দর্শকের একাংশ সেদিন অবশ্যই বিদ্রূপ আর গালাগালি দিয়ে খেলার পরিবেশ নষ্ট করতে সহায়তা করেছিল। কিন্তু তাদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল দলের বিস্ময়কর অশালীন ব্যবহার ও প্রদর্শন।

এর পরে সেদিনের উপস্থিত কোনো সুস্থবুদ্ধি দর্শকের পক্ষে, দর্শকের একাংশের দুর্ব্যবহার স্বীকার করেও, ইস্টবেঙ্গল দলের বিখ্যাত খেলোয়াড়দের আচরণ এবং মনোবৃত্তি সমর্থন করা সম্ভব নয়।

কৃষ্ণকমল দে
বাহলীয়া, তেজপুর

॥ ৩ ॥

আপনাদের পত্রিকায় (অন্যান্য পত্রিকাতেও) কোলকাতায় এ-বছরের ফুটবল খেলার আকর্ষণ সম্বন্ধে নানা চটকদার প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। "এ বছরের খেলা কেমন জমবে"—"কোন দলের কত শক্তি, কোন্ কোন্ কোচ মানে?"—এই সব ধরনের অসংখ্য রচনায় যাকে বলে দর্শক সমর্থকদের উত্তেজনার বাগানটাকে আকাশে ঝোলানো বাগান করা হচ্ছে। কিন্তু এই টেম্পার বেলুন ফুটো করার জন্যে একটা পেরেক ছুঁড়ে জিজ্ঞেস করি—কোলকাতার তিনটি প্রধান দল কি 'প্যাকার'এর সমগোত্রের নয়। এঁরাও কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে চড়া দামে (কালোবাজারে) দক্ষ খেলোয়াড় কিনে বা ভাড়া করে এনে 'প্যাকার'এর মতই একচেটিয়া ধরনের (দর্শকদের টাকা দিয়ে দেখতে বাধ্য করা) মজুতদারী ব্যবসা করছেন না? লজ্জা বোধ, অপমান বোধ এঁদের তো নেই-ই, আমাদের দর্শক-সমর্থকদেরও নেই। সাত-আটজন বাইরের খেলোয়াড় দিয়ে গড়া বাংলা দল সন্তোষ ট্রফি ইত্যাদি জিতলে বাংলা জিতেছে বলে নাচানাচি করি আমরা। একটা জাত (রাজ্য) কতটা আত্মসম্মান বোধশূন্য হলে এটা হতে পারে একবার ভেবে দেখবেন। প্রতিফলিত গৌরব আর গর্ব তারাই করে যারা অযোগ্য-অপদার্থ।

প্রায় 'পাঞ্জাব রেজিমেন্ট'কে লীগ শীল্ডে খেলিয়ে বলছি "ইস্টবেঙ্গল ক্লাব" খেলছে, তিন থেকে পাঁচজন বাইরের (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতের বাইরের) খেলোয়াড় ভাড়া করে দল গড়ে বলছি মোহনবাগান ক্লাব বা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব দারুণ খেলছে। সমর্থকদের উত্তেজনার, গৌরবের আগুন পোয়ানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। ওদের মানসিকতা দেখুন, ঐসব ভাড়া করা দল জিতলে সমর্থকদের উন্মত্ত তাণ্ডব, হাবেল দক্ষযজ্ঞ।

ফলে একদিকে সমর্থকদের একটা করে নতুন সম্প্রদায় তৈরী হচ্ছে, নতুন ধরনের এক সাম্প্রদায়িকতার বিষে রাজ্য ছেয়ে যাচ্ছে। একই দেশের একই বয়সের (যারা অধিকাংশই তরুণ, যুবক-সমাজের বিস্ফোরক শ্রেণীভুক্ত) দুইদল মানুষের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষ তৈরী হচ্ছে, ঘটি-বাঙ্গাল শ্রেণীবোধের কেঁচো খোঁড়া হচ্ছে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত সাপ বেরুবেই। একদল জিতলে তার সমর্থকরা ঢাকঢোল - বোমা - পটকা ইত্যাদি সহযোগে মিছিল-সহ বার করে অন্য দলের সমর্থকদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে—মারপিটও হচ্ছে, চিংড়ি ইলিশের হোলি উৎসব করে রেষারেষি বাড়িয়েই চলেছে—যা পরে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্ন হয়ে উঠতে বাধ্য।

আর অন্যদিকে বাংলার ছেলেদের ভালো খেলোয়াড় তৈরিতে এসব ব্যাপার এক বিরাট বাধা হয়ে উঠছে। ছোটোখাটো ক্লাবের কোনো প্রতিভাবান খেলোয়াড় যদি ভালো খেলে বড় ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করে বসে তাহলে আর রক্ষে নেই তার। ইটপাটকেল থেকে কি না বেচারীর মাথায় বর্ষিত হতে পারে। এইভাবে চললে দেশের ছেলেদের (বাংলার স্থায়ী বাসিন্দাদের আমি দেশের ছেলে বলছি) ভালো খেলার আগ্রহ-উৎসাহ থাকবে? দেশের ভালো খেলোয়াড় হওয়ার প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছেলেরা হয় হতাশায় নষ্ট হবে, না হয় বড় ক্লাবে ঢোকার চেষ্টায় খেলোয়াড় চরিত্রটাকে নষ্ট করবে। আসলে বাংলার ফুটবলের সার্বিক ক্ষতি আটকানো যাবে না।

সুতরাং যদি বলি বাংলাদেশে আই এফ এ নামক সংস্থাটি খেলোয়াড় কেনাবেচার, মজুতদারীর কালোবাজারীর ব্যবসায় মদত দিচ্ছেন, ফুটবল খেলার পবিত্রতা নষ্ট করতে সাহায্য করছেন তাহলে কি অন্যায় বলা হবে? বড়বাজারে ফুটবলের ফলাফল নিয়ে বিরাট জুয়ো বা ফাটকাবাজী হয় তা কি কেউ জানেন না। সেই টাকার কিছুটা অংশ কোথায় যায়, কেন যায়? কেউ খোঁজ নেন? কোনো তদন্ত হয়? এ-এক বিরাট লোকঠকানো ব্যবসা, সাজানো কুস্তি খেলার চেয়েও ভয়ঙ্কর। বাংলা দেশকে ফুটবল খেলার ব্যাপারে পঙ্গু করার দায়িত্ব তাহলে তিনটি দলের, আই এফ এর এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ওপরে অবশ্যই বর্তাচ্ছে।

এখন খেলাধুলোর স্বার্থে আমার বিনীত প্রস্তাব—ঐ তিনটি বড় দলকে লীগ-শীল্ড থেকে বাদ দিয়ে পরিচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে খেলার উন্নতি করুন। ঐ তিনটি দল 'প্যাকার'এর মতই প্রদর্শনী খেলা দেখিয়ে কতদিন চালাতে পারেন পরীক্ষা হক।

দেশে মানুষে মানুষে বিভেদ-বিদ্বেষের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হবে। খেলার মান উন্নত হবে। আইন-শৃঙ্খলা, যানবাহন সমস্যার মত অনেক সমস্যার কিছুটা লাঘব হবে। দুর্নীতি বন্ধ হবে।

কিন্তু এসব ধর্মের কাহিনী 'তাঁরা' কি শুনবেন?

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য
কলিকাতা-৫৪

প্রকাশিত হল

সন্তোষকুমার ঘোষের

প্রতীক্ষিত গল্পগ্রন্থ

সন্ধ্যা-সকাল

দাম ১০·০০

'কিনু গোয়ালার গলি' লিখে যিনি একই সঙ্গে চমকে দিয়েছিলেন বাংলা পাঠক ও লেখক সমাজকে, 'নানা রঙের দিন', 'মুখের রেখা', 'জল দাও' অথবা 'শ্রীচরণেষু মাকে' লিখে যিনি গলি থেকে ক্রমশ পৌঁছে গিয়েছেন সদর সড়কে, তাঁর প্রতিভার আরেকটি বিস্ময়কর ও সমান্তরাল জয়যাত্রা বাংলা ছোটগল্পের সম্পন্ন সরণীতে।

'কানাকড়ি', 'কস্তুরীমৃগ', 'একমেব', 'শনি', 'দ্বিজ', 'মাটির পা', 'ধাত্রী', 'দিনপঞ্জী', 'যাদুঘর'—এমন অজস্র ছোটগল্পের রচয়িতা সন্তোষকুমার ঘোষের নাম পাঠকের স্মৃতিতে চিরকাল জ্বলজ্বলে হয়ে থাকবে। লেখায় তিনি সবসময়ই সমসাময়িক। কী লিখব—এ নিয়ে যেমন ভাবেন, কীভাবে লিখব—এ নিয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ সচেতনতার পরিচয় প্রতিটি রচনায়। ভাষা তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল, আঙ্গিক তাঁর হাতের শাণিত অস্ত্র, বিষয় তাঁর কলমের ধারালো বিশ্লেষণে নতুন দ্যুতির বিচ্ছুরণ ঘটায়। ইদানীংকার গল্পে তিনি সাজানো গল্পের বাহারী শোভা পুরোপুরি ত্যাগ করে আরও অব্যর্থ ও অমোঘভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন জীবন ও জগৎকে, গল্পের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন মহত্তম অভিজ্ঞতাময় এক জীবনবোধ। সম্প্রতি কালে রচিত তাঁর সেই সমুদয় গল্প একত্র করে প্রকাশিত হল এই নতুন গল্পগ্রন্থ 'সন্ধ্যাসকাল।' সন্দেহ নেই বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এ-বই এক অপরিহার্য সংযোজনরূপে চিহ্নিত হবে।

সাগরময় ঘোষের

অনবদ্য উপাখ্যান

একটি পেরেকের কাহিনী

দাম ৪·০০

এক দিকে এক দরিদ্র অল্প-শিক্ষিত সাধারণ মানুষ বৈদ্যনাথ, অন্য দিকে বিশ্রুতকীর্তি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—এই দুই চরিত্রকে নিয়ে এক অসামান্য আলেখ্য 'একটি পেরেকের কাহিনী।' যেমন চমকপ্রদ ঘটনা পরম্পরা তেমনই স্বাদু রচনাভঙ্গি।

এই লেখকের আরেকটি গ্রন্থ :

সম্পাদকের বৈঠকে ১০·০০

সরসীকুমার সরস্বতীর

অনন্যসাধারণ আলোচনাগ্রন্থ

পালযুগের চিত্রকলা

দাম ৪০·০০

"পুস্তকটির সবচাইতে বড় গুণ এই যে, এতে গ্রন্থকার তাঁর যাবতীয় বক্তব্য সংশয়াতীত নিদর্শনের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ...গ্রন্থকার তাঁর যাবতীয় বক্তব্য শুধু সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হননি, দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ উপস্থিত করেছেন তাঁর প্রায় সব বক্তব্যের জন্যই।" লিখেছেন শ্রী দীপক ভট্টাচার্য (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫-১-৭৯)। ৪৫টি রঙীন ছবি ও ১০টি সাদাকালো চিত্র-প্রতিলিপি সংবলিত এক মহামূল্য সংযোজন।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

সরস গল্পের সংকলন

শ্বেত পাথরের টেবিল

দাম ৭·০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নতুন লেখক। মাত্র বছর তিন চার হল সাহিত্যের আসরে তিনি প্রবেশ করেছেন সরস গল্পের ডালি নিয়ে। প্রবেশমাত্রই তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে প্রশংসা আর অভিনন্দনের অজস্র কুসুম তাঁর অসীম কৌতুকবোধ এবং হাস্যরস সৃষ্টির আশ্চর্য নিপুণতার জন্য। বাংলা হাসির গল্পের ছোট্ট আসরটুকু যখন ফাঁকা হয়ে আসছিল, শুধুই প্রবীণ শিবরাম চক্রবর্তী যখন প্রায় 'একা কুম্ভের' মতো বাংলা কৌতুক গল্পের 'বুঁদির গড়'টি একক প্রয়াসে রক্ষা করে চলেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই হাস্যরসের পাঞ্চজন্য হাতে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তরুণ প্রতিভাবান লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর তির্যক দৃষ্টিপাত, সরস মনোভঙ্গি, সজীব রচনারীতি চারপাশে ছড়ানো জীবন থেকে তুলে নেওয়া কৌতুককর ঘটনারাজি, শ্লেষাত্মক মন্তব্য—সব কিছু, সমস্ত কিছুই নতুন স্বাদের। সেই অভিনব স্বাদের সেরা এগারোটি গল্পের এক অদ্বিতীয় সংকলন—'শ্বেত পাথরের টেবিল'। অম্লান কৌতুক রসের এই গল্পগুলির অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একটির পর-একটি দ্রুত নিঃশেষিত সংস্করণের মধ্যেই নিহিত।

লেখকের আরেকটি গ্রন্থ :

পায়রা (উপন্যাস) ৬·০০

বুদ্ধদেব গুহর

শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস

খেলা যখন

দাম ৬·০০

রোমান্টিক উপন্যাসে বুদ্ধদেব গুহর জুড়ি মেলা ভার 'খেলা যখন' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী। এর নায়িকা এক রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী। আর নায়ক? না থাক, পাঠকপাঠিকারা নিজেরাই চিনে নেবেন এই আশ্চর্য গভীর প্রেমের উপন্যাসের জীবন্ত প্রতিটি চরিত্রকে।

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

দু নম্বর ৭·০০ একটু উষ্ণতার জন্যে ১০·০০ ঝাঁকিদর্শন ৬·০০ যাওয়া আসা ৭·০০ সুখের কাছে ৭·০০ জঙ্গলের জার্নাল ৬·০০ বাতিঘর ৪·০০ নগ্ননির্জন ৫·০০ হলুদ বসন্ত ৪·০০

অপরিহার্য আলোচনাগ্রন্থ

শান্তিদেব ঘোষের

রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সংগীত ও নৃত্য

দাম ৫·০০

রাধারাণী দেবীর

শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প

দাম ১৫·০০

সৌরীন্দ্র মিত্রের

খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে

দাম ৪০·০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

শৈলেন ঘোষের

অসামান্য কিশোর গ্রন্থ

আজব বাঘের আজগুবি

প্রকাশিত হল

ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও মলয় দাশগুপ্ত

রচিত

পুষ্পচর্চা-বিষয়ক অনন্য গ্রন্থ

ফুলের বাগান

দাম ২০·০০

সাইত্রিশটি সুপরিকল্পিত সুবিন্যস্ত অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বইটি বাংলা সাহিত্যের বহু অনুভূত একটি বড়ো অভাব পূরণ করবে। বাবহারিক ও বৃত্তিগত প্রয়োজনে ফুলের চাষ করায় যাঁরা উৎসাহী তাঁরাও যেমন তেমনই নিছক সৌন্দর্যপিপাসু মন নিয়ে পুষ্পচর্চা যাঁরা আগ্রহী তাঁরাও একই রকমভাবে উপকৃত হবেন এ বই পড়ে। এই বইয়ের অন্যতম লেখক ভিক্ষু বুদ্ধদেব ব্যক্তিগতভাবে ফুলের চাষ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সম্পৃক্ত। তাঁর উৎপাদিত ফুলের গাছ প্রতিযোগিতাতেও পুরস্কৃত। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই ব্যাপক নিখুঁত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পুষ্পচর্চা-বিষয়ক বইটি লিখেছেন তিনি। অনভিজ্ঞ অথচ উৎসাহী মানুষও সহজেই নিজের পছন্দমতো ও সাধ্যমতো ফুলের চাষ করতে পারবেন। অভিজ্ঞরা খুঁজে পাবেন বহু নতুন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সঠিক সহায়তা। বাহারি পাতার গাছ, লন, ফুলের বাগানের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সেই পাখি—এ-সব নিয়েও আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই বইতে। দেওয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক নাম, বাংলা পরিভাষা ও প্রচলিত নাম, বাছাই প্রজাতি তালিকা। অজস্র সাদা কালো ছবি ও মহার্ঘ বহুবর্ণ প্রতিচিত্র সংযোজিত হওয়ায় বইটির আকর্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশ ৪৬ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা
২২ আষাঢ় ১৩৮৬

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

[illegible] বসুর প্রবন্ধ
আইনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
নিরঞ্জনপ্রসাদ চৌধুরীর ভ্রমণকাহিনী
সবুজ পাহাড়ে পিকনিক
[illegible]কুমার ঘোষের বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা
কুলীপ
[illegible] বসুর গল্প
আমার জীবনের
[illegible] গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প
[illegible] দুপুর

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে [illegible] রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা।
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা
[illegible] অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

প্রতিরক্ষার সার্বিক আধুনিকীকরণ

'আধুনিকীকরণ' কথাটি বিশ্বের বহু দেশের সামরিক সমুন্নতির একটি নীতিমন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়েছে ও হয়েই চলেছে। এই নীতিমন্ত্রটির সরল তাৎপর্য এই যে, সামরিক শক্তির যাবতীয় উপকরণ ও উপচারের নবীকরণ চাই, এবং একেবারে আধুনিকতম প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ও সম্বল দিয়ে প্রতিরক্ষা বক্ষঃপটে উন্নত ও প্রশস্ত বলিষ্ঠতা সঞ্চারিত করতে হবে। সামরিক শক্তিতে খুব উন্নত বলে প্রচারিত চীনও বিশ্বের বহু উন্নত দেশের বাজার চুঁড়ে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ সম্ভব করতে উদ্যোগী হয়েছে, উদ্দেশ্য সামরিক পরিসজ্জার আধুনিকীকরণ। আমাদের ভারতও আধুনিকীকরণের নীতিমন্ত্র খুবই উচ্চকণ্ঠে নাদিত করেছে। ভারতীয় বিমান বহরে ক্যানবেরা, ভ্যাম্পায়ার ইত্যাদি 'সেকেলে' বিমান আর থাকবে না। নাসিকে মিগ-২১ বিমান নির্মিত হয় বটে, তবু উপলব্ধি করতে হয়েছে যে, এর বাইরে এর বাইরে ও উপরে আরো শক্তিকুশল বিমান আছে, যার সংগ্রহ ছাড়া ভারতীয় বিমান বাহিনীর যুদ্ধযোগ্যতার আকাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে একশ ব্রিটিশ জাগুয়ার বিমান কিনেছেন। ভারতে জাগুয়ার বিমানের উৎপাদনও কার্যান্বিত করবার প্রয়োজনে ব্রিটিশ সহযোগিতার চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠার সূচনাও করা হয়ে গিয়েছে। সামরিক উপকরণ ও উপচারের অনেক কিছুই আধুনিকীকরণের দীক্ষা লাভ করেছে ও করছে। ভারতীয় বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্ক আর সুযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে না। নতুন ও উন্নত প্রকারের ট্যাঙ্কের প্রয়োজন। সন্ধান চলছে। কে জানে শেষ পর্যন্ত কোন দেশের ট্যাঙ্ক ভারতের মনঃপূত হবে! ব্রিটেনের চীফটেন, অথবা জার্মানির লিওপোল্ড, কিংবা রাশিয়ার টি-এফ ?

ভারতীয় রণতরী বিক্রান্তের বর্তমান বিমান বহরের সব সী-হক বর্জিত হবে; সী-হক বিক্রান্তের পক্ষে আধুনিক সম্বল বলে আর বিবেচিত হচ্ছে না। এর বদলে ব্রিটিশ হ্যারিয়ার বিমান সংগ্রহ করা হবে। অত্যাধুনিক রূপের ও গুণের হ্যারিয়ার লম্বরেখায় আকাশে উঠতে পারে। ভারত সাবমেরিন নির্মাণের জন্য বৈদেশিক সহযোগিতা চায়। ইওরোপের একাধিক দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বিষয়ক আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। পঁচিশ পাউন্ডার কামান সেকেলে হয়ে গিয়েছে। কানপুরের কারখানাতে ১০৫ মি. মিটার কামান তৈরী হতে শুরু করেছে।

জানতে ইচ্ছে করে, টয়েনবির মতো ঐতিহাসিক বেঁচে থাকলে এই আধুনিকীকরণ নীতিমন্ত্রের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কী মন্তব্য করতেন। কেউ বোধ হয় এই কথা আজ সাহস করে বলতে পারবেন না যে, সামরিক পরিসজ্জায় আধুনিক হবার যে বাধ্যতা এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সকলেরই একটি উপলব্ধির সত্য হয়ে উঠেছে, সেটা অন্য তত্ত্বের দর্পণে নিদারুণ এক অধীনতার দাবি বলে প্রতিফলিত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া এবং জার্মানি, ইটালী, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি আরও গোটা চার-পাঁচ দেশ আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক উপকরণের উদ্ভাবক, আবিষ্কারক ও উৎপাদক। এশিয়া ও আফ্রিকার ছোট-বড় দেশে সামরিক পরিসজ্জার আধুনিকীকরণ ওই কয়েকটি দেশের আর্থিক উপার্জনের বাজারে লাভ ও মুনাফার প্লাবন বইয়ে দেবে। শুধু এঁরাই আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করেন, ভবিষ্যতেও করবেন। এঁদের অবশ্য নিজেদের জন্য বাইরের কোন দেশ থেকে সরবরাহ পাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। এরকম ভাগ্যধর হয়ে এঁরা কি আধুনিকতমের চেয়ে আর-এক ধাপ বেশী আধুনিক ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের নির্মাণ আর কয়েকটি বছরের মধ্যে সম্ভব করবেন না? এই চিরন্তন ও নিরন্তর আধুনিকীকরণের প্রকোপ সহ্য করতে গিয়ে ভারতের মতো দেশের পরিণামে কী সমস্যা দেখা দেবে, সেটা ভেবে দেখবার আগ্রহ এখন ভারতীয় চিন্তাশীলের মনে চঞ্চলিত হয় বলে মনে হয় না। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যোগ্যতর ও সমুন্নত মানের শক্তি অর্জন করবার কর্তব্য জাতির বিচারবুদ্ধিতে প্রথম গুরুত্ব লাভ করেছে। ভারতীয় জাতির একটি বিষণ্ণ ঐতিহাসিক শিক্ষা এই যে, সামরিক পরিসজ্জায় দীন-হীন হয়ে থাকার কারণে রাজনৈতিক ভাগ্য বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণে সহজে বিপর্যস্ত হয়েছিল। এটা এক হিসেবে খুবই করুণ ও দুঃখের দশা, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি মার্কিন ও ইওরোপীয় সামরিক পণ্যের প্রসাদাৎ 'শক্তিশালী' হবার পণ গ্রহণ করেছে। কোন সন্দেহ নেই, আপাতত যুগের একটি অধ্যায় আধুনিকীকরণের দ্বারা প্রসন্ন হয়ে ভারত এবং আরও কিছু দেশ সামরিক যোগ্যতা বাড়িয়ে তুলবে। কিন্তু যুগের পরবর্তী অধ্যায়ে ঘটনা কী রূপে দিবে দর্শন [illegible] গবেষক আজ বুঝতে পারছেন ? কিংবা কোন মনস্বী তাঁর জ্ঞানবিচারের নিক্তিতে সেই [illegible] কোন আভাস পেতে চেষ্টা করবেন ? অস্ত্রশস্ত্রে আধুনিকতম হওয়া ভারতের পক্ষে অসাধ্য ও অকাম্যও নিশ্চয় নয়। কিন্তু কবি গোবিন্দ রায় যে আক্ষেপ করে গিয়েছেন, তার সত্যতা যে থেকেই যাচ্ছে। পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে! পর লৌহ নির্মিত হার বুকে! পরের কাছ থেকে পাওয়া চরম গুণের পণ্য এবং অস্ত্র, উভয়ই অধীনতাসূচক পদার্থ। একটি সন্তুষ্টির বিষয় এই যে, আধুনিকতম প্রকারের বিমান, রণতরী, ট্যাঙ্ক ও কামান উৎপাদনে ভারত আত্মনির্ভর পন্থায় সাধিত করবার অধ্যবসায়ও স্বীকার করেছে।

Regd No. WB|CC|184|74

শিক্ষানীতি লোকসংগ্রহ ও সফল সংস্কার

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

আধুনিক যুগের আত্মসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, স্বপ্রাধান্য, অহমবোধ ও ঔদ্ধত্যের মূলে ব্যক্তিবাদী শিক্ষা, একথা অস্বীকার করা যায় না। সে শিক্ষার আদর্শ যন্ত্রসভ্যতা তথা মানবশক্তির কৃতিত্বজাত। সে শিক্ষায় মানুষের অস্থির চিত্ততা ও সকাম বুদ্ধি প্রবল হয়। বাস্তব জীবনের উপযোগী শিক্ষা নিতান্ত যৌক্তিক একথা সত্য কিন্তু গভীর অর্থে মানসিক উদ্বোধন বা চৈতন্যের পূর্ণতা ও মুক্তির ভাববিচ্যুত হওয়ায় এই শিক্ষা ব্যক্তির উগ্রস্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বেচ্ছাবাদ ও খণ্ডিতব্যক্তিত্বকে বড় করে তোলে, 'আমি' প্রাধান্য পায়, আপাতমনোরম বস্তুভোগ —ঐশ্বর্যের প্রতি নিদারুণ আসক্তি জন্মায়। ফলত ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য টলে, সমাজে অধিকাংশের লুব্ধ গৃধ্নু মনোভাব এবং প্রকট আত্মরতি এক অদ্ভুত জটিলতা সৃষ্টি করে, ব্যক্তি ও সমষ্টির সংঘর্ষ, শ্রেণী বিশেষের সংঘর্ষ হয় অনিবার্য। সমাজে যারা পায় আর যারা পায় না তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক তীব্র বিদ্বেষ, একপক্ষের ঔদাসীন্য অবজ্ঞা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকা প্রাপ্ত সম্পদ সচ্ছলতাটুকু আর একপক্ষের সেই অবস্থাটুকু লাভ করবার মরিয়া প্রয়াস। উন্নত, অনুন্নত, ধনী, দরিদ্র, সব সমাজেই একই ঘটনার লঘু-গুরু রূপ।

কয়েক দশকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া-আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন সমাজের অবস্থা দেখে এবং ধনী পাশ্চাত্ত্য সমাজগুলি দেখে মনে হয় টেকনোলজির অগ্রগতির ফলে মানুষের কায়িক শ্রমের লাঘব অল্পবিস্তর হলেও সমাজের ভারসাম্য হারিয়ে গিয়েছে। ধনী দেশগুলির খনিজসম্পদের প্রাচুর্য, উন্নত কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য পরিমিত লোকসংখ্যা ও সুষ্ঠু বিধিব্যবস্থার দরুন নিম্নস্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মান গরীব দেশগুলির তুলনায় উন্নত। গরীব দেশগুলির আর্থিকভাবে সচ্ছল শিক্ষিত উচ্চস্তরের মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা পাশ্চাত্ত্য দেশের মানুষের মত, কারণ তারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদর্শপুষ্ট। শিক্ষিত মানুষদের অধিকাংশের সঙ্গে গরীব সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের মানসিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নপ্রায়। সামাজিক মন দ্বিধা বিভক্ত।

যদিও কোন চূড়ান্ত রায় পাওয়া অসম্ভব। তবু মনে হয় আজকের সমাজ-পরিস্থিতিতে দুটো পথ খুবই স্পষ্ট : হয় মুষ্টিমেয়ের শক্তি প্রয়োগ, জবরদস্তি, হিংসা-প্রতিহিংসা, দমন-প্রতিদমন, না হয় অধিকাংশের মত গ্রহণ। ভারতবর্ষের সমাজে এখনো পর্যন্ত শেষোক্ত পথটি ধার্য আছে। আমরা শান্তি চাই, বিচার চাই, আইনের চোখে সমান থাকতে চাই, মুষ্টিমেয়ের নির্বিচার বলপ্রয়োগের বিরোধী আমরা, ব্যক্তির সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও অধিকার বজায় রাখতে চাই। আবার উন্নত দেশের মত আর্থিক সমৃদ্ধি, যান্ত্রিক অগ্রগতি আমাদের কাম্য।

কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী তিন দশকের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি সমাজে পরস্পরবিরোধী বহুশক্তি এমন ক্রিয়াশীল যে আমাদের কাম্য-উদ্দিষ্ট কোন লক্ষ্যেই আশানুরূপ সফলতায় পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। এমত অবস্থায় আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিফলতার কারণ অনুসন্ধানের সঙ্গে সমাজের চরিত্র উপাদানে কি রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘনীভূত আছে তাও নতুন করে জানবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্বতই আমাদের মনে শঙ্কা জাগছে সমগ্র সমাজের মানসিক প্রস্তুতিহীন অবস্থাই আমাদের আর্থিক-সামাজিক অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বহু সমস্যাকে গুরুতরভাবে জটিল করে তুলেছে। আজ প্রায় শতাব্দীর অধিককাল ধরে যে শিক্ষাধারায় আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, যে শিক্ষা আমাদের জীবনে বহু অসংগতি দিয়েছে, সেই শিক্ষানীতির প্রতি আমরা সন্দিহান।

এটা ঠিকই যে সমসাময়িক উন্নত ধনিক সমাজের বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ-গুলির আর্থিক সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতা থেকে এই মুহূর্তে আমরা শিক্ষা-গ্রহণে সক্ষম না হতে পারি, কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী এই কয়েক দশকের ক্রম অবনতি, বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের যথেষ্ট শংকার কারণ হয়েছে। ফলত দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। যে হেতু ভারতবর্ষের মাটিতে গণতন্ত্রের আশ্বাস, সেই হেতু হিংসা-প্রতিহিংসা, দমন-প্রতিদমনের পথ ছেড়ে গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় সমাজ-পরিবর্তন সুচিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। যে হেতু আমরা অস্তিবাদে বিশ্বাসী, সেই হেতু ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে মদত দেবার পক্ষপাতী আদৌ নই, আগ্রাসী মনোভাবও আমাদের নয়, ষাট কোটি মানুষের এক অংশও কোন নব আবিষ্কৃত বা বিজিত ভূস্বর্গে স্থান পাবে না। তাই আমাদের কঠিন প্রশ্ন ধনিক সমাজের ব্যক্তিবাদের উৎকট ধারণা আমাদের চারিত্রিক গঠন ও সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার কতটা অনুকূল।

অনেকে মত প্রকাশ করেন ভারতীয় দর্শনে ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়নের একমুখী দৃষ্টির প্রভাবে ব্যক্তির বাস্তব প্রয়োজনের প্রতি শিথিল মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, পরোক্ষভাবে নিরুদ্যম প্রশ্রয় পেয়েছে এবং ভারতীয় চরিত্রে সমাজের ব্যাপক উন্নয়নের চিন্তাটা দানা বাঁধেনি। মানুষের বাস্তব সমস্যা সমাধান সর্বাগ্রে প্রয়োজন একথা সত্য, কিন্তু দেহজ বা কায়িক জীবনের প্রয়োজনই মুখ্য, আত্মোপলব্ধি গৌণ এই দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত ব্যক্তিত্ববোধ জাগায়, মানুষের অখণ্ড পূর্ণতা ও পরিণতির পরিপন্থী বলে বোধ হয়। উপরন্তু এই খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব বোধই বাস্তব অর্থে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থবুদ্ধি জাগায়। তাই আমাদের বিশ্বাস একটি সমন্বয়ী আদর্শ আমাদের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রসূ। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত পার্থক্য সর্বাধিক। পাশ্চাত্ত্য জীবনের সতত সংগ্রামী অসহিষ্ণু ব্যক্তি অধিকারের দৃপ্তভাব মুগ্ধকর কোন সন্দেহ নেই কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানব সমাজের আদর্শ তা হতে পারে না, এবং যদি হয় তার অনিবার্য পরিণাম হিংসা-প্রতিহিংসা, দমন-প্রতিদমন, ভোগ ও দখলের ঐকান্তিক লালসা। ব্যক্তিভেদে গুণগত তারতম্যের ফলে বুদ্ধিমান, শক্তিমান ভোগ দখলের অধিকার অর্জন করে সুযোগ সুবিধা করায়ত্ত রাখতে চায় কিন্তু শক্তিমান, বুদ্ধিমান সুযোগ সুবিধার অধিকারীর দায়িত্বজ্ঞান লঘুতায় সমাজের শান্তি বিঘ্নিত হয়।

মূলত গ্রামীণ সভ্যতার পরিসরে নিরুপদ্রব কৃষিনির্ভর প্রাচীন সমাজের শান্তিময় জীবনের ইতিহাস হিন্দু ভারতবর্ষের। কয়েক শতাব্দীর মুসলমানী ও ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির প্রভাব শিক্ষার প্রভাব সত্ত্বেও কৃষি নির্ভরতা ধর্ম ও দর্শনের গভীর রাসায়নিক ক্রিয়া আমাদের বৃহৎ সমাজে স্থির আছে। সংখ্যা-গরিষ্ঠের বাস গ্রামে। শহরবাসী ভারতীয় পাশ্চাত্ত্য অর্থে নাগরিক মনোভাব-সম্পন্ন খুব অল্প সংখ্যক। সুতরাং এই বৃহৎ জনসমাজের পক্ষে গণতান্ত্রিক আশ্বাস তখনই কল্যাণকর যখন সনাতন জীবন-আদর্শ উচ্চ ও নীচ স্তর নির্বিশেষে সমভাবে ব্যাপৃত। যুগধর্ম ও সনাতন ধর্ম তথা জীবননীতির সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব যদি গণতান্ত্রিক সরকার এই সমন্বয়ী আদর্শ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নীতি পরিবর্তনের দ্বারা সেই আদর্শ জনজীবনে দৃঢ়মূল করে তোলার চেষ্টা হয়। কারণ, আজকের সমাজ আজকের জীবন এমন জটিল ও বিস্তৃত যে সমাজের অনুকূল আদর্শ ধ্যানধারণা শুধু পরিবার বা গোষ্ঠীর দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মে ব্যাপকভাবে সমভাবে সর্বস্তরে সর্ব রাজ্যে অর্থাৎ সমগ্র দেশের ভৌগোলিক পরিধিতে সঞ্চারিত হতে পারে না, পৌরশাসন কেন্দ্রীয় শাসনের মত কেন্দ্রশক্তির আনুকূল্যের প্রয়োজন।

বহু শতাব্দী কালের ইতিহাসে দেখা যাবে বড় কিছু করবার দায়িত্ব অল্প সংখ্যক উচ্চস্তরের মানুষের উপরে ন্যস্ত ছিল। বৃহত্তর সামাজিক বোধ, দৃষ্টির প্রসারতা, সংগঠনের শক্তি, সুষ্ঠু পরিচালনা, সামঞ্জস্যের বোধ, বুদ্ধির চর্চা সর্ব স্তরে তেমনভাবে হয়নি। সুতরাং স্বাধীনতা-পরবর্তী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জনসমাজ বিশৃঙ্খল দুর্নীতিগ্রস্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। রাষ্ট্রনেতাদের ব্যক্তি-রেষারেষি, তামসিকতা, প্রাদেশিকতা রাজনীতির নিদান হবে তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ অধিকাংশ নেতা, দলপতি জনগণের সমর্থনে নির্বাচিত, যাদের হয়তো চারিত্রিক বনিয়াদ-পারিবারিক বনিয়াদ-সামাজিক বনিয়াদের কোন দীর্ঘ ঐতিহ্য নেই। তারা প্রলুব্ধ হবে, জনগণের বিশ্বাস ভঙ্গ করবে এ আর বেশি কথা কি? তাই দেখা যায় যুগে যুগে বহু মনীষী সমাজশিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সমাজমন প্রস্তুত না হলে আদর্শ গ্রহণ ও ব্যাপকভাবে বাস্তব জীবনে অনুশীলন হয় না। আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি যে সামাজিক মৌল পরিবর্তনে ব্যক্তি প্রচেষ্টা একা সফল হতে পারে না, রাষ্ট্রের সুনিয়ন্ত্রিত বিধিনিষেধ ব্যবস্থা প্রয়োজন। সার্বিক সাম্য কোন সমাজে আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সেটা সম্ভবও নয়। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে পৃথক—সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক গুণের প্রাধান্য। মানুষের বুদ্ধি, কর্মশক্তি এক রকম নয়। এই গুণগত পার্থক্য মানুষের আচারে ব্যবহারে, রুচিতে, আহারে-বিহারে, লক্ষ্যগোচর হয়। সমষ্টিগতভাবে যে শ্রেণীতে, সমাজে, দেশে অধিকাংশের মধ্যে একটি গুণের আধিক্য দেখি আমরা সেই জাতি, সেই শ্রেণী, সেই সমাজকে সেই গুণে চিহ্নিত করি। এই রকমই আমাদের বিচারের পদ্ধতি। কিন্তু বিবিধ গুণের সংমিশ্রণ কি নেই? ব্যক্তি-মানুষে বিবিধগুণের সংমিশ্রণ আছে তথাপি দেখা যায় কোন একটি গুণের আধিক্যে ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিত্ব। তেমনি বিশেষ গুণের বিকাশে, বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, বিশেষ জীবনযাত্রার ছাঁদে, বিশেষ মূল্যবোধে, অর্থ-নৈতিক বিন্যাসে, রাষ্ট্রিক বিধিব্যবস্থায় একটি জাতি তথা সমাজের স্বাতন্ত্র্য।

এই স্বাতন্ত্র্যই কুলধর্ম, বর্ণধর্ম নামে চিহ্নিত আমাদের সমাজে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভাবে ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে আমরা এখন আর ঠিক পরিবারে সীমায়িত, কুলে বা জাতিতে সীমায়িত বিদ্যাজ্ঞানে তৃপ্ত থাকতে পারি না, কুলকর্মও গ্রহণ করি না। তথাপি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। শিশু যে পরিবারে জন্মায় সেই পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার রীতি, জীবনযাত্রার মানে সে লালিতপালিত হয় সুতরাং তার জীবনের এক অধ্যায় বিশেষ প্রভাবপুষ্ট। কিন্তু আধুনিক সভ্য সমাজে সর্বত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিদ্যমান, শুধু বংশগত শিক্ষা-সংস্কৃতি নয়, সমগ্র সমাজের, পৃথিবীর মানুষের চিন্তা চেতনা, অতীত বর্তমানের ধ্যানধারণা, সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত সুষ্ঠু প্রণালীতে সংহতভাবে যুক্তিসিদ্ধ প্রথায় সমাজের সর্ব স্তরে ব্যাপৃত। ফলে ব্যক্তির মানসিক প্রসার ঘটে বহু ধরনের প্রভাব অনিবার্যভাবেই ব্যক্তিজীবনে পাঠ জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। বিশেষত শাহরিক জীবনে।

কিন্তু গ্রামের মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে আসে না। পরোক্ষভাবে অর্থনীতি-রাজনীতির চাপ এসে পড়ে। অধিকাংশ গ্রামেই আধুনিক জীবনের উপযোগী ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থার অভাব। অনুন্নত দেশের গ্রামে ঠিক এই কারণেই শিক্ষিতের (পাশ্চাত্ত্য ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত) সংখ্যা খুব কম। কেননা, শিক্ষিত মাত্রেরই দৃষ্টি শহরের দিকে। শহরেই শিক্ষিতের কর্মসংস্থান। যন্ত্র, কারখানা, শ্রমিক, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সংযোগ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, সর্বপ্রকার টেকনোলজির সুযোগ সুবিধা নগর সভ্যতার অনুষঙ্গ। কাজেই নগর, উপনগর, শিল্পনগর
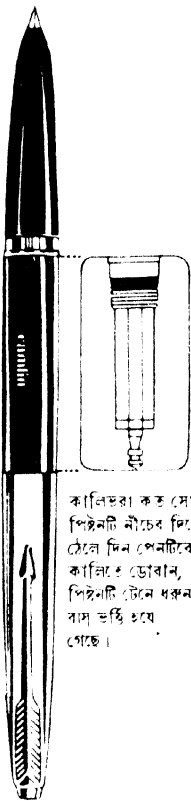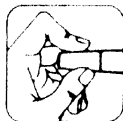
কেন্দ্র করেই আধুনিক শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিতের বাস। কিন্তু গ্রাম ও নগর যে পরস্পরের পরিপূরক এই ধারণা অনুন্নত দেশগুলিতে স্পষ্ট নয়। আবার উচ্চশিক্ষিত, বিত্তবান সম্প্রদায় শহরেও অতৃপ্ত কারণ অনুন্নত দেশগুলির তুলনায় ধনী পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আধুনিক জীবনের উপকরণ আরও উন্নত। এই নানা ধরনের প্রবণতা ও বিচিত্র ধরনের অসঙ্গতির অন্যতম একটি কারণ পাশ্চাত্য সমাজে গতাগতির সুযোগ, পাশ্চাত্য সমাজের খবরাখবর ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যক্তি আদর্শের ধারণা। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে ব্যক্তিজীবনে ও বৃহত্তর সমাজ-জীবনে স্বতোবিরোধের জটিলতার মূলে এইখানে বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

যদি মানব অধিকারের দাবী আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করি, ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাধীনতা যদি স্বীকার করি তাহলে ব্যক্তির স্ব-ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে কোন দায়-দায়িত্ব কর্তব্যের বাধা সৃষ্টি করা চলে না। আমার উচ্চাশা আছে, গচ্ছিত ধন আছে, ধন সঞ্চয়ের ইচ্ছা আছে, কর্মশক্তি আছে, বুদ্ধি আছে কেনই বা আমি সেই বুদ্ধি কর্মশক্তি ধনশক্তির বলে উন্নত জীবনযাত্রার মানে বাস করব না? পাশ্চাত্য সমাজের প্রতি লুব্ধতা যদি থাকে তাতেই বা দোষ কি? প্রশ্ন হল এই একান্ত আত্মস্বার্থকাম কত দূর পর্যন্ত সমর্থনযোগ্য। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই নিরীক্ষণ করছেন সারা পৃথিবীর সমাজে এই প্রশ্নের জটিলতা—কোথাও কম কোথাও বেশি।

দরিদ্র, অন্ত্যজ, অশিক্ষিত, বঞ্চিত জনসমাজের উন্নতি যদি আমাদের উপজীব্য হয়, গ্রামজীবনকে যদি সমাজের ভিত্তি বলে মনে করা যায় তাহলে আমরা দেখব অন্যান্য দরিদ্র দেশগুলির মতই ভারতবর্ষে শহর ও গ্রামে, উচ্চ ও দরিদ্র শ্রেণীতে দুস্তর ব্যবধান। ব্যবধান পথের দূরত্বে নয়। যথাক্রমে জীবনযাত্রায়, অর্থবৈষম্য সুযোগসুবিধা লাভে, পৌরবিধি ব্যবস্থার সর্বোপরি মানসিকতায়। এই আলোচনার উদ্দেশ্য সেই সঞ্জীবনী আবিষ্কারের চেষ্টা যে সঞ্জীবনী সঞ্চারে সমাজে উচ্চ-নীচ সর্বস্তরে, শহর-গ্রামভেদ নির্বিশেষে মানসিক সমঝোতা গড়ে উঠতে পারে। অশিক্ষিত দরিদ্র চাষী, অশিক্ষিত দরিদ্র জাতিব্যবসায়ী (কামার, কুমোর, নাপিত, গোয়ালা প্রভৃতি) ভূমিহীন দরিদ্র কিষাণ, মজুর (অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ধর্মাবলম্বী); অস্পৃশ্য (চামার, দুলে, বাগদী প্রভৃতি) এবং অল্প শিক্ষিত অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন চাষী গৃহস্থ (হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান)—ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামের জনজীবন অল্পবিস্তর এই প্রকার আর্থিক-সামাজিক বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষী গৃহস্থের বা জাতিব্যবসায়ীদের ঘরের ছেলেরা কেউ কেউ শহরে রুটি-রোজগারে ব্যাপৃত। গ্রামের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ টাকা লেনদেনের যোগাযোগ মহাজন-জোতদার-ব্যবসায়ী শ্রেণীর যারা জেলা-শহরে-গঞ্জে, বড় শহরে বাস করে। এছাড়াও শহরের সঙ্গে আর্থিক সংযোগ ব্যক্তির ক্ষুদ্র ব্যবসায় সূত্রে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে যাতায়াতের সুবিধার জন্য চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি সূত্রে, রাজনৈতিক কর্মীদের তৎপরতার সূত্রে। বড় গ্রামে স্কুল, বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার ইত্যাদি আছে তবে সর্বত্র নয়।

গ্রামের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন এখনো মূলত একক ব্যক্তি বা পরিবার প্রচেষ্টা নির্ভর। বড় বড় শহরগুলিকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক বুদ্ধি নিয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় বিশেষত দুগ্ধজাত খাদ্য উৎপাদন, পশুপালন, সবজি, শস্য-পণ্য সরবরাহ ইত্যাদি তাতে আশেপাশের গ্রামের মানুষ খেটে খেতে পারে কিন্তু আর্থিক সমৃদ্ধির অংশীদার হতে পারে না। এ... আমাদের উৎপাদন প্রচেষ্টায় বিশেষত কৃষিজাত উৎপাদন, খাদ্য উৎপাদনে ...নির্ভর একক প্রচেষ্টারই প্রাধান্য। যৌথ প্রচেষ্টা, যৌথ কারবার কম। ...দের সমাজমন সেভাবে প্রস্তুত নয়। গণতান্ত্রিক সরকার সে অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়িত্ব বোধও করে না।

পরিস্থিতি পরিবর্তনের উপায়স্বরূপ একটি পথ বিশেষভাবে অবলম্বিত হওয়া সংগত মনে হয়। সমাজ স্বার্থের প্রতিকূল বিশ্লিষ্ট খণ্ড ব্যক্তিবাদের শিক্ষা নিরোধ, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমাজ মনে সংহতিবোধের উন্মেষ ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধের বিকাশ। মানুষ তো আর সৃষ্টিছাড়া জীব নয়। মাতৃক্রোড়ে জন্ম, পরিবারে লালনপালন, সমাজে আমৃত্যু বাস। ব্যক্তিজীবনে শুধু পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালনই যথেষ্ট নয়, সমাজ তথা দেশের প্রতিও দায়িত্ব থাকে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই। এই বোধই মানুষের সামাজিক সত্তা। সামাজিক সত্তার উপলব্ধি সম্যকভাবে হওয়া সম্ভব নয় যদি সমাজ ব্যক্তিকে সেই কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে না শেখায়। যে সমাজে জন্মাই, যে দেশের ফলে জলে বর্ধিত হই, সুখ আহরণ করি শিক্ষা পাই সেই সমাজের প্রতি দেশের প্রতি ব্যক্তির জন্মসূত্রে দায়িত্ব বর্তায়। শাস্ত্রে বলে ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ—এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয়। তেমনি দেবঋণ, মাতৃ-পিতৃঋণ, অবশ্য পরিশোধনীয়। আমাদের কর্মশক্তি বুদ্ধি-শ্রম দিয়ে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় সেই ঋণ পরিশোধ করি চেতনে অবচেতনে। সমাজশিক্ষা সেই ঋণবোধ এবং পরিশোধ্য কৃত্য সম্বন্ধে সজাগ করে। ব্যাপক সামাজিক শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাধারায় অন্তর্ভূত না হওয়াতে সমাজ মনে অসংহত বিশ্লিষ্ট আত্মস্বার্থবাদ ঘনীভূত হয়। উচ্চস্তরের, শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিতের মধ্যে, কর্মী, দায়িত্বভার ন্যস্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশের এই অপরিসর দৃষ্টিভঙ্গিই আধুনিক কালে নানা পরিবেশ ও পরিস্থিতির সুযোগে এক স্বার্থসর্বস্ব দুর্নীতি পরায়ণতায় পর্যবসিত। এই মনোভাবের প্রাধান্যই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবক্ষয়ের অস্থির দুর্লক্ষণ ঘনিয়ে উঠতে সহায়তা করে। সম্ভবত এই কারণেই আজ বিদেশী শক্তির প্রতিনিধি বিদেশী ব্যক্তিরা অপসারিত হলেও তাদেরই শিক্ষাদীক্ষা পোষণায় পুষ্ট স্বদেশীয়েরা তস্করবৃত্তিতে কীর্তিমান, ধ্বংস, লোভ

তিতসুক প্রবণতায় পারদর্শী। তাই বর্তমানে নিরতিশয় আর্থিক অসাম্যে, তীব্র শিক্ষাভিমান ও অহমিকায় উপরতলার মানুষের নির্বিকার ঔদাসীন্যে নীচুতলার মানুষের নির্বুদ্ধিতায় সরকার শাসনযন্ত্র ও পার্লামেন্টারি রাজনীতি-দের তামসিক অস্বচ্ছ দীর্ঘসূত্রী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সমগ্র দেশে অদ্ভুত শ্লথ, বিশৃঙ্খল, অর্থনীতিতে মার খাওয়া হতাশ দারিদ্র্য ভবিষ্যৎহীন নিরুপায় অবস্থা যেন বিরাজমান।

এই দুঃখজনক পরিস্থিতি অর্থনীতি ও শিক্ষার সুপরিকল্পিত আদর্শহীন ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের আশাহীন বিপুল জনজীবনের দিকে তাকিয়ে স্বতই মনে হয় আমাদের মত দেশে ব্যক্তিবিকাশের চেয়েও সমষ্টি উন্নয়নের প্রতিই অধিকতর মনঃসংযোগ আবশ্যক। জাগতিক ব্যবহারিক জীবন সমগ্র সমাজে সুস্থতা সমতা থাকলে তবেই সামগ্রিকভাবে মানসিক পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। সুযোগ সুবিধা অর্থ ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের আয়ত্তে রাখার চেষ্টায় সমাজে তীব্র প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে কিন্তু ব্যাপক শান্তি সুস্থতা থাকে না। কাজেই আমাদের সমাজজীবনে পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা-আশ্বাস-প্রতিশ্রুতি কতকটা নিষ্ফল প্রহসনের নামান্তর হয় বটে। তাই বারংবার মনে হয় যে ধর্ম ও জীবনের শিক্ষার অস্তিত্ব ভারতবর্ষের জনমানসে ক্ষীণভাবে আছে তা উৎপাটনের চেয়ে সঞ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা অধিক। সংস্কৃতিধ্বংস নয়, ব্যক্তিসংযোগ ও যৌথ কর্ম প্রচেষ্টায় সমাজ সংহতিবোধের শিক্ষায় ব্যক্তি তথা সমাজ-মন পরিমিতিবোধ জাগানোই সমস্যাদীর্ণ বৃহৎ বিপুল জনসমাজের বাস্তব উন্নয়নের অনুকূল।

আমাদের লুব্ধ মনোভাব, অর্থগৃধ্নুতা, দরিদ্র ও বঞ্চিতের প্রতি ঔদাসীন্য প্রমাণ করে যে সমাজমানে বিচ্ছিন্নতার ইন্ধনের যথেষ্ট যোগান আছে। আমাদের উন্নাসিকতা প্রমাণ করে যে বৃহৎ ভারত-সমাজবোধের কত অভাব। শহর-কেন্দ্রিকতা নিত্যই প্রমাণ করে জীবনযাত্রায় আমরা আদৌ আধুনিকীকরণের বিপক্ষে নই। আধুনিক জীবনের মূলমন্ত্র অর্থ এবং কাম এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ আধুনিক সমাজে, ভারতসমাজের যে মূলমন্ত্র ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সে মন্ত্র খণ্ডিত, উপেক্ষিত।

বলা বাহুল্য স্বল্প সংখ্যক আদর্শবাদীর নিরলস চেষ্টা সমাজে যুগ যুগ ধরে চলছে, বিভিন্ন যুগে বহু মনীষীর জীবৎকালে সমাজের কোন কোন স্তরে কিছু সংখ্যকের জীবন প্রভাবিত হয়েছে। দরিদ্র পীড়িতের, বঞ্চিতের সেবায় দান-ধ্যান সমাজে বিদ্যমান। কিন্তু এ যুগে কোন আদর্শ ব্যক্তি প্রচেষ্টায় বাস্তবে ব্যাপক-ভাবে সমাজে দৃঢ়মূল হতে পারে না। কোন আদর্শকে ব্যাপক ও সম্যকভাবে কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা তখনি সার্থক হতে পারে যখন তা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এ যুগে সমাজমানস পরিবর্তনের চাবিকাঠি।

প্রথমত, ধনী পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আর্থিক বিন্যাস ও শিক্ষানীতির পাঠে বোঝা যায় যে সব দেশে খনিজসম্পদের অভাব, আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের অপ্রসার, কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ লোকসংখ্যার অনুপাতে কম সে সব দেশ একদিকে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি সফল করে তোলার চেষ্টা এবং মোটা ভাত-কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকার মত মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টায় উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সমগ্র সমাজের মানসিক অবস্থা সৃষ্টিই হওয়া উচিত শিক্ষার মূলনীতি। একথা স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে ধনী রাষ্ট্রের মত ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত ধনস্ফীতি ও ধর্মবিযুক্ত শিক্ষানীতি উপর্যুক্ত মানসিকতা ও আর্থিক অবস্থা সৃষ্টির আদৌ অনুকূল নয়।

দ্বিতীয়ত, ধনী রাষ্ট্রগুলি দেখে একথাও মনে হয় যে শক্তি ও ধন-প্রমত্ত হয়ে মানুষ পরিমিতিবোধ হারায়। বস্তু, ঐশ্বর্য, ভোগ ব্যতীত জনজীবনে আর কোন লক্ষ্য যেন থাকে না।

তৃতীয়ত, ভয়, ভীতি, কঠোর দমননীতি, হিংসা মানুষকে দিশাহারা করে তোলে। আজ সব দেশের ভাবুক সমাজ, পরিমিতি বোধের শিক্ষাই আদর্শ বলে অনুভব করছেন। সে আলোচনায় আমরা একটু পরে আসছি।

আমাদের দেশে লেখাপড়া শেখার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে পরীক্ষা পাস, চাকরী যোগাড় করা অথবা শহরকেন্দ্রিক একটি বিশেষ পেশা অবলম্বন, সম্ভবস্থলে বিদেশ গমন, ধন দৌলত লাভ। কোন সন্দেহ নেই জীবিকানির্বাহের জন্য আধুনিক যুগে বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তির চরিত্র গঠন, সামাজিক কর্তব্যবোধ, জাতীয়তার উদ্বোধন, ধর্মশিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধির জ্ঞান, রাজনীতির সাধারণজ্ঞান এগুলিও শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ। এই শিক্ষার ভার আমাদের সমাজে থাকে পরিবার ও সমাজ পরিবেশ-প্রতিবেশের উপর। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না, তবে খেলাধুলা, সঙ্গীতনৃত্য, সাহিত্যপাঠ ইত্যাদির দ্বারা বিশেষ মানসিকতা গঠিত হয় সেকথা অবশ্যস্বীকার্য। বহু স্থানে ভাল ভাল শিক্ষাকেন্দ্র আছে, রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাকেন্দ্র, আর্যসমাজের শিক্ষাকেন্দ্র, গান্ধী আদর্শে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র, রবীন্দ্র-আদর্শে শান্তিনিকেতন, অরবিন্দ আদর্শে পন্ডিচেরী, এই প্রকার বহু কেন্দ্র। তথাপি সরকার যদি সারা ভারতবর্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে সম-নীতি কার্যকরী না করে তাহলে বৃহৎ জনসমাজে সম-মানসিকতা কদাচ গঠিত হতে পারে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, যদি সমগ্র সমাজের অগ্রগতি ও ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হয় তবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় দরিদ্র-নিম্নশ্রেণীর জনসমাজকে উপেক্ষা করা চলে না। আমাদের মত দেশে অর্থাৎ যে সব সমাজে আবশ্যিক প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, পনের-ষোল বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই সে সব দেশে দরিদ্র-নিম্নশ্রেণীর মধ্যে, অধিকাংশ গ্রামবাসীর মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার কোন বালাই নেই। গায়ে গতরে খেটে জাতি বা কুলবৃত্তি পিতা-পিতামহের কাছে শিখে দিনাতিপাত করাই রীতি। খেটে খাওয়া মোটা লোকেরা, দিন আনে দিন খায় যারা তাদের পক্ষে ব্যয় সাধ্য, সময় সাপেক্ষ শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয় এবং তারা ইচ্ছুকও নয় কারণ এই ধরনের শিক্ষার ফলে মন-মেজাজ বদলে যাবার সম্ভাবনা থাকে, গ্রাম ছেড়ে জাতব্যবসা ছেড়ে যাবার প্রবণতা দেখা দেয়।

জনশিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় (এক) ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনের উন্নতির সহায়ক শিক্ষা, (দুই) ব্যক্তির মানসিক জীবনের উন্নতির সহায়ক শিক্ষা, তাহলে আমরা হয়ত একটা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে লিখতে পড়তে জানা শিক্ষার লক্ষণ বটে কিন্তু লিখতে পড়তে জানলেই শিক্ষা হল, এমন ধারণা ভ্রান্তিমূলক। আমাদের মত সমাজে অন্তত যে উপেক্ষিত জনতার কথা উল্লেখ করেছি তাদের পক্ষে, লিখতে পড়তে জানার চেয়েও জরুরী সাধারণজ্ঞান। বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিধি, প্রাসঙ্গিক রাজনীতি-শাসনব্যবস্থা অর্থবিন্যাসের সাধারণজ্ঞান, ধর্ম ও সমাজগঠনমূলক ধারণা, সর্বোপরি একটি বৃত্তি শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আরোপ।

কোন নাস্তিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে অস্তিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই বাস্তবিক কল্যাণপ্রদ। প্রয়োগবিধির যে পার্থক্য থাক মনে রাখতে হবে ধনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজগুলির চেয়ে বহু গুণ সফলতায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি জনশক্তি তথা যুবশক্তির অপচয় সংহত করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু কোন দেশের কোন ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ নির্দোষ নয় এবং কোন দেশের বিশেষ আদর্শ, নীতি, পদ্ধতির পূর্ণমাত্রায় নকল চলে না। রাশিয়া, চীন, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা কোন দেশের আদর্শ, নীতি, পদ্ধতির হুবহু নকল যেমন সম্ভব নয় তেমনি মঙ্গলজনক নয় আমাদের সমাজের পক্ষে।

ধর্ম-আধ্যাত্মিকতা-ঈশ্বরে বিশ্বাস মানসিক মুক্তি ও পরিমিতিবোধের যে দিকটা মানবিকতাবোধের পরিপূরক বলে ভারতবর্ষের মানুষের ধারণা তারই প্রকার ও প্রকারভেদ ধর্ম আচরণ অনুষ্ঠানে, সন্তোষে, সংযমে সহাবস্থানের নীতিতে, এগুলি জীবন থেকে মুছে ফেলার যেমন আমরা পক্ষপাতী নই তেমনি শিক্ষানীতিতে প্রতিফলন না থাকাও জাতীয় জীবনের পক্ষে মঙ্গলকর নয় বলে ভাবি। সুতরাং আমাদের মানসিক গঠন, সামাজিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ধর্মনৈতিক সহাবস্থান ও জাতীয় সংহতির উপযোগী শিক্ষাদর্শই আমাদের সমাজের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর। আমাদের ধর্ম ও ন্যায়নীতির আদর্শের সঙ্গে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও বাস্তবজীবনের প্রতি একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সমন্বয়ী আদর্শই ভারতীয় আধুনিক শিক্ষার মূলনীতি হওয়া যুক্তিযুক্ত। এ যুগে জাতি বিশেষের প্রাধান্য অবসিত, ভারতীয় সংবিধানে প্রতি নাগরিকের পূর্ণ সুযোগের অধিকার স্বীকৃত। আজও যে অন্তঃসলিলা ভারতীয় দর্শনের সঞ্জীবনী ভারতবর্ষের বিপুল জনসমাজকে বিনষ্টি থেকে রক্ষা করে চলেছে, সেই দর্শনের তথা জীবন আদর্শের মূল সত্যগুলিকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা আধুনিক শিক্ষার একটি বিশেষ নীতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। উচ্চ-নীচ শ্রেণীর, গ্রাম-শহর বিভেদ, বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়, রাজ্য, ভাষা নির্বিশেষে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকরী হওয়া অত্যাবশ্যক। সাধারণ কয়েক পুরুষে যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই ধারাবাহিক শিক্ষার দিকে ঝোঁকে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শিক্ষিত বেকারের দারুণ সংখ্যাবৃদ্ধি। বিচ্ছিন্ন আন্দোলন, রাজনৈতিক উষ্মা প্রচলিত ধারাবাহিক শিক্ষার দিক পরিবর্তন সূচিত করে। মনে হয় বিষয় শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা, পরীক্ষার পাঠ অভ্যাসের পাশাপাশি কতগুলি অবশ্যপালনীয় আচরণীয় নীতি, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা শিক্ষা অত্যাবশ্যক। যাতে চারিত্রিক বুনিয়াদ দৃঢ় হয় ও সামাজিকবোধের উন্মেষ ঘটে। এতদ্‌ব্যতীত সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধি প্রসারের সঙ্গে বিষয় শিক্ষার সমতা রক্ষায়। বৃত্তিশিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়, শাসন, আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের সঙ্গে সমতা না রেখে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে বেকার বৃদ্ধি, অসন্তোষ বৃদ্ধি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অনিবার্য।

সব সমাজেই ন্যায়, শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, মানুষের প্রতি মানুষের সৌহার্দ্য, আইনের চোখে সমদৃষ্টি কাম্য। কিন্তু এই আদর্শগুলি তখনই স্থায়ী হতে পারে যখন আপামর জনসাধারণ এ সবের মর্ম বোঝে, এবং আপামর জনসাধারণের অধিকার বর্তায়। উৎসাহ, উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস তখনই জাগা সম্ভব যখন জনসমাজ সন্তুষ্টি থাকে, সকলেরই মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান থাকে। আদর্শবাদ সুখী করে না যদি দেখি একজন ভোগ করে আর একজন বঞ্চিত হয়। মনে হয় আত্মস্বার্থসিদ্ধির উগ্রতা, ধনসঞ্চয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে, বস্তুভোগের তীব্র আসক্তি প্রশমিত হতে পারে যদি দেশে সন্তানসন্ততির আর্থিক নিরাপত্তার আশ্বাস বিদ্যমান থাকে, পরিমিতিবোধ সমাজবোধ-জাতীয়তাবোধের দৃঢ়তা থাকে। সার্থক ধর্মনিরপেক্ষতাও তখনই সম্ভব যখন মানুষ বুঝতে শেখে অনুষ্ঠান সর্বস্বতা ও ছুৎমার্গের ঊর্ধ্বে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন। যুক্তি, বিচার, তর্ক ছাড়াও মানুষের বহু ধরনের গোঁড়ামি কুসংস্কার, অবজ্ঞা, ঘৃণা, আবেগ অহমিকা প্রশমিত হতে পারে যদি ব্যক্তি-সমাজ-দেশ-বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান জন্মায়, মানবজীবনের মূল্যবোধ জাগে। লোভও সংবৃত হয় যদি লোভের উপকরণ বিলাস বাহুল্যে নিয়ন্ত্রণ থাকে।

কাম্য সমাজ মানসিকতা প্রসারের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রচলিত

গ্যাস আর বদ্‌হজম। অতিমাত্রায় কোলোসট্রোল। গাঁটে গাঁটে ব্যথা।

ত্রিশ বছর বয়সের পরে এই সব সমস্যা নিয়ে আপনি কী বাঁচতে পারেন?

হ্যাঁ, বাঁচবেন।

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্লসের মাধ্যমে।

আপনার শরীরে রোগের মোকাবিলা করার শক্তি এখন আর ততখানি নেই, যতটা কিছুদিন আগেও ছিল। এখন আপনার নিজের শরীরের প্রতি একটু বেশী যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসুন প্রয়োগে রোগ নিরাময়ের সুপ্রাচীন পদ্ধতিকে আবার প্রমাণ করেছে।

অতি আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে পরীক্ষার দ্বারা রসুন ঔষধির নিরোধক ও নিরাময়ের গুণ সুপ্রমাণিত হয়েছে।

- গ্যাস ও বদ্‌হজম দূর করে, বুকের জ্বালা আরাম করে
- কোলোস্‌ট্রোলের বেশী মাত্রা কমিয়ে আনে
- গাঁটের ব্যথা প্রশমনে সাহায্য করে
- বার-বার কাশি ও সর্দ্দি রোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করে

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্লস্‌—গন্ধ নেই, তবু কাঁচা রসুনের সব গুণই পাবেন এতে।

কাঁচা রসুন একবার রাঁধ্‌লে এর নিরাময় ক্ষমতা নষ্ট হয়।

কিন্তু, র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্লস্‌ এ শুদ্ধ, কাঁচা রসুনের ঘন নির্য্যাস গন্ধহীন সহজলভ্য মুক্তাদানার আকারে পাওয়া যায়।

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্ল'স্‌ নিয়মিত সেবনে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান হয়।

র‍্যানব্যাক্সি—যে নামে ডাক্তারদের আস্থা রয়েছে।

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্ল'স্‌ হ'ল র‍্যানব্যাক্সির লেবরেটরীজের উৎপাদন—যে নামটিতে চিকিৎসকগণ বিশ্বাস রাখছেন।

নিজের প্রতি খেয়াল রাখুন।

সব সময়
র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক
পার্লস্‌ চাইবেন।
আজই একটি
গার্লিক পার্লসের বোতল
বাড়ীতে কিনে
আনুন।

GP-5661 BEN

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্লস্‌ সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য লাভের প্রাকৃতিক পন্থা।

শিক্ষা ব্যবস্থায় সংযুক্তিকরণ বাঞ্ছনীয় বোধ হয় :

প্রথমত : আত্মসংযম শিক্ষা. আত্মজাগরণের প্রাথমিক সোপান কায়িক বাচিক ও মানসিক তপস্যা, অর্থাৎ নিয়ম অভ্যাস। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও ব্যক্তি-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা। বাক্যে বা ব্যবহারে অপরকে আহত না করার শিক্ষা।

দ্বিতীয়ত : সমাজবোধের শিক্ষা : পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, সমগ্রদেশের প্রতি কর্তব্যবোধ ও অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি। প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থের নিষ্প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা।

তৃতীয়ত : তামসিকতা দূরীকরণের শিক্ষা : ব্যক্তি, জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত মনোভাবের উন্মেষক শিক্ষা।

চতুর্থত : আত্মজাগরণের শিক্ষা : স্বকীয় শক্তির উপর আস্থা স্থাপনের মনোভাব, নিজের কাজকে ভালবাসতে শেখানো, জাত ব্যবসায়ের উন্নতিমূলক প্রচেষ্টা।

পঞ্চমত : ন্যায়নীতি, সহনশীলতার শিক্ষা : বিভিন্ন ধর্মের মূলকথা শেখানো, ভালমন্দ বোধের আপেক্ষিক ধারণা দেওয়া, বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রমের যুক্তিসিদ্ধ সহজ আলোচনা দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের শিক্ষা।

ষষ্ঠত : জাতীয়তাবোধের শিক্ষা : পৌরশাসন ও গণতান্ত্রিক আদর্শের সহজ আলোচনার দ্বারা জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার মূল উৎপাটন।

উন্নত দেশ মাত্রেই ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের নাগরিককে সমাজ দেশ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করায়। এর ফলেই শিশু কিশোর যুবক মাত্রই অক্ষর পরিচয়, বিষয়জ্ঞান, বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। বড় মানুষের ছেলেমেয়ের পাশাপাশি চাষী শ্রমিক খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ছেলে-মেয়েরাও আবশ্যিক শিক্ষা পায়। স্বাস্থ্যবিধি ও সাধারণ জ্ঞান তাদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত থাকে বলে বুদ্ধির প্রাখর্য দেখা যায়, পরিচ্ছন্ন হয়ে বাঁচতে শেখে। কায়িক জীবনের উন্নতির চিন্তাই একান্ত ও চূড়ান্ত বলে গৃহীত, ধর্মমূলক, আধ্যাত্মিক চিন্তামূলক শিক্ষা প্রায় উৎখাত (বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া)। তথাপি সব দেশের শিক্ষায় শিল্প, সংগীত, শরীরচর্চামূলক ব্যায়াম, খেলাধূলা, ভ্রমণ, হাতেকলমে কাজ এবং জনসংযোগ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সব সমাজেই উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের মানুষের চিন্তা বুদ্ধি কর্মকুশলতা পরিচালনা ও মেহনতি জনতার কায়িক শ্রমে সমাজ চক্রের নিয়ত আবর্তন। যুগ্মশক্তিই সমাজের ভরসা। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সত্ত্বেও উন্নত দেশগুলিতে গরীবের জন্য, অপারগের জন্য কায়িকশ্রমের জনতার জন্য সমগ্র সমাজের রাষ্ট্রের দায় দায়িত্ব গ্রহণের চেষ্টা আছে, আশ্বাস কার্যকরী হয় সে সব দেশে এইভাবে কায়িক জীবনযাত্রার মান রক্ষা করার চেষ্টা হয়। যদিও সে সব রাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্য তীব্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দমনাত্মক কঠোরতা প্রয়োগ করে সকলের মানবের কায়িক জীবনের সমমান বজায় রাখার চেষ্টা চলছে।

ধনী পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও দেখা যায় কয়েক পুরুষে যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই সাধারণত লেখাপড়া কিছু দূর শিখলে পর, তারা অ-কায়িক শ্রমের কাজের দিকে উৎসাহ পায়, বাদ-বাকি যারা বেশি দূর লেখাপড়া করার উৎসাহ পায় না কায়িক শ্রমই তাদের জীবিকা সংস্থানের উপায়। যে চাষী সেও আবশ্যিক শিক্ষা পায়, যে শ্রমিক সেও বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ শিক্ষার পাঠ নেয়। যেহেতু শ্রমিকের মজুরের মান সর্বনিম্নহারের নীচে যায় না, কায়িক শ্রমের অ-কায়িক শ্রমের আর্থিক মানের তারতম্য অনুন্নত দেশের মত হয় না, সেই হেতু সমাজে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের, ক্রয়ক্ষমতার একটা মোটামুটি সম অবস্থা থাকে। উঁচু-তলার মানুষ যারা এই অবস্থায় বহুকাল যাবৎ অভ্যস্ত বলেই অনুন্নত দেশের শিক্ষিত ও বিত্তশালীর ন্যায় ঔদাসীন্য পোষণ করে না বা দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়ায় না। অপরপক্ষও ন্যায়সংগত অধিকারের দাবী করে। দেশের শিক্ষাই এই পারস্পরিক সমঝোতা সমাজে বজায় রাখে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর্থিক সমতা বজায় রাখার যেমন চেষ্টা তেমনি সুপরিকল্পিতভাবে সমাজ-প্রয়োজন মত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। বিশেষ শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পাঁচ বা দশ বছরের সম্ভাব্য প্রয়োজনের অনুরূপ শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্বাচিত হয়। উচ্চতর বিজ্ঞানের শিক্ষায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ গবেষক, তীক্ষ্ণধী মেধাবী ব্যতীত নির্বাচন নেই। এইভাবেই যুবশক্তি, শ্রম, আর্থিক অপচয় নিবারণের চেষ্টা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শুধু আশ্বাস এবং আদর্শ যথেষ্ট নয়। এমনকি অমূলক প্রতিশ্রুতি, যদি না সেই আশ্বাস ও আদর্শে বাস্তব রূপায়ণ ঘটে। শিক্ষাও নিষ্ফল শ্রম, সময় ও শক্তির অপচয়ের সামিল হয় যদি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই লাভবান না হয়। দেশের শিক্ষা দেশের অর্থনীতির সংগে জড়িত। অর্থনীতির জটিলতা বিশেষজ্ঞরা বিচার করবেন। সাধারণের কাছে একথা স্পষ্ট যে সমাজ স্বার্থের অনুকূলে কতগুলি প্রাথমিক ধারণা দৃঢ়মূল হওয়া আবশ্যক। সমাজের অর্থনৈতিক উচ্চতম ও নিম্নতম শ্রেণীবিভাগ কত দূর পর্যন্ত সহনীয়। সমাজের বিত্তশালী-ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী, সমাজ স্বার্থবিরোধী কার্য-কলাপ কত দূর পর্যন্ত আইনত অনিয়ন্ত্রিত থাকবে। পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত অর্থে উত্তরপুরুষের কতটা দাবী থাকবে। ঊর্ধ্বতম সঞ্চয় ও আয়ের মাত্রা কত দূর হবে। সমগ্র সমাজের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জীবিকা সংস্থানের ভার সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর বর্তাবে কিনা এবং দেশের অর্থ বিদেশে লগ্নী করার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের, ব্যক্তির নয়, যেমন নয় প্রতিরক্ষার দায়িত্ব।

সরকার যদি এই ধারণাগুলি বাস্তবভাবে কার্যকরী করে তোলে তা হলে বিরোধী শক্তির ক্রিয়া সত্ত্বেও সমাজমান-পরিবর্তন ঘটবে আশা করা যায়। পরস্পর-বিরোধী মনোভাব, শক্তির ক্রিয়া সব সমাজে বিদ্যমান। যে যুক্তরাষ্ট্র মানব অধিকারের কথা বলে সেই যুক্তরাষ্ট্রই মারণঅস্ত্র যোগায় সারা বিশ্বের দেশে দেশে, যেখানে সুযোগ দেখে সেখানেই বিবাদ ও বিরোধের ইন্ধন যোগায় ভারতবর্ষেও তাদের গোপন তৎপরতা কম নয়। যে সমাজবাদী রাষ্ট্র তাবৎ দুঃখী জনতার ইমান চায় তাদেরও সেই একই প্রয়োগ বিধি। যুদ্ধ, হিংসা, খুন, বিচারহীন বিবেকহীন দমন। বোধ হয় ভারতবর্ষ এখনো পর্যন্ত

হিংসাত্মক নীতিকে একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করতে পারেনি। বাহ্যত এই ভাব প্রশংসা পায় না। কিন্তু প্রকৃত মানবনীতি হিংসাবিরোধী, সহনশীল বিবেকীনীতি। বহু পরস্পরবিরোধী শক্তি ক্রিয়াশীল থাকা সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক নিদারুণ বৈষম্য ও লোকস্ফীতি সত্ত্বেও হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম প্রভাবে প্রভাবিত ভারত-সমাজের মানুষ মানবিক নীতিতে আস্থাশীল। এই ভাব সার্থক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূলধনস্বরূপ। সুপরিকল্পিত উপায়ে এই ভাব সমাজ-মনে দৃঢ়ীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

॥ ২ ॥

শিক্ষা ও অর্থনীতির পরস্পর সংযোগের মত জীবনযাত্রা ও সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গী বহুলাংশে অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। সর্বজনকথিত বহু কুসংস্কার, ছুঁৎমার্গের নির্বুদ্ধিতা বুঝি। অস্পৃশ্যতা বর্জন কর্তব্য তাও বুঝি। কিন্তু সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে খুব কঠোর সমালোচনা আসে না। স্ববিরোধ, জটিলতা সর্বত্র। যেখানে ছুঁৎমার্গ নেই, অস্পৃশ্যতা বর্জিত, সেখানেও ভেদ আছে, ঘৃণা আছে, অপরিসীম অবজ্ঞা আছে, কঠোর পক্ষপাত আছে; আছে অর্থের তীব্র লালসা বস্তুভোগের আসক্তি, দেহভোগের স্পৃহা। বাহ্যিক মাপকাঠি হয়তো এই যে অপরকে আহত না করলেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ব্যবহার সমীচীন।

ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ বা আমরা অনেকেই এমন অনেক কাজ করি যার দ্বারা অপরের ক্ষতি হয়, সমাজের ক্ষতি হয়, যে ক্ষতির তুলনায় ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার বা বিশেষ জাতের হাতে জল না খাওয়ার দরুন যে মানবিক অবমাননা পুষে রাখি সে ক্ষতি অনেকাংশে লঘু। তাছাড়া আমরা কোন কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হই না। একথা স্বীকার্য যে এই ধরনের মানবিক অবমাননা দূর হওয়া উচিত। কিন্তু এর অসারতা যদি বুঝতে পারি তবেই তা দূর হওয়া সম্ভব, অথবা পরিবেশ পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে ঐ ধরনের দূরত্ব আর রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তখন ধীরে ধীরে সমাজমনে পরিবর্তন আসে।

বাস্তব উদাহরণ যথেষ্ট আছে। বড় বড় শহরে গ্রামের মত বাছবিচার মেনে চলার উপায় নেই। দেশ বিভাগের পর বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধীদের জীবনযাত্রার নানা ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বলাই বাহুল্য যে জীবিকা নির্বাহের বৃত্তি সামাজিক স্তরভেদ ঘটায়। আমাদের প্রাচীন সমাজ বর্ণাশ্রমের ধারণা দৃঢ়মূল থাকায় জাতিভেদের জটিলতা আজও বিদ্যমান। শিক্ষায়, রুচিতে, আর্থিক সমতায় যাদের সংগে মেলে আমরা সহজে তাদের সংগে আদান প্রদান করি।

অন্ত্যজ মেথর, ধাঙ্গড়, চামার-মুচি মুদ্দফরাস ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের হাতে বর্ণহিন্দুরা জল খায় না। অন্যান্য প্রদেশেও হরিজনেরা অচ্ছুৎ। তারা বর্ণহিন্দু সমাজের অংগ হয়ে উঠতে পারেনি আজো। মূলত অপরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যজ্ঞানহীন, শিক্ষাহীন রোগজর্জর, দরিদ্র জীবনযাত্রাই তাদের অস্পৃশ্য করে রেখেছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে শিক্ষা থাকলে এতটা হীন অবস্থা ভোগ করতে হয় না। পাশ্চাত্য সমাজগুলিতে কশাই, রাস্তা পরিষ্কার করা, ড্রেন পরিষ্কার করা শ্রমিক উচ্চ সমাজের তোয়াক্কা করে না।

দ্বিতীয়ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শুচিতা রক্ষা হিন্দুধর্মের একটি রীতি তারই রকমফের ছোঁয়াছুঁয়ি। আমরা কয়জন আর কায়িক-বাচিক-মানসিক শুচিতা রক্ষায় তৎপর ? প্রাচীনকালে দ্বিজগণের বিবিদিষা উৎপন্ন হত কারণ তাঁরা তপস্যা করতেন, ব্রাহ্মণেরা প্রণম্য ছিলেন। আজ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম ব্যক্তিমাত্রেই কি প্রণামের যোগ্য ? অথচ কত হাস্যকর প্রথা প্রচলিত আছে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম বলে বহু পরিবারে অব্রাহ্মণ শ্রদ্ধেয় প্রণম্য ব্যক্তিকেও প্রণামের রীতি নেই।

Regd No. WB|CC|184|74

ব্রাহ্মণকুলে জন্মে সকলেই কি ব্রাহ্মণের আচরণ করে, গুণ আয়ত্ত করে, নাকি ব্রাহ্মণের জীবিকা গ্রহণ করে এযুগে? প্রকৃতকথা এই যে কে কাকে প্রণাম জানাবে না জানাবে তা নিয়ে জবরদস্তি চলে না, ব্যক্তির রুচি, ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে; তাছাড়া পরিবারের শিক্ষায় ব্যক্তির মানসিকতা গড়ে ওঠে।

আরও উদাহরণ দিই। বড় বড় হোটেল রেস্তরাঁতে লোকে খুব পরিতোষ সহকারে সুপ খায়। কিন্তু যারা জানে সুপ তৈরীর সময় রাঁধুনি হাতা দিয়ে তুলে স্বাদ পরীক্ষা করে এবং উচ্ছিষ্ঠটুকু পুনরায় পাত্রে ঢেলে দেয় তাদের মুখে সুপ না রুচতে পারে। যারা কোনদিন আমিষ জাতীয় খাদ্য স্পর্শ করেনি খুব স্বাভাবিক কারণে আমিষ ভোজীর পাকশালায় প্রস্তুত খাদ্যে তাদের রুচি না হতে পারে। আমেরিকা, আফ্রিকা, চীনদেশ বা ভারতবর্ষের বহু আদিবাসীরা যেভাবে জীবনযাপন করে, আমিষ খাদ্য ভক্ষণ করে তাদের ছোঁয়া খাদ্যে পানীয়ে যদি কারো কারো রুচি না হয় তাহলে খুব দোষারোপ করা যায় না বোধহয়। তেমনি যখন আমরা নিজের চোখে দেখি মেথর ধাঙ্গড়রা বাড়ি বাড়ি ময়লা পরিষ্কার করে, গ্রামে গ্রামে হরিজনদের অপরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা দেখি তখন আমরা তাদের সঙ্গে দূরত্ব রাখি। যে কুষ্ঠরোগী, যে রূপোপজীবিনী যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের যেমন আমরা, সমাজের চলমান জীবনের আওতা থেকে দূরে রাখতে প্রয়াস পাই, অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধেও এই একই ভাব ক্রিয়াশীল। আইন করে অস্পৃশ্যতা বর্জিত হয় না। এটা ঠিক জবরদস্তির ব্যাপার নয়। গান্ধীজীর আন্দোলনেও সমগ্র সমাজের মন পরিবর্তিত হয়নি। ঘৃণিত জীবিকা ও অপরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রার পরিবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কাজেই এর জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ক্রুদ্ধ রুষ্ট হওয়ার বা বর্ণহিন্দুর প্রতি আক্রোষ জাগিয়ে তোলার কিছু প্রয়োজন দেখি না। ভারতসমাজ শুধু বর্ণহিন্দুর নয়, বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের এক যৌথ সমাজ। কিন্তু যেহেতু মূলত শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সমাজের প্রতিই আমরা আস্থা রাখি সেই হেতু দায়িত্বও তাদের উপরেই অর্পণ করি। অর্থাৎ তাদের উপরেই বর্তায়, সমাজ ভরসা রাখে।

কে কার হাতে খায় বা না খায়, কার ছোঁয়া জল কোন শ্রেণীতে চলে বা না চলে কাকে স্পর্শ করলে কে স্নান করে তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়? দাক্ষিণী, উত্তরপ্রদেশী অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরা বাঙালী, কাশ্মীরী সারস্বত ব্রাহ্মণদের আমিষ ভোজন আদৌ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। যদি প্রাণীহত্যা ধর্মবিরোধী ব্যাপার হয়, সর্বজীবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করি তাহলে পশু হত্যা করে সেই মাংস ভক্ষণ করা চলে না। যুক্তিতর্ক অনেক আছে, সে বিষয়ের অবতারণা করছি না, তবে সহজভাবে এইটুকু বুঝতে পারি এসব রুচির ব্যাপার, দেশকালে প্রচলিত রীতির ব্যাপার এ সব নিয়ে আন্দোলন করার চেয়ে অনেক জরুরী বিষয় আছে যা নিয়ে আন্দোলন হওয়া যুক্তিযুক্ত। যদি আচারপরায়ণা হিন্দু রমণী কায়িক শৌচরক্ষার্থে কতগুলি সংস্কার মেনে চলে, যদি নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা কতগুলি সংস্কার আঁকড়ে থাকে তাতে বৃহত্তর ভারত সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। নব্বুইভাগ পুরুষরা আজকের যুগে অস্পৃশ্যতা ছোঁয়াছুঁয়ি মানে না, বড় বড় শহরবাসী আধুনিক মেয়েরাও এসবের উপর গুরুত্ব দেয় না। তবে ছোট ছোট শহরে, গ্রামে বা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আছে।

স্বভাবতই যে সব কাজগুলিকে আমরা অপরিচ্ছন্ন ব্যাপার মনে করি সেই কাজের ভার যে শ্রেণীর উপর তাদের আমরা দূরে রাখি। যে খাদ্য অভক্ষ্য মনে করি, যে শ্রেণীর লোকেরা তা ভক্ষণ করে তাদের আমরা দূরে রাখি। গোমাংস, শূকরের মাংস হিন্দু পরিবারে ভক্ষ্য নয়, যারা সে সব খায় তাদের ঘরে অন্নগ্রহণে হয়তো অনেকেরই রুচি না হতে পারে। কিন্তু তাদেরও জীবনযাত্রা যদি উন্নত ধরনের হয়, মানসিকতা সমমানের হয়, আর্থিক সমতা থাকে তখন আসা যাওয়া মেলা মেশার বাধা থাকে না। বিবাহের ব্যাপারেও তাই, ধর্মে আচারে, আর্থিক সমতায়, শিক্ষায় রুচিতে মানসিকতায় যদি দুটি পরিবারের মেলে তাহলে সেই পরিবারে পালিত বর্ধিত নরনারীর জীবন সততই দ্বন্দ্বময় হয় না। ঠিক এই কারণেই কি জাত, কুল, পরিবার বংশ ইত্যাদি দেখার রীতি গড়ে ওঠেনি আমাদের সমাজে? আজ অসবর্ণ বিবাহ যে সচল তার কারণ কি এই নয় যে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে বিভিন্ন শ্রেণী প্রায় একই পর্যায়ে উন্নীত। যতদূর বোঝা যায় ভারতবর্ষে মুসলমান বা খৃষ্টান সমাজেও হিন্দুদর্শনের প্রভাব পরোক্ষভাবে বিদ্যমান। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সমাজে চতুরাশ্রমের পরোক্ষ প্রভাব সে সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের আদর্শের প্রভাবপুষ্ট সমাজ মানসিকতা। এইসব অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও কাফের বিধ্বংসী মনোভাব সংযত। অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষেরা—ধর্মের বন্ধনেই জীবন বিধৃত। এই ভাবের প্রাধান্যই পরিমিতি-সমতা-সন্তুষ্টি এবং অহিংসার মনোভাব দৃঢ় করে তোলে মানব মনে। বৃহৎসমাজে অন্তর্নিহিত, বহু যুগে প্রবাহিত, দৃঢ় মূল ভাব উপাদানগুলি সমূলে উৎপাটন করার নেশায় কোন বাস্তবিক স্থায়ী মঙ্গল সমাজের হবে বলে মনে হয় না অথচ আধুনিক শিক্ষা, পাশ্চাত্ত্য জীবননীতির আদর্শ সেই মূল উৎপাটনের শিক্ষাই ধীরে ধীরে সঞ্চার করে। একটি দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার রীতিপদ্ধতি ভালমন্দের ধারণা, সুখসমৃদ্ধির ধারণা, সাদামাটা মনোভাব আজ এই মুহূর্তে যে অবস্থায় আছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে অপেক্ষাকৃত জীবনযাপনের সচ্ছলতা শারীরিক সুস্থতা, কায়িক ক্লেশ লাঘব করা যায় ও মানসিক দৃঢ়তা আত্মবিশ্বাস জাগানো যায় সর্বপ্রকার সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার লক্ষ্য হওয়া উচিত সেটাই।

মানুষের যে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক পীড়া, সেই সকল পীড়ার সম্বিত, মুক্তিলাভের অন্যতম একটি উপায় মানসিক স্থিতি-দৃঢ়তা নয় কি, যদিও শিক্ষা-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত তথাপি পারিবারিক-সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই কি সমাজ-মনের নিয়ামক হয় না? শিশু যেমন পিতামাতা নির্বাচন করতে পারে না, জীব প্রকৃতির নিয়মে শিশুর জন্ম হয়, তেমনি মানুষ ইচ্ছা করলেই সমাজ গড়তে পারে না, সমাজ আপন গতিতে চলে। জন্ম-অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়বিধ ধর্ম এবং কৌমার্য-যৌবন-জরা জীবনের এই যে স্বাভাবিক ক্রম, নিত্য অর্থ সবদেশের মানুষের এই একই পরিক্রমণ পথ। এই জৈবিক অনুক্রম ও সমগতি যেন এমন একটি পথ ধরে চলে যে পথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিমিত মানসিক সমুন্নতিই হয় লক্ষ্য, অর্থাৎ অকৃত্রিম উপচিকীর্ষা, ঐকান্তিক হিতৈষণা যেন জীবনবাদ হয় সম্ভবত ইহাই সনাতন ধর্ম ও দর্শনের অন্তর্নিহিত একটি মূল ভাব।

নির্দেশ এই যে শিশুর বোধ উদয়ের পর থেকেই পিতামাতা পরিবার সমাজ তাকে যেন এমনভাবে লালনপালন করে অর্থাৎ পিতামাতার জীবনে পরিবারের পরিবেশে সামাজিক বাতাবরণে এমন অবস্থা থাকা প্রয়োজন যার সহায়তায় শিশুর মনে সেই সমাজের আদর্শভাব উপ্ত হয়, ধীরে ধীরে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত করে এই উদ্দেশ্যেই শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের ক্রমবিন্যাস বিকাশ ক্রান্তির নির্দেশ চতুরাশ্রমের ধারণায়। যে ধারণায় জীবনকে খন্ডভাবে দেখা হয় না, কোন খন্ড অংশের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বিশ্লিষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি করাও হয় না। নির্ধারিত পথ দুইটি : নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তিমার্গ। সংসার যাত্রী, গৃহী জনসাধারণ প্রবৃত্তিমার্গের পথিক; চতুরাশ্রমের ক্রমপথ সেই পথিকের জন্য নির্দিষ্ট। পরিবারের শিক্ষা, সমাজ পরিবেশের শিক্ষায় চারিটি সংস্থা আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠা : ধর্ম অর্থ কাম, মোক্ষ। অর্থ ও কামের অধিকার সত্ত্বে প্রবৃত্তিমার্গের পথিকের পক্ষে ধর্মবিযুক্ত অবাঞ্ছনীয় এবং চরম লক্ষ্য মোক্ষের উদ্দেশ্যবিহিতভাবেও মানব জীবনে অকৃত্রিম ঐকান্তিক হিতৈষণার ভাব পরিমিতিবোধ জাগা অসম্ভব। এই কারণেই ব্যক্তিজীবনে কায়িক বাচিক মানসিক শুচিতা রক্ষা, ধর্ম আচরণ, কর্তব্যপালন অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ ও ধ্যান এই ক্রমপথে চরিত্রগঠন ও মানসিক সমুন্নতির পথ নির্দেশিত, এবং স্বধর্ম পালনের নির্দেশ। বর্ণধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা ও আয়ত্তিকরণের উপরেও গুরুত্ব আরোপিত। ব্রহ্মবিদ্যা নিবৃত্তি মার্গের পথিকের জন্য ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানীর। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা, পরা, অপরা যে বিদ্যাই হোক লাভের উপায় শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। প্রক্রিয়া অভ্যাস। উদ্দেশ্য প্রয়োগে সিদ্ধিলাভ। স্বধর্ম বলতে বুঝতে হবে ব্যক্তির কৃত্য, কর্তব্য।

সুতরাং আদর্শের জ্ঞান, শৃঙ্খলা অভ্যাস এবং লব্ধবিদ্যা, জ্ঞান, শৃঙ্খলা প্রয়োগে একক ব্যক্তিজীবনের তথা সমাজ জীবনের চরমাণ অস্তিত্ব ও দলন্দে ক্রান্তিত্বের উপলব্ধি জনজীবনের একটি অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের একান্ত বিশ্বাস এই উপলব্ধিই অহমভাবের প্রশমন ঘটাতে পারে যে ভাবের প্রাধান্যই পরোক্ষ ধর্ম ও মোক্ষের আদর্শকে উপেক্ষা করে কাম ও অর্থের প্রতিই ঐকান্তিক প্রবণতা জাগায় এবং যার ফলে জীবনে ও সমাজে নানা অসঙ্গতি প্রকট করে জনশিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই ব্যক্তিতে উপলব্ধির সহায়ক শিক্ষা গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় একথাও স্মরণ রাখা ভাল যে স্বপ্রাধান্য নীতিতে, নির্বিচার ব্যক্তি-অধিকারবাদের স্বীকৃতিতে বহু অসঙ্গতি নিবন্ধ হয় পরোক্ষ নৈতিক শিথিলতাও প্রশ্রয় পায়। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজগুলি সেই আদর্শ অনুসৃতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারত-সমাজে দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

সার্থক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অর্থনীতির সুষ্ঠু পুনর্বিন্যাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, সুপরিকল্পিত বন্টনব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির পরিকল্পিত দিক পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন বলে বোধহয়। অন্যথায় অস্পৃশ্যতা নিবারণে শ্রেণী বিশেষের বিরুদ্ধে রুষ্ট ভাব জাগানো বিভিন্ন দাবীতে ধর্মঘট, দ্বিতীয় নকশাল আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি, বিশেষ রাজনৈতিক দলের বা ব্যক্তির ক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টায়, প্রাদেশিকতা ও ধর্মবিরোধের ইন্ধন যোগানে, ইতস্তত নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ইত্যাদিতে দেশের শক্তি ও বুদ্ধি অধিক নিয়োজিত হতে থাকবে, ফলত সমাজের সংহত অগ্রগতি অর্ধ শতাব্দী পশ্চাৎপদ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই কয়েক দশকের মধ্যে ভিয়েতনাম, ইরান, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশের অনুরূপ পরিস্থিতি ঘটাও অসম্ভব নয়। সুখ, স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য কিনবার যে অন্তিম প্রয়াস সম্প্রতি ভিয়েতনাম ত্যাগী বিত্তশালী গোষ্ঠীর, কয়েক কোটি ভারতীয়ের পরিণামও তেমন হতে পারে। পৃথিবীর ধনী দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান জাতি বর্ণ বিদ্বেষ ও নানা দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী ভারতবর্ষে মানুষকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে স্বার্থত্যাগ, সমন্বয় সহিষ্ণুতা ও পরিমিতি বোধের স্থায়ী ব্যাপক মনোভাবই ৬০ কোটি মানুষের সমাজের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর। লোকসংগ্রহ অর্থাৎ স্বধর্ম, স্বকর্ম ও সততায় প্রবৃত্ত করার শিক্ষা সমাজ মানসিক প্রস্তুতির প্রথম সোপান। এই পথেই সফল সমাজ সংস্কারের সম্ভাবনা, মৌল অর্থে গণতান্ত্রিকতায় নিহিত আদর্শের সার্থকতা।

উচ্চ-নীচ স্তর নির্বিশেষে, ভাষাধর্ম রাজ্য নির্বিশেষে সমগ্র ভারত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধনে রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব সর্বাধিক। এ-যুগে সাধু-সন্ন্যাসী, গুরু,শিক্ষক, ব্রাহ্মণ পন্ডিতের প্রভাবের চেয়েও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রভাব সমাজে অধিক। একযোগে যুবসম্প্রদায়ের গণসংযোগবুদ্ধি ও রাজনৈতিক কর্মীদের সমন্বয়ী কুশলতা জনসাধারণের বাস্তববুদ্ধি ও শুভবুদ্ধি উদ্বোধন ও বিকাশে সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস হয়।

সুধাসাগর তীরে

সুরেশ চক্রবর্তী

॥ ৯ ॥

সেদিন অপরাহ্ণে যে আলোচনা ও গবেষণার মূল-সূত্র সন্ধানে প্রথম দীক্ষা (initiation) হল, তার জের ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বহু রাগ-রাগিণীর শুধু অ্যানাটমিক্যাল বা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (dissection) হয়নি, কী করে তারা রাগ বা রাগিণীপদবাচ্য হল, কোথায় তার মাধুর্য বা অপরূপ লাবণ্য প্রকাশ পেল, সেটাও উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করা হত—এ এক বৈচিত্র্যময় ও আনন্দরূপের অনুভূতি, এরই মোহে ও স্ফুলিঙ্গের মত দীপ্তিকণায় আকৃষ্ট হয়ে বহু রসিক "পতঙ্গ" আমাদের মহ্‌ফিলে যোগ দিয়েছেন আর আসর ভাঙবার পর পরম অতৃপ্তি নিয়েই ফিরে গেছেন। Ragas & Raginis গ্রন্থখানি ছিল তাঁর প্রাণস্বরূপ, —যাঁদের তিনি খুব অন্তরঙ্গ মনে করতেন, তাঁদেরই তিনি একখানি করে বই স্নেহাশীর্বাদ রূপে দিয়েছেন। তার মধ্যে দুজনার কথাই উল্লেখযোগ্য।

যৌবনে সান্যাল মশায় বেশ কিছুদিন "বীণের" তালিম নিয়েছিলেন,— ওস্তাদ সাদিক আলীর কাছে এবং তাঁর সম্পূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, যদি নিজে কখনো পরে বাজান বা অন্য কোনও যন্ত্রী আগ্রহী হন, তা হলে সব হাতে ধরে শিখিয়ে দেবেন। "বীণ" যন্ত্রটি যে ক্রমে ক্রমে সংগীতজগৎ থেকে অন্তর্ধান করছে এটা দেখে তাঁর খুব দুঃখ হত। তিনি Music of Alapa নামে একখানা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে, সেটা অর্ধপথে ছাপা বন্ধ হয়ে রয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপির একটা কপি আমার কাছে তিনি দিয়ে গিয়েছেন এবং প্রকাশের সমস্ত দায়িত্বও আমার স্কন্ধে অর্পণ করেছিলেন। আমার ব্যক্তিগত নানা অসুবিধার জন্য আমি কাজটা অসমাপ্ত রেখে দিয়েছি, জানি না আমার জীবিতকালে সেটা প্রকাশ করতে পারব কি না। তবে বর্তমান সংগীতের পরিবেশে আমিও ক্রমে ক্রমে 'নৈরাশ্যবাদী' হয়ে যাচ্ছি—কে এসব পড়ে বা পড়বে? কার সেই অনুসন্ধিৎসা আছে যে নিজে রিওয়াজ করে এসব সর্বসমক্ষে প্রচার করবে এবং হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটা রহস্যময় যবনিকার আবরণ উন্মোচন করবে? এক সময়ে সান্যাল মশায়ের মনে হয়েছিল শ্রীযুক্ত রবিশংকরকে বললে কেমন হয়? তার তো জীবিকানির্বাহের জন্য যে পরিশ্রম প্রয়োজন তার দুঃখ মিটে গিয়েছে—তা ছাড়া আজ যদি ভারতের সর্বত্র প্রচার হয় যে রবিশংকর প্রত্যহ কিছুক্ষণ করে বীণ সাধছেন, (কার কাছে শিখছেন বলার দরকার নেই) তা হলে সংগীতজগতের সর্বত্রই আবার বীণ বাজাবার উৎসাহ বর্ধিত হবে। "বীণ" যন্ত্রটা পুনরায় নবতর মহিমায় মহ্‌ফিলে প্রত্যাবর্তন করুক এটাই একমাত্র কামনা। আমাকে বললেন রবি যখন কলকাতায় আসবে আমি যেন যোগাযোগ করে তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি, তা হলে তিনি নিজেই রবির সঙ্গে কথা বলবেন। বিমান ঘোষ আমার বহুদিনের পরিচিত—আমরা একই কলেজের ছাত্র ছিলাম—তাকে ফোন করে দিন ঠিক করা হল। নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় অমিয়নাথ, হরিচরণ কাকা ও এই অধম লেখক, রবিশংকরের ফ্ল্যাট-এ উপস্থিত হলাম। একখণ্ড Ragas & Raginis অমিয়নাথ যে চাদরের তলায় লুকিয়ে নিয়েছিলেন, তা আমি লক্ষ করিনি। রবিশংকর খুব সম্মানের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন ও সান্যাল মশায়ের পদধূলি ভক্তিভরে গ্রহণ করলেন। নানারকম আলোচনার পর অমিয়নাথ আসল কথায় এলেন,—রবিশংকরকে অনুরোধ করলেন যে বীণযন্ত্রটার রিভাইভাল হোক, এবং ভালো হাতেই হক, এটা তাঁর বহুদিনের আন্তরিক ইচ্ছা। তার জন্য যথোপযুক্ত মালমশলা তিনি সঞ্চিত করে রেখেছেন—প্রথম শিক্ষার্থীর পর্যায় থেকে সার্থক পরিণতির পথে অগ্রসর হতে যা কিছু সহায় প্রয়োজন, তিনি সানন্দে দান করবেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিতেও আমি দেখেছি—লড়ী, লড়গুথাও, লড়লপেট, লড়লড়ন্ত, ঠোক, লরজদার তান, ইত্যাদি বহু গুপ্ত রহস্যের গ্রন্থি সহজ করে লেখা আছে। যাঁরা সামান্য একটু বাজাতে জানেন, তাঁরাই এসব ফান্দা বা হরকত অত্যন্ত সাবলীলভাবে আয়ত্ত করতে পারবেন। রবিশংকর শুনে খুব উৎসাহ প্রকাশ করলেন আর বললেন যে তিনি এবার বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। অমিয়নাথ বললেন, আমি তো এখানে থাকি না, তুমি সুরেশের কাছে জানালেই আমি খবর পাব আর তখন কলকাতায় বা কৃষ্ণনগরে বসে শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারবে।

রবিশংকর তার ক'দিন পরেই কলকাতা ছেড়ে আবার বিদেশে পাড়ি দেন কিন্তু আমার সঙ্গে পরে অনেকবার কলকাতায় সাক্ষাৎ হলেও সে-কথা আর আমাকে বলেন নি, হয়তো স্মরণ ছিল না। সেই সন্ধ্যার সাক্ষাতের শেষে অমিয়নাথ খুব সংকোচের সঙ্গে চাদরের তলা থেকে একখণ্ড বই বের করে নিজের হাতে তাতে স্বাক্ষর করে রবিশংকরকে উপহার দেন, রবিশংকরও যথোচিত সম্মান সহকারে বইখানা গ্রহণ করে তাঁকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানালেন। আমরা খুশী মনেই বাড়ী ফিরে সান্ধ্য মহ্‌ফিল নিয়ে বসলাম।

ক'দিন পরেই আবার সান্যাল মশাই আমাকে শ্রদ্ধেয় রাধিকামোহন মৈত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন,—ইচ্ছা যে তাঁকেও একখানা বই দেবেন ও সেই "বীণ" পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে উৎসাহী হতে অনুরোধ জানাবেন। রাধিকাবাবু তখন লাউডন পার্কে থাকেন—একত্র যাওয়া হল বিকেল প্রায় তিনটের সময়,—পূর্বের মত আমরা তিনজন। রাধিকামোহন তাঁকে প্রণাম করে যথাযথ অভ্যর্থনা জানালেন। এবারেও সান্যাল মশাই একখণ্ড বই তাঁকে স্বাক্ষর করে উপহার দিলেন আর সেই বীণের কথা উল্লেখ করলেন। রাধিকাবাবু অত উচ্ছ্বসিত না হলেও নিবিষ্টচিত্তে শুনলেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বললেন। সেদিনই প্রথম শুনলাম রাধিকাবাবু অমিয়নাথের কাছে কিছু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পূর্বে একবার গিয়েছিলেন, কিন্তু তখন অমিয়নাথের সময় ও সুবিধা ছিল না। যা হোক, গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আমরা নিত্যকার কর্ম নিয়ে ব্যাপৃত হলাম।

আমি জানি না কেন রবিশংকর বা রাধিকামোহন আর সান্যাল মশায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি—তাঁরা এ ব্যাপারটায় খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু অমিয়নাথের জীবনে এটা একটা টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ালো। তারপর থেকে প্রায়ই বলতেন,—কী হবে এসব আলোচনা করে বা ব্যক্তিগত সুরের জগতের অভিজ্ঞতার কথা লিখে—কে-ই বা পড়বে, কে-ই বা শুনবে? ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা ছেড়ে কৃষ্ণনগর চলে গেলেন, আর তো এখানে পদার্পণ করলেন না! আমাকে অত স্নেহ করতেন, সেই আমাকেও চিঠি লিখতেন না,—লিখলে জবাব পেতাম না। কী একটা অনীহা তাঁকে ধীরে ধীরে ঘিরে এলো, যে আমরা কৃষ্ণনগর গেলে খুব জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানাতেন, কিন্তু গানবাজনার কথা বিশেষ বলতে চাইতেন না। তার কিছু পূর্বেই অকস্মাৎ তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল, তিনি বেশির ভাগ সময়ই পূজোর ঘরে জপে কাটাতেন, আমরাও ভাবতাম মানসিক আঘাতে হয়তো কোথাও ভারসাম্যের চ্যুতি ঘটেছে। মৃত্যুর কয়েকমাস আগেও তাঁর কাছে গিয়েছি,—আমার সংগীতগুরু ভীষ্মদেবের অকালমৃত্যুর কথা বলে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন, কিন্তু মনে হল সেই অমিয়নাথ আর নেই। এটাও শুনলাম যে কদিন আগে বসে বসে তিনি বহু মূল্যবান

বীণকার ওস্তাদ সাদিক আলী খাঁ

Regd No. WB|CC|184|74

রচনা ও পাণ্ডুলিপি অগ্নিসাৎ করেছেন, কারো নিষেধ-বাক্য শোনেননি। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা গোপা বারবার এসব রক্ষা করতে কাতর অনুরোধ করলে তিনি বলে ফেলেন 'এসব তো পণ্ডশ্রম করেছি, কেউ জানতেও চায় না, দিলেও নেয় না,— হয়তো অন্তরালে উপহাস করে! এসব আমার আগেই নিঃশেষ হয়ে যাক,—বই/পাণ্ডুলিপি যা সুরেশের কাছে রয়েছে, তার যা কিছু করা না করা তার হাতে—আমার আর কিছু করবার নেই।' সেই অগ্নিদগ্ধ কিছু কাগজের স্মৃতিচিহ্ন আমার কাছে রেখে দিয়েছি, শুধু শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাবার ইচ্ছায়। এই যে অবহেলা, ফ্রাস্টেশন, অন্তর্মুখ চিত্তের ধিক্কার সবই তো আমাদের মানসিক অধোগতির পরিণাম। বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে "আমরা কী হারাইতেছি আমরা নিজেই জানি না।"

সেই অপরাহ্নে আবার ফিরে যাই। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, তানসেন তো বহু প্রাচীন রাগ-রাগিণীর নব রূপায়ণ করেছিলেন বলে শুনেছি, তাঁর "মিঞা" নামের ছাপ তো তাদের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে, যথা মিঞাকী টোড়ী, মিঞাকী মল্হার, মিঞাকী সারং ইত্যাদি। কিন্তু হঠাৎ কানাড়াতে নামটা "দরবারী" হোল কেন? দরবারে তো সব রাগই গাওয়া হত, আর তখন মিঞাকী কানাড়া বললেও তো কেউ আপত্তি করবার ছিল না। প্রশ্নটা শুনে অমিয়নাথ একটু বিস্মিত হলেন ও বললেন, "এটা আমারও মনে এককালে জেগেছিল, কিন্তু বদল খাঁ সাহেব যে উত্তর দিয়েছিলেন, সেটাই আমার কাছে খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে।" বদল খাঁ সাহেবও তৎকালীন বুজুর্গদের মতে তানসেন যত রাগ-রাগিণীর রূপ নতুন পোশাকে ও আঙ্গিকে দরবারে দাখিল করেছিলেন, তার সবগুলির নামেই "মিঞাকী" বলে পরিচিতি রয়েছে এবং "মিঞাকী কানাড়া" নামেই তিনি নব রাগের সৃষ্টি করেন। এই বদল খাঁ সাহেব দু'তিনখানা খ্যাল শুনিয়ে দিলেন, যেগুলি ঐ মিঞাকী কানাড়ার স্বরসঙ্গতিতে প্রস্তুত হয়েছিল। "মিঞাকী ভৈরব" নামেও রাগ প্রচলিত হল,—আমি স্বর্গীয় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের "প্রাচীন ধ্রুপদ স্বরলিপি"র গ্রন্থে এই নামে ধ্রুপদ দেখেছি। সুতরাং, "মিঞাকী কানাড়া" নামেই গুণীসমাজে রাগ প্রভূত সমাদর লাভ করল—এই রাগে কোমল ধৈবতের ব্যবহার অল্প। পরবর্তীকালে বীণকার নায়মত খাঁ (সদারঙ্গ) কানাড়াকে আরো একটু ঢেলে সাজালেন, ধৈবতের প্রাধান্য দিয়ে এবং আরো একটু নরম লীলায়িত করে তার গাম্ভীর্য প্রকটতর হল, কিন্তু তাকে তো আর "মিঞাকী" বলা যাবে না! তাই তার নামকরণ হল "দরবারী কানড়া," কারণ সদারঙ্গ ছিলেন তানসেনের কন্যাবংশের উত্তরপুরুষ, বংশের রাগ-প্রবক্তার অসম্মান তিনি তো করতে পারেন না।

এই প্রসঙ্গে অমিয়নাথ একটু থেমে আবার বললেন, "বদল খাঁ সাহেব তো আমাদের 'দরবারী টোড়ী' বলে একখানা বিলম্বিত খ্যাল শিখিয়েছিলেন, সেটা মিঞাকী টোড়ীর কাছাকাছি, কিন্তু শুদ্ধ-মধ্যমের প্রয়োগ আছে।" আমি গানখানা তাঁর মুখে শুনে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম, আর ভাবলাম এই তো সুযোগ, এইবার তাক্-মাফিক খাতাটা বের করা যাক্। পকেট থেকে খাতাখানা বেরুতেই সান্যাল মশায় আমায় বললেন, "তুমি যে খাতাও এনেছ দেখছি!" আমি সবিনয়ে ও সভয়ে নিবেদন করলাম, যদি দয়া করে ঐ "দরবারী টোড়ীর"র আস্থায়ীখানা আমাকে দেন, তা হলে আমার কৃষ্ণনগর আসা-যাওয়া নিষ্ফল হবে না, তা ছাড়া, আড়াই ঘণ্টা তো গাড়িতে বসে থাকতে হবে, পথের সম্বল কিছু কি নেওয়া উচিত নয়? তিনি এবারে আর্দ্র হলেন, অর্থাৎ এই অধমের প্রতি সদয় হলেন আর শুধু গলায় গানখানি তালিম দিতে লাগলেন। আমি পাছে ভুলে যাই, তাই সঙ্গে সঙ্গে মোটামুটি একটা স্বরলিপির কাঠামোতে লিখে নিচ্ছিলাম,—অমিয়নাথ আমার হাত থেকে খাতাখানা নিয়ে একটু নতুন রকমে স্বরলিপি করে দেখালেন যে এভাবে নোটেশন করলে সূক্ষ্ম ও আপাতত ধরাছোঁয়ার বাইরের সুরগুলিও অক্ষরের বাঁধনে ধরা দেয়, সুতরাং গানখানি যতখানি সম্ভব, অবিকৃতই থাকে। তাঁর সেই পদ্ধতি সামান্য অভ্যাসেই আয়ত্ত হল, আর আস্থায়ীখানাও আমার "খাতা-জাত" হল।

এরপর যা হল, এখন আমার মনে হয় আমার কঠিন পরীক্ষা সামনে এসেছিল, যদিও অমিয়নাথ সহজভাবেই আমাকে বললেন যে আগামী সপ্তাহে তো কলকাতা যাচ্ছি, তুমি বিলম্বিত একতালাতে গানখানি স্বরলিপি করে আমার কাছে এসো। আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম করে বিদায় নিলাম আর সমস্ত রাস্তা সেই অপূর্ব বন্দিশ আমাকে যেন মোহগ্রস্তের মত করে রাখলো।

এই গানখানি বিলম্বিত একতালাতে স্বরলিপি করতে গিয়ে বেশী বেগ পেতে হল না, কিন্তু মনটা খুশী হল না। গানটির সম্পূর্ণ আস্থায়ীর কথা একতালার বারোমাত্রার ছকে ফেলতে গিয়ে দেখি, বড্ড ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যাচ্ছে মনে হয়, সুরের বা রাগের স্বচ্ছন্দ চলাফেরা যেন ব্যাহত হচ্ছে, কোনও কোনও জায়গায় কথাগুলো পরস্পর গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম আর চার মাত্রা বাড়িয়ে ত্রিতালে ফেলে দেখা যাক্, কী রকম রূপ নিয়ে দাঁড়ায়—অমনি বিলম্বিত ত্রিতালে স্বরলিপি করে দেখলাম যে এবারে যেন রাগের মূর্তি স্পষ্টতর হয়েছে, হাত-পা ছড়িয়ে সুর খেলাবার যথেষ্ট পরিসর পাওয়া গেল। আমি দুরকম স্বরলিপিই করে সান্যাল মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করলাম যে, একতালাতে নোটেশন করে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগেনি, বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছিল, তাই আমি বিলম্বিত ত্রিতালেও স্বরলিপি করে এনেছি। শুনেই অমিয়নাথ বললেন, "তোমাকে একতালায় গানখানি স্বরলিপি করতে বলেছিলাম নাকি? ওটা তো বিলম্বিত ত্রিতালেরই গান।" আমি বিস্মিত হলাম, কারণ তিনি স্পষ্টই আমাকে একতালাতে স্বরলিপি করতে বলেছিলেন, সেটা তো ভুল হবার নয়, অথচ এখন বলছেন,—ওটা ত্রিতালেই হবে। বুঝলাম যে আমার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল এবং আমি সসম্মানেই উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে পরীক্ষা করে বাজিয়ে নেবার জন্য সান্যাল মশায় ইচ্ছে করেই আমাকে একতালাতে সুর বাঁধতে বলেছিলেন, এবং আমি শেষ পর্যন্ত কীভাবে অগ্রসর হই, তাও লক্ষ করছিলেন। এরপর থেকে আর কখনো আমাকে যাচাই বা পরীক্ষা করেননি এবং আনন্দময় সংগীতের রহস্যপুরীর দ্বার আমার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে গেল—আমি সেই পণ্ডিত বিদগ্ধ পুরুষের হৃদয়ের খুব নিকটে পৌঁছে গেলাম।

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে আমরা জেনেছি যেসব গান বিলম্বিত একতালায় ভালো হয় না, যেখানে বিকাশের স্থান সংকীর্ণ হয়ে আসতে চায়, সেখানে বিলম্বিত ঝুমরা, তিলওয়াড়া বা ত্রিতালে তাকে দাঁড় করালে সুরের সম্পূর্ণ আবৃত্তি করা সম্ভব হয়। জানি না আধুনিক সংগীত-গুরুগণ বিভিন্ন গানের বিভিন্ন বিলম্বিত লয়ে শিক্ষা দেন কি না, কিন্তু নানা সংগীত প্রতিযোগিতায় দেখেছি ছাত্র/ছাত্রীরা "বিলম্বিত" অর্থেই ধরে নেন "একতালা" এবং তাও আবার "অনাপূরী" অর্থাৎ বোল-টুকরো দিয়ে ফাঁক ভরানো ঠেকায়। বিলম্বিত ত্রিতালের বাজ রক্ষা করে আসছেন যন্ত্রীরা, তাঁদের "মসিতখানী" গতের মাধ্যমে কিন্তু কণ্ঠসংগীতে বিলম্বিত ত্রিতালে খুব অল্প সংখ্যক শিল্পীই গান শোনান। গানের ছন্দের সঙ্গে মিল রেখে ঠেকা বাঁধতে হয়, বিশেষত গানখানির রচয়িতা যেভাবে লয় বেঁধেছিলেন, সেভাবে গাওয়াই রীতি ও শাস্ত্রসম্মত, আর তাতে গানের বাহারও খুলে যায়। এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ—লক্ষ্ণৌয়ের নির্বাসিত নবাব ওয়াজীদ আলী শাহের রচনা "বাবুল মোরা নৈহর ছুটো জায়" গানখানি। এটা যেভাবে বন্দিশ আছে, তাতে পাঞ্জাবী ঠেকাতেই চেহারা ভালো খোলে, কিন্তু আট-মাত্রার বং-এ কি সেই সুষমা দেখা দেবে? যিনি শিল্পী, আর্টিস্ট, তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করবেন যে সাতমাত্রা বা আটমাত্রার বং-এ গানখানি কী রকম লাগবে আবার পাঞ্জাবী ঠেকাতে, ছন্দ ও কথার দোলাতে কী অপূর্ব সমাঞ্জস্য গড়ে ওঠে। গানকে সুর ও লয়ের বন্ধনের মধ্য দিয়েই মূর্তিরূপ দেওয়া শিল্পীরই

গম। অমিয়নাথের ঠুমরীর সংগ্রহ ছিল অফুরন্ত—কত নতুন ছক, নতুন শৈলী, নতুন রাগরূপ যে এদের মধ্য দিয়ে অপরূপ মহিমায় আমাদের নয়ন সমক্ষে দাঁড়াত, তাতো লিখে বোঝানো যাবে না, এ পরম অনুভূতির ধন, একে সযত্নে লালিত করে "অন্তরের অন্তঃপুরে" নিবিষ্টমনে উপভোগ করতে হয়। এই সব ঠুমরীর ভাষা-লালিত্য ও "ব্রজ-ভাখা" গঠনের রহস্য এমন রসালো পরিবেশের মধ্যে বিশ্লেষিত হতো, যে তাদের মাধুর্য যেন আরো বহুগুণে ফুটে উঠত। "উজ্জ্বলনীলমণি" (শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী বিরচিত) থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে নায়িকা-ভেদ প্রকরণের সাহায্যে গানের রচনার সৌন্দর্য বিকশিত হত—ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরমধ্যা প্রগল্‌ভা, অধীরপ্রগল্‌ভা এবং অষ্টবিধ অবস্থা, যথা অভিসারিকা বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, ও স্বাধীনভর্তৃকা,—সব কিছু এই ব্রজবুলি ও গানের গঠন ও সুরের ভঙ্গীর মাধ্যমে তিনি দেখাতেন। একটা সামান্য উদারণ দিই : অনেকেই জানেন ও দিলীপকুমার রায়ের লেখায় পড়েছেন যে হিন্দী গানের ভাষা খুব নীচু স্তরের, তাতে গভীর ভাবের উপলব্ধি হবার অবকাশ নেই। একটা গানকে তাঁরা প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন—"সখি, অবতক মোরী সিজিয়া না আওয়ৈ, কাহা তো কা কিয়ে জায়?" অর্থাৎ আমার পালঙ্ক তো এখনো এসে পৌঁছালো না, বলো সখি, আমি কী করব? খাট-বিছানার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করাকে এঁরা অত্যন্ত তুচ্ছ ও অশিক্ষিত মনের ভাব বলে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দিলীপকুমারের বহু লেখায় এই গানটি উদ্ধৃত হয়েছে। অমিয়নাথ বোঝালেন যে এটি নায়িকার "বাসকসজ্জা" অবস্থা, যাকে উজ্জ্বলনীলমণি বলেছেন, :—

"স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়া-সংকল্পো বর্ত্মবীক্ষণম্।
সখীবিনোদবার্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ॥"

অর্থাৎ "নিজাবাসগৃহে প্রিয়তম আসিবেন"—এই ভাবিয়া যিনি নিজদেহ ও বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন, তিনিই বাসক-সজ্জা। ইঁহার চেষ্টা—কেলিবিনোদের সংকল্প, কান্ত-পথ নিরীক্ষণ, সখীসহ বিনোদালাপ এবং মুহুর্মুহু দূতীর প্রতি দৃষ্টিপাত, ইত্যাদি।"

সুতরাং প্রিয়তমের আগমনের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিতা নায়িকা যখন দেখছেন যে, পালঙ্ক এখনো এসে পৌঁছালো না, কোথায় তাঁকে বসাবে, কী করে তাঁর অভ্যর্থনা করবে, তাঁর তো প্রীতিকর আবাহনের কোনও ব্যবস্থাই হয়ে উঠলো না, তখন এই ব্যাকুলতা প্রকাশ করা কি আমাদের চোখে বিস্ময়কর ও তুচ্ছ মনে হবে? বরং অত্যন্ত সরলা, মুগ্ধা, কিশোরীর স্বাভাবিক মনের ভাব প্রকাশ বলে ধরে নেব? আমার মনে হয় এই সমালোচকেরা ধরে নিয়েছিলেন যে প্রিয়তম এসে যখন কোনও বিশিষ্ট আয়োজন বা ঘরসজ্জা দেখতে পাবেন না, তখন বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলে, নায়িকা গালে হাত দিয়ে দরজার সামনে বসে গান ধরবে, (অবশ্য পেছনে বেহালা-বাঁশীর করুণ সুর বাজবে) "ও কেন গেল চলে,—কথাটি নাহি বলে?" তা হলে বোধহয় ভাষার লালিত্যের অভাব ঘুচতো।

এই ছিল অমিয়নাথের বিশ্লেষণভঙ্গী, এক দিকে পরম বিদগ্ধতা, অপর দিকে শিষ্ট প্রয়োগের সঙ্গে স্বনৈপুণ্য—সব কিছু তাঁর কথাপ্রসঙ্গে মণিমুক্তার মতো ঝরে পড়তো আর শ্রোতৃবৃন্দ সুরের নেশায় মশগুল হয়ে যেতেন। অন্য আর একটা গান নিয়ে আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে "জাওয়া মোরী বঁইয়া না মড়োরো গিরধারী" এই গানটীতে "গিরিধারী" (চলতি কথায় গিরধারী) কথাটা ব্যবহার হলো কেন? ঐ অক্ষরে তো আরো অনেক শব্দ আছে, যথা, বনয়ারী, বনমালী, কানহাইয়া ইত্যাদি ছেড়ে "গিরিধারী" বলল কেন জানো? এর মর্মগত অর্থ হল, যে হাতে তুমি গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলে, সেই হাতে যদি আমার হাতের নড়া ধরো, তা হলে তো "নাজুক (ডেলিকেট) কলৈয়া" হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তোমার হাতে যেন সেই মধুর প্রেমের কোমল স্পর্শলাভ করি, তাই তেই আমার নিবিড় প্রেম পরম সার্থকতায় গভীরতর হয়ে উঠবে।" আমরা কি সত্যিই অত ভাষার গঠন-লালিত্য বা অন্তর্নিহিত মাধুর্য উপলব্ধি করে গান শিখি বা গান শোনাই? বাবোওয়ার বিখ্যাত বিলম্বিত খ্যাল—"বরহাকী জো রুত, অব মোরে আলী কঠন ভঈ রাতিয়া"—অর্থাৎ বিরহের যে ঋতু সমাগত হল, সখি এখন আমার রাত্রি কঠিন, দুঃখময় হয়ে উঠেছে—গাইবার সময় কি এই ভাবটা আমরা স্মরণে রাখি, না অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে মুস্কিলয়াৎ তান সৃষ্টি করে বিরহব্যথার অবলুপ্তি ঘটাই? প্রকৃতপক্ষে সংগীত-রচয়িতার ভাব, কল্পনা, ধ্যান-ধারণার আমরা কোনই মূল্য দিই না, এটা তো তাঁর অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না। রবীন্দ্রনাথের গান—"জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে" গাইতে গিয়ে গায়ক যেভাবে রসে আপ্লুত হয়ে যান, ওস্তাদ কালে খাঁর বিখ্যাত গান "দুখকী পাত সব ঝর গয়ে"—অর্থাৎ আমার প্রেমের বৃক্ষের যে দুঃখরূপ পাতাগুলি সব ঝরে পড়ে গেল—এবার তো সুখের পালার সূচনা,—সেই ভাব কি আমাদের মনে জাগে?

এই অত্যাশ্চর্য ও অপরূপ ঐশ্বর্যের বিশ্লেষণে আমরা যেন প্রত্যেকটি গানের এক অপূর্ব সুষমামণ্ডিত প্রকাশ দেখতে পেতাম, বিরহিণীর বেদনা, আমার মিলনপ্রত্যাশার আনন্দময় উৎকণ্ঠা, সবকিছু আভরণ দিয়ে গানগুলিকে সাজানো হত, যা কিছু তুচ্ছ, অসম্পূর্ণ মনে হত প্রথমে, সব ছাপিয়ে এক পরম পরিপূর্ণতার আভাসে আমরা সুরের অন্তর্লোকের স্পর্শ পেতাম। শুধু হিন্দী ঠুমরী গান নয়, রবীন্দ্রনাথের নানা অঙ্গ ও পর্বের গান আর তার সঙ্গে বাংলা পদাবলী কীর্তন, সবকিছুই এই ডালায় সাজিয়ে নানাভাবে সুরের আরতি হত। কথাপ্রসঙ্গে অমিয়নাথ নানারকম ভাবধারা ও তাদের অন্তঃশীলা প্রকৃতির কথা বলে আমাদের সম্মুখে রসভাণ্ডার উন্মুক্ত করে ধরতেন—সে সব দিনের কথা স্মরণ করে এখন অভিভূত হয়ে যাই, এমনটী তো আর দেখতে বা শুনতে পাব না।

কৃষ্ণনগরে প্রথম সাক্ষাৎকালে আর একটি প্রশ্ন করেছিলাম সান্যাল মশায়কে—কথাটা বহুদিন থেকে মনে ঘুরছিল, দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করেও সদুত্তর বা যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ পাইনি। আমাদের উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে "সারঙ্গ" রাগের পরিচয়ে বলা হয়ে থাকে এটা মধ্যাহ্নকালের রাগ এবং বেশির ভাগ সারংগ গানই গান্ধার বর্জিত। কিন্তু আমরা নিজেরাও যা শিক্ষা পেয়েছিলাম এবং অন্যান্য খানদানী গুণীদের মুখে যেসব গান শুনেছি, তাতে বর্ষার কথা আছে, যথা "গরজত আয়ে", "বরসন গরজন আয়ে", "মা চমকে বিজুরিয়া" ইত্যাদি। সাধারণত মল্লার বর্গের গানেই বর্ষার কথা থাকবে এবং তাই শুনতে পাওয়া যায়—হঠাৎ "সারংগ" রাগে, যেখানে কতকটা মধ্যাহ্নকালীন দীপ্তি বা উগ্রতা থাকা উচিত, সেখানে বর্ষার রূপের ভাষা বা "মেঘৈর্মেদুরম্বরম্" বর্ণনা করে স্নিগ্ধ-ছায়া আনবার প্রয়াস কেন হল? আমার প্রশ্ন শুনে তিনি হয়তো কতকটা বিস্মিত ও আনন্দিতও হয়েছিলেন, আমার অনুসন্ধিৎসা দেখে তাই একটু স্মিত মুখেই বলেলেন, "সারঙ্গ" শব্দটার একটা অর্থ "মেঘ", তা জানো কি? আমি কিছু কিছু সংস্কৃত পড়েছি, কিন্তু স্বীকার করলাম, যে ওই অর্থ আমার জানা ছিল না। তিনি বোঝালেন কোনও কোনও গান হয়তো মল্লারের অঙ্গেই রচিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে কয়েকটি ঘরানায় তারা "সারঙ্গের" দলে ঢুকে গিয়েছে, বিশেষত পাঞ্জাওয়ালাদের ঘরানায়। তবে মল্লারে ও সারঙ্গে একটা মূলগত বিভেদ ধরা পড়ে, "ঋষভের" বিচারে—মল্লারে প্রাধান্য থাকবে মধ্যমের, আর সারঙ্গে রেখাবের। মল্লার রূপ নেবে এইভাবে—
ন্‌া সা রা মা রা, রা মা রা পা, মা, সা রা মা, সা রা সা॥
আর সারঙ্গে চলবে ন্‌া সা রা, রা ন্‌া সা, ন্‌া সা মা রা, মা পা মা রা, সা রা ন্‌া ন্‌া সা। অবশ্য সকলে যে এই মত গ্রাহ্য করবেন, তা আশা করি না, কিন্তু "মেঘ" রাগ গাইতে বসে অনর্গল "মদমাদ" সারঙ্গের তান শুনিয়ে যাচ্ছেন, এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সান্যাল মশায়ের বিস্তৃত বিশ্লেষণের পর যেন গহন অরণ্যে সুনির্দিষ্ট পথ খুঁজে পেলাম। (ক্রমশ)

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

শীতের শেষ কিন্তু গ্রীষ্ম এখনো তেমনভাবে আসরে নামেনি। বাতাস মোলায়েম আর রোদ্দুর যেন রেশমী ওড়না। বাজারে এখনো তরিতরকারি টাটকা সতেজ। দিনের বেলা জাগরণের সময় সহসা ক্লান্তি আসে না, রাত্রির নিদ্রা সুখকর। সময়টি প্রকৃতই মধুর।

বাংলায় বসন্ত শুধু কবি কল্পনায় আর মা-শীতলার দয়ার প্রকাশে। শীত যেতে না যেতেই গা-পোড়ানো গ্রীষ্ম হুড়মুড় করে এসে পড়ে। কিন্তু এ বৎসরটি যেন নিতান্তই ব্যতিক্রম। শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতু যেন কিছু ব্যবধান রেখে দুই ধারে দণ্ডায়মান আর মধ্যখানে এসে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বহুকালের অজ্ঞাতবাসের পর ঋতুরাজ বসন্ত। সুন্দর, সুস্নিগ্ধ, পিকরব মুখরিত, মন-উচাটন বসন্তকাল।

ছাতুবাবুর মাঠে সার সার তাঁবু পড়েছে। সকাল থেকে সেখানে শুধু কালো কালো মানুষের মাথা। আর মাঝে মাঝেই তার মধ্য থেকে চিৎকার উঠছে, ধ্যো মারা, ধ্যো মারা।

লাল বুলবুলি, শা বুলবুলি আর সেপাই বুলবুলি। লাল বুলবুলির সর্বাঙ্গই প্রায় কুচকুচে কালো, শুধু পেটের তলা আর লেজ লালবর্ণ। আর শা বুলবুলি শাবক অবস্থায় থাকে পুরো খয়েরি, ক্রমশ শরীরের নানা অংশের রং সাদা হতে থাকে, মাথায় ঝুঁটি, ডাগর চোখে চঞ্চলভাবে তাকায় আর গলা ফুলিয়ে ডাকে।

তবে আসল লড়াকু হল সেপাই বুলবুলি। ওদের ডানা খয়েরি, কিন্তু মাথার দু পাশে লাল রঙের রেখা। ঝুঁটিটি কালো। যেন সেপাইদের মতন লাল-কালো উষ্ণীষ পরে আছে মাথায়।

এক একজন বড় মানুষের তাঁবুতে বিশাল বিশাল খাঁচায় রাখা আছে এই সব শিক্ষিত, যোদ্ধা পাখিদের। খালিফারা তাদের সর্বক্ষণ তোষামোদ করে চলেছে শিস দিয়ে। আজকের দিনটিতে বাবুদের চেয়ে বাবুদের বুলবুলিরাই নায়ক। সালিশী মশায় হাঁক দিলে এক একজন বাবু একজোড়া করে পক্ষী নিয়ে আসছেন লড়াইয়ের আঙিনায়। এই বুলবুলিগুলিকে চব্বিশ ঘন্টা ধরে উপবাসী রাখা হয়েছে.

ছাড়িয়ে দেবার পর দু পক্ষের দু জোড়া বুলবুলি ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। এদের এমনই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে বিপক্ষীয় পক্ষীদের আগে হটিয়ে না হয়েছে যে বিপক্ষীয় পক্ষীদের আগে হটিয়ে না দিয়ে দানায় মুখ দেয় না। পক্ষীতে পক্ষীতে ঝটাপটি বেঁধে যাবার পর দর্শকরা তুমুল হাততালি ও গালবাদ্য দিয়ে ওদের আরও উত্তেজিত করে তোলে। তারপর এক পক্ষের আহত বুলবুলি ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলেই দর্শকরা দুয়ো দেয়, ধ্যো মারা।

এই খেলার উদ্যোগের জন্য প্রতি বৎসর ব্যয়িত হয় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। তবে যারা বহু বৎসর বুলবুলির লড়াইয়ের প্রত্যক্ষদর্শী, যারা আসল সোয়াকীন, তাদের মতে, এ বৎসর খেলার মধ্যে যেন তেমন ধার নেই। কোথায় সেই আড়ম্বর, সেই গীত বাদ্য, সেই পয়সার ঝনঝনি। বাবুদের যেন তেমন আর মৌরোদ নেই। এই মাঠেই মল্লিকবাড়ির বাবু হরনাথের সঙ্গে লড়েছিলেন ছাতুবাবু স্বয়ং। পক্ষীর খেলা তো নয় যেন এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। সে দৃশ্য এখনো অনেকের মনে আছে। রাজা সুখময় রায়ের পুত্রেরাও এ খেলায় ঢেলে দিতেন অঢেল টাকা। আর সে রকম উঁচু নজর ক'জনের আছে।

দু বৎসর আগেই যেন হয়ে গেছে শেষ জমজমাট বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ। সেবার এসেছিলেন রাজা সুখময় রায়ের বংশেরই রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর বিশাল পক্ষিবাহিনী নিয়ে। আগে থেকেই ডংকা বাজিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর বুলবুলিদের রুখতে পারে এমন বুলবুলি-ওয়ালা ভূ-ভারতে কেউ নেই। তাঁর বুলবুলিদের যদি সত্যিই কেউ হারাতে পারে তাহলে তিনি নিজের মাথার মুকুট খুলে রাখবেন প্রতিপক্ষের পায়ের কাছে। সে খেলা দেখতে ছুটে এসেছিল লাখে লাখে মানুষ, এমনকি সাহেব রাজপুরুষরাও আসর ঘেঁষে সার বেঁধে দণ্ডায়মান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অভূতপূর্ব অঘটন ঘটে গিয়েছিল সেবারেই। অতবড় মানী লোক রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ, তাঁকে কিনা টক্কর দিতে এলো কোথাকার এক দয়াল মিত্তির।

বেলা দশটা থেকে খেলা শুরু, প্রথম খেলাতেই রাজার পক্ষী ঘায়েল। তার পরের বারও। এবং তার পরের বার। মোট পঞ্চাশ জোড়া পক্ষীর খেলার ফলাফল নিয়ে জয় পরাজয় হবার কথা, কিন্তু সাঁইত্রিশ বার খেলার মধ্যে সাতাশবারই হারলেন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর প্রথম দিকের বিস্ময় ক্রমশ পরিণত হলো গভীর শোকে। তাঁর অনুচরেরা নিয়মিত খবর রেখেছে যে কলকাতায় কোন কোন বাড়িতে পক্ষীদের কেমন তালিম দেওয়া হয়। একবারও দয়াল মিত্তিরের নামও কেউ উচ্চারণ করেনি। খেলার শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারলেন না রাজেন্দ্রনারায়ণ, দারুণ বিমর্ষ মুখে কুরুক্ষেত্রের দুর্যোধনের মতন রণে ভঙ্গ দিলেন।

লোকে বলে, সেই বুলবুলির লড়াইতে হেরে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ মনের দুঃখে লাল বাবুর মতন বিবাগী হয়ে গেছেন।

এ বৎসরের রণাঙ্গনে সেই দয়াল মিত্তিরই জাঁকিয়ে বসে আছেন মাঝখানে, কিন্তু প্রতিপক্ষ বিশেষ কেউ নেই। কিছু কিছু নতুন উঠতি বাবু তাঁবু ফেলেছেন বটে, কেউ পাঁচ গণ্ডা, কেউ দশ গণ্ডা পক্ষীও এনেছেন। কিন্তু তাদের না আছে তেমন সহবৎ, না আছে রোশনাই। এই সব ফতো-বাবুদের নামই আগে শোনা যায়নি। সেইজন্য ঝানু দর্শকরা নাসিকা কুঞ্চিত করে মন্তব্য করছে, এ যে দেকচি বাওয়া সড়ুপ্তে পোয়াতীর বুড়ো বয়েসের ছেলে গো। ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিংড়ি মাছের দুটো ঠ্যাঙ!

সাধারণ দর্শকদের থেকে খানিকটা দূরে আলাদা দাঁড়িয়ে আছে যুগলসেতুর সুবিখ্যাত সিংহ পরিবারের সন্তান নবীনকুমার। এখন পঞ্চদশ বর্ষীয় যুবা। সে পরিধান করে আছে হলুদ রঙের চায়না কোট ও সাদা পাণ্টলুন, কালো ইংলিশ লেদারের স্বর্ণময় ঘাড়, তার গার্ড চেইনও সোনার। বাঁ হাতের তর্জনীতে একটি বৃহদাকার হীরকসমন্বিত অঙ্গুরীয়। তার কোমল লাবণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডলে চক্ষু দুটি অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল।

নবীনকুমারের পাশে দণ্ডায়মান তার সর্বক্ষণের সঙ্গী দুলালচন্দ্র। এই দুলালচন্দ্রের চেহারায় হঠাৎ পরিবর্তন এসেছে। তার মনিবের চেয়ে সে কয়েক বৎসরের বড়, মাত্র গত বৎসরই সে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তাকে মনে হয় পালোয়ানের মতন। চওড়া স্কন্ধ, চওড়া কব্জি, ঘাড় স্থূল। বড় বড় চুল রেখেছে সে। নবীনকুমারের এখনো কণ্ঠ ভাঙেনি, তার স্বর কোমল, সুরেলা, অনেকটা নারীদের মতন। সেই তুলনায় দুলালচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বয়স্ক পুরুষদের মতন। সে মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে এবং গায়ে একটি তুলোর বেনিয়ান। ইদানীং সে বিম্ববতীর নির্দেশে নবীনকুমারকে আপনি আজ্ঞে বলে কথা বলে।

নবীনকুমার দুলালচন্দ্রের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, তুই আরও দেখতে চাস?

দুলালচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বললো, আজ্ঞে, আপনি যা বলবেন।

নবীনকুমার বললো, তুই দেখতে চাস তো দ্যাখ, আমি গাড়িতে গিয়ে বসি।

দুলালচন্দ্র বললো, আজ্ঞে না। আমিও যাবো।

বস্তুত দুলালচন্দ্র এই খেলা খুবই উপভোগ করছিল। বুলবুলির মতন নরম, সুশ্রী চেহারার পক্ষীও যে ঠোঁট দিয়ে একে অপরের উদর ফুটো করে দিতে পারে, সে আগে কখনো কল্পনাও করেনি। যুদ্ধে পরাজিত কোনো বুলবুলি যখন ওড়বার চেষ্টা করেও বার বার মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, তখন অন্য দর্শকদের সঙ্গে সেও উত্তেজনায় গলা মিলিয়েছে।

নবীনকুমার আগাগোড়া নীরব ছিল। দুলালচন্দ্রের অত্যুৎসাহ তার নজর এড়ায়নি। ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে সে বললো, তোর মতন পাঁচপেঁচী লোকেদের এই বুলবুলির লড়াইয়ে মন চুলবুলোবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই—

দুলালচন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, আজ্ঞে, আপনার ভালো লাগেনি?

নবীনকুমার বললো, বড় বড় বংশের মানী মানী লোকেরা যে এমন ছেলেখেলায় মজে, সেটাই বড় তাজ্জবের কথা। পণ্ড গবোর আসল গব্যটি এদের মাতায় পোরা নিশ্চয়। কোর্তা উল্টে দ্যাখ, এদের সবার পেছুনে একটা করে ন্যাজ আচে!

দুলালচন্দ্র সবটা বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলো।

গম্ভীর ভঙ্গিতে চালে অগ্রসর হতে হতে নবীনকুমার আবার বললো, দেশটা ধনী বংশের মর্কটে ছেয়ে গ্যাচে, আর সেই সুযোগে বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ইংরেজ লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে সব। ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা! বুলবুলি লড়াইয়ের এত নামডাক শুনিচি, তা কিনা এই। এর চেয়ে মেয়েমানুষের পুতুল খেলাও ভালো।

ভিড় ছাড়িয়ে বাইরে এসে নবীনকুমারের মুখের ভাবের পরিবর্তন হলো। হাসি ফুটলো এই প্রথম। সে বললো, তবে একটা ব্যাপারে আমি খুশী হয়েচি। হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্তর সব কটা পাখির ঠ্যাং খোঁড়া হয়েচে, ওকে হারিয়ে একেবারে ভূমিষ্টনাশ করে দিয়েচে। বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে, ভালো হয়েচে?

দুলালচন্দ্র কালীপ্রসাদ দত্তকে চেনে না, সে

বুঝতে পারলো না সেই বিশেষ ব্যাক্তটির হার হওয়ায় তার মনিব এত খুশী কেন।

নবীনকুমার আপন মনে একটুক্ষণ হাসলো, তারপর একদিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে বললো, ওদিকে চ।

দুলালচন্দ্র বললো, আজ্ঞে, গাড়ি এদিকে।

নবীনকুমার এক ধমক দিয়ে বললো, জানি! ওদিকে চ।

ছাতুবাবুর মাঠে এই বুলবুলির লড়াই উপলক্ষে বেশ বড় একটা মেলা বসে যায়। পর পর মোয়া, মুড়কি, পাঁপড় আর তেলেভাজার দোকান। কিছু-দিনের মধ্যেই গাজনের উৎসব আসছে, সেই জন্য রকমারি মাটির পুতুল, গামছা, হাঁড়িকুড়ির ব্যাপারীরা আসে। কাছেই রামবাগান, সেখানকার অবিদ্যা-স্ত্রীলোকেরা খাতায় খাতায় আসে কেনা-কাটি করতে।

আর আসে পক্ষী বিক্রেতারা। নানা জাতের গৃহপোষা, রং-বেরঙের ছোট বড় পাখি তো থাকেই সব চেয়ে বেশী থাকে বুলবুলি। নতুন বাবুরা আগামী বৎসরের লড়াইয়ের জন্য এখান থেকেই বুলবুলি কিনে নিয়ে যায়। কোন কোন বিশিষ্ট খলিফার তালিম দেওয়া বুলবুলি, দোকানদাররা সেইসব নাম হাঁকাহাঁকি করছে।

একটি পাখির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো নবীনকুমার। দুলালচন্দ্রকে বললো, কত দাম, জিজ্ঞেস কর।

দুলালচন্দ্র বিস্মিত হলো। এইমাত্র তার মনিব নিন্দে করলো এই পাখির লড়াইয়ের, এবার সে নিজেই পাখি কিনবে নাকি? আগামী বছর এখানে তাবু খাটিয়ে খেলতে আসবে? তার খামখেয়ালী মনিবের মনের গতিবিধি বোঝা ভার।

একজোড়া বুলবুলির দাম চার টাকা।

তা শুনে দুলালচন্দ্রের চোখ প্রায় কপালে ওঠার অবস্থা। এ লোকগুলো বলে কী? এরা ঠ্যাঙাড়ে না গলা কাটা? সাত আট টাকায় একটি দুধেল গাই পাওয়া যায়, আর এই টুকুন টুকুন এক একটা পাখনার দাম দু টাকা? তার কম বয়স্ক মনিবকে দেখেই এরা বুঝতে পেরেছে যে খুব বড় মানুষের সন্তান, তাই এরা দাঁও মারতে চাইছে।

দুলালচন্দ্র বললে, দিনে ডাকাতি পেইচিস ব্যাটারা?

তখন পাশাপাশি দোকানদাররা বলতে লাগলো, বাবু ছায়েব, জমির শেখ খলিফার নাম শোনেননি? খিদিরপুরের জমির শেখ! তেনার নিজের হাতের শিকুনো....বাবু, ছায়েব, মিঞা হোসেন সা, তিনি আরও বড় খলিফা, এই দ্যাখেন।

নবীনকুমার বললো, দরদাম কর। আমি কিনবো!

অনেক ধস্তাধস্তি করে দু টাকা জোড়ায় নামানো গেল। এর থেকে আর কমানো যাবে না।

নবীনকুমার কোটের লম্বা পাশ পকেটে হাত ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই সবচেয়ে বড় খাঁচাটায় কটা বুলবুলি আছে গুণে দেকতে বল্।

হিসেব করাই ছিল, আবার গণনা করা হলো। ছাঁচা বাঁশের লম্বা খাঁচাটিতে রয়েছে পঞ্চাশ জোড়া সেপাই বুলবুলি।

নবীনকুমার ঝনঝন করে একশোটি টাকা ছুঁড়ে দিল দোকানীর সামনে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে খাঁচার দরজাটা সে নিজেই খুলে ফেললো।

কোনো বড় খলিফার কাছেই এ সব পাখিরা তালিম পায়নি। যারা ধরে, তারাই কিছুদিন পায়ে সুতো বেঁধে রেখে একটু একটু পোষ মানায়। খাঁচার দরজা খোলা পেলেও এরা উড়ে যায় না সহসা।

নবীনকুমার তাদের ডাকতে লাগলো, আয়, আয়। একটা পাখিকে সে খপ করে [illegible] বাইরে আনলো। তারপর শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বল যাঃ।

বুলবুলিটা ডানা ঝটপটিয়ে একটুক্ষণ ঘুর খেল, বিস্মিত চোখে বুঝি একবার দেখে মুক্তিদাতাকে, তারপর উড়ে চলে গেল।

দোকানদার আঁতকে উঠে বললো, [illegible] কী, করেন কী ছায়েব?

খাঁচার ওপর দু হাতের চাপড় মারতে মা নবীনকুমার বলতে লাগলো, আয়! আয় [illegible] আয় সব।

ফুরুৎ ফারাৎ করে উড়ে বেরুতে লা একটি দুটি বুলবুলি। নবীনকুমার নিজে [illegible] ঢুকিয়ে একটা করে ধরে এনে ওপরের দিকে উ দিয়ে বলতে লাগলো, যাঃ। যেখেন ঠেঙে এস সেখেনে যা। মাঠের ধান খা গিয়ে। [illegible] পাহাড়ে উড়ে যা।

একশো বুলবুলি কয়েক মিনিটেই [illegible] নবীনকুমার পাশের খাঁচাটির কাছে সরে বললো, এটার মধ্যে কত আছে, হিসেব করো।

দেখতে দেখতে ভিড় ভেঙে লোকজন ধেয়ে সেদিকে। মূল খেলা ছেড়েও দর্শকরা চলে এলো ন কুমারকে। দেখতে। দাবানলের মতন খবর রটে গেল সিংগীঝাড়ির ছোটকুমার দু হাতে টাকা ওড়া টাকা ওড়ানো নয় তো কী। এক একটা পাখি টাকা। অনেকে আবার সেই পাখিগুলিকে জন্য লম্ফঝম্ফ করতে লাগলো, কিন্তু এক একটাও ধরতে পারলো না।

তিনটি খাঁচা খালি করার পর নবীন একটু থামলো। কয়েকটি বুলবুলি কাছেই বকুলগাছে বসে বিস্মিতভাবে ডাকাডাকি ক একঝাঁক চক্রাকারে ঘুরছে মাথার ওপর আক নবীনকুমার সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো।

এখন সত্যিকারের আনন্দ উপভোগ করছে। সামান্য কয়েকটি টাকার বিনিময়ে যে এমন আনন্দ পাওয়া যায়, সে জানতো না।

তার কাছে আর টাকা নেই। সে হাতের হীরক অংগুরীয়টি খুলে দুলালচন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ইদিকে কোতায় স্যাকরার বাড়ি আচে দ্যাক। এটা বেচে যত টাকা পাস নিয়ায়।

দুলালচন্দ্র কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, ছোট-বাবু, এবার উঠুন। আর দরকার নেই।

—তোকে যা বলচি কর।

—আজ্ঞে ও আংটি আমি বেচতে পারবো না, কত্তামা তা হলে আমায় রক্ষে রাখবেন না। ও আপনার বাবার আংটি।

—তবে যা, বাড়ি থেকে টাকা নিয়ায়।

—আর থাক না। এবার উঠুন বরং—।

নবীনকুমার ওর সংগে আর কোনো বাক্যব্যয় না করে আর একটি খাঁচার দরজা খুলতে গেল। সে খাঁচার মালিক হা হা করে উঠতেই সে ধমক দিয়ে বললো, কাল সিংহ বাড়িতে গিয়ে ডবল দাম নিয়ে আসবি। আমার কতার দাম লাখ টাকা।

বুলবুলির লড়াইয়ের প্রাঙ্গণ একেবারে দর্শক-শূন্য। সমস্ত মানুষ এখন এদিকে। নবীনকুমার এক একটি খাঁচা খুলছে আর তুমুল আনন্দের শোরগোল উঠছে। ছাতুবাবুর বাগানে এমন অভিনব দৃশ্য কেউ কোনোদিন দেখেনি। দয়াল মিত্তির, কালীপ্রসাদ দত্ত পর্যন্ত নিজেদের তাঁবু ছেড়ে চলে এসেছেন এই নতুন খেলা দেখতে।

নবীনকুমার সব কটি খাঁচা শেষ করলো যখন, তখন ওদিকে বুলবুলির লড়াই অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ হয়ে গেছে। যিনি সালিশী করতে এসেছিলেন, তিনি বিরক্ত হয়ে হাঁটা দিয়েছেন বাড়ির দিকে।

নবীনকুমার যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন ঘন ঘন জয়ধ্বনি দেওয়া হতে লাগলো তার নামে। তার যাওয়ার পথ করে দেবার জন্য জনতা বীরের সম্মান দিয়ে ফাঁক হয়ে গেল। নবীনকুমারের জুড়ি গাড়ি পর্যন্ত বহু লোক এলো তার পেছন পেছন।

জুড়ি গাড়িটির ঠিক সামনে রাস্তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল এক উন্মাদ। তার বয়েস হবে বছর পঞ্চাশেক, কাঁচা পাকা চুল ও দাড়িগোঁপ বহুকালের ধুলোয় জট পাকানো।

এত মানুষের শোরগোলে সে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো। সামনেই নবীনকুমারকে দেখে সে হাত দুটি অঞ্জলিবদ্ধ করে বললো, বাবু, এট্টু জল দেবে, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

নবীনকুমার পাগল, মাতাল ও পুলিসদের অত্যন্ত অপছন্দ করে। একেবারে মুখোমুখি এক বলশালী উন্মাদকে দেখে সে বলে উঠলো, দুলাল।

দুলালচন্দ্র অমনি এক কঠিন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল উন্মাদটিকে।

নবীনকুমার গাড়িতে উঠে বসে দরজা বন্ধ করে দিল।

দুলালচন্দ্র পাশের পাদানিতে দাঁড়িয়ে বললো, সহিস, হাঁকো। জুড়ি গাড়ি চলে গেল কপকাঁপয়ে।

সেই উন্মাদ তখন অন্যদের বলতে লাগলো, বাবু, এট্টু জল দেবে, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

শহরের মানুষ বড় বিচিত্র রকমের আমোদ-খোর। অনেকে তখন সেই পাগলটিকে নিয়ে পড়লো। এ ব্যাটা চিঁড়ে চায় না, জল চায়। আগে চিঁড়ের খোঁজ কর, জল তো কত রয়েছে, পাঁচ পা অন্তর একটা করে পুকুর।

—বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

সবাই সামনে থেকে সরে যায়, আর একটু দূরে থেকে বলে, আরে ব্যাটা, চিঁড়ে খাবি কেন, ভাত খা, ভেজাতে হবে না। আর একজন বললো, ভাত কেন, পোলাউ খা না, মনে মনে খাবি যখন, তখন পোলাউতে আপত্তি কী।

লোকটি যেন কারুর কথাই শুনতে বা বুঝতে পারে না। একঘেয়ে কাকুতি মাখা গলায় ও শুধু বলে চলে, বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

এক সময় অপরাহ্ণ শেষ হয়ে সন্ধ্যা এলো, মেলা সাঙ্গ হলো। ছাতুবাবুর বাগান জনশূন্য হয়ে গেল। পশ্চিম দিগন্তে আকাশ অরুণ বর্ণ, রাত্রির মজলিসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে নগরী।

কাছাকাছি আর কোনো মানুষ নেই, তবু সেই উন্মাদটি বলে যেতে লাগলো, বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

উন্মাদটি অসম্ভব ক্ষুধার্ত। কিন্তু সে কেড়ে খেতে জানে না। মস্তিষ্কের গোলযোগ হেতু সে ভিক্ষার সঠিক ভাষাটিও বলতে পারে না। সে যদি বলতো, বাবু, একটু চিঁড়ে দিন, জলে ভিজিয়ে খাবো, কেউ হয়তো দয়াপরবশতঃ তাকে কিছু খাদ্য দিত। কিন্তু ভাষার ভুলের জন্য তার ক্ষুধার কথা কেউ বুঝলো না। সে সবার উপহাসের পাত্র হলো।

কিন্তু সে কী করবে। বহুকাল আগে সে শুকনো চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবার জন্য জলের সন্ধানেই বেরিয়েছিল। সে কথাই তার মনে গেঁথে আছে।

পথ দিয়ে চলতে চলতে সেই মূর্খ উন্মাদটি এক একবার রক্তবর্ণ আকাশের দিকে চায়, তারপর নিকটবর্তী কোনো পথচারীকে দেখলে আবার সেই ভুল ভাষাতেই বলে, বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

পথচারীরা ভয় পেয়ে বলে, আ মলো যা, এ ব্যাটা কে রে, দূর হ। দূর হ।

(ক্রমশ)

নতুন স্টেফ্রী বেল্টবিহীন ন্যাপকিন!

OBM 1638 R-BEN

ফাঁস নেই, বেল্ট নেই, পিন বা অন্য কোনরকম ঝঞ্ঝাট নেই।
যতখানি নির্ঝঞ্ঝাট হতে চান ততখানিই হবেন,
যতখানি সুরক্ষার প্রয়োজন ততখানিই পাবেন।

আপনি যদি এমন মহিলা হন, যিনি জীবনের প্রতিটি দিনের আনন্দ উপভোগ করতে চান তাহলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি একটি অসাধারণ জিনিষের : **স্টেফ্রী** বেল্টবিহীন স্যানিটারী ন্যাপকিন।

যতখানি নির্ঝঞ্ঝাট হতে চান ততখানিই হবেন

ফাঁস বা বেল্ট, পিন বা দড়ির ঝঞ্ঝাট পোয়াবার দিন আর নেই।
ন্যাপকিন সঠিক জায়গায় রাখার জন্যে **স্টেফ্রী**তে তার নিজস্ব একটি অ্যাডেসিভ স্ট্রীপ আছে। আপনাকে শুধু আপনার আঁটসাঁট প্যান্টির ভেতরে ওটি আটকে নিতে হবে। আর তারপর দেখুন যতক্ষণ না আপনি নিজে ওটি সরাচ্ছেন কেমন খাপেখাপে সুরক্ষিতভাবে আটকে থাকে।

স্টেফ্রী ন্যাপকিন ব্যবহার করে আপনি যেমন খুশী পোশাক পরুন—যা খুশী করুন ওটি তার যথাস্থানে থাকবে।

যতখানি সুরক্ষার প্রয়োজন ততখানিই পাবেন

নিশ্চিতভাবে আপনার প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেওয়ার জন্যেই **স্টেফ্রী** বিশেষভাবে ডিজাইন করা। অধিক শোষণ ক্ষমতাযুক্ত ভেতরের স্তর ভেতরের আর্দ্রতা শুষে নেয়, আর ন্যাপকিনের তলা ও ধার ঘিরে যে ৩-মুখী প্লাস্টিকের শীল্ড তা দাগ লাগা নিবারণ করে। আজই এক প্যাকেট কিনুন আর আবিষ্কার করুন বেল্টবিহীন স্বাধীনতা! একবার ব্যবহার করলে আর কখনও ফাঁস বা বেল্ট, পিন বা দড়ির ঝঞ্ঝাটে যেতে চাইবেন না।

ভারতের নির্মাতা : Johnson & Johnson লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী। স্টেফ্রী, জনসন এণ্ড জনসন ইউ.এস.এ-র ট্রেডমার্ক © জে এণ্ড জে '৭১

নরাধম

সোমনাথ ভট্টাচার্য

হরিপদ খোপটা তৈরি করেছিল বাতাসী যখন চতুর্থবার গর্ভবতী। খোপ তৈরি করার জিনিসপত্র যেমন পলিথিনের বাতিল খানিকটা চাদর, তাল আর খেজুরপাতা, পাটকাঠি—এসব কুড়িয়ে-বাড়িয়ে চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করেছিল। খানদুই বাঁশ আর চার-বান্ডা কঞ্চি রাতের অন্ধকারে কাছের বাঁশঝাড় থেকে চুরি করে কেটে এনে পুকুরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। রাতের বেলা জঙ্গলের মধ্যে বসে, চেঁচে ছুলে বানিয়েছিল বাতা আর বেতি। তারপর, খুব আস্তে আস্তে—, যাতে স্টেশনমাস্টার, পাবলিকের নজরে না পড়ে এমনি করে খোপটা বানাতে হয়েছিল। প্রথমে স্টেশনের প্ল্যাটফরমের সীমানার বাইরে রেলিংয়ের গা-বরাবর যে হাত-চারেক চওড়া রেলকোম্পানীর জমির লম্বা ফালি পড়ে রয়েছে—তার খানিকটা পরিষ্কার করে চৌরস করেছিল। আস্তে আস্তে গরুর গাড়ির ছইয়ের মত করে খুঁটি পোঁতা, বাতা বাঁধা। তারপর তালপাতা দিয়ে ছাউনি। পাতা চুঁইয়ে যাতে বৃষ্টির জল না-পড়ে তার জন্য তালপাতার ওপর পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢাকা। খেজুরপাতা, কঞ্চি, পাটকাঠি দিয়ে বেড়া। তাতে আবার জানলা। চটের ছালা ঝুলিয়ে পর্দা। সবশেষে ফুলকাটা পলিথিনের পর্দা খোপের দরজায়। অসুবিধা রইল একটাই। খোপের দরজার একহাত সামনেই লোহার রেলিং। জলের কল প্ল্যাটফরমের মধ্যে। আসা-যাওয়া সেই প্ল্যাটফরমের সীমানা ডিঙিয়ে—। রাতের অন্ধকারে ঠুকঠুক করে ঠুকে হরিপদ মাঝের একটা লোহার পাত খুলে ফেলল। পাশ করে শরীর লাগিয়ে যাতায়াতের সহজ একটা পথ হয়ে গেল।...এ সবই খুব ধীরে ধীরে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে হরিপদকে করতে হয়েছিল। দুটো হাত, দুটো পা-ওয়ালা জীব তো আর সকলের চোখের ওপর বিয়োতে পারে না। এসময়, কুকুর-বেড়ালটাও একটা আবডাল খোঁজে।

রাত শেষ হতে তখনও বাকি,—বাতাসীর ছানা হল। ফাল্গুনের প্রথম। শীত যায়নি তখনও। তারস্বরে কেঁদে ছানাটা জানান দিল, এসে পড়লাম।

লাল জামা পরে রেলের কুলি সুরজ দাঁতন করতে করতে আর নীল সোয়েটার গায়ে রেলের পোর্টার বলাই হাতে ভোরের প্রথম ট্রেন পাস করবার খাতা নিয়ে কুয়াশা ফুঁড়ে হরিপদর সামনে এসে দাঁড়াল।

—কি দাদা? লেড়কা হইয়েছে কি লেড়কি, সুরজ জিজ্ঞেস করল।

হরিপদ বাবার মত লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করে বলল, কন্যা সন্তান।

বলাই কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ট্রেন এসে পড়ল হুড়মুড় করে। —ছুটল।

ছানাটা থেকে থেকে ট্যাঁ করে কেঁদে ওঠে। জোর কি গলার! ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা গাড়ি ধরতে এসে অবাক চোখে তাকায়। কেউ দাঁড়িয়ে পড়ে খুঁটিয়ে দেখে—। ভাবটা, লোকটা তো প্ল্যাটফরমে বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেশ কিছুদিন রয়েছে দেখছি। এর মধ্যে ঘরদোর,—মায় একটা নতুন ছানা বানিয়ে ফেলল কখন!

বিপদ হল,—দুপুরে ক্যাশ ট্রেন আসার সময়। সারাদিন এই একবারই পোর্টার বলাইকে নিয়ে স্টেশনমাস্টারবাবু ধুতির ওপর বুকখোলা রেলের কোট চাপিয়ে আর ক্যাশের চামড়ার থলি বগলে চেপে ডাউন প্ল্যাটফরমে আসেন।

হরিপদ খোপের পর্দার এপাশ থেকে বাতাসীকে ক্যাশ ট্রেনের সিগন্যাল হবার খবর আগেই দিয়েছিল। নিজে বসেছিল বেঞ্চির আড়ালে। ভরসা, ছানাটা অনেকক্ষণ সাড়া শব্দ দেয়নি। —ঘুমচ্ছে। মাস্টারবাবু এলেন। ক্যাশ তোলা হল। ট্রেন চলে গেল। মাস্টারবাবু হাতের কাগজখানা দেখতে দেখতে খোপটা ছেড়ে এগিয়ে গেছেন প্রায়।...গলায় যত জোর আছে সবটুকু দিয়ে ছানাটা কেঁদে উঠল। শব্দটা উঠেই থেমে গেল। হরিপদ বুঝল বাতাসী মুখ চেপে ধরেছে।

কিন্তু ততক্ষণে যা-হবার হয়ে গেছে। মাস্টারবাবু চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন। চোখের চশমাটা নাকের নীচে নামিয়ে ঘাড় হেঁট করে চশমার ওপর দিয়ে দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পেছনে বলাই। হরিপদ ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

চোখ পড়ল হরিপদর ওপর। মাস্টারবাবু হুংকার দিয়ে উঠলেন, অ্যা-ই, এখানে ঝুপড়ি বানিয়েছিস কার হুকুমে?

হরিপদর হাঁটুতে কাঁপুনি ধরে গেছে। —প্ল্যাটফরমটা কি তোর বাপের হারামজাদা?

অন্য ছানাগুলোকেও দেখালেন। ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকা শহরের ভেণ্ডাররা বসে বসে নিজেদের মধ্যে গুলতানি করছিল। মজার সন্ধান পেয়ে এসে জুটল। মাস্টারবাবুকে খুশি করতে ফুট-কাটতে লাগল রসিয়ে রসিয়ে। তখন আবার তিন নম্বর ছানাটা রেলিংয়ের ওপাশে উবু হয়ে বসে সাধের লাউ, সাধের লাউ গান গাইতে গাইতে আর ছ্যাক-ছ্যাড় শব্দ করতে করতে পেট খালি করছে।

—একেবারে নরক করে তুলেছ প্ল্যাটফরমটা। প্যাসেঞ্জাররা যাতায়াত করবে কি করে? মাস্টারবাবু গলা চড়ালেন, এই বলাই—

বলাই তখন মাস্টারবাবুর পেছন থেকে কি-সব ইশারা করছে হাতমুখ নেড়ে,—হরিপদ ধরতে পারছে না।

—এই বলাই, সুইপারকে খবর দে—। ঝুপড়ি ভেঙে দিয়ে যাক। যত্তোসব পাবলিক নুইসেন্স।

এতক্ষণে বলাইয়ের ইশারা বুঝতে পেরে হরিপদ মাস্টারবাবুর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল. মাপ করে দ্যান ছার। অখনকার মত যাইতে দ্যান। পরিবারের ছার শরীল খুউব কাহিল। আঁতুড় উঠলিই নিজিই ভেঙ্গা ফ্যালাবো।

বলাই পেছন থেকে এগিয়ে এল, কথার ঠিক থাকবে তো।—ঠিক ভেঙে ফেলবি তো? সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, রেলের এরিয়ায় পারমিশান না-নিয়ে ঘর করা....

—এদের আবার আঁতুড়। তুই জানিস না বলাই,—আজ ঝুপড়ি বানিয়েছে, কাল এসে দেখবি চালাটালা তুলতে শুরু করছে—।

মাস্টারবাবু গজগজ করতে করতে অফিসের দিকে এগুলেন।

বাইরে হরিপদ, ঘরের মধ্যে বাতাসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

তারপর বর্ষা শুরু হল। হরিপদ আগেভাগে মাস্টারবাবুকে বলে রেখেছিল। বর্ষাটা গেলেই উঠে যাবে। মাস্টারবাবুর কোয়ার্টারের বেড়া বেঁধে দিয়ে এল দুদিন মাগনায়। বর্ষার পর দুর্গা পুজো এখন তো শীত।

হরিপদ বুঝেছে, খোপটা এখন মাস্টারবাবুর চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। কেউ শত্তুতা করে চুকলি না-করলে গত তিনবারের মত খোপ ভেঙে আবার নতুন জায়গার সন্ধান করতে হবে না উপস্থিত।

খোপের পর্দা সরিয়ে বাতাসী বাইরে বেরিয়ে এল। হাতে টুকটাক কাজ জিনিসপত্র। একটা কুলো, ছোট ঝুড়ি, একটা মুড়ো ঝাটা। পর্দাটা ভাল করে টেনে দিয়ে দুটা ইট চাপা দিল—যাতে হাওয়ায় সব সরে না যায়। দাঁড়িয়ে পাখা ঝাপটানোর মত হাত নেড়ে পরনের কাপড়-চোপড় শক্ত করে পরে নিল। মুরগির মত ঘাড় উঁচু করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল।—একেবারে ছোট ছানাটা প্ল্যাটফরমে চটের ছালার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ছালার একটা কোণা মুখে দিয়ে কামড়াচ্ছে। দাঁত ওঠার সময়, মাড়ি শুলোচ্ছে। হামা-টানছে আজকাল। মেজ মেয়ে পা-ছড়িয়ে রোদে বসে। কোলের ওপর সিলভারের বাটি থেকে কাঁচা লঙ্কা ধনেপাতা দিয়ে এলবাটার ঢাকনা দিয়ে পান্তা খাচ্ছে। স্টেশনের চায়ের দোকানে সিঙ্গাড়া খাচ্ছেন দুই ভদ্রলোক। সেজটা তাদের পেছনে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বাতাসী বড়কে দুদিন দেখতে পাচ্ছে না। ডানা গজিয়েছে। এমন একাই ওড়া-উড়ি করে। মাঝে মাঝে ট্রেনে চেপে উধাও হয়ে যায় কদিন। প্ল্যাটফরমের রেলিংয়ের ওপর ভাতের হাঁড়ি। পাশে, রোদে দেওয়া কাঁথা, চটের ছালা, বালিশ। উনুনের ওপর উল্টে রাখা রান্নার কড়া। পাশে কঞ্চির বোঝা, পাটকাঠি, শুকনো পাতা বাকল। গলা উঁচু করে বাতাসী দেখল এসব।

এখন প্ল্যাটফরম অফিস-যাওয়া মানুষের ভিড়ে ওপচানো। হাট থেকে নতুন শীতের সব্জি কিনে ঝুড়ি সাজিয়ে শহরে নিয়ে যাচ্ছে ভেণ্ডাররা। সাড়ে-আটটার লোকাল আসছে।

বাতাসী ডাকল, এই ছেমড়ি।

মেজ মেয়ে তাকাল।

—নোকা রাকবি, বাতাসী হই-হট্টগোলের ওপর গলা চড়িয়ে বলল ছোটটা যানো লাইনের দিকি না-যায়। মুই হাটে গ্যালাম।

প্ল্যাটফরমের শেষে আসতে-না-আসতে হুড়মুড় করে ট্রেন এসে দাঁড়াল। দৌড়োদৌড়ি, হাঁকডাক। বাতাসী সাইডিংয়ের দিকে তাকাল।—সাইডিং-এ আজ আর চাল গমের মালগাড়ি কাটেনি। গতকাল একটা গমের গাড়ি কেটেছিল। গমের বস্তা খালি হয়ে গেলে গাড়ির তলা আর লরি পর্যন্ত রাস্তা আরও কয়েকজনের সঙ্গে ঝাঁট দিয়ে মাটি-কাঁকর মেশান দু কুলো গম পেয়েছিল। এখন একটা কয়লার গাড়ি খালাস হচ্ছে।

আজ হাটবার।

লেভেল-ক্রসিংয়ের বাইরে স্টেশনের বাঁদিকে হাট বসে। অন্যদিকে রাস্তার ধার দিয়ে সার সার পাকা দোকান ঘর। মাছের বাজার, মাংসের দোকান, মদিখানা, বড় বড় আড়ৎ। বাজার-দোকান রোজই খোলা। হাট বসে সপ্তাহে দুদিন। ধান, পাট, ক্ষেতের ফসলের বে-দম আমদানি। শহরের মহাজন, ফোড়ে, ভেণ্ডাররা এসে নামে দলে দলে। গরুর গাড়ি, ভ্যান, রিকশা, মানুষজনের ভিড়ের মধ্যে পা-ঘষটে চলাচল। পুরো মরসুমের মত এখনও শীতের ফসল উঠছে না। তখন, এক-পা হাঁটতে দশজনের গুঁতো লাগে। কপির পাতা, গরু মোষের নাদি, পায়ে পায়ে চটকে রাস্তায় বর্ষাকালের কত কাদা জমে ওঠে। পচা গন্ধে চারিদিক ম ম। সবে শীতের সব্জি উঠতে শুরু করছে। এখন চাষীর খাতির। ভেণ্ডাররা মাথা থেকে ঝাঁকা ধরে নামায়, বিড়ি এগিয়ে দেয় একজন। আর একজন আগুন ধরিয়ে দেয়। পুরো ফসল উঠতে আরম্ভ করলে সামনে ঝাঁকা সাজিয়ে

মাথায় গামছা দিয়ে বসে থাকবে, ভেণ্ডারেরা ফিরেও তাকাবে না। ডেকে মাল গছাতে হবে। এখন সব্জির আমদানি কম। গ্রাহক বেশী।

একজন ভেণ্ডার চাষীর কাছ থেকে পালং শাক কিনে বেছেবুছে ধুয়েমুছে ঝুড়ি [illegible] করছে। বাদ দিচ্ছে না কিছুই—নেহাত ছেঁড়া পাতাগুলো ছাড়া। বাতাসী খুঁটে খুঁটে বাতিল পাতা, দু একটা সরু মতন শাক কুড়োতে লাগল। হল [illegible] দুয়েক। চটের ছালায় কাঁচালংকা বোঝাই করে বেঁধে মাথায় নিয়ে ট্রেন [illegible] জন্য ছুটছে একজন ভেণ্ডার। ছালার ফাঁক দিয়ে রাস্তায় পড়ল কটা। [illegible] কুড়োবার আগেই আর এক বাজার-কুড়ুনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। [illegible] নিতে নিতে বলল, ই...ই...স, একেরে লোপিয়ে এয়েচেন। আমি [illegible] দেকেলাম না!

বাতাসী বড় ছেলেকে দেখতে পেল। টিউবওয়েল টিপে বালতিতে জল [illegible] খাবারের দোকান দুটো স্লাম ভর্তি করে দিলে বাসি কচুরি, সেল্গাড়া [illegible] দিন ছেলি কোন চুলোয়—? বাতাসী দাঁড়িয়ে পড়ে ডাকল।

[illegible] ছেলে কুলকুচি করে রোদের দিকে পিচকিরি-র মত করে জল ছিটাল। [illegible] ওপর থেকে হাত দিয়ে জল মুছে তাকাল। তারপর এক হাতে বালতি [illegible] বেঁকে দোকানের দিকে এগিয়ে গেল।—বাড়ি আসবি আজ, বাতাসী [illegible] বলল।

[illegible] গাড়ি করে মুলো নিয়ে আসছে একজন চাষী। পথের মধ্যেই চার-[illegible] ভেণ্ডার গাড়ি ঘিরে ধরেছে। চাষীকে জোয়াল থেকে বলদ জোড়া [illegible] অবসর দিচ্ছে না। চাষী গাড়ির মাথানি ধরে বলদ সামলাচ্ছে কোন [illegible] নিলামের ডাকের মত দর উঠছে। বাতাসী দেখতে দেখতে গাড়ির [illegible] দিকে চলে এল। নিমেষের মধ্যে চারটে মুলো ভেঙে নিয়ে কোঁচড় [illegible] ফেলল। অন্যদিক সব পড়ল।

একের পর এক আপ-ডাউন ট্রেন আসছে। দাঁড়াচ্ছে,—চলে যাচ্ছে। ঠং-[illegible] করে লেভেল ক্রসিংয়ের গেট পড়ছে।

হই হই করে চিৎকার উঠল হঠাৎ। কিছু বোঝবার আগেই বাতাসী ধাক্কা [illegible] একটা ভ্যান রিকশার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভয়ে, যন্ত্রণায় ককিয়ে [illegible] কেঁউ...কেঁউ...কেঁউ...

[illegible] মত চেহারার যে বিলিতি ষাঁড়টা চরতে চরতে মাঝে মাঝে হাটের [illegible] এসে গেলে হাটের মধ্যে ঢুকে পড়ে সব্জির ঝুড়িতে থাবলা মারে,— [illegible] ষাঁড়টা এসেছে আজ। কোন চাষীর কপির ঝুড়িতে মুখ দিয়ে দুটো [illegible] তুলে নিয়ে দৌড়চ্ছে। পেছনে চাষীর হাতের পাচনের বাড়ি পড়ছে [illegible] ষাঁড়টা দৌড়চ্ছে। মানুষজন ধাক্কা খেয়ে ভয়ে পড়িমড়ি ছিটকে [illegible] থেকে।

[illegible] একেবারে গায়ের ওপর ষাঁড়টা এসে পড়েছে। আধখানা ফুলকপি [illegible] বাইরে। বাতাসী দু চোখ বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে টান দিল।

[illegible] চাষীর ঝাঁকা থেকে কপি তুলে নিয়েছে, সে পাচন হাতে ছুটতে [illegible] এসে বাতাসীর সামনে থমকে দাঁড়াল। বাতাসীর হাতের দিকে তাকাল। [illegible] পালাবার পথের দিকে তাকাল। তারপর হাতের পাচন দিয়ে পিঠ [illegible] চুলকাতে বলল, এ শালোদের পেরানের মায়াও নেই।

বাতাসী আধ-খাওয়া কপিটা কোঁচড়ে ভরে ফেলল। ছিটকে যাওয়া হাতের [illegible] গুলো কুড়িয়ে নিল।

[illegible] মুদিখানা ঝাঁট দিয়ে কাগায় ওচলা ফেলল বাতাসী জানে। ঘুরতে [illegible] গাছটার গোড়ায় ওচলা ঘাঁটিকে শুকনো লংকা পেল গোটা কয়েক, [illegible] টুকরো, ছেঁড়া তেজপাতা, একটা কাচের গুলি। গলা ভাঙা [illegible] শিশি,—তেল রাখা হবে মনে করে কুড়িয়ে নিল।

লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে স্টেশনের ওদিক যাবার সময় বাতাসী দাঁড়িয়ে [illegible] থেকে একবার নজর করল, ছোটটাকে কোল করে মেজ প্লাটফরমের [illegible] বেড়াচ্ছে। সেজটা ন্যাংটো হয়ে একটা কঞ্চির মাথায় দড়ি দিয়ে [illegible] বেঁধে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে ছুটে ছুটে।

[illegible] দোকানে মাল এসেছে। লরি খালাস হচ্ছে। কুলিরা বস্তা মাথায় [illegible] ঢুকে যাচ্ছে দোকান ঘরের মধ্যে। এক একটা বস্তা থেকে চাল বা গম [illegible] ঝরঝুর করে। আগে থেকেই পাঁচ ছ-জন বাজার-কুড়ুনী পড়ার সঙ্গে [illegible] খুঁটিয়ে কুলোয় তুলছে। বাতাসী জুল জুল করে তাকিয়ে রইল কিছু [illegible] বুঝল, যারা আগে এসেছে তারা নতুন কাউকে এখন আর ঢুকতে দেবে [illegible] মধ্যে। বাতাসী নিঃশ্বাস ফেলে মাছের বাজারের দিকে এগুল।

মাছের বাজারের সামনে অন্য এক বাজার কুড়ুনীর সঙ্গে দেখা, ম্যা-ও।

বাতাসীও রোম ফোলাল, ম্যা-য়া-ও—ম্যা-য়া-ও ও, একজনের চোখ অন্য [illegible] চোখের ওপর।

[illegible] চোখ রেখে দুজনে আস্তে আস্তে পাশ কাটাল।

[illegible] মাংসের দোকান। দোকান ধোয়া মোছা। একটা ঠ্যাং শুধু [illegible] দুটো কাটা ছাগলের মাথা আকাশ দেখছে স্থির দৃষ্টিতে। রাস্তার [illegible] একটা কুকুর একমনে একটা হাড় চিবিয়ে যাচ্ছে। বাতাসী এদিক-ওদিক [illegible] খোঁজাল।—একছিটে চর্বিও চাতালে লেগে নেই। দোকানী কাক-কুকুর [illegible] লাঠিটা উঁচিয়ে ধরল, হাট্,-ভাগ্ হিয়াসে।

মাছের বাজারে ভিড় নেই। বেলা বেড়েছে। টিনের ডালা-টালা উলটে চলে [illegible] অনেক দোকানী। যারা আগে এসেছিল কুড়িয়ে নিয়ে গেছে নেবার

গেছিল। খানিক আঁশ-পাকলা জড়ো করা রয়েছে একদিকে। আশায় আশায় বাতাসী ঘেঁটে দেখল, আঁশ, পিত্তের থলি—একটু নাড়িভুঁড়ি নেই। কটা ছোট ছোট চিংড়ি আর চাঁদা পেল।—খুঁটিয়ে তুলে নিল।

বাজার থেকে বেরুবার মুখে, সামনে তাকিয়েই দারুণ ভয়ে বাতাসী ছিল ছিল করে আবার পিছিয়ে এল। নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করল। রিকশায় হেলথ-সেণ্টারের মেয়ে ডাক্তার যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে।

কদিন আগে হেলথ-সেণ্টারের মেয়ে-ডাক্তার এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পেছনে, এই—

বাতাসী তখন বাম্মা চাপিয়েছে। দিনে-রাতে এক বারই রান্না-বান্না। ছানাগুলো উনুনের দিকে তাকিয়ে বসে। সবচে ছোটটা উপুড় হয়ে শুয়ে নিজের মুত দিয়ে প্লাটফরম লেপছে। ছানাদের বাপ তখনও ফেরেনি—এখনও—ই।

বাতাসী ফিরে তাকাল। লম্বা, দশাশই চেহারার মেয়েমানুষ। গোলমুখো পানের রসে ঠোঁট দুটো টকটকে লাল। নাকের ওপর সোনার চশমা। কাঁধে ঝোলান চামড়ার ব্যাগ। দু পাশে আরও দুজন বেঁটে খাটো চেহারার।

মেয়ে-ডাক্তার ধমকে উঠল, এ-ই শুনতে পাচ্ছো না।—উঠে এস এদিকে—

বাতাসী ভয়ে ভয়ে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে গলে প্ল্যাটফরমে এসে ঢুকল।

—এগুলো কার ?

ছানাপোনারা হাঁ-করে তাকিয়ে। বড়টা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে।

বাতাসী ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

—শুনতে পাচ্ছো না ? আসে কোথা থেকে এগুলো

—বা... আ... আ, বাতাসীর গলা ভয়ে কেঁপে গেল।

—ভগবান দিয়েছেন—! লজ্জা করে না বলতে ? বড়টা আগেই সরে গেছিল। মেয়ে-ডাক্তারের ধমক শুনে অন্য দুটো ছিটকে সরে গিয়ে বেঞ্চির আড়ালে লুকোল। ছোটটা সমানে মুত ঘেঁটে যাচ্ছে।

বাতাসী ততক্ষণে ভয়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে।

—এত ছেলেপুলে হয় কেন ?

—বা... আ... আ

—আর তুমি বুঝি ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানো না।—আবার হচ্ছে, ওদের বাপ শোনে না।...সোসাল প্যারাসাইট্ যত্তোসব।

মেয়ে-ডাক্তার পাশের মেয়েটিকে কি বললেন। ব্যাগ থেকে রাঙতা মোড়া কিছু বার করল। আবার কি বললেন। আরও কি-সব বেরুল।

—এই শোন, মেয়ে-ডাক্তার বাতাসীর দিকে ফিরলেন, ওষুধ এগুলো— এগুলো তোমার।—খেতে হবে নিয়ম করে...।

কি করে খেতে হবে, হিসেব করতে হবে বোঝাচ্ছেন। বাতাসীও মাথা নেড়ে যাচ্ছে। মন পড়ে আছে রান্নার হাঁড়িতে।—উনুন ধোঁয়াচ্ছে। ছানাপোনাদের কাউকে যে দুটো জ্বাল ঠেলে দিতে বলবে,—সাহসে কুলোচ্ছে না।

—আর এগুলো ওদের বাপের—, বোঝানো শেষ করে মেয়ে ডাক্তার আরো কি-সব হাতে ফেলে দিলেন, ব্যবহার করতে বললেন—।

ট্রেনের সিগনাল হয়ে গেছে। এই গাড়িতে মেয়ে-ডাক্তার যাবেন।

—বুঝতে পেরেছো তো সব ? আবার ছেলেপুলে হয়েছে তো কাল পুলিশে ধরিয়ে দেব—।

—কুঁই কুঁই, বাতাসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ট্রেন চলে যেতেই ছানা-পোনারা বেরিয়ে এসে ছেঁকে ধরল, কি দেলে, কি দেল দেকি রে মা—।

—ধর এগুলো—, বাতাসী কোন রকমে ওদের হাতে জিনিসগুলো ধরিয়ে দিয়ে প্রায় লাফিয়ে উনুনের ধারে গিয়ে বসল। পটপট করে পাকাটি ভেঙে উনুনে গুঁজে দিল। ফুঁ-দিতে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। বগবগ করে ভাত ফুটে উঠল হাঁড়িতে।

—মা, দ্যাক্—

বাতাসী মেয়ের দিক ফিরে তাকাল। মেয়ে জিভ বার করে রয়েছে জিভের ওপর ওষুধের বড়ি। জিভ টেনে নিয়ে বলল, লজেনগুলো মিষ্টি লয়—।

—ওগুলো খেতে বললে কে তোর হতচ্ছাড়ি—বাতাসী ঝামরে উঠে একটা কঞ্চি তুলল, মরও তো না আপদগুলান—।

মেজ মেয়ে হাতের নাগালের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে জিভ বার করে ওষুধের বড়ি দেখাতে লাগল। মজা পেয়ে হিহি করে হাসছে।

তরকারি নামিয়ে উঠে পেছন ফিরে তাকিয়ে বাতাসী দেখল, বড় ছেলে মোড়ক ছিঁড়ে রবারগুলো বার করে ফুঁ দিয়ে বেলুনের মত ফুলিয়েছে। পাটের কোসটা দিয়ে সারসার এ-থাম্বা থেকে ও-থাম্বা পর্যন্ত টান করে বেঁধে বাহার করছে।

হরিপদ যখন এল তখন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। খেতে খেতে ওপর দিকে নজর পড়তে বলল, এতোগুলান বেলুন আসলো কনেথে ?

—বেলুন লয় গো—, বাতাসী খুব উৎসাহ নিয়ে সব দেখাতে বসল, বেলুন লয় গো—গরমেণ্টর এপাটু। ছানাপোনা হয় না। কতো ওষুধ দেলে। ওষুধ খেলি আর ছানাপোনা হবেনি।

হরিপদ খাওয়া-দাওয়া সেরে বিড়ি মুখে খুব মনোযোগ দিয়ে সব দেখতে লাগল। একটা রবার টেনেটুনে দেখতে দেখতে বলল, গরমেণ্টের মাথা

দেখেছিস—। ছানাপোনা না-হওয়ার কেমন কল বানিয়ে ফ্যালচে।

পরের দিন থাম্বার দিকে তাকিয়ে পাবলিক খুব মুখ টিপেটিপে হাসল। কারবার দেখো—।

বড় ছেলে একটা রবারের মুখ টিউবওয়েলের মুখে লাগিয়ে বেলুন ভেবে খেলা করল সারাদিন।

মেজ মেয়ের গা-গরম হল। সারাদিন ঢিস্‌ঢিস্‌ করে শুয়ে শুয়ে কাটাল।

দুপুরে দেড়টার মেল ট্রেন পেছনে ধুলো-কাগজ-খড়কুটোর ঘূর্ণি তুলে চলে গেল। বাতাসী বন্ধ আলুর আড়তের বারান্দায় উঠে এল। এদিক-ওদিক পড়ে থাকা কাটা আলু কুড়িয়ে পচা দিকটা আঙুলে দিয়ে খেলে ফেলে দিয়ে কোঁচড় ভরল।

বটগাছের তলায় রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে তিন জন ট্রানজিস্টার শুনতে শুনতে শরীর দুলিয়ে বিড়ি বাঁধছে। বাতাসী কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়াল। একজন দুটো ভাঙা বিড়ি ফেলে দিল হাতে।

মাথার ওপর বটগাছের পাতাগুলো ঝনঝন করে নড়ে উঠল সহসা। উত্তর থেকে বাতাস এল।

আজ শীত পড়বে।

হরিপদ গর্তটার পাশে বসে খুব ধীরেসুস্থে বিড়িতে টান দিতে দিতে জলের দিক তাকিয়েছিল। গর্তটার অর্ধেকটায় এখনও পায়ের গোছ-ডোবা জল। বাকি অর্ধেকে জল ফুল রয়েছে। মাঝ বরাবর কাদা, পাঁক তুলে হরিপদ মোটা করে আল দিয়েছে—যাতে এদিককার জল ওদিকে ছেঁচে-তুলে দিলে জলের চাপে আল ভেঙে না-যায়। তবু এদিক-ওদিক দিয়ে জল চোঁয়াচ্ছে তিরতির করে। দু-চারটে পুঁটি আর ঝাঁ মাছ জলের ধারা বেয়ে আলের ওপারে পালাতে চাইছে। যে-দিকটা থেকে হরিপদ জল ছেঁচে তুলছে, সেদিকটার জল পাঁক-কাদা ঘুলিয়ে ভাতের মাড়ের মত মোটা। মাছ যে-কটা রয়েছে এখনও নিশ্বাস নেবার প্রাণান্ত চেষ্টায় ভারি জল ঠেলে উঠে ফুট্‌ কাটছে। হরিপদ বুঝল, চারাপোনাটোনা নেই। থাকলে, ঘোলা জলে পেট চিতিয়ে ভেসে উঠত এতক্ষণ। শক্ত জানের কিছু মাছ যেমন, চ্যাং, কই, উলকো, পাঁকাল এখনও রয়েছে। আরও খানিকটা জল ছেঁচে তুলে মাছকটাকে কাদায় ফেলতে না-পারলে গুঁতিয়ে ধরা যাবে না। এসব শেষ করে ঘেরামুখো হতে এখনও সময় লাগবে বেশ।

এদিকে শরীর কাঁপুনি লাগতে শুরু করেছে। বিড়িও শেষ। উত্তুরে বাতাসের বেগ এখন মরমর। রোদের তেজ যত মিইয়ে আসছে শীত তত জাঁকিয়ে নামছে।

হরিপদর সারা শরীরে লেগে থাকা পাঁক-কাদা, এখন শুকিয়ে রোমের গোড়া ধরে খামচাচ্ছে। পা-দুটো পাঁক-কাদায় গোদের মত ভারি। কোমরে গামছার কোঁচড়ে রাখা মাছগুলো মাঝে মাঝে নড়েচড়ে উঠছে। গোটা কতক চিংড়ি কাঁকড়াও রয়েছে ওই সঙ্গে। গামছা ভেদ করে তলপেটের নরম চামড়ায় তাদের দাঁড়ার ছুঁচ ফুটছে। পাশে রয়েছে হরিপদর শুকনো কাপড়, গোটা ধানের শিষে আধ-বোঝাই বস্তা।

গত দিন পনের হরিপদ মাঠে মাঠে সারাদিন।

ধান কাটার মরসুম এখন। কোন কোন জমির ধান কাটা হয়ে খামারে গিয়ে উঠেছে। কিছু জমির ধান কাটা হয়ে জমিতে পড়ে রয়েছে রোদে খড় শুকিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। জমিতে গাদা দিয়ে সাজিয়ে রাখা অবস্থায় রয়েছে কিছু। মাঠের অর্ধেক ধানের গোড়ায় এখনও কাস্তের পোঁচ পড়তে বাকি। মাঠে এখন চাষীদের ব্যস্ত চলাফেরা। হাঁক ডাক। গরুর গাড়ির চাকার শব্দ।

ধান কাটা শুরু করতে কাস্তে হাতে চাষী নেমেছে মাঠে। প্রায় পেছন পেছন নেমেছে হরিপদও। ধান কেটে-বেঁধে গাড়িতে তোলা হয়ে গেলে হরিপদর কাজ শুরু। যে-সমস্ত ধানের শিষ কেটে বা ঝরে, বাঁধন এড়িয়ে মাঠে পড়ে থাকছে,—সেগুলো কুড়িয়ে তুলে বস্তায় ফেলা। জমি থেকে শিষ কুড়িয়ে তুলে নেবার পর আলের ধারে ধারে ইঁদুরের গর্ত সন্ধান করে খুঁড়ে হাত ঢুকিয়ে মাটি মেশানো জমানো ধান লুঠ করে চোরের ওপর বাটপাড়ি করা।

মাঠের ধান যত গুটিয়ে আসছে, হরিপদর প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়েছে তত। জমির মালিকের ছোটখাটো ছেলেমেয়ে, গাঁয়ের জন মজুরদের ছেলে-মেয়ে মায় বুড়ি মা, জোয়ান বউ পর্যন্ত। সকলের সঙ্গে ঝুড়ি কুলো—। যে যত তাড়াতাড়ি চোখ আর হাত চালাতে পারবে তার কোঁচড় তত তাড়াতাড়ি ফুলে উঠবে। হরিপদর হাত চোখ কাজ করে যন্ত্রের মত। এই নিয়ে ঝগড়া,—রেষারেষি।

—ও-বাপ্‌, বাপ্‌-রে......জমির মালিকের মেয়ে হঠাৎ ডেকে ওঠে দ্যাখচে—, এটা ঢ্যাঙা মত নোক মোদের ভুঁয়ের শিষ কুড়িয়ে নেচ্চে......

—কেডা হে....?

—চিঁ....চিঁ....

—বাড়ি কোন গেরাম ?

—চিঁহি....চিঁ....হ....

—হাঁটা ধরো বাপধন। গেরামের লোকের হাতে দুখানায় কি কুটো নেগেছে যে তোমায় খপোর করে শিষ কুড়ুতি এনেছে। শরীলের হাড় ক'খানা মজুতে রাখতি চাইলে আলমুকো হাঁটা ধরো—। মদ্দো একখান শরীল। কাজকামের ধান্দা না করে শিষ কুড়ুতি এয়েছেন ?....হাঁটা মারো—।

গ্রামের আশপাশের মাঠ ছেড়ে হরিপদ এখন দূর মাঠে যেতে আরম্ভ করেছে। দূর মাঠে প্রতিযোগী কম। দেদার শিষ। সারাদিন কুড়োলে বস্তা

বেশ ভারি হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কাছাকাছি লোকজন না-থাকলে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে জমির ধান গাছ থেকে শিষ কেঁকেও বস্তায় ফেলায় যায়।

আজ এই রকম ধানের শিষ কুড়তে এসে গর্তটার সন্ধান পেয়েছে হরিপদ।—বর্ষায় মাঠ ভেসেছিল। এখন টানের সময়। মাঠের মাটি নরম-গরম। এখানে-ওখানে খালা-খন্দলিতে এখনও কিছু কিছু জল জমে আছে। বর্ষায় মাঠের ভাসামাছ এসে শেষ আশ্রয় নিয়েছে সেখানে।...রাস্তা, রেল-লাইনের পাশে নয়ানজুলি, গ্রামের আশ-পাশের খালা-খন্দলি গ্রামের লোকেদের দখলে। সেদিকে হরিপদ লুলুলু করে তাকিয়ে থাকা ভিন্ন উপায় নেই। লোকজনের চোখের আড়ালে গোটা একটা গর্ত একার দখলে পেয়ে হরিপদ শিষ কুড়নো ভুলেছে। আঁশ-পাকলো চিবিয়ে মুখে ছাতা পড়ে গেছে। হরিপদর জিভে জল—। পেট খিদেতে মোচড় দিয়ে উঠল।

হরিপদকে চমকে দিয়ে ছলাৎ করে শব্দ হল জলে। বিদ্যুতের মত কিছু একটা আকাশে উঠে গেল। বিড়ির শেষটুকু দাঁতে চেপে হরিপদ ঘাড় তুলে তাকাল। সাঁড়াশীর মত দুটো পায়ের বাঁধনের মধ্যে একটা বিঘৎ খানেক মাছের ছটফটানি দেখল। একটা বাজ—। মাথার ওপর উড়ছিল। অসতর্কতার সুযোগে হরিপদর ভাগে ভাগ বসিয়েছে। —শা...র...শা...ল।

হরিপদ বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে জলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, আর একটা চক্রাকারে উড়তে উড়তে নীচে নেমে আসছে ক্রমশ। চাপা গর্জন বেরিয়ে এল হরিপদর গলা থেকে, শা...র...শা...ল।

হরিপদ নুয়ে পড়ে ভাঙা সানকিটা তুলে নিয়ে জল ছেঁচতে লাগল। সন্ধে থেকে শীত পড়তে লাগল জাঁকিয়ে।

স্টেশন অন্ধকার। প্রায়ই স্টেশনে আলো জ্বলে না আজকাল। স্টেশনের অফিসে হ্যারিকেন জ্বলছে। সিগনালের আলোগুলো শুধু দপদপ করে জ্বলছে অন্ধকারে। ট্রেন আসছে,—দাঁড়াচ্ছে,—চলে যাচ্ছে। প্ল্যাটফরমের ওপর খানিকটা করে আলো এসে পড়ছে। ট্রেনগুলো যাবার সময় সাপের জিবের মত আবার আলো মুখের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। কুপ্‌কুপে অন্ধকার নেমে আসছে সারা প্ল্যাটফরমে।

রাত আটটার আপ্ লোকাল ছেড়ে গেল। যারা নামল কান মাথা ঢেকে বাড়ির পথ ধরল। স্টেশনটা ঘুমের ঘোরে বোবায় ধরা মানুষের মত জেগে উঠে আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে বাতাসীর উনুনের আগুন আলো করে রেখেছে খানিকটা জায়গা। উনুনের সামনে বাতাসী উবু হয়ে বসে জ্বালান ঠেলে দিচ্ছে। ছোটটা কোমরের পাশ দিয়ে ঠেলে উঠে দুধ টানতে টানতে ঘুমুচ্ছে। শীতে মাঝেমাঝে কেঁপে উঠে আবার চুক্‌চুক্ দুধ টানছে। ঢাকাখোলা হাঁড়ি থেকে ভাতের গন্ধ উঠে ছড়িয়ে পড়ে ম-ম করে তুলেছে চতুর্দিক।

আগুন ঘিরে ছানাপোনা, হরিপদ—সবাই। ঝোপ জঙ্গলের ওপর ছায়াগুলো কাঁপছে। সকলের চোখ ভাতের হাঁড়ির দিকে। ভাত নামতে যা দেরি!...সামনে সানকি, বাটি, থালা যার যা সামনে পড়েছে। আজ জোর ভোজ—। ভাত, আলু-কপি-মুলো-মাছ দিয়ে তরকারি। হরিপদর ধরে আনা মাছের সঙ্গে বাতাসীর আনা চাঁদা-চিংড়িও পড়েছে তরকারিতে।

শীত পড়ছে। পড়ছে হিম।

হরিপদর মনে হচ্ছিল—আগুনের একেবারে কোল ঘেঁষে বসে। সারা দুপুর কাদা-পাঁক ঘেঁটে, আর ঘোর সন্ধ্যায় পুকুরে চান করে এখন হাড়ের মধ্যে যেন শীত ঢুকে গেছে। কাঁপুনি থেকে কিছুতেই শরীরটাকে বাগে আনতে পারছে না।

খাওয়া শেষ হতে ছানাপোনারা শোয়ার জায়গা খুঁজে নিল। বড়টা বোঁচকার ওপর বিচুলির বালিশে মাথা দিয়ে আর একটা বস্তার মধ্যে শরীর সেঁধিয়ে শুয়ে পড়ল। ছোটটাকে বোঁচকার তলায় শুইয়েছে বাতাসী।—হিম কম লাগবে। আর দুটো কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়েছে। ঘুমের মধ্যে শীতে মাঝেমাঝে নড়েচড়ে উঠছে। বাতাসী নিজের শোয়ার চটের ছালাটা ওদের ওপর চাপিয়ে দিল।

হরিপদ গিয়ে ঢুকেছে খোপের মধ্যে। সারাটা শীত হরিপদ ওখানেই ঘুমোয়।

শীতে শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে। বাতাসী কাপড় চোপড় সাপটে শুতে গিয়ে খোপের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারল, অন্ধকারের মধ্যে হরিপদ তার দিকে তাকিয়ে আছে।—সারা শরীরে মুহূর্তে খানিকটা গরম ভাপ উঠে এল।

খোপের মধ্যে একজনারই জায়গা হয়।—কোন রকমে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে পারে। দু পাশে, জমানো কাঠকুটো, ভাঙা তোরঙ্গ, ধানের বস্তা।... বাতাসীকে আসতে দেখে হরিপদ হামাগুড়ি দিয়ে চার-হাত-পায়ে হল। হাত বাড়িয়ে পর্দা ফেলে দিল হরিপদ। আস্তে আস্তে হাত-পায়ের ভার ছেড়ে দিল।

—আজ জবর জাড় ছেড়েছে।

—শরীল কাইপে দেলে একেরে—।

হরিপদ, বাতাসী পরস্পরের শরীরে শরীর ঘষে উত্তাপ তৈরি করতে লাগল।

—গরমেণ্টের রপাট্ এট্টা আছে নিকি এখোন?

—কেন? কি হবে?

—দ্যাখ্‌তাম,— কেমন নাগে।

—সিকি আর আচে -—সব বেলুন ক'র ফাইটে থুয়েছে—।

রাতের শেষ মেল ট্রেন চলে গেল স্টেশন কাঁপিয়ে।

কোটর থেকে বেরুবার আগে একটা পেঁচা ডেকে উঠল, হুম্, হাম।

নির্ভয়ে একটা শেয়াল মাটি শুঁকতে শুঁকতে প্ল্যাটফরম্-এ উঠে এল।

পেনিসিলিন ঃ

আবিষ্কারের পর খুব অল্প দিনের মধ্যেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের প্রচলিত চিন্তাধারার মূলো-টিকেই যেন নাড়া দিয়েছিল পেনিসেলিন। রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে এই ওষুধটির ভূমিকা অনেকের কাছেই যেন মনে হয়েছিল, এটা যেন একটি অতিনৈসর্গিক ঘটনা। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন 'মিরাকল ড্রাগ'।

জনৈক বিজ্ঞানীর মন্তব্য, 'আমাকে কেউ যদি পেনিসিলিন আবিষ্কারের কাহিনী লিখতে বলেন, তাকে আমি বলবো, আমাকে নয়, এ দায়িত্বটি বরং এক জন যিনি উপন্যাস লেখেন, তাঁকে দিন।' কথাটা হয়ত তিনি মিথ্যে বলেন নি। কারণ একজন বিজ্ঞানী সেই কাহিনীটি হয়ত এই ভাবে লিখতেন : নিজের গবেষণাগারে পরীক্ষা করার সময় অধ্যাপক আলেকজানডার ফ্লেমিং এক দিন একটি কাচের প্লেট রেখে দিয়েছিলেন জানালার ধারে। প্লেটটির গায়ে ছিল অসংখ্য রোগ-জীবাণু। আর তার পরেই ঘটে ছিল সেই ইতিহাসিক ঘটনা। বাইরে থেকে জানালার ভেতর দিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি কখন এসে ঢুকলো সবুজ রঙের এক ধরনের ছত্রাক। তারপর ছড়িয়ে পড়লো এই প্লেটটির ওপর।

এক সময় প্লেটটি পরীক্ষা করতে গিয়ে ফ্লেমিং তো অবাক। প্লেটের ওপরকার সেই ব্যাকটেরিয়া গেল কোথায় ? এই ঘটনা থেকেই পেনিসিলিনের আবিষ্কার। সবুজ রঙের ওই ছত্রাক, যা অনেকের ঘরবাড়ির গায়ে এমনিতেই জন্মায়— সেই ছত্রাকের মধ্যে পাওয়া গেল 'মিরাকল ড্রাগ'—পেনিসিলিন। পরে ফ্লেমিং-এর মৌলিক আবিষ্কারকে সার্থক করে তোলার কাজে সাহায্য করে ছিলেন অধ্যাপক ফ্লোরি এবং অধ্যাপক চেইন। অক্সফোর্ডের উইলিয়াম ডান স্কুল অভ্ প্যাথোলজির সঙ্গে যখন তাঁরা জড়িয়ে ছিলেন, তখন, বলা বাহুল্য, অভূতপূর্ব এই অবদানের জন্যে তাঁদের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল।

কিন্তু একজন ঔপন্যাসিকের কলমে এই কাহিনীটি অরও হৃদয়স্পর্শী হতে পারতো। হ্যাঁ, এই 'মিরাকল ড্রাগ' আবিষ্কারের পর থেকে কোটি কোটি মানুষকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে। নানা রকম শল্যচিকিৎসাকে করেছে নির্বিঘ্ন। জীব থেকে কত রকম দুরারোগ্য ব্যাধি—মানব-সভ্যতার আদিকাল থেকে যারা বিমূর্ত মৃত্যু হিসেবে পেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ওষুধটির প্রচুর উন্নতি সাধন করা হয়। যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের শতকরা ৯৫ জনকে তাদের ক্ষত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এই পেনিসিলিন। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল এই ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক সময় মন্তব্য করে-ছিলেন, 'যে তিনটি বিষয় আমাদের, অর্থাৎ মিত্র-বাহিনীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয় করতে সাহায্য করেছে, পেনিসিলিন তাদের মধ্যে একটি।'

আবিষ্কারের পর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে যেমন জীবন দিয়েছে এই পেনিসিলিন, বেশ কিছু বছর ধরে একে নিয়ে বিতর্কের ঝড়ও চলছে যথেষ্ট। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর অনেকে এখন বলছেন, রোগীকে পেনিসিলিন দেওয়া বন্ধ করুন। তাঁদের বক্তব্য, বছরের পর বছর মুড়িমুড়কির মত পেনিসিলিন প্রয়োগ করার ফলে, অনেকের দেহে পেনিসিলিন আর কোন কাজ করতে পারছে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের ভাষায় যাকে এখন বলা হচ্ছে 'পেনি-সিলিন রেজিস্টান্স'। আগে শরীরের রোগ-জীবাণুকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করতে পারত পেনিসিলিন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করার ফলে শরীরের মধ্যে গড়ে উঠেছে পেনিসিলিনকে প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা। অনেক রোগ আজকাল পেনি-সিলিনে সারে না। সারলেও তার জন্যে এই ওষুধ-টিকে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। আর তার অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই, তাতে রোগজীবাণুরা খতম হয় ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের শরীরের মধ্যেই সংরক্ষিত ফৌজের মত সব সময় বাসা বেঁধে থাকে এমন অনেক জীবাণুও মারা পড়ে। যেমন ধরুন, এক ধরণের জীবাণু আছে, যাদের কাজ আমাদের শরীরে ভিটামিন-বি তৈরি করা। পেনি-সিলিন এ ধরনের জীবাণুর ক্ষতিসাধন করে যথেষ্ট। যার ফলে শরীরের পুষ্টি ক্ষমতা কমে। শরীর দুর্বল হয়। শরীরে ভিটামিন-বি কমলে বেরিবেরি রোগ হয়, এমন কথাও তো আপনাদের অনেকের জানা। এ ছাড়া, অনেকের শরীরে পেনিসিলিন বিষক্রিয়া চালায়। সৃষ্টি করে অ্যালার্জি। এসব কথা ভেবেই পেনিসিলিন প্রয়োগ করার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা চিকিৎসকদের এখন সাবধান হতে বলছেন।

তবু বলা যেতে পারে, চাঁদে কলঙ্ক আছে যেমন, তার স্নিগ্ধতাও তো কম নয় ?

এ কথা ভেবেই সম্প্রতি পেনিসিলিন আবিষ্কারের 'পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি' উৎসব পালন করা হলো। লন্ডনের সেন্ট মেরীজ হাসপাতাল-এ ছোট্ট একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই হাসপাতালেই ফ্লেমিং একদা তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। মরিসাস সরকার এই উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকিটও প্রকাশ করেছেন। এই সঙ্গে বিজ্ঞানীরা পর্যালোচনা করে দেখছেন পেনিসিলিনের ভূমিকার ভালমন্দ সব দিক।

ক্যানসার প্রসঙ্গে

শল্য চিকিৎসা বা অপারেশন এবং সেই সঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ—দীর্ঘকাল ধরে এই ভাবেই ক্যানসার নিরাময়ের ব্যাপারে চেষ্টা করে এসেছেন পৃথিবীর তাবৎ চিকিৎসকরা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের লক্ষ্য ছিলো মুখ্যতঃ দুটি। এক, শরীর থেকে ক্যানসারদুষ্ট কোষকলা বা টিস্যুদের বাদ দেওয়া। দুই, ওই ভাবে ক্যানসার কোষকলা বিচ্ছিন্ন করার পর, শরীরে ক্যানসার কোষের কিছুটা জট যদি থেকে গিয়ে থাকে সেই জটকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নির্মূল করা। শেষোক্ত এই পদ্ধতিকেই বলা হয় 'কেমো-থেরাপি।'

আবিষ্কৃত হলো এক্স-রে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, শল্য-চিকিৎসায় কিছু কিছু অসুবিধে আছে। দেখা গেল, শরীরে এমন জায়গায় ক্যানসার হলো, যেখানে অপারেশান করাই শক্ত। আবার এমনও হয়, অপারেশন করতে গিয়ে ক্যানসার কোষের যৎসামান্য হয়ত শরীরের মধ্যে থেকেই গেল। সে ক্ষেত্রে ওই 'অবশিষ্ট'ই আবার বিপত্তির কারণ হয়। এই অসুবিধেগুলি অনেকাংশে দূর করা গেল এক্স-রে-র সাহায্যে। শরীরের যে অংশে ছুরি-কাঁচি চালানো যায় না, সেখানে বিশেষ এই রশ্মি অবাধে প্রবেশ করতে পারে। ক্যানসার কোষে পড়ার পর এক্স-রে ক্যানসার কোষকে হত্যা করতে পারে।

ফলে ক্যানসার নিরাময়ের অন্যতম পথ হিসেবে এক্স-রে-র আগমন ঘটলো।

কিন্তু তাতেও যে সমস্যা দূর হলো, তা নয়। এক্স-রে ক্যানসার কোষদের হত্যা করে যেমন, সেই সঙ্গে যেখানে ক্যানসার কোষ গড়ে ওঠে তার আশ-পাশের অনেক সুস্থ কোষকেও তো হত্যা করে। পরবর্তীকালে আরও নানা রকম বিকিরণকে এ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা। বলতে কি, সূর্য থেকে যত রকম রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে তাদের প্রায় সবই। একমাত্র গামা-রশ্মি ছাড়া। জীব-কোষের পক্ষে গামা-রশ্মি খুবই ক্ষতিকর বলে।
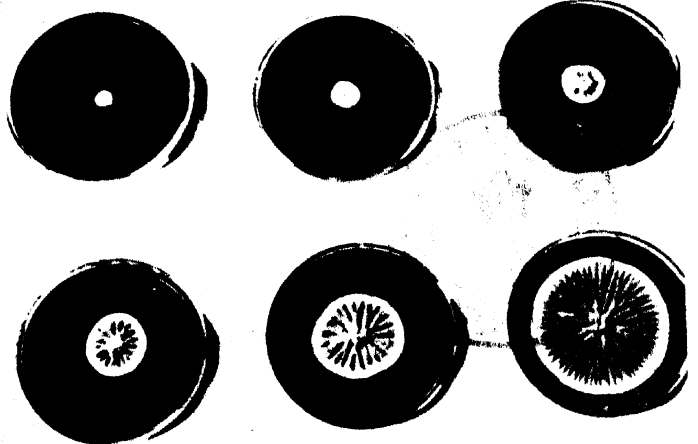
বাঁপাশে : অধ্যাপক ফ্লেমিং তাঁর গবেষণাগারে। ডান পাশে : যে ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন নিষ্কাশন করেছিলেন ফ্লেমিং। বাঁ পাশের উপর থেকে পর পর দশ দিনে ছত্রাকের বৃদ্ধির হার দেখান হলো

অনেক ক্যানসার রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে KARIN-এর সাহায্যে

ইদানীং নিউট্রন কণা বা নিউট্রন রশ্মির সাহায্যে ক্যানসার কোষ হত্যার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর কোন কোন দেশে এই রশ্মির সাহায্যে ক্যানসার সারিয়ে তোলার কাজে হাতও দিয়েছেন চিকিৎসকরা। উল্লেখ্য, মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে এই নিউট্রন। বৈদ্যুতিক চরিত্রের দিক দিয়ে নিউট্রন নিরপেক্ষ কণা। ফলে জীব-কোষের উপর তথাকথিত জীব-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বা তেজস্ক্রিয়তা-জনিত কোন ক্ষতির আশংকা নিউট্রনের ক্ষেত্রে ঘটে না। অথচ শক্তির দিক দিয়ে নিউট্রন যথেষ্ট সক্রিয়।

সাম্প্রতিক খবর, পশ্চিম জার্মানির হাইডেল-বার্গের ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রে অতিকায় একটি যন্ত্র বসানো হয়েছে। যন্ত্রটির নাম KARIN (Karlsruhe Ring Ionic Source Neutron Generator)

হাইডেলবার্গের কাছে অবস্থিত কার্লশ্রু। এখানকার পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে যন্ত্রটি তৈরি। তৈরি করেছেন ডাঃ অ্যালব্রেখট স্মিউট। আসলে এটি একটি ত্বরক যন্ত্র বা অ্যাকসেলারেটার। এই যন্ত্রের সাহায্যে সক্রিয় পারমাণবিক কণা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। KARIN-এ আসলে যা ঘটানো হয় তা হলো হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজন বা ফিউশন। এই সংযোজনের ফলে নির্গত হয় অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক কণা। যাদের মধ্যে অন্যতম নিউট্রন। এই নিউট্রন কণার বর্ষণ ঘটানো হয় ক্যানসার কোষের উপর। যার আঘাতে ক্যানসার কোষ মারা পড়ে। বলা হয়েছে, এই নিউট্রন কণার মাত্রা সেকেণ্ডে ৫০০০ মিলির‍্যাড। উদ্ভাবকদের দাবী, এমন ধরনের নিউট্রন রশ্মির সাহায্যে টিউমার ধ্বংসের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। শরীরের যে সব জায়গায় বিকিরণ নিক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না, এই যন্ত্র সে সব অঞ্চলেও রশ্মি নিক্ষেপ করতে পারে। টিউমার কোষে অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকলে বিকিরণের সাহায্যে চিকিৎসা করা শক্ত হয়। কারণ সে ক্ষেত্রে একস-রে বা অন্যান্য বিকিরণ তেমন কাজ করতে পারে না। কিন্তু KARIN তার ব্যতিক্রম। KARIN থেকে নির্গত নিউট্রন রশ্মি তেমন ক্ষেত্রেও ক্যানসার কোষকে হত্যা করতে পারে।

আইনস্টাইন স্মরণিকা

আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনস্টাইন জন্মশতবার্ষিকী কমিটি একটি সুন্দর স্মরণিকা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সংক্ষিপ্ত এবং পরিচ্ছন্ন প্রকাশন। কোন রকম বাহুল্য না রেখে এই স্মরণিকায় তুলে ধরা হয়েছে বর্ষপঞ্জীর আংগিকে আইনস্টাইনের জীবনের ঘটনাবলী, আলোচিত হয়েছে 'আপেক্ষিকতাবাদ' 'আলোকতড়িৎ ক্রিয়া', 'বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান', 'ব্রাউনীয় বিচলন' সম্পর্কে আইনস্টাইনের গবেষণার পরিচয়। এ ছাড়া আছে শিক্ষার উপর আইনস্টাইনের বক্তব্য। আইনস্টাইনের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক রচনার একটি তালিকাও সংযোজিত হয়েছে এই স্মরণিকায়। বাংলা ভাষায় লেখা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং গবেষক-দের সাহায্যে এ-ধরনের প্রকাশনা চোখে পড়ে না। যাঁরা এক নজরে এই মহান বিজ্ঞানীর পরিচয় পেতে চান—স্মরণিকাটি তাঁদের ভাল লাগবে।

সমরজিৎ কর

For the freshest feeling in the world

Old Spice

Cool, refreshing.
As the spray
of the sea.
The brisk freshness
and fragrance.
Of Old Spice.

Also in the Lime range

Old Spice the mark

Mfd. by: Colfax Laboratories (I) Pvt. Ltd.

HAITRA-OS-37

"ভালারী শহরের ধোঁয়া"—পিকাসোর তৈলচিত্র

মাতিসের তৈলচিত্র 'ডোরাকাটা জামা'

"নগ্ন নীল"—মাতিসের কোলাজ

"মিচেল নীল"—মাতিসের তৈলচিত্র

মাতিশের তৈলচিত্র "নর্তকী"

"ভূমধ্যসাগরের নিসর্গ চিত্র"—পিকাশোর তৈলচিত্র

কোন কিছুই ভাল নয়। এমন এমন ছবি দেখা গেছে—যা রঙের আতিশয্যে যেন ছবির ভারসাম্য বহির্ভূত চোখ ভোলান একটা কিছু।

কিন্তু কি অনবদ্য রঙ! কি অনবদ্য সংবেদন ভাবলে বিস্ময় মনে জাগে। বেশ বোঝা যায় ওঁর চোখের কানায় কানায় নীল সমুদ্রের নীল দিগন্তের প্রতিবিম্ব। একথা সত্য যে অধুনা সব শিল্পীদের মধ্যে মাতিশ স্বীকৃত রীতিনীতিগতভাবে একক ও অদ্বিতীয়। ওঁর কলমে অন্য সব প্রথাগত ও আচারগত চিত্রকলার তুলনায় বেশ অন্য এক জগতের কথা। এখানেই শিল্পী মাতিশকেই কিছুটা সীমাবদ্ধ করতেই হয়। মাতিশ এমন এক জায়গায় নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছেন। ওঁর ছবিতে মানুষ, ফুলদান, চেয়ার, কার্পেট, ফুল, লতাপাতা সব মিলিয়ে এক ঐকতান সঙ্গীতের মত। তথাপি আমার মনে হয়, যদিও বস্তু নিশ্চয় চিনতে পারি—তবু সব কেমন যেন পুষ্প ও উদ্ভিজ্জের ছন্দোবদ্ধ সমাবেশ।

আমার মনে আছে একোল দ্য লুভ্র-এর শিক্ষক বের্নার দরিভল—ইনি ইদানীং হয়তো আরট মডার্নের রক্ষক—তখন ছিলেন জাঁকাসের অধস্তন অধ্যাপক—একদিন গিয়েছি পারীর মডার্ন আর্ট গ্যালারীতে, উনি তখন মাতিশের ঘর সাজাতে ব্যস্ত। আমি বিহ্বল, হতবাক দেখে যে একটা ছবি মাতিশের আঁকা মরোক্কোর নিসর্গচিত্র। ও ধরনের মাতিশের ছবি আমি কোনদিন দেখিনি। কেবল সরলরেখা ও সরল রঙ দিয়ে অনবদ্য রূপ রচনা। রঙে মাতিশের মুনশীয়ানা পরিষ্কার। কিন্তু এ ধরনের চিত্রর কাঠামো, আঁক বাঁক শূন্য সত্যই তাজ্জবের ব্যাপার।

মহাশয় দরিভালকে বললাম এ ছবি কোথায় পেলেন?

উত্তরে বললেন এ এক ব্যক্তিগত সংগ্রহ কিছুদিনের জন্য হাওলাত করা হয়েছে।

সত্যই অপূর্ব, আমি বললাম, এ মাতিশের জগতেই বিস্ময়।

সত্যই তাই নয় কি, কথাটা সমর্থন করলেন, বের্নার দরিভাল পরে আরো যোগ করলেন, এই

হীরে বিক্রির টাকা দিয়ে কী করবি মুরি?
খুব ফুর্তি করব আর ঘুরে বেড়াব!

দামী দামী সব জিনিস কিনব!
তুই তোর যোগ্য কথাই বলছিস জো!

অরণ্যের সীমান্তে গোপন জায়গায়...
হীরোকে দেখো, টোরা!
দেখব অরণ্যদেব!
জঙ্গলের প্রবাদ : ' অরণ্যদেব মাঝে-মাঝে...

... শহরে যান।' আজও তিনি শহরে এসেছেন!
শহরের সেরা জহুরীকে খুঁজে বার করতে হবে।

পুলিসের কাছে যাব না!
ভাটিখানাতেই খোঁজ মিলবে...
The BLUE DRAGON

কী চান?
খবর চাই। চোরাই হীরে কাকে বিক্রি করব?

মনে হচ্ছে লোকটার মতলব ভাল নয়!
ধোলাই দেবার ব্যবস্থা করো!

কী হে, কিছু বিক্রি করতে চাও?
... নাকি অন্য মতলব?
বলছি..... একটু দাঁড়াও!
ক্রমশ

মানবজমিন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

॥ ছয় ॥
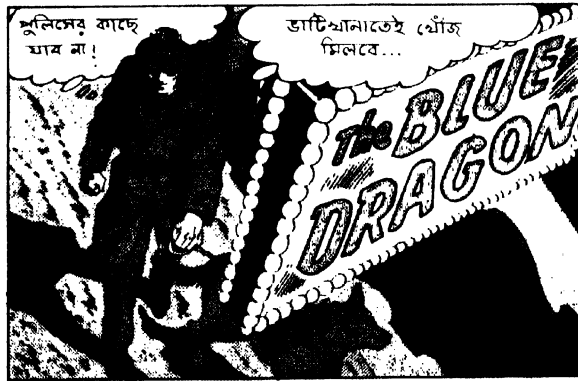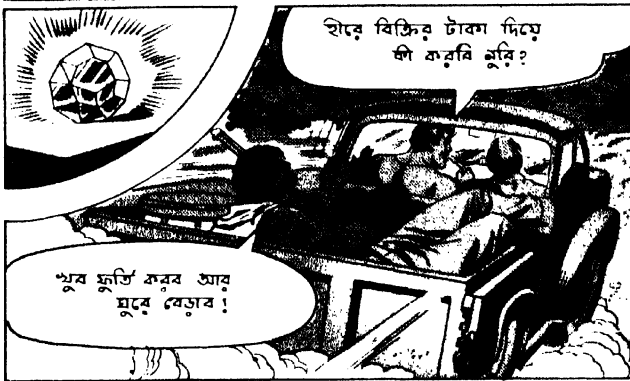
মালদা থেকে গভীর রাতে দার্জিলিং মেল ধরল সরিৎ। ট্রেনে অসম্ভব ভীড়। এই শীতে সাধারণত ভীড় এত হয় না কলকাতা-যাত্রীদের। তার কপাল খারাপ। টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠবার অভ্যাস বহুকাল হল তার নেই। দরকারও হয় না। সব লাইনেই আজকাল রেলের রানিং স্টাফ একটা প্যারালেল ব্যবস্থা চালু রেখেছে। সেকেন্ড ক্লাস টিকিটের প্রায় অর্ধেক খরচে দিব্যি যাতায়াত করা যায়। মালদার রেলের লোকেরা প্রায় সবাই সরিতের চেনা বা মুখ চেনা। স্টেশনের চ্যাটার্জিদাকে ধরতেই রেটটা আরো কিছু কমে গেল। চ্যাটার্জিদা বললেন, থ্রি টায়ারে উঠে কন্ডাকটর গার্ডকে দুটো টাকা দিও, আরাম করে শুয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু সরিতের কাছে দুটো টাকাও অনেক টাকা। দু প্যাকেট চারমিনার আর দেশলাই হয়েও বেশী থাকবে। ফালতু ঘুমোনোর জন্য পয়সা কে দেয়? ভেবেছিল থ্রি টায়ারে উঠবেই না। কিন্তু ট্রেনের অস্বাভাবিক ভীড়ের জন্য উঠতে হল। পাঁচ সাত জন বন্ধু তুলে দিতে এসেছিল স্টেশনে। তারাও বলল, ওঠ।

কন্ডাকটর লোকটা মহা ফ্যাচালে পার্টির। কেবল খ্যাচ খ্যাচ করে যাচ্ছিল, নেমে যান, নেমে যান। আজ কোনো অ্যাকোমোডেশন নেই। বলে লোকটা মালদা স্টেশনেই জি আর পি ডেকে আনল। মহা ঝামেলা।

সরিৎ বেগতিক দেখে নেমে পড়েছিল। পিছন দিকে একটা মিলিটারি কামরা মোটামুটি ফাঁকা এবং দরজা খোলা দেখে আরো দশ বারোজন যাত্রীর সঙ্গে সেটাতে উঠে পড়ে সরিৎ। ঘুমন্ত আধঘুমন্ত মিলিটারিরা প্রথমে কিছু বলেনি। তারপরই হঠাৎ দশ বারোটা কালো কালো গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরা জওয়ান তেড়ে এসে হামহাম করে ভারতের অচেনা কোনো ভাষায় প্রচণ্ড ধমক চমক দিতে লাগল। ধমক শুনে ভয় খেলেও ট্রেন ছাড়ার সেই শেষ মুহূর্তে কারো নামবার ইচ্ছে ছিল না। তখনই হঠাৎ বিনা নোটিশে মিলিটারিগুলো কিল, চড় আর লাথি চালাতে শুরু করে। কে মার খেল আর কে খেল না তা দেখার জন্য দাঁড়ায়নি সরিৎ। মালদা শহরে সে মস্তানী করে বেড়ায় বটে, কিন্তু মিলিটারি কামরায় হুজ্জতি করলে যে জল কত দূর গড়াবে তার ঠিক নেই বলে ঝট করে নেমে পড়ল। কিন্তু অপমানটা পুরো এড়াতে পারল না। নামবার মুহূর্তে পাছায় একটা কেডস পরা পায়ের প্রবল লাথি হজম করতে হল।

বন্ধুরা দৃশ্যটা হয়তো দেখেনি, এই যা ভরসা। ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে, সরিৎ দৌড়ে গিয়ে ফের থ্রি টায়ারে উঠে পড়ল। আবার কন্ডাকটরের খ্যাচ খ্যাচ, ভীতি প্রদর্শন এবং যাত্রীদের দিক থেকেও প্রবল প্রতিবাদ।

কিটব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজা ঘেঁষে। কন্ডাকটরকে দুটো টাকাই দিতে হবে না কি কিছু কমসম দিলেও হবে তা বুঝতে পারছিল না। দুজন আর্মড পুলিশও কামরা পাহারা দেওয়ার জন্য উঠেছে। ডাকাত উঠলে আটকাবে। তবে তারা সরিৎকে কিছু বলল না। আরো জনা তিন চার সরিতের মতোই ফালতু যাত্রী করিডরের গলিতে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কন্ডাকটর অবশ্য আর বেশী খ্যাচ খ্যাচ খ্যাচ করল না। খানিক বাদে যাত্রীরা যে যার ঘুমিয়ে পড়লে দরজার প্যাসেজে দাঁড়িয়ে একটা কাগজের দিকে খুব আনমনে চেয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, কোথায় যাবেন?

সরিৎ পকেট থেকে একটা আধুলি বের করল। কন্ডাকটর আড়চোখে আধুলিটা দেখে বলল, ওতে হবে না। এক টাকা।

সরিৎ পয়সা বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে বলল, জায়গা করে দিন, পারলে দু টাকা দিতাম। জায়গা তো নেই, মেঝেয় বসে যাবো না হয়।

আবার খ্যাচ খ্যাচ। তবে কন্ডাকটর তার নিজের বরাদ্দ লম্বা বেঞ্চটায় সিপাইদের পাশাপাশি সব কজন ফালতু যাত্রীর বসার ব্যবস্থা করে দিয়ে এক টাকা করেই নিল। কিছুক্ষণ বাদে সিগারেট টিগারেট দেওয়া-নেওয়া এবং গল্পসল্পও হতে লাগল।

সরিৎ অবশ্য বুড়ো কন্ডাকটর বা বয়স্ক যাত্রীদের সঙ্গে জমাল না। একা বসে চোখ বুজে রইল, ঘুম আসবে না জানা কথা। মিলিটারির লাথিটা মাজায় জমে টনটন করছে। ফালতু ঝামেলা যত সব। ভাবতে গেলে অপমানে গায়ের ভিতরে জ্বালা ধরে যায়। তবু এত অপমান অনাদরের পরেও যে বসার জায়গা পেয়েছে সেটাই একমাত্র তৃপ্তি।

সেজদি এতকাল তাদের বিশেষ পাত্তা দেয়নি। পয়সা হলে কে কাকে পাত্তা দেয়? সেজদি অবশ্য উল্টো কথা বলে। তার যখন পয়সা ছিল না তখন নাকি বাপের বাড়ির লোকেরাই তাকে তেমন পাত্তা দিত না। সংসারের এই সব কূটকচালে ব্যাপার অবশ্য সরিৎ অত তলিয়ে বোঝে না। এতকাল পরে সেজদি যে তার বেকার ছোটো ভাইকে ডেকে পাঠিয়েছে সেইটেই ঢের। সেজদির গরু চরাতেও সে রাজি আছে, পয়সা পেলে। তারপর কলকাতায় একটা কিছু জুটে যাবে ঠিকই। কলকাতা তো আর মালদা নয়।

বড়দা মালদার সিভিল হাসপাতালের ডাক্তার। কান, নাক আর গলার স্পেশালিস্ট। কিন্তু ই এন টি ডাক্তারের তেমন প্রাইভেট প্র্যাকটিস থাকে না। বড়দারও নেই। তার ওপর লোকটা ঘরকুনো এবং ব্রিজ খেলার পাগল। যেখানেই বদলী হয়ে যায় সেখানেই ঠিক তার ব্রিজের বন্ধু জুটে যাবেই। ঐ খেলাই বড়দার কাল হয়েছে। ডাক্তারীর ব্যাপারটাকে আদৌ গুরুত্ব না দিতে দিতে রুগীদের কাছে এখন আর তার আদর নেই। পসার না থাকায় বাঁধা মাইনেয় সংসার চালাতে হয়। মধ্যপ্রদেশে মেজদার কাছে মা বাবা থাকে, সরিৎ আর তার ছোড়দি পড়ে আছে বড়দার ঘাড়ে। বউদি প্রথম প্রথম খারাপ ব্যবহার করত না। ছোড়দি এই সংসারে রান্নাবান্না থেকে যাবতীয় কাজ বুক দিয়ে করে। তবু ইদানীং বউদি বস্তিবাড়ির মেয়েদের মতো জঘন্য সব গালাগাল দিয়ে ছোড়দির ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছে। মুশকিল হল, ছোড়দিটার বিয়ে হওয়ার চানস খুব কম। ওর কী একটা মেয়েলী রোগ থাকায় ডাক্তার বিয়ে দিতে বারণ করেছে। তবু হয়ে যেত হয়তো, কিন্তু ছোড়দি দেখতে খুব খারাপ। রোগা, কালো, তার ওপর মুখটা এমন ভাঙাচোরা যে, বুড়ির মতো দেখায়। সুতরাং ছোড়দির আর গতি নেই, বড়দার আশ্রয় ছাড়া। সেইটে সার বুঝে বড় বউদি ছোড়দির ওপর সাত জন্মের শোধ তুলে নিচ্ছে। নিক, তাতে সরিতের তেমন আপত্তি নেই। ছোড়দিও বড় কম যায় না, যখন মুখ ছোটায় তখন দিনকে রাত করে দিতে পারে। কিন্তু সরিতের বিপদ নিজেকে নিয়ে। বি-এসসি পাশ করে বহুদিন বসে আছে। বয়স ছাব্বিশের কাছাকাছি। বড়দা বউদি খাওয়াচ্ছে বটে, কিন্তু খুশী মনে নয়। সরিৎ সংসারে বাজার

তবু হাত খরচ চালাতে তিন চারটে টিউশানি করতে হয় তাকে। বড়দা খাওয়া ছাড়া আর কিছু দেয় না। ইচ্ছে থাকলেও বউদির জন্য দেওয়া সম্ভব নয়।

বেকার জীবনের একটা শূন্যতা আছে। সর্বদাই একটা খাঁ-খাঁ করা ভাব বুকের মধ্যে। মনে হয়, ভিতরের অনেক আগুন কাজে না লেগে আস্তে আস্তে নিবে আসছে। চাকরির জন্য সরিৎ পলিটিকস করেছে, এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে নাম লেখানো থেকে শুরু করে নানাবিধ পোস্টাল ট্রেনিং নিয়েছে, শর্ট-হ্যান্ড আর টাইপ শিখে রেখেছে। কিছুতেই কিছু হয়নি। সরকারী চাকরির বয়স পার হতে চলল। এখন কেমন যেন একটা নেতিয়ে পড়া ভাব, 'কিছু হবে না' গোছের একটা ধারণার কাছে আত্মসমর্পণের ঝোঁক এসেছে। শুনছিল তার গরীব সেজদির অনেক টাকা হয়েছে, ভাসুরের সম্পত্তি পেয়েছে বিস্তর, তা ছাড়া নগদ টাকাও। কিন্তু তখন তার কাছে যাওয়া বা তার সাহায্য চাওয়াটা ভারী লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ সম্পত্তি পাওয়ার কিছুকাল আগেই সেজো জামাইবাবুর প্লুরিসির চিকিৎসার জন্য ভাইদের কাছে কিছু টাকা হাওলাত চেয়েছিল সেজদি। কেউই টাকাটা দেয়নি। ঘরের ঘটিবাটি গয়না বিক্রি করে সেজদিকে সে যাত্রা সামাল দিতে হয়। অভাবের সংসার থেকে বড় মেয়ে চিত্রাকে পাচার করতে হয়েছিল সেজদিকে, মেজদির কাছে, এলাহাবাদে। তখন সেজদিকে সবাই সাহায্য করার ভয়ে এড়িয়ে চলত। সেই সেজদি হঠাৎ বড়লোক হওয়ার পর তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে যাওয়াটা কি লজ্জার নয়?

বহুকাল বাদে সেজদি হঠাৎ একটা চিঠিতে সরিৎকে তার কাছে যেতে লিখেছে। সরিৎ বড়দার সংসার থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। সেজদির কাছেও হয়তো তেমন আদর হবে না। না হোক। আদর ভালবাসা কেমন তা ভুলেই গেছে সরিৎ। মধ্যপ্রদেশে মেজদার কাছেও আর আশ্রয় নেই। মেজদা একটা ফার্মে কাজ করে। সামান্যই পায়। মা বাবা তার ঘাড়ে থাকায় সে আর কোনো দায়িত্ব নিতে নারাজ। বড়দি কেরানীর ঘর করে নিউ কুচবিহারে। কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। মেজদি অবশ্য বড়লোক। কিন্তু বাপের বাড়ির সঙ্গে তারও বিশেষ সম্পর্ক নেই। মেজদিকে ভাল করে চোখেই দেখেনি সরিৎ। বড়লোক বলে ভয়ও পায়। সরিতের কাছে সব দরজাই বন্ধ ছিল। এখন হঠাৎ সেজদির দরজাটা খুলেছে। আদরের কথা সে আর ভাবে না, শুধু একটা আশ্রয়ের কথা ভাবে।

গাড়ি ফরাক্কা ব্যারেজ পার হচ্ছে গুমগুম শব্দ করে। প্রচণ্ড শীত। মাফলারের অভাবে সরিৎ রুমালটা দু ভাঁজ করে কান ঢেকে কপালে গেরো দিয়ে বসল। পুরোনো পুলওভার শীত মানতে চায় না। হাত পা অবশ-করা শীত থেকে পরিত্রাণ পেতে সে অনেক হিসেব করে একটা সিগারেট ধরাল। টাকার অভাব তো অনেক বড় জিনিস, তার চেয়েও ছোটো জিনিস আধুলিটা সিকিটা নিয়ে সরিৎকে অনবরত মাথা ঘামাতে হয়। ছোটো জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে ভিতরের মানুষটাও কি ছোটো হয়ে যায় না?

বাঁ পাশে দুটো পুলিস, ডানধারে ফালতু যাত্রীরা। যাত্রীদের মধ্যে ঠিক পাশে বসা লোকটাকে সরিৎ মালদার বাজারহাটে দেখেছে। সঠিক পরিচয় না জানলেও মুখচেনা। লোকটা সরিৎকে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল। হঠাৎ বলল, আপনি ডাক্তার-বাবুর ভাই না?

হুঁ। গম্ভীর গলায় আওয়াজ দেয় সরিৎ।

কলকাতায় যাচ্ছেন কি ইন্টারভিউ দিতে নাকি?

না। দিদির বাড়ি বেড়াতে।

অ। মলিনকে চেনেন? মলিন সাহা?

মলিনকে চেনে সরিৎ। তারই বয়সী ছেলে। খুব ফাটে একটা স্কুটার হাঁকিয়ে বেড়ায়, পরনে সব-সময়ে দারুণ সব জামা প্যান্ট। শুনেছে বড়লোকের ছেলে। মলিনের বোন মলিনা বিখ্যাত সুন্দরী। তার জন্য কলেজের পথে বিস্তর ছেলে লাইন দেয়।

তো!

আমি মলিনের বাবা।

শুনে সিগারেটটা ফেলে দেওয়া উচিত হবে কি-না ভাবছিল সরিৎ। ভারী অবাকও হচ্ছিল সে। মলিনের বাপ বলে লোকটাকে বিশ্বাসই হয় না। কালো একটা তুষের চাদর আর মাফলার জড়িয়ে দীনহীনের মতো বসে আছে। কিন্তু দীনেন সাহা যে ডাকের বড়-লোক এ সবাই জানে। লোকটা মালদায় স্থায়ীভাবে থাকে না। থাকলে চিনতে পারত সরিৎ। শুনেছে, লোকটার চারটে মিনিবাস চালসা, শিলিগুড়ি, ফাঁসি-দেওয়া অঞ্চলে চালু আছে। আর আছে হরিশ্চন্দ্র-পুরে আমবাগান, শিলিগুড়িতে ঠিকাদারী। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক দীনেন সাহা বিনা টিকিটে এই-ভাবে যাচ্ছে দেখে ভারী অবাক হল সে।

সরিৎ ভেবেচিন্তে সিগারেটটা হাতের আড়াল করেই ফেলল। উঠে বাথরুমে গিয়ে খেয়ে আসবে।

দীনেন সাহা কিন্তু নিজেই পকেট থেকে বিড়ি বের করে বলল, আপনার ম্যাচিসটা একটু দিন তো।

দেশলাইটা দিতে পেয়ে আর সংকোচ রইল না সরিতের। মুখটা একটু নীচু করে সিগারেটে আর একটা টান দিল।

দীনেন সাহা ম্যাচটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ট্রেন লেট আছে।

হুঁ, আওয়াজ দেয় সরিৎ। মনে মনে বলে, হাঁ রে শালা শ্বশুর, লেট আছে।

খুব বিষয়ী চোখে সরিৎকে আর একবার দেখে নিয়ে দীনেন সাহা বলল, রেলগাড়ির যা অবস্থা হয়েছে আজকাল, বলার নয়। গত দশ বছর আমি টিকিট কেটে কোথাও যাই নি। ব্যবস্থা যখন আছে টিকিট কেটে যাবোই বা কেন? যাদের ফালতু পয়সা আছে তারা যাক।

সরিৎ সিগারেটটা শেষ করে বাঁচল। লোকটা যদি সত্যিই কোনোদিন তার শ্বশুর হয়?

ব্যাকার করেন নাকি?

না। চেষ্টা করছি।

মলিনটার তো কাজকারবারে মন নেই। শুধু বাবুগিরির দিকে নজর।

সরিৎ একটু হাসে মাত্র। মনে মনে বলে, আমাকে জামাই করলে তোমার কাজকারবারে বিনে মাইনেয় খাটবো, বুঝলে হে শ্বশুরমশাই?

দিদির বাড়ি কলকাতার কোথায়? দীনেন জিজ্ঞেস করে।

কলকাতায় ঠিক নয়। কাছেই রতনপুর নামে একটা জায়গায়। হাওড়া থেকে যেতে হয়।

অ। তা হলে আপনি বর্ধমানে নেমে হাওড়ার লোকাল ধরবেন তো? আমিও তাই। আমি যাবো দাশপুরে। জামাইবাবু কী করে?

চাকরি। সংক্ষেপে জবাব দেয় সরিৎ। খামোখা ভ্যাজর ভ্যাজর করতে ভাল লাগে না। বয়স্ক লোকেরা বড় বেশী হাঁড়ির খবর নেয়। তবু এ লোকটা মলিনার বাবা বলেই জবাব দিয়ে যাচ্ছে সরিৎ।

দীনেন সাহা বলে, আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো হয়েছে ত্যাঁদড়। কথাবার্তা শুনতে চায় না। দাশপুরে গিয়ে মালটা নিয়ে আসতে বাবুর কোনো অসুবিধেই ছিল না। তা বলে কি জানেন? ফার্স্ট-ক্লাসের ভাড়া চাই, আর কলকাতায় সাত দিন থাকার জন্য পাঁচশো টাকা হাতখরচা। শুনেছেন কখনো এমন তাজ্জব কথা! এই তো আমি ছ টাকায় ম্যানেজ করছি। শীল লেনে বোনের বাড়িতে থাকব। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ ষাট টাকার বেশী খরচ নয়। মলিনের সঙ্গে দেখা হলে ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন তো, এভাবে চললে দুর্দিনের বাজারে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

সরিৎ ঢুলছিল। তবু মনে মনে বলল, তোমার টাকায় মলিন একদিন পেচ্ছাপ করবে, শ্বশুরমশাই। তার চেয়ে আমাকে জামাই করো, সব দেখেশুনে

হিসেব।

*

স্টেশন থেকে রতনপুর আধ মাইলের ওপর রাস্তা। রিকশা যায়। কিন্তু সরিৎ রিকশার কথা ভাবতেও পারে না।

স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করে রাস্তাটা বুঝে নিয়ে হাঁটা দিল। মনের মধ্যে নানা-রকম হচ্ছে। সেজদি কেন ডেকে পাঠিয়েছে, কেমন ব্যবহার পাবে, আশপাশে ফুটফুটে মেয়েরা আছে কি-না, চাকরির সুবিধে হবে কি-না, দিদির কত বড়লোক এইসব ভাবছিল।

রাস্তা ফুরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তে। বিশাল বাগান আর গাছে ঘেরা বাড়ির ফটকে ঢুকতেই ঘাউ ঘাউ করে তেড়ে এল একটা কুকুর। কুকুরের পিছনে এক কাপালিক।

ভয় পেয়ে সরিৎ ফটকের বাইরে ফিরে এল আবার। গেটটা চেপে ধরল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে।

কাপালিকটা বলল, কাকে চাই?

শ্রীনাথ ব্যানার্জি।

এই বাড়ি। সোজা ভিতরে ঢুকে যান। কুকুর কিছু বলবে না।

খুব ভয়ে ভয়ে, দুশ্চিন্তায়, অনিশ্চয়তা এক মন নিয়ে সেজদির বাড়ির সীমানায় ঢুকল সরিৎ।

*

মুড়ি চিবোতে একদম উদাস লাগছে। নিত্যদিন রোজ মুড়ি কি ভাল লাগে?

যতদিন জ্ঞান হয়েছে ততদিন থেকে এই এক মুড়িই দেখে আসছে সে। শুকনো খাও, ভিজিয়ে খাও। তরকারী বা তেল মেখে খাও। তাও যে রোজ

...ঠিকঠাক তাও নয়। প্রায়ই তার মাড়িটায় টান পড়ছে। টান পড়লেই আদর বাড়ে। ফাঁক গেল তো তিন দিনের দিন এক কোঁড় ...পেলে মনে হয়, এর কাছে অমৃত কোথায় ...!

আজ তবু মুড়ি বড় উদাস লাগে।

নিতাইয়ের মন ভাল নেই। অমল নন্দী গুসকরায় শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরে এসে কালই খবর ...য়েছে পুতুলরানী ইয়া মোটাসোটা হয়েছে। দুটো ...ছেলের মা। অমল নন্দী নিতাইয়ের কথা ...লেছিল। তাতে নাকি পুতুলরানী বলেছে, ওটা ... উন্মাদ।

সে কারণে নয়। আসলে মন খারাপ তার বাণ ...করণ, মারণ উচাটনে কাজ হচ্ছে না বলে। ... যাকে মোক্ষম মোক্ষম বাণ মারা হচ্ছে সে ...টা হয় কি করে?

যে তান্ত্রিকটা শিখিয়েছিল সেটা আসলে চারশ-... সব কিছুতেই যখন ভেজাল তখন তান্ত্রিকই ...ভেজাল হবে না কেন?

...আজ সকাল থেকে নিতাই ভাবছে, হিমালয়ে চলে ... সেখানে পাহাড়ে কন্দরে খুঁজে আসল সিদ্ধাই ... খুঁজে বের করবে। যদি আসল লোকের ...পেয়ে যায় তবে আর ফিরবে না নিতাই। যেমন তেমন ...হোক পুতুলরানীর গলা দিয়ে রক্ত তুলতেই হবে।

পালপাড়ায় সদর রাস্তার ধারে বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে ... কর্মকার। শালারা দুনিয়াটাই শান বাঁধিয়ে ফেলছে আস্তে আস্তে। একদিন কি লোকে ঘরের মধ্যেই হালচাষ করবে বাবা? না হলে জমিই বা পাবে কোথায়?

রঘু হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে রাজমিস্ত্রিদের ...কাজ দেখছে। নতুন বাড়ির লাগোয়া তার পুরোনো টিনের ঘর। রঘুর মেয়ে এসে বাপকে এক কাপ চা দিয়ে গেল। রঘু রোদে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে।

নিতাইয়ের এখন একটু চা-তেষ্টা পেয়েছে ...ই। সে দাঁড়িয়ে গেল। ইস্পাত একটু এগিয়ে রঘুর দিকে মুখ তুলে ধমকচমক করছে। কুকুরটা লোক চেনে। সোনা চুরি করে রঘুর পয়সা হয়েছে, ...কে না জানে।

নিতাই বলল, চা খাচ্ছো নাকি রঘুবাবু? বাড়িটা ...তো খুব সুন্দর হচ্ছে গো। তা তোমার বুদ্ধির ...বলিহারী যাই, পশ্চিমমুখো সদর করে কেউ? এ বাড়ি যে গরম হবে খুব।

রঘু ফিরে দেখে বলল, তাই নাকি? তবে তো বড় ভুল হয়েছে রে সম্বন্ধীর পুত!

তা একটু হয়েছে। অত গরম চা খেও না। ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে খাও। বেশী গরম খেলে পেটে ক্যানসার হয়।

বলে নিতাই ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখে। বলে তিনতলার ভিত গেঁথেছো মনে হয়।

তাতেও কোনো ভুল হল নাকি?

না, ভাবছি রঘু স্যাকরার কত পয়সা হয়েছে।

রঘু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার আবার পয়সা! আর পয়সাটাই সব রে, নিতাই? তোর মতো মারণ উচাটন শিখতে পারলে কত কাজের কাজ হত! তা শুনলাম তোর বউটা এখনো নাকি মরেনি?

নিতাই মৃদু হেসে বলে, আস্তে আস্তে মরবে। ভুগে ভুগে। পট করে মরে গেলে কর্মফল ভোগ হবে কি করে বলো।

তা বটে। তবে আমি বলি কি, তুই একদিন গুসকরায় গিয়ে সামনা সামনি বাণ মেরে আয় না। ...তে অনেক কাজ হবে।

ও বাবা! পুলিসে ধরবে না? ফাঁসি হয়ে যাবে।

তখন পুলিসকে বশীকরণ করবি।

ইয়ার্কি হচ্ছে?

রঘুর বউ বেরিয়ে এসে উঁকি দিয়ে দেখে বলল, এই সাত সকালে ক্যাপাকে রাগাচ্ছো কেন? কু-বাক্য বলবে যে নামতা পড়ার মতো।

রঘু বউকে বলে, কু-বাক্য না বলছে কে? তোমারটা তো পুরোনো হয়ে গেছে, এর কাছে একটু নতুন রকম শুনি না হয়।

আহা, আমার কথা আলাদা। আমি ঘরের লোক বলি সে একরকম। তা বলে নিতাই বলবে কেন?

রঘু খুব ভাবুকের মতো বলে, কু-বাক্য শোনা কিছু খারাপ নয়। তাতে মন মেজাজ পরিষ্কার হয়ে যায়, মনের ময়লা কেটে যায়, শরীরটাও চনমনে হয়ে ওঠে। বলবে, নিতাই!

জিভ কেটে রঘুর বউ ঘরে ঢুকে যায়।

নিতাই এখন সেয়ানা হয়েছে। কোমরে হাত দিয়ে রঘুকে বলে, আমাকে দিয়ে মেহনত করাবে তো বাপ! তোমার চালাকি জানি। তুমি হচ্ছো সেই স্যাকরা যে নিজের মায়ের সোনা চুরি করে। আগে বলো চা খাওয়াবে, তবে বলব।

খাওয়াবো। রঘু বলল। তারপর সামনের একটা মস্ত জামরুল গাছের তলায় গিয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বলল, শুরু করে দে।

নিতাই অমনি শুরু করল, তুমি শালা শুয়োরের বাচ্চা......

এমন মুখ ছোটাল নিতাই যে রাজমিস্ত্রিরা পর্যন্ত কাজ থামিয়ে হাঁ করে শুনছিল। বাপ মা চৌদ্দপুরুষ ধরে সে কি গালাগাল। রঘু চোখ বুজে বসে মাথা নাড়ে আর মিটি মিটি হাসে। মাঝে মাঝে বলে ওঠে, বহোত আচ্ছা। চালাও।

নিতাই একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। আবার চনমনে হয়ে রঘুর বউ মেয়ে থেকে শুরু করে মা মাসীর কেচ্ছা গাইতে শুরু করে দিল।

আধ ঘণ্টাখানেক ঝিম ধরে বসে শুনল রঘু।

ঠোঁটের কোণে ফেনা তুলে নিতাই থেমে দম নিতে নিতে বলল, এবার চা খাওয়াও মাইরি। রোজ রোজ বিনিমাগনা তোমার ভূত ঝেড়ে দিই, কিছু চেয়েছি কখনো?

রঘু তার মেয়েকে ডেকে নিতাইকে চা দিতে বলে দেয়। ফুড়ুক ফুড়ুক হাসছে রঘু। একটু আগের ম্যাড়ম্যাড়ে চেহারাটায় এখন যেন একটু জলুস খুলেছে। বলল, আহা, কী শোনালি রে নিতাই! এমন বহুকাল শুনিনি।

এক গ্লাস চা রোজগার করে ভারী খুশি হয় নিতাই। গাছের তলায় বসে রক্তাম্বরে পেঁচিয়ে গরম পেতলের গ্লাসটা ধরেছে সাপটে। ইস্পাত মাঝে মাঝে কোলে লাফিয়ে উঠে গ্লাসের গন্ধ শুঁকছে।

রঘু মিস্ত্রিদের কাজ দেখতে দেখতে বলে, ও বাড়ির খবরটবর আছে নাকি রে কিছু?

নিতাই উদাস গলায় বলে, খবর আর কি? বাবু আর গিন্নির মুখ দেখাদেখি নেই।

সে তো পুরোনো কেচ্ছা।

আজ এইমাত্র একটা নতুন ছোকরা এসে ঢুকল। কাঁধে ব্যাগ। দেখে মনে হয়, বাড়িতে সেঁধিয়ে গেল পাকাপাকি। ছোটো মামাবাবুর আসার কথা ছিল। বোধ হয় সেই।

মামাবাবু কাকাবাবু অনেক আসবে এখন। নরক গুলজার হবে। চোখ কান খোলা রাখিস। কাল রাতে বাবু বাড়ি ফিরেছিল?

ফিরেছিল।

ক'দিন ফিরছে না খেয়াল রাখিস।

চায়ে চিনি কম হয়েছে রঘুবাবু। তোমার মেয়েকে একটু চিনি দিয়ে যেতে বলো।

চিনি সস্তা দেখলি? এক ডেলা গুড় নে বরং

তাই দাও। হাত আসুক।

এক জায়গায় বসে থাকলে নিতাইয়ের কাজ চলে না। গুড়ের ডেলাটা মুড়ির কোঁচড়ে ভরে চা-টা তলানি পর্যন্ত খেয়ে উঠে পড়ল নিতাই।

পথে নামতেই মুখোমুখি কালো এবং গম্ভীর প্রকৃতির মদন ঠিকাদারের সামনে পড়ে গেল। এ লোকটাকে কেন যেন একটু ভয় খায় নিতাই। মাঝে মাঝে মদনকেও বাণ মারে সে।

মদন ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর গলায় বলে, এতক্ষণ ও সব অসভ্য কথা বলে কাকে গালাগাল করছিলি?

তা আমি কি করব? স্যাকরা শুনতে চায় যে। শখ করে কেউ গালাগাল শোনে?

শোনে কিনা রঘুকেই জিজ্ঞেস করো না। দেখা হলেই আমাকে খোঁচায় বলার জন্য।

মিছে কথা বলবি তো মুখ ভেঙে দেবো। বলতে বলতে মদন ঘুঁষি পাকিয়ে এক পা এগোতেই ভারী আত্মসম্মানে ঘা লাগে নিতাইয়ের। এটা কেমন কথা যে, যার তার হাতে সে বরাবর মারধর খাবে, আর অপমান সহ্য করবে?

নিতাই দু পা পিছিয়ে গেল বটে, কিন্তু আঙুল তুলে শাসিয়ে বলল, খবরদার মদন! বদন বিগড়ে দেবো কিন্তু!

কিন্তু মদনটা চিরকালে ডাকাবুকো। লাফিয়ে এসে এক থাবায় জটা ধরে ফেলল। নিতাই দেখল, গায়ের জোরে পারবে না। টানতে গেলে জটাও ছিঁড়বে। সুতরাং সে দু হাত ওপরে তুলে নাচতে নাচতে বিকট স্বরে চেঁচাতে থাকে, বোম কালী! বোম কালী! মহাকালী প্রলয়ংকরী! ভাসিয়ে দে মা! ডুবিয়ে দে মা! জ্বালিয়ে দে মা! কানা করে দে। ঠ্যাং ভেঙে দে। শেষ করে দে মা!

মদন ঠিকাদার কালী দুর্গা মারণ উচাটনে বিশ্বাসী নয়। নিতাইয়ের জটা আর দাড়ির কিছু ক্ষয়ক্ষতি হল। মদনের কিলগুলো সাংঘাতিক, চণ্ড ভয়ংকর। ফলে নিতাইয়ের কষের দাঁতের গোড়া টনটন করতে লাগল, মাজায় বিষফোড়ার যন্ত্রণা। আরো ব্যথা পেত, কেবল নাচানাচির ফলে মদন তেমন জমিয়ে মারতে পারেনি বলে।

মার দেখতে কিছু লোক জুটে গিয়েছিল। শেষ তাদের মধ্যেই দু-একজন এসে ছাড়িয়ে দিল। মদন শাসিয়ে গেল, শ্রীনাথের ছেলেকে তুইই তাহলে অসভ্য গালাগাল শেখাচ্ছিস। কোনোদিন আর মুখ খারাপ করতে শুনলে জ্যান্ত পুঁতে মারব।

মদন চলে গেলে হি হি করে হাসে নিতাই ক্যাপা। সকলের দিকে চেয়ে বলে, লাগেনি মোটেই। আহুরেশ বাণ চালিয়ে দিয়েছিলাম তো, মদনের হাতে আর শক্তি ছিল না। মারগুলো যেন বাতাসে ভেসে গেল।

মুখে যাই বলুক, নিতাইয়ের চুলের গোড়া থেকে মাজা পর্যন্ত জ্বালা আর ব্যথা করছে খুব। ভাল করে হাঁটতে পারছে না। দিনটা ভাল করে গড়ায়নি, এর মধ্যেই যে যার বরাদ্দ তুলে নিচ্ছে। বিড়বিড় করে নিতাই বলতে থাকে, একটাই তো নিতাই বাপ, রয়েসয়ে মারলেই হয়। এই নিতাই হিমালয়ে চলে গেলে কেরদানিটা কার ওপর দেখাবে?

মদন শালা লোকও অদ্ভুত। মল্লিকবাবুর সে ছিল জিগির দোস্ত। দুজনের একই সঙ্গে খানাপিনা, একই মেয়েমানুষের কাছে যাতায়াত। মদন ঠিকাদার ছাড়া মল্লিনাথ কারুকে চোখেও দেখতে পেত না। আর মদন ছিল মল্লিনাথের পোষা জীব, এই যেমন ইস্পাত হল ক্যাপা নিতাইয়ের। মল্লিনাথেরও এরকম হঠাৎ হঠাৎ রাগের পারদ লাফিয়ে একশ দশ ডিগ্রিতে উঠে যেত। মল্লিবাবু কত লোককে যে ঠেঙিয়েছে! কিন্তু মদন ঠিকাদার নিজে কখনো মারপিট করত না। তার হয়ে মারপিট করার লোক আছে। কিন্তু আজ হঠাৎ মদনের কি যে হল।

নিতাই সহসা বাড়ি ফিরতে সাহস পেল না। মদন যদি গিন্নিমার কাছে গিয়ে লাগিয়ে থাকে যে, সে সজলখোকাকে খারাপ কথা শেখায়?

আসলে দোষ তো নিতাইয়ের নয়। সজলখোকাবাবু নিজেই এসে শিখতে চায় যে। খারাপ কথা শুনলে খুব খুশি হয়, হেসে গড়িয়ে পড়ে। এই যেমন রঘু স্যাকরা। নিতাইয়ের তা হলে দোষটা হল কোথায়?

নদী পেরিয়ে গরবাথানের জঙ্গলে গিয়ে ইস্পাতকে নিয়ে অনেক ঘোরাফেরার পর বেলা গড়িয়ে নিতাই ফিরে আসে। কোঁচরের মুড়ি যেমন কে তেমন থেকে নিউড়ে গেছে। গুড়ের ডেলাটা বের করে খেয়ে জল খেল নিতাই। তারপর কম্বলে গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

টের পেল, জ্বর আসছে। ব্যথার জ্বরে এসে ওরকম। শুয়ে শুয়ে সে পুতুলরানীর কথা ভাবে। ভারী নাকি মোটাসোটা হয়েছে। তাহলে দেখতে এখন ভালই লাগে নিশ্চয়ই। মহাকালী ভয়ংকরী! শক্তি দে মা। শক্তি দে। মন্ত্রের জোর দে।

যন্ত্রণার পাশ ফিরে শোয় নিতাই। হিমালয়ে যেতেই হবে। আসল বিদ্যা শিখে আসতে হবে। ক্রমশ।

গ্রামের গরীব কারা?

বেশ কিছুদিন ধরে দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে অর্থনীতিবিদেরা, চেষ্টা করছেন ভারতবর্ষের গ্রাম-দেশের 'গরিব' মানুষের সংখ্যা নির্ণয়ের। বিভিন্ন সময়ের মূল্যসূচকের ভিত্তিতে বাৎসরিক মাথাপিছু ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে গরিব মানুষদের চিহ্নিত করার জন্য। যেমন ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যসূচক অনুযায়ী গ্রামের যাদের ভোগব্যয় বছরে ২৪০ টাকা বা তার কম বা ১৯৭০-৭১ সালে যাদের ভোগব্যয় বছরে ৩৬০ টাকার মধ্যে, গ্রামের সে সব মানুষদের গরিব বলে ধরা হয়েছে। এর ফলে দেখা গেছে যে গ্রাম-দেশে গরিবের সংখ্যা কমবার তো লক্ষণ নেই বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছে।

গ্রামে গরিব কারা আর তাদের সংখ্যা সময়ের সঙ্গে বাড়ছে না কমছে—সেটা জানার সত্যই দরকার বিশেষ করে যখন পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম-দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তারও আগে জানা দরকার গরিব বলতে প্রকৃতপক্ষে কাদের বোঝায়। শুধুমাত্র মানুষের ভোগব্যয়কেই নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করে গরিবদের চিহ্নিত করা ঠিক কিনা।

মানুষ মাত্রেরই কতকগুলো অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা থাকে যেগুলোর কোন একটা না পেলে জীবন-যাপন করা সম্ভব হয় না। যেমন, খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গেই দরকার হয় বাসস্থানের, লজ্জা আর শীতাতপ নিবারণের জন্য বস্ত্রের, অসুখ-বিসুখে ডাক্তার-বদ্যির আর ওষুধ-পত্রের, সন্তান-সন্ততির সামান্য লেখা পড়ার ব্যবস্থা আর সংবৎসরে কাজ-কর্মের একটা স্থায়িত্ব। সর্বনিম্ন প্রয়োজন হিসেবে কোন মানুষ যদি এগুলো না পায় তাহলে তার সাধারণভাবেও জীবন-যাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শুধুমাত্র ভোগব্যয়ের পরিমাণকে যদি নির্দেশক হিসেবে ধরা যায় তাহলে মানুষের সর্বনিম্ন চাহিদাগুলোর স্বরূপ ঠিক পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং গরিব কারা জানতে হলে সবার আগে দেখা উচিত কোন্ কোন্ পরিবার জীবন-ধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারছে এবং কারা পারছে না। যে পরিবারগুলো মেটাতে অক্ষম তাদেরই গরিব বলে গণ্য করা উচিত।

এটা ধরে নেওয়ার অবশ্য কোন কারণ নেই যে যারা নিম্নতম ভোগব্যয় মেটাতে সক্ষম তারা পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজনগুলোও যথাযথ মেটাতে সমর্থ হচ্ছে। কেননা গ্রামে এমন অনেক পরিবার দেখা যায় যাদের হয়তো মাথাপিছু ভোগব্যয় বেশ বেশী, কিন্তু অন্যান্য চাহিদাগুলোর জন্য ব্যয় প্রয়োজনের তুলনায় নেহাতই সামান্য। তাদের মোট যা আয় সেটা ভোগ্যপণ্যেই খরচ হয়ে যায়, ফলে অন্যান্য প্রয়োজনগুলো মেটানো সম্ভব হয় না। জামা-কাপড় ও অন্যান্য খরচ অনেক কম হলেও, খাদ্যবস্তুর জন্য যা ব্যয় হয় তাতে দেখা যায় পরিবারগুলোর মাথাপিছু সামগ্রিক ব্যয় দারিদ্র্যসীমার অনেক ঊর্ধ্বে। স্বভাবতই এ সকল পরিবারগুলোকে গরিব বলে ধরা হয় না। অপরদিকে আবার এমন অনেক পরিবারও দেখা যায় যাদের মাথাপিছু ভোগব্যয় বেশ কম, অর্থাৎ দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে, কিন্তু তারা মোটামুটি দোতলা মাটির বাড়িতে বা পরিসর ঠাঁই নিয়ে বাস করে, শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ এগিয়ে, জমি-জায়গা ও অন্যান্য খাত থেকে তাদের বাৎসরিক আয়ও বেশ ওপরে এবং আয়ের একটা অংশ প্রতি বছর জমাও থাকে। তাদের খাদ্যাভ্যাস এমনই যে সে-খাতে ব্যয় অনেক কম করলেই চলে। ভোগব্যয়ের নির্দেশক অনুযায়ী এই পরিবারগুলোকে 'গরিব' বলা উচিত, কিন্তু পরিবারের অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যগুলো মেলালে কি এদের গরিব বলা ঠিক হবে?

উল্লিখিত সব দিক বিচার করে গরিবদের এমন একটা সংজ্ঞা ঠিক করা দরকার যার দ্বারা গ্রামের আসল গরিবদের চিহ্নিত করা যায় এবং তাদের সংখ্যা বিশ্লেষণ করে একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায়। সে ধরনেরই এক উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা গত বছর বীরভূম জেলার শ্রীনিকেতনের আশেপাশের বারটি গ্রামের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে গ্রামবাসীর কিছু অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করি। তথ্যগুলোর সম্যক পরিবেশনের আগে গ্রামগুলোর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সমীক্ষিত গ্রামগুলোতে সর্বসাকুল্যে ৮৮৯টি গৃহস্থের বাস যার মধ্যে দিনমজুরদের সংখ্যা ৩৪২, অর্থাৎ শতকরা ৩৯ ভাগের মতো। ক্ষুদ্র বা ছোট চাষীর সংখ্যাও ঠিক ততোধিক। বড় চাষী তেমন একটা নেই (শতকরা চার ভাগ) তবে বাকী বেশীর ভাগই মাঝারী চাষী (শতকরা আঠারো ভাগ)। অন্যান্য উপজীবিকার মধ্যে চাকুরীজীবী কিছু দেখা গেছে বটে, তবে সংখ্যায় তারা নেহাতই কম। অধিকাংশ গৃহস্থের প্রধান উপজীবিকা হল কৃষি, তবে কৃষি ছাড়া উচ্চবর্ণ ও মধ্যবর্ণ হিন্দুরা চাকুরী ও ব্যবসাতেও নিযুক্ত রয়েছে। এ অঞ্চলটায় আদিবাসীর বাস বেশী (শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ); নিম্ন ও মধ্যজাতের গৃহস্থ সংখ্যা প্রায় সমান সমান (শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ করে); উচ্চবর্ণ হিন্দু গৃহস্থ সংখ্যা প্রায় শতকরা ১১ ভাগ এবং বাকী শতকরা আঠারো ভাগ গৃহস্থ মুসলমান সম্প্রদায়ের। নিম্ন ও তপশীলী অন্তর্ভুক্ত এবং আদিবাসী গৃহস্থের অধিকাংশই দিনমজুর বা বর্গাদারের কাজ করে। অনেক মুসলমান গৃহস্থেরও দিনমজুরী বা বর্গাদারী প্রধান উপজীবিকা। এক কথায়, অঞ্চলটাতে বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন কৃষি-উপজীবী মানুষের বাস যেটা বোধহয় পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলেরও একটা সাধারণ চিত্র। সুতরাং এখানকার গ্রামের মানুষদের জীবন-যাপনের যে চিত্র সেটা বোধহয় পশ্চিম বাংলার অনেক অঞ্চলের সঙ্গে খুব একটা অমিল হবে না। আপাতত দেখা যাক্ এ অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের জীবন-যাত্রার ধারা কেমন।

এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ পল্লীবাংলার অন্যান্য এলাকার মানুষের মতই আশা করে তিন বেলা (সকাল, দুপুর ও রাতে) পেটপুরে খেতে। সর্বনিম্ন খাদ্য হিসেবে সকালে মুড়ি, দুপুরে ও রাতে ভাত। পেটভরে খেতে মাথাপিছু দিনে চাল লাগে গড়ে সাতশ থেকে সাড়ে সাতশ গ্রাম। ধান যেহেতু এ অঞ্চলের প্রধান শস্য, তাই ভাত ও মুড়ি এখানকার প্রধান খাদ্য হিসেবে চলে আসছে। বর্তমান বাজার দরে ঐ পরিমাণ চালের দাম কম করে হলেও এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। এর সঙ্গে একটু তরিতরকারী, তেল, নুন আর জ্বালানীর দাম যোগ করলে একটা মানুষের দিনে খাওয়া বাবদ গড়ে খরচ লাগে এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা বা মাসে বাহান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সা আর সারা বছরে ছ'শ তিরিশ টাকার মতো। বলা বাহুল্য, এই খরচে সে শুধু ভাত-মুড়ি ছাড়া আর কোন খাদ্যদ্রব্য যেমন সামান্য মাছ বা ডিমের মতো আমিষ পদার্থ কল্পনাতে আনতে সক্ষম হবে না। অর্থাৎ ক্ষুন্নিবৃত্তির সামান্যতম প্রয়োজন মেটাতে তাকে বছরে ৬৩০ টাকার মতো ব্যয় করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্যের জন্য এই সর্বনিম্ন ৬৩০ টাকা খরচের সঙ্গে অবশ্য তাকে লজ্জা নিবারণের জন্যও বছরে কিছু খরচ করতে হয়। নিদেনপক্ষে দুটি কাপড়, দুটি গামছা ও দুটি জামা না হলেই চলে না যার দরুন তাকে বর্তমান বাজার দরে বছরে গড়ে ৪৫ টাকার

গা খরচ করতে হয়। অর্থাৎ দু'মুঠো মোটা ভাত র পরবার কাপড় জোগাড় করতেই একটা লোকের রে কমপক্ষে ৬৭৫ টাকার মতো ব্যয় হয়। এর ও অবশ্য থাকে বছরে দু একবার সাধারণ অসুখ-ুখের খরচ। ধরা যাক্, অসুখ হলে স্থানীয় কারী চিকিৎসাকেন্দ্রে বিনা খরচেই তার চিকিৎসা কিন্তু এ ছাড়াও ওষুধ বা পথ্যাদিতে ১৫/২০ র মতো বাড়তি খরচ করতেই হয়। অর্থাৎ অন্ন-র সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা বাবদ মাথাপিছু বছরে ১৫ ধরা হয়তো অযৌক্তিক হবে না। তাহলে সব মাথাপিছু পুরো বছরে খরচ দাঁড়ায় ৬৯০ র মতো।

এ সব বাদেও ন্যূনতম প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁই বা একটু বাসস্থান। এক্ষেত্রে পিছু বাসস্থানের জায়গা ঠিক করা হয়তো যুক্তি-হবে না। পরিবর্তে ধরে নেওয়া যাক্ ৫ জনের া পরিবারে কমপক্ষে ২টি শোবার ঘর (মাটির), লি মাটির রান্নাঘর আর বাড়িতে একটু জলের থা। অবশ্য প্রত্যেক বাড়িতেই যে একটা করে কুয়ো বা নলকূপ থাকবে সেটা নয়—অন্ততঃ প্রতি য় কতগুলো বাড়ির জন্য একটা করে জলের থা থাকবে—এটা ধরে নিলেই বোধহয় জলের তম প্রয়োজন মেটে। মোটের ওপর সব মিলে দেখা র একটা মানুষ তার পরিবারের আকার অনুযায়ী র একটা বাসোপযোগী বাসস্থান সব সময় পাচ্ছে। বাসস্থানকে বাসোপযোগী রাখতে হলে সেটাকে মত বাবদ প্রতি বছর কিছু খরচ করতেই হয়—যেমন নি বদল, খুঁটি দেওয়া, মাটির প্রলেপ ইত্যাদি। রের বাড়ি (রান্নাঘর সমেত) রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য বছরে কম করে হলেও ১৫০ টাকা অর্থাৎ মাথা-পিছু ৩০ টাকার মতো। সুতরাং বসবাসের মাথাপিছু যোগ করলে মোট খরচ তাহলে ৬৯০ টাকা থেকে ০ টাকায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এটাও শেষ নয়। ন-বসনের পরেও থেকে যায় শিক্ষার সুযোগ ও তার একটা খরচ।

ধরা যাক্ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা বিনা-বেতনে পড়ার সুযোগ পায়। সরকারী আনুকূল্যে দেশটিতে হলেও হয়তো অল্পস্বল্প কিছু বইপত্তরও সেই সঙ্গে মেলে। কিন্তু পড়ার আগের দরকার লেখার আর তার জন্য চাই শ্লেট, কাগজ, কলম ও কালি। এ বাবদ কিছু খরচ সব পরিবারেই হয়। একটা পরিবারে যদি তিনজন শিশুও স্কুলে যায় তাহলে বছরে কমপক্ষে এসব কিনতে খরচ হয় ১০০ টাকার মতো, অর্থাৎ দিনপিছু প্রত্যেক শিশুর ১০ পয়সারও কম। এদের মধ্যে যদি কেউ আবার উচ্চ-বিদ্যালয়ে পড়ে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই খরচ বেড়ে যাওয়ার কথা। কারণ সেখানে বিনা-বেতনে পড়া যায় না। বা সরকারী বইও মেলে না। আপাততঃ সর্বনিম্ন প্রয়োজন হিসেবে ধরা যাক্ লিখতে-পড়তে জানার প্রাথমিক জ্ঞান। এতে শিক্ষার জন্য মাথাপিছু ব্যয় দাঁড়ায় ২০ টাকার মতো। লেখা-পড়াকে যোগ করলে তাহলে একজনের বাৎসরিক মোট মাথাপিছু ব্যয় দাঁড়ায় ৭৪০ টাকার মতো।

এখন পর্যন্ত ব্যয়ের হিসেবটাই করা গেছে। আয়ের কথা বলা হয়নি। উপরোক্ত নিম্নতম প্রয়োজনগুলো মেটাতে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন পরিবারের অন্ততঃ একজনের স্থায়ী কাজ, যদি অবশ্য ধরে নেওয়া যায় পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। বছরের অধিকাংশ সময় যদি তাদের কেউ না কেউ কাজে নিযুক্ত না থাকে তাহলে নিম্নতম প্রয়োজনগুলো মেটানো কোন মতেই সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ, এক দিনমজুর—পরিবারের কর্তা বছরে অন্ততঃ ৩০০ দিনের জন্যও কাজ পায়, তাহলে তার মোট রোজগার গড়ে ২ টাকা ৫০ পয়সা মজুরী হিসেবে ৭৫০ টাকা হতে পারে। বা কর্তা হয়তো বছরে ৩০০ দিনের কম কাজ পেল কিন্তু তার সংসারের অন্য কেউ কিছু সময়ের জন্য কাজ পেলে মোট রোজগারের খুব একটা তফাৎ হবে না। অর্থাৎ দেখা চাই যে লোকটির আমরা মাথাপিছু ব্যয় নির্ণয় করছি, তার পরিবারের রোজগারের কোন স্থায়ী পথ আছে কি না। মাঝারি বা বড় চাষীর বছরে রোজগারের একটা স্থায়ী উৎস আছে। সচ্ছল পরিবারের সর্বনিম্ন চাহিদা মেটাতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু দিনমজুর, বর্গাদার বা ছোট ছোট চাষীর রোজগারের তেমন কোন স্থিরতা নেই। যে বছর বর্ষা ভাল হল বা পর্যাপ্ত শস্য হল সে বছর বা তার পরের বছরের কিছু সময় পর্যন্ত তারা ভাল কাজ পেল। ফলে সর্বনিম্ন চাহিদাগুলোও খানিকটা মেটাতে সক্ষম হল। কিন্তু এর অন্যথা হলে তাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকে না। এত সব বলা এ কারণেই যে কোন পরিবারের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করতে হলে দেখা উচিত কি-রকম তার আয়ের কোন নিশ্চয়তা আছে কিনা। এমনটিও হতে পারে যে গত বছর কোন পরিবার তার সর্বনিম্ন চাহিদা মেটাতে পেরেছে, কিন্তু ঠিকমত কাজ না পাওয়ার দরুন সামান্য খাবারের সংস্থানই করতে পারছে না এ বছর। পল্লীবাংলার পারিবারিক জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করতে হলে তাই পর পর কয়েক বছরের হিসেব নিয়ে দেখা উচিত কটা পরিবার মোটামুটি একটা স্থায়ী রোজগারে চলছে এবং সর্বনিম্ন চাহিদাগুলো মেটাতে পারছে। যে সব পরিবার কাজের অনিশ্চয়তার জন্যে কোন বছর সর্বনিম্ন চাহিদাগুলো মেটাতে পারছে বা কোন বছর পারছে না—তাদের নিঃসন্দেহে গরিব বলা যেতে পারে।

সমীক্ষিত গ্রামকটিতে ৩৬৫টি পরিবার অর্থাৎ শতকরা ৪১ ভাগ মাত্র আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী গরিব শ্রেণীর বাইরে কেননা তাদের মোটামুটি একটা স্থায়ী রোজগার আছে (বিগত কয়েক বছরের হিসেব অনুযায়ী) এবং সর্বনিম্ন প্রয়োজনগুলো ও ভালভাবে মেটাতে সক্ষম, আর তাদের মাথাপিছু ব্যয় ৭৪০ টাকা বা তার ওপরে। বাদবাকি পরিবারগুলো (শতকরা ৫৯ ভাগ) এই অর্থে নিঃসন্দেহে গরিব। এদের মধ্যে এমন অনেক পরিবারও আছে যারা

কোনটিও ঠিকমত মেটাতে পারে না। এ ধরনের গরিব পরিবারই সংখ্যায় বেশী—৫২৪টির মধ্যে ৩০০টি অর্থাৎ শতকরা ৫৭ ভাগ। এদেরই প্রকৃতপক্ষে 'অতি গরিব' বলা যায়। অবশিষ্টাংশের মধ্যে এমন অনেক পরিবার আছে যারা খাদ্য-বস্ত্রের প্রয়োজন মেটাতে পারে, কিন্তু অন্যান্য প্রয়োজনগুলো কোন মতেই মেটাতে সক্ষম নয়। কেউ কেউ আবার খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রয়োজন যদি বা মেটাতে পারে কিন্তু বাদবাকি প্রয়োজন মেটানোর আর কোন ক্ষমতাই নেই। নীচের সারণীতে বীরভূমের সমীক্ষিত গ্রাম কটিতে গরিব পরিবারগুলো জীবনধারণের উপযোগী বস্তুসমূহ কি হারে মেটাতে পারছে তার একটা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ পেশ করা হলো।

পরিবারে জীবনধারণের উপযোগী নিম্নতম প্রয়োজন সামগ্রী মেটাবার ক্ষমতা	পরিবার সংখ্যা	শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)
(ক) কোন কিছুরই নেই	৩০০	৫৭·২৬
(খ) শুধু খাদ্যের রয়েছে	১১১	২১·১৮
(গ) মাত্র খাদ্য ও বস্ত্রের রয়েছে	৫৬	১০·৬৮
(ঘ) কেবল খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা রয়েছে	১৪	২·৬৭
(ঙ) খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মাত্র রয়েছে	১০	১·৯১
(চ) খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার রয়েছে কিন্তু কাজের স্থায়িত্ব নেই	৩৩	৬·৩০
মোট সংখ্যা	৫২৪	১০০·০০

ওপরের সারণীতে দেখা যায় যে, আমরা যাদের 'গরিব' আখ্যা দিয়েছি (অর্থাৎ ৫২৪টি পরিবার) তাদের মধ্যে অতি গরিব ছাড়া আরও একটা বড় অংশ (শতকরা ২১ ভাগ) রয়েছে যারা শুধু মাত্র খাদ্যের প্রয়োজনই মেটাতে সক্ষম, অন্যান্য প্রয়োজন নয়। এরা তিন বেলা খাদ্যের নিম্নতম চাহিদা মেটাতে পারে বটে কিন্তু বস্ত্রের সংস্থান তাদের নেহাতই কম ফলে এক বস্ত্র বা অর্ধবস্ত্র প্রত্যেককেই ছোবের সব সময় কাটাতে হয়। শুধু তাই নয়। আবাসনের ব্যাপারেও তারা পিছিয়ে রয়েছে। কেননা খড়কুটো দিয়ে তৈরী একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে তাদের সকলকে থাকতে হয়। অসুখ-বিসুখে বিনা ওষুধেই দিন কাটে; সন্তান-সন্ততির শিক্ষার ব্যয় পরিবারগুলোর আয়ত্তের বাইরে। সবাই মিলে কাজ করে যেহেতু এরা দিনের শেষে খাবারটা শুধু জোগাড় করতে পারে, তাই 'অতি গরিবদের' থেকে এদের খানিকটা পৃথক করা যায়।

সমীক্ষায় আমরা এমন কিছু পরিবারও পেয়েছি যাদের অবস্থা অতি গরিব বা গরিবদের মত তেমন অসচ্ছল না হলেও গরিব এরা ঠিকই। এসব পরিবারগুলো খাদ্য-বস্ত্র মোটামুটি জোগাড় করতে পারে তবে বাসস্থান নেই বললেই চলে। একটা কুঁড়ে ঘরে অপরিসর জায়গায় পরিবারের লোকজন বাস করে। অসুখ-বিসুখ হলে হাতুড়ে ডাক্তার বা গাঁয়ের কবরেজদের ব্যবস্থা হয় কেননা এ চিকিৎসায় তেমন কোন খরচ নেই। এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা অল্প, মোট দরিদ্র পরিবারের শতকরা ১১ ভাগ মাত্র।

এ ছাড়াও প্রায় এ ধরনেরই কিছু পরিবার (শতকরা ৩ ভাগ) রয়েছে যারা খাদ্য-বস্ত্র ছাড়াও চিকিৎসার নিম্নতম খরচ মেটাতে সক্ষম কিন্তু বাসস্থানের সুবিধা বা শিক্ষার সুযোগ থেকে সাধারণভাবে বঞ্চিত।

আরও কিছু পরিবার আমরা পেয়েছি (দরিদ্র পরিবারের শতকরা ২ ভাগ) যারা খাদ্য ও বস্ত্রের নিম্নতম প্রয়োজন মেটাতে পারে, বাসস্থানের জায়গাও মোটামুটি পরিসর, সংসারে কারও অসুখ-বিসুখে ন্যূনতম ওষুধ ও পথ্যের জোগাড় করার উপায় রয়েছে। তবে এ পরিবারগুলো ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন অর্থ ব্যয় করতে পারে না। সর্বোপরি থাকলেও পরিবারের কর্তার অনীহাই এর কারণ। কেননা এদের আশংকা শিক্ষার খাতে ব্যয় করলে মেটানো যাবে না। পরিবর্তে ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে বা অন্য কোথায়ও আংশিক কাজে লেগে থাকলে পরিবারের আয়ের খানিকটা সুরাহা হয়। এ সমস্ত পরিবার নিশ্চয়ই গরিবদের আওতায় আসে কারণ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রয়োজন মেটানোর জন্য বাকী প্রয়োজনকে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

সারণীর সর্বশেষ বিভাবে যে সব পরিবার রয়েছে (দরিদ্র পরিবারগুলোর শতকরা ৬ ভাগ) তাদের গরিব আখ্যা দিতে হয়তো কারও কারও আপত্তি থাকতে পারে। যেহেতু জীবনধারণের নিম্নতম সকল প্রকার ভোগসামগ্রীই তারা মেটাতে সক্ষম। কিন্তু যেহেতু এসব পরিবারে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা প্রকট তাই এরা কাজের স্থায়িত্বের মাপকাঠিতে গরিব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অন্যান্য বিভাগের পরিবারগুলোর কোনটিরও কাজের তেমন কিছু স্থায়িত্ব নেই। তারা অধিকাংশই দিনমজুর বা ছোট চাষী। তুলনামূলকভাবে অবশ্য শেষের ভাগের গরিবদের দারিদ্র্য কম। এখানে কাজের স্থায়িত্ব কথাটার বিশ্লেষণ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক নয়। গ্রামীণ পরিবেশের অস্থায়ী কাজের স্বরূপ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের থেকে আলাদা। এরকম হামেশাই চোখে পড়ে যে, গ্রামের এই সব পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটু বড় বা মাঝারী ভাগচাষী হিসেবে কাজ করে। জমির মালিক যে কোন সময় যদি জমিটা নিজদখলে নিয়ে আসেন তাহলে অনুরূপ মাপের জমি জোগাড় করতে এই পরিবারগুলোকে বেশ বেগ পেতে হয়। সব সময় আবার তেমন মাপের জমি জোগাড় করতেই পারে না। ফলে প্রায়শই পরিবারগুলোর আয় কম হয়ে যাওয়ার একটা আশংকা থেকে যায়, সেই অর্থে এদেরও গরিবের দলে নিয়ে আসার যুক্তি রয়েছে।

এখন দেখা যাক সম্প্রদায় ভেদে উল্লিখিত গরিবশ্রেণীর অস্তিত্ব কেমন। সমীক্ষায় দেখেছি যে 'অতি গরিব' যেন নিম্নহিন্দু বা তপশীলি সম্প্রদায়ের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত বেশী সীমাবদ্ধ (অতি গরিবদের শতকরা ৩৪ ভাগ)। তবে পরেই অবশ্য আদিবাসীদের স্থান (শতকরা ২৯ ভাগ)। বাদবাকী অতি গরিবেরা মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। এ তিন সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীবিকা দিনমজুরী।

যে পরিবারগুলো 'অতি গরিব' নয় (২২৪টি পরিবার) তারা প্রায় সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই কম বেশী ছড়িয়ে রয়েছে। তুলনায় আদিবাসী পরিবারের স্থান ওপরে (শতকরা ৩৯ ভাগ)। আর তার পরেই মুসলমান পরিবার (শতকরা ২৬ ভাগ)। তপশীলি বা নিম্ন হিন্দুজাতিভুক্ত পরিবারগুলোরও সংখ্যা নেহাত কম নেই (শতকরা ১৭ ভাগ)। মধ্যবর্ণ এবং উচ্চবর্ণ হিন্দু পরিবার খুব কম, অর্থাৎ হিন্দু সমাজের ওপরতলার লোকেদের অল্পসংখ্যকই গরিব (যথাক্রমে শতকরা ১৩ এবং ৫ ভাগ)। মধ্যমবর্ণ ও উচ্চবর্ণ পরিবারগুলো ছাড়া বাকী সবার প্রধান উপজীবিকা দিনমজুরী বা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষের কাজ। মধ্যবর্ণ গরিব পরিবারগুলো অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র বা মাঝারী চাষী আর উচ্চবর্ণের অনেকেই মাঝারী চাষী।

মোট কথা, গোষ্ঠীগত বিচারে সমীক্ষিত সকল শ্রেণীর গরিব পরিবারগুলো এমন একটা আভাস দেয় যে গ্রামের গরিবেরা আদিবাসীদের মধ্যেই যেন বেশী কেন্দ্রীভূত (শতকরা ৩৪ ভাগ)—যাদের অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই প্রধান উপজীবিকা হল দিনমজুরী। বাকী গরিব পরিবারগুলোর মধ্যে তপশীলী বা নিম্ন হিন্দুজাতিভুক্ত এবং মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারগুলোর সংখ্যা সমান সমান (শতকরা ২৭ ভাগ করে), তাদের প্রধান উপজীবিকা দিনমজুরী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দিনমজুরীর সঙ্গে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষের কাজ। মধ্যবর্ণ হিন্দু পরিবারগুলোর সংখ্যা খুবই কম এবং উচ্চবর্ণ হিন্দু পরিবারের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য বলা যেতে পারে।

জাতি-ধর্মের দিক দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যায় যে এ অঞ্চলের মোট মুসলমান পরিবারগুলোর মধ্যে প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ গরিব, মোট আদিবাসী

পরিবারগুলোর শতকরা ৭৬ ভাগ গরিব, মোট নিম্নবর্ণ পরিবারগুলোর শতকরা ৬৮ ভাগ গরিব, মধ্যবর্ণ হিন্দু পরিবারগুলোর শতকরা ৩০ ভাগ গরিব, বাকী উচ্চবর্ণ হিন্দু পরিবারগুলোর মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ গরিব।

জীবনধারণের জীবিকা অনুযায়ী, দিনমজুরদের একটা বড় অংশ (শতকরা ৯৩ ভাগ) অতি গরিব বা গরিবদের মধ্যে পড়ে। প্রায় সম পরিমাণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী অতিগরিব না হলেও গরিবদের মধ্যে সব সময়েই থেকে যায়।

এক কথায়, গ্রামে যে সব লোক নিচুজাত বলে পরিচিত এবং দিনমজুরী বা সামান্য চাষের জমির ওপর নির্ভরশীল, তারাই গ্রামের গরিব শ্রেণী। পল্লীসমাজে এ সম্প্রদায়ের এবং এ ধরনের জীবিকার লোক যতই বাড়বে, গরিব শ্রেণীর লোক ততই বাড়তে বাধ্য। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের প্রায় সমস্ত গ্রামাঞ্চলেই এ ধরনের লোক সময়ের সঙ্গে বেড়ে চলেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের গ্রাম-দেশে যে গরিব বাড়ছে সেটা সহজেই অনুমেয়। গ্রাম-দেশে যারা দিনমজুর তাদের যদি মজুরির হার, কাজের সুযোগ ও স্থায়িত্ব বাড়ানো না যায় তাহলে এ অবস্থা হতে বাধ্য। অপরদিকে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষী—যারাও অধিকাংশই গরিব—তাদেরও যদি চাষের মান ও জমির নিরাপত্তা বাড়ানো না যায় তাহলে দেশ থেকে গরিব কমানো হয়তো সম্ভব নয়। বিভিন্ন পরিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে নেওয়া হয়েছে এদের উন্নতি বিধানে। কিন্তু পরিকল্পনার সুফলগুলো কি এদের কাছে ঠিকমত পৌঁছতে পেরেছে না পৌঁছচ্ছে? হয়ত নয়। কেন না যদি ঠিকমত পৌঁছত তাহলে বীরভূমের এ অঞ্চলটাতে দিনমজুর এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের মোট ৫০৫টি গৃহস্থ বা পরিবার আজও 'অতি গরিব' বা 'গরিব' বলে চিহ্নিত হত না। সুতরাং প্রয়োজন আছে ভেবে দেখার যে বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সত্যিই কিভাবে তাদের উন্নতি করা সম্ভব বা আদৌ সেটা সম্ভব কিনা!

মানবেন্দু চট্টোপাধ্যায়

নিতাই চন্দ্র দত্ত

ভিটে

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

দোকানটা আজ খুলবেই না ঠিক করেছিল নৃপেন, কিন্তু চালু ব্যবসায় মালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম নেই। খুলে রাখলে ভাল নাও হতে পারে, কিন্তু বন্ধ রাখলে ক্ষতি অনেক বেশি। তাই যথারীতি কাক-ডাকা-ভোরে গিয়ে সে দোকান খুললো এবং নিয়মিত কাজগুলোও সারলো। অর্থাৎ দোকানের সামনের ঝাঁপটা খুলে বেঞ্চি দুখানা বাইরে পাতলো, উনুনটা ধরালো, কেক-বিস্কুটের জারগুলো সাজালো টেবিলের ওপর। তারপর হাতপাখাখানা টেনে নিয়ে উনুনের মুখে হাওয়া করতে লাগলো সজোরে।

কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় যখন চারদিক ভরে ওঠে, চোখ জ্বালা করে, দূরে থেকে দেখতে পায় নৃপেন, মদন আসছে। দশ-বারো বছরের ছেলে, তারই কর্মচারি মদন। মদন কাছে এলে নৃপেন বলে, 'নে, ও-পাশের ঝাঁপগুলো খোল, বালতি দুটো কলে দিয়ে আয় আর কয়লাগুলো ভাঙ। হ্যাঁরে, কেষ্ট কাল ঘুঘনির হাঁড়িটা মেজে গেছল? আলুরদমের ডেকচিটা?'

মদনের ঘুম তখনও চোখ থেকে ছাড়ে নি, জড়ানো গলায় কি বললো বোঝা গেল না। জল গরমের ছোট ড্রামটা উনুনে বসিয়ে দিয়ে নৃপেন তাড়া লাগালো, 'হাত-পা-টা চালা বাবা ঠিকমত। অমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করলে কি কি করে চলবে?'

অন্যদিন হলে নিজেই থিতিয়ে-জিরিয়ে কাজ করতো নৃপেন, মৌজ করে বিড়ি টানতো আর হুকুম করে করে কাজ করতো। কিন্তু আজ তার নিজেরই তাড়া, কিন্তু মদন আর কেষ্টর অপেক্ষায় না থেকে একটার পর একটা কাজ সে সেরে ফেলতে লাগল।

কলকাতা থেকে ফার্স্ট ট্রেন এখুনি এসে পড়বে। স্ট্যান্ডে রিকশা লেগে গেছে গোটা তিনেক। আজ মল্লিকপুরের হাটবার, মাথায় সবজির বোঝা নিয়ে হাটের পথে চাষীদের যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে।

উনুনের চাতালে গরম জলের ড্রামটা একটু সরিয়ে দিয়ে বাসী দুধের প্যানটা আগুনের ওপর চাপিয়ে দিল নৃপেন। পোড়া কেটলিটা গরম জলে ধুয়ে বসিয়ে দিলে ড্রাম আর প্যানের পাশে উঁকি-মারা আগুনের ধারে।

ততক্ষণে কেষ্ট এসে পড়েছে। ঘর ঝাঁট দিয়ে, জল ছিটিয়ে, ধূপ জ্বেলে দিয়েছে মা-কালীর পটের তলায়। পুবের লালচে রোদ এসে পড়েছে নারকেল গাছের ডগায়, বুড়ো বটগাছটার মাথায়। দু-একজন করে ফার্স্ট ট্রেনের যাত্রী খদ্দেরও এসে দাঁড়াচ্ছে, কেউ বা বসছে সামনের খালি বেঞ্চটায়।

'সিগন্যাল পড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি হাত চালাও ন্যাপা!' 'দশ পয়সার বিড়ি দাও।' 'রুটির দাম আবার বাড়লো?' 'চা-টা একটু কড়া করো ভাই!' 'লজেন্স দিও তো দুটো আর চানাচুরের প্যাকেট একটা।' 'নাম্বার টেন দুটো দেখি'

সরু ও মোটা গলায় কতরকমের খদ্দের, কতরকম তাদের চাহিদা, দিব্যি ন্যাপা ওরফে নৃপেন যেন দশভুজা হয়ে মিটিয়ে চলে সেসব। ফার্স্ট ট্রেনের ভিড় পাতলা হয়ে গেলে কাপডিশগুলো ধোয় কেষ্ট আর পাঁচ ছটাকি ঠোঙায় কুড়ি পয়সার মুড়ি-বাদাম কি মুড়ি-ছোলাসেদ্ধ ভরে এগিয়ে দেয় মদন বেঞ্চে বসা বাসের যাত্রীদের হাতে। লোহার শিক দিয়ে উনুনটা একবার খুঁচিয়ে দিয়ে নৃপেন তৈরি হয় দ্বিতীয় দফা খদ্দের সামলাতে।

একটু ফুরসৎ পেয়ে বিড়িটা সবে ধরিয়ে দু-একটা টান দিয়েছে কি দেয়নি নৃপেন, বাড়ি থেকে ডাক হলো তার দ্বিতীয়বার। ডাকতে এসেছে তারই বড় ছেলে ... একবার ... ডাকছে বাবা এখুনি।'

মদনের ওপর খদ্দের-সামালের ভার দিয়ে কাঠের বাক্সে চাবি লাগিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল নৃপেন। আসবার সময় ইশারায় ছেলেকে ক্যাশ-এ বসবার নির্দেশ দিয়ে এল সে।

দোকানের ঠিক পেছনেই ছোট্ট একটা বাঁশঝাড়, তারপরেই বিঘখানেকের একটা মজা পুকুর, পুকুরের ওপারেই ঘোষালদের বাড়ি। অর্থাৎ নৃপেনদের। বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে পুকুর পাড় ঘেঁষে গেলে মিনিটখানেক, আর ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়ে ঘুরে গেলে মিনিট তিনেক লাগে বাড়ি পৌঁছতে। নৃপেন শর্টকাট রাস্তাটাই ধরল।

নৃপেনকে দেখেই বিপিন, অর্থাৎ তার বড় ভাই, বলে উঠল, 'তোরই ছেলের পৈতে, আর তুইই কিনা ব্যস্ত রইলি দোকান নিয়ে। নে, একবার এসে বস, পুরুতমশাই কি বলেন শোন।'

নৃপেন বিনীত গলায় বলল, 'দাদা তোমরা থাকতে আমাকে চিন্তা করতে হবে কেন? তনু তো তোমাদেরই ছেলে, বাপ আর জ্যাঠায় কোন তফাত আছে? ও যা কিছু করবার তোমরাই কর। আজ হাটবার, দোকান বন্ধ রাখতেও পারি না, অথচ—'

'বেশ, তবে দেখে যা, আয়োজন কি রকম করছে তোর বউদি।' সস্নেহ গলায় বিপিন বললে।

ভিতরের ঘরটায় নৃপেন একবার উঁকি দিল। বড় বউদি ব্যস্ত আছে নান্দীমুখের আয়োজনে। উবু হয়ে বসে মুরারি পুরুত বলে দিচ্ছে এটা-ওটা। করুণা নৃপেনের বউ, সাহায্য করছিল বড় জাকে, নৃপেনকে দেখেই ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে শুধু তাকাল ওর দিকে একবার, কোন কথা বলল না। চাহনিতেই যেন ফুটে উঠল তার বক্তব্য, বাপ হয়ে ছেলের পৈতেতে দিব্যি গা-অড়াল দিয়ে চলেছে সে।

কিন্তু তার যে উপায় নেই কোন, এ কথা বোঝাবে সে কাকে! আপ এবং ডাউন একের পর ঘন ঘন ট্রেন যাতায়াত করবে। আর তার মানেই নিত্যযাত্রীদের সাইকেল জমা পড়বে তার দোকানে। এ সময়টা চোখের আড়াল হলে চলে না। সাইকেলগুলো সাজিয়ে রাখা, নম্বর লাগানো টিনের চাকতি দেওয়া, তালা ঠিকমত লাগানো হয়েছে কিনা লক্ষ করা—দায়িত্ব অনেক। নইলে শুধু শুধু কি আর মাসে মাসে ভাড়াটা পাচ্ছে সে? সাইকেল পিছু তিন টাকা। মুখুজ্যেদের ছোট মাসুদেনকে বহাল করার মূল কারণ অবশ্য এইটেই, তবু নিজে না দাঁড়ালে যেন এতটুকু স্বস্তি পায় না নৃপেন। একটু এধার-ওধার হলেই গচ্চা দিতে হবে অনেক টাকা, আর গচ্চা দেওয়ার কথাটা যেন সে ভাবতেই পারে না। গচ্চা দেওয়া মানে দোকানের সুনাম নষ্ট হওয়া।

অস্থির পায়ে একবার সারা বাড়িটা ঘুরে নিল নৃপেন। দেখলে এদিক-ওদিক অনেক দিন বাদে, অনেক বছরই বলতে হয়, সারা বাড়িটা যেন আবার কলমুখর হয়ে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা হুটোপাটি করছে উঠোনে, এ ঘরে ও ঘরে মেয়েদের ভিড়, কলতলায় টিউবওয়েলের জল ঘড়া-বালতি ভরছে পদ্মা দেবী, উঠানের একধারে মাছ কুটছে দশরথ জেলে, রান্নাঘরের ভেতর তাল তাল বাটনা বাটছে জগু ঠাকুরের লোক আর জগু ঠাকুর নিজে ব্যস্ত কুটনো কোটায়।

নৃপেনকে দেখে জগু বেরিয়ে এল, গামছাটাকে এ কাঁধ থেকে ও-কাঁধে সরিয়ে বলল, 'ডালটা কি মুড়ো দিয়ে হবে, না নিরামিষ হবে সেজকর্তা?'

ঘরের সামনে লাল রোয়াকে চাটাই বিছিয়ে ফর্দ মিলোতে ব্যস্ত বলাই

কিন্তু খলাইয়ের আজ এবং তার সমবয়ক দুই দাদার কথায় যেন ভীষণ একা মনে হলো নিজেকে। পোড়ো ভিটের অন্ধকার নির্জনতার মধ্যে তাকে ঠেলে দিয়ে তারা যেন দূরে চলে গেল—অনেক দূরে। সে আজ একা—ভীষণ রকম একা।

মন-খারাপ করল নৃপেন, কিন্তু থামলো না। চায়ের সঙ্গে যোগ করল আলু-দম, ঘুঘনী, পরটা। চালাঘরের একপাশটা বাড়িয়ে নিয়ে শুরু করল সাইকেল জমা রাখার কারবার। একে একে বিড়ি-সিগ্রেট-দেশলাই, নিত্যপ্রয়োজনীয় দু-চার রকম স্টেশনারী জিনিসও কলকাতা থেকে আনতে আরম্ভ করল সে।

ওদিকে স্টেশনের চেহারাও পাল্টেছে দিনে দিনে। প্ল্যাটফর্ম হয়েছে, টিকিট ঘর ওয়েটিং রুম হয়েছে, ওভার ব্রিজও হয়েছে। এখন আর দুখানা নয়, সারা দিনে-রাতে অন্তত দশখানা ট্রেন এসে দাঁড়ায় এখানে। কলকাতা থেকে শিলগ্রাম হয়ে কুমীরডাঙা পর্যন্ত পাকা সড়কে বাস যাতায়াত করছে চারখানা। রিকশা-স্ট্যাণ্ডে অন্তত আটখানা রিকশার দেখা মেলে একসঙ্গে। দোকান হয়েছে আরও অনেক, কিন্তু খদ্দেরের ভিড় যেন নৃপেনের দোকানেই বেশি; হেন জিনিস নেই যা তার দোকানে এখন মেলে না।

দিন-মাস-বছর পার হয়েছে, শুধু দোকানের নয়, ভিটের চেহারাও পাল্টে ফেলেছে নৃপেন। ঘর তুলেছে চারখানা—টালি-ছাওয়া পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথনি দিয়ে সিমেন্ট বাঁধানো চত্বরে বসিয়েছে নলকূপ, পাতকো-পায়খানা বানিয়েছে একধারে রংচিতের উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে বাড়ির চারধার। নারকেল-চারা বসিয়েছিল বারোটা, এখন সারা বছর ফল দেয়। বাড়ির সামনের মুখুজ্জেদের মজা পুকুরটা এখন তার, দোকানের পেছনের বাঁশঝাড়টার মালিক এখন সে-ই। সন্ধ্যার পর এখন আর কেরোসিনের কুপী জ্বালাতে হয় না, ইলেকট্রিক আলোয় ভেসে যায় তার ঘর-বারান্দা-উঠান।

ত্রিশ-চল্লিশ সের মাল বইবার ক্ষমতা আর নেই নৃপেনের এটা ঠিক, কিন্তু ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করার মত মনের জোর তার এখনও আছে। আঠারো বছর পার হতে চলল মা মারা গেছে। এই আঠারোটা বছর যে কোথা দিয়ে কিভাবে পার হল ভেবে পায় না নৃপেন।

দুপুরে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে দোকানটা একটু ঝিমিয়ে পড়ে। শুধু দোকানটা নয়, স্টেশনটাও। এবং ওই এলাকাটাও। বারোটার পর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত আর কোন ট্রেন থাকে না। এক-আধখানা মালবাহী ছাড়া। রিকশাওয়ালারা খেতে যায়, বাসে যাত্রী থাকলেও গরমে কেউ নামে না বড় একটা। সুতরাং, ওই সময়টাতেই নৃপেনের একটু জিরেন।

মধুসূদনকে পাহারায় রেখে, গোবিন্দকে বিকেলের খাবার তৈরির ফরমাস দিয়ে নৃপেন যখন বাড়ি ফিরল, তখন প্রায় একটা বাজে। পৈতের ঝামেলা শেষ হবো-হবো। বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া চুকেছে, বড়দের বসাবার আয়োজন চলেছে।

আনুষ্ঠানিক সমস্ত পর্ব চুকিয়ে, দক্ষিণের বড় ঘরখানায় ওরা খেতে বসলো একসঙ্গে। চার ভাই মুখোমুখি। বিপিন, বিনোদ, নৃপেন আর বলাই।

ভাতের প্রথম গ্রাস মুখে পুরে নৃপেন বলল, 'আজ আমার ছোট ছেলের পৈতে হয়ে গেল, এতে যত না আনন্দ, তার চেয়ে বেশি আনন্দ কিসে হচ্ছে জানো দাদা? আমরা চার ভাই আজ আঠারো বছর বাদে বাবার ভিটেয় একসঙ্গে হয়েছি একসঙ্গে বসে খাচ্ছি।'

'মা মারা গেছে কি আঠারো বছর হয়ে গেল?' জলের গেলাসটা মুখে তুলে ধরতে ধরতে বিপিন বলল।

জবাব দিল বিনোদ, 'হলো বইকি, তা হলো। আমার চাকরিই তো হয়ে গেল সাতাশ বছর—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বিপিন বলল, 'তোর যদি সাতাশ বছর চাকরি হয় আমার তাহলে আরো এক বছর বেশি—আটাশ বছর।'

নৃপেন আগের কথার জের টেনে বলল, 'বড় ছেলের পৈতের সময় তোমাদের কাকেও আনতে পারিনি, শুধু ঘরের অভাবে। বড় খেদ ছিল মনে, আজ সেই খেদ আমার পূরণ হলো।'

নৃপেনের চোখে জল এসে গেছল, সেটা কাঁটা-চচ্চড়ির ঝালের জন্যে কিনা কে জানে, মুছে আবার বলল, 'আমরা যদি মাঝে মাঝে এরকম একত্র হই, কত ভালো লাগে বল তো!'

'হবো, হবো, নিশ্চয়ই হবো। মাঝে তো আর ক'টা বছর, তারপর রিটায়ার করার পর আবার আমি চলে আসব আমাদের এই ভিটেয়। তা ছাড়া, না আসলে আমার চলবেও না। অফিস থেকে টাকা যা পাব, দুই মেয়ের বিয়ে দিতেই তো শেষ হয়ে যাবে। হাওড়ার বাড়ি ভাড়া দিয়ে, তোর বউদি আর দুই ভাইপোকে নিয়ে এখানেই চলে আসব—'

বিপিনের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, বিনোদ বলে উঠল, 'আমিও ঠিক তাই ভেবেছি। বাবার ভিটে থাকতে অন্য জায়গায় থাকব কেন? তা ছাড়া, আমার মেজ ছেলেটার লেখাপড়াও কিছু হলো না, বসে থেকে থেকে বকে যাচ্ছে, এখানে নিজেদের ব্যবসায় দু' দণ্ড বসলেও কাজ হবে—'

দুই দাদার কথা শুনে নৃপেন কেমন থমকে গেল। মনে হল ব্লটিং পেপার দিয়ে কে যেন তার মুখের সমস্ত রক্ত আস্তে আস্তে শুষে নিচ্ছে। রিভলভিং ফ্যানের মত মুখখানা তার ধীরে ধীরে বলাইয়ের দিকে ঘুরে গেল।

বলাই বলল, 'জানলা দিয়ে ট্রেন দেখবে বলে আমার ছেলের কিন্তু পছন্দ পুবমুখো ঘরখানা। এখানে এসেই আমাকে জানিয়ে রেখেছে, ঘর ভাগের সময় যেন ওই ঘরখানাই আমাদের দেওয়া হয়। তুমি কি বল সেজদা?'

নৃপেন কোন কথা বলল না, বলতে পারল না। বহু দূর পথ পার-হয়ে-আসা একটা মালগাড়ির চলমান চাকা হঠাৎ যেন স্টেশনে এসে থেমে গেল মনে হল।

বোধ হয় সিগন্যাল পায়নি।

দিলীপ ভট্টাচার্য

অন্ধকার প্রেক্ষালয়ে বসে মাথার উপর দিয়ে প্রোজেক্টরের আলোকচ্ছটার মতই এক ঝলক রাঙা রোদ পূবের আকাশ থেকে এই বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এখনও রাত্রিশেষের শিশির বৃক্ষতলের শুকনো মাটি টুপটুপিয়ে ঝরে পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে। শত শত শাল গাছ একে অন্যের গায়ে গা দিয়ে আছে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে আছে এই নিভৃত, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ বনাঞ্চলে একত্রে। দেড়শো বছর ধরে, যেন একটা মস্ত বড় একান্নবর্তী পরিবার, এই পরিবারে কারো বয়স এক-দিন কারোর বা এক বছর, আবার কারোর বয়স দেড়শ বছর। এখানে সদ্যোজাত শিশু কিশোর যুবক বৃদ্ধ ও অতিবৃদ্ধ রয়েছে। রয়েছে পুত্র পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহকুল।

লাল মাটির কাঁচা সর্পিল পথ। নানা বর্ণের সম্ভার নিয়ে একা একা লালিমায় লতান বনস্পতি। সুনীল আকাশের বুকে অবন ঠাকুরের ওয়াশের কাজের মতো ঢেউ খেলানো পাহাড়ের শ্রেণী। রূপো গলান জলে ভরা ঝরনা। ঝরনার পাশে পাশে গ্রিমুলো, অর্কিড আর হুতিতির নব প্রস্ফুটিত ফুল সম্ভার। বৃক্ষছায়ায় বনতুলসী ও সাবাই ঘাসের আচ্ছাদন। সব মিলিয়ে এই দিকের বনাঞ্চল আজ যেন অপরূপার সাজে সেজেছে। আমার চোখে বনাঞ্চল এখন রূপসী হিরণ্য অঞ্চল, এই নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দেখে দেখে যেন দেখার তৃষ্ণা আরও গেছে বেড়ে। বেতারে শোনার সময় জ্ঞানদার ভরাট গলায় আবৃত্তির অংশটুকু যেন এখনও কানে বাজছে। মনে পড়ছে—

ছুটির বাঁশি বাজলো যে ঐ নীল গগনে
আমি কেন একলা বসে এই বিজনে॥
বাঁধন টুটে উঠবে ফুটে শিউলিগুলি,
তাই তো কুঁড়ি কানন জুড়ি উঠছে দুলি।
শিশির ধোওয়া হাওয়ার ছোঁওয়া লাগলো বনে
সুর খুঁজে তাই শুন্যে তাকাই আপন মনে॥

ভোরে উঠে, একলা এ বিজন পথে হেঁটে চলেছি। মনে বড় আশা হঠাৎ কোন সুন্দর বন্য প্রাণীকে তার অসতর্ক মুহূর্তে দেখে ফেলব। দেখে ফেলব চঞ্চল চপল চরণে গতিময় বন-সুষমায় চিত্রিত সেই হরিণের দলকে, মধু চুষে চুষে ক্লান্ত মৌটুসী পাখীকে, বনানীর সবুজাভা চুষে নেওয়া সবুজ টিয়ার ঝাঁককে। বৃহদেহ রত বন্য হাতির দলকে—সব শেষে হিংস্রার প্রতিভূ গা ছমছমে ভয়প্রদ বাঘকে।

সবুজ বনের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের ঢালে ঢলে পড়া রাঙা মাটির পথ ধরে চলেছি। রোদ অনেকটাই এখন ছড়িয়ে পড়েছে। দূর থেকে ছন্দোবদ্ধ সমবেত কণ্ঠের বোল শুনতে পাচ্ছি। গভীর নিস্তব্ধ জঙ্গলে এই শব্দ তরঙ্গের ভার ভেঙে ভেঙে পড়ছে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কাছে এসে কথা-গুলো কিছুটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তবে সঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।

বোলি রে বোলা
হে'ই আঃ।
ভাগিদে কাঁসা
হে'ই আঃ।
দেখিদে তামাসা
হে'ই আঃ।
গুঞ্জরি খানা
হে'ই আঃ।

হুয়া সে হুয়া...... হে' ... ই...... আঃ টানা দেওয়া সমবেতভাবে টেনে, ওরা ভারী গাছের কাণ্ডটাকে বলদবরণ লরীর মাথায় তুলে দিল। এত শীতেও ওরা ঘেমে উঠেছে। কালো কষ্টিপাথরের মূর্তিগুলোর গা বেয়ে শিশিরের ফোঁটা যেন ঝরছে বিন্দুতে বিন্দুতে।

আঠারো নম্বর কম্পার্টমেন্টে ফ্রীফেলিং করা হয়েছে। এখন সেই কেটে ফেলা আকাশ ছোঁয়া বনস্পতিগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে, লরী বোঝাই করা হচ্ছে। লরীর গায়ে ঠেসান
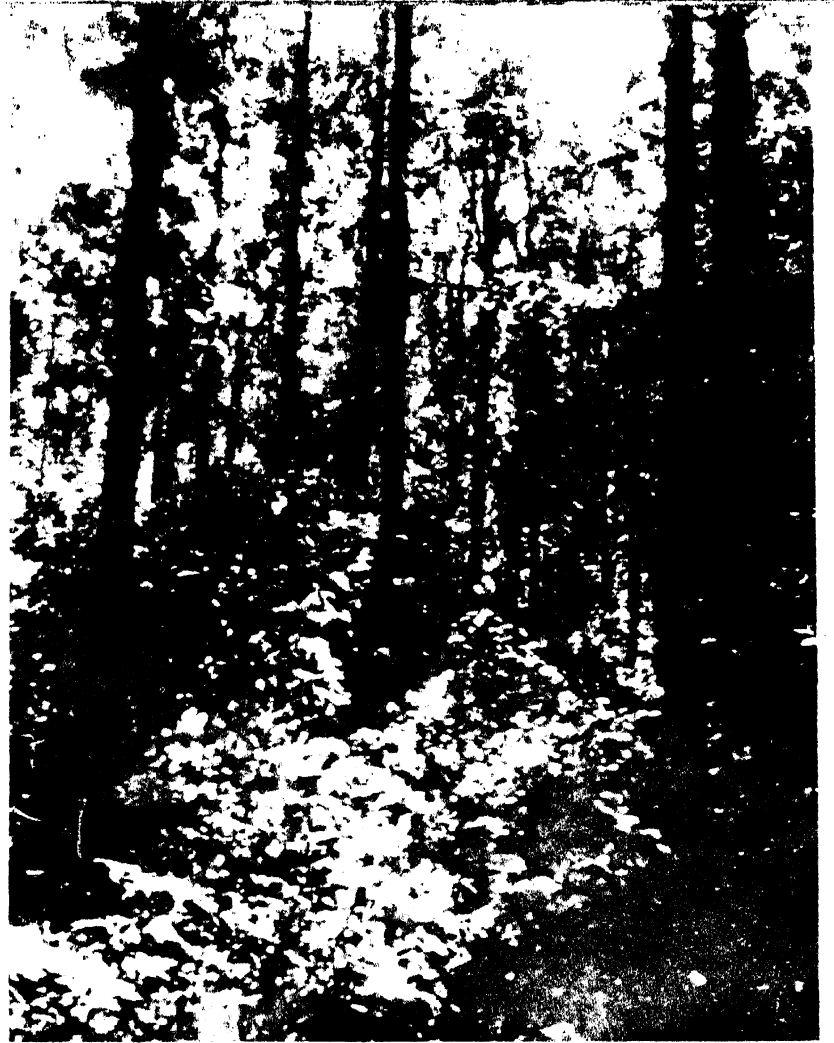
যেখানে বাঘের ভয়

দেওয়া দুটো মজবুত কাঠের বরগা। কোন কোন বরগার উপরের দিকে দাঁত কাটা। কাঠের বড় খণ্ডগুলো ওই বরগাদুটোর দাঁতের উপর দিয়ে গড়িয়ে লরীতে তোলা হচ্ছে। সেই সঙ্গে মজবুত ম্যানিলা রোপ দিয়ে খণ্ডগুলিকে বিপরীত দিক থেকেও টানছে যাতে সমবেত শক্তি একসঙ্গে একই সময়ে ভারী কাঠগুলোকে তুলতে সাহায্য করে। তাই ওই বোল—বোলি রে বোলা হে'ই আঃ।'

যে লোকটা এতক্ষণ বোলি দিচ্ছিল, তাকে বললাম, 'তুমি আস্তে আস্তে বল আমি তোমাদের বোলিটা লিখে নি।' আমার কথা শুনে তার গ্রানাইট পাথরে খোদা মূর্তিটা হেসে কুটি কুটি। এ আর কি লেখার আছে। যা হোক অনেক সাধ্য সাধনায় রাজী হলো লেখানোর চুপ করে বসে, সে ওই 'বোল' দিতে পারছে না। সঙ্গীদের বলল আর একটা প্রকাণ্ড কাঠ তুলতে ওই ভাবে। ঐ সঙ্গে ও এক নাগাড় বোল দিল। লরী তখন পূর্ণ বোঝাই তবু একটা ভারী কাঠ ওই বোলের সাহায্যে ওঠানো হল। বোল শেষ হলে ওটাকে আবার গড়িয়ে ফেলে দিতে কার্পণ্য করল না। বড় অদ্ভুত বড় সুন্দর লাগল। কাজের সঙ্গে আনন্দ যেন একসুরে, তালে লয়ে বাঁধা। আমরা সকলে যদি

এমনটি করে নিজের কাজকে জীবনের আনন্দের সঙ্গে একই ভাবে গাঁটছড়ায় বেঁধে নিতে পারতাম তবে বোধ হয় প্রতিটি কাজই ছন্দময়, গতিময়, লীলাচঞ্চল সুন্দর হয়ে উঠত।

বোঝাই শেষে কাঠ চলে যাবে ৩৪ কিঃ মিঃ দূরে জামদা রেল স্টেশনে। সেখান থেকে কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও আরও অনেক শহরে, বন্দরে গ্রামে গঞ্জে। তৈরী হবে ইমারত, সেতু, আসবাব, ফুলশয্যার খাট আর ছোট ছেলের দোলনা।

তাও গরীব দেশ ভারতের অন্যান্য দেশের তুলনায় কাঠের খরচা কমই। সারা বৎসরে মাথাপিছু জ্বালানি কাঠের খরচা ১৫ কে জি, সেখানে আমেরিকায় ২১০ কে জি। তাছাড়া বাড়ীঘরে বা আসবাবপত্রে যেখানে বাৎসরিক মাথাপিছু খরচা মাত্র ৬ কে জি, সেখানে আমেরিকায় ১২০০ কে জি। এক-দিন ছিল যখন ভারতে উৎপন্ন কাঠের বড় অংশই ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় চলে যেত বড় বড় বৃটিশ কম্পানি ছিল এই সারেণ্ডা জঙ্গলে—তাদের মধ্যে বৃটিশ টিম্বার কম্পানি অন্যতম। এখন কাঠ কাটার ঠিকা নিয়েছে গুজরাটী ঠিকাদার এল পি জ্যারলা। সুদূর গুজরাট, ভারতের পশ্চিম প্রান্ত থেকে এসেছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলের এই অরণ্যদেশে অর্থান্বেষণে
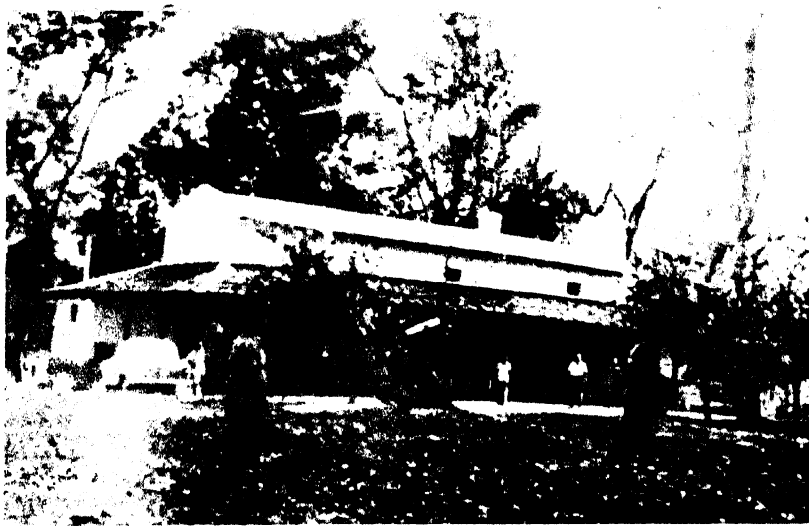
গোপগা বন-নিবাস

৬৯ হেক্টর জমির উপর এই বনকর্তনের ঠিকা আদায় হয়েছে ৪,৫৯,০০০ টাকায়। দু ফুটের বেশী বেড়ের গাছের দাম এখানে **৮৭৫** টাকা ঘন মিটার ও তার কম বেড়ের ৭০০ টাকা ঘন মিটার। তাই **কলকত্তা**, বম্বাই ও দিল্লীর বাজারে আরও চড়া মূল্যে বিকোবে। মুনাফা আসবে বনাঞ্চল ক্রমান্বয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে। কাগজের নোটের তাড়া জমা হবে ব্যাঙ্কের অন্ধকার কুঠুরীতে, মহাজনের সিঁদুর লেপা লাল লোহার সিন্দুকে, বালিশের খোলের ভেতর তোলা কুঠুরীতে মোটা গদীর নীচে ও গয়ানন্দজীর তসবীরের পিছে।

লোহার ভারী হাতুড়ীর ঘায়ে, ছেনির মুখের আক্ষরিক মার্কা পড়ছে সদ্য কর্তিত গাছের ভূমি সংলগ্ন গুঁড়িতে, পড়ছে লট্ নম্বর, ছেদনের তারিখ ইত্যাদি। মস্ত বড় বনস্পতিকে কেটে টুকরো টুকরো করলে ও ভূমি সংলগ্ন জোড়টাকে ওঠাবার শক্তি থাকলেও তাদের ধৈর্য নেই। শাল গাছের শেকড় বাকড় ভূমিস্তরের অনেক নীচে পর্যন্ত তাদের শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করে তুলে আনা কষ্টসাধ্য ও সেই সঙ্গে [illegible] সাপেক্ষ।

এক বছর বয়স্ক একটি শিশু শালগাছের চারা মাটি থেকে অনেক কসরৎ করে তুলে দেখলাম তাতে মাত্র দুটি ক্ষুদে সবুজ পাতা। শিশু কাণ্ডের দুই প্রান্তে যেন ভারসাম্য রেখে দোদুল দোলায় ঝুলছে যমজ কিশলয়। চারার এই এক বছরে [illegible] হয়েছে মাত্র **১৫** সেঃ মিটার এক বিঘৎও নয়। সুশোভন লিলিপুট শাল চারাদের [illegible] নামকরণ করেছে "রিক্রুটমেন্ট", যেন সৈন্য বাহিনীর নতুন ভর্তি শিশু সৈন্যের দল। শত সহস্র বছর ধরে এই শিশুপালদের জীবন যুদ্ধ চলেছে—চলেছে যু[illegible] মানুষের সঙ্গে, তাদের উদাও বিশ্বক্ষুধার সঙ্গে, তাদের অসীম চাহিদার সঙ্গে, সভ্য হবার আকাশ ছোঁয়া পরিকল্পনার সঙ্গে। একাধারে শাল-বনস্পতি দলকে অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে টুকরো টুকরো করে ভূমিতে লুটিয়ে ফেলা হচ্ছে—সেই সঙ্গে মনুষ্য নতুন সৈন্যের দল প্রকৃতির নিয়মে রণক্ষেত্রে [illegible] তুলে দাঁড়াচ্ছে।

বন বিভাগের আধুনিক নিয়ম হিসাবে [illegible] রকম রিক্রুটমেন্ট-এর উদ্ভব হলে পরে [illegible] বয়ঃপ্রাপ্ত শাল গাছগুলি কেটে ফেলার [illegible] দরকার। অন্যথায় সেই বনাঞ্চলে অনুরূপ [illegible] অভাব দেখা দিতে পারে—ও সেই সঙ্গে বনক্ষয়ের [illegible] দায়িত্ব অরণ্য রক্ষকের বর্তাবে।

সাধারণত এই অঞ্চলে একটি শাল গাছের পূর্ণ বয়স্ক হতে সময় লাগে **১২০** বছর অর্থাৎ [illegible] জীবনের দুই কি তিন পুরুষ। বনাঞ্চলে [illegible] বিবর্তনের বয়স (রোটেশান এজ) ২০ বছর। এই [illegible] সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শাল গাছের জীবনচক্র [illegible] চলেছে।

এই শাল বনাঞ্চল ছেদনের সময় ফলপ্রসূ [illegible]

যেমন আম, জাম, মহুয়া, কুরুকুণ্ড, চাঁপা ইত্যাদিকে কর্তন না করে 'যুদ্ধবন্দী'দের মত করে রাখা হয়। ফায়ারিং স্কোয়াড'-এ যখন আর সব বীর বনস্পতিদের রক্তাক্ত দেহগুলো সমস্ত রণাঙ্গন জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তখন কয়েকটা মহুয়া, চাঁপা ও আম গাছ রণক্লান্ত বীরের মত সপ্রতিভ হয়ে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে। চাঁপা গাছের সাদা ছোপ ধরা কাণ্ডের পাশে রডোডেনড্রনের মত পাতায় ভরা বন কাঁঠের 'লিটসাকা নিটিডা' গাছটাও দাঁড়িয়ে রয়েছে অভেদ্য হয়ে। গাছে ধরেছে ছোট ছোট ফল ও ক্ষুদে সাদা ফুল। গাছতলাটা গন্ধে ম ম করছে। ফুলে ফুলে মৌমাছি গুনগুনিয়ে ফিরছে।

ঘন সন্নিবিষ্ট বনাঞ্চলের মাঝে অনেকটা জায়গা বনচ্ছেদনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। কেমন যেন হঠাৎ খাপ ছাড়া বেমানান খোলা চত্বর। চারদিকে বড় বড় গাছের প্রাচীন থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন দানব পুরীর শক্ত প্রাচীরের মাঝে উন্মুক্ত আঙিনা। সকালের মিঠে রোদ লাল হলুদ ধূসর মাটির বুকে ছড়িয়ে রঙের মায়াজাল রচনা করেছে। মাটি থেকে সোঁদা সুবাস উঠে আসছে হিমেল বাতাসে ভর করে। গন্ধ আসছে নতুন কাটা গাছের কাণ্ড থেকে, ফুল থেকে, ফল থেকে, স্থানচ্যুত অর্কিড থেকে। যে অর্কিড বৃক্ষ চূড়ায় ছিল সে আজ বৃক্ষ কর্তনের ফলে, গৃহহারা, আশ্রয়হারা হয়ে ভূলুণ্ঠিত শ্রমিকের পদাঘাতে, কাষ্ঠখণ্ডের আঘাতে তার সোনার বরণ ফুলগুলো নিষ্পেষিত মোহমান, মৃতপ্রায়।

এই বনাঞ্চলের দিকে চেয়ে চেয়ে উদ্ভিদ জন্ম-রহস্য ও সেই সঙ্গে উদ্ভিদ শ্রেণীর পারম্পরিকতার 'প্লান্ট সাকসেশন'-এর কথা ভাবছিলাম। উত্তপ্ত পিণ্ড স্বরূপে এই পৃথিবী ক্রমে শীতল হলে, এক কথায় জীবকোষের উৎপত্তি হবার আগে প্রথমে জীবনের প্রতীক ঘাস, সেই দূর্বাদল। যে দূর্বাকে

শালগাছে পরগাছা

দেখে মুনি ঋষিরা উচ্চারণ করেছিলেন, "যথা শাখা প্রশাখাভিঃ বিস্তৃতাসি মহীতলে/তথা মমাপি সন্তানাং দেহি ত্বমজরামরম।"

এই নব দূর্বাদলই ক্রমে শুষ্ক মরুভূমির বুকে শ্যামলিমার প্রাণ স্বরূপা জীবনদায়িনী মায়ের স্নেহের আঁচলটি বিছিয়ে দেয়। ক্রমে ভূমির উৎকর্ষ বাড়তে থাকে—বাড়তে থাকে আর্দ্রতা। ঘাসের শেকড় শুষ্ক বালুকণাকে তার অসীম ক্ষমতায় আর্দ্র ও সেই সঙ্গে ক্রমে উর্বরা করে তোলে। এক সময় এই জমির উর্বরতা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় আসে, যে

অন্য বৃক্ষেরও বীজ এখানে ক্রমে অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরিত হয় আম, জাম, মহুয়ার বীজ। কিন্তু প্রকৃতি একসঙ্গে একই বনাঞ্চলে অনেক রকম গাছের সমপরিমাণ সন্নিবেশ ঘটতে দেয় না। এখানেও সেই স্ট্রাগল ফর এগজিসটেন্স-এর খেলা। ধরণী যে বীরভোগ্যা। যখন ভূমির উৎকর্ষতা চরমে পৌঁছায় তখন বিশেষ বনাঞ্চলে (যেখানে মানুষের হাত পড়েনি) কোন এক বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদের জন্ম-হারই ক্রমে বাড়তে থাকে। সেই প্রজাতির সংঘাতের চাপে ক্রমে অন্যান্য বনস্পতির সংখ্যা কমতে দেখা যায়। যেমন যেখানে শাল সেখানে কেবল শাল গাছ। যেখানে মহুয়া সেখানে কেবল মহুয়া। তবে শালবনে এমন গাছও বাড়তে দেখা যায় যার প্রভাবে শাল-সংঘাতের ক্ষতি হয় না।

এখানেও যেন বণিকশ্রেণীসুলভ মনোভাব। প্রথমে লোটাকম্বল নিয়ে অতি দীন দরিদ্র বিনয়ীবেশে এসে ব্যবসা ফাঁদল, তারপর ক্রমান্বয়ে বিস্তার। সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বজাতি, প্রতিবেশী সবাই একে একে এসে সংঘবদ্ধ হল, একই ছত্রছায়ায় দিনে দিনে তাদের ব্যবসা বেড়ে চলল। এরপর অন্যান্যদের উচ্ছেদের পালা। শুধু কয়েকটি তোষামুদে পুরুষত্বহীন পাদপের স্থায়িত্ব রইলো—যারা এই বণিক শ্রেণীর কোন রকম স্বার্থের প্রতিকূল নয়। তারপর সারা অঞ্চল জুড়ে তাদেরই দাপট, তাদেরই রাজত্ব। বণিকের মানদণ্ড কালে কালে রাজদণ্ডের রূপ পরিগ্রহ করলো।

মানুষের মতো এই উদ্ভিদ শ্রেণীর মধ্যেও হীন-এফেক্ট রয়েছে। সতেজ সুপুষ্ট বীজ সংগ্রহের জন্যে বলিষ্ঠ ঋজু, সুউচ্চ ভরাট গাছ সংরক্ষণ করা হয়। নইলে সমাজে হীনিয়ান মানুষের মতই উদ্ভিদ সমাজেও 'জীনো-টাইপ ট্রীর' বড়ই কদর অথচ বড়ই অভাব।

Vijayaspray
The answer to a mother's prayer
সহজপাচ্য
শিশু-আহার
Vijayaspray
অন্ধ্র প্রদেশ ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট
কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক বিশেষ পদ্ধতিতে
এদেশের শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য
রেখে তৈরী। মায়ের দুধের মত শক্তিশালী ও
মিষ্টি। এই দুধ সহজেই জলে মিশে
যায় এবং সহজেই হজম হয়।
প্রত্যেক মা-ই তাঁর শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য যা চান
পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও সহজপাচ্য।
একমাত্র বিজয়াস্প্রেতে আপনি ভিটামিন
মিনারেলস ও কার্বোহাইড্রেড প্রভৃতি
পাবেন যা আপনার ডাক্তার আপনার শিশুর
সুস্বাস্থ্যের জন্য সর্বদা পরামর্শ দিয়ে থাকেন।
বিজয়াস্প্রে মায়ের দুধের মতই
হালকা ও সহজপাচ্য।
বিজয়াস্প্রে ছয় মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে
আপনার শিশুর হজম ক্ষমতাকে
শক্ত খাবার হজম করার জন্য উপযুক্ত
করে গড়ে তোলে।
বিজয়াস্প্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত
পদ্ধতিতে তৈরী যেটা কোটান গরম
জলে সহজে তৈরী করা যায়।
বিজয়াস্প্রে
প্রত্যেক মা-ই তাঁর শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য যা চান
পরিবেশক টি কিং প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বাঞ্চল)
FDS APDDC 2810A BEN
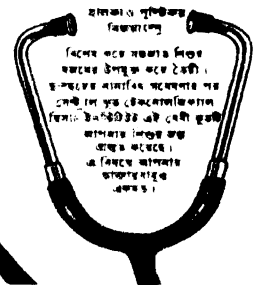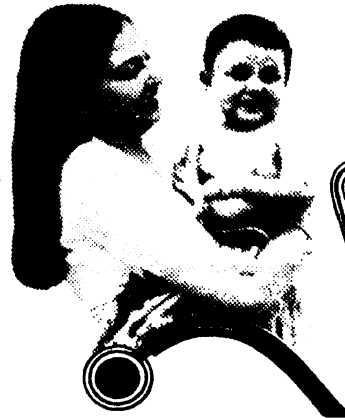
যাঁর ডান হাতে কবিতার বই, বাঁ হাতে টেনিসের র‍্যাকেট

মানিক ঘোষাল

"আমার প্রতিপক্ষ কখনই আমার শত্রু নয়। সে সব সময়ই আমার বন্ধু। তাকে ছোট করে আমি বড় হতে চাই না। আমি খেলা ভালবাসি; ভালবাসি গান আর কবিতা। কাল কি হবে তা আমি জানি না, শুধু জানি আজ আমি কি করছি..."

আর্জেন্টিনার কৃতী টেনিস খেলোয়াড় ও যশস্বী কবি গিলারমো ভিলাসের কথাগুলি এইরকম মায়াময়। সাতাশ বছরের এই তরতাজা যুবকের স্থান এখন সবার হৃদয় জুড়ে। র‍্যাকেট ধরেন বাঁ হাতে। টেনিস কোর্টে তাঁর পেলব কব্জির কেতাবী মার রং ছড়ায়। কখনও বাতাসে ওড়ে শাসন না মানা তাঁর অলকা সোনালী চুল। ঋজু নমনীয় ক্ষিপ্র শরীরে শোভা বাড়ায় স্বপ্নময় দুটি বাদামী চোখ।

ক্লে কোর্টে ভিলাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁকে হারাবার কেউ নেই বললে বেশী বলা হবে না। বিশেষ বিয়রন বর্গ ছাড়া জনপ্রিয়তায় তাঁর ধারেকাছে আসতে পারে এমন টেনিস প্রতিভা এখন বিরল। ক্লে কোর্টে টানা ৯৬ ম্যাচ জেতা ভিলাসের বিশ্ব রেকর্ড। একদশকের দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় জন নিউকোম্ব ভিলাস সম্পর্কে বলেছেন, "আমার দেখা শ্রেষ্ঠ নাটো খেলোয়াড়। এমন কি কখনও রড লেভারের থেকেও বড় মনে হয়।" টেনিস খেলে এক বছরে ৫০,০০০ স্টার্লিং আয় করেছেন ভিলাস তবু বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণকারী তাঁর সহজ জীবন ছন্দোময়। অহংকার কখনও তাঁকে ছুঁতে পারেনি। সত্যই কল্পনা-বিলাসী।

কম বয়সে যা হয় ভিলাস একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেলেন। ফলে যা হয়ে থাকা স্বাভাবিক—কবিতা লেখা শুরু। সমস্ত অনুপ্রেরণার উৎস সেই মেয়েটি। তার জন্য, তাকে ঘিরেই কবিতা লেখা শুরু ভিলাসের। সে মেয়েটি নিশ্চয়ই ভিলাসকে দুঃখ দিয়েছিল। তা না হলে তাঁর কবিতায় এত দুঃখ, বেদনা ও স্বপ্নের [illegible] কেন?

"সকলেই স্বভাবকবি কিন্তু সবাই কবিতা লিখতে পারে না।" ভালমানুষ ভিলাসের এইরকম ভাববিলাস। প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক বর্গের সঙ্গে তাঁর গাঢ় বন্ধুত্ব। বিশ্ব ক্রমপর্যায় তালিকায় বর্গ ও কনর্সের পরেই ভিলাসের স্থান। তাঁর রোমান্টিকতা ও সেন্টিমেন্ট নিয়ে পশ্চিমী ভাবধারায় বিশ্বাসী উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত সতীর্থ খেলোয়াড়রা অনেকেই আড়ালে তাকে 'কাঁদুনে খোকা' আখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও ভিলাসের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। ভিলাসের বর্তমান ম্যানেজার ইয়ান টিরিয়াক। ভিলাস প্রথম জীবনে শিক্ষা নিয়েছেন লোকো কেরোর কাছে। লোকো মধ্যমমানের খেলোয়াড় হয়েও নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দিয়ে বড় কোচের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ভিলাসের প্রিয় খেলোয়াড় ব্রাজিলের মারিয়া বুনো।

বুয়েনস এয়ারস থেকে চার শো মাইল দূরে মার-ডেল প্লাটায় ভিলাসের জন্ম ১৯৫২ সালে। ছেলেবেলায় সে ছিল একা। বহু বিনিদ্র রাত সে একা কাটিয়েছে স্বপ্নের সন্ধানে, নির্জন দুপুরে অলস পর্যালোচনায় ভিলাস সেই বয়সেই ব্যস্ত ছিল স্মৃতিময় বর্তমানের খোঁজে। ছেলেবেলায় ভিলাসের আগ্রহ ও ভালবাসা ছিল ফুটবল খেলা ঘিরে, হয়তো সে ফুটবল খেলোয়াড়ই হতো কিন্তু বাবাই তাকে জোর করে টেনিস খেলোয়াড় তৈরি করেন। তার ভালবাসা এইভাবে তখন ভাগ হয়। প্রতি শুক্রবার ছোট্ট একটি ফিটফাট ছেলে সাত ঘণ্টা বাসে চেপে যেতো বহু দূরে খেলা শিখতে। তখন তার বয়স এগারো। এইভাবেই খেলা শিখেছিল টানা সাত বছর। সেই শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি।

আর্জেন্টিনায় ভিলাস কতখানি জনপ্রিয়? ছোট্ট একটি উদাহরণই যথেষ্ট। তার নিজের স্পোর্টস কারটি নিয়ে রাস্তায় বার হয়েছে ভিলাস। ভুল পথে গাড়ি চালিয়ে ট্রাফিক আইন ভেঙেছে। ট্রাফিক পুলিশ ছুটে এসেছে। কিন্তু কি কাণ্ড! এ যে ভিলাস। হেসে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে ট্রাফিক পুলিশ নিজের কাজে মন দিলেন। অসাধারণ নয় কি?

বিশ্বের বহু বড় খেতাব জয়ের মধ্যে ভিলাসের স্মরণীয় জয় সাতাত্তরে ফরাসী সিঙ্গলস টেনিসে রুদ্ধশ্বাস প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর কোনর্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। এক বছর আগেই আর্জেন্টিনা ডেভিস কাপে হারায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। [illegible] ভিলাসের অবদান অবিস্মরণীয়।

মন্টিকার্লোতে থাকলেও ভিলাসের মন পড়ে থাকে আর্জেন্টিনায় প্রিয় জন্মভূমিতে। ভিলাস যখন যেখানেই টেনিস খেলুন দলমত নির্বিশেষে আর্জেন্টিনাবাসীরা টি ভি-র সামনে স্থির হয়ে বসে অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে আওয়াজ তোলে 'ভিলাস আমাদের ভিলাস'।

তবে ভিলাসের বড় স্বপ্ন এখনও অসফল। একবারও উইম্বলডন জয় করা তার হয়ে ওঠেনি। কবে হবে তাও জানে না। আশাবাদী ভিলাস হেরে গিয়ে যতটা দুঃখ পায় তার চেয়ে বেশী দুঃখিত আর্জেন্টিনার হন বিশ্ব জুড়ে ছড়ানো তার অগণ্য অনুরাগী ভক্তরা। আজন্মের ভালবাসায় বিশ্বাসী ভিলাস তাই ভাগ্যবান। সাংবাদিকদের সে মন কাড়ে, টেলিভিশনের ক্যামেরা আর খেলোয়াড়দের অভিনন্দন এ দুয়ে মিলেই খেলার জগতে পরিপূর্ণতা আসে বলে ভিলাসের বিশ্বাস।

ভিলাসের কবিতার বই আর্জেন্টিনায় সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়, তাঁর প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছে কয়েক বছর আগে। প্রথম দু মাসেই রেকর্ড বিক্রি—কুড়ি হাজার কপি উধাও। স্বপ্ন, মৃত্যু ও একাকিত্ব নিয়ে ভিলাসের কবিতা এইরকম:

"Dream without echo
You are lonely
Dream without reality
You are insipid
Dream of life
You tell me who you are"

ভিলাসের বাম হাতে র‍্যাকেটের [illegible] পারলো নেরুদার কবিতার বই। প্র্যাকটিসের সময় তাঁর সব সময়েই নতুন নতুন চাই কিন্তু ভিলাসের মন জুড়ে থাকে পুরানো দিনের লুকানো স্মৃতি।

সাতাত্তরে ভিলাস প্রথম জয় করেন প্যারিসে ফরাসী ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ। উইম্বলডনে অবশ্য সুবিধা করতে পারেননি। তারপর মার্কিন মুলুকে ফরেস্ট হিলসের খেতাব তাঁর নতুন মর্যাদা দেয়। জিমি কোনর্স আর্জেন্টিনার ভিলাস রাগী উদ্ধত এই মার্কিনী যুবকটিকে হারিয়ে টেনিস কোর্টে ঝড় তোলেন।

গিলারমো ভিলাস

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেস্‌কাফে®
NESCAFE
instant coffee
বিশ্বের সর্বাধিক
বিক্রীত কফি
শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইন্‌স্ট্যান্ট কফি
NS/CAS-2/79 BEN

প্রথম ডিভিশনে দল কমলেই কি ফুটবলের মান বাড়বে ?

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি-মহাশয় বলেছেন যে, প্রতিযোগিতা আনবার জন্য প্রথম বিভাগে টীমের সংখ্যা বারোয় আনা উচিত। তাহলে প্রত্যেকটি দলকে (অর্থাৎ ঐ-দশটি ভাগ্যবান দলকে) ঘেরা মাঠে আসন দেবেন। বেশী অনুদানের ব্যবস্থা করবেন। এতে পশ্চিম বাংলার ফুটবলের মান হু হু করে বেড়ে যাবে। তিনি সাক্ষাতে বলেছেন, প্রথম বিভাগের তেইশটি দলকে ঘেরা মাঠে আসন দেওয়া অসম্ভব। এইসঙ্গে জনান্তিকে তিনি বলেছেন যে, কলকাতার বড় একটি দলকে তাঁর সরকার আরো তিনশ' সীট বাড়াবার অনুমতি দিয়েছেন। এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্যোগকে সাধুবাদ না দিয়ে থাকা যায় না। তবে সেইসঙ্গে বছর চার পাঁচ আগের স্পোর্টস কাউন্সিলের আর একজন সভাপতির কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর ঘরে সেদিন উপস্থিত ছিলেন কলকাতার ছোট ছোট দলগুলির প্রতিনিধিরা, কলকাতার পুলিস কমিশনার এবং রাজ্য সরকারের মাননীয় অফিসারেরা। ছোট দলগুলি করজোড়ে তাদের বড় খেলাগুলিতে মাত্র এক হাজারটি আসন প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁদের দেওয়া হত মাত্র সাতশ' পঞ্চাশটি আসন। সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানালেন রাজ্য সরকার। যুক্তি তাঁদের রাজস্ব কমে যাবে। সুতরাং ছোট দলগুলির আবেদন অগ্রাহ্য হল। ঐ মিটিংয়ে একমাত্র পুলিস কমিশনার প্রস্তাবের জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরের বছর বড় দলগুলির আসন সংখ্যা আরো এক হাজার করে বাড়ল। এতে কিন্তু রাজস্ব হ্রাসের কথা উঠল না। পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সালে তৎকালীন পুলিস কমিশনার ও রাজ্য সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ছোট দলগুলি হাজার করে আসন পেল (নিজেদের বড় খেলাতে)। স্থায়ী আসন এখনও 'নৈব নৈব চ'।

পরে উক্ত সভাপতি মহাশয় বললেন, ক্লাবের সংখ্যা কমিয়ে বারো করতে (প্রথম ডিভিশনে) তাহলেই তিনি আশ্বাস দিলেন যে, ঐ বারোটি দলকে ঘেরা মাঠে আসন দেওয়া হবে। সুতরাং দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ঐ উদ্যোগ নতুন কিছু নয়। আশ্চর্য এই মনের মিল। কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট সরকারের স্পোর্টস কাউন্সিলের দুই চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্য এক এবং অতি সাধু। দুজনেই পশ্চিমবঙ্গে ফুটবলের মান নিয়ে চিন্তিত। দুজনেরই ক্রীড়াপ্রীতি সর্বিদিত। এবং দুজনের চিন্তাধারাটাও মোটামুটি একই।

এখন দেখা যাক উল্লিখিত পন্থায় ফুটবলের উন্নতি কতটা সম্ভব। কলকাতা মাঠে টাকা না থাকলে টীম হয় না। এটা সবারই জানা। কিন্তু ব্যক্তিগত টীম ভালো করা আর খেলাধুলোর সামগ্রিক উন্নতি এক কথা নয়। কলকাতা মাঠে ভালো খেলোয়াড়ের সংখ্যা সীমায়িত। যার টাকা আছে, সে ভালো খেলোয়াড়কে ভাড়া করতে পারবে--সুতরাং তার দল ভালো হবে। কিন্তু সব দলেরই যদি টাকা বেশী থাকে, খেলোয়াড়ের সংখ্যা না বাড়লে, খেলোয়াড়ের সামগ্রিক মান না বাড়লে, খেলার উন্নতি অসম্ভব। সেক্ষেত্রে টাকা যত বাড়বে, অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অনুযায়ী খেলোয়াড়ের দরই বাড়বে কেবল।

সেইজন্য আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে, আমরা কি চাইছি! তারপর দেখতে হবে যা চাইছি তা পেতে আমরা কি করেছি। তৃতীয়ত দেখতে হবে পাবার পথে বাধা কি ? চতুর্থত দেখতে হবে ঐ বাধা অতিক্রম করতে আমরা কি করতে পারি?

আমরা চাইছি ফুটবলের মান বাড়াতে। এই মান বাড়াতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ, খাদ্য, মাঠ, খেলোয়াড়ের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, সামগ্রিক কাঠামোর (infrastructure) পরিশীলন এবং প্রতিযোগিতা। এখন দেখা যাক, কিভাবে দলের ফুটবল বাজেটের শতকরা কতটা অংশ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। বড় দুটি দলের ফুটবল বাজেট প্রায় দশ লক্ষ টাকা। এর শতকরা সত্তর ভাগ যায় খেলোয়াড় কিনতে। অবশ্যই এরই একটা অংশ খেলোয়াড়ের খাদ্য ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য ব্যয়িত হয়। কিন্তু এক নজরে দেখলে দেখা যাবে, জনা দশ পনেরো খেলোয়াড় গত দশ বছরে কয়েক লক্ষ টাকা করেছেন। অথচ এই দল দুটি বেশ কিছু জুনিয়র খেলোয়াড়কে সাইড লাইনের ধারে বসিয়ে রেখে তাদের কেরিয়ার বাজিয়েছেন। যাঁরা খেলছেন তাঁরা অবশ্যই তাঁদের খেলার জোরেই খেলছেন। টাকাও তাঁদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা। কিন্তু এর পাশেই দেখা যাবে শতাধিক খেলোয়াড় দেড়-দু' হাজার টাকার জন্য নিজেদের সব কিছু পণ করেছেন। ছোট দলগুলির বাজেটের শতকরা পঁচিশ ভাগ যায় খেলোয়াড় কিনতে। সাম্প্রতিককালে এই অনুপাত বাড়ছে। বড় দলগুলি মাঠের জন্য অবশ্যই খরচ করেন। তবে ঘেরা মাঠগুলির একটি অন্তত খেলার অযোগ্য, এটা সকলেই মানবেন। প্রশিক্ষণের জন্য সকলেই চেষ্টা করেন। কিন্তু সামগ্রিক কাঠামোর উন্নতি অর্থাৎ আরো বেশী খেলোয়াড় তৈরি করা— নতুন মুখকে উৎসাহিত করা—এতে বড় দলের কিছুই করার থাকে না। এদের এক-একটি জুনিয়র দল আছে —কিন্তু তা থেকে গত দশ বছরে দশজন খেলোয়াড়ও দলে আসেনি।

প্রশ্নটা হল কার টাকা ? কে খরচ করে ? মাঠ তো জানি সরকারের। হেডওয়ার্ড কোম্পানী যদি জাতীয়করণ করা হয়, তবে সব মাঠ জাতীয়করণে বাধা কোথায় ? এক-একটি বড় দলের ঘেরা মাঠ মৌরসী-পাট্টা থাকবে। ছয় থেকে আট হাজার আসন থাকবে। কার্ডের দাম বাড়িয়ে বাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় বর্তাবে। সেই টাকাতে ছোট দলগুলিকে লুণ্ঠন করা হবে। আর লুঠ করা সেই খেলোয়াড়দের নিয়েই বড় দলের বক্সঅফিস চলবে কলকাতা মাঠে। যেহেতু জনগণ এই বিংশ শতাব্দীর কলোসিয়মে ছোট দলগুলির মরণ দেখতে উৎসুক, জনপ্রিয় সরকারের জনদরদী নেতারাও সেই তালে তালি বাজাবেন।

খেলার মানের উন্নতির পথে আসল বাধাটা কোথায় ? বর্তমান কাঠামোতে টীম কমিয়ে, তাদের ঘেরা মাঠে আসন দিলে কিছু খেলোয়াড়ের বাজার দর বাড়বে, বাকি বেশ কিছু খেলোয়াড়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। খেলার মান যেমন তেমনই থাকবে। বরঞ্চ আরো খারাপ হবে। একটা কথা বুঝতে হবে, আজ সমস্ত প্রথম ডিভিশনে খুব প্রতিভাবান এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যা (যাদের যথার্থই সুপারস্টার বলা যায়—খেলার বিচারে, ভাসির বিচারে নয়) বড়জোর জনা তিরিশ। তারপর অন্তত একশজন খেলোয়াড় প্রায় সমান দক্ষ। মাঠে চলতে চলতে যদি কোন একটি দলের অনুশীলনে দেখেন যে, প্রথম দল দ্বিতীয় দলের সঙ্গে খেলছে, দেখবেন তফাত সামান্যই। এ বছর এখনও পর্যন্ত খেলার ফলাফল সে কথা আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং, টীম কমাতে হলে তিন-চারটি দল নিয়ে প্রথম ডিভিশন ও বাকি দলগুলোকে নিয়ে অন্য ডিভিশন গড়তে হয়। আজকের ফুটবলের জনপ্রিয়তা অনেক ব্যাপক। জুনিয়র দল আগে ছিল না। সাব-জুনিয়র দলও আগে ছিল না। এই উঠতি খেলোয়াড়দের ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দিতে হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্য ডিভিশনে সে সুযোগ কি নেই ? আমি বলব না একেবারেই নেই। ঘেরা মাঠ তো তিনটি—তার মধ্যেই একটির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। বৃষ্টির আগেই ঘাসের চাপড়া দিয়ে বাঁধাতে হয়েছে। আর বাইরের মাঠের অধিকাংশই খেলার অযোগ্য। দ্বিতীয়ত, খবরের কাগজের রিপোর্ট কেবল প্রথম ডিভিশনকে নিয়ে। অন্য ডিভিশনে ভালো খেললেও স্বীকৃতি কোথায় ? ভবিষ্যৎ কোথায় ? তৃতীয়ত, অন্য ডিভিশনের খেলার চরিত্রই আলাদা। সেখানে ধস্তাধস্তি খেলার প্রবণতাই বেশী। প্রায়শই পরিকল্পনার কোন সুযোগ থাকে না। সরকার প্রথম ডিভিশনে যে সামান্য অনুদান দেন, অন্য ডিভিশন তাও পায় না। ফলে খেলার সামান্য প্রয়োজনটুকুও—অর্থাৎ সাজসরঞ্জাম ও টিফিনের খরচ জোগাতে ঐ দলগুলির কর্মকর্তাদের

হিমসিম খেতে হয়।

আমি কোন দলকে ছোট করছি না। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ডিভিশনের সমস্যাগুলির কথা জানবার সুযোগ আমার আছে—কারণ, আমি ভুক্তভোগী। আমি খেলার কর্তাদের অনুরোধ করব, দয়া করে বর্ষার মরসুমে একবার বাইরের মাঠগুলি দেখুন। দেখুন, কেমন করে ছোট দলের খেলোয়াড়েরা তাদের শীর্ণ দেহে খেলার মাঠের পঙ্ক মন্থন করছে। দয়া করে একবার দেখুন ঐ খেলোয়াড়দের জামাকাপড় কেমন জলে ভিজছে—কারণ, ওদের কোন টেন্টে প্রবেশাধিকার নেই। আসুন, একবার নিদাঘতপ্ত দিনগুলিতে, ছোট দলগুলির খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলাপ করতে। দেখুন তাদের তৃষ্ণার জলটুকুও জোটে না। আই এফ এ সম্প্রতি লীগ ম্যাচ টিফিনের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু অনুশীলনে খাবার কোথায়? যেটুকু খাবার আসে তা জোটান ছোট দলের একান্ত মধ্যবিত্ত কর্মকর্তারা। একটু খবর নিলেই জানতে পারবেন, ওঁদের ছেলের অসুখের ওষুধের টাকা দিয়ে, বিয়ের আংটি বাঁধা দিয়ে, কলকাতা মাঠের ফুটবলকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। একই হাল বিভিন্ন জেলার দলগুলির কর্মকর্তাদের। খেলার মান উন্নতি করতে চান তো আগে নীচ তলায় আসুন। ভালো সুতো না বানিয়েই বেনারসীর বাহার দেখাতে চান? এ তো সম্ভব নয়। সভাপতি মহাশয়, হয়তো জানেন না যে, কলকাতার মাঠে কুকুরের বাচ্চাদের তাঁবু আছে, কিন্তু অন্তত সাত আটটি প্রথম ডিভিশন দলের নিজস্ব তাঁবু নেই। আর অন্য বিভাগের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

এই ডিভিশনের খেলোয়াড়দের চাকুরিও জোটে না। কারণ, বর্তমানে চাকুরির জন্য দরকার বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল দল, জুনিয়র বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব। ছোট দলের খেলোয়াড়দের চেনেন কে, যে তাঁরা এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার পাবেন। তবে সাম্প্রতিককালে ট্রায়ালের মাধ্যমে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। জুনিয়র খেলোয়াড়েরাও প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রথমত, চাকুরে খেলোয়াড়, বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলতে পারছেন না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন পর্যায়ে বয়সের কড়াকড়ি অনেক বাড়ানো হয়েছে। যেভাবেই হোক আজকের জুনিয়র খেলোয়াড়েরা অনেক ভাগ্যবান সন্দেহ নেই।

এবার তাহলে আমরা সমস্যার আসল রূপটার ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে পেরেছি আশা করি। খেলোয়াড় আগে—তারপর তার মানের উন্নতি। খেলোয়াড় আকাশ থেকে পড়ে না। যেখান থেকে খেলোয়াড় আসে, সেদিকে নজর দিতে হবে। খেলোয়াড় অনেক আছে। আগে উচ্চতার খেলা হত (under height)। অতীতের খ্যাতনামা সব খেলোয়াড়ই এই সব মাঠ থেকে এসেছেন। কেবল প্রশিক্ষণে কিছু হয় না। দরকার প্রতিযোগিতার। সে দিক দিয়ে সাবজুনিয়র লীগ একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, সন্দেহ নেই। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তাদের নিরাপত্তার আয়োজন কোথায়? নিরাপত্তা অর্থে—সাংসারিক ও খেলার নিরাপত্তা। প্রতিভাবান খেলোয়াড় যদি প্রথম থেকেই দল থেকে দলান্তরে গিয়ে দর বাড়ানোর ধান্দাবাজিতে মাতেন, তাতে ফুটবলের মান নামতে বাধ্য। দল বদলের সুষ্ঠু একটা নিয়ম কি করা যায় না? আর খেলোয়াড়দের যদি পণ্যশুল্কেই করতে হয়, তা হলে পেশাদারীবৃত্তি (Professionalism) আনতে বাধা কোথায়? এই অযথা বর্ণবৈষম্য কেন? টাকা জনসাধারণের। ছোট দল খেলোয়াড় খুঁজে আনেন, তাদের তৈরি করেন। অথচ রাইটার্স লালবাজার থেকে আকাশবাণী ও পত্রপত্রিকায় বড় দলের জয়জয়কার। এই অবিচার কত দিন চলবে?

খেলার উন্নতির কথা বলতে গিয়ে আমরা অশ্রুপাত করি। মাঠ কোথায় যে খেলার উন্নতি হবে। কলকাতা মাঠে দলবদল শেষ হয় মারচ মাসের পনেরো তারিখ। মাঠ পাওয়া যায় পয়লা মে থেকে। তাও একমাঠে অন্তত পাঁচ শরিক। পয়লা মের আগে লুকিয়েচুরিয়ে অনুশীলন, কারণ তখন মাঠে ফুটবল খেলা বেআইনী। মাঠের একটা অংশে অনুশীলন—এগারোজন করে অনুশীলনের সুযোগ সপ্তাহে একদিনও জোটে না। লীগ শুরু সাতই মে। ছোট দলগুলির কর্মকর্তা বা খেলোয়াড়দের হাতে তো আর আলাদীনের আশ্চর্য-প্রদীপ নেই, যাতে তাঁরা এই অনুশীলনেই ভালো মানের পরিচয় দেবেন। বিশেষ করে প্রতি বছরই তাঁদের ভাঙা দলে অনেকগুলি নতুন মুখ নিয়ে শুরু করতে হয়।

খেলোয়াড় যা আছে তাতেই মান উন্নয়ন সম্ভব। মাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে কলকাতার পার্ক ও অন্যান্য মাঠগুলি নিয়ে ছোট দলগুলিকে অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। দল-বদল জানুয়ারির মধ্যে সারলে ভালো হয়। তা হলে অনুশীলনের জন্য সময় থাকবে। দল-বদলের গতি কমাতে হবে। বছর বছর দল ভাঙলে খেলার মান কমবেই। কারণ, ফুটবল এগারোজনের খেলা। দলে সমন্বয় আনতে গেলে, দলগত বোঝাপড়া বাড়াতে গেলে, একটা দলকে বছর কয়েক একসঙ্গে খেলতে হবে। তা ছাড়া, খেলোয়াড়দের অনুভূতি থাকা দরকার। খেলোয়াড়ের দৈহিক পটুত্বের সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতি এবং ভাবগত আনুগত্য না থাকলে ভালো খেলা অসম্ভব। অন্তত আমাদের কাঠামোতে।

বিভিন্ন ডিভিশনের ছোট দলগুলি যাতে তাদের খেলোয়াড়দের মুখে টিফিনটুকু তুলে দিতে পারে, সে আয়োজন আগে হোক। সরকারের মডার্ন রুটি আর হরিণঘাটা কি মাদার ডেয়ারীর দুধ কি এই কাজে লাগানো যায় না? ট্রামে বাসে ট্রেনে ছাত্র কনসেশনের মতো খেলোয়াড়দের কনসেশন ব্যবস্থা করা কি খুব কঠিন কাজ? বিভিন্ন ছোট দলের খেলোয়াড়েরা বেশির ভাগই মফস্বল থেকে আসেন। খেলার শেষে কি বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে ঝুলতে তাদের হাওড়া ও শেয়ালদা যেতে হয় চিন্তা করা যায় না। খেলার শেষে ময়দান মার্কেট থেকে গোটাকতক প্লেয়রস স্পেশাল (যাতে পরিচয়পত্র দেখিয়ে উঠতে হবে) ছাড়া যায় না? মাঠের অংশের কথা নয় ছেড়েই দিলাম। সাম্যবাদের নয়া বাইবেলে না হয় ধরেই নিলাম একটি দল আট হাজারের ওপর আরো তিনশ আসন পেল। আরো তিনটি দল নিজেদের মাঠে প্রায় কুড়ি হাজার আসন ভাগ করে নিলো, ভাগ্যবান আরো দুজন পেলো হাজার দেড়েক করে। একটি চতুর্থ ডিভিশন দল পেল হাজার কয়েক আসন। অথচ প্রথম ডিভিশনের বাকি ষোলটি দল কিছুই পেল না। কেন ঐ চল্লিশ হাজার আসন সম-বন্টন করা যায় না? সে অলীক স্বপ্ন ছেড়েই দিলাম। ছোট দলগুলি তিনটি বড় ম্যাচ খেলে—যা থেকে সরকারের রাজস্ব আসে, অন্তত তিরিশ হাজার টাকা। অথচ ঐ দলগুলি অনুদান পায় মাত্র চার হাজার টাকা। খেলার মাঠের টাকা নিয়ে এ কালোবাজারী কেন?

আমি জানি, আমার এ অরণ্যে রোদন মাত্র। কারণ, 'রাজা কর্ণেন পশ্যতি'। একটা কথা আমাদের আজ বোঝার সময় এসেছে: ভালো খেলোয়াড়েরা খেলার টেকনিক্যাল দিকটা ভালো বোঝেন। তাঁরা নির্বাচন কমিটির সদস্য হলে মানায়। তাঁরা প্রশিক্ষক হলে দেশের মঙ্গল। কিন্তু সংগঠন সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। মাটির সোঁদা গন্ধ যার গায় নেই, সে কোনদিন সংগঠনের বাস্তব পরিকল্পনা দিতে পারে না। সেই জন্য একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় এবং খ্যাতনামা প্রশিক্ষক বেহোর-ভাষ্যে বলেন যে, ছোট দলগুলি চার মাস অনুশীলন করে, ফর্মের শীর্ষে থাকে আর বড় দল অনুশীলন করে না বলে, ছোট দলগুলি প্রথমদিকের বড় ম্যাচে ভালো লড়ে। দল-বদল শেষ হয় মারচ মাসের পনেরো তারিখ। ছোট দল কদাচিৎ সারা বছর খেলার সুযোগ পায়। আগেই লিখেছি, যেহেতু প্রতি বছর ছোট দলগুলি দল-বদলের চাপে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, পনেরোই মারচের আগে অনুশীলন শুরু করার প্রশ্নই ওঠে না। তার ওপর মাঠের অভাব। অথচ বড় দলের খেলোয়াড়েরা সারা বছর খেলেন, এবং তাঁদের দলও একেবারে 'খোলনলচে' পাল্টায় না। সুতরাং, তাঁরা অনেক বেশী কন্ডিসন্ড থাকেন। তবে মরসুমের গোড়ায় ছোট টীম লড়ে কেন? খাদ্যহীন সরঞ্জামহীন ঐ হ্যাংলা ছেলেগুলো। মরসুমের গোড়ার দিকে যত দিন জীবনীশক্তি থাকে, রক্ত উজাড় করে দেয়। তারপর খরায় আর বর্ষণে ক্লান্ত ভেঙে পড়া দেহগুলো আস্তে আস্তে লুটিয়ে পড়ে, বড় দলের বুলডোজারের সামনে।

দল যদি কমাতেই হয়, তার আগে ঠিক হোক, কে থাকবে, আর কে নামবে? যে দূরদূরান্ত থেকে খেলোয়াড় আনল, নিজে উপবাসী থেকে খেলোয়াড়ের মুখে অন্ন জোগালো, খেলার জন্য নিজের সমাজ সংসার তুচ্ছ করল, মাঠ ছাড়া আর্থিক সঙ্গতি ছাড়া মাঠে নেমে ভেলকি দেখাল, সে থাকবে? না যাঁরা জনগণকে জয়ের আফিম খাইয়ে, মধ্যবিত্তের পকেট কাটা টাকায় প্রথমেই দলের খেলোয়াড়দের পণ্যশুল্ক করে নিয়ে এলেন, তাঁরা থাকবেন? এ বিচারের ভার জনপ্রিয় সরকারের প্রতিনিধিদের কেবল নয়, এ বিচার করবে মহাকাল।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতের লজ্জাকর হার

ক্রিকেটে ভারতের গৌরবময় জয় এবং অমর্যাদাকর রের অনেক নজির আছে। কিন্তু এবার ইংল্যান্ডে ডেন্সিয়াল বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতের ধারাবাহিক র্থতা এবং লজ্জাজনক হারের বোধ হয় দ্বিতীয় জর নেই।

চার বছর আগে প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারত মি-ফাইনালে উঠতে পারেনি গ্রুপ লীগে ল্যান্ডের কাছে ২০২ রানে এবং নিউজিল্যান্ডের ছে ৪ উইকেটে হেরে যাওয়ায়। জিতেছিল শুধু বে আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে। এবার গ্রুপের নটি খেলাতেই হেরে গেছে। প্রথম খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৯ উইকেটে। দ্বিতীয় খেলায় ৮ ইকেটে হেরেছে নিউজিল্যান্ডের কাছে এবং তৃতীয় লায় শ্রীলংকার কাছে ৪৭ রানে, যে শ্রীলংকা এখনো ক্রকেটের কুলীন সমাজে স্থান পায়নি। পায়নি রকারী টেস্ট খেলার অধিকারও। এই কারণেই রাজয় লজ্জাজনক। এই ফল সাময়িকভাবে রতকে ক্রিকেটের কুলীন সমাজের শেষ ধাপে ঠেলে য়েছে। বিশ্বকাপের মূল প্রতিযোগিতায় ৮টি লের মধ্যে ভারতের পয়েন্টের ঘরে থেকে গেছে ন্য। আর শূন্য আছে কানাডার পয়েন্টের ঘরে— ক্রকেটে যাদের আনাড়ীর অপবাদ ঘোচেনি।

আগেই লিখেছি, ভারতের অমর্যাদাকর হারের নেক নজির আছে। যেমন ৫৯, ৬৭ এবং ৭৪-এ ল্যান্ডে ইংল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজের সব টেস্টেই রতকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ৬২তে য়েস্ট ইন্ডিজেও ৫টি টেস্ট হেরে গিয়েছিল। ৭-৬৮-তে সিরিজের ৪টি টেস্টেই হেরেছিল স্ট্রেলিয়ায়। এই সব পরাজয়ের জন্য বিরুদ্ধ সমালোচনাও কম সহ্য করতে হয়নি। ৫৯-এ ইংল্যান্ডে ৫টি স্ট হেরে যাওয়ায় এবং ৩ দিন বা ৪ দিনের মধ্যে ব টেস্টের ফয়সালা হওয়ায় কথা উঠেছিল ভারতকে দিনের টেস্ট খেলার মর্যাদা দেওয়া ঠিক নয়। ৭৪-এ র্ডস টেস্টে মাত্র ৪২ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ায় ইংল্যান্ডের বনেদী সংবাদপত্রে এমন এক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, যার অর্থ প্রকৃতির ডাকে প্রস্রাবাগারে প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যেই ভারতের ইনিংস ফুরিয়ে গেছে, বেচারা বাড়ি থেকে ওই কাজটি সেরে আসেনি বলেই ভারতের ব্যাটিং দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ব্যর্থতার পটপ্রেক্ষিতে এবং এর পর যদি টেস্ট সিরিজে বিপর্যয় ঘটে, তবে এবারও হয়তো উপহাস সহ্য করতে হবে। ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর ব্যবস্থা ভেস্তে দেবার জন্য অস্ট্রেলীয় বোর্ড যে পরিকল্পনা করেছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সে সে পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভারতের বক্তব্য তেমন জোরালো গলায় বলা যাবে না।

ক্রিকেটে অবশ্য অপ্রত্যাশিত ফল ঘটেই থাকে। গারফিল্ড সোবার্সের শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকেও তো স্বদেশে হার স্বীকার করে ভারতকে রবারের সম্মান দিতে হয়েছিল। ইংল্যান্ডের রে ইলিংওয়ার্থকেও স্বদেশে সিরিজ হেরে "রাবার" তুলে দিতে হয়েছিল ভারতের অজিত ওয়াদেকরের হাতে। তাই ক্রিকেট নিয়ে কারো গর্ব করা সাজে না। প্রুডেন্সিয়াল কাপের খেলার আগে ভারতীয় অধিনায়কের উক্তিগুলিও এখন বড় বেমানান মনে হচ্ছে।

"ভগবান মানুষকে দুটি কান দিয়েছেন, দুটি চোখ দিয়েছেন কিন্তু মুখ দিয়েছেন একটি। তার মানে দু' কানে সব কিছু শুনে যাও। দু' চোখ ভরে সব কিছু দেখে যাও কিন্তু এক মুখে বেশী কথা বলো না।"

এক সময়ে এই দার্শনিক উক্তিটি করেছিলেন ভারতের নতুন ক্রিকেট অধিনায়ক শ্রীনিবাস বেংকটরাঘবন, কিন্তু অধিনায়কের মুকুট পরে নিজেই এক মুখে বহু কথা বলে ফেলেছেন। স্বীকার করছি, নাছোড়বান্দা সাংবাদিকদের তিনি এড়াতে পারেননি। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই, অধিনায়কের পক্ষে বাক্‌সংযম প্রয়োজন ছিল।

ইংল্যান্ড সফরে যাবার আগে দেশে থাকতে বহু সাংবাদিক ও সমালোচকের কাছে তিনি দলের সাফল্য সম্পর্কে বড় বড় কথা বলেছিলেন, ইংল্যান্ডের আবহাওয়ায় খেলার অসুবিধার কথা এবং নিজ দলের সীমায়িত শক্তির কথা জেনেও। বলেছিলেন, এক-দিনের সীমায়িত ওভারের খেলায় ভারত অনেক পোক্ত হয়ে উঠেছে। এখন যে কোনো দেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। ইংল্যান্ডে পৌঁছে নেতাজীর সেই ঐতিহাসিক উক্তির সুরে বলেছেন—"আমাদের ভাল ওয়েদার দাও, আমরা সব খেলায় জয় এনে দেব। আমরা এখানে এসেছি সব কিছু জয় করতে।"

ইংল্যান্ড সফরের খেলা শুরু হবার আগে প্রুডেন্সিয়াল বিশ্বকাপ ক্রিকেট বিপর্যয়ের পরও কিন্তু অধিনায়ক বাক্‌সংযমের পরিচয় দেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে প্রথম খেলায় পরাজয়ের জন্য দায়ী করেছেন আমপায়ারদের। এক বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, "আমপায়াররা শর্ট-পিচ বলে বিচারবোধের অভাব দেখিয়েছেন। অন্তত সাত-আটটি বলকে নো-বল ডাকা উচিত ছিল।"

ওই উক্তি থেকে এই কথা মনে হতে পারে, ওই সাত-আটটি নো-বলে সাত-আট পেলেই বুঝি ভারত জিততে পারত। যে খেলায় পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে ৯ উইকেটে সে খেলা

সম্পর্কে ওই ধরনের উক্তি পরাজিত অধিনায়কের মুখে কি শোভা পায়? অবশ্য বেংকটরাঘবন পরে বলেছেন, "আমাদের ব্যাটিং ব্যর্থতাই পরাজয়ের প্রধান কারণ।"

স্বীকার করছি, ব্যাটসম্যানরা ভাল রান করতে পারেননি। কিন্তু বোলাররা কি করেছেন? পাঁচজনে ৫৩ ওভার বল করে পেয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের একটি মাত্র উইকেট। আসল কথা, জয়-পরাজয়ের ফল ব্যবধান যেখানে বিরাট, সেখানে ব্যর্থতার সাফাই দিতে যাওয়া বোকামি ছাড়া কিছু নয়। তাতে ক্রিকেটে "ফ্ল্যানেল ফুল" বলে যে কথাটি আছে তারই প্রমাণ মেলে। সাংবাদিকদের চাপে যদি বেংকট মুখ খুলতে বাধ্য হয়ে থাকেন তবে বললে শোভন হত যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনেক শক্তিশালী দল, যোগ্য দল হিসাবেই তারা জিতেছে। আমরা ভাল খেলতে পারিনি বলেই হেরে গেছি।

গতবারের বিশ্বকাপ জয়ী (এবারও হয়তো জিতবে) ওয়েস্ট ইন্ডিজ সত্যই দারুণ শক্তিশালী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে দলটি গত মরসুমে ভারত সফর করে গিয়েছে এ দল সে দল নয়, এ দলে আছেন ক্রিকেটের সব উজ্জ্বল তারকা, যাঁরা কেরি প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজে যোগ দিয়েছিলেন বলে সরকারী টেস্ট থেকে বাদ পড়েছিলেন। ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের গ্রুপ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতবে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারত হারল কেন? তাও ৮ উইকেটে শোচনীয়ভাবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঝড়ো গতির চার ফাস্ট বোলার—অ্যান্ডি রবার্টস, মাইকেল হোল্ডিং, জোয়েল গার্নার ও কলিন ক্রফট। তার সঙ্গে লেস্টার কিংয়ের বলের গতিও কম নয়। এদের বলের বিরুদ্ধে ভারতের ব্যাটসম্যানরা তবু ১৯০ রান করেছিলেন ৫৩·১ ওভার খেলে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের নিতান্ত মাঝারিয়ানার পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের সকলে ১৮২ রানে আউট হয়ে গেলেন কেন? ভারতের পেসার ও স্পিনাররা মিলে কেনই বা ৬০ ওভারের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের দুটির বেশী উইকেট ফেলতে পারলেন না? ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে খেলার মত ওভারের সঙ্গে রানের গতির সমতা রেখেই ঠিক ৬০ ওভারের মাথায় নিউজিল্যান্ড ২ উইকেটে ১৮৩ রান করে ম্যাচ জিতে গেল।

গ্রুপের শেষ খেলায় শ্রীলংকার ব্যাটসম্যানরা ভারতীয় বোলারদের উপর আধিপত্য প্রকাশ করে ৫ উইকেটে করল ২৩৮ রান। জয়ের জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল ২৩৯ রান। ওভারে ৪ রান হিসাবে করলে এই টার্গেটে পৌঁছনো যেত। শ্রীলংকাও ওভারে প্রায় ৪ রান সংগ্রহ করে। কিন্তু ভারত ৫৪·১ ওভারের মধ্যেই ১৯১ রানে শেষ হয়ে গেল। তাও এই ম্যাচে শ্রীলংকার অধিনায়ক অনুরো টেনিকুন খেলতে পারেননি অসুস্থ থাকায়। দলনেতৃত্বের ভার পড়ে সহ-অধিনায়ক বন্দুরার উপরে। তবু ভারতকে তারা ৪৭ রানে হারিয়ে দিল বিশ্বখ্যাত বোলারদের বল বেদম প্রহার করে। দুই স্পিনার বর্তমান ও প্রাক্তন অধিনায়ক বেংকটরাঘবন ও বেদী একটিও উইকেট পেলেন না। অথচ বেদীকে দলভুক্ত করা হয়েছিল বিশ্বকাপের জন্য।

তিনটি ম্যাচের ফল খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে ভারত ৫৬৩ রান সংগ্রহ করেছে ৩০ উইকেটের বিনিময়ে। ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি দল সংগ্রহ করেছে ৬১৫ রান মাত্র ৮টি উইকেট হারিয়ে। এ থেকেই ব্যবধান ও ব্যর্থতার চিহ্ন পরিস্ফুট।

বিশ্বকাপের একদিনের গোনা ওভারের খেলার সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটের পার্থক্য আছে। ব্যাটিং টেকনিক ও প্রয়োগনীতি পৃথক। টেস্ট ক্রিকেট মুখ্যত দীর্ঘ লয়ের খেলা। গোনা ওভারের ক্রিকেটে নাটকীয় সজীবতা ও চাঞ্চল্য, এক কথায় বলা হয় ইনস্ট্যান্ট ক্রিকেট। টেস্ট ক্রিকেট সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে— উইকেটে টিকে থাকো, স্বাভাবিকভাবেই রান আসবে। আর সীমায়িত ওভারে রান করার প্রয়োজন নিয়েই উইকেটে থাকতে হবে। অপর দিকে বোলিং পক্ষকে চেষ্টা করতে হবে, যত কম সম্ভব রানের বিনিময়ে বেশী উইকেট দখল করার।

যদিও গত বছর পাকিস্তানে কোয়েটায় এক-দিনের খেলায় ভারত পাকিস্তানকে হারিয়েছিল এবং শাহীওয়ালে জয়ের মুখে এসে ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছিল, তবু সীমায়িত ওভারের খেলায় ভারতের সুনাম নেই। দেওধর ট্রফি ও উইলিস ট্রফির সীমায়িত ওভারের খেলাতেও ভারতীয় ক্রিকেটাররা তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না।

ইংল্যান্ড সফরের জন্য, বিশেষ করে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য যে দল পাঠানো হয়েছে, সে দলটিকেও ভেবে-চিন্তে গড়া হয়নি। ইংল্যান্ডের আবহাওয়ায় তিনজন সীমারের বদলে ৪ জনকে নেওয়া উচিত ছিল। বেদী যদি এখনো অপরিহার্য তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল কেন? এখন কেন রাজিন্দার সিং হংসকে পরীক্ষা করা হয়নি? যশপাল শর্মাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টে রিজার্ভ রেখে একটিতেও না খেলিয়ে কী গুণ দেখে ইংল্যান্ডে পাঠানো হল? অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান কিরমানিকে বাদ দিয়ে নূতন নতুন উইকেটকিপারকে দলভুক্ত করাও কি ক্রিকেট বুদ্ধির পরিচয়?

তবু আমি মনে করি না, দুই একজন খেলোয়াড় অদল-বদল হলেই ভারত খুব ভাল খেলত। আসলে সীমায়িত ওভারের ক্রিকেটে ভারতের শক্তিই সীমায়িত।

মুকুল

জয়ের সম্ভাবনা তাঁর
যিনি এমব্রয়ডারী টাটিং,
নিটিং বা ক্রুশেট বুনতে
বা অন্য কোনও রকম
হাতের কাজ
জানেন—

chic-modithread শিক-মোদীথ্রেড

"নিড্‌লওয়ার্ক কনটেস্ট"

১½ লাখ টাকা মূল্যের প্রাইজ জিতে নিন।
যোগদানও সহজ/জিতে নেওয়াও সহজ
রোমাঞ্চকর ছুটীর আমন্ত্রণ TCI SITA HOLIDAY

অকল্পনীয় গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল প্রাইজ!

শিক মোদীথ্রেড নিডল ওয়ার্ক কুইন ট্রফি সারাভারতের যোগদানকারীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ প্রবেশ পত্রটিকে দেওয়া হবে এছাড়া TCI SITA একটি ২১ দিনের ছুটী ইউ.এস-এর উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমস্ত খরচসমেত যার অর্থমূল্য ১৬,৫০০ টাকা।

প্রবেশমূল্য নেই! কি ভাবে যোগ দিতে হবে—

আপনাকে যা করতে হবে তা' হলো কিছু মোদীথ্রেড কিনে তা দিয়ে বুনতে, এমব্রয়ডারী করতে, টাটিং বা অন্য কোনও রকম হাতের কাজ ২০ সেঃমিঃ × ২০ সেঃমিঃ সাইজের মধ্যে করে পাঠাতে হবে। সমস্ত প্রতিযোগীতা মূলক হাতের কাজই, পরিচ্ছন্নতা রং মেলানো ও ডিজাইনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হবে। অন্যান্য নিয়মকানুন ও প্রতিযোগিতায় প্রবেশের জন্য কুপন মোদীথ্রেড ডীলার, মোদীথ্রেড ক্র্যাফট শপ, মোদীথ্রেড ডিপো এবং মোদীথ্রেড ডিস্ট্রিবিউটারদের কাছে পাওয়া যাবে এবং এই কুপন ১৯৭৯-এর মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই এবং আগস্ট-এর শিক ম্যাগাজিনে পাবেন। প্রতিটি প্রবেশপত্রে সংগে ব্যবহৃত মোদীথ্রেড [illegible] লেবেল [illegible] ছাপানো কুপন থাকা চাই।

জেতার সম্ভাবনাও প্রচুর

আপনার পুরস্কার জেতার সম্ভাবনা বাড়াবার জন্য দেশ এবং এই প্রতিযোগিতাকে মোট ১০টি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে! বিভাগে ৮০টি প্রাইজ—তার মানে মোট ৮০০টি প্রাইজ এছাড়া একটি 'গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল প্রাইজ'—১০টি বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারী দশজনের মধ্য থেকে যার নির্বাচন হবে।

জেতার জন্য ৮০১টি প্রাইজ
(৮০টি প্রাইজ আপনার বিভাগে)

দশটি প্রথম পুরস্কার: KELVINATOR ZENITH 165 লিটারের রেফ্রিজারেটর প্রতিটির দাম ৪,২৭৫ টাকা।

দশটি ২য় পুরস্কার: Oberoi Hotels আয়োজিত দুজনের জন্য ৫ দিনের ছুটী কাটানোর ব্যবস্থা— কাঠমাণ্ডু, গোয়া, কাশ্মীর, দার্জিলিং, সিমলা এবং গোপালপুর অন-সীএর কোনো হোটেলে।

দশটি ৩য় পুরস্কার: modific[illegible] আন্তর্জাতিক মানের মেশিনে তৈরী কার্পেট প্রতিটির দাম ২,৫০০ টাকা।

দশটি ৪র্থ পুরস্কার: MERRITT সেলাই-মেশিন প্রতি[illegible] টাকা।

দশটি [illegible] পুরস্কার: Tiffin [illegible] সেট। প্রতিটির দাম ১,০০০ টাকা।

এছাড়া

১৫০টি মোট পুরস্কার: **modicotton** নিজে তৈরী করুন সালওয়ার, কামিজ সুট— অর্থমূল্য ৬৫ টাকা।

৫০০টি কনসোলেশন পুরস্কার-এর উপহার শিক প্রকাশনীর পক্ষ থেকে। অর্থমূল্য ৪০ টাকা।

১০০টি বোনাস পুরস্কার-এর সম্ভার কর্ন প্রডাক্টস যারা ব্রাউন এ্যাণ্ড পলসন এবং [illegible] বানান। যার অর্থমূল্য ২৫ টাকা।

আজই শিকের গ্রাহক হোন
বাৎসরিক ২০ টাকা বাঁচান নতুন।রেট ১২টির জন্য ৬০ টাকা ১ বছরের জন্য গ্রাহকহলে ৪০ ২ বছরের জন্য গ্রাহক হ'লে ৭৫,। শিক পাবলিকেশনের নামে আপনি পোস্টাল অর্ডার মনিঅর্ডার পাঠান—যা বোম্বেতেই ভাঙ্গানো যাবে গ্রাহক হবার ঠিকানা।
To subscribe, mail this to
CHIC PUBLICATIONS,
89, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400036.
OR VIJAY STORES
231, Dr. D.N. Rd., Commissariat Bldg.,
Fort, Bombay 400001.
Name ________________
Address ________________
Enclosed Postal Order for Rs ________
for ______ years subscription from ______

INCENTIVE-Ben

chic সৃষ্টিশীল আনন্দজনক ফ্যাশন ম্যাগাজিন। তাড়াতাড়ি! প্রতিযোগিতা ৩১শে আগস্ট ৭৯ শেষ হবে। আপনার প্রবেশপত্র আপনার আঞ্চলিক মোদীথ্রেড ডিপোয় পাঠান সঠিক ঠিকানার জন্য নিয়মকানুনটি ভাল করে দেখুন। মোদীথ্রেড 'চিলড্রেনস নিডল ওয়ার্ক' সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতার শিশু বিভাগীয় সংখ্যাটি দেখুন।

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বই**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ। সম্পাদক : সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত। সান্যাল প্রকাশন। ১৬ নবীন কুণ্ডু লেন। কলিকাতা-৯। ত্রিশ টাকা।

এখন নানা কারণে বাঙালীর বিদ্যাচর্চা ও সারস্বতসাধনার একতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে কলকাতা। কয়েক দশক আগেও নৈহাটি, বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান সকল সৃজন ও মননসাধনার সোৎসাহী পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। আজ হয়তো সে সবই সকরুণ স্মৃতি। তবু মাঝে মাঝে ঝলক দেয় কোন কোন মফঃস্বল শহরের উদ্যমের ঐকান্তিকতায় ও নিষ্ঠাব্রতের দুরূহ সিদ্ধিতে। বছর কয়েক আগে চমকে দিয়েছিল মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ'। এবারে সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম জাগালো নৈহাটি থেকে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ'। ১৯৭৬ সালে স্থাপিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র' সংকল্প নিয়েছিল উনিশ শতকের কৃতী বঙ্গসন্তান শাস্ত্রী মশায়ের যথোপযুক্ত মূল্যায়নের। বস্তুত স্মারকগ্রন্থ সেই দুরায়ত্ত সংকল্পের পূর্ণাঙ্গ সমাপন শুধু নয়, নব প্রবর্তনারও ইঙ্গিতবাহী।

এই মহাগ্রন্থখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৭৪। সুপরিকল্পিত বিষয়বিন্যাসে গ্রন্থখানি উজ্জ্বল। প্রথম পর্যায়ে হরপ্রসাদের শতকীর্তি প্রতিভার বর্ণবিচ্ছুরণ আমরা টের পাই তাঁকে লেখা সেকালের নানা অগ্রণী মানুষের চিঠিপত্রের মাধ্যমে। দেশবিদেশের বহু মনীষীর সঙ্গে হরপ্রসাদের বিচিত্রমুখী যোগাযোগ এবং তাঁর প্রতি প্রখ্যাত প্রতিভাধরদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাবোধ বিহ্বল করে। যেমন রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে জানাচ্ছেন (তারিখ ১২-৬-৩১) : 'আমার সপ্ততিতম জন্মোৎসবের উদ্বোধন সভায় আপনি সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন ইহা আমার সৌভাগ্য। বাংলা সাহিত্যে এতদিন ধরিয়া আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহা সমগ্রভাবে দেখিবার শক্তি আপনার মত কয়জন আছে ?'

দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে হরপ্রসাদ সম্পর্কে বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা। বিশিষ্টদের মধ্যে যেমন সুনীতিকুমার রাধাগোবিন্দ বসাক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিদের লেখা রয়েছে, অবিশিষ্টদের মধ্যে তেমনই রয়েছে কালীপদ দাসের স্মৃতিতর্পণ, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন শাস্ত্রী মশায়ের বেয়ারা। এই সংযোজন থেকেই স্মারকগ্রন্থের সম্পাদকদের সামগ্রিক-চিন্তা ও যথাযথ মূল্যায়নের শুদ্ধ সংবাদ গুঞ্জন তোলে। সাধারণতঃ, প্রখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কিত স্মারকগ্রন্থে যেসব দায়সারা স্মৃতিচর্বণ ও গোঁজামিল শ্রদ্ধাঞ্জলি দেখা যায় এই স্মারকগ্রন্থ আগাগোড়া সেই লঘুতা বর্জন করেছে। কালীপদ দাস তাঁর স্মৃতিচারণে 'দেবতুল্য' মানুষ হরপ্রসাদ সম্পর্কে জানিয়েছেন : 'সকাল বেলায় উঠে নিজে জলযোগ করতেন। বাড়ির কাজের লোকদের সবাইকে খাওয়াতেন।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নেবার সময় 'আমাদের বকশিশ দিলেন। সেই সঙ্গে শিশুদের মতো ক্রন্দন করেছিলেন।'

কালীপদ দাসের চোখ দিয়েই আমরা হরপ্রসাদের প্রেজ্জ্বল মানবমূর্তি দেখতে পাই। রসিক অতিথিপরায়ণ, সংস্কৃত গদ্যের ঋণগ্রাহক হরপ্রসাদের জীবনের নানাদিক বিচিত্র বীক্ষণকোণ থেকে দেখিয়েছেন স্মৃতিচারী লেখকরা। শোনা যায়, হরপ্রসাদ ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে আশ্চর্য এক সম্বন্ধ ছিল। গভীর সখ্যের মাধুর্য থেকে হরপ্রসাদ তাঁর পুত্রদের নাম রেখেছিলেন আশুতোষের 'তোষ'টুকু জুড়ে; যেমন বিনয়তোষ, কালীতোষ ইত্যাদি। আর আশুতোষ তাঁর পুত্রদের নাম রেখেছিলেন হরপ্রসাদের প্রসাদটুকু নিয়ে; যেমন রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ ইত্যাদি। অথচ শেষ জীবনে কখন কীভাবে যেন এই দুই মনীষীর সম্পর্কে চিড় ধরে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের জবানীতে আমরা জানতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন নির্বাচনে প্রবীণ হরপ্রসাদ যখন নবীন রমেশচন্দ্রের কাছে পরাজিত হন তখন কলকাতায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় টেবিল চাপড়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুত, বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের যুযুধান স্বভাব আমাদের ভারি নির্মল কৌতুক জোগায়।

গ্রন্থটির তৃতীয় পর্যায়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিভিন্নমুখী প্রতিভার সামগ্রিক মূল্যায়ন করেছেন এখনকার প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিকরা। পণ্ডিত, প্রাচ্যবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ, ভাষাতাত্ত্বিক, ঔপন্যাসিক, গদ্যলেখক, ঐতিহাসিক ও লোক-সংস্কৃতি-অনুরাগী হরপ্রসাদ সম্পর্কে প্রবন্ধগুলি প্রয়োজনানুগ দীর্ঘ ও বিশ্লেষণবহুল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুযায়ী প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ হরপ্রসাদ একাধারে প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় পদ্ধতির সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন তাঁর মননে। অশেষ পরিশ্রমে তিনি একাধিকবার নেপাল যান এবং সেখান থেকে উদ্ধার করেন বাংলা সাহিত্যের আদিসূত্র—চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় ও অন্যান্য গ্রন্থ। আবার তিনিই প্রথম 'মেঘদূত' কাব্যের সার্থক রসভাষ্য লেখেন। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের চমৎপ্রদ সার্থকতা 'কাঞ্চনমালা'-তে তিনি অনায়াসে অর্জন করেছিলেন। আশ্চর্য যে, তাঁর বিস্তৃত কৌতূহল থেকে ১৮৯৫ সালে বিষ্ণুপুরের 'দশাবতার' তাস সম্পর্কে আলোচনাও করেন।

মূল্যায়ন পর্যায়ে রচনায় প্রায় সকলেই বিরল আন্তরিকতা ও মনন-শীলতার পরিচয় রেখেছেন এবং অন্ধ ভক্তিবাদে আচ্ছন্ন হয়ে কেউ অতিভাষণ করেননি। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন পবিত্র সরকার ('হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব'), সত্যজিৎ চৌধুরী ('প্রতিহত ঔপন্যাসিক প্রতিভা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী'), এবং সুকুমার সেন ('হরপ্রসাদের মনীষা—পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধতায়')। শেষোক্ত নিবন্ধে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আচার্য স্বার্থহীন ভাষায় স্পষ্টোক্তি করেছেন :

'হরপ্রসাদের মত পণ্ডিত, তখন ইংল্যাণ্ড ইউরোপ আমেরিকার বাহিরে ছিল না এবং এখন যদি থাকে তবে খুব কমই ছিল এবং আছে'। এই প্রবন্ধের আরেক জায়গায় সুকুমার সেন হরপ্রসাদের গদ্য রচনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন : 'তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবেশী ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনেই তাহার হাতেখড়ি হইতে অমর-জুমর পর্যন্ত হইয়াছিল। তবুও বলিব,—বঙ্কিমভক্তদের ভয়ে ভয়ে,—মোটামুটিভাবে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষাও ভালো—অর্থাৎ সহজ সরল সতেজ ও তীক্ষ্ন—বাংলা লিখিতেন।' খুবই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এবং গ্রহণযোগ্য। স্মারকগ্রন্থের সম্পাদকগণ ভূমিকায় যে যথোপযুক্ত মূল্যায়নের গুরু অঙ্গীকার করেছেন এ জাতীয় সিদ্ধান্ত-গভীর নিবন্ধ তারই পরিপোষকতা করে। তবু মনে হয়, কোন কোন প্রাবন্ধিক তাঁদের খ্যাতি ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। গোপাল হালদার ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের আরও যেন প্রাপ্য থেকে যায়। তাছাড়া 'লোকসংস্কৃতি ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' প্রসঙ্গটি সম্ভবত আরও যোগ্য হাতে ন্যস্ত করতে পারতেন সম্পাদক। এমন জীবনাস্ত ভাষা ও বিচ্ছিন্ন চিন্তার অসম্পূর্ণতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামাঙ্কিত স্মারকগ্রন্থে বেমানান।

স্মারকগ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে সংকলিত হরপ্রসাদের অনুপুঙ্খ জীবনপঞ্জী ও সামগ্রিক রচনাপঞ্জীর সন তারিখযুক্ত তালিকা আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় টেনে নেয়। বোঝা যায়, কত আবেগে, সততায়, নিষ্ঠায় ও সচেতনতায় সম্পাদকগণ এই অংশ প্রণয়ন করেছেন। অতুচ্চ সম্পাদনা আদর্শের এক দুর্লভ উদাহরণ হয়ে থাকল এই স্মারকগ্রন্থ। এই গ্রন্থের পরিপূরক কাজ হবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিচিত্র ও বহুমুখী রচনাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা ও প্রকাশ করা। আমরা আশ্বস্ত যে, সেই পবিত্র অনুধ্যানের কাজটি এঁদের উপরেই ন্যস্ত হয়েছে।

সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী ও সকল সংস্কৃতিসেবীর পাঠকক্ষে 'হরপ্রসাদ স্মারকগ্রন্থ' শোভমান থাকুক।

সুধীর চক্রবর্তী

বাংলা লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাস। বরুণকুমার চক্রবর্তী। সাহিত্যশ্রী। ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। মূল্য ৩৮.০০ টাকা।

আমাদের অনেকের খেয়ালই নেই যে বাঙলায় লোকসাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়েছে আজ থেকে প্রায় একশো পঁয়ষট্টি বছর আগে উইলিয়াম কেরীর হাতে। সে হিসেবে ইওরোপের

গ্রাম-তাঁদের লোকসাহিত্য-বিদ্যার চর্চা আমাদের দেশেরই সমবয়সী। অথচ এই বিদ্যাচর্চার আনুপূর্বিক কোনো ইতিহাস আজ পর্যন্ত লিখিত হয়নি। দেশী-বিদেশী বহু লেখক এবং অখ্যাত কিংবা অজ্ঞাতনামা সংগ্রাহক মাঝে মাঝেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই লৌকিক সাহিত্যের নানা দিকের পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেও একটি বড় বই হয়ে যায়। বরুণবাবু প্রায় সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার এই বইতে লোক-সাহিত্যচর্চার ইতিহাস বিবৃত করেছেন এবং যথাসম্ভব তথ্য প্রমাণ দিয়ে তাঁর বিবৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভূমিকায় লেখক লোকসংস্কৃতির শাখা হিসেবে লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট ক্ষেত্রটিকে পরিচ্ছন্নভাবে বুঝিয়েছেন এবং লোকসাহিত্যের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞার্থকে দাঁড় করিয়েছেন। এই ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ প্রাথমিক কাজ বলেই দুরূহ সন্দেহ নেই এবং দূরে গ্রামাঞ্চলের পত্রপত্রিকায় লোকসাহিত্যের যে-সব উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে বা হচ্ছে তাও সব সময় সংগ্রহ করা দুরূহ বলেই লেখকের পক্ষে এই ইতিহাস বর্ণনায় সেগুলির ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু যে-সব তথ্য তিনি কঠিন পরিশ্রম করে সংগ্রহ করে দিলেন তা পথিকৃৎ ঐতিহাসিকের কাজ।—বিষয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক মূল্যবান পাথেয়।

ভূমিকা ছাড়া আলোচনাকে তিনি ছ'টি ভাগ ভাগ করে নিয়েছেন। বাংলা প্রবাদচর্চার ইতিহাস, বাংলা ছড়াচর্চার ইতিহাস, বাংলা ধাঁধা-চর্চার ইতিহাস, বাংলা লোককথাচর্চার ইতিহাস এবং বাংলা গীতিকাচর্চার ইতিহাস। ছ'টি পরিশিষ্টে পূর্ববঙ্গে বা এখনকার বাঙলাদেশে লোকসাহিত্য-চর্চার ইতিহাস অনুরূপ শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। শেষে একটি সংযোজনে গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ সংক্রান্ত কিছু নতুন প্রাপ্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যা হিসেবে লোকসাহিত্যচর্চার প্রথম যুগে প্রবাদ সংকলনই বেশি হয়েছে। কারণ এখনকার জীবনে প্রবাদের প্রভাব কমে গেলেও পূর্বে প্রবাদের ব্যবহারিক গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমরা যখন নতুন সংস্কৃতি-সংঘাতে বিভ্রান্ত সেই সময় রেভারেন্ড মর্টন-এর 'দৃষ্টান্ত বাক্যসংগ্রহ' (১৮৩২) অর্থাৎ বাঙলা ও সংস্কৃত প্রবাদ-সংগ্রহ আমাদের চমকে দেয়। এবং তারপর রেভারেন্ড লঙ্ সাহেবের বিশাল সংগ্রহ 'প্রবাদমালা' (১৮৬৮-৭২) বিদেশী অনুসন্ধিৎসার এক মহৎ দৃষ্টান্তস্থল হয়ে দাঁড়ায়। তারপর বহু বিদেশী এই সংকলন ও ব্যাখ্যায় নেমেছেন এবং একালে সুশীলকুমার দে, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য লেখকরা প্রবাদ বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। এসব তথ্যের শুধু উল্লেখ করেই বরুণবাবু ক্ষান্ত হননি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মন্তব্যও আছে। অতি সাম্প্রতিককালে প্রবাদ আলোচনায় বাঙালী গবেষকরা যে বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক পথে এগোচ্ছেন তারও কিছু পরিচয় এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। লোকসাহিত্যচর্চাকে স্বদেশ-উদ্ধারব্রতের অন্যতম কর্তব্য বলে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যেমন ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দেন, তেমনি নিজেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ছড়ার সাহিত্যিক আলোচনাও তিনি শুরু করেন। এরপর থেকে যাঁরা এই পথে এসেছেন—যেমন কুঞ্জলাল রায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও অন্যান্যরা তাঁদের সকলের সংগ্রহ নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। আলোচক হিসেবে রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী থেকে সুধীরচন্দ্র রায় পর্যন্ত অনেকেরই আলোচনার সমাজ-তাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। ধাঁধা চর্চার ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র দত্ত, রেভারেণ্ড সরকার, অহিভোষ মিত্র, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ থেকে শুরু করে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ও 'লোকশ্রুতি' পত্রিকার প্রবন্ধ লেখকদের বক্তব্যকে লেখক তুলে ধরেছেন এবং প্রত্যেকের আলোচনার গুণ দোষ ও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পূর্ববর্তী আলোচকদের ভুল মন্তব্যকেও সাহসের সঙ্গে সমালোচনা করেছেন। লোককথাচর্চার ইতিহাসে ডামাণ্ট, ডেল্টন লালবিহারী দে, রিসলে, অঘোর চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণা-রঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর বসন্তকুমার, ইন্দুমতী দেবী ইত্যাদির সংগ্রহ এবং দীনেশচন্দ্র সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য ইত্যাদি আলোচকদের গুরুত্ব নির্ধারিত হয়েছে সমান বিশ্লেষণ-শক্তির সঙ্গে। অনুরূপভাবেই লোকসঙ্গীত ও গীতিকাচর্চার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে দক্ষতার সঙ্গে। লেখকের আলোচনার বৈশিষ্ট্য এই লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাস বর্ণনার সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই বেশ কিছু প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়া বা লোককথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং লোকসাহিত্য বিচারের পদ্ধতিরও কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তাতে আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের পক্ষে মূল লোকসাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ সম্ভব হয়েছে, গুণ-দোষ বিচারের মাধ্যমে এগোতে এগোতে এই বিশেষ সাহিত্য বিচারের একটি প্রয়োজনীয় ক্রিটিক্যাল মনের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছে। কেবল পরিশিষ্টে কোনো সূচীপত্র না থাকায় কোনো তথ্য খুঁজে বার করা খুব মুশকিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই বিশাল লোক-সাহিত্যবিদ্যার চর্চার ইতিহাস পড়ে মনে হয়েছে, আমাদের নাগরিক সাহিত্যের ইতিহাসকে এক সঙ্গে যুক্ত না করতে পারলে তথাকথিত সাহিত্য-ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ। বরুণবাবুর কৃতিত্ব এই পরিশ্রম করে তিনি সাহিত্যের সঙ্গে দেশের নাড়ির যোগটুকু বিস্তৃতভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তথাকথিত সাহিত্য-ইতিহাস রচনার অসম্পূর্ণতাটুকু ধরিয়ে দিয়েছেন।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

ছকে বাঁধা নয়। কেশবভূষণ রায়। দে বুক স্টোর। ১৩, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলকাতা ৭৩। দাম ছয় টাকা।

উপন্যাসের নামে আকৃষ্ট হয়ে পাঠক যদি নতুন কিছু পড়ার আগ্রহে বইটির পাতা উল্টে যান তাহলে অবশ্যই হতাশ হবেন। ছকে বাঁধা নয়—এরকম একটা কথা ঘোষণা করেও কেশবভূষণ রায় যা লিখেছেন তা আসলে অতি গতানুগতিক একটি প্রেমকাহিনী ছাড়া কিছু নয়। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় যথারীতি ছেলেদের হাত থেকে নায়িকাকে উদ্ধার করা দিয়ে এই প্রেম-কাহিনীর শুরু। কাহিনী এগিয়েছে চিরাচরিত পথে। পরিণতিও ছকে বাঁধা। অথচ লেখক কী আক্রোশেই না তাঁর এই উপন্যাসের নাম রেখেছেন ছকে বাঁধা নয়।

কেশববাবু বলেছেন, আমি আমার সাধ্যমত জীবনকে বড় করে ভাববার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সাহিত্যে কতটা ফোটাতে পেরেছি তা পাঠকের বিবেচ্য। তাঁর সাধ্য যে খুব সীমায়িত এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। অন্তত এই বইটি পড়ে তা মনে হল। জীবন যে রকম তিনি যদি সেভাবেই তাকে দেখতেন তাহলে আমরা উপকৃত হতাম। আসলে ছকে বাঁধা নয় গ্রন্থটিকে উপন্যাস বললে বেশিই বলা হবে। এটি একটি কাহিনী। গ্রন্থটিকে কিছু একটা বলতে হবে বলেই আমরা উপন্যাস বললাম। সেখানেও নিজে থেকে একটা ছক পড়ে যেতে হল আমাদের। এ বিষয়ে কেশববাবু নিজে তো নিষ্কৃতি পাননি, এমনকি তাঁর পাঠক ও সমালোচকদেরও উদ্ধারের কোন পথ খোলা রাখেননি। মিলনান্তক রচনা, কিন্তু তা পড়ার অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে ট্র্যাজিক হয়ে থাকল নিঃসন্দেহে।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

"একি সুগন্ধ হিল্লোল"

অনেক দিন জন জঙ্গলে অজ্ঞাত-বাসের পর কেউ যদি হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেন! মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে (আকাদেমী অব ফাইন আর্টস ১—১০ মে)। তিনি সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগের অধ্যাপক

ছিলেন। কয়েক মাস হলো অবসর গ্রহণ করে নিজে আবার ছবি আঁকায় মন দিয়েছেন। নিয়মিত ছবি এঁকে গেছেন না হলে হঠাৎ করে এমন প্রদর্শনী করা সম্ভব নয়। বিধৌত পদ্ধতি (ওয়াশের) নিহিত সম্ভাবনা এবং রেশমের ওপর জল রঙের কাজের মাধুর্য মাণিকলাল হাতে তুলিতে দেখিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। মাণিকলাল কিন্তু অবনীন্দ্র শিষ্যদের "নব্য ভারতীয় কলমের" পৌনঃপুনিক ধারার বাইরে। জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। দৃষ্টি-ভঙ্গীও সরল এবং সরস। স্বাদেশিকতার পরিবেশে যে প্যাচপ্যাচে গদ গদ ভারতীয়ত্বের রাহুগ্রাসে ছবির মুমূর্ষু দশা হয়েছিল, তা মাণিকলালের ছবিকে স্পর্শ করেনি। বেশিরভাগ ছবি আমাদের চেনা জানা জগতের। এঁকে-ছেন গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা এবং প্রকৃতি আর লোকধর্মের বিষয় নিয়ে। তা ছাড়া তন্ত্র বিষয়ক ছবিও তিনি এঁকেছেন। আবার চিরাচরিত মুঘল অণুচিত্র এঁকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তিনি কাজ জানেন। সমগ্র প্রদর্শনী ঘুরলেই মাণিকলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় নামে জনৈক শিল্পীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় গাঢ় হয়। কখনো কখনো তাঁর আধুনিক হবার দুর্বলতা দেখে আমরা আড়ালে মুচকে হাসি—যেমন বিভিন্ন কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস দিয়ে তিনি মহাকালীকে গড়েছেন পটে—কিন্তু সব একটা গোটা দরাজ মানুষের পরিচয়। তেমনি আবার যৌবনে পেনসিলে আঁকা সুদর্শন মাণিকলালের আত্মপ্রতিকৃতির আড়ালে প্রৌঢ়ত্বের গৃহপ্রবেশের ক্ষণের যন্ত্রণার কথাটা ধরা পড়ে বুঝি। "তান্ত্রিক" আর 'বৈদিক' ছবি করব বাতিক শিল্পীর খেয়াল বলে প্রশ্রয় দিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। মাণিকলাল নিবিড় গভীর একজন মানুষ। তাঁর আন্তরিকতা আমাদের ছুঁয়ে যায়। আমরা ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকি চক্ষুষী মায়ালোকে।

আমার নিজের ভাল লেগেছে মধ্য-প্রদেশ আর বাংলার গ্রামগঞ্জ মানুষজন খোলামেলা প্রকৃতি নিয়ে যেখানে তিনি কাজ করেছেন। সেখানেই মাণিকলালকে আমরা পেয়েছি বেশি। সাহিত্যে অনুরূপ জগৎ সৃষ্টি করেন বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের উভয়ের মানস জগতের সাদৃশ্য বৈপরীত্য নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করা যায়।

মানস আর ধারণার জগৎ ছাড়া রূপবন্ধ এবং কারিগরির দিকে মাণিক-লাল খুবই দক্ষ। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির জন্যে পরিশ্রম করেছেন। পটকে তিনি দ্বিমাত্রিকভাবে ব্যবহার করলেও, প্রয়োজনে ছায়-এর রকমারি বৈচিত্র্যে ত্রিমাত্রিক যাদু তৈরী করেছেন। কখনো কখনো আয়োজন খুবই সামান্য, যেমন তালপুকুর ঘিরে তালগাছ দিয়ে তিনি যে নিসর্গ রচনা করেছেন তা ভাবা যায় না। ছোট্ট একটি ছবিতে মন্দিরের সামনে একটি মানুষ, যেখানে মন্দির অনুপাতে মানুষটা খুবই ছোট করেছেন মাপ-জোকের পরোয়া না করে, সেখানেও কি যেন একটা স্পর্শ করে যায়। মন ভরে ওঠে।

আসলে আবহ রচনার জন্য তাঁর প্রতিটি ছবির টুকরো টুকরো কাজ,

রূপ (স্টাইলাইজেসনের) আশ্রয় নিয়েছেন কিন্তু তুলনায় সামান্য। অথচ ক্যামেরার বাস্তবও এ নয়—চাক্ষুষী দৃশ্যকে মাধুরী পুনর্নির্মাণ করেছেন পটে নান্দনিক মাত্রা বজায় রেখে। "গোধূলী"-তে ধুলো উড়িয়ে গরুর ফেরার সংগে, পেছনের বাড়ি ঘর, জ্বলন্ত কৃষ্ণচূড়া সব মিলিয়ে জমজমাট রূপরূপে। তেমনি বটগাছ তলায় দেবী-মূর্তি দিয়ে "শীতলাতলা" রচনার আটসাঁট বাঁধনে লৌকিক জগতে টেনে নিয়ে গেছেন আমাদের। সিল্কের ওপর আঁকা একটি ছবিতে পূর্ব বাঙলার নদীর ঘাটে বাঁধা নানা রকম নৌকা। পেছনে যাতায়াত করছে গ্রামের মানুষ—পালকীতে চলেছে বড়লোকের ঝি, তারও পেছনে গ্রামের বাড়ির চাল। সব মিলিয়ে দারুণ জৌলুস। মাণিকলাল উৎপল দত্তের স্টেজের মতো পটকে বহু জিনিস দিয়ে সাজিয়ে চোখকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে রস সৃষ্টির যাদুকর। যেমন টিলার ওপর "বেদে দের" সাময়িক তাঁবু খাটানোর দৃশ্য বা মধ্যপ্রদেশের ক্ষীণ পাহাড়ী নদীতে ক্ষরার দিনে বউ ঝিয়ের জল আনার দৃশ্য তিনি গভীর মমতায় ছবিতে রূপান্তরিত করেছেন।

মুঘল অণুচিত্রের ধারা অনুসরণ করে পাখির প্রতিকৃতি এঁকে তিনি আশ্চর্য রসসৃষ্টি করেছেন। "শালিক" কিংবা "চড়ুই" বা 'তিতির' কান্নার মধ্যে এনে আমাদের আবেশে আপ্লুত করেছেন। পাখির ডানার মোলায়েম ভাব, বসে থাকার ভঙ্গী, ঠোঁটের, চোখের বিশেষত্ব ধরেছেন কবজীর জোরে। আমাদের শিশুর মতো অলস মুগ্ধময় ডানার জগতে তিনি টেনে নিয়ে গেছেন।

ধর্মমূলক ছবির মধ্যে "যজ্ঞভূমি" ছবিটা রূপবন্ধ নিয়ে তিনি অত্যাধুনিক পরীক্ষা চালিয়েছেন খুবই সাফল্যের সংগে। গাছে হেলান দিয়ে তানপুরার আদিরূপ (প্রোটোটাইপ) নিয়ে ঋষিকল্প ব্যক্তি সামগান করছেন আরণ্যক পরিবেশ—মাঝখানে পুকুর—চারপাশে চতুর্ভুজ এঁকে যজ্ঞভূমিকে চিহ্নিত করে আলাদা করেছেন। ওপর থেকে ডানা মেলে নেমে আসছে দর্শনরূপ দিব্য পাখি। মাণিকলালের মতে এটা তাঁর "বৈদিক" ছবি—আমাদের কাছে নিছক নির্মাণধর্মী চূড়ান্ত শিল্পকর্ম। ভূমি বিভাজন এবং গঠন নির্মাণ নিয়ে অবিস্মরণীয় অনুচিত্র।

মাণিকলাল আমাদের মনোবীণা তুলির মেরজাপ পরে বড় ওস্তাদের মত বাজাতে জানেন।

কলম্বাসের জাহাজ

অনুজপ্রতিম কবি এবং নট গৌতম চৌধুরীর কবিতার বই থেকে শিরোনাম ধার করেছি। কারণ, নতুন একজন শিল্পীকে আবিষ্কার করা তো নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করার মতোই। কলকাতার অনেক শিল্পী দাঁত-বের-করা দারিদ্র্য রোজ দেখেন বলেই বিবেকের অংকুশের মতো তথাকথিত "সমাজসচেতন" ছবি আঁকেন। তাঁরা অনেক সময় ভাবেন না "ওয়ালিং" বা 'পোস্টারিং'-এর সংগে বাঙালী মধ্যবিত্তেরা অফিসে রাস্তায় নানা অংগভঙ্গী করে মাইনে বাড়াবার বিপ্লব করেন। প্রযোজকরা মঞ্চে বিপ্লব করেন। আর তথাকথিত বামমার্গী কিছু আঁকিয়েদের জ্বালাময়ী ছবি আঁকেন। আমার কাছে এসব মধ্যবিত্তের স্ববিরোধী চরিত্রের অভিপ্রকাশ মনে হয়। অশোক দেবের এমনিতর রেখাচিত্র ছিল প্রদর্শনীর প্রথম দেওয়ালে। পরিষ্কার হাত। কিন্তু "ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত" চিত্রকল্প। অনুপ্রাণিত নয় বলেই ধাক্কা দেয় না। হতাশ হবার মুখে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম তাঁর তৈলচিত্র। বিশেষত নিসর্গের ভেতরে যেখানে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। (বিড়লা আকাদমী ৩—৮ এপ্রিল)।

অশোক দেবের নিসর্গচিত্র আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে গেল। রোমহর্ষ হল, স্পষ্ট বুঝলাম আমি একজন নতুন শিল্পীকে আবিষ্কার করছি। বহুকাল এমন একজন নিসর্গচিত্রীকে কলকাতায় দেখিনি। এমন একটা সূক্ষ্ম আবেগ এবং সংবেদের খেলা যেন ধ্রুপদী অংগের গানের মধ্যে টুকরো টুকরো কাজ, যা পুরো গানটাকে গড়ে তুলছে। যেমন তাঁর "কিউবিক সোনাটা"য় ওপরে আকাশ আর নীচের মাটি দিগন্তে মিশেছে। সম্মুখভাগে জ্যামিতিক আকারে মাটির মধ্যে নানা সূর্যকরোজ্জ্বল বর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে আর সবুজ নীল আকাশে ক্ষয়াটে চাঁদ। কিউবিস্টদের উপাদান ব্যবহার করলেও তাঁর রঙ এমন উষ্ণ এবং প্রবল যে ছবিতে ভিন্নতর মাত্রা এসেছে। তেমনি একটি অনবদ্য ছবি "চাঁদ আর সাগর"—আকাশ আর সমুদ্র উত্তাল আর নিসর্গের দামালপনায় হাবুডুবু খাচ্ছে চাঁদ। অশোক দেব যেন নিজের আবেগ, উত্তেজনা আর অনুভূতির যথার্থ চিত্রকল্প খুঁজে পেয়েছেন। তিনি নিজে উদ্বেল, তাই আমরাও আপ্লুত। বর্ণসমারোহে গাছপালার মধ্যে চাঁদের ছবি "রাত্রি এখনও কাঁচকাঁচা" নীল সবুজের গাঢ় সমাহারে অনবদ্য। এই ধরনের একটি ছবিতে বহুব্যবহৃত পেঁচাকে প্রতীকরূপে আনার ফলে ছবিটা মাঠে মারা গেছে।

অশোকের আরেকটি সুন্দর কাজ হল "উদ্ধারকার্য"—জ্যামিতিক আকারধর্মী এবং প্রায় কিউবিক কাজ—বন্যায় বা ভূমিকম্পে ভাঙাচোরা বাড়িঘরের পরিবেশে কিছু মানুষ। হালকা সবুজ, নীল, ধূসর রঙের মধ্যে সামান্য সিঁদুর ব্যবহার করে যেন ঐকতান গড়েছেন মেজাজে, দরাজ হাতে, ফলে ছবিটা টইটম্বুর।

অশোক দেব তৈলচিত্রের ব্যবহার জানেন, আর বর্ণ সম্বন্ধে অকৃপণ বলেই অন্য মাত্রা যোগ হয়। পরের বার তিনি নিশ্চয় নির্বাচনের ব্যাপারে নির্মম হবেন, কারণ ভাল কাজের পাশে ভাবাবেগের এমন ফানুস ছিল যা মনটাকে খিঁচড়ে দিচ্ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক ললিতকলার নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে যখনই ছোট এবং পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির প্রাদেশিক ললিতকলার সক্রিয়তার তুলনা করি তখন লজ্জা হয়। কারণ বাংগালী প্রতিষ্ঠান গড়া এবং চলার ব্যাপারে প্রায়শ অক্ষমতার পরিচয় দেয়। পশ্চিমবংগে ললিতকলা সারা বৎসর কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমায়। শুধু মাঝে একবার জেগে উঠে আকাদমী অব ফাইন আর্টসে একটা প্রদর্শনী করে (১১ই ফেব্রুয়ারীতে এবারে ওদের বার্ষিকী শুরু হল)। যথারীতি এতে কলকাতার বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পী অংশগ্রহণ করেন নি। ফলে প্রদর্শনীর মান খুবই নিম্নশ্রেণীর যদিও কলকাতার দু-চারজন নির্বিরোধী ভাল শিল্পীদের কাজ এতে ছিল। বাদবাকী কাজ প্রায় আর্ট কলেজের শিক্ষার্থী স্তরের। যেমন স্বপনকুমার রায়ের "গতি" বলে একটা কাজ ছিল—যা পুরস্কৃতও হয়েছে ভাস্কর্য বিভাগে—রূপোয় করা। কয়েকটা রূপোর বালাকে চাকার মতো সাজিয়ে তার ওপর বাড়ির মতো ক্ষুদে মাথা বসানো। কাজটির মধ্যে ভাস্কর্যের বিশালত্বগুণ (মনুমেন্টালিটি) ছিল না। সাইকেল রেসের গতির স্কেচ বলা যেতে পারে এইমাত্র।

কিছু কাজ ছিল যা প্রদর্শিত হবার উপযুক্ত নয়। গোপীনাথ রায়ের বাটিকের টুকরো বাঁধিয়ে ঝোলানো যেমন। জলরঙ বিভাগে গুটিকয়েক—হাতে গোনা যায়—কাজ তবুও এরই মধ্যে মন্দের ভাল। বিশ্বপতি মাইতির "হারানো প্রতিমা" বিসর্জনের সময় ভাঙা ঠাকুরের ছবি। মাটিতে মুখ মুখোশের মতো পড়ে আছে। কাজটি সূক্ষ্ম রসের। মনোজকুমার মাইতির কিষাণগড়ের অনুচিত্রের রাধাদের একজন আধুনিক যুবককে চামর দুলিয়ে বাতাস দিতে দেখা গেল। পেছনে বাড়ি-ঘর মাঠ—বেশ মিঠেকড়া জর্দা দেওয়া পানের মতো। মনোজ মিত্রের জার্মান দেখতে এক ভদ্রলোক "একা" পার্কের বেঞ্চিতে। পেছনে ফুলবাগানে একটা সাপ। এই ধরনের গণেশ পাইনীয় কাজ কিছু চোখে পড়ল। সুধীরঞ্জন মুখার্জীর "আনন্দ" সিল্কের ওপর ধোঁয়াটে বাংলা কলমের কাজের মতো আঁকা দুর্গাপূজার দৃশ্য। সমীর মণ্ডলের পাতার জালের মধ্যে একটা আরোপিত প্রজাপতি জলরঙের একটা ভাল কাজ এবং পুরস্কৃত। তেলরঙে নির্মল দত্তের আঁকা শুয়োরটা অনেকটা জীবাশ্মর মতো এবং তেলচুকচুকে হলেও আদিরূপাত্মক (আর্কিটাইপেল)। টেম্পেরায় "রামায়ণী কথা" অসিত মণ্ডলের চিরাচরিত সূক্ষ্মরেখার তন্তুজালে আঁকা কাজ।

ভাস্কর্য বিভাগে দেবব্রত চক্রবর্তীর পুরস্কারপ্রাপ্ত "আমরা এবং নেতা" ব্রোঞ্জে করা ছোট অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ রূপারোপিত কাজ। নেতা অনেকটা দৈত্যসাদৃশ্য এবং আমরা ইতস্তত ছড়ানো ক্ষুদে নগণ্য মানুষ। ভাস্কর্যগুণান্বিত বিশালত্বনিহিত সুন্দর মূর্তি। এরপর "সূর্যদেব"-এর কথা বলতে হয়। যদিও কাজটায় সূক্ষ্ম মোচড় নেই।

বেশিরভাগ কাজ গতানুগতিক। খারাপ কাজ এত যে ভাল কাজ চোখে পড়ে না।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

জুরমানা

এক হোটেলে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচন সূত্রে ক্যাবারে এবং শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত সুন্দরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে প্রচণ্ড মারপিঠ দেখে আর পাঁচটা ছকেবাঁধা হিন্দী ছবির আভাসই পাওয়া যায় একেবারে শুরুতেই। কিন্তু পরের দৃশ্য থেকেই ধারণা পালটে যায়। দেখা যায় হুজ্জতের নায়ক ইন্দ্র সাকসেনা (অমিতাভ বচ্চন) এক ধনী কন্ট্রাক্টরের ভাগনে এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী। বিয়ের আগে তার ভাবি বধূ অপর একজনের সংগে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই ইন্দ্র পকেটের জোরে একের পর এক মেয়েকে অংকশায়িনী করে তার মনের জ্বালা প্রশমিত করতে থাকে। কিন্তু ওকে ঠেক খেতে হল উত্তরপ্রদেশের এক উপনগরীতে এসে। এখানেই দেখা হল তার সহপাঠি প্রকাশ (বিনোদ মেহরা), শিক্ষক শর্মা (শ্রীরাম লাগু) এবং শর্মার কন্যা রমার (রাখি)

অমিতাভ ও রাখি

সাথে। শান্ত প্রকৃতির রমা কবিতা নিয়েই সময় কাটায়; আর কাজের মধ্যে বৃদ্ধ পিতার দেখাশোনা করে। প্রকাশ রমাকে পাবার আশা মনে-মনেই পোষণ করে রেখেছিল, কোনদিন তা বুঝতে দেয়নি। ইন্দ্র তার মিষ্টভাষণে রমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করল। ইন্দ্র প্রকাশের সঙ্গে বাজি ধরল যে পনের দিনের মধ্যেই রমাকে সে তার শয্যাকক্ষে দেখাতে পারে। ঘটলও তাই। ঘটনাক্রমে ইন্দ্রর এক প্রাক্তন শয্যাসঙ্গিনীরও সেখানে আবির্ভাব অধ্যাপক শর্মার ইন্দ্র সম্পর্কে ঘৃণা ও সেই সাথে কন্যা রমার প্রতি বিরূপ করে তুলল। এমন কি অমন কন্যার তিনি মৃত্যুও কামনা করলেন। আড়াল থেকে পিতার কথা শুনে মনোদুঃখে রমা গৃহত্যাগ করল। এর পর আত্মপরিচয় গোপন করে এক অজ গ্রামের স্টেশন মাস্টারের (অ সয়ানি) কোয়ার্টারে আশ্রয় লাভ; স্টেশনমাস্টারের গায়ক মামা (এ কে হঙ্গল)। কাছে গান শিখে থাকতে অভ্যন; ইন্দ্র

কর্তৃক রমাকে খুঁজে পাওয়া এবং পরিশিষ্টে, বলা বাহুল্য, ওদের মিলন।

বিমল দত্ত রচিত কাহিনীটিতে এমন ঘটনা কিছু আছে যা আগেও অন্য ছবিতে দেখা গিয়েছে। কাহিনী মামুলি ধাঁচের কিন্তু পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের বিন্যাসদক্ষতা গোড়া থেকেই দর্শক মনে হৃদয়াবেগ সঞ্চারে এমন সফল যে কাহিনীর ত্রুটির প্রতি সজাগ হবার অবকাশ ঘটে না। হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম খ্যাতি চিত্র সম্পাদনায়। এ ছবিতেও ঘটনাবলীর উপস্থাপনে অসাধারণ সম্পাদনা কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্র, রমা, প্রকাশ প্রমুখের মানসিক দ্বন্দ্ব পরিচালক সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ বিষয়ে পরিচালক অভিনয় শিল্পীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা আদায়ে সক্ষমও হয়েছেন। বস্তুত পরিচালনকৃতিত্বকে মনোগ্রাহী করে তোলায় অমিতাভ, বিনোদ, রেখা, শ্রীরাম লাগু, ফরিদা জালাল (রমার বান্ধবীর ভূমিকায়), আসরানি প্রভৃতি সকলেরই সুসংযত অভিনয় ছবিখানির উপভোগ্যতা সুদৃঢ় করেছে। ডঃ রাহি মাসুম রাজার সংলাপ প্রশংসনীয়। ক্যামেরার কাজে জয়ন্ত পাথারে, সুরযোজনায় লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল এবং শিল্পনির্দেশনায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিখানির সৌষ্ঠবে একটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা । শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশনের (রবীন্দ্রসদন, এপ্রিল ১৭-২১) দুই প্রধান আকর্ষণ ছিলেন কণ্ঠশিল্পী পণ্ডিত ভীমসেন যোশি ও সেতারবাদক ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ। প্রথমোক্তের দুটি বৈঠকই (এপ্রিল ১৯ ও ২১) শ্রোতাদের হতাশ করে। দ্বিতীয়োক্তের বৈঠক তাঁর গত দুই তিন বছরের সকল বৈঠকের চেয়ে অনেক উচ্চ মানের হয়। ভীমসেন যোশির প্রথম বৈঠকের প্রধান নিবেদন ছিল তাঁর স্বরচিত কলাশ্রী রাগে (কলাবতী ও রাগেশ্রীর মিশ্রণ) মধ্য-বিলম্বিত ঝাঁপতাল ও দ্রুত তিনতাল খেয়াল। প্রথমটির বিস্তারের কাজ এলো-মেলো ও তাৎপর্যহীন হয়েছিল এবং তাঁর কণ্ঠস্বরও ক্ষীণ ও বেসামাল শোনায়। অন্তরার বিস্তারের কাজে শিল্পী নিজ মানে ফিরে আসার খানিকটা আভাস দিলেও শেষ পর্যন্ত অক্ষম হন। দুটি তার-সপ্তকের পুকার রীতিমত বেসুরো শোনায়, তানের কাজও দুর্বল ও অসংলগ্ন হয়। দ্রুত খেয়ালটির তানকারি তুলনায় খানিকটা ভাল হলেও উচ্চমানের হয়নি।

একটি সাঁই ভজনের পর শিল্পী যে সাহানা রাগাশ্রিত দ্রুত বন্দেশটি শোনান সেটি আগের খেয়ালগুলির চেয়ে ভাল হয়েছিল তবে শিল্পীর তার-সপ্তকের পঞ্চম লাগানোর প্রচেষ্টা বেসুরো। শেষের শুদ্ধ পিলু-ঠুংরীটি ভাল হয়েছিল। এই বৈঠকে আগে শোনা যায় দুলাল রায়ের সন্তুর বাদন, অপর্ণা চক্রবর্তীর খেয়াল ও

কালিদাস সান্যাল

ভজন এবং সুব্রত রায়চৌধুরীর সেতার বাদন।

ভীমসেন যোশির দ্বিতীয় বৈঠক (এপ্রিল ২১) প্রথম বৈঠকের চেয়েও খারাপ হয়েছিল—তাঁর মেঘ-মল্লার রাগে ঝাঁপতাল খেয়ালটিতে আগের দিনের গানের সকল ত্রুটিগুলো তো ছিলই উপরন্তু শিল্পী মিয়াঁকি মল্লারের ণ ধ ন স পদ বার বার ব্যবহার করায় রাগরূপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শিল্পী এবারে প্রায়ই বেসুরো হয়ে পড়ছিলেন। সুরদাসী-মল্লার রাগে দ্রুত খেয়ালটি একই মানের হয়েছিল এবং এটিতেও শিল্পী অকারণ মিয়াঁ মল্লারের উপরোক্ত পদটি প্রায়ই ব্যবহার করছিলেন।

এই বৈঠকটি ছিল সম্মেলনের শেষ দিনের শেষ বৈঠক। এদিনের অনুষ্ঠান করবী সেনগুপ্তর নৃত্য দিয়ে শুরু হয় এবং এরপরে ছিল পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণের খেয়াল যা আমার পক্ষে শোনা সম্ভব হয়নি। এদিনের তৃতীয় শিল্পী বাঁশি-বাদক। প্রবীর ঘোষ ইমন রাগে আওচার, জোড় ও দুটি গৎ বাজিয়ে শোনান চলনসই পারদর্শিতার সঙ্গে। এরপরে শোনা যায় সম্মেলনের সম্পাদক কালিদাস সান্যালের কণ্ঠসংগীত। এর সাজগিরি রাগ (কেবল শুদ্ধ ধৈবৎ যুক্ত সংস্করণ) খেয়াল দুটিতে সুরেলা ও পরিচ্ছন্ন বিস্তারের কাজ ও একই মানের দানি সরগম ও তান ছিল। পরের কাফি ঠাটের ...ওনি রাগে রূপক তালে বন্দেশটিও ভালই হয়েছিল। একটি ঠুংরী ও ভজন গেয়ে তিনি তাঁর বৈঠক শেষ করেন।

ভীমসেন যোশির বৈঠকের ঠিক আগের বৈঠকটি ছিল বেহালা শিল্পী শিশিরকণা ধরচৌধুরীর। এঁর শুদ্ধ কল্যাণ রাগে ঘন মীড়-আশ যুক্ত

বিলায়েৎ খাঁ

...টির স্বরপ্রগতি ছিল মসৃণ ও সুপরিকল্পিত। জোড়ের প্রথমার্ধ তুলনায় খানিকটা নিষ্প্রভ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে ভাল গমক ও গমকতানকারির কাজ ছিল। দেশ রাগে বিলম্বিত তিনতাল গৎটির বিস্তারের কাজ আনন্দদায়ক হয়েছিল এবং ছন্দের কাজে সুর ঠাসা ছিল। তানকারিও ভাল হয়েছিল।

ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ বসেছিলেন সম্মেলনের চতুর্থ সন্ধ্যায় (এপ্রিল ২০) এবং তাঁর প্রধান নিবেদন ছিল যোগ রাগে আলাপ, জোড় ও একটি মধ্য-দ্রুত তিনতাল গৎ। আলাপের প্রথম দশ মিনিটে নিচের প্ ণ্ স জ্ঞ অংশের চুলচেরা ও রসালো বিস্তার শোনা যায় এবং শিল্পী জুড়িতে নেমে গিয়ে খাদের মধ্যম ও গান্ধার লাগিয়ে প্রধান স্বরবিন্যাসের সমর্থন করেন। সূক্ষ্ম মীড়ের কাজ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বরবিন্যাস শোনা যায় এই অংশে। তবে জুড়িতে কোমল গান্ধারযুক্ত আরোহণ অর্থাৎ জ্ঞ ম্ প্ প পদ শোনা যায় অন্তত দুবার এবং এতে রাগরূপ ক্ষণিক ভাবে বিকৃত হয়।

গ ম প ম গ ম জ্ঞ স অংশের

পণ্ডিত যশরাজ

বিস্তারেও ছিল অসাধারণ বৈচিত্র্য ও আকর্ষণীয়তা। উত্তরাঙ্গের বিস্তারও উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং গমক ও ছোট ছোট আলংকারিক তানের সাহায্যে শিল্পী এই অংশের মহিমা বাড়িয়ে তুলেছিলেন। অন্তরা বিস্তারও খুব জমেছিল।

জোড়টি সর্বদিক থেকেই আলাপের সমকক্ষ ছিল এবং শিল্পী এটিতে উচ্চাঙ্গের মীড়খণ্ড, মীড়, বোল, মধ্যলয় তান ও আশ্চর্য গমক-কৃন্তনের কাজ করেন। যে দুর্ধর্ষ গায়কি-অঙ্গের তানকারি দিয়ে জোড়টি শেষ হয় তাতে পাঁচ-দশ বছর আগেকার বিলায়েৎ খাঁর তানে যে দাপট, অবার্থতা ও শিল্পবোধ থাকতো তাইই ছিল পরিপূর্ণ ভাবে। জোড়ের শেষে কোনো ঝালা বাজানো হয়নি।

মধ্য-দ্রুত তিনতাল গৎটির কাঠামো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল—দোড় ছন্দের মুখড়াটি উঠছিল দশমাত্রা থেকে এবং সমে আসছিল ১৩ মাত্রা থেকে চারটি বরাবর টোকার মাধ্যমে। শেষ হওয়ার আগে ৫ মাত্রা থেকে গৎটি চৌগুনে উঠে বাজছিল। বলাবাহুল্য এই ধরনের বন্দেশের সঙ্গে তবলার কায়দা, রেলা বা টুকরা খাপ খায় না; কাজেই শংকর ঘোষের তবলা খালি ঠেকাই বাড়িয়ে গিয়েছিল—খালি একবার বোধ হয় একটি অতি সংক্ষিপ্ত তেহাই গোছের কিছু বেড়েছিল।

এই গৎটিতে বিলায়েৎ খাঁ উচ্চাঙ্গের দুনি, তিগুনি ও চৌগুনি তানকারি বাজান। দক্ষ বোলকারি, ঘাঁষৎ ও গমকের কাজও শোনা যায় এবং ঠিক যেখানে প্রয়োজন সেখানেই বেজে ওঠে দীর্ঘ মীড়যুক্ত গায়কি ঢঙের বিস্তারের কাজ। গৎটি যে লয়ে আরম্ভ হয়েছিল প্রায় সেই লয়েই শেষ হয় পুরানো মধ্যদ্রুত খেয়ালের কায়দায় এবং শেষে কোন ঝালা ছিল না।

বৈঠকের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল অপেক্ষাকৃত লঘু ঢঙের এবং বিলায়েৎ খাঁর কণ্ঠ ও সেতার যথারীতি সমান প্রাধান্য পেয়েছিল তাঁর 'পিলু অঙ্গাকি খাম্বাজের' আওচারে এতে পিলু ছাড়া কাফি ও শাহানাও ছিল। দ্রুত গৎটি রাগমালায় পরিণত হয় এবং ভৈরবীতে আওচার ও 'পাঞ্জাব অঙ্গাকি গৎ' দিয়ে বৈঠকটি শেষ হয়।

এদিনের অনুষ্ঠান অনুরাধা লোহিয়ার নৃত্য দিয়ে শুরু হয় এবং এরপরে শোনা যায় কঙ্কনা বন্দ্যোপাধ্যায় মারোয়া রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল। স্বর্গীয় ওস্তাদ আমীর খাঁর ঢঙে গাওয়া। বিলম্বিতটির বিস্তার ও সরগমের কাজ ভালই হয়েছিল। দ্রুত খেয়ালটিতে ও পরের সাহানা রাগে খেয়াল ও তারানাটিতে তান ও সরগমের কাজ পরিচ্ছন্ন ও সুরেলা হয়েছিল।

সম্মেলনে প্রথম সন্ধ্যার প্রধান শিল্পী ছিলেন সুনন্দা পট্টনায়ক এবং ইনি মালকোষ রাগে বিলম্বিত খেয়াল, দ্রুত খেয়াল ও তারানা গেয়ে শোনান। এঁর বিস্তারের কাজে কোনো কাঠামোগত উন্নতি না হয়ে থাকলেও এবার স্বরের রেশ বেশি ছিল। দ্রুত খেয়ালটিতে সুরচ্যুতিও কম ছিল।

এদিন প্রথম শিল্পী ছিলেন সুভাষ চাকলাদার। এঁর মধুবন্তি রাগে বিলম্বিত খেয়ালটির বিস্তারের কাজে তাৎপর্যপূর্ণ স্বরপ্রগতির অভাব থাকলেও সুর যথেষ্ট ছিল। সরগমের কাজও একই শ্রেণীর ছিল তবে তানকারিতে দানার অভাব ছিল। একই রাগে ঝাঁপতাল বন্দেশটি তিনি এত অল্পক্ষণ গেয়েছিলেন যে এটি না গাইলেও কোনো ক্ষতি হতো না। দ্রুত তিনতাল খেয়ালে তানকারি খানিকটা ভাল হয়েছিল। এঁর বৈঠকের পরে বন্দনা সেন কথক নৃত্য পরিবেশন করেন মহাপুরুষ মিশ্রের সহযোগিতায়।

পরের শিল্পী দুর্গাশংকরের মারুবেহাগ রাগে বিলম্বিত খেয়ালটির বিস্তারের কাজ সুরেলা হলেও বড় একঘেয়ে হয়ে পড়ছিল। এই খেয়ালটির শেষাংশে তানের কাজ মোটামুটি ভাল লেগেছে। একই রাগে একটি অতি সংক্ষিপ্ত দ্রুত খেয়ালের পর শিল্পী একটি কাজরি গেয়ে শোনান।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম শিল্পী ছিলেন শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সুনন্দা পট্টনায়েক

অনিবার্য কারণে এঁর বৈঠকের প্রধান অংশ শোনা সম্ভব হয়নি। শেষের বাংলা টপ্-খেয়াল ও টপ্পা দুইই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। এরপর শোনা যায় সিপ্রা বসুর মেঘ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল। বিস্তারের কাজ সুরেলা হলেও তাতে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল। তানকারিতে শিল্পীর খানিকটা উন্নতি দেখা গেল। এর পরের শিল্পী ছিলেন সরোদবাদক বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত এবং ইনি জয়জয়ন্তী রাগে আলাপ, জোড় ও দুই গৎ বাজিয়ে শোনান।

এদিকের শেষ শিল্পী পণ্ডিত যশরাজের বাগেশ্রী রাগে বিলম্বিত খেয়ালটির বিস্তারের কাজ সাধারণত যা হয়ে থাকে তার চেয়ে সুপরিকল্পিত হয়েছিল। স্বরমাধুর্যও ছিল অসাধারণ। নিচের দিকের ম্ ধ্ ণ্ স অংশের বিস্তার ভাল হয়েছিল তবে পরের অংশের (অর্থাৎ ধ্ ণ্ স জ্ঞ ম) সুষ্ঠু বিস্তারের দিকে শিল্পী মন দেননি এবং গুরুত্বপূর্ণ স ম বিন্যাস একেবারেই ব্যবহার করেন নি। নিষিদ্ধ স র জ্ঞ ও জ্ঞ স পদও শোনা যায় কয়েকবার। শেষাংশের সরগমের কাজ এবং দ্রুত একতাল খেয়ালটির তানকারি ভাল হয়েছিল। কেদার রাগে দ্রুত তিনতাল খেয়ালটির তানকারি ভাল হয়েছিল। মালকোষ রাগে একটি রূপক তালে নিবদ্ধ বন্দেশ গেয়ে শিল্পী তাঁর বৈঠক শেষ করেন।

নীলাক্ষ গুপ্ত

রবীন্দ্রসদনে গানের আসর : প্রথম পর্ব

গতবার ছিল সাত দিনের, এবারে বেড়ে হয়েছে ন' দিনের। রবীন্দ্রসদনের পর্যায়-ভিত্তিক গানের আসরের এই বাড়তি দিনের সুযোগ পেয়েছেন কিছু তথাকথিত জনপ্রিয় শিল্পী—যাঁদের সবাই অন্তত রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুণী শিল্পী রূপে গ্রাহ্য হবেন না, কিছু পৃষ্ঠপোষিত শিল্পী—যাঁরা না-গুণী না-জনপ্রিয়, দু-একজন যথার্থ গুণী, আর কয়েকজন সম্ভাবনাপূর্ণ নবীন শিল্পী।

এই আলোচনা প্রথম পাঁচটি আসর নিয়ে; পূজা (১৩ মে), প্রেম (২০ মে), প্রকৃতি (২৩ মে), নৃত্যনাট্য ও নাটকের গান (২৭ মে) এবং বিচিত্র-স্বদেশ-আনুষ্ঠানিক (৩০ মে) পর্যায়ের অন্তর্গত। এ থেকে বোঝা যাবে যে, মে মাসের মধ্যেই মোটামুটিভাবে সব ক'টি পর্যায়ের আসর একবার করে অনুষ্ঠিত। জুন মাসের আসরে এই-সব পর্যায়ের গানই দ্বিতীয়বার পরিবেশিত হবে।

দু-দিন বেড়েছে, তবু লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত কয়েকটি বিশিষ্ট নাম। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, শান্তিদেব ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস এবং অমল নাগ—আমন্ত্রিত শিল্পী তালিকায় এঁদের নাম নেই। এঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ নিশ্চিত রয়েছেন যাঁরা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন বা করছেন কোনো নিগূঢ় কারণে। কিন্তু নিশ্চিত করে এ-কথাও বলা যাবে না যে, এঁদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিনা। সদন-কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিবেদনে অন্তত এ সম্পর্কে কোনো প্রকাশ্য উল্লেখ নেই। বরং নিয়মিত নাম ছাপা হয় এবং নিয়মিত অনুপস্থিত থাকেন যে-শিল্পী, সেই অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর নাম এবারেও ছাপা হয়েছিল। এবারেও তিনি আসেননি। পর পর তিন বছর হল। প্রথম পাঁচ দিনের আসরের নির্ধারিত শিল্পী-তালিকায় উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা এবং শ্রীলা সেনের। আর যে-দুজন অনুপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও গীতা দে। নির্ধারিত তালিকায় সংযোজিত নাম—পূরবী মুখোপাধ্যায়। বিচিত্র-স্বদেশ-আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের আসরে তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল বাড়তি-পাওনা হিসেবে। সেদিন অবশ্য তাঁকে স্বাভাবিক স্ফূর্তিময় ব্যক্তিত্বে পাওয়া যায়নি। দমের কষ্ট ছিল। গান শোনালেন, কিন্তু রেশ রেখে যেতে পারলেন না। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সাগর সেন, এঁদের নাম—একই রকম অননুধাবনীয় কারণে—এক দিনের আসরে দেখা গেল। দু দিন করে আমন্ত্রিত যাঁরা, তাঁদের অনেকের তুলনায় এঁরা যে অগ্রগণ্য শিল্পী এতে কি সন্দেহের অবকাশ রয়েছে? অবশ্য এই কারণেই কিনা জানি না, দু দিনের আসরের নির্ধারিত গানই এক দিনের আসরে শোনালেন এঁরা। সাগর সেন নির্ধারিত ছিলেন প্রকৃতি-পর্যায়ের আসরে। দুটি গান গাইলেন তিনি। তার একটি—আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল

আলপনা রায়চৌধুরী

কে—'প্রেম' পর্যায়ের, অন্যটি—কৃষ্ণকলি 'বিচিত্র' পর্যায়ের। সাগর সেনকে অবশ্য সুস্থিরও মনে হয়নি সেদিন। শুধু অন্য পর্যায়ের গান নির্বাচনই নয়, নির্বাচিত গানের কথা-ভুলেও তাঁর অন্যমনস্কতা ধরা পড়ছিল। 'সে ঢেউয়ের মতো' বলে নিজেই শুধরে নিলেন, নির্ধারিত পঙ্‌ক্তিটি ছিল 'সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল ঘুমের ঘোর।' হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রকৃতি-পর্যায়ের আসরে যে চারখানি গান শোনালেন তার একটি ছিল 'বিচিত্র' পর্যায়ের, অন্যটি 'প্রেম' পর্যায়ের, বাকি দুটি 'প্রকৃতি'র। তবে আসরটি প্রকৃতির হলেও 'প্রেম' পর্যায়ের 'এমন দিনে তারে বলা যায়' কি 'বিচিত্র' পর্যায়ের 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়' যে কীভাবে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল সেই আসরের মূলে সুরের সঙ্গে তা কানে না শুনলে বিশ্বাস হয় না। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের পুরনো লাবণ্য নতুন করে দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল সেদিন, কণ্ঠের জীর্ণতাকে জয় করে নিতে তাঁর চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না, সেই ঐকান্তিকতার জন্যই বোধ হয় তাঁর গানে আলাদা রকমের একটা পরিবেশ

কৃষ্ণা মিত্র

রচিত হয়ে প্রেম আর প্রকৃতি একাকার করে দিয়েছিল।

এই পাঁচ দিনের আসরে বহু সম্ভাবনাময় নবীন শিল্পীকে যেমন পাওয়া গিয়েছে, তেমনই কয়েকজন অন্তর্ভুক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে পারেননি। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কল্পনা ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত সেন, শুভ্রা সান্যাল, প্রতিমা মৌলিক ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—শেষোক্ত শ্রেণীর। সুচিন্তা দত্ত ও গায়ত্রী চৌধুরীর স্বরক্ষেপণ নিয়ন্ত্রিত হলে ভাল গাইবেন, গলা কিছুটা কাঁপে। মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায় গত বছর নজরুল গীতির আসরে যে-সম্ভাবনাময় মান দেখিয়েছিলেন, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরে সেই মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। তাঁরও গলা কাঁপে, এলোপাতাড়ি নাটকীয়তার দিকেও ঝোঁক। অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত, 'রজনীর শেষ তারা'য় পরবর্তী দন্ত্য বর্গের প্রভাবে দন্ত্য স উচ্চারণের দিকে প্রবণতা এসে গিয়েছিল তাঁর—'শেষ তারা' হয়ে উঠেছিল 'শেস্ তারা'।

'আমার সুরে লাগে তোমার হাসি'র স্নিগ্ধ মুডটিও তাঁর কণ্ঠে তেমন ধরা পড়েনি। কৌশিকী মজুমদার, মধুমাধবী ভট্টাচার্য এবং হৃষীকেশ সেন কিছুটা নার্ভাস ছিলেন, তা সত্ত্বেও শিক্ষিত গায়কীর ছাপ চিনে নেওয়া যায়। চন্দ্রিমা দত্ত, রমা বিশ্বাস, প্রণতি দাস, শর্বাণী সেনগুপ্ত, চিত্রা রায়, রিনি মিত্র, শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত, ভাস্বতী মুখোপাধ্যায় এবং দেবস্মিতা ঘোষ কমবেশী সম্ভাবনাপূর্ণ। বিশেষত রিনি মিত্রের 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ', ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়ের 'কে উঠে ডাকি', দেবস্মিতা ঘোষের 'বড়ো বিস্ময় লাগে', চিত্রা রায়ের 'হার মানালে গো' এবং শ্যামশ্রী দাশগুপ্তের 'আমি শ্রাবণ আকাশে ওই' দক্ষতাপূর্ণ পরিবেশন। রমা রায়চৌধুরীর কণ্ঠও আশ্চর্য সবল ও সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর গায়কীতে সুচিত্রা মিত্রের অবিকল অনুকরণ প্রকটভাবে কানে লেগেছে। চিত্ত বসুমল্লিকের গানও অমৌলিক গায়কীর কারণে রবীন্দ্র-সঙ্গীত না হয়ে 'দ্বিজেন্দ্রগীতি' হয়ে উঠেছিল (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ক্ষমা করবেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের অন্ধ অনুকরণ বোঝাতে কথাটি ব্যবহার করতে লোভ হল)। অলোক ঘোষ 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' সুন্দর গেয়েছেন, 'সে কি ভাবে গোপন রবে'র লয়টি ধরতে পারেননি। রুণু মতিলাল ও সুপ্রিয়া রায়চৌধুরী যদিও রবীন্দ্রসদনের আসরে এবারই প্রথম গাইলেন, তবু তাঁরা তত নতুন নন। রুণু মতিলালের পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট ভঙ্গি প্রশংসনীয়। সুপ্রিয়া রায়চৌধুরীর 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ'-এ প্রার্থনার ভঙ্গিটি ফুটে ওঠেনি, 'কোন সে ঝড়ের ভুল' চমৎকার জমে উঠেছিল। গোপাল পাত্র নতুন, কিন্তু বহু পুরনোদের মতো গলা চেপে গান করেন। বিভাস ঘোষের 'আনমনা আনমনা' বেশী ভাল লেগেছে।

আভরূপ গুহঠাকুরতা, গীতা মাইতি, শ্রীনন্দা চৌধুরী এবং মিতা দস্তিদারকে আরও স্ফূর্তিময় এবং আরও সজীব লেগেছে এবার। এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রভাতে বিমল আনন্দে' যতটা নিপুণ, ততটা বিবশকারী পরিবেশন নয়। এক-জায়গায় হোঁচটও খেলেন তিনি। 'হৃদয় বাসনা'তে বরং তিনি নিজেও পূর্ণতর। আশিস ভট্টাচার্যের কণ্ঠটি সুরেলা এবং ভরাট, গায়নভঙ্গিও বিস্ময়কররূপে পরিচ্ছন্ন। তাঁর কণ্ঠে 'আমার নিখিল ভুবন হারালেম যে' এবং 'কোথা বাইরে দূরে' বিশেষ স্মরণীয় পরিবেশন। প্রভাতকুমার পাল দুটি গানই দক্ষতার সঙ্গে নিবেদন করেছেন। বিজয়কুমার সিংহের 'জাগো হে রুদ্র জাগো', অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সব দিবি কে', রমা সিংহের 'না গো এই যে ধুলো', প্রসূন দাশগুপ্তের 'এ ভারতে রাখো নিত্য', পূর্বা দামের 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে' কানাই মুখোপাধ্যায়ের 'মরুবিজয়ের কেতন', ধীরা মুখোপাধ্যায়ের 'ওকে বলো সখী বলো', শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্যের 'কে বলেছে তোমায় বঁধু', প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের 'তোমায় গান শোনাব', মেখলা দাশগুপ্তের 'আমার মনের মাঝে যে গান', মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এই কথাটি মনে রেখো', হিমঘ্ন রায়চৌধুরীর 'রাঙা পদ

সুভশ্রী মুখোপাধ্যায়;

পদ্ম যুগে', বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', সুপ্রীতি ঘোষের 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে' এবং বুলবুল সেনগুপ্তের 'এ কী করুণা' উল্লেখযোগ্য পরিবেশন। বুলবুল সেনগুপ্তের দম অবশ্য কমের দিক, ধরা পড়ে। বন্দনা সিংহের দুটি গানেরই—'শান্তি করো বরিষণ' ও 'জানি হে যবে প্রভাত হবে'—নির্বাচন এবং নিবেদন প্রশংসনীয়। মঞ্জরী লালও কৃতিত্বের সঙ্গে বেছেছিলেন একতালা গারা ভৈরবী ভজন 'কোথা আছ প্রভু।' কিন্তু পরিবেশনে কৃতিত্ব ছিল না। 'স'-এর সফিস্টিকেটেড শ শব্দের গোটা গোটা উচ্চারণ কানে লেগেছে, কানে লেগেছে মন্দ্রসপ্তকে তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্যও! সংঘমিত্রা গুপ্তের কণ্ঠটি চমৎকার। 'এ পরবাসে' গান আসরের পরিবেশ শেষ দিকে বেশ ঘন হয়ে এসেছিল। শুধু তাঁর তানবিস্তার তেমন পরিচিত মনে হল না। 'অন্ধকারের উৎস হতে'তে গান ছাপিয়ে উঠেছিল তবলার আওয়াজ। গোরা সর্বাধিকারী, সুনীল মল্লিক ও অরুণ দত্ত কোনো বিশেষ ছাপ ফেলেননি। ছন্দা দাশগুপ্তের শশব্যস্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত গায়নভঙ্গি ভালো লাগেনি। খারাপ লেগেছে গৌতম মিত্রের উৎকট আধুনিক ভঙ্গিও। 'মালা তোমার দেব গলে' বলে বারবার যে-ভাবে ধাক্কা মারছিলেন, তা রবীন্দ্রসঙ্গীতে অসহ্য। এই গানেরই একটি পঙ্‌ক্তি 'গান এসেছে সুরে আসে নাই'—তাঁর ক্ষেত্রে উল্টে ভাবে সত্যি। সুর এসেছে, গান আসে নাই—এ-কথাই বলতে ইচ্ছে করে। মীরা গুপ্ত তানপুরা ছেড়ে হারমোনিয়াম ধরেছেন এবার, কিন্তু কণ্ঠের দুর্বলতা ঢাকতে পারেননি। সুপূর্ণিমা চৌধুরী এবং অরবিন্দ বিশ্বাসকে পূর্ণ মেজাজে পাওয়া যায়নি এবার। মায়া সেন দু দিনের আসরে ছিলেন। বিচিত্র-স্বদেশ-আনুষ্ঠানিকের দিনে তাঁর কণ্ঠ কিছুটা ভার ছিল, গানে বারবার তার প্রভাব পড়ছিল। তুলনায় প্রেম পর্যায়ের আসরে বরং বেশী স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি। 'নীলাঞ্জন ছায়া' অসামান্য পরিবেশন। দ্বিতীয় গানে (আমার যেতে সরে না মন) 'পদে পদে বাধা পাই' পঙ্‌ক্তিতে ঈষৎ বাধা পেয়েছিলেন, পদে-পদে পাননি। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠও 'পূজা'র তুলনায় 'প্রকৃতি'র আসরে

[illegible] হেমন্ত ঋতুকে তিনি প্রকৃতির আসরে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। শীত অবশ্য উপেক্ষিতই ছিল প্রথম দিনের 'প্রকৃতি'র আসরে। চিত্রলেখা চৌধুরী ছিলেন নৃত্যনাট্য ও নাটকের গানে। তিনি বেছেছিলেন বাল্মীকি প্রতিভার বালিকার গান। নিখুঁত তাঁর পরিবেশন, কিন্তু আপ্লুত করে না। শৈলেন দাশও ছিলেন ওই একই আসরে। দুটি বিপরীত মেজাজের গান—এখনো গেল না আঁধার এবং হবে জয় হবে জয়—বেছে নিয়েছিলেন তিনি। দুটিই অনবদ্য পরিবেশন। দেখা গেল, প্রয়োজনে তিনি যেমন ললিত, প্রয়োজনে তিনি তেমনই কঠোর। বিষাদ এবং উদ্দীপনা একইরকম দক্ষতায় সঞ্চারিত করতে পারেন তিনি। বিপরীত মেজাজের গানে পরিবেশনভঙ্গির প্রসঙ্গে আরেকটি নাম স্মরণীয়—তিনি অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকের গানে যেমন নাটকীয়তা তাঁর কণ্ঠে সুরে-লয়ে ধরা পড়েছে, তেমনই বিহ্বল করে শুনিয়েছেন 'প্রেম' পর্যায়ের আসরের চারখানি গান। আরেক স্মরণীয় শিল্পীর নাম মনে পড়ে—তিনি সুচিত্রা মিত্র। প্রেম-পর্যায়ের আসরে ছিলেন তিনি। শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ তাঁকে অনুরোধ জানালেন, 'কৃষ্ণকলি' শোনাবার জন্য। কিন্তু মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত বোধ থেকে পর্যায়-বহির্ভূত গান শোনানোর অনুরোধ তিনি সদৃঢ় সবিনয় ভঙ্গিতে প্রত্যাখ্যান করলেন। তার বদলে শোনালেন—'তবু মনে রেখো।' সত্যিই মনে রাখার মতো ঘটনা। শরীর ভাল ছিল না তাঁর, তবু প্রতিটি গানেই তাঁকে পুরোপুরি পাওয়া গিয়েছে। স্মরণীয়তম নিবেদন—'দিন পরে যায় দিন।'

শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রত্যাশা কানায়-কানায় ভরে গান শুনিয়েছেন অর্ঘ্য সেন স্বপ্না ঘোষাল, সুশীল চট্টোপাধ্যায় ও গীতা ঘটক। আরও তিনজন নবীন শিল্পীর নামও অবধারিতভাবে এই তালিকায় যুক্ত হবার যোগ্য। তাঁরা হলেন শুভশ্রী মুখোপাধ্যায়, আলপনা রায়চৌধুরী এবং [illegible] মিত্র। সহজ গানে অর্ঘ্য সেন যে কত গভীর, রোমান্টিক মেজাজে সুশীল চট্টোপাধ্যায় যে কত তীব্র, স্বপ্না ঘোষাল যে নিখুঁত হয়েও কত বিবশকারী, আবেদনের সামগ্রিকতায় গীতা ঘটক যে কত অমোঘ এবং মর্মস্পর্শী তার পূর্ণ পরিচয় ফুটে উঠেছিল তাঁদের নিবেদনে। শুভশ্রী মুখোপাধ্যায়ের 'বন্ধু রহো রহো', আলপনা রায়চৌধুরীর 'আজি ঝড়ের রাতে' এবং কৃষ্ণা মিত্রের 'ওই মধুর মুখ জাগে মনে' শুধু যে 'অবাক আমি তরুণ গলার গান শুনে' পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারণ করতেই প্ররোচিত করে তা নয়, আগামী দিনের রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে স্বপ্ন এবং প্রত্যাশাকেও করে উজ্জীবিত।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ধ্রুপদী সন্ধ্যা

অরূপ শিল্পী গোষ্ঠী নিবেদিত ধ্রুপদ গানের আসর বসেছিল ১৩ জুন সন্ধ্যায় শিশিরমঞ্চে। মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের বক্তব্য : 'ধ্রুপদাঙ্গের ঐশ্বর্যময় রূপটি জনমানসে আজ ম্লান

[illegible] ধ্রুপদের রাজেন্দ্রাণী মূর্তিকে স্বমহিমায় আজ প্রতিষ্ঠা করা দরকার।' এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। দীর্ঘ অনুষ্ঠানসূচীতে নানা আয়োজনের মধ্যে ছিল প্রবীণ ধ্রুপদ-গায়ক কৃষ্ণদাস ঘোষ মহাশয়ের সংবর্ধনা, ধ্রুপদ সম্পর্কে আলোচনা, সর্বোপরি ধ্রুপদ গান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সংগীত সম্মেলক কণ্ঠে গীত রবীন্দ্রনাথের 'যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি'। উদ্বোধনের পর দ্বৈতকণ্ঠে দীপ্তি দাস ও লাবণী মজুমদারের গান। এঁরা প্রথমে চৌতাল ও পরে সুর ফাঁকতালে নিবদ্ধ আড়ানা রাগে ধ্রুপদ পরিবেশন করেন। দীপ্তি দাসের কণ্ঠ সুখশ্রাব্য ও ধ্রুপদ গানের উপযোগী। কিন্তু এই দুই শিক্ষার্থীর অনুষ্ঠান কোনো ঘরোয়া আসরে হয়তো মানিয়ে যেত কিন্তু সাধারণ্যে তা প্রকাশ করে উদ্যোক্তাগণ শিল্পীদেরই অস্বস্তিতে ফেলেছেন। এঁদের গানের পর কৃষ্ণদাস ঘোষ মহাশয়কে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কিছু উপঢৌকন দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন শ্রদ্ধেয় সংগীতশিল্পী ধ্রুবতারা যোশী। প্রবীণ সংগীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়াল এই সূত্রে তাঁদের পরিবারের ধ্রুপদচর্চার বিষয়ে স্মৃতিচারণ করলেন। সবশেষে প্রবীণ সংগীতশিল্পী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ কৃষ্ণদাস ঘোষ মহাশয়কে তাঁর আজীবন ধ্রুপদ চর্চার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন। আসরের পরবর্তী শিল্পী ছিলেন সুস্মিতা সেন। ইনি ছায়ানট রাগে তানসেন ও বৈজুনাথ ভট্ট রচিত ধ্রুপদ গানের সঙ্গে একটি ধামার শোনালেন। কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়েও বলিষ্ঠতাহীন হওয়ায় তাঁর গানে ধ্রুপদের গাম্ভীর্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মন্দ্রসপ্তক অশ্রুতই থেকেছে আর আলাপের অংশে একই স্বরবিন্যাস কেবলমাত্র লয়ের তফাৎ করে বারবার, যা অত্যন্ত ক্লান্তিকর। তবে এঁর লয়জ্ঞান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এর পর আলোচনা সভা—যা অনুষ্ঠানে আদৌ কোনো মাত্রা যোজনা করেনি। এমন কি, ধ্রুপদের চার বাণীর যে নমুনা কৃষ্ণদাস ঘোষ পেশ করলেন তা এতই সংক্ষিপ্ত যে লয়ের তারতম্য ছাড়া আর কিছুই সাধারণ শ্রোতার পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব ছিল। এর পর আসরের প্রধান শিল্পী হিমঘ্ন রায়চৌধুরী কেদারা রাগে ধ্রুপদ গান শোনালেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে গাওয়া হল রবীন্দ্রনাথের 'মধুর রূপে বিরাজো' 'মোরে এ কি সাজে', 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ' এবং 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল' গানগুলির পাশাপাশি মূল হিন্দী গানগুলি 'কোনোরূপে বনে গো', 'মোরে দুন্দ দল সাজে' 'মুরলী ধ্বনি শুনি' এবং 'প্রচণ্ড গর্জন সজল বরখা ঋতু'। কণ্ঠসংগীতে হিমঘ্ন রায়চৌধুরীর সঙ্গে সহযোগিতা করেন মহাশ্বেতা গাঙ্গুলী, শিবানী দত্ত, সুপর্ণা ভট্টাচার্য, দেবস্মিতা ঘোষ, শিবশঙ্কর গুপ্ত ও নিবেদি বিশ্বাস। এঁদের মধ্যে মহাশ্বেতা গাঙ্গুলীর কণ্ঠমাধুর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিন্তু ভঙ্গি ও উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। এ ছাড়া 'মুরলী ধ্বনি শুনি অরী মাই' গানটি যাঁরা গেয়েছিলেন তাঁর গায়কী ও ভাব প্রকাশ অনায়াস স্বচ্ছন্দতার কারে। অন্যান্য গানগুলির মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না বরং ধ্রুপদ গানে যাঁদের শিক্ষার ভিত তাঁদের ক্ষণে ক্ষণে লয়চ্যুতি বড়ই শ্রুতিকটু।

যন্ত্রানুষঙ্গ ছিল যথাযথ। কেবল মূল হিন্দী গানের সঙ্গে পাখোয়াজ আর রবীন্দ্রনাথের সব গানের ক্ষেত্রেই তবলা যন্ত্র ব্যবহারের যুক্তির ব্যাখ্যা মেলা ভার।

সুভাষ চৌধুরী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **রেকর্ড**

অঞ্জলি লহ মোর

এক সময় নজরুল রেকর্ড-সাম্রাজ্যে সম্রাট ছিলেন। কিন্তু তারপর তাঁর গান বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। গত দশ বারো বছরের মধ্যে নজরুলের গান আরও ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এর জন্য কয়েকজন শিল্পীর প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য। যার ফলে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের পরেই নজরুল জন্মদিনে কিছু রেকর্ড প্রকাশ করা এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের গানকে অতিক্রম করলেও নজরুলের গান নিয়ে গবেষণা হয়েছে কম—চর্চা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু রেকর্ড করার সময় কেন কিছু গানের প্রতি সকলেরই আসক্তি। ফলে একই গান বার বার ঘুরে ঘুরে আসে—ফিরে ফিরে আসে; সম্ভবত সর্বজনপরিচিত বলে সেইগুলির ব্যবসায়িক সম্ভাবনা নিশ্চিত থাকে। রবীন্দ্র-সংগীতের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা ছিল, কিন্তু এখন সেই প্রবণতা গতসু।

ইনরেকো প্রকাশিত এবারের নজরুল-গীতির সংখ্যা খুব বেশী নয়—কিন্তু অনেক গান বার বার বিভিন্ন শিল্পীর মুখে শুধু তুলনামূলক আলোচনার ইন্ধন জোগায়।

দুখানি লং প্লেইং রেকর্ডে নজরুল-গীতি পরিবেশন করেছেন ধীরেন বসু ও পূরবী দত্ত। ধীরেন বসু কাব্যগীতির প্রতি আসক্ত, তাই তাঁর নির্বাচনে সেই সব গানের আধিক্য। কিন্তু নিপুণ ও আন্তরিক গায়নভঙ্গি সত্ত্বেও, একই ধরনের গান একটি লং প্লেইং রেকর্ডে থাকায় কিছু ক্লান্তি আনে। যে কটি গান বৈচিত্র্য আনতে পারত সে-কটি গানেও সুযোগ সদ্ব্যবহৃত নয়। যেমন 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়' গানে হারমোনিয়াম অনুষঙ্গ অনেক জোরালো

পূরবী দত্ত

হতে পারত। অনুরূপভাবে 'চোখ মুছিলে জল মোছে না' গানের সংগীতানুষঙ্গ আরও জোরদার হওয়া প্রয়োজন ছিল। 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী' গানটিতে গলা খুব ভারি মনে হয়। সব চাইতে ভাল গাওয়া এবং অনন্য রেকর্ডিং 'সখার কথা কইলে'। এই গানটি ধীরেন বসুর কণ্ঠে অদ্ভুত শিল্পশোভন হয়ে উঠেছে। 'মহুয়া বনে' গানটির ঢিমা লয় খুব ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ, এই সংকলনে বিলম্বিত লয়ের প্রাধান্য। 'আমি পথমঞ্জরী' গানটিও সাদামাটাভাবে গাওয়া হয়েছে। বহুশ্রুত 'আমার যাবার সময় হল' গানটি তালছাড়া রিভাইভ্রেশন সহযোগে পরীক্ষা করলে হয়ত বৈচিত্র্য আসত। বিচ্ছিন্নভাবে সব গানগুলিই ভাল কিন্তু লং প্লেইং রেকর্ডে গান নির্বাচনের জন্য অনেক মমত্বকে বর্জন করা এবং নির্দয় হওয়া উচিত ছিল—যদিও জানি যার কাছে আসক্তি, সেই শিল্পীর নির্দয় হওয়া স্বভাববিরুদ্ধ কাজ।

ধীরেন বসুর বিপরীত শিল্পরুচি পূরবী দত্তের। কাব্যের থেকে সুর ও লয় রাগের উপর তাঁর বেশী আসক্তি। তাই তাঁর লং প্লেইং রেকর্ডে নজরুল-গীতির রাগ-বৈচিত্র্যের অনবদ্য সমাবেশ। 'সখি বাঁধলো বাঁধো-লো ঝুলনিয়া' (কাজরী), দেশ খাম্বাজে 'পিউ পিউ বোলে পাপিয়া' কিংবা খাম্বাজ পিলুতে 'ক্ষ্যাপা হাওয়াতে মোর আঁচল উড়ে যায়' গানের দাদরায় অদ্ভুত চলন, সব গানেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। আর একটি নিপুণ পরিবেশন 'সেদিনও নিশীথে মোর'। যদিও সবচেয়ে ভাল লাগে—'গোঠের রাখাল'—এই গান বহুদিন মনে থাকার মত। পূরবী দত্ত তাঁর শিল্পরুচির পরিচয় দিয়েছেন 'আমার বিজন ঘরে' গানটিতে তাল বর্জন করে। মিশ্র বারোয়ায়-কার্ফা তালে প্রতি স্তবকে 'সে কাহু তোমার' লাইনে যে রকম গজলের প্রলোভন তাতে শেষ পর্যন্ত 'ঘুমায় আমার প্রিয়তম' কাব্যটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হত। ভালো লাগেনি 'কেমনে কহি প্রিয়'—যার জন্য হারমোনিয়াম অনেকখানি দায়ী। অথচ অন্য গানে হারমোনিয়াম চলচ্চিত্র রচনা করেছে। শুধু হারমোনিয়াম নয়—পূরবী দত্ত গানগুলিতে সংস্কারমুক্ত হয়ে কাজ করেছেন যন্ত্রের ব্যবহারে। 'গোঠের রাখাল' গানে বাঁশি (সেতার-এর সঙ্গে স্প্যানিশ গিটার) অন্যত্র ব্যাঞ্জো কিংবা দুটি গানে সানাই-এর ব্যবহার গানগুলিকে আক্ষরিক অর্থে আধুনিক করে ডাইমেনশন এনেছেন, তবে 'সেদিনও নিশীথে মোর' গানটির প্রিলিউডে সম্পাদনার দোষে অথবা অ্যারেঞ্জমেন্টের গণ্ডগোলে প্রথমে ঝাঁকি লাগে। সম্পূর্ণ ভিন্ন এলাকার গান 'হলুদ গাঁদার ফুল' গানেও পূরবী দত্ত স্বমহিম। একটি বহুশ্রুত প্রায় পচে যাওয়া গানকেও তিনি ভাল লাগিয়ে দিলেন।

তিনখানি ই পি রেকর্ডের মধ্যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কণ্ঠে ভাল লাগে "ধূলি পিঙ্গল জটাজুট মেলে" এবং বাগেশ্রীতে 'চোখের নেশার ভালবাসা'। নজরুল-গীতিতে ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র একটি স্মরণীয় অধ্যায়, তবু সবিনয়ে জানাই 'খেলা শেষ হল' গানটি তাল ছাড়া শুনতে ভাল লাগে। সুপ্রভা সরকারও নজরুল-গীতির একটি উজ্জ্বল যুগ—বহু যুগ পার হয়েও আজও তিনি অনন্যা তাঁর কণ্ঠের দাপটে। এবারের গানের মধ্যে 'স্বপন বিলাসে চাঁদ যবে' এবং 'স্বপনে এসো নিরঞ্জনে' স্মরণীয় সংযোজন। অপর দুটি গানের মধ্যে 'কাজরী গাহিয়া এসো' গানটির মজলিসী ঢংকে প্রশ্রয় দিতে তিনি যেভাবে উচ্চারণ করেন, তাতে গানটি জমে গেলেও অনেক অসংস্কৃত ভঙ্গি প্রাধান্য পেয়ে যায়, যেমন 'স'-এর উচ্চারণ। গান গাইতে গাইতে শিল্পী অবলীলায় অন্য স্বর ছুঁড়ে অদ্ভুত আবেশ সৃষ্টি করেন, কিন্তু প্রতিটি গান আরম্ভ হয় দ্বিধাগ্রস্তভাবে। খেয়া চট্টোপাধ্যায় একজন সম্ভাবনাময় শিল্পী। তাঁর কণ্ঠে অনেক রকম গানই প্রাণবন্ত হয়। তাঁর এবারের রেকর্ডে দুটি তালের গান কিছু অদল-বদল করতে পারলে ভাল হত—কারণ আশাবরীতে 'সখি ওই শোন বাঁশি বাজে' এবং 'শুধু আমি ছিনু' গান দুটির ধরন প্রায় এক, সুতরাং একঘেয়েমি অবশ্যম্ভাবী।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

অরণ্যদেব

শেকসপীয়র যাই বলুন, নামে যায় আসে। অন্তত 'পরমাণু' ([illegible]) এদের বর্তমান প্রযোজনায় (জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে) তা প্রমাণ করলেন। নাট্যকারের কাহিনী কল্পনা ও প্রয়োগ ভাবনায় কিছু অভিনবত্ব আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এই জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রধান অবলম্বনই যে অরণ্যদেবের স্বমহিমা, সেটা বোধ করি পরমাণু সংস্থার কর্মীরাও ঠাওর করতে পারছেন তলে তলে।

নাটকের মূল বিষয় অত্যাচার এবং শোষণ। শহরের শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ বিল্টুখুড়ো, অরণ্যে রাজা বিঠন। এ দুজনের মধ্যে কোনো তফাত নেই, দুজনেই নিষ্ঠুর (কমলের প্রতি বংকাবুড়োর ভাষ্যে এটা জানা যায়)। এই সূত্রেই উপস্থাপনায় ঘুরে ফিরে অরণ্য ও শহরকে এক করা হয়। কিন্তু এই একত্রীকরণে বুদ্ধির তুলনায় আবেগটাই বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে, যার মূলে কষ্টকল্পনা। অনেক চমকপ্রদ কাণ্ডকারখানার পর নাটককে তার লক্ষ্যাভিমুখে ফিরিয়ে আনতে নাট্যকারকে তাই শেষ পর্যন্ত অরণ্যদেবের ময়দানী বক্তৃতার উপরই নির্ভর করতে হয়। আর এভাবেই স্পষ্ট হয় প্রযোজনার অসারতা,—অভিনবত্বও যা পার পায় না।

আসলে, মূল বিষয় যাই হোক, এই প্রযোজনা আগাগোড়া বিভ্রান্ত তার বিন্যাসে। যার নামে এই নাটক, বিভ্রান্তির ঘনঘটা তাকে নিয়েই। সামাজিক দায়িত্ববাহী একটি বক্তব্য প্রতিষ্ঠা এই নাটকের উদ্দেশ্য হলেও ছেলে ভোলানো শিশুদের

অরণ্যদেব ও ডায়না

উপযোগী?) বিভিন্ন মনোরঞ্জনী কারবার নাট্যকার ও নির্দেশককে প্রলুব্ধ করে। এরই ফলশ্রুতি অরণ্যদেবের স্বর্গোদ্যান, ডায়নার ক্যারাটে, দুর্বোধ্য নাচ ইত্যাদি। কিন্তু নাটকের মূল বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় এই সব গিমিক-প্রকল্প কোনো রকম সাহায্য করে না, বরং বক্তব্য গ্রহণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পরিণামে, আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে পরমাণুর প্রযোজনা অরণ্যদেব—এই ধরনের প্রচারে আট থেকে আশী সকল বয়সের দর্শকের মনেই কিছু ধন্ধ লাগে।

এই ধন্দের মধ্যেই চুটিয়ে অভিনয় করে যান রাজা বিঠনের ভূমিকায় শৈলেন সামন্ত, ঝিলম রূপে দুলাল পাল। শেখরবাবুর নির্দেশনা কোনো কোনো অংশে 'লাউড' করলেও বিপুল নন্দীর রূপসজ্জা এঁদের চরিত্র হয়ে উঠতে যথেষ্ট সাহায্য করে। অন্য দুটি জরুরী চরিত্র বিন্টুখুড়ো ও কমলের ভূমিকায় যথাক্রমে দীপক বর্মন ও চৈতালী রায় তাঁদের অভিনয়ে জরুরী দায়িত্ব পালন করেন। অভিনয়ে যথার্থ হলেও দেবজ্যোতি ব্যানার্জীর বংকাবুড়োকে কোনো কোনো দৃশ্যে বাহুল্য বোধ হয়। অবশ্য তার জন্য তিনি দায়ী নন। রাজার চালাও নির্যাতন ও গুহা-নির্বাসন ভোগ করার পরও বংকার মাথার টুপিটা কিভাবে অক্ষত অবস্থায় মাথায় সেঁটে থাকে—এ সব প্রশ্ন না তোলাই ভালো। কারণ এ ধরনের অনেক প্রশ্ন জেগে ওঠার সম্ভাবনা আলোচ্য প্রযোজনায় রয়েছে। 'ফাইটিং' দৃশ্যগুলো প্রায় সবই তথাকথিত হিন্দী ছবির এঁটো। চাণক্য চরিত্রে শেখর সরকার বাস্তবিকই অভিনয়টা জানেন, তবে প্রশ্ন, এই ভরসাতেই কি তিনি কিছু ছ্যাবলামো করে যান? অরণ্যদেবের ভূমিকায় দীপেশ বাগচী পুরোপুরি মেকাপের উপর নির্ভর করেন, তাঁর অভিনয় কিছুতেই অরণ্যদেবের গ্ল্যামারকে স্পর্শ করতে পারে না।

পরমাণু প্রযোজিত 'অরণ্যদেব'কে জনপ্রিয় করে তুলতে যাঁরা অকৃপণ সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুজন আলোকশিল্পী—অলক দে ও অজিত মিত্র। এঁদের কুশলী আলোক-সম্পাত নাটকে বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। স্টুডিও অঞ্জলির শব্দগ্রহণে জয়ন্ত মিত্রর শব্দ প্রক্ষেপন দু-এক জায়গায় একটু চড়া হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে চমৎকার। যথেষ্ট বুদ্ধি রয়েছে অলক দে ও রংগলাল শর্মার মঞ্চ পরিকল্পনায় (শিশির মঞ্চে)। গানের ব্যবহারে কিন্তু 'অনাধুনিক সিনেমা' উঁকি মারে।

কলরব

অপেশাদারী নাট্যপ্রযোজনার বুদ্ধিগ্রাহ্য দৌরাত্ম্যে একালে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রতি অনীহা যেহেতু বিস্তার লাভ করছে, যেহেতু শোনা যাচ্ছে, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের নিয়মিত দর্শকেরাও এখন আর বৈচিত্র্য বা ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিতেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা তাঁদের গন্তব্যস্থলেই পেতে চাইছেন উদ্দীপনা এবং জ্ঞান—সেই হেতু বিমিশ্র দর্শকদের চতুর্বিধ আকাঙ্ক্ষার প্রতি মন রেখেই যে জ্ঞানেশ মুখার্জির নির্দেশনায় নেতাজী মঞ্চে কলরব-এর আবির্ভাব, এটা বোঝা যায়। আরো বোঝা যায়, একটি একান্নবর্তী পরিবারের ট্র্যাজেডি উন্মোচনের জন্য কাহিনীকার শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর গল্পে যত রকম দুর্দৈব ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন তার সুযোগে নাটকে এন্তার আবেগাশ্রিত সংলাপ রচনা করার পর নাট্যকার বীরু মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে, ব্যাপারটা ঠিক যুগোপযোগী হল না। অতঃপর, সে কারণেই, বক্তব্যের সন্ধানে নেমে তিনি দেখলেন 'সাম্যবাদী বক্তব্য'ই এখন সহজলভ্য এবং সর্বমনোহারী। কিন্তু অতি অনাধুনিক কাহিনীর সঙ্গে অতি আধুনিক বক্তব্যের লেজুড়টা নাট্যরসের আস্ফালনে কিরূপ আচরণ করবে সে দিকটা তিনি বিবেচনা করে দেখেন নি। তাঁর এই অবিবেচনার সঙ্গে তাল রেখে জ্ঞানেশবাবুর মনোরঞ্জনী নির্দেশনা আলোচ্য উপস্থাপনাকে অনায়াসেই গতানুগতিক পেশাদারী প্রযোজনার সম্প্রদায়ভুক্ত করতে পেরেছে।

কাহিনী ও বক্তব্যের অসহাবস্থানের এই বিরক্তি ও হাস্যকর দিকটা বাদ দিলে আলোচ্য নাটকে সত্যি যা দেখবার থাকে তা হল অভিনয়। তবে হ্যাঁ, এই অভিনয়ে আধুনিক রীতি খুঁজতে চাইলে হতাশ হতে হবে—এটা যেমন ঠিক, তেমনি একথাও অবশ্যস্বীকার্য কোনো কোনো অংশের ফিজিক্যাল অ্যাকটিং এবং আগাগোড়া মেলোড্রামার যে পক্বতা বর্তমান নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে—যে কোনো নাট্যপ্রেমীর পক্ষে তার প্রতি লোভ সামলানো মুশকিল। এই পক্বতা প্রকাশে যাঁদের নাম সর্বপ্রথমে আসে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মাধবী চক্রবর্তী গীতা দে ও শঙ্কর ঘোষাল। মাধবী-গীতা-শঙ্কর এই তিন শিল্পীই তাঁদের অভিনয়ে নাটকের সেন্টিমেন্টাল পয়েন্টগুলোর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন। এঁদের চারিত্রিক সততার প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি আদায়ের জন্য বিপরীত দিকে দুটি অসৎ চরিত্রের রূপায়ণ যতটা সার্থক করে তোলা দরকার সে ব্যাপারে কোনো রকম ত্রুটি রাখেননি জ্ঞানেশ মুখার্জি ও নির্মলকুমার। নাটকের অন্যতম অভিনেতা অনুপকুমার নিজের অভিনয়-ব্যক্তিত্বের প্রতি খুব একটা সতর্ক ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, চরিত্রসৃষ্টির তুলনায় রিলিফের ক্রিয়াকর্মেই তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখেন বেশী। লোক-হাসানোর জন্য বিভিন্ন মজাদারী সংলাপ উচ্চারণে তিনি এত বেশী লাউড হন যে, তাঁর অভিনয়ের লোকঠকানো দিকটিও অভিজ্ঞ দর্শকদের কাছে প্রকট হয়ে পড়ে। ভাঙা গলায় মহুয়া রায়-চৌধুরী মঞ্চ অভিনয়ের কেন ডাঙায় গিয়ে উঠবেন আমি জানি না কলরব-এর সংলাপ উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি দেখলাম আগাগোড়া বেসামাল। বরং প্রথাসিদ্ধ অভিনয়ে সুযোগমত আন্তরিক ছিলেন তমাল লাহিড়ী, কল্যাণী অধিকারী, ইরা মিত্র, দেবনাথ চ্যাটার্জি, নীহার চক্রবর্তী, শ্যামলবরণ ঘোষ, দীপেন ব্যানার্জি দীপিকা দাশ প্রমুখ।

মঞ্চ প্রকল্পে সাগরতীর ও বম্বের বিলাসবহুল হোটেল এই দুই ক্ষেত্রেই সুরেশ দত্তকে পাওয়া গেল, অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর নামমাহাত্ম্য অনুচ্চারিত। আলোকসম্পাতে তাপস সেন আগাগোড়া নিজের নামটি দিলেও সুনাম দিয়েছেন বেশ কৃপণ হস্তে। আবহকে নাটকীয় করে তুলতে অভিজিৎ ব্যানার্জি তাঁর চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি।

রানা দাস

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

সাবিত্রী

বক্তৃতা বা কথায় মানুষের মন কতটা জয় করা যায় জানি না কিন্তু এই অভীপ্সায় গানের ক্ষমতা যে অনেক বেশী তা উল্লেখ করা বাহুল্য বোধ হয়। শ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে 'শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার'-এর পক্ষ থেকে যে সান্ধ্য আসরটি নিবেদন করা হল অনেকটা এই কারণেই তা বিমিশ্র দর্শক ও শ্রোতার কাছে উপভোগ্যতার দাবি রাখে। জগতের পরম শক্তির মহিমা-ব্যাদান করতে চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে

শান্তি বসু ও অলকানন্দা

ভক্তির উগ্র আচরণ প্রকারান্তরে আরাধ্যকেই লঘু করে। আলোচ্য অনুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে ছিল তার ব্যতিক্রম। ভক্তি এই অনুষ্ঠানের মূল নৈবেদ্য হলেও, নিছক ভক্তিপ্রদায়িনী সন্ধ্যার সীমাবদ্ধতা সে তার সহজ স্ফূর্তিতেই টপকে আসে। আসলে ভক্তির প্রকাশ যখন সনিষ্ঠ শিল্পচেতনার মধ্য দিয়ে ঘটে, রসের স্ফুরণ তখন অনিবার্য। সবিরাম এই অনুষ্ঠানের সংগীতাংশে অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে মাধুরী মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। এঁদের প্রত্যেকের গায়নভঙ্গির অনন্যতন্ত্রে ও গান নির্বাচনের বৈচিত্র্যে পুজোর আবহাওয়াটি রচিত হল বড় সহজ ও সুন্দরভাবে।

বিরতির পর মঞ্চস্থ হল 'সাবিত্রী' নৃত্যনাট্য। মৃত্যুঞ্জয়ী দাম্পত্য প্রেমোপাখ্যান রূপে সাবিত্রী সত্যবান কাহিনী মহাভারতে কীর্তিত। এই কাহিনী অবলম্বন করেই শ্রীঅরবিন্দের মহৎ রচনা সাবিত্রী। সত্যবান এখানে অন্তরে দিব্যভাবাপন্ন আত্মা—মৃত্যু ও তমসায় কবলিত; আদিত্য কন্যা সাবিত্রী ঐশী বাণী, উদ্ধারার্থে অবতীর্ণ; তার মানব পিতা অশ্বপতি তপস্যার পরমেষ্ঠী, সেই অধ্যাত্ম শক্তি যা আমাদের নি[illegible] যায় মরত্ব থেকে অমরত্বে।

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' গ্রন্থখানি আমি দেখেছি। বেশ ভারী ও গম্ভীর চেহারা যার সঙ্গে সখ্যতা পাতানোও প্রায় সাধনাসাপেক্ষ, বিশেষ করে সাধারণ পড়ুয়াদের পক্ষে। এমন একটি গ্রন্থের মূল আবেদনটি মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সাংগীতিক অনুষ্ঠানে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার সেদিন উপস্থিত দর্শকদের কাছ থেকে নিরংকুশ ধন্যবাদ কুড়িয়েছেন। সাবিত্রী রূপে মঞ্চে ছিলেন অলকানন্দা রায়, নেপথ্যে গৌরী ঘোষ। নির্বাক নৃত্যে অলকানন্দা আমাদের দৃশ্যে যে মোহ রচনা করেন তাকে শ্রাব্যে ব্যাপ্তি দেন গৌরী ঘোষ। সত্যবান ও যমরাজের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে শান্তি বসু ও এন কে শিবশংকরণ। নেপথ্য থেকে যমরাজকে সরব করেন বিকাশ রায়। পার্থ ঘোষের ভাষ্যপাঠ যেমনি শ্রুতিমধুর তেমনি নাটকের সংগীতাংশে কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, মাধুরী মুখোপাধ্যায় ও অর্ঘ্য সেনের উপস্থিতিও যথেষ্ট উপভোগ্য।

রানা দাস

সিঙ্গার*
ছুঁচ...
ওঁর চাই-ই
চাই!
কেন শুনুন!

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে প্রকাশিত গ্রন্থ

॥ আনন্দ সংবাদ ॥

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

॥ কিশোর পাঠোপযোগী সমগ্র গ্রন্থের সংকলন ॥

কিশোরসাহিত্য-সমগ্র

নীহাররঞ্জন গুপ্তর লক্ষ লক্ষ গুনমুগ্ধ পাঠক জানেন যে, তিনি কিশোরদের উপযোগী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত—তার প্রমাণ, রাজকুমার, শঙ্কর, কালোভ্রমর, লালুভুলু, বাদশা গ্রন্থের অসামান্য জনপ্রিয়তা। এইসব পাঠকের অনেকেই কিশোর বয়সে এমন কি বাল্যেও তাঁর রচনা পাঠ করে তাঁর অনন্যসাধারণ শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদেরই আগ্রহ ও অনুরোধে সমগ্র কিশোরদের জন্য লিখিত রচনাগুলি একত্র সংকলিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্ভবত তিন বা চারখণ্ডে এই রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হবে। প্রতিখণ্ড আনুমানিক তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার প্লাসটিক জ্যাকেটে মোড়া উপহারোপযোগী সংস্করণ।

প্রথম খণ্ড মূল্য—সাড়ে বারো টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

পাঞ্চজন্য

মহাভারতের মহানপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে ইতিপূর্বে বহু গ্রন্থ রচিত হলেও—উপন্যাস এই প্রথম। শুধু তাই নয়, লেখক এই উপন্যাসে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিকে ব্যাখ্যা করার কোন চেষ্টা করেন নি, বরং তিনি শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্তর মনীষা, অলোক-সামান্য ব্যক্তিত্বকেই চিত্রিত করেছেন। তিনি এও প্রমান করেছেন—শ্রীকৃষ্ণই পৃথিবীর প্রথম সাম্যবাদী। ধনগবিত ও শস্ত্র-গবিত ক্ষাত্রশক্তিকে ধ্বংস করে সাধারণ দরিদ্র মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য। তাই তিনি দরিদ্র বঞ্চিত পাণ্ডবদের বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের মাধ্যমেই চেয়েছেন মূঢ় মূক সাধারণ মানুষের সংঘশক্তিকে শাসনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে। সেইজন্যই তাঁর ঘোষক শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য। সমালোচক পাঠক সবাই স্বীকার করেছেন এই উপন্যাসের ভাষা অনন্য, এর পরিকল্পনা অভূতপূর্ব, গ্রন্থনা অসামান্য। মূল্য : ষোল টাকা

গোবিন্দচন্দ্র দাস কাব্যসম্ভার

ভাওয়ালের গোবিন্দচন্দ্র দাস স্বভাব কবিরূপেই প্রসিদ্ধ। তাঁর কাব্যের উদ্ভব হয়েছিল জমিদার-শাসিত গ্রামীণ পটভূমিতে। তাই তাঁর কাব্যে গ্রাম্য প্রকৃতি—ফুলফল তরুলতা পশু-পাখি উপস্থিত হয়েছে। নানা গ্রামীণ উৎসব—লোকাচার ঋতু-উৎসব বিচিত্র বর্ণে তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। ফলে তাঁর কাব্যে পাই এক বিচিত্র স্বাদ যা তখনকার বহু কবির কাব্যে ছিল না। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত সমস্ত কবিতাই এই কাব্যসম্ভারে সংকলিত হয়েছে।

মূল্য : চল্লিশ টাকা।

সমরেশ মজুমদারের

বহু প্রশংসিত উপন্যাস

উত্তরাধিকার

আগস্ট ১৯৪৭। উত্তরবঙ্গের কোনও এক অখ্যাত চা-বাগানে স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপনের সময় এক কিশোর শুনল "বন্দেমাতরম" শব্দটি। অর্থ সে জানতো না। অতঃপর চা-বাগান থেকে কলকাতায় যেদিন পা দিল শেয়ালদা স্টেশনে, সেদিন সারা কলকাতায় আগুন জ্বলছে—খাদ্য আন্দোলনের ভয়ঙ্কর পরিবেশ। নিজের সম্পর্কে, দেশের সম্পর্কে, পুরনো বিশ্বাস, শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সঙ্গে নতুন করে তার মুখোমুখি পরিচয় শুরু হল। এই যুবকেরই আত্ম-অনুসন্ধানের কাহিনী 'উত্তরাধিকার'।

মূল্য : ত্রিশ টাকা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

ঈশ্বরীতলার রূপোকথা ১৪৲
(২য় মুদ্রণ)

অর্জুনের অজ্ঞাতবাস ১৫৲

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

দীর্ঘতম নতুন উপন্যাস

হাওয়া গাড়ি

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ / ৩৪-৮৭৯১
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ / ৩৪-৩৪৯২

চিঠিপত্র

কণ্টকল্পিত

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬, ৩১ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের 'কণ্টকল্পিত' পড়লাম। ত্রিপুরার ভাষার ব্যাপারে যে তথ্য লিখেছেন তার একটু পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করে এ চিঠি লিখছি।

বাংলা ত্রিপুরার রাজকার্যের ভাষা। ইংরেজীর প্রয়োগ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কিছু কিছু আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক কাল থেকে ত্রিপুরার রাজভাষা বাংলা। একটা উদাহরণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না ভেবে দিচ্ছি—

(১) মহারাজ রাধাকিশোর মন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে ইংরেজী ভাষায় আদেশ প্রচার করতে দেখে তাকে লিখেছিলেন "এখানে আবহমানকাল রাজকার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দু রাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষত আমি বঙ্গ ভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করি। ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারীবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরপোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।"

(২) কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর তাঁর 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে লিখেছেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার সোনার চেনের সহিত একখানা সোনার মোহর দোদুল্যমান দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তোর চেইনের ঝলমলানির সঙ্গে যে মোহর চক চক করিতেছে ইহা কোন মোহর? আমি বিনম্র বচনে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম (১৮৮৪ খৃঃ কথা) ইহা আমাদের রাজ্যের মোহর। তিনি হাতে করিয়া পাঠ করিলেন। "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপদে শ্রীযুত মহারাজা গোবিন্দ মানিক্য শ্রীশ্রী মহারাণী গুণবতী দেব্যা" ইহা পাঠ করিয়াই তিনি পুলকিত হইয়া উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছিলেন ইহাতে যে বাংলা ভাষার ছাপা। তবে আমার বাংলা রাজ ভাষা।

ত্রিপুরার অফিস-কাছারীর সব ব্যাপারই বাংলা ভাষায় চলে। ইংরেজীর প্রবেশ যা কিছু তা কংগ্রেস আমলে। তবু আজও বাংলাই প্রধান ভাষা—ইংরেজী নয়।

মানিক মজুমদার
পাটনা-৪

॥ ২ ॥

গত ২রা জুন "দেশ"-এ শ্রীঅতুল্য ঘোষ তার "কণ্টকল্পিত" নিবন্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সম্বন্ধে যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, তার জন্য তাকে আমার ধন্যবাদ। নানান দেশের ভাষার উৎপত্তি, লেখকদের নাম, বিভিন্ন রাজ্যের লোকসংখ্যা এবং তাদের প্রচলিত ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে তাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং যা পড়ে আমার মত অনেক পাঠক-পাঠিকাই ওই বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত হতে পেরেছে।

শ্রীঅতুল্য ঘোষের কাছে আমার একটি মাত্র প্রশ্ন—তিনি কেন শুধুমাত্র তামিল এবং তেলেগু লেখকগণের নাম ইংরাজীতে লিখেছেন? ওই নামগুলো কি বাংলায় উচ্চারণ করা সম্ভব নয়?

উর্দু গদ্য সাহিত্যের পুরোধা মোল্লা ভাজি (Vazhi)-র মত এই দুই ভাষার লেখকগণের নামও তো উনি পাশে বন্ধনীর মধ্যে বাংলা উচ্চারণে লিখে দিতে পারতেন।

দেশ পত্রিকার বহু পাঠক-পাঠিকা আছেন, যাঁরা ইংরাজী জানেন না। তামিল এবং তেলেগু লেখকগণের নাম ইংরাজীতে লেখার জন্য অনেকেই তা পড়তে পারেননি।

তাই লেখকের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, তিনি তাঁর পরবর্তী লেখাগুলোয় যদি কোন ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেন, তাহলে যেন তাঁর বাংলা উচ্চারণও পাশে লিখে দেন। যাতে তাঁর "কণ্টকল্পিত" লেখা প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাই পড়তে পারে।

মায়া সিদ্ধান্ত
আমডাঙা, ২৪ পরগণা

পৌরানিক মনে কাম

২৩ জুনের সংখ্যায় প্রকাশিত চিঠিপত্রে শ্রীতারাপদ লাহিড়ী যাকে "তথ্য" বলতে চেয়েছেন, তা আদৌ তথ্য বা ইতিহাস নয়; তা মাইথলজি দিয়ে মাইথলজির সমর্থন। তিনি ব্রহ্মার যে অভিশাপের উল্লেখ করেছেন তা অতিপ্রাকৃত গল্পে সাজে এবং কেবলমাত্র দশমুণ্ড কুড়ি হাতবিশিষ্ট রাবণের প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু, যেহেতু ইতিহাসের দিক দিয়ে বিচার করলে রাবণ রক্ষজাতীয় হলেও স্বাভাবিক মনুষ্যোচিত দেহধারী এবং মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন, আর সীতাকে হরণ করলেও কার্যত ধর্ষণ করেননি, সেহেতু তাঁর সংযম যে প্রশংসাযোগ্য ছিল সেটা ধারণা করাটা অযৌক্তিক নয়। সত্যিকারের মূল্যায়ন করতে গেলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। লাহিড়ী মহাশয় যেভাবে বাল্মীকি রচিত তথাকথিত পৌরাণিক বিবরণ দিয়ে প্রকৃত ঘটনাকে যাচাই করতে চেয়েছেন সেটাই হচ্ছে "অবাস্তব কল্পনাবিলাস"। ব্রহ্মার শাপ যদি রাবণের এতই মনে ছিল তবে তিনি সীতার মত মেয়েকে হরণ করতে গেলেন কেন? তিনি তো জানতেনই যে সীতাকে কখনও অঙ্কশায়িনী করতে পারবেন না। আমাদের পুরাণগুলির একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য এই যে পাতার ওপর দিকে যা বলা হয়, নীচের দিকের উক্তি হয় ঠিক তার উলটো। একই পুরাণের এক অধ্যায়ে যে আখ্যায়িকা রয়েছে কয়েক অধ্যায় পরে সেই আখ্যায়িকাই ভিন্ন হয়ে যায় এবং দুই পুরাণে আখ্যাগত অমিলের তো কথাই নেই। এইসব অমিল এবং অলৌকিকত্ব পরিহার করেই আজ সত্যকে উদ্ঘাটিত করবার সময় এসেছে।

বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১৪

৩১ মার্চ, ১৯৭৯ দেশ পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় নীরদ মজুমদার তাঁর 'পুনশ্চ পারী' প্রসঙ্গে মুদ্রিত ছবি লা পিয়েতো-দার্ভিনিও' ছবিটির সম্বন্ধে বলেছেন শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। কথাটি ঠিক নয়। ন্যাশনাল গ্যালারীর ডিরেক্টর কেনেথ ক্লার্ক তাঁর দি নিউড (পেন-গুইন বুকস) গ্রন্থে ছবিটির বর্ণনা করেছেন। শিল্পীর নাম প্রভেনকেল।

মলয় দে

হবিবপুর, মেদিনীপুর

কলকাতার ফুটবলার

২ জুন সংখ্যা দেশে অশোক দাশগুপ্তের "কলকাতার . ফুটবলার" লেখাটা পড়লাম। অনেক বিষয়ে হলেও দু-একটা বিষয়ে ও'র সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

বরদলুই ট্রফির ফাইনালে ইস্ট-বেঙ্গল ও পোর্ট অথরিটির খেলা সম্পর্কে তাঁর বিবরণ পড়লে মনে হতে পারে ইস্টবেঙ্গলের তরফে দোষ মাত্র একটিই। সেটি হচ্ছে, হাস্যকর (?) কারণে পেনাল্টি দেয়া এবং দর্শকদের ইট-পাটকেল ছোড়ায় বিরক্ত হয়ে ভাস্করের মাথা গরম করা।

অশোকবাবু স্পষ্টতই কলকাতার খেলোয়াড়দের আড়াল করতে চাইছেন। নাহলে তিনি কি করে ভুলে গেলেন সে খেলায় ইস্টবেঙ্গলের আরো কিছু খেলোয়াড়ের জঘন্য আচরণের কথা যার ফলভোগ করলো গৌহাটির হাজার হাজার নিরীহ বাঙালী? ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দর্শকদের চিৎকার ইত্যাদিতে সে দলের খেলোয়াড়দের মাথা গরম করা অস্বাভাবিক নয়—এটা কিরকম যুক্তি? কলকাতায় ছোট দলগুলো যখন মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে তাদের মাঠে খেলে তখন অনামী দলগুলোর বিপক্ষে কি পরিমাণ গালাগালি, বিদ্রূপ বর্ষণ হয় তা তো কারোর অজানা নয়। তখন যদি ছোট দলের গোলকীপার ইস্ট-বেঙ্গল বা মোহনবাগানের সমর্থকদের দিকে বুড়ো আঙুল দেখান তবে তিনি কি তার মাথা নিয়ে বাড়ি যেতে পারবেন? তাহলে শীর্ষস্থানীয় দলের নামী খেলোয়াড়েরাই বা দর্শক সমর্থনের অভাবে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবেন না কেন?

এভাবে একপেশে আলোচনায় ফুটবলের উন্নতি কিছু হবে বলে মনে হয় না। বাংলার ফুটবল মান যে যথেষ্ট নেমেছে সম্প্রতি রোভার্স, নাগজী ও স্ট্যাফোর্ড কাপই তার প্রমাণ। আরো প্রমাণ পাবেন কলকাতায় এবারকার তারকাখচিত দলগুলোর খেলা দেখলে। সেখানেও দেখতে পাবেন বাংলার দামী ও নামী ফুট-বলারদের সকলের মাথাই ঠান্ডা নয়। যেমন প্রীতসম্ভের সঙ্গে খেলায় দিলীপ পালিতের অনর্থক ফাউল এবং টালীগঞ্জের সঙ্গে খেলায় ব্যর্থ সুরজিতের ফাউলগুলো।

চুণী-প্রদীপের আমলেও বাংলার দলগুলো গন্ডায় গন্ডায় ট্রফি জিতেছে এবং ভারতীয় দলে যথেষ্ট সংখ্যক চান্স পেয়েছে। কিন্তু

গিয়ে কাঁদুনি গাইছেন "রেফারী অবিচার করেছে।"

বাংলার খেলোয়াড়দের অভিযোগ থেকে আড়াল করার আগে একটু ভেবে দেখুন তাঁরা সত্যিই আড়াল পাবার যোগ্য কিনা।

কল্যাণময় রায়

শিলচর, কাছাড়

টেরাকোটা : সমালোচকের জবাব

২১শে এপ্রিল, ১৯৭৯ আমার চিত্রকলা সমালোচনার বিরুদ্ধে ১৬ই জুন সংখ্যায় প্রতিবাদ করেছেন হারান ঘোষ। সরকারী চারুকলা মহা-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন ভদ্রলোক যদিও আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। আমি তাঁর ক্লাসের ছাত্রও নই, সুতরাং কোন সুবাদে তিনি আমাকে 'শ্রীমান' সম্বোধন করলেন জানি না।

আমার বদ্ধমূল ধারণা, আর্ট কলেজের ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী চোথা আর্টিস্টের ছাড়পত্র নয়! নিয়মিত কাজ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রদর্শনী করতে হয়। কলকাতা এবং অন্য শহরে সর্বভারতীয় এবং এমনি প্রদর্শনী নিয়মিত হয়। যেমন এখানে আকাশতলে ভাস্কর্য প্রদর্শনী বেশ কয়েক বছর ধরে হয়ে গেছে। বছর দুই আগে বিধানসভার উদ্যানে বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন চিন্তামণি কর। এছাড়া বিড়লা আকাদমী, রবীন্দ্র ভারতী এবং আকাদমী অব ফাইন আর্টস-এ নিয়মিত বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় ললিতকলার প্রদর্শনী হয় ফী বছর। সেখানে হারান ঘোষ বলে কারো কাজ দেখিনি। কলকাতার সক্রিয় শিল্পীদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে কিন্তু নিষ্ক্রিয় শিল্পীদের জন্য সময় নেই। "ভাস্কর স্যারের" সঙ্গে সেই জন্য আমার আলাপ হয়নি।

এবার আসা তাঁর যুক্তি খণ্ডনের দিকে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মাধ্যম (মেটিরিয়াল)-এর অপরিহার্য ভূমিকা থাকে। এই ভূমিকা প্রতি আসলে ভাস্কর্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে খাঁটি শিল্পী মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যকে হরণ বা ক্ষুণ্ণ করেন না। উনি একটি প্ল্যাস্টারের মূর্তি দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তার মধ্যে আমি কিন্তু মাধ্যমের জাতি বিশেষত্ব খুঁজে পাইনি। আর্ট কলেজের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে অবশ্য অনেক ভাস্কর্য দেখি কাঁচা মাটির ওপর টেরাকোটা রঙ করা এবং পোড়ামাটির কাজ বলে সেগুলো চালানো হয়। এঁরা সবাই "ভাস্কর স্যারের" ছাত্র—বৎসরে ক্রমে একটা প্রদর্শনী তাতেও টেরাকোটা মূর্তি পোড়ানো হয়ে ওঠে না। স্যারও যতদূর মনে পড়ে, প্ল্যাস্টারের মূর্তিটি টেরাকোটা রং করেছিলেন, সুতরাং এ ধরনের ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

স্যারের বক্তব্য, ওঁর বাউল মূর্তি একটা বিশেষ ধরনের "টেরাকোটা যা হাজার ডিগ্রী সেনটিগ্রেডের চাইতে বেশি তাপে পুড়িয়েছেন। আমি না সেটা ধরতে পারিনি।

এর জবাবে সমালোচকের বক্তব্য

সাধারণ মাত্র (কমন ক্লে)-তে তৈরী চিক্কণলেপহীন (আনগ্লেজ্‌ড) বহুরন্ধ্র (পোরাস) অবয়ব (বডি)-কেই বলে "টেরাকোটা" (পোড়ামাটি)। সাধারণ মাটিতে তৈরী বলে ৮০০/৯০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশি তাপের দরকার করে না। ন-শ ডিগ্রীর বেশি তাপে পোড়াতে হলেই তাকে 'টেরাকোটা বডি' না বলে বলা উচিত "আরদ্যানওয়ার বডি", কারণ পুরো সেরামিক বিষয়টাকেই পোড়ানোর তাপমাত্রা অনুযায়ী নানা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন "টেরাকোটা", "আরদ্যানওয়ার", "স্টোনওয়্যার" এবং "পোরসেলিন"। কোণঠাসা হয়ে "ভাস্কর স্যার" যদি বলেন, তাঁর তৈরী "টেরাকোটা বডিতে" "কমন ক্লে" আছে, আনগ্লেজ্‌ডও বটে, এবং অবশ্যই "পোরাস"। এক্ষেত্রে সমালোচকের জিজ্ঞাস্য : "ফায়ার ক্লে", "চায়না ক্লে", "কোয়ার্টস" এবং আর কিছু বস্তু, যা "ফিউজ" হতে খুব উচ্চ তাপমাত্রা লাগে, তার সংগে যদি কিঞ্চিৎ "কমন ক্লে" মিশিয়ে কোনো "বডি" তৈরী হয়, এবং পোড়ানোর পর যদি সেটা চিক্কণলেপহীন এবং বহুরন্ধ্র থাকে, তবে এটা স্যার কি কি বলবেন—টেরাকোটা? আমি (এবং যে কোন সেরামিক বিশেষজ্ঞই) অন্তত একথা বলব না। কারণ এটা "বিস্কিট ফায়ারিং"-এ হয়েছে।

প্রসঙ্গ নন্দনতত্ত্ব অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে "ভাস্কর স্যার" তাঁর বাউল মূর্তিকে নিজস্ব পরিভাষায় টেরাকোটা বললেও আমি বা অন্য কোন দর্শক একটা রসোত্তীর্ণ কাজ বলতে পারছি না। এর বর্ণ সমান (ইউনিফর্ম) হয়নি এবং ঔজ্জ্বল্য (লাস্টার)-ও আসেনি। মূর্তিটির একটি হাত, যতদূর মনে পড়ে, ভাঙা ছিল। আমি নিশ্চিত "হাই টেমপারেচারে" পুড়িয়েছেন বলে শক্ত হয়নি।

স্যার হয়তো সমালোচককে অজ্ঞ নরম মাটি মনে করেছিলেন। কিন্তু নন্দনতত্ত্বের বিচারে তাঁর কাজগুলি কোন স্তরের সেটা তিনি জানেন বলেই টেকনিক্যাল বিষয়ে আমার অজ্ঞতা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। অথচ তিনি নিজেই "টেরাকোটা" আর "আরদ্যান-ওয়ারের" তফাৎটুকুও জানেন না।

সন্দীপ সরকার

গোঘ্ন

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গোঘ্ন' গল্পের শেষে লেখকের ফুট নোট সম্পর্কে সামান্য নিবেদন আছে।

গোঘ্ন শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় সেখানে এই শব্দ অতিথি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু গোঘ্ন শব্দে গো এবং হনন্ এই দুই শব্দ আছে এবং গোঘ্ন বলতে অতিথিকে বোঝায় তাই অনেকে অর্থ করেন যে বাড়িতে অতিথি এলে গৃহস্থ গো হত্যা করে তার মাংস অতিথিকে ভোজন করাতো বলেই অতিথি "গোঘ্ন"।

কিন্তু এই অর্থ অনেকেই মনে করেন কষ্টকল্পিত। 'গো' বলতে শুধু গরুকেই বোঝায় না। গম+ডচ্‌=গো অর্থাৎ কিনা যা কিছু গতিশীল তাকেই 'গো' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অমরকোষ 'গো' শব্দের অর্থ করেছে যে কোনো পুং ও স্ত্রী জাতীয় পশু। গৌরিতি পৃথিবী নামধেয়মুযাস্ক (৫।২)। এতে গো শব্দের আরেক অর্থ পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবী। হন্ শব্দের অর্থ ভ্রমণও হতে পারে আবার গতিও হতে পারে। অতএব গাং হন্তি তস্মৈ গোঘ্নঃতিথি [পাণিনি সূত্র ৩।৪।৭৩] বলতে এই অর্থও বোঝাতে পারে যে পৃথিবী ভ্রমণ করে বলেই অতিথি গোঘ্ন। তাই গোঘ্ন বলতে আসলে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের কথাই বিশেষ করে বলা হয়েছে কিনা কে জানে!

ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ কাছাড়, আসাম

দেশ সাহিত্য সংখ্যা

নিতান্ত পরিতাপের হলেও এটাই ঘটনা যে ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে বা সরাসরি ইউরোপীয় তথা অন্যান্য বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড়তর হচ্ছে ততই প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ভাষা-সাহিত্যের সংগে আমাদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে এক নিশ্ছিদ্র যোগাযোগহীন অন্ধকারের মধ্যেই কি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যগুলি পরস্পরের নিকট একেবারেই অপরিচিত হয়ে পড়বে?

তারই মধ্যে এবারের সাহিত্য সংখ্যা দেশ-এ প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির সাহিত্যিক পথ চলার মোটামুটি একটা খতিয়ান পাওয়া গেল।

ব্যক্তিগতভাবে আমার বেশী ভালো লেগেছে অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার উপর আলোচনা দুটি। এই দুই নিবন্ধে মোটামুটি প্রতিবেশী দুই ভাষার আধুনিক সাহিত্যের সৃজন-মননের রূপরেখা অনেকটাই ফুটে উঠেছে। উড়িষ্যার কবি সৌভাগ্য মিশ্রের কুয়ালালামপুর কবিতাটি অনুবাদেও উপভোগ্য। হয়তো বাংলা-ওড়িয়া-অসমীয়া সহোদরা বলে অনুবাদেও ধ্বনিব্যঞ্জনা ও ভাবার্থ একই সংগে রক্ষা করা গেছে। ভাষান্তরে মূলের অনেক কিছুই হারিয়ে যায়নি। অসমীয়া থেকেও কবিতার অনুবাদাংশ-গুলি সম্পর্কে একই কথা বলা যায়।

উর্দু আধুনিক ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় ভাষা। কিন্তু এর আলোচনাটির কভারেজ যে-কোন কারণেই কম মনে হয়েছে।

সত্য চক্রবর্তী রামসাগর, বাঁকুড়া

ভ্রম সংশোধন

দেশ সাহিত্য সংখ্যার (১৩৮৬) 'তিন দশকের মারাঠী সাহিত্য' প্রবন্ধের ব্যঙ্গ ও রসরচনা অংশে (পৃষ্ঠা ১৫১) একটি ভুল ধরা পড়েছে। পি এল দেশপাণ্ডের সম্বন্ধে বলা হয়েছে : 'তাঁর বিরুদ্ধে কখনও কখনও সমালোচনা করা হয়ে থাকে যে, মারাঠীতে তাঁর এই উচু পর্যায়ের সাহিত্যে নিন্দাবাদের সুর বেশ চড়া'। এই মন্তব্য মারাঠী কিছু ব্যঙ্গ ও রসরচনা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। পি এল দেশপাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে নয়। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

শৈলেন ঘোষের

আজব রূপকথা

আজব বাঘের আজগুবি দাম ৭·০০

বাঘ কি কখনো গল্প বলে মানুষের মতো? সব বাঘ বলে কিনা জানি না, কিন্তু একটা বাঘকে জানি যে আমাদের শুনিয়েছে তার আশ্চর্য জীবনের অবাক-করা এক গল্প। হ্যাঁ, সেই গল্পের নামই 'আজব বাঘের আজগুবি'। বাঘটা আজব বই কি! গল্প বলে, বেহালা বাজায়, আরও কতসব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে। কিন্তু তা বলে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তার গল্পকে।

আসলে বাঘও তো একটা জীব, যার বাবা আছে, মা আছে, ঠাকমা আছে। আমরা কি তার সব খবর জানি? কিন্তু আজব এই বাঘটা যখন নিজেই গল্প শোনালো তার নিজের জীবনের, তখন আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। সে কি সুন্দর গল্প কী বলব। আজব বাঘের সঙ্গে দেখা হল এক ছোট্ট ছেলের, যে ওই বাঘের মতোই দুঃখী। ছেলেটার বাবাকে আটকে রেখেছে এক দস্যু-সর্দার, রাজত্ব নিয়েছে কেড়ে। সেই ছেলেটা আর এই আজব বাঘটা হঠাৎ বন্ধু হয়ে গেল। তারপর তারা দুজনে মিলে কী করে মেরে ফেলল সেই দস্যু সর্দারকে, আর কী করেই বা ফিরে পেল হারানো রাজত্ব সেই কাহিনীই লিখেছেন এ-কালের রূপকথার জাদুকর শৈলেন ঘোষ তাঁর এই নতুন বইতে।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

বরুণ সেনগুপ্তের

জনপ্রিয়তম গ্রন্থ

পালাবদলের পালা দাম ১২·০০

১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পশ্চিমবঙ্গের এই তিন বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস এই গ্রন্থে। দু-দুটি ফ্রন্ট শাসনের নানা নেপথ্যকাহিনী ফাঁস করে দিয়েছেন বরুণ সেনগুপ্ত তাঁর এই চাঞ্চল্যকর ও আলোড়ন তোলা বইতে।

লেখকের অন্যান্য বই:

রাজ্য ও রাজনীতি ৮·০০ ইন্দিরা একাদশী ১০·০০ ও ৫·০০ (পেপারব্যাক), নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য ৭·০০ বিপাক-ই স্তান ৬·০০ সব চরিত্র কাল্পনিক (উপন্যাস) ৮·০০ অন্ধকারের অন্তরালে (সদ্য প্রকাশিত) ১০·০০

নেতাজী-প্রসঙ্গ

সুভাষচন্দ্র বসুর
তরুণের স্বপ্ন
দাম ১০·০০

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে
দাম ৬·০০

ডাঃ শিশিরকুমার বসুর
মহানিষ্ক্রমণ
দাম ৮·০০

কৃষ্ণা বসুর
ইতিহাসের সন্ধানে
দাম ৭·০০

সত্যজিৎ রায়ের

গোয়েন্দা-ফেলুদার নতুন রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

গোরস্থানে সাবধান দাম ৮·০০

ফেলুদার লেটেস্ট নেশা তখন পুরনো কলকাতা। জটায়ুর নতুন কেনা গাড়িতে চড়ে তোপসেকে নিয়ে ফেলুদা গেলেন জোব চার্নকের সমাধি দেখতে। সেখান থেকে পার্ক স্ট্রীটের পুরনো গোরস্থানের দিকে ঘুরল গাড়ির মুখ। কিন্তু পৌঁছনো গেল না। পথে উঠল প্রলয়ংকর ঝড়। সেদিন যদি পৌঁছে যেতেন ফেলুদারা, তাহলে হয়তো একটা ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে পারতেন। পরদিন সেই ঘটনার খবর ছাপা হল কাগজে। সাউথ পার্ক স্ট্রীট গোরস্থানে একটা গাছ ভেঙে পড়ায় নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। আপাত-নিরীহ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন থেকে ঘটতে লাগল একের পর এক নাটকীয় এবং রোমাঞ্চ-সঞ্চারী ঘটনা। দুর্ধর্ষ এক গোয়েন্দাগিরি চালালেন ফেলুদা। সেই গোয়েন্দা-গিরিতে পদে-পদে উত্তেজনা, ক্ষণে-ক্ষণে মৃত্যুভয়। তবু ফেলুদা জিতে গেলেন।

কেমন করে জিতলেন, তারই রুদ্ধশ্বাস কাহিনী 'গোরস্থানে সাবধান।' সত্যজিৎ রায়ের আঁকা পাতা-জোড়া ইলাসট্রেশন এবং অসামান্য প্রচ্ছদপট এ-বইয়ের বাড়তি আকর্ষণ। কাড়াকাড়ি যে পড়ে গেছে তার প্রমাণ দু-মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ ফুরোনো থেকেই বোঝা যাবে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

চিত্রময় কাব্যগ্রন্থ

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

দাম ৩·০০

অসংখ্য স্মরণীয় ছোট কবিতা লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় গত কয়েকবছরে। 'ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন' সেইসব কবিতার একত্র সংকলন। চিত্রময় কবিতার এই বইতে ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী, যা কবিতার মতোই লাবণ্যময়।

লেখকের অন্যান্য বই:

মানুষ বড়ো কাঁদছে ৫·০০ আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল ৫·০০ প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই ৪·০০ অবনী বাড়ি আছো (উপন্যাস) ৬·০০

খেলাধুলার বই

অমল দত্তের
ফুটবল খেলতে হলে
দাম ১২·০০

মতি নন্দীর
ক্রিকেটের আইনকানুন
দাম ১০·০০

মুকুল দত্তের
ফুটবলের আইনকানুন
দাম ১০·০০

টেবিল টেনিসের আইনকানুন
দাম ৪·০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সমরেশ বসুর

নতুন উপন্যাস

অপদার্থ

সন্তোষকুমার ঘোষের

প্রতীক্ষিত গল্পগ্রন্থ

সন্ধ্যা-সকাল

দাম ১০·০০

'কিনু গোয়ালার গলি' লিখে যিনি একই সঙ্গে চমকে দিয়েছিলেন বাংলা পাঠক ও লেখক সমাজকে, 'নানা রঙের দিন', 'মুখের রেখা', 'জল দাও' অথবা 'শ্রীচরণেষু মাকে' লিখে যিনি গলি থেকে ক্রমশ পৌঁছে গিয়েছেন সদর সড়কে, তাঁর প্রতিভার আরেকটি বিস্ময়কর ও সমান্তরাল জয়যাত্রা বাংলা ছোটগল্পের সম্পন্ন সরণীতে।

'কানাকড়ি', 'কস্তুরীমৃগ', 'একমেব', 'শনি', 'দ্বিজ', 'মাটির পা', 'ধাত্রী', 'দিনপঞ্জী', 'যাদুঘর'—এমন অজস্র ছোটগল্পের রচয়িতা সন্তোষকুমার ঘোষের নাম পাঠকের স্মৃতিতে চিরকাল জ্বলজ্বলে হয়ে থাকবে। লেখায় তিনি সবসময়ই সমসাময়িক। কী লিখব—এ-নিয়ে যেমন ভাবেন, কীভাবে লিখব—এ-নিয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ সচেতনতার পরিচয় প্রতিটি রচনায়। ভাষা তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল, আঙ্গিক তাঁর হাতের শাণিত অস্ত্র, বিষয় তাঁর কলমের ধারালো বিশ্লেষণে নতুন দ্যুতির বিচ্ছুরণ ঘটায়। ইদানীংকার গল্পে তিনি সাজানো গল্পের বাহারী শোভা পুরোপুরি ত্যাগ করে আরও অব্যর্থ ও অমোঘভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন জীবন ও জগৎকে, গল্পের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন মহত্তম অভিজ্ঞতাময় এক জীবনবোধ। সম্প্রতি-কালে রচিত তাঁর সেই সমুদয় গল্প একত্র করে প্রকাশিত হল এই নতুন গল্পগ্রন্থ 'সন্ধ্যাসকাল।' সন্দেহ নেই বাংলা ছোট-গল্পের ক্ষেত্রে এ-বই এক অপরিহার্য সংযোজনরূপে চিহ্নিত হবে।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ:

জল দাও ৩·৫০ সময়, আমার সময় ৫·০০

দেশ ৪৬ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা
২৯ আষাঢ় ১৩৭৬

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

রাজেশ্বর মিত্রর প্রবন্ধ
তাণ্ডব
নিরঞ্জনপ্রসাদ চৌধুরীর ভ্রমণ কাহিনী
সবুজ পাহাড়ে পিকনিক
শিপ্রা ঘোষের
প্রতিবিম্বিত প্রাদেশিক সাহিত্য
কণা বসুমিশ্রের গল্প
হায় গরু! তুমি কোথায়?

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদ্মাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

নৃতাত্ত্বিকের উপেক্ষিত আদিম জাতি

ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকেরা শুধু থিওরীর উপাসনা করেন, গবেষণা করেন না। এই অভিযোগের সবটাই সত্য নয়। ভারতে ঘটনার বহু ক্ষেত্রে দেশের আদিবাসী তথা আদিমজাতীয় জনসমাজের হিতার্থে নৃতাত্ত্বিকের জ্ঞানের সক্রিয় প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আদিবাসীর সেবার ক্ষেত্রে যাঁদের বিশেষ করে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগই আদর্শচারী সমাজসেবক। এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে আদিবাসী ও উপজাতীয়ের হিতপ্রকল্প সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্য নৃতাত্ত্বিকের নিয়োগ সার্থক কোন সহায়তা সম্ভাবিত করতে পারেনি। আন্দামান দ্বীপের আদি অধিবাসী কয়েকটি জনগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা ও সমস্যার কথা বিবেচনা করতে গিয়ে এই অপ্রিয় ধারণার সম্মুখীন হতে হয় যে, নৃতাত্ত্বিকেরা এক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানে সামান্যতম সাহায্যও প্রদান করেননি। নৃতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানিত তথ্যের সংগ্রহে ও বিবরণীতে আন্দামানের চারটি গোষ্ঠীর জীবন ও জীবনচর্যার বৃত্তি এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে নিতান্ত সামান্য তথ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন উদ্ভাবনা ও গবেষণার পরিচয় নৃতাত্ত্বিকের কৃতিত্বের কোন দলিলে পাওয়া যায় না।

জারোয়া নামে পরিচিত আদিম গোষ্ঠীর জনসংখ্যা আড়াই শত। ওঙ্গিদের জনসংখ্যা একশত। সেন্টিনিলি দ্বীপের আদিম অধিবাসী একশত। এবং গ্রেট আন্দামানী নামে অভিহিত গোষ্ঠীর জনসংখ্যা মাত্র পঁচিশ। এদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি লক্ষ্য করে উপলব্ধি করতে হয় যে এরা এখনও নব-প্রস্তরযুগের চেয়েও কিছু পুরাতন যুগের মানবিক দশার প্রকোপ বহন করছে। নৃ-পরিচয় হিসাবে এরা নেগ্রিটো বর্গের মানুষ। দ্রুতক্ষয়িষ্ণুতা এদের জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। ভাষার শব্দসম্বল সামান্য, ভাষার ভাবপ্রকাশ শক্তিও অতি ক্ষীণ। সাম্প্রতিক ঘটনা এই যে, সেন্টিনিলি দ্বীপের অধিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে শুধু একটিই বালিকা ছিল যা'কে বিবাহযোগ্য বয়সের নারী বলে মনে করা চলে, যার বয়স পনের বছর। এই গোষ্ঠীতে বিবাহযোগ্য এমন কোন বালক-পুরুষও ছিল না যে তার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে সম্ভব হতে পারে। ওদিকে গ্রেট আন্দামানীদের মোট জনসংখ্যার পঁচিশ জনের মধ্যে শুধু একটি পুরুষ ছিল যাকে বিবাহযোগ্য বলে মনে করা চলে, যার বয়স সতের বৎসর। এই পুরুষটির স্ত্রী হওয়ার মতো কোন যুবতী বা বালিকা গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল না। সুতরাং প্রজাপতির নতুন নির্বন্ধে ওই ভিন্ন-গোষ্ঠীর বালিকার সঙ্গে গ্রেট আন্দামানী বালকটির বিয়ে সম্পন্ন করানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে আন্দামান জনজাতি সেবক সমিতির প্রধান পরিচালক শ্রীকৃষ্ণাত্রি (আন্দামানের প্রাক্তন কমিশনার) উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং বিশ্বাস করতে হয় যে প্রশাসন ও সেবাসমিতি উভয়েই গ্রেট আন্দামানীদের জীবনের কিছুটা প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আশা করা যায় যে, প্রশাসনের পক্ষে আদিম গোষ্ঠীদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার এবং সেবার কাজ করবার সুযোগ অবাধ হলে তাদের জীবনের দ্রুত ক্ষয়িষ্ণুতার অভিশাপ অপসারিত করবার কিছু সার্থক প্রয়াসও সম্ভব হবে। প্রশ্ন হলো, এই কর্তব্যে নৃতাত্ত্বিকদের কি বিশেষ কোন ভূমিকা নেই।

বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী রিভার্স সাহেবের প্রচারিত একটি অভিমত এই যে, সভ্য মানুষের তথা সভ্যতার সংস্পর্শে এলে আদিমজাতীয় জনসমাজের নিদারুণ ক্ষতি হবে, তাদের জনসংখ্যার দ্রুত ক্ষয় হতে থাকবে তাদের বংশধারার সমূহ বিলুপ্তিও সম্ভাবিত হতে পারে। রিভার্স সাহেবের ধারণার কিছুটা অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু ধারণাটা নির্বিশেষ সত্য নয়। কোন অভিজ্ঞ নৃতাত্ত্বিক আজ ভারত সরকারের প্রাক্তন (ও পরলোকগত) নৃতাত্ত্বিক উপদেষ্টা এবং রিভার্স সাহেবের অনুগত ধারণার পোষক ভেরিয়ের এলুইনের মতো এমনতর কোন জ্ঞানের কথা বলেন না যে, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছোঁয়া লাগলে আদিম জাতীয় গোষ্ঠীর জীবনীশক্তির নিদারুণ হানি হলে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সত্য বরং এই কথা বলবে যে, বহু আদিম গোষ্ঠীকে যৌন রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা করে অবধারিত বিলুপ্তির ভয় থেকে রক্ষা করেছে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ঔষধ ও ইঞ্জেকশন।

দেশের সরকারের সম্মুখে একটি জিজ্ঞাসা উপস্থিত করবার যুক্তি আছে। সরকার কি অভিজ্ঞ নৃতাত্ত্বিকের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করবার কোন চেষ্টা করেছেন? না ক'রে থাকলে বুঝতে হবে যে, আন্দামানের চারটি আদিম গোষ্ঠীকে যথার্থ সুরক্ষায় আশ্রিত করবার এবং তাদের বংশবিলোপ প্রতিহত করবার কর্তব্য নিতান্ত প্রশাসনিক সদাচারের দ্বারা সম্ভাবিত হতে পারবে না। অবশ্য এই শিক্ষাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে নিতান্ত থিওরীর ভক্ত নৃতাত্ত্বিক নয়, গবেষক নৃতাত্ত্বিক চাই যাঁর পক্ষে ক্ষয়িষ্ণু ও ক্ষীয়মান জীবনী শক্তির ধারক ওই চারিটী গোষ্ঠীর মানুষকে পূর্ণতর জৈবিক যোগ্যতায় অন্বিত করা সম্ভব হতে পারে।

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

কলকাতায় চিত্রগুপ্ত

চারজন যমদূত আমাকে টানতে টানতে চিত্রগুপ্তের দপ্তরে নিয়ে গেল। আমার মত সামান্য একজন মানুষের জন্যে চার চারজন যমদূত। টু মাচ। যমরাজের 'দূত পাওয়ার' খুব বেশি। আপনাদের মাইনে কত?

মাইনে? যমালয়ে তো টাকা বা ডলারের চল নেই। ওখানকার সিসটেমটাই অন্য। গেলেই বুঝতে পারবে ছোকরা।

তা একেবারে চারজন কেন? একজনই তো যথেষ্ট ছিল।

না হে না। যমরাজের নির্দেশ, মৃত ব্যক্তি যদি চাকুরিজীবী বাঙালী মধ্যবিত্ত হয়, আবার তার যদি ডিসপেপ্সিয়া, ডায়েরিয়া কি ডিসপেপসিয়া থাকে, তাহলে চারজন কেন, আটজন দূতও আসতে পারে। সে ব্যক্তি অতি বিপজ্জনক, ভেরি ভেরি ভেরি ডেনজারাস। আমাদের কাজের কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে?

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পিঠে এক ঘা ডাণ্ডা।

মারলেন কেন স্যার। আপনারা কি পাঠশালায় পণ্ডিত ছিলেন, কিংবা পুলিস।

না, আমরা পশ্চিম বাংলার কলকাতাতেই ছিলুম, ডাক্তার। মরে যমদূত হয়েছি। ও ছিল ই এন টি স্পেস্যালিস্ট। এ ছিল আই স্পেস্যালিস্ট, ও ছিল গাইনি, আমি হার্ট।

আবার এক ঘা ডাণ্ডা।

শুনে রাখ ছোকরা, যতবার প্রশ্ন ততবার ডাণ্ডা। আমরা প্রত্যেকেই এক একজন জাঁদরেল ডাক্তার ছিলুম। রুগীদের কোন ফালতু প্রশ্নের জবাব

সম্মুখে শান্তি পারাবার
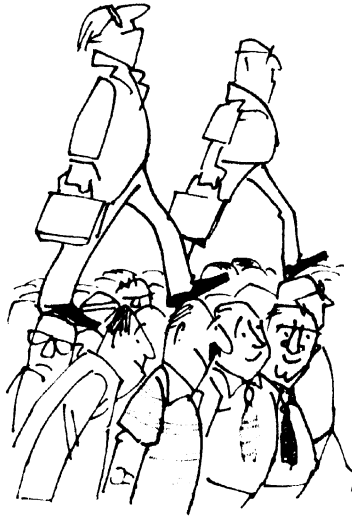
দিতুম না। প্রেসক্রিপসান ঠুকেই পকেটে টাকা পুরতুম। যমদূত বলে হেঁজিপেঁজি ভেবো না।

প্রশ্ন করলেই ডাণ্ডা তবু প্রশ্ন না করে থাকা যায়? একে বাঙালী, তায় কলকাতার লোক, তার ওপর সরকারী চাকরে ছিলুম। ব্রাহ্মস্পর্শ যোগ। সারা জীবন বকবক, পরচর্চা, ব্লাফ, এই করেই তো কেটেছে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে গলিয়ে নাকটি তো ভোঁতা মেরে গেছে। ডাণ্ডাই বা আমাকে কতটা কাবু করতে পারে। কলকাতার বাসে ট্রামে নিত্য পঁচিশ বছর বাড়ি বিবাদিবাগ, বিবাদিবাগ বাড়ি করে করে শরীরের স্পর্শ-কাতরতা নষ্ট হয়ে গেছে।

স্যার মাস্তান মরে কি হয়?

আরশোলা।

আচ্ছা মন্ত্রী মরে কি হয়?

শুঁয়োপোকা।

ব্যবসাদার মরে।

ডগ ইন দ্য ম্যাঞ্জার।

কেরানী মরে?

উইপোকা।

আমাকে তা হলে উইপোকা হতে হবে?

হতে হবে তার আগে নরকের টার্মসটা শেষ করতে হবে।

আর একটা প্রশ্ন স্যার, বউ মরে কি হয়?

পরস্ত্রী।

ও, আপনাদের বেশ সুন্দর নিয়ম তো।

হ্যাঁ সুন্দর নিয়ম। স্বভাব আর প্রবণতা অনুসারে পুনর্জন্ম।

চিত্রগুপ্ত মানুষটি বেশ শান্তশিষ্ট। তাঁর সেক্রেটারিয়েটটিও বেশ বড়। এলাহি ব্যবস্থা। হবেই তো। সারা পৃথিবীর প্রেত নিয়ে কারবার। ক্রিকেটের স্কোর বোর্ডের মতো দেয়ালজোড়া বোর্ড। মৃত্যুর সংখ্যা ভেসে ভেসে উঠছে। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ধরনের মৃত্যু। ভুগে মরা, চাপা পড়ে মৃত্যু। প্রাণদণ্ডে মৃত্যু, পড়ে মৃত্যু, বাড়ি ধসে মৃত্যু, খুন, আত্মহত্যা, জলে ডুবে মৃত্যু, অনাহারে মৃত্যু, ভুলিভোজে মৃত্যু, রাজনৈতিক মৃত্যু, নরবলি, ধর্মীয় মৃত্যু, অনশনে মৃত্যু। এত মৃত্যুর মধ্যে বসেও কেমন হাসি হাসি মুখ।

আমি দপ্তরে ঢুকতেই টেবিলের ওপর একটা ফাইল তিড়িং-বিড়িং করে নেচে উঠল। আমার কেস হিসট্রি। চিত্রগুপ্ত একটা স্লিপে খসখস করে লিখলেন, বাহাত্তর বছর নরক বাস।

যাও নিয়ে যাও।

বাহাত্তর লেখা একটা পদক যমদূতের হাতে দিয়ে বললেন,

পেছনে এক লাথি মেরে নরকে ফেলে দাও।

প্রভু, ঠাণ্ডা নরক, না গরম নরক?

ফুটন্ত নরক।

আমার কিছু বলার ছিল স্যার।

বলে ফেল।

আজ্ঞে আমি কলকাতার লোক। ইংরেজের কলকাতা নয়, স্বাধীন ভারতের কলকাতা।

জানি।

তাহলে জেনে শুনে আমাকে আবার নরকে পাঠাবেন কেন? এটা কি ন্যায়বিচার হচ্ছে? আমার নরকবাস তো হয়েই গেছে। আপনার নরকের মডেল আমার জানা নেই। মিলটন সায়েবের প্যারাডাইস লস্টে পড়েছি আর ফিলিমে দু একবার দেখেছি। কিন্তু কলকাতা। যাবেন নাকি একবার! অমন একটা সুপরিকল্পিত নরক আপনার কল্পনা, আপনার প্ল্যানিংএর কান কেটে দেবে।

চিত্রগুপ্ত কাছে দেখার চশমা খুলে, দূরে দেখার চশমা পরে আমার দিকে তাকালেন।

যাবেন নাকি স্যার? ওই নরকে যদি একবছর থাকতে পারেন আমি সারা প্রেতজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব। আমি যাটটা বছর ওখানে কাটিয়ে এলুম। আপনি আমাকে নরকের ভয় দেখাচ্ছেন স্যার। আপনারটা তো লোক্যালাইজড, ফিলমি নরক, কলকাতা হল রিয়েল নরক বিশাল তার বিস্তার, আকৃতিতে বিকৃতিতে সে নরক দিন দিন আদর্শ নরকের চেহারা নিচ্ছে। নরকের ভয় কি দেখাচ্ছ প্রভু।

বেশ, তুমি মিথ্যে বলছ কি সত্য বলছ দেখার জন্যে আমি যাব। এই কে আছিস আমার পিঁড়িস টেনে তেল ভর। ওভাবে গেলে হবে না গুরু। বিমান থেকে সব জায়গাই একরকম দেখতে, কলকাতা আর স্কটল্যান্ড কোনও তফাত নেই। ছবির মত। ছবিতে সব সুন্দর।

তুমি কি বললে, 'গুরু'?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা ফুটবলের ভাষা।

সেটা আবার কি?

আপনি গেলেই বুঝতে পারবেন। কলকাতায় একদল নাগরিক তৈরি হয়েছেন, এত খানি খানি ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, লতপতে প্যান্ট, বুকের বোতাম খোলা, কাঁধে পতাকা, যাঁদের আপনি, শুধু ময়দানে খেলা দেখার এবং খেলার শেষে তাঁদের নিজস্ব খেলা দেখানর জন্যে ছেড়ে রেখেছেন। শেষ খেলাটাই বড় খেলা। আপনার যমদূতেরাও এই সব ক্রীড়ারসিকদের কাছে ছেলেমানুষ।

খেলা ভাঙার খেলা

যমের বাহন সবচেয়ে নিরাপদ যান

কিভাবে তাহলে যেতে হবে।

আপনি আর আমি সোজা ময়দানে ল্যান্ড করব, তারপর জনারণ্যে মিশে গিয়ে আমি এতকাল যা যা করে এসেছি তার গোটাকতক আপনাকে করে দেখতে বলব। যদি পারেন, আপনাকে আমি বাহাদুর চিত্রগুপ্ত উপাধি দেব, যদি না পারেন বলব, ল্যাদাড়ুস চিত্রগুপ্ত।

তোমার তো তাহলে একটা শরীর চাই।

আবার শরীর। কলকাতায় আমি কোন শরীর নিয়ে ঘুরতে চাই না। অশরীরী হাওয়া হয়ে আপনার পকেটে পকেটে থাকব। তাইতেই আমার মোক্ষলাভ হবে।

মোক্ষলাভ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। শরীরটা হার্ট-অ্যাটাকে গেছে, আত্মার বাতাসটা পলিউসানেই শেষ হয়ে যাবে। ডিজেল আর পেটরলের ধোঁয়া, ধুলো, ইনডাসট্রিয়াল ফিউমস, ভূগর্ভস্থ নর্দমা, জমে থাকা জঞ্জালের পচা বিষবাষ্পে ফিনিশ।

চল তা হলে।

হে মহানগরী। আবার ফিরে এলাম। আমি এখন ভূত, সঙ্গের এই নিরীহ চেহারার মানুষটি হল প্রেত-লোকের বড়বাবু, চিত্রগুপ্ত।

সময়, বিকেল ছটা। স্থান, ধর্মতলার চৌমাথা। বার, অফিসবার। দৃশ্য, আকাশে কাল মেঘ, কয়েক পশলা হয়ে গেছে, আবার আসছে।

চিত্রগুপ্ত : বাবা! গিজগিজ করছে লোক। মৃত্যু দেখছি ফেল করেছে। এত মেরেও শেষ করতে পারছি না।

ভূত : আজ্ঞে এঁরা মরণজয়ী কলকাতাবাসী।

চিত্রগুপ্ত : আমি দাঁড়াব কোথায়। অনবরত গোঁত্তা মেরে চিৎপাত করে দিতে চাইছে।

ভূত : এইভাবেই দাঁড়াতে হবে প্রভু। পাতাল-রেলের টিনের বেড়ায় পিঠটা ঠেকিয়ে রাখুন। মনে রাখবেন বেঁচে ফিরতে হবে।

চিত্রগুপ্ত : এখানে দাঁড়াব কেন ?

ভূত : যখন মানুষ ছিলাম তখন রোজ এইখান থেকে বাস ধরে উত্তর কলকাতায় যাবার চেষ্টা করতাম।

দৃশ্য ॥ বিশাল একটা মিছিল ফেসটুন-মেসটুন নিয়ে মনুমেন্টের দিকে চলেছে। স্লোগান—রুখবই রুখব, রুখবই রুখব। উল্টোদিকে মিছিলের মতই ছাড়াছাড়া একটা দল হল্লা করতে করতে চলেছে। ঘূর্ণিঝড় যে পথে যায় সব ভেঙেচুরে রেখে যায়। পতাকার লাঠি দিয়ে বাসের পেছনে, মোটরগাড়ির [illegible] মারছে। বৃদ্ধ মানুষের চোখ থেকে চশমা খুলে নিচ্ছে। গাড়ির পেছনের আসনে বসে থাকা মহিলার ঝুঁটি নেড়ে দিচ্ছে। হে রে রে। এদের উল্লাসের চিৎকার। মিছিলের রুখবই রুখব। সব দিকের বাস বন্ধ। নিরীহ পথচারী ত্রস্ত। দোতলা বাসের একতলার জানালায় পা রেখে কিছু যুবক দোতলায় উঠে ড্যাং ড্যাং করে ঝুলছে। ট্রামের ওভারহেড ট্রলি ধরে কয়েকজন। সামনে ঝুঁকে পড়ে মাঝে মাঝে বিকট চিৎকার ছাড়ছে। ফটাফট, চটাপট, শব্দ, শব্দ আর শব্দ।

চিত্রগুপ্ত : আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে। এরা কারা। কি হচ্ছে। কি হবে!

ভূত : ধীরে প্রভু ধীরে। খেলা ভেঙেছে, মিছিল চলেছে।

চিত্রগুপ্ত : খেলা ভাঙা মানেই কি সব ভেঙে-চুরে তছনছ করা।

ভূত : আনন্দ, উল্লাস। যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?

চিত্রগুপ্ত : মারা পড়বে যে। ট্রামের ট্রলিতে হাই ভোলটেজ চলেছে, শক খেয়ে মরবে যে! দোতলা বাসের জানালা থেকে চিৎপাত হলেই মার কোল খালি!

ভূত : আপনার মৃত্যু এদের কাছে ম্লান। মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান। মরবে এরা, যারা রুখবই রুখবর মিছিলে নেই, ময়দানের খেলা ভাঙার হুল্লোড়ে নেই।

চিত্রগুপ্ত : নাঃ যমরাজকে বলতেই হবে, মহারাজ আপনার মৃত্যুর দাঁতের ধার কমে গেছে।

দৃশ্য ॥ সার সার দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ ঠাসা বিভিন্ন মাপের বাসের ভেতর থেকে আর্তনাদ, গোঙানির শব্দ। অ্যাই কনডাকটার চালাও না বাপ। কি করে চালাব ছেলে, সামনে মিছিল, খেলা ভেঙেছে। বাসের ভেতর থেকে বৃদ্ধের আর্তনাদ, আর করব না, ওরে বাপ আর করব না, আমাকে নামিয়ে দাও। ধ্যার মশাই, নামবেন কি করে। মরতে হয়, এখানেই মরুন, টার্মিনাসে গিয়ে মাল খালাস করে নেবে। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার এক ভদ্রলোক চিত্রগুপ্তকে এসে বলছেন—কি করে একটা ট্যাকসি পাই। ওই দেখুন আমার স্ত্রী রাস্তার ওপর বসে পড়েছে। ভীষণ অসুস্থ। অন্ধকার উত্তর দিল, ট্যাকসি কোথায় পাবেন, নিউমার্কেট থেকে একটা ঝাঁকামুটে ভাড়া করে আনুন। ট্যাকসি পাবেন না, খেলোয়াড়দের ভয়ে রাত আটটার আগে কোনও বাস এ অঞ্চলে আসবে না। রাত নটার আগে এ জ্যামও খুলবে না। আবার বৃষ্টি শুরু হল।

চিত্রগুপ্ত : ওই যারা রুখবই রুখব করছে, কি রুখতে চাইছে।

ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!

ভূত : প্রথমে চক্রান্ত রুখবে, তারপর লোড-শেডিং রুখবে, আসলে যানবাহন রুখেছে।

চিত্রগুপ্ত : কিসের চক্রান্ত, কার চক্রান্ত। বিদেশী চক্রান্ত নাকি ?

ভূত : না স্যার, দেশী চক্রান্ত। যখন যে দল পাওয়ারে আসে তারাই অফিস ছুটির পর রোজ একটা করে মিছিল বের করে। প্রতিটি ক্ষমতাসীন দলেরই ধারণা, বিদায়ী দল, সংবাদপত্র, ব্যবসাদার মিলে, ঘোরতর একটা চক্রান্ত করে ন্যাজে-গোবরে করার তালে আছে।

চিত্রগুপ্ত : ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে গাত্রে হল ব্যথা।

দৃশ্য ॥ জোর বৃষ্টি। কেরানী ভেজান বৃষ্টি। যে যে দিকে পারছে ছুটছে। একজন ছুটন্ত আর একজনের চটি পেছন দিক থেকে চেপে ধরেছেন, তিনি হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়লেন, পাশ দিয়ে যিনি ছুটছিলেন তিনি অভ্যাসবশে বলে গেলেন—সরি। চিত্রগুপ্ত ছুটছেন গাড়িবারান্দার তলায় আশ্রয় নেবার জন্যে। কোথায় আশ্রয় ? সেখানেও শক্তির লড়াই চলেছে। সবল দুর্বলকে টপকে, ধাকক্কা মেরে, মাড়িয়ে জায়গা দখল করছে। ঠেলতে ঠেলতে হয় খোলা রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে, নয়তো দেয়ালে পিষে পুঁটকি পেট করে ছাড়ছে। অহংকারী গাড়ি দুপাশে জল-কাদার ফোয়ারা তুলে হু কেয়ারস হুম ভাবে ছুটছে।

চিত্রগুপ্ত ধপাস। আমার কি ? আমি তো মরে ভূত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছি। বাতাসের মত, আকাশের মত।

ভূত : কি হল প্রভু ?

চিত্রগুপ্ত : সিলিপ করে পড়ে গেলুম, না পেছন থেকে ল্যাং মারলে বুঝতে পারছি না। কোথায় পড়লুম বলতো ?

ভূত : আজ্ঞে ফুটপাথে।

চিত্রগুপ্ত : এর নাম ফুটপাথ ?

ভূত : কলকাতার ফুটপাথ প্রভু। সিংগাপুর কি হংকং-এর নয়। এর চেয়ে জঘন্য ফুটপাত্র আপনি পাবেন ?

চিত্রগুপ্ত : সারায় না কেন ?

ভূত : কে সারাবে, কেন সারাবে, কাদের জন্যে সারাবে। সারালেই বেদখল, গোটাকতক প্রদেশের মানুষে মানুষে মারদাঙ্গা। ভাগের মা গঙ্গা পায় না স্যার। নিন উঠে পড়ুন। এই তো সবে শুরু। এই অঞ্চলটাতে নরকের ঠোঁট। আসল গহ্বরে তে এইবার ঢুকতে হবে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ব্যঙ্গচিত্র

আমার পায়ে ধরো

আরস

আরস

Kutty

আইনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

সুধাময় বসু

আইন, আদালত, বিচার, ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে অনেকেরই মনে নানা প্রশ্ন জাগে। যাঁরা বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় পারদর্শী নন তাঁদের পক্ষে এসব নিয়ে সম্যক আলোচনা বা পড়াশোনার যথেষ্ট অসুবিধা। অন্যান্য নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ হলেও আইন সম্পর্কে গভীর আলোচনা বাংলা ভাষায় বেশী দেখা যায় না। তাই আইনের প্রকৃতি ও স্বরূপ নিয়ে কিছু আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। মৌলিক বা নূতন তথ্য উত্থাপনের চাইতে আইন সম্পর্কে নানা দিক থেকে বিশেষজ্ঞদের চিন্তাধারা ও মূল প্রশ্নাদিতে পাঠকদের অবহিত করা এবং তাঁদের মনে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলার প্রয়াসে মুখবন্ধ হিসাবেই এই আলোচনার সূত্রপাত।১

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে আইন অচ্ছেদ্য এবং ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। তাই সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আইনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যুগে যুগে মানুষ বিভিন্ন দেশে নিয়ম শৃংখলা ও সুষ্ঠু সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে যেসব চিন্তা করেছে, ও তাকে ব্যবহারিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছে—তাই আইনের প্রকৃতি ও তাৎপর্যের মূল উপাদান। এর উৎপত্তি, স্বরূপ ও সংজ্ঞা নিয়ে স্বাভাবিকতই রয়েছে নানা মতভেদ এবং একদিক থেকে আইনের সমস্যা চিরন্তন হলেও বিভিন্ন দেশ ও কালের বিশিষ্ট রূপের উপর এর নানা সমস্যাদি এবং মীমাংসা নির্ভর করেছে। আইনের মতবাদ অতি ঘনিষ্ঠভাবে দর্শন এবং রাজনীতির সাথে জড়িত। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে দর্শন থেকে আসে আইনের চিন্তাধারার কাঠামো এবং রাজনীতি থেকে আসে এর ন্যায়ের ধারণা। বোডেনহাইমার প্রভৃতি মনীষীদের মতে রাজনৈতিক ভাবধারাকে নিবন্ধ কাঠামোতে পরিস্ফুট করে তোলাই মূলত মানবসভ্যতার আইনের অবদান। তা ছাড়া জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই মূল প্রশ্ন ঘিরে নানা মূল্যবোধ যেসব চিন্তার সংঘাত ও সমন্বয়ের প্রচেষ্টা যুগে যুগে উদ্ভব করেছে—তারাও আইনের নানা মতবাদ ও মূল্যায়ন সৃষ্টি করেছে।

সাধারণভাবে আইনকে আমরা জানি মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অপরিহার্য কতগুলি নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণবিধি হিসাবে। নিয়ম মাত্রই ব্যক্তিগত জীবনে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে—নিয়মের আনুগত্য তাই মানুষের মনে বিদ্রোহের ভাবও জাগায়। প্লেটো থেকে কার্ল মারকস অবধি বহু পাশ্চাত্য মনীষী তাই আইনকে বাদ দিয়ে সমাজ গড়তে চেয়েছেন। প্রুধোর মতে সমাজের শৃংখলার সাথে "নৈরাজ্য" (অ্যানারকি) বা আইনবর্জিত অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার সম্মিলনই মানবসভ্যতার চরম উৎকর্ষ। অ্যানারকি বা অরাজকতা বা নৈরাজ্য এমন সামাজিক ব্যবস্থা যাতে কোন বিধিনিষেধ কাউকে জোর করে মানতে হবে না। সবাইর যা খুশি করার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। বাকুনীন, ক্রপটকিন প্রভৃতি এই মতের সমর্থকদের ধারণা মানুষ আসলে ভাল কিন্তু রাষ্ট্রের চাহিদায় এবং নানা বিধিনিষেধ তাকে নষ্ট করে ফেলে। সমাজবোধের সহজাত সংস্কার নিয়েই মানুষ স্বাধীন আবহাওয়ায়, স্বেচ্ছায়—কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই—নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা শান্তি ও সুখে বাস করতে পারবে। শুধু নৈরাজ্যবাদীরা নন—যুগে যুগে ধর্মীয় অনুশাসনও রাষ্ট্রপরিচালিত আইনকে ভালো চোখে দেখেনি। তা ছাড়া প্রতি যুগে প্রতি দেশেই কিছু কিছু মানুষ নিয়ম এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগে বিক্ষুব্ধ হয়ে নিয়ম শৃংখলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

কিন্তু তবু অধিকাংশ মানুষের ধারণা এই যে বেশির ভাগ মানুষ ভালো হলেও অল্প কয়েকটি বিকৃত বা অপরাধপ্রবণ মানুষ সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। অভিজ্ঞতার নজিরে বলা যায়—অর্থনৈতিক প্রাচুর্যেও অ্যানারকিস্ট বা নৈরাজ্যবাদীরা যা আদর্শ সমাজের ভিত্তি বলে মনে করেন। অপরাধের প্রবণতা কারো যায় না। তা ছাড়া সাধারণ ভালো মানুষও হঠাৎ ইন্দ্রিয়জ দুর্বলতায় এমন সব কাজ করে ফেলতে পারেন—যা সমাজ সহ্য করতে পারে না। ইতিহাস মোটামুটি আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, মানুষের সমাজে নিয়ম এবং শৃংখলা আপনা থেকে চালু হয় না। তারা স্বয়ংক্রিয় নয়। তাই অল্প কয়েকজনের বিরুদ্ধ ধারণা সত্ত্বেও মানুষের সমাজ মোটামুটিভাবে আইনকে অপরিহার্য বলে মেনে নিয়েছে।

আবার নিয়মও শৃংখলার প্রতি মানুষের আনুগত্য সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়। বাইরের প্রকৃতিতেও বিশৃংখলার চাইতে শৃংখলা, ব্যতিক্রমের চাইতে নিয়মেরই প্রাধান্য বেশী। প্রকৃতির সাথে একসঙ্গে থাকতে গিয়ে স্বভাবতই মানুষও নিয়ম ও শৃংখলার সন্ধান করে এসেছে। বোডেনহাইমার-এর অনুকরণে বলতে হয় সকল জীবজন্তু, মানুষ সমেত, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির অংশই শৃংখলা সমন্বিত, সুসংহত ও সঙ্গতিপূর্ণ। নির্দিষ্ট কক্ষে গ্রহসকল এবং সূর্য সুনির্দিষ্ট নিয়মে প্রদক্ষিণ করে চলে। সূর্যের নিয়মানুবর্তিতার ফলেই আমাদের পৃথিবী কোটি কোটি বর্ষ ধরে নানা সম্ভার যুগিয়ে মানুষের জীবন-ধারণ সম্ভব করেছে। বিভিন্ন ঋতুর সুনির্দিষ্ট আবির্ভাব মানুষকে শিখিয়েছে কি করে উপযুক্ত ঋতুতে শস্যাদি উৎপাদন করে অন্য সময়ের জন্য তা সঞ্চয় করে রাখতে হয়। বিশ্বের জল, বায়ু, অগ্নি, রাসায়নিক ও মৌলিক উপাদানদির অপরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যই মানুষকে শিখিয়েছে তার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে। আজিকার সভ্য জগতের সকল ক্রিয়াকাণ্ড যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, জাহাজ ও বিমান তৈরী তাদের পরিচালনা, সেতু নির্মাণ, গ্রহান্তরে গমন, শুক্র প্রভৃতি গ্রহে যন্ত্রাদি প্রেরণ সম্ভব হয়েছে গণিত দ্বারা নির্ণয়যোগ্য বাইরের প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়ম। বিশ্বপ্রকৃতির এই নিয়ম হয়েছে। এই যে আমাদের চিকিৎসাবিদ্যা যার ফলে কোটি কোটি মানুষ ও পশু উপকৃত হয়—তাও সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে মানুষের এবং অন্য জীবাদির শরীরেও রয়েছে সুনির্দিষ্ট শৃংখলা—এক ধরনের দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি রক্ত চলাচল ব্যবস্থা, বিভিন্ন কোষ এবং পেশীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাস। সকল দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালী এক নির্দিষ্ট নিয়মে না চললে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সৃষ্টিই সম্ভব হতো না।

তবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলতে গেলে এও স্বীকার্য যে, নিয়মানুবর্তিতারও ব্যতিক্রম আছে। তবে আমাদের চোখে যে বৈষম্য ও ব্যতিক্রম চোখে পড়ে—তার আড়ালে অজানা কোন নিয়মও থাকতে পারে। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে পণ্ডিতরা বলেন যুগে যুগে মায়া, ইনকা মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি কত সভ্যতা অজ্ঞাত কারণে লুপ্ত হয়ে গেছে। কত অজানা ব্যাধি—জানা অসুখেরও কত অপ্রত্যাশিত গতি কত সময়ে চিকিৎসা সংকট ঘটায়। কত জৈব দেহের সাধারণ সুস্থ গড়ন কর্কটগ্রস্ত জীবকোষের অসম বৃদ্ধির ফলে ব্যাহত হয়। এর ব্যতিক্রমও রয়েছে তবে তা সংখ্যায় কম। বাইরের প্রকৃতির মত মানুষের বেলায়ও দেখা যায় বেশির ভাগ লোক তাদের জীবনযাত্রায়, কাজের ধরনে অবসর যাপনের পদ্ধতিতে একই অভ্যাস মেনে চলে। এর ব্যতিক্রমও রয়েছে তবে তা সংখ্যায় অল্প। পরিবার, সম্পত্তি, যৌনসম্পর্ক নানা বিষয়েই মানুষ শৃংখলার পক্ষপাতি—তাই ওসব সম্পর্কে নিয়ম ও অনুশাসনের সৃষ্টি। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে শৃংখলার প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে গেছে। কোনরূপ আইনানুগ ব্যবস্থা ছাড়া বর্তমান সভ্য জীবন অসম্ভব। নিয়ম ও শৃংখলা ছাড়া দুই প্রকার সামাজিক বিন্যাস হতে পারে। একটি অ্যানার্কি বা নৈরাজ্য যার কিছু বৈশিষ্ট্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি স্বৈরাচার বা ডেসপটিজম। পৃথিবীর ইতিহাসে অবশ্য অমিশ্র নৈরাজ্য বা স্বৈরাচারের দীর্ঘস্থায়ী কোন নজীর নাই। নির্ভেজাল স্বৈরাচারে একটি মানুষের হাতে থাকে অন্যদের উপর প্রভুত্ব করার অবাধ ক্ষমতা। ঐ ব্যবস্থায় চরম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তার খেয়ালখুশি মত যা কিছু করতে সক্ষম পাশা বা তাস খেলায় হেরে গিয়ে এ হেন ব্যক্তি যে জিতবে তাকে ফাঁসি দিতে পারে—কেউ খোশামোদ করলে তাকে যত খুশি পুরস্কার দিতে পারে—একই অপরাধে একজনকে গুরু শাস্তি আবার সেই অপরাধেই অন্যকে তার চেহারা দেখে বা অন্য কোন কারণে বা কারণ ছাড়াই ছেড়ে দিতে পারে। নিজের খেয়াল খুশিতে কি তিনি করবেন আগে থেকে কোন যুক্তি বা বিবেচনার নিরিখে তা ধরা পড়ার নয়। তবে ইতিহাসের নজিরে একেবারে বেপরোয়া ঐ ধরনের স্বৈরাচারের দৃষ্টান্ত বেশি নেই। সমাজের দীর্ঘস্থায়ী আচারব্যবহার পারিবারিক সম্পর্ক, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতির উপর অযথা এবং নির্বিচার হস্তক্ষেপ বড় কেউ করতে চায় না। আধুনিক কালে যাকে বলা হয় টোটালিটারিয়ানে বা সর্বব্যাপক রাষ্ট্র তার ভিত্তি একটা আদর্শমূলক মতবাদ হওয়ার জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার সংযত হয়। সরকারী কার্যাবলীর রীতিনীতি ও মতবাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে কিছুটা অনুমান করা যায়। ইতালীতে জাতীয় স্বার্থের নামে মুসোলিনীর সময় বহু মানুষকে হত্যা করতে, জার্মানীতে আর্য-অনার্যবাদের নামে লক্ষ লক্ষ ইহুদীদের ও রাশিয়াতে বিপ্লবের নামে বহু কুলাক-বুর্জোয়ার অবসান ঘটাতে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে। আইনের দিক থেকে লক্ষণীয় যে, উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক,—দেশের উন্নয়ন বা শ্রমিকের প্রয়োজনে হলেও,—যদি একজন বা কতিপয় ব্যক্তির হাতে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেওয়া হয়, যার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেই—সে ক্ষমতার সাথে স্বৈরাচারী ক্ষমতার মূলত কোন পার্থক্য নেই।

আইন তাই মূলত শৃংখলাসূচক এবং অরাজকতা ও স্বৈরাচার-বিরোধী। কিন্তু এটুকু জানলেও আইনের মূল চেহারা প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে যায়। আইন মানেই এক প্রকার নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণবিধি। সবাই জানেন নিয়ম মাত্রই ব্যক্তিগত জীবনে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে—কিন্তু সাধারণভাবে উদ্দেশ্য সমষ্টির কল্যাণ। রাস্তায় যে কোন ধার দিয়ে যখন তখন চলা বা গাড়ি চালানোর অবাধ স্বাধীনতা নানা প্রকার নিয়মে খর্ব হয়। যেমন বাঁ দিক দিয়ে গাড়ি চালানোর বাধ্যবাধকতা, মোড়ের মাথায় ট্রাফিক লাইট বা আলো দেখে সেই অনুযায়ী ডাইনে বা বাঁয়ে চলা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐসব নিয়মে, জনবহুল শহরের রাস্তায় চলা বিঘ্নিত না হয়ে বরং সুষম এবং দ্রুততরই হয়। নিয়মের দ্বারা সংকুচিত না হয়ে চলার স্বাধীনতা স্থান বিশেষে বরং প্রসারিতই হয়। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় অনেক সময়ই যা আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তির পক্ষে ক্ষণিক অসুবিধা বা কষ্ট, শেষ পর্যন্ত তা সমষ্টিগতভাবে শুভই হয়। এ জিনিসটি মনে রাখলে আইনের চরিত্র বুঝতে সুবিধা হবে।

আইনের পরিণত অবস্থার আগে সামাজিক প্রথা বা আচার (কাস্টম)-ই মানুষের সমাজে প্রচলিত ছিল এবং এ সকল প্রথাই মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করত। স্যার হেনরি মেইন আইন এবং সামাজিক প্রথা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন। আইন মাত্রই কিন্তু সব দেশে লিখিত নয়। কোন আইন সভায় পাশ না হলেও বহু প্রথা নানা কারণে এবং কতগুলি বৈশিষ্ট্যের ফলে আইনের আওতায় এসে যায়। "কমন ল" নামে যা প্রচলিত তার অধিকাংশই অলিখিত। কোন প্রথা বা নিয়মের প্রচলিত আইনের অংশ হিসাবে আদালতে গ্রাহ্য হবার আগে কতগুলি আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। মোটামুটিভাবে সেগুলি হল : ১। তাদের বহুজন গ্রাহ্যতা ও সন্দেহাতীত অস্তিত্ব, ২। স্বার্থহীন নিরপেক্ষতা, ৩। বহুকালব্যাপী স্থায়িত্ব এবং ৪। যুক্তিযুক্ততা। আবার এ সমস্ত গুণ বর্তমান থাকলেও অনেক প্রাচীন প্রথা সামাজিক নীতি বা অন্যান্য প্রচলিত আইন বিরোধী হলে বৈধ বলে স্বীকৃত

আইন তবে কী? সাধারণভাবে বলতে গেলে আইন হল মানুষের বহির্মুখী কার্যকলাপ সম্পর্কে কতগুলি সাধারণ নিয়ম যার কোন ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সহ্য করবে না। হল্যান্ড-এর প্রসিদ্ধ আইনের সংজ্ঞা হল—"a general rule of external human action enforced by a sovereign political authority"—এ প্রসঙ্গে বুঝতে সুবিধা হবে—আইনের চোখে নাগরিকের অধিকার বলতে কি বোঝায়। আইনগত অধিকার হল—নিজের গায়ের জোর ছাড়াই রাষ্ট্রের সম্মতি এবং সাহায্য দ্বারা অন্যের কাজকে প্রভাবিত করা বা নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা। কোন মানুষ যদি তার নিজের জোরে বা [illegible] অন্যকে দিয়ে তার ইচ্ছা পূরণ করে নেয় সেটা হল তার নিজস্ব ক্ষমতা, আইনের অধিকার নয়। কর্তৃত্ব ক্ষমতা বা নৈতিক জোর ছাড়া যেখানে নিছক রাষ্ট্রশক্তি তার ইচ্ছা পূরণের সহায়তা করে এবং অন্যকে তার জন্য কিছু করতে বা কিছু করা থেকে বিরত হতে বাধ্য করে সেখানেই তার ইচ্ছাপূরণের আইনগত অধিকার রয়েছে ধরতে হবে। আবার রাইট বা অধিকারের সাথে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছে ডিউটি বা কর্তব্যের প্রশ্ন। একজনার আইনগত অধিকার মানেই অন্যদের সে অধিকার পূরণ করার বাধ্যবাধকতা। যাক, অধিকার সম্পর্কে আইনগত তাৎপর্য হল এই যে, কোন কাজ যদি নাগরিকের অধিকারের বাইরে হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের অনুমোদিত বিধিব্যবস্থার সংগে সংগতিপূর্ণ না হয়—তখন রাষ্ট্র যে তাকে অবজ্ঞা করে নিষ্ক্রিয় থাকবে তা নয় বরং নিজে থেকে বা কারু আহ্বানে হস্তক্ষেপ করে সে কাজকে নাকচ করে দেবে। রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপই আইনের দণ্ড বা মঞ্জুরী (স্যাংশন)। কারো কারো মতে আইন তাই বিধিবদ্ধ এবং সশস্ত্র জনমত, বা সশস্ত্র শাসক সম্প্রদায়ের মত। হল্যান্ড প্রভৃতি তাঁদের আইন পুস্তকাদিতে আইনের অধিকারকে চার অংশে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন : ১। ব্যক্তি—যার অধিকার আছে বা অধিকার থাকার জন্য যার সুবিধা হচ্ছে। ২। অনেক স্থলে অবজেক্ট বা ক্ষেত্র যার উপর অধিকার খাটে। ৩। কাজ বা কাজ হতে বিরত থাকার ব্যবস্থা যা আইনের অধিকার দাবী করতে পারে। ৪। ব্যক্তি—যার কাছ থেকে কাজ বা কাজ হতে বিরত থাকার দাবী আদায় করা যায়—অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে অধিকার প্রয়োগ করা যায় বা যার কর্তব্য বা দায় হচ্ছে কাজ করে বা কাজ থেকে বিরত হয়ে অন্যের অধিকার পূরণের সহায়তা করা।

যাক, মূলত আমরা জেনেছি আইন শুধু যে কোন নিয়ম নয়—মানুষের বহির্মুখী কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়ম এবং এর ভিত্তি হচ্ছে সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মঞ্জুরী (স্যাংশন)। এই সার্বভৌম কর্তৃত্বের স্যাংশন বা মঞ্জুরী যাকে আইনের অচ্ছেদ্য অংশ বলা হয়, তাকে একটু তলিয়ে দেখা এবং নানা প্রকার সম্ভাব্য জটিলতা সম্পর্কে একটু অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যে নিয়মাবলী চালু করার জন্য প্রয়োজন হলেও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে না—সে নিয়ম আইনের পর্যায়েই পড়বে না। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অনেক স্থলেই সহজে বোঝা যায়। যেমন গণতন্ত্রে পার্লামেন্ট বা আইনসভা আইন সৃষ্টি করে—আদালত তাদের প্রয়োগ করেন এবং আদালতের নির্দেশ সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে পালিত হয়। অস্টিন প্রভৃতির এই মত। গণতন্ত্রে আইন এক হিসাবে শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হয়ে দাঁড়ায়। সেটা চিন্তার কথা। শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা যার হাতে বেশী সংখ্যক আইন সভার ভোট তার হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা চলে গেলে আইন তার উৎকর্ষতা হারিয়ে ফেলে। স্বাধীন চিন্তা এবং বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা সুষ্ঠু আইনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। নইলে আইনের উন্নত মান নষ্ট হতে বাধ্য। ক্ষমতাসম্পন্ন কোন নেতার বা কতিপয় নেতার প্রতি আনুগত্য যদি বেশির ভাগ আইনসভার সদস্য তাঁদের বিবেকবুদ্ধি, বিবেচনা, দেশের ও দশের মঙ্গলবোধ বিসর্জন দেন তবে আইনের আকৃতি কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশে এবং বাহিরে নানা বাস্তব নজিরও আছে। বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেখানে পার্টির মাধ্যমেই বেশির ভাগ সদস্য আইন সভায় নির্বাচিত হন সেখানে মন্ত্রিত্ব ও নানা উচ্চ, অর্থকরী পদের আকাঙ্ক্ষা, পরবর্তী নির্বাচনে নিজেদের মনোনয়ন পাওয়া প্রভৃতি নানা কিছুর স্বার্থে নির্বিচারে পার্টির কাণ্ডারী দু-তিন বা একক কোন নেতার অধীনতা মানার যে প্রবণতা বর্তমানে দেখা যায়—তাতে অনেকেই গণতন্ত্র তথা আইনের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তিত।

আইন এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সম্বন্ধ নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র কি আইন সাপেক্ষ না আইন রাষ্ট্র সাপেক্ষ? সম্ভব হলে পরে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে আইন আলোচনার সময় এর বিস্তৃত বিবেচনা করা হবে। সংক্ষেপে মার্কসীয় মতবাদে আইন হল ক্রমবিবর্তনশীল অর্থনৈতিক শক্তির পরিণাম বিশেষ। উৎপাদন ব্যবস্থার উপর অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে ওঠে। তাকে ভিত্তি করে তৈরী হয় আইনের উপ-বনিয়াদ (সুপার স্ট্রাকচার) যার সাথে মিশে সৃষ্ট হয় বিভিন্ন সামাজিক চেতনার রূপ। রাষ্ট্রের রূপ এবং আইনের সম্পর্ক মূলত বা প্রধানত অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সংগে আইনের চেহারা এবং আধেয় দুই-ই পাল্টায়। মার্কসীয় মতবাদে আইনের কোন স্বাধীন সত্তা নেই। মার্কসবাদে আইন সম্পর্কে আরেকটি মূল কথা এই যে যারা উৎপাদন ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করেন তারাই অন্যের উপর শোষণযন্ত্র হিসাবে আইনকে ব্যবহার করেন। এমনকি মজদুর স্বৈরতন্ত্রেও (প্রোলেটারিয়াট ডিকটেটরশিপ) আইনের শ্রেণীরূপ চলতে থাকবে। শুধু শ্রেণী

হীন সমাজ গড়ে উঠলেই রাষ্ট্র এবং আইন দুই-ই লোপ পেয়ে যাবে। তখন থাকবে নিছক প্রশাসন ব্যবস্থা। সোজা ভাষায় অন্যভাবে বলতে গেলে এই দৃষ্টিতে আইন হল বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত বর্তমান বৈষম্যমূলক সমাজে সম্পত্তির মালিক শ্রেণীর বিশেষ সুবিধাগুলিকে জিইয়ে রাখার একটি বাধ্যতামূলক সংস্থা বিশেষ। বর্তমান সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থায় যে সংঘর্ষমূলক বৈপরীত্য রয়েছে—তারাই অনিবার্যভাবে ঐতিহাসিক কারণে এর অবসান ঘটাবে। তবে একদিন শোষণের অবসানে, অন্যায় উৎপীড়নের সকল উৎস ও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আসবে শ্রেণীহীন স্বপ্ন রাজ্য যেখানে প্রতি ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদা পূরণ হবে, থাকবে যুদ্ধহীন, দ্বন্দ্বহীন সার্বজনীন শান্তি। পণ্ডিতরা মার্কসীয় দর্শনের সবটুকু মেনে না নিলেও, আইনের রূপ যে সমাজ বিশেষের অর্থনৈতিক বিন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং যারাই এর উপর কর্তৃত্ব করেন তাঁদের স্বার্থে অথবা নির্দেশেই যে একে জনসাধারণের উপর রাষ্ট্রের শক্তি দ্বারা চালু করা হয়—এ দৃষ্টি কিন্তু আইনের প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নূতন আলোকপাত। একদিক দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের মূল ভিত্তিকেই মার্কস গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেছেন। মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে যে বিভিন্ন সংস্থা সংবলিত গোটা সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে চিনতে না শিখলে তার আসল রূপ ও ভাবপ্রকৃতিকে বোঝা যাবে না। অবশ্য প্লেটো-র আদর্শ রাষ্ট্রের আইনের অপ্রয়োজনীয়তার কল্পনা আরো অনেক পুরনো। আমরা এর মধ্যেই দেখেছি, নৈরাজ্যবাদী বা আনার্কিস্ট আদর্শ ও আইনের অবসান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর পুরনো সকল আইন ব্যবস্থা এবং আদালত তুলে দিলেও রাশিয়াতেও নূতন আইন ও আদালত সৃষ্ট হয়েছে। মাও-পরবর্তী বর্তমান চীনে বিশেষ করে ব্যক্তির স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং আইনের শাসন চালু করার প্রচেষ্টার সংবাদও লক্ষণীয়। এসব থেকে অনুমিত হয় যে শুধু সংবিধান নয়, বিভিন্ন প্রকারের আইন, বিচার, আদালত প্রভৃতি সবই— যতক্ষণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তার পরিচালনার পক্ষে প্রয়োজন হবে।

পাউন্ড প্রভৃতির মতে আইনের প্রধান স্বরূপ হল এই যে এটি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বিশেষ। যথাযথ সামাজিক প্রয়োজন মেটানোই এর কাজ। তা হলেও অনেক পণ্ডিতদের মতেই শেষ পর্যন্ত বাধ্যবাধকতা বা দণ্ডের ভয়ই আইনের মূল কথা। যদি কোন আচরণ বা নিয়ম শুধু জনমত বা সমাজের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে—তা এই মত অনুযায়ী আইনের মধ্যে পড়ে না। আইনের শাসন তখনি বোঝা যাবে যখন তার অনুবর্তিতা রাষ্ট্র বা সংঘবদ্ধ সমাজের শক্তির দ্বারা বাধ্যতামূলক হয়। Del Vecchio (Philosophy of Law এর মতে যেখানে বাধ্যবাধকতা নেই সেখানে আইনও নেই। বল বা দণ্ডের আবশ্যকতা তখনি পরিস্ফুট হয় যখন সমাজবিরোধী ও অপরাধপ্রবণ মানুষদের কথা মনে আসে। যদি এদের বাধ্য করার শক্তি আইনের না থাকে তবে আইনের যা অন্যতম মূল উদ্দেশ্য শৃঙ্খলা এবং ন্যায়ের অনুবর্তন তা থেকেই সে বিচ্যুত হবে।

কিন্তু বর্তমান যুগের অনেক মনীষী—বোডেনহাইমার এঁদের অন্যতম আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে বাধ্যবাধকতা বা তার পেছনে সে রাষ্ট্রের অমিত দণ্ডশক্তিই আসল—সেটিকে পূর্ণ সমর্থন করেন না। এঁরা বলেন আইন ব্যবস্থার সফলতা প্রধানত নির্ভর করে তাকে মেনে নেওয়ার উপর। সমাজের বেশির ভাগ লোকই একটি সন্তোষজনক শাসন ব্যবস্থা মেনে নেয়—কারণ এতে তাদের সাধারণ স্বার্থ সিদ্ধ হয়। শাসন ব্যবস্থায় বেশির ভাগ নাগরিকের মনেই কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া বা বৈরী মনোভাবের সৃষ্টি হয় না। শুধু মুষ্টিমেয় অসহযোগীদের জন্যেই বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন হয়। দেখা যাবে যে কোন সুশাসিত দেশে আইন ভঙ্গকারীর সংখ্যা আইন মেনে নেওয়া নাগরিকদের তুলনায় অতি নগণ্য। পুলিশী ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয় কিন্তু তা কখনই পর্যাপ্ত নয়। হয়তো কেউ বলবেন গায়ের জোরে অন্যায় ব্যবস্থা চালু হলেও তো লোকেরা ভয়ে তা মেনে নেয়। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে—দীর্ঘদিন অন্যায় ব্যবস্থা চালু হলে ধীরে ধীরে প্রতিরোধ বেড়ে যায়—সে শাসন ব্যবস্থাও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। তাই বোডেনহাইমার মনে করেন সভ্য জগতে শৃঙ্খলার ভিত্তি মানুষের অভ্যন্তরীণ অনুমোদন। বিবেক এবং উচিতবোধই প্রকৃত নাগরিকতার সৃষ্টি করে। সুস্থ এবং সবল আইনব্যবস্থার মূল হল জনসাধারণের সম্মতি। প্রশাসনিক বলপ্রয়োগ ব্যবস্থা একটি ব্যতিক্রম বিশেষ। তাই রাষ্ট্রের বল প্রয়োগের সম্ভাব্যতাকেই যারা আইনের সারাংশ মনে করেন এঁদের মতে তাঁরা ভ্রান্ত। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা যেমন হাসপাতাল, রোগী, চিকিৎসা প্রভৃতি দ্বারা নির্ণয় করা চলে না, তেমনি আইনের ধারণাতেও বলপ্রয়োগের প্রশ্ন সর্বদা ওঠে না। এ সম্বন্ধে দুটি বিশেষ যুক্তি উদাহরণ স্বরূপ দেখান হয়। প্রথমত প্রতি শাসন ব্যবস্থাতেই এমন কতগুলি নিয়ম আছে যার অনুবর্তন শক্তি প্রয়োগের উপর নির্ভর করে না। অনেকেরই জানা আছে যে, বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতির উপর আদালতের কোন কর্তৃত্ব নেই। এটা ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি বা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক শিষ্টাচার জনিত অব্যাহতি। ধরুন রাশিয়া বা অ্যামেরিকা বা অন্য দেশ থেকে মহামান্য কোন রাষ্ট্রনায়ক এদেশ সফরে এলেন এবং তাঁর ভ্রমণের সময় তাঁর গাড়ি চালকের দোষে বা সরাসরি তাঁরই দোষে কারু ক্ষতি হয়ে গেল—তার জন্য আদালতে নালিশ গ্রাহ্য হবে না। এই সব ক্ষেত্রে তাঁদের সদিচ্ছা বা বিবেকবুদ্ধিই কাজ করে। শোনা যায় কোন আমেরিকান রাষ্ট্রনায়কের গাড়িতে গৃহপালিত ক্ষুদ্র এক প্রাণীর মৃত্যু ঘটে—নালিশ বা আদালতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনি—গৃহস্থ বহু স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিপূরণ হিসাবে পেয়ে প্রচুর লাভবান হন। আরো সব ক্ষেত্র রয়েছে —সেখানে অফিসারের বিরুদ্ধে নানা কারণে আদালতে নালিশ চলে না। সে সব ক্ষেত্রে কর্মচারীদের সদিচ্ছা এবং যেখানে গণতন্ত্র আছে সেখানে পরবর্তী নির্বাচনে [illegible] হয়। দ্বিতীয়ত অনেকেরই জানা আছে যে, আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রবিশেষের সার্বভৌমিক শক্তিদ্বারা বলপ্রয়োগের স্থান নেই। অস্টিন প্রভৃতি এই জন্যই আন্তর্জাতিক আইনে (ইণ্টারন্যাশনাল আইন)কে প্রকৃত আইনের স্বীকৃতি দিতে চান না। তাঁদের মতে এগুলি নৈতিক নিয়মাবলীর পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য কেলসেন বলেন, সার্বভৌম কর্তৃত্ব দ্বারা না হলেও যার উপর অন্যায় করা হয় সেই দেশ ও তার মিত্র দেশ দ্বারা যুদ্ধ, প্রতিরোধ, প্রতিশোধ, অর্থনৈতিক বয়কট প্রভৃতিও তো একপ্রকার বলপ্রয়োগ। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের আসল ভিত্তি—বিভিন্ন জাতির সম্মতি। বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী সবাই মেনে নেয়, কারণ এতে পরস্পরের স্বার্থ সিদ্ধ হয়। এ নিয়মভঙ্গের নজীরও অবশ্য আছে। গায়ের জোরে বা বিশেষ দেশের স্বার্থে অনেকবারই তা হয়েছে—এখনো হচ্ছে। তবু আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আইন মানার চাইতে না মানার দৃষ্টান্ত বেশী।

উপরের আলোচনায় সার্বভৌম শক্তির বলপ্রয়োগই আইনের মূলে বা আসল প্রকৃতি কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈত থাকলেও বাধ্যবাধকতা যে আইনের একটি বিশেষত্ব তা নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু এই বাধ্যবাধকতার স্বরূপটি কি? মেনে নেয়ার প্রবৃত্তিকেও বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। সমাজ-বিরোধী যখন কালো অ্যামবাসাডার গাড়ি নিয়ে ডাকাতি করতে গিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে হাত তুলতে বলে তখন টাকা ফেলে হাত তোলা একপ্রকার আদেশ মানা। পুলিস কর্মচারী যখন রাস্তার ফুটপাতে বেআইনীভাবে বিক্রয়কারী দোকানদারকে উঠে যেতে বলে সেও আদেশ মানা। তেমনি আদালতে হেরে গিয়ে রায় এবং ডিক্রি অনুযায়ী টাকা দিয়ে দেওয়াও আদেশ মেনে নেয়া। ডেনিস লয়েড এ-সব ক্ষেত্রে বলেন—তারতম্যটা শুধু ইচ্ছা অনিচ্ছার পায়ে জড়ানো নয়। মামলায় হেরে গিয়ে টাকা দেওয়া, পুলিসের আদেশে অনধিকার দোকান তুলে নেওয়া, এ দুই ক্ষেত্রে এবং ডাকাতকে টাকা দেওয়া সবটাতেই হয়ত অনিচ্ছা রয়েছে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই মানতে হচ্ছে। ডাকাতের বেলায় মানার প্রধান কারণ শারীরিক ক্ষতির ভয়। অন্য দুটি ক্ষেত্রে শারীরিক ক্ষতির ভয়ের চাইতেও বড় কথা—এমন একটি কর্তৃত্বের সম্মুখীনতা, যা ভাল লাগুক বা না লাগুক, মেনে নিতেই হবে। এ মানার অন্তরালে "মানা উচিত" এমনতর কোন নৈতিক মনোবৃত্তিও অনেক সময় কাজ করে। আইন এবং নীতির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ কিন্তু এদের ক্ষেত্র আলাদা। নীতি মানা হয়, যেহেতু তা বিবেক অনুযায়ী উচিত এবং ন্যায়সঙ্গত। আইন মানা হয় প্রধানত সেটি বৈধ কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বলে। নীতি ও আইনের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন এবং পরে তা করা হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে আইনের যে বৈধ কর্তৃত্ব—তার অনেকটাই দণ্ড এবং নীতি দুটির উপর প্রতিষ্ঠিত। এরই জন্য যখন কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে কোন দেশে বিদ্রোহ ঘটে বিদ্রোহীরা বেশীর ভাগ সময়েই নীতি এবং বৈধতার প্রশ্নকে মূলে বলে ধরে।

আইনের বেলায় বল বা দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা মানুষের মনের গভীরেও প্রবেশ করে। লয়েড তাঁর "দি আইডিয়া অফ ল" গ্রন্থে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে বলেছেন যে, মনস্তত্ত্ববিদরা অবচেতন স্তরে আমাদের যে সব সমাজ-সহযোগী উপাদান রয়েছে তাদেরও যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনি আবার আক্রমণাত্মক, কলহপ্রবণ বৃত্তিগুলির কথাও বলেছেন। অ্যারিস্টটল-এর প্রসিদ্ধ উক্তি "মানুষ রাজনৈতিক জীব" সম্ভবত প্রথম উপাদানগুলির ভিত্তি। ফ্রয়েড-এর মতে দ্বিতীয় উপাদানগুলিকে বশ মানানো যায়, দমন করা যায় কিন্তু বিলোপ করা যায় না। তা যদি সম্ভব হত মানুষের সমাজ রামরাজ্য বা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হত। মানুষ তো খালি শান্ত, বন্ধুভাবাপন্ন জীব নয় যারা আক্রান্ত হলেই শুধু নিজেদের প্রতিরক্ষা করে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ হিসাবে প্রবল আক্রমণাত্মক ইচ্ছাকেও গণ্য করতে হবে। সম্ভবত প্রতি সভ্যতা ও কৃষ্টিতেই কিছুটা বলপ্রয়োগ এবং কিছুটা সহজাত প্রবৃত্তির সংযমের উপর নির্মিত। কিন্তু এই সমাজ-বিরোধী শক্তিগুলিকে দমনের প্রয়াসে আধুনিক সভ্যতায় নানা আয়োজন আবার অন্য প্রকার অসুবিধা ও হতাশার সৃষ্টি করে। বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটকের আইন এবং কোন কোন স্থলে তার নির্বিচার অপব্যবহারে কী অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে এদেশের অনেক মানুষ তা জানেন। আবার কোন কোন আশাবাদীরা ভাবেন—মানুষের প্রকৃতির হয়ত কোনদিন পরিবর্তন হবে। 'দিব্যজীবনের' সৃষ্টির প্রয়াসও ভারতবর্ষের অধিবাসীদের অজানা নয়। মুষ্টিমেয় আশাবাদীদের মতে সামাজিক সভ্যতাকে চিরদিন দণ্ডদের উপর নির্ভর করে নাও থাকতে হতে পারে। আবার এটাও লক্ষ্য করার যে অতীতের তুলনায় বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় বলপ্রয়োগ ক্রমেই সীমায়িত এবং নিয়মানুগ হয়ে আসছে। কর্তৃত্বের উপলব্ধিও বল প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়। আজকের দিনে সভ্যজগতে কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বল প্রয়োগের ক্ষেত্র এতই কম যে মানুষের চরিত্র বিবেচনা করলে অতে বিস্ময়ই লাগে। কিন্তু লয়েড প্রভৃতি অনেকের মতে আইনে দণ্ড এবং বলের স্থান নেই বা খুবই কম, এটা ভাবা বিভ্রান্তিরই নামান্তর। উন্নত অনেক দেশের শাসনব্যবস্থায় বিশ্লেষণ করে উনি বলেন দণ্ড বা শক্তির প্রয়োগ এত সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং তা এমন সুকৌশলে ব্যবহৃত হয় যে তা প্রায় চোখের অন্তরালেই রয়ে যায়। বল বা দণ্ডের প্রয়োগ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে বর্তমান রাষ্ট্রে রয়েছে সুসম্বদ্ধ এবং অমিত শক্তিশালী ব্যবস্থা যা যে-কোন সম্ভাব্য প্রতিরোধকে অচিরেই ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। প্রতিরোধের নিরর্থকতার বোধই সর্বত্র ছড়িয়ে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে—আর মনে হতে চায় আইন যেন মানুষ এমনি মেনে নেয়।

আইনের নিয়ামক এবং দণ্ডভিত্তিক প্রকৃতির অল্প যেটুকু আলোচনা হল—তা কিন্তু আইনের স্বরূপ নির্ণয় করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। নীতির সঙ্গে আইনের

সম্পর্ক অতি মূল্যবান। তাছাড়াও ন্যায় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণও অতি প্রয়োজনীয়। বিস্তারিত আলোচনার সাপেক্ষে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে অনেক পণ্ডিত রয়েছেন যেমন হান্স কেলসেন আলফ্রেড জে অ্যায়ের যাঁরা "পিওর থিওরি অব ল"-র বা আইনের অব্যবহারিক মৌলিকতত্ত্বের প্রবক্তা। এঁদের মতে আকৃতিগত ভাবে সম্পূর্ণ এবং বাধ্যতামূলক কিছু নিয়মাবলী রচনা করাতেই আইনের কাজ শেষ হয়। আইনের আধেয় এবং তার যৌক্তিকতা প্রভৃতির প্রশ্ন এঁদের মতে বিজ্ঞানসম্মত আইনের আওতার বাইরে। আইন কি? এই প্রশ্নই আসল। "আইন কি হওয়া উচিত"—এ প্রশ্ন এঁদের মতে অবান্তর। মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে এঁরা আইনকে নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কেলসেন-এর মতে আইনশাস্ত্র হল আদর্শমূলক মানের জ্ঞান (নলেজ অফ নর্মস্)। নর্ম বা "মান" বলতে তিনি বোঝেন এমনতর কাল্পনিক মূল্যবোধ যা ঘোষণা করে দেবে বিশেষ কোন কাজ করা বা কাজ না করা রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক নির্দেশের আওতায় আসবে। যেমন "যে কেউ অবৈধভাবে অন্যের জিনিস নেবে তার কয়েদ বা জরিমানা হবে।" অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে একপ্রকার ব্যবহার চালু করার জন্য রাষ্ট্র বাধ্যবাধকতা বলবৎ করবে। আইন হল এই সব বিধানগুলির এক শ্রেণীবদ্ধ ব্যবস্থা। এর সার কথা হল বাইরে থেকে চাপান এক বাধ্যতামূলক শৃঙ্খলা। সোভিয়েত রিপাব্লিক বা ফ্যাসিস্ট ইটালী বা গণতান্ত্রিক পুঁজিপতি ফ্রান্সের আইন সংস্থা সবই এক প্রকার আইন ব্যবস্থা। এদের কাছে "আইনসম্মত সরকার" এ-কথার অর্থ নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রই আইনের সরকার। আইন আর রাষ্ট্র এঁদের চোখে এক। আইনের জগতে কেলসেন-এর চিন্তাধারা একপ্রকার সুসম্বন্ধ বাস্তববাদ। ন্যায় প্রভৃতি মূল্যবোধক ধারণাগুলি যেহেতু যুগে যুগে দেশে দেশে, বিভিন্ন এবং নিছক যুক্তি দিয়ে তাদের মান নির্ণয় করা শক্ত, সেই কারণে এঁরা মনে করেন ন্যায় আইনের বিষয়বস্তুই নয়। এঁদের মতে যে কোন আধেয়ই বিধিবদ্ধ হলে আইনের পর্যায়ে পড়ে। ন্যায় অন্যায়ের নিক্তি এখানে অচল। কিন্তু এই সব মতের সঙ্গে সায় দেওয়া মুশকিল। বোডেনহাইমারকে অনুসরণ করে বলতে গেলে ধরুন এমন একটি রাজ্য যেখানে আইনের দ্বারা সততা নিষিদ্ধ। ধরুন সেখানকার আইন অনুসারে ঘুষ খাওয়া এবং জালিয়াতিকে পুরস্কার দেওয়া হয়, শুধু টাকা বেশী থাকলেই তাকে বিচারক করা হয়। এসব ক্ষেত্রেও আইনের ঔচিত্য নিয়ে কি মানুষ প্রশ্ন তুলবে না? মানুষ চিরদিনই আইনের সঙ্গে একদিকে শৃঙ্খলা এবং অন্য দিকে ন্যায়কে সংশ্লিষ্ট করে এসেছে। ন্যায়ের দৃষ্টি দিয়ে মানুষ বরাবরই আইনের বিধিগুলির পক্ষপাতহীনতা ও যৌক্তিকতার প্রতি নজর রেখেছে এবং চেয়েছে যাতে আইন সমষ্টিগতভাবে সমাজের সম্পর্ক ও সুখ আনতে কার্যকর হয়। দার্শনিক বা সমাজবাদী যে মতবাদই আইন ভাল কি মন্দ এ প্রশ্ন উপেক্ষা করে বা এড়িয়ে গিয়ে শুধু তার বাইরের কাঠামো ও বাধ্যবাধকতার আকৃতি নিয়ে ব্যাপৃত থাকে তাকে আইনের বাস্তব সত্তার পর্যাপ্ত পরিচায়ক বলা যায় না। জীবনের মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আইনের যে-কোন তত্ত্ব বা দর্শনই নিরর্থক। কারণ আইন জীবনকে ঘিরে। সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রার মাধ্যমে সমষ্টি ও ব্যক্তির সম্পর্ক সমন্বয় করে, ব্যক্তির সকল সম্ভাবনাকে স্ফুরিত করার যে নানামুখী প্রয়াস, আইন তারই সাথে ওতপ্রোতভাবে মেশানো। জীবনের ক্ষেত্রে ন্যায়ের কি ভূমিকা, এর অর্থই বা কি? সংক্ষেপে এবং সাধারণ সূত্রাকারে বলতে গেলে ন্যায়ের লক্ষ হল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যাবলীকে সুসম্বন্ধ করা এবং সমাজের প্রতি অংশে অধিকার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব এমনভাবে বণ্টন করে দেওয়া যাতে একদিকে নাগরিকদের যুক্তিসম্মত চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়, আবার অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন প্রচেষ্টা এবং সামাজিক ঐক্যকে যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেয়। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, কাণ্ট, স্পেন্সার প্রভৃতি থেকে শুরু করে নানাভাবে ন্যায়ের প্রকৃতি ও সমস্যা আলোচিত হয়েছে। প্লেটো প্রভৃতির ধারণায় ন্যায় হল সমাজের প্রতি অংশের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন। প্রতি নাগরিকের কাজ হল তার নির্দিষ্ট স্থানে থেকে কর্তব্য সম্পাদন করা। যে কাজে সে সব চাইতে যোগ্য সেটুকু করা। প্লেটোর রাষ্ট্র শ্রেণীবিভক্ত। অ্যারিস্টটল-এর মতে ন্যায় এক ধরনের সমতা এবং এর দুটি ভাগ। (১) বণ্টনমূলক—যাতে বিধানসভা সবার মধ্যে অধিকার, সম্মান, সরকারী পদ, প্রভৃতি বণ্টন করে দেবে। সমান যোগ্য লোক সমান ভাগ পাবে—অসমান পাবে অসমান ভাবে। যোগ্যতাই হবে সমতার মাপকাঠি। ২। শোধনমূলক। এর প্রয়োজন বণ্টন ব্যবস্থাকে রক্ষা করা—অন্যায়কারীর আঘাত থেকে তাকে বাঁচান প্রভৃতি। এটা হল বিচারকের কাজ। এখানে যোগ্যতার প্রশ্ন নেই, এখানে শুধু গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা। স্পেনসার কিন্তু ন্যায়ের সঙ্গে সমতার প্রশ্ন বড় করে না দেখে স্বাধীনতা রক্ষা করাই ন্যায়ের পক্ষে বেশী মূল্যবান মনে করেছেন। দার্শনিক কাণ্ট-এর মতেও আইনের চোখে স্বাধীনতার প্রশ্ন বড়। তাঁর মতে ন্যায়সঙ্গত আইন হল এমন ব্যবস্থা যাতে এক সমষ্টিগত স্বাধীনতার আবেষ্টনীতে একজনার অবাধ ইচ্ছা অন্যের অবাধ ইচ্ছার সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে। সবার মতবাদ সংক্ষেপেও এ প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে দেখা যাবে দার্শনিকদের তাত্ত্বিক আলোচনা যেমন বিভিন্ন আবার তেমনি সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, ক্যাপিটালিস্ট, সমাজবাদী, নানা ধরনের রাজনৈতিক কাঠামোও কিন্তু আপন আপন পরিবেশে বিভিন্ন যুগে যথেষ্ট অর্থনৈতিক সাফল্য দেখিয়েছে। সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শযুক্ত সমাজব্যবস্থা এবং তা থেকে বিচ্যুত অন্য সমাজব্যবস্থা

দুই-ই যথেষ্ট শক্তি এবং টিকে থাকার সামর্থ্য দেখিয়েছে। ইতিহাসের নজীর থেকে বিশেষ কোন ন্যায়ের ধারণা অন্য সবাইর চাইতে শ্রেয়—অন্তত বাস্তব সাফল্য থেকে এমনতর সিদ্ধান্তে পৌঁছান শক্ত। তাই তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক জগতের নানা বিভ্রান্তিকর বৈচিত্র্য দেখে অনেকে "ন্যায়"-কে সাময়িক স্বীকৃতিমূলক সমাজ ব্যবস্থার চাইতে অধিক মূল্য দিতে চান না। কিন্তু অত সহজে একে নির্বাসিত করা যায় না। ন্যায়বোধ মানুষের সহজাত। উলপিয়ান, সিসেরো, টমাস একুইনাস প্রভৃতি প্রাচীন যুগ থেকে লক্ষ্য করেছেন যে ন্যায় মানুষের এক প্রকার অভ্যাস যার ফলে মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়। ন্যায়ের ধারণা মানুষের মনোবৃত্তির সাথে মিশে আছে। এই বৃত্তির ফলেই মানুষ চায় অন্যায় প্রতি পক্ষপাতহীন যুক্তিসংগত ব্যবস্থা এবং এর ফলেই অন্যকে তার যথাযথ প্রাপ্য দিতে দিতে সে স্বেচ্ছায়ই রাজী হয়। আমরা সাধারণভাবে তাঁকেই খাঁটি মানুষ বলি যিনি অন্যের যুক্তিসঙ্গত স্বার্থকে দেখতে পান এবং তাকে স্বীকার করেন। এই হিসাবে আইনসভার খাঁটি সভ্য তিনিই যিনি প্রতিনিধি হয়ে তাঁর এলাকায় সকল শ্রেণীর মানুষের ও সংঘের স্বার্থ বিবেচনা করেন। এভাবে ন্যায়কে আমরা একপ্রকার নিষ্ঠা ও আদর্শ ধরে নিতে পারি। এর মূল ভিত্তি হল চারিত্রিক সততায়। ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং একটু অস্পষ্ট হলেও—ন্যায়ের এই ধারণা কিন্তু সর্বত্র গ্রাহ্য এবং সার্বজনীন। ন্যায়কে কার্যকর করাতে হলে একমাত্র উপায় ব্যক্তিগত স্বার্থসর্বস্বতা বিসর্জন। এ থেকেই দেখা যায় ন্যায়ের সাথে বিবেকশীলতার কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একমাত্র বিবেকশীল মানুষই আপন স্বার্থকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করে অন্যদের স্থানে নিজেকে স্থাপন করাতে সক্ষম। তাঁরাই বুঝতে পারেন নীতি এবং আইনের মাধ্যমে অন্যের স্বার্থের খাতিরে নিজের স্বার্থ সীমায়িত না করলে কল্যাণকর সমষ্টিগত জীবনযাত্রা সম্ভব নয়। কিন্তু মনের বৃত্তির আকারে—শুধু সদিচ্ছার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায় এর কোন মূল্য নেই। কার্যকরী ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠা করাতেই এর মূল্য।

ন্যায়ের প্রসঙ্গে আরো দুটি প্রয়োজনীয় সমস্যার উল্লেখ প্রয়োজন। তা হল ন্যায়ের সাথে "সাম্যের" সম্পর্ক এবং অন্যটি ন্যায়ের সাথে স্বাধীনতার সম্বন্ধ। এদের পর্যালোচনা আইনের আদর্শগত এবং তাত্ত্বিক আলোচনায় অপরিহার্য।

সমতা সম্বন্ধে প্রথম কথা হল—আমাদের ন্যায়ের ধারণাই বলে যে যদি দুটি ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সকল পারিপার্শ্বিকতা একপ্রকার হয় তবে দুই ক্ষেত্রেই একরূপ ও সমান ব্যবহার হওয়া উচিত। একই অপরাধে বয়স, পূর্বে অপরাধ, প্রভৃতি বিশেষ কারণ ছাড়া—বিচারক যদি দুজন অপরাধীকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শাস্তি দেন—তাকে সবাই অন্যায় বলবে। একজন ছাত্র সব অঙ্ক শুদ্ধ করে এবং অন্য একজন অর্ধেক ভুল করেও যদি সমান নম্বর পায় পরীক্ষকের আচরণকেও লোকে অন্যায় বলে। সমান ক্ষেত্রে সমান ব্যবহার ও অসম ক্ষেত্রে অসম ব্যবহার যেন ন্যায়ের ধারণার সাথে ওতপ্রোত।

কিন্তু শুধু সমদৃষ্টিতেই সব সময় ন্যায়ের আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোন দেশে বিধর্মী বা আগন্তুক দেখলেই যদি নির্বিচারে তাদের উপর জুলুম করা হয়—সামান্য অপরাধেই যদি অপরাধীদের সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হয়, কোন অপরাধীকেই যদি তার স্বপক্ষে কোন কথা বলতে না দেওয়া হয়—সমদৃষ্টি থাকলেও—এসব ন্যায়ের ধারণাকে ক্ষুণ্ণই করে। সমানের সংগে সমান ব্যবহারের নীতির সঙ্গে তাই যুগে যুগে আরো একটি নীতির সংযোগ হয়েছে—সেটি হল প্রত্যেকের যা ন্যায্য প্রাপ্য তা তাকে যথাসম্ভব দিতে হবে। প্রথম নীতিটি সাধারণ সূত্র হলেও তাতে ক্ষেত্র ও ব্যক্তি বিশেষের বিবেচনা নেই—দ্বিতীয়টিতে সেটি আছে। ন্যায়কে সম্পূর্ণভাবে সমতার দৃষ্টিতে দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু এ দৃষ্টিতে যে সার্বজনীন সত্যটুকু লুকিয়ে থাকে সেটি এই যে মানুষ কোনদিনই অযৌক্তিক, খামখেয়ালী বা পক্ষপাতমূলক ব্যবহারকে বরদাস্ত করতে চায় না। পিগেট, বির্নাফলড প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীদের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পরিণত মানুষের মত শিশুদের মধ্যেও ন্যায়ের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকে। যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিয়ে বুঝিয়ে না দিলে শিশুরাও পক্ষপাতমূলক ব্যবহারে ব্যথিত হয় এবং অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহের ভাব পোষণ করে। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে বিশেষ ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত বা যথাযথ বৈষম্য কি হতে পারে তা নিয়ে নিশ্চয়ই মত পার্থক্য থাকবে। আমাদের দেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা—চাকুরীর সংরক্ষণ প্রভৃতি নিয়ে কত না সমস্যা। অনেকে মনে করেন বাস্তবক্ষেত্রে মানুষের ও অবস্থার তারতম্যের জন্য ন্যায়ের ভাবধারাকে সম্পূর্ণ যুক্তির ভিত্তিতে কখনোই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই ঐতিহাসিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুধাবন করে কিছুটা আপেক্ষিক দৃষ্টিতেই ন্যায়কে দেখতে হয়। শিক্ষার অভাবে, বর্তমান যুগের কারিগরি ব্যুৎপত্তির অভাবে এবং নানা প্রকার সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে সামন্ততন্ত্র, মেয়েদের প্রতি বৈষম্য প্রভৃতি অনেক কিছু অতীতে মানুষ মেনে নিয়েছে। আবার ন্যায়ের জন্য যুগে যুগে সংগ্রামও অব্যাহত হয়ে চলেছে।—রোমে পেট্রিশিয়ানদের বিরুদ্ধে প্লেবিয়ানদের, ফরাসী বিপ্লব সামন্ততন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তদের, উপনিবেশের উপর অত্যাচারের জন্য অ্যামেরিকার, শোষণমুক্ত সমাজের জন্য রাশিয়ায় ও চীনার বিপ্লব, বর্তমানে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন—সবই এক নিরন্তর সংগ্রাম। চেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে—ভুল, পরীক্ষা ও অসাফল্যের মাধ্যমে নিতাই নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হচ্ছে। অন্য সব ধারণার মত ন্যায়ের ধারণাও তাই অচল বা অনড় কিছু নয়—এও গতিশীল। সময়, দেশ, ইতিহাস, অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও অন্যান্য জিনিসকে অস্বীকার করে কোন মামুলী সমাধান সম্ভব নয়। ব্যক্তিনিষ্ঠ বা যুক্তিবিহীন আদর্শ নয় বলেই—জীবনের বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে বিচার করেই এর সম্ভাবনা রূপায়িত করতে হবে। তার জন্য সময় সময় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে।

ন্যায় সম্বন্ধে একটু আলোচনার পর আমরা আইনের সাথে স্বাধীনতার কি সম্পর্ক এ প্রশ্নটি তুলব। "ন্যায়ের" ধারণার সাথেই ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে থাকে মানুষের "স্বাধীনতার" আকাঙ্ক্ষা। আইন এবং ন্যায়—দু-এরই মূল স্বাধীনতার ধারণাকে ঘিরে। শুধু যোদ্ধা নয় প্রতি মানুষই চায় শরীর ও মনের অবাধ অনুশীলনের আনন্দ। কোন প্রকার বিধি, নিষেধ, নিয়ন্ত্রণই তার পছন্দ নয়। লক-এর বিখ্যাত উক্তি "আইনের উদ্দেশ্য স্বাধীনতাকে সংকুচিত করা নয় বা তার অবসান ঘটান নয়—তাকে রক্ষা করা, তাকে সম্প্রসারিত করা।" এবং রুশোর অমর কথা—"মানুষ জন্মায় স্বাধীন হয়ে কিন্তু থাকে সর্বত্র শৃংখলিত হয়ে"—এ মূল কথাটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে কিন্তু দেখা যায় সর্বযুগে, সর্বত্র স্বাধীনতাকে মানুষের জন্মগত অধিকার বলে মেনে নেওয়া হয়নি। গ্রীক, রোমান সভ্যতায় ক্রীতদাস প্রথা বিদ্যমান ছিল। অ্যারিস্টটল-এর মতে কোন কোন মানুষ অন্যকে সেবা করার জন্য এবং কেউ কেউ নেতৃত্ব করার জন্য জন্মায়। ক্রীতদাস প্রথা শত শত বৎসর পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল। তবু এটা ঠিক যে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা চিরাচরিত। মনীষী টয়েনবির মতে ন্যূনতম নিরাপত্তা, ন্যায় এবং আহারের মত মানুষ ন্যূনতম স্বাধীনতা ছাড়াও বাঁচতে পারে না। মানুষ স্বভাবতই চায় তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং সম্ভাবনাগুলিকে ফলপ্রসূ করে সার্থক করতে। কিন্তু ইতিহাস এ সাক্ষ্যও দেয় যে অবাধ স্বাধীনতাকে চিরদিনই কিছু বিবেকবর্জিত লোক অপব্যবহার করে এসেছে এবং সমষ্টির কল্যাণের জন্য এদের উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। তাই আইনের চিরন্তন সমস্যা হল একদিকে নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারের ক্ষেত্র এবং অন্য দিকে সমষ্টির কল্যাণকর সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলা। সব সময়ই আইনের লক্ষ্য যাতে এই দুই প্রকার সামাজিক মঙ্গলের ন্যূনতম ক্ষতি না হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নিয়ন্ত্রণকর ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রকৃতিও আবার পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। সহজেই অনুমেয় শান্তির সময়ের চাইতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বেড়ে যায়। জনগণের নৈতিক উন্নতি, অধোগতি, শৃঙ্খলাবোধের তারতম্যের সাথেও এর তারতম্য ঘটে।

স্বাধীনতার কিন্তু দুটি দিক। একদিকে বাইরের বাধাচ্ছ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি এবং অন্য দিকে নিজের সহজাত গুণ ও অর্জিত দক্ষতাগুলিকে সফল করে তোলা। ধরুন কোন মানুষ সকল প্রজার নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মাবলী থেকে মুক্ত, তার গতিবিধি, কথা বলা ও প্রকাশের পূর্ণস্বাধীনতা আছে—কিন্তু সমাজ যদি তাকে কোন উপযোগী কাজের বা গঠনমূলক উদ্যমের সুযোগ না দেয় তবে সে কি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ পাবে? পাবে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে শুধু মাত্র নিয়ন্ত্রমুক্ত অবাধ স্বাধীনতায় কি প্রকার জীবন হতে পারে এ দেশে সবাই তা জানেন। লক্ষ লক্ষ আদিবাসী, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং সাধারণ লোক আমাদের দেশে মোটামুটি প্রথম প্রকার স্বাধীনতার সুবিধা ভোগ করলেও দ্বিতীয়টির অভাবে তাদের জীবন অপূর্ণ। আবার প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে সংঘাত হয়। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ থেকে অব্যাহতির নেতিবাচক স্বাধীনতার সাথে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সমতাকে সফল করে তোলার স্বাধীনতার সংঘর্ষ সম্ভব। শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এবং বিশেষ বয়স অবধি সেখানে পাঠ করার বাধ্যতামূলক আইন যদি পিতামাতার উপর চাপান হয় তাতে পিতামাতা বা শিশু কারুরই নিয়ন্ত্রণ থেকে অব্যাহতি মিলবে না কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এই প্রকার আইন ভবিষ্যৎ জীবনে নানা প্রকার সম্ভাবনার সুযোগ উন্মুক্ত করে কত কত শিশুকে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করবে। এই থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার উৎকর্ষের জনাই সমাজ কল্যাণের যন্ত্র হিসাবে আইনের প্রয়োজন সময় সময় নেতিবাচক স্বাধীনতাকে (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ থেকে অব্যাহতি) খর্ব করার অধিকার বা এক্তিয়ার। আইনের এই তাৎপর্য না বুঝলে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে অনেক সমাজ কল্যাণকর আইন ও বিধিকে ভুল বোঝা হতে পারে।

তেমনি আবার মনে রাখা দরকার যে সব কার্যাবলী বা পরিবেশ ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের স্বাধীনতার সুযোগ এনে দেয় বা তাদের স্বাধীনতা বাড়িয়ে দেয়—তাই আবার অন্য ব্যক্তি বা দলের স্বাধীনতার প্রতিকূল হতে পারে। যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার। যত খুশি জমির মালিকানা প্রভৃতি কখনো কখনো শিল্প এবং কৃষির স্বার্থবিরোধী হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে তাই ন্যায়ের খাতিরে অনেক সময় আইন ব্যক্তিবিশেষ বা দল বিশেষের স্বাধীনতাকে আংশিক খর্ব করে ভারসাম্য রক্ষা করে। সমাজের উৎপাদন, বণ্টন ব্যবহার উন্নত করে আর্থিক সাম্য বজায়ের জন্যও স্বাধীনতার অবাধ অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

অত্যন্ত অল্প পরিসরে ন্যায় এবং স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আইনকে দেখা হল। এ সম্বন্ধে অনেক ভাবনার জিনিস ও জটিলতা হতে পারে কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা একটি ছোট প্রবন্ধে সম্ভব নয়। অতি সংক্ষেপে সাধারণভাবে আইনের চরিত্র ও তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হল।

১। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনেক প্রসিদ্ধ পুস্তকের সহায়তায় এটি লেখা হয়েছে। তার মধ্যে Holland-এর Jurisprudence, Dennis Lloyd-এর "The Idea of Law", Dr. P. B. Mukherji New Jurisprudence. Dr Radhabinode Pal-এর Hindu Philosophy of Law প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে এতে বিশেষভাবে E. Bodenheimer-এর Jurisprudence দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধের প্রস্তাব শুনে এই মনীষী সাগ্রহে তাঁর বইয়ের যে কোন জায়গা থেকে উদ্ধৃতি ও অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন।

উপহার
এশিয়ার
২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে
আজ থেকে মাত্র ১৫ দিন
(১৬ থেকে ৩১শে জুলাই)
স্টক থাকা কালীন
২৫% থেকে ৫০% বিশেষ ছাড়ে!

কণ্টককল্পিত

অতুল্য ঘোষ

(নব পর্যায়)

॥ ১ ॥

প্রথম যখন 'কণ্টকল্পিত' লিখতে আরম্ভ করি তখন লিখেছিলুম : "বহু দিনের স্মৃতি, যখন ডাইরী ছাড়া লিখতে হয়, তখন সবটাই যে সত্য, মনে হয় না। বোধ হয় অধিকাংশই অসত্য হয়। 'কণ্টকল্পিত' শিরোনামায় যেসব লেখা বেরোবে, তাতে যাঁরা মিথ্যে খুঁজে পাবেন, তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করব না ; খালি স্মরণ করিয়ে দেব যে, আমি কখনও ডাইরী রাখিনি। কাজে কাজেই লেখার মধ্যে প্রামাণ্য সত্য খুব বেশী থাকবে না এবং সেজন্য যতটা অনুতপ্ত হওয়া উচিত, তা আমি হতে পারছি না। আমার এই বোধশক্তির অভাবের জন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

'কণ্টকল্পিত' (নবপর্যায়) আরম্ভ করেছি। সাময়িক ঘটনা ও আমার মনে যেসব কথা উঠছে. তাই নিয়ে আলোচনা করা হবে। সেজন্য প্রথমে যা লিখে আরম্ভ করেছিলুম—সে কৈফিয়তের নবপর্যায়ের মধ্যে কোন স্থান নেই।

বরাবরই একটা 'গুজব মহারাজ' বলে কথা চালু আছে। এর মানে অতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ এককালে মহারাজরা যেমন শক্তিশালী ছিলেন, গুজবেরও শক্তি সেইরকম। আগে যখন ছাপাখানা বেরোয়নি, তখন মানুষের কাছে খবর পৌঁছনো শক্ত ছিল—যা কিছু ছিল প্রায় স্থানীয়। তখনও গুজবের সৃষ্টি হলেও তা ছড়াতে পারত না। সীমাবদ্ধ জায়গাতেই তার বিস্তৃতি ছিল। বড় জোর এ-গ্রাম সে-গ্রাম। অবশ্য যেখানে রাজারাজড়ারা থাকতেন, সেখানে একটু বেশী পরিধি নিয়েই গুজব ছড়াত। এই পৃথিবীর যতদিনের ইতিহাস পাওয়া যায়, সবেতেই গুজবের বেশ একটা স্থান আছে। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, যুদ্ধে জয় হয়েছে, কিন্তু পল্লবিত হয়ে সংবাদ এসে পৌঁছেছে পরাজয়ের। ফলে সে অঞ্চলের ইতিহাসই বদলে গেছে। আবার ছাপাখানা আবিষ্কারের পর এক দিকে যেমন ছাপার অক্ষরে অনেক সত্য সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি আবার গুজবের সৃষ্টি হয়েছে অনেক বেশী—ভুল সংবাদের উপর নির্ভর করে। ছাপাখানা আবিষ্কার যাতায়াতের সুগম ব্যবস্থা, তারপরই টেলিগ্রাফ—এই সব মিশিয়ে 'গুজব মহারাজ' দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হয়ে উঠেছেন। এ বিষয়ে **Koestler** তাঁর Sleep Walkers বইতে খুব ভালভাবে লিখেছেন :

'News travelled fast and far in the sixteenth century. The pulse of all humanity was quickening as if our planet, after traversing, on its journey through space, some somnolent and bemused zone of the universe, were now emerging into a region bathed in vivifying rays, or filled with cosmic benzedrine in the interstellar dust. It seemed to act simultaneously on all levels of the nervous system of mankind, on the higher as well as on the lower centres, as a stimulant and aphrodisiac, manifesting itself as a thirst of the spirit, an itch of the brain, a hunger of the senses, a toxic release of passions. The human glands seemed to produce a new hormone which caused the sudden surge of a novel greed: curiosity—the innocent, lecherous, creative, destructive, cannibalistic curiosity of the child.

'The new machines—type foundry and printing press—ministered to this devouring curiosity by a flood of broadsheets, news letters, almanacs, libellea, pasquils, pamphlets and books. They spread the news at a hitherto unknown speed, increased the range of human communication, broke down isolation. The broadsheets and brochures were not necessarily read by all the people on whom they exercised their influence; rather, each printed word of information acted like a pebble dropped into a pond, spreading its ripples of rumour and hearsay. The printing press was only the ultimate source of the dissemination of knowledge and culture; the process itself was complex and indirect, a process of dilution and diffusion and distortion, which affected ever increasing numbers, including the backward and illiterate. Even three and four centuries later, the teachings of Marx and Darwin, the discoveries of Einstein and Freud, did not reach the vast majority of people in their original printed text, but through second- and third-hand sources, through hearsay and echo. The revolutions of thought which shape the basic outlook of an age are not diseminated through text-books—they spread like epidemics, through contamination by invisible agents and innocent germ-carriers, by the most varied forms of contact, or simply by breathing the common air.'

[From 'The Sleep Walkers', by Arthur Koestler. Page 147-148]

কোয়েস্টলার বলেছেন যে, এপিডেমিকের মত ছড়িয়ে যেত। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি। ডাঃ রায় মারা যাবার পর দিল্লী থেকে লালবাহাদুরের ফোন আসে যে, তাঁরা নাকি খবর পেয়েছেন যে, আমি মুখ্যমন্ত্রিত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। আমি অবশ্য প্রতিবাদ জানিয়েছিলুম। কিন্তু সেটা ঠিক সকলের বিশ্বাস হয়নি। তাঁরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছিলেন যে, আমি মুখ্যমন্ত্রী হবার চেষ্টা করছি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ধরে নিয়ে তাঁরা কে কে শাহ-কে পরিদর্শক করে এ আই সি সি-র তরফ থেকে পাঠাবার কথা ভেবেছিলেন। এর আগে কখনও মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের সময় এ আই সি সি থেকে পরিদর্শক আসেনি। গুজবের এমনই মাহাত্ম্য যে, লালবাহাদুরের মত মানুষও গুজবের প্রভাব নষ্ট করতে পারেননি। এর পর আমি জওহরলালকে ফোন করে বলি যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না। প্রফুল্লদা (প্রফুল্লচন্দ্র সেন) সর্বসম্মতিক্রমে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং আমি সেই সভায় সভাপতিত্ব করি। এর আর একটা দিকও আছে। ষাটের দশকে খুব গুজব রটেছিল যে আমি স্টিফেন হাউস কিনে নিয়েছি। এ ছাড়া আমার বাঁকুড়ার বাড়ি সম্বন্ধেও অনেক গুজব রটেছিল এবং বেশ কিছু লোক বিশ্বাস করে ছিলেন। এই মাস-

কয়েক আগে বর্তমান বাম ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী বন্ধুবর শ্রীযতীন চক্রবর্তী এক বিবৃতি দেন। সেই বিবৃতির সারমর্ম ছিল যে, 'তিনি কার্যোপলক্ষে যখন বাঁকুড়া জেলায় যান, তখন আমার বাড়ি তাঁর দেখার সুযোগ হয়। এবং তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, যেসব রটনা হয়েছিল তার সবই ভুল। আমি নিজে এটা বিশ্বাস করি যে, যাঁরা সাধারণের কাছে সমাদৃত হন, তাঁদের মাঝে মাঝে অসম্মানের বোঝাও বইতে হয়—কারণেও হয়, অকারণেও হয়। তবুও মন মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

সেদিন শুনলুম এক তরুণ চিকিৎসক তাঁর এক বন্ধুকে বলছেন যে, 'নবজীবন ট্রাস্ট'-এর মালিক গান্ধীজীর বংশধররা। এবং গান্ধীজীর বই ছাড়া অন্য কোন বই তাঁরা প্রকাশ করেন না। এই তরুণ চিকিৎসকটি শান্ত, শিষ্ট ও সংযত। শুনে মনটা একটু মুষড়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ ১৯৩০ সালের কথা মনে পড়ল। সে সময়ে আমরা অনেক সাইক্লোস্টাইল করা ও ছাপা পুস্তিকা ও হ্যান্ডবিল পেয়েছি, যাতে লেখা থাকত—গান্ধীজী তাঁর ছেলের নামে সাতটি মিল কিনেছেন। আমি গান্ধীজীর পক্ষে সাফাই গাইবার জন্য এসব কথা লিখছি না। যত দিন যাচ্ছে তিনি তাঁর নিজের মহিমায় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছেন। তাঁর কথা আবার নতুন করে বলার ধৃষ্টতা আমি প্রকাশ করতে চাই না। খালি দুঃখ হয় এই ভেবে যে, যাঁরা সৎ, তাঁরাও কোন মত প্রকাশ করার আগে ভালভাবে জানার চেষ্টা করেন না।

'নবজীবন ট্রাস্ট' একটি জনহিতকর ট্রাস্ট; এর সঙ্গে গান্ধী পরিবারের কোন সম্পর্ক নেই। গান্ধীজীর সমগ্র লেখার সম্পাদনা করে ভারত সরকার আজ অবধি ৭৪টি খণ্ড প্রকাশ করেছেন। খণ্ডগুলি বৃহদাকার কিন্তু মূল্য নামমাত্র। শ্রদ্ধেয় শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সেই ১৯২০র দশকে গান্ধীজীর বহু বইয়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। মূল্য যা হয়েছিল তাতে ছাপার খরচও ওঠে না। এসব সত্ত্বেও এই ১৯৭৯তে সেই তরুণ চিকিৎসকটি মনে করেন যে, গান্ধীজীর নামে এসব ট্রাস্ট একেবারে ভণ্ডামি। গান্ধীজীর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে 'গান্ধী স্মারক নিধি'। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর এই ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে ও সর্ব-শ্রেণীর লোক এই ট্রাস্ট গঠন করেন। এসব কথা লিখতে কষ্ট হয়; তবুও মনে হচ্ছে—না লিখে কোন উপায় নেই। এই বাংলা দেশে যেমন মিথ্যা প্রচারের দ্বারা অনেক জায়গায় ভুল তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই গান্ধীজী সম্বন্ধে অনেক বিকৃত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাতে অনেক কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। সেদিন এক তরুণী এসেছিলেন। তিনি প্রাক্‌স্বাধীনতা সময় নিয়ে গবেষণা করছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন তিনি একটি বইয়ে পড়েছেন যে, অবিভক্ত বাংলায় মাননীয় ফজলুল হকের দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন হয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হবার কথা হয়েছিল। সেই সময়ে গান্ধীজীর একটি চিঠি শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লা কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং তার ফলে কোয়ালিশন হয়নি। বইটি কে লিখেছেন জানি না, তবে এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা। আসলে ঘটনা ঘটেছিল—জে সি গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত কংগ্রেস দল ও মাননীয় ফজলুল হকের দলের মধ্যে আলোচনা হয়। আলোচনার সময়ে শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসু এবং মাননীয় ফজলুল হক মশায় দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করেও কোন মীমাংসা হয়নি। মীমাংসার অন্তরায় ছিল দুই দলের দৃষ্টিভঙ্গী। কংগ্রেস দল চেয়েছিলেন মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রথম শর্ত হবে বিনা বিচারে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি। আর ফজলুল হক মশায়ের দল চেয়েছিলেন প্রথম শর্ত হোক কৃষকদের ঋণ কর-ভার ইত্যাদি। দীর্ঘকাল আলোচনাতেও কোন মীমাংসা হয়নি এবং তার ফলেই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হতে পারেনি। শ্রীমান গৌরের (গৌরকিশোর ঘোষ) সাম্প্রতিক একটি উপন্যাসে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। দুঃখ তা নয় যে, এসব গুজব প্রচারিত হয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে; দুঃখ এই যে অনেক বুদ্ধিমান ও সৎ লোকও বিনা অনুসন্ধান ও বিতর্কে এইসব গুজব স্বীকার করে নেন।

বিচার করলে অবশ্য দেখা যাবে যে গুজবে যে ক্ষতি হয়, তাতে সামগ্রিকভাবে সমাজ ও দেশবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হন। যেখানে মহৎ ও বৃহৎকে নিয়ে গুজবের সৃষ্টি, সেখানে বিচার ও বিতর্ক অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। এই অবশ্য-পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে অনেকগুলি করা হয় না। যাঁদের যোগ্যতা আছে তাঁরাও অনেক সময়েই নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। একটা সুস্থ, সজীব, শক্তিশালী সমাজ ও দেশ গড়তে গেলে যে অনেকেরই ভূমিকা আছে এ কথা আমরা ভুলে যাই। আমরা যেন রঙ্গমঞ্চে কেউই নেই—সকলেই যেন প্রেক্ষা-গৃহের দর্শক। কিন্তু কোন স্বাধীন দেশে যদি কিছু সংখ্যক লোকও নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন না করেন, তা হলে সে স্বাধীনতার মর্যাদা থাকে না। সক্রিয় অংশ গ্রহণেই দায়িত্ব পালন করা হয়। সক্রিয় অংশ গ্রহণের একটাই অর্থ হয়—বিচার ও বিশ্লেষণ করা। বিচার ও বিশ্লেষণ করে যদি কারও বিরুদ্ধে যেতে হয়, তা হলে নিশ্চয়ই বিরুদ্ধে যেতে হবে। কেবলমাত্র ভাবাবেগে ভাব প্রকাশ করা হবে বটে, কিন্তু তাতে কোন দিনই কোন সমস্যার সমাধান হবে না বা কোনও দায়িত্ব পালন করা হবে না। স্বাধীন দেশের মানুষ হয়েও যদি আমরা সব ব্যাপারেই নির্ভর-শীল থাকি এবং নিজেদের কিছু করণীয় আছে মনে না করি তা হলে যে কেবলমাত্র নিজের দায়িত্ব পালন করা হবে না তা নয়, অন্যায়ও করা হবে। এটা সত্য যে সমালোচনা করবার অবাধ অধিকার আছে। কিন্তু যে বিষয়ে সমালোচনা করছি, সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের উপরেই যথার্থ সমালোচনা নির্ভর করে।

সুধাসাগর তীরে

সুরেশ চক্রবর্তী

॥১০॥

বদল খাঁ সাহেবের প্রসঙ্গে অমিয়নাথ সান্যাল মশায়ের কথা যেন শেষ হতে চায় না, কত সামান্য কথা থেকে অসামান্য সব স্মৃতির রত্ন কণিকা ফুল-ঝুরির মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আর তার দীপ্তিতে আমরা বিহ্বল হয়ে যাচ্ছি, আর বিচিত্র সব রসের কাহিনী, বেশির ভাগই শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সেই সান্ধ্য মহফিলের। মনে পড়ছে একদিন হোলির পর আমাদের গৃহে যথারীতি আসর বসেছে, কয়েক-জন প্রাত্যহিক অতিথি সামান্য সিক্তবসনে এসে পৌছালেন, আর বলছেন, এই বসন্তকালে আবার বৃষ্টি হচ্ছে কেন? তখন সান্যাল মশায় মন্তব্য করলেন যে এটকেই বোধ হয় 'জল বসন্ত' বলে তাই না? এমনি ছিল তাঁর কৌতুক ও রসের খেলা। ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ ও বদল খাঁ সাহেবের একটা মজার কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছিলেন, সেটা বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

শ্যামলালজীর গৃহে অন্যান্য সংগীত শিল্পীদের মত হাফিজ আলী খাঁ সাহেবও কলকাতায় এলে জমে যেতেন, নানা রং বেরঙের কথা হত, গানবাজনা পুরাণা জমানার 'জিকর' হয়ে আসর জমজমাট হত। একবার এইরকম এক আসরে হাফিজ আলী খাঁ সাহেব তাঁদের ঘরানার কিছু 'অছোপ' (অপ্রচলিত) রাগ ও তার বঢ়ত্ শোনাচ্ছিলেন, বদল খাঁ সাহেবও উপস্থিত রয়েছেন আর সান্যাল মশায়রা উদগ্রীব হয়ে শুনছেন। নানা রকম শুদ্ধ ও কূট রাগ রাগিণীর আলোচনার মধ্যে অমিয়নাথের মাথায় একটা ফন্দী এলো—যখনি হাফিজ আলী খাঁ সাহেব বাজনা বন্ধ করলেন, তিনি অমনি হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে বাজাতে বসলেন, এবং আরম্ভ করলেন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান, 'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা।' সকলেই শুনেছেন যে এই গানটির শুরু হয় শুদ্ধ গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত ও রেখাবের মধ্য দিয়ে, কিন্তু একটু পরেই কোমল ধৈবত ও কোমল নিখাদ এর একটা অন্য রূপ গড়ে দেয়। হাফিজ আলী খাঁ মন দিয়েই শুনছিলেন আর প্রথম দিকে তারিফ কর-ছিলেন, কিন্তু যেই কোমল ধৈবত ও কোমল নিখাদে এসে সুর দাঁড়ালো অমনি চকিত দৃষ্টিতে তাকালেন আর অমিয়নাথ জিজ্ঞাসা করলেন খাঁ সাহেব, এটা কোন রাগ বা রাগিণী বলে মনে হচ্ছে? হাফিজ আলী খাঁ বলে উঠলেন, এ রকম কোনও রাগ হয় না, অন্তত তিনি জানেন না, বা বুজুর্গদের কাছে শোনেন নি। তখন বদল খাঁ সাহেবকে অমিয়নাথ আবার প্রশ্ন করলেন, 'ওস্তাদ ইসী ঠাটমে' কোঈ রাগ যা রাগিণী হৈ?' বদল খাঁ সাহেব বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, 'বেশক হৈ।' হাফিজ আলী খাঁ তো একটু থমকে গেলেন, কিন্তু বদল খাঁ সাহেবকে তো সেই রাগ বা রাগিণী তফসীল ফরমায়েশ করতে পারেন না। খানিকক্ষণ পরে হাফিজ আলী খাঁ বিদায় নিয়ে বদল খাঁ সাহেবের তসলীম জানিয়ে চলে গেলেন। বদল খাঁ সাহেবের কথা শুনে অমিয়নাথের দলও একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন,—কই তাঁরা তো কোনও রাগ বা রাগিণী এ রকম আছে বলে জানেন না—খাঁ সাহেবকে ধরে পড়লেন, ওস্তাদ আপনি তো বলেছেন নিশ্চয়ই এরকম রাগ আছে, দয়া করে আমাদের শোনাবেন কি? খাঁ সাহেব একটু হেসে বললেন, কোঈ নহী—লেকিন উসকা জ্যাদা বাত বন্ধ করনেকে লিয়ে মৈনে বোল দিয়া—'হৈ',—অগর ওয়হ তো সারী রাত ঢুঁড়েগা, পতা মিল সকে যা নহী সকে। অমিয়নাথরা তখন হাস্যোচ্ছল হয়ে উঠলেন বদল খাঁ সাহেবের রসিকতায়।

ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁয়ের সঙ্গে অমিয়নাথের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং সেই কলকাতার কনফারেন্সে (এখন যেখানে Tata Cent হয়েছে, সেই মাঠে সংগীত সভার অনুষ্ঠ হয়েছিল) এসে যখন Broadway Hotel উঠেছিলেন—আমাকে সঙ্গে নিয়ে অমিয়নাথ তাঁ সঙ্গে দেখা করতে যান। খাঁ সাহেব তো তাঁ আলিঙ্গন করেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন আর ব মুখরোচক আহার্যের ব্যবস্থায় তৎপর হয়ে ওঠে তারপর দুজনাই সেই প্রীতিমুগ্ধ আর পুরা জমানার ইতিহাসের রসমধুর অধ্যায়ের আলোচন নিবিষ্ট হয়ে যান। গণপত রাও ভাইয়া সাহেব, বদ খাঁ, আল্লাদিয়া খাঁ, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, শেঠ দুলী চাঁদ ইত্যাদি নামের উল্লেখে সেই আলাপ আলোচ লেন রসের ধারায় সঞ্জীবিত হতে থাকে। আলোচন মূল সুর ছিল যে সংগীত জগতের সব দিকপাল মহারথীরা গত হয়ে যাবার পর আর সেই রসের ধা অনাবিল হয়ে বইছে না,—অমৃতেও ভেজাল ঢুকেছে হাফিজ আলী খাঁ সাহেবের কণ্ঠস্বর খুব মধুর বোলন্দ ছিল, অকস্মাৎ তিনি একখানা ধ্রুপদ গ শোনাতে শুরু করলেন—সমস্ত ঘরখানা যেন গমগম করে উঠল—আমার মনে হল তিনি প্রায় 'F' Scale- গান ধরেছিলেন। সেই সুরে তিনি যখন তার ষড়জে গিয়ে দাঁড়ালেন, আমি বিস্মিত হলাম, এত বয়সেও খাঁ সাহেব কী অদ্ভুত শক্তিশালী কণ্

ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ যে ছবিটি পাঠিয়েছিলেন

অবলীলাক্রমে গান করে যাচ্ছেন, আর এখনকার গায়করা 'C'-Sharp Scale-এ গাইতেই হিমসিম খেয়ে যান। ধ্রুপদটি ছিল গোড়-সারঙ্গ রাগের, পরে ওই রাগেই আবার ধামার গেয়ে শোনালেন—'বহুরী ডফ বাজন লাগে'। কথায় কথায় বললেন, যে তাঁরা যন্ত্র শিখবার পূর্বে ধ্রুপদ-ধামারে তালিম নিতেন। কয়েক শ' গান তাঁর শিখতে হয়েছিল। ওয়াজীর খাঁ সাহেব নিজেই বহু ধ্রুপদ তাঁদের শিখিয়েছেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে সান্যাল মশায় খাঁ সাহেবকে জানালেন যে তিনি বীণের আলাপ ও বাদ্য-পদ্ধতি নিয়ে একখানা বই লিখছেন, (Music of Alapa), যদি প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে, তাহলে খাঁ সাহেবের কিছু বিশিষ্ট শৈলী ও ঘরানার পরিচয় দিতে চান। কী ধরনের Style বা রীতি এই বইতে উদ্ধৃত হবে, তাও স্পষ্ট করে জানান।

খাঁ সাহেব শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন ও অনুরোধ করলেন, তিনি ছোট্ট একটা টিপ্পনী বা Note লিখতে চান—সেটা বইয়ে ছাপা হলে কৃতজ্ঞ থাকবেন। অমিয়নাথ জানালেন যে যা লিখবার তা যেন আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন, তাহলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা যাবে। খাঁ সাহেব পরে আমাকে একখানা চিঠি, ফটো ও তাঁর বর্তমান ও প্রাচীন সংগীত সম্বন্ধে মতামত ইংরেজীতে লিখে পাঠান—তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিল এই লেখাটি যেন সংবাদপত্রে বা সান্যাল মশায়ের বইতে ছাপা হয়। আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত যে সেই লেখা আজ পর্যন্ত ছাপার ব্যবস্থা করতে পারিনি, তবে এখানে হুবহু তার অনুলিপি দিলাম। ইংরেজীতে লেখাটা বোধ হয় অন্য কাউকে দিয়ে খাঁ সাহেব লিখিয়েছিলেন, তাঁর বক্তব্য ও ইচ্ছানুযায়ী আমি স্থানাভাবে আর বঙ্গানুবাদ দিলাম না—পাঠকেরা মার্জনা করবেন।
আমাকে লিখেছিলেন ঃ

Dear Chakraborty,
I am sending a brief opinion and suggestions in regards to the development of Music and its vital change in the modern age. I shall rather be grateful if this brief account of my opinion and suggestions is given in the Newspapers in Calcutta.

I am also sending photograph and hope the report as well as the photograph would find a suitable place in (the) book being published by Dr. Sahib.

Yours faithfully,
Ustad Hafiz Ali Khan

মতামত সম্পর্কিত টিপ্পনী ঃ

I express my opinion about the development of classical music during the last 150 years in my own humble and brief way which is the outcome of the knowledge acquired by me from my ancestors. There are a few suggestions also put forward by me.

In the days of Akbar, Hori Dhrupad used to be sung in two parts, namely Asthai and Antara. With the passing of time, there occurred a change which resulted in sub-divisions of these two parts into four, namely, **Asthai, Antara, Aabhog** and **Sanchari**. Now-a-days the vocalists have deviated from the set course and have introduced Murkis while singing a Raga which are superfluous and mar the beauty of Raga instead of enhancing it. This imposition, according to our Shastras, namely. "Sudh Mudra Dagur Bani", is a sin, and thus must be avoided.

It will be interesting to note that a tradition was prevalent in the family of Mishri Singh Sahib that the persons interested in the art of music, learnt to sing Hori Dhrupad before learning to play on any instrument, e.g., Sarod, Sitar, Been etc. For, they believed that this procedure facilitated a person to grasp ragas and towards rendering them on the instruments, ultimately making him a master of his art.

During the period of Mohd. Shah Rangeele, the Art of music took entirely a different turn. It is understood that Mian Sada Rang composed nearly a lakh and a quarter of Khyals in praise of Mohd. Shah Rangeele, which were sung putting all emphasis on Murkis, i.e. throat vibrations and **Taneti**. People liked this innovation and it became so popular that Mian Sada Rang went to the extent of forecasting that after some time, Murkis and Taneti, as designed by him would wholly eclipse Hori Dhrupad and in the end, his manner of rendering Khyal and Asthai would only be known to the world. How far it has come true, is not in the province of our discussion. But the fact upon which I want to stress, is that the old masters practised this new art so much that they sacrificed their night's sleep for years together in order to be versatile in this art. Sure it is, that one cannot master this art within a small period of five years or so, though most of the people claim themselves to be the master of this art after having practised only for four or five years.

In order to achieve perfect knowledge of music, one must learn the following in order of precedence:

1. Aalap; 2. Hori Dhrupad; 3. Rhythm.

It is very essential to maintain the above order to enable oneself to become a good artist.

Now-a-days very few persons,—it will not be wrong if I say only very rare persons—take to this art in right earnest and one who adopted came out with flying colours. Government is encouraging by giving scholarships to persons interested in this art. But I very much regret to point out that the boys and girls who are in receipt of scholarships in order to acquire advanced knowledge of music and dances are found not very serious about it; especially girls who turn their backs and forget all about what they have learnt after they are married. The expectations of spreading this art in the society and its development, therefore, remain merely castles in the air. As a consequence, not only the Government money is wasted, but there remains none to inherit this art from great masters—a matter of distress for ustads.

In my view, therefore, scholarships should be given only to those who would pledge to serve the cause in whatever environments they might be on. On the other hand, the Government should extend the period of scholarship from 2½ years to at least 4 years, as 2½ years is too short a period for learning all the necessary techniques of this art. Otherwise the aim of spreading this art throughout the length and breadth of this country can never be fulfilled, at the same time, the Government money would continuously be wasted. There is another aspect of the situation, i.e., the great ustads are asked to accept remuneration according to the number of students in his class and are even sent back if there happens to be no student in his class at a particular time. This (is) very distressing especially when an ustad spares no pains whether he has to teach ten students or hundred at a time. His salary should therefore, not be subjected to the numbers of students he can attract in his class. The present procedure would, in due-course of time, tend to turn the art of teaching music, a cheap commodity; an ustad would then try to find more students to attend his class even at the cost of maintaining low standards in teaching his subjects.

পদ্মভূষণ : সংগীতরত্ন-অলঙ্কার, আফ্‌তাব-এ-সরোদ হাফিজ আলী খাঁ। সঙ্গে পাখোয়াজী মৃদঙ্গ বাদক পর্বত সিং

I may also suggest that old prominent artists should be consulted in all matters of importance and they should also be invited to give their suggestions towards improvement of this art, which should be seriously considered by the Government and, if found suitable, be implemented.

Ustad Hafiz Ali Khan
Padma-Bhushan, Sangeet Ratan
Alangkar, Aftab-e-Sarod

খাঁ সাহেব কোনো চিঠিতেই তারিখ দেননি, কিন্তু ঠিকানা দিয়েছিলেন 101, Circular Road, New Delhi তাছাড়া খামের ওপর পোস্ট অফিসের ছাপ দেখছি 'রাষ্ট্রপতি ভবন পোস্ট অফিস, নিউ দিল্লী, ১৭-৩-৬২।' খাঁ সাহেবের মতামতের সঙ্গে হয়ত সকল সংগীত শিক্ষক ও সংগীত রসিক একমত হবেন না, তবু একজন জ্ঞানবৃদ্ধ খানদানী ওস্তাদের বক্তব্য সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত করে আমি হৃদয়ের ভার লাঘব করলাম।

বদল খাঁ সাহেবের অন্য একটি রসিকতা ও স্পষ্টবাদিতার উদাহরণ এখানে দিতে চাই, যাতে আধুনিক কোনও কোনও গায়ক সতর্ক হতে পারবেন। কলকাতার তদানীন্তন কালের একজন বিখ্যাত গায়ক এবং সংগীত শিক্ষক যখন গান করতেন, বাম হাতে কান চেপে সংগীত পরিবেশন করতেন। কোনও আসরে একবার তিনি যখন গাইছিলেন, সেখানে বদল খাঁ উপস্থিত ছিলেন, গায়কের সঙ্গে কোন শিষ্য ছিল না, তাই তানপুরা নিজেই ছাড়ছিলেন। সুতরাং তানপুরায় ডান কান রুদ্ধ আর বাম হাতে বাম কান অবরুদ্ধ, এভাবেই গান চলছিল। একটু বিশ্রাম নেবার অবকাশে গান বন্ধ হলে, খাঁ সাহেব বললেন, আরে বেটা, গানেকো ওয়াক্ত এক কান তো খুলা রাখো—কোই গাল দেগা, তো ওয়হ্ ভী সুননে হোগা। দুকান বন্ধ করে গাইলে তো নিন্দা-প্রশংসা কিছুই শুনতে পাবে না, গান শুনে লোকের মনোভাব কী হচ্ছে, তার প্রকাশও তো বিবেচনা করতে হবে। দুঃখের বিষয় কোনও কোনও সংগীত শিল্পীর সময় জ্ঞান ও পরিমিতি বোধ মনে থাকে না, তান কর্তব করে যাচ্ছেন তো শেষ করবার নাম-ই নেই—লক্ষ করলে দেখা যাবে একই ফান্দা বা হরকৎ বারবার আসছে যাচ্ছে, নতুন ছন্দ অলঙ্কার বা প্যাটার্ন দেখা যায় না। প্রত্যেক বার নব-নব শৈলী, নতুন উঠাওয়, ছন্দ-শৃঙ্খল তো খুব অল্প শিল্পীর কণ্ঠে বা হাতে শুনতে পাই। তাই সব মহ্‌ফিলেই সময়ের দীর্ঘতায় ক্লান্তি আসে না, নতুন জমজমা, খণ্ডমেরুর ভিত্তিতে রিওয়াজ করা তান, আমাদের প্রতি মুহূর্তে চমক ও বিস্ময়ের আভাস দিয়ে মুগ্ধ করে রাখে।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে অনেক স্থানেই দেখা যায় যে একই রাগ বিভিন্ন ঠাটে ও সম্পূর্ণ নতুন স্বরবিন্যাসে গাওয়া হয়— আমাদের বলা হয়, এটা অমুক ঘরানার গান, এটা তমুক ঘরানার গান, ইত্যাদি। বদল খাঁ সাহেবের মতামত এ সম্বন্ধে খুব সুস্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ ছিল। বলতেন, আরে, নতুন পর্দা লাগিয়ে নয়া কিসিম তৈরি করলে, তার নতুন নাম দাওনা কেন? এক বিভাস, গৌরী এসব রাগ কত-রকম প্রচলিত আছে, তার হিসাব রাখাই মুশকিল, বিশেষত শিক্ষার্থীরা হতভম্ব হয়ে যাবে, কোনটা ঠিক? এক মুরগীকো কিতনে দরগামে জবেহ্ করেগা? সকালের গৌরী, সন্ধ্যার গৌরী, রাতের গৌরী, দিনের দুর্গা, রাতের দুর্গা এ রকম করে রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হবে কেন? শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এই বিভেদে মহা সমস্যায় পড়ে যান!

বর্তমানে প্রধানত যে গ্রন্থ অবলম্বনে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম দেওয়া হয়, নানা রকম ডিগ্রী/ডিপ্লোমা বিতরিত হয়, তার বিরুদ্ধে বদল খাঁ সাহেবের আপত্তি ছিল অত্যন্ত সোচ্চার। অমিয়নাথ তাঁর Ragas & Raginis গ্রন্থে লিখেছেন যে বদল খাঁ সাহেবের যে নাইহিলিস্টিক (Nihilistic) মতামত ছিল, তার যুক্তিযুক্ততা তাকে পরে স্বীকার করতে হয়েছে খানদানী তালিমের স্বাদ লাভ করে। এসব ঋষিকল্প গুণীদের রীতি ছিল প্রথমে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর চিজ আদায় করে নাও, পুরা রিওয়াজ করে চীজ পহ্‌ল খালাস করো অর্থাৎ পারোপুরি আরম্ভ করো, সুরই তোমাকে পথপ্রদর্শন করে গভীর রসের অন্তঃস্তলে নিয়ে যাবে, যদি তোমার খানদানী চীজ ও তালিমের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকে। 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ' এই ঋষি বাক্যের সত্যতা জীবনে অনুভূত হবে। বহু সংগীতের যুগন্ধর পুরুষ আছেন ও ছিলেন, যাঁদের তাত্ত্বিক জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাতে রস-সৃষ্টি করে সুরের মোহজাল তৈরী করতে বাধা জন্মায় নি।

নায়ক বখ্‌শুর এক হাজার ধ্রুপদ-সংগ্রহ 'সহসরস'-এর ভূমিকায় ফারসীতে যা লেখা আছে, তার হিন্দী অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করছি :

> 'তানসেনকে শিষ্য-প্রশিষ্যো মেঁ লাল খাঁ হৈ কি জিসকো বন্দগান আলা হজরত খলীফা ইলাহী (সাহজহাঁ) নে 'গুণসমুদ্র' কী পদবী সে গৌরবান্বিত কিয়া হৈ। য়হ লাল খাঁ সংগীত রচনা মেঁ অসমর্থ হৈ, ক্যোঁকি উসনে ইস কলা কী বিদ্যা কা অধ্যয়ন নহীঁ কিয়া, কিন্তু গানেমেঁ ঔর গানে কী সূক্ষ্মতায়োঁ কো প্রস্তুত করনে মেঁ ঔর শৈলী কে সৌন্দর্য ঔর গতিকী পক্বতা প্রস্তুত করনে মেঁ উচ্চকোটিকা অদ্বিতীয় কলাকার হৈ।'
>
> [সহসরস—সংগীত নাটক অকাদেমী, নঈদিল্লী]

এই প্রাচীন বহু পরীক্ষিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে সংগীতের পাঠশালায় প্রথম থেকেই নানা রকম তত্ত্ব, ন্যাস, অপন্যাস, গ্রহ, বাদী সংবাদী অল্পত্ব বহুত্ব সন্ধিপ্রকাশ পরমেল-প্রবেশক ইত্যাদি ধাঁধার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীকে অগ্রসর হতে হয়, তার ফল তো কোথাও ভালো হচ্ছে বলে মনে হয় না। গায়কী অঙ্গ ও সুরবিহারের তরীকা শিখলে এ সমস্ত তথ্য আরো পরিষ্কার হয়ে যাওয়া সম্ভব, অর্থাৎ আমরা Cart before the horse করে শেখাই, তারপরে এরা degree/diploma নিয়ে হয়ত স্কুল কলেজে নোকরী করতে পারবে, কিন্তু সংগীতের দরবারে হয়ত অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকবে এবং প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও গায়কীর development-এর সন্ধান পাবে না। আজকাল কেই বা শিখতে চায় আর কেই বা শেখাবে? (ক্রমশ)

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

কিছুদিন আগে বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়িতে বড় রকম একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা কারুকে প্রাণে মারতে পারেনি কিন্তু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে সবই। এমনই অবস্থা যে পরদিন থালা বাটি, হাঁড়িকুঁড়ি কিনে না আনলে ভাত খাওয়ারও উপায় নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র সে সময় গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন দস্যু মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ মশাল ও বর্শা হাতে নিয়ে আক্রমণ করায় ঈশ্বরচন্দ্র বৃদ্ধ পিতামাতাকে ও বাড়ির অন্য লোকজনদের সরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজে প্রস্তুত রইলেন ডাকাতদের মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু হট্টগোল শুনেও গ্রামবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ডাকাতদের প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে আসেনি একা ঈশ্বরচন্দ্র কী করবেন। বাড়ির লোকেরা সবাই ঈশ্বরচন্দ্রকে পলায়ন করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, কিন্তু এ গোঁয়ার ব্রাহ্মণ একবার জেদ ধরলে সহজে ছাড়বে না। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের পত্নী দীনময়ী দেবী তিন বৎসরের পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে কোলে নিয়ে সদরের কাছে বসে পড়ে বললেন, তবে আমিও থাকবো। ডাকাতরা এসে আগে আমাকে আর ছেলেকে মারুক, কাটুক, তারপর তারা আপনার গায়ে হাত দেবে। পরিবারের নির্বন্ধে তখন ঈশ্বরচন্দ্রকেও খিড়কির দোর দিয়ে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল।

পরে কলকাতায় ফেরার পর হ্যালিডে সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, কি হে পণ্ডিত, তোমার গৃহে ডাকাত পড়িয়াছিল শুনিলাম? আর তুমি কাপুরুষের মতন পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে পলায়ন করিলে?

ঈশ্বরচন্দ্র উত্তর দিলেন আর যদি আমি একা চল্লিশজন দস্যুর সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ দিতাম, তখন আপনি কী বলতেন? বলতেন, লোকটি অতি আহাম্মক। তাই না? না মহাশয়, আমি এত সহজে প্রাণ দিতে চাই না, আমার এখন অনেক কাজ বাকি আছে।

যাই হোক, সেই ঘটনার পর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রামের বাড়িতে একজন লাঠিয়াল নিযুক্ত করেছিলেন। ডাকাতরা যাবার সময় গৃহপ্রাঙ্গণে জ্বলন্ত মশাল পুঁতে রেখে গিয়েছিল, তার অর্থ তারা আবার আসবে। ঠাকুরদাসের পুত্র কলকাতায় সরকার বাহাদুরের অধীনে পাঁচশো টাকা বেতনের চাকরি করে, অর্থাৎ রীতিমতন বড় মানুষ, সুতরাং তাঁর গৃহের প্রতি তো দস্যু-তস্করের দৃষ্টি পড়বেই।

কিন্তু নব নিযুক্ত লাঠিয়ালটি যেমন প্রভুভক্ত, তেমনই শক্তিশালী। তার নাম শ্রীমন্ত। চারপাশের আট-দশখানা গাঁয়ের লোক এই শ্রীমন্তর লাঠির জোরের কথা জানে। তা ছাড়া নিকটস্থ থানার দারোগা একবার ঠাকুরদাসের কাছে ঘুষ চেয়ে বড় নাকাল হয়েছিল। ঠাকুরদাসের পুত্রকে যে লাট-বেলাটেরাও খাতির করে, সে খবর দারোগাপ্রবর তখন জানতো না। ডাকাতির পরদিন দারোগাটি ঠাকুরদাসের সেই পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখেছিল প্রতিবেশী বালকদের সঙ্গে মহানন্দে হা-ডু-ডু খেলতে। ছোট-খাটো, পাঁচপেঁচি ধরনের এই বামুনের এক কথায় যে দারোগার চাকরি চলে যেতে পারে, সে কথা জানার পর দারোগাটি প্রভূতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং সে গৃহের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বারবার। তারপর থেকে আর ডাকাত আসেনি।

সেই লাঠিয়াল শ্রীমন্তকে ঠাকুরদাস কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন ছেলের কাছে। এখন থেকে সে কলকাতাতেই থাকবে। ঈশ্বরচন্দ্র তাকে দেখে বিস্মিত। কলকাতায় লাঠিয়ালের কী প্রয়োজন? কলকাতায় পুলিশ-কাতোয়ালি রয়েছে, তা ছাড়া কলকাতায় বাঘা বাঘা ধনী অজস্র, তাঁদের ছেড়ে দস্যু-তস্করেরা তাঁর মতন এক শিক্ষকের দিকে নজর দেবে কেন? কিন্তু শ্রীমন্ত কিছুতেই গ্রামে ফিরে যেতে রাজি নয়। সে ছায়ার মতন লেগে রইলো ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে, দিনে রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র যখন যেখানে যান, শ্রীমন্ত ঠিক পশ্চাতে পশ্চাতে থাকে।

ঠাকুরদাস গ্রামে বসে ঠিকই সংবাদ পেয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁর পুত্রের প্রাণের আশঙ্কা আছে, লুণ্ঠন-অপহরণের জন্য নয়, অন্য কারণে। ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসিদ্ধ এবং আইনসিদ্ধ করবার পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। এই জন্য তাঁর এখন প্রচুর শত্রু।

'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে ঈশ্বরচন্দ্র রচিত পুস্তিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় তুলেছিল। এই রচনার বিপক্ষে কলম ধরলেন দলে দলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কিন্তু যুক্তিতর্কে ঈশ্বরচন্দ্রকে পরাস্ত করার ক্ষমতা কারুর নেই। লেখনীকে তরবারিতে পরিণত করে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিপক্ষের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করতে লাগলেন শাস্ত্র উদ্ধার করে। কিন্তু শাস্ত্রের সমর্থনের চেয়েও বড় কথা বিবেকের সমর্থন। প্রতিপক্ষকে বরাবর তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন, ব্যভিচার, গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যার চেয়ে কি বিধবার বিবাহ দেওয়া সমাজের পক্ষে বেশী উপকারী নয়? বৈধব্যের ফলে সহস্র সহস্র নারীদের পদস্খলন, অকালমৃত্যু, অপহরণ ঘটছে না? বিধবাকে ব্রহ্মচারিণী করার নামে তিথি বিশেষে তাকে কোনো খাদ্য দেওয়া হবে না, এমনকি তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হয়ে গেলেও দেওয়া হবে না এক বিন্দু জল, এই কি বিবেকসম্মত কাজ। যে-বালিকা জ্ঞানোন্মেষের আগেই বিবাহিতা এবং বিধবা হলো, তাকে বাকি জীবন থাকতে হবে দণ্ডিতা হয়ে?

যুক্তিতে হেরে গেলেই মানুষ বেশী ক্রুদ্ধ হয়। প্রতিপক্ষরা এই ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের কাছে যুক্তিতর্কে পরাজিত হয়ে যে-কোনো উপায়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিবৃত্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। তিনি পথে বেরুলেই এক দল লোক তাকে বিদ্রূপ করে, দূর থেকে গোপনে ইট পাটকেলও ছোঁড়ে। হঠাৎ হঠাৎ তিনি দেখতে পান তাকে ঘিরে ধরেছে একদল লোক। তিনি সোজা তাকান তাদের চোখের দিকে। এখনো সামনাসামনি কেউ গায়ে হাত তুলতে সাহস পায় না। তবে, অনেক বড় মানুষের বাড়িতেই মোসাহেবরা পরামর্শ দিতে আরম্ভ করছে, হুজুর, অত তর্কাতর্কিতে কাজ কী? রেতেরবেলায় ঐ বিটলে বামুনটাকে এক খোপে সাবাড় করে দিলেই তো হয়। জাত ধম্মো সব রসাতলে দিলে, ছ্যা ছ্যা!

আমাদের পূর্ব পরিচিত সিমুলিয়ার বাবু জগমোহন সরকার এখন ঘোর সনাতনপন্থী হয়েছেন। এককালে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা নিয়ে খেপেছিলেন। কিন্তু তাঁর দমদমার বাগানবাটিতে তাঁর ইয়ারবকশীরা একবার দুটি দশ-এগারো বৎসর বয়স্কা বালিকাকে এনে খুব আমোদ ফূর্তিতে মাতে, আমোদ কিঞ্চিৎ মাত্রাতিরিক্তই হয়েছিল নিশ্চয়ই, কারণ পল্লীস্থ ভদ্রব্যক্তিরা তিতিবিরক্ত হয়ে এক সময় সদলবলে এসে সেই গৃহ চড়াও করে। ইয়ারবকশীরা দুর্ভিক্ষ সময়কালীন ইঁদুরের মতন এদিক ওদিক ছুটে পালায়। আর যে-এক্তিয়ার জগমোহন সরকার মুখক্ষ হয়ে বলে ফেলেন, আপনারা নিজেই হল্লা করছেন, এখানে কোনো আনফেয়ার মিন্স নেওয়া হচ্ছে না। আমরা মেয়ে দুটিকে নেকাপড়া শেকাচ্ছিলুম, আমরা অফ টাইমে ফিমেল এডুকেশনের চর্চা করি!

পল্লীর ভদ্রব্যক্তিরা সে কথায় কর্ণপাত না করে জগমোহন সরকার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের উত্তম মধ্যম দেয় এবং ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সেই সময় বেথুন সাহেব মীর্জাপুরে সবেমাত্র বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছেন। কিছু পত্রপত্রিকায় স্ত্রী-শিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করে নানা প্রকার চটুল, অশ্লীল মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই সংবাদপত্রের মসীজীবীরা জগমোহন সরকারের মুখরোচক মামলাটি উপজীব্য করে বিদ্রূপের বন্যা বইয়ে দেয়। "বঙ্গবাসিগণ স্ত্রীশিক্ষার কী সুচারু পরিণতি তোমরা দ্যাখো! আজিকালি রিফর্মড বাবুগণ অবসর বিনোদনের নামে বৃথা সময় ব্যয় না করিয়া প্রমোদভবনে কাঁচি দুই বালিকাদের উলঙ্গ করিয়া তাহাদের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন এ বি সি ডি শিক্ষা দিতেছেন। এক হস্তে সুরার পাত্র অন্য হস্তে কেতাব। ভাবাবেগে চক্ষু মুদিয়া নাম সংকীর্তনের মতন তাঁহারা গাহিতেছেন বি এ টি ব্যাট, সি এ টি ক্যাট। নিশিকালে পুরবাসীরা প্যাঁচী-বুঁচি, বিমি-ক্ষেমীদের কণ্ঠে কলতান শুনিতেছে বি এ টি ব্যাট, সি এ টি ক্যাট। এতদ্দেশীয় নারীগণের ইমানসিপেশনের আর বাকি রহিল কি! যে কালিতে কলম ডুবাইয়া এই বাক্য সকল লিখিতেছি, ইচ্ছা করে সেই কালিতেই ডুবিয়া মরি!"

এই ঘটনার পর জগমোহন সরকার কিছুদিন জনসমক্ষে মুখ লুকিয়ে ছিলেন। এখন আবার নব পরিচয়ে উদিত হয়েছেন। লিভারে ব্যথা উঠে কিছুদিন কষ্ট পাবার ফলে তিনি এখন মদ্যপান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে 'সুরাপান না বিষপান' নামে একটি গ্রন্থ ছাপিয়ে ফেলেছেন। তাঁর বাড়িতে সুরাপান নিবারণী সমিতি স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়া সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই।

প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর বৈঠকখানার আসরে এখন বিদ্যাসাগরের মুণ্ডপাত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে দু'একবার এসেছেন এ বাড়িতে। তিনি কলকাতার বহু ব্যক্তির কাছে স্বয়ং গিয়ে বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছেন এখন। সামনা সামনি বোঝালে অনেক সময় কাজ হয়। জগমোহন সরকারকে বিদ্যাসাগর চিনতেন না, তবে বিশিষ্ট ধনী হিসেবে এই ব্যক্তিটির নাম আছে এবং মন্দির-বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারে কিছু দান ধ্যানও করেছেন। তাই বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এসেছিলেন এই জগমোহন সরকারের কাছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেই বুঝেছিলেন যে এখানে সুবিধে হবে না, নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে।

মোসাহেব পরিবৃত হয়ে জগমোহন সরকার সগৌরবে বলেন, কেমন দিলুম ঐ সাহেবের পা-চাটা

বামুনটার খোঁতা মুখ ভোঁতা করে। আমার কাছে শাস্ত্র কপচাতে এয়েচেন। বিলেতে বেধবার বে হয়, তলে এদেশেও হবে? সাহেবদের খুশি করবার জন্য আমরা আমাদের মাসী-পিসীদের আবার বে দেবো!

এক মোসাহেব বললো, হুজুর, এই বিদ্যেসাগর লোকটার জন্য মাগীগুলোর কেমন আস্পর্ধা বেড়ে গ্যাচে একবার শুনুন। যত বুড়ি ধুড়ি রাঁড়েরাও এখন বে'র জন্য ক্ষেপেচে।

অপর এক মোসাহেব বললো, আরে বুড়ি বলচিস কি! আমার আপন পিসী, পঁচাশি বচর বয়েস, বেধবা হয়েছেল সে ছ' না সাত বচরে, এতদিন মন দিয়ে পুজোআচ্চা করেচে, আহা নিরামিষ্যি রান্না আমার পিসী বড় ভালো রাঁদে, একবার কাঁচকলা আর বড়ির সুক্তো যা খেইচিলুম, আমার বাবার দাঁত নেই, মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েচেন, পিসীর হাতের নিরিমিষ্যি রান্না ছাড়া মুখে কিচু রোচে না, মেথি ফোড়ন দিয়ে লাউঘন্ট

জগমোহন ধমক দিয়ে বললেন, আরে গেল যা নিরিমিষ্যির সাত কাহন শুরু করে দিলে। পিসীর কতা কী বলচিলি।

মোসাহেব বললো হ্যাঁ, আমার সেই পঁচাশি বচরের বুড়ি পিসী হঠাৎ বলে কিনা, আর আমি তোদের হেঁসেল ঠেলতে পারবো না, তোদের জন্যে তো এতকাল হাড় পচালুম, এবার ক্ষ্যামা দে। ও-বাড়ির রাইমণি আর নীরোবালা বলছেল যে বিদ্যেসাগর না কে যেন এক মহাপণ্ডিত বিধেন দিয়েচে যে বিধবা মাগীদের আবার বে হবে। তোরা পাত্তর দ্যাক, আমি আবার বে কর্বো।

জগমোহন বললেন, বলিস কি রে? পঁচাশি বছরের বুড়ি?

মোসাহেব বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর, সে একেবারে ক্ষেপে উঠেচে। বলে কি না আর রান্না কর্বো না, আজই আমার বে দে। মরার আগে একটু সুক করে নিই।

—বুড়ি মাগীর সুক করার শক হয়েচে? হে-হে-হে-হে।

—আরও বলে কিনা, আমার নুকোনো সোনার গয়না আচে আমার বে'র খর্চা আমিই দেবো।

হাসির হুল্লোড় প'ড়ে যায়, জগমোহন সরকার মোসাহেবটির পিঠ থাবড়ে সাবাস জানান।

অপর এক মোসাহেব বললো, ঈশ্বর গুপ্ত বেড়ে লিকেচেন কিন্তু। আপনি পড়েচেন হুজুর?

জগমোহন বললেন, কী লিকেচে, শুনি, শুনি?

মোসাহেবটি মুখস্ত বলতে লাগলো :

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।
কোথা বা করিছে লোক শুধু হেউ হেউ
কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ।
অনেকেই এত মত লতেছে বিধান
"অক্ষত যোনির" বটে বিবাহ-বিধান।
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?
একেবারে তরে যায় যত রাঁড়ী আছে।......

সে আরও বলতে যাচ্ছিল, জগমোহন তাকে মধ্য পথে বাধা দিয়ে বললো, কী বললি, কী বললি, ক্ষতাক্ষত কে বা আর বাছে?

মোসাহেবটি বললো, হ্যাঁ হুজুর, কেউ কেউ বলচে কিনা বেধবার বে হতে পারে বটে তবে শুধু অক্ষত যোনির বেধবাদের।

জগমোহন সোল্লাসে উরু চাপড়ে বললেন, ওরে ঈশ্বর গুপ্ত মশাই তো ঠিকই বলচেন রে। ক্ষতাক্ষত কে বা আর বাচে? মেয়ে ধরে ধরে কি আগে পরীক্ষে করে দেখতে হবে নাকি যে কার অক্ষত যোনি আর কার ছিঁড়চে? হে-হে-হে-হে।

এক রসিক মোসাহেব আবার আর একটু যোগ করলো, মেয়েছেলেদের যোনি পরীক্ষার জন্য তা হলে ইন্সপেকটর রাখতে হবে বলুন, হুজুর! সে ইন্সপেকটারি কাজের জন্য যে হাজারে হাজারে লোকে লাইন লাগাবে!

কানু বিনা গীত নাই আর স্ত্রীলোকের উল্লেখ ছাড়া রসের গপ্প হয় না। সে স্ত্রী-শিক্ষাই হোক আর বিধবা-বিবাহই হোক, যে-কোনো একটা প্রসঙ্গ পেলেই হলো। স্ত্রীলোকেরা যখন জড়িত তখন আদিরসের স্রোত অমনি বয়ে যায়। এই প্রকার বাক্যালাপ শুধু জগমোহন সরকারের বৈঠকখানায় নয়, কলকাতার বহু বড় মানুষের বাড়িতেই এ রকম চলছে।

ঈশ্বরচন্দ্র জোরালো সমর্থন পেয়েছেন ইয়ং-বেঙ্গলের দলের কাছ থেকে। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। ব্রাহ্মরাও তাঁকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাও তাঁর সমর্থক। কিন্তু দেশের ধনী সম্প্রদায় তাঁর প্রতিকূলতা করে চলেছে। এবং এই ধনীদের বেতনভোগী ব্রাহ্মণরাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারক। নব্য ধনীরা আগেকার দিনের রাজ-সভার কায়দায় বাড়িতে একটি সভা বসিয়েছে এবং টিকিকুণ্ট লাভী ব্রাহ্মণেরা সেজে বসেছে সেই সব সভার সভাপণ্ডিত। এবং এই সব রক্ষণশীল ধনীরা তাদের মুরুব্বি হিসেবে ধরেছে রাজা রাধাকান্ত দেবকে।

রাজা রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীলতার শিরোমণি হিসেবে পরিচিত হলেও স্বয়ং কৃতবিদ্য পুরুষ এবং অনেক বিষয়ে উদার মতাবলম্বী। এ দেশে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রভাব খুব। তিনি প্রতি-বন্ধকতা করলে সামাজিকভাবে বিধবা-বিবাহ চালু করা খুবই কঠিন কাজ হবে। সেই জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করেছিলেন রাধাকান্ত দেবকে বিধবা-বিবাহের পক্ষে আনার।

রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের সৌহার্দ্য আছে। এঁর কাছে তিনি শেক্সপীয়ার পাঠ করেছেন এক সময়। তিনি আনন্দচন্দ্রকে বললেন, তোমার দাদামশাইয়ের সমাজে ও রাজদরবারে খুব সম্মান। তিনি ইচ্ছে করলে এ দেশের বিধবাদের দুঃখ দূর করতে পারেন। তুমি তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলো না! আনন্দচন্দ্র রাজি হতে দ্বিধা করলেন। তাঁর দাদামশাই অতি রাশভারি মানুষ, তাঁর কাছে অন্য ব্যাপারে আবদার করা যায় যদিও, কিন্তু এই সব সামাজিক প্রসঙ্গ তুলতে গেলে তিনি যদি প্রগলভ মনে করেন! আনন্দচন্দ্র বন্ধুকে বললেন, তুমি বরং তোমার বই একখানি দাদামশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর মতামত-চাও।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রেরিত বই পাঠ করে রাধাকান্ত দেব সুকৌশলে মতামত এড়িয়ে গেলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের লিপিচাতুর্যের প্রশংসা করে বললেন, দ্যাখো, আমরা বিষয়ী লোক, আমরা আর এ সম্পর্কে কী বিচার করতে পারি। বরং, তুমি যদি রাজি থাকো, তবে আমার সভায় পন্ডিতদের একদিন ডাকি, তাদের সঙ্গে তোমার শাস্ত্র বিচার হোক।

ঈশ্বরচন্দ্র রাজি হলেন। কিছুদিনের ব্যবধানে দু বার পন্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামলেন ঈশ্বরচন্দ্র। রাজা রাধাকান্ত দেব একদিন একটি শাল উপহার দিলেন ঈশ্বরচন্দ্রকে আর একদিন দিলেন নবদ্বীপের স্মার্ত পন্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে। যেন তিনি দু জনের শাস্ত্রজ্ঞানেই মুগ্ধ হয়েছেন। রাধাকান্ত দেবের মনোভাব অনেকটা যেন এই যে বিধবা-বিবাহের পক্ষে বিপক্ষে তাত্ত্বিক আলোচনা চলছে চলুক না, ভালোই তো, এতে দু পক্ষের কাছ থেকেই অনেক শাস্ত্রবচন জানা যাচ্ছে।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বিদ্যা জাহির করবার জন্য বিধবা-বিবাহের পক্ষে কলম ধরেননি। একে কার্যে না পরিণত করে ছাড়বেন না। এক সময় তিনি ঠিক করলেন, ধনীরা যতই বাধা দেবার চেষ্টা করুক, বিধবা-বিবাহের প্রচলনের জন্য আইন পাস করাতে হবে। ইয়ং বেঙ্গল এবং ব্রাহ্মরাও চায় সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন করা হোক। আবেদনপত্র রচনা করে ঈশ্বরচন্দ্র এবার ঘুরে ঘুরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে লাগলেন।

এবার দপ করে জ্বলে উঠলেন রাধাকান্ত দেব। তর্কাতর্কি করা এক ব্যাপার, আর বিদেশী রাজশক্তির সাহায্য নিয়ে দেশের ওপর একটি আইন চাপিয়ে দেওয়া অন্য। সতীদাহ বন্ধ করার সময় রাধাকান্ত দেব যে কারণে বিরোধিতা করেছিলেন, বিধবা-বিবাহের ব্যাপারেও তিনি সেই কারণেই উগ্র হয়ে উঠলেন। সমাজের পরিবর্তন যদি আসে, তবে তা আসবে জনমানসের ক্রম-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, এতে রাজশক্তির হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ রাজশক্তি একবার নাসিকা গলাতে শুরু করলে তার আর কোনো শেষ থাকবে না।

বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীদের মত এই যে দেশের আইন-কানুন রক্ষার দায়িত্ব রাজশক্তির। বিধবা-বিবাহ যদি আইনসম্মত না হয়, তবে, সাধারণ মানুষ এই বিবাহে সম্মত হবে না। কিংবা হলেও, বিধবার পুনর্বিবাহের পর তার সন্তান সম্পত্তির অধিকার পাবে না। সন্তান যদি পিতামাতার সম্পত্তির বৈধ অধিকারী না হতে পারে, তা হলে সেই বিবাহ যে অসিদ্ধ হিসেবে গণ্য এই সরল কথাটি রাজা রাধাকান্ত দেবের দল বুঝেও বুঝলেন না। তাঁরাও দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিবাদী স্বাক্ষর জোগাড় করতে শুরু করলেন।

বিধবা-বিবাহের সমর্থনে আবেদনটিই আগে পেশ করার ব্যবস্থা হলো সরকার সমীপে। এতে স্বাক্ষর করলেন ৯৩২ জন ব্যক্তি, একবারে শেষ স্বাক্ষরকারীর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আবেদনপত্র জমা দেবার আগের দিন ঈশ্বরচন্দ্র সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছেন, তিনি গাড়ি-পাল্কির তোয়াক্কা করেন না, তাঁর দুই পা দুই অশ্বশক্তি, হাঁটাহাঁটি করতে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। পথঘাট নির্জন, ঈশ্বরচন্দ্র ঠনঠনের কাছাকাছি এসেছেন, দেখলেন কিয়দ্দূরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পথজুড়ে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, তারা অপেক্ষা করছে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য।

ঈশ্বরচন্দ্র একবার পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, ছিরে আছিস তো?

লাঠিয়াল শ্রীমন্ত বললো, হ্যাঁ, তুমি থেমো না, এগিয়ে যাও। তোমার চাকর তৈরি আছে, সম্বুন্ধির ভাইদের সে দেখবে।

শ্রীমন্তর তাড়া খেয়ে লোকগুলো ভয়ে দৌড় লাগাল। ওদের মধ্যে একটি লোককে যেন ঈশ্বরচন্দ্র চিনতে পারলেন। কিছুদিন আগেই তিনি ঐ লোকটিকে কোনো এক বাবুর পার্শ্বচর হিসেবে দেখেছেন।

তিনি হনহন করে এগিয়ে গেলেন সিমুলিয়ার দিকে। জগমোহন সরকারের গৃহের সামনে গিয়ে তিনি শ্রীমন্তকে বললেন, ছিরে, তুই বাইরে দাঁড়া!

তিনি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সোজা উপস্থিত হলেন জগমোহন সরকারের সামনে, জগমোহন সরকার আতকে উঠলেন একেবারে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আপনি আমাকে মারতে লোক পাঠিয়েছিলেন না? অত কষ্ট করার দরকার কী? এই তো আমি এসেছি, মারতে হয় মারুন দেখি? (ক্রমশ)

হাই পাওয়ার সার্ফ
ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে
—মায়ের যত্নের কথাই তুলে ধরে

আপনার ছেলে যদি জামাকাপড় ময়লা করায় চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহলে সেই ময়লার সঙ্গে লড়াই করার জন্যেও দরকার এক চ্যাম্পিয়নেরই—হাই পাওয়ার সার্ফ।

হাই পাওয়ার সার্ফের শক্তিশালী ফরমূলায় আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধূলোময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা!

সার্ফে কাচা রঙীন জামাকাপড়ও কত সুন্দর হয়—কত পরিষ্কার আর ঝলমলে! সার্ফ আপনার পুরো পরিবারের জামাকাপড়কে দেয় এক বাড়তি শুভ্রতা আর ঔজ্জ্বল্য!

সার্ফে কাচা কাপড় দেখে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন, আর লোকেও তা তাকিয়ে দেখবে। সেজন্যেই বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SU.221-2415 BG

আমার জীবনের

শেখর বসু

দেখা হতেই সুবিমল বলল, "আজ যা একটা অ্যাকসিডেন্ট দেখলাম না, সাংঘাতিক!" বলে ও ঘটনাটা শোনাল। সত্যিই সাংঘাতিক। শুনতে শুনতে রীতিমত অস্বস্তি হচ্ছিল। দুর্ঘটনার কথা উঠলে বোধহয় কখনোই চট করে শেষ হতে চায় না। একটার পর আর একটা গল্প চলে আসে। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। সুবিমল থামতেই বাকি চারজনের তিনজন আরও তিনটে দুর্ঘটনার কথা শোনাল। প্রত্যেকটাই ভয়ংকর। আমিও কয়েকটা বড় ধরনের অ্যাকসিডেন্ট দেখেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে কোনোটার কথাই পুরোপুরি মনে পড়ল না বলে চুপ করে থাকলাম। চুপ করে ছিলাম, কিন্তু দীপেনের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিল সমানে। কেন জানি না এই চারটে দুর্ঘটনার মধ্যে দীপেনেরটাই আমাকে স্পর্শ করেছিল সব চাইতে বেশি। ও যা বলেছে তার প্রায় প্রতিটি শব্দই আমার মনে আছে। বাড়ি ফেরার পথে পুরো ঘটনাটা আর একবার মনে পড়ল। ঘটনাটা এইরকম :

"কয়েক বছর আগে অফিসের কাজে ভুটানে গিয়েছিলাম। তা, কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে ভাবলাম, এত কাছেই যখন এসে পড়েছি, দার্জিলিংটা ঘুরে যাই একবার। এদিকে আরও কয়েকবার এসেছি, কিন্তু দার্জিলিংয়ে কখনোই যাওয়া হয়নি। দুপুরে বেরোব, কিন্তু বৃষ্টি শুরু হল। প্রচণ্ড বৃষ্টি। সারাদিন কেটে গেল হোটেলের ঘরে বসেই। সন্ধেবেলায় বৃষ্টি ধরতে জেদ চেপে গেল, আজকেই দার্জিলিং যেতে হবে। কপালজোরে ভুটান ট্রান্সপোর্টের একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম। শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। ওখান থেকে যা হোক কিছু একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

"শিলিগুড়ি পৌঁছলাম সন্ধে সাড়ে-সাতটা নাগাদ। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। স্ট্যান্ডে একটা মোটে গাড়ি। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। গাড়িটা দার্জিলিং যাচ্ছিল, কিন্তু ড্রাইভার এক কথায় ভাগিয়ে দিল—জায়গা হবে না। সত্যিই জায়গা ছিল না, যা ধরে তার ডবল প্যাসেঞ্জার উঠেছে। কিন্তু কী করব তখন! মরিয়া হয়ে ড্রাইভারের হাত চেপে ধরে বললাম—ভাই দয়া করে নিয়ে চলো, না হলে খুব অসুবিধেয় পড়ে যাব।

"ড্রাইভারের দয়া হল শেষপর্যন্ত। কোনোরকমে উঠে পড়লাম গাড়ির মধ্যে। গাড়ির দরজা বন্ধ করার জন্যে কসরত করছি, এমন সময় একটি মেয়ে দৌড়ে এল। কিন্তু ও কিছু বলার আগেই ড্রাইভার বলল, জায়গা নেই। মেয়েটি সে-কথায় কান না দিয়ে দরজার পাল্লা টেনে ধরে প্রায় কান্নাকাটি জুড়ে দিল। ও দার্জিলিং হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে, বৃষ্টির জন্য পথে আটকে গিয়েছিল, এখন যদি ও হস্টেলে ফিরতে না পারে ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে। গড়গড় করে নিজের অসুবিধের কথা বলে মেয়েটি উঠতে চাইল। কিন্তু ড্রাইভার ক্ষেপে গিয়ে বলল, আর একটা বাচ্চা ছেলেকেও এ গাড়িতে তোলা যাবে না, তুললে গাড়ির চাকা ফেটে যাবে। পরের গাড়িতে আসুন।

"মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, এর পরে গাড়ি আছে? জানি না—বলেই ড্রাইভার একটা নতুন প্যাঁচ কষল। যদি কেউ নেমে যায়, তার জায়গায় আপনাকে নিতে পারি। গাড়ির লোকগুলো এতক্ষণ ধরে বেশ মজা দেখছিল। হঠাৎ ব্যাপারটা অন্য দিকে ঘুরে যেতেই নড়েচড়ে বসল সবাই।

"মেয়েটিকে সুন্দরীই বলা যেতে পারে। তার ওপর যুবতী। একা। এইরকম একটি মেয়ের জন্যে কিছু করতে পেলে অনেকেই বর্তে যায়, কিন্তু এত রাত্তিরে কে মেয়েটিকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে নেমে যাবে। নেমে যাওয়া মানে সাধ করে মাথায় দুর্ভোগ চাপানো। এর পরে সত্যিসত্যিই আর গাড়ি আসবে কি না কে জানে! এলেও দার্জিলিং পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক রাত্তির। তার ওপর আবার বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে। সুতরাং প্রত্যেকেই এমন মুখ করে বসে থাকল যেন ড্রাইভার তাকে নয়, তার পাশের লোকটাকে শুনিয়ে কথাটা বলেছে।

"ড্রাইভারের কথা শুনে মেয়েটি আরও অসহায় হয়ে পড়ল। কী বলবে, কী করবে ভেবে পেল না কয়েক মুহূর্ত। তারপর ভিক্ষে চাওয়ার মতো মুখ করে তাকাতে লাগল প্রতিটি যাত্রীর দিকে। কিন্তু গাড়ির সবাই যেন পাথর হয়ে গেছে। পাথরের চোখমুখ নিয়ে সবাই তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

"আমিও তাকিয়েছিলাম সামনের দিকে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, মেয়েটি বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। অস্বস্তি কাটাবার জন্যেই বোধহয় মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়েছিলাম। আর তাকাতেই, বললে বিশ্বাস করবি না, আমার সারা শরীর কেমন যেন কেঁপে উঠল।

"মেয়েটির চোখ দেখে মনে হয়েছিল, চারদিক থেকে যেন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কেন মনে হয়েছিল কে জানে? আর মনে হতেই আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। মেয়েটি কৃতজ্ঞ গলায় কী যেন বলতে বলতে উঠে পড়ল আমার জায়গায়। গাড়ির সবাই অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিল।

"গাড়ি ছেড়ে দিতেই মনে হল, এরকম গাধার মতো কাজ আমি জীবনে আর একটাও করিনি। কী দরকার ছিল আমার জায়গা ছেড়ে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ার। গাড়িতে তো আরও কত লোক আছে, সবাই বসেছিল দিব্যি।

"ধারেকাছে মাথা বাঁচাবার কোনো জায়গা ছিল না। ওই টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ গালাগালি দিলাম নিজেকে। তারপর হঠাৎ দেখি, পেছনে আর একটা গাড়ির হেডলাইট। গাড়িটা এসে দাঁড়াল ঠিক আমার পাশে। কিছু বলার আগেই ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, দার্জিলিং যাবেন? আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম।

"গাড়ির সামনে দুজন পেছনে তিনজন প্যাসেঞ্জার। দিব্যি আরামে হাত-পা ছড়িয়ে বসে রওনা হলাম দার্জিলিংয়ের পথে। ভাবলাম, আগের গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছি। অত গাদাগাদি করে অতটা পথ যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা। তাছাড়া মেয়েটির কাছে, গাড়ির অন্যান্য যাত্রীদের কাছে বেশ বাহাদুরিও দেখানো গেল ফাঁকতালে। বলা যায় না কালকেই হয়ত দার্জিলিংয়ের রাস্তায় মেয়েটির সংগে আমার দেখা হয়ে যাবে। দেখা হলেই মেয়েটি বলবে... বলতে বলতে হয়ত আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে হাত জড়িয়ে ধরা কি অস্বাভাবিক ব্যাপার?

"বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল একদম। আকাশে ঝকঝকে চাঁদ। ওই চাঁদনি রাতে পাহাড়ী পথে যেতে যেতে মেয়েটির সংগে মনে মনে দারুণ প্রেম করতে লাগলাম। কিন্তু তখন কে জানত, আর একটু পরেই কী দেখতে হবে আমাকে!

"গাড়িটা রাস্তার একটা বাঁক নিতেই দেখি একটু দূরে রাস্তার ওপর জটলা। কী ব্যাপার? ড্রাইভার গাড়ি থামাতেই জটলার ভেতর থেকে দুতিনজন এগিয়ে এসে বলল, এইমাত্তর এখানে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে। অ্যাকসিডেন্ট! কী রকম? আপনাদের আগে যে-গাড়িটা আসছিল, সেটা খাদে পড়ে গেছে। শুনে থ' হয়ে গেলাম, তারপর এক এক করে সবাই নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে।

"সামনের গাড়ির চাকার দাগ হঠাৎ ডানদিকে বেঁকে গিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে। দেড়-দু হাজার ফুট গভীর খাদে উঁকি মেরেও কিছু দেখতে পেলাম না। চাঁদের আলো সোজা অনেকটা নামার পর অন্ধকারে মিশে গেছে।

"গাড়ির যাত্রীদের কথা ভাবতে গিয়ে গা-হাত-পা কেঁপে উঠল ঠকঠক করে। এত গভীর খাদ সবাই নির্ঘাত তালগোল পাকিয়ে গেছে। এ-গাড়িতে তো আমারও থাকার কথা ছিল। থাকলে। মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যে কেমন হয় সেদিন সেই প্রথম টের পেলাম। গা-হাত-পায়ের কাঁপুনি থামলে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। আর, তক্ষুনি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে কেন তখন আমার সারা শরীর কেঁপে উঠেছিল। কেন মনে হয়েছিল চারদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। অন্য কিছু ভেবে নয়, স্রেফ মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়েই আমি তখন ওকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে নেমে গিয়েছিলাম গাড়ি থেকে। আসল কারণটা তখন বুঝতে পারিনি পারলাম অনেক পরে।

"এর কোনো ব্যাখ্যা আজও আমি ভেবে বার করতে পারিনি। কিন্তু বিশ্বাস করো ঘটনাটা সত্যি, ভাবলে আজও আমার গা ছমছম করে ওঠে।"

বাড়িতে ফিরে, এমনকি রাত্রে শোবার পরও দীপেনের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল সমানে।

পরদিন অফিসে টিফিনের সময় আমি কয়েকজনকে দীপেনের এই ঘটনাটা শোনালাম। দীপেন যে-ভাবে বলেছিল ঠিক সেইভাবে। শোনার পর সবাই বিস্ময় প্রকাশ করল। একজন শুধু একটু তর্ক তুলতে গিয়েছিল, আমি তাকে ধমকে থামিয়ে দিয়েছিলাম।

সন্ধেয় রাসবিহারীর আড্ডায় ঘটনাটা আবার বললাম। বলার সময় কথা-গুলো আমি দীপেনের মুখে না বসিয়ে আমার মুখেই বসিয়ে দিয়েছিলাম। অভিজ্ঞতাটা যেন আমারই। আমিই সেদিন মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম অলৌকিকভাবে। বলতে বলতে নিজেই টের পাচ্ছিলাম, দীপেনের চাইতে আমার বলাটা অনেক ভাল হচ্ছে। ঠিক-ঠিক জায়গায় উফ্, আহ্ আর দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছিল আমার নাক-মুখ থেকে। বলা শেষ হলে শ্রোতাদের মুখেই বিস্ময়ের ছাপ দেখলাম। মন্তব্য শুনে বুঝতে পারলাম, কাহিনীটা ওদের কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে, বাড়িতে ফিরে, রাত্রে শোবার পর ঘটনাটা আমাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে রাখল। পুরো ঘটনাটা স্বপ্নেও দেখলাম। আর অবাক কাণ্ড, স্বপ্নে দীপেনের জায়গায় সত্যিসত্যিই আমি।

সকালে ঘুম ভাঙার পরেও স্বপ্নের রেশ পুরোপুরি কাটল না। ভীষণ শরীর খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন এই মাত্তর একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছি।

আমি কখনো পাহাড়ে যাইনি, দীপেনও ওই ঘটনাটা শোনাবার সময় পাহাড় কিংবা পাহাড়ী পথের কোনোরকম বর্ণনা দেয়নি, অথচ স্বপ্নে আমি সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। এখন যদি কেউ আমার কাছে শুনতে চায়, আমি সব-কিছুর নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারব। এমনকি দুর্ঘটনার জায়গায় পড়ে থাকা বড় পাথরটার রঙও আমার পরিষ্কার মনে আছে।

সন্ধেয় সুদেষ্ণার সংগে দেখা হতেই বললাম, "যা একটা অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি না, একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে আমাকে আর দেখতে পেতে না তুমি।"

সুদেষ্ণা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন কী হয়েছিল! তুমি না...কদ্দিন বলেছি ওভাবে রানিং বাসে উঠো না..."

আমি হেসে উঠে বললাম, "আরে আজকের ঘটনা নয়, পুরানো ব্যাপার, কিন্তু এখনো ভাবলে গা ছমছম করে ওঠে।"

সুদেষ্ণা কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকাতেই ঘটনাটা বলতে শুরু করলাম। কালকেই বার দুয়েক বলার ফলে পুরোটাই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, তারপর রাতে আবার স্বপ্নে দেখেছি দুর্ঘটনার জায়গাটা। বলতে বলতে বারবার কেমন যেন মনে হচ্ছিল অন্যের নয়, আমি আমার নিজের কথাই বলছি। আমার আবেগ উৎকণ্ঠা, বিস্ময় আমাকেই চমকে দিচ্ছিল।

মন দিয়ে কিছুক্ষণ শোনার পর সুদেষ্ণা হঠাৎ হেসে উঠে বলল, "যাঃ, তুমি আবার দার্জিলিং গেলে কবে! কলকাতা ছেড়ে নড়লেই না কোনোদিন।"

এভাবে থামিয়ে দেওয়ার জন্য আমার খুব খারাপ লাগল। একটু থেমে বললাম "যাইনি?"

"না। গিয়েছ তবে দার্জিলিং নয় কাশী। তখন তোমার দশ বছর বয়স বাবা-মার সঙ্গে গিয়েছিলে। আর কখনো কলকাতার বাইরে যাওনি। তুমিই তো বলেছ কদিন।"

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব এল না আমার মুখে। কিন্তু অস্থির বোধ করছিলাম সুদেষ্ণার ওপর। "তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না।" আমার গলাটা আমার কানেই কেমন যেন ভার-ভার ঠেকল।

সুদেষ্ণা আমার দিকে তাকিয়ে কী ভাবল কে জানে, তারপর ভালমানুষের মতো মুখ করে বলল, "তারপর, তারপর কী হল? তুমি তো পরের গাড়িতে রওনা হয়ে গেলে দার্জিলিংয়ের দিকে।"

ঘটনার খেই ধরিয়ে দিয়ে সুদেষ্ণা আমার দিকে তাকাল, কিন্তু আমি আর বলার উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আমিই নাকি ওকে বলেছি, কাশী ছাড়া কলকাতার বাইরে আর কোথাও যাইনি। যদি বলে থাকি, আমার সে-কথা ও বিশ্বাস করেছে। একটু আগে তো আবার আমিই বললাম যে, দার্জিলিং গিয়েছিলাম। এখন তা হলে ও আমাকে অবিশ্বাস করছে কেন?

সবসময় যে আমাদের প্রথম কথাটাই সত্যি হবে, এমন কোনো মানে নেই। এখন, এই মুহূর্তে বারবার মনে হচ্ছে, আমার প্রথম কথাটাই মিথ্যে। আমি কি সত্যিই কখনো কাশী গিয়েছিলাম? যদি যাই, তা হলে কাশীর স্মৃতি কোথায়! কোথাও গেলে সেই জায়গার কোনো ছবি বা ঘটনার কথা ঝাপসা হলেও মনে থাকে। আমার তো কাশীর কোনো কথাই মনে পড়ছে না। অথচ দার্জিলিং যাওয়ার পাহাড়ী পথের প্রতিটি দৃশ্যই কী অসম্ভব জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে। চোখ বুজলে টিপটিপে বৃষ্টি আর কনকনে হাওয়ার অনুভূতি কী তীব্র হয়ে জেগে উঠছে আমার শরীরে। শূন্যে মিশে যাওয়া গাড়ির চাকার দাগের কথা ভাবলে এখনো গা শিরশির করে ওঠে।

মনে পড়ে না কখন আমি সুদেষ্ণার ধরিয়ে দেওয়া খেই থেকে ঘটনাটা আবার বলতে শুরু করেছি। টের পেলাম শেষের দিকে। আমি যেন ধারাবিবরণী দিচ্ছিলাম। চোখের সামনে যা দেখছি তাই বলে যাচ্ছি। বলা শেষ হলে সুদেষ্ণার দিকে তাকালাম।

সুদেষ্ণা কেমন যেন অবাক হয়ে চেয়েছিল। ওর চোখেমুখে আগের সেই অবিশ্বাসের চিহ্ন নেই, কিন্তু ও কি আমার কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে? বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেছে ওর চোখের মণিতে, কিন্তু এ কি আমার অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার জন্যে, না কি ও আমার সম্পর্কে অন্য কিছু ভাবছে! ভাবছে...

সুদেষ্ণার সঙ্গ আমার ভীষণ ভাল লাগে। অন্যান্য দিন ওকে বাড়ি ফিরতে বেশ দেরি করিয়ে দিই, কিন্তু আজ কেন জানি না, ওকে আমার একটুও ভাল লাগছিল না। সুদেষ্ণাকে দেখতে ভালই, কিন্তু ওর দিকে তাকাতেই একসঙ্গে অনেকগুলো খুঁত আমার চোখে পড়ল। ওর চোখদুটো বড়-বড় আর কোমল কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন যেন বোকা-বোকা মনে হচ্ছিল। বোকা চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহ আর অবিশ্বাস।

ওই সন্দেহ আর অবিশ্বাস আমার অসহ্য ঠেকছিল। আমি এখন তর্ক করে যুক্তি দিয়ে, দুর্ঘটনার জায়গার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে সুদেষ্ণার সন্দেহ দূর করতে পারি। কিন্তু কেন করব? কী দায় পড়েছে আমার! ও আমাকে

অবিশ্বাস করতে চায় করুক। আমি তো জানি ঘটনাটা সত্যি। আর নিশ্চিত আমার জীবনেই ঘটেছে। না হলে স্বপ্নের মধ্যে সবকিছু আমার অত চেনা-চেনা লাগত না। অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার ঘটনা বলতে গিয়ে আমার গা শিরশির করে উঠত না এভাবে।

সন্দেকার চোখে সন্দেহ, অবিশ্বাস কেমন যেন ধারালো হয়ে উঠছে। ও এতক্ষণ চুপ করে আছে হয়ত এই ভেবে যে, আমি আরও কিছু প্রমাণ দাখিল করব। সেইরকম প্রমাণ যে প্রমাণে দুয়ে দুয়ে চার হয়। কিন্তু আমি কেন দেব? তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছু এসে যায় না।

কিছু-কিছু এমন সত্যি কথা আছে, যেগুলো নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে গায়ে জ্বালা ধরে যায়। আমারও ধরে গিয়েছিল। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিলাম। সুদেষ্ণার শরীর আর প্রসাধনের গন্ধ আমার অসহ্য ঠেকতে লাগল।

হঠাৎ উঠে পড়লাম আমি। সুদেষ্ণা চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হল। উঠলে কেন?"

আমি জোর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিলাম, "কাজ আছে।"

সুদেষ্ণা আরও কী যেন বলল, আমি শুনতে পেলাম না। শোনার চেষ্টাও করলাম না। তারপর হারিয়ে গেলাম ভিড়ের মধ্যে।

সে রাতে আবার আমি স্বপ্ন দেখলাম। সেই ঘোরানো পথ সেই চাঁদনি রাতের পাহাড়, সেই হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া গাড়ির চাকার দাগ। এসব ছাড়াও এমন আরও অনেক কিছু দেখলাম, যা আগের রাতে দেখিনি।

ঘুম ভাঙল যখন, তখনও ওই মেয়েটির মুখ আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছিল। তার চোখ, তার মুখ, তার ঢেউ-খেলানো চুল। আর, আমার সারা শরীরে অলৌকিকভাবে বেঁচে ফিরে আসার বিচিত্র অনুভূতি।

সুদেষ্ণার সঙ্গে আমার ক'দিনের পরিচয় কালকেও ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কিন্তু এই মেয়েটির মুখের কাছে সুদেষ্ণার মুখ কী ঝাপসা। অত ঝাপসা মুখ নিয়ে সুদেষ্ণা কীভাবে এই মেয়েটিকে অবিশ্বাস করতে চেয়েছিল!

অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলাম ঘরের মধ্যে। তারপরেই আমার রাগ গিয়ে পড়ল দীপেনের ওপর। দীপেন কেন আমার জীবনের ঘটনাটা ওর নিজের বলে চালিয়েছে। কেন?

প্রশ্নটা মাথার ভেতর ঘুরতে ঘুরতে আমাকে এতই উত্তেজিত করে ফেলল যে আমি পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। দীপেনের বাড়ি আমার বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়, কিন্তু আমি কখনোই সকালের দিকে ওর বাড়ি যাইনি।

দীপেন আমাকে দেখে বেশ চমকে গিয়ে বলল, "তুই!"

আমি বললাম, "কথা আছে।"

দীপেনের পরনে লুঙ্গি, খালি গা, হাতে সকালের খবরের কাগজ। ও বলল, "দাঁড়া, চা বলে আসি।"

ও ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল। আমি কেমন যেন অসহিষ্ণু হয়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "না, চা খাব না, তুই বোস।"

দীপেন রীতিমত অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার কী?"

"তুই আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিস?"

"মিথ্যে কথা!"

"হ্যাঁ মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে।"

দীপেন কেমন যেন অসহায় হয়ে দরজার পাল্লায় হাত রেখে বলল "কী নিয়ে তোকে মিথ্যা কথা বললাম?"

"অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে।"

"অ্যাকসিডেন্ট!"

"হ্যাঁ, তুই আমার জীবনের অ্যাকসিডেন্টটা তোর নিজের জীবনের বলে চালিয়েছিস।"

দীপেন কী যেন বলতে গিয়ে পারল না, ওর ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল শুধু। তারপর ও সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল ধপ্ করে।

পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম আমার দুই চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে উঠেছে। আমি ওর চোখে চোখ রেখে জেরা করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম, "বল তো দার্জিলিং যাওয়ার পথে ঠিক কোন জায়গায় অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছিল?"

"মানে?"

"অ্যাকসিডেন্টের জায়গায় কি বিরাট একটা পাথরের টুকরো পড়েছিল?"

"কী বলছিস তুই?"

"বলতো ওই মেয়েটাকে ঠিক কী রকম দেখতে?"

"কী ব্যাপার বলতো?"

"ব্যাপার আর কিছুই নয়, তুই সেদিন যে অ্যাকসিডেন্টের কথা বলছিলি, সেটা আসলে আমার জীবনের ঘটনা, তোর নয়। তুই মিথ্যা বলছিস। মিথ্যে যে তার প্রমাণ, তুই আমার একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারলি না।"

কথাগুলো শুনে দীপেন আর একবার অবাক হল, তারপর ওর দু চোখের মণিতে একগাদা ছোট ছোট তারা লাফিয়ে পড়ল কোত্থেকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ও মজার গলায় হেসে উঠল হো-হো করে।

ওই হাসি শুনে আমার সারা শরীরের রক্ত ধাঁ করে লাফিয়ে উঠল মাথায়। আমি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠে বললাম, "বোকার মতো হাসিস না। ঘটনাটা সত্যিই আমার জীবনের। আজও ভাবতে গেলে আমার গা ছমছম করে ওঠে। এই দেখ।" বলে আমি আমার বাঁ হাতটা এগিয়ে দিলাম দীপেনের দিকে। তারপর ও আর আমি দুজনেই অবাক হয়ে দেখলাম, আমার হাতে সত্যিসত্যিই কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা

বঙ্কিমচন্দ্রকে ছিন্নভিন্ন করা আধুনিক পাঠকের পক্ষে খুব সহজ। তাঁর মুষলধারে বক্তৃতা, অনর্গল হিন্দুয়ানি, দৈব অদৃষ্টবাদ, অলৌকিকে প্রবল আস্থা নিজের সৃষ্ট চরিত্রকে তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করে তাকে প্রাণহীন পুতুলে পরিণত করার অবিশ্রান্ত নীতি-বাগীশ প্রয়াস, সংস্কৃত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের প্রতি অত্যধিক আসক্তি, প্লটপ্রধান উপন্যাসে ঘটনা গাঁথবার ক্রমাগত কৃত্রিম কৌশল—এগুলো আমরা প্রায় সকলেই অবহিত। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় উপন্যাসের গুরুদেবদের হাতে অন্তর ও বাহিরের যে ঐশ্বর্যময় সমন্বিত চেহারা, একই সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে যে আকাশ ছোঁয়া শিখর ও অতল-স্পর্শী গভীরতা তার সবচেয়ে কাছাকাছি বাংলা-সাহিত্যে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র। শরৎচন্দ্র তো নয়ই, এমনকি অনেক আধুনিক, কবিতার ব্যঞ্জনায় ভাস্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নন। এই প্যারাডক্স বোধহয় বাংলা গদ্যসাহিত্যের সবচেয়ে বড় প্যারাডক্স।

'কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যামাত্র। একথা যিনি না বুঝিয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন তিনি এসকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধিত হই।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য তাঁর ছাপ্পান্ন বছরব্যাপী জীবনের চোদ্দটি উপন্যাস লেখার মূল সূত্র। তিনি উপন্যাস লিখতে বসে শুধু গল্প লিখতে বসেননি, তিনি মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যাগুলির ব্যাখ্যায় নিযুক্ত। এই ব্যাখ্যা যেহেতু শুধু তাত্ত্বিক নয়, অথচ তাত্ত্বিক হয়েও গভীর-ভাবে মানবিক, একই সঙ্গে মনুষ্যচরিত্রের প্রবল ভঙ্গুরতা ও মহত্ত্ব তার সমাজ-ভাবনা ও বিশ্ব-ভাবনার সঙ্গে সংপৃক্ত তাই ঔপন্যাসিকের জগৎ অনেকখানি বড় ক্যানভাসে তৈরী। ছোট ক্যানভাসে কাজ করলে হয়তো অনেক কিছু সামলানো যায়, কিন্তু তাতে মনুষ্য-জীবন সমস্যার ব্যাখ্যার প্রয়াস সম্পূর্ণ হয় না। এই বোধ বঙ্কিমচন্দ্রকে যেভাবে আজীবন চালিত করেছিল সেই পরিক্রমার পুনরাবৃত্তি বাংলা গদ্যে খুব কমই ঘটেছে। এই বোধের তাড়নায় একদা বালজাক বলে-ছিলেন, 'নেপোলিয়ন যা করেছেন তলোয়ারে আমি তাই করব লেখনীতে।' তাঁর বাহাত্তর-খণ্ড 'হিউম্যান কমেডি'র প্রধান চালিকাশক্তি এই বোধ, বালজাক শুধু গল্প লেখেননি, তিনি সমস্ত ফ্রান্সের মনুষ্যজীবনের ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের ভাগ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নীতিবাগীশতা, দৈব অলৌকিকে বিশ্বাস ছাপিয়ে গেছেন, তাঁর নিজের চরিত্রকে খর্ব করার তাত্ত্বিক চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে দাঁড়ায়নি। আজও প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেম আমাদের ভাসায়। কুন্দনন্দিনী এমন দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করে, যে আকর্ষণ শরৎচন্দ্রে এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেও পাই না। কৃষ্ণকান্তের উইলের নরনারীর সম্পর্ক এত সজীব যে তাদের নিশ্বাস আমাদের গায়ে এসে লাগে। একই সঙ্গে মানুষের ভঙ্গুরতা ও মহত্ত্বের ছবি এমন জ্বলজ্বল করে ওঠে আমাদের মনে যে একশো বছরের ঝড়-ঝাপটাতেও তা নেবে না।

এই জগৎ সংসারের লীলাখেলায় যে রামপ্রসাদী মুগ্ধতা, যে 'দপ্ করে দেখার দৃষ্টি' যা রামকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন ভক্তের বর্ণনায়, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি তা থেকে কিন্তু একেবারে আলাদা। তিনি একই সঙ্গে আকাশের তারা এবং রাস্তার কাদায় সেই তারার প্রতি-বিম্ব দেখতে পান, সেই জন্যে তাঁর সরু ঠোঁটে এক টেপা বিদ্রূপ। হয়তো ক্রমাগত রিটাচে তাঁর ছবির চাহনি কিছুটা অস্পষ্ট কিন্তু তিনি মনুষ্যজগতের কাণ্ডকার-খানা দেখে যে কেবল মুগ্ধ নন তা প্রকট। তিনি মজা পেয়েছেন মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে এই ভাবখানা তাঁর মুখের চেহারায় স্পষ্ট।

বিষবৃক্ষের প্রথম পরিচ্ছেদ 'নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা'। দু পাশে ঘাটের যে চেহারা তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যময় 'ঘাটের কথা' পাশাপাশি রাখলে দু-জনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। ঘাটের

সমস্ত অনুষঙ্গই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কাব্যময়, কল্পনা স্বপ্নে মাখামাখি। বঙ্কিমচন্দ্র নিপট গদ্যের লজিকে চালিত। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, বিশ্লেষণ করেন, চারপাশের দৃশ্যমান জগত কোনো কিছুর প্রতীক নয়, তারা তাদের নিজেদের সাধারণ ত্বই সম্পূর্ণ। এমন কি পাখিদের বর্ণনাও বিশ্লেষণাত্মক। 'নারিকেল গাছে চিল বসিয়া রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোটলোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখি হালকা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে।' বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্কিম দৃষ্টি সর্বত্রঃ 'ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠ নিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীর শুরুতে যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন : তিনি জীবদ্দশায় সাহিত্যস্রষ্টা ঔপন্যাসিক রূপে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর দশ বারো বৎসরের মধ্যেই জাতীয়তার উদ্গাতা রূপেই তিনি সমধিক পূজিত হইতে থাকেন।' জাতীয়তার উদ্গাতা এই ধরনের একটা গণ্ডী টেনে তাঁর অত্যুৎসাহী ভক্তের দল বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পাঠকদের মাঝখানে এক অলঙ্ঘ্য পাঁচিল তুলে দিয়েছেন। বস্তুত যে উপন্যাসখানি তাঁকে এই বিশেষ ভূষণে সজ্জিত করেছে, সেই 'আনন্দমঠ' তাঁর 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পাশে অনেকখানি প্রাণহীন, তাঁর দেশপ্রেম ও তাত্ত্বিক দৃষ্টি তাঁর বাস্তব দৃষ্টিকে গ্রাস করতে এখানে উদ্যত। কিন্তু এখানেও, প্রায় ডিটেকটিভ কাহিনীর মতো অসম্ভব অবিশ্বাস্য ঘটনাবলীর শুরুতেই যে প্রথম পরিচ্ছেদ তাতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের চমৎকার পাবদর্শী বর্ণনা-খেয়াল করলেই বোঝা যায়, হান্টারের অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল রিপোর্টের কোনো কোনো লাইনের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে দৃশ্যমান জগৎও তাঁর তত্ত্বের চেয়েও বড় ব্যাপার এ কথাটা বারে বারে তাঁর লেখা পড়তে পড়তে ছলকে ওঠে। তিনি এই জগতকে বুঝবার জন্যে যা পেয়েছেন নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যিকের পরিচয় বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

সেকালে জমিদার বাড়ি কেমন ছিল? তার পুঙ্খানু-পুঙ্খ বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রে পাই কুন্দের চোখ দিয়ে দেখা নগেন্দ্র দত্তের বাড়ির বর্ণনায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এই খুঁটিনাটি অপ্রয়োজনীয় মনে হোত, শরৎচন্দ্র এ বর্ণনার ধারকাছ দিয়েও যেতেন না। বাহিরে তিন মহল, ভেতরে তিন মহলে আমরা তৎকালীন জীবন-যাত্রার এক চমৎকার ছবি পাই।

বস্তুজগতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দেখবারও চোখ ছিল বঙ্কিমের চমৎকার। নরনারীর সম্পর্ক বর্ণনায় দেহের আকর্ষণ তিনি কখনও খাটো করেননি। দেহ মন সবটা মিলিয়ে এমন দুর্নিবার আকর্ষণে তারা পরস্পর ধাবিত যার তেজ এখনও অম্লান। নারী চরিত্রের জন্যে শরৎচন্দ্রকে ধন্য ধন্য করা হয় কিন্তু বঙ্কিমের নারী আরও জীবন্ত, কারণ তিনি নির্যাতিতা দেবী সৃষ্টি

করতে অনুৎসাহী। তাঁর নারী সাদায় কালোয় অমৃতে গরলে মাখামাখি। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বাংলা সাহিত্যের এক তুলনাহীন কীর্তি। কিন্তু সুচরিতা ও গোরার প্রেম অনেকখানি বিদেহী। সুচরিতা লক্ষ করে গোরার মুখের ওপর আলো এসে পড়েছে এবং সেই আলোয় প্রতিভাত গোরা প্রায় দেড় পাতা ধরে তার হৃদয়ে অনুরণন তোলে। বঙ্কিমসৃষ্ট নরনারীর মাথার পেছনে কোনো 'হ্যালো' নেই, কোনো চালচিত্রের অপেক্ষা রাখে না গোবিন্দলাল রোহিনী ভ্রমর। অথচ স্টিলের রেখায় আমাদের মনের পটে আঁকা হয়ে থাকে এ সব চরিত্র।

দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে উত্তর ও পশ্চিম বাংলার কুড়িটা জেলায় ও কয়েক মাস উড়িষ্যায় সরকারী কাজে ঘোরার সময় তাঁর সজাগ দৃষ্টি চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে একটা খুব জ্যান্ত প্রকাণ্ড পুরুষের সামনে এসেছি বলে পাঠকের বোধ হয়। অন্দরমহলে বুড়ী ছুঁড়ি মাঝ বয়সীরা কিভাবে গজরালি করে তা কান পেতে শুনেছেন তিনি, মাঝি মাল্লাদের সঙ্গে অনেক গপ্পগুজব করেছেন, কাছারীর কাযকলাপ তো তাঁর নখাগ্রে, মেয়েমানুষদের রং ঢং তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সাহেবসুবোদের কাণ্ডকারখানা তাঁর কাছে জলের মতো পরিষ্কার, গ্রামাঞ্চলের বর্ণনাতে বন-জঙ্গল নদী নালা দিয়ে যে তিনি বহুবার হেঁটেছেন, ঘোড়ায় কিংবা পাল্কীতে ঘুরেছেন তার ছাপ খুব স্পষ্ট। তখন অবিভক্ত বাংলার কাঁচ মধ্যবিত্তের আকাশখানা ছিল অনেক চওড়া। বঙ্কিম তাঁর সময়ের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন, দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সর্বত্র, তাঁর বর্তমান তাঁর অতীতে।

বঙ্কিমের ইতিহাসচর্চার বিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস্যর মাঝখানের রেখাটি খুব ক্ষীণ। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে শৈবলিনী হুটপাট করে মুঙ্গের ফোর্টে ঢুকে নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে তর্কাতর্কি লাগিয়ে দেয়। দেবী চৌধুরাণী সীতারামেও এই ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনার প্রাবল্য বেশী যার ফলে চরিত্রের পেছনে যে চালিকা শক্তি তা কখনও কখনও দুর্বল। কিন্তু এই সব গ্রন্থেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয়তা মাঝে মাঝে স্পষ্ট। সীতারামের মতো দুর্বল উপন্যাসের শেষে একটি পরিশিষ্ট জুড়ে দেন—রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ নামে দুজন অতি সাধারণ মানুষের কথোপকথনের মারফত যেন বইখানির বিশ্বাসযোগ্যতা তিনি পাঠকের কাছে প্রতিপন্ন করতে চান।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এবং তাঁর বেশ কিছুকাল পরও ইংল্যান্ড ছিল ইয়োরোপের সমার্থক শব্দ। উপন্যাসে তাঁর প্রায় সমসাময়িক বালজাক স্তাঁদালের অমর কীর্তির সংবাদ বহুকাল পর্যন্ত ছিল ভারতীয়দের কাছে অপরিচিত। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে উপন্যাস চর্চার দিগন্ত ফ্রান্সের পাশাপাশি অনেকখানি সীমাবদ্ধ। ভাবালু রিচার্ডসন কিংবা মিস বার্নের মতো হাল্কা রোমান্টিক ঔপন্যাসিকের পর জেন অস্টিনের যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজ তখনও বিশেষ সমাদৃত নয়। ফিল্ডিং-এর চেয়ে সমাদৃত ওয়ালটার স্কট, রোমান্টিক বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য ঘটনাবলীর জালে মোড়া একান্ত প্লট-প্রধান তাঁর কাজ। এবং এখানেও যে কারণে রাজা-রাজড়ার জগতের বর্ণনায় তাঁর সে যুগের জনপ্রিয়তা সে জনপ্রিয়তার বদলে সাধারণ মানুষের—চাষী, গাঁয়ের গিন্নি, দোকানদার, চাকরবাকর এদের চরিত্রমালাই অনেক জীবন্ত আজকের পাঠকের কাছে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্কট থেকে পেয়েছেন কিন্তু স্কটকে ছাড়িয়ে গেছেন। উপন্যাসের আদি যুগে প্লট সর্বস্বতা অনিবার্য। এক শতাব্দীরও বেশী কালব্যাপী গদ্য লেখকরা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন সফোক্লিসের ইডিপাস নাটকের মতো কিংবা পুশকিনের ইস্কাপনের বিবির মতো নিটোল প্লট। তারপর কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মেজাজের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আর নিটোল প্লটের মরীচিকার পেছনে সীরিয়াস লেখকেরা ছোটেন না, প্লটের কৌশলের খুঁটি ছাড়াই চরিত্র স্বাবলম্বীভাবে দাঁড়াতে চায়। এখন ক্রাইম থ্রিলার কিংবা ডিটেকটিভ লেখকদের জন্যে পড়ে আছে এই সব বহু ব্যবহৃত জংধরা প্লটের কৌশলের যন্ত্রপাতি। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব তিনি উপন্যাসের আদি যুগের আদিম কিছু হাতিয়ার ব্যবহার করেও মহৎ ঔপন্যাসিকদের প্রায় সমগোত্রীয়। তাঁর যে সব শ্রেষ্ঠ চরিত্র—রোহিণী কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখী—তারা কোনো কায়দার ওপর দাঁড়িয়ে নেই। ইংরেজী উপন্যাসে স্কটের যে গুরুত্ব তার থেকে অনেক বেশী গুরুত্বময় স্থান বঙ্কিমচন্দ্র দখল করে আছেন বাংলা উপন্যাসে।

সাহিত্যে যারা পিওরিস্ট তারা খুব শৌখীন লোক। এই সব শৌখীন লোক সাহিত্যকর্মের বাইরে যে সব চিন্তা ভাবনা কাজ তা খুব আমল দিতে চান না, এমন কি এগুলো যে সাহিত্যকর্মের পরিপন্থী এরকম মতও পোষণ করেন কেউ কেউ। যেমন আধুনিক কোনো লেখকের সমাজবাদ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শৌখীন লোকদের কাছে মনে হতে পারে অপ্রাসঙ্গিক যেমনভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কোৎ মিল চর্চা। তাঁর কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্গদেশের কৃষক, বিজ্ঞান রহস্য কিংবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধাবলী মনে হতে পারে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু উপন্যাস যেহেতু গল্পমাত্র নয়, মনুষ্যজীবনের ব্যাখ্যা সেই জন্য তার চওড়া ক্যানভাস সমৃদ্ধ ছবিতে ভরিয়ে তোলা অসম্ভব যদি লেখক মনীষার চর্চা না করেন। পরিপন্থী তো নয়ই যাঁরা অন্তর্জগতের কারবারী তাঁদের কারবার গুরুত্ব অর্জন করে তখনই যখন তা বহির্বিশ্বের সঙ্গে সেতুবন্ধনে যুক্ত। বহির্বিশ্বের যে সমস্ত চিন্তাভাবনা ঢেউ তোলে সে ঢেউয়ের অবগাহন বড় লেখকের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল ঐশ্বর্যশালী গদ্যরীতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব অবিচ্ছেদ্য। শুধু মরমী দরদী একজন মানুষের পক্ষে এই ঐশ্বর্য আয়ত্তে আনা অসম্ভব। কপালকুণ্ডলা থেকে মুচিরাম গুড়—তাঁর গদ্যরীতির বিশাল ও বিচিত্র পরিধি আমাদের এখনও অভিভূত করে। কপালকুণ্ডলায় শুধু সংস্কৃত শব্দের জলতরঙ্গই আমাদের কানে বাজে না, বন জঙ্গল পাহাড় সমুদ্র দেখবার এক স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী আমরা সব সময় উপলব্ধি করি। মাঝে মাঝে কোনো কোনো আখ্যানে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের আধিক্যে অল্পস্বল্প হোঁচট খেলেও বঙ্কিমের ভাষা কখনই আড়ম্বরপূর্ণ যাত্রাগন্ধী প্রাণহীন ভাষা নয়। এবং যেটা সবচেয়ে বড় কথা, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক বর্ণনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চরিত্রের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী, তা কথার জমকালো খেলায় পর্যবসিত নয়। পুকুর ঘাটের অন্ধকারে কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যার অভিলাষে অপেক্ষমান কিংবা আলোকিত গবাক্ষে নগেন্দ্রনাথকে দেখা প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষেত্রে চরিত্রের গতিপ্রকৃতির ওপর লেখকের তন্ময় মনোযোগ বার বার চোখে পড়ে। বঙ্কিমের গদ্যরীতির মেরুদণ্ড একই সঙ্গে সংস্কৃত ও কথ্যভাষার ওপর দখল —যে মেরুদণ্ডের ওপর আজও বাংলা গদ্য দাঁড়িয়ে আছে।

বঙ্কিমের উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের মূলধারা—রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস যেমন চতুরঙ্গ অথবা শরৎচন্দ্রের অবহেলিত গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্তদের নিয়ে উপন্যাস তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব সত্ত্বেও শাখানদী। মনুষ্যজীবনের সমস্যার ব্যাখ্যায় মনীষার উজ্জ্বল দীপ্তির সঙ্গে তিনি মিশিয়েছিলেন এক হৃদয়বান পুরুষের উষ্ণ সজীবতা। তাঁর উপন্যাস চর্চার ক্রিয়াকাণ্ড শুধু গল্প রচনা নয়, তা এক ক্রিয়েটিভ ভিশান যার মারফত তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব বার বার প্রতিভাত। তিনি যে পথ দিয়ে হেঁটেছেন তা আজ কাঁটা আর আগাছায় ভর্তি। তাঁর বহিরঙ্গের নকলে কয়েকটি অবাস্তব ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছে মাত্র। মনীষা ও হৃদয়ের এক সমন্বিত ঐশ্বর্যশালী রূপের বদলে আমরা ক্রমাগত পাই তরলমতি বয়ঃসন্ধি-জনিত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য। আমাদের আধুনিক জটিল মানসের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত উপলব্ধি ও আয়ত্তের চেষ্টা বঙ্কিমের চেষ্টার পাশে ক্ষীণপ্রাণ। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের সম্ভাবনা যেহেতু অনন্ত সে জন্যে আমরা অপেক্ষা করব—বঙ্কিমের রাস্তার আগাছা পরিষ্কার হবে। উপন্যাসের নামে শুধু গল্প রচনার বদলে আমরা আধুনিক মনুষ্যজীবনের ব্যাখ্যায় আনন্দ পাব। মনীষার দীপ্ত, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও মানুষের অন্তহীন রহস্যের শরিক লেখকের দুর্জয় চেষ্টায় বাংলা উপন্যাসের ক্ষীণ-ধারা আবার সঞ্জীবিত হবে।

অসীম রায়

পুনশ্চ পারী

নীরদ মজুমদার

পাইন গাছ এবং পাথর—পল সেজান (তৈলচিত্র ১৯৩৬)

॥ ছাব্বিশ ॥

আসল সড়ক থেকে বেশ কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে নামতে হয় প্লাজ অর্থাৎ বালুময় তটে। সমুদ্রের ধাক্কায় বালুকণারাশির যার ঘুম ভাঙে না, দিবালোকে তার সুপ্তর ভাব।

এ সিঁড়ি ভেঙে নামলো আর্লেৎ। দীর্ঘ কেশা, সুঠাম দেহের নবীন অভিনেত্রী। চোখে সান গ্লাস। পরনে গাঢাকা দীর্ঘ বেশ। ভিতরে সাঁতারের নিমিত্ত-মাত্র সজ্জা। হাতে ঝুলি। তাতে টাওয়েল এবং টুকিটাকি আনুষঙ্গিক।

ভোয়ালা আর্লেৎ! উঠে অভিবাদন জানালাম।

ভোয়ালা নীরদ! অপ্রত্যাশিতভাবে মিলিত হওয়ায় খুব মজা লাগলো। ওর হাতে ধুলোবালির হাত মেলালাম। তাগিদহীন ছুটি এক মজার কাল। এখন পারী জনশূন্য। পরিত্যক্ত। সকলেই পলাতক। কে কোথায় তা কে জানে! গ্রামে জংগলে, পাহাড় পর্বতে, নদীতে, সমুদ্রে—কেউ বা ফ্রান্সের বাইরে। কানের এই প্লাজটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত। এদিক ওদিক মাইল ছড়িয়ে স্নানার্থীদের ভীড়। বালিতে পড়ে অনেকেই তপক্লিষ্ট। বাচ্চারা বল খেলায় ও বালির দুর্গ রচনায় ব্যস্ত। ছেলেরা পিংপং বা কেউ বাস্কেট বল নিয়ে সারা সকাল বালুতটে সূর্যের আলোয় খেলা করে চলে। বাকিরা সাঁতার ও নৌকায় নিয়োজিত।

আর্লেতের মত বিস্ময়করভাবে এলো আঁদ্রে তার পিঠে ইজেল ও ক্যানভাস নিয়ে। এল একে একে আমেরিকান ছাত্র কেন, হাংগেরীয়ান সংগীতজ্ঞ গার্গাই, ইতালিয়ান জুলিয়েৎ। আমরা সব পুরাতন পারীর পাপী আবার মিলিত। তা ছাড়া জোন, বিল, অলেক্সান্দ্রভিচ এবং নতুন শ্বেত রুশ চারিয়াপানফ—নতুন পরিবেশে দারুণ জমে গেল আড্ডা। সকালে ও বিকালে। অনেকটা বাঙালী ছেলেমেয়েদের মতই ভীষণ আড্ডাবাজ সকলেই। তবে আড্ডার বিষয়বস্তু সর্বদাই ভিন্ন ধরনের, কখনই আমাদের মধ্যে সিনেমা, ফুটবল, রাজনীতি নিয়ে কথা হয় না। বরং হয় অপেরা, থিয়েটার, অর্কেস্ট্রা, ছবি, কবিতা, সাহিত্য নিয়ে। এমন কি খুব সহজেই এসে পড়ে দর্শন।

সকলেই এ ক্ষেপে নোনা জল সাঁতরে মিষ্টি জলে গা ধুয়ে মুখোমুখি উপুড় হয়ে পড়ে কথা বলছিল। ইদানীং দার্শনিক চিন্তাধারার কথায় মেতে উঠেছিল।

কেন একমুঠো বালি মুঠি করে নিয়ে, পরে মুঠি আলগা করে ছেড়ে দিচ্ছিল। বালিতেই আবার ঝরে পড়ছিল বালি।

সার্বলিয়ের মত, যাতে সময় নির্ণয় করা

আন্তীবে রাত্রিতে মাছধরা—পাবলো পিকাসো (তৈলচিত্র, ১৯৩৯)

সমুদ্রতট—নীরদ মজুমদার (জলরঙ, ১৯৪৮)

সমুদ্রতীরে স্নানার্থিনী—নীরদ মজুমদার (জলরঙ ১৯৪৮)

স্নানার্থিনীদের রেখাচিত্র—নীরদ মজুমদার

হোটেল তাতে সাঁতে বাতাসে বাতাসে হেলে দুলে বিস্তৃত হচ্ছে।

ওদিকে নীচে সমুদ্রতটে অনন্ত সঙ্গীত। ঝপাস ঝপাস একঘেয়ে—। বেলাভূমি বাঁ দিক থেকে চন্দ্রকলার মতো বক্রভাবে চলে গিয়েছে বহু দূরে। অবশেষে নেমে গেছে বেশ খানিকটা সমুদ্রের দিকে, এক বিরাট চাপড়া পাথরের ঢিবি নিয়ে—পুরাতন কালে, নাম ভিক্টোরিয়াসকে। আমরা—আর্লেৎ ও আমি—সেখানে গেলাম। জায়গাটা বেশ নির্জন। সেখান থেকে কানের সমস্ত সমুদ্রতট আর তার গায়ে ঝলমলে আলোকিত সঙ্গীতমুখর হোটেল ইমারৎ চোখে পড়ে।

আকাশে চাঁদ নেই। অনেক তারা। আমি পরেছি হাল্কা পাজামা ও হাফশার্ট। আর্লেতের গায়ে একটা বড় হাল্কা রোব। ও ওটা খুলে, স্নানের ভঙ্গিতেই চিত হয়ে শুলো। এখন সন্ধ্যা হলেও এটা বালুকাশয্যাবিলাসী সকলকারই পোশাক। বলা যায় না হয়তো রাত বারোটায় একটায় আবার ইচ্ছে করবে সমুদ্রে স্নান করতে। বেশ গরম হাওয়া, সব সময় ইচ্ছে করে জলে নামতে। আকাশে ঈষৎ হাল্কা আলো। হয়তো এক্ষুনি চাঁদ উঠবে। ওকে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

আমি ওর পাশেই হাতে মাথা দিয়ে শুয়েছি। ওর লম্বা চুল, ম্লান আলোয় ওর দেহ বেশ নিখুঁত, বেশ নিটোল। আমার ধারণা প্লাস্টারে ওর ছাঁচ নিয়ে ফের ঢালাই করলে ওর মূর্তি মনে হবে যেন এ্যালাবাইট—এরা যাকে বলে "বেল" (সুন্দরী)।

আমার কিন্তু মনে হয় আরো সুন্দর লাগে সেইসব মেয়েদের এরা যাকে বলে 'জোলি' অর্থাৎ মিষ্টি সুন্দরী, তাদের তা হলে বলা যেতে পারে সাঁতাল আরো সুন্দরী। সাঁতাল আদত "জোলি" সাঁতাল যখন সাজে তখন দেখবার মত ওর রূপ, চেহারা, ওর শুভ্র মুখের ত্বক, গোলাপের পাপড়ির মত আর চোখের উপরের কোণের নাকবরাবর ও কি একটা সুর। আমাদের দেশী যুবতীর যা দেয় তেমনি তেলযাম জাতীয় একটা কিছু যেখে মুখটাকে জীবন্ত করে তোলে। তা ছাড়া ওর হাবভাব ভঙ্গী অতুলনীয়। চোখ মুখে সদা হাসি বিজড়িত। মনে আছে একদিন অপেরায় কোইন্সতে, কত উজ্জল ঘরের মনোমুগ্ধকর বেশে কত উজ্জল যুবতীরা সব

ছিল। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি সবার চোখ সঙ্গোপনে সাঁতালকে নিরীক্ষণ করতে ব্যস্ত।

তুমি আকাশ চেন? হঠাৎ আর্লেতের এ প্রশ্নে আমি সজাগ হলাম।

ও সবই আমার কাছে সমান প্রায়। তবে তোমরা যাকে বলো "ভোয়ালাক্তে" তাকেই আমরা বলি আকাশগঙ্গা। ঐ একমাত্র জিনিস চিনি। তোমাদের ভাষায় হবে ল' গাঁজ দ্য সিয়েল।

আর্লেৎ আমার উপর ঝুঁকে আমার দৃষ্টির সঙ্গে ওর দৃষ্টির বরাবর করে, বাঁ হাত প্রসারিত করে তারায় তারায় রেখা টেনে বলতে থাকলো, এটা হল আকোয়ারুশ, আর ঐ আরো আরো ডান দিকে পাঁচটা তারাই দেলফেন্‌স্, আরো সোজা নেমে বাঁ দিকে এসো একটু ঐটাই হল সাজিটারুশ, প্রতীক চিহ্ন ঊর্ধাঙ্গ মানুষ ও অধমাঙ্গ ঘোড়ার—তীর নিক্ষেপরত এই আমার জন্মসূত্রের রাশি, উপরের চারটে তলার চারটেতে মিলিত তারা, কিন্তু, ছবিটা কেমন করে হলো বোঝা শক্ত।

আমি উত্তর করলাম, ঠিক বলেছো, আমিও ভাবছি, ঐ প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে তোমার মিল কোথায়?

দুষ্টুমি করো না বলে আমাকে ভর্ৎসনা করে আর্লেৎ বললে, আরো বাঁ দিকে দেখ, একথা বলে রেখার পর রেখার লাইন টেনে এক মস্ত নক্‌শা করে বললে, ঐ হল এরিডানুস—বল নীরদ তোমার জন্ম কোন মাস, তোমার প্রতীক চিহ্ন দেখাব।

বললাম, আমি জন্মেছি এপ্রিলেই মে।

ও।আর্লেৎ বলে। আমার উপর আরো ঝুঁকে আরো বাঁ দিকে আমার দৃষ্টি টেনে বললে, তোমার তোরো বা টাউরাস (বৃষরাশি) —এরিডানুসের ঠিক

স্নানার্থিনীদের রেখাচিত্র—নীরদ মজুমদার

বাঁয়ে ঐ পাঁচটা তারা বদ্বীপের মত, এইটাই তোমার চিহ্ন।

আমার সঙ্গে মিল পাচ্ছো?

আলবৎ, দেখ, আর্লেৎ বললে, যেমন সাজিটারের (ধনুরাশি) দুই জ্যামিতিক নকশা একটা খোলা আর একটা বন্ধ—যদিও বিজড়িত আর তোমার সবটাই বন্ধ। শুধু একটা উজ্জল তারকা পেন্ডেন্ট জাতীয় বেশ বড়। যেটাকেই বলা হয় আলডেবারন, এ রকম কত কত তারা, আর্লেৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—ঠিকানা নেই।

আমি বলতে পারি কত, বলবো?

বল?

ও চুলের গোছ তুলে হাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে বললাম, অজোই।
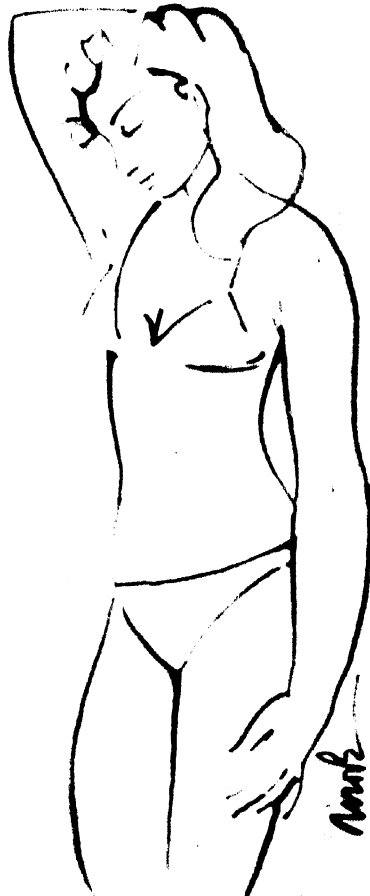
ও হাসলো। ও বললে, তুমি জান খোলা চোখে আমরা দেখতে পাই দু হাজার, দু হাজার পাঁচশ তারা পরিষ্কার রাতে, আর দূরবীন দিয়ে আরো হাজার বেশী আর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায় হাজার হাজার লক্ষ। আর ঐ ভোয়ালাক্তে তো গোনার বাইরে সেকালে, লোকে মনে করতো, মৃতের আত্মা ঐ পথে যাত্রা করে যায় স্বর্গে, বাবার মুখে শোনা গল্প।

ওর কথা শুনতে শুনতে আমার হঠাৎ যেন মনে হল, ও যেন একটা গোপনীয় কথায় ছবি আঁকছে আকাশের পটে। ওকে প্রশ্ন করলাম, তুমি এত সব জানলে কোথা থেকে?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আর্লেৎ বললে, আমার বাবার কাছ থেকে। বাবা ছিলেন অঙ্কের প্রফেসর, ঐ কাজ করতেন কেবল জীবন অতিবাহিত করার তাগিদে। তবে ওঁর অন্তরঙ্গ কামনা বাসনা বিজড়িত ছিল আকাশে—অঙ্কের পর শুধু অঙ্ক কষা। প্রাচীন বই ঘাঁটা আর পুরাতন দূরবীক্ষণ যন্ত্র কেনা। ঐ এক ধ্যান ঐ জ্ঞান ছাড়া আর কিছু ছিল না। মনে হতো কিছু আবিষ্কারের প্রত্যাশায় নিমগ্ন। অহোরাত্র মার কাছে বকুনি খেতেন আর তারা দেখে সব ভুলে যেতেন। ওঁর ভাবনা, স্বপ্ন, ধ্যান বোঝবার মত বয়স আমার হতেই উনি মারা যান। তারা দেখলেই আমার বাবার কথা মনে পড়ে। ঐ ভোয়ালাক্তের পথে মনে হয় এখন বাবা চলছেন। আমার ভালবাসা, আমার প্রেম আমার বাবাকে ঘিরেই।

আমি চুপ করে থাকলাম। দুজনে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। তাছাড়া কোন কথা বলার ছিল না।

তারপর একসময় ওকে অন্যমনস্ক করার জন্য ওর হাতের পাতা হাতে তুলে দোলাতে দোলাতে বললাম, এই সৌরজগৎ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান প্রায় শূন্য অঙ্ক। আর রাশির কথায় যা শিখেছি তা মার মুখে এবং তাই আমার সমগ্র জ্ঞান, যেমন প্রথম রাশি পরিচয়। এক চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারি বেদ, পাঁচে পঞ্চ বাণ, পঞ্চ বাণ অর্থাৎ শর-সংক্রান্ত মদনের আয়ুধ। আমার তো মনে হয় "তোরোর" পঞ্চতারা যা তোমার মতে আবার আমার প্রতীকচিহ্নের পাঁচ তারা। ছয়ে ষড়ঋতু, তোমাদের চারটে, আমাদের দেশে ছটা ঋতু। সাতে সাত সমুদ্র, আটে অষ্টবসু, তোমার আট তারা তাই সমস্ত দিকে ছড়িয়ে দেয় তুমি। নয়ে নবগ্রহ। দশে দিক। এইসব আমরা বাল্য শিখি—

ও উত্তর করলে, তোমাদের দেশে দৃষ্টি বেশ মেধাবী, বেশ অসাধারণ।

আমি বললাম, হ্যাঁ তাই তো ছিল।

ও বললে, চল যাই সাঁতার কাটতে।

আকাশে হাল্কা চাঁদ উঠেছে।

সময়ের কোন বালাই নেই। হোস্টেলের দরজা বা ভার্মিটারির দরজা সারারাত উন্মুক্ত। কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না।

চল যাই।

ও বললে, চল।

হাত ধরাধরি করে নেমে গেলাম জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত নীল পাথারে। (ক্রমশ)

ছোটোবাবুর প্রতি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ছোটোবাবু, আপনার জানলায় আমি দূরবীন ঝুলিয়ে ব'সে আছি।
ছোটো বড়ো মেঘ আজ আকাশ সাজিয়ে দিয়ে অকূলে চলেছে—
একটা হরিয়াল ঠিক দু' দুটো বকের ফাঁকে বিশুদ্ধ হলুদ হয়ে উড়ে গেলো।
ছোটোবাবু, আপনি কিছু দেখতে পান? আপনারই জানলায় ব'সে
আমি আজ পুরো পৃথিবীকে খুব স্পষ্টভাবে দেখতে শিখেছি।
আপনারই পত্নীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি ক'রে দুপুরটা বেশ কেটেছিলো।
আপনি ফাইল-পত্র নিয়ে, অনুঘরে সময় কাটিয়ে
তারপর ঘুমোতে গেলেন। বুনো কুকুরের দল
অতৃপ্ত প্রেতের মতো গেটের সামনে ঘুরে গেলো।
একটা ঝংকার উঠলো। গাছের ভেতর দিয়ে হাওয়া চ'লে এলো।
বেড়ালছানাকে দেখে "কী মিষ্টি!" —এই ব'লে, আপনার জায়া
আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।
ছোটোবাবু, আপনারই জানলায় আমি চোখ রেখে
"রেডি-সেডি-গো" ব'লে চেঁচিয়ে উঠলাম।

কারা দৌড়ে গেলো, ছোটোবাবু?
আপনি কি কোনো কিছু বুঝতে পেরেছেন?

মৃত্যু আর বীজের প্রবাদ

পিনাকী ঠাকুর

রয়ে যায় নষ্টশস্য, স্মৃতিবিষ, পৌত্তলিক ধর্মের মহিমা
শিয়রে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না, ভ্রান্তিবিলাসের হিম
অই দেখি দক্ষিণদুয়ারে
এইরূপে ফেরা হয়, কলরোল থেকে এই মেলা ভেঙে ফেরা?
ক্রমে দৃশ্যাবলী ভাঙে, দর্পণে তাহার মুখ,
সে রমণী পাথরপ্রতিমা!
জলের নিকটে যাই, কথা বলি, ভগ্নচূর্ণ ক্ষণিক দর্পণ
পতনের অপরাহ্নে ; সে ভাষা বোঝে না মাত্র সাযুজ্য লেখায়
তথাপি দর্পণহীন দেখি প্রস্তরমুখ অই, বর্ণময়
গ্রীবা তার ছুঁতে চায় কুবিন্দুর প্রসিদ্ধ পরশে
এবং ভাসানগান শেষ হলে আপাত-শব্দহীন বেহেড নগরে
অগ্নি ও শস্যের ইচ্ছা সমুদ্রশাসনকালে
প্রোথিত করেছে তার সর্বনাশী হাত
শালবনে ঝরে সব কুসুমে আহ্লাদ, যাবতীয় গূঢ় উচ্চারণ
হিম চরাচরময় মূক বর্ণ-চাঁদ;
অমোঘ ঢাকের সুরে অরণ্য প্রবাদগুলি
মৃত্যু আর বীজের প্রবাদ......

অমল

কবিতা সিংহ

যতদিন সে ছিল ঘরে
ঘরে এবং চরাচরে
অসুখ তাকে ছুঁয়েছিল
সুখ না থাকার অ-সুখ!

একটু না-ছেড় জ্বরের মতন
জ্বরের কিংবা ভরের মতন
নাড়িতে তার জড়িয়েছিল
ঘোর দুঃখের খানিক

অমল ছিল দূরের মধ্যে
সক্তি অনাসক্তির
যেমন ফাগুন, আগুন বোশেখ
মধ্যে রাখে চাপ্তর!

একই ডালে নতুন পাতা
একই ডালে শুকনো
অমল আমার এইবা ভালো
এই বা আবার রুগ্ণ।

এখন অমল ঘরেই আছে
ঘরে চরাচরেই আছে
অসুখ তাকে আর ছুঁয়ে নেই
আর ছুঁয়ে নেই দুঃখ।

অমল থাকো এমনি থাকো
ঘরে চরাচরেই থাকো
হাওয়ার সঙ্গে জলের সঙ্গে
মাটির কণার অঙ্গে অঙ্গে
গহন এবং সুক্ষ্ম।

"দ্রৌপদী"—ওয়াসিম আর কাপুরের আঁকা (৪৮" × ৩০" তৈলচিত্র)। জন্ম ১৯৫১। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের স্নাতক (১৯৭১)। বহু সর্বভারতীয়, যৌথ এবং একক প্রদর্শনী করেছেন। বিকল পা নিয়ে অসহ্য কষ্ট পান। প্রতিভাবান এই শিল্পীকে আদর করে ডাকা হয় "কলকাতার তুলুজ লোত্রেক"।

অরণ্যদেবের হাত বিদ্যুতের গতিতে চলছে ....

ক্রমশ ॥ ৯
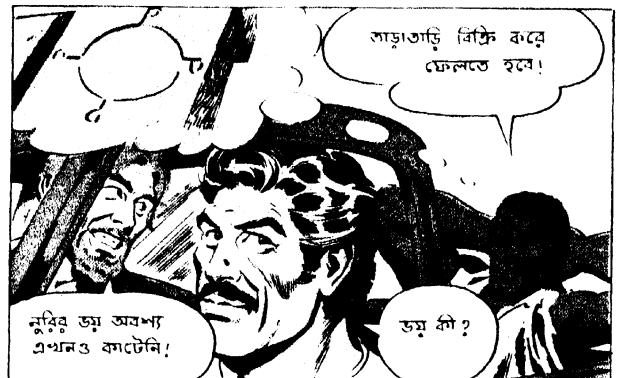
॥ সাত ॥

প্রীতমের ঘুম ভাঙে খুব ভোরবেলায়, যখন সূর্য ওঠে না, যখন চারদিক এক ভুতুড়ে আবছায়ায় নিঃঝুম হয়ে পড়ে থাকে। তখনই কি প্রথম ঘুম ভাঙে প্রীতমের? তা তো নয়। সারা রাত আরও বহুবার ঘুম ভেঙে যায় তার। খুব তুচ্ছ সব কারণে। কখনো রান্নাঘরের এঁটো বাসনে ধেড়ে ইঁদুরের শব্দ, আরশোলার পাখার আওয়াজ, কখনো বা নিছকই স্বপ্ন দেখে, কখনো এমনিই।

ঘুম ভাঙলেই বড় একা। ভীষণ একা। পাশের ঘরে এক খাটে বিলু আর লাবু খাওয়ার ঘরের মেঝেয় বিন্দু নামে নতুন কিশোরী ঝি। তাদের ঘুম খুব গাঢ়। প্রীতমের কোনোদিনই গাঢ় ঘুম ছিল না। আর বরাবরই সে ঘুম ভেঙে একাকিত্বকে হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায় টের পেয়েছে।

এখন প্রীতম আরো একা। সামান্য সর্দি-জ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হলেও বরাবর বিলু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেছে প্রীতমের। এখন দীর্ঘ রোগ-ভোগের কালবেলা চলছে। এখন তার নীরেট নিশ্ছিদ্র একা থাকা একা হয়ে যাওয়া।

কিন্তু মনকে দুর্বল হতে দেয় না প্রীতম। মানে, একবার ভয়কে প্রশ্রয় দিলে আর পরিত্রাণ নেই। মৃত্যুর চেয়েও বহুগুণ ভয়ংকর মৃত্যুভয় ধারে কাছে তরুণ উৎসাহী চিতাবাঘের মতো অপেক্ষা করে আছে। প্রীতম তার অন্ধকার নড়াচড়া চোখের নীল আগুন সব টের পায়, দেখতে পায় তার শরীরের কটাশে ছোপচক্কর। এক মুহূর্তে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভাব দেখলেই লাফিয়ে পড়বে।

ঘুম ভাঙলে তাই প্রীতম একা বোধ করা থেকে নিজের পরিত্রাণ খুঁজেছিল প্রাণপণে। সে জানে তার বহু বহু দূর পরিধির মধ্যেও কোনো মানুষ নেই। বউ না, আত্মীয় না, ডাক্তার বা বন্ধুও না। সে একা, আর তার শরীরের অজস্র জীবাণু।

এই সব রহস্যময় জীবাণু কি রকম কোথা থেকে এল তা জাঁহাবাজ ডাক্তারেরাও জানে না। তারা শুধু জানে হাড়ে-মজ্জায় কোন গোপন অদ্ভুত রন্ধ্রপথে জীবাণুরা দিনরাত অবিরাম কাজ করে চলেছে।

একদিন তারা মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড়গুলি পেরিয়ে মগজে পৌঁছে যাবে। আজও অবশ্য ততদূরে পৌঁছয়নি তারা। প্রীতমের চিন্তাশক্তি আজও পরিষ্কার। ওই প্রসঙ্গে কোনো গোলমাল নেই। মাঝে মাঝে সে এখনো জটিল কুটিল সব এন্ট্রি দুবার না ভেবেই করতে পারে। হায়ার অ্যাকাউন্টেন্সির কয়েকটা বই তার শিয়রের কাছে থাকে সব সময়ে পাশে খাতা ডটপেন।

তবু প্রীতম জাগে এবং কিছুক্ষণ একা বোধ করে। এই বোধের সঙ্গে তার লড়াই চলছে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে। প্রায় হারতে হারতেও লড়াইটা টিকিয়ে রেখেছে সে। বাঘের চোখ রোজ অন্ধকারে দীপ দীপ করে জ্বলে উঠে তাকে দেখে নেয়।

কিন্তু এক বিপুল গভীর অন্ধকারের বাঁধ-ভাঙা স্রোত জানালা দরজার সব রন্ধ্রপথ দিয়ে হুড়-হুড় করে ঘরে ঢুকে আসে। বর্ণ গন্ধ আকারহীন সে এক নিষ্ঠুর অন্ধকারের বিপুল সমুদ্র। এই আবছা ভোরে ভয় ভয় করে। কাছে এগিয়ে আসে কি বৈতরণী? প্রীতম তখন খুব খেলোয়াড়ের মতো চোখ বুজে নিজের শরীরের ভিতরে চিরজাগ্রত অবিরাম ক্রিয়াশীল নিদ্রা ও বিশ্রামহীন জীবাণুদেরই ডাকতে থাকে। বলে, তোমরা তো আছো। তোমরা তো আছো! আমি তো একা নই! মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা তো থাকবেই সঙ্গে! তারপর একসঙ্গেই মরণ আমাদের।

কথাটা কতদূর ঠিক কে জানে। তবে প্রীতম টের পায় যখনই সে ডাকে তখনই শরীরের ভিতরে ঝাঁকে ঝাঁকে কী যেন জেগে ওঠে সাড়া দেয়। সে কেমন? যেন শরীরের ভিতরে ভিতরে এক রোমাঞ্চ এক সচেতনতা, এক চনমনে ভাব।

তখন নিশ্চিন্ত হয় প্রীতম। একা কথা বলছে দেখলে বিলু হয়তো তাকে পাগল ভাববে। কিন্তু মাঝরাতে বা খুব ভোরের বেলায় কেউ তাকে দেখার জন্য জেগে থাকে না। তাই প্রীতম একা একা কথা বলে, তোমাদের দোষ নেই। তোমাদের কাজ তোমরা করছ মাত্র। জীবাণুরাই কি শুধু মারে মানুষকে? মানুষ নিজেও কি মারে না? কষ্ট দেয় না? তোমাদের তাহলে দোষ কি বলো? আমার তাতে কোনো দুঃখ নেই। শরীরটাই তো শুধু আমি নয়। এই হাত, এই পা, এই চোখ, কান, এগুলো আলাদা ভাবে কোনোটাই তো আমি নয়। তবে আমি কেন তোমাদের শত্রু ভাববো? তোমরা একটা বাসা দখল করেছো মাত্র, তোমরা জোগাড় করছ বেঁচে থাকার রসদ। অন্যায় ভাবেও তো নয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষও তো কত কি করে। তবু বলি, আমাকে তোমরা ছুঁতে পারো নি আজ পর্যন্ত। কি করে পারবে? দেহটাই তো আর আমি নয়। এর ভিতরেই কোথাও আছে আর এক আমি, তাকে স্পর্শ করা যায় না।

খুবই আন্তরিকভাবে কথাগুলি বলে প্রীতম। আর তখন তার পুবের জানালার অন্ধকার ক্রমে ফ্যাকাসে হতে থাকে। ভবানীপুরের এই গলির মধ্যে সরাসরি জানালার ওপর সূর্যের আলো এসে পড়ে না প্রথমেই। একটু সময় নেয়। ততক্ষণ এবং যতক্ষণ বিলু না ওঠে এবং চতুর্দিকের কাজকর্ম যতক্ষণ না শুরু হয় ততক্ষণ ঠোঁট অবিরাম নড়ে যায় প্রীতমের। ততক্ষণে সে এক ভয়াবহ লড়াই চালিয়ে যায়। এবং টিকে থাকে একের পর এক দিন।

একটা দিনের বাড়তি আয়ু পাওয়া, আর একটা দিনের সূর্যের আলো দেখাই কি এখন যথেষ্ট বেশী আহ্লাদের বিষয় নয়?

তাই সকালের দিকে প্রীতম ক্লান্ত থাকলেও মনটা একরকম শক্ত সমর্থ রয়ে যায়। চোখ বুজে সে মৃদু মৃদু একটু হাসতেও থাকে। যতক্ষণ না বিলু এসে মশারি তুলে উঁকি দেয়।

মাঝে মাঝে মশারির মধ্যে এক আধটা মশার গুণগুণ শুনে মাঝরাতে চোখ মেলে চায় প্রীতম। খুব কান পেতে শোনে। বেড সুইচ টিপে আলোও জ্বালায়। অবশ্যই মশা মারবার জন্য নয়। সে সাধ্য তার নেই। হাঁটু গেড়ে বোসো, সাবধানে মশাটাকে খুঁজে বের করো, সেটাকে কোথাও নিশ্চিন্তে বসতে দাও তারপর এগিয়ে গিয়ে দু হাতে চটাস করে মারো। না এত সব প্রীতমের কাছে বিরাট বিরাট কাজ। মারবার কথা তার মনেও হয় না।

ঘুম ভেঙে সে মশারির মধ্যে কোনো মশার অস্তিত্ব টের পেলে চুপ করে শব্দ শোনে, তারপর ফিসফিস করে বলতে থাকে তোমরা অন্য জগতের। তোমরা এক চিন্তাশূন্য কর্তব্যের জগৎ থেকে আসা জীব। সুখীও নও, দুঃখীও নও। জেগে থাকো আমার সঙ্গে জেগে থাকো।

বিলু মশারি তুলে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করে তুমি জেগেছো?

হুঁ।

বাথরুমে যাবে এখন?

একটু পরে।

পরে আবার কেন? এখনই সেরে নাও। গরম জল বসিয়ে এসেছি। ওঠো।' বলে হাত বাড়িয়ে পাঁজাকোলে করে প্রীতমকে বসায় বিলু। প্রীতম তখন বিলুর শরীরে বাসী জামাকাপড়ের গন্ধ পায়। বিলুর শরীরে কোনো উৎকট গন্ধ নেই। গ্রীষ্মকালেও বিলুর ঘাম হয় না। তবু সব শরীরেরই যেমন একটা না একটা গন্ধ থাকে তেমনি বিলুরও আছে। প্রীতম গন্ধটা ভালই বাসে।

দাঁড় করানোর সময় বিলুর মুখ প্রীতমের মুখের কাছাকাছি এসেছিল। বিলু বলল আজ ভাল করে তোমার দাঁত মেজে দিতে হবে। মুখে দুর্গন্ধ হচ্ছে।

দাঁড়ানোটা ভারী কষ্টকর প্রীতমের কাছে। তবু এখনো বিলুর ওপর শরীরের পুরো ভর ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে পারছে। বিলু বলল কতবার বলি বাথরুমে যাওয়ার দরকার নেই। বিছানাতেই তো প্লাস্টিকের গামলায় মুখ ধোওয়া যায়।

আমার ঘেন্না করে।

ঘেন্না করলে চলবে কেন? যেমন অবস্থা তেমনি তো ব্যবস্থা হবে।

এখনো পারছি।

কষ্টও হয় তো! বিলু বলল।

আমার চেয়ে তোমার কষ্টই বেশী।

আমার কষ্ট! আমার আবার কষ্ট কি!

সকালের দিকে বিলুর মন ভাল থাকে। এই সময়টায় বিলুর শরীরটা যেন মায়ের শরীরের মতো মমতা ও সুঘ্রাণ ভরা থাকে।

বিলুর শরীরে ভর দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে বাথরুমে যায় প্রীতম। বিলু খুবই সাবধানে তার বগলের নীচে কাঁধ দিয়ে, কোমরে হাত জড়িয়ে ধরে থাকে তাকে।

বাথরুমে বাচ্চা ছেলের মতো তাকে ধরে থেকে হিসি করায়, তারপর একটা বেতের চেয়ারে বসিয়ে মাথাটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে গুঁড়ো মাজনে আঙুল দিয়ে খুব যত্নে তার দাঁত মেজে দেয়। কোষে জল নিয়ে কুলকুচো করায়।

এসব করতে করতেই বলে আজ স্নান করাবো তোমাকে।

ভাল লাগে না। বড্ড ঝামেলা।

স্নান না করলে শরীর কষে যাবে।

আজ কর দিনটা থাক।

রোজই তো থাকছে। ডাক্তার বলেছে সপ্তাহে তিন দিন স্নান করাতে।

আবার ধরে ধরে নিয়ে এসে চেয়ারে বসিয়ে চিরুনিতে চুল পাট করে দেয়। বাসী জামা কাপড় বদলে দেয়। বিছানার চাদর, বালিশের তোয়ালে পালটে দেয়। রোজই চাদর আর তোয়ালে পাল্টানো হয় ডেটল জলে কাচা হয়। বেডসোর যাতে হতে না পারে তার জন্য পিঠে সযত্নে একটা ওষুধ দেওয়া পাউডার ছড়িয়ে দেয়।

এইসব প্রাতঃকৃত্যের পর শরীরের ভার অনেক কমে যায় প্রীতমের। বিলু তাকে সকালের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাতে জামার ওপর গরম সোয়েটার পরিয়ে দেয়, হালকা শাল টেনে দেয় গলা অবধি।

তারপর বিছানায় হাত রেখে মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, আজ কী খাবে?

এই সময়ে রোজ প্রীতমের মনে হয় বিলু এখন খুব আলতো আমাকে চুমু খেলে কত ভাল হত! এরকম অবস্থায় খাওয়াই তো নিয়ম! খাবে কি?

কিন্তু বিলু কখনোই তা করে না। প্রীতমও কোনোদিন এরকম কোনো প্রস্তাব মুখ ফুটে করতে পারেনি।

পীতম বলে. যা খেতে দেবে তাই খাবো।

কোনো বায়না নেই তো ?

প্রীতম স্নিগ্ধ হেসে বলে, না। কোনোদিন ায়না করেছি ? বলো !

বিল্ হাসে না। ভ্রূ কুঁচকে কেমন একটু ানমনা হয়ে যায়। আর ঠিক এই সময় প্রীতমের মনে তে থাকে, এবার বিল্ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। ফলবে নিশ্চয়ই ফেলবে।

কিন্তু বিলুর দীর্ঘশ্বাস নেই। কোনোদিনই ীর্ঘশ্বাস ফেলে না বিলু।

প্রীতম বলে, আজকাল ডিমে বড় আঁশটে গন্ধ াগে। আজ আমি ডিম খাবো না।

এই তো বায়না করছ ! করো না বলে ?

এটা তো না খাওয়ার বায়না। একে বায়না বলে া।

এটাও বায়না। বিলু বলল, কিন্তু হাসল না। ষথচ এরকম কথায় একটু হাসাটাই কি নিয়ম নয় ?

বিলু বলল, ঠিক আছে, মাখন দিয়ে ডিমের পাচ করে দিচ্ছি, তাহলে অতটা আঁশটে গন্ধ লাগবে া।

দাও। আর জানালার কাছে ইজিচেয়ারটা পেতে াও। একটু বাইরেটা দেখি।

বিলু লোহার ইজিচেয়ারটা পেতে দেয়, ধরে রে নিয়ে গিয়ে বসায়, সযত্নে গলা পর্যন্ত চাপা দয়ে দেয়।

প্রীতম বিলুর দিকে চেয়ে বলে, সকালে উঠে রাজ একটু ফিটফাট হয়ে নাও না কেন ? চুল উড়ছে, িঁদুর লেপটে আছে, ওরকম চেহারা দেখতে কি াল ?

আমার এখন সাজবারই সময় কি-না।

প্রীতম ভ্রূ কুঁচকে বলে, কেন ? তোমার কি দুঃসময় চলছে ?

তবে কি সুসময় ?

তাও নয়। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি সব হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছো।

বিলু মৃদু স্বরে আত্মবিশ্বাসহীন গলায় বলে, হাল ছাড়ার কি আছে ! ঘরে রুগী থাকলে কার সাজতে ইচ্ছে করে বলো তো !

প্রীতম ঘুনঘুনে নেই-আঁকড়া স্বরে বলে, না. ওরকম দেখতে ভাল লাগে না। ও ভাবে কখনো আমার সামনে এসো না। আমার খারাপ লাগে।

আচ্ছা। বলে বিলু চলে যায়।

জানালা দিয়ে কিছুই দেখার নেই প্রীতমের। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে রাস্তা দেখা যায় না। শুধু কয়েকটা বাড়ির তিন বা চারতলা আর আকাশ দেখা যায়। কিন্তু প্রীতমের কোনো অনামনস্কতা নেই। যেটুকু দেখে সেটুকুই যথাসাধ্য চেতনা আর প্রখর অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করে অভ্যন্তরে।

বিলু খাবার নিয়ে আসে। প্রীতমের গলায় বাচ্চাদের মতো একটা ন্যাপকিনের বিপ বেঁধে দেয়। তারপর পাশে একটা টুলে বসে আস্তে আস্তে খাইয়ে দেয় তাকে। খাওয়া জিনিসটা বরাবরই প্রীতমের কাছে খুব বিরক্তিকর ছিল। খেতে হবে বলেই তার খাওয়া। বরাবর সে খায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি। বিলু এখন তা হতে দেয় না। প্রীতমও বুঝেছে খাওয়াটা খুবই জরুরী ব্যাপার। যদি বেঁচে থাকতে হয়, যদি লড়াই চালাতে হয় তবে যথেষ্ট রসদের দরকার।

প্রীতম মুখ ফিরিয়ে বলে, আজকাল আমার খাওয়া কি খুব বেড়ে গেছে বিলু ?

অন্য বউ হলে বলত, ছিঃ ছিঃ, ওসব কথা কি বলতে আছে ? বিলু গম্ভীর মুখে বলল, আরো একটু বাড়লে ভাল হয়।

প্রীতম লক্ষ্য করল, বিলুর চুল এখনো রুক্ষ, এলোমেলো, কপালে সিঁদুর লেপটানো। এ নিয়ে আর বলতে গেলে সকালের নরম সরম বিলু আর নরম সরম থাকবে না। রেগে যাবে, ঠাণ্ডা কঠিন এক ব্যবহার দিয়ে সারাদিন প্রতিবাদ জানিয়ে যাবে।

খাওয়া শেষ হলে প্রীতম মুখ তুলে ফের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে। ও-ঘরে লাবু ঘুম ভেঙে মাকে ডাকতে থাকে, মা ! ও মা ! মা ! ও মা ! মা। ও মা ! ঠিক নামতা পড়ার মতো। বিলু বোধ হয় বাথরুমে। সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু যতক্ষণ না সাড়া দেবে ততক্ষণ এক সুরে, এক গলায় একঘেয়ে ডেকেই যাবে লাবু।

মেয়েকে পারতপক্ষে ডাকে না প্রীতম। বড় মায়া। এই বাসায় এই এক পুকুর ভালবাসায় ডুবজল থম থম করে আছে তার জন্য। বড় গভীর জল। একবার পা বাড়ালে তলিয়ে যেতে হবে। এখন ভালবাসায় ভেসে যেতে নেই। মন নরম হবে, মৃত্যুভয় এসে যাবে তবে। প্রীতম তাই কান খাড়া করে মেয়ের ডাক শোনে, কিন্তু নিজে তাকে ডাকে না বা সাড়াও দেয় না। লাবুর সঙ্গে তার এখন আড়ি।

ঝিটা বাড়িতে নেই, দোকানে গেছে। প্রীতম লাবুর ঐ অবিরল পাখির স্বরের ডাক সইতে পারছে না। ছটফট করে ভিতরটা। আপনা থেকেই শরীরটা দাঁড়িয়ে পড়তে চায়। সরু হাত তুলে সে কপাল টিপে ধরার এক অক্ষম চেষ্টা করে।

বাথরুম থেকে বন্ধ দরজা ভেদ করে বিলুর ক্ষীণ স্বর এল এই সময়ে, আসছি-ই।

লাবু শোনে এবং চুপ করে। মেয়েটা কেমন একরকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। মাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে চায় না। সারা দিন খাওয়া নিয়ে বিলু ওকে মারে, বকে। বিলুকে ভয়ও পায় ভীষণ, আবার অবাধ্যতাও করে যায় অনবরত। মার খেলে মায়ের কাছ থেকে সরে যায় না, পালায় না একই জায়গায় দাঁড়িয়ে অসহায় ভয়ে আর ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে।

যত ভাববে তত মায়ার পলি জমবে মনের মধ্যে।
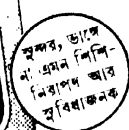
তাই প্রাণপণে নিজের অনুভূতির অন্য জগৎ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে প্রীতম। আগে উদাস ছিল প্রীতম এখন সে অনেক অনুভূতিপ্রবণ হয়েছে। কীট পতঙ্গ জীবাণুদের জগৎকে সে আজকাল স্পষ্ট টের পায়। বাড়িময় যে সব আরশোলা ওড়ে, যে একটা দুটো ইঁদুর বা ছুঁচো আনাগোনা করে তাদের গতিবিধি, সময়জ্ঞান ও চরিত্র সম্পর্কে সে অনেক অভিজ্ঞ হয়েছে ইদানীং। একটা দুধের শিশু বেড়াল অনেক তাড়া খেয়েও এই ফ্ল্যাটের আনাচে কানাচে নাছোড়বান্দা হয়ে ঘুরে বেড়াত। তাকে দু চোখে দেখতে পারত না প্রীতম। এখন সেই বেড়ালটা বড় হয়েছে। সারা দিন পাড়া বেড়ায়, কিন্তু মাঝে মাঝে এসে প্রীতমকে দেখা দিয়ে যায় ঠিকই। আর রোজ রাতে নিয়মিত এসে প্রীতমের খাটের তলায় শুয়ে থাকে। কখন শুতে আসবে বেড়ালটা তার জন্য ঘুমের আগে উন্মুখ হয়ে থাকে প্রীতম এলে নিশ্চিন্ত হয়।

মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকবে তার তো কোনো বাঁধাধরা ছক নেই। প্রীতম এইভাবে বেঁচে আছে, সুতরাং যতদূর সম্ভব এই বাঁচাটাকে সে সইয়ে নেয়। খুবই কঠিন কাজ কিন্তু প্রীতমকে পারতেই হবে।

লাবু ছিল তার প্রাণ। যতক্ষণ বাসায় থাকত প্রীতম ততক্ষণ লাবু এঁটুলির মতো লেগে থাকত তার সঙ্গে। মেয়ের প্রতি তার ভালবাসা ছিল এক-বুক তেষ্টার মতো সহজে মিটতে চাইত না। মেয়েকে ছুঁয়ে না থাকলে রাতে ঘুমোতে পারত না প্রীতম। অসুখ হওয়ার পর বিলু লাবুকে সরিয়ে নিয়েছে। সরিয়ে নেওয়া নয় যেন ছিঁড়ে নেওয়া। প্রথম দিকে লাবুকে ছাড়া খাঁ খাঁ শূন্য লাগত বুক। তারপর সয়েও গেছে। আগে আগে লাবু বাবার কাছে আসতে না পারায় ভীষণ কাঁদত নিষেধ মানতে চাইত না, ফাঁক পেলেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত কোলে। কিন্তু ক্রমে সেও দূরত্ব রক্ষা করে চলতে শিখল তো! পারতপক্ষে প্রীতমও আর মেয়েকে ডাকে না। কথা বলে না। তাও সইল তার।

বিলুর সঙ্গে বরাবরই একটু দূরত্ব ছিল প্রীতমের। ঝগড়াঝাঁটি নয়, মন কষাকষিও নয় ঠাণ্ডা লড়াইও বলা যায় না। তবে বিলু একটু অন্যরকম, কোনোদিনই প্রীতমের কাছে নিজের মনটা সবটুকু খুলে দেয়নি সে। বিয়ের পর প্রথম ভাব হলে মানুষ কত আগড়ম বাগড়ম বলে, কত তুচ্ছ কথার পাহাড় বানায়। বিলু কোনোদিন সেরকম ছিল না। কথা বরাবর কম বলত। কিন্তু একথাও বলা যাবে না যে, বিলুর প্রীতমের প্রতি ভালবাসা নেই। বললে খুব মিথ্যে বলা হবে, ভুল বলা হবে। গড়পড়তা বাঙালী বউরা যা করে বিলু তার চেয়ে এক রত্তি কম করে না তার জন্য। কিন্তু তার ঐ সেবার মধ্যে কোথায় যেন দক্ষ নার্সের পটুত্ব আছে, কোনো আবেগ নেই। অন্য কারো স্বামীর এরকম শক্ত অসুখ হলে চোদ্দবার কেঁদে ভাসাত, বিলু একদিনও চোখের জল ফেলে নি। কিন্তু যারা কেঁদে ভাসায় তারাও হয়তো ওষুধ দিতে এক আধবার ভুল করে, রুগীর সেবা করতে করতে হয়তো বা কখনো বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলে। বিলুর সেরকম ভুল হয় না, বিরক্তির প্রকাশও তার নেই। তবে বিলুর মুখ সর্বদাই গম্ভীর, বিষণ্ণ। যে স্থায়ী বিরক্তির ছাপ বিলুর মুখে আছে তার সঙ্গে প্রীতমের অসুখের কোনো সম্পর্ক নেই।

বিয়ের আগে বিলুর সঙ্গে ভাব ছিল না প্রীতমের। তবে শিলিগুড়িতে বিলু মাঝে মাঝে তার পিসির বাড়ি বেড়াতে যেত। তখন দেখেছে। বিলুর হাতে কখনো এক গ্লাস জল বা এক কাপ চা খেয়েছে প্রীতম। দুটো চারটে কথাবার্তাও হত তখন। পরে সেই পিসিই বিয়ের সম্বন্ধ আনে এবং বিয়ে হয়েও যায়। মনে আছে, প্রথম রাত্রে বিলু তাকে বলেছিল, তুমি খুব শান্ত স্বভাবের। আমার শান্ত মানুষ খুব ভাল লাগে।

এটা কি ভালবাসার কথা নয়?

আজকাল ঘরবন্দী প্রীতম প্রায়ই ভালবাসার কথা ভাবে। কিন্তু ভালবাসার কথা ভাবলে কখনোই তার বিলুর মুখ মনে পড়ে না, কি আশ্চর্য। মনে পড়ে বনগন্ধ ভরা শিলিগুড়ির মাঠঘাট, আকাশ উপুড় করা শীতের ঢালাও রোদ, নীলবর্ণ মেঘের মতো দিগন্তে ঘনীভূত পাহাড়, মহানন্দার সাদা চর, মনে পড়ে তাদের ভরা সংসারের কলরোল। ভালবাসা ছিল ঝুমকো ভোরে ফুল চুরি করতে যাওয়ায়, ভালবাসা মাখা থাকত জোহা চালের ফেনা ভাতে গলে-যাওয়া ঘীয়ের গন্ধে হাইস্কুলের নরেশ মাস্টার মশাইয়ের বিজবিজে কাঁচা পাকা দাড়িওলা মুখে ভালবাসার নিবিড় একটা ছায়া দেখেনি কি? প্রীতম, শতম, রূপম আর মরম এই চার ভাইয়ের মধ্যে ছিল অবিরাম খুনোখুনি ঝগড়া, বিছানায় বালিশকে গদা বানিয়ে প্রবল মারপিট, খাওয়া নিয়ে, খেলা নিয়ে, জামা কাপড় নিয়ে বরাবর রেষারেষি। এখন মনে হয় তার মধ্যেই ভালবাসার কীট গোপনে গোপনে সুড়ঙ্গ

খুঁড়ে এর হৃদয়ের সঙ্গে ওর হৃদয়ের পথ করে দিয়েছিল। আর মা? বাবা? কোনোদিন তারা কেউ তো মুখ ফুটে বলেনি প্রীতম তোকে বড় ভালবাসি। কিংবা, তুই বড় ভাল ছেলে। জ্ঞান বয়সে তাদের মুখে কখনো আদরের কথা শোনেনি প্রীতম, তবু সেই বাড়ি বুকসমান ভালবাসার জলে ছিল আধডোবা। চিরদিনই কলকাতা ছিল প্রীতমের কাছে নিষ্ঠুর প্রবাস। আজও তাই আছে। ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাটটা তার কাছে নিতান্তই এক বাসা বাড়ি, মেস-বাড়ির মতো, হাসপাতালের মতো একটা নিরাপদ আশ্রয় মাত্র। এখানে ডুবজলে স্নান নেই।

যখনই শিলিগুড়ির কথা, ভালবাসার কথা মনে পড়ে তখনই বুকের মধ্যে নাটবল্টু ঢিলে হয়ে একটা কপাট যেন ভেঙে পড়তে চায়। ভারী ঘুনঘুনে এক নেই-আঁকড়া ভাব আসে মনে, শিশু হয়ে যেতে ইচ্ছে জাগে। সেই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় না প্রীতম। কাগজ খাতা ডটপেন নিয়ে অংকে ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করে।

আচমকাই কলিং বেল বেজে ওঠে রি-রি করে।

প্রীতম তখনো আনমনে ভালবাসার কথাই ভাবছে। ভাবছে, তুমি কি অকৃতজ্ঞ নও প্রীতম? বিলু কি তোমার জন্য নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছে না? দিচ্ছে তো? শুধু সকালে মুখের কাছে মুখ এনেও চুমু খায়নি বলেই কি এ বাড়িতে ভালবাসা নেই? এ কেমন ইতরের মতো কথা?

কে গিয়ে দরজা খুলে দিল সদরের। হঠাৎ একটা আফটার শেভ লোশনের সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। শুধু আফটার শেভ নয়, সঙ্গে হয়তো আরও কোনো সুগন্ধ আছে।

এ গন্ধ চেনা প্রীতমের। মুখে হাসি নিয়ে চোখ তুলে সে বলল, আসুন।

আজ ভালই আছেন মনে হচ্ছে! নইলে এই সাতসকালে কেউ কি অ্যাকাউণ্টস নিয়ে বসে? বলতে বলতে অরুণ ইজিচেয়ার টেনে এনে বসে।

প্রীতম লক্ষ্য করল, অরুণ জুতো সুদ্ধু ঘরে ঢুকেছে। প্রীতম এ নিয়ে কাউকে কিছু বলতে পারে না কখনো। কিন্তু বিলু পারে। অরুণের এ ধরনের ভুল প্রায়ই হয় এবং বিলু বকলে ফের গিয়ে জুতো ছেড়ে আসে। আজও বিলু ওকে বকবে ঠিক।

প্রীতম কিছুতেই অরুণের জুতো জোড়া থেকে চোখ তুলতে পারে না। কী সাংঘাতিক দামী এবং ঝকঝকে উঁচু হীলের জুতো! জুতো থেকে চোখ তুললে গাঢ় খয়েরী রঙের ঢোলা প্যাণ্ট এবং তার ওপর ডাবল ব্রেস্টেড কোট, কোটের ফাঁকে গাম্ভীর্যপূর্ণ টাই চোখে পড়বে। তার ওপর অরুণের সুন্দর গোলপানা ফর্সা মুখখানা। বেড়ালের মতো একটু কটা চোখ, সামান্য লালচে এক ঝাঁক চুল, চোখ দুখানা বিশাল। আভিজাত্যের স্থায়ী ছাপ তার সর্বাঙ্গে। হাতের আঙুলগুলো দেখ, কী মোলায়েম, লাল টুকটুকে পেলব!

প্রীতম হাসছিল। বলল, আজ একটু ভালই।

অরুণ খুব চোখা হেসে বলল, খুব ভাল কি থাকবেন আজ! ডাক্তার যে আজ বিকেলে আবার গোটা দশ বারো ছুঁচ ফোটাবে। আমি ঠিক ছটায় গাড়ি নিয়ে চলে আসব।

প্রীতম অস্বস্তি বোধ করে বলে আপনার আসার কী দরকার? বিলুই ঠিক নিয়ে যেতে পারবে। এতদিন তো নিয়ে গেছে।

বিলু পারবে না, বলিনি তো! তবে কষ্ট হবে। দিন দিন কলকাতায় কনভেয়ানস কেমন ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে জানেন তো! ঠিক সময়ে ট্যাক্সি না পেলে? ডেটটা মিস হওয়া কি ভাল?

প্রীতম কৃতজ্ঞতাবোধে অস্বস্তি বোধ করে সবচেয়ে বেশী। একটা লোক নিজের পেট্রল পুড়িয়ে গাড়ি নিয়ে আসবে, নিয়ে যাবে, ফের দিয়েও যাবে—এতটা কি পাওনা প্রীতমের ওর কাছে? অথচ অরুণের জন্য কিছু করারও নেই তার।

হতাশ হয়ে প্রীতম বলে, ঠিক আছে তাহলে।

ঠিকই আছে। খামোকা আমার অসুবিধের কথা ভেবে নিজেকে ব্যস্ত করেন কেন? আমার অসুবিধে হচ্ছে না।

অরুণ এরকম। কোনো জড়তা নেই, অকারণ বেশী ভদ্রতার ধার ধারে না। সবদিক দিয়েই ঝকঝকে প্রকৃতির মানুষ। ভীষণ ধারাল। উচিত কথা বলতে বা রুখে দাঁড়াতে ভয় খায় না প্রীতমের মতো।

রান্নাঘর থেকে এলো চুল দু হাতে পাট করতে করতে তড়িৎ পায়ে বিলু ঘরে ঢুকতেই প্রীতমের বুক কেঁপে ওঠে। এইবার ঠিক অরুণের পায়ের জুতো-জোড়া নজরে পড়বে বিলুর। সে চোখ কুঁচকে উদ্যত মারের অপেক্ষা করতে থাকে।

বিলু খুব ঝাঁঝালো গলায় অরুণকে বলে, আমার কমলা রঙের উলের কী হল? কবে থেকে বলছি, মেয়েটা জানুয়ারি থেকে স্কুলে যাবে! ওর ইউনিফর্ম লাগবে না?

অরুণ বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে অন্য দিকে চেয়ে বলে, কমলা রঙ কাকে বলে তাই তো আমি বুঝি না। আমি একটু রঙকানা আছি।

তা জানি। কানা শুধু নয়, ধসাও। কতবার জুতো নিয়ে রুগীর ঘরে ঢুকতে বারণ করেছি?

(ক্রমশ)

ভারত-শিল্পে শিশু

দীপক ভট্টাচার্য

মা ও সন্তান—মথুরা

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে শিশুর রূপায়ণ কতটা গুরুত্ব পেয়েছিল তা জানার কৌতূহল অনেকের মনেই জাগা স্বাভাবিক—বিশেষত বর্তমান আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে। এমনই এক কৌতূহল বর্তমান প্রবন্ধের অনুপ্রেরণা। বলাই বাহুল্য, এ-বিষয়ে সব তথ্যের সন্ধান দেওয়া বা কোনও গভীর তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করা—এর কোনওটাই বর্তমান প্রবন্ধকারের সাধ্য বা উদ্দেশ্য নয়। একক কৌতূহলের দীপশিখা বহুজনের জ্ঞানালোকের উদ্‌ভাসনে সার্থকতা লাভ করবে, এই আশায় বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রাথমিক দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে শিশুর দেখা আমরা পাই না বললেই চলে। অনেক খুঁজে-পেতে তবেই শিশু-মুখের সন্ধান পাই। প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা থেকে শুরু করে পরবর্তী বেশ কিছু-কাল ধরে শিল্পে আমরা শিশুর খেলনা পোড়ামাটির পুতুল-গাড়ি-বল ইত্যাদি অনেক কিছুই পাই। কিন্তু যারা এসব নিয়ে খেলতো তাদের রূপায়ণ তেমন করে পাই কই। শিশুর দেখা একেবারে যে পাই না তা নয়। যা পাই তা যেন 'হঠাৎ-আলোর-ঝলকানি'র মত দেখা দিয়েই হারিয়ে যায়। অবশ্য পৌরাণিক কাহিনী-চিত্রণের প্রয়োজনে শিশুরূপে কিছু দেবদেবীর রূপায়ণ প্রায়ই আমরা ভারত-শিল্পে পাই। তবে তার অধিকাংশই গুপ্ত বা পরবর্তী যুগের, এবং সেখানেও, সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে, শিশুরূপের সার্থক প্রকাশ আমরা দেখি না।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে দেবদেবীর রূপায়ণ যতটা গুরুত্ব পেয়েছে পার্থিব মানুষ ততটা পায়নি। কেন পায়নি সে-প্রশ্নের মীমাংসা বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর। দেবদেবীর কার্যকলাপ সবই লীলা—যেন তাঁদের শিশুসুলভ ক্রীড়া-কৌতুকের ভাবরূপ। তাই, বোধ হয়, দেবদেবীর কার্যকলাপের মাধ্যমেই শিল্পী রূপায়িত করেছেন শিশুর হাসি-খেলা, তার 'দুষ্টুমি' এবং সারল্য, তার বুকভরা স্নেহ-মমতা কিংবা আপাত-অবুঝ নিষ্ঠুরতা। অর্থাৎ শিশুর 'রূপভেদ' নয়, তার 'ভাবলাবণ্যের' প্রতি-বেদনই যেন দেখি অসংখ্য দেবদেবীর রূপায়ণের মাধ্যমে। তবে দেবদেবীরা প্রায় সর্বদাই কিন্তু চিরযৌবনময়। দেবীরা ষোড়শী যুবতী, দেবতারাও তথৈবচ—'ষোড়শাব্দকপ মূর্ত্তি' বা 'নিত্যরূষ্টবর্ষাকার'। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তবে তার সংখ্যা সীমায়িত। সে-প্রসঙ্গে আসার আগে অন্য দু'একটি কথা সেরে নেওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে বিভিন্ন বিষয়ের রূপায়ণের বিশদ আলোচনা আছে। অনেক বস্তু এবং বিষয়ের রূপগত বৈশিষ্ট্য এসব শাস্ত্রগ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে। রূপবর্ণনায় নারী, পুরুষ, দেব, দেবী, যক্ষ, রাক্ষস, পশু, পাখি এসব কিছুই শিল্পশাস্ত্রকাররা বাদ দেননি। অথচ, ভাবতে অবাক লাগে, তাঁরা শিল্পে শিশুর রূপের কথা প্রায় এড়িয়েই গেছেন! 'প্রায়' বললাম এইজন্য যে, এ বিষয়টি একেবারে যে বাদ গেছে তা নয়—এদিক-ওদিক খুঁজে-পেতে যা আমরা পাই তা যৎসামান্যই বলা যায়। উপরন্তু এসব বিবরণ যা পাওয়া যায় তাতে শিশুর রূপ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ

মা ও সন্তান—ভুবনেশ্বর

না করে তার অবয়বের তালমানের কথাই বলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, এ-বিষয়টিতেও সুপরিচিত শিল্পগ্রন্থগুলি খুব সরব নয়। এর কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় 'আত্রেয়তিলকের' প্রতিমা-মানলক্ষণ অংশে (স্তবক ১৫ থেকে

শিব পরিবার—নূরপুর

১০২ পর্যন্ত)। এখানে অবশ্য যেসব দেবতাদের বালরূপে রূপায়িত করতে হবে, যথা কার্তিকেয়, গণেশ এবং স্কন্দ তাঁদের দেহমাপের কথা আলোচিত হয়েছে। এঁদের প্রতিমাকে বলা হয়েছে ষট্‌তাল, অর্থাৎ অন্যান্য প্রতিমার প্রায় অর্ধেক পরিমাপযুক্ত। এসব তালমানের হিসেব শিল্পের রস উপভোগে খুব একটা প্রয়োজনীয় নয়। উপরন্তু এ-জাতীয় বিবরণ থেকে ভারত-শিল্পে শিশুর রূপায়ণের কোনও সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই না।

ভারতের ভাস্কর্য এবং চিত্র-শিল্পের যেসব অসংখ্য উদাহরণ আমরা চাক্ষুষ করার সুযোগ পেয়েছি তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, শিশুর দেখা আমরা সব চাইতে বেশী পাই মা ও সন্তানের (Mother and Child) রূপকল্পের (motif) প্রতিরূপায়ণে। এই রূপকল্পটি ভারত-শিল্পে কতটা প্রাচীন, বা এটা ভারতের নিজস্ব উদ্ভাবন কি-না, এসব বিতর্কমূলক প্রসঙ্গে প্রবেশ না করেও বলা চলে যে, 'মায়ের কোলে শিশু' এই বিষয়টির সার্থক রূপায়ণ ভারত-শিল্পে বেশ প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। এই বিষয়টির রূপায়ণের রকমভেদ ভারত-শিল্পে স্থান-কাল-ভেদে বিভিন্নভাবে দেখা যায়। শিশুকে যে সব সময় মায়ের কোলেই দেখান হয়েছে তা নয়—কখনও সে মায়ের হাত ধরে রয়েছে, কখনও বা অন্য কোনও শিশুসুলভ ভঙ্গিমায় সে প্রাণবন্ত। মায়ের মুখের অভিব্যক্তিতে স্নেহরস সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত। বলাই বাহুল্য, এইসব ক্ষেত্রে শিশুর

সন্তানসহ জৈনদেবী অম্বিকা

রূপায়ণ গৌণ—মাতৃরূপের পরি-পূরক লক্ষণ হিসেবেই প্রধানত তার উপস্থিতি। এসব মাতৃরূপকে কিছু ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট লেখ-এ "স্কন্দমাতা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলো যেন 'কুমারসম্ভবে'র পার্বতীর রূপকল্প। এরই রকমফের পাই আমরা বিভিন্ন মাতৃকামূর্তির রূপায়ণে। সপ্ত বা নবমাতৃকার মূর্তি ভারত-শিল্পে, বিশেষত মধ্যযুগীয় উদাহরণগুলোতে, প্রায়শই দেখা যায়। এই মাতৃকামূর্তির প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে দেখা যায় ক্রোড়ে বসা এক শিশুমূর্তিকে। এ শুধু হিন্দু মাতৃকার বেলাতেই নয়, বৌদ্ধ দেবী হারীতি কিংবা জৈন মাতৃকা অম্বিকার বেলাতেও তাই। অর্থাৎ শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে সুন্দর, মাতৃত্বের সুচারু সৌন্দর্যও ক্রোড়স্থ শিশুর রূপলাবণ্যে পরিস্ফুটিত হয়, এই রসবোধ ভারত-শিল্পীর অধিকারে এসেছিল সেই প্রাচীন কালেই।

আগেই বলা হয়েছে, দেবতাদের মধ্যে কার্তিকেয় এবং গণেশকে

মা ও সন্তান—পঠারি

শিশুসহ বৌদ্ধদেবী হারীতি, গান্ধার

কৃষ্ণ

বালরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভাস্কর্যে এবং চিত্রে গণেশের যে-মূর্তি আমরা দেখি তাতে তাঁর বালসুলভ পেলব এবং কোমল দেহ স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়া তাঁর হাতের লড্ডুকপাত্রটি শিশুসুলভ মোদকপ্রিয়তার ব্যঞ্জনা চমৎকারভাবে প্রকাশ করে। গণেশের নৃত্যরত মূর্তির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এই নৃত্যে নটরাজের তাণ্ডব তাল নেই, আছে শিশুর নাচের সহজ সরল লালিত্যের ছন্দোময় দোলা। এই লালিত্যের আর এক সুমধুর প্রকাশ দেখি বালগণেশের মূর্তিতে। কার্তিকেয়কে শিশুরূপে খুব বেশী দেখা যায় শিবের সোমাস্কন্দমূর্তির অনুষঙ্গ হিসেবে। পাশাপাশি বসা শিব ও উমার মাঝখানে দেখা যায় শিশুরূপে স্কন্দকে—প্রায়শই নৃত্যরত ভঙ্গিমায়। এ ছাড়া চিত্রকলাতে বিশেষত কাংড়া ও মণ্ডির পাহাড়ী শৈলীর চিত্রাবলীতে, শিব-পার্বতীর পারিবারিক সুখচিত্র রূপায়ণে কার্তিকেয় এবং গণেশকে দুই শিশু-পুত্রের ভূমিকায় কত মধুরভাবেই না দেখা যায়!

তবে একটা কথা, কার্তিকেয় এবং গণেশের এইসব রূপায়ণে শিশু-ভাব যতটা পরিস্ফুট দেবভাবও ততটাই। গণেশের 'হস্তিমুখ' এ কার্তিকেয়ের 'ষড়ানন' এঁদের খাঁটি শিশুরূপকে কিছুটা বিড়ম্বিত ক[রে] বইকি। ফলে এইসব রূপের মধ্যে শিশুর সারল্য এবং দেবতার গাম্ভীর্যের একটা টানাপোড়েন যেন থেকে গেছে। অথচ কৃষ্ণলীলার রূপায়ণে কৃষ্ণের বাল্যরূপে যেন আমরা একটি চিরপরিচিত শিশুকেই দেখতে পাই। ভাগবতপুরাণ বা বালচরিতের কাহিনী-চিত্রণে কৃষ্ণ-বলরামকে শিল্পী বারবার উপস্থাপিত করেছেন শিশুর চিরন্তন রূপের মাঝে। জন্ম থেকে শুরু করে যশোদাগৃহে ক্রমবর্ধমান কৃষ্ণের কার্যাবলীর মধ্যে আমরা তাঁর যে-রূপটি বারবার দেখি তা একটি অতি পরিচিত চপল শিশুর। এই চিরন্তন শিশুটিই যখন অজান্তে দেবতার আসন দখল করে বসে তখনও তাঁর বহু রূপের মধ্যে সব চাইতে মনগড়া হয়ে থাকে তাঁর বালগোপাল রূপটিই। শিশুরূপের এমন সার্থক রূপায়ণ ভারত-শিল্পে আর কোথায় পাবো!

পুরাণবর্ণিত ধ্রুব বা প্রহ্লাদের কাহিনীকে চিত্রশিল্পী যখন রূপায়িত করেছেন, তখন কিন্তু এই নিখাদ শিশুভাবটি খুব একটা রক্ষিত হয়নি। এর কারণ যাই হোক, প্রহ্লাদ বা ধ্রুবকে চিত্রে আমরা শিশুর মত করে ততটা পাই না—তাঁদের অদমনীয় মনোবল শিশুচরিত্রের পক্ষে একটু বড় মাপের হয়ে যেন দেখা দেয়। ঠিক এমনটিই ঘটেছে গৌতম বুদ্ধের বাল্যরূপের বেলায়। জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর শৈশবের বেশ কিছু ঘটনা ভারত-শিল্পে, বিশেষ করে গান্ধার ভাস্কর্যে, দেখা যায়। কিন্তু জন্ম মাত্রেই যে-শিশুকে সপ্তপদ ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, বা ভেড়ার পিঠে

স্কন্দমাতা

চড়ে স্কুলে যাওয়ার পথে যে-শিশু গভীর চিন্তায় আত্মস্থ থাকে, তার মধ্যে প্রকৃত শিশুকে খুঁজে পাওয়া ভার। প্রাপ্ত-বয়স্কের শিশু ভূমিকায় অভিনয়ের মত এগুলোতে রূপা-রোপের ছাপ এত বেশী যে, শিশু-অবয়বে স্বচ্ছন্দ এবং সরল প্রাণের প্রতিষ্ঠা যেন কেমন কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সব শিশুরূপও, শিল্পীর সৃজনী-প্রতিভার দীপ্তিতে, কখনও কখনও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তবে মন কাড়ে না।

শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে শিশুরূপের আরও কিছু উদাহরণ যে [illegible] পাই না তা নয়। সাঁচী-স্ত[ূপের] উত্তর তোরণের গায়ে উৎকীর্ণ দৃশ্যাবলীতে কিছু শিশুর উপস্থিতি অনেকেরই নজরে পড়ে থাকবে। কিন্তু সে তো

গৌতম বুদ্ধের জন্ম.

উপস্থিতি মাত্র। শারীরিক মাপে ওরা শিশু, তার বেশী কিছু নয়। পশু-পাখির জগতে বরং এই শিশুভাবটির কিছুটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ভারত-শিল্পের একাধিক উদাহরণ আমাদের মনে পড়বে। চিত্রকলায়, বিশেষ করে মুঘল চিত্রে, রাজপুত্রের জন্ম এবং তাঁর অন্যান্য ক্রীড়া-কৌতুকের রূপায়ণ বেশ কিছু আমাদের চোখে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য জন্মমুহূর্তের নগ্ন শিশুটি ছাড়া আর কোথাও প্রকৃত শিশুরূপকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাদশাহের ছোটবেলার কীর্তিকলাপের মধ্যে হবু-বাদশার দর্প-দাপানি এত বেশী করে প্রকাশ পেয়েছে যে, তার মধ্যে শিশুর সারল্য একেবারেই চাপা পড়ে গেছে। ইউরোপীয়ান চিত্রের মত মুঘল চিত্রেও কখনও কখনও ডানা-যুক্ত দুটো শিশুর ব্যঞ্জনাময় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেও তো শুধু উপস্থিতিই। ওরা শিশু নয় আমরা মানি। তাই ওদের সঙ্গে আমাদের মনের মিতালি হয় না।

প্রবন্ধের শুরুতে বলেছিলাম যে ভারত-শিল্পে শিশুর দেখা কদাচিৎ মেলে। অথচ উদাহরণ হিসেবে বেশ

সোমাস্কন্দমূর্তি

মা ও সন্তান

কিছু নিদর্শনের উল্লেখ করা গেল। আরও অনেক উদাহরণ অনেকেরই হয়তো জানা আছে। ব্যাপারটা তবে কি দাঁড়াল? যেসব নিদর্শনের কথা বলেছি তার প্রায় সবগুলোতেই শিশু-রূপের উপস্থিতি পরোক্ষ সূত্র ধরে। অর্থাৎ শিল্পী খুব কম ক্ষেত্রেই শিশুরূপ রূপায়ণে ব্রতী হয়ে এসব চিত্রিত করেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, সম্ভবত, শিশুরূপটির প্রয়োজন হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে বা কাহিনীচিত্রের পরিপূরক হিসেবে। একক সত্তার প্রভায় ভারত-শিল্পের শিশুরূপে কদাচিৎ চোখে পড়ে। তবুও কৃষ্ণ-লীলায় কৃষ্ণের রূপায়ণে যেন কিছু আশাতিরিক্ত প্রাপ্তি ঘটে। ঘরের চির-পরিচিত শিশুটিকেই অজান্তে শিল্পী যেন বালকৃষ্ণরূপে রূপায়িত করেছেন। একবার নয়, বারবার। শিল্পীর 'মনের মাধুরী' দিয়ে রচিত এইসব শিশুরূপ ভারত-শিল্পের মণিমুক্তা।

নবনীত নট—বালকৃষ্ণ

চিত্র পরিচিতি :—

মা ও সন্তান—মথুরা। টেরা-কোটা। বর্তমানে শ্রীমতী ও শ্রীহেরী লেনার্ট-এর ব্যক্তিগত সংরক্ষণে (আমেরিকা) আছে।

মা ও সন্তান—মথুরা। মথুরা মিউজিয়ামে রক্ষিত।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম—লোরিয়ান টঙগাই, গান্ধার। ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা।

মা ও সন্তান—পঠারি। আর্কেও-লজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সৌজন্যে।

সন্তানসহ বৌদ্ধ দেবী হারীতি, গান্ধার। আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সৌজন্যে।

সন্তান সহ জৈনদেবী অম্বিকা —দেবগড় দুর্গ। ডঃ ইউ পি সাহু-র সৌজন্যে।

সো মা স্ক ন্দ মূ র্তি—দক্ষিণ

মা ও সন্তান—রাজস্থান

ভারত। ব্রঞ্জ। রীটবার্গ মিউজিয়াম-এর সৌজন্যে।

স্কন্দমাতা—মহুড়ী কোটার্ক মন্দির গুজরাট। ডঃ ইউ পি সাহু-র সৌজন্যে।

মা ও সন্তান—ভুবনেশ্বর। আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সৌজন্যে।

মা ও সন্তান—রাজস্থান। লস্ এঞ্জেলস্ কাউন্টি মিউজিয়ামের সৌজন্যে।

নবনীতনট-বালকৃষ্ণ — দক্ষিণ ভারত। সৌজন্য ঐ।

বালকৃষ্ণ—পেনুকোণ্ডা, অনন্ত-পুর জেলা। আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সৌজন্যে।

শিব - পরিবার— নূ র পু র, পাহাড়ী। ডোগ্‌রা আর্ট গ্যালারি (জম্মু)র সৌজন্যে।

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

লিনটাস-BBC.MB-3-2416 BG

শুভর দুপুর

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় ঠিক ঝি এসে কড়া নাড়ে। এই শীতে তখন রীতিমত অন্ধকার। পুবের আকাশটুকুও ফর্সা হতে দেরি থাকে। উস্কোখুস্কো ঝুনো মাথা নিয়ে বুড়ো নিম আর ঝাঁকড়ামাথা হিমঝুরিটা পেন্সিল স্কেচের মত অকম্পিত দেখা যায়। নির্মম কড়া নাড়া থামাতে চায় না। সাবধানে শুভর শিথিল হাত সরিয়ে, দূর্বা, বাবুমে ও মা-মণিকে ডিঙিয়ে দ্রুত হাতে দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শাড়ি ঠিক করতে করতে পূর্বা বলল, যাই বউ।

আজো পূর্বা উঠে গেলে, ওর শূন্যস্থানে মুখ গুঁজে খানিক সটান শুয়ে থাকল শুভ, পূর্বার শরীরের ওম নিল, তারপর চিৎ হয়ে মুখ থেকে লেপ সরিয়ে তাকাল। অন্ধকার। হয় আলো জ্বালেনি পূর্বা, নয়তো কারেন্ট নেই। আজ কি সারারাত ছিল না? পাশ ফিরে কুঁকড়ে সুঁকড়ে ঘন হয়ে শুল শুভ। পূর্বাকে পেতে ইচ্ছে হল খুব। এই সময়। এইটুকু আয়েসের সময়। ওঠার আগের এই আধ এক ঘণ্টা। চুপচাপ থাকতে, হাল্কা পলকা আশ্বিনের শাদা মেঘের মত ভাসমান লঘু ভাবনায় ভেসে যেতে, ভেসে যেতে যেতে কোনোদিন ঘুমিয়ে পড়তে, ঘুমিয়ে পড়ে দু'একটি স্বর্গীয় স্বপ্নে ডুবে যেতে বড় ভাল লাগে শুভর।

শুয়ে থাকতে থাকতে কানে এল, পূর্বা গুনগুন করে গাইছে। কথাগুলি লেপের ভিতর ঢুকতে পাচ্ছিল না। শুধু সুরটুকু শুভ শুনতে পাচ্ছে। প্রভাতী। বেশ লাগে। আশ্চর্য, একেকটা বিশেষ সময় একেকটি বিশেষ সুরে জড়িয়ে থাকে। আকাশ মুচড়ে নাকি বৃষ্টি নেমেছিল মেঘমল্লারে। পদ্মাবতীর রাগে পতিতপত্র তরুশাখা মঞ্জরিত হয়েছিল। শুভ অতবড় ব্যাপার দেখেনি। কিন্তু শুনবার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। 'আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ মধুর বসন্তমে।' মীড়ে ও গমকে, আলাপের ধ্যান তন্ময়তায় বাংলার একান্ত দ্রুপদ রাগে বিষ্ণুপুরের আকাশ যেন যন্ত্রণাহীন নেমে এসেছিল সেদিন। 'হর মুকুর পর যূথ মধুপ মদহর বিরত কর রব কুঞ্জ মে।' অনতিদূরের শ্যামল বনভূমি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। 'ইত যৌবন মদমাতি যুবতী জুরি রহি বিন কান্ত মে।' গানের কিছু বোঝে না সে, তবু যেন কী ঘটে যাচ্ছিল ক্রমশ, শিহরিত জলতরঙ্গ বুকে দুলে উঠছিল উন্মোচিত হচ্ছিল রহস্যের পর রহস্য।

আর পূর্বা? হারিয়ে গিয়েছিল।

মুখ থেকে লেপ সরিয়ে শুভ একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলে তাকাল। ঝাপসা। মনে পড়ল, পুরনো প্রায়ান্ধকার, আশুতোষ বিল্ডিংস-এর ঝাপসা করিডোরে, ফিরে ফিরে একটি কলির বিস্তার, তার ব্যাকুল বাজনা শুভকে টেনে এনেছিল, বেঁধে ফেলেছিল আজীবন। বাইরে ঘনিয়ে এসেছিল বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা কালিদাসী আষাঢ়ের মালা। শঙ্কিত চমকে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছিল যেন কারো কালো আবরণ। একটি গল্পের কয়েকটি আলোকিত রেখার আঁচড় স্ফুট হয়ে উঠছিল বেদনায়।

শুভর জীবনে, তৃণহীন উপলখণ্ডের প্রান্তরের জীবনে পূর্বা সেদিন পা রেখেছিল। সাবধানে হাত ধরেছিল শুভ।

মনে মনে গানগুলির প্রভাতী কখন শেষ হয়ে গিয়েছে। মশারি খুলে দিয়েছে পূর্বা, কখন যে খোকন ওরা উঠে গেছে অলস নিদ্রার ফাঁক টের পায়নি শুভ। টের পেল জানলা খুলতে। বিছানায় শরীরের আধখানা তুলে বাইরে দেখল পূর্ব দিগন্ত লাল। প্রচণ্ড হিমে যেন নীল হয়ে গেছে অনড় নিম আর কাঠবাদামের ঝাঁকড়া ডালপালা। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অকম্পিত রোমাঞ্চিত তিনটে খেজুর। বুক খোলা পুকুরটার জলছুঁই বকুল ডালে ঠাণ্ডায় ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া একটা ফিঙে।

'বাবুম, মাফলার বেঁধে নাও, তারপর বাইরে যেয়ো। মা মনু, তুমি যাবে না, দাদার সঙ্গে যাবে না—, দূর্বা—, বউ, আঁচটা একটু দেখো না—।'

শুরু হয়ে গেছে, শুভ দেখল, পূর্বার সকাল শুরু হয়ে গেছে। পূর্বার চেঁচামেচি, ব্যস্ততা, সংসার। ধোঁয়া উনুনে খুন্তি কড়াই বাবুম মামন দূর্বার হারমোনিয়ম, কেটলি, শাশুড়ি, ফুলকপির হরিহরছত্র। এই সময় ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে পূর্বা, দ্রুত ক্ষিপ্র হাতে কাজ সারতে থাকে। এক্ষুনি নটা বেজে যাবে। শীতের দিনের বেলা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। সকাল দুপুর বিকেল যেন আলাদা করাই যায় না। সব যেন লেপ্টে একসঙ্গে একাকার হয়েই থাকে। ঘন ঘন আলমারীর মাথায় তাকাবে পূর্বা আর নটা বেজে গেলে আরো দ্রুত স্নান সেরে দুটো মুখে দেবে যেন এক্ষুনি কেউ কেড়ে নেবে। শুভও একটু একটু করে রান্নাবান্নাটা আয়ত্তে এনেছে। এইসময় একটু এগিয়ে আসে সেও ফ্রন্টে। সাবধানে সতর্ক হয়। কিছুতেই আসতে দিতে চায় না পূর্বা তাকে। এই নিয়ে ঝগড়াঝাটিও করেছে বহু। তবু না। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় পূর্ণ করে, সকালের দ্রুততম সংসার সম্পন্ন করে ইশকুলে চলে যায়। পূর্বা যায়, দূর্বা যায় ও খোকন। দূর্বার প্রি, খোকনের টু। ঘরে থাকে শুভ। মা-মণি ও শুভর মা।

শুভ না খেতে না খেতে আজ স্নান সেরে ফেলেছে পূর্বা। মস্ত চওড়া লাল পাড় শাদা শাড়ি পরেছে। শীতার্ত সকালের সূর্যের মত গোল টিপ পরেছে সিঁদুরের। ভেজা একরাশ চুলের ডগায় এখনো বিন্দু বিন্দু জলকণা। আজ নিশ্চয়ই সোমবার, শুভ ভাবল। শুভ ভকতে ভাবত পুরী থেকে আনা কমণ্ডলু ও ফুলের সাজি হাতে হাসতে হাসতে শুভকে 'আসছি, তুমি তরকারিটা যেন লেগে না যায়, একটু দেখো, লক্ষ্মীটি' বলে বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য। মনে মনে হাসল শুভ অবাক হয় সে। সিগারেট ধরিয়ে খাসা কাগজে চোখ রেখে ভাবতে লাগল। এই সেই পূর্বা পূর্বা রাহা? সুরেশ সরকার স্ট্রীটের সাথে ললিত শহরের পূর্বা? ব্যান্ডাগু বিল্ডিংস-এর গমগমে ক্লাসরুম চমকে দেওয়া, আশুতোষ হলের আর্কিস্টটিলিয়ান এসথেটিক্যাল ইনডাকশন নিয়ে ডিবেটে কাঁপিয়ে দেওয়া বিলাস, তীক্ষ্ণ প্রশ্নে জটিল অধ্যাপক থমকে দেওয়া ফাজফর সেই পূর্বা রাহাকে আজ কেউ দেখলে চিনতে পারবে না। শুভকেই মাঝে মাঝে থমকে যেতে হয়।

'একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু, "চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ", বলে যেন বিনু।' চেঁচিয়ে সুর করে রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ পড়ছে বাবলু। এলোমেলো চুলে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকে অঙ্ক করছে দুর্বা। দশ বছরের মা-মনি তার উঠানে পাতা সংসার নিয়ে তাল সামলাতে ব্যস্ত। আরো ব্যস্ত হয়ে উঠছে উনানের কড়াইয়ের ঢাকা।

সশব্দে নিস্তব্ধতাকু ছেড়ে দিয়ে মা-মনকে চিবুক ধরে একটু নেড়ে দিয়ে কিনে গিয়ে দাঁড়াল শুভ। অত হাত লাগাতে না লাগাতেই পূর্বার গলা শোনা গেল, 'এই সাবধানে কিন্তু, ওঃ ঠিক আছে, দাঁড়াও।'

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রসারিত করতল পেতে প্রসাদ নিল শুভ। ছেলেমেয়েদের মত মাথায় হাত ঠেকাল। শুভর ফন্দি টের পেয়ে ক্ষিপ্র গতিতে ওর হাতের সীমানা ছাড়িয়ে ঘরে ঢুকে গেল পূর্বা।

যত নাস্তিকই হোক, শুভর ভালো লাগে। মেয়েদের এ একটা অদ্ভুত সুন্দর রূপ, শুভর মনে হয়। একটা কেমন স্নিগ্ধতাময় সৌন্দর্য ওখানে রয়ে গেছে। শুভ যেন ছুঁতে পারে না। যেন পবিত্রতা ওই পুণ্যশ্লোক, শোকাতুরাকে স্পর্শ করার, অনাভাবে স্পর্শ করার লোভ থমকে দাঁড়ায়। কি জানি, কেন। শতপথ শুভ দেখেছিল সেবার সিরাজুল, দুর্ধর্ষ ছেলে, সেই অপরূপ সুন্দরী নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসিনীকে প্রণাম করেছিল। ওর দু'চোখের পাতা স্পষ্ট ভিজে দেখেছিল শুভ। বিপন্ন বিস্ময়ে শুভ ভেবেছিল, হয়, সবই হতে পারে মানুষ জানে না। শুভ ভাবে সবই সম্ভব। জীবনের গল্প বড় রহস্যময় দুর্বোধ্য, জটিল। অনেক সময়েই শুভ দেখেছে মানুষের ধারণার অতীত কিছু। গল্পের খসড়া কোন একটা ব্যাখ্যাহীন নিয়মে সহসা সহসা বদলে যায়। ভেঙে চুরে যায় জলরেখা। ঝাপসা হয়ে যায়। শুভর গল্পও তছনছ হয়ে গেছে।

কখন সব বেড়ে হয়ে গেছে। দুর্বা বাবলুও ইউনিফর্ম এঁটে কাঁধে পিঠে ব্যাগ নিয়ে তৈরী। লক্ষ্মী কথা না শোনাটাই তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে নিও, লক্ষ্মীটি। আসি।' পূর্বাও আর দাঁড়ায় না। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই জিনিস মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাস এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে তাকে।

এরপর শুভর দুপুর। পূর্ণ দুপুর। আজ আট বছর যেন একটানা একটাই দীর্ঘতম দুপুর শুভকে ঘিরে রেখেছে। বড় দীর্ঘ, বড় বিলম্বিত, বড় গভীর কাজহীন এর বিস্তার। কঠিন, থমথমে। উটের গ্রীবার মত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। কাঁটা চিবোয়। আরাম মুখে চিবোতে থাকে। রক্ত ঝরে। চিবোতে থাকে সময়, স্মৃতি, মৃত স্বপ্ন, সম্ভাবনা, শুভর অস্তিত্ব। শুভ দেখে, একলা। প্রতিদিন। পৌনঃপুনিক। নিশ্চয়ই আজো দেখবে।

চান খাওয়া চুকিয়ে, পূর্বার দুমুহূ প্রমের নির্জন বাগানে গাছপালার ফাঁকে রোদে পিঠ রেখে বসল শুভ। 'উজ্জ্বল আকাশ ছুঁয়ে' হাতে রেখে চারদিনের ধরাল। পাতার ফাঁকে আঙুল আটকে রইল, দক্ষিণের অনুচ্চ পাঁচিল টপকে দিগন্ত অবধি উধাও উঁচু নিচু ডাঙ্গা আর প্রান্তরের পুরনো অথচ প্রতিদিন আকর্ষণকারী বুকে পালিয়ে গেল দুচোখ। রুক্ষ রুঢ় রুক্ষ প্রান্তর আর খোয়াই। তৃণহীন নিরুদ্ভিদ বুকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খেজুরের তাল আর খেজুর। উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো নির্জনতায় শীতের রোদ্দুর পড়ে আছে অলস মন্থর। দিগন্তের কাছাকাছি নেমে গেছে নির্মেঘ নিবিড় অকূল অকরুণ আকাশ। কাঁকুরে পাথুরে বিস্তীর্ণ কঠিন মাঠ আর প্রান্তর এক একসময় শুভর সারা বুক জুড়ে ঘন হয়ে আসে। তার নিজের জীবনের সঙ্গে যেন মিল খুঁজে পায় শুভ। সেও এমনি নিষ্ফল নিরুদ্ভিদ প্রেতের মত জেগে আছে। ব্যর্থতার, বিস্মৃত স্মৃতির, উদ্দেশ্যহীনতায় ভারাক্রান্ত তার জীবনে ঐসব ছোট ছোট বাঁটকুল, সেয়াকুল, মনসা ঝোপগুলির মত, কাঁটা ঝোপগুলির মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে স্বপ্ন, কত কত স্বপ্ন নয় জ্বালা। এই কঠিন পাথুরে মাটির মত তীব্র সংবেদনশীল তারও জীবন। গ্রীষ্মে যতখানি সম্ভব উত্তপ্ত হতে পারে যেমন, শীতে ততখানি শীতল হয়ে ওঠে এই মাঠ আর প্রান্তরের দেশ। এই রুক্ষ রুক্ষমুখী রক্ত কাঁটা-জমির স্তব্ধ কঠিন খোয়াইগুলির মত শুভরও বুক জুড়ে যেন অতীত বর্ষার ধারাপাতের, গৈরিক স্রোতের স্মৃতিচিহ্ন খর রোদ্দুরে জ্বলে যায়।

মা-মনি কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিল। মা কি যেন ঝুঁকে সেলাই করছে। মার এখনো চশমা লাগে না। কত বয়স হল, কে জানে, নিশ্চয়ই সত্তরের বেশি। মার মুখে দুঃখের অজস্র কাটাকুটি। দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা শুভর নিকটতম পৃথিবীর একটি নিটোল মহাকাব্য। শুভ পড়তে পারে না। ঐ ভাষা শুভর জানা নেই।

দরজা গলিয়ে আজকের দৈনিক আর সাপ্তাহিক কাগজ রেখে গেল কাগজ-ওয়ালা। এই দুপুরে পূর্ণ দুপুরে, দুশ একত্রিশ কিলোমিটার দূর থেকে ছুটে আসছে কাগজ। কলকাতা থেকে এই দূর মফস্বল শহরে। অজ কেমন নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তুলে নিল শুভ, কাগজ হাতে বাগানে আবার ফিরে আসতে না আসতে কড়া নাড়ল কেউ। পোস্টম্যান। সেই রকম অভিব্যক্তিহীন হাতে চিঠি নিল শুভ। আবার দরজা ভেজিয়ে ফিরে আসতে, আবার কড়া নাড়ার শব্দ। শুভ বিরক্ত হল, সাড়া শব্দ করল না, কড়া নাড়ার শব্দ জোর হল। গম্ভীর মুখে দাঁড়াতেই দেখল একদঙ্গল ছেলে, সরস্বতী পুজো, চাঁদা চাই। শুভ মুখের রেখা নরম

করল, ম্লান হাসল বলল, পরে এসো তোমরা, কাল বা পরশু, কেমন?

আবার এসে পিঠ ঘুরিয়ে বসল শুভ। পূর্বার বাগানে। পূর্বার বাগানে এখন গাঁদা, সামান্য চন্দ্রমল্লিকা। কয়েকটি ক্রোটন, একটি ঝাউ। নিখুঁত পরিচর্যায় পাথরের মাটিতেও সতেজ হয়ে আছে। এই বাগান রচনার শখ ওর বরাবরই। মাটিহীন বাপের বাড়ির তিন ছাদ বারান্দাময় পূর্বার বাগান ছিল। ও বলত মোবাইল গার্ডেন। মা বলত শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবি। শুভ চুপি চুপি বলত, আমার নিরুদ্ভিদ মাঠ পূর্বা। পাথরের দেশ।

দুপুর মরে আসছিল। রোদ্দুরের উত্তাপটুকু ম্লান হয়ে আসছিল। ইজি-চেয়ারে শুয়ে থাকা শুভর মাথার ওপর নেমে আসছিল শীতের নিস্করুণ আকাশ। জামরুলের ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল কয়েকটা চড়ুই। গেটের বাঁ পাশের খেজুর গাছটার মাথায় একটা শঙ্খচিল বসতে গিয়ে উড়ে গেল। শুভ তার পাটকিলে ডানায় নরম হয়ে আসা রোদ্দুরটুকু শুষে নিয়ে যেতে দেখছিল। উঁচু রেল-লাইনটার ওপার দিয়ে রাস্তাটা দেখা যায়। কালো একফালি ফিতের মত বেশ খানিকটা লাফিয়ে উঠে যেন অকূলে ঝাঁপ দিয়েছে হঠাৎ, উধাও হয়ে গিয়েছে কোন খাদে। পাওয়ার হাউসের আঁকা বাঁকা জটিল জ্যামিতিক নকশাময় পিলার গম্বুজের নাড়িভুঁড়িতে রোদ্দুর ঝলকে যাচ্ছে। শুভ হারিয়ে-যাওয়া অদৃশ্য রাস্তাটার দিকে তাকিয়েছিল।

পূর্বার ইসকুল ঐ রাস্তায়। মাইল পাঁচেক এই শহর থেকে। একটা মস্ত মাঠ ধু ধু করছে, পাশে মজা একটা খাল। স্থানীয় লোক বলে নদী। ঐ মাঠের হাতায় শ্রীহীন ছাদহীন লম্বা প্লাসটারহীন একটা বাড়ি। পূর্বার ইসকুল। মৃন্ময়ী গার্লস স্কুল। বিবাহের ইন্টারভ্যু উত্তীর্ণ হবার আশায় নামসাক্ষী মেয়েরা আসে পড়তে। যতগুলি ভর্তি হয় তার অধিকাংশই ধীরে ধীরে খালি হতে থাকে। কেমন যেন নির্জীব, নিরুৎসাহী, ম্রিয়মান স্কুল চৌহদ্দী ঘিরে একটা রুক্ষতা, একটা হাহাকার। একটা কৃষ্ণচূড়া কি শিরিষ নেই পর্যন্ত।

পূর্বা অবাক হয়েছে। হেডমিসট্রেসের কোনো অফিস নেই, টিচার্স রুম নেই, লাইব্রেরীর কোনো অস্তিত্ব নেই, খেলাধুলোর ব্যবস্থা না, তেমন একটা প্লোব, দুটো ভালো ম্যাপ না। সবচেয়ে লজ্জার—মেয়েদের টয়লেটের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। বিপদে আপদে জনহীন ঐ মজা খালটুকু ছাড়া ভাবা যায় না। অবাক হয়েছে পূর্বা, অবাক হয়, কী করে এইসব স্কুল স্যাংশন হয়। বিল্ডিং গ্রান্ট, লাইব্রেরী গ্রান্ট, এত ডেফিসিট গ্রান্ট কোথায় যায়। যত ছাত্রী তার চেয়ে ঢের বেশি কাগজে কলমে কেন রাখা হয়। ঘণ্টা দেবার, জল দেবার, সামনের দোকান থেকে একটু চা এনে দেবার কেউ নেই, তবু এক অদৃশ্য ঝি-র নামে মাসে মাসে মাইনে তোলা হয় ঘাড় নিচু মাথা হেঁট করে পঞ্চাশ টাকা কমেও কেন সই করে দিতে হয় রিসিভড রুপিস ফুললি। পূর্বা জানে না। আজ আট বছর ধরে দেখে দেখে আর কষ্ট হয় না। অভ্যস্ত পাপ, পাপ মনে হয় না, স্বামীজী বলেছিলেন।

আজ আট বছর ধরে ব্ল্যাকবোর্ডে তাজা চকখড়ির মত ক্ষয়ে যাচ্ছে পূর্বার জীবন। শুভ ভাবে, তার জন্যে, একমাত্র তার জন্যই পূর্বা ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে কি করবে, কি করতে পারে! এমন নয় যে সে চেষ্টা করেনি চাকরির এমন নয় যে তার কোনো যোগ্যতা ছিল না, এমন নয় যে সে জীবনের কাছে হটকারিতা করেছে। অথচ কিছুতেই কিছু হল না। কিছুতেই কিছু হয় না। কে যেন কোথায় তালা বন্ধ করে রেখেছে শুভর ভাগ্যদুয়ার। কে যেন কোথায় অদৃষ্ট মেন সুইচ অফ করে রেখেছে তার ঘর দ্বারের। কে যেন একটা দুর্বোধ্য লিপিতে কি কি লিখে গেছে তার ললাটে। হাজার চৌকাঠে মাথা খুঁড়ে খুঁড়েও সে অর্থহীন ললাটলিপির অদল বদল হল না। কতো কি দিন দিন বদলে গেল। রাজা উজির, রাজ্য রাজধানী। কতো যোগ বিয়োগ, জয় পরাজয় সফলতা ব্যর্থতার গল্প কাহিনী। কেবল শুভ, একটা অলৌকিক কিংবদন্তীর মত অনড় হয়ে আছে, কপালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অশ্লীল শীলমোহর নিয়ে। তার আর কিছু হওয়া হল না। শুভ ভাবে, কারোরই কিছু হয়নি, কোনো সম্ভাবনাই কখনো পূর্ণ হয় না। চাওয়া পাওয়া কোনোদিন এক শুভদৃষ্টিতে মেলে না। শুভ জানে। কৈশোরের রূপকথা জীবনের হারিয়ে যেতে মানা নেই, রুক্ষ কাটা জমির তেপান্তরে ভেঙে যায়। অন্ধকার গ্রাম্য স্কুলঘরের মাস্টার থেকে জজ পর্যন্ত কারোরই কিছু হয়নি। সর্বত্রই স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস, নাটক। রাতভর দেওয়ালে পোস্টার এঁটেও মানুষ শেষ পর্যন্ত একলা। একটা তাজ্জব তামাশায় তামাম দুনিয়ার মানুষ ডিগবাজী খেতে খেতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো পথে নিরন্তর ধাবিত হচ্ছে, বার্ধক্যের দিকে, ব্যর্থতার দিকে, নিরর্থকতার দিকে। তবু যেন সবাই কিছু পেয়েছে, ভগ্নাংশও। কিন্তু সে? পৃথিবীর ব্যর্থতম প্রেতায়িত একটা জীবনের ভার বহন করে চলেছে। নামহীন গোত্রহীন পরিচয়হীন উদ্দাম ও উদ্দেশ্যহীন একটা অনির্দেশ গন্তব্যে স্থির চলে যাচ্ছে প্রতিদিন।

শুভ ভাবে, প্রতিদিন প্রতি দুপুর, একা, দীর্ঘ পূর্ণ দুপুর জুড়ে শুভ একা, আজ আট বছর, যেন একটি অনন্ত দীর্ঘ দুপুরে সে জেগে আছে।

কী গো, কী ভাবছো এত?

ওঃ, তুমি এসে গেছো পূর্বা। আজ একটু আর্লিয়ার?

হ্যাঁ। টিফিনে। লোকাল ফেস্টিভ্যালের ছুটি হয়ে গেল।

তোমার চোখ কেমন আছে, ধরেনি তো?

না, ঠিক আছে। তুমি একটু বেড়িয়ে এস। শীতের বিকেল, টুক করে ফুরিয়ে যাবে। রাত করো না। বড্ড ঠাণ্ডা। আমি চা করছি।

পূর্বার গমনপথে তাকায় শুভ। তার ভালোবাসার দিকে। তাকায় আর আশ্চর্য হয়। সে জানত ভালোবাসা সব খিদে মেটাতে পারে না, অন্তত জীবনের আগ্রাসী খিদে। জীবন ছেড়ে কথা বলে না। ভালোবাসা বিকিয়ে যায়। সমস্ত

অস্তিত্ব মুচড়ে দুলে ওঠে ভালোবাসার ভুবন। ছিন্নভিন্ন হয় স্বরচিত স্বর্গ। সমস্ত ব্যাকুলতা ভেঙে বেজে ওঠে প্রপঞ্চাবর্তে। কিন্তু না, আজ মনে হয়, ভালোবাসা সব পারে। তার অসাধ্য কিছু নেই। এই সত্য ভয়ংকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে পূর্বা।

চায়ের কাপ হাতে বাগানে এসে দাঁড়ায় পূর্বা। শুভর হাতে কাপ ধরিয়ে প্রায় মুখের কাছে ঝুঁকে বলে, এই রাগ করবে না বলো?

কেন, রাগ কেন করতে যাব পূর্বা। পূর্বার আকস্মিক অনুযোগে সত্যি অবাক হয় শুভ।

তাহলে দেখই। বলে ঘর থেকে একরাশ ধূসর রঙের উল কোলে করে নিয়ে আসে। শুভর চোখে তাকিয়ে বলে, তোমার জন্যে আজ কিনেছি, তোমার পছন্দ?

আশ্চর্য, তুমি কি করে জানলে এই রঙটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগবে? দারুণ, সত্যি—, বলতে বলতে শুভ উঠে দাঁড়ায়। একটা নামহীন ব্যথায় বুকের কোথায় যেন বেজে ওঠে। পূর্বার নিজের একটা স্কার্ফ পর্যন্ত নেই।

রোদ্দুরের তাপটুকু ঠাণ্ডা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই ক্রমশ নিচু হয়ে মিলিয়ে যাওয়া পথটা ছায়া ছায়া। পথের দু' পাশে দীর্ঘ দীর্ঘ সেগুন আর শাল আর মহুয়ার সারি। শহরের শেষ চিহ্নটুকু ওই লেভেলক্রসিংয়েই মুছে গেছে। দু' কিলোমিটার জুড়ে ছায়াময় এই নির্জন পথটা শুভর খুব ভালো লাগে। এই গাছগাছালি পূর্ণ পথ যেন অনতি অতীত জংগল মহলের কথা বলে। রাঢ় বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের এই মফস্বল জেলা শহরটির প্রবুদ্ধ ইতিহাস যেন দুলে উঠতে থাকে। কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে শুভ। কতদিন যেন আর পূর্বার সঙ্গে হাঁটে না সে। ওই কালভার্ট পেরিয়ে কতদিন যেন ওরা আর দূরে প্রান্তরের বুকে যায়নি। পৃথিবীর সব দৃশ্য মুছে দিয়ে অকারণ দীর্ঘ হেঁটে হেঁটে গোবিন্দনগর, লোকপুর, পাটপুর পেরিয়ে দুপুরের রেলব্রীজে আর দাঁড়ায়নি ওরা। কেঁদুয়াডিহির সেই অলৌকিক মাঠে গিয়ে শুভ্রতম পিপাসায় আর বাষ্প হয় না। কতদিন।

দিগন্তব্যাপী উঁচুনিচু খোয়াই সামনে রেখে শুভ বসেছিল। সিগারেটের প্যাকেট বের করতে গিয়ে পকেটে হাত লাগল, দুপুরের সেই চিঠিটা, তখন থেকে আর খোলাই হয়নি।

সাবধানে হাওয়া বাঁচিয়ে শুভ সিগারেট ধরাল। হাওয়ায় ধোঁয়া উড়িয়ে ঠিকানাটায় চোখ বোলাল। অক্ষরের ছাঁদ ঠিক চেনা যাচ্ছে না। খুলে ফেলল। একটানে চিঠিটা সব পড়ে গেল শুভ। একবার, দুবার, তিনবার পড়ে যেতে লাগল। আঙুলের ভাঁজে পুড়ে যেতে লাগল সিগারেট। তবু সব ভুলে চিঠিটায় ডুবে গেল যেন শুভ।

স্বাহা লিখেছে। ইউনিভার্সিটির সেই স্বাহা মুখার্জী, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের স্বাহা মুখার্জী। এখন স্বাহা রায়। সংক্ষিপ্ত দ্রুত চিঠি। শুভ, তুমি যদি আসো, সেই আশায় লিখলাম। আমার স্বামীর হাতে, তুমি এলেই হয়ে যাবে। তোমার পক্ষে স্যুটেবল পোস্ট। কোম্পানির কাগজ এডিটরের কাজ। মাইনেও ভাল দেয়। দ্বিধা করো না। অসম্মানজনক ভাবে নিও না। অনেক কষ্টে তোমার খবর পেয়েছি, ঠিকানা ততোধিক কষ্টে।

ততক্ষণে দুপুর দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। একটা হু হু হাওয়ায় শুকনো লাল পাতার রাশি ছড়িয়ে যাচ্ছে ঝাঁকড়া-মাথা শিরিষের ডালপালা থেকে। অনতিদূরে একটা দীর্ঘ মালগাড়ী ভৈরব পুলের দুর্গম বাঁক পেরোচ্ছে।

শুভর মনে আছে। স্বাহা ওকে ভালোবাসত। শুভর [illegible] বড় রহস্যময়, বড় দুর্বোধ্য ছিল স্বাহার ভালোবাসা। শুভ যা কোনোদিন পছন্দ করে না। তাছাড়া শুভ তখন নিঃস্ব, সবচেয়ে দরিদ্র। পূর্বাকে সব নিঃশেষে তুলে দিয়েছে।

আশ্চর্য, বিয়ের দিনে পূর্বার সঙ্গেই গিয়েছিল শুভ। ওর আগেই বিয়েট হয়ে গেল। সেদিন ওর মুখে, দৃষ্টিতে সমস্ত তীক্ষ্ণতা এনেও শুভ কোনো ছায়া খুঁজে পায়নি। স্বাহাকে বরং একটু বেশিই খুশি দেখাচ্ছিল, একটু বেশিই সপ্রতিভ। বিয়ের পরই স্বামীর সঙ্গে বিদেশ চলে গিয়েছিল।

যেন দীর্ঘ ছুটির মত ফুরিয়ে গিয়েছিল দুপুর। বড় বেশি দ্রুত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল সমস্ত প্রান্তর জুড়ে ব্যঞ্জনাহীন বিকেল। রক্তমুখী প্রান্তরের তাল আর খেজুরের বিশীর্ণ ছায়াগুলি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল যেন। শীতে ঘন হয়ে ডালপালা-ঝুরিময় বুড়ো বট জড়োসড়ো হয়ে উঠছিল। যেন কোনো গল্পের আভাসে উৎকণ্ঠিত হাওয়া সহসা চঞ্চল হয়ে যাচ্ছিল। প্রান্তরের মৌন চিরে অপস্রিয়মান মালগাড়ির বাঁশি মন্থর চেতনাকে জাগিয়ে দিচ্ছিল তখন।

চিঠিটা হাতের মুঠোয় ঘামছিল। সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে চলেছিল শুভ। দৈবের দান এমন দুঃসহ হয়ে আসতে পারে, নাটক এমনভাবে দুরূহ বাঁক নিতে পারে, জীবনের গল্পের খসড়া এমন চকিতে বদলে যেতে পারে ভাবতে ভাবতে পায়চারি করছিল শুভ। একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল তার মন। দুরূহতম একটা জটিলতায় যেন জড়িয়ে যাচ্ছিল শুভর উপেক্ষা। রহস্যময় একটা বিপন্ন অনুভূতি যেন বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিল শুভর সত্তা। সাহচর্যহীন একটা থমথমে বেদনা আটকে যায় শুভর গলায়, শুভর অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে।

হাওয়ার বেগ বেড়ে গিয়েছিল এদিকে। এই হাওয়া বাঁচিয়ে আর সিগারেট ধরাতে পারছিল না শুভ। তীক্ষ্ণ হিম হাওয়ার বিরুদ্ধে যেন টান টান হয়ে দাঁড়াল সে, দিগন্তের পরপারে তাকিয়ে থাকল, কি যেন দেখল শুভ, আর তারপর দু'হাতে চিঠিটা ছিঁড়ে শতচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দিল প্রান্তরের প্রবল হাওয়ায়। দ্রুত ফিরে আসতে লাগল শুভ, হিম নীল হাওয়া ভেঙে, বিকেলের বিপন্ন ষড়যন্ত্র ভেঙে যেন তার মহিমময় দীর্ঘ দুপায়ে।

কুলপি

অরুণকুমার ঘোষ

শহরাঞ্চলে প্রায় বিরল। পাড়াগাঁয়ে এখনও দেখা যায়। গ্রীষ্মের দুপুরে পাগড়ির ওপর ঢাউস এক হাঁড়ি মাথায়, ঘামে দরবিগলিত নরপুঙ্গব, মুখে ঠান্ডা মিষ্টি হাঁক, কুলপি চাই, কুলপি—ই-ই। গ্রীষ্মের দিনে সকালে ইসকুল, দুপুরে চ্যাংড়া চিংড়িরা গরমে আইঢাই—এমন সময় এই প্রাণজুড়ানো হাঁক। এ-বাড়ি থেকে বলে, ও কুলপিওয়ালা আমাদের বাড়ি এস। ও-বাড়ি থেকে বলে, কুলপিওয়ালা এদিকে এস। কুলপিওয়ালা বিচক্ষণ রাজনীতিক সে ধীরেসুস্থে দুই বাড়ি থেকে সমদূরত্বে গাছের ছায়ায় মাথার বস্তাজড়ানো হাঁড়ি নামিয়ে কপালের ঘাম মোছে। ততক্ষণে সেখানে একটা ছোটখাট ভিড়। আস্তে আস্তে তার হাঁড়ি থেকে পানের বড় খিলির আকারের টিনের খাপ বার হয়। সেগুলো এক এক করে হাতের তেলোয় ঘুরিয়ে নখ দিয়ে কানার ময়দার পেস্ট চাঁছে, সে মাথার ঢাকনি খোলে। তারপর বাঁ হাতের শালপাতায় সন্তর্পণে কুলপি প্রসব।

এটা আইসক্রিমের যুগ। এখন শহরে পুরু আস্তর লাগান চাকাওয়ালা কাঠের বাক্সে ফিরিওয়ালা আইসক্রিম বিক্রি করে। এখানে ওখানে, মোড়ের পানের দোকানে, রেস্তোরাঁয়, হোটেলে ডীপ ফ্রিজে ভরা থাকে নানা স্বাদের, নানা আকারের আইসক্রিম। আইসক্রিম তৈরির নানা মশলা নানা ফর্মুলা, নানা পেটেণ্ট, নানা ট্রেডমার্ক। ফ্রিজওয়ালা বাড়ির গৃহিণীরা নানা রেসিপিতে আইসক্রিম বানিয়ে পরিচিতমহলে সুখ্যাত হন। পাড়াগাঁয়ে ছবি একটু ভিন্নতর। সেখানে ফিরিওয়ালার কাঁধে ঝোলানো কাঠের বাক্স, তাতে ভরা থাকে বাঁশের কাঠি লাগানো মিষ্টি বরফ হয়ত বা তাতে ছিটেফোঁটা দুধ—তারও নাম আইসক্রিম।

কুলপিওয়ালারা ক্রমশই হুঁকো, পাল্কি কিংবা ঘোড়ার গাড়ির মত বিরল হয়ে যাচ্ছে।

আইসক্রিমের নামেই মালুম, জিনিসটার জন্ম বিলেতে, হালফিল সাগরপারের আমদানি—টেরিলিন, টেরিকটনের মত। কুলপি শব্দ পয়দা হয়েছে আরবী কুলফী থেকে। পুরানো জমানার চীজ খানদানী—মসলিনের মত। হয়ত বা তার সমসাময়িক।

মসলিন কি আজকের জিনিস? কুলপি যদি মসলিনের যুগে তৈরি হত তবে বরফ আসত কোথা থেকে? বরফ বিনা ত কুলপি তৈরি হয় না।

রেফ্রিজারেশনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় টমাস হ্যারিস এবং জন লঙ নামে দুজন ইংরেজ ১৭৯০ সালে এক রেফ্রিজারেশন মেশিনের পেটেণ্ট নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ড্রয়িং বোর্ডের বাইরে সেই মেশিনের অস্তিত্ব ছিল কি-না বলা কঠিন। একই কথা বলা যায় ১৮৩৪ সালে পেটেণ্ট-নেওয়া জেকব পার্কিন্‌সের নামে এক আমেরিকানের হাতে চালানো বরফকল সম্পর্কে। ১৮৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ডঃ জেম্‌স হ্যারিসন এক মদের কারখানায় রেফ্রিজারেশন যন্ত্রপাতি বসান। সেটাই বোধ হয় পৃথিবীর প্রথম সফল হিমঘর।

অথচ উইলিয়ম কেরী বলছেন, কলকাতার ওল্ড কোর্ট হাউসে অনুষ্ঠিতব্য সমাবেশগুলিতে বরফের আয়োজন সংক্রান্ত খবর ১৭৮৭ সালের নভেম্বর মাসের এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায়।

ফ্যানি পার্কস ১৮২৩ সালে কলকাতার এক ধনী বাঙ্গালীবাবুর বাড়িতে দুর্গা পুজো দেখতে যান। সেখানে খাওয়া দাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, " খাদ্যের সঙ্গে বরফ ও ফরাসী মদ্যও ছিল প্রচুর।"

এখন কলকাতার মোড়ে মোড়ে বরফের দোকান। রোগীর মাথার আইসব্যাগ থেকে শুরু করে মাছের ঝুড়ি পর্যন্ত বরফের হরেকরকম প্রয়োগ। অবশ্য কালবোশেখীর দিনে কালেভদ্রে শিলাবৃষ্টি হলে এখনও আট থেকে আশি বছরের বালক-বালিকারা ছাদে বরফ কুড়োতে যান, কিন্তু তা বলে এখন কোন ভ্রমণকারী রোজনামচার পাতায় লিখবেন না, অমুক পার্টিতে খাবারের সঙ্গে বরফের আয়োজন ছিল। ফ্যানি পার্কস লিখেছেন কারণ তখন কলকাতায় বরফ এক মহার্ঘ বস্তু। সুতরাং সমাজের উঁচুতলায় তার বড়ই সমাদর। হয়ত এখনকার ফরাসী খুশবু কিংবা বিলেতি নিষিদ্ধ তরলের মত।

শুনতে আশ্চর্য লাগে, বরফের এই চাহিদা দেখে মার্কিনী এক ব্যবসাদার ১৮৩৩ সালে জাহাজে করে কলকাতায় বরফ চালান দিতে শুরু করেন। সেই বছর মার্কিন দেশের নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্যের জমে যাওয়া পুকুর, খালবিল কেটে ১৮০ টন বরফ 'টাসকানি' নামক জাহাজে চেপে কলকাতায় এসে হাজির হল। পনেরো হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে পালতোলা জাহাজে এমন একটি পণ্যদ্রব্য আনার পরিকল্পনা দুঃসাহসী কল্পনাকেও হার মানায়। কিন্তু, কল্পনা নয়—ঘটনা। হেনরি ডেভিড থোরো 'Walden'-এ এই প্রসঙ্গে লিখছেন "মাদ্রাজ, বম্বে এবং কলকাতার....গ্রীষ্মকাতর অধিবাসীরা আমার পুকুরের জল খাচ্ছেন"। যখন তিনি ভগবদ্গীতার দর্শনে অবগাহন করছেন তখন "ওয়ালডেনের বিশুদ্ধ জল গঙ্গার পবিত্র জলে মিশছে।" পাইন কাঠের গুঁড়ো ভর্তি ডবল-কাঠের বাক্সবন্দী জাহাজের খোল-বোঝাই বরফ আমেরিকার বস্টন বন্দর থেকে কলকাতায় বেশ কিছুদিন ধরে আসত। কলকাতার 'বরফ-ঘরে' এই বরফ জমা করা হত। খরবৈশাখে তপ্ত শহরের তৃষ্ণার্ত ধনিককুল পানীয়ের সঙ্গে এই বরফ মিশিয়ে শীতল হতেন। বস্টনের মার্কিন ব্যবসাদার ফ্রেডরিক টিউডরের তখন খুব বোলবোলাও। শুধু কলকাতা নয়, পারস্য, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ আমেরিকার নানা শহরে বরফ বিক্রি করে তিনি 'বরফ-রাজা' (আইস কিং) নামে খ্যাত হয়ে গেলেন। কলকাতার বণিক রামদুলাল দেও সম্ভবত এই ব্যবসায় জড়িত ছিলেন।

কিন্তু, এ ত' হল ১৮৩৩ পরবর্তী সময়ের কথা। তার আগে কলকাতায় বরফ আসত কোথা থেকে? দার্জিলিং থেকে গোরুর গাড়ি করে? —না। হরিদ্বার থেকে নৌকাযোগে? —তাও না। স্টাণ্ট নয়, ঐতিহাসিক সত্য, বরফ তৈরি হত কলকাতার কাছে হুগলি শহরে। তৈরি করতেন এদেশেরই কুশলী কারিগররা এক অদ্ভুত উপায়ে। বলা উচিত অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে। শুধু হুগলি নয়, উত্তর ভারতের অনেক শহরের আশেপাশে এইভাবে বরফ তৈরি হত। এই দারুণ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে কীভাবে বরফ জমানো হয়, সেই প্রক্রিয়া সাহেবরা সশ্রদ্ধ কৌতূহলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতেন। অন্যান্য অনেক বিলাসসামগ্রীর মত বরফেরও তাঁরা বড় খরিদ্দার হয়ে উঠেছিলেন। ফলে কলকাতা থেকে উত্তর ভারতে যাবার প্রধান রাস্তার ধারে ধারে পিরামিড আকারের অনেক 'বরফ-ঘর' গজিয়ে উঠেছিল। সাহেবদের কৌতূহল শুধু পর্যবেক্ষণেই নিবদ্ধ থাকে নি। তাঁরা এ-ব্যাপারে যথেষ্ট লেখালেখিও করেছিলেন। এইরকম একটি নিবন্ধের লেখক, ইংল্যান্ডের রয়াল সোসায়েটির সদস্য, স্যার রবার্ট বার্কার। ১৭৭৫ সালে প্রকাশিত এই নিবন্ধের শিরোনাম 'দ্য প্রসেস অব মেকিং আইস ইন দ্য ঈস্ট ইণ্ডিজ'। নিচে এর অংশবিশেষের অনুবাদ নিবেদন করছি।

"....এলাহাবাদ, মোতিঝিল এবং কলকাতা—২৫½ থেকে ২৩½ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত ঈস্ট ইণ্ডিজের এই তিন শহরে কী করে বরফ তৈরি করা হয় সে বিষয়ে লিখছি। শেষোক্ত শহরে পুকুর, চৌবাচ্চা বা রাস্তার জমা জলে নিজে নিজে বরফ জমতে কেউ কখনও দেখেছে বলে শুনিনি বা থার্মোমিটারের পারা কখনও হিমাঙ্ক পৌঁছেছে এমন শুনিনি। প্রথমোক্ত শহরে অবশ্য কদাচিৎ বরফ দেখা গেছে এমন কথা শুনেছি। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই তিন মাস এই শহরগুলিতে সূর্যোদয়ের আগে রোজই (অবশ্য আবহাওয়া বিশেষে এর ব্যতিক্রম হত) যথেষ্ট পরিমাণ বরফ সংগ্রহ করা হত।

এলাহাবাদে (এই শহরেই আমি এই পদ্ধতি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম) আমার বরফওয়ালা শীতকালে এত বরফ তৈরি করত যে সারা গ্রীষ্মকাল আমি খাবার টেবিলে বরফ পেতাম। তার অনুসৃত প্রণালী নিচে বিবৃত হল।

আইসফিল্ডের নকশা। জলপজোখ স্যার রবার্ট বার্কারের বর্ণনা। সরার গভীরতা (১½ ইঞ্চি), তুলনামূলকভাবে একটু বেশি দেখান হয়েছে
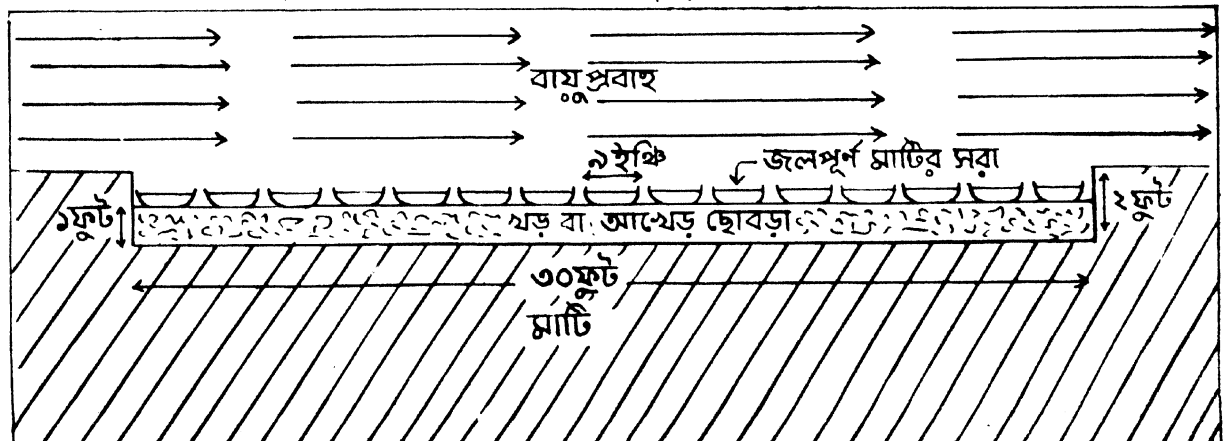
উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রায় ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ও সমান প্রস্থবিশিষ্ট এবং দু ফুট গভীর তিন-চারটে থানা করা হত। থানার ভূমিতে আট ইঞ্চি থেকে এক ফুট পুরু আখের ছোবড়া কিংবা ভুট্টা গাছের শুকনো ডাঁটা বিছানো হত। এইভাবে যে বিছানা তৈরি হল, তার ওপর সারি দিয়ে গায়ে গায়ে বিস্তর অগভীর ছোট মাটির সরায় জল ভরে বরফ তৈরির জন্য রাখা হত। সরাগুলো অমসৃণ, প্রায় ¼ ইঞ্চি পুরু, গভীরতায় সওয়া এক ইঞ্চি। এগুলো এত রন্ধ্রবহুল যে জল ভর্তি করলে তৎক্ষণাৎ মাটির সরাটা ভিজে যায়। সূর্যাস্তের পর আগে-ফোটানো মৃদুজলে (Soft water) সরাগুলো ভর্তি ক'রে ওপরে বর্ণিত অবস্থায় রেখে দেওয়া হত। সূর্যোদয়ের ঠিক আগে বরফওয়ালারা ঝুড়ি করে সরাগুলো থেকে বরফ সংগ্রহ করে আনত। এই বরফ জমা করা হত ১৪/১৫ ফুট গভীর এক কূপের মধ্যে। কূপ উঁচু শুকনো জায়গায় খোঁড়া হত, ভেতরে খড় ও নিকৃষ্ট কম্বলের আস্তরণ থাকত। বরফ কূপে ঢেলে দুরমুশ করে শক্তভাবে জমিয়ে দেওয়া হত। কূপের মুখ খড় ও কম্বল দিয়ে বন্ধ করে রাখা হত যাতে বাইরের হাওয়া না ঢোকে। কূপের ওপর খড়ের চালাও তৈরি ক'রে দেওয়া হত।

নির্মেঘ, পরিস্কার আকাশ এবং হালকা আবহাওয়া বেশি বরফ জমার অনুকূল। পক্ষান্তরে, ঘন ঘন বাতাসের পরিবর্তন বা মেঘলা আকাশ প্রতিকূল অবস্থার সূচক। যেসব রাত আমাদের খুব ঠাণ্ডা লাগত লক্ষ্য করেছি, সেই সব রাতে বিশেষ বরফ জমত না। অথচ তুলনামূলকভাবে গরম কিন্তু নির্মেঘ, শান্ত রাতে সরার সমস্ত জলই জমে বরফ হয়ে যেত।*

উইলিয়ম কেরী তাঁর 'গুড ওল্ড ডেজ অব অনারেবল জন কম্পানি' গ্রন্থে হুগলিতে বরফ তৈরির প্রণালীর বিবরণ দিয়েছেন। এর সঙ্গে এলাহাবাদের প্রণালীর প্রায় কোনও পার্থক্যই নেই। কেরী সাহেব জানিয়েছেন তাঁর বর্ণনা ডঃ ওয়াইজের (Dr Wise) লেখা থেকে নেওয়া। ডঃ ওয়াইজের পর্যবেক্ষণ তীক্ষ্ণতর। তিনি বলছেন, আবহাওয়া বুঝে সরাগুলো কম অথবা বেশি ভর্তি করা হত। "আকাশ কতখানি পরিস্কার এবং উত্তর উত্তর-পশ্চিম থেকে কীরকম বেগে হাওয়া বইছে বুঝে আন্দাজ করা হয় কতখানি বরফ জমতে পারে। তদনুযায়ী জলের পরিমাণ কমানো বাড়ানো হয়।"

"মাঠের তাপমাত্রা ৫০° ফারেনহাইটের (=১০° সেলসিয়াস) নিচে নামলে এবং উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে মৃদুমন্দ হাওয়া বইতে শুরু করলে রাত্রে সরাগুলোর বরফ জমত। জলের ওপর পাতলা বরফের সর জমতে আরম্ভ করলেই বরফওয়ালারা এক পাত্রের জল অন্য পাত্রে ঢেলে মিশিয়ে ঘেঁটে দিত। এতে বরফ তাড়াতাড়ি জমত। রাত দুটো তিনটে নাগাদ খুব বরফ জমত। রাত ১১টা/১২টা নাগাদ জোর হাওয়া বইলে বা আকাশে মেঘ জমলে বরফ জমতে দেরি হত। সেসব দিনে ভোরের আগে বরফ জমতই না। অনুকূল রাতে সরার সমস্ত জল শুধু বরফই হত না, সরার ভেতরে ও বাইরে বরফ জমে শক্ত জমাট হয়ে যেত।"

পাঠক এবার এই পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক দিকটা অনুধাবন করুন। বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় লীনতাপ জল থেকে সংগৃহীত হচ্ছে। ফলে জলের তাপমাত্রা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। প্রক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করছে জলের পাত্রটিকে যথেষ্টভাবে ইনসুলেট করে রাখার ওপর। না হলে তার তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমান হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন, মাটিতে গর্ত করে এমনভাবে পাত্রগুলোকে
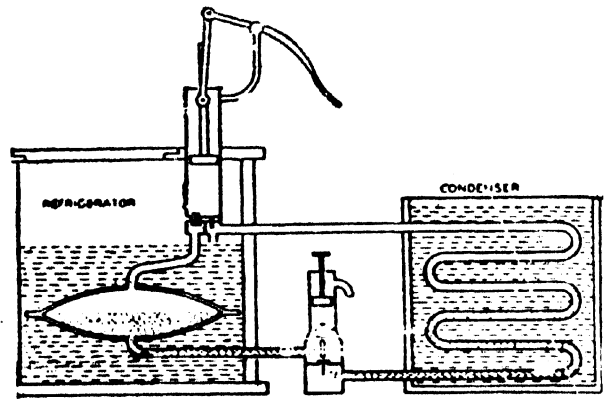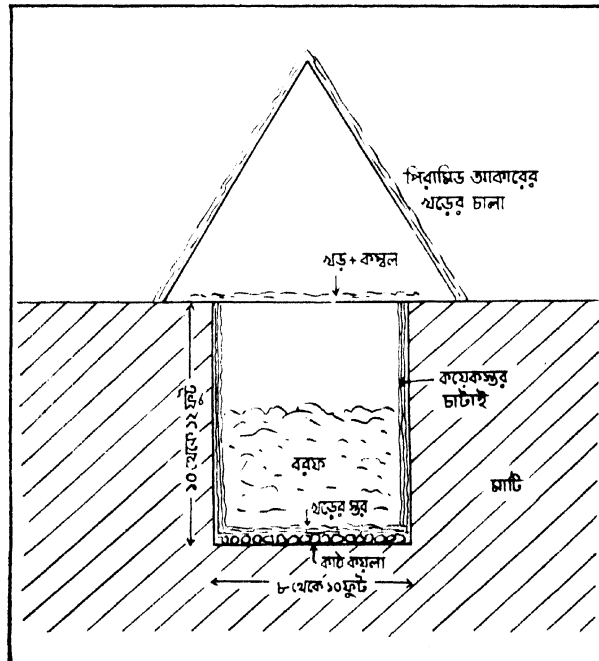
BRITISH PATENT #6,662
to
JACOB PERKINS, GRANTED 1834.

What I claim is an arrangement whereby I am enabled to use volatile fluids for the purpose of producing the cooling or freezing of fluids, and yet at the same time constantly condensing such volatile fluids, and bringing them again and again into operation without waste.

১৮৩৪ সালে পেটেন্ট প্রাপ্ত জেকবপার্কিনসের হাতে-চালান বরফকল। ডিজাইন অনুযায়ী ঈথার নামক উদ্বায়ী তরল এর হিমায়ক (রেফ্রিজারেট)।

বসানো হয়েছে যে, ওপর দিয়ে হাওয়া বয়ে যাবে. তাতে পাত্রগুলির আশেপাশে আংশিক বায়ুশূন্যতার সৃষ্টি হবে। ফলে দ্রুত বাষ্পীভবন হবে, অথচ সোজাসুজি হাওয়ার সংস্পর্শে না আসায় পাত্রগুলির তাপমাত্রা বাড়বে না। দ্বিতীয়ত সরাগুলোকে আখের ছোবড়া বা খড়ের ওপর মাটি থেকে ইনসুলেট করে বসানো হয়েছে। অন্যান্য ইনসুলেটর থেকে খড় বা আখের ছোবড়া শস্তা ত বটেই, সুবিধা এই যে এর ভেতর দিয়ে হাওয়া খেলতে পারে। সুতরাং সরার নিচের দিক থেকেও বাষ্পীভবনের অসুবিধা নেই।

বড় একটা পাত্রে জল না রেখে ছোট ছোট অনেক পা[illegible] নেওয়া হয়েছে যাতে উন্মুক্ত তলের ক্ষেত্রফল বাড়ে উন্মুক্ত তলের ক্ষেত্রফল যত বেশী, বাষ্পীভবনের মাত্রাও তত বেশী।

খরজলে নানারকম পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে থাকে, ফলে তার হিমাংক ০° সে-এর নিচে খরজল তাই দেরিতে জমে। সুতরাং জল ফুটিয়ে মৃদুজলে পরিবর্তিত করে নেওয়া হচ্ছে।

আরও লক্ষ্য করুন, জলের ওপর বরফের সর জমতে আরম্ভ করলে বাষ্পীভবন কমে যাবে, বরফ জমতে দেরি হবে—তাই তখন পাত্রের জল ঘেঁটে দেওয়া হচ্ছে।

এইভাবে বরফ তৈরি ভারতে কবে শুরু হয়েছিল বলা কঠিন হয়ত অসম্ভব। কবে এর শেষ হল, তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। হয়ত ফ্রেডারিক টিউডরের জাহাজী বরফের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে কলকাতার আশেপাশে এই পদ্ধতিতে বরফ তৈরি বন্ধ হয়ে গেল হয়ত।

কুলপিও হয়ত এই সরায় তৈরি বরফের সমবয়সী। সেই ১৭৭৫ সালে স্যার রবার্ট লিখছেন,

"শঙ্কু-আকৃতি রুপোর কাপে, শরবৎ, ক্রীম বা অন্যান্য যে তরল জমানো দরকার রেখে মাথার ঢাকনি পেস্ট দিয়ে ভালভাবে বন্ধ করা হয়। সমান অনুপাতে সোরা এবং লবণ মেশানো বরফ ভর্তি বড় একটা পাত্রে এগুলো ডুবিয়ে রাখলে খানিকক্ষণের মধ্যে কাপগুলোতে ইয়োরোপের আইসক্রিমের মত জিনিস তৈরি হয়।"

সন্দেহ নেই, স্যার রবার্ট কুলপি তৈরির প্রক্রিয়ার কথা বলছেন।

সরায় তৈরি বরফ কালের বিবর্তনে এবং টেকনলজির আগ্রাসনে বহুদিন আগেই অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু, মাটির তৈরি হাঁড়ি, কলসি, সরা যেমন নানারকমের ধাতব বাসনকোসনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখনও গ্রামাঞ্চলে বেঁচে আছে তেমনি কুলপিও আইসক্রিমের সঙ্গে এখনও অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কুলপিও একদিন গল্পকথায় পরিণত হবে। যেমন হয়েছে বা হচ্ছে টাঙ্গা পালকি ঘোড়ার গাড়ি।

বিজ্ঞান

কোটি কোটি বছর আগে যারা ভারতেও বিচরণ করত

১৯০০ সাল। জনৈক রুশ শিকারী সাইবেরিয়ার বেরেজোভকা নদীর পাড় ধরে হাঁটছিল বরাবর উত্তর দিকে। লক্ষ্য, একটি আহত হরিণ। ওই অঞ্চলের মানুষের কাছে একটি হরিণ মানে একটি অমূল্য সম্পদ। পেটের জ্বালা এবং শীতের হাত থেকে বাঁচতে গেলে হরিণ, ভালুক—এ সব প্রাণী না হলে তাদের চলে না। আর তাদের সন্ধানে সেখানকার মানুষদের কখনও কখনও প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়।

যেমন পরিশ্রম করতে হচ্ছিল সেই লোকটির। অস্ত্রের সাহায্যে হরিণটিকে সে জখম করেছিল ঠিকই, কিন্তু জখমটি তেমন জোরালো না হওয়ায় শিকার শেষ পর্যন্ত তার নাগালের বাইরে চলে যায়। আর সেও নাছোড়বান্দা হয়ে তাকে ধাওয়া করতে থাকে।

বেরেজোভকা নদীর পাড় দিয়ে এইভাবে ধাওয়া করতে করতে লোকটি এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হায় ভগবান! একি দেখছে সে? দুর্দান্ত সাহসী না হলে হয়ত তখনই সে ভির্মি খেতো।

অতিকায় একটি মাথা। কেমন হাতির মাথার মত মনে হচ্ছে না? ঠিক। হাতিরই মাথা। তবে যে হাতির সঙ্গে তার পরিচয়, তার সঙ্গে এই হাতির মাথার মিল অনেক কম। তুষারের ভেতর দিয়ে মাথাটি শুধু বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। আর সেই মাথার নিচে বিরাট দুটি বাঁকানো দাঁত।

জায়গাটি সুমেরু বৃত্তের প্রায় ১০০ কিলোমিটার ভেতরে অবস্থিত। এখন যে সব অঞ্চলে হাতি পাওয়া যায় সেখান থেকে ৩২৫০ কিলোমিটার দূরে।

খবরটি শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো লেনিনগ্রাদের বিজ্ঞানীমহলে। খবর পাওয়ামাত্র বিজ্ঞানীরা সেখানে ছুটে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরাও থ। হাতি। হ্যাঁ, হাতিরই মুন্ডু। তবে সে হাতির সঙ্গে এখনকার হাতির চেহারা মিলবে না। বিরাট মাথা। মস্ত দুটি দাঁত। গায়ে পুরু চামড়া। চামড়ার ওপর ভেড়ার মত লোমের আচ্ছাদন। হাতিটির মাথা তুষারের বাইরে। বিরাট দেহের এক অংশ তখনও তুষারচাপা। প্রচণ্ড ঠান্ডায় তার মাংস তখনও নষ্ট হয় নি। তবে অন্য কোন প্রাণী মাঝে মাঝে এসে তার মাংস যে ভোজ সেরে গেছে, বোঝা যায়। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে আবিষ্কার করলেন, বিশেষ প্রজাতির এই হাতি এক সময় সাইবেরিয়ারই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করত। বাস করত ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার বনাঞ্চলে। কয়েক হাজার বছর আগেও। এখন তারা অবলুপ্ত। হিম-কঠিন এই অতিকায় প্রাণীর নাম রাখা হয় বেরেজোভকা ম্যামথ।

বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছিলেন তখন। কারণ অনেকেই জানেন, আলাসকা অথবা সাইবেরিয়ায় এখন কোন হাতি পাওয়া যায় না। যদি তাই হয়, তেমন একটি অঞ্চলে এ ভাবে হাতির দেহাবশেষ পাওয়া গেল কী ভাবে? এ থেকে একটি মাত্র সিদ্ধান্তই করা চলে। আর সেই সিদ্ধান্তটি হলো, এক সময় কুমেরুও নিশ্চয় এই ধরণের প্রাণী-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। এখনকার মত সেখানকার বিস্তৃত অঞ্চল তখন হয়তো এত বেশি তুষারাচ্ছন্ন ছিল না। ঘন সবুজ বন, হ্রদ, নদীর প্রবাহ সব কিছুই ছিল সেখানে। প্রাণের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে থাকত সেখানকার পরিবেশ। তারপর এল তুষার যুগ। তুষার সেখানকার জীবজগৎকে স্তব্ধ করে দিল। কিন্তু কিছু প্রাণী হয়ত সেই অবসরে সেখান থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল অন্যত্র। অনেকে চাপা পড়ে রইল তুষারের নিচে।

*

শুধু সাইবেরিয়া, বা অন্যত্রও নয়, একই কাহিনীর পুনরাবৃত্ত ভারতেও ঘটেছিল। হিমালয় অধ্যুষিত অঞ্চলে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে শিবালিক গোষ্ঠীর শিলাস্তূপ। এই শিলাস্তূপের নিচে শিলীভূত

আদিযুগের এই জলহস্তীর প্রাণবন্ত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন সুরজিৎ দাস

অবস্থায় পাওয়া গেছে নানা রকম প্রাণীর জীবাশ্ম। পাওয়া গেছে বেলেপাথর, মৃত্তিকা এবং পাললিক স্তরের ভেতর। যেখানে তাদের পাওয়া গেছে, সেখান থেকে আরও দূরে, হিমালয় এলাকার অভ্যন্তর অঞ্চলে হয়তো তারা বাস করত প্রায় কুড়ি লক্ষ থেকে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগেও। হিমালয়ের উচ্চতা তখন এখনকার মত ছিল না। তখন সে মাথা চাড়িয়ে ক্রমেই আকাশের দিকে ঠেলে উঠছে। তখন দ্রুত-প্রবাহিণী নদ-নদীর ধারায় ওই সব প্রাণীর দেহাবশেষ ভেসে এসে অধঃক্ষিপ্ত হয়, এখন তাদের যে সব অঞ্চলে পাওয়া গেছে, সেখানে। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর জমে উঠেছে স্তরে স্তরে প্রায় ৬০০০ মিটার উঁচু পাথরের স্তূপ। এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো শিলার বয়েস দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছরের মত।

হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানার উত্তরাঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত শিবালিক পাথরের দেশে সৃষ্টির পর থেকে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। প্রথম দিকে যা ছিল বন্য অধ্যুষিত শুষ্ক অঞ্চল, পরে সেখানে একে একে গজিয়ে ওঠে আর্দ্র-বনভূমি। ভূতাত্ত্বিকদের ভাষায় 'টারশিয়ারি' যুগের শুরুতে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আগে, হিমালয়ের অভ্যন্তর অঞ্চলের উচ্চতা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ফলে সেখানে জলীয় বাষ্পের আনাগোনাও হতো কম। পরে ওই অঞ্চলের উচ্চতা বাড়তে থাকে। আর তারপর থেকে সেখানে আর্দ্রতাও বাড়ে। সেই সঙ্গে তাপমাত্রা। এর ফলে ওই সব অঞ্চল ভরে উঠতে থাকে এক একটি গভীর বনে। শিবালিক অধ্যুষিত এলাকায় তখন আবির্ভাব ঘটে নানা প্রাণীর। আদিকালের প্রাণী। যেমন, ঘোড়া, গরু বা মোষ, হাতি, শুয়োর; জিরাফ; মানুষের পূর্বপুরুষ হোমিনয়ডিয়া, জলহস্তী, গণ্ডার; কুমির; স্থলচর-কচ্ছপ এবং আরও নানান প্রাণী। এই অঞ্চলে 'রামাপিথেকাস' নামে এক ধরনের প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, যার বয়স প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বছর। যাদের বর্তমান মানুষের আদিপুরুষ বলে দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এদের মুখের আদল এবং দাঁতের গঠন মানুষের প্রায় কাছাকাছি ছিল। বিজ্ঞানীদের

টাইর‍্যানোসরাসের এই প্রতিমূর্তিটি দেখা যাবে হায়দ্রাবাদে। ১৫ মিটার লম্বা। তৈরি করেছেন সুরজিৎ দাস এবং দেবব্রত চক্রবর্তী

হিমালয় অধ্যুষিত অঞ্চলের আদিম কচ্ছপ। এটি তৈরি করেছেন দেবব্রত চক্রবর্তী

ধারণা, এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে যতগুলি হমিনিড-এর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, এই জীবাশ্ম তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। বিভিন্ন দেশের নৃবিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। কেউ কেউ মনে করেন, 'রামাপিথেকাস'ই পরবর্তীকালে বিবর্তনের মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে উন্নততর প্রজাতি 'অস্ট্রেলো-পিথেকাস'-এ। যারা শিকার এবং আত্মরক্ষার জন্যে পাথরকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। শিবালিক অধ্যুষিত অঞ্চলে এরা বাস করত প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে। সম্প্রতি জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়া ওই অঞ্চলে অজস্র পাথরের অস্ত্রের সন্ধান পেয়েছে। এই সব অস্ত্রের সঙ্গে আফ্রিকায় পাওয়া অস্ট্রেলোপিথেকাস নির্মিত অস্ত্রের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

আজ থেকে কুড়ি লক্ষ বছর আগে শিবালিক অঞ্চলে নেমে আসে বরফ যুগ। তার প্রভাবে বহু স্তন্যপায়ী প্রাণী অবলুপ্ত হয়। অনেকে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয়ও নিয়েছিল।

*

বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে ছিল আজ থেকে প্রায় তিনশ' কোটি বছর আগে। পরবর্তীকালে জৈবিক বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে নানা রকম প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাইনোসরস। এদের পূর্বপুরুষদের আকৃতি ছিল অনেক ছোট। তাদের চেহারা ছিল কতকটা কুকুরের মত। চারপেয়ে সরীসৃপ। এদের বলা হয় 'থেকোডনট'—এরা বাস করত প্রায় বাইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে 'ট্রাইঅ্যাসিক' যুগের যখন শুরু, তখন। এদের আয়তন গোড়ার দিকে ছিল খুদে মুরগির মত। পরে তা বাড়তে বাড়তে অতিকায় ডাইনোসর-এ রূপান্তরিত হয়। এই সব প্রাণীর পেছনের দুটি পা ছিল যথেষ্ট লম্বা। কারোর গা ছিল নগ্ন। কারোর গায়ে ছিল পুরু এবং শক্ত আঁশের মত আবরণ। এরা কেউ ছিল জলচর, কেউ স্থলচর, অনেকে উভচর। আবার কেউ কেউ রূপান্তরিত হয় পাখির মত প্রাণীতে।

ডাইনোসরদের অবলুপ্তিকাল অনুমান আজ থেকে প্রায় ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে 'মেসোজোয়িক' যুগের সময়। বিশেষ এই সময়টিকে ভূতাত্ত্বিকরা বলে থাকেন 'সেনোজোয়িক যুগ'। এ যুগ এখনও চলেছে। এই যুগেই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে, শুধু স্তন্যপায়ীই নয়, পাখি, ঘাস, গুল্ম, সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রভৃতির মধ্যে দ্রুত বিবর্তন ঘটতে থাকে। উল্লেখ্য, অনেকের অনুমান, সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাবই ডাইনোসরদের অবলুপ্তির অন্যতম কারণ। আগে গাছে ফুল ধরত না। এবার হলো ফুলের আবির্ভাব। উদ্ভিদভোজী ডাইনোসররা ফুলের পরাগ সহ্য করতে পারল না। এ ধরনের খাদ্য তাদের দেহে বিষক্রিয়া ঘটায় এবং ক্রমে তারা অবলুপ্ত হয়।

যাই হোক, ভারতভূমিতেও কিন্তু একদা অতিকায় ডাইনোসররা বিরাজ করত। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ জেলার ইয়ামানপল্লী থেকে ডাইনোসরের জীবাশ্ম সংগ্রহ করেছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার কর্মীরা। যে শিলার মধ্যে তাদের পাওয়া গেছে, তার বয়স প্রায় ষোল কোটি বছর। 'জুরাসিক' যুগের শিলা। যার অর্থ আজ থেকে ষোল কোটি বছর আগে ওই অঞ্চলে ডাইনোসরদের অবাধ চলাফেরা ছিল। এই সব ডাইনোসরদের একটির জীবাশ্ম জোড়া-তালি দিয়ে বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, সেটি লম্বায় ছিল ১৫ মিটারের মত। উল্লেখ্য, গত ২২শে জুন জিওলজি-ক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়া একটি পাখির জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশে। অনুমান, এর বয়স ১৭ কোটি বছর। যদি তাই হয়, আগে যে অনেকে মনে করতেন পৃথিবীতে পাখির আবির্ভাব ঘটেছিল ১৪ কোটি বছর আগে, সে সিদ্ধান্ত এবার ভুল বলে প্রতিপন্ন হবে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ এবং হিমাচল প্রদেশের সার্কেটের কাছাকাছি পুরনো দিনের আদিকালের সে সব প্রাণীর কিছু কিছু প্রতিমূর্তি বসানো হয়েছে ইতিমধ্যে। খণ্ডিত জীবাশ্মকে জোড়াতালি দিয়ে এর জন্যে প্রথমে কল্পনা করে নিতে হয়েছে ওই সব প্রাণীর বাস্তব স্বরূপ। তাদের দেহের গঠন, হাঁটাচলার ভঙ্গিমা, ইত্যাদি। তারপর কংক্রিট, প্লাস্টার অভ প্যারিস অথবা বিশেষ ধরনের কাচের সাহায্যে, আর সেই সঙ্গে রঙ বুলিয়ে এক একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করেছেন কয়েক-জন নামী ভাস্কর। শ্রীসুরজিৎ দাস এবং শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী। এই সব মূর্তিকে খোলা আকাশের নিচে প্রাকৃতিক পরিবেশে রেখে দেওয়া হয়েছে। জনৈক বিদেশী বিশেষজ্ঞের মত—এমন জীবন্ত প্রতিমূর্তির কাজ পৃথিবীতে খুবই বিরল।

তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। মুহূর্তে আপনার সমস্ত অনুভূতি চলে যাবে কোটি কোটি বছর পেছনে। আর তখন একটি কথাই হয়তো মনে পড়বে বার বার: পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে ওদের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধানের সত্যিকারের তাৎপর্য কি? একমাত্র পরিবর্তিত পরি-বেশই কি ওদের সমাপ্তির দিকে ঠেলে দিয়েছিল? এ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেলে, বর্তমানের প্রাণী (আমরাও অন্তর্ভুক্ত) এবং উদ্ভিদজগৎ কোন দিকে এগিয়ে চলেছে, সেটা হয়ত অনুমান করা যেতে পারে।

সমরজিৎ কর

ট্রাইসেরাটপস। লম্বায় ১৫ মিটার, উচ্চতায় ৭ মিটার। এরা এক সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশের অধিবাসী ছিল। দেবব্রত চক্রবর্তী এবং সুরজিৎ দাস এটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন

টেনিসের বিস্ময় বালক

ছোটবেলায় গ্রেড স্কুলে ফুটবল এবং বাস্কেটবল খেলতো। ছেলেটি মার্কিন নাগরিক কিন্তু জন্মেছিল পশ্চিম জার্মানীর ওয়াইসবাডেন শহরে। বাবা-মা সেখানে থাকতেন। বাবা কাজ করতেন এয়ার ফোর্সে।

বাবার বয়স যখন বত্রিশ এবং ছেলের আট, তখন দুজনে টেনিস খেলার জন্য ভর্তি হলেন নিউ-ইয়র্কের ডগলাসটন ক্লাবে। বাড়ির পাশের ব্লকেই এই ক্লাব। মাত্র দু সপ্তাহ খেলার পর ১২ বছর এবং ১২ বছরের কম বয়সীদের টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উঠল ছেলেটি। তারপর দুই একটি জুনিয়র প্রতিযোগিতাও জিতল। যখন বয়স মাত্র দশ তখন টেনিস কোর্টে বাবাকে হারাতে শুরু করল। বারো বছর বয়সে ডাবল বয়সী খেলোয়াড়দের হারিয়ে পেল ডগলাসটন সামার টুর্নামেণ্টে বিজয়ীর সম্মান। টেনিস বিশেষজ্ঞরা চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগলেন ছেলেটির র‍্যাকেট ধরার কৌশল এবং মারের চটক। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন ছিলেন বিশ্ব টেনিসের বড় রূপকার। নাম হ্যারী হপম্যান, টেনিসে অস্ট্রেলিয়ার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে যার অবদান সব চেয়ে বেশী—বহু নিপুণ খেলোয়াড়কে যিনি গড়েপিটে তৈরি করেছেন।

"প্রথম দিনেই আমার ছেলেটিকে মনে হয়েছিল আর এক নীল ফ্রেজার। চমৎকার চিপ করছিল, ভলি মারছিল, প্রচণ্ড স্পিন মিশিয়ে বলগুলি হিট করছিল। অন্য ছেলেরা সোজা সার্ভ করছিল কিন্তু ওই ছেলেটি চেষ্টা করছিল জোরের উপর টুইস্ট ও স্লাইস করাতে।"

যে ছেলেটির খেলা দেখে টেনিসের দ্রোণাচার্যের এই উক্তি এবং ছেলেটিকে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উন্নত টেনিসের তালিম দিয়েছিলেন সেই ছেলেটির নাম জন প্যাট্রিক ম্যাকেনরো, বিস্ময় বালক হিসাবে টেনিসে যার আত্মপ্রকাশ।

উনিশ শো বাইশ সালে উইম্বলডন থেকে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড প্রথা বিলোপের পর কোনো টেনিস খেলোয়াড় টানা চার বছর উইম্বলডন খেতাব জিততে পারেননি। এ বছর বিয়রন বর্গের সামনে ছিল সেই অনন্য সম্মান জয়ের সুযোগ। তবে উইম্বলডন শুরুর আগে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল বর্গ এই সম্মান না-ও পেতে পারেন। টেনিসের বিস্ময়কর প্রতিভা জন ম্যাকেনরো তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন।

বিশ্ব টেনিসে বর্গের নতুন কীর্তি অর্জনের পথে ম্যাকেনরো বাধা হলেন কি না কিংবা ম্যাকেনরো আগেই হেরে গেলেন অন্য খেলোয়াড়ের কাছে, এ লেখা পড়ার আগেই পাঠকরা তা জেনে যাবেন। বাছাই তালিকা অনুযায়ী রচিত খেলার তালিকায় ফাইনালেই দুজনের মুখোমুখি হবার ব্যবস্থা ছিল। তার আগে নয়। বর্গ ছিলেন এক নম্বর বাছাই ম্যাকেনরো দুই নম্বর। অর্থাৎ খেলোয়াড়দের যোগ্যতা অনুযায়ী টেনিস বিশেষজ্ঞরা এই দুজনকে সম্ভাবিত বিজয়ী বলে ধরে নিয়েছিলেন।

সুইডেনের বিয়রন বর্গ নিঃসন্দেহে টেনিসের সুপ্রিম স্টার। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন টেনিস প্রোফেশনালের র‍্যাঙ্কিংয়ে বেশী পয়েন্ট সংগ্রহকারী চারবারের উইম্বলডন রানার্স জিমি কোনর্সকে টপকে কীভাবে ম্যাকেনরো দুই নম্বর বাছাই হলেন? কীর্তির অবশ্য অভাব নেই তবে ম্যাকেনরো সম্পর্কে হালফিল উঁচু ধারণা টেনিস কোর্টে সম্প্রতি সিংহ শিকারের সুবাদে। পাঁচবার মুখোমুখি হবার মধ্যে বর্গকেই হারিয়েছিলেন তিনবার কোনর্সকেও দুই-তিনবার। তার মধ্যে দুবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলায়।

নানা কারণে এবং সুমহান ঐতিহ্যের দাবীতে উইম্বলডন টেনিসের পৃথক মর্যাদা। বিজয়ীকে বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি প্রোফেশনাল টেনিসের

যোগিতা জয় সবচেয়ে মর্যাদাময় সে দুটি প্রতি-যোগিতারই খেতাব জিতেছিলেন জন ম্যাকেনরো। প্রথম গত জানুয়ারিতে গ্রাঁ প্রীর মাস্টার্স চ্যাম্পিয়ন-শিপ, পরে গত মে মাসে ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়নশিপ টেনিসে বিজয়ীর সম্মান। বলা বাহুল্য, বেশী পয়েন্ট সংগ্রহকারী শীর্ষ খেলোয়াড়রাই এ দুটি প্রতি-যোগিতায় খেলার অধিকারী। মাস্টার্সে ৬ জন এবং ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়নশিপে ৮ জন। দুটি প্রতিযোগিতারই বিজয়ীর পুরস্কার এক লাখ ডলার। আমাদের টাকার হিসাবে প্রায় নয় লাখ টাকা। দুটি প্রতিযোগিতা থেকে পেয়েছেন ১৮ লখ টাকা, তা ছাড়া ৭৮-এ যুক্তরাষ্ট্র দলকে ডেভিস কাপ জিতিয়ে দিয়ে প্রোফেশনাল হবার পর থেকে এ পর্যন্ত পুরস্কার ও বিজ্ঞাপন থেকে ম্যাকেনরোর রোজগার এক কোটি টাকার মতো।

বড় টেনিসে আবির্ভাবেই বালক বীরের সম্মান। এক ম্যাকেনরো ছাড়া আর পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো খেলোয়াড় যোগ্যতা অর্জনের খেলায় যোগ দিয়ে উইম্বলডনের সেমিফাইনালে উঠতে পারেননি। অত কম বয়সেও পারেননি কেউ উইম্বলডন সেমিফাইনাল খেলতে। ৭৭এ মাত্র ১৮ বছর বয়সে এই দ্বৈত কীর্তি অর্জন করেছিলেন ম্যাকেনরো। সারা পৃথিবী সেদিনই জেনে গিয়েছিল তাঁর নাম।

পরের বছরেই উইম্বলডনের প্রথম রাউণ্ড হেরে গেলেন ম্যাকেনরো।

টেনিসে অভাবনীয় ফল হামেশাই ঘটে থাকে। ম্যাকেনরোর ক্ষেত্রেও ঘটেছে একাধিক খেলায়। আবার স্কিল, স্ট্যামিনা ও ফাইটিং স্পিরিটে বার বার প্রমাণ করেছেন ফর্মে থাকলে পৃথিবীর কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে তাকে হারানো সম্ভব নয়।

পাঁচ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চি মাথায় উঁচু, ১৬৫ পাউণ্ড ওজনের খেলোয়াড়টির হাতে আছে টেনিস কেতাবে লেখা সব রকমের মার। বাঁ-হাতী খেলোয়াড়। তাই কোর্টে বাড়তি কিছু সুবিধাও পেয়ে যান ডান-হাতী খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। প্রচণ্ড সার্ভিস, জোরালো পাসিং শট, দারুণ ভলি, যা বড় খেলোয়াড়দের থাকে তা তার হাতেও আছে। কিন্তু ম্যাকেনরোর বৈশিষ্ট্য খেলায় গতির চমক ও মন্থরতার জাদু মিশিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিভ্রান্ত করা এবং শক্তির সঙ্গে পেলবতা যোগ করে খেলায় সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা।

৭৫-এর উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন আর্থার অ্যাশের মতে ফর্মে থাকলে ম্যাকেনরো যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি নির্দয় হয়ে তাকে নাস্তানাবুদ করে তুলতে পারেন। প্রায় হারা ম্যাচে জিতে যেতে পারেন অনমনীয় দৃঢ়তায় ও অসাধারণ কোর্ট ক্র্যাফটের

ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনসে মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের কথাই বলা যাক। অ্যাশ প্রথম সেটটি পেলেন ৭—৬ গেমে। ৬—৩ গেমে দ্বিতীয় সেট পেলেন ম্যাকেনরো; মীমাংসাসূচক তৃতীয় সেটে অ্যাশ ৪—১ এগিয়ে থাকার পর যখন ষষ্ঠ গেমে ৩০—১৫ পয়েন্টে তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল এখান থেকে ম্যাচ ফেরানো সম্ভব? ম্যাকেনরো কিন্তু ফিরিয়েছিলেন। ম্যাচ পয়েন্টের মুখ থেকে দুবার প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নকে বঞ্চিত করে শেষ পর্যন্ত জিতেছিলেন ৭—৫ গেমে। অ্যাশের মতো অসাধারণ খেলোয়াড়ের সার্ভিস ভেঙ্গে এবং বার বার ডিউস করে তাকে নাজেহাল করে হয়েছিলেন মাস্টার্স খেতাবের অধিকারী। তার আগে ওই মাস্টার্সেই হারিয়েছিলেন জিমি কোনর্সকে। পরে বিয়রন বর্গের নিজের শহর স্টকহোমে গ্রাঁ প্রীর ফাইনালে বর্গকে ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে।

গত মে মাসে ডালাসে ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়নশিপ প্রয়ের মধ্যেও পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়। প্রথম খেলাতেই অস্ট্রেলিয়ার জন আলেকজান্ডারকে হারালেন ৬—৪, ৬—০ ও ৬—২ গেমে। খেলার শেষে আলেকজান্ডারের মন্তব্য: "আমি যে শ্রেষ্ঠ তারকাদের সংগে এতকাল খেলেছি ম্যাকেনরো তাদেরই সমকক্ষ। যেমন রড লেভার, কেন রোজওয়াল বিয়রন বর্গ, জিমি কোনর্স প্রভৃতি। আমি জানি না এই ফর্মে সে সর্বদিন খেলতে পারবে কি না। যদি পারে তবে পৃথিবীর যে কোনো খেলোয়াড়কে সে নিজ দক্ষতায় হারাতে পারবে।"

আলেকজান্ডার ঠিকই অনুমান করেছিলেন। বর্গ সেমিফাইনালে কোনর্সকে এবং ফাইনালে বর্গকে হারিয়ে ডালাসের টেনিস রসিকদের পাগল করে তুলেছিলেন। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা দেখার জন্য ১৫ ডলারের টিকিট কালোবাজারে বিক্রি হয়েছিল ১৫০ ডলারে। অর্থাৎ ১৩৫ টাকার টিকিট ১৩৫০ টাকায়। ম্যাকেনরোর কাছে কোনর্স হেরেছিলেন স্ট্রেট সেটে, বর্গ চার সেট খেলে। পৃথিবীর এক নম্বর ও দুই নম্বর খেলোয়াড়কে একই প্রতিযোগিতায় এমনভাবে আজ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হয়নি। তখনো র‍্যাংকিংয়ে ম্যাকেনরোর স্থান ছিল চতুর্থ। বর্গ, কোনর্স ও ভিলাসের পরে। ওয়ার্লড চ্যাম্পিনশিপ জেতার পরে উঠে এলেন তৃতীয় স্থানে। এবার উইম্বলডনে হয়েছিলেন দুই নম্বর বাছাই।

খেলায় যেমন খ্যাতি, তেমন অখ্যাতি বদমেজাজী খেলোয়াড় বলে। হার সহ্য করতে পারেন না। সমালোচনায় এবং আম্পায়ার ও লাইন্সম্যানের ভুলচুকে অধৈর্য হয়ে ওঠেন। কোর্টের মধ্যে হামেশাই মুখে ফুটে ওঠে বিরক্তির অভিব্যক্তি। এ ব্যাপারে ইলি নাস্তাসে এবং কোনর্সের মতোই ম্যাকেনরোর অপবাদ। জামাইকাতে গ্রাঁ প্রীর খেলায় নাস্তাসের সংগে কথা কাটাকাটি ও গালাগালির পর ম্যাকেনরো এমনভাবে র‍্যাকেট ছুঁড়ে মেরেছিলেন যে ইঞ্চি দুয়েক এদিক-ওদিক হলে র‍্যাকেট লাগত নাস্তাসের মাথায়। নাস্তাসে দর্শক গ্যালারির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন —"কোর্টের মধ্যে আমি ও কোনর্স দুজন মিলে যতখানি খারাপ হতে পারি এ ছেলেটি দেখছি তার চেয়েও খারাপ।"

খেলার সময় বহু ক্ষেত্রেই ম্যাকেনরো আত্মসংযম বজায় রাখতে পারেন না, সেটা তারুণ্যের তেজের জন্যই হোক কিংবা অপরিণত বুদ্ধির জন্যই হোক। ৭৭এ যুক্তরাষ্ট্র ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে আম্পায়ারের সংগে তর্ক করার জন্য তার পেনাল্টি হল। একটি পয়েন্ট কাটা গেল। কিন্তু তর্ক করেছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীর পয়েন্টের জন্য। নিজের জন্য নয়।

এত কীর্তি সত্ত্বেও স্বীকার করেন র‍্যাংকিংয়ে তিনি ঠিক জায়গাতেই আছেন। এবং যতদিন না উইম্বলডন জিততে পারবেন ততদিন বর্গ ও কোনর্সের নীচেতেই থাকবেন। ২০ বছর বয়সী জন ম্যাকেনরো কোর্টের বাইরে অসম্ভব বিনয়ী ও সুভদ্র।

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমার মেজাজ কেমন?"

—"কার তুলনায়?"

"ধরো নাস্তাসের তুলনায়।"

ম্যাকেনরোর উত্তর: "আমি দারুণ মেজাজী।"

অটোগ্রাফ হান্টার এক বয়সী মহিলা জিজ্ঞেস করেছিলেন—"তুমি 'ন্যাস্টির' (নাস্তাসে) মতো এমন দুষ্টু হচ্ছ কেন?"

ভদ্রমহিলার হাত থেকে অটোগ্রাফের খাতা টেনে নিয়ে বড় বড় অক্ষরে নাম সই করে দিয়ে লিখেছিলেন —"ভাল হতে চেষ্টা করব।" এই হচ্ছেন টেনিসের বিস্ময় বালক জন ম্যাকেনরো।

মুকুল

ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল কতদূর সফল হবে

অলোক দাশগুপ্ত

"ক্রিকেট ছেড়ে এবার ওদের ডাং-গুলি খেলা উচিত।"

"আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য কানাডা আমাদের গ্রুপে ছিল না, তা না হলে এবারের প্রুডেন্সিয়াল কাপ টুর্নামেন্টে অন্তত একটা ম্যাচ আমরা জিততাম।"

"শ্রীলংকার বিরুদ্ধে এই দশা, ইংল্যান্ডের সংগে টেস্ট ম্যাচে ওরা কি করবে—৪২ রানের রেকর্ডটা এবার ভাঙল বোলে!"

এই সব বাঁকা মন্তব্যের কতটা ভেঙ্কটরাঘবন এবং তার দলের খেলোয়াড়দের কানে গিয়ে পৌঁছেচ্ছে জানা নেই; তবে রাতারাতি প্রায় সমস্ত ভারতবাসী যে হঠাৎ ভারতীয় ক্রিকেট-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছেন তা নিশ্চয় ওঁরা বিলেতে বসেও টের পাচ্ছেন।

স্বীকার করছি, শ্রীলংকার কাছে ভারতের হারটা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত; কিন্তু প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার মত এবারও যে আমরা সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করব না সেটা তো আমাদের জানাই ছিল। তবু জেনেশুনে আমরা কাগজে বাঘ হতে পছন্দ করি। আমাদের অধিনায়ক নিজের দলের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন না হয়ে অবিবেচকের মত মন্তব্য করে বসেন: "ভারত সেমিফাইনালে যাচ্ছেই, এমন কি ভগ্য সহায়ক থাকলে আমরা ফাইনালেও খেলতে পারি।"

এবারের ইংল্যান্ড সফরে যে ভারত খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না সেটা দল নির্বাচনের সময়ই টের পাওয়া গিয়েছিল। এই নিয়ে ক্রিকেট-প্রেমী মহলে চাপা গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছিল। ইংল্যান্ড সফরের জন্য দল গড়ার সময় নির্বাচকরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন, ফলে দলটি প্রুডেন্সিয়াল কাপের ঠিক ঠিক উপযুক্ত যেমন ছিল না তেমনি
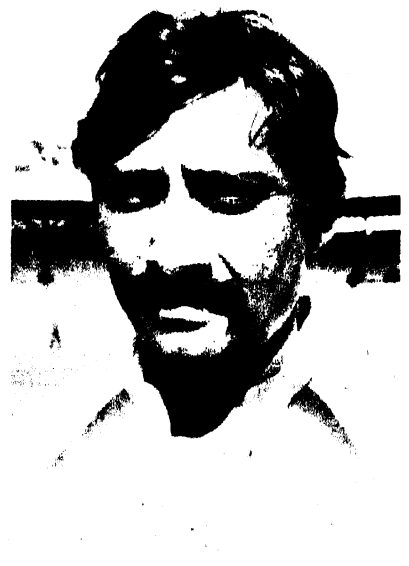
ভরত রেড্ডী

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে পরবর্তী তিনটি টেস্টে যে ভালো খেলবে তার আশাও কম। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষিত হওয়ার আগে কেরী প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে কিছু সিনিয়র খেলোয়াড়ের সঙ্গে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তাদের যে ঠাণ্ডা লড়াই চলেছিল আমার বিশ্বাস তলায় তলায় তা বর্তমান দলটির মনোবলকে কিছুটা নষ্ট করে দিয়েছিল। প্রুডেন্সিয়াল কাপে চরম বিপর্যয়ের পর খেলোয়াড়দের মনোবল এখন কী অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে ১২ই জুলাই এজবাস্টনে, একমাত্র টেস্টের আগের কয়েকটি ম্যাচে আশাতীত সাফল্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোবলকে কিছুটা জোরদার করতে পারে।

সাম্প্রতিককালে ইংল্যাণ্ড সফরের অভিজ্ঞতা ভারতীয় ক্রিকেট দলের পক্ষে খুব একটা মধুর হয়নি। ব্যতিক্রম শুধু ১৯৭১—ওভালে চন্দ্রশেখরের দারুণ বোলিং ভারতকে ইংল্যাণ্ডের মাঠে প্রথম জয়লাভের আস্বাদ দেয়। ঐ জেতাকে 'হঠাৎ জয়' আখ্যা দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের স্পিন বোলিংয়ের তখন যথেষ্ট ধার ছিল এবং চন্দ্র তো দারুণ ফর্মে ছিলেন। স্পিনারদের উপযুক্ত সাহায্য করার জন্য ছিল সোলকার, ওয়াড়েকার, ভেঙ্কট এবং আবিদ আলির মত দুর্ধর্ষ ক্লোজ-ইন ফিল্ডাররা। শর্ট লেগে সোলকারের দুদান্ত ক্যাচগুলি তো প্রায় কিংবদন্তী পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আর সবার উপরে ছিল দারুণ টিম স্পিরিট— কয়েকদিন আগে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ওদের দেশে হারিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটাররা উপলব্ধি করেছিলেন যে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাণ্ডকে হারানোও অসম্ভব নয়। অন্য দিকে ইংল্যাণ্ডের বেশ কিছু খেলোয়াড় নিজেদের সেরা সময় পার হয়ে এসেছিলেন এবং ইংল্যাণ্ড দলে তখন পালা বদলের পালা চলছিল।

কিন্তু এবারের অবস্থা একেবারে ভিন্ন। প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং পাকিস্তানের উপর বড় রকমের আঘাত হানলেও, ইংল্যাণ্ডকে কিন্তু মোটেই কাবু করতে পারেনি। বরঞ্চ গ্রীগ, নট, আণ্ডারউড, অ্যামিস উলমারদের 'প্রস্থানের' মধ্যে দিয়ে একটা স্পিরিটেড এবং ওয়েল ব্যালেন্সড ইংল্যাণ্ড দল গড়ে উঠেছে যাঁরা অস্ট্রেলিয়াকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৫-১ টেস্টে হারিয়েছেন এবং সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব কাপ ক্রিকেটে

অংশুমান গায়কোয়াড়

এই নতুন দল গড়ার কৃতিত্ব অনেকটাই কেম্ব্রিজের কৃতী ছাত্র মাইক ব্রিয়ারলির প্রাপ্য যিনি উপযুক্ত মুহূর্তে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ব্রিয়ারলির সৌভাগ্য তিনি বেশ কিছু ট্যালেন্টেড খেলোয়াড়কে সঙ্গে পেয়েছেন। এঁরা হলেন জিওফ বয়কট—অসাধারণ ওপেনিং ব্যাটসম্যান এবং ভারতীয় বোলাররা সম্ভবত এঁকেই সবচেয়ে সমীহ করে চলেন; ডেরেক র‍্যানডল—স্যার গ্যারফিল্ড সোবার্সের মতে বর্তমান বিশ্বের সেরা দশজন ব্যাটসম্যানের একজন, ডেভিড গাওয়ার—অনেকের মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ডের সেরা বাঁ-হাতী ব্যাটসম্যান, গ্রাহাম গুচ্—প্রুডেন্সিয়াল কাপে ইংল্যাণ্ডের সফল ব্যাট; বব উইলিশ—পৃথিবীর অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার; মাইক হেনড্রিক—বিশ্ব কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অসাধারণ বোলিং ওঁর সাফল্যের একটা নজীর এবং আয়ান বথাম—সবকালের সেরা অল-রাউণ্ডারদের একজন। এ ছাড়া মিলার ওল্ড, এডমণ্ডস, লারকিন্স, গোটিং, টেলার প্রত্যেকেই কৃতী ক্রিকেটার। বব টেলারকে তো অনেকে অ্যালান নটের চেয়ে দক্ষ উইকেট রক্ষক মনে করেন।

অন্যদিকে ভেঙ্কটরাঘবনের ভারত নিতান্ত সাদামাটা একটা দল। টিমটির ব্যাটিং যে সম্পূর্ণভাবে গাভাসকার এবং বিশ্বনাথের উপর নির্ভরশীল সেটা প্রুডেন্সিয়াল কাপে আবার প্রমাণিত হল। ব্রিজেশ প্যাটেল কিছুটা ভাল খেললেও বাকী ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হয়েছেন। যে দুজন বিশ্ব কাপে খেলার সুযোগ পাননি সেই যজুরবেন্দ্র সিং এবং যশপাল শর্মা যে টেস্টে সুযোগ পেলে ভালো খেলবেন তা হলফ করে বলা যায় না, যজুরবেন্দ্র ক্লোজ-ইন ফিল্ডার হিসেবে যথেষ্ট নাম করলেও ব্যাটসম্যান হিসেবে এখনও

বব উইলিস

নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন নি। পাঞ্জাবের যশপাল শর্মা পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন কিন্তু আজও টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। আনকোরা একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে সফল হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। চেতন চৌহানের যোগদান ভারতীয় ব্যাটিংকে হয়ত কিছুটা মজবুত করবে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় বড় নগণ্য।

একাত্তরের বেদী, চন্দ্র, ভেঙ্কট উনআশির ভারতীয় দলে থাকলেও এই আট বছরে ওঁদের বোলিংয়ের ধার অনেক কমে গেছে, বিশেষ করে প্রথম দুজনের। ভারতীয় পেস বোলিংও যে আহামরি কিছু না তা বিশ্ব কাপে প্রমাণিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে এবারের প্রুডেন্সিয়াল কাপে ভারতীয় বোলারদের ব্যর্থতা বড় বেশী করে চোখে পড়েছে। তিনটি ম্যাচে মাত্র আটজন ব্যাটসম্যানকে ভারত আউট করতে সক্ষম হয়েছে, তার মধ্যে দুজন আবার রান আউট।

প্যাটেল, ভেঙ্কট প্রভৃতি দুই-চারজনের ফিল্ডিং ব্যক্তিগতভাবে উঁচু পর্যায়ের হলেও সমগ্রভাবে ভারতীয় দলের ফিল্ডিং মোটেই টেস্টের উপযুক্ত নয়। আর আমাদের নির্বাচকরা সব থেকে বড় গ্যাম্বল করেছেন উইকেটরক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ পজিশনটির জন্য। সুরেন্দার খান্না এবং ভরত রেড্ডি দুজনেই বয়সে তরুণ এবং টেস্ট ক্রিকেটে কোন অভিজ্ঞতা নেই—ওঁরা দুজনেই ব্যর্থ হলে সৈয়দ কিরমানির অভাবটা আমরা হয়ত বড় বেশী অনুভব করবো।

ক্রিকেট বোদ্ধারা দাবী করেন ইংল্যাণ্ড সফর প্রত্যেক ক্রিকেটারের খেলোয়াড় জীবনের 'অ্যাসিড টেস্ট'। বিলেতের খামখেয়ালী আবহাওয়া এবং ভিন্ন চরিত্রের উইকেটের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে যতক্ষণ না একজন খেলোয়াড় সফল হচ্ছেন ততক্ষণ তাঁকে জাত খেলোয়াড়ের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা চলে না। এহেন সফরে ভেঙ্কটরাঘবনের ভারতীয় দলের কাছে বড় রকমের সাফল্য আশা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তবে অধিনায়ক ভেঙ্কটের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে ভারত টেস্টে প্রুডেন্সিয়াল কাপের চেয়ে ভালো খেলবে। কারণ, লিমিটেড ওভার ক্রিকেটের চেয়ে পাঁচদিনের খেলায় আমরা বেশী অভিজ্ঞ। তবে ইংল্যাণ্ড সফরের ফলাফল যাই-ই হোক না কেন, ভারতীয় দলের সাফল্যে আমরা যেন বাড়াবাড়ি না করি আবার ব্যর্থতায় গেল গেল রব না তুলি; কারণ

emami
VANISHING CREAM
তরতাজা ফুলের পাপড়ির
মতো রঞ্জিতার এমন
অনিন্দ্য সুন্দর অপরূপ
মুখশ্রী তো ইমামী
ভ্যানিশিং ক্রীমেরই জাদু।
যে দেখে সে-ই ভোলে।
ইমামীর ছোঁয়ায় আজ
ইনি সবচেয়ে জনপ্রিয়
চিত্র নায়িকাদের
অন্যতমা।
TALC POWDER
ইমামী
ট্যালকাম্ পাউডার
বহুক্ষণস্থায়ী
মনমাতানো ফরাসী
সুগন্ধে ভরা ইমামী
ট্যালকাম পাউডার।
এই পাউডার আর
ইমামী ভ্যানিশিং
ক্রীম—দুয়ে মিলে
প্রসাধন হয় নিখুঁত
ও মনোরম।
অপরূপ
কেমকো ক্যামিক্যালস্, কলিকাতা-৭০০ ০০৯
adlink/dps/kc-1/79 Ben

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

দুই নারী ও তিন নায়িকা। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তক-বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। ছয় টাকা।

তিনটি পৃথক অধ্যায়ে বিভক্ত হলেও বইখানির প্রথম দুটি অধ্যায়কে একটি পর্বে এবং অপর অধ্যায়টিকে আর একটি স্বতন্ত্র পর্বে বিন্যস্ত করা চলে। বইয়ের নামকরণেও লেখকের এই অভিপ্রায়। প্রথম অধ্যায় দুটির আলোচনার বিষয় উনিশ শতকের দুই বাঙালী নারীর স্মৃতিকথা। এঁরা হলেন যথাক্রমে পূর্ব বাংলার গৃহবধূ রাসসুন্দরী দাসী এবং খ্যাতনাম্নী রঙ্গনটী বিনোদিনী দাসী। রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' প্রথম বাঙালী মহিলা-লিখিত আত্মজীবনী। আর বিনোদিনীর 'আমার কথা' এক ঘটনাবহুল ও বহুবর্ণময় আত্মচরিত। অভিজ্ঞতার দিক থেকে স্মৃতিকথা দুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকলেও একটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। লেখকের

বিনোদিনী

ভাষায় তাহল, 'ভোগজীবনের অন্তরাল-বর্তী জীবনজিজ্ঞাসা।' উভয় নারীই দীর্ঘজীবনের অধিকারিণী হয়েছিলেন। রাসসুন্দরীর জন্ম উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, বিনোদিনীর সত্তের দশকে। ফলে, কালানুক্রমিকতার বিচারে স্মৃতিকথা দুটিতে মোটামুটি ভাবে গোটা উনিশ শতকের বাংলার সমাজ জীবনের এক বিচিত্র এবং বিশদ আলেখ্য ফুটে উঠেছে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ কৃতিত্ব এইখানে যে—তিনি স্মৃতিকথা দুটিকে অনুসরণ করে সেকালের গ্রামজীবনের পরিবেশ, গার্হস্থ্য জীবন, নারীশিক্ষা, রঙ্গালয়ের ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ে সরস, তথ্যসমৃদ্ধ এবং চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাছাড়া এই দুই নারীর অন্তর্জীবনের পরিচয়কেও অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে লেখক আজ থেকে দুশো বছর আগেকার নিমীয়মান নগর কলকাতার একটি মনোজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত সামাজিক চলচ্চিত্র অঙ্কন করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেকালের তিন রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এঁরা হলেন যথাক্রমে সেকালের টপ্পা ও আখড়াই গানের নেতা রামনিধি কবি-ওয়ালা রাম বসুর সঙ্গিনী মেয়ে-কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বরী, প্রখ্যাত পাঁচালী-কার দাশু রায়ের নর্মসহচরী সঙ্গীত-নিপুণা কবিদলনেত্রী অক্ষয়া বাইতনী বা 'অকাবাই'। সমাজচ্যুতা এই তিন নায়িকা সেকালের কলকাতার তিন প্রতিভাধর কবির জীবনে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তার চমৎকার পরিচয় পরিবেশন করেছেন লেখক।

স্বল্পপরিসরেও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বইটিতে এমন কিছু মূল্যবান তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন যা সন্দিৎসু পাঠককে কৌতূহলী করে তুলবে। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির সরসতা বইখানির প্রধানতম আকর্ষণ।

প্রলয় সেন

মুকুল [রবীন্দ্রবাণী চয়ন] সংকলক ও প্রকাশক : রণজিৎ রায়। বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা—১৭। মূল্য পঞ্চাশ পয়সা।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্য গানের মধ্য থেকে শিশু সংক্রান্ত রচনার কিছু কিছু অংশ নিয়ে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচিত অংশগুলিও পুস্তকের আয়তনের সঙ্গে সমতা রেখে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র। এই রচনাকণিকাগুলিকে সংকলক রবীন্দ্রনাথের বাণী হিসেবে চয়ন করেছেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক মিনিয়েচার বা ছোট পকেটবই প্রকাশ অভিনব হলেও ইতিপূর্বে রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ছোট গীতাঞ্জলি এবং নৈবেদ্য বেরিয়েছিল। তবে আলোচ্য বইটি ঠিক কাদের হাতে দেবার জন্যে তা বোঝা গেল না এবং কি কাজে লাগাবার জন্যে, সেটাও। অর্থাৎ উপলক্ষটা স্পষ্ট কিন্তু উদ্দেশ্যটা নয়। এটা উদ্ধৃতি পুস্তক অথবা নিতান্তই নিয়মরক্ষার্থে স্মারক গ্রন্থ, নাকি ছোটদের জন্যে মনোরঞ্জনী উপহার? ছোটদের জন্যে যে নয় সেটা রচনার ধরন থেকেই বোঝা গেছে। রবীন্দ্ররচনার মধ্যে আরও অনেক সাহিত্যগুণান্বিত এবং গভীর ভাবাত্মক বাক্য ছিল যা উদ্ধৃতি কিংবা স্মারক হিসেবে আরও লাগসই এবং মূল্যবান হত। শিশুসুলভ মজাদার রচনাও অপর্যাপ্ত ছিল যা দিয়ে শিশু-বর্ষে শিশুদের জন্যে সচিত্র উপহার সাজানো যেত। তবে যাই হোক না কেন পুস্তিকাটি চিত্তাকর্ষক হয়নি, গদ্যপদ্য তেমন অঙ্গাঙ্গী মিশ খায়নি, গানের কর্তিত অংশবিশেষ অহেতুক মনে হয়েছে।

আনন্দ বাগচী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

রাজধানী থেকে

কিছু শিল্পী সমসাময়িক কালে স্বীকৃতি পান না, বা পেতে দেরী হয়। আমার ধারণা দুলাল মণ্ডল সেই জাতের শিল্পী। তাঁরা রূপবন্ধ (ফর্ম) নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যান। জীবন এবং শিল্প-ভাবনা ভিন্ন হওয়াতে সমকালীনদের দৃষ্টিতে তাঁদের কাজ কিছুটা অপরিচিত মনে হয়। ঠিক সময়ে বাধা না থাকলে অনুরণন ওঠে

বসন্তের আগমন (অঙ্কন)

যে এঁরা আপন মনে কাজ চালিয়ে যান। কাজের মধ্য দিয়েই পরিণত হতে থাকেন। দুলাল কাজ চালিয়ে গেলে ভবিষ্যতে বড় শিল্পী হতে পারবেন এ বিশ্বাস এবারের কাজ দেখে আমার হয়েছে (আকাদমী অব ফাইন আর্টস, ৫-১১ই জুন)।

এবারের প্রদর্শনীতে যেন গত-বারের জের রয়ে গেছে। গরু মহিষ নিয়ে এবারও তিনি অদ্ভুত রাখালিয়া গান গেয়ে গেছেন। গগ্যাঁর সমতল রঙের আলঙ্কারিক ব্যবহারের সঙ্গে দড়ি পাকানোর মতো করে বর্ণলেপন করেছেন এবং সব মিলিয়ে একটা মজা তৈরী হয়েছে। ছবির ভেতর থেকে বর্ণ এবং রচনার সঙ্গতি এবং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার দিকেই তাঁর ঝোঁক। বাইরের দৃশ্যজগৎ এবং শিল্পীর অন্তর্জগতের মধ্যে বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই, যদিও বৈচিত্র্য আছে। কল্পকল্পনায় এবার তিনি আকাশে গরু উড়িয়েছেন—নার্সারী রাইমের "দ্য কাউ জাম্পস ওভার দ্য মুন" মনে পড়ে যায়।

পটভূমি বিভাজনের জন্য তিনি অনুভূমিকভাবে অর্ধবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। দিগন্তে আকাশ মাটির মিলনস্থানে এই অর্ধবৃত্ত কখনো পাহাড়, কখনো মাঠের ঢেউ, কখনো স্বপ্নময় দ্বীপ—বস্তুত পটভূমিকে এইভাবে খেলিয়ে নিয়ে তিনি দ্রৌপদীর শাড়ির মতো পটের ভেতর একটা বিস্তার দিয়েছেন। এই তেপান্তর কখনো বাথান। কখনো আবর কাটার জায়গা। আবার এতে কখনো ভেসে ওঠে বিকালের গোক্ষুর-ধুলোর দৃশ্য। কিন্তু মাঝে মাঝে আকাশে দেখা যায় একটা গরু উড়ে যাচ্ছে—আবর কাটতে কাটতে দুটি গরু স্বপ্ন দেখছে—কখনো পক্ষীগরুর পিঠে সন্ন্যাসী, কখনো সুন্দরী এক নারী—এই দেবদেবী কারা ঠিক করা না গেলেও বেশ একটা পৌরাণিক স্বাদ এসেছে। যাযাবর পশুপালকীয় সুর গন্ধ। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজমানস নিয়ে তিনি কাজ শুরু করে অন্য ধরনের একটা জগৎ গড়েছেন। এক হিসাবে দুলাল মণ্ডলের এই পর্যায়ের ছবিকে "পাস্টোরাল" বলা যায়। বাস্তব দৃশ্যের ধারা যৌথ নিশ্চেতনাও

আপনার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে... বিনীর যাদুস্পর্শ!

এ শার্টিং যেন আপনার স্টাইলেরই প্রতিফলন! আমাদের
দক্ষ ফ্যাশনবিদদের সৃষ্টি—নানান বিচিত্র রঙের নানান
অসাধারণ ডিজাইনের এই কাপড়ের পেছনে আছে
বয়নশিল্পে এক শতাব্দীরও দীর্ঘকালের দক্ষতা!
চোখে পড়ার মত, মনে ধরার মত, ফ্যাশনের মোড় ঘোরানো
এই সব ব্লেণ্ডেড শার্টিং—অত্যন্ত টেকসই ও আরামদায়ক!

আপনার কথা ভেবেই ডিজাইন করা!

Interpub/BB/5/79 BN

নিয়েছে। অথচ ছবিগুলির কোথায় যেন একটা প্রাসঙ্গিকতা আছে। তাঁর রচনা, নির্মাণ, রূপারোপ—বিশেষত একাধিক বর্ণ দড়ির মতো পাকিয়ে গাছ বা গরুর পাল আঁকা, ভাল লেগেছে। কিন্তু সমতল বর্ণ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এক আধবার তাঁর রঙে গুঁড়ো মশলার চেয়ে তেলের ভাগ বেশী হয়েছে। ফলে পটে একটা তেল চুকচুকে ভাব এসেছে। আমার মনে হয় এমনভাবে বর্ণ মেলাবার চেষ্টা না করে, ছায় (টোন)-এর কাজ করতে পারতেন। এক আধবার রঙ বড় ক্যাটক্যাটে মনে হয়েছে। নিসর্গ এবং গবাদি পশু নিয়ে কাজ ভাল লেগেছে মোটের ওপর।

তাঁর কালি কলম, উডপেনসিল, জলরঙের অংকন খুবই দক্ষ। মসজিদ, সাদা কালো শ্বেত পাথরের মেজে, পাহাড়, দুর্গ আর ছায়া ছায়া মানুষ নিয়ে অন্য ধরনের একটা ব্যাপার ঘটিয়েছেন। কখনো কুচি রেখার কাটাকুটি বিছিয়েছেন। কখনো চাপ কালো থেকে হালকা ধূসর ছায় রেখাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। কখনো ঘোরালো রেখার ছন্দ। কখনো সাবলীল রেখার আনন্দ। রাজধানী থেকে দুলাল মণ্ডল সংবৎসরে আসবেন ?

সন্দীপ সরকার

একটি বিশিষ্ট প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে অশোক ভৌমিক ও তিলক মণ্ডলের ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেলো। অশোক ও তিলক দুজনের ছবিই আমার ভালো লেগেছে, কিন্তু বিপরীত কারণে। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, অশোকের ছবির বিষয়বস্তু আমার ভালো লেগেছে, এবং তিলকের ছবির আঙ্গিক। আমি জানি, যে চিত্রকলায় বিষয়বস্তু ও আঙ্গিককে এতটা সহজে আলাদা করা যায় না, এবং করা উচিতও নয়, কিন্তু এই সত্য মেনে নিয়েও আমি বলবো যে কোথায় বিষয়-বস্তু-র ওপর ঝোঁক পড়ছে, এবং কোথায় প্রকরণের ওপর, তা কিন্তু আপেক্ষিকভাবে বলা সম্ভব।

অশোক গত দু'তিন বছর ধরে যে বিষয়সত্যকে তাঁর ছবিতে আনছেন, সেই বিষয়ভূমিকেই আবার নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই প্রদর্শনীর দশটি ছবিতে। অর্থাৎ মানুষজনকে তিনি পোকামাকড়, ব্যাং ইত্যাদির রূপকে দেখছেন, এবং আধুনিক মানুষের ক্রমাবনতি (অর্তেগা-কথিত dehumanization !) বিষয়ে শিল্পী হিসেবে তাঁর বক্তব্য জানাচ্ছেন। মানুষকেই যে তিনি পতঙ্গ ভাবছেন, এবং পতঙ্গদের মানুষ ভাবছেন না, তার প্রমাণ হলো "সেলুলয়েড ওম্যান", "প্যারাসাইট" প্রভৃতি ছবি—বিশেষত প্রথমোক্ত ছবিটি যেখানে যন্ত্রকল্প জনৈকা চিত্রাভিনেত্রীকে ক্যামেরার সামনে বসানো হয়েছে, অর্থাৎ এখানে মানুষকে ঠিক পোকার শরীরে দেখানো হচ্ছে না, কিন্তু অন্তঃসারহীন "অ-মানবী"-র আকারে আঁকা হয়েছে। কাফকার বহু আলোচিত গল্প "মেটামরফোসিস"-এ একটি মানুষ শেষ পর্যন্ত পতঙ্গ হয়ে যায়, এবং এই "অ-মানবিক" রূপান্তরের সূত্রটি অশোক ভৌমিকের ছবিতেও চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত শিল্পসমালোচক জন বার্জারের একটি উক্তি উদ্ধার করছি :

"Kafka, whose formative years were 1900 to 1914, was the pro-

…et of this anoymity. Other …tists of the same period—…unch and the German Ex…essionists—sensed the same …ing, but only Kafka under…ood the full horror of the …ew bargain: the bargain by …hich in exchange for sustenance a man forgoes the right … have his existence noticed" (Success and Failure of Picas…o)

…শোকের প্রায় সব ছবিই মোটামুটি…ভাবে একই থীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত, …তরাং ওঁর ছবিগুলো আলাদাভাবে …আলোচনা করবার হয়তো প্রয়োজন হয় …া, তবু প্রদর্শিত চিত্রমালার মধ্যে "দি …ডিয়টস" ছবিটি—যেখানে পোকা…মাকড়রা সোপ-বক্সের ওপর দাঁড়িয়ে …বক্তারত, এবং যার রূপকার্থ বুঝতে আমাদের মোটেই অসুবিধে হয় না, এবং "দি রয়্যাল ডিনার"—যেখানে …পতঙ্গসদৃশ আকারেরা পরস্পরকে …খাইয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে—…বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় সব …ছবির পটভূমিই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ (রূপকের …দিক থেকে এই বর্ণ ব্যবহারও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য) এবং পোকামাকড়দের ছবি সবুজ-হলুদ রঙে আঁকা হয়েছে। পুরোভূমির রঙের ব্যবহার কখনও কখনও একটু ক্লান্তিকর।

তিলক মণ্ডলের ছবিতে প্রথমেই গাঢ় রঙের ব্যবহার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরে আমাদের চোখে পড়ে মানুষের শরীর সংস্থানকে

তিলক মণ্ডল

স্বাধীনভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতা। দ্রুত ব্রাশ ব্যবহারের রীতিও আমাদের আকর্ষণ করে।

আমি এই আলোচনার প্রথমে তিলকের ছবির প্রকরণগত উৎকর্ষের কথা উল্লেখ করেছিলাম এবং সেই সূত্রটি এখন ঈষৎ বিস্তৃত করছি। ছবির জমি (স্পেস) এবং তল-বণ্টনের সমস্যাটিকে অশোক অধিকাংশক্ষেত্রেই খুব সুন্দরভাবে সমাধান করেছেন—যেমন "দেয়ার" ছবিটিতে ('দেয়ার' নামটি আমার ভালো লাগেনি)—যেখানে ছবির ডানদিকে মানবমানবীর মুখের ভিড় এবং বাঁ-দিকের বিস্তৃততর এলাকায় বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রেখাভাস। ডানদিকের জমির আকারবাহুল্যকে বাঁ-দিকের জমির তুলনামূলক নিরাবরণতা একটা টান-টান ভারসাম্য সংহতির সৃষ্টি করেছে যা আমাদের মুগ্ধ করে। "স্কেটিং" ছবিতে তিনটি প্রায়-সমান্তরাল জমির মধ্যে একটি মানুষের উল্লম্ব (ভারটিক্যাল) আকার আবার তল-বণ্টনের একটি সুন্দর পরীক্ষা। দ্বিতীয় ছবিটি অন্য একটি কারণেও উল্লেখযোগ্য—কোথাও বরফ বা তুষারের শুভ্রতা নেই ছবিতে, বস্তুত শাদা রঙের ব্যবহারই নেই ক্যানভাসে তবু বেগুনী, নীল, সবুজ ইত্যাকার রঙের ঈষৎ-ফিকে ব্যবহারের মধ্যে স্কেটিংরত লোকটির নিঃসঙ্গতা খুব সুন্দরভাবে আভাসিত হয়েছে। প্রায় একই থীম ও রীতি চোখে পড়ে 'রান আওয়ে' ছবিটিতে।

তিলক অনেক ছবিতেই মহিলার আকার এবং মুখাবয়ব এঁকেছেন কিন্তু নারীর মুখের স্পষ্টতঃ কোনো কোনো ছবিতে ঈষৎ দুর্বল মনে হলো। যেমন 'অন স্টেয়ার' ছবিটিতে। "পিকক্যারিং পাপেট" ছবিটি খুব সুন্দর, যেখানে পুতুলকল্প মহিলাকে এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে, তাতে নতুন একটি আয়তন সংযোজিত হয়েছে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

গণদেবতা

এমনি চরিত্র এবং উপাদান বহুল উপন্যাস অবলম্বনে, এতখানি বিস্তৃত পটভূমিকায় ইদানীং কালে আর কোনো বাংলা ছবি তৈরি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিচিত্র ঘটনাবলীকে ভিশ্যুয়াল পারম্পর্যে অনিবার্যভাবে নিয়ে আসা, চরিত্রগুলিকে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে কক্ষপথে ধরে রাখা; এবং ঘটনা এবং চরিত্রের অজস্র খণ্ডিত রূপকে শেষপর্যন্ত একটি নিটোল অখণ্ড সমগ্রতায় উপনীত করা—সিনেমাশিল্পের এই একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সাবলীল সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে তারাশঙ্করের উপন্যাস ভিত্তিক এবং স্বর্ণকমল বিজয়ী চলচ্চিত্র গণদেবতা। ছবিটি নিঃসন্দেহে তরুণ মজুমদারের মহত্তম ছবি। এমন কথা বলছি না যে, গণদেবতা জীর্ণ পংগু টালিগঞ্জীয় বাংলা ছবির কিছু-কিছু দুর্বলতা ফাটলের মধ্যে অবিশ্বাস্য পোকার মতো আশ্রয় পায়নি। কিন্তু চিত্রনাট্যে এই ব্যবসায়িক ফাটল পরিচালক যেন সযত্নে ইচ্ছাকৃতভাবেই রেখে গেছেন সম্ভবত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, এই ফাটলগুলির মধ্যেই অংকুরিত হবে কমার্শিয়াল সাফল্যের বীজ এবং নির্ধারিত হবে টিকিট ঘরের ভবিষ্যৎ। কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সমস্ত ছবিটির মধ্যে ব্যাপ্ত রয়েছে এমনি বৈদ্যুতিক প্রেরণা, এবং আন্তরিক তাগিদ যে, কোন রকম আপোস বা কম্প্রোমাইজ ছাড়াই ছবিটি পরিচালকের ঈপ্সিত শৈল্পিক মানে পৌঁছতে পারতো। বরং যেখানে যেখানে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আপোস করেছেন, অকস্মাৎ নিজস্ব সঞ্চরণ থেকে সরে এসে বাংলা ছবির চিরন্তন পথে কিছুদূর চলবার চেষ্টা করেছেন, সেখানেই তাঁর চিত্রনাট্যে ঢুকে পড়েছে মারাত্মক গুরুচণ্ডালী বিপর্যয় এবং বিঘ্নিত হয়েছে ভারসাম্য। যেমন গানের সংখ্যা কমলে (এবং সেটি সহজেই হতে পারতো) ছবিটি আরো ঐকতান, সুঠাম তীব্র এবং দ্যুতিময় হতো নিঃসন্দেহে। খ্যামটা নাচের দৃশ্যটিও (যেটি দুর্গার ধর্ষণ দৃশ্যের ফ্ল্যাশব্যাকে খণ্ডিত) আরো ছোটো হতে পারতো। অনিরুদ্ধ-দুর্গার গান গেয়ে চড়াপড়া নদী পার হবার দৃশ্যটিও বড় বেশি চেষ্টিত, সাজানো, সিনেমাগন্ধী। রবি ঘোষ এবং নাপিতের মধ্যে ঝগড়ার দৃশ্যটি ছবিতে ঠিক যে সময়ে এসেছে তাতে ঐ সিকোয়েনস-এর সামগ্রিক মেজাজের বিরোধিতা করছে ঐ কলহ-দৃশ্যের অতিনাটকীয়তা। এ ছবির আর একটি ছোট দুর্বলতা দুর্গা চরিত্রে সন্ধ্যা রায়ের মেকআপ। দুর্গাকে তার চরিত্র এবং মানসিকতার প্রয়োজনেই অন্যান্য মেয়েদের থেকে বেশভূষায় পৃথক হতে হবে সে-কথা মনে রেখেও বলা চলে যে তার মেকআপ-বিলাসিতা কিছুটা বাস্তব-বিরোধী।

কিন্তু ছবিটির সামগ্রিক আবেদন এই সব ছোটোখাটো বিঘ্নের দ্বারা কিছুটা বিপর্যস্ত হলেও শেষপর্যন্ত পরাজিত হয় না। ছবিটিকে প্রাণশক্তি জোগায় সহজ শৈল্পিক প্রেরণা, সযত্ন প্রচেষ্টা, এবং বিচিত্র উপাদান থেকে প্রয়োজনীয় নির্যাসটুকু শুষে নিয়ে তাকে সিনেমা মিডিয়ামের ধর্মানুসারে নতুন করে নেবার মতো প্রতিভা। গণদেবতার একান্ত সাহিত্যিক সম্ভারকে সাহিত্যগন্ধী সিনেমায় 'অনুবাদ' না-করে কি ভাবে তার রূপান্তর ঘটানো হয়েছে একের পর এক অনন্য ভিশ্যুয়ালসে তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে ছবিটির আগাগোড়া। সংলাপ খুব কম ক্ষেত্রেই ছবিকে ছাপিয়ে ওঠে। কোনো-কোনো দৃশ্য শতকরা একশো ভাগই ভিশ্যুয়াল—আবহ সংগীত ছাড়া অন্যকোনো শাব্দিক সংযোজন নেই এসব দৃশ্যে। ছবিই সেখানে কথা, কিংবা কথার চেয়েও বেশি এই সব ভিশ্যুয়ালস-এর প্লাবনী ক্ষমতা। এ জিনিস শুধু সিনেমাতেই সম্ভব। এবং সাহিত্যের নাগালের বাইরে। রাতে চাঁদের আলোয় ধান মাড়িয়ে দেবার দৃশ্যটি স্মৃতিতে অনির্বাণ থাকবে বহুকাল। কিংবা, পদ্ম পুকুরের পারে বাসন ধুচ্ছে আর সন্ধেবেলার আবছা আলোয় পাথর ছুঁড়ে পুকুরে ঢেউ তুলে ছিরু পাল যে-দৃশ্যে নিজেকে প্রথম

সন্ধ্যা রায়

নির্লজ্জভাবে ঘোষণা করে সেটিও চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভঙ্গিতে অব্যর্থ। এই ছোটো-ছোটো দুটি দৃশ্যের পাশে, গ্রাম-জুড়ে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যটির প্রতিতুলনা একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত পর্দা জুড়ে জ্বলছে একটি গ্রাম এবং রাতের আকাশ সেই হিরন্ময় ধ্বংসলীলার পশ্চাৎপট। আগুনের উত্তাপ এবং শব্দ আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। এবং সর্বগ্রাসী সর্বনাশের মুহূর্তেই, ঐ অগ্নিময় পশ্চাৎপটের সামনে, এক ব্রাহ্মণ তুলে ধরে একটি রৌপ্য মুদ্রা এবং তারই মূল্যে বিক্রিত হয় এক যুবতী। পশ্চাৎপটের দীপ্যমান তাণ্ডব মুহূর্তের জন্যে যেন স্তব্ধ হয়ে যায় এই লালসা ও লেনদেনের সামনে। এবং সর্বনাশের শেষে সূর্য ওঠে দূরের দিগন্তে। সোনালী সূর্য, এবং পর্দা জুড়ে একটি গাছের পল্লবহীন ডালের ছায়াঘন প্যাটার্ন এবং শব্দহীন শান্তি—এই হচ্ছে এ দৃশ্যের একমাত্র সংলাপ। এই সর্বগ্রাসী অগ্নিদৃশ্যের সংগে প্রতিতুল্য ভুবনভাসানো ঝড়ের দৃশ্যটি। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া সূর্যের আলো, থমথমে হয়ে আসা আকাশ, তারপর পাগলা হাওয়ায় ছুটে আসা মেঘ, তারপর দিগন্ত

ছোঁয়া মাঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ঝড় এবং সেই উন্মাদনায় প্রাণিত অনিরুদ্ধ— এ দৃশ্যেরও একমাত্র কথা ছবি, রং, আবেশ। ঝড় পর্দা থেকে ছিটকে চলে আসে প্রেক্ষাগৃহে, মনে হয় আমাদের ছাদহীন মাথার ওপর বৃষ্টি এলো। এ ছাড়া সমগ্র ছবিটি জুড়ে রয়েছে গ্রামবাংলার সারা বছর ধরে ঋতু পরিবর্তনের রং, মেজাজ, এমনকি হয়তো গন্ধ!

কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তের অভিনয়ের কথাই শুধু আলাদা করে বলবো। পদ্মর বাড়িতে যে-দৃশ্যে পণ্ডিতের চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এসে তাকে নিশ্চিন্ত করে যায়, কিংবা অনিরুদ্ধর (সীমিত ভঞ্জ) সঙ্গে দুর্গার একাধিক দৃশ্যে সন্ধ্যা রায়, কিংবা পদ্মবেশী মাধবী যে-দৃশ্যে শুধু নীরবে অনিরুদ্ধর চুলের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেখানে দুর্গার টিপটি ঝুলছে সেখানে তাঁর 'নীরব বাঙ্ময়' অভিব্যক্তি, কিংবা রবি ঘোষের কোঁচায় পদাঘাত করে ছিরু পালের পঞ্চায়েতে প্রবেশের দৃশ্যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়, ছেলের হাতের বালা খুলে স্বামীর হাতে তুলে দেবার দৃশ্যে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, ছিরু পালের বাগান ধ্বংস করার স্বীকারোক্তি দৃশ্যে সমিত ভঞ্জের অভিনয়, একাধিক দৃশ্যে নিমু ভৌমিকের অভিনয়, ঘোড়ার পিঠে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনু মুখার্জি এবং নাপিতের চরিত্রে তপেন চ্যাটার্জির অভিনয়, অগ্নিদৃশ্যে রবি ঘোষ, তেঁতুল গাছ হাতে দেবরাজ রায়, এবং কিছু কিছু সিরিওকমিক দৃশ্যে সন্তোষ দত্তর চতুর পারদর্শিতা এ-ছবির রত্নভাণ্ডার, যেখানে প্রতিটি ছোটো-ছোটো বিচ্ছুরণেও নিজস্ব চরিত্র আছে। ক্যামেরার কাজের জন্যে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথকভাবে অভিনন্দনীয়। কামেরার গতি সহজ সাবলীল— কিন্তু একটু ভালোভাবে দেখলেই বোঝা যায় প্রতিটি দৃশ্য ভাবনার পিছনে রয়েছে পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের কতখানি সযত্ন মননশীল প্রচেষ্টা। পরিশেষে বলতে হয়, তরুণবাবু সহজাত দক্ষতায় পেরিয়ে গেছেন এ-ছবির কেন্দ্রস্থ সমস্যাটিকে—কে হতে পারে এই কাহিনীর নায়ক, ছিরু পাল, পণ্ডিত, অনিরুদ্ধ? ছবিতে সাধারণ অর্থে কোনো তথাকথিত নায়ক নেই। কিংবা আছে, সে-নায়ক গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটি। তরুণবাবুর ছবিতে এই বৃদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপটিই কেন্দ্রবিন্দু, সেখানেই বারংবার ক্যামেরা এবং চরিত্রগুলি ঘুরে ফিরে আসে।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরন্তন

সন্তানের জন্য মায়ের আকুতি—এই শাশ্বত আবেদনকে উপজীব্য করে গঠিত হয়েছে ছকে ঢালাই করা এই ছবির কাহিনী। ধনী শিল্পপতি এ এন চ্যাটার্জীর (বসন্ত চৌধুরী) একমাত্র সন্তান, কন্যা সুচন্দ্রা (সুমিত্রা মুখার্জী) ছক মাফিক প্রেমে পড়ে তার পিতারই কারখানার শ্রমিক সুপ্রিয়র (মৃণাল মুখার্জী)। গোপনে ওরা বিবাহও করে। চ্যাটার্জী ওদের প্রেমের ব্যাপার জানতে পেরেই একটা সাজানো দুর্ঘটনায় সুপ্রিয়কে ধরা থেকেই অপসারিত করে। সন্তানবতী সুচন্দ্রাকে নার্সিং হোমে

সুমিত্রা

ভর্তি করা হয় (ছবির আরম্ভ প্রসব যন্ত্রণায় কাতর সুচন্দ্রার ওপর ফ্ল্যাশব্যাকে)। একটি পুত্র জন্মায়। সুচন্দ্রার সংজ্ঞাহীন অবস্থার সুযোগে চ্যাটার্জী শিশুটিকে লালনের ভার দেয় শ্যালক অধীরকে (দিলীপ রায়।) সুচন্দ্রাকে জানানো হল সে এক মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছে। শিশুটির প্রতিপালনে অধীর মাসে মাসে প্রচুর টাকা ঘুষ পেতে থাকে। অধীরকে অসৎ দেখাবার জন্য দরকার হল তার পালিতকে গৃহভৃত্যের চরিত্রে উপস্থাপিত করার। পিতা ও মাতুলের কথা আড়াল থেকে শুনে সুচন্দ্রা তার সন্তানের অস্তিত্ব অবগত হল। এর পর স্বতই সুচন্দ্রা পিতৃগৃহ ছেড়ে আশ্রয় নিলে বান্ধবী নীলার (শিবানী বসু) গৃহে। নীলা, নীলার মা (পদ্মা দেবী) এবং দাদা সুজন (সন্তু মুখার্জী) সুচন্দ্রার দুঃখে সমব্যথী। আরম্ভ হল অনাথের ত্রাস। অনাথ তখন অধীরের গৃহ থেকে পলাতক। আরম্ভ হল সুচন্দ্রা ও অনাথের লুকোচুরি। লুকোতে লুকোতে অনাথ দেখা পেল ফেরিওলা ভবর (অনুপকুমার)। ভবর সান্নিধ্যে অনাথ জীবনে প্রথম মমতার আস্বাদ লাভ করল। ভবর সঙ্গে ফেরি করতে বেরিয়ে পথে পথে ঘোরার সময় সুচন্দ্রা তাকে প্রায় ধরেই ফেলে আর কি! এতদিনে চ্যাটার্জী অনুতপ্ত না হয়ে পারে না। দৌহিত্রর সন্ধানে তাই বেতার মারফৎ পুরস্কার ঘোষণা করল। পরিশিষ্টে অতি-নাটকীয় একটা ঘটনা না হলে তাল কেটে যাবার সম্ভাবনা। সুতরাং অনাথকে মোটর দুর্ঘটনায় আহত করে হাসপাতালে পাঠাতে হল। আর সেখানেই ঘটল পিতা পুত্রী ও দৌহিত্রের পুনর্মিলন।

ছবিখানি দেখতে দেখতে মনে হয় হিন্দী ছবির একটি বাংলা সংস্করণ। পার্থক্য, এতে মারদাঙ্গা এবং সেক্সি নাচ বা বেশবাসের অনুপস্থিতি। সাহিত্য-শিল্পরস সম্পর্কে উদাসীন দর্শকদের হৃদয়াবেগকে আপ্লুত করার মতো স্থূল ঘটনার সমাবেশ। পরিচালক গুরু বাগচী আবেগের স্ফুরণ অব্যাহত রাখাতেই সচেষ্ট থেকেছেন। ছবিখানিতে যেটুকু প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায় সেজন্য অভিনয়শিল্পীদের কৃতিত্বই স্মর্তব্য। রঙ্গীন ছবি এবং অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহার ক্যামেরার কাজ দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। সন্তোষ মুখার্জীর সুরযোজনা ছবিখানির আর একটি প্রশংসনীয় দিক।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

বিস্ময় বালক এবং মহিলা তবলিয়া

গত ২৪ জুন তারিখে পাকিস্তানের 'বিস্ময় বালক' মাস্টার সাজ্জাদ খানের গজল-গীত এবং ভারতের নামী মহিলা তবলাশিল্পী অবন মিস্ত্রীর তবলা-লহরা একই সান্ধ্য আসরে পেলাম। 'শ্রাবণী' গোষ্ঠী আয়োজিত এই অনুষ্ঠান জে জে আজমেরা স্কুল হলে হয়েছিল। ভাল লাগা এবং ভাল না-লাগা এই দুই ধরনের প্রতিক্রিয়াই শ্রোতৃবর্গের মধ্যে দেখা গেছে।

প্রথম আসর সাজ্জাদ খানের। সাজ্জাদ অবশ্যই এক বিস্ময় বালক। দশ বছর বয়সের ছেলের গলায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন প্রকারের অলংকার এত সুন্দর জমায়েত হয়েছে যে আমরা অবাক না হয়ে পারি না। উপরন্তু খুবই সুরেলা ওর গলা। প্রয়োজন মত একটা চমৎকার খাদের আওয়াজ আছে। বড় গজলিয়ার স্টাইলে তান করে কোন শেরের কোন ক্রিটিক্যাল শব্দে পৌঁছে যেতে পারে, এবং গলা খেলিয়ে সেটিকে আরো নাটকীয় কোন স্তরে উঠিয়ে বা নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে। খানিকটা

সাজ্জাদ খান

গজল রীতির আকারও আছে গলায়। অনেকটা নকলনবিশী আছে মেহেদি হাসানের স্টাইলের। বিশেষ করে খিরতের অঙ্গে এবং জমজমা কায়দায় সাজ্জাদের গলা ভাঙ্গেও এবং এসবের প্রমাণ ছিল ওর 'চলতে হো তো চমনকো চলিয়ে' কিংবা 'চুপকে চুপকে রাত-দিন আঁসু বহনা ইয়াদ হ্যায়' গজল দুটিতে এবং বড়ে গোলাম আলির প্রসিদ্ধ 'আয়ে ন বালম' গীতে। বস্তুত 'আয়ে না বালম' গানটি সাজ্জাদ এত চমৎকার অলংকার-বিন্যাসে গেয়েছিল যে আমরা তাজ্জব না হয়ে পারিনি। কিছুদিন আগে পাকিস্তা

থেকে আসা সফদর হুসেন খাঁর গলায় যে 'আয়ে ন বালম' শুনেছিলাম তার চেয়েও প্রসাদগুণে এবং প্রয়োগে সাজ্জাদের গান উৎকৃষ্ট, উত্তীর্ণ।

তবে বলা হচ্ছে সাজ্জাদ নাকি তালিম পায়নি, শুনে শুনে গায়। এবং তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের ভয়ের কারণ অনেকখানি। যাঁরা মনে করেন গজল যেহেতু লাইট ক্লাসিক্যাল তার জন্য বিশেষ তালিমের প্রয়োজন নেই, আমি তাঁদের দলে নই। ধ্রুপদ-খেয়ালের তালিমে কাওয়ালি বা গজল যে কোন স্তরে উঠতে পারে সে রকম কিছু গান শোনার অভিজ্ঞতা আমার আছে। বেগম আখতার বা মেহেদির গানে খেয়ালের বিন্যাস সবাই জানেন। নিছক ধ্রুপদের তালিমে কাওয়ালিকে কোন স্তরে নিয়ে গেছেন পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ কাওয়াল সাবরি ভাইয়েরা তার কী বর্ণনা দেব? সাজ্জাদকে শুনতে শুনতে বারংবার এই কথা মনে হয়েছে আমার। যার গলায় এত সুর, যার লয়েও এত ইনটুইটিভ দখল তাকে স্রেফ শুনে শুনে গাইতে হবে কেন? সে তো রেকর্ডের ফরম্যাট নয়, অতি অল্প বয়সে সমস্ত অলংকার মুখস্থ গাওয়ার একটা বিপদ আছে। যখন নিজের গান গাইবে তখন পারম্পর্যটুকু থাকবে না। অত্যন্ত অল্প বয়সে আসরে বসেও পরে খুব বড় হতে পেরেছেন আমাদের দেশের বিলায়েত খাঁ এবং পাশ্চাত্যের ইহুদি মেনুহিন। এরকম খুব বেশি দৃষ্টান্ত কিন্তু ইদানীং নেই। অধিকাংশ বিস্ময় বালকই পরে হাওয়ায় মিশে যায়। খুবই দুঃখ হবে আমাদের যদি সাজ্জাদও জনারণ্যে হারিয়ে যায়।

'চলতে হো তো চমনকো চলিয়ে' গানে যে দোলা আমরা পেয়েছি তাতে শব্দের এবং বর্ণের আস্বাদ আছে। একটা রোমানটিক ভাব, বিরহ আছে সাজ্জাদের 'চুপকে চুপকে' গানে। বয়সকালে এর চেয়েও গভীর কাব্যের এবং ভারি অঙ্গের গজল ওকে গাইতে হবে। নিজের সুনাম মতন বড় হতে গেলে। তখন প্রয়োজন হবে কবিতার শিক্ষা এবং গানের তালিম। ওর অভিভাবকদের এখনই সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতের পয়লা নম্বর মহিলা তবলা-শিল্পী বলে বিঘোষিত ওস্তাদ আমীর হুসেন খাঁর ঘরের ছাত্রী শ্রীমতী অবন মিস্ত্রী শুরু থেকে শেষ অবধি একজন অ্যাকাডেমিক আর্টিস্ট। তিনি অনেক অনেক গবেষণা করে বিভিন্ন তালের ওপর কায়দা, পরন, চক্রধার, তেহাই পেশ করতে পারেন, কিন্তু একজন লহরাশিল্পীর হাতে সেটুকু বাদ না থাকলে শ্রোতা কিছুতেই খুশি হবেন না তা তাঁর হাতে নেই। এমনিতে খুব খোলা আওয়াজ, কিন্তু বড্ড চোখা চড়া সুরের ডেনার আওয়াজ। বাঁয়াতেও সেই গম্ভীর, জমাট নাদ নেই। ডেনা-বাঁয়ার সুষ্ঠু কম্বিনেশনেও যে কান-ভরা মেজাজ সৃষ্টি হয় তাও পেলাম না সেখানে।

তবে অবন মিস্ত্রীর কৃতিত্ব তিনি রীতিমত মর্দানা ঢঙে তবলা বাজান। হাতে নানান কিসিমের উপজের কাজ আছে। যেমন শোনা গেল তাঁর ৩+৪ ৪+৪ হিসেবের পাঁচের মাত্রার

অবন মিস্ত্রী

সওয়ারিতে। তাতে টুকরোর এবং ভাল লয়কারির কাজ দেখিয়েছিলেন তিনি। ধিন্‌না কৃধিন্‌ না-র ঠেকায় মজা ছিল। কিন্তু ও'র ১ থেকে ১৫ অবধি আধ মাত্রা করে সরানো তেহাইগুলো জমেনি। তার মধ্যে একটি তেহাই বে-জায়গায়।

পরব অংশের একটা কায়দা দিয়ে ও'র তিন তালের নিবেদন শুরু করেছিলেন অবন মিস্ত্রী। কিন্তু তার চেয়েও আমার ভাল লেগেছে ও'র শোলাপুরের থেকে আমদানী করা তিস্র এবং সংকীর্ণ অর্থাৎ ৭ এবং ৯-এর কম্বিনেশনের বোল। শিল্পীর দ্রুত একতাল নিবেদন আমি শুনে উঠতে পারিনি।

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

ভানুসিংহের পদাবলী ও শেষবর্ষণ

বৈষ্ণব কবির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছিলেন, আজ তাঁর উদ্দেশেও সে-কথাই বলতে ইচ্ছে করে। এত গীতি, এত ছন্দ, এতভাবে উচ্ছ্বসিত প্রীতি ও মধুরতা সমুদ্র-বাহিনী রবীন্দ্রসাহিত্যে যে, সেই প্রেমধারা থেকে নি[illegible]র কলস ভরে নেওয়ায় দোষ ধরা মিথ্যে হয়ে যায়। বরং বলা ভালো—'যার ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে/অসীম স্নেহের হাসি হাসছেন বসে।' এই স্নেহের হাসটুকুর ওপর ভরসা রাখলেই একমাত্র ভানুতীর্থের নিবেদন 'ভানুসিংহের পদাবলী' (রবীন্দ্রসদন ২৪ মে সন্ধ্যা) সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হওয়ার অবকাশ আছে।

প্রশ্রয়-মেশানো এই স্নেহহাসিটুকু বাদ দিয়ে দেখলে, এই নৃত্য-সহযোগ গীতি-আলেখ্য সম্পর্কে বহু আপত্তি উঠতে পারে। সোনার তরীর বৈষ্ণব-কবিতার অংশবিশেষ দিয়ে শুরু করে ভানুসিংহের পদাবলীর বিভিন্ন টুকরো অংশের উদ্ধৃতি তুলে তুলে নাটকীয় সংলাপ তৈরি করে (এমন কি গোবিন্দ দাসের অভিসারের পদও সংযোজিত সেই সংলাপে) নাচ ও গান সহযোগে যে-আলেখ্যটি নিবেদন করা হল, সামগ্রিকভাবে তার আবেদন না নাটকের দিক থেকে না গানের দিক থেকে মনকে স্পর্শ করে। নাচের কথা তুললে ব্যর্থতার পাল্লা আরও নেমে যাবে। মহত্ত্বাবিহীন নাচ রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের ফ্যাশানে পরিণত হতে চলেছে। একে অন্যকে দেখে হাত

ভানুসিংহের পদাবলী

ছবি : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

তোলে, হাত নামায়; হুড়মুড়িয়ে এক-জন পড়ে অন্য জনের ঘাড়, হঠাৎ ঢুকে পড়ে কেউ-বা পালাবার পথ খুঁজে পায় না। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুতপা দত্তগুপ্তের 'রাধায়' একমাত্র নিষ্ঠার ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়।

গতিতে মন্থর, সংলাপে দুরূহ (ব্রজবুলি শুনে মর্মোদ্ধার কি সহজ কথা ?), নৃত্যে আবেদনহীন এই আলেখ্যের গানগুলিও সর্বত্র সুগীত নয়। কমলা বসুর 'বাজাও রে মোহন বাঁশি', গীতা ঘটকের 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' এবং পার্থ ও গৌরী ঘোষের সললিত কণ্ঠ সেই সন্ধ্যার সব-ছাপানো সম্পদ।

মালঞ্চের 'শেষবর্ষণ' ছিল ৩১ মে। এই রবীন্দ্রসদনেই গত বছর ৪ আগস্ট এই অনুষ্ঠানটি নিবেদিত হয়েছিল। তার বিস্তারিত আলোচনাও এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। পরি-বর্তনের মধ্যে, 'তোমার নাম জানিনে' গানটি এবার বর্জিত। নাচে সংযোজিত দু-একটি নতুন নাম। তবে সব মিলিয়ে মূল অনুষ্ঠানটি আরও পরিণত ও সংহত হয়েছে। এই একটি আলেখ্য, যার নৃত্য-পরিকল্পনায় যথার্থ কল্পনা-শক্তির পরিচয় স্পষ্ট। পোশাক রুচি-পূর্ণ। গানগুলি প্রায় প্রত্যেকটি শ্রুতি-নন্দন। শুধু রাজা, নটরাজ এবং রাজ-কবির ভূমিকা এবারে স্থানান্তর। নটরাজের ক্ষেত্রে উচ্চকিত প্রম্পটিং অত্যন্ত কানে লেগেছে। সুরের এই অংশকে আরেকটু উজ্জ্বল করা যায় না ?

প্রণব মুখোপাধ্যায়

সুনীত বসু ও লীলাশ্রী বসু

ফটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

বাঘবন্দী

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মত ভাগ্যবান পুরুষ খুব কম দেখা যায়। একই সঙ্গে তাঁর তিনজন প্রেমিকা—কবিতা, নাটক, চলচ্চিত্র। সময় বিশেষে পক্ষপাতের তারতম্য ঘটে, যেমন হয়ে থাকে ঠিক সেই রকমই। কখনও কেউ সুয়োরাণীর আদর পায়, কেউ বা দুয়োরাণীর অবহেলা। আমরা যারা বাইরে থেকে দেখি তারা অনেক সময় এই টানা-পোড়েনে কবিতায় আলোড়িত হই, কখনও চলচ্চিত্র ভাষায় হতবাক হই, নাটক খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্ত হই। প্রথম যখন কবিতা থেকে নাটকে মোহগ্রস্ত হলেন তখন সেই মৃত্যু সংবাদ, চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি নাটকের বক্তব্যে মতই বিরোধিতা থাক, সেই সব নাটকের সংলাপের কবিত্ব সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত—এই ধরনের আধুনিক নাটক আমাদের অজানা ছিল এবং অজানা ছিল বলেই অনভ্যাসের জন্য অনেকের উদ্ভট মনে হত—তাই বিস্মিত। নাটক জনপ্রিয় না হলেও মোহিনী মায়ায় অনেককে ভোলালো—পার অনেকে চেষ্টা করলেন কিন্তু হবে না কংসে হবে বলা মুশকিল।

জামসেদপুর থেকে 'বর্তিক' এসেছিলেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঘবন্দী' প্রযোজনা নিয়ে। প্রেমিকারা একই শাড়ি দ্বিতীয়বার পরতে চায় না—মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রেমিকার বাহানা বজায় রেখে, তাঁকে নিত্য নতুন সাজে সাজান। কোন সময় নাটকের নাম বদলে যায়—অন্তত সংশোধিত হয় বার বার। 'বাঘবন্দী' সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের ঘরানার মত প্রযোজনার ধরনও সম্পূর্ণ আলাদা। 'বর্তিক' সেই অসামান্য মমতার অধিকারী যে ক্ষমতায় কবিতা, নাটক চলচ্চিত্র তিন প্রেমিকাই সমান মর্যাদা পায়। নাটকের তিনটি পর্বের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ ছাড়া কোন যোগাযোগ নেই। প্রদীপ চক্রবর্তীর অসাধারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং কয়েক জনের অভাবনীয় অভিনয় প্রযোজনার একটি নিটোল চেহারা তুলে ধরে।

জামসেদপুরের 'বর্তিক'এর প্রযোজনা এর বারেই কলকাতার দর্শককে চমকিত করেছে, শিশির মঞ্চে এবারেও সেই প্রত্যাশা পূর্ণ। নাটকের তৃতীয় পর্ব অনেক সময় দোষাবহ 'অধিকন্তু' মনে হতে পারত, কিন্তু প্রযোজনা-শৃঙ্খলায় ঐ পর্বের নাটক, চলচ্চিত্র ভাষা নিয়েই

কবিতার সঙ্গে তাঁদের প্রেম নয়—ভাসুর ভাদ্দর বউ সম্পর্ক থাকায় চরম হাস্যকর প্রচেষ্টা হয়ে রইল। পরবর্তীকালে বক্তব্যের দিক থেকে সোজাসুজি আক্রমণ হানল 'রাজরক্ত', 'ক্যাপ্টেন হুররা'। এইবার দেখা গেল দর্শক শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। সম্ভবত এই দুটি নাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সব থেকে বেশী অভিনীত নাটক। এর পর মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক লিখেছেন খুব কম—চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড়তর হল—এই পর্যায়ে 'মহাকালীর বাচ্চা' বা অন্যান্য নাটকে মোহিত অনেক মাটির কাছাকাছি—কিন্তু নাটকে ঘটনা, সংঘাত থেকে প্রাধান্য পেল চলচ্চিত্র ভাষার অনেক সাজেশন—হয়ত অনভ্যস্ত চোখ ক্রমশ সয়ে যাবে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না—তাঁর নাটকে এখন আলাপ বিস্তার সব আছে, কিন্তু শেষ পর্যায়ের ঝালার কাজ, তান সরগম অনেক কিছুই ইঙ্গিতে সারা হয়—তাই পরিণতি সুস্পষ্ট নয়। একমাত্র 'আলিবাবা' সম্পূর্ণভাবেই নাটক যা বাংলা নাটকের একটি স্মরণীয় সংযোজন হয়ে থাকবে—কিন্তু এই কথা নিতান্তই বাহুল্য কারণ যে সন্তান ভূমিষ্ট হয়নি সে অবতার নাটক হয়ে উঠেছে। শুধু একটাই কথা, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক প্রযোজনারীতি একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে—একই ধরনের মঞ্চ, আলো, পোশাক সর্বত্রই কাজ করে। হাতের কাছে পাণ্ডুলিপি না থাকায় উদ্ধৃতি দেওয়া গেল না—নইলে দেখান যেত, সংলাপের কবিত্বের মারপ্যাঁচ মায় অনেক সময় নাটককে পথ ভোলায়। সর্বোপরি সংলাপ বলতে গেলে কয়েক জন আবশ্যিকভাবে শম্ভু মিত্র অথবা শ্যামল ঘোষের স্বর প্রক্ষেপণ মেনে চলেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রথাভঙ্গের নাটক লেখেন, অবাক বিস্ময়ে বর্তিক-এর প্রযোজনা দেখতে দেখতে মনে হয়, এই প্রথাভঙ্গও কোথায়, কেমনভাবে যেন 'বাঘবন্দী' খেলায় মেতেছে।

সাধারণ দর্শক যাঁরা নাট্যবোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত হতে চান, তাঁরা আধুনিক কবিতা বোঝেন, আর্ট ফিল্ম দেখেন, নাটকীয়তা দেখলে পরে 'মেলোড্রামা' বলে মুচকি হাসেন, অথচ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় প্রচলিত অর্থে 'নাটকীয়তা' না পেলে ক্ষুণ্ণ হন। তাতে যথার্থ শিল্পীর কিছু আসে যায় না।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

সুশীল মুখোপাধ্যায় (১৯১৯—)

এখন অবশ্য মার্কিন নাগরিক। ওঁদের বাড়ি ছিল রাঁচীতে। সেখান থেকে পড়াশুনো শেষ করে তিনি মাদ্রাজ আর্ট কলেজে ভর্তি হন। অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সান্নিধ্যের সঙ্গে পেলেন সতীর্থ পানিক্কর এবং পরিতোষ সেনকে। একটু ওপরে পড়েন প্রদোষ দাশগুপ্ত। গোপাল ঘোষ, কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদারও সহপাঠী। সেই সময় অবশ্য বোহিমীয় জীবনযাপন করতেন সুশীল, পানিক্কর এবং পরিতোষ। একই বাড়ির নীচের তলায় থাকতেন তাঁরা তিনজন বেশ কয়েক বছর। তিন জনের মধ্যে সুশীলই প্রথম চাকরি পান মাদ্রাজের বিদ্যোদয় বালিকা বিদ্যালয়ে। সেই বাড়ির ওপরতলায় থাকতেন আরেক সহপাঠী ব্যঙ্গচিত্রকর কুট্টি। টাকা পয়সার বেশ অভাবের মধ্যে পানিক্কর চাকরি পেলেন মাদ্রাজ আর্ট কলেজে। এর মধ্যেই সুশীলের সঙ্গে মনস্তত্বের অধ্যাপিকা কুর্গী সুন্দরী গৌরী বেলিয়াপ্পার প্রেম এবং বিবাহের পর্ব। এরপর গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া পাবলিক স্কুল এবং নীলগিরির লরেন্স স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পানিক্কর এবং সুশীলকে আধুনিক দাক্ষিণী কলমের প্রাণপুরুষ বলা হয়।

১৯৫৩-তে তিনি প্রথম ভারতীয় স্মিত মুণ্ড ফুলব্রাইট বৃত্তি পেয়ে মার্কিন মুলুকে সাংস্কৃতিক বিনিময়-সূচী অনুসারে ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি সম্বন্ধে পড়াতে যান উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬০ সালে তিনি দ্বিতীয়বার এই বৃত্তি পান। ফিরে এসে তিনি শিল্পচর্চার সঙ্গে স্টেটসম্যানের কলাসমালোচক ছিলেন। গৌরী দেবী তখন "শ্রীশিক্ষায়তন" মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। শেষে ওঁরা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন আমেরিকায় গেলেন। গৌরী এখনও অধ্যাপনা করেন সেন্ট্রাল কনেক্টিকট স্টেট্ ইউনিভারসিটিতে। সুশীল এখন অবসর নিয়ে পুরো সময়ের শিল্পী।

তিনি নানা দেশে ঘুরেছেন। তাঁর কাজ একক এবং ভারতীয় চিত্রকলার যৌথ প্রদর্শনীতে বহু দেশে প্রদর্শিত হয়েছে। যথা ইউনেসকো ইণ্টারন্যাশনাল, ম্যুজি দ্য আর্ট মডার্ণ, পারী। জাতীয় প্রদর্শনী, প্রথম ত্রিয়ানাল, দিল্লি। সাউথ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব পেনটারস, মাদ্রাজ, দিল্লি। ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীর সঙ্গে টোকিও, পিকিং, কাবুল, কায়রো, মেলবোর্ন। একক প্রদর্শনী : মাদ্রাজ (বৃটিশ কাউনসিল, ইউসিস আয়োজিত), দিল্লি আইফেকস, কলকাতা (আকাদমী অব ফাইন আর্টস, ইউসিস আয়োজিত)। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়। হেমসায়ার কলেজ। ন্যু ইণ্ডিয়া হাউস, ন্যু ইয়র্ক। ওয়াশিংটন আর্টস ক্লাব। বার্কসায়ার ম্যুজিয়াম পিটসফিল্ড। গ্রীয়ার গ্যালারী এবং বড়লি গ্যালারী, ন্যু ইয়র্ক। এই বছরে একক প্রদর্শনী হবে ওয়াশিংটনে। এখন তিনি পুলিটজার প্রাইজ বিজয়ী খবরের কাগজ "বার্কসায়ার ঈগল"-এর কলা-সমালোচক।

তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী এবং নামী অধ্যাপক, কিন্তু সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতি কম নয়। আকাশবাণীতে বাঁশী বাজিয়েছেন একসময়ে নিয়মিত। তাঁর বাড়ি লেনকস শহরে শিল্পসংস্কৃতির পীঠস্থান রূপে সুপরিচিত। সাহিত্যিক, চিত্রকর, সঙ্গীতশিল্পীর ভীড় লেগে থাকে। ওদেশের বিখ্যাত জাজ পিয়ানোবাদক রেনডী ওয়েস্টন, লোকসঙ্গীত গায়িকা জোন বোয়াজ, জুডি কলিনস এবং বেলাফনটে নিয়মিত আসেন। ওঁদের জলসায় ভারতীয় বাঁশী নিয়ে সুশীল বসেন।
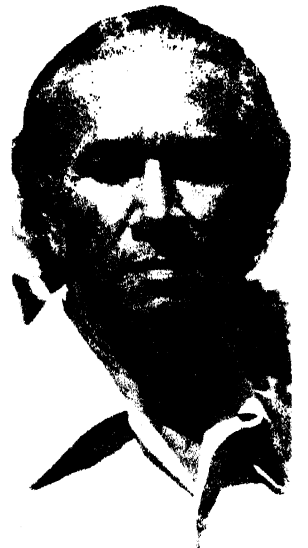
আসেন আলী আকবর, রবিশংকর এবং সারেঙ্গীবাদক রাম নারায়ণ। ঐতিহাসিক উইলিয়াম সেয়ার, নাট্যকার উইলিয়াম গিবসন আর অসংখ্য শিল্পী। যান এদেশ থেকে কালেভদ্রে পরিতোষ সেন, কৃষ্ণা কুলকারনি। আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় ষাট দশকের প্রথম দিকে। শ্রীশিক্ষায়তনে ওঁর স্ত্রীর কোয়ার্টারে জমিয়ে আড্ডা হতো। আমি ভালবাসি বলে নেমন্তন্ন করলেই ফ্লুরীর কেক পেস্ট্রী থাকতো। এখন তিনি আবার দেশে ফিরতে চান। এ বছরের গোড়ায় এসেছিলেন। স্পষ্ট বুঝলাম বিত্ত বৈভব সত্ত্বেও দেশের জন্য মন কেমন করছে। স্নেহপ্রবণ, অতিথিবৎসল, বিদগ্ধ এবং গুণী তিনি।

"ত্রিমূর্তি" (জলরঙ ১৮"×২" পার্চমেণ্ট কাগজে আঁকা। ওঁর নিজস্ব পদ্ধতির এই অঙ্কনরীতির নাম দিয়েছেন ভাসমান জলরঙ। আধ বিমূর্ত হলেও ওড়িশী জগন্নাথ পা এবং লোকশিল্পের রূপবন্ধ তাঁর ছবির উৎস অবশ্যই। নীল, হলুদ কমলা এবং আরও রঙের স্বচ্ছ কাজে মাতোয়ারা করেছেন। সোনালী রঙের বাহারও আছে। মণ্ডনধর্মী হলেও মেজাজ কাব্যিক।

Regd No. WB|CC|184|74

ত্বক বলে মৃদু স্বরে, 'তোমায় ভালোবাসি'...

ল্যাক্‌মে ভ্যানিশিং ক্রীম। মেক-আপ আর পাউডারের নিখুঁত আধার। আপনার মুখে লাগায় কোমল পরশ···যেন ভালোবাসার পরশ···আগলে রাখে সোহাগ ভরে, সযতনে! সকল মরশুমে···সকল সময়ে! যাতে আপনার রঙরূপ থাকে—ফর্সা, তাজা, নিখুঁত সুন্দর!

যারা সুন্দর ত্বকের মর্ম বোঝে

ল্যাক্‌মে

ত্বকের মৃদু সৌরভে [illegible] ভালোবাসা ... [illegible] মেখে আসা!

শান্ত শীতল শ্যামলিমা। সারাবেলা সতেজতা। আপনার বয়েস কম, তবু জানেন ফরাসী ল্যাভেণ্ডারের সুরুচিপূর্ণতার মর্ম, চেনেন এর সৌখিন সুরভি! আপনি উপভোগ করেন শীতল মৃদুলতা—ল্যাক্‌মে ল্যাভেণ্ডার ট্যাল্‌ক!

সৌন্দর্য্য নির্মাতা

ল্যাক্‌মে

daCunha/L-VC/LT/5 BN

ল্যাকমে ক্যালামাইন

সৌন্দর্যের জগতে নতুন আলোড়ন

যা এর আগে আপনি কখনো ব্যবহার করেন নি।

ল্যাকমে ক্যালামাইন ওষধি গুণসম্পন্ন—যা আপনার ত্বককে ত্রুটিহীন লাবন্যে ভরে তোলার জন্য যত্ন নেবে।
একমাত্র ল্যাকমে ক্যালামাইন-এ পাবেন নানান শেড যা আপনার রূপে ফুটিয়ে তুলবে ঝলমলে জৌলুষ। সুগন্ধে ভরা ল্যাকমে ক্যালামাইন বেছে নেবার জন্য দুরকম সুবিধাজনক সাইজ এ পাবেন। ১২০ মিঃলিঃ আর ৬০ মিঃলিঃ ত্বকের সম্পূর্ণ পরিচর্য্যার জন্য ল্যাকমে ক্যালামাইন !

ত্বকের পরিচর্য্যায় যার। সবার সেরা

ল্যাকমে

daCunha/L/C/3 Ben

যে টর্চটি পকেটমারটিকে দেখাল আর শীলা ও মোহনকে বিপদ থেকে বাঁচাল সেটি হল এভারেডী এলিফ্যান্ট। এভারেডীর তৈরী ২৭টি নির্ভরযোগ্য টর্চের মধ্যে একটি।

প্রতিটি এভারেডী টর্চ একটি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য, একটি বিশেষ আর্থিক সামর্থের দিকে নজর রেখে তৈরি করা হয়েছে। রংচঙে ছোট টর্চ যা অনায়াসে মেয়েদের হ্যাণ্ড ব্যাগে রাখা যায়। শার্ট অথবা জ্যাকেটের পকেটে লাগানোর উপযুক্ত পেনের ক্লিপ সমেত সরু টর্চ। ভারী কাজের জন্য পেতলের টর্চ যা আজীবন সেবা করবে। হাল্কা ধরনের এলুমিনিয়াম টর্চ, দেখতে সুন্দর আর দামে কম। এছাড়াও আরও অনেক।

এভারেডীর রকমারী টর্চের মধ্যে প্রত্যেকের জন্যই কিছু না কিছু আছে। আপনার জন্যও।

এভারেডী

আজ রাত্রে আপনার একটি এভারেডী টর্চের প্রয়োজন হতে পারে।
এটি অন্ধকারে বাড়তি চোখের কাজ করে।

UNION CARBIDE

OBM-6070C/7 BEN

চিঠিপত্র

কীট পতঙ্গ ঃ সাহিত্যে

গত ১২ই মে'র দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীপুষ্পেন্দু লাহিড়ীর 'কীট-পতঙ্গ বৈচিত্র্য' শীর্ষক আলোচনাটি পড়তে পড়তে মনে হল যে আমাদেরই একান্ত প্রতিবেশী কীট-পতঙ্গেরা সাহিত্যের জগতে সত্যিই উপেক্ষিত রয়ে গেছে; কেবল বাংলা সাহিত্য নয়, বোধ করি, পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্য সম্পর্কেই এ কথা অল্পবিস্তর-ভাবে সত্য। তবে, সেই সঙ্গে এ-ও মনে হল যে কবিরা কীট-পতঙ্গ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্যভাবে সচেতন না হলেও মাঝে মাঝে যখন এদের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন—তখন কেবল প্রজাপতির ডানার বর্ণোজ্জ্বল লাবণ্যে, জোনাকির স্নিগ্ধ আলোয় অথবা বসন্তের বার্তা-বহ ভ্রমর ও মৌমাছির আবেগ-সঞ্চারক গুঞ্জনেই তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকেনি। মাকড়সা, ফড়িং, মশা, মাছি, ঝিঁঝিঁপোকা এবং অন্যান্য পোকামাকড়ের কথাও তাঁরা লিখেছেন।

মাকড়সার জালের শিশিরবিন্দু-খচিত অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন অনেকেই। একালেরই এক বাঙালী কবির কবিতায় সেই মুগ্ধতার প্রকাশ মনে রাখবার মত।—'ভোরবেলাকার শিশিরকণার মুক্তো দিয়ে গাঁথা/ ঊর্ণনাভের সূক্ষ্ম জালে সোনার কিরণ লেগে/ছোট্ট গীতিকাব্য একটি কাঁপছে থরে থরো/ঊর্ণনাভের আটটি বাহুর কোমল আলিঙ্গনে।'

(দুপুরবেলার চম্পূ—বিমলচন্দ্র ঘোষ)।

'কামিনীর ডালে মাকড়সা শিশিরের ঝালর দুলিয়েছে'—সেই ছবিটি ধরে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ; এমন কি সেই মাকড়সার আপন জগতের অন্তরঙ্গ হবার জন্য ব্যাকুলতাও প্রকাশ করেছেন তিনি (দ্রঃ 'কীটের সংসার'—পুনশ্চ)। তারা ঊর্ণনাভের ঝিকিমিকি জালের নয়নলোভন রূপের কথা শুনিয়েছেন যতীন বাগচী। ঝিঁঝিঁপোকার গান তো বহুকাল ধরেই কবির মনকে আবিষ্ট করে আসছে। আমাদের বর্ষার গানের সঙ্গে তার সংযোগ নিবিড়। বৈষ্ণব পদাবলী, রবীন্দ্র-কাব্য এবং রবীন্দ্র-সমকালীন অনেকেরই লেখায় ঝিল্লীরবের মোহসঞ্চারক ক্ষমতা স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে প্রখ্যাত ইংরেজ কবি কীটসের কথা—তিনি অনুভব করেছিলেন পৃথিবীর কবিতার মৃত্যু নেই এবং প্রকৃতিজগতের অনিঃশেষ সংগীতপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে ঐ কবিতার ধারা অনবচ্ছিন্নভাবে বহমান—তাঁর এই অনুভব প্রকাশ পেয়েছে ঝিঁঝিঁপোকা ও ফড়িং-এর গুঞ্জনে তাঁর মুগ্ধতাকে কেন্দ্র করে (on the grasshoper and the cricket)। ফড়িং-এর কথা বলতেই মনে আসে একাধিক বাংলা কবিতা যেখানে এই চঞ্চল সুন্দর ছোট্ট প্রাণীটির কথা রয়েছে। জীবনানন্দের কবিতার দু-একটি চরণ বিক্ষিপ্তভাবে মনে পড়ছে। 'গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং/আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ' [illegible] মত কোমল নীল'। যতীন বাগচীর কবিতায় ফড়িং-এর রূপ আরো জীবন্ত—'শষ্পশয্যা ছাড়িয়া ফড়িং/উড়িবে বলিয়া তুলিছে ঘাড়' (ব্রাহ্মমুহূর্তে), 'ঘাসের ডানায় ফড়িং ঘুমায়/সবুজ স্বপন-সুখে' (স্বপ্নদেশ)। ভিজে ঘাসঝাড় থেকে ফড়িং-এর লাফিয়ে ওঠার দৃশ্য কবিতায় ধরে রেখেছেন অক্ষয়কুমার বড়াল ('শ্রাবণে')।

মাছির গানের মায়াময় আবেশকে একাধিক কবিতায় ধরে রেখেছেন জীবনানন্দ দাশ। প্রসঙ্গত কীটস্ এর 'Ode to Autumn' মনে পড়ে—ঐ কবিতায় মাছির গুঞ্জনের বিষন্নতা-সঞ্চারক আবেশ চমৎকার ফুটেছে। সোনালী রোদ্দুরে উড়ন্ত কীটের খেলা জীবনানন্দের কবিতায় ছবি হয়ে ধরা দিয়েছে। (দ্রঃ—আট বছর আগের একদিন)।

পিঁপড়ে সম্পর্কে দুজন কবির কবিতা আপাতত মনে পড়ছে, রবীন্দ্র-নাথের 'কীটের সংসার' এবং অমিয় চক্রবর্তীর 'পিঁপড়ে'। দ্বিতীয়জনের কবিতায় সস্নেহ পর্যবেক্ষণের ভাবটি লক্ষ করার মত।

'মশা'-কে নিয়ে হালকা চালে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'মশকমঙ্গলগীতিকা' সকলেরই মনে পড়বে। মশার মত বিরক্তিকর প্রাণীও যে 'সীরিয়াস' কবিতার বিষয় হতে পারে তার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সপ্তদশ শতকীয় ইংরেজ কবি 'জন ডন'। তাঁর একটি কবিতায় বলা হয়েছে যে মশা তাঁকে এবং তাঁর প্রিয়াকে পর পর দংশন করে তাঁদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে এবং তাঁদের আত্মিক মিলন-সাধন করেছে। মশা সম্পর্কে এমন উচ্চাঙ্গের ভাবনা কোনো কীট-পতঙ্গ-প্রেমিক কি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন?

যাকে চলতি ভাষায় আমরা মখমল পোকা বলি—সাধু ভাষায় ইন্দ্রগোপকীট—সেই রক্তবর্ণের ছোট্ট প্রাণীদের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে বাল্মীকি-রামায়ণে।

কবিদের কীট-পতঙ্গ বিষয়ে সচেতনতার আরো অনেক নজীর হয়তো আছে, পুষ্পেন্দুবাবুর চিন্তা-কর্ষক আলোচনাটি এ ব্যাপারে নতুন করে ভাববার জন্যে ডাক দিয়েছে। তাঁকে ধন্যবাদ। দেশ পত্রিকায় কীট-পতঙ্গ বিষয়ে আরো লেখা আমরা ভবিষ্যতে দেখতে পাবো আশা করি। তাতে কবিরা অনুপ্রাণিত হবেন-ই এমন কোনো কথা নেই; কিন্তু পাঠকের সেই অনাদৃত উপেক্ষিত প্রাণীদের—যারা 'আদিম জীবন-লক্ষণের অন্যতম স্মারক'—কথা জেনে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন।

পূরবী বিশ্বাস
কলিকাতা-৭৩

আজকের জাপান

সবে হাতে পাওয়া ১২ মে ১৯৭৯ সংখ্যা দেশ-এ প্রকাশিত শ্রীসুখরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের "আজকের জাপান" পড়তে গিয়ে আদ্যোপান্ত হোঁচট খেতে খেতে শেষ

আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রবন্ধের শুরু নারিতা বিমান-বন্দরে "মাইনাস তিরিশ ডিগরি তাপমাত্রা"-য় লেখকের অসহায় অপেক্ষার কাহিনী দিয়ে। অথচ তোকিও আবহাওয়া দপ্তরের শরণাপন্ন হতে তাঁরা জানালেন, সেই ১৮৭৬-এর ১৩ জানুয়ারি তোকিও ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রা মাইনাস নয় দশমিক দুই ডিগরি (–৯. ২০) সেণ্টিগ্রেডে নেমেছিল, সেই অবধি তোকিওর সর্বনিম্ন তাপমাত্রার এ-টি হল হিসাব। গড়ে এ শহরের তাপমাত্রা তীব্রতম শীতেও গত কয়েক বছর শূন্য ডিগরি (০.০০) সেণ্টিগ্রেডেরই কাছাকাছি ওঠানামা করেছে। মাইনাস তিরিশ ডিগরির ব্যাপারটা কি সুখরঞ্জন-বাবু জানেন তো?

প্রবন্ধে বলতে গেলে একটি জাপানী ব্যক্তিনামেরও লিপ্যন্তর শুদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বুদ্ধদেব বসুর জাপান সংক্রান্ত লেখা পড়ে দেখলেই সুখরঞ্জনবাবুর এ ব্যাপারে চেতনা হবে বলে মনে করি। এ দেশে স্বল্প সংখ্যক যে ক'জন জাপানী বঙ্গচর্চায় নিযুক্ত, বর্তমানে তাঁরা বাংলা নামের জাপানী লিপ্যন্তরে কি উপায় অবলম্বন করবেন তাই নিয়ে চিন্তা করছেন। যেমন বাংলা ব্যক্তিনাম "সত্য"-র জাপানী লিপ্যন্তরে বাংলা 'শোত্তো' নাকি সর্বভারতীয় Sতিয়া', কোন উচ্চারণ অনুসৃত হবে। অধিকাংশেরই মত 'শোত্তো' উচ্চারণের পক্ষে। জাপানী পত্র-পত্রিকায় বাংলা নাম লিপ্যন্তরের প্রয়োজন হলে এঁদের মতামত গ্রহণের চল আছে। বিশেষত এই পরিপ্রেক্ষিতে সুখরঞ্জনবাবুর "মাসায়োশি ওহিরা"-কে 'মোশিয়োশি ওহিরা' বানিয়ে ছাড়া লজ্জাকর। এ ছাড়াও তাঁর কলমের দৌড়ে "সোনোদা" হয়েছেন 'সোনাদা'। স্থাননাম 'নারা'-কে 'নাড়া'-তে পরিণত করেও সুখরঞ্জনবাবু আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করেননি। সবচাইতে মারাত্মক উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো। লকহীড কেলেঙ্কারিতে দুর্নীতির দায়ে শ্রীঘরে প্রেরিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ফুকুদা নন, প্রধানমন্ত্রী তানাকা। এবং তানাকার পর মিকি তারপর ফুকুদা প্রধানমন্ত্রী হন, ফুকুদার পর তানাকা নন। এ তথ্যটুকু জানতে দেশে বসে নিয়মিত আনন্দ-বাজার পড়াই যথেষ্ট এজন্য জাপানে আসার দরকার হয় না।

তথ্যের ভুল শুধু তাপমাত্রায়ই নিবদ্ধ নয়। জাপানে শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক ন' বছর বয়স অবধি নয়, নবম শ্রেণী অবধি। পশ্চিমবঙ্গে বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার যে পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন, তার মেয়াদ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের বয়স গড়ে কত দাঁড়াবে সে খেয়ালও যদি সুখরঞ্জনবাবুর থাকত তবে তিনি এই অযৌক্তিক তথ্যটি পরিবেশন করতেন না। জাপানে সর্বত্র না হলেও তোকিওয় অবশ্য টেলিভিশনে সাতটি চ্যানেলেই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়, কিন্তু তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা সংস্থা নামে কোনও সংস্থা নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পরিশেষে জানাই সুখরঞ্জনবাবুকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে তোকিও প্রবাসী অন্যান্য বাঙালীর সঙ্গে যিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম "সৈয়দ হাসান" নয়, শহিদ আসাদ। এবং প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এখানে শম্ভু চ্যাটার্জি নামে কেউই নেই, যিনি সেদিন আসাদ সাহেবের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর নাম সুচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়। তিনি কোনও জাহাজ কোম্পানীতে কর্মরত নন জাহাজ সংক্রান্ত ব্যবসায় নিযুক্ত।

সুখরঞ্জনবাবুর কাছে সবিনয়ে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। এ-ই কি সেই সাংবাদিকতা, যার স্বাধীনতা রক্ষায় বিশ্বময় আপনাদের এত তোড়জোড়?

দিলীপ কর

টোকিও

এডেলেডে বিশ্ব আরট কংগ্রেস

গত ৯ জুনের 'দেশ' পত্রিকায় অহিভূষণ মালিক মহাশয়ের লেখা 'এডেলেডে বিশ্ব আরট কংগ্রেসের' দ্বিতীয় স্তবকটি পড়লাম। অহিবাবু অতি সুন্দরভাবে আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি খসড়া আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমার সবচেয়ে ভালো লাগল তাঁর অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের বর্তমান যুগের পটভূমিকায় হতাশাপূর্ণ অবস্থিতির চিত্রটি। বহুদিন আগে প্রবাসে থাকার সময় অধ্যাপক গিলবার্ট মারের মুখে শুনেছিলাম, কিভাবে তাঁর বাল্যকালে তিনি তাঁর পিতাকে প্রত্যহ প্রাতরাশের পর আদিম অধিবাসী নিধনে যেতে দেখেছেন। এটা সেই সময় সমস্ত শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের দৈনন্দিন কাজ ছিল। আদিম অধিবাসী[illegible] ধ্বংস না করলে তাঁদের [illegible]দের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে বিলুপ্ত হত। এই অবস্থার পরিবর্তন হল যখন অস্ট্রেলিয়ায় সোনা পাওয়া গেল সোনার খোঁজে যে বিদেশী মানুষের ভীড় হল তাদের সহায় হলেন আদিম অধিবাসীরা। স্বর্ণপিপাসুরা আকস্মিকভাবে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিশ্বাসপরায়ণতা, বন্ধনহীন জীবনের অনাবিল আনন্দ ও মানবিক প্রীতি লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন। রচিত হল এই তমসাক্লিষ্ট দ্বীপের ইতিহাসে এক প্রীতি ও মৈত্রীর সমুজ্জ্বল অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের পরিপূর্ণ রূপ এই শতাব্দীর পঞ্চম দশকে প্রকাশ পায়। এই রূপ প্রকাশ পায় এক কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাবে। এই গোষ্ঠী নিজেদের নাম দিলেন 'জিন্ডিওরোবাক' দল। 'জিনডিওরোবাক' কথাটা এসেছে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ভাষা থেকে এবং এটির অর্থ হল সমন্বয় সাধন করা। এই কবিগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনকে ইউরোপীয় স্পর্শ থেকে মুক্ত করা।

করেন কাব্যসৃষ্টির মূলে আছে পারিপার্শ্বিকতার মূল্যবোধ। যখন আদিম অধিবাসীদের মানসিক ভাবধারায় আধুনিক অস্ট্রেলিয়ান শিল্পী অনুপ্রাণিত হবেন তখনই হবে সার্থক ও স্বকীয় অস্ট্রেলীয় সংস্কৃতি। লক্ষণীয় এই যে, এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ার ডাক টিকিটে—সেখানে আদিম অধিবাসীদের চিত্রকলার প্রতিলিপি শোভা পেয়েছে। এই গোষ্ঠীর এক কবি হলেন রুঅন মুডি। তাঁর এক কবিতায় আদিম অধিবাসীদের রীতিনীতির সঙ্গে আধুনিক অস্ট্রেলীয়দের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা রয়েছে—

Deep flows the flood
deep under the land
Dark is it and blood
and encalypt colour and scent
it.

একটা কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের দৈহিক আকৃতি ভাষা ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে কিছু পরিমাণে আমাদের দেশের তামিল সম্প্রদায়ের আকৃতি ও ভাষা ও সমাজব্যবস্থার মিল আছে।

নতুন কৃষ্টি স্থাপনের উদ্দীপনায় আজ অস্ট্রেলিয়া উদ্বেল, কিন্তু কি উপায়ে ও কিভাবে এই নতুন কৃষ্টি রূপে দেশে তা লক্ষ্য করবার জন্য অনেকের নজর পড়ছে আজ অস্ট্রেলিয়ায়।

দিলীপকুমার সেন
কল্যাণী।

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত অহিভূষণ মালিক রচিত "এডেলেড-এ বিশ্ব আরট কংগ্রেস" নিবন্ধটি আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্মুখে এক বিলম্ব জিজ্ঞাসা। সমস্ত বিশ্ব যখন শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আর্ট-এর ভূমিকার গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষাক্রমকে তদুপযোগী করে সাজানো হয়েছে তখন আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরট বইয়ের পাতায় আঁকা অ-শিশুসুলভ কিছু ছবি এবং ওয়ার্ক এডুকেশন-এ শেখান কাগজের ফুল ও পাপোশ তৈরিতেই গণ্ডীভুক্ত হয়ে আছে।

বিশেষজ্ঞরা শিশুর আড়াই থেকে ছয় বছরের শিক্ষাক্রমে আরট-এর অনিবার্যতা প্রধানত স্বীকার করেন। কারণ, তাঁদের মতে এই বয়সেই শিশুর ব্যক্তিত্বের ভিত গড়ে ওঠে। আর্ট শিশুদের মস্তিষ্কের চিন্তা করবার ক্ষমতা বাড়ায়। নিজের খুশিমত রঙ তুলি বা কাদামাটি ঘাঁটতে ঘাঁটতে শিশুরা যে "রূপ" আবিষ্কার করে, সেই রূপ আবিষ্কারের প্রক্রিয়া তার কল্পনাশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও রুচি গড়ে তোলে। তা ছাড়াও ছবির মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুভার অনেক লাঘব হয়। শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ-শিল্পী গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য নয়। এদেশে প্রথম রবীন্দ্রনাথই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি, গান, অভিনয় ইত্যাদির প্রয়োজনকে কার্যত প্রয়োগ করেছেন তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে। অথচ বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কতখানি প্রভাবিত করতে পেরেছে? আমাদের প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলিতে (দু-একটি একক প্রচেষ্টার ব্যতিক্রম আছে) আরট-এর ভূমিকা কিছুমাত্র নেই। যে বয়সটা খেলা করবার, (কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে পাঁচ বছরের আগে হাতে খড়ি হত না) এটা সেটা নাড়াচাড়া করে কল্পনা করবার বয়স, সে বয়সে অনেক ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞান শিখিয়ে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিয়ে আমরা কি কল্পনাশক্তিহীন ছাঁচে ঢালাই করা মানুষ তৈরি করছি না? অহিভূষণ মালিকের লেখায় আমরা জানলাম নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিদেশে আরট-এর ওপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ওয়ার্ক এডুকেশন বিষয়টি আবার লেখাপড়ার ওপর হঠাৎ করে চাপিয়ে দেওয়া বাড়তি বোঝার মত। কারণ, প্রাথমিক স্তরে আরট-এর সঙ্গে যোগ স্থাপিত না হলে একজন ছাত্র কিভাবে এ বিষয়টি নিজের উপযোগী করে গ্রহণ করতে পারবে। অহিভূষণ মালিক তাঁর রচনায় অনেক ছবি ছেপেছেন যার কয়েকটিতে আমরা দেখি মাধ্যমিক স্কুলের ছেলেরা ঢালাইয়ের মত কঠিন কাজও শিখছে। কথা উঠবে, "আমাদের অত টাকা নেই"। সত্যি কথা আমাদের টাকা নেই। কিন্তু আমাদের কি কাদামাটি নেই? রূপ তৈরী করতে তার মূল্য তো কিছু কম নয়। আসল কথা হল, আমরা কতটা গুরুত্ব দিচ্ছি। মানুষ হিসাবে দাঁড়ানর জন্য আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিকে কতখানি মানছি।

মানছি না কিছুমাত্র। বাল্যের শিক্ষা-ব্যবস্থা সবচেয়ে অবহেলিত এ দেশে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য সভ্য দেশগুলি প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের ওপর কম গুরুত্ব দেয় না। এডেলেড বিশ্ব আরট কংগ্রেসে বাঘা বাঘা দার্শনিক ও ডক্টরেটদের সঙ্গে সঙ্গে আমন্ত্রিত হয়েছেন সেখানকার প্রাইমারী স্কুল টিচাররা।

বড় বড় কাজ করবার জন্য তো অনেক বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, এদেশে আছেন। বুনিয়াদি শিক্ষার ক্ষেত্রে আরটকে মূল্য দেবার বিষয়ে তাঁরা কি ভাবছেন জানতে ইচ্ছা করি। নতুবা এডেলেড-এ বিশ্ব আরট কংগ্রেস-এর মত নিবন্ধের প্রয়োজনীয়তা দেশ পত্রিকার পাতাতেই ফুরিয়ে যায়।

অরুণিমা চৌধুরী
নৈহাটী, ২৪ পরগণা।

রাবণ

সাপ্তাহিক দেশের ২৩ জুন সংখ্যায় শ্রীতারাপদ লাহিড়ীর একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীলাহিড়ীর মূল বক্তব্য হল যে রামায়ণের রাবণ এক দুশ্চরিত্র লম্পট। সীতাকে সম্ভোগ করার প্রবলতম স্পৃহা থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মার অভিশাপের কথা স্মরণবশত মৃত্যুভয়ে রাবণ সীতাকে বলপূর্বক ভোগ করতে পারেন নি বলে তিনি মনে করেন। তবে রাবণকে দুষ্ট

করার আগে তিনি 'রামায়ণ' আদ্যোপান্ত পড়ে নিলে ভাল করতেন। সম্ভোগের তাড়নায় রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন এরূপ অর্বাচীন ধারণা অদ্যাপি ভারতীয় সমাজে প্রচলিত। রাবণের দুর্ভাগ্য যে বিংশ শতকেও তাঁর স্থান অতি নিন্দিত। বিশ্ব জুড়ে রাবণের নিন্দা। কিন্তু রামায়ণকারের রাবণ সত্যই অসংযত ছিলেন না। বাল্মীকি রাবণকে বিশেষ চরিত্রবত্তায় চিত্রিত করেছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের মহনীয়তাকে ঈর্ষা করেন, অসাধরণ রামভক্ত ছিলেন তিনি। সীতাকে রাবণ অপহরণ করেছিলেন রামচন্দ্রের হাতে নিহত হওয়ার জন্য। বহুবাঞ্ছিত প্রাণকে তিনি রামকে তার ভক্তির অর্ঘ্যরূপে রক্ষা করেছিলেন। রাবণ নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সীতাকে দেখে রাবণের 'sex at first sight' গোছের কিছু হয়নি অশোকবনেও তিনি সীতাকে ধর্ষণ করতে বিন্দুমাত্র ব্যগ্র ছিলেন না। সুপ্রাচীন মহাকাব্যে আদিরসাত্মক শ্লোকের অভাব নেই, কিন্তু এই শ্লোক গুলি পরবর্তীকালে কোন কামোন্মত্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত বলেই মনে হয়।

রাবণ বহুবিদিত চরিত্র; প্রাকৃত ধারণার বশবর্তী হয়ে ও কয়েকটি আদিরসগর্ভ শ্লোক ভাঙিয়ে রাবণকে দুরাচারী ও সীতাত বলে চিহ্নিত করা অনুচিত। বুদ্ধদেব বসু রামায়ণ অনুপুঙ্খ অধ্যয়ন করেছিলেন, তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন : সম্ভোগ কোথায়?

রঞ্জিত শর্মা হুগলী

চোরবাগানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

দেশ পত্রিকার ২৬শে মে, ১৯৭৯ সংখ্যায় শ্রীরানা দাস নাট্যসমালোচনা প্রসঙ্গে কলিকাতা মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের রামচন্দ্র ভবন ও চ্যাটার্জী পরিবারের ঐতিহ্যের কথা যেভাবে তুলে ধরেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গেই আরও দু-একটি তথ্যের সংযোজন আলোচনাটিকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবে মনে করে এই পত্রের অবতারণা।

প্রথমত, চোরবাগানের চ্যাটার্জি পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শুধুমাত্র পারিবারিক থিয়েটারেই নয়, কীর্তন গানের মাধ্যমেও সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পরবর্তী কালপরম্পরায় যে কীর্তন গান তার জনপ্রিয়তা হারিয়ে ক্রমশ গ্রাম্যবাসরে সীমায়িত হয়ে পড়েছিল, তাকে জনপ্রিয় করে তোলা তথা সমঝদারের আসরে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্বও অনেকাংশে এই চ্যাটার্জী পরিবারেরই একজন বিদুষী মহিলা শ্রীমতী সরোজসুন্দরী দেবীর। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধারমণ কীর্তন সমাজ (স্থাপিত ১৯৪৯ খৃঃ) দীর্ঘদিন ধরে বাংলার তথা সারা ভারতের কীর্তন রসপিপাসুদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে এবং সংগীতের এই ধারাটিকে যথাযথ মর্যাদা দান করেছে। শ্রীমতী সরোজসুন্দরী দেবীর মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র, যথাক্রমে স্বর্গত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমণীন্দ্রকিশোর চট্টোপাধ্যায় মূল গায়েন হিসাবে গান করতেন এবং 'চোরবাগানের দু ভাই' নামে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। যতদূর মনে আছে, এই সংগীত সমাজের প্রথম গান হয় ১৯৪২ সালে কাশী মল্লিকের ঠাকুরবাড়িতে এবং মূলত এই রাধারমণ কীর্তন সমাজের জন্যই চোরবাগানের চ্যাটার্জী পরিবার এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, রানাবাবুর উল্লিখিত 'ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠায় ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে আর একজনের নামোল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি হলেন, অ্যান্ডারসন রাইট কোম্পানির ভূতপূর্ব বেনিয়ান শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—যাঁর উৎসাহ ও আর্থিক আনুকূল্য এই ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মূল শক্তি ছিল। তাঁর নিয়মিত অভিনয়ও এই প্রতিষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। এবং একথা অনস্বীকার্য যে শখের অভিনয় করলেও শৈলেনবাবুর অভিনয় প্রতিভা যে কোন খ্যাতিমান পেশাদার অভিনেতার সমকক্ষ ছিল। তার প্রধান সাক্ষী ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার ভূপেনবাবু নিজেই। এছাড়া, তৎকালীন পর্দানশীন যুগে শৈলেনবাবুর মধ্যম ভ্রাতা চিন্তামণি চ্যাটার্জীর নারী ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় আজও অনেকের মনে আছে।

মলয় ঘোষ
কলকাতা-৯

পরিবেশ দূষণ প্রসঙ্গে

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত সমস্যাবলী বিগত কয়েক বৎসর ধরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে। শ্রীযুক্ত সমরজিৎ কর মহাশয় সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় (৯-৬-৭৯) এ ব্যাপারে যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন—তা খুবই সময়ানুগ। ভারতবর্ষে পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা করবার জন্য যদিও সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তবু এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সরকার ও জনসাধারণের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া কোন ফলপ্রসু সমাধানই সম্ভব নয়। এদিক থেকে সমরজিৎবাবুর প্রস্তাবিত উদ্যোগসমূহ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

'৭৫ সালের ডিসেম্বর নাগাত 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত ডঃ বি ডি নাগচৌধুরীর এক সাক্ষাৎকারে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত সমস্যাবলী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কলকাতা এবং তার আশপাশের গবেষণাগারগুলির মিলিতভাবে এক সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ডঃ নাগচৌধুরীর প্রস্তাবিত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন আর লক্ষ করা গেল না। সম্ভবত সমরজিৎবাবুর প্রস্তাবসমূহ কার্যকরী হলে এ ধরনের কর্মসূচীর বাস্তবায়ন কিছুটা সহজতর হয়ে উঠত।। কিন্তু তার আগেও প্রয়োজন বিশেষ প্রচার ব্যবস্থার—যা অতি সম্প্রতি ডঃ নাগচৌধুরী আবার মন্তব্য করেছেন।

মানিক চক্রবর্তী
গয়েশপুর, নদীয়া।

প্রকাশিত হল

সমরেশ বসুর

বলিষ্ঠ উপন্যাস

অপদার্থ দাম ৬·০০

সেই এক সময় যখন জরুরী অবস্থার নামে সারা দেশ জুড়ে চলেছে একক পার্টির ফ্যাসিস্টসুলভ নির্যাতন। সেই নির্যাতন চোখের সামনে দেখেও যারা অসহায় অক্ষমতার ক্লীব হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জয় তাদেরই একজন। কর্মহীন যুবক জয়—বিভ্রান্ত, তবু সৎ থাকার চেষ্টা করেছে। থাকতে চেয়েছে নিরাপদ দূরত্বে।

কিন্তু পারেনি। সে জড়িয়ে পড়েছে জটিল এক সংকটের আবর্তে। এক বিবাহিতা রমণীর সান্নিধ্যে এসে জয় হয়ে ওঠে তাৎক্ষণিক মোহের শিকার। বন্ধ্যা বলে প্রচারিত সেই রমণী যে আদৌ বন্ধ্যা নয়, জয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। তখনই ঘনিয়ে এল সংকটের মুহূর্ত। আপাতভাবে যাকে মনে হয়েছিল ক্লীব, সন্ত্রস্ত, ভীত এবং অপদার্থ—সেই জয়ই হয়ে উঠল বিদ্রোহী, প্রতিবাদে মুখর।

জয়-এর এই উত্তরণের মধ্য দিয়েই ক্লীবত্ব থেকে বীরত্বে উত্তীর্ণ হবার এক দুর্মর কৌতূহলকর বলিষ্ঠ কাহিনী শুনিয়েছেন সমরেশ বসু। জয়-এর সংকট আসলে যে কোনো একক ব্যক্তির সংকট নয়, এই সমাজ ও সময়েরই এক গভীরতর সংকট—তা অতি সূক্ষ্মভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের

চাঞ্চল্যকর নেপথ্যকাহিনী

মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র দাম ৮·০০

বাংলাদেশের ফৌজী সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ এই গ্রন্থে সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত শুনিয়েছেন এক নৃশংস নাটকের দারুণ চাঞ্চল্যকর নেপথ্যকাহিনী। কেন খুন হলেন মুজিব? কারা লিপ্ত ছিল এই চক্রান্তে? মুজিব নিজেও কি কিছুটা দায়ী এই চূড়ান্ত পরিস্থিতির জন্য? নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কেন খোন্দকার মোস্তাক আহমদ ষড়যন্ত্র করেছিলেন স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিরুদ্ধে? কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেল কীভাবে সাহায্য করেছিলেন তাকে? এখন বাংলাদেশের অবস্থাই বা কী? এমন বহু প্রশ্নের উত্তর এই বই। একদিকে মুজিব হত্যার পশ্চাৎপট ও ঘাতকদের সনাক্তকরণ, অন্যদিকে বাংলাদেশের পূর্বাপর রাজনীতির গতিপ্রকৃতির এক নিখুঁত বিশ্লেষণ 'মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র' গ্রন্থে। এই লেখকেরই আরেকটি চাঞ্চল্যকর বই সিদ্ধার্থশংকর: সিদ্ধি ও নির্বাণ (দাম ৬·০০)। মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসে কীভাবে রাজত্ব চালিয়ে গেলেন সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং শেষ পর্যন্ত কোন্ মোক্ষ লাভ করেছিলেন তারই অন্তরঙ্গ কাহিনী বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্ঘাটন করে এই গ্রন্থে শুনিয়েছেন তিনি।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে
আনন্দ-উপহার

১৯৭৯—আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। এই বিশেষ বৎসরটিকে শিশু ও কিশোরদের কাছে স্মরণীয় করে তোলার জন্য ছোটদের বইয়ের অগ্রণী প্রকাশক হিসেবে আনন্দ পাবলিশার্স-এর পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে কিছু অভিনব ও আকর্ষণীয় পরিকল্পনা। তার বিস্তারিত পরিচয় ক্রমশ প্রকাশ্য।

অগ্রগণ্য লেখকদের সেরা কিশোর সাহিত্য-সম্ভার যাতে সুলভে এবং ঝলমলে চেহারায় ছোটদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে-বিষয়ে প্রথমাবধি প্রযত্নবান আনন্দ পাবলিশার্স। এ-বছর আরও ব্যাপক ও সামগ্রিক করে তোলা হয়েছে এই লক্ষ্যকে। অনেক নতুন-নতুন বই বেরুচ্ছে, হরেক মন-মাতানো চেহারায়। এর মধ্যেই হৈ-হৈ করে বেরিয়ে পড়েছে সত্যজিৎ রায়ের নতুন ফেলুদা-কাহিনী 'গোরস্থানে সাবধান', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়া আর বিমল দাসের ছবি নিয়ে 'দাদা বাধ', অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর যুগল কাহিনী 'শাদা ঘোড়া' এবং শৈলেন ঘোষের অপরূপ রূপকথা 'আজব বাঘের আজগুবি।' এই সবে শুরু। এ-ছাড়াও—

সমরেশ মজুমদারের

সমাদৃত উপন্যাস

দৌড় দাম ৭·০০

ঘোড়দৌড়ের মাঠ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গণিকার পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাট, সমাজের প্রতিপত্তিশালী মহলের স্খলিত জীবনযাত্রা, আধুনিক ছেলেমেয়েদের প্রেম-প্রেম খেলা—এ-সব যেমন নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে, তেমনই মধ্যবিত্ত জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছনোর আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-যন্ত্রণাময় দৌড়েরও এক অনুপম ছবি ফুটিয়েছেন তরুণ লেখক সমরেশ মজুমদার তাঁর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাসে। চলচ্চিত্রে রূপায়িত।

একটি অপরিহার্য বই

শিবকালী ভট্টাচার্যের

ভারতীয় ভেষজবিষয়ক গ্রন্থ

চিরঞ্জীব বনৌষধি

তিন খণ্ডে প্রকাশিত।
প্রতি খণ্ড ২৫·০০ টাকা
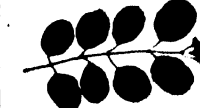
অথর্ব বেদের যুগ থেকে শুরু করে সংহিতার যুগ পেরিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় বনৌষধি-সমূহের সাড়ে তিন হাজার বছরের সমীক্ষা এই গ্রন্থে। বইটির প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয় খণ্ড দ্রুত পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। ৫০ টাকা অগ্রিম পাঠালে ১ম ও ৩য় খণ্ড রেজিস্ট্রি ডাকে বিনা ডাকখরচে পাঠানো হবে। অগ্রিম ছাড়া কোনও বই ভিপি-তে পাঠানো হয় না। যে কোনও এক খণ্ড নিলে

প্রকাশিত হল

শৈলেন ঘোষের

আজব রূপকথা

আজব বাঘের আজগুবি

দাম ৭·০০

বাঘ কি কখনো গল্প বলে মানুষের মতো? সব বাঘ বলে কিনা জানি না, কিন্তু একটা বাঘকে জানি যে আমাদের শুনিয়েছে তার আশ্চর্য জীবনের অবাক-করা এক গল্প। হ্যাঁ, সেই গল্পের নামই 'আজব বাঘে আজগুবি'। বাঘটা আজব বই কি! গল্প বলে, বেহালা বাজায়, আরও কতসব অদ্ভু অদ্ভুত কাণ্ড করে। কিন্তু ত বলে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তার গল্পকে
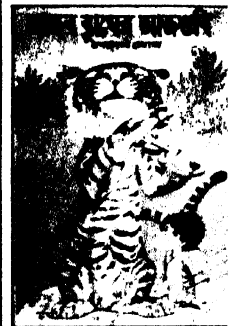
আসলে বাঘও তো একটা জীব, যার বাবা আছে, মা আছে, ঠাক... আছে। আমর কি তা... খবর জানি? কিন্তু আজব এই বাঘটা যখ নিজেই গল্প শোনালো তার নিজের জীবনের, তখন আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। সে কি সুন্দর গল্প কী বলব। আজব বাঘের সঙ্গে দেখা হল এক ছোট্ট ছেলের যে ওই বাঘের মতোই দুঃখী। ছেলেটার বাবাকে আটকে রেখেছে এক দস্যু-সর্দার, রাজত্ব নিয়েছে কেড়ে। সেই ছেলেটা আর এ আজব বাঘটা হঠাৎ বন্ধু হয়ে গেল। তারপর তারা দুজনে মিলে কী করে মে ফেলল সেই দস্যু সর্দারকে, আর কী করেই বা ফিরে পেল হারানো রাজত্ব সেই কাহিনীই লিখেছেন এ-কালের রূপকথার জাদুক শৈলেন ঘোষ তাঁর এই নতুন বইতে।

দেশ ৪৬ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা
৫ শ্রাবণ ১৩৮৬

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : মার্ক শাগালের আঁকা ভাস অঞ্চলের আশপাশ (১৯৫৫) তৈলচিত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ
আসন্ন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ, ভারতে
সন্তু সেনগুপ্তের গল্প
কলকাতা কসমস
সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের গল্প
লাঠি

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

বিক্ষুব্ধ আরক্ষা, কঠোর সরকার

স্বাধীন ভারতের বিগত বত্রিশ বছরের জীবনে যে অবাঞ্ছিত ঘটনার অভিসংকেত কখনও দেখা দেয়নি অথবা দেখা দিতে পারেনি, এই বৎসরের মে-জুন মাসে সারা দেশে পুলিস কর্মীর এবং আরক্ষার আধা-সামরিক বিভিন্ন সংস্থার বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদের অজস্র ঘটনাতে তারই প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। প্রতিরক্ষার মতো আরক্ষা তথা পুলিসও জাতীয় নিরাপত্তার একটি বৃহৎ অঙ্গীকার। ভারতীয় আরক্ষার ক্ষেত্রে এমন একাধিক বিভাগীয় সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়, যে-সংগঠন জনজীবনের শান্তিরক্ষা ছাড়াও প্রতিরক্ষার অনুরূপ নানা কর্তব্য প্রতিপালিত করে। ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী তার বিভাগীয় পরিচয়ে পুলিস বলে অভিহিত। কিন্তু তার প্রাত্যহিক কর্তব্য বস্তুত প্রতিরক্ষামূলক কর্তব্যের একটি প্রাত্যহিক সক্রিয়তার নিত্য-নিয়োজিত অনুষ্ঠান, যদিও অসামরিক প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় বিবিধ আরক্ষার কাজও তাদের করতে হয়। এই সহজ ও সরল সত্যের উল্লেখ হিসেবে বলতে পারা যায় যে, পুলিসের এইসব সশস্ত্র সংগঠন রাষ্ট্রিক ও জাতিক জীবনের রক্ষাবিধায়ক একটি সশস্ত্র শক্তি। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিস, যাদের জনবলের সংখ্যাগত হিসাব খুব সামান্য নয়, মোট পঁচাত্তর হাজার সশস্ত্র কর্মীর মোট আটাত্তরটি ব্যাটেলিয়ান। কেন্দ্রীয় শিল্প-নিরাপত্তার রক্ষাকারী পুলিসের সংখ্যা চল্লিশ হাজার। এছাড়া আরও যারা কেন্দ্রীয় উদ্যোগে সংগঠিত, তাদের মধ্যে আছে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী, রেলওয়ের রক্ষা বাহিনী ইত্যাদি। রাজ্যের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে সংগঠিত এবং রাজ্য সরকারের পরিচালনায় অনুগত আরও অনেক ছোট-বড় সশস্ত্র আরক্ষা তথা পুলিসী সংগঠন সারা দেশের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই আছে।

জাতীয় অদৃষ্টের পক্ষে অত্যন্ত বিপর্যয়মূলক পরিণামের অভিসংকেত এই যে, প্রতিরক্ষার সশস্ত্র বাহিনী দুটি আরক্ষ বাহিনীর উপর গুলিচালনা করেছে। বোকারোতে এইরকম একটি সংঘর্ষের ঘটনাতে পঁচিশ জন কেন্দ্রীয় পুলিসের শিল্প-নিরাপত্তা জওয়ান মৃত্যুবরণ করেছে। একজন সেনা অফিসার সেনাবাহিনীর দুজন জওয়ান এবং একজন হোমগার্ডের প্রাণ গিয়েছে। দিল্লিতে সেনাবাহিনীর গুলিচালনায় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিসের তিনজন জওয়ান মারা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু অদ্ভুত রকমের এক আত্মপ্রসন্নতায় অভিভূত হয়ে রয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীপ্যাটেল এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, উভয়েরই উক্তি নানারকমের স্থূল মন্তব্যে আকীর্ণ হয়ে দেশবাসীর দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়েছে। উভয়েরই বক্তব্য : সশস্ত্র পুলিসের বিক্ষোভ, হরতাল, প্রতিবাদ ও উদ্ধত দাবি কঠোর হাতে দমন করা হবে, এবং আরক্ষার বিভিন্ন বাহিনী সমস্ত বিক্ষোভ বর্জন না করলে তাদের দাবির কোন কথা বিবেচনা কিংবা আলোচনা করা হবে না। দেশের মানুষ ভেবে আশ্চর্য হবে এবং উদ্বেগও বোধ করবে যে, সাংঘাতিক লক্ষণযুক্ত ঘটনাকে সরকারী কর্তামহাশয়েরা অত্যন্ত শিথিল চিন্তা দিয়ে বিচার করছেন।

সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর আচরণে এখনও কোন বিক্ষোভ প্রকট হয়নি। রেলওয়ে রক্ষা বাহিনীতে বিক্ষোভ বিলোড়িত হতে শুরু করেছে। পাঞ্জাবে সাধারণ পুলিসের দাবি ও প্রতিবাদের একটি আন্দোলন রূপে যে ঘটনার প্রথম সঞ্চার দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, যেন সেই ঘটনারই সূত্র ধরে ভারতের বিভিন্ন বিভাগীয় আরক্ষা বাহিনীর প্রতিবাদ বস্তুত এক ধরনের অভ্যুত্থানের ভঙ্গীতে ব্যাপক এক পরিদৃশ্য সৃষ্টি করেছে। প্রশাসনিক কর্তৃত্বের আচরণে এই অবস্থার সম্মুখীন হবার মতো শান্ত বিচারবুদ্ধির কোন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যে প্রায় সেই নিদারুণ ব্রিটিশ মনোবৃত্তির এক জেনারেল ডায়ারের ভাষা উচ্চারিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা চলে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই সি-আর-পি'র দুইটি ব্যাটেলিয়নকে ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন।

নিয়ম ও শৃঙ্খলার নৈষ্ঠিক ভক্ত হতে হলেও কিন্তু আরক্ষা বাহিনীর মর্যাদার উপর প্রতিরক্ষার গুলিবর্ষণ করবার কোন প্রয়োজন হয় না। দেশের ও জনজীবনের সম্পর্কে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী অবশ্যই কামনা করবে যে, আরক্ষার বিক্ষুব্ধ জওয়ানেরা শান্তি ও শৃঙ্খলার পথ বর্জন করবেন না, এবং সরকারকে তাঁদের স্বার্থের সকল দাবির বিচার নিষ্পন্ন করবার সুযোগ দেবার মতো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু সন্দেহ হয়, সরকারের উত্তেজিত মনোভাব ঘটনার ক্ষেত্রে উত্তেজনারই মাত্রা বাড়িয়ে তুলবে। এর স্বাভাবিক প্রতিফল খুবই ভয়াবহরূপে দেখা দেবে বলে আশঙ্কা হয়। স্মরণ করতে হয়, আসাম রাইফেলস পুলিস বিভাগের বাহিনী হয়েও চীনা আক্রমণের সময় নেফার ওয়ালং রণাঙ্গণে শত্রুকে সার্থক রকমে প্রতিহত করার কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় পেশোয়ারে গাড়োয়াল রেজিমেন্ট সত্যাগ্রহী মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করবার নির্দেশ অমান্য করেছিল, ব্রিটিশ সরকার কিন্তু এই ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সাবধান হয়েছিলেন। ভারতীয় সেনা-বাহিনীকে দিয়ে সত্যাগ্রহী জনতার উপর গুলিচালনা করবার রীতি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

করতেন। কলকাতা থেকে সঙ্গে করে প্রচুর উপহার সামগ্রী নিয়ে যেতেন।

পুত্রের আরোগ্য কামনায় জোড়া দুর্গোৎসব এবং প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়ে "রাজরাজেশ্বরী" পুজো অনুষ্ঠান করে অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত রেখে যান। সকল কর্মের মধ্যেই রাজেন্দ্রনাথের একটি স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হত। সাধারণ লোকে যে কাজ যেভাবে করত উনি সচরাচর তা করতে ভালবাসতেন না। সর্বদা মনে করতেন, "নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।"

উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন এই ব্যক্তিটি গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলের প্রতি তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের তীব্র রশ্মি বিকীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরস্পরের কোনও প্রকার বিরুদ্ধ মনোভাব হলেই উভয় পক্ষই তাঁর শরণাপন্ন হতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে দুই পক্ষকেই নতি স্বীকার করতে হত।

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে দুটি চমকপ্রদ কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ না করে পারছি না।

রাজেন্দ্রনাথ তখন মুলাজোড় সংস্কৃত টোলের শিক্ষক। বহুদিনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার মানসে তিনি একদিন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দর্শন লাভের জন্য তাঁর বাদুড়বাগানের বাড়িতে গেলেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে কথোপকথন হয়ঃ—

বিদ্যাসাগর—কি চাও তুমি? কি জন্য আসা হয়েছে?

রাজেন্দ্রনাথ—(সোজা জবাব) কোনও কাজের জন্য আসিনি। আপনাকে দেখতে এসেছি।

বিদ্যাসাগর এই জবাবে অতিশয় বিরক্ত হলেন। বললেন ঃ

দেখ বাপু, আমাদের বাঙালীদের এই একটা মহা দোষ। আসবে ত একটা কাজ আদায় করতে, কিন্তু সে কথাটা প্রথমেই কিছুতেই খুলে বলবে না। নানান্ কুশলাদি প্রশ্নের ভান করে, নানান্ রকম আজে বাজে কথা বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করে ঠিক যাবার মুহূর্তে বলবে, দেখুন আমার এই কাজটা যদি দয়া করে করে দেন, তা'হলে বিশেষ উপকৃত হই, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বাপু, কথাটা হচ্ছে তা' না করে সে যদি প্রথমেই তার প্রয়োজনের কথাটা খুলে বলে তা হলে, পারলে আমি করেই দিতাম। নয়ত না পারলে সোজাসুজি বলতাম, না বাপু, পারলাম না। ব্যাপারটা কত সহজে কয়েক মিনিটেই মিটে যেত। অনর্থক আমার সময় নষ্ট হত না। নাও, এখন তুমি বলো ত বাপু, কি জন্য এসেছ আমার কাছে? কি তোমার প্রয়োজন?

—বললাম ত, কোনও প্রয়োজনে আসিনি। এসেছি আপনাকে চাক্ষুষ একবার দেখে যেতে।

মৃদু ধমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। বললেন,—ফের আজে বাজে কথা বলছ? কি করা হয় তোমার?

—আজ্ঞে, আমি মুলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক।

—অধ্যাপক! বলি, বয়স কত হে তোমার ছোক্‌রা?

—আজ্ঞে, আঠার বৎসর।

—মাত্র আঠার বৎসর! এই বয়সে অধ্যাপক! কিন্তু একজন অধ্যাপকের ত সত্যের অপলাপ করা সাজে না, বাপু। এখন চট্‌পট্ তোমার প্রয়োজনের কথাটা বলে ফেলে আমাকে রেহাই দিয়ে বিদেয় হও ত দেখি। আমার অনেক কাজ আছে।

রাজেন্দ্রনাথ নত হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর একবার পদধূলি গ্রহণ করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন,

—আপনি যখন আমার কথা বিশ্বাসই করছেন না তখন আমি কিই বা করতে পারি বলুন? ঠিক আছে, আমার দেখা হয়ে গিয়েছে, আমি বরং এখন আসি।

এই কথা বলে তিনি পিছন ফিরে গমনোদ্যত হতেই শশব্যস্ত বিদ্যাসাগর বলে উঠলেন ঃ

—আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ? ও বাবা? এ যে দেখি বাচ্চা কেউটে—একেবারে কুলোপানা চক্কর! আবার ফোঁস্ করতেও জানে!

রাজেন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন। বিদ্যাসাগর বললেন,

বিনা প্রয়োজনে আমার কাছে কেউ ত কোনওদিন আসেনি। তুমি আমার জীবনে প্রথম এলে—যার কোনও স্বার্থ নেই, শুধুই দেখতে এসেছ।

বলতে বলতে বিদ্যার সাগর—সেই দয়ার সাগরের চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। তারপর তিনি কোমল মধুর স্বরে বললেন ঃ

—নাও, স্নানের জন্য তৈরী হও—আমার সঙ্গে এখানে আজ তোমাকে একেবারে আহারাদি সেরে যেতে হবে।

এই কথার পর রাজেন্দ্রনাথের আর কোনও আপত্তিই টিকল না। ধোপদুরস্ত নতুন ধোয়া তাঁতের ধুতি ও একজোড়া চাদর বের করে তিনি রাজেন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে জোর করেই তাঁকে স্নানের জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন।

স্নান সেরে এসে তিনি দেখলেন দুটি সুদৃশ্য কার্পেটের আসনে পাশাপাশি খাবার জায়গা। সামনে দুখানি রুপোর থালায় পরিপাটি করে সুগন্ধি মিহি চালের ভাত বাড়া। রুপোর গেলাসে ঢাকা-চাপা জল এবং থালার চতুর্দিকে রুপোর বাটীতে বিভিন্ন প্রকারের ব্যঞ্জনাদি।

গল্পের মধ্যে আহার পর্ব সমাধা হল। সমস্ত দ্বিপ্রহরটাই কেটে গেল খোশগল্পের মধ্যে দিয়ে। অপরাহ্নে একটি ভাড়াটে গাড়ী আনিয়ে দিলেন এবং তার ভাড়া বাবদ রাজেন্দ্রনাথের হাতে কিছু অর্থ দিলেন। ইতিমধ্যে লোকজন সেই রৌপ্য নির্মিত তৈজস পত্রাদি সামান নিয়ে এল। উনি দুটি প্রস্থই একটি বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে রাজেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন ঃ —এই সবই তুমি নিয়ে যাও।

রাজেন্দ্রনাথ প্রবল বেগে মস্তক সঞ্চালন করে বললেন ঃ

—দেখুন, আমি ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নই। —কোনও দান আমি গ্রহণ করি না।

এই কথায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বিদ্যাসাগর বললেন ঃ

—দেখ বাবা, আমি তোমার পিতৃতুল্য। পিতার কাছ থেকে স্নেহের উপহারকে দান বলে অবজ্ঞা করার মত নিষ্ঠুর বুদ্ধি তোমায় কে দিয়েছে? তুমি নিতান্তই বালক! ছিঃ! এ সব যদি তুমি প্রত্যাখ্যান কর, তা'হলে আমি অতিশয় ব্যথা পাব। তুমি কি আমাকে অতখানি ব্যথা দেবে?

তখন লজ্জিত হয়ে রাজেন্দ্রনাথ সেই সব উপহার সামগ্রী এবং ধুতি ও উত্তরীয় সমেত তাঁরই গাড়ীতে ভাড়াটে বাড়ী ফিরলেন।

পরবর্তী কালে বহুদিন পর্যন্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশীর্বাদপূত সেই উত্তরীয়খানি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। মধ্যে মধ্যে গায়ে দিয়ে শিশু, কন্যাদের দেখিয়ে বলতেন—এটা কার জানিস্? তোদের 'বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগের' যে বিদ্যাসাগর—এটা তাঁরই দেওয়া। এটা গায়ে দিলে আমি পিতৃস্নেহ অনুভব করি।

বলতে গিয়ে তাঁর চোখ দুটি সজল হয়ে উঠত।

তেজস্বী পুরুষ রাজেন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন। জাতীয়তাবাদ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। ইংরেজদের তিনি ঘৃণা করতেন না বরং তাঁদের গুণমুগ্ধই ছিলেন। যদিও পরে এই ইংরেজদের কর্তৃত্ব মানবেন না বলেই অসময়ে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ওঁদের নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি গুণাবলীর সর্বদাই প্রশংসা করতেন। কিন্তু অন্যায় তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। একবার বালীগঞ্জ থেকে শিয়ালদহগামী ট্রেনের কামরায় একটি সাহেবকে জুতাসুদ্ধ আসনের উপর পা তুলে বসে থাকতে দেখে হাতের নিত্যসঙ্গী লাঠিটি দিয়ে সজোরে আঘাত করে প্রতিবাদ করেছিলেন।

আরেকবার এক ইংরেজ রেল কর্মচারী তাঁর পুত্রকে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট থাকা সত্ত্বেও শৌচাগার ব্যবহার করতে দেয়নি।

ব্যস্! রাজেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ আদালতে নালিশ ঠুকে দিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই ইংরেজ জেণ্টল্‌ম্যান্ একটা আনকোয়ালিফায়েড আপলজি লিখে দিয়ে

উত্তর কলকাতার বাস উঠিয়ে ১৯১১-১২ সালে তিনি বালীগঞ্জ শহরতলীতে কাঁকুলিয়া রোডে নতুন গৃহনির্মাণ করে নাম দেন, "সারস্বত কুটীর"। সার্থক নামকরণ হল। গ্রাম্য পরিবেশে ভারতীর সাধনাপীঠ গৃহটি সর্বদাই শাস্ত্র-সঙ্গীতে, কাব্যে-আবৃত্তিতে, অভিনয়ে ও বক্তৃতায় মুখর হয়ে থাকত। কান্তকবির দেহতত্ত্বের অতুলনীয় ভক্তিগীতি, স্বদেশপ্রীতির নিদর্শন দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দীপনাময় জাতীয় সঙ্গীত, কবিগুরুর কাব্য ও ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতির দ্বারা সারস্বত কুটীরের প্রতিটি কক্ষ সদাই মন্দ্রিত ও আনন্দ মুখরিত হত। সেই যুগে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার মতন সংস্কৃতিসম্পন্ন গৃহস্থ ওই অঞ্চলে খুব কমই ছিল, চৌদ্দ নম্বর কাঁকুলিয়া রোড ছিল এর ব্যতিক্রম। আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও অতিথিদের সমাগমে প্রাণচঞ্চল ওই গৃহাঙ্গণটি সকলকেই আকৃষ্ট করত!

নিজে বাসগৃহ নির্মাণ করে অন্যান্য বন্ধুবর্গকেও সেই পল্লীতে বসবাস করতে উৎসাহ দিতে লাগলেন। এইভাবে দৌলতপুর কলেজ ও ব্রজলাল হিন্দু অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত ব্রজলাল শাস্ত্রী এবং মূকবধির বিশেষজ্ঞ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজ পল্লীতে নিয়ে আসেন। গৃহনির্মাণের পর পল্লী সংস্কারে মন দিলেন। কাঁচা রাস্তা পাকা হল রাস্তার ধারে ধারে গ্যাসের বাতি জ্বলল, ডাকঘর তৈরী হল। মশা আর ম্যালেরিয়া দূরীকরণের উদ্দেশ্যে 'ওয়ার্ড হেলথ্ অ্যাসোসিয়েশান' নামে একটি সংস্থা গঠন করলেন। রেললাইনের অপর পারে ঢাকুরিয়া পল্লীর দিকেও তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন, "ঢাকুরিয়া পাবলিক্ লাইব্রেরী।"

জনদরদী রাজেন্দ্রনাথ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করার সংকল্প নিয়ে এবার ঐ পল্লীর জমিদার ধনী ব্যক্তি জগবন্ধু রায়ের শরণাপন্ন হলেন এবং প্রতিষ্ঠা হল 'জগবন্ধু বিদ্যালয়ের'। স্বনামধন্য পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তিনি বিদ্যালয়ের কার্য-ভার গ্রহণ করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পণ্ডিত মুরলীধরেরই পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা বিবাহ করে সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে একটি অনন্য ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পর রাজেন্দ্রনাথ নিজের পুত্রগণকে অন্য বিদ্যালয় থেকে নাম কাটিয়ে এনে নতুন বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। তাঁর অনুসৃত "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও" নীতি দেখবার পর অন্যান্য বন্ধুবান্ধবরাও পুত্রদের ছাড়িয়ে এনে এই স্কুলে ভর্তি করলেন। এই সঙ্গে "শীতলা চতুষ্পাঠী" নামে একটি টোলও স্থাপিত হল। ভারতবিখ্যাত কর্মবীর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন সুবিখ্যাত আইনজীবী স্যার আশুতোষ চৌধুরী। ১৯১৬ সালে এই বিদ্যালয়ের ম্যানেজমেণ্টের মধ্যে একটি গোলযোগের সূত্রপাত হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবার অদম্য ক্ষমতা নিয়ে রাজেন্দ্রনাথ তখন অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে, বিদ্যালয়টিকে উদ্ধার করেন।

এই প্রসঙ্গে বিদগ্ধ মুরলীধরের সুযোগ্য পুত্র ও রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য যশস্বী ডক্টর হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"সেই দুর্দিনে যিনি বিদ্যালয়টিকে দুর্ভাগ্য হ'তে মুক্ত করে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা করেছিলেন তিনি রাজেন্দ্রনাথ। এটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অধ্যাপক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।......তাঁর গ্রন্থাবলী বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।"

রাজেন্দ্রনাথের নামকরণপ্রীতি সর্বজনবিদিত ছিল। নিজের সন্তানের প্রত্যেককে বিভিন্ন নামে ডাকতেন। পল্লীর পিতৃদত্ত নাম বদলিয়ে তিনি নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখলেন, "রাজলক্ষ্মী।"

স্যার আশুতোষ যে আজ বিখ্যাত 'বাংলার বাঘ' বা 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার' সেটি রাজেন্দ্রনাথেরই উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। এই সম্বন্ধে স্বনামধন্য অধ্যাপক রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "আশুতোষ স্মৃতি কথা" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ—

গিয়াছে।......একদিন আমি ও অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ ট্রামে যাইতেছিলাম। অনতিদূরে আশুতোষকে দেখিবামাত্র বিদ্যাভূষণ হর্ষোজ্জ্বল চক্ষে অঙ্গুলী নির্দেশপূর্বক বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ বাঘ, (the tiger!)'......ইহার পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে ও যেখানে সেখানে আশুতোষকে 'টাইগার' বলিয়া উল্লেখ করিতেন।"

এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র রাজেন্দ্রনাথের চরিত্র সম্বন্ধে অন্য একটি গ্রন্থে লিখেছেন :—

"রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তুলনা নাই, ইনি পণ্ডিতোচিত সাজসজ্জায় খড়কুটার মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নি, ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া ইঁহাকে উপেক্ষা করা চলে না। ইঁহাকে রাগাইলে ইঁহার পণ্ডিতী মুরুকচ্ছ মল্লবেশে পরিণত হন এবং খগের কলম শানিত তরবারির আকার ধারণ করে। এত বড় জেদী লোক বিলাতফেরতদের মধ্যেও দুর্লভ। কিন্তু যাঁহারা ইঁহার বন্ধুত্বের অভিমানী, তাঁহারা জানেন ইঁহার প্রাণটি ভীম নাগের সন্দেশের ন্যায় মিষ্ট।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজেন্দ্রনাথকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করতেন। রাজেন্দ্রনাথও হরপ্রসাদকে অগ্রজের সম্মান ও শ্রদ্ধা দিতে কার্পণ্য করতেন না।

হরপ্রসাদের একমাত্র জীবিতপুত্র শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও দুজনের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরতা ছিল। হরপ্রসাদের 'মেঘদূত' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"...যাঁহার উৎসাহে আমার এ ব্যাখ্যা লেখার প্রবৃত্তি তিনি...উৎসর্গ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, আপনার নাম প্রকাশ করিতেও দিলেন না...।"

(সত্যজিৎ চৌধুরী—নৈহাটি কলেজ)।

সমবেত ছবি (বাঁ দিক থেকে) : স্যার আশুতোষের তৃতীয় পুত্র উমাপ্রসাদ, রাজেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সতীশচন্দ্র বোস, আশুতোষের মধ্যমপুত্র শ্যামাপ্রসাদ; রাজেন্দ্রনাথ, আশুতোষের কনিষ্ঠ পুত্র বামাপ্রসাদ, আশুতোষের জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদের শিশুকন্যা (শৈশবে মৃতা)। ছবিটি ১৯২৫ সালে স্যার আশুতোষের মধুপুরের বাড়িতে তোলা

অপরপক্ষে রাজেন্দ্রনাথ তাঁর 'কালিদাস ও ভবভূতি' গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, "...যাঁহার উপদেশ ব্যতীত এই গ্রন্থ কদাচ লিখিতে পারিতাম না, যাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য, তিনি ইহাতে তাঁহার নাম সংযোগ করিতে দিলেন না ইত্যাদি...।"

উভয়ের এই অকৃত্রিম স্নেহের সম্পর্ক কিন্তু স্থায়ী হয়নি। স্যার আশুতোষের বিধবা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তৎকালীন রক্ষণশীল পণ্ডিতবর্গের মনোমালিন্য ঘটে। এই কারণেই হরপ্রসাদ চিরশত্রু হয়ে গেলেন। যার ফলে রাজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের সকল বিভাগে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও কোনও দিনই 'মহামহোপাধ্যায়' হতে পারেননি। ঐ উপাধির জন্য নাম সুপারিশ করা হলেই 'রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিত নন' বলে হরপ্রসাদ বাধা দিতেন। অথচ উনিই সস্নেহে একদা অনুজোপম এই পণ্ডিতকে সংস্কৃত কলেজে আহ্বান করে এনে 'স্মৃতিশাস্ত্র' পরীক্ষা দেওয়ান এবং ঐ বিভাগের অধ্যাপকপদটিতে রাজেন্দ্রনাথকে অধিষ্ঠিত করেন। বিচিত্র মানবচরিত্র!

তৎকালীন ডি, পি আই-এর ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত নিদারুণ অপমানের বোঝা মস্তকে ধারণ করে তাঁকে সুদূর চট্টগ্রামে যেতে হয় সেকথা আগেই বলা হয়েছে। যুগটা ছিল বৃটিশ সরকারের যুগ এবং কর্তৃপক্ষ ছিলেন ইংরেজ। চট্টগ্রামে কাজে যোগদান করেই তিনি পদত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। রাজেন্দ্রনাথের মতন একরোখা জেদী লোকের পক্ষে এইটাই সম্ভব! তাঁর কর্মক্ষেত্র শুধু ত সংস্কৃত কলেজেই নিবদ্ধ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ প্রতিষ্ঠা হলে স্যার আশুতোষ অনেক অধ্যাপকদেরই ঐ বিভাগে নিয়ে আসেন। রাজেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম ছিলেন। এই সময়ে তাঁর রচিত বহুল প্রশংসিত গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানি, যেমন :— কালিদাস ও ভবভূতি, শ্রীকণ্ঠ, পিতৃহারা ও তপোবন প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্য ছিল। এবং তাঁর প্রণীত 'পদ্য-পুষ্পাঞ্জলি', 'সাহিত্য-পুষ্পাঞ্জলি' ও 'প্রবন্ধ-পুষ্পাঞ্জলি' সংকলন গ্রন্থ তিনটি বিদ্যালয়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য ছিল।

রাজেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রশ্নকর্তা এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। সমস্ত বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠান থেকে একযোগে নিজেকে একেবারে সরিয়ে আনলেন। ইচ্ছা করলে বিবিধ উপায়ে তিনি অর্থোপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু 'ভারতী' বংশীয় এই সত্যনিষ্ঠ পণ্ডিত অধ্যাপক ভারতীয় সাধনা ছেড়ে লক্ষ্মীর উপাসনা করতে কোনও দিনই পারেননি।

স্যার আশুতোষের সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথের হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত ছিল। স্যার আশুতোষ তাঁকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখতেন। এই কারণে পরশ্রীকাতর ঈর্ষাপরায়ণ বহু ব্যক্তিরই কটূক্তি তাঁকে সহ্য করতে হত। উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন রাজেন্দ্রনাথ এই সকল হীনতার অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। আশুতোষের পুত্রকন্যাদেরও তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিশেষত মধ্যমপুত্র শ্যামাপ্রসাদ তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। রমাপ্রসাদকে ডাকতেন 'যুধিষ্ঠির', শ্যামাপ্রসাদকে 'ভীমসেন'। রমাপ্রসাদের বিবাহের পর নববধূর নাম "তারা" শুনে রসিক রাজেন্দ্রনাথ সানন্দে বলে ওঠেন,—"খুব ভাল হ'ল। উঠতে বসতে 'মায়ের নাম' করে আত্মার উন্নতিসাধন করা যাবে।"

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯০৮ সালে আশুতোষের বিধবা কন্যার বিবাহ। পূর্বেই বলেছি সংস্কারমুক্ত উদারমতাবলম্বী রাজেন্দ্রনাথ সমস্ত রকম জনমত অগ্রাহ্য করে অকুতোভয়ে ও নির্দ্বিধায় স্যার আশুতোষের পাশে এসে দাঁড়ান। স্যার আশুতোষের মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাই তিনি বলেছিলেন—"প্রথম সন্তান কমলা দেবীই আশুতোষের জীবনে বুঝি তড়িৎরূপিণী ছিলেন। এই কন্যার জন্মকাল হইতেই আশুতোষের আত্মজীবনের সর্ববিধ শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত এবং ইঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষের সর্ববিধ অভ্যুদয়।"

"আশুতোষ এবং হরপ্রসাদের হৃদ্যতাও সর্বজনবিদিত ছিল। 'আশুতোষ'এর 'তোষ' যোগ করে শাস্ত্রী মশাই নিজেদের ছেলেদের নাম রাখেন, সন্তোষ, বিনয়তোষ, পরিতোষ ও কালীতোষ। এদিকে 'হরপ্রসাদের' 'প্রসাদ' নিয়ে আশুতোষ পুত্রদের নাম হয়—যথাক্রমে রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ ও বামাপ্রসাদ।"

(সত্যজিৎ চৌধুরী)।

যে কারণে রাজেন্দ্র-হরপ্রসাদ মধুর সম্পর্কটি ছিন্ন ... সুমধুর ঘনিষ্ঠতাটুকু লোপ পায়। অর্থাৎ আশুতোষ-কন্যা শ্রীমতী কমলাদেবীর পুনর্বিবাহ।

এই প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজেন্দ্র-হরপ্রসাদ ঘটিত মনোমালিন্য বিষয়ে সে যুগে অনেকেরই একটি ভুল ধারণা ছিল। অনেকেই মনে করতেন বিবাদের কারণ বুঝি রাজেন্দ্ররচিত "কালিদাস ও ভবভূতি" গ্রন্থের ভূমিকা। অর্থাৎ হরপ্রসাদের নিকট হতে সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও রাজেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে এই অগ্রজোপম পণ্ডিতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু এই গ্রন্থের মুখবন্ধটি পাঠ করে আমরা দেখতে পাই রাজেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই হরপ্রসাদের নামটি উহ্য রেখেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেননি।

দেখা যাচ্ছে বিবাদ গ্রন্থঘটিত একেবারেই নয়। পুনর্বিবাহঘটিত।

প্রবল প্রতাপান্বিত আত্মীয়োপম প্রিয়তম সুহৃদ আশুতোষের অকস্মাৎ মৃত্যুতে রাজেন্দ্রনাথ অন্তরে অন্তরে একেবারে ভেঙে পড়লেন। বাইরে অবশ্য তার প্রকাশ ছিল না। বজ্রের কঠোরতা দিয়েই বজ্রাঘাত তাঁকে সইতে হল। কিন্তু নিজেকে অতিশয় নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ মনে করতে লাগলেন।

এদিকে কর্মক্ষেত্রে তাঁর উপর দিয়ে প্রবল ঝটিকা প্রবাহ বয়ে গিয়েছে। অত্যধিক মানসিক অশান্তিতে জর্জরিত হলেও জীবনযুদ্ধে তিনি কখনও হার স্বীকার করবেন না। অধ্যয়নের তপশ্চর্যায় নিজেকে নিমগ্ন করে দেবেন। অধিক বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ইন্টারমিডিয়েট দেবেন স্থির করলেন।

কিন্তু প্রভঞ্জনের দ্বিতীয় আঘাত এসে তাঁকে প্রায় সমূলে উৎপাটিত করে ফেলল। সহধর্মিণী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী এই সময়ে (১৯২৬ খৃঃ) নিঃসহায় স্বামী এবং দশটি পুত্রকন্যা রেখে ইহলোক ত্যাগ করলেন।

রাজেন্দ্রনাথ যেমন অতিশয় আমোদপ্রিয়, সুরসিক, দয়ার্দ্রচিত্ত, উদার এবং কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, এক কথায়—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি' বলা যায়, রাজেন্দ্রপত্নী তেমনই অতিশয় কোমল, শান্ত, নিরহঙ্কারভাবের নারী ছিলেন। মারাত্মক ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র আট-দশ দিন

অরাজকতা সৃষ্টির মুখে আরও পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে দিচ্ছেন? তাঁরা কি নিজেদের অসহায় মনে করছেন? অথবা মনে করছেন সরকারে গিয়েই তাঁদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে, তাঁদের আর কিছু কর্তব্য নেই?

খুব একটা বিসদৃশ ঘটনা ঘটে গেল মরিচঝাঁপি নিয়ে। সরকার পক্ষও যেমন নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মত ভেসে বেড়ালেন, বিরোধীপক্ষের অবস্থাও ঠিক তাই। বিরোধী-পক্ষরাও ভুলে গেলেন যে, দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে আসাটা কোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকই সমর্থন করবেন না। আর সরকার পক্ষ সুবিধামত ভুলে গেলেন যে, তাঁদের এক মন্ত্রীর প্ররোচনার ফলেই দণ্ডকারণ্য ত্যাগ করার হিড়িক পড়ে যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিকান্দর বখ্ত্ নির্দিষ্টভাবে এই অভিযোগ প্রকাশ করেছেন। আর আমি শুনেছি যে, উড়িষ্যা সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গের এই মন্ত্রীর ভাষণ টেপ রেকর্ড করা আছে। ভাষণটিতে পুরোপুরি দণ্ডকারণ্য ত্যাগ করার প্ররোচনা আছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে এতেও অরাজকতা সৃষ্টির প্ররোচনা আছে। কারণ. এই মন্ত্রী এখনও বহাল তবিয়তে মন্ত্রিত্ব করছেন। এইসব বক্তৃতার ফলেই কি অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে? এ প্রশ্নের কি সদুত্তর আছে?

জুন মাসের সবচেয়ে বড় খবর যে, একজন ডি আই জি দার্জিলিং-এ রাজ্যপাল কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীকে প্রদত্ত নৈশভোজের সভায় দেরি করে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসে পড়েন। সেই সভায় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনিও উপস্থিত ছিলেন। প্রোটোকলে কি বলে জানি না. কিন্তু বাম ফ্রন্ট সরকারের দু বছর শাসনের ফলে যদি দু-একজন ডি আই জি এরকম করতে পারেন, তা হলে সাধারণ পুলিসকে অপবাদ দিয়ে লাভ কি?

আর ক্রমাগত যে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের কথা বলা হচ্ছে, তার পেছনে কি মনোভাব আছে? যাঁরা ক্রমাগত এইসব ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের কথা তুলছেন, তাঁরা কি মনে করছেন যে, সব-রকম সমালোচনা আর সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করে দিলেই দেশের কল্যাণ হবে? আর তখনই হবে জনসাধারণের সত্যিকারের দরদী রাজ্য? নির্ভীক, আদর্শবাদী সরকার সমালোচনা এবং সংবাদ পরিবেশনে ভয় পাবেন কেন? যারা অত্যাচার ও নির্যাতন করে এসেছে, তাদের সংখ্যা তো মুষ্টিমেয়। কিন্তু তার বাইরে সাধারণ নাগরিকের যে বৃহৎ সমাজ তাদের মূক ও বধির করলেই কি জনসাধারণের সত্যি-কারের কল্যাণ হবে? মাঝে মাঝে দেখতে পাই যে, সঠিক সমালোচনাও বাম ফ্রন্ট দলের দল-পতি ও মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তপ্ত করে তোলে। তা হলে তাঁরা কি চান বাক্‌স্বাধীনতা আর লেখার স্বাধীনতা দূর হোক? অপপ্রচার যারা করে, তারা নিশ্চয়ই নিন্দার্হ। কিন্তু সরকার যদি সব ব্যাপারেই উদাসীনতা দেখান, তা হলে কি করে তাঁরা নিন্দা ও সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন? আর লোকের লেখা বন্ধ ও কণ্ঠরোধ করলেই কি অরাজকতা দূর হবে?

লোকের কণ্ঠরোধ সম্বন্ধে বর্তমান রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ANDREI D SAKHAROV বলেছেন:

'Intellectual freedom is essential to human society—freedom to obtain and distribute information, freedom for open minded and unfearing debate, and freedom from pressure by officialdom and prejudices. Such a trinity of freedom of thought is the only guarantee against an infection of people by mass myths, which, in the hand of treacherous hypocrites and demagogues, can be transformed into bloody dictatorship. Freedom of thought is the only guarantee of the feasibility of a scientific democratic approach to politics, economy, and culture.

But freedom of thought is under a triple threat in modern society—from the deliberate opium of mass culture, from cowardly, egotistic and philistine ideologies, and from the ossified dogmatism of a bureaucratic oligarchy and its favourite weapon, ideological censorship. Therefore, freedom of thought requires the defence of all thinking and honest people. This is a mission not only for the intelligentsia but for all strata of society'.....

(Sakharov speaks. page—60)

Sakharov আরও বলেছেন:

'Millions of people throughout the world are striving to put an end to poverty. They despise oppression, dogmatism, and demagogy (and their more extreme manifestations—racism, fascism, Stalinism, and Maoism). They believe in progress based on the use, under conditions of social justice and intellectual freedom, of all the positive experience accumulated by mankind.' (Sakharov speaks. page—58)

সুধাসাগর তীরে

সুরেশ চক্রবর্তী

॥ ১১ ॥

সঙ্গীতমর্মজ্ঞ, পরমবিদগ্ধচিত্ত, স্বর্গীয় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অমিয়নাথের অন্তরঙ্গতা ও হৃদ্যতা ছিল,—তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে অমিয়নাথ আমাকে নিয়ে তাঁর গোখেল রোডের বাসায় গিয়েছিলেন। তখন তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু পুরাতন সখাকে দেখে যে কী আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর ভাবভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। মধুর, স্বপ্নময় স্মৃতির রোমন্থনে আমরা পারিপার্শ্বিকের কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম,—কত সন্ধ্যায় কত মহান সঙ্গীত-গন্ধর্বের সুধাবর্ষণের ইতিহাস তাঁরা আবার স্মরণ করছিলেন, আমি বসে বসে দুই বিদগ্ধ-পুরুষের আত্মার মিলন উপভোগ করছিলাম। সঙ্গীত সম্পর্কে ধূর্জটিবাবুর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের কথাও আলোচিত হচ্ছিল,—কিছু কিছু চিন্তাধারা তাঁর রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা পত্রাবলীতে প্রবাহিত হয়েছে, কৌতূহলী পাঠক তা অনুধাবন করে ধূর্জটিবাবুর সঙ্গীতের জ্ঞান ও রসচেতনার ঠিকানা পাবেন। তাঁর রেকর্ড-সংগ্রহ ছিল বিশাল ও সেকালের সব গাইয়ের—যাদের নাম শুনলে আজও আমরা সসম্ভ্রমে অবনতমস্তক হয়ে যাই। এই প্রাচীন ও খানদানী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকরূপে ধূর্জটিবাবুর প্রচেষ্টার কোন প্রকৃষ্ট মূল্যায়ন হয়েছে বলে জানা নেই।

সেই সন্ধ্যায় যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তার মূলসূত্র ও গতি ছিল প্রাচীন ধারা আধুনিক খাতে প্রবাহিত হয়ে কী রূপ ধারণ করছে এবং প্রসঙ্গক্রমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালোচনার অংশবিশেষ তুলে ধরছি, তার থেকেই বোঝা যাবে সঙ্গীত ও তার ধর্ম সম্বন্ধে ধূর্জটিবাবু ও অমিয়নাথ সম্প্রদায়ের কী ধারণা ছিল :

"......আমাদের সঙ্গীতে অন্ততঃ দুটি বিভাগ আছে। প্রথমতঃ আলাপ, যাতে কথা নেই.... এবং যার একমাত্র উদ্দেশ্য রাগিণীর বিকাশ সাধন। দ্বিতীয়তঃ বন্দেশী, যাতে শব্দ আছে, শব্দের অর্থ আছে, যদিও রাগিণীর বিকাশ সেই অর্থের সা রি গা মায় অনুবাদ নয়। বন্দেশী গানে "বন্দেশ" (composition) অর্থাৎ রচনার মেজাজটাই (temper : mood) সুরের বিকাশকে ধারণ করে, তার রূপের কাঠামো জোগান দেয়, গতির সীমা নির্ধারণ করে। যাঁরা পাকা ঘরানার খেয়াল গান, তাঁরাও রচনার অন্তঃপ্রকৃতি বুঝে তানের সাহায্যে রচনারই রূপ উদ্ঘাটিত করেন। ভীমপলশ্রীর দুটো বিখ্যাত খেয়াল আছে—"অবতো সুনলে" ও 'অবতো বড়ি বের।' কিন্তু দুটির গঠনসৌষ্ঠব পৃথক। যে খেয়ালিয়া বন্দেশের গঠনতারতম্য না স্বীকার করে স্বকীয় প্রতিভারই জোরে ভীমপলশ্রীর ঐশ্বর্য দেখাতে তৎপর, সে সাধারণ শ্রোতাকে চমক লাগাতে পারে, কিন্তু ওস্তাদের কাছে তার খাতির নেই। .....শ্রেষ্ঠ ঠুংরী গায়ক-গায়িকা কত সাবধানে শব্দ উচ্চারণ করেন, কী রকম শ্রদ্ধার সহিত মূলভাবের ও রচনার মর্যাদা দেন, যদি কেউ মন দিয়ে লক্ষ করে থাকেন, তাহলে তিনি কখনো আমাদের গায়কি রীতিকে স্বাধীনতার নর্তনভূমি বলতে চাইবেন না। ....ধরুন ছায়ানটের আলাপ হচ্ছে। ছায়ানটের আরোহী, অবরোহী, তার বাদী, সম্বাদী, তার বিশেষ "পড়ক" দেখিয়ে ছায়ানটের ঘটস্থাপনা হল। কিন্তু সেইখানে থামলেই কি ছায়ানটের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল—তার প্রকৃতি ফুটল? এ যে সেই ভক্তের কথা যিনি প্রতিমার মুণ্ডু পরাবার পূর্বেই বলেছিলেন, 'আহা, মা যেন হাসছেন।' ... আমার মতে এখনো হল না, হল কেবল ছায়ানটের blue print টুকু, ডিজাইনটুকু। ....সেইজন্য নীচের ও উপরতলার, স্নানের ঘরের মায় সিঁড়িরও cross-section চাই, এলিভেশনের লোভ দেখিয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না। তার ওপর চাই নির্মাণ, চাই গৃহপ্রবেশ, চাই বসবাস—এ ঘরে রোসর, ও ঘরে মৃত্যু, এ জানলা দিয়ে লবঙ্গলতিকার উগ্রগন্ধ পাওয়া, ওটা দিয়ে নারকেল গাছের সোনালী ফুল থেকে গাঢ় সবুজ ডাবের পরিণতি দেখা, এ দেয়ালে সিঁদুরের দাগ, ওটায় খুকীর আঁচড়, এ পর্দা মেজদির, ওটা সেজ বৌমার তৈরী—সব চাই, তবে গৃহ। .....ছায়ানটের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা কথাটি ঠিক নয়, কারণ আলাপের প্রাণই হল গতি) বিস্তারের দ্বারা তাকে মুক্তি দিতে হবে। ....ছায়ানটের এই তানে দেখুন বিলাবল, আবার অন্য তানে শুনুন কল্যাণের অঙ্গ। ....অতএব কল্যাণ ঠাটের যতরকম রাগিণী আছে, তার সঙ্গে ছায়ানটের সাদৃশ্য দেখানো চাই—কারণ ছায়ানট কী নয়, তাও দেখাবার প্রয়োজন আছে। সেইরকম বিলাবল ঠাটের রাগিণী, বিশেষতঃ আল্হাইয়ার সঙ্গে তার পার্থক্যও রয়েছে। অনেকটা endogamy ও exogamy-র সম্বন্ধের মতন, যে জন্য সুপাত্র খুঁজতে বাজার উজাড় করতে হয়। ছায়ানটকে কত হাত থেকে বাঁচাতে হয়, ভাবুন—কামোদ, শ্যাম, কেদারা, হাম্বীর, গৌড়-সারঙ্গ—সব গণ্ডীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ক এক-একবার গণ্ডীর থেকে বেরিয়ে তাদের সঙ্গে মিশল। কিন্তু আবার ঘরে এলো জাত বজায় রেখে। এই মেশার ভেতর স্বকীয়তা বজায় রাখা তানকর্তবের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ....তানকর্তবের অন্য কাজও আছে তার উল্লেখ মাত্র করছি। গমকিতে গাম্ভীর্য, মিড় ও আশে মাধুর্য, মুড়কিতে অলঙ্কার, জমজমায় ঐশ্বর্য সূচিত হয়। তবে বুঝে তান ছাড়তে হবে—নির্বাচনের হাত থেকে রেহাই নেই। বন্দেশী গানে রচনার মেজাজ ও আলাপে সুকুমার পারম্পর্যই হল নির্বাচনের principle। ঘরানায় নির্বাচনের দায়িত্ব সহজ করে দিয়েছে মাত্র। কিন্তু, নির্বাচনপ্রক্রিয়াটি কঠিন বলে তান বর্জন করাটা স্নানের টবের জলের সঙ্গে খোকাকে নর্দমায় ফেলে দেবারই মতন।"

এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে বদল খাঁ সাহেব, গণপতরাও ভাইয়া সাহেব, আল্লাদিয়া খাঁ ইত্যাদি সঙ্গীতের মহাপুরুষগণের কী রকম তালিম ও ইল্মের মধ্যে রস ও শিল্পে অমিয়নাথ-ধূর্জটিপ্রসাদের শিক্ষা ও বিবর্ধন হয়েছিল—সঙ্গীতের এই মহা মূল্য intellectual phase-টাই আজকের যুগের সঙ্গীতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের "সাওয়নীকল্যাণ" রাগ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল, তার মূল কাহিনীও এই সূত্রে শোনা গেল। এলাহাবাদে থাকার সময় পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন পণ্ডিতজী দুঃখ করে বলেন যে অনেক লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর গান পুরানা জমানার ওস্তাদেরা শেখাতে চান না, হয় তাঁরা সেই রাগরাগিণী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন, অথবা নিজস্ব খাস শাগির্দ ছাড়া কারুকে দিতে অনিচ্ছুক। ধূর্জটিবাবু প্রথম কারণটা বিশ্বাস করেননি, কিন্তু বলেছিলেন শেষের কারণটাই সত্য ও যুক্তিসংগত। যেসব রত্নতুল্য গান তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছে বহু খিদমদ করে ও সঙ্গীতের রাজ্যে অনেকখানি দখলের পর লাভ করেছেন, সেগুলো তাঁদের প্রাণপ্রিয় সম্পদ (heirloom)—তাঁরা যে চাইবে, তাকেই দেবেন কেন? বিশেষত পণ্ডিতজী তো গান নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে বইতে ছাপিয়ে দেবেন,—এতে ওঁরা ভাবতে পারেন ওঁদের ঘরানার বেইজ্জতি হয়ে যাব। যথার্থ অধিকারী হলে ও গান্ডাবাঁধা শাগির্দ হলে নিশ্চয়ই পাবে, তবে গানের সত্যকার রূপ ও মাধুর্য প্রকাশ করার মতো কুশলী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই বলে ধূর্জটিপ্রসাদ "এ আলী সাঁঝ ভঈ" বলে অমিয়নাথের কাছে শেখা "সাওয়নীকল্যাণের" বিখ্যাত খ্যালের আস্থায়ীটা শোনালেন। ভাতখণ্ডেজী এই গানটির রচনা-সৌকুমার্য ও অপূর্ব বন্দিশ শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন আর বললেন,—সত্যি বলতে কি, আমি সাওয়নীকল্যাণের ভালো খ্যাল কোথাও শুনিনি, তাই আমার সংগ্রহপুস্তকে (হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি—ক্রমিক পুস্তকমালিকা-৫) একখানি মাত্র গান দিতে পেরেছি, কিন্তু ওর বন্দিশ এটার মত সুন্দর নয়। আর একটা লক্ষণগীতও আমি নিজে রচনা করে দিয়েছি—তবে এর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। আপনি কি আমাকে গানখানি শেখাবেন? ধূর্জটিপ্রসাদ পেশায় সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও খানদানী বুজুর্গদের নিয়ম বা Norm মেনে চলতেন, তাই জানালেন যে ওটা তিনি শিখেছিলেন তাঁর বন্ধু অমিয়নাথ সান্যালের কাছে,—সে তো ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের পুরানা শাগির্দ। আমার মনে হয়, ওদের কারো কাছ থেকে সরাসরি তালিম নিলেই গানটির প্রকৃষ্ট রূপ পাবেন। তবে গান্ডা বেঁধে শাগরেদী না করলে এ সমস্ত গান পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্যই বলা চলে।

বদল খাঁ সাহেবের নাম শুনে পণ্ডিতজী চমকিত হলেন, —প্রশ্ন করলেন, বদল খাঁ সাহেব এখনো জীবিত আছেন? এত বড় গুণী কলকাতায় অত্যন্ত সাধারণভাবে বাস করে শাগির্দদের তালিম দিচ্ছেন, এটা তো আমার জানা ছিল না। আমি যত শীঘ্র পারি কলকাতায় গিয়ে তাঁর পদমূলে বসে কয়েকটা আসলী চুনী, মোতী নিয়ে আসব। ইচ্ছা প্রকাশ করলেও পণ্ডিতজীর এই কামনা পূর্ণ হয়নি,—তাঁর যখন অবসর বা সুযোগ হল, তখন কলকাতায় এসে দেখা করবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হল। বদল খাঁ সাহেব তারপরেও এক বৎসর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু যোগাযোগ আর হল না।

বদল খাঁ সাহেব তাঁর বিশিষ্ট শাগির্দদের মল্লার অঙ্গের একখানা খ্যাল শিখিয়েছিলেন "চরজুকী মল্লার" নামে। এই গানটির বন্দিশ বা রচনা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন যে বিশিষ্টভাবে মল্লারের রূপ এতে ফুটে উঠেছে,—স্নিগ্ধ মধুর রসনির্ঝর যেন বর্ষার ধারার মতো ঝরে পড়ছে—"আজ ঝর লায়ো" কথায়-সুরে এমন সামঞ্জস্য ও বাঁধুনী বহু গানের মধ্যেই বিরল। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের ক্রমিকপুস্তক মালিকার একখানি মাত্র গান আছে—"ছমে বোলী"—এটা আবার ঠাকুর নবাব আলী সাহেবের "মআর-ফুন-নগ্‌মাত" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে গৃহীত—তাতে লেখা আছে এই গানখানি রামপুরের নবাববংশের সাদত আলী খাঁ ওরফে ছম্মন সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত। কোন

প্রথম যৌবনে অমিয়নাথ সান্যাল—১৯০৬ সাল

ঘরানার গান তা লেখা নেই, কিন্তু এইটাই বাজারে চলে যাচ্ছে। স্বরলিপি থেকে গানটি তুলে দেখলে একে বারওয়া ও প্রদীপকীর মাঝামাঝি বলে মনে হবে—মল্লারের যা বিশেষ রূপ তার ছায়ার চিহ্নই নেই। আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, কিন্তু কী করে এটা মল্লার-বর্গে প্রবেশ করল, তার হদিশ খুঁজে পাইনি।

অমিয়নাথ এদিকে শান্তিনিকেতনে গিয়েও কিছুদিন ছিলেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করে তাঁর গানের সঙ্গে এস্রাজ বাজিয়েছেন। বিশ্বভারতীর প্রকাশিত "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ" গ্রন্থমালায় তাঁর একখানি বই আছে "প্রাচীন ভারতের সংগীত চিন্তা"। বইখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, বোধহয় অপ্রাপ্য, কিন্তু এর মধ্যে প্রাচীন ভারতের সংগীতের কিছুটা ইতিহাস ধরা আছে, এখনকার দিনে পুনর্মুদ্রিত হলে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট দিগদর্শনের সহায়তা হবে।

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালীন বিশ্রান্তির অবসরে অমিয়নাথ গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।—রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতেও তিনি আর বেশি দিন থাকতে চাইছিলেন না। অগত্যা কবি কয়েকজনের সামনে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কি অমিয়র স্ত্রী-কে দেখেছ? অকস্মাৎ এইরকম প্রশ্নে সকলেই বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। কবি সহাস্যে বললেন—না, আমি ভাবছিলাম যে আমার এত আগ্রহেও যখন অমিয় থাকতে চাইছে না, তখন মনে হচ্ছে ওর গৃহিণী আমার চাইতেও সুরূপা হবেন। নইলে এত জোর আকর্ষণ হত কি? অমিয়নাথ সলজ্জে স্বীকার করলেন যে তাঁর স্ত্রী সুন্দরী বলেই পরিবার ও কৃষ্ণনগর সমাজে পরিচিতা, কিন্তু শান্তিনিকেতনের এই অলোকসামান্য প্রতিভার রূপ ও দীপ্তির কাছে যেন চন্দ্রের সঙ্গে খদ্যোতের তুলনা হবে। তাই "চন্দ্রাহত" হবার পূর্বেই তিনি জোনাকীর কাছেই ফিরে যেতে চান।

যে সর্বতোমুখী প্রতিভা ও বাগবৈদগ্ধ্য অমিয়নাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেছি, সে তুলনায় তাঁর প্রকাশিত লেখা মোটেই বেশি নয়। তার মধ্যে গ্রন্থাকারে মাত্র দুটি বই (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের ছোট্ট বইটি বাদে) যথা—Ragas and Raginis এবং অতুলনীয় সংগীতরসাপ্লুত গ্রন্থ "স্মৃতির অতলে"। অন্যান্য যেসব লেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তার একটা অসমাপ্ত তালিকা দিচ্ছি—তাতে তাঁর ভাবধারার পরিধি ও মূলসূত্র সম্বন্ধে রসিকজনেরা অবহিত হতে পারবেন:

(ক) নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকা—"সমকালীন" পত্রিকায় এর কতকাংশ প্রকাশিত হয়—বৈশাখ ১৩৬৭ থেকে চৈত্র ১৩৬৭ পর্যন্ত। *

(খ) মিয়াঁ তানসেন—"দেশ" সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়—২০শে আষাঢ় ১৩৬৫ থেকে ১৭ই আশ্বিন, ১৩৬৫ পর্যন্ত।

(গ) নাট্যশাস্ত্রে নৃত্ত ও নৃত্য: "সমকালীন" জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

মন্ত্রের বস্তুতত্ত্ব: "সমকালীন" আষাঢ়, ১৩৬৮

(ঘ) ভীষ্মদেবের প্রত্যাবর্তন: "সমকালীন" পৌষ ১৩৬৬

(ঙ) গুরুজীর বৈঠকে বদল খাঁ সাহেব: "সমকালীন" আশ্বিন, ১৩৬৭

(চ) সুরের সন্ধানে: "সমকালীন" শ্রাবণ, ১৩৬৮

অমিয়নাথ সম্বন্ধে আমি একটু বিস্তৃতভাবে লিখেছি এজন্যে যে তিনি ছিলেন একান্ত ভাবেই অন্তর্মুখী (introvert) সুতরাং প্রকাশ্যজগতে খুব বেশী যাতায়াত ছিল না। আকাশবাণীর Audition Board-এও তিনি কিছুদিন ছিলেন, কিন্তু পরে সংস্পর্শ ত্যাগ করেন। কোনও আসরে বা মহফিলে তাঁকে কিছুতেই নেওয়া যেত না—আমাদের ওই ক্ষুদ্র আসরেই যেন তিনি পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে রসধারা-

পরিণত বয়সে অমিয়নাথ—আনুমানিক ১৯৫৭ সাল
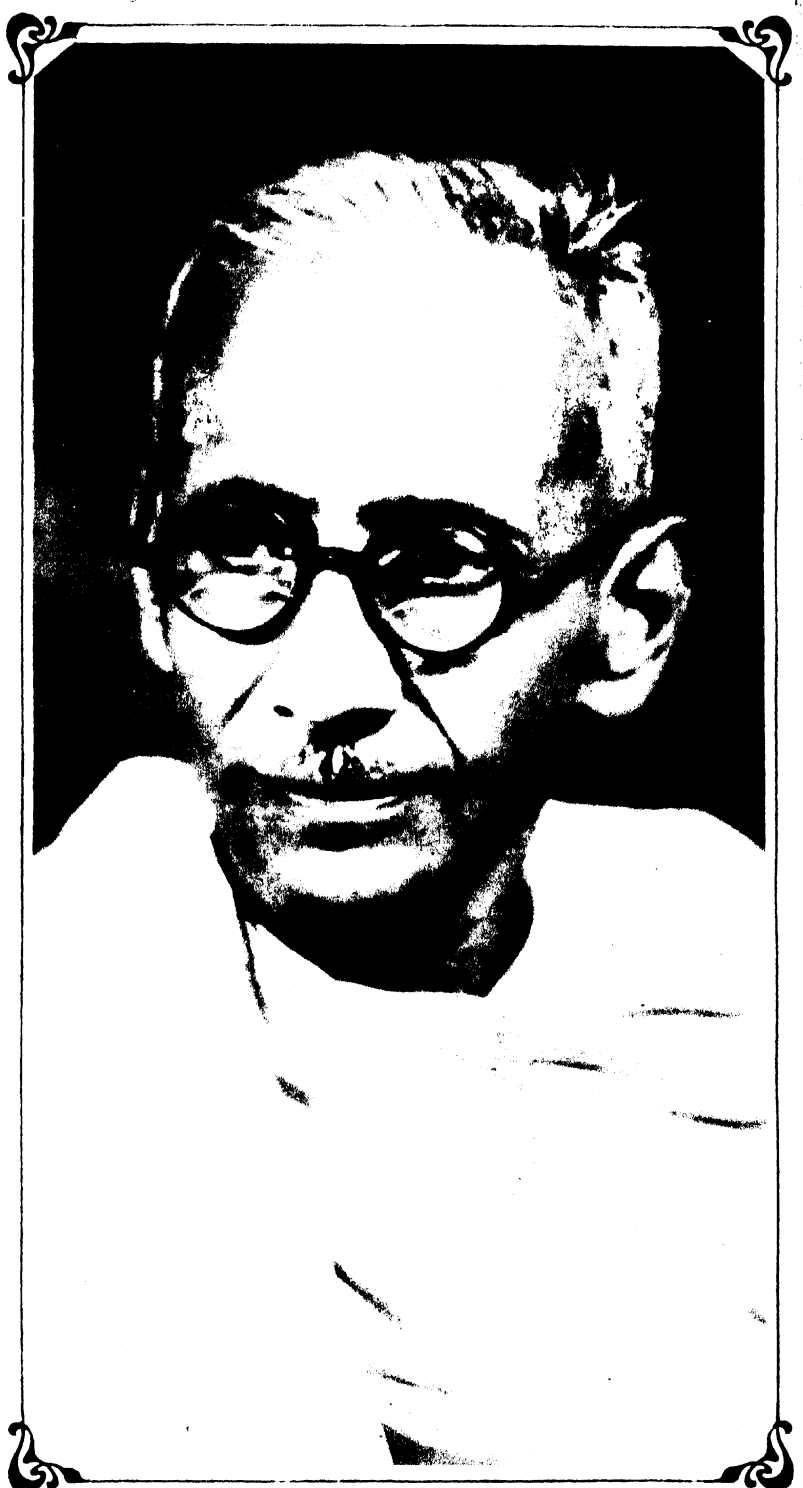
প্রস্রবণে আমাদের স্নিগ্ধ করে দিতেন। এই অনীহা, ফ্রাসট্রেশান, সবকিছুর মূলে নানা কারণ ছিল, সেগুলো এখানে বলা সঙ্গত হবে না। পরে ভীষ্মদেব প্রসঙ্গেও তাঁর কথা আসবে, সেই সময় তাঁর জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর সামান্য আলোচনা করতে প্রয়াস করব। (ক্রমশ)

*লেখার অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি বৈশ্বানরের কুক্ষিগত হয়েছে—সেটা পুনরুদ্ধারের কোনই আশা নেই।

তারাশঙ্করের জন্মদিনে পাঠকদের বিশেষ সুযোগ

বাংলা সাহিত্যের চিরবিস্ময় তারাশঙ্কর

অনেকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরে শ্রেষ্ঠ বাংলা ঔপন্যাসিক

তারাশঙ্করের মহত্তম ও বিরাটতম উপন্যাসের একটি, তাঁর সর্বশেষ সৃষ্টি
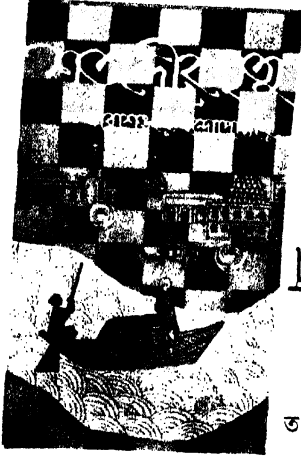
শতাব্দীর মৃত্যু

প্রথম ২০৲, দ্বিতীয় ২৫৲, তৃতীয় ২০৲

৮ই শ্রাবণ, তারাশঙ্করের জন্মদিনে পাঠকদের বিশেষ সুযোগ

এই বিশাল গ্রন্থ, যার মোট মূল্য ৬৫৲ টাকা—মাত্র ৪৮·৭৫ মূল্যে পাওয়া যাবে।

কেবল একমাত্র এই বিশেষ সুযোগ থাকবে। ৮ই শ্রাবণ থেকে ৭ই ভাদ্র

তারাশঙ্করের উপন্যাস পাঠের অর্থ—বিশাল মানব জীবন রহস্যের মধ্যে সঞ্চরণ।

পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল !

শঙ্কু মহারাজের

অমরাবতী আসাম

দাম : কুড়ি টাকা

শঙ্কু মহারাজ

অমরাবতী আসাম

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সাধুসঙ্গ

দশ টাকা

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জাল প্রতাপচাঁদ ৮·০০

সুকুমার ভট্টাচার্য
আঁধি আঁধার আলো ১০·০০

নারায়ণ সান্যাল
চীন-ভারত লঙ্‌ মার্চ ২০·০০

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
বেঞ্চ অ্যাণ্ড বার ১২·০০

শ্রীপারাবত
সেফল্যাণ্ডিং ১০৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
ঝংকার ১০·০০

চিরঞ্জীব সেন
বারমুডা ট্র্যাঙ্গল (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ১০·০০
আবার বারমুডা ট্র্যাঙ্গল ১০·০০
ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা ১০·০০

সুকন্যা
নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ১২.০০

বিমল কর
পাশাপাশি ৮৲

শক্তিপদ রাজগুরু
নিঃসঙ্গ যৌবন ৭৲

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
হেলেন, ট্রয়ের হেলেন ১০·০০

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শংকর নর্মদা ১৬.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র
সুরনৃত্যের উর্বশী ১০.০০

মণ্ডল বুক হাউস ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন : ৩৪-৮৭৪৭

সল বেলো বাড়িওয়ালা বাংলাদেশ

অসীম রায়

সাহিত্য হতভম্ব করে, এইটাই বোধ হয় আধুনিক সাহিত্যের প্রধান গুণ। তুমি আগে যা ভেবেছো চিন্তা করেছো তা অকস্মাৎ জঞ্জালে পরিণত এবং তোমাকে হতবাক করে দিয়ে সেই তীব্র মানসিকতা তার অমোঘ সম্মার্জনী চালাতে শুরু করেছে। সবাই উড়ে ছারখার, উনবিংশ শতাব্দীর দিকপাল তো ছত্রভঙ্গই। এই ষাট সত্তরের দশক জুড়ে তোমার মনের আনাচে কানাচে যারা বাসা বাঁধছিল তারাও এক দৌড়ে পগারপার। তারপর এক শূন্য মনে অবস্থান, এমন এক নিঃসীম শূন্যতা যেখানে কোনো চিন্তার কোনো মানে হয় না; অতীত চিন্তা যেমন বাতুলতা তেমনি ভবিষ্যৎ ভাবনাও লক্ষ্যভ্রষ্ট। একটার পর একটা সল বেলো পড়তে পড়তে কদিন থেকেই তার মনের মধ্যে যেসব ভাবনাগুলো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল তা এই বর্ষণস্নিগ্ধ সকালে তার মনের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে। এবং ঠিক এই মুহূর্তে 'সা-লা-ল্যা-বা-লা-লা' এই ধরনের বিলম্বিত আর্তনাদে সে চমকে ওঠে।

সচরাচর এই বিলম্বিত আর্তনাদ মাঝরাতে কিংবা অপরাহ্ণে শোনা যায়। কিন্তু এই বর্ষণস্নিগ্ধ সকালে যখন হাওয়ায় সুধীন দত্তের লাইন 'শ্যামলী বরষা সাঁঝের আঙিনা পরে' তখনই এই. 'সা-লা-লা-বা-লা-লা।' ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সে ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করে। সেই টকটকে লাল শাড়িপরা হাড়গিলে হিন্দুস্থানী মহিলাটি, জনৈক রিকশাওয়ালার স্ত্রী, আর একটি রিকশাওয়ালার স্ত্রীর সঙ্গে তাদের সন্তান-সন্ততি পরিবৃত হয়ে এই অমানুষিক তান বিস্তারে ব্যাপৃত। চারপাশে ঝনঝন শব্দে কাঁসার বাসন পড়ছে, কেউ কেনেস্তারা পিটাচ্ছে কানের ওপর। কয়েকজন দক্ষিণ ভারতীয় যুবক মজা দেখছে। বাজার ফেরতা এক ভদ্রলোক মুহূর্তের জন্যে থমকে হন হন করে এগিয়ে যায়। উল্টোদিকে তরুণ বঙ্গ সন্তান যে সকাল সন্ধে চড়া পর্দায় তার স্টিরিওতে রাজেশ খান্না বাজাচ্ছে সে সাবানমাখা গাল বাড়িয়ে দোতলা থেকে হাঁকে, 'চালা চালা, আরও জোরে।'

সত্যিই এমন জলভরা মায়াটে আকাশ। বিকেলবেলা থেকেই ঢালবে। আরব ব্যবসায়ীরা এই বাঙালী বর্ষা দেখবার জন্যে নাকি ঢাকায় আসছে। হঠাৎ পড় পড় শব্দে তার দৃষ্টি আকাশ থেকে রাস্তার ওপর পড়ে। তার ঠিক বাড়ির সামনেই সার দিয়ে তিন চারটে রিকশাওয়ালার ছেলেমেয়ে বসে গেছে। হঠাৎ খেয়াল হয় তার একটা কিছু করা দরকার। গত বছর মা যাবার পর থেকে সে এ বাড়ির গৃহস্বামী। এবং ফুটপাথ দিয়ে ভদ্রলোকেরা ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে গেলেও মাঝে মাঝে ব্যালকনিতে দাঁড়ানো বাড়িওয়ালার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে। উদভ্রান্তের মতো সে হাততালি দিতে থাকে। একবার হেঁড়ে গলা দেবে না কি ? তবে তার আর প্রয়োজন নেই। সবাই এক একটি চুবড়ি উল্টিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

তিন-চার বছর আগেও এই সব শিশুদের সংখ্যা ছিল পাঁচ-ছটি, এখন হেসেখেলে পঁচিশ-ছাব্বিশ। অনেক সময় সে ভেবেছে ম্যাক্সিম গোর্কির লেংকা এদের মধ্যে হয়তো খুঁজে পাবে। সেই আশ্চর্য স্পর্শকাতর খোঁড়া ছেলেটা যে প্রবল অস্বাভাবিকতার মাঝখানেও এক মানবিক পতাকা বয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্ত এদের মধ্যে লেংকা নেই, হয়তো ছিল, হারিয়ে গেছে। দুপুরে এরা নীচতলার ছিটকিনি চুরি করে।

মাস দুয়েক আগে পাড়ার বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকেরা এক ঘরোয়া বৈঠকে স্থানীয় পুলিশ অফিসারদের এই বিপন্ন অবস্থার কথা জানায়। সেও ছিল এই সভায়। রিকশাওয়ালারা সপরিবারে তাদের রাস্তাটা দখল করে নিয়েছে। রান্নাবান্না হাগা মোতা শয়ন মৈথুন, ডাঁই করা ছেঁড়া কাগজের ব্যবসা, মদ চোলাই—লম্বা ফিরিস্তি সবাই একে একে দিলে। এগুলো কোনটাই নতুন কথা নয়। এইসব নিয়েই তিলোত্তমা কলকাতা। কিন্তু তরুণ পুলিশ অফিসারটির ছোট্ট বক্তৃতায় সে চমৎকৃত হয়েছিল। কিছুই করণীয় নেই এই কথাটার সে বেশ অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যাখ্যা দিলে। পেটি কেসে ঝুলিয়ে এদের হাজতে মাত্র এক রাত্তির রাখার ব্যবস্থা আছে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে। তা ছাড়া কি করতে পারে সরকার? নতুন করে অনাথ আশ্রম খোলার পয়সা নেই।

'বিশ্বেস করেন, শাড়িতে আগুন ধরে যায় মেয়েদের ফুটপাথে হাঁটিতে গেলে। দাউ দাউ করে উনুন জ্বালায়। ইস্কুল ফেরতা বাচ্চারা হাঁটিতে পারে না। দুটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে।' জনৈক মাঝবয়সী বাড়িওয়ালার করুণ আবেদন। আর একজন সমাজতান্ত্রিক বাড়িওয়ালা বললে, 'আমরা কি সপ্তাহে এক ঘন্টা দিতে পারব না এই সব রাস্তার ছেলেদের জন্যে ? নইলে র‍্যাপোর্ট কি করে তৈরী হবে?' আর একজন তরুণ বললে, 'আসলে আত্মশক্তির অভাব। আমরা যদি ইউনাইটেড হতে পারি।'

বুশ শার্ট পরা তরুণ ও-সিটি চমৎকার সোশিও-ইকনমিক বিশ্লেষণ দিলেন, কেমনভাবে গ্রামজীবন ভেঙে তছনছ হচ্ছে, শহরে চাপ বাড়ছে, সমস্ত ভারতবর্ষেই বলতে কি সারা বিশ্বেই একই ঘটনা। তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল বস্তুত দর্শক হওয়া ছাড়া হাততালি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করণীয় নাই।

বোধ হয় কষে বেলো পড়ছে লোকটা। বেলো পড়তে পড়তেও তো এই কথাটাই মনে আসে। আমেরিকান টেকনলজিকাল জয়যাত্রা এখন এমন দিগ্বিজয়ী যে এর সামনে দাঁড়িয়ে কোনো বক্তৃতার কোনো মানে হয় না। তুমি যখন তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হেগেল নিয়ে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করছো তখন সে বেমালুম শুয়ে পড়ছে তোমার বন্ধুর সঙ্গে এবং এখানে কিছু করণীয় নেই। বই লিখে তোমার খুব
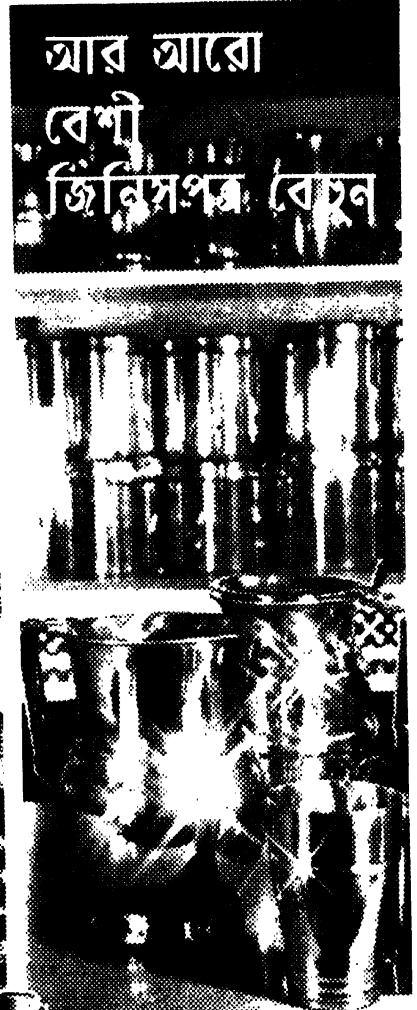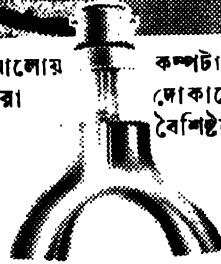
হাঁকডাক হচ্ছে কিন্তু তোমার স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের কেসে তোমাকে লটকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে ফেলছে। এবং আর কিছু করণীয় নেই। কেবল এক যোনি থেকে আর এক যোনিতে চঙ্ক্রমণ, ডলারের জালে জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার আকুলতা। আর মাঝে মাঝে বিশ্বভ্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দর্শন, কার্ল মার্কস থেকে শুরু করে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক, পদার্থ বিজ্ঞানী। কারণ কিছুতেই কিছু হবার নয়। সব সময় বুঝে নিতে হবে যে মানুষ এখন এক শিক্ষিত উন্মুকে পরিণত। উন্মুকের হাহাকার তো গ্রীক ট্র্যাজিক হিরোর হাহাকার নয়। কাজেই সব কিছু জেনেও নির্জ্ঞানী হবার সাধনা, লাম্পট্যে অনীহা সত্ত্বেও মানুষ নিপাট লম্পট। একমাত্র প্রবল অস্থিরতার বৈদ্যুতিক তাড়নায় নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যহীনতা থেকে লক্ষ্যহীনতায়।

এবং ঠিক এমনি সময় সিঁড়িতে গলাঝাড়ার শব্দ। ধড়মড় করে সে টেবিল থেকে উঠে পড়ে। নীচের দরজা কি খোলা ছিল?

'আমরা একটু এসেছিলাম, স্যার।'

এক নজরেই চেনা যায়। বাড়ির দালাল। ময়লা পাঞ্জাবি, ঘেমো গন্ধ। মুখও ঘামে চ্যাটচেটে চকচকে।

'আপনার নীচের তলাটা, স্যার। সাতশো-আটশো পর্যন্ত উঠতে পারে। আর যদি পার্ট দেন তাহলে চারশো। কোনো ঝামেলা নেই ভালো ভালো ফার্ম।'

মাহিন্দার অ্যান্ড মাহিন্দার, লারসন অ্যান্ড টুবরো, মার্টিন বার্ন, হিন্দুস্তান স্টিল, জেসপ, ইণ্ডিয়ান টিউব, বিড়লা ব্রাদার্স...

'কিন্তু আমি তো ঠিক...'

'যদি পার্টও দেন হিন্দুস্তান স্টিলের একটা পার্টি আছে।'

'নীচের ধাড়া তো এখনও ওঠে নি।'

'ও উঠে যাচ্ছে, স্যার। মে ফেয়ারে হাই রাইজ ফ্ল্যাট কিনেছে। আমরা স্যার, সব খবর রাখি। এই মাসের শেষেই চলে যাবে। আপনি আগে যা পেতেন তার ডবল পাবেন।'

'আচ্ছা, আমি যদি ভাড়া দিই কখনও...'

দালালদের কাছে ভীষণ অবিশ্বাস্য বোকা-বোকা লাগছিল তার কথাটা। 'ভাড়া দেবেন নাকি, স্যার! এতো গোল্ড মাইন। এই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। একেবারে তোপের ওপর জায়গা। এখানে আসবার জন্যে লোকে মাথা কুটছে। সারা শহর উঠে আসছে এইখানে। ঝামেলা নেই, নকশাল নেই। মেয়েছেলেরা আরামে ঘোরে।'

বাড়ির দালালরাও পুলিস অফিসারদের মতো সমস্ত ব্যাপারটা সমাজতাত্ত্বিক ভঙ্গিতে দেখে।

'আমার আসলে ওপরতলার ঘর খুব কম। সারা শীত আমার ছেলেকে বারান্দায় পড়তে হয়। আগেকার দিনের বাড়ি তো। জায়গা অনেক, ঘর কম।'

'আপনি তিনতলায় দুখানা ঘর তুলে নিন। সে ব্যবস্থাও করে দেব। দশ হাজার অ্যাডভান্স দেবে পার্টি। তার সঙ্গে এল আই সি থেকে আরও হাজার তিরিশেক পাবেন।'

ঘেমো চ্যাটচেটে মুখখানা সম্পর্কে শ্রদ্ধা আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রবল একসময়তাও আসে। চার পাশ থেকে ক্রমাগত চাপ আসছে বাড়ি ভাড়ার জন্যে। সকাল-সন্ধে বাড়িতে অনাহূত আবির্ভাব। অযাচিতভাবে নাম ঠিকানার লিস্ট জমছে।

যাক, তানিবস্তার স্তবধ। কৃষ্ণ মেঘের রুপোলি পাত এই ধরনের ইংরেজী আত্মবিশ্বাসের প্রবচন তার মনে আসে। অবশ্য কৃষ্ণ মেঘে সর্বক্ষই আকাশ যখন ছেয়ে আছে তখন কৃষ্ণ মেঘের সঙ্গে সহবাস অনিবার্য। যেমনভাবে বেলো চিকাগোর আণ্ডার ওয়ার্লড মেনে নিয়েছেন, মাফিয়াদের নির্যাতন এড়িয়ে যাবার কোনো রাস্তাও নেই এবং ফ্রান্সের খেতাব পাওয়া যশস্বী লেখকেরও তলপেটে ছুরি লাগার ভয়ে রাস্তার মাঝবরাবর হাঁটার অভ্যাস। 'রাতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।' কলকাতায় কিংবা চিকাগোতে। তবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় মানুষ এমন মশামাছির মতো কিলবিল করত না চারপাশে সর্বক্ষণ।

'আপনাদের ঠিকানা রেখে যান। আমি যদি মনস্থির করি তাহলে নিশ্চয় জানাব।'

'ঠিকানা কি, স্যার! এই মিষ্টির দোকানে খোঁজ নেবেন। ওর ম্যানেজার স্যার, আমার বোনাই।'

তারপর সিঁড়ির মাথায় থমকে দাঁড়ায় সেই ঘামে ভেজা মুখ। 'ভালো ভালো ফার্ম ছিল স্যার—মাহিন্দার অ্যান্ড মাহিন্দার, লারসন অ্যান্ড টুবরো...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মার্টিন বার্ন, হিন্দুস্তান স্টিল, জেসপ, ইণ্ডিয়ান টিউব, বিড়লা ব্রাদার্স (মনে মনে : এই সব বিখ্যাত শব্দগুলোর যে অমোঘ মন্ত্রশক্তি তা আমি জানি)।

'তার মানে আপনি স্যার, ভাড়া দেবেন না।'

'কেন, আপনি দেখেন নি, আমার ছোট ছেলে পোস্টার লাগিয়েছে দরজায়—বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে না।'

'ওটা কি স্যার, আপনার শেষ কথা?'

'শেষ কথা বলতে স্যার, কিছু নেই।'

আশ্চর্য নৈস্তব্ধ্য নেমেছে। বাস্তবিক বেলো চমৎকার লেখক। পড়তে পড়তে মনে হয়, আগে কখনও সে ইংরেজী পড়ে নি। ভাবেও যেমন হতভম্ব ভাষাতেও তেমনি হতভম্ব। বাংলায় যদি কেউ গণিকালয়ের ভাষার সঙ্গে কিংবা অপরাধ-জগতের ভাষার সঙ্গে বৈদিক স্তোত্র পাঞ্চ করে তা হলে যেরকম ব্যাপারটা দাঁড়ায় অনেকটা সেই রকম। মাঁতলাবা যাঁরাই রজস্বলা তাঁরা সকলেই ঠিক মহিলা নন, তাঁরা 'চ্যাপ্টা' বা 'ব্লড'। আমাদের অপরাধ জগতেও আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় ভাষা যেমন 'কলসি ওড়ানো' অর্থাৎ দোলায়িত নিতম্ব কিংবা 'অশোক ফুল ফুটেছে' অর্থাৎ মেয়েটি ঋতুমতী হয়েছে। বেলোর ক্ষেত্রে এই অপরাধ জগতের ভাষা উন্নীত সাহিত্যের ভাষায়, অপরাধী ও নিরপরাধী, ওয়ার্লড এবং আণ্ডার ওয়ার্লডের মাঝখানে ব্যবধান লুপ্ত।

কিন্তু হায়, কি ঋংকৃত সর্বনাশ! কি নির্মল বল্কিত দুধেই চোনা! এত ঐশ্বর্য, এত বৈভব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি রকম নেকার নেকার লাগে। মাইকেল-এঞ্জেলোর সেই আদম আর এই বিংশ শতাব্দীর পরিপুষ্ট উন্মুক। ভারতবর্ষ কি পারবে সরে থাকতে। তার প্রচণ্ড সূর্যরশ্মি ও প্রচণ্ড দারিদ্র্য কি ঠেকাতে পারবে এই উন্মুকে পরিণত হবার প্রবল অনুচিকীর্ষা?

'ক্রি-ক্রি-ক্রর-র'...

জানলায় দাঁড়িয়ে 'কে? কে?'

'টেলিগ্রাম।'

একটা সংক্ষিপ্ত লাইন : ফ্লাইট নাম্বার—, ষোলই, দমদম, বন্-এর পথে।

ষোলই! মানে আজই। কি কারবার। আসাদের সমস্ত ব্যাপারটাই এরকম। কোন কিছুর ভূমিকা নেই। তার বোধ হয় দৃঢ় ধারণা, বন্ধুত্ব মানেই ভূমিকাশূন্য, বন্ধুত্ব মানেই ডেডপ্যান, ফটাফট, একেবারে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়াতে হবে।

'হ্যালো, এয়ারপোর্ট? এয়ার কন্ট্রোল? ঢাকা থেকে ফ্লাইট...'

'এক ঘণ্টার মধ্যে।'

'ধাঃ শালা!'

রুমা বললে, 'অতো হুকমুক করছো কেন? ছুটির দিন।'

'আসাদ।'

'তোমার সেই পাগলা বন্ধু।' স্ত্রীর কথায় সে হাসে। সত্যিই একেবারে উন্দাম লোকটা। ই এম ফর্স্টার কোথায় বলেছিলেন না, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব দেশের স্বার্থেরও ঊর্ধ্বে? আসাদ এ সব তত্ত্বকথা বলে না কিন্তু তার হাবভাবে এ কথাটা যেন স্পষ্ট।

বছর দশেক আগে তার ছেলেকে সে নিয়ে গিয়েছিল দমদমে উড়ো জাহাজ দেখাতে। রুপোলি পাখির টেক-অফ দেখতে দেখতে ছেলের কি উত্তেজনা। এবং বরাবর তার যা হয় শিশুদের উত্তেজনায় শরিক হতে পারলে মানসিক বোর্ডম অনেকটা কাটে। মুখ দিয়ে অনেক রকম আওয়াজ বার করার পর ব্রেন বেশ খোলে। কারণ, এই সব আওয়াজে অর্থের কোনো দায় নেই। সভ্য মানুষ সভ্য মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেট করে ভাষার মারফত এটা একেবারে বাজে। খুব কম ক্ষেত্রেই কমিউনিকেশনের সেতুবন্ধন তৈরী হয়। মানুষ দাঁত বার করে, চোখ বড় করে, কেউ কেউ আঙুল নাড়ায় খানিকটা নিজের মনের গ্যাস বার করার জন্যে। সে ভেবে দেখেছে পুরো একটা বছরে জাগ্রত অবস্থায় যাকে সংলাপ বলা হয় তার সময়ের পরিধি হয়তো এক সপ্তাহ। এই এক সপ্তাহ মতো সময় সে অন্যের সঙ্গে কথা বলেছে, অন্যের কাছ থেকে উৎসুকভাবে শুনেছে এবং শুনে উপকৃত হয়েছে, অন্যেকে বলেছে এবং বলে আনন্দ পেয়েছে। শিশুদের সঙ্গে আলাপে এই সংলাপের ভণিতা নেই। তার ছেলেও বলে যায়, সেও বলে যায়। হয়তো পরে যখন ছেলেকে মানুষ করার দায় বর্তাবে তখন এই সচ্ছন্দতা থাকবে না। কিন্তু এখন সেও গলা গল করে কথা বলে, তার ছেলেও বলে চলে, দুই নির্ঝরের ধারা পাশাপাশি বয়ে যায়। এবং ঠিক এই সময় কাস্টমস চেকিংয়ের কাছে খুব কেতা-দুরস্ত পশ্চিমী পোশাকে একটা চেনা মুখ তার দিকে চেয়ে আছে।

'দুলাল না? তাই বল।' লোকটা চেটাল থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে আসে। তারপর প্রকাণ্ড আলিঙ্গন, গালে গাল।' দুলালের খেয়াল হয় বয়স বাড়ার পর কোনো পুরুষ মানুষ তাকে কখনও এভাবে আলিঙ্গন করে নি।

তখন সে যাচ্ছিল মন্ট্রিলে, এখন বন-এ।

প্লেন আসতে সেবার দু ঘণ্টা দেরি। আসাদ ভালো ভালো খাবার অর্ডার দেয়। তারপর নীচু হয়ে একটা লেডিজ ম্যানিলা ছাতা তুলে বলে, 'তোর বউরে দিস।'

দুলাল হাসে। 'তোর আর পাগলামি গেল না।'

আসাদ বলে, 'পাগলামি কি রে! বাইচ্যা আছস না? তোদের দেখলে মনে হয় মইরা গ্যাছস।'

'তোর তুলনায় হয়তো মরে গেছি।'

'আর কি জামাকাপড় পরস! এমন কোট তোদের ইণ্ডিয়াতে হয়?'

সত্যিই আশ্চর্য সুন্দর অলিভ রঙের ইটালীয়ান কোট। চমৎকার মানিয়েছে। দুলালের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে আসাদ পা নাচায়। 'এ রকম জুতা বানায় ইণ্ডিয়া?'

জুতোও ভারী বাহারে। দুলাল হেসে বললে, 'তোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব ফরেন।'

'আর তর দ্যাখ। সব ম্যাড় ম্যাড় করছে। বাইচ্যা থেকে কি লাভ!'

আসাদের অলিভ কোটে বাহারে চাকচিক্যর দিকে চেয়ে বেলোর চরিত্রের কথা মনে আসে। চিকাগো আণ্ডার গ্রাউণ্ডের এক মাস্তান এই রকম কোট আর জুতো পরে নায়কের সামনে পা নাচাত না?

দুলালের অনেক চোখা উত্তর জিভে আসে। যেমন 'আমাদের পোশাক ম্যাড়-মেড়ে। কিন্তু এগুলো আমাদের দেশেই তৈরী। তোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব কিছুই তো ফরেন। এতে গর্ব করার কী আছে। এতো অধঃপাতের লক্ষণ।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে বোঝে এই ধরনের যুক্তিতে আত্মপ্রবঞ্চনা যথেষ্ট। আসাদের মতো মন্ট্রিল ম্যানিলা বন্ করতে পারার চান্স পেলে সে কি ছেড়ে দিত। এবং হয়তো বিদেশী জুতোর বাহার দেখাবার জন্যে পা নাচাত না, কিন্তু পারত এবং পরে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অর্জন করত। তা ছাড়া, কয়েক বছর আগে দিল্লিতে একটা নিলামে গিয়ে তার তো মাথা ঘুরে গিয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনীদের নিতম্ব লাঞ্ছিত বাথ টাব, শ্বেতাঙ্গিনী ব্যবহৃত প্যান্টি পাওয়ার জন্যে ভারতীয় উচ্চ

মধ্যবিত্তের কি আকুলিবিকুলি। আর তা ছাড়া বাঙালী খদ্দের হিসেবে তার তো কোনো পাওনা নেই। ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজী ফার্মের স্থান দখল করেছে বম্বে। আসাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফরেন, তার নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বম্বে। গ্রামীণ অর্থনীতির স্বয়ংসম্পূর্ণতার একটা মানে করা যায়। কিন্তু পা থেকে মাথা পর্যন্ত বম্বে পরে বম্বের কিছু মিলওয়ালাদের সে সাহায্য করছে মাত্র, বম্বে এবং তার শহরতলীর শ্রমিকদের লে-অফ থেকে বাঁচাতে সে সাহায্য করছে। কিন্তু তার ফলে কলকাতার শহরতলীর রুগন মিল আরও রুগ্ন হয়েছে। ইংরেজের সময়েও যে বাঙালী ব্যবসা ছিল তাও বিপর্যস্ত। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে ক্রেতা হিসেবে দ্রব্যগুণের বিচারই তো একমাত্র মাপকাঠি। ক্রেতার ভূমিকায় আসাদ কিছু ভুল করে নি। একমাত্র চীন, জাপান ও কিছু পরিমাণ ভিয়েতনাম বাদ দিলে সমস্ত এশিয়াবাসীই ফরেনের জন্যে লালায়িত। দুলাল বললে, 'নাচা, আরও জোরে পা নাচা।'

'তোদের ট্রামগুলো তেমনি আছে?'

এই জন্যে আসাদকে তার এত ভালো লাগে। প্রত্যেকবারই একই প্রশ্ন করে। এবং প্রত্যেকবারের মতো সে একই উত্তর দেয়, 'না রে, সে ছেলেবেলার কলকাতা আর নেই। ট্রামে বাসে এখন সর্বক্ষণ ভিড় মারামারি। এখন মিনিবাস হয়েছে। তাই খানিকটা বাঁচোয়া। তাও, সেখানেও ভিড়।'

'কলকাতার ট্রাম আর আমাদের লঞ্চোস্টিমার, একই অবস্থা। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি।'

'আমার মনে হয়, এই বাংলাদেশটা আর থাকবে না', দুলাল বললে।

আসাদ জিভ কাটে। 'কী কস? এ যে শুনলেও পাপ।'

'আরে না না, তোদের বাংলাদেশটা বলছি না। বাংলাদেশটা কোনো জিওগ্রাফির ব্যাপার না। ওটা একটা আইডিয়া, আমার আইডিয়া, তোর আইডিয়া। আমরা যারা এই বাংলার জল মাটিতে মানুষ হয়েছি, কেউ মন্ট্রিলে আছি, কেউ দিল্লিতে আছি, সকলের মনের মধ্যে এই বাংলা জেগে আছে। বাইরে কিছু নেই, বাইরে সব নষ্ট হয়ে গেছে। সব ওলটপালট হয়ে গেছে।'

'তরে দ্যাখলে আমার ফরিদপুরের ইস্কুলটার কথা মনে আসে। তরে আমাদের কুঞ্জবাবু হেডমাস্টার ডাকত ফিলজফার বলে। তুই সেই ফিলজফারই আছস, দুলাল। কিছু ওলটপালট হয় নাই।'

'তাই তো বলছি আসাদ, তাই তো বলছি', দুলাল উত্তেজিত হয়ে বলে, 'বাংলাদেশটা একটা ফিলজফি, একটা কনসেপ্ট, একটা আইডিয়া।'

'লন্ডনে থাকবার লগে তরে বলছিলাম আসতে। তুই বইস্যা থাকলি কলকাতায়। এখন উয়ারা আমাদের পিটছে। এখন বাংলাদেশীরা যাচ্ছে আরবে। আরবীরা আসছে ঢাকায়।'

'আমার এই কলকাতাই ভালো, স্বর্গ বল, নরক বল।' দুলাল বললে।

'তোদের বাড়িটা বেশ লাগছিল আমার।'

বছর তিন-চারেক আগে একবার দুম করে আসাদ চলে এসেছিল এয়ারপোর্ট থেকে। তখনও রিকশাওয়ালারা তাদের সামনেটা দখল করে নেয়নি। মাঝ রাস্তারে 'সা—রা—রা—বা—রা—রা' তানবিস্তার শুরু হয়নি। মলমূত্রত্যাগও কম ছিল।

'এখন বাড়ির সামনেটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে।'

'এখনও দু ঘণ্টা সময় আছে', আসাদ ঘড়ি দেখে।

আসাদের অদম্য যৌবন। এই দু ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা দর্শন। আবার ফিরে আসা।

'আমাদের এইটাই ভালো। এই এয়ারপোর্ট। এইটাই রিয়ালিটি। ফরিদপুর নয়, কলকাতা শহর নয়, লন্ডন নয়। তবে মাঝে মাঝে ঢাকা যেতে ইচ্ছে করে। শুনি অনেক উন্নতি হয়েছে শহরটার। চওড়া চওড়া রাস্তা হয়েছে, বড় বড় বাড়ি।'

আসাদ হেসে বলে, 'এখন যাস না। এখন ইন্ডিয়া দুশমন।'

দুলালও হেসে ওঠে। বলে, 'সত্যি, কি ভুতুড়ে রাজনীতি না রে!'

'রাজনীতির তো ঐ কাম। মানুসের সঙ্গে মানুসের ফারাক বাড়ায়।'

'আরেক রকম রাজনীতিও আছে', দুলাল বলবার চেষ্টা করে।

আসাদ তার মোটা থাবাথানা শূন্যে তোলে। পিতলের সুদৃশ্য চাকতি আলোর ঝলকায়। 'আমি তর মতো ফিলজফার নই। আমি সামনে যা দেখি সেইটারেই রাজনীতি কই।'

'তা হয়তো সত্যি, কিন্তু যেমন বাংলাদেশের একটা কনসেপ্ট, তেমনি রাজনীতির একটা কনসেপ্ট আমাদের মনের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে।'

'ঘুমন্ত রাজকন্যা।'

'হ্যাঁ, কখনও কখনও কোনো কাঠির ছোঁয়ায় সে জেগে ওঠে। আমার তোর জীবদ্দশায় হয়তো জাগবে না। কিন্তু জাগবে। তোর মনে হয় না এই বাংলাদেশের ব্যাপারটা? কি বন্, কি মন্ট্রিল, কি ঢাকা, কি দিল্লি, সর্বত্র আমরা এই উঠতি মধ্যবিত্ত একটা শিক্ষিত উদ্বাস্তুকে পরিণত হচ্ছি। সব কিছু মূল্যবোধ যা নিয়ে আমাদের বাপদাদারা আঁকড়ে থাকতো তা এখন আবর্জনা হয়ে যাচ্ছে। তা হলে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের সামনে কী রাখব?'

'তরে দেখলে আমার সেই ফরিদপুরের ইস্কুলের কথা মনে পড়ে। সেই কুমার নদীতে সাঁতার? মনে আছে?'

'ঘুমন্ত রাজকন্যা ঘুমাক।'

এমন সময় মেমী অ্যাকসেন্ট মাইকে বাজে : প্যাসেঞ্জারস টেকিং দ্য ফ্লাইট নাম্বার...ওয়েটার এগিয়ে আসে বিল নিয়ে।

এয়ারপোর্ট থেকে ফেরবার পরও সেদিন বিকেলে হামলা হয়। দরজা খোলা চমৎকার বাংলা বলেন, উচ্চারণ প্রায় শুদ্ধ। 'আমরা মাদ্রাজীরা তো ভাড়া নিয়ে ঝামেলা করি না জানেন। আমার ছোট বোন, তার স্বামী। দুজনেই স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি করে। ওখান থেকে সোজা চেক আসবে। আপনার একাউণ্টে জমা করে দেবে।'

প্রথম দিকে সে বলেছে, বাড়ি ভাড়া দেবে না। কিন্তু সে ঠিক বৃদ্ধ নয়, জীবনের ভোগলালসা এখনও তার অম্লান। কাজেই লোকে নিপাট ব্লাফ ভাবত তার কথা। সে নিশ্চয় আরও বড় দাঁও মারবার তাল করছে এইটাই ছিল সাধারণ প্রতিক্রিয়া।

'আপনার নাম ঠিকানা রেখে যান। আমি যদি মনস্থির করি...

'যদি পার্টও দেন। পার্ট দিলে আমরা সাড়ে চারশো পর্যন্ত উঠতে পারি।'

'আসলে কি জানেন, বাড়িটা ঠিক ভাড়া দেবার জন্যে তৈরি হয় নি। দোতলায় এত স্পেস। কিন্তু ঘর কম। সারা শীত বারান্দায় পড়তে হয় ছেলেকে।'

'পার্ট দিয়ে দিন। পার্ট দিলে আর আপনার অসুবিধে হবে না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ব্যাঙ্কে চলে যাবে। সন্ধ্যেবেলা ফিরবে।...আপনার যদি প্রাইভেসির বেশী দরকার। পেছনের উঠোনটা তো আপনার অনেকখানি। ঐটা আমরা দেওয়াল দিয়ে আলাদা করে নেব। আপনার পয়সা খরচা করতে হবে না।'

তার বর্তমান মনের অবস্থায় তাদের বাড়ির নীচতলার পেছনদিকটাই তার প্রধান আকর্ষণ। চল্লিশ বছর আগেও ফলিত বিজ্ঞানের প্রতাপ এত বাড়েনি। তার ফলে অনেকখানি ফাঁকা। এখনকার ভাষায় বিরাট ওয়েস্ট। এই ফাঁকার ওপর একটা ফুলন্ত নিম। নীচে চৌবাচ্চা, সার্ভিস কল বাঁধানো উঠোন। পাশ দিয়ে ছেতলাভরা সেকেলে পাঁচিল। সেখানে সারা দুপুর একটা বেড়াল গা চলকায়।

'আমি যদি মনস্থির করি..'

ভদ্রমহিলা সটান উল্টোমুখ হয়ে নেমে গেলেন।

কত দিন তার এই অপ্রস্তুত কাঁচুমাচু বাড়িওয়ালার ভূমিকা পালন করতে হতো সে জানে না। এরই মধ্যে হঠাৎ গাঁক গাঁক করে দুটো ভারী ট্রাক এসে দাঁড়াল দরজার গোড়ায়। গডরেজের আলমারি, রকমারি বাহারে পর্দা পেলমেট থেকে শুরু করে দেওয়াল জোড়া সাঁইবাবার ফটো ট্রাকে উঠতে লাগল। বারবার চাপাচাপি করে ভদ্রলোক দুলালকেও তার হাইরাইজ ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে গেল। কোনো জবাব নেই। আগাগোড়া গোলাপী পোর্সিলেন টাইলে ঢাকা বাথরুম মেয়ে বাবলির জন্যে, স্বামী-স্ত্রীর বাথরুমের দেওয়াল ঢাকা হালকা নীল পোর্সিলেনে। এখনকার হাল ফ্যাশানী ড্রইং রুম-কাম-ডাইনিং রুম যাতে দুলালের অবশ্য ঘোরতর আপত্তি আপনি গেঞ্জি পরে খাচ্ছেন, এমন সময় অফিসের কাজে এক অপরিচিত ভদ্রলোক সামনে সোফায় আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। তবে আড়াই লাখ টাকার সাজানো অ্যাপার্টমেন্টের মালিক এ সব ভাবে না। ভদ্রলোক বাঙালী ব্যবসায়ী। যুদ্ধের সময় ব্যবসা মার খেয়েছিল। তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসেশান। এই সবে চাক ঘুরেছে।

'লেফ্‌ট ফ্রন্ট কি রকম হবে। আপনার মনে হয়? জ্যোতি বোস তো ভাল বলছে, কি বলেন?'

'ভালই হবে, ভালই হবে', দুলাল আন্দাজ দেয়।

'বাবলিরই খালি কষ্ট হচ্ছে। ও বলছে, এটা তো হোটেল। আমাকে বাড়ি নিে চলো।' ভদ্রলোকের স্ত্রী বললে।

'আসলে আপনার বাড়ির পেছন দিকটায় অনেকখানি জায়গা তো। অব ওয়েস্ট। অতখানি জায়গার এখন অনেক দাম। ওখানে আপ একটা আলাদা বা তুলতে পারেন।' ভদ্রলোক বললে।

ইলেকট্রিক লাইন, ল্যাচ-কি, সব ছেঁচেমুছে নিয়ে গেছে ভাড়াটে ভদ্রলোক সব বসাতে ঠিক করতে আরও দিন দশ পনেরো কেটে যায়। এরই মাঝখানে আর মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, দূর সম্পর্কের আত্মীয়, মুখচেনা পাড়ার ভদ্রলোক ভদ্রমহিল একই সঙ্গে উদ্দামভাবে 'সা—রা—রা—বা—রা—রা' আর স্টিরিওতে ফি সঙ্গীত। তা ছাড়া, চারপাশ থেকে টি-ভির আওয়াজ। সভ্য হবার বাসনায় মানু যত যন্ত্র উচ্চ স্তরে নিয়ে যাচ্ছে ততই কার্যত অসভ্য মানুষ। সর্বত্র এই সর্বনা কুহক।

পনেরো কুড়ি দিন পর গৃহপ্রবেশ। দুতিন দিন হল কিছু জিনিসপত্র নামো কিছু কিনতে হবে। কিন্তু জ্যাবড়া করা চলবে না।

নীচতলায় রান্না বাড়ি নেমেছে। মাংসের গন্ধ আসছে। 'তুমি কোথায়?' র বললে।

চৌবাচ্চার পাশে উঠোনে সার্ভিস কলের নীচে বালতি পেতেছে দুলাল। মা ওপর তাদের বাড়ির ছাদ বরাবর ফুলন্ত নিমের ডাল পেরিয়ে সাদা মেঘ। এ জুঁই লাগালে কেমন হয়। ফরিদপুরে এমনি চাতালের ধারে ছিল জুঁইয়ের ঝা ভাগ্যিটি পাশের বাড়িটা এজমালি বাড়ি, অনেকখানি জমি, ভূতো হয়ে পড়ে আ নইলে এতদিন হাইরাইজ উঠত।

'তুমি কোথায়?' রুমা আবার বললে।

বালতি থেকে মগে করে জল ঢালতে ঢালতে দুলাল বললে, 'আমি এখা

'সে কি, তোমার ওপরের বাথরুম, নীচের বাথরুম দুটোই খালি।'

'কিন্তু ঘুমন্ত রাজকন্যা?'

রুমা বললে, 'কার কথা বলছো? বাংলাদেশ না বিপ্লব?'

'না', দুলাল মাথা নাড়ায়।

'আবার প্রেমট্রেম নয় তো?'

সাবান মাখতে মাখতে দুলাল বললে, 'হ্যাঁ, নিজের সঙ্গে।'

ছবি সুধীর

তীজ

দিলীপ সিনহা

রাজস্থানের একটি ছোট্ট গাঁ। মা বাপ মরা সাত ভাইয়ের সচ্ছল সংসারে আদরের ছোট বোনটি এসেছে চাঁদ পুজোর ব্রত পালন করতে। ভাইদের সুখের সংসার, অভাব নেই কোন। গোলা ভরা বজরা আর চার চারটে উটের দুধ, খেয়ে ফুরোয় না।

শ্রাবণ মাস, চাঁদ পুজোর দিন। বিবাহিতা মেয়েরা পুজোর পর চাঁদ দর্শন করে, তারপর প্রণাম করে উপোস ভাঙবে। এরকমই নিয়ম। বৃষ্টিবাদল রাজস্থানে কমই হয়ে থাকে কিন্তু আজ বুঝি তার ব্যতিক্রম, আকাশ ঘন মেঘে ঢেকে রয়েছে। ক্রমে রাত বাড়ছে কিন্তু চাঁদের দেখা পাওয়া ভার। এদিকে সাত ভাইয়ের বড়ো স্নেহের বোনটির অবস্থা কাহিল, খিদেয় তেষ্টায় সে কাতর।

সাত ভাই যুক্তি করে বোনকে নকল চাঁদ দেখিয়ে ব্রত ভঙ্গ করালো। দূরের টিলার ওপরে ঝোপের মধ্যে কৌশলে আগুন জেলে দিয়ে এল এক ভাই। সবাই তখন বোনকে বলল ঐ দ্যাখ চাঁদ উঠছে, তার আলো। মেয়েটি এই ছলনায় বিশ্বাস করে উপোস ভাঙলো।

পরদিন মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে এল মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। মেয়েটির স্বামী নাকি হঠাৎ মারা গেছে। মাত্র ছ'মাস আগে মহা ধুমধাম করে বোনটির বিয়ে দিয়েছিল তারা। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। এটা যে তাদের পাপেরই প্রতিফল তা অনুমান করে সাত ভাই অনুশোচনায় দগ্ধ হল।

সকলের অজান্তে মেয়েটি চোখের জলে ভাসতে ভাসতে পথে বেরিয়ে পড়েছিল। কোথায় চলেছে কোন হুঁশ নেই। যেতে যেতে রাস্তার মধ্যে এক নাগিনীর সঙ্গে দেখা। মেয়েটির দুঃখের কাহিনী শুনে নাগিনী পথ বাতলে দিল, তার স্বামী নাগরাজকে দুধ জল দিয়ে পুজো করতে।

কিছুদূর এগোতেই নাগরাজের দেখা পেল মেয়েটি। পুজোয় সন্তুষ্ট হয়ে নাগরাজ বলল, 'আমাকে একটা কলসীতে ভরে শ্মশানে নিয়ে যাও। সেখানে তোমার স্বামীর চিতার ওপর কলসীসুদ্ধু আমাকে রেখে তোমার লোকজনদের দাহ করতে বলো। তাহলেই দেখবে আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নাগিনী ছুটে আসবে। তখন চাপে পড়ে তোমার স্বামীকে পুনর্জীবন দিতে বাধ্য হবে।'

এইভাবেই মেয়েটি তার মৃত স্বামীকে ফিরে পেয়েছিল। গ্রামের লোকেরা এই দিনটিকে আনন্দ উৎসবে চিরস্মরণীয় করে রাখতে তীজ উৎসবের প্রচলন করল।

হরিয়ানার রোতক জেলায় মণিমাজরা গ্রামে গিয়েছিলাম 'তীজ' দেখতে। সেই গ্রামের এক বৃদ্ধার মুখে এই রাজস্থানী উপকথাটি শুনেছিলাম। এই ব্রত উপকথাটি অনেকটা আমাদের দেশের মনসার উপাখ্যানের মত।

তীজ উৎসবের দিনটি সাধারণত পড়ে শ্রাবণ মাসে, কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। গ্রামের বড় বড় গাছগুলি থেকে শক্ত দড়ি ঝুলিয়ে দোলনা খাটিয়ে দেওয়া হয়, আর মেয়েরা তাতে গান গেয়ে গেয়ে দোলে। এইসব গানের সুর ছন্দ আর অর্থ সরল সহজ আর বলিষ্ঠ ঠিক গ্রামবাসীদেরই মত। নীচের উদ্ধৃত গানটিতে এ কথার তাৎপর্য উপলব্ধ হবে।

> আরী সে এ সাওন কী তীজ
> গাড়ে হিণ্ডোলে চাম্পে বাগ মে
> এক জোটা ইসায়ে দো
> পিহার দেখ্যা মেহরা শাশরা
> চলেগ পিরুয়া পিছুয়া বাল
> ল্যাগে হ্যায় ঝাকোলা সুন্দর হ্যায় পড়
> এক ব্যা মুখড়েতে বোলা না যায়ে
> মুখমে কিঁড়ি বড় বড় লিকড়ে থী
> মুখ ষরদায়ী বেইমান ফিরিঙ্গ।

[নববধূ তার সখীদের বলছে—সাওনের তীজ এসেছে। বাগানেও ঝুলা লাগানই আছে চল আমরা দুলি। খুব জোরে আমাকে দোলা দাও যাতে আমি অনেক উঁচুতে উঠে যাই। সেখান থেকে আমি পিহার (বাপের বাড়ি) আর শ্বশুরবাড়ি দুই দেখতে পাব। দুলতে দুলতে হঠাৎ ধাক্কার চোটে সুন্দর (বউটির নাম) মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। ঠিক সেই সময়ে পথ দিয়ে স্বামী যাচ্ছিল, স্ত্রীর অবস্থা দেখে দাঁড়িয়ে গিয়ে মুচকি, মুচকি হাসছে।]

তীজ' উৎসবে ঝুলনরত নববধূ

তীজ উৎসব ১৫ দিন ধরে চলে। শুরু হয় ছোটি তীজ দিয়ে আর শেষ হয় ১৫ দিন পর বড়ী তীজে। ছোটি তীজে মেয়েরা পিহার অর্থাৎ বাপের বাড়ি আসে 'তীজ' পালন করতে। ঘরে, ঘরে 'পাকোয়াল' (উৎসবের বিশেষ রান্না) আর 'সুহালি' মিষ্টি তৈরী হয় আটা আর গুড় দিয়ে। তীজের আগে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী থেকে 'কোথলি'—'সুহালি' মিষ্টি ভর্তি চুপড়ি বয়ে নিয়ে আসে নাই (নাপিত)—আর সেই মিষ্টি গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে বিতরণ হয়। নান (নাপতেনি) 'সুহালির' বিরাট থালা নিজের উড়ানি দিয়ে ঢেকে নিয়ে যায় বাড়িতে বাড়িতে বিলি করার জন্য আর পেছনে পেছনে দৌড়ায় গ্রামের যত ছেলে-মেয়ে 'সুহালির' লোভে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

'তীজ' উৎসবের সঙ্গে হিমালয় দুহিতা দেবী পার্বতীরও একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কথিত আছে পার্বতী নাকি এই দিনটিতে কৈলাস যাত্রা করেন স্বামী মহাদেবের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে। তীজের সময়ে তাই বাড়িতে পার্বতীরও পুজো হয়। পুজো শেষ হলে গৌরী কন্যা পার্বতীকে বিদায় দেওয়া হয় স্বামীর কাছে যাওয়ার জন্যে। এই সময়ে গ্রামবাসীদের মুখের ভাব দেখলে মনে হয় যেন বাড়ির সবচেয়ে আদরের মেয়েকে বিদায় জানানো হচ্ছে শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্য।

তীজ উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা আর পাঞ্জাবেও পালন করা হয়, যদিও তীজ মুখ্যত রাজস্থানেরই উৎসব। রাজস্থানে 'তীজ' বর্ষা ঋতুকে আমন্ত্রণ জানাবার উৎসব হিসাবেই পালিত হয়।

ছায়ি ঘন ঘটা ঘোর, সাওন কে দিনে আ গেয়ে
বাদল গরজে, বিজলী চমকে.........।

কিন্তু মরুভূমির দেশ রাজস্থান। বৃষ্টি এখানে বিরলপ্রায়। বর্ষাকালেও—অবশ্য বর্ষাকালের উল্লেখে বাঙালীর মনে বর্ষার যে মেঘমেদুর ঘনঘোর মূর্তির ছবি সহজেই ভেসে ওঠে তার সঙ্গে রাজস্থানের এই ক্ষণ-স্থায়ী বর্ষার তুলনাই চলে না—কোন কোন জায়গায় বৃষ্টি হয়, কিন্তু কোথাও কোথাও বিশেষত জয়সালমীর, বিকানীর, পোসরা এইসব অঞ্চলে বৃষ্টি কম হয় না বলে, একেবারে হয় না বলাটাই সত্যি বলার কাছাকাছি হবে। বৃষ্টি বাংলাদেশকে বিধাতা মুক্ত হস্তে দিয়েছেন। যে জিনিস প্রচুর পরিমাণে এবং না চাইতেই পাওয়া যায় তাতে আমরা কোন নতুনত্ব দেখতে পাই না বা তাকে পাওয়ার জন্য আমাদের বিশেষ কোন প্রয়াসও থাকে না। তা না হলে বাংলাদেশ, যেখানে ১২ মাসে ১৩ পার্বণ লেগেই আছে, বর্ষার তেমন কোন উৎসব নেই কেন? বর্ষাকে সম্ভাষণ জানাতে রবীন্দ্রনাথের গানই আমাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু রাজস্থান ত আর বাংলাদেশ নয়। বৃষ্টি এখানে এত শস্তা নয় যে চাইলেই পাওয়া যাবে। এখানে জয়সালমীরের কোন কোন জায়গায় বৃষ্টি সাত, আট বছরে হয়ত একবার হয়। কাজেই কমবয়সী অনেক ছেলেমেয়েরই দেখা এখানে মিলবে যারা জীবনে হয়ত বৃষ্টি কখনও চোখেই দেখেনি। আর এইসব ছেলেমেয়েরা বৃষ্টি প্রথম দেখে, আকাশ থেকে ঝাঁঝরির মত জল পড়ছে ঝর ঝর করে তাদের বিস্ময়ের আর আনন্দের যেন সীমা থাকে না। অনেকে ত ভয়ে কেঁদেই ফেলে আর ছুটে বাড়িতে চলে যায়। ভয় ভাঙলে দলে দলে ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে বৃষ্টি উপভোগ করতে, বৃষ্টিতে খেলতে। বুড়ো বুড়ীরা যে এই আনন্দ উপভোগে পেছিয়ে থাকে তা নয়। বাচ্চাদের সঙ্গে তারাও সমান তালে যোগ দেয়, বৃষ্টিতে ভিজে হই হই করে। তাই রাজস্থানে 'তীজ' উৎসব বর্ষা বন্দনার উৎসব হিসাবে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

তীজের আগের দিন পর্যন্ত চলে উপহার দেওয়া-নেওয়ার পালা। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হয় মিষ্টি আর নতুন জামাকাপড়ের ভেট। যাকে এরা বলে কোথলি। সেখান থেকেও আসে অনুরূপ বদলি উপঢৌকন। বাঙালীদের অনেকটা তত্ত্ব পাঠানোর মতন। তীজের দিন সকাল হতে না হতেই মেয়েরা উৎসব নিয়ে মেতে ওঠে। ঝলমলে রঙীন লেহেঙ্গা আর উড়নি আর ভারী রুপোর গহনায় নিজেদের আবৃত করে গান গাইতে গাইতে সব দলে দলে দোলনা তলায় জড়ো হয় তারপর শুরু হয় দোলা। গান গেয়ে গেয়ে আর গানের তালে তালে দোলনায় দুলতে থাকে।

'তীজ' বা দোলনা উৎসব সঙ্গীতভিত্তিক। গান এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। অবিবাহিতারা এবং নব বধূরা এই উৎসবের পুরোধা বলে। গানগুলি সাধারণত প্রেমভালবাসা, প্রণয় প্রণয়ীর বিরহ মিলনের কাহিনী নিয়ে রচিত। এছাড়া আছে দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, বিশেষত শাশুড়ীকে নিয়ে নানা-রকম ঠাট্টা তামাশার গান। পরবর্তী গানের স্তবক দুটিতে সেই দীর্ঘ শাশুড়ী-সমালোচনার সামান্য নমুনা পাওয়া যাবে।

কাড়ুই কাচোরি এমা মেরি কচ কচোজি
হাঁজি কোই কড়ুয়ে শাশড় কে বোল
বহুত দোহেলো এমা মেরি শাশরা জি।
(কাঁচা কচরি ফলের মত আমার শাশুড়ির
কথাবার্তা তিক্ত আর কটু
আমার শ্বশুরবাড়িও এক আজব জায়গা)

আমাতে পালো এমা মেরি খোসড়ে জি
হাঁজি কোই বিচমে শাশড়কে বোল
বহুত দোহেলো মেরি শাশরা জি।

[কোথলিতে আমার জন্য যে লেহেঙ্গা (নিম্নাঙ্গের ঘাগরা জাতীয় বসন) আর উড়নি এসেছে সেগুলো ঠিক আমার শাশুড়ির কথার মতনই পীড়াদায়ক, পরতে একদম রুচি হয় না। আমার শ্বশুরবাড়ি এক আজব জায়গা।]

মেয়েরা এক একবারে দুজন করে দোলনায় চড়ে। এইভাবেই সারাদিন কাটে। বাড়ি বাড়ি থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার আসে দোলনা তলায়। ছোট ছোট মেয়েরা বয়ে নিয়ে আসে সেই খাবার।

'তীজ'-এর ঝুলনে আরও দুটি সহাস্য মুখ

প্রথম বা ছোটি 'তীজে' বিবাহিতা মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করে বটে কিন্তু প্রথম তীজে কুমারী মেয়েদের বিশেষ করে বিবাহযোগ্যা কুমারী মেয়েদের উৎসাহই বেশী। ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে 'তীজ' পুজো করলে নাকি মনের মত স্বামী পাওয়া যায়। তীজের দিন শুভদিন। অনেকে গৃহপ্রবেশ, নতুন জমির অধিকার নেওয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানও এই শুভদিনে সারবার জন্য তীজের অপেক্ষায় বসে থাকে।

দ্বিতীয় বা বড়ী 'তীজ' প্রধানত সধবাদের, সৌভাগ্যবতীদের, সোহাগনদের উৎসব। মেয়েরা শ্বশুর-বাড়ি আসে দ্বিতীয় 'তীজ' পালন করতে। উৎসবের আগের দিন মেয়েরা ব্রতকথা শোনে আর সারাদিন উপবাস করে থাকে। বাড়ির আঙিনায় চারচৌকা এক মাটির ঢিপি তৈরি করা হয়, এক ফুটের মত উঁচু। তার মাঝখানে ছোট্ট এক নিমগাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয় আর তার চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয় কাচরা (এক রকমের ফল), মোতি, পাতিলেবু। এক টুকরো রঙীন কাপড়, আয়না আর একটা প্রদীপ। বাড়ির বউরা হাতে মেহেদি লাগিয়ে আর কনুই পর্যন্ত সবুজ চুড়ি পরে আয়নার মাধ্যমে এই জিনিসগুলো প্রতিফলিত অবস্থায় দেখে। সোজাসুজি পুজোর এ সমস্ত উপচার দেখতে নেই। এরপর তৈরী হয় ছাতুর লাড্ডু। এক একটির ওজন সওয়াপাও। এক একটা বার কাশে ১৬টা এরকম লাড্ডু রাখা হয় আর বাড়ির সব বউদের সামনে একটা করে লাড্ডু ভর্তি বারকোশ বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বাড়ির ছেলেরা এসে সেই লাড্ডু রুপোর টাকা দিয়ে ভেঙে যে যার বউকে মিষ্টিমুখ করায়। এইসব অনুষ্ঠান শেষ হলেও নিমডালের পুজো চলতেই থাকে যতক্ষণ না আকাশে চাঁদ ওঠে। চাঁদ দর্শনের পর পুজো আর উপবাসের সমাপ্তি। উৎসবের শুরু শুরু হয় গান, বাজনা আর নাচের আসন। হাসি ঠাট্টা আর দিল্লাগীর চূড়ান্ত। কোন মেয়েই এই আনন্দ

উৎসবের দোলনায়

উপভোগ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। 'তীজ' উৎসব প্রেম, ভালোবাসার উৎসব। প্রিয় ও প্রিয়তমার যুগল মিলনের আনন্দমেলা। বিরহীদের এ উৎসবে স্থান খোঁজার কথা নয়। কিন্তু তীজের এমনই আকর্ষণ, ঝুলন গানের এমনই মাদকতা যে বিরসবদনা বিরহীরাও ছুটে যায় এই উৎসবে অংশ নিতে প্রবাসী প্রিয়র চিন্তা ক্ষণিকের জন্য ভুলে। পরবর্তী শাশুড়ি বধূর সংলাপধর্মী দ্বৈত সঙ্গীতটিতে এমনই একটি নারী মনের প্রকাশ যার স্বামী গেছে কিছুদিনের জন্য প্রবাসে।

বউ— রেশম কি মেরী ঝুলো ধরী সে
আরি শাশড় হাসনে ঝুলন কি চাহ
হামনে ঝুলেন যান দেরি।

(বাইরে বাগানে সুন্দর রেশমি দোলনা খাটানো হয়েছে আমার তাই দেখে ভীষণ দুলতে ইচ্ছা করছে আমাকে দুলতে যেতে দাও)।

শাশুড়ি—কন্ লে যা তেরী ঝুলে নে হে?
হায় বহু কন্ ঝোটে দে?
বাগ ঝুলন কি তেরি টাল সে হি।

(বউ কে তোর ঝুলো বাগানে নিয়ে যাবে আর কে-ই বা তোকে দোলা দেবে? কাজেই তুই দোলনা-তলায় যাবার ইচ্ছা ত্যাগ কর।)

বউ— ননন্দ তো লে যা মেরী ঝুলে নে রি
হেরি কোই দেবর ঝোটে দে
বাগ ঝুলন্ নে যান দে রি।

(ননদ আমার ঝুলো নিয়ে যাবে আর কোন দেওর আমাকে দোলা দেবে। আমাকে দোলনা খেতে যেতে দাও।)

শাশুড়ি—লাল গয়ে পরদেশ মে
হেরি বহু লোগ করেংগ তকরার
বাগ ঝুলন কে টাল সে।

(আমার ছেলে বিদেশে তা সত্ত্বেও তুই যদি দুলতে যাস ত লোকে নিন্দে করবে। সেইজন্য বলছি তুই আজ দুলতে যাস না।)

বউ— তেরি লাল গয়ে পরদেশ
হেরি শাশড় হাম্ ভি মরেংগ উনকে সাথ?
বাগ ঝুলন যান দেরি।

(তোমার ছেলে বিদেশ গেছে সেইজন্য আমাকে কি সবকিছু ত্যাগ করতে হবে? আমাকে দোলনায় দুলতে যেতে দাও।)

তীজ সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের উৎসব। মেয়েদের গান, মেয়েদের জন্যই দোলনা আর মেয়েদের উপরেই বর্তায় পূজার অনুষ্ঠান, উপচারের দায়িত্ব। পুরুষদের স্থান পিছনের সারিতে দর্শক হিসাবে। শুধু হরিয়ানায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম। হরিয়ানায় মেয়েদের সঙ্গে পুরুষরাও এই উৎসবে যোগ দেয়। যদিও পুরুষদের দোলনা খাটানো হয় অনেক দূরে যেখান থেকে মেয়েদের দোলনা দেখা যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কঠিন পর্দা প্রথায় ভাঙনের কোন চিহ্নই নজরে আসে না উত্তর ভারতের এই সব গ্রামে। আর একটি ব্যতিক্রম—হরিয়ানায় 'তীজ' খালি একদিনের জন্য মানানো হয়। এখানে ছোটি তীজ বড়ি তীজ বলে কিছু নেই। পূজো-আচ্চাও বিশেষ হয় না। আমোদ, প্রমোদ আর মনো রঞ্জনই হরিয়ানার 'তীজ' উৎসবের প্রধান লক্ষ্য। আর পুরুষেরা দোলনায় দোলে বটে কিন্তু উৎসবের জন্য বিশেষ করে নতুন জামাকাপড় পরে সাজতে এদের বিশেষ দেখা যায় না। গান গেয়ে গেয়ে মেয়েদের মত দোলার রেওয়াজও পুরুষদের মধ্যে নেই। খুবই স্বাভাবিক। গান গেয়ে গেয়ে মেয়েদের মত দুলতে আর কোন বেটাছেলের ভাল লাগে! নেহাত অনেকদিন চলে আসছে এই রীতি তাই। সেইজন্যই এই উৎসবকে কেন্দ্র করে পুরুষদের জন্য বছরের এই সময়ে হরিয়ানার গ্রামে গ্রামে আয়োজিত হয় নানারকমের গ্রাম্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, যার মধ্যে কুস্তি, কাবাডি ও গরুর গাড়ি দৌড় উল্লেখযোগ্য। গ্রামবাসীরা দলে দলে এইসব প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। প্রতিযোগিতায় যারা অংশ নেয় আর দর্শক উভয়ে সমান ভাবেই এইসব প্রতিযোগিতার আনন্দ উপভোগ করে। একদল শরীর চালনা করে আর অপর দল গলাবাজী করে।

জয়পুরে আর উদয়পুরে 'তীজ' খুব ধুমধামে সঙ্গে পালন করা হয়। জয়পুরে 'তীজ' উপলক্ষে বিরাট শোভাযাত্রা বার হয়। ভ্রমণবিলাসী (Tourists) ও পর্যটকের (Travellers) দল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এই সময়ে জয়পুরে আসে তীজ দেখতে দর্শকদের মধ্যে বিদেশীদের সংখ্যাও বড় কম হয় না। জয়পুরের উপকণ্ঠের গ্রামগুলি থেকে বহু গ্রামবাসী উটের পিঠে বা হাতীতে চড়ে জয়পুরে আসে 'তীজ' শোভাযাত্রায় অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য। বলা বাহুল্য জয়পুরের রাজবাড়ির হাতী, উট, ঘোড়া সবই এই শোভাযাত্রায় সামিল হয়।

তীজ উৎসবের এই সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার মূলে আছে রাজস্থান সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে রাজস্থানের প্রাণ মাতানো এই গ্রামীণ উৎসবটিকে ট্যুরিস্ট আকর্ষণকারী সর্বাঙ্গসুন্দর একটি অনুষ্ঠানে পরিণত করার। 'তীজ' উপলক্ষে জয়পুরের ভ্রমণবিলাসীদের ভীড়কে মাপকাঠি ধরলে রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টা অনেকটা সফলও বলা যেতে পারে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ধরনের প্রচেষ্টার ফল সাধারণত যা হয়ে থাকে—অনেক কৃত্রিমতা এসে ঢুকেছে এই উৎসবে তাই গ্রাম-রাজস্থানের এই ঝুলন উৎসবের প্রকৃত রস উপভোগ করতে গেলে কোন ছোট শহরে বা গ্রামে তাঁবু গাড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

শীতের এক সকালে পেন্টিংক নামক একটি জাহাজ এসে ভিড়লো কলকাতার পোতাশ্রয়ে। জাহাজটি এসেছে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে সেই জাহাজ থেকে নামলেন এক কালো রঙের পাক্কা সাহেব। হ্যাট, কোট, প্যান্ট, বুট জুতো পরিহিত। এঁর ওষ্ঠে সাদা লম্বা একটি পদার্থ, যার এক প্রান্ত থেকে ধূম উদ্গীরিত হচ্ছে। কাগজের মধ্যে তামাক পাকানো এই জিনিসটির নাম সিগারেট, কলকাতাবাসীর চক্ষে এ বস্তুটি নতুন।

এই কৃষ্ণকায় সাহেবটিই স্বর্গত উকিল রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র মধুসূদন। তবে মধু নামে যে উচ্ছৃঙ্খল, প্রতিভাবান, কোমল, হঠকারী, উদ্ধত যুবকটি এক সময় কলকাতা শহর মাতিয়ে তুলেছিল, সে আর নেই, তার বদলে ইনি একজন স্থূলকায়, মধ্যবয়সী, ক্লান্ত চেহারার পুরুষ। মধুসূদনের বয়েস এখন বত্রিশ, কিন্তু তাঁর চেহারায় যৌবনের দীপ্তি নেই, এবং এরই মধ্যে যেন প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়েছে।

সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল মধুসূদন মাদ্রাজে প্রবাসী ছিলেন। একদা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজন কারুকে কোনো সংবাদ না দিয়ে গোপনে তিনি কলকাতা পরিত্যাগ করেছিলেন, তখন বুকে কত আশা ছিল, ভবিষ্যতের কত পরিকল্পনা ছিল, তার কিছুই ফলে নি। আজ কলকাতার অনেকের চোখেই তিনি মৃত, জাহাজঘাটায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একজনও দাঁড়িয়ে নেই। তবু মধুসূদন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন, যদি একটিও চেনা মুখ চোখে পড়ে। কেউ নেই। ইতোমধ্যে কলকাতার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মধুসূদন এখন কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, তারও ঠিক নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মধুসূদন মালপত্র একটি ছ্যাকড়া গাড়িতে তুলে বললেন, চলো ফেরীঘাট, বিশপস কালেজ মে যায়েগা!

মাদ্রাজে মধুসূদনের ভাগ্যে জুটেছে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা। খৃস্টান হয়েছিলেন বিলাত যাবার লোভে, কিন্তু অদ্যাপি সে সুযোগ ঘটেনি। মাদ্রাজে গিয়ে ভেবেছিলেন ইওরোপীয় সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে উচ্চ কোনো পদে নিযুক্ত হবেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর নেটিভ আখ্যা ঘোচেনি, জীবিকার্জনের জন্য তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল সামান্য স্কুল মাস্টারি। কবিখ্যাতির মোহে রচনা করেছিলেন মিল্টনের অনুকরণে গাথা-কাব্য, তাঁর সেই ইংরেজি কাব্যের সমাদর হয়নি। কেউ কেউ পিঠ চাপড়ানি দিয়েছে মাত্র, কলকাতার সংবাদপত্র তাঁর রচনারীতি নিয়ে পরিহাস করেছে। মধুসূদন মনে করতেন বাঙালী মেয়েদের তুলনায় ইওরোপীয় রমণীরা শতগুণে শ্রেষ্ঠা, সেই মোহে মাদ্রাজে যাবার অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁর ছাত্রীস্থানীয়া এক নীলকর সাহেবের কন্যা রেবেকাকে বিবাহ করেছিলেন। চারটি পুত্র কন্যার জন্ম দিয়েও সে বিবাহ সুখের হলো না, স্থায়ী হলো না। পুত্র-কন্যা সমেত রেবেকাকে পরিত্যাগ করে আবার এক ফরাসী যুবতীর সঙ্গে পত্নীভাবে বসবাস করছিলেন।

কবি হতে গেলে পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নেই, এই আহরিত বক্তব্যকে বিশ্বাসে মধুসূদন মাদ্রাজে গিয়ে পিতামাতার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগই রাখেননি। প্রথম প্রথম বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখতেন। যে প্রাণপ্রতিম সুহৃদ গৌরদাসকে একদিন না দেখলে থাকতে পারতেন না, প্রবাসে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই গৌরদাসকে প্রথম দিকে নিয়মিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি লিখতেন, তারপর এক সময় তাতেও ভাটা পড়লো। চোখের বার হলেই মনের বার হয়ে যায়, কলেজ জীবনের বন্ধুরা সকলেই সংসারী হয়ে নানা কর্মে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে, আর সেই প্রাণের টান থাকে না। পর পর কয়েক বৎসরের নীরবতার পর কলকাতার অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিল যে, মধু আর বেঁচে আছে কি নেই। সে যেমন যথেচ্ছচারী, তার পক্ষে আকস্মিক মৃত্যু অসম্ভব কিছু নয়।

একমাত্র গৌরদাসের ভালোবাসাই অকৃত্রিম এবং একনিষ্ঠ। তিনি একদিনের তরেও তাঁর প্রিয় বন্ধু মধুকে ভোলেন নি। এই আট বৎসর ধরেও মধুর জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে আছেন। পত্র লিখেও মধুর কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে তিনি হাল ছাড়েন নি। মাদ্রাজের ইংরেজি পত্রপত্রিকা আনিয়ে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে দেখেন, তাতে মধুর কোনো লেখা আছে কি না। অনেক লেখাতেই মধু নিজের নাম দেয় না, কিন্তু মধুর রচনারীতি গৌরদাসের এতই পরিচিত যে, গৌরদাস একটি লাইন দেখলেও চিনতে পারবেন।

খৃস্টান হবার পর মধুসূদন প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়েছেন বিশপস কালেজের ছাত্রাবাসে। তারপর আট বৎসর মাদ্রাজে। এই এক যুগের অধিককাল কলকাতার জীবনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এই সময়ের মধ্যে এ দেশে ও সমাজে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, মধু তার কোনো সন্ধানই রাখে না।

পুত্র বিরহে জাহ্নবী দেবী ধরাধাম পরিত্যাগ করে চলে গেছেন অকালে। ক্রুদ্ধ উন্মত্ত রাজনারায়ণ জাহ্নবী দেবী জীবিত থাকতেই পর পর শিবসুন্দরী, প্রসন্নময়ী এবং হরকামিনী নামে তিনটি সদ্বংশীয়া রূপ লাবণ্যবতী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। আর একটি পুত্র তাঁর চাই-ই, বিধর্মী মধুকে তিনি ত্যাজ্য করেছেন, তার হাতের জল তিনি নেবেন না। এবং অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর পুন্নাম নরকে তিনি কিছুতেই যেতে রাজি নন। কিন্তু পুত্র-বিরহের ওপর সপত্নী-জ্বালায় পীড়িত হয়ে জাহ্নবী দেবী অভিশাপ দিয়েছিলেন স্বামীকে, আমি যদি সতী হই, তবে আর কোনো পত্নী দ্বারা তোমার সন্তান উৎপন্ন হবে না। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই, দ্বিতীয় পুত্রের মুখ দেখা আর হলো না, নিদারুণ মনস্তাপ নিয়ে রাজনারায়ণ এক সময় মৃত্যু বরণ করলেন।

পিতার মৃত্যু সংবাদ মধুসূদনের কানেও পৌঁছোয় নি এক বৎসরের মধ্যে। আত্মীয়-জ্ঞাতিরা রাজনারায়ণের বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করে নেওয়ার জন্য চুলোচুলি শুরু করেছিল। তারা রটিয়ে দিয়েছিল যে মধুসূদন মৃত, সুতরাং নিকট জ্ঞাতিরাই সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নেবে। তা ছাড়া, সে জীবিত থাকলেই বা কী, হিন্দু আইনে বিধর্মী সন্তান পিতৃ সম্পত্তির অধিকার হারায়। সেই কারণেই নিম্নবর্ণের, দরিদ্র শ্রেণীর হিন্দুরাই সাধারণত মুসলমান বা খৃস্টান হয়েছে, অবস্থাপন্ন, ধনী হিন্দুরা সহসা ধর্মান্তরিত হয় না। তবে সম্প্রতি খৃস্টান মিশনারীদের প্ররোচনায় সরকার 'লেক্স লোসি' নামে এক আইন প্রণয়ন করেছেন, এই আইন বলে ধর্মান্তরিত পুত্র পৈত্রিক সম্পত্তির দাবীদার হতে পারে। তবে এ পর্যন্ত অবশ্য কেউ এই নতুন আইনের প্রয়োগ পরীক্ষা করেনি।

রাজনারায়ণের নিজস্ব বাসগৃহটিও অন্যেরা দখল করে নিচ্ছে শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন গৌরদাস বসাক। এ বাড়ি মধুর প্রাপ্য। অথচ কোথায় মধু? সে সময় রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো কাজ উপলক্ষে মাদ্রাজ যাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে মধুর নামে একটি চিঠি দিয়ে গৌরদাস তাঁকে অনুরোধ করলেন যে-প্রকারে হোক মধুকে খুঁজে বার করতে। কৃষ্ণমোহনের মাধ্যমেই আবার কলকাতার সঙ্গে মধুসূদনের যোগসূত্র স্থাপিত হলো।

মধুসূদন কলকাতায় এসেছেন অর্থ সংগ্রহের আশায়। মাদ্রাজে দারিদ্র্য তাঁকে পীড়া দিয়েছে। পিতার কতখানি এবং কী প্রকার সম্পত্তি আছে, সে সম্পর্কে মধুসূদনের কোনো ধারণা নেই। পুত্রের মতন রাজনারায়ণও ছিলেন বিলাসী, ভোগী পুরুষ। যদৃচ্ছ দু হাতে অর্থ উড়িয়েছেন। মাদ্রাজে দ্বিতীয়া পত্নীকে রেখে মধুসূদন একা জাহাজ ভাড়ার ঝুঁকি নিয়ে কলকাতায় এসেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, পৈত্রিক সম্পত্তি যদি কিছু পাওয়া যায়, তবে তা বিক্রয় করে সংগৃহীত অর্থ নিয়ে আবার ফিরে যাবেন মাদ্রাজে।

কলকাতায় তাঁর থাকার কোনো জায়গা নেই। তাঁর মতন খৃস্টানকে কোনো হিন্দু বন্ধু স্বগৃহে আশ্রয় দেবে কিনা, সে সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ আছে। সেই জন্যই মধুসূদন সোজা গিয়ে উঠলেন বিশপস কলেজে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়ার্টারে। পৌঁছেই দ্রুত চিঠি পাঠালেন গৌরদাস বসাকের কাছে।

গৌরদাস পত্রপাঠ হাজির। বহুকাল পর দুই বন্ধুতে দেখা।

মধুসূদন আগের মতন আর ছুটে গিয়ে গৌরদাসকে আলিঙ্গন করে তাঁর গণ্ড চুম্বনে সিক্ত করলেন না। শুধু উঠে দাঁড়িয়ে গৌরদাসের প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, অ্যাডস্যুম! আই অ্যাম হিয়ার!

বিস্ময়ে বেদনায় গৌরদাস বললেন, এ কী চেহারা তোর হয়েছে, মধু!

গৌরদাসের চোখে ভাসে সেই ছিপছিপে কৃষ্ণকায় যুবকটির শরীর। তার বদলে মধু যে এখন শুধু স্থূলোকার হয়েছে তাই-ই নয়, মুখখানি ফোলাফোলা, চোখের নীচে গভীর কালো দাগ, সর্বাঙ্গে অমিতাচারের ছাপ। কণ্ঠস্বর ভাঙাভাঙা।

মধুসূদন হেসে বললেন, বাট্ গাউর, ইউ আর অ্যাজ হ্যান্ডসাম অ্যাজ এভার!

গৌরদাসেরও পরিবর্তন হয়েছে অনেক, কালপ্রবাহ কারুকেই স্পর্শ দিতে ভোলে না। গৌরদাস এখন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, উচ্চপদস্থ চাকুরে, হিন্দু কলেজের অন্যান্য মেধাবী ছাত্রের মতন তিনিও এখন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এরই মধ্যে তাঁর দুবার পত্নী বিয়োগ হয়েছে, সেই শোকের ছাপ আছে তাঁর চোখে। তবে তাঁর মুখশ্রী প্রায় আগের মতনই সুন্দর বটে।

মধুসূদন সমস্ত কথাবার্তাই বলছেন ইংরেজিতে, বাংলা তিনি প্রায় ভুলেই গেছেন। গৌরদাসকে চিঠি পাঠিয়ে তিনি ছটফট করছিলেন। কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে মদ্যপানের সুবিধে নেই, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন ও ব্যাপারের ঘোর বিরোধী।

মধুসূদন বললেন, গৌর্ গাউর, আমরা কোথাও যাই। আর কিছু না হোক, শহরটা একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসি।

গৌর বললেন, আমি গাড়ি এনেছি। আগে খিদিরপুরে যাবো। তোর নিজের বাড়ি দেখবার সাধ হয় না?

—আমায় সে বাড়িতে ঢুকতে দিবে?

—কেন দেবে না? দুএকদিন আগে গিয়ে আমি হম্বিতম্বি করে এসেছি। পা-বাবু আর ক-বাবুকে বলে দিয়েছি, খপরদার, মধু শিগগিরই এসে পড়বে, তার আগে আপনারা কিচ্ছুটি করবেন নাকো!

—সে কি, তুই আমার আগমন বার্তা চতুর্দিকে

রটাইয়া দিয়াছিস নাকি? আমি কিছুকাল সংগোপনে থাকিতে চাই।

—না, আর কারুকে বলিনি। তবে, এত গোপনতাই বা কেন? বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করবি নি?

—আমার লজ্জা হয়, গাউর! পূর্বে সগৌরব উন্নত মস্তকে হেথায় পরিভ্রমণ করিতাম। এখন আসিয়াছি ভিখারির মতন।

—কে বলে তুই ভিকিরি। তুই আমাদের সকলের প্রিয় সেই মধু।

—তোদের সকলের প্রিয় হইবার মতন আমার আর কী আছে বল, গাউর।

—তুই আমায় গাউর, গাউর করিসনি তো। গৌর বল! সব বিষয়ে ইংরেজি কেতা ধরিচিস বলে কি আমাদের নামগুলোও ইংরিজি করে ফেলবি!

—সরি, আই অ্যাম প্রফিউজলি সরি, মাই ডিয়ারেস্ট গৌর! বাঙ্গালা আমার মুখে একেবারেই আইসে না।

—তোকে আমি চিঠিতে অনেকবার লিকিচিলুমে যে, তুই বাংলা শেখ্। বাংলা ছাড়া আমাদের আর গতি নেই। তোর কবিত্বশক্তি তুই বাংলায় প্রয়োগ কর।

—সে আর এ জীবনে হইবে না! বন্ধুদের সংবাদ কী বল! ভূদেব, বঙ্কু, ভোলানাথ, রাজনারায়ণ, লতিফ ইহারা সব কে কেমন রহিয়াছে? উহারা আমাকে মনে রাখিয়াছে কি?

—কেন মনে রাকবে না? দেকা হবে, আস্তে আস্তে সবার সঙ্গেই দেকা সাক্ষাৎ হবে। তবে রাজনারায়ণ এখন থাকে মেদিনিপুরে।

—আর গঙ্গানারায়ণ? দ্যাট শাই, ইনট্রোভার্ট ফেলো? আমি উহাকে খুব পছন্দ করিতাম।

—গঙ্গানারায়ণ তোরই মতন বহুদিন নিরুদ্দেশ। কেউ আর খবর জানে না।

গৌরদাসের জুড়ি গাড়ি অপেক্ষা করছিল গঙ্গার এ পারে। দুই বন্ধুতে নৌকোয় নদী পেরিয়ে এসে সেই গাড়িতে উঠলো। খিদিরপুরের কাছাকাছি আসবার পর মধুসূদন হঠাৎ গৌরদাসের হাত চেপে ধরে বললেন, না, গৌর, আমি যাইব না। ঐ গৃহে আমার মাতা প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, সেই শূন্য ভবনে আমি কোন্ প্রাণে প্রবেশ করিব?

গৌরদাস ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, এতদিন বুঝি মায়ের কতা মনে ছেল না? মৃত্যু শয্যায় একবার তো দেকা দিতেও আসিস নি।

মধুসূদন ভগ্নকণ্ঠে বললেন, সত্যই আমি অপরাধী। আমি কুপুত্র! তুই আমাকে যা বলিবি বল!

মধুসূদনের দু' চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে লাগলো। সাহেব মানুষদের যে যেখানে সেখানে চক্ষের জল ফেলতে নেই, সে কথা খেয়াল রইলো না তাঁর।

রাজনারায়ণ দত্তের সুবিখ্যাত গৃহটির দরজা হাট করে খোলা। সন্ধ্যা সমাগতা, সে গৃহের কোথাও আলো জ্বলে নি।

এক সময় মধু এ বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলেই তিন চারজন ভৃত্য ছুটে আসতো তার হুকুম শোনবার জন্য। আজ সেখানে দ্বারবান, ভৃত্য একজনও নেই। বাড়ির ভিতরটাও যেন খাঁ খাঁ করছে। মনে হয় জনশূন্য।

সিঁড়িতে পা দিয়ে মধুসূদন আবার কাতর হয়ে পড়লেন। এককালে তিনি সুহৃদদের নিয়ে কত প্রমোদ রঙ্গ করেছেন এ বাড়িতে, এখানে কত প্রিয় স্মৃতি লেগে আছে। আজ সব কিছুরই যেন ভগ্নদশা। নড়বড় করছে সিঁড়ির রেইলিং। এক সময় চতুর্দিকে ঝাড়বাতি জ্বলতো, এখন ছিন্ন ছিন্ন অন্ধকার ঝুলেছে মাথার ওপরে।

গৌরদাস হাঁক দিলেন, কই, কে আছো? কেউ এখানে আছো?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যেন পরিত্যক্ত, হানা বাড়ি।

গৌরদাস বললেন, আর তা হলে ওপরে গিয়ে কাজ নেই। বরং দিনের বেলায় আর একদিন আসা যাবেখন।

মধুসূদন বললেন, একবার আমার শয়ন কক্ষটি দেখিব।

গৌরদাস বললেন, এই অন্ধকারের মধ্যে আর সেখানে কী দেকবি!

মধুসূদন বললেন, একবার স্বহস্তে দেওয়ালগুলি স্পর্শ করিব। দেখিতে চাই, উহারা আমাকে চিনিতে পারে কি না।

উভয়ে উঠে এলেন দ্বিতলে। অলিন্দটি পুরোপুরি অন্ধকার নয়, সম্মুখস্থ অপর একটি অট্টালিকার আলোকচ্ছটা কিছুটা এসে পড়েছে সেখানে। কিছুকাল আগেও এ অঞ্চল জনবিরল ছিল, এখন অনেক বাড়ি উঠছে।

মধুর ঘরের দ্বারটি ভেজানো, একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ভিতরে আসবাবপত্র কিছুই নেই, কারা যেন নিয়ে গেছে সে সব। শুধু শূন্য চারটি দেওয়াল। এক সময় এখানে স্তূপীকৃত হয়ে থাকতো মধুর বইপত্র, যেখানে সেখানে ছড়ানো থাকতো তার রকমারি পোশাকআশাক।

গৌরদাসের কাঁধে ভর দিয়ে মধুসূদন আবার ক্রন্দন করতে লাগলেন। ভগ্নকণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন, গৌর, কী ছিল, আর কী হইল! সেই সব দিন কোথায় গেল? মনে পড়ে, এই কক্ষে, এক পালঙ্কে তুই আর আমি একত্র শয়ন করিয়াছি! কী উন্মাদের মতন ভালোবাসিয়াছি তোকে, কোনো নারীর প্রতিও এত আকর্ষণ বোধ করি নাই-

গৌরদাস চমকিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে?

দ্বারের সামনে এক শ্বেতবসনা মূর্তি। গৌরদাসের প্রশ্নেও সেই মূর্তি নিথর নীরব।

কান্না থামিয়ে মধুসূদনও ভয় পেয়ে গেলেন। অন্ধকারের মধ্যে ঐ মূর্তিটি হঠাৎ ওখানে এলো কী করে? যেন অপার্থিব কোনো কিছু—

গৌরদাস আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে?

কোনো উত্তর নেই।

তখন গৌরদাস সাহস করে এগিয়ে গিয়ে এসে ভালো করে দেখে বললেন ও আপনি? সারা বাড়ি অন্ধকার কেন?

মধুসূদনের তখনো ভয় কাটে নি। তিনি বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন কে? গৌর কে?

মধু কলকাতা ত্যাগ করার পরও গৌরদাস কয়েকবার এসেছেন এ বাড়িতে। জাহ্নবী দেবীর মৃত্যু শয্যায় গৌরদাস এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মধুর চেয়ে এ বাড়ির সংবাদ তিনি অনেক বেশী রাখেন।

গৌরদাস বললেন ইনি হরকামিনী দেবী। মধু, ইনি তোমার একজন জননী।

মধুসূদন ঈষৎ বিরক্তভাবে বললেন, অন্ধকারে প্রেতাত্মার মতন উনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? কথা কহেন না কেন?

গৌরদাস বললেন, শোকে দুঃখে উনি অমন স্তব্ধ হয়ে গ্যাচেন।

মধুসূদন বললেন, আমার আবার কয়টি জননী? ইঁহাকে আমি কস্মিনকালে চক্ষে দেখি নাই!

গৌরদাস বললেন, ইনি তোমার বাপের চতুর্থা পত্নী। আমি এনাকে আগে দেকিচি।

গৌরদাস সেই রমণীকে জিজ্ঞেস করলেন, মা, আপনার এখানে বাতি নেই? আপনি এখেনে একা একা রয়েচেন কেন? বাড়িতে আর কোনো লোকজন নেই?

এবার মহিলা বললেন, একজন চাকর থাকে, তাকে বাজারে পাঠাইছি। আপনেরা খাড়ান, আমি বাতি নিয়া আসি।

অনতিবিলম্বেই মহিলা একটি সেজবাতি নিয়ে এলেন হাতে ঢেকে। সেই আলোয় দেখা গেল রমণী অতি অল্প বয়সিনী, ষোড়শী বা সপ্তদশী বড় জোর, বৈধব্যের কারণে মাথার চুল অতি ছোট করে ছাঁটা। মুখখানি দেখলে মনে হয়, যেন বিষাদ প্রতিমা।

হরকামিনী ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন আপনেরা কে? কোথা থনে আসছেন?

গৌরদাস মধুসূদনের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইনি আপনার পুত্র, এর নাম মধু, বোধ করি আপনি এর কতা শুনে থাকবেন।

হরকামিনী ঠিক উন্মাদিনীর মতন এক পা দু পা করে এগিয়ে এসে হাতের বাতিটা মধুসূদনের মুখের সামনে তুলে অদ্ভুত করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মধু? এতদিন পরে এলে? সব যে শেষ বাবা!

তারপরই তিনি ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠে বললেন, ওগো আমার আর কেউ নেই? আমি কোথায় যাবো?

মধুসূদন বিব্রত হয়ে এক পা পিছিয়ে গেলেন। অপরের কান্না তিনি সহ্য করতে পারেন না। তিনি গৌরদাসকে বললেন গৌর, তুই এই রমণীকে অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দে যে, আমি উঁহাকে বলিতেছি, মাতা আপনি এই গৃহে যতদিন খুশী অবস্থান করুন।

গৌরদাস বললেন, তুই কি বাংলায় মা অবধি বলতে ভুলে গিচিস? তুই নিজের মুখে বল, মা, আপনি থাকুন।

নিজের প্রায় অর্ধেক বয়েসী এক যুবতীকে মাতৃ সম্বোধন করে মধুসূদন সেই কথাই জানালেন।

তারপর আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে এলেন সে ঘর থেকে।

এর কয়েকদিন পর গৌরদাস একদিন নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন কয়েকজন বন্ধু ও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। এই উপলক্ষে তিনি মধুসূদনকে কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজে পরিচয় করিয়ে দিতে চান।

মধুসূদনের বিষয় সম্পত্তির নিষ্পত্তি করতে অনেক সময় লাগবে। এদিকে তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য। কিছু একটা রোজগারের সুরাহা না হলে তাঁর পক্ষে কলকাতায় থাকা অসম্ভব। দূরাত্মা আত্মীয়রা কোথা থেকে একটি জাল উইল দাখিল করেছে, সুতরাং সম্পত্তি এখন গভীর জলে। তা ছাড়া, গৌরদাসের আন্তরিক বাসনা, মধু আর মাদ্রাজে না ফিরে কলকাতাতেই থেকে যাক।

সেই আসরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাই কিশোরীচাঁদ মিত্র। তিনি পুলিস কোর্টের জুনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর স্ত্রী খিদিরপুরের মেয়ে, এক সময় মধুসূদনদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন এবং তাঁকে মধুদাদা বলে সম্বোধন করতেন। খিদিরপুরের বাড়ি নিয়ে মামলা বেধেছে বলে মধুসূদনের এখন কলকাতায় বাসস্থানের কোনো স্থিরতা নেই। কিশোরীচাঁদের সহধর্মিণী স্বামী মারফত বলে পাঠিয়েছেন যে, মধুসূদন তাঁদের দমদমের বাগান বাড়িতে এসে থাকতে পারেন। সেখানে অতি সুন্দর উদ্যান রয়েচে এবং অনেকগুলি কক্ষ সমন্বিত একটি বাড়ি। কিশোরীচাঁদ সাগ্রহে মধুসূদনকে তাঁর বাড়িতে অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

শুধু তাই নয় কিশোরীচাঁদ বললেন, পুলিস কোর্টে তাঁর অধীনে একটি কেরানীর পদ খালি আছে। মধুসূদন ইচ্ছে করলে সেই চাকুরিটি নিতে পারেন।

গৌরদাস প্রমুখ অনেকেই এ প্রস্তাবকে সোল্লাসে স্বাগত জানালেন। এই তো মধুর চমৎকার ঠিকে হয়ে যাবে।

মধুসূদনের মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। কেরানীর চাকরি! এদের এতদূর স্পর্ধা যে তাঁকে এমন প্রস্তাব দিতে পারে! যে ব্যক্তি বাইরন বা স্কটের মতন লেখক হতে চায়, সে করবে পুলিস কোর্টে কেরানির চাকরি?

কিশোরীচাঁদ বললেন, বেতন নেহাত মন্দ না, আপাতত একশত কুড়ি টাকা দেবে, ভবিষ্যতে পদোন্নতির আশা আছে।

গৌরদাস বললেন, তুই চুপ করে আছিস যে মধু? কিশোরীচাঁদবাবু অতিশয় সহৃদয় মানুষ।

কিশোরীচাঁদ বললেন, আপনি আমার গাড়িতে আমার সঙ্গেই যাতায়াত করতে পারবেন, মিঃ ডাট।

মধুসূদন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এরা ধরেই নিয়েছে যে, এই চাকরি তাঁর মতন একজন বেকারের পক্ষে লোভনীয়। যাতায়াত ও বাসগৃহেরও অসুবিধে নেই। পকেট শূন্য। এর মধ্যেই মধুসূদনকে পর-মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। ঋণ করতে হয়েছে কয়েকজনের কাছে। আর উপায় কী! মধুসূদন বললেন, ইহা তো আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা।

মধুসূদন চলে গেলেন দমদমের বাগান বাড়িতে। কিশোরীচাঁদের সঙ্গে রোজ অফিসে যাতায়াত করেন। কিশোরীচাঁদ অবশ্য মোটেই তাঁর সঙ্গে কর্মচারীর মতন ব্যবহার করেন না তিনি ঠিক বন্ধুর মতন।

দমদমের এই বাগান বাড়িতে প্রায়ই অনেকে আলাপচারির জন্য আসেন। প্রচুর পানাহার তর্কবিতর্ক সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চা হয়। মধু এমনিতে বেশ মজলিশী স্বভাবের, নানা প্রকার গল্পগুজবে তাঁর জুড়ি নেই, মুখে মুখে এখনো তিনি ইংরেজি কবিতা বানাতে পারেন, কিন্তু এক এক সময় তাঁর খুব অসুবিধে হয়। অহংকারী মধুর তখন নিজেকে মনে হয়, বকের দলের মধ্যে এক হংস। সেই সময় তিনি চুপ করে শুধু সুরার গেলাসের দিকে মনঃসংযোগ করেন।

কিশোরীচাঁদের এই বাড়িতে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আসেন। এঁরা ইংরেজি সাহিত্যে ডাকসাইটে পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আজকাল প্রায়ই কথা বলেন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে। রামগোপাল ঘোষ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখকে মধুসূদন ছাত্র বয়েস থেকেই চেনেন, এঁরা হিন্দু কলেজের গোড়ার যুগের ছাত্র, ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ শিষ্য, এ দেশে পশ্চিমী ধ্যানধারণা তো ছড়িয়েছেন এঁরাই। আর ইদানীং এঁরা মেতেছেন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে। কেউ কেউ আবার প্যান্ট কোর্ট ছেড়ে ধুতি-মেরজাই-চাদর পরে দিশিবাবু সেজে আসেন। কে এক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাকি বিধবাদের বিয়ে দেবে বলে মেতেছে, সে সম্পর্কেও এঁদের দারুণ উৎসাহ। প্রায়ই সে প্রসঙ্গ আসে, আর এঁরা তখন রৈ-রৈ করে ওঠেন এবং প্রখ্যাত রাজা রাধাকান্ত দেবের মুণ্ডপাত করেন। মধুসূদনের এ সময়ে কথা বলার কিছুই থাকে না। হিন্দুরা বিধবাদের পুনর্বিবাহ দিতে পারবে, এ তাঁর বিশ্বাস হয় না। এই যে সেদিন তাঁর তরুণী বিমাতা হরকামিনীকে দেখে এলেন, তাঁর তো সারা জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। হিন্দুরা পারবে ঐ অসহায় বিধবাকে কোনো সুপথ দেখাতে?

একদিন হঠাৎ কিশোরীচাঁদের দাদা প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে মধুসূদনের বাক্‌ দ্বন্দ্ব বেধে গেল। সন্ধ্যায় বাগান বাড়ির এক প্রান্তে সরোবরের বাঁধানো ঘাটে আসর বসেছে। আজও কথা চলছে বাংলা ভাষার বইপত্র বিষয়ে। প্যারীচাঁদের বন্ধু, মাউন্ট এভারেস্টের সূত্রে প্রখ্যাত রাধানাথ শিকদার এখন আপন যত্নে বাংলা শিক্ষা করে নিয়েছেন এবং নিজে লিখছেনও কিছু কিছু। রাধানাথ ও প্যারীচাঁদ যুগ্মভাবে প্রকাশ করছেন একটি পত্রিকা, স্ত্রীলোক এবং অল্প শিক্ষিতেরাও যাতে পড়ে বুঝতে পারে এমন সরল বাংলায় সেখানে সব কিছু লেখা হয়, পত্রিকাটির নামটিও অতি সরল, "মাসিক পত্রিকা"। মধুসূদন কিশোরীচাঁদের কাছ থেকে নিয়ে দু'একবার উল্টে দেখেছেন সে পত্রিকাটি। তাঁর বিবমিষা হয়েছে। সে পত্রিকায় প্যারীচাঁদ ধারাবাহিক-ভাবে লিখছেন একটি উপন্যাস, নাম 'আলালের ঘরের দুলাল', ছোটলোক চাঁড়ালদের মতন ভাষায় লেখা। অথচ সেই লেখাটির জন্যই নাকি তুমুল সোরগোল পড়ে গেছে সারা দেশে।

মধুসূদন বিরক্তি সহকারে শুনছিলেন ওঁদের কথাবার্তা, খানিক বাদে নেশার মাত্রা কিছুটা চড়লে তিনি বলে উঠলেন, হোয়াট ট্রাস ইউ আর রাইটিং, প্যারীচাঁদবাবু? ইহা কি ভদ্রলোকের ভাষা? গৃহ মধ্যে লোকে ঝি চাকরের সহিত যে ভাষায় কথা বলে, তাহাও কি আপনি সভ্যসমাজে আনিতে চান! গৃহ মধ্যে আপনি যেমন তেমন পোশাকে থাকিতে পারেন, গামছা জড়াইয়াও ঘুরিতে পারেন, কিন্তু ভদ্রমণ্ডলীতেও কি সেই পোশাক পরিধান করিয়া আসিবেন?

প্যারীচাঁদ চমকিত হয়ে তাকালেন মধুসূদনের দিকে। তারপর একটু কৃপার হাস্য দিয়ে বললেন, আমরা কথা বলছি বাংলা সাহিত্য নিয়ে, আপনি সে বিষয়ে কিছু বুঝবেন না, মিঃ ডাট।

মধুসূদন তবুও বললেন, আমি আপনার ঐ পত্রিকার রচনা পাঠ করিয়াছি। উহা কি সাহিত্য? এইরূপ ভাষায় সাহিত্য হয়? বাংলা তো জেলে-জোলা-তাঁতীদের ল্যাঙ্গোয়েজ! সংস্কৃত হইতে প্রচুর শব্দ আমদানি করিয়া তবু এই ভাষাকে কিছুটা ভদ্রস্থ করা যায়।

প্যারীচাঁদ বললেন, মিঃ ডাট, আমি বলচি, শুনে রাখুন! সংস্কৃতের দিন গ্যাচে। এই যে খাঁটি চলতি মুখের ভাষা আমি ব্যবহার করচি, দেকবেন একদিন সবাই আমার এই ভাষাতেই লিকবে, আমার প্রবর্তিত এই ভাষা বঙ্গে চিরস্থায়ী হবে!

মধুসূদনও তৎক্ষণাৎ সগর্বে বললেন, মোটেই তাহা নহে। ছি ছি, সাহিত্য একটি পবিত্র জিনিস, তাহা লইয়া আপনারা বাল-ক্রীড়া করিতেছেন! এই কুৎসিত বাংলা ভাষায় যদি কিছু রচনা করিতেই হয় তবে অগ্রে ইহার উন্নতি করিতে হইবে! দেখিবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব, তাহাই হইবে চিরস্থায়ী।

—আপনি ভাষা সৃষ্টি করবেন? কোন ভাষা? ল্যাটিন, গ্রীক, তামিল?

—না, বাংলা।

সকলে সমস্বরে হো-হো করে হেসে উঠলো। হাসির কথাই বটে, যে ব্যক্তি ইংরেজি ছাড়া বাংলাতে কথাই বলে না, দুচারটি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে গেলেও ভুল করে, সে কিনা বড়াই করে বাংলা ভাষা সৃষ্টি করার।

প্যারীচাঁদ বিদ্রূপ করে বললেন, আপনি বাংলা লিকবেন? কোন্ কালে? এই কলিকালে, না সত্য যুগে?

মধুসূদন গুম হয়ে রইলেন। (ক্রমশ)

ভ্রম সংশোধন : ১৬ই জুন সংখ্যায় 'সেই সময়' উপন্যাসের ৪৮তম পরিচ্ছেদে কামাপুকুর টোলের পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম ভ্রমক্রমে রামকুমার ভট্টাচার্য ছাপা হয়েছে। রামকুমারের সুবিখ্যাত ছোট ভাই গদাধর যে চট্টোপাধ্যায় বংশীয় ছিলেন, তা সবারই জানা। —লেখক

সাহিত্য

প্রতিবিম্বিত প্রাদেশিক সাহিত্য

তেরশ ছিয়াশির সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ'-এর সৌজন্যে দেখলাম স্বদেশকে অবশ্য সাহিত্যের বাতায়নে। প্রাদেশিক সাহিত্যের খবর পৌঁছে দিয়েছে এই সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ। স্বল্পায়তনে প্রবন্ধগুলি তথ্যনিষ্ঠ এবং বিশ্লেষণধর্মী। ভারতীয় সাহিত্যের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিতির সুযোগ সাহিত্য আকাদমী, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্টের অনুবাদ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাওয়া যায়। প্রেমচন্দ ফণীশ্বরনাথ রেণু, সুমিত্রানন্দ পন্থ, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, মহাদেবী বর্মা, যশপাল, মুলক রাজ আনন্দ, অমৃতা প্রীতম, খাজা আহমদ আব্বাস, সুব্রহ্মণ্য ভারতী, ফকিরমোহন সেনাপতি, হেম বড়ুয়া, জাভের চাঁদ মেঘানি, শিবকুমার যোশী, বিজয় তেন্ডুলকর, গিরিশ কারনাড (এই তালিকা যথাযথ এবং সম্পূর্ণ নয়)—নবীনে ও প্রবীণে মিলে এঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই খ্যাতিমান। ভারতের যে কোনো প্রান্তের সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে এঁরা অপরিচিত নন। তবে এঁদের সমগ্র রচনাধারা, সাহিত্যকৃতি এবং এঁদের সাহিত্যজগৎ সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা আমাদের নেই। অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কানাড়া, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, পাঞ্জাবী, মারাঠী ও হিন্দী সাহিত্যের আধুনিক মেজাজ-মর্জির পরিচয় পেয়ে সেই-সমস্ত সাহিত্যানুরাগীরা সন্তুষ্ট হয়েছেন, যাঁরা প্রতি-বেশীদের সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহলী।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ভাষাগত বৈচিত্র্যে আমাদের চিন্তাশক্তি অনেকাংশে পঙ্গু। ফলে একজাতীয় কূপমণ্ডূকতার দাসত্ব করি, পরিণামে হই প্রবঞ্চিত। কর্মসূত্রে যাঁরা ভিন্ন প্রদেশে বসবাস করেন, মাতৃভাষা ছাড়াও ঐ অঞ্চলের ভাষায় তাঁদের কিছুটা দখল জন্মায়। কিন্তু বিদেশী ভাষা শিখে অস্মিতা প্রকাশের যতটা ব্যাকুলতা আছে, দেশীয় ভাষার ব্যাপারে ঠিক ততখানি অনীহা আমাদের মজ্জাগত। তবে একথা সত্য যে, দাক্ষিণী ভাষাসমূহ উৎপত্তির বিচারে ভিন্ন ভাষা-বংশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আর্যাবর্তের ভাষাগুলির তুলনায় স্বভাবতই অনাত্মীয় বোধ হয়। সুতরাং আমরা এদের প্রতি ঔদাসীন্যই পোষণ করি। কিন্তু যথার্থ সাহিত্যপ্রেমীর কাছে "ভাষা" কোনো অন্তরায় নয়। "ভাষা" হল চাবি। ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারলে সাহিত্যের বন্ধ প্রকোষ্ঠাকে উন্মুক্ত করা যায়। তবে সব-ক্ষেত্রে ভাষাকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। কাজেই অনুবাদের দ্বারস্থ হতে হয়। অনুবাদের চাবিকাঠিতেই 'দেশ' প্রাদেশিক সাহিত্যের অন্দরমহলকে চকিত দর্শনের সুযোগ করিয়ে দিয়েছে।

প্রবন্ধকারেরা যশস্বী লেখক। প্রতিবেদনের মধ্যে তাঁদের মনস্বিতার পরিচয় মুদ্রিত। তিন দশকের মারাঠী সাহিত্যকে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন শ্রী এস বি যোশী। প্রবন্ধটি তথ্যবহুল, বিশ্লেষণধর্মী এবং সুস্বাদু। কিন্তু শ্রীশিবকুমার যোশীর প্রবন্ধটি পড়ে অতৃপ্ত থেকে যায়। কারণ, গুজরাটী সাহিত্যের কিছু চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে শ্রী যোশী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারদের উল্লেখ করেননি। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত পন্থী হতে চাননি। তবে শেষাংশে যুগ-বিভাগের ধারায় গুজরাটী সাহিত্যের কয়েকজন লেখকের তালিকা দিয়েছেন। কিন্ত তালিকা রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায়। শ্রী টি জানকীরামন তামিল সাহিত্যের সংবাদ পরিবেশন করেছেন বেশ প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে। কিন্তু শ্রী এন ভি সুব্বারাওয়ের তেলুগু সাহিত্যের বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর তেমন জোরালো হয়নি। ভারতীয় সাহিত্যে নব্যআন্দোলনের নেতৃত্বে আছেন তরুণ সম্প্রদায়। স্বভাবতই তাঁদের কণ্ঠস্বরে আছে অগ্নিদাহ। প্রবন্ধকারের প্রতিবেদনের শিরোনামে যেমন চমক আছে, বক্তব্যের অন্তরঙ্গে তা কিন্তু অনুপস্থিত। তবে প্রদত্ত তথ্যাবলী অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। স্বল্প পরিসরে শ্রী বিক্রমন নায়ার মালয়ালাম সাহিত্যের অনিশ্চিত বর্তমানের ছবি এঁকেছেন। শেষাংশে প্রবন্ধকার যখন বলেন "বঙ্কিম-চন্দ্র থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মুস্তাফা সিরাজ পর্যন্ত যাবতীয় আধুনিক বাঙালী ঔপন্যাসিকদের লেখা মালয়ালামে প্রকাশিত হয়েছে। ...কেরালায় প্রবাসী বাংলার মেয়ে নিলীনা আব্রাহাম আর সার্থক অনুবাদক সংকট। রবি বর্মা—এই দুজনের চেষ্টায় বাঙালী লেখকরা আজ কেরলবাসীদের কাছে সুপরিচিত"—তখন বাঙালী হিসাবে আত্মতুষ্টি জাগে। ত্রিশ বছরের পাঞ্জাবী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ডঃ এস এস দোসাঞ্জ। প্রথমেই তিনি শুনিয়েছেন চমকপ্রদ ঘটনা—"মাতৃভাষায় কিছুই না লিখে কয়েকজন পাঞ্জাবী সাহিত্যিক দেশ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন। তাঁরা হলেন ইকবাল, কৃষণ চন্দর, উপেন্দর নাথ, আশোক যশ পাল, ফৈজে আহমেদ ফৈজ, মুলক রাজ আনন্দ এবং খুশবন্ত সিং।" সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন, "এর অর্থ এই নয় যে, পাঞ্জাবী ভাষা উপেক্ষিত হয়েছে।" একালের ওড়িয়া সাহিত্যের ওপর শ্রী বিষ্ণুপদ পাণ্ডার সাবলীল আলোচনার আলোকপাতে আমরা উপকৃত হই। শ্রী ডি এন বেজবরুয়ার যুদ্ধোত্তর কালের অসমীয়া সাহিত্যের তথ্যবহুল, বিশ্লেষণাত্মক দীর্ঘ আলোচনা যথেষ্ট মনোগ্রাহী। তাঁর রচনার সূচনাতে কলকাতার সঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাস জড়িত থাকার সংবাদও আমাদের গর্বিত করে। পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ভিন্ন "অসমীয়া সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ আসাম ছাত্র

সাহিত্য সংঘের সূত্রপাত হয়েছিল কলকাতায়।" কানাড়া সাহিত্যের বিগত ত্রিশ বছরের অগ্রগতি যে সাম্যবাদী আদর্শ ও বিপ্লবকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত তা জানতে পারি শ্রী এল এস শেষাগিরি রাওয়ের আলোচনায়। তবে রচনাটিতে তথ্যের অভাব আমাদের কিছুটা আহত করে। উর্দু সাহিত্য কোনো প্রাদেশিক সাহিত্য নয়। ভারতের মাটিতেই এর জন্ম, বৃদ্ধি এবং বিবর্তন ধীরে ধীরে প্রাদেশিক ভাষার মতই বিশিষ্ট মান ও মর্যাদার অধিকারী করে তুলেছে। সেই উর্দু সাহিত্যের বর্তমান গতিপ্রকৃতিকে চাক্ষুষ করে তুলেছেন সৈয়দ মানাল শাহ আলকাদেরী। এখানে আলোচনার পরিসর অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং তৃপ্তি মেলে না। সাহিত্যের ইতিহাসের প্রচলিত পথ ধরে তিনি সাহিত্যের রূপরেখা এঁকেছেন ডঃ গোপাল। এখানে তথ্যের পাল্লা অধিক ভারি। ঘাটতি পড়েছে প্রবন্ধকারের মৌলিক চিন্তার।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রতিবিম্বিত প্রাদেশিক সাহিত্যের সাম্প্রতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে লক্ষ করা গেছে সমসূত্রতা। সেটি হল স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষীয় ক্রান্তিকাল ভারতীয় সাহিত্যাদর্শকে স্বভাবতই প্রভাবিত করেছে। কারণ, সাহিত্যের ধ্রুব সংজ্ঞা বা প্রকৃতি দেশ ও কালের ধারায় অভিন্ন। সর্বত্রই বলা হয়েছে—সমকালের গর্ভেই জন্ম নেয় সাহিত্য। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতবাসীর জীবনবোধ ও মননে যে ভাঙাগড়ার পালা চলেছে, ভারতের প্রতিটি প্রান্তের সাহিত্যে পড়েছে তার প্রতি-ফলন। কোনো সাহিত্যে প্রাচীন রীতিবাদকে ভাঙতে কিছু সময় লেগেছে, কোথাও তা ঘটেছে অতি দ্রুততায়। এক কথায়, ভারতীয় সাহিত্যাদর্শ কোনো প্রান্তিক বিচ্ছিন্নতাগ্রস্ত নয়, প্রগতিবাদের একসূত্রে প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহ ঐক্যবদ্ধ।

অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, অধিকাংশ প্রাদেশিক সাহিত্যেই বর্তমানে নাট্যসাহিত্য তুলনায় পশ্চাদ্‌গামী। আমরা জেনেছি "আধুনিক তামিল সাহিত্যেও উপেক্ষিত বিষয় হল নাটক।" পাঞ্জাবী সাহিত্য "ছোটগল্পের তুলনায় পাঞ্জাবী নাটকের মান নীচের দিকে।" বাংলা নাট্যসাহিত্যেও (বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র এবং অন্যান্য কয়েকজন নাট্যকারের রচনা ভিন্ন) এখন চলেছে বন্ধ্যাদশা। জনরুচি ও অন্যান্য কারণ এর জন্য কি পরিমাণ দায়ী, তা আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। বর্তমানে মঞ্চপ্রয়োজনার প্রতি লক্ষ রেখেই নাটক রচনার অতি উৎসাহ চোখে পড়ে। তবে বিভিন্ন রাজ্যে নাট্যাভিনয়ে জনগণের আগ্রহ কিছু বেশী। মারাঠী ও হিন্দী মঞ্চনাটকের খ্যাতি সর্বজন-বিদিত। কিছুদিন আগে 'দেশ'-এর পৃষ্ঠায় ডঃ প্রতিভা অগ্রবাল কলকাতার হিন্দী রঙ্গমঞ্চের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় যখন ডঃ এস এস দোসাঞ্জ বলেন, "পাঞ্জাবে একটিও পেশাদার রঙ্গমঞ্চ নেই।" স্বীকারও করেছেন, "পাঞ্জাবী নাটক অনুন্নত হওয়ার পেছনে এটি বোধ হয় অন্যতম কারণ।"

দু' একটি ভিন্ন অধিকাংশ প্রবন্ধই অনূদিত। অনুবাদও মনোগ্রাহী। ধরে নেওয়া যেতে পারে, 'দেশ' এর জন্য এগুলি সৌজন্যমূলক প্রবন্ধ। ফলত বিন্দুতে [illegible] সিন্ধুর স্বাদ। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের চালচিত্র চোখে পড়ে ইদানীংকালে প্রকাশিত গবেষণাধর্মী বহু গ্রন্থে। সে ধরনের আলো-চনার সুযোগ ও পরিসর 'দেশ' পত্রিকায় হয়তো সম্ভব নয়।

রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে রাষ্ট্রীয় একতার আদর্শ উচ্চারিত হলে কৌলিন্য বাড়ে। অথচ কার্যকালে দেখি নানা সরকারী প্রকল্পের যাঁতাকলে তা মাথা কুটে মরে। কিন্তু সাহিত্যের আসরেই তার দৃপ্ত পদচারণা। অনুবাদ ভিন্ন বিশেষ একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় একতাকে বাস্তবরূপে দেওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন ডঃ এস বি যোশী, "আমি মনে করি, ভারতে এখন আর যা দরকার, তা হল, প্রতিটি রাজ্যে একটি করে 'কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস সার্ভিস' অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের বর্তমান হালচাল সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার জন্য বিশেষ ধরনের চাকরি প্রবর্তন করা উচিত। রাডারের মত সাহিত্যের আকাশের ওপর নজর রাখাই হবে এর কাজ।" অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তাঁর মতামত, "প্রতিটি ভাষায় আমাদের একদল করে যোগ্য অনুবাদক গড়ে তুলতে হবে। তাঁরা পরম নিষ্ঠা ও ভালবাসার সঙ্গেও কাজ করবেন তা প্রকাশের জন্য তাঁদের উৎসাহ দিতে হবে।" একই অভিমত বেজবরুয়ার "এখন শুধু এই আশাই করা যায় যে, আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি সুযোগ্য তর্জমার কল্যাণে দেশের অপরাঞ্চলের নাগালে আসবে।" দেশ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে শ্রী এস বি যোশী বলেছেন, "কামনা করি, বিভিন্ন সহযোগী ভাষার সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির ওপর আলোকপাতের জন্য দেশ পত্রিকার এই প্রচেষ্টা তার পাঠকদের অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্য বাঙলায় অনুবাদে অনুপ্রাণিত করুক।" পাঠক হিসাবে আমাদের প্রশ্ন জাগে, যোশীজীর কামনা কি শুধু অক্ষরবন্দী হয়ে থাকবে, না স্থায়ী এবং ধারা-বাহিকভাবে অনুবাদের সুব্যবস্থা দ্বারা প্রাদেশিক সাহিত্য ধারার সঙ্গে গড়ে তুলবে নিকট আত্মীয়তা? যোগ্য অনুবাদের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হবে না কি আমাদের প্রতিবেশী সাহিত্য?

শিপ্রা ঘোষ

পুনশ্চ পারা

নীরদ মজুমদার

॥ [illegible] ॥

কোৎ দ্যাজুরের ইদানীং সমুদ্র বেশ জনপ্রিয়। সমুদ্রতীর কান থেকে আমরা ডিলুক্স বাসে চড়ে সকালে রওনা হলাম। আমরা যাব গ্রাস, জঁুয়া লে পাঁ, আঁতিব্ তারপর নীস। সমুদ্রের গা বেয়ে গেছে ছিমছাম রাস্তা। পার হয়ে যায় বর্দালিও, সাজ মোনাকো, মাঁতো। এই সমুদ্রতীর ভরে যায় দূর দূরে দেশের নানা ভাষাভাষী মানুষের ভীড়ে। আমাদের সাগর সঙ্গমের ভীড়ের মত।

সবজি ও ফুলের বাহার এতই যে যে-কোন শিল্পীর চিত্রপটের নিয়ম লঙ্ঘন করে সরাসরি ছবিতে তারা স্থান দখল করতে পারে, একথা সম্পূর্ণ সত্য মার্ক স্যাগালের চিত্রকল্পে। জন্মস্থান শিল্পীর যদিচ রুশদেশ, তবে একবার ফ্রান্স ও এবার রুশ দেশে যাতায়াত করে ১৯৪৭ সালে পাকাপাকিভাবে আস্তানা করেন সাগাসভাঁস বলে একটা জায়গায়— মাঁতশের থেকে বেশী দূরে নয়, পিকাসোও হাতের নাগালে। প্রায় যাতায়াত ছিল ব্রাক এবং লেজেরের

মোনাকোর রাজপ্রসাদ—চেঞ্জ অফ গার্ড

"তরুণী একরোব্যাট" (১৯৩০, তৈলচিত্র)—মার্ক স্যাগাল

মিদিতে। স্যাগালের সব ছবিতে মিদির রঙ চিত্রে উপছে পড়তে দেখা যায়—ফুল, লতাপাতা, স্বচ্ছ আলোক। স্যাগালের চিরসাথী বেলা স্যাগাল, মাদাম স্যাগাল, যাকে ঘিরে কত না চিত্র স্যাগাল রচনা করেছেন তাকে ঘিরে চিত্র সকল ১৯৩৭এ শুরু করেছিলাম আজও শেষ হয়নি। বেলা সাগালের মৃত্যুর পরও ১৯৪৪ সালে, সমস্ত ছবিতেই স্যাগালকে শনাক্ত করা যায় তার ব্যক্তিগত ঈক্ষণে, যে রূপকথার কাছাকাছি কাব্য কবিতার মত ছবি দিয়ে ঠাসা।

বেলা স্যাগালের প্রেম ও তাকে ঘিরে মিদির রঙ, নতুন ছন্দ ছবিতে এনেছিল ইহুদী রহস্যগত ছবির যা বাইরের কথা। ওর নিজেরই উক্তি ছবি আঁকা আমার কাছে রুটির মতই প্রয়োজনীয়। ঐ রূপ প্রয়োজনীয় একটি জানালা যা দিয়ে আমি পালাতে পারবো অন্য জগতে—১৯৫৮ সালে এক-সভায় এই কথা ঘোষণা করেন স্যাগাল। আমার কিন্তু স্যাগালের কাজ দেখে মনে হয় ঠিক উলটো। মিদি সত্যই এমন এক অঞ্চল, এমন এক অন্য জগৎ যা ফাঁক পেলেই জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে।

রাস্তা নীচু থেকে বহু উঁচুতে উঠে আবার নেমে যায় অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্যের কোল ঘেঁষে।

শুধু নীল শব্দে সব কথা প্রকাশ হয় না। নীল-এর ভাগ একমাত্র আমাদের প্যালেটই বর্ণনা করতে সক্ষম। কোথাও বিস্তৃত সমুদ্রে আলট্রা মেরিন

সঙ্গে গল্প করবো যাতে নাচ এড়ান যায়।

নাচ শুরু হল। তখনকার দিনে সাম্বা-রুম্বার প্রচলন ছিল। নাচ তেমন কিছুই নয়। দুজনে পরস্পর বিজড়িত হয়ে সঙ্গীতের ছন্দে রোমান ধরনের লেপ-রাইট করার মত। জুড়ি বদলে বদলে নাচ বেশ জমে উঠেছে।

আর্লেৎকে প্রশ্ন করলাম, তুমি নাচতে ভালবাস না?

মাথাটা হেলিয়ে একটা চোখ ছোট করে ঘুমঘুম একটা হাসি ঠোঁটে টেনে বললে, মনের মত মানুষ জুড়ি পেলে নাচতে ভালবাসি। নাচতে হলে নাচতে ইচ্ছা করে 'মন আমুরের' সঙ্গে (আমার প্রেমিকের সঙ্গে)। যার তার সঙ্গে মোটেই নয়।

ওকে প্রশ্ন করলাম, তোমার 'মন আমুর' আছে না কি?

'এলাস নো,' উত্তর করলো একটু হতাশার স্বরে।

কেন নেই? ছিল না কোনদিন?

ছিল, আমার প্রথম আমুর ছিল আমার বাবা, তোমাকে তো বলেইছি। তারপর বার-তের বছর বয়েসে আবার প্রেমে পড়েছি। ব্যাপারটা কি তা কিন্তু

[খো]লা জানালা" (১৯৫৫; তৈলচিত্র)—মার্ক স্যাগাল

[ধ্য]ানরত সৈনিক" (১৯১২)—মার্ক স্যাগাল

"তাকে ঘিরে" (১৯৪৫, তৈলচিত্র)—মার্ক স্যাগাল

খুব পারিস্কার নয়। একটি জার্মান কিশোরের সংগে আমার বন্ধুত্ব হয়। তার মা বাবা কার্যব্যপদেশে এসেছিলেন প্যারীতে। কয়েক বছর বাদে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে আমাদের ছাড়াছাড়ি। ছেলেটির অবর্তমানে অনুভব করতে পেরেছিলাম যে ঐ আমার "আমুর" হতে পারতো।

একটু থেমে অন্যমনস্ক ভাবে আর্লেৎ বললে, তারপর, আর কিছুই মনে ধরেনি। অভিনয় আমার সর্বস্ব গ্রাস করেছে।

আমি ওকে শ্লেষ করে বললাম, আমার বিশ্বাস মেয়েমাত্রেই জন্ম-অভিনেত্রী, যেমন নীৎসের ধারণা ছিল মেয়েমাত্রেই জন্ম-মাস্টারনী আবার ঐ লাইনে গেলে মেয়েরা দু দফায় অভিনেত্রী। দু দফায় মাস্টারনী এদের সংগে প্রেম করা চলে না।

খুব চলে। বলে আমাকে ভর্ৎসনার ভংগীতে বললে, এবং পুরুষরা মহাশয়, সব শয়তান, দু দফায় শয়তান।

এই সময় হঠাৎ একটি হাঙ্গেরীয়ান ছেলে এসে আর্লেৎকে উদ্দেশ করে বিনম্রভাবে আবেদন করলো, 'ভুলে ভু দাঁসে মাদমোয়াজেল' (তুমি নাচবে মাদ-মোয়াজেল) ?

"ছুটি" (১৯১৪ তৈলচিত্র)—অর্ক সান্যাল

এ হলো আমন্ত্রণের স্বর।

এক্ষেত্রে আর্লেতের কোন উপায় নেই, ভদ্রতা এরা মূল্যবান স্বভাব মনে করে, আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম, জানালাম আমার সম্মতি।

আর্লেৎ উঠে দাঁড়িয়ে লীলায়িত ভংগীতে হস্ত বিস্তারিত করে ছেলেটির হাতে ধরা দিল। ওরা সংগীতের লাইন বেয়ে এগিয়ে নৃত্যের জটলায় মিলিয়ে গেল।

আমার কিন্তু কিছুই ভাল লাগছিল না।

হঠাৎ একটি ইতালীয় যুবতী এসে এই ফাঁকে আর্লেতের চেয়ারে উপবেশন করলো, ভারী মিষ্টি মুখ, একেবারে শিশুর মতো। ছোট ছোট করে ছাঁটা কালো চুল, পরনে ধূসর তাফতার ভূষা, কোমরে বেল্টের মত কোমরবন্ধ, ভাঁজ নেমেছে হাঁটু অবধি। ভূষণের কানায় কানায় ওর দেহ। খুব পরিষ্কার বাঙালী মেয়েদের মত গায়ের রং। পিটোনো সোনার মত। বয়স উনিশ-কুড়ি হবে হয়তো। অথচ দেহে বেশ আদিক্যেতা লক্ষণীয়। হয় তো, প্রচুর ম্যাকারনী খাওয়ার গুণ।

আমি কিন্তু কিছুটা বিস্ময়াহত হলাম ও যখন বেশ নিম্নস্বরে আমাকে বললে, "ভুলেভু দাঁসে মঁসিয়ে" (তুমি নাচবে মহাশয়) ? ওর স্বরে আবেদনের ভাষা।

স্বভাবত এদেশে এ নিয়ম নয়। পুরুষরাই মেয়েদের আমন্ত্রণ করে। মেয়েদের করার কথা নয়।

আমি বুঝতে পারলাম এ কেবল অন্যদের বা অন্য মেয়েদের মুখে তুড়ি দেওয়ার বাসনা। আর কিছু নয়।

আমি খুব বিনয় সহকারে বললাম, আমাকে ক্ষমা কর। আমি একদম নাচতে পারি না। আমি অত্যন্ত সম্মানিত তোমার আবেদনে।

এবার ও উৎসাহিত হয়ে বললে, এতো খুব সহজ।

আমরা দুজন দুটি নরম পানীয় নিয়ে পান করতে থাকলাম। অবশ্য নাচ আমি দেখছিলাম। দেখতে আমার ভালই লাগে।

সবাই এসেছে নানান বেশভূষায়, সব মেয়েদের এ সন্ধ্যায় মনে হল সুন্দরী। সব পুরুষ যেন সম্ভ্রান্ত নবীন।

আমার মেয়েটি কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে থাকলো, এসো না একটু নাচি। তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমাকে নাচাব। তুমি শুধু তোমাকে ছেড়ে দেবে আমার হাতে।

অমন একটি বাচ্চা সুন্দরীর আবেদনে 'না' করা যায় না। অগত্যা আমি ওকে হাত বাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটি খুব এলেগেন্টভাবে আমার হাতে কোমরে হাত মিলিয়ে, ভয়ানক ঘনিষ্ঠ হয়ে, চাতালে ঘুরতে থাকলো সংগীতের তালে তালে।

আমি অনুভব করতে পারছিলাম, সব মেয়েদের

গোধূলি—মার্ক স্যাগাল

ঈর্ষান্বিত করে ও জয়ী হতে চাইবে। কারণ সবার মধ্যে আমিই একমাত্র রঙীন পুরুষ।

তোমার নাম কি?

বিয়াঙ্কা।

বিয়াঙ্কা মানে কি?

শ্বেত।

তুমি কোথায় থাকো?

মিলানে।

তুমি একা এসেছো?

না। আমার দিদি জীনা আমার সঙ্গে আছে।

তুমি কি কর?

কলেজে পড়ি।

এই সব টুকরো-টাকরা কথা হচ্ছিল। ওই আমাকে ঘোরাচ্ছিল সংগীতের তালে তালে।

আমি, ওকে বললাম, কিছুটা ওস্তাদী করে, ইয়োভোলিও আন্দরে আন ইতালী। (আমার ইতালীতে যাবার ইচ্ছে আছে)।

ব্রাভাসিমো।

তুমি কথাটার ইতালীয় ভাষা আমার জানা নেই। ওকে উদ্দেশে ইঙ্গিত করে বললাম, 'মোলতো বেল্লো'।

ও খুব হাসলো।

তারপর দুই একটা কথা ইতালীয় ভাষায় ভুল-ভাল বলে দিতে ও বললো নো নো, শুধু 'আমরে' প্রেম। তারপর আমাকে ও বললে, তুমি খুশী?

আমি বললাম অবশ্যই—আরো খুশী হতাম যদি কিছু ভাল পানীয় থাকতো।

এই ভাবেই প্রায় রাত বারোটা। বিয়াঙ্কা বললে, তুমি পান করবে? ওর দুষ্টু চোখে একটা যেন নকশা ভেসে উঠল।

কি করে করবো এখানে তো কিছুই নেই। বাজারে যেতে হলে তো মাইল খানেক পথ যেতে হবে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ও বললে, এসো আমার সঙ্গে, তোমাকে ভাল জিনিস পান করাবো। ঐ সঙ্গীতমুখর ভীড়ের মধ্যে আমরা দুজন গা-ঢাকা দিয়ে হল থেকে বার হয়ে পড়লাম বাগানে।

আশ্চর্য ধুরন্ধর মেয়ে। এরা পুরুষকেও বোকা বানাতে পারে।

বাগানে তখন অন্ধকার, দূরে দূরে আলো, ও আমার হাত ধরে নিয়ে গেল। ঝোপঝাড় এদিক ওদিক করে একটি মস্ত ঘন ঝোপের কাছে এসে বললে, এসো আমরা এখানে বসি।

এখানে, এখানে পানীয় কোথায়?

বিয়াঙ্কা হেসে গড়িয়ে গেল।

মনে মনে ভাবছিলাম, পাগলের পাল্লায় পড়িনি তো। বেশ একটু ভয় হল। মেয়েটি যদি নিম্ফোম্যানিয়াক হয়? মরেছে।

ওর সুন্দর শিশুর মতো দেখতে মুখে ও বললে, তোমার চোখ বন্ধ কর।

আমি চোখ বুজলাম। ঐ ঝোপে বেশ কিছু আওয়াজ হল। তারপর আমার হাতে একটা কি অনুভব করলাম। কি একটা গুঁজে দিল বিয়াঙ্কা, বললে চোখ খোলো।

আমি চোখ খুলে বিস্ময়ে হতবাক। আমার হাতে এক বোতল ফিন স্যাম্পাইন। বা কোনিয়াক। নেপোলিয়ানের প্রিয় পানীয়।

আমি কিছুটা হতভম্ব। বললাম, তুমি এ সব জোগাড় করেছো কেন?

ও বললে, সত্যি কথা বলব?

বল।

তখন ও বললে তোমাকে আমি প্লাজে দেখেছি রোজ। ইচ্ছে হচ্ছিল তোমার সংগে আলাপ করতে, কিন্তু তুমি যত রাজ্যের বুড়ীর ব্যূহে আটকে থাকো। ওখানে তাই সুযোগ কিছুতেই হল না। তারপর ভাবলাম এই সন্ধ্যায় নাচের আসরে তোমাকে ধরবো. এবং ধরেছি, এই বোতল জোগাড় করে লুকিয়ে রেখেছি। যদি সুযোগ হয়, দুজনে মাতাল হব।

বোতলে মুখ দিয়ে ক্রমশ দুজনেই প্রায় মাতাল। ওকে কত কথা বললাম, পিয়েরো দ্য লা ফ্রেন্সেকলা, পাওলো উচেলো, তাঁতোরে, ম্যানতেনা। পান করতে করতে আলুথালু কথাবার্তা।

রাত গড়াতে থাকলো।

বিয়াঙ্কার ভয়ানক গরম বোধ হওয়াতে ওর ব্লাইজ খুলে ফেলে আমার পাশে শুলো। আমাদের দুজনের মধ্যখানে কোনিয়াকের বো[illegible] ব্যবধান।

ও একবার, আমি একবা[illegible] বোতলে মুখ দিয়ে তৃষ্ণা দূর করতে করতে কোথায় পৌঁছেছি আমাদের জ্ঞান নেই।

গরমে আমি আমার বুশসার্ট খুলে ফেললাম।

ও ওর সুতিয়াগর্জ (কঞ্চুলিকা) খুলে ফেলে বললে, ভয়ানক গরম।

সত্যই ঐ অন্ধকারের আলোয় ওর জাগ্রত দুটি উন্মুক্ত স্তন মনে হল যমজ দুটি ভিসুভিয়স। এক্ষুনি অগ্নি উদ্গীরণ করবে, ওর যৌবনের লাভা আমাকে পুড়িয়ে ছারখার করবে।

পান করতে করতে আধ বোতল শেষ হয়ে গেল। বিয়াঙ্কা নগ্ন স্তন আমার বুকের উপর বিছিয়ে অনেক কথা ইতালীয় ভাষায় উচ্চারণ করলো। সব কথার মূল বক্তব্য আমুর, আমুর, আমুর, প্রেম প্রেম প্রেম, তারপর কোনিয়াকের বোতল তুলে আমার গলায় ওর গলায় ভিজতে ভিজতে কখন আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছি বাগানে। অগণন অনন্ত তারারা মিটমিট করে চেয়েছিল আমাদের দিকে। নারীপুরুষের অন্তরঙ্গতায়। তারপর দুজনেই শান্ত হয়ে ঘুমিয়েছি। কতক্ষণ কেটেছে, আমাদের কোন জ্ঞান নেই।

বিয়াঙ্কা, মিষ্টি বিয়াঙ্কা, অন্তরে এখনও বিরাজিত।

ওকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়: এক ল্যাটিন ডাকাত।

(ক্রমশ

কেন যে এমন ক'রে

দিব্যেন্দু পালিত

কেন যে এমন ক'রে জেগে ওঠো ঘুমে!
শীতল সুবাস ঘেরা এই ঘুম আত্মার ভিতরে
নিজস্ব সুড়ঙ্গ কেটে যেতে-যেতে হঠাৎ কেন যে
তোশকের ম্লানগন্ধ তুলোয় আহত হয়ে ফেরে
প্রথম ঘুমের দিকে ; হাঁটুমোড়া, শৃঙ্খলিত হাতে
নতজানু হ'তে হ'তে তাকাও চোখের অন্ধকারে—
যেখানে আকাশ নেই, স্মৃতিসম্মোহিত কোনো আবেদন নেই,
বন্যার জলের মতো ক্লোমরসে জড়ানো সময়
শুধুই চেনায় ঢেউ একইরকম অন্ধকারে!

বিশ্বপিতা ঃ ৭৯

শামসুল হক

সাক্ষী নেই কাছাকাছি কেউ ঃ
আমি আছি—আমার ছায়া
আমার পাশে তুমি!

মনই বললে, তুমি আছ
অথচ চেয়ে দেখি শুধু অস্তিত্ব—
চারিদিকে সাদা খড়ির এক গন্ডী!

কান পেতে শুনি, নিস্তব্ধ বাতাসে
এক আশীর্বাণী
তুমি আমার জন্যে রেখে গেছ
স্পষ্ট এক হস্তাক্ষর!

তোমাকেও বলা হবে

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

তোমাকেও বলা হবে, আর নয়। ডাকবাক্সের ঠান্ডা হাত
খুলে দেবে সমস্ত কপাট, বিকেলের মরা রোদে
উড়ে আসবে উই, গম্বুজের ঘেরা থেকে
ছুটি নিয়ে চলে যাবে মেঘ; পোড়া ট্রামে
একা তুমি যাত্রী ও চালক—ট্রাম-লাইন
দুহাত আকাশে তুলে মধ্যরাতে ছুটে যাবে মাঠে
নত হবে ভালবাসা, পতাকার দক্ষ রঙ,
পৃথিবীর অবাক উদ্ভাস।

বস্তুত সমস্ত তরল হয়ে চলে যায়, ভেঙে পড়ে
মেয়েদের অতুল শরীর, ভাঙে
বুকের ভিতরে বুক, হরিজন বস্তির কুলুপ।

যেতে যেতে ভ্রান্ত ছায়া এক আধবার ঝুমঝুমি বাজায়
প্রস্থানের মুখোমুখি তেতে ওঠে নিষিদ্ধ বিশ্বাস।

ঊর্ণনাভ

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়

আপাতত এখানেই আছি। ভালো আছি।
সর্বার্থসাধক দেশে ইতরজনের
অলভ্য কিছুই নেই। মেলায় পাঁচালি বেচি,
পটে হরগৌরী আঁকি, শালপত্রে কন্দের ব্যঞ্জনে
অমৃতের স্বাদ পাই; জিভের চামচে
সেই স্বাদ ধরে রাখি। আরক্ত চোখের আরশিতে
মা মেয়ে উকুন বাছে, ঊর্ণনাভ চুলে
কারা যেন মুখ ঘষে। মুখর পিঙ্গল মাঠে
আতুরে ও কামাতুরে ভেদ নেই।

কখনো গভীর রাত্রে উঠে এসো।
রাত্রি ঘন হ'লে এ মাঠ অরণ্য হবে;
কুহকী মায়ায় উদ্দাম ঘুঙুর-নৃত্য
শোনা যাবে; নিশাচর বিবরবাসীরা
তালে তালে মাদল বাজাবে; সুভগা কামিনী
তোমার নাচের সঙ্গী হবে।
লতাগুল্ম ঘেরা গুহা, সেখানে মধুপ
তোমার উত্তপ্ত ঠোঁটে সোমরস দেবে।
এ অরণ্য মধুময়; আপাতত এখানেই আছি।
সুখে আছি॥

'মিজাজ সাহেব'—গোপালপ্রসাদ মন্ডলের করা প্লাস্টারের প্রতিকৃতি। জন্ম ১৯৫৬। সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক (১৯৭৫)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুকুমারকলা নন্দনজ্ঞান (১৯৭৬)। জাতীয় বৃত্তি নিয়ে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে (১৯৭৭-৭৮)। বর্তমানে ফ্রী লানস করেন।

জ্যাক, থেমো না, আগে ফোজাকে খুঁজে বার করা চাই।
সে জানে, আমরা আসছি।

... বড্ড খিদে পেয়ে গেছে!
!
আমারও!
MENU

এই হচ্ছে ফোজার ঠিকানা।
লোকটা মুদী সেজে কারবার চালায়!
13
GROCERY
'স্টার অব বেংগালা'র সন্ধানে...

ফোজা? ও-নাম কখনও শুনিনি!
PICKLES
যে খবর বোমমের আড়ালে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে বলো, আমি হীরে বেচতে এসেছি।

আমি তো মুদীর দোকান চালাই। হীরে দিয়ে কী করব?
10/1
চালাকি কোরো না। 'স্টার অব বেংগালা' কিনবে?

হীরে চুরির খবর বেতারে শুনেছি বটে!
নিশ্চয় জানো। বলো, হীরেটা কমবে?
তা ছাড়া কিছু জানি না।

অত টাকা কোথায় পাব? তা, হীরেটা তোমার কাছেই আছে তো?
না। তবে কোথায় আছে, তা আমি জানি।

এই তো... এই তো ফোজার দোকান...
13
GROCER
চল, ভেতরে ঢুকি...
ক্রমশ
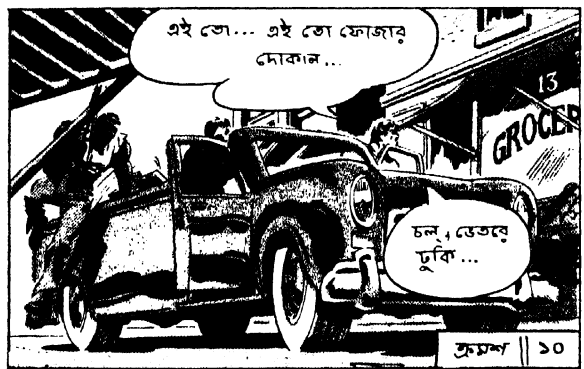
তাণ্ডব

রাজ্যেশ্বর মিত্র

তাণ্ডব শব্দটা আমরা তেমন সদর্থে ব্যবহার করি না। যেখানেই একটা এলোমেলো ব্যাপার অথবা হইহুল্লোড় ঘটে, সেখানেই আমরা মন্তব্য করি—লোকগুলো একটা তাণ্ডব জুড়ে দিয়েছে। তাণ্ডব যেন ডিসিপ্লিনের সম্পূর্ণ উলটো একটা ভয়াবহ কার্যকলাপ, যেখানে কেবল অসংযত, উন্মত্ত দেহভঙ্গী আমাদের যুগপৎ ভীতি এবং বিতৃষ্ণার সঞ্চার করে। অথচ—এই নাচটিকেই দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ক্রুদ্ধ শংকরের সংহারমূর্তিতে যে উল্লম্ফন, প্রলম্ফন, সেটাই হচ্ছে তাণ্ডব,—এমনি একটা ধারণা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কাব্যে, সাহিত্যে, লৌকিক পুরাণে—এরই উল্লেখ, এমন কি বর্ণনাও আমাদের চোখে পড়ে।

অথচ, এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন আমাদের মনে এ যাবৎ জেগেছে বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যে তাণ্ডব নিয়ে তেমন গুরুতর আলোচনা কদাচিৎ প্রকাশিত হয়ে থাকবে। এমন কি, সংস্কৃত পুরাণাদিতে শিবের নৃত্য সম্বন্ধে স্থানে স্থানে উল্লেখ থাকলেও তাণ্ডব শব্দটি কদাচিৎ দেখা যায়। জনশ্রুতিই এই শব্দটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে এবং একটা লৌকিক ধারণা গঠন করতে সাহায্য করেছে।

প্রথমেই যে কথাটা মনে জাগে সেটা হচ্ছে এই যে, এই নৃত্য যদি সম্পূর্ণভাবে শিবের আচরিত হয়ে থাকে তা হলে তার আখ্যা "তাণ্ডব" হল কেন? তাণ্ডবের সঙ্গে মহাদেবের সম্পর্কটা তা হলে কোথায়? শিবের এতগুলি নামের কোনও একটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হয়েও তো এই নৃত্যের পরিচয় হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি কেন? স্বভাবতই মনে সন্দেহ জাগে এই নৃত্য পুরোপুরি শিবের কৃতিত্বে সম্পাদিত হয়নি, অন্য কারুর হাত এই রচনায় অবশ্যই ছিল। যদিচ, অমরকোষ এই শব্দের একটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—ভূমিতে তাড়নাদ্বারা এই নৃত্য সম্পাদিত হয়েছিল বলেই এর আখ্যা তাণ্ডব; তথাপি সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন যে, "তণ্ডুনা মুনিনা প্রোক্তম্" (তণ্ডু মুনিদ্বারা উপদিষ্ট) বলেই একে ওই আখ্যায় চিহ্নিত করা হয়। শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি যে সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আমাদের সর্ববিধ সংশয়ের নিরসন করেছেন। কিন্তু এই নৃত্য সম্পর্কে শিবের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। আসলে, তাঁরই প্রবর্তিত নৃত্যের পরিশীলন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের ফলেই যে নৃত্যধারার প্রবর্তন হয়েছিল, তাই হচ্ছে তাণ্ডব নৃত্য। অতএব শিবই হচ্ছেন এর নায়ক এবং প্রধান নির্বাহক। কিন্তু 'তণ্ডু' নামক ব্যক্তিটিরও একটি বড় ভূমিকা আছে; কেননা—শুধু শিবপ্রবর্তিত নৃত্যের শোধনই নয়, তাকে গানের সঙ্গেও সম্বন্ধযুক্ত করেছিলেন তিনি। অতএব, নাট্যশাস্ত্রের কাহিনী অনুসারে একে একটি যুগ্মপ্রয়াস বললেই বোধ হয় সত্যভাষণ হয়। কিন্তু গ্রন্থ অনুসারে দেখা যাচ্ছে শংকর নিজেই এই নৃত্যকে তণ্ডুর নামাঙ্কিত করে বলেছেন—'তাণ্ডব'। এটার পিছনে কোনও রহস্য থাকলে সেটাও বিচার্য বিষয়। এই সব প্রসঙ্গে আলোচনায় আসছি পরে, কেননা তার আগে আরও কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন।

শিব যে জাতির নায়ক ছিলেন সেই জাতির বৈদিক নাম—রুদ্র। রুদ্রেরা ঠিক আর্য ছিলেন না এবং বেদ তাঁদের দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। এঁরা ছিলেন 'দেবজন'; অর্থাৎ যেসব জাতি দেবতা বা আর্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁদের অন্যতম। মরুৎ, গণ—প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী এই রুদ্র জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এঁরা তেমন একটা দীর্ঘদেহী ছিলেন না, কিন্তু দেখতে সুশ্রী ছিলেন। এঁদের মাথায় থাকত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, সেগুলি ছিল স্বর্ণাভ। এঁদের অনেকেই বল্কলবাস ধারণ করতেন, আবার চর্মবাসও এঁদের প্রিয় ছিল। স্বভাবত শান্ত এবং কৃষিনির্ভর হলেও এঁরা যুদ্ধবিদ্যা খুব ভাল জানতেন; অশ্বারোহণেও এঁদের দক্ষতা ছিল। এঁরা এক রকম বিশেষ ধনু ব্যবহার করতেন, যাকে বলা হত পিনাক। এঁরা যাদের দুর্ধর্ষ সেনা বাহিনীরূপে নিয়োগ করতেন, তাঁরা "গণ" নামে পরিচিত ছিলেন।

নৃত্য ছিল এঁদের একটি বিশেষ অবসরবিনোদন। নানা রকম নৃত্যের চর্চা করতেন এঁরা, যার মধ্যে যৌথ এবং একক নৃত্য—উভয়েরই প্রচলন ছিল। এঁদের এক ধরনের নৃত্য ছিল, যাকে ইংরেজিতে বলে 'ম্যাকেবার ড্যান্স'। মৃত্যু বা হনন প্রসঙ্গে এই নৃত্য ভয়াবহরূপে অনুষ্ঠিত হত। তিব্বতে এখনো (অবশ্য চীন অধিকারের পর কতটা আছে বলা যায় না) এই নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। এটি বর্তমানে একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। 'নালজরপা' নামক তথাকথিত অলৌকিক শক্তির অধিকারী সাধনার একটা পর্যায়ে এককভাবে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করে থাকেন শ্মশানে, টাটকা খণ্ডিত মৃতদেহের সম্মুখে। তিব্বতে মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে কেটে পাখিদের বা জীবজন্তুদের আহারের জন্য ফেলে দেবার রীতি আছে। নির্জন রাত্রিতে যখন ধারেকাছে কোনও লোকসমাগম থাকে না তখনই অনুষ্ঠিত হয় এই নৃত্য। একমাত্র উপস্থিত নর্তকের কাছে থাকে নরদেহের উরুর অস্থি থেকে তৈরি এক রকম জোরালো তূরীজাতীয় বাঁশী (ট্রামপেট), ঘণ্টা, ফুরবা (কাঠের ছোরা, বৈদিক অভিচারক্রিয়ার পরিভাষায় 'স্ফ্য') এবং ডমরু। এই ডমরু বা দমরু (তিব্বতী—ধোন-ডাম?) বাদ্যটিও বোধ করি এই দিকেরই পরিকল্পনা, কেননা প্রাচীন তিব্বতে এর বিশেষ ব্যবহার ছিল এবং এই নামটিও আর্যভাষীদের নিজস্ব নয় বলে মনে হয়। এই নাচ শেখবার জন্য অভিজ্ঞ গুরুর কাছে রীতিমত মহড়া দিতে হয়। এর বিধিবদ্ধ নানা রকম প্রণালী আছে। এই নৃত্যের মূলকথা হচ্ছে—এঁরা নিজেকে প্রেতযোনিদের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন; তাঁরা সম্মোহিত হয়ে দেখতে থাকেন যে তাঁদের দেহের রক্তমাংসে প্রেতগণ পরিতৃপ্ত

নটরাজ (দক্ষিণ ভারতীয়)

হচ্ছেন এবং ক্রমে তাঁদের দেহ বলতে আর কিছু থাকছে না। যখন তাঁদের সব ফুরিয়ে যায়, একটা চেতনামাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন তাঁরা উপলব্ধি করেন যে দেহের সঙ্গে সমস্ত পাপ থেকেও তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন। সমস্ত রাত্রিব্যাপী এই নৃত্যপ্রক্রিয়ার পর সকালে ফিরে আসবার সময় তাঁরা বোধ করেন যে তাঁরা একটা পবিত্র দেহ নিয়ে নবজন্ম লাভ করেছেন। এই যে ক্রমে ক্রমে প্রেতযোনিদের ডেকে তাদের কাছে সমস্ত দেহকে সঁপে দেওয়া এবং সমস্ত শারীরিক বৃত্তি বা পাপবোধকে পদদলিত করা—এই সমস্তকেই একটা শিক্ষিত নৃত্যে এঁরা ফুটিয়ে তোলেন। এই নৃত্যকে বলে—"ছোদ"। "ছো" শব্দের অর্থ হচ্ছে ধর্ম, যার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সমস্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মঠ সম্পর্কিত লামাদের ধর্মানুষ্ঠানসমূহও এই শব্দে সূচিত হয়। লামারা মুখোশ পরে যে ধর্ম এবং ধর্মদ্বেষীদের নিয়ে বিরাট পৌরাণিক নৃত্যানুষ্ঠান করেন, তাকে বলা হয় "ছাম"। এই নৃত্য সম্ভ্রান্ত লামারা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বহু বৎসর ধরে শিক্ষা করেন। এটি এঁদের জাতীয় নৃত্যানুষ্ঠান, যা শ্রেষ্ঠ অভিজাত থেকে অতি সাধারণ ব্যক্তিরাও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এক এক সময় মনে হয়, তিব্বতীদের এই সব "ছো" সম্পর্কিত নৃত্য থেকেই ভারতে ছো-নৃত্য বিস্তৃতি লাভ করেছে। মুখোশ রচনায় তিব্বতীদের পারদর্শিতা অসাধারণ এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যযুক্ত মুখোশ নৃত্যও তাঁদের কাছে অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় অনুষ্ঠান। "ছো"—শব্দটিই তিব্বতীয় এবং পৌরাণিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতীক। এই ধরনের নৃত্যের মূলে আছে সুপ্রাচীন "বন"-ধর্মীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব, যার সঙ্গে 'শামা'-ধর্মীদের (ইংরেজি—শামানিজম) প্রভাবও প্রবলভাবে যুক্ত হয়েছে। অবশ্য এটি এই লেখকের অনুমান মাত্র, বিশেষজ্ঞদের এ বিষয়ে অন্য অভিমত থাকতে পারে। বর্তমানে এটি একটি বৌদ্ধতান্ত্রিক ক্রিয়াবিশেষ হলেও আদিতে এটি একটি চিত্তবিনোদন নৃত্য ছিল বলেই মনে হয়।

এই যে মৃত্যুসম্পর্কীয় নৃত্যের উল্লেখ করা হল, এর কারণ এই যে রুদ্রেরা নানা রকম সংহারপর্বের পর এই রকম ভয়াবহ যৌথ নৃত্যের অনুষ্ঠান করতেন। এঁরাও এই হিমালয় অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। শিব সম্পর্কে তিনটি বড় বড় সংহারপর্ব আছে, একটি ত্রিপুরদাহ, অপরটি দক্ষযজ্ঞ বিনাশ এবং তৃতীয়টি গজাসুর বধ। ত্রিপুরদাহ সম্বন্ধে পুরাণাদিতে একাধিক কাহিনী পাওয়া যায়। মহাভারতের কর্ণপর্বে যে বিবরণটি আছে, সেটিকে অবলম্বন করলে ইতিবৃত্তটি এই রকম দাঁড়ায়।

তারকাসুরের ভীষণ পরাক্রমশালী তিন পুত্র ছিলেন। তাঁদের ঐশ্বর্যও ছিল

প্রচুর। তাঁদের নাকি স্বর্গে, অন্তরীক্ষ ও মর্ত্যে যথাক্রমে কাঞ্চনময়, রজতময় এবং লৌহময় তিনটি পুর ছিল॥ এই তিনটি পুরীর নির্দেশক স্থপতি ছিলেন ময় নামক একজন দানব। এই তিনটি ঘাঁটিতে বহু অসুর সমবেত হয়ে ত্রিলোকের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করতে আরম্ভ করলেন। দেবতারা বহু চেষ্টা করেও তাঁদের নিবারণ করতে না পেরে, অবশেষে শিবের শরণাপন্ন হলেন। শিবের সেনাপতিত্বে সমগ্র রুদ্র ও দেবসৈন্য ওই পুরীগুলি আক্রমণ করেন এবং শিব নাকি ব্রহ্মা পরিচালিত রথে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনটি পুরী ধ্বংসের উদ্দেশ্যে একটি বাণ নিক্ষেপ করেন। সেই বাণ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে যুগপৎ তিনটি পুরীকেই ধ্বংস করে ফেলে। এই বিপুল কীর্তির পর থেকেই শিব মহাদেব নামে পরিচিত হন। যুদ্ধকালে রুদ্রসৈন্যেরা নৃত্য করেছিলেন, কিন্তু অসুরপুরীগুলি ধ্বংস হবার পর শিব কোনও নৃত্যানুষ্ঠান করেছিলেন, এমন উল্লেখ নেই। তবে ত্রিপুরবিজয় গাথা যে অতি প্রাচীনকালেই রচিত হয়েছিল এবং কিন্নর রমণীরা সেগুলি গাইত, তার উল্লেখ কালিদাস মেঘদূত কাব্যে করেছেন॥ এই বিষয়টির উপর একটি গম্ভীর নাটক অতি প্রাচীন কালে রচিত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং এটি দেবতারাও প্রত্যক্ষ করেন।

দক্ষযজ্ঞ বিনাশ সম্বন্ধেও বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন উপাখ্যান দেখা যায়॥ সবগুলি মিলিয়ে ঘটনাটার এই রকম একটা রূপ দেওয়া যায়।

দক্ষকন্যা সতীকে বিবাহ করবার পর শিব সপারিষদ হিমবৎ পর্বতে অধিষ্ঠান করছিলেন। এতদিন তিনি সতীর সঙ্গে রুদ্রাধিপতির মর্যাদায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁর সভায় বহু দেবতার সমাগম হল। তাঁদের মধ্যে তাঁর শ্বশুর দক্ষও ছিলেন॥ তিনি এসেছিলেন কন্যাজামাতাকে দেখতে। শিব বা সতী কেউই কিন্তু তখন তাঁদের মহিমান্বিত আসন থেকে উঠে দক্ষকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলেন না। দক্ষ এতে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হয়ে কন্যাজামাতার প্রতি একটা তীব্র ক্ষোভ পোষণ করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে এক মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে দক্ষ সকলকেই আমন্ত্রণ জানালেন, কিন্তু সতী বা মহাদেবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। নারদের মুখে পিতা যজ্ঞ করছেন জানতে পেরে সতী তৎক্ষণাৎ পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। সেই সময় শিব গৃহে ছিলেন না, কিন্তু তিনি এতই উত্তেজিত হয়েছিলেন যে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করবার ধৈর্যও তাঁর তখন ছিল না। একটা বার্তা রেখে তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই নির্ভরযোগ্য অনুচরদের নিয়ে পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন। তাঁর আগমনবার্তা যখন ঘোষিত হল তখন দক্ষ অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। স্বীয় কন্যাকে অপমান করবার উদ্দেশ্যে তিনি সতীর সম্মুখে তাঁর ছোট বোনদের বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করলেন অথচ তাঁকে একবারও সম্ভাষণ করলেন না। অপমানিতা সতী পিতাকে এই ব্যবহারের জন্য তীব্র তিরস্কার করলে দক্ষ কঠোরভাবে বললেন যে তাঁর অপরাপর কন্যাজামাতা তাঁদের চেয়ে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, কেননা তাঁরা শিবের মত তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করেন না এবং এই কারণেই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তার স্বামীকে অবমাননার যোগ্য বলে মনে করেন। সতী এর প্রতিবাদে সেইখানেই আত্মবিসর্জন দিলেন॥ এদিকে স্বামীর অগোচরেই পিতৃগৃহে যাত্রা করায় শিব শুধু অসন্তুষ্টই নন, বহুল পরিমাণে শঙ্কিতও হয়েছিলেন, কেননা তাঁর আশংকা ছিল এতে একটা অঘটন ঘটবে। সেটা যখন সত্যই ঘটল এবং তিনি যখন জানতে পারলেন কিভাবে সতী দেহত্যাগ করেছেন তখন তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন॥ তিনি গণজাতীয় রুদ্রদের সেনাপতি বীরভদ্রকে অসংখ্য রুদ্রসৈন্যসহ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করবার জন্য পাঠালেন এবং নিজে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে এই ধ্বংসকার্য প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। কিন্তু সতীর মৃতদেহ চোখে পড়ায় তিনি শোকে এত কাতর হয়ে পড়লেন যে যুদ্ধও যেন তাঁর মন থেকে মুছে গেল। কিন্তু তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। হঠাৎ তিনি সতীর মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে উন্মত্তের মত পূর্বদিক লক্ষ্য করে ছুটে চললেন॥ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা দেখলেন, সতীর দেহ যতক্ষণ শিবের কাঁধে রয়েছে ততক্ষণ তাঁর এই উন্মত্তভাব নিবৃত্ত হবার উপায় নেই এবং সেই দেহেরও ধ্বংস হবে না। তখন তাঁরা মায়াবলে সতীর শবশরীর চক্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলতে লাগলেন। যেখানে যে অঙ্গ পড়তে লাগল সেই স্থানই পীঠস্থান বলে গণ্য হল। এইভাবে সেই দেহ সম্পূর্ণ খণ্ডিত হলে নিরতিশয় ক্লান্ত হয়ে ব্যথিত শিব এক জায়গায় বসে পড়লেন॥ ওদিকে গণসেনাপতি বীরভদ্র তাঁর অনুচরদের নিয়ে সমগ্র যজ্ঞস্থল মথিত করে যজ্ঞের সমস্ত নিদর্শন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেললেন। বাধাদানকারী দেবতারা সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। অবশেষে, তাঁরা সকলেই দক্ষকে নিয়ে এসে শিবের স্তব করতে লাগলেন। শিব দেখলেন যে আর কিছু করবার নেই, যা হবার তা হয়ে গেছে॥ তিনি শেষ পর্যন্ত সবাইকে ক্ষমা করলেন সতী হিমালয়কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন শিব তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন

এই কাহিনীতেও কিন্তু কোথাও শিবের নৃত্যের কথা নেই। যা কিছু বীভৎস হত্যা ও নৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা করেছিলেন গণ-নায়ক বীরভদ্র এবং তাঁর অনুচরবর্গ॥ অবশ্য লৌকিক কাহিনীতে কল্পনা আরও কিম্ভূততর হয়েছে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামংগল কাব্যে অনবদ্য ভুজংগপ্রয়াত ছন্দে বলছেন—শিব নিজেই তাঁর অনুচরদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ নাশ করেছিলেন।

> অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে
> অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে।
> ভুজংগপ্রয়াতে কহে ভারতী দে
> সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে।

এরই সঙ্গে দক্ষের নিপাত ঘটল॥

> মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড
> মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে
> মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ

পরের কাহিনী আমাদের জানা। বিধবা শাশুড়ীর মিনতিতে দক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করা হল; কিন্তু সতী অভিশাপ দিয়েছিলেন—

যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল।

অতএব, পুনরুজ্জীবিত দক্ষ ছাগমুণ্ডের অধিকারী হলেন। এ ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর শিবের আচরিত বিশেষ কোনও নৃত্যের উল্লেখ করেননি, যদিও তিনি বিশিষ্ট পুরাণবিৎ ছিলেন। এই আখ্যায়িকা ও শিবের নৃত্য সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে বলছি, কারণ নাট্যশাস্ত্রে তাণ্ডব প্রসঙ্গে এই ঘটনারই বিশেষ উল্লেখ আছে এবং বলা হয়েছে যে মহেশ্বর দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর সন্ধ্যাকালে, তাল এবং লয় সহকারে বিভিন্ন অঙ্গহার প্রদর্শন করে যে নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন, সেটিই নাকি তাণ্ডবের মূল উপাদান।

বর্তমানে, বহু স্থানে শিবের যে নৃত্য তাণ্ডব নামে প্রচলিত আছে, সেটি কিন্তু গজাসুরবধের কাহিনীর পটভূমিকায় পরিকল্পিত। শিব গজাসুরকে বধ করেন। তারপর সেই নিহত অসুরের দেহের চর্ম উচ্ছেদ করে সেই রক্তাক্ত চর্ম হাতে নিয়ে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করেছিলেন। এর উল্লেখও মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনীস্থিত মহাকাল মন্দিরের প্রসঙ্গে করেছেন। মেঘদূত কাব্যে অপূর্ব মন্দাক্রান্তা ছন্দে তিনি বলছেন:—

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা॥

অস্যার্থঃ— হে মেঘ, তুমি সন্ধ্যাকালে পূজার পর পশুপতির নৃত্যারম্ভের সময় তাঁর ঊর্ধ্বপ্রসারিত বাহুর মত বৃক্ষসমূহের উপরদিকে মণ্ডলাকারে অবস্থান করবে এবং সেই সময় অভিনব জবাপুষ্পের মত রক্তবর্ণ সান্ধ্য তেজ ধারণ করে তাঁর শোণিতার্দ্র গজচর্ম ধারণের ইচ্ছাকে হরণ করবে। ভবানী উদ্বেগপ্রশমিত স্তিমিত নয়নে তোমার সেই ভক্তি পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন।

মল্লিনাথ তাঁর এই শ্লোকের টীকায় এই নৃত্যকেই তাণ্ডব আখ্যা দিয়েছেন। 'নৃত্যারম্ভে'—শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলছেন—"তাণ্ডবপ্রারম্ভে" এবং পরে বলছেন—"গজাসুর মর্দনান্তর ভগবান্ মহাদেবঃ তদীয়মার্দ্রাজিনং ভুজমণ্ডলেন বিভ্রৎ তাণ্ডবং চকার—ইতি প্রসিদ্ধিঃ"। এখানেও তিনি কোনও বিশেষ পুরাণের উল্লেখ করেননি, —শুধু বলছেন যে—গজাসুর মর্দনের পর ভগবান মহাদেব তাঁর রক্তসিক্ত চর্ম উঁচু করে হাতে ধরে মণ্ডলাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে তাণ্ডব নৃত্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন; —এইরকম জনশ্রুতি বা প্রসিদ্ধি বর্তমান। এও সেই 'ম্যাকেবার ড্যান্স', অর্থাৎ হননোত্তর বীভৎস নৃত্য।

এইবার নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। ভরতমুনির বিবরণকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তা হলে তাণ্ডবের পরিকল্পনা মুখ্যত নাটককে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল,—এ কথা স্বীকার করতে হয় এবং এতে সন্দেহ প্রকাশের কোনও হেতু দেখা যায় না। তাণ্ডব কিন্তু নাটকের সব স্তরে, অর্থাৎ বিভিন্ন দৃশ্যগুলির সঙ্গে জড়িত ছিল না; এর প্রয়োগ হয়েছিল কেবলমাত্র পূর্বরঙ্গে, যেখানে নাট্যের প্রারম্ভে কেবলমাত্র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের বিধান ছিল। পূর্বরঙ্গে নৃত্যগীতের বিশেষ আয়োজন ছিল। আচার্য ভরত তাঁর ইতিহাসে তিনটি পূর্বরঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন। এই তিনটির মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের পূর্বরঙ্গেই তাণ্ডবের অভিস্থাপনা হয়েছিল। গোড়ার দিকে পূর্বরঙ্গ নেহাতই পূজাবিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; এর মধ্যে তেমন কিছু চিত্তাকর্ষক বস্তু ছিল না। এটা যখন একঘেয়ে হয়ে গেল তখন নতুন কিছু প্রযোজনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই সময় ভরত কৈলাসে তাঁর দলবল নিয়ে এলেন নাট্যানুষ্ঠান করতে,—উদ্দেশ্য মহেশ্বরকে এই নাট্যকলা দেখাবেন এবং গূঢ়তর উদ্দেশ্য, যদি নটরাজ রুদ্রাধিপতির কাছ থেকে কোনও নতুন প্রস্তাব পাওয়া যায়; কারণ রুদ্রদের সংগীতে অভিজ্ঞতার কথা তখন সুবিদিত। ভরতের সঙ্গীত পরিচালক নারদ স্বয়ং গন্ধর্ব ছিলেন, কিন্তু তিনিও রুদ্রদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নতুন কিছু পাবার আশায়। কৈলাস পর্বতে একটি খুব চমৎকার স্থান বেছে নিয়ে ভরত শিবকে দেখালেন তাঁর নাটক,—ত্রিপুরদাহ। এর বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। দেখে শুনে মহাদেব অত্যন্ত প্রীত হলেন; শুধু তাই নয়, একটা নতুন সৃষ্টির জন্যও উদ্বুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন, —নাট্যশাস্ত্রের ভাষাতেই বলি,—

ময়াপীদং স্মৃতং নৃত্যং (নৃত্তং) সন্ধ্যাকালেষু নৃত্যতা।
নানা করণসংযুক্তৈরঙ্গহারৈর্বিভূষিতম্॥

অর্থঃ—আমারও মনে হচ্ছে সেই সময়ের কথা যখন সন্ধ্যাকালে আমি নৃত্যানুষ্ঠান করতুম। এই নৃত্যে নানারকম অঙ্গহার এবং করণ সংযুক্ত হয়ে সৌন্দর্য সম্পাদন করত।

মহাকবি কালিদাস মহেশ্বরের এই সান্ধ্য নৃত্যেরই ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু, এ নৃত্য নিশ্চয়ই সেই উন্মত্ত প্রেতসম্ভব উদ্দাম অঙ্গবিক্ষেপ নয়,—এ রীতিমত সুশিক্ষিত পরিমার্জিত অভিজাত নৃত্য। অতএব, রুদ্রেরা যে বিধিবদ্ধ ললিতকলা হিসাবে নৃত্যের অভ্যাসও করতেন,—ইতিহাসই তার সাক্ষ্য প্রদান করছে।

মহেশ্বর ভরতকে ডেকে বললেন—"তুমি যে নৃত্য আমাকে দেখালে তাকে আমি 'শুদ্ধ' নৃত্য বলে স্বীকার করি; কিন্তু আমি বিবিধ গীতের সঙ্গে যে নৃত্য সম্পাদনের উপদেশ দেব তাকে 'চিত্র' আখ্যা দিলেই শোভন হবে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুচর তণ্ডুকে ডেকে বললেন—"তুমি ভরতকে নৃত্যের অঙ্গহার (অঙ্গবিন্যাস) সম্পর্কে উপদেশ প্রদান কর।" তারপরে ভরত তাঁর শাস্ত্রে বলছেন যে—"মহাত্মা তণ্ডু আমাকে যে অঙ্গহার প্রদর্শন করেছেন তার সঙ্গে করণ (হস্ত-

নটরাজ শিব (ইলোরা গুহা)

পদের যুগপৎ বিন্যাস) এবং রেচক (বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গীতে পরিভ্রমণ)—এই সবও আমি এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করব।" এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। 'মুদ্রা' নামক যে অঙ্গুলিক্রিয়ার ব্যাপক প্রয়োগ ভারতীয় নৃত্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তার ব্যবহার ভরতের যুগে খুব কমই ছিল বলে মনে হয়। তণ্ডু নাকি বত্রিশ রকমের অঙ্গহার প্রদর্শন করেছিলেন; আর এই অঙ্গহারগুলিকে উপলব্ধি করতে গিয়ে ভরতগোষ্ঠীকে এক শো আট রকমের করণ এবং চার রকমের রেচক সম্বন্ধেও শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল। যে গানগুলি এই নৃত্যের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল, সেগুলি প্রধানত তৎকালপ্রচলিত বর্ধমানক এবং আসারিত গীতি। এইগুলিই ছিল সে যুগের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত।

এইসব আঙ্গিকের পরিচয়পর্বে ভগবান শঙ্কর স্বয়ং করণ, রেচক এবং অঙ্গহারগুলি অনুষ্ঠান করে তণ্ডুর সহায়তা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুকুমার নৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন পার্বতী। এইসব নৃত্যের সঙ্গে বেজেছিল—মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, ভাণ্ড, ডিণ্ডিম, পণব, দর্দুর, গোমুখ—প্রভৃতি নানাপ্রকার চর্মনিবদ্ধ তালবাদ্য।

নবলব্ধ এই নর্তনশিল্পের বিস্তৃত বিবরণের পর ভরত আর একবার বলছেন, —এই নৃত্য সেই পর্যায়ের যা দক্ষযজ্ঞ "বিনিহত" হলে মহেশ্বর সন্ধ্যাকালে লয় তাল অনুসারে সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত পুরাণগুলিতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর শিবের যে শোককাতর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, তাতে এই ধরনের নৃত্যানুষ্ঠান যে তৎকালে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে এইটাই মনে হয় যে, একটা ঐতিহাসিক সংজ্ঞা প্রদান করবার জন্যই নাট্যশাস্ত্রে শিবের মুখ দিয়ে এই ধরনের উক্তি করানো হয়েছে। আসলে এই নৃত্য রুদ্রদের বহুদিনের অভ্যস্ত সংস্কৃতির ফসল, যা উৎসবাদিতে সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত হত। হয়তো সতীবিয়োগের শোকভার অপসারিত হবার পর এই বিজয়োৎসবকে স্মরণ করে এই জাতীয় নৃত্য সম্পাদিত হয়েছিল, কিন্তু সদ্য দক্ষযজ্ঞ ভাঙার পর শিবের পক্ষে একটি আর্ট-নৃত্য সম্পাদনের মনোভাব নিশ্চয়ই ছিল না, সেখানে গণসৈন্য অনুষ্ঠিত প্রেতনৃত্যই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে গণ্য হতে পারে। শিব নিজের একক নৃত্যের কথা উল্লেখ করলেও তাণ্ডব হিসাবে যে নৃত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সম্মেলক নৃত্য এবং স্থানে স্থানে পিণ্ডীবদ্ধভাবে, অর্থাৎ দু-তিনজনের একত্র সমাবেশে নৃত্যটি বৈচিত্র্যলাভ করেছিল। এই সব পিণ্ডীবন্ধ অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকদেরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

নৃত্যের কাঠামোগুলি ঠিক হয়ে গেলে ভগবান শঙ্কর আচার্য তণ্ডুকে এইসব বিধির সঙ্গে উপযুক্তভাবে সঙ্গীত প্রয়োগ করবার নির্দেশ দিলেন। তণ্ডু এই বিশেষ নৃত্যগীতের সমন্বয় সাধন করেছিলেন বলেই সমগ্র নৃত্যক্রিয়াটি তাণ্ডব নামে পরিচিত হয়।

তাণ্ডিনাপি ততঃ সম্যগ্‌গানভাণ্ডসমন্বিতঃ।
নৃত্যপ্রয়োগঃ সৃষ্টো যঃ স তাণ্ডব ইতি স্মৃতঃ॥

ভরত তৎকালীন প্রচলিত সঙ্গীতের যে সব অংশ নৃত্যে প্রয়োগ করেছিলেন তার মধ্যে কিছু অর্থহীন শব্দের ব্যবহার ছিল। এগুলি নৃত্যের সঙ্গে চমৎকার ধ্বনিবৈচিত্র্য সম্পাদন করত। পূর্বে যে আসারিত গীতের উল্লেখ করা হয়েছে সেই গীতের প্রারম্ভে ঝণ্টুং ঝণ্টুং প্রভৃতি কতকগুলি অর্থহীন শব্দ যোজিত হত।

এই উচ্চারণগুলি রুদ্রদের অত্যন্ত প্রিয় এবং এই কারণেই এগুলি বিশেষভাবে সংযোজিত হয়েছিল। আসারিত গীতের এই অংশকে বলা হত "উপোহন"।

যে নৃত্য একদা রুদ্রজাতীয় পুরুষগণই আচরণ করতেন, তার সঙ্গে যুক্ত হল মেয়েদের সুকুমার নৃত্য এবং তাতে আবার শোভনভাবে প্রযুক্ত হল সঙ্গীত। এর নৃত্যভাগটির প্রযোজনা করলেন স্বয়ং শিব, সুকুমার প্রয়োগ করলেন পার্বতী। তারপরে যৌথ প্রচেষ্টায় স্ত্রীপুরুষের পিন্ডীবদ্ধ প্রক্রিয়া (গ্রুপ বা উপদল অনুসারে নৃত্য) সুসম্পন্ন করা হল। অতঃপর সমস্ত কম্পোজিশনটা শিব স্বয়ং ছেড়ে দিলেন আচার্য তণ্ডুর কাছে সঙ্গীত যোজনা এবং সম্পাদনার জন্য। এ সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্র বলছেন—

> যে গীতিকাদৌ যুজ্যন্তে সম্যঙ্ নৃত্যবিভাবকঃ।
> দেবেন বাপি সম্প্রোক্তস্তান্ড্যাস্তাণ্ডব পূর্বকঃ॥
> গীতপ্রয়োগমাশ্রিত্য নৃত্যমেতৎ প্রনৃত্যতাম্।
> প্রায়েণ তাণ্ডববিধির্দেবস্তুত্যাশ্রয়ো ভবেৎ॥

এর অর্থ : তাণ্ডবনৃত্যকে পুরবর্তী করে দেব শংকর তাণ্ডীকে (তণ্ডুকে) ডেকে বললেন—এই নৃত্যের বিভাজন (এনালাইজ) করে যেখানে যেখানে যেসব গীতিকা সুষ্ঠুভাবে যোগ করা যায়, সেগুলি আগে নির্ণয় কর। তারপরে সেই গুলিকে প্রয়োগ করে এই নৃত্যকে আরও প্রকৃষ্ট নৃত্যে রূপায়িত কর। তাণ্ডববিধি প্রায়শই দেবতার স্তুতিরূপেই নিবেদিত হবে।

এইভাবে যে নৃত্যের সৃষ্টি হল তাই হচ্ছে তাণ্ডব নৃত্য। বলা বাহুল্য, কাজটি সহজে সম্পাদিত হয়নি এবং এর জন্য আচার্য তণ্ডুকে দীর্ঘকাল ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রম ও চিন্তা করতে হয়েছিল। তাণ্ডবের নৃত্যভাগ প্রচলিতই ছিল; তথাপি একে নতুন করে সাজিয়ে নিতে যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়েছিল তা কেবলমাত্র অতি পরিণত স্রষ্টার মধ্যেই থাকা সম্ভব। এর জন্য নৃত্যপ্রযোজকের কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য; কিন্তু এর সঙ্গে তাল-লয়ে সঙ্গতি রেখে গীত ও বাদ্যকে শোভনভাবে যুক্ত করা একটি সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা এবং এর কৃতিত্ব আরও বহুগুণে বেশী এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। অতএব, সমস্ত কম্পোজিশনটিকে তণ্ডুর নামে পরিচিত করে তাঁকে যথার্থভাবেই মহিমান্বিত করা হয়েছে।

ভরত এবং তদীয় সম্প্রদায় এই বিদ্যাটিকে অধিগত করে কিভাবে নাটকের প্রারম্ভে যোজনা করেছিলেন, অতি সংক্ষেপে তার একটি বর্ণনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এই যে 'চিত্র' নামক অনুষ্ঠান, এটি অভিনয় আরম্ভ হবার আগে মঙ্গলাচরণ হিসাবে সম্পাদিত হত। প্রথমে বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যে কনসার্ট শুরু হত। বাজনা জমে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে আসারিত গীতের প্রয়োগ হত। এই গীতের প্রচুর লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তার রূপায়ণ সম্বন্ধে ধারণা করা এ যুগে সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় ঝুণ্টুং ঝুণ্টুং ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একজন নর্তকী লীলায়িত ভঙ্গীতে রঙ্গপীঠে প্রবেশ করতেন। বীণায় তখন নানারকমের কলাকৌশল দেখানো হত এবং সেই বাজনার সুর ও ছন্দকে অনুসরণ করে নর্তকীটি কয়েক প্রকার অঙ্গহার সমন্বিত নৃত্য আচরণ করতেন। তারপর তিনি ক্ষণকালের জন্য অন্তরালে গিয়ে অঞ্জলিপুটে পুষ্পপুঞ্জ নিয়ে এসে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতেন। সেটি হয়ে গেলে তিনি রঙ্গ-পীঠের চারদিকে পরিভ্রমণ করে দেবতাদের প্রণাম জানিয়ে আবার কিছুক্ষণ নৃত্য করতেন। এইটি ছিল পুষ্পাঞ্জলি অনুষ্ঠান। এঁর ভূমিকা এই পর্যন্ত। তিনি প্রস্থান করলে অপরাপর নর্তকীরা অনুরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে পৃথকভাবে একে একে প্রবেশ করতেন। তারপর তাঁরা নানারকম অঙ্গহার প্রদর্শন করতে করতে পিণ্ডীবদ্ধ হতেন। এইরকম যৌথ নৃত্যের সঙ্গে চমৎকার বাজনা বাজত। সর্বসমেত চারটি পিণ্ডীবদ্ধ নৃত্যানুষ্ঠানের সঙ্গে কনিষ্ঠাসারিত, মধ্যমাসারিত, অন্তরিত এবং জ্যেষ্ঠাসারিত—এই চারপ্রকার আসারিত গীত সম্পাদিত হত। এর সঙ্গে যে সব তাল প্রযুক্ত হত সেগুলি ছিল চচ্চৎপুট, চাচপুট, পঞ্চপাণি প্রভৃতি মার্গতাল। পূর্বে যে বর্ধমানক গীতের কথা বলা হয়েছে, তা আর কিছুই নয়, আসারিত গানের অঙ্গসমূহের পরিবর্ধন মাত্র। এই জন্যই এর আখ্যা বর্ধমানক; আসল গান ছিল আসারিত। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপক অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হতে সময় নেহাত কম লাগত না। বিদগ্ধ দর্শকদের কিন্তু এর জন্য কোনও অভিযোগ তো ছিলই না, বরঞ্চ তাঁরা এই নৃত্যকলাটিকে সর্বতোভাবে উপভোগ করতেন। এই পর্যায়ের তাণ্ডবে দেখা যাচ্ছে কেবল স্ত্রীলোকই অংশগ্রহণ করতেন। লক্ষণ অনুসারে এটি লাস্য নৃত্যের পর্যায়ে পড়ে না।

পরবর্তী কালে কিন্তু এই ব্যাপক পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠান আর আদৌ ছিল না। সামান্য কিছু নৃত্যানুষ্ঠান যা ছিল তাও একান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এর স্থান দখল করেছিল প্রস্তাবনা, যাতে নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতির ভূমিকা সংযুক্ত হত। কালিদাস এই শেষোক্ত কালেরই নাট্যকার।

তাণ্ডবের মোটামুটি পরিচয় আমরা জানতে পারলুম এবং এর মধ্যে মহেশ্বর ও তণ্ডু,—এই দুজনের ভূমিকা কতখানি, সে সম্বন্ধেও একটা ধারণা করা গেল; কিন্তু এই সঙ্গে একটি প্রশ্নের উদয় হয়, সেটি এই যে—এই তণ্ডু নামক ব্যক্তিটি কে? তাণ্ডব প্রসঙ্গে তিনটি নাম পাওয়া যায়;—তণ্ডু, তণ্ডি এবং তাণ্ডিণ্ (তাণ্ডী)। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন—ইনি আর্যজাতির অন্তর্ভুক্ত নন এবং এঁর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ইনি কোন জাতির লোক, সে সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এঁর পরিচয় যে একেবারেই পাওয়া যায় না, এমন নয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব উপমন্যু-বাসুদেব সংবাদ একটি বড় অংশ জুড়ে আছে। এই অধ্যায়ে উপমন্যু বাসুদেব কৃষ্ণকে বলছেন—"সত্যযুগে তণ্ডি নামে একজন বিশ্রুত ঋষি ছিলেন, তিনি বহু বর্ষ ধরে মহাদেবের আরাধনা করেছিলেন। এই কঠোর তপোনুষ্ঠানের পর মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিলেন,—তোমার একটি পুত্র হবে। সেই পুত্র অক্ষয়, অব্যয়, দুঃখবর্জিত, যশস্বী, তেজস্বী এবং দিব্যজ্ঞানসমন্বিত হবে। আমার প্রসাদবলে সেই দ্বিজশ্রে ঋষিগণের অভিগম্য বেদের সূত্রকর্তা হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।" এ তণ্ডিপুত্রই সম্ভবত তাণ্ডী নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন; আর সেই সূত্রই "তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ" নামে সামবেদের প্রধান সূত্ররূপে (সূত্র আর ব্রাহ্মণে তফাত এমন বিশে কিছু নয়) চলে আসছে। সামবেদের সংহিতাভাগে বিধৃত মূল মন্ত্রগানগুলি উৎপত্তি, ইতিহাস, প্রয়োগ প্রভৃতি তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে বর্ণিত হয়েছে। পণ্ডিতগণ এবে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণও বলে থাকেন। সামগানের ঐতিহ্য যাঁরা ধারণ করে এসেছিলেন তাঁদের উল্লেখ করতে গিয়ে বংশব্রাহ্মণ "নিরুক্ষণ তাণ্ড্য" নামক অনেক তাণ্ড্যবংশী আচার্যের নাম করেছেন। তা ছাড়া প্রবচনকর্তা হিসাবেও তাণ্ড্যবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব এঁরা যে কেবল লৌকিক নৃত্যগীতের চর্চা করতেন তাই নয়, সাম গানের ঐতিহ্যকেও সযত্নে রক্ষা করে এসেছিলেন। বস্তুত সামগায়কদের একটি শাখাকেই তাণ্ড্যশাখা বলা হয়ে থাকে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন সংস্করণে পূর্বোল্লিখিত তণ্ডু এবং তাণ্ডিণ্— এই দুটি নামই পাওয়া যায়। তণ্ডি—নামটি কেবল মহাভারতেই দেখা যায়। কিন্তু তাণ্ডব নামকরণের পরিপ্রেক্ষিতে যত দূর মনে হয়, গোড়াতে নামটি তণ্ডুই ছিল সংস্কৃতভাষীরা তণ্ডি নামটি প্রদান করেছিলেন এবং পরে ব্যাকরণসম্মতভাবে এই নামকে "তাণ্ডিণ্" শব্দে রূপান্তরিত করা হয়। তাণ্ডব নৃত্যকে তাণ্ড্য-নৃত্য বললে ক্ষতি হয় না, কারণ এরকম উল্লেখও দু-এক স্থানে দেখা যায়। তণ্ডু নামটির ব্যবহার এখনও তিব্বতে বর্তমান। "তোন্দ্রুপ" (তথা তোন্দুপ—তিব্বতী বানান অনুসারে দন্-গ্রুব) নামটি তিব্বতীদের বিশেষ প্রিয়। এর অর্থ—"যে তার উদ্দেশ্যকে আয়ত্তে আনতে পারবে" বা "যে তার পিতামাতার উদ্দেশ্য সাধন করেছে"। আবার তাণ্ডী বা তাণ্ডিণ্ নামটিও যে নেই তা নয়,—"তাম্দ্রিন" (তিব্বতী বানান অনুসারে 'র্তা-ম্গ্রিন্') এক দেবতার নাম, যাঁকে ধ্যান করলে বুদ্ধ যে স্বর্গে অধিষ্ঠান করছেন সেখানে যাওয়া যায়, অথবা মৃত্যুর পর কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে সেটি আত্মার ইচ্ছা অনুসারে নির্ধারিত হয়।

এই সব লক্ষণ দেখে মনে হয় অতি প্রাচীন যুগে বর্তমান তিব্বতীদেরই কোনও উপজাতির লোক ছিলেন এই রুদ্রেরা। কৈলাস পর্বত তিব্বতীদের কাছে পবিত্রতম পর্বত। প্রসিদ্ধ তিব্বতী সাধক কবি তথা গায়ক "মিলা রেপা" এই পর্বতের একাধিক গুহায় ধ্যান-ধারণায় কাল কাটিয়েছেন। এমন আরও অনেকেই সাধনার স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন কৈলাস পর্বতের নিম্নদেশ। রুদ্র নামটি বৈদিক, মরুৎ নামটিও তাই, গণ শব্দও আমরা সংস্কৃত বলেই জানি। এঁদের নিজেদের ভাষায় এঁরা কি নামে পরিচিত ছিলেন কে বলবে? তথাকথিত রুদ্র জাতীয় তণ্ডু ব তাণ্ড্যগণ ক্রমে একটি বৃহৎ শাখায় পরিণত হন। এঁরা সম্পূর্ণভাবে বৈদিক ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন, তণ্ডিকে তো দ্বিজই বলা হয়েছে। তথাপি এঁদের মধ্যে আদিম বিশ্বাস বা আদিম সংস্কারগুলি সমানভাবেই প্রচলিত ছিল, যার ফলে নানা ঘটনায় তাঁদের সেই হিংস্র এবং বীভৎস নৃত্যগুলি ভয়াবহ আকারে আত্মপ্রকাশ করত। সম্ভবত এঁদেরই আর একটা শাখা ছিলেন যক্ষেরা। মহাভারতে অলকার বর্ণনা পাওয়া যায়, বর্তমান তিব্বতেও তার একটা ক্ষীণ আভাস দেখা যায়। এঁদের মঠ, মন্দির বা অভিজাত গৃহগুলিতে তেমনি সোনার ছড়াছড়ি দেখা যায়, তেমনি নানা বর্ণের পতাকার ব্যবহার আজও রয়েছে, চিত্রবিদ্যায় দক্ষতাও বিলুপ্ত হয়নি এমন কি মহাভারতের যুগে "মণিভদ্র", "মণিমান" প্রভৃতিতে "মণি" শব্দের বহুল প্রয়োগ যক্ষদের নামে দেখা যেত, আজও "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" স্লোগানে সেটি রক্ষিত আছে। আমরা ভারতীয়েরা যেমন যুগ যুগ ধরে নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাচীনতম ধর্ম-সংস্কৃতির কিঞ্চিৎ কণামাত্র প্রচলিত রাখতে পেরেছি তেমনি এঁরাও ঠিক একইভাবে খুব সামান্য বৈশিষ্ট্যই বর্তমানে রক্ষা করতে পেরেছেন।

যাই হোক, এ সবই অনুমান মাত্র। তবে এর মধ্যে যেটি সত্যি সেটি হল এ যে, তাণ্ডব নামক নৃত্যটি সুপ্রাচীন রুদ্রজাতির একটি বিশিষ্ট নৃত্যের ঐতিহ্য বহন করে। যে তণ্ডু এই নির্দিষ্ট আকারটি প্রণয়ন করেছিলেন তিনি শিবের সম সাময়িক হয়তো আদৌ ছিলেন না, এমনও হতে পারে, কিন্তু যে নৃত্য শিবের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসেছিল, তাকেই তিনি একটি সম্পূর্ণ নতুন আকারে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাণ্ডব সম্বন্ধে আর একটি ধারণা থেকে আমাদের অব্যাহতি পেতে হবে। এই নৃত্য কেবলমাত্র পুরুষদের আচরিত নৃত্য নয় এবং এ প্রকৃতিও উদ্ধত ছিল না। যিনি যাই বলুন না কেন, ইতিহাস এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে তাণ্ডব একটি সুললিত নৃত্য, যার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সুশৃংখলভাবে নর্তনলীলার পরিচয় প্রদান করতেন আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে উচ্চশ্রেণীর সুর তাল লয়যুক্ত গীতবাদ্য ব্যতীত তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হতে পারে না। নৃত্যে সঙ্গীতের প্রয়োগই তাণ্ডবের মূল বৈশিষ্ট্য ভরত যে কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তাকে পৌরাণিক বলে মনে করলেও এ সত্যকে স্বীকার করতেই হবে যে তিনি যে নৃত্যধারাকে নাটকে মঙ্গলাচরণের জন্য গ্রহণ করেছিলেন, সেটিই তৎকালে তাণ্ডববিধি নামে পরিচিত ছিল।

পরিশেষে আরও একটি কথা বলে রাখা ভাল। দু-একজন মহামান্য দার্শনিক ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকা বা ভাষ্য রচনা করে গেছেন। এঁদের নিজেদের কয়েকটি ব্যক্তিগত মতবাদ ছিল এবং অনুবর্তীদের সংখ্যাও কম ছিল না। এঁরা ব্যাখ্যার নামে ভরতের সুস্পষ্ট এবং সহজ মতবাদকে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত করেছেন এবং একাধিক বিষয়ে এক একটা নতুন তত্ত্বের আমদানি করেছেন যার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁদের। ঠিক সেইভাবেই তাণ্ডব সম্বন্ধে বহু চমকপ্রদ তথ্য নানা অর্থারটি নানা গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন যা ভরত আদৌ উত্থাপন করেননি, এমন কি ইঙ্গিতও করেননি। অতএব, ভরত তাণ্ডববিধি সম্বন্ধে যে "একসপারটাইজ" বা প্রয়োগবিজ্ঞান তাঁর গ্রন্থে সর্বজনবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাকে যথার্থ হয়ে অবলম্বন করাই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠ পন্থা।

হায় গরু ! তুমি কোথায় ?

কণা বসুমিশ্র

সেদিন গরু খোঁজা করেও আমি একটা গরুর দেখা পাইনি। অথচ প্রায়ই দেখতে পাই রাস্তায় ছাড়া থাকে ধর্মের ষাঁড়। এদের মালিকের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। এই তো কিছুদিন আগে এক ষাঁড়কে বাঁচাতে গিয়ে স্কুটার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল এক দম্পতি। শুধুই কি তাই? কেন এক দোতলা বাসের তলায়ও তো! রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা উদাসীন গরুকে রক্ষা করতে গিয়ে বাসটা হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল ফুটপাথে। আর ইঞ্জিনটা লাইট পোস্টে ধাক্কা খেতেই ছিটকে পড়ল কয়েকটি ছেলে। উদাসীন গরুর ঔদাসীন্যে সেদিন বাসের চাকার তলায় পিষ্ট হল দরজায় ঝুলে থাকা কয়েকজন নিরীহ যুবক।

গড়িয়াহাট বাজারে গেলেও তো এরকম ঘটনা প্রায়ই হয়। তরিতরকারির দাম করছে কেউ, হঠাৎ পেছন থেকে গুঁতিয়ে দিল একটা গরু। একবার তো আমায় শিঙে তুলে আছাড়ও মেরেছিল! তার ফলে স্রেফ ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল কদিন বিছানায়। অথচ যখন আমি সেজে গুজে সিনেমা দেখতে যাচ্ছিলুম বন্ধুদের সঙ্গে। সেই তখন! গরুটা কি দারুণ বেরসিক!

কিন্তু এই গরুর খোঁজেই হন্যে হয়ে ঘুরেছি সেদিন। গরুর খোঁজে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, গরুর খোঁজে। তখন বেলা একটা। গড়িয়াহাট বাজার প্রায় বন্ধ হয় হয়। কেনাকাটার পাট আর নেই বললেই চলে। দোকানদারেরা একে একে সব ঝাঁপ বন্ধ করছে। ভ্যাপসা গরমে গলদঘর্ম অবস্থায় কেউ কেউ সিমেন্টের বেদীর ওপরে শুয়ে শুয়ে বিড়িও টানছে। মাছ-বাজারের পাশে কর্পোরেশনের কলের জলে গায়ে গামছা রগড়ে স্নানও করছে অনেকে। পাশেই কয়লার তোলা উনুনে কেউবা রান্নাও চাপিয়ে দিয়েছে। টগবগ করে ভাত ফুটছে। ফুটন্ত ভাতের ফ্যানের গন্ধও নাকে আসছে। তখন একদিকে মাংসের দোকানের নীচের খোলা জায়গাটার ঠিক পথের ওপর কচ্ছপের নাড়িভুঁড়ি, পাঁঠার নাড়িভুঁড়ি, মাছের আঁশের স্তূপের পাশ দিয়ে কৃপণের মত কুঁকড়ে থাকা একটুখানি পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি ব্যাকুল আগ্রহে গরু খুঁজে চলেছি। নেই, নেই, কোথাও নেই। সারা বাজার খুঁজেও যখন নেই, ফেলে দেওয়া পচা তরকারির উচ্ছিষ্ট খেতেও কেউ আসেনি যখন, তখন ফুটপাথের আশেপাশে খুঁজে বেড়াই, যদি হঠাৎ চোখ দুটো বলে 'ইউরেকা' 'ইউরেকা'।

বিষণ্ণ মনে ফুটপাথে বসে থাকা ফলের দোকানদারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা, ভাই, এখানে গরুটরু আসে না?" "আসে।" "আজ দেখেছ এখানে?" লোকটা কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খায়। ও অবাক হয়ে দেখে আমায়। তারপর বলে, "দেখব না কেন?" কতক্ষণ আগে? "এই কিছুক্ষণ আগে।" "কোনদিকে গেছে?" অদ্ভুত হেসে লোকটা বলে, "আপনি গরু খুঁজছেন?" এগিয়ে আসে আর একজন দোকানী। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। ওদের পাশ কাটিয়ে আমি হন্ হন্ করে চলে যাই। আমার চোখদুটো কড়া গোয়েন্দার মত আসামীকে খুঁজে বেড়ায়। আসামী? হ্যাঁ, আসামী বইকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে একটা গরু। যে আমায় এত বেলা অবধি অভুক্ত রেখেছে।

গড়িয়াহাটের মোড়ে বাটার উল্টোদিকে, যেখানে শেয়ারের ট্যাক্সিগুলো দাঁড়িয়ে থাকে সন্ধ্যেবেলায়, তারও উল্টোদিকের ফুটপাথে যেখানে মাসিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকার স্টল। তারই সামনে যে একটা নতুন মিনি বাজার গজিয়ে উঠছে, আমি সেখানে ধাওয়া করি। একটি মেয়ে বসেছিল কতগুলো শশা আর কাঁঠাল নিয়ে। মাছি ভন্ ভন্ করছে। নীল নীল ঢাউস মাছিগুলো ছেঁকে ধরেছে মেয়েটিকে। তবু, ওর হুঁশ নেই। ও বসে আছে অন্যমনস্কভাবে। "এই শোনো, এখানে কোন গরু-টরু এসেছিল?" আমি বলি মেয়েটিকে। ও যেন চমকে ওঠে। মেয়েটির নাকে নথ। সদ্য কান বিঁধিয়েছে। ওর কানে সুতোর দুল। বাঁ হাতের তেলোয় সর্দি মুছে ও বলে, "হ্যাঁ, এই তো। এই মাত্তর একটাকে তাড়িয়েও দিলুম।" "তাড়িয়ে দিলে?" আমি একেবারে আঁতকে উঠি। "গরুটা কোনদিকে গেল বলবে? ওকে আমার বড় দরকার।" ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় মেয়েটি। ওর বোধ হয় মায়া হয়। ও কি ভাবে আমায় কে জানে? মাথা ফাথা খারাপ? মেয়েটি আঙুল দেখায় গোল পার্কের দিক, বলে, "ওই তো ওই দিকে গেছে।" আমি দ্রুত হেঁটে যাই সেদিকে। মাথার ওপরে চৈত্রের গরম হাওয়া, কাঠফাটা রোদ, আকণ্ঠ পিপাসা আমার। চোখ দুটো জ্বলে যায় দারুণ। তবু আমার বড় দরকার একটা গরুর।

গোলপার্কেও সেই নেই নেই হাহাকার। ওরা কেউ নেই? তবে কোথায় গেল? ঠা ঠা রোদ্দুরে আমি হাঁটি। হাঁটতে থাকি। গরু তুমি কোথায়?

একটা ডাব খাবো? গামছার পাগড়ি বেঁধে বসে আছে ডাবঅলা, "ডাব খাবেন দিদি?" হায়রে! যদি উপায় থাকত! তাকে না খাইয়ে আমি খাই কি করে। আমি তৃষ্ণায় কাতর চোখে ডাব দেখি। কচি ডাবের জলের গন্ধ নাকে আসে। পোস্ট অফিসের পাশ দিয়ে ফার্ন রোড ধরে ফের এগোই। কড়া রোদে ছাতা মাথায় দিয়ে যারা যায় তারা অনেকেই দেখে আমায়। আমার উদভ্রান্ত দৃষ্টি এলোমেলো খুঁজে বেড়ায় যেন কাকে। দু পা এগোই, দু পা পেছোই। সামনে তাকিয়ে আবার পেছন ফিরি। শুকনো খটখটে পীচের রাস্তায় গোবর ছড়ানো। টাটকা গোবর। ধোঁয়া উঠছে গোবর থেকে। খুব বেশীক্ষণ আগের নয়। গরু, গরু নেই। কিন্তু সে আছে, সে তার অস্তিত্বের চিহ্ন রেখে গেছে খানিকটা গোবর।

অনেক বন্ধু বলেছিল, "শুক্রবারে তুমি যে পুজোটা কর, তার প্রসাদ খানিকটা গরুকে খাওয়াও তো? না তো। ওমা সেকি! বন্ধু বলল, "তোমার পুজোটাই অসার্থক।" "কিন্তু গরু?" আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাই। এখানে

মানে এই বালীগঞ্জে তিনতলার ফ্ল্যাটে বসে আমি গরু পাবো কোথায় ? বন্ধু বলল, "কেন এই চৌরঙ্গী এলাকায় তিনতলায় বসেও তো আমি গরু পেয়েছি।" "কি ভাবে ?" "কলকাতা শহরে গরু পাওয়া কি এতই কঠিন ?" "রাস্তায় বেরিয়ে পড়।"

তাই তো। তক্ষুনি আমার মনে পড়ে যায় কলকাতার রাস্তায় ভ্রাম্যমান অসংখ্য গরুর মুখ। যারা উদাসীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিক। ডিজেল ইঞ্জিনের আর্তনাদ, মোটরগাড়ির হর্ন, সৌখীন মহিলার সুকণ্ঠী গলা, "এই গরু সরনা রে", কিছুই যাদের বিচলিত করে না।

অতএব আমি বেরিয়ে পড়ি। একেবারে পুজারিণী বেশেই বেরুব ? না, না, অতখানি সাহসী তো হতে পারিনি। শহুরে মানুষগুলোকে যে এখনো বড় ভয়। দেবতা আমার কয়েক ঘণ্টা সময় কেড়ে নিলেও মনটাকে তো কেড়ে নিতে পারেনি এখনো। তাই আমায় শাড়ী পাল্টাতেই হয়, হাইহিল জুতোটা পরতে হয়, হাতে নিতে হয় চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। শুদ্ধ হোক, অশুদ্ধ হোক, ক্ষতি নেই। তারই মধ্যে কাগজের প্যাকেটে থাকে ছোলা, গুড়, দেবতার প্রসাদ। যা আমি মহাদেবের প্রিয় বাহন গরুকে খাওয়াতে চলেছি। কিন্তু গরু কোথায় ? তাকে আমি ঠ্যাঙাবো না, তাড়াবো না। শুধু আদর করে তাকে একটু খাওয়াবো ছোলা আর গুড়। হায় গরু, তুমি কোথায় ?

ভাঙা মন নিয়ে আমি ফিরে আসি বাড়ি। তিনতলায় আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায় বেল টিপে গরুর মত হাঁপাতে থাকি। গরুর মত তাকায় আমাদের কাজের ছেলেটি। দরজা খুলেই বলে, 'পেলেন ?' 'নাহ! কোথায়।' 'আমি যাব ? ঠিক খুঁজে পাবো।' 'তুই ?' আমি ক্লান্ত চোখে তাকাই। 'তুই গেলে কি আমার কাজ হবে ?' বলিষ্ঠ চেহারার ফর্সা নেপালী ছেলেটি দাঁত বের করে হাসে। বলে, 'হবে না ?' 'না, হবে না।' আমি ঝাঁজ ঢেলে বলি। 'হাঁ, ঠিকই বলেছেন, আমার মাও এই পুজো করেছিল। আমার মাও নিজে খাইয়ে দিয়েছিল। গরুকে।' 'তবে আবার বলছিস কেন ?' আমি চলে যাই। তাড়াতাড়ি বসার ঘরের সুইচে হাত দিই। সুইচ টিপি। পাখা তো ঘোরে না। আরে, লোডশেডিং। 'কতক্ষণ পাওয়ার নেই ?' 'বহুৎ সময়।' কাজের ছেলেটি ফের বলে, 'আমার মাও এই পুজো....।' এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো।' 'জল ? গরুকে খাওয়াননি এখনো।' 'আবার গরু' 'আমার মাও তো....।' 'তোর মা আর আমি সমান ?' নিজের কথাই নিজের কানে বাজে। গরমের এই শুকনো খটখটে দুপুরে আমি হিমালয়ের দার্জিলিঙ পাহাড়ে চলে যাই। যেখানে তুষের গুঁড়োর মত তুষার পড়ে। ভানুভক্ত ছেত্রীর নেপালী মা পাহাড়ী চমরী গাইকে পরম মমতায় ছোলা, গুড় প্রসাদ খাওয়ায়। দেবতা তার ছানি-পড়া অন্ধ চোখ দুটো বিনা অপারেশনে ফিরিয়ে দেবে, এই অন্ধ বিশ্বাসে সে শুধু পুজো করে যায়। আমাদের হিন্দুস্থানী জমাদারের বউ, জমাদারের মেয়ে ওরাও পুজো করে শুক্রবারে। যে বর পায় না, সে বর চায়। যে ঘর পায় না, সে ঘর চায়। যে মামলায় হারে, সে মামলায় জিতে যায়। কিন্তু আমি ? আমি কি চাই ? তা কি আমি নিজেই জানি ? মাথায় হাত রেখে সোফায় পিঠ এলিয়ে দিয়ে আমি শুধু ভাবি।

জলের গ্লাস নিয়ে ভানু এসে দাঁড়ায়। ফ্রিজের ঠাণ্ডা বরফ জল। আহ ! কি আরাম। সন্ন্যাসীরা যে কি করে কৃচ্ছ্রসাধন করেন জানি না। একটি দিনের কয়েক ঘণ্টার কষ্টেতেই....। জয় সন্তোষী মা, তুমি রাগ কর না।'.... 'আচ্ছা, ভানু শোন্। তোর মা যে জন্যে পুজো করেছিল তা কি সে পেয়েছে ?' 'মানে চোখ তো ? হ্যাঁ। উনি এখন পরিষ্কার দেখতে পান।' সরল বিশ্বাসে বলে যায়। এত ভাল বাংলা বলে ছেলেটা। নেপালী ছেলে বেমালুম বাঙালী বনে গেছে। 'আচ্ছা ভানু শোন্, তোর মা অপারেশন করেছিল ?' 'হ্যাঁ।' 'তবে ?' আমার যুক্তিবাদী মন নড়ে ওঠে। 'সবই মায়ের কৃপায়।' ভানু কপালে হাত ছোঁয়ায়। আমি আবার অন্যমনস্ক হই। আমি কল্পনায় চলে যাই, নেপালী বস্তির সেই অন্ধকার ঝুপড়িতে, যেখানে কনকনে ঠাণ্ডায়, হিমেল হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে ভানুর অন্ধ মা চমরী গাইকে ছোলা গুড় খাওয়ানোর জন্যে ব্যস্ত হয়। ভাবতে ভাবতে আমি বুড়ী নেপালী ভক্তের মত পরম নির্ভরতায় চোখ বুঁজি। কোন এক জোড়া অদৃশ্য সুন্দর রাঙা পায়ে আমি আমার মাথা রাখি। আমরা দুজনে কখন এক হয়ে যাই। নেপালী মাইজী আর আমাতে কোন প্রভেদ থাকে না।

আমি এম এ। শুধু এম এ নই। আগে বি এ হনস্। তারপর এম এ। হা হা হা। বড় অহঙ্কার হত মনে। প্রথম এম এ হই যখন। সোজা কথা ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। এই গড়িয়াহাটের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা কয়েকবন্ধু উল্লাসে ফেটে পড়ি, "আরে, আজ থেকে আমরা সবাই এম এ।" "আমরা নতুন যৌবনেরই দূত।" এই গানটা গাইতে গাইতে আমরা গেয়ে উঠি, "আ ম রা ন তু ন হয়েছি এম এ।" বড় স্টুডিওতে গিয়ে ঘটা করে কন্‌ভোকেশনের ছবিও তুলি। হাতে ডিগ্রী, গায়ে কালো গাউন মাথায় হুড্ পরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ দেখি সেই ছবি। তারপর নিজের প্রেমে নিজেই পড়ে যাই। কিন্তু কদিন পরই সামনে যখন জিজ্ঞাসার চিহ্ন, কলেজে কলেজে অদৃশ্য সাইনবোর্ডে ঝোলে "ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই ছোট সে তরী," তখন ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমরা মরে যাই। নিজের ওপরে আর আস্থা থাকে না। কেমন যেন হীনম্মন্যভাব জন্মে যায়। কচ্ছপের মত এম এ ডিগ্রীধারী মুখটাকে স্রেফ লুকিয়ে ফেলি।

তারপর থেকে নিজেকে আর চিনতে পারি না। দেখি, আমি আর এক

আমির মুখোশ পরে বসে আছি। আমার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আমি দিব্যি আর একজনের মন জুগিয়ে চলতে শিখে গেছি। আমি রান্না-বান্নার গপ্পও শিখেছি। ফ্রাইডরাইস, চিকেন, বিরিয়ানী অথবা চাউ চাউ, শুক্তো, পালংশাক, মাছের ঝোল....? কত্তার অফিস, ছেলের ইস্কুল নিয়ে দিব্যি গপ্প চালিয়ে যাই। স্বামীর পদমর্যাদায় গৌরব বোধ করি। পুজো টুজোও করি। জমাদারের বউ, ভানুর মায়ের মত। কেন পুজো করি? কি চাই?

ছেলের ইস্কুলের ভ্যান এসে যায়। বেল বাজে। ও একলাই একশো। ওর দুরন্ত গলার স্বর এক ঝাঁক পাখির কলকণ্ঠের মত ভরিয়ে দেয় ঘর। দেবতার পুজোর ভক্তিরস দূরে সরে যায়। আমার বাৎসল্য রস জেগে ওঠে। "আমার বাবুসোনা এসেছে নাকি?" "তোমার কি হয়েছে, মাম্?" ছেলে ছুটে কাছে আসে। আমার রোদে পোড়া ক্লান্ত মুখ ওর চোখে ধরা পড়ে যায়। "কিছু হয়নি, বাবু।" "তুমি কোথায় গেছিলে, মাম্?" "এই একটু দরকারে, বাবু। ওকে আর বলা হয় না, "গরু খুঁজতে, বাবু।" ও কেমন অবাক হয়ে আমায় দেখে। ওর কৌতূহলী চোখের মধ্যে একরাশ জিজ্ঞাসা কেবলই উঁকি মেরে যায়। ওর ছেলেমানুষী মন নিয়ে ও বারবারই বলে, "তোমায় কেউ বকেছে নাকি?" "আমায়?" হেসে ফেলে বলি, "কে বকবে?" "তবে তুমি কেঁদেছিলে?" কাঁদব কেন?" "কে তোমায় কাঁদিয়েছে, মাম্?" "কে?" আমি বলতে পারি না, "সে একটা গরু।" ও আমার কোল ঘেঁষে দাঁড়ায়। ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে। আমি নির্বিকার। আমি সতৃষ্ণ নয়নে দেখি ওকে। হঠাৎ আমার মনে হয়, আমি একটা গরু। ও আমার বাচ্চা বাছুর। আমি চারদিকে গরু দেখতে থাকি। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে খাটাল ভরা গরু, গোয়াল ভরা গরু, খোঁয়াড় ভরা গরু, লাঙ্গল চষা গরু, "রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।" সবুজ ঘাসের মাঠে ঘাস খায় গরু।

ছোটবেলায় একটা গরুর লেজ ধরে খুব করে ঘুরিয়ে দিয়েছিলুম। সে আমায় তেড়ে গুঁতোতে এসেছিল। কিন্তু আজ যে আমি কত সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গরু খোঁজা হয়ে গরু খুঁজে চলেছি, সে কথা গরু বোঝে না কেন?

সন্ধ্যেবেলা আমার স্বামী অফিস থেকে ফিরলে ওঁকে জল খাবার দিয়ে আমি ছুটি চাই। "কোথায় যাবে?" আমার স্বামী নাস্তিক। পছন্দ করেন না পুজো টুজো। তাই বলি, "কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি।" "তোমার কি না গেলেই নয়?" "কেন বল তো?" "আমার এক বন্ধু আসবে সস্ত্রীক। আরেকটু পরেই।" "বেশ। বেরুব না তবে।" মনের অস্বস্তি নিয়ে আমি বসে থাকি। ছোলা গুড়ে পিঁপড়ে হবে না তো? ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে পিঁপড়ে? অসংখ্য ঠিকানা লেখা ছোট ডায়েরীটা, কয়েক টুকরো কাগজপত্র সবই যে রয়েছে ব্যাগে। লণ্ড্রীর বিল, বাজারের ফর্দ, ছেলের ইস্কুলের মাইনের কার্ড, ক্ষুদে ক্ষুদে লাল পিঁপড়েগুলো যদি লাইন করে ঢুকে যায় ব্যাগে? ওরা ঢুকে যেতে পারে স্বচ্ছন্দে সামান্য ফাঁকের মধ্যেও। কি সর্বনাশ! একটু একটু করে ছোলা গুড় খেয়ে ফেলে যদি? তা হলে গরু কি খাবে? শুধুই ঠোঙাটা?

বেল বেজে ওঠে, "এই যে কি খবর? আসুন, আসুন।" "আপনারা তো আর যাবেন না।" "এই তো যাব যাব।" "তাই না তাই! আর গেছেন! ভি আই পি মানুষ কত্তা গিন্নী দুজনেই।" "দারুণ দিয়েছেন। আর আপনারা?" "আমরা? রাম, শ্যাম, যদু মধু!" "কি যে বলেন! কবে ফিরছেন ভেনীজুয়েলা?" "তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলবে? ওঁদের বসাবে না?" আমার স্বামী চাপা হেসে বলেন। ওঁর ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। আমার স্বামীর বন্ধু হেসে ওঁকে বলেন, "কনগ্রাচুলেশনস। কেমন লাগছে আপনার নতুন চাকরি?" কথা বলতে বলতে ওঁরা গিয়ে বসেন সোফায়। "আর কেমন! ভাবছি ফের কনসালটেন্সি শুরু করবো কি না।" স্প্রীং ডিভানটায় শুয়ে আমার স্বামী বলেন।

পর্দা সরে যায়। চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে ভানু ঘরে ঢোকে।

"চা নিন।" "চা নিন।" "তুমি নাও।" আমি তাকাই আমার স্বামীর দিকে।

"কে ভেজেছে চপ?" "ওই তো ভানু।" "বাহ্ দারুণ হয়েছে তো।" "চিলি সসটা নিন।"

"ওকি আপনি খাচ্ছেন না কিছুই।" ওঁরা সস্ত্রীক বলেন আমায়। করিডোরে সাইকেল চালাতে চালাতে ফিরে তাকায় ছেলে। ক্রিং ক্রিং বেল বাজিয়ে বলে, "আমার মা আজ পুজো করেছে তো। তাই চপ খাবে না। চপে যে পেঁয়াজ চিলি সস টক। আজ মা টকও খাবে না।"

"কি ব্যাপার আপনি সন্তোষী পুজো করেন মনে হচ্ছে?" চার জোড়া চোখ তাকায় আমার দিকে। আমার স্বামীর গলায় ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে, "হ্যাঁ, যত সব কু-সংস্কার।" কটাক্ষ করে ওঁর বন্ধুর স্ত্রী, "কুসংস্কার বলছেন কেন? যার যা সংস্কার। হিন্দুধর্মে তেত্রিশ কোটি...।" "তাই বলে সন্তোষী পুজোও করতে হবে?" আমার স্বামী মৌজ করে আর একটা সিগারেট ধরান। "কেন জয় সন্তোষী মা। সিনেমাটা দেখেন নি?" "আমার স্বামীর বন্ধু হেসে বলেন, "আমারও অবশ্য সে সৌভাগ্য হয়নি।" আচ্ছা সন্তোষী মা কে বলুন তো? কোন দেশে তাঁর বাড়ি? আমার স্বামীর বন্ধু প্রশ্ন করেন আমায়। "উনি গণেশের মেয়ে।" "গণেশ! মাই গুডনেস।"

ওঁর স্ত্রী বলেন, "শুনেছি, উনি নাকি হিন্দুস্থানীদের?" "আচ্ছা, আপনারা আবার ধর্ম নিয়ে পড়লেন কেন বলুন তো?" আমার স্বামী ছোট একটা ধমক মারেন সদ্য আমেরিকা ফেরত ওঁর বন্ধুর বউকে। স্ত্রীর পক্ষ টেনে বন্ধুটি বলেন, "বুঝলেন না এসব আমাদের কালেকশন। আমেরিকায় গিয়ে গপ্প করতে হবে তো।" ওঁর স্ত্রী দ্বিগুণ উৎসাহে বলে, "তা যা বলেছ। সেদিন আমার এক বন্ধুকেও দেখলাম সন্তোষী মা করে। সায়েন্সের লেকচারার। কলেজে পড়ার সময় ও কিন্তু ঠাকুর টাকুর বিশ্বাসই করত না। আর এখন শুক্রবারে পুজো করে তবে কলেজে পড়াতে যায়। টিফিন কৌটো ভরে নিয়ে যায় সাবু মাখা।" "হাউ স্ট্রেঞ্জ!" আমার কত্তা নড়ে চড়ে বসেন। "এরা দেশকে কুড়ি বছর পিছিয়ে দিচ্ছে।"

আমি অবাক হই। হাসি না। কিন্তু হাসতে ইচ্ছে করে। আমি মনে মনে বলি, "হে সন্তোষী মা, তুমি ইহাদের ক্ষমা করিও।"

ওঁরা চলে যান। আমার স্বামী বলেন, "বেরুবে নাকি এখন?" ছেলে বায়না ধরে, "হ্যাঁ, বাবা।" "তুমিও?" ও মাথা নাড়ে। "তুমি থাকো না ভানুর কাছে?" "না না, আমি লেকে যাব।" "লেকে? এখন? এই রাত্তিরে?" আমার স্বামী চেপে দিতে চান ছেলের ইচ্ছেকে।

দপ্ করে আলো নিবে যায়। আবার লোড শেডিং। অমনি পাশের বাড়ির জেনারেটর চলতে থাকে। ঝট ঝট। কড় বিশ্রী আওয়াজ। "উহ্! কি অসহ্য গরম।"

আমি বলি। "লেকে চল বাবা?" "বেশ তবে চল। গাড়ির চাবিটা নিয়ে এসো তো বাপজীবন।" আমার স্বামী অন্ধকারে ছেলেকে খোঁজেন। অন্ধকারে টর্চের আলোটা নড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ায় দেওয়ালে দেওয়ালে। প্রেতের মত আমরা কজন নিঃশব্দে চলতে থাকি। তিন তলার সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামি। আর আমি কানের মধ্যে হাজারটা হাম্বা রব শুনে যাই।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করেন আমার স্বামী। "দেখ তো বাপজীবন, দেওয়ালে ধাক্কা লাগছে নাকি?" ছেলে ওস্তাদের মত জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখে। "আর একটু ব্যাক কর বাবা।" "ব্যস?" "হ্যাঁ।" "আমি হেডলাইট জ্বালি, বাবা?" "জ্বালো।"

আমি অন্ধকারে হাম্বা হাম্বা শুনব ভেবে কান পাতি। শুনতে পাই না। গোল পার্ক আলোয় আলোময়। ওখানে লোড শেডিং নেই। "মা, তোমার ছোলা গুড় খাইয়েছো গরুকে? ওই তো গরু।" "কোথায় কোথায়?" আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে আনন্দে। "অদ্ভুত!" আমার স্বামীর মোটা গলার স্বর সরু হয়ে যায়। উনি তেরছা চোখে দেখেন আমায়। এটা ঝড়ের পূর্ব সংকেত অতএব আমি চুপ করে যাই।

লেকের পাড় দিয়ে গাড়ি ছোটে হু হু করে। আমার স্বামী বিড় বিড় করেন, "লেখাপড়া শিখেও অশিক্ষিতদের মতন...।" "তুমি ব্রেক কষলে না কেন বাবা?

গরুটা যে চলে গেল।" "হ্যাঁ! এখন অ্যামবাসাডার গাড়ি থামিয়ে গরুকে ছোলা গুড় খাওয়াতে হবে।" ছেলে বলে, "কাল ইস্কুলে যাবার সময় আমায় ছোলা গুড়টা দিও মাম, আমি গরুকে...।" "ওইটেই বাকি আছে!" আমার স্বামী রেগে ওঠেন। আমার ছেলে তবু আমাদের দুজনের মধ্যে সেতু বাঁধতে চায়। "তুমি কেন তবে গাড়ি থামালে না?...।" আমি নীরব। চুপচাপ শুনে যাই ছেলে-বাবার কথোপকথন।

পরদিন কলেজ স্ট্রীটে এক পাবলিশারের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। যথা সময়ে আমি বেরিয়েও পড়ি। বগলে পাণ্ডুলিপি। ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে ছোলা আর গুড়ের ঠোঙাটা। কলেজ স্ট্রীট এলাকায় নিশ্চয় গরুর অভাব হবে না।

শেষ বিকেলের মরা আলোয় পাবলিশারের মুখ দেখি। বইয়ের গাদার মধ্যে বসে খুরিতে চা খেতে খেতে বলেন, "ও আপনার নাম অমুক? বসুন। বসুন।" "এখানেও লোড শেডিং?" "হ্যাঁ, পাখা টাখা নেই এই ভ্যাপসা গরমে।" তালপাতার হাত পাখা নাড়তে নাড়তে পাবলিশার বলেন, যদি এক বছর অপেক্ষা করতে পারেন, তবে আপনার বই...।" "এক বছর? সে কি?" "আমরা কিন্তু ভালই বিজ্ঞাপন দিই।" "সে তো জানি। কিন্তু যদি এতো দেরী হয়...।" "আপনাকে তো কম করেই বলেছি। কি করবো বলুন, এই গ্রন্থাবলীগুলো ছাপাতে গিয়েই তো। তারপর আবার এই হারে যদি লোড শেডিং চলতে থাকে...!" "কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমি এক বছর সময়টাকে মেনে নিতে পারছি না" "এতো তাড়াহুড়ো করছেন কেন? আপনার তো বয়েসও কম। সামনে সময় প্রচুর। এই নিন চা-টা খান।" "কিছু মনে করবেন না, এত গরমে চা আমি খাই না।" "চা খান না? সে কি? আপনি একজন লেখিকা চা খান না? অন্তত চায়ের নেশাটা না থাকলে আপনি লিখবেন কি করে!"..."শুনুন, যদি তাড়াতাড়ি করতে পারেন তবেই বইটা আপনাকে দিতে পারি, নইলে...।" "দেখুন, বড় বড় লেখকদের বই পর্যন্ত পড়ে রয়েছে, ছ' মাস, আট মাস। হরে দরে ওই এক বছরই সময় যাবে। হতো, যদি লোডশেডিংটা...।" "আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব।" "আপনার টেলিফোন নাম্বার আর ঠিকানাটা বরং দিয়ে যান না, দিদি। আমিই যোগাযোগ করে নেব। আপনার তো বাজারে নাম আছে। আসলে কমারশিয়াল সাইডটা আমাদের ভাবতে হয়, বুঝলেন না?"...

পাবলিশারের দোকান থেকে বেরুতেই রাস্তায় আলো জ্বলে ওঠে। হঠাৎ-ই মনে পড়ে যায় ব্যাগের ছোলা আর গুড়ের কথাটা। কাল থেকে আমি আর অভুক্ত নই। পুজো করে গরুকে খাইয়ে তবে আমার খাবার কথা। আমি গরুকে খাওয়াতে পারিনি। তাই বলে না খেয়েই বা থাকি কি করে? আমরা এ কালের পুজোরিণী, আমাদের সংযম...! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার কথাটা মনে রেখো মা!

কলেজ স্ট্রীটেও গরু নেই। ঘিঞ্জি রাস্তায়, এলোমেলো গলিতে। না না, কোথাও নেই। আমার পুজোয় কি কোন ত্রুটি থেকে গেল? তাই গরু দেখা দেবে না আমায়? ভানুর মায়ের আধ চোখ ভাল হয়ে গেল। জমাদারের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। আমি তো তোমার কাছে তেমন কিছুই চাইনি, মাগো! ওদের মত ভক্তি বোধ হয় আমাদের নেই। আমাদের ভক্তি নেই। কিন্তু পুজো আছে। পুজোটা কেন আছে তবে? ওটা কি সংস্কার? না ভয়? এখনো আমরা মধ্যযুগে।

ভিড়। ভিড়। দারুণ ভিড়। একটা দশ নম্বর বাসের ওপর তলায় ঠেলে ঠুলে উঠি কোন রকমে। কপাল গুণে একটা বসার জায়গাও পেয়ে যাই। জানলায় চোখ রেখে আমি শুধু গরু খুঁজি। চলমান মানুষের স্রোত, ট্রাফিকের ভিড়, পাতাল রেলের লাইন তৈরীর জন্যে রাস্তা খোঁড়া খাদের আশেপাশে চোখ বুলোই আমি। যদি চোখে পড়ে যায় কোন ধর্মের ষাঁড়।

আমার পাশে জানলার দিকে বসেছে একটি মেয়ে। তাকে ডিঙিয়ে আমি বাইরে মুখ বাড়াই। মেয়েটি বিরক্ত হয়, বুঝতে পারি। আমি তবু আমাদের ক্লাসের সেই সুচরিতার মত কাণ্ড করি। ইউনিভার্সিটিতে আঠারোর সিটে, বাংলা ক্লাসে বসে সুচরিতা প্রায়ই গল্প করত রত্নার সঙ্গে। মধ্যিখানে আমি। আমায় ডিঙিয়ে সুচরিতা গল্প করত রত্নার সঙ্গে। আমিও তেমনি আমার পাশে বসা মেয়েটিকে শূন্য ভেবে জানলায় মুখ রেখে গরু খুঁজি। গরুর সঙ্গে কথা বলি মনে মনে।

পুরনো বাড়ির ধ্বসে পড়া দেওয়ালের গায়ে অনেক গোবর। আমাদের স্কুলের বন্ধু রাধা সব সময় বকুনি খেত ক্লাসে। "রাধার মাথা ভরা গোবর।" রাধার মাথায় গোবর? তা হলে গরুটা কে?

জনতার উদ্দেশে কোন এক নেতা বক্তৃতা দিতে দিতে বলেছিলেন, "বন্ধুগণ! আপনারা সব গরু।" জনতাকে উত্তেজিত করার জন্য তিনি বলেছিলেন, "গরুরা জানে না, তারা কত অসহায়!"

গরুর উপমা দিয়ে আমরা কথা বলি। বুদ্ধিহীন মানুষকে গরুর সঙ্গে তুলনা করে সুখ পাই। "গরু কোথাকার!" গালাগালও দিই। আমরা গরুর দুধ খাই। গরুর চামড়ায় জুতো পরি। গরুর মাংস... গরুর শিং...। গরুর পুজো...। আর ভাবতে পারি না। আমি যেন নিজেই কখন শিংঅলা একটি চতুষ্পদী জীব হয়ে যাই। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার চোখে পড়ে যায়, পার্ক সার্কাসের মোড়ে ভ্রাম্যমাণ উদাসীন অবলা সেই...। উত্তেজিত আমি ভেবে পাই না কি করি, কি করি?

আমি কি ওপর থেকেই ফেলে দেব প্যাকেটটা? যার মধ্যে দেবতার প্রসাদ ছোলা, গুড় যা আমি বহু যত্ন করে বয়ে নিয়ে চলেছি অবলা এই জীবটির জন্যে? কিন্তু এটা যদি ছিটকে ছড়িয়ে যায় রাস্তায়? গরুর বদলে যদি কোন কুকুর এসে?... না না, আমি বরং...। "এই বেঁধে বেঁধে, এই রোকখে।" কিন্তু আমার কথায় বাস থামায় না কনডাকটর। "দাঁড়ান স্টপেজ আসুক। এটা স্টপেজ নয়। সে রীতিমত ধমকায় আমায়। আর আমি তখন করুণ চোখে তাকিয়ে দেখি, পেছনে ফেলে আসা ধর্মের ষাঁড়কে। হায় রে, আমার হাতে তখন খাবার। আর গরুটা খাবার খোঁজে ডাস্টবিনের পাশে।

ছবি : গৌতম বসু

মানবজমিন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

॥ আট ॥

বিয়ের পর যখন অরুণ এ বাড়িতে আসত তখন প্রীতম ওর সঙ্গে বিলুর সঠিক সম্পর্কটা জানত না। আজও জানে কী? আসলে মানুষে মানুষে সঠিক সম্পর্ক বলে তো কিছু নেই। সম্পর্ক পাল্টে যায়।

সাহস করে একদিন তবু প্রীতম জিজ্ঞেস করেছিল বিলুকে, অরুণের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বটা কেমন ছিল? খুব গাঢ়?

বিলু খুব একটা সংকোচ বা লজ্জা বোধ করেনি প্রশ্ন শুনে। তবে চোখের পাতাটা একটু নত করেছিল। কয়েক সেকেন্ডের দুর্বলতা মাত্র। তারপর বলল, আমরা একসঙ্গে স্কটিশ চার্চে পড়তুম বলিনি তোমাকে?

বলেছো।

অরুণ ছিল আমার দু বছরের সিনিয়র। এমন পাজি না, একদিন ওর পোষা বেজীটাকে এনে ছেড়ে দিয়েছিল করিডোরে। মেয়েদের মধ্যে সে কী চেঁচামেচি আর আতংক! আমি তো একটা জানালায় উঠে বসে রইলুম।

সেই থেকে তোমাদের ভাব?

সেই থেকেই। তবে আরও অনেক কাণ্ড আছে। শুধু যে ইয়ার্কি করে বেড়াত তা নয়। ইয়ার্কিটা ওর মুখোশ। ভিতরে ভিতরে ভীষণ সিরিয়াস।

অরুণ তোমার চেয়ে বয়সে বড়, ছাত্র হিসেবেও সিনিয়র। তবু ওকে তুমি তুমি করে ডাকো কেন?

ঠোঁট উল্টে বিলু বলল, ওকে আপনি বলতে যাবে কে? মেয়েরা সবাই ওকে নাম ধরে তুমি তুমি করে বলত। তুমি কি অরুণ সম্পর্কে জেলাস ফিল করো প্রীতম?

না, না, তা নয়। লজ্জা পেয়ে প্রীতম বলেছিল আসলে আমি মানুষের সম্পর্কে জানতে ভালবাসি।

বিলু মৃদু হেসে বলল, তুমি কী জানতে চাও জানি। তুমি খুব শান্ত, ভালমানুষ। কিছু মনে করবে না তো?

না, কী মনে করব? মনে করার কিছু থাকলে কবেই তা বলে ফেলতাম।

বিলু একটু যেন আধোগলায় বলল, ওর সঙ্গে আমার ভাব ছিল। খুব ভাব। হয়তো বিয়েও করতুম।

করলে না কেন?

একটা কথা ভেবে।

কী কথা?

ও ভীষণ মেয়েদের সঙ্গে মিশত। বাছবিচার ছিল না। ওরকম পুরুষ একটু আনফেইথফুল হয়। জানো তো, পুরুষরা প্রকৃতির নিয়মেই পলিগেমাস। তারা কখনো একজন মহিলাকে নিয়ে খুশি নয়। তার ওপর অরুণ আবার ভীষণ ফ্রী ওয়ার্লড তত্ত্বে বিশ্বাসী। ও বিয়ে, বন্ধন, সংসার, সন্তান ইত্যাদি রেসপনসিবিলিটি একদম জানে না। আমি বাপু অতটা আধুনিক নই। তাই ভেবেচিন্তেই ওকে বিয়ে করিনি তোমাকে করেছি।

সেজন্য আজ তোমার দুঃখ হয় না বিলু?

ধুস, দুঃখ কিসের? আমার অত সেন্টিমেন্ট নেই। যা করেছি তা হিসেব করেই করেছি।

আমার সঙ্গে অরুণকে কখনো তুলনা করতে ইচ্ছে হয় না তোমার?

যাঃ! নেভার। তুলনা করব কেন? ও একরকম তুমি অন্যরকম।

প্রীতম হাসিঠাট্টার হালকা চালটা বজায় রেখেই বলল, ধরো আমি তো বেশ রোগা, আর অরুণ কত স্বাস্থ্যবান। অরুণ আমার চেয়ে অনেক ফর্সা। ও প্রচণ্ড বড়লোক আর দুর্দান্ত স্মার্ট যে গুণগুলো আমার নেই।

তেমনি তুমি আবার শান্ত, দায়িত্বশীল, গভীর মনের মানুষ। সকলের তো সব গুণ থাকে না। শোনো তুমি কি অরুণ সম্পর্কে সত্যিই জেলাস নও?

প্রীতম হাসিমুখে মাথা নেড়ে বলল না, নই বিলু। বরং অরুণকে আমার বেশ পছন্দ।

বিলু খুব গভীর মনের মেয়ে নয়, প্রীতম জানে। তবু সেদিন বিলু খুব গভীর অতল এক চোখে প্রীতমের মুখখানা মন দিয়ে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর শুকনো গলায় বলল, অরুণের এ বাড়িতে আসা যদি তোমার পছন্দ না হয় তবে বলে দিও, আমি ওকে বারণ করে দেবো। তাতে ও কিছু মনেও করবে না।

ছিঃ বিলু!

বিলু নতমুখ হয়ে বলল, তুমি অত করে জানতে চাইছিলে বলে আমার মনে হচ্ছিল তুমি বোধহয় ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছ না।

প্রীতম খুব স্পোর্টসম্যানের মতো কলার-উঁচু করা গলায় বলে, আমার কাছে ব্যাপারটা নিতান্তই মজার। মফস্বলের ছেলে তো, আমরা জানি, প্রাক্তন প্রেমিকরা তাদের হাতছাড়া প্রেমিকাদের মুখোমুখি বড় একটা হয় না। তাহলে আর জীবনে ট্র্যাজেডি বলতে কিছু থাকে, বলো?

এ কথায় বিলু হেসে ফেলল। বলল, দেবদাসদের যুগ তো এখন আর নেই।

ফলে এ বাড়িতে অরুণের যাতায়াত বহাল থাকল। ঢাকা চাপার কিছু রইল না।

এখন বিলুর ধমক খেয়ে এই যে অরুণ উঠে গেল বাইরের ঘরে, জুতো ছেড়ে আসতে, তার মধ্যেও যেন অরুণের ওপর বিলুর গভীর অধিকারবোধ ফুটে উঠল। বুকের মধ্যে সামান্য চিনচিন করে ওঠে প্রীতমের। এত অধিকারবোধ নিয়ে আর এত জোরের সঙ্গে বিলু কোনোদিন তাকে কোনো হুকুম করেনি।

কিন্তু মানুষে মানুষে স্থায়ী সম্পর্ক বলেও তো কিছু নেই। প্রেমিকা চিরকাল প্রেমিকা থাকে না, স্ত্রীও থাকে না স্ত্রী। এইসব সম্পর্ক ভাঙচুর করতে করতে পৃথিবী খুব দ্রুত এগোচ্ছে।

মোজা পায়ে অরুণ ফিরে এসে বসে এবং বলে তোমার বড় নীচু নজর বিলু, আজ আমি এত সুন্দর পোশাক পরে এসেছি, তবু তুমি আমার জুতো জোড়াই দেখলে?

বিলু একটু কঠিন গলায় বলে, এটা রুগীর ঘর মনে রেখো।

সে কথা ঠিক। ভুলে যাই। বলে একটু লজ্জার হাসি হাসে অরুণ।

প্রীতম লক্ষ্য করে, সব কিছু অরুণকে মানায়। ওর ওঠা, হাঁটা, হাসি, লজ্জা এ সবকিছুই যেন বহুকাল ধরে রিহার্সাল দিয়ে যত্নে রপ্ত করা।

আবার একটু চিনচিন করে প্রীতমের।

বিলু কথার ফাঁকেই গিয়ে মেয়েকে বাথরুমে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে অরুণকে বলে, সবকিছুই তো আজকাল তুমি ভুলে যাও। একটা হুইল চেয়ারের কথা বলেছিলাম, মনে আছে?

ভুলিনি। কিন্তু প্রীতমবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, উনি হুইল চেয়ার পছন্দ করেন না।

বিলুর মুখ থমথমে হয়ে যায়। প্রীতমের দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে বলে, হুইল চেয়ার হলে তোমার একা থাকতে তেমন কষ্ট হবে না।

বলতে নেই, আগের তুলনায় তার ধৈর্য ও স্থৈর্য বেশ কমে আসছে। যেমন বিলুর এই হুইল চেয়ারের ব্যাপারটায় এখন হল। অত্যন্ত তেতো স্বরে সে বলল না না, ওসব আমি পছন্দ করি না। ঘরে একটা জবরজং জিনিস ঢুকিয়ে জঙ্গল বানাতে হবে না।

যদি এরকম স্বরে অরুণ কিছু বলত তাহলে বিলু ওকে তেড়ে মারতে যেত। কিন্তু প্রীতমের সঙ্গে বিলুর ব্যবহার অন্যরকম। কথাটা শুনে বিলু নিজের নখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, তুমি না চাইলে অন্য কথা। হলে তোমার সুবিধেই হত।

আমার কোনো সুবিধে হবে না বিলু। কেন কথা বাড়াচ্ছো? বালিশে এলিয়ে চোখ বোজে প্রীতম। চোখের পাতাটা পুরো বন্ধ হওয়ার আগেই এক পলকের দৃশ্যটা চোখে পড়ল। অরুণ হাতের ইশারায় বিলুকে সরে যেতে বলছে।

বাথরুম থেকে লাবুও ডাকছিল। বিলু নিঃশব্দে চলে যায়।

অরুণ চেয়ারটা বিছানার আরও একটু কাছে টেনে এনে বসে। নরম গলায় বলে, ঘরে বসে থেকে থেকে তো পচে গেলেন মশাই! একটা কথা বলব? একদিন চলুন দিল্লি বা বম্বে রোড ধরে খানিকটা বেড়িয়ে আসি। এবছর ওয়েদারটাও ভাল।

ইচ্ছে করে না যে! শরীরে অত শক্তিও নেই।

দূর মশাই! এই মনোবল নিয়ে আপনি লড়ছেন! শক্তি কারো শরীরে, কারো মনে। মনটা শক্ত করুন, ঠিক পারবেন।

ভাল লাগে না।

তবে কী ভাল লাগে? ঘরে বসে থাকতে?

প্রীতম ক্ষীণ হেসে বলে, ঘর আমার খারাপ লাগে না। বাইরেই তো যত গোলমাল।

বিলু ঠিকই বলে, আপনি ভীষণ ঘরকুনো এবং ঘোর সংসারী। সেইজন্যই কি বউকে চাকরি করতে দিতেও চান না?

মেয়েদের চাকরি করা আমাদের পরিবারে কেউ পছন্দ করে না।

সে তো বুঝলাম। বলে হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অরুণ আবার বলল, কিন্তু এখন বিলুর চাকরি করা একটু দরকারও যে!

কেন? বুলেটের মতো প্রশ্নটা বেরোয় প্রীতমের মুখ থেকে।

অরুণ মৃদুস্বরে বলে, আপনি নিজে অ্যাকাউনট্যান্ট, আপনাকে আমি আর কী বোঝাব?

প্রীতমের চিন্তার স্রোত খুব ধীরে ধীরে খাত বদল করে। সে আবার চোখ বুজে নিঃঝুম হয়ে শুয়ে মনে মনে খুব দ্রুত হিসেব করে দেখে নেয়। ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টের দরুন সে এক লাখ তিশ হাজার টাকার মতো পেয়েছিল। সেই টাকার ওপরেই এতদিন সংসার চলছে। বসে খেলে রাজার ভাঁড়ারও শেষ হয়।

অরুণ মৃদু স্বরে বলে, খরচও তো কম নয়। মেয়েদের চাকরি করা হয়তো স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভাল না হতে পারে আপনার কাছে। কিন্তু জরুরী প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই তাতে আপনার আপত্তি হবে না?

বিলু তো আমাকে কিছু বলেনি।

বিলু আপনাকে বলতে তেমন জোর পাচ্ছে না।

প্রীতম দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। বিলু তাকে বলতে জোর পাচ্ছে না, তবে অরুণকে বলছে কিসের জোরে? প্রীতম বিরক্তির গলায় বলল, বলতে জোরের দরকার কি?

অরুণ আরও একটু কাছে এগিয়ে আসে এবং খুবই নীচু গলায় বলে, আপনি যতটা শান্তশিষ্ট দেখতে, ঠিক ততটাই কি ডেনজারাস নন? বিলু বলে, প্রীতমের মুখোমুখি হলে ওর ঠাণ্ডা গভীর চোখের দিকে চেয়ে আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে।

কথাটার মধ্যে খুশি হওয়ার মতো কিছু একটা ছিল বোধহয়, নইলে প্রীতমের ভিতরে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল কেন? চোখ খুলে সে বলল, আমি

ডেনজারাস হতে যাব কেন? বিলু ওসব বলে বুঝি!

অরুণ হাসিমুখে চেয়ে থাকে। তার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি। চাপা গলাতেই বলে, ডেনজারাস বলতেই তো আর মারদাঙ্গাবাজ লোক নয়। আপনার বিপজ্জনকতার উৎস হচ্ছে স্ট্রং লাইকস অ্যানড ডিসলাইকস। আপনি মুখে কিছু তেমন বলেন না, কিন্তু একটু নাকের কুঞ্চন বা ঠোঁট ওল্টানো কিংবা চোখের এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেন। যারা কম কথা বলে এবং যারা চাপা স্বভাবের, তাদের সকাই ভয় পায়।

প্রীতম নিজের এত গুণের কথা জানত না। কথাগুলো যে সত্যি নয় তাও সে একটা মন দিয়ে বুঝতে পারে। সে জানে তুখোড় বুদ্ধিমান অরুণ তাকে তেল দিচ্ছে। একটা উদ্দেশ্য নিয়েই দিচ্ছে। তবু অন্য একটা অবুঝ মন এই এত সব মিথ্যে গুণের কথা হাঁ করে গিলল। নিজের খুশির ভাবটা চাপা দেওয়ার জন্য সে একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমাকে কারো ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

প্রীতমকে এক মোহময় সম্মোহনে আচ্ছন্ন করে দিতে দিতে বড় আন্তরিকভাবে অরুণ বলে, আছে। আপনি তা হয়তো টের পান না। বিল পায়।

প্রীতম একটু অন্যমনস্ক থেকে বলে, ব্যাংকের টাকা কি ফুরিয়ে এসেছে?

তা নয়। এখনো অনেক আছে। হয়তো দু-চার বছর চলেও যাবে। কিন্তু তারপর একদিন ফুরোবে।

কত আছে?

বিলু বলছিল কত যেন!

আমাকে বললে পারত। প্রীতম আবার চোখ বোজে। গোঁ আঁকড়ে ধরে থেকে লাভ নেই সে জানে। চোখ খুলে আবার তাকায় এবং বলে, লাবুর কি হবে? বিলু চাকরি করতে গেলে ওকে দেখবে কে?

আয়া থাকবে। আপনিও তো রয়েছেন। লাবুর জন্য চিন্তা নেই। যে সব বাড়ির স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে তাদের ছেলেমেয়েও তো মানুষ হচ্ছে।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, ঠিক মানুষ হচ্ছে বলা যায় না। মায়ের সঙ্গ না পেলে বাচ্চারা ভীষণ রাগী, অভিমানী, জেদী আর হিংসুটে হয়ে ওঠে।

কথাটা স্বীকার করে অরুণ মাথা নাড়ে। সাদা একটা হাসিতে প্রীতমের মাথা গুলিয়ে দিয়ে বলে, লাবু তার বাবাকে তো পাবে। লাবু তো বাবা ছাড়া কিছু বোঝে না।

প্রীতম স্নিগ্ধ হয়ে গেল। দুর্বল হয়ে গেল। মোহাচ্ছন্ন হল। আনমনা গলায় বলল, বিল কি কোথাও চাকরি পেয়েছে?

একটা ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করেছিল। পেয়ে গেছে।

আমাকে বলেনি। দুঃখের সঙ্গে বলে প্রীতম।

অরুণ কথাটার জবাব দেয় না। শুধু হাসে।

অরুণ চলে যাওয়ার পর প্রীতম বিলুকে ডেকে বলে, তুমি চাকরি পেয়েছো, আমাকে বলোনি কেন?

বিল প্রীতমের দিকে খুব সহজ চোখে তাকাল, আর সেই দৃষ্টি দেখেই প্রীতম বুঝল, বিলু কস্মিনকালেও তাকে ভয় খায় না। অরুণ এমন সুন্দর সাজিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলে!

বিলু জবাব দেয়, বললে তো তুমি খুশি হবে না। কিন্তু চাকরির এখন দরকার।

অ্যাকাউনট্যান্ট প্রীতম টাকার হিসেব জানে। তাই রোগা দুর্বল হাতে মাথার লম্বা চুল একটু পাট করতে করতে বলে, সেটা বুঝি। কিন্তু লাবু আর একটু বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না বিলু?

ততদিন কি আমারই চাকরির বয়স থাকবে? নাকি ইচ্ছে করলেই এই বাজারে চাকরি পাওয়া যাবে?

চাকরি নেওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করলে না একবার?

বিলু ভ্রূ কুঁচকে বলে, এখনো নিইনি। তোমার অসুবিধে হলে না হয় নেবো না।

কথাটায় ঝাঁঝ ছিল। প্রীতম কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, ভাবাবেগ আসছিল। সেটা সামলে নিতে পারল। বলল, রাগ করো না। টাকার হিসেব আমি কারো চেয়ে কম বুঝি না। আমার জন্যও অনেক খরচ হচ্ছে। জমানো টাকা আর কত আছে?

খুব বেশী নেই। বিলু অন্যদিকে চেয়ে বলল যা আছে তা দিয়ে একটা ছোটোখাটো বাড়ি একটু শহরের বাইরের দিকে হয়ে যেতে পারে।

তুমি বাড়ি করার কথা ভাবছ?

তুমি বারণ করলে ভাবব না। কিন্তু এইবেলা কিছু না করলে টাকাটা খরচ হয়ে যাবে।

বাড়ি করার কথা আমি কখনো ভাবিনি।

কেন ভাবোনি? সবাই তো এসব ভাবে।

শিলিগুড়িতে আমাদের একটা বাড়ি তো আছে।

বিলু কথাটার জবাব দিল না। কিন্তু মুখে একটা কঠিন ভাব ফুটে উঠল।

প্রীতম সবই জানে। বিলু কোনোদিন শিলিগুড়ি যাবে না। ও বাড়িটাকে সে নিজের বাড়ি বলে ভাবতেও পারে না। প্রীতম একটা সত্যিকারের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, জমিটমি দেখেছো?

দেখিনি। তবে দু-একটা খবর পেয়েছি। অরুণের ছুটির দিন দেখে তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে সবকটা দেখে আসব ভেবে রেখেছি।

আমি জমির কিছু বুঝি না। তোমরা থাকবে, তোমাদের পছন্দ হলেই হল।

কেন, সেই বাড়িতে তুমিও তো থাকবে!

প্রীতম এই কথায় বিলুর দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখে। হঠাৎ মনে হয়, তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য বিলু আর অরুণ আড়ালে কোনো ষড়যন্ত্র করছে না তো। প্রীতমের ঠোঁটে জবাবটা ঝুলেছিল, যদি ততদিন পৃথিবীতে থাকি। কিন্তু অত সহজ ভাবপ্রবণতার কথা বলল না প্রীতম। ভাবের ঘোরে ভেসে গিয়ে লাভ নেই। তার বড় শক্ত লড়াই।

তাই প্রীতম স্বাভাবিকভাবে বলে, ঠিক আছে যাবো।

বিলু একটু যেন সংকোচের সঙ্গে বলে, এসব টাকা পয়সা বা বাড়ির কথা বলতে আমার খারাপ লাগে। তুমিও হয়তো খুশি হও না। কিন্তু ভাল না লাগলেও তো ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়।

এত তাড়াতাড়ি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তা কখনো চিন্তা করিনি।

বিলু কঠিন মুখে চুপ করে থাকে।

প্রীতম হাসে একটু। আশপাশ থেকে রেডিওতে দূরাগত একটা ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণীর শব্দ আসছে। প্রীতম নিজের পাজামায় ঢাকা পা দুখানা দেখতে থাকে। ইডেনে টেস্ট খেলা দেখে দু বছর আগেও সে হেঁটে ভবানীপুর ফিরেছে।

বিলু মৃদু স্বরে বলল, আমি লাবুকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরোচ্ছি। বিন্দু রইল।

প্রীতম চোখ বন্ধ করে হুঁ দিল।

ভালবাসা থাক বা না থাক, বিলু বাড়িতে না থাকলে প্রীতমের বড় ফাঁকা আর নিরর্থক লাগে।

বিলু চলে গেলে প্রীতম বিন্দুকে ডেকে খবরের কাগজটা চাইল। কাগজ মুখের সামনে মেলে ধরে শূন্য চোখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। কিছুতেই মন দিতে পারল না।

পা দুটো ঝিন ঝিন করছিল। আজকাল প্রায়ই এটা হয়। অনেকক্ষণ ধরে কুঁচকি থেকে পাতা পর্যন্ত পা দুটোয় ঝিঁঝিঁ ছাড়তে থাকে। প্রীতম তার অস্ত্রশস্ত্রের জন্য হাত বাড়ায়। নিরন্তর শরীরের সঙ্গে তার লড়াই। তাকে তো বাঁচতেই হবে। অসহনীয় ঝিনঝিন অনুভূতিটাকে সহনীয় করতে সে প্রাণপণে চোখ বুজে সেতারের বাজনার শব্দ মনে আনতে থাকে। বহুক্ষণের চেষ্টায় শরীরের ঝিনঝিনাকে সে সেতারের ঝালার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে। তাতে অস্বস্তি কমে যায় না, কিন্তু খানিকটা সহনীয় হয়। সেতার হয়ে যাওয়ার একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতাও হতে থাকে তার।

এ বাড়িতে কেউ গানের তেমন ভক্ত নয় বলে রেকর্ড প্লেয়ার কেনা হয়নি। প্রীতম ভাবল বিলুকে একটা সস্তার রেকর্ড প্লেয়ার কিনতে বলবে। আর অনেক সেতার সরোদের রেকর্ড। তার অস্ত্র চাই।

বিলু তার জন্য হুইলচেয়ার কেনার কথা

ভাবছে, চাকরি করার কথা ভাবছে, ভবিষ্যৎ চিন্তা করছে। আসলে এ সবের পিছনে প্রীতমের অনস্তিত্বের কথাই কি ভাবা হচ্ছে না? বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা ভয় হঠাৎ চিরন্তিন করে বাধিয়ে ওঠে, ককিয়ে ওঠে। জ্বর বাবো নাকি?

বে-খেয়ালে হাত মুঠো পাকায় প্রীতম, চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, ভাল আছি। ভাল আছি। ভাল আছি। ভাল আছি। এবার থেকে যখনই কেউ জিজ্ঞেস করবে, কেমন আছেন? তক্ষুণি খুব হোঃ হোঃ করে হেসে আনন্দে ভেসে যেতে যেতে প্রীতম বলবে, ভাল আছি।

রাস্তা পার হওয়ার জন্য ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছোট্ট লাবু মুখ তুলে মায়ের দিকে চাইল। সে কিছু বলতে চায়, কিন্তু ভরসা পায় না। মা মারবে।

বিলু আনমনে দাঁড়িয়ে আছে। ভ্রু কোঁচকানো। ভাবছে। লাবু আবার মুখ তুলে মায়ের মুখটা দেখে। তারপর ডাকে মা!

উঁ।

লাল আলো জ্বলে গেছে। পেরোবে না?

চলো। বিল শক্ত মুঠিতে মেয়ের হাত ধরে রাস্তা পার হয়।

আনমনে হাঁটছিল বিলু। লাবু হঠাৎ হাত টেনে ধরে বলে, মা! জল!

বিলু বিরক্ত হয়। দেখে মাংসের দোকান থেকে অঢেল রক্তমাথা জল ফুটপাথ বেয়ে বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় পিছন থেকে একটা লোক পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনোরকমে সামলে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। বিলু মেয়ের চুল টেনে দিয়ে বলে, কতবার বলেছি না, রাস্তায় সভ্য হয়ে চলবে। জল তো কী হয়েছে?

লাবু মায়ের দিকে চেয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। আস্তে করে বলে, জুতোয় লাগবে তো।

জুতোয় নোংরা লাগেই তাতে কি?

লাবু আর জবাব দেয় না। টুকটুক করে মায়ের পাশে পাশে হাঁটে। আবার হঠাৎ ডাকে, মা।

আবার কী?

ফিতে।

তোমার অনেক ফিতে আছে। আর নয়।

চশমা?

তাও নয়। বায়না করবে না একদম।

লাবু ঘাড় হেলিয়ে রাজি হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি হাঁটো লাবু। বাবা একা রয়েছে।

পায়ে লাগছে।

কী হয়েছে পায়ে?

লাবু থামে এবং হেঁট হয়ে নিজের পায়ের জুতো খুলতে চেষ্টা করে। পারে না। অসহায় মুখে মার দিকে চেয়ে থাকে।

উবু হয়ে স্ট্র্যাপটা খুলে বিলু জুতোর ভিতর থেকে একটা কমলালেবুর বিচি বের করে ফেলে দেয়। বলে, কতবার শিখিয়েছি জুতো পরার আগে ঝেড়ে নিয়ে পরবে! মনে থাকে না কেন?

বিলু দোকান থেকে গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট, মাখন, বিস্কুট ইত্যাদি কেনে। তারপর লাবুকে বলে তুমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও তো লাবু। বেশী দূরে যেও না। সিঁড়িতে রোদ আছে, ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখ।

লাবু বাধ্য মেয়ের মতো সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে থাকে মায়ের দিকে। মা যতক্ষণ টেলিফোনে কথা বলবে ততক্ষণ তাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সে জানে।

লাবু ফোনে অরুণকে পেয়ে বলে ওর অ্যাটিচুড কেমন দেখলে?

খারাপ কিছু নয়। মেনে নেবে।

তুমি চলে আসার পর ও চাকরির নিয়ে আবার কথা তুলেছিল। ভারী অবুঝপানা করে। বলে, লাবু বড় হলে চাকরি কোরো। তাই কি হয়?

তুমি রাগ টাগ দেখাওনি তো!

আমি বুঝি শুধু রাগই দেখাই? তোমরা আমাকে কী ভাবো বলো তো?

এই তো আমার ওপর রাগ দেখাচ্ছো।

তোমার কথা আলাদা।

আলাদা কেন? আমি রিঅ্যাক্ট করি না বলে?

ঠিক তাই। তোমার মতো কম রিঅ্যাকশনারি আমি বেশী দেখিনি।

অরুণ হাসল। বলল, তাহলে আমি তোমার রাগের জিম্মাদার রইলাম। প্রীতমবাবুকে অনুরাগটুকুই দিও।

ছি ছি!

হঠাৎ ছিছিক্কার কেন?

এত বাজে অনুপ্রাস বহুকাল শুনিনি। তুমি না স্মার্ট ছিলে? রাগের সঙ্গে অনুরাগ মেলানো কি তোমাকে মানায়? শোনো, ও জমি দেখতে রাজি হয়েছে। তুমি কবে ফ্রি হবে বলো তো! গাড়ি নিয়ে সব কটা জমি একদিনে ঘুরে দেখতে হবে।

বিলু, জমি কেনার ডিসিশনটা পাল্টাও আবার বলছি। কে তোমার বাড়ি তৈরির খবরদারি করবে? তার চেয়ে ফ্ল্যাট কেনো।

ফ্ল্যাটেই যদি থাকব তবে তা কিনতে যাবো কেন? ভাড়া দিয়েই তো থাকতে পারি।

ফ্ল্যাট কিনলে ভাল পাড়ায় যে মেটিরিয়ালের তৈরি বাড়িতে থাকতে পারবে, জমি কিনে বাড়ি করলে সেটা তো পাবে না। খরচ বেশী, ঝামেলা বেশী।

তবু আলাদা বাড়িই আমার পছন্দ।

তোমার যে এস্টিমেট তাতে জমি কেনার পর দুখানা ঘর তৈরির টাকাও থাকবে না।

চাকরি করলে টাকা হবে। ধীরে ধীরে করব।

অরুণ একটু চুপ করে থেকে বলে, তুমি হয়তো পারবে। তুমি চিরকালই অন্যরকম ছিলে।

ছাড়ছি। ফোন রেখে বিলু দেখে, লাবু হাঁটুর কাছে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চেয়ে আছে। তাকাতেই বলল, একটা পাগল আমাকে ডাকছিল। বিলু সামান্য একটু লজ্জা পেল কি?

লাবু ঘরে ঢুকেই থমকে গেল। বাবা কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। বালিশ থেকে মাথাটা নীচে পড়ে গেছে। বাবার শরীরের ওপর মস্ত পাতা খোলা খবরের কাগজটা পড়ে আছে।

মা বাথরুমে ঢুকে যেতেই খুব আস্তে আস্তে হেঁটে বাবার বিছানার কাছে আসে লাবু। সে জানে, মানুষ মরে গেলে শ্বাস ফেলে না।

লাবু বাবার নাকের কাছে ছোট্ট হাতটা বাড়িয়ে দিল। খুব জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে বাবার। সন্তর্পণে খবরের কাগজটা টেনে আনে লাবু। ছোটো হাতে অত বড় বড় পাতা ভাঁজ করতে পারে না। কোনো রকমে মচমচ করে দলা পাকিয়ে টেবিলে সরিয়ে রেখে দেয়।

একটু ছোঁবে বাবাকে? ভয় করে। কত রোগা না লোকটা, এত রোগা কেন? এত অসুখ কেন?

প্রীতমের একটা রোগা হাত খাট থেকে বেরিয়ে ঝুলে আছে। লাবু খুব ভয়ে ভয়ে একবার হাতটা ছোঁয়। ভয় করে। হাতটা ঠাণ্ডা। কত বড় বড় নখ বাবার হাতে! ভয় করে।

বাবা চুল কাটে না কেন মা? ভাত খেতে বসে লাবু মাকে জিজ্ঞেস করে।

বিলুর খেয়াল হয়, তাই তো। অনেকদিন প্রীতমের চুল ছাঁটানো হয়নি। সে লাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, ও মেয়ে! বাবার দিকে তো খুব নজর তোমার!

(ক্রমশ)

বিজ্ঞান

াইওনিকস

একটি নতুন বিষয়ের নাম ইদানীং খুব শোনা াচ্ছে। 'বাইওনিকস'। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ত কয়েক বছরে সম্প্রসারণ ঘটেছে যেমন প্রচুর, র্মান একাধিক বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় টিয়ে এমন সব নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে দের তাৎক্ষণিক অর্থ বুঝতে গিয়ে বিজ্ঞানীরাও খনও কখনও হিমসিম খেয়ে যান। বর্তমান শতাব্দীর াড়াতেও বিজ্ঞানের এক একটি ক্ষেত্র ছিল যেন ক একটি কক্ষ বা কমপারটমেণ্ট। যেমন, পদার্থ-জ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি। জ্ঞানীরাও তখন অনেক সময় এক ধরনের োঁড়ামিতে ভুগতেন। যিনি পদার্থবিজ্ঞানী, তিনি জেকে একজন পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবেই ভাবতেন, ন্য কিছু নয়। একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর চিন্তা শুধু ছপালাকে নিয়েই ছিল নিবদ্ধ। পদার্থবিদ্যা, ায়ন, এসব বিষয় নিয়ে তিনি ভাবতেন না, বলেও ভাবতেন খুব ভাসা ভাসা ভাবে। ব্যাপারটা ন: ওরা তো সব পরের বাড়ি, সেখানে তার বিচরণ ার কোন অধিকার নেই। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও বস্থাটা ছিল ওই রকম।

কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতিটা যেন আমূল লটে গেল। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রকেই পরিপূর্ণভাবে এক একটি নির্দিষ্ট কক্ষের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে আটক রাখা যায় না। তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নানারকম সম্পর্ক সব সময় বিদ্যমান।

যেমন ধরুন, যিনি শারীরবিদ্যা নিয়ে চর্চা করেন, তিনি দেখলেন, মানব-দেহে যেমন প্রচুর সংখ্যক অস্থি আছে, সে কথাও যেমন জানা দরকার, সেই সঙ্গে এটাও জানা দরকার ওই সব অস্থি দেহের কোথায় কীভাবে অবস্থান করে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে, দেহের যান্ত্রিক গতিবিধিকে অনায়াস করে তুলতে সাহায্য করে। কেউ হয়ত একটি চেয়ারে বসে আছেন। চেয়ারটির গঠনের উপর নির্ভর করছে, তাঁর শরীরের চাপ কীভাবে কোথায় চেয়ারটির উপর ছড়িয়ে পড়ছে। আর তারই উপর নির্ভর করবে চেয়ারটিতে বসে তিনি কতটা আরাম পাবেন। কাজ করতে সুবিধে হয়। অথবা কেউ হয়ত একটি কোদাল দিয়ে মাটি কাটছেন। দেখা গেল, ওই কোদালের হাতলটি কোদালের সঙ্গে একটি বিশেষ কোণ করে আটকে রাখলে মাটি কাটার কাজটা সহজতর হয়, দেহের উপর চাপ পড়ে কম। এক্ষেত্রে এক দিকে দেহ যার অভিজ্ঞতা একজন শারীর-বিজ্ঞানীর চৌহদ্দীর মধ্যে পড়ে ; অন্য দিকে আছে প্রযুক্তি-বিদ্যা, যা একান্তই একজন প্রযুক্তিবিদের ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে তৈরি করলেন নতুন একটি বিজ্ঞান। যার নাম দেওয়া হলো 'সাইবারনেটিকস'। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত এই বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা চর্চা করতে লাগলেন, তাঁদের ভূমিকা হলো দুই রকম। শারীর-বিজ্ঞানীর এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞানীর। অর্থাৎ তাঁকে জানতে হলো, শরীরের গঠন এবং বিভিন্ন অবস্থায় কাজ করার সময়, যেমন হাঁটা, বসা, যন্ত্রচালনা, প্রভৃতির সময় শরীরের কোন কোন অংগ-প্রত্যংগের উপর কতটা চাপ পড়ে, এবং চেয়ার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম কীভাবে তৈরি করলে তাদের নিয়ে কাজ করার সময় শরীরের পরিশ্রম লাঘব করা যায়, এবং সেই সংগে কর্মীরা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে একজনকে শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কেও যেমন খবরাখবর রাখতে হয়, তেমনি প্রযুক্তিবিদ্যারও অধিকারী হতে হয়।

ইদানীং 'বাইও-ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর নামও হয়ত অনেকে শুনে থাকবেন। এই বিদ্যাটির ক্ষেত্রেও মুখ্যতঃ দুটি বিষয় জানা দরকার। দেহের অংগ-প্রত্যংগের গঠন এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান। ধরুন, কারোর বাহুর একটি হাড় কোন কারণে এমনভাবে অকেজো হয়ে গেছে, যাকে কেটে বাদ দিতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং অভিজ্ঞতা থেকে জেনে নেওয়া হল, ওই হাড়টির গঠন সম্পর্কিত তথ্যাবলী, কাজের সময় ওই হাড়ের কোথায় কতটা চাপ পড়ে। তারপর বিজ্ঞানীরা ধাতু অথবা অধাতু দিয়ে ওই ধরনের অবিকল একটি প্রত্যংগ তৈরি করে দেহে এমনভাবে জুড়ে দিলেন, যার সাহায্যে দেহ তার কাজ কর্ম চালিয়ে নিতে পারে। ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানীরা এইভাবে হৃৎপিণ্ড থেকে শুরু করে নানারকম কৃত্রিম অংগ-প্রত্যংগ তৈরি করছেন আজকাল। এ ধরনের কাজকর্ম পড়ছে

ুন তো, কার মুখ দেখছেন? কোন শিল্পীর পক্ষেও এমন ভয়াবহ মুখের কল্পনা করাটা ভাবা যায় না। অথচ কল্পনা নয়, যা কিছু দেখছেন, সবই বাস্তব। ঁচে থাকার জন্যে দরকার। খালি চোখে এমন বিদঘুটে চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না বলেই প্রকৃতির অনেক কিছুই আমরা এড়িয়ে যাই। অথচ যদি চোখে ত, আমাদের নিজেদের সমস্যার অনেক কিছু হয়ত আমরা সমাধান করে নিতাম। পশ্চিম জার্মানির আরলাংগেনে অবস্থিত 'সিমেনস' সংস্থা ইলেকট্রন ্রোসকোপে ছবিটি তুলেছে। প্রবর্ধন করা হয়েছে তিন লক্ষ গুণ। আর যা দেখছেন, সেটি একটি আমাদের চিরপরিচিত সেই পিঁপড়ের মাথা।

বাইও-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আওতায়।

'এক্সো-বাইওলজি'। এটি আর একটি নতুন ক্ষেত্র। যার জন্ম হয়েছে মুখ্যত মহাকাশ বিজ্ঞানের আবির্ভাবের পর থেকে। মহাকাশে জীব-বিদ্যা বিষয়ক গবেষণা অথবা জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কিত সন্ধান এর মধ্যে পড়ছে।

অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি। মহাকাশে এবং আন্তঃনক্ষত্র-জগৎ অথবা নক্ষত্রজগতে কীভাবে কী ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে অথবা ঘটতে পারে তার সন্ধান যোগানোই হলো এই বিশেষ বিষয়টির কাজ। বলা বাহুল্য, এসব কাজে একই সংগে প্রয়োজন হয় নানারকম বিষয়ের উপর জ্ঞান। এক্স-রে, গামা রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ বা অণুতরংগ, বর্ণালীবিজ্ঞান, পারমাণবিক কণা বিষয়ক বিজ্ঞান এবং রসায়ন। অর্থাৎ এক কথায়, শুধু রসায়ন বিষয়ক জ্ঞানই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, তার সংগে পদার্থবিদ্যার বিস্তৃত আঙিনা সম্পর্কেও চাই প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যথাযথ ধারণা।

এইসব উদাহরণের মধ্যে 'বাইওনিকস' একটি আধুনিকতম সংযোজন। কী অর্থ 'বাইওনিকস' নামক এই শব্দটির ?

বলা হচ্ছে, 'বাইওলজিক্যাল ইলেকট্রনিকস' ইংরেজি এই শব্দ দুটিকে সংক্ষেপিত করে এবং তারপর একসংগে জুড়ে 'বাইওনিকস' শব্দটি তৈরি করা হয়েছে। যদি তাই হয়, তা হলে শব্দটির বাংলা পরিভাষা হয়ত দাঁড়াবে 'জীববৈদ্যুতিন'। অনেকে বলছেন, নতুন এই বিজ্ঞানে জীববিদ্যা এবং গণিত-শাস্ত্রের মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছে। কারোর কারোর অভিমত, জীবজগতের বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কিত জ্ঞানের সাহায্যে প্রযুক্তিগত সমস্যাবলীর সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করাই বিশেষ এই বিজ্ঞানটির উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, 'বাইওনিকস্'-এর জন্মবৃত্তান্তের পেছনে মানুষের যে উপলব্ধিটি কাজ করেছে, তা সংক্ষেপে এই : এমন কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে কর্মযোগ্যতায় প্রকৃতি মানুষ থেকে অনেক বড়। যেমন ধরুন, আমাদের মস্তিষ্ক। ভাবতে গেলে কেমন আশ্চর্য হতে হয় না ? কত রকম কম্পিউটার বা যন্ত্রগণকই না এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। কিন্তু মস্তিষ্ক নামক বস্তুটির সংগে পাল্লা দেওয়ার মত কম্পিউটার কেউ এখনও পর্যন্ত কি কল্পনাও করতে পেরেছেন ? দেহের ছোট্ট এই অংশটি শারীরিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে মানুষের জ্ঞান, হাসি কান্না, উদ্ভাবনা, শিল্প, কলা—সর্বত্র, যেসব দায়িত্ব পালন করে তার কোন জুড়ি নেই। আরও উদাহরণ আছে। অবশ্য, এই সংগে একথাও বলা চলে, প্লেন, রকেট, টেলিভিসন প্রভৃতির মত সামগ্রীও তো তৈরি করেছে মানুষই। এসব ক্ষেত্রে প্রকৃতির চেয়ে মানুষের যোগ্যতাও সম্ভবত প্রকৃতির যোগ্যতা থেকে কম মহান নয়। প্রকৃতির নিজস্ব কর্মধারাকে সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করে মানুষ তার প্রযুক্তিগত সামর্থ্যকে যাতে প্রসারিত করতে পারে, বাইওনিকসের মূল লক্ষ্য কিন্তু সেটাই।

একটা কথা আছে, বিজ্ঞানী অথবা প্রযুক্তিবিদরা যা করেন, তা আবিষ্কার নয়। তাঁরা মোটেই কিছু আবিষ্কার করেননি, বা করেন না। যা তাঁরা করেন সেটা হল : তাঁর পারিপার্শ্বিক, পরিবেশ, অথবা ব্যাপক অর্থে যাকে আমরা বলি 'প্রকৃতি'—সেই প্রকৃতির মধ্যে সব কিছুই বিদ্যমান। বিজ্ঞানীদের কাজ মুখ্যত তাদের অন্বেষণ করা, তাদের তাৎপর্যের সূত্র আবিষ্কার। অতঃপর নিজের চেষ্টায় প্রকৃতির সেই কাজটিকেই তাঁরা নকল করে শেষ পর্যন্ত যা করেন, আমরা তাদেরই নাম দিয়ে থাকি 'উদ্ভাবনা' বা 'ডিসকভারি'।

যেমন ধরুন, সাধারণ তড়িৎ-কোষ। আমরা জানি, ইলেকট্রোলাইট বা তড়িৎ বিশ্লেষ পদার্থের মধ্যে যদি দুটি বর্তনী রাখা যায়, আর ওই বর্তনী দুটির মুক্ত প্রান্তের মধ্যে কোনভাবে সংযোগ ঘটে তা হলে সৃষ্ট হয় তড়িৎ-প্রবাহ। আমাদের শরীরের মধ্যেও কিন্তু এইভাবেই বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্ট হয়ে থাকে। অথবা পারমাণবিক বিভাজন। প্রকৃতিতে এই বিভাজন সমানে চলছে। মানুষ একদিন তা আবিষ্কার করল। তারপর প্রাকৃতিক ওই পদ্ধতিরই নকল করে একদিন সে তৈরি করে বসলো 'নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটার'। গোড়ায় হয়ত সে জানত না, সে প্রকৃতিকেই অনুকরণ করছে। একথা সে জেনেছে অনেক পরে। বলতে পারেন, এসব ঘটনা কাকতালীয় ব্যাপার।

এদিক দিয়ে ভাবলে 'বাইওনিকস'-এর ভূমিকা স্বতন্ত্র। কাকতালীয় নয়।

যেমন ধরুন জোসেফ মনিয়ের নামে এক ফরাসী মালীর কথা। বাগানে কাজ করতে গিয়ে লোকটি একদিন আবিষ্কার করল, একটি গাছ কেমন শক্ত হয়ে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর তার শেকড়গুলি এলোপাথাড়ি মাটির মধ্যে এপাশ ওপাশ দিয়ে সেঁধিয়ে মাটিকে কেমন শক্ত করে ধরে আছে। দেখার সংগে সংগে তার মগজে এলো একটি মতলব। সে ভাবলো, তাই তো, এক কাজ করা যেতে পারে। সিমেণ্ট-বালি মিশিয়ে তার মধ্যে যদি তারের টুকরো রাখা যায় আর ওইভাবে যদি ফুলের টব তৈরি করা হয়, সে টব নিশ্চয় চট্ করে ভাঙবে না। যা ভাবা, তাই কাজ। টব তৈরি করলো সে ওই ভাবে। দেখলো, নতুন এই টব অনেক শক্ত। সহজে ভাঙে না। গাছের শেকড় থেকে ধার করা এই 'আইডিয়া' থেকেই শেষ পর্যন্ত এক দিন জন্ম নিলো যাকে এখন আমরা বলি 'রিইনফোরসড কংক্রিট' বা কংক্রিট-ঢালাই, তাই। প্যারিসের বিখ্যাত 'আইফেল টাওয়ার' তৈরি করেছিলেন গুস্তফ আইফেল মানুষের নলের মত হাড়ের অনুকরণে, ওই একই ধরনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। পাখি, কীটপতংগ প্রভৃতি কীভাবে পথ চিনে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়, মৌমাছির জৈবিক কাজকর্ম কীভাবে সময়ের সংগে তাল রেখে চলে, সম্প্রতি কিছু কিছু ফরাসী বিজ্ঞানী তা নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁদের ধারণা এই গবেষণা 'নেভিগেশন' বা নৌ এবং বিমান চালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

আবিষ্কৃত হলো বাদুড় অতি-গতিসম্পন্ন শব্দ বা আলট্রাসোনিকস সাহায্যে অন্ধকারে পথ চেনে, সম্মুখে বাধা থাকলে অতিক্রম করে অথবা শিকার সন্ধান করে। ১৯৩০-এর দশকে এই ঘটনাটিকেই আবিষ্কারের মূল সূত্র হিসেবে কল্পনা করে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হিরাম ম্যাকসিম তৈরি করলেন রেডার। এই একই রেডার পদ্ধতি উত্তরকালে 'সোনডার' নামে এক ধরনের যন্ত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছে। যা অন্ধজনদের পথের বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে। এটি দেখতে একটি টর্চের মত। বোতাম টিপলে সামনে থেকে বেরিয়ে আসে আলট্রাসোনিকস। এই শব্দ তার সামনে অবস্থানরত কোন প্রতিবন্ধক অথবা চলন্ত কিছু থাকলে তার উপর আছড়ে পড়ে এবং প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত শব্দ ফিরে এসে তার সংগে বাহিত একটি যন্ত্রে পড়লে বিপ্ বিপ্ শব্দ হয়। যা থেকে সে বুঝতে পারে তার সামনে প্রতিবন্ধক রয়েছে।

অনেকেই জানেন, ব্যাঙের মাথার সামনে যদি একটি মাছি ওড়ে, সে তাকে দেখতে পায় না। দেখলেও যেন দেখতে চায় না। তখন তার চোখের পাতা নড়ে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাছিটির ছবিও ব্যাঙটির মস্তিষ্কে যে প্রতিচ্ছবি অংকিত করে তা খুবই অস্পষ্ট। কিন্তু যে মুহূর্তে তার চোখে সন্দেহজনক এমন কারোর ছায়া এসে পড়ল যা তার শত্রুর উপস্থিতির ইংগিত বহন করে, অমনি সেই ছায়ার ছবি তার মস্তিষ্কে গিয়ে গভীর ছাপ গেঁথে দিল। সংগে সংগে সে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য হয়ে উঠল অস্থির। মনোবিজ্ঞানীরা এ ধরনের ঘটনারই নাম রেখেছেন 'রিফ্লেকস অ্যাকশন', বা প্রতিক্রিয়া। মজার ব্যাপার মার্কিন বিজ্ঞানীরা ব্যাঙের চোখের এই অদ্ভুত ব্যাপারটি অনুকরণ করে এক ধরনের যন্ত্র তৈরি করেছেন যা যাত্রীবাহী বিমান থেকে শুরু করে, মহাকাশযান, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, রকেট সন্ধান প্রভৃতির কাজে সাহায্য করবে। যন্ত্রটির নাম রাখা হয়েছে 'ফ্রগস আই'।

পিচ্ছিল এবং উঁচু নিচু বরফের উপর দিয়ে কেমন সাবলীলভাবে হেঁটে চলে পেংগুইন। ব্যাপারটা লক্ষ করলেন সোভিয়েত দেশের 'গোর্কি অটো ওয়ার্কস'-এর কুশলীরা। তাঁরা ভাবলেন, তাই তো ? দক্ষিণ মেরুতে চলতে গেলে সাধারণ গাড়ি যেন জুৎসই নয়। এমন ধরনের গাড়ি তৈরি করলে কেমন হয়, যার চলার ভংগীটি হবে পেংগুইনের মত। হ্যাঁ, তৈরি করলেন তাঁরা ওই ধরনেরই গাড়ি। মেরু অঞ্চলে বরফ অধ্যুষিত এলাকায় পথ চলার কসরৎ অনেক কমলো।

জেলিমাছ দূর থেকে আগত নিম্ন কম্পাংকের শব্দ ধরতে পারে। কয়েকজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী এই ঘটনাটি লক্ষ করে তৈরি করলেন এক ধরনের 'কৃত্রিম কান'। এই 'কানে'র সাহায্যে পনের ঘণ্টা আগে ঝড়ের পূর্বাভাস জানা সম্ভব হচ্ছে।

সামুদ্রিক প্রাণী 'ডলফিন' তো রীতিমত গবেষণার বস্তু। ডলফিন জলের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টায় ৬৫ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। এত বেগে আর কোন জলচর প্রাণী ছুটতে পারে না। কীভাবে জলের মধ্যে এত বেশি গতি তোলা সম্ভব ? বিজ্ঞানীরা দেখলেন, তাদের চামড়ার এক ধরনের আস্তরণ এর জন্যে দায়ী। আসলে তাদের গা ঢাকা থাকে দুই প্রস্থ চামড়ার আস্তরণে। ওই আস্তরণের মাঝখানে থাকে এক ধরনের তরল পদার্থ। জলের মধ্যে ছুটতে শুরু করলেই চামড়ার ভেতরকার ওই তরল এমনভাবে আন্দোলিত হয়, যা ডলফিনের গতি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

ব্যস। ব্যাপারটা অনুকরণ করে বসলেন জার্মান বিজ্ঞানীরা। ঠিক হলো সাবমেরিনের গা ওইভাবে দুটি রবারের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হোক। আর আস্তরণের মাঝখানে রাখা হোক সিলিকনঘটিত এক ধরনের তরল। যা ডলফিনের চামড়া দুটির ভেতরকার তরলের মত চলার সময় আচরণ করতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়ায় ডুবো জাহাজের জলের মধ্যে চলার সময়কার বাধা প্রায় অর্ধেকের মত কমিয়ে আনা গেছে।

কেউ কেউ এখন ডলফিনের কায়দাকানুন অনুকরণ করে মাছ ধরার কথা ভাবছেন। ডলফিন তার দেহ থেকে 'আলট্রাসোনিকস' নির্গত করে। অতিগতি সম্পন্ন এই শব্দের কম্পন সেকেণ্ডে ২০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০ এর মত। এই শব্দের চাপ এমনই যে যার সামনে কোন মাছ পড়লে সেই মাছ মুহূর্তের জন্যে পংগু হয়ে যায়। 'বাইওনিকস' যদি এই পদ্ধতির নকল করতে আমাদের সাহায্য করে, সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপারটা কত সহজ হয়ে যাবে, ভাবুন তো ?

ভূমিকম্প এখনও পর্যন্ত মানুষের কাছে বিভীষিকাই থেকে গেছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ভূমিকম্পের নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস যোগান এখনও সম্ভব হয়নি। কিন্তু দেখুন, ফড়িং এর ব্যাপারটা। পৃথিবীর সামান্যতম কম্পনও ফড়িংএর স্নায়ুতন্ত্র ধরতে পারে। অতএব এমন ধরনের ভূকম্পনজ্ঞাপক যন্ত্র কি তৈরি করা যায় না, যা ওই ফড়িং-এর ভূকম্পন-গ্রাহক যন্ত্রের মত সংবেদনশীল হতে পারে ? হ্যাঁ, বিষয়টি নকল করার চেষ্টা করছেন এখন বিজ্ঞানীরা।

জনৈক কবি একবার বলেছিলেন, প্রকৃতি আমাদের বড় শিক্ষক। উপরের ঘটনাবলী এই উক্তির সত্যতাই প্রমাণ করে। আর তার সংগে এটাও প্রমাণ করে, এই সত্যতায় পৌঁছতে গেলে দরকার প্রকৃতির নিকটতম সান্নিধ্য, প্রকৃতিকে দেখা এবং উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা। শৈশব থেকে এই দেখা এবং উপলব্ধি করার মত গুণ অর্জন করার চেষ্টা করলে মানুষ হয়ত তার বহু সমস্যার সমাধান অনেক বেশী অনায়াসে করতে পারতো। 'বাইওনিকসে'র চর্চা এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

সমরজিৎ কর

দূরের রবীন্দ্রনাথ

দেবাশিস দাশগুপ্ত

আধুনিক কবিতার আসরে অনেকে স্কুলের অভ্যাসমতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করেন। ভাবখানা এই, শুধু রবীন্দ্রনাথ বললে আমরা হয়ত বিভ্রান্ত হতাম। অথচ এঁরাই আসরে জীবনানন্দের কবিতা বা সুকান্ত, নজরুলের কবিতা বলতে দ্বিধা বোধ করেন না। আসলে রবীন্দ্রনাথ বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা সশ্রদ্ধ দূরত্ব রচনা করা হয়—এই দূরত্ব সব সময় সুফল দেয় না, উল্টে বিপত্তি ঘটায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস লাইব্রেরী থেকে নিয়ে কজন তরুণ তরুণী পড়েন তার একটা পরিসংখ্যান যদি পাওয়া যেত তবে এই দূরত্বের সত্যতা যাচাই করা যেত। অবশ্যই কেউ মনে করেন না রবীন্দ্রসাহিত্যে গবেষণার মত দুরূহ কাজ অথবা প্রাচীন সাহিত্যের মত খটমটে ব্যাপার—তাঁকে আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি তবে দূর থেকে, জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নয়। উপহার উপলক্ষ ছাড়া কয়জন তরুণ তরুণী রবীন্দ্রনাথের বই কেনেন! ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, তবে সেটা ব্যতিক্রমই, সাধারণের বোধ হয় এইটাই হিসেব। উল্টো ব্যাপারটা ঘটে গানের ক্ষেত্রে। যে কোন ঘরোয়া আসরে, বাসরে, পিকনিকে, কোন তরুণ তরুণীকে গান গাইতে বললে অবধারিত ভাবে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হবেই, আধুনিক কবিতার আসরে আধুনিক কবিতার প্রতি আধুনিক তরুণ তরুণী অনুরক্ত কিন্তু গানের আসরে আধুনিক মনস্ক যুবসমাজের কাছে আধুনিক গান অন্ত্যজ। রবীন্দ্রসংগীত আমাদের যতটা কাছাকাছি জীবনের প্রতিটি অবস্থায় যে-ভাবে মিশে আছে অন্য কিছু সেভাবে মিশতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাটকের কথা ভাবলে এই শূন্যতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। অতি বড় আশাবাদীও অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বাংলায় ভাল নাটকের খুব অভাব। রবীন্দ্রনাটক সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্রাত্য হয়ে রইল কেন? রবীন্দ্রনাটক মঞ্চের উপযোগী নয় এরকম একটা চালু ধারণা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে বহুরূপীর রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনার পরও। কেউ বলেন বড় বেশি কাব্যিক তাই পড়া যায়, মঞ্চে করা যায় না। সাহিত্যগুণ না থাকলে সার্থক নাটক হয় না—পৃথিবীর নাট্যসাহিত্য এর সাক্ষ্য দেবে। অনেকে গঠনগত দৌর্বল্যের প্রশ্ন তোলেন: এই যুক্তিটাও অযৌক্তিক। ঠিক এই সময়ে আমরা ছোট বড় নানা মাপের স্টেজে এত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি যে জোনাল অ্যাক্টিং সেট আমাদের কাছে এখন সমস্যাই নয়, বরঞ্চ ঐরকম কিছু ঘটলেই আমাদের প্রযোজনা নিয়ে কাজ করতে আনন্দ হয়—অনড় অংকবিভাগে যেটা সম্ভব ছিল না। অনেকের প্রতীক এবং গানের বাহুল্য নিয়ে দ্বিধা। এক্ষেত্রেও ভাবনার বিস্তারের অভাব। আমাদের চালু ধারণার জোতদার এবং অত্যাচারের নানারকম প্রতীক আবিষ্কৃত—রবীন্দ্রনাটক নিশ্চয়ই সেইসব ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দেয় না—সেইখানে সাবালকত্বের প্রশ্ন। সবচেয়ে বড় কথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চ সফল হয়নি, বারবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ব্যর্থ হয়েছে দুটি কমেডি ছাড়া। রক্তকরবীর সাফল্যের পরও অনেকের দ্বিধা। রবীন্দ্রনাটক করতে গেলে যে প্রচুর ভাবনার দরকার সেটা অনেকেই নিতে চান না। ইদানীং একটা কথা প্রায় চালু হতে বসেছে—রক্তকরবী চলে শম্ভু মিত্রের নামে—তাঁরা এখনকার দীর্ঘ লাইন দেখে তা-ই ভাবেন। কিন্তু 'রক্তকরবী' 'চারঅধ্যায়' বা 'রাজার' পিছনে যে ভাবনা ছিল, সম্পূর্ণতা ছিল, সেই দুরূহ দায়িত্ব অনেকেই পাশ কাটিয়ে যান। সুতরাং স্কুলে পুরস্কার বিতরণীতে অভিনয় হয় 'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'মুকুট' 'নটীর পূজা' 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'—আর সাধারণভাবে প্রথমেই ধরা হয় 'শেষরক্ষা', 'মুক্তির উপায়' প্রভৃতি। এই সব নাটকে ভাবনার দায়িত্ব বিশেষ নেই। অভিনয় করার লোভে, স্বাদবদলের জন্য যে যেমন পারেন, যাত্রার ঢঙে অথবা বিগত যুগের রঙ্গমঞ্চের অভিনয় রীতিতে 'বিসর্জন'। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বা গল্পের নাট্যরূপেও বিপত্তিগুলো সমান ভাবে কাজ করে। এই দূরত্বের জন্য আমাদের অভিনয়-রীতিতেও দ্বিধা। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাটক অভিনয় করতে গেলেই একটা আড়ষ্ট ন্যাকামিতে শ্লথভাবে সংলাপ উচ্চারণ করেন যে অভিনয় কখনই আমাদের পরিচিত জীবনে নিয়ে যায় না। মিষ্টি সুরেলা অভিনয় অবলম্বন করেন যথার্থ অনুশীলন ছাড়াই। পুরোন দিনের অভিনয়রীতিকে আমরা বাতিল করেছি কিন্তু তখনকার দিনের শিল্পীদের কণ্ঠস্বর উচ্চারণের জন্য যে অক্লান্ত অনুশীলন সেটাকে আমরা বর্জন করেছি স্বাভাবিকত্বের দোহাই দিয়ে—তাই অধিকারীভেদের প্রশ্নটা রয়েই যায়। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে বলে রাখা ভাল রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তার মূলে কলকাতার অনেক নামী

রূপসজ্জা : 'শাজিরা'

শিল্পীরা। তাঁরা রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা করেছেন অভিজ্ঞজনের কাছে, তারপর অন্যতম ভাবে গেয়েছেন তবে জনপ্রিয় হয়েছেন। ক্রমশ চর্চার ফলে আমরা এখন বুঝতে পারি কোনটি শুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত, কোনটি আধুনিকত্বের রঙে ছোপানো—ক্রমশ আমরা শুদ্ধ শিল্পকে মর্যাদা দিতে শিখেছি এবং এখানকার শিল্পীরাও শুদ্ধতা রক্ষায় অনেকাংশে মর্যাদাবান হয়ে উঠছেন। রবীন্দ্রনাটকের ক্ষেত্রে বহুরূপী এবং আরও কিছু সামান্য প্রযোজনা ছাড়া উদাহরণ দেওয়া যাবে না। আর একদল রবীন্দ্রনাটক বা গল্পের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে আধুনিকত্বের অহমিকায় আটপৌরে করে ফেলেন। রবীন্দ্রনাটক প্রাত্যহিকতা ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে যায় সেই সত্যটা এঁরা ভুলে যান অথবা নিজেদের সুবিধের জন্য ভুলতে চান—ফলে গ্রুপ থিয়েটারের নাম প্রযোজক হিসাবে থাকলেও কোন সুদূরপ্রসারী চিন্তার আভাস মেলে না। এই কারণেই 'বিসর্জন' হয়ে ওঠে শুধু যাত্রার ঢঙে রাজকীয় দ্বন্দ্বের নাটক বা ছাগহত্যা নিবারণী নাটক, চণ্ডালিকা হয়ে ওঠে অস্পৃশ্যতা বিরোধী পোস্টার ড্রামা, শেষরক্ষার সংলাপ বলা হয় ছদ্মবেশে বা মানময়ী গার্লস স্কুলের রীতিতে, তাসের দেশের আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় তাসবংশের তাৎক্ষণিক আনন্দ, শ্যামা নৃত্যনাট্য উত্তীয় বধের সময় কোটালের নাচের জন্য হাততালি পড়ে। ঐতিহাসিক চরিত্র থাকলে সেগুলির মেকআপ বা অভিনয় নন্দকুমার বা মীর কাশিম অভিজ্ঞতাকেই মূলধন করা হয়।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় সক্ষোভে লিখেছেন, "বত্রিশ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত একখানি নাটকের নিয়মিত অভিনয় সম্ভবপর হয়েছিল।" 'রাজা ও রাণী' ও দুটি কৌতুক নাটক ছাড়া দর্শক রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেনি। করানোর চেষ্টা হয়েছিল কি? বাংলা থিয়েটারের প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ-চিন্তার নাটক হয়ে এসেছে, সরলীকৃত সহজলভ্য জনপ্রিয়তা। সাল মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা কাল এবং সেই সময় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলি দেখলেই এই সত্য প্রমাণিত হবে। জনপ্রিয়তার এই অভিশাপ। জনপ্রিয়তার মারীচমায়ায় দর্শক তৈরির কোন চেষ্টাই সেভাবে হয়নি, হলেও কিছুদিনের মধ্যে পিছিয়ে আসা হয়েছে। দানীবাবু ও তারাসুন্দরী অভিনয় করা সত্ত্বেও মিনার্ভা থিয়েটারে একদিনের জন্য 'বিদায় অভিশাপ' হয়। নেহাতই অ্যাডেড অ্যাটরাকশন হিসাবে রবীন্দ্রনাথ। যে 'রাজা ও রাণী' মঞ্চসফল হয়েছিল সেই নাটক পরবর্তী কালে শিশিরকুমার প্রযোজনায় প্রয়াসী হলে রবীন্দ্রনাথ তাকে 'তপতী' দেন, 'রাজা ও রাণী' নয়। নিজেরই সৃষ্টি সম্পর্কে যে স্রষ্টা বারবার এত নির্দয়, সেখানে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রযোজকরা জনপ্রিয়তার প্রতি সদয় হয়ে একই জায়গায় রয়ে গেলেন—এটাই পরিহাস। রবীন্দ্রনাট্যের উপযোগী প্রযোজক তখন ছিল না। স্তানিস্লাভস্কি প্রযোজনার আগে চেখভ-এর নাটক সম্পর্কেও লোকের একই রকম ভ্রান্ত ধারণা ছিল। 'সী গাল'-এর প্রথম অভিনয়ের পর চেখভ তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন,

"A terrible flop .... The actors played disgracefully. Never will I write any more plays'.

চেখভ মস্কো ছেড়ে চলে গেলেন। স্তানিস্লাভস্কির প্রযোজনার পর অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। কিন্তু আমাদের এখানে বহুরূপী প্রযোজনার পরও ভ্রান্ত-ধারণা রয়েই গেল। উদাসীনতা সত্য ছিল কিনা জানি না, তবে ভাবনার ঘাটতি ও অসুবিধে প্রতি পদক্ষেপে।

রবীন্দ্রনাটকে গান অনেক সময় বাহুল্য। বহু সময়ে গান নাটকের গতি কমিয়ে দেয়—এক্ষেত্রে যাত্রা বা পুরোন নাটকের শিক্ষা আমাদের কোন কাজে লাগেনি। অনেক সময় গান ছাড়া সম্পূর্ণ নাটক অসহায় হয়ে পড়ে। যে গণনাট্য সঙ্ঘ নতুন থিয়েটারের প্রবর্তক—১৯৪৬ সালে তাঁরাও যখন 'মুক্তধারা' প্রযোজনা করেন তখন ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয় করেন গঙ্গাপদ বসু। সুতরাং গান বাদ দেওয়া হল। অথচ নেপথ্য-কণ্ঠ দিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জর্জ (?) দাশগুপ্ত, বেলা রায়, সুচিত্রা মিত্র। ধনঞ্জয় বৈরাগীর একটি গান নেপথ্যে গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই সময় ফাঁকা মঞ্চে নির্মল ঘোষের (সঞ্জয়) কিছুক্ষণের পদচারণা। পরিচালক শম্ভু মিত্র সযত্নে শিখিয়ে দিলেন: কি ভাবে পায়চারির মধ্যে দিয়ে উৎকণ্ঠা ফোটাতে হবে। বহুরূপীর 'মুক্তধারা' প্রযোজনায়ও গান বাদ। কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগী গান না গাইলে বন্ধজলা কখনই মুক্তধারা হয় না। 'অরূপরতন' নাটকে গানের বিন্যাস এমনই যে বসন্ত উৎসব বা কিছু বাউলদের গান ছাড়া পরপর ইমন বেহাগ থেকে সকালের রাগিণীতে পৌঁছয়। সুদর্শনার অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে কেউ যদি গান বাদ দিলেও সুরগুলি আনুপূর্বিক অনুসরণ করেন তবে প্রযোজনা অন্য ডাইমেনশন পায়। মঞ্চসজ্জার

রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে নিজস্ব প্রয়োজনায় যে রকম ধারা অবলম্বন করেছিলেন পরে সেইগুলি অন্যভাবে ভাবা হতে থাকল—পাশে ছিলেন অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মত শিল্পী। প্রথম দিকের বনদৃশ্যে জঙ্গল—ছাদের উপর রোলার চালিয়ে মেঘ-গর্জন ও বৃষ্টি, জোনাকি ছেড়ে দেওয়া থেকে এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জনে' কেবল চৌকো দুটো বেদী এবং বেদীর উপর দীপবৃক্ষ ও পুষ্পপত্র দিয়েই মঞ্চসজ্জা সম্ভব হল। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে হেনরি আর্ভিং-এর অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করেন "তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয় গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন তো আমি আর দেখি নাই।" আমাদের বিশ্বাস ঐ 'বাহিরের দোলা'র দিকে—তাই শূন্য প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় সত্ত্বেও বহুরূপী পরপর রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনা করে চলেন। সংখ্যার দিকে রূপকার ও শৌভনিকও কম যান না। অথচ কয়েক রাত্রি 'তপতী', 'শোধবোধ' এবং 'অচলায়তন' করেই উৎপল দত্ত বলেন "প্রতিজ্ঞে করিছি, আর কখনো করবুনি, এই কাজটা আর কখনও করবুনি।" 'রক্তকরবীর' উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পরও তিনি বলেন "পৃথিবীতে কোন ঈশানী পাড়ার মেয়ে নন্দিনীর মতো ছত্রে ছত্রে জীবন দর্শন ঘোষণা করতে পারে না। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ কল্পিত অধ্যাপক ও ও-পাড়ার নন্দিনী কবি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এক রূপকথার রাজ্যে উন্নীত হয়েছে, তারা তাদের শ্রেণীর চরিত্র হারিয়েছে।" আবার অন্যত্র তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন সেটা নাটকের কাব্য সৃষ্টি করা.... ....কোন কোন নাটকে বিপ্লবের কবিতা সৃষ্টি করা। সেটা যখন এর্নস্টটলের করেন বা পেটের ভাইস করেন বা ব্রেখট করেন তখন গদগদ হয়ে সমঝদার সাজিস। সেটা বাংলায় করলেই সাংকেতিকতার শৃগালরব তুলিস।" 'আপনি আচরি ধর্ম' উপদেশটা এদেশে শুধু সুবিধার্থে দেওয়া হয়। শিশিরকুমার বলেছিলেন, "আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে ঘটে উঠল না। আমি নিজে তাঁকে এদিকে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বাধা এসেছে নানা দিক থেকে।' এটা মর্মান্তিক সত্য, তাই নাচঘর বলেছিল, "যে ব্যক্তি মনেপ্রাণে অধ্যবসায়ী সে যদি ব্যবসায়ী হবার চেষ্টা করে তবে ব্যবসা তাঁর দ্বারা হয়ই না বরং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রেও বিচরণ করা তাঁর পক্ষে ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হয়ে পড়ে।" পাবলিক থিয়েটারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা ছিল না তা নয়। হরিশচন্দ্র হালদার পাবলিক থিয়েটারেও যুক্ত ছিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধও ছিলেন। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার অহীন্দ্র চৌধুরীকেও কয়েকটি নাটকের ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন মমত্ব নিয়ে। নীহারবালার গান শুনে খুশী হয়ে গান বাড়িয়ে দিলেন। এক একটা গান সন্তোষ দাশকে ভোলানোর জন্য বারবার চেষ্টা করছেন—পার্টের রিডিংও। নিজের প্রযোজনার খুঁটিনাটির জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুক্ষণ চিন্তা ছিল। বারবার তিনি চিঠিতে পরিবর্তন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য পরামর্শ দিতেন। নিজে বিভোর ছিলেন প্রযোজনায়। জগদানন্দ রায় লিখেছেন, "লক্ষ্য করিয়াছি, আশ্রমে কোন কারণে কোন ক্ষোভ দেখা দিয়াছে তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।" এই আন্তরিকতা নিশ্চয়ই পাবলিক থিয়েটারের লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রুপথিয়েটার কত আন্তরিকতার সঙ্গে কত পরীক্ষা করলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দূরে কেন থেকে গেলেন এটাই ভাবনার কথা। আধুনিক নাট্যরূপও সার্থক রূপ নিতে পারল না, অথচ চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় পূর্ণেন্দু পত্রী কিন্তু উদাহরণ দিতে পারলেন।

আগেকার মত এখনও রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়মিত হয় না বললেই চলে। বছরে একবার রবীন্দ্র-সদনে দীর্ঘ উৎসবে সকলে যে অভিনয় প্রযোজনা করেন সেই প্রযোজনার দায় হয়ত থাকে, তবে দায়িত্বের পরিচয়-পাওয়া যায় খুব কম। 'ফাল্গুনী' প্রযোজনা করেছেন গীতবিতান। রবীন্দ্রসংগীতের দায়িত্ববান প্রতিষ্ঠান। ধরে নেওয়া যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের অপব্যাখ্যা তাদের হাতে হবে না। কিন্তু নাটক প্রযোজনায় শুধু তাত্ত্বিক হলেই চলে না তার সঙ্গে চাই অভিনয় ক্ষমতা। আরও চাই নাট্য প্রযোজনার সামগ্রিক আধিপত্য যা শুধু স্বরলিপি পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ববান অনেকে ছিলেন যাঁরা অন্তত পুরোন দিনের অভিনয় স্মৃতি-উদ্ধার করতে পারতেন। যদি সেভাবেও করা যেত তবে অন্য মেজাজ আসত। 'ফাল্গুনী'র মঞ্চসজ্জা পরীক্ষার পালাবদল ঘটিয়ে গেল। বাঁকুড়ার বন্যার্তদের সাহায্যে জোড়াসাঁকোতে ফাল্গুনীর যে প্রথম অভিনয় হয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সেখানে ছিলেন দর্শক। তাঁর বর্ণনায় "রঙ্গতোরণের একদিকের স্তম্ভে আঁকা জলাভাবে শুষ্কপ্রায় পাপড়ি ঝরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্ম-চাকী অন্যদিকের স্তম্ভে দিঘির নীলজলে সদ্যফোটা শতদল পদ্ম। তোরণের মাথায় মরালের শ্রেণী শুষ্কতার দিক পরিহার করে পরিপূর্ণতার দিকে সোৎসাহে ছুটে চলেছে।" আর অবনীন্দ্রনাথের মঞ্চসজ্জা? "নীল রংয়ের পর্দায় সবুজের আভা—আকাশে এবং অরণ্যে মিলেমিশে যেন নিবিড় হয়ে উঠেছে। গোটাকতক তারা দেখা যাচ্ছে। হরশিরস্থিত চন্দ্রকলার মতো একটুখানি চাঁদও দেখা দিয়েছে। দু একটা গাছের ডাল মাথার উপর ঝুঁকে রয়েছে—তার একটাতে একটি ঝুলনা বাঁধা। দু একটা লতা জড়িয়ে উঠেছে। উঁচু নীচু জায়গায় ফাঁকে ফাঁকে তৃণমঞ্জরী বসন্তের হাওয়ায় রঙ্গীন হয়ে উঠেছে। এর বেশী আর কিছু নয়।" প্রথম যুগের মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বলেন "আমাদের রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা অনেকটা বিলিতি অনুকরণে হত। হ চ হ—হরিশচন্দ্র হালদার আমাদের দৃশ্যপটগুলি অতি নিকৃষ্ট বিলিতি অনুকরণে আঁকতেন। বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ করাই ছিল তখনকার আদর্শ।" 'ফাল্গুনী' নাটক প্রায় হয় না বললেই চলে। গীতবিতান সেই নির্দেশে এই আদর্শ মেনে চললেও অনেক কিছুই তাঁদের অনায়ত্ত। অর্থাৎ স্থাণু অংশে তাঁরা সফল, চলমান অংশে তাঁরা ব্যর্থ। যদিও সূচনা অংশ বাদ দিয়ে তাঁরা প্রযোজনাকে অনেক সহজ করে নিয়েছিলেন।

রূপকার : 'অচলায়তন'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অভিনয় বর্ণনায় হয়ত আবেগ আছে, কিন্তু এটা বোঝা যায় সকলেই অন্য কিছু প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং যেটা দর্শক অনুভব করেছিলেন। কিন্তু গীতবিতান 'ফাল্গুনী' অভিনয় মাইক্রোফোন নিয়েও আড়ষ্ট ভাবে করে গেলেন। 'ফাল্গুনী' নাটকের একটি বিশেষ অংশ প্রতি দৃশ্যের আগে গীতভূমিকা। যেমন বেণুবনের গান, দুরন্ত প্রাণের গান, পাখির নীড়ের গান, ফুলন্ত গাছের গান, প্রবীণের পরাভব, নবীনের জয়, উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান প্রভৃতি। এই গীতভূমিকার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে যেটা শুধু গান এবং প্রচলিত রীতির নাচ নয়। গীতবিতান আরম্ভে পর্দা পড়া অবস্থায় দুটো গান গাইলেন। 'ওগো দখিন হাওয়া', 'আকাশ আমার ভরল আলোয়' তারপর মামুলী নাচের সঙ্গে 'ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা'। ফলে গীতভূমিকার চাবি দিয়ে নাটকের দরজা যখন খোলা গেল না তখন ঐ গান বাদ দিলে ক্ষতি কি হত? যেহেতু গানটা তাদের অধিগত বিষয় তাই গান তাঁরা সব কখানি রেখেছেন। গেয়েছেন অবশ্য তাঁরা ভালই—একবার 'ভালোমানুষ নইরে মোরা' গানে স্কেল বিচ্যুতি ঘটে অর্কেস্ট্রা থেকে বাজানো সত্ত্বেও। কিন্তু গান নাটককে কিভাবে ব্যাহত করতে পারে তাঁরা সেই উদাহরণ রেখে গেলেন।

ইন্দ্রলতা : 'সে'

যদি অভিনয়ের দিকটা শক্তিশালী হত তবে গানের সংখ্যাধিক্য উৎকটভাবে চোখে পড়ত না। বরঞ্চ গান নাটককেই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত, বিশেষত নব যৌবনের দলের গানটা অত্যন্ত জরুরী। মঞ্চে নব যৌবনের দল একই লাইনে দাঁড়ান, একই সঙ্গে যন্ত্রবৎ হাত পা ছোঁড়েন, মাঝে মাঝে যান্ত্রিক নিয়মে হা হা করে হাসেন। একমাত্র চন্দ্রহাসের ভূমিকায় স্বপন ঘোষ কিছুটা সার্থক। আর রবীন্দ্রনাথের অন্ধ বাউলের ভূমিকা সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি দিলেই গীতবিতান প্রযোজনার দৈন্য প্রকট হবে : "শেষ দৃশ্যে সোনালী আলখাল্লা পরা অন্ধ বাউল, গাঢ় নীল প্রচ্ছদপটের পাশে যেন মূর্তিমান সুর। চাঁদের ম্লান ছায়া পড়েছিল রূপালী কেশের উপর, হাতের একতারায় বেজেছিল সেদিনের অকথিত গান।...... 'ধীরে বন্ধু ধীরে'। সুরের গতি সেই আঁধার রাত্রির সীমাহীন পথের পাশে ছায়ায় মায়ায় মিলিয়ে শ্রোতাদের প্রাণের মধ্যে একতারা হাতে যে সুর বাজিয়েছিল, সেই সুরের সম্পূর্ণ রূপটি ফুটত না যদি পারিপার্শ্বিক নাট্যের অনুযায়ী আবহাওয়া সৃষ্টি না করত।" গীতবিতান প্রযোজনায় সেই স্মৃতির অক্ষম অনুকরণ আবার 'দাদা'র অভিনয়ে 'ঠাকুরদাদা' চেষ্টে সম্পূর্ণ বিবাদী স্বর ছুঁয়ে যায়—যা পেশাদারী থিয়েটার এর ভিলেনির গ্রাম্য কায়দা রবীন্দ্রনাট্যের সংলাপ সেখানে বারবারই হোঁচট খায়।

শান্তিনিকেতন অয়ন কিন্তু প্রায় 'মালঞ্চ'কে সার্থক করে তুলেছিলেন। তাঁরা নাটকের সংলাপকে অযথা সুরেলা করে রাবীন্দ্রিক বলে চালাতে চাননি। মঞ্চসজ্জায় তাঁরা পুরোপুরি কলকাতাকেই অনুকরণ করতে চেয়েছেন, তাতে সব জায়গায় ফল যে ভাল হয়েছে তা নয়। প্রবেশ প্রস্থান নিয়ে বেশ বিভ্রাট ঘটে যায়, ঘর ও বাহির সব একাকার। অভিনয়ে নীরজার ভূমিকায় গায়ত্রী রায় বেশ ভাল। শুধু উচ্ছ্বসিত কান্নার জায়গাগুলি ছাড়া। সরলার ভূমিকায় মধুমিতা দত্ত মৃদুভাষিণী, যে মৃদুকন্ঠ মাইকের সামনেও অসহায়। রমেন সম্পূর্ণ বেমানান তার কথাবলার ভঙ্গিতে। সঞ্জীব সিংহের আদিত্য শুধু কথার কাজ চালিয়ে যায়—হাত নিয়ে অসুবিধেয় পড়ে। শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত কিন্তু অভিনয় সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করতেন। যদিও তিনি বারবার বলেছেন, অভিনেতা সব চেয়ে মুশকিলে পড়ে দুটি হাত নিয়ে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে হাত দুটিকে ব্যবহার করেন সেটা পেশাদারী অভিনেতাদেরই ঈর্ষণীয় বিষয়। 'মালঞ্চ'

নাটকে মাঝে মাঝে বেতার নাটকের মত গানের ছত্রগুলি ভেসে এসেছে যা খুব ভাল গাওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সময় আন্ডারলাইন দিয়ে বোঝানোর মত হাস্যকর লেগেছে। আবার কোন কোন সময় অদ্ভুত কাজ করেছে। এইখানে নাটকের গতির কথা ভেবেও পরিমিতি রক্ষা করা যায়নি।

এছাড়া শিল্পায়ন প্রযোজিত 'মুক্তির উপায়' নাটকে হাসির নাটকের নাম করে যা যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে। নটরাজ প্রযোজিত অরূপরতন বা শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রযোজিত **নটীর পূজা** নাটকের প্রযোজনা রীতি অন্য ঘরানার, (প্রযোজনা দুটি আমি দেখিনি)। রূপকার নিবেদিত 'অচলায়তন' সবিতাব্রত দত্তের পরিচালনায় প্রায় এক যুগ আগের প্রযোজনা—তার দোষ-গুণ সমেত একযুগ পরেও বর্তমান। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সংলাপের মহিমা তাঁরা অনেক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন অনেক অনেক জায়গায় চলতি থিয়েটারের প্রশ্রয় ও প্রলোভনে তাঁরা ভারসাম্য হারিয়েছেন। সংগীত ও আবহ-সংগীত দুই মেরুর বাসিন্দা।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরূপ না বলে অবলম্বন বলাই বোধ হয় সংগত। কারণ উপন্যাস বা গল্পের নাট্যরূপটাই দেওয়া হয়। কিন্তু মেজাজটা প্রায়শই অধরা থেকে যায়। এ ব্যাপারেও আমরা আগের দিনের থিয়েটার থেকে এক চুল এগোতে পারিনি। আর্ট থিয়েটার ক্যালকাটা প্রযোজিত যোগাযোগ একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা। কিন্তু পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বৃত নাট্যাংশে অনেক অবান্তর পুনরাবৃত্তি যা শুধু নাটকের দৈর্ঘ্য বাড়ায়। কিন্তু নাটকীয়তা গঠনে সাহায্য করে না। রবি চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চশিল্প রবীন্দ্রনাথের নিরলংকার মঞ্চভাবনাকে উপহসিত করে। অযৌক্তিক বিরাটত্ব। অভিনয়ে মধুসূদনের ভূমিকায় পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় আদ্যন্ত বিরক্তিকর। একঘেয়ে গলায় অভিনয় করেন। সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের কণ্ঠ কখনই রবীন্দ্রনাথের বিপ্রদাসকে প্রকাশ করতে পারে না। যখন তিনি সংযত অভিনয় করেন তখন অনেকটা মানিয়ে যায় কিন্তু রাগের সময়, গভীর আবেগের সময় তাঁকে প্রথাসিদ্ধ হতেই হয়। একই কথা বলা চলে দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুমুদিনী প্রসঙ্গে। কুমুদিনীর অবরুদ্ধ ব্যথায় তিনি রবীন্দ্রনাথের মর্মানুসারী কিন্তু তীব্রতা প্রসঙ্গে পরিচিতি পেশাদারী থিয়েটারের আশ্রয় নিতে হয়। অবাক করে দিয়েছেন সুলতা চৌধুরী। শ্যামার ভূমিকায় তিনি কখনও বাড়াবাড়ি করেন নি অথচ রবীন্দ্রনাথের চরিত্রকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে তাঁর অব্যর্থ প্রকাশভঙ্গী। ঘটক চরিত্রে সাধন সেনগুপ্ত একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি। তবে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে চরিত্রের গভীরতা নিয়ে আমাদের ভাবনা কম। তাই হালকা চরিত্র যত সহজে ফোটে রবীন্দ্রনাথের গভীর চরিত্রগুলি ততই দূরে সরে যায়। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য অংশ সংগীত। পূর্ণেন্দু রায়ের পরিচালনায় এই নাটকের আবহ প্রচলিত রীতিকে অগ্রাহ্য করে মহিমান্বিত। বিশেষত এক জায়গায়, রাগ আলাপ এবং কুমুদিনীর মুখে গান অদ্ভুত। একটি জায়গায় প্রচলিত ক্লাশ কানে লাগে।

ইন্দ্রসভার প্রযোজনা 'সে'। ইন্দ্রসভা নবজাতক। পরিচিতি অংশে পাওয়া গেল বরুণ দাশগুপ্তের পরিচিতি ইন্দ্রসভার নয়। 'সে' নাটক এর আগেও প্রযোজিত। এবারের পুনঃপ্রযোজনা ইন্দ্রসভার মাধ্যমে। শিল্পী তালিকায় কিছু বদল ছাড়া সব আগেরই মত। নাটক পুনঃপ্রযোজিত হবার সময় সংযুক্তি বা বিযুক্তি সুবিধা অনুযায়ী ঘটে। নচেৎ সব সময় পুনর্মুদ্রণ হয়, নব-সংস্করণ নয়। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্যে এই নাট্যরূপ দিয়েছেন এবং বরুণ দাশগুপ্ত অনেক পরিশ্রমে এই দুঃসাধ্য কাজটি সফল করেছেন। যদিও তাঁর নিজের চরিত্র রূপায়ণ আগের তুলনায় অনেক কমজোরী, কমজোরী অনেক টুকরো অভিনয়। কিন্তু অবাক করে দিয়েছেন সে-র ভূমিকায় রুমা দাশগুপ্ত। অনেক পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়েছে পুরুষালী হওয়ার জন্য। যেটুকু তিনি পারেননি তাতে নাটকের লাভ হয়েছে। কারণ প্রলুব্ধ হয়ে অনেকবার রবীন্দ্রভাবনার বিচ্যুতি ঘটাত। এখনকার 'সে' অনেক পরিমিত যা রসাস্বাদনে সাহায্য করে। নাটকে অনেক বাই-ডায়লগ, উপস্থাপনা একইভাবে হয়তো স্মার্ট কিন্তু অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে অচেনার গন্ডীতে নিয়ে যায়। পরিশেষে একটি প্রশ্ন, রুমা দাশগুপ্তা খুব ভাল অভিনয় করেছেন—এবার যদি তিনি কোন পুরস্কার পান তবে সেটা শ্রেষ্ঠ মহিলা শিল্পী অথবা শ্রেষ্ঠ পুরুষ চরিত্রশিল্পী হিসাবে?

আর একটি স্মার্ট প্রচেষ্টা রঙ্গভূমি নিবেদিত **বদনাম**। কিন্তু ঐ প্রচেষ্টাটুকুই সম্বল। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গল্প **'বদনাম'**। নাট্যরূপায়ণে পরিচালক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বতোভাবে প্রচলিত নাটকীয়তাকে পরিহার করতে চেয়েছেন। এই বর্জনের প্রচেষ্টা কখন সুফল দিয়েছে, কখনও বিপরীত। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের অনিল কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। কুমারেশ মুখোপাধ্যায়ের নিতাই বা বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়ের ছেদীলাল অসম্ভব ভাল টাইপ চরিত্র। এখানেই পরিচালকের সার্থকতা। কোনরকম প্রথাসিদ্ধ রাবীন্দ্রিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি চরিত্র রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সৌদামিনী চরিত্রে গীতা ভট্টাচার্যের অভিনয়ের ব্যর্থতা আবার রবীন্দ্রনাথকে দূরে নিয়ে যায়। তাঁর অভিনয়ে সংলাপের আশ্চর্য দ্যুতি অনেকখানি অপহৃত। কল্লোল মুখোপাধ্যায়ের বিজয়মাধব দ্বিতীয়াংশে যতটা ভাল প্রথমাংশে ততটা নয়। হাসানোর জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে যা আর এক ধরনের প্রচলিত গিমিক। বহু ব্যবহারে ইতি-মধ্যে জীর্ণ যদিও সেটা একালেরই অনুকরণ। সেট মায়া বিস্তার করে কিন্তু কাজে লাগে কতটুকু? সংগীতে রাজেশ্বর ভট্টাচার্য খুব ভাল কাজ করেছেন—বিশেষত সেতারের অংশে। কিন্তু অনিলের আসার সময় দু লাইন গানের ব্যবহার আন্ডারলাইন করার মতন জরুরী নয়। পোশাকে, মেকআপে কালানুগত্য সব সময় রক্ষা হয়নি। সব মিলিয়ে প্রযোজনাটি তাৎক্ষণিক চমকেই অবসিত হয়, স্থায়ী অনুরণন তোলে না।

পীযূষ বসুর নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় রঙ্গসভা নিবেদন করেছেন মালিয়া। ঐতিহাসিক পটভূমি পেয়ে অভিনেতারা অভিনয়ে রূপসজ্জায় পুরোপুরি গতযুগের ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়ের রেওয়াজটিকে কাজে লাগিয়েছেন। চমকপ্রদ ইনডোর সেটের মত

শিল্পায়ন : 'মুক্তির উপায়'

আরাকান রাজপ্রাসাদ—যা দ্বিতীয়বার দেখানোর জন্য বিরতি দিতে হয়। পর্দা উঠলে দেখা যায় আগের দৃশ্যের ঘন্টাটি নেই, তখন ড্রপ ওঠার সময় একজনের দৌড়ে পালানোর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য আধ ঘণ্টা পরেই যবনিকা পতনের প্রয়োজন ঘটে। অভিনয়ে সন্তু মুখোপাধ্যায় এবং শমিতা বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিশ্বস্ত হয়েও আধুনিক। অপরদিকে কল্যাণী মণ্ডলের বয়স কম কিন্তু অভিনয় করেন পুরনো দিনের ধারায়। তুষার ভৌমিক ও রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণভাবে যাত্রানুসারী। আর রসরাজ চক্রবর্তী ও কল্যাণী মণ্ডলের একটি আবেগাশ্রয়ী দৃশ্য ঐ যাত্রাকেই সুচিহ্নিত করে। ইতিহাস কি বলে জানি না—তবে এই নাটকে শাহসুজা অশীতিপর বৃদ্ধ। দীর্ঘ সাদা দাড়ি, যে দাড়িটি বশিষ্টমুনিও পরেন আবার নবাবের হিতাকাঙ্ক্ষী দরবেশও পরে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে আবহ সব সময় যাত্রার কনসার্টের মত—বাজতেই থাকে, বাজতেই থাকে, বাজতেই থাকে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অভিযাত্রী শাখার **'শাস্তি'** বা পূর্বভারতী প্রযোজিত **'নাস্তিক'** অভিনয়ের কথা আমি এই আলোচনায় আনছি না। কারণ এই নাটকে শুধু রবীন্দ্রনাথের নামটাই আছে, তাছাড়া

আর্ট থিয়েটার ক্যালকাটা : 'যোগাযোগ'

পাড়ার থিয়েটারের মত স্টেজের মধ্যে হোঁচট খাওয়া, পাট ভুলে যাওয়া, চশমা পরে ঢুকে যাওয়া এবং সেটাকে সামলাতে হিমসিম খাওয়া, অকারণে হাত পা ছোঁড়া, বিকট চিৎকার হাসি কান্না অনেক কিছু হাসির খোরাক এই সব প্রযোজনা রবীন্দ্র সদনের উৎসবে যোগদানের মাপকাঠি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগায়।

রবীন্দ্রনাথের গানের কথা যেমন বেমালুম আধুনিক গীতিকারেরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজে লাগান, সুরকারদেরও অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ সহায় হন। কিন্তু আধুনিক নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজক বুক বাজিয়ে বলতে পারেন, তাঁরা কখনও রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করেননি। যদিও অনেক রূপক সংকেত গোপনে গোপনে কাজ করে যায়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'সওদাগরের নৌকা'** নাটকের প্রশংসা করেও **কালান্তর** পত্রিকায় সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যিক সংলাপকে **রবীন্দ্রপ্রভাবে** অভিযুক্ত করেন। কাবাকে কি আমরা থিয়েটারে বর্জন করেছি? রবীন্দ্রনাথের নাটক কি সাধারণের থেকে অনেক যোজন দূরে? অথচ মাঝে মাঝে বিপরীত প্রমাণও তো মেলে। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ-পরিকল্পনা আমরা সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছি। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল যা শুরু করেছিলেন আমরা নানাভাবে তার প্রভাবান্বিত। গান তো এখন বাংলা নাটকে বাহুল্য হয়েও অলংকার। অবশ্য সেই গান গভীরতার কথা বলে খুব কম, শুধুই ব্যঙ্গ অথবা ঘটনার বিবরণ—যা **কল্লোল** নাটকে নব যৌবনের দল থেকে অনেক দূরে। রবীন্দ্রনাথ চিত্রপট থেকে দর্শকের চিত্তপটের ভরসা করেছিলেন বেশী। আমাদের প্রযোজকদের চিত্তপটে কিন্তু এখনও রবীন্দ্রনাটক যথার্থ ভাবে নাড়া দিতে পারে নি—দিলে হয়ত বাংলা নাটকের অন্য একটি দিক খুলে যেতে পারত। সম্পাদনা করে এখনকার প্রযোজনা হিসাবে যদি বার বার চর্চা করা যেত তবে হয়ত ঋণ বেড়েই যেত। তাতে ক্ষতি নেই—কিছু কিছু ঋণ আছে যা শোধ না হওয়াতেই আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের ঋণ সেই জাতের। *

---

*এই নিবন্ধ রচনার জন্য নানাজনের লেখা ও বিভিন্ন পত্রিকার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নাম উল্লেখ না থাকলেও অনুল্লেখিত ঋণ স্বীকার করছি।

পরলোকগত সালে এবং অন্যান্য লেফট উইঙ্গার

আমি আগেও লিখেছি, আজও বিশেষ কারণে লিখছি, পঞ্চাশ সালের প্রথম পাদে ফুটবলে নানা কীর্তির সুবাদে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পাঁচ ফরোয়ার্ডের নামকরণ হয়েছিল—"PADAS"। পাঁচজনের নামের ইংরাজী আদ্যাক্ষর নিয়ে ওই নাম। অর্থাৎ পম্মোত্তন ভেঙ্কটেশের 'পি', আপ্পারাওয়ের 'এ', ধনরাজের 'ডি', আমেদ খাঁর 'এ', এবং সালের 'এস' নিয়ে "প্যাডাস"। পাঁচ অক্ষরের প্রতীকী শব্দটি থেকে দুটি অক্ষর আগেই মুছে গিয়েছিল। আর একটি অক্ষরও খসে পড়ল। আপ্পারাও ও ভেঙ্কটেশের পরে পরলোক গমন করলেন সালে। তিনজনই চলে গেলেন কিছুটা অপরিণত বয়সে, যে বয়সে ওপারের ডাক আসার কথা নয়। সালের বয়স হয়েছিল ৫৫। কলকাতা থেকে স্বগৃহ কোট্টায়মে গিয়েছিলেন কন্যার বিবাহ উপলক্ষে। সেখান থেকে আবার ট্রেনে কলকাতায় ফেরার পথে তৃতীয়বার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ট্রেনের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কলকাতা ফুটবলের দীর্ঘ ইতিহাসে 'প্যাডাসের' চেয়ে ভাল ফরোয়ার্ড লাইন হয়নি বলে ফুটবল মহলে ওঁরা পঞ্চ পাণ্ডব নামেও পরিচিত। তাঁদেরই এক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন পি বি এ সালে, যাঁর পুরো নাম ছিল পুত্তান পরমভিল বাবাকাম্নু রফতার আব্দুর সালে।

যাঁরা কলকাতার ফুটবলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বহুকাল খেলা দেখেছেন তাঁদের অভিমত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গৌরব লগ্নের পাঁচ ফরোয়ার্ড—নূর মহম্মদ, রহিম, রসিদ, রহমৎ ও আব্বাস-এর মধ্যে ছিল চমৎকার যোগাযোগ। তখনকার দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ড লাইন। নিজ নিজ ভূমিকায় সবাই ছিলেন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। খেলাও ছিল দেখার মতো। কিন্তু পারস্পরিক যোগাযোগে, পরিমার্জনে এবং আক্রমণ রচনায় দৃষ্টি-নন্দন দক্ষতায় পঞ্চ পাণ্ডব ম্লান করে দিয়েছিল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের পঞ্চ রথীর পরাক্রম। প্যাডাস-এর খেলা দেখে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যেত। ওই পাঁচ ফরোয়ার্ডের আগেও ইস্ট-বেঙ্গলে বহু ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় খেলেছেন। যেমন লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্গেশ। আপ্পারাও, সোমানা, সুনীল ঘোষ এবং সুশীল চ্যাটার্জীকে নিয়েও এক সময় ফরোয়ার্ড লাইন দারুণ শক্তিশালী ছিল। কিন্তু ভেঙ্কটেশ-আপ্পারাও-ধনরাজ-আমেদ-সালের মত পঞ্চ-তারে ফুটবলের সিম্ফনি আর কোনো ফরোয়ার্ড লাইনই সৃষ্টি করতে পারেনি।

আমরা যারা সে খেলা দেখেছি তা চিরদিনের স্মৃতি হয়ে আছে। এক দুই বছর নয়, দীর্ঘ ন-বছর ধরে লেফট উইংয়ে দেখেছি সালের মন-ভুলানো খেলা। পঞ্চপাণ্ডব হিসাবে ফরোয়ার্ড লাইন গড়ে ওঠার আগেই অবশ্য সালে ইস্টবেঙ্গলে খেলতে আসেন। পঁয়তাল্লিশ সালে ত্রিবান্দ্রামে এইচ এম সি দলের হয়ে প্রতিশ্রুতি-বান ছেলেটিকে খেলতে দেখে কলকাতায় নিয়ে আসেন ফুটবলের জহুরী জ্যোতিষ গুহ। সালে তখন স্কুলের ছাত্র। ওর বাবাকে জ্যোতিষবাবু কথা দিয়েছিলেন লেখাপড়া শিখিয়ে ফুটবলের মাধ্যমে ওকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব তাঁর। বলা বাহুল্য, জ্যোতিষ বাবু সে দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে সালে গ্রাজুয়েট হন এবং পরে এম এ পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চুয়ান্ন সালে ইন্সপেক্টর হিসাবে ক্যালকাটা কাস্টমসের চাকরিতে যোগ দেবার আগে পঁয়তাল্লিশ থেকে তিপান্ন সাল পর্যন্ত ন' বছর খেলেছেন ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবে। ওই সময়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বহু স্মরণীয় কীর্তির অন্যতম সংগ্রামী সৈনিক ছিলেন সালে। পঞ্চাশ সালে তাঁর অধিনায়কত্বে ইস্টবেঙ্গল কলকাতার লীগ, শীল্ড এবং দিল্লির ডি সি এম ট্রফি জয় করে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অতীতের তিন খেলোয়াড় ধনরাজ, তাজমহম্মদ ও সালে

ভারতের নাম-করা লেফট উইঙ্গারদের মধ্যে সালের স্থান ছিল অনেক উপরে। অন্তত পাঁচ ছ' বছর তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতের দল গড়ার কথা কল্পনা করা যায়নি। বাহান্ন সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ছিলেন ভারতের অন্যতম খেলোয়াড়। প্রতিনিধিমূলক খেলায় ছিলেন অপরিহার্য। দিল্লি এশিয়ান গেমসে খেলেছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে বুখারেস্ট এবং সোভিয়েট ইউনিয়নও সফর করেছেন।

মাথায় তেমন উঁচু ছিলেন না। দেহের বাঁধুনিও যে খুব মজবুত ছিল, তা নয়। কিন্তু পাতলা দেহ নিয়ে টাচ লাইন ধরে তরতর করে এগিয়ে বিপক্ষ ডিফেন্সকে তছনছ করতেন। পায়ে ছিল চমৎকার কাজ। একে একে বিপক্ষকে কাটিয়ে গোল লাইন থেকে ব্যাক পাস করতেন বেশি। অনেক খেলায় দেখেছি গোলরক্ষ-পারকে টেনে এনে শূন্য গোলে বল শট করেছেন, কিংবা শট নিয়ে অসুবিধা বোধ করলে গোল করার জন্য বল ঠেলে দিয়েছেন ধনরাজের পায়ে। ওঁর মৃত্যু সংবাদ শোনার পর ধনরাজ বলেছিলেন, "ওর বল থেকেই আমি গোল করেছি বেশি। আমার দেখা শ্রেষ্ঠ দুই লেফট উইঙ্গারের মধ্যে সালে অন্যতম। অপরজন রমন।"

লেফট উইঙ্গার হিসাবে সালে কতবড় খেলোয়াড় ছিলেন তা পরিমাপের জন্য তুলনামূলক আলোচনাও অবশ্যই প্রয়োজন আছে। অনেক নামই মনে আসছে। যেমন শিবদাস ভাদুড়ি, সামাদ, দুলাল গুহঠাকুরতা সন্তু চৌধুরী, আব্বাস, অমল ভৌমিক সুশীল চ্যাটার্জী, নির্মল মুখার্জী, এস নন্দী, নায়ার, আলাউদ্দিন, রমন, ফাকীর, এ দাশগুপ্ত, প্রণব গাঙ্গুলী থেকে আজকের হরজিন্দর সিং ও বিদেশ বসু। কিছু কিছু নাম অবশ্যই বাদ পড়ল। অন্তত যখন মাঝামাঝিনায় অনেক খেলোয়াড়ের নাম করলাম তখন এ তালিকায় আরও কিছু লেফট উইঙ্গারের নাম যুক্ত হওয়া উচিত ছিল। তবে আমি শ্রুতি এবং স্মৃতি নিয়েই সমীক্ষা করার চেষ্টা করছি। অর্থাৎ ফুটবল রসিকদের মুখে যাঁদের খেলার কথা প্রচুর শুনেছি আর যাদের খেলা দেখেছি।

এগারো সালে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ির খেলা আমি কেন, আমার চেয়ে বহু প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক-দের দেখার সৌভাগ্য হয়নি। শুনেছি তাঁর সময়ে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ লেফট উইঙ্গার। খেলতেন মাথার বুদ্ধি এবং পায়ের নৈপুণ্যে। তিনি তো প্রবাদ পুরুষই পরিণত হয়েছিলেন। ফুটবল খেলে একজনই জাদুকরের যশ আদায় করতে পেরেছিলেন। শুধু সামাদকেই বলা হত ফুটবলের জাদুকর। তাঁর কিছু কিছু খেলা যখন দেখেছি তখন তাঁর গৌরব-গরিমা কালের মেঘে ঢাকা পড়েছে। লেফট উইংয়ে খেলেলেও লোকে তাকে জাদুকর বলত অন্য কারণে, পায়ের ভেল্কিতে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে পুতুলের মতো নাচানোর গুণে। বলে বলে এবং বাজি ধরে গোল করতে পারতেন। কিন্তু প্রতিভাদীপ্ত জীবনের যা ধর্ম, অনুশীলনে আগ্রহ ছিল না, খেলার মধ্যে ছিল নিষ্ঠা ও মনসংযোগের অভাব। ইস্টবেঙ্গলের দুলাল গুহঠাকুরতা এবং মোহনবাগানের সন্তু চৌধুরীর খেলা দেখেছি অল্পস্বল্প। দুজনেই লেফট উইংয়ে যথেষ্ট খ্যাতির সঙ্গে খেলেছেন। দুলাল গুহঠাকুরতার খেলায় যদি পরিমার্জন বেশি থেকে থাকে তবে সন্তু চৌধুরীর বাঁ পায়ে ছিল বুলেটের মতো শট।

২+৩+৫ ছকের বদলে ৪+২+৪ ছকে খেলার রূপ বদলের সঙ্গে সঙ্গে উইঙ্গারের ক্রীড়া পদ্ধতিতেও রূপান্তর ঘটে গেছে। আগে টাচ লাইন ধরে তীব্র বেগে ছুটে উইঙ্গাররা কর্নার ফ্ল্যাগের কাছ থেকে বল সেণ্টার করতেন। ধনুকের মত বাঁক নিয়ে সেণ্টারগুলি এসে পড়ত পেনাল্টি বক্সের মধ্যে। যে যত ভাল সেণ্টার করতেন তাঁর সুনাম তত বাড়ত। উইঙ্গাররা কাট করে ভিতরে ঢুকতেন। কালে ভদ্রে। যতদূর মনে পড়ে এরিয়ানের অমল ভৌমিককে প্রথম দেখেছি কাট করে ভিতরে ঢুকতে। চল্লিশের শীল্ড ফাইনালে ওই ভাবেই ভিতরে ঢুকতেন তিনি মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন। অত মোহনবাগানের লেফট আউট নির্মল মুখার্জীর ঝোঁক ছিল সেণ্টার করার দিকে। তবে নির্মলের বাঁ পায়ের শট ছিল দারুণ জোরালো। ই বি আর-এর (তখন নাম ছিল বি অ্যান্ড এ রেলওয়ে) এস নন্দী দুই উইংয়ে ছিলেন সমান দক্ষ। কাটও করতেন। আবার সেণ্টারও করতেন। ড্রজের চতুরি এবং গতি ও শক্তির মিশ্রণে এক সময়ে শ্রেষ্ঠ উইঙ্গারের সম্মান পেয়েছিলেন। নায়ার লেফট আউটে যতখানি সফল তার চেয়ে বেশি সফল পরবর্তীকালে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলে। উইঙ্গার হিসাবে নায়ারের প্লাস পয়েণ্ট ছিল তাঁর বাঁক খাওয়ানো জোরালো শট এবং শটের নিখুঁত নিশানা। কর্নার ফ্ল্যাগের কাছাকাছি জায়গা থেকে শট করেও ওই কারণে অনেক গোল পেয়েছেন। বি অ্যান্ড এ রেলের আলাউদ্দিনের গতি ছিল সব চেয়ে ক্ষিপ্র। বোধ হয় এখনকার বিদেশ বসুর চেয়েও দ্রুত দৌড়তে পারতেন বল নিয়ে। কিন্তু গতির চমক ছাড়া অন্য গুণ ছিল না তারিফ করার মতো। ইস্ট-বেঙ্গলের সুশীল চ্যাটার্জি এবং মোহনবাগানের এ দাশগুপ্তও লেফট আউটে ভাল খেলে গেছেন। রমন সত্যিকারের ট্যালেন্টেড লেফট উইঙ্গার। অসম্ভব বল কন্ট্রোল এবং পায়ে ছিল আচমকা জোরালো শট। খেলার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ ফুটে উঠত। বিপক্ষকে সব সময় চিন্তিত থাকতে হত রমনকে নিয়ে। লেফট আউটে খেলেও রাজস্থান ক্লাবে কিছুটা প্লেমেকারের ভূমিকা নিতে শুধু রমনকেই দেখেছি। পাকিস্তান থেকে এসে মাসুদ ফাকীর দু সিজন ইস্টবেঙ্গলে এবং এক সিজন মহমেডানে খেলে স্মরণীয় হয়ে আছেন। স্টেপিং ছিল দেখার মতো। বাঁ পায়ে ছিল অভ্রান্ত রকেটের মতো

শট। জিরো অ্যাংগেল থেকেও গোল করতে দেখেছি। হেডও করতেন ভাল। পরবর্তীকালে মোহনবাগানের প্রণব গাংগুলী স্বল্পকালের মধ্যে সুনাম কুড়িয়েছেন ভল স্টোপিং ও সোয়ার্ভ শটে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে নায়ারের পরিপূরক হন সালে এবং সালের পরে খেলেন ফ্লাকার। বাঁ পায়ের দুই উইংগারের মধ্যবর্তী না বছর সালে ছিলেন দু পায়ে প্রায় সমান দক্ষ উইংগার। অন্য গুণ ছাড়াও সালের যেটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তা হচ্ছে তার অপূর্ব বল রিসিভিং এবং চলতি বলে জোরালো শট। অত ভাল রিসিভিং কোনো উইংগারের মধ্যে দেখিনি। বল রিসিভের জাদুতেই বিপক্ষ ট্যাকলারকে তিন-চার গজ পেছনে ফেলে দিতেন। তারপর বল নিয়ে ছুটতেন বিদ্যুৎ গতিতে। চলতি বলে চমৎকার টাইমিংয়ে শট নিতেন। ডিফেন্স চিরে এগিয়ে যাবার ঝোঁক এবং ক্ষমতা তাঁকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে স্থান করে দিয়েছিল। খেলার মধ্যে ছিল শিল্পের ছাপও তবে ছোট টানে হরজিন্দার সিংয়ের ছন্দ-সুখ সালে দিতে পারেননি। দলের প্রয়োজনে এবং জয়ের প্রয়োজনে কিন্তু সালের স্থান ছিল অনেক উপরে।

ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে অসাধারণ লেফট উইংগার ছিলেন ক্যালকাটা ক্লাবের নাইট। পরলোকগত ক্রীড়া সাংবাদিক চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় নাইটের জন্য ক্যালকাটা ক্লাবের প্রেমে পড়েছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি সালের নাম দিয়েছিলেন "কালো নাইট"।

মুকুল

কলকাতা ফুটবলের আদি পর্ব

পরেশ নন্দী

এক রাতের অন্ধকারে মাঝ গংগাতে এসে নোঙর করল দুটি পাল-তোলা জাহাজ। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে জাহাজ দুটি এসেছিল ইংলণ্ড থেকে।

পরদিন প্রভাতে—

ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার সংগে সংগেই ডিঙি নৌকো বোঝাই করে নাবিকের দল এসে উঠল তীরে। বেশীর ভাগই দল বেঁধে ছুটল পানশালার উদ্দেশ্যে। একটি দল কিন্তু বেশী দূরে গেল না। গংগার ধারেই পুরোনো কেল্লার কাছাকাছি ময়দানের এক অংশে তারা মেতে উঠল ফুটবল খেলা নিয়ে।

এবার তারা সংগে এনেছে ফুটবল। তাই নিয়ে শুরু হল তাদের লাথালাথি, দাপাদাপি। তাদের হই-হল্লা এবং কলরবে আকৃষ্ট হয়ে কেল্লা থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এল কিছু সৈনিক। তারাও মেতে উঠল একই ফুটবল নিয়ে। ময়দানের বুকে জমে উঠল অজানা ফুটবল খেলার প্রথম আসর। সেই হল ভারত ভূ-খণ্ডে ফুটবলের প্রথম আবির্ভাব।

এভাবেই শীত ও বরফের দেশ জন্মস্থান ইংলণ্ড থেকে ফুটবল এল বর্ষামুখর বঙ্গদেশে। শীতের দেশের অত্যন্ত নিজস্ব একটি আনন্দের বীজ পড়ল গরম দেশের মাটির বুকে। অঙ্কুরিত হল অচিরেই এবং পল্লবিতও হল যথাসময়ে। কালক্রমে রূপে, রসে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ঐ বিদেশী ফুটবলই হয়ে উঠল আমাদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় খেলা।

তবু ইংরাজ এবং ইংরাজের খেলা ফুটবল কিন্তু একই সংগে আসেনি আমাদের দেশে। ইংরাজ এসেছিল বাণিজ্য করতে এবং প্রথমে নেমেছিল সুরাটে। তারপর নানা ঘাটের জলে নাকানি-চোবানি খেয়ে ইংরাজরা এসে স্থিতিলাভ করল জব চার্ণকের কলকাতাতে। তখনই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরও পত্তন হল। আস্তে আস্তে করতলগত হল বাংলা, বিহার এবং ওড়িশার দেওয়ানি। ঐ সময়েই মানদণ্ডও রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করল। হল পলাশীর যুদ্ধ এবং সর্বশেষে ভিক্টোরিয়া হলেন ভারত সম্রাজ্ঞী।

বিলেত থেকে তখন ছোকরা রাইটার্স আসছে দলে দলে। সৈনিক এবং নাবিকেরাও আসছে জাহাজ বোঝাই হয়ে। এ পরিস্থিতিতে কলকাতার ইংরাজদের অবসর বিনোদনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। সে সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্যই হল ফুটবলের সূচনা। পরিকল্পিত কিছু নয়। চোখে পড়ার মতও কিছু নয়। তার আগে ফুটবলের জন্য কখনও সখনও তাদের মন হয়ত কেমন করত। কিন্তু তখন বলে লাথি দেবার মত শক্ত মাটি তাদের পায়ের নীচে ছিল না।

সৈনিক এবং নাবিকেরাই এ খেলা শুরু করেছিল আমাদের দেশে। তারাই প্রথম ফুটবল কীর্তনের আসর বসিয়েছিল। তারাই প্রথম ফুটবল প্রতিমার কাঠামো গড়েছিল। রাইটার্স এবং সদাগারি অফিসের তরুণ সাহেবরাও শীঘ্রই খোল করতাল নিয়ে দেখা দিলেন এ আসরে। তারা ফুটবল প্রতিমার গায়ে মাটি লাগালেন, খড়ি মাখলেন। কিন্তু আমাদের ফুটবলের প্রকৃত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হল যেদিন ভারতীয়েরা নিজস্ব রং মাখিয়ে প্রতিমাকে করে তুললেন শ্রীময়ী। ফুটবলের আনন্দ-ঘন রসের ঘট প্রতিষ্ঠা হল যেদিন ভারতীয়েরা এ বিদেশী খেলাতে উড়িয়ে দিলেন নিজেদের বিজয় কেতন। সেদিন মৃণ্ময়ী হল চিন্ময়ী। সেদিন থেকেই অচেনা খেলা হয়ে গেল অত্যন্ত চেনা এবং বিদেশী খেলার আসর জম-জমাট হয়ে উঠল স্বদেশের মাঠে।

ফুটবলের বোধন থেকে 'জয়ং দেহি' মন্ত্র উচ্চারণ পর্যন্ত নিশ্চয়ই কিছু সময় লেগেছিল। তবে খুব বেশী দিন লাগেনি। সে হিসাব করব যথা সময়ে এবং যথাস্থানে। এখন বলছি প্রথম দিকে ইংরাজদের ফুটবলের লালন পালন এবং পরিচর্যার কথা। তাঁরা করেছিলেন অনেক কিছু, কিন্তু ফুটবলকে তাঁরা রেখে দিয়েছিলেন 'সাদা' গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে। অবশ্য ফুটবলকে ভারতীয় স্পর্শের কালিমা মুক্ত রাখার সে প্রচেষ্টা লক্ষ্মণের গণ্ডী টেনে সীতাকে রক্ষার চেষ্টার মতই ব্যর্থ হয়েছিল।

শুরু করেছিল নাবিকেরা এবং সৈনিকেরা। তারপর কিন্তু ফুটবল যেতে উঠেছিল বে-সামরিক সাহেবদের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাদেরই আগ্রহে এবং প্রশ্রয়ে পরিপুষ্ট হল ফুটবল। কলকাতাতে এ নূতন খেলার গোড়া পত্তনের কৃতিত্ব সম্পূর্ণই তাদের প্রাপ্য। তখন অবশ্য ফুটবল ছিল নিতান্তই বিদেশীদের বিলাস ব্যসন। সাহেবদের খেলা, সাহেবরাই খেলতেন এবং খেলতেন কেবল নিজেদের মধ্যে। সে যুগে কলকাতার ফুটবল একেবারেই সাদা। এসব খেলা ছিল নিতান্তই খেলা-খেলা। সে সময়ের খেলাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন প্রশ্নই ছিল না। ফুটবল খেলাটাই ছিল বড় কথা।

এমন খেলাও কলকাতাতে প্রথমে কবে এবং কখন আরম্ভ হয়েছিল তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবু প্রাপ্তিকথাতে জানা যাচ্ছে যে, কলকাতার সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা হয়েছিল ১৮৫৪ সালে। খেলাটি হয়েছিল মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। ক্রীড়াঙ্গণ ছিল এসপ্লানেড। সে খেলাতে পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ ছিল 'ক্যালকাটা ক্লাব অব সিভিলিয়ান্স' এবং 'জেন্টেলম্যান অব ব্যারাকপুর'। ফুটবল পুরাণের এ প্রথম কাহিনীর স্থান, কাল এবং পাত্রের উল্লেখ থাকলেও খেলার ফলাফল সম্বন্ধে কিন্তু কোন কথাই নেই। এটি নাকি ছিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রথম খেলা। সে সংবাদপত্রের অবশ্য এখন কোন অস্তিত্ব নেই।

১৮৫৪ সালের পর দীর্ঘ চৌদ্দ বছর কলকাতাতে আর কোন ফুটবল খেলার কথা শোনা যাচ্ছে না। আবার অনেক দিন পর—সংবাদপত্রে ফুটবল খেলার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে এবং এ খেলাটি সম্বন্ধে অনেক বিশদ তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৬৮ সালের খেলাটি হয়েছিল 'ইটোনিয়ানস্' এবং 'অবশিষ্ট' দলের মধ্যে। এটি নাকি সত্যই 'সিরিয়াস' খেলা ছিল। 'সিরিয়াস' কথাটির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। এ সময়ের মধ্যে কলকাতার ফুটবল খেলা-খেলার গণ্ডী অতিক্রম করেছে। এখন প্রতিযোগিতার স্পর্শে ফুটবল কিছু সবল হয়ে উঠেছে। আলোচ্য খেলাটিতে 'ইটোনিয়ানস্' দল ৩—০ গোলে বিজয়ী হয়েছিল। বিজয়ী দলের হয়ে দুটি গোল বরার্ট ভ্যানসিটার্ট এবং তৃতীয় গোলটি করেছিলেন জনৈক গ্রান্ট। বর্তমান বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের সংলগ্ন দক্ষিণে ভ্যানসিটার্ট রো অতীতের সে খেলোয়াড়েরই নামাঙ্কিত।

১৮৭০ সালেও একটি খেলার কথা শোনা যায়। সে খেলাটিও হয়েছিল এসপ্লানেডে, 'পাবলিক স্কুল' এবং 'প্রাইভেট স্কুল' দলের মধ্যে। 'পাবলিক স্কুল' দল গঠিত হয়েছিল ইটন, হ্যারো এবং উইনচেস্টার বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে। 'প্রাইভেট স্কুল' দলে ছিল মিস টিনার স্কুলের পড়ুয়ারা। ঐ মিস টিনা যে কে তা সঠিক জানা যায় না। তবে পুরোনো কলকাতার নথিপত্রে সে সময়ে পার্ক স্ট্রীটে মিস টিনা নাম্নী এক মহিলা পরিচালিত একটি 'ফিনিসিং স্কুলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ঐ সময়ের আরো দুটি খেলার কথাও জানা যাচ্ছে। একটি খেলা হয়েছিল আই সি এসদের নিয়ে গঠিত একটি দল এবং ট্রেডাস দলের মধ্যে। দ্বিতীয় খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটি সৈনিক দল এবং অবশিষ্ট দলের মধ্যে। সে খেলাতে সৈনিক দল জিতেছিল ৪—০ গোলে।

এ সময়েই ব্যবসা বাণিজ্যের সংগে সংযুক্ত সাহেবদের আগ্রহে কলকাতার প্রথম ফুটবল ক্লাব গঠিত হল ১৮৭৬ সালে। নাম হল ট্রেডস ক্লাব। তখন ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশনের সদর দপ্তর ছিল ডালহৌসি ইন্সটিটিউট। তাই ট্রেডস ক্লাব নামে জন্ম হলেও এ ক্লাব পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হল ডালহৌসি অ্যাথলেটিক ক্লাব নামে। কলকাতার প্রথম সংগঠিত ক্লাবের সম্মান পেল ডালহৌসি ক্লাব। কিন্তু প্রসংগত বলা যেতে পারে যে, তদানীন্তন নৈকষ্য কুলীন সাহেবরা যদি ফুটবল সম্বন্ধে এমন উদাসীন না হতেন তাহলে হয়ত এ সম্মান ক্যালকাটা ক্লাবের ভাগ্যেই জুটত। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব প্রথম গঠিত হয়েছিল ১৮৭২ সালে। এ হিসাবে তারা ডালহৌসি ক্লাবের অগ্রজ; বয়সে চার বছরের বড়। কিন্তু ক্যালকাটা তখন কেবল রাগবি খেলত। রাগবি-প্রা... সে ক্যালকাটা ক্লাব ভেঙে গেল ১৮৭৬ সালে। তারপর ১৮৮৪ সালে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব পুনর্গঠিত হল। এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন মি (পরে—স্যার) মর্টিমার ডুরাণ্ড—ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যিনি আজও স্মরণীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর আশীর দশকে সংগঠিত ফুটবলের প্রসার হল বিস্ময়কর। ১৮৮০ সালে জন্ম নিল আর্মেনিয়ান ক্লাব। ১৮৮৪ সালেই গঠিত হয় ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স, বর্তমানে যার নাম রেঞ্জার্স ক্লাব। এ সময়েই সাহেবদের আর একটি ক্লাব হয় গংগার ওপারে। কুঠিয়াল সাহেবরা হাওড়া ইউনাইটেড নাম দিয়ে গঠন করলেন একটি ক্লাব।

পর পর এতগুলি ক্লাব গঠনের ফলে কলকাতার ইংরাজ ফুটবল মহলে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হল ফুটবলের কিন্তু সামগ্রিক বিচারে ফুটবল তখনও পর্যন্ত হয়ে রইল বিদেশীদের বিলাস। আশীর দশকের শেষ দিকেও ফুটবল রইল সংকীর্ণ সাদা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ—একেবারেই সাদা।

সাহেবেরা ফুটবল খেলে ময়দানে। স্থানীয় লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখে নূতন খেলা; তারিফ করে অবাক বিস্ময়ে। কেউ কেউ আবার বিহ্বল কণ্ঠে

এবং বিস্ফারিত নেত্রে বলে, 'পশ্য! পশ্য! বায়ু-বিস্ফারিত চর্ম-গোলকটি সংহত পদাঘাতে ভীম বেগে কেমন ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত।'১ স্থানীয় যুবকেরা মুগ্ধ চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকে মাঠের ধারে। সাহেবরা এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা বল নিয়ে দাপাদাপি মাতামাতি করে মাঠে। দেখে দেখে তাদের ধমনীতেও রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। চিত্ত আত্মহারা হয়।

এভাবে দেখতে দেখতেই বাঙ্গালী ছেলেরাও একদিন আরম্ভ করল ফুটবল খেলতে। দ্বিধায় জড়িত পদে এগিয়ে আসা বাঙ্গালী ফুটবলের তখন 'ন যযৌ, ন তস্থৌ' অবস্থা। মাঠ ছেড়ে যেতে পা ওঠে না, অথচ মাঠে টিকে থাকার মত শক্তি নেই। যুগ-ধর্মে শীঘ্রই এ দ্বিধা কেটে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাঙ্গালীর জীবনে সর্বক্ষেত্রে নূতনের আহ্বান। 'তখন নূতন কালের প্রথম প্রহর। অনেক পাখির মেলা আকাশে, কাকলি তার ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। বাঙ্গালী তখন নূতন মন্ত্র, নূতন তন্ত্রে জীবন-যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে। বাংলা তখন বানের জলে ভরেছে। বান এসেছে ইউরোপ থেকে।'২ সে বানের তোড়ে সব বাঁধ ভেঙ্গে ফুটবলও প্রবেশ করল বাংলার মাঠে এবং বাঙ্গালীর জীবনে।

কেউ কিন্তু তাদের 'এসো' বলে আহ্বান জানাল না। নূতন খেলাতে হাতেখড়ি দেবার জন্য এগিয়ে এলেন না কোন বিদেশী বিশেষজ্ঞ। গজিয়ে উঠল দিশী পণ্ডিতমশাই। এগিয়ে এল ইংরেজী শিক্ষিত ছাত্রের দল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ-সর্বাধিকারী। তাঁরই আগ্রহে এবং চেষ্টাতে গঠিত হল প্রেসিডেন্সি কলেজ ফুটবল ক্লাব। স্কটিশ চার্চ কলেজের দলও হল শীঘ্রই। কিন্তু শুধু কলেজ দলে খেলার সুযোগ বড়ই সীমায়িত। কলেজের বাইরে আছে বৃহত্তর বাঙ্গালী যুবা-সমাজ। তাদের আগ্রহেই ১৮৮৪—১৮৮৫ সালে আগুপিছু করে সৃষ্টি হল ওয়েলিংটন, শোভাবাজার, ন্যাশনাল, কুমারটুলি মহমেডান স্পোর্টিং এবং টাউন ক্লাব। এ কয়টি ক্লাবের সম্মিলিত প্রয়াসেই সূচনা হল বাঙ্গালী তথা ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতি। তবু এ কয়টি ক্লাব ছিল আমাদের ফুটবল আকাশে নক্ষত্র মাত্র। সূর্য এবং চন্দ্রের উদয় হল ১৮৮৯ সালে। তখন জন্ম হল মোহনবাগান এবং এরিয়ানস ক্লাবের।

এ ভাবেই ফুটবল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল ভারতীয়েরা। ফুটবলে দেখা গেল অক্ষম অনুকরণের একটি ক্ষীণ স্রোত-ধারা। এ সময় দুটি পৃথক কিন্তু সমান্তরাল স্রোতে প্রবাহিত হল কলকাতার ফুটবল। সাদারা খেলে সাদাদের সঙ্গে। বাঙ্গালীরা খেলে নিজেদের মধ্যে। সাদা ফুটবল তখন গর্বিত ও উদ্ধত; কালো ফুটবল উপেক্ষিত ও অবহেলিত। সাহেবরা বিদ্রূপ করে বলে 'বাবু' ফুটবল। সাদা ফুটবলের গায়ে জেল্লা, বল-দৃপ্ত তাদের বিবরণ। আমাদের নিজস্ব ফুটবলের তখন চলেছে নীরব সাধনা।

পরিস্থিতি যখন এমন তখনই আমাদের ফুটবলে আবির্ভাব হল তিনজন স্মরণীয় ব্যক্তির। এখন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে তাঁদের উদ্দেশ্যে। আমাদের ফুটবলের ঊষা-লগ্নে এ তিন ব্যক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে প্রতিভাত হলেন। তাঁরাই ধারক, বাহক এবং পরিপালক হয়ে ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন সার্থকতার পথে। নগেন্দ্রপ্রসাদের নাম আগেই করা হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন তাঁরই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হরিদাস শীল। তিনি ছিলেন কুমারটুলি ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সর্বাপেক্ষা বরণীয় হলেন কালীচরণ মিত্র। তিনি ছিলেন শোভাবাজার ক্লাবের প্রাণ-ভোমরা। খেলোয়াড় হিসাবে ছিলেন চমৎকার সুনামের অধিকারী এবং সংগঠনেও ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা। প্রথম দশ বছর তিনি একটানা শোভাবাজার ক্লাবের অধিনায়ক ছিলেন। আই এফ এ কাউনসিলের প্রথম ভারতীয় সদস্যও ছিলেন কালীচরণ মিত্র। একই সঙ্গে প্রণাম জানাতে হবে ন্যাশনালের মন্মথ গাঙ্গুলির উদ্দেশ্যে। তিনিই সর্বপ্রথম আই এফ এর ভারতীয় সহ-সেক্রেটারী হয়েছিলেন।

শ্রদ্ধা তর্পণ করে ফিরে আসি আবার ফুটবলের কথাতেই। দল গঠন হল কয়েকটি এবং গজিয়ে জুটে গেল একাধিক। কিন্তু খেলছে বাঙ্গালীরা কার সঙ্গে? নিজেদের মধ্যে খেলা ছাড়া তাদের আর কোন গতি নেই। সাহেবরা ফিরেও তাকায় না তাদের দিকে। কিন্তু কালীচরণের অক্লান্ত চেষ্টাতে এ অবস্থারও কিছু সুরাহা হল। 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়', এ আপ্ত বাক্য সম্বল করে তিনি সামরিক ও বে-সামরিক সাহেব দলগুলির দরজাতে মাথা খুঁড়তে লাগলেন। একবার কেল্লার বাফ রেজিমেন্টের প্রথম দলটিকেই তিনি সমরে আহ্বান করলেন। ইংলিশম্যান বিদ্রূপ করে লিখলেন, 'শোভাবাজার দল নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে। নইলে আজ সন্ধ্যাতে তারা বাফ রেজিমেন্টের শক্তিশালী দলকে তাঁদের বিরুদ্ধে খেলতে অনুরোধ করত না। সৈনিক দলের কর্তৃপক্ষ অবশ্য বুঝিয়ে বলেছিলেন যে পূর্ণশক্তিসম্পন্ন দলের বিরুদ্ধে না খেলে একটি কোম্পানি দলের সঙ্গে খেললেই ভাল হবে। শোভাবাজার তা শুনতে নারাজ। আজকের খেলাতে যে রেকর্ড গোল হবে ঐ অনুমান অসঙ্গত নয়।' সে খেলাতে শোভাবাজার ৪—০ গোলে হেরেছিল।

কালীচরণবাবুর এ প্রকার নিরলস চেষ্টাতে সাদা এবং কালো ফুটবলের ব্যবধান কিছু সংকুচিত হল। আর এ সমস্ত খেলার মাধ্যমেই সহজাত প্রতিভার সাহায্যে নন্দপদ ক্রীড়াশৈলী দিয়ে বাঙ্গালীরা ফুটবলে সঞ্চারিত করল এক নূতন রূপ, নূতন রস। কায়েমি হল 'বাবু' ফুটবল। 'বাবু' ফুটবল অর্থাৎ নন্দপদ খেলা।

এ ভাবেই এসে গেল ১৮৮৯ সাল—কলকাতা ফুটবলের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এ বছরেই হল ট্রেডস কাপের সূচনা; শুরু হল প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল। ট্রেডস কাপের জন্ম-বৃত্তান্তের একটি বিবরণ দিয়ে ইংলিশম্যান লিখেছিলেন, 'কলকাতার ইংরাজ বণিকেরা প্রশংসনীয় ফুটবল প্রীতির পরিচয় দিয়ে ৫০০ টাকা মূল্যের একটি সুদৃশ্য কাপ ডালহৌসি ক্লাবের হাতে অর্পণ করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। এ কাপটিকে উপলক্ষ করে বর্তমান মরসুম থেকেই আইন অনুসারে গঠিত সমস্ত ক্লাবের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। কোন ক্লাব যদি একাদিক্রমে তিনবার অথবা সব সুদ্ধ চার বার এ প্রতিযোগিতাতে বিজয়ী হতে পারে তবে এ কাপটি সে দলের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে। এ প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি দলের একজন করে প্রতিনিধি এবং ডালহৌসি ক্লাবের দুজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে।'

কলকাতা ফুটবলের সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতা হিসাবে ট্রেডস কাপের একটি অক্ষয় সম্মানের আসন আছে। কিন্তু ট্রেডস কাপের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে এটি হল কলকাতা তথা ভারতের সর্বপ্রথম উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা। প্রথম বছরে এ প্রতিযোগিতাতে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছিল ডালহৌসি দল। কিন্তু পরে ফুটবল ভক্তদের অধিকতর আগ্রহের সঞ্চার হবে একমাত্র ভারতীয় প্রতিযোগী শোভাবাজারকে কেন্দ্র করে। শক্তিহীনতা সম্বন্ধে আত্ম-সচেতন ভারতীয় দলগুলি প্রথম বছর এ প্রতিযোগিতাতে অংশ গ্রহণ করতে সাহসী হল না। কিন্তু মাথা উঁচিয়ে, বুক চিতিয়ে সবে-ধন নীলমণি শোভাবাজারের হাত ধরে এগিয়ে এলেন কালীচরণ মিত্র।

কলকাতার সর্বপ্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম একটি ভারতীয় দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা! ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতির ইতিহাসে এ খেলাটির বিশেষ গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ট্রেডস কাপের উদ্বোধনী বৎসরে শোভাবাজারের খেলাটি হয়েছিল ১১ জুলাই ডালহৌসি মাঠে। প্রতিপক্ষ ছিল সেণ্ট জেভিয়ার্স দল। খেলাটি সম্বন্ধে ইংলিশম্যান লিখেছিলেন, "মাঠ ছিল পিচ্ছিল। তবু এক সময়ে মনে হল যে শোভাবাজার দলই প্রথম গোল করেছে। কিন্তু সেণ্ট জেভিয়ার্স দলের প্রতিবাদে সে গোল নাকচ হল। প্রথমার্ধে খেলায় আর কোন গোল হল না। বিরতির পর সেণ্ট জেভিয়ার্স তীব্রভাবে আক্রমণ করল। এ সময়ে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের জন্য নর্ম্যান প্রিচার্ড সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁরই করা উপর্যুপরি তিনটি গোলে কলেজ দল জয়লাভ করে। তবু শেষ পর্যন্ত শোভাবাজার খেলাতে প্রশংসনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ করে।" উল্লেখ্য নর্ম্যান প্রিচার্ড এ দেশের ফুটবলে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন।

সে ঐতিহাসিক খেলাতে শোভাবাজার দলে খেলেছিলেন, গোল: গ্যালিয়ট, থ্রি-কোয়ার্টার ব্যাক: কে মিত্র (অধিনায়ক), মতিলাল ও দাশ; হাফব্যাক: এম দাশ ও চৌধুরী; ফরোয়ার্ড: ডি দাশ, বি সর্বাধিকারী, ইউ ব্যানার্জি, এম বিদ ও মিত্র।

সেদিন হেরে গিয়েছিল শোভাবাজার! কিন্তু সে সময়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন ফুটবল প্রতিযোগিতাতে যোগদানও কম কথা ছিল না। এ অসীম সাহসের পুরস্কার পেল শোভাবাজার কয়েক বছর পর। তখন তারা করল এক অসাধ্য সাধন—হারিয়ে দিল একটি সৈনিক দলকে। কিন্তু আরো কিছু আগে, ১৮৯৩ সালে আই এফ এ গঠিত হল এবং সূচনা হল আই এফ এ শীল্ডের খেলা। একই সঙ্গে শুরু হল কোচবিহার কাপ প্রতিযোগিতা। কোচবিহার কাপ ছিল কেবল ভারতীয় দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা। তাই তদানীন্তন সব কয়টি ভারতীয় দলই এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করত। মোহনবাগানও প্রতিযোগিতামূলক খেলাতে প্রথম অংশ-

ট্রেডস কাপের প্রথম বিজেতা ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন
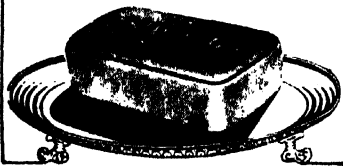
প্রকাশ করেছিল উদ্বোধনী বৎসরের কোচবিহার কাপের খেলাতেই।

আমরা এতক্ষণে ফুটবলের অজানা যুগের প্রথম পদ-ধ্বনি থেকে ইতিহাসগ্রাহ্য ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে ১৮৮৯ সালের ট্রেডস কাপ এবং পরে ১৮৯৩ সালের কোচবিহার কাপের সাঁকো বেয়ে পৌঁছে গিয়েছি আই এফ এ শীল্ডের প্রথম বছরের আসরে। এখন সেদিকে একটু নজর দিলে অন্যায় হবে না।

আই এফ এ শীল্ডের সূচনা হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। সে অবশ্য অনেকদিনের কথা। প্রধান উদ্যোক্তা হলেন ডালহৌসি ক্লাবের সি এ বি ব্রাউন এবং মিঃ আর সি লিন্ডসে। তাঁদের সঙ্গে কাঁধ মেলালেন শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। তখন ১৮৯২ সাল। এ তিন ব্যক্তি পরামর্শ করে স্থির করলেন যে প্রথমে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মর্যাদার উপযুক্ত একটি ট্রফির বন্দোবস্ত করতে হবে। স্থির হল যে, একটি প্রকাণ্ড শীল্ডই হবে ঐ প্রতিযোগিতাতে বিজয়ীর উপযুক্ত পুরস্কার। এখন কর্মকর্তাদের সামনে দেখা দিল দুটি সমস্যা। প্রথম, শীল্ডের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ এবং দ্বিতীয়, নূতন প্রতিযোগিতার একটি লাগসই নামকরণ। আনন্দের কথা যে ১৮৯২ সালেও উদ্যোক্তারা এ প্রতিযোগিতাকে কোন ব্যক্তি বিশেষের নামাঙ্কিত করার চিন্তা করেন নি। অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলের আইন অনুসারে সব ভারতীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এ প্রতিযোগিতা। তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন শীল্ডই (আই এফ এ শীল্ড) হবে সঠিক ও সার্থক নাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবে যে কমিটি তার নাম হল 'ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।'

দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান হল আগে। অতঃপর কোচবিহার এবং পাতিয়ালার মহারাজার বদান্যতায় এবং মিঃ আপকার ও মিঃ সাদারল্যান্ডের দাক্ষিণ্যে অর্থ সমস্যারও সমাধান হল। তখন কলকাতার মেসার্স ওয়াল্টার লক এন্ড কোং-র মাধ্যমে লন্ডনের মেসার্স এলকিংটন এন্ড কোং-র সঙ্গে শীল্ড তৈরীর জন্য চুক্তি হল। কথা হল, লন্ডনের কোম্পানী ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি শীল্ড কলকাতায় পৌঁছে দেবে। তাই ১৮৯৩ সালের জুন মাসেই সংবাদপত্রসমূহে মিঃ ব্রাউনের স্বাক্ষরে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল। উদ্যোক্তারা ভাল করেই জানতেন যে প্রথম বৎসরে ডুরান্ড ছেড়ে কোন সৈনিক দলই নূতন প্রতিযোগিতায় খেলতে কলকাতা আসবে না। মহম্মদ পর্বতের কাছে যাবেন না, তাই পর্বতকেই আসতে হবে মহম্মদের কাছে। মতলব হল যে প্রথম বছরের শীল্ড প্রতিযোগিতা পরিচালিত হবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে। অর্থাৎ শীল্ডকে নিয়ে যাওয়া হবে সৈনিক দলের কাছে। স্থির হল, কলকাতা এবং লক্ষ্ণৌ—এই দুই অঞ্চলে শীল্ডের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলাগুলি হবে। দুই আঞ্চলিক বিজয়ী দলের মধ্যে চরম খেলাটি হবে কলকাতায়।

অতঃপর স্টেটসম্যান সংবাদ দিলেন, 'শীল্ড প্রতিযোগিতায় এখন পর্যন্ত ছয়টি স্থানীয় দল (শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছিল নয়টি দল) নাম পাঠিয়েছে। এর মধ্যে আছে ভারতীয় দল শোভাবাজার।' সাবাশ শোভাবাজার! ফুটবলের সে আদি যুগে শোভাবাজারই ছিল বাঙ্গালী ফুটবলের যোগ্যতম প্রতিনিধি। বহিরাঞ্চলের পাওয়া গেল মাত্র চারটি দল—রয়্যাল, আইরিশ, অকসফর্ডশায়ার, ইস্ট ল্যাংকাশায়ার এবং আর্নল্ড এণ্ড সাদারল্যাণ্ড।

প্রথম বছরের শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা শুরু হয়েছিল ৬ই আগস্ট। এত দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সে সমস্ত খেলার বিস্তারিত বিবরণের কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। তবু শোভাবাজারের খেলাটির কথা একটু বলতেই হবে। শোভাবাজারকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী ফুটবল রসিপিপাসুদের বিশেষ কোন আশা নিশ্চয়ই ছিল না। তবু ঘরের ছেলেরা শীল্ডে খেলছে এবং খেলছে একটি সৈনিক দলের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মদত জোগাতে মাঠে এসে-

ছিল বেশ কিছু লোক। "ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স মাঠে শোভাবাজার এবং ৫ম রয়্যাল আর্টিলারি দলের মধ্যে খেলাটি দেখতে", লিখলেন স্টেটসম্যান, "এসেছিল একটি ক্ষুদ্র জনতা। তবে যেমন আশা করা গিয়েছিল, এ খেলাতে সৈনিক দল ৩—০ গোলে বিজয়ী হয়েছে। প্রথমার্ধে স্মিথ ও ম্যাকডোনাল্ড দুটি গোল করলে বিরতির পর ফোমাস তৃতীয় গোলটি করে।" এদিন শোভাবাজার দলে খেলেছিলেন :
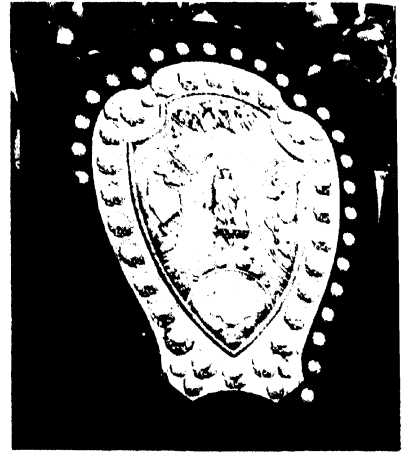
ডি চৌধুরী, মতিলাল ও বি সর্বাধিকারী, এম দাশ, কে মিত্র (অধিনায়ক) ও এ পাল, ইউ ব্যানার্জি ডি দাশ, সিংহ, কে ব্যানার্জি ও নিকলস।

শোভাবাজার বিজয়ী রয়্যাল আর্টিলারি দল কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থানীয় অঞ্চলের বিজয়ী হয়ে ফাইনালে উঠেছিল। লক্ষ্ণৌ অঞ্চল থেকে ফাইনালে উঠল রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস। উদ্বোধনী বৎসরের আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল—সবপ্রথম এবং সর্বনূতন। সংগ্রাম করবে দুটি সামরিক দল। যোগ্যতর দলের জয়লাভের মাধ্যমে সূচনা হবে শীল্ডের জয়যাত্রার।

এল সে দিন। ফাইন্যাল খেলা হল ২রা সেপ্টেম্বর, শনিবার। খেলা হল ডালহৌসি মাঠে। লোক হয়েছিল মাত্র দশ হাজার। কিন্তু ১৮৯৩ সালে ফুটবল মাঠে তাই ছিল প্রচণ্ড ভিড়। ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ লিখেছিলেন, "বিকাল সাড়ে চারটাতেই চার আনা মূল্যের আসনগুলি ভর্তি হয়ে গেল। পাঁচটার সময় মাঠের দড়ির পাশে দাঁড়াবার আর কোন জায়গাই নেই। জায়গা নেই, তবু জন-সমাগমের শেষ নেই। চার পাঁচ পংক্তি গভীর হয়ে শেষ পর্যন্ত লোক দাঁড়াল দড়ির পাশে—ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি।"

সর্বপ্রথম শীল্ড ফাইন্যালে আবহাওয়া হল শোচনীয়। সকালের দিকে বৃষ্টি নামল অঝোরে। একটানা চার ঘণ্টা বৃষ্টি হল। সেদিন বরুণদেব সত্যই বড় অকরুণ হয়েছিলেন। স্টেটসম্যান মন্তব্য করেছিলেন, "জুপিটার প্লুভিয়াসের ভ্রূকুটিতে ফাইন্যাল খেলাটির সব সৌষ্ঠব নষ্ট হয়ে গেল। উচ্চ মানের খেলার আর কোন আশাই রহিল না।' পিচ্ছিল ডালহৌসি মাঠে খেলাটি হল নিতান্তই শ্লথগতি এবং শেষ পর্যন্ত শেষ হল ১—১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে। রয়েল আইরিশ অবশ্য প্রথমার্ধে ১—০ গোলে এগিয়ে ছিল।

প্রথম দিনের অমীমাংসিত খেলার পর কলকাতায় সাইক্লোনের ভাব দেখা দিল। ৬ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে ফাইন্যাল খেলার পুনরুত্থান সম্ভব হল না। সেদিন কিন্তু আবহাওয়া হল সুন্দর এবং খেলাও হল চমৎকার। শেষ পর্যন্ত রয়্যাল আইরিশ বিজয়ী হল খেলার একটি মাত্র গোল করে।

সবই হল, কিন্তু "হিপ, হিপ, হুররে" কই? সাড়া নেই, শব্দ নেই! বিজয়ী দলের ব্যাপারে চেঁচামেচির

ছায়া। মাঠে শীল্ড নেই। তবে কি খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে লক্ষ্মৌ? কর্তৃপক্ষ প্রচুর ক্ষমা প্রার্থনা করে নিবেদন করলেন যে, শীল্ড তৈরী হতে সময় লাগবে আরো দুমাস। এ পরিস্থিতিতে শেষ রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন জনৈক ক্যাপ্টেন উইলিয়ামস। তিনি বিজয়ী দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের হাতে তুলে দিলেন ফিকে নীল রং-এর ফিতে বাঁধা একটি করে রুপোর মেডেল। মেঘের কোলে রোদ উঠল। সরব হল মাঠ—"হিপ, হিপ, হুর্রে" থ্রি চিয়াস ফর"— এ ঘটনা থেকেই ভারতীয় ফুটবলের ব্লু রিব্যান্ড বলে খ্যাত হল আই এফ এ শীল্ডের।

এখন আমরা অজানা এবং অল্প-জানা ফুটবল অতীতের প্রায় শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছি। অবশ্য এখনও একটু বাকী আছে, বাকী আছে এ পুরাণ কাহিনীর মধুর সমাপ্তি। ১৮৫৪ সালের ময়দানের প্রথম খেলা থেকে মাত্র ৪০ বছরের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম শীল্ডের আসরে। তারপর ১৮৯৮ সালে হল কলকাতা ফুটবল লীগের প্রতিষ্ঠা। ভত-দিনে ফুটবলের অগ্রগতি হয়েছে চমকপ্রদ। কিন্তু এ অগ্রগতি হয়েছে সামরিক ও বে-সামরিক ইংরাজ দল-গুলির কল্যাণে। তারা এগিয়ে চলেছে সামনে। 'বাবু' ফুটবল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে পেছনে। সাহেবী ফুটবল তখন উদ্ধত, গর্বিত। বাবু ফুটবল তখনও সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত।

কিন্তু এ অবস্থারও আংশিক অবসান ঘটল ঊনবিংশ শতাব্দীর মৃত্যুর অল্প পূর্বেই। আই এফ এ শীল্ডের সূচনার দু' বছরের মধ্যেই ঘটল সে অঘটন। সেই প্রথম সাদা ফুটবলের জয়ধ্বজা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সেই প্রথম একটি 'বাবু' দলের নিকট পরাজিত হল একটি সৈনিক দল।

১৮৯৫ সালের কথা। ট্রেডস কাপে শোভাবাজারের খেলা পড়ল 'ডি' ব্যাটালিয়ন স্রপশায়ার দলের বিরুদ্ধে। সে খেলাতেই সর্বপ্রথম পাশার দান পড়ল উলটে। শোভাবাজার বিজয়ী হল ২—০ গোলে। ইংলিশম্যান লিখলেন, "ট্রেডস কাপে এ দুটি দলের মধ্যে খেলাতে বাঙালী দলটি বিজয়ী হয়েছে ২—০ গোলে। শোভাবাজার মাঠে অনুষ্ঠিত এ খেলাটিতে প্রথমার্ধে স্থানীয় দলেরই শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এবং এ সময়েই এস বোস এবং বি সর্বাধিকারীর কৃতিত্বে দুটি গোল করে তারা বিজয়ী হল।" এ খেলাতে শোভাবাজার দলে ছিলেন :

চৌধুরী; মতিলাল ও এ দাশ; বি সর্বাধিকারী কে মিত্র (অধিনায়ক) ও এম দাশ; এন সর্বাধিকারী, এ পাল, এস বোস, ইউ ব্যানার্জি ও বি দাশ।

প্রতিযোগিতামূলক খেলাতে একটি ইংরাজ দলের বিরুদ্ধে একটি বাঙালী তথা ভারতীয় দলের এই প্রথম জয়লাভ। এতদিন সাদাকালোর খেলা হলেই সাদা জেতে, কালো হারে। বাঙালীরা সব সময়েই বিজিত

কলকাতার ফুটবলের প্রবর্তক নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী

ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ১৯৩৪

বিদেশীরা বিজয়ী। এই প্রথম বিজয়ী হল একটি ভারতীয় দল। দেখা গেল পূর্ব দিগন্তে ফুটবল উষার প্রথম রক্তিম পদক্ষেপ। এ ছিল সবে শুরু। তখন পর্যন্ত মাত্র একটি খেলাতে জয়লাভ এবং তারপরই আবার পরাজয়। এ যেন হাসি না ফুটতেই চোখের জলে মিলিয়ে যাওয়া। কিন্তু পাঁচ বছর পর ১৯০০ সালে লাগল এক অপরূপ এবং অবিশ্বাস্য চমক। ট্রেডস কাপ বিজয়ী হল ন্যাশনাল। মাত্র একটি খেলাতে জয়লাভ নয়, হল একটি প্রতিযোগিতাতে চরম বিজয়ীর সম্মান লাভ। ন্যাশনাল দলে এদিন খেলেছিলেন : কর্মকার; ঘোষাল ও পি গাঙ্গুলী; ব্যানার্জি, জোসেফ ও ভট্টাচার্য; মিত্র, হুইলার*, এস মুখার্জি, চ্যাটার্জি ও পলসাই।

ফাইন্যালে জিতল বটে ন্যাশনাল, কিন্তু খেলার মীমাংসা হল তৃতীয় সাক্ষাতে। ন্যাশনাল দলের সেমি-ফাইন্যালের খেলাও তিন দিন ধরে হয়েছিল। সেই যে ১৯০০ সালে একটি রেকর্ড হল আজও বোধহয় তা টিকে আছে। একটি দলের সেমি-ফাইনালে তিন দিন ও ফাইনালেও তিন দিন খেলার রেকর্ড ভারতীয় ফুটবলে বোধহয় আর নেই।

এভাবে প্রথম পরিপূর্ণ সাফল্য এল ১৯০০ সালে। ভারতীয় ফুটবলের ললাটে প্রথম জয়-তিলক পরাল ন্যাশনাল। সংগে সংগে ভারতীয় দলগুলির মধ্যে ন্যাশনাল হয়ে উঠল বনস্পতি। শোভাবাজারের এখন আর তেমন নামডাক নেই। আই এফ এ শীল্ডে যোগদান করে কোনমতে কৌলীন্য রক্ষা করে চলেছে। মোহনবাগান তখনও বিকশিত হয়নি। এ পরিস্থিতিতে সকলেই ভাবলেন যে, ভারতীয় ফুটবল বোধহয় এখন থেকে ন্যাশনালের হাত ধরেই এগিয়ে চলবে।

হয়ত তাই হত। যদি না ১৯০২ সালে ভারতীয় ফুটবলে দুটি বিস্ময়কর প্রতিভার উদয় হত। শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা মুক্তি লাভ করেছিলেন, মানবী হয়েছিলেন। এ দুটি ফুটবল প্রতিভার যাদু স্পর্শে স্থাবর ভারতীয় ফুটবল হল জঙ্গম। এতদিন 'কালো' ফুটবল ছিল সাদা ফুটবলের অক্ষম অনুকরণ মাত্র। এ দুজন আমাদের ফুটবলে নিয়ে এলেন স্বকীয়তার মন্ত্রধারা। এখন আর অক্ষম অনুকরণ নয়। এখন আমাদের ফুটবল হল নিজস্ব কলা-কৌশল সমৃদ্ধ এবং অপূর্ব গতিশীল-সৃজনী শক্তিতে হিল্লোলিত।

ভারতীয় ফুটবলের এক পরম লগ্নে হল এ দুই বিরল প্রতিভার আবির্ভাব। কিন্তু আবির্ভাবের আগে আছে আবিষ্কার। আজ 'শিবে, বিজে' ভারতীয় ফুটবলের কিম্বদন্তী এবং রূপকথা। কিন্তু কেউ জানে না কবে এবং কোথায় তাঁরা মানিক মুক্তা নিয়ে (বাতাবি এবং রবারের বল) শৈশবের খেলা করেছিলেন। সকলেই অবশ্য জানেন যে, এ দুজন ছিলেন মোহনবাগানের কৃষ্ণার্জুন। কৃষ্ণ কিন্তু ছলনার আশ্রয় নিয়ে দুর্যোধনকে এড়িয়ে এসেছিলেন পাণ্ডব পক্ষে। 'শিবে, বিজে'ও এলেন মোহনবাগানে; এলেন কিন্তু ন্যাশনালকে ছলনা করে। আমাদের আদিযুগের ফুটবলের সে এক অল্প-জানা কাহিনী।

১৯০২ সালের কথা। ট্রেডস কাপ বিজয়ী হয়ে ন্যাশনাল তখন ভারতীয় ফুটবলের কীর্তির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে। তাদের প্রাণ-পুরুষ মন্মথ গাঙ্গুলী সজাগ চোখে খোঁজ করছেন নতুন খেলোয়াড়ের। এমন সময় ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজে হঠাৎ সংবাদ প্রকাশিত হল "শিবপুর কলেজের অসাধারণ ক্ষিপ্রগতি রাইট উইং-এর দুটি ভাই বোধহয় এবার ন্যাশনালে খেলবে।" এ দুটি ভাই-ই হলেন বিজয়দাস ও শিবদাস ভাদুড়ি; আমাদের অল্প-জানা ফুটবল কীর্তনের আসরের গৌর-নিতাই।

সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মাত্র এ দুই তরুণকে নিয়ে পড়ে গেল টানাটানি। তখন কোন দলে খেলা সম্বন্ধে বর্তমানের মত বাড়াবাড়ি ছিল না। তাই ন্যাশনালকে কথা দিয়েও তাঁরা খেলতে লাগলেন এ দলে, সে দলে। ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ সখেদে মন্তব্য করলেন, "ভাদুড়ি ভাই দুটি যেন এক প্রহেলিকা। তাঁরা চমৎকার ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধিকারী হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের নীতি-জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহের প্রচুর অবকাশ আছে। এখন মনে হচ্ছে ভাদুড়িরা হয়ত শেষ পর্যন্ত ন্যাশনালে টিকে থাকবেন না। এখনও তাঁরা ন্যাশনালে আছেন কিনা বলা কঠিন। গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি এ দুজন মোহনবাগান, এরিয়ানস এবং স্টুডেন্টস ইউনিয়ন দলের হয়ে খেলেছেন। এখন আমাদের ধারণা যে তাঁরা হয়ত শেষ পর্যন্ত নিয়মিত-ভাবে মোহনবাগানেই খেলবেন।"

তাই হল। শিবে, বিজে গেলেন মোহনবাগানে। সংগে সংগে ভারতীয় ফুটবলেরও 'কৈশোর যৌবন দুই মিলি গেল।' ফুটবল পুরাণের মধুর সমাপ্তি হল।

অজানা এবং অল্প-জানা কাহিনীরও শেষ হল।

---

* বহরমপুরের হুইলার শীল্ড এই খেলোয়াড়েরই নামাঙ্কিত।

১ 'সারা দিনের খেলা'—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু
২ 'শতাব্দীর মৃত্যু'—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনি এখন তরুণী; তাই এখন আপনার-
এমন সুরক্ষা দরকার, যা শুধু
কেয়ারফ্রী* যোগাতে পারে

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

Indo-British Cultural Confrontation : Gooroodass Banerjee and his times by Bhola Chatterji. Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd., Calcutta 700029. Rs 60.

বই-এর নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে, শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায় নিছক জীবনী লেখেননি তাঁর প্রমাতামহ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এ-মহাপুরুষের জীবনকথা ত আছেই বইতে; তবু তা ছাড়া আছে গুরুদাসের সময়কার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ। পটভূমিকা জানা না থাকলে গুরুদাসকে বোঝা যাবে না, আর তাঁর মূল্যায়ন ত সম্ভবই নয়।

তিনি জন্মেছিলেন এক যুগসন্ধিক্ষণে — ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাত্র ১৪ বছর আগে। সে সংগ্রাম যখন চলছে তখন গুরুদাস কিশোর। সে-বয়সে আন্দোলনের ছোঁয়াচ তাঁর লেগেছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। এর প্রধান কারণ এ-স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙালীকে স্পর্শ করেনি মোটেই। বিদ্রোহ বাংলার জনগণকে আকৃষ্ট করেনি, তারা এতে অংশ গ্রহণও করেনি। যদিও বিদ্রোহ শুরু হয় ব্যারাকপুরে বেঙ্গল রেজিমেণ্টে। তবে সে বেঙ্গল রেজিমেণ্টে বাঙালী ছিল না।

বাঙালী মধ্যবিত্ত যারা কলকাতায় এসে ইংরেজী শিক্ষালাভ করে তারা সকলেই ইংরেজের তাঁবেদার হয়ে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহীদের দ্বারা নিগৃহীতও হয়। তারা বাংলায় প্রাণ নিয়ে ফিরে বিদ্রোহীদের কিছু প্রশংসা করেনি। আর ইংরেজ রাজত্বের অবসান মানে বাঙালীর চাকুরী অর্থাৎ রুজিরোজগারের পথ বন্ধ হওয়া। গ্রামের মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণী "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে"র কল্যাণে ভালই ছিল। তারাও ইংরেজ রাজের পতন চায়নি। সাধারণ কৃষকও খুব দুঃস্থ ছিল না বলেই মনে হয়। কারণ জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীর মহানুভবতা নয়। কারণ জমির তুলনায় লোকসংখ্যার কমি। জোরজুলুম সহ্যের সীমা ছাড়ালে তারা আরও পূবে চলে যেতে পারত। সমসাময়িক সাঁওতাল বিদ্রোহ ও চুয়াড় হাঙ্গামা ঠিক বাঙালীর নয়। আর তা আঞ্চলিক। নীল বিদ্রোহও বহু বিস্তৃত ছিল না।

কাজেই গুরুদাসকে "সিপাহী" বিদ্রোহ অভিভূত না করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজের নৃশংস অত্যাচারও তাঁকে দেখতে হয় নি, শুনতেও খুব হয়েছে বলে মনে হয় না। যাতায়াত সহজ ছিল না। আর সংবাদপত্র—তারা বিদ্রোহের পরাজয়ের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে প্রতিদিন—সিপাহীদের নিন্দায় তারা ছিল পঞ্চমুখ, ইংরেজের গুণগানেও তারা ছিল সোচ্চার।

গুরুদাস যত বড়ই হোন, তিনি শ্রেণীচেতনার ঊর্ধ্বে যেতে পারেন নি। তিনি কিছু Supra-class phenomenon নন। লেখকের ভাষায়, তিনি তৎকালীন যুগের ফসল—a product of his times. তিনি ইংরেজী শিখেছিলেন রোজগারের সুবিধার জন্য, বড় হওয়ার জন্য। কিন্তু শিখতে গিয়ে তিনি মেরুদণ্ডযুক্ত মানুষ হলেন। হয়ত বিদ্যাসাগরের প্রভাব। তখনকার দিনে বেশী বাঙালীর ঐ জিনিস ছিল না। আর এজন্যই ইংরাজ রাজশক্তির সঙ্গে সংযোগের সুযোগে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করতে সচেষ্ট হননি। সততা ও নির্লোভতা—এ দুটো গুণও তাঁর ছিল পূর্ণমাত্রায়। তৎকালীন সমাজে এ সমস্তই বিরল ছিল। মেরুদণ্ড ছিল বলেই শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষা গ্রহণের জন্য চেষ্টা করে গেছেন চিরকাল, রাজশক্তির মতামত গ্রাহ্য না করে। ছাত্র অবস্থায় অন্য যে গুণের অধিকারী হন তা হল শিক্ষানুরাগ। হয়ত প্যারীচরণ সরকারের সাহচর্যের ফল। আর শিক্ষাবিদ হিসাবেই দেশের লোক তাঁকে প্রধানত মনে রাখবে।
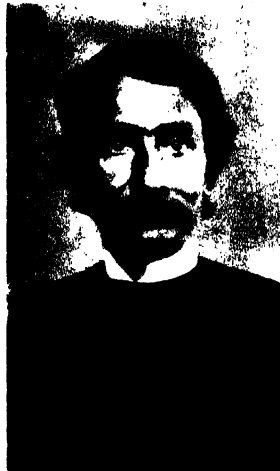
কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পর আস্তে আস্তে জাতীয়তাবোধ দৃঢ় হতে থাকে। প্রশ্ন উঠতে থাকে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কতটা নেব; স্বদেশী ধ্যান-ধারণা ঐতিহ্যের কতটা রাখব আর কতটা বর্জন করব। দেশের সব কিছু বাতিল করে পাশ্চাত্যের সব কিছু নকল করব; ইংরাজী ধরনে হাসব, ফরাসী ধরনে কাসব—এ মতবাদ গুরুদাস কোন দিনই গ্রহণ করেন নি। অনুকরণ করা অল্প লোকের পক্ষে সম্ভব। একটা গোটা জাতির পক্ষে নয়। ডি-রোজিওর আন্দোলন এ জন্যই দানা বাঁধতে পারল না। ঘুরিয়ে বললে শিকড় গাড়তে পারল না—উপযুক্ত জমির অভাবে। আবার বিধিনিষেধের অচলায়তন না ভাঙলে, আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ না করলে জাতি বাঁচতে পারে না, দেশও থাকে না। গুরুদাস তাই মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইঙ্গ-ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংঘাতে দেশ যখন দিশাহারা তখন যে কজন মহাপুরুষ জাতিকে আত্মপথ হতে সাহায্য করেন গুরুদাস নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। অথচ তাঁর ভাল জীবনী এতদিন লেখা হয় নি। জীবনী মানে জীবনের ঘটনা-পঞ্জী মাত্র নয়। কোন ঘটনায় নায়ক কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, কি ভাবে সে ঘটনাকে প্রভাবিত করেছেন—এ সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জীবনীতে থাকবে। আর থাকবে কি সামাজিক পটভূমিকায় নায়কের জন্ম হয়েছে, জীবন কেটেছে। জীবনী হবে তৎকালীন সমাজের ইতিহাসও। এ হিসাবে শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়ের বইখানি অনেকখানি প্রশংসার দাবি রাখে। গুরুদাসের এরকম জীবনী বোধ হয় এই প্রথম। পথিকৃতের সম্মান তাঁর প্রাপ্য। আর প্রাপ্য সাফল্যের কৃতিত্ব। দক্ষতার সঙ্গে শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায় গুরুদাসের জীবনের ঘটনার ও মতামতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, তাদের পরস্পর সম্পর্ক ও ঘাত-প্রতিঘাত উদ্ঘাটন করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে। সামাজিক পটভূমিকার সঙ্গে নায়কের সম্পর্কের ব্যাপারে শ্রীচট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট সাবধান হননি বলে মনে হয়। তাই গুরুদাসের মাতাকে তিনি এক enlightened মহিলা বলে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। প্রমাণ না সংগ্রহ করেই। মা চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে বড় হোক, তার পসার-প্রতিপত্তি হোক যা আর সবাইর মা আজও চান। ইংরেজী শিক্ষা তার উপায় মাত্র। এ-কথা বললে সোনামণি দেবীকে ছোট করা হয় না, তাঁকে স্বাভাবিক করা হয়। নিঃসন্দেহে তিনি স্বাবলম্বী ও দৃঢ়চেতা ছিলেন এবং ছেলেকে সব সময়ে কাজে অনু-প্রেরণা যুগিয়ে এসেছেন। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় হয় তবে ১৮২৩ সালে যখন রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টের কাছে শিক্ষা সংক্রান্ত আবেদন পেশ করেন তখনও ঔপনিবেশিক শক্তি তার নখদন্ত ব্যবহার শুরু করেনি বলা চলে না। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে অন্তত সিপাহীদের সঙ্গে জনসাধারণও যোগ দিয়েছিল বিদ্রোহে। তার কারণ সেখানকার শোষণ ও নিপীড়ন। বিদ্রোহে বাধা দেওয়ার মত ইংরেজী শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণী সেখানে ছিল না। আর শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পূবে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। indentured labour-এর যুগ তখনও আরম্ভ হয় নি। শোনা যায় বিদ্রোহীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোককে মরিসাসে পাঠান হয় indentured labour-এর মত কাজ করার জন্য।

যে কারণে রামমোহন ১৮২৩ সালে ইংরেজের উপর ভরসা রেখেছেন গুরুদাসও সেই একই কারণে ইংরেজ রাজের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এ কথা বললে গুরুদাসকে ছোট করা হয় না। এতে সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ পায়।

ইন্দ্র সেন

মেটাল ক্রাফ্টস্মেন অব ইণ্ডিয়া—মীরা মুখার্জী। প্রকাশক—অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া। কলিকাতা। মূল্য—উল্লেখ নেই।

শ্রীমতী মীরা মুখার্জী একজন যশস্বী ভাস্কর এবং পশ্চিম বাংলার গৌরব বিশেষ। তাঁর শিল্পকর্মের প্রধান মাধ্যমও পিতল বা ব্রোনজ ধাতু এবং ধাতুর ভারতীয় কারিগরদের সম্বন্ধেই তিনি উপরোক্ত বইটি লিখেছেন।

মীরা দেবী নিঃসন্দেহে একজন উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী। কিন্তু তাঁর অন্য কিছু গুণের খবর তাঁকে যাঁরা ভালভাবে চেনেন না তাঁদের জানবার কথা নয়। সেগুলির ভেতর দুটি হল—অত্যন্ত বিরূপ পরিস্থিতির ভেতরও অদম্য দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের কাজে লেগে থাকবার ক্ষমতা এবং যে কাজ ভালবাসেন তার জন্য হাসিমুখে অমানুষিক পরিশ্রম করবার মানসিকতা।

শ্রীমতী মুখার্জী ভারতীয় কারু-শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি দেশ-বিদেশে শিল্প শিক্ষার পর দেশের নানা অঞ্চলে ধাতুশিল্পের ঐতিহ্যগুলি বোঝবার জন্য বহু গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং পিতলের লোকশিল্প দেখে মোহিত হয়েছেন।

প্রয়াত অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় নির্মলকুমার বসু মশাই একজন মহিলা শিল্পীকে এইরকম কষ্টসাধ্য কাজে উৎসাহ দেবার সময় নিশ্চয় মীরা দেবীর উপরোক্ত গুণগুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন,—যার ফলে এইরকম একটি পরিশ্রমসাধ্য এবং শিল্পীর চোখে দেখা তথ্যপূর্ণ বইএর প্রকাশ সম্ভব হল।

বইটির ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন যে তাঁর সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নিজস্ব ধাতুশিল্পের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা, ধাতুশিল্পীদের সামাজিক অবস্থা নির্ণয় এবং কারু-শিল্পীদের করণকৌশলের একটি আধুনিক বিবরণী তৈরী করা। তিনি জানিয়েছেন যে, তামা ও তামাভিত্তিক মিশ্র ধাতুগুলি নিয়েই তিনি প্রধানত কাজ করেছেন। অন্য ধাতুগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং লোহাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সোনা রূপার কাজ, গহনা ইত্যাদি নিয়ে—কিছু কিছু লেখা আমাদের দেশে হলেও—সারা দেশের পটভূমিতে—তামা পিতল কাঁসা এবং তাদের কারিগরদের অবস্থা নির্ণয়ের কোনও প্রচেষ্টা এর পূর্বে হয় নি। কোনও বিশেষ কারু-শিল্পী গোষ্ঠী বা কোনও অঞ্চলের শিল্প নিয়ে কিছু আলোচনা বা লেখা হয়েছে, কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই সমগ্রভাবে শিল্পের বর্তমান মান নির্ণয় এবং শিল্পীর সামাজিক ও করণকৌশলগত অবস্থার সমীক্ষার চেষ্টা হয় নি।

মীরা দেবী দেশের সর্বত্র এবং নেপালে শহর ও গ্রামাঞ্চলে তামা পিতলের প্রায় সমস্ত কারুশিল্প কেন্দ্রগুলি ঘুরেছেন। শিল্পীদের কাজ দেখেছেন, তাঁদের কাজ এবং সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত সহজভাবে, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত যথাসম্ভব পরিহার করে তিনি সমস্ত দেশের ধাতুশিল্পের

ও শিল্পীদের অবস্থার একটি বাস্তবচিত্র বইটিতে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

ভারতবর্ষে, মোটামুটি বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পশ্চিমী শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কায় দেশের কারু-শিল্পগুলির অবক্ষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উত্তর ভারতের মূর্তিশিল্পের অবনতির শুরু আরও অনেক পূর্ব থেকেই। মুসলিম সংস্কৃতির আবহাওয়ায় এবং পরে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ও নাগরিক সংস্কৃতির আওতায় এ অঞ্চলে মানুষের মূর্তি-শিল্প সম্বন্ধে সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আগ্রহ কমে যায়। দক্ষিণ ভারতে বা নেপালে হিন্দু সংস্কৃতির একটি অমিশ্র ধারা চলে আসাতে ঐ দুটি অঞ্চলে মূর্তি-শিল্প আধুনিক কালেও অনেকটা নিজস্ব জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে। যদিও এখন শিল্প-বিপ্লব এবং বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার অগিদে এ-দুটি অঞ্চলেও শিল্পমান অনেকটাই নেমে এসেছে।

শ্রীমতী মুখার্জীর সমীক্ষাগুলির ভিতর দিয়ে কয়েকটি বিষয় বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন তাঁর সমীক্ষায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভারতের সব অঞ্চলেই বহু কারুশিল্পী গোষ্ঠীই ভাষা বা আঞ্চলিক সংস্কৃতি বেড়া ডিঙিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধিত। হিন্দু সমাজের অনমনীয় বর্ণ-ব্যবস্থার ভিতরেও কি ভাবে কারুশিল্পীরা অন্য বর্ণ থেকে এসে ধাতুর কাজ করতে করতে তাঁদের বর্ণে শামিল হচ্ছে যাচ্ছেন বা কি করে আজকের আধুনিকতার স্পর্শে তাঁদের ভিতর বর্ণভেদ ভেঙ্গে পড়ছে—মীরা দেবীর সমীক্ষাগুলির ভিতর দিয়ে তার একটি সুন্দর চিত্র ধরা পড়েছে।

মূর্তি নির্মাণ ছাড়া দেশের নানা অঞ্চলে যেসব ব্যবহারিক তৈজসপত্র তৈরী হয়—পিতল, কাঁসা বা ভরনে—সেগুলির আঞ্চলিক নাম, ব্যবহার এবং নকশা দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। লেখিকা এইসব তৈজসপত্রের নকশা বা কারুশিল্পীদের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির নকশাগুলি যে কোনও ড্রাফ্টসম্যানকে দিয়ে না করিয়ে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে এঁকেছেন তার জন্য তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ। এর ফলে যেমন তৈজসপত্রের শিল্পমূল্য বুঝতে সুবিধা হয়েছে, হাতিয়ারপত্রেরও চরিত্র বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় নি।

দেশের নানা অঞ্চলে ব্যবহৃত করণ-কৌশল, বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে মিশ্র-ধাতুর নানা ধরনের অনুপাত, পরিবেশ এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনে শিল্পের চরিত্রে পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে তাঁর আলোচনাগুলি সাধারণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক এবং শিল্পটির বিষয়ে আগ্রহশীল মানুষদের সমানভাবে আনন্দ দেবে। প্রচ্ছদপটটি সুন্দর। মুদ্রণ ত্রুটিগুলি না থাকলে ভাল হত।
প্রভাস সেন

আলোচনা: শিল্প সংক্রান্ত

চিত্রকলা

নৈশ বিভাগের বার্ষিকী

বিস্ময়ের শুরু তোরণদ্বার থেকে। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের নৈশ বিভাগের তোরণদ্বার শুনলাম নব নিযুক্ত অধ্যাপক অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর (অঃ লাঃ চঃ-র) মস্তিষ্কপ্রসূত। এবার অই আর্ণমিক্যক বিভাগের কাজে ভিন্নতর জৌলুস আছে। নব নিযুক্ত অন্য অধ্যাপক বাকুলির কৃতিত্ব কিছু আছে। বস্তুত নৈশ বিভাগে বিজন চৌধুরীর মতো অধ্যক্ষ এবং অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর মতো নামী অধ্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ পাঁচ বছরের পাঠ্যসূচী থাকা সত্ত্বেও মাইনে দেড় শ' টাকা নয়। সরকারী অধিগ্রহণের ফলে অধ্যাপকদের মাইনে বাড়েনি। মাঝ থেকে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কায়েম হয়ে বসছেন।

এই প্রদর্শনীতে তৈলচিত্রে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কাজে যথেষ্ট সম্ভাবনা প্রতিশ্রুতি দেখলাম। বিশেষত তার দুটি "রচনা" নামক ছবিতে। একটিতে লুঙ্গি পরা একজন যুবক নেশা করে বসে আছে। সামনে বোতল, অ্যাসট্রে, দিশী মালের বোতল। অন্যটিতে কুষ্ঠরোগীর চিতাশয্যার দৃশ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এঁকেছেন। যদিও আগুনটা বেশি করে আঁকা উচিত ছিল। বীভৎস রসসৃষ্টির দক্ষতা যথেষ্ট। অন্য দিকে বাড়িঘর ছাগল গরু নিয়ে আলো ছড়ানোর নিসর্গ দৃশ্য এঁকেছেন। সম্মুখ দন্ত-গুম্ফ বড় পটের ওপরের দিকে দু হাতে মার্বেল টিপ করছে, নিচে গাছ এবং গলি—বিরাট ভূমি একরঙে ভরে একটা পরীক্ষা করেছেন। সাধন চক্রবর্তীর

বিজন ভট্টাচার্যের "পোস্টার"

ম্যুরাল "শবানুগমন" ভারতীয় রূপারোপ এবং আঁটসাট রচনার মধ্যে বিধৃত। কিন্তু শবানুগমনকারীদের পায়ের অঙ্কন দুর্বল। দীপক ঘোষের দুটি প্রতিকৃতি—একটি মেয়ে গভীর বিষণ্ণ চোখে চেয়ে আছে, অন্যটি একটি যুবকের মুখ, একটু প্রথাগত বেশি—সুন্দর কাজ কিন্তু পেছনে হাওয়া-বাতাস খেলাতে না পারার জন্যে প্রতিকৃতি পটে সাঁটা মনে হয়। অলোক মিত্রের "পিঞ্জর অভ্যন্তর"-এর বৈশিষ্ট্য, নতজানু হবার স্টুল—সমগ্র পরিবেশ ভালোই এসেছে। শুধু দরজার বাইরে এবং ঘরের ভেতরের আলোর তফাত করেননি।

জলরঙের কিছু কাজও ভাল ছিল। যেমন উদয়শংকর দাস, অনিল রায় প্রমুখ কারো কারো কাজ। স্কেচ, জল-রঙ, প্যাস্টেল ভাল কাজ ছিল, যদিও মাউন্টবোর্ডে যত্ন করে কেউ কেউ সাঁটেননি। কিন্তু অনেকের কাজে প্রতি-শ্রুতি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল।

বিজ্ঞাপন বিভাগে বিজন ভট্টাচার্যের পোস্টার "শারদীয় দেশ", রেকর্ড জ্যাকেট "রাজা ওয়েদিপাউস", কেয়া চৌধুরীর পোস্টার "আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ", দেবকুমার আদকের শো কার্ড, তপন পালচৌধুরী, দীপক সেনগুপ্ত, অলোক সরকার, গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কাজ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গোলাধর মোদকের শো কার্ড "অ্যাকুরিয়াম"-এর মাছের রূপারোপের মজা এবং সুচিন্তা ভাবকের শো কার্ড একটা জুতো কোম্পানীর বিজ্ঞাপন দারুণ। নৈশ বিভাগে চাকুরি করার পর যারা কাজ করতে আসেন সেসব তরুণ তরুণী তাঁদের আন্তরিক ত্যাগিদের ছায়া কাজে পড়েছে।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের "রচনা"

ফটো : দেবীপ্রসাদ সিংহ

পেনটারস স্টুডিও এবং আকিবুকি

ইদানীং শিল্পীদের চেষ্টায় আকিবুকির ইস্কুল বেড়ে যাচ্ছে। নিখিলেশ দাস তো বলতে গেলে হাওড়ার স্কুল কলেজ দুই করে ফেলেছেন। পাঁচ থেকে একুশ, শিশু থেকে প্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলেমেয়েদের নিজের স্টুডিওতে সপ্তাহান্তে কাজ শেখান সকাল থেকে রাত অবধি। ইদানীং ছাত্রছাত্রীদের ভীড়ে বলতে হচ্ছে সীট নেই, সীট নেই, ছোট এ তরী। আকাদমী অব ফাইন আর্টসে স্টুডিওর ৮ম বার্ষিকী প্রদর্শনী হলো ১৮—২৪শে মে।

পাঁচ-সাত বছরের ছেলেমেয়েদের যে সারল্য এবং বিস্ময়কর সৃজনক্ষমতা, তা ক্রমশ প্রচলিত রীতির দ্বারা রাহু-গ্রস্ত হতে দেখি। তবুও তারই মধ্যে থেকে দু চারজনকে বেরিয়ে আসতে দেখি। "আকিবুকি" ছেলেমেয়েদের কাজে যত্ন অনুশীলনের ছাপ ছিল। "পেনটারস স্টুডিও" (আমার মনে হয় "আতেলিয়ে" শব্দটা ভাল, কারণ স্টুডিও বলতে অনেকে এখন ফোটো-গ্রাফারের দোকান বোঝেন) কাজ ষোল থেকে একুশ বছরের ছাত্রছাত্রীদের কাজ। ওয়াশ, জলরঙ, টেম্পেরা, তেলরঙ—নানা মাধ্যমের কাজ। যদিও সমস্ত ব্যাপারটা আর্ট কলেজের ছাত্রদের কাজের ধরনের। প্রতিকৃতি, স্থিরবস্তু চিত্র, পর্যবেক্ষণ, নিসর্গ—খুবই ধরা-বাঁধা কাজ। আরও কিছু রচনাধর্মী কাজ প্রত্যাশিত ছিল। ছাত্রছাত্রীরা খাঁচার পাখির মত অনেকটা যেন শেখানো গান গেয়েছে। মুক্ত আকাশ-বিহারের উদাহরণ আছে অবশ্য। কিন্তু সংখ্যায় কম। তবে রীতিবদ্ধ প্রথা-প্রকরণ যে ভালভাবে শেখানো হয়েছে সেটা বেশ বোঝা যায়। তপতী মুখোপাধ্যায়ের ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকা কাজগুলি মন্দ লাগলো না। কুঁড়ে ঘরের সামনে মায়ের কোলে ছেলের রচনা, রূপবন্ধ সাজানোটা বেশ। কাজল কর্মকারের খোড়ো বাড়ি নিয়ে নিসর্গ-দৃশ্য ভালোই। স্বপন মল্লিকের ছবিটার যথারীতি পেছনে পর্দা, সামনে "ভ্যাট ৬৯"-এর বোতল এবং গ্লাস মদ—আর্ট কলেজের ব্যবহৃত স্টীল লাইফ হলেও মোটের ওপর খারাপ লাগে না। যদিও ভ্যাটের বোতলের সবুজের ওপর যে প্রতিবিম্ব তা ভাল এসেছে। কিন্তু গ্লাসটায় সেই জিনিস আসেনি। প্রতাপ গঙ্গো-পাধ্যায়, স্বপন চন্দ্র, দীপ্তি কাঁড়ার প্রমুখ এবং শবরী ঘোষের কাজে প্রতিশ্রুতি আছে। সবচেয়ে ভাল কাজ বিভূতিভূষণ সিমলাই-এর। বেশ পরিণত মেজাজী জলরঙের কাজ। খেলার নিয়ে মানলার বিভূতিবাবুর বয়স পঞ্চাশ। তিনি ছোটবেলায় শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু বাড়ির অমত ছিল বলে তিনি ছবি আঁকা শিখতে পারেননি। এখন এই বয়সে শিল্পী হওয়া যাবে না জেনেও তিনি নিয়মিত সপ্তাহান্তে আসেন। এ তাঁর জীবনের পরম প্রেম। এঁর কাজে শিক্ষার্থীসুলভ কোনো ব্যাপার নেই। নিসর্গের মধ্যেকার বৈচিত্র্য চিত্র-ভাষায় তিনি এনেছেন সুকৌশলে। এর মধ্যে ধনের ভেতর নির্জন পল্লী আকাশমাটির নির্জনতাকে ধরেছে। ধু-ধু প্রান্তরের মধ্যে কয়েকটা গাছের মাটলার সামনে একটি মেয়ে। সব মিলিয়ে তাঁর কাজই আমার সবচেয়ে ভাল লাগলো।

অসট্রেলিয়ার কুম্ভকার

নাম রিচার্ড ব্রুকস।

বললেন, আমার বয়স তখন বারো বছর, তবুও সিডনীর ইস্কুলে পড়ার সময় আমি ন্যাশনাল আর্ট ইস্কুলে চীনামাটি কাচের বিষয় দু বছরের পড়া শেষ করি। কাজ শিখি জগদ্বিখ্যাত কুম্ভকার বার্নার্ড লিচের ছেলে ডেভিড লিচের কাছে (১৯৭১-৭৩)।

রিচার্ডের কাজের মধ্যে নানা দেশের পুরাতন আকার মিশিয়ে জগ, গামলা, প্লেট, ডিশ, পেয়ালা, পিরিচ, চা-পাত্রের মধ্যে অভিনবত্ব সম্পাদন করেছেন। তাঁর কাজের বেশির ভাগ চীনামাটির চেয়ে স্টোনওয়্যার—অর্থাৎ ১৪০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেটের তাপমাত্রায় কড়া করে উত্তাপ দিয়ে পাথরের মতো কঠিন করে নেওয়া। সাধারণ গড়নের ফরাসী চা-পাত্রের আকারের সঙ্গে ওপরের হ্যান্ডেলের মিশ্রণ আবার জাপানী বাঁশের কাঁধের হ্যান্ডেলের মতো। সব সময় আকারগুলো মিশেছে তা বলব না—হয়তো আমার চোখেই খারাপ লাগছে, কারণ কোথা থেকে আকার দুটো এনে জোড়া দিয়েছেন তা জানি। কিন্তু আমার মনে হয়—যেমন ধরা যাক জগের আকার—সব দেশেই মূলত এক রকম। কিন্তু দেশভেদে তার বিশেষত্ব কোথায় যেন একটা আছে। সুতরাং দুই দেশের আকারের বিশেষত্ব সুকৌশলে না মেলালে সেটা আলাদা থেকে যায়।

রিচার্ডের জাপানী গুরু ইসগা সিগিওর কাছে জাপানী চীনামাটির কাজের পরিমিতিবোধ, ছন্দ আয়ত্ত করেছেন। চিকণলেপের (গ্লেজিং) ব্যাপারে রঙের যে বিভ্রম উপরিভাগে তৈরি করতে হয় সেটা শিখেছেন। মৌনতার গাম্ভীর্য তাঁর কাজে ছায়া ফেলেছে।

কলকাতায় সস্ত্রীক উনি আশিস আর ক্রিশ্চিন জানার সঙ্গে কাজ করে গেলেন। আকাদমী অব ফাইন আর্টসে ২৫-২৭ মে প্রদর্শনী হলো।

যেসব কাচের বাসনকোসন আমরা ব্যবহার করি তার যদি আকারপ্রকার নান্দনিক হয়, তা হলে খেয়েও তৃপ্তি হয়। এই ধরনের প্রদর্শনী দেখলে মনে হয় কারুকলা চারুকলা থেকে খুব দূরের নয়। শরিকানা বিবাদ মিটে গেলে হয়তো মন্দ হবে না।
সন্দীপ সরকার

বসন্ত পণ্ডিতের 'নিসর্গ'

কলকাতা - প্রবাসী মহারাষ্ট্রীয় শিল্পী বসন্ত পণ্ডিত দীর্ঘদিন ধরে জলরঙে নিসর্গ চর্চা করে যাচ্ছেন। অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসে তাঁর সাম্প্রতিক প্রদর্শনীটিও চুয়াল্লিশটি নিসর্গ চিত্রমালা। তবে তাঁর আগের প্রদর্শনীগুলি থেকে এবারের প্রদর্শনীর পার্থক্য হলো যে, এবারের ছবিগুলিতে নিসর্গের পটভূমিতে কিছু কিছু মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। মনে রাখতে হবে, যে পার্বত্য উপজাতি ও প্রায়-আদিম মানুষের ছবি তিনি এঁকেছেন (যারা সাধারণত নগ্নতারত ও বাদারত) তারা কখনোই নিসর্গকে ছাপিয়ে যায়নি —হালকা সবুজ, গাঢ় লাল বা নিবিড় নীলে অলংকৃত প্রকৃতির সংগে মিলে-মিশে গেছে। অর্থাৎ বসন্ত পণ্ডিতের ছবিতে প্রকৃতিই প্রধান, মানুষ নয়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিতের ছবিতে যে দুটি জিনিস আমার বরাবরই ভালো লাগে, এবং এবারও ভালো লাগলো, তা হলো বর্ণ ব্যবহারের সুষমা (যা মাঝে মাঝে গোপাল ঘোষের ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়), এবং প্রকৃতির মধ্যে বা প্রকৃতির প্রতীকে কোনো শান্ত স্থিরবিন্দুর অন্বেষণ। কোনো কোনো ছবিতে, শিল্পীর এক ধরনের মগ্নতা বা ধ্যান-মগ্নতার আভাস পাওয়া যায়, যা আমাদের বিশেষভাবে স্পর্শ করে। তিন-চারটি ছাড়া, প্রায় সব ছবিই খুব নয়ন-রঞ্জন, সুতরাং আলাদাভাবে ছবিগুলির উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে "ওয়াটার ফল, সিংগার অফ নেচারে' পুরোভূমিতে তিনটি রক্তিম গাছের আড়ালে সূক্ষ্ম পৈতের মতো ঝরনার সাদাকে তিনি যেভাবে আভাসিত করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ফুল মুন ড্যান্সে' চন্দ্রালোকিত মানুষজনকে তিনি পুরোপুরি সাদা রঙে এঁকেছেন (বিশেষত অন্য গাঢ় রঙের বৈপরীত্যের মধ্যে) খুবই কৃতিত্বব্যঞ্জক। সবুজ ও কোনী রঙের বিশিষ্ট ব্যবহারের জন্য "ডার্ক স্টর্ম ক্লাউড্স"-ও অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। বসন্ত পণ্ডিতকে আমার অভিনন্দন জানালাম।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

সোলভা সাঁবন

ভালো ছবির বীজ ছিল অন্তরে। কিন্তু অঙ্কুরিত হল না। নিঃসন্দেহে কোনো কোনো অংশ হিন্দি ছবির ব্যবসায়িক কাঠামোকে অতিক্রম করেছে। এবং এক কথায় প্রশংসার্হ এই খণ্ডিত প্রচেষ্টা। কিন্তু যতটুকু প্রশংসা পেতে পারে এই ছবি, তা শুধু এর অন্তরস্থ সম্ভাবনার জন্যে। শেষপর্যন্ত শ্লথ, অপটু, দায়িত্বহীন পরিচালনা, গল্প এবং চিত্রনাট্যের মেরুদণ্ডহীন নড়বড়ে ভাব, আলগা এডিটিং এবং কমার্শিয়াল গোঁজামিল ছবিটিকে অপ্রতিরোধ্য বীজাণুর মতো ধীরে ধীরে, আমাদের সব প্রত্যাশা এবং অমল পালেকর-এর সুঠাম, পরিশ্রমী অভিনয় সত্ত্বেও, গ্রাস করে। গানের দৃশ্যগুলির হাস্যকর থিয়েটারময়তা, ষোড়শী নায়িকার ওপর গাঁদা ফুলের বৃষ্টি, পরচুলের বিজ্ঞাপনের মতো উইগ উড়িয়ে নায়িকার দোলনায় গান, সূর্যাস্ত দৃশ্যের সেণ্টিমেণ্টাল বাড়াবাড়ি এবং রঙের অতি-নাটকীয়তা, বারংবার নায়িকার এবং নায়কের দিবাস্বপ্নের দৃশ্যগুলিকে সরাসরি বাস্তবধর্মী করে পরিবেশনার মুদ্রাদোষ—এসব কিছু হিন্দি ছবির চিরদিনের রোগ, যার থেকে এই ছবিটি শেষপর্যন্ত বাঁচতে পারলো না।

নায়িকার নাম ময়না। ষোলো বছরের গ্রামীণ মেয়ে। অভিনয়ে নবাগতা শ্রীদেবী। শ্রীদেবী অতি-আধুনিক রোগে ভুগছে। রোগের নাম এলিয়েনেশন। বুর্জোয়া সমস্যা অবশ্যই নয়। ময়নাকে কেউ বোঝেনা, কেননা সে 'মিস্টিক' পাশ এবং ময়নার গ্রামে আর একটি লোকও

ময়নার স্কুলে আর কোন সহপাঠী ছিল না এবং সে কোনো কম্পিউটারের কাছে লেখাপড়া শেখে। পরিচালক অবশ্য ময়নার এলিয়েনেশন এবং বৈদগ্ধ্য বোঝাবার একটি সহজ এবং ফরম্যুলা-অনুমোদিত উপায় বার করেছেন। ময়না গ্রামের আর পাঁচজনের মতো জামাকাপড় পরে না। তার ভুরু, চোখ, ঠোঁট সব সময়ে বিজ্ঞাপন-মডেলের মতো সযত্নে বানানো। কপালে নিখুঁত নিটোল টিপ। এবং একটি গানের সিকোয়েনস-এই সে তিনচারবার বেশ পরিবর্তন করে। ময়নার এই বেশবিন্যাসের রসদ আসে এই কাহিনীর অনেক বাইরে প্রযোজকের পকেট থেকে। ফলে, ময়না মুহূর্তের জন্যেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে পারে না। নবাগতা শ্রীদেবীর সুষ্ঠু অভিনয়ও ময়নার পূর্ণাঙ্গ চরিত্রায়ণের বিরুদ্ধাচরণ করেছে অনেকটাই।

প্রতিতুলনায় গোপাল নাগের এক বিকলাঙ্গ যুবকের ভূমিকায় অমল পালেকর চমৎকারভাবে বাস্তবধর্মী। ময়নার ভালোবাসায় এবং অনুপ্রেরণায় গোপাল-চরিত্রের ক্রমিক পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের মর্মান্তিক পরিণতিই ছবিটির বিষয়বস্তু বলা যেতে পারে। ছবির প্রথমার্ধে ময়না, গোপাল এবং শহর থেকে গ্রামে আসা একটি মুরগীর ডাক্তার—এদের নিয়ে এক ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। ছবিটির দ্বিতীয়ার্ধে ময়না, গোপাল এবং গ্রামবাসী শত্রুরা যাদের মধ্যে একজন ময়নাকে ধর্ষণ করে—এই হচ্ছে মূল উপাদান। এবং এই ধর্ষণকারীকে হত্যার অপরাধে ছবির শেষে গোপালের জেল হয়। ময়না অবশ্যই অপেক্ষা করবে গোপালের জন্যে।

ডাক্তারবাবুটি বড় মজার। সব সময় সান গ্লাস পরে, গলায় রুমাল বেঁধে থাকেন। বাড়িতে নগ্ন মেয়েদের দেয়াল পটের সামনে ইংরেজী গান শোনেন এবং মুরগী, গরু, বাছুরের প্রয়োজনে দাওয়াই ঝাড়েন। ছবির প্রথমার্ধে তাঁকে সেকস-মেনিয়েক মনে হয়। এবং 'দ্বিগ্রামের' পর তিনি হঠাৎ সায়েবী ছেড়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে চায়ের দোকানে মিলিত হন, কিন্তু তিনি তখন পরিচালকের হাতে একটি অপ্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ার্ধে তিনি না এলেই পারতেন।

শ্রীদেবী

ছবিটির আগাগোড়া শ্যাম বেনেগাল-এর নিশান্ত এবং মন্থন ছবি দুটির প্রভাব প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। গ্রামীণ দৃশ্যের আবহ রচনায়, বাস্তবধর্মী সংলাপে সযত্ন কষ্ট এবং সেকস-এর ট্রিটমেন্ট-এ 'শ্যামচ্ছায়া' রয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু সেই সঙ্গে অফুরন্ত গোঁজামিল, প্রায় অর্থহীন প্রলাপের মতো। ছবিটি আমি দেখেছি মধ্য কলকাতার একটি নামী প্রেক্ষাগৃহের সর্বোচ্চমূল্যের বারান্দা-আসনে। সেখানে ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ছিল বলে আমায় বসতে হল একটি টিনের চেয়ারে। দেখলাম অতিরিক্ত টিনের চেয়ারে আরো অনেক দর্শক। এবং প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় এতো ময়লা যে বেশিরভাগ ক্লোজআপে মনে হয় নায়িকার গোঁফ বেরিয়েছে! পর্দাটিকে অবিলম্বে না বাতিল করলে ভালো ছবিকেও পথে বসতে হবে।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি সংগীত

তরুণ শিল্পীদের আসর

তাঁদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওস্তাদ মহম্মদ আমীর খাঁ যন্ত্রসঙ্গীত বিদ্যালয় এ বছরও এক উদীয়মান শিল্পী-সমাবেশের আয়োজন করেন রবীন্দ্র-সদনে গত এপ্রিল মাসের ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ তারিখে।

সমাবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল শেষ দিনে সমরেশ চৌধুরীর খেয়াল গান। ইনি তাঁর পিতা অমরেশ চন্দ্র চৌধুরী ও ওস্তাদ সাগিরুদ্দিন খাঁর শিষ্য এবং বলিষ্ঠ মেজাজী ও তৈরী কণ্ঠস্বরের অধিকারী। এঁর দরবারী কানাড়া রাগে বিলম্বিত খেয়ালটিতে বিস্তারের কাজ রাগটির প্রত্যেকটি অঙ্গ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিল এবং আমীর খাঁ ঘেঁষা গমক-সরগম তানগুলিও উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। একই রাগে দ্রুত তিনতাল খেয়ালটি দুনি সরগমের কাজ দিয়ে শুরু হয় এবং এর পরেই শোনা যায় চমকপ্রদ দ্রুত তানকারি ও সরগম যা যৌবনের ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁর তানের সঙ্গেই খালি তুলনা করা যায়। তানের কাঠামো, বলা বাহুল্য, ছিল অতি সঠাম ও সুপরিকল্পিত। পরের তারানাটিতে ও শেষের আড়ানা রাগে দ্রুত খেয়ালটিতে আরো উচ্চাঙ্গের তানকারি ছিল।

এদিনের আরেক উল্লেখযোগ্য বৈঠক ছিল জয়দীপ ঘোষের সরোদ বাদন। এঁর দেশ রাগে আওচারটি সুর, শ্রোত. ও ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁর ঢঙে কিছু আকর্ষণীয় স্বরসঙ্গতিতে ভরপুর ছিল। জোড়টিও আনন্দদায়ক হয়েছিল এবং এতে ভাল বোল মীড় যুক্ত কাজ ও আমজাদ আলী ঢঙে তান-তোড়া ছিল। বিলম্বিত তিনতাল গৎটিতে শিল্পীর গুরু রাধিকামোহন মৈত্রের প্রভাব বেশি ছিল এবং চৌগুণী ও কুআড়ি ছন্দে কাজগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। দ্রুত তিনতাল গৎটিতে বলিষ্ঠ দুনি তান ও পরিষ্কার স্থায়ীর ওস্তাদ কেরামতউল্লার ছাত্র স্বপনকুমার শিবের তবলাসঙ্গত ভাল হয়েছিল এবং তাঁর বাজনা সব সময়েই তাঁর গুরুর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

এদিনের আসর সমর সাহার মোটামুটি চলনসই তবলা লহরা দিয়ে শুরু হয় এবং এর পরে শোনা যায় অর্পিতা পালের সেতারে পুরিয়া ধানেশ্রী। দ্বিতীয় শিল্পীকে এখনও আরো অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এর পরে শোনা যায় বকুল চট্টোপাধ্যায়ের পুরিয়া-কল্যাণ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল এবং খাম্বাজ ঠুংরী। খেয়াল দুটি বিশেষ ভাল না হলেও ঠুংরী মোটের উপর ভালই হয়েছিল।

এদিনের শেষ শিল্পী ছিলেন সেতার বাদক সৌমিত্র লাহিড়ী। এঁর মালকোষ রাগে আলাপটি সুরেলা ও গোছানো হয়েছিল এবং জোড়টিতে ভাল গমকের কাজ ও ঝালা ছিল। পঞ্চম সোয়ারী তালে গৎটিতে ছন্দ, তেহাই ও চৌগুণী তানের কাজ ভালই হয়েছিল। দ্রুত তিনতাল গৎটিতে জমজমা তানের কাজ ও ঝালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠান কাবেরী করের ইমন রাগে আলাপ ও ধ্রুপদ দিয়ে শুরু হয়। আলাপ সুরেলা হলেও দ্বিতীয়াংশে শিল্পী পঞ্চমের ব্যবহার প্রায় করেননি। ধ্রুপদটি ও শংকরা রাগে ধামারটি খারাপ হয়নি। এর পর শোনা যায় কিশোর শিল্পী বিক্রম ঘোষের তবলা লহরা এবং ইনি তাঁর বয়সের পক্ষে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখান।

এদিনের তৃতীয় শিল্পী পল্লব ভট্ট রায় বাগেশ্রী রাগে বিলম্বিত খেয়াল ও তারানা গেয়ে শোনান। এঁর বিস্তারের কাজ একটু খাপছাড়া গোছের হলেও বিভিন্ন অলংকারের প্রয়োগ ও রেওয়াজী কণ্ঠের গুণে তা মোটামুটি উতরে যায়। তান ও সরগমের কাজ ভালই হয়েছিল।

পরের শিল্পী দেবাশিস ভট্টাচার্যের সরোদে মালকোষের আলাপ সুরেলা হয়েছিল এবং দ্রুত জোড়ের একহারা তান ও গমকের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। গৎ দুটিতে তান-তোড়া, বোলকারি, তেহাই ও ঝালার কাজ সবই ভাল হয়েছিল।

এদিনের পঞ্চম শিল্পী ছিলেন সুগত মার্জিত এবং এঁর মেঘ রাগে বিলম্বিত খেয়ালটিতে বিস্তারের কাজে বুদ্ধি ও রসবোধ দুইয়েরই যথেষ্ট পরিচয় ছিল। সরগমের কাজে বেশ কিছু জটিল নকশা পাওয়া গেল এবং দ্রুত তানকারিও ভাল হয়েছিল। পরের ঝাঁপতাল খেয়ালটিতে ভাল তানকারি ও ছন্দপূর্ণ সরগমের কাজ ছিল। দ্রুত তিনতাল খেয়ালটিতে তানকারি আরো উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং শিল্পীকে মুনশীয়ানার সঙ্গে মিহি ও জোরদার তান ব্যবহার করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে দেখা গেল। এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয় তরুণ ভট্টাচার্যের সন্তুর বাদন দিয়ে এবং এঁর রাগেশ্রী রাগে আওচার ও দুই গৎ অতি মনোরম হয়েছিল। শুনে মনে হল শিল্পী প্রতিষ্ঠিত সন্তুর বাদকদের থেকে কোন অংশেই পেছিয়ে নেই।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় সুব্রত সারখেলের তবলা লহরা দিয়ে। যদিও এই তরুণ শিল্পীর বাজনা ভালই লাগে তাঁর এক লহরা যতটা তৃপ্তি দিয়েছিল ততটা দিতে পারেনি। কেদারো সুরেশী সঙ্গত পীড়াদায়ক হয়েছিল। এর পর শোনা যায় গোপাল রায়ের বাঁশিতে আভোগী। মধ্য বিলম্বিত ঝাঁপতাল গৎটির বিস্তারকেন্দ্রিক গৎকারি যতটা ভাল হয়েছিল দ্রুত তিনতাল গৎকারি ততটা ভাল হয়নি।

এদিনের তৃতীয় শিল্পী ছিলেন সেতার বাদক গণেশ মোহন। এঁর হেমন্ত রাগে সংক্ষিপ্ত আলাপটিতে রসমাধুর্য ছিল এবং জোড়ের শেষে কিছু নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঢঙের তান-তোড়া ভালই হয়েছিল। বিলম্বিত তিনতাল গৎটিতে ছন্দের কাজ ও তেহাইগুলি সুপরিকল্পিত ও সুরেলা হয়েছিল। দ্রুত তিনতাল খেয়ালটিতে কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ তানকারির অভাব ছিল। অতি দ্রুত তিনতাল গৎটিতে সুরেলা ঝালার কাজ ছিল। অশোক মৈত্রের তবলা সঙ্গত ভাল হয়েছিল।

এর পর শোনা যায় মোহন সিং-এর গোরখ-কল্যাণ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল। বিস্তারের কাজে পরিপক্কতা ছিল এবং তানকারিতে দক্ষতা ও সঠাম পরিকল্পনা দুইই ছিল। শেষের পাহাড়ী ঠুংরীটিও ভাল হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের পঞ্চম শিল্পী ছিলেন মুসরৎ আলী খাঁ। এঁর বাগেশ্রী রাগে আলাপটি রেশের অভাবে জমে উঠতে পারেনি, তবে জোড়টি খানিকটা ভাল হয়েছিল। ঝাঁপতাল গৎটিতে চৌগুণী তানের কাজ, বোলকারি ও লয়কারি (একটি দ্রুত তিনতাল গৎ ও তার তান ঝাঁপতালের গণ্ডির মধ্যে দক্ষতার সঙ্গে বাজানো হয়েছিল) সবই ভাল হয়েছিল। দ্রুত গৎটিও ভাল হয়েছিল। আসলাম খাঁর তবলা সঙ্গত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল।

মঞ্জু ভট্টাচার্যের বাগেশ্রী রাগে খেয়াল দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়। এঁর বিস্তারের কাজ সুরেলা ও গোছানো হলেও এতে তাৎপর্যপূর্ণ স্বরপ্রগতি ও প্রাঞ্জলতা দুইয়েরই অভাব ছিল। তাঁর সরগম ও তানের বিষয়েও একই কথা বলা যায়।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান রাধিকা-মোহন মৈত্রের বিদেশী ছাত্র জেমস স্যান্ডলার হেমিলটনের সেতার বাদন দিয়ে শুরু হয়। ইনি বাজিয়ে ছিলেন পুরিয়া-ধানেশ্রী রাগে আলাপ, জোড় দুই গৎ। এঁর পরেই ছিলেন রাধিকা-মোহনের আরেকজন বিদেশী ছাত্র মাইকেল রবিনস যিনি সরোদে মালকোষ রাগের আলাপ, জোড় ও তিনটি গৎ বাজান। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় জনের কিঞ্চিৎ প্রতিশ্রুতি লক্ষ করা গেল। দুই শিল্পীর সঙ্গেই তবলা সঙ্গত করেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বিদেশী ছাত্র স্টিভেন রোজেনবম।

এরপর শোনা যায় সুকমল মৈত্রের তবলা লহরা। এঁর হাত অতি পরিষ্কার ও দক্ষ—বলতে গেলে প্রায় তাঁর গুরু স্বপন চৌধুরীরই মত তৈরী। ইনি দ্রুত 'ধেরে ধেরে কেটে'রেলা, গৎ, কিসম, উঠান, চক্রদার ও টুকরার কাজে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। পরে জানলাম যে এই শিল্পী সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন—তাঁর মত বাজানো কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের পক্ষেও দুরূহ।

রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত একতাল খেয়াল গেয়ে শোনান। এঁর বিস্তার, সরগম ও তানের কাজ গোছানো ও সুরেলা হলেও তাতে আকর্ষণীয়তা ও তাৎপর্যপূর্ণ স্বরপ্রগতির অভাব ছিল। দ্রুত খেয়ালটির তান খানিকটা ভাল হয়েছিল কিন্তু এই খেয়ালটির অন্তরায় হঠাৎ শুদ্ধ নিষাদ কেন ব্যবহার হল বোঝা গেল না। শিল্পী যদি যোগে দুই নিষাদের ব্যবহারের পক্ষপাতী হন তা হলে উত্তরাঙ্গে সব সময়ই দুই নিষাদের প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল। শিল্পী শেষে একটি পঞ্চম সে গান্ধার ঠুংরী গেয়ে শোনান।

এর পরের শিল্পী ছিলেন মিনতি খাউন্ড এবং ইনি বেহালায় দেশ ও হংসধ্বনি বাজিয়ে শোনান। দেশ রাগে সংক্ষিপ্ত আওচার, জোড় সুরেলা হয়েছিল কিন্তু বিলম্বিত গতের বিস্তারের কাজে বড় বেশি পুনরাবৃত্তি ছিল। হংসধ্বনিতে গৎ দুটি মোটামুটি চলনসই হয়েছিল।

এদিনের শেষ শিল্পী ছিলেন মুকুল দে। এঁর শুদ্ধকল্যাণ রাগে বিলম্বিত খেয়ালটিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু পেলাম না। দ্রুত খেয়ালের তানের কাজ ওজনের দিক থেকে হালকা হলেও মোটামুটি সুপরিকল্পিত হয়েছিল। একটি ভজন গেয়ে ইনি তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন।

নীলাক্ষ গুপ্ত

কোয়েল-এর নিবেদন

২৭ মে সকালে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ কোয়েল-এর নিবেদন: 'আমি যে গান গেয়েছিলাম'। বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানে, মনের নানা আবেগে কবি কণ্ঠে গীত গানগুলি থেকে নির্বাচন করে এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। সঙ্গে প্রতিটি গানের পূর্বে প্রসঙ্গ-কথা পাঠ করে শোনানোর আয়োজনও ছিল। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও গ্রন্থনা: অমিতাভ চৌধুরী। প্রধানত কবির স্বলিখিত ও বিভিন্ন জনের স্মৃতি-কথার টুকরো দিয়ে সাজানো হলেও গ্রন্থনার কাজ অমিতাভ চৌধুরী বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন; তা যেমন সুখ-শ্রাব্য তেমনই তথ্যবহুল। একই বিষয়ে কেবলমাত্র সূচীর পরিবর্তন করে ১৯৭৭ সাল থেকে 'কোয়েল' এই অনুষ্ঠান করেও শ্রোতৃমণ্ডলীর কৌতূহল জাগ্রত রাখতে পেরেছেন, সে বড়ো কম কথা নয়। ১৯৭৭-এ এঁদের অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'রবীন্দ্রনাথ'; ৭৮-এ শিরোনাম: 'গানের ঝরনাতলায়' এবং বর্তমান অনুষ্ঠানের শিরোনাম 'আমি যে গান গেয়েছিলাম'—প্রসঙ্গত, একই শিরোনামে, একটি সংগীত শিক্ষায়তনের স্মারকগ্রন্থে পার্থ বসু রচিত একটি বিস্তারিত প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে।

এদিনের অনুষ্ঠানে মোট একুশটি গানের মধ্যে আটটি সম্মেলক, একটি দ্বৈতকণ্ঠে, অন্য বারোটি একক কণ্ঠে গীত। মোট উনিশটি গান ছিল রবীন্দ্রনাথের। বাকি দুটির একটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত 'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে', অন্যটি রবীন্দ্রনাথ-সুরারোপিত অনুষ্ঠানে শুধুই আর ছন্দ [illegible] অথচ সমাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথের 'এই কথাটি মনে রেখো' গানের অংশবিশেষ গীত হয়—যা চমকিত করে। এই অনুষ্ঠানে পারম্পর্যের প্রশ্ন ওঠে না তবু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান-নির্বাচনে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটেনি। গানগুলির পরিবেশনের দায়িত্ব যাদের উপর ছিল তাঁদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া গানগুলির সংযত পরিবেশন বিশেষ তৃপ্তি দিয়েছে। রাণো গুহঠাকুরতার গাওয়া 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' ও 'চিত্ত পিপাসিত রে' গান দুটিতে ছিল সনিষ্ঠ প্রস্তুতির ছাপ। সেদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর গানে উচ্চারণের স্পষ্টতা লক্ষিত হল। বনানী ঘোষের গাওয়া গানগুলির মধ্যে 'এসো এসো ফিরে এসো' গানটি প্রার্থিত রসসঞ্চারে ব্যর্থ হলেও অন্য দুটি গানে সে অভাব তিনি পূর্ণ করেছেন। তাঁর গানে আজও কেন অনুকৃতি! প্রশ্বাসের শব্দ কর্ণপীড়াদায়ক। বাণী ঠাকুরের গাওয়া 'ধীরে বন্ধু ধীরে' গানটি সুগীত, গানের সুরে কিছু নতুনত্ব ছিল! 'আজি বিজন ঘরে' গানটির স্বচ্ছন্দ পরিবেশন শোনা গেল শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্যের কণ্ঠে। কিন্তু দ্বৈতকণ্ঠের জন্য 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' গানটি নির্বাচন করে তিনি অধিকার-ভেদ মানেননি—এই কথাই বলা যায়। জয়শ্রী দাশগুপ্তের কণ্ঠে গীত 'এই লভিনু সঙ্গ তব' গানটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। চিত্রলেখা দত্তের কণ্ঠ সুরেলা হয়েও ম্লানিমায় আড়ষ্ট। সম্মেলক গানগুলিতে সযত্ন নিষ্ঠার ছাপ। কেবল দু-একটি গানে উচ্চারণের ক্ষেত্রে আরো যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। যেমন 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা-মাটির পথ' গানে গ্রাম/ছা/ড়া/ওই—এভাবে অত্যন্ত কাটা কাটা করে গাওয়ায় গান সাবলীলতা হারায়। 'তুমি বিনা কে প্রভু' গানটির 'নিবারে' কথাটির উচ্চারণে নিবা এবং রে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিতভাবে বিচ্ছিন্ন রূপে উচ্চারিত হয়েছে। শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্যের পরিচালনা অবশ্যই প্রশংসার্হ।

ভাষ্যপাঠে পার্থ ঘোষ এবং গৌরী ঘোষ শুধু যে তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন তা নয়, তাঁরা অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ মাত্রা যোজনায় সক্ষমও হয়েছেন। সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়ের পাঠ অনুষ্ঠানের সঙ্গে একেবারেই সংগতি রক্ষা করতে পারেনি।

যন্ত্রানুষঙ্গ যথাযথ। অনুষ্ঠান সম্পর্কে সবিনয় দু-একটি কথা—এই সঙ্গে কালানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্রনাথ-গীত তাঁর প্রিয় বিভিন্ন ভাষা ও সুরের গানগুলিও পরিবেশিত হলে শ্রোতাদের অতিরিক্ত কিছু লাভ হত, বৈচিত্র্যেও বাড়ত। স্মারকগ্রন্থে এত বেশি মুদ্রণবিচ্যুতি দৃষ্টিকটু। সবশেষে 'তবু মনে রেখো' গানটি রবীন্দ্রকণ্ঠে রেকর্ড শোনার পর একই অনুষ্ঠানে অন্য কারো কণ্ঠে সেই আবেদন সৃষ্টি করা কি সম্ভব?

সুভাষ চৌধুরী

রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত ৪০ দিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসবের ছেচল্লিশটি অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনটি সন্ধ্যা ছিল স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। শুধু শ্রবণকে তৃপ্ত করা নয়, মননকেও পুষ্ট করার কিছু আয়োজন ছিল এই তিনটি অনুষ্ঠানে।

ঋতু গুহ

প্রথম দিনের—২৫ মে—অনুষ্ঠানটি নিবেদিত হল রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিষদের পক্ষ থেকে। সুপরিকল্পিত দুটি পর্ব। প্রথম পর্বের সূচনায় বর্ষীয়ান সঙ্গীত সমালোচক রাজেশ্বর মিত্র সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারবান ভাষণে রবীন্দ্রসঙ্গীতে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর শান্তিনিকেতনের কয়েকজন শিল্পীর কণ্ঠে শোনা গেল দুটি করে নির্বাচিত গান। এঁদের মধ্যে ছিলেন আরতি উপাধ্যায়, বিজয়-কুমার সিংহ, বীথি সরকার, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না দত্ত এবং প্রভাত-কুমার পাল। এঁদের পরিবেশনের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্ট একটি ঘরানার ছাপ অনায়াসে চিনে নেওয়া যায়। সেই ঘরানার ভাণ্ডারীর নাম শান্তিদেব ঘোষ। এ-দিনের আসরের দ্বিতীয় পর্বে তিনিই ছিলেন স্বমহিম আকর্ষণ।

শান্তিদেব ঘোষের একক আসর—বলা যেতে পারে দ্বিতীয়ার্ধের অনুষ্ঠান। সে-অনুষ্ঠান যেমন সজীব, তেমনই মহার্ঘ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কীর একটি বিশেষ ধারার অপ্রতিম ধারক তিনি। এই বয়সেও যে-স্ফূর্তি ও প্রাণময়তা তাঁর গানে, তার তুলনা বিরল। সেদিন তাঁর গানের নির্বাচনেও ছিল অনন্যতা। অতি সূক্ষ্মভাবে সব কটি প্রধান পর্যায় ছুঁয়ে গেলেন তিনি। পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, স্বদেশ পার হয়ে পৌঁছলেন তিনি গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য ও নাটকের গানে। তাঁর কণ্ঠে 'হ্যাঁচ্ছো', 'হা-আ-আ--আই' বা 'ইচ্ছে!'—'ইচ্ছে' এমন এক জীবন্ত নাটকীয়তায় মূর্ত হয় যে, নাটকের গান বলে না দিলেও চলে। প্রসঙ্গ এবং পরিপ্রেক্ষিত চাক্ষুষ হয়ে ওঠে তাঁর গানে। 'তাসের দেশ' ছাড়াও শান্তিদেব ঘোষ বেছে-নিয়েছিলেন 'চণ্ডালিকা' এবং 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অংশবিশেষ। 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা'তে তিনি ভক্তিরসে যেমন জারিত করেন কণ্ঠ, 'বলব কী আর বলব খুড়ো'তে তেমনই সিঞ্চিত করেন কৌতুকরসে। শুধু নাটকের গানেই নয়, প্রত্যেকটি গানেই অন্তর্নিহিত মুডটি বিস্ময়করূপে ফুটিয়ে তোলেন শান্তিদেব ঘোষ। সেদিনের আসরেও বারবার তা ধরা পড়ছিল। 'ওই বুঝি কালবৈশাখী'র বজ্র হুংকার' যেমন গর্জে উঠেছিল, তেমনই 'অমল ধবল পালে'র মন্দমধুর গতিও টের পেতে দেরি হয় নি। বর্ষণমুখর অন্ধকারে একেলা ঘরে মন-না-মানার ব্যাকুল আর্তি যেমন সজল সমীরে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন তিনি, তেমনই 'আলো আমার আলো'র উদ্দীপনাকে করে দিচ্ছিলেন সঞ্চারিত। সেদিনের আরও অবিস্মরণীয় স্মৃতি জড়িয়ে আছে যে-সব গানে তার মধ্যে বিশেষ-

রাজেশ্বর মিত্র ও শান্তিদেব ঘোষ

ফটো: সুবীর চট্টোপাধ্যায়

ফিরিয়া যাও', 'তোমায় নতুন করে পাব বলে', 'বাকি আমি রাখব না', 'তুমি কি কেবলই ছবি' এবং 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না'। গায়নভঙ্গির যে-বলিষ্ঠতার শেষ প্রতিভূ শান্তিদেব ঘোষ, তা কি চিরস্থায়ী করে তোলা যায় না কোনো তথ্যচিত্রের মাধ্যমে? উত্তরকালের কথা ভেবেই এখুনি এ কাজে কারও এগিয়ে আসা দরকার।

*

৩ জুন সন্ধ্যায় দক্ষিণী নিবেদন করলেন 'রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিক্রমা' নামে একটি অনুষ্ঠান। শুভ গুহ-ঠাকুরতা ছিলেন 'বক্তৃ-ভাষণে'। সঙ্গীত পরিচালক—সুদেব গুহ-ঠাকুরতা। গীতবিতানের প্রচলিত পর্যায়গুলিকে আরও সূক্ষ্ম পর্যায়ে ভাগ করে দেখানোর প্রয়াসই 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিক্রমা'র মৌল উদ্দেশ্য। এক দিক থেকে এই প্রয়াস মূল্যবান নিঃসন্দেহে। কিন্তু সূক্ষ্মতার এই বিভাজনও স্পষ্ট করে দেখাতে অক্ষম—'আমার প্রিয়ার ছায়া' ঋতু-সঙ্গীত না প্রেম-সঙ্গীত। 'ঋতু-সংগীত' বললে যেমন সবটুকু বলা হয় না, 'প্রেমসঙ্গীত' অভিধাতেও তেমনই ফাঁক থেকে যায়। 'ধর্মসংগীত' থেকে আলাদা করে নেওয়া যায় না 'জাগে নাথ, জ্যোছনা রাতে' বা 'আনন্দ তুমি স্বামী'। সুরের দিক থেকে যে-ধরনের ভাগ যুক্তিযুক্ত, বাণীর দিক থেকে সেই ভাগ হয়ে ওঠে অযৌক্তিক। 'বরিষ ধরা মাঝে' গানেও কি নেই উদ্দীপনার প্রকাশ? এ-সব প্রশ্ন উঠতেই পারে।

নবীন শিল্পীদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিময় কণ্ঠ প্রবাল দাশগুপ্ত, শুচিতা গুপ্ত এবং সোমা দের। দেবাশিস রায়চৌধুরী, রণো গুহ-ঠাকুরতার গায়কী শুধু নয়, ম্যানারিজম পর্যন্ত অনুকরণ করতে পেরেছেন। এটাও হয়তো এক ধরনের গুণ, কিন্তু সুগায়ক হবার পক্ষে পরিহার্য এই প্রতিভা। বিশ্বজিৎ গুপ্তের কণ্ঠ মন্দ্রসপ্তকে স্বচ্ছন্দ লেগেছে। অভিরূপ গুহঠাকুরতার 'চিত্ত পিপাসিত রে', রিনি মিত্রের 'সুমঙ্গলী বধু' দক্ষতাপূর্ণ পরিবেশন। রণো গুহঠাকুরতার দুটি গানের মধ্যে 'কে বসিলে আজি' তুলনামূলকভাবে ভালো লেগেছে। বাণী ঠাকুর ও মীরা গুপ্ত তাঁদের গানের প্রতি সুবিচার করেননি। কৃষ্ণা হাজরার 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল' অনবদ্য।

দক্ষিণীর এই অনুষ্ঠানের সব-ছাপানো আকর্ষণ ছিলেন ঋতু গুহ। 'বতবার আলো জ্বালাতে চাই'তে তার সপ্তকে তাঁর অনায়াস বিচরণ, 'বাজে করুণ সুরে' এবং 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না'য় লাবণ্যময় সুরের কারুকৃতি ও অলঙ্কার প্রয়োগের অসামান্যতা এই গুণী শিল্পীকে আদ্যন্ত বিরল অনন্যতায় চিহ্নিত করে দিয়েছে।

*

'ইন্দিরা'র নিবেদন 'গীতিমাল্যঃ সন্ধ্যায়। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই পরিসমাপ্ত হল রবীন্দ্রসদনের মাসাধিক-কালব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মোৎসব।

গত বছর 'ইন্দিরা' গোষ্ঠী বেছেছিলেন 'গীতাঞ্জলির গান'। এবারের অনুষ্ঠানটিকে বলা যেতে পারে তারই পরিপূরক। কিন্তু সব-মিলিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, 'গীতামাল্যর গান'-এ তাঁরা নিজেদের মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। ভরিয়ে তুলতে পারেন নি শ্রোতাদের প্রত্যাশা।

ভাষ্যপাঠ থেকেই ত্রুটি-বিচ্যুতির সূত্রপাত। প্রথমার্ধে যে মহিলা ভাষ্য পড়লেন, তাঁর উচ্চারণ অশুদ্ধ, ভঙ্গি অস্বাচ্ছন্দ্যময়। ভাষ্যটি শুনে মনে হয় শঙ্খ ঘোষের রচনা, অথচ স্বীকৃতি ছিল না কোথাও। গানও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জমে নি। শৈলেন দাস সময়ে পৌঁছোন নি। নির্ধারিত দুটি গানের বদলে একটি মাত্র গান শোনালেন তিনি। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ণ মেজাজে পাওয়া যায় নি সেদিন। দ্বিতীয় পর্বে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠের দুটি গান ছিল একমাত্র আকর্ষণ। 'ইন্দিরা'র নিয়মিত শিল্পীগোষ্ঠীর কারও গানেই স্ফূর্তিময়তা ছিল না। অরুণরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন দাশগুপ্ত, সুপূর্ণা চৌধুরী, জয়শ্রী রায়—প্রত্যেকেই যেন মেজাজ-ছুট ভঙ্গিতে গান শোনালেন। অমর বসুর গলা ভাল, কিন্তু সুবিনয় রায়ের অনুকৃতি কানে লাগে। শ্রীনন্দা মল্লিক তারসপ্তকে অস্বচ্ছন্দ। শ্রীনন্দা চৌধুরীর 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে' বরং কিছুটা ব্যতিক্রম। সম্মেলক গানগুলিও তেমন জমজমাট নয়।

'ইন্দিরা'র এই অনুষ্ঠানের স্মরণীয়তম পরিবেশন বলা যেতে পারে কৃষ্ণা হাজরার কণ্ঠে 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে'। অনায়াস মসৃণ তাঁর কণ্ঠ, প্রাণবন্ত তাঁর পরিবেশন। ওই একটি গানেরই রেশ এই অনুষ্ঠানের সর্বময় সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

ভারতভূমির ছন্দ-ধারা

"বাংলাভূমির ছন্দধারা পালন করে মান/দানবো মোরা বিশ্বে মোদের বিশিষ্টতম দান"—ব্রতচারী এই ঘোষণা একটু পালটে দিয়ে "ভারতভূমির ছন্দ-ধারা" বলতে ইচ্ছে করছিল সেদিন, গত ২৪ জুন রবীন্দ্রসদনে, বাংলার ব্রতচারী সমিতি পরিবেশিত সর্বভারতীয় লোক-নৃত্যানুষ্ঠান দেখতে দেখতে। স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত ব্রতচারী আন্দোলন যে থেমে নেই, বরং ছন্দোময় তারই জ্বলন্ত প্রমাণ এ-দিনের সান্ধ্য-অনুষ্ঠান।

শক্তির সঙ্গে শৌর্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের সঙ্গে জীবনপ্রবাহের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি কী, লোকনৃত্যের মধ্যে তারই প্রকাশ দেখা যায়। লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, বার-ব্রত—এগুলির

...দৃশ্যে মিশে গুরুকে বলে এই নৃত্যের ...জতাত্ত্বিক মূল্যও অসীম। বাংলার ...চারী সমিতি সেদিন প্রায় তিন ঘণ্টা ...র যে-সব নৃত্য পরিবেশন করলেন ...র মধ্যে ছিল—বীরভূমের জৌর্যময় ...রণবেশে, শ্রীহট্টের বিবাহানুষ্ঠানের ...বরণ, ময়মনসিংহের বিষাদময় জারি, ...দিনীপুরের রণনৃত্য পাইক, পূর্ব-...ঙ্গের নৌকোচালনার অনুষঙ্গ-জড়ানো ...রি, পুরুলিয়ার মুখোশ-নৃত্য ছৌ, ...ড়িষ্যার ফসলকাটা নিয়ে মাসপরব, ...জরাটের কৃষ্ণলীলা রাস, রাজস্থানের ...ল সংগ্রহের পানিহারী, মহারাষ্ট্রের ...সজীবী সম্প্রদায়ের মছুয়া, কেরলের ...লবন্দনা মালয়ালী এবং পাঞ্জাবের ...প্রিয় ভাংড়া। যাঁরা পরিবেশন ...রলেন তাঁরা সকলেই বাংলার ব্রতচারী ...মিতির সভ্য ও কর্মী, কিন্তু পেশাদারী ...শিল্পী কেউ নন। নানা ধরনের ...জীবিকায় নিয়োজিত এই শিল্পীরা ...ক মহৎ উদ্দেশ্যে একত্র হয়েছেন মাত্র।

ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল না, এমন নয়। ...নগুলি বহু ক্ষেত্রেই সংগীত নয়। ...রি গানের মাঝির ডান হাতের ...ক-লাগানো স্টিলের বালা, ...হারাষ্ট্রের গানের আরম্ভে দু-...ইন মাত্র বাংলা গান গেয়ে ...কের মারাঠী ভাষায় গান শোনানো, ...নৃত্যে মহলাহীনতার জন্য অনাবশ্যক ...লম্ব বা ঢুকে ফের অদৃশ্য হয়ে ...ওয়া, পিছনে ছবির প্রোজেকশন ফেলে ...প্রয়োজনীয়ভাবে আকর্ষণীয় করে ...তোলার চেষ্টা, মহিলাকণ্ঠের ভাষা-...ণ্ঠের কর্কশতা—অনেক কিছু নিয়েই ...আপত্তি তোলা যায়। কিন্তু সে আপত্তি ...মন কড়া করে দেখবার নয়। সামগ্রিক-...ভাবে সার্থক, বর্ণময় ও আন্তরিক ...পরিবেশনের কথাই সব-ছাপিয়ে মনে ...থেকে যায়।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা: শিল্প সংক্রান্ত **নাটক**

ভালোমানুষের পালা

দেবতা নয়, তিনজন নাট্যানুরাগী দর্শক কলকাতায় ভাল থিয়েটার খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ধরা যাক তিনজনের নাম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। নাট্যপ্রেমীদের সভা থেকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পরপর একই ধরনের নাটক দেখে দেখে যখন অনুরাগীরা ক্লান্ত তখন ভাল নাটকের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে "যথার্থ নাটকের সম্প্রতি প্রযোজনা যথেষ্ট পরিমাণে চলছে কিনা খুঁজে বের করতে হবে, নচেৎ—" এর পর তিনটি শব্দ দিয়ে বাক্য পূরণ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে তিনজন দর্শক সরেজমিনে নাট্য প্রযোজনা তদন্তে বেরিয়েছেন—এই সিদ্ধান্তের 'যথার্থ' শব্দটি মুছে গেছে এবং 'যথেষ্ট' শব্দটির উপরেও কালি লেপটে গিয়ে দুবোধ্য হয়ে গেছে—আপাতত একটি সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন, তারই খোঁজে আকাদেমি মঞ্চে তাঁদের আসা।

ব্রহ্মা—কিন্তু সিদ্ধান্তে বলা আছে বাংলা নাটক—এতো—

বিষ্ণু—আঃ এর জন্যেও আবার খাতা খুলতে হয়। হ্যা জানি জানি, এটা ব্রের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট অবলম্বনে 'ভালো

মানুষের পালা'। এই কলকাতায় কোন জিনিসটা আগাগোড়া স্বদেশী? আসলে দেখতে হবে যথার্থ ভাল নাটক হল কিনা—, ওসব বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুর মাথায় নিয়ে নাচানাচি—বিচ্ছিরি! তাছাড়া কলকাতায় 'চেতনা' দলটি অনেকবার তাঁদের নামের সার্থকতা প্রমাণ করেছে, আর নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায়ের কাজ বারেবারেই নতুন হয়ে আসে।

মহেশ্বর—এই নাটকটাই কিন্তু কয়েক বছর আগে নান্দীকার করেছিল—

বিষ্ণু—তাতে কি? এই নাটকটা চেতনাও করেছিল, থিয়েটার গিল্ডও করেছিল প্রায় একই সঙ্গে। এখনও তো একই সঙ্গে তিনটি দল ব্রেশ্‌ট-এর একই নাটক নিয়ে কাজ করছে। ভাল নাটকের ঐটাই তো মজা—যুগে যুগে নতুন নতুন ব্যাখ্যা পাবে, নতুনভাবে অভিনীত হবে। শেকসপীয়র, রবীন্দ্রনাথ তো আর নতুন করে লিখতে পারবেন না—তাই বলে কি তাঁদের কাজগুলি বারবার আলোচনা হবে না, যাঁদের মূল্য ফুরিয়ে গেছে তাঁদের তো বছরে একবার ভাঙা মূর্তিতে মালা দেবার মত নিয়ম রক্ষাও হয় না। ভাল নাটক কোন যুগের নয়—কোন দেশের নয়, এই কথাটা বুঝতে এত সময় লাগে? বিচ্ছিরি।

ব্রহ্মা—এটা কি সাম্প্রতিক প্রযোজনা?

বিষ্ণু—জানি জানি, চেতনা এই নাটক ১৯৭৪ সালে ২১ বার অভিনয় করেছিল। কিন্তু এবারের প্রযোজনা পুনঃমুদ্রণ নয়, নব সংস্করণ। আমাদের দেশে কয়েকজন শিল্পী দল ছেড়ে গেলেই শিল্পী বদল করে বাজার বুঝে আবার প্রযোজনা চালু করা হয় কিন্তু চেতনার প্রযোজনা সম্পূর্ণই নতুন করে লেখায় এবং ভাবায়। মূল ব্যাপারটি পালটে গেছে। ভালো মানুষ মন্দ মানুষ একটি মেয়ে নয়—একটি মেয়ে ও একটি ছেলে অভিনয় করছে।

মহেশ্বর—বেশ দেখা যাক কতটা নতুন।

ব্রহ্মা—সিনেমা! সিনেমা কি দারুণ। ভাবা যায় না, নয়নতারা, কপিল যখন মুখোমুখি। একজনের জায়গায় আরেকজন আসছে একদম সিনেমার মত। নয়নতারা বিয়ের সময়

আজকের সুন্দরতম-ফ্যাসান বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আপনি ফ্যাসান বিপ্লবের পুরোগামী হোন।
● "ট্রিপল ক্রাউন" এবং "ভেনাস সুপ্রিম" সুটিংস
● পলিফিল এবং পলিকট সারটিংস
৪৮/৫২, ৬৭/৩৩ ও ৮০/২০ অনুপাতের মিশ্রবোনট
● "সুপারষ্টার" ১০০% পলিয়েষ্টার প্রিন্টস
● "রাজেশ্বরী" শাড়ী এবং পরমানন্দ ধুতি।
● লিজেণ্ডারি এম ৭ এ্যাণ্ড এম ১১ মুলস্
● এক্ষক্রু সিভ এম ২৪ এ্যাণ্ড S ৬ লং ক্লথ
একই সঙ্গে সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যকে আড়ম্বর উনমুখতায় মিলিয়ে কোঠারীর তৈরী বস্ত্র যে কোন ব্যাপারে যে কোন জায়গায় এবং যে কোন সময়ে আপনাকে আদর্শ সাজে সাজাবে। আজকের ফ্যাসানের ঘুর্ণাবর্ত্তে আপনাকে রাখবে সকলের আগে।
তাই আসুন কোঠারীর বস্ত্রের রংগীন জগতে ঢুকে ফ্যাসান দুনিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটান।
KOTHARI'S FABRICS
কোঠারী (মাদ্রাজ) লিমিটেড
কোঠারী বিল্ডিংস ১১৪/১১৭, নুংগমবাককম হাই রোড, মাদ্রাজ-৬০০ ০৩৪
কোঠারী ভবনের উৎকৃষ্ট বস্ত্র
কোঠারীর বস্ত্রে পরুন
ফ্যাসানে উৎফুল্লিত হয়ে উঠুন
national 639 BN

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার!

প্রকৃতির নিজস্ব কোমল পদ্ধতিতে আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

সাধারণতঃ রঙ ময়লা হয় কি করে

বছরের পর বছর সাধারণতঃ আপনার রঙ একটু একটু করে ময়লা হতে থাকে। আর তাহয় দুভাবে: ভেতরের ও বাইরের প্রক্রিয়ায়। আপনার ত্বকের ভেতরে মেল্যানিন নামে একটি শরীর রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু লোকের শরীরে অন্যদের তুলনায় বেশী ছড়িয়ে পড়ে। আর, যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, রঙ তত ময়লা দেখায়। তাছাড়া, আপনি যতবার বাড়ীর বাইরে যান সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে, ফলে মেল্যানিন বেশী করে ছড়াতে থাকে আর আপনার রঙও হতে থাকে আরো বেশী ময়লা।

রঙ ফর্সা করার প্রচলিত উপায়

শত শত বছর ধরে ত্বকের রঙরূপের উন্নতির জন্যে মহিলারা রকমারি উপায় অবলম্বন করে এসেছেন। বেসন, দুধের সর, পাতিলেবু আর গ্লিসারিন, এমনকি শশার রস পর্য্যন্ত! এগুলি সম্ভবতঃ আপনার ত্বকের উন্নতি করে—ত্বক নরম করে, কিন্তু এসব দিয়ে কি সত্যিই রঙ ফর্সা হয়?

অপর পক্ষে আছে—ব্লীচ করার উপাদান। এগুলি যে ত্বকের কত ক্ষতি করে তা আপনাকে বলে দিতে হবে না। আচ্ছা, কোনো দামী আর নরম কাপড় কি আপনি ব্লীচ করবেন? আপনার ত্বকও তো কম দামী আর কোমল নয়!

আবিষ্কার! ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর রঙ ফর্সা করার প্রণালী—প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী বিজ্ঞানের এক অভিনব আবিষ্কার—যা পৃথিবীতে এই প্রথম, প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে! আপনার ত্বকের ভেতরে কাজ করে এর 'ভিটামিন ক্রিয়া'। ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীতে একটি ভিটামিন আছে, যা ক্রীম মাখবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ত্বকে প্রবেশ করে। মেল্যানিনের বিস্তার রোধ করবার জন্যে এই ভিটামিন স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে, ফলে আপনার রঙ এমন ফর্সা হয়ে ওঠে, যা নজরে পড়ে! এই ভিটামিনটির ক্রিয়া আর ফর্সা-ত্বক ওয়ালা লোকের ত্বকের ভেতরের মেল্যানিন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে প্রকৃতির যে ক্রিয়া তা বলতে গেলে একই রকমের। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-আড়ালের-পর্দা' দিয়ে সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ছেঁকে বাদ দেয়। এইভাবে আপনার ত্বক রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা পায়, অথচ সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে।

৬ সপ্তাহ ধরে নিয়মিত মাখুন, তারপর দেখুন কি তফাৎ!

সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল নিজে চোখে দেখা। ছ'সপ্তাহ নিয়মিত ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী ব্যবহার করুন। তফাৎ নিশ্চয়ই নজরে পড়বে আপনার! অন্যদেরও! হাজার হোক, এটি প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে। আর সেইজন্যেই তো আপনার ত্বকে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর কাজ এত সহজে হয়!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী রঙ ফর্সা করার ক্রীম তো বটেই...আরো কিছু

আপনি উপভোগ করবেন ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর কোমল স্পর্শ আর মনোরম সুগন্ধ! দিনে অন্ততঃ একবার ব্যবহার করুন, সবচেয়ে ভালো ফল পেতে হলে দুবার! নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার রঙ এমন ফর্সা হবে, যা নজরে পড়বে, আর প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে ঐ রকমই থাকবে!

লিনটাস-FALOV 8-2415 BG (R)

কফি, চা
আর
আমি!
SAGAR
SPRAY DRIED SKIM MILK POWDER
PROTEIN RICH
DISSOLVES INSTANTLY
NET WT. 500 GMS.
Skim Milk Powder
BANASKANTHA DIST. CO-OP. MILK PRODUCERS' UNION LTD. PALANPUR 385 001

চিঠিপত্র

বাংলাভাষা ব্যবহার ঃ লেখকের বক্তব্য

গত ২৩শে জুন 'দেশ' পত্রিকার ভাষার আত্মমর্যাদা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরীর চিঠিখানি পড়লাম। বাংলা ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও ইংরেজী ভাষার মতো আজো বলিষ্ঠ নয়, একথা সত্য। তা ছাড়া সংবাদপত্র বা ইত্যাকার প্রচার মাধ্যমে যে সব বাংলাভাষা ব্যবহার করা হয় তাতেও অনেক ত্রুটি, বিকৃতি দেখা যায়। তবু শ্রীচৌধুরীর দুটি কথার প্রসঙ্গে আমার কিছু বলার আছে।

প্রথমত, তিনি বলেছেন, 'কুম্ভীরাশ্রুপাত' কথাটির অর্থ তারাই বুঝতে পারবে যারা "ইংরেজীতে কথাটার অর্থ কী হয়" জানে। তাই কি ? আমাদের দেশে কুমীর কি খুবই অপরিচিত প্রাণী ? কুমীরের অশ্রুপাত যে অসম্ভব, তা 'ব্যাঙের সর্দি'র মতোই সকলের জানা। বিজ্ঞানীরা হয়ত কুমীরের চোখে অশ্রু দেখতেও পারেন, আমরা দেখিনা। সুতরাং 'কুম্ভীরাশ্রু' মানেই যে মায়াকান্না বা কপট সহানুভূতি' তা সকলেই বোঝে। এর জন্য 'ক্রোকডাইলস টিয়ার' না জানলেও ক্ষতি নেই।

দ্বিতীয়ত, "অর্ধেক বাঁটিয়া দেন বীর বৃকোদরে" বাক্যটি প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরীর মন্তব্য, "বৃকোদরের ভাগ বা ভীমসেনের ভাগ বলতে অসুবিধে আছে কিছু ?" আমরা বলি, আছে। ভীমসেন ও বৃকোদর একই ব্যক্তি হলেও কার্যত ভিন্ন। ভীমসেন নামে তাঁর প্রবল ভয়ঙ্কর শক্তির কথাই বোঝা যায়। আর বৃকোদর তিনিই যাঁর জঠরাগ্নি প্রবল। অর্থাৎ প্রচুর খেতে পারেন। অর্ধেক জিনিস (নিশ্চয় তা খাদ্য) যখন তাঁকে বন্টন করে দেওয়া হচ্ছে, তখন 'বৃকোদর' বিশেষণ ছাড়া বাক্যটি যথার্থ রূপলাভ করত না।

তরুণ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠ-নির্ণয়

'দেশ'-এর ৮ই আষাঢ় ১৩৮৬ তারিখে (৪৬ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা) প্রকাশিত প্রবন্ধে ডঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য রবীন্দ্র উপন্যাসের পাঠ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। আমি রবীন্দ্র-কাব্যের পাঠ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি—যা সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশেই তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করবে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠ-নির্ণয়ে কোন নীতি অবলম্বন করা উচিত।

প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি রবীন্দ্র-রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের নয়টি পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি। তা থেকে আমার এই ধারণা হয়েছে, তিনি অবলীলাক্রমে সব সময়ে করতেন, শব্দ বাক্য বিন্যাস পরিবর্তন করে শেষ পর্যন্ত লেখার চূড়ান্ত রূপ দিতেন। এই কাব্যের 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' কবিতাটির দুটি খসড়া পাওয়া যায়—৫ এবং ১২ নং খাতায়। স্পষ্ট বোঝা যায়, ১২ নং খাতাটির খসড়া পূর্ববর্তী, ৫ নং খাতার খসড়া পরবর্তী। কারণ প্রথমটিতে সচিত্র কাটাকুটি অনেক বেশি এবং দ্বিতীয়টিতে অনেক কম। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণের মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে ৫ নং খাতার খসড়ার মিল বেশী। এই ৫ নং খাতার পাঠেরও পরিবর্তন ঘটেছে প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে (আশ্বিন, ১৩৩৯)। যেমন পাণ্ডু-লিপিতে আছে 'প্রেমে জড়ানো তার ফুলের মালা।' কিন্তু প্রথম সংস্করণে 'তার' শব্দটি নেই। খসড়ায় আছে—'শমিতা বললে, ছি ছি দিদি, কী কলচ।' কিন্তু প্রথম সংস্করণে 'দিদি'-র পর কমাটি নেই, 'কলচ' বানান হয়েছে 'কল্চ'। খসড়ায় আছে—'ময়লা জামিয়ে কাগজপত্র রাশ করা'। প্রথম সংস্করণে আছে—'কালি-মাখা ময়লা জমিয়ে রাশ করা।' রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে 'পুনশ্চের' আর একটিমাত্র সংস্করণ (ফাল্গুন, ১৩৪০) বেরিয়েছিলো। এই শেষ সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠের কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তা আমার হাতের কাছে যে পরবর্তী (সর্বশেষ) সংস্করণ আছে তার পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাচ্ছি। কবিতাটির নাম 'সাধারণ মেয়ে'।

পাণ্ডুলিপি (৫ নং খাতা)
লাগত
করে
উঠল
করব-যে
করেচে
এই অংশ নেই

১৩৩৯ সন
লাগত
করে
উঠল
করব-যে
করেচে
তবুও কি সত্য নয় ?

১৩৪০ সং
লাগতো
কোরে
উঠলেম
করবো-যে
করেছে
তবুও কি সত্য নয় ?

১৩৭৭ সং
লাগত
করে
উঠল
করব যে
করেছে
তবুও কি সত্য নয় ?

যতিচিহ্নের যে কি রকম পরিবর্তন ঘটেছে, তা দেখাতে গেলে অনেকখানি জায়গা জুড়বে। 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু 'সাধারণ মেয়ে' প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৩৯ সালের কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে

এখন আপনি ওর দাঁত যন্ত্রণাদায়ক ছিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন

কিনুন সিগন্যাল 2

এতে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা যা দাঁত মজবুত ক'রে দন্তক্ষয় রোধ করে

দাঁতের ব্যথা শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়—এ দন্তক্ষয়েরও লক্ষণ। অবহেলা করলে ক্ষয় আরও গভীর হবে, পরিণামে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত্তের সৃষ্টি হবে।

সাধারণ টুথপেস্ট গুলো এসিড রোধ করতে পারেনা, যে-এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করে।

সিগন্যাল 2-তে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা যা মুখের এসিডকে দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করতে বাধা দেয়।

দন্তছিদ্র রোধ করে

বেশী দেরী হয়ে যাবার আগে এখনই পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করুন যা দন্তক্ষয় রোধ করে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, আর তা হোল —সিগন্যাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা দাঁতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এসিডকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে—আর দাঁতে গর্ত্ত সৃষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল ফল দেয়না।

শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন না। আপনার দাঁতের ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন।

পরিবারের সবার দাঁতে ছিদ্র রোধ করে।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SG2.1-2416 BG

হয়তো কিছু পার্থক্য ধরা পড়তেও পারে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ একাধিক খসড়ায় নানা পরিবর্তন করেছেন, খসড়া থেকে পত্রিকায় প্রকাশের সময় পরিবর্তন করেছেন, জীবৎকালে প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তন করেছেন। সুতরাং এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো গ্রন্থের যথার্থ পাঠ নির্ণয় যে দুরূহ, শ্রমসাধ্য ও বিপদসংকুল কাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে শব্দের বানান, বাক্যের সংস্থান, পঙ্ক্তির বিন্যাস, যতি-চিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নানা সময়ে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা যদি সম্পূর্ণভাবে কবি-অনুমোদিত না হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট সম্পাদক বা প্রকাশকেরা পাঠকের কাছে দায়ী হয়ে থাকবেন। পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতার পাণ্ডুলিপি এবং কবির জীবৎকালের প্রথম ও শেষ সংস্করণ মিলিয়ে দেখে অমিত্রসূদনবাবুর মতো আমারও মনে হয়েছে, আর কিছু না হোক অন্তত বানান ও যতিচিহ্নের পরিবর্তনে সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। কবির মৃত্যুর পর এই জাতীয় যে পরিবর্তন ঘটেছে তার দায়িত্ব প্রকাশন কর্তৃপক্ষের।

এই পর্যন্ত যা লিখলাম, তাতে অমিত্রসূদনবাবু কোনো কোনো বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। শুধু রবীন্দ্র-উপন্যাস নয়, সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোনো ক্ষেত্রেই কবিকর্তৃক একদা বর্জিত পাঠ মূলপাঠে গ্রহণ করা যাবে না। যদি কোনো বর্জিত পাঠ তাঁর অগোচরে যুক্ত হয়ে থাকে তবে তা বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ করা উচিত। তা ছাড়া অমিত্রসূদনবাবুর মতো আমিও মনে করি, কবির জীবৎকালে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থের শেষ সংস্করণের পাঠকেই আদর্শ পাঠরূপে নীতিগত-ভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য। অবশ্য এতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর অসুবিধা হতে পারে—যেমন পুনশ্চের শেষ সংস্করণে ক্রিয়াপদের যে বানান আছে তা গ্রহণ করা কি সঙ্গতিপূর্ণ হবে?

আর কয়েক বছর পরেই বিশ্ব-ভারতীর রবীন্দ্র-গ্রন্থস্বত্ব থাকবে না। তখন প্রতিযোগিতামূলক বাজারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের শেষতম সংস্করণের বহুবিধ মুদ্রণ পাওয়া যাবে। তাই আমার প্রস্তাব, রবীন্দ্রনাথের লিখিত পাণ্ডুলিপি ও প্রথম প্রকাশিত রূপের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেক গ্রন্থের পাঠ প্রস্তুত করা উচিত এবং তা প্রকাশের সময় পরিশিষ্টে সাময়িকপত্রে ও বিভিন্ন সংস্করণে পাঠের যে পরিবর্তন হয়েছে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া উচিত। সেই প্রস্তাবিত সংস্করণ সাধারণ পাঠকের কাছে না হোক, গবেষক-বিশেষজ্ঞের কাছে মূল্যবান হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ যত বড়ো কবি-মনীষীই হোন না কেন তিনি উর্বশীর মতো জন্মলগ্নেই পূর্ণ প্রস্ফুটিত হননি। তাঁরও একটা ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আছে। প্রস্তাবিত সংস্করণ সেই ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

জীবেন্দ্র সিংহরায় বর্ধমান

গোঘ্ন

মৎ-প্রবন্ধে 'গোঘ্ন' শব্দার্থ প্রসঙ্গে ১৪ জুলাই দেশে শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের চিঠিতে বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। আমার ব্যাকরণবোধ অতি নগণ্য। কিন্তু এও বুঝি, ব্যুৎপত্তির গাড্ডায় পড়লে কিন্তর সুপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ, রূপ এবং মানে উম্ভট ঠেকতে পারে। এ যেন চিটে গুড় মেখে তুলোর গুদামে ঢোকা।

ব্রজেনবাবু লিখেছেন গম্+ডচ্= গো। তা কী করে হবে? ব্যাকরণ শাস্ত্র অনুসারে অবশ্যই গম্+ডো=গো (গৌঃ)। ডচ্ প্রত্যয় প্রকরণের কথা জানি না। কিন্তু ডাচ্ তদ্ধিত প্রকরণে ধাতুর উত্তরে কিছু করা কোথায়। এক্ষেত্রে বড় জোর গম্+ডাচ='গমনাকরোতি' পেতে পারি। কদাচ গো বা গৌঃ নয়।

গোঘ্ন ছান্দস শব্দ। (ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল, ১১৪ সূক্ত ১০ ঋক দেখুন।) কোন ছান্দস শব্দের প্রকৃত মানে ছান্দস প্রয়োগের ক্ষেত্র চুঁড়ে নিষ্কাশন করতে হবে। হাজার হাজার বছর পরে কে কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা গণ্য করব কেন? ঋগ্বেদে 'গো' সর্বদা সর্বথা গরুতেই প্রযুক্ত। এই প্রয়োগ এত সামান্য (common) যে সারা ঋগ্বেদ শুধু নয়, পরবর্তী সব প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে গরু বোঝাতে 'গো'র ছড়া-ছড়ি। ঋগ্বেদেই কোথাও কোথাও অবশ্য সংশয়ের সুযোগ আছে। যেমন, 'গোমাতারো' (১।৮৫।৩), কিংবা 'গোরদস্থাৎ' ১।১৬৪।১৭)। সায়ন প্রথমটিতে গো মানে পৃথিবী এবং দ্বিতীয়টিতে আদিত্য রশ্মি ব্যাখ্যা করেছেন। আবার 'গোর্ন পর্বাকিরদা' (১।৬১।১২) বাক্যে সায়ন গো মানে পশু করেছেন। (যথা মাংসস্য বিকর্ত্তার লৌকিকপুরুষাঃ পশরোঙ্গবান ইতস্ততো তদ্বৎ।) বৈদিক ব্যাখ্যায় গো শব্দের মানে জল, বাক্য ইত্যাদিও বলা হয়েছে। এক শব্দের একাধিক অর্থ এবং প্রয়োগ স্বীকার করলেও আমরা অধিকতর প্রচলিত প্রয়োগকেই গুরুত্ব দেব। ঋগ্বেদে প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবী বলতে পৃথিবী শব্দই বহুল প্রযুক্ত। এমনকি, পৃথিবী নামে পৃথক একটি সূক্তই রয়েছে (৫।৮৪)। তা ছাড়া, দৌ-এর সঙ্গে যুক্ত করে 'দ্যাবাপৃথিবী'র নামেও ছয়টি সূক্ত আছে। উপরোক্ত 'গোমাতারো' প্রযুক্ত সূক্তটি মরুৎগণের উদ্দেশে নিবেদিত। স্পষ্টত এটি রূপক। মনে রাখা দরকার, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা বৈদিক রূপকতত্ত্বের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। এই তত্ত্বটি গোলকধাঁধা। এঁরা তো অর্বাচীন ব্যাখ্যাকার। প্রাচীন নিরুক্তকার যাস্ক কিংবা তাঁরও পূর্ববর্তী সপ্তদশ টীকাকার—স্বয়ং যাস্ক যাঁদের উল্লেখ করেছেন এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের সায়ন পর্যন্ত সকলেই যে-যার ইচ্ছেমত ছান্দস শব্দের অর্থনিষ্কাশনে ব্রতী হয়েছেন। নিঘণ্টু নামে অপ্রচলিত ছান্দস শব্দের যে তালিকা-সমন্বিত অভিধান আছে, সেটিও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সব টীকাকারই বস্তুত প্রত্যক্ষ শব্দার্থের চেয়ে ভাবার্থ নিষ্কাশিত করছেন। এক কথায়, ওঁরা ব্যাখ্যাকার মাত্র। যেমন 'নষ্ট কাঞ্চনলতা' বললে বিদ্যুৎ

ছটি উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়
(ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার)
সমরেশ বসু
শংকর
বিমল কর
নীললোহিত ও
গৌরকিশোর ঘোষ

বিশেষ রচনা

'সৈনিকের স্মৃতি'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রবাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত তখন যে ক'জন ভাগ্যবান তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবিদ হাসানের মত নেতাজীর কাছের মানুষ খুব বেশী ছিলেন না। ইয়োরোপের সংগঠন ছেড়ে নেতাজী সাবমেরিনে পূর্ব এশিয়া রওনা হলেন, নব্বুই দিন ধরে সেই দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল সমুদ্র যাত্রায় একমাত্র ভারতীয় সঙ্গী আবিদ হাসান।
আবিদ হাসানের সঙ্গে টেপ রেকর্ডারে ধৃত এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই চাঞ্চল্যকর রচনাটি লিখেছেন কৃষ্ণা বসু।

গল্প রম্যরচনা রসরচনা

**সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী,
সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রতিভা বসু,
রমাপদ চৌধুরী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়,
সমরেশ মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়,
বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেবসেন
ও আরো অনেকে।**

কবিতা

অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র,
সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী,
শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুমার সরকার,
শঙ্খ ঘোষ, কেতকী কুশারী ডাইসন,
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার,
আনন্দ বাগচী, রাজলক্ষ্মী দেবী
সুনীল বসু ও আরো অনেকে।

এছাড়া রামকিঙ্কর, শক্তি বর্মন ও
গণেশ পাইনের আর্টপ্লেট।

১২.০০ টাকা/সডাকে ১৪.৯০ টাকা

আপনার কপির জন্যে এখনই এজেন্টকে বলে রাখুন বা আমাদের লিখুন। সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০১

বোঝাতে পারে। কিন্তু বিদ্যুৎ, কাঞ্চন ও লতার পৃথক পৃথক নিজস্ব শব্দার্থ আছে—যা সুপ্রচলিত। নৈরুক্তিক ব্যাখ্যায় 'গৌঃ ইতি পৃথিবী' বললে আপেক্ষিক অর্থ খুঁজতে হবে প্রয়োগ-ক্ষেত্রটিতে এবং কোনও ক্ষেত্রে পৃথিবীকে গো-রূপে কল্পনার ব্যাপারটাও সত্য হয়ে উঠতে পারে। গৌঃ মানে পৃথিবী—এমন একচ্ছত্র ঢালাও অর্থ মানব কেন? বিশেষ করে যখন প্রাচীনতম টীকাকার থেকে শুরু করে অর্বাচীনতমও টীকাকার পর্যন্ত সকলের মধ্যেই পরস্পর বিরোধিতা এবং বিতর্কের অন্ত নেই! এর কারণ, প্রধানত দুটি। অধিকাংশ বৈদিক সূক্ত রূপক এবং তার ভাষা ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল পরবর্তী যুগে।

এ বিষয়ে আচার্য সুনীতিকুমারের মত প্রণিধানযোগ্য। 'ঋগ্বেদ সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমে সংগৃহীত এবং প্রাচীন ব্রাহ্মীতে লিখিত হয়।...খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের আগে ঋগ্বেদের ভাষা আংশিক দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। তখন ওই এলাকায় একটি অর্বাচীনতর রূপভেদ প্রচলিত হতে থাকে। এর নামই সংস্কৃত।...প্রথমে একে লৌকিক বলা হত।' ...বৈদিক টীকাকাররা এমতাবস্থায় নিজের নিজের যুগ ও সামাজিক ধ্যানধারণা-সংস্কার অনুসারেই বেদব্যাখ্যা ও ছান্দস শব্দার্থ নিরূপণ করেছেন।

পাণিনিসূত্রের যে ব্যাখ্যাটি ব্রজদুলাল বাবু উল্লেখ করেছেন, তার অর্থ প্রাঞ্জল। 'গাং হন্তি তস্মৈ গোঘ্নঃ অতিথি।' গো শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে গাং ঃ গরুকে। হন্-এর (পরস্মৈপদী) লট এক বচনে প্রথম পুরুষে হন্তি ঃ হত্যা করে। বাক্যটির সরলার্থ ঃ গরুকে হত্যা করে যে, সে গোঘ্ন এবং অতিথি। পাণিনি মতে এ ক্ষেত্রে গো মানে পৃথিবী হলে সপ্তমী প্রয়োগই স্বাভাবিক হত। অর্থাৎ শব্দটি হত 'গাবি'। পৃথিবীকে কেউ ভ্রমণ করে না, পৃথিবীতেই ভ্রমণ করে। আর, হত্যা ... ...ছে বোঝাতে ঋগ্বেদে 'হন্তি'ও রয়েছে।

এবার হন্ শব্দটি দেখা যাক। 'গো'র মতো হন্-এর ছান্দস প্রয়োগ বহুল এবং সুপ্রচলিত। পুনঃপুনঃ তা হত্যা অর্থেই প্রযুক্ত। অদাদিগণীয় ধাতু হন্-মূলক শব্দগুলি লক্ষ করা যাক। যেগুলি হন্+ক=ঘ্ন হয়েছে। বৃত্রঘ্ন (বৃত্রহন্), শত্রুঘ্ন, কৃতঘ্ন পিতৃঘ্ন, পুরুষঘ্ন, বিঘ্ন ইত্যাদি। প্রত্যেকটিতে হত্যা আছে। হঠাৎ গোঘ্নের বেলায় কেমন হন্+ক=ঘ্ন গতি বা ভ্রমণ বোঝাতে যাবে কোন যুক্তিতে? গোঘ্নের ছান্দস প্রয়োগের একটি প্রত্যক্ষ নজির দিই ঃ 'আরে তে গোঘ্নমুত পুরুষঘ্নং' (১।১১৪।১০) ইত্যাদি। স্পষ্ট অর্থ ঃ গোহত্যাকারী, পুরুষ হত্যাকারী। এখানেও কি বলা হবে ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী বোঝাচ্ছে?

এ কথা ঠিক, অভিধানে হন্ অর্থে গতিও আছে। কিন্তু সুস্পষ্ট ছান্দস প্রয়োগ কোথায়? কবিকল্পদ্রুমে (গুরুনাথ কাব্যতীর্থ সম্পাদিত) বলা হয়েছে ঃ 'উদ্ধৃতি বিনা গতৌ নাস্য প্রয়োগঃ।' গমন অর্থে হন্-এর একটি রূপ আমার চোখে পড়েছে। তা হল ঃ জঙ্ঘনাতে (হন্+যঙ)। কিন্তু কোথায় ঘ্ন, আর কোথায় জঙ্ঘনাতে! (বাংলায় হনহন করে যা হন্তদন্ত চলার যে প্রয়োগ আছে, তাও কিন্তু মূলত এসেছে হত্যার উদ্দেশে গমন থেকে। বাংলায় এমন প্রয়োগ-বিকৃতির নমুনা প্রচুর।)

তদুপরি ভাষাতাত্ত্বিক-ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারও অনিবার্য হয়ে ওঠে। গো শব্দ ইন্দো-ইউরোপীয় অর্থাৎ তথাকথিত আর্যভাষাগোষ্ঠীতে একটি সুপ্রচলিত এবং সামান্যভাবে প্রযুক্ত শব্দ। সবার এটি গরু। জেন্দাআভেস্তায় গাও, ফার্সিতে গাও, জার্মানে Bous ল্যাটিনে Bos, কেল্টিক ভাষায় Bo, লিথুয়ানিয়ান ভাষায় Cow, ইংরেজীতে Cow এবং সবই নিতান্ত গরু—যা কি না পশুপালক আদি আর্যজনগোষ্ঠীর একান্ত মূল্যবান সামাজিক সম্পদ।

'গোঘ্ন' শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থ গো-হত্যাকারী। অতিথিকে গোঘ্ন বলার কারণ, একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা—যা আজও কিছু আদিম জনগোষ্ঠীতে প্রচলিত। যে পশুর মাংসে অতিথি সৎকার হবে, তা অতিথিকে দিয়েই বধ করিয়ে নেওয়া হয়। এতে অতিথিকে মর্যাদা দেওয়া হয় এবং গৃহস্থের সামাজিক সংস্কার তৃপ্ত হয়। এতে বিন্দুমাত্র কষ্টকল্পনা নেই। বরং ঘ্ন শব্দের অর্থ ভ্রমণকারী ধরে নেওয়াটাই শুধু কষ্টকল্পনা নয়, অতিমাত্রায় উদ্ভট।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলকাতা-১৪

বরাবর যাত্রায় ভীষণ বিপদ

অবশেষে "বরাবর যাত্রায় ভীষণ বিপদই" হল। আর বিপদটি ঘটালেন শ্রীমতী বাণী রায়। আসলে 'মানসী' পত্রিকায় প্র কা শি ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি বহু পঠিত ও বহু আলোচিত রচনা। বিহারের যে কোন প্রবীণ বাঙালীর কাছে বসে (যেমন অশীতিপর বৃদ্ধ অথচ মনের দিক দিয়ে এখনো সবুজ ও সতেজ শ্রদ্ধেয় শ্রীরংগীন হালদার মহাশয়) রবীন্দ্র-প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করুন, বরাবর যাত্রার কৌতুক-জনক কাহিনীটি এসেই যাবে। যত দূর স্মরণে আসে, রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বইতে এই রচনাটির উল্লেখ করেছেন।

আমরা খুশী হতুম শ্রীসেনগুপ্ত যদি "বরাবর" সম্পর্কে আরও কিছু আলোকপাত করতেন। গয়া থেকে রেল-পথে পাটনা যেতে একটু পরেই বেলা স্টেশন পড়ে। ট্রেন থেকেই বরাবর গিরিশ্রেণী নজরে আসে। কথিত আছে, মৌর্য সম্রাট অশোক আজীবিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের জন্যে এই পাহাড়ে গুহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। গুহার ভিতরের মসৃণতা আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তবে দিনের বেলাতেও বড় সেল্-এর টর্চ নিয়ে প্রবেশ করাই যুক্তিযুক্ত। অনেক সময় সর্পদেবের উপদ্রব দেখা দেয়।

মহাভারতেও এই পাহাড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। মগধ সম্রাট জরাসন্ধকে বধ করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন যখন রাজগৃহাভিমুখে যাচ্ছিলেন তখন সঙ্গে পথপ্রদর্শক বা গাইড ছিলেন লোমশ মুনি। শোণ নদী অতিক্রম করে তাঁরা গয়া শহরে প্রবেশ করেন। পরে তাঁরা বরাবর শৃঙ্গে আরোহণ করলেন।

পুজো সংখ্যা মানেই আনন্দবাজার

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা

উপন্যাস

কালকূট
রমাপদ চৌধুরী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব গুহ
রমানাথ রায়

বড় গল্প

শংকর

সচিত্র প্রবন্ধ

'রবীন্দ্রনাথ কেমন ক'রে লিখতেন।'
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

গল্প

আশাপূর্ণা দেবী
সন্তোষকুমার ঘোষ
বিমল কর
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
নবনীতা দেব সেন
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সমরেশ মজুমদার
শেখর বসু
এবং আরো অনেকে।

কবিতা

বিষ্ণু দে
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
রাজলক্ষ্মী দেবী
অরুণ কুমার সরকার
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
আলোক সরকার
সুনীল বসু
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
রত্নেশ্বর হাজরা
সাধনা মুখোপাধ্যায়
দেবারতি মিত্র
এবং আরো অনেকে।

১২.০০/রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪.৯০

আপনার কপির জন্য আজই এজেন্টকে বলে রাখুন বা আমাদের লিখুন ঃ
সার্কুলেশন ম্যানেজার,
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড
কলকাতা-৭০০ ০০১

১৩৮৬

AAB/CAS-2/79 BEN

রাজগীরের দিকে হস্ত প্রসারিত করে লোমশ মুনি দেখালেন তাঁদের পরবর্তী যাত্রাপথ। মহাভারতে বর্ণিত ভৌগোলিক বিবরণ মোটামুটি ঠিকই আছে; তবে আজকাল গয়া থেকে রাজগীর যেতে হলে বরাবর পাহাড়ের দিকে যাবার প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে গয়া থেকে রাজগীর যাবার যে পথ, "বরাবর" ঘটনার প্রায় বছর দশেক আগে ভগিনী নিবেদিতা ও আচার্য যদুনাথ সরকার সহ রবীন্দ্রনাথ সেই পথে গিয়েছিলেন, যার সরস বর্ণনা শ্রীসেনগুপ্ত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় পেতে পারেন। প্রখ্যাত ইতিহাস-বেত্তা, ডক্টর বেশাম (A L Basham) গয়া-বুদ্ধ গয়া ভ্রমণে এলে বরাবর পাহাড়ে অবশ্য যাবেনই একবার। ফর্স্টারের A Passage to India যদি একটু সজাগ মনে পড়া যায়, তবে বরাবর পাহাড়ের পরোক্ষভাবে উল্লেখ লক্ষ করা যায়। সেদিনের মত বেলা স্টেশনে নেমে বরাবর দেখতে যাওয়া আজও অসুবিধাজনক; কারণ, যানবাহনের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে টাঙ্গা পেলেও পেতে পারেন, তবে সন্ধ্যা নামার আগেই প্রত্যাবর্তন করা সমীচীন।

সোমনাথ রায়
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বিগত যুগের গান

এইচ এম ভি রেকর্ডে পি ১১৬৬৮ জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের গাওয়া দুটি বাংলা গান আমরা শুনেছি (১) আমি বেসেছি ভাল বেসেছি (জৌনপুরী), (২) বহুদিন পরে এসেছ বঁধুয়া (ভৈরবী)।

'সুধাসাগরতীরে' রচনার সুধী লেখক ১৬ জুনের দেশে মুশতারী বাঈ-এর প্রসঙ্গ তুলেছেন। ইনি কি রেকর্ডের মুশতারী—যিনি সেকালের অনেকের মত গানের শেষে নিজের নাম বলেছেন? যাই হোক না কেন, আমরা সুনিশ্চিত যে, পরে পরে সুরেশবাবু এমন অনেক অধুনাবিস্মৃত সঙ্গীত-গুণীর কথা শোনাবেন যাঁদের কণ্ঠস্বর বা গায়নভঙ্গির আভাস বিগত যুগের গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত ছিল। লালচাঁদ বড়াল, নিকুঞ্জ দত্ত থেকে শুরু করে কিষণরাও, শ্রীজান বাঈ, পিয়ারা সাহেব, গোপেশ্বর, গহরজান, লালচাঁদ, অঘোর নাথ, রাধিকাপ্রসাদ, ললিত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

একালের উৎসুক সঙ্গীত-পিপাসুরা তা কোনদিনই শুনতে পাবেন না। এর কি কোন প্রতিকার নেই?

শুভেন্দুশেখর পাত্র
সুরঞ্জলাল মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-২

শালবীথি

দেশ পত্রিকায় গত ৭ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীদিলীপ ভট্টাচার্যের 'শালবীথি' রচনাটিতে বেশ কয়েকটি ভুল চোখে পড়ে।

তিনি লিখেছেন, 'বন বিভাগের আধুনিক নিয়ম হিসাবে এই রকম রিক্রুমেন্ট-এর উদ্ভব হলে পরই কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত শালগাছগুলি কেটে ফেলার অধিকার জন্মায়।'

যতদিন পর্যন্ত না শালচারাগুলি পোল-স্টেজে পৌঁছায়, ততদিন ... প্রাপ্ত শালগাছগুলি কেটে ফেলা হয় না। রিক্রুটমেণ্ট স্টেজ-এ অ্যাডভার্স ক্লাইমেটিক কণ্ডিশন, বায়োটিক ইণ্টার-ফিয়ারেন্স ফায়ার প্রভৃতি কারণে শাল-চারাগুলির মধ্যে ডায়িং-ব্যাক বলে এক ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায় এবং যার ফলে শালের রিজেনারেশন পিরিয়ড বেড়ে যায়, এমনকি অনেক রিজেনারেশন অসফলও হতে পারে।

তাই এই সব অ্যাডভার্স কণ্ডিশন-এর হাত থেকে রিক্রুটমেণ্টকে বাঁচাবার জন্য বয়ঃপ্রাপ্ত গাছগুলিকে ততদিন পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয় যতদিন না শালচারাগুলি পোল বা এসট্যাবলিশড স্টেজ-এ পৌঁছায়।

আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'একটি শালগাছের পূর্ণ বয়স্ক হতে সময় লাগে ১২০ বছর......'

এখানে 'পূর্ণ বয়স্ক' বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? যদি তিনি রোটেশন এজ-এর কথা ভেবে থাকেন, তবুও বক্তব্যে ভুল থেকেই যায়।

তিনি যে অঞ্চলের কথা বলেছেন, ঐ অঞ্চলে ১২০ বছরে শালগাছের কাণ্ডের গড় ব্যাসার্ধ হয় ৪১ সেঃ মিঃ এবং ঐ ব্যাসার্ধযুক্ত শালগাছের কাণ্ডের এখন বাজারে চাহিদা আছে। তাই ১২০ বছরকে রোটেশন এজ ধরা হয়। কিন্তু যদি ৯০ বছরের ৩১ সেঃ মিঃ ব্যাসার্ধ-যুক্ত শালকাণ্ডের বাজারের চাহিদা বেড়ে যায় এবং সেই অনুসারে রোটেশন এজ ঠিক করা হয়, তবে কি দিলীপবাবু ৯০ বছরের শালগাছকেও 'পূর্ণ বয়স্ক' বলবেন?

আরও ভুল রয়েছে 'বনাঞ্চলে বৃক্ষবিবর্তনের বয়স (রোটেশন এজ) ২০ বছর'—তা হলে কি শাল ফাস্ট গ্রোয়িং স্পিসিজ? যে অঞ্চলের কথা দিলীপবাবু লিখেছেন, সেখানে শালের ক্রম বিবর্তনের বয়স ১২০ বছর। শালের এই রোটেশন এজ যে সব বনাঞ্চলেই ১২০ বছর হবে তাও ঠিক নয়। সাইট ফ্যাক্টর বায়োটিক অ্যান্ড অ্যাবায়োটিক ইনফ্লুয়েন্সেস, ফায়ার হ্যাজার্ড প্রভৃতি ফ্যাক্টরসের উপর রোটেশন এজ নির্ভরশীল।

শ্যামলকুমার দত্ত দেরাদুন

বিজ্ঞান

সাতই জুলাই ১৯৭৯ দেশ পত্রিকায় সর্বসাধারণের জন্য লিখিত 'পেনিসিলিন'-এর জন্য ধন্যবাদ জানাই। এক জায়গায় লেখা হয়েছে—"টিবি থেকে কত রকম দুরারোগ্য ব্যাধি—মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে যারা মূর্তিমান মৃত্যু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছিল, তাদের নির্মূল করা গেল।"

আমার বক্তব্য, পেনিসিলিন টিউবার-কুলোসিসের জন্য ব্যবহৃত হয় না। কারণ, এই রোগের জীবাণু "মাইকোব্যাক-টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস"-এর উপর পেনিসিলিনের কোন ক্রিয়া নেই।

বেনীমাধব দাস অধিকারী
কলিকাতা-৪

লেখকের নিবেদন : বেনীমাধববাবুর বক্তব্যই ঠিক। অনবধানতাবশত এই ত্রুটির জন্যে আমি দুঃখিত।
সত্যজিৎ কর

দেশ ৪৬ বর্ষ ৪২ সংখ্যা
১ ভাদ্র ১৩৮৬

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

রশীদ আল ফারুকীর প্রবন্ধ
মুসলিম রচিত বাঙলা উপন্যাসের আদিপর্ব
উমা সিদ্ধান্তের প্রবন্ধ
লোকশিল্প ও লোকশিক্ষা
শিশির লাহিড়ীর গল্প
নিরাপদর তীর্থযাত্রা
রমানাথ রায়ের গল্প
রামরতন সরণি

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৭৪ থেকে
মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্কাইল্যাবের অন্তিম ও ততঃপর

স্কাইল্যাব নাটকের শেষ অঙ্কের দৃশ্য তথা ঘটনা বিশ্বজনতার উদ্বেগ প্রশমিত করেছে। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের অদূরে ভারত মহাসাগরের জলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপগ্রহ স্কাইল্যাবের পতন চরম প্রকারে নিষ্পন্ন হয়ে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুস্টনে অবস্থিত 'জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ প্রশাসন' নামে আখ্যাত সংস্থা স্কাইল্যাবের পতনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষজ্ঞতার নানা তথ্য ও অভিমত বেশ কিছুদিন ধরে প্রচারিত করে এসেছেন। সেই তথ্য ও সেই অভিমত অবশ্য ওই সংস্থার সদাজাগ্রত সন্ধিৎসা ও গবেষণার প্রত্যক্ষ দান। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ওই 'নাসা' সংস্থার প্রচারিত তথ্য ও ধারণা একটু বেশি মাত্রায় পরিবর্তশীল হবার ফলে বিশ্বজনতার উদ্বেগ সার্থক প্রকারে প্রশমিত করতে পারেনি। একবার প্রচারিত হলো, স্কাইল্যাব পৃথিবীর কোন অংশের কোন্ স্থানের উপর ভেঙে পড়বে, সেটা হিসেব করে বলে দেওয়া সম্ভবই নয়। কবে ও ঠিক কোন ক্ষণে পতন শুরু হবে, তারও পূর্বাভাস প্রদান করা কোন বৈজ্ঞানিক অনুমানের কৃতিত্বে সম্ভব হয়নি। আবার এই ধারণার কথাও প্রচারিত হয়েছিল যে, স্কাইল্যাব সমুদ্রের জলেই আত্মবিসর্জন করবে। স্কাইল্যাবের শেষ পরিণামের রীতি-নীতি ও দিনক্ষণ সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তার ঘোষণা বিশ্বের জনজীবনের উদ্বেগের উপর আতঙ্ক সঞ্চারিত করেছিল। তার ফলে অনেক দেশের অনেক স্থানের জনজীবনে মাত্রাধিক অস্বস্তি ও চাঞ্চল্য উদ্বেলিত হয়েছিল, যেমন মনে তেমনি আচরণে। ভারতে দেখা গিয়েছে রক্ষাকারক তাবিজ-মাদুলির একটা ব্যবসায়িক পরিস্ফীতি। একটি খবর, গুজরাটের শুধু এক রাজকোটে পঞ্চাশ কোটি টাকার সম্পত্তি-বীমা সম্পন্ন হয়েছে। যেন কেয়ামতের দিন এসে গিয়েছে, যেন মানবীয় অস্তিত্বের ভয়ংকর শেষের সেদিন আসন্ন. এ হেন এক বিশ্বাসের প্রকোপ ভারতের নানা স্থানের জনতার চিন্তায় ক্রিয়ান্বিত হয়েছে।

স্কাইল্যাবের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই যে, আশি টন ওজনের এই উপগ্রহ মহাকাশ গবেষণার একটি যান্ত্রিক আয়তন হিসাবে নির্মিত হয়ে ১৯৭৫ সালে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। আশা ছিল যে, অন্তত ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মহাকাশে উপার্জিত কক্ষপথে স্কাইল্যাবের বিচরণ অব্যাহত থাকবে। কিন্তু আশার হিসাবটা খুবই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। নিউ-ইয়র্ক টাইমস অভিযোগ করেছেন যে, প্রয়োজনীয় খরচের ঝুঁকি নেবার ইচ্ছা ছিল না বলে কম খরচের মধ্যে স্কাইল্যাবের নির্মাণ সমাপ্ত করবার ফলে স্কাইল্যাব দুর্বল হতে বাধ্য হয়েছিল স্কাইল্যাবের নিরাপদ পতনের ঘটনা সম্বন্ধে 'নাসা'র পক্ষ থেকে একটি চমৎকার অধ্যবসায়ের কথ প্রচারিত হয়েছে। ঠিক সময়ে, অর্থাৎ পতনের পূর্ব মুহূর্তে নাসা সংস্থার দ্বারা নিয়োজিত ও উৎক্ষিপ্ত রকেটের ক্রিয়ার তাড়নাতে স্কাইল্যাব ভারত মহাসাগরের উপরভাগের দিকে প্রধাবিত হয়েছে। স্থলভাগের ভাগ্য অনাহত ও নিরাপদ হয়েছে। 'নাসা' সংস্থার এই বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের সত্যাসত্য বিচার করবার যোগ্যতা বিশ্বের সাধারণ জনতার নেই। তবু, 'নাসা'র কৃতিত্বের দাবিটিকে নিতান্ত একটা চতুর মনোবৃত্তির দাবি বলে সন্দেহ করবারও কোন সার্থকতা নেই বিগত ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী ও আগস্টে ওই স্কাইল্যাবের ছয়-হাজার পাউন্ড পরিমিত ওজনের অংশ তিন ভাগ সমুদ্রে এক ভাগ আজোরস দ্বীপের নিকটে পড়েছিল। বাস্তব সত্যতার তথ্য এই যে, উপগ্রহের দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে ছোট-বড় এক-একটি উল্কা-লোষ্ট্র পৃথিবীতে পড়তেই থাকবে। এই সম্ভাবনার মধ্যে পৃথিবীর জনপদ ও জনপদবাসীর পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কোথায়?

বর্তমান মহাকাশে উপগ্রহ বিচরণের তথ্যগত যে হিসাব সংকলিত করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, মহাকাশে এখন সোভিয়েট রুশিয়ার ৪৫৬৩টি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৫৩৩টি এবং অন্যান্য দেশের ৭৮টি উপগ্রহ মহাকাশে বিচরণ করছে। অন্যান্য দেশের এই ৭৮টি উপগ্রহের মধ্যে ভারতের 'আর্যভট' এবং 'ভাস্কর'ও আছে। একদিন এরা সকলেই ক্লান্ত হবে, বিকল হবে ও গতিবেগ ক্রমে মন্থর হয়ে পৃথিবীর আকর্ষণ-বৃত্তের পরিধির কাছে এসে পৌঁছবে। সুতরাং, প্রত্যেককেই প… যেতে ও ভূতলে পড়ে যেতে হবে। এই অবধারিত সম্ভাবনাকে কোন রাজনৈতিক ভাবনা দি… পরিচ্ছন্ন করতে পারা যাবে না। ক্ষতিপূরণের দাবি-দাওয়াও সমস্যার সার্থক প্রতিকার সাধি… করবার পন্থা নয়। এই পন্থা অনুসৃত হলে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের সৌষ্ঠব শুধু ক্ষুণ্ণ হ… কিন্তু উপগ্রহের পতন তো নিবারিত হবে না। উপগ্রহের বৈজ্ঞানিক নির্মাণের একেবারে নিখুঁ… পদ্ধতি উদ্ভাবিত করা সম্ভব নয়। মহাকাশে বিচরণরত উপগ্রহেরা একদিন উল্কাপিন্ড হ… চরম বিনাশ আহ্বান করবে, অধিকন্তু বহু নতুন উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে সুতরাং, এ বিষয়ে এমনতর এক আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও চুক্তি নিষ্পন্ন করতেই হ… যেটা পৃথিবীর সব মানুষের পক্ষে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার সার্থক এক সনদ হতে পারবে

'রাজা মহারাজা কে জানে —
আমিই রাজা ধিরাজ'
দিল্লীর বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত

সুধাসাগর তীরে

সুরেশ চক্রবর্তী

॥ ১৫ ॥

বদল খাঁ সাহেবের সংগীতশৈলী ও ঘরানা সম্পর্কে আমি অবশ্য এ কথা বলছি না যে তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন বা একমাত্র বুজুর্গ ছিলেন, কিন্তু আমরা আমাদের স্বল্প জীবন-পরিসরের মধ্যে যত গুণী ও সংগীতের সাধক দেখেছি বা শুনেছি তাঁদের মধ্যে বদল খাঁ সাহেব যে পহিলা রজার অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর সারিতে ছিলেন, সেটা নিঃসন্দেহ। তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্বের শিল্পী-দের নাম-ই শুনেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে সংগীত-শ্রবণের সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। সংগীতসম্রাট আল্লাদিয়া খাঁ-এর গানও আমরা শুনেছিলাম তাঁর অত্যন্ত প্রাচীন বয়সে, সুতরাং যৌবনের ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তির চমক উপভোগে মুগ্ধ হওয়া সম্ভব হয়নি। কথায় কথায় দু-একজন বিশিষ্ট ঘরানার সংগীতজ্ঞের কথা মাঝে মাঝে বলতেন, তার মধ্যে প্রধানতম ছিলেন এই আল্লাদিয়া খাঁ। আর একজন সামান্য বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু প্রতিভায় অসাধারণ ভাস্বর, বিশিষ্ট 'কিরানা' ঘরানার ধারক হিসাবে সম্মানিত গুণীর কথাও তিনি বলেছিলেন, তাঁর নাম ছিল আবদুল ওয়হীদ্ খাঁ। তিনি উপাধি পেয়েছিলেন 'সিরতাজ-এ মৌসিকী' আর বিখ্যাত বীণকার বন্দে আলী খাঁয়ের ঘনিষ্ঠ রিশতেদার (আত্মীয়) ছিলেন। কলকাতায় তাঁর গান একবারই আমার শোনার সুযোগ হয়েছিল, তখন তাঁর সামন্য শ্রবণশক্তির ব্যাঘাত ঘটেছিল, তাই ওস্তাদ-মহলে তাঁর নাম হয়েছিল বহরে ভাই অর্থাৎ বধির গুণী। তানপুরা কানের সংগে লাগিয়ে তিনি গাইতেন,—সুরবিহার, ছন্দের ক্রমশ প্রকাশ্যমান নানা রকম অলংকার, গমক ও বিদ্যুৎগতি তানের যে সৌন্দর্য লক্ষ করেছি, তা অতুলনীয়। খুব শান্ত, ধীরস্থিরভাবে গান শুরু হত, আর ধীরে ধীরে বাড়ত ও তানালংকারের মধ্য দিয়ে রাগের সম্পূর্ণ সুষমা বিকশিত হত। কলকাতার সংগীতসমাজে আধুনিককালে আমীর খাঁ সাহেব খুব ইজ্জত লাভ করেছিলেন, তাঁর গানের স্টাইলে আবদুল ওয়হীদ্ খাঁয়ের শৈলীর ছাপ বেশ পাওয়া যেত, অবশ্য সাক্ষাৎ ভাবে তালিম নিয়ে ছিলেন কিনা জানি না। খান সাহেব আবদুল করিম খাঁ তাঁর শাগির্দ হীরাবাঈ বড়োদেকারকে আবদুল ওয়হীদ খাঁয়ের কাছেই পাঠিয়েছিলেন, কারণ প্রসিদ্ধ কিরানা ঘরানার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ তখন ছিলেন এই ওয়হীদ খাঁ সাহেব।

প্রসংগত উল্লেখ করতে পারি যে কিরানার এই ঘরানার প্রধান প্রবক্তা হিসেবে বন্দে আলী খাঁয়ের নামই সুপ্রসিদ্ধ এবং তাঁর অনবদ্য বীণাবাদনের তুলনা ছিল না। আমাদের ছোটে খাঁ সাহেব (সারেঙ্গীবাদক) তো স্পষ্টই বলতেন, বন্দে আলী খাঁ চলা গিয়া তো বীণ চলা গিয়া। কিরানা ঘরানার আবদুল করিম খাঁ পরে পুনার নিকটবর্তী মিরাজে বাস করতেন, তিনিও বদল খাঁ সাহেবের মাতুল বংশের আত্মীয় ছিলেন।

এবার বদল খাঁ সাহেবের ঘরানার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই, কতকটা তুলনামূলক (কমপারেটিভ স্টাডি) ও সর্ব-সাধারণের অর্থাৎ সংগীতপিপাসুদের দিকে লক্ষ রেখে সহজবোধ্য (নন-টেকনিক্যাল) রূপে যাতে খানিকটা বোঝা যেতে পারে, এই ঘরানার প্রতি কল-কাতার সংগীতসমাজ কেন মুগ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। যে সব গান (স্পেসিমেন) এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হবে, সেগুলিও যে সম্পূর্ণ রাগ-সংগীত ও ভালো বন্দিশ-এ গড়া, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু খাঁ সাহেবদের ঘরানায় এসে দু একটি গুম্বীর মোচড়ে, ছন্দোবৈচিত্র্যময় রূপে, যে তাদের কী মনো-মুগ্ধকর পরিবর্তন ঘটেছে, সেটাই দেখানো উদ্দেশ্য। ভালো বা মন্দ বলে বিচার করার অভিপ্রায় বা ক্ষমতা আমার নেই, সেটা গুণিজন সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন, পুষ্পমঞ্জরীর মতো স্থানে স্থানে কী অপরূপ শোভায় এই সব অলংকার সাজানো হয়েছে, তাই স্পষ্টতর করবার প্রয়াস করব। ভুলত্রুটি হলে কেউ অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

আমি প্রথমে পাঠ্যপুস্তকে যে স্বরলিপি আছে তাই তুলে দিচ্ছি, (শুধু মুখপাতটুকু) কারণ বিস্তৃত স্বরলিপি দেবার স্থানাভাব, তারপরে খাঁ সাহেবদের ঘরানায় সেই চীজ কী রূপ ধারণ করেছে তাই জানাতে চেষ্টা করব। বর্তমানে বহুপ্রচলিত আকারমাত্রিক স্বরলিপির মাধ্যমেই লিখছি সর্বজনবোধ্য হবে বলে।

খাম্বাজের একটা তেলানা ধরা যাক। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে আছে :

ণা ধা ণা পা । ধা ণা (র্সা) -া । ণাধাপা মা । গা
-গা মমা গগা ।
ও দে তা না দে রে না ০ ০ দী ০স তা নো ০স দির দির

বদল খাঁ সাহেবের ঘরানায় পেলাম :

-া -া ধাধা । ণা ধা ণধা পা । ধণা র্সর্রা র্সণা
ধপা । ধা গা -া মা । গা -া,
০ ০ ও দেব তা না দে০ রে না০ ০ ০
০ ০ ০ ০ ০ দি ম তা নু ম,

একবার কণ্ঠে অত্যন্ত দ্রুতলয়ে 'ধণা র্সর্রা র্সণা ধপা ধা', এই অংশটুকু তুলে নিলেই গায়ক এর মধ্যের প্রচ্ছন্ন মজা ও চমক উপলব্ধি করবেন এবং স্বীকার করবেন যে, এই মোচড়টি একে অপরূপ শোভায় সুসজ্জিত করেছে ও তেলানাটির বাহার খুলে দিয়েছে। অবশ্য পরের অংশতে আরো সুষমা রয়েছে যা গায়কীর অঙ্গ হয়ে দেখা দেয়।

'বাহার আঈরে' বলে বাহার রাগের একটা বিখ্যাত গান আছে—পাঠ্যপুস্তকে তার বন্দিশ বিলম্বিত ঝুমরাতে এভাবে আছে :

মা পা ণণপমা পমা । ণা মা মজ্ঞা । মা ণধা না র্সা ।
র্সা নর্সা -া ।
বা হা ০ ০ ০ ০ ০ র আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ঈ ০রে
০ ০ ০

আমার গুরু ভীষ্মদেবের রেকর্ডে ত্রিতাল দ্রুতলয়ে বদল খাঁ সাহেবের তালিমে আছে :

-া -া -া ণণা । পমা ণর্ণা পমা জ্ঞমা । র্সা -া ণা ধা ।
-া মা ণধা না । র্সা ধনা র্সা -া
০ ০ ০ বা ০ ০ ০ হা ০ ০ ০ র ০ আ ০ ঈ ০ ০ আ
ঈ ০ ০ রে ০ ০ ০, ০

গানখানি নেড়েচেড়ে দেখা যাক—
পাঠ্যপুস্তকে ত্রিতাল মধ্যলয়ে এই স্বরলিপি রয়েছে :

ম ম ম র
সা সা জ্ঞা মা পা ণা মা সা র্সা-া জ্ঞা জ্ঞা মা মা
রা রা সা-া
ব র্সন । লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ গি রে ০ বা দ রি য়া ০

বেশ সহজ বন্দিশ, শিক্ষার্থীদের তালিম দেওয়ার খুব সুবিধা সন্দেহ নেই, কিন্তু একেই যখন লয়টা সামান্য ভেঙে সাজানো হয় তখনি শিল্পীর কঠিন অথচ সুরের মাধুর্যে অভিভূত হয়ে যাবার অবস্থা ঘটে :

মা মা । রা সা রা না । সা -া মা রা । পা -া ণা ধা ।
না -া র্সা -া । -া ধণা মপা ধপা ।
ব র স ন লা ০ আ ০ আ ০ আ ০ আ ০ আ ০ ০ পি
০ ০ ০ ০ ০
জ্ঞা -া -া মা । রা রা সা সা । -া -া,
রে ০ ০ বা দ রি য়া ০ । ০ ০

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। জয়জয়ন্তী সকলেই শুনেছেন ও ভালোবেসেছেন, তার একখানা নামী গান—'বৈরন হো গয়ী রাত', পাঠ্য-কেতাবে যা দেওয়া আছে তাই লিখছি : (ত্রিতাল-বিলম্বিত বলে স্বরলিপি আছে)

-া গা সা সা । রা মা গা রা । রা ণা ধা ণা । ধমা পা
ধা মা । গা না সা সা ।
০ বৈ র ন হো ০ গ ঈ হো ০ গ ঈ ০ ০ রা ০ ত । ই
স মে রে
রা রজ্ঞা রা সা । ণ্া ধ্া ণ্া সা । ন্সা ন্স রণ্ ধ্া প্া
প্যা ০ ০ রে কী লা গ গ ঈ । অাঁ ০ ০ ০ ০ ০ খে ০

বদল খাঁ সাহেব এই গানটি তাঁর শাগির্দদের ত্রিতাল মধ্যলয়ে শিখিয়েছেন, তার বন্দিশ শুনলেই ঘরানার বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হবে :

-া সা ধ্া ণ্া । -া -া -া । রা গমরগা মা পা ।
মা গা রজ্ঞা রসা ।
০ বৈ র ন । হো ০ ০ ০ । হো ০ ০ ০ ০ গ ঈ রা
০ ০ ০ ত ০
রা জ্ঞা রা সা । রা -া -া -া । -া রজ্ঞা মজ্ঞা রা ।
সা -া -া -া । ণ্া ধ্া ন্া সা ।
অ ব মো রে । প্যা ০ ০ ০ । ০ ০ ০ ০ ০ রে । কী
০ ০ ০ । লা গ গ ঈ
মমা রসা গসা রজ্ঞা । রসা ণ্া সরা ধ্া । ণ্সা ধ্া
ণ্ধ্া প্া ।
অাঁ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ ০ ০ খে

আর একখানা নমুনা পেশ করেই এ প্রসংগ শেষ করব। এবার দিতে চাই গোঁড়মল্লার-এর সুবিখ্যাত খ্যাল—'বরসে মেহারওয়া', যেটা পাঠ্য বইতে পাচ্ছি এই রকম :

(আড়াচৌতাল-বিলম্বিত লয়ে বাঁধা হয়েছে)

ধা।ণমা পা।মপা ণধা।র্সা নর্সা।পগা মা।রগা
ব র্স০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মে০ ০ ০
মপা।ধধপমা পা।ম-মগা মরা
হর ০০০০ ০ ওয়া-০০ ০০
সসা রগা।মা গমা।পমা পমা।রগা পা।মপ
বঁড় বঁড় ০ ০০ বঁড় বঁড় ০০ বঁ্ ০০
গরমগা।মপা ধধপমগা।মা, -ধা
দ০০০ গ০ ০০০০০ ০, ব

বদল খাঁ সাহেবের শিক্ষা ছিল ত্রিতাল মধ্যলয়ে এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য ও আমার সংগীতগুরু ভীষ্মদেবের রেকর্ডখানা শুনলে কী অদ্ভুত ছন্দ ও লয়ের কাশ্মীরী ছুঁচের কাজ ফ্রেমে এর চারপাশে সাজানো আছে তা উপভোগ করা যাবে। আমার অক্ষম স্বরলিপিতে কী সেই মাধুরী, সুরের ঝলক অক্ষরের বাঁধনে ধরা যাবে? তবুও চেষ্টা করে দেখছি—হয়তো বুদ্ধিমান, সুরজ্ঞ ব্যক্তি এর অন্তর্নিহিত রস এই কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) থেকে নিঃসারিত করতে পারবেন :

-া মা রা পা । র্সা ধা র্সা -া । -া -া ধপা
০ ব র সে এ ০ ০ ০
মগা।রা গা -া মা।ধপা মা গা রগা
০০ ০ ০ ০ হা র০ ওরা ০ ০০
রগা মপা মগা মা । রা সা রা -া । সা -া
০০ ০০ ০০ ০ ব ডি ব ০ ডি ০
-া -া। মা রা পা পা। ধা না র্সা ধা।
০ ০ ব ডি ব ডি ব্ ০ ০ ০
গা পা মগা পা। মা গমা পপা মগা। মা, মা রা পা
০ দ ন০ ০ সোঁ ০০ ০০ ০০ ০, ব র সে

এই স্বল্পসংখ্যক উদাহরণের মাধ্যমে বদল খাঁ সাহেব বা ভীষ্মদেবের সংগীতসুধার বিশাল বারিধির কোনও পরিচয় হবে না, সেটা জানি, কিন্তু সেই কলকল্লোল ও উত্তাল তরঙ্গের আভাস হয়ত পাওয়া যেতে পারে, সেই ভরসায় এই কয়েকটা নমুনা (স্পেসিমেন) গুণী ও বিদগ্ধ সমাজে পেশ করা হল. যদি অংশ থেকে সম্পূর্ণের কোনও রূপের দর্শন মেলে। এই গানগুলির সর্বাঙ্গ নানা রকম, ছন্দ, লয়, বল-ফান্দা, জমজমা সব দিয়ে এমন সুসজ্জিত যে যেদিক থেকেই দেখা যাক—বিদ্যুৎপ্রভার মতন দীপ্তি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতে বেশির ভাগ সময়েই দেখা যায় যে আস্থায়ী (বা স্থায়ী) অত্যন্ত মধুর ও লাবণ্যে পরিপূর্ণ কিন্তু অন্তরা যেন কোনও মতে দায়সারা গোছের হয়েছে। বিশেষ করে কোনও গানের অন্তরা বিস্মৃত হলে, বাঁধা গতের মত—'জবসে গয়ে মোরী, সুধ হু না লীনী', বলে লাগিয়ে দেন, তাতে গানের মূলগত পারম্পর্য বা রসের ধারা অব্যাহত থাকুক বা না-ই থাকুক। বদল খাঁ সাহেবের ঘরানায় যেমন আস্থায়ী, তেমনি অন্তরা অর্থাৎ গানটিকে সর্বাঙ্গ-বিভূষিত করতে কোনও ত্রুটি হয়নি। তাঁর শেখানো 'পাওরস ছায়ার' গান—'নেওয়ারে বাজুরে' বা 'হেমছায়ার গান'—'সবনিস জাগি' 'লংকদহন সারং' অর্থাৎ হরদাসী সারং-এর, 'এরি মাঈ পিয়া', 'চরজুকী মল্লার'-এর অপূর্ব বন্দিশ—'আজ ঝর লায়ো—' ইত্যাদি গানগুলি যেন সর্বক্ষণ অলোক-সামান্য ভাস্বরতায় গায়ক ও শ্রোতার সমক্ষে রূপের জৌলুস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সুরের ধ্যানে ও আরতিতে গায়ক মস্ত্ হয়ে আছেন!

কাব্যের রস-বিচারে নন্দন-তত্ত্বের নিরিখে বলা হয়, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। এই কথাটি ঘুরিয়ে নিয়ে আমরাও বলতে পারি 'রীতিরাত্মা সংগীতস্য'—অর্থাৎ সংগীতের রীতি বা স্টাইলকেই তার আত্মা বলা চলে। অবয়ব, গঠন, সম্পূর্ণ থাকলেও এই স্টাইল বা রীতির অনুভূতির জন্য অলংকার বা পুষ্প-সজ্জা প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাই বলে কি সমস্ত অঙ্গেই অলংকার পরিধান করলেই সৌন্দর্যে যথার্থ বিকাশ ঘটবে? প্রাচীন কাব্য-সমালোচক অভিনবগুপ্ত তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে একটি শ্লোক লিখেছেন:

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু
মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি
লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥

রমণীদেহের লাবণ্য কোথায় বা কতখানি, তা যেমন ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয় এবং সেটা অবয়ব সংস্থানের অতিরিক্ত অন্য বস্তু, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন রস আছে যা শব্দ, অর্থ, বাক্যভঙ্গী, সব কিছুর অতিরিক্ত আরো কিছু, সেটা ভাষার বন্ধনে ধরা দেয় না। কাব্য ও সংগীতে এই লাবণ্য-ই আমাদের মুগ্ধ করে ও মনের, রসের অতীন্দ্রিয়লোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।

এসথেটিকস-এর দিক থেকে বিচার করলে এটা স্বীকার করতে হয় যে, কাব্য বা সংগীতের অনুভূতির ক্ষেত্রে বাক্যালঙ্কার বা তানালঙ্কার কোন কিছুই চিত্তে যতক্ষণ না অন্তরের রসকেন্দ্রে আঘাত করে (ইমপিনজমেণ্ট) কাব্য বা সংগীতের মাধুর্যে আপ্লুত না করে, ততক্ষণ সেটা শ্রেষ্ঠ কাব্য বা শ্রেষ্ঠ সংগীত বলে বিবেচ্য হবে না। কবিতার গঠন, অনুপ্রাস বা সংগীতের সোপান হিসেবে স্বরলিপি, সরগম্ সব কিছুর ঊর্ধ্বে রসের ধারায় স্নান না করলে মন পরিতৃপ্ত হয় না, অনুপ্রাস-যমক ইত্যাদির বাহুল্য কবিতার অমৃতনিষ্যন্দী রূপকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, সংগীতেও রসানুভূতিবর্জিত তান, সপাট, অলংকারের দাপটে রসনিবেদন 'কণ্ঠবাদন' হয়ে দাঁড়ায়। মনের মণিকোঠায় যে সুরের পিপাসী মন ব্যাকুল হয়ে আছে, রাগের রঞ্জনা না সৃষ্টি হলে, তার তৃপ্তি হতে পারে না, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কণ্ঠবাদন স্বল্পকাল মধ্যেই স্মৃতির পট থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ যেন আধুনিক যুগের সর্বজনীন পূজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে সাজসজ্জা, আলোক-মালার ঐশ্বর্য নিয়ে মাতামাতি চলছে, অথচ প্রতিমার লাবণ্যময়ী প্রকাশভঙ্গী অনুপস্থিত।

অতি শ্রেষ্ঠ কাব্য ও তার সংজ্ঞা নিরূপণে গ্রন্থের অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন:

তরঙ্গানিকরোন্নীত তরুণীগণ সংকুলা।
সরিদ্‌বহতি কল্লোলব্যূহব্যাহত তীরভূঃ॥

এ বাক্যের শব্দে ও অর্থে অনুপ্রাস ও রূপক অলংকার রয়েছে, কিন্তু একে কেউ কাব্য বলবে না। বাক্য অনলংকৃত, অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্য, এর উদাহরণে সাহিত্যদর্পণকার কুমারসম্ভবের অকালবসন্তবর্ণনা থেকে তুলেছেন:

'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং
স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত
কৃষ্ণসারঃ॥'

অকালবসন্তের উদ্দীপনায় যৌবনরাগে রক্ত বনস্থলীতে রতিদ্বিতীয় মদনসমাগমে তির্যক প্রাণীদের অনুরাগের লীলাটি মাত্র কালিদাস ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাকে কোনও অলংকারে সাজাননি, অথচ মনোহারিত্বে এ পাঠকের মনকে লুঠ করে নেয়।

সংগীত সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে—অলংকার-বাহুল্যে সংগীতের মুক্তি হয় না, উপযুক্ত রসপ্রয়োগে রসিকের অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয়, কোন ঠাট, কী তার পকড়, জাতি, বাদী, সংবাদী ইত্যাদি কিছুই আলাদা করে রসের তৃতীয় নয়ন সমক্ষে আবির্ভূত হয় না, সব কিছু অপূর্ব সুষমায় মিলে (টোটালিটি) সত্যকার রাগসৃষ্টি করে। শ্রোতৃবৃন্দের মনে কাব্য বা সংগীতের মোহ সৃষ্টি করার বিশ্লেষণে সাহিত্য-দর্পণকার প্রেম ও প্রেমিকের সম্বন্ধের তুলনা করেছেন। প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্বোধ, তা রস নয়, কারণ সেটা প্রেমিকের নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ, সুতরাং পরিমিত: তা লৌকিক, সুতরাং প্রেমের রসবোধের অন্তরায়। কবি বা গুণী তাঁর প্রতিভার মায়ায় এই পরিমিত লৌকিক ভাবকে 'সকল সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী' অলৌকিক রসমূর্তিতে রূপান্তরিত করেন। এই অলৌকিক রসই চেতনার উদ্বোধন করে।

'রস' সম্পর্কে আর একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির রচনা থেকে উদ্ধৃত করেই এই অধ্যায় শেষ করব:

'Rasa is realized when an emotion is awakened in the mind in such a manner that it has none of its usual conative tendencies and is experienced in an impersonal, contemplative mood .... Rasa is realized when the self loses its egoistic, pragmatic aspect and assumes an impersonal, contemplative attitude which is said to be one of its higher modes of being. Rasa, thus, is a realisation of the impersonal contemplative aspect of the self, which is usually veiled in life by the appetitive part of it. As the contemplative self is free from all craving, striving and external necessity, it is blissful. This bliss is of a different quality from the pleasure we derive in life from satisfaction of some need or passion."

[Studies in Aesthetics—by Late P. J. Chaudhury, P.R.S., D. Phil—Rabindra Bharati — 1964, Chapter on "The Theory of Rasa"]

এই ব্যক্তিসত্তার ঊর্ধ্বেই রসচেতনার মূলধারা ও অনুভূতির নির্ঝর! (ক্রমশ)

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৭ ॥

হাটখোলার মল্লিক বাড়িতে জগাই মল্লিকের কনিষ্ঠ সন্তান চন্ডিকাপ্রসাদের মনে একটাই শুধু খেদ, সে আর তার মধ্যমাগ্রজ মিলে তাদের পিতার শ্রাদ্ধ উৎসব করতে পারলো না এখনো। এ বাড়িতে বিবাহযোগ্য এমন কোনো পুত্র বা কন্যা নেই যে তার বিবাহ উপলক্ষে খুব ধুমধাম করা যায়। বধূরা কোনো নতুন সন্তানও প্রসব করেনি যে তার অন্নপ্রাশনে জাঁকজমক করা যাবে। একটা কোনো সামাজিক উপলক্ষ তো চাই। খ্যামটা নাচ কিংবা বাঈ-নাচ বসত বাড়িতে ঠিক জমে না। আর দোল-দুর্গোৎসবে পোস্তার রাজবাড়ি কিংবা রাণী রাসমণিকে কিছুতে হার মানানো যাবে না। যতই ধুমধাম করো, লোকে তবু ঐ দুই বাড়িতেই ছুটবে।

লোকে কথায় কথায় বলে, শোভাবাজার রাজবাড়িতে ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়েছিলুম বটে! তেমনটি আর কেউ দেখাতে পারলে না! কিংবা হাটখোলার দত্ত বাড়িতে সেই যে মুখে-ভাত হয়েছেল, তাকেই না বলে মুখে ভাত, ধন্যি ধন্যি, হাজার হাজার লোকের মুখে পোলাও কালিয়া উঠেছিল সেদিনকে। কিংবা ছেরাদ্দ হয়েছেল সেই জোড়াসাঁকোর রামকমল সিংগীর, সে একেবারে রাজার গোলাম তুরুপ, তার ওপর আর কেউ দেখাতে পারলে না।

এই মল্লিক বাড়িতে এখন শুধু একটি শ্রাদ্ধেরই অবকাশ আছে। তখন দেখানো যায় রামকমল সিংহের ছেলেরাই বা কতখানি আর চন্ডিকাপ্রসাদও কত বড় বাপের ব্যাটা। কিন্তু চন্ডিকাপ্রসাদের এই অভিলাষ মেটাবার জন্য তার পিতার কোনোই তৎপরতা নেই। জগাই মল্লিক যেন অজর, অমর। তাঁর বয়েস বর্তমানে প্রায় একশো ছুঁই-ছুঁই, তবু এখনো তিনি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে রয়েছেন। কানে শুনতে পান না, তাঁর দন্তহীন মুখের বাক্য একটিও কেউ বুঝতে পারে না, তবু তিনি চলা-ফেরায় সক্ষম।

চন্ডিকাপ্রসাদ তার বাপকে দেখে কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং কখনো কখনো ক্রোধে দাঁত কড়মড় করে। অবশ্য যতক্ষণ চন্ডিকাপ্রসাদ সুস্থ অবস্থায় বাড়িতে থাকে। ইদানীং এই চিন্তাটি যেন তার মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে, এক এক সময় সে ক্ষিপ্ত হয়ে পিতাকে মারতে যায় আর চিৎকার করে বলে, হারামজাদা বুড়ো, বলচি যে তোর ছেরাদ্দ দেখ সুখ কাঁপিয়ে দেবো। তাও মরবিনি! আজ আর তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

ভৃত্যারা তৈরিই থাকে তারা যথাসময়ে চন্ডিকাপ্রসাদকে ধরে ফেলে।

বাইরে থেকে নেশায় টপ ভুজঙ্গ অবস্থায় বাড়িতে ফেরার সময় সে জড়িত গলায় হাঁক পাড়তে থাকে, মরেচে? বুড়োটা মরেচে? অ্যাঁ? যে আমায় আগে সু-সু-সু-সু-সুসংবাদ দিবি, তাকে পাঁচ মোহর বকশিস কবলাবো? মরেচে অ্যাঁ?

সেই সময় জগাই মল্লিক দ্বিতলের বারান্দার লোহার রেলিং ধরে ঠিক দশ-মেসে শিশুর মতন পা বেঁকিয়ে নাচে আর মুখ দিয়ে ম-ম-ম-ম শব্দ করে।

একদিন জুড়ি গাড়ি থেকে চন্ডিকাপ্রসাদকে কয়েকজন ভৃত্য মিলে ধরাধরি করে নামালো। তার বাহ্যজ্ঞান নেই কিন্তু সমস্ত শরীরটা তড়কা রোগীর মতন কাঁপছে, আর গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে।

এক যবনী বেশ্যার বাড়িতে নাচের পাল্লা দিতে গিয়ে চন্ডিকাপ্রসাদ চেতনা হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়, সেই থেকে আর জ্ঞান ফেরেনি।

এ গৃহে এমনই অব্যবস্থা যে কে কার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে, তারও ঠিক নেই। জগাই মল্লিকের মধ্যম পুত্র কালীপ্রসাদই গৃহকর্তা, কিন্তু বিলাসিতা ও রঙ্গ-তামাশায় তিনিও কম যান না। তবে কালীপ্রসাদের একটি অন্তত গুণ আছে, তিনি মত্ত অবস্থায় কখনো গৃহে আসেন না। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর একাধিক রক্ষিতালয় আছে, মাঝে মাঝে সে-সব জায়গায় তিনি কিছুদিনের জন্য ডুব দিয়ে থাকেন। আবার স্বগৃহে, পরিবারের মধ্যে কয়েকদিন সুস্থ অবস্থায় কাটিয়ে যান। হয়তো সেই কারণেই বিষয়সম্পত্তি সব এর মধ্যে গোল্লায় যায়নি। কিংবা, জগাই মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র কর্মবীর চিত্রপ্রসাদ এমন শক্ত বাঁধনে তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি বেঁধে দিয়ে গেছেন যে তার কিছু নষ্ট হবার বদলে দিন দিন বেন শ্রীবৃদ্ধিই হচ্ছে।

চন্ডিকাপ্রসাদকে যেদিন অচৈতন্য অবস্থায় বয়ে আনা হয় দৈবাৎ সেদিন কালীপ্রসাদ গৃহেই ছিলেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতার চিকিৎসার জন্য বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ আনালেন। তাঁরা একে একে সকলেই মুখ গোমড়া করে ফিরে গেলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হয় পিতৃশ্রাদ্ধ করার সৌভাগ্য বুঝি চন্ডিকাপ্রসাদের হলো না, বরং চন্ডিকাপ্রসাদেরই শ্রাদ্ধ বুঝি তার পিতাকে দেখতে হবে।

জগাই মল্লিকের তিন সন্তানের জন্য তিনটি মহল। জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রপ্রসাদ বিলাসী পুরুষ ছিলেন না, এবং প্রায় একার উদ্যোগেই এই পরিবারের এতখানি বৈষয়িক উন্নতি ঘটিয়েছেন। কিন্তু তিনিই সব চেয়ে ভাগ্যহীন, তাঁর অকালমৃত্যু ঘটেছে এবং তার একমাত্র পুত্র অঘোরনাথ এখন ঘোর উন্মাদ।

একদিন দুপুরে নিজের মহল ছেড়ে কুসুমকুমারী এলো মাঝ মহলে পীড়িত খুড়শ্বশুরের অবস্থা জানতে। চন্ডিকাপ্রসাদের পত্নী দুর্গামণির সঙ্গ তার ভালো লাগে। এ-বাড়িতে একমাত্র দুর্গামণির কাছেই কুসুমকুমারী দুটো মনের কথা কইতে পারে।

দুর্গামণি চন্ডিকাপ্রসাদের তৃতীয়পক্ষ। কলকাতার ধনী পরিবারের একটি নিয়ম এই যে বাবুদের বাইরে যে-কটি রক্ষিতাই থাকুক না কেন, বাড়িতে একটি স্ত্রী রাখতেই হবে। এক স্ত্রী মরলে আবার আর একটি। কায়স্থ বা বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু-বিবাহের বিশেষ চল নেই, কিন্তু এক পত্নী বিয়োগের পর আর একটি পত্নী আনতে কোনো দোষ নেই। বাবু হয়তো মাসের মধ্যে একদিনও রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন গ্রহণ করেন না। কিন্তু অন্তঃপুর শূন্য রাখা চলবে না। বাড়িতে একজন কষ্ট পেয়ে কান্নাকাটি না করলে রক্ষিতালয়ে আমোদ যেন ঠিক জমে না।

ভাগ্যবানের বউ মরে। প্রতিটি নতুন বিবাহ মানেই নতুন করে অর্থ এবং অলংকার প্রাপ্তি। চন্ডিকাপ্রসাদের ভাগ্য সেই হিসেবে ভালো, তার প্রথমা পত্নী মারা গেছে বিবাহের দু বৎসরের দ্বিতীয়া পত্নী এ গৃহে এক বৎসর অবস্থান আত্মঘাতিনী হয়েছিল।

দুর্গামণি কান্নাকাটি কিংবা আত্মঘাতিনী মতন পাত্রীই নয়। সে অতিশয় তেজস্বিনী আত্মসম্মানসম্পন্না যুবতী। তার পিত্রালয় ডাঙ্গায়, সেখানে সে কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখে তার নরাধম স্বামীকে সে প্রথম দিকে সুপথে অনেক চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এখন সে পারতপক্ষে তার স্বামীর মুখ দেখতে চায় না

দুর্গামণি একটি পশমী আসনে নকশা ছিল. কুসুমকুমারীকে দেখে বললো, আয়,

কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করলো, খুড়ী, উনি আচেন গো?

দুর্গামণি বললা, ঐ একই রকম।

—জ্ঞান ফেরেনি?

—না।

—ডাক্তাররা কী বলে গ্যালেন আজ?

—ডাক্তাররা কী বলে গ্যাচেন তা বুঝিনি, তুইও বুঝবিনি। যদি ওঁর নিয়তিতে তবে বাঁচবেন।

—ওঁর নিয়তি, না তোমার নিয়তি?

—আমার নিয়তি নিয়ে আমি মাতা ঘামাইন তুই তো জানিস, আমি মাচ, মাংস খেতে ভালে না। উনি গেলেন কি রইলেন তাতে আমার এলো গেল।

কুসুমকুমারী চোখ কপালে তুলে বললো, এ কি অলুক্ষণে কতা। ছি ছি, খুড়ী, এমন ব বলতে নেই। অন্য কেউ শুনলে কী ভাববে

দুর্গামণি ফিক করে হেসে ফেলে ব আমি বুঝি অন্যের কাচে বলতে গ্যাচি! তোকেই তো বলি এ সব কতা!

—সাঁত্য খুড়ী, তোমার বড্ড সাহস।

দুর্গামণি মোটেই অবলা অন্তঃপুরি মতন নয়। সে বেশ লম্বা, শরীরের গড় ভালো। চন্ডিকাপ্রসাদ প্রায়ই তাকে প্রহার চন্ডিকাপ্রসাদের তো গুণের ঘাট নেই, প্রহার করাও তার বাসনা চরিতার্থ করার অঙ্গ। দুর্গামণি একবার মাত্র একজন দাসীকে নিয়ে গোপনে তার পিত্রালয় ফরাসডাঙ্গার গিয়েছিল। চন্ডিকাপ্রসাদ লোক পাঠিয়ে পত্নীকে আবার জোর করে ফিরিয়ে দুর্গামণির পিতার অবস্থা হঠাৎ পড়ে গেছে, ধনী জামাইকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তার সেবার চন্ডিকাপ্রসাদ দুর্গামণিকে খুব প্রহার দুর্গামণিও উলটে দু-এক ঘা দিয়েছিল। কুসুমকুমারী নিজের চক্ষে দেখেছে যে দুর্গামণি সংজ্ঞাহীন তার স্বামীর দু গালে ঠাস ঠাস করে মারছে।

দুর্গামণির আর একটি কান্ড দেখেও অ হয়ে গিয়েছিল কুসুমকুমারী। দুর্গামণি হাতে একটি পত্র লিখেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগ সেই পন্ডিত বিধবাদের বিবাহ দেবার জন্য সং ঘেরা অভিমন্যুর মতন লড়াই করছেন এবং রাজদরবারে একটি আবেদন পাঠিয়েছেন। দুর্গা লিখেছিল, আপনার উদ্দেশ্যে শতকোটি প্র আপনি সার্থক হইলে লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগিনী আ পায়ে পুষ্প দিবে। আপনি এ অধীনার প্রণাম ল আপনি চিরায়ু হউন।

নিজের হাতের একটি স্বর্ণবলয় খুলে চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল দুর্গামণি।

কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করেছিল, বিধবাদের জন্য তুমি এত আকুল হলে কেন গো, খুড়ী?

দুর্গামণি বলেছিল, জীয়ন্তে মরা ব শুনিচিস? আমি হলুম গে স্বামী জীয়ন্তে বি তোর দশাও তো একই।

কুসুমকুমারী দুর্গামণির পাশে বসলো। দু মণির বেশ আঁকার হাত আছে। কোনো ছবি দেখেই সে আসনের ওপর ফুল লতাপাতা সেল ফুটিয়ে তুলতে পারে। অনেকগুলি এমন স সুন্দর আসন সে বানিয়েছে। তবে, এই

সে কার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে? কোন হৃদয়েশ্বরকে সে এই আসনে বসাবে? তার কেউ নেই।

দুর্গামণি জিজ্ঞেস করলো, তোরটি আজ কেমন আছে? আজ তেমন চ্যাচানি শুনিনি যেন!

স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলেই কুসুমকুমারীর মুখখানি ম্লান হয়ে যায়। দুর্গামণির মতন তার অবস্থা নয়। কুসুমকুমারী ইচ্ছে করলেই তার পিত্রালয়ে চলে যেতে পারে। সেখানে সে আদরের কন্যা। তার বাবা তাকে নিয়ে যেতেও চান। এবং তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনবে না, সে জ্ঞানই তার নেই। কিন্তু কুসুমকুমারীর মা বলেন, ওরে কুসোম, নারীর জীবনে পতিই সব। দ্যাক, তুই এখোনো সেবা যত্ন করে তাকে বাঁচাতে পারিস কি না। তাকে ছেড়ে তুই এখেনে থাকলে তোকে যে সারা জীবন দগ্ধাতে হবে!

কুসুমকুমারী বললো, তিনি আজ সকাল থেকেই ঘুমুচ্চেন।

দুর্গামণি বললো, ভালো। ঘুমুনোই ভালো। আমার ভয় হয় কি জানি না, ঐ পাগলের কাচে কাচে থেকে তুই-ও না এক সময় পাগল হয়ে যাস!

—ও কথা বলো না, খুড়ী। আমার ভয় করে!

—তোকে তো আমি ভয়ই দেখাচ্চি।

পাশের ঘরে হুড়মুড় করে একটা শব্দ হতেই চমকে চমকে উঠলো দুজনে। তারপর ছুটে গেল সেদিকে।

ঘোরের মধ্যে পাশ ফিরতে গিয়ে পালঙ্ক থেকে নীচে পড়ে গেছে চণ্ডিকাপ্রসাদ। যদিও মেঝেতে পুরু গালিচা পাতা, কিন্তু পালঙ্কটিও বেশ উঁচু। নিশ্চয়ই খুব লেগেছে। চণ্ডিকাপ্রসাদ অবশ্য মুখ দিয়ে কোনো শব্দ উচ্চারণ করেনি, চোখও মেলে নি।

কুসুমকুমারী ব্যাকুলভাবে বলে উঠলো, খুড়ো-ঠাকুর পড়ে গ্যাচেন। ও খুড়ী, ধরো ধরো, তোমাতে আমাতে তুলে দিই।

দুর্গামণি কড়া গলায় বললো, দাঁড়া! এই, ছুঁবি না। কত পাঁচ জাতের মেয়েমানুষে ওকে ছোঁয়, সাত জন্মে চান করে না, ওকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে।

কুসুমকুমারী বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

দুর্গামণির নিজস্ব দাসীটি ডাক শুনে উপস্থিত তুলবে!

তারপর সে বাইরে বেরিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকলো, চন্দনবিলাসী! চন্দনবিলাসী!

দুর্গামণি নিজস্ব দাসীটি ডাক শুনে উপস্থিত হতেই সে বললো, যেদো আর মেধোকে ডেকে নিয়ায়। বাবু পড়ে গ্যাচেন, তুলতে হবে!

যেদো আর মেধো এই বাবুর পেয়ারের চাকর। তাদের কাছাকাছি থাকার কথা সব সময়। কিন্তু তখুনি খোঁজাখুঁজি করে তাদের পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত দেউড়ির বাইরে থেকে ধরে আনতে হলো তাদের, তারা সেখানে বসে গাঁজা টানছিল।

ততক্ষণ মেঝেতেই পড়ে রইলেন চণ্ডিকাপ্রসাদ, দুর্গামণি তার পাশে এসে একবার নাড়ি দেখলো না পর্যন্ত।

তবু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে চণ্ডিকাপ্রসাদ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো।

চণ্ডিকাপ্রসাদের বয়েস এখন চল্লিশ। তার জীবনের এখনো অনেক কিছু বাকি আছে। অতি অল্প বয়েস থেকেই সে কুসঙ্গে পড়েছে ও সুরা ও নারীতে মজেছে বলে জীবনের অন্য কোনো ভালো দিকের কথা সে জানেই না। সে জানে না স্নেহ-মমতার মূল্য। সামান্য বিদ্যাশিক্ষাও করেনি বলে সে নিজের ঘেরাটোপের বাইরের জগতের কথাও কিছু জানে না। সে শুধু জানে, টাকা ছড়াতে পারলে কিছু লোক সব সময় ঘিরে থাকে ও নানা ভাবে খাতির করে। যত টাকা ছড়াও, তত বেশী খাতির।

যতদিন তার চলাফেরার ক্ষমতা ঠিক মতন হলো না, ততদিন সে দুর্গামণিকে নানাভা জ্বালাতন করলো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হাজ গন্ডা হুকুম। কোনো মানুষকে সুস্থির হয়ে ব থাকতে দেখা তার পছন্দ হয় না। বেশ কয়ে বছরের মধ্যে সে দুর্গামণির সঙ্গে এতদিন একটা থাকেনি। দুর্গামণি তার কাছ ঘেঁষতে চায় বলে সে প্রথমে বিস্ময়ে, তারপর ক্রোধ প্রকাশ কর শুরু করে। এবং হুমকি দেয়, দেখিস মাগ তোর তেজ ভাঙবো! আমি আর একটা বি করবো!

একদিন মদ্যপান না করে যে থাকতে পা না, সেই ব্যক্তি পুরো এগারো দিন গলায় একবি ঢালেনি। চিকিৎসকদের কড়া নির্দেশ, তার ক যেন কোনোক্রমেই সুরা না পৌঁছোয়। অবশে যেদো ও মেধোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দ্বাদশ দিে মাথায় সে একটি সুরার বোতল হস্তগত করা এবং তা থেকে কাঁচা চুমুক দিয়ে অনেকখানি টে নিল একসঙ্গে। সুরা নয়, যেন জাদু। তাতেই আবার জেগে উঠলো শেরের মতন। রীতিমতন এব হুংকার দিল পর্যন্ত।

তখনই সে বেরুবে। তার প্রিয় পোশ পরে নিল সে। পাজামা, রামজামা, কোমরবন্ধ, মাথ বাঁ কান-ঢাকা টুপী। হাতে একটি লাল রুমাল সেই রুমাল ঘোরাতে ঘোরাতে সে 'পরে মনেরো ভাবো বুঝিতে কি পারে প্যা'রে' গাই গাইতে নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। যাবার স দুর্গামণির সঙ্গে একটি বাক্য বিনিময় পর্য করলো না।

সদরে সিংহদ্বারের সামনে তার পিতার সে দেখা হলো। জগাই মল্লিক তখন দুজন ভৃ সমভিব্যাহারে বৈকালিক ভ্রমণ সেরে ফিরছেন। তা দেখে মাথায় একটা চাঁটি মারার লোভ অতিকে দমন করলো চণ্ডিকাপ্রসাদ। শুধু রোষকষায়ি নেত্রে তাকিয়ে বললো, ভেবেছিলে আমিই আ

পটোল তুলবো! বড় মজা, না?

তারপর থেকে চন্ডিকাপ্রসাদের নিয়মিত জীবন-যাত্রা শুরু হলো। সেই দু-তিন দিন অন্তর একবার করে চূড়ান্ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরা টাকার খোঁজে। এর মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু নেই।

কয়েকদিন পর আর একটি বৈচিত্র্য ঘটালো কুসুমকুমারীর স্বামী অঘোরনাথ।

বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, এ পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানটিই উন্মাদ। অঘোরনাথ জ্ঞান-পিপাসু মেধাবী যুবক ছিল। কাকাদের ভ্রষ্টাচার তাকে একটুও স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু ধর্ম-উন্মাদনায় বিঘ্ন ঘটায় সে মস্তিষ্ক ঠিক রাখতে পারলো না।

অঘোরনাথ গোড়ার দিকে থাকতো চুপচাপ, কোনো কথা না বলা কিংবা আপন মনে অর্থহীন শব্দ উচ্চারণই ছিল তার রোগের লক্ষণ। কিছুদিন হলো সে হিংস্র হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকায় সুপুরুষ সে। শরীরে দারুণ শক্তি, একটি চুতোর গলা টিপে তাকে প্রায় হত্যাই করেছিল একদিন। তার থেকেও ভয়াবহ কথা, সে একদিন তার ঘুমন্ত জননীকে পাঁজাকোলা করে তুলে তিনতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েছিল নীচে। সেদিন একটা কেলেঙ্কারিই হয়ে যেত আর একটু হলে।

অঘোরনাথকে এখন লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। বাড়ির একটি অতি বৃদ্ধা দাসী ছাড়া সে আর কারুকে চিনতে পারে না। সেই দাসীটিই তাকে প্রত্যহ দু বেলা খাইয়ে দেয়। আর কেউ ধারে কাছে ঘেঁষলেই সে চোখ ঘূর্ণিত করে গর্জন শুরু করে দেয়।

হঠাৎ একদিন কোন উপায়ে যেন অঘোরনাথ শিকল খুলে বেরিয়ে এলো। প্রথমেই সে একটি বৃহৎ অতি সুদৃশ্য চীনে মাটির পাত্র ভাঙলো আছাড় দিয়ে। তারপর অদূরে তার জননীকে দেখে তাড়া করে গেল।

সারা বাড়িতে একটা দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি হলো। ভূমিকম্পের সময় দিশাহারা মানুষের মতন সকলে ছুটলো এদিকে ওদিকে। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখ ভর্তি গুম্ফ-দাড়ি, কোমরে শুধু একটু ফালি জড়ানো, অঘোরনাথকে দেখায় যেন ভয়ংকর রুদ্রের মতন। আজ বুঝি কারুর রক্ত না নিয়ে ছাড়বে না।

ভৃত্যকুল ও দারবানরা ছুটে এলো তাকে সামলাবার জন্য। কিন্তু কেউ কাছে আসতে সাহস করে না। অঘোরনাথ যার দিকে তাকায়, সে-ই প্রাণভয়ে দৌড়োয়। চিৎকার চ্যাঁচামেচিতেও কান পাতা দায়। কেউ ভগবানের নাম জপছে। কেউ বলছে কেল্লায় খবর পাঠাতে।

কালীপ্রসাদের দুই পুত্র শিবপ্রসাদ ও অম্বিকা-প্রসাদ দ্বিতলের বারান্দা থেকে নানা প্রকার নির্দেশ দিতে লাগলো ঐ উন্মাদকে ধরবার জন্য। তাদের নিজেদের এগোবার সাহস নেই। অঘোরনাথ তখন নীচতলার উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার জননী ওপর থেকে হাপুস নয়নে কেঁদে বলছেন, ওরে, ওকে তোরা বাইরে যেতে দিসনি। তাহলে আর ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওরে, যেমন করে পারিস ধর! আমি একছড়া সোনার হার দোবো, যে ধরবে—।

শিবপ্রসাদ ও অম্বিকাপ্রসাদের নির্দেশে দ্বার-বানেরা শেষ পর্যন্ত বড় বড় লাঠি এনে পেটাতে লাগলো অঘোরনাথকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মার খেতে লাগলো এবং গজরাতে লাগলো। একটা সুবিধে এই যে, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মতন অঘোরনাথ কোনো অস্ত্র ধারণ করতে ভুলে গেছে। কোনো এক ভোজপুরীর হাতের লাঠি যদি কেড়ে নিয়ে সে রুখে দাঁড়াতো, তাহলে অনেকেই ঘায়েল হতো। তার বদলে, মার খেতে খেতে সে এক সময় পড়ে গেল মাটিতে। তখন দশ-বারো জনে মিলে তাকে চেপে ধরে আবার শিকল নিয়ে এসে বাঁধলো।

অঘোরনাথকে শিকল বাঁধা অবস্থায় টানতে টানতে ফিরিয়ে আনা হলো তার কক্ষে। যেন বিরাট একটা যুদ্ধ জয় করা গেছে, এইভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো সকলে।

শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলেন অঘোরনাথের জননী। তিনি কপাল চাপড়ে চাপড়ে বলতে লাগলেন, কী কুক্ষণেই তোকে আমি নিষেধ করিছিলুম, বাপ আমার! আমার কী কুগ্রহ! তুই বেহ্ম হ, কেরেস্তান হ, তোর যা খুশী, শুধু একবার সাদা চোখ মেলে চা, আমায় একবার মা বলে ডাক। অঘোর, বাপ আমার, একবার চেয়ে দ্যাখ।

তার পাশে পুত্তলির মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে কুসুমকুমারী। তার যেন কথা বলারও শক্তি নেই। অঘোরনাথ যদি তাকে তাড়া করে যেত, তবে সে বুঝি পলায়ন করতেও পারতো না। তার স্বামীকে সকলে মিলে যখন বাঁশ পেটা করে মারছিল, তখন সেও শিউরে শিউরে উঠছিল। কুসুমকুমারী যেন আর সহ্য করতে পারছে না।

শাশুড়ির কান্না শুনতে শুনতে কুসুমকুমারীরও যেন এক সময় মতিভ্রম হলো। সে হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার স্বামীর শিকল বাঁধা পায়ের ওপর। সেখানে মাথা কুটতে কুটতে সে বলতে লাগলো, আপনি ভালো হয়ে উঠুন, আপনি ভালো হয়ে উঠুন। হে ঠাকুর, ওনাকে ভালো করে দাও।

অঘোরনাথ চোখ মেলে দেখলো একবার। সেই চোখে বিস্ময়। ভাবখানা যেন, এ আবার কে? বেশ কিছুক্ষণ সে কুসুমকুমারীকে দেখলো। তারপর, পায়ের ওপর যেন কোনো পোকামাকড় পড়েছে এই ভঙ্গিতে সে দু পায়ে সজোরে ঝাঁকুনি দিল একবার। তাতেই কুসুমকুমারী ছিটকে গিয়ে দেয়ালের কাছে পড়লো এবং দেয়ালে ঠুকে তার মাথা ফেটে গেল।

তখন ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হলো কুসুমকুমারীকে।

অনেক পরে কুসুমকুমারী সুস্থ হয়ে যখন ভালোভাবে চোখ মেললো, তখন দেখলো, তার শিয়রের কাছে বসে আছে দুর্গামণি। সে কুসুম-কুমারীর সারা গায়ে নরম হাত বুলোচ্ছে।

কুসুমকুমারীকে চোখ মেলতে দেখে দুর্গামণি উঠে গিয়ে ঘরের দ্বারের অর্গল বন্ধ করলো। তার-পর ফিরে এসে শয্যার ওপর আবার বসে সে উচ্চ স্বরে বললো, তুই ওর পায়ে পড়তে গেলি কেন?

কুসুমকুমারী কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

দুর্গামণি আবার বললো, বল, চুপ মেরে আছিস কেন? বল?

কুসুমকুমারী ধীরে ধীরে বললো, কী জানি খুড়ী, মাতাটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল!

—বলেছিলুম না, ঐ পাগলের সঙ্গে থাকতে থাকতে তুইও একদিন পাগল হবি! শোন, আমি একটা কতা বলবো, তুই করতে পারবি?

কুসুমকুমারী তার নীল, কোমল ছলছল চক্ষু দুটি স্থাপন করলো দুর্গামণির মুখে।

—একদিন ওকে বিষ খাইয়ে দে। সব জ্বালা জুড়োক। আমার কাচে বিষ আচে, তুই খাওয়াতে পারবি?

—তুমি কী বলচো, খুড়ী?

—ঠিকই বলচি! ও পাগল আর কোনোদিন ভালো হবে না। তুই বিধবা হ, তোর আমি আবার বিয়ে দেবো। তোর জন্যই তো আমি সাগরকে চিঠি দিয়েচি! আমি তো কুড়িতে বুড়ি, আমার জীবন শেষ, কিন্তু তোর অল্প বয়েস।

—খুড়ী।

—বুকে সাহস আন, কুসোম! ভালো করে বাঁচতে শেক্। মাতাল, পাগল—এদের সঙ্গে যে আমরা ঘর করবো? আমাদের সাদ-আহ্লাদ নেই, আমি সব সময় বিষ কাচে রাকি, কারুকে আমি পাই না! তোকে যা বললুম, পারবি?

পাশ ফিরে দুর্গামণির কোলে মাথা গুঁজে কুসুমকুমারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলো, অমন কতা বলো না, খুড়ী, ও সব কতা শুনলেও যে পাপ (ক্রমশ

কার্জন-সুরেন্দ্রনাথ পার্কের সেই লোকটা

হিমানীশ গোস্বামী

কার্জন-সুরেন্দ্রনাথ পার্কের একটি ফাঁকা বেঞ্চে বসে বিনামূল্যে বিতবিত প্রাকৃতিক হাওয়ায় অফিসের সারাদিনের ক্লান্তি অপসারণের চেষ্টা করছি, আর একটা একটা করে চীনাবাদামের খোসা ভেঙে খোসাগুলোকে ছুড়ে ছুড়ে এদিক-ওদিক ফেলছি। এমন সময় একজন কে এসে আমারই বসা বেঞ্চে একটু দূরে বসে পড়ল। সেদিন আকাশে মেঘ থাকায় এবং কাছাকাছি কোনো সরকারী আলো না জ্বলায় জায়গাটি মোটামুটি অন্ধকারই ছিল। একটু পরেই সুখেন্দু আসবে—ও এলে আমরা খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে একটা চায়ের দোকানে বসে চা এবং সিগারেট টেনে মোটামুটি ফাঁকা ট্রামে করে শেয়ালদা পৌঁছে, মোটামুটি ফাঁকা বনগাঁ লোকালে করে গিয়ে পৌঁছব বারাসতে। মোটামুটি ফাঁকা, অর্থাৎ ঝুলতে টুলতে হবে না। তারপর সেখান থেকে মোটামুটি ফাঁকা বাসে করে আরও সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে আমরা নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাব। রোজই তাই করি। এই সময়টা কাটানোর জন্য একটা গল্পের প্লট নিয়ে মানসিকভাবে উত্তেজিত হতে থাকলাম। কয়েক সপ্তাহ যাবৎই একটা গল্প আমার মাথায় ঘুরছে। কিন্তু শুরু করতে পারছি না। বাড়িতে নানারকম ঝামেলা, অফিসেও। তা ছাড়া গল্প লেখা আমার নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যেসের মধ্যেও পড়ে না। বছরে দুটো কি তিনটি গল্প লিখি, পাড়ার অখ্যাত এবং অজ্ঞাত কাগজে সেগুলি ছাপার অক্ষরে মুক্তি পায়। দু একজন অতি পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া কেউই জানে না আমার গল্প লেখার ক্ষমতা।

গল্পের নায়ক বৃন্দাবনের কথা ভাবছি। সে বিষম বিপদে পড়েছে। অফিস থেকে দু লক্ষ টাকা উধাও হয়েছে—এবং অনেকেই সন্দেহ করছে কাজটা বৃন্দাবনেরই, কেননা এর আগে ও একবার অফিসের ক্যাশ বাক্স থেকে দু টাকা একুশ পয়সা সরিয়েছিল। এইভাবেই গল্পের শুরু করব ভেবে রেখেছি। তারপর বৃন্দাবন উদ্ধার পাবে কিনা, শেষ পর্যন্ত নাকি মিথ্যে অপরাধে তার শাস্তি হয়ে যাবে এটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ শুনতে পেলাম, দাদা একটা দেশলাই-এর কাঠি হবে?

দেখলাম বেঞ্চের লোকটি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক প্রত্যাশায়।

আমি বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে সিগারেট লাইটার বার করে বললাম, কাছে আসুন ধরিয়ে দিই!

লোকটি বলল, কী ধরিয়ে দেবেন মশাই? না আমি ও-সব সিগারেট ফিগারেট টানি না। আর আমাকে ধরিয়ে দেবেন যদি বলেন, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা।

—তবে? আমি প্রশ্ন করলাম, তবে কেন আপনি দেশলাই চাইছিলেন?

লোকটি বলল, দেশলাই? না মশাই আমি দেশলাই চাইনি।

আমি বললাম, আপনি আমার কাছে দেশলাই চেয়েছেন।

লোকটি বলল, মশাই, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারিনি যে আমি আপনাকে বলেছিলাম দাদা একটা দেশলাই-এর কাঠি হবে? মাইন্ড ইউ, আমি একটা দেশলাই-এর কাঠি চেয়েছিলাম। অর্থাৎ আরও একটু, [illegible] দেশলাই-এর একটি কাঠিই চেয়েছিলাম।

আমি ফোঁস করে উঠে বললাম, চেয়ে উদ্ধার করেছিলেন। তা আমিও [illegible] আপনার সিগারেট ধরিয়ে দেওয়ার জন্য লাইটার জ্বালাতে প্রস্তুত হয়েছিলা[m] এখন বলছেন আপনি সিগারেট ফিগারেট টানেন না।

—না, টানি না। ওতে পোষায় না। লোকটি বলল।

—তবে?

—তবে আর কি। আমার কানে একটা মশা ঢুকে পড়েছে সেটাকে বার কর[তে] পারছি না, মশাই কেবলি পোঁ পোঁ করছে। ওই জন্যই বুঝলেন কিনা, দেশলা[ই] কাঠির দরকার ছিল। কিন্তু যখন আপনার কাছে সে বালাই নেই, দেখি [illegible] আঙুল দিয়ে কিছু করা যায় কিনা, বলে লোকটি দাঁড়িয়ে উঠে তার [illegible] হাতের কড়ে আঙুলটা বাঁ কানের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেন নাচ[তে] লাগল, আর বলতে লাগল, যা বাবা বেরিয়ে যা ভালয় ভালয়, ওখানে ঢুক[লে] গেলি কি করতে অ্যাঁ?

তখন খেয়াল করে দেখলাম লোকটা যেমন ঢ্যাঙা তেমনি রোগা। আর [illegible] গায়ে আলখাল্লার মতো কোনো পোশাক। আবার গলায় একটা চাদরও আ[ছে] আরও লক্ষ্য করে দেখলাম লোকটার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, আর [illegible] কালো দাড়িও রয়েছে এক মুখ। তবে ঠিক যে কালো দাড়িই সবগুলি ছিল সে[টা] জোর করে বলা যায় না, কেননা ঐ সময় বেশ অন্ধকারই লাগছিল চারদিকটা।

আমার মনে হতে লাগল, এ এক অদ্ভুত লোক তো! এদিকে সুখেন্দু আসছে না। সুখেন্দুর আসার কথা না থাকলে আমি কোনো অজুহাতে [illegible] পড়তে পারতাম, কিন্তু হল না। লোকটি বলল, বুঝলেন দাদা, অবিচার চল[ছে] চতুর্দিকে। অবিচার। এইযে শালার মশা, এর সাধ্য ছিল কি বৃটিশ আমলে [illegible] পার্কে এসে কামড়ায়। তখন এই পার্ক ছিল কত চমৎকার। কেবল সায়েব, [illegible] তাদের বাচ্চাকাচ্চারা, আয়া আর কুকুর। আর সে কি কুকুর! কোনোটা দেখতে বা[ঘের] মতো, কোনোটা বাছুরের মতো, আবার কোনোটা এত ছোট যে সেগুলোকে [illegible] বেড়াল বলেও চালিয়ে দিতে পারত। তখন এই পার্কে বসা কেন, একবার আ[সার] কথা ভাবলেই বুকের ভেতরটা কিরকম ঢিব ঢিব করত। আর এখন? যে কে[উ] যখন ইচ্ছে, বুঝলেন কিনা গামছা পর্যন্ত পরে এখানে এসে শুয়ে বসে [illegible] টিপে টিপে খায়। ভাবা যায় না। আর অবিচারও বেড়েছে। বৃটিশ আম[ল] হলে, বুঝলেন কিনা, আমার উপর দিয়ে যে অবিচারের স্রোত বয়ে চলেছে সে বইতে পারত?

—আপনার উপর দিয়ে অবিচারের স্রোত বইছে?

—গত ছ বছর আট মাস তেরো দিন ধরে। উঃ সে কি অবিচার আ[প]নি ভাবতেও পারবেন না। দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে পুলিস আমাকে ধরার [illegible] কুত্তার মত খুঁজে বেড়িয়েছে। এখন অবশ্য তাদের খোঁজে ভাটা পড়েছে। [illegible] হয়ত ধরে নিয়েছে আমি মরে টরে গিয়েছি।

—আপনি মরে গিয়েছেন?

লোকটি খিক খিক করে হেসে উঠে বলল, আমি মরব? তা হলে [illegible] যেতাম মশাই। সে ভাগ্য কি হবে আমার কখনো? না, আমি মরিনি। তবে অবস্থায় আছি সে তো মড়ার বাড়া। তবে আমি তো নাম টাম বদলে রয়েছি [illegible] আর চেহারাও পালটে ফেলেছি সেজন্য পুলিস আর আমাকে খোঁজে না। সে[illegible]

[illegible]

ঘুমুচ্ছে। না, সবটা ঘুম নয় তাতেও সে ভেজাল মেশাচ্ছিল। ডিউটি দিতে দিতে ঘুমুচ্ছিল, আবার দিব্যি যে ঘুমুবে তা নয়, ঘুমুতে ঘুমুতে আবার তাকাচ্ছিল। আমাকে দেখে সে যেন কোনরকম গ্রাহ্যই করছে না এমন ভাব করল। অথচ একদিন আমার এই মাথার দাম ছিল পাঁচ হাজার টাকা। জীবিত বা মৃত, যে কোনো অবস্থাতে আমার মাথা পুলিসকে জমা দিলেই বুঝলেন একজন গরীব লোক বড়-লোক হয়ে যেতে পারত সে আমলে। আজকাল অবশ্য পাঁচ হাজার টাকা তেমন কিছু না। কিন্তু তখন পাঁচ হাজার টাকায় অনেক কিছু করা যেত। সম্ভবত পুলিসের সেই পুরস্কারের ঘোষণা প্রত্যাহৃত হয়নি।

আমি বললাম, কী হয়েছিল বলবেন?

লোকটি বলল, বলব বইকি। বলবই ঠিক করেছি আমার ইতিহাস। কেননা, আমার মনে হয় আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। মহাকাল আমাকে প্রায়ই হাতছানি দিয়ে ডাকে। একদিন ঘুমুচ্ছি এমন সময় স্বপ্নে যমদেব এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। দিব্যি চেহারা, আবার মহাদেবের মতো ভুঁড়িও আছে। তবে চোখ দুটিতে করুণা মাখানো। তিনি কিছু বললেন না, কেবল আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, আর হাত দিয়ে যেন আমাকে ডাকছেন এমন-একটা ইংগিত করলেন। আমার মনে হল তিনি আমাকে চান, আর আমারও মনে হল আমিও তাঁকে চাই। বুঝলেন দাদা, সুকান্ত মিথ্যে কথা বলেনি—এ পৃথিবীতে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম। সেই পৃথিবী থেকে যমদেবের আহ্বানও রমণীয়।

লোকটি আমার কাছে বসে বলল, তা হলে সবটাই শুনুন। আমি—সবটা? বলে ঘাড় দেখবার চেষ্টা করলাম। কিছু দেখা গেল না। অন্ধকার আরও চেপে বসেছে। দূরের ট্রামগুলির আওয়াজও কমে এসেছে তখন। আমি ভাবলাম, সুখেন্দুটা আজ দেরি করছে কেন? অনেক সময় তো হয়ে গেল। আর এই লোকটা নিশ্চয় সাংঘাতিক, নইলে পুলিস তার জীবিত বা মৃত মাথা খোঁজে? লোকটা কয়েক বছর আগে সাংঘাতিক ছিল, এবং হয়ত এখনও সাংঘাতিকই রয়েছে। কিংবা আরও সাংঘাতিক হয়েছে। এখন হয়ত ঠিকমত দরটর বাঁধা হলে ওর মাথার ন্যায্য দাম হতে পারে সোয়া একচল্লিশ হাজার টাকা! আর কালো বাজারে আরও কত বেশি কে জানে? এই কথা ভাবতেই আমার লোভ হল। মনে হল একে যদি আমি এবং সুখেন্দু ধরে ফেলতে পারি এবং জীবিত বা মৃত মাথাটা পুলিসকে পৌঁছে দিয়ে ন্যায্য দাম সংগ্রহ করতে পারি তা হলে আমরা দুজনে বড়লোক হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারব।

লোকটি বলল, সবটা না শুনলে চলবে কেন? আমার ইতিহাস তো কম নয়। আমার উপর দিয়ে যে অত্যাচার এবং অবিচারের স্রোত বয়ে চলেছে তা যদি অন্য কারুর হত তা হলে সে পাগল হয়ে যেত। যাক তা হলে বলি আমার কথা। আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে, কাউকে আমার কথাটা বলে যেতে চাই।

লোকটি তার পকেট থেকে একটা পলিথিনের ব্যাগ বার করে কি একটা বার করে মুখে পুরে দিয়ে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলতে শুরু করল :

আমি হতে চেয়েছিলাম একজন গল্প-লেখক। ছোটবেলা থেকেই আমার মনে নানা রকম ভাব উঁকি ঝুঁকি মারত। আমার মনের মধ্যে কত গল্প এসে ঘোরাফেরা করত। পাখির মত। কিন্তু ধরতে পারতাম না। পাখি ধরতে গেলে যেমন উড়ে পালায় তেমনি উড়ে পালিয়ে যেত গল্পের দল। সে বিশ্রী অবস্থা। কাগজকলম নিয়ে বসলেই গল্পরা যেন হা হা অট্টহাসি হেসে পালিয়ে যেত। আমি বসে থাকতাম টেবিলের ধারে, কলমের রাশি আর কাগজ হাতে নিয়ে কিন্তু হত না। একপাতা দু পাতা লিখে পড়তে গি‍য়ে দেখতাম যা ভেবে লিখতে বসেছিলাম তা একেবারেই হয়নি। অন্য কিছু এসে গেছে আমার কলমে। অন্য ভাব, অন্য কথা। যেন যেতে চেয়েছিলাম যেখানে সাদার্ন অ্যাভিনিউ হঠাৎ দেখি পৌঁছে গেছি হাওড়া ব্রিজের উপর। ঠিক লেখার বেলাতেও তেমনি হতে লাগল আমার।

আমার উৎসাহ হল। লোকটা যেন আমারই কথা বলছে। গল্প-লেখক ছিল এ তাহলে? আমি ভাবলাম এ এক যোগাযোগ বটে। লোকটি ঠিক মানুষকেই বেছে নিয়েছে। আমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে সে মর্যাদা পাবে? না, লোকটি আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিচ্ছে। সুখেন্দু একটু দেরী করুক না, ক্ষতি কি? একদিন না হয় বাড়ি ফিরতে আর একটু দেরি হবে। এ রকম ত হয়। আচ্ছা, লোকটির নাম কি? নিশ্চয়ই নিজেই বলবে। লোকটি গল্প-লেখক ছিল, না এখনও আছে? লোকটি বলতে লাগল :

অথচ আমার মনে হত আমাকে গল্প লেখক হতেই হবে। কেন জানি না —আমি প্রায়ই দিবাস্বপ্ন দেখতাম, গল্প-লেখক হিসেবে আমার খ্যাতি গগন স্পর্শ করেছে। দেশবিদেশ থেকে খ্যাতি পুরস্কার পাচ্ছি। আমার এক হাজার গল্প প্রকাশ উপলক্ষে কুড়ি খণ্ডে স্বর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। চল্লিশ হাজার সেটের অর্ডার আগেই পাওয়া গেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার সমুদ্রে আমি সাঁতার কাটছি। আর সাহিত্যের জগতে একটা কেও-কেটা হয়ে বসে আছি। রাজত্ব করছি। সে এক উন্মাদনাময় অনুভূতি, সে এক আশ্চর্য জগৎ। কিন্তু হায়, দিবাস্বপ্ন দিবাস্বপ্নই। স্বপ্ন ভেঙে যেতেই আবার কঠিন বাস্তব জগতে প্রবেশ করে দেখতাম হাজার গল্প কেন, একটি গল্পও কাগজের পাতায় ছেঁকে তুলতে পারছি না। বিরাট বিরাট মাছের আভাস পেয়ে যখন জেলে আশায় বুক বেঁধে বড় জাল ফেলে, আর জাল গুটিয়ে আনার পর দেখতে পায় একটা চুনো-পুঁটিও তাতে ধরা দেয়নি তখন তার যা মনের অবস্থা হয়, কিংবা ধরুন, একজন ক্যামেরায় রঙীন ফিল্ম পুরে ছত্রিশখানা এক্সপোজার দেওয়ার পর দেখা গেল একটি ছবিও তাতে ওঠেনি তখন ফোটোগ্রাফারের যেমন অবস্থা হয় আমার অবস্থা ঠিক সেই রকম হত। সব মনে আসছে— সব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পর পর, অথচ কাগজে আর কলমের সাহায্যে

সম্পর্ক নেই।

গল্পের প্লটকে আমি কি নাম দিয়েছিলাম জানেন? বীচি। গল্পের বীচি। প্লট কথাটা ইংরিজী, কথাটার বাংলা নেই। তা বীচি কথাটা মন্দ কি? একটা বীচি ক্ষেত্রে পুঁততে হয়, জলসেচন করতে হয়, রক্ষা করতে হয় তারপর বেরিয়ে আসে গাছ তর তর করে। তখন আর ভাবতে হয় না। দিনে কি দুদিনে একটু জল দিলেই গাছ বেঁচে থাকে, বড় হয়, ফুল হয় ফল হয়। তবে মাটিটা ভাল দরকার। আমার মাটিটা ভাল নয় বলে বীচিগুলো থেকে ঠিক গাছ বেরুত না। হয়ত আমের আঁটি পুঁতলাম, হয়ে গেল একটা ক্যাকটাস। তখন আমি ঠিক করলাম আমার গল্পের বীচি অন্য কাউকে দিই। অর্থাৎ যে কিনা আমার গল্পের প্লট থেকে গল্পটা কাগজে ঠিক মত লিখে ফেলতে পারবে। আমি চিনতাম একজন গল্প-লেখককে। তিনি মিউজিয়মে কি একটা কাজ করতেন, আর মাঝে মাঝে দু-একটা গল্প এখানে ওখানে ছাপাতেন। তাঁর নাম বিশাল সামন্ত। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। পাড়াতেই থাকতেন। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে কথা-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতাম। গল্প, উপন্যাস অনুভূতি ইত্যাদি। তা একদিন একটা চমৎকার গল্পের বীচি আমার মাথায় এসে গেল। কিছুতেই সেটাকে কাগজস্থ করতে না পেরে আমি চলে গেলাম তাঁর বাড়ি। দেখি বিশাল সামন্ত একজন সাধুর সঙ্গে বসে কী সব পরামর্শ করছেন। আমি যেতেই সেই সাধু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি বিশালবাবুকে বললাম, শুনুন দাদা আপনার জন্য একটা গল্পের বীচি নিয়ে এসেছি।

—গল্পের বীচি? তিনি প্রশ্ন করলেন।

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম ব্যাপারটা। তিনি বললেন, ভারি আশ্চর্য তো? আমি দুদিন থেকে একটা গল্পের প্লট—অর্থাৎ তোমার ভাষায় বীচি খুঁজছি। বলো দেখি কি রকম ভেবেছ তুমি?

আমি তখন তাঁকে বললাম। একটি গরীব কেরানীর কাহিনী। সে তার কেরিয়ারের জন্য সমস্ত ভুলে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে লাগল—আর যত সে সফল হয়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠতে লাগল ততই তার বাড়িতে ট্রাজিডি ঘটতে লাগল। এক পুত্র পাগল হয়ে গেল, অন্য পুত্র গাড়ি চাপা পড়ে পঙ্গু হয়ে রইল, কন্যা আত্মহত্যা করল—এবং যেদিন কেরানীটি বড়বাবু হল, সেদিন সে বাড়িতে এসে আর স্ত্রীকে দেখতে পেল না। তার আগেই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। দেখলাম বিশালবাবু গল্পটিকে বেশ পছন্দই করেছেন। তিনি বললেন, ধন্যবাদ ভাই।

সেবারে গল্পটি একটি মাঝারি ধরনের কাগজে বেরিয়েছিল পুজো সংখ্যায়। সর্বসাকল্যে হয়ত হাজার পাঁচেক বিক্রি হয়েছিল, কিন্তু আর কত দূর? এই নামের গল্পটির জন্য বিশাল সামন্ত হঠাৎ যেন একটা আলোচনার সামগ্রী হয়ে উঠলেন। যেখানে সাহিত্য আলোচনা হয় সেখানেই কেউ না কেউ উল্লেখ করে বিশাল সামন্তকে? এত পাকা গল্প নিয়ে বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসু বা সতীনাথ ভাদুড়ী ছাড়া আর কার আবির্ভাব ঘটেছে? চারিদিকে যখন বিশালবাবুকে নিয়ে হই-চই চলছে তখন একদিন তাঁর বাড়িতে গেলাম। সেদিনও দেখি তিনি সন্ন্যাসীর সঙ্গে কী সব পরামর্শ করছেন। আমাকে প্রায় আধ ঘন্টা বসিয়ে রাখলেন দূরে। আর কথাবার্তা বলার সময় মনে হল আমাকে দেখিয়ে কিছু তাঁরা আলোচনাও করছেন। তখন গরমকাল কিন্তু সেখানে বসে বসে আমার কেমন যেন শীত করতে লাগল। যেন তুন্দ্রা অঞ্চলের সমস্ত ঠান্ডা কোনো গোপন পথে আমার গায়ে এসে লাগছে।

সন্ন্যাসী চলে গেলেন। যাবার সময় আমার দিকে তিনি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। মাত্র দু সেকেন্ড হবে, কিন্তু আমার যেন মনে হল তিনি আমাকে যুগ যুগ ধরে ঐভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। আমার কি রকম একটা অস্বস্তি হল। আমি তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। তিনি হাসলেন। কোন কথা না বলে চলে গেলেন। বিশালবাবু আমাকে তখন ডাকলেন। বললেন, কি ব্যাপার সুধীন—এসো, এসো। তোমাকে খবর দিতে পারিনি, ভাবছিলাম তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতাটা জানাই। তোমার দেওয়া গল্পের বীচির মহিমা কি রকম প্রচারিত হয়েছে দেখছ তো? থ্যাংক ইউ! এক কাপ চা খাবে নাকি?

আমি একটু হতাশই হলাম। আমার দেওয়া গল্পের বীচির মহিমায় তিনি এখন বিখ্যাত। আর তার বদলে কি? না থ্যাংক ইউ, আর এক কাপ চা! আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমার স্টকে আর কোনো বীচিটীচি আছে নাকি? বীচি? আমার মাথায় সর্বদাই অন্তত দশ-বারোটা গল্প জট পাকিয়ে থাকে। নানা ধরনের সে সব গল্প। কোনোটা হাস্য-উদ্রেককারী, কোনোটা বিমান-সেবিকার প্রেম, কোনোটা কৃষকদের জীবন নিয়ে, কোনোটা বন্যার পটভূমিকায়, কোনোটা ভূমিকম্পের পরে, কোনোটা স্বামী-স্ত্রী এবং অন্য একজনকে নিয়ে ঘোট, কোনোটা কেবলই মেঠো। ওঁর বীচিটীচি আছে নাকি কথাটা শুনে আমার বুকে দারুণ আঘাত লাগল বুঝলেন? আমার মনে হল বিশাল সামন্ত লোকটা বদ। ও আমার গল্পের বীচি হাতিয়ে নিতে চায়। কিন্তু লোকটির কথায় একটা মন্ত্রমুগ্ধকর ক্ষমতা ছিল তাই আমি বললাম, তা আছে। এই বলে একটা হাতির গল্প বললাম। কাদায় পড়ে যাওয়া হাতির এক করুণ কাহিনী। সে হাতি পুকুরে নেমেছিল জল খেতে, সেখানে নেমে কাদায় আটকে গিয়ে আর উঠতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে যখন তিলে তিলে মরছিল তখন এক জমিদার তনয়ের ইচ্ছে হল হাতি শিকারের। ইয়ার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সে এল, পুকুরের একধারে, পোলাও কালিয়া রান্না হতে

গর্জে উঠল। আঠাশটা গুলিতে শেষ হয়ে গেল হাতি। খবরের কাগজে ছবি সহ রিপোর্ট বেরুল, এক বুনো হাতির হাত থেকে মানুষজনকে উদ্ধার করেছেন জমিদারপুত্র শ্রীহরি রায়।

চমৎকার। বিশাল সামন্ত বললেন। আর আমার পাঁজরা থেকে যেন একটা হাড় খসে পড়ল। আমার একটা গল্পের বীচি হাতছাড়া হয়ে গেল। এবং কী আশ্চর্য—মাসখানেক পর একটা অখ্যাত কাগজে তাঁর ওই গল্পটি ছাপা হল, আবার সাড়া পড়ে গেল চতুর্দিকে। আমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরাজকে বলাতে সে বলল, দুনিয়াটাই এই রকম রে, আক্ষেপের কথা। তবে ভবিষ্যতে সাবধান হবি। ও শালা চাইলে গল্পের বীচি তুই দিবি না। বলবি নেই। ফুরিয়ে গেছে, আর মনে আসছে না। শালা তখন আর চাইবে না। প্রথমে দিয়েই বিপদে ফেলেছিস। ওটাই অন্যায় হয়ে গেছে।

আমি বললাম, তাই করব। বিশাল সামন্তকে একটিও আর গল্পের বীচি দেওয়া নয়। কিন্তু পারলাম না। বিশাল সামন্ত একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমাকে চমৎকার এককাপ চা এবং তার সংগে একটা ওমলেট দিয়ে বললেন, দেখ ভায়া সুধীন, তুমি একটা জিনিয়াস। তুমি আকাশের একটা নক্ষত্র। তোমার ভেতরে যে পদার্থ রয়েছে তাতে তুমি একদিন নিজের পথ কেটে বেরিয়ে পড়তে পারবে। গল্পের জগতে তোমাকে লোকে সম্রাট আখ্যা দেবে। কিন্তু ভাই আপাতত আমার বড় গল্পের বীচির আকাল যাচ্ছে আমাকে আর একটা বীচিও কি দিতে পারবে না? কি আর করি। প্রথমে ভেবেছিলাম বলব—না মশাই, আমি ও রকম ছেঁদো কারবারে লিপ্ত হইনি। গল্পের বীচির আমি দাতব্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বসিনি। কিন্তু সে সব কথা আমি কিছুতেই বলতে পারলাম না, শেষ পর্যন্ত আমাকে আরো দুটি গল্পের বীচি তাঁকে উপঢৌকন দিতে হল।

এইবার আমি মুখ খুললাম। আমি, অর্থাৎ রাবণ রায়। আমি বললাম, কিন্তু সেজন্য আপনি তাঁকে হত্যা করেছিলেন। আমার এখন স্পষ্ট মনে পড়েছে। আপনি বিশাল সামন্তর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সংগে খাওয়া দাওয়া করার পর তাঁর পেয়ালার তীব্র কি এক বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন তারপর তিনি কফিতে চুমুক দেওয়ার সংগে সংগে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আপনার পাত্তা আর পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আপনি কে। আমাকে এতক্ষণ আপনি নিজেকে সুধীন বলে পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আপনার আসল নাম তো রণবীর দত্তাচার্য। আপনি তারপর থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। খুনে, কাপুরুষ!

আমি বললাম বটে, কিন্তু কেমন ভয়ও করতে লাগল। লোকটা যেরকম খ্যাপা, তাতে দুম করে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে বলে আমার মনে হতে লাগল। কিন্তু দেখলাম সুধীন ওরফে রণবীর দণ্ডাচার্য আমার কথা শুনে চুপ করে বসে রইল। আমি তখন তাকে আরও খানিকক্ষণ আমার বক্তৃতা শোনালাম। বললাম, রণবীরবাবু আপনি অতি গর্হিত কাজ করেছেন। একজন প্রায় পৃথিবী-বিখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিককে অতি সামান্য কারণে হত্যা করেছেন। কেবল তাই নয়, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেউ আপনাকে ক্ষমা করবে না।

রণবীর দত্তরায় তখন বলল, আপনিও ক্ষমা করবেন না?

আমি বললাম, আমিও ক্ষমা করব না।

রণবীর দত্তরায় তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বলল, বিশ্বাস করুন আমি বাধ্য হয়ে বিশাল সামন্তকে খুন করেছিলা.. আপনি যদি লেখক হতেন তা হলে বুঝতে পারতেন। কিন্তু আপনি তো লেখক নন। লেখকের যে সে কি বেদনা, কী কষ্ট তা আপনার জানা থাকলে ..।

আমি ফোঁস করে উঠে বললাম, আমিও লেখক। আমার নাম রাবণ রায়। কিন্তু আমি অখ্যাত এবং অজ্ঞাত।

রণবীর দত্তরায় বললেন, আপনিও লেখক? তা সত্ত্বেও আপনি মনে করেন আমি অন্যায় করেছিলাম, রাবণবাবু?

আমি বললাম, হত্যা হত্যাই। কোনো মানুষকে হত্যার কোনো ক্ষমা নেই।

রণবীরবাবু তখন বলতে শুরু করলেন...পাঠকেরা লক্ষ করেছেন নিশ্চয় এখন আর 'লোকটা' বলে উল্লেখ করছি না তাঁকে। হাজার হক তিনি একজন লেখক। এবং তাঁর কথা সত্য হলে বলতে হয় বাংলা সাহিত্যের অন্তত দুটি বিখ্যাত ছোট গল্পের তিনি দিয়েছিলেন প্লট। অর্থাৎ ইনি যাকে বলছেন গল্পের বীচি।

রণবীরবাবু বলতে শুরু করলেন, আগে আমার সব কথা শুনুন বিচার তারপর হবে। আপনি প্রথমেই ধরে নিলেন আমি হত্যাকারী। ঠিকই, আইনগত-ভাবে আমি নিশ্চয়ই হত্যাকারী। আইন যদি আমাকে বাগে আনতে পারত তাহলে আমার গলার চারদিকে ঘিরে ফেলত একটা সূক্ষ্ম দড়ি, এবং বিচারপতি বলতেন, টু বি হ্যাংগড টিল ডেথ। অর্থাৎ, কোন উপায়েই আমার মত খুনেকে সমাজে বাঁচিয়ে রাখা হত না। আমিও ভেবেছিলাম খুন করে আমিও ফাঁসীতে মরব। তবে নিশ্চয় আমার মাথাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল সাময়িকভাবে, কেনন আমি ভাবতাম আমি বিশাল সামন্তকে খুন করে সাহিত্য জাদুকর কিংব সাহিত্য অধীশ্বর হয়ে খুব রাজত্ব করে নেব। কিন্তু একটা কথা আর একট স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়ে যায়। যাকে ইংরিজীতে বলে মিউচুয়াল একসক্লুসিভ। শুনেছেন নিশ্চয় এই কথাটা?

আমি আপনাকে সবটা বলিনি। অল্প একটু মাত্র বলেছি। আপনি

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলতে পারেন বিশাল সামন্তকে হত্যা করার কোনো দরকার ছিল না। তাঁর কাছে না গেলেই হত, তাঁকে গল্পের বীচি সরবরাহ না করলেই হত। গল্পের বীচি সরবরাহ না করে সেই বীচির সাহায্যে নিজেই গল্প তৈরি করে নিতে পারতাম, তাই না? এটাই তো স্বাভাবিক হত। আর আমিও সে জন্য বিশাল সামন্তর সম্মোহনী শক্তির আওতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বদলীর দরখাস্ত করে দিয়েছিলাম বোমবাইতে। এবং অনেক তদ্বির করে সেই বদলীর আদেশও পেয়ে গিয়েছিলাম। এই সময় আমার বিয়েরও কথা হচ্ছিল, কিন্তু সে সব পরে হবে, আগে নিজেকে গল্প জগতে প্রতিষ্ঠা করি এই মনোভাব নিয়ে একদিন কলকাতা ত্যাগ করে চলে গেলাম বোমবাইএ। সেখানে আন্ধেরিতে ছোট্ট একটা ঘর নিয়ে কোনক্রমে বেঁচে রইলাম, আর সঙ্গে নিলাম কয়েক রিম কাগজ, প্রচুর ফাউনটেনপেন, বল পয়েন্ট পেন। কয়েকটা ভাল প্রাকৃতিক রেফারেন্স বই, দুটো অভিধান। প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে এসে চান করে মন্ট সহযোগে এক গেলাস গরম দুধ খেয়ে আধ ঘন্টা বিশ্রাম করে লিখতে শুরু করতাম। সে কি অসাধ্য সাধনা! যে গল্পগুলির বীচি আমার মনের মধ্যে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াত সেগুলিকে ঠিক মত কাগজে নামানো দেখলাম আমার পক্ষে আগের মতই কঠিন মনে হতে লাগল। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। ক্রমাগত লিখে যেতে লাগলাম। বোমবাই-এর নানা প্রলোভন, মজা হই-চই আমি ত্যাগ করলাম। মালাবার হিলস-এ মাত্র একদিন গিয়েছিলাম, বাস—ঐ আমার বোমবাই দর্শন। বাকি সময়টা হয় অফিস, নয় তো আমার ছোট ঘর এবং কাগজ, কলম আর অমানুষিক প্রচেষ্টা। কত কাগজ যে এক লাইন লিখে কি দু লাইন লিখে ফেলে দিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। অবশেষে প্রায় এক বছর যখন হয়ে এল তখন দেখলাম আমার গল্পের বীচি থেকে গাছের অঙ্কুর বেরুচ্ছে। একটি চমৎকার গল্প শেষ পর্যন্ত লিখেই ফেললাম। এক বছরের অমানুষিক পরিশ্রমের পর সেই গল্পটি সম্পূর্ণ করতে পারলাম। গল্পটি একবার পড়লাম, দুবার পড়লাম—আমার তো কোনো খুঁত চোখে পড়ল না। এবারে এটাকে কোথাও পত্রস্থ করা দরকার। ঠিকানা নিয়ে এসেছিলাম পাঁচটি পত্রিকার। আমি তখন গল্পটিকে কপি করে ফেললাম। ধরে ধরে কপি করলাম যাতে অক্ষরগুলি স্পষ্ট বোঝা যায়। বুঝলেন রাবণবাবু, বহুদিন পর আমি একটা গল্প লিখতে পারলাম, সে যে কী আনন্দ তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। হঠাৎ যেন আমার মনে এবং প্রাণে বসন্ত এসে গেল। অফিসে দণ্ডকার বলে একটা মারাঠী ছেলে ছিল সে একটু সাহিত্যচর্চাও করত। তাকে আমি আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালাম এবং গল্পটিকে মোটামুটি ইংরিজীতে অনুবাদ করে শোনালাম। সে প্রচণ্ড অভিভূত হয়ে গেল গল্পটি শুনে। আমার দিকে সে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালো। আমি বুঝতে পারলাম আমার গল্পটি উতরেছে। এবারে কলকাতায় পাঠানোর অপেক্ষা। একটি বিখ্যাত কাগজে গল্পটিকে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিলাম এবং রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করে রইলাম তার উত্তরের জন্য। প্রায় দু সপ্তাহ পরে উত্তর এল। কিন্তু উত্তরটা বুঝলেন রাবণবাবু, আমাকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলল।

আমি বললাম, গল্পটি পছন্দ হয়নি সম্পাদকের, এই তো?

রণবীরবাবু বললেন, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। গল্পটি ফেরত এল। সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। সম্পাদক পছন্দ না করলে কিছু করার নেই। কিন্তু সম্পাদক যা লিখলেন তাতে আমার মাথা ঘুরে উঠল। তিনি লিখলেন, গল্পটি ফেরত পাঠানো হল। এই গল্পটি বিশাল সামন্তর 'পরীর দেশে' গল্পটির হুবহু নকল। গল্পটি আমাদের কাগজেই তিন মাস আগে প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে সাহিত্যে জোচ্চুরি করার স্পর্ধা আপনার কোত্থেকে হল? ইত্যাদি। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। খুঁজে খুঁজে বান্দ্রায় একটা বাঙালীদের আড্ডা খুঁজে বার করলাম, এবং ঐ কাগজটা খুঁজে বার করলাম।

আমি বললাম, তারপর?

রণবীরবাবু বললেন, তারপর সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল আমার। দেখলাম পরীর দেশের সঙ্গে আমার গল্পটির অজস্র মিল প্রায় প্রতিটি কথার সঙ্গে প্রতিটি কথার।

এটা কেমন করে হল? আমার মন মেজাজ সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে গেল। একি ব্যাপার? একি সম্ভব? আমি দু একজনকে ব্যাপারটা বলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাঁরা ভাবলেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এ তো অসম্ভব ব্যাপার। আমারই মনে হতে লাগল আমার মাথার বারোটা বেজে গেছে। এক বছর চেষ্টা করে যে গল্প আমি লিখলাম সেই গল্পই হুবহু বিশাল সামন্ত অন্তত তিন মাস আগে কি করে লিখলেন? তিনি থাকেন কলকাতার এক গলিতে আর আমি থাকি বারশো মাইল দূরে এই বোমবাইতে!

এরপর আমি পরপর দুটি গল্প লিখে ফেললাম। এবং রাবণবাবু, আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, দুটি গল্পই দেখা গেল বিশালবাবু কেবল আগে লিখে ফেলেছেন তাই নয় আগে ছাপিয়েও ফেলেছেন। আমার মনে সে যে কী দাপাদাপি শুরু হল, কী বিরাট ঝড় উঠল তা আমি কাউক বোঝাতে পারলাম না। তা ছাড়া যাকেই বলতে যাই সে-ই ভাবে আমি গল্পগুলি টুকে এক ধরনের আনন্দ পাচ্ছি। কেউ মুচকে মুচকে হাসতেও থাকে, যেন আমি একটা অদ্ভুত কথা বলছি। তা ওদের দোষও নেই—এরকম কথা আমাকে কেউ বললে আমিও বিশ্বাস করতাম না। সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে হজম করতে হল। এবং তারপর আমার ঐ একই অভিজ্ঞতা হতে লাগল। যত গল্প লিখি সেগুলির সবই বিশাল সামন্তর নামে বেরিয়ে যায়। আমি অবশেষে রেগে গিয়ে বিশাল সামন্তকে একটা চিঠি লিখলাম। তাতে আমার গল্পকে নিজের বলে চালানোর জন্য তাঁর কাছে অভিযোগ জানালাম। তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে লিখলাম। তাতে তিনি খুবই সহানুভূতির সঙ্গে জবাব দিলেন। লিখলেন, ভাই রণবীর, তোমার চিঠি পেয়ে খুবই অবাক হলুম। তবে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না। আমি তোমার লেখা গল্প আমার বলে চালিয়েছি বা চালাচ্ছি এটা আজগুবী অভিযোগ। এ হতেই পারে না, অসম্ভব। তা ছাড়া তুমি থাকো বোমবাইএ, আমি থাকি কলকাতায়। এটা তুমি নিজেই বুঝবে এবং বিচার করবে। তবে হ্যাঁ, আমি তোমার কাছে কতকগুলি গল্পের প্লট (মনে পড়ে, গল্পের বীচি নাম দিয়েছিলাম সেগুলিকে?) নিয়েছিলাম। কিন্তু প্লট আর গল্প এক নয়; যেমন কিনা বীচি এবং গাছ এক নয়। কিন্তু তবু বীচির দাম আছে স্বীকার করি। আমি আমার বইএর যথাস্থানে তা স্বীকারও করেছি হয়তো দেখে থাকবে। আমার বই কয়েক মাস আগে বেরিয়েছে, কিন্তু তোমাকে পাঠাতে পারিনি, প্রকাশককে বলে দিয়েছি এক কপি পাঠিয়ে দিতে, আশা করি পেয়েছ। স্নেহাশীর্বাদ নাও, ইতি বিশাল সামন্ত। পুনশ্চঃ যদি তোমার মাথায় কিছু গল্পের বীচি থাকে আমাকে পাঠিয়ে দিতে পারো।

রণবীরবাবু বলতে লাগলেন—বুঝলেন রাবণবাবু, ঐ চিঠি পড়ে আমার সর্ব শরীর জ্বলে উঠল। আমি তখনই একটা প্রতিজ্ঞা করলাম। নিজের মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আর আমি লিখব না। লিখে লাভ কি? বিশালবাবুর নামে আমার লেখা বেরুবে সেজন্য কি আমি এই পৃথিবীতে এসেছিলাম নাকি? সপ্তাহ দুয়েক কিছু করলাম না। কিন্তু লেখবার জন্য যখন হাত নিসপিস করত তখন আমি একটা চমৎকার নেশার সন্ধানে বেরুলাম। কী একটা নেশার কথা বলল দণ্ডেকার একদিন। শুনে তার সঙ্গে গিয়ে আণ্ডার ওয়ারল্ড থেকে জোগাড় করে ফেললাম কয়েকটা পুরিয়া। বাস, তাতেই কাজ হল। গল্প কিছু মাথায় এলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা করে পুরিয়া মুখে ফেলতাম। আর তখন আমার সামনে নানা রকম দৃশ্য ভেসে উঠত। কখনো মনে হত আমি বেড়াতে গিয়েছি সিংহলে, রাবণ রাজার দেশে। আমার যেন নিজেরই দশটা মুণ্ডু আর আমিই যেন রাবণ রাজা। কয়েক মাস এইভাবেই কাটল। এই সময়, কথা নেই বার্তা নেই একদিন বিশালবাবু এসে হাজির হলেন বোমবাইএ। বললেন, ভাই, আমার দুটি গল্প বোমবাই ফিলমজগৎ পছন্দ করেছে। দুটির জন্য পঞ্চাশ দিচ্ছে। এ দুটিই তোমার দেওয়া বীচি থেকে গড়া। তা আমি অকৃতজ্ঞ নই, এই নাও বীচির দাম! বলে আমাকে কয়েকটা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন। আমি সেগুলি হাতে না নিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলাম টেবিলের উপর। তিনি বললেন, এটা তোমার পছন্দ নয়? গুণে দেখ পোনের শ টাকা আছে। কম হল? আমি বললাম। তা নয়—আমাকে কেউ চিনল না। টাকার অভাব আমার আছে ঠিকই, কিন্তু সেজন্য তো আমি লিখি না। তাছাড়া, আপনি আমার লেখা গল্প পুরো নিজের নামে চালাচ্ছেন, এটাও তো ঠিক নয়।

বিশালবাবু বললেন, সেকি সম্ভব নাকি?

আমি বললাম, আপনি জানেন, সম্ভব। আমি কি বুঝি না আপনি কেন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দহরম করতেন? তারাই কোনো মন্ত্রবলে আমার গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার এক অলৌকিক ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আপনি কেবল চোর নন, আপনি ডাকাত।

বিশালবাবু বললেন, রণবীর, তোমার মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে। তা ছাড়া একটা জিনিস ভেবে দেখ, চুরি যদি কেউ করে থাকে সে হল তুমি। যদি তোমার কথা সত্যি হয় অবশ্য। অর্থাৎ, আমার লেখা ছাপা হওয়ার পর তুমি লিখছ হুবহু আমারই গল্প। এবার বলো কাকে লোকে দোষ দেবে? আমি তো বলতে পারি তুমিই আমার লেখা গল্প নিজের বলে চালাতে চেষ্টা করছ। আমার কাছে কয়েকজন সম্পাদক অভিযোগও করেছেন তোমার বিরুদ্ধে। আমি অবশ্য কিছু বলিনি। বুঝতে পারছি তুমি অসুস্থ। তোমার মানসিক চিকিৎসার দরকার।

এই বলে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু তখুনি আমি স্থির করলাম, হ্যাঁ তাঁকে আমি হত্যা করব। হত্যা! এ ছাড়া উপায় কি? যদি আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায় তা হলে আমার লাভ কি?

দু সপ্তাহ ধরে মতলব আঁটলাম। তারপর একদিন বিমানে করে চলে এলাম কলকাতায়। তা বিশালবাবুর দেওয়া টাকাটা আমার কাজে লেগে গেল। বোমবাই আনডার ওয়ারলড থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলাম কড়া বিষ। পটাসিয়াম সায়ানাইড। তারপর একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে....।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর আমি জানি কি ঘটেছিল।

না, আপনি জানেন না, রাবণবাবু, জানেন না। মৃত্যুর কথা জানেন। অর্থাৎ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা। সেসব খবরের কাগজে বেরিয়েছিল সবই। কিন্তু কেউই একটা কথা জানে না—সেটা হল, তারপর থেকে এই ছ বছরর আট মাস তেরো দিন চলে গেল আমার মনের ভেতরটা একেবারে শুকিয়ে গেল। না এল একটা গল্প, না গল্পের বীচি। বুঝলেন রাবণবাবু, এরকম হতাশ হব আমি কখনও স্বপ্নেও আশা করিনি। আমার জীবনটাই বৃথা হয়ে গেল, চাকরীস্থলে আর ফিরে যেতে পারলাম না। গেলেই তো ফাঁসী। চলে গেলাম হরিদ্বার, কনখল, হিমালয়ের আনাচে কানাচে। তবু ভরিল না চিত্ত। তারপর এই তো পরশু এসেছি কলকাতায়। শরীর অসুস্থ—মনে জোর নেই। আর কদিন বাঁচব কে জানে!

উঃ, মশাটা কান থেকে এখনও গেল না। বলে আমাকে স্তম্ভিতভাবে ওখানে বসিয়ে রেখে রণবীরবাবু ডান হাতটার কড়ে আঙুল বাঁ কানটার ভেতর দিয়ে নাচতে নাচতে অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেলেন। আর আমি তখন দেখলাম সুখেন্দু আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলছে, চল চল একটু দেরি হয়ে গেল, সোয়া আটটার ট্রেনটা এখনও হয়ত পেতে পারি বাসটা ঠিক মত পেয়ে গেলে।

ছবি : হিমানীশ গোস্বামী

র সাধ ডিলাইটের সুস্বাদ
elite
BRITANNIA
কমলার সুগন্ধে
ব্রিটানিয়া ডিলাইট মজাদার খাস্তা, মুচমুচে বিস্কুট

মানবজমিন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

॥ বারো ॥

কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নায় নদীর ধারে পাঠশালার বারান্দায় দুটো লোক জবুথবু হয়ে বসে আছে। আজ একেবারে রক্তজমানো ঠান্ডা। থেকে থেকে উত্তুরে হাওয়া মারছে, তাতে ভিতরের প্রাণবায়ুটা পর্যন্ত যেন নিবু নিবু হয়ে আসে। জ্যোৎস্নায় দেখা যায়, নদীর বুকটা খাঁ খাঁ করছে, শুকনো আর সাদা। একধার দিয়ে শুধু নালার মতো একটা জলধারা কাষ্ঠেসৃষ্টে বয়ে যাচ্ছে। নদীর খাত আগে গভীর ছিল। এখন মাটি আর বালি জমে জমে তা প্রায় মাঠঘাটের সমান উঁচু হয়ে এল। বর্ষার প্রথম চোটেই জলের ঢল উপচে মাঠঘাট ভাসায়, পাঠশালার ক্লাস ঘরে গোড়ালিডুব জল দাঁড়িয়ে যায়। তাই এখন গ্রীষ্মের বদলে পাঠশালায় বর্ষার লম্বা ছুটি দেয়।

এই পাঠশাল, এই নদী, চারদিকের মাঠঘাট এসব কিছুর সব গল্পই জানে নিতাইক্ষ্যাপা। খুব যত্নে ছোটো কলকেয় গাঁজা সাজতে সাজতে বলল, এ জায়গার একটা নেশা আছে। থাকো কিছুদিন, টের পাবে। মেরে তাড়ালেও যেতে চাইবে না।

ধুর! এ তো ব্যাকওয়ার্ড জায়গা।

নিতাই ইংরিজি কথাটা বুঝল না। তবে আন্দাজে ধরল, নিন্দের কথাই হবে। একটু চড়া স্বরে বলল, এ জায়গার মাটির তলায় কী আছে জানো? বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ। তাকে জড়িয়ে আছে সাতটা জ্যান্ত সাপ। মাকালতলার মোড়ে যে বটগাছ আছে, ঠিক তার দেড়শ হাত নীচে। একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে, তা দিয়ে যাওয়া যায়। তবে সুড়ঙ্গের হদিশ কেউ জানে না।

যত সব গুলগপ্পো।

নিতাইক্ষ্যাপা এবার ক্ষেপে গিয়ে বলে, আর চাঁদে যে মানুষ গেছে সে গপ্পোটা কি? সেটা গুল নয়? হিমালয় পাহাড়ে মানুষ ওঠার গল্প গুল নয়? নিতাই সব জানে। বেশী বকিও না।

সরিৎ হাসে। বলে, এখানে আর কি কি আছে?

সে অনেক আছে। শুনলে মহাভারত। থাকো, জানতে পারবে।

বলে নিতাই কলকেটা এগিয়ে দিয়ে বলে, ধরাও। অগ্রে ব্রাহ্মণং দদ্যাৎ। প্রসাদ দিও।

আমার পৈতে নেই, ব্রাহ্মণ টাহ্মণ আবার কি?

ও বাবা, গোখরো সাপের বিষদাঁত উপড়ে ফেললেই সেটা ঢোঁড়া হয়ে যাবে নাকি? পৈতে থাক না থাক ব্রাহ্মণ বলে কথা।

কলকেটা নিয়ে সরিৎ সন্দেহের গলায় বলে, খুব কড়া নয় তো। মাথাটাথা ঘুরে গেলে মজা দেখাবো।

আরে না! মিহিন ধোঁয়া, ভারী মিষ্টি, শরীরটা গরম হবে, মাথাটা হালকা লাগবে। একটার বেশী টান দিও না, ধোঁয়াটা বেশীক্ষণ ধরে রেখো না।

রাখলে কি হবে?

নেশা করেছো টের পেলে তোমার দিদি আমাকে ঠেঙিয়ে তাড়াবে।

তা তুমি তো হিমালয়ে চলেই যাচ্ছো। তাড়ালে ভয় কি?

সে তো যাবোই। খাঁটি জিনিস এখনো সেখানেই পাওয়া যযায়। আমাকে এক পোটকা সাধু এসে ভেজাল মাল দিয়ে গেছে। মন্ত্রে তেমন কাজ হচ্ছে না।

সরিৎ খুব আস্তে ন্যাকড়া জড়ানো কলকেয় টান দিল। মিষ্টি, মাতলা ধোঁয়া। ধক করে গলায় লাগল না, কিছু তেমন টেরই পাওয়া গেল না। ফলে আর একটা জোর টান মেরে ধোঁয়াটা ধরে রাখল বুকে।

হাত বাড়িয়ে নিতাই কলকেটা নিয়ে বলে, সাবধান কিন্তু। ধরা পড়লে আমার নাম কোরো না।

আরে না! বলে ধোঁয়াটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয় সরিৎ।

নিতাই কলকেটা জুতমতো ধরে বলে, নিতাইয়ের কপালটা খুব ভাল কিনা! যেখানে যত খারাপ ব্যাপার হবে সবাই ধরে নেয় এ নিশ্চয়ই নিতাইয়ের কাজ। তোমার ডেঁপো ভাগনেটা কোথা থেকে খারাপ খারাপ কথা শিখে এসেছে, সে দোষটা পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চালান করল মদনা।

বাণ মারতে পারো না। বাণ মেরে সব ফিনিশ করে দাও।

নিতাই অভিমানভরে বলে, বাণমারা নিয়ে সবাই আমাকে ক্ষ্যাপায়। তুমিও নতুন এসেই পেছুতে লাগলে?

সরিৎ বাঁশের ঠেকনোয় মাথা রেখে কুয়াশামাখা আধখানা চাঁদের দিকে চেয়ে বলল, ক্ষেপাব কেন? বাণ মারা জানলে আমিও বিস্তর লোককে বাণ মারতাম।

নিতাই শ্বাসটা সম্পূর্ণ ছেড়ে কলকেয় একটা চুমু খেয়ে মুখ লাগাল, তারপর হাপরের শব্দ করে টেনে নিতে লাগল ধোঁয়া। ধিইয়ে উঠল কলকের আগুন। অনেকক্ষণ ঝিম মেরে থেকে বলল, আমিও মারি। কিন্তু মদনা শালা মরে না।

মদনটা কে বলো তো?

ঠিকাদারবাবুকে চেনো না? ভুষুণ্ডির কাক। দেখলেই চিনবে। মল্লিবাবুর সঙ্গে খুব মাখামাখি ছিল।

সরিৎ খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করল, মল্লিবাবু লোক কেমন ছিল?

নিতাই আবার টান মেরেছে। ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকক্ষণ কথা বলল না। তারপর নাক দিয়ে দুটো সাদা সাপ ছেড়ে দিয়ে বলল, যারা বিয়ে করে না তারা লোক খারাপ হয় না। পুরুষদের খারাপ করে তো মেয়েছেলেরা। যাদের এগারো হাতেও কাছা হয় না।

মেয়েছেলের ওপর তোমার অত রাগ কেন বলো তো?

মা বোন পর্যন্ত মেয়েছেলেরা ভাল। যেই বউ হল অমনি সর্বনাশ।

সরিতের নেশা হয়েছে কিনা তা বুঝতে পারছে না। তবে মাথাটা হালকা লাগছে, টলমল করছে। শরীরে তেমন ঠান্ডা টের পাচ্ছে না। বরং একটা যেন হাঁসফাঁস লাগে। তবু সেজদির বাড়ির রহস্যটা জানবার একটা আগ্রহ সে এসে থেকেই বোধ করছে। গত সাত দিনে সে শুধু রহস্যটা টের পেয়েছে। বোঝেনি। এ ব্যাপারে কাউকে প্রশ্নও করা যায় না। কেবল নিতাইক্ষ্যাপার কথা আলাদা।

সরিৎ খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করল মল্লিবাবু বিয়ে করল না কেন?

বিয়ে করেনি তাতে কি? ভালই ছিল। অনেক মেয়েমানুষ ছিল তার। লাইনের ওধারে মঙ্গলহাটের চামেলীর কাছে খুব যাতায়াত ছিল। কলকাতাতেও তো ছিলই শুনি। ফুর্তিতে থাকত। ফেল কড়ি মাখো তেল। কোনো বাঁধাবাঁধি নেই।

বিয়ে করবে না তো এত সব সম্পত্তি করতে গিয়েছিল কেন? কার ভোগে লাগবে?

ও হচ্ছে পুরুষ মানুষের একটা নেশা। রোজগার করবে, সম্পত্তির মালিক হবে, এ না হলে পুরুষ কিসের? ভোগের কথা যদি বলো তো ভোগ মল্লিবাবু একাই কিছু কম করেনি।

এত লোক থাকতে সেজো জামাইবাবুকেই সব সম্পত্তি দিয়ে গেল কেন, জানো?

সে অনেক গুহ্য কথা আছে। থাকলে টের পাবে। তবে সম্পত্তি তোমার ভগ্নীপোতের নয় দিদির।

তাও জানে সরিৎ। সেই শোকেই কি জামাইবাবু বাড়ি থেকে অনেকটা বাইরের দিকে আলাদা ঘরে পর মানুষের মতো বসবাস করছে? সেজদির সঙ্গে জামাইবাবুর কথাবার্তা প্রায় নেই বললেই হয়। এ বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো একটু নির্জীব যেন। গাছ-পালা, পুকুর, আলো-হাওয়া, প্রচুর খাবার-দাবার সত্ত্বেও বাড়িটায় যেন আনন্দ নেই।

ক্ষ্যাপানিতাই আর কী বলে শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে সরিৎ।

নিতাই বোম ভোলানাথের মতো চোখ বুজে থাকে খানিক। তার পর গদ গদ স্বরে বলে, 'জয় কালী।'

সরিৎকেও গাঁজাটা বেশ ধরেছে। চোখ অনেক ঝিকিমিকি দেখছে সে। শরীরের মধ্যে দে দোল দোল ভাব। চিন্তাশক্তি ঠিক থাকছে না, একটু একটু গুলিয়ে যাচ্ছে বোধভাসি।

কি খাওয়ালে গো নিতাই! বাড়ি যেতে পারব তো! পা টলবে না?

আরে দূর দূর! খুব পারবে বাড়ি যেতে। অত ভয় খেলে কি নেশা করে সুখ আছে? চেপে বসে থাকো, চারদিককার কান্ড কারখানা দেখ আর হাসতে থাকো। জয় কালী!

নিতাইয়ের দেখাদেখি চোখ বুজে ধ্যানস্থ হতে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তন্দ্রা এসে যায় সরিতের। হালকা মাথাটা বাঁশের ঠেকনোয় কিছুতেই আটকে থাকতে চায় না। ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে।

ঝিমুনি কাটিয়ে চোখ চাইতেই বুঝতে পারে, নিতাই তাকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে।

কী বলছ?

বলি, দিদি তোমাকে মালদা থেকে এখানে আনাল কেন?

কী জানি! লিখেছিল এখানে কাজ করতে হবে।

কী কাজ?

তা কে জানে! জমিজিরেত সম্পত্তির ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না।

নিতাই একটা শ্বাস ফেলে বলে, শ্রীনাথবাবুও বোঝেন না। বোঝেন বটে তোমার দিদি। জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ। মল্লিবাবু ঠিক লোক চিনত, তাই শ্রীনাথ-বাবুর নামে সম্পত্তি লিখে দিয়ে যায় নি। গেলে এতদিন পুরোটা ফুঁকো হয়ে যেত।

কেন বলো তো?

সে আর বলে কাজ নেই। শ্রীনাথ কর্তা মল্লি-বাবুর দোষগুলো পুরোমাত্রায় পেয়েছেন, গুণগুলো পাননি। এবার বুঝে নাও। আমি এই ছোটো মুখে বড় কথা বলতে চাই না বাবা। তবে ঠাকরোনের সঙ্গে ওঁকে মানায় না।
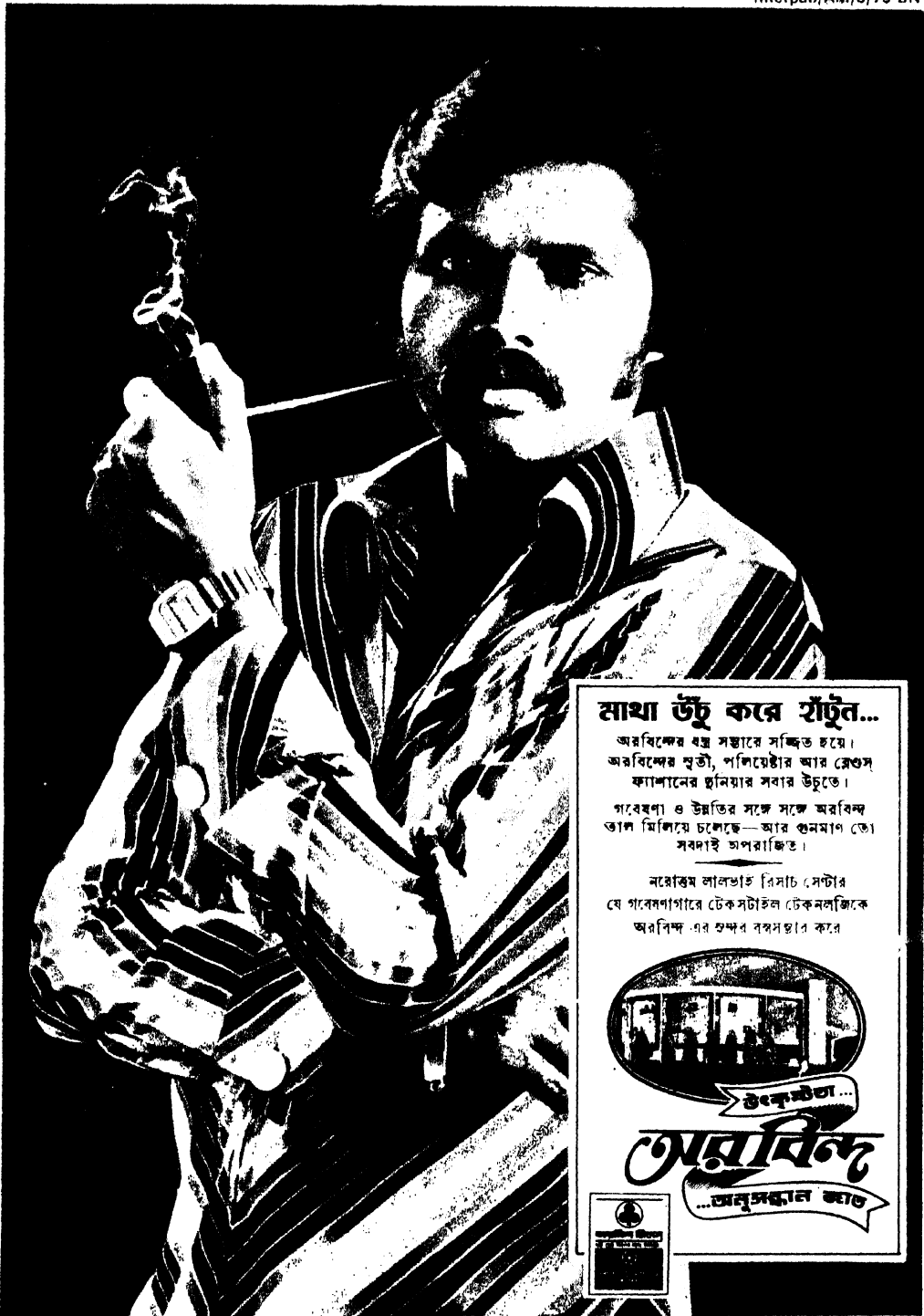
সরিৎ হেসে বলে, তা আমার দিদিও তো মেয়ে-মানুষ তারও এগারো হাতে কাছা হয় না'

আ ছি ছি, তোমার দিদির কথা এখানে হবে কেন? ওসব কথা এলেবেলে মেয়েছেলে সম্পর্কে খাটে। ঠাকরোন কি তেমনধারা মেয়েমানুষ?

তবে কেমনধারা?

নিতাই একটু ফাঁপরে পড়ে গিয়ে বলে, তোমার দিদিকে আসলে কেউ আমরা মেয়েছেলে বলে ভাবিই না। সবাই যমের মতো ভয় খাই।

সরিৎ মৃদু মৃদু হাসে। সেজদিকে কুমারী অবস্থাতেও লোকে একটু সমঝে চলত। লম্বা সুগঠিত চেহারার সেজদির দিকে নজর দিত অনেকেই, কিন্তু ভিড়তে ভয় পেত। একবার সেজদির সঙ্গে রাস্তায় যেতে পিছনে একদঙ্গল ছেলের মন্তব্য কানে

মাথা উঁচু করে হাঁটুন...
অরবিন্দের বস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত হয়ে।
অরবিন্দের সুতী, পলিয়েষ্টার আর ব্লেণ্ডস্
ফ্যাশানের দুনিয়ার সবার উঁচুতে।
গবেষণা ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ
তাল মিলিয়ে চলেছে—আর গুনমাণ তো
সবদাই অপরাজিত।
নরোত্তম লালভাই রিসার্চ সেণ্টার
যে গবেষণাগারে টেকসটাইল টেকনলজিকে
অরবিন্দ এর সুন্দর বস্ত্রসম্ভার করে
উৎকৃষ্টতা...
অরবিন্দ
...অনুসন্ধান জাত

এসেছিল সরিতের, এ যা ফিগার মাইরি, সাতটা মিলিটারিও ঠাণ্ডা করতে পারবে না।

কথাটা শ্লীল নয়, শুনে সরিৎ লজ্জাও পেয়েছিল বটে। কিন্তু কথাটা মিথ্যেও নয়। বলতে কি সেজ জামাইবাবুর আদুরে মোলায়েম চেহারার পাশে সেজদিকে মানায় না। ভাই হিসেবে তার কথাটা ভাবা উচিত নয়, তবু তার মাঝে মাঝে ইদানীং সন্দেহ হচ্ছে, নরম সরম জামাইবাবু তার পাঞ্জাবী মেয়ের মতো ফিগারওলা সেজদিকে ঠাণ্ডা করতে পারে কি-না। কথাটা এই নেশার ঘোরে মনে হওয়ায় হাসিটা চাপতে পারল না সরিৎ। ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। বিয়ের আসরে সেজদি আর জামাইবাবুকে দেখে মুখ পাতলা বড় জামাইবাবু বলেই ফেলেছিল এ যে প্রশান্ত মহাসাগরে একটা কাঁচকলা। কথাটা মনে হওয়ায় সরিৎ আবার হাসে। হাসতেই থাকে।

জাপানিতাই চোখ খুলে গম্ভীর গলায় বলল, হাসছ যে।

একটা কথা ভেবে।

কি কথা?

সে আছে।

নেশাটা খুব ধরেছে তোমায়। বাড়িতে গিয়ে খানিকটা দুধ খেয়ে নিও। নইলে এ নেশায় শরীর শুকিয়ে যায়।

আর কি হয়?

ব্রেন খুব কাজ করে। লোকে গাঁজাখোরকে গাঁজাখোর বলে বটে, কিন্তু মগজকে এমন তরতরে করার মতো জিনিস আর নেই। গাঁজা হচ্ছে কুলোর মতো, ঝেড়ে ঝেড়ে আজেবাজে চিন্তা মগজ থেকে ফেলে দেয়। কাজের জিনিসগুলো রাখে।

কুলোর উপমায় সরিৎ আবার ফিক করে হাসে। বুঝতে পারে, হাসিটা কিছুতেই সে সামলাতে পারছে না। খুব ডগমগ লাগে ভিতরটা। সেজদিকে এখানকার এরা সবাই ভয় খায় জেনেও তার হাসি আসতে থাকে। সে বলে সেজদিকে তোমরা যে মেয়েমানুষ বলে মনে করো না সেই কথাটা আমি আজই সেজদিকে বলে দেবো।

নিতাই আবার ফাঁপরে পড়ে গিয়ে বলে, তাই কি বললাম নাকি?

তাই তো বললে।

দূর বাপু, তুমি সব কথারই সোজা মানেটা ধরো। এ কথার মধ্যে একটা প্যাঁচ আছে, সেটা তো বুঝবে।

প্যাঁচটা আবার কি?

নিতাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তখন মল্লিকবাবু বেঁচে। গুঁতে নামে একটা বিখ্যাত চোর ছিল এ তল্লাটে। গুণী লোক। তার হাত খুব সাফ ছিল। তো সে একবার এ রকম মাঘের রাত্তিরে তোমাদের দক্ষিণের ঘরে হানা দিয়েছিল। সে ঘরে ঠাকরোন আর তাঁর মেয়েরা শোয়। শ্রীনাথবাবু তখন কলকাতায়। সজলখোকা তখনো হয়নি।

গল্পটা বলতে বলতে নিতাই একবার আঁধারভেদী বেড়ালচক্ষুতে সরিতের মুখখানা দেখে নেয়। শালা শুনছে তো ঠিক? প্যাঁচটা ধরতে পারছে তো?

সরিৎ শুনছে। মন দিয়েই শুনছে। এসব কথাই তো সে শুনতে চায়।

সরিৎ বলল, হুঁ।

নিতাই থুঃ করে কৃত্রিম থুথু ফেলে বলে, তা ঘরে ঢুকতে অবশ্য গুঁতেকে কষ্ট করতে হয়নি। ঠাকরোন বুঝি বাইরে গিয়েছিলেন দরজাটায় শেকল দিয়ে। গুঁতে তক্কে তক্কে ছিল, সেই ফাঁকে গিয়ে ঢুকে মেয়েদের গলার হার, হাতের বালা হাতাচ্ছে।

তুমি তখন কোথায় ছিলে?

আমি তখনো সাধু হইনি। গোলাঘরের পাশে মল্লিকবাবু একটা কাঁচা ঘর করে দিয়েছিলেন, সেইখানে মড়ার মতো পড়ে ঘুমোতাম।

তো কী হল?

গুঁতে যখন বেরোতে যাচ্ছে সেই সময় ঠাকরোন উঠোন পেরিয়ে ফিরে আসছিলেন।

উঠোন পেরিয়ে কেন? কলঘর কি তখন উঠোনের অন্যধারে ছিল?

নিতাই একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ছাড়ল। যাক বাবা, ছেলেটা একেবারে গাড়ল নয়। ঠিক ঠিক শুনছে জায়গামতো প্যাঁচটা ধরতেও পারছে।

নিতাই একটু আমতা আমতা করে বলল, ঠিক তা নয়। ঠাকরোন হয়তো বাড়িটা চক্কর মারতে বেরিয়েছিলেন। খুব ডাকাবুকো মানুষ তো। ভূত-প্রেত চোর-ডাকাত কাউকে ভয় নেই।

উঠোনের এধারে কে থাকত?

নিতাই অবাক হওয়ার ভান করে বলল, কে আবার থাকবে? তখন তো এত ঘর ওঠেনি। উত্তরধারে মল্লিকবাবুর সেই ঘর এখনো আছে, উনিই থাকতেন।

সরিৎ মৃদু হাসে। গোলমালটা সে আগেই আন্দাজ করেছিল, এখন ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। গাড়ল নেতাইটা বুঝতে পারছে না যে, গুহ্যকথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।

সরিৎ বলল, তারপর?

ঠাকরোনের হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ ছিল। চোখ ধাঁধানো আলো হত সেটাতে। গুঁতে যেইমাত্র চৌকাঠ ডিঙিয়েছে অমনি ঠাকরোন টর্চটা মারলেন। গুঁতে এক লাফে উঠোনে নেমেই ঠাকরোনের হাতের টর্চটা কেড়ে নিয়ে উঠোনে ফেলে দিয়ে দু হাতে মুখ আর হাত চেপে ধরে বলল টুঁ শব্দ করলে মেরে ফেলব। গুঁতে ভেবেছিল, মেয়েমানুষকে আর ভয় কি? মতলব ছিল, ঠাকরোনকে ঘরে ভরে দিয়ে বাইরে থেকে শেকল টেনে পালাবে। অন্য সব মেয়েমানুষ হলে তা পারতও। ঐ অবস্থায় বেশীর ভাগ মেয়েছেলেরই দাঁত কপাটি লাগার কথা। কিন্তু ঠাকরোনের ধাত অন্য। এক ঝটকায় গুঁতের হাত ছাড়িয়ে এমন এক চড় কষালেন গুঁতে

থাপে থপে পড়ল। আশ্চর্য যে ঠাকরোন কাউকে ডাকি ডাকেননি, হাঁকাচিক্কা ফেলেননি। সেইখানে তকে ধরে লম্বা টর্চখানা দিয়ে এমন উত্তম-ম পেটালেন যে, তার ধাত ছাড়ার জোগাড়।।

সাংঘাতিক তো! সেজদির এই সাহসে সরিৎ ী বিস্মিত হয়।

সেই তো কথা। কাণ্ডটা মল্লিবাবু তাঁর ঘর ক আগাগোড়া দেখেছিলেন।

সে কি ? দেখেও বেরোননি ?

বেরোননি কেন তারও কারণ আছে। পরে বলে নন, আমি ত্যক্তার সাহস আর বীরত্বটা দেখছিলাম। কার করতে হয়, হ্যাঁ, মেয়েমানুষ বটে। এ-রকম ন ঘরে থাকলে পুরুষমানুষের আর চিন্তা-ভাবনা ঃ না।

সেজদিকে খুব শ্রদ্ধা করতেন বুঝি মল্লিবাবু ?

খুব। শুনিয়ে শুনিয়েই বলতেন, শ্রীনাথের বউ গোবরে পদ্মফুল। দেখেছো তো মল্লিবাবুকে ?

অনেকবার। দারুণ চেহারা ছিল। মিলিটারির া।

তবে বলো ঠাকরোনের পাশে মানাত কাকে ? টা মুখে বড় কথা হয়ে যাবে। তবু বলি শ্রীনাথ কে একেবারে গোবরগণেশ আগে ঠাকরোনের া। মল্লিবাবুর উঁচেগোটে জম্পেশ চেহারাখানা । কার্তিকঠাকুরটি নন, রীতিমত, খাটিয়ে পিটিয়ে র।

সে কথা ঠিক।

তবেই বোঝো মল্লিবাবু কেন ঠাকরোনের নামে ত্ত দিয়ে গেলেন। জানতেন. এঁর কাছ থেকে ক ভয় দেখিয়ে নিতে পারবে না।

লোকে কি চেষ্টা করেছে ?

করে আবার নি! বিস্তর করেছে। তবে রোনের সঙ্গে এঁটে ওঠেনি কেউ। গুণ্ডেকে যেমন হাজতবাস করিয়ে ছেড়েছিলেন তেমন আরো অনেক কীর্তি আছে। থাকো, শুনবে।

দু-চারটে বলো না শুনি।

সে অনেক আছে। লোকে সাধে কি ঠাকরোনকে মেয়েছেলে বলে ভাবে না।

কেউ ভাবে না ?

নিতাই আবার মুখটা দেখার চেষ্টা করল। ছেলেটা ল্যাজে খেলাচ্ছে না তো! ভাল মানুষের মতো বলল ঠাকরোনের সমান সমান পাল্লা টানার মতো মরদ কে আছে বলো। একমাত্র ছিলেন মল্লিবাবু। তাঁর সামনে ঠাকরোন মাথা উঁচু করে কথা বলতেন না।

বটে! বটে! সরিৎ নড়ে চড়ে বসে।

মরদ এ তল্লাটে ঐ একজনই ছিল। আর দিনে কালে আর একজনও হয়তো হয়ে উঠবে।

কে ? কার কথা বলছ ?

সজল খোকাবাবু।

সরিৎ একটু ধাঁধায় পড়ে যায়। সজলকে নিয়ে সে কখনো কিছু ভাবেনি। এখন হঠাৎ ভাবনাটা শুরু হল। খিন্ন হয়ে খানিক এলোবেলো চিন্তা ও টলো-মলো মাথায় সে সজলের মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। তারপরই অর মনে হল, সজলের চেহারাটা বয়সের তুলনায় বেশ লম্বা। হাড়গুলো মজবুত এবং কাঠামোটাও শক্ত, ভারী জেদী ছেলে। মায়ের শাসনে মিনমিনে হয়ে থাকে বটে. কিন্তু ওর ধাত তা নয়। পরশু কি তার আগের দিনই হবে, সজল মুগীর ঘর থেকে একটা মস্ত মোরগ চুরি করে নিয়ে যায় এবং তার বাবার দাড়ি কামানোর জার্মান ক্ষুর দিয়ে সেটাকে জবাই করে। সেই অবস্থাতেই ফেলে রেখেছিল পুকুরের ধারে। হুলো বেড়ালটা মুখে করে সেটাকে নিয়ে গোলাঘরের পিছনে ছেঁড়াছেঁড়ি করছিল। স্বপ্না দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি করায় ঘটনাটা ধরা পড়ে। প্রথমে সজলকে কেউ সন্দেহ করেনি। কিন্তু সেজদি সহজে ছেড়ে দেবার, সকলকে প্রশ্ন করে করে অবশেষে ঠিক আসামীকে ধরতে পারে। সজল কবুল করেছে সে মাংস খাওয়ার জন্য মোরগটা চুরি করেনি। তবে ? তার কোনো জবাব নেই।

ক্ষ্যাপা নিতাই বলল. ঠিক মল্লিবাবুর মতো।

কে ?

সজল খোকাবাবু।

কথাটার মানে কি নিতাই ?

সরিতের গলার স্বরটা হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠায় নিতাই সাবধান হয়ে বলে, কোনো মানে টানে নেই বাপু। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

নেশাটা যত জোর ধরেছে বলে ভেবেছিল সরিৎ ততটা নয়। হঠাৎ এই সঙ-সাজা ভাঁড়টার ওপর তার রাগ হল প্রচণ্ড। টাপে টোপে বলছিল সে এক রকম কিন্তু এ তো পষ্টাপষ্টি সেজদির কলঙ্ক রটানো।

সরিৎ মালদায় বিস্তর মারপিট করেছে। অনেক-গুলো কাজিয়া ছিল না-হক খামোখা। অনেক সময় নির্দোষ লোককেও মেরেছে। আজ একটা মতলববাজ হারামজাদাকে মারলে কেমন হয় ?

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ উঠে একটা লাথি চালায় সরিৎ. এই শালা! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

নিতাই পোটলার মতো গড়িয়ে পড়েছে বারান্দা থেকে। পড়েই চেঁচাল. মেরে ফেললে! মেরে ফেললে।

সরিৎ লাফিয়ে নামে। মাথায় আগুন ধরে গেছে। পর পর কয়েকখানা লাথি ঝাড়ল কাঁকালে। বলল. শব্দ করলে মেরে চরে পুঁতে ফেলব।

কে শোনে কার কথা। মাটিতে পড়ে ক্ষ্যাপা-নিতাই গড়ায় আর জটাজুট ধুলো মাখে আর প্রাণ-পণে চেঁচাতে থাকে, নির্বংশ হবি। অন্ধ হয়ে যাবি। কুষ্ঠ হবে। (ক্রমশ

কণ্টকল্পিত
অতুল্য ঘোষ

(নবপর্যায়)

॥ ৬ ॥

সংবাদপত্রে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে: চব্বিশ পরগণার এক গ্রামে গণ-আদালতের বিচারে এক ব্যক্তির তিরিশ হাজার টাকার জরিমানা হয়। জরিমানা না দিতে পারায় তাকে এমন মারধর করা হয় যে, সে অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই অবস্থায় তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। তারপর ঐ ব্যক্তির স্ত্রী অনেক চেষ্টা করে তাকে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং পুলিসও সজাগ হয়। খবরটি পড়ে শিউরে উঠলুম। চল্লিশ দশকের শেষার্ধে ও পঞ্চাশ দশকের শেষার্ধে ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও গণ-আদালতের বিচার হয়েছিল। বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের ভারতবর্ষের সর্বত্র নৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায় সৃষ্টির চেষ্টার একটি কার্যক্রম ছিল। আগের 'কণ্টকল্পিত'য় এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছি। তখন স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই এইসব ঘটনা ঘটেছিল। কারণ, সব দেশেই দেশ স্বাধীন হবার পর কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই ১৯৭৯ সালে? ব্যাপারটি অসম্ভব বলেই মনে হয়। বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই চায় না। সংবাদের মধ্যে একটি ছোট্ট লাইন আছে যে, এখনও কোন গ্রেপ্তার হয়নি। দুষ্কৃতিকারীরা দুষ্কার্য করতে পারে—এটা ঠিকই; কিন্তু যেখানে সংবিধানস্বীকৃত গণতান্ত্রিক সরকার আছে সেই রাজ্যে এরূপ গণ-আদালত হওয়াই অস্বাভাবিক। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, হঠাৎ হয়ে গেছে, তা হলে এরকম বেআইনী ঘটনার পরও দুষ্কৃতিকারীরা এখনও গ্রেপ্তার হয়নি এ জিনিস কি করে সম্ভব হয়!

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বাম ফ্রন্ট সরকার আছে। তারা বর্তমানে যেসব আইন ও নিয়ম বিধিসঙ্গতভাবে এ রাজ্যে প্রচলিত আছে তা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেইজন্যেই বিস্মিত হয়ে ভাবছি যে, এ জিনিস কি করে সম্ভব হল। সরকারী দল যদি কোন আইন খারাপ মনে করে, সে আইন বদলে নেবার ব্যবস্থা আইনসভায় অনায়াসেই করা যায়। কিন্তু গণ-আদালত কখনও হতে পারে না। আইনের শাসন একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে যায়। তার সঙ্গে স্বেচ্ছাচার বা খামখেয়ালের কোন সংস্রব নেই। সেইজন্যেই অবাক লাগছে যে, গণ-আদালত যাঁরা বসালেন তাঁরা সাহস কোথা থেকে পেলেন। কে বা কারা গণ-আদালত বসিয়েছিল, জানি না। তারা কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত কিনা তাও জানা নেই। যে মত বা যে দলেরই তাঁরা হন, নিজেদের হাতে আইনের অধিকার নেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের নেই এবং নেওয়াটাই বেআইনী। ভারতবর্ষে যে যত বড় অন্যায়ই করুক, ভারতবর্ষের কোন লোক বা কতকগুলি লোকের তার বিরুদ্ধে বেআইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার নেই। মাঝে মাঝে অবশ্য শোনা যায় যে, সামাজিক অনাচারের জন্য দেশের খুব নিভৃততম পল্লীতে কতকগুলি গ্রামবাসী অনাচারকারীকে আইনের বাইরে গিয়ে সাজা দেয়। কিন্তু সকলেই জানে এ কাজ বেআইনী। আর এখানে কলকাতার এত কাছে দিনের আলোয় কি করে এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে! তা হলে কি শাসনযন্ত্রের কোন ত্রুটি আছে? এই গণ-আদালত উপলক্ষ করে কেবলমাত্র সরকারের সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এই বেআইনী কাজের দিকে জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যাতে ভবিষ্যতে কোন একজন বা কতকগুলি লোক এরকম বেআইনী কাজ করতে সাহসী না হয়।

আইনের শাসনের বাইরে যদি কোন কাজ সংগঠিত হয় তা হলে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ। এবং এ কাজ যদি করতে দেওয়া হয় তা হলে গণতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আমাদের দেশে আইনের মর্যাদা যাতে রক্ষিত হয় তার জন্য সংবিধান আছে ও গণতান্ত্রিক প্রথায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত আইনসভা আছে। এবং আইনসভার সংখ্যাধিক দল সংবিধান সম্মতভাবে সরকার গঠন করেন। এখানে যদি আইনের মর্যাদা রক্ষিত না হয় তা হলে সংবিধান ও গণতন্ত্রের অমর্যাদা হয়।

আজ এসব কথা লেখার প্রয়োজন হচ্ছে এইজন্য যে, অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায় যে, সরকার পক্ষের কোন কোন নেতা ও মন্ত্রী যেভাবে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন বা জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দেন তাতে সব সময়ে আইনের মর্যাদা অনুযায়ী কাজ করার জন্য লোককে উদ্বুদ্ধ করা হয় না। জোতদার-বর্গাদার, শ্রমিক-মালিক, ধনী-নির্ধন সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে সব উক্তি করা হয় তা প্ররোচনামূলক। বাম ফ্রন্ট সরকার আছেন। তাঁরা রাজ্যের আইন সভায় আদর্শমত আইন পাস করাতে পারেন। বাম ফ্রন্ট সরকারের দলীয় যাঁরা পার্লামেণ্টে আছেন তাঁরা নিজেদের আদর্শমত সংবিধান সংশোধনের চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে—যে আইন ও বিধান বিধিসম্মতভাবে চালু আছে তার মর্যাদা দেওয়া ও রক্ষা করা সরকারের একান্ত কর্তব্য। তাঁরা যে দলভুক্তই হন, এ কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, প্রচলিত আইনের অমর্যাদার অর্থই হল সরকারের ব্যর্থতা ও অপদার্থতা। কোন আইন ভাল কি মন্দ তা বিচার হবে আইনসভায়, ময়দানে বা রাস্তায় নয়। বিচার করবার যে পদ্ধতি সংবিধান অনুযায়ী আইনসভায় স্থির হয়ে আছে তার পরিবর্তন একমাত্র সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট আইনসভাই করতে পারে। কোন ব্যক্তি বা দলের এর ব্যতিক্রম করার অধিকার নেই। যদি মনে হয় যে, কোন আইন বর্তমান যুগোপযোগী নয়, তবে তার পরিবর্তন বর্তমান নিয়মানুযায়ীই করতে হবে।

সাধারণ নির্বাচনে অনেক সংখ্যাধিক্যে জয়ী হয়ে বাম ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকারের স্থায়িত্ব অনেকেই চান। সঙ্গে সঙ্গে সরকার যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদেরও দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। দেখা যাচ্ছে গণ-আদালত বা ঐরূপ বেআইনী কাজ এখনও কেউ কেউ চান। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থায় Individual Terrorism-এর স্থান থাকতে পারে না। যদি দেশে নৈরাজ্যবাদের আদর্শ নিয়ে কেউ কাজ করতে চান তা হলে বুঝতে হবে—তিনি বর্তমান শাসনব্যবস্থার বিরোধী। কোন ব্যক্তি বা কোন দল হয়তো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে গিয়ে নির্যাতন বরণ করতে পারেন; কিন্তু সরকারে থেকে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায় না। সরকার যদি এ সম্বন্ধে সম্যক সচেতন না হন তা হলে সেটা হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি। আমার তো মনে হয়, বর্তমান বাম ফ্রন্ট সরকার দেশে কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক তাঁরাও তা চান না। এইজন্য এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশের কোন কোন রাজনৈতিক দল অতীতে গণ-আদালতের পথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন; সেইসব দলের কোন কোন দল বর্তমান বাম ফ্রন্ট দলের মধ্যেও আছেন। তাঁরা তাঁদের মত ও পথের পরিবর্তন করেছেন এটা আমি জানি। কিন্তু আজ যদি পুনরায় ঐসব বেআইনী কাজের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় তা হলে জনসাধারণের মনে সন্দেহ জাগা একান্ত স্বাভাবিক। এরূপ ঘটনা হয়তো খুব কম ঘটেছে; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এইরূপ ঘটনা এমন সর্বনাশের ইঙ্গিত বয়ে আনে, যা দেশের পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর। এ বিষয়ে ভালভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। এই জন্য সরকারে আছেন এমন কোন কোন লোক কমিউনিজম সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও নিজেদের কমিউনিস্ট বলেন। কমিউনিজম একটা মতাদর্শ: একে রূপ দেওয়ার একটা বিশিষ্ট বিধিবদ্ধ পথ আছে। পৃথিবীতে আরও তো দেশ আছে। যেখানে কমিউনিজম

অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হয়। দেশে কমিউনিস্ট শাসন আছে তার কোন দেশেই তো বেআইনী কাজ ও তা সৃষ্টির চেষ্টা সহ্য করা হয় না! ামাদের রাজ্যেই বা মাঝে মাঝে এমন কাজ হতে পারছে কি করে—যা বিধি-ত, অসঙ্গত ও বেআইনী! ভারতবর্ষে কেন্দ্রে, কি কোন রাজ্যে এখনও নজমের মতাদর্শ অনুযায়ী সংবিধান বা বস্থা চালু হয়নি। সেই জনাই মনে প্রশ্ন যে, মাঝে মাঝে সরকার পক্ষের নেতারা কেন সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে প্রতি-স্থী, বুর্জোয়া, জনস্বার্থবিরোধী, রী প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করেন? য়া বলতে একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে। সাধারণ অর্থে এইটাই লোকে মনে , অপরের শ্রমের ওপর নির্ভর করে একটা বিশেষভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ াদেরই বুর্জোয়া বলে। বাম ফ্রন্ট দলের কতজন আছেন যাঁরা এই বুর্জোয়া মধ্যে পড়েন না? কতজন আছেন যাঁরা ধকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়ের উপর নির্ভর-ন? কতজন আছেন যাঁরা জনসাধারণের জীবনধারণ ব্যবস্থা বা আয় তার চেয়ে আয় করেন না; বা উন্নততর জীবন করেন না? যাঁরা আহারে বিহারে ারায় সাধারণের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রেখে বাস করেন তাঁরা কি গুণে ক বুর্জোয়া বলেন? বর্তমান সমাজে তো প্রতিনিয়তই দেখা যাচ্ছে যাঁরা নিজেদের জনদরদী বামপন্থী প্রভৃতি বলেন তাঁদের বাড়িতেও ঝি-চাকর যেভাবে exploited হয় তার সঙ্গে তথাকথিত বুর্জোয়া-বাড়ির exploitation-এ কোন পার্থক্য নেই। অনেকে শ্রমিক-আন্দোলন করেন,—তাঁরা শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে যে-সব আন্দোলন করেন তার অধিকাংশই আমি সঙ্গত বলে মনে করি। কিন্তু প্রশ্ন এই—যাঁরা শ্রমিক-আন্দোলন করেন তাঁদের ক'জন তাঁদের বাড়ির শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন? বাড়িতে যারা কাজ করে তাদের শোবার জায়গা হয় বারান্দায়, না-হয় সিঁড়ির নীচে, সুস্থ অবস্থা এবং অসুস্থ অবস্থায়। ড্রইংরুম খালি পড়ে থাকে, সেখানে চামচিকে, টিকটিকি, গিরগিটি থাকতে পারে কিন্তু অসুস্থ অবস্থাতেও বাড়ির শ্রমিকদের থাকা নিষিদ্ধ। শহরাঞ্চলে নিজেদের ঘরে পাখা তো আছেই, তার ওপর এয়ার কন্ডিশনও আছে; বাড়ির শ্রমিকদের ঘরে ক'জন পাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন? এইসব স্বাতন্ত্র্য যাঁরা বজায় রাখেন তাঁদের কি বলে অভিহিত করা হবে? ধনীর তনয় বা ধনী যদি বামপন্থী দলের প্রার্থীরূপে নির্বাচনে দাঁড়ান তা হলেই তিনি শুদ্ধ হয়ে যান; তাঁর জীবনধারার কোন পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। বৈষ্ণবসাহিত্যের একটি পদ মনে পড়ে যাচ্ছে: 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়'। একে হয়তো অনেকে নীতিবাক্য মনে করবেন, কিন্তু এটাই রূঢ় বাস্তব।

যাঁরা সরকার পরিচালনা করছেন তাঁদের মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে এমন সব উক্তি বেরোয় যা প্ররোচনা দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সরকারের দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছে লোকে আশা করে সংবিধানসম্মত উপায়ে শাসনকার্য পরিচালনা। এর চেয়ে বেশী জনসাধারণ আশা করে না। বিপদ তো সেখান দিয়ে আসে না, ব্যতিক্রম আসে যখন সরকারী দলের কোন কোন নেতা বা কর্মী অকারণে অহেতুক 'বুর্জোয়া', 'শোষণকারী' এইসব কথা ব্যবহার করেন। প্রশ্ন এই যে, এঁদের মধ্যে কতজন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় এইসব কথা বলবার অধিকার অর্জন করেছেন? কেবলমাত্র মতা-দর্শের কথা বললেই হয় না, সীমাবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যেও যদি সেই মতাদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাত্রা নির্বাহের চেষ্টা হয় তা হলেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করা যায়। কেবলমাত্র কথা আর কথা আর কথা হয়তো তাতে সাময়িক ফল পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্থায়ী ফল পাওয়া অসম্ভব। যাঁরা সরকারে আছেন তাঁদের শুধু মুখে বললেই হবে না, কাজে প্রমাণ করতে হবে যে, তাঁরা রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলার মর্যাদা দিতে ও রক্ষা করতে সর্বদা সচেষ্ট। তা হলেই লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করা যাবে। সরকারের বাইরে থেকে স্লোগান দিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে দায়িত্ব এড়ানো যায়, কিন্তু সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে অতন্দ্র প্রহরায় সদাসর্বদা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

পুনশ্চ পারী

নীরদ মজুমদার

॥ একত্রিশ ॥

আমাদের মতই ফরাসীদের একটা স্বভাবদোষ হল ভাল ভাল শব্দকে একটা বিশেষ অর্থে, অন্যভাবে উচ্চারণ করা। এমন অনেক শব্দের মধ্যে সাধারণ একটার কথা মনে পড়ছে। প্রথমেই 'ফ্লিক্' অর্থাৎ পুলিস। কথাটা অবশ্য সব পুলিসের কর্ণেই শ্রুতিকটু ঠেকবে। ওদেশে চলমান পুলিস আছে! দুজন দুজন করে সাইকেলে ঘোরে। গায়ে একটা নীল জোব্বা জাতীয় পরে। লোকে ওদের বলে "হিরোঁদেল", বা সোয়ালো পাখি. কথাটা শুনলে ওরা অবশ্যই খুশি হয় না।

যখন ছাত্র হিসাবে ছিলাম তখন মহিলা পুলিস ছিল না। আজকাল হয়েছে। ১৯৭৭ সালে তাদের রাস্তায় ঘাটে দেখেছি। বেগুনী রঙের ছিমছাম বেশ-ভূষায়, রাস্তাঘাট তদারক করছে, ওদের ঐ বেগুনী রঙের পোশাকের জন্য লোকে বলতো "ওব্যার্জীন" অর্থাৎ বেগুন। পুলিস মহিলাদের কানে এ কথা মোটেই মধুর শোনাত না। তাই বোধহয় সরকার ওদের ইউনিফরমের রঙ বদলে সুন্দর নীল রঙের পোশাক করেছে। পোশাকের রঙ এত সুন্দর নীল তাই অনেকেই ওদের বলে "পোর্ভাস্"। সুন্দর এক জাতীয় পাখির নাম পের্ভাস। এতো মিষ্টি এবং কাব্যিক বলেই যে কারণে ওকথা পুলিসের বেলায় হোক না তারা মেয়ে তবু কেউ মানতে চায় না। দূর। পুলিসের নাম আবার পের্ভাস। প্রথমত ফ্লিক্ দ্বিতীয়ত আর্গো ভাষায় বা স্ল্যাং শব্দে মহিলাদের বলে 'গোঁজেস', কথাটা খুবই খারাপ—তাদের ক্ষেত্রে অত মিষ্টি নাম সত্যই হাস্যকর।

আর্গো সাধারণত মানুষ মজুর শ্রেণী এবং সৈন্য বাহিনীতে প্রচুর চালু। গোড়ায় অনেক কথাই আমি বুঝতাম না। পরে অবশ্য রপ্ত করেছিলাম কারখানায় কাজের দৌলতে।

গতবারে পারীতে গিয়ে এইসব কথা উঠল এক সন্ধ্যায় রঘুবীর সিং ও তার স্ত্রী আনের আমন্ত্রণে ওদের বাড়িতে। রঘুবীর সিং আমার সব থেকে প্রিয় ফোটোগ্রাফার। শুধু যে ফোটোতে সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য একথা বলছি না, তা তো অন্য ফোটোগ্রাফারও পারে, কিন্তু ওর তোলা "গঙ্গার" ওপর চিত্ররাজি একেবারেই অন্য ধরনের। ফোটোতে পবিত্র পুস্তক সৃষ্টি বললে অত্যুক্তি হয় না। যদিও এর আগে আমি পরিচিত হয়েছি থরেজ লাপ্রা কার্তিয়ে ব্রেসোঁর সঙ্গে।

রঘুবীরের সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিল রেজীন দারিক, এবং অবশ্য আরো মহিলা ও পুরুষ।—রেজীনের সঙ্গে দিল্লীতে পরিচিত হয়েছিলাম অনেক বছর আগে। সেবার ফরাসী অ্যাম্বাসাডার জাঁ দারিদ ও মাদাম দারিদ আমাকে নিমন্ত্রণ করে দিল্লীতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। সেবার রেজীনের কল্যাণে প্রদর্শনী সুষ্ঠুভাবে হয়েছিল। সেই সূত্রেই বছর পনেরো আগে থেকে আমাদের পরিচয়। ওর সঙ্গে এসেছে ওর বন্ধু জাঁ ভাঁসা। সংবাদপত্র মহলে এর বেশ নামডাক। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মুখ।

ওরাই প্রশ্ন করলো এতদিন বাদে এসে পারীর কি পরিবর্তন তুমি দেখছ?

বললাম, আমার কালে পারীর আকাশ প্রতিভার জ্যোতিষ্কে ছিল ঠাসা; দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে চিন্তাবিদ ছিল অঢেল। চিত্র, ভাস্কর্য, কবিতা, সাহিত্য সর্বত্র গমগম করতো। এবার এসে খুব খারাপ লাগে দেখে যে সেই আকাশে আজ মহাশূন্যতা বিরাজ করছে। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব নিশ্চিহ্ন থাকলেও তাঁরা বৃদ্ধ সারাত্ বা সিমন বুভিয়ে একদম বুড়োবুড়ী—

রেজিন বললো, কথাটা খুব সত্য—ইদানীং ভুরি ভুরি বই ছবি সর্বত্র দেখা যায়, কিন্তু সবই মধ্যবিত্ত জাতীয়।

কন্‌স্ট্রাক্টার

আমার আরো খারাপ লাগছে তাদের মধ্যে এমন অনেককে চিনতাম, যাদের অনেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল, তারা প্রায় সবাই "ওপোদির" অর্থাৎ যা বলা যেতে পারে "ক্যাসে লা পীপ্"—মারা গেছে।

একথায় ওরা সবাই হেসে ফেললো। ক্যাসে লা পীপ—পাইপ ভেঙেছে, বাংলায় বলতে গেলে, পটল তুলেছে।

জাঁ ভাঁসা আমাকে বললে, আমি একটি নতুন অভিব্যক্তি শুনেছি, এক রাশিয়ানের কাছে "ইলে ফার্মে লা পারাপ্লুই" ও ওর ছাতা বন্ধ করেছে, অর্থাৎ গত হয়েছে—

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, এ অভিব্যক্তি নিশ্চয়ই রাশিয়ান নয় অবশ্যই ইংরেজের।

সকলে হেসে ফেলল, বস্তুত "ছাতা"ও "ইংরেজ" এককথা। কালো ছাতা হাতে ছাড়া ইংরেজকে ভাবা যায়? পানীয়ের সঙ্গে আমরা এই আলোচনায় জমে গেলাম।

আমি বললাম আমার একটা অভিব্যক্তি ভয়ানক ভাল লাগ, তোমাদের দেশে প্রচলিত যেমন "ইলা আভালে সোঁ বুলত্যাঁ দা নেসাঁস"—মানে হলো "ও তার বার্থ সার্টিফিকেট গিলেছে"—অথবা আরো ছোট করে "অ্যাভালের গিলেছে. অর্থাৎ গত হয়েছে।

ওরা খুব হাসলো, প্রশ্ন করলো, এ সব কো শিখেছ?

বললাম, কেন, এখানে! আমিও ছিলাম এ "পো-ল-সুয়র" অর্থাৎ মজুর। সব শিখেছি সুবের্ণ—অর্থাৎ "কয়লায়" সরল বাঙলায় কার কাজে।

ওরা হাসলো, বললাম, আরো অনেক শিখেছি, তবে এ মহিলাসমাজে বলা চলবে না।

মেয়েরা সবাই বললে, না না বল না, বল স্বভাবত মেয়েরা পুরুষদের থেকে বেশ বি বেশী ভদ্র হয়, অশ্লীলতা ওদের রুচি বহি কিন্তু কারখানার মেয়েদের কাছে এসব কথা গায়ে লাগে না। ওসব জায়গায় প্রায় সব স্বাভাবিক। এসব কথা আমি শিখেছিলাম কার কাজ করার কালে। সে এক যন্ত্রণার ও দু ইতিকথা।

মীরেই মীয়াই-এর কল্যাণে ওর ভাই কারখানা, মস্ত ঘর, প্রায় পঁচিশ মিটার লম্বা, টেবিলে আমরা প্লাস্টিকের চাদরে নানা ফুললতাপ রঙীন ছবি প্রিন্ট করতাম; টেবিলের দুদিকে

স্ক্রিন ফ্রেমের নকশা রঙের আঁচড়ে ছাপ ফেলে নকশা তোলা, কখন দুবার তিনবার, সকাল থেকে অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ টেবিল থেকে ও দৌড়াদৌড়ি করে মেরুদণ্ড ব্যথা হয়ে তার উপর রঙের ও আসেটোনের দুর্গন্ধ। দিন গা বমি বমি করে। ঝাঁজে চোখ জ্বালা নিরুপায় তবু বাঁচতে হবে।

বছর খানেক পরে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, পাঁচটায় যখন বিছানা আন্তরিক উষ্ণতায় য় ধরেছে তা ছেড়ে ওঠা। ওঃ! কি কষ্টের তা বোঝান শক্ত। কিন্তু উঠতেই হবে, কোনমতে ধোও, তারপর নিজেকে গলাও প্যান্টে, শার্টের ও র ভিতর ঢোকো। তারপর মোজা জুতোয় কে পোরো, তারপর দস্তানা, বড় কোট ও স্কেরে নিজেকে ঠেসে কফি টোস্ট খেয়ে বার হও নিয়মিত। বুলভার প্যাস্তরের সুড়ঙ্গ পথে বার কালে দেখা যায় ঐ অন্ধকারে, আমার মত গারা পিলপিল করে চতুর্দিক থেকে নিশ্চিহ্ন সুড়ঙ্গগহ্বরে। তখনও চোখে ঘুম, চোখের য় সিসের ভার। সব কিছুই কুয়াশায় আবছা। ঐ অন্ধকারে সব ঘুমন্ত কাকেখানায় আলো। রয়া পরা গাঁট্টাগোট্টা পুরুষ মেয়ে কাঁচের ন জমি সাবান জল দিয়ে ধুতে ব্যস্ত, চেয়ার ন হচ্ছে যথাযোগ্য স্থানে।

আর একটা দিনের দরজা খোলা শুরু হয়েছে। া সকলেই সুড়ঙ্গপথে, প্লাটফরম ভরে গেল। চার ভেদ করে এলো কেঁচো পোকার মত ড়োড় দিয়ে, এলো ট্রেন। দরজা খুলে গেল, ড় করে ঢাকার সঙ্গে সঙ্গে দরজা আপনা বন্ধ হয়ে গেল। আমি পং দল ভিলেং-এ যাব ট্রেনে চাপলাম। নানান কর্মী নানান গন্তব্যে। সকালে সব পুরুষ-মেয়েমানুষের মুখ বেশ টো লম্বা। কিছু দাঁড়িয়ে। কিছু বসে। সবার ই গামেল অর্থাৎ খাবার বাক্স—রেস্তোরাঁয় লর পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়।

একটা চাকায় টাল খেলে যেমন হয়, তেমনি-

এই ধরনের ছাপখানায় কাজ করতাম। —শিল্পকর্মীনের টানা ছাপা।
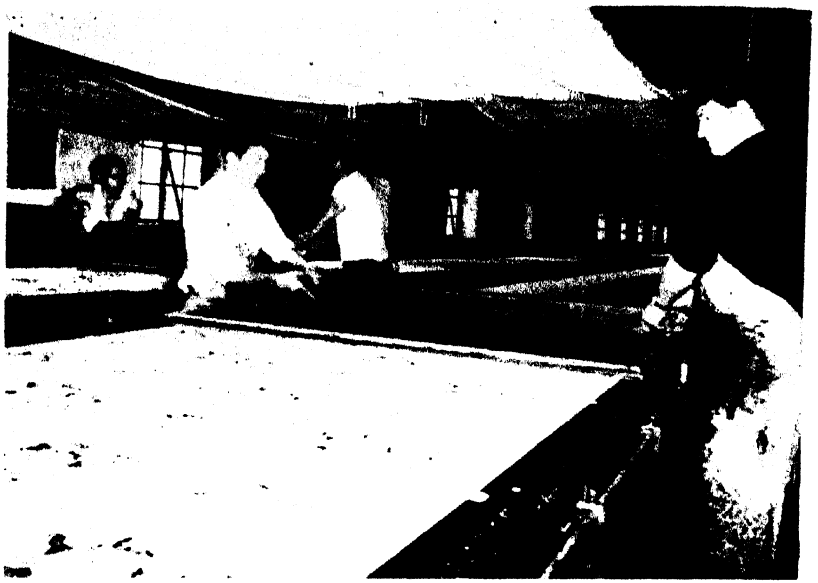
ভাবে চললো। দিনের পর দিন রোজ মনে হয়েছে জীবনের চাকা কেমন পাল্টে গেল! সব পারা যায়, কেবল ভাগ্যকে শায়েস্তা করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। কলকাতায় হলে এসব নিয়ে মা কালীর কাছে অভিযোগ করতাম। কিন্তু এখানে, মা আমার গোরী। তাঁকেই, "আভে মারীয়া"কে রোজই মনে মনে বলতাম, মা আমাকে বাঁচাও, উদ্ধার করো—ছবি কেমন করে আঁকবো?

তবে, বারোটা থেকে একটা অবধি আমরা একটা কাছাকাছি রেস্তোরাঁয় খেতাম। রনে ও জাঁ ওখানেই খেত, আর রেস্তোরাঁর মালিক বড় ডেকচিতে গরম-ফোটা জলে, আমাদের গামেল গরম করে দিত। তাই খেতাম। পয়সা থাকলে একটু ওয়াইন চাখতাম। এখানে অন্যান্য কারখানার কর্মীরা আসতো খেতে। আর আসতো বিস্কুট ফ্যাক্টরীর মহিলা কর্মীরা। অনেকের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ও অন্তরঙ্গতাও হয়েছে খেতে খেতেই। ওদের মধ্যে আমরাই কেবল অন্য জাতের মানুষ। ওরা বুঝতে পারতো আমাদের হাবভাব ও কথাবার্তায়—ওদের ভাষা আমরা বুঝতাম. স্যাঁ বুঁ?

উত্তর, উই স্যা কল.—

কথায় কথায় আর্গো বা স্ল্যাং ওদের মুখ থেকে বার হয়, যেমন মোয়া, তোয়া, লুই, নু, ভু—এ সবের পরিবর্তে ওরা বলে মোজগ্, আমি। তেজিগ্, তুমি। সেজিগ্, সে। নোজিগ্, আমরা। ভূজীগ, ওরা ইত্যাদি।

তবে মেয়েরা এ সব বাকা সামলে চলত। —আমাদের মধ্যে ছিল মাদ্লেন, ওদের ভাষায় "মাদো"—দশাসই মেয়ে—বয়স বেশ নয়। হয়তো চব্বিশ পঁচিশ হবে। মাথায় সোনালী মস্ত পাগড়ির মত চুল। গোলগাল মুখে নীল চোখ। গোলাপী গাল, উগ্র লাল রঙের দুটো পুরু ঠোঁট। হাসলে গালে টোল খায়। সর্বদাই গালভরা হাসি। বেশ উন্নত স্তন, ওদের ভাষায় "নিসো"। মাদোর নধর পাছা অদ্ভুত তার আর্গো অভিব্যক্তি, ওরা বলে চাঁদ বা "লুন", "পানীয়ের" বা ঝুড়ি। তা ছাড়া আরো অনেক কথা আছে যা সত্যই অশ্রাব্য তবে মাদো মেয়েটি আমাদের সিনেমায় দেখা সুন্দরীদের মতই। গায়ে গতরে সৌন্দর্য ঝরছে। লক্ষ না করে উপায় নেই। ওর সখী জীলবোর। ওকে সবাই ডাকে "জীজী" বলে। চেহারাটা মেহনতী মহিলাদের তুলনায় অনেক মার্জিত। বেশ মায়াময় ও লাজুক স্বপ্নমাখা ওর দুটো চোখ। তাছাড়া লরাস—গাট্টাগোট্টা এবং মজবুত মেয়ে। জ্যাকো অবশ্য রোগা বেশ ছিপছিপে ছেলে, তীক্ষ্ণ চোখ নাক ও ইঁদুরের মত চালু, ঠোঁটের বাঁকে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী। সর্বদা মেয়েদের পিছনে লাগা ওর স্বভাব। আর একটি ছেলে ছিল, সকলেই তাকে বলতো "মোঁ পং" অর্থাৎ বন্ধু, নাম জানি না। তাছাড়া আমরা প্রায়শই মুখোমুখি টেবিলে খেতাম।

জ্যাকো আমার মাস্টার, ও আমাকে অনেক আর্গো শিখিয়েছে, যেমন "গোজ" অর্থাৎ মরদ গোজেস শব্দে বোঝায় "মেয়েমানুষ"—এই সব অভি-

...পূর্বে মহিলা
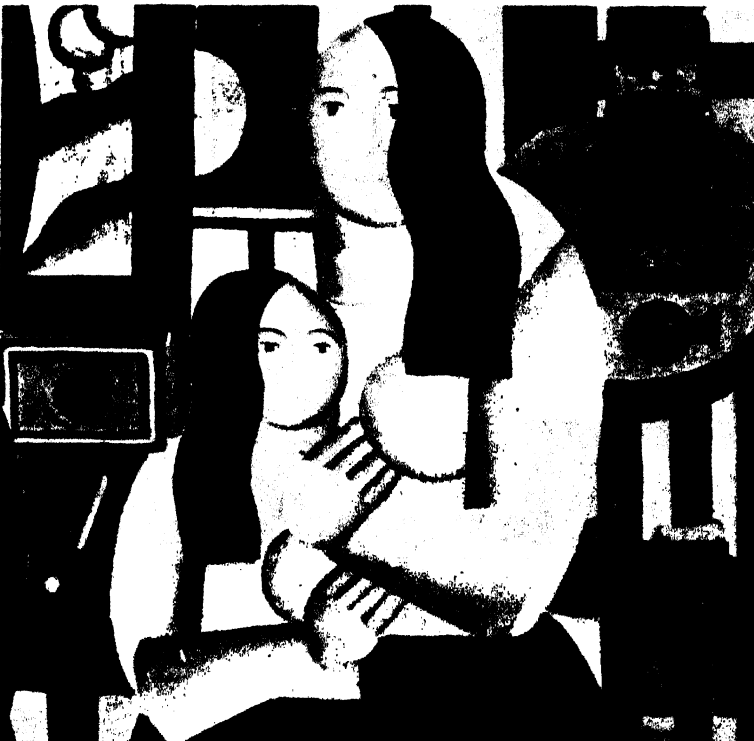
ব্যাপ্তিতে আমার মনে হয়, শৌখিন সমাজ তার আদব-কায়দার বাব্‌ জগতের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ ভাব লুকোনো থাকে।

এই ধরনের পরিভাষা সংক্রান্ত একটা বই এবার পড়েছি আলফোঁস বুদার ও লুক এতিয়েনের লেখা। পড়তে পড়তে সমস্ত কথা আবার ঘুরে ফিরে মনে এলো। বেশ হাসি পায় পড়তে পড়তে। মনে আছে কারখানার কালে মাদোর মুখে তার জীবন-কাহিনী শুনছিলাম। আর্গো এ ঠাসা জীবন। ও একটি উত্তর আফ্রিকার ছেলের প্রেমে পড়ে। ওকেই বিবাহ করবে বলে সব ঠিকঠাক।

আমি ওকে হুঁশিয়ার করে বললাম, তুমি ওদের পরিবারদের চেন? মাদো বলে, না, ও থাকে মার্সেই, তারপর আলজেরীয়া। তবে তুমি এ ঝুঁকি নিচ্ছো কেন? তুমি কি শোননি, উত্তর আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকায় শ্বেত নারীর বেসাতি বেশ পুরোদমে চলে? বাজার উত্তুঙ্গ। মাদো উত্তর করলো, দেখ কিছু কিছু মানুষ তো ভাল থাকেই, জীজীও দেখেছে। লোকটি বেশ ভাল ও ভদ্র। অনেক দিনের পরিচয় ওদের। জ্যাকো কি একটা টিপ্পনী কাটল, তা আমার বোধগম্য হলো না। যাই হোক যার যা ভাগ্য। আমি অন্য কথায় এলাম— হঠাৎ জ্যাকো বললে, এই মাদো, তুমি নীরদকে বোঝাতে পারবে কেসকেসে "স্যাগাৎ" কথাটা। শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আড়ালে জ্যাকোকে, তখন সে কোন উত্তর দেয়নি, বদমাস কাকে বলে। এখন বুঝতে পারলাম। যেহেতু মাদো রুটির ডাণ্ডা নিয়ে মারলে জ্যাকোর মাথায়, রুটিটা ভেঙে গেল। স্যাল গল, মুখপোড়া, তাতে লর‍্যাঁস খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর বেশ গালাগাল হাতাহাতি অবশ্য বন্ধুভাবে—আপোসে লড়াই, যদিও ওয়াইনের গেলাসটা গেল উল্টে, মাদোর ও জীজীর জামায় ছিটকে গেল ভিজে। অন্যেরা সবাই খুব খুশী, হাসির বহরে বোঝা গেল, আর্গোর বেশির ভাগই যৌনসংক্রান্ত রূপক। এ কথা সর্বত্র সব মেহনতী মানুষের কাছেই সত্য। আসলে আমি
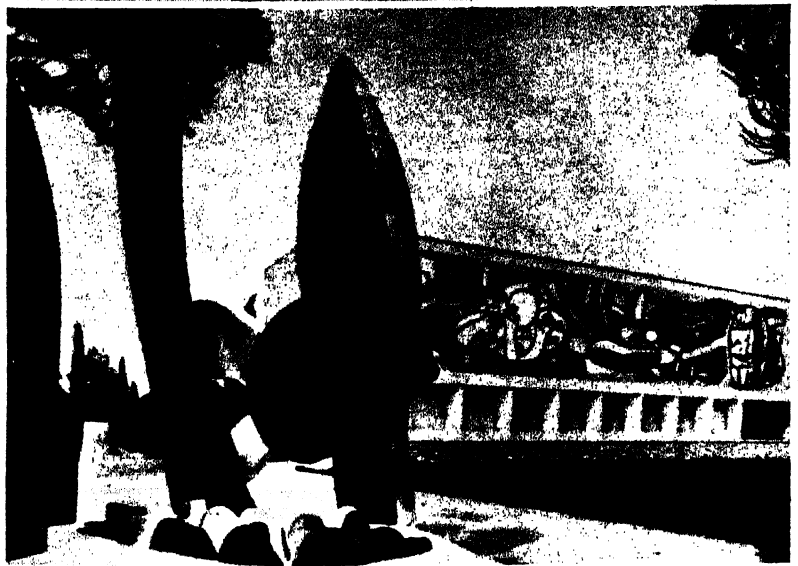
বিস্ট্রো যাদুঘরে লেজের-এর কাজ— দেয়ালচিত্র ও মূর্তি

জানতাম না স্যা বা স্যাগাৎ-এর সহজ অর্থে বিড়াল বা বিড়ালী—ইঙ্গিত করে মহিলাদের যৌন অঙ্গ। কি পাজী জ্যাকো।

এবার আর একটা অভিনব বই দেখলাম পারীতে, সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার এক লিঙ্গুইস্ট বা ভাষাতত্ত্ববিদ, তাছাড়া শব্দকোষ ইত্যাদি নানা পুস্তক রচয়িতা, নাম মহাশয় গীরো। এদিকে পল ভ্যালেরীর ভাষার পদ্ধতি রীতিনীতি, কবি ভালেরীর ব্যালাদের জার্গন বিশ্লেষণ, মালার্মের ভাষার ও শব্দের কাঠামো, বোদলেয়ারের বাক্য বিন্যাস সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে খ্যাত হয়ে... অন্য দিকে গ্যাস্তো ব্যাসলার, অধুনা খ্যাতি... দার্শনিকের পরম ভক্ত। তিনি মানুষের আদি... অভিব্যক্তি সূচনায় সরাসরি যৌনমূলতার ... উপলব্ধি করে একটি অভিধান রচনা করেন ... সাত হাজার ফরাসী শব্দ নিয়ে। জনসাধারণের ... আর্গো, যাকে উনি বলেছেন প্রায়শ সৈনি... মেহনতী মানুষের ওষ্ঠপ্রসূত ভাষা অর্থাৎ ... বা রমণের রূপক। এরটিক-এর অভিধান। রস... কয়েকটা অদ্ভুত অদ্ভুত উদাহরণ দেখলাম বইটি... যেমন "আঙুর ক্ষেতে কাজ করা", "বাই... মেলায় নিয়ে যাওয়া" ইত্যাদি।

তবে সচরাচর দুনিয়ায় সব মজুররাই ... উগ্র শব্দ প্রয়োগ করে রমণ করা বোঝাতে, যা ... অশ্লীল, যেমন তীরে অ্যাকু, তীরে স্যা ... তীরে স্যা সাঁক ইত্যাদি। তার থেকে ঐ কথাই ফ... ভাষায় কত কাব্যিক, কত সুন্দর এবং কত ... "ফের লামুর" অর্থাৎ প্রেম করা অর্থে ... সঙ্গম করা।

সেইবার গরমের ছুটিতে হাতে পয়সা থাকাতে কোথাও যাবার পরিকল্পনা আমার ... না। মার্গারীট যাবে কানে, মারিলিনও দক্ষিণ ... উপকূলে। ক্যাথরীন যাচ্ছে আলপস্ পাহাড়। সা... যাবে উত্তরে নরওয়ে সুইডেনে। আমি ... থাকবো শূন্য পারীতে। ঐ সময় থি... কনসার্ট সব বন্ধ। কিন্তু বিদেশীর ভিড় ... পারীকে চেনা যায় না। রনে যাচ্ছিল ওর ব... সঙ্গে মোটরবাইকে ফ্রান্স টহল দিতে। মীরেই ... অবস্থা কিছুটা দুঃখের ভেবে, ছোট ভাই র... বললে, নীরদকে পিছনে নিয়ে যাও না, কার্তো।

রনের বয়স কম। দেহ তেজী ঘোড়ার মত সমর্থ। মনটা উড়ো পাখির ডানার মতো ... মেলা। বললে, চল নীরদ, চল আমাদের সঙ্গে।

পারী থেকে পশ্চিমে সোজা নামতে ... লারসেল বন্দরে, ওখান থেকে রোয়াইয়াঁ, সব ... সমুদ্রের তীর ধরে এক শ, এক শ পঁচিশ কিলো... বেগে ধাবিত হল ওর ইংরেজী যন্তর রয়াল এনফি... ওখান থেকে আর্কাশাম, তারপর একেবারে ... স্পেনের ধারে বিয়ারিৎস ও আন্দাই—আবার ... মুখে চললাম আমরা তিনজন, ওর বন্ধু ... ডিকে কখন কখন মোটর কারখানার মিস্ত্রিদের ... গোঁজোলী গল্প। সারা পথেই আমার আ...

অর্কেস্ট্রা পার্টি

মোনালিসা ও চাবিকাঠি

মেকানিকাল যন্ত্রের মধ্যে ফুল' (ক্যাকম্বা)

সাইকেল সুন্দরীরা

দুই ট্রাপেজিস্ট এবং যাদুকর
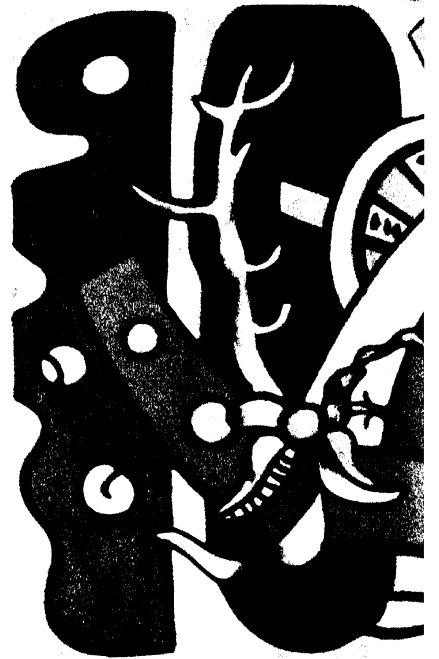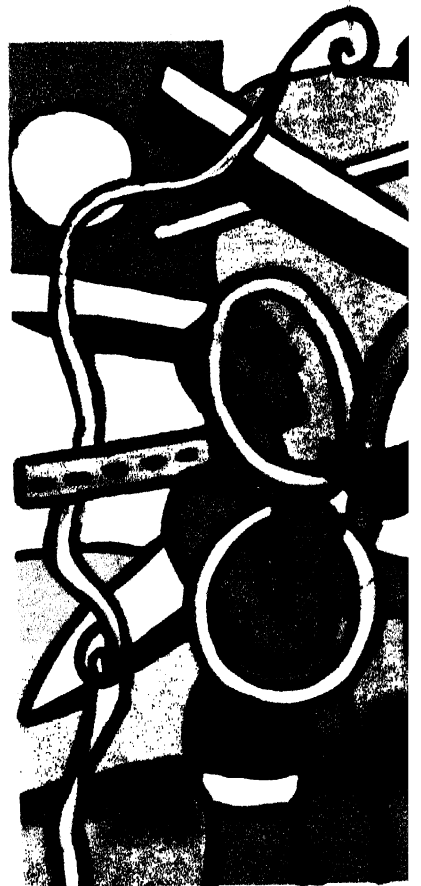
কাল ঘোড়সোয়ার

কাটিয়ে উঠতে পারতাম না। আমার সারথি রনে নবীন যুবা। রাস্তার বাঁক এমন নেবে, হেলে শুয়ে পড়ার অবস্থা।

তার ওপর মাঝে মাঝে ওর পাগলামি চাপতো দেখ নীরদ, "গাঁদেরি ব্যালেন্স" দেখ। এ কথা বলে হ্যান্ডেল ছেড়ে দিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে এনফিল্ড তার আপন ভাব ও গতির বেগে। সোজা হয়ে যদি এক চুল বাঁকে, আমাদের শেষ—যমরাজের দুয়ারে হাজিরির ডাক পড়বে। প্রাণ হাতে নিয়ে চলা। উঠে গেলাম আমরা পিরেনে পর্বতমালার উপর—প্রথম মন্তুবাঁ, তারপর তুলুজ।

তারপর কার্কসন হয়ে পার্পিনীয়া ভূমধ্যসাগর উপকূলে। ওখানে মহা আনন্দ করে সমুদ্রের গা বেয়ে মোঁপেলীয়ে হয়ে মার্সেই থেকে তুঁলো, তারপর কানে মার্গারীট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। এত পথ এলাম, কিছুই দেখা হল না যেন। খুব গতিশীল অবস্থায় কিছুই দেখা যায় না। গতি মানে একরকম গতি। দেখার ইতি। এমন অবস্থায় ছবি আঁকা তো দূরের কথা।

(ক্রমশ)

শিল্পী লেজের জন্ম ১৮৮১। অতএব তিনি প্রায় পিকাশো-ব্রাক-মাতিশদেরই সমসাময়িক। প্রথমত সেজানের প্রভাবে যে সময় শিল্পকলার জগৎ আপ্লুত সেই সময় ওর পরিচয় হয় সব খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে। তা ছাড়া অ্যাপলিনের, ম্যাক্স জ্যাকব, পিয়ের রেভারদি, ব্লেজ সাঁদ্রাস, হ্যারি রুশো ইত্যাদি কবি শিল্পীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে যান। সেই সময় ওঁকে মেশিন, যোদ্ধা সব আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তী কালে সেই কারণে ওঁর ছবি আঁকার ধরনের অনেক হেরফের হয়েছে। এই একমাত্র চিত্রকর যাঁর চিত্রে আমরা আজকের মেশিন, মেহনতী মানুষ, সর্বহারা ইত্যাদি পরিপুষ্ট ও পূর্ণ রঙে বিকশিত দেখি। তবে সবই চিত্র সংস্থানের জন্য টুকরো টুকরো বিজড়িত ছন্দ। ম্যুরালধর্মী বিরাটাকার পরিকল্পনা। আমেরিকান সমালোচক সুইনে বলেছেন, "আধুনিক জগতের আদিম শিল্পী লেজে"। উত্তরে ফ্রাঁক এল্‌গার বলেছেন, "অবশ্য তা হলেও একই কালে ক্লাসিক।"

এখনো আগুন

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

এখনো যেটুকু আছে সেটুকু আগুন
ঘাট পেরোবার জন্যে কে একজন জুতো খুললো
তার কি বয়স সবে ষাট
দিকে উন্মুক্ত কবাট হা-হা হাসি হাওয়ার ভিতরে
ভাঙা প্রসাদ, হাতীদহ, সামনের গড়খাই
আমাদের পেরোতেই হবে
দেখতে হবে সুড়ঙ্গ এখন কোনদিকে গেছে
দণ্ড পথের মধ্যে সেই সনাতন পাখি
সেই শিস দূরশ্রুত অভিমানভরা
আকাশের অভিধায় পুকুরে এখন ঢেউ তোলে
পাড়ভাঙা নদীর প্লাবনে দিকচিহ্নহীন এই সময়সীমায়
ষাট বছরের কেউ হেঁটে যায়
আমরা তারই একপাশ ধরে কিশোর পাখির গান শুনি
কিশোরীর নাম ধরে ডাকি
এখন বুকের মধ্যে যেটুকু সেটুকু আগুন
এখন আগুন ডাক দেয়।

"...ন ঘেরজ" (জলরঙ ৩০" × ২০") দুর্গাদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের কাজ (জন্ম ...৪১)। কলাভবনের স্নাতক (১৯৬২)। বর্তমানে তিনি সর্বসময়ের শিল্পী। ...নের কুটিল আবর্তের কথা বলেছেন।

সহবাস ভাঙে

মৃদুল মুখোপাধ্যায়

মধ্যরাতে ঘুম ভাঙে পরমুখাপেক্ষী মানুষেরা
ধূর্ত শৃগালের ডাকে অলক্ষুণে পেঁচার চিৎকারে
পিঠ থেকে পরস্পর নামায় মানুষ খুব দ্রুত
বৈদেশিক হাওয়া এসে গ্রাস করে গ্রামগঞ্জ
খেত খামার পল্লীর মজলিশ
সহবাস ভেঙে যায় হাটতলায় অশ্বত্থ ছায়ায়
গজফিতা এসে পড়ে মানুষের ছায়ায় মানুষ
বারুদের মত জ্বলে ওঠে—

ধূর্ত শৃগাল, পেঁচা, রাজনীতি কর্তব্যবিহীন
অধিকারে মানুষের সহবাস ভাঙে মধ্যরাতে।

চতুর্থ জন

শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

একজন মানুষ লেখে
আর একজন ভাবে
তৃতীয় যে জন অন্তহীন সাজিতে
ফুল সাজায়ঃ
তিনজনের তিন বাঁকে
তিনরকম অপ্রস্তুত চিত্রমালা
ভাঙেচোরে মোচড়ায়
কুঁকড়ে ওঠে মন্থনসিদ্ধ সাপ
তার চেরা জিভে অশনির চাবুক
আছড়ে মরে নিষ্ঠ সোপানে
চতুর্থ মানুষ সাজানো ফুল ছিটিয়ে
এক হাতে সিদ্ধবকুল ছুঁয়ে
সাপের মাথায় কালীয়দমন নাচে
যে লেখে
যে ভাবে
যে সাজায়
তারা চালকহীন দীঘল চোখে
নাচ দেখে—দেখতে দেখতে
অনিবার্য চিত্রার্পিত হয়

উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের 'ঝুম' চাষ

সৌরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির যেমন আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরার, একটি ব্যাপক উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা জুড়ে এক ধরনের চাষ ব্যবস্থার প্রচলন আছে যাকে স্থানীয়ভাবে ঝুম চাষ বা ইংরেজীতে শিফটিং কালটিভেশন বলা হয়। অন্যান্য রাজ্যের সমতল ভূমিতে বছরের পর বছর একই ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে চাষাবাদ করবার যে প্রথা চলে আসছে, তার সঙ্গে এই ঝুম চাষের মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। এই ব্যবস্থায় কোন এক বিশেষ ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে চাষ করা হয় না এবং এই অঞ্চলে যেভাবে ঝুম চাষ করা হয় তার বিভিন্ন ধাপগুলি মোটামুটি এই ধরনের : (১) ডিসেম্বর মাসের আগে গ্রাম-প্রধান বা গ্রামবাসীরা পাহাড়ের কোন অংশ চাষের আওতায় আনা হবে তা নির্ণয় করে এবং এই সময়ে কোন জমি কোন পরিবার চাষ করবে তাও স্থির করা হয়। (২) ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস নাগাদ সেই জমিতে যেসব গাছপালা থাকে তা কেটে সেখানেই ফেলে রাখা হয়। (৩) মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ যখন গাছের ডালপালা সব শুকিয়ে আসে তখন তাতে আগুন লাগিয়ে সমস্ত কিছুকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সময় পাহাড়গুলি পরিষ্কার হয়ে যায় এবং জমির উপর শুধুর ছাই এবং কালো অঙ্গারময় বড় বড় গাছের কান্ড ও গুঁড়ি দৃশ্যমান হয়। (৪) মে মাস নাগাদ প্রথম বৃষ্টিপাতের প্রাক্কালে বিভিন্ন ধরনের শস্য, যেমন ধান, ভুট্টা, তুলো, তিল, বীন, শশা, লংকা ইত্যাদির বীজ জমিতে ছোট ছোট গর্ত করে মিশ্রশস্য আকারে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া আরও কিছু ধরনের ফসল যেমন কলা কচু ট্যাপিওকা মিষ্টি আলু আদা ইত্যাদিও একই সঙ্গে চাষ করা হয়। অঞ্চলভেদে শস্যের প্রকারভেদ থাকলেও, ধান প্রায় সর্বজনীন ভাবে চাষ করা হয়ে থাকে। (৫) চাষের সময় শুধু মাত্র আগাছা পরিষ্কার করা ছাড়া অন্য কিছু, যেমন জমিতে সার দেওয়া বা রোগ বা কীটনাশক কোন ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদির রেওয়াজ নেই। বলতে গেলে এই চাষাবাদ প্রায় মূলধন বিনিয়োগ বর্জিত এবং একমাত্র মূলধন হচ্ছে পরিবারের লোকদের বা গ্রামবাসীদের কায়িক শ্রম। (৬) সাধারণত একই জমিতে পরপর দুই বছর আবাদ করবার পর তাকে উপর্যুপরি কয়েক বছর অনাবাদী ফেলে রাখা হয়, যে সময়টায় বনজ গাছপালায় তা আবার জংগলে পরিণত হয়। সুদূর অতীতে যখন জনসংখ্যা কম ছিল এবং জমির উপর চাপ ছিল না তখন ফসল আবাদের পর প্রায় ২০-৩০ বছর পর্যন্ত জমিকে এমনি করে অনাবাদী ফেলে রাখা হত এবং ফলে এমনকি বনজ বৃক্ষ সম্পদও পুনর্জীবিত হতে পারত। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে এবং জমির উর্বরতা কমে আসবার দরুণ বর্তমানে অধিকাংশ এলাকায় জমিকে মাত্র ৩ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত অনাবাদী ফেলে রাখা সম্ভব হচ্ছে এবং তারপরেই আবার একই জমিতে ফিরে আসতে হচ্ছে চাষ করবার জন্যে। যে সময়টাতে বিশেষ ভূখণ্ডটিতে অনাবাদী ফেলে রাখা হচ্ছে সেই সময়টাতে নূতন নূতন বনাঞ্চল পরিষ্কার করে একই ভাবে খাদ্যোৎপাদন করা হচ্ছে। কোন একখন্ড জমিতে আবাদ করা—অনাবাদী ফেলে রাখা এবং কবছর পরে আবার তাতে ফিরে আসা—এই অবস্থাটাকে সাধারণত 'ঝুম সাইকল' (Jhum Cycle) বা ঝুম আবর্তন বলা হয়।

১৯৭৪ সালের প্রাপ্ত-পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে প্রায় ২৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে স্থায়ী ভাবে চাষ করা হয় এবং প্রায় ২৭ লক্ষ

আগুন লাগিয়ে জমিকে পরিষ্কার করা হচ্ছে

হেক্টর জমি ঝুম চাষের আওতায় আসে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে নাগাল্যানড এবং মিজোরামে ঝুম চাষের ব্যাপকতা বেশী। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে প্রতি বছর নাগাল্যান্ডে প্রায় ৭৩৫ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল পরিষ্কার করে ঝুম চাষ করা হয় এবং মণিপুর রাজ্যে এই ধরনের এলাকার পরিমাণই প্রায় ৬০০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় সমস্ত পার্বত্য উপজাতিই এই চাষ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং জাতীয় কৃষি কমিশনের রিপোর্ট (১৯৭৬) অনুযায়ী এই অঞ্চলের প্রায় ৫ লক্ষ উপজাতি পরিবারের জীবনধারণের অন্যতম অবলম্বন এই ঝুম চাষ। এদি অসংখ্য উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে নাগাল্যা 'আংগামী' অরুণাচল প্রদেশের 'আপতানি' ও 'ম এবং গারো পাহাড়ের হাজংদের ছাড়া বাকিরা সবাই এই চাষ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে—এই আদি কৃষি ব্যবস্থা, যার শুরু হয় নিওলিথিক যুগে প্রা হাজার বছর আগে এবং যে কৃষি-ব্যবস্থাকে কা বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বাতিল বলে ধরে হয়েছে তা যেন আজকের কৃষি বিপ্লবের

ঝুম জমির মিশ্রশস্য ও ঝুম চাষী থাকবার ঘর

। চাষের জন্যে জঙ্গল কেটে ফেলা ও বনজ সম্পদের বিনাশসাধন

াদের দেশের এই অঞ্চলে এখনও এত ব্যাপক-
ব প্রচলিত আছে। এই অবস্থার ব্যাখ্যা পেতে হলে
পত্তনের ঐতিহাসিক দিকটাতে যেমন নজর দিতে
, তেমনি ভাবে এই অঞ্চলের সামাজিক, অর্থ-
তিক ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হবে।

ঝুম চাষ বা ঐ ধরনের জমির আবাদীকে বলা
প্রাচীনতম শস্য উৎপাদন ব্যবস্থা। যে সময়টাতে
ব্যবস্থার পত্তন সেই সময়ে কৃষির ব্যাপারে উপ-
ধ বা জ্ঞানের যে স্তর ছিল এবং যে ধরনের
াকৃতিক পরিবেশে মানুষের অবস্থান ছিল সেই
প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থার মধ্যে এটাই
স সর্বোত্তম। আমাদের দেশের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে
ষ্টিপাতের আধিক্যের দরুণ বনাঞ্চলের বিস্তার
ী এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার দরুন
াড়ী বনাঞ্চলে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন উপজাতি
ষ্ঠীকে বনাঞ্চলের উর্বর জমিকে একমাত্র মূলধন
স্বনির্ভর খাদ্যোৎপাদনের কথা ভাবতে হয়েছে।
ল ফলানোর জন্যে বনাঞ্চল পরিষ্কার করবার সময়
কেটে তাতে আগুন লাগানো তাদের কাছে সহজ
উপায় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অভিজ্ঞতায়
দেখেছেন যে, একই জমিতে উপর্যুপরি আবাদ
লে ফসল উৎপাদন ক্রমশ কমে আসে এবং যেহেতু

অরুণাচল প্রদেশে ঝুম জমিতে বীজ বপনের দৃশ্য

অরুণাচল প্রদেশের 'মোপিন' উৎসব

পাহাড়ী জমির কোন অপ্রতুলতা ছিল না, তাই তারা স্থায়ী চাষ ব্যবস্থাকে গ্রহণ না করে নূতন নূতন বন-ভূমিতে চাষাবাদ সরিয়ে নিয়েছেন। জীবনযাত্রার চাহিদা সম্বন্ধে এই অঞ্চলের উপজাতিদের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল এবং বিচ্ছিন্নভাবে থাকবার দরুন অন্যান্য অঞ্চলের উন্নততর জীবনযাত্রা ব্যাপারে কোন সম্যক ধারণা ছিল না। এই চাষ ব্যবস্থা থেকে ন্যূনতম প্রয়োজনভিত্তিক যা কিছু উৎপাদন হত তাই নিয়েই এঁরা সন্তুষ্ট থাকতেন এবং যেহেতু এই চাষ ব্যবস্থা তাঁদের সামান্য চাহিদাকে মেটাতে পারত তাই আস্তে আস্তে ঝুম চাষ স্থায়িত্ব লাভ করে।

এই চাষ-ব্যবস্থা যতই স্থায়ী রূপ নিতে শুরু করল এবং যখন ঝুম চাষই জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল তখন অবশ্যম্ভাবী রূপে একে ঘিরে কতকগুলি সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠতে থাকল। এককভাবে দুর্গম বনাঞ্চলে চাষাবাদ করা খুব কষ্টসাধ্য বলে যৌথ-ভাবে কিছু কিছু চাষের কাজ করবার প্রথা অনেক উপজাতি গোষ্ঠীতে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল এবং একটা সুস্থ একাত্মবোধ গোষ্ঠীগুলোর ভিতর দানা বাঁধতে থাকল।

যদিও বর্তমানে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানত তিন ধরনের ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থা, যেমন (১) জমি সমগ্র গ্রামবাসী বা উপজাতি গোষ্ঠীর সম্পদ এবং প্রতিটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীসভ্যের যে কোন জমির অংশ চাষ করবার বা কাজে লাগানোর অধিকার আছে (২) জমি গোষ্ঠী-প্রধানের সম্পত্তি এবং সে তা অন্য সভ্যদের অস্থায়ীভাবে বণ্টন করে থাকে ঝুম চাষের জন্যে এবং (৩) পারিবারিক বা ব্যক্তিগত মালিকানার জমি, দেখতে পাওয়া যায়, মাত্র কয়েক দশক আগেও কিন্তু জমির চাষের ঠিক ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কিছু ছিল না এই অঞ্চলের উপজাতি সমাজে। গোষ্ঠীগত জমির মালিকানাবোধ গোষ্ঠীকে যেমন সংঘবদ্ধ করেছে, তেমনিভাবে উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা শুভ আবহাওয়া বিরাজ করত ঝুম চাষকে কেন্দ্র করে। ঝুম চাষ দারিদ্র্য বা সম্পদকে সুষমভাবে গ্রহণ করবার মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে উপজাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে।

কিন্তু এটাই একমাত্র দিক নয়। যতই দিন যাচ্ছে, যতই যোগাযোগ ব্যবস্থা বা বাজারের সুযোগ বাড়ছে, যতই বাইরের জগৎ উন্মোচিত হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-গত মালিকানার ঝোঁক কিছু কিছু অংশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বিশেষত অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি যেখানে সেচের ব্যবস্থা থাকছে বা জমিকে 'টেরাস' করা (Terrace) সম্ভব হচ্ছে সেখানে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ভূমিস্বত্ব নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধি বা জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে দাঁড়াচ্ছে, আত্ম-কেন্দ্রিকতা দানা বাঁধছে। তা ছাড়া উপরে বর্ণিত ২নং জমি স্বত্ব ব্যবস্থা অর্থাৎ জমির স্বত্ব গোষ্ঠী প্রধানের

মালিকানায়, এই ব্যবস্থাকে ঘিরেও অনেক জায়গায় বেশ খানিকটা সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব জন্ম নিয়েছে এবং উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিক্ততার অবকাশ রেখে যাচ্ছে। এর অবশ্যম্ভাবী ছাপ পড়ছে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর সামাজিক ও মানসিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে।

হাজার হাজার বছর ধরে ঝুম চাষ উপজাতিদের প্রধান জীবিকা হিসেবে চলে আসায় একে ঘিরে উপজাতিদের অনেকগুলি সামাজিক উৎসব বা নিজস্ব সংস্কৃতিও গড়ে ওঠে। ধর্মীয় বা সর্বজনীন উৎসবগুলি ঝুম চাষের বিভিন্ন ধাপ, যেমন ফসল বোনা, ফসল তোলা বা ফসল ফলানোর অন্যান্য কর্মসূচীর সংগে যুক্ত। অরুণাচল প্রদেশের 'আদি' উপজাতিদের সবচাইতে বড় সামাজিক উৎসব 'মোপিন', যা কিনা ৫ দিন ধরে চলে, তা সংঘটিত হয় কৃষি বৎসর আরম্ভ হবার সূচনায়, বীজ বপনের আগেই। মেঘালয় রাজ্যের গারোদের নিজস্ব ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসবগুলির প্রায় সব কটিই ঝুম চাষের বিভিন্ন ধাপের সংগে যুক্ত। যেমন চাষের জমি নির্ধারণের পর প্রতিটি পরিবার জমিতে ধর্মীয় প্রার্থনা করে থাকেন পর্যাপ্ত ফলনের আশায়। 'আগলমাকা' (agalmaka) প্রার্থনা অনুষ্ঠান করা হয় জমিতে আগুন লাগানো ও বীজ বপনের সময়। উপজাতি গোষ্ঠীপ্রধান, যাঁকে স্থানীয়ভাবে 'নকমা' বলা হয়, 'মিয়ামুয়া' (miamua) অনুষ্ঠান করে থাকেন যখন ধানগাছে শস্যদানা দেখা দেয়। ফসল তোলবার সময় গারোদের সবচাইতে বড় সামাজিক উৎসব 'ওয়াংগালা' অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াংগালা উৎসব কৃষি বৎসরের পরিসমাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত এবং এই উৎসবের সময় 'সালজং' বা সূর্যদেবতার পূজা করা হয়ে থাকে, যেহেতু ফসলকে সূর্যদেবতার আশীর্বাদ বা দান হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

ঝুম চাষ ব্যবস্থার ভাল-মন্দ দিক নিয়ে বিস্তর আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। এই ব্যবস্থা এত দীর্ঘদিন ধরে চলতে পেরেছে মোটামুটি নিম্নলিখিত ইতিবাচক দিকগুলির জন্যে :

(১) ঝুম চাষে মিশ্রশস্য উৎপাদনের যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন সম্পূর্ণ শস্যহানির সম্ভাবনা যেমন কম থাকে, তেমনিভাবে বিভিন্ন ধরনের শস্যের পত্ররাজির বিস্তারে ভূপৃষ্ঠের আচ্ছাদন এমন সুষমভাবে হয় যাতে বৃষ্টিপাতের দরুন ভূমিক্ষয় অপেক্ষাকৃত কম হয়। (২) এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের আধিক্যের দরুন আগাছা, রোগ জীবাণু এবং পোকামাকড়ের দৌরাত্ম্য শস্যের ক্ষতির সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী থাকে। আগুন জ্বালিয়ে জমিকে পোড়ানোর দরুন আগাছা বিস্তার যেমন কম হয়, তেমনিভাবে রোগ বা পোকার উপদ্রবজনিত ক্ষয়ক্ষতিও অপেক্ষাকৃত কম পরিলক্ষিত হয়। তা ছাড়া জমিতে আগুন লাগানোর দরুন জমির অম্লতা কিছুটা হ্রাস পায়, পটাশ জাতীয় শস্যখাদ্য বেশীমাত্রায় পাওয়া যায়,—যদিও জমির জৈব পদার্থের ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। (৩) ঝুম চাষে কোনপ্রকার কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার নেই এবং জমিকে না জুতেই গাছের ডাল সরু করে চেঁচে তার সাহায্যে জমিতে ছোট ছোট গর্ত বা ছেদ করে তাতে বীজ বপন করা হয়। এতে জমি স্বাভাবিক শক্ত অবস্থায় থেকে যায় এবং ভূমিক্ষয় অপেক্ষাকৃত কম হয় (৪) ঝুমচাষের প্রথম অবস্থায় বছর দুয়েক চাষ করবার পর জমিকে দীর্ঘদিন (২০—৩০ বছর পর্যন্ত) অনাবাদী ফেলে রাখবার যে ব্যবস্থা ছিল, তাতে বনসম্পদ পুনর্জীবিত হতে পারত। এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য যেমন মোটামুটি বজায় থাকত তেমনিভাবে ঐ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জমির উর্বরাশক্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগ থাকত। এর ফলে ঐ জমিতে দীর্ঘদিন ধরে ঝুম চাষী যখন আবাদ করবার জন্যে ফিরে আসতেন, তখন যথেষ্ট পরিমাণে ফসল ঘরে তুলতে পারতেন। ঝুম চাষী এটা বেশ ভালভাবেই জানতেন যে প্রকৃতির সংগে নিবিড় ভাবে মিশে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে তাকে বাঁচতে হবে এবং তাই তাঁরা তাঁদের সহজাত বুদ্ধিতে এমন সব সম্ভাব্য ব্যবস্থার কথা ভেবেছেন যা দ্বারা প্রাকৃতিক বনসম্পদ বা ভূমির ন্যূনতম ক্ষতিসাধন হয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও বর্তমানের কৃষি উন্নয়নের বিকাশের স্তরের বিচারে, আবহাওয়া বা পরিবেশ সংরক্ষণের

গাছের ডালকে চেঁচে সরু করা হচ্ছে, যার সাহায্যে জমিতে গর্ত করে বীজ বপন করা হয়

প্রয়োজনে এবং অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের দৃষ্টিকোণে ঝুম চাষ ব্যবস্থাকে সেকেলে এবং অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে, প্রধানত নীচের কারণগুলির জন্যে :

(১) ঝুম চাষের বিস্তারের দরুন বিস্তৃত অঞ্চলে বনসম্পদের দারুণ ক্ষতিসাধন হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে ক্ষতিকারক ভাবে। ঢালু পাহাড়গুলি গাছপালা শূন্য হয়ে যাওয়ায় এই অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং শস্য উৎপাদনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ঝুম সাইকল সংকুচিত হতে হতে এখন এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে একাধারে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ হচ্ছে, অন্য দিকে জমির উর্বরাশক্তি কমে আসার দরুন ঝুম চাষীরা যথেষ্ট ফসল পাচ্ছেন না। অনেক অঞ্চলে ঝুম চাষী প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থায় বাস করেন এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচে নেমে গেছে। (২) পাহাড়ে ভূমিক্ষয়ের দরুন সন্নিহিত অঞ্চলের জলাধার বা নদীগুলিতে পলি জমছে এবং এদের জল ধারণের ক্ষমতা কমে আসছে। ফলে বন্যার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে (৩) ঝুম চাষের চালু ব্যবস্থায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণের সুযোগ খুবই কম এবং ফলে অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের সম্ভাবনাও সীমায়িত। (৪) যে সব গোষ্ঠীতে জমির মালিকানা গোষ্ঠী-প্রধানের হাতে সেখানে সম্পদ বা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার সম্ভাবনা থাকছে। যেহেতু জমির মালিকানা স্বত্ব থাকছে না বা জমির বিলিব্যবস্থাও নিজে নির্ধারণ করতে পারছে না সেই হেতু ঝুম চাষী জমির দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির ব্যাপারে কোন আগ্রহ বোধ করেন না। (৫) ক্রমাগত চাষের জমির পরিবর্তনের জন্যে সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নমূলক কাজ যেমন সেচ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রসার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। অনেকক্ষেত্রে যেখানে ঝুম চাষীরা চাষের জমির কাছে থাকাটাকে বেশী শ্রেয় বলে মনে করেন, সেক্ষেত্রে অন্যান্য জনহিতমূলক কাজ যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির বিস্তারের ব্যাপারেও কিছু করাটা কঠিন হয়ে পড়ে।

ঝুম চাষের এই সব ক্ষতিকারক দিকগুলি বিবেচনা করে বিভিন্ন সময়ে সরকারী পর্যায়ে অনেক ধরনের পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়েছে, এক কথায় যার উদ্দেশ্য ছিল ঝুম চাষীদের আস্তে আস্তে এই অস্থায়ী চাষ ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে এনে স্থায়ী ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা। রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব পরিকল্পনা ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদের (North Eastern Council) দিক থেকেও বিশেষ

গারো রমণী ফসল তুলতে ব্যস্ত

ব' উৎসব

ী হাতে নেওয়া হয়েছে এই প্রথার অবলুপ্তি কাজকে ত্বরান্বিত করবার আশায়।

১৫০-এর দশকে অবিভক্ত আসাম সরকার বিভিন্ন ী বাগানজাত শস্য যেমন কফি, রাবার, গোল কাজু বাদাম ইত্যাদির চাষের ব্যাপারে ঝুম আগ্রহান্বিত করতে প্রয়াসী হন এই উদ্দেশ্যে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে এবং ক্রমশ ঝুম চাষ থেকে সরে আসবেন। পঞ্চম যোজনার পর্যায়ে ঝুম চাষ সংক্রান্ত ব্যাপারে মূলত তিন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়ঃ (১) রাজ্য পাইলট ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা, (২) কেন্দ্র অনুমোদিত বন্ধের পাইলট প্রোজেক্ট এবং (৩) উত্তর লীয় পরিষদের নদী উপত্যকাভিত্তিক ঝুম চাষ স্কীম। বিভিন্ন রাজ্য সরকার পাহাড়ী জমিকে করবার পর তা স্থায়ী ভাবে ঝুম চাষীদের মধ্যে করবার কথা ভাবেন এবং এই ধরনের প্রচেষ্টা ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং মেঘালয় রাজ্যে ভাবে চালু হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে একাধারে রাবার চাষের কাজে ঝুম চাষীদের নিয়োজিত করে, তাদের বাসস্থান নির্মাণ ও অন্যান্য কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে ঝুম চাষ থেকে সরিয়ে আনতে প্রয়াস চালান এবং অন্যধারে কৃষি দপ্তর পাহাড়ী টিলা জমির উন্নতিসাধন করে তা ঝুম চাষীদের মধ্যে বিলিবন্টন করে তাদের স্থায়ী চাষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করান। পঞ্চম যোজনায় শুধুমাত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের ৮টি স্কীমের জন্যেই বরাদ্দ করা হয়েছিল ৫৩০ লক্ষ টাকা। যার লক্ষ্য সব মিলিয়ে শুধুমাত্র ৪৩৭৫টি পরিবারকে ঝুম চাষ থেকে সরিয়ে এনে স্থায়ী চাষে প্রতিষ্ঠিত করা। এই সব প্রোজেক্টগুলোকে বলা যেতে পারে এই ঝুম চাষ ব্যবস্থার অবসানের একটা বাস্তবায়িত রাস্তা খুঁজে বের করবার জন্যে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যদিও এখনই এই প্রোজেক্টগুলোর সাফল্য-অসাফল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করাটা সম্ভব নয়, তবুও সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে এই সব উদ্যোগের যে লক্ষ্য ছিল তা মূলত ব্যর্থ হয়েছে। এমন কি যে সব অঞ্চলে এই প্রোজেক্টগুলি কার্যকরী করবার কথা ছিল, সেই সব অঞ্চলের ঝুম চাষীদের উপরেও এর প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় না, কোন কোন

মণিপুরের সামাজিক উৎসব 'ওয়াংগালা'

ক্ষেত্রে আংশিক সাফল্য চোখে পড়ে মাত্র। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে যেসব অঞ্চলে টেরাস করা জমিকে সেচ ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে ঝুম চাষীরা স্থায়ী চাষের ব্যাপারে উৎসাহিত বোধ করেছেন। কিন্তু শুকনো সেচ ব্যবস্থা বর্জিত টেরাসগুলি দুই-এক বছর চাষ করবার পর তাকে পরিত্যাগ করে ঝুম চাষীরা আবার পুরোনো ব্যবস্থায় ফিরে গেছেন। এটাও দেখা গেছে যে দিনমজুরীর ব্যবস্থা করে ঝুম চাষীর দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমে তাকে ঝুম চাষ থেকে সরিয়ে আনানো সম্ভবপর নয়। ঝুম চাষ ব্যবস্থার পরিবর্তন শুধুমাত্র টেরাসিং-এর মাধ্যমে জমির উন্নতি সাধন বা উন্নত ধরনের কৃষি প্রযুক্তির প্রবর্তনের দ্বারা সম্ভবপর হবে না। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের (Indian Council of Agricultural Research) উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সংস্থা ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উন্নত ধরনের চাষাবাদের উপযোগিতা নির্ণয় করছে এবং গত কয়েক বছরের কাজের অভিজ্ঞতায় ঝুম চাষের বিকল্প হিসেবে পথ নির্দেশে প্রয়াসী হয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ ফলবাগিচা এবং অর্থকরী শস্য যেমন রাবার, কফি ইত্যাদির ব্যাপক বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং রাবার-বোর্ড, কফি বোর্ড, ইত্যাদির সহায়তায় এই সব বিশেষ ধরনের শস্যের বৈজ্ঞানিক বা অন্যান্য কারিগরী দিকটা খতিয়ে দেখছেন। কৃষি প্রযুক্তির প্রসার অবশ্যই অত্যন্ত জরুরী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে। কিন্তু ঝুম চাষের অবলুপ্তি সাধনের জন্যে এর সঙ্গে যুক্ত সামাজিক দিকগুলোর কথা ভাবতে হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ভূমিস্বত্বের ব্যাপারটা হয়ত বিশেষভাবে বিচার করতে হবে। যে সব জায়গায় জমি গোষ্ঠী-প্রধানের মালিকানাধীন সে সব ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এই ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে—অন্যথায় ঝুম চাষ চলবেই। এই কাজটা যে খুব সহজ নয় এবং এতে যে প্রতিরোধ আসবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাবার, কফি জাতীয় অর্থকরী ফসলের চাষাবাদও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া আনতে পারে। বিশেষত এই সব নূতন নূতন বাগানে শস্যের ঠিকমতন চাষাবাদ করতে হলে এই অঞ্চলের বাইরে থেকে অনেক শ্রমিককে আনতে হবে, হয়ত বা বাইরের ব্যক্তিগত মূলধনের এই অঞ্চলে প্রবেশ ঘটবে। আসামের চা বাগিচার অভিজ্ঞতা অনেকাংশে সেই ধরনেরই। বিস্তৃত করে না বললেও এটা মনে হয় এতে সুদূরপ্রসারী সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। বর্তমানে গোষ্ঠীপ্রধান ... উপজাতিদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যে সব সামাজিক বা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন ঝুম চাষ ব্যবস্থা চলে গেলে তাতেও পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং অবশ্যই এই সব নূতন ব্যবস্থা তাঁরা সহজ মনে নেবেন না। তাই এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যে কিছু দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সেটা হবে মূলত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

এই অঞ্চলের ৭টি রাজ্যে সরকারী পর্যায়ে যে সব প্রকল্পে কাজ চলছে তার লক্ষ্য সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ হাজার ঝুম চাষী পরিবারকে উপকৃত করা এবং প্রায় ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে ঝুম চাষ ব্যবস্থার অবসান ঘটানো। আগেই বলা হয়েছে যে এই অঞ্চলে প্রায় ৫ লক্ষ উপজাতি পরিবার এবং প্রায় ২৭ লক্ষ হেক্টর জমি ঝুম চাষের সঙ্গে যুক্ত। সমস্যার ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পগুলি যথেষ্ট নয় এবং এই অঞ্চলের সরকারী প্রশাসনের সীমাবদ্ধ আয়তনের মধ্যে এর বেশী কাজে হাত দেওয়াও হয়ত সম্ভব নয়। তাই গতানুগতিক চিন্তাধারা চলতে থাকলে এই সমস্যার কবে যে সমাধান ঘটবে তা বলা শক্ত, বরঞ্চ সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশী। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে ১৯৮৯ সাল নাগাদ এই অঞ্চলের প্রায় ৬·৫২ লক্ষ উপজাতি পরিবারের প্রায় ৩২·৬১ লক্ষ ব্যক্তি কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবেন এবং বলাই বাহুল্য যে, ঝুম চাষ ব্যবস্থাই হবে এই বিপুল জনসংখ্যার বেঁচে থাকবার প্রধান অবলম্বন। যদি না এর মধ্যে কোন ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে কোন দ্বিতীয় দিগন্তের উন্মোচন হয়।

ফটো : আহমেদ হুসেন

মোর পুরাতন ভৃত্য

তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য

"ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না।...

এখন এক-একবার ভাবি, ভৃত্যদের হাত হইতে কেন এমন নির্মম ব্যবহার আমরা পাইতাম। মোটের ওপরে আকারে প্রকারে আমরা যে স্নেহ-দয়ামায়ার অযোগ্য ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আসল কারণটা এই, ভৃত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা বড়ো অসহ্য। পরমআত্মীয়ের পক্ষেও দুর্বহ।......"

এই স্বীকারোক্তি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। ছেলেবেলায় বাড়ির ভৃত্যদের অধীনে বালক রবীন্দ্রনাথের জীবন কতটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, তারই অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাড়ির বড়োরা যখন নিজেদের খুশীমত দিন কাটাচ্ছেন, বালক রবীন্দ্রনাথকে তখন ভৃত্যদের কঠোর শাসনে এক অভিশপ্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হয়েছিল। তাঁর মন যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। ইচ্ছে হ'ত এক উন্মুক্ত, শৃংখলাহীন, আনন্দমুখর জীবনের আস্বাদ পেতে। সাধ জাগত বাড়ীর বড়োদের কাছে গিয়ে কিছুটা হাল্কা হতে। কিন্তু তা হবার নয়। তাই 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হয়েছে। শিশুমনের অতৃপ্তি প্রকাশলাভ করেছে। ধাঁধাধরা জীবনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে জীবজগতের প্রত্যেকের সঙ্গে মিলিত হবার বাসনা বালক রবীন্দ্রনাথকে এক যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে বাধ্য করে।

এই কঠিন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা কিন্তু চিন্তা করলে খুব আশ্চর্য লাগে! যে-রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে ভৃত্যশাসন এক অভিশপ্ত ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল, সেই রবীন্দ্রনাথই শেষ জীবনে তাঁর ভৃত্যদের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন যাদের না হলে তিনি একটু ভাবনায় পড়তেন। এদেরই একজন হল রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় বনমালী। এই বনমালীর কথা রবীন্দ্রনাথ নানান জায়গায় পরিহাস করে বলে গেছেন—এমনকি তাঁর কবিতার ভেতরেও বনমালীকে স্থান দিয়েছেন। এই প্রবন্ধ সেই বনমালীকে নিয়েই যাকে না হ'লে রবীন্দ্রনাথের চলতো না, কারণ—রবীন্দ্রনাথের কথায়— "আমার লীলমণি আর কিছু পারুক না পারুক পেট ভরে হাসতে জানে, ঠাট্টায় যোগ দেয়—তাই ওর সঙ্গে কথা বলে আমি আনন্দ পাই।" বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ বনমালীকে সময় সময় 'লীলমণি' বলে পরিহাস করে সম্বোধন করতেন।

রবীন্দ্রনাথের একান্ত কাছের মানুষ ছিল এই বনমালী। মনিবের কখন কি লাগবে না লাগবে, কোথায় বসবেন কোথায় যাবেন কখন কি খাবেন—এসব বনমালীর নখদর্পণে ছিল। বনমালীর মনিব তো যে সে মনিব নয়—স্বয় রবীন্দ্রনাথ! কিন্তু দুজনের মধ্যে চিরাচরিত মনিব-ভৃত্য সম্পর্ক একেবারেই ছিল না—ছিল অপূর্ব পরিহাসমুখর, স্নেহমমতায় ভরা এক অনির্বচনীয় সম্পর্ক। তারই কিছু হদিস মিলবে এই প্রবন্ধে।

একবার রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একটি বাড়ীতে এসে রয়েছেন। বয়স হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে ছিল পদ্মার চরে বোটে গিয়ে থাকবেন, কিন্তু তখন তো আর সম্ভব নয়। পরিবর্তে চন্দননগরে ঐ বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। বাড়িটার বিশেষত্ব এই যে বাড়িটা গঙ্গার ওপর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। বাড়ির বাঁধানো ঘাটে রবীন্দ্রনাথের বোট নিয়ে আসা হল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আছেন রানী চন্দ আর আছে বনমালী। কবি থাকতেন দোতলায়। কয়েকদিন পরে বাড়িটার একতলায় এক হরিজন তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসে উঠল। সে এককালে জাহাজে কাজ করত। সেই সুবাদে সে বহু দেশ বিদেশ ঘুরেছে। তার সেই ভ্রমণ-কাহিনী সে বনমালীকে রসিয়ে রসিয়ে বলত। এদিকে বনমালীও কম যায় না। সেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বেশ কয়েকটি জায়গায় গিয়েছে। সেই ঘটনার সাক্ষী রানী চন্দ এই ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে লিখেছেন : "বনমালী গুরুদেবের খাস্ নোকর, সে হার মানবে কেন? সেও ভারিক্কী চালে বলতে থাকত—আমি যখন সেবার বাবামশায়ের সঙ্গে বোমবাই গেনু—

মেথর বলত, আরে রেখে দাও তোমার বোম্বাই। বলে হাতে চাপড় মেরে এক ধাক্কায় তার কথা ঠেলে দিত। বলত, আমেরিকা দেখেছ? ইংলন্ড? বাড়ি কি এক একটা সেখানে, আরে বাপ্‌রে—

বনমালী বেচারী চুপসে যেত। তার দৌড় বড় জোর বোমবাই হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত। বাবামশায়ের সঙ্গে এর চেয়ে বেশি দূরে সে যায়নি কখনও।

নিরালা দুপুরে তাদের একতলার আলাপ খোলা জানালা বেয়ে স্পষ্ট উঠে আসত উপরে। গুরুদেব হাসতেন শুনে।

বিকেলে যখন বনমালী চা সাজিয়ে দিত, চা খেতে খেতে গুরুদেব বলতেন, তুই তাকে আরও বড়ো বড়ো নাম বলালি নে কেন? বললেই হত যে বাক্সিয়ারপুর গেছি? উটকামন্ড ভিজেগাপট্টম বেজোয়াড়া এই সব জায়গায়? খটোমটো নাম শুনে নিশ্চয়ই ভড়কে যেত ও।

বনমালী খুদে খুদে দাঁত বের করে হি হি করে হাসত আর বলত, তা বাবামশায় কথাগুলি কঠিন কিনা? অতবড়ো নাম আমার তাই স্মরণ থাকে না।

—তা থাকবে কেন? যাও তবে, ওর কাছে বোকা বনে বসে থাকগে। খাবার আগে আমার ন্যাপকিনটা দিয়ে যাও। ন্যাপকিনটা দিয়ে 'নাম্বা টেবিলটা এদিকে সরিয়ে দাও। তারপর স্যানাতড়ন-এর শিশিটা রাখ তার উপরে।..."

'ন্যাপকিন', 'নাম্বা', 'স্যানাতড়ন'—এগুলি বনমালীর ভাষা। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বনমালীর সঙ্গে প্রায়ই রসিকতা করতেন। উপস্থিত সকলেই এই পরিহা অত্যন্ত উপভোগ করতেন। আর বনমালীও এতে ভারী খুশি হত। বনমা ন্যাপকিনকে 'ন্যাপকিন', ল্যাম্পকে 'নাম্বা' আর স্যানাটোজেনকে 'স্যানাতড়ন' কি 'স্যানাটমটম' বলত। বনমালীর এই ভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যাতেও বহু পরিহাস করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন অত্য অসুস্থ। আস্তে আস্তে শরীর ভেঙে পড়ছে। বেশির ভা সময় আধো ঘুম আধো জাগা অবস্থায় থাকেন। তারই মধ্যে মুখে মু কবিতা রচনা করেন। পাশে যিনি থাকেন তিনি তা খাতায় টুকে রাখেন। সে পাশে ছিলেন নির্মলকুমারী মহলানবিশ। রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে একটি কবি বলে যাচ্ছেন। ঘরেতে লণ্ঠন জ্বলছে। নির্মলকুমারী মহলানবিশ ঐ লণ্ঠ আলোতেই কবির স্বর লেখার খাতায় কবিতাটি যতটা পারলেন লিখে রাখলে পুরোটা পারলেন না কারণ রবীন্দ্রনাথ এত তাড়াতাড়ি বলে যেতেন যে সবটা টু নেওয়া সবসময়ে সম্ভবপর হতো না। তারপরে আবার রবীন্দ্রনাথ ঘুমের ঘো বলে গেছেন। তবুও নির্মলকুমারী মহলানবিশ যতটা পারলেন লিখে রাখ কারণ তিনি জানতেন যে "ছিন্ন ভিন্ন কথার টুকরোগুলো দেখলেও সকালে ক

রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য বনমালী 'শ্যামলী'র সামনে

সবটাই মনে পড়ে যাবে, তাই যতটা সম্ভব খাতায় ধরে রাখার চেষ্টা করলা যাইহোক, কবিতা বলা শেষ হয়ে গেলে কবি পাশে দাঁড়ানো নির্মলকুম মহলানবিশকে বললেন, "ও আবার কি? তুমি কি লিখছো? ও কিছুই এমনি মনে এল তাই বলে গেলুম।" বলেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন "দাও এ গুলকুশ খাওয়াও তা হলে। আমার লীলমণি বলে 'গুলকুশ', 'স্যানাটম (স্যানাটোজেন)—কী ওর ভাষা!" কল্পনা করা যায় ভৃত্যের ওপর কতটা স্নে মমতা থাকলে তবেই কঠিন রোগযন্ত্রণার ভেতরেও একজন এতটা হাসিঠাট্টা ক পারেন? বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ বলেই এও সম্ভব হয়েছে।

বনমালীর এই অকৃত্রিম ভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গেও বহু রসিকতায় যোগ দিয়েছেন। মংপুতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন মৈত্রেয়ী দেবীর আ গ্রহণ করেছেন তখন একদিন রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে বলে "আজ যে সমস্ত দিন দর্শন নেই, ছিলে কোথায়? একটা চৌ 'নাম্বা' হয়ে শুয়ে বালিশের উপর চুল মেলে দিয়ে 'প্রবাসী' পড়তে পড়তে ঘু দিচ্ছিলে নিদ্রা? আমি ঠিক করেছি এবার থেকে বনমালীর মত বলব 'ন্যা

তখন আমাকেই ওর ভাষাটাকে মেনে নিতে হবে।" আরেকটি ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকার জন্য তৈরি হচ্ছেন। তাই দেখে মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা কি কি রং গুলব?" উত্তরে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন "আহা, আগে কাগজটা লাম্বা করে কাটো, তবে তো? বনমালীর কাছ থেকে আমার ভাষার খুব উন্নতি হচ্ছে, আজকাল আর লম্বা বলতে ইচ্ছেই করে না।"

অবসর পেলেই বনমালীর সংগে হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠতেন রবীন্দ্রনাথ। একদিন এমনি অবসর সময়ে রবীন্দ্রনাথ বনমালীকে জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা বনমালী, তুই কি জানিস্ যে আমি একজন খুব বড়লোক?" বনমালী জবাব দেয় "হ্যাঁ বাবুমশায় জানি।" রবীন্দ্রনাথ সংগে সংগে জিজ্ঞাসা করেন "কিসে আমি বড়লোক বল্ তো? দ্বারকানাথের 'নাতি' বলে? বনমালী হাসে আর দাঁত কচলায়, বলে "বলব? বলব?" রবীন্দ্রনাথ : "বল্ না"। বনমালী : "আপনি নেকার জোরে বড়লোক।" অক্ষরজ্ঞানহীন বনমালীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এক ধ্রুব সত্য।

বহু সময় রবীন্দ্রনাথ বনমালীর সংগে গল্প করে কাটাতেন। এতে রবীন্দ্রনাথ সত্যিকারের প্রাণের আরাম পেতেন। আর বনমালীও পেত তার মনের মতো শ্রোতা। একদিন বনমালী রবীন্দ্রনাথকে তার গ্রামের "মণিবাবা"র মাহাত্ম্য কাহিনী শোনাচ্ছে। অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করছে বনমালী এই মাহাত্ম্য কাহিনী শোনাতে। গল্প এগিয়ে চলে এইভাবে :

বনমালী : সে বাবামশায়, মণিবাবার এত মাহাত্ম্য কাউকে যদি জাত সাপে কাটলো তো তিনবার শুধু বল, 'মণিবাবা, মণিবাবা, মণিবাবা', ব্যস অমনি সে উঠে বসবে, বিষ নেমে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ : বটে?

বনমালী : হ্যাঁ বাবামশায়—এত তার নামের গুণ।

রবীন্দ্রনাথ (অনিল চন্দকে উদ্দেশ করে) যাতো অনিল, যেখান থেকে পারিস এখুনি একটা কেউটে সাপ জোগাড় করে আন। এনে সাপটাকে দিয়ে বনমালীকে কাটা। তারপর তিনবার কেন আমি তিনশ বার বলব 'মণিবাবা মণিবাবা মণিবাবা—

সংগে সংগে বনমালীও হেসে ফেলত। এইরকমই ছিল দুজনের সম্পর্ক! কি ভালোই যে লাগে!

এবার আরেকটি ঘটনার কথা। বনমালী কি একটা ভুল করে ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ আপাত গাম্ভীর্যের সংগে বনমালীকে ডেকে বললেন : "জানিস্, তোর আচরণ যদি সংবাদপত্রের সম্পাদকদের জানাই, তাহলে দেশ জুড়ে এক্ষুনি তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বইবে, বড় বড় 'স্তম্ভ' লেখা হবে, চাই কি একটা অনাস্থা প্রস্তাবও গৃহীত হতে পারে?" বনমালীও বুঝল যে আসলে রবীন্দ্রনাথ রাগ করেননি, করেছেন পরিহাস।

আরেকটি ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ বনমালীকে তাড়াতাড়ি চা তৈরি করে আনার জন্য বলেছেন। কিন্তু বনমালীর চা আনতে দেরী হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ কপট বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন : "চা-কর বটে, কিন্তু সু-কর নয়।" কিছুক্ষণ পর বনমালী চা নিয়ে হাজির। তাকে দেখেই রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন : "তুই বোধ হয় জানিস না যে তোর অতুলনীয় অকর্মণ্যতায় আমি খুব বেশী পুলকিত হইনি?" উপস্থিত সকলেই এ রসিকতার মর্মটুকু উপলব্ধি করলেন।

পিতা যেমন পুত্রকে অন্তরের সমস্ত স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, শাসন দিয়ে পালন করেন, রবীন্দ্রনাথও ঠিক সেইভাবে বনমালীকে অপত্যস্নেহ দেখাতেন। তাই বনমালীর যাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট না হয় কোনো কিছুতে, সেদিকে রবীন্দ্রনাথের খেয়াল ছিল ষোল আনা। অথচ ভৃত্য বলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলে সেই সমস্ত কষ্ট থেকে বনমালীকে রেহাই নাও দিতে পারতেন। এবং বনমালীও তাতে কোনোকিছু প্রতিবাদও করতো না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো প্রচলিত অর্থে বনমালীর 'মনিব' ছিলেন না। তিনি ছিলেন বনমালীর 'বাবামশায়'। তাই বনমালীকে রবীন্দ্রনাথ নিছক 'চাকর' মনে করে ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে অহোরাত্র খাটিয়ে মারতেন না। একটি ঘটনার কথা নন্দগোপাল সেনগুপ্ত জানিয়েছেন এইভাবে : "একদিন দুপুরের দিকে কবি লিখছেন, ইতিমধ্যে ঝড় উঠলো। দমদাম করে ঘরের জানালাগুলো খুলতে আর বন্ধ হতে লাগলো—ভৃত্য বনমালী কখন ফুরসৎ বুঝে ঘুমিয়ে পড়েছে, এই হৈ হট্টগোলেও তার ঘুম ভাঙলো না। কবি তাকে জাগাতে বললেন না, লেখা ছেড়ে স্বয়ং উঠলেন এবং একটি করে সব জানালা বন্ধ করে দিলেন। ভাবলাম, বনমালী নির্ঘাৎ ধমক খাবে, কিন্তু না। স্বস্থানে ফিরে কবি স্মিতহাস্যে বললেন, ঘুমিয়েছে বেচারা! হঠাৎ জেগে গেলে ধড়মড় করে উঠে শেষটা একটা অনর্থ করে বসবে। এসব টুকিটাকি কাজ গৃহস্থ লোককে করে নিতে হয় বৈকি।" এই 'গৃহস্থ লোক' কথাটা ঠাট্টার আর বাকী কথাটা স্নেহের—কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে কথাটা আত্মনির্ভরতার।"

রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে বনমালী পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল ছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই মনের ভুলে এটা সেটা নিজের জোব্বার পকেটে ফেলে দিতেন। এদিকে হয়তো খোঁজাখুঁজি চলেছে জিনিসটার। রবীন্দ্রনাথও ভুলে গেছেন যে সেটি তাঁর জোব্বার পকেটেই রয়েছে। বনমালী কিন্তু সংগে সংগেই বলে দিত "বাবামশায়ের পকেটটা দেখেছেন?" এমনি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করেছেন মৈত্রেয়ী দেবী। একবার মৈত্রেয়ী দেবীর বোন চিত্রিতা দেবীর চশমা পাওয়া যাচ্ছে না। মৈত্রেয়ী দেবী লিখছেন : "সন্ধ্যাবেলা ফেরবার সময় কোথাও চিত্রিতার চশমার খাপ পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িশুদ্ধ লোক তোলপাড় করে খুঁজছে। বনমালী একবার বলেছিল বটে, 'বাবামশায়ের পকেটটা দেখেছেন?'

রবীন্দ্রনাথ এতে বললেন, 'শোনো কথা একবার! যদি নিতেই হয় তেমন তেমন জিনিস নেব, চশমার খাপ নেব? তার মত পছন্দ তো নয়।'

পরদিন মংপুতে একটা চিঠি ও চশমা এসে উপস্থিত। বনমালীর সন্দেহই সত্যি, চশমা তাঁর পকেটেই ছিল। তবে সেটা ইচ্ছাকৃত নয়, নিজের চশমা বলে ভুল ক'রে জোব্বার বিশাল পকেটের গহ্বরে তাকে ফেলেছেন। সেখান থেকে চশমার পুনরুদ্ধার বনমালীর অমর কীর্তি। সেই থেকে কোনো কিছু হারালে প্রথমেই মনে পড়ত—'বাবামশায়ের পকেটটা দেখছেন?'..." ভাবতে পারা যায়, জিনিস হারাতেই ভৃত্য তার মনিবের পকেট দেখাতে বলছে!

বনমালীর সঙ্গে কোথাও গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বনমালীকে জিজ্ঞাসা করতেন যে বনমালীর জায়গাটা পছন্দ কিনা এইসব। সেইরকম মংপুতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বনমালীকে জিজ্ঞাসা করলেন :

"বনমালী তোর জায়গাটা লাগছে কেমন?"

বনমালী : "আজ্ঞে আমার তো ভালই লাগছে—আমার দেশের লোকও রয়েছে কিনা।"

রবীন্দ্রনাথ : "তোর দেশের লোক আবার এখানে পেলি কোথায়?"

বনমালী : "কেন, ঠাকুর আয়া; ওর বাড়ি—আর আমার বাড়ি, মাত্র একখানি গ্রাম মাঝখানে।"

রবীন্দ্রনাথ : "লোকটি রসিক আছে, এমন নৈলে আর আমার চাকর হয়—মধ্যে মাত্র একখানি গ্রাম!"

বনমালী রসিক মানুষ, পরিহাস বোঝে, রসবোধ আছে পুরোমাত্রায় বলেই রবীন্দ্রনাথের বনমালীকে বিশেষভাবে পছন্দ। আরো তো অনেক ভৃত্য ছিল রবীন্দ্রনাথের, কই তাদের কথা তো রবীন্দ্রনাথ এতবার ক'রে বলেননি। রসবোধ যার নেই, রবীন্দ্রনাথ তার ধারে কাছে নেই, তা সে কাজের লোক হলেও। বনমালী অথর্ব হয়ে পড়াতে রবীন্দ্রনাথের একজন ভৃত্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যে কিনা বনমালীর মত রবীন্দ্রনাথের দেখাশোনা করবে। এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ একদিন নির্মলকুমারী মহলানবিশকে বিশেষভাবে বলেন যে, যদি তিনি সেরকম কোনো লোকের সন্ধান দিতে পারেন। নির্মলকুমারী মহলানবিশ ওদের পুরোনো চাকর রামচরিতকে দিয়েছিলেন কবির দেখাশোনা করতে। এতে, নির্মলকুমারী মহলানবিশের ভাষায়, "প্রতিমাদি খুশী হলেন রামচরিতকে দিয়েছি বলে, কারণ—বেহারের লোক হলেও সে দিব্যি বাঙলা কথা বলতে পারতো এবং ট্রেনে যাতায়াতের সময় সবরকম—যেমন মাল বুক করা, গাড়ি রিজার্ভ করা প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ বহন করার শক্তি ছিল।" কিন্তু হ'লে হবে কি, "রামচরিতের গম্ভীর মুখ এবং একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফ" রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহনীয় ঠেকল। কিছুদিন পরে নির্মলকুমারী মহলানবিশ যখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, "রানী, দোহাই তোমার, ঐগুণের চাকরকে তুমি ফিরিয়ে নাও। আমি মানছি ও কাজ খুব ভালো জানে, কাজেই তোমার ইচ্ছে ওকে রেখে দেন আমার কাছে, কিন্তু আমি কি করে ওকে কাছে রাখি বলো? ওর মুখ দেখলে যে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কোনো ঠাট্টা তামাশা ওর সঙ্গে করতে পারিনে, ঠাট্টা করলে ও হাসতে জানে না, শুধু কাজ নিয়ে আমি কি করবো? আমার 'নীলমণি' আর কিছু পারুক না পারুক পেট ভরে হাসতে জানে ঠাট্টায় যোগ দেয়—তাই ওর সঙ্গে কথা বলে আমি আনন্দ পাই। ওর হাতটাতগুলো যদিও একটু কাঁপে, তা হোকগে, তবু ওকে দিয়েই আমি চালিয়ে নেবো। ঐ গম্ভীর মুখের মস্তো বড়ো একজোড়া গোঁফ আর আমি দেখতে পারছি নে।" ফলে রামচরিতকে ফিরিয়ে নিতে হয়। বনমালীর পরিবর্ত পাওয়া কি সোজা কথা। অকপটে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ওর সঙ্গে একটু ঠাট্টা করি, ও সেটা পছন্দই করে. আবার ঠাট্টা না করতে পেলে আমার চলে না সে চাকর নিয়ে। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।" তাই রামচরিতকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।

মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীতে গিয়ে বনমালীর কিরকম খাওয়া দাওয়া চলছে সে খোঁজটুকুও রবীন্দ্রনাথ বনমালীর কাছ থেকে নিতেন। জিজ্ঞাসা করেন "বনমালী খাওয়া দাওয়া চলছে কেমন?"

বনমালী : "আজ্ঞে তা ভালই চলেছে, দিদিমণি আবার আমায় দুধ খাওয়াচ্ছেন।"

রবীন্দ্রনাথ : "দুধ খাওয়াচ্ছেন কেন, তার চেয়ে দুধ মাখালে পারতেন, খেয়ে তো রং-এর বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না।"

বলুন, একে কি বলবেন এ কি মনিব ভৃত্যের সংলাপ, না অন্য কিছু. বনমালীর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে বোম্বাই গেলে তার গায়ের রঙ অনেক ফর্সা হয়ে যায়—আর এর প্রমাণও সে নাকি পেয়েছে তার "বাবামশায়"-এর সঙ্গে বার কয়েক বোম্বাই গিয়ে। আর তাই রবীন্দ্রনাথ যখন তাকে বলতেন "চল্ বোম্বাইতে গিয়ে থাকি এবার হবে তোতে আমাতে" তখন বনমালীর আর খুশির সীমা পরিসীমা থাকত না।

আগেই বলেছি নতুন কোনো জায়গায় বনমালীকে সঙ্গে নিয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন জায়গাটি তার পছন্দ কিনা। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তখন সস্ত্রীক বি, টি, রোডের ওপর "গুপ্ত নিবাস"-এ থাকেন। এ-বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার এসে থেকেছেন। ঐ বাড়িটির পাশ দিয়ে সারাদিন রেলগাড়ি যেত। রেলগাড়ির শব্দ থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাড়িটির নামকরণ করেছিলেন "ঘড়ঘড়িয়া"। একদিন রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে ডেকে বলছেন : "তোমার ঐ 'ঘড়ঘড়িয়াটা' আমার মোটে পছন্দ নয়। ঘরগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কিন্তু শুধু ঘরটাই দেখতে হয়, বাইরেটা আড়াল পড়েছে। আমার নীলমণির ঘড়ঘড়িয়া খুব পছন্দ। বলে, ঠিক যেন রাজবাড়ি, যেমন দরজা দরজার, তেমনি বারান্দা উঠোন, রান্নাঘর, চাকরদের ঘর, সবই চমৎকার। বোকা বাড়ি দেখেই ভুলেছে, কিন্তু ঘরে বসে যে আমি বাগান দেখতে পাইনে সেটা ও মাথায় ঢুকলো না। অবশ্য দোষই বা দিই কি করে? এ সব বুঝলে তো আমারই মতো কবিতা লিখতো, আমার কাছে এসে তো নীলমণি হয়ে থাকতো না, কি বলো।"

একদিন মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা চলছে বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথই প্রধান বক্তা। এমন সময় কফি এল। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন : "...এই দেখ, সাহিত্যালোচনা চলছে, উনি নিয়ে এলেন কফি। আজ বলেছিলুম কফির সঙ্গে দুধ খাব বেশি ক'রে, তা কতটুকু দুধ এনেছে দেখ। ও বনমালী খুব তোমার পয়সা বাঁচাচ্ছে।" সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত অসামান্য পরিহাস, সাহিত্যের গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যে এত সুন্দর হিউমার-এর অবতারণা—এ জিনিস রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহু ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই তার উপলক্ষ্য হয়েছে ঐ বনমালী।

বিদেশে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ বনমালীকে ভুলে থাকতে পারেননি। সেবার তিনি জার্মানিতে গিয়েছেন। সেখান থেকে ১৯৩০ সালের ১৮ই আগস্ট পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে একটি চিঠি লেখেন। প্রতিমা দেবী তখন লন্ডনে। চিঠিটির কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :

"...থেকে থেকে মনে আসছে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। (রবীন্দ্রনাথের কল্পিত বাসভবন বা স্টুডিয়োরূম)। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায়—খোলা জানালার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে; তার পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে আমার দেয়ালের উপর,— জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকছে সমস্ত দুপুরবেলা; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়া-বীথি চলে গেছে,—কুর্চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবু ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে, জারুল পলাশ মাদারে চলেছে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়; অশথ গাছের পাতাগুলো ঝিলমিল ঝিলমিল করছে—আমার জানলার কাছ পর্যন্ত উঠেছে চামেলি লতা নদীতে নেমেছে একটি ছোট ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো, তারি এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার খাট দেওয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটি মাত্র আরাম কেদারা—মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা, দেয়াল বসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পূর্বদিকে একটুখানি বারান্দা, সূর্যোদয়ের আগে সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আবার খাবার সময় হলে নীলমণি সেইখানে খাবার এনে দেবে......"

যেখানেই থাকুন, স্নেহের নীলমণির কথা ভুলতে পারেনি রবীন্দ্রনাথ। এত কাছের, এত প্রিয় ছিল বনমালী। তাই বনমালীকে কবি বলতেন "তোমার যেখানে পছন্দ সেইখানেই আমার পছন্দ।"

বনমালীর সুখ দুঃখের নিত্য সঙ্গী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই বনমালী যদি কখনও কোনো বিপদে পড়ত, তখন রবীন্দ্রনাথও বিচলিত হ'য়ে পড়তেন। যতক্ষণ না বনমালী সে বিপদ থেকে রক্ষা পাচ্ছে ততক্ষণ রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অন্ত থাকত না। একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি। সালটা ১৯৪১। কবির জীবনের শেষ বছর। শরীর খুব অসুস্থ। এদিকে বনমালী জমি সংক্রান্ত এক ব্যাপারে নিজের দেশে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তো অত্যন্ত চিন্তিত—কি হয় বনমালীর। যাই হোক, বনমালী যথাসময়ে ফিরে এল। ফিরে এসেই বনমালী রবীন্দ্রনাথের কাছে না গিয়ে স্নান করতে গেল। এদিকে রবীন্দ্রনাথ তো ভীষণ অস্থির হ'য়ে পড়ছেন। এরই মধ্যে তাঁর কাছে খবর পৌঁচেছে যে বনমালী এসে পৌঁচেছে। এতে রবীন্দ্রনাথ আরও উদ্বেগ বোধ করতে লাগলেন। বনমালী ফিরে এসেছে অথচ তাঁর সঙ্গে কেন দেখা করল না? কেবলই বলছেন : "বনমালী কেন আমার কাছে আসছে না। তার জমি নিলাম হয়ে যাচ্ছিলো, তার কি হ'ল জানতে চাই।" নির্মলকুমারী মহলানবিশকে রবীন্দ্রনাথ কাছে ডেকে বললেন "যাও তো, শুনে এসো তার বাড়ির কী খবর।" বলেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন 'ওঃ তুমি বুঝি জানো না বনমালী কী বিপদে প'ড়ে বাড়ি গিয়েছিল। ওর জমির জন্যে ৩০৲ খাজনা স্ত্রীর নামে বাড়িতে পাঠায়। সে সেই টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, জমিদারকে খাজনা দেয়নি। তাই ওর জমি নিলাম হ'য়ে যাচ্ছে খবর পেয়ে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে বাড়ি চলে যায়। তারপর আর আমি কোনো খবর জানিনে। ওর কথা প্রায়ই ভেবেছি যে কী হল। বাঁদরটা আসছে না যে আমার কাছে।" এ কথা বলতেই নির্মলকুমারী মহলানবিশ সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বনমালীকে বললেন "তুমি ময়লা কাপড়েই এসো, গুরুদেব কত বার ব্যস্ত হচ্ছেন, তোমার নিজের মুখে সব শুনলে নিশ্চিন্ত হবেন।" বনমালী তখন এসে কবিকে জানালো যে না কিছু গোলমাল হয়নি। ব্যাপারটা হ'ল বনমালীর স্ত্রী হাতে অতগুলো টাকা দেখে ওর কোনো ভাই ফুসলে বাপের বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু বনমালীর স্ত্রী তা থেকে দু' টাকার বেশি খরচ করেনি, কাজেই ২৮ টাকা ফিরে পাওয়া গেছে, আর বনমালীর স্ত্রীও বাড়ি ফিরে এসেছে এবং জমিও নীলাম হয়নি। সমস্ত শুনে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হলেন। বনমালীকে তখন বললেন "যা এবার স্নানটান কর গিয়ে।

অনেকের একটা ধারণা আছে যে রবীন্দ্রনাথ "হে মাধবী দ্বিধা কেন" গান রচনা করেছিলেন বনমালীকে উপলক্ষ্য করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা হ'ল—তা নয়। তিনি বলেছেন "...এখনও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনেছে পাই আমার রচনা সম্বন্ধে, এই যেমন সেদিন—বল্লে, 'আপনি নাকি বনমালীকে নিয়ে লিখেছেন—হে মাধবী দ্বিধা কেন?' শুনে এমন মনের অবস্থা হল—না

... হয়েছে যে বনমালীকে দেখে গাইব—
মাধবী তোমার দ্বিধা কেন?”

তবে একথা সত্যি যে রবীন্দ্রনাথ বনমালীকে তাঁর বেশ কতকগুলি কবিতায় দিয়েছেন। যেমন ধরুন “খাপছাড়া”-র ৬১ সংখ্যক কবিতাটি :

স্বামীর বোনা চায়ে তার
ভুলে ঢেলেছিল কালি,
‘শ্যালী’ ব'লে ভর্ৎসনা
করেছিল বনমালী।
এতবড়ো গালি শুনে
জ্বলে মনে মনাগুনে,
আফিম সে খাবে কিনা
সাত মাস ভাবে খালি,
অথবা কি গঙ্গায়
পোড়া দেহ দিতে ডালি।

আবার ঐ “খাপছাড়া”-র ৬৭ সংখ্যক কবিতায় রয়েছে :

ভূত হয়ে দেখা দিল
বড়ো কোলাব্যাঙ,
এক পা টেবিলে রাখে,
কাঁধে এক ঠ্যাঙ।
বনমালী খুড়ো বলে—
‘করো মোরে রক্ষে,
শীতল দেহটি তব
বুলিয়োনা বক্ষে।’
উত্তর দেয় না সে,
বলে শুধু ‘ক্যাঙ’।

...বার “প্রহাসিনী”-র অন্তর্গত “পলাতকা” কবিতাটি ধরা থাক। এই ...টি রবীন্দ্রনাথ নন্দিতা দেবীর উদ্দেশে লিখেছেন :

কোথা তুমি গেলে যে মোটরে
শহরের গলির কোটরে,
এক্‌জামিনেশনের তাড়া।
কেতাবের পত্রে ঝুঁকে থাক
স্বপ্নীর ডগাও দেখি নাকো,
দিনে রাতে পাই না যে সাড়া।
আমার চায়ের সভা শূন্য
মনটা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ,
সম্মুখে নফর বনমালী।
‘সম্মুখ’ তাহারে বলা মিছে,
মুখ দেখে মন যায় পিঁচে,
বিনা দোষে দিই তারে গালি।

...ই ধরনের আরেকটি কবিতার উল্লেখ এখানে করব। কবিতাটি ‘প্রহা...সিনী’-র অন্তর্গত “অটোগ্রাফ”। তারই কয়েকটি লাইন :

“বস্তু অবস্তুর সেন্স্‌
খাঁটি তব, তার ডিফারেন্স
পষ্ট তোমার কাছে খুবই—
তাই, হে লজ্জুস-লুব্ধি,
মতলব করি মনে মনে,
খাতা থাক টেবিলের কোণে।
বনমালী কো-অপেতে গেলে
টফি চকোলেট যদি মেলে
কোনোমতে তব অন্তত
মান রবে আজকের মতো।
ছ-বছর পরে নিয়ো খাতা,
পোকায় না কাটে যদি পাতা।”

...মালী একবার রবীন্দ্রনাথের নাটকেও অভিনয় করেছিলো। এবং ভালোই ... করেছিলো। বাংলা ১৩৪৮ সালের ২৫শে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ...ক শান্তিনিকেতনে “বশীকরণ” নাটকটির অভিনয় হয়। নির্মলকুমারী ...বিশ সেই অভিনয়ের একজন দর্শক ছিলেন। দর্শক হিসেবে সেই অভি-... সংবাদ দিয়ে নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখেছেন : “সন্ধ্যেবেলা উদয়নের ...কর আঙিনায় সামিয়ানার নিচে দর্শকদের বসবার জায়গা এবং চাতালের ... অভিনয়ের আয়োজন। কবি নিজে চাতালের একধারে আরাম চৌকিতে ...। প্রথমে কয়েকটা গান ও সঙ্গে সঙ্গে নাচ হল—ছেলেমেয়েরা মিলেই ... তারপর ‘বশীকরণ’ নাটকটির অভিনয়।

...ভিনয় খুব ভালোই হ'ল। সকলেই নিজের নিজের অংশ খুব ভালো করে ...লা। এর মধ্যে সত্যিই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্য ...। তাকে চাকরের ভূমিকাতেই নামানো হয়েছিল। বনমালীর আবির্ভাবে ...হেসেই খুন। ও কিন্তু তাতে একটুও কাবু না হয়ে ঠিক স্বাভাবিকভাবেই

‘আজ্ঞে হ্যাঁ মাঠকরুণ’ এবং অভ্যাগতকে জলখাবার এনে দেওয়া, হাত ধোয়ানো, ইত্যাদি সবই বেশ সপ্রতিভভাবে করে গেল। আমাদের খুবই ভালো লাগল যে কবির এতদিনের ভক্ত-সেবক বনমালীও এই আনন্দ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কবির পায়ে সেদিন দিতে পারলো। তখন জানতাম না, এই শেষ ২৫শে বৈশাখ কবিকে ঘিরে আনন্দ করব।

অভিনয়ের পরে যখন আমরা বনমালীকে বললাম, তোমারটা খুব ভালো হয়েছে, তখন বনমালী এক গাল হেসে বলল—‘বাবাঃ! আমি কক্‌খনো কিছু করি নাই, তার উপরে সামনে বাবামশায় চৌকিতে বসা। আমার তো কথা বলবার সময় গলা বন্ধ হবার মতো হচ্ছিল। গৌরীদিদি (শিল্পী নন্দলাল বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। সন্তোষ ভঞ্জের স্ত্রী) আমাকে জোর করে ধরে ভরে দিলেন নাটকের মধ্যে তা আমি কি করব?”......কবি বললেন, ‘কেন, তোর তো বেশ ভালোই হয়েছিল।’ আমাদের দিকে ফিরে বললেন, ‘আমার নীলমণির কত গুণ তাই দেখো। বাঁদরটা আমার কাছে থেকে থেকে নাটক করতেও শিখে গেল।’...”

শুধু অভিনয় নয়, রবীন্দ্রনাথ বনমালীকে নিজের হাতে সাজিয়েও দিয়েছেন। সে এক অপূর্ব কাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শী রানী চন্দ তাঁর বিবরণ দিয়ে লিখেছেন :

“বনমালীকে গুরুদেব একবার নিজের হাতে সাজিয়েছিলেন, দেখেছি। হায়দ্রাবাদের পথে ভিজেনাগ্রামে যাচ্ছেন গুরুদেব একদিনের জন্য, রাজমাতা ললিতা দেবীর আমন্ত্রণে। ভোর রাত্রে ভিজেনাগ্রাম স্টেশনে ট্রেন থামল। দেখি, ট্রেনের করিডোরে দাঁড়িয়ে গুরুদেব তাঁরই একটা কালো ভেলভেটের টুপি বনমালীর মাথায় পরিয়ে থাবড়ে থুবড়ে ঠিক করে দিচ্ছেন। বনমালীকে পরিয়েছেন গুরুদেব নিজেরই একটা সাদা সিল্কের পাজামা। বললেন, রাজবাড়িতে যাচ্ছিস—তোর ঐ সাজে যাবি নাকি? আমার পাজামা টুপি পরে সেজে নে ভালো করে।

গুরুদেবের টুপি আর পাজামা পরে কাঁদে বনমালীর সে এক অপূর্ব সাজ। বনমালী টুপি সামলায়, না, পাজামা সামলায়। বনমালী চওড়া ঢলঢলে পাজামা কেবলি গুঁজে গুঁজে তোলে। তুলতে তুলতে পাজামা হাঁটু অবধি তুলে ফেলল। মাথার টুপি চোখ ঢেকে ঝুলে রইল।”

রবীন্দ্রনাথ বনমালীর জন্য কতটা যে ভাবতেন তা রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর জমিদারী তদারকের জন্য শেষবার পতিসর (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) গিয়েছিলেন তখনকার একটি ঘটনা থেকে উপলব্ধি করা যাবে। সেবার রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এবং বনমালী। রাজসাহীর তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট ও সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়ও সেবার রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন। যাই হোক, পতিসর যাবার পথে আত্রাই রেল স্টেশনে নেমে আত্রাই নদী দিয়ে বোটে রবীন্দ্রনাথ রওনা হলেন। বোট যখন পতিসর কাছারির এক মাইল দূরে তখন প্রবল বর্ষণ শুরু হল। পতিসর কাছারিতে যখন বোট পৌঁছল তখনও সেই বর্ষণ থামেনি। এই বৃষ্টির জন্য সেদিন সেখানকার প্রজাদের কি আনন্দ। কারণ সেবার সেই বৃষ্টির আগে খরা চলছিল। অনাবৃষ্টিতে সমস্ত খেত একেবারে শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। প্রজারা রবীন্দ্রনাথের আগমনের সঙ্গে ঐ প্রার্থিত বর্ষণের এক মিল খুঁজে পেল নিজেদের মনে। তাদের ধারণা হল যে রবীন্দ্রনাথ পতিসর গেলেন বলেই ঐ বৃষ্টি হল। না হলে হয়তো হতো না। প্রজারা সবাই ঐ বৃষ্টির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানাল। অভ্যর্থনার পালা মেটবার পরের ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী উল্লেখ করেছেন এইভাবে :

“সন্ধ্যা হয়ে এল,—সেদিনকার মত প্রজা-কর্মীদের বিদায় করতে হল। (রবীন্দ্রনাথ) বোটের মধ্যে গেলেন। রাত্রি প্রায় আটটার পর রবীন্দ্রনাথ আহার শেষ করে বোটে বিছানায় শুতে যাবেন, দেখেন ভৃত্য বনমালী তাঁর শোবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, কিন্তু তাকে যেন খুব বিব্রত মনমরা মনে হল। বাবুমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী রে বনমালী, জমিদারীতে এসে ভাল লাগছে না বুঝি? তোর বিছানা করেছিস কোথায়? আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়। কাল তো অনেক হৈ-হাঙ্গামা আছে, কাল সব দেখে বেড়াস। শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি, তোর বিছানা কোথায়?’

বনমালী কথা কয় না, মুখ চোখে বিব্রত ভাব, তার শুকনো হাসিতে তার অসহায় ভাব যেন বেশি প্রকট হয়েছে। কিন্তু নির্বাক। বোটের পাহারারত বরকন্দাজ ও মাল্লাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ব্যাপার কী রে,—বনমালীর মন খারাপ হয়েছে—কথা কয় না যে—’

বোটের মাল্লা ভয়ে ভয়ে বলল, ‘হুজুর, হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হলে বোটের ছাদের মালপত্র সব ভেতরে আনা হল, কিন্তু বৃষ্টির আনন্দে ভুল করে বনমালীর বিছানার বান্ডিলটা ছাদেই পড়ে রইল।—সেটা ভিজে একেবারে—’

তার মুখের কথা শেষ না হতেই কবি রেগে উঠলেন, ‘কী আশ্চর্য, এত জিনিস ছাদ থেকে নামানো হল, আর বেচারি বনমালীর বিছানাটা কারো চোখেই পড়ল না? এ অত্যন্ত অন্যায়, অদ্ভুত ব্যাপার তো! এত লোক জিনিসপত্র টেনে নামাল—কারো খেয়াল হল না এই গোবেচারির বিছানার ওপর। এখন এ বেচারি শোবে কী করে? ছিছি, ছিছি, তোদের কী কাণ্ড। যা—এখুনি যা; ম্যানেজারবাবুকে ডেকে আন—এখুনি এর ব্যবস্থা করতে বল—’ কবি বোটের মাঝিমাল্লা, বরকন্দাজ সবাইকে খুবই বকতে লাগলেন। অনেকদিন তারা এমন বকুনি খায়নি।

ম্যানেজারবাবু সারাদিন পরিশ্রমের পর বাসায় সবেমাত্র খেতে বসেছেন,

মরকন্দাজ-মুখে 'বাবুমশাই ভয়ানক চটেছেন' শুনেই তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন—একজন চাকরের মাথায় বালিশ, তোশক, চাদর ইত্যাদি চাপিয়ে। এসেই দেখেন, ভয়ানক ব্যাপার; কবি রেগে আগুন, খুব বকছেন—সবাইকে দোষ দিচ্ছেন—চুপটি করে সবাই বকুনি খাচ্ছে, কিন্তু এ কাজটা যে বনমালীরও কর্তব্য ছিল—সে কথা বলবার সাহস কার? বনমালী চুপটি করে বসে। মুখে কথাটি নেই।

ম্যানেজারবাবু আর একপত্তন বকুনি খেলেন। বনমালীকে গিয়ে বললেন, 'বনমালী, নে ভাই, ভালো করে বিছানা পেতে নে—এই নে ডবল বালিশ।' বনমালী একটু হেসে নিয়মমত বাবুমশায়ের বিছানার নিচে পাটাতনে পরিপাটি করে সেই বিছানা পেতে নিল। ডবল বালিশ, পাশ বালিশ। বাবুমশাই খুব খুশি—বললেন, তোর বেশ বিছানা হয়েছে—শুয়ে পড় বনমালী—শুয়ে পড় চটপট।'

বনমালীর বিছানাপর্ব মিটল।..."

বনমালী সবসময় রবীন্দ্রনাথের ঘরের বাইরে শুত। রাত্তির বেলা যখন যা দরকার হত সবই বনমালীই করত। সেবার কালিমপঙে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বনমালীকে আগে থেকেই বলা ছিল যে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ, তাই রাত্তিরবেলা যেন সে সজাগ থাকে। প্রতিমা দেবী বনমালীকে বলেছেন যে "বাবামশায় যদি রাতে ওঠেন, আমাকে ডাকিস্।" খানিকক্ষণ পরে প্রতিমা দেবীর ঘুম ভেঙে গেল কিসের শব্দে। তিনি বুঝতে পারলেন যে বনমালী উঠেছে। দেখলেন যে রবীন্দ্রনাথের ঘরে আলো জ্বলছে। প্রতিমা দেবী উঠে গিয়ে বনমালীকে জিজ্ঞাসা করলেন : "কী রে, বাবামশায় কেমন আছেন?" বনমালী তার 'বাবামশায়'কে এত ভালভাবে জানতো যে সে ঠিক বলে দিতে পারত রবীন্দ্রনাথ কেমন আছেন। এবারেও সে নির্ভুল ভাবে বলল, "না বউমা, ভালো ঠেকছে না, আপনি জিজ্ঞাসা করুন ঘরের মধ্যে এসে।" এই "ভালো ঠেকছে না" কথাটা যে একেবারে ঠিক ছিল তা পরবর্তীকালে স্বনামধন্য বিশিষ্ট চিকিৎসকরাও জানিয়েছেন। সাদাসিদে মানুষ বনমালী কিন্তু তার অভিজ্ঞতা আর নিখুঁত পরিচর্যার ফলেই আগেভাগে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে "ভালো ঠেকছে না।" রবীন্দ্রনাথও প্রতিমাদেবীকে "বউমা, ভালো না" বলেই আরেকটা বায়োকেমিক ওষুধ খেয়ে বিছানায় শুলেন। যাই হোক, সে যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ রক্ষা পেয়ে গেলেন। তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা হল।

আস্তে আস্তে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হল। ঠিক হল কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই অস্ত্রোপচার হবে। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথকে অস্ত্রোপচার করাবার জন্য নিয়ে আসার আগের দিনের কথা। বনমালী কদিন আগে জরুরী চিঠি পেয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল। কয়েক দিন হল ফিরেছে। রবীন্দ্রনাথের যাবার তোড়জোড় চলেছে। সবাইকে তাগাদা দিচ্ছেন ঠিকঠাকভাবে গোছগাছ করে নিতে। সব জিনিসপত্র যেন নেওয়া হয়—এই সব আর কি? এক ফাঁকে বনমালীকে ডেকে রবীন্দ্রনাথ বললো : "তুই তো কিছুদিন ছিলি না; জিনিসপত্র কোথায় কি গেছে। ঠিক করে দেখে শুনে নিস কিন্তু আমার যা-যা লাগে।" আসলে, এই কথা, বনমালীকে বলছেন শুধুমাত্র এই কারণে যে বনমালী কাছে থাকলে রবীন্দ্রনাথ অনেক দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। বনমালীর অনুপস্থিতিতে যে তাঁর জিনিসপত্র অগোছালো হবে, তা নয় কিন্তু। অথচ রবীন্দ্রনাথের মন বলত বনমালী না হলে ওসব ব্যাপার সুচারুভাবে হওয়া সম্ভবপর নয়। বনমালীর ওপর রবীন্দ্রনাথ এতটা আস্থাবান ছিলেন। বনমালীও অবশ্য এর মর্যাদা পূর্ণভাবেই দিয়েছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলা সেই অভিশপ্ত দিন—২২শে শ্রাবণ। অমৃতধামে যাত্রা করলেন সেই অমৃত পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। এক বুকভরা শূন্যতা নিয়ে পড়ে রইল তাঁর বহু দিনের একান্ত আপনজন বনমালী। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য বনমালীকে নিয়ে সরস হাসিপরিহাস আর ঠাট্টা। আজ যেন আর বনমালীর কোনো দামই নেই। তার কাজ বুঝি সত্যিই ফুরিয়ে গিয়েছে। সেই অভিশপ্ত দিনটিতে বনমালীর অবস্থা কতটা নিঃসঙ্গ হয়েছিল সেকথা জানিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখেছেন : "......ঘরে লোকে লোকারণ্য। দেখি বনমালী দূরে এক কোণে দাঁড়িয়ে নীরবে চোখের জল ফেলছে। এ অসুখের কদিন দিনেরাতে ছায়ার মতো সে তার বাবামশায়ের ঘরের আশেপাশে ঘুরেছে, যখন যা দরকার করে দিয়ে গেছে। আজ সব মান্য লোকেদের মাঝে তার কোনো অধিকার নেই যেন খাটের কাছে এগিয়ে আসবার। আমি ডাক দিয়ে বললাম—বনমালী, তুমি গুরুদেবের কাছে এগিয়ে এসে ওঁকে ভালো করে চেয়ে দেখো। বেচারা ভিড় সরিয়ে এগিয়ে খাটের কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালো। কতদিন কত সেবা ও করেছে। ওর মনিব তো সাধারণ মনিব ছিলেন না, কাজেই প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধটা স্নেহ-ভক্তির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। কত হাসিঠাট্টায় বনমালীর প্রতি তাঁর স্নেহের প্রকাশ তা তো নিজের চোখে দেখেছি। আজ থেকে বনমালীর কাছে এ-বাড়ির কাজ নিরর্থক মনে হবে।"

একই ধরনের সাক্ষ্য দিয়েছেন ডঃ পশুপতি ভট্টাচার্য। লিখেছেন : "ভয়ঙ্কর খবর শুনে অতিক্রান্ত হয়ে সেদিন সকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।..

এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হঠাৎ দেখি, বারান্দার প্রান্তে সিঁড়ির পাশে গা ঘেঁষে একটি মানুষ হাঁটুর উপর মুখ রেখে চুপটি করে বসে আছে। কে ওখানে? কাছে গিয়ে দেখি, সে বনমালী, কবির বহুদিনের পুরোনো সেবকভৃত্য। খুবই পরিচিত, কতদিন কতবার ওকে দেখেছি কবির কাছে। সর্বদাই সে তার ঘরের কাছে হাজির থাকত। কবি তাকে আদর করে বা ভর্ৎসনা করে নানা রকম নাম ধরে ডাকতেন, কিন্তু যে নামেই ডাকুন, তৎক্ষণাৎ সে হাসিমুখে কাছে গিয়ে দাঁড়াতো। বিশেষ কোনো কথা বলতো না। কবি তাকে ধমকও দিতেন, কিন্তু তার জন্য তাঁর উদ্বেগেরও অন্ত ছিল না। ভালবাসতেন তাকে। সেই তাঁর প্রিয় বনমালী। তার

উত্তরায়ণ 'পুনশ্চ' বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের পাশে উপবিষ্ট বনমালী, পিছনে দাঁড়িয়ে চীনা অধ্যাপক ডঃ তান

এখনসব কাজ ফুরিয়ে গেছে, তাই সে আজ সিঁড়ির পাশে অমন করে বসে আ[ছে।] সকলের মুখে উদ্বেগ কিন্তু তার মুখ পাথরের। এক বিন্দু অশ্রু নেই, মুখে কো[নো] ভাবলেশমাত্র নেই, ভিতরে বাহিরে স্তম্ভিত অসাড়। আমি তার কাছে গি[য়ে] একবার ডাকলাম—বনমালী! কোনো সাড়া নেই, শুনতেই পেল না।

মহাসরস্বতীর বর্ষামঙ্গলের মহাবীণা স্তব্ধ হয়ে গেছে, বীণার তার ছিঁ[ড়ে] গেছে। আর সে বীণা বাজবে না। সমগ্র জগৎ আজ মর্মাহত। আর ঐ চেতনাহা[রা] হয়ে, দৃষ্টিহীন হয়ে চেয়ে থাকা উদাস সেবক বনমালী যেন তারই এক বাস্[তব] প্রতিকৃতি। ওকে দেখে চোখে জল এল।..."

এ যেন আরেক বনমালী। এ বনমালীর সঙ্গে পরিহাসপ্রিয়, কবির নিত্যসঙ্গী বনমালীর যেন অনেক, অনেক পার্থক্য। আজ সে বিহ্বল, বিভ্রান্ত, হতাশ। ও[র] 'বাবামশায়' আজ চলে গেছেন, শূন্য এ-পৃথিবীতে আজ কে রইল তার জন্য? আ[র] তো কেউ 'নীলমণি' বলে ডাকবে না, আর তো কেউ লম্বাকে 'নাম্বা' বলে ও[র] সঙ্গে পরিহাস করবে না, আর তো কেউ তার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের খোঁজ অম[ন] ভাবে নেবে না যে-রকমটি তার 'বাবামশায়' নিতেন তাঁর হাজারো কাজের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর বনমালী পেনসন নিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছি[ল।] রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের বই সংগ্রহ করে বনমা[লী] নিজের বাড়িতে একটা গ্রন্থাগারও বানিয়েছিল। ঘরেতে রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি রেখেছিল যত্ন করে। রবীন্দ্রনাথের কাছে থাকতে থাকতে বোধ হয় এই উপলব্ধি তার হয়েছিল যে তার "বাবামশায়"-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা [হল] জ্ঞানের চর্চা। নিজে নিরক্ষর হয়েও বনমালী তাই রবীন্দ্রনাথের বইগুলিকে সয[ত্নে] আঁকড়ে রেখেছিল। এতেই তার শান্তি। এর বেশি সে কিই বা পারে? এই শ্রদ্ধা[র] কোনো তুলনা হয় না। এ তো লোকদেখানো, ভড়ংসর্বস্ব তথাকথিত রবীন্দ্র প্রী[তি] নয়—এ যে নিখাদ শ্রদ্ধার এক উজ্জ্বল প্রকাশ। নির্মলকুমারী মহলানবিশের ভা[ষায়] বলতে হয় : "বনমালী নিজে লেখাপড়া কিছু জানে না। কিন্তু কবির প্রতি ওর কী গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, তা এতেই প্রকাশ পায়। এ কি শুধু মাইনে দেও[য়া] মনিবের জন্যে হতে পারতো?"

বিজ্ঞান

ইঁপিল-ইঁপিল

ইঁপিল-ইঁপিল এক ধরনের গাছ। এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় রকমের বিস্ময়। এক সময়ে এই গাছ বনজ উদ্ভিদ হিসেবেই বিবেচিত হত। কিন্তু এখন তার কদর বেড়েছে। বিশেষ করে ফিলিপিনস-এ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ইঁপিল-ইঁপিল এমন এক ধরনের গাছ যার পাতা থেকে শেকড় পর্যন্ত কিছুই ফেলনা নয়। এবং মানব-কল্যাণে ব্যাপকতরভাবে এই গাছটিকে কাজে লাগানোর জন্যে স্বপ্নও দেখছেন অনেকে।

কারণ এই :

ইঁপিল-ইঁপিল খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই গাছের শুকনো পাতা থেকে পাওয়া যায় শতকরা ২২ ভাগ প্রোটিন, শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন এবং প্রতি দশলক্ষ ভাগে ২২৫ ভাগ ক্যারোটেন বা ভিটামিন-এ। গাছটি শুঁটি জাতীয় বলে এর শেকড় নাইট্রোজেন সংগ্রাহক ব্যাকটেরিয়ার আদর্শ বাসস্থান। ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে এই গাছের শেকড় বাতাস থেকে নাইট্রোজেন শোষণ করে এবং সেই নাইট্রোজেনকে জমিয়ে রাখে পাতায়।

বড় জাতের ইঁপিল-ইঁপিল বছরে হেক্টর প্রতি ৭০ থেকে ৯০ মেট্রিক টন সবুজ পাতা উৎপাদন করতে পারে। যা সার হিসেবে ৫০ বস্তা অ্যামোনিয়াম সালফেট, ২০ বস্তা সুপারফসফেট এবং ১৮ বস্তা মিউরিয়েট অভ্ পটাস্ সারের বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে। এ-ছাড়া আরও একটি লাভ এই, এই সব কৃত্রিম সার বছরের পর বছর ব্যবহার করে দেখা গেছে, এরা ক্রমান্বয়ে মাটির ক্ষতি করে। অথচ ইঁপিল-ইঁপিলের পাতা থেকে যে সার তৈরি হয় তা জৈবিক সার এবং এই সার মাটির গুণগত উৎকর্ষ বাড়ায়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ইঁপিল-ইঁপিলের পাতা সার হিসেবে ব্যবহার করলে দানা জাতীয় শস্যের ফলন বাড়ে শতকরা তিনশ ভাগের মত। এই গাছ জমির মাটি শক্ত করে ধরে রেখে মাটির অবক্ষয় রোধ করে। বিভিন্ন ফসলের পাশাপাশি এদের বপন করলে ফসলের কোন ক্ষতি করে না।

ইঁপিল-ইঁপিলের পাতায় প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ২২ ভাগ এ কথা আগেই বলেছি। অতিরিক্ত প্রোটিন থাকায় এই পাতা মোষ, গরু, মুরগি, ছাগল এবং যেসব প্রাণী খাবার রোমন্থন করে তাদের ক্ষেত্রে আদর্শ খাবার হিসেবেও ব্যবহার করা চলে। তবে হ্যাঁ, শুয়োর বা ওই ধরনের প্রাণীর ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হওয়া দরকার। শেষোক্ত ওই প্রাণীর ক্ষেত্রে ইঁপিল-ইঁপিল পাতার পরিমাণ তাদের মোট খাবারের পাঁচ শতাংশের যাতে বেশি না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। কারণ অতিরিক্ত ইঁপিল-ইঁপিল পাতা খেলে তাদের গায়ের লোম পড়ে যায়।

হ্যাঁ, গুণের একেবারে শিরোমণিও বলতে পারেন এই ইঁপিল-ইঁপিল। আপনার জমিকে তিন ভাগে ভাগ করে নিন। জমির অংশগুলির নাম রাখুন প্লট্ নম্বর এক, দুই এবং তিন। এবার প্রথম বছর এক নম্বর প্লটে বুনে দিন ইঁপিল-ইঁপিল; এবং বুনুন ২ এবং ৩ নম্বর প্লটে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে। তাহলে এক একটি প্লট থেকে পর্যায়ক্রমে প্রতি তিন বছর অন্তর যথেষ্ট পরিমাণ ইঁপিল-ইঁপিলের কাঠ সংগ্রহ করতে পারবেন। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, বোনার তিন বছর পর প্রতি হেক্টর জমি থেকে যতটা ইঁপিল-ইঁপিল কাঠ সংগ্রহ করা যায় তার পরিমাণ ২০০ ঘন-মিটারের মত। আর এক ঘন-মিটার ওই কাঠের ওজন এক টন। ওই কাঠ বিক্রি করে হেক্টর প্রতি বছরের আট থেকে দশ হাজার টাকা রোজগার করা যায়। জ্বালানি হিসেবে ইঁপিল-ইঁপিল কাঠ উৎকৃষ্ট মানের। উন্নত মানের চারকোল বা কাঠকয়লাও তৈরি করতে পারেন, ওই কাঠ থেকে। পৃথিবীতে কয়লার পরিমাণ কমছে এবং সেই সঙ্গে বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল আমদানী করতে গিয়ে অনেক দেশের এখন দেউলে হওয়ার অবস্থা। এমন পরিস্থিতিতে ইঁপিল-ইঁপিল কাঠ এবং তার চারকোল জ্বালানির বিকল্প উৎস হিসেবে কাজে আসতে পারে। এতে করে আরও একটা লাভ এই, এই ভাবে মূল্যবান বনসম্পদও হয়ত আমরা রক্ষা করতে পারবো। উদাহরণ হিসেবে হিমালয়ের কথাই ধরা যাক। কাশ্মীর থেকে জম্মু, হিমাচল প্রদেশ, তারপর সোজা পার্বত্য এলাকা ধরে এগিয়ে যান অরুণাচল থেকে আসাম, মেঘালয় এবং নাগাল্যাণ্ড হয়ে মণিপুর মিজোরাম পর্যন্ত। বিস্তীর্ণ এই পার্বত্য এলাকা এক সময়ে ছিল মূল্যবান বনসম্পদের আকর। দেখবেন, গত কয়েক বছরে ওই সব অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছে প্রচুর। নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে আরও। ওই সব বসতির বহু জায়গায় না আছে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, না পাওয়া যায় কয়লা। ফলে জ্বালানির জন্যে সেখানকার অধিবাসীদের নির্ভর করতে হয় একমাত্র কাঠের ওপর। ওই কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে বনকে বন তারা সাফ করে দিচ্ছে। দামী দামী কাঠের বন। যাদের গড়ে উঠতে সময় লাগে প্রচুর। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও যাদের মূল্য যথেষ্ট।

অবিবেচকের মত বনভূমি কেটে ফেলার দরুন পার্বত্য এলাকার বহু জায়গার মাটি আলগা হয়ে গেছে। বর্ষার জলে সেই মাটি ধুয়ে নেমে আসছে

সমভূমির দিকে। নেমে এসে বিভিন্ন নদ-নদীর বুকে চরা সৃষ্টি করছে। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে বন্যার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলছে। এ-ছাড়া কঠিন পাহাড়ের ওপর থেকে মাটির স্তর সরে যাওয়ায় পার্বত্য এলাকার ভূস্তরের বাঁধুনি আলগা হচ্ছে কোনও কোনও অঞ্চলে। এতে করে কোথাও কোথাও স্থানিক ভিত্তিতে ভূমিকম্পের সম্ভাবনাও বাড়ছে। তাই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যেসব অঞ্চলে জ্বালানির অভাব এবং তার জন্যে প্রাকৃতিক বনসম্পদের উপর নির্ভর করতে হয় সেখানে ইঁপিল-ইঁপিল গাছের উৎপাদন যথেষ্ট কাজে আসতে পারে।

তিন বছরে ইঁপিল-ইঁপিল গাছ উচ্চতায় গিয়ে দাঁড়ায় ২৭ ফুটের মত। এবার এক কাজ করুন। মাটি থেকে চার ফুট উপরের অংশ বাঁচিয়ে এর কাণ্ডটি কেটে দিন। কাণ্ডের উপরের অংশ ব্যবহার করুন সার অথবা জ্বালানি হিসেবে। আর যে অংশটি মাটিতে লেগে রইলো, তাকে ওই ভাবে রেখে দিন। কিছু দিন পর দেখবেন, কাটা কাণ্ডের ডগা থেকে বেরিয়ে আসছে একাধিক শাখা-প্রশাখা। বেরিয়ে এসে বাঁশের ডগার মত তারা বেড়ে যাচ্ছে। এই বাঁশের মত ডগা বাঁশের বিকল্প হিসেবেও কাজে লাগানো যায়। মাছ ধরার জন্যে অনেকে বাঁশের তৈরি কত রকম সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করেন। দেখা গেছে ওই সব সাজসরঞ্জাম বেশি দিন জলে রাখলে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ওই সব কাজে বাঁশের পরিবর্তে ইঁপিল-ইঁপিল গাছের কাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা ওই শাখা প্রশাখা ব্যবহার করুন, তাতে আপনার লাভ হবে আরও বেশী। এই কাঠ জলে নষ্ট হয় না। এই কাঠের তৈরি মাছধরার সাজসরঞ্জাম আরও দীর্ঘস্থায়ী। এ-ছাড়া গ্রামীণ অঞ্চলে বাগানের বেড়া তৈরি, ঘরবাড়ির দেওয়াল ছাওয়া এমন আরও অনেক কাজে ইঁপিল-ইঁপিল কাঠের গুণগত বাঁশের চেয়ে বেশী।

ইঁপিল-ইঁপিল গাছে ফুল ধরে বছরের সব ... এর ফল থেকে চারা তৈরি করাও যায় বছরের ... সময়ে। ঢালু জমিতে বুনলে তার ফল ওই ... বেয়ে ছড়িয়ে পড়ে অনেকটা দূর পর্যন্ত। ... পার্বত্য এলাকায় ইঁপিল-ইঁপিলের বংশ ... অনায়াসেই করা যায়। ইঁপিল-ইঁপিলের ... ভূস্তরের গভীরেও ছড়িয়ে পড়ে। এতে করে ... বাঁধুনি এবং ফাটলকে শক্ত করে ধরে রাখা ...

অর্থাৎ সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই : ইঁপিল উৎকৃষ্ট জৈব-সার হিসেবে ব্যবহার কর... এর কাঠ উৎকৃষ্ট জ্বালানি। ঘরবাড়ির কাজে ... কাঠের কদর যথেষ্ট। এবং আরও একটা গু... বিষয় হলো, ভূমির অবক্ষয় রোধ করার ... ইঁপিল-ইঁপিলের ভূমিকা যথেষ্ট আদর্শস্থানীয় ...

'অতিকায় ইঁপিল-ইঁপিল গাছ যেন গাছ ন... একটি জ্যান্ত কারখানা। শক্তি এবং খাবার কারখানা।' মন্তব্য করেছেন ফিলিপিনস-এ... উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী।

অতীত যুগে প্রকৃতির বিস্ময়কর এই ... বিকশিত হয়ে উঠেছিল মেকসিকোর পার্বত্য ... মায়া' যুগের অধিবাসীরা একে পার্বত্য ... থেকে নিয়ে আসে সমতল অধ্যুষিত ... গাছটিকে তারা গরু এবং অন্যান্য পশুদের ... হিসেবে কাজে লাগাতো। পরে মেকসিকো ... লাতিন আমেরিকার গুয়াতেমালা, এল সা... প্রভৃতি অঞ্চলেও এই উদ্ভিদের চল সম্প্রসারিত ...

ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের নাবিকরা এ... নিয়ে আসেন ফিলিপিনস-এ, সেখান ... বিস্তৃতি ঘটে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ... এবং প্রশান্ত মহাসাগরের একাধিক দ্বীপে। ... শতাব্দীতে ইঁপিল-ইঁপিলের চল শুরু হয় ... দ্বীপপুঞ্জে। হাওয়াই দ্বীপবাসীদের এখ... ইঁপিল-ইঁপিলের আদি বাসস্থান হাওয়াই।

ফিলিপিনস-এ যে ধরনের ইঁপিল-ইঁপি... জন্মায়, তারা সাধারণত উচ্চতায় পনের থেকে ... ফুটের মত হয়ে থাকে। এদের পাতা আকা... এবং ফল ছোট ছোট শুঁটির মত হয়ে থাকে ... ফুলও আসে খুব কম সময়ে।

১৯১০ সালে মধ্য আমেরিকায় এক ... ইঁপিল-ইঁপিল গাছের সন্ধান পাওয়া যায় ... আকারে অনেক বড়। মাত্র পনের ষোল বছর আ... জাতের গাছ হাওয়াই দ্বীপে এনে চাষ করার ... করা হয়েছে।

দৈত্যাকার এই ইঁপিল-ইঁপিল লম্বায় ... তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ফুট। এবং ওই ... পৌঁছতে সময় লাগে ৬ বছরের মত। বি... দেখেছেন, এরা মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত ... উচ্চতা পর্যন্ত বেড়ে ওঠে, বহু ক্ষেত্রে ওই সম... শেকড়ও মাটির স্তর ভেদ করে নিচে নামে ... গভীর অঞ্চল পর্যন্ত। ফলে লাভ হয় এই, ... মাটির গভীর স্তর থেকে প্রচুর পরিমাণ না... ঘটিত সার অথবা অজৈব সার আহরণ করতে ... হয়। এতে করে ভূমিসংরক্ষণের কাজটিও ... হয়।

ইঁপিল-ইঁপিল গাছের কাণ্ড এবং ডালপা... সহজে ভাঙে না। অতিরিক্ত বন্যা এবং ঝড়ে ... খুব একটা ক্ষতিগ্রস্তও হয় না। ফিলিপি... অনেক জায়গায় এই গাছ বুনো টাইফুন থেকে ... অবক্ষয় এবং জনবসতি বাঁচানোর চেষ্টা ... আমাদের দিঘার সৈকতে এ ধরনের উদ্যোগ ... সেখানকার সৈকতভূমিকে হয়ত অবক্ষয়ের হা... বাঁচানো যেতে পারে।

দেশের কৃষিপরিকল্পকরা এই গাছটি ... ভেবে দেখুন এটাই আমরা আশা করবো। ... দেশে সার এবং মাটির অবক্ষয় একটা বড় ... সমস্যা। ইঁপিল-ইঁপিল গাছ ব্যাপকভাবে এ-দে... করা যায় কী না সেটা সবারই ভেবে দেখা দর...

সমরজিৎ কর

নতুন স্টেফ্রী
বেল্টবিহীন ন্যাপকিন!

ফাঁস নেই, বেল্ট নেই, পিন বা অন্য কোনরকম ঝঞ্ঝাট নেই।
যতখানি নির্ঝঞ্ঝাট হতে চান ততখানিই হবেন,
যতখানি সুরক্ষার প্রয়োজন ততখানিই পাবেন।

আপনি যদি এমন মহিলা হন, যিনি জীবনের প্রতিটি দিনের আনন্দ উপভোগ করতে চান তাহলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি একটি অসাধারণ জিনিষের: **স্টেফ্রী** বেল্টবিহীন স্যানিটারী ন্যাপকিন।

যতখানি নির্ঝঞ্ঝাট হতে চান ততখানিই হবেন

ফাঁস বা বেল্ট, পিন বা দড়ির ঝঞ্ঝাট পোয়াবার দিন আর নেই। ন্যাপকিন সঠিক জায়গায় রাখার জন্যে **স্টেফ্রী**তে তার নিজস্ব একটি অ্যাডেসিভ স্ট্রীপ আছে। আপনাকে শুধু আপনার আটসাঁট প্যান্টির ভেতরে ওটি আটকে নিতে হবে। আর তারপর দেখুন যতক্ষণ না আপনি নিজে ওটি সরাচ্ছেন কেমন খাপেখাপে সুরক্ষিতভাবে আটকে থাকে!

স্টেফ্রী ন্যাপকিন ব্যবহার করে আপনি যেমন খুশী পোশাক পরুন—যা খুশী করুন ওটি তার যথাস্থানে থাকবে।

যতখানি সুরক্ষার প্রয়োজন ততখানিই পাবেন

নিশ্চিতভাবে আপনার প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেওয়ার জন্যেই **স্টেফ্রী** বিশেষভাবে ডিজাইন করা। অধিক শোষণ ক্ষমতাযুক্ত ভেতরের স্তর ভেতরের আর্দ্রতা শুষে নেয়, আর ন্যাপকিনের তলা ও ধার ঘিরে যে ৩-মুখী প্লাস্টিকের শীল্ড তা দাগ লাগা নিবারণ করে। আজই এক প্যাকেট কিনুন আর আবিষ্কার করুন বেল্টবিহীন স্বাধীনতা! একবার ব্যবহার করলে আর কখনও ফাঁস বা বেল্ট, পিন বা দড়ির ঝঞ্ঝাটে যেতে চাইবেন না।

ভারতের নির্মাতা: Johnson & Johnson LIMITED BOMBAY 400 036 লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী। স্টেফ্রী, জনসন এণ্ড জনসন ইউ.এস.এ-র ট্রেডমার্ক © জে এণ্ড জে '৭১

বাবার স্মৃতি নলিনী বেরা

লোকটা এল, এইমাত্তর এল, একদম তেতেপুড়ে, রোদে ঝলসে গিয়ে। আহা রে, তাম্রবর্ণ গাত্র! তার কী হাল হয়েছে, জ্বলেপুড়ে কালো, খসখসে কালো। দু-পায়ে হাটু অবধি ধুলোবালি, তার মাঝেও ডান পায়ের আঁচিলটা, আঁচিলটা আছে, ঠিক কেষ্টঠাকুরের চুড়ো যেন। চারধারে দু-তিনটে চুল লতিয়ে পড়ে আছে। মনে মনে আশা, একদিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঠিক খসে যাবে, যাবেই। তখন বড় পরিষ্কার পা, আঁচিলের চিহ্নমাত্র নেই, বাঁধা চুলের গায়ে যা রক্ত, হুঁউ রক্ত। তার মানে ক্ষয়, কর্তন শুরু হয়েছে, কুটুর কুটুর কেটে পুরোটাই যাবে একদিন। হাঁ এতদিন সে বাড়ি ছিল না, বিদেশ গেছিল, বিদেশ বলতে গাঁ ছেড়ে আর কোথাও। হয়ত একটা আস্ত নদী পেরিয়ে গেছিল। যাবার সময় যে পুঁটলিটা হাতে, সেই ডোরাকাটা বিছানার চাদরের ভগ্নাংশ, যা ছিল চুপসান বেলুনের মত, তা এখন ফুলে ফেঁপে ঢোল। বাঁ হাতের কাছে পরম মমতায় ওটি রাখা আছে। আর বাঁ হাতে এক ধরনের খুঁত, যা শিশুকালে লুকিয়ে বিড়ি ফুঁকতে গিয়ে ঘটেছিল, যা কনুইয়ের চামড়া কাপড়ের মত ফুলিয়ে হাত আর বাহুকে কাছাকাছি টেনে রেখেছে, যার দরুন বাঁ হাত দশ্যাত বাঁকা,—আর এসবই আগুনে পুড়ে যাবার ফল। সেই বাঁ হাতের কাছে রাখা পুঁটলিটা, যার ভিতর না জানি কি মণি-মুক্তো আছে, আমাকে অষ্টপ্রহর টানছিল আর বলাচ্ছিল, 'কি আছে ভিতরে বল-অ-না', 'কি জিনিস, পুঁটলিতে রাখা আছে, দেখি', 'সেই সেই জিনিসটা কি?' কুশলী সাপুড়ের মত লোকটা পুঁটলি আগলে বসেছিল, যেন ভাবটা এই—'দাঁড়াও বাছা, ডম্বরুটা আগে ভাল মত বাজাই, তবেই না।' পুঁটলিটা খোল-অ, আমি দেখব, দেখতে আমার মন চায়', বলে, তার যক্ষের ধনে হাত রাখি। হাতটা আলতো করে, যেন না-না, সোনা-মনা, এখন না, বলে সরিয়ে দিল। দিয়ে পষ্টাপষ্টি বলল, 'আগে ডাক তোর মাকে।'

এই, এক ধরনের লোকটা, আমার বাবা ছিল। এটুকু বলার পর, গল্পটাতো এভাবেই বলতে পারি, যে তারপর আমি মাকে খুঁজতে গেলাম।

একজন নাবালকের পক্ষে তার মাকে খুঁজে বের করা—এই কাজে যা যা করণীয়, যেমন নিজেদের ঘরটা আগে তল্লাসী করা, তারপর পাশের বাড়ি, তারপর যেখানে যেখানে মা যেত, যার যার সংগে হেসে কথা বলত, আমি একে একে তাই করলাম।

আমাদের বাড়িটা বেশ বড়, আর সেকেলে। সেকেলে বড় বাড়ির আজকাল যা হয়, ধ্বসে ভেঙে পড়া, আমাদেরও তাই হয়েছিল। বাড়িটা ধ্বসে ভেঙে পড়ছিল। আমরা সেই পোড়ো বাড়িতে সপরিবারে থাকতাম, বাবার আটজন শরিক, মানে আমার জেঠু-কাকুরাও থাকত। আমার মা খুব ফর্সা, আর ঢ্যাঙা। ঢ্যাঙা বলেই কি রোগা লাগত? ফর্সা, ঢ্যাঙা, আর রোগামাত্রই ফ্যাকাসে? কি জানি, আমার ফ্যাকাসে লাগত।

সেই মাকে খুঁজছি, আর খুঁজছি। 'মা তুমি যে কি কর-অ, কো[...] যাও মা, সময়ে পাওয়া যায় না তোমাকে'—আপনার মনে বলতে বলতে মাকে খুঁ[...] চলেছি। দুপুরবেলা, রান্নাবান্নার সময় এখন, রান্নাঘরে থাকলেও থাকতে পা[...] এই ভেবে উঁকি মেরে দেখছি, না নেই। আজ কি আঁচও উনুনে পড়ল ন[...] 'আর কখন দেবে মা, বেলা ত ঢের হল। নাকি দিয়েচ? তোমার রান্না কি হ[...] গেচে?' উনুনের ছাইয়ে হাত রেখে তাপ নিলাম, ঠাণ্ডা জলের মত হাবভ[...] তার মানে কালকের বাসী ছাই এখনও পড়ে আছে। আজ আর রান্না হল ন[...] 'কিন্তু মা, আমার যে খুব খিদে, দেহের তুলনায় মাথাটা বড়, হাঁ-মুখ ব[...] এই জন্যই কি? যা খুশি বল, আমি সোনাজেঠু খেতে বসলে জেঠুর পা[...] একহাতা ভাত চেয়েচিন্তে খেয়ে নেব। ওদের আজ বাটামাছের ঝাল [...] শুকনো ভাত হয়েচে।' পেটে হাত রেখে হতাশ হয়ে রান্নাঘর থেকে বেরু[...] —এখন আর কোথায় বা যেতে পারে? মাকে অনেকদিন দেখেছি অবেলায় চু[...] চাপ তক্তপোশে শুয়ে থাকতো কিনা, 'অসুক করেচে বাবা, পেটের অসু[...] খুব মাথা ধরেচে।' শিবু কোবরেজের 'আরোগ্য' থেকে দুটো-চারটে বড়ি এ[...] দিলেই ব্যাস, সেরে যেত। তাই শোবার ঘরে খুঁজতে গেলাম মাকে।

বড় সড় তক্তপোশ, ছেঁড়া-ফাটা তুলো বেরিয়ে আসা তোশক, তার উ[...] ডোরাকাটা আধময়লা চাদর, —মা নেই। খাটের উপরে না থাক, তলা[...] থাকতে পারে। কতদিন দেখেছি মা পেট-তাবড়ে দিয়ে তক্তপোশের তলায় শ[...] আছে। ঠান্ডা, আর বেশ নিরিবিলি বলেই কি? হাঁতড়ে হাঁতড়ে খুঁজছি[...] মা নেই, খালি অন্ধকার, দুটো-চারটে টিন, কাঁচের বয়ম যা পড়ে আ[...] 'একি মা লুকলুকোনি খেলচ না ত।' শোবার ঘর ছেড়ে এলাম গোয়াল ঘ[...] গরুবাছুর নেই এখন, চরানে-বুড়ো গরু খুলে বাথানে নিয়ে গেছে। গো[...] আর গোমুত্রের গন্ধে ঘর ম ম। উত্তরে এই ঘর, খান তিনেক জানলা, [...] একটাতে মা বসে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে—এ দৃশ্য ত অনেকদিন দে[...] আজও দেখব ভেবে ঢুকেছিলাম, তিনটে জানলাই খাঁ খাঁ করছে, মা নে[...] অথচ এখান থেকেই রাস্তার এন্তার লোকের সংগে মা কথা বলে। 'কিগো কো[...] যাচ্চ', 'এই ফিরলে বুঝি', ছেলে ক্যামন আচে—কত কি। জানালায় [...] অবধি গলিয়ে রাস্তাটা দেখলাম, ঠিক মাথার উপর একটা কাক বসেছিল, [...] গেল। জানলা থেকে সরে এসে এবার চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মা। মাগো, ঘরে [...] এসেচে, কি এনেচে দেখবে এস। মা।' তিনুকাকা এ সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি[...] হাঁকডাক শুনে জানলাতে মুখ বাড়ায়। 'হ্যারে, অত কেন চেঁচাচ্ছিস?' 'না, ম[...] মা—।' 'দ্যাক কোতাও গেচে-টেচে' বলে তিনুকাকা চলে গেল। অ[...] মহা ফাঁপরে পড়ে প্রায় কেঁদে উঠলাম, কার বাড়ি বা যাব এখন?

সোনাজেঠুর বাড়ি গেলাম। জেঠীমা উনুনে মাছ ভাজছে কড়া [...]

তেলে-মাছে পড়পড় আওয়াজ, খানিক গন্ধ নিলাম। 'জেঠীমা, মা এসেছে?' 'কে গেল? মা বাবা।' বলে আঁচলে ঘাম মুছে ফের মাছ ভাজতে মন দিল। পিছনে দাঁড়িয়ে জেঠীমার কালো চকচকে চওড়া পিঠ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। খারাপ লাগল, আজ আর সোনাজেঠুর পাতে দু-মুঠো খাওয়া হবে না। ভাবতে ভাবতে মেজজেঠু, বিজুকাকা, তিনুকাকা, স-ব কাকার বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বৃথা সব, মা কোথাও নেই, বোধ করি ঘাটে। আমাদের কোণকলে বাড়িটার দক্ষিণে পুকুর, বাসন ধুতে মা গেছে সেই পুকুরে। হয়ত জলে নেমে এতক্ষণ শাক তুলছে, কলমী শাক। জল কমে যাওয়ায় গেঁড়ি তুলতেও পাঁবিধে, হয়ত গেঁড়ি তুলছে। সাত-পাঁচ ভেবে ঘাটে এসে দেখি, রমানাথকাকা ঝুলিজালে মাছ ধরছে। রাঙাকাকা, মাকে দেখেছ, আমার মাকে?' 'ধুর পাগলা, সেই থেকে জলে আছি, তোর মাকে দেখব কোথেকে? দ্যাক কোতাও গেচে-টেচে।' মার কথা ছেড়ে দিয়ে বলি, 'রাঙাকাকা, একটা মাছ দেবেগো?' 'মাছ?' রমানাথকাকা অদ্ভুতচোখে তাকাল, তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, 'হবে না'। আজ পুরো দিনটাই খারাপ যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে দশরথদার বাড়ি গেলাম। আমাদের উঠোনের সামনে খুব বড় একটা নিমগাছ, তাতে আঁকুড়-পাকুড় ঘোড়াবিছুটি লতা-গাছ। তার পাশ দিয়ে যেতে হয় দশরথদার বাড়ি। গেলাম, মা ওখানে হামেশাই যায়, আজ গেলেও যেতে পারে, এই ভেবে। দশরথদা তার বউয়ের পিঠে হাত রেখে বড় যত্নে ঘামাচি মারছে, মা নেই। 'মা! মাগো, আর তুমি কোথায়? তোমাকে যে হন্যে হয়ে খুঁজে মরছি।' চেঁচিয়ে বলে উঠতে মন গেল, চেষ্টাও করলাম, কিন্তু গলা চিরে স্বর এল না। তো খারাপ লাগল, বিরক্ত হলাম, এই মুহূর্তে যত রাগ গিয়ে জড় হল মায়ের উপর। কাঁদলাম, তারপর আরও দু-চারটে ঘর দেখে হতাশ মনে ঘরে এলাম।

বাবা তখনও সেইভাবে বসে, বাঁ হাতের কাছে সেই পুঁটলিটা, বসে বসে চোখ বুজে বিড়ি খাচ্ছে। এমনই নির্লিপ্ত ভঙ্গি যেন এ-বাড়ির সে কেউ না, অতিথি মাত্র। বা তাও নয়, একজন সামান্য ফেরিঅলা, তার পোঁটলা নিয়ে বসে আছে। এ-বাড়ির ছেলেটা তার মাকে ডাকতে গেছে, কিছু জিনিস কিনবে। কেনাকাটা হলেই সে চলে যাবে। বাবার পাশে ধপ করে বসে পড়ে বলি, 'বাবা, মাকে পাওয়া যাচ্চে না।' চোখ খুলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল বাবার, বিড়ির আগুন মেঝেয় গুঁজে ধরে ভাঙা গলায় কটা চেনা বাড়ির নাম করল, যেখানে যেখানে মা যেতে পারে। আমি ঘন ঘন মাথা নেড়ে জানালাম, সে-সব খোঁজা হয়ে গেছে। তারপর বাবা গুঁজে হয়ে বসে থাকলে আমি ফের বায়না ধরলাম, 'কি আছে ভিতরে এবার বল', 'কি জিনিস পুঁটলিতে রাখা আছে, এবার দেখাও, সেই সেই জিনিসটা কি?' ঠোঁটে যেন অল্প হাসির রেখা, 'তোর মা থাকলে ভাল হত।' বলতে বলতে বাবা খুলে ফেলল পুঁটলিটা। এ সময় তার দু-পাটি দাঁত মাজা বরাবর ছুঁয়েছিল, চোয়ালের মাংস কান অব্দি টানা ছিল, আর চোখের বাইরের কোণ দুটোতে তিনটেরও বেশি খাঁজ পড়েছিল, চোখ অল্প খোলাই ছিল। হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগলাম, পুঁটলিতে কি কি আছে। দুটো ডুরে শাড়ি (মার জন্য); একজোড়া জামা-প্যান্ট (আমার), আর কেজি পাঁচেক চাল। এই। বাবা আমার জন্য আনা জামাটা দু-হাতে দু-দিকে টেনে ধরে বলে, 'কেমন, তোর পছন্দ না?' আর ঠিক এ সময়ই একটা লম্বা, ফর্সা, ফ্যাকাশে মানুষ ঘরের ভিতর ছাত করে ঢুকে গেল, আমি আর বাবা তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছি, মানুষটা দেখেও দেখল না। যেন কেউ বসে আছে, বসে থাকতে পারে,—তার ধারণা নেই।

এই আরেক ধরনের মানুষটা, আমার মা ছিল। যার সঙ্গে বাবা ঝগড়া করে গাঁ ছেড়ে অনেকদিন চলে যেত, বিদেশে যেত। বুঝতে অসুবিধে নেই যে, হাত-খোঁড়া মানুষটা তেমন রোজগারপাতি করত না, তাই নিয়ে বউ তার ঝগড়া করত। এটুকু বলার পর, গল্পটা তো এভাবেও বলতে পারি যে, স্থায়ী রোজগারের আশায় বাবা গাঁয়ে একটা মুদিমালের দোকান খুলল।

ছোট-মোট দোকান, তার গণেশ প্রতিষ্ঠে হল, বিক্রিবাটাও বাড়তে থাকল। ইঁদুর যেহেতু শ্রীশ্রীসিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন, তাই ইঁদুর মারা বন্ধ হল, দোকানে নেঙটি ইঁদুরের উৎপাত বেড়ে চলল। দেদার চিনি খায়, মশলাপাতি চুরি করে, তেল মাপবার পলা নিয়ে ছুট দেয়। বাবা দেখেও দেখে না, যেহেতু গণেশের বাহন তার কিছু ক্ষতি হলে গণেশও উল্টে যাবে। অতএব ইঁদুর দেখলেই, নমঃ সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ। আর খদ্দের যেহেতু লক্ষ্মী, বা চার হাত খুলে দিয়ে যাও। ফলত ধার-দেনায় গণেশ ওল্টাল, আমরা (আমি ও সোনাজেঠুর ছেলে কেনারাম) ততদিনে হোস্টেলে, ক্লাস 'নাইন'-এ পড়ি। কেনারাম-খোরাকি দিত, আমি তাও না, দরিদ্র আর মেধাবী বলে সে-সব ছাড় ছিল। আমাদের ইস্কুল গ্রাম থেকে দূরে, মাঝ রাস্তায় একটা বড় নদী, নদী পেরুলে বিরাট চর, তাতে আকন্দ, টোপাকুলের ঝোপ, তাও পেরুলে আরেক নদী, সেই নদী পেরিয়ে আমাদের যেতে হত। বাজে-শিমুলের (বাজে পোড়া শিমুল গাছের) কাছে এক কুষ্ঠরোগীর ঘর ছিল, সে গেরুয়া পরত। আসতে-যেতে কেনারাম ঘরটার কাছাকাছি হলে নাকে রুমাল চাপাত। তাই দেখে রোগীটা তেড়ে মারতে এসেছিল একদিন, কেনারাম ছুটে পালিয়ে গেছিল। সেই দৃশ্য,—কেনারামকে কুষ্ঠরোগীর ভর্ৎসনা—আমার কাছে, মহাভারতের ছবিতে দেখা কোন এক রাজাকে দুর্বাসা মুনির অভিশাপ দেবার মত লেগেছিল। এরপর নাকে আর রুমাল চাপাত না কেনারাম, তার ভয় ছিল যদি লোকটা অভিশাপ দিয়ে থাকে, আর যদি তা ফলে যায়! সে যাহোক আমি আর কেনারাম বাবার গণেশ উল্টানোর কালে এগুলুরের এক ইস্কুল-হোস্টেলে থাকতাম। হোস্টেলের কাছাকাছি সপ্তাহান্তে একদিন, মানে রবিবার, হাট বসত, সেই হাটে গ্রাম থেকে

সা লোখেদের মুখে সব খবরই পেতাম।

একদিন শুনলাম বাবার অসুখ করেছে, রক্ত-আমাশয়, কিছুতেই সারে , শিবু কোবরেজও 'ফেল' মারছে। যত রবিবার যায় একে-তাকে বলি, কিগো র আছে ?" "আমার বাবার অসুক কি সারল ?" "তোমরা জান কিছু ?" তবার শুনি, "না বাছা, অসুকটা বেড়েচে।" "কেন, পেঁপে সিদ্ধ খাওয়াচ্ছে ?" "মাকে বল, বাবাকে খুব করে পেঁপে খাওয়াতে"—এ সব কথা আসছে ট গাঁয়ের লোকেদের বলব ভেবে রাখছি, তো দশরথদা এল।

তখন সান্ধবেলা, নাকি সূর্যও ঠিকমত ডোবেনি। ইস্কুল মাঠে বড় ম্যাচ ল, দেখতে গেছি, কেনারামও গেছে। টুনিঠাকুর (হোস্টেলের রাঁধুনী) পাতে হাঁপাতে এসে বলল যে, হোস্টেল-সুপার আমাদের দু জনকে ডাকছে, নি। "আমাকে ?" "আমাকে ?" "হুঁ-রে বাবা, এখন চ দিনি" বলে টুনি র হাত ধরে টানতে থাকল। আমরা যে-বার কৃতকর্মের কথা ভাবছি, আর বছি। দোষের কিছু না পেয়ে খুব অস্থির হলাম, তাকে পীড়াপীড়ি শুরু লাম। "মুই কি-জানি।" বলে টুনি ঠাকুর এড়িয়ে গেল। এক সময় কুল-গেটে ঢুকলাম, খানিকটা ঘেসো মাঠ পেরুলে তবেই আশুবাবুর ঘর। দূর যেতে হল না, মাঠের মাঝ বরাবর চেয়ার পেতে হোস্টেল-সুপার বসে, র দু-তিন গজ তফাতে হেরিকেন হাতে আমাদের দশরথদা। দু-চারটে ঘাস- ড়ও হেরিকেনের চিমনীতে আছড়ে পড়ছে, আর ভুসো ধরছে আস্তে আস্তে। ব নিচু স্বরে কথা হচ্ছিল, আমাদের দেখে দু-জনেই থামল। "যাও, দশরথ ত এসেচে, বাড়ি যাও।" বলে আশুবাবু ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন। আমি র কেনারাম দশরথদার মুখের দিকে চেয়ে আছি, "খবর সব ভাল ত ?" রথদা লাঠি আর হেরিকেন হাতে যাবার জন্য তৈরী হয়ে বলল, "ভাল।" বে দু-চারটে বই পড়ার মত নিয়ে আসি ?" "কিছু জামা কাপড়— ?" রথদা প্রায় ধমকে উঠল, "ও সবের কি দরকার, কাল তো আসচিস।" অগত্যা ল হাতেই দশরথদার পিছু নিলাম। হেরিকেন হাতে লোকটা হাটতলা ড় গেল, এবার মুচিপাড়ার ভিতর দিয়ে ধানক্ষেতে নেমে যাবে। সবুজ আর ঘন বোয়ালি, ধানে ফুল আসতে আর দেরী নেই। এখন রাত বলে ঠিকমত র হয় না, সব কিছুই আঁধার লাগে। দশরথদা হাতের লাঠিতে দু-ধারের ল গাছগুলো সরিয়ে যেতে যেতে বলে, "আয়, সাবধানে আসিস।" ধান- তের উপর হাওয়া আছড়ে পড়ল, তার হুরহুর আওয়াজ, আর কোথাও াল ডাকল। এ সময় কেনারাম দশরথদার ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, "দীনুকাকা মন আছে ?" দশরথদা তক্ষুনি জবাব দিল না, পরে বলল, "বিকেলে বাড়া- ড় হয়েছিল, বড় ডাক্তার আসবার কথা আছে।" এ সময় পিছন থেকে চেঁচিয়ে । উঠি, "দশরথদা, তুমি কিছু লুকোচ্চ ?" "ধুর পাগলা কি-আবার লুকোব।" দশরথদা হাসল। আমরা বাজে-শিমুলের কাছাকাছি এসে গেছি। সেই কুষ্ঠরোগীর ঘর থেকে একটা বোঁটকা গন্ধ উড়ে এলো, যা আমি কোনদিন করিনি সেই নাকে রুমালচাপা, আজ যেন মরিয়া হয়ে ক'র ফেললাম। তারপর মনে হল, কুষ্ঠরোগীটা আমাকে ভর্ৎসনা করতে এই বুঝি পিছনে এসে গেছে। তাকে দেখবার জন্য ঘাড় ঘোরাতেই আঁতকে উঠলাম, "দশরথদা-আ-আ।" কেনারাম আর দশরথদা আচমকা থেমে পড়ে বলে, "কি-ই কি-হল ?" ততক্ষণ সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি, বললাম, "না, কিছু না"। দশরথদা বলল, "নির্ঘাৎ ভয় পেয়েচিস।" বলে আমাকে আগলে রেখে হাঁটতে থাকল। আমরা ডুঙি করে সেই ছোট্ট নদীটা পেরুলাম, তারপর চরে উঠলাম। তার আগে বেশ কবার জানতে চেয়েছি দশরথদার কাছে, "দশরথদা, বাবা ভাল আছে ত ?" কেনাও বলেছে, "দীনুকাকা ভাল ত ?" দশরথদার সেই এক জবাব, "ভালই"। হেরিকেনটায় ভুষো পড়ে পড়ে আর তেমন আলো দিচ্ছে না, বোধ করি তেলও ফুরিয়ে আসছে। সেই ক্ষীণ আলোয় আমরা তিনজন দু পায়ে ধুলো উড়িয়ে হাঁট- ছিলাম। আমাদের ভিতর অল্প কথাবার্তা হলেও আমরা তিনজনই নিঃশব্দে হাঁটা পছন্দ করছিলাম বেশি। আর এভাবেই চরটা পেরিয়ে আমরা ঢাউস নদীটাব কাছাকাছি হলাম। তখন শ্রাবণ মাস, সুতরাং ভরা নদী, দিনে মাত্র দু-তিনবার ঘাট পারাপার করা হয়, মাঝি হয়ত নৌকো বেঁধে চলে গেছে, হয়ত শেষভরা নিয়ে গেছে। এ সব ভাবতে ভাবতে জলের কিনারার দিকে এগুচ্ছি, আর তখনই চোখে পড়ল পানসিটা, জলের উপর থলথল করে ভাসছে। একে একে তিনজনই উঠে যেতে নৌকো খুলে দিল, যেন বলাই ছিল আমরা আসব, ঠিক এত রাতেই তুমি তৈরী থেকো, সেই মত নৌকো তৈরী রেখেছে মাঝি। দশরথদা নৌকোয় চড়ে মাঝির গা ঘেঁষে বসল, তাদের দু-জনের ভিতর তারপর কিছু কথা হল। নৌকো তরতর করে জল কেটে এগুচ্ছে, হাঁসের মত। এ সময় আরেকবার বলতে মন গেল, "দশরথদা, তুমি বাবার কথা ঠিক বলচ ত ? কোন কিছু লুকোচ্চ না ত ?" চারদিকে জল, জল আছড়ে ভেঙে পড়ছে—তার শব্দে আর কোন কিছুই ঠিকমত বলা যাচ্ছে না। অর্জুনগাছের গোড়ায় নৌকোটা থামল, লাফ মেরে তিনজনই উঠে এলাম, বিপরীত চাপে নৌকোটা আর কিছুদূর ভেসে গেল, মাঝি তাকে ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আনতে কসরৎ করছে। "দশরথদা, দীনুকাকাকে কোন ডাক্তার দেখতে আসবে, বললে না তো ?" কেনারাম জানতে চাইল। চুপচাপ হেঁটে যেতে তার আর বোধ হয় ভাল লাগছে না। দশরথদা তক্ষুনি জবাব দিল না, পরে বলল, "সেন ডাক্তার"। "কে, সুধীর সেন ?" "হুঁউ"। ডাক্তারের নাম শুনে খুশী হলাম, এ নামে কে না খুশী হয়, বড় ভাল ডাক্তার, শহর থেকে আসে। একটা রাতচরা পাখি বোঁ বোঁ করে দু-চারবার মাথার উপর ঘুরে সামনের দিকে উড়ে উড়ে যেতে থাকল। আমার কেন জানি মনে হল, দশরথদা সত্যি বলছে না। মনে হল, চেঁচিয়ে তাকে বলি, "দশরথদা, তুমি মিথ্যে বলচ, তোমার সব চালাকি বুঝে গেচি।" মুখফুটে বলতে পারছি না, পাখিটা প্রাঁ প্রাঁ করে ফিরে আসছে, এসে মাথার উপর চক্কর মেরে নদীর দিকে উড়ে গেল। আমরা নদী ছেড়ে অনেকটাই এসে গেছি, আগে দশরথদা, সেই ভুষো মাথা হেরিকেন হাতে। এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল, আমাদের দিকে ফিরে যেন কিছু বলবে বলে হাঁ করল। "থাক থাক।" বলে ফের চলতে থাকল। গ্রামের মাথায় ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার তলায় এসে দশরথদা বলল, "দীনুকাকা নেই, আজ বিকেলেই মারা গেচে।" আমরা হাউ হাউ কেঁদে গাঁ মাথায় করে বাড়ি এলাম।

বাবা চলে গেল, দাহ-টাহ হয়ে যাবার পর, দু-তিন দিনের ভিতর আমার মা বাবার কাজগুলো দেখতে লাগল। জমিজমার হিসাব বুঝে নেয়া, লাগানো ধানের জমি থেকে ঘাস নিড়নো, কুমড়োর খেতি পরিচর্যা করা, জঙ্গলে গিয়ে জ্বালানি নিয়ে আসা, ইত্যাদি কাজ মা নিজেই করতে থাকল। তাই দেখে আত্মীয়স্বজনরা বলাবলি শুরু করল যে, তাকে স্বামী-মৃত্যুর শোক একদম ছুঁতে পারেনি, নাকি বউটার জন্যই লোকটা অকালে মরে গেল। এরই ভিতর একদিন ঘর-ভরতি (মা ছাড়া) লোকের কাছে দশরথদা সেই মৃত্যু সংবাদ দেয়ার গল্পটাও ফলাও করে বলল। নাকি নদীর আগে, নদীতে নৌকোয় চড়ে খবরটা দিলেও দিতে পারত, পাছে খবর পেয়ে শোকে-দুঃখে নাবালক ছেলে দুটো নদীতে ঝাঁপ দেয়—সেই ভয়ে বলতে পারেনি। এটুকু বলার পর দশরথদা খুব হেসেছিল, তারপর হাসতে হাসতে বলেছিল, "অবিশ্যি, খবর পেয়ে কেনারামই আ-গে কেঁদেছিল।"

আরও অনেকদিন কেটে গেছে, বাবার পোঁতা সেই কুমড়ো খেতিতে তখন ফল আসছে, কালচে সবুজ রঙের ফল। মা আর আমি, প্রায়দিন গিয়ে ঘুরে ঘুরে খেতি দেখে আসি। সেদিনও গেছিলাম, সারা খেতি জুড়ে গাঢ় সবুজের ঢেউ দিচ্ছিল, তার মাঝে মাকে হারিয়ে ফেললাম। "এ কি মা, লুকলুকানি খেলচ না তো!" সেই ছেলেবেলার মত ভেবে মাকে খুঁজতে লাগলাম। এক সময় দেখি, খেতির সব চেয়ে বড় কুমড়োটা বুকে আঁকড়ে মা বসে আছে, তার চোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরছে। দেখতে পেয়ে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছল, বলল, "খোকা, তোর বাবার হাত বড় পয়া ছিল রে।"

সেই মাও একদিন চলে গেল, এখন আমি একা, শহরে থাকি, বড় চাকরি করি। নির্ঝঞ্ঝাট থাকতেও চাই, তবু মাঝে মধ্যে "হঠাৎ টেলিগ্রামের" মত সেই কথাটা ভেসে আসে, "কেনারাম আ-গে কেঁদেছিল।" তখন সর্বশক্তি জড়ো করে, সেই তখনকার বয়স, সেই অবিকল মুহূর্তে ফিরে প্রতিবাদ করতে মন চায়, "এ তোমরা কি বলচ, বাবার মৃত্যু-খবরে আগে কাঁদতে পারিনে বলেই কি বাবাকে ভালবাসি না, নাকি।" বলা হয় না, আর এভাবে, কোনদিনও বলা হবে না, তাই কথাটা মনে এলে অবলার মত কাঁদি। যেমন এখন এই দেখ আমার দু-চোখে টস টসে জল, হাতের কোটো [illegible]।

শেষ সাক্ষাৎ

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের মণিমামা মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। সুদর্শন সুগায়ক শচীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের খুবই প্রিয় ছিলেন। ভাগলপুরের বিখ্যাত গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চায় সমৃদ্ধ ছিল। এই ঐতিহ্যের ধারা শচীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। গানে এবং অভিনয়েও সহজাত দক্ষতা ছিল তাঁর। বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনে ও অভিনয় দেখে শরৎচন্দ্র প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতেন।

ছাত্রজীবনেই শচীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রেরণা ছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র এবং তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ (শচীন্দ্রনাথের কাকা)। পরবর্তী কালে প্রবাসী, বসুমতী প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অনেক ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। 'দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকা গত কয়েক বছরে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ ও মনোজ্ঞ রচনাগুলির পরিচয় পেয়েছেন।

শচীন্দ্রনাথ ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। বিহারের মুঙ্গের, অধুনা বেগুসরাই জেলার এক সুবৃহৎ বর্ধিষ্ণু গ্রামে চিকিৎসক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। হৃৎশূলে ও উচ্চ-রক্তচাপ জনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে শেষজীবনে দেওঘরে নিজের বাড়িতে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। পরে সেখানকার বালানন্দ আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে বেশ কিছুকাল সুনামের সঙ্গে চিকিৎসকের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। দরিদ্র ও নিপীড়িত রোগীদের প্রতি তাঁর গভীর মমতা ছিল।

গত ৪ জুন ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি অকস্মাৎ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে পরলোকগমন করেন। বর্তমান রচনাটি মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখা, সম্ভবত এটিই শচীন্দ্রনাথের শেষ রচনা। এ প্রসঙ্গে তাঁর পুত্র শ্রীরজতকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল। 'বাবার মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে "শেষ সাক্ষাৎ" প্রবন্ধটি রয়েছে দেখলাম, এটি আপনাদের কাছে পাঠানো হয়েছে কিনা জানি না। যদি না হয়ে থাকে এই ভেবে এর অনুলিপি পাঠালাম, ইদানীং তাঁর লেখা শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে শেষ এবং সম্ভবত তাঁর জীবনেরও শেষ লেখা।'

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বালীগঞ্জের অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছি। ১৯৩৭-এর মাঝামাঝি হবে, জানতে পেরেছিলুম তিনি খুবই অসুস্থ, শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। এর কয়েক মাস পরেই তিনি পরলোক গমন করেন।

যে কোন প্রয়োজনেই আমার যখনই কলকাতা যাওয়ার সুযোগ ঘটেছে, তখন শত কাজের মধ্যেও একটি অবশ্য কর্তব্য মনে করে, সময় করে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নিশ্চয় একবার দেখা করেছি।
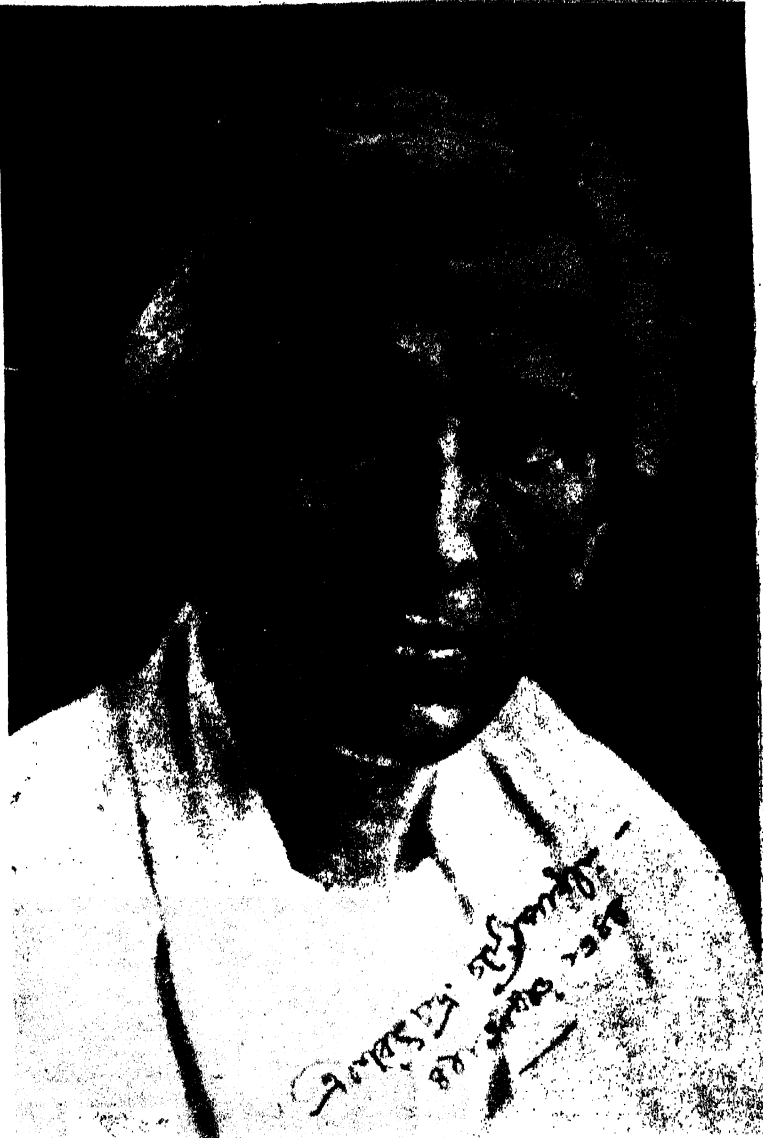
সেবার যখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলুম তখন বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে হবে।

বাইরের ঘরটা খোলাই ছিল কিন্তু লোকজন কাউকে দেখতে পেলাম না। প্রায় দশ পনর মিনিট অপেক্ষা করার পর একটি চাকরের মত লোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, শরৎবাবু বাড়িতে আছেন?

আছেন, তবে তাঁর খুব অসুখ কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।

আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল। ভাবলুম মিছিমিছি খবর নিতে গেলুম, বাড়ি তো চেনাই, এবং বাড়ির প্রায় সকলেই আমাকে চেনেন, সোজা ভেতরে চলে গেলেই হতো।

আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ভাগলপুর থেকে; আমি বাবুর ভাই হই।

দাঁড়ান, একবার জিগেগেস করে আসি—কি নাম বলবো?

শচী বললেই চিনতে পারবেন, বলো ভাগলপুরের শচী।

সে দ্রুতপদে ওপরে উঠে গেল এবং মুহূর্তেই নেমে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে চলুন, ডাকছেন।

দোতলায় উঠে দেখি, মাঝের ঘরটায় খাটের ওপর শুয়ে, একটি কাঁচের গ্লাসভরা লেবুর রস নিয়ে তাঁর স্ত্রী (আমাদের বউদিদি, মাথার কাছে দাঁড়িয়ে অনুনয় করে সেটি খেতে বলছেন।

আমি ঘরে প্রবেশ করতেই শরৎচন্দ্র চেঁচিয়ে উঠলেন—দেখেছ, ইনি আবার নীচে থেকে দেখিয়ে খবর পাঠিয়ে তবে এসেছেন। হ্যাঁ আবার খবর দিয়ে আসবি কিরে! মস্ত হয়ে উঠেছিস দেখছি?

লজ্জিত ভাবে বলি, আপনি খুব অসুস্থ ছিলুম, তাই মনে করলুম—

বুঝেছি। তুই ভাগলপুরের গাঙ্গুলী ছেলে সেটা ভুলে যাসনে। বোস।

তার পায়ের দিকে একটা টুল রাখা ছিল, সেটা দেখিয়ে বসতে বললেন।

বড়দি তার দিকে কমলালেবুর রসভরা গ্লাসটা এগিয়ে ধরে বললেন, এটা খেয়ে নাও।

হচ্ছে হচ্ছে, বিরক্ত ভাবে শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—কেবল এটা খাও আর ওটা খাও, অত খাওয়ালে কি আর রোগ সারে? হ্যাঁরে তুই বল না, তুইও তো ডাক্তার!

হেসে বললুম, ওতো একটু কমলা লেবুর রস মাত্র।

তাঁর ভাবে ভঙ্গিতে ঐ রসটুকু খাবার অনিচ্ছাই প্রকাশ পাচ্ছিল। মুখে বললেন—মাত্র বলিসনে তুই তো দেখিসনি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ ধরনের কত কি যে খেতে হচ্ছে তার ঠিক নেই—কখনও ওষুধ কখনও পথ্য কখনও বা খাবার, চলেইছে, বিশ্রাম নেই।

বড়দি আবার গ্লাসটা এগিয়ে ধরলেন।

দাঁড়াও উঠে বসি, শচী প্রণাম করবে তো!

উঠে বসতে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম বড়দিকেও। কমলা লেবুর রসটা হাতে নিয়ে নিঃশেষে পান করে বললেন, কঠিন প্রাণ আমার, বুঝলি শচী—নইলে এত অত্যাচার সয়? অন্য কেউ হলে কবে মরে যেত!

বড়দি তোয়ালে এগিয়ে দিলে সেটা নিয়ে মুখ মুছে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এর বাবা, আমার মণিমামা কত অল্প বয়সে চলে গেলেন, কলেরা হলো, দিন তিন চার ভুগলেন—চিকিৎসার চূড়ান্ত হলো, তবু বাঁচান গেল না। আর আমার ভোগান্তির শেষ নেই।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টায় বড়দি মাঝখানে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা শচীর তো এমন সুন্দর চেহারা, ওর বাবা কেমন দেখতে ছিলেন?

শরৎচন্দ্র মুচকি হেসে বললেন, ভাগনেটিকে দেখে বুঝতে পারছ না, তার মামা কেমন দেখতে ছিলেন!

সবাই হেসে উঠি, বড়দি বললেন, অমনি। নইলে—এ এমন দেখতে কি করে হলো?

ও তো গাঙ্গুলী বংশ ছাড়া, নইলে গাঙ্গুলীরা সব (নিজেকে দেখিয়ে) আমারই মত সুপুরুষ! শচীর মা যে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। তোর মাকে মনে পড়ে রে? কি যত্নই আমাকে করতেন!

মনে পড়বে না কেন? আমি ত তখন অনেক বড়, সে বছর ডাক্তারী পাশ করি।

তোর বাবাকে?

খুব।

একটু ভেবে বললেন, মণিমামা শুধু আমার সহপাঠী ও বাল্যসঙ্গীই ছিলেন না আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিলেন, আমরা দুজনে প্রায় সমবয়সীও ছিলুম। আমি তাকে খুবই মানতাম এবং মান্যও করতুম, আচ্ছা তুই বলতে পারিস, তোর বাবার মৃত্যু সময়ে প্রায়শ্চিত্ত করানো হয়েছিল?

বোধ হয় না। আমার তো প্রায় সব কিছুই স্পষ্টই মনে আছে, প্রায়শ্চিত্তের কথা তো মনে পড়ে না,—কারুর মুখে কখনও শুনিনি।

কিন্তু আমার মনে হয়, আমার একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিতে পারলেই এই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে যাই!

দুঃখিত ভাবে বলি—এসব কথা আপনি কেন ভাবছেন জানি না, আপনি ত এসব বিশ্বাস করেন না বলেই জানি।

করি রে করি, মনে মনে সবই বিশ্বাস করি। বিশেষ এই মরণ কালে বিশ্বাস না করে উপায় নেই!

বড়দি বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমার কি এসব ছাড়া আর কথা নেই। রাতদিন কেবলই ঐ মরার কথা!

শরৎচন্দ্র বিরস হাসি হেসে বললেন—এছাড়া আর কি কথা আছে বলো, সব কথাই তো ফুরিয়ে আসছে।

বড়দিদি সেই ভাবেই আমাকে বললেন, দ্যাখো না ভাই—সেবার দেওঘরে গিয়ে অতদিন রইলেন, বাবা বদ্যিনাথের মন্দিরে একটি দিনের জন্যেও একবার গেলেন না পর্যন্ত—দর্শন বা পুজো করা তো দূরের কথা!

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন,— তাই বোধহয় বাবা বদ্যিনাথ আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন রে—কিছুতেই আর নিষ্কৃতি দিচ্ছেন না—রোগ যন্ত্রণায় ভুগিয়ে ভুগিয়ে মারছেন। একটু থেকে বললেন মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল, তাঁর ধামে গেলুম, অতদিন রইলুম, ঘুরলুম ফিরলুম আর তাঁকেই বাদ দিয়ে চলে এলুম! উঃ মহাপাপ করা হয়ে গেছে!

বড়দিদি আর কোন কথা না বলে দুটি টাকা এনে শরৎচন্দ্রের মাথায় ছুঁইয়ে, আমার হাতে দিয়ে বললেন, তুমি ত ভাই দেওঘর হয়েই ফিরবে, তোমার দাদার নামে বাবার পুজো দিয়ে দিও, আর যদি সুবিধে হয়, বাবার ফুল চন্দন একটু পাঠিয়ে দিও।

নিশ্চয় দোব।

শরৎচন্দ্র বললেন, তাই দিসরে ভাই, তাতেই যদি রেহাই পাই।

বৈদ্যনাথ ধামে এসে নিজে মন্দিরে গিয়ে শরৎচন্দ্রের নামে পুজো দিয়ে বাবার প্রসাদী ফুল চন্দন ইত্যাদি খামে ভরে পাঠিয়ে দিই এবং যথাসময়ে প্রাপ্তি সংবাদও পাই।

চলে আসবার সময় দুজনকে প্রণাম করতে শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন, নে নে ভালো করে প্রণামটা সেরে নে,— কে জানে আর অবসর হবে কিনা!

আমার চোখে জল ভরে আসতে দেখে কাছে ডেকে পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন,—কাঁদছিস? তুই কি পাগল নাকি!

কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়ে তাঁর দুই চোখের কোণেও জল ভরে এসেছিল।

বড়দি চোখে আঁচল চেপে সেখান থেকে সরে যান।

সত্যিই জীবনে তাঁকে প্রণাম করার অবসর আর পাইনি।

তাঁর সঙ্গে আমার সেই শেষ সাক্ষাৎ।
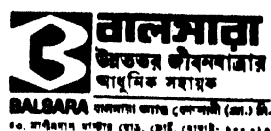
গ্লানি অনেক মুছে দিয়েছে লর্ডস টেস্ট

অতীতে অনেক টেস্ট খেলাতেই ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা প্রথম ইনিংসে ব্যর্থতার পর দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণ ব্যাট করেছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল তাই রসিকতা করে একবার বলেছিলেন, "আমাদের ভারতীয়রা দ্বিতীয় ইনিংসটা আগে খেলে না কেন?"

এবার লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে শোচনীয় ব্যর্থতার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের গৌরবময় ব্যাটিং সর্দার প্যাটেলের সেই উক্তিকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সত্যিই একই টেস্টে পাশাপাশি সামগ্রিক ব্যর্থতা এবং সম্মানে মোড়া সাফল্যের এমন ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না।

সাফল্য বলতে আমি জয় বোঝাতে চাইছি না। জয়ের কোনো প্রশ্নও ছিল না। বরং ইনিংস পরাজয়ের আশঙ্কা ছিল ষোল আনা। এই প্রতিকূল পরিবেশ এবং মনের উপর অসম্ভব চাপ থাকা সত্ত্বেও ভারত যেভাবে দ্বিতীয় টেস্ট ড্র করেছে, জয়ের চেয়ে তার মূল্য কিছু কম নয়। অন্তত এইটুকু বলা যায়, ইংল্যান্ড এ টেস্টে জিতলেও ক্রিকেট-মক্কায় ভারতীয় ক্রিকেটের মর্যাদা ক্ষুন্ন হত না।

ইংরেজরা, শুনেছি বচনে সংযত এবং তাঁদের লেখনীতে পরিমিতিবোধের মাত্রা বেশি। কিন্তু জাতীয় দলের দুর্বলতা ঢেকে খেলোয়াড়দের বড় করে দেখাতে ইংরেজ সাংবাদিকদের যেমন জুড়ি নেই, তেমন তাঁদের প্রতিপক্ষ দলের শক্তিকে খাটো করে দেখাতেও তাঁরা অদ্বিতীয়। হয়তো এর পেছনে আছে নিজেদের খেলোয়াড়দের প্রেরণা জোগাবার চেষ্টা।

এজবাসটন মাঠের প্রথম টেস্টটির কথাই ধরা যাক। ভারত ইনিংস ও ৮৩ রানে পরাজিত হবার পর বেশির ভাগ সংবাদপত্রে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নস্যাৎ করে দিয়ে সাধারণের চোখে তাদের অযোগ্যতার চিত্রটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। সবচেয়ে তিক্ত ও কটু সমালোচনা করা হয়েছিল 'সানডে পিপল' পত্রিকায়। লেখক অতীতের নামী ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান। তিনি লিখেছিলেন, "ছেঁড়া পোশাক পরা ছন্নছাড়া একটি দল ভারতের টেস্ট দল বলে নিজেদের চালাচ্ছে, যে দলে শুধু গাভাসকর ও বিশ্বনাথ ছাড়া আর কারো শক্তিশালী ইংল্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী দলে স্থান পাবার যোগ্যতা নেই।"

গাভাসকর এবং বিশ্বনাথ ছাড়া ভারতের আর কারো ইংল্যান্ডের সঙ্গে টেস্ট খেলার যোগ্যতা নেই—এটা অপর খেলোয়াড়দের যোগ্যতা অস্বীকার করা এবং সত্যের অপলাপ। অতীতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ভারতের জয় এবং সেই সুবাদে রাবার লাভ সত্ত্বেও আমরা ভারতীয় সাংবাদিকরা কিন্তু ইংল্যান্ডের ক্রিকেট শক্তিকে এ ভাবে হেয় করার কথা কল্পনাই করতে পারিনি। অপরদিকে যে কোন দেশের দলের বিরুদ্ধে ভারত ব্যর্থতার পরিচয় দিলে সেই ব্যর্থতার ছবিটাই বড় করে তুলেছি, আবার সাফল্যে সাধুবাদও জানিয়েছি।

এবারের এই লর্ডস টেস্টের কথাই বলছি। টসে জয়ের পর মাত্র ৯৬ রানে ইনিংস শেষ করায় সব সংবাদপত্রেই খেলোয়াড়দের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। ধিক্কার জানানো হয়েছে তাদের দায়িত্ববোধের অভাবের। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয়দের শৌর্যমিশ্রিত সুন্দর ব্যাটিং প্রথম ইনিংসের গ্লানি অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে। সাধুবাদ তাদের অবশ্যই প্রাপ্য।

মন্দ আবহাওয়া এবং বৃষ্টির জন্য ৫ দিনে ৩০ ঘণ্টা খেলার সময়ের আট ঘণ্টার মতো সময় নষ্ট না হলে লর্ডসের এই দ্বিতীয় টেস্ট জিতে ইংল্যান্ড সিরিজে ২—০ এগিয়ে যেতে পারত কিনা সেটা অনুমানের ব্যাপার। হয়তো পারত। অবশ্য তাদের

অধিনায়ক বেঙ্কটরাঘবন ফটো : নিখিল ভট্টাচার্য

গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ ফটো : তারাপদ ব্যানার্জী

অনুকূল ছিল। কিন্তু ইংল্যান্ড জিতলেও—
লিখেছি, ভারতীয়দের সাহসসুন্দর ব্যাটিং এবং স
শক্তি সমভাবে প্রশংসা পেত।

দীর্ঘ ৪৭ বছর আগে এই লর্ডসেই টেস্ট ক্রি
ভারতের প্রথম অভিষেক। এই খেলাটি
ইংল্যান্ডে ২৭টি টেস্ট খেলার মধ্যে ভারত জি
মাত্র একটি টেস্টে, ১৯৭১ সিরিজের খেলায়।
এর আগে ৮টি টেস্টের মধ্যে ৭টিতে হেরে গেছে
করেছে একটি টেস্ট। এবার নিয়ে ড্র হল দুটি।
অভিষেক টেস্টে ক্রিকেটের পূত মক্কায় ভারতী
যেমন গৌরবের নজির আছে, তেমন উনিশশো বা
সিরিজে লর্ডসে আছে ভারতের ভিনু মানক
অলৌকিক এক কীর্তিগরিমা। বচনে সংযত ই
ক্রিকেট লিখিয়ে আজও স্বীকার করেন লর্ড
৯৫ বছরের টেস্ট ইতিহাসে মোট ৭০টি খেলার
মানকড়ের ভূমিকাই একক কীর্তির বড় নজির।

সেই টেস্টে মানকড়ের ভূমিকা কী? প্রথম ই
৭২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে চোখ ঝলসানো ১৮৪
এবং তৃতীয় উইকেট জুড়িতে বিজয় হাজারের
২১১ রান করার রেকর্ড। দীর্ঘ সময় ব্যাট
মাঠে কাটিয়ে আবার বলের চমক। ৭৩ ওভার
করে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ৫টি উইকেট দ
দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪ ওভার বোলিং। ক্রিকেট বিশে
স্বীকার করেছিলেন অলৌকিকতা ভর না
পরাজিত পক্ষের কোনো খেলোয়াড় এমন কাজ
পারে না।

এই সিরিজের লর্ডস টেস্টের আলোচনার পর
গত ভিনু মানকড়ের সেই অনন্য কীর্তির কথা
কারণেই স্মরণে আসছে যে, দিলীপ বেঙ্গসর
এবং গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ দুজনেই সেঞ্চুরি করে
একক গৌরবের পর জোড় গৌরবের উজ্জ্বল নজি
লর্ডসে ভারতের আর কারো সেঞ্চুরি করার কৃ
নেই।

বার বার লর্ডস কথাটির উল্লেখে যারা দি
দোষ আবিষ্কার করবেন তাদের মনে রাখা দর
বিশ্ব ক্রিকেটের পীঠভূমি হচ্ছে লর্ডস। ওখানে
খেলার সুযোগকে যে কোনো বড় ক্রিকেটার জীব
বিশেষ ঘটনা বলে মনে করেন। ওখানে যে-কোন
কৃতিত্ব ক্রিকেট ইতিহাস ও সাহিত্যের অঙ্গীভূত
ওঠে। সুতরাং বিশ্বনাথ (১১৩) ও বেঙ্গসরকর
(১০৩) সেঞ্চুরি এবং দ্বিতীয় ইনিংসের তৃ
উইকেটে দুজনের ২১০ রান যোগের ঘটন
স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে এই টেস্টে '
অফ দ্যা ম্যাচ'-এর সম্মানকে দিলীপ বেঙ্গসর
তাঁর খেলোয়াড় জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে স্ম
করবেন, আরো বড় কোনো গৌরব অর্জন না
পর্যন্ত। সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডের চৌকস খেলোয়
ইয়ান বথামের জীবনেও মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে লর্ড
যখন তিনি গাভাসকরের উইকেটটি দখল করে
সময়ের মধ্যে শত টেস্ট উইকেট দখলে নতুন রেক
করেছেন।

দুই দলের প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং লক্ষ কর
একটা দারুণ বৈসাদৃশ্য দেখতে পাব। ইনিংসের
গড়ায় কিন্তু তেমন বৈসাদৃশ্য ছিল না। ভারতের ৪
উইকেট পড়ে গিয়েছিল ৭৫ রানের মধ্যে। ৭
রানের মধ্যে পড়েছিল ইংল্যান্ডের ৩টি উইকে
অথচ দেখুন, কীভাবে ভারতীয় ইনিংসে ধস এসে
আর কীভাবে ইংল্যান্ড ইনিংসের হর্ম্য তৈরি হয়েছে

ভারতের শেষ ৭টি উইকেট পড়ে মাত্র ২১ র
যোগ হয়ে। শেষ ৫টি পড়ে ১৭ রানের মধ্যে। শে
৪টি উইকেট পড়ে একটিও রান যোগ না হয়ে
তার মধ্যে গরুর গাড়ি চাপা পড়ার একটি ঘটনা
আছে। অধিনায়ক বেঙ্কটরাঘবনের রান আউট হব
ঘটনা।

অপরদিকে ৩ উইকেটে ৭১ রান থেকে
উইকেটে ৪১৯ রানে টেনে নিয়ে ইংল্যান্ড ইনিংসে
সমাপ্তি ঘোষণা করেন মাইক ব্রিয়ার্লি। চতু
উইকেটে গাওয়ার-র‍্যানডল জুড়ির ১১৪ রান যো
করার কথা ছেড়ে দিচ্ছি। অষ্টম উইকেটে মিলার

দুজনে দুজনার

যেমন উইল্‌স ফিলটার।
ফিলটার আর তামাকের
অপূর্ব মিলন।
স্বাদে পরিপূর্ণ তৃপ্তি—
প্রতিবার, প্রতিক্ষণ।
লক্ষ লক্ষ ধূমপায়ীর
এটি ছাড়া মনে ধরে না।
উইল্‌স ফিলটার।
একবার ধরলে এ ছাড়া
চলে না।

**ভারতের
সর্বাধিক বিক্রীত
ফিল্‌টার সিগারেট**
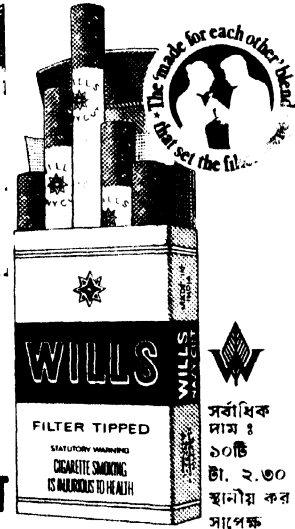
উইল্‌স ফিলটার
তামাক ও ফিলটারের অপূর্ব সমন্বয়

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

WF 9245-4 RI

টেলার যোগ করেন ১০৩ রান, যেটা ভারতের গোটা ইনিংসের ৯৬ রানের চেয়েও বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মোটামুটি সূচনার পর এক দলের শেষদিকের ব্যাটসম্যানদের দৈন্য প্রকটভাবে ফুটে ওঠে, আর এক দল আপাতদৃশ্য মন্দ সূচনার পর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে শেষদিকের ব্যাটিং সম্পদে।

এর পর ভারত ম্যাচ বাঁচাতে পারবে এটা ছিল প্রায় কল্পনার বাইরে। কেননা এজবাসটন টেস্টে ইংল্যাণ্ডের ৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার করা ৬৩৩ রানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল ২৯৭ রানে। ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিল ২৫৩ রান। ঘাটতি ছিল পুরো একটি ইনিংস ও ৮৩ রানের। সেই ইংল্যাণ্ড দল লর্ডসে প্রথম দফার ব্যাটিংয়ে যখন ৩২৩ রানে এগিয়ে গেল তখন ভারতের আবার ইনিংসে হারের শঙ্কাটাই বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের পেস ও স্পিন বোলারদের বল গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলে খেলাটি ড্র করেন বিশ্বনাথ-বেঙ্গসরকর-গাভাসকর-চৌহান।

পঞ্চম দিনের শেষ দিকে ভারত যখন ৪ উইকেটে ৩১৮ রান তোলে তখন খেলায় জয় পরাজয় সম্ভাবনা ছিল না বলে ম্যাণ্ডাটরি ওভারের ১১টি ওভার বাকি থাকতেই ইংল্যান্ড ড্র মেনে নিয়ে খেলা ছেড়ে দেয়।

মহীন্দার অমরনাথ এবং চন্দ্রশেখর চোট আঘাতে অসুস্থ থাকায় ভারতকে সীমায়িত আক্রমণ ক্ষমতা নিয়ে দ্বিতীয় টেস্টে লড়াই করতে হয়েছে। মাত্র দুজন মিডিয়াম পেসার কপিলদেব ও ঘাউড়ি এবং দুজন স্পিনার বেদি ও বেংকটরাঘবনের বল খেলতে ইংল্যাণ্ড ব্যাটসম্যানরা তেমন বেগ পায় নি। কয়েকটি টেস্টে দ্বাদশ খেলোয়াড়ের দায়িত্ব পালনের পর যশপাল শর্মা এ টেস্টে প্রথম খেললেও যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাননি। প্রথম ইনিংসে করেন ১১ রান, দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার তেমন সুযোগ মেলে না। ৪ রান করে নট আউট থাকেন।

দিলীপ বেঙ্গসরকর ফটো : অলোক মিত্র

ইংল্যাণ্ডের ইয়ান বথামের কৃতিত্বের কথা আগেই বলেছি। ২৩ বছর বয়সী সামারসেট কাউন্টির এই চৌকস ক্রিকেটারের প্রথম টেস্ট আবির্ভাব নটিংহামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। টেস্ট উইকেট অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপে আউট করে। দু বছর ৯ দিনের মাথায় শ উইকেটটি পান গাভাসকরকে প্যাভিলিয়নে (পাঠিয়ে। ১৬টি টেস্ট অবশ্য শত উইকেট দ রেকর্ড আছে ইংল্যাণ্ডের জি এ লোম্যানের। পেলেন ১৯ টেস্টে। কিন্তু এত কম সময়ের কেউ একশো উইকেট পাননি। ওয়েস্ট ইন্ডি অ্যাণ্ড রবার্টস পেয়েছেন দুই বছর ১৪২ দি মাথায়।

বথাম এখন আর একটি রেকর্ডের মুখে। আর তিনটি টেস্টের মধ্যে আর ১৪০ রান ক পারেন তবে ভিনু মানকড়ের দ্রুততম ডাব রেকর্ডটি ভেঙে দেবেন। মানকড় হাজার রান শত উইকেট লাভ করেন ২৩ টেস্টে। দ্রুততম ডাব সে রেকর্ড এখনো অম্লান।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর।

ভারত—প্রথম ইনিংস ৯৬ রান। (গাভা ৪২, বিশ্বনাথ ২১, অংশুমান গায়কোয়াড় যশপাল শর্মা ১১ ; ইয়ান বথাম ৫—৩৫, হেন ২—১৫, গুচ ১—১৬, লিভার ১—২৯)

ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংস—৯ উইকেট ডিক্লে ৪১৯ রান (গাওয়ার ৮২, টেলর ৬৪, মিলার র‍্যানডল ৫৭, বথাম ৩৬, বয়কট ৩২ ; কপিল ৩—৭৩, বেদি ২—৭৮, ঘাউড়ি ২—১১০, বেংক রাঘবন ১—৬৫)

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস—৪ উইকেট ৩১৮ (বিশ্বনাথ ১১৩, বেঙ্গসরকর ১০৩, গাভাসকর চৌহান ৩১ ; বথাম ১—৮০, লিভার ১—৬৯)

(খেলা ড্র)

মুকুল

ফাজার দোকান চুরমার!
এইয়ো...!

অরণ্যদেব বনাম হীরে-চোরের দল!
ধর তো ডেভিল!

ইইইইই

ধাঁই

ফোজা কোথায়?
এইটেই বেশি কথা বলছিল! এটাই বোধহয় দলের সর্দার।

এই তো সেই হীরে!
!
10-29
ক্রমশ

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

বই

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রঙ্গমঞ্চ। নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। মণ্ডল বুক হাউস। ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম কুড়ি টাকা।

অভিনয় - সংগীত - নৃত্য শিল্পের আবাল্য প্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণ কীভাবে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চের সংগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন তার কিছু কিছু ইতিহাস গিরিশচন্দ্রের জীবন ও অভিনয়ের গল্পসূত্রে সাধারণ পাঠক হিসেবে আমরা জানি। কিন্তু নলিনীরঞ্জন প্রায় তিন-শো পৃষ্ঠার এই সমুদ্রিত বইতে অভিনয়-প্রেমিক গদাধর সহজাত আকর্ষণে কেমন অভিনয় করতেন, যাত্রার পালার পুঁথি নকল করতেন, মেয়ে পুরুষের হাবভাব নকল করতেন, তাঁতির বউ সেজে নির্বিঘ্ন অন্দর মহলের মধ্যে ঢুকে পুরুষের অহংকার ভেঙে দিতেন—এই সব বর্ণনার সূত্র সংকেত দিতে দিতে গিরিশচন্দ্র ও সমকালীন রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র ঘটনাজালের মধ্যে চলে এসেছেন। গিরিশের জীবনের এক সন্ধিক্ষণে—যখন তিনি নাস্তিকতার জ্বালা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন—তখন তিনি শুনলেন ইন্ডিয়ন মিররে খবর বেরিয়েছে দক্ষিণেশ্বরের এক পরমহংসের কাছে কেশব সেনের দল যাতায়াত শুরু করেছেন। গিরিশ তখন সংশয়বাদী। তিনি ভেবেছিলেন, ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা ইত্যাদি বলতে শুরু করেছে—সেই রকমই এক পরমহংস তারা খাড়া করেছে। নিতান্ত কৌতূহলবশত পাড়ায় একজনের বাড়ি পরমহংস আসছেন শুনে দেখতে গেলেন, এবং হতাশ হয়ে হাসি চেপে ফিরে এলেন। দ্বিতীয়বারও বলরাম বসুর বাড়িতে পরমহংসকে দেখে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তারপর স্টার থিয়েটারে চৈতন্য লীলা দেখতে এলেন রামকৃষ্ণ। দেখে ভাবাবেশ হলো। গিরিশ সেই সময়টা ছিলেন না। শুধু দেখা করেই চলে গিয়েছিলেন। পরে শুনলেন। কিন্তু চতুর্থ সাক্ষাতে রামকৃষ্ণদেব তাঁকে নিজেই ডাকলেন। তারপর থেকে 'মঞ্চের রাজা' আর 'মঞ্চের দেবতার' বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মঞ্চের রাজা যদিবা বৈরাগ্য-ব্যাকুলতার টানে থিয়েটার ছাড়তে চান, মঞ্চের দেবতা লোকশিক্ষার জন্যেই বার বার তাঁকে থিয়েটারে ফিরিয়ে আনেন। অথচ এই থিয়েটারে তখন সমকালীন ব্রহ্মজ্ঞানীদের মতে 'বেশ্যাভিনয়ের দ্বারা সর্বনাশের দ্বার খোলা হইতেছে।' মঞ্চের দেবতার নির্দেশে যে প্রত্যাবর্তন ঘটে তার ফলেই প্রফুল্ল-বলিদান, জনা-বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেব চরিত সিরাজদ্দৌলা-মীরকাশিম ইত্যাদি জনপ্রিয় নাটক লেখা হয়েছিল। শিল্পমূল্যে যাই হোক, এই সব নাটকই রঙ্গমঞ্চকে সেকালে জীবন্ত করে রেখেছিল। ভক্তির বাড়াবাড়ি ছিল ঠিকই, কিন্তু নৈতিক শিক্ষাও জুগিয়েছিল। আবার ঐতিহাসিক নাটকগুলি স্বদেশী জাগরণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকাও নিয়েছিল। থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন ও তাঁর মানসিক পরিবর্তনের কাহিনীটি প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করে চমৎকারভাবে বলা হয়েছে।

থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের পতিতাদের নিয়ে অভিনয় এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণের সংগে তাঁর সংসর্গ নিয়ে যে সামাজিক জগতে বিচিত্র আলোড়ন হয়েছিল তার বিচিত্র ইতিহাস বইটির চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। গিরিশচন্দ্রের উৎসাহ ও রামকৃষ্ণের স্নেহধন্য হয়েই রংগালয়ের নটীরা নিজেদের আর্থিক সম্পদ সংগ্রহে মন দিয়েছিলেন। নটীদের ওপর সামাজিক বিষদৃষ্টির প্রখরতাও কমেছিল, আর সবচেয়ে বড় কথা, অভিনেত্রীদের প্রণম্য শিল্পীর মর্যাদাও সমাজ ধীরে ধীরে দিতে শুরু করছিল। পরের অধ্যায়ে দেখি, সন্ন্যাসের শুষ্কতা আনন্দ উপভোগের পথে বাধা সৃষ্টি করেনি বলেই রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় অভিনয় জগৎকে আপন করে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের শিষ্যরা সেই অভিনয় জগৎকে কী অসাধারণ মানবিক গুণে আপন করে নিয়েছিলেন বহু ঘটনা উল্লেখ করে লেখক তা দেখিয়েছেন।

ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু করে ক্ষীরোদ প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমরেন্দ্রনাথ, মনোমোহনের নাটকে এবং হারাণচন্দ্রের উপন্যাস-ভিত্তিক নাটকে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও চরিত্র কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা লেখক উদ্ধৃতিসহযোগে দেখিয়েছেন। নবম অধ্যায়ে রামকৃষ্ণের জীবন নিয়েই দানীবাবুর প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে যে সব নাটক লেখা হয়েছিল তার বিবরণ আছে। বিবরণ আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-যাত্রাপালার।

নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণ — শিল্পী : নন্দলাল বসু

সাম্প্রতিক কালের নট্ট কোম্পানী, তরুণ অপেরা, প্রদীপ অপেরায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গিরিশচন্দ্রের জীবন-ভিত্তিক পালা রচনা পর্যন্ত। চলচ্চিত্রে এই প্রভাব কতদূর বিস্তৃত তারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে আছে। দশম অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় অভিনয়-শিল্পীরা কে কীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তার চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে। বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, মণিমালা, হাবু দত্ত, সুরেন্দ্র দত্ত, অঘোর পাঠক, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, দানীবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী সরযূবালা, শিশিরকুমার ভাদুড়ী থেকে একালের রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অন্যতম শিল্পীরা যে রামকৃষ্ণের প্রভাবকে সক্রিয় প্রভাব বলেই মানেন তা এঁদের স্বীকারোক্তি সংগ্রহের মধ্য দিয়ে লেখক নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন। পরিশিষ্টে কিছু নতুন তথ্য আছে, আর বইটির সূচনাতেই কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি ও পোস্টার-প্রোগ্রামের ফটো-কপি বইটির মূল্য বাড়িয়েছে।

নলিনীরঞ্জন যে প্রচন্ড পরিশ্রম করে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সূত্রে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য ইতিহাস রচনা করেছেন তা একদিক থেকে আমাদের সামাজিক ইতিহাসেরও অন্যতম প্রামাণিক দলিল।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

বিলুপ্ত রাজধানী। শ্রীউৎপল চক্রবর্তী। প্রকাশনায় অমর ভারতী; ৮।সি ট্যামার লেন কলিকাতা-৯। মূল্য দশ টাকা।

'বিলুপ্ত রাজধানী' গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলার আটটি অবলুপ্ত রাজধানীর অতীত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শ্রীউৎপল চক্রবর্তী একজন অনুসন্ধিৎসু পর্যটক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে এসব রাজধানী পাঠভ্রমণ করেছেন। এই পাঠভ্রমণকালে তাঁর চোখের সামনে এসব রাজধানীর যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাই তিনি প্রকাশ করেছেন একজন পর্যটকের নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি নিয়ে একজন ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে, একজন জাত শিল্পীর সৌন্দর্যচেতনা নিয়ে এবং কখনো কখনো একজন কবির প্রাণস্পন্দন আবেগ নিয়ে। গ্রন্থের কোনু পর্যায়ে তাঁর কেনু দৃষ্টিভঙ্গী ছায়া বিস্তার করেছে তা সহজ চোখে পড়লেও গোটা গ্রন্থে তাঁর অস্তিত্ব একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবেই। সেখানে কোন প্রকার ভাবাবেগ বা পক্ষপাতিত্ব তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ এসব রাজধানীর ধ্বংসস্তূপে যাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে আছে তাঁদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান কেউ বা বৌদ্ধ। কিন্তু লেখকের সজ্ঞান পর্যবেক্ষণ গুণে এসব রাজধানীর নায়কেরা সাধারণ বাঙালীতে পর্যবসিত। নারীমাংসলোলুপ উচ্ছৃঙ্খল বাক্তি প্রতিভা যেমন এ দেশের আলোক ব্রাঅসকে ভালো বলেছেন, তেমনি পরধর্মবিদ্বেষী বিকৃতবুদ্ধিজনিত দুর্দান্ত শাসক ও দেশকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ। লেখক এসব বিলুপ্ত রাজধানীর মূক ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার ভেতর যেন সত্যি সত্যি 'বাংলার মুখ' প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন।

প্রথম অধ্যায়ে গোটা গ্রন্থের পটভূমিকা অঙ্কন করা হয়েছে। এই পটভূমিকায় তিনি প্রধানত বাঙলার প্রাচীন ভৌগোলিক সীমাই আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। এর পর অবশিষ্ট আটটি অধ্যায়ে আটটি রাজধানীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে মোহ ও আবেগের ভেতর দিয়ে।

সর্বপ্রথম বর্ণিত হয়েছে 'আনুমানিক ৩৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে খৃষ্টীয় ১ম, ২য়, ৩য় শতকের বাংলার রাজধানী গঙ্গের কাহিনী। এই রাজধানীর অস্তিত্ব আবিষ্কারে ব্যর্থ হলেও লোকমুখে শ্রুত বিভিন্ন প্রকার গল্প ও কিংবদন্তীর মাধ্যমে তিনি রাজধানীটিকে পাঠকের চক্ষুগ্রাহ্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তারপর বর্ণিত হয়েছে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ-এর পদরেণু ধন্য মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। তারপর বর্ণিত হয়েছে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের রাজধানী বাণগড়ের। পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে রাজধানী গৌড়ের বর্ণনা—যা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েছে রাজা লক্ষণ সেনের নামানুসারে লক্ষণাবতী রূপে এবং পরিণতি লাভ করেছে মুসলিম অভিযানের সাক্ষ্য হিসেবে লখনৌতিতে। এই অধ্যায়টির বর্ণনায় লেখক বহু তথ্যের অবতারণা করেছেন —যার ভেতর রয়েছে অধুনা আবিষ্কৃত সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক গৌড় অধিকারের অলীক কাহিনীর খণ্ডন প্রয়াস। এই প্রসঙ্গে নতুন তথ্য সন্নিবেশিত না হলেও লেখক ইতিহাসের প্রতি অনুগত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত রাজধানী দেবীকোটের বিবরণেও পূর্ববর্তী অধ্যায়ের রেশ রয়েছে যা মুহম্মদ-ই-বখত-ইয়ার খিলজীর স্মৃতিচিহ্নকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত। সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে পাণ্ডুয়া, পাণ্ডুনগর বা পরবর্তীকালে খ্যাত ফিরোজাবাদ রাজধানীর বর্ণনা। এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বাস্তব ও ইতিহাসসম্মত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে বাংলার এককালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে। এই অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাকে কোন কিংবদন্তী বা গাল-গল্প ভারাক্রান্ত [illegible] পারেনি। কারণ এর ইতিহাস [illegible]। লেখক গভীর আবেগ দিয়ে অধ্যায়টি রচনা করেছেন। বিশেষত "বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব' হতভাগ্য সিরাজের পরিণতিতে লেখকের বেদনা প্রতিটি পাঠকের অন্তরে করুণ ও মর্মস্পর্শী প্রতিধ্বনি তোলে। নবম অধ্যায়ে বর্ণিত বিষ্ণুপুরের কথা আলোচ্য অধ্যায়গুলোর তুলনায় দুর্বল বলেই মনে হলো।

এই গ্রন্থের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো লেখকের সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ—যাতে প্রত্যেকটি ব্যক্তির চরিত্র ও ঘটনাবলী ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত। এমনকি যে-সব স্থলে তিনি প্রাগৈতিহাসকালের বর্ণনা প্রদান করেছেন, সেখানেও অত্যন্ত সংযম ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঘটনাধারা আবর্তিত হয়েছে—যাতে প্রাধান্য পেয়েছে ইতিহাস এবং তার মহানায়কেরা। এসব ঘটনা বলতে গিয়ে কখনো কখনো লেখক গর্বে ও গৌরবে যেমন রুদ্ধবাক্, তেমনি মাঝে মাঝে অতীত বাঙলার এসব কাহিনী জানার ক্ষেত্রে আমাদের স্কুল-কলেজের ব্যর্থতায় তিনি বেদনাহত। এই গ্রন্থের আরো একটা বৈশিষ্ট্য হলো আমাদের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ তেরখানা

আলোকচিত্র সংযোজন। তবে যেহেতু বিভিন্ন স্থান প্রত্যক্ষ করে লেখক এই গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং যেহেতু রাজপুরুষের প্রসঙ্গ বারে বারে আলোচিত হয়েছে, সেহেতু গ্রন্থটির ভেতর মাঝে মধ্যে পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে। এই পুনরাবৃত্তি কিংবদন্তী রচনার ক্ষেত্রেই বেশী প্রকটিত।

গ্রন্থখানার শেষে সহায়ক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে লেখক যেমন আমাদের ভবিষ্যৎ রসপিপাসা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্র তৈরি করেছেন, তেমনি একটা নির্ঘণ্ট যোগ করে দিলে সেক্ষেত্র আরো বিস্তৃতি লাভ করতো। আশা করি, আগামী সংস্করণে লেখক একথা মনে রাখবেন।

শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা অপ্রয়োজনীয় ও গতানুগতিক হলেও এতে উৎপল চক্রবর্তীর কাঠ ও চিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাতির যে পরিচয় রয়েছে, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—যার স্বাক্ষর এই গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে বিদ্যমান।

রশীদ আল ফারুকী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

তিন বন্ধু

শিল্পীও বয়স এবং অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পালটে যান। ক্রমশ পরিণত হন। সকলে যে একভাবে বা একই বয়সে হন তা অবশ্য নয়। কেউ হয়তো ক্রমে খুব কুশলী হন। অন্য কারো পটে হয়তো অভিজ্ঞতা উপলব্ধির তীব্রতা প্রকাশ পায়। এ অনেকটা পর্বতারোহণের মতো। বেস ক্যাম্প তৈরি করে তারপর ক্রমে শৃঙ্গে ওঠা।

অশোক বিশ্বাস সম্ভবত ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বয়ঃক্রমের শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম তারা। গত পাঁচ বছরে তাঁর কাজের মধ্যে ভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি। অত্যন্ত নিষ্ঠায় পাগলা বিজ্ঞানীর মতো কি একটা গোপন পরীক্ষা চালাচ্ছেন। ফলাফল মনঃপুত হচ্ছেনা বলেই খানিকটা বেজার মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কলেজী জীবনে জলরঙ আর পেনসিলের কাজে সতীর্থ এবং অধ্যাপকদের কিছুটা চমকে দিয়েছিলেন। তারপর অশোক তেলরঙ, অংকন, ছবির ছোট খসড়ায় সর্বত্র পুরাণকল্প রচনা করলেন

ক্লান্ত মানুষ অসীম বসু

চিত্রভাষায়। তাঁর বড় তৈলচিত্রে আপাত সমতল বর্ণবিন্যাস আমাকে টানেনি। এবার তাঁর এক ডজন বোর্ডে আটা পট আঁকা তেলরঙের নিসর্গ দেখে চমকে উঠলাম। ছোট ছবি—এর কয়েকটি ক্যানভাসে হলে ভাল হতো। নিসর্গ ছবির প্রধান চরিত্র—যাদবপুরের পেছনের গ্রামের দৃশ্য। গাছপালা, পুকুর, আন্দোলিত নারকেল গাছ, ডোবা, ফুলন্ত গাছ, ধানক্ষেত এঁকেছেন। বেলা অবেলায়। ঋতুতে ঋতুতে তার রূপ, মেজাজ, মর্জি, আলো, হাওয়া, আকাশ আর অবসর ধরেছেন অশোক। ছোট ছোট ছোপ ছোপ রঙের ঘন প্রলেপ, হয়তো কোথাও তেল দিয়ে রঙ ফাটিয়েছেন। বর্ণের গাঢ় সমাচার সত্ত্বেও জলরঙের গুণ ছবিতে কখনোসখনো বর্তেছে। আমার মনে হয়, এই ছবিগুলো খসড়া। তাঁকে তৈলচিত্রের কাঠামো আর নির্মিতি সম্পর্কে ভাবতে হবে। তৈলচিত্রে নিসর্গ মোক্ষের একটি উপায়। সুতরাং অশোকের গুটিগুটি এদিকে এগুনোয় সাধুবাদ জানাচ্ছি। খালি খুট খুট করে স্যাকরার মতো কাজ না করে, কামারের মতো পেশীর ব্যবহার করতে হবে।

অসীম বসুর তৈলচিত্র দেখে আমি হতাশ হয়েছি কিছু পরিমাণে। প্রথমে সদবস্তব (সুররিয়ালিস্টিক) ছবি আঁকতেন। তারপর নিজস্ব পথ পেয়েছিলেন। এবার কল্পচিত্রে (ফ্যানটেসীর) প্রত্যাবর্তন করে দেখালেন কত সীমায়িত তাঁর চিন্তাভাবনা। গতবারে তিনি যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, এই প্রদর্শনীতে—বিড়লা আকাদমী—(২২—২৭ মে- তা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন। কৌশলের ক্ষেত্রেও তিনি কাঞ্চন দাশগুপ্তের পটের ওপর কাগজ সেঁটে কুঁচকে দেবার পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। রঙের কোনো জেল্লা নেই। রূপকথার জগৎটা বিদেশী বইয়েব সচিত্রকরণের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই ভিড়, লোডশেডিং, জঞ্জালের মধ্যে যিনি এমন রূপকথা ভাবতে পারেন তিনি ধন্য! সচক্ষে দেখলে বুঝতেন এমন অগভীর ফ্যানটাসীর শিল্পী ছিলেন না পল ক্লী। এর মধ্যে একটি ছবিতে দেশজ প্রাসঙ্গিকতা আছে "ক্লান্ত লোকটি" ছবিতে মোটামুটি দুটি অনুভূমিক রেখা দিয়ে ওপরের ভাগ করে, মাঝখানে নিপুণভাবে আকাশ মাটির মাঝখানে সাদা জায়গা ছেড়েছেন। রেলিঙ ঘেরা জনৈক দেশনেতার অবাক্ষ মূর্তির তলায় বেঞ্চিতে বসা ক্লান্ত মানুষটিকে আমাদের চেনা জানা মনে হয়। মূর্তির মাথায় কাক বসালে আরও তীব্র হতো বক্তব্য।

রমাপ্রসাদ ঘটক যথারীতি ৮০-পয়রার ছবি এঁকেছেন। এবার তাঁর রঙের জেল্লা অন্যরকম। মোটামুটি মধ্যস্থলে রচনাটা রেখেছেন। চারপাশে গাছপালা, জন্তু, খেলনা, পাত্রপাত্রী দিয়ে ভরালেও আসল রচনাবস্তু পটের মাঝখানে। বিন্যাসে মুনশীয়ানা দেখালেও রচনার ব্যাপারে আরেকটু কিছু যেন প্রত্যাশিত ছিল। "রাজা এবং চন্দ্রমা" ছবিতে গায়ে ডোরা দাগ দেওয়া সোঁদরবনের বাঘ গাছতলায় চাঁদের আলোয় বসে কি ভাবছে—একটু সচিত্রকরণের ধার ঘেষে গেছে। "মা এবং

ছেলে"-র রচনাটা সেই অনুপাতে আমার ভাল লেগেছে বেশী। পটটা প্রস্থর দিকে রেখে এ'কেছেন। মায়ের হাটু থেকে নীচের নীল শাড়ি, গাঢ়তর নীল পাড়ের তলায় পা দুখানি। একপাশে বাচ্চা ছেলে আর খেলনা। রমাপ্রসাদের অন্য কাজ দেখলে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। গতবারের তুলনায় নিশ্চয় এগিয়েছেন, কিন্তু শামুকের গতিতে।

প্রদর্শনী থেকে ফেরার সময় অশোক বিশ্বাসের নিসর্গচিত্রের বিষয় ভাবতে গিয়ে রিলকের কতগুলো কথা মনে পড়ল, "স্বীকার করা হোক, নিসর্গ আমাদের কাছে বিদেশের মতো। আর ফুলন্ত গাছের সামনে যেমন, তেমনি প্রবহমান নদীর সামনে আমাদের ভয় ভয় করে। মৃতদেহের সঙ্গে একা থাকার চেয়ে বরং গাছের সঙ্গে একা হতে ভয় করে বেশী। কারণ মৃত্যু যতই কেন রহস্যময় হোক, জীবন—যে জীবন আমাদের নয়—তা আরও রহস্যময়। এই জীবন আমাদের সম্বন্ধে অবহিত নয়। আমাদের না দেখেই তারা নিজস্ব উৎসবে মেতে ওঠে যেন বা, আর আমরা অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে দেখি। আমরা যেন এমন হঠাৎ উপস্থিত অতিথিদের মতো যারা ভিন্ন ভাষাভাষী।" অশোক বিশ্বাসের নিসর্গে এই রহস্যময় জগতের স্পর্শ ছিল।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

সুনয়নী

আরম্ভতেই ফটো - অ্যালবাম খুলে এক-এক করে মুখ্য চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল এমন সব কথা বলে যাতে কাহিনী (রচয়িতা ও পরিচালক: সুখেন দাস) অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী কোন্ পথে চলবে তার অনেকখানিই দর্শকমনের পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

অগাধ বিত্তশালী শিল্পপতির পুত্র অরুণ (শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়) আর্ট স্কুল থেকে পাস করা শিল্পী—অর্থাৎ কারবার ও বিষয় সম্পত্তি ব্যাপারে উদাসীন। ওর ভাই বিদ্যুতের (সুখেন দাস) প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল মস্তান ধরনের চরিত্রে। পরে দেখা গেল সে পাগল (এমন উন্মাদ যে সবই বুঝতে পারে)। এই পরিবারেই পালিত, অরুণের চেয়ে বয়সে বড় বিনোদ (দিলীপ রায়) যে কারবার ও বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করে—এবং সবকিছুই যে সে হস্তগত করতে চায় সেটা শুরুতেই ধরা পড়ে। এ ছাড়া আছে অরুণের বন্ধু চক্ষু-চিকিৎসাবিশারদ শীর্ষেন্দু (উত্তমকুমার) যার চালচলনে নিজের পেশার চেয়ে বিনোদের খপ্পর থেকে অরুণদের রক্ষা করা ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরিতেই বেশী তৎপর। এর-ছাড়া আছে শীর্ষেন্দুর মামা কুঞ্জবাবুর (কালী বন্দ্যোপাধ্যায়) বাড়িতে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত অন্ধ মেয়ে সুনয়নী যাকে তার প্রতিপালকের গৃহ থেকে পথে এনে শীর্ষেন্দুর গাড়িতে ধাক্কা খাওয়ানো হয়। উদ্দেশ্য: শীর্ষেন্দুর

শকুন্তলা

আশ্রয়ে থাকবার পর যাতে বিনোদের দ্বারা ট্রেন থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে লাইনের ধারে পড়ে থাকা জ্বলন্ত কয়লায় ঝলসানো-মুখ অরুণের সঙ্গে তার বিবাহ ঘটানো যায়। বিনোদ বিদ্যুতকেও সরাবার চেষ্টা করে দেশ-ভ্রমণে যাবার নাম করে বেরিয়ে জলে ডুবিয়ে। শীর্ষেন্দু সুনয়নীর দৃষ্টি-শক্তি ফিরিয়ে আনল অন্ধের ভান করে বিনোদের ক্রিয়াকলাপের ওপর নজর রাখার জন্য। আর তার পরই বিনোদের জারিজুরি ফাঁস হল। বলা বাহুল্য, অন্তিম মুহূর্তে সুস্থ বিদ্যুতের আবির্ভাব। এবং ভূমিকাতেই ওকে গুন্ডা প্রকৃতির দেখানো হয়েছে সুতরাং বিনোদের সঙ্গে বোম্বাই ছবির ধাঁচে মারপিট যে অনিবার্য হবেই সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বিয়ের পর সুনয়নী অরুণদের সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়—কিন্তু ওর নামে ছবির নামকরণ হলেও ও কিন্তু মুখ্যচরিত্র নয়।

যেমন ছকে বাঁধা ঘটনা তেমনি চরিত্রাবলীও বড় কৃত্রিম দেখায়। অরুণ ও সুনয়নী ছাড়া প্রতিটি চরিত্রের কথা ও অভিব্যক্তি ঘটনার গতিপথের নির্দেশ আগে থেকেই প্রকাশ করে দেয়। আরম্ভতেই পর্দায় দৃশ্য কাঁপতে থাকে—সেটা কি সমগ্র কাহিনীর নড়বড়ে চেহারার প্রতীক। বিজয় দে'র পরিকল্পনায় ক্যামেরা চালিয়েছেন শান্তি দত্ত। অজয় দাসের সুরযোজনায় রাজকুমারের গান ভাল লাগবে।

ছঠ মইয়া কী মহিমা

'জয় সন্তোষী মা'র প্রভৃতি আর্থিক সাফল্য ভক্তিমূলক ছবি তোলায় একটা প্রবণতা এনে দিয়েছে। মৃতের পুনর্জীবন এবং পঙ্গুর চলচ্ছক্তি লাভ—এমনি অলৌকিক বা অবিশ্বাস্য ব্যাপারে অন্ধবিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা এদেশে কম নয়। তাদের কথা মনে রেখেই দেবী ষষ্ঠীর আলোচ্য উপখ্যানটি (কাহিনী: অমিতাভ ও নারায়ণ দুবে) উপস্থাপিত হয়েছে। গৃহস্থ বধূ নিঃসন্তান মীরা (সুলতা চৌধুরী) স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মা ষষ্ঠীর ভক্ত হয় এবং তারই পুরস্কার স্বরূপ লাভ করে জ্যোতি (গায়ত্রী) নামে একটি কন্যা। সদাই পরের অমঙ্গলে তৎপর কবিরাজের কাছে মীরার সুখ

অসহ্য হল। সুতরাং কলিরাজের কোপে জ্যোতি মাতৃহারা হয়। জ্যোতির জীবনেও এল নানা অশান্তি। তার বিবাহ হল এক মাতাল দুশ্চরিত্রের সঙ্গে। চুরির দায় মাথায় নিয়ে স্বামী দীপক (মনীশ) গৃহত্যাগী হয়। অন্তঃস্বত্ত্বা জ্যোতিও স্বামীর সন্ধানে পথে বের হয়। শেষে নানা বিপর্যয় কাটিয়ে সে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হল মা ষষ্ঠীর কৃপায়। কলিরাজ শেষে পরাস্ত হলেন। কাহিনীর সারমর্ম যা দাঁড়ায় তা হল: কলিরাজের কোপ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় মা ষষ্ঠীর ভজনা।

নিতান্ত নাস্তিকদের মনোরঞ্জনের কথাও প্রযোজক মহুয়া দে ভোলেননি। তাদের জন্যে পরিবেশিত হয়েছে চোলি-পরা প্রায় অর্ধনগ্ন বলা যায় এমন বেশ পরা অপ্সরাদের এবং বাঈজীর লাস্যময় নাচ॥ ভক্তিমূলক গানের সঙ্গে ট্যুইস্ট ধাঁচের নাচও যে চলে তারও দৃষ্টান্ত রয়েছে জ্যোতির ভাসুরের (ভগবান) সপাত্র নাচ দেখিয়ে। কৌতুক পরিবেশিত হয়েছে মহর্ষি নারদ (জীবন) চরিত্রটি দিয়ে—যিনি মীরা ও জ্যোতির প্রতি সদয় হবার জন্য নারায়ণ-এর নাম করে কলিরাজকে বারবার সতর্ক করতে থাকেন; আবার দুঃসময়ে হঠাৎ মর্তে অবতীর্ণ হয়ে সান্ত্বনা ও মনোবল সঞ্চারে সাহায্য করেন।

মামুলী দুর্বল কাহিনী। পরিচালক তপেশ্বর প্রসাদ সেই মামুলীয়ানকে কাটিয়ে তুলতে পারেন নি। কলাকৌশলের দিক থেকে ক্যামেরার কাজে পিন্টু দাশগুপ্ত এবং সুরযোজনায় ভূপেন হাজারিকার প্রশংসনীয় কৃতিত্ব এবং অভিনয়াংশে পদ্মা দেবী, গীতা দে, অভী ভট্টাচার্য, সাহু মোদক, বি এম ব্যাস, ইন্দ্রনীল ও নবাগতা নম্রতার দক্ষ চরিত্রচিত্রণও ছবি হিসেবে এটিকে মনোজ্ঞ উপহার করে তুলতে পারে নি।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

রবীন্দ্রসদনে গানের আসর : শেষ পর্ব

'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না'—এই কলিটি যে-উপলক্ষেই লেখা হোক না কেন, কেউ যদি ঠাট্টা করে বলেন যে, সদনমঞ্চে গানের আসরে এস্রাজ এবং পাখোয়াজ-এর ব্যবহার নিয়ে গানটি রচিত, তা হলে সেই পরিহাসকেও তাৎক্ষণিক সত্য বলে মেনে নিতে হয়। এবারের ন-দিনের গানের আসরের প্রথম পাঁচ দিনে নির্ধারিত যন্ত্রানুষঙ্গে এস্রাজ ছিল না। পাখোয়াজ তো থাকেই না; একদিন এক ঝলক দেখা গিয়েছিল রূপেন ঘোষের দাক্ষিণ্যে। অথচ এস্রাজের স্থান যে হারমোনিয়ামের থেকে কোনো অংশে কম নয় রবীন্দ্রসংগীতের আসরে, বরং তত্ত্বগতভাবে প্রবলতর তার দাবি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে এস্রাজ সমান গুরুত্ব পায় না সদনমঞ্চে। পাখোয়াজ দেখা

অদিতি সেনগুপ্ত,

দিয়েই চলে যায়। ফলে, হারমোনিয়াম যাঁরা স্পর্শ করেন না, তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে বাধ্য হন এস্রাজের অভাবে। ধ্রুপদাঙ্গ গান মর্যাদাপূর্ণ সঙ্গত পায় না পাখোয়াজের অনুপস্থিতিতে। বরং সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ভূমিকা নিয়ে 'গীটার' ঢুকে পড়ে অভিজাত গানের আসরে, বিরক্তিকর সঙ্গত জোগায়। তাল-ছাড়া গানের কথা ধ্রুপদাঙ্গ গানের মহিমাকে খর্ব করছে গীটারের আওয়াজ—রবীন্দ্রসদন মঞ্চে এ-ঘটনা আর ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে না, এটা প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

শেষ চার দিনের আসরের উল্লেখযোগ্য সংযোজন—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু-দিন পাওয়া গেল তাঁকে, দুটি আসরে। দুটি করে মাত্র গান গেয়েছেন তিনি। শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধ দু-দিনই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু দুটি করে গানেই আসর ভরে তুলেছেন তিনি। বিশেষত, শেষ দিনের আসরে তাঁর কণ্ঠের 'নীলাঞ্জনছায়া' [illegible]যুগের স্বপ্নে পাওয়া প্রথম ফুলের গুচ্ছের মতোই মহার্ঘ উপহার। এই গানটিতে বিশেষত যে-দুর্লভ রেশ রেখে গেলেন তিনি, তার স্মৃতি একমাত্র মহাকালই বহন করতে সমর্থ।

শেষ দিনের আসরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, বাংলাদেশ থেকে আগত তিন শিল্পীর অন্তর্ভুক্তি। পাপিয়া সারওয়ার এ-দিনে আরও স্ফূর্তিময় ছিলেন, দমের কষ্ট ছায়া ফেলেনি তাঁর নিবেদনে। 'যদি বারণ করো'—নিঃসন্দেহে অন্যতম স্মরণীয় নিবেদন। কাদেরি কিব্রিয়াও সেদিন খুব জমিয়ে গেয়েছেন—'পুরানো জানিয়া চেয়ো না।' দীনতার লেশ সত্যিই ছিল না তাঁর গানে, অশেষের ধনেই নিমেষ ভরে দিয়েছিলেন তিনি। ফাহমিদা খাতুনের গানে এত জমজমাট পরিবেশ অবশ্য রচিত হয়নি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ উপহার—'ওগো কাঙাল আমারে'।

দ্বিতীয়বারের 'পুজা'র আসর ছিল ৩ জুন সকালে। রঞ্জনা মিত্র, রিনি চৌধুরী এবং সুমিত্রা বসু অনুপস্থিত ছিলেন নির্ধারিত শিল্পীদের মধ্যে।

বন্দ্যোপাধ্যায় অনুল্লেখ্য। রুমা দাশগুপ্তের দুটি গানই চমৎকার। গোপাল মহাপাত্র এবং জয়ন্তী পুরকায়স্থ সম্ভাবনাপূর্ণ। রাজেশ্বর ভট্টাচার্যর কণ্ঠ সর্বত্র সুরেলা লাগেনি। সত্রাজিৎ বসুর 'চিরসখা হে'র আরম্ভ সুন্দর, কিন্তু কণ্ঠের স্নেম্মা শেষ রক্ষা করতে দেয়নি। বিজয়া চৌধুরীর ভঙ্গি পুরনো, কিন্তু পরিবেশন ত্রুটিহীন। রণো গুহঠাকুরতার গলা এখন অত্যন্ত ফ্যাঁসফেঁসে শোনায়, অথচ ক' বছর আগেও কত সুন্দর গাইতেন তিনি। উচ্চারণেও বিকৃতি এসেছে তাঁর। বনানী ঘোষের গানের নির্বাচন প্রশংসা পাবে না, জন্মোৎসবের আসরে 'যা হারিয়ে যায়' বা 'শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা' বেমানান। কিন্তু দুটি গানই খুব জমিয়ে গেয়েছেন তিনি। গীতা সেনের কণ্ঠ তারসপ্তকে কিছুটা বিব্রত ছিল সেদিন। তাঁর তিনটি গানের মধ্যে বরণীয় নিবেদন—'দেখা যদি দিলে ছেড়ো না আর'। নতুনদের মধ্যে প্রমিতা মল্লিক দুটি গানই গেয়েছেন সজীব স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে। মঞ্জু গুপ্তের প্রয়াণসংবাদে এ-দিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে এক মিনিটের নীরবতা পালিত হয়েছিল। সদন-কর্তৃপক্ষের এই সময়োচিত উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়। প্রমিতা মল্লিক ছিলেন এ-দিনের একক আসরের প্রথম শিল্পী। পূর্ব-নির্ধারিত তাঁর প্রথম গান—'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা' অন্যতর তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হল এ-দিনের আসরে। মঞ্জু গুপ্তের স্মৃতি-বিজড়িত এই গানটি যেন তাঁরই পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হল, এ-কথা মনে পড়ে গেল অনিবার্যভাবে।

এ-দিনের অনুষ্ঠানের তারকাচিহ্নিত তিন শিল্পী—শর্বাণী হোম, ঋতু গুহ এবং সুবিনয় রায়। ঋতু গুহ এখন পুরোপুরিভাবে তারযন্ত্র-নির্ভর। তারযন্ত্রের মতোই সূক্ষ্ম এবং ঝঙ্কারময় কণ্ঠে তিনি শোনালেন আরু কেদারা রাগে চৌতালে নিবন্ধ—'অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ'। তাঁর দাপট ও দক্ষতা আসরকে স্তব্ধ করে রাখল দ্বিতীয় গানেও। দেশ একতালে 'প্রভু খেলেছি

সুমিত্রা বসু.

অনেক খেলায়' প্রার্থনার এক আশ্চর্য পরিবেশ রচনা করলেন তিনি। অনুরোধে শোনালেন তাঁর কণ্ঠের আরেকটি অনুপম গান—'শ্রাবণের ধারার মতো'। শ্রাবণের ধারার মতোই অবিরল সুরের ধারা শ্রোতৃমণ্ডলীর তৃষা এবং ভুখের পরে ঝরে পড়েছিল।

সুবিনয় রায় যে ইদানীং কী পরিমাণ জনপ্রিয় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। প্রতিটি আসরে, প্রতিটি জায়গায়। তিনি শুরু করলেন সিন্ধুড়া ঝাঁপতালে নিবন্ধ 'কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে' গানটি দিয়ে। ক্রমশই ধরা পড়ল, নতুন নতুন মহিমায় কীভাবে উজ্জীবিত তিনি, হৃদয়ে উদিত, আত্মবিহারী, অমোঘ এবং প্রবল। এর পর সুধাসংগীতে তিনি ডেকে নিলেন 'ডাকে বারবার ডাকে' (কেদারা, ত্রিতাল) গানে আলাইয়া একতালায় শোনালেন নরনারীমন অনায়াসে হরণ-করা 'বসে আছি হে'। এবং সব শেষে, ফের ঝাঁপতালে, 'হৃদয়নন্দন বনে'। মধুর চিরসঙ্গীতে শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর ধ্বনিত করে নিরন্তর সুধানির্ঝরই ঝরিয়ে গেলেন তিনি।

শর্বাণী হোম এবার শুরু থেকেই ছাপিয়ে গিয়েছিলেন নিজেকে। যেমন সুন্দর তাঁর গান নির্বাচন, তেমনই পরিচ্ছন্ন, প্রসন্ন এবং সুরেলা তাঁর গায়নভঙ্গি। যোগিয়া ত্রিতালে 'নিশিদিন চাহো রে' এবং 'হে নিখিলভার তারণ' (গৌড়, ঝাঁপতাল) আদ্যন্ত বিবশকারী পরিবেশন। তাঁর গান আগেও শুনেছি, কিন্তু এ-দিনের নিবেদন বিশেষ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'নৃত্যনাট্য ও নাটকের গান' রূপে স্মারক পুস্তিকায় পূর্ববিজ্ঞাপিত হলেও, ৭ জুন বৃহস্পতিবারের আসরে 'বিচিত্র' পর্যায়ের গানও অন্তর্ভুক্ত হল। দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও সমীরণ মনসী অন্তর্ভুক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করতে পারেননি। নতুনদের মধ্যে মৃগাঙ্ক সরকার আস্থা জাগিয়েছেন, নূপুর চক্রবর্তী অনুপস্থিত ছিলেন। অনুরাধা মুস্তাফীর কণ্ঠস্বর মধুর, কিন্তু গান গাইবার ভঙ্গি কিছুটা কাটা কাটা। মঞ্জুষা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলা কাঁপে, গায়কীও পুরোপুরি আয়ত্ত হয়নি। বনানী গোয়েঙ্কা বেশ ভাল গেয়েছেন। খুবই সুরেলা, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি উজ্জয়িনী রায়ের। বাণী ঠাকুরের 'রোদনভরা এ-বসন্ত' নির্বাচনের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ, তার কণ্ঠে শনিয়েছেও বেশ করুণ রঙীন। হেনা সেন বহু পুরনো শিল্পী, কিন্তু এবারই প্রথম দেখা গেল রবীন্দ্রসদনের আসরে। তাঁর দুটি গানই 'পূজা ও প্রার্থনা' পর্যায়ের। বিশেষভাবে কানে লেগে আছে শান্ত মেজাজী ভঙ্গিতে গাওয়া 'ডেকেছেন প্রিয়তম'। সুমিত্রা রায় দুটি গানই গেয়েছেন পুরনো দিনের স্বচ্ছন্দ নৈপুণ্যে। 'ফুল বলে ধন্য আমি' নিঃসন্দেহে এদিনের অন্যতম স্মরণীয় নিবেদন। প্রসাদ সেনের 'হায় রে নূপুর' এবং সুমিত্রা সেনের 'পথহারা তুমি'-তে প্রার্থিত নাটকীয়তা চমৎকার ফুটে উঠেছিল। সুমিত্রা সেন পূজার আসরেও ছিলেন একার, কিন্তু এ-দিনই তাঁকে স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে পাওয়া গিয়েছিল।

শর্বাণী ঘোষ

অনুরোধে শোনানো তাঁর তৃতীয় গান—'আমার পরান যাহা চায়'—সমৃদ্ধ পরিবেশন। বয়স-জয়-করা কণ্ঠে কমলা বসুর দুটি গানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুবিনয় রায় এ-দিনের আসরেও স্বমহিম। 'যেয়ো না যেয়ো না ফিরে'—গীতিনাট্য মায়ার খেলার এই গানটি তালফেরতায় বেশী ভাল লাগে বোঝা গেল। এ-দিনই নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'র সুরে ও কথায় গানটি আগ গেয়েছিলেন তন্ময় চট্টোপাধ্যায়। ছাপ ফেলতে পারেননি; সুবিনয় রায় গানটিকে সঠিক ভঙ্গিতে শোনাবেন বলেই বোধ করি গীতিনাট্যের দিকে হাত বাড়ালেন। 'কোন সে ঝড়ের ভুল' এবং 'আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে' সুবিনয় রায়ের কণ্ঠের স্মরণীয় উপহার। শেষ গানটি অনুরোধে শোনানো—'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ'। এটি যে অন্য পর্যায়ের—আগেই বলে নিলেন তিনি। এটিও অসামান্য পরিবেশন।

প্রকৃতি পর্যায়ের ফিরতি আসর ছিল ১০ জুন, সকালে। চারজন শিল্পী অনুপস্থিত ছিলেন এ-দিন। দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী মুখোপাধ্যায়, বিভা সেনগুপ্ত এবং সুশীল মল্লিক। নবীন শিল্পীদের মধ্যে রুনু বসুর দক্ষতা বিস্ময়কর। কিন্তু গায়কীতে সুমিত্রা সেনের অবিকল অনুকরণও একই রকম বিস্ময় জাগায়। শান্তিব্রত দাশের কণ্ঠ মধুর। নাটকীয়তার অল্প ঝোঁক রয়েছে, এ-ঝোঁক কাটালে ভাল গাইবেন। কাশীনাথ রায় গানকে সুরেলা কবিতা করে তুলেছিলেন। অমরেশ দাশের উচ্চারণ কিঞ্চিৎ দুষ্ট, কিন্তু গান গাইতেন এবং ভাল গাইতেন এখনো বোঝা যায়। দীপংকর চট্টোপাধ্যায় একমাত্র শিল্পী যিনি 'শীত' ঋতুকে অবহেলার আসন থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, রবীন্দ্রসংগীত তাঁর কণ্ঠে মানায় না। 'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে' এই কলির 'মনে' তিন-চার রকম সুরে শোনালেন তিনি। কখনো ট্রেমেলো দিয়ে, কখনো ট্রেমেলো ছাড়া। কিন্তু একটিও মূল সুরের মতো হল না। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণা সরকার এবার ভাল গেয়েছেন, কিন্তু আগেরবার যেন আরও ভাল গেয়েছিলেন। কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের 'বেদনা কী ভাষায় রে', শিখা বসুর 'একলা বসে বাদল শেষে' এবং স্নিগ্ধ ঘোষের 'আজি শরৎ তপনে' সজীব সবল কৃতিত্বপূর্ণ পরিবেশন। শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় খুবই জমাটি ভঙ্গিতে গেয়েছেন এবার। তাঁর দুটি গানই ভাল লেগেছে। বিশেষ করে, 'আমি পথভোলা এক পথিক'-এর কথোপকথনের মেজাজটি তাঁর গায়নভঙ্গিতে চমৎকার ফুটে উঠেছিল। পূরবী মুখোপাধ্যায় এবং চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় এ-দিনের আসরের স্মরণীয় দুই শিল্পী। পূরবী মুখোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ স্পষ্ট মাধুর্যময় সবলতায় তিনটি গানই কানে লেগে আছে। তেমনই সুরেলা লাবণ্যময় কণ্ঠে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের গান আসর ভরে তুলেছিল এবার। 'নাই রস নাই' এবং 'প্রখর তপন তাপে' গান দুটিতে গ্রীষ্মের হাহাকার যেমন মূর্ত করে তুলেছিলেন এই পরিণত শিল্পী, তেমনই 'বিদায় যখন চাইবে'র দক্ষিণ সমীর তাঁর রোমান্টিক মেজাজে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ধরা দিয়েছিল। এবার বোধ হয় গীটার-এর প্রতি তাঁর দুর্বলতা কাটাবার সময় হয়েছে।

শেষ দিনের—১৭ জুন, সকাল—আসরে ছিলেন পঁচিশজন শিল্পী। বন্যা মজুমদার, বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় আসরের মানের প্রতি সুবিচার করেননি এ-দিন। কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়ের গলা বেশ কাঁপে। 'হে ক্ষণিকের অতিথি'তে 'আধার পানে'—তিনি গাইলেন 'আঁধার পানে'। হসন্ত কোথায় পেলেন? বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের ক্লান্ত কণ্ঠে সুর ফুরানোর কথা ('দীপ নিবে গেছে') স্বীকারোক্তির মতোই মনে হয়। বন্যা মজুমদারের কণ্ঠেও সুর কম লাগে। নিয়তি বসু এবং জয়শ্রী দাশগুপ্ত নিঃসন্দেহে আবিষ্কার। সুরেলা সপ্রতিভ সাবলীল ভঙ্গিতে গান শুনিয়েছেন এই দুজন নতুন শিল্পী। ইলা মুনসীর 'ওলো সই ওলো সই' ভাল লেগেছে। অনুভা মৈত্র এখনো অপরিণত। জয়শ্রী ঘোষের কণ্ঠস্বর মৌলিক, গায়নভঙ্গিও বেশ খোলামেলা। জয়শ্রী রায়ের 'আমার মন মানে না' নিখুঁত। বুলবুল ভট্টাচার্যের কণ্ঠ আরেকটু খুললে ভাল হত। কিন্তু মার্জিত তাঁর গায়নভঙ্গি। বিশেষ করে লেগেছে, 'কেহ কারো মন বুঝে না'। মণিকা গঙ্গোপাধ্যায় সবল কণ্ঠে শুনিয়েছেন 'তুমি কোন ভাঙনের পথে'। চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের 'কে বলে যাও যাও' এবং স্বপন গুপ্তের 'কাছে ছিলে দূরে গেলে' গান দুটি বেশ জমজমাট পরিবেশ তৈরি করেছিল এবার। নীলাঞ্জনা সেনের শান্ত স্নিগ্ধ ভঙ্গি মনকে স্পর্শ করে, কিন্তু সবলতার অভাবও চোখে পড়ে তাঁর নিবেদনে। সুশীল মল্লিক পুরনো ফর্ম ফিরে পাচ্ছেন দেখে ভাল লাগল। তাঁর দুটি গানেই বেশ দরদ ছিল, ছিল মেজাজ এবং কুশলতা। বিভা সেনগুপ্তের অকারণ নাটকীয় ভঙ্গি ভাল লাগেনি।

বাংলাদেশের শিল্পীরা ছিলেন এদিন, ছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই বলেছি সে-কথা। আর ছিলেন সুচিত্রা মিত্র। তাঁর কণ্ঠের 'আজি কোন সুরে

প্রাপ্তি। দৃপ্ত, বলিষ্ঠ উচ্চারণে প্রতিটি যুক্তাক্ষর—যা এই গানের কথার সম্পদ —যেন পূর্ণ দলে উন্মোচিত হচ্ছিল তাঁর কণ্ঠে। অনুরোধ ছিল, কিন্তু তৃতীয় গান শোনাননি তিনি। অনুরোধ রাখেননি চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ও। 'বড়ো বেদনার মতো' এবং 'ধরা দিয়েছি গো' এই দুটি গানেই সেদিনের আসরের পরিসমাপ্তি টানলেন তিনি। 'বড়ো বেদনার' সঞ্চারী অংশ তাল ছাড়া গাওয়ায় আলাদা রকমের স্বাদ ফুটেছিল গানটিতে।

শেষ দিনের আসরের বিশেষ উল্লেখ্য আর দু-জন শিল্পী : অদিতি সেনগুপ্ত এবং সুমিত্রা বসু। স্পষ্টতই, নিজেদের নির্দিষ্ট মাপ ছাপিয়ে উঠে ছিলেন সেদিন এঁরা। যে-দক্ষতা এবং দাপট যে-নৈপুণ্য এবং নিষ্ঠা, যে-স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাতন্ত্র্য ছিল এই দুই শিল্পীর সেদিনের পরিবেশনে সচরাচর তা দেখা যায় না। অদিতি সেনগুপ্তের 'মনে যে আশা লয়ে' শুরু থেকেই তীব্র বিষণ্ণতাময় এক পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল সেদিন। 'যা ছিল কালো ধলো' শুধু নিবেদনেই নয়, নির্বাচনের দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য। সুমিত্রা বসু বেছেছিলেন অপেক্ষাকৃত চেনা দুটি গান। 'জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার' এবং 'ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে'। কিন্তু প্রথমটিতে শান্ত প্রণয়-বেদনা এবং দ্বিতীয় গানের পরান-খোলা উদাত্ত ডাক অতি অনায়াসে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন তিনি। গানের অন্তর্লীন মেজাজের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে গেলে যে কী পরিবেশ ফুটে ওঠে তা অনুভব করা গেল এঁদের গানে।

ন-দিনের এই গানের আসরে যন্ত্রানুষঙ্গে যাঁদের অক্লান্ত ও অকৃপণ সহযোগিতা স্মরণযোগ্য তাঁরা হলেন সলিল মিত্র, অমল দেব, রূপেন ঘোষ, সুকেশ জানা, রাজা রায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, নালু মিত্র, কমল পণ্ডিত, নির্মল দে, পার্থ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি সরকার, স্বপন রায়বর্মণ এবং শীতল গঙ্গোপাধ্যায়। মঞ্চ সাজিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। বিশেষত দ্বিতীয় পর্যায়ের ফিরতি আসরের মঞ্চসজ্জা প্রথম পর্যায়ের তুলনায় অনেক বেশী কল্পনাপ্রবণ।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ছবি : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংক্রান্ত **নাটক**

দেনাপাওনা

'আমাদের দেশে সেকালে থিয়েটারের পালা পাঁচ অঙ্কে অসংখ্য গর্ভাঙ্কে বহু পাত্রপাত্রী এবং সুদীর্ঘ দেশকালে বিস্তৃত বেশ এক গন্ধমাদনী কাণ্ডই ছিল। সেখানে অল্প সময় কালে ঘন বিন্যস্ত ইবসেনের নাটকগুলি স্বভাবতই চমকিত করেছিল আমায়।....ইবসেনি কায়দায় সেই বিস্তৃত বইকে (দেনা পাওনা) চার অঙ্কের প্রত্যেক অঙ্ক একটিমাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাট্যাকারে ঘন সম্বদ্ধরূপে দাঁড় করানো গেল। ভারতীতে প্রকাশিত নাট্যরূপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক অবিকল

বসন্ত চৌধুরী ও শমিতা বিশ্বাস

রেখে তার প্রথম ও চতুর্থ অঙ্ক দুটি মঞ্চে একাধিক দৃশ্যে ভাগ করে একটু পরিবর্তন সাধিত করা হয়েছিল।' (ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা—শিবরাম চক্রবর্তী)। বিশ্বরূপায় শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনার মঞ্চায়নে নাট্যরূপকার রাসবিহারী সরকারের সামনে উপন্যাস ও নাট্যরূপ দুই-ই ছিল। তিনি 'ষোড়শী' নাটক করেননি—নাটকের নাম দিয়েছেন 'দেনা পাওনা'। নাট্যরূপে সুবিধে মতো তিনি বিচরণ করেছেন উপন্যাস ও নাটকে। রাসবিহারী সরকার প্রবর্তিত দ্রুতদর্শনের নামে যে জোন্যাল অ্যাকটিং হয় সেটা হামেশাই গ্রুপ থিয়েটার করেন সেট নির্মাণের অসুবিধের জন্য। রাসবিহারী সরকার সেটি করেন রিভলভিংটা আড়ালে রাখার জন্য। এই মারপ্যাঁচটা নাটকের ক্ষেত্রে কার্যকরী—কারণ গতিই নাটকের প্রাণ। প্রাণ কথাটা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে। নাটক হল শরীর, অভিনয় হল প্রাণ। কিছু কিছু মানুষ প্রাণশক্তি ছাড়াও তো রিকেট শরীর নিয়ে বাঁচে। বিশ্বরূপায় 'দেনা পাওনা'র মঞ্চরূপে সেই নীরন্ধ্র প্রয়োজনা। অবশ্য তাঁরা ভাগ্যবান, কারণ নানাভাবেই লালনের অভাব তাঁদের হয়নি। দর্শক বার বারই ভীড় করছে নিষ্প্রাণ অভিনয় দেখার জন্য দায়িত্বহীন প্রযোজনা দেখার জন্য। সুতরাং নির্দেশক রাসবিহারী সরকারের থিয়েটার অনুরাগী দর্শকের কাছে দেনা প্রচুর।

টিমওয়ার্ক ছাড়াই যে থিয়েটার হয় সেটা বিশ্বরূপায় বোঝা যায়। দেনা পাওনা নাটকে কয়েকজন ভাল অভিনয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করলেও পাশাপাশি এমন অ-জ্ঞান অভিনয় হয় যা কোন সময়েই ভাল অভিনয়কেই বিকশিত হতে দেয় না।

বিগত স্মরণীয় অভিনয়ের তুলনায় ন্যূন দিয়েও বলা যায় জীবানন্দ ও ষোড়শীর ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী ও শমিতা বিশ্বাস চরিত্রের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে নতুনভাবে রূপায়িত করেছেন। শমিতা বিশ্বাস প্রথমার্ধে সামান্য একঘেয়েমিতে আক্রান্ত। প্রথমার্ধের শেষে 'এই লোকগুলোকে তোরা দেখে রাখ, এঁদের কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় না আসতে পারে।' এইখান থেকে তিনি প্রদীপ্ত হলেন। এরপর জীবানন্দের সঙ্গে নিভৃত সংলাপ উচ্চারণে নির্মলের সঙ্গে হাস্যপরিহাসে, শেষ দৃশ্যের ব্যাকুলতায় তিনি অদ্ভুতভাবে সংযমী। যে কোন-

ভাবে একটু বেসামাল হলে প্রশ্নচিহ্নিত হতে পারত কিন্তু ষোড়শী বা অলকা রূপে সবসময়েই তিনি ব্যক্তিত্বকে অটুট রেখেছেন। প্রথমদিকে প্রতিকথায় একই ধরনের সুর লাগার যে একঘেয়েমি দ্বিতীয়ার্ধে নানা সংঘাতের মধ্যে তিনি ক্রমেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জীবানন্দের ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী প্রথম থেকেই তাঁর দম্ভ, উচ্ছৃঙ্খলতা, তারপর সংসার আসক্তি, একাকিত্বের ব্যথা সব জায়গায় আধিপত্য বিস্তার করেন। যদিও তাঁর দুটি হাতের ব্যবহার বরাবর একই রকম। হয়ত এটা ম্যানারিজম। কিন্তু রাড়ারাড়ির জন্য সেই ম্যানারিজম চরিত্রের না তাঁর নিজের এটা বুঝতে বিভ্রম ঘটায়। এঁরা দুইজন হয়ত এই চরিত্র সৃষ্টির জন্য স্মরণীয় হতে পারতেন কিন্তু কিছুতেই সেটি সম্ভব হয়নি তাঁদের সহযোগী শিল্পীদের জন্য। হৈমর ভূমিকায় বকুল ধর প্রতি-কটু কণ্ঠে গড়গড় করে মুখস্থ বলে যান মডিউলেশনের তোয়াক্কা না করেই সৈকত পাকড়াশীর নির্মল নির্জীব কাঠের পুতুলের মত যা নাটকের গতিকে শ্লথ করে দেয় এবং ষোড়শীর অভিনয়কে বিড়ম্বিত করে। শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং প্রজার অনেক স্মরণীয় চরিত্র আছে। দেনা পাওনার 'সাগর' তার অন্যতম। এই প্রযোজনায় সাগরের ভূমিকায় শঙ্কর ঘোষের চেহারাই শুধু বিশ্বস্ত—আর অভিনয়? দমের অসুবিধা, যতি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে কথার মানে পালটে যায়। এই অজ্ঞানতায় ভোগেন অনেকেই তার মধ্যে কল্যাণী দেবী আবার পার্ট ভুলে যান। বসন্ত ডাক্তারের সংলাপই যথেষ্ট রসাত্মক—নীলরতন ভট্টাচার্য সেই সংলাপের সঙ্গে সর্বক্ষণ অঙ্গ কাঁপিয়ে যাত্রার রিলিফ সঞ্চারের চেষ্টা করেন। যাত্রার প্রভাব এই প্রযোজনায় সর্বত্র, শুধু নেই যাত্রার পরিশীলিত কণ্ঠসুষমা। নাটকের ভিলেন জনার্দনের ভূমিকায় অভিনয় করেন কিরণ মৈত্র। অনেক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এই অভিনয় দেখে মনে হয় তিনি শুধু অভিনয়ের ভান করে গেছেন নইলে অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দাপটের পাশাপাশি তিনি সম্পূর্ণভাবেই বিধ্বস্ত। অভিনয়ে যাঁরা সিদ্ধশিল্পী তাঁরা স্বল্প উপস্থিতিতেই চিনিয়ে দিয়ে যান—এমন দুইজন শিল্পী হলেন প্রেমাংশু বসু ও গীতা নাগ। তাঁর ফকির সাহেবের ভূমিকায় একটি দৃশ্যেই রবীন মজুমদার স্থায়ী ছাপ রেখে যান। রবীন মজুমদার স্বল্প উপস্থিতিতেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যান পাশাপাশি শিল্পীরা কতখানি পঙ্গু। এমনভাবে নাটকের সঙ্গে মিলে যাওয়া বিরল ঘটনা।

নির্দেশক রাসবিহারী সরকার যেমন অভিনয়ের সামগ্রিকতার দিকে নজর রাখেননি তেমনি প্রযোজনায় নানা হাস্যকর মুহূর্ত প্রযোজনাকে কোথাও দাঁড় করায় না। সুবিধে মতো তিনি কিছু সংযোজন করেছেন—যেমন প্রথমেই জীবানন্দ হুকুম করেন "এই চাষীর মেয়েটিকে মাথা মুড়িয়ে নষ্টচরিত্র বলে গ্রাম থেকে দূর করে দে।" কিছুক্ষণ পরে পেয়াদা হুকুম তামিল করে প্রমাণ হিসাবে একটি মেয়েদের উইগ দেখায়। ছাল ছাড়ানো পাঁঠার মত যে নরুসুন্দর অটুটভাবে মেয়েদের মাথা কামাতে পারেন তাঁকে পুরস্কৃত করা উচিত। শরৎচন্দ্রের নামই এক সময় দর্শক আকর্ষণ করত এখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যোগ করতে হয় 'মঞ্চে ফিল্মর নদী, নৌকা, জলন্ত বাড়ি, ঝড়, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি!' এই সব কাণ্ডকারখানা নাটককে বিন্দুমাত্র সাহায্য ত করেই না উপরন্তু হাস্যকর বাহুল্য প্রয়োগ তাপস সেনের সুনামে কালি ছিটোয়। অবশ্য এর জন্য কমল চৌধুরীর শব্দ গ্রহণ অনেকাংশে দায়ী। মন্দিরের চাতালে আধো জ্যোৎস্নার মধ্যে যখন যাত্রী গান করে—জীবানন্দ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আরও কতকগুলি ঘনীভূত মুহূর্তে তাপস সেন অনন্য। মঞ্চ নির্মাণে সুরেশ দত্ত নানা ধরনের কাজ করেছেন। ষোড়শীর ঘরের দৈন্য, শান্তিকুঞ্জের ফাটল, প্রয়াগ প্রধান যা চেয়েছেন তিনি তাই করেছেন। ১৩৩৪ সালেও নাট্য-মন্দিরে 'ষোড়শী' নাটকে বোধ হয় একই রীতি অনুসৃত হত। চণ্ডী-মন্দির-এ 'ষোড়শী' নাটকের দৃশ্যনির্দেশ মেনে চলা হয়েছে—একটি ত্রিশূল না থাকলে ওটা বৌদ্ধবিহারও হতে পারত। শৈলেশ রায়ের সঙ্গীতের একমাত্র গুণ, পরিমিতি। বেশী শুনতে হলে অসহ্য লাগত। গানের মধ্যে শুনতে ভাল লাগে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গানটি। জীবানন্দ ও ষোড়শী যেখানে কথা বলে সেখানে কোন বাড়তি আবহ দেওয়া হয়নি বলে ধন্যবাদ—না হলে অভিনয় মাধুর্য ক্ষুন্ন হত। নাটকে পাঁচখানি গানের মধ্যে তিনটি শরৎচন্দ্রের লেখা। প্রচলিত শ্যামা সঙ্গীতের কয়েকটি পংক্তি নিয়ে আর একটি গান এবং রাসবিহারী সরকার নিজে একটি গান লিখেছেন "পরান বন্ধুরে/দিনের শেষে আঁধার লগন নামরে/রাতের শেষে উপর লগন নামের'—কি অদ্ভুত গীত রচনা! এই অজ্ঞাত তথ্যটি বারবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে মাঝে মাঝে দিন রাত্রির দৃশ্যের আগে ছুঁড়ে মারা (শব্দটি আমার ইচ্ছাকৃত নির্বাচন) হয়েছে। ক্যাবারে-অজন্ত্র নৃত্যের পর বিশ্বরূপা এই নাটকে গাজন নৃত্যের প্রগতিতে পৌঁছেছে। চিত্তশংকরের নৃত্যনির্দেশে নেচেছেন আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মিস সোফিয়া—না ভুল বলছি, সোফিয়া চট্টোপাধ্যায়। রাসবিহারী সরকার রচিত গানের মতো—বাংলার গাজনের সঙ্গে পাঞ্জাবের ভাংগড়ার যে অদ্ভুত মিল আছে—এ নাচে সে তথ্যও আবিষ্কার করা গেল। শুনতে ভাল লাগে বনশ্রী সেনগুপ্তের একক কণ্ঠের গানটি। আবারও বলছি এই প্রযোজনার পর রাসবিহারী সরকারের 'দেনা' অনেক বেড়ে গেল—কারণ নাট্যরসপিপাসু দর্শকের 'পাওনা' তিনি মেটাতে পারলেন না।

দেবাশিস দাশগুপ্ত ছবি : বিশু মিত্র

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

দুই চণ্ডালিকা

পরপর দুদিন নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার দুটি প্রযোজনা দেখার সুযোগ হল

যথাক্রমে সাত ও আট জুলাই সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে। প্রথমটির প্রযোজনা : সোশ্যাল এনটারপ্রাইজের, পরিচালনা : পূর্ণেশ সিংহ। দ্বিতীয় দিনের প্রযোজনা : নবনালন্দা, নির্দেশনা : ভারতী মিত্র। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডালিকাকে নৃত্যনাট্যে রূপদান করার প্রেরণার প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, 'কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি।... দিনরাত্রি এত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মন যে সমস্ত সামাজিক কর্তব্য তুচ্ছ বলে মনে হয়।' অন্তরের প্রেরণার তাগিদে-সৃষ্ট এই অনন্য সৃষ্টি তাই সম্ভবত আমাদের এমন করে আকর্ষণ করে। শুধু কাব্যসম্পদেই নয় সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের চরম বিকাশ আশ্চর্য রূপে বিভাসিত এই নৃত্যনাট্য। তাই এর প্রযোজনায় সনিষ্ঠ অনুশীলনই যথেষ্ট নয় এর সঙ্গে প্রযোজনার সমস্ত দিকগুলির প্রতি সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত কাম্য। দুদিনের প্রযোজনার মূল কয়েকটি বিষয় প্রসঙ্গে :

নৃত্য ॥ প্রথম দিনের নৃত্য-পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খল, সৌন্দর্য ও মৌলিকতাহীন সমবেত নৃত্যগুলিতে দৃষ্টিকটু—অংগসঞ্চালন বারেবারেই ব্যথিত করেছে। নৃত্যশিল্পীদের গ্রীবা ও কটি-আন্দোলনের বেগ অঙ্গদুটির স্থানচ্যুতির আশঙ্কা জাগিয়েছিল। প্রকৃতি ও মায়ের চরিত্রে যথাক্রমে অলকনন্দা রায় ও আরতি মজুমদার তাঁদের কর্তব্য সমাধা করেছেন সুষ্ঠুভাবে। অলকনন্দা এই চরিত্রের রূপায়ণে অত্যধিক মার্জিত হয়েও নৃত্য কুশলতায় দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। তুলনায় নবনালন্দার সমবেত নৃত্যগুলি অনেক বেশি সমৃদ্ধ। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র ছিল সনিষ্ঠ প্রস্তুতির চিহ্ন। মায়ের চরিত্রে পলি গুহ আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি যে একজন পেশাদার ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী তাঁর নৃত্যাভিনয়ে সে কথা বারেবারেই উপলব্ধি করা গিয়েছে। প্রকৃতির ভূমিকায় নৃত্যশিল্পী ছিলেন ভাস্বতী মিত্র। তাঁর প্রস্তুতি ছিল, নিষ্ঠা ছিল কিন্তু এই চরিত্রের রূপদানে যে উপলব্ধির প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না। থাকার কথাও নয়—বয়স ও অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টার। বিশেষ করে এই চরিত্রের গান গেয়েছিলেন অদ্বিতীয় সুচিত্রা মিত্র। একদিকে সুচিত্রা মিত্রের গান অন্য দিকে পলি গুহের নাচের মাঝখানে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

গীত ॥ সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজের সমবেত গানগুলি অনুল্লেখ্য। একক কণ্ঠে প্রকৃতি ও মায়ের গানগুলি গেয়েছেন জয়শ্রী রায় ও বাণী ঠাকুর। অন্যান্য একক গান গেয়েছিলেন রাখাল বাঁকত, দেবদাস ব্যানারজি, দুলাল ব্যানারজি। গান সামগ্রিকভাবে কোনক্রমে চলনসই বলা যেতে পারে। সনিষ্ঠ প্রস্তুতি ছিল নবনালন্দার সমবেত গানগুলিতে। প্রণতি লাহিড়ীর কণ্ঠে মায়ের গানগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় নয়। তাঁর কণ্ঠস্বর (বলিষ্ঠ অথচ যথেষ্ট মার্জিত নয়) এই চরিত্রের গানগুলির পক্ষে বিশেষ উপযোগী প্রতিপন্ন হয়েছে। সুচিত্রা মিত্র গেয়েছিলেন প্রকৃতির গানগুলি। তাঁর পাশাপাশি নাটকের গান গাওয়া একটি পরীক্ষা বিশেষ, এক্ষেত্রে সেই পরীক্ষায় তিনি সগৌরবে উত্তীর্ণ। আর প্রকৃতির গানে সুচিত্রা মিত্র তাঁর অননাস্বে সমুজ্জ্বল। এই গানগুলির নাটকীয়তা তাঁর কণ্ঠের বলিষ্ঠতা, উচ্চারণ ও সর্বোপরি তাঁর উপলব্ধিতে বিভাসিত হয়ে ওঠে। এ গান শোনা তাই এক অভিজ্ঞতা। চোখ মুদে তাঁর কণ্ঠে এ গান শুনলেও মানসচক্ষে সমস্ত দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে— এ কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাই এ গান শুনে তরুণ সাংবাদিক বন্ধু যখন কৌতুকচ্ছলে বলেন 'রবীন্দ্রনাথের সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি উইলে দেখা গেছে এ গানের সর্বস্বত্ব তিনি শ্রীমতী মিত্রকে দিয়ে গিয়েছেন'—তখন তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় অপূর্ব গেয়েছেন আনন্দের গানগুলি।

মঞ্চসজ্জা। নবনালন্দার মঞ্চসজ্জা বাস্তবানুগ করার প্রচেষ্টা যথার্থ ও সার্থক একথা বলা যায় না। সম্ভবত এই খরচ বাড়তি ও মনে হয়েছে তাঁদের।

যন্ত্রানুষঙ্গ ॥ গতানুগতিক যন্ত্রানুষঙ্গ বিশেষ কোনো মাত্রা যোজনা করেনি দুটি প্রযোজনার কোনটিতেই।

নবনালন্দার 'চণ্ডালিকা'য় ভাস্বতী মিত্র ও পলি গুহ

সাজসজ্জা ॥ নবনালন্দার সাজ-পোশাকে বৈশিষ্ট্য ছিল যা দৃষ্টিসুখকর। কেবল মায়ের চরিত্রের পোশাক কি একটু মাত্রাতিরিক্ত সফিস্টিকেটেড নয়?

আলোকসম্পাত ॥ দুটি প্রযোজনায় আলোকসম্পাতের দায়িত্ব ছিল সুশীল দাশের ওপর। নির্দেশকের নির্দেশে সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজের প্রযোজনায় অনেক চমক দেখিয়েছেন তিনি নানা রঙে রঞ্জিত করে। হিন্দু মন্দির, বুদ্ধদেবের মূর্তি থেকে শুরু করে মেঘ বিদ্যুৎ ইত্যাদি—তবে এত করেও নৃত্য-নাট্যের জলুস খুব বাড়েনি।

আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা যে প্রযোজনাকে অনেকাংশে সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে পারে তার প্রমাণ নবনালন্দার 'চণ্ডালিকা'। তাই পরিশেষে সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজের কাছে নিবেদন : চমকিত করার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে সৃষ্টির প্রয়াসে উদ্যোগী হোন।

সুভাষ চৌধুরী

mpty Dumpty was having a ball!
nching away at his Amul'n' bread
d quite forgotten to fall on his head.
t Humpty Dumpty wasn't a fool -
d fallen already for creamy Amul!
Amul
PASTEURISED
BUTTER
Amul

১৫ অগাস্ট ১৯৭৯ এক টাকা
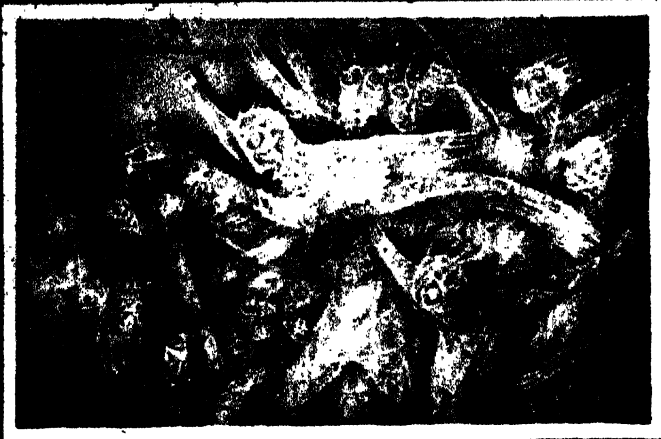
আমার
ডাক্তারকে
জিজ্ঞাসা করুন
কেন আমায় সপন
দিতে বলে...

চিকিৎসকের নির্দেশিত ফর্মুলা অনুযায়ী
প্রস্তুত যাতে শিশুর বাড় ও শরীর গঠন হয়।

সপন মিল্ক ফুড ফর ইনফাণ্টস এতে সবকিছু আছে যা আমার তাড়াতাড়ি বাড়তে দেয়, আমার শক্ত ও সবল রাখে। আমার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি বলেন, ৭ মাসেই আমি নিজে নিজে বসতে পারব যদি এই ভাবে চলি !
কেমন ভান না, হাঃ ?

প্রতি ১০০ গ্রামের উপাদান			
প্রোটিন	২১.০ গ্রাম	ভিটামিন এ	১৫০০ আই.ইউ.
ফ্যাট	১৮.০ "	ভিটামিন ডি	৫০০ আই.ইউ.
কার্বোহাইড্রেট	৫২.৪ "	ভিটামিন সি	৪০ মিঃগ্রাঃ
ক্যালসিয়াম	১.০ "	ভিটামিন বি১	০.৬ "
ফসফরাস	০.৮ "	ভিটামিন বি২	১.০ "
আয়রণ	৪.০ মিঃগ্রাঃ	ভিটামিন বি৬	০.৩ "
নিয়াসিনামাইড	৬.০ মিঃগ্রাঃ	ভিটামিন বি১২	১.২ মি.সি.জি.

IS: 1547

স্বাস্থ্যবান শিশুর গঠনের জন্য
সপন
মিল্ক ফুড ফর ইনফাণ্টস

প্রস্তুতকারক : ডালমিয়া ডেয়রী প্রোডাক্টস, থানা সেওয়ার বাইপাস রোড, ভারতপুর, রাজস্থান

ADPLAN-DD-414 BN.

এ বছরটি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। আপনি আপনার বাচ্চার ভবিষ্যতের কথা ভাবুন।

বাচ্চা বড়ো হওয়ার সাথে সাথে আপনার অর্থ-সঞ্চয়ও বেড়ে ওঠা দরকার।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক সেই সুযোগই আপনাকে এনে দিয়েছে দুটি পরিকল্পনায়—ডবল ডিপোজিট আর রেকারিং ডিপোজিট স্কীমে

বাচ্চারা বড়ো হতে থাকবে। বয়সের সাথে সাথে ওদের লেখাপড়া, আমোদ-আহলাদ, সাজ-পোশাক, এটা-ওটা উপহার ও আরো কতো কি চাহিদা আপনাকে মেটাতে হবে। তার জন্যে বাড়তি টাকার সংস্থান কি ক'রে হবে কিছু ভেবেছেন?

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক কিন্তু এব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারে...

ডবল ডিপোজিট স্কীম

★ এতে আপনার এককালীন জমা টাকা দু'উপায়ে বাড়বে। আসল টাকার ওপর পাবেন প্রতি তিনমাস অন্তর সুদ, যা সঙ্গে সঙ্গেই আবার আসলের সঙ্গে যোগ হয়ে পরবর্তী তিন মাসে আপনাকে পাইয়ে দেবে আরো বেশী সুদ। এই ভাবে আপনার সঞ্চয় বেড়ে উঠবে।

★ [illegible] বছর পরে আপনার জমানো টাকা দ্বিগুণ হয়ে উঠবে।

রেকারিং ডিপোজিট স্কীম

★ এতে আপনার সুবিধেমত প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট টাকা জমা রাখতে পারেন।

★ [illegible] থেকে [illegible] মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদ বেছে নিতে পারেন।

★ মেয়াদ অনুসারে জমানো টাকার [illegible] শতাংশ কিংবা তারও বেশী বাড়তি ফেরত পাবেন।

মনে রাখবেন, ব্যাঙ্কের আমানত থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক ৩০০০ টাকা পর্যন্ত সুদ আয়করমুক্ত এবং ব্যাঙ্কে ১.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানতের ওপর সম্পদকর লাগেনা। আপনাদের সুবিধের জন্য বছরে অর্জিত সুদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

আপনার কাছাকাছি যেকোন শাখায় বিস্তারিত জেনে নিন।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্ক

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

ULKA-AB 5 BLN

চিঠিপত্র

পৌরাণিক মনে স্ত্রী বিদ্বেষ

গত ৩০ জুন ১৯৭৯-তে প্রকাশিত দেশ পত্রিকায় "পৌরাণিক মনে স্ত্রী বিদ্বেষ" প্রবন্ধে শ্রীঅশোক রুদ্র অধ্যবসায় ও সত্যানুসন্ধানের যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসা-যোগ্য। কিন্তু প্রসঙ্গত তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন মনে জাগে। কারণ তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজে হিন্দুধর্মের পটভূমিকায় নারীর স্থান নিয়েই আলোচনা করেছেন এবং অন্যান্য দেশের সমাজ ও ধর্মের কথা তুলনামূলকভাবে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত দুটি মহাকাব্য ও কয়েকটি তথাকথিত শাস্ত্রের বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি এবং কাহিনী থেকে সমাজতত্ত্বের একটি জটিল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্মত হবে? কি পরিপ্রেক্ষিতে, কোন প্রসঙ্গে এইসব উক্তি করা হয়েছে তার উপর এগুলির মূল্যায়ন হওয়া উচিত। আমরা পাশ্চাত্ত্য কাব্যে ও ধর্মশাস্ত্রেও তো এই ধরনের অজস্র উক্তি বা মন্তব্য পাই। ইংলন্ডের মহাকবির উক্তি :
"Frailty, thy name is woman" (Shakespeare)
বা অন্য এক সুবিখ্যাত কবির উক্তি :
"Most women have no characters at all" (Pope) থেকে কি প্রমাণিত হয়? নারীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে
"It is not good that the man should be alone; I will make him and help meet for him" (Bible) অর্থাৎ কেবলমাত্র পুরুষকে সম্পাদানের জন্য নারীর সৃষ্টি
"God make the woman for the man" (Tennyson)
এটা কি নারীর পক্ষে বিশেষ সম্মান-সূচক? পুরুষের একটি মাত্র পঞ্জরাস্থি থেকে পুরুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিধাতা যে নারী সৃষ্টি করেছেন, তাকে যে কখনোই পুরুষের সমকক্ষ মনে করা হয়নি একথা সকলেই স্বীকার করবেন। মানুষের স্বর্গ থেকে পতনের জন্যও দায়ী করা হয়েছে নারীর লোভ, চিত্ত-চাঞ্চল্য এবং পুরুষের উপর মোহবিস্তার —এই প্রসঙ্গে পুরুষের কৈফিয়ৎ
'The woman whom thou gavest to be with me, she gave me the tree & I did eat" (Bible)
এবং এই কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে অন্য দেশের এবং অন্য শাস্ত্রকার ও কবিরা নারী সম্বন্ধে একই রকম বিদ্বিষ্ট মনোভাব পোষণ করতেন। বিশ্বের আর একটি বড় ধর্ম ইসলাম শাসিত সমাজে নারীর সম্মান কেমন ছিল মধ্যযুগের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে।

ইসলামের অনুশাসন অনুসারে এখনও যে কোনো পুরুষ চারটি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। এমনকি বর্তমান-কালেই একটি গোঁড়া ঐসলামিক রাষ্ট্রে 'বোরখা' প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলছে। এগুলি নারীর পক্ষে কতখানি সম্মানজনক? প্রাচীন সভ্যতার আর একটি পীঠস্থান মিশরে ফ্যারাও সম্রাট-দের মৃত্যু হলে তাঁর প্রিয় বস্তুগুলির সঙ্গে নারীকেও সমাধিস্থ করা হত। প্রাচীন মহাচীনেও নারীর স্থান কি সম্মানিত ছিল? কিন্তু হিন্দুধর্মাশ্রিত ভারতের যে দুটি প্রাচীন মহাকাব্যকে লেখক উপজীব্যরূপে ব্যবহার করেছেন সেই দুটিকেই সামগ্রিকরূপে বিচার করলে আমরা দেখি এক নারীর অসম্মানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ স্বর্ণলঙ্কা ও রাক্ষসকুল সমূলে ধ্বংস হল, আর এক নারীর অপমানের ফলে কুরুবংশ নির্বংশ হল। নারীর অশ্রু অপরাজেয় দানবরাজ বিত্রাসুর নিধনের প্রত্যক্ষ কারণ। মহিষাসুর (অশুভশক্তি)-কে দমনের জন্য শুভশক্তিকে হিন্দু-ধর্মে নারীরূপেই আবাহন করা হয়েছে। এগুলি কি সমাজে নারীর সম্মানিত আসনের স্বীকৃতি নয়? এই সব পরিকল্পনা নিশ্চয় বিদ্বেষপ্রসূত নয়। তাছাড়া পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যে নারী চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তার তুলনায় সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, গান্ধারী কি অনেক মহত্তররূপে চিত্রিত নয়? সীতা অপহৃতা এবং পরপুরুষ গৃহে বসবাস করা সত্ত্বেও তাঁর স্বামী তাঁকে পুনরুদ্ধার করে সসম্মানে নিজ আসনে প্রতিষ্ঠা করতে একটুও দ্বিধা করেননি। আমরা আরও দেখি সতীত্বের আদর্শ (যার উপর লেখক বিশেষ কটাক্ষপাত করেছেন) থেকে বিচ্যুত 'পঞ্চকন্যা' ভারতীয় আদর্শে নিত্যপূজা লাভ করছেন। এই সব দৃষ্টান্ত অশোকবাবুর সিদ্ধান্ত সমর্থন করে কি?

দ্বিতীয়ত, যেহেতু লেখক ব্যাপক-ভাবে ভারত ও হিন্দুধর্মের উল্লেখ করেছেন, সেই হেতু আর একটি কথা স্মরণ রাখলে ভাল করতেন। ভারত অর্থে কেবলমাত্র আর্যাবর্ত নয় এবং উচ্চবর্ণের আর্য সমাজ সমগ্র ভারতের প্রতিচ্ছবি নয়। দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় সভ্যতাবিশিষ্ট সমাজে নারীর স্থানও প্রসঙ্গত অবশ্যই বিচার্য হওয়া উচিত।

তৃতীয় এবং শেষ কথা আমি যা বলতে চাই সে বিষয়ে লেখক নিজেই কারণ নির্ণয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। সেটি হল পৃথিবীর কোন ধর্মে হিন্দু-ধর্মের মত নারীদেবতার প্রাধান্য দেখা যায় কি? প্রসঙ্গত হিন্দুদর্শনে পুরুষ প্রকৃতি চিন্তা এবং কাব্যে অনন্ত নায়িকা শ্রীরাধার কল্পনা ভারতীয় সমাজে নারীর সম্মানিত আসন সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে কি?

আশা করি লেখক এবং অন্যান্য বিদগ্ধ পাঠকবৃন্দ উপরিউক্ত যুক্তিগুলি চিন্তা করবেন।

বিমান গঙ্গোপাধ্যায়
বালী, হাওড়া

গান্ধী চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা

শ্রীযুক্ত সামন্ত হোমের 'গান্ধী-চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা' প্রবন্ধটি পড়ে ভাল লেগেছে। গান্ধীর চিন্তাধারায় এমন কিছু মৌলিকতা আছে যা দেশ ও বিদেশের চিন্তাবিদদের ভাবিয়েছে। বর্তমান লেখকও সেই ভাবনার শরিক হতে চেয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ এ কথাই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে, ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের কাজে গান্ধীর অর্থনৈতিক চিন্তার প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। গ্রামকেন্দ্রিক এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর প্রাধান্য দিয়ে

পূজা সংখ্যা মানেই আনন্দবাজার

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা

উপন্যাস

কালকূট
রমাপদ চৌধুরী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব গুহ
রমানাথ রায়

বড় গল্প

শংকর

সচিত্র প্রবন্ধ

'রবীন্দ্রনাথ কেমন ক'রে লিখতেন।'
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

গল্প

আশাপূর্ণা দেবী
সন্তোষকুমার ঘোষ
বিমল কর
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
নবনীতা দেব সেন
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সমরেশ মজুমদার
শেখর বসু
এবং আরো অনেকে।

কবিতা

বিষ্ণু দে
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
রাজলক্ষ্মী দেবী
অরুণকুমার সরকার
শঙ্খ ঘোষ
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
কেতকী কুশারী ডাইসন
আলোক সরকার
সুনীল বসু
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
রত্নেশ্বর হাজরা
সাধনা মুখোপাধ্যায়
দেবারতি মিত্র
এবং আরো অনেকে।

১২.০০/রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪.৯০

আপনার কপির জন্য আজই এজেন্টকে বলে রাখুন বা আমাদের লিখুন ঃ
সার্কুলেশন ম্যানেজার,
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড
কলকাতা-৭০০ ০০১

১৩৮৬

AAB/CAS-7/79 BEN

দেশকে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এর জন্যে তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই।

তবু আমার মনে হয়েছে যে, লেখকের দৃষ্টি আংশিক সত্যকেই উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছে এবং তাঁর আলোচনায় একদেশদর্শিতার প্রাবল্য।

গান্ধীর দৃষ্টিতে গ্রামভারত এবং গ্রামের মানুষ বড় হয়ে উঠেছিল বলেই গান্ধীর নেতৃত্বে একদা সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ জেগে উঠেছিল এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পথে নেমে এসেছিল। এই জনজাগরণের ভূমিকাই গান্ধী নেতৃত্বের সব চেয়ে বড় দান। তবু গান্ধীর জীবনে তাঁর রাজনৈতিক প্রেরণাকে অতিক্রম করে জেগেছে তাঁর ধর্মগুরুর ভূমিকা। আজীবন এই নীতিবিদ ও ধর্মগুরুর জীবনচিন্তার সঙ্গে সংঘাত চলেছে বাস্তব রাজনীতিকের। যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাঁকে সরে যেতে হয়েছে প্রথমে সবরমতী আশ্রমে এবং শেষ পর্যন্ত জনচেতনার অন্তরালে।

আমরা লেখকের সঙ্গে একমত যে, 'গান্ধীজির গ্রামীণ অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ' এবং 'ভারতবর্ষের মতন কৃষিপ্রধান দেশের অর্থনীতি কৃষিকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না।' কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশই পুরোপুরি কৃষিনির্ভর হয়ে মাথা তুলতে পারেনি। কারণ কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ ইচ্ছে করলেই বাড়ানো যায় না, বরং জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিমাণ কমতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, কৃষিতে উন্নত দেশগুলিতেও কৃষি মানুষকে সারা বছরের কাজ যেমন দিতে পারে না, তার সামগ্রিক চাহিদাও তেমনি মেটাতে পারে না। তা হলে কৃষিকর্মের পরিপূরক হিসেবে দরকার কুটিরশিল্প ও গ্রামীণ শিল্পের প্রসারের। কিন্তু গ্রামীণ শিল্প একটি দেশের সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে পারে কি?

কুটিরশিল্পের জন্যও চাই ব্যাপক বাজার। বাজার বা মার্কেটিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির কাঁচামালের চাহিদা মেটানোর সমস্যাও কম নয়। এই কাঁচামাল অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশ থেকে আনতে হয়। তার জন্যেও চাই টাকা।

শুধু কুটিরশিল্প ও গ্রামীণ শিল্প কখনো কোন দেশকে স্বয়ম্ভর করতে পারে না। যদি উল্লেখ করা যায় যে, পুরুলিয়ার জঙ্গলে অথবা তরাই অঞ্চলে ও আসামের আদিবাসীরা সভ্যজগৎকে উপেক্ষা করেও বেঁচে আছে, তা হলে সেই উদাহরণ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয় না।

একটি প্রসারমাণ সভ্যদেশকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পাশাপাশি যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়, তবে তাকে স্বনির্ভর হতেই হবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ ধনতন্ত্রের প্রসার নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু দেশের চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাও সম্ভব নয়। ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারের জন্য কাঁচামাল কেনা এবং যন্ত্রপাতি কেনার জন্যও যেমন আমরা অন্যের দরজার পাত্র হতে পারি না, কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সার, কীটঘ্ন ঔষধ এবং কৃষির যন্ত্রপাতির ব্যাপারেও তেমনি বহির্জগতের কাছে ভিখারী হয়ে থাকতে পারি না। পারি না বলেই ক্ষুদ্রশিল্পের প্রয়োজনেই বৃহৎ ও মৌলিক শিল্প প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তা ছাড়া বিদেশী মুদ্রা না হলেই বা ভারতবর্ষ বাঁচবে কি করে? আজকে যদি বাইরের জগতে আমরা হাতে কাটা সুতোর চাদর বিক্রি করতে যাই তবে সে ক্ষেত্রে বাজার শুধু সংকুচিত নয়, ব্যক্তিগত রুচির ওপরও নির্ভরশীল।

গ্রামীণ শিল্পের ওপর অতি প্রাধান্য দিতে গিয়ে গান্ধী বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পের প্রয়োজনকে একেবারেই অস্বীকার করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু যখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন, তখন শিল্পপ্রসারের গুরুত্ব চিন্তা করে তিনি ডঃ মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধী প্রথম থেকেই এর বিরোধিতা করেন। সুভাষকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করা হলে গান্ধীর নির্দেশে ওই কমিশনের বিলুপ্তি ঘটে।

লেখক তাঁর কাব্যময় ভাষায় বলেছেন বা উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, 'সমস্ত শরীরকে রক্তশূন্য করে যদি সমস্ত রক্ত কেবল মুখেই সঞ্চারিত হয়, তবে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।' কিন্তু লেখক ভুলে গিয়েছেন যে, মুখে সঞ্চিত হওয়াটা যেমন অস্বাস্থ্যকর, রক্তশূন্যতা তেমনি মারাত্মক। এই ষাট কোটি মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সামগ্রী—খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধ থেকে শুরু করে যুদ্ধাস্ত্র পর্যন্ত—আজও আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। এবং পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষের মোট ঋণের পরিমাণ বারো হাজার কোটি টাকারও বেশী। জাপান শুধু ক্ষুদ্রশিল্প নয়, বৃহৎ শিল্পকেও সমাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বাইরের জগতে জাপানী ইয়েনের প্রবল মর্যাদা কিন্তু ভারতীয় মুদ্রার মূল্য ছেঁড়া কাগজের মতই।

রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃত করেছেন লেখক, কিন্তু তিনি বলেননি, যে, গান্ধীনীতিকে কবি সমর্থন করেননি। শুধু চরকা সম্বল করে, সুতো বয়ন করে, পেস্ট-এর বদলে দাঁতন ব্যবহারের দ্বারা একটা দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে না। চরকা যেমন রবীন্দ্রনাথের কাছে মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারেনি, গান্ধীর বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যে যে ফাঁক ছিল, তাও তেমনি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

মার্কসবাদ বা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির নীতির মধ্যে যে ফাঁকি, তা যেমন তাঁর চোখে পড়েছে, গান্ধীর অর্থনৈতিক ও স্বাদেশিকতার ভাবনায় যে অসম্পূর্ণতা, তা তেমনি তাঁর দৃষ্টি

এড়িয়ে গেছে। আমরা চাই, গ্রামভারত এবং গোটা ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতি। এই সার্বিক উন্নতির পথে গ্রামকে যেমন প্রাধান্য দিতে হবে, গ্রামীণ শিল্পকে যেমন প্রসারিত করতে হবে, তেমনই আধুনিকীকরণের পথে গোটা ভারতবর্ষকেই নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে। সে ভারতবর্ষ শুধু রাষ্ট্রচিন্তায় নয়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে; এবং কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতেও নয়, মনুষ্যত্বের চেতনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার সমন্বয়ের পথ ধরেই সে পরিপূর্ণতা আসবে।

সন্তোষ অধিকারী
কলকাতা-২৯

'বরাবর' নিয়ে ভীষণ বিবাদ

শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্তের 'বরাবর যাত্রায় ভীষণ বিপদ' (দেশ, ১৯ মে) পড়েই এই চিঠি লেখবার ইচ্ছে হয়েছিল। শ্রীমতী বাণী রায়ের চিঠি পড়ে (দেশ, ৭ জুলাই) সে ইচ্ছে প্রবলতর হল। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশায়ের 'রবীন্দ্র সংগমে' পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। 'রবীন্দ্র-জীবনী' ২য় খণ্ডের ৩৮৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় প্রবন্ধটির উল্লেখ দেখেছি। তবু শ্রীসেনগুপ্তের তথ্যাবলম্বন যে 'রবীন্দ্র সংগমে' এটি অনুমান করতে অসুবিধে হয়নি। কারণ, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রজীবনীকার), অসিতকুমার হালদার ('রবিতীর্থে' পৃঃ ৭০-৭১), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত বর্ণনা (লোক-সেবক বার্ষিকী, ১৩৬০—অসিতকুমার হালদার কর্তৃক 'রবিতীর্থে' উদ্ধৃত, পৃঃ ৭১)-র সংগে আলোচ্য প্রবন্ধটির স্থানে স্থানে কিছু গরমিল আছে। মূল ঘটনায় অবশ্যই নয়, কোথাও কোথাও details-এ। শ্রীমতী রায়ের চিঠি থেকে জানা গেল সুজিতবাবুর প্রবন্ধটি সতীশবাবুর প্রবন্ধের প্রায় হুবহু অনুকৃতি। প্রাচীন কোনো ঘটনা বা ইতিহাস উদ্ধার করতে গেলে অবশ্যই পূর্বসূরীদের রচনার ওপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু সূত্রের উল্লেখ থাকলে কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় না। এ ক্ষেত্রে সব-চেয়ে বিভ্রান্তিকর লেখকের বর্ণনাভঙ্গি। ভ্রম হয়, বুঝি 'বরাবর যাত্রার ভীষণ বিপদ'-এর লেখক স্বয়ং এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তিনি কোন সূত্রে তথ্য আহরণ করেছেন জানাননি। আমাদের আরো একটি আপত্তি আছে। তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তিনটিতে যখন কিছু অসামঞ্জস্য আছে, গবেষকের উচিত সমস্ত তথ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করা। অসিতবাবু লিখেছেন, তাঁরা নিজেরাই রবীন্দ্রনাথ সহ গয়া থেকে ট্রেনযোগে বেলা পৌছান এবং সেখানে গিয়ে 'ক'-বাবুর সাক্ষাৎ পান না। নিজেরাই শাস্তগ্রামের একটি দোকানে ফুলুরি-কচুরি-কলা-দই যা' পেলেন তাই দিয়েই উদরপূর্তি করে কবির জন্যও স্টেশন ওয়েটিং রুমে কিছু কলা কিনে নিয়ে যান। বেলা স্টেশনেই তাঁদের বেলা পড়ে যায়। তারপর (অভিযানের) 'প্রযোজকের এক বন্ধু রাজার কাছ থেকে 'একটা বিরাট দাঁতওয়ালা হাতি এলে' ও'রা তাতে চড়ে বরাবরের উদ্দেশে রওনা হন। রবীন্দ্রনাথের দৌর দেখে অসিতবাবুরা নিজেরাই পাহাড়ে চড়ে স্থানীয় এক ব্যক্তির সহায়তায় 'আজীবক সাধুদের গুহা-কর্ম দেখে' আসেন। তাঁরা যে বরাবর গুহা দেখেছিলেন তা চারুবাবুর বর্ণনা (অসিতবাবু কর্তৃক উদ্ধৃত) থেকেও জানা যায়।

সুজিতবাবুর বিবরণে আছে, 'ক'বাবু, সতীশবাবু এবং কবিকে পালকিতে রওনা করিয়ে দিয়ে নিজে বেলা স্টেশন থেকেই পালিয়ে যান। রবীন্দ্রজীবনীকার কিন্তু জানিয়েছেন ('বরাবর'কে অবশ্য তিনি লিখেছেন 'বারবরা'), "বেলা স্টেশনে পৌঁছিলে অনেক কষ্টে একখানি পালকি যোগাড় হইল। কবিকে উহার মধ্যে ঢুকাইয়া লোকটি মহোৎসাহে চলিয়াছেন। গ্রামের পর গ্রাম, কোথায় আতিথ্য, কোথায় অভ্যর্থনা। জিজ্ঞাসা করিলেই লোকটি বলে, 'আর একটু আগেই সব ব্যবস্থা আছে।' ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কবি যখন ফিরিবার জন্য জিদ ধরিলেন তখন লোকটি অদৃশ্য হইয়াছে।" (রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৮৮)। অমিল যদিও খুঁটিনাটি বর্ণনায়, তবু সুজিতবাবু যখন এত ডিটেলস-এ গিয়েছেন, এ সমস্ত বিষয়ের ওপরই আলোকপাত তাঁর মত গবেষকের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল। আর তা হলে সতীশবাবুর লেখাটিকেই তিনি নিজের নামে নতুন করে উপস্থাপিত করেছেন—এই অভিযোগেও তাঁকে অভিযুক্ত হতে হত না।

অমল সেনগুপ্ত
নবাবগঞ্জ, হাজারিবাগ

হরপ্রসাদ ও আশুতোষ

'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থ'-এর আলোচনায় (দেশ ৭-৭-৭৯) সুধীর চক্রবর্তী প্রসংগত লিখেছেন—'হরপ্রসাদ ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে আশ্চর্য এক সম্বন্ধ ছিল। গভীর সখ্যের মাধুর্য থেকে...আশুতোষ তাঁর পুত্রদের নাম রেখেছিলেন হরপ্রসাদের প্রসাদটুকু নিয়ে।...অথচ শেষ জীবনে কখন কীভাবে যেন এই দুই মনীষীর সম্পর্কে চিড় ধরে।'

আশুতোষ-পুত্রদের নামকরণ ব্যাপারে অন্য মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন, পিতা গঙ্গাপ্রসাদের প্রসাদটুকু পুত্রদের নামের সঙ্গে যোগ করেছিলেন আশুতোষ। যেমন, তাঁর নামের 'তোষ' যুক্ত হয়েছে পৌত্রদের নামের সঙ্গে।

তবে বড় কৌতুক ও কৌতূহলের বিষয়, আশুতোষ ও হরপ্রসাদের বিরোধ। গবেষক মনীষী হরপ্রসাদকে কেন্দ্র করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' যেমন এক বিদ্বৎ-গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল, তেমনি আশুতোষের 'কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠান আর এক বিদ্বৎ-গোষ্ঠী তৈরি করে গবেষক মনীষী দীনেশচন্দ্র সেনকে কেন্দ্র করে। ঐ দুই মনীষীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কের আবর্ত রচনা করেন দুই গোষ্ঠীর লেখকেরা।

এ বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ মহল আলোকপাত করতে পারেন।

সমর রায় কলকাতা-৫

রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ

শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্তী মশাইয়ের ধারাবাহিক রচনা "সুধাসাগরতীরে" (দেশ, ৩০-৬-৭৯) পড়তে গিয়ে আধুনিক গানের সুরসৃষ্টি সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের এক প্রশ্নের সহজ মীমাংসা খুঁজে পেলাম। তিনি শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সান্যালের Ragas and Raginis গ্রন্থ থেকে অঙ্কের হিসেবে ষাড়ব বর্গের একটি সরগম দিয়েছেন (সা রা গা মা দা ণা র্সা) যাতে কোনোক্রমেই রাগ সৃষ্টি সম্ভব নয়। আসলে যে-কোনো স্বরেই সুরের প্রকৃতি ফুটে ওঠে না, কী কী স্বর-সংবাদে রাগের মাধুর্য আসে তার রহস্য না উপলব্ধ হলে রঞ্জনা আনা অসম্ভব। বস্তুত সমস্ত শিল্পকলাই সুষমার নীতি মেনে গড়ে ওঠে। আর এই বোধ তো তৈরী হয় আবাল্য দেখে আসা ফুল্ল-কুসুমিত জ্যোৎস্নাপুলকিত পৃথিবীর রূপ থেকেই। প্রকৃতিতে আছে সংগতি, যা সৌন্দর্যবোধ জাগায়, আর অসঙ্গতি সে তো ভয়াবহ। প্রকৃতি-বিচ্ছিন্নতাই অসুন্দরের দিকে এ-বিশ্বকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বেশীর ভাগ আধুনিক গান তারই এক প্রকাশ।

'খণ্ড মেরু' আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীসান্যালের মত উল্লেখ করে লিখেছেন, "প্রাচীনকাল থেকে যে রাগ ও রাগিণী নামে সুরের ভেদ রয়েছে সেটা মোটেই কারো মনঃকল্পিত নয়",—এই বক্তব্যের সঙ্গে রুশ ধ্রুপদী সঙ্গীতগুরু Glinka-র মতের যোগ খুঁজে পাই, তিনি বলেছেন,

It is the people who create music. We only arrange it.

ভেঙে বললে দাঁড়ায়, 'পার্সোন' নয় 'পিপ্‌ল্'ই সুর-স্রষ্টা, আর আমরা সেই সুরের ঐতিহ্যকে নতুন নতুন পরিশীলনে নতুন নতুন অবয়ব দিই। Glinka-র বক্তব্যের তাৎপর্য যা বুঝি তা হল এই ভূ-প্রকৃতি, অর্থাৎ দেশের জল-বাতাসের ভেতর থেকেই লোক-সাধারণ গড়ে তোলে সুর, যার শাশ্বত ও মধুর রূপ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, সমস্ত লোকায়ত সম্পদই গুণীদের পরিশীলনে হয় শাস্ত্রীয়।

সবশেষে তাই আধুনিক সুর-স্রষ্টাদের কাছে একান্ত অনুরোধ তাঁরা যেন সৃষ্টির প্রয়োজনে আরো বেশী যুগপৎ লোকায়ত এবং শাস্ত্রীয় হন, নতুবা যে অ-সুরের অগাধ জলে হাবু-ডুবু খেয়েই মরব।

করুণাপ্রসাদ দে ইছাপুর

আণ্টিগোনে

শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্ত প্রমুখ নাট্য-সমালোচকদের ধন্যবাদ তাঁরা ম্যাক্সমুলার ভবন প্রযোজিত "আণ্টি-গোনে"র (দেশ—২রা জুন) চাকচিক্য দেখেই অভিভূত হননি, প্রযোজনাটির অন্তঃসারশূন্যতা তাঁরা অনুভব করেছেন। এ কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন আছে কারণ এমন সমালোচকও আছেন যিনি ম্যাক্সমুলার ভবন আয়োজিত অনুষ্ঠান মাত্রেরই প্রসঙ্গে নমিত হয়ে পড়েন, বিশেষত তা যদি কোনো বিদেশী পরিচালিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে কলকাতার প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত অনুচিতভাবে এই ধরনের ব্যয়বহুল প্রযোজনার তুলনা করে পূর্বোক্ত প্রযোজনাগুলিকে হেয় করে দেখানোর চেষ্টা হয়। হয়তো কলকাতার প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলগুলি দ্বারা বর্জিত হবার জন্য যে হীনম্মন্যতা পীড়িত করে তা প্রকাশ পায় সেই দলগুলির নাট্য-প্রযোজনা সম্বন্ধে যুগপৎ রুচিহীন ও যুক্তিহীন আক্রমণে। যদিও নাট্যানুরাগী দর্শকের উপর এমন সমালোচনার প্রভাব শূন্যপ্রায় তবু নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে দেবাশিসবাবুর কাছে একটি অনুরোধ রাখতে চাই। ম্যাক্স-মুলার ভবন প্রযোজিত আণ্টিগোনে জাতীয় প্রযোজনায় শুধু মঞ্চ নির্মাণে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তাও যেন তাঁরা তুলে ধরেন। হয়তো দর্শক তা হলে নিজেই বিচার করতে পারবেন যে শুধু অভিনয়-গৌরবে বা সামগ্রিক শিল্পসৌকর্যেই নয়, আমাদের নাট্য-দলগুলি (যাদের সঙ্গে দেবাশিসবাবুরই ভাষায় "বিত্ত-বৈভবের ভাসুর-ভাদ্দর-বউ সম্পর্ক") এই পরিমাণ অর্থ সাহায্য পেলে কোনো উন্নততর নাট্য নির্দশন রাখতে সক্ষম কিনা?

কল্যাণী বসু কলকাতা-১৯

রোমে নয় মেলবোর্নে

২৩ জুন দেশ পত্রিকায় সুপ্রিয় সেনের লেখা ফুটবলে 'নতুন চিন্তার প্রয়োজন' পড়লাম। লেখাটির মধ্যে কিছু ভুলত্রুটি চোখে পড়েছে—সে সম্পর্কে আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভারত ফুটবলে মোট চারবার বিশ্ব অলিম্পিকে যোগদান করার সুযোগ পেয়েছিল। যথাক্রমে ১৯৪৮, ৫২, ৫৬ ও ৬০ সালে। লেখক লিখেছেন ১৯৫৬ সালে রোম অলিম্পিকে রহিম কোচ হয়েছিলেন। এবং ঐ খেলায় ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। এই তথ্যটি সম্পর্কে জানাই ১৯৫৬ সালে মেলবোর্নে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, রোমে নয়।

মেলবোর্ন অলিম্পিকে বদ্রু (সমর) ব্যানার্জির নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল দল চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে বদ্রু ও নিখিল নন্দী খেলতে যাননি। ১৯৬০ সালে প্রদীপ ব্যানার্জির নেতৃত্বে বলরাম, চুনী গোস্বামী, কানন, সাইমন, সুন্দররাজ, রামবাহাদুর, কেম্পিয়া, জার্নেল সিং, অরুণ ঘোষ, থঙ্গরাজ প্রভৃতি খেলোয়াড়রা গিয়েছিলেন, সে অলিম্পিকে ভারত সন্তোষজনক ফল দেখাতে পারেনি।

বানিক অধিকারী কলকাতা-১২

হায় বাংলার ক্রিকেট

১৬ই জুন সংখ্যায় চিঠিপত্রে হায় বাংলার ক্রিকেট-এর বিরুদ্ধে অম্বর দত্ত মহাশয়ের প্রতিবাদপত্র পড়লাম, আমিও অম্বরবাবুর সঙ্গে একমত।

অশোকবাবু ত্রুটি স্বীকার করে লিখেছেন সম্বরণ ব্যানার্জী নাকি ইউনাইটেড ব্যাংকের কর্মী। ওটাও ভুল। উনি বোধ হয় সম্বরণ ব্যানার্জীকে

স্টেট ব্যাংকের কর্মী পরে ত্রুটি স্বীকার করে লিখলেন ইউনাইটেড ব্যাংকের অফিসার। আসলে উনি চাকরি করেন ইউনাইটেড কমারশিয়াল ব্যাংকে।

দীপঙ্কর মজুমদার কলকাতা-১২

বিজ্ঞান

২৩ জুনের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসমরজিৎ করের লেখা "একটি ওষুধ, মা, সন্তান এবং একটি সামাজিক প্রশ্ন" প্রবন্ধটি পড়ে খুব ভাল লাগল। সমরজিৎবাবু সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা অর্থাৎ প্রায়-বন্ধ্যা নারীর সন্তানলাভের সমস্যার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেছেন। কিন্তু একটি জায়গায় একটু সংশয় লাগছে। তিনি লিখেছেন, "অনেক সময় দেখা যায়, মেয়েদের কোন ত্রুটি নেই। ত্রুটি পুরুষের দেহে, কোন পুরুষ হয়তো উপযুক্ত পরিমাণ শুক্র-কোষ উৎপাদন করতে পারছেন না বলেই মেয়েদের ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সন্তানধারণ করতে অসমর্থ হন।" যত দূর জানি, নিষিক্ত হওয়া বা ফার্টিলাইজেশন কাজটি হয় ডিম্বাণুর সঙ্গে একটি মাত্র শুক্র-কোষের মিলনের ফলে। শুক্র-কোষের পরিমাণ উপযুক্ত পরিমাণে না হলে ফার্টিলাইজেশনের অসুবিধা হতে পারে কিন্তু ফার্টিলাইজেশন হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিমাণ শুক্র-কোষের অভাবে সন্তানধারণে অসমর্থ হন—কথাটা কেমন গোলমেলে লাগছে। তবে ফার্টিলাইজেশনের পর অবশিষ্ট শুক্র-কোষের সন্তানধারণের ব্যাপারে ভূমিকা কী? লেখক এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করলে বাধিত হব।

দিলীপ রায়চৌধুরী মুর্শিদাবাদ

পর্বতারোহণ স্পোর্ট পশ্চিমবঙ্গ

৩০ জুনের সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তীর লেখা পর্বতারোহণ স্পোর্ট পশ্চিমবঙ্গ লেখার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু শ্রীচক্রবর্তী কিছু কিছু কথা এড়িয়ে গেছেন তার জন্য লিখতে বাধ্য হচ্ছি।

(১) বেসরকারী পর্বতারোহণের প্রথম উদ্যোক্তা আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার শ্রীঅশোককুমার সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল। কারণ, তাঁর ইচ্ছা এবং চেষ্টা না থাকলে দার্জিলিং-এ H M I স্থাপন সম্ভব ছিল না। অন্যথায় এই বিপুলসংখ্যক পর্বতারোহী তৈয়ারী হওয়াও সম্ভব ছিল না।

(২) ১৯৭৮ সালে পশ্চিম বাংলায় ১৮টা অভিযান সংগঠিত হয়েছিল। এটা ভুল। কারণ ১৯৭৮ সালে পশ্চিম বাংলায় সবচেয়ে বড় অভিযান সংগঠন করেছিল 'টেকার্স গিল্ড'। এর "ইণ্ডিয়ান মানা কামেট অভিযান" যার কোন উল্লেখ ওঁর মূল শিবিরে মৃত্যুর খবর লিখেছেন। এই দেখেই মনে হয় ভুলটা ইচ্ছাকৃত। দ্বিতীয়ত তিনি লিখেছেন এই ১৮টি অভিযানে খরচ হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। এটাও মেনে নেওয়া যায় না। কারণ শ্রীচক্রবর্তী বোধ হয় কোন পর্বত অভিযানের উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেননি। কারণ যে-কোনও ২৫ থেকে ৩০ দিনের অভিযানের সদস্যপ্রতি ২ হাজার টাকা খরচ পড়ে। এ টাকা ছাড়াও ভারতবর্ষের বহু নামী কোম্পানী প্রচুর জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করেন।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তী মহাশয়কে পর্বতারোহণ সম্বন্ধে লেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ওঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই জাতীয় কোন লেখার আগে যেন তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন।

সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা ২০

বিজ্ঞাপনে প্রতারণা : প্রকাশক পক্ষের নিবেদন

'দেশ' পত্রিকার ২৮শে জুলাই সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত তিনটি চিঠির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই চিঠিগুলিতে ডাকযোগে বই না পাওয়ার জন্য গ্রাহকরা অভিযোগ করেছেন। গোয়াল-পাড়ার শ্রী জে ভট্টাচার্য সরাসরি প্রবঞ্চনার অভিযোগই করেছেন। অথচ তাঁর কাছ থেকে দু দুবার বইয়ের প্যাকেট ফেরত এসেছে। ডাকঘরের ছাপ ও মন্তব্য সহ প্যাকেটে তার প্রমাণ আছে। এরকম প্যাকেট প্রায় প্রতিদিন ফেরত আসে। তেজপুরের শ্রীপরিমল ভট্টাচার্যকে বই পাঠানো হয়েছে। আশা করি ইতিমধ্যে তিনি তা পেয়েছেন। শ্রীমতী মীরা ভট্টাচার্যের অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছি।

মূলত স্বেচ্ছাকর্মীরা এই সংগঠন চালান। সাক্ষরতা প্রকাশন নানা কারণে গত ১৯৭০ সাল থেকে সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। প্রকাশন বিভাগের কর্মীদের এই ত্রুটির দায় স্বীকার করে নিয়ে অনতিকালের মধ্যে তা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। বিভিন্ন গ্রন্থের কয়েকটি খণ্ড পাঠাতে দেরি হবে। কারণ, ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বরের অতি বর্ষণে সমিতির বাড়ির একতলা জলমগ্ন হওয়ায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ বহু ফর্মা নষ্ট হয়েছে। ক্রমে ওঠা কাজ করানোর সঙ্গে এই সব ফর্মা ছাপাতে বেগ পেতে হচ্ছে।

তবু সময়মত বই পৌঁছে না দেবার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েও বলছি, উদ্দেশ্য যে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নয়, আমাদের শুভানুধ্যায়ী গ্রাহকরা তা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন।

দীন মহাম্মদ
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
কলকাতা-৯

বিশেষ রচনা

‘সৈনিকের স্মৃতি’

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রবাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত তখন যে ক'জন ভাগ্যবান তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবিদ হাসানের মত নেতাজীর কাছের মানুষ খুব বেশী ছিলেন না। ইয়োরোপের সংগঠন ছেড়ে নেতাজী সাবমেরিনে পূর্ব এশিয়া রওনা হলেন, নব্বুই দিন ধরে সেই দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল সমুদ্র যাত্রায় একমাত্র ভারতীয় সঙ্গী আবিদ হাসান।

আবিদ হাসানের সঙ্গে টেপ রেকর্ডারে ধৃত এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই চাঞ্চল্যকর রচনাটি লিখেছেন কৃষ্ণা বসু।

গল্প

সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রতিভা বসু, রমাপদ চৌধুরী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেবসেন ও আরো অনেকে।

কবিতা

অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুমার সরকার, শঙ্খ ঘোষ, কেতকী কুশারী ডাইসন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, আনন্দ বাগচী, রাজলক্ষ্মী দেবী সুনীল বসু ও আরো অনেকে।

এছাড়া অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রবন্ধ

১২.০০ টাকা/সডাকে ১৪.৯০ টাকা

আপনার কপির জন্যে এখনই এজেন্টকে বলে রাখুন বা আমাদের লিখুন। সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০১

উপন্যাস

সমরেশ বসু
শংকর
বিমল কর
নীললোহিত
গৌরকিশোর ঘোষ
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ABD/CAS-3/79 BEN

প্রকাশিত হল

বুদ্ধদেব গুহর

রোমাঞ্চকর শিকার-কাহিনী

বনবিবির বনে

দাম ৭.০০

আবার সেই ঋজুদা, আবার সেই রুদ্র। ঋজুদার সঙ্গে কিশোর রুদ্র এবার যে-জঙ্গল-মহলে শিকারের সঙ্গী হয়েছে সেই অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বনবিবি। বনবিবির বনে পদে পদে মৃত্যুভয়, ক্ষণে-ক্ষণে আতঙ্ক, মুহূর্তে-মুহূর্তে রোমাঞ্চ। যাকে ঘিরে এত রোমাঞ্চ-আতঙ্ক আর মৃত্যুভয়, সেই সোঁদরবনের বাঘের জন্যই এবারের অভিযান। ঘোর দুর্যোগ, শীতকালেও অবিরাম বৃষ্টি। সুঁতিখালে নোঙর-করা মোটরবোটে বসে ঋজুদার গল্প শুরু হল। পরদিন সকালে দেখা গেল, ভাটার টানে জল সরে যাওয়ায় বোটের একদিকটা তখন কাদায় আটকে গিয়েছে।

সেই কাদায় বাঘের পায়ের অসংখ্য চিহ্ন। তার মানে বাঘটা যে-কোনো মুহূর্তে বোটে উঠে এসে একজনকে নিয়ে যেতে পারত! সেদিন কৃপালগুণে বেঁচে গেলেও পরদিন বাঘটা সত্যিই একজনকে নিয়ে গেল। বাঘের খোঁজে ঋজুদা একলা রাইফেল নিয়ে ঢুকে গেলেন জঙ্গলে। বহুসময় কেটে যাওয়ার পরও ঋজুদা ফিরলেন না। কিশোর রুদ্র উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে আর-একটা রাইফেল নিয়ে, ঋজুদার নিষেধ অমান্য করে, ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। সঙ্গী হল আরেকটি ছোট ছেলে, জেলে-নৌকোর মাঝির। তারপর? ঋজুদা কি ফিরে এলেন? রুদ্র আর মাঝিরও কি ফিরে এল? এক দুর্ধর্ষ কৌতূহলকর শিকারকাহিনী শুনিয়েছেন বুদ্ধদেব গুহ 'বনবিবির বনে'তে।

প্রকাশিত হয়েছে

শিশিরকুমার বসু ও বীরেন্দ্রনাথ সিংহের

যুগ্ম-সম্পাদনা-ঋদ্ধ
ইংরেজী ভাষায় চিত্রময় জীবনী

NETAJI A Pictorial Biography

দাম ৫০.০০

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় নাম—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। শারীরিক ও মানসিক গঠনে, আচরণে ও জীবনচর্যায়, আদর্শবাদে, দুঃসাহসে এবং নাটকীয় সংঘাতে উজ্জ্বল কর্মে বিংশ শতাব্দীর এক অনন্য ব্যক্তিত্ব রূপে তিনি চিহ্নিত হয়ে আছেন। তাঁর জীবন ও কর্মের অনুশীলন বস্তুত এমন এক প্রেরণাময় জীবনের চিত্র আমাদের সামনে উন্মোচিত করে, যে-জীবন ছিল অক্লান্তরূপে কর্মশীল এবং ভারতের মুক্তিসংগ্রামে উৎসর্গীকৃত। সেই মহাজীবনের এক আশ্চর্য কৌতূহলকর রূপরেখাই এই বইতে তুলে ধরা হয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম থেকে অন্তর্ধান পর্যন্ত বিস্তৃত জীবনের পরিচয় এই বইতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অসংখ্য আলোকচিত্র এবং প্রতিলিপির মধ্য দিয়ে। সেই সঙ্গে সুললিত ইংরেজী ভাষায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে প্রতিটি চিত্র ও মূল্যবান প্রতিলিপির পরিচয়। শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের প্রতিটি স্মরণীয় পর্যায় এই চিত্রশোভিত অ্যালবামে স্থান পেয়েছে। আগাগোড়া অফসেটে এবং দামী কার্টিজ কাগজে মুদ্রিত বড়ো-মাপের এই বইটিকে সমস্ত দিক থেকে প্রবলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কোনো রকম কার্পণ্য করা হয়নি। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সক্রিয় সহযোগিতায় এমন বহু তথ্য ও ছবি সংযোজিত করা সম্ভবপর হয়েছে যা বইটিকে মহামূল্য করে তুলেছে।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

শান্তিদেব ঘোষের

অপরিহার্য আলোচনাগ্রন্থ

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা

দাম ১৬.০০

চন্দ্রচূড় তাঁর জটাজালে যেভাবে জাহ্নবীকে ধরে রেখেছিলেন শান্তিদেব ঘোষও তেমনই রবীন্দ্রসঙ্গীতের
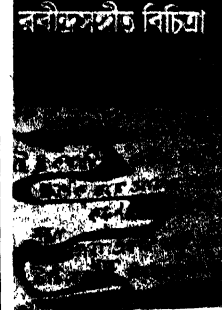
এক ঐতিহ্যময় প্রবাহের অন্যতম ধারক। সান্নিধ্যে-স্মৃতিতে-জ্ঞানে-বোধে-চর্চায়-গবেষণায় তিনি তাঁর নিজস্ব ভাণ্ডারটিকে অনিঃশেষ করে রেখেছেন সুদীর্ঘকাল ধরে। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে তাঁর অনন্য আকর-গ্রন্থ—'রবীন্দ্র সঙ্গীত।' সেই গ্রন্থেরই পরিপূরক আলোচনা গ্রন্থ—'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা।' নামে দ্বিতীয় মুদ্রণ, কিন্তু বস্তুত একটি আদ্যন্ত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। নতুন যে-সব রচনা ইত্যবসরে প্রকাশিত তা যেমন যুক্ত হয়েছে এই দ্বিতীয় মুদ্রণে, তেমনই প্রতিটি লেখাকেই আরও তথ্যবহুল করে তুলেছেন তিনি, প্রয়োজনে ঘটিয়েছেন আমূল সংস্কার। এ-ছাড়াও এই সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে প্রয়াসসাধ্য ও প্রয়োজনীয় একটি নির্দেশিকা। গান ও কবিতা, গ্রন্থ-পত্রিকা-প্রবন্ধ ও স্থান এবং উল্লেখিত ব্যক্তি নিয়ে তিনটি স্বতন্ত্র নির্দেশিকা বইটিকে আরও মূল্যবান করে তুলেছে। সব থেকে আকর্ষণীয় আলোচনা হল—যেটি এই গ্রন্থের অন্তর্গত—'রবীন্দ্রজীবনে গীতরচনার অজ্ঞাত যুগ' নামে একটি দীর্ঘ তিরাশি পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধ। রবীন্দ্রচনার গবেষক-উৎসাহী থেকে শুরু করে সাধারণ পাঠক পর্যন্ত নানান কৌতূহলকর তথ্য খুঁজে পাবেন এই অপ্রতিম প্রবন্ধটিতে।

সেরা কবি, সেরা বই

তুষার রায়ের
মরুভূমির আকাশে তারা
দাম ৪.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
আজ সকালে
দাম ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
আমার স্বপ্ন
দাম ৪.০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল
দাম ৫.০০

প্রভু নষ্ট হয়ে যাই
দাম ৪.০০

সরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য
দাম ৩.০০

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্বপ্নে উপকূলে
দাম ৫.০০

দিব্যেন্দু পালিতের
কিছু স্মৃতি কিছু অপমান
দাম ৫.০০

সুব্রত চক্রবর্তীর
বালক জানে না
দাম ৫.০০

কেতকী কুশারী ডাইসনের
বল্কল
দাম ৫.০০

সুনীল বসুর
হৃৎপিণ্ডে দারুণ দামামা
দাম ৫.০০

পূর্ণেন্দু পত্রীর
তুমি এলে সূর্যোদয় হয়
দাম ৫.০০

শেখর বসুর
গা ছমছম-করা রহস্য উপন্যাস
সোনার বিস্কুট
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

প্রকাশিত হল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

জাতককাহিনীর আধুনিক অধ্যায়

নবজাতক

দাম ৬.০০

এক নিদারুণ রৌদ্রতপ্ত দিনে বাঁকুড়া জেলার দুটি গ্রামের মধ্যবর্তী প্রান্তরে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে জেগে উঠলেন বোধিসত্ত্ব। তখন ঠিক মধ্যাহ্ন। তাঁর শরীরে কোনো বস্ত্র নেই, তিনি কে—তিনি নিজেই জানেন না। তিনি এই বিংশ শতাব্দীতে বেরুলেন পৃথিবীকে চিনতে। তাঁর কাজ-চলতি নাম হল কুমার সিংহ। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় এক জীবন কাটালেন তিনি। মাটি কাটার কাজ করলেন, মিশনারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলেন, হিসাব-রক্ষকের চাকরি নিলেন। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেন রাজনীতি-নিয়তি এবং নারীর। আবার সব-কিছু ছেড়ে একদিন পৌঁছে গেলেন শহর থেকে দূরে এক গ্রামে।

পৌঁছে গেলেন এক চিরন্তন সত্যের উপলব্ধিতে। কী সেই মহত্তর সত্য যার অন্বেষণে বারবার জন্ম নেন বোধিসত্ত্ব? মানুষের জীবনের একটি সত্য বেঁচে থাকা। তার থেকে বড়ো সত্য কী? সেই সত্যেরই অনুসন্ধান করেছেন কুমার সিংহ তাঁর এই নতুন জীবনে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে নতুন বোধিসত্ত্বের আবির্ভাবের কথা আছে। তুষিত স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে এসে তিনি নতুন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই নতুন জাতক কাহিনীরই একটি আধুনিক অধ্যায় সংযোজনা করলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সে-অধ্যায় যেমন সজীব, তেমনই বর্ণময়

দেশ ৪৬ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা
৮ ভাদ্র ১৩৮৬

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

সন্তোষকুমার ঘোষের নিরাকাশ
ভবতোষ দত্তর প্রবন্ধ
সাথী খুঁজিতে কি
শিশির রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ
গোয়ার গাওড়ে আদিবাসী
উমা সিদ্ধান্তের প্রবন্ধ
লোকশিল্প ও লোকশিক্ষা
দীপালি দত্ত রায়ের গল্প
প্রমোদকর
আনন্দ বাগচীর গল্প
প্রেমের পাঁচালি

চাঁদ ও সমুদ্রতলের বস্তু-সম্পদ

আকাশের ওই চাঁদ পৃথিবীর সব জাতির সম্পত্তি। এই সম্পত্তির ওপর সব জাতির সমান অধিকার। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই নীতির ঘোষণা আজকের আন্তর্জাতিক জীবনে অবশ্যই একটি শুভ স্বস্তিবাণী বলে অভিনন্দিত হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বহিঃমহাকাশ কমিটি চাঁদ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত এতদিনে গ্রহণ করতে পেরেছে সেটা বস্তুত আন্তর্জাতিক মতৈক্যের একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ বলে বিশেষিত হতে পারে। এই কমিটির দীর্ঘকালীন বিচার-বিবেচনার এবং আলোচনার একটি অধ্যায় সমাপ্ত হবার পর এতদিনে একটি চুক্তির খসড়া সকলের সম্মতিতে অনুমোদিত করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতের মানুষ চাঁদ নামক সম্পত্তির বৈষয়িক ভোগদখল সম্পন্ন করতে গিয়ে যে-সব নিয়মের অনুগত হয়ে ক্রিয়াকলাপ চালিত করবে, বস্তুত তারই একটি বিধান এই চুক্তির খসড়াতে রচনা করা হয়েছে। আদর্শিক অভীষ্টের যে-পরিচয় এই চুক্তির মধ্যে প্রকট হয়েছে, এবং পূর্ণ মতৈক্যের নৈতিক সম্বলের গৌরব যে চুক্তি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে পেরেছে, সেটা মানবীয় প্রতিভার একটি উত্তীরিত সফলতার ঘটনা। চাঁদের দেশের শান্তি-স্বস্তি বিহিত করবার এই আন্তর্জাতিক চুক্তির মধ্যে এই উপলব্ধি নিহিত রয়েছে যে, আন্তর্জাতিক মতৈক্য ও সৌহার্দ্যের দুই প্রদীপ হলো মানুষের জীবনের পক্ষে দুটি আলোকময় সম্বল, যুদ্ধ নামক বিভীষিকার তমোনাশ সম্ভাবিত করবার দুই উজ্জ্বল সম্বল।

চাঁদের দেশ সম্বন্ধে প্রচলিত রূপকথার মায়া ভবিষ্যতের মানুষের বিরাট রকমের বৈষয়িক চন্দ্রাচারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না, সে প্রশ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কৃতিত্বে বস্তু ও বাস্তবতার প্রত্যক্ষ সত্যের যে পরিচয় ও যেমনতর পরিচয় উদ্ঘাটিত হোক না কেন, তার পক্ষে রূপকথার বস্তু-বিস্ময়ের মায়া পরাহত করা সম্ভব নয়। বরং সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গবেষকের মনে এই সম্ভাবনার সঙ্কেত রূপায়িত হয়ে উঠেছে যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যের কঠিন বস্তুদেহ কালক্রমে রূপকথার মায়াবরণ লাভ করে নতুন এক সাহিত্যের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করবে। যাই হোক, আপাতত স্বস্তির বিষয় এই যে, ভবিষ্যতে চাঁদের দেশে কেউ ভয়াবহ আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এই চুক্তিগত নির্দেশের শাসন সবাইকে স্বীকার করে নিতে হবে। চাঁদের বৈষয়িক বস্তুর সম্বলকে নিতান্ত শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করবার অধিকার থাকবে, অন্য কোন উদ্ধত শক্তিমত্তার সহায়ক ও সুবিধার প্রয়োজনে চাঁদের বস্তুসম্বল ব্যবহার করবার অধিকার কোন জাতিরই থাকবে না। সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করাও নিষিদ্ধ। সামরিক ব্যক্তিরা অবশ্য কাজ করতে পারবেন। কিন্তু সামরিক প্রয়োজনে অথবা উদ্দেশ্য নয়। নিতান্ত বৈজ্ঞানিক অন্বেষণার কাজে সামরিকেরা নিযুক্ত থাকবেন। সাতচল্লিশটি জাতির দ্বারা অনুমোদিত চুক্তির এই খসড়া পত্রটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের একশত একান্নটি জাতির অনুমোদন স্বাক্ষর শীঘ্রই লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

বিস্ময়ের বিষয়, চাঁদের দেশের বস্তুসম্বল উপভোগ করবার বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচার-বিবেচনার যে সক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল, সেটা পার্থিব সীমায়তনের মধ্যেই অবস্থিত পাতাল দেশের ভোগদখল সম্বন্ধে আজও সুস্পষ্ট রকমের কোন সফলতায় বিমূর্ত হয়ে উঠতে পারছে না। পাতালের দেশ, অর্থাৎ সমুদ্রতল। সাত বছর ধরে বিষয়টি আন্তর্জাতিক চিন্তায় আলোচিত ও আন্দোলিত হয়ে আসছে। কিন্তু মতৈক্যানুগ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবই হচ্ছে না। পৌরাণিক কাহিনীর গন্ধর্ব বিশ্ববসুর কন্যা, সুন্দরী মদালসাকে হরণ করে পাতাললোকে বন্দিনী করে রেখেছিল দানব পাতালকেতু। সেই পাতাললোকেই অবস্থিত ছিল সমুদ্রের অধিপতি বরুণের আলয়। অজস্র রত্নে আকীর্ণ সেই বরুণালয়ের সঙ্গে বর্তমান বিশ্বের সমুদ্রতলের কোন তুলনা সম্ভব না হলেও একটা উপমা সম্ভব হতে পারে। সমুদ্রতলের কোবাল্ট, নিকেল, তামা ও ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি বস্তুর বিরাট সম্ভার বিশ্বের সফল জাতিক জীবনের পক্ষে সমান অধিকারে উপভোগ্য হবার একটি ঐশ্বর্যময় বিরাট সম্বল। কিন্তু এই ঐশ্বর্যের স্বত্ব বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সমান অধিকারে আশ্রিত করবার প্রয়াস আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বহু আসরে উচ্চকণ্ঠ বিচারবুদ্ধির অনেক নির্ঘোষ সৃষ্টি করেও কোন সুষ্ঠু সিদ্ধান্তের দ্বারা অঙ্গীকৃত হতে পারেনি। লক্ষ্য করতে হয়, যে-কয়েকটি জাতি বৈষয়িক শক্তিতে অন্যদের তুলনায় খুবই বেশী উন্নত, তাদের প্রস্তাব অন্যদের পক্ষে সমর্থনযোগ্য হয়ে উঠতে পারছে না। অভিযোগ করবার যুক্তি আছে যে, শক্তিশালী কয়েকটি জাতি সমুদ্রতলে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের অনুকূলে একটি আন্তর্জাতিক শাসন বিহিত করতে চায়। এটা স্বভাবত অন্য সব জাতির পক্ষে ভীত হবার কারণ সৃষ্টি করেছে। সমালোচকেরা মন্তব্য করতে পারেন, আন্তর্জাতিক চরিত্রের এ কী দীনতা? চাঁদের দেশ সম্বন্ধে সমান অধিকার চুক্তিবদ্ধ করবার প্রয়াস সফল হলেও সমুদ্রতলের ঐশ্বর্যকে সমান অধিকারে আশ্রিত করবার চেষ্টায় সফলতার কোন সূচনাই হলো না। বলা চলে, পাতাললোকে বন্দিনী সুন্দরী মদালসার উদ্ধার তবে কি সম্ভবই হবে না?

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদলাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

ব্যঙ্গচিত্র

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

॥ ১ ॥

মনুষ্য ক্লেশ নিবারণী সমিতি

আপনারা আমাকে যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্বের আমি উপযুক্ত কিনা জানিনা। অতীতে আমি বিপ্লবী ছিলুম, তখন আমার কাজ ছিল ধ্বংসের। বোমা, বন্দুক, সত্যাগ্রহ। আমার বয়েস হয়েছে। এই বয়েসে মন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী হওয়াই সাজে। বললেই ত আর সাজা যায় না। গদিতে গদিয়ান হতে হলে দল চাই, বল চাই, ছল চাই। শুনেছি ভাল জনপদবধূ হতে হলে ভাল 'ছেমো-ছলা-কলা' শিখতে হয়। সে যাই হোক এখন কাজের কথায় আসা যাক। বহুকাল আগে এই শহরে সি এস পি সি এ নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল—ক্যালকাটা সোসাইটি ফর প্রিভেনসান অফ ক্রুয়েলটি টু আনিম্যালস। সেই সোসাইটির এখন কি অবস্থা, কি তাঁদের কাজ আমি জানি না। সারা শহরের এখানে ওখানে এখনও কিছু পরিত্যক্ত মরচে ধরা লোহার জলপাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। এখন তার আর কোনও ফাংসান নেই। অতীতের স্মৃতি মাত্র। ঘোড়া নেই, ঘোড়ায় টানা ট্রাম নেই। জলাধারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। শহরে এখন যে পশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী তা হল মানুষ। সেই মানুষের ক্লেশ নিবারণের জন্য আমাদের প্রস্তাব, একটি সমিতি স্থাপন, যার নাম হবে, সি এস পি সি এম, ক্যালকাটা সোসাইটি ফর প্রিভেনসান অফ ক্রুয়েলটি টু ম্যান। ক্লেশ নিবারণ করতে হলে জানা দরকার, আমাদের কি কি ক্লেশ, কিসে আমরা ক্লিষ্ট। আমি বসছি, সদস্যরা এইবার একে একে আলোচনা করুন।

মাননীয় সভাপতি, সমবেত পশুগণ, আপনারা জানেন, জানা না থাকলেও জেনে নিন, সারা পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া অন্য যে কোনও পশু সম্পর্কে ভয়ানক চিন্তা ভাবনা চলেছে। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতি, হায়না, কুমির, সাপ, পাখি, গিরগিটি প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্যে বিশ্বসংস্থা, প্রাদেশিক সংস্থা, রাষ্ট্রপুঞ্জ জলের মত অর্থব্যয় করছেন, আইন তৈরি করছেন, কিনা করছেন! এদিকে মানুষের ক্লেশ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে কলকাতায়। এই শহরে মোস্ট নেগলেকটেড অ্যানিম্যাল হল মানুষ। মোস্ট টরচারড অ্যানিম্যাল হল মানুষ। যে হেতু আমরা দ্বিপদ সেই হেতু আমরা চতুষ্পদদের সুযোগ সুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। দিন দিন আমাদের বঞ্চনা বেড়েই চলেছে। অন্যান্য পশুরা জন্মেই স্বাধীন, আমরা কিন্তু জন্মেই পরাধীন। দেহের দাসত্ব, পরিবারের দাসত্ব, সমাজের, নামের দাসত্ব, অর্থনীতির দাসত্ব। সবচেয়ে বড় ক্লেশ হল এই দাসত্ব। সেই কবিতার লাইন কটা আমার এখন মনে আসছে :

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায়
কে পরিবে পায়।

আমাদের যা খুশী আমরা তা করতে পারবনা কেন? বাঘ পারে, সিংহ পারে, কুকুর পারে। আমরা দুর্বল, আমরা ভীতু, আমরা অভ্যাসের দাস। কোড অফ কনডাক্টের বাইরে গেলেই ছি ছি পড়ে যাবে—লোকটা নরপশু। পশ্বাচার। এইটাই হল ফ্যালাসি নাম্বার ওয়ান। সাইকো-লজিক্যালি আমাদের মেরে রাখা হয়েছে। আপনারা ফ্রয়েডের নাম শুনেছেন। সাহসী মানুষ, তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন—

Most of what we are conscious of is not real and the most of what is real is not in our consciousness.

এখনও জানা গেল না, হোয়াট ইজ 'রিয়েলি রিয়েল'।

আপনাদের কথা আমি জানি না। আপনাদের সামনে আমি নিজেকেই নিজে অ্যানালিসিস করছি। মনে হয় আমার আয়নাতেই আপনাদের চেহারা দেখতে পাবেন। আমার দুটো ভাব, একটা বায়োফিলিয়া। তার মানে লাভ অফ লাইফ। জীবনকে ভালবাসা। তার অর্থ কিন্তু জীবে প্রেম নয়। জিভে প্রেম। নিজের জীবনকে ভালবাসা। আমি বাঁচতে চাই, প্রভুত্ব করতে চাই, ভোগ চাই, সুখ চাই, সম্পত্তি চাই, ভাল খেতে চাই, পরতে চাই, অধিকার করতে চাই। অনায়াসে সব কিছু পেতে চাই? আমি একটা homme mechine। এসব ব্যাপারে আমি প্রতিযোগিতা পছন্দ করিনা, ভাগাভাগির মধ্যে যেতে চাইনা। এই দিক থেকে আমি ভুয়েলিস্ট। আমি আর আমার প্রাচুর্য ভরা পৃথিবী, এর বাইরে সবাই আমার অপরিচিত। কিন্তু ইয়েস, দেয়ার ইজ এ বিগ বাট। আমি ত আর জায়েন্ট নই যে সব কিছু নিজের ক্ষমতায় দখল করে নেব। তাই আমার দুটো দিক, একটা হল হোমো সেকস্যুয়ালিস, আর একটা হল হোমো ইকনমিকাস।

ফ্রয়েড সায়েবের মডেল অনুসারে আমার মধ্যে দুটো শক্তি কাজ করছে, একটা হল নিজেকে রক্ষা, সেলফ প্রিজারভেটিভ আর একটা প্রজননেচ্ছা, সেকস্যুয়্যাল-ড্রাইভ। আমার এই দুটো ইচ্ছে প্রতিমুহূর্তে খর্বিত, খণ্ডিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত। সমাজ এর ওপর চেপে বসে আছে, সংসার এর মধ্যে গোঁজামিল ঢুকিয়ে দিয়েছে। কালচার মনের মধ্যে ঢুকে দুটো শব্দ নিশব্দে তৈরি করেছে—আচার, অনাচার। আমি অসুস্থ, আমি ক্লান্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে খণ্ড বিখণ্ড। কোনটা আচার, কোনটা অনাচার বুঝতে গিয়ে জীবনটাই জেবড়ে গেল। আবার সেই ফ্রয়েড :

Society imposes unnecessary hardships on man which are conducive to worse results rather than the expected better ones.

বায়োফিলিয়া থেকে আমার মধ্যে এখন প্রবল হয়ে উঠেছে নেক্রোফিলিয়া। মৃত্যুকেই আমি এখন ভালবাসতে শুরু করেছি—মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান। যে অবস্থায় পড়ে মানুষ মৃত্যুকে ভালবাসতে শেখে সেই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। এই অবস্থা যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা কারা। তাঁরা হলেন এক ধরনের পোচার।

কাজিরাঙা ফরেস্টে যে সব পোচার গণ্ডার মারে তাদের জন্যে কড়া আইন তৈরি হয়েছে। আমাদের যারা মারছে তাদের জন্যে কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চাই। সাপ্রেসান, অপ্রেসান এসব কি অপরাধ নয়? অবশ্যই অপরাধ। কে সেই অপরাধী? সভ্যতা। সভ্যতাই হল রিয়েল অপরাধী। 'রিয়েল রিয়্যালিটি' হল, আমি একটা পশু, আমি দেবদূত নই, দেবতা নই। একটা জীবন, একটা জীব।

জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে সভ্য করে তোলার জন্যে কম অত্যাচার হয়েছে! কম মগজ ধোলাই দেওয়া হয়েছে আমাকে একটা কৃতদাস করে তোলার জন্যে! আমি যদি বাঘ হতুম, গরিলা কি গণ্ডার হতুম, তা হলে কি আমাকে অত সহজে পোষা মানান যেত? যেত না। ভয়ের ব্যাটারি চার্জ দিয়ে সার্কাসের রিং মাস্টাররা

যা হলাম জেগে আছে—হোমো ইকনমিকাস। নো ওয়ার্ক, নো পে। নো সাবমিসান, নো প্রোমোসান।

ছেলেবেলায় মা বলতেন, কথা না শুনলে কিছু পাবি না। বাবা বলতেন, উনিশের নামতা মুখস্ত না দিতে পারলে খাওয়া বন্ধ। মুখে মুখে তর্ক কোরোনা, কানধরে নিলডাউন করিয়ে রেখে দেব, বলতেন শিক্ষক মশাই। বয়েস হলেও ভুলিনি সেইসব দুঃস্বপ্নের দিনের কথা। বাঁদরটাকে মানুষ করার জন্যে জাঁদরেল একজন শিক্ষক চাই। উঠতে বসতে পিটুনিই হল একমাত্র ওষুধ। এই পিঠের ওপর কত কিছুর স্মৃতি চিহ্ন—জুতো, ঝাঁটা, লাঠি, বেল্ট, দাদুর খড়ম। দুটো কানের দুরকম লেংথ। ডান কানটা পণ্ডিত মশাই টেনে টেনে বাঁটার চেয়ে এক ইঞ্চি বেশী লম্বা করে দিয়েছেন। এর থেকে আমি একটা সহজ অংক পেয়েছি। ব্যাকরণ কৌমুদীর একের চার ভাগ আরও করতে কান এক ইঞ্চি লম্বা হয়, পুরোটা আরও করতে হলে কানের চেহারা আর মানুষের মত রাখা যায় না, হাতি কিংবা খরগোসের মত হয়ে যায়।

ভেবে দেখুন ভাইসব সেই অতীতের কথা। শৈশবে আমাদের কেউ মানুষ বলে মনে করতেন কি? এই দেখুন আমার শৈশব পরিচয়ের একটা লিস্ট তৈরি করেছি, বিভিন্ন পশুর সমন্বয়ে আমার শৈশব—গাধা, গরু, বাঁদর হনুমান, শুকর, উল্লুক, পাঁঠা সব মিলিয়ে জানোয়ার। একমাত্র অবতারদেরই একই আধারে এত রূপ কল্পনা করা চলে। প্রেমিকের পক্ষেই প্রেমিকার শরীরে এতরূপ দেখে গান গেয়ে ওঠা চলে—একই অঙ্গে এত রূপ দেখিনি ত আগে। শৈশবের নামরূপেই আমার রূপ প্রকাশিত। ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন পশুর পশ্বাচার জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত করে আমি প্যাসকেলের সেই সত্যকেই প্রমাণিত করেছি—ম্যান ইজ এ বাইপেড অ্যানিম্যাল উইদাউট এনি উইংস।

এইবার আসা যাক ব্যবহারিক দিকে। কি ভাবে সেই মধুর মানব-শৈশবে আমি ব্যবহৃত হয়েছি। কখনও ফুটবলের মত, কখনও চটি জুতোর মত, পাপোশের মত, তবলার মত, পাখোয়াজের মত, আবর্জনার মত। শরীরের ওপর কোনও স্বাধীনতা ছিলনা। যিনি যেভাবে পেয়েছেন তিনি সেইভাবে ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন—মানুষ জন্মায়না, আদিতে সবাই অকৃত্রিম পশু। শুধুমাত্র নির্বিচার পেটাই আর ধোলাইয়ের সাহায্যেই মানুষ তৈরি হয়।

পৃথিবীতে এখন বর্ষপালনরীতি চালু হয়েছে এখন চলেছে শিশুবর্ষ। শিশু ক্লেশ নিবারণের, শিশু নির্যাতনের নানা কথা শুনতে পাচ্ছি। যদিও আমি শিশুর পিতা তবু আমি আমার নির্যাতিত শৈশবের জন্যে উপযুক্ত বিচার ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি। সেদিনের সেই নির্যাতিত শিশু আজকের নির্যাতক পিতা, তবু বিচার চাই।

এই সভা আজকের মত মুলতুবি রইল। ক্লেশের ক্লাসিফিকেসান ও [illegible] জন্যে প্রয়োজন হলে আমাদের একাধিকবার বসতে হবে। যাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন উঠে বসুন। [illegible]। আজ থেকে প্রত্যেকেই লিখতে থাকুন কার [illegible] ক্লেশ!

কণ্টককল্পিত
অতুল্য ঘোষ

(নবপর্যায়)

॥ ৭ ॥

গত দু' বছর ধরে প্রায়ই শোনা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতার পর তিরিশ বছরে ভারতবর্ষে কোন কাজই হয়নি। এসব কথা যাঁরা বলছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই—অধিকাংশ কেন শতকরা প'চানব্বইজনই—কেন্দ্রে অথবা রাজ্যে মন্ত্রী অথবা সরকারী দলের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ'দের মধ্যে আবার মুখ্য-মন্ত্রীও আছেন। সেইজন্য অনেকে বিস্মিত হয়ে ভাবেন যে, তা হলে এ'রা কি করলেন এবং কেন তাঁরা এতদিন মন্ত্রী ছিলেন বা সরকারী দলের দায়িত্বশীল পদে ছিলেন? যাঁরা বরাবর বিরোধী পক্ষে ছিলেন, তাঁদের বলার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এ'দের বলা তো সত্যই বিভ্রান্তিকর! আমি অবশ্য একটুও আশ্চর্য হইনি। বর্তমানে যেমন দেখা যাচ্ছে যে, অনেকের কাছেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করা কোন অপরাধ নয়, তেমনি হয়তো দায়িত্ব অবহেলা করাতেও কোন অন্যায় করা হয় না। কেউ কেউ অবশ্য বলতে পারেন যে, এ'রা হয়তো এতদিনে বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁরা কিছু করতে পারেননি, তাই অনুতাপ প্রকাশ করছেন। তা হলে প্রশ্ন থেকে যায়, আবার মন্ত্রী হলেন কেন? আমার মনে হয়, এ'রা যদি এইসব বিবৃতি দূরদর্শন, আকাশবাণী এবং সংবাদপত্রে না দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন, তা হলে হয়তো নিজেদের অপরাধ বুঝতে পারা সম্ভব হবে। আর এ'রা যদি মনে করে থাকেন যে, সাধারণের কাছে বারবার এ কথা বললে সাধারণে এ কথার মূল্য দেবেন—তা হলে এ ধারণা একেবারেই ভুল।

আমি আগের যুগের লোক। পরাধীন ভারতবর্ষের অবস্থাও দেখেছি, স্বাধীন ভারতবর্ষও দেখছি। যেমন সব কিছু হয়েছে বলা একান্ত হসনীয়, তেমনি কিছু হয়নি বলাটাও একেবারে অর্থশূন্য। এ কথা সব সময়েই বলা উচিত যে, আরও অনেক কিছু করতে হবে। পরাধীন ভারতবর্ষের ছবিটা একবার যদি ভাল-ভাবে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়, তা হলেই বোঝা যাবে স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে কি হয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষ প্রত্যেকটা অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের জন্য পরনির্ভরশীল ছিল। আর অবিভক্ত ভারতবর্ষকে খাবারের জন্য বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে হত। তখন তো পশ্চিমবঙ্গ হয়নি, ছিল বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশের হাটবাজার ভর্তি হয়ে থাকত রেংগুনের চাল আর আলুতে। ইংরাজের কাছে অবশ্য ভারতবর্ষ আর বার্মার কোন তফাৎ ছিল না; কারণ, দুটোই ছিল তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে বাইরের থেকে চাল, আলু আনাকেই পরনির্ভরশীলতা বলে। দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেক প্রাতঃ-স্মরণীয় ব্যক্তিও এই গ্লানি অনুভব করতেন না। আমাদের কবি যেমন লিখেছিলেন 'গলায় গলায় গান ছিল ভাই গোলায় গোলায় ধান' তেমনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত লোকের লেখাতেও আছে যে, তখন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ধান-চাল ছিল। এখনও রেডিওয় সকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের লেখা এই অংশটি বলা হয়ে থাকে। অবাক হয়ে ভাবি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—যিনি বাংলাদেশকে ভালভাবে জানতেন, তাঁর কলম দিয়ে এই লেখা কি করে বেরোল?

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই অন্নভোজী। তা সত্ত্বেও এখানে বাইরে থেকে চাল এলে তবে লোকের চলত। ঠিক এইভাবেই গরীবের কাঁথা সেলাই করার সুচ-সুতো—তাও আসত বাইরে থেকে। ভারতবর্ষের তিন দিকে সমুদ্র, কিন্তু আমাদের জাহাজ ছিল না। এতবড় দেশে মানুষ ও পণ্যদ্রব্য চলাচলের জন্য মাইলের পর মাইল রেল লাইন; আর সেই রেল লাইন, ইঞ্জিন গাড়ি—সবই আসত বিদেশ থেকে। সামান্য বৃষ্টিতেই নদীর জল ফেঁপে-ফুলে প্লাবন সৃষ্টি করে সর্বনাশ করত। আর বিদ্যুতের কথা না বলাই ভাল। বড় বড় শহরে খুব কম এলাকাতেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল। এই সেদিনও পূর্ব কলকাতার অনেক অঞ্চলে রাস্তায় কেরোসিনের আলো জ্বলত। ইস্পাত যা তৈরী হত, তা ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার অনুপাতে একেবারেই নগণ্য। সিমেন্টও ঠিক তাই। ছাপাখানার যন্ত্র তৈরী হত না বললেই চলে। আর কাগজের কলও ছিল অনুরূপ। কাপড়ের কল কয়েকটি হয়েছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ কলই চলত বাইরের তৈরী সুতো দিয়ে। যেসব জিনিস এখানে তৈরীও হত, তার মূলধন ছিল বিদেশী; আর কর্মকর্তারাও অধিকাংশই ছিলেন বিদেশী। সমস্ত ছবিটা যদি পরিষ্কারভাবে বুঝতে হয়, তা হলে স্বাধীনতার পর যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের তৎকালীন ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য অর্থনীতির উপরে লেখা বই ভালো করে পড়তে হবে। বড় হয়ে অবধি তাঁরা ক্রমাগতই শাসক গোষ্ঠীর কাছে শুনছেন—'কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।' শাসকগোষ্ঠী বলছে বলে তুলনা করে দেখবারও প্রয়োজন নেই।

এখন অনেক কিছু করতে হবে, তা সত্য। সরকারীভাবে যেমন করতে হবে, বেসরকারী-ভাবেও তেমনি করতে হবে। মন্ত্রী এবং সরকারী দলের নেতারা যদি অনর্থক খেদোক্তি না করে বেসরকারী প্রচেষ্টায় যেসব কাজ হচ্ছে, তাতে শক্তি দেন, তা হলে কিছুটা দায়িত্ব পালন করা হবে। এখন দেশের মাঝে অনেক সুযোগ হয়েছে, যাতে বেসরকারী প্রচেষ্টায় অনেক ছোট ছোট শিল্পসৃষ্টি করা যায়। কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। প্রথম বাধা আসে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কাছ থেকে। সব নিয়মকানুন মেনে যাঁরা শিল্পসৃষ্টি করার জন্য এগিয়ে যান, তাঁরা মাসের পর মাস ব্যাংকে ধরনা দিয়েও সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ পান না, যা পান, তাতে ছ আনা আট আনা কি দশ আনা ভাগ হয়তো পাওয়া যায়। ফলে যিনি শিল্পসৃষ্টি করতে চান, তাঁর উৎসাহে বাধা পড়ে এবং কাজও এগোয় না। সরকারী এক বিভাগ থেকে আর এক বিভাগে চিঠি চালাচালি করতে এক মাস, দু মাস, ছ মাস, এক বছর, দেড় বছর সময় তো কাটেই, অনেক সময়ে আরও বেশীও লাগে। তার পরের বাধা হল জমি সংগ্রহ। চাষের জমি যদি হয়, তা হলে সেখানে যে কারখানা করা হবে, তার অনুমতিপত্র আনতেই কয়েক মাস কেটে যাবে। তারপর যদি কারখানা করার অনুমতিও পাওয়া যায়, তখন আবার তার সংশ্লিষ্ট কাজ করতে কয়েক মাস। তারপরই লাইসেন্স। আমার নিজের অভিজ্ঞতা নেই। যা শুনি তাতে মনে হয় সরকারী দপ্তর থেকে লাইসেন্স বার করার চেয়ে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠা ঢের সহজ। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে যাতায়াত করতে জুতো তো ক্ষয়েই যায়, পা-ও অনেক সময়ে ক্ষয়ে যায়। আবার নাকি অনেক সরকারী কর্মচারীর বাড়িতেও যেতে হয়, বিশেষ ব্যবস্থা করে নেবার জন্য। এ সবই শাসকবর্গের জানা। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে কিছু করণীয় আছে এ বোধ এখনও তাঁদের বিশেষ হয়নি।

এখন এ কথাটা প্রায়ই শোনা যায় যে, আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা বাইরে থেকে যেসব ধান-গম ধার নিয়েছিলুম তা শোধ করছি, বিদেশে ধান-গম পাঠাচ্ছি তাদের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য। এ সবই ভাল কথা। কিন্তু গোলমাল বাধছে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' শব্দটি নিয়ে। যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিলুম, তখন বাইরে থেকে অত চাল-গম আসলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই অভুক্ত থাকত। আমাদের এই 'শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা', বাংলাদেশেই হুগলী জেলার সদর মহকুমা, আরামবাগ মহকুমা, বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমা, মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম আর সদর মহকুমা, বর্ধমান জেলার আসানসোলের শিল্পাঞ্চল বাদ দিয়ে যে এলাকা সেই এলাকা এবং সদর মহ-কুমার যে বন্যা অঞ্চল, বীরভূমের অনেক অঞ্চল —বর্ধমান বিভাগেরই নাম করলুম—এইসব অঞ্চলের অধিকাংশ পরিবার সন্ধেবেলা ভাত রেঁধে সন্ধ্যার খাওয়া শেষ করে তাতে জল ঢেলে দিত। তার পরদিন সকালে খেত ভাতের জল, যাকে আমানি বলে; আর দুপুরে খেত সেই ভিজে ভাত। তোফা নুন দিয়ে খেত; আর সঙ্গে যদি কোন দিন কাঁচা লঙ্কা বা কলমি-সুষনি শাক থাকত—তা হলে তো রাজসিক আহার! এখন সে অবস্থার অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ইংরাজীতে 'Two square meals a day' যাকে বলে তা এখনও ভারতবর্ষে হয়নি। তা হলে কি করে বলা যাবে যে, ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে? আর যারা এখন দু বেলা খায়, তারাই বা কি খায়? দুধ নেই, মাছ নেই, মাংস নেই, ডিম নেই, ফল নেই, সবজিও বিশেষ নেই। তা হলে কি করে মানুষ খাটবে বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষকে কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ করবে? যারা 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি/ কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া'

—এদের তো স্বাধীন ভারতবর্ষের যোগ্য নাগরিক তৈরি করা হচ্ছে না। আমরা তো বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যায় অনেক এগিয়ে গিয়েছি! আমাদের 'আর্যভট্ট' আকাশে, আবার 'ভাস্কর'ও উঠেছেন। ঠিকই তো—এ সবই তো চাই। জেট প্লেনও চাই, দূর-পাল্লার কামানও চাই, শিল্পসামগ্রী বহনের জন্য জাহাজও চাই, আবার বিদ্যুৎ উৎপাদনও করা চাই। কিন্তু যারা এইসব কাজ করছে, তাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই যদি এখনও যথোচিত আহার না পায়, তা হলে কি করে সেই দেশের সমৃদ্ধি সম্ভব?

আমরা এখন বিদেশে রেল লাইন পাতছি, মাল বইবার গাড়ি পাঠাচ্ছি, বিদেশে বড় বড় কারখানা তৈরি করছি—এসব দিকে তো অনেক দূরে এগিয়ে গেছি। এখন তো আর সেদিন নেই, নদী উপত্যকা পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য বিদেশ থেকে নানা সুখ-সুবিধে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার আনা হবে! যখন আমরা রৌরকেল্লা, ভিলাই, দুর্গাপুর—এইসব ইস্পাতের কারখানা আরম্ভ করলুম, রুশ, জার্মান আর ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা দল বেঁধে এল, যন্ত্রপাতি বসাল, চালাল। এখন আর তাদের প্রয়োজন নেই; ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা নিজেরাই চালাতে পারছে। আর রেলের তো উন্নতি হয়েছে অভূতপূর্ব! স্টীম, ইলেকট্রিক, ডিজেল—সবরকম ইঞ্জিন আমরা তৈরি করছি; আবার বাইরে চালানও দিচ্ছি। কিন্তু এখনও তো অনেক বাকি আছে! শিক্ষার কথা না বলাই ভাল। ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বেড়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় তো দু-তিন মাইল অন্তর অন্তরই হয়েছে। অবশ্য এই শিক্ষার ব্যাপারে মস্ত গলদ রয়েছে যাঁরা সব ব্যবস্থা করছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন পন্থা বাতলাচ্ছেন। আর অসুবিধা হচ্ছে যারা শিক্ষার্থী—তাদের, সেইজন্য মনে হয় যদি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নজর দেওয়া হয়, তা হলে হয়তো অনেক কাজকে বহু দূর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। প্রথমেই যদি ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের দু বেলা ন্যূনতম খাবার কথা ভাবা যায় এবং তার ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে তো সত্যি সত্যি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যাবে! তা নইলে, সবই তো কথার কথা থেকে যায়।

প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের যাঁরা হয়েছেন, তাঁরা সকলেই তো গান্ধীভক্ত বলে পরিচিত। গান্ধী ভারতবর্ষের ন্যূনতম প্রয়োজনের কথা বলেছেন খাওয়া, থাকা আর কাপড় নিয়ে। তাঁর অনেক কথাই তো আমরা শুনি। কিন্তু সেই ১৯৪১-এ সেবাগ্রামে যা বলেছিলেন তার কাছেও যদি আমরা পৌঁছতে পারি, তা হলে অন্তত আপামর জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটবে। যা বলেছিলেন তার মধ্যে কোন বিতর্কের স্থান নেই। বামপন্থা, মধ্যপন্থা, দক্ষিণপন্থা—এসব কিছুই নেই। অতি সাধারণ কথা, সাধারণভাবে সাধারণের জন্য বলা।

'I mean what I say. According to my definition, there cannot be true Swaraj as long as there is exploitation. Mere change from British to Indian rule does not mean Swaraj. As long as one class dominates over another, as long as the poor remain poor or become poorer, there will be no Swaraj. In my Swaraj the millions will live happily. They will get good food, decent houses and enough clothing. By good food, I do not mean that they will eat sweets. But everyone must get pure milk, pure ghee, and sufficient fruit and vegetables. I know I am talking tall because the poor today do not even know what fruit is. During the mango season, they get a few mangoes and during the guava season they have a few guavas. They do not get any other fruit except these and a few other. They do not get even clean and nutritious foodgrain. They have to live on rotten rice, coarse grain and dirty salt. I wish everyone gets what they call a balanced diet as also a clean and comfortable house. This according to me is real freedom. I have written those words to Maithilisharanji with this kind of freedom in view.' (Speech at Sevagram —October 12, 1941).

সুধাসাগর তীরে

সুরেশ চক্রবর্ত্তী

॥ ১৬ ॥

এতক্ষণ এই চরিত্রচিত্রণের যে প্রয়াস আমি করেছি, তা সম্পূর্ণই বদল খাঁ সাহেব ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের সংগীত শিক্ষা, প্রসার ও বাংলাদেশের সাংগীতিক জগতে তার কী প্রভাব পড়েছিল এবং আমরা কতটা দিগদর্শন লাভ করেছি তারই যথাসাধ্য আলোচনার মধ্যে সীমায়িত, আমি কারো জীবনের অন্যান্য দিক (facet), জীবনধারা, সামাজিক পরিবেশ, কিছুই এই প্রবন্ধে অন্তর্গত করতে চেষ্টা করিনি, কারণ সেটা হবে আমার এখ্‌তিয়ারের বাইরে। প্রাত্যাহিক জীবনের নানা তুচ্ছ ঘটনা বা ব্যক্তিগত ভাব-অভাবের কাহিনীতে সংগীতের রসধারা ব্যাহত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

একথা যেন কেউ মনে না করেন যে আমি বদল খাঁ সাহেবকে এক মহাশক্তিধর মহাপুরুষ রূপে চিত্রিত করতে চাইছি, কারণ এই সংগীতের যুগন্ধর পুরুষের একটা দিকের সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ও স্নেহস্পর্শ ঘটেছিল, তাই আমার অক্ষম লেখনীতে অঙ্কন করে তাঁর মহান সংগীত-স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। যাঁরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এঁদের জীবন পর্যালোচনা করবেন, তাঁরাই মানুষকে সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করে চরিত্রের বিভিন্ন-দিকে আলোকপাত করে চরিত্রপূজা সার্থক করে তুলবেন এই ভরসাই করছি।

শ্রদ্ধেয় স্বর্গত শৈলেশ দত্তগুপ্ত প্রথমে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে তালিম নিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই বদল খাঁ সাহেবের কাছে 'গান্ডা' বেঁধে যথারীতি শিক্ষা আরম্ভ করেন। তখন তিনি মধ্য কলকাতার বেনিয়াটোলা লেনে একটা মেসে থাকতেন আর আমার বাসস্থান ছিল সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে। অত্যন্ত সন্নিকটে ছিলেন বলে সময়ে অসময়ে তাঁর আস্তানায় হাজিরা দিতাম আর সংগীতের নানা রকম ঘরানা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে খুব আলোচনা হত। যখন বদল খাঁ সাহেব তাঁকে তালিম দিতে আসতেন, তখন কখনো কখনো আমি উপস্থিত থাকতাম খাঁ সাহেবের অনুমতি নিয়ে। জৌনপুরীর সুপ্রসিদ্ধ খ্যাল "বাজে ঝনন" গানখানি যখন শেখাচ্ছিলেন, কোমল ধৈবত যে কী অপূর্বভাবে লাগাচ্ছিলেন খাঁ সাহেব, তাই মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতাম—পঞ্চমের পর ধৈবত যেন লাগছে কি লাগছে না—একটু যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে, অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে যখন ধৈবতে কায়েম হল, গানখানির বাহার যেন সদ্যোদ্ভিন্ন পুষ্পগুচ্ছের মত শোভা নিয়ে দাঁড়ালো। অনেকবার চেষ্টা করেও সেই অপূর্ব ধৈবত কণ্ঠে আদায় করতে পারিনি, আমার গুরু ভীষ্মদেব পরে এই সুর লাগাবার তরীকা (পন্থা) বলে দিয়েছিলেন, কারণ আমার সংগীতের তালিম তখনো বেশিদিনের হয়নি। আবার একখানা ভৈরোঁর বিলম্বিত খ্যাল "তোরী বারী ফুল রহি" শুনে চমকে গিয়েছিলাম—'জাগো মোহন প্যারে'—শোনা কানে যেন মধুবর্ষণ করছিল এই অপূর্ব বন্দিশ্‌ এর গান—জোড়া গান আজো খুঁজে পাইনি, তবে বিলায়েত হুসেন খাঁ সাহেবের "সংগীতজ্ঞোঁকে সংস্মরণ" গ্রন্থে খুর্জাঘরানার জহুর খাঁ (ছদ্মনাম রামদাস)-এর একখানি "ভৈরব" রাগের বিলম্বিত গানের স্বরলিপি আছে, তার শুধু মুখপাতের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়—"মরী সুর লীজো" পর্যন্ত। তারপরে আর মিল নেই—উদারার পঞ্চম থেকে মুদারার শুদ্ধমধ্যম পর্যন্ত যে সুত্‌-এর রূপ বদল খাঁ সাহেবের গানে আছে, তার তুলনা নেই। এই গানখানি তালিম পেয়ে শৈলেশবাবু যে কী আনন্দিত হয়েছিলেন, তা প্রকাশ করে বলতে পারি না। কতবার কতরকমে আমাকে গানটা শুনিয়েছিলেন, গান করে করে যেন তৃপ্তি হত না। আজকাল তো শুদ্ধ ভৈরবের গান অপাঙ্‌ক্তেয় ও অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছে, নটভৈরব, আহীরভৈরব, বৈরাগীভৈরব, উদাসীভৈরব ইত্যাদি নানা রূপে ভৈরবের আরতি হচ্ছে, কিন্তু এই বনস্পতির আক্রমণে আসলী ঘিউ-এর চেহারা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। হয়ত আমাদের শিক্ষার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

একদিন তালিম শেষ হলে পর শৈলেশবাবু সবিনয়ে খাঁ সাহেবকে জানালেন যে সামনের শীত-কালে খান সাহেব আবদুল করিম খাঁ কলকাতায় আসছেন, স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও লালাবাবুদের অল বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্স-এ গাইবেন। শৈলেশবাবু ইতিপূর্বে বদল খাঁ সাহেবকে আবদুল করিমের রেকর্ডগুলো শুনিয়েছেন ও খাঁ সাহেবও খুব প্রশংসা করেছেন। আবদুল করিম আসছেন শুনে বদল খাঁ সাহেব বললেন, ওতো আমার মাতুল বংশের ছেলে, তবে আমি বহুদিন ওর সামনে বসে গান শুনিনি, এবার যখন এখানে আসছে, তাহলে একবার শোনবার ইচ্ছে আছে। বলেই আমার দিকে তাকালেন, বললেন, তুমি কি একদিন আমাকে ওর গান শোনাতে নিয়ে যাবে? আমি তো এখন বেশী রাত জাগতে পারি না, তাই সকালবেলার অনুষ্ঠানে গেলেই ভালো। আমি সানন্দে সম্মত হলাম, বললাম, ওস্তাদ আপনি বেফিকর থাকুন, আমি টিকিটের ব্যবস্থা করে যথাসময়ে আপনাকে নিয়ে যাব। খাঁ সাহেব অমনি বলে উঠলেন—তুমি তো কলেজে পড়ছ, টিকিটের পয়সা কোথায় পাবে? নিজের জেব (পকেট) থেকে তিনটে টাকা আমাকে দিলেন, শৈলেশ-বাবুর কাছ থেকেও নিতে চাইলেন না। বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, একদিন আগে আমাকে বলে যাবে, টিকিট হয়েছে কিনা আর আন্দাজ কয়টার সময় আবদুল করিমের গান শুরু হবে, তাহলে সেভাবে তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

আমি নিজের জন্য একটা সীজন টিকিট আগেই কিনেছিলাম, সেটা বেশ পশ্চাতের সারি, কারণ উচ্চমূল্যের টিকিট ক্রয় করবার ক্ষমতা সত্যিই আমার ছিল না। তবে অধিক রাত্রে গিয়ে সামনের সারিতে বসতে পেতাম, বন্ধুবর রাধিকামোহন মৈত্রের পিতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্রের একটা লম্বা সোফামতন রিজার্ভড সীট থাকত, তিনি আমাদের বসবার অনুমতি দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন আর আমরা রাজা মহারাজাদের সঙ্গে এক সারিতে বসে চারদিকে চেয়ে দেখতাম, যাতে পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা দেখে আমরা কী দরের লোক। দুর্ভাগ্যবশত অত গভীর রাত্রে লোকজন স্বভাবতই কমে আসত, তাই আমাদের "ভাট" দেখাবার মওকা মিলত না, কিন্তু যখন দিনের বেলায় অনেক পিছনের সারিতে বসতে যাচ্ছি, তখনই জানাশোনা লোকেরা তাকিয়ে দেখত আর জিজ্ঞেস করত, —তোমরা বুঝি পিছনের সারির টিকিট কিনেছ? ইচ্ছে হত বলি যে বেশী রাত্তিরে এসে দেখবেন, আমরা কোথায় বসি।

যাক ব্রজেনবাবুর পাশেই আসন ছিল নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়ের—সব গায়ক বাদকরাই তাঁকে সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করত। কনফারেনসের শেষ দিনের একটা ঘটনার কথা এখনো মনে আছে—পরে বিবৃত করা যাবে। ভূপেনবাবুদের বাড়ির একটা ছেলে, বিভূতির সঙ্গে আমার বেশ জানাশোনা হয়েছিল, হাসিখুশি মুখ, সর্বদা পান ও জর্দায় মশগুল—এই অনুষ্ঠানের সময় ও-ই স্টেজ ম্যানেজ করত। আমি ওকে ধরে খাঁ সাহেবের জন্য একদিনের একটা টিকিট সংগ্রহ করলাম, আর জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে আবদুল করিম খাঁয়ের গান শুরু হতে হতে প্রায় বেলা এগারোটা তো হবেই। আমি তারপর বদল খাঁ সাহেবের ডেরায় গিয়ে তারিখ ও সময় জানিয়ে এলাম—খাঁ সাহেব বললেন, টিকিট তোমার কাছেই থাক—আমাকে সাড়ে দশটা-পৌনে এগারোটার মধ্যে নিতে এসো। ফায়ার ব্রিগেড-এর পেছনের ঘর থেকে গোলদীঘির পূর্ব-উত্তর কোণে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট খুব বেশী দূর নয়—রিক্‌শ-তে দশ-পনের মিনিটের বেশী লাগবে না।

বদল খাঁ সাহেবের বয়স তখন শত বৎসর অতিক্রম করেছে, শরীর অনেক দুর্বল, তাছাড়া শীতকালে তাঁর খুব কাশি হত আর সেই কাশি একবার শুরু হলে ১৫ মিনিটের আগে থামত না। খাঁ সাহেবের জীবনযাত্রা ও সংগীতসাধনার পদ্ধতি সম্পর্কে তখন আমার খুব বিশেষ জ্ঞান হয়নি, তাঁরা নানারকম শ্বাসনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত ছিলেন, হাঁটু মুড়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারতেন আর গান-বাজনা করবার সময় মেরুদণ্ড সরল করে বসতেন, এসব অভ্যাস যে গায়ক বা বাদকের পক্ষে অত্যাবশ্যক তাতো পরে জেনেছি। আমার শুধু ভয় হচ্ছিল যে আবদুল করিমের গানের সময় যদি একবার খাঁ সাহেবের কাশি আরম্ভ হয়, তাহলে সুরের ধ্যান ভঙ্গ করার অভিযোগে আমি তো বহিষ্কৃত হবই, তাছাড়া প্রহারের আশংকাও কম নয়।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় আমি খাঁ সাহেবের ঘরে উপস্থিত হলাম, দেখি যে তিনি গরম কাপড়ের আচকান, টুপী ও লাঠি নিয়ে তৈরী হয়ে বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে ঘরের বাইরের রাস্তায় আসতেই তাঁর পরিচিত রিকশাওয়ালা সেলাম করে সামনে এসে দাঁড়ালো। দুজনে রিক্‌শায় উঠবার পর খাঁসাহেব হুকুম দিলেন—গোল তালাওমে চলো। রিক্‌শা ভবানী দত্ত লেন দিয়ে কলেজ স্ট্রীট YMCA-র পাশ দিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনের রাস্তা ধরে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এর হলের সামনে পৌঁছালো। আমি টিকিট গেটে দেখালাম ও ধীরে ধীরে ভেতরে এলাম। সামনের সিঁড়ির কাছে আসতেই খাঁ সাহেবের শাগির্দরা যাঁরা ব্যাজ-ট্যাজ পরে ঘোরাফেরা করছিলেন, সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে এলেন, বার্ধক্যে জরাজীর্ণ বুজুর্গকে এবার তাঁরা সম্মান দেখাবার জন্য ব্যস্ত হলেন। বিভূতি বাইরের দিকেই চা খেতে এসেছিল, খাঁ সাহেবকে সসম্মানে একেবারে স্টেজের ভেতরদিকে নিয়ে যাচ্ছে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি, অকস্মাৎ "দ্বারপাল" বললেন, আপনার আসন হলের অন্দরে, পেছনের দরজা দিয়ে চলে যান। খাঁ সাহেব খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, পেছন ফিরে আমাকে দেখতে না পেয়ে প্রশ্ন করলেন, ওয়াহ লড়কা কিধার গিয়া? দ্বারপাল আমাকে তখনো খাঁ সাহেবের কাছে যেতে দিতে চাইছে না, খাঁ সাহেব লাঠিটা উঁচিয়ে বললেন,—উসকো ইধার আনে দো, দরওয়াজা ছোড়ো। বিভূতিও এগিয়ে এসে আমাকে সঙ্গে করে একেবারে মঞ্চের ওপর যেখানে খাঁ সাহেবের জন্য একটা আসন পাতা হয়েছিল তার পাশেই বসতে বলল। খাঁ সাহেব আসন পরিগ্রহ

করে আমার দিকে তাকিয়ে লাঠিটা পাশে রাখতে বললেন। বসবার কায়দা কী ম্যাজেসটিক—ওই ন্যুব্জ শরীর যতখানি সম্ভব ঋজু করা যায়, সেইভাবেই মাথা উঁচু করে বসলেন, মনে হচ্ছিল এই আসরের তিনিই সভাপতি—ও ভাগ্য-বিধাতা। আমি অত্যন্ত সন্তর্পণে খাঁ সাহেবের কালো আচকানের পশ্চাৎ দিকে একটু আড়াল বসে আছি—এমনভাবে যে যদি দুর্ভাগ্যবশত খাঁ সাহেবের সেই কাশি শুরু হয়, তাহলে যেন অতি দ্রুত আসর থেকে পলায়ন করতে পারি।

সেই সকালের জনসমাগম যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন, উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে তখনকার দিনে এরকম ভিড় আগে দেখা যায়নি। বাংলা, বিহার ও আসামের দূরপ্রান্ত থেকে সংগীত পিপাসু বিশাল জনসমুদ্র যেন সেই গৃহের অভ্যন্তরে সমবেত হয়েছেন—নীচের হলে তো বহুলোক টিকিট কেটেই দাঁড়িয়ে শোনবার প্রতীক্ষা করছেন, দোতলার বারান্দাতেও শ্রোতৃবৃন্দ উন্মুখচিত্তে দাঁড়িয়ে আছেন, কোনও গোলমাল বা অশান্তি নেই। আবদুল করিম খাঁ ও পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর—এঁদের রেকর্ড তার কিছুদিন আগে থেকেই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল—আবদুল করিম খাঁসাহেবের "পিয়া বিনা নহী আওয়াত চৈন" ও "জমনাকে তীর" এই সব গানগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরছে; ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের "মাঈ কৌন্থ" "মিতওয়া বালমুওয়া" "ঝাঁঝরিয়া ঝনকে" ইত্যাদি জবরদস্ত গান অনুকরণ করবার ব্যর্থচেষ্টা অনেকেই করছেন—এই অসাধারণ শিল্পীর সাক্ষাৎদর্শন ও সংগীতশ্রবণ করবার সৌভাগ্য হবে, এই আশাতেই সমস্ত সংগীতসমাজ যেন উন্মত্ত আবেগে অপেক্ষমান। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল দোতলার বারান্দার রেলিং না ভেঙে পড়ে যায়, তার উপর এত লোকের চাপ ক্রমেই বাড়ছে, কারণ হলে আর তিলধারণের স্থান নেই, বেশী দাম দিয়েও অনেকে ওপরে উঠে এসেছেন এই অপরূপ সংগীত-সুধা পানের আকাঙ্ক্ষায়।

প্রায় এগারোটা নাগাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে আসরে প্রবেশ করলেন। কলকাতার আরো কয়েকটা নিরালা ও Exclusive মহ্‌ফিলেও তাঁর গান শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি যে খাঁ সাহেব আসরে স্থান গ্রহণ করবার পূর্বেই তানপুরা, তবলা, সারেঙ্গী সব সুরে বেঁধে নিয়ে প্রবেশ করতেন, আসরে বসে কান মোচড়া-মোচড়ি করতেন না। বিভূতি আমাকে বলেছিল, খাঁ সাহেব প্রায় আধঘণ্টার উপর হল অনুষ্ঠানে এসেছেন, কিন্তু একটা ছোট্ট ঘরে দরজা বন্ধ করে সব যন্ত্রপাতি মেলাচ্ছেন আর সুর বাঁধা হয়ে গেলে পর দুজন শাগির্দের হাতে দুটো তানপুরা দিয়ে সুর ছাড়তে বললেন—নিজে সেই সুরের গুঞ্জনে যেন মস্তৃ হয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ সুরের রসে ও আনন্দে পূর্ণ নিষিক্ত হয়ে তারপর শ্রোতাদের সমক্ষে হাজির হতেন। আসরে বসে নানা রকম পাঁয়তাড়া কষে আত্মমাহাত্ম্য বা শ্লাঘা বিশ্লেষণ করা তাঁর রীতিবিরুদ্ধ ছিল—তাঁর সুরের পূর্ণসিদ্ধি লাভের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল তাঁর আশ্চর্যজনক মৃত্যুর কাহিনী, কিন্তু সেটা কিছুদিন পরের কথা আর তার সঙ্গে আমাদের এ প্রবন্ধের সম্পর্ক নেই।

খাঁ সাহেব প্রথমে লক্ষ করেননি মঞ্চের ওপর কারা বসে আছেন, তিনি নিজের স্থানে বসতে যাচ্ছেন এমন সময় অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ল বদল খাঁ সাহেবের দিকে, আর আসনে বসা হলো না, তিনি ধীরপদে এগিয়ে এলেন বদল খাঁ সাহেবের দিকে। নত হয়ে বদল খাঁ সাহেবের জানু স্পর্শ করে যেন শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করছেন—বদল খাঁ সাহেব মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। এ এক অপূর্ব দৃশ্য—সমস্ত জনসমুদ্র স্তব্ধ হয়ে আছে, কে এই বৃদ্ধ, যাঁর পদস্পর্শ করে আবদুল করিমের মত গুণী ধন্যবোধ করছেন? প্রণতি শেষ করে আবদুল করিম খাঁ সাহেব শ্রদ্ধাভরে বললেন, আপনি যে এই বয়সে

খান সাহেব আবদুল করিম খাঁ

কষ্ট করে আমার গান শুনতে এসেছেন এতে আমার পরম সৌভাগ্য। আগে জানলে, আমিই আপনাকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসতাম। বদল খাঁ সাহেব মৃদুহাস্যে বললেন, তাতে কী হয়েছে—আমি তো খুব কাছেই থাকি, আমার কোনও কষ্ট নেই, কোনও তক্‌লিফও হচ্ছে না। তোমার গান শুনেছি তোমার কত কিশোর বয়সে, তারপর আমি কলকাতায় চলে আসায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই এবার তুমি কাছে আসাতে ইচ্ছে হল একবার সামনে বসে গানও শুনব, আর তোমার সঙ্গেও তো সাক্ষাৎ হবে। আমি মুগ্ধবিস্ময়ে দুই সংগীতের দিক্‌পালের "সাহিব-সলামত" (অভিবাদন) ও মিজাজপুর্শী (কুশল প্রশ্ন) এবং "তরজ-কলাম" (আলাপন-সম্ভাষণ) শুনছিলাম।

এবার বদল খাঁ সাহেবের কাছে "ইজাজত" নিয়ে আবদুল করিম খাঁ গাইতে বসলেন, কিন্তু গান শুরু করবার পূর্বে শ্রোতৃবৃন্দকে যে কটি কথা নিবেদন করেছিলেন, তা আমার স্মৃতিপটে আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি বললেন, আজ যে আপনারা সকলে আমার গান শোনবার জন্য সমবেত হয়েছেন এবং বহু কষ্ট স্বীকার করে প্রতীক্ষা করছেন, তার জন্য আমি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার বহুভাগ্য ও গুরু-মুর্শীদের আশীর্বাদেই এই সম্মান আমি মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু আজ থেকে প্রায় বারো বৎসর পূর্বে আমি একবার কলকাতায় এসেছিলাম, শ্রীযুক্ত দিলীপ রায় আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন। আমার গানের যে স্টাইল বা বাড়ত, তানপদ্ধতি, সুর লাগাবার তরীকা, কিছুই পরিবর্তন হয়নি, শুধু রিওয়াজের ফলে হয়ত কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সেই সময় আমার গানের মহ্‌ফিলে লোক জমা হত না, বহু কষ্টে কয়েকটি ছোটখাট মহ্‌ফিলের আয়োজন করেছিলেন দিলীপ রায়। আজ যে আপনারা আমার সামান্য সংগীত শ্রবণে উৎসুক হয়েছেন, তার মূলে আছেন এই আমার বুজুর্গ ও খলিফা, ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব, যিনি অত্যন্ত কৃপা করে আমার গান শুনে আমাকে কৃতার্থ করতে এসেছেন। ইনি তাঁর সংগীত শিক্ষার মণিরত্নগুলি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে অকুণ্ঠ-ভাবে দান করেছেন, যার ফলে আসলী সংগীত, সুর সুষমায় সমৃদ্ধ রাগের ধ্যানমূর্তির রূপে স্নিগ্ধ হয়ে আপনাদের রসচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, আপনারা সুরের রসধারায় স্নাত হয়ে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছেন, এর কিছুই সম্ভব হত না, যদি না বদল খাঁ সাহেব আপনাদের সমক্ষে এই সুধা ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে না দিতেন। তাই আজকের এই সম্মান, আপনাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আমার প্রাপ্য নয়, এসব আমি আমার গুরুস্থানীয় খলিফা ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবকেই সমর্পণ করছি। বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে এই যুগ পরিবর্তনের মূলে বদল খাঁ সাহেবের অবদানই নিহিত রয়েছে। (ক্রমশ)

মনপছন্দ ১০১ টি নানান ধরনের ডিজাইন, সুপার কটন ও ব্লেণ্ডেড ড্রেস মেটিরিয়াল, শার্টিং, স্যুটিং ও শাড়ী।

নিরাপদর তীর্থযাত্রা

শিশির লাহিড়ী

চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর নিরাপদর অখণ্ড অবসর।

দিনকতক চুপচাপ ঘরে বসে থাকতেই হাঁটুতে বাত এবং মনে ছাতা ধরে গেল। খেলে হজম হয় না, চোঁয়াঢেঁকুর ওঠে। রাতের ঘুমও পাতলা হয়ে আসছিল। মাঝরাতে উঠে হুটোপুটি করলে গৃহস্থের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। গৃহিণী মনোরমা একদিন রেগে বলল, "তুমি কি সারা রাত চোর-পুলিস খেল?" ছোট ছেলে আরও এক কাঠি সরেস। সে সানাইয়ের পোঁ ধরল, "আজ থেকে আলটিমেটাম দিচ্ছি, ভোর ছ'টার আগে বিছানা ছেড়ে নড়া চলবে না।" নিরাপদ ঘাড় নেড়ে বলল, "তাই হবে বাবা। তবে রাতে পেচ্ছাপ পেলে কি করব বলে দাও।" মনোরমা মুচকি মুচকি হাসছিল। ছেলে অট্টহাস্য করে বলে উঠল, "যখন তখন ওসব পাওয়া চলবে না। কনট্রোল কর।"

আর কনট্রোল। নিরাপদ যেদিন অবসর নিয়েছে, সেদিন থেকে সব কনট্রোল উঠে গিয়েছে। —এ রোগ অকর্মার রোগ। ঘরে বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজলে রোগে ধরবে না তো, কি শরীর চাবুক হবে? আহা! ন'টায় দুটি নাকেমুখে গুঁজে নিরাপদর সেই ছোটা: আর সন্ধে ছ'টায় সময় হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে ফেরা। তার মতন স্বর্গসুখ কি আর আছে! সেই যুদ্ধের সময়, নিরাপদর বাইশ বছর বয়সে বাবা শিবপদ চট্টোপাধ্যায় ম্যাকফারসন সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, "সাহেব, আজ থেকে তুমি পাঠাপিতার এক পিতা হলে। ওকে দেখো।" তারপর এই ছত্রিশ বছরে কত সাহেব এল গেল, কিন্তু নিরাপদ ঠিক ঘানি ঘুরিয়ে আসছিল। হঠাৎ বয়সের হিসাব কষে, ঘানির জোয়াল কাঁধ থেকে তুলে ফেলে, নিষ্কর্মার জনারণ্যে ঠেলে ফেলে দিলে মানুষ বাঁচে কি করে?

নিরাপদরও বাঁচবার আশা কম। এখন মুক্তি পেলেই হয়। এই বয়সে জীবন ফুরিয়ে গেল দেখে, নিরাপদ হতাশ হল। একদিন বলল, "আমি তোমাদের কাছে হাতজোড় করছি, তোমরা আমাকে মুক্তি দাও। দু চোখ যেদিকে যায়, আমি সেদিকে চলে যাই।"

সেদিন বাড়িতে অনেক লোক। মেয়ে জামাই এসেছে। ধানবাদ থেকে মাসকাবারী শনিবারে বড় ছেলেও এসে উপস্থিত। নিরাপদ নাটক ভালবাসে না। কিন্তু ব্যাপারটা নাটকই হয়ে গেল। মনোরমা বলল, "ঢং! লোক দেখলে আপসে ওঠে। যাও না যেখানে খুশি, কে তোমাকে মানা করেছে। তবে যাবার আগে সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিও, আমি ছেলেদের হাততোলা হয়ে থাকতে পারব না।"

নিরাপদ বলল, "গুছোবার আর কি আছে? মেয়ের বিয়ে আর পুরনো বাড়ি সারাতে গিয়ে পুঁজি যা ছিল তা তো ফুঁকেই দিয়েছি। গ্র্যাচুইটি আর প্রভিডেন্ট ফন্ডের দু চার হাজার টাকা, সেও সেলফ অর সারভাইবার। তুমি অনেক আগেই বাঁশগাড়ি করে রেখেছ।"

বলার সুরে যে কোন মানুষই রাগতে পারে। মনোরমাও রাগল। "ওই ব্যাঙের আধুলি নিয়ে আর বড়ফট্টাই করো না। যে কোন মুটে মজুরের ওর চেয়ে বেশী থাকে। তোমার জ্ঞানগম্যি নেই তাই এ কথা বলতে পারলে। অন্য লোক হলে লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকত।"

নিরাপদর গলার সুর চড়ল। "দেখ, আজেবাজে কথা বলবে না বলছি। ভাল হবে না।"

"হ্যাঁ, চেঁচাও। চেঁচিয়ে সাতপাড়া মাথায় কর। বাড়িতে জামাই এসেছে, শ্বশুরের চেহারাটা দেখে যাক। তবে না ইজ্জত বাড়বে!"

জামাই-এর নাম শুনে নিরাপদ সামান্য দমে গেল। চাপা গলায় বলল, "তুমি অমন বেয়াক্কেলের মতন কথা বলবে, আর আমি চুপ করে বসে বসে শুনব?"

"বেয়াক্কেলে! —আমি! না তুমি? কোন কথা কখন বলতে হয় জানো? বাড়িতে যখন লোক থইথই করছে, ওঁর তখন বানপ্রস্থের সাধ উথলে উঠল। —তা যাও না, যাও। আমি তোমার পায়ে ধরে সাধতে যাব না। তেমন মেয়ে আমায় পাওনি।"

"সে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। এই সাতাশ বছরে তোমাকে চিনতে আমার বাকি নেই।"

"আমারও।" মনোরমা চাবির রিং সশব্দে পিঠের ওপর ফেলে দিল। "তোমাদের ঝাড়ে ঝাড়ে দণ্ডবৎ। এমন স্বার্থপর, একবগ্গা, নীচ লোক পৃথিবীতে যদি দুটো থাকে!"

"কি! কি বললে?" নিরাপদ রাগে চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল। নিচের পাটির বাঁধানো দাঁত ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল।

রমাপদ পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে কিছু করছিল। তারাপদও উপস্থিত।

"যন্ত্রণা!" রমাপদ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। দ্রুত পায়ে বাবা মার ঘরে ঢুকে বলল, "কি! তোমরা পেয়েছ কি? মাসে একটা দিন বাড়ি আসি, এবার থেকে সেটাও তুলে দিতে হবে?"

"দে। দে! তাই দে। এ হতচ্ছাড়া যমপুরীতে আর কোনদিন পা দিসনে।"

রমাপদ রাগ সামলাতে পারল না। মার দিকে তাকিয়ে বলল, "থামো। তুমি যেন ঢাকের কাঠি। শুরু হলে থামতে জানো না।" তারপর বাবার দিকে ফিরে বলল, "তোমার হল কি? কেসটা কি! এত চেঁচাচ্ছ কেন?"

"চেঁচাচ্ছি কি আর সাধে। তোমরা এবার বিদায় দাও। —চলে যাই।"

"কোথায়?"

"যেদিকে দু চোখ যায়। যেখানে খুশি।"

"বাবে বাও। চেঁচামেচি করবার কি আছে? কোন কাজ কি এ বাড়িতে শান্তিমতন হয় না?"

"হবে কি করে?" তারাপদ বলে উঠল। "বাবা আজকাল যা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।"

"বাড়াবাড়ি শুরু করেছি?"

"কর নি?"

"বুঝলি দাদা, বাবা রিটায়ার করবার পর অনেক বাই হয়েছে। খেতে দিলে খাবে না, খ্যাক খ্যাক করে ঢেঁকুর তুলবে। সারা রাত ঘুমোবে না, খটর খটর করে ঘুরে বেড়াবে। বল, ভোর চারটেয় উঠে, কেউ যদি রান্নাঘরে ঢুকে স্টোভ জেলে নিজে চা করতে চায়, তা হলে মা রাগবে না?"

নিরাপদ প্রতিবাদ করল। "এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হল। আমি কাউকে ডাকছি না, নিজেই করে নিচ্ছি। সেলফ হেলপ।"

"সেলফ হেলপ। তারপর হাত-পা পুড়িয়ে বসে থাক। ওটা তোমার কাজ?"

"কি কাজ, আর কি অকাজ সেটাই আজকাল বুঝিনে বাবা।—তোমরা যা বলবে এবার থেকে তাই হবে।"

রমাপদ কি যেন ভাবছিল। একটু থেমে বলল, "ছোটকু, বাবার এই অবস্থার কথা তুই আমাকে চিঠিতে লিখতে পারতিস। একটা ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল। একটা লোক দিনের পর দিন খাচ্ছে না, রাতে ঘুমোচ্ছে না, দিস ইজ ট্ব্যাড। —এরকম করলে ক'দিন বাঁচবে।"

নিরাপদ হাঁটু চাপড়াল। "দেয়ার ইউ আর। রাইট।"

"তুই মাসে একদিন আসিস, তুই কি বুঝবি। বাবার ডাক্তারি বাবা নিজেই করছে। ঘুমের ওষুধ নেই বলে, একদিন অ্যানটিবায়োটিকস মেরে দিল। তার ওপর দিনরাত খিঁচিয়েই আছে। —লাইফ হেল করে দিচ্ছে। আমি শালা এবার কাটব।"

"হতেই পারে। একটা বাঁধা প্রফেশনে বাবা এতদিন কাটিয়ে এল, —এখন সব ফাঁকা, কিস্সু করবার নেই। লাইফটা ভয়েড,—শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এমন হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।"

নিরাপদ সাবাস জানাল। "হি নোজ। অ্যাবসলিউটলি করেক্ট।"

"তোর বাপ নিষ্কর্মার ধাড়ি হতে পারে, কিন্তু আমাদের তো সংসার আছে, কাজ আছে। এই এক হাতে রামাবান্না, এসোজন বসোজন করতে হয়।" মনোরমা ছেলেকে সাক্ষী মানল। "তুই বল খোকা, সেখানে একটা মানুষ দিনরাত টিকিস টিকিস করলে ভাল লাগে?"

রমাপদ শুনল। শুনে বলল, "লেখাকে ডাক তো।"

"দিদি, এই দিদি। প্রদীপদাকে নিয়ে নিচে আয়।"

মনোরমা উঠে পড়ল। "আমি যাই।"

"ব'সো।"

"না বাপু, শেষমেষ জামাইয়ের সামনে হেনস্থা করবি।"

তারাপদ চেঁচিয়ে উঠল। "এই জন্যেই তোমার ওপর রাগ ধরে। দাদা কি মুখ্যু? ঘাসে মুখ দিয়ে চলে?"

মেয়ে-জামাই ঘরে ঢুকল। প্রদীপ নিরাপদর পাশে, সুলেখা মনোরমার ধারে। রমাপদ সামান্য একটু সময় নিয়ে, খুক খুক করে কেশে গলা চুলকে বলল, "বুঝলে জামাই, তোমার শ্বশুরমশাই রিটায়ার করবার পর ক্ষেপে গিয়েছেন। এখন সন্ন্যাসী হতে চান।"

নিরাপদ অপ্রস্তুত। বিব্রত বোধ করছিল। "না, ব্যাপারটা ঠিক তাই নয়। রমা একটু বাড়িয়ে বলছে। বুঝলে, আমার যেন আজকাল সংসার-টংসার তেমন ভাল লাগছে না। কেমন একটা আনইজি, আনকম্ফর্টেবল ফিল করছি।"

প্রদীপ ঠোঁটের কোণে হাসছিল। সুলেখা মেয়েদের মতন হাউমাউ করে উঠল "ওমা! সে কি! কি যা তা সব বলছ।"

রমাপদ শক্ত চোখে সুলেখার দিকে তাকাল। "মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেও তাদের আই কিউ বাড়ে না। যেমন তুই। বাবা কি আর সত্যি সত্যি সংসার ছেড়ে যাবে। বাবার একটা অ-সুখ হয়েছে।"

"এমন যা তা কথা বলবি না।"

মনোরমা চিপটেন কাটল। "বাপসোহাগী!"

"তা হবে কেন? দিনরাত মার পায়ে ম্যাও ম্যাও করে ঘুরবে।" নিরাপদ না বলে পারল না।

রমাপদ অর্কেস্ট্রা পরিচালকের মতন দু দিকে দু হাত ছড়িয়ে বলল, "চুপ। —এটা খুব স্বাভাবিক, একজন লোক, এ ম্যান অফ অল ইমপরট্যানস, হঠাৎ অফ নো ইমপরট্যানস হয়ে গেলে, জীবন একেবারে মূল্যহীন হয়ে থাকে। বাবার অন্য কিছু ভোকেশন নেই। চাকরি-বাকরি ছাড়া জীবনে আর কিছু করেনি, করতেও চায়নি। থিয়েটার দূরে থাক, একটা সিনেমা পর্যন্ত দেখে না। বই পড়া দূরে অস্ত। ধর্মপুস্তক হাতে ধরিয়ে দেবার মতন বয়সও বাবার নয়। সুতরাং একটা রেস্টলেসনেস—ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে। কি করবে ভেবে পায় না। এবং যা করতে চায় তার ফল উল্টো হয়।"

রমাপদর ব্যাখ্যা নিরাপদর মনঃপূত হল। ঘাড় নেড়ে সম্মতির সায় দিল, "বাহ! সুন্দর বলেছ। রাইট।"

রমাপদ প্রদীপের দিকে ঘুরে বলল, "এ ক্ষেত্রে কি করা প্রয়োজন। তোমার কি মনে হয়?"

"বাবাকে আজকাল খুবই টায়ার্ড দেখায়। চেহারাতেও সেই ছাপ ফুটে উঠেছে। আমার ধারণা দিন কতক কোথা থেকে ঘুরে এলে—"

"দেয়ার ইউ আর।" রমাপদ কথাটা লুফে নিল। "আমিও তাই বলতে চাইছিলাম। বাবার একটা চেঞ্জ দরকার, এই একঘেয়ে পুরনো ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও অন্য কিছু, অন্য কোনখানে।"

প্রদীপ সম্মতির ঘাড় নাড়ল।

"শুধু বাবা নয়, মারও দরকার।" রমাপদর স্বর ঈষৎ হালকা হয়ে এল। "বাবা না খেটে খেটে এবং মা খেটে খেটে ম্যাড হয়ে গেছে। দিনরাত ফাইট করে যাচ্ছে। ছোটকু দরজায় বড় বড় করে "পেণ্টাম্যাড" লিখে রেখেছে। আসলে ওটা হবে ট্রাইম্যাড —তিন পাগলের বাড়ি। বাড়ির দুজনকে দিনকতক রাঁচি ঘুরিয়ে আনলে, বাকি থাকবে এক।" রমাপদ তারাপদর দিকে হাসি হাসি মুখে তাকাল। "তাকে যথাসময়ে পিঁজরাপোলে পাঠিয়ে দিলেই চলবে।"

সুলেখা ছটফটে গলায় হেসে উঠল

"কে কাকে পিঁজরাপোলে পাঠায়! তোকে একদিন ধানবাদ থেকে বরখাস্ত পাঠিয়ে দেব।"

"তা তুই পারিস। যা মেজাজ।" সুলেখা বলল।

"সিমলার কালীবাড়িতে আমার একটু জানাশোনা আছে।" প্রদীপের ধীর গলা। "ওঁরা যদি যেতে চান আমি বন্দোবস্ত করতে পারি।"

"গ্র্যান্ড! চারিদিকে পাহাড়। বরফ। বাহ! বেশ হবে।"

নিরাপদ টাগরায় জিব ঠেকিয়ে একটা আক্ষেপের শব্দ তুলল। "সিমলা শুনেছি

খুব ভাল জায়গা। তবে বুঝলে কি না ইহজন্মে আর বোধ হয় সিমলা যাওয়া হবে না। —হাঁটুতে বাত। চলতে ফিরতে বড় কষ্ট হয়।"

সুলেখা লাফিয়ে উঠল। আদুরে গলায় বলল, "ও তোমার মনের কষ্ট বাবা। এক-আধ দিন হাঁটাহাঁটি করলেই সব সেরে যাবে। এখন অল্প অল্প ঠাণ্ডা পাবে। তুমি আর মণি যা একটা দারুণ পেয়ার হবে না!"

"রক্ষে কর। আমি মরে গেলেও ওর সঙ্গে যাচ্ছি না। দিনরাত দাঁতখিঁচুনি, —এর চেয়ে আমার এই যমপুরীই ভাল।"

"যাবে না মানে," তারাপদ চেঁচিয়ে উঠল, "তোমার ঘাড় যাবে।"

"চেঁচাসনে।" রমাপদ ধমক দিল। তারপর মনোরমার দিকে ঘুরে বলল, "তুমি কোথায় যেতে চাও?"

"কোথাও নয়।"

বাপের দিকে ফিরল রমাপদ। "তুমি?"

"একটু প্লেন ল্যাণ্ডের দিকে হলে ভাল হয়। ধরো সী বীচ—পুরীটুরী। কিংবা বেনারস, হরিম্বার, লছমনঝুলা। বয়স হচ্ছে। কোনদিন আছি, কোনদিন নেই। যাবার আগে একটু পুণ্যটুণ্য করে নেওয়া ভাল।"

পুণ্যের কথা শুনে মনোরমা নিজেকে চাপতে পারল না। "হ্যাঁ, ওর আবার পুণ্য! বাবা আজ এই আঠারো বছর মারা গেছেন, অমন রাজারাজড়ার মতন বাবা, সেই তাঁকেই কোনদিন একগণ্ডূষ জল দিল না, তার মুখে আবার পুণ্যের নাম।"

"সেই জন্যেই তো বলছি। কখলে বাবার কাজ করার ইচ্ছে আছে। মারটাও সেরে নেব।"

"সেই সঙ্গে আমারও একটা সেরে এস।"

সকলেই হেসে উঠল। এমন কি নিরাপদও।

হাসি থামলে রমাপদ মার দিকে ফিরে বলল, "এসব সিরিয়াস ডিসকাশনে কফি লাগে। —একটু কফি বানাও। কড়া করে।"

সুলেখা উঠে পড়ল। "মণি, তুমি বসো। আমি আনছি।"

"আমি বসে কি করব। যে যাচ্ছে সে বসুক। আমি যাচ্ছি না।"

মনোরমার কথায় কেউ কান দিল না। সুলেখা চলে গেল। রমাপদ বলল, "বুঝলে জামাই, ক'দিনের জন্য ছোটকু হেড-অফ-দি-ফ্যামিলি। ওটা আবার মহা উন্মাদ। সুলেখাকে ক'দিন পাঠিয়ে দেবে। তুমি এসে থাকলে ভাল হয়। আমি কফি খেয়ে দুখানা টিকিট রিসার্ভ করতে যাব। আমার এক বন্ধু রাসবেহারীতে আছে, মহা খলিফা ছেলে, শালা ঠিক দুখানা ম্যানেজ করে দেবে।"

"আমি যাব না খোকা। তুই একটা টিকিট কাট।"

তারাপদ দু হাতের গুলো ফুলিয়ে এগিয়ে এল। "তুমি না গেলে তোমাকে চ্যাঙদোলা করে দিয়ে আসব।" তারপর রমাপদর দিকে ফিরে বলল, "দাদা, যাবার দিন কিছু ফুলের মালাটালা চাই। একটা ফটোও তুলতে হবে।"

সুলেখা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ফটো কি হবে রে?"

তারাপদ জোর গলায় হাসল। "কাজে লাগবে। গেলে আর তো ফিরবে না, ফাইট করে কোথাও না কোথাও থেকে যাবে দুজনে। তখন ফুলের মালাটালা চড়িয়ে রোজ ধূপধুনো দিয়ে সন্ধে দেখাতে হবে না ফটোতে।"

নিরাপদর ঠোঁটের কোণে হাসি। প্রদীপ মুচকি। রমাপদ সোল্লাসে হাসল। মনোরমা মুখের হাসি আঁচলে মুছে নিতে নিতে বলল, "হতভাগা!"

কফির পাত্র হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সুলেখা বলল, "ভাই! আমারও একটা ফটো চাই। বাবা-মার জোড়ে-ফটো আমার একটাও নেই।"

হাসির তরঙ্গ এবার মুখ থেকে মুখে সুর করে গড়িয়ে গেল।

রিকশার খোঁচ লেগে শাড়ি ছিঁড়ল।

নিরাপদ বলল, "ছিঁড়ল তো!"

"ছিঁড়ুক! সব দিকে তোমার নজর দেবার দরকার কি?"

"না, আমার আবার দরকার কি? দরকার পড়বে ওপাড়ার হরের বাপের।"

"যে দেখবে, সে দেখবে। তুমি চুপ কর তো। ঘর বার কিছু মানা নেই, এমন মানুষ যদি দুটো থাকে!"

নিরাপদ কথা বাড়াল না। কথা বাড়ালেই বাড়ে। সকালে একচোট হয়ে গিয়েছে। এখন আবার, এই নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু করলে, অশান্তির শেষ থাকবে না। বেড়াতে এসে কে আর সাধ করে অশান্তি কিনতে চায়? পুজো আর্চা করো, ঠাকুর-টাকুর দেখ, খাওদাও, বেড়িয়ে বেড়াও। দেখবার কি আর শেষ আছে! পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার কূলে বসলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। তা নয়, দিনরাত এটা কিনব, সেটা কিনব, গোটা শহরটাকে কিনে আঁচলে গিঁট বাঁধতে পারলে ভাল হয়। মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষ যেখানেই থাকুক, ওরা আর কোনদিন মানুষ হয় না।

রমাপদর কথা শুনে নিরাপদ কি মুর্খামি করেছে। মনোরমা কি সত্যি চাইছিল না, স্বামীর সঙ্গে এলে অসুবিধে হয়। মরুক গে যাক, না এলেই ভাল হত। নিরাপদই বলতে পারত, "দেখ বাপু, আমি একটু একা একা ঘুরতে চাই। এতদিন বন্ধনের মধ্যেই রইলাম, সংসারের ঘানিতে। এখন আমায় একটু ছেড়ে দাও, ঘুরে ফিরে মন শান্ত হলে আবার খোঁয়াড়ে ফিরে আসব।" তা নয়, কাকের পিছনে ফিঙের মতন বাপের পিছনে মাকে লেলিয়ে দিলে। এখন পান থেকে চুন খসলেই মেজাজ, খরচ-টরচ নিয়ে কথা বললেই অগ্নিশর্মা। আরে বাবা, উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুতে কোনদিন মিল হয়? হলেই পৃথিবী রসাতলে যাবে।

সূচনাতেই ব্যাপারটা নজরে পড়েছিল নিরাপদর। ছেলে ভালভাবে পাঠাতে কসুর করেনি। মেয়ে জামাই এসে কড়াপাকের সন্দেশ দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে শুলো, রাতভর ঘুমলো। তারপর কি না ভোরবেলা আসীমুখে স্টেশনের ঐ পচা সিঙাড়া খেতে চায়। নিরাপদ আশ্চর্য হয়েছিল। কপালে চোখ তুলে বলেছিল, "ঐ সিঙাড়া খাবে?"

"কেন? খেলে কি হয়?"

"বিদেশ বিভূঁই যাচ্ছ। এসব খেয়ে গাড়িতেই যদি শরীর খারাপ করবে, তবে যাবার দরকার কি? যেখানে যাচ্ছ, সেখানে কি আর সিঙাড়া পাওয়া যায় না?"

মনোরমা রাগ করে চায়ের ভাঁড় ফেলে দিয়েছিল। বাধ্য হয়েই নিরাপদকে নিজের ভাঁড়টা ফেলতে হল। চেঁচিয়ে বলতে হল, "এ চা খাওয়া যায়? চা না পাঁচন হে!" পাশের থেকে কে এক ছোকরা উলটে টিটকিরি মারল, "দাদা, থ্রি-টায়ারে যাচ্ছেন, পাঁচন খাবেন না তো পরমান্ন খাবেন!"

ছোট রিকশা। রিকশায় ভালমত দুজন আঁটে না। নিরাপদ বসতেই, মনোরমা নিজেকে যথাসম্ভব কুঁকড়ে ছোট করে নেবার চেষ্টা করল। মুখ ফিরিয়ে বলল, "সরে বসো।"

নিরাপদ সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকল, "এর থেকে বেশী সরতে হলে, নিচে নেমে যেতে হয়।"

"আর একটা রিকশা নিলেই হয়। এমনভাবে বস্তার মতন চাপাচাপি করে যাওয়া যায়?"

একদিন গাদাগাদি করে যেতে মনোরমার কষ্ট হয়নি। আজই যতো হচ্ছে। হুঃ। রিকশা নিলেই হয়। পয়সা যেন খোলামকুচি। নিরাপদ ভাবল। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যায়! কত ধানে কত চাল বোঝ না তো। থাকো, খাও, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ ছড়িয়ে ঘুমোও। মাসকাবারী মাইনেটুকু হাতে না পেলে মেজাজ তিরিক্ষে। এখন আবার সে মাইনেও নেই। পেনসনের ক'টা টাকা। সে টাকা যদি নয় ছয় করে উড়িয়ে দিতে হয়, তবে চিলুর কাঠ কেনবার বরাদ্দটুকুও থাকবে না।

নিরাপদ কথায় উত্তর দিল না। সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। ধর্মশালা এসে পৌঁছলে বাঁচে। অন্তত হাত-পা মেলে স্বস্তিতে কিছুক্ষণ বসা যায়। গেটের গোড়ায় ধরণীবাবু। পান চিবোতে চিবোতে সিগারেট খাচ্ছেন। ধরণীবাবু মুচকি হেসে বললেন, "এই দুপুর রদ্দুরে জোড়ে কোথায় যাওয়া হয়েছিল মশাই?"

রিকশায় ভালমত দুজন আঁটে না

মনোরমা হাসির মুখ করে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। নিরাপদ ভাড়া চুকিয়ে বলল, "ঐ ওঁদের দেশের এক মাস্টারবাবু শিবালার দিক থাকেন। সেখানে দেখা করে, পঞ্চকোটের কালীবাড়িতে একটু পুজো দিয়ে এলাম।"

"তা বেশ করেছেন।" ধরণীবাবু টেনে টেনে বললেন, "তবে মশাই, পঞ্চকোটে যেতে হলে সন্ধের দিকে যাবেন। আহা! অপূর্ব! বিকেলের আলো মরে আসছে। গঙ্গার জল রুপোলী পাতের মতন চকচকে। মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজছে। আপনার মনটা একেবারে ভরে উঠবে। মনে হবে পৃথিবীতে এর চেয়ে আর বেশী শান্তি নেই।"

নিরাপদ নাকের ভেতর শব্দ তুলল। "শান্তি! শান্তি আর কোথায়!"

মনোরমা হাসি মুখে ধরণীবাবুর দিকে ফিরে বলল, "খুঁজে নিতে হয়, কি বলেন? না চাইলে পাওয়া যায়!"

ধরণীবাবু গুনগুন করে উঠলেন। "না চাহিলে তারে পাওয়া যায় না......" তারপর বললেন, "খেয়েদেয়ে ফিট হয়ে নিন মশাই। আমি টাঙ্গা ঠিক করে ফেলেছি। তিনটে নাগাদ বের হব। সারনাথের মিউজিয়াম আবার পাঁচটার ভেতর বন্ধ হয়ে যায়।"

"টাঙ্গা কত নিল?"

"আর বলবেন না। একেবারে খাবড়ে দিয়েছে মশাই। পনের টাকার এক পয়সা কমে যাবে না। শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। ঘোড়ার দানার নাকি এখন হেভি প্রাইস। অথচ গাড়িতে জুতবে তো সেই পক্ষীরাজের বাচ্চা!"

ধরণীবাবু এমন করে বললেন যে, মনোরমা না হেসে পারল না। নিরাপদ বলল, "তা রিকশা নিলে হত না।"

"হবে না কেন মশাই। খুব হবে। তারপর রাস্তায় টায়ার পাঙ্চার হয়ে পড়ে থাকুক। তখন হাঁটতে হাঁটতে পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে যাবে।"

ধরণীবাবুর মুরুব্বীআনার ভঙ্গিটুকু নিরাপদর ভাল লাগে না। অথচ মেনে নিতে হয়। এই মেনে নিতে নিতেই সারা জীবন কেটে যাচ্ছে। ম্যাকফারসন সাহেবের পর যে ব্যাটা স্কচ সাহেবটা এসেছিল, সেটা মহা বদমাশ। নিরাপদকে প্যাঁকেচক্রে ফেলে কতরকম বিপদে ফেলতে চেয়েছে। শেষ অবধি গাঁটের কড়ি ফেলে এক বোতল হুইস্কি কিনে ব্যাটাকে সেলাম দিতে হল। বলতে হল, "সাহেব, আমার বাবার শ্রাদ্ধে

ও এখন বড় হয়েছে সব সত্য জানতে চায়...
কেবল মায়ের স্নেহ সব জানাবে।

বড় হওয়ার নিগূঢ় সত্য ওকে জানান।
মায়ের সেই সময়ের সত্য বলুন।
স্যানিটারি ন্যাপকিনস এর বিষয়ে সত্য
ঘটনা জানান। কমফিট...

কমফিট...বিশেষ এবসরবেন্ট, বিশেষ হাল্কা, বিশেষ নরম আর কোন বিব্রতকরভাবে ফুলে যাবে না। ভারতের অত্যাধুনিক অটোমেটিক প্লান্ট এ চিকিৎসকের নির্ধারিত প্রথায় কমফিট তৈরী হয় যাতে আপনাকে রক্ষা করবে, অন্য স্যানিটারি টাওয়েলে রোগজীবাণু থাকে বলে পারে না। সম্পূর্ণ ধোয়া যায়। কমফিট ব্যবহার করুন, সুইডেনের কাসটাইন হোডেন এর আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন নাম। কমফিট ব্যবহার করুন আর ভুলে যান যে সম্পূর্ণ রক্ষা ব্যবহার পাবার জন্য করছেন।

যৌবনের প্রথম পরিচয় কমফিট

CH3 BEN

লেগেছিল। একটা বেঁচেছে, তুমি যদি এটা প্রসাদ করে দাও, তা হলে ধন্য হই।"

তারপর মনোরমা ? ছেলেমেয়ে ? কাদের সঙ্গে না অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে: এইভাবে মানিয়ে চলতে চলতে একদিন সব শেষ হয়ে যাবে—নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু এখন আর সব সহ্য হয় না। বয়স হচ্ছে। শরীরও ভেঙে পড়ছে। তার ওপর চাকরিটা গিয়ে অবধি নিরাপদ ত্রিভুবন অন্ধকার দেখছে। হাতে সামান্য কটা টাকা। জমানো রেস্ত প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। অথচ দু বেলা তিনটি মুখে শুধু অন্নগ্রাস তুলতেই বিশটি টাকা দরকার। ছেলে যথাসাধ্য সাহায্য করছে। তবু পুরুষ বলে কথা। নিরাপদ একেবারে অক্ষম হলে কথা ছিল না। সুতরাং মেজাজ রুক্ষ্টদুষ্ট হয়ে আসে।

নিরাপদ যেতে যেতে বলল, "বেশ। আমরা তৈরী থাকব। আপনি যেন দেরি করবেন না।"

"আরে না মশাই, আই অ্যাম এভার রেডি।" তারপর মনোরমার দিকে ফিরে বলল, "বউদি, আজ আপনাকে বিরজু মহারাজের পান খাওয়াবো। এমন মঘাই পান কালেভদ্রে চোখে পড়ে। আপনি আপনার চার শো বিশ জর্দাটা ঠিক করে রাখবেন।"

মনোরমা হাসল। "চার শো বিশ নয় সোনালী তবাক। আমার জর্দাও ফেলনা নয়।"

"তা আর বলতে।"

ফিরতে ফিরতে বেশ দেরি হল।

দেখবার কি আর শেষ আছে। সীতা মাঈ-র রন্ধনশালা, মিউসিয়াম, বুদ্ধ-মন্দির, পুরনো গার্ভগৃহ, ডিয়ার পার্ক। তার ওপর একটু এগিয়ে গেলেই গাছেও কেয়ারিকরা সাজানো স্টেশন।

নিরাপদ মিউসিয়াম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। এখানকার কয়েকটা মূর্তি বিলেতে গিয়েছিল। কি আশ্চর্য কারুকাজ। পাথর যে কথা কয় নিরাপদ এতদিনে বুঝল। কনিষ্কের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে নিরাপদ নির্বাক। ধরণীবাবু বললেন, "কি মশাই! এত কি দেখছেন?"

"নিজেকে।"

"নিজেকে।" ধরণীবাবু রহস্য ধরতে না পেরে বলে উঠলেন, "কি ব্যাপার! এককালে রাজাটাজা ছিলেন নাকি?"

মনোরমা হাসছিল। নিরাপদ সেদিকে তাকিয়ে বলল, "না। আমার চোদ্দপুরুষে কেউ কখনো রাজাগজা ছিল না। তবে কি না ঐ কবন্ধ মূর্তি আমার প্রতিমূর্তি বলে মনে হচ্ছে। আমিও ঐ কবন্ধ হয়েই বেঁচে আছি।"

"কিরকম।"

"সে মশাই যে রিটায়ার করেছে সেই জানে। আপনি এখন সুখের পায়রা, ভাল চাকরি, বাড়ি, গাড়ি, আপনি কি বুঝবেন!"

ধরণীধর হাসল। "অহো! এই! আরে মশাই, একদিন না একদিন সবাইকে রিটায়ার করতে হবে। শুধু রিটায়ার কেন, সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে। কেউ আটকে রাখতে পারবে না। তবে মাঝখানের এই কটা দিন কেন হেসেখেলে, সুখে কাটিয়ে দিই না মশাই। আমি চার্বাক সাহেবের শিষ্য। পিও! জিও! ধার করে ঘি খেতে আমার আপত্তি নেই।"

বিকেলটা ভালই কাটল। মনোরমার মুখে সকালের ঝাঁজ নেই। হয়তো মঘাই পানের গুণ। কিংবা এমনও হতে পারে বাইরে এসে মনের রাগ মনে পুষে রাখতে পারছে না মনোরমা। অথবা বয়স হলে শরীরের আর সব গ্রন্থির মতন রাগের গ্রন্থিও শিথিল হয়ে আসে, বেশীক্ষণ ধরে রাখা যায় না।

ফেরবার পথে পিসনেরিয়ার গোলাপজামুন। মুখে দিলে শিমুল ফলের মতন ফেটে যায়। একমুখ রস আর সুগন্ধ মেজাজ ভরিয়ে তোলে। মনোরমা আলতো আঙুলে খাবার মুখে তুলতে তুলতে বলল, "আমার ছুটকু থাকলে একাই পাঁচ টাকার খেয়ে ফেলত।"

"তোমার বড় ছেলে বুঝি কম যায়? সে খেতো না?"

"বাব্বা! সে থাকলে কাউকে খেতে দিত। কেড়েকুড়ে, এর চেয়ে ওর চেয়ে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে ছাড়ত।"

নিরাপদ জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। "আহা! ভাজা পানিতুয়া মেয়েটা খুব ভালবাসে। সেবার কালোজামের জন্যে কিরকম ছুটিয়েছিল।"

"তোমার জামাইয়ের কিন্তু নাক উঁচু। ভাজা মিষ্টি খায় না। সন্দেশের কোণ ভেঙে খাবে। বেচারী! পেট পেট করেই গেল!"

নিরাপদ লোভ সামলাতে পারল না। বলল, "বুঝলে না, পসেটিভ নেগেটিভ দুজনে দুরকম না হলে কি আর সংসার জমে।"

"রক্ষে কর। সে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝছি।" মনোরমা হেসে উঠল, "পাগল ছাড়া কেউ এ কথা বলে!"

ফিরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। ছোট কেরোসিন স্টোভে চা হল। ধরণীবাবু ডেকে গেলেন। বলে গেলেন, "একটু জিরিয়ে নিন মশাই। তারপর আমার ঘরে তাস পড়ছে। দু-চার হাত হয়ে যাক।"

নিরাপদ তাস জানে না। মনোরমা জানে। মনোরমা বলল, "টোয়েন্টিনাইন খেললে খেলতে পারি। আমি কিন্তু ব্রীজ জানি না।"

"আমাদেরও টোয়েন্টিনাইন চলে। আমার গিন্নীই আমার পার্টনার।"

মনোরমা চোখের কোণ দিয়ে নিরাপদকে দেখল। যেন বলল, "দেখ। দেখে শেখ।" নিরাপদ বলল, "আমাকে মাফ করতে হবে। আমি তাসের ত জানিনে। ও যাবে। আপনি আর একজন খেলুড়ি দেখুন।"

"না। আমি একটু বের হব। গঙ্গার ঘাটে যাব। বাইরে চাঁদ উঠেছে।"

ধরণীবাবু হেসে উঠলেন। মনোরমাও হাসল। "বলিহারি যাই। প্রাণে এখনও এত শখ আছে?"

নিরাপদ হাসি ফিরিয়ে দিল। "না, ছিল না। হয়েছে। ধরণীবাবুর কাছ থেকে শিখলাম। চাঁদের আলো ধার করতে হয় না, চুরিও করতে হয় না।"

কথাটার মধ্যে গোপন খোঁচা আছে। কিছু আক্রোশ। ধরণীবাবু ঠিক কান করলেন কিনা বোঝা গেল না। মনোরমা করল। চোখের পাতা কুঁচকে এল মনোরমার।

ধরণীবাবু যেতে গিয়ে বললেন, "বউদি, আপনি রেডি হয়ে নিন। মশাইকে তাঁর সুখের-চাঁদ থেকে বঞ্চিত করতে চাইনে। আমরা বরং খেলাধুলো করি। সেই আমাদের ভাল।"

ধরণীবাবু ফিরে গেলে মনোরমা রাগী চোখে তাকাল। "তুমি না,—তোমার জন্যে আমার মাথা কাটা যায়।"

নিরাপদ কিছু বলল না। উদাস চোখে তাকিয়ে থাকল।

দাঁতের পাটি খুলে রাখলে নিরাপদকে কেমন বোকা বোকা দেখায়। মনোরমা ঘরে ঢুকে বলল, "কি শুয়ে আছো যে! যাওনি?"

"না।"

"না আবার কেন? তখন অত শখ করে বললে চাঁদ দেখতে যাব। যাওয়া হয়ে গেল?"

নিরাপদ ঘাড় নাড়ল। "ইচ্ছে হল না।"

"তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ। কখন কি যে হয়, বোঝাই যায় না।"

"আমিই কি বুঝতে পারি, যে তোমায় বুঝিয়ে বলব।"

"আমি বুঝতে চাইনে। তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে নিয়ে তুমি থাকো। এই নাক কান মুলছি, আর ইহজন্মে যদি তোমার সঙ্গে আসি। খুব শিক্ষা হল এবার।"

"শিক্ষা কি তোমার একার হল, আমার হয়নি?"

"এ জন্মে তোমার আবার শিক্ষা হয়েছে!" মনোরমা গলার আওয়াজ চাপতে পারল না। "নাও, ওঠো। খেতে চল। ঢং করে আবার শুয়ে আছো কেন?"

"আমি খাব না। পেট ভার লাগছে।"

"এ ক'দিন তো খুব খাচ্ছিলে। জলে নাকি হজমের গুলি পোরা আছে। তা আজই আবার এত অরুচি? পেট ভার, না গোসা হয়েছে।"

"গোসা হলে শোনবার গোঁসাই আছে।"

"কথার পিঠে খুব কথা বলতে শিখেছ। শুধু সহজ হতে শেখনি। সেটা শিখলে আখেরে কাজ দিত।"

"আমার আবার আখের কি? মুর্দার কি ভবিষ্যৎ থাকে।"

"তা হলে তুমি খাবে না?"

"না।"

"আমিও খাব না।" মনোরমা শুয়ে পড়ল। "রাগ করে তুমি যদি পেট মারতে পার, আমিও পারি। একদিন না খেলে এমন কিছু শুকিয়ে যাব না।"

"কে তোমাকে শুকোতে বলেছে? তুমি যাও, খেয়ে এস।"

"তেমন বাপে আমার শিক্ষা দেয়নি।"

"হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কথা, আবার বাপ-মাকে ধরে টানাটানি কেন?"

"সাধ করে কি আর টানি, টানতে হয়।—তোমার এমন মেজাজ, তোমার বিয়ে করাই উচিত হয়নি।"

"এতদিনে বুঝলে। আগে বুঝলে কাজ দিত।"

"ভাগ্য! সবই ভাগ্য! তখন কে জানতো এমন সোনার জিনিস এত কালি হয়ে যাবে।"

"আমি কালি হয়েছি। তুমি হওনি?"

"না।—একেবারে না।"

"বুকে হাত দিয়ে বল। দেখি তোমার বুকের পাটা।"

"বুকে হাত দিতে বয়ে গেছে।—তোমাকে আমি ঘেন্না করি। ঘেন্না করি।"

মনোরমার কথাগুলো ভিজে আসছিল। কথার জোরের চেয়ে জলের শব্দ বেশী। নিরাপদ চুপ করে শুয়ে থাকল। তারপর ফাঁকা গলায় বলল, "আমিও। আমিও নিজেকে খুব ঘেন্না করি। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে হয় না।"

মনোরমা কিছুক্ষণ চুপচাপ নিঃশব্দে শুয়ে শুয়ে নিজেকে সামলে নিল। পরে বলল, "নিজেকে ঘেন্না করবার মতন কিছু হয়নি। তুমি সব তাতেই বাড়াবাড়ি করে ফেল।"

নিরাপদ উদাস চোখে ঘাড় নাড়ল। "না। আমি বুঝি, ঠিক বুঝি। আমরা পরস্পরকে ভালবাসতে ভুলে যাচ্ছি। আমরা অবস্থার দাস হয়ে উঠছি। চরম অবস্থার।"

মনোরমা সামান্য সরে এল। সরে এসে বলল, "এই! কি হল কি! ভূতে পেল। —অমন করে কথা বলছ কেন?"

"বলবার কথা যেখানে ফুরিয়ে যায়, সেখানে এ ছাড়া কি বলব। আমরা কেউ কাউকে ভালবাসি না।"

"আর বলতে হবে না।" মনোরমা হাত ধরে টানল। "ওঠো। ওঠো দেখি। পেটে খিদে থাকলে, মানুষ এমন আবোলতাবোল বকে।"

নিরাপদ গা ছেড়ে দিল। মনোরমা ঝুঁকে পড়ল। কানের কাছে মুখ আনল। "আমার বুড়োটা কখন কোন কথা বলতে হয় জানে না। একেবারে পাগল।"

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৮ ॥

রানী রাসমণির জেদ শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন মহা সমারোহে।

সমারোহ মানে কী, তেমনটি আর কেউ কখনো দেখে নি। বাংলায় ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার তো কম নেই, কিন্তু আর কেউ এত বৃহৎ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাও করেন নি, এ রকম বিপুল উৎসবের আয়োজনও কেউ করতে পারেন নি। শুধু অর্থ থাকলেই হয় না সেই অর্থ ব্যয় করার মতন অন্তঃকরণও থাকা দরকার।

রানী রাসমণি দাপটের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর এই মন্দির সমষ্টি প্রতিষ্ঠিত করলেন এমন একটি সময়ে, যখন হিন্দুধর্ম নানা দিক থেকে বহু রকম আক্রমণে পর্যুদস্ত। অনেক হিন্দু শাস্ত্র এবং সংস্কৃত গ্রন্থ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল প্রায়, ইংরেজ পণ্ডিতগণই তা উদ্ধার করেন। আবার এক শ্রেণীর ইংরেজ সেই সব শাস্ত্র ঘেঁটেই প্রমাণ করতে চান যে, হিন্দু ধর্মের মধ্যে কত রকম বর্বর প্রথা ও বিশ্বাস রয়েছে। খৃষ্টান মিশনারিরা হিন্দু ধর্মের অকাট্য সব দোষ তুলে ধরেছেন ভারতবাসীর সামনে এবং সেই সুবাদে তাদের আকৃষ্ট করছেন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে। অন্যদিকে ব্রাহ্মরাও হিন্দু ধর্মের নানান ত্রুটির কথা প্রচার করছেন, দেব-দেবীরা তাঁদের চক্ষে পুতুল মাত্র, এবং এই পুতুল পূজা তাঁদের কাছে দু-চক্ষের বিষ। শুধু কি তাই, সম্প্রতি তাঁরা এমনও ঘোষণা করেছেন যে, বেদ অপৌরুষের নয় এবং বেদ বাক্য মাত্রই অভ্রান্ত নয়। হিন্দু ধর্মের পরম পবিত্র গ্রন্থের প্রতি এই আঘাত হেনে ব্রাহ্মরা আরও দূরে সরে গেলেন

শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার এবং অনৈতিক প্রথাগুলি সম্পর্কে ঘৃণা বোধ করেন। এই কি সেই মহান ধর্ম যা স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার বিধান দেয়। এই ধর্মে পুরুষের বিবাহ প্রশস্ত কিন্তু নারী যদি ছ-সাত বছরেও বিধবা হয়, তাহলেও তাকে সারা জীবন বঞ্চিত, অসহ দিনাতিপাত করতে হবে। এই সেই ধর্ম যেখানে একজন মানুষ বিদ্যায় বুদ্ধিতে অন্যের চেয়ে উচ্চ হলেও শুধু সে জন্ম কারণে শূদ্র বলেই ব্রাহ্মণ ইত্যাদি জাতির ধর্মের মানুষ মুসলমান চাষীর শ্রমে ফলানো ধান অম্লান বদনে আহার করবে কিন্তু মুসলমানের হাতে ছোঁয়া জল পান করবে না।

অনেক মুক্তমনা হিন্দু, যাঁদের মনের মধ্যে ধর্মের জন্য আকুতি আছে, কিন্তু বিজাতীয় খৃষ্ট ধর্মও গ্রহণ করতে চান না, ব্রাহ্মদের সম্পর্কেও পুরোপুরি আস্থা নেই, তাঁরাও নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন এই ধর্মের নানা দোষের কারণে।

এই রকম সময়ই কালীপদ অভিলাষী রাসমণি দাসী পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মেই নতুন প্রাণ সঞ্চারের জন্য দক্ষিণেশ্বরে শুরু করলেন এই মহাযজ্ঞ। জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিযোগে জগন্নাথের স্নান যাত্রার দিনটি শুভযোগ, সেইদিন হলো প্রতিষ্ঠা-উৎসব। বরাহনগর থেকে নাটমন্দির পর্যন্ত পথের দু-পাশে টানানো হলো ঝাড় লণ্ঠন। মধ্যে মধ্যে এক একটি বাঁধা মঞ্চে বাজনদাররা বাজনা বাজাচ্ছে। সামনের তোরণটি যেন আকাশচুম্বী এবং বহু বর্ণ সব কুসুমে সজ্জিত।

শুধু নিমন্ত্রিতের সংখ্যাই প্রায় এক লক্ষ, এছাড়া অনাহূত, রবাহূত যে কত, তার ইয়ত্তা নেই। রাণী রাসমণির নির্দেশ যে কেউই অভুক্ত অবস্থায় এবং দান না নিয়ে ফিরে যাবে না। বারাণসী, পুরী, পুণা, মান্দ্রাজ থেকেও তিনি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আনিয়েছেন, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কোটালিপাড়ার কোনো ব্রাহ্মণই বাকি নেই। দেশের সম্ভ্রান্ত নাগরিকদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সকলকে। গঙ্গায় বুকে পিনিস, বজরা বোট, ভাউলিয়া প্রভৃতি জলযান গিস গিস করছে, আবার রাজপথে গাড়িও অসংখ্য।

মন্দির প্রাঙ্গণের এক পাশে অনেকগুলি হৃষ্টপুষ্ট গোরু বাঁধা, এক পাশে স্তূপাকার পট্ট বস্ত্র। এছাড়াও কয়েকটি পাহাড় সাজিয়েছেন, রৌপ্য মুদ্রার পাহাড়, সন্দেশের পাহাড়, পাকা কলার পাহাড়, অন্নের পাহাড়। কলকাতার বাজার তো বটেই, পানিহাটি, বৈদ্যবাটি, ত্রিবেণী ইত্যাদি সন্নিহিত সব এলাকার বাজার সাফ করে আনা হয়েছে সন্দেশ, সব মিলিয়ে ৫০০ মণ। আর অন্নের পাহাড়টি তো অন্নমেরু পর্বত। রানী রাসমণি সম্মান অনুসারে ব্রাহ্মণদের গোধন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং বস্ত্র দান করবেন। এবং অন্ন ও মিষ্ট দ্রব্য ইত্যাদি উৎসর্গ করবেন দেবতাকে।

উৎসবের কয়েকদিন আগে একটি বাধা দেখা দিয়েছিল। মাহিষ্য সম্প্রদায়কে গোঁড়া ব্রাহ্মণের দল শূদ্র বলে মনে করে, সেই শূদ্র প্রতিষ্ঠিত মন্দিরকে ব্রাহ্মণরা অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করেছিল। তারপর ঝামাপুকুর টোলের রামকুমার পণ্ডিতের বিধান মতন দেবালয়টি রানী রাসমণি তাঁর গুরুদেবের নামে আগে উৎসর্গ করায় সে সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ঐ মন্দিরের প্রতিদিনের পূজারী হবেন কে? কোনো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই শূদ্রের বেতনভুক্ পূজারী হতে সম্মত হলেন না, সামাজিক অপবাদের ভয়ে। শেষ পর্যন্ত রানী রাসমণির নির্দেশে তাঁর জামাতা মথুর ঐ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন মন্দিরের পূজার ভার গ্রহণ করার জন্য।

সব ব্রাহ্মণই পূজারী নয়। বঙ্গে ভট্টাচার্যরাই বংশানুক্রমিক পূজারী। চট্টোপাধ্যায় বংশীয় রামকুমার রানীর প্রস্তাবে কিছু দ্বিধা করেছিলেন প্রথমে। জীবিকার জন্য তিনি কামারপুকুর থেকে এসে কলকাতার ঝামাপুকুরে টোল খুলেছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর রামকুমারের ওপরেই সংসারের ভার বর্তেছে। অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি বেতনভুক পূজারী হবেন? এদিকে রানী রাসমণি মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন পর্যন্ত ঘোষণা করে ফেলেছেন, পুরোহিতের অভাবে যে সব পণ্ড হয়ে যায়। রামকুমার শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন।

নিয়তি নির্বন্ধে রামকুমারই হলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনের হোতা। সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই গদাধর, তাঁর বয়েস এখন উনিশ। গদাধর বড় লাজুক প্রকৃতির। গ্রাম থেকে এসে এখনো সে এখানকার

বারাণসীর পট্টবস্ত্র পরে রামকুমার পুজোয় নিরত, এক পাশে হাত জোড় করে চক্ষু মুদে বসে আছেন রানী রাসমণি, তাঁর মুখখানি ভক্তি ও তৃপ্তির ভাবে বিভোর। অন্যদিকে বসে আছে যুবক গদাধর, মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাবার ভয়ে সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাশ ছাড়েনি একবারও। তার দুই চোখ বিস্ময়াবিষ্ট, এত মানুষ, এত দ্রব্য, আর নবরত্নের মন্দিরটি যেন একটি পর্বত। গদাধরের এক ভাগিনের হৃদয়ও এসেছে সঙ্গে। সে বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও গদাধরের চেয়ে অনেক চটপটে, সে ঘোরাঘুরি করছে চতুর্দিকে।

জানবাজারের মাড় পরিবারের সঙ্গে জোড়া-সাঁকোর সিংহ পরিবারের সম্পর্ক অনেক দিনের। তাই রাসমণি সিংহ পরিবারকে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে যোগদান করার জন্য। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে নবীনকুমারকেই। তবে সে একা আসেনি, জননী বিম্ববতীকেও সঙ্গে এনেছে।

বিম্ববতী গৃহ থেকে নির্গত হতেই চান না। পূর্ণিমা অমাবস্যায় শুধু একবার করে স্নান গঙ্গা স্নানে। তাও ঘেরাটোপ পাল্কিতে, এবং সেই পাল্কি সমেতই তাঁকে জলে ডুবিয়ে আনা হয়। নবীনকুমার অনেকবার বলেছে তাঁকে কোনো তীর্থ দর্শন করে আসতে। কিন্তু বিম্ববতী তাতে সম্মত নন, পুত্রমুখ দর্শন না করে তিনি একদিনও থাকতে পারবেন না।

নবীনকুমার বলে, মা, আমি যখন মহাল পরিদর্শন করতে যাবো, তখন তুমি কী করবে? তুমিও কি আমার সঙ্গে সঙ্গে বজরায় ঘুরবে?

বিম্ববতী উত্তর দেন, তোর বাবা মহাল দেকতে গিয়ে কাজ নেই। সেজন্যে অনেক লোক আচে!

নবীনকুমার বলে, আমার ঠিক বয়েসটা হোক না, তখন দেকো চর্কির মতন ঘুরবো। বিষয় সম্পত্তি নিজে না দেকলে চলে?

মহাল পরিদর্শনে গিয়েই গঙ্গানারায়ণ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে, সে কথা ভেবে বিম্ববতীর এখনো বুক কাঁপে। তিনি ঐ সব কথা শুনে নবীন-কুমারের হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বলেন, না, না, তুই কক্ষুনো মহালে যাবি নে! বিষয় যা আচে, ঢের আচে, দূর থেকে চালালেই যথেষ্ট চলবে।

নবীনকুমার মায়ের কথা শুনে হাসে।

নিমতলা ঘাট থেকে বজরায় চেপে অনুকূল জোয়ারে এক ঘণ্টার মধ্যেই নবীনকুমারেরা পৌঁছে গেল দক্ষিণেশ্বরে। সদ্য দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে, উৎসব তখন তুঙ্গে। জননীকে নিজের হাতে ধরে নবীনকুমার তীরে নামালো। বিম্ববতীর মুখ ঘোমটায় ঢাকা, কোনো দিন তিনি সূর্যালোকে অচেনা মানুষের সামনে বেরোন নি, এই মধ্যবয়েসেও তিনি নববধূর মতন ব্রীড়াকুণ্ঠিতা।

লোকের ভিড়ে পথ চলা দায়। দুলাল এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী মিলে সামনে থেকে পথ সাফ করে দিতে লাগলো। নবীনকুমার তার মাকে ধরে ধরে নিয়ে এলো পুজামণ্ডপে।

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ঘেরা জায়গায় বসবার স্থান নির্দিষ্ট আছে। একদিকে পুরুষ, অন্য-দিকে রমণী। নবীনকুমার বিম্ববতীকে একটি গালিচা-মোড়া কেদারায় বসিয়ে দিল। সে নিজে বসলো না, এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসে থাকার মানুষ সে নয়। সে পরে আছে কোঁচানো ধুতি এবং লম্বাহাতার জামা, এবং পরিবার-প্রধানের চিহ্ন হিসেবে সে হাতে নিয়েছে একটি ছড়ি। আর কোনো পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক যুবককে ছড়ি-লাঠি হাতে দেখা যাবে না।

নবীনকুমার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো সব ব্যাপার। রাজা-মহারাজা থেকে শুরু করে দেশের খুঁজতে লাগলো একজনকে। তিনি আসেন নি। তিনি নবীনকুমারের গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই উপস্থিত, তাঁরা রানী রাসমণির অর্থ বস্ত্র দান গ্রহণ করেছেন শুধু অনুপস্থিত তাঁদের অধ্যক্ষ।

নবীনকুমার ভাবলো, তিনি আসেন নি কেন? তিনি কোনো জায়গা থেকে দান গ্রহণ করেন না বলে? কিংবা ঈশ্বরচন্দ্রকে বোধ হয় অনেকে আজকাল ব্রাহ্মণ বলেই মনে করে না। তিনি নাকি সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না কোনো ঠাকুর-দেবতার পুজো করতেও কেউ কখনো দেখেনি তাঁকে। এ কী ধরনের ব্রাহ্মণ? তা ছাড়া তিনি এখন বিধবা বিবাহের ব্যাপারে মহা ব্যস্ত।

এত বড় নবরত্ন মন্দির, নাটমহল ও সার সার শিবমন্দির এবং এত জাঁকজমক দেখে নবীনকুমার প্রথমটায় বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আসেননি দেখে নবীনকুমারেরও খানিকটা স্ফূর্তি কমে গেল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও দেখতে পেল না নবীন-কুমার। ব্রাহ্মরা সদলবলে এই অনুষ্ঠান বর্জন করেছে। ইয়ংবেঙ্গলের দলও যে আসবে না, তা যেন জানাই ছিল, তবু তাদের দু-একজনকে সেখানে দেখে নবীনকুমার চমৎকৃত হলো। সাহেবীভাবাপন্ন ইয়ং-বেঙ্গল দলেরও কয়েকজনের মধ্যে ভক্তিভাব দেখা দিচ্ছে তা হলে!

সন্ধ্যা হতে না হতেই জ্বলে উঠলো রোশনাই। উৎসব এখনো অনেক রাত পর্যন্ত চলবে। নবীন-কুমারের আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে ছিল। গঙ্গা-তীরের এই স্থানটি বড় মনোরম। লোকের ভিড় থেকে সরে গিয়ে যেখানে গাছপালার ঝোপজঙ্গল, সেখানে বসে থাকতে বেশ ভালো লাগছিল তার। কিন্তু বিম্ববতী উতলা হয়ে পড়েছেন, তিনি বারবার দাসী মারফৎ খবর পাঠাচ্ছেন, নবীনকুমারের কাছে।

বিম্ববতীর হাত ধরে নবীনকুমার নিয়ে এলো ঘাটের কাছে। বজরায় উঠতে গিয়ে হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়লো। এতগুলি মন্দিরের কোনো বিগ্রহকেই সে প্রণাম জানায় নি। একবার তার ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে প্রণাম করে আসে। তারপর আবার ভাবলো, থাক। দূর থেকে প্রণাম জানালেও তো হয়।

সে তখনও তার জননীর হাত ধরে থমকে আছে। বিম্ববতী জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো?

নবীনকুমার বললো, কিছু না।

তারপর সে বজরায় উঠে পড়লো। এবং দূর থেকেও প্রণাম জানালো না।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রানী রাসমণির দাক্ষিণ্য, মহানুভবতা এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে ধন্য ধন্য করা হলো দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে। শুধু ব্রাহ্মরা নীরব রইলো। পৌত্তলিকতা নিয়ে নতুন ভাবে এই আড়ম্বর তারা সুনজরে দেখলো না।

ব্রাহ্মদের নিজেদের মধ্যেও খানিকটা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এই ধর্ম প্রতিষ্ঠার পর দ্বাদশ বৎসরের একটি যুগ পার হয়েছে। এবার দেখা দিয়েছে একটি সংকট। দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নিষ্কলুষ ধর্ম সাধনা এবং পরম ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে। এবং পৌত্তলিকতা ও নানারকম কুসংস্কার বর্জন করে হিন্দু ধর্মেরই একটি পরিশুদ্ধ রূপ দিতে। কিন্তু ইদানীং তাঁর সন্দেহ হচ্ছে যে কতকগুলান নাস্তিক তাঁর এই সভার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকদের অশ্রদ্ধা করেন, খৃষ্টানদের অপছন্দ করেন এবং নাস্তিকদের মনে করেন অমানুষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করেন

তন্ত্রের বদলে শুষ্ক জ্ঞান চর্চারই বেশী পরিচয় দেখা যাচ্ছে। সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের ঝোঁক যেন ঐ দিকেই। আর একজন রচনা-পরীক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তিনি তো কোনো ধর্ম-আলোচনার মধ্যেই থাকেন না। অক্ষয়কুমার আবার একটা রচনা লিখেছেন, "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার"। রচনাটি দেখে বিরক্ত হয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি খুঁজছেন ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, আর এরা মাথা ঘামাচ্ছে বাহ্য বস্তু নিয়ে? এরা কি মানুষের মনের মধ্যে ঢুকতে জানে না? ঐ অক্ষয়-কুমারের শুধু বিচারের দিকে ঝোঁক। ওঁরই প্ররোচনায় দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বেদের সব কিছুই অভ্রান্ত নয়।

অক্ষয়কুমার আরও একটি কাণ্ড করে দেবেন্দ্র-নাথকে আরও চটিয়ে দিলেন। রামমোহনের অনুসরণে অক্ষয়কুমারও একটি আত্মীয় সভা স্থাপন করেছেন। ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আসেন, সেই সুযোগ নিয়ে অক্ষয়কুমার তাঁদের মধ্যে নিজের মতাদর্শ প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে চান। ঐ আত্মীয় সভায় অক্ষয়কুমার একদিন বললেন, আচ্ছা, ঈশ্বর যে অনন্ত তার কী প্রমাণ আছে? আপনারা সকলেই বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ? আচ্ছা, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কি-না তার বিচার করা যাক। কে কে বিশ্বাস করেন ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, হাত তুলুন তো?

এ সংবাদ শুনে দেবেন্দ্রনাথের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। হাত-তোলা ভোটাভুটিতে ঈশ্বরের স্বরূপ বিচার? এতদূর স্পর্ধা? তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একেবারে বন্ধ করে দেবার অভিপ্রায় জানালেন, শুধু তাই নয়, গোটা ব্রাহ্মসমাজের ওপরেই অভিমান করে ভাবলেন এর সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক ছেদ করবেন। এমনকি সংসারও পরিত্যাগ করে চিরকালের জন্য চলে যাবেন হিমালয়ে। সেখানে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করবেন। এবং সত্যিই সেরকম উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন।

নবীনকুমার ষোড়শ বর্ষে পা দিয়ে দু-একদিন ব্রাহ্মসভার অধিবেশনে যোগ দিতে এলো। তার গৃহে বিদ্যোৎসাহী সভা এখন জমজমাট। প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন সদস্য আসছে এবং নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু নবীনকুমারের জ্ঞানস্পৃহা তাতেও মেটে না। শহরের যেখানে যেখানেই বিশজ্জন সমাগম হয়, সেখানেই সে যেতে চায়।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নবীনকুমার নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারলো না। প্রথম বাধা বয়সের। ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্যেরই বয়েস নবীনকুমারের দ্বিগুণেরও বেশী। সে প্রায় বালক বয়েসী বলে সভা-চলাকালীন অবস্থায়ও সকলে তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চায়। তাছাড়া, ব্রাহ্মদের মুখের ভাষা অতি সুগম্ভীর, এক একজন বক্তৃতা শুরু করে আর থামতেই চান না। পরম ব্রহ্মের প্রসঙ্গে অনেকের চক্ষু থেকে অশ্রু গড়ায়। স্বভাব-চঞ্চল নবীনকুমার এ-রকম সভায় আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে থাকবে!

তাছাড়া, একজন দলত্যাগী ব্রাহ্মও খানিকটা প্রভাবিত করলো তাকে। লোকটির নাম যদুপতি গাঙ্গুলী। নবীনকুমারের চেয়ে সে বয়সে কিছু বড়, সে রীতিমতন দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্ম হয়েছিল, তারপর আবার ব্রাহ্মদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে এক পাদ্রীর কাছে গিয়ে ইউনিটারিয়ান মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছে। সে মাঝে মাঝে বিদ্যোৎসাহী সমিতিতেও আসে। নবীন-কুমারের সঙ্গে তার বেশ সৌহার্দ্য হয়েছে।

সেই যদুপতি গাঙ্গুলী একদিন বললো, ভাই নবীন, তুমি আজকাল ব্রাহ্মদের সভায় যাতায়াত কবচো, শুনচি।

নবীনকুমার বললো, ওঁদের ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কোচ্চি।

যদুপতি বললো, আমার ভাই বড়ই আশা ভঙ্গ হয়েচে। বড় আশা নিয়ে আমি ওঁদের কাচে গেসলুম। কিন্তু দেকলুম, ওঁদের কতায় আর কাজে মেলে না।

—কী রকম।

ব্রাহ্মরা বলেন, ওরা পুতুল পুজোয় বিশ্বাস করেন না। অথচ দ্যাখো, সব ব্রাহ্মদের বাড়িতেই এখনো পাথরের নুড়ি কিংবা মাটি কিংবা কাঠের ঠাকুর দেবতা রয়েচে। ও'রা নিজেরা হয়তো পুজো করেন না, কিন্তু তাঁরা নিজের বাড়িতেই এখনো ঐসব পুজো বন্ধ করাতে পারেননি, তাহলে সারা দেশে বন্ধ হবে কী করে। এমন কি, ঐসব পুজোর খরচাও ও'রা দিচ্চেন। দেবেন্দ্রবাবুর বাড়িতে যে দোল-দুর্গোৎসব হয়, তার খরচা তো ওঁর এস্টেট থেকেই জোগাতে হয়।

নবীনকুমার চুপ করে রইলো।

—তারপর দ্যাকো, ব্রাহ্মদের মধ্যে তো জাতি ভেদ নেই। সবাই এক ঈশ্বরের পুজারী। এঁদের মধ্যে আবার ভেদাভেদ কী? কিন্তু বলো, বামুন-কায়েতরা ব্রাহ্ম হতে পারে কিন্তু কোনো শূদ্রও কি ব্রাহ্ম হয়? কোনো বামুন ব্রাহ্মের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কোনো কায়েত-ব্রাহ্মের ছেলেমেয়ের বিবাহ হয়েছে এ পর্যন্ত? আমি কিন্তু দিকিনি।

নবীনকুমার তর্কে যেতে চায় না। সে ফস করে বললো, যাই বলো, দুর্গাপুজো কিংবা দোল বা রথ-যাত্রার উৎসব আমার বেশ ভালো লাগে।

—তাহলে তুমি ব্রাহ্মদের কাচে যাও কেন?

—দুটো জ্ঞানের কতা শুনতে।

নবীনকুমার একদিন শুনতে পেল শহরের আর একটি বাড়িতে যুবকরা বিদ্যাচর্চার জন্য মিলিত হয়। প্রখ্যাত দেওয়ান রামকমল সেনের পৌত্র কেশবকে ঘিরে বসে এই আসর।

হিন্দু কলেজে পড়বার সময় কেশবকে কয়েকবার দেখেছে নবীনকুমার। তার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। গম্ভীর, স্বল্পভাষী যুবক, সহজে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। এমন কি কেউ কোনো প্রশ্ন করলেও উত্তর দেয় না সহজে। নবীনকুমারের খুব একটা পছন্দ হয়নি কেশবকে। এত কিসের অহংকার।

কিছুদিন আগে কেশব সম্পর্কে একটা গুজব শুনে নবীনকুমার একটু খুশীই হয়েছিল মনে মনে। কেশব নাকি কলেজের পরীক্ষায় টোকাটুকি করতে গিয়ে ধরা পড়ে ভর্ৎসিত হয়েছে। ও ছেলের আবার অহংকার, হুঁঃ।

যদুপতিই নবীনকুমারকে বোঝালো একদিন যে, না, কেশব ছেলেটিও মোটেই সাধারণ নয়। সে ভাবুক প্রকৃতির মানুষ, বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে একটা শুদ্ধতার প্রকাশ পেয়েছে। সে পড়াশুনোও করে অগাধ। বন্ধু ও পরিচিত মণ্ডলীতে সে যখন কোনো বিষয়ে কথা বলে তখন সকলে নিঃশব্দে চিত্রার্পিত হয়ে শোনে। সম্প্রতি কেশব তার বন্ধুদের নিয়ে একটি থিয়েটার করারও ব্যাপার নিয়ে মেতেছে।

নবীনকুমার একদিন যদুপতির সঙ্গে গেল কলুটোলায় কেশবদের বাড়ির আসরে। এখানকার যুবকরা সকলেই প্রায় তার কাছাকাছি বয়েসী, এদের সঙ্গে সখ্য স্থাপনে তার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।

তবু এখানেও কারুর সঙ্গে মনের মিল হলো নবীনকুমারের।

কেশব বক্তৃতা দেয় ইংরেজি ভাষায়, এমন কি বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলে ইংরেজিতে। যে নাটকের তারা মহলা দিচ্ছে, তার নাম হ্যামলেট।

ইংরেজ গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠ নিয়ে নবীন-কুমারও ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। কিন্তু এমন নির্লজ্জ পরানুকরণ তার পছন্দ হয় না। বাঙালীরা অধ্যাত্ম-বিষয়ক আলোচনাও করছে ইংরেজিতে, হায়।

নবীনকুমার সেখানেও যাওয়া বন্ধ করে দিল।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞান

পরমাণু বোমা ধ্বংস করুন

'আই অ্যাম এগেইনস্ট দ্য অ্যাটম বোম্ব। আই অ্যাম এগেইনস্ট দ্য পিসফুল ইউসেজ অভ নিউক্লিয়ার একসপ্রেসন ইদার। ইউ ক্যান কল দ্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার এ সিভিলিয়ান পাওয়ার, হুইচ ইজ টেরিবল। অ্যান্ড ফর দ্যাট ইউ জার্নালিস্টস আর কোয়ায়েট এ বিট রেসপনসিবল টু—!'

কথাগুলি বলতে গিয়ে ক্ষোভ এবং হতাশায় মুহূর্তে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। তারপর আমাকে কিছুটা বিব্রত দেখে মৃদু হেসে বললেন, 'একসকিউজ মি। নট অল জার্নালিস্টস, আই মিন—সাম অভ্ দেম।'

তিনি অধ্যাপক জর্জ ওয়ালড। ১৯৩০-এর দশকে শারীরবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্যে যিনি নোবেল পুরস্কারে বৃত হন। তবে এখন আর শুধু শারীরবিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্র নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন তিনি। এবং শুধু নিজের মাথা ঘামিয়েই ক্ষান্ত নন, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ—যাঁদের নিয়ে জনসাধারণ—এই মাথা ঘামানোর ব্যাপারে তাঁরাও যাতে তৎপর হয়ে ওঠেন, সে ব্যাপারেও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

অধ্যাপক ওয়ালড নিজের কর্মস্থল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ভারত দর্শনে এসেছিলেন। ওই সময় একমাত্র 'দেশ' পত্রিকার জন্যে আয়োজিত এক সাক্ষাৎকারে পারমাণবিক শক্তি এবং পরমাণু বোমা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার যে সংলাপ হয়, এখানে তা উদ্ধৃত করলাম।

প্রশ্ন : অধ্যাপক ওয়ালড, আমি জানি, গত কয়েক বছর ধরে আপনি সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন এবং যেখানেই যাচ্ছেন প্রচার করছেন, পরমাণু বোমা ধ্বংস করুন, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন বন্ধ করুন। পরমাণু বোমার ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু তাই বলে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন বন্ধ হোক এ কথা বলার তাৎপর্য কী?

উত্তর : শুনুন, আমি সব সময়ে পারমাণবিক শক্তির বিরোধী। পারমাণবিক শক্তিকে আমি দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকি। এক, সামরিক পারমাণবিক শক্তি (মিলিটারি এন-পাওয়ার); যাকে এক কথায় আমি বলবো পরমাণু বোমা। দুই, বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি (সিভিলিয়াম এন-পাওয়ার)। যার লক্ষ্য পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা। আমি মনে করি, এই বেসামরিক পারমাণবিক শক্তিও যে কোন দেশের পক্ষেই একটা সাংঘাতিক ধরনের অর্থনৈতিক সর্বনাশ তো বটেই, সেই সঙ্গে জীবন নিয়ে খেলা।

প্রশ্ন : অর্থনৈতিক সর্বনাশ বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

উত্তর : ব্যাপারটা জলের মত সহজ। একটি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের জন্যে যে কি প্রচণ্ড পরিমাণ খরচ তার হিসেব সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয়। কারণ খরচের বেশ মোটা একটি অংশ জনসাধারণের কাছ থেকে সব সময় গোপন করা হয়ে থাকে। যেমন ধরুন, কোথাও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বসানোর কথা উঠলেই উদ্যোক্তারা কেবল দুটি বিষয়ের উপরই আলোকপাত করেন বেশী। শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি তৈরির খরচ এবং কেন্দ্রটি চালু রাখার জন্যে দৈনন্দিন যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয় শুধু তার কথাই বলে থাকেন তাঁরা। বলা বাহুল্য, ১৯৭৩ সালের পর শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই এই খরচের পরিমাণ বেড়েছে তিন থেকে আট গুণ। উদ্যোক্তারা এই ... করেন এবং আপনারা

এর আড়ালেও খরচের যে ধাক্কাটা থেকে যায় তার কথা জানতে পারেন কজন? তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দরুন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এ পর্যন্ত কতটা দাঁড়িয়েছে এবং এইভাবে চললে ভবিষ্যতেই বা কত দাঁড়াবে তার হিসেব দিচ্ছে কে? যেমন ধরুন, পারমাণবিক চুল্লির পরিত্যক্ত পারমাণবিক আবর্জনা (নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট)। গত দুই দশকে পারমাণবিক উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে পারমাণবিক আবর্জনারও পরিমাণ। মুশকিল এই, এই আবর্জনা তো আর জ্বালানি কয়লার ছাই নয় যে এক জায়গায় জমিয়ে রাখলেই হলো? পারমাণবিক আবর্জনা থেকে নির্গত হয় বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। এই বিকিরণ

শুধু মানুষই নয় সমস্ত রকম প্রাণী এবং উদ্ভিদেরও ক্ষতি করে। চুল্লি থেকে পারমাণবিক আবর্জনা নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কিছু কিছু ব্যবস্থা যে করা হয়নি, সে কথা বলবো না, কীভাবে এই আবর্জনা সংরক্ষিত করলে বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তারও কিছু কিছু উপায় বের হয়েছে, এ কথাও ঠিক। তবু বলবো, এ সব করতে গিয়েও খরচ হচ্ছে প্রচুর। এই খরচের হিসেব কোন দেশেই জনসাধারণের কাছে খোলাখুলি তুলে ধরা হয় না এবং আবর্জনা সংরক্ষণের ব্যাপারটা কতটা নির্ভরযোগ্য সে ব্যাপারেও আজও পর্যন্ত কেউ নিঃসংশয় হতে পারেননি। অতএব আর এক প্রস্থ খরচের ধাক্কা। ধরুন, আবর্জনা নিয়ে গিয়ে জমিয়ে রাখলেন পরিত্যক্ত কোন লবণের খনির ভেতর (প্রধানত এইভাবেই পারমাণবিক আবর্জনা থেকে মুক্তি পাওয়ার আমরা চেষ্টা করছি)। কিন্তু সেখান থেকে বাতাস অথবা ভূগর্ভস্থ জলাধারের সঙ্গে তা অন্য কোথাও ছড়িয়ে পড়ছে কী না সে দিকে নজর রাখার জন্যে রাখতে হচ্ছে নিয়মিত পুলিসী ব্যবস্থা। তার জন্যে দরকার নানা রকম দামী যন্ত্র এবং কুশলী। এদের জন্যেও খরচের অঙ্কটা বড় কম দাঁড়ায় না।

প্রশ্ন : অধ্যাপক ওয়ালড, কেউ কেউ তো পারমাণবিক চুল্লির পরিত্যক্ত আবর্জনাকে রি-প্রোসেসের কথা ভাবছেন। এ নিয়ে মার্কিন দেশে কিছু কাজও হয়েছে শুনেছি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এইভাবে ওই আবর্জনা থেকে তেজস্ক্রিয় বস্তুগুলি পৃথক করা যেতে পারে এবং তাদের শক্তি উৎপাদন বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করাও সম্ভব।

উত্তর : আপনার প্রশ্নের প্রথম উত্তর পারমাণবিক জ্বালানির যে অবশেষ চুল্লি থেকে আমরা পেয়ে থাকি তাকে রিপ্রোসেস করার কাজটি খুবই কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। দ্বিতীয় উত্তর, মার্কিন দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে মোট উনসত্তরটি। সেই সব কেন্দ্রের পারমাণবিক আবর্জনা শোধন বা রিপ্রোসেসিং করার মত কোন বেসরকারী শিল্প-উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। তার একমাত্র কারণ, এ কাজে এত বেশী খরচ এবং ঝুঁকি যে, বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান তেমন কাজে হাত দিতে সাহস করছেন না। একমাত্র সরকারী উদ্যোগে নিউইয়র্কের ওয়েস্ট ভ্যালিতে একটি রিপ্রোসেসিং প্ল্যান্ট চালু করা হয়। দ্যাট ইট হ্যাজ প্রুভড এ ফেইলইওর।'

'হ্যাঁ, আরও বলছি, শুনুন।' বললেন অধ্যাপক ওয়ালড। 'আমি ওই যে পুলিসী ব্যবস্থার কথা বললাম, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে প্রতি পদেই তো সে কথা ভাবতে হয়। যে রাস্তা দিয়ে পারমাণবিক জ্বালানি পরিবহন করা হবে, চোখ রাখুন তার ওপর। প্ল্যান্ট চালু অবস্থায় এতটুকু তেজস্ক্রিয়তা যাতে না মানুষের ক্ষতি করে, সেদিকে দৃষ্টি দিন। এর জন্যে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হচ্ছে কোটি কোটি ডলার। আবার দেখুন, এক একটি প্ল্যান্ট বড়জোর শক্তি উৎপাদন করবে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর। তারপর সেটাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না। অথচ ওই প্ল্যান্ট শেষ পর্যন্ত থেকে যায় মরণফাঁদের মত। এতো আর জল অথবা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নয় যে, প্ল্যান্ট বিকল হলো কিংবা অকেজো হয়ে গেল আর অমনি সেটাকে ফেলে রেখে চলে এলেন। যে কোন পারমাণবিক প্ল্যান্টের জীবনকাল শেষ হয়ে গেলেও তার পরিবেশ তেজস্ক্রিয় অবস্থায় থেকে যায়। প্ল্যান্টের বহু অংশও থাকে তেজস্ক্রিয় অবস্থায়। অতএব প্ল্যান্টটিকে তখন এমন কোন জায়গায় আবদ্ধ রাখা দরকার যেখান থেকে তার তেজস্ক্রিয়তা কারোর ক্ষতি না করতে পারে।'

উত্তর : প্ল্যান্টটির যাবতীয় অংশ কোন পাহাড়ের নিচে কবর দিন। ধরুন, উঁচু পর্বতের একটি শৃঙ্গ। সেই শৃঙ্গের ভেতর দিয়ে খাড়া গর্ত করুন কয়েকশ ফুট। তারপর প্ল্যান্টটিকে সেই গর্তের মধ্যে পুরে কংক্রিট দিয়ে গর্তটি বুজিয়ে দিন। আর শুধু

বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় কণা বেরিয়ে আসছে কী না সে দিকে নজর রাখার জন্যে চাই নিয়মিত পুলিসী ব্যবস্থা। এক একটি প্ল্যান্টের জন্যে এই ব্যবস্থা হয়ত একশ থেকে পাঁচশ বছর রাখতে হতে পারে। এবার ভাবুন, এত সব কান্ডর জন্যে খরচের বহরটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে? মুশকিল কী, জানেন? অনেক সময় সরকার চালান কিছু মাথামোটা লোক। গুটিকয় বিজ্ঞানী খেয়ালখুশির মত তাঁদের যা বোঝান, তাঁরা তাই বোঝেন। তাই করেন। অনেক সময় বহু তথ্য বিজ্ঞানীরা তাঁদের কাছে চেপে যান। ব্যাপারটা এমনভাবে তাঁদের কাছে তুলে ধরেন, যেন যা তাঁরা বলছেন, দেশবাসীর কাছে সেটাই মুশকিল আসান। বহু বৈজ্ঞানিক প্রকল্প মাথাভারী বোঝার মত এইভাবে জনসাধারণের ওপর নেমে আসে। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন তারই একটি উদাহরণ।

আমি বলবো যে কোন দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এ ধরনের উদ্যোগ বড় রকমের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই টেনে আনবে। তার থেকে শক্তির বিকল্প উৎসগুলি নিয়ে আরও ব্যাপক অর্থ-সহ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না কেন? মার্কিন দেশ ঠিক করেছে, আগামী দু হাজার খৃষ্টাব্দের মধ্যে ওই দেশ তার প্রয়োজনীয় শক্তির পঁচিশ শতাংশ সংগ্রহ করবে সূর্য থেকে এবং দু হাজার কুড়ি খৃষ্টাব্দ নাগাদ এই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে পঞ্চাশ শতাংশে। উত্তর আমেরিকার তুলনায় ভারতে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ বেশী। কারণ এ দেশে সারা বছর ধরে অনেক বেশী সৌরকিরণ পাওয়া যায়। এছাড়া বায়ুশক্তি, জল-শক্তি, জৈব-সামগ্রীর জীবাণুর সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে জ্বালানি গ্যাস উৎপাদন (যেমন গোবর গ্যাস), সৌররশ্মির সাহায্যে জলকে বিশ্লেষিত করে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি, এমন অনেক পদ্ধতি আছে, শক্তি উৎপাদনের জন্যে যাদের আমরা কাজে লাগাতে পারি। উন্নত দেশগুলিও এখন এই পথেই শক্তির মোকাবিলা করায় উদ্যোগী হয়েছে। অথচ আমি দেখছি, এ কাজে যাদের আগে এগিয়ে আসা উচিত ছিল—সেই উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের অনেকেই এখনও পারমাণবিক শক্তি নিয়ে মাতামাতি করছে। এতে লাভবান হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স অথবা পশ্চিম জার্মানির মত শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি। ইতি-মধ্যে তারা প্রচুর পারমাণবিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। থার্ড-ওয়ার্ল্ডকে পারমাণবিক সাজ-সরঞ্জাম বিক্রি করে লাভবান হবে তারা। অথচ নিজেদের দেশে তারা জোর দেবে অপারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের দিকে। এই দেখুন না, অস্ট্রিয়া পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র করল। কিন্তু জনসাধারণের চাপে সেটি চালু করতেই দেওয়া হলো না।

পারমাণবিক শক্তির কথা বলতে বলতে নিজেই প্রসঙ্গ পালটালেন অধ্যাপক ওয়ালড। শুরু করলেন পরমাণু বোমা নিয়ে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য। বললেন, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের জ্বালানির অবশেষ থেকে যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায়, তা দিয়ে প্রচুর বোমা তৈরি করা যায়। এই বোমা তৈরির ব্যাপারটা জনসাধারণ জানতে পারে না। অথচ ট্র্যাজেডি এই, এর যাবতীয় খরচ তারাই বহন করে। আমরা মুখে বলছি, পরমাণু বোমা তৈরি বন্ধ কর। কিন্তু বন্ধ কি হচ্ছে?

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন না, এ ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিরা যতক্ষণ উদ্যোগী না হচ্ছেন, কোন ফলই হবে না?

উত্তর : সেখানেই তো ট্র্যাজেডি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত দেশের মধ্যে চলেছে পারমাণবিক প্রতিযোগিতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র প্রতিযোগিতায় প্রথম। শুধু পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্যেই তার বাৎসরিক বাজেটের পরিমাণ দশ বিলিয়ন ডলার। মজার ব্যাপার এই, ভিয়েতনামে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন মার্কিন দেশের ওই যুদ্ধের দরুন বাজেটের পরিমাণ ছিল চব্বিশ বিলিয়ন ডলার, আর এখন এই শান্তির সময় সেই বাজেটের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলারে। কেমন অদ্ভুত মনে হয় না? কিলিং অ্যান্ড ডেসট্রাকশন হ্যাজ বিকাম এ বিগ বিজনেস ফর বিগ পাওয়ারস, অ্যান্ড গভর্ন-মেন্টস এলসহোয়ার ডু নট ইন ফ্যাক্ট গভর্ন, দে অ্যাক্ট অ্যাজ দেয়ার এজেন্ট।'

অধ্যাপক ওয়ালডের বক্তব্য : জনসাধারণকে সোচ্চার হতে হবে। তাঁদের প্রথম কথা হবে, পৃথিবীর তাবৎ পরমাণু বোমা ধ্বংস করুন। দ্বিতীয় কথা, বিদ্যুৎ শক্তির জন্যে হলেও পারমাণবিক বিভাজন-জনিত শক্তিকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত প্রতি-ক্রিয়ায় বিশ্বের মানব সমাজ থেকে শুরু করে সমস্ত জীবজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পরমাণু বিজ্ঞানকে শুধু সেই দিকে কাজে লাগান, যে দিকে গেলে আগ্রাসী মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে কম। যেমন, কৃষি বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান, ভূগর্ভস্থ জলের গতিবিধি জানা, আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্যের অন্বেষণ অথবা রোগ নিরাময়।

কথা বলতে বলতে অধ্যাপকের কন্ঠস্বর ভারি হয়ে উঠল। বললেন, আমার একটি পুত্র এবং একটি কন্যা। ছেলের বয়েস উনিশ এবং মেয়ের বয়েস সতের। জানি না আরও পাঁচ বছর পর তারা কেউ বেঁচে থাকবে কী না।

মনে হলো, শুধু নিজের ছেলেমেয়ের কথাই নয়, পৃথিবীর সব ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওয়ালড রীতিমত আতঙ্কিত।

সমরজিৎ কর

সূর্যের প্রতি : কন্যাকুমারীতে

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

তোমার সীমানা
সূর্যাস্ত অবধি, সূর্য।
আরবসাগরে শেষ রক্তপাতে ঝরে যায় দিন:
রাত্রির কালো হাত থেকে
পারো না ছিনিয়ে নিতে একটাও গেরুয়া পাথর।
দূরের গর্জনে আছে ড্রাগনের পদশব্দ; পশ্চাতে নিকট-মন্দিরে
শাঁখ বাজে; হোটেলের কলকাকলিতে
মনে হয় প্রাণময় এ পৃথিবী শব্দের বনিতা।
তুমি কি নিঃশব্দে চলো! মধ্যরাতে ঘরে ফেরা জীবনের মত
শঙ্কায় পা টিপে পা টিপে,
প্রতিটি পাখির ডাকে সন্ত্রস্ত তাড়ায়
তরঙ্গে লুকোও মুখ—
রোদ্দুর-জ্বালা প্রদীপের মতও পারো না
রাত্রির মুখোমুখি দাঁড়াতে বিদ্রোহে।
তুমি শুধু নিয়মের দড়ি-বাঁধা কলুর বলদ—
সময়-সর্ষেকে পিষে ঘুরে যাচ্ছ ঘুরে মরছ আকাশের
মৌন ঘানিঘরে।

"ঘোড়ার নাচ" (প্লাস্টার)—ভাস্কর সুনীল দাসের রচনা। জন্ম ১৯৫২। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের স্নাতক (১৯৭৪)। ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রভারতী পুরস্কার (১৯৭৬)। জাতীয় বৃত্তি নিয়ে অধ্যক্ষ অজিত চক্রবর্তীর অধীনে কাজ করছেন (শান্তিনিকেতন ৭৭-৭৯)।

মন কেমন করে

পূর্ণেন্দু পত্রী

ভীষ্মদেবের জন্যে মাঝে মাঝে মন কেমন করে
আবার যামিনী রায়ের জন্যেও।

সমস্ত বৃহৎ অট্টালিকার ভিতরে ঢুকে পড়েছে আগুনের শিকড়
সমস্ত প্রাচীন বইপত্রে উইপোকার তছনছ সুড়ঙ্গ
সমস্ত সুফলা গাছের গায়ে কুড়োলের আঠারো ঘা আর রক্ত পুঞ্জ।

আমীর খাঁ-এর জন্যে মাঝে মাঝে মন কেমন করে
আবার জীবনানন্দের জন্যেও।

গান এবং ছবি যে পথ দিয়েই মানুষের কাছে আসতে চায়
সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ে কড়কড়ে মেঘ আর বাতাসের লম্ফঝম্প।
আমাদের সামনে দৃশ্য বলতে এখন চুনকাম করা দেয়াল
আর শব্দ বলতে সেই সব উল্লাস, যা সারমর্মহীন।
ভাঙা মন্দিরের টেরাকোটার জন্যে মন কেমন করে
আবার সেনেট হলের সিঁড়ির জন্যেও।

সেই সব মহিমাময় নক্ষত্রেরা মরে গেছে
যারা জীবনের গায়ে জড়িয়ে দেয় ভয়ংকর উচ্চাভিলাষ।
সেই সব ছলবলে নদীরাও শুকিয়ে গেছে মানচিত্রে
যাদের মুখস্থ ছিল মহাদেবের জটার ঠিকানা।
ক্রমশ কমে যাচ্ছে সেই সব মানুষ যারা মৃগনাভির মত।

মাঝে মাঝে গাণ্ডীবের জন্যে মন কেমন করে
আবার একতারার জন্যেও।

সুভদ্র বালকের কথা

শিশির রায় নাথ

প্রতিমার হাত ধরে উদ্যানে বসে ছিল সুভদ্র বালক
কোমরে করুণ ঘুনসী, নষ্ট শাঁখ, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী মুখ
দুই ছিন্ন করতল দৈবী হাতে দশ দিক ধারণ করেছে
আঙুলে স্থাবির মুদ্রা; ইতস্তত ময়ূরপালক

বহু দিন পরে ফের উদ্যানে ফিরে আসে সুভদ্র বালক
গলায় প্রতীক-চিহ্ন, বন্ধ্যা স্মৃতি, বিবাহের মাঙ্গলিক সুতো
খিন্ন চোখে দশ মাস অঘোষিত হিমস্তব্ধতা
স্বরভঙ্গ গেয়ে ওঠে : ধ্রুপদে বিষণ্ণ নদী, অন্তরায় শোক

পুনশ্চ পারী

নীরদ মজুমদার

পুরাতন মোমার্ত

॥ ত্রিশ ॥

পারী ফিরে কারখানায় আর যাইনি, কিছু ধাতু খোদাই ছাপাই ছবি (এনগ্রেভিং) এবং কিছু ড্রইং মারিলিনকে দিয়ে বিক্রি করে চলছিল।

সেই সময় দনিসের সুন্দর ঘর আমাকে ছেড়ে দিতে হল, কারণ ঐ ঘর ওর স্বামী রুব্যারের নতুন ব্যবসার জন্য প্রয়োজন। উঠে গেছি ছতলায়। "সাল দ্য বেন"-র ঘরে। সব ফ্ল্যাটেরই একটা ঘর থাকে চাকর-বাকর-ঝিদের জন্য—সেইটেই আমি দখল করলাম। অর্থাভাব আমাকে শীর্ণ করে তুললো, তবে দনিস রোজ একটা ভাল সুপের অংশ আমায় দিত, তাই রুটি দিয়ে আর সামান্য কিছু খাবারে দিনাতিবাহিত করতাম। কখনও কখনও এক-আধ বেলা উপোস। অবশেষে জানাশোনা লোক মারফৎ শুনলাম একটা নতুন কারখানায় লোক নিচ্ছে। কাজে লেগে গেলাম।

মস্ত কারখানা। নানান বিভাগ—তারই মধ্যে একটা ছিল সিল্কস্ক্রীন প্রিন্টিং-এর ঘর। এখানে আমরা কয়েকজন কাজ করতাম। কারখানাটা মস্ত হলেও ওটার কি নামধাম এ সব কথা আমার এখন আর মনে নেই। কেবল মনে পড়ে, মেট্রোতে গিয়ে পরে স্যাঁ লাজারে ট্রেন ধরে যেতাম ভোরে। ফিরতাম জ্বালা-যন্ত্রণার চোখ আর দেহ নিয়ে। আর খাদ্য, অল্প পয়সায় নিমিত্তমাত্র। তারই ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ এক-আধ রাত কপাল খুলে যেত। হয় তো কোন নিমন্ত্রণ জুটে যেত। প্রাণ হাঁপ ছাড়তো।

একদিন মাদাম এল্স-এর সান্ধ্যভোজে আমার নিমন্ত্রণ। আমি আর মাদাম এল্স এক-টেবিলে দুই দিকে। পুলে রোতি, স্যাম্পাইন আর আনুষঙ্গিক সব কিছুই উন্নতমানের উন্নত রুচির পরিচয়—ওঁরই সঙ্গে এটা যায়। মাদাম এল্স যেন চিরযৌবনা। যখনই যাও তখনই মনে হবে সদ্য প্রস্ফুটিত।

আমি কারখানায় কাজ করে মেহনতি মানুষের সংস্পর্শে এসে ওদের মাধুর্য অনুভব করতে পারি। বিশেষ করে এদেশের শ্রমিকদের মধ্যে বেশ একটা অন্তরঙ্গতার পরশ পাওয়া যায়। আবার ফরাসী অভিজাত সমাজও আমাকে মুগ্ধ করে। তাদের মার্জিত রুচি, ম্যা রাফিনমা, কথাবার্তা, ব্যবহার সত্যই খুবই উচ্চাঙ্গের। তৃপ্তিদায়ক। আর একটা শ্রেণী আছে সব সমাজে যারা এ-ও নয় ও ও-নয়, যদি ইংরেজীভাষা অনুমতি দেয়, তবে তাদের বলবো "মিডিওক্রাটস"। তাদের আমার আদপেই ভাল লাগে না।

সেদিন মাদাম এল্সের ওখানে খেয়ে ফিরেছি। গেলাম স্যাঁ জর্মাঁদ প্রেতে। এখানে আমার আর একটা "রাঁদেভু" (আড্ডা) ছিল। সেখানে একটি ছোট হলে, আমাদের বন্ধু জীনেৎ গীয়ামার গান শুনতে যেতাম। জীনেৎ এক খ্যাতনাম সোপ্রানিস্ট। (সোপ্রানো মানে মধুর গলার সুর)। একসময়ে অপেরাতে গেয়েছে জীনেৎ। এখন নানা দেশ-বিদেশে গেয়ে বেড়ায়। তা ছাড়া জীনেতের মহিমা হল সে সব নতুন সুরকারদের গান প্রথম মহড়ায় গেয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দান করতো। স্বাভাবিকভাবেই উঠতি সঙ্গীত রচয়িতাদের অতি প্রিয় জীনেৎ গীয়ামা। বয়স হয় তো চল্লিশের আনাচে কানাচে। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতো। ও যেখানেই গাইতো সর্বত্রই আমার নিমন্ত্রণ থাকতো।

একদিন রাতে ওর গান শুনে ফিরছি। "কাফে দা ফ্লরের" সামনে দেখা হল, শ্বেত রুশ (এরা বলশেভিক আন্দোলন বিরোধী আত্ম নির্বাসিত রুশ) অনবদ্য সুন্দরী ইরেনের সঙ্গে। অতটুকু মেয়ে অত রাতে আড্ডা দিয়ে ফিরছে। ওকে ধরে নিয়ে গেলাম "কাফে দা ফ্লরের" টেবিলে।

আমার জানা ছিল রুশীরা খুব ভাবপ্রবণ হয় তাই ওকে জীন ভারমুৎ খাওয়ালাম, নিজেও পান করলাম। গ্ল্যাসে চুমুক দিতে দিতে অনেক গল্প হলো। আর লক্ষ করছিলাম ওর চেহারার গুণ। যাদু। শুধু তাই নয়, মেয়েটির গুণও অনেক। ভাল গান গায়। পড়াশোনায় একজন সেরা ছাত্রী। অন্যান্য ভাষায় দুরস্ত। আর তা ছাড়া মনে হয় ওর কাছে নিজের ওর সৌন্দর্য যেন অজ্ঞাত। আমি নিশ্চিত যে, ও বেশ হুঁশিয়ার। সেকথা ওর হাবভাবে প্রকাশ পায় না।

আমি বললাম, ইরেন তুমি অনবদ্য সৌন্দর্যের টুকরো—

ও চমকে উঠল প্রথমে। তারপর স্বাভাবিকভাবে এমন একটা ভঙ্গী করল যেন আমি হাস্যকর একটা মন্তব্য করে বসেছি। তারপর হাসিতে ওর দেহে ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছিল। বললে, "মঁসিয়র" মিথ্যাবাদী।

না সত্যিই।

"মের্সি মঁসিয়র"—তোষামোদ, একথা বলে ও ঝাঁকি দিয়ে নিজের দেহ সোজা করলো—

সুন্দর ওর কাঁধ। সুন্দর গলা। রূপকথার একটা মুখ। চোখ দুটো মার্বেল নীল। সর্বদাই ছলছলে। ভিজে। উপরের দেহ জড়িয়ে আছে হাল্কা নীল পরিপাটি পোশাক, ফুলদানের মত দেহটিকে ঘিরে—তাতে স্তনদ্বয় অপরিণত কিন্তু পরিপূর্ণ। কত বয়স হবে—উনিশ কি বিশ বড় জোর। সাধারণত খুব সুন্দরীদের বুদ্ধিসুদ্ধি দরকাঁচা হয়। সরলতার আড়ালে ওর বুদ্ধিটা কিন্তু খুব তীক্ষ্ম। ধারালো। ওর সঙ্গীত শিক্ষা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে

বীয়ারিৎস সমুদ্রতট
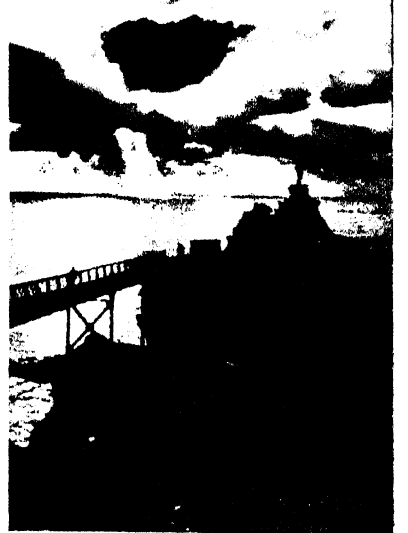
আমরা তিন-চার পাত্র পান শেষ করেছি ও বেশ আমেজে আছে। আমিও।

ওকে প্রশ্ন করলাম, তারপর তুমি কি করবে?

কি করবো? একথা বলে, সিগারেটে একটা টান দিল ইরেন, তারপর ছেড়ে দিল, অবকাশে ওর সুন্দর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পান-পাত্র তুলে গলাটা আর একটু ভেজাল, 'কি করবো' বলে গম্ভীর ভাব মুখে এনে বললে, 'জান, আমি চাই পারীর শ্রেষ্ঠ, খ্যাতনামা বেশ্যা হতে—জগতবিখ্যাত পুতা হতে, তারপর গেলোয়াজে', আবার টান দিল।

আমি ওর কথায় বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় চুপ করে রইলাম। মনে মনে ভাবছিলাম চালিয়াতি। ও হয়তো আমাকে গ্রাম্য বিবেচনা করেই ল্যাং মারল। তারপর আরো বেশ কয়েক পান-পাত্র শেষ করেছি। অন্যান্য অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু ওর উত্তর আমার মনে বেশ আলপিন ফুটিয়েছে। এমন ভাব উপেক্ষা করে কথোপকথনে হাওয়া বদলাতে চাইছিলাম। ভাবছিলাম অন্য কথা, অনেক কথা—ফেলে আসা দৃশ্য, রনের মোটর বাইক ভেদ করে চলেছে—রোয়াইর বন্দর, বিয়ারবীৎস্, বাস্কের জলোচ্ছ্বাস, তারপর আর্কাশোঁ—পিরেনি পর্বতমালা পার হয়ে একেবারে বাঁলিউস, আমি অন্যমনস্ক,—কিন্তু ইরেন বেশ নেশা করলেও ওর চতুরতা সজ্ঞান এবং সপ্রতিভ। ও আমার মনের অবস্থা বুঝেছে। ব্যাপারটাও ভোলেনি মোটেও। ও আমাকে চমকে দিতে চেয়েছিল। চমকেও দিয়েছে।

তাই হয় তো, পাত্রের অন্তস্থ সমস্ত গলায় ঢেলে বললে, নীরদ তুমি কি করবে? তুমি কি হতে চাও?

মনে হলো এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। বললাম, আমি কি হতে চাই জান?—শ্রেষ্ঠ, খ্যাত-

রোয়াইর বন্দর

একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল...
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!

লিরিল

তরতাজা হ'বার সাবান **লেবুর মত চনমনে তরতাজা**

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-LR.23-2415 BG

নামা কলকাতার বেশ্যা মাগীদের "ম্যাকরো" দালাল! সব দেশের সব প্রেসিডেন্টদের আমি আপ্যায়িত করবো চিৎপুরে, সোনাগাছিতে।'

হেসে গড়িয়ে পড়ল আমার গায়ে।

বললে তু এ ম্যালা—দুষ্টু।

এসো এবার ওঠা যাক।

ও আপত্তি করলো, না না এই তো সবে সন্ধ্যা হল। তখন অবশ্য রাত প্রায় বারোটা।

আর একটু বসো নীরদ! ও একটু হেলছিল দুলছিল।

আমি বললাম, আর না, তোমার অবস্থা, খুব কাহিল।

না না কিছুই নয়, খুব ভাল লাগছে তোমার সঙ্গ। তুমি আমার হিন্দু প্রেমিক।

না না চল বাড়ি চল—

না—

অবশেষে কে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে?

তুমি।

না।

হ্যাঁ তুমি আমায় কোলে করে বাড়ি নিয়ে যাবে। বাড়ি নিয়ে গিয়ে শেমীজ দা নুয়ি পরাবে, জামা-কাপড় খুলে শুইয়ে দেবে আমার বিছানায়।

ইরেণ তুমি একটু সহজ হবে।

সহজ? ও ওর ধনুকের মত ভ্রূতে টংকারের এক বাঁক নিয়ে এলো। বললে, জান নীরদ, এ দেহ, প্রাণ মন তোমার হাতে তুলে দেবো।

না না, চল বাড়ি চল। তোমার মাদাম মা কি ভাববেন?

আবার পান-পাত্র আমরা নিঃশেষ করলাম। কোন মতে হেলতে দুলতে ও ওর হাত আমার কাঁধে রেখে ভর করে আমার সঙ্গে বার হল।

ওর দেহ আমার দেহে ভর করে কাফে থেকে বার হল, ওর সমস্ত দেহের স্পর্শ ওর কোমল স্তনের কোমল ভেলভেট ছোঁয়ায় আমার নেশা ছুটে গেল।

একটা ট্যাক্সি ডেকে ওকে ওঠালাম ও আমার কাঁধে মাথা হেলিয়ে দু-বাহু জড়িয়ে ধরে বললে, তুমি আমায় কোলে করে বাড়ি নিয়ে ঢুকবে।

কিন্তু তোমার মা?

মা দেখবে, যে এক হিন্দু রাজকুমারের কোলে বাড়ি ফিরছি। মার সব অহঙ্কার ভেঙে যাবে।

কিন্তু ইরেণ আমি রাজকুমার নই।

ও, আমি জানি, সব ভারতীয় পুরুষরাই রাজকুমার।

না, ইরেণ সব পুরুষই ভিখিরী।

না অসম্ভব নয়।

তারপর থেমে থেমে ইরেণ বলল, আমার একটি আবেদন করার আছে।

বল?

তুমি বাড়ি গিয়ে আমাকে আদর করে বিছানায় শোয়াবে, মা যাতে ভাল করে দেখে।

তারপর?

তারপর তুমি আমার চুলে হাত বোলাবে প্রিন্স-এর মত, তারপর আমার ঠোঁটে মিষ্টি একটা চুম্বন বসিয়ে বলবে, "আ বিয়াঁতো মন আমুর"—বুঝলে? বলে তুমি চলে যাবে।

বললাম, বেশ তুমি যদি খুশি হও তাই করবো। অনেক রাতে ওর বাড়ির দরজায় ওকে পৌঁছে দিয়ে হাঁফ ছেড়েছি।

তার পরদিন তাই অনেক বেলায় উঠেছি, পিনের ঘুরান সিঁড়ি দিয়ে নেমেছি, যে সিঁড়িটা দনিসের রান্নাঘরের দরজায় উপস্থিত। কড়া নাড়তে দনিস খুলে দিল দরজা। বললাম, বোঁ জুর।

বোঁ জুর বলে গালে চুম্বন বিনিময় করাতে দনিস বললে, কয়েকজন মেয়ে সকালে এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে, আমি জানতাম তুমি তখনও ঘুমোচ্ছে। তখন বেলা হয় তো নটা হবে। তাই আর তোমার ঘুম ভাঙাইনি—ওরা একটা চিঠি ও ঐ প্যাকেটটা রেখে গেছে। দনিস আঙুল দিয়ে দেখাল টেবিলের উপর।

পাস্তর স্টেশনের কাছে সড়কপথ

পারীর মেয়ে পুলিস
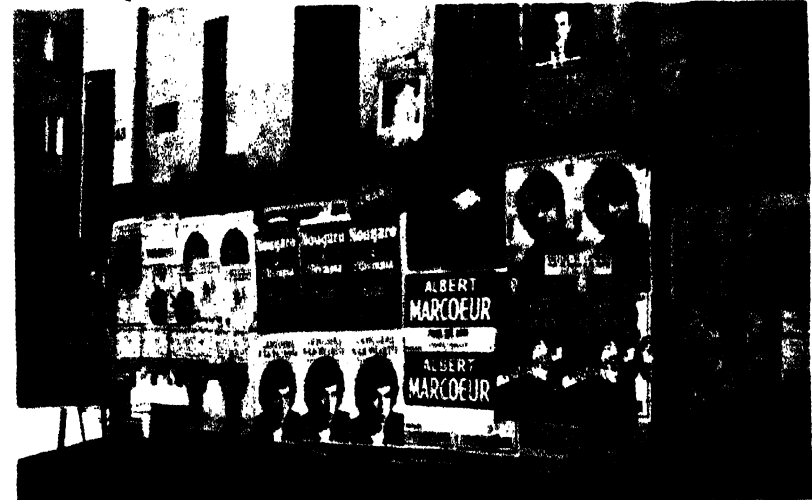
সেদিনের পথ এদিনে

দাঁনিস কফি এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। পান করতে করতে চিঠিটা খুললাম। "প্রিয় আমি, প্রিয় বন্ধু নীরদ, শুনলাম তুমি এখনও ঘুমোচ্ছ। আমরা এসেছিলাম তোমাকে সন্ধ্যেবেলা নিয়ে যাব বুৎমোমার্তে। ওখানে আমরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবো। এক প্যাকেট বিস্কুট তোমাকে দিলাম। আমরা সবাই তোমার জন্য প্যান্তরের বুস দ্য মেত্রোর অপেক্ষা করবো। লরাঁস মাদো, জ্যাকো, আমি সন্ধ্যা সাতটায় 'আ বিয়াঁতো' খুব শীঘ্রই—ইতি জিজি।" ওরা বিস্কুট ফ্যাক্টরীর শ্রমিক হিসাবে বিস্কুট উপহার পায়। তাই বেচারা জমিয়ে রেখেছে আমার জন্য। কিন্তু বুঝলাম না এদের মধ্যে মাদলেন ওরফে মাদো কোথা থেকে এলো ও তো চলে গেছে মার্সেই—ওর বিবাহ উপলক্ষে। যাই হোক, কোন মতে খাওয়া সেরে উপরে উঠে গেলাম। আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল ক্যাথরীনের —ওকে বসিয়ে ছবি আঁকার। ও এলে বসিয়ে কিছু স্কেচিং করলাম।

ছাদের উপর এ ঘর সরু। একটা বড় জানলা খোলা পশ্চিম দিকে। ঘরটা আমার বেশ ভাল লাগে। জানলা দিয়ে পারীর ছাদ। তোয়া দ্য পারীর মনোরম দৃশ্য দেখা যায় বহুদূর অবধি।

আঁকতে আঁকতে ওকে বললাম ফ্যাক্টরীর ছেলে-মেয়ে আমায় সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করেছে ওদের সঙ্গে খাবার জন্য। মজার সমাবেশ, তোমার তো ফুরসৎ নেই, টিপ্পনী কেটে ক্যাথরীন হাসলো। তুমি জান ক্যাথরীন, এরা বেশ মজার লোক, অন্য জগতের, ওদের নিমন্ত্রণ পাশ কাটানো ঠিক হবে না।

বেশ অশ্লীল, তাই না?

এদের মুখ কিছুটা আলগা ঠিকই কিন্তু এদের মন বেশ সরল। চিন্তা টিন্তাও স্বচ্ছ। তাছাড়া দেখ এদের অবস্থা যে খুব সচ্ছল তা নয়। তবু ওর মধ্যে অনেক লোকজন আপ্যায়ন করতে এরা ভালবাসে। খোলামেলা লোক এরা। সব সুখ দুঃখের কথা তোমাকে বলবে। এমন ভাবে বলবে যেন তুমি ওদের কত আত্মীয়। তবে এদের আদ্ধেক কথাই আমি বুঝতে পারি না যেমন ওরা বলে, "জ্যাকো", "সে পা ল মোভেজ ফের্" মানে খারাপ লোক নয়, ভয়ের কিছু নেই, "জ্যাকোতাই"—এমনি সব পরিভাষা। আমি প্রায় মুখস্থ করি।

পিরানিজের লু সা সো জা

তারপর চুপচাপ ক্যাথরীনকে কিছুক্ষণ আঁকলাম। ওর সোনা রঙের চুলে জানালা থেকে আসা রোদ। আমি এক সময় বললাম, ওরা আবার খুব সিনেমা ভক্ত। জিজির খুব ইচ্ছে ওদের পাড়ার সিনেমায় আমাকে নিয়ে যাবে। জানোই তো সিনেমা জিনিসটাকে আমি আবার ভীষণ ডরাই।

ক্যাথরীন বলল, হ্যাঁ ওরা যেতে ভালবাসে খুবই। বললাম, তাছাড়া জিজিদের পাড়ার সিনেমায় মাঝে মাঝে, অ্যাক্রোবেট, মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখায়। তাতে ওদের মহা আনন্দ। এই প্রসঙ্গেই আমি ক্যাথরীনকে বললাম, থিয়েটার, কনসার্টে কখন সময় কেটে যায় বুঝতে পারি না। সিনেমায় দু ঘণ্টায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

ক্যাথরীন বললে, ঠিক বলছো যদি আবার খারাপ সিনেমা হয়। মাথা ব্যথা করবে। এ কথায় ওকে বললাম সেদিন কমেদী ফ্রাসেজে রাসিনের বেরেনীস্ দেখতে গিয়েছিলাম, কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল কি বলবো। তাছাড়া ঐ সঙ্গে ছিল আলফ্রেদ মুসের "ঈল্ ফোলা পর্ৎ উভের্ৎ ঔ ফারমে" —কি মজার।

মুসের কথা উঠতে দুজনেরই খুব আনন্দ হল।

সত্যই সুন্দর—

তবে আমি বললাম বেরেনীস কিন্তু অভূতপূর্ব নাটক।

সত্যই সাংঘাতিক ভাল।

কথায় কথায় আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। ওকে বললাম, তোমার গ্রীক পোশাক আছে না-কি? একদিন পরই না, কোথাও একটা ভাল জায়গায় গিয়ে তুমি, দুই একটা ভাব ভঙ্গী করে বসবে দাঁড়াবে আর আমি ছবি আঁকবো। ক্যাথরীন তোমার তো সব মুখস্থ—"বেরেনীসের" কয়েকটা দৃশ্য ফেদ্রের কয়েকটা আর বীটানীকাবোর জুপীর ভূমিকার অংশবিশেষ করবে?

ও উৎসাহিত হয়ে বললে, অবশ্যই, পোশাক-আসাক আমার সব আছে কিন্তু কোথায় গিয়ে করা যায় বলতো?

ধর যদি আমরা স্যাতো দ্য ভো-ল-ভিকোঁতে যাই। ওখানে কি হয় না? ও বললে, হ্যাঁ খুব সুন্দর হবে, জায়গাটার দৃশ্য চমৎকার। কেমন একটা রাজকীয় পরিবেশ আছে।

সন্ধ্যা হতেই সেন্তেগুজে প্যান্তরের বুস দ্য মেত্রোর ওখানে দাঁড়ালাম—সুড়ঙ্গের সিঁড়ি ভেঙ্গে জীজী, জাকো, মাদো সকলেই উঠে এসে হাতে হাত মেলালো। মাদলেনকে দেখে আমি অবাক! ঝড়ে বিধ্বস্ত পাখির মত ওর এলোমেলো অবস্থা। আমরা ওখান থেকে মেট্রোতে রওনা হলাম বুৎ মোমার্তের দিকে। যেতে যেতে পথে মাদোর গল্প শুনলাম। মাদো উত্তর আফ্রিকার প্রেমিকের সঙ্গে মার্সেই গিয়েছিল। ওখানে দু'তিন দিন থেকে ছেলেটি বললে, আমি কয়েকদিনের মধ্যে ঘুরে আসছি। সব ব্যবস্থা করে ফিরব। তারপর দুজনে জাহাজে যাবো। এখানে মাসী রইলো। মাসী মানে এক বুড়ী। তার মেজাজ খুব খারাপ। যে হোটেলে রেখেছিল মাদলেনকে সেটা ইয়োরোপীয়ানও নয় ওরিয়েন্ট্যালও নয়।

মাদলেন নিশ্বাস ছেড়ে বলল, ঘর মন্দ নয় তবে অন্য ঘরে দেখেছি আমারই মত আর একটা মেয়ে। হোটেলটায় বহু উত্তর আফ্রিকার লোকজনের আনা-গোনা। ওদের কথা আমি কিছুই বুঝি না, চাহনি মারাত্মক। ছেলেটি কখন ফিরবে জানতে চাইলে, বুড়ী খেঁকিয়ে উঠতো, চুপ করে থাকো না। ঠিক সময় মত আসবে।

রাতে নানা অদ্ভুত লোকজন আর খারাপ মেয়েদের আনাগোনা: অশ্লীল বীভৎস মেয়েদের হইচই। এক ফুরসতে অন্য মেয়েটির সঙ্গে স্নানাগারে দেখা এক মিনিট মেদলেনের। কেঁদে ফেলে মেয়েটি বললে, ভুল করেছি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে। এখন বুঝতে পারছি এ এক মস্ত দল। এরা শ্বেত মেয়ে-মানুষ চালান দেয়। যার পারিভাষিক নাম হোয়াইট শ্লেভ ট্রাফিক।

মেদলেন বলল, ওর কাছে সব শুনে আমার বুকের রক্ত জমে গেল—শিউরে উঠলাম। ওই বুদ্ধি দিল কোন মতে এ বাড়ির বাইরে পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে প্রায় দিন সাতেক কেটে গেছে।

বাসকের ওলোচ্ছ্বাস

পররীপনীরা

আলিউস পিরেনিজ

এখনও মনে ক্ষীণ আশা ছেলেটি আসবে। ছেলেটির কিন্তু দেখা নেই বুড়ী নেশা করে আমাদের পানীয় দিত। পরে বুঝলাম কি মিশিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম ওটা খেয়ে সারা রাত অচৈতন্য অবস্থায় আমরা দুজনে পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে থাকতাম। দরজায় চাবি দিয়ে যেতো বুড়ী। ভীষণ ভয় করতো। পরামর্শ করে একদিন পানীয় না পান করে কোন মতে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে সোজা বাড়ির বাইরে পালিয়ে আসি—ট্যাক্সি ধরে পুলিস স্কোয়াকে চলে এলাম। তারপর পুলিসই আমাদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করেছিল। ঐ আড্ডা ওরা ভেঙে দেবে, আমাদের প্রতিশ্রুতি দিল—ভয়ের কিছু নেই।

আমি মাদোকে বললাম, তোমরা মেয়েরা এই-ভাবে কোন কারণে একটা ছেলেকে পছন্দ হলে লাফিয়ে পড়ে মরো—

মাদলেন আশাবাদী, ম্লান হেসে ও বললে, তবু নীরদ অনেক ভাল লোক তো আছে।

কি বলবো? কিছু বলার নয়। জীজী এই সন্ধ্যায় এই জমায়েতের ব্যবস্থা করেছে মাদোর দুঃখ ভোলাতে। জীজীর মনটা খুবই নরম, স্নেহমায়াপ্রবণ।

এই সব কথার সময় মাদোর চোখে জল, শুধু দুঃখে নয় লজ্জায়ও বটে।

জীজী ওকে রুমাল বাড়িয়ে দিল। আমরা প্লাস পিগালের সুড়ঙ্গ পথ হতে বার হয়ে হেঁটে কিছুটা গিয়ে ফিনিকুলের বা দড়ির ট্রেনে উঠে গেলাম বুৎ মোমার্তে—

বুতের অনেক ইতিহাস। এখানকার এগলিস স্যাঁ পীয়েরে অতি প্রাচীন। হয়তো এগলিস স্যাঁ মার্শার পরই এটি তৈরী হয়েছে। প্রায় মধ্যযুগেই। শুরু অবশ্য দ্বাদশ শতাব্দীতে। উনবিংশ শতাব্দীর তৈরী বাসিলিক দ্য স্যাক্রাকর কিন্তু বহু দূর থেকে দেখা যায়।

সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীই এই জায়গাটা ছিল লা ভা দা বোহেমের, বা ভবঘুরেদের রাজত্ব। ছবির মত পরিবেশ ও মুক্ত আবহাওয়ার জন্য বুতের ছিল খ্যাতি। বের্লিওজ, কবি নের্ভাল, মুর্জের, হাইনে ইত্যাদি এখনও পুরাতন স্মৃতি বহন করছে "ল্যাপাঁ আজিল" ও "ম্যুলাঁ দ্য লা গালেৎ" যেখানে অধুনা শিল্প ও কাব্যের জন্ম। একটা কাঠের বাড়ি তের নম্বরে। যেখানে পিকাসো, ব্রাক, ভ্যানডঙ্গেন, খোয়ান গ্রীস, যেখানেই রচিত হয়: দা মোয়াজেল দ্যাভিনিও তাছাড়া ম্যাক্স জ্যাকব, আপলিনেয়র ইত্যাদি বিখ্যাত সব শিল্পীরা জায়গাটাকে অমর করে গেছে।

সব সময় জায়গাটা গমগম করছে—প্যারাসোলের তলায়, রাস্তায় বসে সকলে পানরত—কিছু ছবি বিক্রির জন্য ঝুলছে—শিল্পীরা প্রতিকৃতি এঁকে পথে রোজগার করছে।

ছোটখাটো অলিগলি অনেক অনেক পুরাতন ঘর বাড়ি কোথাও কোথাও মনে হবে সব যেন চিত্রার্পিত মহিমা, এমনি এক গলিতে আমরা আগে আপারিতিফের জন্য প্রবেশ করলাম। এক রেস্তোরাঁয়—জ্যাকোর পুরাতন জানা শোনা, বোঁ জুর 'পাঁত্রো' কর্তা সকলের সঙ্গে হাত মেলালাম। কর্তা-কর্ত্রী সকলেরই ঐ জীবিকা তাছাড়া সতেরো-আঠারো বছরের গোলগাল একটি মেয়ে, পুলওভার পরিহিত, জামার থেকেও কিছুটা অতিরিক্ত, নিকল। জ্যাকো ওকে সম্বোধন করে বললে "তুয়া বন মীন", তোমার বেশ স্বাস্থ্য—ফিক করে মেয়েটি হাসলো, বুঝতে পেরে যে ওর দেহের অহংকার জ্যাকোর চোখে পড়েছে।

আমরা যে যার পছন্দসই পানীয় নিয়ে, সকলের স্বাস্থ্য কামনা করে, বিশেষভাবে মাদোর উদ্দেশে পান করলাম।

জ্যাকো, আমাদের বললে, মনে হচ্ছে প্যাত্রোঁর মন খারাপ, আমাদের সামনে কাচের দরজা রাস্তার সব দেখা যায়। উল্টো দিক একটা কর্দনীয়ের বা মুচীর বুতিক—আমাদের ওপাশে কাউন্টারে, প্যাত্রোঁ ও তাঁর গিন্নী গেলাস ধুতে ব্যস্ত—মেয়েটি একটি নিম্ন-শ্রেণীর ছবিওয়ালা পত্রিকার পাতা উল্টোতে ব্যস্ত।

কি করছে ওখানে ফ্লিকাইরা,—দুজন পুলিস মুচীর সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত। জ্যাকো ঘুরে লক্ষ করে প্যাত্রোঁকে প্রশ্ন করলো, কি জেল পলাতক খুঁজছে নাকি? প্যাত্রোঁ নাঃ নাঃ তা নয়, ওয়ে বিয়া মহাশয় এমিল, আজ প্রায় দশ বছর এ বাড়ির তিন-তলায় একটা ছোট্ট কামরায়—যেদিন থেকে কাজ

আঁতিবের সমুদ্রতট

বাসক দেশ—এসপেলেত গ্রাম
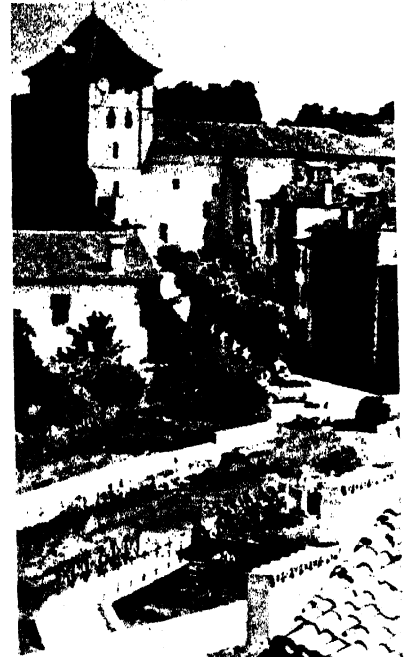
ছেড়েছে সোসাল সিকিয়রিটির ব্যবস্থায় যা পায় তার একার বেশ চলে যায়।

জ্যাকো প্রশ্ন করলো, ওর কি কেউ নেই—কোন-দিন তো শুনিনি, কোনদিন একটা চিঠিও আসতে দেখিনি—অথচ ভারি ভাল মিশুকে লোক, রোজ সকালে খাবার আগে এখানে আপারিতিফ খেয়ে খবরের কাগজ পড়ে—ওর চেনা রেস্তোরাঁয় সকাল বিকাল খেয়ে ঘরে ওঠে। একার জীবন, কোনদিন সঙ্গীসাথী দেখিনি—এমন কি একটা মেয়েমানুষও নয়। বোঁ জুর, অরভোয়ার ছাড়া মুখে কোন কথা ছিল না। কিন্তু আজ তিন-চারদিন আর নীচে নামেনি ভাবলাম হয় তো শরীর খারাপ—আজ সকালে কঁসিয়েজ—অর্থাৎ বাড়ির তদারক যে করে সে দরজায় ধাক্কা দিয়ে কোন সাড়া শব্দ পায়নি, না পেয়ে কঁসিয়েজ পুলিসকে ফোন করেছে।

আমরা মহাশয় এমিলের কথা হাঁ করে শুন-ছিলাম। ইতিমধ্যে পোঁপোঁ পোঁপোঁ সশব্দে পোঁপীয়ে এসে উপস্থিত, অর্থাৎ দমকল। ব্যাপারটা জানবার জন্য আমরা আর একপ্রস্থ পানীয় নিয়ে বসে রইলাম। রাস্তায় বেশ আলো। কিছু কিছু লোক জমা হয়েছে।

আমরা সকলেই বাগ্‌রহিত—বাইরের সকলে, প্যাত্রোঁ স্তব্ধ।

আমাদের এই চলমান জীবনে ঐ একমাত্র ঘটনা কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে দেয়, আরো খারাপ লাগছিল ভাবতে, মহাশয় এমিলের একবিন্দু অশ্রুও ফেলার কেউ নেই। পরে পুলিস মারফৎ জানা গেল, এমিল দিন তিনেক আগেই বিগত হয়েছেন, ডাক্তারের অভিমত।

একা থাকার বিপদ এই—অবশেষে তুমি একা পচবে। আমরা একে তো মাদলের শোকে কাহিল, আবার আর এক শোক উপস্থিত। আমরা পরামর্শ করে বেরিয়ে পড়লাম অন্য রেস্তোরাঁয়। বিয়াণ্ড ও খোমদতের স্ত্রীৎ খেয়ে অবশেষে জ্যাকোর জানা এক নোয়াৎ দ্য নুইতে। সারা রাত হাত বদলা-বদলি করে আমরা নেচেছি, জীজী খুব অন্তরঙ্গ হয়ে আমাকে নাচিয়েছে—আমার খুব ভাল লাগছিল। সে রাতে খুব ফূর্তি করে, শেষ রাতে বাড়ি ফিরেছি। (ক্রমশ)

আপনার
রজত-মুহূর্ত আর
স্বর্ণ মুহূর্তের
অনুরূপ

এইচ এম টি ঘড়ি

আপনি নারী। আপনি নিশ্চয়ই
জানেন—নারীর সাধ কত বিচিত্র!
কখনও রূপোলী, কখনও বা সোনালী
সাজের সাধ—স্বর্ণ মুহূর্তের জন্যে!
কখনও সাদামাটা পছন্দ...
কখনও বা বিশেষ কিছুর আনন্দ...
এইচ এম টি চেনে নারীর কোমল
মনোভাবকে—তাই নিবেদন করছে
চমৎকার লেডীজ মডেলে চাঞ্চল্যকর
ঘড়ির সমাবেশ!—যা এর আগে
কখনও পাওয়া যায়নি।
...স্টেনলেস স্টীল, সোনালী, শুভ্র-
সোনালী, নানান রকমের!
গোল আর চৌকো—নানান আকার,
চাবি ওয়ালা আর অটোম্যাটিক
ঘড়ির সাজানো সংসার!
বাস্, আপনার আর কি চাই?
শুধু বেছে নেবার সময়!

এইচ এম টি ঘড়ি

- ১৭ আর ২১ জুয়েল
- প্যারাশক
- অ্যান্টি ম্যাগনেটিক

মার্কেটিং ডিভিশন

hmt

জাতীয় সময়রক্ষী

আপনার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে
আমরা আছি, প্রতিপলে... সবসময়!

মুসলিম রচিত বাঙলা উপন্যাসের আদিপর্ব (১৮৬৯-১৯০০)

রশীদ আল্ ফারুকী

॥ এক ॥

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস লিখিত হয়। উপন্যাস মানেই যে শুধু কাহিনী নয়, বা চরিত্রের সমাবেশ নয় তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হবার পর প্রথমবারের মতো বোঝা গেলো। মাইকেল মধুসূদন যেমন পাশ্চাত্য রীতির উপর ভিত্তি করে বাঙলা নাটকের সূত্রপাত করেছিলেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও পাশ্চাত্য রূপরীতিরই পুনর্বিন্যাস। পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করেছি, উপন্যাস অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন শিল্পরীতি হওয়া সত্ত্বেও অ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। এই জনপ্রিয়তাই সমকালীন লেখকদের উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত করার মূল কারণ। অথচ বাঙলা সাহিত্যে নিছক আখ্যায়িকাধর্মী রচনার সূত্রপাত হয়েছে বহু আগে থেকেই। কাব্যে রচিত বিভিন্ন প্রকার ধর্ম ও তত্ত্বনির্ভর রচনা বাদ দিলেও গদ্যে কাহিনী রচনার সূত্রপাত হয়েছে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের আরো প্রায় একযুগ আগে। মিসেস ম্যানেন্সের যে গ্রন্থটিকে ডঃ সুকুমার সেন 'আকার ও প্রকারে উপন্যাসের মত' বলে আখ্যায়িত করেছেন (১) সেটির প্রকাশকাল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ। অর্থাৎ 'দুর্গেশনন্দিনী'র তের বছর আগে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য যদি উপন্যাসের মূল খুঁজতে হয় তাহলে আমাদের লৌকিক কাব্য বা গাথা সাহিত্যের শরণাপন্ন হতেই হবে। তবু আমরা এত গভীরে যেতে চাই না। কিন্তু যেসব উপাখ্যান বা উপাখ্যানধর্মী রচনায় বাঙলা উপন্যাসের সম্ভাবনা লুকিয়েছিলো সেগুলোকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র আগে যেসব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার ভেতর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসগুলোর নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তবে আমরা শুধু উপন্যাস বা উপন্যাসধর্মী রচনাগুলোর কথাই উল্লেখ করছি।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র আগে যেসব উপন্যাসধর্মী রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তাতে উপন্যাসের বীজ নিহিত থাকলেও উপন্যাস প্রসঙ্গে তাদের আলোচনা একেবারেই গৌণ। কারণ উপন্যাসের ক্ষীণ এক-আধটু লক্ষণ ছাড়া এসব রচনায় আর কিছুই নেই। তবে যে জীবনবোধ উপন্যাসের প্রাণমূল তা এ জাতীয় রচনায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এ সব রচনার ভেতর ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) ও 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এ জাতীয় রচনায় কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষিত না হলেও জীবনের তাবৎ গূঢ় রহস্য চিত্রিত হয়েছে—যা উপন্যাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পরবর্তীকালে রচিত নীলমণি বসাকের 'আরব্য উপন্যাস' (১৮৪১), বত্রিশ সিংহাসন (১৮৫৪) পারস্য উপন্যাস (১৮৫৬) বা মধুসূদন চক্রবর্তীর কাব্য-উপন্যাস 'মধুমালিকা বিলাস' (১৮৪১) এই শিল্পকর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। এরই ভেতর প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। বাঙলা সাহিত্যে এই প্রথম একটি গ্রন্থ পাওয়া গেল যাতে তুলনামূলকভাবে উপন্যাসের লক্ষণ বেশী। তবু একে উপন্যাস না বলাই সঙ্গত। কারণ উপন্যাসের যে দৃঢ়বন্ধ ও কেন্দ্রগত কাহিনীর প্রয়োজন তা এতে নেই। শুধু 'আলালের ঘরের দুলাল' নয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের (দুর্গেশনন্দিনী) আগে আরো কয়েকটি উপাখ্যানধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—যা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করেছে। সে গ্রন্থগুলো হলো ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সফল স্বপ্ন' (১৮৫৭) ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' (১৮৬০), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬১) গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়বল্লভ' (১৮৬৩)। এর ভেতর ভূদেববাবুর 'সফল স্বপ্ন'কে কোন অর্থেই উপন্যাস বলা যায় না। তবে 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়' তৎকালীন সমাজ ও ধর্মের যে ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা যে কোন উপন্যাসের জন্যে বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু এই গ্রন্থেও কোন কেন্দ্রীয় ঘটনা নেই।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে উপন্যাসধর্মী রচনায় মাধ্যমে যে শিল্পরীতি ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছিলো তাই পরিণতি লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে প্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্যের নভেলের সব লক্ষণ একযোগে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাই বলে এর পরবর্তীকালে লিখিত সবগুলো উপন্যাসধর্মী রচনাই যে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো এমন কথা বলা যায় না। এই উক্তির সপক্ষে মধুসূদন দত্তের 'হেক্টর বধ' (১৮৬৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তি-বিলাস' (১৮৬৯) অথবা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'অভেদী'র (১৮৭১) নাম উল্লেখ করা যায়। তবে এ জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নেই। কারণ 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা উপন্যাসের গতিধারা তীব্রতা লাভ করে এবং রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র পর (১৯০৩) তা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়।
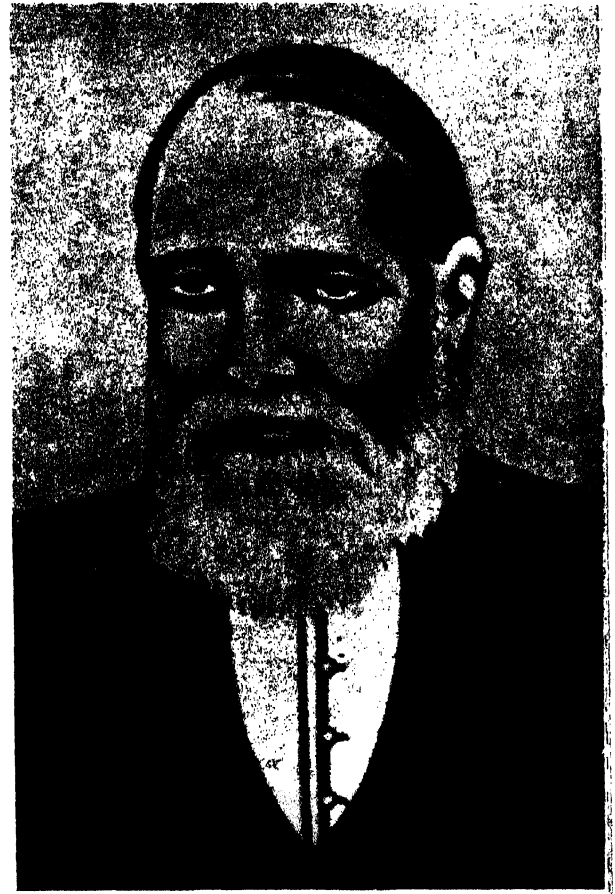
[illegible]: জমিদার দর্পণ প্রভৃতির লেখক মীর মশাররফ হোসেন

॥ দুই ॥

বাঙলা উপন্যাসশিল্প যখন সার্থকতার উত্তুঙ্গে তখনো মুসলিম সাহিত্যিকদের দৃষ্টি এদিকে পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়নি। শুধু অই নয় বাঙলা গদ্য বিকাশের পুরো অর্ধশতাব্দী পর খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর (১৮০৬-১৮৭০) 'উচিত শ্রবণ' প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিই মুসলিম রচিত বাঙলা গদ্যের আদি নিদর্শন। শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর 'ভাবনাও' (১৮৫৩) ও 'সুরতজান' নামক দুখানা কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। এছাড়াও এরপর আরো দুজন গদ্যশিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন গোলাম হোসেন এবং শেখ আজিমদ্দিন। কয়েকখানা নকশা ও প্রহসন রচনা করে তাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

পক্ষান্তরে মধ্যযুগীয় বাঙলা কাব্য সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান অবিসংবাদিত। কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' মুসলিম রচিত আদি কাব্য। এটি শুধু যে আদি কাব্য তা নয়, এটি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম পার্থিব প্রেমের কাব্যও(২) বটে। এই কাব্যটির আনুমানিক রচনকাল হলো চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। কারণ এই কাব্যের বর্ণনার মাধ্যমে অনুমিত(৩) সুলতান গিয়াসুদ্দীন আলম শাহের রাজত্বকাল ১৩৯১ খৃঃ থেকে ১৪১০ খৃষ্টাব্দ(৪)। অবশ্য কেউ কেউ এ মত সমর্থন করেন না। ৫ তাঁদের মতে শাহ মুহম্মদ সগীর চতুর্দশ শতাব্দীর কবি নন। তবে জৈনুদ্দীন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি সে ব্যাপারে সব ঐতিহাসিক এক মত পোষণ করেছেন।৬ অর্থাৎ যেখানে মুসলমানেরা চতুর্দশ শতাব্দী না হলেও পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম বাঙলা কাব্য রচনা করছেন, সেখানে মুসলমানদের দ্বারা প্রথম বাঙলা গদ্য লিখিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের (১৭৫৭) পর থেকে মুসলিম-মানসে এই অবক্ষয়ের সূচনা(৭) হলেও কাব্য-ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। মিশ্র ভাষা-রীতির কাব্য নামধেয় এই ধারাকে ডঃ আনিসুজ্জামান ফকির সংস্কৃতিধারার

নিদর্শন' বলে গণ্য করেছেন।৮ অতএব আধুনিক সাহিত্যালোচনায় এই বিস্মৃতির কথা কোনভাবেই আসে না।

॥ তিন ॥

মুসলমানদের দ্বারা রচিত প্রথম বাঙলা গদ্য (উচিত শ্রবণ : ১৮৬০) প্রকাশিত হওয়ার নয় বছর পর মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) রত্নবতী প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিই মুসলিম রচিত প্রথম উপাখ্যানধর্মী রচনা। ডঃ সুকুমার সেন "মুসলমান খৃষ্টান" সঞ্জাত নামীর 'দুঃখিনী কন্যা' (১৮৬৩) নামে একখানা "গদ্য আখ্যায়িকাস্ব" উল্লেখ করেছেন।৯ কিন্তু এখন সেই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য।

মীর মশাররফ হোসেন 'রত্নবতী'কে "কৌতুকাবহ উপন্যাস" বলে উল্লেখ করেছেন।১০ কিন্তু এই গ্রন্থটিকে কোন অর্থেই উপন্যাস বলা যায় না। যদিও মীর সাহেবের 'রত্নবতী' প্রকাশের চার বছর আগেই বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, তবু রূপে-রসে-ভাবে কোন দিক দিয়েই 'রত্নবতী'তে তার ছাপ নেই। 'রত্নবতী' একটি অতিক্ষুদ্র পুস্তক। মধ্যযুগীয় ভাবধারার অনুসরণে একটি নীতিবাক্যকে কেন্দ্র করে গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে একটি প্রশ্নের সমাধান প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, 'ধন বড় না বিদ্যা বড়'? লেখক কাহিনীটিকে কাল্পনিক বলে উল্লেখ করেছেন। "তবে মনে হয় লেখক প্রচলিত কোন লোককাহিনী থেকে এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন।"১১ নীচে সংক্ষেপে 'রত্নবতী'র কাহিনী প্রদান করা হল।

গুজরাট নগরের রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রিপুত্র সুমন্তের সঙ্গে ধন বড় না বিদ্যা বড় এই বিষয়ে মতভেদ হল। রাজপুত্রের মতে ধন বড়, মন্ত্রিপুত্রের মতে বিদ্যা বড়। প্রমাণের জন্যে তাঁরা দেশ পর্যটনে বের হলেন। রাজপুত্র বহু দেশ ভ্রমণ করে এক সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক বানর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। রাজপুত্র সরোবরে নেমে হস্তপদ প্রক্ষালন করার সময় সামান্য জল বানরের গায়ে পড়ায় তিনি একটি ক্রুদ্ধ মানুষে রূপান্তরিত হলেন। রাজপুত্র ভয় পেয়ে কাকুতিমিনতি করে তাঁকে শান্ত করলেন। সন্ন্যাসী অন্তর্দৃষ্টি বলে তাঁর উদ্দেশ্য জানতে পেরে তাঁকে একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করলেন এবং জানালেন যে, এই অঙ্গুরীয়ের কাছে তিনি যা চাইবেন তাই পাবেন। তবে তাঁকে পশ্চিম দিকে যেতে নিষেধ করলেন। রাজপুত্র সন্ন্যাসীর কথা অগ্রাহ্য করে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন এবং রত্নপুর নামক রাজ্যে উপনীত হলেন। জানতে পারলেন, রত্নপুরের রাজকন্যা রত্নবতী প্রতিজ্ঞা করেছেন, যিনি সাতদিন যাবৎ তাঁর ইচ্ছে পূরণ করতে পারবেন তিনি তাঁকেই পতিত্বে বরণ করবেন। রাজপুত্র পাঁচদিন পর্যন্ত সেই সন্ন্যাসী প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ের মাধ্যমে রাজকন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। বিস্মিতা রাজকন্যা তাঁর পরিচারিকার মাধ্যমে রাজপুত্রের শক্তির গোপন উৎস জানতে পেরে ষষ্ঠ দিবসে সেই অঙ্গুরীয় হস্তগত করলেন। ফলে সপ্তম দিবসে রাজপুত্র রাজকন্যার মনোবাঞ্ছা পূরণে ব্যর্থ হয়ে কারারুদ্ধ হলেন। ওদিকে মন্ত্রিপুত্র সুমন্তও চারিদিকে পর্যটন শেষে সেই সরোবর তীরে উপস্থিত হলেন, যেখানে বানররূপী সন্ন্যাসী তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। মন্ত্রিপুত্রের ব্যবহৃত জল বানরের গায়ে পড়ায় তিনি একজন সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হলেন। ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী মন্ত্রিপুত্রের আক্ষেপে তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর প্রদান করলেন যে, তিনি চাইলেই নিজের রূপ পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে তাঁকেও পশ্চিমদিকে যেতে নিষেধ করা হল। চতুর মন্ত্রিপুত্র লক্ষ্য করলেন, সরোবরের একদিকের জল স্পর্শে বানর মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে, আবার অন্যদিকের জলস্পর্শে মানুষ বানরে রূপান্তরিত হয়েছে। অতএব তিনি দুটো পাত্রে উভয়বিধ জল নিয়ে সন্ন্যাসীর কথা অগ্রাহ্য করে পশ্চিমদিকে যাত্রা করলেন। কতদূর গিয়েই তিনি রত্নপুরে পৌঁছুলেন এবং একটা সরোবর তীরে বসে থেকে সরোবর থেকে জল উত্তোলনরতা কয়েকজন পরিচারিকার কাছে রাজ্যের রাজকন্যার প্রতিজ্ঞার কথা জানতে পারলেন। আরো জানতে পারলেন, বহু রাজপুত্র রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা পূরণে ব্যর্থ হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। এই দলে সুকুমার নামে একজন রাজপুত্রও রয়েছেন। মন্ত্রিপুত্র বন্ধুর পরিণতি বুঝতে পারলেন। এর প্রতিকারের আশায় তিনি জলপানের নাম করে পরিচারিকাদের একজনের জলপাত্রে তাঁর সঙ্গে রক্ষিত সামান্য জল ঢেলে দিলেন। এই জলের প্রভাবে রাজপুত্রী, দাসীবৃন্দ ও রাজমহিষী বানরীতে রূপান্তরিত হলেন। রাজার এই দুঃখের সময় শ্রীমন্ত একজন ব্রাহ্মণ গণকের রূপ ধারণ করে রাজাকে বললেন যে, তাঁর মেয়ের পাপের জন্যেই এই অবস্থা। তবে কালে একজন সন্ন্যাসী আসবেন যিনি এর প্রতিবিধান করতে পারবেন। সন্ন্যাসীর রূপ ধরে শ্রীমন্ত পরদিন সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া সবাইকে মানবীতে রূপান্তরিত করলেন। রাজা রত্নধ্বজ সন্তুষ্ট হয়ে রাজপুত্র সুকুমারকে তাঁর কন্যা এবং সুমন্তকে মন্ত্রিতনয়া অর্পণ করে প্রভূত ধনসম্পদ দিয়ে বিদায় করলেন। এ কথা শুনে রাজপুত্র স্বীকার করলেন যে, ধন অপেক্ষা বিদ্যা বড়।

উপরের কাহিনী থেকে একটা কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, 'রত্নবতী'কে কোন অর্থেই উপন্যাস বলা চলে না। রাজকন্যা রত্নবতীকে কেন্দ্র করে একটা কাহিনী গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু কাহিনীতে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব নেই। সাধারণ রূপকথা বা লোক-কাহিনীর মতো সমান্তরাল বেগে এর ঘটনাধারা এগিয়ে গেছে। এর পরিবেশ সাধারণ দেশকালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। সুদূর গুজরাট নগরের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক কোন স্থলেই বাঙলাদেশের সাধারণ পরিবেশের কথা বিস্মৃত হননি। রাজসভা, রাজ্যস্থিত বাগান ও সরোবর, পরিচারিকাদের কথোপ-

চিত্রিত। এই চিত্র মধ্যযুগের আখ্যায়িকা কাব্যগুলোর সঙ্গে বিশেষভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই পরিবেশচেতনা মধ্যযুগের যে-কোন কাব্যে—সে হিন্দুর লিখিত হোক, কি মুসলমানের—লক্ষ্যযোগ্য। অবশ্য একে এ জাতীয় কাব্যের প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করাই অধিকতর শ্রেয়। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে এ জাতীয় বহু কাহিনী রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—ওসব কাহিনীতেও কোন প্রকার দ্বন্দ্ব নেই। প্রায় কাহিনী একটা অবধারিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে—যা পাশ্চাত্য রীতিতে লিখিত উপন্যাস শিল্পের পরিপন্থী। গোটা কাহিনীটি গড়ে উঠেছে অতিপ্রাকৃত চিন্তা-ভাবনার উপর। সরোবরের জলস্পর্শ পেয়ে মানুষে বানরের রূপ ধারণ, আবার মানুষে রূপান্তর, অঙ্গুরীয়তে যদেচ্ছাপ্রাপ্তি, সন্ন্যাসীর বরে নিজ রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে যে বাস্তবের শুধু সম্পর্ক নেই তা নয়, বাস্তবে এ জাতীয় ঘটনা অসম্ভবও। এসব অতিপ্রাকৃত ঘটনা ছাড়া এ জাতীয় রচনার জট খোলাও যায় না। মধ্যযুগীয় প্রায় সব কাব্য-সাহিত্যে এ জাতীয় ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সম্পূর্ণ অবাস্তব অতিপ্রকৃত-নির্ভর কাহিনীবিন্যাস মিশ্র ভাষারীতির কাব্যেই বেশী দেখা যায়।

কাহিনীটি গতানুগতিক রূপকথা জাতীয়। তবু 'রত্নবতী'র পূর্বেও এ জাতীয় কয়েকটা কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে রাজকন্যা তাঁর বিয়ের ব্যাপারে এ জাতীয় শর্ত আরোপ করেছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার শর্ত ছিলো, যে বিদ্যায় তাঁকে হারাতে পারবেন, তাঁকেই তিনি স্বামিত্বে বরণ করবেন। মিশ্র ভাষারীতি কাব্যে হাতেম তায়ীর ঘটনাতেও রাজকুমারীর বিয়ের ব্যাপারে এ জাতীয় শর্ত আরোপের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ দুটো কাব্যের কোনটাতেই এত স্থূলে শর্ত আরোপ করা হয়নি, যেমনটি 'রত্নবতী'তে হয়েছে। বিদ্যার গৌরব ছিলো তাঁর শিক্ষার। তাই তিনি সেটি জাহির করছেন। হাতেম তায়ীর নায়িকা হুসনা বাণু সাতটি সওয়ালের জবাব দাবী করছেন জ্ঞানী হবার জন্যে। এসব প্রশ্নের জবাব সংগ্রহ করতে হাতেমকে জানের ঝুঁকি নিয়ে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে তা পাঠকমাত্রই জানেন। রত্নবতীর প্রথমদিনের প্রার্থনা "বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা", দ্বিতীয় দিনের প্রার্থনা "বিংশতি সহস্র" রৌপ্যমুদ্রা, পরের প্রার্থনা গজমুক্তা। অবশেষে তাঁর অলৌকিক কৌশলের কথা অবহিত হয়ে তিনি সেই অঙ্গুরীয় প্রার্থনা করে বসলেন—যা তাঁর প্রার্থনা চরিতার্থতার উৎস। মজার কথা হল, এই আখ্যায়িকার বহু আগে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কাব্যকারেরা যে বুদ্ধিমত্তা ও উদ্দেশ্য প্রবণতার পরিচয় প্রদান করেছেন, মীর মশাররফ হোসেনের পক্ষে তাও সম্ভব হয়নি।

এই আখ্যায়িকায় কয়েকটি চরিত্র রয়েছে। সে সব চরিত্রের মাধ্যমে গড়ে ওঠা কাহিনীর গতি কেন্দ্রাভিমুখী—যা উপন্যাসের একটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু যেহেতু গল্পটিতে কোন প্রকার উপ-কাহিনী নেই, সেহেতু ঘটনাটি জমাট বেঁধে ওঠেনি। একই কথা এই গল্পের চরিত্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কাহিনীটিতে দু ধরনের চরিত্র রয়েছে। একদিকে রয়েছে রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানুষ যারা প্রকৃতির বশীভূত। অন্যদিকে রয়েছে সেই সরোবরতীরস্থ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সন্ন্যাসী। একে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। মধ্যযুগে এ জাতীয় চরিত্রের আমদানী ঘটে কাহিনীর গতিধারা নিয়ন্ত্রণের জন্যে। কারণ তৎকালীন লেখকেরা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলে তাঁদের পক্ষে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে কাহিনীতে পরিবর্তন [illegible] করা অথবা কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত না। অতএব সেকালের জন্যে এ জাতীয় চরিত্র আমদানীর কারণ উপলব্ধি করা সহজ। চরিত্রগুলোতে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব নেই। গোটা গ্রন্থে মাত্র দুটো চরিত্রে খানিকটা দ্বন্দ্বের আভাষ পাওয়া যায়। এর একটা হল মন্ত্রিপুত্র সুমন্ত, অন্যটা রাজা রত্নধ্বজ। মন্ত্রিপুত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে কোন প্রকার নতুনত্ব নেই। কর্তব্যের আহ্বানে তিনি পর্যটনে বেরিয়েছেন এবং বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণ তাঁকে এই কাহিনীর কেন্দ্রমূলে নিয়ে এসেছে। সে হিসেবে মন্ত্রিপুত্রের কাজকে বন্ধুবাৎসল্য আখ্যা দেওয়াটা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তবে রাজা রত্নধ্বজের দ্বন্দ্ব সত্যি বাস্তবানুগ। রত্নধ্বজের চরিত্রে দুটো পরস্পরবিরোধী ভাবনা কাজ করছে। একদিকে তিনি একমাত্র কন্যা রত্নবতীর আশাআকাঙ্ক্ষা অসঙ্গত, অবাস্তব ও অসম্ভব জেনেও নিছক স্নেহমমতার আকর্ষণে তাঁকে বাধা প্রদান করছেন না। অন্যদিকে যেসব রাজপুত্র বা রাজপুরুষ রাজকন্যার এ জাতীয় কাজের শিকারে পরিণত হচ্ছেন তাঁদের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি রয়েছে অফুরন্ত। এ কারণেই তিনি প্রথমে রাজপুত্রকে তাঁর কন্যার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা প্রদান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজপুত্রকে দেখে তাঁর ভেতরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু তিনিও স্বভাবের বশ—যার বেশীর ভাগ জুড়ে রয়েছে পুত্রীস্নেহ। রানীর চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা দুর্বল। কারণ সাধারণত এ জাতীয় কাহিনীতে মায়েরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানে বিদ্যার মার ভূমিকা স্মরণ করলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। সুন্দরকে দেখে মার আকুলতা এবং মেয়ের পরিণতি দেখে উৎকণ্ঠার যে পরিচয় এই কাব্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা সত্যি অপূর্ব। 'রত্নবতী'তে মার কোন ভূমিকা নেই। মেয়ে বানরী হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে ধরার জন্যে সরোবরে ঝাঁপ দেওয়ার পর তিনিও বানরীতে রূপান্তরিত হলেন। এই দৃশ্যটি এত সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, মার চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যই পাঠকের চোখে পড়ে না।

'রত্নবতী' প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে। মীর সাহেবের

ঘরের দুলাল' এবং তারও কয়েক যুগ আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শহর কলকাতার বিভিন্ন জীবনধর্মী চিত্র সংবলিত 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'নববাবু বিলাস' প্রকাশিত হয়েছে। এসব রচনার পরিণতি হিসেবে পাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী'। 'রত্নবতী'র আগে এতগুলো রচনা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও মীর সাহেব সার্থক উপন্যাস না হোক, একটি জীবনধর্মী আখ্যায়িকা রচনা করতে পারলেন না কেন? 'রত্নবতী'র ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী যে সমকালীন সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে। অতএব এ প্রসঙ্গে মীর সাহেবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অথচ অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) ও 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) দেখে তাঁর সমাজ চেতনা সম্পর্কেও কোন সন্দেহ করা চলে না। এ প্রসঙ্গে 'বসন্তকুমারী নাটকে' মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র এবং 'জমীদার দর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র অন্য কিছু না হোক নামের প্রভাবের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। অতএব মনে হয় মীর সাহেব তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের রচনা পড়েছিলেন। তবে সদ্য আবিষ্কৃত উপন্যাসশিল্পের অন্তর্নিহিত শৈল্পিক টেকনিক ও ভাবসৌন্দর্য অবলোকনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। উপন্যাস শিল্পরীতি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্ত্য থেকে আমদানী। অতএব এর টেকনিক ও শিল্পরূপ সম্পর্কে মীর সাহেব ওয়াকিবহাল ছিলেন না। কারণ তিনি ইংরেজী জানতেন এরকম কোন প্রমাণ এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। এছাড়া মিশ্রভাষারীতির কাব্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণও এর জন্যে দায়ী হতে পারে।

॥ চার ॥

'রত্নবতী' প্রকাশিত হবার পর মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যে-পদ্যে আরো কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলো হলো 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩), 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩), 'গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু' (১৮৭৩), 'এর উপায় কী' (১৮৭৬) ইত্যাদি। এরপরই প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত আখ্যায়িকামূলক রচনা 'বিষাদ সিন্ধু'। প্রকৃতপক্ষে 'বিষাদ সিন্ধু' থেকেই (১৮৮৫) মুসলিম রচিত বাঙলা উপন্যাসের সূচনা। প্রকৃষ্ট শিল্পের আলোকে দেখলে এই গ্রন্থেও বহু ত্রুটি লক্ষ করা যাবে। তবু কাহিনী, পটভূমিকা, চরিত্র নির্মাণ ইত্যাদি বিবেচনা করলে এই গ্রন্থে উপন্যাসের বহু লক্ষণ লক্ষ্যগোচর হবে।

'বিষাদ সিন্ধু' মোট তিন পর্বে সমাপ্ত। প্রথম পর্ব (মহরম) প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় পর্ব (উদ্ধার) ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৃতীয় পর্ব (এজিদ-বধ) ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। এর ফাঁকে তাঁর অন্যান্য বিষয়ে রচনা অব্যাহত থাকে। তবে সমসাময়িক কালে 'বিষাদ সিন্ধু'র মতো এত বৃহৎ উপন্যাস খুব একটা ছিল না।

'বিষাদ সিন্ধু' মহররমের বিয়োগান্ত ঘটনা নিয়ে লিখিত। অতএব এই ঘটনাটি ঐতিহাসিক। সাহিত্যের যেসব লক্ষণকে আমরা আধুনিক আখ্যা দিয়ে থাকি ইতিহাসচেতনা তার অন্যতম। সেদিক থেকে বিচার করলে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। অবশ্য 'বিষাদ সিন্ধু'র আগে বঙ্কিমচন্দ্রের যে কয়েকটা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে১২ তার প্রায় সবগুলোতেই ইতিহাসের ছাপ রয়েছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে যেভাবে স্থাপন করেছেন, সেভাবে মীর সাহেব করতে পারেননি। তবু মুসলিম রচিত প্রথম উপন্যাস যে একটা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে সেটিও কম কথা নয়।

'বিষাদ সিন্ধু' যখন ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে তখন নিশ্চয়ই এর একটা উৎস রয়েছে। সে উৎস কি? এ সম্পর্কে মীর সাহেবের মত হল "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ সিন্ধু' বিরচিত হইল।"১৩ লেখক একথা বললেও উপন্যাস পাঠে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ এ যাবৎ যতগুলো ইতিহাসগ্রন্থ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় গোটা উপন্যাসের কাঠামো ছাড়া অনেক কিছুই ইতিহাসে নেই। এজিদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সম্পর্কেও সব ইতিহাস এক কথা বলে না। কারণ মুসলিম জগতে শিয়া ও সুন্নী বলে যে উপভাগের অস্তিত্ব রয়েছে তাদের মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী। এ কারণে মানসিকতা বিচারে মতামতও যে পরস্পরবিরোধী হবে তা বলাই বাহুল্য। অতএব কোনো কোনো ইতিহাসে এজিদ যেমন হীনচিত্রে চিত্রিত হয়েছেন১৪ তেমনি কোনো কোনো ইতিহাসে তাঁর চরিত্রের বহু সদগুণ উদ্ঘাটিত হয়েছে।১৫ সেদিক দিয়ে বিচার করলে এজিদ চরিত্রের ভিত্তিও নিরূপণ করা যায় না। এজিদের বিরুদ্ধে কোনো কোনো ঐতিহাসিক যেমন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তার যাথার্থ্য যাই হোক না কেন তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের বহু দিক প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু যেহেতু এজিদ-হোসেন বিরোধকে আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ না করে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করি, সেহেতু চরিত্রটির প্রতি কখনো সুবিচার করা সম্ভব হয় না। তথাপি 'বিষাদ সিন্ধু'তে আরবী ও ফারসী কেতাবের নাম করে মীর সাহেব যা বিবৃত করেছেন তা আসলে মিশ্র ভাষারীতি কাব্যের হুবহু অনুকরণ। কোন কোন সমালোচক১৬ কবি হেয়াত মামুদের 'জঙ্গনামা' এবং গরীবুল্লার 'জঙ্গনামা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরাও নিজেদের কাব্যরচনার সময় মশাররফ হোসেনের ন্যায় আরবী-ফারসী কেতাবের দোহাই দিয়েছিলেন। অতএব মীর সাহেব এসব পুঁথি থেকে শুধু কাহিনীই চয়ন করেননি, কাহিনীর উৎসের ব্যাপারটাও গ্রহণ করেছেন। এ কারণে একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত হলেও এতে এমনসব ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে যা শুধু অনৈতিহাসিকই নয়, অবাস্তব ও অতিপ্রাকৃতও বটে। হজরত মুহম্মদের [illegible]

'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' রব, বৃক্ষ থেকে শোণিতধারা নির্গমণ, ইমাম হোসেনের খণ্ডিত মস্তক তাঁর দেহে পুনঃ সংযোজন, এজিদ ও হামিদার পরিণতি ইত্যাদি ঘটনা পুঁথি থেকেই আহৃত।

আমরা 'রত্নবতী' আলোচনা করে দেখেছি, তাতে উপন্যাসের কোন লক্ষণই নেই সেটি একটি রূপকথা জাতীয় আখ্যায়িকা। কিন্তু 'বিষাদ সিন্ধু' কি উপন্যাস এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থটির অতিপ্রাকৃত অংশগুলোর কথা মনে আসে—এ আমরা ইতিহাস প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। এসব অতিপ্রাকৃত ঘটনা কোন উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারে না। অতএব সেই দৃষ্টিতে দেখলে 'বিষাদ সিন্ধু'কে উপন্যাস বলা যায় না। কিন্তু 'বিষাদ সিন্ধু'তে একটি কাহিনী রয়েছে এবং সে কাহিনীকে কেন্দ্র করে বহু উপকাহিনী গড়ে উঠেছে—যা উপন্যাসের একটি প্রধান লক্ষণ। অবশ্য লেখক কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিকথনের দরুন কাহিনীগুলোকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। কাহিনীর আরো একটি ত্রুটি হল, গোটা গ্রন্থে যে কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে তা নির্দ্বন্দ্ব গতিতে এগিয়ে গিয়ে পরিণতি লাভ করেছে। কাহিনীটি বহুল পরিচিত হওয়ায় এর গতি আরো সহজ ও স্বচ্ছন্দ মনে হয়। লেখক কোথাও দ্বন্দ্বের মাধ্যমে কাহিনীতে গতি সঞ্চার করতে চাননি। 'বিষাদ সিন্ধু'তে লেখক নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে গোটা কাহিনীটিকে অনুসরণ করেছেন। ফলে কোথাও এর ধর্মীয় ভাবধারা কাহিনীটিকে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবে পাঠ করলে মনে হবে এই গ্রন্থটিতে ধর্মের প্রাধান্য বেশী। কিন্তু "যেদিক থেকে বিচার করি না কেন, আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মীর মশাররফ হোসেনের মানবপ্রীতি ও শিল্পবোধ 'বিষাদ সিন্ধু'র ধর্মীয় উদ্দেশ্য গুরুতর রূপে ব্যাহত করেছে।"১৭ এই 'মানবপ্রীতি ও শিল্পবোধ' বিষাদ-সিন্ধুর অন্যান্য ত্রুটিকে আচ্ছন্ন করে তাকে একটি উপন্যাসের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। 'বিষাদ সিন্ধু'র ভাষা আবেগপ্রধান। মীর মশাররফ হোসেনের ভাষা তার আগেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এই উপন্যাসের ভাষায় কাব্যময়তা পাঠকের মনে নতুন করে চমক সৃষ্টি করে। এই উপন্যাসের আয়তন, বিষয়বস্তু, তার সূচনা ও পরিণতি মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, মাইকেল মধুসূদন দত্তও কারবালার ঘটনা নিয়ে একটি মহাকাব্য লেখার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। মাইকেলের এই বাসনা মীর সাহেবকে এই গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল কিনা বলা যায় না, তবে এতে মাইকেলের প্রভাব লক্ষ্যগোচর।

'বিষাদ-সিন্ধু' একটি চরিত্রপ্রধান উপন্যাস। তবে এর চরিত্রগুলোর সাধারণ গতি পরস্পরবিরোধী এবং কাহিনীর মতো চরিত্রগুলোও নির্দ্বন্দ্ব। এর একদিকে রয়েছে ইমাম হাসান, হোসেন, মোসলেম কাসেম, আবদুল ওহাব জাতীয় মহৎ চরিত্র; অন্য দিকে মারোয়ান, আবদুল্লাহ জেয়াদ, সীমার জাতীয় পাষণ্ড, কুৎসিত ও নীচ চরিত্র এসব চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব নেই। সবগুলো চরিত্র সমান্তরাল বেগে এগিয়ে গিয়েছে এবং একটি পূর্বনির্ধারিত প্রান্তে পরিণতি লাভ করেছে।

গোটা গ্রন্থে একটিমাত্র চরিত্র রয়েছে যাতে তাবৎ মানবিক আবেগ-অনুভূতি আরোপ করা হয়েছে। সেটি এজিদ-চরিত্র। চরিত্রটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যে ধর্মবোধ সেদিন কর রাজনৈতিক ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল তাকে নির্দ্বিধায় অতিক্রম করে এমন একটি প্রাণস্পর্শী, আবেগময় ও বীর্যবান চরিত্র নির্মাণ করা কম কথা নয়। এই এজিদ যেন সেদিনের ইমামহন্তা এজিদ নন, তিনি এমন একজন প্রাণবান পুরুষ যিনি বিচক্ষণ রাজনীতিতে, দক্ষ কূটনীতিতে, কুশল ও অকুতোভয় সমরক্ষেত্রে, প্রেমিক ব্যক্তিগত জীবনে, দানশীল তাঁর প্রজাদের ক্ষেত্রে। লেখকের সচেতন মানসিকতার ছাপ এই চরিত্রের সর্বত্র বিদ্যমান। এই কারণে সবার উপরে একটা তীব্র বিরহবেদনা তাঁর অন্তরকে বার বার দোলায়িত করে তাঁর সত্তাকে সমূল বিপর্যস্ত করে তোলে। এই বিপর্যয় মূলত মানবীয় এবং এর আবেদনও সার্বজনীন। মীর মানসের এই সার্বজনীন দিকটি সমগ্র উপন্যাসের একমাত্র এজিদ চরিত্রেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এজিদ দোষেগুণে মানুষ। যে প্রবল রূপতৃষ্ণা থেকে এই উপন্যাসের সূচনা, সেই রূপের অদৃশ্য আগুনের মর্মান্তিক দহনের ভেতর তার পরিসমাপ্তি মীর মশাররফ হোসেন অত্যন্ত সচেতনভাবে চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। মানবিক অনুভূতির যে ছিদ্রপথ বেয়ে ট্রাজেডীর বীজ উপ্ত হয় এবং তা পরিণামে বিরাট মহীরুহের রূপ ধরে গোটা কাহিনীকে একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যায় তার সবগুলো লক্ষণ 'বিষাদ-সিন্ধু'তে সজ্ঞানে বিন্যস্ত। এজিদ একজন প্রেমিক—যে কারণে রূপের আগুনে দগ্ধ; এজিদ একজন মানব, যে কারণে সামগ্রিকভাবে তিনি হাসি ও কান্নাকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে এজিদ একজন দক্ষ শাসক—যিনি প্রজাপর্যায়ে সুবিচার প্রদানে বদ্ধপরিকর, প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্যে নীচতা ও হীনতা অবলম্বনে পরাঙ্মুখ, স্বীয় সভাসদের সাথে সর্ববিষয়ে পরামর্শ গ্রহণে উৎসাহী, যুদ্ধক্ষেত্রে একজন অকুতোভয় সৈনিক। এতগুলো মানবিক গুণ আরোপ করেছেন শুধু চরিত্রটিকে মহত্ত্ব প্রদানের জন্যে। পুঁথি সাহিত্যের সঙ্গে এই লেখকের পার্থক্য এখানে মৌলিক। এমন মানবিক আবেগ-অনুভূতি আরোপ করে একটা চরিত্রে এমন প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা এর আগে মুসলিম শিল্পীদের পক্ষে অকল্পনীয় ছিল।

এজিদ ছাড়া আরো দুটো চরিত্রে মানবিক অনুভূতি আরোপ করা হয়েছে। এর একটা হল ইমাম হাসানের দ্বিতীয় স্ত্রী জায়েদা। জায়েদা চরিত্রের মাধ্যমে মীর সাহেব সপত্নীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। এই সপত্নীবাদ তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থে নিন্দিত হয়েছে। 'বসন্তকুমারী নাটকে'র উপজীব্য এই সপত্নীবাদ। এছাড়া তাঁর পরবর্তীকালের রচনায়ও এর ছাপ রয়েছে। কারণ তিনি নিজেও এর নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছিলেন।১৮ শুধু তাই নয়, তাঁর সাহিত্য [illegible]

হয়েছিল।"১৯ জায়েদা ইমাম হাসানকে ভালোবাসেন। অতএব প্রথম স্ত্রী হাসনাবানুর প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। অথচ এতদিন তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু "হাসনাবানুর ভয়ে যে আগুন এতদিন চাপা ছিল, ক্রমে ক্রমে জয়নাবের রূপরাশিজ্যোতিঃতেজে উত্তেজিত হইয়া সেই আগুন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল।"২০ অতএব তাঁর ভেতর একটা অপরিসীম দ্বন্দ্বের সূচনা হল। এই দ্বন্দ্বের প্রাক্কালে মায়মুনার আবির্ভাব। তাঁর কাছে জায়েদা মনের কপাট খুলে দিলেন। সুযোগ বুঝে মায়মুনা হাসানকে হত্যায় প্ররোচনা করল। বিনিময়ে এজিদের পত্নীত্ব লাভ। এবার জায়েদার ভেতর এই দ্বন্দ্ব বাস্তব রূপ লাভ করল। "একদিকে রাজভোগের লোভ, অপর দিকে স্বামীর প্রণয়, এই দুটি ক্রমে ক্রমে তুলনা করিতে লাগিলেন। যদি জায়েদা হাসানের পত্নী না হইতেন, যদি জায়েদা সপত্নীর ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত না হইতেন, তবে কি আজ জায়েদা বিবেচনা-তুলাদন্ডের প্রতি নির্ভর করিয়া সম্পত্তি সুখ সমুদয় একদিকে, আর স্বামীর প্রণয়, প্রাণ—ভিন্নদিকে ঝুলাইয়া পরিমাণ করিতে বসিতেন? কখনই নহে। কতবার পরিবর্তন করিলেন, দুরাশা পাষাণ ভাঙিয়া তুলাদন্ড মনোমত ঠিক করিয়া অসীম সুখভাব চাপাইয়া দিলেন, তথাচ স্বামীর প্রাণের দিকেই বেশী ভারী হইল। কিন্তু জয়নবের নাম মনে পড়িবামাত্রই পরিমাণদন্ডের যে দিকে স্বামীর প্রাণ, সেই দিক একেবারে লঘু হইয়া উচ্চে উঠিল। হঠাৎ একদিকের লঘুতাপ্রাপ্ত রাজভোগ, ধনলাভস্পৃহা-পরিমাণ একেবারে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া জায়েদার মন ভারী করিয়া ফেলিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও বিবেচনা তুলাদন্ড স্বামীর প্রাণের দিকে আর নীচে নামাইতে পারিলেন না।"২১ এই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত জায়েদার শেষ সিদ্ধান্ত, "আমার কেহ নাই, আমিও কাহার নহি। জায়েদাই যদি বঞ্চিত হইল, জায়েদাই যদি মনের আগুনে পুড়িতে থাকিল তবে তাহার চক্ষের উপর জয়নাব সুখভোগ করিবে, তাহা কখনই হইবে না।"২২ কিন্তু এত যন্ত্রণার ভেতরও দ্বন্দ্বের অবসান হল না। হাসানকে বিষ প্রয়োগ করতে গিয়ে আবারো প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করলেন জায়েদা। ঘুমন্ত হাসানের মুখ দেখে তাঁর অন্তরের প্রেম অনির্বাণ দীপশিখার মতো জ্বলে উঠল। তিনি "হাসানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে মুখ, বক্ষ, উরু ও পদতল পর্যন্ত সর্বাঙ্গে চক্ষু পড়িলে আর সে ভাব থাকিল না। তাড়াতাড়ি বিষের পুটলি খুলিয়া সোরাহীর মুখের কাপড়ের উপর সমুদয় হীরক-চূর্ণ ঢালিয়া দিলেন। দক্ষিণ হস্তে সোরাহীর মুখবন্ধবস্ত্রের উপর বিষ ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। হাসানের পদতলে যাহাকে দেখিলেন, তাহাকেই বার বার বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। স্বামীর মুখপানে আর ফিরিয়া চাহিলেন না।"২৩ এ কাজের প্রতিক্রিয়া তাঁর ভেতর কতদূর হবে সে সম্পর্কেও যে জায়েদা সতর্ক ছিলেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না যখন তাঁকে বলতে শুনি—"যদি জায়েদা বাঁচিয়া থাকে, তবে দেখিস জায়েদার মনের দুঃখের পরিমাণ কত?"২৪ অতএব জায়েদা চরিত্রটিও পুরোপুরিই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত।

মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ আরেকটি চরিত্র হল হামান। হামান এজিদের সভা... হলেও অন্যান্যদের মতো তিনি কুটিল ও স্বার্থপর নন। যে কারণে এজিদের সঙ্গেও অনেক সময় তাঁর মতভেদ হয়েছে এবং এই মতভেদের দরুন তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কারাগারে হামানের স্বগতোক্তি একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিকের কথা মনে করিয়ে দেয়। কারণ, তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারেন "স্বাধীনতা-ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও আর সে মহামূল্য রত্ন হস্তগত হয় না। স্বাধীনতা-সূ... একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদয় হওয়া বড় ভাগ্যের কথা।"২৫ এ কারণেই এজিদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েও এজিদের জন্যে তিনি চিন্তিত এবং এজিদের পরিণতির কথা শুনে "দেখিবার মধ্যে দেখা গেল চক্ষের জল, আর শুনিবার মধ্যে শুনা গেল দীর্ঘ নিশ্বাস।"২৬

আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি যে, 'বিষাদ-সিন্ধু' একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এর প্রেরণামূলে মিশ্র ভাষারীতির কাব্য। কিন্তু কাহিনীর বাইরে এই কাব্যের প্রাণমূলে পুঁথিসাহিত্যের কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রভাবই সর্বাপেক্ষা বেশী। মাইকেলের জীবনের সঙ্গে যেমন মীর মশাররফ হোসেনের জীবনের কিছুটা মিল রয়েছে, তেমনি তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু'র মিল রয়েছে। মাইকেল মধুসূদন যেমন হিন্দু পুরাণের একটি বহু পরিচিত ঘটনাকে তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেছেন, তেমনি মশাররফ হোসেন মুসলিম জগতে পরিচিত একটি কাহিনীকে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাবণ চরিত্রের সঙ্গেও এজিদ চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। যে-প্রেম মাইকেলের কাব্যে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই প্রেমই 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রত্যক্ষ প্রেরণা। ধনে-জনে, শৌর্যে-বীর্যে, দানে-দাক্ষিণ্যে রাবণের মতো এজিদও অদ্বিতীয়। তবু রাবণের মতো এজিদকে পরাভব স্বীকার করতে হল। দুটো রচনাই মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। কারণ, রাবণের পতনের সঙ্গে যেমন লঙ্কার মান-সম্ভ্রম নির্ভরশীল, তেমনি এজিদের পতনের সঙ্গে দামেস্কের। এ কারণেই এই দুটো নগরীর পতনকে দুটি উদ্দীপ্ত মানসিকতার পতন হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে—যাতে জাতীয়তা-বোধ আরোপিত। রাম-রাবণ সম্পর্কে সাধারণ ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অনুভূতি এবং হোসেন-এজিদ সম্পর্কে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অনুভূতি অভিন্ন। অবশেষে উভয় কবিই এই দুটি ঘৃণ্য চরিত্রে মানবিক অনুভূতি আরোপ করে তাঁদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ফলে উভয়েই বহিরাক্রমণ থেকে স্ব স্ব দেশ উদ্ধারের জন্যে বদ্ধপরিকর। মাইকেল সমুদ্রের প্রতি সম্বোধনের নামে যে স্বাধীনতার জয়গান করেছেন, মীর সাহেব সেই স্বাধীনতারই জয়গান

জীবিত এজিদের অন্তর্ধানেরও মিল রয়েছে। কাব্যদ্বয়ে এত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও পরিণতি এক নয়। রাবণের তুলনায় এজিদের পরিণতি আরো বেশী করুণ, ভয়াবহ ও শোকাবহ। রাবণের মতো এজিদও বুঝতে পেরেছিলেন, নিয়তি তাঁর বিপক্ষে। কিন্তু রাবণ যেখানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি, সেখানে এজিদ কেন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন? এই চরিত্রের কোথাও তো এত হীনম্মন্যতা লক্ষ করা যায়নি। যিনি একা জীবিত থাকতেও মোহাম্মদ হামিদাকে দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করতে দিতে নারাজ, শেষে কেন তিনি লাঙ্গুল গুটিয়ে পালালেন? এখানে মীর-মানসদ্বন্দ্ব সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকটিত। কারণ, মাইকেল খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে হিন্দু ধর্মের কোন আবেগের দ্বারা পরিচালিত না হওয়া তাঁর পক্ষে এমন কিছু নয়। কিন্তু মীরের ক্ষেত্রে সে কথা খাটে না। তাঁর ব্যক্তিগত মানসিকতা যাই হোক না কেন, তাঁর পক্ষে পরিবেশ ও পারিবারিক ধর্মবোধকে অস্বীকার করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। এই ধর্মীয় আবেগই 'বিষাদ-সিন্ধু'র শেষে বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল। কারণ, হজরত মোহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কি তা তিনি জানতেন। এ কারণেই তাঁকে এজিদের এমন ভয়াবহ চিত্র আঁকতে হয়েছে তাঁর নিজ হাতে গড়া সোনার প্রতিমা নিজ হাতেই বিসর্জন দিতে হয়েছে। এই বিসর্জনের বেদনা মোহাম্মদ হামিদার পরিণতিতে প্রত্যক্ষগোচর। মোহাম্মদ হামিদার উন্মুক্ত অসির শিকার গোটা মদিনা ও দামেস্ক হতে পারে— কিন্তু পারেন না একটি ব্যক্তি। তিনি এজিদ নামদার। অতএব "শিল্পীর অদৃশ্য মহাশক্তিই যেন নিয়তির রূপ ধারণ করে, হামিদার প্রতিহিংসা চরিতার্থতা লাভ করার প্রাক্‌মুহূর্তে, নিজের বরপুত্র এজিদকে অন্তরীক্ষে টেনে নিয়ে গিয়ে চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করল।"২৭ তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই গ্রন্থের পরিণতিতে একজন খাঁটি মুসলমান মীর মানসে সওয়ার হয়েছিল—যাঁর হাতে শিল্পী মীরের পরাভব ঘটেছে।

॥ পাঁচ ॥

'বিষাদ-সিন্ধু'র পর মীর মশাররফ হোসেনের আরো দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ দুটোর মূলে ভিত্তি মীর মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী। তবে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' বহুলাংশে উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। কাহিনীর সঙ্গে মীর সাহেবের পারিবারিক জীবনের বা সমকালীন কোন ঘটনার সম্পর্ক ভুলে যেতে পারলে গ্রন্থটিকে নির্ভেজাল উপন্যাসও আখ্যা দেওয়া যায়—যেখানে গ্রন্থস্থিত দোষ-ত্রুটি সাধারণ নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রাহ্য করে তার আলোচনা-সমালোচনা সম্ভব। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' একটি রস-রচনা। তবে এতেও উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ রয়েছে।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলোকে মীর মশাররফ হোসেন 'তরঙ্গ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই গ্রন্থে সর্বমোট বিয়াল্লিশটি 'তরঙ্গ' রয়েছে। প্রত্যেকটি তরঙ্গের আলাদা আলাদা শীর্ষনাম দেওয়া হয়েছে।

'উদাসীন পথিকের মনের কথায় দুটো ভাগ রয়েছে। একভাগে মীর সাহেবের পারিবারিক জীবন। অপর ভাগে নীলকর কেনীর বিবরণ এবং ইতিহাসখ্যাত নীল বিদ্রোহের বর্ণনা। উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রের ভেতর প্রথমভাগে রয়েছে মীর মশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন, তাঁর চাচাত বোনের জামাই সাগোলাম (সাগোলাম মোয়াজ্জেম) এবং তাঁর মাতা দৌলতন্নেসা। অপর ভাগে রয়েছেন নীলকর টি আই কেনী, জমিদার প্যারীসুন্দরী ও ভৈরববাবু। এই চরিত্রগুলোকে কেন্দ্র করে গোটা 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র ঘটনাজাল বিস্তারিত।

মীর মোয়াজ্জেম হোসেনের চরিত্র অংকনের সময় লেখক প্রচুর সচেতনতা ও সততার পরিচয় প্রদান করেছেন। কারণ, মীর সাহেবের (এই অংশে 'মীর সাহেব' বলতে মশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন বুঝতে হবে। অন্যত্র 'মীর সাহেব' অর্থ মীর মশাররফ হোসেন) ব্যক্তিগত চরিত্রের দুটো গুরুতর দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়েছে। প্রথমত, নাচ-গান ও মদ্যাসক্তি; দ্বিতীয়ত, নীল বিদ্রোহের বিরোধিতা। মীর সাহেবের নাচ-গান ও মদ্যাসক্তির চিত্রটি পথিক অত্যন্ত সচেতনভাবে অংকন করেছেন। হয়তো এ জাতীয় কাজ তিনি নীতিগতভাবে অনুমোদন করতেন বলেই তাঁর পক্ষে অবলীলায় মীর সাহেবের ব্যক্তিগত আমোদস্ফূর্তির চিত্র সহজে অংকন করা সম্ভব হয়েছে। এই গ্রন্থে পথিক মীর সাহেবের পারিবারিক জীবনের যে চিত্র অংকন করেছেন তা সত্যি দুর্লভ। তবে মীর সাহেবের আমোদ-আহ্লাদ স্বচক্ষে দেখার পর এবং প্রতিবেশীদের উসকানির পরও দৌলতন্নেসার ভেতর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হওয়া সাধারণ মনস্তত্ত্ববিরোধী। অবশ্য পথিকের বর্ণনা যদি সত্য হয়, তা হলে তাকে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা অসঙ্গত। এ কারণেই সমালোচকেরা 'ফিকশন' ও 'ফ্যাক্ট'কে আলাদা করে দেখেন। তবে মীর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা মহৎ কাজ হল সাগোলামকে ক্ষমা করা। কারণ, সাগোলাম মীর সাহেবের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। তবু মীর সাহেব কোন প্রকার প্রতিবাদ না করে নীরবে সরে দাঁড়িয়েছেন। মীর সাহেবের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি হল নীল বিদ্রোহের বিরোধিতা। কেনী সাহেবের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বই এই অংশে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করেছে। মীর সাহেব এ সব ক্ষেত্রে কখনো কখনো দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন। এই দ্বন্দ্ব সর্বাপেক্ষা বেশী লক্ষ করা গেছে, কেনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে।

কারণে একটা ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের সপক্ষে থাকা সত্ত্বেও তিনি লেখকের সহানুভূতি হারিয়েছেন। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে মীর সাহেবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এ নীলবিদ্রোহের সময় প্রজাসাধারণের পক্ষাবলম্বনকে কেন্দ্র করে চরিত্রটিতে মানবি আবেগ-অনুভূতি আরোপ করা যেত। কিন্তু লেখকের একদেশদর্শিতার দরুন সম্ভব হয়নি।

দৌলতন্নেসা চরিত্রটি নির্দ্বন্দ্ব। লেখক মুসলিম বিশ্বের বহু ঐতিহাসি চরিত্র এবং সাহিত্যের প্রসিদ্ধ নারী চরিত্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে দেখিয়েছেন। তাঁদের চেয়ে দৌলতন্নেসার রূপ ও গুণ অনেক বেশী। এই গ্রন্থে তাঁর সহনশীলত যে পরিচয় প্রদান করেছেন তা পরবর্তীকালে লিখিত কোন কোন বর্ণনায় অস বলে প্রমাণিত হয়েছে।২৮ তবে 'উদাসীন পথিকের মনের কথায় এই চরিত্র ভূমিকা খুব বেশী নেই।

টি এ কেনীও একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। এই চরিত্র অংকন করতে গি পথিক তুলনামূলকভাবে অধিক শিল্প-সচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন। কারণে একজন অত্যাচারী, নারীলোলুপ নীলকুঠির মালিক হওয়া সত্ত্বেও, এক প্রজাপীড়ক হওয়া সত্ত্বেও চরিত্রটি পাঠকের মনে সহানুভূতি উদ্রেক করে। কারণে এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, এই চরিত্রটিতে উপন্যাসের যথেষ্ট লক্ষ রয়েছে। পথিক ইচ্ছে করলে এটিকে এজিদের সমতুল্য একটি চরিত্রে রূপান্তরি করতে পারতেন।

প্যারীসুন্দরী ও ভৈরববাবু চরিত্রও পথিক দক্ষতার সঙ্গে অংকন করেছে এরা দুজনেই জমিদার এবং কেনীর প্রতিদ্বন্দ্বী। কেনী দুজনকেই ভয় করেন। কার "স্ত্রীলোকের মধ্যে প্যারীসুন্দরী—নাম করিতেও ভয় হয়। আর পুরুষের মধ্যে ভৈরববাবু। ভৈরববাবুর আরও গুণ এই যে, তিনি নিতান্তই কৌশলী, দাঙ্গা ফ্যাসাদে অগ্রসর হইতে চাহেন না।"২৯ এই উক্তি থেকেই চরিত্র দুটোর গুরু উপলব্ধ হবে।

পরিশেষে একটা কথা বলে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' প্রসঙ্গ শেষ কর আগে বলেছি যে, এই গ্রন্থের সবগুলো চরিত্রই বাস্তব। যেহেতু "শোনা কথ পথিকের মনের কথা"৩০ সেহেতু হয়তো কাহিনীতে বর্ণনায় একটু রঙ লাগাব সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি সত্য বিকৃত করে নি। এই কারণেই গ্রন্থটি একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হতে পারেনি। আমি 'বিষা সিন্ধু'কেই মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মনে করি। কিন্তু শৈল্পি দৃষ্টিতে 'বিষাদ-সিন্ধু'র তুলনায় 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র উপন্যাসের লক্ষ অনেক বেশী।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' লিখিত হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থটি মে বিশটি 'নথি'তে বিভক্ত। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপন্যাস নয়, একটি রসরচন এই গ্রন্থে মীর সাহেব তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন অনাচারের মূলে কুঠারাঘা করেছেন। চারশ' পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে কোন সুবিন্যস্ত কাহিনী না থাকলেও কতগুলে বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র রয়েছে। চরিত্রগুলোর মাধ্যমে লেখক সমাজের মুখো উন্মোচন করে দিয়েছেন। সমাজ ও ধর্মের সেবকেরা বিভিন্ন রঙের মুখোশ প কিভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছেন তারই মর্মন্তুদ বিবরণ এই গ্রন্থে উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' তার পূর্বে লিখিত 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' মতো শিথিলবদ্ধ আখ্যায়িকা। এই গ্রন্থে মীর সাহেবের তিক্ততা সংযমের বাঁধ ছে ফেলেছে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণনাকে অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে এ ছাড়া, এই গ্রন্থে কিছু কিছু অশ্লীল বর্ণনাও রয়েছে—যার শিল্পমূল্য একেবারে কম।

'গাজী মিয়ার বস্তানী'র উদ্দেশ্যমূলকতা গ্রন্থে বর্ণিত নায়ক-নায়িকা স্থানের নাম থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। জমিদারের নাম সাবলোট চৌধুরী পয়জার্‌ন্নিসা, সোনা বিবি, মণি বিবি ইত্যাদি। জমিদার সাবলোট চৌধুরী মোসাহেব কালোয়ার, কটা লাহিড়ী, অলকাতেরা সান্যাল, ঘরভাঙ্গা সান্ন্যাল সোনা বিবির পক্ষে দাগাদারী, কেআক্কেল, ধড়িবাজ। মণি বিবির পক্ষে মথা পাগল রায়, ধামাধরা সরকার। গ্রন্থে বর্ণিত স্থানের নাম অরাজকপুর, যমদ্বার, কুম্ভ নিকেতন, নচ্ছারপুর। থানার নাম হাতপাতা। এই গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসে 'ভেড়াকান্ত' নামে পরিচিত।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর প্রায় সবগুলো গ্রন্থেই ইংরেজের জয়গান করেছেন এই গ্রন্থও তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু এই গ্রন্থে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কোর্ট-কাছা ও থানার যে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে তা এত ভয়াবহ যে, তার বিকট মুখব্যাদানে বিকৃত অভিব্যক্তির আড়ালে তাঁর সাধের ইংরেজ রাজত্বের সৌরভ ও গৌরব খড়ে মত ভেসে গেছে—যার উত্তরাধিকার আজও আমরা সযত্নে বহন করে চলেছি। এ দৃশ্যগুলো বাস্তব ও জীবন্ত হওয়ার কারণ মীর মশাররফ হোসেন ব্যক্তিগ অভিজ্ঞতা থেকে এ সব বর্ণনা প্রদান করেছেন। জমিদারী হারিয়ে অন্য জমিদারে অধীনে কাজ করতে গিয়ে তিনি যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন অই তাঁ এ জাতীয় রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। 'গাজী মিয়া'তে বহু অশ্লীল দৃশ্যের বর্ণ রয়েছে, সমাজবিগর্হিত বহু চিত্র রয়েছে, কিন্তু এ সব চিত্র ছাপিয়েও লেখকে নিখুঁত চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে লেখকে মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি দাবি করেছেন, "গাজী মিয়ার বস্তানীর মধ্যে না আছে [illegible]

ছোট বড় সর্বাঙ্গ কণ্টক, সর্বাঙ্গ মধুমাখা, নয়ন মনের তৃপ্তিকর, বিরক্তিকর যাহা যাহা আছে, 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে তাহার অভাব নাই।"৩১ তব এ কথা অনস্বীকার্য যে, "গাজী মিয়া জগৎকে বর্ণনা করেছেন সমাজ-সচেতন মহৎ শিল্পীর নিরপেক্ষ বেদনাবোধ নিয়ে নয়। বর্ণকের মর্মবেদনা এমন কোন আদর্শগত মহত্তর জীবনের সংকেত নির্মাণ করতে পারে নি, যার ক্ষয় বা বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে আমরাও মর্মাহত বা অভিভূত হয়ে পড়তে পারি।"৩২

॥ ছয় ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত অরেকটি উপন্যাস আজিজমন্দ আলীর (১৮৬৫-১৯২৬) 'প্রেম দর্পণ'। এই উপন্যাসটি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'প্রেম দর্পণ' "বাঙালী-মুসলিম রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস।"৩৩ উপন্যাসটি একটি "সত্য ঘটনা অবলম্বনে" রচিত বলে লেখক দাবী করেছেন।৩৪ ১৩১৫ (১৯০৮ খৃঃ) বঙ্গাব্দে উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসটিতে একটি হিন্দু রমণীর সঙ্গে মুসলিম যুবকের প্রেম ও বিবাহের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে কিছু হিন্দু লেখক মুসলিম রমণীর সঙ্গে হিন্দু বীরের প্রেমের চিত্র অংকন করেছিলেন। এ সব চিত্রের ভেতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। পরবর্তীকালে মুসলিম ঔপন্যাসিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), ডাক্তার সৈয়দ আবদুল হোসেন প্রমুখ এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। বস্তুত সিরাজীর 'রায়নন্দিনী' (১৯১৮) যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রতিবাদে লিখিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সিরাজী মুসলমানদের পক্ষে উপন্যাস রচনা করা ক্ষতিকর মনে করা সত্ত্বেও এই উপন্যাস রচনা করেছিলেন। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' অথবা 'দুর্গেশনন্দিনী'তে মুসলিম রমণীর সঙ্গে হিন্দু যুবকের প্রেমের চিত্র অংকিত হলেও তাঁরা কোথাও ধর্মের অমর্যাদা করেননি। এবং এ কারণেই বঙ্কিমের পক্ষে আয়েষার মত একটি যুগান্তকারী চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। তবু এর প্রতিবাদ যে অবশ্যম্ভাবী ছিল তা বহু হিন্দু মনীষীও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর বার্ষিক রিপোর্টে এ কথা উল্লেখ করেছিলেন।

সেই হিসেবে 'প্রেম দর্পণ'কে এ জাতীয় উপন্যাসের সঙ্গে এক করে পড়া যায় বা এই গ্রন্থটিকে উপরে উল্লেখিত হিন্দু লেখকদের উপন্যাসের প্রতিবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, আজিজমন্দ আলীর উপন্যাসটিতে সেকালের একটি বিশিষ্ট প্রবণতার স্বাক্ষর থাকলেও লেখক বহু ক্ষেত্রেই সচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছেন। কাহিনীতে পরিবেশ ও কালের প্রভাব তার প্রমাণ।

প্রথমেই মধ্যযুগীয় রীতিতে নর ও নারীর রূপের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসটির সূচনা। এই বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। কাসেম-ক্ষেত্রমণির প্রেমে কোন দ্বন্দ্ব নেই। যদিও দুটো পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে তাঁদের ভেতর দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক ছিল। ক্ষেত্রমণির মায়ের ভূমিকা অস্বাভাবিক। একমাত্র মেয়ে হিসেবে ঘরজামাই রেখে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে স্বাভাবিক হলেও কোন মার পক্ষেই জেনেশুনে গজপতির মতো মূর্খের হাতে মেয়ে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে কোন মা-ই স্বার্থপর হতে পারেন না। তবে বিয়ের পর গজ-ক্ষেত্রমণির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ক্ষেত্রের ভেতর দ্বন্দ্ব আরোপ করা যেত। কিন্তু লেখক সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছেন। কাহিনীর গতিধারা সমান্তরাল বেগে এগিয়ে গিয়ে পরিণতি লাভ করেছে।

উপন্যাসটি মিলনান্ত। গোড়াতেই লেখক ক্ষেত্রমণির মুসলমান হওয়ার ইচ্ছে জ্ঞাপনের মাধ্যমে মিলনের আভাষ দিয়ে রেখেছেন। ফলে কাহিনীটি পূর্বনির্ধারিত পথেই পরিণতি লাভ করেছে। লেখক সমস্ত ব্যাপারটিকে সহজ করে দিয়েছেন। ফলে "ক্রমশ জানা গেল, ক্ষেত্র মুসলমান-ধর্ম পরিগ্রহণ করিয়া কাসেমের অর্ধাঙ্গিণী রূপে তাঁহার বাটিতে সুখে জীবন যাপন করিতেছেন। গ্রামে কয়েক দিন পর্যন্ত এই বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা চলিল; অবশেষে সকলেই নীরব হইল। ভাবিল যে, এ বিষয়ে বৃথা আন্দোলন করিয়া কেবল মন নষ্ট করা বই আর কিছুই নয়।"৩৫ এখানে একটা কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এই উপন্যাসের পরিণতি সমর্থনযোগ্য নয়। যদিও লেখক ধর্ম-মত পরিবর্তনের চিত্র অংকন করেছেন, গজপতির সঙ্গে ক্ষেত্রের বিয়ের পরে এবং যদিও ক্ষেত্রমণি একখানা পত্রের মাধ্যমে তার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত করেছেন তবু এতে কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। কিন্তু আধুনিক যুগে যেমন স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেও বিয়ে হচ্ছে তেমনটি সেই যুগের জন্যে ছিল অচিন্তনীয়। অতএব উপন্যাসের এই পরিণতির বিকল্প ছিল বিয়োগান্ত—যেমনটি আমরা 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' অথবা 'দুর্গেশনন্দিনী'তে দেখেছি। সম্ভবত আজিজমন্দ আলী নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে এ জাতীয় শিল্পগুণরহিত পরিণতি অংকন করেছেন—হিন্দুদের রচিত উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় লিখিত হোক বা না হোক। লেখকের ধর্মবিশ্বাসের স্পষ্ট ছাপও উপন্যাসটিতে রয়েছে।

এই উপন্যাসের আরো একটা ত্রুটি হল, লেখকের অতিকথন। এই অতিকথন খুবই বিরক্তিজনক। প্রায় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে এই অতিকথনের নিদর্শন রয়েছে। [illegible] উপর লিখিত গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রবন্ধে পর্যবসিত হয়েছে। যে কোন উপন্যাসের জন্যে এ জাতীয় ত্রুটি গুরুতর।

নারী-পুরুষের বয়স সংক্রান্ত হিসেবে লেখক কখনো কখনো পারম্পর্য রক্ষা করতে পারেননি। ক্ষেত্রের বয়স প্রথমে দেখানো হয়েছে, বারো বছর (১ম প্রতিবিম্ব)। তাদের পরিণয়ের আগেই তার বয়েস পনেরো বছর বলা সত্ত্বেও কাসেমের সঙ্গে পরিচয়ের পর বরাবরই তার বয়স তেরো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ গজপতিকেও প্রথমে ত্রিশ বছরের যুবক বলা হয়েছে (৬ষ্ঠ প্রতিবিম্ব), পরে একটি অধ্যায়ে তাকে "চত্বারিংশ বর্ষ বয়স্ক" বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই উপন্যাসটিকে কোন দিক দিয়েই সার্থক বলা যায় না। এর কোন চরিত্রই যথাযথ ফুটে ওঠে নি, লেখক বিভিন্ন বিষয়ের উপর এত বেশী কথা বলেছেন যে, তা পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে এবং ঘটনাটিও যুগবিচারে অস্বাভাবিক। তবে তৎকালের একটি মুসলিম প্রধান অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনায় লেখক দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের লিখিত আরো কয়েকটি উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। উপন্যাসগুলো হল, কাফিলউদ্দীন আহমদের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'নিশাদ কুমারী' (নভেম্বর ১৮৯৩), মুহম্মদ আলিমুদ্দীনের 'তারাবতী-মনোহর' (জুলাই, ১৮৯৬), মোঃ ওসমান আলীর 'হাফেজ সাহেব' (নভেম্বর, ১৯০০), শেখ সাজ্জাদ করিমের (হোসেন?) 'আমিনা' (২৮ নভেম্বর, ১৯০০)। উপন্যাস-গুলো এখনো দুষ্প্রাপ্য।

পাদটীকা :—

১ ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস; ২য় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৬৯) ১৮১ পৃষ্ঠা।
২ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (কলিকাতা ১৯৬৬) তৃতীয় খণ্ড। ৬৯৫ পৃষ্ঠা।
৩ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাংলা সাহিত্য (দ্বিতীয় মুদ্রণ; ঢাকা, ১৯৬৫) ৫৭ পৃষ্ঠা।
৪ শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দুশ বছর (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলিকাতা, ১৯৬৬); বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বংশানুক্রমিক তালিকা।
৫ ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস; প্রথম খণ্ড অপরার্ধ (কলিকাতা ১৯৬৩) ৫৩১ পৃষ্ঠা।
৬ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক : প্রাগুক্ত; ৬০ পৃষ্ঠা। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় : প্রাগুক্ত; ৬৯৫ পৃষ্ঠা।
৭ দ্রষ্টব্য : দেশ; ৫ই মে ১৯৭৯।
৮ ডঃ আনিসুজ্জামান : প্রাগুক্ত; ১৬৩ পৃষ্ঠা।
৯ ডঃ সুকুমার সেন : প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড; ১৮৯ পৃষ্ঠা।
১০ ডঃ আনিসুজ্জামান : প্রাগুক্ত; ২২২ পৃষ্ঠা (উধৃত)।
১১ ডঃ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল : মীর মশাররফের গদ্য রচনা (ঢাকা ১৯৭৫) ২৮ পৃষ্ঠা।
১২ দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরানী (১৮৮২)। এ ছাড়া রয়েছে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের ঐতিহাসিক উপন্যাস।
১৩ ডঃ আনিসুজ্জামান : প্রাগুক্ত, ২৩৪ পৃষ্ঠা। (উধৃত)
১৪ সৈয়দ আমীর আলী : হিস্ট্রী অব সেরাসেন
১৫ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইনসানিয়াৎ মওতকে দরওয়াজে পর' গ্রন্থে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বরাত দিয়ে এ জাতীয় বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন।
১৬ মুনীর চৌধুরী : মীর-মানস (ঢাকা, ১৯৬৫), ৪৪ পৃষ্ঠা।
১৭ প্রাগুক্ত, ৪৭ পৃষ্ঠা।
১৮ ডঃ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল : প্রাগুক্ত, ১৮ পৃষ্ঠা।
১৯ মুনীর চৌধুরী : প্রাগুক্ত, ১৮ পৃষ্ঠা।
২০ মহরম পর্ব : সপ্তম প্রবাহ।
২১ মহরম পর্ব : ত্রয়োদশ প্রবাহ।
২২ প্রাগুক্ত।
২৩ মহরম পর্ব : ষোড়শ প্রবাহ।
২৪ মহরম পর্ব : সপ্তদশ প্রবাহ।
২৫ এজিদ-বধ পর্ব : প্রথম প্রবাহ।
২৬ প্রাগুক্ত।
২৭ মুনীর চৌধুরী : প্রাগুক্ত, ৪৮ পৃষ্ঠা।
২৮ দ্রষ্টব্য : মীর মশাররফ হোসেনের 'আমার জীবনী'।
২৯ কেনীয় উক্তি : ষোড়শ তরঙ্গ।
৩০ উদাসীন পথিকের মনের কথা : মুখবন্ধ।
৩১ গাজী মিয়ার বস্তানী : ৬ষ্ঠ নথি।
৩২ মুনীর চৌধুরী : প্রাগুক্ত, ৬৯।
৩৩ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় সংস্করণ, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮) ১১৭ পৃষ্ঠা।
৩৪ প্রেম-দর্পণ : প্রথম প্রতিবিম্ব।
৩৫ [illegible]

রামরতন সরণি

রমানাথ রায়

রামরতন সরণি কোথায় তা জানি না। তবে বাবার মুখে রামরতন সরণির অনেক কথা শুনেছি। বাবা বলত, সারা শহরে রামরতন সরণির মত সুন্দর রাস্তা আর একটাও নেই। এখানে পিচের রাস্তা সারা বছর পরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কোথাও সিগারেটের বাক্সের খোল, কলার খোসা, মরা ইঁদুর বা ছেঁড়া কাগজ পাওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, এই রাস্তা গরমে গলে না, বর্ষায় ডোবে না। আর ফুটপাথে সারি সারি বকুল, রাধাচূড়া, দেবদারু কেবলই বেড়ে ওঠে। এখানকার বাড়িগুলোও দেখতে ছবির মত। কখনো মলিন হয় না। সূর্যের আলোয় সারাদিন ঝকঝক করে। দেখলেই মনে হয় যেন সবে রঙ করা হয়েছে। এখানে বাড়ির দেয়ালে কেউ পোস্টার মারে না, কালো কালিতে শ্লোগান লেখে না। এখানে প্রতিটি বাড়িতেই একটা করে লন। লনের ঘাস সব সময় সবুজ হয়ে থাকে। প্রতিদিন বিকেলে বাড়ির ছেলেমেয়েরা এখানে ব্যাডমিন্টন খেলে।

বাবার কথা শুনে আমার খুব লোভ হত। রামরতন সরণির ফুটপাথ ধরে হেঁটে যেতে ইচ্ছে করত। বাবাকে সে কথা বলতামও। তবে বাবা আমার কথায় তেমন আমল দিত না। আজ নয় কাল করে আমাকে নিরস্ত করত। আমি অবশ্য এতে হতাশ হতাম না। বা মন খারাপ করে বসে থাকতাম না। ভাবতাম, একদিন না একদিন বাবা আমাকে ঠিক রামরতন সরণিতে নিয়ে যাবেই। আমি মনে মনে সেই দিনটার জন্যে অপেক্ষা করতাম।

একদিন বাবা বলল, আর এখানে থাকা যায় না।

আমি বললাম, তা হলে রামরতন সরণিতে চল।

আমার কথা শুনে বাবা অদ্ভুতভাবে হাসল। বলল, সেখানেই যাব ঠিক করেছি।

কথাটা শুনে আমার খুব আনন্দ হল। এবার তাহলে রামরতন সরণিতে যাওয়া হবে।

কিন্তু আমাদের রামরতন সরণিতে আর যাওয়া হল না। তার আগেই বাবা মারা গেল।

বাবা মারা গেল। রামরতন সরণি মরল না। বেঁচে রইল। অফিসে কাজ করতে করতে, কিংবা বাড়িতে শুয়ে শুয়ে রামরতন সরণির কথা ভাবতে লাগলাম। বাবা আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারেনি। আমি আমার ছেলে মেয়ে বউকে ঠিক সেখানে নিয়ে যাব। নিয়ে যেতেই হবে। না নিয়ে গিয়ে উপায় নেই। কারণ...

মাঝে মাঝে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন কষ্ট হয়। ছেলেটা আগে লেখাপড়ায় ভাল ছিল। ক্লাসে ভাল ফল করত। এখন দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হবে নাই বা কেন? ওর কোন দোষ নেই। আগে প্রতি-দিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে ছেলেটাকে পড়াতে বসাতাম। এখন নানা কাজে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায়। ছেলেটাকে নিয়ে আর বসতে পারি না। আমার ভীষণ ঘুম পায়। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন স্কুলে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। তারপর কোনদিন ইচ্ছে হলে স্কুলে যাচ্ছে, কোনদিন যাচ্ছে না। আমি সব খবর পাই। একদিন একজন ওকে পাড়ার সিনেমা হলে ম্যাটিনি শোর লাইনে দেখেছে। আর একদিন আর একজন ওকে রাস্তায় বন্ধুদের নিয়ে গল্প করতে দেখেছে। ওর এই সব বন্ধুদের আমি একদম পছন্দ করি না। কারণ, ওরা কেউ ভাল ছেলে নয়। ওদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমি কতদিন সেকথা ওকে বুঝিয়ে বলেছি। বলেছি, এভাবে নিজেকে নষ্ট করো না। নিজের ক্ষতি করো না। কিন্তু ও আমার কথা এক কান দিয়ে শোনে, আর এক কান দিয়ে বের করে দেয়। কোন কথা গায়ে মাখে না। এখন আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। ও আমার কথা উপেক্ষা করেই এইসব বন্ধুদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়ায়, বল খেলে, ঘুড়ি ওড়ায়, সিনেমা দেখে, হয়ত সিগারেট খায়, মেয়েদের বিরক্ত করে। আর রাত্রিবেলা পড়তে বসে ঘুমোয়। ওর মা ওর ওপর ছেলেমানুষের মত রাগারাগি করে, চিৎকার চেঁচামেচি করে। বোঝে না, এখানে থেকে কোন ছেলে এর চেয়ে ভাল কিছু করতে পারে না। ওকে মানুষ করতে হলে রামরতন সরণিতে যেতেই হবে। রামরতন সরণিতে গেলে ভাল স্কুল পাবে। ভাল বন্ধু পাবে। ওদের সঙ্গে লনে ব্যাডমিন্টন খেলতে পাবে। আমি চাই ও একদিন রামরতন সরণির ছেলেদের মত আই এ এস হোক। কিংবা ডাক্তার হোক। কিংবা ইঞ্জি-নীয়ার হোক। আমি চাই না ও এভাবে নষ্ট হয়ে যাক।

একদিন আমি ছেলেকে বললাম, আমরা আর এখানে থাকব না।

ছেলে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?

বললাম, রামরতন সরণি।

ছেলে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বাস হচ্ছে না?

ছেলে এর উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ওখেনে কবে যাবে?

—শিগগির।

ছেলের চোখমুখ খুশিতে ভরে উঠল।

মাঝে মাঝে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়েও আমার কেমন কষ্ট হয়। ও নামমাত্র স্কুলে যায়। বাড়িতে পড়াশুনোর সময় পায় না। ওর মা রান্না করে। ও পাশে বসে বাটনা বাটে, তরকারি কোটে। কখনো কখনো দরকার হলে বাজারে যায়, রেশন তোলে, কাপড় কাচে। আর সময় পেলে রেডিও খুলে গান শোনে, গালে স্নো ঘষে, পাউডার লাগায়, জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে। পাড়ার

না। আমি জেনে গেছি এই রাস্তায় এই পরিবেশে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না। আশা করাটাই ভুল। আমি এই রাস্তায় থেকে হাজার চেষ্টা করলেও ভাল ঘরে ওর বিয়ে দিতে পারব না। এমনকি সাধারণ ঘরেও বিয়ে দিতে বেগ পেতে হবে। তার চেয়ে ও যদি কাউকে ভালবেসে বিয়ে করে আমি তাতে খুশিই হব। আমি কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু আমি অন্তর থেকে এ রকম বিয়ে চাই না। আমি ওকে রামরতন সরণিতে নিয়ে যেতে চাই। আমি চাই ও রামরতন সরণির কোন ছেলের সংগে লনে ব্যাডমিন্টন খেলুক। কিংবা রামরতন সরণির ফুটপাথ ধরে বকুল, রাধাচূড়া, দেবদারুর নিচ দিয়ে ও প্রেমিকের হাত ধরে হেঁটে যাক। আমি দূরে থেকে ওদের দেখব। দেখে খুশি হব।

একদিন আমি মেয়েকে বললাম, আমরা আর এখানে থাকব না।

মেয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে ?

বললাম, রামরতন সরণি।

মেয়ে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

মেয়ে ছেলেটার মতই এর উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কবে যাবে ?

—শিগগির।

মেয়ের চোখমুখ ছেলেটার মতই খুশিতে ভরে উঠল।

মাঝে মাঝে বউটার মুখের দিকে তাকিয়েও আমার কষ্ট হয়। সেই ভোরবেলা ওঠে। উনুন ধরায়। রান্না করতে বসে। বেলা দুটোর আগে ভাত খাবার ফুরসত পায় না। সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। কোথাও যাবার সময় পায় না। আর, যাবেই বা কোথায় ? শ্বশুর-শাশুড়ি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বাপের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। তাঁরা গত হওয়ার পর থেকে বাপের বাড়ি যাওয়া এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে সারাদিন ঘরে আটকে থাকে। বড়জোর কোনদিন সন্ধ্যেবেলা পাশের বাড়িতে গিয়ে বসে বসে টি-ভি দেখে। বা কোনদিন ইভনিং শোয়ে কাছের কোন হলে ঢুকে সিনেমা দেখে। আমি বউকে নিয়ে কোথাও যেতে পারি না। কতদিন ভেবেছি বউকে নিয়ে দার্জিলিঙ কিংবা পুরী ঘুরে আসব। কিন্তু কিছুতেই যাওয়া হয়ে ওঠে না। আমার চোখের সামনে বউয়ের শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখের কোলে কালি পড়ছে, মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। আমার কিছু করার নেই। অথচ একদিন সুন্দরী বলেই বাবা বউকে ঘরে এনেছিল। একদিন যে হাত ধরার জন্য আমার হাত উসখুস করত এখন সেই হাতের দিকে ফিরে তাকাতেও ইচ্ছে করে না। আমি চাই আমার বউ রামরতন সরণির বউদের মত সুখে থাকুক। তাদের মত আমার বউকেও যেন রান্নাঘরে ঢুকতে না হয়। আমার বউও যেন তাদের মতই ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে আনে, প্রতিদিন টি-ভি দেখে, গাড়ি করে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন আমি বউকে বললাম, আমরা আর এখানে থাকব না।

বউ জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে ?

বললাম, রামরতন সরণি।

বউ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

বউ ছেলেমেয়েদের মতই এর উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কবে যাবে ?

—শিগগির।

হ্যাঁ, এবার আর দেরি করা যায় না। শিগগির রাম[illegible] সরণিতে চলে যেতে হবে। আমি প্রতিদিন কাগজে বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখতে লাগলাম। কিন্তু কোনদিন রামরতন সরণির নাম চোখে পড়ল না। বুঝতে পারলাম, রামরতন সরণির বাড়িওয়ালারা বিজ্ঞাপন দিয়ে ভাড়াটে আনে না। আনার দরকার হয় না। কোথাও ঘর খালি হলেই ভাড়াটেরা ছুটে আসে। সুতরাং রামরতন সরণিতে থাকে এমন একজন জানাশুনো লোক দরকার। তাকে ধরেই ওখেনে যেতে হবে। কে থাকে ওখেনে।

একদিন এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, রামরতন সরণিতে জানাশুনো কেউ আছে ?

বন্ধুটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, রামরতন সরণি !

—হ্যাঁ, রামরতন সরণি।

—সেটা কোথায় ?

—জানি না।

তারপর আর এক বন্ধুকে কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। সেও কিছু বলতে পারল না। আমি হতাশ না হয়ে আরো অনেককে কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। কেউই কিছু বলতে পারল না।

এদিকে ছেলে-মেয়ে-বউ রামরতন সরণিতে যাবার জন্যে দিন দিন ব্যস্ত হয়ে উঠল। ছেলে কেবলই জিজ্ঞেস করতে লাগল, আর কত দেরি ? মেয়ে কেবলই জিজ্ঞেস করতে লাগল, আর কত দেরি ? বউ কেবলই জিজ্ঞেস করতে লাগল, আর কত দেরি ? আমি প্রত্যেককেই সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলাম, আর দেরি নেই। অথচ দেরি হতেই লাগল। আমি কিছুতেই রামরতন সরণির হদিশ পেলাম না।

শেষে একদিন এই শহরের একটা পথনির্দেশিকা কিনে আনলাম। তার প্রতিটি পাতায় তন্ন তন্ন করে চোখ বুলোলাম। দেখলাম এখানে অনেক সরণির নাম আছে। কিন্তু রামরতন সরণির নাম নেই। আমার মনে হল এই নির্দেশিকা অসম্পূর্ণ। অথবা ইচ্ছে করেই রামরতন সরণির নাম এতে বাদ দেওয়া হয়েছে যাতে আমাদের মত লোকেরা কোনদিন সেখানে না যেতে পারে। আমি তখন আরো যে সব পথনির্দেশিকা আছে তা কিনে আনলাম। আমার চৌকিখানা

কটা পথনির্দেশিকার পাতা ওল্টাতে লাগলাম।

একদিন ছেলে এসে বলল, রামরতন সরণিতে গিয়ে আমাকে একটা ভাল র‍্যাকেট কিনে দিতে হবে।

আমি বললাম, আচ্ছা।

একদিন মেয়ে এসে বলল, রামরতন সরণিতে গিয়ে আমাকে একটা দামি শাড়ি কিনে দিতে হবে।

আমি বললাম, আচ্ছা।

একদিন বউ এসে বলল, রামরতন সরণিতে গিয়ে আমাকে একটা টি-ভি সেট কিনে দিতে হবে।

আমি বললাম, আচ্ছা।

অথচ দিনের পর দিন কেটে গেল। কোন পথনির্দেশিকায় রামরতন সরণির নাম খুঁজে পেলাম না। তখন মনে হল, রামরতন সরণির নাম হয়ত ঠিকই আছে। আমারই নজর এড়িয়ে গেছে। আমি আবার প্রথম থেকে সবকটা পথনির্দেশিকার পাতা ওল্টাতে লাগলাম।

একদিন ছেলে এসে মনে করিয়ে দিল, আমার কথা মনে আছে তো?

আমি বললাম, নিশ্চয়।

একদিন মেয়ে এসে মনে করিয়ে দিল, আমার কথা মনে আছে তো?

আমি বললাম, নিশ্চয়।

একদিন বউ এসে মনে করিয়ে দিল, আমার কথা মনে আছে তো?

আমি বললাম, নিশ্চয়।।

কিন্তু এবারেও রামরতন সরণির নাম কোন পথনির্দেশিকায় খুঁজে পেলাম না। না পেলেও রামরতন সরণি মিথ্যে হয়ে গেল না। আমি জানি রামরতন সরণি আছে। না থেকে যায় না। আমি চোখের সামনে রামরতন সরণি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমি রামরতন সরণির স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নের মধ্যে আমি ছেলে-মেয়ের হাত ধরে রামরতন সরণির ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাই। এরপরেও আমি কি করে ভাবব যে রামরতন সরণি নেই। রামরতন সরণি মিথ্যে। রামরতন সরণি একটা কাল্পনিক নাম!

একদিন একটা ট্যাক্সিতে উঠে ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, রামরতন সরণি চল।

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, রামরতন সরণি কোথায়?

—তুমি রামরতন সরণি চেন না?

—না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই ট্যাক্সি থেকে নেমে আর একটা ট্যাক্সিতে উঠলাম। কিন্তু এই ট্যাক্সিওয়ালাও রামরতন সরণি চেনে না। তারপর আরো অনেক ট্যাক্সিওয়ালাকে রামরতন সরণির কথা বললাম। তারা কেউই রামরতন সরণির নাম শোনেনি।

আমি তখন একটা বাসে উঠে কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা রামরতন সরণি যাবে?

কন্ডাক্টর বলল, না।

—কত নম্বর বাস যাবে?

—জানি না।

আমি তারপর একটার পর একটা বাসে উঠতে লাগলাম, নামতে লাগলাম। দেখলাম, কোন বাসই রামরতন সরণি যায় না। শুধু তাই নয় সবাই এমন ভাব দেখাল যেন রামরতন সরণির নামই কেউ শোনেনি।

শেষে ট্রামের কন্ডাক্টরদের ধরে ধরে রামরতন সরণির কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। তারাও কিছু বলতে পারল না। অথবা না জানার ভান করল।

এদিকে বাড়িতে দিন দিন তাগাদা বাড়তে লাগল। একদিন ছেলে এসে জিজ্ঞেস করল, রামরতন সরণি যাবে না?

—যাব, নিশ্চয় যাব।

মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, রামরতন সরণি যাওয়ার কি হল?

—যাব, এবার যাব।

বউ এসে জিজ্ঞেস করল, আর কবে রামরতন সরণি যাবে?

—যাব, শিগগির যাব।

আর একদিন ছেলে এসে বলল, এখানে আর একদম ভাল লাগছে না।

আমি বললাম, আমারো না।

মেয়ে এসে বলল, এখানে আর মন টিঁকছে না।

আমি বললাম, আমারো না।

বউ এসে বলল, এখানে আর থাকতে পারছি না।

আমি বললাম, আমিও না।

সত্যি, আর এখানে একদম ভাল লাগছে না। মন টিঁকছে না। কেমন কষ্ট হচ্ছে। এখান থেকে এবার চলে যেতে হবে। কিন্তু সে কবে? কবে আর রামরতন সরণির হদিশ পাব? আমি কম চেষ্টা করিনি। তাহলে কি....

একদিন সবাই একসঙ্গে আমাকে ঘিরে ধরল।

ছেলে বলল, তুমি আমাদের কেন রামরতন সরণির কথা বলতে গেলে?

মেয়ে বলল, কেন মিথ্যে আশা দিতে গেলে?

বউ বলল, কেন? কেন?

তারপর আবার ছেলে বলল, আমরা তো রামরতন সরণি যেতে চাইনি।

মেয়ে বলল, আমরা তো এখানে দিব্যি ছিলাম।

বউ বলল,' তুমিই আমাদের কষ্ট বাড়ালে।

আমি এবার বললাম, আমি মিথ্যে কথা বলিনি।

সবাই তখন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, বলেছ।'

—বলিনি।

—একশবার বলেছ।

—আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

—না।

আমি তখন একটু থেমে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কবে রামরতন সরণি যেতে চাও?

—এখনি।

—এখনি?

—হ্যাঁ, এখনি।

—চল তা হলে।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই কেমন বদলে গেল। সকলের চোখ মুখ আবার খুশিতে ভরে উঠল। একটু আগেই তাদের চোখেমুখে আমার ওপর যে রাগ দেখে-ছিলাম, যে অবিশ্বাস দেখেছিলাম তা আর একটুও রইল না। ঠিক করলাম, আজ আমি সকলকে রামরতন সরণিতে নিয়ে যাবই। যে করেই হোক আজ আমাকে রামরতন সরণি খুঁজে পেতেই হবে।

দেখতে দেখতে সবাই সাজ-পোশাক বদলে নিল। আমিও বদলে নিলাম।

এখন বিকেল। পথে পথে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সকলের মুখে অদ্ভুত হাসি।

আমরা রাস্তায় বেরিয়ে একসঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

বললাম, রামরতন সরণি।

—সেটা কোথায়?

—জানি না।

সমাপ্ত

পুনশ্চ : এই গল্প পড়ে একজন বিশিষ্ট সমালোচক হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হাসলেন কেন?

—একসঙ্গে এত মিথ্যে কথা লিখেছেন বলে।

—যেমন?

—যেমন আপনি নিজে অবিবাহিত, অথচ লিখেছেন আপনি শুধু বিবাহিত নন, আপনার একটি পুত্র ও কন্যা আছে।

—আর?

—আপনি মোটেই পথনির্দেশিকা দেখেননি।

—আর?

—আপনি শুধু বন্ধুদের নয়, কোন ট্যাক্সিওয়ালা বা কোন কন্ডাক্টরকেই রামরতন সরণির কথা জিজ্ঞেস করেননি। আপনার পুরো গল্পটাই একেবারে বানানো।

সঙ্গে সঙ্গে আমি তীব্র প্রতিবাদ করলাম, মোটেই না। এই গল্পের প্রতিটি শব্দ সত্য।

সমালোচক মৃদু হেসে বললেন, না, একটুও সত্য না। কারণ, রামরতন সরণি কোন কাল্পনিক রাস্তা নয়। এই নামে সত্যি ও রকম একটা রাস্তা আছে। আর এটা নিশ্চয় আপনারও অজানা নয়।

আমি জোর গলায় বললাম, বাজে কথা।

সমালোচক তখন নিজের পকেট থেকে একটা পথনির্দেশিকা বার করে আমাকে প্রায় চোখে আঙুল দিয়ে রামরতন সরণির নাম দেখালেন। তারপর একটু রসিকতার ছলে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সত্যি এখানে যেতে চান?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, না।
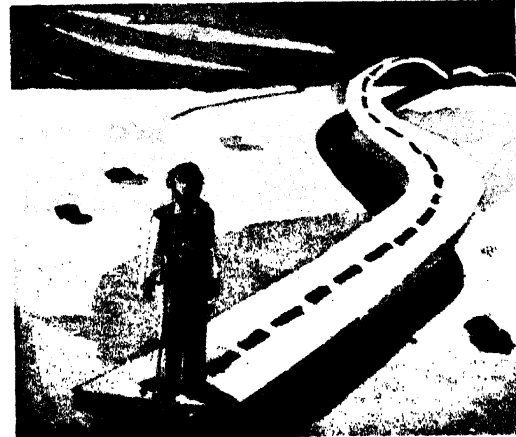
স্বাদের গুণেই
এর সমাদর

॥ তেরো ॥

বদ্রীর ইনফ্লুয়েনজা হয়েছিল, খবর পেয়েছিল শ্রীনাথ। তারপর থেকে সে আর আসছে না। নদীর ওধারে মাইল দশেক ভিতরে শ্যামগঞ্জ বলে একটা জায়গা আছে। যেখানে এক প্লটে প্রায় বিঘে দশেক জমি আছে। তাতে বর্গা নেই। খবরটা ভালই ছিল। কিন্তু বদ্রী একদম নাপাত্তা। সে থাকেও বহু দূরে। লাইনের ওধারে অনেকটা যেতে হয় কাঁচা রাস্তায়। জায়গাটা খুব ভাল চেনেও না শ্রীনাথ।

দাদার এই বাড়ি থেকে তার যে বাস উঠে গেছে সেটা সে টের পেয়েছে বহুকাল। ভাঁড়ারঘরের চাবি তার সঙ্গে থাকে। মজবুত তালা ঝোলে দরজায়। ডুপ্লিকেট চাবিটা সে বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখেছে। সেটা যেমনকে তেমনই আছে। খোয়া যায়নি। তবু সজল কি করে ঘরে ঢোকে এবং তার জিনিসপত্র ঘাঁটে তা প্রথম প্রথম ততটা খেয়াল করে ভাবে নি সে। কদিন আগে আবার তার ক্ষুরে হাত পড়ায় হঠাৎ খেয়াল হল।

স্বপ্না এসেছিল সকালে, চা দিতে। তাকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, আমার ঘরের তালাটা সজল খোলে কি করে জানিস?

স্বপ্না বা স্বপ্নলেখা রোগা মেয়ে। খুব শান্ত, খুব নীরব এবং দুঃখী চেহারার। মুখখানা ভীষণ ধারাল বটে, কিন্তু স্বভাবের সঙ্গে তার মুখশ্রীর কোনো মিল নেই। নিজের এই মেয়েটিকে শ্রীনাথ কখনো ঠিক বুঝতে পারে না।

শ্রীনাথের প্রশ্ন শুনে স্বপ্না ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থেকে বলল, বোধ হয় চাবি আছে।

চাবি তো আমার কাছে।

তা হলে ঠিক জানি না।

সজলকে দেখতে পেলে পাঠিয়ে দিস তো।

ও আসবে না।

কেন?

সেদিন সেই মোরগা চুরির পর থেকে মা ওকে দক্ষিণের ঘরে সারাদিন শেকল দিয়ে আটকে রাখে।

ও। বলে একটু গম্ভীর হয়ে যায় শ্রীনাথ। ভিতরবাড়িতে কি হয় না হয় তার সব খবর তার কানে এসে পৌঁছোয় না। শ্রীনাথ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আচ্ছা যা।

স্বপ্না চলে যাচ্ছিল। শ্রীনাথ ডাকল, শোন।

বলো।

চাবির কথাটা তোর মায়ের কানে তুলিস না।

স্বপ্না একটু হেসে বলল, কে ওসব কথা তুলবে বাবা! মা যা রেগে আছে দুদিন ধরে! ভাইকে শুধু গলা টিপে মেরে ফেলতে বাকি রেখেছে। ছোটোমামা না আটকালে কি যে হত!

বিরক্ত হয়ে শ্রীনাথ বলল, দোষ যখন স্বীকারই করেছে তখন অত মারধরের কী দরকার ছিল!

মা জানতে চাইছিল মোরগটাকে ও মারল কেন! সেই কথাটার জবাব দেয়নি যে। শুধু বলেছে, আমি চুরি করেছি, আমিই কেটেছি। কিন্তু কেন তা বলতে পারছে না।

কেন আবার! রক্তের দোষ! মায়াদয়াহীন বলেই তরতাজা মোরগটাকে মেরে মজা দেখেছে। আমি তো দেখেছি ও প্রায়ই ডিম চুরি করে এনে ঢিল ছোড়ে তাই দিয়ে।

স্বপ্না চলে গেল। চাবির রহস্যটা বসে বসে ভাবতে লাগল শ্রীনাথ। ভেবে কোনো হদিশ করতে না পেরে বাগানে নেমে গেল।

গাছপালার মধ্যে শ্রীনাথের আনন্দ অগাধ। আচার্য জগদীশ বোস গাছপালার মধ্যে প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন। সারা দুনিয়ার বোকা লোকেরা এক বাঙালীর কাছে শিখেছিল এই মহান সত্য, তবু নোবেল প্রাইজ দেয়নি। শ্রীনাথের হাতে ক্ষমতা থাকলে জগদীশবাবুকে চারবার নোবেল প্রাইজ দিত। গাছপালার প্রাণ যে কত বড় আবিষ্কার তা কেন যে তেমন স্বীকার করল না সাহেবরা! জগদীশ বোস নেটিভ বলেই কি? হবে। সাহেবরা বড় নাকউঁচু জাত।

প্রতিদিন শ্রীনাথ নিজেও গাছপালার প্রাণ আবিষ্কার করে। এখানে এক অদ্ভুত নীরব অনুভূতির সাম্রাজ্য। বাক্য নেই, শ্রবণ নেই, যৌনতা নেই, তবু জন্ম আছে, বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার আপ্রাণ প্রয়াস আছে। ক্রিসেনথিমাম, কসমস, প্যাঁপি বা গোলাপ বলে কথা নেই, নগণ্য আগাছাও শ্রীনাথের প্রিয়। ফুলের বাগান থেকে বহুবার ওপড়ানো আগাছা সে ঘের-দেয়ালের ধারে ধারে পুঁতে দিয়ে এসেছে। আজও বীজ থেকে গাছের জন্ম দেখে অবাক হয় শ্রীনাথ। বসে বসে ভাবে। চোখে সবুজের ঘোর লেগে যায় তার। মাটির ভিতর পোঁতা শুকনো বীজ থেকে গুপ্ত সৈনিকের মতো সারি সারি ওরা কি করে যে বেরিয়ে আসে! কী অদ্ভুত! কী আশ্চর্য! একই মাটি থেকে বীজের রকমফেরে কি করে জন্মায় এত রকমের গাছ!

শ্রীনাথের হাতের গুণে সামনের বাগানটা হয়েছে দেখবার মতো। অবশ্য কারও চোখে পড়ে না তেমন। লোক লাগিয়ে শুকনো ডালপালা দিয়ে দেড় মানুষ সমান উঁচু দুর্ভেদ্য একটা বেড়া দিয়ে রেখেছে শ্রীনাথ, যাতে তেমন চোখে না পড়ে। ক্ষ্যাপা নিতাইয়ের কুকুরটা আর কোনো কাজের না হোক, গাছের পাতা খসলেও চেঁচায়। শুধু চেঁচাতে জানে। তবু সেই ভয়েই ফুলচোররা বড় একটা হানা দেয় না। এ হল শ্রীনাথের নিজস্ব বাগান। নার্সারি থেকে বিচিত্র ফুলের বা ফলের বীজ আর চাড়া নিয়ে আসে সে। সার দেয়, জল দেয়, আর দেয় অগাধ মায়া মেশানো ভালবাসা। গাছ তেজে বেড়ে ওঠে। বার বার অবাক করে, আনন্দে ভরে দেয় শ্রীনাথকে। যতক্ষণ সে বাগানে থাকে ততক্ষণ সে অন্য মানুষ। কাম নেই, ক্রোধ নেই, লোভ নেই, অভিমান নেই, এমন কি অহংবোধটুকু পর্যন্ত থাকে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা বিভূতিভূষণের মতো সেও তখন অর্ধেক নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে বিসর্জন দেয়। সম্মোহিত হয়ে থাকে নীরব প্রাণের খেলা দেখে।
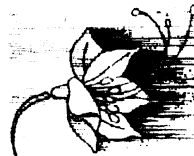
একটা নাইট কুইনের গোড়া উসকে দিচ্ছিল শ্রীনাথ। হঠাৎ নজরে পড়ল বাগানের পিছন দিয়ে আগাছায় ঢাকা পড়ো এক ফালি জমির দিকে। কেউ চলাচল করে না দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢেকে আছে। কিন্তু ঐ পড়ো জমি দিয়ে যেতে পারলে সকলের অলক্ষে দক্ষিণের ঘরের পিছন দিকটায় হাজির হওয়া যায়।

একটু ভাবল শ্রীনাথ। যাওয়াটা ঠিক হবে কি?

তারপর ভেবে দেখল, তার সংকোচের কোনো কারণ তো নেই। সে তো এখনো এ বাড়ির কর্তা।

খুরপী রেখে শ্রীনাথ উঠল। জঙ্গলে কাঁটা গাছ থাকতে পারে বলে ঘরে গিয়ে বাগানের কাজের হাওয়াই চটি ছেড়ে এক জোড়া পুরোনো রবারের বর্ষার জুতো পরে নিল। সাপ বা অন্য কিছুর ভয় তার নেই। জন্মসূত্রেই বোধ হয় সে কোন জায়গায় সাপ আছে বা নেই তা টের পায়। গত গ্রীষ্মেও একদিন ভোর রাতে অন্ধকারে বারান্দার সিঁড়িতে পা বাড়িয়েও সে পা ফেলেনি। মন থেকে কে যেন সাবধান করে দিয়েছে। পা আটকে গেছে। পরে টর্চ জেলে দেখেছে, কেউটে। এখন শীতকাল বলে আরো ভয় নেই।

পড়ো জমিটা মোটামুটি নির্বিঘ্নেই পেরিয়ে গেল শ্রীনাথ। দক্ষিণের ঘরের পিছনে নিষ্পত্র ঝোপঝাড়। একটু খড়মড় শব্দ হয়ে থাকবে।

ঘরের ভিতর থেকে ভয়ে ভয়ে সজল বলল, কে রে?

শ্রীনাথ জানালায় পৌঁছে দেখল, পড়ার টেবিলে বসে সজল সোজা জানালার দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে আছে। চোখে অবাক চাউনি।

বাবা!

শ্রীনাথ মৃদু ম্লান একটু হাসল। বলল, ভয় পাওনি তো!

না। তুমি ওখানে কি করছ?

তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

সজল আরো অবাক। বাবার কথা থাকলে এমন চোরের মতো পিছনের জানালা দিয়ে কেন? কিন্তু সেটা বলল না সজল। চেয়ে রইল।

শ্রীনাথ বলল, তোমাকে তোমার মা আটকে রেখেছে বুঝি?

সজল মৃদু একটু হাসল। চমৎকার দেখাল ওকে। সুপুরুষ ছেলেটি। গালে টোল পড়ল। ঘন ভ্রূর নীচে চোখ দুটো ঝিকিয়ে উঠল বুদ্ধির দীপ্তিতে। চাপা স্বরে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু আমার খারাপ লাগছে না।

আটক থাকলে তো খারাপ লাগারই কথা। তোমার তবে লাগছে না কেন?

খারাপ লাগলে তো আমি মার কাছে হেরে যাবো। মা তো চায় আমার খারাপ লাগুক।

এ কথায় একটু অবাক হয় শ্রীনাথ। সজল যে অনেক গভীর করে ভাবতে পারে তা টের পায়নি কখনো। এ প্রসঙ্গে আর না গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, সারাদিন তুমি কী করো?

বই পড়ি। আর পাটাতনের ওপর অনেক পুরোনো জিনিস আছে। এত জিনিস যে অবাক হতে হয়।

পাটাতনে ওঠা না তোমার বারণ? ওঠবার মইটা তেমন ভাল নয়। নড়বড় করে। পড়ে গেলে?

সজল ভয় খেয়ে বলে, সবসময় নয়। যখন একঘেয়ে লাগে, ঘুমটুম পায় তখন উঠি। সাবধানে।

উঠে কি করো?

জিনিস দেখি। ওপরে অনেক জিনিস বাবা! আমি রোজ ওখানে গুপ্তধন খুঁজি।

এত সহজভাবে সজল কখনো শ্রীনাথের সঙ্গে কথা বলে না। এখন কেন বলছে তাও বোঝে শ্রীনাথ। সজল জানে তার বাবা আর মা দুই প্রতিপক্ষ। সব সময়েই সজল তার মায়ের পক্ষে। কিন্তু সেই মোরগ চুরির ঘটনার পর মায়ের ওপর গভীর ও তীব্র বিরাগ থেকে সজল সাময়িকভাবে তার বাবার পক্ষ নিয়েছে। এবং এও হয়তো কারণ যে, শ্রীনাথকে এভাবে চুপি চুপি পিছনের জানালায় হাজির হতে দেখে সে বাবার গুরুত্বটা খানিক হারিয়ে ফেলেছে।

শ্রীনাথ বলল, আমি কখনো ঐ পাটাতনে উঠিনি। কী আছে বলো তো!

অনেক ট্রাংক বাক্স। পুরোনো সব মেটে হাঁড়ির মুখে মালসা দিয়ে ঢেকে ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখা। পুরোনো বই আর খবরের কাগজের ডাঁই।

আর কি?

একটা টর্চ থাকলে বুঝতে পারতাম। পাটাতনটা দিনের বেলাতেও এত ঘুটঘুটি অন্ধকার যে কিছুই ভাল করে বোঝা যায় না।

আর উঠো না। মা টের পেলে আবার শাস্তি দেবে।

দিলেই কি? আমাকে যে গুপ্তধন খুঁজতে হবে।

ভ্রূকুটি করে শ্রীনাথ বলে, শাস্তিকে তুমি ভয় করো না?

সজল বাবার দিকে চেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে বসা স্বরে বলে, করি।

করবে। শাস্তিকে ভয় যে না করে তার সর্বনাশ।
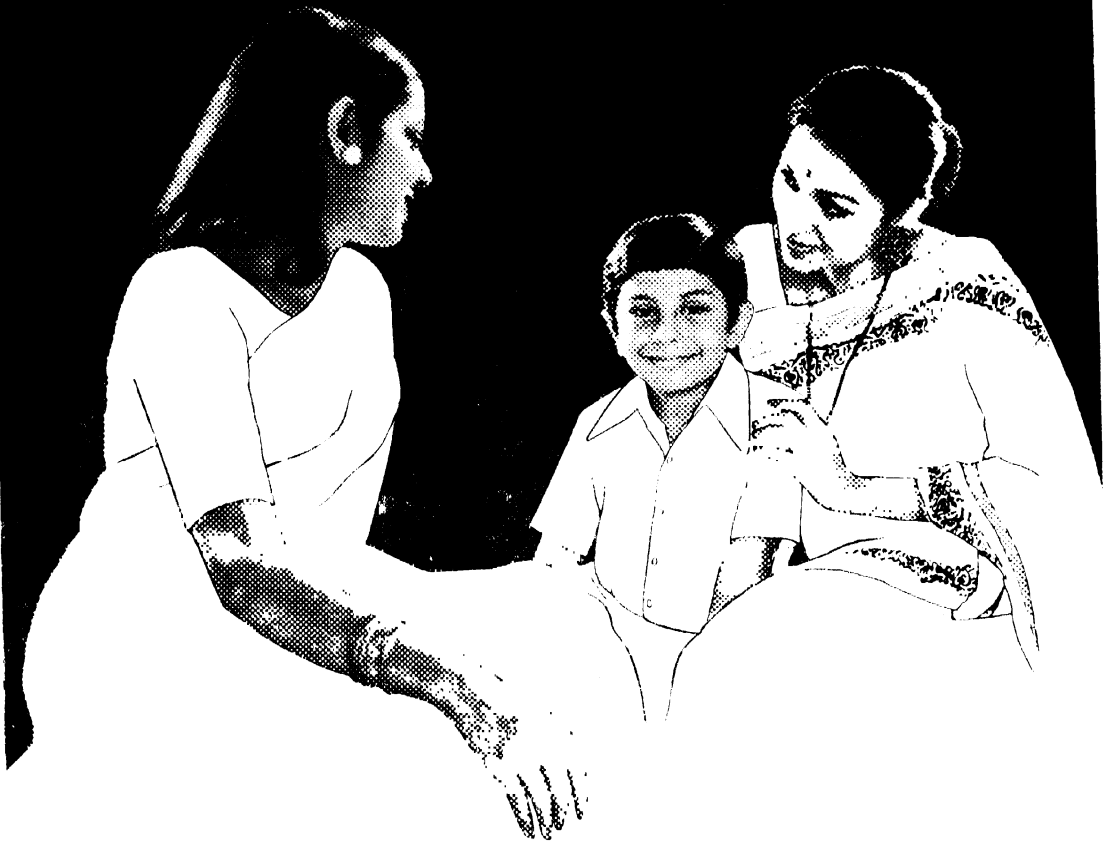
সজল চুপ করে চেয়ে থাকে।

বাবা ছেলের মধ্যে একটু আগের সহজ সম্পর্কটা ঠাং কেটে যায়।

শ্রীনাথ গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, ইয়ে, তোমাকে একটা প্রশ্ন করার ছিল। জবাব দিতে ভয় পেও না। সত্যি কথা বললেও আমি রাগ করব না।

কী?

আমার ঘরের তালাটা তুমি কিভাবে খোলো? চাবি দিয়ে, না অন্য কোনো যন্ত্রপাতি আছে?

সজল একটু অবাক হয়ে বলে, কেন, চাবি দিয়েই খুলি। অবশ্য খোলাটা অন্যায় হয়েছে। আর কখনো—

বাধা দিয়ে শ্রীনাথ বলে, অন্যায় তুমি স্বীকারও করেছ। সেটা নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। কথা হল, চাবি দিয়েই বা খোলো কি করে? চাবি তো আমার কাছে থাকে।

সজল একটু আমতা আমতা করে বলে, মায়ের কাছে যে চাবিটা আছে, সেইটে চুরি করি।

মায়ের কাছে, শ্রীনাথ ভীষণ অবাক হয়। ঘরের তালাটা সে মাস দুই আগে চাঁদনী বাজার থেকে বাইশ টাকায় কিনেছে। নামকরা তালা। দুটো চাবিই তার কাছে। তৃষার কাছে আর একটা চাবি যায় কি করে? এলেবেলে তালা নয় যে, যে-কোনো চাবিতে খুলে যাবে। শ্রীনাথ কঠিন স্বরে বলে, তোমার মায়ের কাছে তো চাবি থাকার কথা নয়।

সজল বাপের দিকে চেয়ে আবার ফ্যাকাসে হয়। শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলে, গুরুপদ চাবিওলা মাকে চাবিটা বানিয়ে দিয়েছে।

শ্রীনাথ অবাক ভাব চেপে রেখে বলে, ও তালার চাবি কি বানানো যায়? চাবি বানাবে কি ভাবে?

সজল মাথা নেড়ে বলে, জানি না তো! গুরুপদদা একদিন চাবিটা দুপুরে বেলায় মাকে দিয়ে যায়। সেই চাবি দিয়ে মা একদিন তোমার ঘর খুলে বৃন্দাদিকে দিয়ে ঘর পরিষ্কার করিয়েছিল।

ও। বলে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে শ্রীনাথ।

সজলের ভয় কাটেনি বরং বাড়ল। সে তাড়াতাড়ি বলল, দোষটা আমারই।

তুমি মোরগটাকে মেরেছিলে?

হ্যাঁ।

মরার সময় মোরগটা কেমন করেছিল?

খুব ডানা ঝাপটাচ্ছিল। ভীষণ ডাকছিল। আমাকে ঠোকরানোর চেষ্টা করছিল। অথচ যখন চুরি করে ঠ্যাং ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন কিছু করেনি। ঠিক যখন কাটব তখন ঐ রকম করতে লাগল। কি করে যেন টের পেল, আমি ওকে কাটব।

মোরগের তো অত বুদ্ধি নেই, তবে টের পেল কি করে?

সজল কিছুক্ষণ ভেবে বলে, ক্ষুরটা দেখে বোধ হয়।

ওরা তো ক্ষুর চেনে না।

অসহায় ভাব করে সজল বলে, তা হলে কি?

শ্রীনাথ একটু হেসে বলল, ওরা অস্ত্র চেনে না ঠিকই। তবে বোধ হয় ওরা কখনো সখনো মানুষের চোখ মুখ আর হাবভাব দেখে কিছু টের পায়। আর কিছু না হোক, নিষ্ঠুরতাটা বুঝতে পারে, মৃত্যুর গন্ধও পায় নিশ্চয়ই।

সজল একটু অন্যমনস্ক হয়ে বোধ হয় দৃশ্যটা কল্পনা করে। তারপর মাথা নেড়ে বলে, আমি অতটা বুঝতে পারিনি।

শ্রীনাথ সান্ত্বনার গলায় বলে, তোমার এখনো বোঝার বয়সও হয়নি। বয়স হলেও অনেকে ব্যাপারটা বোঝে না।

কাজটা খুব অন্যায় হয়েছিল, না?

শ্রীনাথ একটা শ্বাস ফেলে বলে, আমরা সবাই যখন মাছ মাংস খাচ্ছি তখন কাজটাকে একা তোমার অন্যায় বলি কি করে? মোরগ তো সবাই মারছে।

সজল একটু হেসে বলে, তা হলে অন্যায় নয় তো!

তা ঠিক বলতে পারি না। হয়তো অন্যায়ই হবে। কিন্তু তুমি ওটা করতে গেলেই বা কেন? মাংস খেতে ইচ্ছে হয়ে থাকলে মংলুকে বললেই তো পারতে। ও কেটে দিত।

মাংস খেতে ইচ্ছে হয়নি তো! মা রোজ টেংরির জুস খাওয়ায়। রোজ খেতে ভাল লাগে, বলো? খেতে খেতে এখন মাংসের গন্ধে আমার বমি আসে।

শ্রীনাথ বলে, তা হলে কাটলে কেন?

এমনিই।

শ্রীনাথ হাসে, দূর পাগল! এমনি এমনি কিছু করে নাকি মানুষ? কারণ একটা থাকেই। একটু ভেবে দেখ তো!

আমার খুব রাগ হয়েছিল।

কার ওপর?

সকলের ওপর।

আমার ওপরেও?

সজল লজ্জা পায়। মাথা নেড়ে বলে, না, তোমার ওপর নয়।

তবে কি মায়ের ওপর?

হুঁ।

কেন?

সজল এবার আবার একটু ভাবে। ভেবে বলে, ঠিক মায়ের ওপরেও নয়।

তবে কার ওপর?

এই বাড়িটার ওপর। গাছপালার ওপর। হাঁস মুরগীর ওপর।

তোমার অত রাগ কেন?

এক একদিন খুব রাগ হয়।

শ্রীনাথ আবার ক্ষীণ হাসে। বলে, রেগে যদি মোরগ মারতে পারো, তা হলে একদিন মানুষকেও খুন করে বসবে যে!

না, তা নয়। সজল মাথা নীচু করে।

শ্রীনাথ এই বাক্যালাপে আগাগোড়া কৌতুক বোধ করছে। সে হেসেই বলল, স্কুলে যাচ্ছো না?

না। দুদিন মা স্কুলে যাওয়া বন্ধ রেখেছে।

কবে তোমার ছুটি হবে?

বোধ হয় আজ। বৃন্দাদি সকালে এসে বলে গেছে পড়া করে রাখতে। আজ স্কুলে যেতে হবে।

রাত্রে তুমি এই ঘরে একা থাকো?

না, ছোটো মামা শোয়।

ও। শ্রীনাথ মৃদুস্বরে বলে, শোনো। তোমার সঙ্গে আমার আরো কয়েকটা কথা আছে। সন্ধের পর একবার আমার ঘরে এসো।

আচ্ছা।

তারপর শ্রীনাথ একটু ইতস্তত করে বলে, আমার সঙ্গে এই যে কথা হল এটা কাউকে বোলো না। আমি লুকিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম।

সজল এক গাল হেসে বলল, জানি।

শ্রীনাথও হাসল।

বলতে কি, মল্লিনাদার ওপর শ্রীনাথের কোনো রাগ নেই।
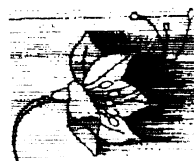
আগাছায় ভরা পড়ো জমি পেরিয়ে সামনের দিকে ফিরে আসতে আসতে শ্রীনাথ ভাবে, স্ত্রী বা মেয়ে মানুষের ওপর অধিকারবোধটা ভুলে যেতে পারলে পৃথিবীটা কি আরো একটু সুন্দর হয়? কুকুর, বেড়াল, পাখি, পতঙ্গের তো বউ থাকে না। ওরকম হলেই কি ভাল? তা হলে সজল কার ছেলে, তার বউ কার সঙ্গে শুয়েছে না শুয়েছে এসব বাজে চিন্তায় আর কষ্ট পেতে হয় না। ভেবে দেখলে, সজলের ওপরেও তার বিরাগ থাকা উচিত নয়। নিজের জন্মের জন্য সে তো দায়ী ছিল না।

গাছপালা, কীটপতঙ্গের কাছ থেকে শ্রীনাথ আজকাল অনেক শিখছে।

পালং ক্ষেতে সরিৎ দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে বলল, জামাইবাবু, কোথায় ছিলেন? কখন থেকে খুঁজছি।

শ্বশুরবাড়ির কারো ওপর খুব খুশি নয় শ্রীনাথ। অবশ্য ওদের কোনো দোষও নেই। ভালমন্দ মিশিয়ে যেমন মানুষ হয়, ওরাও তেমনি সাধারণ। তবু তৃষার

পর থেকে যেদিন তার মন সরে গেছে সেদিন ওদের পর থেকেও গেছে।

শ্রীনাথ জোর করে মুখে হাসি এনে বলল, খুঁজে-ছলে?

হ্যাঁ। ভাবলাম, কোনো কাজ নেই যখন, জামাই বাবুর বাগানটা দেখে আসি। আমি খানিকটা বাগানের কাজ জানি।

খুব ভাল। এর পর থেকে এই বাগান তোমরাই দেখবে।

কেন, ওকথা বলছেন কেন? বাগান তো আপনারই।

কিছুই আমার নয়। জানো না? মুখ ফসকে কথাটা বেরোলো।

সরিৎ বোধ হয় মুখোমুখি কথাটা শুনে লজ্জা পেল। বলল, আমার বেশী জানার দরকার কি?

শ্রীনাথ অবশ্য সামলে গেল। বলল, আসলে কি জানো? এসব এখন ভাল লাগে না। এখন ভাল লাগে চুপচাপ সময় কাটিয়ে দিতে। কেউ একজন যদি বাগানটা দেখে তো ভালই।

সরিৎ মাথা নেড়ে বলে, আমি দেখব। আপনি কি করে কি করতে হয় বলে দেবেন।

বেশ তো।

সরিৎ বেশ লম্বা চওড়া ছেলে। ওদের ধাতটাই এরকম। যা জোয়ান সব। তবে খুব একটা বুদ্ধি বা রুচি নেই। একটু ভোঁতা, ব্যক্তিত্বহীন। এক সময়ে এই সরিৎ খুব প্রিয় ছিল শ্রীনাথের।

সরিৎ বলল, আগে আপনি আমাকে সব সময়ে দাদার বলে ডাকতেন। এবার এসে একবারও ডাকটা শুনিনি।

শ্রীনাথ হাসল। বলল, কতকাল দেখা হয়নি। কি ডাকতাম তা মনেই ছিল না। এবার থেকে ডাকব।

আমাদের ভুলে গিয়েছিলেন তবে? সরিৎ সকৌতুকে প্রশ্ন করে।

শ্রীনাথ বিপাকে পড়ে বলে, আরে না। ডাক ভুলতে পারি, মানুষকে কি ভোলা যায় সহজে!

শুধু মানুষ কেন, আমরা তো আত্মীয়। নয় কি?

সে তো বটেই।

তবে?

শ্রীনাথ কথার পিঠে কথা বলতে জানে না। তাই লজ্জা পেয়ে বলল, এসো, ঘরে এসো।

ঘরে ঢুকেই সরিৎ বলে, ঘরটা তো! ঘর না বাগ তা বোঝা যায় না এত আলো বাতাস!

শ্রীনাথ তার ইজিচেয়ারে বসে বলল, তোমাদের বাড়ির সকলের খবর-টবর কি?

সরিৎ জবাবের জন্য তৈরিই ছিল। বলল, দিন পনেরো হল এসেছি, এই প্রথম এ কথাটা জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীনাথের বাস্তবিকই কারো কোনো খবর জানার কৌতূহল হয়নি। এই সব নীতি নিয়ম ভদ্রতাবোধ তার মাথা থেকে উবে যাচ্ছে কেন?

সরিৎ ফের বলল, এ কয়দিন ভাল করে কথাই বলছিলেন না। আমি ভাবলাম, আমাদের ওপর বুঝি রাগ করে আছেন।

কথাটার জবাব হয় না। শুধু হাসি দিয়ে সেরে দিতে হয়। শ্রীনাথ যতদূর সম্ভব অপরাধী হাসি হেসে বলল, সংসারের নানা রকম ব্যাপার। আমি ঠিক এত বড় একটা এনটায়ারমেন্টের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অভ্যস্ত নই কিনা। তাই বড্ড ভুলও হয় সব কাজে।

সরিৎ বিছানায় বসে বলল, কার খবর জানতে চান?

শ্রীনাথের মনে পড়ল প্রথমেই শাশুড়ির কথা। বিয়ের সময় শ্রীনাথ খুব খেতে পারত। শাশুড়িও তাকে তখন প্রাণভরে খাইয়েছেন। থালার চারদিকে বাটি সাজিয়ে গোটা দুই বৃত্ত রচনা করে ফেলতেন প্রায়। প্রথমেই সেই ভদ্রমহিলার কথা মনে পড়ে। শুনেছে, খুব সুখে নেই। শ্বশুর রিটায়ার করার পর ছেলের হাত তোলা হয়ে আছেন।

শ্রীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জিজ্ঞেস না করাই বোধ হয় ভাল। বরং মনে মনে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করাটাই এখন দরকার।

সরিৎ কথাটা বুঝল। একটু গম্ভীর হয়ে বলল, এটা খুব ঠিক কথা। জানতে গেলেই মন খারাপ হবে। কেউই তো ভাল নেই।

তুমি কেমন সরিৎ?

সরিৎ না, দাদার।

হ্যাঁ হ্যাঁ দাদার।

আমিও ভাল না জামাইবাবু। বড়দার কাছে ছিলাম। ভাল ছিলাম না। মেজদি ডেকে আনল, এলাম। দেখি এখানে কেমন থাকি।

খারাপ লাগছে না তো এখানে?

ভাল কি লাগার কথা! বেকারকে কাজ না দিয়ে যত ভালই রাখুন সে ভাল থাকে না।

শ্রীনাথ চিন্তিত মুখে বলে, সেটা তো সকলেরই প্রবলেম দাদার।

আমারও। তাই বলি, কেমন আছি না জানতে চেয়ে বরং আমারও মঙ্গল প্রার্থনা করুন।

দূর পাগলা! তোমার তো বয়স কম, জীবনটাই পড়ে আছে।

একটা চাকরি দিন, তবেই জীবন থাকবে। নইলে কবে শুনবেন, ট্রেনের তলায় গলা দিয়েছি।

যাঃ! বলে হাসে শ্রীনাথ।

মাইরি জামাইবাবু! বিশ্বাস করুন।

(ক্রমশ)

সমকালীন ভাস্কর্য ও তরুণশিল্পী

অজিতকুমার দত্ত

ভারতীয় ভাস্কর্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের কাহিনী খুবেই সুবিদিত। বিভিন্ন রূপে, ভাবের নানা বৈচিত্র্যের মাঝে তার প্রকাশ ঘটেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। সেই গৌরবদীপ্ত প্রতিভার পরিচয় রয়েছে সারনাথের ধ্যানী-বুদ্ধে, ইলোরার প্রাণচঞ্চল কৈলাসনাথে, মহাবলীপুরমের প্রস্তরগাত্রে খোদিত গঙ্গাবতরণে অথবা তাণ্ডব-উচ্ছল নটরাজ মূর্তিতে। ভারতীয় ভাস্কর্য-পরম্পরার উদ্ভাস যথার্থই বহুবিচিত্র।

কিন্তু কালের কুটিলগতিতে এই ধারাবাহিকতায় পড়েছে ছেদ। ক্রমে ঐতিহ্যচর্চার পরিবর্তে চালু হয়েছে পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক শিক্ষা। কিন্তু গতানুগতিক সেই অ্যান্টিক ও ফিগার স্টাডি কারুকে নতুন কোনও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। ফলে একদা কপি আর তস্য ভিড়ই বেড়ে উঠতে দেখা গেল। বলা যায়, একরকম নিষ্ফলাই কেটে গেল বেশ কিছুকাল।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক নাগাদ যে কিছু কাজ বা নাম উচ্চারিত হল, তা মুখ্যত শিল্পনৈপুণ্যোৎকৃষ্ট কারণে। হিরণ্ময় রায়চৌধুরী, ম্হাত্রে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী কিন্তু প্রধানত পরিচিত পোর্ট্রেট, হেড স্টাডি বা ফিগার কম্পোজিশনের জন্যই। বরং ত্রিশের দশকে বলা যায় যে এক পরিবর্তন সূচিত হল রামকিংকরের আবির্ভাবে। তাঁর ভাস্কর্যে—সহজ সাবলীল বলিষ্ঠতায়, উন্মুক্ত আকাশতলে স্থাপনায়, অপেক্ষাকৃত অপরিচিত মাধ্যম কংক্রীটের ব্যবহারে—নানা অর্থেই একটা বলিষ্ঠ নবীন প্রকাশ পরিলক্ষিত হল। শান্তিনিকেতনের সৃষ্টিশীল আবহাওয়াও নিশ্চয়ই তাঁকে কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কাছাকাছি সময়ে চিন্তামণি কর, প্রদোষ দাশগুপ্ত বা শঙ্খ চৌধুরীর কাজেও লক্ষ করা গেল সেই নব-আবাহন-প্রচেষ্টাকে। কাঠ বা পাথরের কাজ একসময় করলেও, ব্রোঞ্জ বা ঢালাইয়ের কাজেই যেন দেখা গেল মনোযোগ এঁদের বেশী। আবার শিক্ষা বা করণ-কৌশলে পাশ্চাত্য আঙ্গিকাশ্রয়ী হলেও, মনন বা প্রকাশে অনেকটাই প্রাচ্যধর্মী। যথার্থই, এক হিসাবে ভূমিকা এঁদের সেতুবন্ধের। সময়ের আরও খানিকটা ব্যবধানে ভবেশ সান্যাল (হয়ত বা ছবিই বেশী এঁকেছেন), ধনরাজ ভগত এবং আদি দাবিয়েরওয়ালাকে কর্মব্যস্ত দেখা গেল, যথাক্রমে, পাথর ধাতুপাত ও কাঠ এবং বাতিল যন্ত্রাংশ সহযোগে।

সংক্ষেপে, নানাভাবে এই পরিবর্তন-প্রয়াসের ফলে, ভারতীয় ভাস্কর্য-আন্দোলনে এক নতুন সাড়া জাগল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা বৃদ্ধি পেল। চেষ্টা চলল কাজে সৃষ্টিধর্মী তথা ব্যক্তিবিশিষ্টতার এক ছাপ আনার। সূত্রপাত হল আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অথবা স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে পৌঁছে সেই আন্দোলন আরও ব্যাপক, আরও জোরদার হল—আলোড়ন তুলল চেতনার গভীরে। ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক যোগসূত্র যেমন এই প্রসারের একটি হেতু, তেমনি তরুণদলের নব উদ্যমও সমকালীন আন্দোলনের বহুবিস্তৃতির আরেকটি উল্লেখনীয় কারণ। বরং বলা যায় যে তরুণ-গোষ্ঠী তাদের শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষা এবং ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। ফলে দেশ জুড়ে আজ গড়ে উঠেছে অনুকূল আর সম্ভাবনাময় পরিমণ্ডল।

নিঃসন্দেহে গত বছর বিশেকের ভাস্কর্যের কাহিনী অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক ভাস্করদলের নতুন উদ্দীপনা, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ আর সফল উত্তরণেরই কাহিনী। বিশেষ অঞ্চল বা শহরে এ-প্রচেষ্টা সীমায়িত থাকেনি। শান্তিনিকেতন, বরোদা, মাদ্রাজ, কলকাতা, দিল্লী এবং আরও বহু কেন্দ্র জুড়ে এর পটভূমি। কাজের চেহারা বা প্রকাশভঙ্গীও এর বৈচিত্র্যময়। কিছু উদাহরণ বা সমীক্ষা-সহযোগে বিশদ করা যেতে পারে কথাটা। মাদ্রাজের পি ভি জানকীরাম তামা বা অন্য ধাতুপাতের ওপর কাজেতেই সিদ্ধহস্ত। কল্পিত রাজা বা অন্য
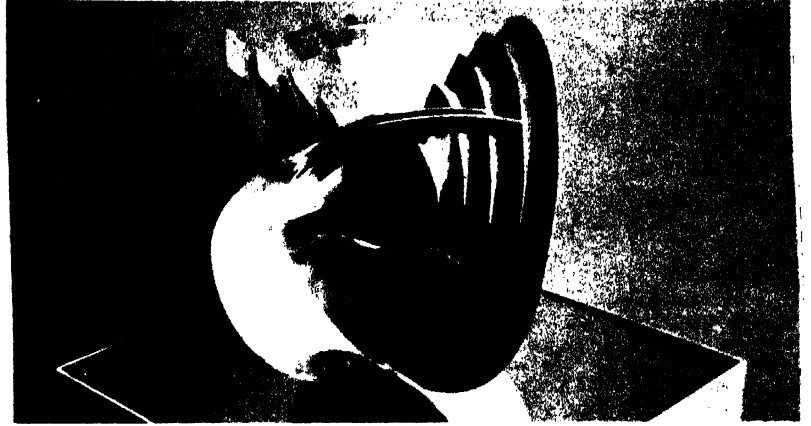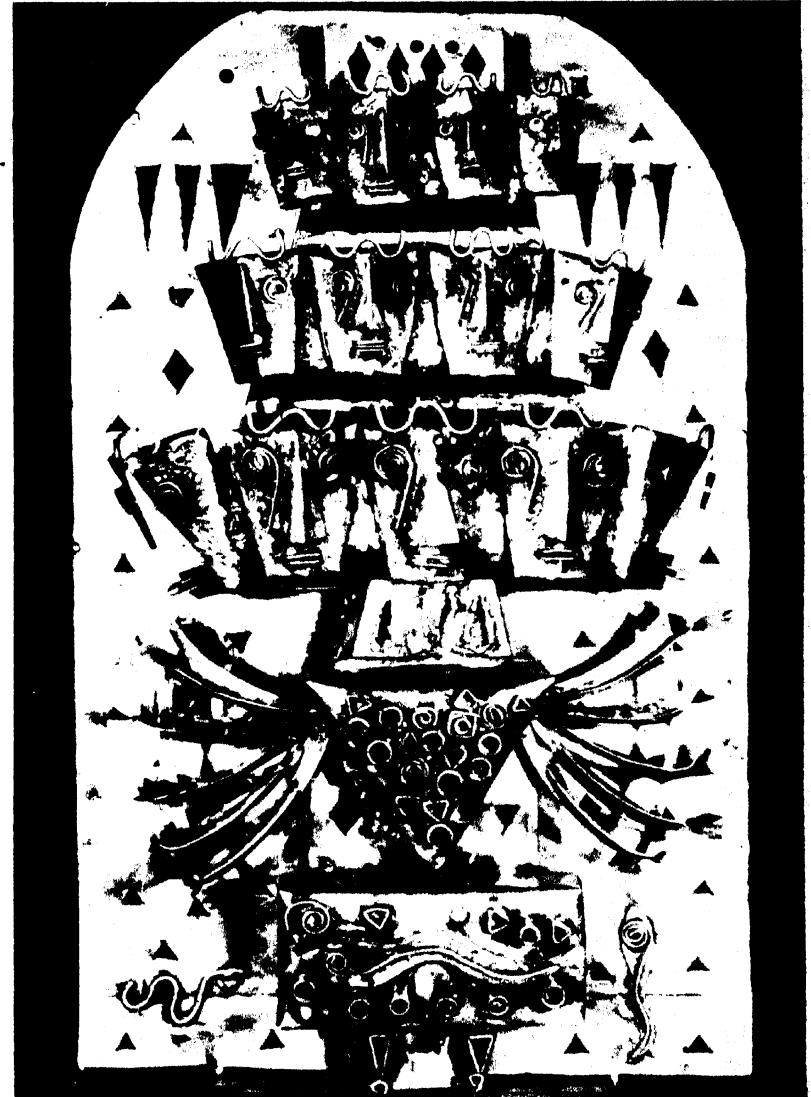
ধর্ম রত্নম : "অবজেক্ট"

এস, নন্দগোপাল : "নানা প্রতীক"

রমেশ পাটোরিয়া : "নারীর লুকানো মুখ" (মার্বেল)

কোনও চরিত্র, কিংবা পরিচিত খুঁটি আর নানা নকশার রূপায়ণ সেই সব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধাতুপাতে সেখানকারই আরেক তরুণ এস নন্দগোপালের হাতে এই ধাতুপাতই আরও নানা যোগ-বিয়োগে ভিন্নতর এক চেহারা নিয়েছে। আবার, শান্তিনিকেতনে শর্বরী রায়-চৌধুরীর কাজ মুখ্যত ব্রোঞ্জে। শিক্ষাদানের সঙ্গে নিজের কাজও চলছে। আকারে প্রায়শ ছোট হলেও কাজগুলো নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। হয়ত সংগীতের প্রতি অসীম ভালবাসা বলেই ভাস্করের হাতে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী হয়ে ওঠেন অবিস্মরণীয়।

ভারতের শিল্প-মানচিত্রে বরোদার অভ্যুদয় একরকম সাম্প্রতিক। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদার-চিন্তার ফলে বহু সুপরিচিত চিত্রকর ও ভাস্কর এসে যোগদান করেছেন এখানকার ফাইন আর্টস ফ্যাকাল্টীতে। প্রদোষ দাশগুপ্ত ও শঙ্খ চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে এখানে ছাত্রদের তালিম দিয়েছেন ভাস্কর্যে। ফলে এক শক্তিমান তরুণ দলের দেখা মিলেছে এখানে। অল্প বয়সেই প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর মিলেছিল রাঘব কানোরিয়ার "লম্ফমান গো-বৎস" ইত্যাকার কাজে। উৎসাহ সমভাবেই এখনও ধাতুর কাজেই, তবে তার চেহারায় যথেষ্ট বিমূর্ত ছাপ। পক্ষান্তরে মহেন্দ্র পাণ্ডেয়ের কাঠের পর্যায়ের পর ইদানীং পাথর বা মার্বেলে কাজ করতেই আগ্রহ। সেদিক থেকে রমেশ পাটোরিয়ার উৎসাহ উল্লেখনীয়। এক নাগাড়ে মাসের পর মাস রাজস্থানে মাকরানায় অর্থাৎ পাথর খাদে বসে কাজ করতে দেখা গেছে এই ভাস্করটিকে। আয়াস বা পরিশ্রম ছাড়াও, লেগে থাকার এই মনোবলও আজকের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই অর্থব্যঞ্জক।

শিল্প-আন্দোলনে কলকাতার অবদান অথবা এক-কালীন নেতৃত্ব অনস্বীকার্য। পুরোধার ভূমিকা এর প্রায় অব্যাহত রয়েছে বলা চলে। প্রধানত চিত্র-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হলেও, এককালে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট ওড়িশা-শৈলীতে তক্ষণ-কর্ম শিক্ষাদানের আয়োজন করেছিল। আবার ছাত্রমহলে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে সাড়া পরিলক্ষিত হল—প্রদোষ দাশগুপ্ত ও চিন্তামণি কর প্রমুখের শিক্ষা ও সান্নিধ্যের ফলে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগ্রহ কলকাতায় বরাবরই লক্ষণীয়। পরিচিত কাঠ বা পাথরের (বিশেষত চুণারের) আদর ত' আছেই, ধাতুও (ব্রোঞ্জ ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম বা ব্রাসও) আকর্ষণীয়। নতুন মাধ্যমও অনাদৃত নয়। তাই একই সঙ্গে দেখা মেলে নানা চেহারায় বিভিন্ন মাধ্যমে করা সব কাজ। নিরঞ্জন প্রধানের কাঠের বিচিত্র কম্পোজিশনের পাশেই মেলে দিলীপ সাহার সূক্ষ্ম অনুভূতিময় মার্বেল-খণ্ড। বিমান দাসকে (বর্তমানে দিল্লীবাসী) মুনশীয়ানার ছাপ আনতে ভঙ্গি দেখা যায় পোড়ামাটির বড় আকারের কাজে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় দেবব্রত চক্রবর্তীর ফাইবার-গ্লাসে করা গ্রুপ কম্পোজিসনের। বৈচিত্র্য এবং কর্মকুশলতা থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অন্য সব সৃষ্টি-ধর্মী কাজের মতোই এক্ষেত্রেও কলকাতায় প্রাণরসের উৎস অফুরন্ত।

দিল্লীও আজ অনেকাংশে কর্মমুখর। এককালের দফতরকেন্দ্রিক জীবন আর নিছক দশটা-পাঁচটায় বাঁধা নয়। সরকারী আনুকূল্য আর পাঁচ জায়গার পাঁচজন এসে জমায়েত হওয়া বা আর যে-কারণেই হোক, এখানেও কিছু প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে কয়েকজনের নাম নিশ্চয়ই উল্লেখ করা চলে। বলবীর সিং কাটের শিল্পশিক্ষা শান্তিনিকেতন ও বরোদায়। কাজ প্রধানত পাথরে। একসময় গ্রুপ স্কাল্পচার বা খণ্ডাংশের সমন্বয় এবং ইদানীং কাজে মনুমেন্টাল বা বিশালাকারের সম্ভাবনা-অন্বেষণের চেষ্টা লক্ষণীয়। নারায়ণ কুলকার্ণীর আদিবাস কর্ণাটকের মন্দির পরি-বেষ্টিত পল্লীতে। ঝোঁক একদা ছবির প্রতি থাকলেও, আজ পুরো সময় ব্যয়িত হয় ভাস্কর্য-কর্মে। ধাতু নিয়ে পরীক্ষা এবং ঢালাইয়েই তার আগ্রহ বেশী। *এককালের বিষয়বস্তু জন্তু-জানোয়ার হলেও জ্যামিতিক বা বাক্স ধরনের চেহারা এর আজকের সব কম্পোজিসনের।* আরেক এককালীন ছবি-আঁকিয়ে সি ভি ধর্মরত্নমকে খুঁজে পাওয়া যায় ধাতুপাত ও কাঁচসহযোগে গঠিত তার মাল্টিপল্‌সে বা জ্যামিতি-আশ্রয়ী প্রতিবিম্বে।

প্রসঙ্গত দেশের দূরপ্রান্ত বা অভ্যন্তরের অবস্থাও খানিকটা অনুধাবন করা যেতে পারে। আন্দোলনের রেশ সেসব জায়গায় কিছুটা পৌঁছানো খুবই সম্ভব, বিশেষত শান্তিনিকেতন, বরোদা বা বাইরে অন্যত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত উৎসাহীদের মারফৎ। স্মরণ হচ্ছে গৌহাটির কথা। স্থানাভাবে কটি উদ্যমী তরুণ স্থানীয় এক ফুটবল ক্লাবের ঘরেই স্টুডিও বানিয়েছে। কিন্তু এক নীলপবন বড়ুয়া বা তার সতীর্থ ক'জন কিংবা আগরতলায় প্রায় একক বিপুলকান্তি সাহা সে-উৎসাহ ক'দিন বয়ে বেড়াবে? স্থানীয়ভাবে একটা সচেতনতা বা কর্তৃপক্ষের সহৃদয় মনোভাব আশু প্রয়োজন। সহায়তার অভাব হবে না—আশাবাদী হিসাবে এটুকু ভাবতে ভাল লাগবে।

কোনও সংস্থা বা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও বা সে সুযোগের অপেক্ষা না করেও ভাস্কর্যকর্মরত অনেকেই ব্যক্তিক প্রচেষ্টায় রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম বলে দেখা যাচ্ছে। তবে কাজের কেন্দ্র তাদের

কুনচাঁদ পাইন : মুখ (ব্রোঞ্জ)
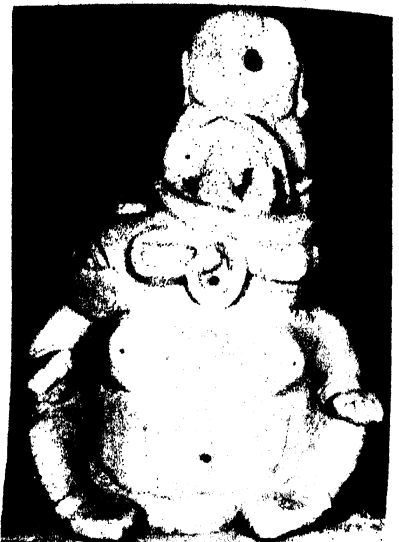
ঈশ্বরীপ্রসাদ গুপ্ত : পোড়ামাটির কাজ

বড় শহরেই, দূরপ্রান্তে নয় এবং সুখের বিষয় পরিবেশও অনুকূল। চণ্ডীগড়ের শিব সিং এমনই একজন। বহু সংখ্যক রড, পাইপ, রিং ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত এর কাজ এবং বহুক্ষেত্রেই উন্মুক্ত আকাশের নীচে সংস্থাপিত। লক্ষ্ণৌর শ্রীখণ্ডের কাজেও (প্রায়শই ছোট) দেখা মেলে ফর্ম নিয়ে ভাঙা-চোরার। উল্লেখযোগ্য হায়দ্রাবাদের ওসমান সিদ্দিকী পাথরের কাজের জন্য। কিন্তু এই একক প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী নিশ্চয়ই রাখতে পারেন শ্রীমতী মীরা মুখার্জী। বাস কলকাতায় হলেও, দেশের নানা প্রান্তের লৌকিক শিল্প বিশেষত আজকের সুপরিচিত ঢোকরা রীতি-প্রকরণ নিয়ে এঁর জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা নিরলসভাবে চলেছে। কাজেও সেই ছাপটা খুব স্পষ্ট।

সমকালীন ভাস্কর্যের একটা রূপরেখা মোটামুটি এই আলোচনা থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্যই নামের তালিকা আরও দীর্ঘ করা যেতে পারে। নতুনের সংখ্যা এবং পরীক্ষার পরিসরও ত' ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তবে আজকের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণীয় দিকগুলো থেকে বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে আন্দোলনে একটা নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। তার প্রমাণ কাজের সংখ্যা এবং বহুবিচিত্রতায়। আরেক প্রকাশ শিল্পী, রসিক তথা সাধারণের নবলব্ধ আগ্রহে। প্রদর্শনী, প্রকাশনা, আলোচনা, শিল্পী-শিবির ইত্যাকার কার্যক্রমও অনেক বেড়েছে। সুলক্ষণ সন্দেহ নেই। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। পৃষ্ঠপোষকতা সেই সঙ্গে সত্যি কতটা বেড়েছে?

ভাস্কর্য ব্যয়বহুল ব্যাপার। দামী, ভারী কাঠ, পাথর বা ধাতু নাড়া-চাড়া তথা আনা নেওয়ায় যথেষ্ট ঝকমারি। আর বিশেষ সেই কারণেই উৎসাহদান বা পৃষ্ঠপোষকতা (হয়ত বা বিক্রীর আকারেই)—খুবই বড় কথা। তাই এই পৃষ্ঠপোষকতাসম্পর্কিত প্রশ্নের যথোচিত সদুত্তর বা সুসমাধানের ওপরই বিশেষভাবে নির্ভর করবে, ভাস্কর্য তথা সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তির প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ। শুধু সরকারীভাবে কেন, বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-গবেষণা-সংস্থা (যেমন, প্রয়াত ডঃ ভাবার উদ্যোগে টাটা ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছে মূল্যবান এক শিল্প-সংগ্রহ) প্রভৃতিরও এই ব্যাপারে আজ চিন্তা করার বা অগ্রণী হবার সময় এসেছে। এ ধরনের কিছু না হলে আন্দোলনের গতি হয়ে আসবে স্তিমিত, উদ্দীপনা যাবে হারিয়ে। অনিশ্চিত অন্ধকার অবশ্যই কেউ চাইবে না। তরুণের দুর্মর প্রাণশক্তিই জীইয়ে রাখবে সব প্রচেষ্টা, সব আশা। এত উদ্যম এত পরিশ্রম, এত জনের এত নিরলস সাধনা—কখনই বৃথা যেতে পারে না।

অ্যাথলেটিকসে বাঙালী গৃহবধূ রীতা সেন

রূপক সাহা

গত বছর ব্যাংকক এশিয়ান গেমসের জন্য পাতিয়ালায় যখন ভারতীয় অ্যাথলেটিকস টিমের কোচিং চলছিল, এক সাংবাদিক তখন কোচ ইলিয়স বাবরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমাদের মেয়েদের মধ্যে এই মুহূর্তে কাকে আপনার সবচেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতিময় বলে মনে হচ্ছে?"

মাঠে প্র্যাকটিসে ব্যস্ত ছিল মেয়ে অ্যাথলিটরা। একমুহূর্ত দ্বিধা না করে তাদের একজনের দিকে ইঙ্গিত করে বাবর উত্তর দিয়েছিলেন, "ওই বাঙালী মেয়েটাকে, যে স্প্রিনট ইভেনটে নামে—রীতা সেন।"

সাংবাদিকটি বিস্মিত হয়ে বলেন, "কেন ওকে প্রতিশ্রুতিময় বলছেন?"

স্মিত হেসে বাবর উত্তর দেন, "ও কিছু সহজাত দক্ষতা নিয়ে এসেছে। ঘষে মেজে নিতে পারলে লাইম-লাইটে আসবেই।"

কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই অ্যাথলেটিকস কোচের কাছে আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পাননি সাংবাদিকটি। কারণ উনি জানতেন, বাবর অকারণে কারো সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হন না। অ্যাথলিট মহলে ওঁকে সবাই শ্রদ্ধা করেন 'প্রতিভা' খুঁজে আনার ব্যাপারে ওঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই বলেই। আজ পর্যন্ত দশজন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও পাঁচজন এশীয় চ্যাম্পিয়ন বানার উনি তৈরী করেছেন যাঁদের মধ্যে আছেন মিলখা সিং থেকে শুরু করে হার্ডলসের শ্রীরাম সিং, গোপাল সাহনীরাও।

এই ঘটনাটির কয়েকমাস পরেই বাঙালী মেয়েটি ভারতীয় অ্যাথলেটিকস জগৎকে চমকে দেয়। টোকিওতে এশীয় ট্র্যাক অ্যানড ফিলড মিটে গিয়ে এমন দুটি নজীর সৃষ্টি করে আসে যা এর আগে কোন ভারতীয় মেয়ে পারেনি। রীতা পঞ্চান্ন সেকেনডের কমে চারশো মিটার দৌড়য় এবং সেই সুবাদে বিশ্বকাপগামী এশীয় অলস্টার টিমেও নির্বাচিত হয়। টোকিওতে যাবার আগে পাতিয়ালায় ট্রায়াল ক্যামপেই ও কিছুটা হদিশ দিয়েছিল, অবাক করে দেওয়ার মতো কিছু একটা করবেই। ওখানে একশো মিটার দৌড়য় ১১·৮ সেকেনডে। বারো সেকেনডের কমে অন্য কোন ভারতীয় মেয়ে যা পারেনি। এসব ছাড়াও রীতা আরো একটা অনন্য-সাধারণ কৃতিত্ব দেখায় যা বাঙালীকে বেশ কয়েক বছর গর্বিত করে রাখবেই। এশীয় মিট থেকে দুটি মেডেল ও আনতে পেরেছে, যা অন্য কোন বাঙালী মেয়ে আজ পর্যন্ত পারেনি।

ভারতীয় অ্যাথলেটিকস আকাশে রীতার এই উত্থান অনেকটা ধূমকেতুর মতোই। মাত্র এক বছর আগেও ওকে কেউ চিনত না। জলন্ধরে গত বছরের জাতীয় ওপেন অ্যাথলেটিকস মিটে একশো মিটার দৌড়ে চতুর্থ হয়েছিল। আর জাতীয় স্তরে এটাই ছিল ওর করা সবচেয়ে ভালো ফল। আশ্চর্য, জলন্ধর মিটের পর থেকেই ধীরে ধীরে ও সময় কমিয়ে ফেলতে শুরু করে এবং ব্যাংকক এশিয়াডের আগে অ্যাথলে-টিকস বোদ্ধাদের চমকে দেয় ভারত-রুশ দ্বৈত মিটের সময়। এর পিছনে অবশ্য একটি কারণও ছিল যেটি ওকে অনুপ্রাণিত করে অদ্ভুতভাবে। টোকিও থেকে ফেরার পর রীতাকে এ সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করে-ছিলাম, তখন সহজ সরলভাবে ও ঘটনাটি জানিয়েছিল আমাকে।

দক্ষিণ কলকাতার বিবেকানন্দ পার্কের সামনে সরকারী ফ্ল্যাটে ওদের ঘরে বসে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম রীতাকে। আধময়লা আমেরিকান জর্জেট পরা তরুণী বউটিকে দেখে কিছুতেই মন থেকে আরেকটি ছবি তাড়াতে পারছিলাম না। মার্চ মাসে জামশেদপুরের ওপেন মিটে প্রেস বক্সে বসা আমার বুককে ক্ষণিকের জন্য গর্বে, উত্তেজনায় ভরিয়ে দিয়েছিল এই সাধারণ বাঙালী ঘরণীটিই। দুশো মিটার দৌড়ে প্রথম ফিতে ছুঁয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ও যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন শুনলাম পাশে বসা বোম্বাইয়ের সাংবাদিক জো কাম্পো চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বলছেন, "হোয়াট এ রেস, ফ্যানটাসটিক!" কাম্পো পরিচিত অ্যাথলে-টিকস বিশেষজ্ঞ হিসেবে বলেছিলেন, "দেখো, তোমাদের এই মেয়েটা খুব অল্পদিনের মধ্যে আমাদের সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। এতো টাফ রেস করেও কি সহজভাবে হেঁটে গেল দেখলে। ওর মতো পাওয়ারফুল মাসলস যদি আমাদের অন্য মেয়েরা পেত তাহলে জাপানীজ আর চাইনীজ মেয়েদের দেখিয়ে দিতে পারতাম।" জামশেদপুরের মিটে ভিকট্রি স্ট্যানডে দাঁড়িয়ে রীতাই বাঙলার জন্য একটি সোনার পদক নেয়।

সাদার্ন অ্যাভিনিউতে ওদের ফ্ল্যাটে বসে রীতার সংগে যখন কথা বলছিলাম তখন পাশেই ছিলেন ওর স্বামী আশিসবাবু। উনি রীতার কোচ। বলেছিলেন, "জলন্ধর মিটের থেকে ও ভালো রেজাল্ট করতে শুরু করে তার কারণ ওখানে ওর প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল। একশো মিটারে রীতা থার্ড ফিনিশ করা সত্ত্বেও ওকে জাজরা ফোরথ করে দেন। মেডেল না পাওয়ায় ও খুব ভেঙে পড়েছিল। আমি বলেছিলাম, এতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। তোমার ক্ষমতা আছে, চেষ্টা করে ফার্স্ট হবে। তখন কেউ তোমার কাছ থেকে মেডেল কেড়ে নিতে পারবে না।"

কয়েক মাস পরেই ব্যাংকক এশিয়ান গেমস। আশিসবাবু উৎসাহ দেন, স্প্রিনট ইভেনটে মেয়েদের মধ্যে কে সেরা—তা প্রমাণ করার সুযোগ আবার পাওয়া যাবে ট্রায়ালেই। আশিসবাবু জানতেন রীতা আরো অনেক সময় কমাতে পারবে। '৭৩ সালে দুর্গাপুরে জাতীয় অ্যাথলেটিকসের সময় মিলখা সিংও এই একই কথা বলেছিলেন ওকে। রীতা সেবার সিনিয়র গার্লস-দের রীলে টিমে দৌড়েছিল। রেসের পর মিলখাই খুঁজে বার করেছিলেন ওদের। বলেছিলেন, "একে দিয়ে এখন ১০০ মিটার দৌড় প্র্যাকটিস করাও। কিন্তু লক্ষ্য রেখো ৪০০ মিটারের দিকে। ও ভালো করবে ৪০০ মিটারেই।"

এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে ডাক না পাওয়ায় রীতাকে জোর করেই পাতিয়ালায় নিয়ে যান আশিস-বাবু। এন আই এস কোচ যোগিন্দর সিং সাহনী প্রথমে পাত্তা দেননি। রীতা একশো মিটার ১২·৫ সেকেনডে দৌড়য় শুনে হেসে দুদিন পরে ওকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। এনট্রি ট্রায়ালে রীতা কিন্তু সবাইকে পিছনে ফেলে ১২·৩ সেকেনড সময় করে। কুড়ি দিন ক্যামপে থাকার পর সবার নজর কাড়ে ট্রায়ালে ১২·১

সেকেনডে দৌড়ে। অনসুয়া বাস্তও একই সময় নিয়েছিল। রীতা আরও সময় কমাতে পারত কিন্তু ভারত-রুশ টেস্ট মিটের চারটিতেই নামায় ও ক্লান্ত ছিল। অনসুয়া সব কটিতে যায়নি, এশিয়ান গেমসের সিলেকশন ট্রায়ালে যাতে ভালো সময় করতে পারে। করেও, ১২·৩ সেকেনড টাইমে দৌড় ভারতীয় দলে জায়গা পেয়ে যায়। ১২·৫ সেকেনডে দৌড়নোর জন্য রীতা বাদ পড়ে।

এশিয়ান গেমসে অনসুয়া অংশ নিতে পারেন সেকস টেস্টে বাতিল হওয়ায়। এ খবরটি রীতাকে দুঃখিত এবং ক্ষুব্ধও করে। অনসুয়ার বদলে ওকে পাঠানো হলে, ও মনে করে—ও খালি হাতে ফিরত না। চীনা মেয়ে পিন ভিন ইয়া চ্যাম্পিয়ন হয় ১২·৫ সেকেনডে। ব্যাংককে যেতে না পারায় রীতা ক্ষুব্ধ আরেকটি সেন্টিমেন্টাল কারণেও। ট্রায়ালে যাবার আগে আশিসবাবুকে ও কথা দিয়েছিল ভারতীয় টিমে যে করেই হোক ঢুকবেই এবং গেমস থেকে ফিরে এসে একটি উপহার দেবে। উপহারটি আর কিছু নয়—একটি ঘড়ি। পাতিয়ালায় ট্রায়ালে যাবার আগে ভারত-রুশ টেস্ট মিটে এই ঘড়িটা ও জিতেছিল।

মীরাটে ঐ টেস্ট মিটে রাশিয়ান মেয়ে নিনা মারগুলিনা ওকে ডেকে বলেছিল, "আমাকে ২০০ মিটার দৌড়ে যদি হারাতে পারো, তাহলে আমার হাত-ঘড়িটা তোমাকে দিয়ে দেব। কিন্তু তুমি যদি হারো তাহলে তোমারটা আমাকে দিতে হবে, রাজী?" নিনা মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে দেশের হয়ে দৌড়েছিল। ও রাশিয়ার অন্যতম সেরা স্প্রিন্টার। ওর বেস্ট টাইম ১১·৬ সেকেনড একশো মিটারে। মীরাট টেস্টের আগে কোনি ভারতীয় ওকে হারাতে পারেনি। ওর কথা শুনে হঠাৎ রীতা বাজি ধরে বসে। অনমনীয় জেদে দারুণ দৌড়ে নিনাকে দুশো মিটারে হারিয়ে দেয় এবং ঘড়ি জেতে। রীতা ভেবেছিল এ ঘটনাটা আশিসবাবুকে জানাবে না। এশিয়ান গেমস থেকে ফিরে এসে ঘড়িটা প্রেজেন্ট করে অবাক করে দেবে। ওর দুর্ভাগ্য, তা সম্ভব হয়নি।

এশিয়ান গেমসের পরে কলকাতায় মহিলা ক্রীড়ায় কমলজিত সাধু রীতার সম্পর্কে খুব আগ্রহ দেখান। কমলজিত ৭০ সালে ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে চারশো মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছিলেন। এখন এন আই এস কোচ। পাতিয়ালায় রীতার স্পিড আর রানিং স্টাইল দেখে কমলজিত বলেছিলেন, "তোমার পক্ষে দুশো মিটার রেসটাই মানানসই। একশ মিটার দৌড় ছেড়ে দিয়ে তুমি যদি ঐ ইভেন্টটা তো মন দাও তাহলে ওয়ারল্ড ক্লাস অ্যাথলিট হতে পারবে।" মহিলা ক্রীড়ায় রীতার পারফরমেনস ভালো ছিল না। কমলজিত তবুও ওকে একটি সিডিউল দিয়ে গিয়েছিলেন, ফেব্রুয়ারীতে ন্যাশনাল গেমস আর মার্চ মাসে ওপেন মিটারে প্রস্তুতির জন্য। আশিসবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে রীতা নিবিড় প্র্যাকটিস করে এবং ফলও পায়। ঐ দুটো জাতীয় আসর থেকে মোট চারটে পদক জিতে আনে—দুটি সোনা ও দুটি রুপো।

এর পরের লক্ষ্য এশীয় ট্র্যাক অ্যানড ফিলড মিট। মে মাসে পাতিয়ালায় কোচিং-কাম-ট্রায়াল। একশো ও দুশো মিটারের জনাই রীতা ট্রায়ালে ডাক পেয়েছিল। কিন্তু ওখানে গিয়ে শুনল ওকে চারশো মিটারেও দৌড়তে হবে। যোগিন্দর সিং সাহনী, কমলজিত সাধু, ডঃ মাথাইয়া—তিন কোচই ওকে দিয়ে ৪০০ মিটার প্র্যাকটিস করাতে চাইলেন। এর আগে চারশো মিটারে রীতা খুব একটা নামেনি। দিল্লিতে মার্চ মাসে এক সি আই মিটে নেমেছিল—প্রথম হয় ৫৯·১ সেকেনডে। তার আগের মাসে হায়দরাবাদে জাতীয় গেমসের সময় কোচ সুজিত সিনহা-ই জোর করে ওকে 4×400 রিলে টিমে নামিয়েছিলেন। সুতরাং ঐ ইভেনটে খুব কম অভিজ্ঞতা থাকায় রীতা পাতিয়ালা ট্রায়ালে রাজি হবার আগে স্বামীর মত চায়। আশিসবাবু জানিয়ে দেন, "শুধু কমলজিতের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাও।"

পাতিয়ালায় চারশো মিটার ট্রায়ালের দিনেই আগে ছিল একশো মিটারেরও ট্রায়াল। প্রথম ট্রায়ালটি হবার পর ক্যাম্পে হইচই পড়ে যায়। রীতা একশো মিটার দৌড়েছে ১১·৮ সেকেনডে! তাইওয়ানের মেয়ে চি চেং-র এশিয়ান রেকর্ড ১১·৬। রীতার এই অবিশ্বাস্য দৌড় নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ হয়ে গেল কোচিং ক্যামপে। একদলের অভিযোগ, স্টার্টিংয়ে রীতা কিছুটা সুবিধে পেয়েছিল বলেই বারো সেকেনডের কমে দৌড়েছে। অবশ্য স্টার্টার কমলজিত সাধু ওদের অভিযোগ নস্যাৎ করে দেন। কুড়ি মিনিট পরে চারশো মিটার দৌড়। সেখানেও অনিমা ব্রহ্ম, শ্রীরূপা চ্যাটার্জী আর পূর্ণিমা দাসকে পিছনে ফেলে দেয় রীতা। সময় : ৫৭·১ সেকেনড। আর এতেই কোচেরা নিশ্চিত হয়ে যান ওকে কোয়ার্টার মাইল দৌড়ে নিয়ে এলে নেহাত খারাপ দৌড়বে না।

সবচেয়ে শক্ত ইভেনট এই চারশো মিটার দৌড়। এতে ক্ষিপ্রবেগ যেমন দরকার তেমনি সহনশীলতাও। এই দুটো গুণ না থাকলে টিকে থাকা ভয়ানক কঠিন। রীতা সহজাত স্প্রিন্টার। সেটা লক্ষ্য করেই কমলজিত পাতিয়ালায় কেবল ওর সহনশীলতা বাড়ানোর দিকে নজর দিলেন। "ট্র্যাকে বাঁক নেবার কৌশল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ক্রমশ জানতে পারবে, এবং তখন সময় আরো কমে যাবে। সুতরাং স্ট্যামিনা বাড়িয়ে যাও"—কমলজিত ওকে বোঝাতে লাগলেন। রীতা নিজেও জানত, ভালো কমপিটিটর পেলে ও আরো ভালো দৌড়বে।

এর পরের ঘটনা ঘটল দ্রুত এবং নাটকীয়ভাবে। এশীয় মিট থেকে পদক আসবে—এ আশা অবশ্য রীতা না করেই টোকিও গিয়েছিল। একে তো বিদেশের মাটিতে ওর ওই প্রথম যাওয়া, তারপর দৌড়নোর ব্যবস্থা টার্টান ট্র্যাকে, যেখানে দৌড়বার অভিজ্ঞতা ওর একেবারেই ছিল না। লেগ পাওয়ার এবং বাউনসিং ক্যাপাসিটি যে স্প্রিনটারের ভালো, টার্টান ট্র্যাকে সে বাড়তি সুবিধে পায়। রীতা সে ব্যাপারে ভাবিত ছিল না। কিন্তু প্রতিযোগিতার আগের দিন ট্র্যাকে প্র্যাকটিস করে পায়ে খিমচানো ব্যথা অনুভব করে। অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য একশো মিটার ইভেনটে কিছু করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু পরের দিন চারশো মিটার রিলে রেসে ভালো দৌড়য় এবং ব্রোনজ পায়। তারপর চারশো মিটারে রুপোর পদক

রীতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওর ইভেনট না হওয়া সত্ত্বেও কি করে ও ৪০০ মিটারে সেকেনড হয়েছিল। লাজুক হেসে ও উত্তর দিয়েছে, "সত্যি, আমিও তাই ভাবি। রেস কমপ্লিট করার পর কমলজিত সাধু যখন দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেন তখনও কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারিনি সেকেনড ফিনিশ করেছি। আমি জানতামও না চারশো মিটারের জন্যও ওঁরা আমার নাম পাঠিয়ে রেখেছিলেন। আমাকে দৌড়তে বলেছিলেন ওঁরা তাই নেমে পড়েছিলাম। স্ট্র্যাটেজিও বলে দেয় নি কেউ। সবাইয়ের মুখে শুনেছিলাম, দক্ষিণ কোরিয়ার একটা মেয়ে এই ইভেনটে ফার্স্ট হতে পারে। আমিও তাই ঠিক করি, যা হবার তা হবে—শুধু ঐ মেয়েটাকেই তাড়া করে যাব। এখন এখানে ফিরে এসে ভাবছি এতো কম সময়ে দৌড়লাম কি করে? ওদের কোন ভুল হয়নি তো?"

ওর কথা শুনে আশিসবাবু বললেন, "আসলে ওর স্পিড ছিল, কমলজিত শুধু ওকে একটু ঘষে মেজে দিয়েছে। সেজন্য মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই ও এতো টাইম কমাতে পেরেছে। ট্রায়ালে ও করেছিল ৫৯·১ আর টোকিওতে ৫৪·৯। অভিজ্ঞতা হলে আরো দু'তিন সেকেনড কমাতে পারবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "টোকিও থেকে কি অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছ?" বন্দুকের আওয়াজ শুনে স্টার্টিং ব্লক ছেড়ে যেভাবে ও ছিটকে বেরোয়, প্রায় সেইরকম দ্রুত গতিতে উত্তর দিল রীতা, "রানিং স্টাইল সম্পর্কে আমার নতুন একটা ধারণা জন্মেছে।"

আশিসবাবুও বললেন, "এখন প্র্যাকটিসে দেখছি ওর লেগ মুভমেনট বদলে গেছে। ও এখন কোয়ারটার মাইলারের মতোই দৌড়চ্ছে।"

টোকিওর পারফরমেনসের জন্য রীতা এশিয়া দলে চানস পায়। এই টিমটি আগসট মাসের শেষের দিকে মন্ট্রিয়লে বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিকসে যাবে। সেজন্য রীতা এখন মন দিয়ে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। আশিসবাবু জানালেন, "টোকিও থেকে ফিরে আরো একটা ওর পরিবর্তন হয়েছে। আগে প্র্যাকটিসে ফাঁকি মারত। এখন নিজেই উৎসাহ নিয়ে মাঠে যায়। সহজাত স্প্রিনটাররা একটু ফাঁকিবাজ অবশ্য হয়ই। কিন্তু এদের পিছনে কেউ লেগে থাকলে ফল পাবেই। রীতাকে যখন প্রথম দৌড়তে দেখি তখন অ্যাথলেটিকসের কিছুই জানতাম না। ফুটবল খেলতাম কালীঘাট ক্লাবে। চোট পাওয়ার পর খেলা ছেড়ে দিয়ে ভাবলাম, নিজে বড় হতে পারিনি—রীতাকে গড়ে তুলব। আজ ন' বছর ওর পিছনে লেগে আছি। ওর জন্য অ্যাথলেটিকসের প্রচুর বই পড়েছি, অ্যাথলিটদের পিছনে দিনের পর দিন ঘুরেছি—শুধু ওর জনাই।"

আশিসবাবু এ কথাগুলি বলার প[illegible] রীতার ছোট বোন কৃষ্ণা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ব[illegible] উঠল, "দিদিটা খুব মেজাজী। প্র্যাকটিসে না যাবার জন্য আশিসদাকে কম হেনস্তা করেনি। অন্য কেউ হলে তো রেগে আর মুখও দেখত না দিদির।"

সেই মুহূর্তে রীতার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অদ্ভুত চোখে ও আশিসবাবুর দিকে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টিটা গভীর কৃতজ্ঞতাবোধের, প্রেমের এবং আস্থার। ফিরে আসার সময় বারবার কৃষ্ণার কথাই মনে পড়ছিল, "দিদি আজ যে গৌরব এনেছে, তার পুরো কৃতিত্বটা আশিসদারই পাওয়া উচিত।"

কলকাতার মাঠে দুই বিদেশী ফুটবলার

অন্য রাজ্য থেকে যত ফুটবলার এবং যত বড় ফুটবলারই কলকাতায় খেলতে আসেন তাঁরা বলে থাকেন—'কলকাতা হচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের মক্কা। এখানে খেলার শখ চিরদিনই ছিল। সুযোগটা যখন এল, সে সুযোগ ছেড়ে দেব কেন?

কথাটা পুরো সত্য নয়, আংশিক সত্য। কী কারণে ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়রা ফুটবল মরসুমে কলকাতায় ভিড় জমান তা কারো অজানা নয়। একই কারণে ভিন দেশের ফুটবলাররাও কলকাতার হাতছানি উপেক্ষা করতে পারেন না। ভিন দেশ বলতে আমি ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের কথাই বলছি। অতীতে ব্রহ্মদেশের কিছু খেলোয়াড় এবং পাকিস্তানের প্রচুর খেলোয়াড় কলকাতায় খেলে গেছেন। একবার তো নূর নামে শ্রীলংকার এক খেলোয়াড় মোহন-বাগান ও ইস্টবেঙ্গলের লীগ খেলার দিন দুপুরে আই এফ এ অফিসে নাম রেজিষ্ট্রি করে বিকেলে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে গোল করে বসলেন। মোটেই বড় মাপের ফরোয়ার্ড ছিলেন না। পরে আর পাত্তা পাননি। তবে বিদেশের বেশ কিছু ভালো খেলোয়াড় কলকাতায় খেলে যাচ্ছেন বহুকাল থেকে।

এ বছর লীগ শুরুর আগে শোনা গিয়েছিল পাঁচ-ছয়জন বিদেশী খেলোয়াড় ময়দান কাঁপাবে। নাইজিরিয়ার খেলোয়াড় ডেভিড উইলিয়াম এবং জাইরের বিশ্বকাপ দলের খেলোয়াড় কাকোকো খেলবে ইস্টবেঙ্গলে। ইরানের খেলোয়াড় খাবাজি মহমেডান স্পোর্টিংয়েই ছিল। সে সঙ্গে করে আনবে ইরানের আর এক খেলোয়াড় সানজারিকে। ইরাক থেকে হঠাৎ কারো উদয় ঘটতেও পারে। বর্মার খেলোয়াড় মোহন ছেত্রী মোহনবাগান দলে রেজিস্ট্রি হলেন মরসুমের মাঝে।, এই লেখার সময় পর্যন্ত তাঁর খেলা দেখিনি। বর্মার আর এক খেলোয়াড় শিবা থাপা যাঁর মোহনবাগানে আসার কথা ছিল তাঁরও টিকি দেখিনি। কাকোকোকে ইস্টবেঙ্গল একটি ম্যাচও খেলায়নি, তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ডিসিপ্লিন ভঙ্গের দায়ে সানজারিকে সাসপেণ্ড করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে, বেশ কয়েকটি ম্যাচে খেলিয়ে। সুতরাং হাতে থাকছে দুই দলের দুই বিদেশী ফুটবলার—ইস্টবেঙ্গলের

ভিড **উইলিয়াম** **এবং** মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খাবাজি।

দ্জনই ছাত্র-খেলোয়াড়। বৈদেশিক ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের এনজিনিয়ারিং, মেডিক্যাল এবং অন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশী ছাত্রদের জন্য কিছু আসন রক্ষিত থাকে। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী ইরানের খাবাজি ভরতি হয়েছেন আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির বি এস সি-র স্ট্যাটিসটিকসে। ডেভিড উইলিয়াম ১৯৭৬এ নাইজিরিয়া থেকে এসেছিলেন মাদ্রাজে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। খাবাজি আলিগড়েই পড়ছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদানের পর ডেভিড উইলিয়াম ভরতি হয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল এনজিনিয়ারিং ক্লাসে। একসঙ্গেই চলছে পড়াশুনা ও খেলা। কর্মজীবনে প্রবেশের আগেই 'বোনাস' হাতে আসছে ফুটবলের দৌলতে। অবশ্য ও'দের দেশে ফুটবল খেলে রুজি-রোজগারের তুলনায় বোনাসটা এমন কিছু মোটা অঙ্কের নয়। বুরথ দেখা ও কলাবেচার মতো ওটা ওঁদের বাড়তি লাভ। আমাদের ক্লাবগুলির লাভ অপেক্ষাকৃত সহজে এই সব বিদেশী ছাত্র-খেলোয়াড়দের সাহায্য পাওয়া। তা হলে আমাদের ফুটবলের অ্যামেচার কাঠামোর মধ্যে থেকে অর্থের বিনিময়ে বিদেশী খেলোয়াড় আমদানী করা সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য, ডেভিড উইলিয়াম এবং খাবাজি দুজনই যোগ্যতা ও দক্ষতার জোরে দুই দলের অপরিহার্য খেলোয়াড়। মহমেডান স্পোর্টিংয়ে খাবাজির এটা দ্বিতীয় সিজন, ইস্টবেঙ্গলে ডেভিড উইলিয়ামের প্রথম।

খাবাজি

কীভাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব খাবাজির সন্ধান পেয়েছিল? কলকাতার তিন বড় ক্লাবের কর্মকর্তাদের সারা বছরই নজর থাকে ভারতের নামী ও উঠতি খেলোয়াড়দের দিকে। প্রায় সব রাজ্যেই এই তিন বড় ক্লাবের এজেন্টরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। আলিগড় ফুটবল ক্লাবের সভাপতি সুলতান আখতারের মাধ্যমে গত বছর মহমেডান স্পোর্টিং খাবাজিকে রিক্রুট করে। তখন খাবাজির বয়স একুশ।

ইরানে খাবাজি ছিলেন যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার। ১৯৭৪এ তেহরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুব ফুটবলে নাকি খুব ভাল খেলেছিলেন। আলিগড়ে এসেও প্রমাণ করলেন ভারতের যে-কোনো বড় দলে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লেফট লিংকম্যান মানিয়েও নিয়েছেন চমৎকার। স্ট্রাইকারের দায়িত্বও পালন করতে পারেন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী খেলোয়াড়টি মাঠের মধ্যে সদা সঞ্চরণশীল। অসম্ভব স্ট্যামিনা। গত বছর দেখেছি সারা মরসুমই ফর্ম বজায় রেখে খেলে গেছেন। কলকাতা ফুটবল মাঠের দর্শক এবং রমরমা পরিবেশ ও'কে এই কারণেই এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি। যে, তেহরানে বিশাল জনতার সামনে খেলে এসেছেন। তেহরানের আর্যমেহের স্টেডিয়ামে দর্শক-আসন এক-লক্ষ, আমজাদি স্টেডিয়ামে পঞ্চাশ হাজার। সুতরাং মনের উপর চাপ পড়ার প্রশ্ন ছিল না। উপরন্তু খাবাজির আছে একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। এ বছরও ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলছেন।

ও'র ধারণা, ভারতের তুলনায় ইরানের ফুটবল মান অনেক উন্নত। এবং কলকাতা ফুটবলের প্রশাসনিক কাঠামো ও ক্লাব পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হলে মহমেডান স্পোর্টিং অনেক ভাল ফল করত। চ্যাম্পিয়ন হওয়াও সাধ্যায়ত্ত ছিল।

ইরানের ফুটবল মান যে এখন ভারতের মানের চেয়ে উন্নত সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কীভাবে এত তাড়াতাড়ি ইরান ফুটবলে এত এগিয়ে গেল সে সম্বন্ধে খাবাজি বললেন—'আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে তাল রেখে।'

আরও বললেন, 'পশ্চিম জারমানির বিজ্ঞ ফুটবল কোচ ডেটমার ক্র্যামার ইরানের জাতীয় কোচ। তা ছাড়া
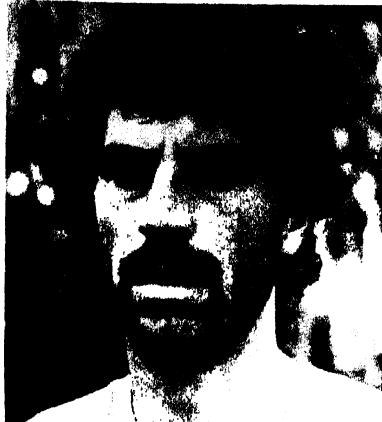
ক্লাবেই আছে ইউরোপীয় কোচ। ইউরোপ থেকে নানা দল মাঝে মাঝে খেলতে আসে। ইরানের জাতীয় এবং জাতীয় যুব দল হামেশা বিদেশ সফর করে। কোচিং সিডিউল যেমন কড়া, তেমনই আকর্ষণীয়। সকালে দু ঘণ্টা, বিকেলে দু ঘণ্টা প্র্যাকটিশ। কিন্তু শুধু ফুটবল প্র্যাকটিশই নয়। তার সঙ্গে থাকে থিওরিটিক্যাল ক্লাস এবং আন্তর্জাতিক বড় বড় খেলার ফিলম ও স্লাইড। কোচিংয়ের ব্যবস্থাপনা কখনো বোরিং হয় না।'

প্রশ্ন করেছিলাম, ইরানের শাহই তো ছিলেন ফুটবলের বড় প্রেরণাদাতা। রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে ফুটবলের অগ্রগতি থমকে দাঁড়াবে না তো? খাবাজির উত্তর: সাময়িকভাবে কিছু বাধার সৃষ্টি হতে পারে। ফুটবল কিন্তু আমাদের দেশের দারুণ জনপ্রিয় এবং ফুটবলের পরিবেশও সুশৃঙ্খল।

ভারতে পড়তে এসে ফুটবল নিয়ে মেতে উঠলেও পড়াশুনা সম্পর্কে খাবাজি বেশ সজাগ। ও'র ইচ্ছে স্ট্যাটিসটিকসে ডিগ্রি পাবার পর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে পড়াশুনা করা।

ডেভিড উইলিয়াম

আটাত্তরের জানুয়ারিতে কলকাতায় জাতীয় ফুটবল আসরে দেখা গেল নাইজিরিয়ার খেলোয়াড় ডেভিড উইলিয়াম তামিলনাড়ু দলের সুপার স্টার।

স্বদেশে ছোটবেলায় খেলা শিখেছিলেন এক জারমান কোচের কাছে। পরে পেপসি-কোলা কোচিং পরিকল্পনায় কিছুদিন তালিম নিয়েছিলেন ফুটবলের রাজা পেলের কাছেও। তামিলনাড়ুতে এসে তিন বছর খেলেছেন উইমকো স্পোর্টস ক্লাবে। তিন বছরই টপস্কোরার। পাটনা ন্যাশন্যালেও ডেভিড উইলিয়াম তামিলনাড়ু দলে খেলেছিলেন: কিন্তু কলকাতায়

যেভাবে দর্শকদের মাতিয়েছিলেন পাটনায় সেভাবে খেলতে পারেননি।

কলকাতা ন্যাশন্যালের পর তিন বড় ক্লাবই ডেভিড উইলিয়ামকে দলে টানতে চেয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়ার কারণ সম্পর্কে চব্বিশ বছর বয়সী খেলোয়াড়টির বক্তব্য, যেহেতু ইস্টবেঙ্গলে অপেক্ষাকৃত তরুণ খেলোয়াড়ের সমাবেশ বেশি, সেহেতু তাদের সঙ্গে খেলে যোগ্যতা প্রমাণ করাই ছিল কাম্য।

কিন্তু যেখানে সুরজিৎ, সাবির, মিহির, মানজিৎ, সুভাষ, হরজিন্দার, সাম্মাদ প্রভৃতি বহু তারকা সমাগম, সেখানে কি নিয়মিত দলে স্থান পাওয়া সম্পর্কে সন্দেহ ছিল না? ভিন্ন পরিবেশে সাফল্য সম্পর্কেও কি মনের কোণে সংশয় উঁকি মারেনি?

ডেভিড জানালেন, সন্দেহ এবং সংশয় অবশ্যই কিছু ছিল কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের মতো টিম তাঁকে রিক্রুট করত যদি তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ না পেত।

মাদ্রাজে অবশ্যই আমি স্টার খেলোয়াড় ছিলাম। চেয়েছিলাম ফুটবলের মক্কায় স্টার হতে।

সন্দেহ নেই ডেভিড উইলিয়াম এখন কলকাতা ময়দানের এক উজ্জ্বল তারকা। কিন্তু সিজনের প্রথম দিকে দলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে, একজন ভাল ফুটবলারের যে সব গুণ থাকা দরকার সব থাকা সত্ত্বেও। ভাল শুটার। সুযোগ সন্ধানী স্ট্রাইকার। স্কিমারও বটে। শটে প্রচণ্ড জোর। ভলি মারতেও সিদ্ধপদ। খেলার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ সহজেই চোখে পড়ে। চমৎকারভাবে ফলস দিয়ে বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আছে। প্রকৃত ফুটবলারের স্বাস্থ্য। দেহের তুলনায় দুই উরু একটু বেশি ভারি। তার ফলে গতি একটু মন্থর হলেও চকিতে শট নেবার ক্ষমতা অসাধারণ। খুব ছোট জায়গা থেকে শট নিতে পারেন সময় একটুও নষ্ট না করে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের কিছু ট্রিক জানা আছে। বলটি হেড করতে যাচ্ছেন হয়তো হেড না করে দেহটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে একটু উবু হয়ে পা দিয়ে হিল করে বলকে সামনে নিয়ে এলেন। নিখুঁত সময়-জ্ঞান এবং পারফেকশন ছাড়া এটা করা সম্ভব নয়। তবে দর্শক মনোরঞ্জনের মোক্ষম অস্ত্রটি আছে ও'র সারল্য মাখা হাসিতে। কালো পাথরের বাটিতে নারকেলকোরা রাখলে যেমন দেখায় তেমন নিকষ কালো মুখের সাদা দাঁতগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গোল করার পর ডেভিডের হাসির মধ্যে। বড় সুন্দর সে হাসিটি।

আচরণে সব সময়ই একটা সারল্য আছে। একটি ম্যাচে কোচ অরুণ ঘোষ ওঁকে পিছিয়ে এসে ডিপ ডিফেনডারদের সাহায্য করতে বলেছিলেন। ডেভিড বললেন, কই আমাকে তো কেউ বল দিচ্ছে না, সাহায্য করছে না। কোচ একটু বিরক্ত হয়েই বললেন সে কি, ওরা কি তোমার শত্রু? একটু ধমকের সুরেই বললেন, ঠিকভাবে খেলো।

তরতাজা নাইজিরীয় তরুণের মাথাটা সহসা গরম হয়ে উঠল। অরুণ ঘোষের মুখের উপরই বললেন, 'আমি খেলব না'। অরুণ ঘোষ ডেভিডকে মাঠ থেকে তুলে নিলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কোচের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন ডেভিড।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লীগ ম্যাচে চিন্ময় চ্যাটার্জীর ভুলে মোহনবাগান গোলটি শোধ করে দেওয়ার ফলে খেলার শেষে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা যখন চিন্ময়কে অভিসম্পাত করে বলছে ওর জন্যই ইস্টবেঙ্গল জিততে পারল না তখন ডেভিড উইলিয়াম বলল, 'আমার জন্যই জিততে পারেনি। আমার অন্তত দুটি গোল করা উচিত ছিল।'

বলা বাহুল্য, মোহনবাগানের সঙ্গে ওই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ডেভিড গোল না পেলেও মোহনবাগান ডিফেন্সকে ডেভিডই সব সময় উৎকণ্ঠায় রেখেছিলেন। বড় খেলাগুলিই খেলোয়াড়ের জাত বিচারের কষ্টিপাথর। ডেভিড উইলিয়াম সে পাথরে পরীক্ষিত জাত প্লেয়ার।

মকল

অতীতের ফুটবলার

শান্ত মিত্র

মাণিক ঘোষাল

ছোট্ট একটি খবর—শান্ত মিত্র বিদেশ গেছেন, অ্যাডভান্স কোচিং নিতে। এককালের নামী খেলোয়াড় এখন জর্জ টেলিগ্রাফের কোচ হিসাবেই যথেষ্ট খ্যাতিমান। নতুন করে অ্যাডভান্স কোচিং শিক্ষা নেবার আগ্রহ ও আন্তরিকতার তাগিদ সামগ্রিকভাবে তাঁকে দেশছাড়া করেছে। কেমন খেলোয়াড় ছিলেন শান্ত মিত্র, কোচ হিসাবে ওঁর সাফল্য কতটুকু পাঠক এসব প্রশ্নের জবাব জানতে চাইবেনই। কিন্তু তার আগে একটি কথা বলে দেওয়া ভালো—ক্ষীণতনু শানু মানুষ হিসাবে অনেক বড় মাপের। কলকাতা ময়দানে শানু ডাক নামে পরিচিত শান্ত মিত্রকে ভালবাসেনি এমন লোক বিরল।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে খ্যাতির চূড়ায় উঠেছেন তিনি নিজ গুণে। ছেলেবেলা থেকেই ওঁর স্বপ্ন বড় ফুটবলার হবার। ১৯৪৪ সালের ৭ জানুয়ারি জন্ম। ১৯৫৯ সালে মাত্র পনেরো বছর বয়সে ঘেরা মাঠে ওঁর আবির্ভাব উয়াড়ী ক্লাবের হয়ে। সেই সময়ে খেলাধুলো করা এত সহজ ছিল না। বিশেষ করে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে লেখাপড়া না শিখে মাঠ নিয়ে মাতবে—এরকম নিয়ম ছিল না। ফলে অন্যদের ক্ষেত্রে যা হয় শান্তর কপালেও তাই জুটেছে। বাবার শাসন এড়িয়ে ফুটবল নিয়ে মাতামাতি করার উপহার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। আড়াল করতে এগিয়ে আসতেন মা। মায়ের স্নেহ বাবার শাসন তাঁকে মানুষ করেছে।

যে বছর স্কুল ফাইনাল পাস করে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ঢুকলেন সেবারই জার্সি গায়ে দিলেন বাঘা দল অর্থাৎ সোমের উয়াড়ীতে। ১৯৫৮ অর্থাৎ এক বছর আগে শান্ত বাংলা স্কুল ফুটবল দলের অধিনায়ক। বাঘা সোমই ওঁর প্রকৃত শিক্ষাগুরু। এ ছাড়া, ফুটবলের পাঠ রপ্ত করেছেন বলাইদাস চ্যাটার্জি ও ল্যাংচা মিত্রের কাছে। শান্ত এঁদের সবার কাছেই সমানভাবে ঋণী। শান্তর চিরকালের আদর্শ খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল ও শৈলেন মান্না। কিন্তু ওইটুকু ফুটফুটে ছেলে ডিপ ডিফেন্সে টিঁকবে কি? সংশয়বাদীরাও স্বীকার করেছে,—হ্যাঁ ছোকরার জেদ আছে।

দিন আসে দিন যায়। ১৯৬২ সালে শান্ত যোগ দেয় বি এন রেলে। সেবার সে জুনিয়র বাংলা দলের "লাকি ক্যাপ্টেন"। বিধান রায়ের ঘরে বিধান ট্রফি এলো শান্তর হাত ধরে। ক্রীড়া সাংবাদিকদের চোখে ছেলেটি তারুণ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। তিন বছর উয়াড়ীতে হামাগাড়ি দিয়ে আরও তিন বছর বি এন রেলে হাঁটি হাঁটি পা পা করে বয়স বাড়লো। ১৯৬৪তে ভারতীয় যুব দল যাবে ভিয়েৎনামে। ক্যাপ্টেন কে হবে? কানাঘুষোয় খবর—নির্বাচকরা একটি লাকি ছেলেকে চায়। কে সে? বাংলারই শান্ত। তাঁর সফল জীবনের সেই শুরু।

পরের বছর তরুণটিকে যে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দুদলই চাইবে এতো জানা কথা। ময়দানে গুজব উড়ো খবর অফিসে কানাকানি, রাতে শান্তর ঘুম আসে না। সবুজ মেরুন? না কি লাল হলুদ? আশা আশঙ্কা ঘিরে উল্লাস ও উদ্বেগ। কোথায় নাম লেখাবে সে? আশৈশব স্বপ্ন সে মোহনবাগানে খেলবে কিন্তু তাকে প্রথমে ডাক দিল ইস্টবেঙ্গল। দ্বিধা সংকোচ জড়তা ছুঁড়ে ফেলে হাতে তুলে নেয় নব-যৌবনের প্রতীক জ্বলন্ত মশাল। তারপর তাকে আর পিছন পানে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৬৫—৭৩ টানা নয় বছর শান্তর জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সুখে দুঃখে সে ছিল ইস্টবেঙ্গলের নিত্যসঙ্গী। মনে-প্রাণে আজও তাই। একদিন স্বপ্ন ছিল মোহনবাগানে খেলার, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দিয়েছে তার চেয়েও বেশী। অনেক প্রলোভন, টোপ হাতছানি উপেক্ষা করে শান্ত ধীর স্থির সচ্ছন্দে অতিবাহিত করেছে তাঁর সমৃদ্ধ খেলোয়াড়-জীবন। মাঠের মধ্যে যেমন ছিল তাঁর সহজ

সৌন্দর্য। মাঠের মেজাজ কলুষিত করার স্পর্ধা নিয়ে তিনি আসেননি। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন কি বিনম্র বিশাল মহিমায় শান্ত মাঠে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছেন।

শান্তর জীবনের দুটি স্মরণীয় স্মৃতি—১৯৭০ সালের ইস্টবেঙ্গলের নেতৃত্ব দেওয়া। সেবার ইস্টবেঙ্গল লীগ, শীল্ড ও দিল্লির ডুরান্ড কাপ জয় করে। এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের স্মৃতি অবিস্মরণীয়। সন্তোষ ট্রফি জয় করেছে বাংলা বহু বার কিন্ত সেবার দেশজুড়ে সোরগোল পড়ে যায়। নওগাঁর মাঠে বাংলা প্রথম খেলায় গোয়াকে ৪—০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হলো মাদ্রাজের (এখন তামিল-নাড়ু)। বাংলার ৮—০ গোলের মালাটি এত ভারী ছিল যে, মাদ্রাজকে মাথা নীচু করে মাঠ ছাড়তে হয়। সেমি-ফাইনালে অন্ধ্র রীতিমতো শক্তিশালী। দু দিনের খেলায় বাংলা ১০—১ গোলে হতমান করলো অন্ধ্রকে। ফাইনালে সার্ভিসেস সেবার ডাকাবুকো দল। বাংলা জিতলো ৬—১ গোলে। অকল্পনীয় এই রেকর্ডের দাবিদার বাংলার পক্ষে সেদিন ফাইনালে খেলেছিল—বলাই দে, সুধীর কর্মকার, কল্যাণ সাহা, অশোকলাল ব্যানারজি ও শান্ত মিত্র, কালন গুহ ও প্রিয়লাল মজুমদার, বিমান লাহিড়ী (সীতেশ দাস), সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার, হাবিব ও প্রণব গাঙ্গুলী। দলের অধিনায়ক শান্ত স্বয়ং। গর্ব করে বলার মতো ব্যাপার।

একটানা ১৬ বছর শান্ত সিনিয়র ডিভিসনে ফুটবল খেলেছেন। ১৯৬৮ সালে একবারই মারডেকায় ভারতীয় দলের হয়ে জাতীয় দলে খেলেন। তবে তাতে তাঁর ক্ষোভ নেই। স্বদেশের মাটিতে হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া কিংবা রাশিয়ান দলের বিপক্ষে আই এফ এ দলের নেতৃত্ব তিনিই দিয়েছেন। খেলা ছাড়লেন তখনই যখন দেখলেন, বয়স তাঁকে ছুঁয়েছে এবং পরিবার তাঁকে টানছে। সবাইকে যখন একদিন সরতে হবে তখন সময় থাকতেই সরে যাওয়া ভালো। শান্ত এই নীতিতে বিশ্বাসী। সেই সঙ্গে প্রত্যেকেরই উচিত ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবারের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করা। ১৯৭৩ সালের ২৩ জানুয়ারি শান্তর জীবনের এক পরম লগ্ন, আকাশে উড়তে গিয়ে একদিন যার সঙ্গে পরিচয় ভালো লাগা থেকে ভালবাসার পথ পেরিয়ে তাকে নিয়েই ঘর বাঁধা। পবিত্র বন্ধনের এই শৃঙ্খল জীবনে শৃঙ্খলা আনে—শান্তর দৃঢ় বিশ্বাস।

খেলা ছাড়লেও মাঠ ছেড়ে দূরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে কোচ হবেন এমন কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও ছিল না। ১৯৭৬ সালে জর্জ টেলিগ্রাফের কোচ হতে হলো তাঁকে ঘটনাচক্রে। আসলে কি হয়েছিল? ল্যাংচা মিত্রর শরীর খারাপ তিনি পারছেন না। জর্জের কর্মকর্তাদের কয়েকজনের অনুরোধ এবং অগ্রজ বন্ধু প্রশান্ত সিংহের অনু-প্রেরণা তাঁকে কোচের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী করে।

নয়। ইস্টবেঙ্গলে তখন প্রদীপ ব্যানার্জী কোচ। রেলের প্রয়োজনে পি কে কলকাতার বাইরে গেলে শান্ত সেই দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া দলকে পরি-চালিত করার প্রেরণা তাঁর সহজাত। ছোটবেলা থেকেই তিনি সফল দলনেতা। এই আত্মবিশ্বাস সব সময়েই তাঁকে যে কোন দলের হাল ধরতে সাহায্য করেছে। তিন বছরে শান্তর কোচিং নৈপুণ্যে জর্জ টেলিগ্রাফের স্থান লীগে প্রথম দুবারই পঞ্চম ও তৃতীয়বার চতুর্থ। এবার শুরুতেই তিনি ক্লাবকে তাঁর সময়াভাবের কথা জানান। স্টেট ব্যাংকের পাবলিক রিলেশন অফিসার এখন ডিভিসনাল ম্যানেজার। দায়িত্বের বোঝাটি বেড়েছে। তা ছাড়া তিনি বিদেশ যাবেন এটাও ঠিক ছিল। তবু ওরই মধ্যে যতটা পেরেছেন খেলোয়াড়দের দেখাশোনা করেছেন।

সারাজীবন নিজেকে যেভাবে দেখে এসেছেন তিনি এখনও নিজেকে সেইভাবে শিক্ষার্থী মনে করেন। আগামী কয়েক মাস নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন ইংলণ্ডে (৪—২৪ আগস্ট) পশ্চিম জার্মানীতে (২৭—২১ সেপ্টেম্বর) যুগোশ্লাভিয়া (২৪ সেপ্টেম্বর—১১ অকটোবর) এবং হাঙ্গেরীতে (১২ অকটোবর—১২ নভেম্বর), বার্মিংহামশায়ারে ইংলণ্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত এবং ফ্রাংকফুর্টে জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কোচিং ক্যাম্পটির প্রতি তাঁর আগ্রহ অনেকদিনের। আরও দুটি উন্নত দেশ হাঙ্গেরী ও যুগোশ্লাভিয়ায় যাবার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান ভাবছেন। সেই সঙ্গে সময় পেলে শান্তর ইচ্ছে পূর্ব জার্মানী ও হল্যান্ড ঘুরে আসা। শুধু থিওরিটিক্যাল কিংবা প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানেই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। শান্ত মনে করেন সাইকলজিক্যাল শিক্ষাও কোচের জীবনে অপরিহার্য। জুলাই মাসের ২৬ তারিখ ২৬ হাজার টাকার যাওয়া আসার ধাক্কা নিয়ে তিনি আকাশে ওড়েন। কিন্তু শান্ত অভিভূত এই ভেবে—কত মানুষ নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে এসেছেন তাঁর সাহায্যে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই দিয়েছে পাঁচ হাজার টাকা। ফিরে এসে শান্ত ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের কোচ হতে চান কি? আমার এই প্রশ্নের জবাবে স্বভাবসুলভ হাসি নিয়ে বলেন— সুযোগ পেলে কেন নয়?

পেশাদারী ফুটবলের সমর্থক ও প্রথম ডিভিসনে দল কমিয়ে রিটার্ন লীগ করার পক্ষপাতী শান্ত বলেন—নটিংহ্যাম ফরেস্ট লীগে দশম স্থান পেয়েও এবার ইউরোপীয়ান কাপ জিততে পেরেছে যেহেতু ট্রেভর ফ্রান্সিসকে সব থেকে বেশি দাম দিয়ে দলে নিতে পেরেছে তাই। জর্জ টেলিগ্রাফ কিংবা উয়াড়ীর পক্ষে শীল্ড জেতা অসাধ্য নয় যদি সুরজিৎ বিদেশ অথবা গৌতম-প্রসূনকে পায়। শান্ত জানেন জীবন তার চলার ছন্দেই এগিয়ে যায়। তবু দু-একটি ঘটনা মনে দাগ কাটে। নয়াদিল্লিতে সেবার ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলা। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি এসেছেন মাঠে। নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্রপতির দুগজের মধ্যে কেউ যেতে পারেন না। কেউ কিছু বোঝার আগে শান্ত কোথা থেকে ছুটে গিয়ে রাষ্ট্র-পতির বুকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একটি ব্যাজ এঁটে দিয়ে এলেন। একজন মেজর ছুটে এসেছেন, রাষ্ট্র-পতি তাকে থামিয়ে বলেন—তুমি ক্লাবকে এত ভালবাসো?

আরও আগে শান্ত ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়ে সায়গন গেছেন। ভারত ভালো খেলছে না তবু একটি কিশোরী মেয়ে ভারতকে ভালবেসে ফেলে। চুপচাপ সে ভারতের খেলা দেখতো। হেরে গেলে তার নীরবতা বেড়ে যেতো। তার দুঃখ দেখে ভারতীয় খেলোয়াড়রা লজ্জা পেতো। খেলোয়াড়দের সঙ্গে তার সখ্যতাও হয়েছিল খুব। সবাই তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। অধিনায়ক হিসাবে শান্ত হয়তো কিছুটা বেশী। মেয়েটির খুব ইচ্ছে ছিল একবার ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেবে। নাম মনে নেই কিন্তু ফেরার পথে মেয়েটির অশ্রুসজল মুখটি মনে পড়লে আজও শান্তর মন কেমন করে। এতেই বোঝা যায় মানুষ হিসাবে

ফোজা, মোড়োনা! পরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।
গর্‌র্‌...
মড়িনি, বাপ!

আমার জামাটা এবার আমায় দেবেন?
এই নাও!

পুলিসকে ডেকে বলো যে, তুমি এই হীরে-চোরদের গ্রেফতার করেছ!
না না, আমার ব্যবসা তাহলে লাটে উঠবে!

শুধু মুদীর ব্যবসাতেই খুশি থাকো! নইলে বিপদ ঘটবে! পুলিসকে খবর দাও!

এরা হীরে-চোর? তা হীরেটা কোথায়?
হীরেটা তার মালিক ডঃ অ্যাক্সেলকে ফেরত দিচ্ছি!
এই নিন, পড়ে দেখুন।

ডঃ অ্যাক্সেলের হাসপাতালে...

উঃ, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব!
যাক বাচ্চাদের জন্যে কয়েকটা বেড এবারে করা যাবে!
সব ভাল যার শেষ ভালো!

ছাপটা কিসের? যেখানে ঘুষি মেরেছে, সেখানেই ছাপ!
খুলির ছাপ! অরণ্যদেবের চিহ্ন!
যত্ত সব!
এরপর নতুন কাহিনী।

চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের রঙীন পূজাবার্ষিকী আনন্দলোক

৬টি সম্পূর্ণ উপন্যাস

বিমল মিত্র
আশাপূর্ণা দেবী
প্রতিভা বসু
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সমরেশ মজুমদার
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিশেষ প্রবন্ধ

সত্যজিৎ রায়
সেবাব্রত গুপ্ত
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
বাসু ভট্টাচার্য

বিশেষ রচনা

রবিশঙ্কর—কিছু দেখা, কিছু শোনা।

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'রাগ-অনুরাগ'-এর পরিসমাপ্তি 'কিছু দেখা, কিছু শোনা।' রবিশঙ্কর বাংলা, হিন্দি ও বিদেশী বহু ছবির সংগীত-পরিচালক। তিনি আবাল্য ভারতীয়, য়ুরোপীয়, আমেরিকান ছবির অনুরক্ত দর্শক। দেশী-বিদেশী ফিল্ম ও ফিল্ম সংগীত সম্পর্কে রবিশঙ্করের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি নিয়ে লেখা 'কিছু দেখা, কিছু শোনা'। সত্যজিৎ রায়ের প্রথম চারটি ছবির সংগীত পরিচালনার স্মৃতিচারণাও রয়েছে এই অসাধারণ লেখাটিতে।

অবসরহীন অশোককুমার—অশোককুমারের চলচ্চিত্র জীবনের ওপর দীর্ঘ রচনা।

একদা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়িকা সুমিত্রাদেবীর ওপর বড় লেখা।

অন্যান্য রচনা

বোমবাইয়ে বাঙ্গালী:
কলকাতার শিল্পী, যাঁরা বোমবাইয়ে গেছেন, যেমন রাখী, মৌসুমী, মালা সিনহা, মিঠুন চক্রবর্তী ও উত্তমকুমার, এঁরা কেন বোমবাই গেলেন, সেখানে কী পেলেন?

জীনাত আমন ও হেমা মালিনী—দুই দৃষ্টিভঙ্গীর দুই নায়িকাকে নিয়ে নতুন ধরনের লেখা।

নিজের অভিনয় প্রসঙ্গে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করেছেন দিলীপকুমার, দেব আনন্দ ও ধর্মেন্দ্র।

১২.০০/রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪.৯০

আপনার কপির জন্য আজই এজেন্টকে বলে রাখুন বা আমাদের লিখুন:
সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০১

AAL/CAS-6/79 BEN

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি বই

নদী যখন সাগরে। নিখিলচন্দ্র সরকার। **বর্ণালী, ৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯।** মূল্য কুড়ি টাকা।

একঘেয়ে গতানুগতিক বৈচিত্র্যহীন দুর্বল কাহিনীর আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে ক্লান্ত পাঠক যখন 'বিধ্বস্ত' সেই সময় বিস্মৃত কোনো চমক জাগানো লেখা হাতে পেলে মন স্বভাবতই প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তরুণ এবং প্রতিশ্রুতিবান লেখক নিখিলচন্দ্র সরকারের 'নদী যখন সাগরে' উপন্যাসখানি ত্রুটিবিচ্যুতি এবং ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও আমাদের কিছুটা প্রত্যাশা পূরণ করতে সাহায্য করবে। সাগর দ্বীপের বিস্তৃত আকাশ সীমাহীন দিগন্ত, অন্তহীন নদী নালা খাল বিলের পটভূমিকায় লেখা পল্লী জীবনের পরিবেশে এই কাহিনীর সূত্রপাত। কলকাতা শহরের এক ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার যুবক অরুণাংশু রুজি-রোজগারের ব্যর্থ চেষ্টায় যখন হতাশায় ম্রিয়মাণ, সেই সময় সুদূর সাগরদ্বীপের একটি গণ্ডগ্রাম বামনখালিতে স্কুল মাস্টারীর হাতছানি সে উপেক্ষা করতে পারেনি। সাগর দ্বীপের দূরত্ব হয়ত বেশি নয়। ডায়মণ্ডহারবার থেকে কাকদ্বীপ হয়ে বামনখালি যেতে হয়। কিন্তু সেই পথ অনভিজ্ঞ অরুণাংশুর কাছে যেমন 'দুর্গম', তেমনি ভয়াবহ। সমুদ্রের মতো ত্রাস জাগানো বিশাল নদীর হিংস্র ঢেউয়ের ভ্রূকুটির মধ্যে টালমাটাল নৌকোয় রোমাঞ্চকর পাড়ি জমাতে যে সাহস ও মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, অরুণাংশুর তা ছিল না। তাই পদে পদে তাকে নাজেহাল হতে হয়েছে, সহযাত্রিদের কাছে হাস্যাস্পদ ও কৃপার পাত্র হতে হয়েছে। নোনামাটি নদীনালা সাপখোপ অধ্যুষিত অনগ্রসর কৃষিনির্ভর এই গ্রামের মানুষদের সঙ্গে অতঃপর তার ধীরে ধীরে পরিচয় হয়েছে, তারা কেউবা সরল সাদাসিধে, কেউবা কুটিল, স্বার্থপর। বন কেটে বসত গড়ার অশ্রুসিক্ত নেপথ্য ইতিহাস, আঞ্চলিক ভাষায় কথোপকথন, প্রতিনিয়ত সাপের আবির্ভাব এবং আতংক। ছাত্রদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, বৃষ্টিতে ভিজে মাছ ধরা, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া, লোভ আর লালসার কদর্য মূর্তি— নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। স্বল্পকালীন ঐ গ্রামবাসের অভিজ্ঞতার ফসল ভালোভাবেই কুড়িয়ে নিয়েছেন তিনি। পণ্ডিত মশায়, ধীরেনবাবু, নির্মলবাবু, কেষ্টবাবু, সুদর্শনবাবু, কার্তিকবাবু, মহাদেবদা, দীনু, অনিল, অবনী, বলরাম, কাঞ্চন প্রভৃতি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে উপন্যাসে, তাদের ভূমিকা যথাযথ। অরুণাংশুর সঙ্গে দুটি বিপরীত মানসিকতার নারী, স্বাতী ও টগরের প্রেমপ্রীতি মমতার কাহিনী সেই সঙ্গে জমে উঠেছে। একটু অসতর্ক হলে যার বিকৃতি ঘটার আশংকা ছিল, লেখক সংযত ভাষায় তার বেদনামধুর সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

[illegible] গোস্বামী

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

শিকড়

আমরা যারা নাগর পরিবেশে দীঘল ডাগর হয়েছি তারা ছিন্নমূল। বড় জোর বলা চলে, আমরা কাচঘরের ভেতর অর্কিড জীয়ল ফুল। ঔপনিবেশিকত্বের অবস্থায় নৈসর্গিক মৃত্তিকার সঙ্গে মূলত নিঃসম্পর্ক। আমাদের ছবি লেখা গান সবই বাবু আর বিবি বিলাস। বৃক্ষ নয়, লতা নয়, নিছক অর্কিড। এইজন্যে হয়তো মাঝে মাঝে শিকড়ের খোঁজ করতে হয়। শুধু আমাদের ধ্রুপদী শিল্পকলার ঐতিহ্যর অনুসন্ধান নয় কিন্তু তার চেয়েও প্রগন্ধা লৌকিক পরম্পরার অঙ্গনে তীর্থে যেতে হয়। সভ্যতা সংস্কৃতির মূল শিকড়ে।

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার পটের সুন্দর একটা প্রদর্শনী দেখলাম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রা ভবনে (তিরিশে এপ্রিল—দশরা মে)। খুব পুরনো পট না হলেও রাঢ় সমতট অঞ্চলের মোটামুটি এক শ সোয়া শ বছরের কাজ থেকে হাল আমলের পট। কলকত্তাওয়ালীর মন্দিরের আশপাশের পটুয়াদের সুন্দর কাজও ছিল। চিত্রকররাও স্বয়ং হাজির ছিলেন কেউ। সুতরাং মোটের ওপর প্রদর্শনীর একটা অন্য পরিবেশ রচিত হয়েছিল।

পটের ঐতিহ্য খুঁজতে যদি পিছু হাঁটি তা হলে প্রাগৈতিহাসিক কালে পৌঁছে যেতে পারি। বৌদ্ধ আমলে ভারতশিল্পের যে সমৃদ্ধি তার পেছনে লোকশিল্পের প্রভাব কাজ করেছে। বুদ্ধদেবের আমলে পটকে বলা হতো 'চরণচিত্র' এবং স্বয়ং তিনি চরণচিত্রের প্রশংসা করেছেন এ রকম উল্লেখ পাওয়া গেছে। প্রথম দিকের জৈন এবং বৌদ্ধ সাহিত্যেও এমন লোকশিল্পীর কথা আছে যাঁরা পটুয়াদের মতোই জড়ানো পটচিত্র খুলে গান গেয়ে লোকের মনোরঞ্জন করতেন। সাঁচী থেকে অজন্তা পর্যন্ত এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে গোটা উপাখ্যান দেওয়ালে অংকন বা ভাস্কর্য করা হয়েছে পটুয়াদের কায়দায়।

অ্যাপেনডিকসের মতোই চিত্রকররা এখনও টিঁকে আছেন। বাঙালীমাত্রের কাছে তিনি পটুয়া বা পোটো। পট শব্দটি সম্ভবত 'পট্ট' শব্দের অপভ্রংশ—পাট বা রেশমে তো এককালে ছবি আঁকতেন ভারতবর্ষীয় শিল্পী সম্প্রদায়। মতান্তরে শব্দটি আদিবাসী ভাষার অবদান। পট দুই রকমের— জড়ানো এবং চৌকো। জড়ানো পট নীচের দিকে খুলে ওপরের দিকে জড়ানো হয় একঘেঁয়ে সুরে গান গেয়ে উপাখ্যানটা বলা হয়। বর্তমানে কাগজের ওপর এঁকে কাপড়ের ওপর সাঁটা হয়। উদ্ভিজ্জ বর্ণের চাইতে জলরঙের ব্যবহার বেশি। পটুয়া বিষয়ের জন্য দুটি মহাকাব্য, মঙ্গলকাব্য, কিংবদন্তী এবং সমকালীন ঘটনার ওপর প্রধানত নির্ভরশীল। তা ছাড়া দুর্গার ছবিও আঁকা হয়। বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুরে এখনও পটুয়ারা আছেন।

কাশি স্তব্ধ
এসে গেল
ভরসার চিকিৎসা আজ
নতুন প্যাকের সাজ
Alembic
Glycodin
TERP-VASAKA
COUGH SYRUP
গ্লায়কোডিন
টর্প বসাকা
খাঁসী কী দবা
Dosage:
Children:
1 to 3 years as advised by the physician
4 to 6 years. 1.25 ml.
(1/4 teaspoonful):
7 to 12 years: 2.5 ml.
(1/2 teaspoonful):
three or four times a day.
Caution:
It is dangerous to exceed the stated dosage
Indications
Alembic
Glycodin
TERP-VASAKA
COUGH SYRUP
MADE IN INDIA
কাশি উপশমের জন্য গ্লাইকোডিন
কোনও সাধারণ মামুলি সিরাপ নয়।
ভারতের সেরা এই কফ সিরাপ
শরীরে কাশি হওয়ার চারটি ঘাঁটি
আক্রমণ করে কাশি সম্পূর্ণ দূর করে।
● মস্তিষ্ক থেকে কাশবার ইচ্ছাকে দূর করে।
● গলা খুশ্ খুশ্ বন্ধ করে।
● বুকের আড়ষ্টতা দূর করে, ফলে শ্বাস নেওয়া খুব সহজ হয়।
● বুকের জমা শ্লেষ্মা গলিয়ে বার করে দেয়।
কাশি যেমনই হোক তা সম্পূর্ণ দমন
করার জন্যে গ্লাইকোডিনের ওপর পুরো
ভরসা রাখুন। এটি কাশি থেকে চটপট
আরাম এনে দেয়, আপনি খুব সহজে
শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেন, যার দরুন
আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন।
Alembic
অ্যালেম্বিক—যাঁদের ওষুধের ওপর
ডাক্তাররা সম্পূর্ণ ভরসা করেন।
গ্লাইকোডিন কাশি স্তব্ধ করতে ভারতের সেরা ওষুধ।
everest/78/ACW/236-bn

গ্রামের গরীবগুর্বোরাই তাঁদের পৃষ্ঠপোষক, যদিও ইদানীং বৃত্তিচ্যুত হয়ে তাঁরা ভূমিহীন চাষীদের মতো ঘরামির কাজ, ধান-কাটার সময় জনমজুরের কাজ করছেন। এঁরা একই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ—উভয় ধর্ম মানেন। সুতরাং একই পট থেকে তাঁরা অবলীলায় মুসলমানের কাছে "সত্যপীর" এবং হিন্দুর কাছে "সত্যনারায়ণের" গান গান। লোকজীবনে এঁদের ধর্মসমন্বয় শ্রীচৈতন্যের চেয়ে কম কৃতিত্বের নয়। নিজেদের জীবনেও তাঁরা একাধারে হিন্দু মুসলমান—সুতরাং তাঁদের মধ্যে স্ববৈপরীত্য নেই। প্রদর্শনীতে এ ছাড়াও ছিল গাজী পট, আদিবাসী পট এবং কালীঘাটের পট—মূল ধারার অন্তর্গত হয়েও যা কিছুটা আলাদা। ছিল না সাহেবপট, দশাবতার তাস ইত্যাদি অন্য কয়েকটি উদাহরণ।

ভারতপ্রেমী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এবং স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ কালে আমরা নিজেরা স্বাদেশিকতার জন্যে ভারতীয় ঐতিহ্যকে বৈচিত্র্যের মধ্যে অখণ্ডতার ঐক্যরূপে দেখেছি। ঐতিহাসিকদের চেয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রমাণ করেছে ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্য ভিন্নতর আঞ্চলিক লোকপরম্পরার যোগফল। কৃষিপ্রধান বলে অঞ্চলের সঙ্গে অঞ্চলের জীবনদর্শনের মিল যেমন আছে তেমনি ভূগোল, ভাষা, লোকধর্মের ভিন্নতার জন্য লোকায়তিক রীতিনীতি, পূজন, ভোজন, সমাজবিন্যাস ভিন্ন হয়েছে এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রভেদ রয়েছে, যা আবার প্রত্যেক আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে বিশেষত্ব দান করেছে। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে আঞ্চলিক সংস্কৃতির মোট যোগফল বোঝায়।

প্রত্যেকটা পট নিয়ে আলাদা আলোচনা করা যায়। কিন্তু তাতে না গিয়েও বলা যায় লোকরঞ্জনের জন্য উপাখ্যান সচিত্র করা হলেও চিত্রের শর্ত পুরোপুরি চিত্রকররা মেনেছেন বরং উপাখ্যানের আঙ্গিকের দিকে দৃষ্টি দিয়ে প্রায়শ আমরা ছবি উপেক্ষা করি। সামগ্রিকভাবে ছবিগুলো জনপদের মৌখিক সাহিত্য-ঐতিহ্য (ওরাল ট্রাডিশনের) ওপর নির্ভর করেছে, লিখিত সাহিত্য-ঐতিহ্যের ওপর নয়। তাই তা বিমূর্ত ধারণা (অ্যাব্স্ট্রাক্ট কনসেপটস) নয় কিন্তু প্রাগক্ষর (প্রি-লিটারেট) চাক্ষুষী ছবির ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি দিতে পেরেছে। প্রত্যেকটি ছবিতে আলাদাভাবে রচনা, অংকন, বর্ণিকাভঙ্গ এবং রূপবন্ধের দিকে চিত্রকর দৃষ্টি দিয়েছেন। দৃশ্য জগৎ-পটে অনূদিত হবার সময় সহজ চিত্রভাষা ব্যবহার করেছেন। রূপবন্ধ (ফর্ম) এবং রূপারোপ (স্টাইলাইজেসন) স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রগাঢ় সরল (নাঈভ) এবং চিত্রকরভেদে মৌলিক। যেমন পিতার ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রতিমারীতি (আইকনোগ্রাফি) যে পুলের ওপর থেকে বাসের জলে পড়ে যাওয়ার ঘটনা রূপায়িত করার পক্ষে উপযুক্ত নয়, এটা বুঝতে

"বাঘছট রোঙ্গা"—আদিবাসী পটচিত্র

করেছেন। বিশেষত বাসের অংকন শিশুচিত্রের মতো। তেমনি স্টীমারে "নগেনবাবুর খুন" পটটিতে স্টীমার, জল পুলিসের নৌকা, পদ্মাবক্ষ, কলকাতার কেরানীবাবু এবং সালংকরা তাঁর স্ত্রীর সাজসজ্জা, ভঙ্গী, নাবিক, দারুণ। বিশেষত ঢাকার কোর্টের দৃশ্য আঁকিবার জন্যে পটে একটা ত্রিভুজ বসিয়ে মাঝখানে জজসাহেব এবং ত্রিভুজের বাইরে একদিকে আসামী, অন্যদিকে নগেনবাবুর স্ত্রীকে যে কায়দায় আঁকা হয়েছে তা চিত্রের নির্মিতির বিষয় চূড়ান্ত সৃজনধর্মপরায়ণতার পরিচয় দেয়। সাবলীল তরল চঞ্চল রেখা এবং হাত খুলে তুলি চালনা প্রত্যেকটি পটকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। বর্ণিকাভঙ্গের ব্যাপারে তাঁরা স্বাধীন—বিরোধী এবং পরিপূরক বর্ণ খেয়াল খুশিতে ব্যবহার করেছেন। পট যে মূলত দ্বিমাত্রিক এ বিষয় তাঁরা অবহিত। এর মধ্যে একটি পট—"বাঘছট রোঙ্গা" আদিবাসীদের আঁকা। বহুদিন ভুলতে পারব না। বাঘটির মজাদার রূপারোপ, গায়ের দাগ, লোম, গোঁফ—সব মিলিয়ে নিখুঁত লৌকিক কলমের কাজ। আর রঙের কী বাহার।

কালীঘাটের পটে ঔপনিবেশিক নগরায়ণের প্রভাব পড়লেও পটের লৌকিক ধারারই রূপান্তরিত সংস্করণ তাতে সন্দেহ থাকে না। সাহেব চিত্রকরদের কাছে পটুয়ারা যদি কিছু পেয়ে থাকেন, তবে তা তাঁদের লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী বিন্দু পরিমাণও আচ্ছন্ন করতে পারেনি বরং মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়িষ্ণু দশায় যেসব বাঙালী অনুচিত্র কলম (মিনিয়েচর স্কুলস) ছিল তার সঙ্গে কালীঘাটের অঙ্কন রীতির সাদৃশ্য ছিল—ইদানীং মুর্শিদাবাদ, হালিশহরের অনুচিত্র এবং চন্দননগর-ব্যাণ্ডেলের তৈল মাধ্যমে আঁকা পট জয়া আপ্পাস্বামীর সঙ্গে ঘুরে দেখার সময় আমি এ-বিষয় নিঃসন্দেহ হয়েছি। কালীঘাটের বহিরঙ্গ রেখা এঁকে, ভেতরে ছায়া-সুষমা (শেডিং) দিয়ে আলেখ্যকে ভাস্কর্যগুণান্বিত করার রীতিটির ভাস্কর্যগুণান্বিত করার প্রবণতার জন্য পোড়ামাটির মন্দির ভাস্কর্য কিছু পরিমাণে দায়ী এ অনুমানও বোধ হয় ভুল হবে না। সুতরাং উইলিয়াম আর্চার কালীঘাটের পট সম্বন্ধে যা বলেছেন তা পুরোপুরি সত্য নয়—জয়াদি এবং আমি উভয়েই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

১৯৩০ থেকে '৪০ পর্যন্ত যামিনী রায়, নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ লোকায়ন পর্বে পটুয়াদের রীতি প্রকরণ অঙ্গীকার করে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রাণকৃষ্ণ পাল থেকে পরিতোষ সেন পর্যন্ত "ক্যালকাটা গ্রুপের" শিল্পীরা নতুনতর নিরীক্ষায় নেমেছিলেন। কিন্তু পটের ঐতিহ্যের মধ্যে অন্যতর সম্ভাবনা হালের শিল্পীদের জন্য অহল্যার মতো প্রতীক্ষা করে আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

তন্ত্রমন্ত্র

এস কে রায়চৌধুরী কলকাতা সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। এঁর সহপাঠীরা এখন অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। এঁকে জীবনের নানারকম উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি বহু বছর দিল্লির একটি বিদ্যালয়ের আর্ট টীচার। কলকাতায় এটি তাঁর প্রথম প্রদর্শনী (জুন ২৬—১লা জুলাই)।

বেশির ভাগ ছবি কালিকলমের। কয়েকটি প্যাস্টেলে আঁকা। তাঁর ছবি খুবই পরিচ্ছন্ন। রেখারও জোর আছে। কালো সাদা রঙ নিয়ে কিছু খেলাও আছে। অনেক ছবিই কিন্তু তন্ত্র নিয়ে। তান্ত্রিক প্রতীক নিয়ে তিনি ছবি সাজিয়েছেন। এসব ছবি এমনই মামুলি এবং বহুবার দেখা যে আর টানে না।

বরং যা কিছু তিনি দেখে এঁকেছেন তা বহু গুণে ভাল। তাঁর প্যাস্টেলে আঁকা জয়পুরের দৃশ্যগুলি মোটামুটি পাহাড় ঘরবাড়ি নিয়ে জমেছে। বিশেষত চিতোর দুর্গটুর্গ নিয়ে ছবিতে হাওয়া বাতাস সব মিলিয়ে মন্দ নয়।

পাহাড় আর ফণিমনসা বা ঘাটের নৌকা নিয়ে তিনি যে কালিকলমের ছবি এঁকেছেন, সেগুলো একরকম ভালোই। যদিও এসব ছবিতে আর্ট কলেজের একটা গন্ধ আছে।

তাঁর হাত যে ভাল এবং দেখার চোখ আছে, সেটা বেশ বোঝা যায়। আমার মনে হয়, চোখে দেখা জগতের দিকে তিনি যদি আরেকটু নজর দেন তো ভাল করবেন। তাছাড়া প্রদর্শনীতে পাঁচমিশালী কাজের নমুনা না দেখিয়ে, যদি একটা সিরিজ হিসাবে ছবি ভাবেন, কারিকুরির চেয়ে যদি নান্দনিক বিষয় আরেকটু সতর্ক হন, তাহলে তাঁর ছবি আরেকটু উৎরে যাবে।

আরও পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে তাঁকে। চিত্রকরের যে-সব গুণ থাকার দরকার তা সবই তো তাঁর আছে।

সন্দীপ সরকার।

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

কৃষ্ণ সুদামা

প্রকৃত বন্ধুত্ব বলতে দু-জনের সম্পর্ক কত অন্তরঙ্গ হতে পারে এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরে ভক্তির মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য ছবিখানিতে। কাহিনী সংগঠনে প্রযোজক কেদারনাথ আগরওয়ালা মহাভারতে বর্ণিত আখ্যানের সার মাত্র গ্রহণ করেছেন—চিত্রায়িত ঘটনাবলীর অধিকাংশই তাঁর স্বকপোলকল্পিত। ছবির প্রারম্ভে একথা স্বীকারও করা হয়েছে।

ছবিতে কৃষ্ণ ও সুদামার জীবনের দুটি পর্ব দেখা যায়। একটি গুরুগৃহে পাঠকালে এবং অপর পর্ব প্রাপ্ত বয়সে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাধিপতি এবং সুদামা স্বগ্রামে দারিদ্র্য ও সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বলে কংসভার্যা অস্তির রোশানলে জর্জরিত। বন্ধুর কষ্টে শ্রীকৃষ্ণ কাতর হলেও নিরুপায়। কারণ, গুরুর আশ্রমে পাঠকালে সামান্য কারণে দুই বন্ধুর মধ্যে কলহের সময় হঠাৎ মুখ থেকে নিসৃত একটি কথার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সুদামকে প্রত্যক্ষ সাহায্য দানে অপারগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী মায়াবিনীর বেশে সুদাম ও তার স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করে বন্ধুর বিপদে কর্তব্য পালনে অসহায়তা থেকে স্বামীকে রক্ষা করেন।

মহাভারতের কাহিনী এবং তার নায়ক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং দানব হত্যা থেকে পর্ণকুটিরকে বিশাল রাজপ্রাসাদে পরিণত করা জাতীয় অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাবল্য থাকা স্বাভাবিক এবং তা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক কাণ্ড হাসির উদ্রেক করে, যেমন অঘাসুর বধের দৃশ্যটি। মূল কাহিনীতে আছে অঘাসুর বিরাট এক অজগরের রূপ ধারণ করে মুখ হা করে থাকে যাতে আশ্রম বালকরা পর্বতগুহা ভ্রম করে সেই মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করে। ছবিতে দেখা যায় একটি বিরাট হাঁ-করা কুমীর এবং আশ্রম বালকরা যেন স্বেচ্ছায় গড়াতে গড়াতে এসে মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করল। যন্ত্রচালিত ব্যাপারটা বড় কৃত্রিম মনে হয়। তবুও শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামার আশ্রমে শিক্ষার্থী কালের অংশ অন্তত ছোটদের ভাল লাগবে। শ্রীকৃষ্ণের কাহিনীতে গোপিনীদের সঙ্গে বিশেষ করে শ্রীরাধিকার সঙ্গে তাঁর প্রেমাভিসার বাদ থাকতে পারে না। বস্তুত ছবির শেষার্ধ মুখ্যত শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে শ্রীরাধিকার আকুলতার দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু বাণীকুমার রূপায়িত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রটির

দর্শনের জন্য লালায়িত হওয়ার ব্যাপারটা বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না। সে তুলনায় সুদামা চরিত্রে ভারতভূষণ দর্শক মনে দাগ কাটেন।

ছবিখানি সাজ-পোশাক, প্রাসাদ, আশ্রম ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে জাঁকজমক এবং বার্ণাঢ্যতায় বাংলা ভক্তিমূলক বা পৌরাণিক ছবির বিচারে একটা নিরিখ স্থাপন করবার মত। এ বিষয়ে অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহার ক্যামেরার কাজ এবং সত্যেন রায়চৌধুরীর শিল্প নির্দেশনার কাজ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। নীতা সেনের সুর যোজনায় সুমন কল্যাণপুরী, আশা ভোঁসলে, ভূপেন্দ্র সিং, মহেন্দ্র কাপুর ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গীত গান ও স্তোত্র ভাল লাগবে। ভাল লাগবে মাস্টার রাজেশ ও মাস্টার সুশোভনকে বালক বয়সের কৃষ্ণ ও সুদামার চরিত্রে।

ভূমিকম্পের সময় পাহাড় সরে যাওয়ার ব্যাপারটা যেন হাত দিয়ে সেট ঠেলে দেওয়া, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে ঝরা-পাতা উড়ছে অথচ গাছের ডালে পাতা শুকনো ও স্থির ; দ্বারকায় বন্ধুর আপ্যায়নে স্টেইনলেস স্টিলের বাসনে সুদামাকে খাদ্য পরিবেশন—পরিচালক-সম্পাদক অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল কি করে।

পঙ্কজ দত্ত

গোলমাল

পরিচ্ছন্ন ছবি। হিন্দি ছবির কয়েকটি মুদ্রাদোষকে সচেষ্টভাবে এড়িয়ে চলেছে। এবং পরিচালক বাঙালী—হৃষীকেশ মুখার্জি। ছিম-ছাম হাসির ছবি হিসেবে অনেকের ভালোই লাগবে। সময়টা নেহাৎ মন্দ কাটবে না। অমল পালেকর নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলেন আর একবার তাঁর ক্ষমতা। নবাগতা বিন্দিয়া গোস্বামীকে কয়েকটি বিশেষ ক্যামেরা কোণ থেকে চোখে লাগার মতো ভালো লাগে। তিনি যদি ম্যাটিনি আইডল হবার চেষ্টা না করে সত্যিকার অভিনেত্রী হতে চান তাহলে ভবিষ্যতে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারবেন। উৎপল দত্ত নায়িকার খেয়ালী বদমেজাজী সেকেলে বাবা। একেবারে তাঁর বিশেষ ধরনের অভিনয়ের জন্যে কেটেছেঁটে তৈরি করা টাইপ চরিত্র। এইসব চরিত্রে তিনি কতটা ভালো অভিনয় করতে পারেন তার উদাহরণ পাওয়া যাবে শ্রীমান পৃথ্বীরাজে। গোলমালের এক এক জায়গায় তিনি অনবদ্য। কিন্তু তিনি তাঁর অভিনয়ের ভারসাম্য বজায় রাখেননি। হয়তো পরিচালকের প্রবল উৎসাহেই তিনি কখনো কমেডি থেকে ফারসে এবং ফারস থেকে ল্যামপুনে নেমে গেছেন। এবং এইখানেই সমগ্র ছবিটির প্রধান দুর্বলতা। ছবির একমাত্র লক্ষ্য, হাসাতে হবে। কিন্তু হাসির মধ্যে কোথাও মনন নেই। এবং ষোল রীল ধরে যান্ত্রিক হাসি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। ছবির দ্বিতীয় দুর্বলতা ছবির কাহিনী।

বিন্দিয়া গোস্বামী

সৃষ্টির সবচেয়ে সহজ উপায় তো এইটেই—নায়ককে সাজতে হচ্ছে অন্য একজন। রেস্টোরেশন কমেডির মধ্যে এ জিনিস হামেশাই এসেছে। অস্কার ওয়াইল্ডের মধ্যেও রয়েছে একই বিষয়। আবার সেদিন রাজ কাপুরের একটা ছবি দেখলাম টি ভি-তে, সেখানে রাজ কখনো গরীব বেকার, কখনো নিজের পরিচয় লুকিয়ে নায়িকার অঙ্কন শিক্ষক। ফলে এই পরিচিত ছকের সবকটি চাল আমাদের জানা। এবং গোলমালের শুরু থেকে গোলমালটা আমাদের একেবারেই গোলমেলে ঠেকে না। কোন সিকোয়েনস-এর সমাপ্তি ঠিক কিভাবে ঘটবে তাও আমরা আন্দাজ করতে পারি। এবং ছবির চমকগুলো ভোঁতা হয়ে যায় বলেই, কৌতুকে চাকচিক্যের অভাব দেখা দেয়, এবং কিছু কিছু অংশ শ্লথ মনে হয়। ছবির আর একটি দুর্বলতা আয়তন। আরো আঁটো এডিটিং-এ ছবিটিকে সংক্ষিপ্ত করলে ছবির আবেদন নিঃসন্দেহে বাড়তো। স্ক্রীন-কমেডির প্রাণ দ্রুতি, গতি হঠাৎ ঝুলে গেলে কমেডি মার খেয়ে যায়। বিশেষভাবে গানের দৃশ্যগুলি খুবই শ্লথ। এসব দৃশ্যে বিশেষ কিছু ঘটে না। অন্তত কিছু ভিসুয়াল মজা আনা যেতে পারতো। চতুর্থ দুর্বলতা, সিনেম্যাটিক ডিটেলস এবং বাস্তবধর্মিতার অভাব। বেশীর ভাগ দৃশ্যই ছোটো ছোটো ইঙ্গিতে বাস্তব হয়ে ওঠে না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ছবির নায়ক অমল পালেকর তার বোনের সঙ্গে বম্বের একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। ভাই-বোনের সংসার। তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। কিন্তু কেমন সেই সংসার? এবং কোথায় সেই সংসারের একটি বিশ্বাস্য রূপ? ভাইবোন একসঙ্গে খেতে বসেছে, বা গল্প করছে, বা ঝগড়া করছে—কোথায় সেই সব আশ্চর্য মজা? অথচ দু-একটা ছোটো ছোটো টাচে কি কাণ্ড না ঘটতে পারতো! বুড়ো মামার চরিত্রে ডেভিডের মধ্যেও একটা দারুণ সম্ভাবনা ছিল ফরমুলা থেকে কিঞ্চিৎ বেরিয়ে গিয়ে কৌতুক সৃষ্টির—কিন্তু পরিচালক সে-সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন। বাঁধাধরা ■

ছোঁয়ায় অনেক কিছুই ঘটতে পারতো—সে সুযোগ ছিলো। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। গোলমালের গোলমালটা সেখানেই।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

নবনালন্দার অনুষ্ঠান

রবীন্দ্রসদনে দশ জুলাই সন্ধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের নাট্য সংগীত' পরিবেশিত হল নবনালন্দার প্রযোজনায়, অনুষ্ঠানের বিষয়-নির্বাচনে মৌলিকতা না থাকলেও যে রুচি ও মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেল তা অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। যে-কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় এরূপ সুপরিকল্পিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের নিবেদনই প্রত্যাশিত। এভাবে নানা প্রতিষ্ঠানের মিলিত প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের গান একদিন আমাদের কাছে কেবলমাত্র প্রমোদোপকরণের সামগ্রী হয়ে থাকবে না—ক্রমে তার গভীরতর ব্যঞ্জনা আমাদের মানসিক জীবনকে সমৃদ্ধ করতে উদ্দীপিত করবে। অনুষ্ঠানসূচীর গান নির্বাচিত হয়েছিল শ্রাবণগাথা, শারদোৎসব, ফাল্গুনী, রক্তকরবী, মুক্তধারা, অরূপরতন

কণিকা, বনানী, অশোকতরু

তাসের দেশ, অচলায়তন, তপতী ও নটীর পূজা নাটক থেকে। নাটক ও তার গান নির্বাচনে 'গ্রন্থনা' রচয়িত্রীর লক্ষ্য স্থির না থাকায় অনেক অসংগতি কানে বেজেছে। নির্বাচনে 'গৃহপ্রবেশ' 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি নাটকের গান কেন সূচীর অন্তর্ভুক্ত হল না তাও বিস্ময়কর। এক্ষেত্রে শিল্পগত অথবা ভাবের অসংগতির কোনো বাধা তেমন করে উপলব্ধি করা যায় নি। সম্ভবত নাটকের কালক্রম রক্ষিত হয়নি বলেই অস্পষ্ট থেকেছে রবীন্দ্রনাথের নাটকে 'গান' ক্রমে কতখানি অমোঘ হয়ে উঠেছে, কেমন করে 'শারদোৎসব থেকে নাটকের গদ্যাংশে লেগেছে কবিতার স্পর্শ', 'ফাল্গুনী এসে মিলেছে গীতিনাট্যের মোহনায়' আর 'জীবনের উপান্তে নাটকের সংলাপ হয়েছে সম্পূর্ণ গান'। গ্রন্থনায় তেমন কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্যের সুরও বেজে ওঠেনি যাকে অবলম্বন করে গানের তরী তীরে এসে ভিড়তে পারে।

অনুষ্ঠানে একক গানগুলি গেয়েছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ, প্রবীর লাহিড়ী। কয়েকটি সম্মেলক গান নবনালন্দার শিল্পী-গোষ্ঠীর কন্ঠে গীত হয়—এর মধ্যে ... নির্ধারিত। যুগল গান ছিল দুটি। বনানী ঘোষের কন্ঠে এদিনের গান-গুলি তাঁর সুললিত কন্ঠে অনুকৃতিহীন ও বলিষ্ঠ হওয়াতে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে। 'এসো নীপবনে' 'জাগো আলসশয়নবিলগ্ন' গান দুটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্ঠে 'মুক্তধারা'র গানগুলি তাঁর গায়নভঙ্গির জন্য সার্থকভাবে রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। চতুর্মাত্রিক ছন্দে 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব' গানটির যে একটি বিশেষ আবেদন আছে এদিনের অনুষ্ঠানে তিনি তার যাথার্থ্য প্রমাণিত করেছেন। কেবল 'ফাল্গুনী' নাটকের 'হবে জয় হবে জয়' গানটিতে প্রার্থিত বলিষ্ঠতা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাঁর মেঘগম্ভীর কন্ঠস্বরের যথোপযুক্ত ব্যবহার দেখিনি কেন এই গানে? কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের কথা বলতে প্রথমেই তাঁর কন্ঠমাধুর্য ও কন্ঠে স্বরস্থানের কথা উল্লেখ করতে হয়। এমন নিখুঁত স্বরস্থান এযুগে মুষ্টিমেয় কয়েকজন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর কন্ঠে ধৃত। মেদুর কন্ঠে তাঁর গাওয়া সেদিনের গানগুলির মধ্যে অরূপরতন-এর 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না যে' নভোবিস্তারী সুরের আবহ সৃষ্টি করেছিল তা বিস্ময়কর। সুরের অলংকরণের পরিচ্ছন্নতা ও মীড়ের সুমিত প্রয়োগে আশ্চর্য সুন্দর। এই গান সেদিনের অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ গান। তাঁর কন্ঠে অন্যান্য গানগুলিও সুগীত। প্রবীর লাহিড়ী এই আসরে সম্পূর্ণ বেমানান। সমবেত গানগুলি অনুল্লেখ্য। যুগল গান দুটি অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় গীত।

যন্ত্রানুষঙ্গ : তাল যন্ত্রবাদকের লয়জ্ঞান পীড়াদায়ক, তাঁকে সমানভাবে উৎসাহিত করেছে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের অস্থির লয়। অনুষ্ঠান সৌকর্যার্থে অন্যান্য সহযোগী যন্ত্র কোনো সহায়তা তো করেই নি বরং শিশুদের কন্ঠের 'আলো আমার আলো' গানটি যন্ত্রের কোলাহলে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

মঞ্চসজ্জা : অত্যন্ত রুচিপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দন।

আলোক সম্পাত : রঙ-বেরঙের আলোর খেলা অনুষ্ঠানে কোনো মাত্রা যোগ করতে পারেনি। এই ধরনের অনুষ্ঠান আলোকসম্পাতের প্রয়োজনের যৌক্তিকতা কতখানি উদ্যোক্তাদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

নাট্যাংশ পাঠ অপেশাদার শিল্পী হিসাবে যথাযথ।

গ্রন্থনা - সংগীত পরিচালনা-নির্দেশনা : ভারতী মিত্র।

সুভাষ চৌধুরী

কয়ার স্পেশালে ভারত ভ্রমণ

আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্র সদনে ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি একটি অনুষ্ঠান নৃত্য সহযোগে লোকসংগীত গণসঙ্গীতের আয়োজন করেন। শুধু ভারতীয় লোকসঙ্গীত নয়, গান নির্বাচনে অনুষ্ঠানটি প্রায় ... এই ধরনের অনুষ্ঠানে যে রকম হয়ে থাকে এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যন্ত্রসঙ্গীত নৃত্যের সঙ্গে সম্মেলক গানের কর্মাঢ্য অনুষ্ঠান। যথারীতি মঙ্গলাচারণের নিয়মরক্ষায় প্রথমে বেদগান দিয়ে শুরু। (রবীন্দ্রনাথের পর গানের ক্ষেত্রে আর বেদ নিয়ে চর্চা হয়নি) ক্রমশ আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রমা। বিরাট এই ভারতবর্ষের বিরাট লোকসঙ্গীতের ভান্ডার থেকে মাত্র কয়েকটি গানই বিভিন্ন ভাষার পরিবেশন করেন। মাস্ সঙ বলতে এখনও গণনাট্য সঙ্ঘ এবং পরবর্তী কিছু রেকর্ডের গানই সম্বল। ফলে কীর্তনের আসরে নৌকাবিলাস, মাথুর প্রভৃতি বিষয়বস্তু যেমন সকলেই জানেন এখানেও তাই। তবে সে আসরে বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্নভাবে পদ সংগ্রহ করেন—এখানে গায়নভঙ্গী অর্কেস্ট্রার নাচ প্রায় সব ক্ষেত্রেই সমানতার দোষগুণ সমেত। কিছু গান যা একই কথা দুবার স্কেল চেঞ্জ করে দেড় মিনিটেই শেষ হয়ে যায়—তবু আন্তর্জাতিক ভান্ডার দেখতে পারলে প্রেস্টিজ বাড়ে। ইন্দ্রাণী সেন এবং কয়েকজন মহিলা শিল্পীর গান এই দিনের অনুষ্ঠানে অনবদ্য। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান পুরুষকণ্ঠ নিশ্চিন্তভাবেই রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করেন আন্তরিকভাবে। তাই লোকসঙ্গীতের গায়নভঙ্গি ও উচ্চারণ নিয়ে বিভ্রাট হয়। অনেকক্ষেত্রে ছন্দের মজাটাই পাওয়া যায় —গানের কথা একটুও বোধগম্য হয় না। তবু নেপাল, ফিলিপাইন, মহারাষ্ট্র বিহারের গান কিছুটা মনে ছাপ ফেলে।

যথারীতি নাচে যে পথ বেছে নেওয়া যায় এখানেও তাই, অর্থাৎ লাস্য এবং সংগ্রামের দৃঢ় মুষ্টি। 'অবমচল উঠা হ্যায় দরিয়া' গানটির সঙ্গে কোনক্রমেই ভাঙরার উদ্দাম উচ্ছ্বাস দেখানো চলে না। 'সুবহ্ সুহানী তুমে পুকারে / সাহিল তেরী রাহ নিহারে / সপ্নে সুহানে সাচ্ হোপে মেওয়াইয়া/' গানের সঙ্গে নিশ্চয়ই 'বোলে বোলে—ক্যা কুট বোলিয়া' গোবের নাচ চলতে পারে না। এই কথা বলা চলে 'ধিতাং ধিতাং বোলে' এবং আরও কয়েকটি গান সম্পর্কেও। পূর্ববাংলায় গানের সঙ্গে যে ধরনের নাচ সেটা যাত্রায় এখন রিলিফ হিসাবে মাঝে মাঝে দেখা যায়। ভাল লাগে 'ওই উজ্জ্বল দিন' এবং কয়েকটি প্রদেশের নাচ। নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন পিয়ালী রায় মহাশয় ও চন্দ্রোদয় ঘোষ।

এইসব অনুষ্ঠানে সাধারণত যন্ত্রসঙ্গীত আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। চন্দন রায়চৌধুরীর ভাইব্রোফোন ও ইলেকট্রিক অর্গান অদ্ভুত পরিবেশ রচনা করেছে। তার থেকেও গানকে অন্য মাত্রা এবং আশিস গুপ্তের ম্যান্ডোলিন ও স্যাক্সোফোন—যা আলাদাভাবে চিহ্নিত করার মত। কিন্তু সব ছাপিয়ে অনেক সুর মুহূর্তে নষ্ট হয়েছে তবলা ও ঢোলের দাপটে। আর মনে থাকবে সেই মহিলাকে যিনি এই কয়ার স্পেশালে ভারত ভ্রমণের গাইড হিসাবে কাজ করেছিলেন। ইংরাজীতে প্রতিটি গানের আগে—কখনো তিনি স্মার্ট কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি বোঝাতে ... স্কুলের মেয়েদের আবৃত্তি করার মত এই স্মরণীয় দিনে প্রধান অতিথি ছিলেন শঙ্করপ্রসাদ মিত্র।

হাত বাড়ালেই

শিশিরমঞ্চে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় এক প্রতিবেশী এসে নিকট আত্মীয় হয়ে গেলেন। আসাম থেকে এসেছিলেন রামেশ্বর পাঠক ও তাঁর সহধর্মিণী ধনদা পাঠক; সঙ্গে দো-তারা ও ডুবুগি সহযোগিতায় আরও দুজন শিল্পী ছিলেন। পাঠক দম্পতি কামরূপ-বড়পেটা অঞ্চলের শিল্পী। আসামের যে সব গান আমরা শুনে থাকি, তা হল 'আপার আসাম' অর্থাৎ চলতিভাষায় 'উজনী অহমে'র গান। বড়পেটা অঞ্চলের গান চরিত্রে আলাদা। শংকরদেবের জন্য এখানে ধর্মের প্রভাব বেশি। গানের মধ্যে রাম ও হরি প্রায়ই শোনা যায়। রামেশ্বর পাঠক অজ্ঞাত লোককবি; ভিক্ষুক-গায়কদের কাছ থেকে গান সংগ্রহ করে শিল্পী হিসেবে দুরূহ দায়িত্ব পালন করেছেন। দুজনের কণ্ঠ-মাধুর্য অবাক করে দেওয়ার মত। আমরা এখানে ভূপেন হাজারিকা, নির্মলেন্দু চৌধুরী, পূর্ণদাস বাউলের যে গান শুনি—সেটা তাঁদের গান হয়ে ওঠে তাঁদের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের গুণে। রামেশ্বর পাঠকের মধ্যে শিল্পী-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সযত্ন প্রচেষ্টা রয়েছে মূল সুর অক্ষত, অব্যাহত রাখার; এটাই উপরি পাওনা।

সূচনায় বন্দনা গান 'হরি হে তুমি প্রভু অনাথর নাথ' গানেই দুজন আমাদের অন্যলোকে নিয়ে গেলেন। আমাদের কীর্তনের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে, কিন্তু আরও এমন কিছু আছে, যা অনাস্বাদিত। এরপর 'বেহুলার বিয়া', 'বস্ত্র মেলি মেলি' গানে তাঁতবস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখে রাধিকার সঙ্গে আমরাও মোহিত হয়ে যাই। কিছু গান

যুগল
মিলন
ভারতের একমাত্র শারীরিক দুর্গন্ধনাশক
সাবান ও ট্যাল্‌ক
দু'ভাবে দুগন্ধ প্রতিরোধের জন্য একেবারে সঠিক
যুগল মিলন. . সিন্থল সাবান মেখে পরিষ্কার স্নান .
আর তারপর সুগন্ধ পাউডার মাখা...
যার ফলে আপনি ঝরঝরে তাজা
বোধ করবেন।
গোদরেজ্‌-এর
নিবেদন—সিন্থল
CINTHOL
Godrej
CINTHOL
DEODORANT AND COMPLEXION SOAP
CINTHOL
DEODORANT
LUXURY
TOILET POWDER
BY
Godrej
Interpub/CTS/1/79 BN
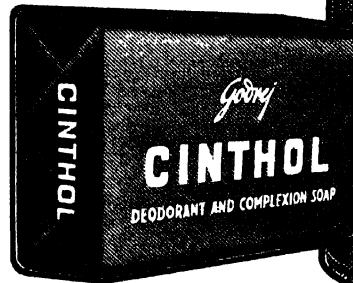
আমাদের ভাওয়াইয়ার মত, আর কিছু গান আমাদের চেনা—যেমন 'জলে না যাইও'। যদিও জনপ্রিয় গানটির রেকর্ডের সুর অন্য। এই প্রসঙ্গে আরও একটি গানের কথাও মনে আসছে 'ও মোর মলুয়ারে'। এখানে বিভিন্ন কয়ারে এটা 'বিহু' বলে চালানো হয়। এইদিন শোনা গেল এটি বড়পেটা অঞ্চলের নৌ-বাইচের গান। আমাদের পূর্ববঙ্গের নৌকা বাইচের সংগে একটি মৌল পার্থক্য আছে। এই অঞ্চলের নদীগুলি নাব্য নয়। খেলাধূলাও অনেক সময় ধর্মের অঙ্গ। এ গানের কথা এক, সুর সম্পূর্ণ আলাদা। কোন উদ্দাম তাল নয়—অন্য ধরনের নিবেদনের সুর। নিজেদের ঘরের কাছের তথ্য সম্পর্কে যখন এত অজ্ঞতা, তখন বিদেশের গান পরিবেশনে আমরা কতখানি আন্তরিক সে সম্পর্কে সহজেই সন্দেহ জাগে। সযত্নে গান শেখা নয়—রেকর্ড থেকে গান তুলে শিল্পী হওয়াটাই বোধ হয় রেওয়াজ। মনে থেকে যায়, শ্রীকৃষ্ণের গো-চারণ গান 'ধেনু, পৈ যায়' কিংবা 'অমায় কেনে বিয়া দিলা বাপে'। এই গানটির নাম 'ঝানু'; আমাদের ঝুমুর গানের কাছাকাছি। আমাদের 'নৌকা-বিলাস' গোত্রের একটি গানও মনোহরণ করে আর সবশেষে 'বিহু' গানের সংগে শ্রোতারা সব ভুলে তাল দিতে থাকেন—সেখানেই শিল্পী-দম্পতির সার্থকতা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, হেমাংগ বিশ্বাস। আর অতিথিদের আগে কালী দাশগুপ্তের গান যথার্থ সেতুবন্ধন। কালী দাশগুপ্তের গীতি ভূমিকার পর রামেশ্বর পাঠক ও ধনদা পাঠক আমাদের যেভাবে সুররসে আপ্লুত করলেন, তার সঙ্গে যোগ রেখেই বোধ হয় অনেকদিন পরে সেদিন প্রথম কলকাতায় কূলভাসানো বৃষ্টি এসেছিল।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

ছবি—অজয় দত্তগুপ্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

কাল তুমি আলেয়া

সভানেত্রী ছিলেন ডঃ ফুলরেণু গুহ। মঞ্জু দে প্রধান অতিথি। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের দক্ষিণ কলকাতা শাখার সংস্কৃতি সংঘের মহিলা সদস্যাদের বাৎসরিক নাট্যানুষ্ঠান নিবেদিত হল বিগত ১৫ জুলাই, হিন্দী হাই স্কুলের 'বিদ্যামন্দির' মঞ্চে। কল্যাণব্রতী এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য লক্ষ্যের প্রতি সমর্থন উৎসাহ জানালেন, সভানেত্রী এবং প্রধান অতিথি দু-জনেই।

'কাল তুমি আলেয়া' উপন্যাসটিকে (মূল রচনা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) আড়াই ঘণ্টার নাটকে রূপান্তরিত করা সহজ কাজ নয়। পরিচালক সুহৃদ চট্টোপাধ্যায় নিজেই নাট্যরূপ দিয়েছেন। পরিচালনায় তিনি যতটা সার্থক, নাট্য রূপায়ণে ততটা নয়। এত বিস্তৃত, ব্যাপক, বহুমুখী ঘটনাপ্রবাহকে অল্প অবকাশে নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে সব চরিত্রের প্রতি সমান আলো ফেলতে পারেননি তিনি। ফলে, কিছু-কিছু উপাখ্যানের পরিণতি আকস্মিক ও আরোপিত মনে হতে বাধ্য। যেমন, পার্বতী ও অমিতের ঘনিষ্ঠতা। কাঞ্চন এবং রমেনের সম্পর্কও দুশাত স্পষ্ট হয়নি। একদম শেষে গিয়ে কালকে আলেয়ার সঙ্গে তুলনা করে উচ্চারিত সংলাপটিকেও কাঁচা লাগে। নামকরণের সার্থকতা এভাবে তুলে না ধরলেও চলত।

তবে নাট্যরূপে ফাঁক থাকলেও, উপস্থাপনায় ফাঁকি ছিল না। মহিলারাই সবচরিত্রের রূপকার এই নাটকে। দর্শকের কাছে এটা যেমন ঝলমলে আকর্ষণ, পরিচালকের কাছে তেমনই দুরূহ পরীক্ষা। সে-দিক থেকে তিনি অনেকটাই সার্থক। অনেককে দিয়েই অপ্রত্যাশিত কাজ আদায় করে নিতে পেরেছেন। বিশেষত, মন্দিরা সিনহার অমিত ধারা রায়ের ধীরাপদ, গীতা মুখোপাধ্যায়ের হিমাংশু, কনক মালীর গনু বেশ সপ্রতিভ চরিত্রায়ণ। অল্প অবকাশে ছাপ রেখে যান শোভনা দে এবং রমা দাশগুপ্তা। নূপুর সাহার 'লাবণ্য' আরেকটু স্বচ্ছন্দ হতে পারত। তবে অভিনেত্রী হিসেবে সব থেকে সফল 'সোনাবৌদি'র চরিত্রে মঞ্জুশ্রী বসু। তাঁর দাপট এবং দক্ষতা বিস্ময়কর ও অভিব্যক্তি নিখুঁত, নিশ্ছিদ্র। চরিত্রের সঙ্গে একেবারে একাত্ম তিনি।

সেট সুন্দর। আবহ সর্বত্র ঘটনা-অনুসারী নয়। অভিব্যক্তির সঙ্গে কয়েকক্ষেত্রে তাল রাখতেও সমর্থ হয়নি। আগুপিছু হয়ে বেজেছে। রূপসজ্জা এবং আলোকসম্পাত যথাযথ। স্মারক দু-জন যে নেপথ্যে ছিলেন, মঞ্চের জোরালো মাইকের কল্যাণে তা মাঝে মাঝেই ধরা যাচ্ছিল।

তিনটি একাংক

সদ্যোতন নাট্যগোষ্ঠী 'অয়ন্তিকা' তাদের আবির্ভাব সূচিত করলেন বিগত ৪ জুলাই, রয়েজ ওন মঞ্চে। তিনটি একাংক পরিবেশিত হল। 'ওদের যীশু' (রচনা / নির্দেশনা অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়), 'মাছি' এবং 'এখন নাটকে'। শেষ দুটির নাট্যকার-নির্দেশক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ওদের যীশু'র পটভূমি এই দশকের প্রথমার্ধ। তৎকালিক যুবমানস ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন নাট্যকার। 'মাছি'র মধ্য দিয়ে সামাজিক অবক্ষয় এবং 'এখন' নাটকে ব্যবসায়িক মনোভঙ্গির সংগে আদর্শবাদী থিয়েটারের সংঘাত চিত্রিত করতে চেয়েছেন অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের উদ্দেশ্য সাধু, এতে সংশয় নেই। কিন্তু রচনা কাঁচা এবং অপরিচ্ছন্ন। কিছু বদহজমও ঘটে গেছেই কষ্টকল্পনা ও চিন্তার স্থূলতা চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দিয়েছে নাটকের সামগ্রিক আবেদনকে। যেমন 'কুনাল'কে যীশুরূপে চিহ্নিত করা। মূল কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মেশেনি এই কষ্টকল্পিত ব্যঞ্জনা। মাছিতে দেশলাইকাঠি ও সিগারেটের বিদ্রোহ আকস্মিক, ফলে আরোপিত মনে হতে বাধ্য। 'এখন নাটকে'র বক্তব্য জরুরী, কিন্তু বিষম জট-পাকানো ও স্থূলভাবে হাজির করা হয়েছে নাটকটিকে। অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি দুর্বলতা, নাটকের গতিকে রুদ্ধ করে কথায়-কথায় সুকান্তর কবিতা আওড়ানো। এমন কি, একই পঙ্‌ক্তি দু-নাটকেই ব্যবহার করেছেন তিনি।

সংলাপ দুর্বল। ততোধিক দুর্বল সংলাপ উচ্চারণ। স-এর দোষ অনেকেরই জিহ্বায়। কেউ-কেউ একই সংলাপ বারবার বলে গেছেন, কেউ প্রয়োজনীয় সংলাপও না বলে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। মহলার অভাব চাপা থাকেনি।

প্রয়োগগত ক্ষেত্রে কিছু কাজ ভাল লেগেছে। নিশ্চল অভিব্যক্তি, কিছু কম্পোজিশন, কিছু ব্যঞ্জনাধর্মী অঙ্গ সঞ্চালন সার্থকভাবে প্রযুক্ত। সামগ্রিকভাবে অভিনয়ের মান বড়ো-মাপের নয়। দু-একজন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ, কিন্তু সহ-অভিনেতার দুর্বলতায় তাঁরা ঢেকে গেছেন। সেট সুন্দর। আলোর কাজ যথাযথ।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

উজ্জ্বল উদ্ধার

আমার সেদিন হিংসে হচ্ছিল। যদি চল্লিশের পর থেকে বয়েসটাকে আবার ঘুরিয়ে কমিয়ে নিয়ে পাঠভবনে যেতে পারতাম। রবীন্দ্র সদনে হ য ব র ল দেখে আমার এই উপলব্ধি। প্রতিটি চরিত্র শুধু হুল্লোড় করেনি, আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে হ য ব র ল রাজ্যে। ক্ষণে ক্ষণে চমক আর হিজ বিজ বিজ যখন হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, তখন সুকুমার রায় আরও একবার মনে করিয়ে দেন এই দেশের ছেলে-মেয়েদের কাছে তিনি কতখানি অমূল্য। আর নেড়ার প্রতিটি চলন-বলন স্তম্ভিত করার মতন। অনেক পরম-পাকা শিল্পীও হয়তো এবার লজ্জা পাবেন, একটা তেড়া-ব্যাঁকা আয়নায় অনেকে যেমন নিজের ভাঙাচোরা চেহারাটা দেখে লজ্জা পান। আর তার গান 'মিশিমাখা শিখি-পাখা'—সে তো নির্দয় শিক্ষা। বলতে ভুলে গেছি, এই প্রযোজনায় আবহ খুবই কার্যকর হয়েছে—এই সব ছোটদের সহজ খেলার সংগে বড়দের বুদ্ধি যেখানে মিশেছে, সেখানেই ছন্দপতন—যেমন দীর্ঘ সময় ধরে কায়দা করে 'কার্টেন কল' দেখানো।

'হ য ব র ল'র সঙ্গে কাল-মৃগয়া। প্রায় সকলেই গান গেয়ে অভিনয় করেছেন, যেটা এখন অভাবনীয়। অনেকে ভাল কোরিওগ্রাফী সত্ত্বেও বনদেবীদের কিছু কিছু নাচে সাম্প্রতিক যথাবিহিত নৃত্যরুচি। কিন্তু সঙ্গীতাংশে এবং অভিনয়ে প্রায় সকলেই দক্ষ, একমাত্র দশরথ কিছুটা আড়ষ্ট। কিন্তু অন্ধমুনির ভূমিকাভিনেতা তাঁর অসাধারণ গানে অনেকের চোখ ঝাপসা করেছেন। হ য ব র লর মত উদ্দাম হাসির পর এই দুরূহ গান গেয়ে, যে শিল্পী ঋতু বদল ঘটাতে পারেন, তাঁর সম্ভাবনা অনস্বীকার্য।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

চার্ণক-এর দু'টি নাটক

'অকর্মণ্য সংস্থার (চার্ণক) অপদার্থ প্রযোজনা!' মন্তব্যটা আমার নয়, বয়স্ক এক দর্শকের। নাটক দেখতে

শ্মশানে শবের খেলা

এসে যথেষ্ট রুষ্ট না হলে এমন নির্দয় মন্তব্য তিনি নিশ্চয়ই করতেন না। আসলে, নাটক যেমন অভিনয়কে কোনো সাহায্য করেনি, অভিনয়ও তেমনি নাটকের প্রতি কোনো রকম দায় বোধ করেনি। কান্ডটি ঘটল গত সাতাশ জুলাই'য়র মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে। ক্ষমতার তুলনায় আস্ফালনটা খুব বেশী হয়ে গেল যে কোনো প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত হাসির খোরাক যোগায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। 'শ্মশানে শবের খেলা' ও 'রাম-সীতার গপ্পো' দুটি নাটকেরই রচয়িতা ও পরিচালক বিকাশ জানা। পরিণতির অনেক আগেই তিনি প্রচারে নেমে পড়েছেন। ঠিক করেননি। দুটি নাটকেরই সংলাপ যেমন দুর্বল, বিন্যাস যেমন শ্লথ তেমনি নির্দেশনাও যথেষ্ট অশিক্ষিত, অশোভন। বুদ্ধি ও চিন্তার উপস্থিতি ভীষণ ভাবে কম। ফলে যাবতীয় বিপত্তি। নেই নেই করেও কিছু সম্ভাবনা ছিল প্রথম নাটকটিতেই, এবং সেটা বক্তব্যের দিক থেকে। আত্মকেন্দ্রিকতা প্রকট হলে যূথবদ্ধতায় চিড় ধরে, আর তখন বিচ্ছিন্নতাই উপযাচক হয়ে ডেকে আনে সর্বনাশ—'শ্মশানে শবের খেলা' নাটকটির বক্তব্য বিষয় এই। কিন্তু নাটকটির উপস্থাপনা আগাগোড়া শ্মশান হয়েই থাকে। মঞ্চের খুব কাছাকাছি বসে থাকা দর্শকও কুশীলবদের সংলাপ শুনতে পান না। প্রেক্ষাগৃহে 'আওয়াজ' ওঠে—'জোরে জোরে'। অভিনয়ের পরিস্থিতি ও পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যায়। একে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা নাট্যকার বা অভিনয় শিল্পী কারোরই ছিল না। আসলে সংলাপের যে টান, অভিনয় ও নির্দেশনার যে ন্যূনতম মান একটি নাটক সম্পর্কে দর্শককে আগ্রহান্বিত করে তোলে আলোচ্য ক্ষেত্রে তা স্পর্ধাস্বরূপ অনুপস্থিত।

চারমূর্তি

সাহিত্যের জননী গর্ভবতী হলেই তার ভ্রূণ প্রাপ্তবয়স্ক প্রেমের পদ্য লেখে! চলচ্চিত্র বা মঞ্চাপিতার সন্তানসন্ততিদের অবস্থাও তথৈবচ। অর্থাৎ, সবদিক থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনের জন্য যেখানকার আবহাওয়া প্রায় মুখিয়ে থাকে, সেখানে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য কিছু করতে চাওয়াটাও অনেকের মতে পাগলামোর নামান্তর। তা এমন পাগলামো বিরল হলেও, কিছু না কিছু থাকে। এবং সেটাই স্বস্তির কথা, আনন্দেরও।

'আনন্দ থিয়েটারের' বর্তমান প্রযোজনা 'চারমূর্তি' দেখে ফিরে এসে এই আনন্দ-সংবাদটুকু দেওয়া তাই বাহুল্য নয়, জরুরী বোধ করলাম। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যাবাসে টেনিদার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান সর্বজন-বিদিত। নতুন ও পুরাতন কৈশোর তাতিয়ে দেওয়া এই দাদাটিকে কিছুকাল আগে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গেই চলচ্চিত্রে নিয়ে এসেছিলেন চিত্রপরিচালক উমানাথ ভট্টাচার্য, এই মর্যাদার ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে সম্প্রতি তাকে মঞ্চে নিয়ে এলেন তরুণ নাট্যকার ও নির্দেশক তপন গঙ্গোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রে টেনিদার ভূমিকায় চিন্ময় রায়ের অভিনয় সহসা ভুলে যাবার মত নয়। গল্পে পড়া টেনিদার মানস রূপটিকে তিনি তাঁর অব্যর্থ মুদ্রাভিনয়ে মূর্তিমান করে তুলেছিলেন। অনেকটা এই কারণেই বর্তমান প্রযোজনা দেখতে যাবার আগে মনে কিছু দ্বিধা ছিল, ভয় ছিল, পাছে চিন্ময়ের জনপ্রিয়তায় মঞ্চাভিনেতা আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু নাটকের সূচনাপর্বেই আশ্বস্ত হয়েছি, মঞ্চে টেনিদার চরিত্রে মনু সরকার স্বক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। এর জন্য অনেকটা গৌরব যিনি নিঃসন্দেহে দাবি করতে পারেন, বলা বাহুল্য তিনি নির্দেশক। তপনবাবুর সযত্ন প্রয়াসে নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যপরিকল্পনায় টেনিদার সঙ্গে অনবদ্য কতগুলো কমিক মুহূর্ত আমাদের উপহার দিয়েছে বাকি তিন মূর্তি প্যালা, হাবুল ও ক্যাবলা। তিনটি চরিত্রে যথাক্রমে অভিনয় করেন রতন বোস, অশোক গাঙ্গুলী ও চন্দন দাস। এই চারমূর্তি ছাড়া নাটকের অন্যান্য মূর্তিরাও কি কম যায় না। স্বপন চক্রবর্তীর ...জম্বর, গোপাল ব্যানার্জির ঝন্টুরাম, স্বপন রায়ের ঘুটঘুটানন্দ কিংবা সাত্তিক রায়ের শেঠজী একই সঙ্গে হাস্য-রহস্য-কৌতুকে প্রযোজনাকে জমজমাট করে দেয়। মেসোমশাইয়ের ভূমিকায় অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি যতটুকু অবকাশ পেয়েছেন, তাতেই আমোদ যোগান।

কিন্তু এই সামগ্রিক আমোদের

মধ্যেই কিছু কিছু বিরক্তির কারণ ঘটে গেছে। এই বিরক্তির মূলে রয়েছে আলোকসম্পাত, সংগীত প্রক্ষেপণ এবং লাউড-অ্যাকটিং। চিত্ত সরকারের আলোক পরিকল্পনায় যতটুকু চিন্তা রয়েছে, নিয়ন্ত্রণে ঠিক ততটা দায়িত্ব নেই। রাজেশ্বর ভট্টাচার্যের সুর নাটকের উপযুক্ত, কিন্তু গানের অনেক কথাই বোঝা যায়নি। ভূতুড়ে বাংলো ও ষড়যন্ত্রকারীদের আস্তানা তড়িৎ চৌধুরীর মঞ্চে চমৎকার। শচীন আঢ্যের রূপসজ্জাও বাহুল্যহীন।

রাণা দাস

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

কবি

অসিত চট্টোপাধ্যায় রাজপুত্র নন, কিন্তু সোনার কাঠির ছোঁওয়ায় তিনি আমাদের আধুনিক নৃত্যনাট্য সম্পর্কে সুপ্ত চেতনার ঘুম ভাঙিয়েছেন। সোনার কাঠিটি হল তারাশংকরের 'কবি'। এরকম সুষমিত প্রযোজনা কদাচিৎ দেখা যায়। রাজেশ্বর মিত্রের নৃত্যনাট্য-রূপে তারাশঙ্করের অমর কাহিনী প্রাণবন্ত হয়েছে। উপন্যাসের পর চলচ্চিত্ররূপও যেমন স্মরণীয় হয়ে আছে, সেখানে ভিন্ন মাধ্যমে নৃত্যনাট্যও বাংলা নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয় সংযোজন হয়ে রইল। এর জন্য দায়ী শুধু নৃত্যনাট্যরূপ নয়, প্রত্যেক শিল্পীর আন্তরিক প্রয়াস।

নৃত্যাংশে অসিত চট্টোপাধ্যায় (কবি), গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় (ঠাকুরঝি), পলি গুহ (বসন) সকলেই সবেদন কাহিনীর প্রতিমা হয়ে উঠেছেন; সব ভূমিকাই সুপরিকল্পিতভাবে কোনদিন এক লহমায় এইভাবে আমাদের কলকাতা থেকে বীরভূমে নিয়ে যেতে পারেনি। ঝুমুর দলের ছোটখাট ডিটেলস্, কবির আসর—সব জায়গাতেই সুবিন্যস্ত কম্পোজিশন অবাক করে দেওয়ার মত। ইদানীংকালের রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে সাধন গুহ অনেকবার লোককে কাঁদিয়েছেন নানা নায়কের ভূমিকায়, কিন্তু এই নৃত্যনাট্যে তিনি ঝুমুরের দলে ক্ষণেকের আবির্ভাবে লোককে হাসান, সেটাও মনে রাখার মত। এই নৃত্যনাট্য সেজন্যেই সার্থক—সার্থকতার চরিত্র সৃষ্টিতে।

গানে অংশগ্রহণ করেছেন অনেক শিল্পী, যাঁরা প্রত্যেকেই অশোক রায়ের নেতৃত্বে সম্পূর্ণভাবেই মাটির কাছাকাছি। অশোক রায়ের সুর এই নৃত্যনাট্যের ঐশ্বর্য। চলচ্চিত্রের যে গান বিখ্যাত হয়ে প্রায় ট্র্যাডিশনাল হয়ে আছে, তাকেও তিনি সম্পূর্ণ নতুন সুরেও নাড়া দিতে পারেন। প্রমাণিত হল, গানের পক্ষে কথা কতখানি জরুরী। গানে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কবির গান অনেককেই অবাক করবে এই ভেবে যে, এ হেন শিল্পী, আমাদের গানের জগতে অবহেলিত। 'কি বিচিত্র এই দেশ!' বনশ্রী সেনগুপ্তের 'ঠাকুরঝি' এবং আরতি মুখোপাধ্যায়ের 'বসন' শ্রোতাকে সম্মোহিত করে রাখে। এরই সংগে অশোক রায়, অংশুমান রায়, দীনেন্দ্র চৌধুরী, অমর রায়—প্রত্যেকেই এই প্রথম প্রমাণ করলেন সার্থক প্রযোজনার জন্য 'টিমওয়ার্ক' কতটা দায়ী।

অসিত চট্টোপাধ্যায় ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

'কবি' নৃত্যনাট্যে আলাদাভাবে নাচ ও গান ভাল হয়েছে বলেই স্মরণীয় প্রযোজনা নয়। আসলে প্রযোজনার পিছনে এমন শিল্পচিন্তা আছে, যা নৃত্যনাট্যে, দায়িত্ব নিয়েই বলা যায়—কখনও হয় না। নৃত্যনাট্যে পনেরোটি দৃশ্য এমনভাবেই সাজানো যে জোনাল অ্যাকটিং-এ সুচিন্তিতভাবে ভাগ করা। প্রথমার্ধে ঠাকুরঝির সঙ্গে নিতাই-এর অংশে দৃশ্যান্তর এবং সময়ান্তর বোঝানোর জন্য ট্রেনের আবহ, কৃষ্ণচূড়া গাছের তলা দিয়ে ঠাকুরঝি আসার সময় বারবার ব্যবহৃত সেতারের টুকরো, আবার বসনের সঙ্গে নিতাই-এর পর্যায়ে ঝুমুর গান—'ঝুমঝুমাঝুমে বাজে লো নাগরী' দিয়ে সময় বয়ে চলে—এ ধরনের প্রয়োগ নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে বিরল। এই শিল্প-দক্ষতা আরও প্রমাণিত হয় মাসীর ভূমিকায় সংগীতে বেলা অর্ণবের নির্বাচন। কণিষ্ক সেনের আলো কয়েকটি ক্ষেত্রে নাট্যমুহূর্ত রচনায় উদাহরণ হয়ে থাকবে। বিশেষত নিতাই, বসনের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে ঠাকুরঝির বাইরে থেকে দেখা, কিংবা শেষ দৃশ্যে বনশ্রী সেনগুপ্তের গাওয়া 'আমার মন মানেনা কবিয়াল'। শেষ পর্বে যখন গানের পর শুধু বাঁশিতে 'কবিয়াল' শব্দটি উচ্চারিত হয়, তখন শিশিরমঞ্চে শ্রোতাদের প্রত্যেকের উপলব্ধি 'জীবন এত ছোট কেন?'

দেবাশিস দাশগুপ্ত

পরিশোধ' এবং 'মেঘনাদ বধ-কাব্য'

'কথা ও কাহিনী' কাব্যের 'পরিশোধ' কবিতাটিকে সাইত্রিশ বছর পর নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নৃত্যনাট্য 'পরিশোধ'-এর দুটি অভিনয়ও হয়েছিল। এর দু বছর বাদে মঞ্চস্থ হল 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যের বহুলাংশে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ—নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'।

সুর সপ্তয়নের উদ্যোগে রবীন্দ্র-সদনে তিনদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে—বাইশ জুলাই সন্ধ্যায়—নিবেদিত হল এই তিন রূপের এক নতুন সমন্বয়। 'পরিশোধ' কবিতা, নৃত্যনাট্য 'পরিশোধ' এবং নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'র গান—এই তিনের মিলন ঘটিয়ে একটি আলেখ্য সংকলন করেছেন গৌরী ও পার্থ ঘোষ। নৃত্য পুরোপুরি বর্জিত। শুধু কবিতা এবং গান। অভিনবত্ব ছিল সন্দেহ নেই।

তবে 'শ্যামা'র সংহত নাটকীয় রস এই আলেখ্যে পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ ছিল কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। নতুনত্বের বাইরে এমন কী পাওয়া গেল যা 'শ্যামা'য় পাওয়া যায় না, এ প্রশ্নও গুঞ্জরিত হবার যোগ্য। এর সদুত্তর মেলা ভার। নাচ যেমন বর্জিত হয়েছে, তেমনই চক্ষুর তৃপ্তির অন্যতর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পিছনে সাইক্লোরামায় রাজপ্রাসাদ, কারাগার, ঘাটে-বাঁধা তরী প্রভৃতি দেখানোর চেষ্টা ছিল। কিন্তু বস্তুত এই দৃশ্যাবলী চোখকে তৃপ্তি দিয়েছে না দিয়েছে পীড়া—এ নিয়ে মতভেদের অবকাশ রয়েছে। সম্পূর্ণত শ্রবণ-নির্ভর রূপে এই আলেখ্যটি পরিবেশিত হলেই বরং ভাল, এ-কথা মনে হয়নি, এমন নয়।

তবে আরো কিছু সম্পাদনা প্রয়োজন। প্রয়োজন আরও গতিবেগ সঞ্চারিত করার। এটি অবশ্য প্রথম রজনী, তাই কিছু অপ্রস্তুত অবস্থা চোখে পড়েছে। উত্তীয়ের গান শুরু হয় যে-ভাবে, ফ্ল্যাশ ব্যাকে, তার আগেই উত্তীয়ের স্বল্পরেখ পরিচয় তুলে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। পরিশোধ বা শ্যামার কাহিনী যাঁর অজানা, উত্তীয়ের গানের মর্মবেদনা—এই ভূমিকার অনুপস্থিতিতে তাঁর কাছে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে কিনা, সন্দেহ জাগে। গানে সেদিন সব থেকে সার্থক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। উত্তীয়ের প্রণয় এবং বঞ্চনা স্বল্প অবকাশে যথার্থ নাটকীয়তায় তুলে ধরেছেন তিনি। কোটালরূপী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু মূল দুই চরিত্রে প্রার্থিত নাটক আনতে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং বনানী ঘোষ। এককভাবে তাঁদের কিছু কিছু গান নিঃসন্দেহে সুঠাম ভঙ্গীতে পরিবেশিত, কিন্তু নাটকীয় আবেদন ছিল না সেই পরিবেশনে। সহচরী ও পল্লীরমণীর ভূমিকায় একটি করে একক গান গেয়েছেন শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্য এবং জয়শ্রী দাশগুপ্ত। দুটি গানই সুগীত। পাঠ ও সংলাপে ছিলেন পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, মণিপদ্ম দত্ত ও সব্রুজ বিশ্বাস। এঁরা নিজেদের ভূমিকা খুবই যোগ্যতার সংগে পালন করেছেন। বিশেষত, 'আমি দয়াময়ী!' বলে শ্যামার উন্মত্ত উৎকট হাস্য শোক-শ্রুরাশিতে শতধাদীর্ণ হয়ে পড়ায় যে বর্ণনা পরিশোধ কবিতায় রয়েছে, গৌরী ঘোষ তাকে যেন পুরোপুরি জীবন্ত করে তুলেছিলেন তাঁর কণ্ঠে।

সুর সপ্তয়নের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে নিবেদিত হল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধকাব্য'। এটিও নতুন ধরনের প্রচেষ্টা। কেবল গ্রন্থনা ও পাঠাভিনয়-এর মধ্য দিয়ে এই অবিস্মরণীয় সৃষ্টির সংগে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সব মিলিয়ে অত্যন্তই সার্থক হয়েছে এই দুরূহ প্রয়াস।

পাঠাভিনয়ের মাধ্যমে 'মেঘনাদ বধকাব্য' পরিবেশন করার পরিকল্পনা যাঁর, দুঃখের বিষয়, তিনি আজ প্রয়াত। এই অনুষ্ঠানটি এর আগেও নিবেদিত হয়েছিল রবীন্দ্র সদনে। প্রয়াত আবৃত্তিকার কল্যাণ রায় ছিলেন এর পরিকল্পক এবং নির্দেশক। তিনি অভিনয় করেছিলেন রাবণের চরিত্রে। আর-এক প্রয়াত আবৃত্তিকার কাজী সব্যসাচীও এবার অনুপস্থিত। তিনি পূর্ববর্তী প্রযোজনায় ছিলেন সূত্রধর-এর ভূমিকায়। এবারের প্রযোজনায় তাই বেশ কিছু রদবদল ঘটেছে। দায়িত্বভার পাল্টেছে আবহ সংগীতের ক্ষেত্রেও। এবারের আবহসংগীত পরিকল্পনা দেবাশিস দাশগুপ্তের। বর্তমান প্রযোজনাটিকে তাই নতুনই বলা চলে, সর্বাংশে না হোক, বহুলাংশে।

পাঠাভিনয়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ে নীলাদ্রিশেখর বসুর নাম। তিনি ছিলেন বিভীষণ চরিত্রে। অমিত্রাক্ষরের অন্তর্লীন সঙ্গীতব্যঞ্জনা তাঁর কণ্ঠের পৌরুষময় লাবণ্যের ঝংকারে বিশিষ্ট একটি মাত্রায় ধরা পড়েছিল। বিশেষত, মেঘনাদের মৃত্যুর পর বিভীষণের সজলাক্ষ বিলাপ নীলাদ্রিশেখর বসুর কণ্ঠে এমন এক জীবন্ত আন্তরিকতায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল যে, শ্রোতৃমন্ডলীর চক্ষুও আপ্লুত হয়ে যায়। প্রদীপ ঘোষের ভূমিকা এবার সূত্রধরের। শান্ত, সংযত, সুনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থনার টান বজায় রেখেছেন তিনি। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাবণ প্রথমার্ধে যতটা প্রাণবন্ত, শেষ পর্বে ততটা নয়। অথচ তাঁরই সুযোগ ছিল সব থেকে বেশী। অমিতাভ বাগচীর কণ্ঠে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব প্রচ্ছন্ন থাকেনি। তাঁর 'হনুমান'—এ সত্ত্বেও—বিশিষ্ট চরিত্রায়ণ। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্দ্রজিৎ, পার্থ ঘোষের লক্ষ্মণ এবং মুরারি চক্রবর্তীর ইন্দ্র স্মরণীয় উপহার। শুধু রাম-এর চরিত্রে প্রদীপ মুখোপাধ্যায়কে অত্যন্ত নিষ্প্রভ লেগেছে। তাঁর পাঠে কাব্য-সৌন্দর্য বা নাটকীয় রস কিছুই সেভাবে ফুটল না।

প্রমীলা চরিত্রে গৌরী ঘোষ দ্বৈধরূপ ফোটাতে চেয়েছেন। প্রথমার্ধে তিনি স্বামী-সোহাগিনী, দ্বিতীয়ার্ধে তেজস্বিনী। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বেই তিনি বেশী সার্থক। শুভ্রা বসুর সীতা, প্রণতি মিত্র মুস্তাফির সরমা এবং তুলসী রায়ের লক্ষ্মী বিশেষ সফল এবং সাবলীল চরিত্রায়ণ। সমবেত আবৃত্তির পরিকল্পনা সুন্দর। আবৃত্তিও চমৎকার।

কনিষ্ক সেনের আলো এই অনুষ্ঠানে কোনো নতুন মাত্রা যোজনা করতে পারেনি। দেবাশিস দাশগুপ্তের আবহ-বহুক্ষেত্রেই সার্থকভাবে প্রযুক্ত। বিশেষত, জলতরঙ্গের ব্যবহার এবং শঙ্খধ্বনির প্রয়োগ মনে ছাপ ফেলে যায়। কিন্তু কয়েক ক্ষেত্রে উচ্চকিত ও অতিরিক্ত মাত্রায় প্রযুক্ত আবহ কানে লাগে। বিশেষভাবে মনে পড়ছে, বিভীষণের বিলাপোক্তির শেষে চড়া সুরের বেহালা প্রায় যাত্রাসুলভ করে তুলেছিল উত্তুঙ্গ বিষাদগম্ভীর পরিবেশকে।

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মঞ্চ-সজ্জায় ন্যূনতম উপকরণ, কিন্তু ব্যঞ্জনার মূল্যে তা অসামান্য।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

প্রকাশ কর্মকার (১৯৩৩—)

প্রকাশ কর্মকার বিখ্যাত চিত্রকর প্রহ্লাদ কর্মকারের ছেলে। প্রকাশ নিজে খুব অল্প বয়স থেকে বহু কিংবদন্তীর নায়ক। সেদিক থেকে খ্যাতি প্রহ্লাদবাবুরও কম ছিল না। ছাত্রবৎসল এই গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষক কলকাতায় এসেছিলেন ময়মনসিংহ থেকে সঙ্গীতশিল্পী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাত ধরে। প্রহ্লাদবাবুর বাবার কৌলিক পেশা ছিল স্বর্ণালংকার তৈরি করা। ন' বছর বয়সের প্রহ্লাদবাবুর ডিজাইন দেখে মুগ্ধ বীরেন্দ্রকিশোর তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন। সেকরার ছেলে হলেন আর্ট স্কুলের শিক্ষক। খুললেন নিজের স্টুডিও। বাঘা বাঘা ছাত্রদের কাছ থেকে মাসিক পাঁচ টাকা নিয়ে নগ্নিকা নারী পর্যবেক্ষণ এবং অনুশীলন করাতেন। মাটির বাড়ি, কিন্তু উত্তরে আলোর পাকা বন্দোবস্ত। মাখন দত্তগুপ্ত, রথীন মৈত্র, জ্যোতিষ ভট্টাচার্য, বিমল দাশগুপ্ত, অর্ধেন্দু দত্ত সেকালের অনেক ছাত্র প্রহ্লাদবাবুর গল্প বলেন। প্রকাশ তখন বালক। কাজ ছিল স্টুডিওর দেওয়াল আর মেজেতে গোবর-ছড়া দেওয়া। প্রকাশ বাবার কাছে মাত্র একদিন কাজ শিখেছিলেন। যুদ্ধের বাজারে রেশনে লাইন দিয়ে তাঁর সময় কাটে। প্রহ্লাদবাবু স্ত্রীর গঞ্জনায় একদিন বসলেন ছেলেকে চিত্র-শিক্ষা দিতে। বড় বড় টিনের ওপর বসে প্রহ্লাদবাবু গরু এঁকে তার অ্যানাটমি বোঝালেন। সেই শেষ। কিছু দিনের মধ্যে জিবের কর্কট রোগে মারা গেলেন। বোনেদের হাত ধরে আত্মীয়স্বজনের ষড়যন্ত্রে বাস্তুচ্যুত প্রকাশ উঠলেন এক বস্তিতে। **১৯৫১-৫২** সালে সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। কিন্তু পেটের জ্বালায় রঙরুট হয়ে মিলিটারী হলেন। '৫৩-তে প্রথম প্রদর্শনী। **১৯৫৯**-এ সদর স্ট্রীটের ফুটপাতে তাঁর প্রদর্শনী তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দিল। **১৯৬৬** সালে ললিতকলা আকাদমির জাতীয় পুরস্কার। সেই বছরে ফরাসী সরকারের আমন্ত্রণক্রমে ফ্রান্স গেলেন। পশ্চিম ইউরোপ ঘুরলেন। দেখলেন। প্রদর্শনী করলেন।

প্রকাশ কর্মকার এখন নৈনীতে থাকেন। কিন্তু কলকাতায় যতদিন ছিলেন ততদিন তাঁর কাজ এবং শিল্পিজনোচিত আচরণ তাঁকে বার-বার করেছে কিংবদন্তীর নায়ক। নীরদ মজুমদার প্রকাশের ইদানীংকার কাজের সমর্থক নন। তবুও তাঁর মতে, প্রকাশ তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। নিঃসন্দেহে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। সোসাইটী অব কণ্টেম্পোরারী আর্টিস্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ক্যালকাটা পেন্টা-রসের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। মার্কেট স্কোয়ারের শিল্পমেলার পরিকল্পনা তাঁর। দারুণ ছবি এঁকে তাসা পার্টি

পারে? শিল্পমেলায় ছবি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কে আর বলতে পারেন, "ছবির সঙ্গে সহবাস করতে পারেন? ছবি কিনুন!" অসংখ্য একক এবং যৌথ প্রদর্শনী করেছেন। নয়াদিল্লি ট্রিয়ানাল, সাওপাওলো বিয়ানাল, "টোয়েণ্টী ফাইভ ইয়ারস অব ইণ্ডিয়ান আর্ট" এ তাঁর ছবি প্রদর্শিত।

প্রকাশের ফুটপাতের প্রদর্শনী, বঙ্গসংস্কৃতির গোড়ার দিকে শিল্পকলার স্টলের ছবি একরকম ছিল। তারপর নীরদ মজুমদার যখন প্যারী থেকে ফিরলেন, তখন বিজন চৌধুরীর সঙ্গে তিনি মজুমদারের ছাত্র হলেন। এই শিক্ষানবীশী দুজনেরই খুবই কাজে লেগেছে। সমকালীন ছবির রূপরীতি, প্রতিমাভঙ্গী সম্বন্ধে হাতে তুলিতে কাজ শিখলেন। এবার প্রাসঙ্গিক চিত্রকল্প সম্বন্ধে, রূপবন্ধ বিষয় ভাবনা। যুদ্ধ দাঙ্গা স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের জটিল রাজ-নৈতিক ডামাডোল, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মূল্যবোধের বিপর্যয় সম্বন্ধে পুরাণকল্পের রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। করণ-কৌশলে, অঙ্কনে, বর্ণিকাভঙ্গে, চিত্রের কাঠামো সম্বন্ধে নতুন ভাবনা। বুকের রক্ত নিঙড়ে আঁকলেন। যন্ত্রণা আর অবক্ষয়ের ছবি। কিন্তু কোথায় যেন আশা আছে। এইসব মানুষ পরাজয় মানে না, ভাঙে না। প্রকাশের বক্তব্যের তীক্ষ্ম আর্তির সঙ্গে যোগ হয়েছে শিল্পীর অদম্য শক্তি। প্রকাশ নিজে যেমন তেমনি তাঁর ছবির মানুষজন প্রতিবন্ধক-পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে বটে, তবুও উঠে দাঁড়ায়।

প্রচ্ছদের ছবি বিরাট তৈলচিত্র (৬'×৪') মানবপুত্রকে ক্রুশ থেকে নামানোর দৃশ্য বর্ণিত। যীশু নিজে এখানে বুলেটবিদ্ধ— শিষ্যরাও। যন্ত্রণার শেষ সীমায় মৃত্যু তবুও মনুষ্যত্ব বর্জিত নয়। লাল ধূসর আর হলুদ এখানে প্রধান বর্ণ—আর রয়েছে নিষ্কলুষ সাদা—গভীরতর প্রতীতীর এষণা রূপে। খ্রীষ্ট এখানে মানব-পুত্র—যেন সকল মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়, অবিচার, যন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। দর্শকও ক্রমশ এই যন্ত্রণার মধ্যে একাত্ম হয়ে নিজের বিশ্বরূপ দেখছে। সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ছবির মানবপুত্র অংশটি আলাদা করে দেখানো হলেও পুরো

যে সমস্ত মায়েরা আরও বেশী সাবধানী হতে চান তাঁদের জন্য বেশী কার্যকরী অ্যান্টিসেপ্টিক
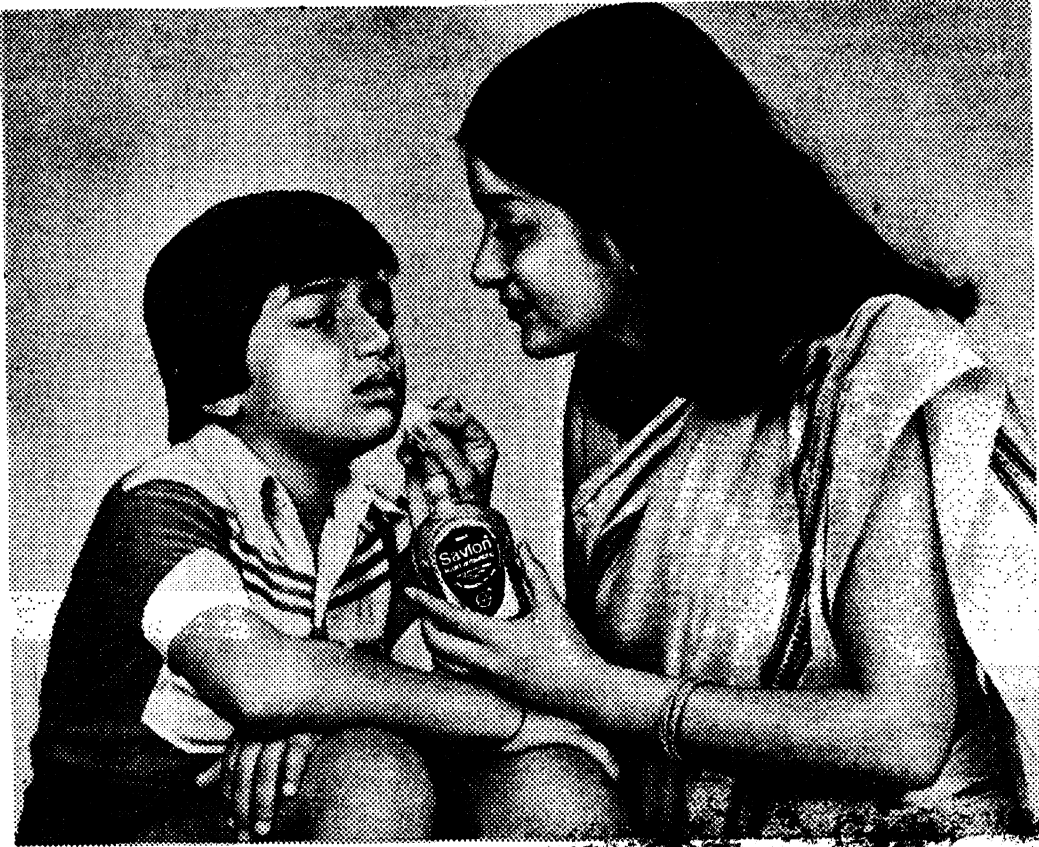
বেশী জীবাণু নাশ করে—বেশী ধরনের জীবাণু বেশী কার্যকরীভাবে।

আপনার বাচ্চার যখন কেটে, পুড়ে বা ছড়ে যায়, তখন তার সুরক্ষার জন্যে দরকার আজকের দিনের সেরা কার্যকরী অ্যান্টিসেপ্টিক স্যাভলন।

কারণ স্যাভলন এমন ধরনের জীবাণু নাশ করে যা অন্যান্যরা ছুঁতেই পারে না। এটি অত্যন্ত বিপদজনক ধরনের গ্রাম-পজিটিভ জীবাণু নাশ করে এবং এমনকি গ্রাম-নেগেটিভ জীবাণুও প্রতিরোধ করে।

সেরা অ্যান্টিসেপ্টিক লাগাতে চান তো স্যাভলন লাগান। কোমল, উপশমকারী এবং শক্তিশালী অ্যান্টিসেপ্টিক—স্যাভলন।

Savlon
liquid antiseptic

CAS ACCI I BEN 79

আজকের দিনের আধুনিকতম সেরা অ্যান্টিসেপ্টিক

দেশ

এখন আপনি ওর দাঁত যন্ত্রণাদায়ক
ছিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন

কিনুন সিগন্যাল 2
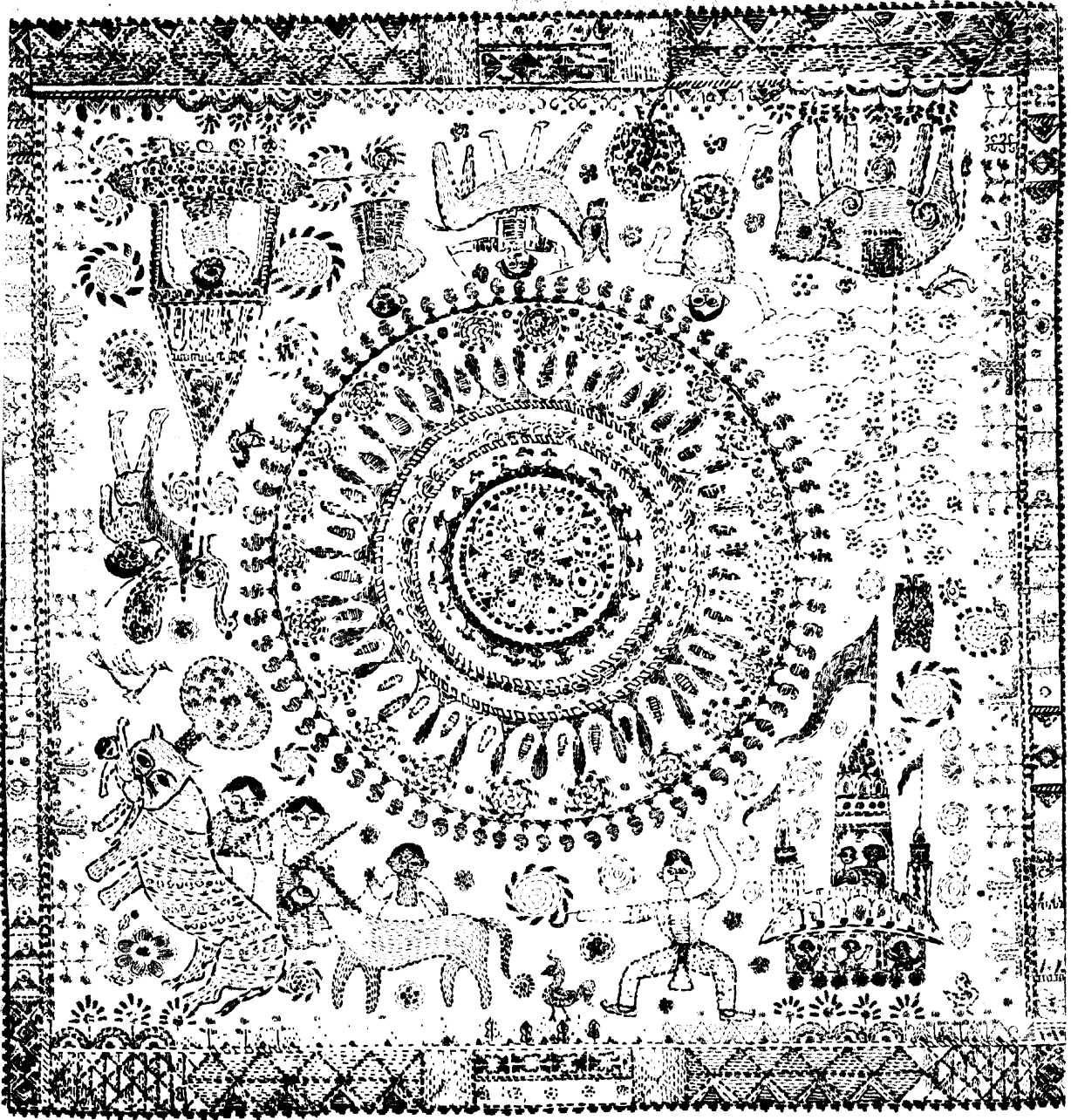
**এতে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্মুলা
যা দাঁত মজবুত ক'রে দন্তক্ষয় রোধ করে**

দাঁতের ব্যথা শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়—এ দন্তক্ষয়েরও লক্ষণ। অবহেলা করলে ক্ষয় আরও গভীর হবে, পরিণামে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত্তের সৃষ্টি হবে।
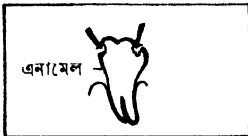
সাধারণ টুথপেস্ট গুলো এসিড রোধ করতে পারেনা, যে-এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করে।
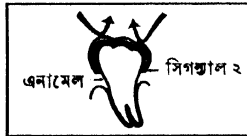
সিগন্যাল 2-তে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্মুলা যা মুখের এসিডকে দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করতে বাধা দেয়।

দন্তছিদ্র রোধ করে

বেশী দেরী হয়ে যাবার আগে এখনই পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করুন যা দন্তক্ষয় রোধ করে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, আর তা হোল —সিগন্যাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইড ফর্মুলা দাঁতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এসিডকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে—আর দাঁতে গর্ত্ত সৃষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল ফল দেয়না।

শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন না। আপনার দাঁতের ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন।

পরিবারের সবার দাঁতে
ছিদ্র রোধ করে।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SG2.1-2416 BG

Interpub/AM/5/79-BN.

রিটেল বিক্রেতা : কলিকাতা : গঙ্গাদিন গুপ্তা, ৩২ নিউ মার্কেট ● সুনিট, এফ-২৯/৩৮ নিউ মার্কেট ● রাঁচী : মধুকুঞ্জ, মেন বাজার, বেগুসরাই ● পাটনা : চন্দুলাল দুর্গাপ্রসাদ, বাঁকীপুর ● সেলস রিপ্রেসেনটেটিভস ● আগ্রা : অরোরা টেকসটাইল ট্রেডিং করপোরেশন, ৪২/১৬৪ বিলোচপুর, মোতিকুঞ্জ রোড ● কানপুর : গনেশপ্রসাদ হীরালাল, ৪৯/২৬ জেনোরল গঞ্জ ● কলিকাতা : গিরধরীলাল রামনারায়ন, পি/১০ নিউ হাওরা ব্রীজ, এ্যাপ্রোচ রোড। আসাম : জয়শ্রী টেকসটাইলস, অশোক ভবন, এস আর সি বী রোড, গোহাটি ● ওড়িষ্যা : আগরওয়াল টেকসটাইল এজেন্ট, জৌনলিয়াপট্টি, কটক।

চিঠিপত্র

পৌরাণিক মনে স্ত্রীবিদ্বেষ

শ্রীঅশোক রুদ্রের 'পৌরাণিক মনে স্ত্রীবিদ্বেষ' (দেশ, ৩০শে জুন ১৯৭১) প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

প্রথমত, সাহিত্য-শিল্প ইত্যাদি সৃজনশীলতার দিক থেকে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে কোনো দুই বিশিষ্ট কবির মতামতের প্রসঙ্গটিকে ভূমিকা করে লেখক প্রাচীন হিন্দু ভাবধারায় স্ত্রীবিদ্বেষের অনুসন্ধান করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টিশীল কর্মে নারীর ভূমিকাকে গৌণ করে দেখার সঙ্গে পৌরাণিক স্ত্রীবিদ্বেষের সামঞ্জস্য সন্ধান, যা আদৌ যথোচিত নয়। যে বিষয় আজো আমাদের কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারেনি, সে সম্পর্কে কেউ কোন মতামত প্রকাশ করলে তা বিদ্বেষপ্রসূত হবে কোন্ যুক্তিতে? গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের কথা আমরা জানি, তাঁর সেই বিখ্যাত 'রিপাবলিক' গ্রন্থটিতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে পুরুষের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা নারীর চেয়ে বেশী এবং নারীর নিজের 'ওয়েল-বিয়িং'-এর কারণেই একজন পুরুষকে প্রয়োজন। আবার যখন তিনি Laws লিখছেন, তখন এই ধারণা তাঁর মধ্যে স্পষ্ট যে, নানা কারণে সমাজ পুরুষ-শাসিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নারী সম্পর্কে প্লেটোর ধারণায় যে শেষ অবধি নারীর প্রজননক্ষমতার বেশী কিছু গৃহীত হয় নি, তা উদাহৃত হতে পারে Timaeus থেকে, যেখানে তিনি বলেছেন:

'The womb is an animal which longs to generate children. When it remains barren too long after puberay, it is distressed and sorely disturbed..'

প্লেটোর ধারণায় কিছু স্ববিরোধিতা লক্ষ করা গেলেও তাঁর সুশিষ্য অ্যারিস্টোটলের স্থির বিশ্বাস ছিল যে বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিকবৃত্তি দুদিক থেকেই পুরুষের স্থান রমণীর ওপরে; পুরুষের প্রাধান্য প্রকৃতির বিধান এবং সমতার নীতি মেনে তাকে খর্ব করলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই ক্ষতি হতে পারে। আধুনিক সময়েও ফ্রয়েড নারীকে 'অসম্পূর্ণ পুরুষ' বলে মনে করেছেন, সেকারণে তাঁর ধারণা, পুরুষের জগতে যে-কোন প্রতিযোগিতাতেই নারীর অসামর্থ্য প্রকাশ পাবে। নারী প্রতিভার প্রতি এই সব সন্দিগ্ধতাকে কোনভাবেই অশোকবাবুর মতো ইতিহাসবোধহীন যুক্তিহীন অলপনের নারীবিদ্বেষ' বলা যাবে না। ভারতে নারীবিদূষীদের কথা বলতে গিয়ে উপনিষদের যুগের করেকজনের নাম প্রায়শই উচ্চারিত হয়। কিন্তু যে সমাজে শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল, নারীর সামাজিক অধিকার ছিল স্বীকৃত এবং যে-কোন সামাজিক ব্যাপারে অংশগ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, সে অনুপাতে তাঁরা তৎকালীন শিক্ষিত নারীসমাজেরই বা কত অংশ? পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক নারী-শাসক ও খ্যাতনামা রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ'দের অনেকেই কৃতিত্বের অধিকারী, কিন্তু এই কৃতিত্ব যতখানি না নারী হিসেবে তার অনেক বেশী পুরুষতা বা 'ম্যানলিনেস'-এর অধিকারী হিসেবে। রানী এলিজাবেথের শাসন কৃতিত্ব কম নয়, কিন্তু একই কারণে তাঁকেও চিরকুমারীত্ব বরণ করতে হয়েছে। ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়, যখন দেখি তাঁর আমলে কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মেয়েদের সামাজিক অবস্থান আইনগতভাবে একটুও উন্নত হয়নি। বাইজানটাইন সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরার খ্যাতি যতখানি না সম্রাজ্ঞী হিসেবে, তারো বেশী তাঁর যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে। এলিনর অফ অ্যাকুইটেন, হ্যাৎসেপসুট, ক্লিওপেট্রা, ক্যাথারিন দ্য গ্রেট, লুক্রেজিয়া—এভাবে তালিকা দীর্ঘ হতে পারে। তবে একথা মেনে নিতে বাধা হবে না যে, পুরুষের গর্ভধারণ ক্ষমতা নেই বললে যেমন তাকে অসম্মান করা হয় না, সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মে নারীর পারদর্শিতা পুরুষের চেয়ে কম, একথা বললে তেমনি নারীকে নিশ্চয় অসম্মান করা হবে না।

দ্বিতীয়ত, 'নারীজাতি সম্বন্ধে যে সীমাহীন ঘৃণা আমাদের দেশের সমাজশাসক পুরুষেরা পোষণ করতেন এবং যে ঘৃণাকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে নারী সম্পর্কিত সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তার তুলনা অন্য কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না'—অশোকবাবুর এ ধারণাও ভ্রান্ত। এই দেশের প্রাচীন সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নারীদের সম্বন্ধে যে মনোভাবের কথা বলা হয়েছে, তা যে-কোন প্রাচীন সমাজের মানুষের ধারণারই অনুরূপ। বুদ্ধি-বিদ্যায় উন্নত খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের গ্রীসেও নারীদের স্থান উন্নত ছিল না। 'ইলিয়াডে' নারীর প্রসঙ্গ নেই, আছে 'ওডিসি'তে। ইউলিসিস ট্রয়ের যুদ্ধের পর আরো দশ বছর এমন সব রমণীদের সঙ্গে কাটাচ্ছেন, যারা তাকে বারবার তাঁর স্ত্রীর কাছে যাওয়া থেকে বিরত করছে। ওদিকে হেসিয়ড শুনিয়েছেন প্যাণ্ডোরার কাহিনী, যে শুধুমাত্র মেয়েলী কৌতূহলবশে দেবতাদের কাছ থেকে পাওয়া বাক্সটিকে নিষেধ না শুনে খুলে মানুষের দুর্দশাকে আহ্বান করেছে; আর সবশেষে তাই হেসিয়ডের উপদেশ—man who trusts womankind trusts deceivers. প্রাচীন রোমেরও জগৎ ছিল পুরুষের, আর নারীকে সেখানে মাতা, স্ত্রী ও কন্যার ভূমিকাতেই দেখা হয়েছে। খ্রীস্টপূর্ব দু শতকে জুভেনাল মেয়েদের কম খাটো করেন নি:

'Never will you find a woman who spare the man who loves her; for although she be herself aflame, she delights to torment and plunder him'

জুভেনালের গোটা ষষ্ঠ স্যাটায়ারটিতে

দেওয়া হয়েছে নারীর নানা দোষের ফিরিস্তি। তাঁরই কালে ওভিড 'আর্ট অব লাভ'-এ প্রেমের সৌন্দর্য ও তার আকর্ষণ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু 'রেমিডিজ অব লাভ'-এ পথ খুঁজছেন কিভাবে নারীর সেই আকর্ষণ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তাঁর মতে, নারীরা আকর্ষণের হতে পারে, কিন্তু তারা বোকা লোভী, তাদের কামনার পরিসীমা নেই। মেসোপটেমীয় মহাকাব্য গিলগামেসের কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে, গিলগামেসের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে মানুষ দেবতাদের স্মরণ নিলে দেবতারা প্রতিদ্বন্দ্বী করে পাঠালেন এনকিদুকে। কিন্তু তার সঙ্গে ক্ষমতায় পেরে উঠবে না জেনে গিলগামেস সাহায্য নিলো নারীর, যার সংস্পর্শে এসে দেবতা-সৃষ্ট এনকিদু তার সব শক্তি হারিয়ে ফেললো; অর্থাৎ কাহিনীটিতে নারীকে পুরুষের ক্ষমতাহরণকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর একটি কাহিনী থেকে প্রভু ও তার ক্রীতদাসের কথোপকথন উদ্ধৃত করছি :

"No slave, I will by no means love a woman". "Do not love, Sir, do not love. Woman is a pitfall—a pitfall, a hole, a ditch; women is a sharp iron dagger that cuts a man's throat."

তৃতীয়ত, অশোকবাবু উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, 'গো, সুবর্ণ যে স্তরের বস্তু রমণীগণকেও ঠিক সেই স্তরের বস্তু হিসাবে দেখানো হয়েছে', কিন্তু তিনি কোন কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন নি। এঙ্গেলস-এর ব্যাখ্যা এখানে খুব স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, মানুষ যখন ধাতু, টিন, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি আবিষ্কার করে চাষবাস ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মে লিপ্ত হল, তখন প্রয়োজন হল শ্রমের, প্রয়োজনে মানুষ অপরের কাছে শ্রম বিক্রয় করা শুরু করল, উদ্ভব হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির; মানুষ যেমন দাসের প্রভু হল, তেমনি মালিকানা লাভ করলো স্ত্রীলোকেরও। সুতরাং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন না হলে স্ত্রীলোকেরও অধীনস্থ অবস্থা দূর হবে না। এর সত্যতা প্রমাণের জন্য ইজিপ্সীয় সভ্যতার উল্লেখ করা যায়। কেননা প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃতভাবে ইজিপ্টেই মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা ছিল, ফলত সেখানের সমাজ তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। আধুনিককালে এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ। এইচ আর হেজ প্রমুখ বলছেন, নারীকে স্বীয় অধীনে রাখার পেছনে পুরুষের যে মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল তা হল যৌনজীবনে নারী সম্পর্কে পুরুষের ভীতি ও উদ্বেগ। কেননা সে জানে নারীর যৌনক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশী। ফলত এরকম সন্দিগ্ধতা সবসময়ই কাজ করে যে সে তাকে তৃপ্ত করতে পারছে না বলেই নারীর অন্য পুরুষের কাছে যাওয়া বিচিত্র নয়। এই মনস্তাত্ত্বিক ভীতি থেকেই বিশ্বাসভঙ্গকারী নারীর প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান, আর ডন জুয়ানেরা হাসিমুখে সমাজে ঘুরে বেড়ায়। সাধারণ নারী সম্পর্কে তাই এতো অমূলক বিদ্বেষ ও ক্রোধ। কিন্তু জননী বা দেবী হিসেবে নারীকে দেখলে ওই মনস্তাত্ত্বিক ভীতি বা উদ্বেগ কাজ করে না বলেই মানুষ নারীকে জননী ও দেবী হিসেবেই সম্মান দিয়েছে; আর তাই নারী হয় খুব খারাপ, নয়তো দেবী হিসেবে চিত্রিত। তবে প্রাচীন চার্চপিতাদের নারীবিদ্বেষ বা 'মিসোজিনি'র প্রসঙ্গ টানলে আরো একটি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্মে নারীকে 'টেম্‌প্ট্রেস' বা প্রলোভনকারী হিসেবে দেখা হয়েছে, উদাহরণ ইভের। ক্লার্জিম্যানদের তাই সাধনা ছিল কৌমার্যের। তাদের ধারণা ছিল, সব নারীকেই ইভের ভুলের মাশুল দিতে হবে। জেনিসিসে ঈশ্বরের মুখ দিয়ে বলা হয়েছে :

'I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee'.

কিন্তু একথা কখনোই স্বীকার করা যাবে না যে সচেতন ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণেই নারীকে সবসময় পুরুষের অনুগত হতে বলা হয়েছে। 'স্বামী ও শুশ্রূষাই পরম ধর্ম'—ভারতীয় নারীর প্রতি এই উপদেশের সঙ্গে যে ধর্মীয় ও নৈতিক নির্দেশ জড়িত, তা অসম্মানসূচক নয়, ইতিহাসের প্রয়োজনে অনুভূত। দেশে যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য কাজে শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন স্বতই অনুভূত হতো আর নারীকে তার প্রজনন-ক্ষমতার জন্যে সম্মানিতও করা হতো। 'রমণীগণকে উত্তমরূপে রক্ষা করো তো?' ভরতের প্রতি রামের এই উক্তির কারণ রমণীর চরিত্র দুর্বলতা নয়, বীর পুত্রদের মাতা হিসেবে নারীর প্রতি এই উক্তি সম্মানসূচক। নারী সম্পর্কে মনু অনেক [illegible] উক্তি করে গেছেন, কিন্তু [illegible]ও বলেছেন, যেখানে নারী সম্মানিত নয়, সেখানে যে-কোন ধর্মীয় আচরণই নিষ্ফলা। শুধু বিদ্বেষ নয়, সামাজিক মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত নারীর আনুগত্য বিভিন্ন ধর্মীয় নির্দেশাবলীতে স্থান পেয়েছে। এক বৌদ্ধধর্ম ছাড়া আর কোথাও পুরুষ ও নারীকে সমান সমান হিসেবে ভাবা হয় নি। বিখ্যাত চার্চ প্রভু সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের একটি উক্তি এখানে স্মরণযোগ্য :

"For good order would have wanting in the human family if some were not governed by others wiser than themselves. So by such a kind of subjugation woman is naturally subject to man, because in man the discretion of reason predominates."

প্রটেস্টানটিজমের উদ্ভবে বিবাহ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হয়েছিল, কিন্তু মার্টিন লুথার থেকে কেলভিন পর্যন্ত এই ধারণাই দৃঢ় থেকেছে যে পুরুষের কাছে নারীর আনুগত্যেই সামাজিক মঙ্গল। ইসলামেও নারীর প্রলোভনকারী রূপ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। নারীকে পুরুষের

চোখের আড়ালে রাখার জন্যে পর্দাপ্রথা বা বিশেষ পরিচ্ছদের বিধান। আর পুরুষকে এই পৃথিবীর কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত রাখতে বেহেস্তের সুন্দরী রমণী হুরীদের কথা বলা হয়েছে। তবে ক্রিশ্চিয়ানিটির মতো ইসলামে কখনোই বিবাহে নিরুৎসাহ দেওয়া হয় নি, কেননা নারী প্রজননক্ষমতার অধিকারী বলে বিবাহ পবিত্র কর্ম, ঈশ্বরের বিধান।

সৈয়দ কওসর জামাল শিলিগুড়ি

॥ ২ ॥

'দেশ' পত্রিকায় ৩০শে জুন তারিখের সংখ্যায় অশোক রুদ্র মহাশয়ের 'পৌরাণিক মনে স্ত্রীবিদ্বেষ' শিরোনামায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, তার এক স্থানে তিনি লিখছেন, 'এই দুর্ভাগা দেশে মানুষ দ্বারা মানুষের অপমানের পর্যায় যে অতল গভীর স্পর্শ করেছে তার তুলনা বোধ হয় বিশ্বের ইতিহাসে নেই'। আমার কাছে এটা অত্যুক্তি বলে মনে হয়। আফ্রিকাবাসীদের হরণ করে আমেরিকায় যে অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখানে পৌঁছতে পারলে তাদের পণ্যসামগ্রী হিসাবে যেভাবে ব্যবহার করা হত, আয়ারল্যান্ডের ইংরাজ জমিদাররা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন, স্পেনীয় দিগ্বিজয়ীরা মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় আদিবাসী (মায়া ও আজটেক) সভ্য জাতিদের সঙ্গে যে অমানুষিক ব্যবহার করেছিলেন, বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের অনুচররা মধ্য আফ্রিকার কঙ্গোতে শ্বেত-উপনিবেশ স্থাপন করার সময় সেখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন, হিটলার ইহুদীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্রে কৃষ্ণকায় লোকেদের সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা এখনও চালু আছে, তাদের সঙ্গে হিন্দুদের নিম্নশ্রেণীর সহিত ব্যবহারের তুলনাও করা চলে না? তিনি আবার এক স্থানে এমন যুক্তিও দেখিয়েছেন যে গ্রীস-রোমের দাসেরা যে সময় সময় বিদ্রোহ করেছে, তাতে বোঝা যায় যে তাদের অবস্থা হিন্দুদের নিম্নশ্রেণীর চেয়ে উন্নত ছিল। এমন কি হতে পারে না যে, হিন্দুদের নিম্নশ্রেণীদের অবস্থা কখনও অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছায়নি বলেই, ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটেনি?

আমাদের দেশে আর্য আগন্তুক বিজেতারা যাদের কাছ থেকে দেশের প্রভুত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন তারের দাস, অসুর, রাক্ষস, এমন কি বানর, হনুমান পর্যন্ত আখ্যা দিয়ে তাদের সম্বন্ধে বিদ্বেষ প্রচার করেছেন, কিন্তু ব্যাপক সংহার (genocide) দ্বারা তাদের পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে লোপ করে দেননি। আড়াই হাজার বছর ধরে তারা সহাবস্থান করছে, বিজেতাদের সঙ্গে তাদের ব্যাপক বর্ণসাঙ্কর্যও ঘটেছে। আমেরিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদের যেভাবে সংহার করা হয়েছে, তেমন কিছুই ঘটেনি। এই তো বছর কয়েক আগে ব্রাজিলে সরকারী-[illegible]

থেকে বিষ ছড়িয়ে সেখানে আদিবাসীদের ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে। উপযুক্ত ঘটনাগুলি বিশ্ববিদিত, তবু রুদ্র মহাশয় আমাদের তুলনাও করতে দেবেন না। আত্মসমালোচনা খুবই প্রয়োজনীয়, কিন্তু অতিরঞ্জিত আত্মধিক্কার থেকে সুফল পাওয়া যায় কি?

শুভেন্দ্রকুমার মিত্র কলকাতা-১৯

॥ ৩ ॥

"পৌরাণিক মনে স্ত্রীবিদ্বেষ" প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখক ধর্মীয় গ্রন্থ (হিন্দু ধর্ম) এবং প্রাচীন সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্ত্রীবিদ্বেষ সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য লেখক যদি পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ থেকেও উদ্ধৃতি দিতেন তা হলে প্রবন্ধটি আরও তথ্যপূর্ণ হতো বলে মনে হয়।

কিন্তু প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক নারী সম্বন্ধে হিন্দু পুরুষের মনে দ্বৈতভাবের যে ব্যাখ্যা (আবছা ধারণা) দিয়েছেন, তার এক স্থানে আল্লা, জেহোভা এবং ঈশ্বরকে পুরুষ এবং পিতৃস্থানীয় বলে উল্লেখ করেছেন। লেখকের কাছে আমার একটি প্রশ্ন—দেবতা (নারী অথবা পুরুষ) এবং সৃষ্টিকর্তা কি এক? —যেহেতু সৃষ্টিকর্তা নিরাকার তাই তাঁর পুরুষ বা নারী হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আশা করি লেখক এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য অবহিত করার চেষ্টা করবেন।

মহঃ মনিরুল ইসলাম
কুষ্টিয়া বাংলাদেশ

সুধাসাগরতীরে

শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী লিখিত সুধাসাগরতীরে সম্পর্কে জব্বলপুর হইতে শ্রীমণি সেন ৪ঠা আগস্ট ১৯৭৯-এর দেশ মাধ্যমে জানাইয়াছেন যে সুরেশবাবু গিরিজাশংকরের শিষ্য-শিষ্যার তালিকায় অনবধানবশত শিল্পী এ টি কাননের নাম উল্লেখ করেন নাই। আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু সুরেশ বাবুকে সমর্থন করে।

আমার কন্যা ১৯৭৫ সালে এ টি কাননের নিকট সংগীত শিক্ষা করিত। খ্যাতিমান শিল্পী শ্রীকানন মধ্যে মধ্যে তাঁহার অতীত সম্পর্ক আমাদের নিকট গল্প করিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি গিরিজাবাবুর নিকট সংগীত শিক্ষালাভ করিবার আশা পোষণ করিতেন; এই উদ্দেশ্যে তিনি যখন গিরিজাবাবুর নিকট সাক্ষাৎ করেন, তখন গিরিজাবাবুর তালিম দিবার ক্ষমতা বিনষ্টপ্রায়। গিরিজাবাবু শ্রীকাননের সংগীত পরিবেশন শ্রবণ করেন। কিন্তু গিরিজাবাবু বলেন যে তাঁহার আর নূতন করিয়া সংগীত শিক্ষা দিবার ক্ষমতা নাই। তবে, অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যাদিগের ন্যায় শ্রীকাননও প্রায়ই গিরিজাবাবুর নিকট যাইতেন। গিরিজাবাবু তাঁহাকে সমধিক স্নেহ করিতেন। মুর্শিদাবাদে তিনি একবার গিরিজাবাবুর সহিত গিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে

শিল্পী এ টি কানন গিরিজাবাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীমণি সেন ঠিকই বলিয়াছেন, শ্রীকানন সংগীতে কিরানা শৈলীর অনুসারী। আমি কানন সাহেবের নিকট ঐরূপ শুনিয়াছি।

সঠিক তথ্যের জন্য আমি একটি বিকল্প প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি। স্বর্গত গিরিজাবাবুর যোগ্যতম শিষ্য শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী এখনও জীবিত। গিরিজাবাবুর উত্তর-সাধকরূপে তিনি এখনও গিরিজাবাবুর স্মৃতি বিজড়িত কলিকাতাস্থ 'গীত বিতান'-এর অধ্যক্ষ। তাঁহার সহিত যোগাযোগ করিলে গিরিজাবাবু সম্পর্কিত খুঁটিনাটি সঠিক বিষয় জানা যাইবে।

দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুরুলিয়া

নৃতাত্ত্বিকের উপেক্ষিত আদিম জাতি

গত ১৪ই জুলাই ৩৭ সংখ্যার "দেশ"-এ 'নৃতাত্ত্বিকের উপেক্ষিত আদিম জাতি' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রতি বিশেষ আলোকপাত করার ইচ্ছা নিয়েই এ চিঠির অবতারণা করছি।

এই নিবন্ধে সাম্প্রতিককালে আন্দামানের আদি অধিবাসীদের বিবাহের ব্যাপারে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে স্থানীয় ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের কর্মী হিসাবে আন্দামান আদিম জনজাতি বিকাশ সমিতির প্রধানের নিমন্ত্রণের সুবাদে গত ১৮ই জুন স্ট্রেট দ্বীপে আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছে। সেই বহু প্রতীক্ষিত বিবাহ স্ট্রেট দ্বীপের বসবাসকারী গ্রেট আন্দামানী সম্প্রদায়ের ১৭ বৎসর বয়স্ক যুবক গোলাট-এর সংগে ঐ একই দ্বীপের গ্রেট আন্দামানী সম্প্রদায়ের ১৫ বৎসর বয়স্কা যুবতী লিচ্চোর মধ্যে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই ক্ষুদ্র পরিসরে এও জানাচ্ছি যে বর্তমানে এই সম্প্রদায়ে উপযুক্ত বিবাহযোগ্যা যুবতীর অভাবে অন্য একটি বিবাহযোগ্য যুবকের বিবাহ হতে পারছে না।

সম্পাদক মহাশয় সেণ্টিন্যালি আদি অধিবাসীর একমাত্র বিবাহযোগ্যা যুবতীর খবর কিসের ভিত্তিতে পেলেন জানি না। কারণ সেণ্টিন্যালি জাতি আজও সভ্যসমাজের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন। তাদের ব্যাপারে যে সকল তথ্য নানাবিধ পত্র-পত্রিকায় পরিবেশিত হয়েছে সে সবই অনুমান ভিত্তিক মাত্র। তাদের বাসভূমি নর্থ সেণ্টিন্যাল দ্বীপের কাছাকাছি যাওয়াটাই ভীতিপ্রদ। খবরাদি সংগ্রহ করাটা তো নিতান্তই অকল্পনীয়। এদের হিংস্রতার পরিচয় কিছুটা অনুমান করতে পারা যাবে "ম্যান ইন সারচ অব ম্যান" শীর্ষক ডকুমেণ্টারীতে। যা ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগ, ফিল্ম ডিভিসান ও আন্দামান প্রশাসনের যৌথ প্রচেষ্টায় তোলা

আন্দামানে যে চারটি (সেণ্টিন্যালি, জারোয়া, ওংগি ও গ্রেট আন্দামানী) আদি অধিবাসী আছে তাদের প্রত্যেকের রীতিনীতি এতই স্বতন্ত্র যে একটির সংগে অন্যটি নৃ-পরিচিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ মাত্র। অন্যান্য সামাজিক প্রথা প্রকরণে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। তাই সম্পাদক মহাশয়ের পরিবেশিত সেণ্টিন্যালি বিবাহযোগ্যা যুবতীর সহিত গ্রেট আন্দামানী বিবাহযোগ্য বিবাহের সংবাদ যদি সত্য হতো তা হলে সেটা ঐতিহাসিক ঘটনার সামিল। এ ধরনের বহির্দলীয় বিবাহের রীতি আজো আন্দামানের আদি অধিবাসীর দলিলে পাওয়া যায় নি। একান্তই যদি তা সম্ভব হতো সেক্ষেত্রে বহু সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে পেতে হয়ত বেশীদিন লাগত না। সেই শুভদিনের আশা করাটা অন্যায় বা সমীচীন হবে কি-না অনেকটা বিতর্কিতই রয়ে গেল।

সুজিত সোম
ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগ
পোর্ট ব্লেয়ার

নজরুলের নিষিদ্ধ নানা গ্রন্থ

শ্রীশিশির করের লেখা 'নজরুলের নিষিদ্ধ নানা গ্রন্থ' শীর্ষক প্রবন্ধটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং তথ্যবহুল হয়েছে।

তবে এই প্রবন্ধ প্রসংগে ক'টি কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি। কবি নজরুলের 'ফণিমনসা' গ্রন্থ নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়েছে। আমার কাছে ডি এম লাইব্রেরী প্রকাশিত 'ফণিমনসা' কবিতাগ্রন্থটি আছে। বইটির ভিতরে লেখা আছে 'ডি এম-এর প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৭৪'। প্রকাশিত প্রবন্ধে ফণিমনসা গ্রন্থের দুটি কবিতার ক'টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। (১। ওরে ভয় নাই আর দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাণ,....এবং ২। যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া।....) খুবই বিস্ময়কর যে আমার হাতের বর্তমান 'ফণিমনসা' গ্রন্থে ঐ দুটি কবিতাংশবিশিষ্ট কোন কবিতা খুঁজে পেলাম না। অথচ কাজী নজরুল ইসলামেরই রচিত 'ফণিমনসা' গ্রন্থের দুটি প্রকাশনে এরকম গরমিল কি করে সম্ভব। প্রকাশন সংস্থা পৃথক হলেও একই বইয়ের বিষয়বস্তুর বৈসাদৃশ্য অস্বাভাবিক বইকি। আবার উল্লেখিত 'নব-যৌবন-জল-তরঙ্গ' বা 'সব্যসাচী' নামেও কোন কবিতা এই বইতে নেই।

তাই বর্মন পাবলিশিং হাউস থেকে কবি কর্তৃক প্রকাশিত 'ফণিমনসা' কাব্যগ্রন্থে (যেটি ইংরাজ সরকারের বিষনজরে পড়েছিল) কি কি শীর্ষনামে এবং ক'টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল জানা গেলে ভাল হত।

আর লেখক প্রবন্ধের শেষ প্রান্তে লিখেছেন '১৯৪১ সালের পর থেকে কবি ক্রমশ গুরুতর অসুস্থ হতে থাকেন।' কিন্তু কবে কবি সম্পূর্ণ বাক্‌রহিত হয়ে যান সে বিষয়ে কিছু নির্দেশ করেননি। যত দূর মনে হয় কবি বাক্‌রহিত হন মোটামুটিভাবে ১৯৪৩ সালে।

মানস রায় কলকাতা-[illegible]

দেশ ৪৬ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা
১৫ ভাদ্র ১৩৮৬

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

অশীন দাশগুপ্তের প্রবন্ধ
বিষয় স্বাধীনতা
সুহাস মজুমদারের প্রবন্ধ
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
ও ঐতিহাসিক সত্য
সমীর মুখোপাধ্যায়ের গল্প
কেন যাওয়া

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
বাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আহ্বান

নিয়ত অস্থির রাজনৈতিক পরিদৃশ্যের প্রকোপ অপসারিত করবার ও ক্ষণভঙ্গুর মন্ত্রী পরিষদের পৌনঃপুনিক আবির্ভাব এবং তিরোভাবের চক্রবৎ আবর্তন নিরাকৃত করবার প্রয়োজন ছিল। যদিও প্রতিষ্ঠাচ্যুত ও আস্থাভোটে পরাজয়ের ভয়ে পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শ্রী চরণ সিং-এর পক্ষে রাষ্ট্রপতিকে কোন পরামর্শ দেবার নৈতিক অধিকার ছিল না, রাষ্ট্রপতি তবু বর্তমান লোকসভা ভেঙ্গে দেবার ও মধ্যবর্তী নির্বাচন আহ্বান করবার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী নবেম্বর-ডিসেম্বরে এই নির্বাচন হবে। এই নির্দেশ অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের, বস্তুত প্রত্যেক দলের মনঃপূত হয়েছে বলে মনে করা চলে, শুধু এক জনতা দল ছাড়া। জনতা দল ও শ্রীজগজীবন রামের চিন্তায় রাষ্ট্রপতির ওই নির্দেশ বস্তুত আশাভঙ্গের আঘাত হয়ে বাজবে, এবং তাঁদের প্রতিবাদের বক্তব্যে ক্ষোভ ও বিষাদের অভিব্যক্তি বড় হয়ে উঠবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু জনতার বিপক্ষ দল হিসাবে আর যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কি হর্ষান্বিত ও উৎফুল্ল হয়েছেন? ঘটনার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য এই যে, যাঁরা মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি মুখরিত করেছেন, তাঁরাও উৎফুল্ল হতে পারেননি। তাঁরাও নির্বাচনের সম্মুখীন হতে ভীতি বোধ করছেন। শ্রীচরণ সিং-এর প্রধানমন্ত্রিত্বের অবসানের পর বিরোধী পক্ষের নেতা শ্রীজগজীবনকে কেন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান করা হলো না, রাষ্ট্রপতির সম্পর্কে জনতা দলের এই অভিযোগের প্রশ্নময় মুখরতা খুবই প্রবল হয়ে উঠেছে। সাংবিধানিক আদর্শের সুষ্ঠু তাৎপর্য অনুযায়ী যেটা উপস্থিত ক্ষেত্রে উচিত বলে বোধ করেছেন রাষ্ট্রপতি, স্বভাবত তিনি তারই সুপারিশ করেছেন। এক্ষেত্রে সংবিধান-বিষয়ক কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অভিমতে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গতির প্রশ্ন উত্থাপিত হলেই বা কী আসে যায়। রাষ্ট্রপতির নির্দেশকে খুবই যুক্তিসঙ্গত ও সংবিধানসম্মত বলে স্বীকৃতি দেবারও বড়-বড় বিশেষজ্ঞ আছেন। একটি অভিমত এই যে, সংবিধানের ৬০, ৭২ ও ৭৪ অনুচ্ছেদ্র তাৎপর্য সম্মিলিতভাবে এই সত্যেরই ইঙ্গিত বহন করে যে, অবস্থাবিশেষে ও ঘটনাবিশেষে রাষ্ট্রপতির পক্ষে স্বয়ংক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার অধিকার আছে। জনতা দলের দাবির পক্ষে কিছু যুক্তির অনুমোদন থাকতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রপতির সম্পর্কে জনতা-নেতারা যে ভর্ৎসনার গর্জন ধ্বনিত করেছেন, সেটা খুবই গর্হিত এক দৌরাত্ম্যকর ঘটনা।

রাষ্ট্রপতির নির্দেশের খুঁত কিংবা ভুল ধরবার চেষ্টায় অজস্র বিজ্ঞতা খরচ না করে, এবং রাষ্ট্রপতিকে চক্রান্তকারী বলে অপবাদিত না করে প্রত্যাসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনকে স্বাগত এক শুভযোগ বলে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করাই উচিত। জনসাধারণের বেশিরভাগই মধ্যবর্তী নির্বাচনকে দুষ্ট এক গ্রহচক্রের সর্বনাশক প্রকোপ হতে মুক্তি লাভ করবার মতো একটি সুযোগের আবির্ভাব বলে বোধ করবে। রাজনৈতিক দল এবং দলীয় ব্যক্তিরা বিশেষ করে যাঁরা বিগত সাধারণ নির্বাচনের অনুগ্রহে সংসদ সদস্য ও বিধায়ক হবার ভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁদের বিগত ঐ আড়াই বৎসরের ক্রিয়া-কলাপের ফলে দেশের দুর্ভাগ্যেরই একটি করুণ দশাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাঁরা দলীয় আনুগত্যের সত্তাকে যেন ছিন্নভিন্ন করে কর্মনাশার জলে নিক্ষেপ করেছেন। দলের প্রতি আনুগত্যের নিষ্ঠাশীল সম্বন্ধ ভারতের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে এতটা অসৎ দুঃসাহসের প্রগল্‌ভতায় কখনও বিকৃত হয়নি। লোকসভায় আস্থাভোট অথবা অনাস্থাভোটের প্রস্তাব স্বীকৃত অথবা অস্বীকৃত হলেও সেটা বর্তমান অবস্থায় জনসাধারণের ইচ্ছা ও প্রকৃতির পরিমাপক কোন হিসাবের প্রতিচ্ছবি নয়। সেটা বস্তুত রাজনৈতিক এক জঙ্গলের যত স্বার্থবাদী জীবকুলের দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বের তথাকথিত সফলতা অথবা ব্যর্থতার আঙ্কিক পরিচয় মাত্র। দেশবাসীর ধারণাতে এঁরা দেশের সমুন্নতির পক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মনিষ্ঠার কোন সম্বল নন। তাই অনেকের মনে এই ধারণার উদ্ভব খুবই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যে, আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই সব প্রয়োজনহীন শুষ্ক কাষ্ঠের জঞ্জাল ও লোভী মক্ষিকার ব্যাপক বিলোপ সম্ভাবিত হবেই হবে। এবং কোন দলই পূর্ণসংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৌরবান্বিত হতে পারবে না। যদি তাই হয়, তবে এই সত্যও অনুভব করতে হয় যে, বহু দলের সমন্বিত কোয়া-লিশনী কৃতিত্বে জাতীয় জীবনের অভীষ্ট খুব স্বচ্ছন্দ প্রশ্রয় লাভ করতে পারবে না। বিভিন্ন দলীয় আধিপত্যবাদের (ব্যক্তি স্বার্থবোধের তাড়না না হয় নিষ্ক্রিয় হয়েই রইল) দ্বন্দ্ব আবার প্রবল হয়ে উঠতে পারে। তার ফলে নবগঠিত মন্ত্রিসভার আয়ু আত্যন্তিক ক্ষীণতায় অভিশপ্ত হবে। ইতিহাসের বিধাতা সত্যই কি ভারতের রাজনৈতিক অদৃষ্টকে এমনতর এক দৈন্যের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন? প্রাক্-দ্যগল ফরাসী-রাজনৈতিক দৈন্যের কথা স্মরণ করা চলে। এক-একটি মন্ত্রিসভা যেন নলিনীদলগত জলের ফোঁটার মত টুপ-টুপ করে ঝরে পড়বার দুর্ভাগ্যকর দৃশ্য জাগ্রত করে রেখেছিল। কিন্তু যোগ্য নেতা দ্যগল তাঁর বুদ্ধি প্রতিভা নিষ্ঠা ও সৎসাহসের বলে ফ্রান্সকে দীর্ঘকালীন এক স্থায়ী সরকারের শাসনিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠার মাঙ্গলিক উপহার প্রদান করতে পেরেছিল।
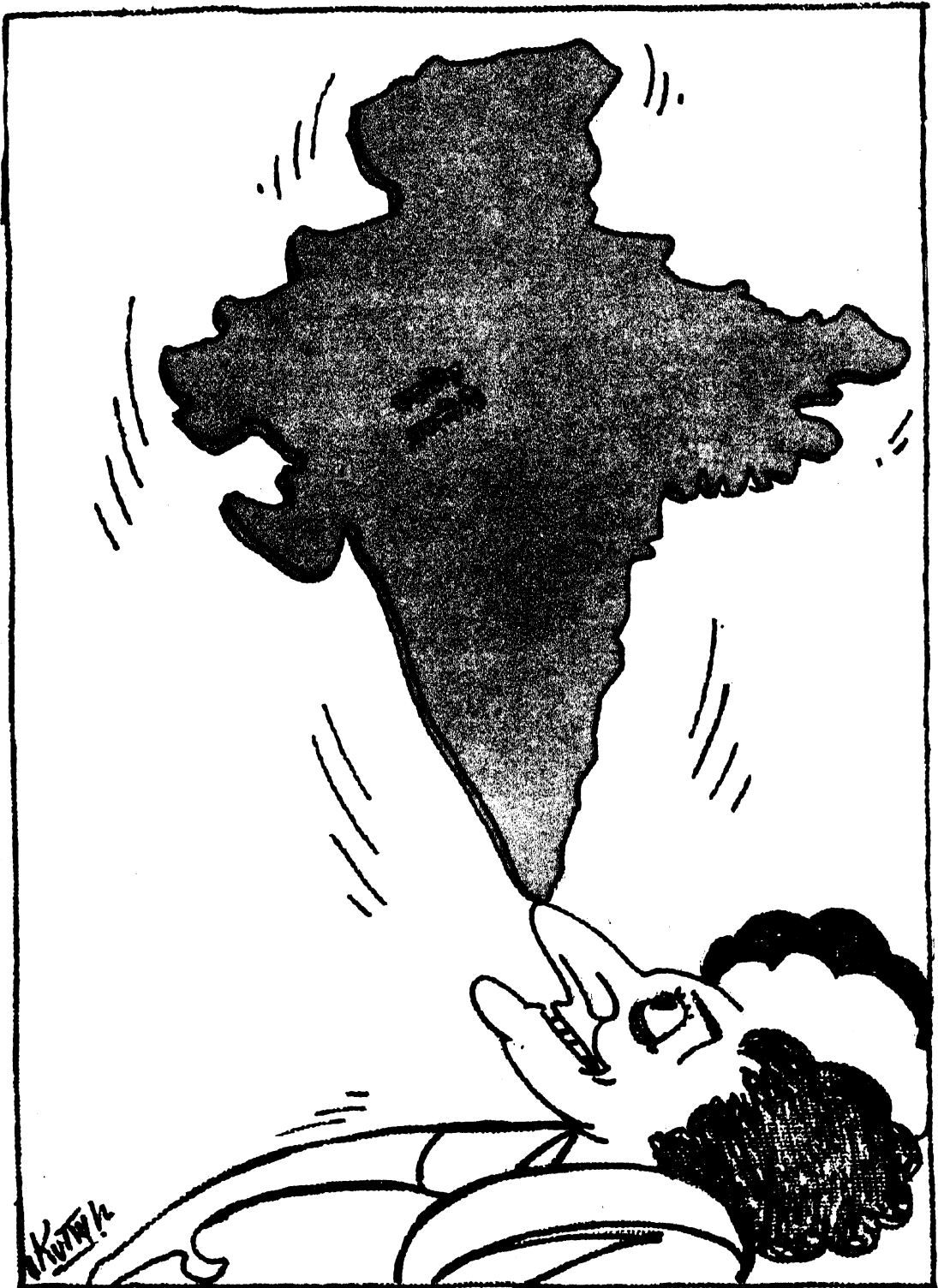
সাথী খুজতে কি

ভবতোষ দত্ত

বলাকার পর (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথ প্রায় চার বছর তাঁর আপন ধারায় কবিতা লেখেননি। 'আমেরিকার বস্তুগ্রাস' থেকে বেরিয়ে এসে 'শিশু ভোলানাথে'র সহজ হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে কবি বাঁচলেন। তার কিছুকাল পর থেকে শুরু হল পুরবীর কবিতা লেখার পালা।

এ সময়ের দুটি কবিতায় কবির মানসজীবনের উৎকণ্ঠা ও আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে ; একটি 'তপোভঙ্গ', অন্যটি 'লীলাসঙ্গিনী'। প্রথমটির রচনাকাল ১৯২৩-এর অক্টোবর, দ্বিতীয়টির রচনাকাল ১৯২৪-এর মার্চ। দুটিতে মাত্র চার মাসের ব্যবধান। বোঝা যায় এই চার মাসই কবিতা লেখা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে ভাবনা ছড়িয়েছিল। কখনো বলছেন—

বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

আবার কখনো বলছেন—

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুলি ?
কল্পনাপটে নেশার বরণে
বুলাব রসের তুলি ?

যৌবনে একবার কবিতা লেখার জোয়ার এসেছিল। 'সোনার তরী' 'চিত্রা' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত কবিতা রচনার বিরাম ছিল না। সে সময়ের কাব্য বিশিষ্ট গুণে গুণান্বিত। যৌবনে অনুভূতি থাকে প্রখর, ইন্দ্রিয় স্পর্শকাতর আর পৃথিবী বর্ণবৈভবে উজ্জ্বল। মানুষের সুখ-দুঃখ বিরহ-ভালোবাসার জীবন অপরূপে বলে ঠেকে। কল্পনাশক্তির বিকাশও থাকে বাধাহীন। যৌবনের স্বাভাবিক গ্রহণক্ষমতায় যে কৌতূহল কবির মনে জাগে তারই সঙ্গে যুক্ত হয় সৌন্দর্যের নিরংকুশ চর্চা। তখনও যোগ দেয়নি দার্শনিকের জিজ্ঞাসা। গীতাঞ্জলির যুগে অধ্যাত্মপিপাসা দেখা দিল : সেও এক হৃদয়ের সাধনা, ভক্ত যে মানবিক ভাবের ভাবুক হয়ে ভগবানের সাধনা করে। যাকে বলে সৃষ্টিজিজ্ঞাসা, তত্ত্বভাবুকতা, জগৎ ও জীবনের রহস্যসন্ধান, সমাজ ও সভ্যতার নীতি-প্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা—কবিকে তখনও তা উতলা করেনি। তত্ত্বের যে স্পর্শে জীবনের সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়, সে স্পর্শ তখনও লাগেনি কবির ভাবনায়। সে তত্ত্ব এসেছে বলাকার যুগে। সেখানে কবির দার্শনিকতা স্পষ্ট। রূপরসের রচনার চেয়েও চিন্তা ও ধ্যানের সৃষ্টি হিসাবেই বলাকার গতি-তত্ত্বের কাব্য আমাদের মুগ্ধ করে।

এই পরিপ্রেক্ষিকাতেই 'আবার সাজাতে হবে আভরণে' পঙ্‌ক্তির 'আবার' কথাটি তাৎপর্যবহ। এতে বোঝাচ্ছে কবি মানসপ্রতিমাকে শিল্পের আভরণে সাজানোর কাজ থেকে এতদিন বিরত ছিলেন। মনে যেসব ভাবকল্পনার উদয় হয়েছিল, একদিন ভাষায় তাদের সজ্জিত করে দিয়েছিলেন। কল্পনা ছিল তার পট, সৌন্দর্যমত্ততায় কবি ছিলেন অন্ধ, রসের তুলিকাতে সে ছবি ছিল রেখাঙ্কিত। লীলাসঙ্গিনীর এই বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবির মনে সেই যৌবনের মুখর স্মৃতিই ফিরে এসেছে। তখন কবিকে মুগ্ধ করত চৈত্রবসন্তের বকুলগন্ধ, শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি, নবমুকুলের গন্ধ, বর্ষার সজল মেঘ, দূরশায়িত নদীর কল্লোল। এই গন্ধ ধ্বনি স্পর্শের জগৎ কবির কাছে বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। মাটির পৃথিবী সৌন্দর্যের পৃথিবী হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে সৌন্দর্য ছিল বিশুদ্ধ রসের সৌন্দর্য। তাতে স্থূল ভোগের বাসনা ছিল না। উপভোগের রমণীয়তা ছিল। কবিতা লেখার এই অনুপ্রেরণাটিকে কবি পুরবীতে আবার ফিরে পেতে চাইলেন।

কিন্তু কবির সেই যৌবন কি আর আছে ? সেই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সংবেদনশীলতা প্রকৃতির আহ্বানে যা চঞ্চল হয়ে উঠত সে কি আর তেমনি অটুট ? এখনও কি ভালো লাগে বর্ষা বসন্তের বৈচিত্র্য, ফুল ফোটা আর গন্ধ বিলানো ? এখন কবি পৌঁছে গেছেন ষাট বছরের প্রান্তে, নানা বিশ্বসমস্যার চিন্তা তাঁর মানস-ক্ষেত্রকে অধিকার করেছে, বাইরের প্রকৃতির হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার অবসর নেই এখন, হৃদয়শক্তির চেয়ে মানসশক্তিই এখন তীক্ষ্ণতর। কবির অন্তরের নিভৃত লোকে এক দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। তার আকুল আকাঙ্ক্ষা যৌবনের কাব্যধর্মকে ফিরিয়ে আনার জন্য, বিউটি এবং ট্রুথকে মেলানোর জন্য।

মাঝখানে কয়েক বছর রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার বিরতিকালেও চলেছে রবীন্দ্রনাথেরই অনুসরণ। তখন ভারতীর যুগ। ভারতীর যুগ রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণের যুগ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি, তার ভাষা ছন্দ অনুসরণ করে কবিতা লিখছেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রভৃতি কবিরা। তবে ঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের চেয়েও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণই তাঁদের সহজসাধ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতা রচনার কয়েকটি রীতি স্থির করে দিয়েছিলেন, তাকে কেউ লঙ্ঘন করত না। ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত ছন্দ, দ্রুত লয়ের দলবৃত্ত ছন্দ, বলাকার পর মুক্তক বন্ধ—ছন্দের দিক দিয়ে বাংলা কবিতায় এগুলি সুপ্রচলিত হয়ে গেল। কবিতার একটা নির্দিষ্ট ভাষাভঙ্গিমাও গড়ে উঠল। এমন কয়েকটি বিশিষ্ট কাব্যিক শব্দ যা বৈষ্ণব কবিতা থেকে এল যা রবীন্দ্রনাথের সূত্রে কবিতার নিজস্ব চারিত্রলক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেল। কল্পনাবিষয়ের দিক দিয়েও সহজ পল্লীজীবনের প্রতি আকর্ষণ, প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে মুগ্ধতা, সর্বোপরি অশরীরী প্রেমের কল্পনা —এসবই রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে বাংলা কবিতায় সঞ্চারিত হল। এটাই বাংলা কাব্যের রবীন্দ্রযুগ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশককে রবীন্দ্রযুগই বলতে হয়। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের অনুগত কাব্যসহচর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথের মানসশক্তি রবীন্দ্রনাথের মতো প্রবল নয়, তবু রবীন্দ্রনাথের আদর্শই ছিল তাঁর আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের অশরীরী কল্পনার শরীরী প্রকাশ সকলের বিস্ময়। সত্যেন্দ্রনাথের মনেও সেই বিস্ময় ছিল কিন্তু সূক্ষ্মতা ছিল না। তাঁর কবিতা বক্তব্যপ্রধান। তবে সেই ছন্দ, সেই ভাষা, সেই শুচিতার আদর্শ, সৌন্দর্যের পূজা—তাঁর কবিতারও বিশেষত্ব। রবীন্দ্রকাব্যের আশাবাদিতা সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্যপ্রধান কবিতায় ভবিষ্যতের আশ্বাস ও বিশ্বাস নিয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতায় নানা স্তর আছে—পৌরাণিক সাময়িক, লঘু কাল্পনিক। তবে কোনোটাতেই তেমন গভীরতা বা সূক্ষ্মতা নেই। আছে স্পষ্টতা, ঋজুতা, সর্বজনবোধ্যতা, সর্বোপরি ছন্দের নানা কৌতূহল। রবীন্দ্রযুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে এক কাব্যপরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তখন বিশ্বসমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত; নানা দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কবিতা লেখায় তখন তাঁর ভাটা।

১৯২১-এ রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন। তাঁর পুরবীর প্রথম দিককার কবিতাগুলি লেখা হল। আবার কবিতার রাজ্যে তিনি ফিরতে চাইলেন : সেটাই তো তাঁর আসল জগৎ। বাল্যকাল থেকে কবিতা লিখেছেন, বাংলা কাব্যধারায় যুগান্তর নিয়ে এসেছেন। বাংলা কবিতার রূপের পরিবর্তন ঘটেছে তাঁর একক প্রভাবে। বহু অনুগামী এসেছেন যাঁরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছেন। কিন্তু কবি এবার দেশে ফিরে লক্ষ করলেন সাহিত্যে একটা বিদ্রোহের সুর। এ-বিদ্রোহ দ্বিজেন্দ্রলাল-সুরেশ সমাজপতি-চিত্তরঞ্জন দাশের রবীন্দ্রসমালোচনা নয়, এ-বিদ্রোহ তৈরি হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রপরিমণ্ডলের মধ্য থেকেই ভারতী গোষ্ঠীর আশ্রয়েই। এ-বিদ্রোহ স্থূল আক্রমণ নয়, এ এক সূক্ষ্ম আদর্শভেদ। আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্রের ভাষা ও ভঙ্গিতে সুরক্ষিত কিন্তু চিন্তা ও কল্পনায় রবীন্দ্রসরণী থেকে ভ্রষ্ট।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসধারায় একটি বিচিত্র যোগাযোগ এই যে, ১৯২১-এর পর দু তিন বছরের মধ্যে প্রায় একই সময়ে পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল যাতে একটি তাৎপর্য সূচিত হল। ১৯২১-এ নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী নামক বহুবিখ্যাত কবিতাটি প্রকাশিত হল, ১৯২২-এ বের হল অগ্নিবীণা এবং মোহিতলালের স্বপনপসারী। সেই বছরেই কবি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু। ১৯২৩-এ কল্লোল পত্রিকার প্রকাশ, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরীচিকা' কাব্যখানিও সেই বছরেই। এই নতুন কবিদের মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে, তা সেকালের দিনে কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। কল্লোলের লেখকরা যতীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম এবং মোহিতলাল মজুমদার সবাইকে নিয়েই উল্লসিত। তা ছাড়া অচিন্ত্যকুমার, মণীশ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র—তরুণতরদের মধ্যেও অস্থির যৌবনের নতুন সৃষ্টির প্রেরণা জেগে উঠছে। জীবনকে তাঁরা অধিকতর আবেগে এবং বাস্তব প্রবৃত্তির আলোকে দেখতে উৎসুক। যতীন্দ্রনাথ তো ঈশ্বরের সৃষ্টিকেই চ্যালেঞ্জ করলেন। এক অশান্ত বেদনায় জগৎকে তিনি অক্ষম স্থপতির ব্যর্থ রচনা বলে ঘোষণা করলেন। মোহিতলাল দেখলেন জীবন এক মহাপিপাসার রঙ্গভূমি। ক্ষুধিত আত্মার চিরন্তন হাহাকার দেহপ্রেমে অমরত্বের সন্ধান করে ফিরেছেন। আর নজরুলের সমাজচেতনায় ধ্বনিত হয়েছে মানুষের গড়া সৃষ্টির অসম্পূর্ণতা ভোগের প্রমত্ত বাসনা জীবন থেকে রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্ন হরণ করে। বাস্তবের সত্যকে অনাবৃত করে বলবার জন্য আমাদের সামাজিক নীতিবোধ, শুচিতা ও সংস্কার ইচ্ছে করেই বিসর্জন দিয়ে নতুন সাহিত্য গড়ে উঠল। রবীন্দ্রযুগের সংযম শ্রী সৌন্দর্য সাহিত্য থেকে বিদায় নিতে চলল। নজরুল ইসলামের অসংযত প্রতিবাদ, মোহিতলালের তীব্র বাসনা, অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেবের দেহক্ষুধা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিকৃত ক্ষুধার ট্রাজেডি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রদর্শিত আদর্শকে বিচলিত করল।

১৯২২-এর পর কবি সত্যেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তিনি এই নতুন সাহিত্যকে কিভাবে নিতেন ? সজনীকান্ত দাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী নজরুলের 'বিদ্রোহী'র কাব্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ সংশয়মুক্ত ছিলেন না। আবার মোহিতলালের অঘোরপন্থী পড়ে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। মোহিতলালের 'নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর' তাঁকে অভিভূত করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ যেন সাহিত্যের পালা পরিবর্তনের আভাস পেয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো তখনও রবীন্দ্র-আদর্শ থেকে বড়োরকমের বিচ্যুতি তাঁর চোখে পড়েনি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু যেন এক ঐতিহাসিক ইঙ্গিত—একটি আদর্শের অবসান। এই জনাই সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে এমন নিঃস্বতা বোধ করেছিলেন—

যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়
কোথায় সান্ত্বনা।

ভারতীতে যাঁরা কবিতা লিখে রবীন্দ্রানুগামী বলে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই আরো অনেকদিন কবিতা লিখেছেন সত্য, কিন্তু একথা ইতিহাসের দিক দিয়ে মানতেই হবে যে নতুন কবিতার আবাহনও শুরু হয়ে গিয়েছে এবং তাঁদের ধারাই কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-পরিচয় অবলম্বন করে বাংলা কবিতার ইতিহাস রচনা করল।

পুরবীর 'পথিক'-অংশ ছাড়া অন্য কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল বাংলা কবিতার এই সন্ধিক্ষণে। ১৯২৪-এর মার্চ মাসে চীন যাত্রার আগে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাগুলি লেখেন। এদের মধ্যে অন্তত দুটি কবিতাতে কবির কাব্যরচনার পশ্চাৎপটরূপে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। 'লীলাসঙ্গিনী'কে কেউ বলেছেন যৌবনের সেই জীবনদেবতা যিনি যৌবনের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে স্বভাবতই প্রত্যাবৃত্ত। এ-ব্যাখ্যা খুব অযৌক্তিক নয়। জীবনদেবতা ছিলেন কবির অন্তরে কবি, তাঁর সৃষ্টিপ্রেরণার প্রতিমা। এই প্রেরণা কবির সচেতন বুদ্ধি, ব্যবহারিক কর্তব্যকে ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কাব্যরচনা শেষ হয়ে গেলে দেখা যায় কবি যা ভেবেছিলেন কাব্য সে রূপ নেয়নি, নিয়েছে এক ভিন্নতর রূপ। কবি তাই বলেছিলেন—

আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই এ একটা ব্যাপার যাহার উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে।'

অন্তরের সৃষ্টির প্রবল আবেগ একটা অন্ধ শক্তির মতো; তাকে একসময়ে কখনো নাম দিয়েছিলেন জীবন-দেবতা, কখনো বলেছিলেন অন্তর্যামী। এর অস্তিত্বের বিচিত্র অনুভূতি কখনো কখনো ভক্তের অন্তরে ঈশ্বরের উপলব্ধির পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঈশ্বরে নিবেদিতচিত্ত ভক্তের মতোই তিনি বলেছেন—

> জেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার,
> করিবারে পূজা কোন দেবতার
> রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
> মহামন্দিরতলে ?

পূরবীর যুগেও এসে দেখা গেল সেই জীবনদেবতাই লীলাসঙ্গিনীরূপে কবিকে ডাক দিয়েছেন কবিতার ক্ষেত্রে।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী লীলাসঙ্গিনীকে প্রেমের কবিতাই বলেন। লীলাসঙ্গিনীর প্রেমিকা অবশ্য বিশিষ্ট কোনো নারী নয়, সে প্রৌঢ়ত্বের পটভূমিকায় যৌবনপ্রেমের আদর্শায়িত আধার। এ-ব্যাখ্যাও অযৌক্তিক না হতে পারে। কারণ 'পূরবী' কাব্যের একাধিক কবিতায় প্রেমের স্মৃতি ও প্রেমের বেদনার কথা আছে। কবি যখন দক্ষিণ আমেরিকার পথে যাত্রা করেন ১৯২৪ সালের সেপ্টেমবর মাসে তখনই যে ডায়েরি রচনা করেছিলেন তাতেও প্রেমতত্ত্বের বিশ্লেষণ আছে দেখতে পাই। কিন্তু কবির প্রেম নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে; তাতে কোনো রক্তমাংসের মানবীর মুখের রেখা, আর্ত চক্ষু, চোখের জল, কালো কেশের অন্ধকার ফুটে ওঠে না। লীলাসঙ্গিনীর প্রেমিকা তেমনি এক টুটিয়া আলয় বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছে উদয়'। যৌবনের আবেগতপ্ত ভালোবাসা আর প্রৌঢ়ের শান্ত ভালোবাসায় কোনো ভেদ নেই। দুই ভালোবাসাই কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে এই আলো হাওয়া, এই বর্ষা-শরৎ-বসন্তকে ভালোবাসতে। এই ভালোবাসাই কবিকে করেছে শিল্পী।

কবিতা রচনার সময়টাকে মনে রাখলে লীলা-সঙ্গিনীর আর একটি বিশ্বাসযোগ্য তাৎপর্য মনে হওয়াই সম্ভব। এই লীলাসঙ্গিনী কবির জীবন-লীলার সঙ্গিনী অর্থাৎ কবিতা। কবিতাই কবির আবাল্য সঙ্গী। কবিতার সাহচর্যে কবি অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করে এসেছেন। তাঁর জীবনের পর্বে পর্বে কবিতাই নতুন নতুন রূপে দেখা দিয়েছে। আরও নানা কাজের মধ্য থেকে কবিতাই তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছে—

> মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,
> ভুলায়েছ বারে বারে—
> বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
> কঙ্কণঝঙ্কারে।
> ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
> ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে
> কখনো আমের নবমুকুলের বেশে
> কভু নব মেঘভারে।

বলাকার পর কবির জীবনে কাব্যরচনার বিরতি। এ সময়টাতে কবি কর্মজগতের নানা আহ্বানে কবিতাকে উপেক্ষা করেছিলেন। আজ আবার সেই কবিতাই কর্মমুখর কবিকে ডাক দিয়েছে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-যাত্রায়, বিশুদ্ধ রসের চর্চায়। কবি জেগে উঠেছেন, তাঁর ঘোর কেটে যাচ্ছে, তিনি বিস্মরণের গোধূলি-আলোয় কবিতালক্ষ্মীকে চিনতে পারছেন। নানা কাজে তিনি ছিলেন ব্যস্ত, তাই 'কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন দূরে'। আবার এতদিন পরে চেনা সুরের ডাকে কবি ফিরে এসেছেন কবিতার জগতে।

এই 'চেনা সুর' কথাটি অর্থবহ। এই কথাটির মধ্যে আছে তাঁর যৌবনের অভ্যস্ত কাব্যলীলার ইঙ্গিত। এই সুরটিকে তিনি চিনতেন, এই সুরের সাধনাতেই তিনি কৈশোর-যৌবন উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন। এই সুরেরই সৃষ্টি চিত্রা কল্পনার রোমান্টিক স্বপ্নলোক, ভাষা ও সঙ্গীতের সেই যাদু। যে যুগে কবি এখন পৌঁছেছেন, সেই যুগে সেই সুর আর বাজে না। এখন যে-সুর তিনি শুনতে পাচ্ছেন তারা কেউ তাঁর চেনা নয়।

> বাহিরিনু হেথা হতে
> উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রখর রাজপথে
> জনতার মাঝখানে।—কোথা যাও, পান্থ,
> কোথা যাও।
> আমি নহি পরিচিত, মোর পানে
> ফিরিয়া তাকাও।

একদিন কল্পনার জগৎ থেকে ফিরতে চেয়েছিলেন কর্মের জগতে; আজ কর্মের জগৎ থেকে তিনি ফিরতে চান কল্পনার জগতে। সেখানেই লীলাসঙ্গিনীর আহ্বান বাজল। আহ্বান বাজল কোথায় যেখানে নতুন কবিতা, নতুন সুর— 'এখন আসিয়াছে নূতন লোকে, ধরায় নব নব রঙ্গ'। কর্মের জগৎ থেকে কাব্যের জগতে এসে নিজেকে যখন নিঃসঙ্গ বোধ করছেন, সেই সময় চিরন্তনী কবিতার চেনা সুরে আপন মনেই তিনি কাব্যরচনায় বসলেন। প্রেম ও সৌন্দর্য-রচনায় চিরন্তন আদর্শকেই তিনি বলেছেন 'চেনা সুর'।

যে নতুন কবিতা তখন লেখা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কবিতার সঙ্গে তার আপাতসাদৃশ্য থাকলেও অন্তরধর্মে যেন মিল নেই। নতুন যুগ যে-কবিতার সমাদর করে, তিনি সেরকম কবিতা লেখেননি। 'অঘোরপন্থী'র মতো তান্ত্রিক কবিতা—সে কবিতা রূপক হলেও—রবীন্দ্রনাথ লিখতেন না। সে তাঁর রুচি এবং সংস্কারেই বাধত। ঈশ্বরকে নিয়ে সে

ব্যঙ্গ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরীচিকা' 'মরুমায়ার'র দেখা গেল গীতাঞ্জলির অধ্যাত্মপ্রাণ ভক্ত কবির কাব্যাদর্শের তা ঠিক বিপরীত। বলাকায় রবীন্দ্রনাথ যৌবনের জয়ধ্বনি করেছেন কিন্তু নজরুলের কাব্যের অসংযত মুখরতা মুক্তিহীন ভাবাবেগ তাঁর কবিতা-বোধকে পীড়িত করবেই। যাঁরা বলেন—

> যে আনন্দ আন্দোলিত সুগন্ধ বন্দিত
> স্নিগ্ধ চুম্বন-তৃষ্ণার
> বঙ্কিম-গ্রীবার ভঙ্গে অপাঙ্গে জঙ্ঘায়
> লীলায়িত কটিতটে ও কটু ভ্রূকুটিতে
> চম্পা-অঙ্গুলিতে
> পুরুষ পীড়নতলে যে আনন্দ কম্প্র মুহ্যমান
> গাব সেই আনন্দের গান।

রবীন্দ্রনাথ সেই তীব্র বাসনাতপ্ত কবিতার আদর্শকে গ্রহণ করতে পারেন না। নতুন যে-সাহিত্যকে তিনি গড়ে উঠতে দেখেছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রভাবাদর্শের সহমর্মিতা থাকার কথা নয়। বাংলা কবিতার একটা পালা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। এরা কি যুগের হাওয়ায় চিরন্তন কাব্যকে ভুলে গেল? আজ কবিতা নতুন কালে তার সাথী খুঁজে বেড়াচ্ছে—

> কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
> কাজের কক্ষকোণে।
> সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
> তব খেলাপ্রাঙ্গণে।

সাময়িকতার উত্তেজনায় বিস্মৃত চিরন্তনী কবিতা তার সাথী খুঁজে খুঁজে শেষে আমাদের কর্মব্যস্ত কবির কাছেই এল, তাঁর কাজের কক্ষকোণ থেকে উন্মুক্ত আকাশতলে ঘরছাড়া দিশাহারা স্বপ্নমগ্ন চিরন্তন কবিদের দলেই ডেকে নিয়ে গেল।

'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায় শেষ দিকটি বিষণ্ণ। মনে রাখতে হবে কবিতাটি রচিত হয়েছে কলকাতায় নানা কাজের মধ্যে। বিদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এসেছেন রাজার সম্মান নিয়ে, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ভারত পরিভ্রমণ করে এসেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, চীনযাত্রার আমন্ত্রণ এসেছে। তাঁর কর্মজীবনের গৌরবমুহূর্তে কবিকণ্ঠে বাজল বিষণ্ণতার সুর—

> দেখ না কি হায়, বেলা চলে যায়
> সারা হয়ে এল দিন।
> বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
> শেষ রাগিণীর বীণ্।

এ-বিষণ্ণতা কর্মক্লান্তির নয়, কাব্যজগতের। কাব্যের জগতে কবি দেখছেন তাঁর দিন কি শেষ হয়ে এসেছে—চিরন্তনতার জায়গায় ক্ষণিকতার জায়গায়?

তবু মনে রাখতে হবে নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে কবির মনে কোনো দ্বিধা নেই। কবিতার যে আদর্শকে তিনি সত্য বলে মনে করেছেন তার থেকে তিনি বিচলিত হননি। কবিতা লেখার সময় ক্ষণিকতার মোহে ভ্রষ্ট হননি তিনি, তিনি চিরন্তনী কবিতাকেই ডাক দিয়েছেন। সেই তাঁর লীলাসঙ্গিনী। আজকের কবিরা তাকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানেন কাব্যের শাশ্বত আদর্শ কখনোই মলিন হবে না। লীলাসঙ্গিনী লেখার চার মাস আগে লেখা 'তপোভঙ্গ'র (কার্তিক ১৩৩০) কবির এ-বিশ্বাসের প্রমাণ আছে। সৌন্দর্য ও প্রেমের চিরন্তন আবর্তন-লীলার রূপকারই কবি। সুন্দরকে অবজ্ঞা করে স্থূলতার ছন্দোরূপ যারা রচনা করে তারা রবীন্দ্রনাথের কাছে বরমাল্য পায়নি। কাব্যের আদর্শ তা নয়, একথা রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই জানতেন—

• I have read some modern writing in which the coming out of the stars in the evening is described as the sudden eruption of disease in the bloated body of darkness. The writer seems afraid to own the feeling of a cool purity in the star-sprinkled night which is usual, lest he should be found out as commonplace. From the point of view of realism the image may not be wholly inappropriate and may be considered as outrageously virile in its unshrinking incivility. But this is not art.

The Religion of an Artist, 1924

এখানে রবীন্দ্রনাথ কোন কবির কবিতার কথা বলছেন ঠিক জানি না তবে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় এরকম রুগ্ণ চিত্রকল্প আছে—

> দিনান্তে যবে ব্যর্থ যে রবি অস্তশিখর পরে,
> ছেঁড়া মেঘ পাতি মৃত্যুশয়ন রক্তবমন করে,
> ওঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী গান;
> রাত্রি আসিয়া ঢেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান।
> সেই রাত্রির তারায় তারায় জ্বলে অসংখ্য জ্বালা,
> আঁধার আঁচলে নিশার অশ্রু উষার শিশির মালা।
>
> —কবির কাব্য মরুশিখা

রবীন্দ্রনাথ কবিতার চিরন্তনতার ব্যাখ্যা করেছেন নানা উপলক্ষে। যে সময়ে পূরবীর কবিতা লেখা শুরু হয় সেই সময় থেকেই তিনি একাধিক ভাষণে, প্রবন্ধে আর্টের তত্ত্ব বুঝিয়ে বলেছেন। ঠিক এ-সময়ে লেখা তিনটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি' লীলাসঙ্গিনী রচনার কয়েক দিনের মধ্যেই লেখা হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই তিনটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন, পরে তারা 'সাহিত্যের পথে'তে সংকলিত হয়েছে। 'তপোভঙ্গ' এবং 'লীলাসঙ্গিনী' সাহিত্যের পথের প্রবন্ধগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত তাতে সন্দেহ নেই। 'তপোভঙ্গ' সাহিত্যের নিত্য আদর্শকে কাব্যরূপ দিয়েছে আর লীলাসঙ্গিনীতে পাই কবির আপন সৃষ্টির গূঢ় ইঙ্গিত, সেই সঙ্গে আভাসে জানিয়েছেন নতুন সাহিত্যান্দোলনে তাঁর নিঃসঙ্গ কথা।

কণ্টকল্লিত
অতুল্য ঘোষ

(নবপর্যায়)

॥ ৮ ॥

'হ্যাঁ রে, তুই সকালে এলি না কেন?'

'আহা, কি করে যাব? মায়ের তো অসুখ!'

'অঃ, কি রাঁধলি?'

'ভাত, মাছের ঝোল, আলু-বেগুন-উচ্ছের তরকারি, আলুভাজা আর বেগুনভাজা।'

শিশু উদ্যানের দুটি সভ্যার মধ্যে কথা হচ্ছিল। আমার সঙ্গে নয়—নিজেদের মধ্যে। তবে তাদের অজ্ঞাতে আমি সবই শুনতে পাচ্ছিলুম। তারপর তারা খেলায় চলে গেল। খেলার মধ্যে মধ্যে অনেক ছেলেমেয়ে আমার কাছে এসে বসে। জল খাবার নাম করে ছুটি নিয়ে আসে। যে মেয়ে দুটি কথা বলছিল, তাদের বয়স এগারো থেকে বারোর মধ্যে। খানিকক্ষণ বাদে যে মেয়েটি রান্না করেছিল, আমার কাছে এসে বসল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'হ্যাঁ রে, অতরকম রান্না করলি কেন?' সে ঠোঁট উলটে বলল, 'বাব্বাঃ, তা নইলে বাবুদের রুচবে না!' 'বাবু'রা কারা জিজ্ঞেস করায় বলল, 'কেন, দাদারা!' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তোর দাদারা রাঁধে না?' মেয়েটি হিহি করে হেসে উত্তর দিল, 'দাদারা রাঁধবে! তারা জল গড়িয়ে খেতে পারে না!'

সেদিন দিল্লীর একটি পাক্ষিক পত্র ওলটাতে ওলটাতে দেখলুম যে, একটি চব্বিশ বছরের মেয়েকে নাকি তার শাশুড়ী এবং ননদ কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়েছে। হাসপাতালে পাঁচ দিন মরণের সঙ্গে লড়াই করবার পর মেয়েটি তার মৃত্যুকালে শাশুড়ী এবং ননদের কথা বলে গেছে। মেয়েটিকে পুড়িয়ে মারবার কারণ—মেয়েটির পরিবার তার বিয়ের সময়ে যথোচিত পণ দিতে পারেনি। বিয়ের সময়ে তারা দিয়েছিল একটি টিভি সেট, পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র, একটি বড় আলমারি, ডানলোপিলো, চীনেমাটির ও স্টেনলেস স্টীলের ভাল বাসনপত্র। সত্যিই তো, গুরুতর অপরাধ! মধ্যবিত্ত ঘর থেকে মেয়েটি এসেছে। এই সামান্য যৌতুকে কি করে হবে? তাই তাকে প্রাণ দিতে হল। এই কাগজেই বেরিয়েছে যে, ১৯৭৫ সালে তিন শো মেয়েকে এইভাবে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। আবার ১৯৭৮-এ দিল্লী পুলিসের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, দু শো মেয়েকে এইভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়। পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরের সময়ে জানা যায় যে, সাতটির মধ্যে তিনটি অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয় এবং তিনজন গ্রেপ্তার হয়। আর বাকি সবাই মুক্তি পায়। পত্রিকাটিতে আরও ঘটনার উল্লেখ আছে। অনেকে হয়তো অবাক হবেন যে, সত্তর দশকের শেষার্ধে এখনও এসব ঘটনা কি করে ঘটছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পরেও মেয়েরা এখনও অবহেলিত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত।

ভারতবর্ষে বামপন্থী আছেন, মধ্যপন্থী আছেন, দক্ষিণপন্থী আছেন। কিন্তু এসব সামাজিক কলঙ্ক কোন পন্থীরই মনকে এখনও স্পর্শ করতে পারেনি। নির্বাচনী ইস্তাহার বেরোয়, সব রাজনৈতিক দলই বড় বড় আদর্শের কথা তুলে ধরেন—কিন্তু ভারতবর্ষের নারী-সমাজ এখনও অবহেলিত। সংস্কৃত শ্লোকে এবং কথায় আমরা মেয়েদের 'মহতোমহীয়ান' মা—এই আখ্যা দিই। কাব্যে, উপন্যাসে, ছোট গল্পে মেয়েদের প্রতি অনাদরের কথা যত না আছে, আদরের কথা তার চেয়ে বেশী আছে। কিন্তু বাস্তবে একেবারে অন্য কথা।

অনেক দিন আগেকার কথা মনে পড়ছে। একটি মেয়ে লেখাপড়ায় ভাল। সে অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তার ভাই, সরস্বতীর সঙ্গে যার শত্রুতা, লেখাপড়া মোটেই করে না, সে খেলাধুলো করে এসে বলল, 'আই দিদি, জল দে।' মেয়েটি তাড়াতাড়ি রোগশয্যা থেকে উঠে জল এনে দিল। এই হচ্ছে নিয়ম। ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, গরীব, দারিদ্র্যসীমার যারা নীচে—সব সমাজেই এই নিয়ম। হয়তো ইতরবিশেষ আছে। স্বতই প্রশ্ন জাগে, ভারত-

বর্ষকে যখন ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা হচ্ছে তখনও কি এইসব নিয়ম বহাল থাকবে? মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সংসারে এ তো রোজকার ঘটনা যে, পুরুষের উচ্ছিষ্ট পাতে স্ত্রী মেয়ে বোন অতি সমাদরে আহার্য গ্রহণ করে। প্রতিবাদ করলে বলে—এই-ই নিয়ম। আমাদের ছেলেবেলায় যা দেখেছি, সত্তর বছর বাদেও তার বিশেষ পরিবর্তন দেখছি না। ভাল ভাল খাবার এলে পুরুষদের খাইয়ে যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে মেয়েরা পায়। অনেক জায়গাতেই একটা প্রথা চালু আছে যে, মাছের মুড়োর দিকটা ছেলেদের, আর ল্যাজের দিক যেদিকটা কাটায় ভর্তি, সেদিকটা মেয়েদের। বাড়ির যিনি গৃহিণী, তিনি সন্তান প্রসব করবেন, আর বাড়ির সব কাজকর্ম করবেন। তাঁর অসুখ হলে বাড়িতে যদি কোন মেয়ে থাকে, তা হলে তার আর রক্ষা নেই। তার যত কম বয়সই হোক, তাকে রান্নাবান্না, ঘরের সব কাজ করতে হবে। বাড়ির পুরুষরা—তা সে ছেলেই হোক আর বুড়োই হোক—তারা রান্নাঘরে ঢুকবেই না। তা সে ফেন গালতেই হোক, আর ভাত বাড়তেই হোক। এই নিয়ম।

বামপন্থীরা নাকি দেশের আপামর জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করতে চান। ভাল কথা। দারিদ্র্য এবং ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা দূর করতে চান। বামপন্থীরা তো অন্য সব দলকে আদর্শহীন ও অন্যান্য সব অভিধানবহির্ভূত ভাষায় অভিহিত করেন। বেশ তো—তাঁদের কথাই মেনে নেওয়া গেল। জিজ্ঞাস্য এই, তাঁরা কবে এইসব কুপ্রথা দূর করবার জন্য সচেষ্ট হবেন? ভারতবর্ষের উন্নতি অনেক হয়েছে, সেই সঙ্গে কুপ্রথাও অনেক বেড়েছে। পণপ্রথা এখন আর সমাজে ধিক্কৃত নয়। এখন বরং বিয়ের সময়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেখানো হয় যে, কন্যাপক্ষ কিরকম সব মহার্ঘ জিনিস দিয়েছে। মানুষে মানুষে বিয়ে হচ্ছে। বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছে—অবশ্য সংস্কৃতে—যে, তুমি আমি এক। কিন্তু বিয়ের সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, সর্ব ক্ষেত্রে সব সময়েই কন্যাপক্ষের অবস্থা আতুর অধমর্ণের মত। সর্বস্ব বন্ধক দিয়েও যা যোগাড় করেছে, তাতেও বুঝি ঠিক দেওয়া হয়নি। আর পাত্রপক্ষ বুক ফুলিয়ে সমাজের সকলকে ডেকে দেখান যে, তাঁরা কতটা শোষণ করতে পেরেছেন। লজ্জা নেই, নিন্দা-ভয় নেই, সমালোচনা নেই। এই হল নিয়ম। যে বাপ সর্বস্বান্ত হয়ে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর যদি একটি ছেলে থাকে, তা হলে তাঁরও লক্ষ্য হচ্ছে যে, ছেলের বিয়ের সময়ে আর একটি মেয়ের বাপকে সর্বস্বান্ত করা। যে ছেলে বিয়ে করছে, সে যদি এম এসসি পাসও হয়, আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ তরুণ কর্মী হয় তা হলেও তার মনে এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে কোন সঙ্কোচ, কোন ঘৃণা বা লজ্জা নেই। পরিবারের সঙ্গে আদর্শবাদ নিয়ে হয়তো অনেক ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু পণপ্রথার ক্ষেত্রে একেবারে বিনয়-নম্র, পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আদর্শ ছেলে। এই হল নিয়ম।

'সতীদাহ' আমাদের দেশ থেকে উঠে গেছে। সতীদাহ বন্ধের চেষ্টা মোগল সম্রাটরা করেছিলেন। রামমোহনের আগে ইংরাজ রাজপুরুষরাও কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু রামমোহনের চেষ্টাই সার্থক হয়ে ওঠে। 'সতীদাহ' বন্ধ হয়েছে। কিন্তু তার জায়গা নিয়েছে 'বধূদাহ' ও 'পত্নীদাহ'। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ—আমরা এখন সভ্য। এখন আর ঠগ, বোম্বেটে—এসব নেই। কিন্তু 'বধূদাহ' ও 'পত্নীদাহ' এখন সগৌরবে বিরাজমান। আবার সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, এসব ঘটনা অধিকাংশই ঘটে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে এ ব্যাপারে খানিকটা এগিয়েও সবটা এগোতে পারেননি। শরৎচন্দ্রের মত লেখকও তাঁর 'স্বামী' বইতে বড় বউ বাপের বাড়ি থেকে বেশী গহনা আনতে পারেনি বলে নির্যাতিতা হচ্ছেন দেখিয়েছেন। কিন্তু শেষ অবধি স্বামীকেই মহৎ করে দেখিয়েছেন অর্থাৎ পুরুষকে। এ সম্বন্ধে কি রাজনৈতিক [illegible] অবশ্য যাঁরা নিজেদের সাচ্চা [illegible] করেন, কিছু করণীয় [illegible] না তাঁদের দায়িত্ব

কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের কল্যাণের চেষ্টা করেই শেষ হচ্ছে? আমি এখানে ঠিক বাম-পন্থী, মধ্যপন্থী, দক্ষিণপন্থীর কথা বলছি না। সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কার ও ঘৃণিত নিয়ম সম্পর্কে সব পন্থীই সমান।

পরিবারের পুরুষেরা—যাঁদের বাড়ি ঝি-চাকর নেই, তাঁরা কেন গৃহস্থালির কাজকর্মে সমান অংশ নেবেন না, এটা বোঝা শক্ত। বাড়ির বাইরে যে-সব পুরুষ বারো ঘণ্টা কাজ করেন, তাঁদের কথা তবু বোঝা যায়। আর যাঁরা দশটা-পাঁচটা অফিস করেন, মাস্টারি করেন, বা পড়েন, তাঁদের অসুবিধেটা কোথায়? বাইরে যে-সব পুরুষ দেশের সমৃদ্ধির জন্যে, ধনী-নির্ধন ও ছোট-বড়র পার্থক্য দূর করার জন্যে সত্য সত্যই পরিশ্রম করছেন, তাঁদের বাড়িতেও কিন্তু একই নিয়ম চলছে। স্ত্রী-মেয়ে-বোনের অসুখ করলেও কিন্তু তাদেরই খাটতে হয়। আদর্শ-বাদী কিন্তু খেয়ে উঠে থালাটাও পরিষ্কার করে দেন না। এ যে-কোন পরিবারের প্রাত্যহিক ঘটনা। পুরুষদের এই কলঙ্কিত জীবনযাপনের কথা পড়ে অনেকে হয়তো ক্রুদ্ধ হবেন; কিন্তু যদি ভেবে দেখেন, কিছুক্ষণের জন্যও যদি সংবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে ভেবে দেখেন, তা হলে দেখবেন যা যা লেখা হয়েছে সবই নিখাদ সত্য।

ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক পল ভালেরি এক জায়গায় লিখেছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা যে, মেয়েদের মধ্যে যদিও দু-একজন মহীয়সী সম্রাজ্ঞী বেরিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক বেরিয়েছেন, কিন্তু মেয়েদের কাছে যেটা আশা করা যায়, গানের জগতে অথবা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন মহিলাই বিশেষ নাম করতে পারেননি। পল ভালেরি পণ্ডিত লোক—তিনি আশ্চর্য হয়েছেন। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই! পুরুষশাসিত এই পৃথিবীতে তো বরাবরই মেয়েদের অমানুষ করে রাখা হয়েছে এবং তাদের শেখানো হয়েছে যে, তারা পুরুষের চেয়ে ঢের নীচু স্তরের। সেই আদিম যুগে, যখন আমাদের পূর্বপুরুষরা গুহায় থাকত, যখন তাদের অনেক স্ত্রী ছিল, তখনও পুরুষে পুরুষে মারামারি করে যে জিতত, স্ত্রীরা তারই সম্পত্তি হয়ে যেত। অর্থাৎ স্ত্রীরা ছিল নিশ্চল সম্পত্তির মত। নিশ্চল সম্পত্তি যেমন জয়ী পুরুষের হাতে যেত; স্ত্রীরাও তেমনি যেত। আমাদের দেশেই এই উপাখ্যান আছে যে, খনা পরম পণ্ডিত শ্বশুরের ভুল ধরেছিলেন বলে নিজের জিব নিজেই কেটে ফেলেন। আর সে কোন যুগে? —যখন কাব্যে-সাহিত্যে-বাণিজ্যে সব দিক দিয়েই ভারতবর্ষ মহাসমৃদ্ধ। এই ধারাই চলে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী—যখন 'বাংলার স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত, তখন সেই স্বর্ণযুগের অনেক সুবিখ্যাত ব্যক্তি সকলেই বাগানবাড়ি যেতেন, বারাঙ্গনা রাখতেন, এবং তাতে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা হ্রাস হত না। আবার তাঁদেরই বাড়ির মেয়েরা ছিলেন অসূর্য-ম্পশ্যা। পরপুরুষ স্পর্শ করা দূরে থাক, পরপুরুষ দেখলেও তাঁদের পাপ হত। এখনও সেই মানসিক অবস্থাই আছে, তবে বাধ্য হয়ে কিছু মেয়েকে সম্মতি দেওয়া হচ্ছে চাকরির—তবে মনে কিন্তু ক্ষোভ রেখে। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, স্ত্রী-পুরুষের এই পার্থক্য বজায় রেখে দেশের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হচ্ছে না কি? তা হলে তার কোন সদুত্তর নেই।

আমাদের দেশের এক কবি লিখেছেন, 'না জাগিলে আর ভারতললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না, জাগে না।' তিনি লিখেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার বত্রিশ বছর পরে এখনও সেই অবস্থাই আছে। বিস্মিত হই এ কথা ভেবে যে, মেয়েরা কেন এর প্রতিবিধানের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন না। সমাজে দুর্নাম দেবে? দিক। উচ্ছৃঙ্খল বলবে? বলুক। পরিবারের সর্বনাশ হবে? হোক। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তো অনেক পরিবারের সর্বনাশ হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে ইউরোপ আমেরিকার বহু তাজা প্রাণ নষ্ট হয়েছে, বহু পরিবার ধ্বংস হয়েছে, বহু জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তবু তো যুদ্ধ বন্ধ হয়নি! নাগাসাকি-হিরোশিমা দুটো শহরই তো ধ্বংস হয়ে গেছিল! তার পরেও এখনও তো আণবিক বোমা তৈরী হচ্ছে! দেশের স্বাধীনতার জন্য যদি সর্বস্বান্ত হওয়া যায় তা হলে মেয়ে-দের সম্মান রক্ষার জন্য কেনই বা সর্বনাশকে সহাস্য মুখে সংবর্ধনা জানানো হবে না? এখন তো বেশ কিছু মেয়ে ফুটবল খেলছে, ক্রিকেট খেলছে, পাহাড়ে উঠছে, প্যারাসুট করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালী মেয়ে গীতা চন্দ তো রেকর্ড করেছিলেন; আর সরোজিনী নাইডুকে তো বক্তৃতায় কোন পুরুষও হারাতে পারতো না। ভারতের বাইরের মেয়েদের কথা লিখলাম না। এখানে তো রানী দুর্গাবতীরও নাম আছে, রানী লক্ষ্মী বাঈয়েরও নাম আছে। আর জহরব্রতের কথা এখনও সগৌরবে স্মরণ করা হয়। জহরব্রতে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁদের মৃত্যুতে তাঁরা অসম্মানের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। আর আজকের দিনে মেয়েরা, যাঁদের কুপ্রথা, কুসংস্কার ও নানা ঘৃণিত নিয়মের জন্য রোজই মর্যাদাহানি হচ্ছে, তাঁরা প্রাণের চেয়ে বড় জিনিসকে বরণ করে নিন না—চির অশান্তি, যে অশান্তি আসবে মর্যাদা, সম্মান ও মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য। পুরুষদের দিকে চেয়ে থাকলে সমাজ থেকে এ কলঙ্ক কোন দিনই লোপ পাবে না। প্রথম এলিজাবেথের প্রেম ও প্রেমিক নিয়ে অনেক কথাই শোনা যায়। কিন্তু তাঁর বাবা অষ্টম হেনরি যে নিজের শয্যাসঙ্গিনী করার জন্য পরের পর কতগুলি মেয়েকে খুন করেছিলেন—তার বেলা! রাশিয়ান সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের কতজন শয্যাসঙ্গী হতেন, তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। আর পিটার দি গ্রেট কেমন করে জাহাজ তৈরি আরম্ভ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আরও সব ভাল ভাল কথা বেশ পরিষ্কার করে লেখা আছে। কিন্তু তাঁর যে কত শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন তার বিশেষ কোন উল্লেখই নেই। এই হল পুরুষের লেখা ইতিবৃত্ত। সেইজন্য মেয়েদেরই আজ ভাবতে হবে যে, পণপ্রথা, বধূদাহ, পত্নীদাহ, পারিবারিক কাজে পার্থক্য—এইসব কলঙ্কময় ঘটনা সমাজে আর কত দিন চলবে!

সুধাসাগর তীরে

সুরেশ চক্রবর্ত্তী

॥ ১৭ ॥

সেদিনের সকালের অনুষ্ঠানে আবদুল করিম খাঁ সাহেবের মিশ্রাকী টোড়ীর গান যে কী অনন্য-সাধারণ দীপ্তি নিয়ে পরিবেশিত হল, তা আজো স্মরণ করে অভিভূত হয়ে পড়ি—যাঁরা সেই গান শুনেছেন, হয়ত তাঁদেরও স্মৃতিতে এর অপরূপ মাধুর্য ধরা আছে। আমার মনে হচ্ছিল যে সর্বক্ষণ বদল খাঁ সাহেবকে সম্মুখে রেখে আবদুল করিম যেন সুরের ধ্যানমূর্তির আরতি করে যাচ্ছেন, তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করে পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে সুরের গভীরতর গহনে অবতীর্ণ হচ্ছেন। আর বদল খাঁ সাহেব সেই যে শান্ত, ঋজুদেহ নিয়ে উপবেশন করেছেন, যতক্ষণ গান হচ্ছিল, নিশ্চল হয়ে বসে আছেন, ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি নিয়ে—তুলনা করতে পারি "নিবাত-নিষ্কম্প-দীপশিখা ইব।" যখন হলফ্ তান দেখা দিচ্ছে, তখন বদল খাঁ সাহেব একটু নড়ে চড়ে উঠছেন, তাছাড়া আর কোনও শব্দ বা নড়াচড়া নেই। তাঁর যে কাশির উপদ্রব ছিল, যাতে পনেরো মিনিটও নিঃশব্দে বসে থাকা সম্ভব হত না, সেই কাশি বা কণ্ঠস্বরের অস্বস্তি সব যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাঁকে লক্ষ করছিলাম, আর ভাবছি কী পর্যায়ের শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ ও স্বরসংযমের অভ্যাসে এই গুণ অর্জন করেছিলেন তিনি। আসরে প্রবেশ করবার পূর্ব পর্যন্ত ঘন ঘন কাশির কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু যেই সংগীত আরম্ভ হল, আর তার চিহ্নমাত্র নেই—আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলাম আমাকে যেন বিপদে পড়তে না হয়। খাঁ সাহেব পুণ্যাত্মা, অন্তর্যামী, তাই তাঁর অলোকসামান্য শ্বাসনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে বাক্‌শক্তিহীন হয়ে গেলাম।

টোড়ীর পর আবদুল করিম ভৈরবীর বিখ্যাত গান—"জমনাকে তীর" গাইতে শুরু করলেন, আর সেই সুরের যাদুতে সবাই যেন নেশায় উত্তাল হয়ে উঠলো—প্রতিটি হরকৎ, লচাও-এর কাজে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী বিহ্বল হয়ে হায় হায় করে উঠছে, বদল খাঁ সাহেবেরও অল্প অল্প শিরঃসঞ্চালন হচ্ছে। রেকর্ডে যা গান করেছেন, আবদুল করিম খাঁ যেন তার অনেক ঊর্ধে চলে গিয়েছেন, সবাই মনে করছে এ রকমটি আর শুনতে পাব না। পূর্ণ আড়াই ঘন্টা গান করে খাঁ সাহেব সুরের জাল গুটিয়ে আনলেন, সমস্ত আসর ভৈরবীর সুরে মগ্ন হয়ে আছে, সময়ের কথা কারো স্মরণে আসছে না। ধীরে ধীরে খাঁ সাহেব বদল খাঁ সাহেবকে আদাব জানিয়ে মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন—একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে শ্রোতারা তাঁকে অভিবাদন জানালো। আমার মনে হল খাঁ সাহেব যদি আরো দু'তিন ঘণ্টা গাইতেন, সমস্ত শ্রোতারাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা-আদি মানবিক প্রয়োজন বোধরহিত হয়ে মুগ্ধ আনন্দে বসে থাকতেন!

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা বদল খাঁ সাহেবকে নিয়ে—অনেক মহারথীরাই তখন তাঁদের গাড়ি নিয়ে খাঁ সাহেবকে পৌঁছে দিতে উদগ্রীব, কিন্তু খাঁ সাহেব সর্বক্ষণ লক্ষ রাখছেন, আমি কোথায় রয়েছি। সবাইকে সরিয়ে আমাকে বললেন রিক্‌শা বোলাও বেটা। আমি প্রায় গেটের কাছেই এক রিক্‌শাকে ধরলাম—দেখি সে খাঁ সাহেবকে ভালোই চেনে। লম্বা কুর্নিশ দিয়ে, নিজের গামছা দিয়ে আসনটা মুছে খাঁ সাহেবকে তশরীফ রাখতে অনুরোধ জানালো খাঁ সাহেবও ধীরে ধীরে উঠে বসলেন, আর আমাকে পাশে বসতে বললেন। রিক্‌শাওয়ালাকে পথনির্দেশ করতেই সে বলে উঠলো—ওস্তাদকো ডেরা হমে মালুম হৈ। বুঝলাম, এরাও খাঁ সাহেবের কৃপাধন্য হয়ে থাকে, তা ছাড়া সে ছিল মুসলমান, ঐ কলা-বাগান বস্তি এলাকাতেই থাকে, সুতরাং খাঁ সাহেব তো তাদের মুর্শীদের সামিল, তাঁর সেবা করতে পারলে তারা কৃতার্থ মনে করে। রিকশায় যেতে যেতে এবং তারপরে ঘরে পৌঁছে বদল খাঁ সাহেব যে কটি কথা আমাকে বলেছিলেন, তা সকল সংগীত-শিক্ষার্থীরই প্রণিধানযোগ্য।

আবদুল করিম খাঁ সাহেবের সুরের সিদ্ধিলাভ হয়েছে, এটা স্পষ্টই স্বীকার করলেন খাঁ সাহেব; তাঁর ভাষায় বহ্ সুরমে পাক্কা হো গয়া। বহ্ জো পঞ্চম য়া ধৈবত বোলেঙ্গে, বহী সাচ্চা পঞ্চম য়া ধৈবত হৈ, তুমহারা যন্তরসে নহী মিলে তো যন্তরকী গলত্, লেকিন গলাকে নহী। তবে একটা মন্তব্য করেছিলেন, সেটাও এ প্রসঙ্গে বলে রাখতে চাই। খ্যালের তরীকা বা চেহারা কতকটা বদলে নিয়েছেন আবদুল করিম, সুর তাঁকে সাধনার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু খ্যাল গানের মধ্যে যে দাপট, ভারী তানের কারুকার্য, কণ্ঠস্বরের বোলন্দ আওয়াজ, এটা কিছু খর্ব হয়েছে। তাছাড়া কর্ণাটকী সংগীতের পরিবেশে কিরানা ঘরানার আসলরূপ থেকে একটু সরে গিয়েছে। সমস্ত কিছু মিলে যে খাঁ সাহেব খুব পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত বোধ করছিলেন, তা তাঁর মুখের ভাব থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল। ঘরে ঢুকবার আগে রিক্‌শাওয়ালা বলল, ওস্তাদ, আমি হোটেলে খবর দিয়ে দিচ্ছি, আপনার খানা দিয়ে যাবে—বাবুজীর জন্যও কি দিতে বলব? আমি বললাম, না, না, তার দরকার নেই, আমার বাড়ি খুব কাছেই, ফিরে না গেলে বাড়িতে ভাববে। রিক্‌শাওয়ালা চলে গেল পর খাঁ সাহেব ঐ মিশ্রাকী টোড়ীর গান আমাকে শোনাতে বসলেন—কী জবরদস্ত সব তান আর তার আনোখা প্যাঁচ—আমি তো বুঝতেই পারছি না, এই বয়সে এই কণ্ঠে কী করে এসব বের হচ্ছে। মাঝে মাঝে হলফ্ তান দেখাচ্ছেন, তার দানা সব যেন কামানের গোলার মতন মনে হচ্ছে! সেসব কাজ যৌবনকালেও ওঠাতে পারিনি, আজ এই বার্ধক্যের কূলে এসে আরো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে রিক্‌শাওয়ালা ফিরে এলো, সঙ্গে হোটেলের একটি ভৃত্য খাঁ সাহেবের খানা নিয়ে। এরা এত শ্রদ্ধা করত খাঁ সাহেবকে যে রিক্‌শাওয়ালা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিল, পয়সা দিতে চাইলাম, বলল—আপ হামারা বুজুর্গকা সাথ আয়ে, পৈসা কিস্‌তরে লেঙ্গে? লক্ষ করেছিলাম, খাঁ সাহেব যখন ও পাড়ার ভিতর দিয়ে রিক্‌শায় যাচ্ছিলেন, দু'পাশের লোক, দোকানদার, হোটেলওয়ালা, সবাই সেলাম জানাচ্ছিল। তাঁরা খাঁ সাহেবদের পর্যায়ের লোকদের সম্মান না করাকে গুনাহ্ মনে করে।

আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই কথাই বারবার মনে হচ্ছে যে কী সৌভাগ্যই করেছিলাম পূর্বজন্মে যে ভারতের অস্তাচলগত সূর্য বদল খাঁ ও অস্তগমনোন্মুখ সূর্য আবদুল করিম দুই মহাপুরুষের সাহচর্য এত ঘনিষ্ঠ ভাবে লাভ করেছিলাম, আর আমার মত সামান্য লোক এই গুণীদের মধ্যে শেষ যোগসূত্র স্থাপিত করতে পেরেছিল। এটাই এই জীবনের পরম প্রাপ্তি, গভীর সার্থকতায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

এই কনফারেন্সের শেষ দিন রাত্রির অধিবেশনে একটু খুব সামান্য বিচ্যুতি ঘটেছিল আর আবদুল করিম খাঁ এবং পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের সংগীত পরিবেশন নিয়ে অল্প আলোচনা করেছিলেন নাটোরের মহারাজা স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ রায়। প্রথমে একটু অসুবিধা হল, কে কখন গাইবে, তাই নিয়ে। অবশ্য প্রোগ্রামে ছাপা ছিল—আখেরী গান গাইবেন, খান সাহেব আবদুল করিম খাঁ, কিন্তু কোনও কোনও ব্যবস্থাপক বললেন, আখেরী প্রোগ্রাম পণ্ডিতজীকে দেওয়া হোক। আবদুল করিম খাঁ মধ্যবর্তী সময়ে গাইতে সম্মত হলেন না, কারণ শোনা গেল তাঁর অঙ্গীকারপত্র (কনট্রাক্ট) এভাবেই রচিত হয়েছিল যে সময় রাত্রির শেষ প্রহরেই হোক, বা পরদিন প্রাতঃকালেই হোক, শেষ অনুষ্ঠানের আখেরী গান তিনিই গাইবেন। ব্যাপারটা নিয়ে যখন কথাবার্তা চলছে, তখন অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল যে আবদুল করিম খাঁ আর গান করবেন না, তিনি যন্ত্রপাতি বাঁধাছাঁদা করতে আদেশ দিয়েছেন। তখন নাটোরের মহারাজার কানেও কথাটা এল আর তিনি উঠে মঞ্চের পেছনে ব্যবস্থাপকদের কাছে গিয়ে বললেন, "কী ছেলেমানুষী করছ তোমরা, কনট্রাক্ট মতন গাইতে দিতে হবে, নইলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।" তাঁর হস্তক্ষেপে এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি হলো না, অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম মতনই চলতে লাগল।

মধ্যরাত্রিতে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর গাইতে বসলেন—তাঁর গানের বিস্তার, ছন্দ ও লয়ের কারুকার্যে আসরে সবাই মুগ্ধ হয়ে, নিস্তব্ধ আসনে বসে শুনছেন আর উপভোগ করছেন পরম আনন্দ। পণ্ডিতজী অনেকক্ষণ গাইবার পর প্রশ্ন করলেন—আজ তো আমাদের শেষদিনের অনুষ্ঠান, আপনারা কি আমার কাছে কোনও বিশিষ্ট রাগ শুনতে চান, তাহলে আমি তা আমার সাধ্যমত পরিবেশন করতে চেষ্টা করব। আমরা যথারীতি কয়েকজন একেবারে সম্মুখের আসনে নাটোরের মহারাজার পাশেই বসেছিলাম, মহারাজা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, পণ্ডিতজী জরা মালকৌস তো সুনাইয়ে। পণ্ডিতজী সহাস্যমুখে স্বীকার করে নিলেন আর তানপুরার পঞ্চমকে মধ্যম করে নিয়ে মালকৌশ ধরলেন। এর আগে যে রাগ গাইছিলেন, (যতদূর মনে পড়ে পূরিয়া) তার সঙ্গে মালকৌশের স্বর-সংস্থানের অনেক প্রভেদ তাছাড়া আগের গানটা খুব জমেছিল, সেই রাগ তখনো যেন আসরের মধ্যে গুঞ্জন করছে, তাই খুব ধীরে ধীরে পণ্ডিতজী সেই রাগকে সরিয়ে নতুন রাগ মালকৌশকে আবাহন করছেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে গান করছেন, এভাবে দ্া ণ্া সা, দ্া ণ্া সা জ্ঞা -া সা দ্া দ্া ণ্া সা—মালকৌশ যেন তখনো ধরা ছোঁয়া দিচ্ছে না, এসেও আসছে না, যখন মধ্যমে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন যেন মালকৌশ পূর্ণ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হল। মহারাজা খুব নিবিষ্ট চিত্তে রাগ-ব্যঞ্জনার গতিপ্রকৃতি অনুভব করছেন আর তাঁর চোখমুখ রসের জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠছে, এটাও লক্ষ করছি। খুব জমাটী করে পণ্ডিতজী মালকৌশের বিলম্বিত ও দ্রুত গান শেষ করছেন, নানা রকম তান, গমক, হলক—সব কিছু নিয়ে মালকৌশ রাগরূপের মূর্তিতে অধিষ্ঠান হল। আরো দু'একজন শিল্পীর গান ও তন্ত্রবাদ্য হবার পর এবার আসর শেষ হবার পালা—আবদুল করিম খাঁ সাহেব সকলকে আদাব জানিয়ে মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন। তানপুরা, তবলা, সারেঙ্গী মেলানো-ই ছিল, তাই গান আরম্ভ করতে কোনও বিলম্বই হলো না। আজ শেষদিন খাঁ সাহেবও কলকাতার জনসাধারণের কাছ থেকে বিদায় নেবেন, হয়ত রসিকজনহৃদয় থেকে দূরে সরে যাবেন, এই চিন্তা ও ধারণা তাঁর মনকে ব্যথিত করছিল তাই আজ খাঁ সাহেবের মধুক্ষরা কণ্ঠ থেকে যেন সুরের বেদনা, আকুতি, স্বপ্ন-মদির রস ঝরে পড়ছিল, শ্রোতৃবৃন্দ অপরিসীম আনন্দের গভীরে মগ্ন হয়ে আছেন—আমরা তো সে রাত্রির গানের কথা জীবনেও ভুলতে পারিনি। তাছাড়া আজো মনে পড়লে আরো দুঃখ হয় যে এবার কলকাতা থেকে যাবার পরে আর খাঁ সাহেবের দেখা আমরা পাইনি, এর কিছুদিন পরেই মিরাজ থেকে পন্ডিচেরী যাবার সময় মধ্য স্টেশনে শরীর অসুস্থ হয়ে তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়েন এবং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই গান করতে করতে তাঁর ইন্তিকাল (মৃত্যু) ঘটে।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর

খাঁ সাহেব প্রথম গান অনেকক্ষণ ধরে গাইলেন আর সুরের আভায় যেন সমগ্র মহ্‌ফিল ঝকমক করছে। তারপরে তিনিও সকলের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন ও বললেন—আবার কবে কলকাতা আসব, জানি না—এবারের স্মৃতি আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকবে; আপনাদের প্রেম, প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য আমি শিরোধার্য করে নিলাম। যদি কোনও রাগ আমার কাছে শুনতে চান, আর আমার তা জানা থাকে, আমি আপনাদের শুনিয়ে বিদায় নেব। এবারেও মহারাজা উঠে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করলেন, খাঁ সাহেব একবার আপকী মালকৌস তো সুনাইয়ে। ঐসব সংগীত মহ্‌ফিলের দস্তুরি ছিল একই রাগ দুজন গুণী এক আসরে গান করেন না, কতকটা শিল্পীর এথিক্‌স্‌ বিচার করে। মহারাজার একই রাগ শোনবার অনুরোধ আমাদের যেন একটু বিভ্রান্ত করল—এটা কেমন বা-কায়দা ফরমায়েশ হল? যাহোক কোনও ইথিক্যাল তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়ে খাঁ সাহেব তানপুরার পঞ্চমকে মধ্যমে নামিয়ে নিলেন আর অনেকক্ষণ তানপুরা ছাড়বার পরে যেভাবে সুরকে আবাহন করলেন, তা আজো স্মরণে রয়েছে। এর আগের রাগ ছিল খুব সম্ভব "পরজ বসন্ত" তারই সুরের রেশ সমস্ত গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। খাঁ সাহেব সুরু করলেন: মা, মা, জ্ঞা-মা-জ্ঞা-সা" —আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল পূর্বের রাগ মিলিয়ে গিয়ে শুধু মালকৌশ-ই আবির্ভূত হল সকলের নয়নসমক্ষে। মহারাজা তাঁর পার্শ্ববর্তী বন্ধুকে বলছিলেন—দেখলে তো শিল্পীমনের কাণ্ড-কারখানা, —মুহূর্তের মধ্যে অন্য রাগ অন্তর্ধান করে গেল কীভাবে? শিল্পীর মনের গহনে সুরের খেলা কীভাবে চলতে থাকে, আমরা শ্রোতৃবৃন্দ কী করে তার হদিস পাব? ওটা ওঁদেরই কাজ—কতকটা আদায় হয় মেহনতে, বেশিটা হয় কুদ্‌রতে (ঐশ্বরিক ক্ষমতায়)—শিল্পীর সুরের ধ্যানসমাধি থেকে আশীর্বাদ নেমে আসে তাঁর কণ্ঠে, কল্পনায় ও পরিবেশনে। এর আনাগোনার রহস্য বা পথঘাট আমাদের জানা নেই।

কেউ যেন মনে না করেন, আমি দুজনার কোনও রকম তুলনা করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে বসেছি—কারণ উভয়েই সংগীতের পরম বিদগ্ধ পুরুষ, সার্থক শিল্পী ও অবিসংবাদীরূপে সুর সাধনায় সিদ্ধ। তাছাড়া একদিনের গানে কখনো কোনও বিচার সম্ভব নয়, তুলনামূলক কথাবার্তা বলা তো আমাদের পক্ষে আস্পর্ধার সামিল হবে—শিল্পীর জীবনে এ-রকম চমক কখন, কোনদিক দিয়ে আবির্ভূত হবে, তা হয়ত শিল্পী নিজেই জানেন না।

বহুদিন পরে অমিয়নাথের সঙ্গে নাটোরের মহারাজার গৃহে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গ তুলেছিলাম, —তিনি স্মিতমুখে বললেন—"বহ জমানা চলা গিয়া, এসব শিল্পীরা এক সময়েই জন্ম নেন, পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, সাধনার বিস্তৃতি—সব কিছু নিয়ে সংগীত ও শিল্পের গতি-ধারা পরিবর্তন করে নতুন যুগের উদ্বোধন করে যান,—আবার এই galaxy of artistes কাছাকাছি সময়েই অন্তর্হিত হন,—এসব ঠিক চলে sine-curve-এর প্যাটার্নে। ভবিষ্যতে আবার কখন এঁরা আবির্ভূত হয়ে তুঙ্গস্থানে অধিরোহণ করবেন, আমরাই বা সে সময় কোন পারিষদ দলে থাকব, তাই বা কে জানে? যা পেয়েছ শুনেছ ও দেখেছ, তাদের মধ্য দিয়েই পূর্ণতার আস্বাদ লাভ কর।"

বহুদিন পূর্বে আমার গুরুদেব ভীষ্মদেবের বলরাম দে স্ট্রীটের গৃহে তখনকার একজন সুপ্রসিদ্ধ সারেঙ্গীবাদক পণ্ডিত গৌরীশংকর মিশ্র (এঁর ছেলের নাম ছিল চাম্মু) আমাদের কাছে আর এক সুরসাধক অসামান্য প্রতিভাধর শিল্পীর গল্প করেছিলেন,—তাঁর নাম রহমৎ খাঁ (বড়ে মহম্মদ খাঁ সাহেবের ভ্রাতা)। পুণার নিকটবর্তী ছত্রপতি শিবাজীর কোনও বংশধরের গৃহে তাঁরা মহ্‌ফিল করতে গিয়েছিলেন, অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে রহমৎ খাঁকে দেখতে পান। সারেঙ্গী বাজাবার সময় মিশিরজীর হাত থেকে যন্ত্রটা টেনে নিয়ে খুব অল্প স্বল্প কান মুচড়ে যে সুর বেঁধে দিয়েছিলেন, সে রকম সুরে মিশিরজী কখনো বাজান নি, এটা স্পষ্টই স্বীকার করেছিলেন। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর খাঁ সাহেব দয়া করে একটু গান করে শোনান, তা তাঁদের কানে এখনো লেগে রয়েছে। ঐ সময় খাঁ সাহেব বলেছেন—গলার তানবাজী, চক্কর, সব রিওয়াজ করলেই অর্জন করা যায়, কিন্তু সাচ্চা সুর ভগবানের আশীর্বাদ ভিন্ন হবার জো নেই। এই দেখো, আমি অঙ্গুলী হেলাচ্ছি—আর তিন সপ্তক তান চলে যাচ্ছে—এসব তো মেহনতের খেলা, কিন্তু সুরকে পেলাম কই? ওটা রিওয়াজে ঠিক আদায় হয় না,—তার জন্য খোদার কাছে মোনাজাত (প্রার্থনা) করতে হবে।

অমিয়নাথ সান্যালের "স্মৃতির অতলে" গ্রন্থে এই রহমৎ খাঁ সাহেব ও মৌজুদ্দীনের মুলাকাত প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, তাতে খাঁ সাহেবের এই অদ্ভুত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধরা রয়েছে। ঐ আসরেরও মধ্যমণি ছিলেন, আমাদের সবাকার বুজুর্গ বদল খাঁ সাহেব। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভ্রম সংশোধন

২৮ জুলাই ১৯৭৯-এর 'দেশ' পত্রিকায় "সুধা সাগরতীরে" রচনার মধ্যে ভীষ্মদেবের মৃত্যুর তারিখ ভুল ছাপা হয়েছে এজন্য আমরা দুঃখিত। সঠিক তারিখ হবে ৮ই আগস্ট, ১৯৭৭।

চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের রঙীন পূজাবার্ষিকী আনন্দলোক

৬টি সম্পূর্ণ উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী
বিমল মিত্র
প্রতিভা বসু
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সমরেশ মজুমদার
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিশেষ প্রবন্ধ

সত্যজিৎ রায়
সেবাব্রত গুপ্ত
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
বাসু ভট্টাচার্য

বিশেষ রচনা

রবিশঙ্কর—কিছু দেখা, কিছু শোনা।

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'রাগ-অনুরাগ'-এর পরিসমাপ্তি 'কিছু দেখা, কিছু শোনা।' রবিশঙ্কর বাংলা, হিন্দি ও বিদেশী বহু ছবির সংগীত-পরিচালক। তিনি আবাল্য ভারতীয়, য়ুরোপীয়, আমেরিকান ছবির অনুরক্ত দর্শক। দেশী-বিদেশী ফিল্ম ও ফিল্ম সংগীত সম্পর্কে রবিশঙ্করের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি নিয়ে লেখা 'কিছু দেখা, কিছু শোনা'। সত্যজিৎ রায়ের প্রথম চারটি ছবির সংগীত পরিচালনার স্মৃতিচারণাও রয়েছে এই অসাধারণ লেখাটিতে।

অবসরহীন অশোককুমার—অশোককুমারের চলচ্চিত্র জীবনের ওপর দীর্ঘ রচনা।

একদা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়িকা সুমিত্রাদেবীর ওপর বড় লেখা।

অন্যান্য রচনা

বোমবাইয়ে বাঙ্গালীঃ কলকাতার শিল্পী, যাঁরা বোমবাইয়ে গেছেন, যেমন রাখী, মৌসুমী, মালা সিনহা, মিঠুন চক্রবর্তী ও উত্তমকুমার, এঁরা কেন বোমবাই গেলেন, সেখানে কী পেলেন?

জীনাত আমন ও হেমা মালিনী—দুই দৃষ্টিভঙ্গীর দুই নায়িকাকে নিয়ে নতুন ধরনের লেখা।

নিজের অভিনয় প্রসঙ্গে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করেছেন দিলীপকুমার, দেব আনন্দ ও ধর্মেন্দ্র।

১২.০০/রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪.৯০

আপনার কপির জন্য আজই এজেন্টকে বলে রাখুন বা আমাদের লিখুন ঃ
সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০১

AAL/CAS-6/79 BEN

প্রমোদকর

দীপালি দত্তরায়

বিবেক শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলো ফোন বাজছে। দু-চার সেকেন্ড পর বিপাশার উঠে গিয়ে ফোন ধরাও বুঝতে পারল। বিপাশা অনেক ভোরে ওঠে। একা বসে চা খায়, কাগজ পড়ে—ছেলেমেয়েদের তদারকি—সংসারের এটা ওটা। এখন ফোন। প্রায়ই ওর ফোন আসে।

বিবেক ওঠে অনেক পরে। ঘুম ভাঙে সকাল সকালই। তবু ঘুমের জড়তা, আর আলস্য কাটতে চায় না। বিপাশা আগে, ওকেও খোঁচাখুঁচি করে ওঠাতে চেষ্টা করত। বিবেকের ঘুমকাতুরে ভাব, আলস্য, এসব আর যাবে না ভেবে এখন ডাকাডাকি ছেড়েছে। বিবেক বিছানায় শুয়ে শুয়েই বিপাশার খুটুরখাটুর টের পায়। কখনো কখনো আবার নতুন ঘুমে তলিয়ে যায়।

আজকাল—কতদিন হবে? বছর খানেক? এই ভোর বেলায় ফোন আসছে প্রায়ই। বিপাশারই ফোন। খুবই পরিচিত লোকের কাছ থেকে। ফোনটা যেখানে, সেখান থেকে মৃদু কথার আভাষ পাওয়া যায় মাত্র। মুখ দেখা যায় না। বিপাশাও এ সময়টাতে খুব আস্তে আস্তে কথা বলে। পাশে এসে না দাঁড়ালে, কিছুই শোনা বা বোঝা যায় না।

বিপাশা কথা বলে যাচ্ছে। বিবেক মাথা তুলে, কান পাততে চেষ্টা করল। শোনা গেল না। শুধু বোঝা গেল, রিসিভার এখনও ওর কানেই ধরা আছে। সেই যন্ত্রণাটা ফিরে এল আবার। যা ওর এই সকালগুলি বিষিয়ে দিচ্ছে। অসহ করে তুলছে সব কিছু। আগে রাগ হত। এখন হয় না। শুধু বিষাদ আসে। রাগ নিষ্ফল। এ নিয়ে কিছু বললেও বিপাশা শোনে না।

তেমন কিছু করে নিজেকে ছোট করতেও ইচ্ছা করে না। তা ছাড়া—নিয়মিত ফোন আসা নিয়ে বিরক্তি অসোয়াস্তি আসতে পারে। আর কি করা যায়? হঠাৎ যদি কারো সামাজিকতাবোধ একটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়—তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা অথবা খিটিরমিটির করা যেতে পারে। ও সবই করা হয়েছে। একঘেয়ে আচরণ বিপাশার পছন্দ হতে পারে—বিবেকের হয় না।

তাছাড়া অন্যদিকেও কিছু করার উপায় নেই। বিপাশার যদি রুচিতে না বাধে, এ চলতেই থাকবে। স্বামী হিসেবে, সঙ্গী হিসেবে, বিবেক কবে থেকে বিপাশাকে এমন নিরাশ করতে শুরু করল, অথবা, এ তা নয়—সম্পূর্ণ অন্য কিছু—বিবেক কিছুই ভেবে পায় না। নিয়মিত ভোরবেলায় ফোন, বিসদৃশ ঠিকই। কিন্তু এটা কি শুধু তাই? নাকি এর নীচে অন্য কোনও টানের ব্যাপার আছে, সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব নয়। হলেও হতে পারে, নাও হতে পারে।

বিবেকের ভূমিকাটা এখানে কি তবে? যদি বা ধরে নেয়া যায়, সে ভিলেন নয় এক্ষেত্রে! নায়ক তো নয়ই! তবে কি শুধু দর্শক? না পার্শ্বচর? এই দৃশ্যে, কোনও ডায়লগবিহীন, বল্লম অথবা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী? কিংবা সামনে পড়ে থাকা কোনও মৃত সৈনিক? যে আসল জীবনে নায়িকার স্বামী—অথচ, এ দৃশ্যে, মৃত অবস্থায়, রাজাটাজা জাতীয় এক মস্ত পুরুষের সঙ্গে তার স্ত্রীর, কোনও জমজমাট প্রণয় দৃশ্য সহ্য করে যাচ্ছে—কাহিনীর প্রয়োজনে? দৃশ্যের সঙ্গতিতে, নির্দেশকের শত নিষেধ সত্ত্বেও, উপযুক্তভাবে অনুভূতিহীন হতে পারছে না?

এসব নাটকীয় কথাবার্তাও না হয় ছেড়ে দেয়া গেল। হারজিৎ, ছোট বড়, রাজা প্রজা, এসবও ছাড়া গেল। এতবড় একজন বয়স্ক লোক রোজ ডেকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, সহানুভূতি আদায় করতে চাইছে—মনোযোগ এবং আর কি—ওরাই জানে (বিপাশা কি আর সব কথা বলে?) চাইছে, এ অনুভূতির ঐশ্বর্য বিপাশা অবহেলা করতে পারছে না, সেটাই বিশ্বাস করা ভালো নয় কি?

তবু যন্ত্রণা আসে। ওর নিষ্ক্রিয়তা ওদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে পেরেও ছটফটানি বাড়ছে বিবেকের। অথচ কি করার আছে তার? বিপাশাই পারে থামতে। কিন্তু বিপাশা নির্বোধ। একজন, হোক বয়স্ক—পুরুষের এই নিঃসঙ্গতা দূর করার এই সাগ্রহ ইচ্ছা ও সহানুভূতি ওকে কোথায় কতদূরে নিয়ে যেতে পারে—সেটা বুঝতে পারছে না। বিবেক কিছু বললেও, বিবেকের হৃদয়হীনতার কথা তুলে খোঁটা দিচ্ছে।

তাই কৌতুক আর তাচ্ছিল্য মেশানো সুরেই জিজ্ঞেস করতে হয়, 'কার ফোন ছিল? হিজ হাইনেসের? আজ কি বলছিল আবার?' বিপাশা এড়ানো জবাব দেয়—'ঐ একই কথা! লোন্‌লিনেস—মন খারাপ। নতুন কথা আর কি বলবে?' তারপর আবার একটু খোঁচা দেয়া—'ভদ্রলোক কথা বলার লোক পান না, অথচ কথা বলতে ভালোবাসেন। গীতাদির সঙ্গে খুব গল্প করতেন তো? ওঁদের খুব ভাব ছিল।'

অর্থাৎ বিবেক আর ওর সঙ্গে বেশী গল্প করে না। ওদের দুজনে ভাব নেই বিপাশারও কথা বলতে ভালো লাগে—তাই বলে। 'তোমাদের অফিসের কথাবার্তাও কিছু কিছু শুনি ওঁর কাছে। তুমি তো বল না?' বিবেক একটু রাগ দেখায়। 'এসব কথা তোমার সঙ্গে বলার দরকার কি ওঁর? অফিসের কথা শুনে তোমার কি লাভ?'

'সবাই কিছু লাভের কথা ভেবেই কাজ করে না। এমনি এমনি গল্প করার জন্যও লোকে অনেক কথা বলে। তাছাড়া—উনি যদি বলতে থাকেন—আমি কি বলব—আপনি থামুন তো? উনি বিরক্ত হলে তোমারই ক্ষতি।' বিপাশা আবার খোঁচা দেয়। অর্থাৎ বিবেকের কেরিয়ারের কথা ভেবেই ও এসব সহ্য করে। বিবেক জেনেও ভান করে জানে না বোঝে না—এই ধরনের মুখের ভাব হয়ে ওঠে বিপাশার।

বিবেক চুপ করে যায়। এ নিয়ে কথা বাড়াতে তার ভালো লাগে না। বিশেষ

করে সে যখন সত্যিই, এ বিষয়ে তার করণীয় কি, বুঝে উঠতে পারছে না, তখন কি-ই বা বলার আছে? আর বিপাশা এটা ঠিকই বোঝে। তাই যত খুশী আদিখ্যেতা দেখিয়ে যাচ্ছে॥ বিবেককে জ্বালিয়ে যাচ্ছে। ধিক্কারও দিচ্ছে যেন। ভাবখানা—'দেখি বন্ধ করো কি করে! বন্ধ করতে গেলে, তোমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে না? পারবে চাকরির মায়া ছাড়তে? ওসব জানা আছে!'

শরীর জ্বালা করে ওঠে ওর॥ তবু কি করবে, ভেবে পায় না। বিপাশার নষ্টামি বন্ধ করার উপায় কি একমাত্র চাকরি ছেড়ে দেয়া? নাকি তার এই চাকরির ওপরেই এখন বিপাশার বিরাগ! কবে থেকে? বিবেকের ডিরেকটারের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার পর থেকেই কি বিপাশার বিবেকের এই পোস্টের ওপর তাচ্ছিল্য? অবজ্ঞা? ওঁর যা বয়স সে বয়সে পৌঁছে বিবেকও ডিরেক্টার হয়ে যাবে না—এমন কথা কি এখনই জোর দিয়ে বলা যায়? কি চায় বিপাশা? কি আশা করে বসে আছে? সেনগুপ্ত বড় অফিসার। একটা কম্পেনীর ডিরেক্টার॥ বিবেকদের এই বিরাট কম্পেনীর, বিরাট একটা ডিপার্ট-মেণ্টের ডিরেক্টার। সেই সূত্রে, ক্ষমতার নেশা ধরেছে ওর? ঐ রকম একটা জবরদস্ত লোককে হাসিতে বিরাগে হাসানো কাঁদানো? সামান্য কিছু দিয়ে, অনেক প্রশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা? লোক দেখানো ফাদার ফিগার? নাকি মুরোডিয় রাবিশ কিছু?

বিবেক ভালো মতন কিছু বুঝতে পারছে না। তাই অবাক হচ্ছে বেশী॥ ওর যে প্রশ্রয়েরও নেশা ধরেছে, সেটাই শুধু বুঝতে পারে॥ সবাই মিলে কেবল প্রশ্রয় দিয়ে যাও। কিছু চেয়ো না। বিবেচনা তো নাই॥ বিবেকের অসহায় অবস্থা নিয়ে শুধু খেলা করতে চায় ও॥ মাঝে মাঝে ভোরবেলা টেলিফোনে কথা বলে যাওয়া, কখনো সখনো ছেলেমেয়ে, ঘরসংসারের নাবিকহীন অবস্থায় একটু সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠানো, পার্টি টার্টিতে দেখা হলেই পিতৃব্য সুলভ একটু জড়িয়ে ধরা, গালে মাথায় হাত বুলোন ঐ বয়স্ক লোকের তরফ থেকে॥ এরই ভিত্তিতে ডিরেক্টারের সঙ্গে বিশ্রী ঝগড়া অথবা শাসানি টাসানি—এসব কি সম্ভব? বিপাশা না গলে গেলেই তো পারে? এতটা দাবী ওর ওপরে নেই ওঁর, একথা অন্যভাবে বুঝিয়ে দিলেই পারে?

এতদিন, এতে ও কিছু সত্যিই মনে করেনি। বিপাশার উনি বাবার বয়সী না হলেও কাকা মামার বয়সী তো হবেনই। স্নেহ প্রবণতায় এসব করে থাকতে পারেন, এই ভেবেই এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি॥ কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে॥ প্রায় রোজই ভোরবেলায়, বিবেক যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন ফিস্‌ফিস্ করে কথাবার্তা বলা—আর তারপরই বিপাশার আহ্লাদী আহ্লাদী মুখ করে থাকা? বিবেকের যেন ও-ই বস্—এই ভাব নিয়ে চলা?

শরীর, মন জ্বলে নাকি? ভদ্রলোক যদি বেসামাল হনই, বিপাশাও হবে? ভদ্রলোক বিপত্নীক। বয়সটাও খারাপ। কিন্তু বিপাশার তো স্বামী সংসার সবই আছে? সংসারের তরফ থেকে, স্বামীর তরফ থেকে, তেমন অভাব অভিযোগেরও কোনও কারণ নেই? দুনিয়ার যত বিপত্নীক দুঃখী বয়স্ক লোকের নিঃসঙ্গতা কি বিপাশা তার সহানুভূতি আর অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে দূর করার কথা ভাবছে?

প্রথম যখন, ভদ্রলোকের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন সত্যিই তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো মানবিক কর্তব্য ছিল॥ ঐ অতবড় একটা লোক কি অসহায় ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, সেটা বিবেকই প্রথমে দেখেছিল। তারপর বিবেকই বিপাশাকে নিয়ে গিয়েছে তাঁদের কাছে সাহায্য সান্ত্বনা, সমবেদনা জানাবার জন্য। বিপদে আপদে আজকাল কেউ কাছে ঘেঁষলেও আলগোছে থোকে। বিবেকের বিবেকই তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে সাহায্যের জন্য॥

তারপর, মিসেস সেনগুপ্তে মারা যাবার পরও এসেছে গিয়েছে। ওরা দুজনে মিলেই ভেঙে পড়া মানুষটাকে, অনেকখানি সামাল দেবার চেষ্টা করেছে॥ সমস্ত অফিসের লোকই তখন সেনগুপ্তের শোক দেখে অভিভূত। সকলে মিলে কি করে তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেয়, ভুলিয়ে রাখতে পারে, সেই চেষ্টাতে মগ্ন। সেনগুপ্তের গুণমুগ্ধ সকলেই॥ তাঁর অপরিসীম কর্মদক্ষতা ও অমায়িক ব্যবহারের সুনাম বহু বিস্তৃত। অসংখ্য লোক তাঁর কাছে কোনও না কোও সময়ে কিছু না কিছু সাহায্য পেয়েছে।

আজ উনি যা করছেন, তাঁর এক অদ্ভুত, স্খলিত মানসিক অবস্থায়, তা নিয়ে কারো কাছে কথা তুললে কেউ বিশ্বাস করবে? বিবেক নিজেই কি কিছুদিন আগেও বিশ্বাস করতে পারত? বিবেকও তাঁর কাছে কত আনুকূল্য পেয়েছে। এই বছর দেড়েক আগে, বিবেকের একটা অকল্পনীয় প্রোমোশন হয়ে গেল, তাঁরই কৃপায়॥ তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় বিবেকের মন পূর্ণ। ঠিক কথা—সে এবং বিপাশা তাঁর দুর্দিনে, তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যথাসম্ভব সাহায্য ও সেবা করেছিল। কিন্তু সে তো কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে নয়?

সে ছিল, প্রায় প্রত্যেক কম্পেনীরই বড় বড় ডিপার্টমেণ্টে যেমন অনেকজন মিড্‌ল্ লেভেল একজিকিউটিভ থাকে তাদেরই একজন। হয়তো, অন্যদের চেয়ে কিছু বেশী উজ্জ্বল, কর্মনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী॥ কিন্তু ওর সিনিয়র দু তিনজন ছিলেন যাঁরা ভেবেই রেখেছিলেন যে তাঁদের ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজার মিঃ চ্যাটার্জি রিটায়ার করলে অ্যাসিস্টেণ্ট মিঃ বোস হবেন ম্যানেজার এবং তাঁদেরই একজন অ্যাসিস্টেণ্ট-ম্যানেজার। মিঃ বোসের রিটায়ারমেণ্টের আর মাত্র তিন বছর বাকী॥ অতএব তারপরেই ম্যানেজার॥ কিন্তু কোথা থেকে বিবেককে বেছে নিয়ে সেনগুপ্ত বসালেন অ্যাসিস্টেণ্টের জায়গায়॥

সমস্ত অফিস, বিশেষ করে ওদের ডিপার্টমেণ্ট—এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত মুখর হয়ে উঠেছিল। বিবেক ব্যানার্জির গোপনে তৈলদানের হাতযশ, এবং সেনগুপ্তের নেক্‌নজরের যথেষ্ট নিন্দামন্দ হয়েছিল॥ ঈর্ষা গোপন করে, আবার

তারাই, নিজেদের হাত মসৃণ ও তৈলাসিক্ত করতে তৎপর হয়েছে। বিগ বস্ বোসও এ-অবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন। যখনই কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি অথবা ডিপার্টমেন্টাল গাফিলতির তলব হয়, কোনও বিশেষ সুবিধার প্রয়োজন হয়, বিগ বস্ ওকেই ঠেলে দেন সেনগুপ্তর কাছে।

বিবেক মৃদু আপত্তি জানালে, কেন ওকেই যত অসুবিধার ব্যাপার নিয়ে সেনগুপ্তর সংগে ডিল করতে হবে এ প্রশ্ন তুললে, বোস বলেন, 'কারণ তোমার সংগেই ওঁর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বেটার। কমিউনিকেশন ক্লিয়ার। আমার আবার ভ্রূকুটি টুকুটি দেখলেই মাথা গরম হয়ে যায়। বড় ব্যাপার হলে তো আমি আছিই, আফটার অল রেসপন্সিবিলিটি যখন আমার। এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে ডিল করতে করতেই তো তুমি শিখবে।'

অগত্যা বিবেককেই এগিয়ে যেতে হয়। এবং বলা বাহুল্য, সামান্য খিটিমিটি ছাড়া অল্পতেই তুষ্ট হয়ে পড়েন, ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টার, মিঃ এম কে সেনগুপ্ত। মাঝে মাঝে বিবেকের খুঁটিনাটি বোঝার এবং বোঝাবার অনায়াস ক্ষমতা দেখে প্রশংসাসূচক 'হুঁ'! আচ্ছা—আই সীই—। বাট আই শ্যুড হ্যাভ বীন ইনফরমড বিফোর!' ইত্যাদিও বলেন। তারপর আরো জিজ্ঞাসা এবং তারপরও 'দিস বোস —অওয়ার ম্যানেজার—' মাথা নাড়েন সেনগুপ্ত। 'হিজ শিপ-শড্ ম্যানার অব ওয়ার্কিং নেভার অ্যাপীলড্ টু মী। আ—ওয়েল, হার্ডলি টু মোর ইয়ারস্—! দেন হী রিটায়ারস্—অ্যান্ড দেন—' বলে অর্থপূর্ণ ভাবে তাকান বিবেকের দিকে। ডেলিবারেট ইনডিসক্রিশন? না ক্যালকুলেটেড ফ-পা?' বিবেক অবাক হয় তার বসের সম্বন্ধে, এ ধরনের কথা তার কাছে বলার অর্থ খোঁজে। অবশ্য প্রথম দিকে এ ধরনের কথা শুনলে ওর বুক ফুলে উঠত। মনে অসম্ভব উদ্যম আসত। এই সবে—একচল্লিশ বছর বয়স হয়েছে ওর, আর এখনই এখানে এসে পেঁছেছে। বোস তো বোধহয় আটচল্লিশের আগে আসেন নি। তাও কতদিন এক জায়গায় থাকলেন। আর বিবেক—আরো বছর তিনেকের মধ্যেই আরো ওপরে উঠে যাবে। আঃ—

আজকাল কেমন একটা ভয় জাগছে যেন। ও কি একটা খরগোশ হয়ে গেছে, সেনগুপ্তর চোখে? আর তাই উনি একটা সুন্দর চকচকে তাজা গাজর দুলিয়ে যাচ্ছেন ওর চোখের সামনে? 'ধরো তো—ধরো তো—ধরতে পারলে না তো? দূর অপদার্থ তুমি!' এই মনোভাব নিয়ে? আবার সেও কি, কখন অজানতে একটা অমনি গাজর সেনগুপ্তর চোখের সামনেও দোলাতে শুরু করেছে? যে গাজরটার ওপর ওর কোনও কনট্রোল নেই—যে গাজরটা যে কোনও মুহূর্তে নিজের শক্তি নিয়ে টুপ্ করে পড়ে যেতে পারে সেনগুপ্তের মুখের মধ্যে? তার তো তেমন কোনও প্রয়োজন ছিল না? কে তুলে দিল এটা ওর হাতে? বিপাশা? কেন?

শরীরটাকে টেনেটুনে বিছানার ওপরে তুলে বসল বিবেক। তারপর নেমে একটু এদিকে এল। বিপাশা এখনও কথা বলে যাচ্ছে ফোনে। বিরক্ত মুখ নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল ও। সকালবেলায়—আহা কি মধুর দৃশ্য! তোমার বউ, তোমার বসেরও বসের সঙ্গে গুনগুন্ করে কি বলে যাচ্ছে আর শুনে যাচ্ছে। শুনে যাচ্ছে—শুনে যাচ্ছে! আশ্চর্য—লজ্জাও নেই। একবার বলেও না—'আচ্ছা রাখি?'

কি বলে—কি বলে ওরা? কি শোনে বিপাশা? শুধু প্যানপ্যানানি? কেউ ওসব এতবার করে শুনতে পারে? কেউ শুধু ওই কথাই বলে যেত পারে? বলার তারতম্যে কি ওই সব কথাই বিশেষ কথা হয়ে যায়? নাকি একজনের আরেক-জনকে ভালোলাগার জন্যই ভালো লাগে? মিসেস্ বিপাশা ব্যানার্জি—বিবেক ব্যানার্জির স্ত্রী—দুই ছেলেমেয়ের মা—ঐ বুড়ো মণীন্দ্র সেনগুপ্তের কোন কথা শুনে এত আকৃষ্ট হয়? কোন সাহসে শোনে? কোন সাহসে ঐ বুড়ো সেনগুপ্ত, বিবেকের স্ত্রীর এত ঘনিষ্ঠ মনোযোগের ওপর দাবী জানায়! বারবার—বারবার?

এক-এক সময় বিবেকের মনে হয় সব বাঁধ আড়াল ভেঙে ফেলে ডেকে আনে ঐ সেনগুপ্তকে ঘরের ভেতরে। বারবার নেমন্তন্ন করে পালিয়ে যায় অন্য কোথাও। হয়ে যাক্ এসপার ওসপার। কিন্তু তাতে তার কি লাভ? টেলিফোন আরো বাড়বে ছাড়া কমবে না। বিপাশা আরো বেপরোয়া হবে। বিবেকের মুখ বিতৃষ্ণায় বিকৃত হয়ে যায়। বিপাশা ভাবে ওর ধরনধারণ খুব আধুনিক বলে, ও যথেচ্ছ ধরনের পারমিসিভ। সেই সুযোগই নিচ্ছে বিপাশা?

ম্যানেজার হতে হলে তো এমনিতেই হবে। যদি না কাজে ও নিতান্তই ক্রমাগত ভুল করে যেতে থাকে। অথচ বিপাশার হাবভাব যেন ওই ওর দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে পড়েছে। সেনগুপ্তর জন্ম সম্বন্ধে ইঙ্গিতময় একটি গালাগালি দিল ও। আচ্ছা আজ যদি বিবেক বিপাশাকে ডিভোর্স করে তা হলে কি দাঁড়াবে ব্যাপারটা? যদি, ও বলে 'চলে যাও ডিরেকটার গিন্নী হতে। পোস্টটা তো খালিই আছে।' কি করবে বিপাশা? আর সেনগুপ্ত কি তখনও টেলিফোন চালিয়ে যাবে?'

'লাইফ হেল্!' বিবেক নিজের মনেই বলল। অত কাঁচা ওরা! ওকে হাতিয়ার করেই খেলছে ওরা—আবার ওই আড়াল। ও সরে গেলে সাহস হবে না দুজনের একজনেরও কিছু করার। সেনগুপ্তর সমাজে মান সম্মান নেই? ডিপার্ট-মেন্টের একটা এক্জেকিউটিভের ডিভোর্সড্ বউকে বিয়ে করলেই হল?

আর বিপাশার অত সাহসই নেই। একটা হোমরাচোমরা লোককে নিয়ে একটু খুনসুটি করে বিবেককে জ্বালানো আর বস্ করার মজাই সে উপভোগ করতে চাইছে। ন্যাকামি! যাচ্ছেতাই! মুখটুখ ধুয়ে বিবেক বারান্দায় এসে বসল।

কাগজটা টেনে নিল। বিপাশাও টেলিফোন সেরে এসে বসেছে। চায়ের ট্রে সামনে। চা ঢালছে। মুখের ভাব একটু স্বভাবিক ভাবেই উৎফুল্ল। বিবেক আড়চোখ চেয়ে দেখল।

কাগজ পড়ায় মন দিল এবার। দিল্লীতে কি যে চলেছে। মোরারজী বিদেশ সফরে গেছেন। এদিকে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা চলছে ক্যাবিনেট এবং জনতা দলে। মসনদের প্রতি কতজনের যে লোভ। নোংরা দলবাজী। দূর—কাগজ পড়তে ভাল লাগে না। তবু পড়তে হয়। রাজার ইচ্ছাই প্রজার জীবন। কে রাখেন, কে মারেন, যার যার নিজ নিজ জীবনধারণের সংকটে সে সম্বন্ধে অবহিত থাকতেই হয়।

'কে ফোন করেছিল?' চায়ের কাপ নিতে নিতে বিবেক জানতে চাইল। 'কে আবার?' বিপাশার বিরক্তিমাখা জবাব শুনে বিবেক মুখ তুলে চাইল। বিরক্তিটা প্রশ্নের জন্য না ফোনের জন্য বোঝা গেল না। আবার জিজ্ঞেস করল 'তার মানে?' 'তোমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক—আবার কে?' বিপাশা এবার একটু স্পষ্ট হবার চেষ্টা করল। 'সেনগুপ্ত?' 'ঠিক চিনেছ তো?' বিপাশা, বিতৃষ্ণা আর বিদ্রূপ মেশানো গলায় বলল।

কার প্রতি বিতৃষ্ণা? কিসের জন্য বিদ্রূপ? বিবেক বুঝতে পারল না। ওর দিকে চেয়ে থেকেই আবার জিজ্ঞেস করল 'কি চায় ও? রোজ এত ভোরে ফোন? এত ভোরে মানুষের কি এত কথা থাকতে পারে?' বিপাশা বিরক্ত গলায় বলল 'কি আবার চাইবে? ভোরে ছাড়া কখন ফোন করবে? অফিস থেকে? আরো ভালো হবে তা হলে।' 'খারাপ কিছু বলছে নাকি?' বিবেক একটু চিন্তিত গলায় বলল।

'কি জানি কি খারাপ আর কি ভালো। রোজ রোজ এই প্যান-প্যানানি শুনতে একটুও ভালো লাগে না। জ্বালা হয়েছে আমার।' বিপাশার গলায় এবার রাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। বিবেক এবার আবার কাগজে মন দিয়ে বলল—'কথা না বললেই পারো। ওর গলা শুনলেই রিসিভার রেখে দিলেই পারো?' 'আবার করবে না? হাড় জ্বালিয়ে খেল।' বিবেক আর কিছু বলল না—বলল না, রিসিভারটা তারপর তুলেও রাখা যায় কানেকশন কাটা অবস্থায়।

ওর চোখের সামনে শুধু একটা কিছুদিন আগের পার্টির দৃশ্য ভেসে উঠল। সেনগুপ্ত বিপাশার একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলছেন 'বাঃ তোমার শাড়িটা তো ভারী সুন্দর? চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায়।' আর বিপাশা খুশিতে ডগোমগো হয়ে বলছে—'আপনাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে এ স্যুটটাতে। নতুন?'

অসহ্য! ভেবে বিবেক ওখান থেকে সরে পড়েছিল। বিপাশা সেদিন একটা রুপোলী জরিপাড় চাঁপাফুল রং-এর শাড়ি পরেছিল। চাঁপা ফুলের গন্ধ-রং দুটোই অসহ্য লাগে বিবেকের কাছে। সাধারণত বিপাশা কি পরে বেরোয় না বেরোয় তা নিয়ে ও কিছু বলে না। সেদিন বলেছিল—'এটা কি একটা শাড়ি পরেছ? জঘন্য! বদলে ফেল।' 'কেন? খারাপ কি? এখন আর বদলাবার সময় নেই' বলে বিপাশা ওটাই পরে এসেছে।

আর সেই শাড়িরই গুণগান করছেন সেনগুপ্ত। বিপাশা কেমন দৃষ্টি নিয়ে বিবেকের দিকে চাইল তখন। ও চলে আসার পরও বিবেক জানে, বিপাশা সেনগুপ্তকে বলেছে, বিবেকের এই রংটা একেবারেই পছন্দ নয়। আর তার জবাবে সেনগুপ্ত কি বলেছেন তাও সে অনুমান করতে পারে অনায়াসে। সবাই কি সব কিছু অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারে? না না—তুমি এই রংটাই [illegible] বেশী করে। ভারী মিষ্টি লাগে তোমায়।' এবং তা শুনে বিপাশার কি অবস্থা হয়েছিল, তাও সে আন্দাজ করতে পারে।

অ্যাপ্রিসিয়েশন! এই একটা কথা আজকাল মেয়েদের বীজমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে! মেয়েদের ইগোকে কি চমৎকার আহার যুগিয়ে যাচ্ছে এই একটা কথা। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা কি ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে—যেখানে হোক সেখানেই, অ্যাপ্রিশিয়েশন পাবার জন্য। যতই বুদ্ধিমতী হোক, ঐ একটি কথার টোপ গিলবেই। আর টোপ নিয়ে জ্ঞানত এবং অজ্ঞানত পুরুষ অষ্ট প্রহর তৈরী।

আজ হঠাৎ বিপাশার মুখে ঐ কথা শুনে তাই একটু অবাক হয়ে আবার ওর মুখের দিকে চাইল। অভিনয়? 'তোমার জন্যই তো আসকারা পাচ্ছেন ভদ্রলোক।' বিপাশা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল। 'আমার জন্য?' বিবেক আরো অবাক।

'তা নয় তো কি? তুমি তো ভালোবাস শুধু তোমার কেরিয়ারকে, আর তোমার বউকে তাই উনি এভাবে ফোন করে জ্বালিয়ে মারেন। উনি কি আর বোঝেন না তোমার কাছে আমার কতটুকু দাম? চাকরি যাবার ভয়ে, তুমি সব সহ্য করে যাবে—তা উনি ঠিকই জানেন।' বাজিয়ে দেখছে বিপাশা? চেয়ে রইল বিবেক ওর দিকে।

'জানেন—তাই না?' বিবেক অদ্ভুত গলায় বলল এখন। 'আর তুমি? তুমিও তাই জানো—কি বলো? তাই স্বামীর অনিষ্ট যাতে না হয় সেই জন্যই ওর জ্বালাতন সহ্য করো! সত্যি বিপাশা—আমি যে তোমার কাছে কত ঋণী বলার নয়!'

'বিদ্রূপই করো আর, যাই করো ব্যাপারটা যে সত্যি তা তুমিও জানো। জেনেও ন্যাকা সেজে বসে থাকো। আমি কিছু বুঝি না? আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে আপত্তি দেখি না—যত বড় বড় কথা অন্যের বেলায়।'

বিপাশার কথা শুনে বিবেকের শরীর কেমন কুঁকড়ে গেল। কি সহজে এবং অনায়াসে এ ধরনের কথাগুলি বিপাশা বলে যায়। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে যে ধরনের ঘটনা নাটক নভেলের প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে থাকতো সে তাই আজো আঁকড়ে ধরে বসে আছে। আর সেই ধারণা থেকেই ভাবছে, বিবেককেও ওর আচরণের

পেল না। বিপাশা ওর খালি হয়ে যাওয়া কাপটা টেনে নিয়ে আবার চা ঢালছে। তারপর ওটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের খালি কাপটাতেও চা ঢালতে লাগল। বিবেক এলানো ভঙ্গীতেই কাপটা তুলে, মুখের কাছে ধরল।

ভালোবাসা! সেটা কি জিনিস—বিপাশা বোঝে কি? ফ্লার্টিং-এর নেশায় ও উন্মত্ত। এর পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে—এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে সংসারের কত ক্ষতি হয়ে যেতে পারে—তার আভাস কি ও পায়? কোথায় কত দূরে যাওয়া যায়, কখন অন্যের সম্মানের কথা ভাবতে হয়, কোথায় থামতে হয় সসম্মানে, সে বিষয়ে কোনও জ্ঞান ও চাতুর্য কি ওর আছে? নেই বলেই তো বিবেক ওকে এত আলগা দিয়েও ঘিরে রাখে। বিপাশা যে তারই স্ত্রী।

'আচ্ছা বিপাশা—এসব কথা তোমার বলতে খুব ভালো লাগে না? ভাবতে ভালো লাগে, তোমার প্রতি মুগ্ধ হয়েছেন বলে আমার চাকরিতে উন্নতির ব্যাপারটাতে সেনগুপ্ত খুব মনোযোগ দেবেন?' 'তা ছাড়া আবার কি? এত ভালো আর বড় কম্পেনীতে, এত তাড়াতাড়ি উন্নতি আর কিসের জন্য হবে? কে সাহায্য করবে তোমায়? সেধে অন্য জায়গায়ই বা কে তোমায় চাকরি দেবে? হাজার হাজার ডিজার্ভিং লোক রয়েছে।' বিপাশা আজকাল এত খবরও রাখছে? ব্রেন ওয়াশ করছে কেউ?

বিবেক ভাবতে চেষ্টা করল—কোনটা আগে হয়েছে। ওর প্রোমোশন—না, বিপাশা আর সেনগুপ্তর মধ্যে এভাবে ফোনে কথা বলা শুরু। মুরগী না ডিম? কোনটা আগে? না—মুরগীই আগে। অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে। তা কি ডিমের জন্যই শুধু? বিবেকের তো তা মনে হয় না। কারণও নেই। নেই কি? সেনগুপ্তর মতন অত দায়িত্বশীল, কম্পেনীর প্রতি অসীম মমতাসম্পন্ন লোক শুধু এই কারণেই, ওর দিকে নজর দেবেন? বিবেক বুঝতে পারে না। সেনগুপ্তকে এত সাধারণ মতলববাজ লোক বলে ও মনে করতে পারে না।

তাই কি বিপাশা অত গরম হয়ে থাকে? ও কি চাইছে, ওর কথা শুনে বিবেক ঘেন্নায় চাকরিটা ছেড়ে দিক? একই কম্পেনীতে স্বামী এবং—কি? যাই হোক থাকলে ওর অসুবিধা? সেনগুপ্তরও অসুবিধা? তাই কি? আজ যদি ও চাকরি সত্যিই ছেড়ে দেয়, বিপাশা কি করবে? ভাবতে চেষ্টা করল আবার। চাকরির প্রতি মায়া নেই, কেউ একথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে না। আরেকটা এ ধরনের চাকরি টপ্ করে বাগিয়ে নেওয়াও সহজ নয়। সে সে-চেষ্টাও করছে না। কেন করবে? চাকরির ক্ষেত্রে তো তার কোনও অসুবিধা নেই? সেনগুপ্ত তো ওর আরো উন্নতির চেষ্টা করছেন।

এই অবস্থায়, এখন যদি একবার বেরিয়ে যায়, সে অন্য চাকরির চেষ্টা করছে, আর কি তার কিছু হবে এখানে? ম্যানেজারের পদটি ফসকে বেরিয়ে যাবে হাত থেকে তার ফলে। মিথ্যেমিথ্যি আশাভঙ্গ আর মান নিয়ে টানাটানি। ওর প্রোমোশনের পেছনে সেনগুপ্ত থাকলেও, ওর নিজেরও কি যোগ্যতা নেই? সে নিঃস্বার্থভাবেই সেনগুপ্তর দুর্দিনে সাহায্য করেছে সেনগুপ্ত কি তা বোঝেন নি? তাঁর কত অভিজ্ঞতা—আর এটুকু বুঝবেন না? তবে এ বিষয়ে ওর বিবেকের কোনও দংশন কেন থাকবে? কেন বিপাশা ওর আত্মসম্ভ্রম আর আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিতে চায়?

ওদের মধ্যে কি ব্যাপার চলেছে—ওরাই জানে। বিবেকের এতে কোনও হাত নেই, সে কথা বিপাশার চেয়ে কে বেশী বুঝবে? তবু ও বুঝতে চায় না কেন? সেনগুপ্তও কি ভাবেন—বিবেকই তার লোভবশত এসব সহ্য করে চলেছে? উনিও কি এতই অন্ধ? না কি তিনি বিবেককে খেসারত দিয়ে যাচ্ছেন? মন খারাপ হয়ে যায়—সব কিছু বিষিয়ে যায়—বিপাশা যদি একটু বুঝতো? বোঝা দূরের কথা, উল্টে নিজেই সাগ্রহে এই অসম্মান মাথা এগিয়ে পেতে নিচ্ছে। বললেও শোনে না। চাকরি ছাড়লেই সব বিপদ কেটে যাবে? কখনোই না। তবে কেন এতদূরে এগিয়ে আজ বিবেকই বা পিছিয়ে আসবে তার কর্মজীবনের সব সার্থকতাকে নিশ্চিহ্ন করে?

বিপাশাকে নিয়ে কি আর সুখী হওয়ার আশা করা যায়? আর কি বিবেক ওর সঙ্গে নিরুদ্বেগ জীবন কাটাতে পারবে? ওর নতুন জেগে ওঠা অথবা লুকিয়ে থাকা পুরোন লোভকে ও পোষ মানাতে পারবে? মেটাতে পারবে? চাকরি ছেড়ে দিলে, বিপাশা যে তার সঙ্গে থাকবে না, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে, বিপাশার খেয়াল-খুশি মেটাবার জন্য সে কেন তার জীবনকে লণ্ডভণ্ড করে দেবে? ওর ছেলেমেয়ের জীবনে অনিশ্চয়তাকে ডেকে আনবে?

এ সব নিয়ে আর ভাবতে চায় না ও। তবু ভাবনা আসে নিজে থেকে ভীড় করে। প্রথমে তো ও হেসেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ বিপাশার ভাবগতিক ওর কৌতুককে বিরক্তিতে পরিণত করেছে। সব সময়ে আনমনা—। কথা বলতে গেলে বিরক্তি, উদাসীনতা। ছেলেমেয়ের প্রতি অবহেলা। বিবেকের চাকরির প্রতি উপহাস ও তাচ্ছিল্য। এ সমস্তই বিবেকের একে একে চোখে পড়েছে। বিবেক উদ্বিগ্নবোধ করেছে। বিপাশাও কিছু বলতে গেলে, অবজ্ঞা দেখিয়ে থামিয়ে দিয়েছে।

'তোমার মাথায় শুধু এক চিন্তা। আশ্চর্য! এত পোজেসিভ তুমি আমি জানতাম না। অথচ এদিকে দেখাও এত মডার্ন আর লিবারাল।' বিপাশার এই কথায় বিবেক কোনও অর্থ এবং সামঞ্জস্য খুঁজে পায়নি। অবশ্য, কোনও দিনই বিপাশা কোনও জিনিস তলিয়ে বুঝতে চায় না অথবা পারে না। সব কিছুই সে হালকা ইমোশনালিজম দিয়ে জারিয়ে নিতে চায়। তার যা ভালো লাগে তাই ঠিক। আর সব বাজে।

তার ধারণায়, শারীরিক অসংযম যতক্ষণ সে না দেখাচ্ছে ততক্ষণ বিবেকের শিক্ষিত সমাজে, শারীরিক সংযম অতটা দুষ্প্রাপ্য নয়। বস্তুত, বিপাশা যদি হঠাৎ কোনওভাবে এ ধরনের অসংযম দেখিয়ে বসতো বিবেকের পক্ষে মেনে নেওয়া এবং ক্ষমা করা সহজ হত। কিন্তু সে তিলে তিলে মন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একজনের দিকে। আর তার পেছনে অন্য কিছুও নেই, সে কথাটা কি বিশ্বাস্য? মনই তো সব।

হয়ত পারে এটা একটা সাময়িক মোহ। হতে পারে বিবেককে আর তার যোগ্য মনে করছে না সে। বিবেকের আধুনিক মনোভাবের সে খেই ধরতে পারে না, তাই, একটু পুরোনপন্থী, পিতৃ জাতীয়, অথবা শুধুই উচ্চপদস্থ লোককেই তার মন আশ্রয় করতে চাইছে। বিবেক এবং বিপাশার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত। সেটাও কারণ হতে পারে। তাই তার নিজের ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীওয়ালা লোককেই খুঁজছিল এতদিন। এখন হঠাৎ হাতের কাছে পেয়ে এবং ঐ তরফের আকাঙ্ক্ষার ধরণ বুঝতে পেরে পরম উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

অথচ বিবেক তো কোনও দিন এসব চায়নি? না হয় হলোই একটু গরমিল! কোন বিবাহিত জীবনেই বা একটু-আধটু ফাঁক ফোকর না থাকে? তাই বলে হঠাৎ সেগুলিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এত বড় বড় গর্ত করে ফেলার কি প্রয়োজন? একটা মানুষ, আরেকটা মানুষের সম্পূর্ণ মনের মতন কখনোই হতে পারে না। এটাও কি বিপাশা জানে না? ও তো তবু বিপাশাকে নিয়েই সুখী হতে চেয়েছিল?

আজও যে বিপাশা বুঝতে পারছে না, তার নিজের ক্ষতি—নিজের পরিণাম, এতেও সে মায়া বোধ করছে। হয়তো কেটে যাবে এ অবস্থা। হয়তো বিপাশা আবার স্বাভাবিক হয়ে ফিরে আসবে তাদের এই সংসারের মধ্যে, এই আশাই সে করছে, সব সময়। তার মতন করে অত ভালোবাসা দিয়ে কেউ কি বিপাশাকে বুঝতে চেষ্টা করবে? সে সম্ভাবনা যদি সে দেখতো, তা হলে না হয় ওর সুখের জন্যই বিবেক ওকে ছেড়ে দিতো। কিন্তু তা কি হবে?

এসব ছিল ওর কিছুদিন আগের চিন্তা। আজ আস্তে আস্তে অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে চিন্তার ধারা। বিবেক কাগজ পড়ায় মন দিল আবার। দিল্লিতে চলেছে, কে কাকে ওঠাবে, কে কাকে নাবাবে—এরই খেলা। আর কে সেই সুযোগে নিজের জন্যও বাগিয়ে নেবে ক্ষমতার কিছু অংশ। ওর মনে হল, ওর ঘরেও চলেছে সেই খেলা। বিপাশাও এক নেশায় মেতেছে। বড় হবার নেশা। লোককে ওঠানো নাবানোর ক্ষমতার নেশা। বিপাশার মুখে আজকাল এক রকম আলো ছড়িয়ে থাকে। সার্থকতার আলো। কাম্য ও প্রার্থিত হবার আলো।

বিপাশা একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পাতা উল্টে যাচ্ছে। কিন্তু ওতে ওর মন আছে বলে মনে হচ্ছে না। একটু পরেই ম্যাগাজিনটা ফেলে রেখে উঠে গেল। বিবেক টেবিলের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে কাগজ পড়ায় মন দিল। দু-তিনটে কাগজ রাখে ও। আজ সময় যথেষ্ট আছে, অতএব সব কটাই মোটামুটি পড়ে ফেলতে পারবে। মনের মধ্যে ছটফটানি আছে। বিপাশা উঠে গেল বলে, একটু রাগও হচ্ছে। দূর—কি যে চায় ও!

'আজ চান করে ব্রেকফাস্ট খাবে—না আগেই খেয়ে নেবে?' কতক্ষণ পরে ওর ঠিক খেয়াল নেই বিপাশা এসে আবার প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'আঁ?' বিবেক কাগজ সরিয়ে ওর দিকে তাকাল। 'ও—দাও—আগেই দিয়ে দিতে বল।' আবার কাগজ ওঠাল মুখের ওপর। একটু হাসি না—একটু উত্তাপ না। বিবেকের জন্য কিছুই আর নেই বিপাশার স্বভাবে।

'তুমি যে বিলেত যাচ্ছো সে খবরটা আমাকে দিলে না যে বড়?' দোষ দেয়া গলায় বিপাশা জানতে চাইল। বিবেক একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'ঠিক হলে খবর পেতেই।' 'তবু তুমি জানাতে পারতে। আজকাল তোমার খবর আমায় অন্যের কাছ থেকে জানতে হয়।' এ অনুযোগের কারণ কি বিপাশা জানে?

'তোমার যা সোর্স আছে, তুমিই আমার সম্বন্ধে আমার চেয়েও বেশী জানবে, জানতাম। তাই জানাইনি।' বিবেক এখনও মুখ থেকে কাগজ না সরিয়েই বলল। 'একজন বয়স্ক লোক—তায় বিপত্নীক হওয়ায় দুঃখ কষ্ট পাচ্ছেন—তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তা বলাটা কি এতই দোষের? তোমার এত জেলাসী হয় কেন এতে?' বিপাশা ক্ষোভ-জড়ানো গলায় বলল।

'জেলাসী?' বিবেক ভীষণ অবাক হয়ে কাগজ সরাল এবার। 'সেনগুপ্ত তোমাকে টেলিফোন করে বলে, আমার জেলাসী হয়? কে বললো একথাটা? কে তোমাকে ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখের কথা জানায়। তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক এসব নিয়ে, আমার কোনও মাথাব্যথা কোনও দিন দেখেছ?'

'দেখিনি ঠিকই। মায়া মমতা—লাজলজ্জা তোমার কোনও দিনই কিছু নেই। আছে শুধু নিজের স্বার্থ নিয়ে। কিসে খালি উন্নতি করবে—বড় হবে। আর সেই জন্যই আমি ভদ্রলোককে কড়া কথা কিছু বলি না।'

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি অনায়াসে মিথ্যে কথার চাষ চলে। বিবেক বিতৃষ্ণা বুঝতে দিল না। শুধু বলল, 'সত্যি বিপাশা—আমি বুঝি সেটা। কিন্তু শেষ সামলাতে পারবে তো?' বিকারশূন্য ওর স্বর। বিপাশা তাই ধরতে পারল না এর অন্তর্নিহিত শ্লেষটা। একটু এগিয়ে এসে উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'খুব পারবো—তুমি দেখো! একবার ম্যানেজার হয়ে যাও—তারপরই ঝপাং।' বিবেক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝোপের দুটো পাখির চেয়ে হাতের একটা পাখি? নিজের মূল্য সম্বন্ধে সামান্য সংশয়? ঘুণাটিনা বিবেক বেশী বোঝে না—কিন্তু কি কারণে জানি ওর পিঠের পেশীগুলি কিলবিল করে উঠল। দমবন্ধ গলায় বলল, 'আমার উন্নতির জন্য তুমি, এতখানি ভাবো? আমার ভালোর জন্য?'

আরো একটু সরে এল বিপাশা—'বাঃ ভাবি না? তবে কি জন্য মনে কর, ঐ

অত বয়স্ক লোকটার অসহ্য প্যানপ্যানানি শোনো যাই? দিনের পর দিন? একটু কথা বলে যদি ও আনন্দ পায় পাক না?' বেশ ঘনিষ্ঠ গলায় বলল সে। 'তবে যে কাল— আমি তোমাকে ইউজ করছি?' বিবেক ওকে একটুক্ষণ আগের কথা মনে করিয়ে দিল।

'সেটা তোমাকে রাগাবার জন্য। তোমার তো কোনও দিকেই এতটুকু এসে যায় না? একটু তো অন্তত রাগ দেখাবে? তোমার ডিরেকটার বলে, তুমি কিছু বলো না। আমাকেই খালি দোষ দাও। ওকেও তো কিছু বলতে পারো?' বিপাশা অভিমান ফোটাল গলায়। সেনগুপ্তকে যে কিছু এখনও বলা যায় না, বলতে পারবে না বিবেক, সে তা খুব ভালো করেই জানে।

'সেনগুপ্তকে কি বলা যায়, বলো দেখি? তা হলে বলেই ফেলি—কি বলো?' বিবেক ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল। 'সে তুমিই জানো। করছে তো খালি ফোন। বুড়ো হয়েছেন প্রায়, একা একা লাগে, একটা কথা শুধু বলতে চান। তা এ নিয়ে তুমি কি বলতে চাও, তুমিই ঠিক করো।' বিপাশা সামান্য ভুরু কুঁচকে রইল।

'তা হলে বাদ দাও!' বিবেক উড়িয়ে দেবার গলায় বলল. 'ফোন করে তো করুক না! কিছু কথা বলতে চায়, বলুক। আমার আর কি এসে যাচ্ছে বলো এতে?' বেশ নিরুদ্বেগ গলা ওর। 'অথচ—লাভ। তাই না?' বিপাশার মুখ আবার কেমন। চোখের দৃষ্টি ধূর্ত। বিবেকের মুখ লাল হয়ে উঠল। 'লাভ? কিসের লাভ? আমার প্রোমোশনের কথা ভাবছ?'

বিপাশা মুচকি হাসল। বিবেকের সারা শরীর জ্বালা করে উঠল। একটু সামলে নিল নিজেকে। এসব কথা নিয়ে এ ধরনের আলোচনা করতে ওর রুচিতে ভীষণ বাধে। ঠাণ্ডা গলায় বলল—'বিপাশা—গেট ওআন থিংগ ক্লিয়ার ইন ইওর মাইণ্ড। আনলেস আই মোক এ কমপ্লিট অ্যাস অভ মাইসেলফ, প্রোমোশন আমার হবেই। ও নিয়ে তুমি মাথা না ঘামালেই আমি খুশী হব।' 'হবেই?' বিপাশার মুখে তুমি আর কি জানো! কতটুকু জানো? এই ধরনের ভাব।

বিবেক ওর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল এবার। চেয়ে চেয়ে দেখা যায় না এ কদর্য দৃশ্য। কোথায় নামতে চাইছে ও? কত দূরে যেতে চায়? কিছু বলার নেই আর। তবু না বললেও নিজের বিবেক মানে না। বলল, 'সেনগুপ্ত কাজের লোক, বিপাশা। এই বয়সে স্ত্রী মারা যাওয়ায় হয়তো হঠাৎ একটু মেয়ে ঘেঁষা হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নেই।' বিপাশা একটু ওর দিকে চাইল মাত্র। জবাব দিল না।

বিবেক আবার বলল, 'তোমার ঐ সেনগুপ্তকে নিয়ে এই অবসেশন কেন, আমি কিছুতেই বুঝি না। তোমার কিসের অভাব? এই বয়সে তুমি এসব কি এবং কেন করছ? তোমার লজ্জা করে না? আমার তো করে। সেনগুপ্তর দিক থেকে এটাকে একটা কমিক্যাল ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে—কিন্তু তুমি? তোমার এ ডিপ্রেভিটি কিসের? আমার যে কি লজ্জা করে তোমার এসব কাণ্ড কারখানা দেখে, তুমি জানো না। তোমার কি এতটুকু আত্মসম্মান বলেও বস্তু নেই? লজ্জা নেই?'

'লজ্জা? লজ্জা কিসের? একটু কথা বললে, এত কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় আমি বুঝতে পারি না। আমি তো আর যেচে যেচে কথা বলি না ওঁর সঙ্গে?' বিপাশা হতভম্ব হল। লজ্জা? লজ্জা কেন? টেলিফোনে কথা বলে বলে? তা সে কি করবে? সেনগুপ্ত যদি লজ্জা না করে টেলিফোন করতে পারেন তো বিপাশার ঘর থেকেই তাঁর সঙ্গে কথা চালিয়ে যাওয়ায় লজ্জার কি আছে? সেনগুপ্ত ওকে পছন্দ করেন বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু এমন কিছু তো এখনও বলে বসেননি? নাকি, বিবেক তাই ভাবছে? এত সন্দেহ করার কি আছে? কেন? কি অন্যায় সে করছে? শুধু কথাই তো বলছে সে। আর তো কিছু না? রাগ দেখিয়ে চলে গেল সে বিবেকের ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত করতে।

বিবেক বিস্বাদ মুখ নিয়ে বসে থাকে। বিপাশার এই ধরনের আচরণের কোনও মাথামুণ্ডু বুঝতে পারে না সে। রাগ হয়, দুঃখ হয়। আর আসে এক ধরনের হতাশা। বিপাশা এত বোকা, এত কাণ্ডজ্ঞানহীন—একথা ভাবতেও খারাপ লাগে। প্রশ্রয় দিয়ে, লোভ জাগিয়ে, কোন অসম্মান ও বিপদের মুখে গিয়ে সে হঠাৎ পড়তে পারে ও বুঝতেই পারে না? না কি পারে তবু থামতে পারে না? খেলার লোভ ও সামলাতে পারে না?

এভাবে বিবেকের মান সম্মান নষ্ট করে, ওর মনকে, বিশ্রী চিন্তায় ভরে তুলে. সামাজিক দয়া, মায়া-মমতা দেখাচ্ছে বিপাশা? অত পদমর্যাদাওয়ালা লোক না হয়ে সেনগুপ্ত যদি অন্য কোনও সাধারণ মানুষ হত, বিপাশা কি তখনও এত সামাজিকবোধ দেখাত? বোধ হয় না। সেনগুপ্তর উঁচু পদের গ্ল্যামার ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে—এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। আর অত উঁচুতে আছে বলেই, সেনগুপ্তও অত অধস্তনের স্ত্রীর প্রতি, অন্যায় অসংযম দেখাবে না. আবার বিবেকও কিছু করতে পারবে না। সেদিকেও বিপাশা নির্ভয়।

লোক জানাজানির ভয় বিশেষ নেই। কিন্তু সেনগুপ্ত তো জানছে বিবেকের স্ত্রী কি রকম মহিলা। অবশ্য বিবেকও জানছে, সেনগুপ্ত কি ধরনের লোক। তবে এটাও হয়তো ভাবছে, বিবেক ধরেই নিচ্ছে, এ সবই স্নেহটেহ জাতীয় কিছু ব্যাপার চলছে। হয়তো কবে শুনবে বিবেক সেনগুপ্তর বিপাশারই মতন দেখতে একটি ছোট বোন ছিল, যে তাঁর বড় আদরের ছিল। আজ আর সে নেই। তাই বিপাশাকেই তার জায়গায় বসিয়েছেন উনি। তাই এত ডাকাডাকি।

আর বিপাশাও সুযোগ বুঝে—ওঁকে দাদা, কাকা অথবা মামার মতন বলে চালিয়ে দেবে। বিবেকের মন কত ছোট—তাই প্রমাণ করতে তৎপর হয়ে উঠবে। বিবেকের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। কি চায় বিপাশা? কি পায়নি সে? বোরডম্? তাই একটু নতুন কিছুর আস্বাদ লাভ করা? নিজের ক্ষমতার গৌরবে, সুন্দরভাবে

সময় কাটানো? নাকি প্রথমে কৌতূহল নিয়েই এগিয়েছিল? এগিয়েছিল কি? না কি সাড়া দিয়েছিল। তারপর হঠাৎ কখন খেলা জমে গেছে—নেশা ধরে গেছে? বিবেককে তো ওই প্রথম দিকে সব বলতো। করুণা-হাসি-মজা—এই সব মিলিয়ে ওর মনে ভাব ছিল। আজ বিবেক জেনে ফেলেছে, বুঝতে পারছে, তাই বিরক্ত? এবং ইচ্ছা করে বিরক্তি দেখানো?

কিন্তু ঠিক সুরে যে বাজে না বিরক্তিটা, সেটা কি ও বোঝে? বিবেকের কেরিয়ারের কথা তুলে খোঁটা দেওয়া, নিজের ব্যবহারের জাস্টিফাই করা? ও কি সত্যিই বিশ্বাস করে, এইভাবেই বিবেকের উন্নতি হবে? সেনগুপ্তর লোভ জাগিয়ে রেখে। একটার পর একটা রাজ্য চেয়ে নেবে বিবেকের জন্য? বিবেকের কেরিয়ারে, স্ত্রীর সাহায্য ছাড়া কিছু হবার নয়? ও কি এতই অপদার্থ?

যাক্ তবে। বিপাশা যদি আজ নিজের কল্পিত ক্ষমতায় এতই মশগুল থাকতে চায়—থাকুক। বিবেকের ভাগ্য ওরই হাতের মুঠোয়—এ ধারণা নিয়ে সুখী থাকে—থাকুক। ওকে নিয়ে, বিবেকের যা সুখ ছিল, তা তো উবে গেছে। কিছু, এসে যায় না আর। এখন এই সব আজেবাজে ভাবনায়, নিজেকে সে ভুলিয়ে রাখতে চায়—রাখুক। বিবেক আর কিছু বলবে না। নির্বোধের মতন, এক এক সময়, মাত্রা ছাড়িয়ে, যে সব ইঙ্গিত দেয়, অনায়াসে, বিবেকের আর কিছু বলার রুচি থাকে না। এই বিপাশাকেই কি সে এত ভালোবাসতো?

ব্রেকফাস্ট এসে গেল। বিবেক ছুরি কাঁটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে খেতে শুরু করল। বুকের ভেতরটা একবার ভয়ানক হালকা—একবার ভয়ানক ভারী লাগছে। কেমন একই সঙ্গে শোক এবং আনন্দ! কিছুদিন ধরে কত যন্ত্রণা কষ্ট ভোগ করেছে সে। এখন যেন সে যন্ত্রণার উপশম হয়েছে—তবু স্মৃতি যায়নি। আবার আসতে পারে কি সে যন্ত্রণা ফিরে?

বিপাশাকে ও কতবার বলেছে। মানা করেছে। বিপাশার একগুঁয়ে প্রকৃতি তাতে আরো খেপে গিয়েছে। 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না—আমার ওপর তোমার এতটুকু ভরসা নেই! আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছি তোমার কথায়। নিজের স্বার্থে, ওঁকে কিছু বলবার সাহস নেই তোমার—' ইত্যাদি ইত্যাদি রাগে চোখ মুখ লাল করে বলেছে।

কোনও কঠিন দুরারোগ্য রোগে ভুগতে থাকা প্রিয়জন মারা গেলে, কি এমনি বিষাদ আর সোয়াস্তি আসে মনে? আজ যেমন আসছে বিবেকের? হারাবার দুঃখ—আবার রোগীর রোগ যন্ত্রণা শেষ হয়ে যাবার জন্য একটা মিশ্র অনুভূতি? বিপাশা কি মরে গেল এই মাত্র ওর চোখের সামনে? না আর কিছু—যা দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু অনুভব করা যায় তাই মরে গেল? কিংবা মরেই ছিল, সে শুধু ভুল করে কাঁধে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিল? আজ এইমাত্র কাঁধ থেকে নামিয়ে দেখতে পেল—সে একটা মৃত জিনিস সযত্নে বয়ে বেড়াচ্ছিল, বোকার মতন—অন্ধের মতন?

ভালোবাসা কি মরে যায়? বোধ হয় যায়। সম্পর্ক ফ্যাকাশে হয়ে যায়? তাও বোধ হয় যায়। আকর্ষণও ফুরিয়ে যায়? নিশ্চয়ই যায়। তবে কার জন্য শোক করছে বিবেক? নিজের জন্য? তার ভালোবাসার জন্য? তার, এত যত্নে হাতে তুলে দেয়া বিশ্বাসের জন্য? এ তো হরদম হচ্ছে। চারদিকে হচ্ছে। যে পারছে সেই করছে, এই বিশ্বাসের অমর্যাদা। তবে বিবেকের এত কষ্ট হচ্ছে কেন এখনও? মানুষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ প্রিয়তমের কাছ থেকেই তো মানুষ সবচেয়ে বেশী দুঃখ, আঘাত পায়। বিবেক কি তা জানতো না?

বিবেক কি নিজেকে এই মনুষ্যগোষ্ঠীর একজন বলে কোনও দিন ভাবেনি? নিজের সততা, বিশ্বস্ততা সযত্নে লালন করে গেছে বলে, সে কি ধরেই নিয়েছিল, তার চারপাশের, অতি প্রিয় লোকেরাও তাই করবে? সে নিজে, তার স্ত্রী, তার সন্তান এবং বন্ধুবান্ধব সকলেই যে এই মনুষ্যগোষ্ঠীর একটা নিহিত অংশ—সে কেন তা বোঝেনি? জীবনের কোনও বড় আশা নয়, কোনও বড় পাওয়া নয়—জীবন-মরণের ব্যাপার নয়, নিজেকে টিকিয়ে রাখার আদিম ইচ্ছা নয়, শুধুমাত্র একটু মানসিক বিলাসের জন্যই, সব কিছু ভেঙে ফেলা যায়—একথাটা বিশ্বাস করতে তার এত কষ্ট হলো? এত দেরী হলো?

তবে কিসের জন্য কি? কিসের জন্য পরিশ্রম করে বড় হওয়া, কিসের আশায় স্বর্ণমৃগের পেছনে ছোটা? 'সেই কখন থেকে ডিমটাকে কেবল কেটে যাচ্ছ—মুখে পুরছ না কেন? কি এত ভাবছ তুমি?' বিপাশার কথায়, বিবেক অন্যমনস্ক মুখ ওঠাল। ঠেলে দিল প্লেটটাকে। 'নাঃ আর খেতে ইচ্ছে করছে না।' উঠে পড়ল। 'যাই দেখি চানটান করি গিয়ে। ক'টা বাজল?' 'এই তো মোটে আটটা। এখনি বেরোবে নাকি?' বিপাশা ওর মুখ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল। আটটা। ড্রাইভার আসবে পৌনে নটায়। এই পৌনে এক ঘণ্টা সে কি করবে? সব কিছু শেষ হয়ে যায়—সময় তবু যায় না কেন?

মাঝখানে মাত্র পনর দিন। তারপরই ও যাবে বিলেত। অবশ্য একুশ দিনের কোর্স মাত্র। সব মিলিয়ে হয়তো মাস খানেকের মতন থাকবে বিদেশে। অফিসে, মিঃ ঘোষ খুব চেষ্টা করে প্রসন্নতা ধরে রাখছেন মুখে। অন্যান্য সহকর্মীরা চুপ-চাপ। বিবেক নিজেও চুপচাপই। নিজের মনে কাজ করে যাওয়া—আর অবসাদ বয়ে বেড়ানো। সেনগুপ্ত ওকে ভালো করে এ সুযোগ এবং সম্মানের অর্থ বুঝিয়েছেন। তিনিই তার পোটেনশিয়েল বুঝে বোর্ডের কাছে এ প্রস্তাবনা তুলেছেন, এবং সম্মতি আদায় করেছেন।

বিবেক কৃতজ্ঞ বোধ করেছে। না—একবারও তার মনে হয়নি—তাকে এক মাসের জন্য অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে সেনগুপ্ত নিজের কোনও মতলব হাসিল করার জন্যই এত সব করছেন। অমায়িক সেনগুপ্ত, দয়ালু সেনগুপ্ত, কম্পেনীর উন্নতিসাধনে সদারত সেনগুপ্ত, এই ধরনের কোনও ছোট কাজ যদি করতে চান—তাতে বিবেকের কিছু এসে যায় না। কাজে তিনি তার গুরু। কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোন পাগলামি করবেন, কোন খেয়াল মেটাবেন, তার সঙ্গে বিবেকের কি সম্পর্ক? সে যার সঙ্গে সম্পর্ক, সে বুঝবে। বিবেকের আর কোনও মাথাব্যথা নেই তা নিয়ে।

এয়ার পোর্টে, ছেলেমেয়ের কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে তাকিয়ে বিবেকের বুক ফেটে যাচ্ছিল! 'কার কাছে তোদের রেখে যাচ্ছ বোজো আর তাপ্তি?' মুখে বলল, 'তোমরা কিন্তু খুব গুড বয় আর গুড গার্ল হয়ে থাকবে। আমি এক মাসের মধ্যেই ফিরে আসব। মাকে একটুও জ্বালিয়ো না।' ওরা একজন ওর হাঁটু আর একজন ওর কনুই আঁকড়ে রইল সারাক্ষণ। বিপাশা, বিভ্রান্ত আর করুণ মুখ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার কাঁধে আলগোছে ছুঁয়ে 'লুক আফটার ইওর সেলফ।' বলে বিদায় নিল বিবেক।

প্রথমে লণ্ডন। সেখানে দু-তিন দিন। তারপর সেই ইনস্টিট্যুট-এ। লণ্ডন থেকে আশী কিলোমিটার দূরে—এই টপ ম্যানেজমেণ্ট সেণ্টার। ওদেরই গ্রুপ কম্পেনীর নিজস্ব সংস্থা এটা। চার পাঁচ একর জমির ওপরে সুন্দর ক্যাম্পাস। আলাদা আলাদা ঘর। থাকা খাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। মনোরম পরিবেশ। দুনিয়ার সর্বত্র ছড়ানো গ্রুপের প্রতিটি টুকরো অফিস থেকে—সব টপ্ এক্সেকিউটিভরা আসেন ম্যানেজমেণ্টের নতুন তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে। পুরোনো ধারণা ছেড়ে, নতুন ধারণায় দীক্ষিত হতে। 'ফাইন্যাল এনালিসিস অভ অ্যান এক্সেকিউটিভ' জানতে। তারপর নবলব্ধ জ্ঞান ও গ্ল্যামার—শরীরে, মনে, ব্যক্তিত্বে মেখে নিয়ে, চলে যান, নিজ নিজ জায়গায় এ জ্ঞান প্রয়োগ করতে।

কঠিন কোর্স। প্রচুর খাটুনি। দিনে কনফারেন্স, মিটিং কিংবা ক্লাস—যাই বলা যাক। রাতে, সান্ধ্য সম্মিলন এবং ডিনারের পরে, অ্যাসাইণ্ড পেপারস তৈরী করা এবং এ বিষয়ে পড়াশোনা করা। ছত্রিশ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-বাহান্ন পর্যন্ত বয়স সকলের। সবাই প্রায় টপ্ র‍্যাংকিং। শুধু বিবেক আর আরো তিনজন দ্বিতীয় শ্রেণীর। অন্য তিনজন এসেছে, মালায়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তান থেকে। ওরা চারজন যথেষ্ট অন্ত্যজ মনে করছে নিজেদের।

পশ্চিমী দেশগুলির ধারণায়, চল্লিশের মধ্যেই, একজন এক্সেকিউটিভকে সবচেয়ে ওপরের নীচের ধাপটিতে এসে পৌঁছুতে হবে। আর পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই—সবচেয়ে ওপরে। যদি তা হল, তো হল—নইলে আর হল না এ জীবনে। বিবেকের বিয়াল্লিশ হয়ে গেছে। এখনও পৌঁছয়নি সেখানে। তবে আমাদের এই অনগ্রসর দেশগুলিতে অগ্রসরতায় বন্যা হালে শুরু। এ নিয়ম, এখনও সম্পূর্ণভাবে খাটছে না। বিবেক ওরা চারজন দুরু দুরু বুকে নিয়ে ভাবে, ভাগ্যিস!

লণ্ডনে এসে দেখা হয়েছিল পুরোন বান্ধবী গুলুর সঙ্গে। ছাত্র জীবনের ঠিক পরটাতেই, যার সঙ্গে একটা সম্পর্ক 'হবো হবো' করে উঠেছিল কিছুদিন। বিবেক জানতো, ও বিলেতেই আছে। কিন্তু এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবেনি। আশ্চর্য যোগাযোগ। ওর মন যখন বারো বছরের বিবাহিত জীবনের আগের সময়টা এবং আজ থেকে আরো ক'বছর পরের সময়টাতেই ঘোরাঘুরি করে বেড়াতে চাইছিল—সেই সময়েই, তরুণ বয়সের সব হারানো সুগন্ধ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল গুলু। একজনের বাড়িতে দেখা হয়ে গেল আচমকা।

ও চিনতে পারেনি—কিন্তু গুলু ঠিক চিনেছে। নিজেই কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বিবেক না? আমায় চিনতে পারছ না? আমি গুলু।' বিবেক ভীষণ অবাক এবং খুশী হয়ে উঠল। গুলুর তরুণী বয়সের রূপের মাধুর্য এখন গ্ল্যামারের ঐশ্বর্যে চাপা পড়ে গেছে। যৌবনের প্রান্তে এসেও, আসলে নকলে, অত্যন্ত আকর্ষণীয়া। গুলু এখন সঙ্গীহীন।

বিয়ে করেছিল দুবার। একবার ভারতীয়, আরেকবার ইংরেজ। কোনওটাই টেঁকেনি। গুলু চিরকালই খামখেয়ালী ছিল। এখনও আছে। চার্টার্ড সেক্রেটারিশিপ পাশ করেছিল ভালো ভাবে। এখন কাজ করছে লণ্ডনেরই একটা চেইন-স্টোর-হাউসে। চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে আছে। ভারতীয় ছেলে। বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশোনা করে।

আর ভালো লাগছে না গুলুর—এভাবে এখানে একা পড়ে থাকতে। বলল, 'ইটস সো টেরিবলি টেরিবলি লোনলি—ইউ নোও।' বিবেক হাসলো। 'তুমি লোনলি আছ—একথা ভাবাই যায় না। উইথ ইওর ফেটাল এট্রাকশনস দ্যাট শ্যুড বী দা রিমোটেস্ট প্রবলেম ইন ইওর লাইফ।'

'দূর—আর ওসব ভালো লাগে না। দেশে ফিরে যেতে চাই। চাকরি যোগাড় করে দিতে পারবে? হাও ইনফ্লুয়েনশিয়েল আর ইউ?' গুলু ড্রিংক বানাতে বানাতে ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল। তার পর গ্লাস এনে, বিবেকের হাতে দিয়ে ধপ করে বসল সোফায়। ওর ফ্ল্যাটেই এসেছে বিবেক বাকী সন্ধ্যাটা কাটাতে। বিবেকও বসে পড়ে—গুলুর কথার জবাবে বলল—ড্যাম লিটল! ইন ফ্যাক্ট আয়্যাম অলসো ইন দ্য সেম বোট অ্যাজ ইউ আর।'

তারপর কত রাত পর্যন্ত কথা। দুজনেই ওরা নিটোল সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন। বিবেক কম্পানীর খরচে হোটেলেই উঠেছে। আজ আর ফিরবে না গুলুর অনুরোধে। গুলুর ফ্ল্যাটে, বাড়তি বিছানা—ঘর সবই আছে। অনভ্যাসের বাধাও—সময় বিশেষে, কোনও বাধাই নয়। দু-তিনটে দিন এইভাবেই কাটল। বিবেক শেষ রাত্রে কিংবা সকালে ফিরে যায় হোটেলে। সকালে এখানকার অফিসে কিছুক্ষণ কাটিয়ে—সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যে হলে গুলুর সঙ্গে বেরোয় নয়তো ঘরে বসেই গল্প আড্ডা চলে। তার আহত পৌরুষে, প্রলেপ লাগায় গুলু। উত্তাপের সেঁক দেয়।

তারপর যথাস্থানে। কোর্স। প্রাণপণে খেটে যাওয়া শুষে নেওয়া মেখে নেওয়া।

সেনগুপ্তের নির্বাচনকে সম্মানিত করা। নিজের ক্ষমতায় মর্যাদা আহরণ করা। ক্যাম্পাস থেকে ফোন করে গুলুকে। উইকেণ্ডে লণ্ডনে চলে আসে। আর হোটেল নয়। গুলুকে ছুটি নিতে উৎসাহিত করে। একই সঙ্গে ওরা দেশে ফিরবে। তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে নিতে অনুরোধ জানায় গুলুকে।

দুঃখ গেছে—আছে অবসাদ। ঘৃণা নেই শুধু বিতৃষ্ণা। নিজের ওপর—দুনিয়ার ওপর—বিপাশার ওপর। জীবন কাটিয়ে যেতেই হবে উদ্যোগের সঙ্গে—এই ধ্রুবসত্যের ওপর। ভালোবাসার জায়গায়—কামনা-আশা আশংকার জায়গায় শুধু সামরিক ইচ্ছে—উদাম উদ্দীপনার জায়গায়—নির্বেদ দৃঢ়তা আর কর্তব্য, কখন এসে আপনিই, অজানতে বসে যায়। জীবনে, পৃথিবীতে, দুনিয়ায়—কিছুই আর শুদ্ধ নেই। হাওয়াতে মেশে, বিষাক্ত ধোঁয়া, আলোতে বিষবাষ্প—আর পবিত্র মাটিতে, নির্মল জলে মেশে আবর্জনা! পোলিউশন চলতেই থাকে।

কোর্স শেষ হয়ে গেল। ফিরে এলো লণ্ডনে। আরো ক'টা দিন সময় আছে হাতে। যতটুকু পারা যায়, দর্শনীয় যা যা আছে দেখে নিতে হয়। উপহার কিনতে হয়, প্রিয়জনদের জন্য। নিজের জামা কাপড় কিছু অর্ডার দিয়েছিল—সেগুলি আনতে হয়। তারপর ফেরার ব্যবস্থা। তার ব্যবস্থা আগেই করা আছে। গুলুও সঙ্গে যাচ্ছে—তাই, একই ফ্লাইটে যাতে যাওয়া যায়, তারই তদ্বির করা।

দমদম এয়ার পোর্টে বিপাশা আর ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোজো আর তান্তিকে দেখে, হৃদয় উদ্বেল হল। কাছে এসে একজনকে কোলে তুলল, আরেকজনকে জড়িয়ে ধরল। তারপর—বিপাশার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে বলল—হেলো বিপাশা—ভালো আছ? গুলু—মীট মাই ওআইফ বিপাশা। অ্যাণ্ড দিস ইজ গুলু।

বিপাশার মুখ কালো দেখাচ্ছে। গুলু আবার কে? চিঠিতে তো কিছু লেখেনি? ও কি বাড়িতেই উঠবে? ওদের বাড়িতে? কোনও মতে মুখে হাসি ফুটিয়ে বিপাশা আড়ষ্টভাবে স্বাগত জানায় গুলুকে। বিবেকের মুখ দেখে। গুলুর মুখ দেখে। আর পেটের মধ্যে শূন্যতা ওলটপালোট খায়।

গুলু উঠবে হোটেলেই। মধ্য কলকাতার একটু নিরিবিলি জায়গায় একটা ভালো হোটেলে তুলে দিল ওকে বিবেক। ওই ভেতরে গিয়ে গুলুর সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে এলো। বিপাশা আর ছেলে মেয়ে গাড়িতে বসে রইল।

শুধু মাত্র একটা মাসে, একটা লোক, এত বদলে যায়, বিপাশা চোখে না দেখলে, বিশ্বাস করতে পারত না। স্মার্ট তো ও চিরকালই। দেখতেও ভালো। কিন্তু এখন যেন তার সঙ্গে মিলেছে অদ্ভুত এক ওপরে তুলে ধরা গাম্ভীর্য। যেন ওর নাগাল আর বিপাশা পাবে না কোনও দিন। মাত্র একুশ দিনের ট্রেনিং-এ মানুষ এত বদলে যায়? হঠাৎ ব্যক্তিত্ব পালটে যায়? সামান্য পুরন্ত মুখ, ঝকঝক করছে। নতুন স্যুটে, টাই-এ, সার্টে, বিলেতী ম্যাগাজিনের পুরুষ মডেল যেন ও।

কত দূর—কত দূরের মানুষ—বলে ওকে মনে হচ্ছে। নিজেদের বলে আর চেনাই যাচ্ছে না। কি করে হয়? বিপাশা হতভম্ব হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে, ও ফিরে এল গাড়িতে। 'চলো বাড়ি।' এসে সামনের সীটে বসলো সে। বোজো ওখানে আগেই বসে আছে, বাবার কাছ ঘেঁষে বসবে বলে। তান্তিও এবার উঠে দাঁড়িয়ে বাবার কাঁধের ওপর দিয়ে হাত নামিয়ে দিল। ওদের দুজনকেই আদর করল আবার বিবেক। তারপর বিপাশার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল 'হেলো বিপুস্—কেমন ছিলে? কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

মন্ত্রমুগ্ধের মতন বিপাশা মাথা নাড়ল। ওর শরীর অবশ অবশ লাগছে। বারো বছর আগে? বিয়ের পরটাতে বহু কাল, বিবেক ওকে আদর করে 'বিপুস্' বলে ডাকত। আজ আবার এই ডাক? ওর চোখে জল আসতে চাইল। চুপ করে বসে রইল বিপাশা সারা পথ। বিবেক বাচ্চাদের সঙ্গে বকবক করতে ক... বাড়ি ফিরে এল।

রাত্রে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বিবেক শুলো। বিপাশা সামান্য দূরে থেকে, ওদের কথাবার্তা শুনল। ছেলেমেয়ে ঘুমোলে, বিপাশা জিজ্ঞেস করল, 'গুলু কে? ওকে তুমি কোথায় মীট করলে?' হাই তুলতে তুলতে বিবেক জবাব দিল, 'ও—গুলু? ওকে অনেকদিন ধরে চিনি। সেই অল্পবয়স থেকে। ওদের আর আমাদের বাড়ির মধ্যে আসা যাওয়া ছিল খুব। কি একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে যেন। লণ্ডনেই ছিল এতকাল। ছুটিতে দেশে এসেছে। আবার হাই তুলে, বিবেক পাশ ফিরে শুলো আর তারপরই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে অফিস যাবার আগেও, বিশেষ কিছু কথাবার্তা হয়নি। টুকটাক ঘরোয়া ঘরসংসারী কথাবার্তা ছাড়া। বিপাশা শুধু ওকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। বিবেক দেখেওনি। নিয়ম মাফিক অফিসে চলে গেছে। আর অফিস থেকে ফিরেছে অনেক দেরিতে। গুলুর কাছে গিয়েছিল। বাড়িতে এনে তুলে, ওর আতিথেয়তার প্রতিদান দিতে পারেনি। তাই বলে খবরাখবরও করবে না?

'অফিসের কেউ আমি চলে যাবার পর খোঁজ খবর করেছিল?' বিবেক বিপাশাকে প্রশ্ন করল। বিপাশা মুখ লাল করে শুধু মাথা নেড়ে ওদিকে চলে গেল। বিবেক কাঁধ ঝাঁকাল। রাত্রে, বিছানায় শুয়ে বিপাশা জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে খুব ভালো কাটল?' ভদ্র কৌতূহলী গলায় আওয়াজ ওর। 'হ্যাঁ—মন্দ কি? তবে যা টাফ্ কোর্স, বেশী ঘোরাঘুরি করার ফুরসুৎই পাওয়া যায়নি।' বিবেকও ভদ্র গলায় জবাব দিল।

'শিখলে অনেক?' আবার প্রশ্ন করল বিপাশা। 'ওই আরকি।' 'বাকি ন'দিন কি করলে?' বিপাশা জানতে চাইল। 'একটু আধটু ঘুরলাম, এদিক সেদিক দেখলাম—কি আবার করে মানুষ বিদেশে গেলে। সাইট-সীয়িং করতে করতেই সময় চলে যায়।' বিবেক পাশ ফিরে শুলো। বিপাশা তবু জিজ্ঞেস করল, 'গুলুর কাছেই

ছিলে।' 'শুধু ফেরার সময়টাতে।' 'ওর বাড়িতে আর কে কে আছে?' বিবেক মুখ ফেরাল। বলল, 'কেউ নেই। গুলু একা থাকে।' বিপাশার নিশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড় হল। কোনও মতে, বলা উচিত নয় জেনেও বলল, 'ওর সঙ্গে—?'

বিবেক সময় নিল একটু। বিপাশার স্বামী হারিয়ে গেছে। সে যায়ওনি, ফিরেও আসেনি। উপহারও যৎসামান্য, এবং যথাকর্তব্য শুধু। বিপাশাও হারিয়ে গেছে। তবু সম্পর্ক রাখতেই হবে। আরো কিছু উপহার দিলেও বোধ হয়, বিবেকের ক্ষতি হবে না। একটা মস্ত বড় সান্ত্বনা, বিবেক বিপাশার হাতে তুলে দিল তাই। বলল, 'হ্যাঁ।' এ থেকে যদি শান্তি পায়, নিজের কৃতকর্মের জন্য যদি অপরাধবোধ ওর কমে যায়—যাক না। বিবেকের তো আর লাভ-ক্ষতির কিছুই নেই।

তবু কিছুক্ষণ মন ও অভ্যাসের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলল। নিজেকে নিষ্ঠুর মনে হল। কোনও দিন অকারণে বিপাশাকে ও দুঃখ দেয়নি—দিতে চায়নি। সাধ্য-মতন ওর সাধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে। আর ওর হাসিমুখ দেখে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছে। সামান্য ঝগড়া বিবাদ হলে, নিজে সেধে, সব সময় ওর মান ভাঙিয়েছে। আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিয়েছে। ওর দুঃখী মুখ ও সয়নি কোনও দিন। আজও সান্ত্বনা দিতে চেয়ে শান্তি কেড়ে নিল সে, বুঝতে পারল। কিন্তু মিথ্যে বলার অভ্যাস সে কোনও দিন করেনি—নিজেদের মধ্যে।

পরের দিন অফিস থেকে ফোন করল বিবেক বেলা তিনটের পর—'বিপাশা? মিঃ বোস—আমাদের ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার—এই মাত্র মারা গেলেন। অফিসেই। কার্ডিয়াক অ্যাটাক। নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল—দরকার পড়ল না। এখানেই সব শেষ হয়ে গেল। আমার ফিরতে অনেক রাত হতে পারে।' চাপা গলায় কথাগুলি বলে বিবেক ফোন রেখে দিল। বিপাশা শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থেকে, রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ও ভাগ্য মানে। ঠিকুজি কোষ্ঠী—সব মানে। শেষ কবে যেন ওর আর বিবেকের কোষ্ঠী বিচার করিয়েছিল। মনে নেই। জ্যোতিষী কি বলেছিলেন? মনে নেই। হয়তো বলেছিলেন, ও রাজরাণী হবে, জ্যোতিষীদের চিরাচরিত ভাষায়। হয়তো বলেছিলেন, বিবেকের বৃহস্পতির দশা শিগগীরই শুরু হবে। কিছু মনে নেই। গত একটা বছর কেমন আলুথালু হয়ে কেটেছে ওর। কে যেন শনি হয়ে ওর কাঁধে চেপে বসেছিল।

সেনগুপ্ত! মাসের মধ্যে পনর দিন খালি 'বিপাশা'—আর 'বিপাশা।' অত বড় একটা মানুষ—অসহায়ভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন, বিপাশাকে অত গুরুত্ব অত প্রাধান্য দিচ্ছেন—তাঁর ঘরোয়া জীবনের ক্ষেত্রে, বিপাশার পরামর্শ, উপদেশ, সাহায্য চাইছেন। বিপাশা আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। সময়ে সময়ে বিহ্বলও। স্বামীর কম্পেনীর ডিরেকটার তাকে অমনভাবে চাইছেন! একটু কথা বলা তাঁর সঙ্গে। একটু মুরুব্বিয়ানা করা, একটু বেসামাল স্বপ্নে ভেসে যাওয়া—সে রোধ করতে পারেনি।

তারই অনুগ্রহে, একজন অত হোমরা চোমরা মানুষ, তার স্বামীকে ওঠাবে। —এ ভাবনার মাদকতা সে পরিপাক করতে পারেনি। সর্বোপরি, এতদিন বাদে, অন্য পুরুষের অতখানি চাওয়াকে সে নির্লোভীর মতন অস্বীকার করতে পারেনি। শুধু কথা, শুধু হাসি, শুধু একটু মনোযোগ দিয়ে, সে এক পুরুষকে ধন্য করার খেলায় মেতেছিল। নিজের শক্তিতে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

পরিণামের কথা বার বার, বিবেক ওকে বলে গেছে। কিন্তু সে ভেবেছিল, পরিণাম আসবে সেনগুপ্তের দিক থেকে। যা সে, টিপিক্যাল ভারতীয় মহিলার 'ধরি মাছ-না ছুঁই পানি' ভাব দেখিয়ে কাটিয়ে নিতে পারবে অনায়াসে। বিবেককে চিরকৃতজ্ঞ করে রাখবে ওর কাছে। সেনগুপ্তকে আহত। কারো কোনও ক্ষতি হবে না—অথচ বিপাশার মোহিনী শক্তির জয়-জয়কার। বিবেক উঠে যাবে। সেনগুপ্ত পড়ে থাকবে যেখানকার সেখানেই। আর নিজের দুর্বুদ্ধিকে দোষ দেবে। এ মদির আত্মপ্রসাদের লোভ এড়ানো যায়নি।

অথচ, অথচ, বিবেকের ভাগ্য কি অনায়াসে বিবেককে ঠেলে দিচ্ছে ওপারের দিকে। কোনও জড়িবুটি, কোনও বিশেষ রত্ন, সুন্দরী মোহিনী স্ত্রীর বিন্দুমাত্র সহায়তা ছাড়াই। ফুলছে, ফাঁপছে, ঝাঁপিয়ে বাড়ছে বিবেক। কারো কোনও তোয়াক্কা না করে। সেনগুপ্তরা নিজেরাই যেচে, ওদের সাহায্য করে—এই বিবেকদের! গুলুরা, হাস্য লাস্য আর শুশ্রূষা দিয়ে ওদের সেবা করে। আর দুনিয়া করে সেলাম। এমন কি বিচক্ষণ বসেরাও অনায়াসে সরে গিয়ে ওদের জায়গা করে দেয়। সাফল্য ওদের হাতের মুঠোতে নিজে এসে ধরা দেয়।

আর বিপাশাদের কি হয়? আনন্দময়, স্নেহময়, প্রেমময় স্বামী হয়ে ওঠে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত দূরের মানুষ। বিপাশার হাতের পাঁচ বিবেক, অমন বশম্বদ বিবেক, অত বিবেচক বিবেক যে এমনি হয়ে যাবে, সে কি কল্পনাও করতে পেরেছিল?

এ দূরত্ব, এ অনধিগম্যতা, সে টের পেয়েছিল, বিবেক বিলেত যাওয়ার আগেই। কত রাত ডাকেনি। কতদিন কাছে আসেনি। এক মুহূর্তও মুখের দিকে আর চেয়ে থাকেনি, যাওয়ার পনেরো কুড়ি দিন আগে থেকেই। এমন কি যাবার আগের রাতে পর্যন্ত, বিবেক ওকে একবার ছোঁয়ওনি। যাবার দিন, সারা দিন, সারা সন্ধ্যা—কতটুকু সময় পেয়েছে, এতটুকু নিভৃতি খোঁজেনি।

তারই ফলে, এই এক মাস, সে সেনগুপ্তের সঙ্গে কথা বলেনি। কত সহজে কাটিয়ে ওঠা যায় এই ধরনের সম্বন্ধ, বুঝতে পেরে সে অবাক হয়ে গেছে। শুধু একদিনই সে বলেছিল, 'মিঃ সেনগুপ্ত—কিছু মনে করবেন না—আপনি আর কষ্ট করে ফোন করবেন না। আমাকে কিছু জানাবার থাকলে, অন্য কাউকে দিয়ে ফোন করবেন।' সেনগুপ্ত আর ফোন করেননি। মানী লোক, এক মুহূর্তেই, তার মান সম্মানের পরিচিত আবহাওয়ায় ফিরে গেছে।

অথচ—সে কেন ভাবতো, যদি সে কথা বলা বন্ধ করে, সেনগুপ্ত ভয়ংকর চটে উঠবেন! ভাবতে ভালো লাগতো বলে? কেন সে ভাবেনি, এই সব সেনগুপ্তরা, সময়ে শিশুটি, আর সময়ে পিতাটি? পুরুষের অহংকার, ক্ষেত্রবিশেষে, ভিন্ন রকম। নিজের কুবুদ্ধি, নিজের লোভ অপ্রমাণ করার জন্যও, ওদের জায়গা বিশেষে সাহায্য করার ইচ্ছা হয়। সেনগুপ্তের দুর্বলতার কথা যদি কেউ জানে, তো বিবেকই তো জানে। কিংবা বিপাশা। বিপাশা যে কেউ নয়—সে কথা বোঝাবার জন্যও কি সেন-গুপ্ত আজ আরো উদার হয়ে উঠবেন না বিবেকের প্রতি? দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল বিপাশা! ঠিক এইভাবে সে না ভাবলেও, আসল খবরটি কোথা থেকে এক সূক্ষ্ম তরঙ্গবাহিত হয়ে এসে, ওর মর্মে পৌঁছে গেল।

ক'দিন খুব ব্যস্ত রইল বিবেক। চার্জ টেকওভার চলেছে নিউ ওরিয়েন্টেসন! ডিপার্টমেন্ট আগেই জানতো, আজ আবার একবাক্যে স্বীকার করল, ব্যানার্জির লাক্ বটে! কি সুন্দর, সময়ের আগেই প্রার্থিত বস্তুটি, গাছের পাকা ফলটির মতন, টুপ করে পড়ে গেল হাতে। আরো এক বছর চার মাস অপেক্ষা করতে হল না। কেউ কেউ এ রকম লাক নিয়ে জন্মায়!

অপ্রস্তুত যদি কেউ হয়ে থাকে—বিবেকই হয়েছে। ঘটনার অভাবনীয়তায় সেই সবচেয়ে হতভম্ব। গুলুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে। একদিন চট্ করে গিয়ে জানিয়েও এসেছে সব ব্যাপার। গুলু খুশী হয়ে বলেছে, 'সো আই গট লাক ফর ইউ?' বিবেক অপ্রস্তুত ভাব সামলে বলেছে, 'গুলু প্লীজ! একজন লোক মারা গিয়েছেন—তাঁর ফ্যামিলির কথা ভাবো। ইউ মাস্‌ন্ট টক লাইক দিস।'

'ও শাটাপ! আই হ্যাভ নো পেসান্স ফর হিপক্রিসি। ইউ গট ইওর প্রোমোশন। আমার কাছে সেটাই বড় কথা। আজকের দিনে যে গেছে, সে গেছে। যে আছে, তার কথাই ভাবতে হবে। এবার কি আমার জন্য একটু লাক অ্যারাউন্ড করবে?'

'লেট মি গেট মাই বেয়ারিং ফার্স্ট! তারপর যা করার চেষ্টা করব। তোমাকে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, বলেছি তো! ও'র চারদিকে খুব ইনফ্লুয়েন্স। তারপর তুমি যা করবার করো।' বলে বিবেক এক রকম পালিয়ে এসেছে।

ক'দিন পর বিপাশাও, বিবেক সকালে অফিস যাবার আগে আয়নার সামনে যখন টাই পরছে, তখন এসে দাঁড়িয়ে বলেছে—'ম্যানেজার হয়ে গেলে? কংগ্রাচুলেশনস! খুব খুশী তুমি, তাই না?' বিবেক আস্তে আস্তে—ওর দিকে ফিরে বলল, 'আমি আসার ঠিক পরেই উনি মারা গেলেন, তুমি কিছু সন্দেহ করছ না?'

'সন্দেহ? সন্দেহ কিসের? আমি তোমার সৌভাগ্যের কথাই বলছি।' বিপাশা ঠান্ডা গলায় জবাব দিল। বিবেক 'ধন্যবাদ!' বলে বেরিয়ে গেল।

কিছুদিন কেটে গেছে। গুলু ছটফট করছে। ওর আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে, খুঁজে খুঁজে, এখানে ওখানে দেখা করে এসেছে। এবার যাই যাই করছে। কিছু যখন এখানে হচ্ছে না, তখন আর থেকে কি লাভ? এ রকম নিষ্ক্রিয় জীবন ভালো লাগছে না ওর। বিবেকটা একটা নীরেট গবেট। প্রোমোশন হয়েছে, ফূর্তি করে থাক, তা নয়, নীরবে খেটে যাচ্ছে।

খাটো—অফিসে খাটো। খাটতেই হবে। সন্ধ্যাবেলা এসেই অত যাই যাই কেন? ওর যেন মোর্নিং চলছে। কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে বলেছিল, তাও দিচ্ছে না। এখানে লোকেরা বড্ড বেশী ইনভলভড হয়ে পড়ে। অবশ্য প্রপার ডেকোরাম কিছু মানতেই হয়। কিন্তু যখন কেউ থাকে না সামনে, তখন রিল্যাক্স করলে ক্ষতি কি? আসলে, হঠাৎ এত বড় দায়িত্ব, বিবেককে কিছুটা আড়ষ্ট করে দিয়েছে। সব সময় টেনসড হয়ে আছে।

দায়িত্ব এবং আশাতীত দ্রুত অগ্রগতি, বিবেককে সত্যিই কিছুটা বিহ্বল এবং আড়ষ্ট করে দিয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতাই এর মূল কারণ। অপ্রস্তুত অবস্থায় এই নূতন মর্যাদায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হলে, এখন সামগ্রিক একাগ্রতা দরকার। রিল্যাক্সেশনের সময় এখন নয়। চাইলেও পারবে না। তব গুলু, চলে যাবার আগে ওর জন্য কিছু একটা করা দরকার। অন্তত একটা জেশ্চার দেখাতেই হয়।

নতুন পরিস্থিতিতে সেনগুপ্তই, একমাত্র বন্ধু, গুরু এবং পথ প্রদর্শক। তাঁর প্রতি এখন অশেষ শ্রদ্ধা আর ভক্তি। ডিপার্টমেন্টের সকলে, নতুন করে সমীহের চোখে দেখলেও, সহযোগিতার আবহাওয়া অত্যন্ত ঠান্ডা। যে কোনও মুহূর্তে, এখন ভুল হতে পারে—এবং তারই জন্য সকলে উৎকর্ণ উন্মুখ।

এ সময়ে সত্যিকারের বন্ধু ও শুভার্থী দরকার। সেনগুপ্ত ছাড়া আর কে আছে? সেনগুপ্তকে তাই, এখন, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা ভুলে, শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পবিত্র জলে শোধন করে নেয়া দরকার। তাঁকে তাই, একদিন নিজের বাড়িতে ডিনারে ডাকল। অজুহাত তাঁর জন্য ভালো স্কচ হুইস্কি নিয়ে এসেছে সে বিলেত থেকে। এতদিন বলতে পারেনি বোসের মৃত্যুর ব্যাপারে সবাই শোকাহত হয়ে ছিল বলে।

সেনগুপ্তও ভক্ত শিষ্যের কৃতজ্ঞতা, সময় জ্ঞান ও সামাজিক সুরুচির পরিচয় পেয়ে সুখী হলেন। গুলুকেও ডাকল সেইদিন। ওকেও বাড়িতে ডাকাই হয়নি এখনও। বিপাশা শুনে ভয়ানক সিঁটিয়ে গেল। দুটি লোকের আয়োজন করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল। তার নার্ভাসনেস দেখে বিবেক আগের মতই সাহায্য করতে এগিয়ে এল। বিপাশা কোনও দিনই করিৎকর্মা নয়।

নার্ভাস বিবেকও বোধ করছে। গুলুর সম্বন্ধে। ও বাড়াবাড়ি করবে না তো? সেনগুপ্তের প্রতি বিবেকের আজকের মনোভাব আর কিছুদিন আগের মনোভাবে আকাশ পাতাল তফাত। গুলুকে নিয়ে আসতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল যে কারণে, সে কারণটা এখন ভীষণ কুরুচিপূর্ণ মনে হচ্ছে ওর। গুলু আবার উৎসাহের আতিশয্যে নিজের এবং বিবেকের কেস্ খারাপ করে দেবে না তো? যদিও আশ্বাস দিয়েছে, তবু যে অপ্রস্তুতে ফেলবে না, তার কি স্থিরতা আছে?

সেনগুপ্ত আসার আধ ঘণ্টা পরে গুলু এল। দরজা খুলে বিবেক অবাক হয়ে গেল ওকে দেখে। এখানে এসে তাঁতের শাড়ি কিনেছে বোধ হয়। সুন্দর একটি সাদা খোল চওড়া পাড়, তাঁতের শাড়ি পরে, টিপ দিয়ে মাসকারা আর হালকা লিপস্টিকে অপরূপাটি সেজে এল সে। মুগ্ধ হয়, 'ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছে তো? ভেতরে এসো', বলে বিবেক সরে দাঁড়াল। গুলু ভ্রুভঙ্গী করে ওকে শাসন করে, ভেতরে ঢুকে এল।

সে সন্ধ্যা সফল সন্ধ্যা। গুলুর মোহময়তার দিক থেকে। সে সন্ধ্যা সফল সন্ধ্যা, বিবেকের আতিথেয়তার দিক থেকে। শুধু এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে বসে বসে সকলের উৎসাহিত বাক্যোচ্ছ্বাস শুনে গেল, আর গুলুর সপ্রতিভ বাকনৈপুণ্য ও কুশলতা দেখে গেল চুপ করে বিপাশা। নামে সে হোস্টেস—কিন্তু আজকের সন্ধ্যার সে শুধু ঘরসাজানো পুতুল। একবার দেখে তারিফ করলেও হয়, না করলেও কেউ কিছু মনে করবে না। তার প্রতি মনোযোগ যা দেবার গুলুই দিল।

গুলু বিলেতে পড়ে থাকতে চায় না শুনে সেনগুপ্ত খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এখানে চাকরি পেলেই চলে আসতে পারে শুনে চেষ্টা করবেন আশ্বাস দিলেন। সেনগুপ্ত কত লোককে কতভাবে সাহায্য করেন, গুলুকেও করবেন, তাতে সন্দেহ কি? দেশের মেয়ের বিদেশে পড়ে থাকার, সেনগুপ্ত কোনও যুক্তিই খুঁজে পেলেন না। নিশ্চয়ই দেখবেন তিনি—নিশ্চয়ই দেখবেন।

খুব আনন্দের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটিয়ে সেনগুপ্ত উঠলেন। গুলুকে পৌঁছবার জন্য বিবেকের এখন গাড়ি বের করার কোনও প্রয়োজন নেই। তিনিই নামিয়ে দিয়ে যাবেন। নো প্রবলেম! বিবেক আবার কাঠ কাঠ হয়ে গিয়ে ওদের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে এল। গুলুকে আড়ালে কিছু বলার সুযোগও পেল না সে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা গুলুর হোটেলে গেল বিবেক। ওরই অপেক্ষা করছিল গুলু। ওকে দেখে মুচকি হাসল। বিবেক প্রশ্নভরা চোখে চাইল ওর দিকে। গুলু মাথা নাড়ল। 'কিছু দিন সময় চাই।' মুখে বলল। চাকরির আশা আছে কিনা দেখবো—না থাকলে যে লণ্ডন আবার সেই লণ্ডন! গুলু, তোমার ড্রাক এনে দিয়েছ, দেখি তুমি গুলুর জন্য কি আনো।'

বিবেক মনে মনে বলল, 'তুমি তোমার লণ্ডনেই ফিরে যাও গুলু। এখানে তোমার উপস্থিতি আমার আর ভালো লাগছে না। তুমি যে কি করে বসবে সেই ভয়ে স্থির থাকতে পারছি না।' মুখে বলল, 'কিন্তু গুলু—মনে রেখো, উনি আমার ডিরেক্টার—এবং এক রকম গার্জিয়ান এঞ্জেল। ওঁর মুখ হাসিও না তুমি।' গুলু চোখ বড় করে চেয়ে থেকে বলল, 'তোমার কাজ হয়ে গেছে—না? বোস্ তোমার কাজ মিটিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই না?'

'কি জানি—ভালো লাগছে না ওসব কথা ভাবতে।' বিবেক সিগারেট ধরাল এবং ধরিয়ে দিল। 'গুলুকেও আর ভালো লাগছে না?' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গুলু অনুযোগ করল। 'বোসো তো—একটু গল্প করি। কি যে খালি উঠ উঠ করো আজকাল। লেট্ গুলু অ্যামিউজ ইউ ফর এ হোআইল ডার্লিং। রিল্যাক্স!' গুলু ফোন তুলে ওর ঘরে খাবারদাবার আর ড্রিংক আনবার অর্ডার দিল।

বিবেক ফিরল বেশ রাত্রি করে। সামান্য অ-কণ্ঠ অবস্থায়। বিপাশা দেখেই বুঝল—গুলু! এক্তিয়ার নেই জেনেও, অভ্যাসবশত বিপাশা বলে ফেলল, 'গুলুকে নিয়েই সবাই কি মজে থাকবে নাকি? কত টাকা খরচ করে ওকে নিয়ে এলে?' বিবেক রুক্ষ গলায় জবাব দিল, 'আর কে মজে থাকবে আমি জানি না—আমি কোনও মেয়ের ওপর মজে থাকার লোক নই। কত টাকা? আজকাল আর টাকা খরচ করে কোনও মেয়েকে নিয়ে আসতে হয় না। মেয়েরা আপনিই আসে।' বলে জামা কাপড় ছাড়তে চলে গেল।

বিপাশা নিরুপায় রাগে, ক্ষোভে, অপমানে চুপ করে বসে রইল একটা চেয়ারে। বিবেক এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে চেয়ে চেয়ে দেখল। সে ...ন কি করবে? কোথায় যাবে? কোথায় থাকছে ও?

'আমি তবে এখন কি করব?' হঠাৎ কখন জোরেই কথাটা বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে। 'অ্যাঁ?' বিবেক বালিশ থেকে মাথা ওঠাল। 'কি আবার করবে? খোজো রয়েছে, তাস্তি রয়েছে। সংসারও রয়েছে। তোমার রাজরানী হওয়া কপালে আছে—তাও বাড়ি রয়েছে। তবে আজকাল রাজরানী কি করে হয়—আমার জানা নেই।' বিবেক আবার মাথা রাখল বালিশে।

ঘুম আসছিল—এখন পালিয়েছে। নিজের ওপর গ্লানি আসছে। ঐ এক কোণে বসে থাকা একটি পরিত্যক্ত মহিলার, বিগত দিনের মূল্যের কথা মনে পড়ে, সামান্য কষ্টও হচ্ছে—লজ্জাও হচ্ছে। যার প্রতি আজ ভালোবাসা নেই—শুধু দায়িত্ব আছে। প্রেম নেই—শুধু কর্তব্য আছে। আকর্ষণ নেই—আছে শুধু করুণা।

দিন যাবে। আস্তে আস্তে এই অসহনীয় অবস্থাও সহনীয় হয়ে উঠবে। বিবেকের যন্ত্রণার দিন কেটে গিয়েছে—অস্বস্তি রয়ে গেছে। বিপাশার হয়তো অস্বস্তির দিন কেটে গিয়ে এসেছে যন্ত্রণার দিন। ও যন্ত্রণা বিবেক জেনে। চায় না—বিপাশাও পাক সে যন্ত্রণা। কিন্তু উপায় নেই। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। সব মিলিয়ে যায়। থাকে শুধু এক সুবিধাবাদী সমঝোতা। সাংসারিক ও সামাজিক সামঞ্জস্য বোধ।

একদিন হয়তো, মায়া আর প্রয়োজন, আবার কাছে টেনে আনবে ওদের। কিন্তু যা গেল তা আর ফিরবে কি? বিশ্বাস ও ভালো লাগা চলে গেল, শুধু সহিষ্ণুতার কোনও সম্পর্কে আর রূপ রস গন্ধ থাকে কি?

আপাতত বিবেকের মনে হচ্ছে, ঐ ভদ্রমহিলা—যিনি এক ট্রাজেডির নর মূর্তিটি হয়ে আজ এক কোণায় বসে আছেন—যে জিনিসটার ওপর উনি বসে আছেন, ওটা একটা চেয়ার নয়—ওটা বিবেকের বিবেক—কনসেন্স! বসেই থাকবেন বোধ হয় চিরকাল! দমবন্ধ অবস্থায় বিবেক মনে মনে বলল—'গড ও গড্! হোআট এ সিলি রিলেশন!'

ছবি সুধীর মৈত্র

বিজ্ঞান

উষ্ণতা এবং জীবনের অস্তিত্ব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের উষ্ণ প্রস্রবণটি শুধু লক্ষ লক্ষ দর্শকের কাছেই নয়, বিজ্ঞানীদের কাছেও যেন বড় রকমের একটি বিস্ময়। সমুদ্রতল থেকে জায়গাটি কিছুটা উঁচুতে অবস্থান করায় এই উষ্ণ প্রস্রবণের ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা কম। ৯২ থেকে ৯৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীরা বিস্মিত। কারণ, ওই ফুটন্ত জলের ভেতর তাঁরা এমন দুই শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছেন, যারা প্রকৃতির সেই উত্তপ্ত পরিবেশে বহাল তবিয়তে বাস করছে। এবং শুধু বাস করা নয়, তাদের স্বভাব চরিত্র দেখে মনে হয়, ওই উষ্ণ প্রস্রবণের চরম পরিবেশই যেন তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান। সেখানে তারা সাঁতার কাটে। জলের মধ্যে মিশে থাকা জৈব রাসায়নিক সামগ্রী খেয়ে জীবন ধারণ করে। সেই সঙ্গে করে বংশবিস্তার। না। পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশ তাদের কাছে যেন অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার।

"যেহেতু পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক কম, আমরা ধরে নিতে পারি, স্বল্প উষ্ণ পরিবেশেই বেশীর ভাগ জীবাণুর বাসস্থান। ধরা যাক এই উষ্ণতা শূন্য থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোনও কোনও জীবাণু অবশ্য মানুষ এবং উষ্ণ-রক্তবাহী প্রাণীর দেহের মধ্যেও বাস করে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে তাদের বাস করতে হয় ৩৫ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। সে তুলনায় ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ওই দুই শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া বড় রকমের ব্যতিক্রম।" সম্প্রতি "টেকিং দ্য হিট" শিরোনামে প্রকাশিত (ন্যাচারাল হিসটোরি : ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯) একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন ইয়েলোস্টোন রিসার্চ প্রজেক্টের জীবাণু-বিজ্ঞানী ডঃ জেরি এল মোৎসের এবং উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডঃ টমাস ডি ব্রক। উল্লেখ্য, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া কীভাবে বাস করে, পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে তাদের আচরণ এবং শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মের অবস্থাটা কী পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় সে সব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে গত দশ বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে আসছেন ডঃ মোৎসের। ডঃ ব্রক মনে করেন, জীবাণুর স্বভাব চরিত্র জানার জন্যে যদি গবেষণা করতে হয়, তাহলে ঠিক যে পরিবেশে তারা বাস করে, সেখানেই তা করা উচিত। কারণ গবেষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশে কালচার করতে গিয়ে তাদের অনেক মৌলিক চরিত্রই আমরা নষ্ট করে ফেলি।

ব্রকের এই মন্তব্য ইয়েলোস্টোন পার্কের প্রস্রবণ থেকে সংগৃহীত ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, মোৎসের এবং ব্রক দু-জনই দেখেছেন, ওদের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া উষ্ণ প্রস্রবণের জলেই বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত। গবেষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশে তাদের বংশবৃদ্ধি করানো সম্ভব হয় না।

ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের উষ্ণ প্রস্রবণে যে আর এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে তার নাম থারমাস অ্যাকুয়াটিকাস। মজার ব্যাপার এই, ওই প্রস্রবণেই শুধু নয়, অনেক সময় ঘর-বাড়িতে স্নানের জল গরম করার জন্যে বিদ্যুৎচালিত যে সব আধার ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কোনও কোনও জায়গায় সেই সব আধারের গরম জলের মধ্যেও এদের পাওয়া যায়। সাধারণত ওই জলের তাপমাত্রা হয়ে থাকে ৬৫ থেকে ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উল্লেখ্য, থার্মাস ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধি সব চেয়ে বেশি ঘটে যদি জলের তাপমাত্রা থাকে ৭০ থেকে ৭৫ ডিগ্রির মধ্যে। ভয়ের কোন কারণ নেই। মানুষের উপর এই ব্যাকটেরিয়ার কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি।

ডঃ মোৎসের এবং ডঃ ব্রকের বক্তব্য : অনেকের ধারণা, যে পরিবেশে তাঁরা বাস করেন, জীব-জগতের বেঁচে থাকার ব্যাপারে সেটাই একমাত্র আদর্শ পরিবেশ। কিন্তু কোনও কোনও জীবাণু যে কি প্রচণ্ড অস্বাভাবিক (?) পরিবেশেও জীবনধারণ করে সে খবর অনেকেই হয়ত রাখেন না।

এই সব ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কেউ কেউ বাস করে স্বাভাবিক উষ্ণ জলে। কারও বাস উষ্ণ জলে, কিন্তু সেই জলে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষার থাকে। কারোর কারোর বাসস্থান উষ্ণ জল এবং সেই জলে অ্যাসিডের মাত্রা বেশি।

কয়লাখনি অঞ্চলের কথাই ধরুন। খনি থেকে কয়লা সংগ্রহ করার সময় বেশ কিছু পরিমাণ জঞ্জালও সংগৃহীত হয়। এই জঞ্জালের মধ্যে থাকে কার্বণ কণা। মাটি, পাথরকুচি এবং নানা রকম জৈবিক এবং অজৈব পদার্থ। এইসব জঞ্জাল স্তূপ করে রেখে দেওয়া হয় খনির কাছাকাছি কোন জায়গায়। বাতাসের অক্সিজেন ওই সব অজৈব এবং জৈবিক পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। এর ফলে উৎপন্ন হয় তাপ। পরিত্যক্ত জঞ্জাল স্তূপের তাপমাত্রা তখন কখনও কখনও ৫৯ ডিগ্রি সেলসিয়ামের মত দাঁড়াতে পারে। এবং শুধু তাই নয়। জঞ্জালের মধ্যে থাকে পিরাইটিস এবং গন্ধকঘটিত অন্যান্য সামগ্রী। বিক্রিয়ার দরুণ ওই গন্ধকঘটিত সামগ্রী থেকে উৎপন্ন হয় সালফিউরিক অ্যাসিড। প্রকৃতির এই প্রতিকূল পরিবেশেও বাস করে এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া। যারা উষ্ণ পরিবেশেই শুধু নয় অ্যাসিডের সান্নিধ্যেও
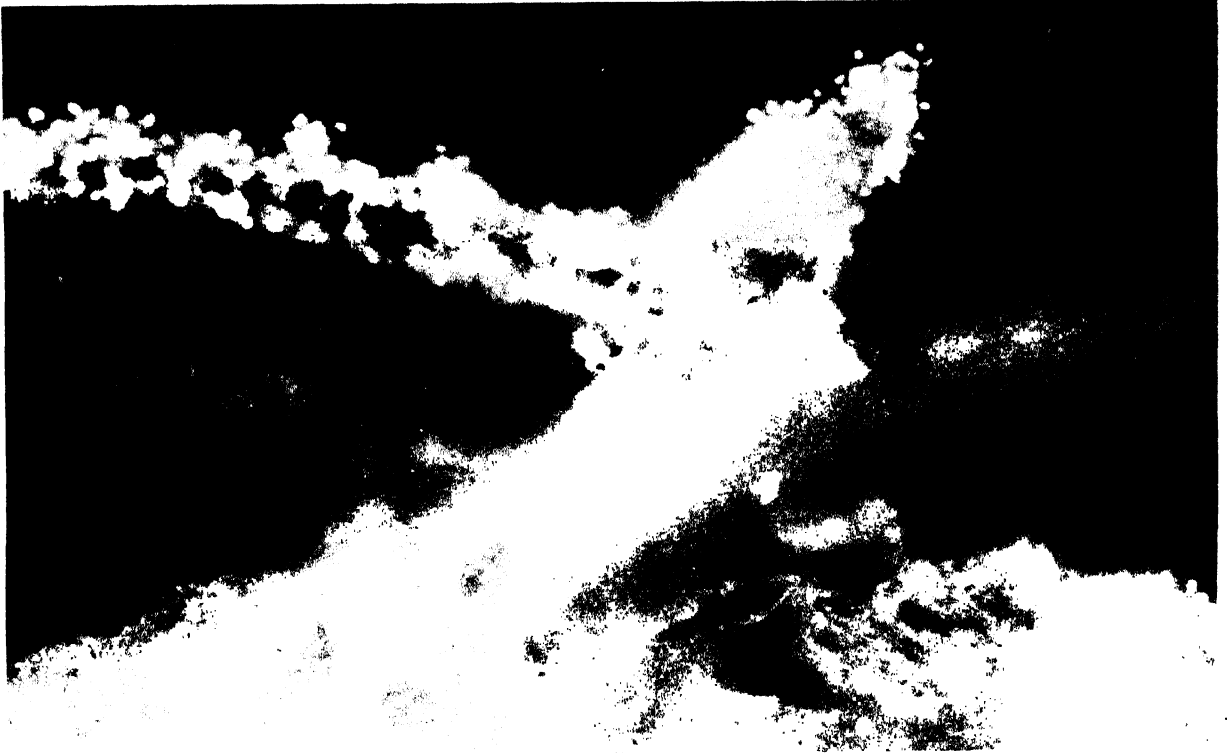
গন্ধক কেলাসের গায়ে লেগে রয়েছে সালফোলোবাস ব্যাকটেরিয়া (উজ্জ্বল আলোক বিন্দু লক্ষ করুন)। বিশেষ রঞ্জক পদার্থের মাধ্যমে প্রতিপ্রভা-অনুবীক্ষণ পদ্ধতিতে (ফ্লুয়োরেসেন্স মাইক্রোসকোপি) ছবিটি তোলা হয়েছে।

বাস করার ক্ষমতা রাখে। মাইক্রোবাইওলজিস্ট বা জীবাণু-বিজ্ঞানীরা এই সব ব্যাকটেরিয়ার নাম রেখেছেন "মাইকোপ্লাজমা"। এদের চেহারা গোল। এদের কোষপ্রাচীর অপেক্ষাকৃত কঠিন। কয়লা-খনি এলাকার উষ্ণ জঞ্জালের মধ্য যে সব ব্যাকটেরিয়ার বাস শ্রেণীগত হিসেবে তাদের বলা হয় "থারমোপ্লাজমা অ্যাসিডোফাইলাম"। এদের বৈশিষ্ট্য এরা সব চেয়ে বেশি বংশ বৃদ্ধি করতে পারে ৫৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। এছাড়া, এইসব ব্যাকটেরিয়া বাঁচার জন্যে সব সময় একটি আশ্রয়কে বেছে নেয়। এই আশ্রয়কে কখনও তারা সংগী হিসেবে গ্রহণ করে, কখনও বাস করে আশ্রয়ের গায়ের উপর অথবা অভ্যন্তরে। বলা বাহুল্য, আশ্রয়টি কখনও উচ্চতর জীবাণু হিসেবেই বিরাজ করে।

"যে সব ব্যাকটেরিয়া উষ্ণ প্রস্রবণের অ্যাসিড মিশ্রিত জলে বাস করে চরিত্রের দিক দিয়ে তারা অনেক বেশি চমকপ্রদ।" বলেছেন ডঃ মোৎসের এবং ডঃ ব্রক।

যেমন ধরুন, "সালফোলোবাস অ্যাসিডোক্যালডেরিয়াস" শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়ার কথা। এই ব্যাকটেরিয়া উষ্ণ জলে যে গন্ধক থাকে তাকে জারিত করে তৈরি করে সালফিউরিক অ্যাসিড।

ভূতাত্ত্বিকদের বক্তব্য, সালফোলোবাসের বাসস্থান এমন সব অঞ্চলে, ভূতাপের পরিপ্রেক্ষিতে যে-সব অঞ্চল অনেক বেশি সক্রিয়। ওই সব অঞ্চলে উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায়, উষ্ণ প্রস্রবণের জলে থাকে কিঞ্চিৎ অ্যাসিড। এবং আশপাশের মাটিতেও অ্যাসিডের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী। এ সব জায়গায় ভূস্তরের গভীর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে গরম বাষ্প। সেই বাষ্পের মধ্যে থাকে হাইড্রোজেন সালফায়েড। এই হাইড্রোজেন সালফায়েড বাষ্পের সংগে ভূস্তরের বাইরে বেরিয়ে এসে স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ধতিতে জারিত হয়ে গন্ধক দেয়। গন্ধক পরে জারিত হয়ে উৎপাদন করে সালফিউরিক অ্যাসিড। এই জারণের ব্যাপারে সালফোলোবাস ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মোৎসের এবং ব্রক দেখেছেন, জলের তাপমাত্রা ৬০ থেকে ৯২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সেই জলে দ্রবীভূত সালফিউরিক অ্যাসিডের মাত্রা প্রতি লিটারে ১৪.৭ গ্রাম। অথচ তেমন পরিবেশেও সেই জলে সালফোলোবাসের বাস।

বিজ্ঞানীদের কাছে এই ঘটনা একটি বড় রকমের বিস্ময়। কারণ, দেখা গেছে বেশির ভাগ ব্যাকটেরিয়া অত বেশি অ্যাসিড-পরিবেশ সহ্যই করতে পারে না। ওই অ্যাসিডের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্রাতেই তারা কাহিল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মাধ্যমের (এ ক্ষেত্রে জল) তাপমাত্রা যদি ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয়, তাহলে তো কথাই নেই। সে ক্ষেত্রে তাদের বাঁচাটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অথচ অমন অবস্থা সালফোলোবাসের কোন ক্ষতি করে না।

মোৎসের এবং ব্রকের মন্তব্য : সালফোলোবাসই একমাত্র প্রাণী যাদের আমরা চরমতম পরিবেশে আবিষ্কার করতে পেরেছি। এখানে চরমতম পরিবেশ বলতে বোঝাচ্ছি অতিরিক্ত অ্যাসিড মিশ্রিত মাটি এবং জল, এবং যাদের তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশী। সালফোলোবাস ছাড়া আর কোন প্রাণীর অস্তিত্ব অমন পরিবেশে এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সালফোলোবাস সম্পর্কে যে সব তথ্য এ পর্যন্ত তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাদের মধ্যে প্রধান : এক, এই ব্যাকটেরিয়া মৌলিক পদার্থ হিসেবে বিরাজমান (এলিমেণ্টাল) গন্ধককে জারিত করে সালফিউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করতে পারে। দুই, এই বিক্রিয়াটি তারা সম্পন্ন করে উচ্চতর তাপমাত্রায়। এ ক্ষেত্রে আদর্শ তাপমাত্রা ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রির উপরে উঠলে এদের বিপাকীয় কাজ-কর্মের উপর চাপ পড়ে।

ভূতাত্ত্বিকদের কাছে সালফোলোবাস ব্যাকটেরিয়া একটি বড় রকমের জিজ্ঞাসা। তাঁদের ধারণা, নানা রকম ভূতা[illegible] ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা খুবই সক্রিয়। ভূস্তরে নানা রকম সালফেট পাথর দেখা যায়। ওই সব সালফেট পাথর তৈরির জন্য দরকার সালফিউরিক অ্যাসিড।........ অতএব ব্যাপারটা এইভাবে কল্পনা করুন : সৃষ্টির পর উত্তপ্ত পৃথিবীর ভূস্তর ক্রমে ঠান্ডা হলে এলো। তার উপরের তাপমাত্রা নেমে এলো ৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। তখন তার বুকে বিরাজ করছে লক্ষ লক্ষ উষ্ণ প্রস্রবণের ধারা। তখন জীবন হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করল সালফোলোবাস অথবা তার অনুরূপ কোন ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া ভূস্তরের সঞ্চিত গন্ধকের একটি বড় রকমের অংশকে জারিত করে তৈরি করল সালফিউরিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিড উত্তরকালে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সংগে বিক্রিয়া করে উৎপাদন করল নানা রকম সালফেট শ্রেণীর পাথর।

প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে ইয়েলোস্টোন পার্কের উষ্ণ প্রস্রবণের সেই থারমাস ব্যাকটেরিয়া এবং সালফোলোবাস ও থারমোপ্লাজমা কি সমগোত্রীয় ?

মোৎসের এবং ব্রকের উত্তর : না। প্রজননগত গঠন বা জেনেটিক ফরমেশনের দিক দিয়ে থারমাস শেষোক্ত ব্যাকটেরিয়াগুলির চেয়ে স্বতন্ত্র। বরং তাদের সংগে এখনকার সাধারণ ব্যাকটেরিয়ারই মিল বেশী।

ঘটনা যাই হোক, বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে যে সব ব্যাকটেরিয়া বাস করে তাদের নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করা দরকার। এতে করে হয়ত আমরা এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেতে পারি যাদের মানব কল্যাণে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। যারা উৎপাদন করতে পারে জ্বালানি গ্যাস ; ধাতু নিষ্কাশনের ক্ষেত্রেও যাদের ভূমিকা প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে লাভজনক হওয়া অসম্ভব নয়।

সমরজিৎ কর

শিশুরা জন্মায় কোমল শরীর নিয়ে
জনসন্স* সেই কোমলতা বজায় রাখে

জনসন্স বেবী ক্রীম এখানে সবচেয়ে ভাল কাজ করে কেন—
[illegible] সাদা জনসন্স [illegible] গালে আরাম এনে দেয়। শুকনো ত্বক নরম করে। ল্যানোলিনে সমৃদ্ধ। তেলাক্ত করে না। কাপড়ে দাগও পড়ে না।

জনসন্স বেবী ক্রীম এখানে সবচেয়ে ভাল কাজ করে কেন—
বাতাস, আবহাওয়া, নাক দিয়ে সর্দিঝরা এবং এমন কি চোখের জল ত্বকের ওপর প্রবল ধকল ফেলে। পেলব জনসন্স ত্বক চটপট শুষে নেয় এবং ত্বকের ফাটলে বা ক্ষতে চটপট আরাম এনে দেয়।

জনসন্স বেবী ক্রীম এখানে সবচেয়ে ভাল কাজ করে কেন—
কাঁথিয়া বদলে দেবার সময়টুকুর বাইরে জনসন্স আর্দ্রতা প্রতিরোধের কাজটি করে। শিশুকে শুকনো রাখে অথচ লোমকূপের মুখ বন্ধ ক'রে দেয় না।

জনসন্স বেবী ক্রীম এখানে সবচেয়ে ভাল কাজ করে কেন—
হামাগুড়ি দেবার সময় শিশুর কনুই আর হাঁটুতে ব্যথা লাগে এবং ত্বকের ছাল উঠে যায়। চটপট কাজ করার জনসন্স ব্যথা জায়গায় আরাম এনে দেয় এবং ত্বক রেশমের মত কোমল রাখে।

Johnson's*
baby cream
PUREST PROTECTION

জনসন্স*
বেবী ক্রীম

সারা বিশ্বের মায়েরা এর ওপর আস্থা রাখেন

Johnson & Johnson*

পুনশ্চ পারী

নীরদ মজুমদার

॥ তেরীশ ॥

বুলভার ভাঁসপার্নাস ও রুস্যার্চ স্যমিদীর মোড়ে একটি কফিখানা আছে যার নাম "ও সিগ্নাকিয়ন্" অর্থাৎ "ধূমপানরত কুকুরদের" কাফে। এইখানে বসে বুভিয়ে ও আমি আড্ডা মারছিলাম। বহুকাল পরে পারীতে আমার প্রদর্শনী ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এ কাহিনী তার পরের।

যেখানে বসে আছি ঠিক আমাদের উল্টো দিকে ফ্লোরিস্ত মোলার। দনিসের ফুলের দোকান। ঠিক হয়ে রয়েছে সন্ধ্যা ছটায় মার্গারীট এখানে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। তারপর মার্গারীট ও আমি কৃষ্ণ রিবুর বাড়ি ডিনারে যাব। ১৯৭৭ সালের কথা। আর এক "প্রাতাঁয়" বা বসন্তকালে পারীর মধ্যস্থলে বসে আড্ডা দিচ্ছি। বেশ কিছুটা পাগলামোতে ভরা ঋতু এই "প্রাতাঁ"। তবে আমাদের কালের থেকে যেন মনে হয় অনেক তফাত। তা ছাড়া যেখানে কাঁচেঘেরা কাফে টেরাসের আশেপাশে যুবতীদের ভীড় সেখানে প্রাতাঁ। এখানে ওখানে তির্যক গোলাপী আলোয় উদ্ভাসিত স্বচ্ছ গোলাপী স্তনদ্বয় চোখে পড়ে।

সী থ্রু ব্লাউজ বা নয়ন-সুখ স্বচ্ছ জামা ভেদ করে দেখা যায় রক্তিম বাদামী বোঁটা, সেখানে সে বৃন্ত দুটিতেও "প্রাতাঁ"। আমাদের কালে এ সৌভাগ্য ছিল না।

আমাদের কথোপকথনে মনঃসংযোগ করতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল। বুভিয়ে বলল, তুইলরীতে হেনরী মুরের মূর্তির প্রদর্শনী হচ্ছে দেখেছো ?

আমি উত্তর করলাম, হ্যা। তবে আমার ভাল লাগেনি। আরো যোগ করলাম, তুমি জান, কখনও কখনও বাজারে উপন্যাস লেখকরাও বেশ ভাল মন্তব্য করে, যেমন সেদিন পড়লাম আর্থার হেলীর 'হুইল' উপন্যাসটা তাতে লিখেছে, 'একটা ভক্স ওয়াগন গাড়ি পেডাস্টেলে বসিয়ে দিলেই হেনরী মুরের ভাস্কর্য হয়ে যাবে।' বুভিয়ে হেসে ফেলল। বলল, কথাটা ঠিক। কিন্তু কথাটা আমি হলে ইম্প্রোভাইজ করে আরো বলতাম, ঐ ভক্স ওয়াগানটা যদি একটা বড় হেভি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায় তা হলেই হয়ে যাবে যার্মান রীসিয়ে ভাস্কর্য। তারপর ওটাকে ব্রোঞ্জ ফাউন্ড্রিতে ঢুকিয়ে দিলে, গলিত হয়ে, তা হয়ে যাবে বিচিত্র আকৃতির। তাই হবে জিয়াকমেতীর ভাস্কর্য।

এ কথায় আমরা দুজনেই খুব হেসেছি।

মার্গারীট আসাতে আমরা নতুন করে পানীয় নিলাম। কিছু পরে বুভিয়েকে বিদায় দিয়ে, মোলারের দোকান থেকে ফুল কিনে আমরা রওনা হলাম সেদিনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য।।

আমাদের বাড়ির পাশেই "লাপিতাল স্যাঁ নোকর" ঐ হাসপাতাল ভেদ করে গেলে এভিনিউ দ্য ব্রতই। খুব কাছেই এইখানে, কৃষ্ণ রিবুর বাড়ি। ১৯৭৭-এ প্রথমবার কৃষ্ণাদের বাড়িতে যাই মহা উৎসাহে। শুনেছিলাম ওঁদের চিত্র-সংগ্রহ অতীব উত্তম। তাছাড়া ইদানীং নতুন একটা পিকাশোর ছবি ওঁরা সংগ্রহ করেছেন। ছবিটা নাকি অনবদ্য।

আমার প্রদর্শনীতে উপস্থিত মাদমোয়াজেল ওবোইয়ে একথা সমর্থন করে বলেন, সত্যই অপূর্ব ছবি।

বাড়িটা ভারি সুন্দর। দরজার পর একটি আঙিনা। তারপর ওঁদের ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটের পিছনে মনোরম একটি উদ্যান।

বাড়ির সমস্ত দেয়ালে আধুনিক চিত্রকলার সমাবেশ। তাছাড়া আছে বহু ভারতীয় চিত্র-মূর্তি। সব কিছু রুচিসম্মত। নমুনামাত্রই বাছাই করা।

জরম্যান রিসিয়ে "বাদুড়" (ভাস্কর্য)

মহাশয় ও মাদাম রিবুর সংগ্রহ পিকাশোর চিত্র "পাইপমুখে মানুষ"

ান্দিনস্কীর 'বন্যা' (তৈলচিত্র)

মহিলা শায়িত (ভাস্কর্য)—হেনরী মুর

কান্দিনস্কীর 'অতিরঞ্জিত' (তৈলচিত্র)

মন্দ্রিয়ান "রচনা" (তৈলচিত্র)

মন্দ্রিয়ান "রচনা" (তৈলচিত্র)
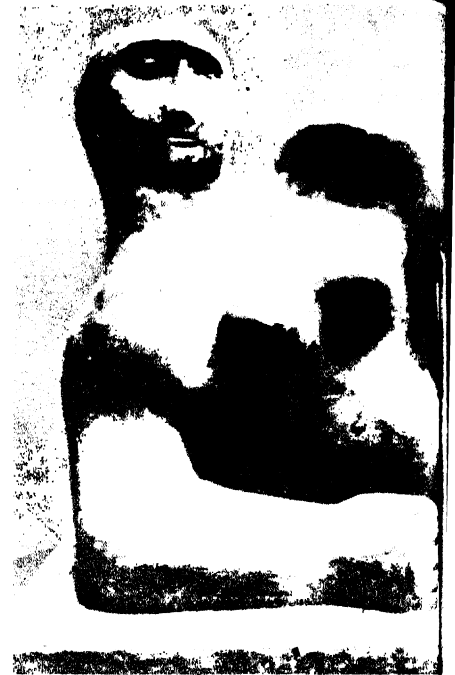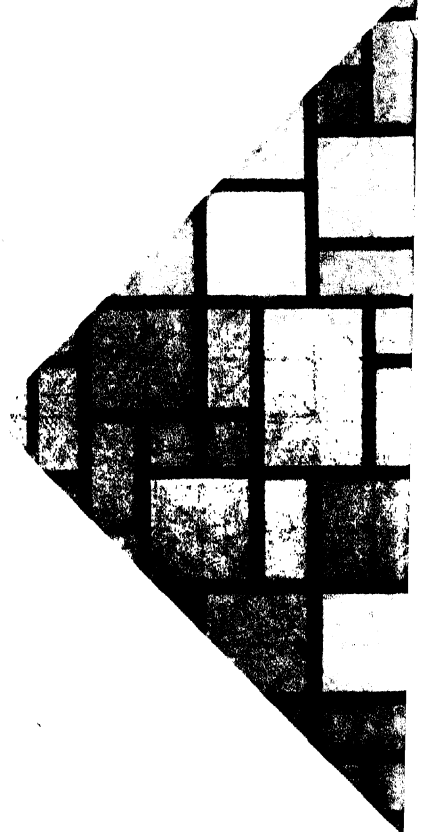
আমার জ্ঞানে কোন ভারতীয়র এমন একটা বাড়ি দেখিনি। সত্যই কৃষ্ণা ও তাঁর স্বামী রিবু মহাশয়কে প্রশংসা করতে হয়। কৃষ্ণা কলকাতার মেয়ে আর মহাশয় রিবু ফরাসী। সুন্দর দম্পতি। আধুনিককালের শিল্পীদের ছবি সংগ্রহ করেছেন রিবু দম্পতি সযত্নে। পিকাশো, ব্রাক, মাতিশ, ক্লী, লেজের তো আছেই। তা ছাড়া আছে সুররিয়ালিসং বিমূর্তবাদী সবরকম চিত্রের সুনির্বাচিত সংগ্রহ। একটা ছোট্ট যাদুঘর জাতীয় ব্যাপার। এমন খুব কম দেখা যায়। সর্বত্রই মার্জিত রুচির পরিচয় সুস্পষ্ট। মনে মনে আমি ভাবছিলাম এরূপ পরিচয় খুব স্বাভাবিক, প্রথমত মহাশয় রিবু লিয়োঁ সহরের এক বড় ঘরের সন্তান। কৃষ্ণা বাঙলার তথা কলকাতার এক খ্যাতনামা ঘরের কন্যা এবং ঠাকুরবাড়ির সম্পর্কে আবার সম্পর্কিত। সুতরাং উভয়ের ক্ষেত্রে উন্নত রুচি স্বভাবসিদ্ধ হতে বাধ্য।

মাদাম রিবুকে আমি কৃষ্ণা বলি, আমার স্ত্রী বলে "গ্রাঁদ দাম" অর্থাৎ মহান মহিলা।

ওঁদের সঙ্গে সে সন্ধ্যার পানীয় আড্ডা ও ডিনারের অন্তরঙ্গতা, সত্যই ভোলবার নয়।। পরিপূর্ণ আহারাদির পর কৃষ্ণা আমাদের হাতে, কিছু আম ছাঁদা বাঁধবার জন্য দিলেন। একেবারেই বাঙ্গালী মহিলাসুলভ আচরণ। ফরাসী দেশে এতকাল জীবন যাপন করলেও ঘুচবে না। পারীতে আম আমরা অবশ্য সানন্দে সদ্ব্যবহার করেছি। মনে মনে বলেছি, বেঁচে থাক কৃষ্ণা।

এক কথায় আধুনিক চিত্র সম্পদ কৃষ্ণাদের বাড়িতে সব নমুনাই পাওয়া যাবে। তবে, পিকাশোর চিত্রটি ঐ বাড়িতে যেন ডিনামাইট। সব কিছুই ধ্বসিয়ে দিতে পারে। কারণ অবশ্য একটা আছে। বেশি বয়সে পিকাশোর কেমন এক নস্টালজিয়া এসেছিল। উনি তাঁর অগ্রদূত সব মাস্টারদের ছবি স্বকীয় রীতিতে রচনা করেন। সাহিত্যে যেমন মার্সেল প্রুস্ত তাঁর "পাস্তিসএ মেলাজে" পুস্তকে একটা গল্প বিভিন্ন রচনারীতিতে পরিবেশন করেছেন। আমার তরুণ বয়সে এসব কথা আমি জানতাম না। সে সময় আমিও একদা এই পারীতে ঐতিহাসিক কাল থেকে একাল পর্যন্ত চিত্র ও মূর্তিকলা স্বকীয় রীতিতে রূপান্তরিত করে ছিলাম। এসব না জেনেই একটা পাখির মোটিভে কালে কালে দেশে দেশে কতরকমভাবে আঁকা হয়েছে তাই অবলম্বন করে "ডানায় অশেষ যাত্রা" (উইংস অব নো এন্ড) চিত্রমালা রচনা করেছিলাম। ১৯৬২ সালে কলকাতায় তার প্রদর্শনী করেছিলাম। কিন্তু, হায়! সংগত কোন উচ্চ-উত্তর কলকাতার দর্শকের কাছে পাইনি।

নতুনভাবে পুরাতন চিত্রে পরিকল্পনার পিকাশোর জুড়ি নেই। পুরাতন গ্রীস আত্মসাৎ করে তিনি রূপান্তরিত করেছেন নিজস্ব ধরনে নতুন জগৎ উদ্ভাবন করে স্বদেশী বিদেশী রসাত্মকরূপে পরিতৃপ্ত করেছেন। এসবের মর্মকথা আমরা পরবর্তীকালে অনেক জেনেছি ফ্রাঁসোয়াজ জিলোর পুস্তক "পিকাশোর সহিত সহবাসে" গ্রন্থ পাঠ করে। সেই বইতে এক জায়গায় যেন পিকাশোর পাপ স্বীকারের স্বর সত্যই বিহ্বল করে আমাদের। সে এক দীর্ঘ কাহিনী, পিকাশো বললেন, (ফ্রাঁসোয়াজ)

তুমি ভাল শ্রোতা। তোমাকে আমি খুলে বলি। ছবি আঁকতে চাইলে তোমাকে ফিরে যেতে হবে গ্রীক শিল্পকলার শুরুতে। ফিরে যেতে হবে ঈজিপ্সিয়ন অধ্যায়ে। (তার বাইরের কথা হয়তো পিকাশোর অগোচর) নৈকট্য চেতনা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে স্বয়ং আমরা এমন এক অবস্থায় যাকে বলা যেতে পারে দুর্ভাগ্য, যেখানে কোন নিয়ম, নান্দনিক রীতি শূন্য, কোনো আইনের বশবর্তী আমরা নই। গ্রীকদের চিত্রবিধান ছিল। রোমানদের ছিল। ইজিপসিয়ানদেরও ছিল। সৌন্দর্যের কারণে তাদের প্রামাণ্য বিধির বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই ধরনের বিচার তাদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেই শিল্পকলা তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এক ধরনের স্বাধীনতা শিল্পীদের মধ্যে, সব শিল্পীদের মধ্যেই, চাড়া দিয়েছে। একই ধারণার বশবর্তী হয়েছে তারা। যে কেউ যা ইচ্ছে করতে পারে! সেইদিন থেকে চিত্রশিল্পের শেষ। খতম। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে তাদের ভাবপ্রবণতা, তাদের সংবেদন সার বস্তু। থেকেও যা ইচ্ছে তাই করতে পারে তাদের বোধ অনুযায়ী। যে কোন ভিত্তিতে— সেই থেকে কোন চিত্রই সঙ্গত চিত্র নয়; কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়েছে; চিত্রকর-ভাস্কর সম্প্রদায়েরও ঐ একই রোগে মৃত্যু।

শিল্প-না হলে এমত স্বীকারোক্তি সম্ভব নয়। একথা খুব সত্য! ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে এক বিরাট উচ্ছৃংখলতা চলেছে। আমাদের সমকালীন ইতিহাসে এটা যেমন প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে, ইতিপূর্বে কোন সভ্যতায় কোনদিন এমন বিস্ফোরণ হয়নি। অধুনা শিল্পকলার আসল কথা হলো নিছক সংবেদন। অর্থহীন। এই ধরনের শিল্পকলার স্বপ্ন অংকুরিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের গোড়ায়। পরেও। কিন্তু পিকাশো, মাতিস, ব্রাকের ব্যক্তিত্বের চাপে মাথা চাড়া দিতে পারেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অবশ্য আরো জোরদারভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফরাসী দেশ জার্মান অধিকৃত অবস্থায় প্রথমে বাঁধ ভাঙলো।

২০ই মে ১৯৪১ সাল। একদল নবীন শিল্পী ফরাসী ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারী বলে গর্বিতভাবে নিজেদের পরিচয় দিল। এই দলই ১৯৪৪ সালে "স্যালো দতোন" আবার মিলিত হল। তারা সকলেই আজ বিশ্বস্বীকৃত শিল্পী বাজেন, এস্তেভ, গীসকীয়া, লাপিক, মানেসিয়ের এবং পিনিও। এই তরুণ দলটির প্রথম প্রদর্শনীর গুরুত্বর সঙ্গে ১৯০৫-এর "ফোভ" এবং ১৯১১-র "কিউবিস্ত" প্রদর্শনীর তুলনা করা হয়।

এই শতাব্দীর গোড়া থেকে বা বলা যেতে পারে গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চিত্রকলার মধ্যে একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা গেল। পুরোপুরি বিমূর্ত-বাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তাঁরা। শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রাক, পিকাশো, অ্যানালিটিকাল কিউবিজিম অধ্যায়, এখানে সেখানে আকৃতি ভেঙ্গে বেশ কিছু অবয়ব নিঃস্ব হতে দিয়েছিলেন বটে তবে পরিচিত জগৎ থেকে একেবারে দূরে সরে যাননি। এ কারণে তাঁদের কাজ বেশ জীবন্ত। কাঁদিনিস্কি (১৮৬৬—১৯৪৪) ১৯১০ সালে রাশিয়া থেকে জার্মানীতে এসে প্রথম বিমূর্ত চিত্র রচনা করেন। কিন্তু তাতে তখনও কিছু কিছু জাগতিক চিহ্নের পরিচয় তাঁর চিত্রে পাওয়া যেত। ১৯১৩ সালেই যথার্থ বিমূর্ত চিত্র তিনি রচনা করেন। একটি জলরঙের ছবি। অনেকটা অনুশীলন জাতীয় কাজ। নিজের রচনা দেখে কাঁদিনিস্কি নিজেই ভয় পেয়ে যান। একথা নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি, "পায়ের তলায় এই ভীতিপ্রদ শূন্যতা কেমন করে সইব?" তখন নানারকম চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনা তাঁর মাথায় চাড়া দিয়ে উঠতে থাকলো। কি আনতে পারি বস্তুর বিকল্পে? শুধু রঙ বিশুদ্ধ আকৃতি অবশ্যই। কিন্তু কেমন করে উদ্ধার পাব নিছক অলঙ্করণের কবল থেকে? উনি নিজেই বলেছেন, বহু বছর, অত্যন্ত অধ্যাবসায় সহকারে কাজ করে তবে আমার উপস্থিত রীতি বা নিজস্ব কলমে পৌঁছেছি।

জিয়াকোমিত্তির "মহিলা" (ভাস্কর্য)

১৯১৩ সালে ওঁর কাজ অলঙ্কারবহুল নকশা কাজ থেকে অনেক দূরে। ক্যানভাসে মস্ত রঙের আঁচড়। ধীর ও ত্বরিত রেখার আঁচড়। এঁকে বেঁকে ধাবিত। ছিটে ফোঁটা নানাবর্ণের উপস্থিতি। উত্তেজিত স্নায়বিক মুহূর্তের প্রখরতার প্রতিফলন। কঠিন রঙের চাপ। এ জগতেই একটা অন্য জগৎ, কিন্তু রুশী কাঁদিনিস্কির বর্ণের উজ্জ্বলতা ও দুর্লভ সব কেয়ারী করা বাহুল্য দেখে বেশ বোঝা যায় যে কাঁদিনিস্কি এক প্রাচ্যের মানুষ ও প্রাচ্য ভাবাপন্ন। রুশ দেশীয় আইকন থেকে যে তাঁর দৃশ্য সুর লয় আহরণ করেছেন এটা বেশ বোঝা যায়।

প্রায় এই একই কালে অন্যান্য চিত্রকর বিমূর্ত চিত্র রচনা করতে শুরু করেন। চেক দেশে ফ্রান্টিস কুপকা, ১৯১০-১১ সালেই আকৃতি নিরলম্ব চিত্র রচনা করেন। কিছু পরেই পারীতে দোলনে রচনা করেন গোলাকৃতির রূপবিন্যাস। তখন ডাচ শিল্পী একটি বিষয়ে, যথা গাছের বিভিন্ন রূপকতার রচনায় ব্যস্ত। এই সময় পিকাবিয়া রচনা করেন সেভিলের মিছিল।

কাঁদিনিস্কি যখন জার্মান পরবাসে বিমূর্ত ছবি আঁকছেন ১৯১০ সালে, সেই সময় তাঁর নিজের দেশে কিছু শিল্পী বিমূর্ত রূপকল্প নিয়ে নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। মস্কোতে লারিওনভ, গোনচারোভা মেলভিচ এই ধরনের চিত্র রচনা সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবিত। ১৯১৫-তে মেলভিচ রচনা করেন তাঁর চিত্র "সাদার বিরুদ্ধে কালো চৌকো"। এর কিছু দিনের মধ্যেই ইতালিয়ানদের মধ্যেও সেই বিমূর্তবাদের মন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকলো। বালা এবং সেভেরিনী রচনা করেন "ফিউচারিস্টের" শিরনামায় কিছু চিত্র। তা ছাড়া ফ্লোরেনটাইন মান্‌নেলী এদিকে আর্বা। এবং অতঃপর ১৯১৬ সালে দাদা গোষ্ঠী চিত্রজগতে উঞ্ছবৃত্তি ঘোষণা করলেন। বলা যেতে পারে বিমূর্ত-তার অছিলায় যথেচ্ছাচার বা স্বেচ্ছাচার শুরু হয়ে গেল।

এদিকে হল্যাণ্ডে আর এক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হলেন পিয়েত মন্দ্রেন (১৮৭২-১৯৪৪)।

একদা মন্দ্রেন কিউবইজম পদ্ধতিতে কাজ করে ছিলেন কিছুকাল। ১৯১১ সালে ইনি নিজে পিকাশো আর ব্রাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে চিত্রচর্চা করেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজস্ব সিদ্ধান্তে নিয়োজিত করতে থাকলেন। মন্দ্রেনের কাছে বস্তুনিচয় নিছক রেখা ও ছন্দ। তাঁর চিত্রপটে এসবই গড়তে থাকলেন। স্বয়ংসিদ্ধ রূপায়ণ দেখালেন। ১৯১৪ সালে মন্দ্রেন ফিরে গেলেন হল্যাণ্ড। আকৃতি আর প্রকৃতির সমস্ত স্মারক নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে। এবার পরিচিত জগৎ সম্পূর্ণ-রূপে উদ্বায়ু হয়ে বা বড় জোর জ্যামিতিক শুদ্ধতায় দেখা দিল। ১৯১৭ সালে প্রথম প্রকাশিত "দ্য স্তীল" (ইংরেজী "দ্য স্টাইল" অনুদিত হলে বাঙলায় দাঁড়াবে "কলম") নামে পত্রিকায় থেও ভান ডোয়েসবার্গের সাহচর্যে সম্পাদনা শুরু করেন—এই পত্রিকায় কাঁদিনিস্কি ঘোষণা করেন। কেবলমাত্র শুদ্ধ নমনীয়তাই উপনীত করতে পারে যথার্থ বাস্তবতায়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পরবর্তী অনেক শিল্পকলা সৃজিত হল। এসব কাজে কোথাও আকৃতির স্থান নেই। একেই ওরা বলেন নব্য নমনীয়কল্প শিল্পরচনা। নিছক সরল রেখা; খাড়া, আনুভূমিক এবং সমতলগত দিয়ে বিরচিত কাজ।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় পরিচিত জগৎ তো পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে নব্য নমনীয়তা প্রকাশ করতে পারল না? কারণ দ্বিমাত্রিক পটভূমি এঁকে দেওয়া অনুভূমিক রেখা, সমতল রেখা ও খাড়া রেখার সমাবেশ, তো আসলে পরিচিত দেখা আকৃতি। ফ্রেমের কেয়ারী ছন্দোবদ্ধভাবে উপস্থাপিত এইমাত্র। ঘুরিয়ে বললে বলা যেতে পারে, বিমূর্ত শিল্পকলায় শিল্পী নিজেকে অস্বীকার করেন, শিল্পকলাকেও নেতিবাচক অস্তিত্বে আনেন। পরিপূর্ণ নঞর্থক আর্ট। (ক্রমশ)

যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।

এতো কালো মেখেছি দু হাতে
এতো কাল ধরে!
কখনো তোমার করে, তোমাকে ভাবিনি।

এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো ?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না, অসময়ে ॥

সন্ধ্যায় বৃষ্টি

বিনয় মজুমদার

সন্ধ্যায় প্রায়ান্ধকারে বৃষ্টিপতনের ধ্বনি শুনি।
কোমল পিচ্ছিল ছন্দে বৃষ্টি পড়ে ফুলের উদ্যানে।
এবং আশ্চর্য এই—বৃষ্টি হলে শব্দ হয় শব্দ হতে থাকে।
সমস্ত সৃষ্টির জন্য এই নভোচর বারি প্রয়োজন। আমি
দেখছি অনেক ঘণ্টা বৃষ্টি হচ্ছে, তা সত্ত্বেও শাশ্বতকালের
তুলনায় বৃষ্টি হচ্ছে কয়েক মুহূর্তমাত্র—এই সত্য বুঝি।

প্রৌঢ় বয়সেও আমি প্রায়শ দাঁড়াই দৃঢ় হয়ে,
তার কিছুক্ষণ পরে আবার নেতিয়ে পড়ি আমি।
বৃষ্টির দেবতা আমি এ জীবনে যত বৃষ্টিপাত
করেছি সেসব কথা মনে পড়ে, ফলে বেঁচে আছি।
বৃষ্টিপতনের কথা কোনোদিন গোপন থাকে না।

সাজ

সত্যসাধন চেল

তোমার হাতের কাঁটা ঘুরে ঘুরে বুনে চলে শীতের পোশাক,
তুমি নিসর্গের মতো হয়ে ওঠো এইসব আষাঢ় দুপুরে ;
বেতের মোড়ায় বসে গেয়ে ওঠো বসন্তের গান,
জোয়ার লেগেছে বনে, তাই শিমুলের কোন বীজ
একা একা উড়ে যায় দূরতম দ্বীপে
আদর্শগ্রামের মতো ভরে ওঠে ফসলের মাঠ,
গমে আর ধানে যেন নিটোল হলুদ ;
মনে হয় চারবিঘে জমির উপর কোন নারী
বিছিয়ে রেখেছে তার প্রিয়তম পশমের সাজ।

"রচনা"—ত্রিদিব চন্দ্রের তৈলচিত্র। জন্ম ১৯৪০। সরকারী চারু-কারু মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক ক্যানভাস আর্টিস্ট সারকালের সদস্য। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের অধ্যাপক।

এইভাবেই গড়ে উঠেছে নানা কিংবদন্তী।

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ নয় ॥

হীরা বুলবুলের পুত্র চন্দ্রনাথকে ভর্তি করা উপলক্ষে হিন্দু কলেজ ভেঙে যায়। বারবনিতার সন্তানকে গ্রহণ করার জন্য শহরের গণ্যমান্য অভিভাবকরা নিজেদের সন্তানদের এ কলেজ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পৃথক কলেজ স্থাপন করেছিলেন। গৌরবোজ্জ্বল, ঐতিহ্যবাহী হিন্দু কলেজের হীন দশা দেখে কর্তৃপক্ষ অচিরেই তাঁদের ভ্রম বুঝতে পারেন এবং তা শুধরে নেবার জন্য বিনা আড়ম্বরে, এক কথায়, অবাঞ্ছিত কুকুরের মতন চন্দ্রনাথকে দূর করে তাড়িয়ে দেন। নানা প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে প্রাক্তন ছাত্রদের ফিরিয়ে আনারও চেষ্টা চলতে থাকে। ছাত্ররা ফিরে আসতেও শুরু করে এবং নব প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজটি ভেঙে যায়।

কিন্তু হিন্দু কলেজ তার আগেকার রূপে আর ফিরে পেল না। হীরা বুলবুল আর তার পুত্রের ঘটনার প্রভাব মুছে ফেলা সহজ হলো না। হিন্দু কলেজের নিয়ম কানুনের আমূল সংস্কার করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন অনেকেই। এবং তারই পরিণতিতে হিন্দু কলেজ রূপান্তরিত হলো প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই প্রেসিডেন্সি কলেজ চলে এলো পুরোপুরি সরকারী ব্যবস্থাপনায়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ছাত্রেরাই এখানে প্রবেশের সুযোগ পেল। এর স্কুল শাখাটির নাম অবশ্য রইলো হিন্দু স্কুল। অন্যান্য স্থানে আরও কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং ছাত্র সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে বলে প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও উদ্যোগ চলতে লাগলো।

হিন্দু কলেজের অনেক প্রাক্তন ছাত্রই পড়াশুনো করতে লাগলো প্রেসিডেন্সি কলেজে কিন্তু চন্দ্রনাথের পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব হলো না। এই রকম জীবন থেকে সে চলে গেছে অনেক দূরে। এর মধ্যে তার এমনই পরিবর্তন হয়েছে যে তাকে দেখে আর সহজে চেনার উপায় নেই। ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে সে মাতৃ সান্নিধ্য ছেড়ে অনেক আগেই পথ নিবাসী হয়েছে। রাত্রিকালে যাদের মাথার ওপর ছাদ থাকে না, যাদের দুবেলা নিশ্চিন্ত অন্ন নেই, তাদের সব সময় একটা লড়াইয়ের মনোভাব রাখতে হয়। প্রায় অধিকাংশই এই লড়াই চালিয়ে যায় নিয়তির সংগে। মাত্র দু' একজনই বাস্তব যুদ্ধে জয়ী হয়।

মায়ের কাছে চন্দ্রনাথ ছিলো অতি আদরের সন্তান, ননী-মাখন খাওয়া শরীর, কখনো কোনো কষ্টভোগ করে নি। জেদের বশে পথে নেমে আসায় সে সব রকম দুঃখ-কষ্টকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছে, পরিবেশ অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়েছে তার শরীর। কৈশোর কাটিয়ে সে এখন যৌবনে উত্তীর্ণ, হঠাৎ অনেক লম্বা হয়ে গেছে, কণ্ঠস্বর বদলেছে, মাথায় বড় বড় চুল, চিবুকে দাড়ির রেখা। তার নামও এখন আর চন্দ্রনাথ নয়, শুধু চাঁদু, বা উচ্চারণ বৈগুণ্যে চেঁদো।

প্রথম কিছুদিন সে শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে আহার সংগ্রহ করতো, এখন তার থেকে সহজতর উপায় পেয়েছে। এখন তার ডেরা নিমতলা শ্মশান-ঘাটে।

মানুষের জীবিকার এমনই বৈচিত্র্য যে কিছু মানুষ শ্মশানে মৃতদেহগুলিকে অবলম্বন করেই চমৎকার-ভাবে নিজেদের বেঁচে থাকার উপাদান সংগ্রহ করে নেয়। শুধু চণ্ডাল নয়, আরও কিছু কিছু লোক থাকে যাদের ওপর নির্ভর করতেই হয় মৃতের আত্মীয় স্বজনদের। কাঠ সংগ্রহ করা, পুরুত ডেকে আনা থেকে শুরু করে আরও বহুবিধ কাজ থাকে।

চাঁদু এখন ছোটখাটো একটি দলের নেতা। এই নেতৃত্ব তাকে অর্জন করতে হয়েছে। বনের মহিষের পালের মধ্যে একটি করে নেতা-মহিষ থাকে। কোনো আগন্তুক মহিষ দেখলেই সেই নেতা-মহিষটি লড়াই করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। কখনো বা আগন্তুক মহিষটিই জেতে এবং তার পরই সে-ই পালটির নেতা হয়ে যায়। দুনিয়ার সর্বত্র এই নিয়মই চলছে।

নিমতলার শ্মশানঘাটে পরগাছাদের দলে চাঁদু সহজে স্থান পায় নি। বেশ কয়েকবার মার খেয়ে তাকে পালাতে হয়েছে সেখান থেকে। তারপর একদিন সে ঐ দলের নেতা ফকিরের সঙ্গে মারামারি করতে-করতে দুজনে এক সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে যায় জলে, সেই জলের মধ্যে ফকিরের ঘাড়টা চাঁদু ঠুসে ধরে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। ফকির সেবার মারা যায় নি বটে কিন্তু দেখা গেল যে তার ডান হাতটি ঠুঁটো হয়ে গেছে। চাঁদু তার হাতটি এত জোরে পিছমোড়া করে ধরেছিল যে মটমট করে তার হাড় ভেঙে যায়।

এসব বৎসর খানেক আগেকার ঘটনা। এখন চাঁদুর কোমরে একটা ছুরি গোঁজা থাকে মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা, হাতে একটি ডাণ্ডা। ইচ্ছে করেই সে তার চেহারাটি ভয়ংকর করে রেখেছে। মৃতদেহ নিয়ে কোনো একটি দল এসে পৌঁছোলেই চাঁদু তার দলটি নিয়ে ঘিরে দাঁড়ায়। তার অনুমতি ছাড়া কোনো ডোমও কাছে এগোয় না। কেমন ধারার দাহ হবে, চন্দন কাঠ না জামরুল কাঠ, কতখানি ঘি আর কর্পূর। চার ঘণ্টার চিতা না ছ' ঘণ্টার চিতা—এইসব বিষয় আগে ঠিক করে নিতে হবে চাঁদুর সংগে। মৃতের গায়ের জামা-কাপড়, খাট-পালঙ্ক এসবও প্রাপ্য চাঁদুর দলের। পোস্তার বাজারে এগুলো ভালো দামে বিক্রি হয়। অবশ্য বিক্রির জন্য এসব নিয়ে চাঁদুদের পোস্তার বাজার পর্যন্ত যেতে হয় না, সেখান থেকেই নিয়মিত লোক আসে।

তেমন শাঁসালো মড়া তো আর রোজ আসে না, মাসে দু মাসে দুটি একটি। হেঁজিপেঁজি ধরনের লোকই বেশী মরে, তারা অল্প কাঠে কোনো রকমে মুখাগ্নি করে আধপোড়া শব জলে ভাসিয়ে দেয়। সে সব ক্ষেত্রে ঐ অর্ধ দগ্ধ দেহ বহন করে জলে ফেলার মজুরি আদায় করে চাঁদুর দল। যার কাছ থেকে যেমন পাওয়া যায়।

চাঁদুর একটা বিশেষ শখ আছে। চিতায় কিছু-ক্ষণ জলবার পর একটা সময় শবের মাথাটা জোরে জোরে লাঠির বাড়ি মেরে ফাটাতে হয়, নইলে ও জিনিসটি সহজে পোড়ে না। এই কাজটি চণ্ডালদের বদলে চাঁদু নিজে নেয়। গাঁজার নেশায় চক্ষু লাল, কপালে লাল কাপড়ের ফেট্টি, হাতের প্রকাণ্ড লাঠিটা ঘুরিয়ে চাঁদু লাফিয়ে লাফিয়ে দমাস দমাস করে মারে। খুলিটা চৌচির হয়ে যখন ছিটকে বেরোয় ঘিলু, তখন তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তখন তাকে দেখায় কালভৈরবের মতন। তখন তাকে দেখলে কে বুঝবে যে একদিন এই লোকটির মাথাতেই [illegible], বাহুবল, কালিদাসের কবিতার [illegible] গল্প করতো।

এই তো মল্লিকবাড়ির ছোটবাবুর শব এসেছিল গত মাসে, আর পরশু এসেছিল বাগবাজারের বোসেদের অকালমৃত সেজো ছেলেটি, চাঁদুই তাদের মস্তক চূর্ণ করেছে।

যখন চিতা জ্বলে না, শ্মশান জনশূন্য, তখন চাঁদু তার দলবল নিয়ে বসে থাকে জলের ধারে। হাতে হাতে ফেরে গাঁজার কল্কে। তখনও তাদের একটা কাজ থাকে। যতই গল্পে মেতে থাকুক, তাদের চোখ থাকে স্রোতের দিকে।

মা হীরা বুলবুলের কাছ থেকে একটি গুণ পেয়েছে চাঁদু, তার গানের গলাটি খাসা। নানান উত্সবে বাবুরা গঙ্গায় প্রমোদতরণী নিয়ে বাঈজীদের গান শুনতে শুনতে যায়। রথযাত্রা, লক্ষ্মী পুজোর সময় গংগাবক্ষ এই সব নৌকোতে একেবারে ছয়লাপ। শুনে শুনে কয়েকটা গান চাঁদুর মুখস্থ হয়ে গেছে, আর মধ্যে এই গানটি তার সবচেয়ে প্রিয় :

> যাবি যাবি যমুনাপারে ও রঙ্গিনী
> কত দেখবি মজা রিষড়ের ঘাটে শামা বামা দোকানী
> কিনে দেবো মাতা ঘষা, বারুইপুরের খাসা খুনসী খাস
> উভয়ের পুরাবি আশা, ও সোনামণি।

হঠাৎ এক সময় গান থামিয়ে চাঁদু চেঁচিয়ে ওঠে ঐ দ্যাক, দ্যাক! অমনি তার দলের ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে, কোতা? কোতা? কোতা? গংগার স্রোতে প্রায়ই একটি দুটি মৃতদেহ ভেসে যায়। অনেক দূর দূরান্ত থেকেও এমন শব আসে। কিন্তু চাঁদু দলের ছাড়পত্র না পেয়ে কোনো শব নিমতলা ঘাট পার হতে পারে না।

চাঁদুর নির্দেশ মতন তার দল ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে এবং প্রায় শুশুকের মতন ডুব সাঁতার দিয়ে ঠিক সেই মৃতদেহটিকে ধরে পারে টেনে আনে। তারপর সেটি তন্নতন্ন ভাবে পরীক্ষা করা হয়। অনেক সময় শবের আঙুলে থাকে সোনার আংটি অথবা পায়ে রুপোর চুটকি। তামা বা রুপোর তাগা-মাদুলি মৃতদেহ থেকে আত্মীয়রা খুলে নেয় না, সেগুলি সবই চাঁদুদের প্রাপ্য। পাঁচটা শবের মধ্যে অন্তত একটা থেকে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই।

শবদেহ পাড়ের কাছে আসলেই শকুন আর হাড়গিলের পাল ধেয়ে আসে। তখন চাঁদুর দল লাঠি-সোঁটা নিয়ে তাদের তাড়া করে যায়। শকুনগুলো উড়ে পালালেও হাড়গিলেরা সহজে যেতে চায় না, তারা রীতিমতন লড়াই করে। কিন্তু হাড়গিলেরা মৃতদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, এটা চাঁদুর দল পছন্দ করে না। জলের জিনিস তারা আবার জলকে ফেরত দেয়।

এই শ্মশানে দুটি চণ্ডাল একজনের নাম ঝিনিয়া, আর একজনের নাম তাড়ু। তাড়ু আবার তার বউকে নিয়ে থাকে একটি গোলপাতার ঘরে। ঝিনিয়াটা যেমন গাঁজাখোর, তেমনি মাতাল অধিকাংশ সময়েই তার চলৎশক্তি থাকে না। ঝিনিয়া যে কোথা থেকে এখানে এসেছে তা জানে না কেউ, অদ্ভুত হিন্দী-বাংলা মেশানো তার ভাষা, বয়েসও হয়েছে যথেষ্ট। চাঁদুর দল ঝিনিয়াকে নিয়ে নানারকম মস্করা করে, তার গাঁজার কল্কে কিংবা মদের ভাঁড় কেড়ে নিয়ে পালায়। তারপর ঝিনিয়া যখন নতুন নতুন স্বরচিত বীভৎস গালাগালির ঝড় বইয়ে দিতে থাকে, সেই সময় ওদের একজন কেউ পেছন দিক থেকে চুপি চুপি গিয়ে তার কোমরের কষি টেনে কাপড়টা খুলে দেয়। অমনি ঝিনিয়া শুরু করে দেয় তাণ্ডব নাচ। এই নিয়ে বেশ সময় কাটে।

তাড়ু সেই তুলনায় বেশ শান্ত ও গম্ভীর, বয়েস চল্লিশের বেশী না, কালো কুচকুচে শরীর, মাথায় চুল তেল চুকচুকে। তাকে দেখে কেউ চণ্ডাল বলে মনেই করবে না, কিন্তু ঝিনিয়ার চেয়ে তাড়ু কাজে অনেক বেশী দক্ষ। তার বৌয়ের নাম মতিয়া, কিছুদিন আগেও সে ইংরেজ পাড়ায় মেথরানী ছিল। কোন্ মন্ত্র বলে যে সে মতিয়াকে বিয়ে করে এই শ্মশানে রাখতে পেরেছে, তা তাড়ুই জানে। মতিয়ার সংগে চাঁদুর দলের সকলের বেশ ভাব আছে।

হয়তো তাড়ু স্নানটান করে খেতে বসেছে, এমন

য় কোনো একটা বড় দল এসে উপস্থিত হলো। ঝিনিয়া অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, তাড়ুকেই আসতে বে। অদ্ভুত অবস্থাতেই তাড়ু চলে আসে, মৃতের আত্মীয় স্বজনদের কান্নাকাটি পর্বে সে ভাবলেশহীন খে দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে, নিজের লাঠিটিতে ভর য়ে। তারপর মুখাগ্নি হয়ে গেলে সে সাজানো তার তলায় ভালো করে আগুন জেলে দিয়ে আবার তে চলে যায়। খাওয়া সেরে আঁচিয়ে ভেজা মুখেই ফিরে এসে শবর পা মুড়ে দেয়।

মতিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে য় ঝিনিয়ার। তাড়ুর বউ আছে, আর তার নেই, টা মাঝে মাঝে ঝিনিয়া সহ্য করতে পারে না। এক ক রাত্রে সে তাড়ুর গোলপাতার ঘরে জোর করে ঢুকে ড়ে। তাড়ু কিছু বলে না, মতিয়াই সব ব্যবস্থার র নেয়। ঠেলতে ঠেলতে সে ঝিনিয়াকে ঘরের াইরে নিয়ে আসে, তারপর তার বাপান্ত করতে করতে কটা পোড়া কাঠ তুলে নিয়ে তাকে পেটায়।

চাঁদুরা কিছুক্ষণ মজা দেখে। এক সময় অবস্থা রমে পৌঁছোলে তারা এগিয়ে গিয়ে বলে, আরে আর পটাসনি, বুড়োটা তো মরে যাবে।

মতিয়া বলে, মরুক, মরুক গিধ্ধরটা!

চাঁদু ওর কাছ থেকে পোড়া কাঠটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে মতিয়া চোখ পাকিয়ে বলে, তবে তোর ভেঙে দিব! তোহার ঘিলু ছটকাবো!

চাঁদু হাসতে হাসতে পিঠ ফিরে বলে, মার! মার খানি আমায়!

সবাই মিলে ধরাধরি করে ঝিনিয়াকে গাঙ্গায় ফলে দেয় ঝপাং করে।

সবাই জানে, ঝিনিয়া ওতেও মরবে না। বড্ড কড়া ান তার, ঠিক আবার বেঁচে উঠবে।

এইভাবে চাঁদুর দিন বেশ কেটে যাচ্ছে।

মাঝখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল। হঠাৎ দেখা গেল তিদিন বিকেলবেলা একজন ভদ্রবেশী সুশ্রী চেহারার যুবক এখানে এসে জলের ধারে বসে থাকে। এখানে ঘাট বলতে কিছু নেই, কয়েকটি গাছের গুঁড়ি ফেলা আছে, জোয়ারের সময় সেগুলোও ডুবে যায়। যুবকটি এসে সেখানে বসে। অপরাহ্নে নদীর জলে সূর্যাস্তের শোভা দেখতে দেখতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং মাঝে মাঝে পকেট থেকে একটি নোট বই বার করে তাতে কী সব লেখে।

লোকটিকে দেখে খটকা লাগে চাঁদুর দলের। এ আবার কী চায়? শ্মশানে তো কেউ বিনা কারণে আসে না। পাশের আনন্দময়ীতলায় অনেকে স্নান করতে আসে। এদিকে স্থানার্থীরাও আসে না। এ লোকটা যেন তাদের জায়গা জুড়ে বসেছে।

চাঁদুরা লোকটির পাশে বসে খিস্তি খাস্তা হই হল্লা করলেও লোকটি ভ্রূক্ষেপ করে না সে যেন ধ্যানস্থ, আপনভাবে বিভোর। লোকটির নাকে সোনালী ফ্রেমের রিমলেস চশমা। গায়ে পাতলা ফিনফিনে জামা, কাঁধে একটি গোলাপি রঙের চাদর।

কখনো জ্বলন্ত চিতার পাশে এসেও দাঁড়িয়ে থাকে লোকটি। তখন তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। এ যে এক তাজ্জব ব্যাপার। কার না কার মড়া তার ঠিক নেই, সে জন্যও এ লোকটি কাঁদে।

লোকটিকে চাঁদুর সহ্য হয় না। একে জব্দ করার জন্য সে তার সঙ্গীদের নিয়ে একটি মতলোব এঁটে ফেলে।

ঘাটের গুঁড়িগুলো অনেক দিন থাকার জন্য কাদার মধ্যে পেঁথে আটকে আছে। একদিন চাঁদুর দল সেই গুঁড়িগুলো তুলে তুলে আলগা করে রাখে। তারপর সেদিন বিকেলে যুবকটি এসে একটা গুঁড়ির ওপর বসেছে, একটু পরে চাঁদু তার হাতের লাঠিখানা দিয়ে পেছন দিক থেকে সেই গুঁড়িটায় একটা চাড় দেয়। অমনি লোকটি সমেত গুঁড়িটি গড়িয়ে চলে জলের দিকে ধ্যান ভেঙে যুবকটি দু' হাত তুলে উচ্চকণ্ঠে বাবা রে, মা রে, গেলুম রে বলে চেঁচিয়ে ওঠে। এবং সটান গিয়ে পড়ে জলের মধ্যে।

বোঝাই যায় যুবকটি সাঁতার জানে না। জলে পড়ে সে দু' একবার মাত্র বাঁচাও, বাঁচাও বলতে পারে, তারপর হাবুডুবু খায়। যথেষ্ট নাকানি চোবানির পর যুবকটি যখন স্রোতের টানে পড়তে যাচ্ছে, সেই সময় চাঁদুর দল লম্ফ দিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

সুদৃশ্য বস্ত্র পরিহিত যুবকটিকে এখন দেখায় ভিজে বেড়ালের মতন চোপসানো। দম নিতে তার খানিকক্ষণ সময় লাগে।

তারপর সে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তোমরা এমন কেন কল্লে, ভাই?

চন্দ্রনাথের দল হো হো করে হেসে ওঠে।

লোকটি হাতজোড় করে আবার সেই রকম একই কণ্ঠে বললো, ভাই, তোমরা কেন এমন কল্লে? আমি কী দোষ করিচি?

চাঁদুর এক স্যাঙাৎ ন্যাড়া তার কাছা টেনে খুলে দেবার চেষ্টা করলো।

লোকটি তখন মুক্ত কচ্ছ অবস্থায় কোনো রকমে মান বাঁচাবার জন্য চোঁ চাঁ দৌড় মারলো।

চাঁদুর দলের কাছে এটা নির্মল আনন্দের ব্যাপার। ন্যাড়া হাসতে হাসতে বললো, ও বোকাচৈতন আর কোনোদিন ইদিকে আসবে না!

চাঁদু বলে, আসবে, আসবে! সব ব্যাটাকেই আসতে হবে। এমন ঘাঁটি আগলে আচি যে সব ব্যাটাকেই আসতে হবে একদিন না একদিন। সব ব্যাটার মাতা ফাটাবো!

এর চেয়ে অনেক বেশী রোমহর্ষক ঘটনাও ঘটে মধ্যে মধ্যে।

এক রাতে ফিনিক দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে আর বাতাস বইছে এলোমেলো। এমন রাতে গাঁজার নেশা বড় ভালো জমে আর তার সঙ্গে চেল্লামেল্লি গান। অশথ গাছটার গায়ে একটা গোলপাতার মাচা বেঁধে চাঁদু তার দলবল নিয়ে বসে থাকে। কিন্তু গান গাইবার উপায় কী, তার মধ্যে ঝিনিয়া এসে দারুণ হল্লা লাগিয়ে দেয়,
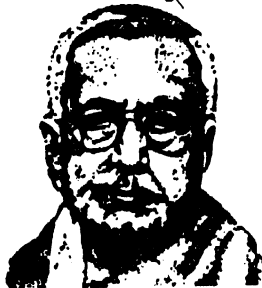
ছেলেদের চড়-চাপাটি খেয়েও সে থামতে চায় না।

সেই সময় চারজন লোক একটা শবের খাট বয়ে নিয়ে এসে শ্মশানতলায় সেটি নামিয়ে রেখেই দৌড় লাগায়।

চাঁদু ঠিক দেখে ফেলে তার সাগরেদদের বলে, আরে, আরে, লোকগুলো কোথায় গেল দ্যাখ তো।

ন্যাড়া খানিকটা এগিয়ে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে জানায়, ব্যাটারা ভেগে যাচ্ছে, ওস্তাদ!

সবাই হই হই করে তাড়া করে যায় সেই শবযাত্রীদের। কিন্তু তারা দিকবিদিক শূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছে, তাদের ধরা যায় না। অনেকের ধারণা, এই নিমতলা শ্মশানে দুটো ভূত আছে, সেই জন্য রাত বিরেতে ভাড়া করা শ্মশানযাত্রীরাও সহজে এদিকে অসতে চায় না। ওরা কি ভূতের ভয়েই পালালো! অথবা ওদের কাছে ঘাট খরচা নেই!

চাঁদু তার দল বল নিয়ে ফিরে আসে মড়ার খাটের কাছে।

পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দেখা যায় চাদর দিয়ে ঢাকা এক আলুলায়িত কুন্তলা, গৌরবর্ণা যুবতীর মুখ। মনে হয় যেন জীবন্ত, চোখ দুটি সম্পূর্ণ খোলা। চাঁদুর মনে হলো সেই চোখ দুটি যেন তার দিকেই চেয়ে আছে।

চাদরখানি একটুখানি সরাতেই এক দৃশ্য দেখে চাঁদু এবং তার সংগীরা শব্দ করে আঁতকে ওঠে। যুবতীটির নগ্ন বুকের ঠিক মাঝখানে একটি ছুরি বেঁধা। তখনও সেখানে থকথকে রক্ত জমে আছে।

প্রতিদিন নানা রকম মৃতদেহ দেখলেও চাঁদুর সংগীরা ভয় পেয়ে যায়। সবাই সরে যায় দূরে।

একজন বলে, কোনো বড় ঘরের মেয়ে, খুন করেছে!

অপর একজন বলে, রেন্ডি, রেন্ডি!

আর একজন বলে, বেঁচে আছে, এখনো বেঁচে আছে!

চাঁদু কাছে গিয়ে ঝুঁকে মেয়েটির গাল ধরে এ-পাশ ও-পাশ নাড়িয়ে দেয়। জীবনের কোনো লক্ষণ তাতে প্রকাশ পায় না।

ন্যাড়া একটানে সরিয়ে দেয় চাদরটা। এবার আরও বিস্ময়ের পালা। যুবতীটির অংগে এক টুকরো বস্ত্রও নেই।

কয়েক মুহূর্ত ওরা চুপ করে থেকে পরস্পরের দিকে চায়। এমন সুন্দর নারীদেহ ওরা কখনো চক্ষে দেখেনি। চাঁদের আলোয় সেই শরীর যেন আরও অপার্থিব দেখায়।

হঠাৎ ন্যাড়া একটা উৎকট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই যুবতী শরীরের ওপর। পাগলের মতন সেখানে মুখ ঘষতে থাকে।

কী করছিস, কী করছিস বলে চাঁদু তার চুলের মুঠি ধরে তাকে তোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু ন্যাড়া কিছুতেই উঠবে না। শেষ পর্যন্ত চাঁদু এক লাথিতে তাকে ছিটকে ফেলে দেয়।

তখন আরও দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মৃতদেহের ওপর। চাঁদু অদেরও সরাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সবাই যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কেউ আর তার কথা শুনতে চায় না। ন্যাড়া উঠে এসে বলে, তুমি সরে যাও, ওস্তাদ!

বাকি সবাই একেবারে পথের ছেলে, কিন্তু চাঁদুর এক সময় বাড়ি ছিল। সেই জন্য এ বীভৎসতা সে ঠিক সহ্য করতে পারে না। সে একাই চেষ্টা করে সবাইকে সরিয়ে দেবার, কিন্তু এই উপলক্ষে যেন তার দলে একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। কেউ তাকে আর মানছে না।

অবিলম্বেই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য চাঁদু বিশেষ একজনকে টেনে নেয় এবং নিজের ছুরিটা তার গলায় চেপে ধরে বলে, একদম শেষ করে দোবো। সব কটাকে আজ খতম করবো।

ন্যাড়া সেই যুবতীটির বুক থেকে ছুরিটা টেনে খুলে নিয়ে চাঁদুকে রুখতে আসে। কিন্তু হাতে একটা ছুরি থাকলেই ন্যাড়া যদি জিততে পারতো, তা হলে তো সে-ই নেতা হতো। ন্যাড়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর চাঁদু যুবতীর শরীর আড়াল করে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, আয়, কে আসবি!

বিদ্রোহ প্রশমিত হলে চাঁদু বলে, ধর, সবাই হাত লাগা, একে মা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে।

একজন তখনও দুর্বল গলায় বলে, যদি বেঁচে থাকে এখনো

—যদি বেঁচে থাকে, মা গঙ্গা ওকে বাঁচাবেন?

ধরাধরি করে শেষ পর্যন্ত ওরা যুবতীর দেহটিকে নিয়ে ভাসিয়ে দেয় জলে। ন্যাড়া ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে। এ পর্যন্ত ন্যাড়াকে কেউ কখনো কাঁদতে দেখেনি। ভাগ্যহীনা যুবতীটি কোন্ বেঘোরে, কার হাতে মারা গেছে কে জানে! কেউ তার জন্য শোক করেছে কিনা তারও ঠিক নেই। তবু তো শ্মশানঘাটে একজন তার জন্য কাঁদলো।

সম্প্রতি এখানে আরও একটি কান্ড ঘটেছে।

সন্ধার রাত্রে চাঁদুরা সবাই ঘুমিয়ে ছিল। সেদিন একটাও মড়া আসেনি। এক সময় শোনা গেল ডাক্তারের ঘর থেকে একটা ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ। মতিয়াও যেন ভয় পাওয়া গলায় গোঙাচ্ছে। ন্যাড়া প্রথমে সেই আওয়াজে জেগে উঠে ডেকে তুললো চাঁদুকে।

নিশ্চয়ই ও ঘরে হাড়গিলে ঢুকেছে। হাড়গিলেরা মারামারি করবার সময় ঐ রকম আওয়াজ করে।

সবাই মিলে দৌড়ে গেল ডাক্তারের ঘরের দিকে।

ন্যাড়া প্রথম ঢুকেই বেরিয়ে গেল জিভ কেটে। তারপর মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে বললো, আরিব্বাস! মতিয়ার একটা বাচ্চা হয়েছে!

(ক্রমশ)

উপরে—পুরাকালে গুরুগৃহে শিক্ষা। নীচে—কর্ম্মমুখী স্ত্রীশিক্ষা।

লোকশিল্প ও লোকশিক্ষা

উমা সিদ্ধান্ত

॥ ১ ॥

ভারতের অসংখ্য মন্দিরগাত্রে, স্তূপে, বিহারে, স্মৃতিসৌধে ও স্তম্ভে ভারতীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সমস্ত ভাস্কর্য ও অজন্তার দেয়াল-চিত্রে ভারতীয় শিল্পীদের যে বিস্ময়কর অবদান আছে তাকেই ভারতের ধ্রুপদী শিল্পকলা বলা যায়। প্রাচীন-কাল থেকে ভারতীয় কারুশিল্পীরাও বয়নশিল্পে ও ধাতুশিল্প এবং তার কারুকার্যে অসামান্য নৈপুণ্যের ছাপ রেখেছে। ঢাকাই মসলিন থেকে শুরু করে বর্তমানের ভারতীয় রেশম, পশম, সুতীবস্ত্রের বয়ন ও নকশায় নিপুণ কাজ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধাতব বস্তু নির্মাণ ও অলংকরণ নন্দনতত্ত্বের বিচারে আজও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। এই সব জিনিস দেশে-বিদেশে সমভাবে আদৃত ও ভারতের গৌরব। এই কাজে রত শ্রমিক শিল্পীরা প্রেরণা পেয়েছে তাদের বংশানু-ক্রমিক ধারাতে ও প্রয়োজনভিত্তিক এই সব শিল্প সৃষ্টি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেছে যুগ যুগ ধরে। এ-দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশ তার শিল্প-সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে, এবং এই কাজের কাঁচামাল তারা সংগ্রহ করেছে দেশজ উদ্ভিদ ও বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ থেকে।

আদিমজাতি যারা ভারতের পাহাড়ে পর্বতে দুর্গম স্থানে বাস করত তারা জনবহুল স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তাদের প্রয়োজনের তাগিদে বয়নশিল্প বা অন্যান্য কারুশিল্পের রচনা করেছে। সেই শিল্পধারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই প্রবহমান। জনবহুল এলাকা শহরে ও গ্রামে ঐ একই ছন্দোময় গতিতে কারিগরি শিল্প সৃষ্টি হয়েছে নিজস্ব ও সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে। শিল্পসৃষ্টির আনন্দ ও এই সব কুশলী হাতের বংশানুক্রমিক অনুশীলনে এই শিল্পকর্ম সম্ভব হয়েছে। বংশগত প্রেরণা ও সৌন্দর্যসৃষ্টির আনন্দ মানুষকে দিয়েছে শিল্পকাজে নিষ্ঠা—শিল্পীর সৌন্দর্যসাধনা চলেছে যুগে যুগে বিরামহীন গতিতে। সুতরাং লোক শিল্পের ধারা অব্যাহত আছে যুগ যুগ ধরে একইভাবে।

ভারতীয় শিল্পসাধনার প্রথম প্রমাণ আমরা পাই মহেন্-জো-দারো হরপ্পার সিন্ধুসভ্যতায়। সুন্দর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, দেবদেবী ও প্রাণীর মূর্তি উৎকীর্ণ মুদ্রা ও শীল সে যুগের অনবদ্য কৃষ্টি ও উৎকর্ষের প্রমাণ। সেদিন সুসভ্যতার আলোকে ভারত জাগরিত হয়েছিল অন্যান্য এশীয় দেশ—চীন, সিরিয়া, মেসো-পটেমিয়া, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রায় সমকালীন শিল্পকর্মের বর্ণনায় তা অনুধাবন করা যাবে।

মানবসভ্যতার বিকাশের প্রথম পদক্ষেপে মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে ও দৈনন্দিন কর্মের সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেছিল সত্য ও সুন্দরকে। এই সতসুন্দরকে। তারা স্থায়ী রূপ দিয়েছিল শিল্পের বা চিত্রের মাধ্যমে। শিল্পসৃষ্টির উষাকালে আমরা দেখতে পাই, প্রথম প্রস্তর যুগের মানুষেরা তাদের পারিপার্শ্বিক ঘটনার সত্য-রূপ, সুন্দর, ভালবাসা, বিস্ময় ও দুঃখের স্থায়ী রূপ দিয়েছিল চিত্রে ও ভাস্কর্যে—রেখায় ও বর্ণে এবং তাদের তৈরী ছেদন অস্ত্রের সাহায্যে। তাতে ছিল বাস্তব জীবনের ঘটনার জীবন্ত রূপ ও শিল্পীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের সহজ ও সরল প্রকাশ। এই সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক তৈজসপত্রের উপর অলংকরণ করে গেছে ঐ যাদু শিল্পীরা যা পৃথিবীতে অতি উচ্চমানের কারিগরি শিল্প বলে পরিগণিত হয়।

নন্দনতত্ত্বের বিচারে এই পদক্ষেপকে মানব সংস্কৃতির প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। ধীরে ধীরে এই ধারাতেই মানুষের শিল্পাশ্রিত অভিব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে ও বর্বরতার অবসান হয়েছে, যা মানবসভ্যতার চরম বিকাশ। মানবজীবনের গভীর মানবীয় চেতনার প্রকাশ ঘটল শিল্পকলায় এবং যুগে যুগে শিল্পকলা রক্ষা করে চলেছে মানবীয় সংস্কৃতির ধারা যেমন ক্রোমোজম তার বংশরক্ষা করে আসছে অনাদি কাল হতে।

চিত্রের ভাবরূপ চিত্রলিপি—এই চিত্রলিপি থেকে অক্ষরের সৃষ্টি। যে অক্ষর আমাদের ভাষার রূপ দিয়েছে, যার সাহায্যে আমরা সারা বিশ্বকে কাছে টেনে এনেছি, যাকে আমরা বলতে পারি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সোপান। সুতরাং এই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীরাই আমাদের আজকের এই সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছেন একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। ঐ আদিমধর্মী শিল্পের ধারা আজকের যুগেও লোকধর্মী শিল্পের মধ্যে প্রবহমান। এই প্রসঙ্গে ভারত ও চীনের প্রাচীন শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশের মির্জাপুরের পাহাড়ে। শিকারের চিত্র : ছ'টি মানুষ—মাথায় পালকের সাজ—তাড়া করছে একটি গণ্ডারকে। রায়গড়ের সিংহানপুরে পর্বতগাত্রের চিত্র দেখা যায় নানা রঙের বাহার—হালকা হলুদ, বেগুনি, লাল। চিত্রে মানুষের ছবি, পাখি, জন্তু এবং জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতি দেখা যায়। ঐ যুগের পোশাক ও ব্যবহারিক জিনিসের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের বর্তমান সমাজের পোশাক ও জিনিসের মিল আছে ও যে সকল মূর্তি পাওয়া যায় তা বর্তমান কালের মূর্তির অনুরূপ। এই সব চিত্র ও মূর্তি কিন্তু একই সময়ের নয়। হতে পারে পুরোনো যুগের চিত্রকলাকে পরবর্তী যুগের শিল্পীরা চিত্রায়িত করেছে।

মহেন্-জো-দারো ও হরপ্পার সিন্ধু সভ্যতাকে প্রস্তর যুগ ও তাম্র যুগের সংযোজক বলা চলে। মহেন্-জো-দারো থেকে ৮০ মাইল উত্তরে আবিষ্কৃত পর্বতগাত্রের চিত্রসম্ভার পাওয়া যায় যা দেখে পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন ঐ শিল্প মহেন্-জো-দারো থেকেও ১০০০ বৎসর আগের যুগে নির্মিত। এই সিন্ধুসভ্যতা আর্য সভ্যতার থেকে ভিন্ন—কারণ এর সঙ্গে মিল মেসোপটেমিয়া ও সুমেরিয়ার সঙ্গে। মহেন্-জো-দারো ও হরপ্পার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত উচ্চমানের শিল্প নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় সুসভ্যতার বিকাশ হয়েছিল ঐ যুগে এবং বিদেশী পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এটাই ভারতীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন। আবার অপর একদল পণ্ডিত অনুমান করছেন যে এই উচ্চকোটি শিল্পসম্ভারের শিল্প নৈপুণ্য ও কারিগরি বিদ্যার পিছনে প্রাগৈতিহাসিক ধারাবাহিকতা না থাকলে এই শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব হত না। মহেন-জো-দারোতে প্রাপ্ত নর্তকী ও পুরুষ নর্তকের মূর্তি এবং প্রচুর পরিমাণে উচ্চমানের শীলমোহর ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে যার শিল্পনৈপুণ্য অপূর্ব। এবং এই জাতীয় শীলমোহর ও মুদ্রা ব্যাবিলনে পাওয়া যায়। এই শীলমোহর ও মুদ্রায় দেখা যায় ধর্মীয় চিত্রলিপি (hieroglyphic ফরম)। আবিষ্কৃত মৃৎ-পাত্রের নকশা ও অলংকরণ অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। ইষ্টকনির্মিত বাড়ি, পয়ঃপ্রণালীও চমৎকার ব্যবস্থা। ব্রোঞ্জের মূর্তি, ষাঁড়ের বা অন্য প্রাণীর প্রতিকৃতি, বিভিন্ন ভাস্কর্যও নন্দনতত্ত্বের বিচারে অতি উচ্চমানের শিল্প-সম্ভার।

আর্য সভ্যতার গোড়াপত্তন ও মৌর্য যুগের সভ্যতার মাঝে ভারতীয় শিল্প ইতিহাসের কোন নজীর পাওয়া যায় না। মৌর্য যুগের শিল্পসম্ভার ও পরবর্তী যুগের উন্নতমানের শিল্প নিদর্শন যা দেখা যায় তাতে মনে হয় ধারাবাহিকতা না থাকলে এইভাবে শিল্পের বিবর্তন সম্ভব নয়। ভারতীয় ভাস্কর্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ভারতে প্রচুর পরিমাণে স্মৃতিসৌধ, গুহা, বিহার এবং মূর্তি-উৎকীর্ণ মন্দিরগাত্র ও পাহাড়, স্তূপ ও বিভিন্ন ধর্মমন্দিরের অবস্থিতি। এর বৈচিত্র্য ও শিল্প-নৈপুণ্য অপরূপ। এই জন্য পৃথিবীতে ভারতীয় ভাস্কর্যের স্থান অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। শুধু ধর্মকে কেন্দ্র করে নয়, প্রধানত সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মের মাধ্যমে ঐ নৈপুণ্যের বিকাশ হয়েছে। অরূপরূপী দেবতাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করে শিল্পী তার শিল্পকর্মের মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয় ও মানবিক আত্মচেতনার অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেছে। এটিকে শিক্ষা, ধর্ম, সামাজিক ভাবধারা ও দৈনন্দিন জীবনের সত্য-প্রকাশ বলা যেতে পারে। এই 'সত্যসুন্দরম্' যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বাহন হয়ে এসেছে—এরই মাধ্যমে যুগে যুগে শিল্পে রূপায়িত হয়েছে তৎকালীন ধর্মের প্রকৃত রূপ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক ভাব-ধারা। এইভাবে শিল্পীরাই এঁকে গেছে সভ্যতার সোপানের উপর এগিয়ে চলা মানুষের এক একটি পদ-চিহ্ন যার দ্বারা একালের পণ্ডিতেরা সভ্যতার মূল্যায়ন করতে পারে।

॥ ২ ॥

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হল চীন। খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর থেকে চীনের শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রবহমান। চীন বার বার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও চৈনিক সভ্যতাকে স্তিমিত হতে দেয়নি। অন্যান্য বহু দেশ বৈদেশিক শিল্প-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু চীন তার হস্তলিপি ও শিল্প-সংস্কৃতিকে একান্ত আপন ধারায় পৃথিবীর সামনে অদ্বিতীয় রূপে তুলে ধরেছে। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র চীনই আদিকাল থেকে হস্তলেখকে উচ্চ আসনে স্থান দিয়ে চারুকলার সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রথম যুগ থেকেই এই লেখকে অক্ষর হিসাবে ব্যবহার না করে কোনো প্রাণী বা বিষয়বস্তুর বা ভাবপ্রকাশের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছে। এই চিত্রধর্মী অক্ষরের মধ্যে দিয়ে ভাষার রূপ ও সমুদয় ভাবার্থ ব্যক্ত হয়ে সম্পূর্ণ অর্থটি প্রকাশিত হয়। প্রাচীন যুগ থেকে এই ভাষার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি বলেই চৈনিক শিল্প ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়েছে। জগতের একমাত্র জাতি চীন যে চিত্রলেখ ভাষাকে প্রথম স্থান দিয়ে শিল্পকে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছে। চীনে কবিতায় চিত্র সংযোগে পূর্ণাঙ্গ চিত্ররচনার রীতি প্রচলিত। এখানে চিত্র ও কবিতা একে অন্যের পরিপূরকরূপে সামগ্রিক ভারসাম্য রক্ষা করে। চিত্রের এক-চতুর্থাংশ চিত্র রূপায়িত করে বাকি শূন্য স্থানটিতে কবিতা লিখে চিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। শিল্পীর নামাঙ্কিত শীলমোহরের সাহায্যে নিজের নাম ছেপে চিত্র সমাপ্ত করা হত। তাতে ঐ নামাঙ্কিত শীল-মোহর ও কবিতা চিত্রের একটি অংশ বলে মনে হত। এইভাবে কাব্যরূপী হস্তলিপি চীনে চারুশিল্পের মর্যাদা পেয়েছে এবং ঐ উচ্চকোটির চিত্রকলা জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছে।

চীনের চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল কালির টানটোনে অল্প রঙে বা ধৌতবস্ত্রের ব্যঞ্জনায় বিষয়বস্তুর বাহুল্য বর্জন করে চিত্র রূপায়িত হত। প্রকৃতির বাহ্য রূপকে নিখুঁত-ভাবে অনুধাবন করে তা থেকে শিল্পী আপন মনের ধ্যান-ধারণায় চিত্র রূপায়িত করতেন। অপর দিকে চীনের কারিগরি শিল্পে সমান দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাংস্য ধাতু, কাঠ, বিশেষভাবে প্রচলিত জেড্‌প্রস্তরের নির্মিত জিনিসপত্রে। জেডের নানা রঙের ক্ষুদ্রাকৃতি ভাস্কর্য, ব্যবহারিক তৈজসপত্র, গহনা ইত্যাদির নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই দ্রব্যগুলি ধর্মীয় অঙ্গরূপে মৃতের সঙ্গে সমাধিস্থ হওয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে জেড্‌-প্রস্তরে গড়া দ্রব্য মাটির তলা থেকে পাওয়া গেছে।

চীনে পীত নদীর ধ্বংসলীলার দরুণ চীনের জন-জীবন কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে একতাবদ্ধভাবে কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারাই সভ্যতার চরম উৎকর্ষ গড়ে তুলেছে এবং জগতে ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী জাতিরূপে গণ্য হয়েছে।

চীন সম্রাটের লিখিত ইতিহাস থেকে জানা যায়, চীনেই প্রথম চক্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে অশ্ববাহিত গাড়ি ও রথের প্রচলন হয়। গুটিকা থেকে রেশমবস্ত্রের আবিষ্কারও হয়—ঐ রেশম বুনন শিল্পের শিল্পনৈপুণ্য অপরূপ। সমগ্র ইয়োরোপে তুলা আবিষ্কারের আগে চীনা বস্ত্রের চাহিদা ছিল। পৃথিবীর আর এক প্রান্তে পেরুতে দড়িতে গাঁট বেঁধে হিসাবনিকাশের যে রীতি প্রাচীন যুগে ছিল চীনেও অতি প্রাচীন যুগে অনুরূপ পদ্ধতির প্রচলন ছিল। পরে বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পর চিত্রাক্ষর বা চিত্রলিপির উদ্ভব হয়। সর্বপ্রাচীন চীনা চিত্রলিপি দেখা যায় 'শ্যাং' রাজত্বে (খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বছর)। প্রথম যুগে যা শুরু হয়েছিল বর্তমান যুগেও তা অবিকৃতরূপে প্রচলিত রয়েছে। মুদ্রণ পদ্ধতিও চীন দেশে অতি প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত হয়।

॥ ৩ ॥

শুধু চীন ভারত কেন, সমগ্র পৃথিবীর শিল্প

সংস্কৃতি ও কারিগরির শিল্প পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিল্প প্রাচীন ও সুসভ্য মানব সমাজের অপরিহার্য জিনিস। বর্তমান যুগে অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন বিজ্ঞান শিক্ষার সংগে মানুষের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধনের জন্য অন্যান্য বিষয়ের সংগে সুকুমার কলার চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বস্তুজ্ঞান লাভ করে মানুষ অনেক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারে কিন্তু তাতে মানসিক শান্তি ও আনন্দ লাভ করে না এবং নান্দনিক বিকাশ ঘটে না যার দ্বারা জগতে শান্তি ও কল্যাণকর কিছু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এই প্রসংগে 'আধুনিক শিল্প শিক্ষা' বইয়ে স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'শিল্পের প্রধান তাৎপর্য অভিব্যক্তির দিক দিয়ে। হৃদয়হীন মানুষ শক্তিশালী হলেও যেমন তার বর্বরতা ঘোচে না, তেমনি শিল্পাশ্রিত অভিব্যক্তির অবর্তমানে সমাজে বিশেষ রকমের বর্বরতার লক্ষণ দেখা দিতে বাধ্য।'

বর্তমান যুগে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শিল্পবর্জিত শিক্ষাক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবধারা কি করে আসবে? বহু কালের আরো একটি বৃহৎ সমস্যা—পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও মেহনতী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানের অসুবিধা। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে "বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম" বইটিতে শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়ের বক্তব্য : "মানুষের জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টা থেকে এবং তার উদ্ভাবিত জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পকলা থেকে বিজ্ঞানের জন্ম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয় যুক্তি ও বিচারসম্মত চিন্তাধারার। যে সমাজ ব্যবস্থায় বুদ্ধিবিচারের সংগে হাতের কারিগরি কৌশলের সহযোগিতার অভাব ঘটে সেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যায় রুদ্ধ হয়ে। তাই ঘটেছিল গ্রেকো-রোমান সমাজ ব্যবস্থায়। ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চার অবনতির মূলেও এই একই কারণ নির্দেশ করা যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভাষায়—

'In the Vedic age, the Rishis or priests did not form any exclusive caste of their own....But all this was changed when Brahmins re-asserted their supremacy on the decline or expulsion of Buddhism.

'The caste system was established *de novo* in a more rigid form. The drift of Manu and the later Puranas is in the direction of glorifying the priestly class, which set up most arrogant and outrageous pretensions.

'The arts thus being relegated to the low castes, and the professions made hereditary, and the intellectual portion of the community being thus withdrawn from active participation in the arts, the how and why of the phenomenon—on co-ordination of cause and effect—were lost sight of. The spirit of enquiry gradually died out among a nation naturally prone to speculation and metaphysical subtleties, and India for once bade adieu to experimental and inductive science.'

এর অর্থ, বৈদিক যুগে ঋষি বা পুরোহিতেরা সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে নিজেদের কোনো দুর্ভেদ্য প্রাচীরে পৃথক করে রাখেন নি। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পতনোন্মুখ কালে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ে এর পরিবর্তন ঘটে। ফলে কঠোরভাবে জাতিভেদ প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। মনু এবং পরবর্তীকালের পুরাণাদিতে পুরোহিত শ্রেণীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ফলে তাদের মধ্যে দম্ভ, দর্প, অহংকার ও প্রাধান্যের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে।

শিল্পকলার অনুশীলন নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে এবং জীবিকাবৃত্তি হয়ে ওঠে বংশানুক্রমিক। এই ব্যবস্থার দরুন সমাজের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সংগে শিল্পকলার অনুশীলনের প্রত্যক্ষ সংযোগ যায় ছিন্ন হয়ে। ফলে, ঘটনাবলীর কেন এবং কেমন অর্থাৎ কার্যকারণের শৃংখলাবোধ যায় হারিয়ে। কল্পনা ও বিতর্কপ্রবণ জাতির মধ্যে অনুসন্ধিৎসার মনোবৃত্তি যায় ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এবং ভারতবর্ষ এক প্রকার চিরতরে পরীক্ষা এবং আরোহ (inductive)-মূলক বিজ্ঞানের অনুশীলন থেকে বিদায় নেয়।......অতএব দেখা যাচ্ছে, গ্রীস ও রোমের মত ভারতবর্ষেও বিজ্ঞানের অবনতির কারণ হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থায় দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব—মুষ্টিমেয় ধনী ও ভোগবিলাসী শ্রম বিমুখ উচ্চ জাতি এবং বহু সংখ্যাগরিষ্ঠ পতিত ও অনেক ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য নীচ জাতি। এর ফলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে তার প্রয়োগের সম্বন্ধ গেছে ছিন্ন হয়ে।

আমাদের দেশে বর্তমানে নিরক্ষরতা প্রসংগে বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শ্রমিক শিল্পী কারিগরদের মধ্যে প্রাচীন সেই প্রাচীর আমরা এখনও ভেঙে ফেলতে পারিনি। যদিও আমাদের দেশের বিশ্ব-বন্দিত নেতারা ঐ ব্যবধান দূর করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন ও এখনও চেষ্টা চলছে, তবুও আমরা এখনো সিদ্ধি লাভ করতে পারিনি। তার প্রমাণ বর্তমানে আমাদের দেশের ৭০ ভাগ নিরক্ষর মানুষ।

আদি মানবগোষ্ঠী সভ্যতার ঊষাকালে প্রথম
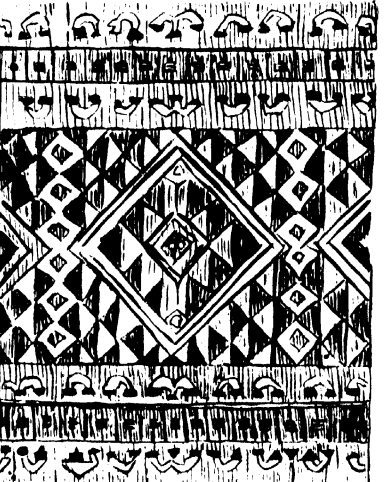
আসামের উপজাতীয় তাঁতবস্ত্রের নকশায় বিভিন্ন জ্যামিতিক ফর্ম : হীরকাকার; ত্রিভুজ ও সরলরেখা সমন্বিত। চিত্র (দুই)

শিল্পকে আশ্রয় করে সভ্যতার সোপানে পদক্ষেপ করেছিল। যন্ত্রের যুগে আমরা অনেক উন্নত। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতিসম্পন্ন মানুষের মন তো যন্ত্র নয়। তার আছে আপন সত্তা। মানুষ চায় আত্ম-উপলব্ধিকে ব্যক্ত করতে। আদি শিল্পকলা ও কারিগরি শিল্প শুরু থেকে এখনো লোকায়ত শিল্পের মধ্যে প্রবহমান। সুতরাং এই শিল্পশ্রমিকদের উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, লোকশিল্পকে যুগোপযোগী করে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে। বর্তমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হবেন বর্তমানের অভিজ্ঞ লোকশিল্পী ও নিরক্ষর মানুষের ভাব আদান-প্রদানের সেতু। শিল্প শুধু নিরক্ষরতার ক্ষেত্রে নয়, সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। এই প্রসংগে উল্লেখ করি কিছুদিন আগে দেশ পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় অহিভূষণ মালিকের লেখা এডেলেড-এ বিশ্ব আরট কংগ্রেস সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ, যা থেকে আমরা জানতে পারি যে পৃথিবীর বড় বড় শিক্ষাবিদদের চিন্তায় আর্টের মূল্য সবার উপরে এবং ছেলেমেয়েদের সত্যকারের কাজের মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজন।

শ্রমিক শিল্পীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আধুনিক শিল্প-শিক্ষা' বইটিতে একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছেন : "...নন্দলালের ইচ্ছা হয় কলাভবনের দেয়ালে ভিত্তিচিত্র অংকনের। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জয়পুরের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কারিগর নরসিংলালকে নিযুক্ত করা হয়। নরসিংলাল যখন শান্তিনিকেতনে কাজে নিযুক্ত হন তখন জয়পুরে তাঁর পদমর্যাদা সাধারণ মিস্ত্রি অপেক্ষা অধিক ছিল না। নন্দলাল ছাত্র ও অধ্যাপক সকলকে জানালেন যে, 'কে শিক্ষক কে ছাত্র একথা যেন নরসিংলাল জানতে না পারে। তার সংগে তোমরা সকলে যোগাড়ের মতন কাজ করবে এবং তার হুকুম বিনাবাক্যে পালন করবে।' নন্দলালের আদেশ শিল্পীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন এবং প্রয়োজন হলে নন্দলালও যোগাড়ের কাজ করেছেন। বহু দিন পর্যন্ত নরসিংলাল জানতে পারেননি যে নন্দলাল তাঁর মনিব। কাজের সময় বৃদ্ধ নরসিংলালের মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ থাকতো, অকথ্য গালিগালাজ করতে দ্বিধা করতেন না কারণ তাঁর ধারণা ছিল সকলেই তাঁর যোগাড়ে।...

"...কারিগরদের প্রতি নন্দলালের গভীর সহানুভূতি ও উপযুক্ত মর্যাদা দেবার কারণেই কলাভবনের শিল্পীরা নরসিংলালকে গুরুরূপে শ্রদ্ধা করতে এবং উপযুক্ত মর্যাদা দিতে শিখলেন। এই শ্রদ্ধার প্রতিদানে নরসিংলাল অকুণ্ঠিত চিত্তে ছাত্রদের করণকৌশলের খুঁটিনাটি যত্নের সংগে শিক্ষা দিলেন। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল শান্তিনিকেতন-পূর্বে তাঁর কারিগরি-জীবন কতই না লাঞ্ছনার ছিল। এখানকার মত ব্যবহার তিনি পূর্বে কোথাও পাননি।"

সুতরাং এই সব আদর্শ এ যুগে গ্রহণ করে আমরা লোকশিক্ষায় লোকশিল্পের মর্যাদা দিতে পারি।

॥ ৪ ॥

লোকশিল্প অর্থাৎ লোকের শিল্প। এতে যেমন সমাজ, ধর্ম ও অর্থনীতি তার গভীর প্রত্যক্ষ ছাপ রেখেছে তেমনিভাবেই ব্যক্তির নিজস্ব শিল্পভাবনা ও শিল্পচেতনাও লোকশিল্পের একটা বড় উপাদান। একটি সুন্দর আল্পনার মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব যেমন আছে (বিভিন্ন সাংকেতিক বা ধর্মীয় চিহ্ন প্রভৃতি) তেমনি শিল্পীর নিজস্ব অভিব্যক্তিও তারই মধ্যে পাওয়া যায়। এবং এর পিছনে আছে প্রকৃতি। সে তার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ ঢেলে দিচ্ছে দু হাত ভরে, অকুণ্ঠভাবে—শিল্পী এই বিচিত্রের আনন্দরস আকণ্ঠ পান করে পূর্ণ করছে চিত্ত—হয়তো বা চেতনে হয়তো বা অবচেতনেই—সেই প্রকৃতির দানকেই সে তার নিজস্ব অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে কত বিচিত্র রূপে রঙে রেখায়, নৃত্যে ছন্দে সংগীতে, কত বিভিন্ন শিল্পকর্মে।

মানবসভ্যতার আরম্ভিম ঊষাকাল থেকে এখনকার যুগ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি শিল্পকর্মে জ্যামিতিক আকৃতির সমাবেশ দেখা যায়। এরও আদি প্রেরণা কিন্তু প্রকৃতি। তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বিভিন্ন জ্যামিতিক ফর্ম। সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদ গোলাকার, গাছের পাতা প্রধানত ত্রিকোণাকার বা ডিম্বাকৃতি, বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বক্ররেখার সমন্বয়, রামধনু অর্ধগোলাকার, দ্বিতীয়ার চাঁদ দুটি অর্ধগোলাকারের সংযোগ, জলের ঢেউয়ের তরঙ্গাত আকৃতি ইত্যাদি। প্রকৃতির মধ্যে যে শৃংখলা, সংহতি, বিভিন্ন সরল ও বক্র রেখার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় দেখা যায় তা-ই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এখনও পর্যন্ত মানুষকে বিভিন্ন জ্যামিতিক ও আলংকারিক নকশা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু মানুষের কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টি তো মানুষের বহির্দৃষ্টির অন্ধ দাস নয়। বাইরে যা দেখল সে, তাকেই

হিমাচল প্রদেশের স্বস্তিক চিহ্ন ও চতুষ্কোণ সমন্বিত পশমী শালের নকশা। (চম্বা)
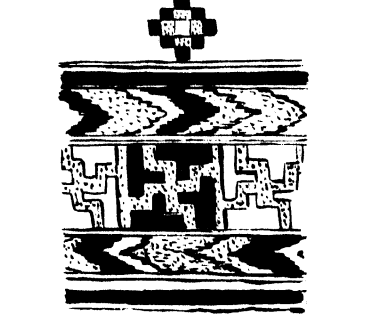
আপন অন্তরের কল্পনা ও রহস্যময়তার রসে জারিত করে নিয়ে অন্য কোনো আকৃতিতে রূপান্তরিত করে

নিল। বাহিরমহলের বস্তুকে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে এই রূপান্তরের ফলে জন্ম নিল বহু প্রতীকচিহ্ন বা সিম্বল্। তাই পৃথিবীর লোকশিল্পে সাংকেতিক চিহ্নের এই বহুল ব্যবহার।

প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত লোকশিল্পের পশ্চাৎপটে থেকে শিল্পীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এসেছে। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবের সংগে লোকশিল্পের সম্পর্ক যেমন মাটির সংগে গাছের, যেমন আলোর সংগে প্রাণের—একটা না হলে অন্যটা বাঁচে না। বস্তুত লোকশিল্পের প্রধানতম উৎস হল গ্রামের বিভিন্ন উৎসব ও মেলামেশা।

ভারতে ধর্মীয় উৎসবের ধারা যে বিচিত্রমুখী হবে তা অতিমাত্রায় স্পষ্ট, কেননা প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ বহু ধর্মাবলম্বী ও বহু মতাবলম্বী। প্রতিটি ধর্ম ও প্রতিটি মতের (sect) নিজস্ব কিছু ধর্মীয় আচার (rituals) আছে এবং এই আচার পালনে লোকশিল্পের স্থান অনস্বীকার্য। আমাদের বাংলাদেশেই আছে শাক্ত, বৈষ্ণব, মুসলিম, বৌদ্ধ, আস্তিকরা—তাদের বিভিন্ন স্বতন্ত্র ধর্মকৃত্য ও উৎসবাদি আমাদের লোকশিল্পকে পুষ্ট ও মণ্ডিত করেছে। দুর্গা, শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবীদের পুজাও আমাদের গ্রামে-শহরে প্রচলিত। আর বাংলাদেশে তো কথাই আছে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'! এ ছাড়া বিভিন্ন ব্রত পালনের মধ্যেও আমাদের লোকশিল্পের কিছু উৎস আছে।

সামাজিক মেলামেশা ও একই সংগে অর্থনৈতিক লেনদেনেরও একটা বড় কেন্দ্র হল গ্রামের মেলা। বিভিন্ন কারণে এই মেলা বসে—কখনো ধর্মীয়, কখনো বা সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে। গ্রামের মেলাগুলি হল লোককৃষ্টির অন্যতম ধারক ও বাহক। পটচিত্র ও রকমারি পুতুল থেকে শুরু করে হাতে বোনা বেতের বা বাঁশের চুপড়ি, ঝুড়ি, মাদুর ইত্যাদি থেকে তাঁতবস্ত্র পর্যন্ত বহু রকম লোকশিল্পজ বস্তুর আমদানি হয় এখানে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার লেনদেনের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য অঞ্চলে।

লোকশিল্পের শেষ প্রধান উৎসটি হল বিভিন্ন জাতি উপজাতি আনীত সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ (cultural elements)। যুগে যুগে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি উপজাতি তাদের সংস্কৃতির ছাপ রেখে গেছে—কালক্রমে সেগুলো হয়তো কিছু পরিবর্তিত হয়ে অন্য কোনো রূপে স্থান পেয়েছে আঞ্চলিক লোকশিল্পে।

এইভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি লোকশিল্পের স্বরূপ ও উৎস কি কি। লোকশিল্পের উপাদান সম্পূর্ণ দেশীয় ও আঞ্চলিক—সেই জন্যেই তা লোকশিল্প। এর মূলে আছে উপজাতীয় কৃষ্টি ও তার পরে আগত যুগের সদাপরিবর্তনশীল সংস্কৃতিও স্বাভাবিকভাবেই একে প্রভাবিত ও পরিচালিত করেছে।

এতক্ষণ আমরা প্রাচীনকাল হতে প্রবহমান শিল্পধারা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এই শিল্পের সংগে শিক্ষার বিশেষ সম্পর্ক কি ও কিভাবে বর্তমানকালে লোকশিল্পের মাধ্যমে লোকশিক্ষা দেওয়া সম্ভব, সেই বিষয়ে এখন আলোচনা করা যাক।

॥ ৫ ॥

পুরাকালে ছাত্ররা গুরুগৃহেই সর্ববিধ শিক্ষা গ্রহণ করত—তাদের শিক্ষা হত প্রাকৃতিক পরিবেশে, জীবনের দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে। গুরুগৃহে শিষ্যদের শুধু বেদপাঠই ছিল না; সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নানারকম কাজের মধ্য দিয়েই তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হত, স্বচ্ছন্দ প্রাকৃতিক পরিবেশে। গোপালন, বৃক্ষরোপণ ও তার পরিচর্যা, চাষবাস, সেবাকার্য বেদগান, প্রাকৃতিক দ্রব্যসমূহের মধ্যে থেকে ঔষধের সন্ধান, এইরকম বিভিন্ন কাজে তারা পারদর্শী হয়ে উঠত। এইসব কাজের মধ্য দিয়েই তারা লাভ করত সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, ধর্মজ্ঞান ও কর্তব্যবোধ। এ গেল বেদপুরাণের যুগের শিক্ষা।

যুগের পরিবর্তনের সংগে সংগে এসেছে নতুন ধারা। কিন্তু এ যুগেও রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন প্রাকৃতিক পরিবেশই হল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান। সূর্য, তারা, বৃক্ষ, ফুল, নদী এবং পাহাড়—এরাই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আর এক মহানায়ক মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাসম্পর্কিত বক্তব্যও এই ধারণারই অনুগামী।
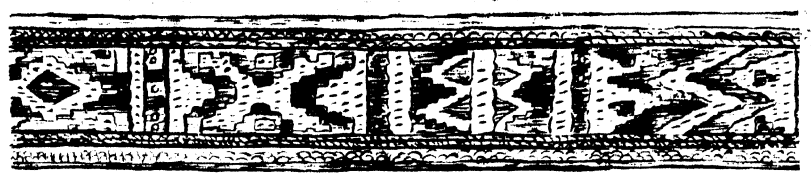
অরুণাচল প্রদেশের তাঁতবস্ত্রের নকশায় হীরকাকার, ত্রিভুজ, উল্লম্ব ও আনুভূমিক সরলরেখার সমাবেশ। (তিন)

তিনিও স্বাভাবিক পরিবেশে হাতের কাজের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও জীবনমুখী শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর জীবনে প্রয়োগ করে গেছেন। বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগে এবং আধুনিক কালের পূর্বে মানুষ ধর্ম ও প্রকৃতিকে আশ্রয় করে জীবনের পরম শিক্ষা গ্রহণ করেছে। পুরাকালে শিক্ষায় যদিও বর্ণবৈষম্যের বাধা ছিল, পুঁথিপাঠের অধিকার ছিল শুধু ব্রাহ্মণের, কিন্তু পরবর্তী যুগে সেই ব্রাহ্মণই হয়তো দিনের শেষে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বসে রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করতেন বা পৌরাণিক কাহিনী শোনাতেন, আর শুনতেন গ্রামের অন্য সকল বর্ণের মানুষ। তাতেই তারা পেতেন নীতিজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান ইত্যাদি। আবার আনন্দ অনুষ্ঠানে,—যাত্রাগান, কবিগান, বাউলগানের মধ্যেই জীবনের সত্য উপলব্ধি করতেন। বাংলাদেশের আদিবাসীরা রায়বেঁশে নাচের মাধ্যমে শরীরচর্চাও করতেন। পরবর্তী যুগে চারণ কবি মুকুন্দদাসের গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘরের মেয়েরা বিদেশী রেশমী চুড়ি ভেঙে, দেশে গড়া জিনিসের আদর করতে শিখেছে। পুরুষও জাতীয়তাবোধে সচেতন হয়েছে। এভাবেই দেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয়েছে।

সে যুগে লোকশিল্প ছিল শিক্ষার একটি বিশেষ অংগ। গ্রামের চিত্রকর ও কুমোর ছিল জাতীয় কৃষ্টির বাহক; পট এঁকে, দেবদেবীর মূর্তি গড়ে, জাতীয় কৃষ্টিকে সাধারণের সামনে তুলে ধরত। অন্য দিকে নানা পটচিত্রে তৎকালীন সমাজের বিকৃত রুচিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। যেমন কালীঘাটের পটচিত্রে পাই বাবুদের উচ্ছৃংখলতার চিত্র, যাতে করে সাধারণ মানুষও জানতে পারত সমাজের খারাপ দিকগুলি।

বাংলাদেশের কাঁথার নকশায় জ্যামিতিক ফর্ম। (পাঁচ)

অতীতে লোকশিক্ষা হাতের কাজের মাধ্যমেই হয়েছে। মেয়েরাও থেমে থাকেনি। বাড়ির বয়োবৃদ্ধা মহিলার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছে,—শিশুপালন, ব্রতকথা, কাঁথা সেলাই, তুলো দিয়ে সুতো কাটা, কুলো ডালা চিত্রিত করা, পুতুলগড়া, সেবা, রন্ধন ও গো-দোহন, বৃক্ষসেবা, প্রভৃতি—এইসব বৃত্তিমূলক কাজে। রবীন্দ্রনাথও এই ধারারই প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে।

গ্রামের মেলা, দুর্গোৎসব, যাত্রাগান, কীর্তন ইত্যাদি ছিল সর্বসাধারণের মিলনের প্রধান স্থান। মেলা বা শীতলাপুজা গ্রামে আজও হয়, কিন্তু অন্য আর এক রূপে—তাতে বিকৃত রুচির পরিচয় পাই। এখন মেলায় আসে লোকশিল্পের বদলে সস্তা রুচির প্ল্যাস্টিকের জিনিস—আনন্দ অনুষ্ঠানেও বিকৃতির পরিচয় মেলে। তাই গ্রামের কৃষ্টি ও রুচির এই নিম্নমুখী দিক আমাদের মনকে অনেক সময় কষ্ট দেয়।

গ্রামের মেলায়, উৎসবে বা চণ্ডীমণ্ডপে একত্রিত হওয়া মানুষেরা নিজেদের একই গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে করতেন। এইসব উৎসবে একে অপরের খবরাখবর নিত, ও একে অনোর সমব্যথী ছিল। তাই লোকশিল্প ও উৎসব-আয়োজনে সমাজে যেন একটা বাঁধন গড়ে উঠেছিল ও সমাজজীবনে উন্নতি দেখা গিয়েছিল।

এই আধুনিক যুগেও গ্রামের বহু মানুষ নিরক্ষর, কিন্তু আজও তারা প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। যেমন, দিনের রৌদ্রছায়া দেখে বলে দেয় বেলা কয় প্রহর। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের হাতের ঘড়িটি যদি বিকল হয় তবে তিনি নিরুপায় প্রহর গুনতে। আকাশের চাঁদ দেখে গ্রামের মানুষ বলে দেয় আজ কি তিথি বা মাসের কত তারিখ। এইভাবে প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষালাভ করে তারা আজও স্বনির্ভর।

॥ ৬ ॥

আদিম যুগে যখন ভাষার সৃষ্টি হয়নি, তখন মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করত চিত্রের মাধ্যমে। সুকুমার সেনের "ভাষার ইতিবৃত্ত" বইয়ে পাওয়া যায়, "দশহাজার বৎসর পূর্বের মানুষ ও এখনো যে মানবগোষ্ঠী সেই ঐতিহাসিক যুগের মানসিক অবস্থায় আছে, তাহারাও চিত্রের সাহায্যে কোন ঘটনাকে স্থায়ী রূপে দিত ও এখনো দেয় চিত্রের সাহায্যে।" ধ্বনি থেকে লিপির ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখি, আদিম যুগে মানুষের ধ্বনিগুচ্ছ বা শব্দ থেকে লিপির উদ্ভব হয়েছে এবং এই লিপি সৃষ্টির প্রথম সোপান হল চিত্র। দেশবিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্বত ও গুহাগাত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আঁকা ছবি আজও পাওয়া যায়। সেইসব ছবি মানুষের জন্তুর বা মানুষ কর্তৃক জন্তু শিকারের ছবি। আধুনিক যুগেও আদিবাসী শ্রেণীর মধ্যে এই দেয়ালচিত্রাংকন প্রচলিত আছে।

লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের প্রথম স্তর চিত্র। তখন কোন কিছু বোঝাতে চিত্রলিপির (পিক্টোগ্রাম) সাহায্য নেওয়া হত। চিত্রলিপি আরও সহজ হয়ে ভাবলিপির (বা রেখাচিত্র, ইডিওগ্রাম) উদ্ভব হয়। এর পর আসে চিত্রপ্রতীকলিপি (হাইরোগ্লাফিক) সুতরাং চিত্র ও অক্ষরের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ আছে অর্থাৎ চিত্র থেকে অক্ষরের যাতায়াতের পথ সুগম।

সমস্ত চিত্রকলায় ও স্থাপত্যে কয়েকটি জ্যামিতিক ফর্ম বা আকৃতির সমাবেশ দেখা যায়। প্রাচীন শিল্পকলায় এই মূল আকারগুলি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের ইতিহাসে যত পিছনে যাওয়া যায় সেখানে দেখা যায় বিভিন্ন লোকশিল্পে জ্যামিতিক ফর্মের সমাবেশ। বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ এবং আসাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশের উপজাতিদের বেশীরভাগ শিল্পকর্মে এই জ্যামিতিক ফর্মগুলিকে নানাভাবে ব্যবহার করে ও নানারঙের সমাবেশে মনোমুগ্ধকর নকশার সৃষ্টি করা হয়েছে। মণিপুর, অরুণাচল, আসাম, নাগাল্যান্ড এই প্রদেশগুলিতে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নানা জ্যামিতিক ফর্ম—যেমন হীরকাকার, ত্রিভুজ,
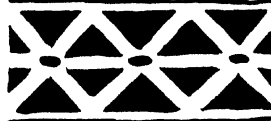
বাংলাদেশের কাঁথার নকশায় জ্যামিতিক ফর্ম। (ছয়)

সামান্তরিক, উল্লম্ব ও আনুভূমিক সরলরেখা, বিন্দু ও গোলাকার,— ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। দুই, তিন ও চার নম্বর চিত্রে এই ধরনের কিছু তাঁতবস্ত্রের নকশা দেখানো হয়েছে।

সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে আদিম যুগের পরে একালেও উপজাতিশ্রেণীর মধ্যে এখনও বিভিন্ন নকশায় জ্যামিতিক ফর্মের ব্যবহার কতখানি। বাংলাদেশের কাঁথা-আলপনার মধ্যেও নানা জ্যামিতিক ফর্ম দেখা যায়। (চিত্র নং পাঁচ ও ছয়।)
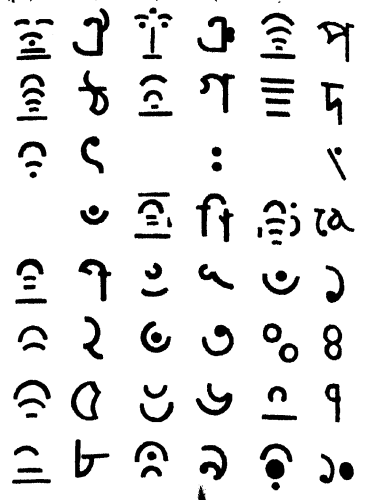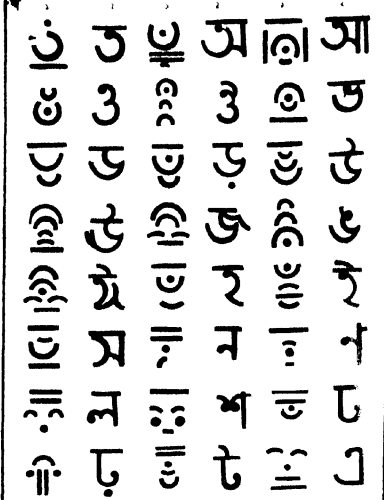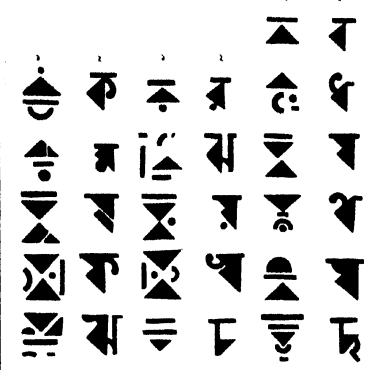
নব বর্ণপরিচয় পদ্ধতি (চিত্র ক; খ; গ)। এখানে এক নম্বর সারিতে মূল জ্যামিতিক ফর্ম ও দুই নম্বর সারিতে ওই ফর্ম দ্বারা গঠিত বাংলার অক্ষর ও সংখ্যা দেখানো হয়েছে।

আদিম যুগের মানুষই বর্তমান শিল্পকলার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছে এবং তাদের সৌন্দর্য-বোধ ও শিল্পচেতনা আমাদের আজও বিস্মিত করে।

॥ ৭ ॥

আজ আমাদের দেশ অনেক উন্নত, কিন্তু এ যুগেও দেশে শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ নিরক্ষর। এযাবৎকাল বয়স্কদের জন্যে চিরাচরিত প্রথার শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সাফল্য লাভ করতে পারিনি : তা আজ প্রমাণিত। তাই এহেন অবস্থায় আমাদের কর্তব্য, নতুন কোন পদ্ধতি—যা সহজ, সরল এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত—তার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ। তাই সাংকেতিক চিহ্ন বা জ্যামিতির ফর্মগুলিকে গাণিতিক ফরমুলার সাহায্যে প্রয়োগ করে অক্ষর পরিচয়ের এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। লোকশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানই এই বর্ণপরিচয় পদ্ধতির প্রধান ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এবার দেখা যাক এর সুযোগ সুবিধা কি এবং বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এটির প্রয়োগের উপযোগিতা কি।

প্রথম কথাই হল, লোকশিল্প শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হলে আনন্দের সঙ্গে বয়স্ক ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করবে।

দ্বিতীয়ত, এতে বয়স্ক কর্মরত শিক্ষার্থীর নিজস্ব পেশায় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি তো হবেই না উপরন্তু তার দৈনন্দিন কাজই হবে তার অক্ষর পরিচয়ের প্রথম শিক্ষক। মেয়েরা কাঁথা-সেলাই, নকশা কাটা বা অন্যান্য কুটিরশিল্পের কাজ করতে করতে

বাংলার কাঁথার নকশায় হাইরোগ্লাফিক ফর্ম বা সাংকেতিক (ক, খ, গ) চিহ্নকে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার। এক নম্বর সারিতে দেখানো হয়েছে মূল জ্যামিতিক ফর্ম; দুই নম্বর সারিতে আছে কাঁথার নকশায় আলংকারিক রূপ; তিন নম্বরে আছে নকশার মধ্যে অক্ষরের অংশটি, এবং চার, পাঁচ, ছয় ও সাত নম্বর সারিতে আছে অক্ষরগুলি।

এবং বয়স্ক পুরুষেরা দারুশিল্প, মৃৎশিল্প, তাঁত-শিল্প প্রভৃতির কাজ করতে করতেই শিখে যাবে কেমন করে তাদের চিরপরিচিত মূল জ্যামিতিক আকৃতি-গুলি থেকেই তাদের ভাষার সমস্ত অক্ষর ও সংখ্যা গঠিত হতে পারে। এই শিক্ষণব্যবস্থায় তাদের রুজি-রোজগার কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

তৃতীয়ত, আমাদের পদ্ধতি খুবই সহজ সরল যা শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে বিশেষ চাপ সৃষ্টি করবে না। শিক্ষার্থীর প্রধান কাজ হবে কয়েকটি বেসিক ফরমস বা মূল আকার থেকে তার ভাষার অক্ষর ও সংখ্যা গঠন করতে শেখা। এটি শিখতে তাকে আলাদা করে কিছু করতে হচ্ছে না—তার নিজস্ব কাজের মাধ্যমেই সে তা শিখতে পারবে। ফলে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা তার কাছে একেবারেই কষ্টসাধ্য হবে না।

এখন যে সমস্ত বয়স্ক শিক্ষণপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাতে শিক্ষা এবং কর্মের মধ্যে বহু ফারাক থাকার দরুন নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। একজন ছুতোর, কামার, কুমোর, চাষী বা মজুর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর তার ন্যূনতম বিশ্রামের সময়টিতে আবার অন্য কিছু—যা কিনা তার নিজস্ব কর্মগত পরিমন্ডল (প্রফেশনাল এনভায়রনমেন্ট) থেকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত ও তার কাছে উদ্ভট—সেরকম কোনো বিদ্যা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে না। কিন্তু এই অভিনব পদ্ধতিতে সে সমস্যা একেবারেই নেই।

চতুর্থত, এই শিক্ষণপদ্ধতি শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকায় তার পক্ষে অক্ষর ও সংখ্যা ভুলে যাবার কোন আশঙ্কা নেই। অক্ষরপরিচয়ের তিন বছর পরেও সে আবার নিরক্ষরে পরিণত হবে না—যা এখনকার মামুলী শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রায়শই হয়ে থাকে।

পঞ্চমত, এই শিক্ষাপদ্ধতি কেবল আমাদের ভাষাতেই সীমাবদ্ধ নয়; ভারত, এমন কি বিশ্বের প্রায় সমস্ত ভাষার লিপিমালা এইভাবে মৌল আকৃতি-গুলির গাণিতিক সংন্যাস ও বিন্যাস (পারমুটেশন অ্যান্ড কম্বিনেশন) করে পাওয়া যাবে। প্রতিটি ভাষাগত অঞ্চলের নিজস্ব লোকশিল্পের মাধ্যমেই সেখানকার অধিবাসীদের এই বর্ণপরিচয় সম্ভব।

ষষ্ঠত, ছোট ও বড় উভয়ের পক্ষেই এইভাবে অক্ষর ও সংখ্যাগুলি শেখা সম্ভবপর।

ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়স্ক শিশুশিক্ষায় ঐ ফর্মগুলি ব্যবহৃত হবে। শিশুশিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ধারা বয়স্কশিক্ষার বিপরীতমুখী। কারণ বয়স্ক মানুষের (১৫—৩৫ বছর) কর্মের মধ্যে মনে অনেক হল ঐ চেনা ফর্ম দিয়ে অক্ষর পরিচয়। অবশ্য শিশুদের ক্ষেত্রে প্রথমে ঐ ফর্ম তাদের চিনিয়ে দিয়ে তারপর অক্ষর পড়া শেখানো হবে। এতে শিশু ও বয়স্কশিক্ষা একসাথে চলবে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান অনেকাংশে সফল হবে বলে আশা করতে পারি।

লোকশিক্ষা ও বয়স্কশিক্ষায় নব অক্ষরপরিচয় পদ্ধতি একটি চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের দেশে যারা খেটে-খাওয়া মানুষ, তাদের উপযোগী হবে হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। বর্তমান অক্ষরপরিচয়ের পদ্ধতিতে কতগুলো বেসিক জ্যামিতিক ফর্ম বা মূল আকৃতিকে কাজে লাগানো হয়েছে। এই ফর্মগুলি সকলেরই পরিচিত—যেমন, সরলরেখা, বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুষ্কোণ ও অর্ধবৃত্ত। এই আকৃতিগুলি ভেঙে একটি নিয়মের মাধ্যমে শিক্ষার্থী অক্ষর তৈরী করবে কাগজ কেটে, মাটি দিয়ে গড়ে বা তার নিজস্ব কারিগরি কাজের মাধ্যমে। দারুশিল্প, গ্রিলের কাজ, কাঠের ব্লকে কাপড় ছাপাইয়ের কাজ, সূচীশিল্প, রেশমশিল্প, মৃৎশিল্প, সেরামিকস্—ইত্যাদি কারুশিল্পের মাধ্যমে এই অক্ষরপরিচয় সম্ভব।

টীকা :

চিত্র নম্বর সাত-এ অক্ষরগঠনে প্রয়োজনীয় জ্যামিতিক ফর্মগুলি কাগজ কেটে তৈরী করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

এই সাধারণ বেসিক ফর্মগুলি সম্পর্কে বয়স্ক লোকের একটা স্বাভাবিক জ্ঞান আছে। এই ফর্ম-গুলিকে ভেঙে কারুকলার মাধ্যমে এক একটি অক্ষর প্রস্তুত করা যাবে। এ পদ্ধতিতে হাতের কাজের নিপুণতা বাড়বে ও সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরপরিচয়ও হবে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

১। একটি চতুষ্কোণকে আড়াআড়িভাবে কেটে দুটি ত্রিভুজ হয়। একটি ত্রিভুজ খাড়াভাবে বসিয়ে সরলরেখার নীচে রাখলে 'ব' অক্ষরটি তৈরী হবে। এখানে সরলরেখাটি অক্ষর মাত্রার কাজ করছে।

২। এইভাবে 'ব' অক্ষরটির তলায় একটি গোল বিন্দু দিলে 'র' অক্ষরটি হয়।

৩। অর্ধগোলাকার থেকে ভিতরের কিছু অংশ সমানভাবে বাদ দিলে যে অংশটি পাওয়া যাবে সেটি 'ব' অক্ষরের পাশে জোড়া দিলে 'ক' অক্ষরটি পাওয়া যায়।

৪। অনুরূপে 'ব' অক্ষরটির উপরাংশে তিন নম্বর উদাহরণে ব্যবহৃত অর্ধগোলাকার অংশটি জুড়ে 'খ'

(দশ)
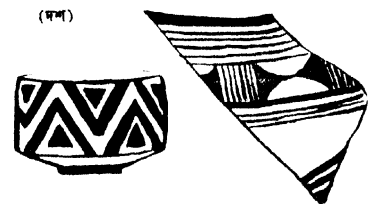
মহেন্-জো-দারো হরপ্পার মৃৎপাত্র প্রভৃতির নকশা।

অক্ষরটি তৈরী হয়। বাংলা প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্যে একটি বড় চার্ট প্রস্তুত করে দেওয়া হল। সেখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে বিভিন্ন আকৃতি ভেঙে আর জুড়ে অক্ষরগুলি প্রস্তুত করা যায়। চিত্র (চার্ট) নং সাতে এটি পাওয়া যাবে।

হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই অক্ষরপরিচয়ের এই নতুন পরিকল্পনা আমার মাথায় আসে। কলকাতার পার্ক সার্কাস বস্তি অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে ওখানকার নিরক্ষর বয়স্ক মেয়েদের হাতের কাজ শেখানো শুরু করি এবং তার মাধ্যমে কিছু কিছু রুজির বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করি। তাতে তাদের কাছ থেকে প্রচুর সাড়া পাই। তাদের কাজ শেখাতে গিয়ে দেখলাম, কার্পেটের সাধারণ নকশা তারা আঁকতে পারছে না; সাধারণ কয়েকটা ফুল আঁকতে গিয়ে কোনোটা ছোট কোনোটা বড় হয়ে যাচ্ছে। তখন আমি তাদের কাগজ কেটে ফুলগুলি তৈরী করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলাম। তারা তখন অতি সহজেই ঐ ফুল তৈরী করতে সক্ষম হল ও চার্টের ওপরে ওই কাগজে কাটা ফুলগুলি ফেলে তার নকশা এঁকে ফুল তৈরী করতে শুরু করে দিল। তখনই আমার মনে হয় যে এই পদ্ধতি অক্ষর-পরিচয়ের কাজে যদি লাগানো যায় তাহলে অক্ষর-
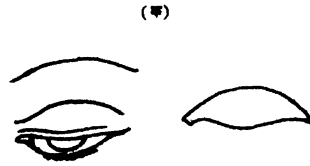
(ক)

(খ)

প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে শাস্ত্রীয় আলঙ্কারিক শিল্পকর্ম। ক) পদ্মপলাশ আঁখি। খ) পানপাতার মত মুখ। গ) চাঁপার কলির মত আঙুল। (এপারো)

আয়ত্ত করতে পারছে, এই পদ্ধতিতে অক্ষরও তারা আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে।

আমার বিশ্বাস, মেয়েদের পক্ষে এই প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতি খুবই উপযোগী হবে। আমাদের দেশে মেয়েদের নিরক্ষরতা খুবই ভয়াবহ। সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব বেশী। মা যদি নিরক্ষর হন, সন্তানের শিক্ষায় উৎসাহ আসবে না; তাই মা যদি স্বল্পশিক্ষিতও হন তবে তিনি সন্তানের শিক্ষার জন্য আগ্রহী হবেন, তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক আর নিরক্ষর থাকবে না। তাই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন বেশী।

বাংলার নিরক্ষর মেয়েদের অক্ষর শেখানোর একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল বাংলার কাঁথাশিল্প। তাই আমার পদ্ধতি বোঝানোর জন্য এখানে এই শিল্পটিই আমি বেছে নিয়েছি। অন্যান্য যে কোনো কারুকলার মাধ্যমেই এই শিক্ষণপদ্ধতি চলবে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, যিনি কোন অঞ্চলে এই নবশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁর ঐ আঞ্চলিক শিল্প (যেমন বাংলার ক্ষেত্রে এটি হল কাঁথাশিল্প) সম্বন্ধে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন—অর্থাৎ বস্তুত তাকে নিজেকেই একজন শিল্পী হতে হবে। সেটা সবক্ষেত্রে কেমন করে সম্ভব?

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। যিনি শিক্ষক, তাঁকে আঞ্চলিক লোকশিল্প হাতেকলমে না জানলেও চলবে। তাঁকে কেবল জানতে হবে কি করে ঐ অঞ্চলের বিশেষ কোনো লোকশিল্পে ব্যবহৃত নকশাগুলি থেকে প্রাদেশিক ভাষার অক্ষরগুলি গঠন করা যেতে পারে। যেমন, বাংলার কাঁথাশিল্পের মাধ্যমে যিনি কোন গ্রামের মেয়েদের সাক্ষর করতে চান, তাঁকে শুধু জানতে হবে কি ভাবে কাঁথার নকশায় ব্যবহৃত মূল জ্যামিতিক ফর্ম থেকে বাংলা অক্ষর গঠন সম্ভব। বয়স্কশিক্ষার জন্য আঞ্চলিক শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র থাকবে। কাঁথাশিল্পের সাংকেতিক চিহ্নকে (হাইরোগ্লাফিক) আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত নব বর্ণ-পরিচয় ও সেই সঙ্গে থাকবে কাঁথার ঐতিহ্যগত নকশার (ট্র্যাডিশনাল ডিজাইনস) কিছু চার্ট। এইগুলি বুঝে নেওয়ার পর শিক্ষকের কাজ হবে গ্রামের একজন দক্ষ কাঁথাশিল্পীকে খুঁজে বার করা। তাকে তিনি ঐ নকশা এবং অক্ষরগুলির সংযোগ-সূত্রটি ধরিয়ে দেবেন। সেই শিল্পী তারপর অন্যদের কাঁথা তৈরী করার পদ্ধতি ইত্যাদি শিখিয়ে দেবে। সেগুলি প্রস্তুত হয়ে গেলে শিক্ষক শুধু তাঁর ছাত্রীদের (অর্থাৎ যারা ঐ কাঁথাগুলি তৈরী করল) বুঝিয়ে দেবেন কিভাবে তাদের তৈরী নকশার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাংলা অক্ষর। এভাবে তারা বাংলা অক্ষর প্রথমে পড়তে পারবে। আগেই যারা রেখায় অভ্যস্ত হয়েছে তাদের পক্ষে লেখার পরে অসুবিধা হবে না।

বাংলা দেশের কাঁথাশিল্প লোকশিল্পের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পুরোনো কাপড় তিন-চার ভাঁজ করে তাতে পাড়ের সুতোর সেলাই দিয়ে নানাবিধ সুন্দর নকশা করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের কাঁথা ছিল আগের দিনে। ১) গায়ে দেবার জন্য লেপের মত মোটা কাঁথা; ২) বিছানা ঢাকার জন্য সুজনী বা বেড-কভার; ৩) কোনো মূল্যবান দ্রব্য যেমন পুঁথি ইত্যাদি মুড়ে রাখার জন্য চৌকো আকারের কাঁথা; ৪) বালিশের ঢাকা; ৫) আয়না ও চিরুনী মুড়ে রাখবার জন্য ছোট আয়তক্ষেত্র আকৃতির কাঁথা যাকে বলা হত 'আরশিলতা'; ৬) টাকা-পয়সা

(গ)

রাখার জন্য থলি ; ৭) রুমালের মত কাঁথা। সাধারণত এই সাত রকমের কাঁথা হত।

পুরনো কাপড়ে দু-তিন ভাঁজ করে তার ওপরে বিভিন্ন রকম নকশার কাঁথা হত। বাংলাদেশে এই নক্শা কাঁথা বিখ্যাত। বড় বড় কাঁথায় এত সুন্দর নকশা থাকতো যা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ও অত্যন্ত সময়-সাপেক্ষ। অনেক সময় কাঁথা দেখে বোঝা যেত না কোনটা উল্টো বা কোনটা সোজা পিঠ। এর উপকরণ খুবই সামান্য : পুরনো কাপড় ও পাড়ের সুতো। বিভিন্ন আকারের কাঁথায় বিভিন্ন ধরনের নকশা করা হত। 'আরশিলতা' কাঁথায় থাকতো চারদিকে লতা ও মাঝখানে পদ্ম বা গাছ। বালিশের ঢাকায় থাকতো গাছ, ফুল, পাখি ও চারধারে বর্ডার।

আমাদের দেশে এই কাঁথা ও আল্পনার নকশায় সাধারণত দেখা যায় পদ্মলতা, শতদল পদ্ম, ফুল, পাখি, শঙ্খ, গাছ ও নানা জ্যামিতিক ফর্ম—যেমন ত্রিকোণ, গোলাকার চৌকো, ইত্যাদি।

বর্তমান কালে কাঁথাকে আধুনিক যুগোপযোগী করে নানা জিনিসে আমরা ব্যবহার করতে পারি। যেমন, চিরাচরিত কাঁথার বালিশের ঢাকার নকশা দরজা জানলার পর্দায় ব্যবহার করতে পারি। সেভাবেই আরশিলতাকে ওয়াল-ডেকরেশন হিসেবে বা ব্যাগে ও কুশানকভারে নকশা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

অক্ষরসৃষ্টির পূর্বে যে হাইরোগ্লাফিক ব্যবহার করা হত সেই রকম হাইরোগ্লাফিক ফরম বাংলাদেশের কাঁথা বা আল্পনায় পাওয়া যায়। এখন লোকশিক্ষা বা বয়স্কশিক্ষায় পেশাগতভাবে লোকশিল্পের ওই হাইরোগ্লাফিক ফরম বা সংকেতিক চিহ্নকে অক্ষরের উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। এই লোকশিল্পে হাতের কাজ ও শিক্ষা দুই-ই চলবে। ঐ চিরাচরিত কাঁথার মধ্যে আমরা পাচ্ছি প্রকৃতির বহু জিনিসের সাংকেতিক ফরম এবং তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের বাংলা অক্ষর। সুতরাং ওই কাঁথা যে হাতে সেলাই করছে তাকে শুধু অক্ষরটি চিনিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা থাকছে। ওই নকশার কোন অংশ বাদ দিয়ে বা কোন অংশ জুড়ে একেকটি অক্ষর তৈরী করা হয়েছে। দেশের লোকশিক্ষার মাধ্যমে এইভাবে লোকশিল্পের পুনঃপ্রচারও হবে।
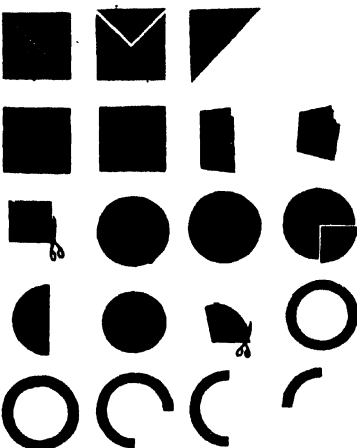
এভাবে ভারতের সমস্ত প্রদেশের প্রচলিত লোক-শিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন প্রাদেশিক লোকশিল্প ও তার ফরম অনুযায়ী বর্ণপরিচয় তৈরী করা। যেমন বাংলার কাঁথাশিল্পের মাধ্যমে বাংলা ভাষার বর্ণমালা এখানে তৈরী করা হয়েছে। এইভাবে প্রাদেশিক লোকশিল্পের উপর প্রাদেশিক ভাষার বর্ণপরিচয় করা সমস্ত ক্ষেত্রেই সম্ভব। বিহারের 'কশিদা' এমব্রয়ডারি ও মিথিলার দেয়ালচিত্র, পাঞ্জাবের ফুলকারি কাজ, গুজরাটের 'কচ্ছ ভারত' এমব্রয়ডারি এবং দক্ষিণ ভারতের আলপনা ও 'কাসুতি' এমব্রয়ডারি—এই সমস্ত থেকেই প্রাদেশিক লিপিমালা গড়া যাবে। কাঁথার বিভিন্ন নকশা থেকে বাংলা ভাষার অক্ষর গঠনপ্রণালী চিত্র নং আটে বোঝানো হয়েছে।

॥ ৯ ॥

অতীতের চিত্রশিল্পে ও ভাস্কর্যে কিমূর্ত বা অ্যাব্স্ট্রাক্ট ফর্মের প্রাধান্য দেখতে পাই। পরবর্তী যুগে এই ললিতকলায় আলংকারিক রূপের সমাবেশ হয়েছে। আধুনিক যুগের চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য চক্রাকারে ঘুরে আবার এসেছে অ্যাব্স্ট্রাক্ট ফর্ম। এই সব শিল্পকর্মে ইচ্ছামত নানা জ্যামিতিক ফরমের প্রয়োগ হচ্ছে। চিত্র ও অক্ষরের এইভাবে নিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। আমাদের প্রস্তাবিত অক্ষরপরিচয় পদ্ধতিতে পুরাতন চিত্রলিপির ধারা ও নতুন যুগের অক্ষরের সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রাচীনকালের ললিতকলায় ও কারুশিল্পে হৃপয়াবেগ-প্রসূত সহজ সরল মনের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। আধুনিক যুগের শিল্পকলা বুদ্ধিদীপ্ত। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে প্রকৃত শিল্প সৃষ্টি হয়ে আসছে।

আমার শিল্পীজীবনের প্রায় ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি পৃথিবীর সর্বদেশে ও সর্বকালে মূলে কয়েকটি আকৃতির উপরই পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে ও চলছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাচীনকালের মুদ্রায় অঙ্কিত জ্যামিতিক নকশা (চিত্র নং নয়) আর মহেন্-জো-দারো ও হরপ্পার মৃৎপাত্র ইত্যাদির নকশা (চিত্র নং দশ)। এর পরবর্তী যুগে ওই মূল ফরমগুলিকে নানাভাবে ভেঙে এর সঙ্গে প্রকৃতির নানা জিনিসের সাদৃশ্য রেখে আলংকারিক ভাবধারায় শিল্পসৃষ্টি হল—শাস্ত্রীয় মতে (চিত্র নং দশ)। প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে এই শাস্ত্রীয় আলংকারিক শিল্পকর্ম বিশদভাবে দেখিয়েছেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিত্র নং এগারো)।

যে মূল আকৃতিগুলিকে ভেঙে গড়ে শিল্পে ও ললিতকলায় নানারকমের পরীক্ষানিরীক্ষা চলে আসছে সেইভাবেই বিভিন্ন শিল্পকর্মের অন্তর্গত আকৃতিগুলি ভেঙে গড়ে অক্ষরগঠনের এক নতুন প্রণালী আমরা উপস্থাপিত করেছি। নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষা দেশে লোকশিল্পের উন্নতি ও একই সাথে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সহায়ক হবে। এর জন্য জনসাধারণের স্বাভাবিক ও সহজাত শিল্পচেতনাকে শুধু একটু উসকে দিতে হবে, প্রদীপের আলো বাড়াবার জন্য সলতেটি যেমন আমরা উসকে দিই।

চিত্র ৭(খ)

স্বীকৃতি

Folk And Tribal Designs of India—Enakshi Bhavnani
Folk Art of Bengal—Ajit Mookerjee
5000 Indian Designs And Motifs—Indian Institute of Art In Industry Publications.
ভাষার ইতিবৃত্ত—সুকুমার সেন।
বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম—প্রিয়দারঞ্জন রায়।
আধুনিক শিল্পশিক্ষা—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।
Primitive Art—Leonhard Adam.

॥ চৌদ্দ ॥

চাবিটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না শ্রীনাথ। তৃষা তাকে গোপন করে ভাবন ঘরের একটা চাবি করিয়ে রেখেছিল কেন তা বুঝতে অবশ্য তার কষ্ট হয় না। সোজা কথা শ্রীনাথের এই একটেরে ঘরখানার ভিতরেও তৃষার দখলদারি রয়ে গেল। অবারিত হল ঘরখানা। শ্রীনাথের কিছু লুকোনোর রইল না, তার অনুপস্থিতিতে নিরাপত্তাও রইল না ঘরখানার।

মানুষ 'ঘর ঘর' করে গলা শুকোয়। শ্রীনাথেরও শুকোতো এতদিন। আজকাল সে ঘরের অসাড়তা বুঝতে পারে। এই সব অবসেসন অভিভূতির কোনো মানে হয় না। একখানা ঘর আর কতখানিই বা আশ্রয় দেয় মানুষকে, যদি না ঘরের লোক আপন হয়। মিস্ত্রী এসে যে ঘর তৈরি করে দিয়ে যায় তার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, বিকার নেই। সেই ঘরে যে সব মানুষজন বসবাস করতে আসে তারাই ইঁট-কাঠ-টিনের ওপর নানা মায়া ভালবাসার পলেস্তারা দেয়, স্মৃতির রঙ মাখায়, কত ঠাট্টা ইয়ার্কি খুনসুটি, আদর ভালবাসা দিয়ে পূরণ করে তোলে ঘরের শূন্যতাকে। শ্রীনাথ তবে কেন ঘর ঘর করে মরবে? ঘর তো তৃষার।

সরিৎ চলে যাওয়ার পর খানিক বসে এই অন্ধ-কথা চিন্তা করল সে। তারপর উঠে খুব তীক্ষ্ন নজরে নিজের দেরাজ খুলে সব পরীক্ষা করল। বাক্স তোরঙ্গ উল্টে পাল্টে দেখল। সবই ঠিক আছে। দেরাজের বা বাক্সের চাবিও হয়তো করিয়েছে তৃষা। কে জানে? তার চেক বই, পাশ বই, ইনসুরেন্সের পলিসি, শেয়ার সার্টিফিকেট, নগদ টাকা এ সবই বোধ হয় খুঁটিয়ে দেখেছে।

মালদা থেকে সরিৎকে কেন আনিয়েছে তৃষা তাও খানিকটা আন্দাজ করতে পারে শ্রীনাথ। একথা তৃষা ভালই জানে যে জমিজিরেতের ওপর নির্ভর করে থাকার বিপদ আছে। মল্লিনাথের সব জমি আইনত তার নয়ও। ভুতুড়ে জমি মেলাই আছে। যে কোনোদিন শত্রুরা খবর দিয়ে ধরিয়ে দেবে আর সরকার জমি কেড়ে নেবে। কানাঘুষোয় শ্রীনাথ শুনেছে, তৃষা বড় পাইকারী দোকান দেবে। চালকল খুলবারও ইচ্ছে আছে। হয়তো বা সেই সব কাজের জন্য বিশ্বস্ত লোকের দরকার বলেই আনিয়েছে সরিৎকে।

সরিতের ইতিহাসটা খুব পরিষ্কার জানে না শ্রীনাথ। শেষ বার যখন দেখেছিল তখন বোধ হয় সদ্য কলেজে ঢুকেছে। তখনো ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়নি। এক বছরে ছেলেটা মানুষ হয়েছে না অমানুষ তা এই অল্প সময়ে বোঝা গেল না। কিন্তু সে যাই হোক, [illegible] শ্রীনাথের কেউ নয়।

শ্রীনাথের লোক পৃথিবীতে খুবই কম। নেই বললেই চলে।

গভর্নমেন্ট প্রেসে স্ট্রাইক চলছে বলে শ্রীনাথের প্রেসে এখন বিস্তর জব ওয়ার্ক এসে জমা হয়েছে। ডাঁই ডাঁই হরেক রকমের ফর্ম, বিল, বিজ্ঞপ্তি ছাপার কাজ চলছে। মালিক বলে দিয়েছে, কামাই করা চলবে না। কাজ তুলে দিতে পারলে সবাইকে একটা থোক টাকা দেওয়া হবে। মিনি বোনাস।

বোনাসের ওপর শ্রীনাথের কোনো টান নেই। তবে সে হল জব ওয়ার্কের বিশেষজ্ঞ। বহুকাল প্রেসে কাজ করায় সে হেন কাজ নেই যে জানে না। মল্লিনাথের সম্পত্তি হাতে আসায় কিছুকাল আগে সে নতুন কেসের কিছু টাইপ তৈরি করার জন্য ভূতের মতো খাটছিল। বাংলা টাইপরাইটার সংস্কারের কাজেও বিস্তর মাথা ঘামাচ্ছিল। কাজ এগিয়েছিল অনেকটাই। লেগে থাকলে কিছু একটা হয়ে যেত হয়তো। কিন্তু, দেদার সম্পত্তি আর নগদ টাকা হাতে আসায় কেমন যেন গা ঢিলে দিয়ে দিল। তবু এখনো বোধ হয় প্রেসের কাজকে সে এক রকম ভালই বাসে। প্রেসটার ওপরেও তার গভীর মায়া। তাই এই কাজের চাপের ব্যস্ততা তার খারাপ লাগে না।

স্নান করে খেয়ে বেরোতে একটু দেরী হল তার। তা হোক। মালিকপক্ষ জানে, দেরী করে গেলেও শ্রীনাথ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। দরকার হলে সারা রাত খেটে কাজ তুলে দেবে। কাজের চাপে থাকলে শ্রীনাথ অন্য মানুষ। সেই কাজের জন্য সে বোনাস ইনক্রিমেন্ট বা প্রোমোশনও চাইবে না। ও সব কথা তার মনেই আসে না। শুধু মনটার মধ্যে একটা কথাই খচখচ করছে, সজলকে বিকেলে আসতে বলেছিল ঘরে। যদি দেরী হয় তবে সজল এসে ফিরে যাবে। কথার খেলাপ হবে তার। বাচ্চাদের কাছে কথার খেলাপ করা ঠিক নয়। ওতে ওরা শ্রদ্ধা হারায়, হতাশায় ভোগে।

অফিসে পৌঁছে এক গ্লাস জল খেয়ে, একটা পান মুখে দিয়ে কাজে ডুবে গেল শ্রীনাথ। চাবির কথা মনে রইল না, ঘরের কথা মনে রইল না, তৃষা বা সজলের কথাও বেমালুম গায়েব হয়ে গেল মন থেকে।

কিন্তু মনে পড়ল বিকেলের দিকে। মনে করিয়ে দিল সোমনাথ।

বোসবাবু এসে খবর দিলেন, আপনার ভাই এসেছে।

সন্ধ্যে হয় হয়। শ্রীনাথের ঘাড় টনটন করছিল। কপি ধরে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোধরানো কম কথা নয়। ভুল থাকলে প্রেসের রাক্ষুসে মেসিন এক লহমায় সেই ভুল কপি কয়েক হাজার ছেপে ফেলবে। ভুল ধরা পড়লে ছাপা কাগজ সব ফেলে দিতে হবে। এখন কাগজ কালি লেবারার খরচার যে বহর তাতে ক্ষতির পরিমাণটা বড় কম দাঁড়াবে না। তাই মালিক নিজে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কাজ দেখে গেছে। প্রিন্ট-অর্ডার দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেছে শ্রীনাথকে। তাতে শ্রীনাথের ঝামেলা বেড়েছে। মাথা তোলার সময় পায়নি।

ভাই কথাটা কানে শুনেই বুঝেছিল সোমনাথ। দীপনাথ কিছুতেই নয়। কারণ দীপ ভাই হলেও একটু দূরের ভাই।

প্রেসটা বিরাট বড় দরের হলেও রিসেপশন বা ওয়েটিং রুম বলে কিছু নেই। বাইরের দিকে সুপারিনটেনডেন্টের ফাঁকা অফিসে বসে আছে সোমনাথ। মুখটায় চোর-চোর ভাব, চোখের দৃষ্টিতে শেয়ালের মতো একটা এড়ানো এড়ানো ভাব।

প্রকৃতির নিয়মে বাপের মেজো ছেলেরাই নাকি সব চেয়ে পাজি হয়। তাদের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। শ্রীনাথ নিজেই মেজো। সে কতটা পাজি তা হিসেব করে দেখেনি এখনো। কিন্তু পাজি বলতে সত্যিকারের যা বোঝায় তা হল সোমনাথ। মল্লিনাথের সম্পত্তির ভাগ চাইছে বলেই নয়, সোমনাথ বুড়ো বাবাকে নিজের কাছে রেখে অন্য দু ভাইয়ের কাছ থেকে সেই বাবদ টাকা নেয়। ভয়ংকর কৃপণও বটে। সরকারের একটা বিল সেকশনে কাজ করে। ঠিকাদার-দের কাছ থেকে প্রচুর টাকা ঘুষ নেয়।

শ্রীনাথ বলল, কি রে?

তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

সোমনাথের কপালে এখনো সেই মারের দাগ রয়েছে। মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল।

শ্রীনাথ দারোয়ানকে দু ভাঁড় চা আনতে পাঠিয়ে বসে বলল, সব ভাল তো?

সোমনাথের চেহারাটা মন্দ নয়। মোটাসোটা গোলগাল, গোপাল-গোপাল চেহারা। মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন ছোটো ছেলেকে চূড়ান্ত আদর দিয়ে গেছে। সেই সুবাদেই এই চেহারা।

সোমনাথ বলল, বাবার অবস্থা তো জানই। যে কোনোদিন হয়ে যাবে।

জানা কথা। বাবার খবরের জন্য ব্যস্ত নয় শ্রীনাথ। এই সব নিষ্ঠুরতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আসে। বাবা যে কবে ফালতু হয়ে গেল তা টেরও পায়নি। কিন্তু হয়েছে।

শ্রীনাথ একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, সে তো জানি।

সোমনাথ মার খাওয়ার পর দু তিন বার ওকে দেখতে এসেছিল শ্রীনাথ। তখন বাবার সঙ্গেও দেখা হয়। কিন্তু দেখা হওয়া আর না হওয়া সমান। বাবা এখনো লোক চিনতে পারছেন বটে কিন্তু কারো জন্যই কোনো অনুভূতি নেই। সোমনাথ যে হাস-পাতালে তা শুনেও নির্বিকার। বিকেলের জল খাবার নিয়ে শমিতার কাছে বায়না করছিল বলে শমিতা কটকট করে উঠল। বলল, আপনার ছেলে হাসপাতালে সিরিয়াস অবস্থায় পড়ে আছে, আর আপনি চিঁড়ে সেদ্ধ চিঁড়ে সেদ্ধ করে পাগল হচ্ছেন! এ রকমই ধারা নাকি আপনাদের?

কথাটা তা নয়। বাবা এখন সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ এই সব অনুভূতির বাইরে চলে গেছে। বোধ-বুদ্ধি ছোটো হয়ে হয়ে এখন কেবল নিজের জৈবিক চাহিদাটুকু নিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এও হয়তো এক ধরনের পাগলামি। তবে যাই হোক, বাবাকে নিয়ে তাদের আর খুব বেশী ভাবনা চিন্তা নেই। তৃষা কিছুকাল আগেই শ্রীনাথকে একবার বলেছিল, শ্বশুরমশাইকে এখানে এনে রাখলেই তো হয়। এখানে অনেক ফাঁকা ঘর, খোলামেলা জায়গা, দেখাশুনো করার লোকও আছে, তবে কেন উনি সোমনাথদের খুপরি বাসায় পড়ে থাকবেন?

যখনকার কথা তখনো সোমনাথ মার খায়নি। ফি-রবিবারে সস্ত্রীক ঝগড়া করতে আসত। প্রস্তাব শুনে কিন্তু সোমনাথ বা শমিতা কেউ রাজি হল না। বলল, না, উনি আমাদের কাছেই থাকতে চান। অন্য কোথাও যাওয়ার নাম করলেই রেগে ওঠেন।

কথাটা মিথ্যেও নয়। বুড়ো বয়সে অনেক সময়েই অভ্যস্ত জায়গা ছেড়ে লোকে অন্য কোথাও যেতে চায় না। যুক্তি হিসেবে ছেলেমানুষের মতো বলে, এ বাড়িতে পায়খানাটা কাছে হয়, এখানে জলের সুবিধে। সোমনাথ রোজ মাছ আনে ইত্যাদি। তবু বাবাকে জোর করে আনাও যেত এবং তাতে ফল খারাপ হত না। কিন্তু সোমনাথ রাজি হল না অন্য কারণে। বাবার খরচা বাবদ তৃষা মাসে মাসে ওকে তিনশো টাকা করে পাঠাত এবং শ্রীনাথ যত দূর জানে,

এখনো পাঠায়। কর্তব্যের ব্যাপারে তৃষার কোনো ত্রুটি নেই। আর কিছু সোমনাথ আদায় করে নিল, আর দীপনাথের কাছ থেকে। দীপ মাসে মাসে দেয় না, কিন্তু কখনো সখনো থোক পাঁচ-সাতশো টাকাও দিয়ে ফেলে। সুতরাং বাবাকে নিজের কাছে রাখলে সোমনাথের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

সোমনাথ একটু চুপ করে থেকে বাবা সম্পর্কে ট্র্যাজেডিটা শ্রীনাথের মাথায় বসতে সময় দিল। তারপর বলল, আমি ছেলে হিসেবে কোনো ত্রুটি রাখি না, সব কর্তব্যই করি।

হুঁ। শ্রীনাথ ওর মতলব বুঝতে না পেরে সাবধান হয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিল।

সোমনাথ দুঃখী দুঃখী মুখ করে গম্ভীর গলায় বলল, শমিতার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

কী হয়েছে?

সোমনাথ অপরাধীর মতো মুখ নীচু করে বলে, ছেলেপুলে হবে।

ও।

তাই বলছিলাম এ অবস্থায় বাবার যত্ন-আত্তি ঠিক মতো হবে না। বাবার অবশ্য অত বোধ-টোধ নেই, কিন্তু আমার তো বিবেক আছে। ডাক্তার শমিতাকে কাজকর্ম করতে একদম বারণ করেছে, বেশী নড়াচড়া করলে মিসক্যারেজ হয়ে যেতে পারে।

কোনো ডিফেক্ট আছে নাকি?

আছে।

তা হলে এখন কী করতে চাস?

যদি কিছু মনে না করো তো বলি, এখন বাবাকে কিছুদিন তোমাদের কাছে নিয়ে রাখো।

শ্রীনাথ টক করে প্রস্তাবটায় রাজি হতে পারে না। তৃষা এক সময় শ্বশুরকে তার কাছে রাখতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু এতদিনে যদি মত পাল্টে থাকে? বাড়ি তো শ্রীনাথের নয় যে নিজে সিদ্ধান্ত নেবে।

শ্রীনাথ বলল, তোর বউদিকে একটু বলে দেখ।

সোমনাথ একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, বউদিকে বলব কেন? বউদি কে? তুমি কর্তা, তুমিই ডিসিশন নেবে।

শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, আমি কিসের কর্তা? কোনো ব্যাপারেই আজকাল আমি থাকি না।

সোমনাথ ওপরওয়ালার মতো চড়া গলায় বলল, থাকো না কেন? থাকো না বলেই তো মেয়েমানুষের বাড় বাড়ে।

বিরক্ত হয়ে শ্রীনাথ বলে, ওসব কথা থাক। আমি না হয় তোর বউদিকে আজ জিজ্ঞেস করবখন। কাল এসে জেনে যাস।

কী জেনে যাবো? জানাজানির মধ্যে আমি নেই। বাবা তো তোমারও। তোমরা এক সময়ে বাবাকে রাখতেও চেয়েছিলাম। তা হলে এখন আবার পিছোচ্ছো কেন?

শ্রীনাথ একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইল। এটা যে পিছোনো নয় তা সোমনাথও কি জানে না? ও এখন একটা চাল খেলছে, সেটা যে কি তা অবশ্য শ্রীনাথ বুঝতে পারছে না।

সোমনাথ বলল, তা ছাড়া অত মতামতেরই বা দরকার কি বুঝি না বাবা। বড়দা তো বাবারই ছেলে। তার বাড়িতে বাবা তো নিজের রাইট নিয়েই থাকতে পারে।

ছেলের সম্পত্তির ওপর বাবার অধিকার আছে, এমন কথা কোন আইনের বইতে আছে তা একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল শ্রীনাথের। কিন্তু তাতে কথা বাড়বে বলে বলল না।

শ্রীনাথ মৃদুস্বরে বলল, আমি তো অমত করছি না। তবে আমার মতামতের দামও নেই।

একশ বার দাম আছে। সোমনাথ গলার জোরে কথাটাকে যত দূর সম্ভব গেঁথে দিতে চেষ্টা করল শ্রীনাথের মাথায়। তারপর মোলায়েম আদুরে গলায় বলল, তুমি মেজদা, দিনকে দিন কেমন হয়ে যাচ্ছো বলো তো! তোমার টাকাপয়সা বা বিষয়সম্পত্তির লোভ নেই সেটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তা বলে সংসারের সব কতৃত্ব বউদির হাতে ছেড়ে দেবে?

শ্রীনাথ যে নির্লোভ সেটা যে সোমনাথ জানে তা শুনে খুশিই হয় শ্রীনাথ। বলে, আমি যেমন আছি তেমনিই থাকতে দে। গন্ডগোলে জড়াস না।

সন্ন্যাসি তো নও। সংসারে থাকলে গা বাঁচিয়ে চলবে কি করে? তা ছাড়া চোখের সামনে এত বড় সব অন্যায় ঘটে যাচ্ছে দেখেও যদি চুপ করে থাকো তবে তোমার ভালমানুষির কোনো দাম থাকে না।

ভালমানুষির দামই বা চাইছে কে! কথাটা বলতে পারত শ্রীনাথ, বলল না। শুধু আনমনে একবার হুঁ দিল।

সোমনাথ বলল, বউদি যে তোমাকে বাড়ির চাকর-বাকর মনে করে সেটা আমাদেরও খারাপ লাগে। তুমি যদি একটু রোখাচোখা হতে তবে এমনটা হতে পারত না।

শ্রীনাথের একটু রাগ হচ্ছিল। কিন্তু সোমনাথকে রাগ দেখিয়ে লাভ নেই। কোনোকালেই ও কারো পরোয়া করে না। শ্রীনাথ তাই চুপ করে থাকে।

সোমনাথ নিজেই বলে, তুমি চুপ করে থাকলেও আমি ছেড়ে দেবো বলে ভেবো না। তোমাদের ওখানকার লোকেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তারা কেউ বউদির পক্ষে নয়। তারা নিজেরাই বলছে বড়দার সম্পত্তিতে বউদির কোনো রাইট নেই। দরকার হলে তারা ওখানকার মাতব্বরদের সালিশী মানবে। বউদির রাজত্ব অত নিষ্কণ্টক হবে ভেবো না।

এটা যে অপমান তা শ্রীনাথ বুঝতে পারছে। তৃষার সঙ্গে তার বনিবনা থাক বা না থাক এই কথাগুলো তৃষাকে জড়িয়ে তাকেও বলা। তবু জবাব দেওয়ার মতো জোর পায় না শ্রীনাথ। সে নিজেও বোঝে, দাদার সম্পত্তি নিয়ে একটা অন্যায় দখলদারি চলছে।

শ্রীনাথ বলল, এসব আমাকে বলছিস কেন? আমি তোদের কি করেছি? যা করবি করিস, আমার কিছু বলার নেই।

সোমনাথ একটু নরম হয়ে বলে, তোমাকে কষ্ট দিতে চাইও না। দুঃখ হয় বলে বলি।

ওখানকার কে কে তোর কাছে এসেছিল?

অনেকেই আসে। বহু গুপ্ত খবর দিয়ে যায়। বউদি নাকি তার গুন্ডা ক্লাসের সেই ভাইটিকে মালদা থেকে আনিয়েছে!

শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, সরিৎ! সরিৎ গুন্ডা নাকি?

সোমনাথ একটু হেসে বলে, তুমি তো মানুষ চেনো না। নিতাই খ্যাপাকে মেরে তোমার শালা পাট পাট করে দিয়েছিল। বউদি ঘটনাটা চেপে দিয়েছে। এতকাল ভাড়াটে গুন্ডা ছিল, এখন নিজের ভাইকে দিয়েই গুন্ডামি চালাবে।

নিতাইকে সরিৎ মেরেছে, একথা কেউ তো আমাকে বলেনি।

তুমি কোন খবরটাই বা রাখো! বউদি যে বন্দুকের লাইসেনস চেয়ে অ্যাপলিকেশন করেছে তা জানো?

না তো।

বড়দার একটা জার্মান বন্দুক ছিল তা মনে আছে?

আছে। আমি নিজেও কয়েকবার শিকার করতে গিয়ে চালিয়েছি। তারপর সেটা থানায় জমা করে দিই।

বউদি সেইটেই ফেরত চেয়েছে। তবে লাইসেনস হবে সরিতের নামে।

শ্রীনাথের কাছে এগুলো খুব একটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার নয়। সে বলল, ও তা হবে।

ছেলেপুলের ঘর বলে মারাত্মক অস্ত্রটা শ্রীনাথ ঘরে রাখতে চায়নি। নইলে সে দরখাস্ত করলে বন্দুকটার দখল পেয়ে যেত। কিন্তু দখল করার ইচ্ছেই তার ছিল না। তাই থানায় জমা করে দিয়েছিল। তৃষা বন্দুকটা ফেরত চেয়েছে, ভাল কথা, কিন্তু সেটা একবার তাকে জানালেও পারত।

সোমনাথ বলল, সরিৎ হল বউদির রঙ্গরাজ।

শ্রীনাথ বুঝল না। বলল, কে রঙ্গরাজ?

দেবী চৌধুরানীর বড় সাকরেদ, মনে নেই? ...ার বউদি নিজে হতে চাইছে দেবী চৌধুরানী।

শ্রীনাথের গম্ভীর থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ...পমাটা এমন অদ্ভুত যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষীণ ...কটু হেসে ফেলল।

সোমনাথ আঁঝটে মুখে বলে, হেসো না মেজদা। ...াপারটা খুবই সিরিয়াস।

শ্রীনাথ এবার গম্ভীর হয়ে বলল, তা আমি ...ক করব বল।

কিছুই যদি না করো তবে অন্তত দেখে যাও। ...তুদিকে লক্ষ্য রেখে চলো।

চাবির কথাটা আবার মনে পড়ে গেল শ্রীনাথের। ...কটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। বলল, লক্ষ রেখেই ...া লাভ কি? আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।

সোমনাথ অধৈর্যের গলায় বলল, বাবার ...্যাপারটা কি হবে?

বললাম তো।

শোনো, মেজদা! সোমনাথ খুব জোরালো ...লায় বলে, বউদির মত থাক বা না থাক আমি ...ামনের রবিবার বাবাকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসছি। তারপর আর আমার ...ায়িত্ব থাকবে না।

দারোয়ান চা দিয়ে গেল। শ্রীনাথ চায়ে চুমুক ...দিয়ে বলল, তাতে হয়তো আপত্তি উঠবে না। কিন্তু ...আমি বাবার কথাটাই ভাবছি।

কি ভাবছ?

বাবার খুব কষ্ট হবে হয়তো।

বাবার কষ্টের কথা যদি সত্যিই ভাবো তবে কষ্ট দিও না।

মুখের মতো জবাব পেয়ে শ্রীনাথ চুপ করে ...গেল। চা খেয়ে উঠল সোমনাথ। বলল, তা হলে ঐ, কথাটাই ফাইন্যাল।

শ্রীনাথ উর্ধ্বমুখে ভাইয়ের মুখখানা দেখল। বাবাকে ও কেন রতনপুরে চালান করছে তার সত্যি কারণটা বুঝতে চেষ্টা করল। সম্ভবত সোমনাথ বাবাকে ওখানে পাঠিয়ে ক্ষীণ একটা অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। নইলে মাসে তিনশ টাকার ফালতু আয় জলাঞ্জলি দিত না।
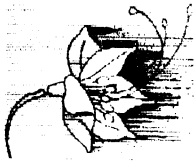
সোমনাথ চলে যাওয়ার পর আরো কিছুক্ষণ কাজ করল শ্রীনাথ। যখন উঠল তখন সন্ধে সাতটা।

খারাপ পাড়ায় যেতে হলে প্রথম প্রথম একটু বুকের জোর চাই। একা যেতে সাহসও হয় না। কিন্তু আশ্চর্য আশেপাশে বন্ধুবেশী আড়কাঠিরা ইচ্ছেটাকে ঠিক টের পেয়ে যায় এবং তারাই পৌঁছে দেয় মেয়েমানুষের ঘরে। শ্রীনাথেরও তাই হয়েছিল। যখন ফেবারিট কেবিনে আড্ডা মারত তখন কানাই বোস নামে একজন ঠিকাদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। সে খারাপ পাড়ায় যেত এবং সেইসব গল্পও করত খুলে মেলে। শ্রীনাথকে খারাপ পাড়ায় নিয়ে গিয়েছিল সে-ই। তারপর থেকে অবশ্য আর বাধা হয়নি। যেতে যেতেই শ্রীনাথের অভিজ্ঞতা হয়েছে, কলকাতা শহরে নাম লেখানো এবং না-লেখানো খারাপ মেয়ে অঢেল। আজকাল তার চোখ পাকা হয়েছে। রাস্তায় ঘাটে যে কোনো মেয়েকে একনজর দেখেই বুঝতে পারে, খারাপ না ভাল। তা ছাড়া যাতায়াতে বহু দালালের সঙ্গে চেনা হয়েছে। তারাও খোঁজ দেয়। বাবুল দস্তিদার নামে একজন বন্ধুগোছের দালাল কদিন মেয়েদের কাছে যান কেন? ওরা তো পান্তা ভাত। কোনো মজা নেই। যাদের রেস্ত আছে তারা নানারকম এনজয়মেন্ট করবে। শরীরের ব্যাপারটারও তো অনেক রকম স্টাইল আছে।

বাবুল তাকে হাওড়া ময়দানের কাছে নমিতার খোঁজ দেয়। দেখে খারাপ মেয়ে মনে করা বেশ কঠিন। একদম আধুনিকা। ফটা-ফট ইংরিজি বলে, দারুণ সাজে, গীটার বাজায়, বি এ পাশ। রবি ঠাকুর থেকে বিষ্ণু দে পর্যন্ত কোটেশন দেয়।

খরচ অনেক বেশী বটে, কিন্তু নমিতা কেবলমাত্র শরীরী তো নয়। সে শ্রীনাথের সঙ্গে বেড়ায়, রেস্টুরেন্টে খায়, সিনেমা থিয়েটারও দেখে। সারাক্ষণ বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলে। বেশির ভাগ কথাই প্রেম-ভালবাসা ঘেঁষা। এমন সব কথা যা শ্রীনাথের বয়ঃসন্ধির যৌবনকে ফিরিয়ে আনে। নমিতার চোখের চাউনি, ঠোঁটের হাসি সব কিছুই অত্যন্ত উষ্ণ, নিবিড় এবং অনেকটাই যেন আন্তরিক। বিভ্রমই বটে, তবে বিভ্রমই তো মানুষ চায়।

শ্রীনাথ তাই সম্প্রতি নমিতার খাতায় নাম লিখিয়েছে। জমানো টাকা হু-হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। তা যাক। জীবনে টাকা দিয়ে তো কিছু পাওয়া চাই। শ্রীনাথ মনে করে নমিতার কাছে সে কিছু পাচ্ছে। কৃত্রিম হলেও পাচ্ছে।
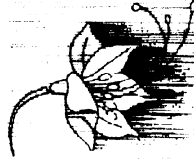
নমিতার খদ্দেরের সংখ্যা বেশী নয়। দিন ও সময় বাঁধা থাকে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া যাওয়া যায় না। এইটেই একমাত্র যা অসুবিধে।

আজ শ্রীনাথের দিন নয়। তবু মনটা ভাল ছিল না বলে হাওড়ায় এসে গাড়ি ধরতে গিয়েও ধরল না। বেরিয়ে বাসে উঠে ময়দানের কাছে নমিতার দোতলার ফ্ল্যাটে এসে উঠল।

আশ্চর্য! নমিতা একা ফাঁকা ঘরে সেজেগুজে বসে আছে। তাকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে বলল, আজ একটা ছোটলোকের আসার কথা ছিল। দেখ তো, সারা বিকেলটা বসে বসে নষ্ট করলাম! তুমি এলে, কী ভাগ্যি!

খুশি হয়েছো?

সকলের বেলায় হই না। তুমি তো সকলের মতো নও।

নই?

নমিতা হেসে ফেলে বলে, বললে ভাববে তেল দিচ্ছি। তা কিন্তু নয়।

সোফায় বসে শ্রীনাথ হাসিমুখে বলল, আমি কিরকম তা আজ তোমার মুখে শুনব। বলো তো।

যাঃ! লজ্জায় যেন লাল হল নমিতা। মুখ দু হাতে ঢেকে বলল, এভাবে বলা যায় নাকি? বোঝো না কেন?

নমিতার দোভাঁজ করা বিনুনির সঙ্গে অনেকগুলো আলগা ফিতে বাঁধা। তাতে ভারী ছুকরি দেখাচ্ছে ওকে। কানে মস্ত রুপোর কানপাশা। হাতে রুপোর চুড়ি। একটু অবাঙালী সাজে আজ ওর আকর্ষণ তিনগুণ বেড়েছে।

মায়া ও মতিভ্রমের দিকে অভ্যাসবশে হাত বাড়াল শ্রীনাথ।

কিন্তু তারপর শরীরে সেই খিতখিত ভাব। যেন অপবিত্রতা, অশৌচ। বাড়িতে ফিরে কেরোসিন স্টোভ জ্বেলে গরম জল বসিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। স্নান করবে।

এমন সময় দরজার বাইরে সজল এসে দাঁড়ায়।

এসো। শ্রীনাথ নরম স্বরে ডাকে। মনে মনে ভাবে সজলের সঙ্গে এই দেখা হওয়ার আগে স্নানটা সেরে নেওয়া উচিত ছিল। স্নান না করে যেন এই অবস্থায় ছেলের সঙ্গে কথা বলতে নেই। কোথায় যেন আটকায়।

সজল একটু যেন সংকোচের সঙ্গে ঘরে আসে। মুখে একটু লজ্জার হাসি।

সজল দেখতে ভারী মিষ্টি। মুখখানা যেন নরুণ দিয়ে চেঁচে তৈরি। শরীরের হাড়গুলো চওড়া। লম্বাটে গড়ন। বড় হলে ও খুব লম্বা চওড়া আর শক্তিমান পুরুষ হয়ে দাঁড়াবে।

সজল ঘরে ঢুকে কৌতূহলভরে ঘুরে ঘুরে এটা ওটা দেখতে থাকে। হঠাৎ বলে, জল গরম করছ কেন বাবা? চা খাবে? ছোড়দিকে বলো না, করে দেবে।

না, চা খাবো না।

তবে?

চান করব।

এত রাতে! সজল অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকায়।

কী বড় বড় অন্তর্ভেদী চোখ! কিছুতেই শ্রীনাথ ওর চোখে চোখ রাখতে পারল না। মাথা নীচু করে বলল, পায়ে নোংরা লেগেছিল।

বুকটা ঢিব ঢিব করে ওঠে শ্রীনাথের। হে ভগবান! আর যাই হোক ছেলের কাছে যেন কোনদিন মুখ ঝলো না হয়।

সজল বলে, তোমার শীত করবে না?

শীত করবে বলেই তো গরম জল করছি।

বাড়িতে বলে পাঠালেই তো মা গরম জল করে দিত।

লোককে কষ্ট দিয়ে কি লাভ। এটুকু নিজেই পারা যায়।

তোমার ক্ষুরটা ধরেছিলাম বলে রাগ করেছো, বাবা?

একটু করেছিলাম। এখন আর রাগ নেই। টেবিলের ডান ধারের দেরাজে আছে। বের করে নাও। ওটা তোমাকে দিলাম।

দিলে? উজ্জ্বল হয়ে সজল জিজ্ঞেস করে।

হুঁ। কিন্তু খুব সাবধান। অসম্ভব ধার। হাতটাত কেটে ফেলো না।

না, আমি দাড়িই কাটব।

দাড়ি! অবাক হয়ে শ্রীনাথ ক...য়।

হি হি। নিতাইদা যখন ঘুমোবে তখন চুপি চুপি গিয়ে ওর দাড়ি কামিয়ে দিয়ে আসব।

সর্বনাশ। শ্রীনাথ প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ে, খবর্দার এসব করতে যেও না। কখন গলায় বসিয়ে দেবে অসাবধানে। তা হলে কিন্তু ফাঁসি।

আচ্ছা। তাহলে রেখে দেবো। বড় হলে নিজের দাড়ি কামাব।

ক্ষুরটা ওকে দেওয়া ভুল হল কি? হয়তো। কিন্তু তখন দেওয়া জিনিস ফেরত নেওয়া ঠিক হবে না।

শ্রীনাথ বলে, তুমি মাকে জিজ্ঞেস করে এখানে এসেছো তো!

হাঁ। ঘাড় নাড়ে সজল। বলে, মা বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

তোমার মা! বলে আবার সচকিত হয়ে খাড়া হয় শ্রীনাথ।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার আড়াল থেকে কালো শাড়ি পরা তৃষা দরজার আলোয় দেখা দেয়।

অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তার স্ত্রী এই ঘরে আসতেই পারে। তবু ভীষণ যেন চমকে যায় শ্রীনাথ। যেন তার লুকোনো কোনো ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেছে। প্রকাশ পেয়েছে তার ভীষণ কোনো গোপনীয়তা।

শ্রীনাথ বলল, তুমি।

তৃষা গম্ভীর মুখে বলে, অবাক হওয়ার কি

ীগ খেতাব পাওয়া এবং ‌া-পাওয়ার সমীক্ষা

কলকাতার ফ‌ুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়ে মোহনবাগান ‌াব চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে দ‌ুই কদম এগিয়ে ‌াইল। দ‌ুই দল ১৫বার করে লীগ জয়ের পর গতবার ‌্যাম্পিয়ন হয়ে মোহনবাগান এক কদম এগিয়েছিল। ‌বার নিয়ে লীগ খেতাব পেল ১৭ বার। তার মধ্যে ‌াঁচবার অপরাজিত থেকে।

লীগ ফ‌ুটবল, যেখানে খেলার সংখ্যা বেশী, ‌ারস্পরিক লড়াইও জোরদার সেখানে অপরাজিত থেকে ‌ীগ জয়ের অবশ্যই প‌ৃথক গৌরব আছে। কিন্তু ‌াম্প্রতিককালের লীগে অপরাজিত থাকার বৈশিষ্ট্য ‌মে গেছে ম‌ুখ্যত তিনটি বড় দলের পরের দলগ‌ুলির ‌ুটবল শক্তি হ্রাস পাবার ফলে। আগে দ‌ুই রেল দল ‌বং এরিয়ান রীতিমত শক্তিশালী ছিল। এদের কাছে ‌িন বড় দলের পরাজয় অপ্রত্যাশিত ছিল না। তারও ‌াগে, প্রাক-স্বাধীনতা য‌ুগে এরিয়ান তো একাধিকবার ‌স্টবেঙ্গল ক্লাবকে লীগ জয়ের সম্মান থেকে বঞ্চিত ‌রেছে শেষ ম‌ুখে পরাজিত করে। না হলে মহমেডান ‌্পোর্টিং ক্লাবেরও আগে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ‌স্টবেঙ্গলই লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারত। এখন ওই ‌নের ফল ঘটেই না বলা যায়। কলকাতা ফ‌ুটবলের ‌র্তমান তৃতীয় শক্তি মহমেডান স্পোর্টিংও ১২ বছরের ‌ধ্যে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে পারেনি। ‌াই এখন অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স ‌ওয়ার নজির বেশী। চ্যাম্পিয়নশিপের তালিকায় ‌েখছি, ১৯৬৪ সাল থেকে এ বছর পর্যন্ত ১৬ বছরের ‌ধ্যে ১৪ বছরই অপরাজিত থেকে লীগ জয়ের সম্মান। ‌ই ১৬ বছরের মধ্যে একবার লীগ খেলা অসমাপ্ত ‌াকে। দ‌ুবার (১৯৬৬ ও ১৯৭৩) ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন ‌য়ে মাত্র একটি করে খেলায় হেরে।

অথচ ১৮৯৮ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত ৬৬ বছরে অপরাজিত থেকে লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার ঘটনা হাফ-এপায়োটির বেশী নয়। প্রথম দিকে দলের সংখ্যা কম থাকায় অপরাজিত থাকার সম্ভাবনাও কিন্তু বেশী ছিল। এখন দলের সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও বড় দ‌ুই ক্লাব লীগ জিতছে বা রানার্স হচ্ছে অপরাজিত থাকার গৌরব নিয়ে।

এর কারণ কি? আগে যে কথা বলেছি, সেইটাই কি আসল কারণ? অর্থাৎ বড় তিনটি দলের পরের দলগ‌ুলির শক্তি ক্রমক্ষীয়মান বলেই বড় ক্লাবগ‌ুলি হারছে না?

এ বছরের কথাই ধরা যাক। লীগের শ‌ুর‌ুতে ছোট ক্লাবগ‌ুলি সত্যিই স‌ুন্দর খেলেছে। ফ‌ুটবল খেলা গায়ের ঘাম ঝরানো খেলা। ছোট ক্লাবগ‌ুলির বির‌ুদ্ধে জিততে বড় ক্লাবের খেলোয়াড়দের গায়ের ঘাম একট‌ু বেশীই ঝরাতে হয়েছে। কিন্তু তিন প্রধানের কেউ কি ছোট দলের কাছে একটি খেলাতেও পরাজিত হয়েছে?

ড্র ম্যাচের সংখ্যাও তো হাতে গোনা। অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান শ‌ুধ‌ু একটি পয়েন্ট নষ্ট করেছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ড্র করে। ওই খেলাটি বাদে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ড্র করার ফলেই ইস্টবেঙ্গল হয়েছে অপরাজিত রানার্স। লীগের শেষ খেলায় ইস্টবেঙ্গলকে অবশ্য তৃতীয় পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছে জর্জ টেলিগ্রাফ দলের সঙ্গে ৩—৩ গোলে ম্যাচ ড্র করে। কিন্তু ওটা ইস্টবেঙ্গলের ভেঙে-পড়া মনোবলেরই প্রতিফলন। চ্যাম্পিয়ন হবার সম্ভাবনা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার উপর খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে কলহ এবং ক্লাবের মধ্যে গোষ্ঠী কোঁদলের ফলে চিড় ধরেছিল সংগ্রামী শক্তিতে। না হলে যে জর্জ টেলিগ্রাফ আগের ম্যাচটিতে ০—৪ গোলে হেরে গিয়েছিল শক্তিহীন হাওড়া ইউনিয়নের কাছে, প্রথম ৮টি ম্যাচের মধ্যে জিতেছিল মাত্র একটি ম্যাচ, সেই জর্জ টেলিগ্রাফ কি শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গলের বির‌ুদ্ধে তিনটি গোল করার ক্ষমতা ধরে? তিনবার ইস্টবেঙ্গল গোল করে এগিয়ে যাবার পর তিনবার গোল শোধ করতে পারে?

যে কথা আগে বলছিলাম। অর্থাৎ অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স হবার কথা। সন্দেহ নেই, অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা এর বড় কারণ। এর সঙ্গে হয়তো অন্য কারণও আছে। পর্দার অন্তরালের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন, এখন অনেক খেলাই 'ম্যানেজ' করা হয়। কে কোন্ দলকে পয়েন্ট ছাড়বে, কোন্ দলের হাত-ধরা টিমের কাছ থেকে দ‌ুটি পয়েন্ট পেয়ে দ‌ুটি পয়েন্ট অভয়দাতাকে দিয়ে অবতরণের হাত এড়াবে, গাণিতিক গবেষণায় সেটা ঠিক করা হয়। তার ফলে অনেক খেলা পরিণত হয় নকল য‌ুদ্ধে।

আগে থেকে খেলাটা ম্যানেজ করা হয়েছিল, সেটা যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমন ময়দানপাড়ার কথা-গ‌ুলিও কু-লোকের কুকথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অনেক খেলা সত্যিই ম্যানেজ করা হয়ে থাকে এবং হয়ে থাকে বলেই যে খেলায় সত্যিকারের লড়াই হয়—ময়দানের ভাষায় স্ট্রেট ফাইট হয়, সে খেলাও অনেক ক্ষেত্রে ম্যানেজ খেলার অপবাদ পায়। এবার তো লীগের সবচেয়ে গ‌ুর‌ুত্বপ‌ূর্ণ খেলাটিকে, অর্থাৎ মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলাটিকেও অনেকে 'ম্যানেজ' খেলা আখ্যা দিয়েছেন।

তবে গড়ের মাঠে গড়া-পেটা খেলা অনেক বেশী হয় অবতরণের সঙ্গে জড়িত ম্যাচে, চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ম্যাচে ম্যানেজ খেলা সীমায়িত। এবং সারা মরশ‌ুমে কঠিন সংগ্রাম করেই চ্যাম্পিয়নের সম্মান করায়ত্ত করতে হয়। এ বছরের দলগত শক্তি অন‌ুযায়ী ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের পর তৃতীয় শক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়েও মোহনবাগান ক্লাব লীগ খেতাবের অধিকারী হয়েছে খেলোয়াড়দের সংগ্রামী শক্তি, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণের গ‌ুণে এবং ক্লাবের সাংগঠনিক কাঠামোর সহযোগিতায়। তার সঙ্গে অবশ্যই আছে ভাগ্যের সহায়তা।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দার‌ুণ দল গড়েও খেলোয়াড়দের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং নড়বড়ে সংগঠনের জন্য লীগ জয় করতে

মোহনবাগানের জয়মর্দিনতে উদ্বেল তর‌ুণ সমর্থক দল

রেনি বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের সংগে আমি একমত নই। দলাদলি এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব কোন্ ক্লাবে না আছে? সিজন শুরুর আগে মোহনবাগান খেলোয়াড়দের মধ্যে একটু মারামারি হয়ে গেছে, কোচের সংগে ক্যাপ্টেনের চলেছে ঠাণ্ডা লড়াই, যার জন্য অনেক ম্যাচে ক্যাপ্টেন দিলীপ পালিতকে মাঠের পাশে বসিয়ে রেখেছেন কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি। এমনকি এরিয়ানের সংগে যে ম্যাচে চ্যাম্পিয়নশিপের ফয়সালা হয় সে ম্যাচেও। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কোচ রহমান এবং ক্যাপ্টেন হাবিবের মধ্যে ছিল অহি-নকুল সম্পর্ক। যার ফলে মরশুমের মাঝে রহমানকে পাততাড়ি গুটিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যেতে হয়। ডিসিপ্লিন ভংগের দায়ে সরে যেতে হয় ইরানী খেলোয়াড় সানজারিকেও। ইস্ট বেংগলের কর্নাটকী খেলোয়াড় দেবরাজের উপর পাঞ্জাবী খেলোয়াড় গুরুদেব মানজিত হরজিন্দারের লাঞ্ছনা একই রকমের অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক ঘটনা। সব ক্লাবেই যখন কম-বেশী দলাদলি আছে, তখন ওই দলাদলিই ইস্টবেংগলের লীগ না পাবার কারণ এটা যুক্তিগ্রাহ্য কথা নয়।

অস্বীকার করি না এই সব ঘটনায় খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস ও মনোবলে চিড় ধরে। খেলার উপরও প্রতিক্রিয়া পড়ে। তবু আমার ধারণা, ইস্টবেংগল ক্লাবের লীগ হাতছাড়া হয়েছে দুটি কারণে। একটি কারণ বহু খেলোয়াড় রিক্রুট করায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ টিম সেট করা সম্ভব হয়নি। তার ফলে স্কিল ও ট্যালেণ্ট অনুযায়ী খেলোয়াড়রাও তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারেনি। আর একটি কারণ—হয়তো সেটাই বড় কারণ —ভাগ্যের মার।

অদৃষ্ট এবং পুরুষকার নিয়ে জীবন সংগ্রাম। খেলার ব্যাপারেও অদৃষ্টকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে যে খেলায় দুই দলের শক্তি উনিশ-বিশ। অনেকে খেলার ব্যাপারে অদৃষ্ট মানতে চান না। বলেন, যেখানে শক্তি ও নৈপুণ্যের পরীক্ষা, সুযোগ সদ্ব্যবহারের ক্ষমতা ও অক্ষমতার উপর খেলার ফল নির্ভরশীল সেখানে অদৃষ্টকে টেনে আনা কেন? কিন্তু অনেক খেলাতেই দেখা গেছে শক্তিশালী একটি দল অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের বিরুদ্ধে আক্রমণের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে কিন্তু গোল পাচ্ছে না। বল পোস্টে বা বারে লেগে ফিরে আসছে কিংবা অসাধারণ একটি শর্টে গোলকিপার আশ্চর্যভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে হাতে গোনা দু'তিনটি আক্রমণ থেকে দুর্বল দল একটি গোল করে ম্যাচ জিতে গেছে। এখানেই আসে অদৃষ্টের প্রশ্ন।

ইস্টবেংগলের হাত থেকে সেইদিনই লীগ চলে যায়, যেদিন জেতা-ম্যাচ তারা ড্র করে মোহনবাগানের সংগে। কথাটা একটু ভুল হল। জেতা-ম্যাচ আবার ড্র হয় কীভাবে? হ্যাঁ, জেতা-ম্যাচই ছিল। প্রথমার্ধের খেলাতেই ইস্টবেংগলের ৩—০ গোলে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, খেলার ধারা এবং প্রাপ্ত সুযোগ অনুযায়ী। যদিও একটি গোল করে এগিয়েছিল সে গোলটিও শোধ হয়ে গেল ডিফেন্সের মারাত্মক ভুলে। তারপর চ্যাম্পিয়নশিপের ফয়সালার জন্য মোহনবাগান ও ইস্টবেংগলের মধ্যে আর একটি খেলার যে সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসছিল সেটা শেষ হয়ে গেল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সংগে ইস্টবেংগল ড্র করায়। ইস্টবেংগল এক পয়েন্ট পিছিয়ে পড়ল, লীগ জয়ের সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল মোহনবাগানের হাতে।

বিজয় মিছিলের একাংশ

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে জিততে না পারার ক্ষেত্রে ইস্টবেংগলের ভাগ্য বঞ্চনার পরিচয় আছে। অবশ্যই মহমেডান স্পোর্টিং ওই ম্যাচে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে তবু যেভাবে দু'তিনবার তারা গোল খেতে খেতে বেঁচে গেছে সেটা এক দলের ভাগ্য এবং অন্য দলের দুর্ভাগ্যের পরিচয়। মহমেডান স্পোর্টিং এ বছর মোহনবাগানের সংগেও দারুণ লড়ে হেরে যায়। ওই ম্যাচে মোহনবাগানের জয় খেলার সঙ্গতিসূচক ফল সন্দেহ নেই, কিন্তু খেলার শেষ মুখে লতিফুদ্দিনের রকেট শর্টটি মোহনবাগান গোলকিপারকে পরাস্ত করার পর বারে লেগে ব্যর্থ না হলে ওই ম্যাচও হয়তো ড্র হয়ে যেতে পারত। শ্যাম থাপার যে গোলটিতে মোহনবাগান ওই ম্যাচ জেতে ওই ধরনের প্রচণ্ড ভলি মারতে শ্যামকে কখনো দেখিনি। শ্যাম সাধারণত গোল পায় দেহের দোলায় বিপক্ষ ডিফেন্সকে মাটাল করে বল প্লেস করে বা ক্লিক শর্টে। ভলিতে অবশ্যই গোল করেছে। গতবারই তো লীগের মোক্ষম খেলায় ইস্ট বেংগলের বিরুদ্ধে করেছিল। কিন্তু সে শর্টে চমক ছিল না, চমক ছিল দেহের ডিগবাজিতে। অদ্ভুত একটা অ্যাকশান। কিন্তু এ বছর মহমেডানের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলটি দর্শনীয় ভলিতে, যে শর্টে মরসুমের সবচেয়ে বিশ্বস্ত গোলকিপার নাসির আমেদের পক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে পরাজিত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

তারপর ধরা যাক গোলদাতার তালিকায় সাব্বিরের সংগে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থানাধিকারী মানস ভট্টাচার্যের ২৩টি গোলের সেই গোলটির কথা। আমি ইস্টবেংগলের বিরুদ্ধে মানসের গোলের কথাই বলছি। আগেই বলেছি, ইস্টবেংগল ডিফেন্সের মারাত্মক ভুলে ওই গোলটি শোধ হয়ে যায়। কিন্তু শুধু কি ভুলটাই দেখব?' ওৎপাতা শিকারী সিংহের মত ছুটে এসে যে সেই ভুলের সুযোগটি কাজে লাগাল তার কৃতিত্বটা দেখব না? মানসের মতো সদাসতর্ক ট্যালেণ্টেড উইংগাররাই ওই ধরনের সুযোগ কাজে লাগাতে পারে এবং সারা লীগে বাইশ তেইশটি খেলার মধ্যে ওই রকম দু'চারটি কাজই লীগ জয়ের পথ প্রশস্ত করে দেয়। তবে তার সংগে ভাগ্যেরও একটু দরকার থাকে বইকি।

এবার লীগ জয়ে ভাগ্যের কথাটা মোহনবাগান কোচ প্রদীপ ব্যানার্জিও অস্বীকার করতে পারেননি। সেই সংগে তিনি বাহবা দিয়েছেন, তাঁর খেলোয়াড়দের পরিকল্পনামত সংগ্রাম করার জন্য।

সত্যিই তাই। ইস্টবেংগল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের তুলনায় মোহনবাগানে খেলোয়াড়ের সংখ্যা কম ছিল এবং হাবিব, আকবর ও সুভাষ ভৌমিক দলত্যাগ করায় খেলোয়াড়রা দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল। সেইভাবেই খেলে লীগ জিতেছে এবং চ্যাম্পিয়ন হবার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে গৌতম সরকার এবং মানস ভট্টাচার্য। দলের সাফল্যে সকলেরই কিছু না কিছু অবদান থাকে। গৌতম এবং মানসের অবদান নিঃসন্দেহে অনেক বেশী।

সমগ্র লীগে স্টার প্লেয়ারদের ব্যক্তিগত ভূমিকার কথা পরে আলোচনা করা যাবে। আজ দুটি বিশেষ কৃতিত্বের কথা বলে লেখা শেষ করছি। একটি কৃতিত্ব ইস্টবেংগলের সাব্বিরের ২৩টি গোলের মধ্যে তিনটি হ্যাটট্রিক। যদিও ১৯৪৬ সালে ইস্টবেংগলের নায়ার তিনটি এবং ১৯৬৬তে বি এন আর-এর রাজেন্দ্রমোহন ৪টি হ্যাটট্রিক করেছিল তবু সাব্বিরের বাহাদুরি অনস্বীকার্য। আর একটি রেকর্ড উইংয়ে খেলে মানসের ২৩টি গোল। সবচেয়ে ট্যালেণ্টেড খেলোয়াড় সুরজিৎ সেনগুপ্তও খেলে উইংয়ে। সুরজিতের গোল যেখানে মাত্র দুটি, মানসের সেখানে ২৩টি। নিঃসন্দেহে কলকাতা ময়দানের এবারের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র মানস ভট্টাচার্য।

মুকুল

শংকর ব্যানার্জি

অ.শাকলাল ব্যানার্জি

ফটো : নিখিল ভট্টাচার্য
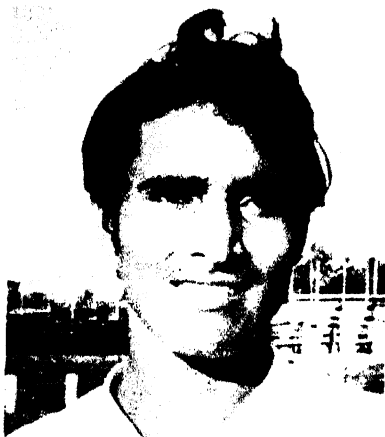
বাংলার খেলাধূলায় জেলাগুলি কত অবহেলিত

চিরঞ্জীব

সালটা সম্ভবত ১৯৭৬। মার্চ। উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটে বড় বড় পোস্টার—'বালুরঘাটে এই প্রথম বক্সিং'। পোস্টারের এই চারটি কথায় সঙ্গী অন্য সাংবাদিকরাও অবাক হলেন। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে দু দিন ধরে বক্সিং। তাও টিকিট কেটে। যতদূর মনে পড়ছে নীচে পঞ্চাশ পয়সা, আর উপরে পাঁচ টাকা পর্যন্ত টিকিট ছিল। স্টেডিয়ামের মাঝে রিং বানিয়ে চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে বক্সিং, অভাবনীয়। মফস্বল। সুতরাং পাঁচটায় শুরুর কথা থাকলেও নানা কারণে দেড়, দু ঘণ্টা দেরীতে লড়াই শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথিদের বক্তৃতাও। প্রথম দিন বক্সিং শেষ হল রাত পৌনে বারোটায়। বিভিন্ন বয়সের দর্শক এসেছিলেন। সংসারের কাজ চুকিয়ে শিশুকোলে মায়েরাও অত রাত অবধি বক্সিং দেখেছেন। আর ওই দীর্ঘক্ষণের মাঝে কারুর মধ্যে কোনো বিরক্তি নয়—বরং বক্সিং-এর ঘুঁষির সঙ্গে দর্শকাসন (চট, বেঞ্চি, চেয়ার) থেকেও ওঁরা চিৎকারে, উল্লাসে স্টেডিয়াম কাঁপিয়ে তুলেছেন। দু দিনের বক্সিং-শেষে স্থানীয় বেসরকারী ক্রীড়া-কর্তারা এবং সরকারী উচ্চপদস্থরা বললেন অনুযোগের সুরে : 'দেখলেন তো এখানে, এই ছোট মফস্বল শহরে কত উৎসাহ। এখানকার অধিবাসীরা জীবনে এই প্রথম বক্সিং দেখলেন। সব খেলার রাজ্য সংস্থা কলকাতায় থাকুক আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁরা মফস্বলের দিকে তাকাবেন না কেন? তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে আমরা এগোব কেমন করে। আর আমরা না এগোলে গোটা রাজ্যই যে পিছিয়ে থাকবে।' আরও বললেন ও'রা : 'এই যে কলকাতা থেকে এসে ডজন দুয়েকের বেশি বক্সিং-এর ছেলে লড়ল দু'দিন ধরে এর মধ্যে খাস কলকাতার কজন আছে দেখুন তো!'

'খাস কলকাতার কজন আছে দেখুন তো' প্রসঙ্গে পরে আসছি। মফস্বলে খেলাধুলায় কত উৎসাহ—একথা জানেন—যাঁদের সামান্য যোগাযোগ আছে জেলাগুলোর সঙ্গে। সামান্য কিছুতেই ওঁরা মন প্রাণ সঁপে দেন। আর বড় কিছু হলে তো কথা নেই। তা ওঁরা সাধারণ কর্মী হোন বা হোন না সংগঠকদের উপরের সারির কেউ। প্রায় দু দশকের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ১৯৭৩-এ দুর্গাপুরে যে রকম নিখুঁতভাবে আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিকস করেছিল, ভারতের কোনো সংস্থা আজও অমনটি করতে পারেন নি। আর অ্যাথলেটিকসের মত গ্লামারহীন খেলা দেখতে কালোবাজারে দৈনিক ও সিজন টিকিট যায়, কলকাতায় তেমন দিন কখনও আসবে কিনা কে জানে? আসানসোলে সপ্তাহব্যাপী জাতীয় কবাডি প্রতিযোগিতায়ও একই অবস্থা হয়েছিল। মনে হয়েছিল কবাডি ছাড়া ওই ছোট শহরে আর কিছু বোধ হয় নেই।

মেদিনীপুরে প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি একটি দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। শুরু হয় সূর্যোদয়ের আগে। কিন্তু ওটি ঘিরে মেদিনীপুর শহর ও যে সব গ্রাম দিয়ে ওরা ছুটে চলে, সেখানে না গেলে বোঝা যায় না প্রতিটি মানুষ ওকে কেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন। রানাঘাটে রাজ্য জিমন্যাস্টিকস, দিনহাটায় আন্তঃজেলা কবাডি, শিলিগুড়ি ও সাহাগঞ্জে রাজ্য টেবল টেনিস, কৃষ্ণনগরে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা—সব কিছু দেখলে মনে হবে স্থানীয়দের কাছে কোনোটাই ছোট নয়। শুধু খেলা হলেই হল। তা না হলে আই এফ শীল্ডের প্রাথমিক রাউণ্ডের খেলার আয়োজনেও দুর্গাপুর, কৃষ্ণনগর, বার্নপুরের অত উৎসাহ কেন? পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া কেন আকুতি জানায় 'আন্তঃ জেলা সাব-জুনিয়র বা জুনিয়র ফুটবলের দায়িত্বটা অন্তত দিন আমাদের'।

এটা হয়তো ঠিক ওঁরা বড় কিছু দেখার সুযোগ পান না, বড় কিছু করার দায়িত্ব পান না—তাই 'কানা মামা' ভেবেও ওই ছোটখাট ব্যাপার গুলিতেই নিয়োজিত হতে চান। হয়তো ওঁদের আনন্দ বা রিক্রিয়েশনের একমাত্র মাধ্যমও এগুলি। কলকাতার কর্তাগণ অপেক্ষা ওঁরা যদি সফল ও নিখুঁত সংগঠক হন। যদি মফস্বল শহর গ্যারাণ্টি-মানিও দেয় কলকাতার চাইতে অনেক বেশী তবে কেন ওঁরা প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পাবেন না? বিশ্বনাথ দত্তকে ধন্যবাদ আই এ শীল্ডকে তিনি কলকাতার বাইরে ছড়িয়েছিলেন। অশোক ঘোষকে অনুরোধ—আপনার টার্ম শেষ হওয়ার আগে লীগকে হোম অ্যাণ্ড অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে জেলায় জেলায় খেলান। সব খেলার রাজ্য কর্তারা যদি তাদের অন্তত রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনাল (সম্ভব হলে পুরো প্রতিযোগিতা) পর্যন্ত জেলায় জেলায় করেন, তাহলে প্রভূত উপকার হতে পারে। জেলার ছেলেমেয়েরা ভাল খেলা না দেখলে উন্নত হবে কেমন করে! কিংবা তাদের বাবা মা-দের মধ্যে খেলার প্রতি ভালোবাসা আনার জন্যও দরকার ওই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজনের।

টেনিস যেহেতু এখনও হাই সোসাইটির খেলা (যদিও খরচ টেবল টেনিসে আরও বেশী), তাই ব্রিটিশ যুগের মফস্বলে তৈরী কোর্টগুলিরও সংস্কার হয়নি, এখন ব্যবহারও হয় না ওইগুলির। কিন্তু হকির প্রসারে বাধা কোথায়? রাজ্য হকি সংস্থা আজও হকিকে কলকাতার বাইরে নিতে পারলেন না। মফস্বলে ছড়ানো তো দূরের কথা—এমন কলকাতা-কেন্দ্রিক খেলা বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই গোটা পশ্চিমবঙ্গে। আর তার বড় প্রমাণ এবারে ওদের পুরস্কার-বণ্টন অনুষ্ঠান। রাজ্য হকিতে চ্যাম্পিয়ন কে হল—তা হকি প্রেমিকরাও জানতে পারেননি। রাইটার্স বিল্ডিং এর রোটাণ্ডায় পুরস্কার-বণ্টন অনুষ্ঠানের আগে সাংবাদিকদেরও অগোচরে ছিল ওই খবর। এখন কলকাতায় হকি লীগ বা বেটন কাপের সর্সেমিরা অবস্থার কথা চিন্তা করে একে মফস্বল শহরে ছড়িয়ে দেওয়ার আশা করাটা নিরর্থক। বক্সিং-এর মত এই সংস্থাটিও যে কিছুই করেনি তার প্রমাণ কয়েক মাস আগে কলকাতার দুটি মেয়ে হকি ক্লাবের উত্তরবঙ্গ সফরের সময়ের কিছু কথা। ময়নাগুড়ি ও শিলিগুড়িতে ওদের খেলার পর স্থানীয় প্রবীণরা জানান, 'উত্তরবঙ্গ এই প্রথম হকি দেখল।' আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এখনও ভারতকে চেনে যা দিয়ে ('হকির দেশ' বলেই—নেহরু বা ইন্দিরার জন্য নয়) সেই হকির এই হাল আমাদের দেশে! সুতরাং অজিত পাল, অশোককুমার, সুরজিত সিংদের দোষ দিয়ে লাভ কি! চণ্ডীগড়, জলন্ধর বা ঝাঁসি থেকে গোটা পৃথিবীর সঙ্গে লড়ার মত কজন প্লেয়ার বেরোবে? ময়নাগুড়ি, শিলিগুড়ি, কাঁথি, জঙ্গীপুর, ছাতনা দুবরাজপুরও তো ভারতেরই অংগ। বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের সম্ভবত এই চেতনা এখনও আসেনি।

টোকিওর এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ডে এবার ভারতীয় দলে ছিল [illegible] রায়

২৪ পরগনার [illegible] শ্রীরূপা চ্যাটার্জি তেহরান এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে।

ভারতের সবচাইতে ধনী সংস্থা সম্ভবত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সি এ বি)। ব্যাংকে রয়েছে ওঁদের সত্তর-পঁচাত্তর লাখ টাকা। হালে কিছু উন্নয়ন কাজে হাত দিলেও এতদিন ওঁদের টলানো যায়নি। অথচ ব্যাংকে জমানো টাকার সুদেই ওঁরা অন্তত প্রতিটি জেলায় কভার্ড পীচ বানাতে পারতেন। এই সংস্থার অচলায়তন এখনও পুরোপুরি ভাঙেনি। তা না হলে দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেটে রেলিগেশন হয় না—কেন? জেলা স্পোর্টস ফেডারেশনকে কিছু টাকা আর কয়েকটি ম্যাচ এবং স্বল্পস্থায়ী ট্রেনিং ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই বাংলা ভারত চ্যাম্পিয়ন হবে না।

সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি—'খাস কলকাতার কজন আছে দেখুন তো।'

ওই যে বক্সিং দলটি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াচ্ছে মাসের পর মাস, তাদের শতকরা দুজনও কিন্তু কলকাতার নয়। অধিকাংশই হুগলি, ২৪ পরগনা হাওড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলার। যে খেলাটি নিয়ে প্রতি মরসুমে আমরা উতলা হয়ে উঠি—সেই ফুটবলের দিকে তাকালেও একই চিত্র ফুটে উঠবে। প্রথম ডিভিশনে যে শ'পাঁচেক খেলোয়াড় আছে, তাদের ১০০ জনও কলকাতার নয়। এই মুহূর্তে যে কজন তারকার নাম মনে পড়ছে তাদের কে কলকাতার? সুরজিত সেনগুপ্ত—হুগলি, বিদেশ বসু—বর্ধমান, সুব্রত ভট্টাচার্য—২৪ পরগনা, ভাস্কর গাঙ্গুলী—২৪ পরগনা, সমরেশ চৌধুরী—২৪ পরগনা, অশোক

আন্তঃজেলা সাব জুনিয়র ফুটবলে বিজয়ী হাওড়া দল

চক্রবর্তী—বর্ধমান, মিহির বসু—২৪ পরগনা, মানস ভট্টাচার্য—২৪ পরগনা। পাঠকরা হয়তো আরও বিস্তারিত তালিকা দিতে পারবেন।

অ্যাথলেটিকসে পশ্চিমবঙ্গের সুনাম এনেছে মেয়েরাই। সারা ভারতের ভিকট্রি স্ট্যান্ডে বাংলার মুখ রাখে ওরাই। এবং এখনও যারা আমাদের গর্বের সেই অণিমা ব্রহ্ম, সুব্রতা দেবনাথ, শ্রীরূপা চ্যাটার্জি, অনুভা চ্যাটার্জি, সুরজা ঘোষাল—সকলেই কলকাতার বাইরের। কলকাতা গর্ব করবে শুধু বোধ হয় রীতা সেনকে নিয়ে। পূর্বভারতে আজ পর্যন্ত দুজন মেয়ে এন আই এস কোচ হয়েছেন। ওঁদের একজন অ্যাথলেটিকসের ওই সুব্রতা—বালির মেয়ে। আর একজন জিমন্যাস্টিকসে—চন্দননগরের মিন্টি মল্লিক। চলে আসুন টেবল টেনিসে। দুর্গাপুরের শ্যামলী চৌধুরী কিংবা শ্রীরামপুরের তিন সহোদরা—দীপ্তিকণা, প্রীতিকণা ও তুষারকণা দে-র নাম এসে পড়বে। তীরন্দাজীতে হাওড়ার চন্দ্রকুমার দাস, ২৪ পরগনার কৃষ্ণা দাস ভারতশ্রেষ্ঠ। জিমন্যাস্টিকসে হুগলির অমিয় মল্লিক, গোরা মল্লিক, শেফালী মজুমদার, ২৪ পরগনার চন্দনা চক্রবর্তী, রূপালী দে দালালকে নিয়ে আমরা গর্ব করি। যতদিন মফস্বলের ওরা তেমনভাবে এগোয়নি ততদিনই কলকাতাই নজর কাড়ত।

দেশী খেলা খো খো, কবাডিতে কলকাতায় দল-গড়া হয়। শতকরা ৯৫ ভাগ মফস্বলের ছেলেমেয়ে নিয়ে। কবাডির সেরা মেয়ে এবার বিরাটির গৌরী মজুমদার, সেরা ছেলে হুগলির কালোবরণ কোলে। ব্যাডমিন্টনে শিলিগুড়ির সেই মধুমিতা গোস্বামী এখনও সবার উপরে। নিখিল ভারত পাওয়ার লিফটিং বা 'মিস্টার হারকিউলিস অফ ইন্ডিয়া' হতে দেখি যে বাসুদেব দাসকে—সে কিন্তু জলপাইগুড়ির। বাস্কেটবলে এগিয়ে এসেছে দুর্গাপুর, বর্ধমান, হিন্দমোটর্স। মেয়েদের বাস্কেটবল কলকাতা-কেন্দ্রিক না থাকলে বোধ হয় মফস্বলের মেয়েরা ভলিবলের মত এই খেলাতেও প্রথম সারিতে উঠে আসত। পর পর কয়েকবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বা বাংলার রাজ্য দল এবং এখন দুই রেল ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন যেভাবে সারা ভারতে শীর্ষস্থান পেয়েছে তার অধিকাংশই কলকাতার বাইরের মেয়েদের দ্বারা গঠিত।

সাঁতারের দুই বিভাগেই—তা যেমন ইলা পাল, সুমিত চক্রবর্তীরা, তেমনি আশিস দাস, আজিদ ঢালিরাও কলকাতার বাইরের। সারা ভারতে আজ বাংলাকে সমৃদ্ধ করছে হুগলি, হাওড়া ও ২৪ পরগনার ছেলেমেয়েরা। তবে মেয়েদের ফুটবল, ক্রিকেট, হকি নিয়ে কলকাতা গর্ব করতে পারে। কিন্তু তা তো একটি কারণেই, মফস্বল বা জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার মত সংগঠন আজও ওঁরা গড়ে তুলতে পারেননি।

বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে—অধিকাংশ খেলার রাজ্য দল গঠিত হচ্ছে মফস্বলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। নিজের তাগিদে ওরা খেলাকে আঁকড়ে রয়েছে। একটু কৃতিত্ব দেখাবার পর কলকাতার নজরে পড়েছে। তারপর ওরা কলকাতার ক্লাবে এসেছে, বসবাসও করছে পরে অনেকে কলকাতায়। এর দ্বারা মফস্বলের খেলাধুলার উন্নতি হয়নি এতটুকু। কারণ প্রয়োজনের তাগিদে চিরকালের জন্য ওদের অধিকাংশই কলকাতার বাসিন্দা হয়ে পড়ছে। অতীতকে ভুলে যাচ্ছে।

বক্তৃতায়, পরিকল্পনায় কিন্তু বলা হচ্ছে কলকাতাকে সমৃদ্ধ করতে হলে এর বিরাট হিন্টারল্যান্ড—জেলাগুলিকে ভুললে চলবে না। কিন্তু স্বাধীনতার বত্রিশ বছরেও ওসবের অধিকাংশ শব্দ হয়ে থাকে আটকে আছে অথবা ফাইলবন্দী হয়ে রয়েছে। যে পাঞ্জাবের ক্রীড়া পরিষদ শুরুর পাঁচ বছরের মধ্যে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রবেশ করেছে—আমরা এই পশ্চিমবঙ্গ আজও তার শাখা জেলা সদরেও নিয়ে যেতে পারিনি। আসলে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এখনও খেলাধুলার গুরুত্বটা তেমনভাবে ভাবাতে পারেনি। আগে বলি বেসরকারী পর্যায়ের কথা। এই রাজ্যে জেলার খেলাধুলার জন্য ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশন নামে একটি সংস্থা রয়েছে। বিভিন্ন জেলায় তাদের সংগঠন থাকলেও না আছে অর্থবল, না লোকবল। আর তাদের অনুমোদিত খেলা শুধু ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি। ২৪ পরগনা ও চন্দননগরে অবশ্য জেলা স্পোর্টস ফেডারেশন জেলা স্তরের অধিকাংশ খেলার আয়োজন করেন। ফলে ওই দুই জেলায় (চন্দননগর এখনও জেলা বলে পরিগণিত) সব খেলা মোটামুটি রুটিনমাফিক সংগঠিত হয়। অন্যান্য জেলায় অন্যান্য খেলার উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশনের। যেমন ব্যাডমিন্টনের রাজ্য কর্তৃপক্ষ কলকাতা থেকে কাজ পরিচালন করেন। অ্যাথলেটিকস, খো-খো, কবাডি, সাঁতার, টেবল টেনিস সকলেই পৃথকভাবে কাজ করেন। এঁদের সঙ্গে অপরের কোনো সম্পর্ক নেই। দুঃখের কথা—এত ১৯৭৯-তেও অনেক খেলার রাজ্য সংস্থার পৃথক জেলা ইউনিটও গড়ে ওঠেনি। প্রশ্ন উঠতে পারে—কলকাতায় যখন বিভিন্ন খেলার পৃথক পৃথক সংস্থা পৃথক পৃথকভাবে খেলাগুলোর আয়োজন, ট্রেনিং ইত্যাদি পরিচালনা করেন, তেমনিভাবে জেলাগুলিও করবে না কেন? সংগত প্রশ্নই। কিন্তু অর্থবল যেখানে সীমায়িত, টেকনিক্যাল জ্ঞানসম্পন্ন লোকবল যেখানে কম, সেখানে একের সাহায্য অপরের অপরিহার্য। আসল ব্যাপার—জেলাগুলিকে সতেজ করতে, শক্তিশালী করতে, খেলাধুলার প্রচলন করতে শক্তিশালী সংগঠন চাই—তা একত্রে হোক বা পৃথক ভাবে হোক—চাই চাই-ই। চাই সরঞ্জাম, ট্রেনিং ব্যবস্থা, মাঠ, কোর্ট, পুল ইত্যাদি।

একথা ঠিক—বেসরকারী উদ্যোগে আজও কেউ কেউ গদী আঁকড়ে আছেন নানা সুযোগ-সুবিধা বা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে মনোভাব নিয়ে অনেকেই কলকাতায় বসে লাঠি ঘোরাতে চান। কিন্তু সরকারী উদ্যোগও কি কিছু আহা মরি! এতবড় একটা রাজ্যে আজও ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব কোনো একজন পৃথক মন্ত্রীর উপর নয়। মুখ্যমন্ত্রীর মত ব্যস্ত মানুষ ওটি নিয়ে রয়েছেন। আবার দেখুন আগে যুক্তফ্রন্টের আমলে এমন একজনকে পৃথকভাবে ক্রীড়ামন্ত্রী (রাম চ্যাটার্জি) করা হয়েছিল যাঁর কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলে খাদ্য-র সঙ্গে প্রফুল্লকান্তি ঘোষকে জুড়ে দেওয়া হয় ক্রীড়াকে। তাও ভাল যদি আমলা বা তাঁর ডিপার্টমেন্ট এবং ক্রীড়া পরিষদ তেমন সচল হতেন। কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ রায়ের পর বামফ্রন্টের জ্যোতি বসুর সরকারের তো দু বছর কেটে গেল। গ্রামীণ ক্রীড়া নামক সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার খবর কি আজও জেলায় জেলায় যথাসময়ে পৌঁছয়? বা সকলে জানতে পারেন—আপনারা দল গড়ুন, দল পাঠান ইত্যাদি? এরাজ্যে ৩৩৫টি ব্লক আছে—ব্লক পর্যায়ের ক্রীড়া অফিসার নিয়োগ সম্পর্কে বর্তমান সরকারের কী পরিকল্পনা আছে জানি না। তবে জেলা অর্গানাইজার বা অফিসার পদগুলির কিছু আজও শূন্য। শুনেছিলাম এই ১৯৭৯ থেকে প্রত্যেক ব্লকের ১৫০০ ছেলেমেয়েকে গ্রামীণ ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তা যদি হত, পাঁচ লক্ষাধিক ছেলেমেয়ে ব্লক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারত। গ্রামীণ ক্রীড়ার অষ্টম বছরেও রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ এ কাজটি করতে পারেনি।

বে-সরকারী পর্যায়ে যেখানে সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে, তাঁদের আর্থিক সংগতিও নেই, সেখানে সরকারী প্রশাসনের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। জেলাশাসক থেকে, মহকুমাশাসক এবং বি ডি ও মারফত গ্রামে গ্রামে পৌঁছবার মত মাধ্যম তো সরকার ছাড়া কারুর নেই। কিন্তু এসবের সুযোগ নেওয়া হয়নি। বরং ব্লক পর্যায়ে খেলার আয়োজনের জন্য যে সামান্য অর্থ বরাদ্দ ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে। একথা যথার্থ—ওই টাকার ব্যয় নিয়ে অনেক গলদ ছিল। কিন্তু সেজন্য দায়ী কারা? নিশ্চয়ই গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নয়? সরকারী কর্মীরা অপদার্থ বা দুর্নীতিপরায়ণ হলে সে দায়ভার তো সরকারেরই।

সরকার কলকাতাকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করবেন। নেতাজী স্টেডিয়ামে বড় বড় প্রতিযোগিতা করুন। উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ হোক ওখানে, লবণ হ্রদে স্টেডিয়াম হোক, অবিলম্বে স্থাপিত হোক এন আই এস-এর পূর্বাঞ্চল শাখা,—কিন্তু জেলাগুলো আর কতকাল পিছিয়ে থাকবে? আজও তিন-চার সপ্তাহের কোচিং, কিছু বল, বুট, জাল, বোর্ড এবং আন্ডার স্টাডি কোচিং, এর জন্য কিছু অর্থ দিলেই কি চুনী গোস্বামী, পংকজ রায়, মনোজ গুহ, দীপু ঘোষ, রূপা মুখার্জি, সুব্রতা দেবনাথ, ইলা পাল, বুলা নাথ, অম্বালিকা মজুমদার, শক্তি মজুমদার, ক্লডিয়াস, তপতী মণ্ডল, মণিকা নাথ, জয়ন্তী বিশ্বাস তৈরী হবে?

বর্তমানের রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় কিছু নতুন সংযোজন হয়তো আছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। আসলে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী এখনও জানাননি, এ রাজ্যের স্পোর্টস পলিসিটা কি? না, তাঁকে সোভিয়েট ইউনিয়ন বা চীনের মত কিংবা অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর ন্যায় বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় খেলাধুলাকে সরকারের কাজে বা পার্টির ম্যানিফেস্টোয় সবার আগে স্থান দিতে বলছি না—তিনি অন্তত ভারতের একটি রাজ্যকে অনুসরণ করুন। তা হলেও গ্রামগুলি আর অবহেলিত থাকবে না। হ্যাঁ ভারতের সেই রাজ্যটির নাম—পাঞ্জাব।

ৃত্যনাট্য প্রযোজনা
বাধিনী

দবাশিস দাশগুপ্ত

যোজনা সহায়িকার বিশেষত্ব :

রবীন্দ্র সদন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবের নৃত্যনাট্য প্রযোজনা বিষয়ক সর্বপ্রকার সমস্যা ও সমাধানের বিস্তারিত আলোচনা।

প্রযোজনা বিষয়ে আলোকপাত করিবার জন্য বিগত অভিজ্ঞতা ও তথ্যের সমাবেশ।

নৃত্যনাট্য প্রযোজনার ব্যাকরণ ও আলঙ্কারিক বিশ্লেষণ।

বিশেষ গানের সঙ্গে নৃত্যের সূত্র সহ ব্যাখ্যা।

প্রযোজনার বাণিজ্যিক সাফল্য বিষয়ক পরিসংখ্যান সহ গোপন তথ্যের সমাহার।

নৃত্যনাট্যরূপ পাণ্ডুলিপি রচনার জন্য অনুশীলন-বিধি।

আঙ্গিক বিষয়ক নির্দেশিকা।

১৯৭৯ সালে প্রযোজিত নৃত্যনাট্যের উদাহরণ সহ বিশ্লেষণ।

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ বর্তমান বৎসরে নৃত্যনাট্য প্রযোজনার কিছু কিছু অপ্রস্তুত অবস্থার কারণ সহ সমাধান নিরূপণ কর।

উঃ এ কথা সকলেই অবগত আছেন যে, কলিকাতায় নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় আয়োজক সংস্থা যাহাই হউক না কেন, শিল্পিবৃন্দ প্রায়শই এক এবং সেইসব শিল্পীরাও নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক কর্মে ব্যস্ত থাকেন। রবীন্দ্র সংস্কৃতির বাণিজ্য এইসব সদাব্যস্ত শিল্পীরাই ভরসা। মহড়ার নির্ধারিত দিনে নৃত্য-শিল্পী, কণ্ঠসংগীতশিল্পী এবং যন্ত্রসংগীতশিল্পী একত্রে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। এমতাবস্থায় বিভিন্ন খণ্ডে রচনাবলী প্রকাশের মত খণ্ডাংশে নৃত্যনাট্য মহলা। তদুপরি কলিকাতার দূরভাষা প্রায়শই অকেজো হইয়া থাকে। বালীগঞ্জে সুরতীর্থের মহলাকক্ষে উপস্থিত থাকিবার নির্দেশ যথাসময়ে টালা পার্কে পৌঁছায় না। সুতরাং অগোছাল অপ্রস্তুত নৃত্যনাট্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের টেলিফোন বিভাগকে দায়ী করা যাইতে পারে।

নির্ধারিত সময়ের এক থেকে দেড় ঘণ্টা বাদেও কোন কোন প্রথম দৃশ্যের শিল্পী শেষ দৃশ্যে উপস্থিত হন। এর কোন উপায়ান্তর নাই, কারণ পাতাল রেল প্রকল্পের জন্য কলিকাতার যানবাহন বিভিন্নভাবে ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অপটু নৃত্যনাট্যের জন্য সি এম ডি-কে দায়ী করা যাইতে পারে।

বহু আয়াসসাধ্য মহলার আগে দু'-এক পশলা বৃষ্টিপাত হইলে নামী শিল্পীদের গাড়ি জলের মধ্যে অকেজো হইয়া যায়। কোন কোন সময়ে তাদের জলবন্দী হইয়া দীর্ঘ সময় কাটাইতে হয়। শিল্পীদের এমন লাঞ্ছনা ও বহুমূল্য সময়ের অপচয়ের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে দাবি করা যাইতে পারে।

মহলার নির্দিষ্ট সময়ে অনেক মহিলার বাসস্থানে লোডশেডিং থাকার জন্য তাঁরা ঘরবন্দী হইয়া মহলায় অনুপস্থিত থাকেন। এই খামখেয়ালী লোডশেডিং-এর জন্য বাম ফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করা যাইতে পারে।

অনেক শিল্পী বাটী হইতে নির্গত হইয়াও বিক্ষোভ মিছিল, অবরোধের সম্মুখীন হইয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসেন। এমত অবস্থায় অনেকের সন্দেহ রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য বানচাল করার পেছনে প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারের উস্কানি আছে।

সুতরাং রবীন্দ্র বাণিজ্যবিরোধী এইসব চক্রান্তের মোকাবিলা করার জন্য নৃত্যনাট্যশিল্পীদের হরতাল নয়—নৃত্যনাট্যের মাধ্যমেই সর্বাত্মক আন্দোলন চালাইয়া প্রকৃত ভাষায় ক্ষেপকে অব্যাহত রাখা উচিত।

প্রঃ সদাব্যস্ত শিল্পীদের কণ্ঠে অসমর্থ থাকিলে সঙ্গীতাংশ কিভাবে উত্তীর্ণ করানো যায় তাহা বিশ্লেষণ কর।

উঃ নৃত্যনাট্য প্রযোজনার মূল উদ্দেশ্য প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হওয়া। স্বভাবত এই প্রেক্ষাগৃহ পূর্তির জন্য খ্যাতনামা শিল্পীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। শারীরিক অপটুতা এবং বয়সভারে অনেক কণ্ঠই ত্রিসপ্তক বিচরণ করিতে পারে না। কিন্তু সেসব বিচার করিতে হইলে মূল উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুতি ঘটে। সুতরাং নামী শিল্পীদের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। ইহার জন্য এমন হইতে পারে 'চণ্ডালিকা' বা অন্য নৃত্যনাট্যে বিজ্ঞাপিত শিল্পী গানের স্থায়ী বা অস্থায়ী অংশটি গাহিলেন; অন্তরার অংশে যেখানে তারসপ্তকে যাওয়া প্রয়োজন, সেখানে তাঁহার ছাত্রী কণ্ঠ দিলেন। ইহাতে দুইরকম উপকার পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের মান রক্ষা হয় এবং ছাত্রীও ক্রমশ প্রস্তুত হইতে পারে। সময়াভাব ও ব্যস্ততার জন্য প্রত্যেকের সব গান শিক্ষা সম্ভব নহে—এটা অবশ্যই বিবেচ্য। সুতরাং কিছু কিছু নৃত্যনাট্যে একটি চরিত্রে কোন নামী শিল্পী চারিটি গান গাহিবেন, চরিত্রের বাকি ছয়টি গান অন্য কেউ গাহিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। খ্যাতনামা শিল্পীদের অনেক দায়িত্ব থাকে ; একটি প্রযোজনার ক্ষেত্রে নতুন করিয়া গান তোলার জন্য 'বুকিং কাউণ্টার'-প্রশ্রয়ী শিল্পীকে কখনই বিব্রত করা উচিত নহে। 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্যে কোন শিল্পী যদি গানের সময়ে নীরব থাকেন—নৃত্যশিল্পী বিমূঢ় হইয়া ফিরিয়া যান, তাহাতে দর্শকের হতবাক হওয়া নিরর্থক। কারণ শিল্পীরা জাতির গর্ব। সুতরাং তাঁহাদের মেজাজ, ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'মুড'—তাহাকে কখনই বিঘ্নিত করা উচিত নহে। এ কথা শ্রোতাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত। শিল্পীদের বরাভয়ে উৎসবের আয়োজন এবং দর্শকের ফ্যাশানেই পরিতৃপ্তি।

চণ্ডালিকা

প্রঃ নৃত্যনাট্য রূপদানের সরল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

উঃ নৃত্যনাট্যরূপের জন্য রবীন্দ্রনাথের যে-কোন একটি কবিতা বা গল্প বাছিয়া লইতে হয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মানসিক অবস্থার উপযোগী রবীন্দ্রসংগীত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেই। সেক্ষেত্রে 'পুরাতন ভৃত্য', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' কিংবা 'দুই বিঘা জমি' সব কিছুরই নৃত্যনাট্যরূপ দেওয়া যাইতে পারে। এই নৃত্যনাট্যের জন্য নায়ক-নায়িকা আর কিছু সখীর দল হইলেই চলে। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের ঐতিহ্যে নায়িকা সর্বদা সখী পরিবৃতা কিন্তু নায়কেরা নির্বান্ধব। একমাত্র 'চিত্রাঙ্গদা'য় অর্জুনের সহচর বা গ্রামবাসীদের নৃত্য আছে। মায়ার খেলায় তিন বন্ধু তাঁহারা আপন মন লইয়া কাঁদিয়া মরে। নৃত্যনাট্যরূপে নায়ক-নায়িকা গায়ক-গায়িকার পছন্দসই গানের সহিত নাচিয়া কুঁদিয়া এক দেড় ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে পারে ; মাঝে মাঝে লাস্যময়ী সখীরা বাসরঘরের শ্যালিকাদের মত আসিয়া রঙ্গ করিতে পারে। 'বিদায় অভিশাপ' নৃত্যনাট্যরূপে ঋষিদের গানের জন্য বেদগান আছে এবং নাচের জন্য 'কালমৃগয়া'র উদাহরণ আছে। রাজভক্ত প্রহরীর বীর-রসের জন্য শ্যামার কোটাল' আছে এবং হাস্যরসের জন্য 'তাসের দেশ' অবলম্বন। সঙ্গীত নির্বাচনে অসুবিধা নাই ; শুধু খোঁজ লইতে হয়, দর্শক-স্নেহধন্য শিল্পীদের কোন গানগুলি জানা আছে। নতুন করিয়া গান তোলা তাঁহাদের সময়াভাবে সম্ভব নহে। গান আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত গাহিতে হয়। হয়তো স্ত্রী-কণ্ঠে পুরুষোচিত গান বা পুরুষ-কণ্ঠে নায়িকাসুলভ আবেদন প্রকাশ পাইতে পারে।

শ্যামা

ভানুসিংহের পদাবলী

কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই। দর্শক প্রিয় শিল্পীদের গান শুনিবার প্রত্যাশী—গানের অর্ধখোঁজা সেখানে হল্লা মাত্র। এর জন্য নায়িকা নায়কের উদ্দেশে অবলীলায় গাহিতে পারে, "এসেছো তুমি তো বীণা আভরণে, মুখর নূপুর বাজে না চরণে—" অথবা 'গোপনে দেখেছি তোমার ভাবের খেলা—উতল আঁচল এলোথেলো চুল ঢেউয়ের খেলা" (এই বছর এই জাতীয় ভুল খুব কম দেখা গিয়াছে)। নৃত্য-নাট্যের জন্য গানের যদি অকুলান হয়, তবে আবৃত্তির জন্য পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষকে আহ্বান জানানো যাইতে পারে। নৃত্যনাট্য আবৃত্তির ক্ষেত্রে এঁরা "সুপারস্টার"। নৃত্যনাট্যের উপযোগী নাট্যরূপ যোগ্য হাতে অর্পিত হইলে অনেক ভাল কাজও হইতে পারে। যেমন "মল্লার"-এর 'ভুল স্বর্গ' অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের এই নৃত্যনাট্য বহু দিন আগের রচনা। এখানেও নায়ক-নায়িকার দীর্ঘক্ষণ আলাপ ক্রমশ তুঙ্গে উঠিয়া "আয় রে তবে মাত রে সবে আনন্দে" উদ্দাম নৃত্যে অবসিত হয়। এখানে সখীরা ফাল্গুনী নাটকের "এবার তো যৌবনের কাছে মেনেছ হার মেনেছ" গান গায়, যা খুবই উপযোগী অথচ স্বল্প-পরিচিত বলিয়া ব্যবহৃত হয় খুব কম। চিত্রকরের নির্বাসন শুধু সংলাপের মধ্য দিয়া বর্ণিত। এই অংশ দেখিয়া নিশ্চিত হওয়া যায় যে ইহা আগের রচনা—প্রগতিবাদী নহে। কারণ এখানে "তাসের দেশ" এবং কোটালের অনুগামী হইয়া অনেক নৃত্যের অবকাশ ছিল, যাহাতে দর্শক করতালি দিতেন এবং সময়ও অনেকখানি বাড়িয়া যাইত। নৃত্যনাট্যরূপে শুধু রবীন্দ্রনাথ নহে, বুদ্ধিক্ষমতা থাকিলে অন্য কবিতাও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

উদাহরণ—"ভানুসিংহের পদাবলী"তে অনেক বৈষ্ণব পদকর্তার পদ সংযুক্ত করা যাইতে পারে। মাঝে মাঝে হাস্যকরভাবে দক্ষিণ ভারতীয় পাণ্ডার পোশাকে হাত-পা নাড়িয়া ব্রজবুলি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। যদি কোন সময়ে পাণ্ডাঠাকুর প্রবেশ করিতে ভুলিয়া যান, তথাপি কনিষ্ক সেনের আলোর বৃত্ত পাক খাইতে থাকে। পিছনে অপার্থিব আবৃত্তি মায়া সৃজন করিতে পারে।

প্রঃ ব্যবসায়িক স্বার্থ বজায় রাখিয়া শিল্পী নির্বাচন সম্পর্কে তোমাদের অভিমত ব্যক্ত কর।

উঃ রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রকাশমাত্র গানের আসরের প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হইয়া যায়। এতদ্-ব্যতীত নৃত্যনাট্যের ব্যবসায়িক সাফল্যও তদ্রূপ। সুতরাং যথায় নিশ্চিত লাভ প্রত্যাশিত, তথায় খামখেয়াল নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। এই শহরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন অপ্রতুল নহে। কিন্তু তাহারা শুধু উদ্বোধন-সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্য কেউ অপারগ হইলে সেই গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের দায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপর অর্পণ করা হয়, এবং যেসকল গীতিনাট্যে নামী শিল্পীদের অনভিজ্ঞতা, সেখানে বারংবার একই প্রতিষ্ঠান "মনোপলি" হইয়া থাকে। "বাল্মীকি প্রতিভা" শুধু "শ্রুতি"ই পরিবেশন করেন (দুই এক-বার ক্যালকাটা ইয়োথ কয়ার)। "বাণী বিদ্যাবীথি" "কালমৃগয়া"তে স্পেশালাইজড্ হইয়াছেন। "চণ্ডালিকা"য় ঝামেলা একটু বেশী। একখানা করিয়া গানের জন্য বর্ধিষ্ণু পুরুষ শিল্পীকে অন্তর্ভুক্ত করা দূরে পোষায় না। সুতরাং দায় সুরমন্দির বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত হয়। একবার উদয়শংকর কালচার সেণ্টার-এর নাম আছে। নৃত্য-নাট্যের ক্রম অনুসারে সর্বাধিক চাহিদা শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, শাপমোচন (এই নৃত্যনাট্যে সুবিধা আছে নৃত্য ও কণ্ঠসঙ্গীতের জন্য দুইজন করিয়া নামী শিল্পী হইলেই যথেষ্ট। তাহার সহিত প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিত আবৃত্তিকারের।), মায়ার খেলা। এই নৃত্য-নাট্যগুলি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বারবারই করিয়া থাকেন। ইহার জন্য নিয়মিত বিদ্যায়তনের প্রয়োজন নাই। মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রচার ও ব্যবসা যুগ্মবেণী রচনা করিয়া থাকে। নৃত্যনাট্য ফুরাইয়া গেলে নৃত্যনাট্যরূপের আয়োজন হইতে পারে (বিশদ আলোচনার জন্য পূর্ব প্রশ্নের উত্তর দেখ।)। ১৯৬৯ সাল হইতে রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হইতেছে। এই এক দশকের মধ্যে নতুন শিল্পী এবং প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র সদন খুঁজিয়া পান নাই। বিভিন্ন বৎসরের স্মারক-পুস্তিকা দেখিলে ইহা অনুধাবন করা যাইবে। স্মারক-পুস্তিকার মুদ্রক প্রথমেই কয়েকজনের নামের টাইপ বহুল পরিমাণে গুছাইয়া রাখেন, কারণ ঐ নামগুলি বহুবার ব্যবহৃত হইবে। নৃত্যাংশে সাধন গুহ, পলি গুহ, অলকানন্দা রায়, পিয়ালী রায় মহাশয়, আরতি মজুমদার, বটু পাল, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সঙ্গীতাংশে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, বনানী ঘোষ, বাণী ঠাকুর, সুমিত্রা সেন প্রভৃতি। দশ বছরের মধ্যে ১৯৭৪ সালে শ্যামা নৃত্য-নাট্যে কোটালের ভূমিকায় দেবব্রত বিশ্বাস একবার এবং ১৯৬৯ সালে একবার তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দেখা যায়। কোটালের আসনটি শূন্য আছে। বিভিন্ন সময়ে সুবিধামত শিল্পীকে বণ্টন করা হইয়া থাকে। বজ্রসেনের ভূমিকায় হেমন্ত মুখো-পাধ্যায় ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় সর্বাধিক আদৃত, আর উত্তীয়র সাম্রাজ্যে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় দুই দশক-ব্যাপী সম্রাট। চিত্রাঙ্গদা বা মায়ার খেলায় অতটা ইমেজ দর্শকমনে সৃষ্ট হয় নাই। শাপমোচনে সুবিধার কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৭১ সালে প্রকাশিত পুস্তিকায় দেখা যায় পুরুষ ভূমিকায় চারটি নাম—অশোকতরু, সুপ্রকাশ চাকী, গোরা সর্বাধিকারী ও শৈলেন বসু। মহিলা ভূমিকায় কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র ও কমলা বসু। সৌজন্যরক্ষা ব্যতীত যদি অসুবিধাজনিত কারণে এত শিল্পী-সমাবেশ ঘটে, তবে খুবই ব্যয়-সাধ্য হইয়া পড়ে। ১৯৭৮ সালে চণ্ডালিকা এবং ১৯৭০ সালে শ্যামা—এই দুইবার ঋতু গুহর নাম দেখা যায়। মায়ার খেলায় একবার অরবিন্দ বিশ্বাস ও সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের নাম চোখে পড়ে। নৃত্যনাট্যরূপে সাগর সেনের নাম সর্বাগ্রগণ্য। চণ্ডালিকায় 'মা'-এর ভূমিকায় প্রতিবারই মায়া সেন (দুই-একবার সুমিত্রা সেনের উল্লেখ পাওয়া যায়।)। নৃত্যাংশে স্বর্ণা দত্ত ও আরতি মজুমদার। পরিসংখ্যান দেখিয়া ব্যবসা সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্র সদনের সহযোগিতায় এই একাদিক্রমিক ব্যবসা বেশ লাভজনক। কারণ নৃত্যনাট্য দেখা কলিকাতার একটা ফ্যাশন। দর্শক আদৃত শিল্পীদের পাশাপাশি যখন বন্দনা সিংহ, গীতা ঘটক গান করেন অথবা তপতী রায়, শান্তি বসু, সুতপা দাসগুপ্ত, সুনীতি বসু যখন নাচেন তখনও কিন্তু রসের ঘাটতি হয় না। বিশেষত কমলা বসু এখনও যখন 'বাজাও রে মোহন বাঁশি' গান করেন তখন অন্য নৃত্যনাট্যে তাহার অনুপস্থিতি বিস্মিত করিতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থে অনেক বিস্ময়কেই চাপা দিতে হয়। আবার অনেক সময়ে নামী শিল্পীদের পাশাপাশি ম্রিয়মাণ অন্য শিল্পীদের গান অসহ্য মনে হয়। বর্তমান বৎসরে ভুল স্বর্গে প্রসূন দাসগুপ্ত যখন 'পাতাল যে তুই' সাহসভরে জানাইয়া দেন, তখন আমরাও জানিয়া লইয়া সাবধান হইতে পারি।

প্রঃ নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় আঙ্গিক বিষয়ে বিশদ আলোচনা কর।

উঃ নৃত্যনাট্য ব্যবস্থাপনার অসুবিধা প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হইয়াছে (এক নং প্রশ্নের উত্তর দেখ)। সময়স্বল্পতার জন্য মহলায় বেশী সময় ব্যয় করা অনুচিত। নায়ক-নায়িকারা নিজের পছন্দমত নাচিয়া যাইবে এবং সখীরা একে অপরের হাত দেখিয়া নাড়াইলেই চলে। এইজন্য সখীদের নাচ প্রায়শই অবিন্যস্ত। আলোকচিত্রী সঙ্গত কারণেই নায়ক-নায়িকার একত্র কম্পোজিশনে ফ্লাশ

চিত্রাঙ্গদা

মারেন। মঞ্চে পার্টিশন দিয়া সংগীতশিল্পীদের বসিবার প্রথা এখন বাতিল হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-সদনে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ থাকায় ফ্লাশব্যাক বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মঞ্চ ঘুরানো যাইতে পারে। 'মুড লাইটের' জন্য থিয়েটারে ব্যবহৃত স্পটের সংগে পূজা প্যাণ্ডেলে ব্যবহৃত লালনীল আলোর চাকা উদ্দাম নৃত্যে ঘুরান যাইতে পারে। আবহ সৃজনে দীনেশ চন্দের জন্য প্রত্যেকেই শরণার্থী। দীনেশ চন্দ 'মায়ার খেলা'র টাইটেল বা অনেক স্থলে নিজের পছন্দমত আবহ সৃষ্টি করিতে পারেন। অন্যথা তাঁহাকে নৃত্য ও সংগীতকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। মহলার সময় অল্প বলিয়া মধুর রস, করুণ রস, বীর রস সর্ব ক্ষেত্রেই এইরকম হওয়া বিধেয়। নচেৎ বাঁধা জিনিসের বাহিরে যাইতে হইলে মঞ্চে অসুবিধা ঘটিতে পারে। গানের শিল্পীদের জন্য প্রতি গানের আগে তবলায় তিনটি ঘা অথবা গানের প্রথম লাইন বাজানো বাঞ্ছনীয়; অন্যথায় শিল্পীদের বড়ই অসুবিধা হয়। অনেক সময়ে অন্য সুরবিস্তারে অনভিজ্ঞ শ্রোতার সঙ্গে ভিন্ন জগতে লইয়া যায়। যেমন 'নীরবে থাকিস সখি ও তুই নীরবে থাকিস' গান না বাজাইয়া একটু অদল-বদল ঘটিলেই 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যে হল' বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। পোশাকের ব্যাপারে চিন্তার কিছু নাই। মুনি, ঋষি, প্রহরী সব পোশাকই সরবরাহকারীদের কাছে প্রস্তুত থাকে। কালমৃগয়া, বাল্মীকিপ্রতিভা বা বিদায় অভিশাপে অনেক সুবিধা আছে। ক্যালকাটা পুলিস বেংগল পুলিসের পোশাক যেমন সর্বত্র এক, তেমনি মুনি, ঋষি, দস্যুর 'আগ মার্কা' পোশাক আছে। যাত্রায়, থিয়েটারে, চলচ্চিত্রে, নৃত্যনাট্যে একই পোশাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নৃত্যনাট্যের অন্য চরিত্রের জন্যও পোশাক প্রস্তুত থাকে। সর্বত্র একই-রকম পোশাক ব্যবহৃত হয়—ঋতুবদলে ফুলমালা পরিবর্তিত হয়। শ্যামা নৃত্যনাট্যে কসমোপলিট্যান পোশাক ব্যবহারই রীতি। শ্যামা ও বজ্রসেন নৌকায় চড়িয়া অনেক দূরে রাজস্থানে গিয়া পৌঁছায় —আহিরিনীদের রাজস্থানী পোশাকে ইহার পরেই প্রেমিকযুগল পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসে—'ওকে দেখে মনে লাগে ব্যথা'—'ও কথা কেন নেয় না কানে' গানে পল্লীরমণীদের বাংলাদেশের পূজারিনীর পোশাক। প্রদেশান্তরের লোক ভাবিতে পারেন, রাজস্থান হইতে কোন্ নদীবক্ষে ইহারা বঙ্গদেশে আসিল। ভৌগোলিক ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ত্বরান্বিত প্রযোজনার জন্য রেডিমেড মাল সংগ্রহটাই নীতি হিসেবে বিবেচ্য।

প্রঃ ব্যাখ্যা লিখ (নৃত্যের মুদ্রা সহযোগে)।

উঃ (ক) 'তাই আমি দিনু বর—'

এই গানটি চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের মদনের কণ্ঠের গান। চিত্রাঙ্গদার সু-রূপের জন্য মদনের আরাধনা সাঙ্গ হইলে মদনদেব আবির্ভূত হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে বর দেন। 'বর' বুঝাইতে হাত উল্টাইয়া প্রণামান্তে 'বেঁচে থাক' গোত্রের ভঙ্গি করিতে হইবে। 'কটাক্ষ' চক্ষুর ব্যবহার হিন্দী ফিল্মের মত 'তিরছি নজর' দিতে হইবে। পঞ্চম বুঝাইতে পাঁচটি আঙুল এবং 'শর' দেখাইতে তীর ছুঁড়িবার ভঙ্গি করিতে হইবে। 'মনমোহিতে' বিগলিত হাস্য, 'নারী বিদ্রোহী'তে পা দিয়া অ্যাটেনশন বা সাবধান'-এর ভঙ্গি, সন্ন্যাসী বুঝাইতে ধ্যানরত বুদ্ধদেবকে মনে রাখিতে হইবে। ভুজপাশে বন্দী করিবার সহজ মুদ্রা দেখাইবার পরে বিদ্রূপহাস্য বুঝাইতে 'ম্যাকলনীস' হাসি অবশ্য পালনীয়।

(খ) 'আমার এ পথ তোমার পথের থেকে' এই গানটি প্রেম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। নৃত্যনাট্য-রূপে বিচ্ছেদ-বিরহ বুঝাইতে এই গানটি খুব কার্যকরী। উপরন্তু এই গানটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হিট রেকর্ড। সুতরাং সকলেরই জানা—মহলার প্রয়োজন হয় না। 'আমার এ পথ' বলিতে নিজেকে দেখাইয়া সরীসৃপের মত আঁকাবাঁকা ভঙ্গি করিয়া অনেক দূরে গেছে বেঁকে বুঝাইতে হইবে। 'আমার ফুলে' বুঝাইতে পাঁচটি আঙুল

শাপমোচন

গায়ত্রীজপের মত জড় করিতে হইবে এবং 'তোমার মালা' বুঝাইতে হাত বৃত্তাকারে প্রসারিত করিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে হইবে। 'তোমার বাঁশি' দেখাইতে বাঁকা শ্যাম এবং 'কেঁদে বাজে' বলিতে মাথায় হাত দিয়া বসিতে হইবে। 'শ্রান্তি লাগে পায় পায়' বুঝাইতে শনৈঃ পায়ে কপালের ঘাম মুছিতে হইবে, 'তরুছায়া' দেখাইতে হাতটি সম্পূর্ণ উপরে তুলিয়া বক দেখাইতে হইবে। 'সাথীহারার গোপন ব্যথা' বুঝাইতে পায়ের উপর ভর করিয়া পাক মারিতে হইবে। 'পথিকরা যায় আপন মনে' বলিতে দৌড়াইয়া সামনে আসিতে হইবে এবং 'আমারে যায় পিছে রেখে' বলিবার সংগে পিছু হটিতে হইবে।

(গ) 'হৃদয়ের এ-কূল ও-কূল দু কূল ভেসে যায় সজনী' এই গানটি প্রেম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কীর্তনাংগ এই গানে নৃত্যশিল্পীর সম্ভাবনা প্রচুর—'হৃদয়' যুক্ত শব্দে নায়িকাদের নৃত্যরীতি 'এ' মার্কা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই তথ্যটি বুঝাইবার পর শিল্পীর স্বাধীনতার উপর ছাড়িয়া দিতে হয়। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

প্রঃ দর্শকের মোহ বা ক্লান্তির জন্য কি কি করণীয়?

উঃ মোহ বিস্তারের বিভিন্ন পন্থা প্র... সব প্রশ্নে আলোচিত। ইহা সম্ভব হইলে ... দূর হইতে পারে। শিল্পীদের যেমন মহলায় অসুবিধা, আভিজাত্যগর্বী দর্শকেরও সেই অসুবিধা থাকিতে পারে (বিঃ দ্রঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেখ)। ইহাতে ক্ষতি নাই। মাল্লার প্রযোজিত ভুল স্বর্গে স্বর্গীয় কর্মকাণ্ডে দেখা যায় (শ্যামল দত্ত রায়-কৃত সুন্দর আধুনিক মঞ্চসজ্জার প্রেক্ষাপটে) ঢেঁকিতে ধান-কোটার দৃশ্য। প্রমাণিত হইল, 'ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে'। বাঙালী প্রথার বিপরীত কিছু রবীন্দ্র সদন করেন না। রবীন্দ্র সদন কখনই বিজ্ঞাপিত সময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন না। প্রবেশদ্বার খুলিবার কিছু পরে সেতার বাজিতে থাকে। সন্ধ্যায় সকালের রাগও অভাবনীয় নয় (পূর্বে শানাই বাজিত)। নির্ধারিত সময়ের পনেরো মিনিট বা আধ ঘণ্টা পর মধুর 'মাইক ফিটিং ভয়েস'-এ উচ্চারিত হয় 'আজ রবীন্দ্র জন্মোৎসবের.... ..দিনে. নিবেদিত হচ্ছে.......উপস্থিত কলাকুশলী শিল্পী ও সুধী দর্শক রবীন্দ্র সদনের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'

অনুষ্ঠিত নৃত্য-নাট্য

শাপমোচন—সোস্যাল এনটারপ্রাইজ, চিত্রাঙ্গদা—ত্রিবেণী, কচ ও দেবযানী—কিংশুক, শ্যামা—এ বি ডি এনটারপ্রাইজ, ভানুসিংহের পদাবলী—ভানুতীর্থ, শেষ বর্ষণ—মালঞ্চ, চণ্ডালিকা—সুরমন্দির, কালমৃগয়া—বাণী বিদ্যাবীথি, রাজারানী—সুরতীর্থ, মায়ারখেলা—স্বরলিপি কালচারাল ইউনিট, ভুল-স্বর্গ—মাল্লার, বাল্মীকি প্রতিভা—প্রভৃতি।

ফটো ঃ সঞ্জীব চ্যাটার্জী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সংগীত ও নৃত্য। শান্তিদেব ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পাঁচ টাকা।

শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে আলোচনা শুরু করেন গত শতাব্দীর শেষ দশকে 'শিক্ষার হেরফের' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ দিয়ে। তারপর সারা জীবন যত প্রবন্ধ পাঠ করেছেন বা প্রকাশ করেছেন এবং নানা প্রসঙ্গে যত ভাষণ দিয়েছেন তার পরিমাণ অল্প নয়। তার মধ্যে যেমন একদিকে আছে শিক্ষার নামে যে অ-শিক্ষা বা কুশিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল (এবং আছে) তার ব্যর্থতা, অবাস্তবতা ও পীড়নের তীব্র সমালোচনা, তেমনি অন্য দিকে প্রকাশ পেয়েছে যথার্থ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এবং সেই শিক্ষাকে দেশে কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়মূল করবার পথনির্দেশ। শিক্ষা সম্বন্ধে কবির এই চিন্তা ভাবনার পরিপূরক হিসেবে ১৯০১ সালে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় সামান্য উপকরণ নিয়ে গুটি কয়েক ছাত্র এবং কয়েকজন আদর্শবাদী শিক্ষক নিয়ে শান্তিনিকেতনে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে যে আবাসিক বিদ্যালয়ের পত্তন করেন নানা বাধা বিঘ্ন সংকটের মধ্য দিয়ে পরবর্তী চল্লিশ বৎসরব্যাপী তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যেই তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় ধ্যান ধারণার উপযুক্ত প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। 'পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শ' বলতে যা বোঝায় সেই রকম একটা স্পষ্ট নিরূপিত অতি নির্দিষ্ট blue-print যদিও তিনি কখনো পেশ করেন নি এবং যদিও তাঁর প্রতিষ্ঠান কোনো-দিনই সুসম্পূর্ণতার পঞ্চম অংকে পৌঁছে পর্যন্ত পায়নি, তথাপি শিক্ষার সাধারণ সমস্যা এবং আশ্রম বিদ্যায়তনের বিশেষ সমস্যাদি নিয়ে তিনি যত রচনা প্রকাশ করেছেন বা ভাষণ দিয়েছেন সেগুলি তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিধি-ব্যবস্থা, গ্রহণ-বর্জন, পরিবর্তন প্রসার, সাফল্য অসাফল্যের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে পর্যালোচনা করলে শিক্ষা বলতে তিনি কী বুঝেছেন, দেশের জন্য তিনি কোন শিক্ষাকে প্রার্থনীয় মনে করেছেন এবং কী ভাবে কতটুকুই বা তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত করতে পেরেছেন তার একটা স্পষ্ট রূপ আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়। বিশেষ করে ১৯২১ সালে যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে পরিণত হল তারপর থেকেই কবির শিক্ষাদর্শ সম্পূর্ণভাবে না হলেও অন্তত সুসংগত স্পষ্ট মূর্তি নিয়ে দেখা দিল। দেখা গেল যে শিক্ষাকে কবি আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করলেন তার শিকড় রইল দেশের মাটিতে কিন্তু তার শাখাপ্রশাখা প্রসারিত হল বিশ্ব সংস্কৃতির আকাশে। ধীরে ধীরে যে বিভাগগুলি গড়ে উঠলো সেগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় একদিকে যেমন প্রাচ্য প্রতীচ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার বিশেষ কেন্দ্র প্রস্তুত তেমনি সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং সেই সঙ্গে শ্রীনিকেতনে মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, চর্ম-শিল্প, দারুশিল্প প্রভৃতি Crafts শিক্ষার কেন্দ্র, গ্রামোন্নয়নের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান-কেন্দ্রের পত্তন হল, সেই সঙ্গে খেলাধুলো, নাটকাভিনয়, সংগীতের আসর, ঋতু-উৎসব এবং অন্যান্য আশ্রমিক অনুষ্ঠান, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সূত্রে আগত বিদেশী সহ-যোগীদের সংস্পর্শ ও সম্মেলন। সব মিলিয়ে ছিল শান্তিনিকেতনের বিশেষ 'কালচার', তার মধ্য দিয়েই ছিল বিশ্বের সঙ্গে তার যোগ। এই কালচারের পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতখানি মূল্য, সংগীত নৃত্য, চিত্রকলা কারুশিল্প ইত্যাদিরও ততখানি। শুধুমাত্র পাণ্ডিত্যের চাষ নয়, একটা মুক্ত কিন্তু ছন্দোময় এবং সানন্দ সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে সজীব, সজাগ এবং সক্রিয় মনের উদ্বোধন—এই ছিল কবির শিক্ষাদর্শের শেষ ফলশ্রুতি। এই ফল তিনি যে জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ লাভ করতে পেরেছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গতিটা ছিল সেই পূর্ণতারই অভিমুখে।

আলোচ্য পুস্তিকাটিতে লেখক শ্রীশান্তিদেব ঘোষ কবির ঐ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শের তাত্ত্বিক আলোচনার দিকে যাননি, এমন কি, সংগীত ও নৃত্যের সঙ্গে কবির শিক্ষাদর্শের যোগটা ঠিক কোথায় তারও তাত্ত্বিক বা নান্দনিক আলোচনাকে তাঁর রচনার বিষয়ীভূত করেননি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটা মূলত ঐতিহাসিক, যদিও তিনি শান্তি-নিকেতনের বিস্তৃত ইতিহাস লিখতে বসেননি। একটি সীমায়িত ক্ষেত্রে তিনি একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সূত্রের অনুসন্ধান করেছেন : সংগীত ও নৃত্য কখন কীভাবে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-ক্রমের অন্তর্ভুক্ত হল এবং তার শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিবর্তনক্রমের রূপটি কী ছিল। বিষয়টি সম্বন্ধে যে আলোচনা করবার এবং মতামত দেবার বিশেষ অধিকার তাঁর আছে সেটা সকলেই স্বীকার করবেন, কেননা তিনি যে কেবল আজন্ম শান্তিনিকেতনবাসী তাই নয়, প্রায় আ-শৈশব তিনি এই শিক্ষায়তনের সঙ্গে, বিশেষ করে সংগীতভবনের সঙ্গে, যুক্ত ছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল তার দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে বহন-করেছেন। তদুপরি রবীন্দ্র সংগীতের শিল্পী, শিক্ষক এবং প্রচারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

খানিকটা ব্যক্তিগত স্মৃতির উপর নির্ভর করে, খানিকটা গবেষণামূলক অনুসন্ধানের যোগে তিনি যে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন এবং প্রবন্ধে যুক্তি সহযোগে সাজিয়ে তুলেছেন তাতে সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা প্রচলনের ইতিহাস সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে। গানের চর্চা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গোড়া থেকেই ছিল, দীনেন্দ্রনাথের সান্ধ্য-ক্লাসে সকলেরই অবারিত আহ্বান ছিল, সেখান থেকে কবির সদ্য রচিত গানের স্রোত আশ্রমের সর্বত্র প্রবাহিত হত। ছাত্ররা গান শিখতো মনের আনন্দে, গান অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী আশ্রমে যোগ দিলে হিন্দুস্থানী রাগ-সংগীত চর্চারও সুবিধে হল। এটাও ছিল শিক্ষাক্রম-বহির্ভূত। আচার্য নন্দলাল বসু যোগ দিলে যে চিত্রবিদ্যার

শুরু হল তাও ছিল সেই রকম আনন্দের শিক্ষা। সংগীত, নৃত্য, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য ইত্যাদি বিধিবদ্ধভাবে শিক্ষা-ক্রমের অন্তর্ভুক্ত হল বিশ্বভারতীর পত্তনের পর নূতন কর্মসূচী প্রবর্তনের কালে। তারপর থেকে সংগীতের নানা বিভাগ, নৃত্যের নানা ঘরানার চর্চা বিধিবদ্ধভাবেই প্রচলিত হল। সে হিসেবে মনে হয় পুস্তিকাটির যথার্থ শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল 'বিশ্বভারতীর শিক্ষাক্রমে সংগীত ও নৃত্য'।

লেখকের আলোচনাটি মূলত ঐতিহাসিক হলেও তিনি তথ্যাদি সাজিয়েছেন কয়েকটি বিতর্কমূলক প্রশ্নের দিকে লক্ষ রেখে। সেই প্রশ্নগুলির যথেষ্ট সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান। এই শ্রেণীর প্রাসঙ্গিক প্রতিপাদ্যগুলির প্রথমটি ইতিহাস সমর্থিত। লেখক স্পষ্ট করেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায়তনটি কোনো সময়েই একটি যন্ত্রের সম্পূর্ণতা ও নির্দিষ্টতা নিয়ে দেখা দেয় নি, তাই কোনো সময়েই একটা স্থাণু অচলায়তন হয়ে ওঠে নি, জন্মাবধি প্রাণধর্মের প্রবর্তনায় বাধাবিঘ্ন, অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও প্রসার ও বৃদ্ধির পথেই গেছে। তা না হলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিশ্বভারতী হত না, ব্রহ্মচর্যাশ্রমই থেকে যেত। লেখকের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য হল এই যে, অন্তত কবির জীবদ্দশায় সব বিদ্যাকেই সমান মূল্য ও অধিকার দেওয়া হত তার কারণ তাঁর লক্ষ ছিল সাংস্কৃতিক সমন্বয়, কোনো বিষয়ে নিরঙ্কুশ বিশেষজ্ঞতার চর্চা নয়। সেই জন্য অন্তত কবির জীবদ্দশায় বিশ্বভারতীর বিভাগগুলির মধ্যে হরিজন ছিল না। লেখকের তৃতীয় প্রতিপাদ্যটি সা ম্প্র তি ক সংগীত পলিটিক্স-এর ক্ষেত্রে বিশেষ সময়োপ-যোগী। লেখক দেখিয়েছেন শান্তি-নিকেতনে সংগীত শিক্ষার শুরু রবীন্দ্র সংগীত দিয়ে হলেও, কোনো সময়েই বিশ্বভারতী বিশেষভাবে রবীন্দ্র সংগীতের কেন্দ্র হিসেবেই পরিকল্পিত বা গঠিত হয় নি। বিশ্বভারতী হবার পূর্বেই কীভাবে রাগ-সংগীত শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল এবং পরে বিশ্বভারতীর সংগীতভবনে কীভাবে হিন্দুস্থানী রাগ-সংগীত শিক্ষার বিশদ ব্যবস্থা হয়, নানা পাঠক্রম ও অন্যান্য দলিল উদ্ধৃত করে লেখক তা স্পষ্ট করেই বিবৃত করেছেন।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে আগ্র তাঁরা গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত হবেন অ যাঁরা গবেষণা করছেন বা করবেন তাঁ কাছে এটি বিশেষ মূল্যবান ব বিবেচিত হবে মনে করি।

সৌরীন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা : সুব্রত রু সম্পাদিত। আশা প্রকাশনী। ৭৪ মহা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। পনে টাকা।

দেড়শো পৃষ্ঠার বই, দাম পনে টাকা। টাকার অংকে মূল্যটা যত চমক বইটি ততটা নয়। সম্পাদক সুব্রত রু তাঁর তিনবাক্যের মুখবন্ধে যা বলছে তা একবাক্যে দাঁড়ায় : রবীন্দ্রনাথের গা সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাক অনেকের রচনা থেকে নির্বাচিত এ সংকলনে রবীন্দ্রসংগীতের একা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাঠকের কাছে ফু উঠবে।

কিন্তু তা ফুটে ওঠেনি। কারণ ১৪৩ পৃষ্ঠার মূল গ্রন্থাংশে আঠারো রচনার স্থান সংকুলান করতে হয়েছে ফলে দীনেন্দ্রনাথ পেয়েছেন চার পৃষ্ঠা অমিয় চক্রবর্তী আড়াই পৃষ্ঠা, আব সয়ীদ আইয়ুব সওয়া পাঁচ পৃষ্ঠা, স্বাম প্রজ্ঞানানন্দ আড়াই পৃষ্ঠা, সৈয় মুজতবা আলি সাড়ে তিন এবং শৈলজা রঞ্জন মজুমদার তিন পৃষ্ঠা। কাজেই এমন সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ নিবন্ধ দিয়ে সম্পাদক যে 'রবীন্দ্রসংগীতের একা পূর্ণাঙ্গ চিত্র' ফুটে উঠবে আশা করেছেন তা খুবই উচ্চাশা এবং সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর অনতি গভীর ধারণার প্রকাশ।

সম্পাদক সুব্রত রুদ্রকে বরং সংকলক বললে মানানসই হয় এবং সে সংকলনও স্পষ্টত উদ্দেশ্যহীন। শান্তিদেব ঘোষের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব', বুদ্ধদেব বসুর মৌলিক ভাবনাসমৃদ্ধ 'রবীন্দ্রনাথের গানে পদ্য ও গদ্য', ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর অদ্বিতীয় সৃষ্টি 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম' জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও ভারী রচনার সঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'ময়ূরকণ্ঠী' থেকে নির্বাচিত হালকা লেখা কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নীললোহিতের হঠাৎ দেখা' থেকে উৎকলিত ব্যক্তিগত উৎসার কি কোন স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ উদ্দেশ্যসাধন করে? তার চেয়েও জরুরী প্রশ্ন হল, এ সংকলনের অনেকগুলি নিবন্ধ কি আদৌ নিবন্ধ এবং সেগুলি কি সম্পাদকীয় বক্তব্য অনুযায়ী 'ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন জায়গায়'? যেমন ধরা যাক, আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'গীতাঞ্জলি পর্ব' শিরোনামের শীর্ণ নিবন্ধটি আসলে তাঁর 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' বইয়ের ৫০ থেকে ৫৩ পৃষ্ঠার খণ্ড উদ্ধৃতি। নিবন্ধটির প্রথম বাক্য : 'এই ভরা সরোবরের কাব্য রবীন্দ্রনাথের নাম ছড়িয়ে দিলো স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে জাপান এবং আর্জেন্টিনা পর্যন্ত।' প্রথমেই ঠোক্কর খান পাঠক, এই ভরা সরোবরের কাব্য কোনটি? দোষ আইয়ুবের নয়, সম্পাদকের। প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যে আইয়ুবের অঙ্গীকার ছিল : 'অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-কাব্যেও আমার অ-ভক্ত মন মুগ্ধ;

তা নিয়ে যে-সমস্যার উদয় হয় তার আলোচনা একটু পরেই করবো।'

না, পরে আর আলোচনাটি মেলে না। কারণ, সম্পাদক লেখাটি তাঁর মর্জি মত কেটেছেঁটে আমাদের দিয়েছেন। কর্তনের এমন নির্মম ও শোচনীয় নমুনা এ বইয়ে অনেক আছে। 'সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান' নামক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ২৯৩ পৃষ্ঠার বইটি থেকে আড়াই পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করা হয়েছে 'রবীন্দ্র সংগীতের ব্যাপ্তি, আত্মবোধ ও বৈশিষ্ট্য' শিরোনামে। রচনাটি মূল বইয়ের পূর্বাভাষের একটি উপ-অধ্যায়। প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের গান' রচনাটি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইয়ের অংশবিশেষ। সুতরাং, পাঠকের পক্ষ থেকে প্রশ্ন উঠবে, এই সব অতিপ্রসিদ্ধ বইয়ের আংশিক উৎকলন কিভাবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে বলা যাবে? বস্তুত রচনাগুলি বিভিন্ন জায়গায় নয়, বরং স্পষ্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মৌলিক অখণ্ড চিন্তাপ্রবাহের আকর নানা বইয়ে সুবিন্যস্ত হয়ে আছে। সেখান থেকে যদৃচ্ছভাবে একটি অংশ তুলে আনা অবাঞ্ছনীয়।

অবশ্য সুব্রত রুদ্র উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিভ্রান্ত হলেও প্রয়াসের আন্তরিকতা কিছু কিছু দেখিয়েছেন। বেতার জগৎ থেকে সংগৃহীত ধূর্জটিপ্রসাদের নিবন্ধ, গীতবিতান পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'রবীন্দ্রসংগীতের সামাজিক মূল্য' এবং এক্ষণ পত্রিকা থেকে পুনরুদ্ধৃত সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা' এই বইয়ের উজ্জ্বল অংশ। সম্ভবত এমন কতকগুলি রচনার জন্য বইটি সকল সংগীতজিজ্ঞাসুকে সংগ্রহ করতে প্ররোচিত করবে। লেখক নির্বাচনের দিক থেকে সুব্রত রুদ্র খুব উঁচু মনের পরিচয় রেখেছেন, সেই সঙ্গে যদি কিছু তরুণ লেখকের রচনা থাকত তবে তাঁর প্রয়াস সর্বাঙ্গীণ হত।

এই বইয়ে সংকলিত নানা বিখ্যাত রচনা এবং প্রশ্নাতীত যোগ্যতাসম্পন্ন তার লেখকদের ব্যক্ত মতামত সম্পর্কে সমালোচনা করা উচিত হবে না। দীনেন্দ্রনাথ, ধূর্জটিপ্রসাদ, মুজতবা আলী বা বুদ্ধদেব বসুর মত প্রয়াত ব্যক্তির বিশ্বাস ও প্রত্যয় সম্পর্কে আমাদের অন্য মত জানিয়ে লাভও নেই। অন্যান্য লেখকদের বক্তব্য তর্কাতীত না হলেও শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণীয়। তবু তাঁদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্যের নতুনত্ব ও বলিষ্ঠতা আমাদের চমকে দেয়। তিনি নির্ভীকভাবে জানিয়েছেন, রবীন্দ্রসংগীতকে যথার্থ সংগতের সাহায্যে নতুনভাবে পরিস্ফুট করতে হবে। এবং এ বিষয়ে 'অবিলম্বে কিছু না করলে, কেবল স্বরলিপির শুদ্ধতা নিয়ে মাতামাতি করে বা সংগীত শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে বা সিনেমা-রেডিও-গ্রামোফোনে গান গেয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।'

বলতে দ্বিধা নেই, সমস্ত বইটিতে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে সত্যিকারের ভাবিষ্যচিন্তা শুধু সত্যজিতের রচনায় রয়েছে।

সুধীর চক্রবর্তী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

অতুল বসু : সাফল্য এবং বৈফল্য

যাঁরা আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে সত্যিই কিছু দান করে গেছেন তাঁদের প্রদর্শনী মাঝে মাঝে হওয়া প্রয়োজন। জুলাই মাসে অতুল বসুর প্রদর্শনী আমাদের নতুন করে কিছু ভাবনা-চিন্তার সুযোগ দিয়েছে (আকাদমী অব ফাইন আর্টস)। অতুল বসুর এবার যে সব ছবি ছিল তার কিছু আকাদমী অব ফাইন আর্টসের সংগ্রহের, বাকিগুলি তাঁর ছেলেদের উত্তরাধিকার।

একজন শিল্পীকে সমূহ বুঝতে গেলে, ব্যক্তিগত এবং সাধারণ সংগ্রহশালায় কোথায় কোথায় তাঁর কাজ আছে, তার একটা রঙীন সচিত্র তালিকা প্রয়োজন। ছবি বাদ দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনী রচনা করেও একজন বড় (মেজর) শিল্পীর অবদান বিচার করা অসম্ভব। কিটস বা ভ্যান গগের চিঠি মূল্যবান কেবল প্রথম জনের কবিতা আর দ্বিতীয় জনের ছবির আলোকে। সোনার তরী স্বর্ণ ফসলের সম্ভার নিয়ে চলে যায়। ফসল যদি কেউ ফলিয়ে থাকে এবং তার হদিশ যদি অন্যদের জানা থাকে তবেই "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ" এটা বোঝা যাবে। আর বোঝা গেলেই "তব জীবনের রথ পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার"। অথচ আমরা যারা গত ত্রিশ বছরে অতুল বসুর কীর্তির সৌরভ আঘ্রাণ করেছি, তারা অনেকেই জানি না অতুল বসুর শিল্পকৃতি কোথায় কোথায় কাদের কাছে আছে। এদেশে তাঁর সুনির্বাচিত কাজের রঙীন প্লেট দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বেরবে না। ফলে আকাদমী, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল এবং পুত্রীয় সংগ্রহ ছাড়া গোটা মানুষটিকে চেনার উপায় নেই। ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে তাঁকে আবছা দেখছি, সুতরাং তাঁর ওপর অবিচারের সম্ভাবনা বেশী।

অতুল বসুকে আমরা জানি, প্রচুর অর্ডারী কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রদর্শনীতে অন্য ধরনের কাজ ছিল। যদিও রেখাচিত্র, পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন এবং সৃজনধর্মী কাজ ছিল তবুও রচনাধর্মী কাজের অভাব চোখে পড়ে। আমার বিনীত অনুমান, এদেশে রচনাধর্মী কাজ করার সুযোগ তিনি পাননি। আরেকটা বিষয় বোঝা যায়, যে কাজ তিনি শিখে গেছিলেন এ দেশ থেকে এবং যে কাজ তিনি বিলাত থেকে শিখে ফিরেছিলেন, তার নন্দনতত্ত্ব ধরার মতো প্রস্তুতি এদেশে অংগুলিমেয় লোকেরই ছিল। রহস্য করে বলা যায় স্পেস স্যুটের বদলে ডিনার স্যুট বানাবার মজুরাই তাঁকে নিতে হয়েছিল। দুর্ভাগ্য, তাঁর নয় আমাদের।

তাঁর অবদান বিচার করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে তিনি বিলাতের রয়েল আকাদমীতে প্রশিক্ষিত। সেই সময় স্বৈপায়ন ইংরেজ আধুনিক চিত্রকলার মূল ধারা থেকে আপন দেশজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। সেই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সিকার্ট থেকে অগাস্টাস জন পর্যন্ত শিল্পীর তুলি চালনায় প্রথাগত তৈলচিত্রে যে মেজাজ আনতে পেরেছিলেন—যা শেষ বিচারে প্রধানুগ অথচ ভিন্ন স্বাদের—অতুল বসুর কাজে তার আভাস পাওয়া যায়। সেইখানে তরুণতর প্রজন্ম তাঁর দৃষ্টান্তে উপকৃত এবং অনুপ্রাণিত হবেন বলেই আমার ধারণা। বস্তুত সেই সময়কার ভারতীয় তৈলচিত্রের যে কুরুচি—যা অন্তত ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও, হেমেন মজুমদারের কাজকে কীটদষ্ট ফুল বলে প্রতিভাত করে—তার বিন্দুমাত্র সংক্রমণ অতুল বসুর পরিজ্ঞাত চিত্ররাজিতে দেখা যায় না। অথচ তদানীন্তন কালে স্বদেশীয়ানা এমনই প্রবল পরাক্রান্ত যে অতুল বসু তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সময় হলো—এবার আমাদের পূর্বসুরীদের অবমূল্যায়ন ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করা যাক। মনে রাখতে হবে, স্বদেশীয়ানার চাপে যখন তৈলচিত্রাঙ্কনকে গোমাংসভক্ষণতুল্য পাপ বলে মনে করা হতো, তখন নাইটের মতো ঘাঁটি আগলেছেন তৈলচিত্ররূপ দুর্গের এই দুর্গেশ।

ব্রিটিশ চিত্রকলার শাখা নদী, মহাদেশীয়, অর্থাৎ আধুনিক চিত্রকলার মূল নদীস্রোতে মিশেছে বহু পরে। হারবার্ট রীড মহাশয় "কনটেমপোরারী ব্রিটিশ আর্ট" (পেলিকান '৫১, '৬৪, লণ্ডন) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, বৃটিশ চিত্রকলায় আধুনিক চিত্ররীতির গোড়াপত্তন হয় খুব দেরীতে—১৯১০-এ অর্থাৎ সেজানের মৃত্যুর বছর চারেক পরে। বৃটেনে এই শতাব্দীর শুরুতে চিত্রকলায় ক্ষমতাসীন দু জন কেলটিক রোমান্টিক [illegible] রেকওয়েন এবং অগাস্টাস [illegible]ন। আর ভাস্কর্যে ইহুদী কুলোদ্ভব জেকব এপিস্টন। অন্য দিকে উইলসেন স্টিয়ার এবং ওয়ালটার সিকার্ট (শুনেছি অতুল বসু শেষোক্তর ছাত্র ছিলেন), ইমপ্রেসেনইজম থেকে সরে এসে নিজেদের নিও রিয়ালিস্ট বলতে শুরু করেছেন। অথচ এই যে আঞ্চলিক আন্দোলন ব্রিটেনে শুরু হলো দুম

।, তা আবার ফস করে ফুরিয়ে ।। রজার ফ্রাই এবং ক্লাইভ বেলের য় সমালোচক সিকার্টকে যেমন ুবাদ দিয়েছেন দেগাকে গ্রহণ করার । তেমনি আবার সেজানকে অস্বীকার ার প্রক্রিয়াকে বলেছেন আত্মহত্যার ন।

অতুল বসুর চিত্র-বিচারে এসব ঙগ এসে পড়া স্বাভাবিক। তিনিও ার কাজ দেখে অনুপ্রাণিত—যদিও নগ্নিকা নারীর স্থাণু—কিন্তু ান এবং পরবর্তী আন্তর্জাতিক ার সঙ্গে তিনি আত্মিক সংযোগ তে পারেননি। পরিস্থিতি প্রতি- ্ ছিল। তা ছাড়া তখনকার দিনের । এবং বুদ্ধিজীবীরা অবনীন্দ্রনাথের মকে বাতিল করে, যামিনী রায়কে ঃ হয়তো সংগত কারণেই) নাচা- চ শুরু করেছেন। এঁরা লক্ষ লেন না যে, যামিনী রায়ের কায়ন অন্য শিল্পীদের মুক্তির ার নয়। অতুল বসুকে তাঁরা ধর্তব্যের ্য আনেননি। সুধীজনপ্রশংসা- ঞত অতুল বসু প্রতিকৃতির মজুরা ়য় মূল চিত্রধারা থেকে সরে গেলেন। ল আধুনিক আন্তর্জাতিক চিত্র- ার মূল ধারার সঙ্গে মিশে যাবার ুপ্রেরণা তিনি লাভ করলেন না। ্যালকাটা গ্রুপ"ও বিদ্রোহী হয়ে কে সারথি হতে বলল না। তিনি ধুনিক চিত্রকলার কৃষ্ণ নন, কিন্তু রাম। উপেক্ষিত, অনাদৃত, কিন্তু য়োগান্তের নায়ক।

এখনও তাঁর কাজ দেখলে মনে ়, তৈলচিত্রের যে তান লয় তাঁর ায়ত্তে ছিল তা আজও ভারতবর্ষে না কোন তৈলচিত্রশিল্পীর নেই। কাদম্বরীর সংগ্রহের আলোচনা ইতি- ুর্বে এই পাতায় করেছি, সুতরাং াই প্রসঙ্গে আর যাব না। তাঁর ্রদের সংগ্রহের গুটিকতক কাজ ছিল রুণ। এর মধ্যে বিলাতে ছাত্রজীবনের কটি চিত্র—নগ্নিকা নারী মাঝখানে াড়িয়ে আছে, আর ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে বি আঁকছেন। পেছন থেকে আঁকা -পেলব, নরম—ভালবেসে আঁকা—ত্বক. াড়াবার ঋজু ভঙ্গী—সম্পূর্ণ। । পাশের ছাত্ররা ঝাপসা আউট অব ফোকাস। রচনা, বর্ণিকাভঙ্গ, অঙ্কন -সামগ্রিক বিচারে এ ছবির জুড়ি মকালীন ভারতবর্ষে নেই। তেমনি জলখড়িতে আঁকা শেষ বয়সের রাতালার বারান্দার রেলিঙে রোদে দওয়া দুধসাদা ওয়াড় পরানো বালিশ। াধারণ আটপৌরে জীবনকে তিনি াপন ক্ষমতাবলে শিল্পের আঙিনায় াকার মর্যাদা দিয়েছেন। তেমনি াছতলায় গ্রামবাসীর শব দেখার দৃশ্য —সম্ভবত দুর্ভিক্ষের সময় আঁকা, জলমাধ্যমে কাঠের ওপর গাছপালা নয়ে এমন একটা নিস্তার তৈরী করেছেন যে তার তুলনা নেই। বাগানে ফুল আর রোদের লুকোচুরি খেলাও মৎকার। কিছু কিছু ছবি আমাদের তীব্রভাবে টেনে নেয়।

নিঃশব্দে তাঁকে আমার প্রণাম ানিয়ে হল থেকে বেরিয়ে এলাম।

[illegible]

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

সবুজ দ্বীপের রাজা

ছিমছাম ভঙ্গিতে, টানটানভাবে গল্প বলেছেন তপনবাবু। এবং টেনশনটা অনেকদূর পর্যন্ত ধরে রেখেছেন। ছবিটির মূল আকর্ষণ ঘটনাস্থল আন্দামান। সযত্ন এবং ব্যাপক লোকেশান শুটিং-এ জায়গাটিকে, বিশেষ করে সমুদ্র এবং জঙ্গলকে কাজে লাগিয়েছেন তপন-বাবু। সমুদ্র এবং জঙ্গল রঙিন বাংলা ছবিতে বড় একটা আসেনি এমনি নাটকীয়ভাবে এবং কোনো জাহাজও বাংলা ছবির এতটা কাজে লেগেছে বলে মনে পড়ছে না। সুতরাং নতুনত্বের আকর্ষণ তো একটা আছেই। আসলে গল্প বাছাই, এবং গল্পের ট্রিটমেন্ট—উভয় দিক থেকেই ছবিটি উতরে গেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী। আনন্দমেলায় এ-কাহিনী পড়তে পড়তে এর দুটি গুণ বিশেষ-ভাবে আমাদের আকৃষ্ট করে। এক. কাহিনীর বৈচিত্র্য এবং দ্রুতি। দুই. কাহিনীর ঘটনাস্থল এবং চরিত্রের মধ্যে সম্ভাব্য সিনেমার বীজ। মূল কাহিনীর শেষাংশ সিনেমায় পরিবর্তিত হয়েছে আমূলভাবে। এই পরিবর্তন সাহিত্য থেকে সিনেমায় ভাষান্তরের জন্যে যে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, এমন কথা ভাবতে পারছি না। তবে এই পরিবর্তনের ফলে মূল কাহিনীর শেষাংশের বেদনাবোধ ছবিতে অতোটা নেই। দ্বিতীয়ত, ছবিটিকে যে-ভাবে শেষ করা হয়েছে, যে মুহূর্তে শেষ করা হয়েছে, সেখানে সেইভাবে এ-কাহিনী নিশ্চয় শেষ হতে পারে।

ছবির কাহিনী সূচিত হয়েছে চমকপ্রদভাবে। এই অংশে দেখানো হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে কেমন করে আকাশ থেকে বহু নক্ষত্র আর তারকার বিবর্তনের মধ্যে ছিটকে পড়লো এক আশ্চর্য আগুন পৃথিবীর বুকে। বিদেশী ছবির সঙ্গে তুলনা করলে তপনবাবু তাঁর ছবিতে যতটুকু এই সুদূর শূন্যের নাক্ষত্রিক নাটক দেখাতে পেরেছেন তা কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের দেশে একটি বাংলা ছবির জন্যে সেকেলে যন্ত্রপাতি এবং ছোটো পুঁজি নিয়ে এর চেয়ে বেশি ভিস্যুয়াল অ্যাডভেনচার—বিশেষ করে মহাশূন্যে —নিশ্চয় সম্ভব নয়। কিন্তু ছবির শুরুতে যতখানি চমৎকারিতা, এবং বিশেষ করে ছোটোদের জন্যে ভিস্যুয়াল মজার ব্যাপারটা যেভাবে এসেছে ছবির অন্তিমে ঠিক তেমনি একটি মজার ব্যাপারকে তপনবাবু সেভাবে অনু-পুঙ্খের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রেখে, কাজে লাগাননি। অবশ্যই বলছি সেই হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর বুকে নেমে আসা আশ্চর্য রহস্যময় আগুনের সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় এবং শেষ সাক্ষাৎদৃশ্যটির কথা।

আমরা যা দেখি তাতে মনে হয় কুয়োর মধ্যে একটি লালচে আলো জ্বলছে। এবং ঐ আলোর রহস্যময়তা এবং ভয়ংকরতা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। এবং যখন দেখি ঐ আশ্চর্য আগুন চুম্বকের মতো একটি মানুষকে টেনে নিচ্ছে, তখনো নয়। দৃশ্যটিকে আগাগোড়া বড় বেশি নকল মনে হয়, মনে হয় তপনবাবু যেন বড় অল্পে সন্তুষ্ট হয়েছেন এই দৃশ্যে। যেহেতু এই কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছে এই আগুনের রহস্য, আগুনের সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের দৃশ্যটি নিশ্চয় অনেক বেশি দাবী করছে।

এ ছবির সবচেয়ে প্রশংসার্হ প্রচেষ্টা রয়েছে লোকেশান শুটিং-এ। পোর্ট ব্লেয়ারকে কাজে লাগানো হয়েছে মোটামুটি ব্যাপকভাবে। এবং যেহেতু বাংলা ছবিতে আন্দামানের দৃষ্টিগ্রাহ্য আবেদন এ পর্যন্ত খুব সামান্যই কাজে লাগানো হয়েছে, তপনবাবুর ছবিতে প্রায় বিদেশের নতুনত্ব এসেছে। বিশেষ করে গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে ধরা নৌকো করে ভিলেনদের গতিবিধি, কিংবা বোটের দৃশ্যটি—যে দৃশ্যে কিশোর-নায়ক কাকাবাবুর নৌকোটিকে টানতে টানতে সমুদ্রের তীরে নিয়ে আসছে, — সিনেম্যাটিক বিন্যাসে প্রশংসনীয়। জাহাজের দৃশ্যগুলি খুবই বাস্তবধর্মী এবং বিশেষ করে জাহাজের সিকোয়েনসে সম্পাদনার জন্যে সুবোধ রায় প্রশংসা পাবেন। আমার চোখে অন্তত জাহাজের সিকোয়েনসে রঙের ব্যবহার ভালো লাগলো, বিশেষ করে ডেকের বিস্তৃত দৃশ্যগুলিতে। হয়তো তার জন্যে দায়ী আকাশ এবং সমুদ্রের নরম সুদূরপ্রসারী নীল। পোর্ট-ব্লেয়ারের রাস্তাঘাটও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ ভালো লাগলো ন্যাশনাল হোটেলের সামনে তোলা দৃশ্যটি, যেখানে বিক্রী হয় ঝাঁটা, বালতি, উনুন। ঐ একটি দৃশ্যে শহরটিকে পর্দার বুকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা রয়েছে অনেকখানি। তপনবাবু ইচ্ছে করলে আর একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দিতে পারতেন শহরটির সঙ্গে তাঁর দর্শকের—তাতে ছবির টেকসচারে ঘনতা আসতো অনেক বেশি। এ-ছবির কিশোর নায়কের সঙ্গে একটি নতুন শহরের ক্রমিক পরিচয়ের মধ্যে হিউমার এবং ছোটো ছোটো মজার সুযোগ ছিলো সাংঘাতিক। ছেলেটি তো কাকাবাবুর সঙ্গে বেড়াতেই এসেছে—সুতরাং সে যে একটু বেড়াতে বেড়াতে শহরটিকে নানাভাবে চিনবে সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। ছোট্ট একটা মজা শুধু একবারই আসে—

[illegible]

পণ্ডিত ও অবশোভ

ছবিটি একটু বেশি গুরুগম্ভীর। একটি দৃশ্যে রবি ঘোষ খুবই ভালো, কিন্তু তাঁকে প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। তাঁকে আরো বড়ভাবে আনা যেত ছবিতে। বিপদ এবং অ্যাডভেনচারের মধ্যেও হিউমার আসতে পারতো। আমার ছোট্ট একটি টাচ খুব ভালো লেগেছে—ব্লেডের খাপ থেকে ভিলেন সর্দার বার করলো একটি ম্যাপ।

অরুণাভ অধিকারী অভিনীত কিশোর-নায়ক এক কথায় চমৎকার। কিল ঘুঁষি লাথির দৃশ্যে ছেলেটির তৎপরতা ছোটো দর হাততালি পাবে। জাহাজে যে-দৃশ্যে সে ভিলেনদের হাতে পড়ছে সেখানে অরুণাভর অভিনয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অরুণাভর হাসিটি খুব সুন্দর—এবং তপনবাবু সেটি খুব ভেবেচিন্তে দু-একবার ব্যবহার করেছেন। মিঃ দাশগুপ্তর ভূমিকায় অরুণ মুখার্জি অভিনয়-বর্জিত অভিনয় করেছেন। বাংলা ছবিতে এ জিনিস খুব কম চোখে পড়ে। বিপ্লব চ্যাটার্জি অল্প বুদ্ধি, রগচটা, তোতলা ভিলেন কিছুটা কমিক রিলিফের মতো। সমিত ভঞ্জর কাকাবাবু খুব সচেষ্ট, যত্নবান প্রয়াস। কিন্তু বয়েসের দিক থেকে সমিত মেক-আপ নিয়েও এ-চরিত্রের জন্যে নয়, সুতরাং তাঁকে প্রথম থেকেই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

রাহুকেতু

"হ্যালো রাহু, মায় কেতু বোলরাহা হুঁ"। দুই শয়তানের এই টেলিফোন সংলাপ থেকে এ ছবির বিষয়বস্তু এবং মান সম্বন্ধে কিছু ইশারা পাওয়া যায়। ছবির পরিচালক বি আর ইশারা অবশ্য ইশারায় বোঝাতে ভালোবাসেন না। তাঁর চলচ্চিত্রের ভাষা অতি প্রকট, স্থূল এবং কদর্য। একটি কোনো রকমে খাড়াকরা কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু আধ-সেদ্ধ যৌনদৃশ্য। বিন্দু ও প্রেমনাথের নৃত্যদৃশ্যের মতো গা-ঘিনঘিনে যৌনতা হিন্দি ছবিতেও কম দেখা যায়। সিনেমার দোহাই দিয়ে এই ধরনের পারভারশান কিভাবে ছাড়পত্র পায়? সরাসরি চুম্বনে আপত্তি, অথচ কোন গঙ্গাজলে ডুবিয়ে এহেন দৃশ্যগুলি তৈরী হয় যে এদের বিষয়ে কোনো আপত্তি ওঠে না? চুম্বনের কথা ছাড়ুন, একাধিক বিদেশী ছবির অপরিবর্তিত সংস্করণে সঙ্গম দৃশ্যও দেখেছি, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা স্বাভাবিক ও বস্তুধর্মী মনে হয়েছে। রাহুকেতুতে যদি সরাসরি সঙ্গম দৃশ্য থাকতো তা হলে কি সেনসর বোর্ড সেটিকে অনুমোদন করতেন? আমার প্রশ্ন, এই নৃত্য দৃশ্যটি যেখানে আগাগোড়া পারভারসানের চূড়ান্ত দেখানো হয়েছে, কিভাবে, কোন আন্তরিক পবিত্রতার জোরে, সেনসরের সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এলো? সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো, এই যৌনতা আর খুনখারাপির সঙ্গে একটু ধর্ম, দর্শন এবং সাইকোলজির আচার মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়ে আসা হয়েছে ডক্টর জেকিল এবং মিস্টার হাইডের সেই পুরোনো নীতিমূলক কাহিনীর একটি আধুনিক আভাস এবং এমন কি "সোয়ামী" বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ পর্যন্ত! ইশারা সায়েবের জন্যে অবশ্য কিঞ্চিৎ মায়া অনুভব করছি। ভারতবর্ষে যদি পুরনো ফিলম তৈরির একটি অনুমোদিত পৃথক ইনডাস্ট্রি থাকতো, তা হলে তাঁকে ধর্ম দর্শনের পথে এমনি ঘুর ঘুর করতে-করতে তাঁর গন্তব্যে আসতে হতো না। এ ছবিতে দুই শয়তানের ভূমিকায় রয়েছেন প্রেমনাথ এবং প্রাণ। এবং এদের সায়েস্তা করতে রয়েছেন সি বি আই অফিসার শশীকাপুর। শশীর প্রেমিকা হিসেবে রয়েছে মেড-টু-অর্ডার ঝি রেখা। শশী জেমস বণ্ডের গুরু। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। প্রাণের এক গুণ্ডাকে শশী মারলেন এক ঘুঁষি। ঘুঁষিটা এতই দ্রুত যে ঘুঁষির আওয়াজটা ঘুঁষির সঙ্গে নিশ্চয় পাল্লা দিয়ে পারলো না। তাই আগে দেখলাম ঘুঁষি। তার খানিক্ষণ পরে শুনলাম, ঢিশুম! ঘুঁষি নয়, যেন স্কাইল্যাব পড়ার শব্দ। ততক্ষণে গুণ্ডটা স্রেফ উড়ে গিয়ে পড়লো বাড়ির দেয়ালে। গুণ্ডার গতি তখন স্পেসরকেটের মতো। সেই আঘাতে দেয়াল ধ্বসে গেল এবং গুণ্ডাটা ল্যান্ড করলো বাড়ির বাইরে। এই সব দুর্ধর্ষ দৃশ্যের পরিকল্পনা করেছেন ভীরু দেবগণ। তাঁর নাম কেন ভীরু হল বুঝলাম না। তবে শশীর ঘুঁষি লাথি কিল চড় কিছুই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিলেনদ্বয়কে কাত করতে পারছে না। যে ভয়াবহ অস্ত্রের দ্বারা প্রেম এবং প্রাণ দুজনেই ধরাশায়ী হচ্ছেন সেটির নাম বিবেকের দংশন। প্রাণের মধ্যে যে ডক্টর জেকিলটি বাস করে তার নাম করিম মিয়া। এই করিম মিয়াই প্রাণের হাতে শেষ পর্যন্ত বিষ-পাত্র তুলে দেয়। এবং প্রেমও আত্মঘাতী হন। তবে মরবার আগে একটি বড় পুণ্যময় কাজ করেন। স্ত্রীকে রিভলবারের গুলিতে ছাতু করে দেন, কেননা এই স্ত্রীটি লেডি ম্যাকবেথের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ওদিকে শশী বাড়ির ঝির সঙ্গে নাচানাচি শুরু করে দেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের মিলনে[illegible] পথ থেকে রাহুকেতু উভয়েই অপসারিত হয়। অধিকাংশ ছবিটিই আমাদের এই পৃথিবীতে তোলা হয়েছে বলে মনে হয় না। পৃথিবীতে কোথাও অমন টাকাকড়ি হয় বলে আমাদের জানা নেই, যেমন হলো প্রেম ও বিন্দুর নৃত্য দৃশ্যে। পৃথিবীর ভিলেনদের বাড়িতে কখনো-কখনো লোডশেডিং হয়, প্রাণের মতো সুইচ টিপলেই দরজা খুলে সুন্দরী মেয়েরা বেরিয়ে আসে না। এবং পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণের জোর অনেক বেশি বলে এক ঘুঁষিতে আক্ষরিক অর্থে পগারপার করিয়ে দেওয়া যায় না।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

সাজ্জাদ আলী খাঁর একক আসর

পাকিস্তানের কিশোর গায়ক সাজ্জাদ আলী খাঁর গান শুনলাম সবরঙ্গ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে (ভারতীয় ভাষা পরিষদ, জুলাই ১)। এ সম্পর্কে বড় গুলাম আলী খাঁর নাতি এবং এর বয়স ১০ বৎসর। অনুষ্ঠানের আকর্ষণই

ঘোষণা করা হয় যে সাজ্জাদ তার কাকা ওস্তাদ মুনেওয়ার আলী খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে।

এই অনুষ্ঠানে সাজ্জাদ যা গাইল সেটি তার নিজে নিজে শুনে শেখা গান। তার গেয়ে প্রমাণ করেছিল যে তালিম জীবনব্যাপী সাধনা সত্ত্বেও সাধারণ শিল্পী যা করতে পারে না প্রতিভাবান শিল্পী তা বিনা তালিমেই করতে পারে। প্রথমার্ধে সাজ্জাদ গেয়েছিল গোলাম আলীর কিছু বিখ্যাত ঠুংরী ও দাদরা— রাজা বালম পরদেশী, তিরছি নজরিয়াকে বাণ, মরণ মুঠে য়ুঁ, বাজুবন্ধ, ইয়াদ পিয়াকি আয়ে এবং আয়ে না বালম। গোলাম আলীর প্রত্যেকটি অলংকার, তান ও স্বর সমষ্টি নিখুঁতভাবে গেয়ে সাজ্জাদ সত্যই অবাক করলো। তবে ওর গলা মাঝে মাঝে ধরা-ধরা শোনাচ্ছিল—বোধ হয় কলকাতা সফরকালীন গলার উপর অত্যাধিক চাপ পড়েছিল।

দ্বিতীয়ার্ধে ছিল গজল—চুপকে চুপকে, চলতে হো, ও যে হামনে তুমনে করার থা, মহব্বত করনেওয়ালে, রঞ্জিসে হি ও জিনকে হোঁঠোপে হাঁসি। এই অর্ধে সাজ্জাদের গলাতে কোন খুঁত ছিল না এবং গানগুলির সুরমাধুর্য ও অলংকারসমৃদ্ধি ছিল লক্ষণীয়। প্রয়োজনীয় জায়গায় ধাঁ করে পাঞ্জাব অঙ্গের তান লাগানোর কায়দাটিও ছিল দর্শ।

নীলাক্ষ গুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**
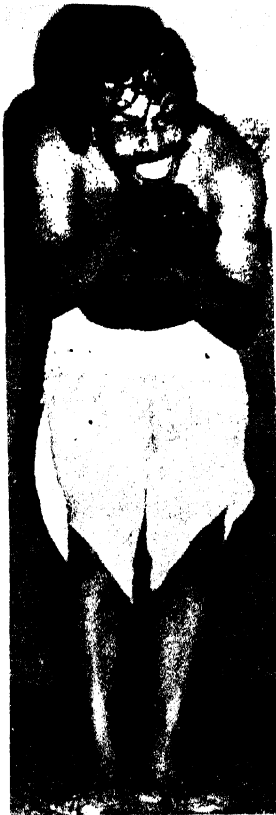
দ্বীপান্তর

পারিবারিক সূত্রে তারাশংকরের নাট্য অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারাশংকর যেমন নতুন সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন, গান লেখায় তেমন তিনি সিদ্ধ শিল্পী। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি সেই যুগের প্রথাকেই অনুসরণ করেছেন : কোন নতুন পথ নিয়ে ভাবাতে পারেন নি— যেমনটি পেরেছিলেন সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে বনফুল এবং অচিন্ত্যকুমার তাঁদের একাংকগুলিতে। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাট্য রচনায় আর এক স্বতন্ত্র স্বাদ এনেছিলেন। মনোজ বসুর নাটক কিংবা শিবরাম চক্রবর্তীর একাংক এবং নাটকে শ'-এর মেজাজ প্র না বি-র নাটক এমনকি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুক নাটকেও যে লাইন থেকে বেরিয়ে আসার স্পর্ধা ছিল, তারাশংকরের নাটকে সেই স্পর্ধা নেই ; একই লাইনে হেঁটে যাওয়া আছে –যদিও 'দুই পুরুষ' ও 'কালিন্দী' মঞ্চসফল নাটক। সামাজিক নাটক ছাড়াও ঐতিহাসিক নাটক 'বালাজী বাজীরাও' (?) প্রথার ব্যতিক্রম নয়।

চিত্রন সংস্থা রঙ্গনায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বীপান্তর' মঞ্চস্থ করলেন। মনু মুখার্জীর নির্দেশনায় তাঁরা অদ্ভুত দক্ষতায় পিছনে ফিরে গেলেন। নাটককে কোথাও যুগোপযোগী না করে সম্পূর্ণভাবে বিগত যুগে ফিরে গেলেন। এই পদ্ধতিতে

নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গেল। সারা রাত ধরে কলকাতার পাড়ায় অথবা পল্লীগ্রামে হ্যাজাকের আলোয় থিয়েটারের কথা মনে পড়ে গেল। প্রতি দৃশ্যের পরে যবনিকা পতনের সময় বাদাম-ভাজা অথবা গুরুজনকে লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার নিষিদ্ধ আনন্দ। ঘুমচোখে শেষ রাত্রে বাড়ি ফেরা. সকালে উঠে খালি গায়ে দাঁতনরত বীররসের নায়ক—ঘটি হাতে বিড়ি খেতে খেতে জঙ্গলে গমনোদ্যত নায়িকার দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকতাম। অবিকল সেই স্মৃতি। শুধু রঙ্গনায় প্রতি দৃশ্যে পর্দা পড়েনি এবং স্ত্রী ভূমিকায় মহিলারাই ছিলেন।

এই পুরোনো রীতির একটা সুবিধে আছে যে, কণ্ঠ দৌর্বল্য ফাঁকি দেওয়া যায় না। চিত্রণের প্রযোজনায় মনু মুখার্জীর দাপট রাবণের মত। প্রথম দৃশ্যেই জ্যোতি মুখার্জীর কালী বাগদীকে দেখেই বোঝা যায় অরুণকিরণ বসুর ব্রাহ্মণত্বের গর্ব লুপ্ত প্রায় : শুধু চেহারায় নয়— জ্যোতি মুখার্জীর কণ্ঠের ব্যাপ্তি, অভিনয়ক্ষমতা এতই সমৃদ্ধ, যেখানে কেউ আধুনিক ফাঁকিবাজিতে রপ্ত হয়ে পার পাবেন না। একমাত্র ছোট ভূমিকায় অখিল চ্যাটার্জী চরিত্রের একটি আধুনিক ভাষা দিতে পেরেছেন (ম্যানারিজমটা বাড়াবাড়ি)। আর সমভাবেই আর একটি টাইপ চরিত্র স্বরূপ অবকাশেও গলার জোরে নয় অভিনয় জোরেই ছাপ ফেলে যায় সে হল 'গুরুচরণ'। অপরাজিতা দাশগুপ্তা ও চন্দ্রাণী হালদার নাটকের দাবি মিটিয়েছেন। এবং চন্দনা সেনগুপ্তা চরিত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন, যদিও নাটকটি তাঁর অভ্যাসের বাইরে। পদ্মর ভূমিকায় বিস্তৃতি ছিল অনেকখানি, চন্দনা সেনগুপ্তা সম্ভবতর দোটানায় পড়েছিলেন—আধুনিক অথবা বিগত প্রথা গ্রহণে। ফলে তাঁর অভিনয় যখনই দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছে, তখনই দর্শক সচেতন হয়েছেন তাঁর অভিব্যক্তিতে। বাপী দাস গান গেয়েছেন ভাল। কিন্তু নেপাল দাসের আবহ আড়াই ঘণ্টার মধ্যে সর্বসাকল্যে পাঁচ মিনিট নীরব থেকেছে কি-না সন্দেহ। ফলে প্রথমে শ্রুতিকটু সুরেলা ঘোষণা সত্ত্বেও মনে দ্বিধা থাকে, এটি তারাশংকরের 'দ্বীপান্তরে'র নাট্যচিত্র অথবা আকস্মীয় দ্বীপান্তরের সুরচিত্র।

সেণ্ট জোয়ানের বিচার

ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটারের সেণ্ট জোয়ান ১৯৭৯ সালের একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা, কিন্তু স্মরণীয় নয়। ব্রেখট অবলম্বনে এই নাটক মঞ্চায়নে ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটারের পরিশ্রম ছিল প্রচুর। যে পরিশ্রম তথ্যানুসন্ধানের জন্য করা হয়েছে, সেই পরিশ্রম যদি প্রযোজনা শৃংখলার জন্য, ব্যতিক্রমী অভিনয় ভাবনার জন্য, সর্বোপরি অনুবাদ যদি নিকট আত্মীয়তা রচনায় কলকাতার দর্শককে আলোড়িত করতে পারত।

সংস্থার শিল্পীরা, বেশীর ভাগ সময় এই যুগের একটি বিশেষ অভিনয় রীতিকে 'দত্তক' নিয়েছেন। সুতরাং রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। অনেক সময়, 'বহুরূপী'র মুখোশ এঁটেছেন, তাইতে নিজস্ব চেহারা বেরিয়ে আসে না। কারো কারো বাচনভঙ্গিতে 'নান্দীমুখ'ই আছে, সুখপ্রদ উপসংহৃতি নেই। বলাই বাহুল্য, এই মিশ্র প্রতিক্রিয়া অবিমিশ্র নাট্যরস সৃষ্টিতে বাধা।

একটি নতুন দলের প্রযোজনায় আটাশজন অভিনয় শিল্পীকে সমবেত করা প্রায় দুঃসাধ্য ঘটনা। অভিনয়ে বিশপ কঁশোর ভূমিকায় দিব্য ভট্টাচার্যের বাচনভঙ্গীতে চরিত্রটি মর্যাদাবান হয়ে ওঠে—যদিও কয়েক জায়গায় তাঁর কথা জড়িয়ে যায়। বারর্ণিতার ভূমিকায় ইন্দ্রাণী লাহিড়ী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বচ্ছন্দ। কিন্তু অনুবাদ আড়ষ্টতার জন্য তাঁর অভিনয় সবসময় প্রেক্ষাগৃহে ঈপ্সিত সমর্থন আদায় করতে পারে না। সেণ্ট জোয়ানের ভূমিকায় কাজল চৌধুরী সেই স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি করতে পেরেছেন যা নিজস্ব ভাবনায় স্মরণীয় জীবনের বিস্ফোরণ আধুনিকরূপে হয়ে উঠেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ঘটনা এখনও তার প্রয়োজনীয়তা হারায়নি। এই পঞ্চদশ শতকের ব্যাখ্যায় মঞ্চসজ্জায় মনু দত্ত ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু সেই মঞ্চোপকরণ এত বিরাট যা অতি বোঝার মত সমস্ত প্রযোজনার বুকে চেপে বসে। আট বছরের মেয়ের বেনারসী পরে হিমসিম খাওয়ার মত অবস্থা, কোন সময় পর্দা সম্পূর্ণ সরে না, পর্দার অন্তরালে বিচার দৃশ্যে তিনচারজন রয়ে যায়, তাঁরা এগিয়ে এলে নজরে আসেন। পর্দার সামনে যখন সূত্রধরের কাজ চলে, পিছনে তখন মালপত্র সরানোর শব্দে মনে হয় 'লাগেজ ভ্যানে' মাল তোলা হচ্ছে। পোশাকেও কালানুগত্য মেনে চলা হয়েছে এবং রূপসজ্জায় শক্তি সেন প্রত্যেককে যথাযথভাবে রূপায়িত করেছেন। তথ্যানুসন্ধানের গবেষণা মঞ্চ ও পোশাকে যতটা সুফল দেয়, অন্য ক্ষেত্রে ততটা নয়—কারণ মঞ্চ ও পোশাক স্থান, অন্য সবকিছুই চলমান।

অনুবাদ যদি পৌরাণিক হয়, তবে আধুনিক কালে তা আড়ষ্ট মনে হবেই। বিরাট শিল্পী সমাবেশ কিন্তু কম্পোজিশনের কোন বালাই নেই। প্রথম বাজারের দৃশ্যে সবাই এলোমেলো হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু জটলা সৃষ্টি করে। হাসির কথায় শিল্পীরা নিজেরাই হাসেন, দর্শকের হাসি আদায় করতে পারেন না। অভিনয়ে আড়ষ্টতার জন্য। দুটি গানে পার্থ সেনগুপ্ত সুর ভাল করেছিলেন, কিন্তু কথা কিছুই বোঝা গেল না। হিমাদ্রী ভট্টাচার্যের শব্দগ্রহণে প্রথম ভূমিকাপাঠ কানে ভালো ধরায় (জানি না এই ভূমিকা মাইকে পড়া হয়েছে কিনা)। গানের সময় মঞ্চে সংলাপ না থাকলেও মৃদুস্বরে বাজে। প্রয়োজনীয় রেকর্ড থেকে সঙ্গীত সংকলিত, কিন্তু বিক্ষুব্ধ ফ্রান্স বা আগুনের দৃশ্যে শব্দের কোন ভূমিকা নেই; ভূমিকা না থাকলেও ক্ষতি ছিল না যদি সামগ্রিক অভিনয় জোরালো হয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার অক্লান্ত পরিশ্রমে, অসীম আন্তরিকতায়; অপরিমিত উপচারে প্রতিমাকে সাজিয়েছেন—শুধু
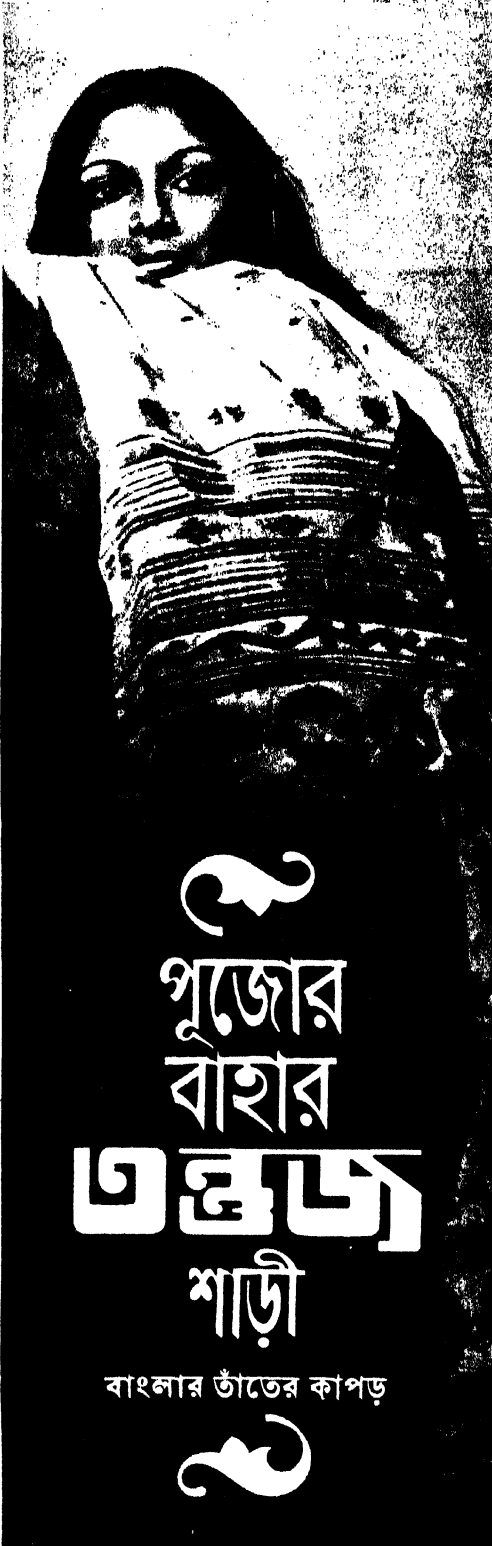
চক্ষুদানটি অসম্পূর্ণ। সেই দায় নির্দেশক পুরোহিত অনল গুপ্তের।

দেবাশিস দাশগুপ্ত ছবি অজয় দত্তগুপ্ত

'সাত ভাই চম্পা' ও 'শাপমোচন'

বোন পারুলকে মাঝখানে রেখে তার চারপাশে খুশি-খুশি ফুটে আছে সাত ভাই চম্পা। আটটি ফুলের আড়ালে আটটি শিশু, শিশিরমঞ্চের পর্দা সরে যেতেই মিট-মিট করে হাসে, যেন বলতে চায়, আমরা খুব ছোট্ট তবু আমরা শিল্পী, তোমাদের আনন্দ দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। 'বিমূর্ত'র প্রযোজনায় এইভাবেই শুরু হয় শিশু নাটিকা 'সাত ভাই চম্পা' (লিপিকার : সমর চট্টোপাধ্যায়)। এই দৃশ্য আমাদের ভালো লাগে। শিশুদের স্বভাবসুলভ সারল্য অনায়াসেই সোহাগ কেড়ে নেয়। কিন্তু শিশুদের নিয়ন্ত্রণে বয়স্করা যে কতটা দায়িত্বহীন এদিনের অনুষ্ঠানে তারও কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। পরিচালক রীতা মুখার্জী শিশুদের কাছ থেকে শুধু অভিব্যক্তি দাবি করেছেন; কথা ও গান শুনিয়েছেন টেপ চালিয়ে। কিন্তু টেপটি কি তিনি আগে

সাত ভাই চম্পা-র একটি দৃশ্য

পরখ করে দেখেন নি ! যদি দেখে থাকেন সে ক্ষেত্রে অস্পষ্ট কথা ও সুরের ঐ ক্ষীণ টেপটি চড়া টিউনে বাজিয়ে একই সঙ্গে শ্রোতাদের বিরক্ত ও শিশুশিল্পীদের বিভ্রান্ত করলেন কেন ? খারাপ লাগে ! পারুল ও তার ভাইদের সঙ্গে এদিন আলোচ্য নাটিকার অন্যান্য চরিত্রে যে সকল শিশু শিল্পী হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে রীমা, জুলিয়া, সোনিয়া, তাপসী, অপরাজিতা, চন্দনা, অনিন্দিতা, নিবেদিতা, রণিতা, নবনীতা, মুমু ও পৃথা।

বিরতির পর দীনেশ চন্দ্রের আবহ-সংগীত, রীতা মুখোপাধ্যায়ের নৃত্য ও স্বরাজ বসুর সংগীত পরিচালনায় মঞ্চস্থ হলো 'শাপমোচন'। কবিগুরুর এই বহুল প্রযোজিত নৃত্যনাট্যে বিমূর্তের পক্ষে এদিন যে সকল শিল্পী মঞ্চে এসেছেন, কিংবা নেপথ্যে থেকে কণ্ঠ দিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই চর্চা বা অভিজ্ঞতায় প্রশ্নে এখনো অপরিণত। সঙ্গত কারণেই নৃত্যনাট্যের সর্বতোভদ্র রূপ কোনো অভিজ্ঞ দর্শক তাঁদের কাছে আশা করেন নি। আর যাই হোক, দর্শকদের এই ক্ষমাস্নিগ্ধ আগ্রহের মর্যাদা বিমূর্ত রেখেছেন।

'জ্বালা' এবং 'বিধি ও ব্যতিক্রম'

নামে বিশেষ ভার নেই। অবলম্বন গুণ। এবং এর ভিত্তিতেই দু'টি নাটকের উন্নত প্রযোজনার অধিকারী হয়েছেন ক্লাস থিয়েটার। এঁরা এঁদের বর্তমান প্রযোজনায় একই সঙ্গে উপস্থিত করেছেন ঋত্বিক ও ব্রেশটকে। এর যদি কোনো তাৎপর্য থাকে তবে তা এই—ঋত্বিকের 'জ্বালা' এবং ব্রেশটের 'বিধি ও ব্যতিক্রম' (একসেপশন অ্যান্ড দ্য রুল) দু'টি নাটকেরই শুরু 'বিধি' দিয়ে কিন্তু লক্ষ্য 'ব্যতিক্রম' প্রতিষ্ঠায়। এই লক্ষ্যে একজন বাস্তবমুখী আবেগকে মূলধন করেন, অন্যজন বিবেচনাসাপেক্ষ বুদ্ধি। একজন নাটকের মধ্যকার চরিত্র দিয়েই কাজটা সারেন, অন্যজন নির্ভর করেন সূত্রধারের মন্তব্যে। ঋত্বিকের ভোলা বলে—'আর কতদিন একা লুকিয়ে কাঁদা, আর মানুষ হয়ে মানুষের বাইরে থাকা, অত্যাচারীরা নাকচ হয়ে যাবে। তার রাস্তা তৈরী। খালি মানুষের মধ্যে এসো'। অন্য দিকে নাট্যঘটনার শেষে ব্রেশটের সূত্রধার মন্তব্য করে—'এখন আমাদের শুধু প্রশ্ন, এটা (বিত্তশালীর শোষণ ও অত্যাচার) কি চলবেই ? যা কিছু স্বাভাবিক বলে (নাটকে) দেখানো হ'ল, সেটা কি সত্যি স্বাভাবিক ? আর যদি স্বাভাবিক না হয় তা হলে তো একটা কিছু করা দরকার। ওরা ওদের বিধিকেই হাতিয়ার করেছে, কিন্তু আমরা এখনও ব্যতিক্রমের কাজ শুরু করলাম না।' লক্ষ করার ব্যাপার, ঋত্বিক তাঁর নাটক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন, আর ব্রেশট চেয়েছেন দর্শকদের বিবেচনা-সাপেক্ষ উদ্দীপনা। কুশলী প্রয়োগ-নির্দেশনা ও অভিনয়-কৃতিত্বে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দুটি নাটকের উপস্থাপনাই যথাযথ—সেই অর্থে সার্থক। এবং এই সার্থকতার মধ্যেই সূচিত নাট্যপ্রয়োগ সম্পর্কিত ক্লাস থিয়েটারের অনুসন্ধিৎসা। বলা বাহুল্য, তা [illegible]কদের আগ্রহ, জিজ্ঞাসা, চিন্তা ও [illegible]ল্যায়নের প্রতি আস্থা রেখে।

'জ্বালা' এবং 'বিধি ও ব্যতিক্রম' দুটি নাটকেরই নির্দেশনার দায়িত্বে রয়েছেন রমেন সরকার—সোজা কথায় এক আত্মবিশ্বাসী শিল্পী ব্যক্তিত্ব। তাই প্রচলিত বুজরুকি ছাপিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে কাঙ্ক্ষিত শিল্পবোধ। শিল্পীদের মঞ্চ-ব্যবহার, সংলাপ প্রক্ষেপণ, অভিব্যক্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আলোচ্য ক্ষেত্রে

বিধি ও ব্যতিক্রমের একটি দৃশ্য

নবাবুর নির্দেশনা একালের বাংলা
চর্চায় নিঃসন্দেহে অতুলনীয়
ন্তের দাবি রাখে। পূর্বে
ধিকবার প্রযোজিত এই
ট নাটকই তাই তাঁর হাতে ভিন্ন
দায় প্রতিষ্ঠিত, আবিষ্কৃত নতুন
্যায়নে। রমনবাবুর এই নির্দেশনায়
র চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিকল্পনা
র সহযোগিতা করেছে। অন্য দিকে
ভনয়-শিল্পীরা প্রতিটি চরিত্র
য়ালেই ছিলেন অসংশয়িতচিত্ত।
পীদের মধ্যে রয়েছেন পঙ্কজ প্রামা-
, সন্দীপ দাস, অসীম চক্রবর্তী,
য় সাহা, রেখা সরকার, জয়ন্ত
দার, প্রশান্ত রায়, রূপক রায়, রিতা
. প্রসূন মল্লিক, সমীর চট্টোপাধ্যায়
থে। নির্দেশনা ও অভিনয়ে মাত্রাজ্ঞান
কোনো সফল প্রযোজনার জরুরী
। ক্লাস থিয়েটারের প্রতি এই
বোধকর অভিনন্দন যেহেতু তাঁরা
অর্জন করতে পেরেছেন। শুধুমাত্র
দ্যা সমস্যা করে যাঁরা নিজেদের দৈন্য
ক রাখার চেষ্টা করেন তাঁরা ক্লাস
য়টারের কাছে জরুরী ক্লাস করতে
রন,—প্রস্তাবটা রেখেই ভাবছি,
ম্ভাবিতা তাঁদের যথার্থ ছাত্র হ'তে
ব তো?
। দাস ছবি : শীতল দাস

আলোচনা। শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

লেজারঞ্জন-সংবর্ধনা

বিজ্ঞানের রসায়ন রাগরাগিণীর
য়নে পূর্ণ হয়েছে যাঁর জীবনে, তিনি
ই জুলাই মাসে আশির ঘরে পা
লেন। সুরসপ্তয়ন আয়োজিত তিন-
নব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তিদিবসে—
৪ জুলাই সন্ধ্যায়—রবীন্দ্রসদনে
তি'র পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো
ল তাঁকে—রবীন্দ্রসংগীতাচার্য
লেজারঞ্জন মজুমদারকে। ছোট্ট মেয়ে
পা মুখোপাধ্যায় পরালো তাঁকে
লা, সুদর্শনা ভট্টাচার্য কপালে এঁকে
ল চন্দনতিলক। নেপথ্য থেকে ভেসে
ল সম্মেলক গান—সুরের গুরু,
ও গো সুরের দীক্ষা। ক্রমশ এগিয়ে
ল সুরভিক্ষু সেই সম্মেলক স্বর.
বীন্দ্রসদনের দক্ষিণ দুয়ার খুলে
ক্ষাগৃহে ঢুকে পড়ল বৈতালিক। সে
ক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সেই সুরময়
ছিল বাঁদিকের দরোজা দিয়ে অদৃশ্য
য়ে গেল মঞ্চের নেপথ্যে। 'শ্রুতি'র
ন্যতম কর্ণধার অশোকতরু বন্দ্যো-
ধ্যায় তখন পরবর্তী অনুষ্ঠানের
ন্য বাল্মীকির রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে
পেক্ষমান। সামনে আসতে পারলেন
। সাজঘর থেকে তাঁর পাঠানো
ঠিটি পড়া হল। মানপত্র তুলে দেওয়া
ল সুরের গুরুর হাতে। সংক্ষিপ্ত
বু সুন্দর স্মৃতিচারণ করে শৈলজা
নের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন
মিতাভ চৌধুরী এবং অরুণ বাগচী।
সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে শৈলজা-
নের ভাষণ ছিল অনতিদীর্ঘ।
জেকে তিনি 'ছাত্রধনে ধনী' বলে
র্না করলেন। জানালেন, 'অশোক-
রু' নামটি তাঁরই দেওয়া। রবীন্দ্র-
থকে তিনি প্রথম দেখেন ১৯২১
লে। বর্ষামঙ্গল উৎসবে ঠাকুর
ড়িতে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাঁর

প্রথম শোনা গান—'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' সেই অনুষ্ঠানে গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর তাঁকে শেখানো রবীন্দ্রনাথের স্বকন্ঠে গীত গান—'পথহারা তুমি পথিক যেন গো।' সেই ১৯২২ সাল থেকে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া অন্য কোনো গান যে তিনি গাননি, আবেগময় কণ্ঠে জানালেন শৈলজারঞ্জন। সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্র-সংগীতে নানা ধরনের বিকৃতির ও রবীন্দ্রসংগীতকে 'হাটের মাল' করে তোলার মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা করে শৈলজারঞ্জন প্রার্থনা জানালেন, রবীন্দ্র-সংগীতে যেন রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যায়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হল আরেকটি সম্মেলক গানে। 'তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারই পারে।' সম্মেলক কণ্ঠে শ্রুতির ছাত্রছাত্রীরা শোনালেন এই গানটি।

সেদিনের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে নিবেদিত হল শ্রুতির 'বাল্মীকি প্রতিভা।'

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ছবি : সুধীর চট্টোপাধ্যায়

রাজনৈতিক থিয়েটার

ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে থিয়েটার ওয়ার্কশপ একটি অভিনব অনুষ্ঠানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এগারোই জুলাই দুটি তথ্যচিত্র ঋত্বিক ঘটকের 'আমার লেনিন' ও উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'মুক্তি চাই'-এর আগে একটি আলোচনাচক্র ছিল, বিষয় 'পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক নাটক গড়ে উঠেছে কি না?' আলোচক ছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায়।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে বলেন, যে কোন ভাবেই নাট্যকর্মী রাজনৈতিক আদর্শে জড়িয়ে পড়েন। দিনের পর দিন সকলে অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে যখন গ্রুপ থিয়েটার করেন, তখন সকলেই নিশ্চিতভাবে একটি মতে না মিললে এগোতে পারতেন না। অপর-দিকে যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল অপসংস্কৃতির নাট্যকর্মে প্ররোচনা দেন, প্রতিপক্ষ হিসেবে তাঁরাও নিশ্চয়ই একটি লক্ষ্য এগিয়ে চলেন, সেই লক্ষ্য হচ্ছে পূর্বতন আদর্শকে বিভ্রান্ত করা। শেখর চট্টোপাধ্যায়ের মূল অভিযোগ হল, কেন নাট্যকর্মীরা গ্রামে পৌঁছতে পারছে না?' রাজনৈতিক চেতনা শুধু মাত্র শহরেই বিস্তারিত শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নাট্যচর্চা। রুদ্রপ্রসাদ সেন-গুপ্ত শেখর চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, সকলেই বক্তৃতার সময় গ্রামে যাওয়ার কথা বলেন, নিজেরা থিয়েটার করেন শহরের বিভিন্ন মঞ্চে, আগে করতেন নিউ এম্পায়ারে। রাজনৈতিক নাটকের বিস্তৃতি কতখানি? এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তীর' বা 'মানুষের অধিকারে' সর্বাংশে ভাল প্রযোজনা হলেও জন-সমাদৃত হয়নি। অথচ 'কল্লোল' বা 'অঙ্গার'-এ জনসমুদ্র উপচে পড়ত। নান্দীকারের 'যখন একা' সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির ভিন্ন প্রতিক্রিয়া। আসলে কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙ্গনের পর দর্শকও ভাগ হয়ে গেল; বিভিন্ন নাটক। নাটক হিসেবে নয়—মতবাদের ভিত্তিতে চিহ্নিত হতে থাকল। মোহিত চট্টোপাধ্যায় শহরের থিয়েটারকে নাট্যবিলাস বলে উড়িয়ে দেবার বিপক্ষে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দুটি কাহিনী বর্ণনা করেন। তাতে দেখা গেল গ্রামের লোকের মনে শহরের বাবুদের সম্পর্কে কি ধারণা। অরুণ মুখোপাধ্যায় সরাসরি ব্যক্ত করেন তাঁর অভিমত। গ্রামে যাওয়ার অসুবিধাটা তিনি সবিস্তারে যুক্তি সহ বিশ্লেষণ করেন। আদর্শ ও কর্মধারায় বৈপরীত্যে তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানান। আলোচনায় উপসংহারে আবার শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটখাট দল নিয়ে গ্রামে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা এবং তৃতীয় থিয়েটারের ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা করেন।

শিশিরমঞ্চে সেদিনকার আলোচনা-সভায় যথেষ্ট উত্তেজনা এবং পারস্পরিক দোষারোপ থাকলেও মূল বিষয় থেকে আলোচনা সরে গেছে অনেকখানি। সকলেই উত্তমপুরুষে কথা বলেছেন, প্রথম পুরুষে পৌঁছাননি। মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক থিয়েটারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেও শেখর চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অরুণ মুখোপাধ্যায় বেশির ভাগ সময় 'আমি' 'আমরা' থেকে 'তিনি' 'তাঁহারা'তে এগোতে পারেননি। ফলে আগ্রহী শ্রোতা হয়তো বুঝতে পারলেন না 'পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক নাটক গড়ে উঠেছে কিনা'।
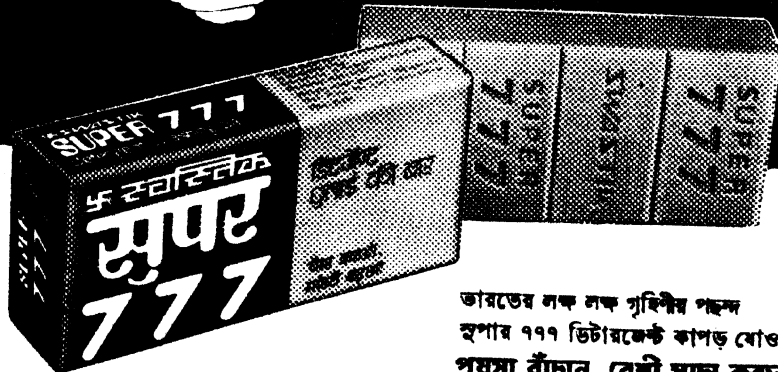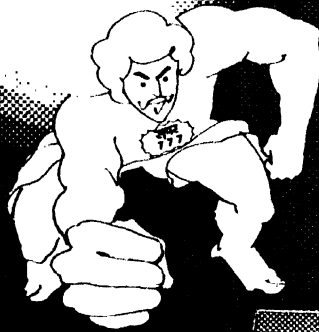
দেবাশিস দাশগুপ্ত

সুপার ৭৭৭

ময়লার বিরোধী, শুভ্রতার শক্তি

Shilpi dm. 15 A/78 Ben

প্যারাগন
এলপার স্যুটিং
প্যারাগন টেক্সটাইল মিলস
everest/78/PTM/316-bn
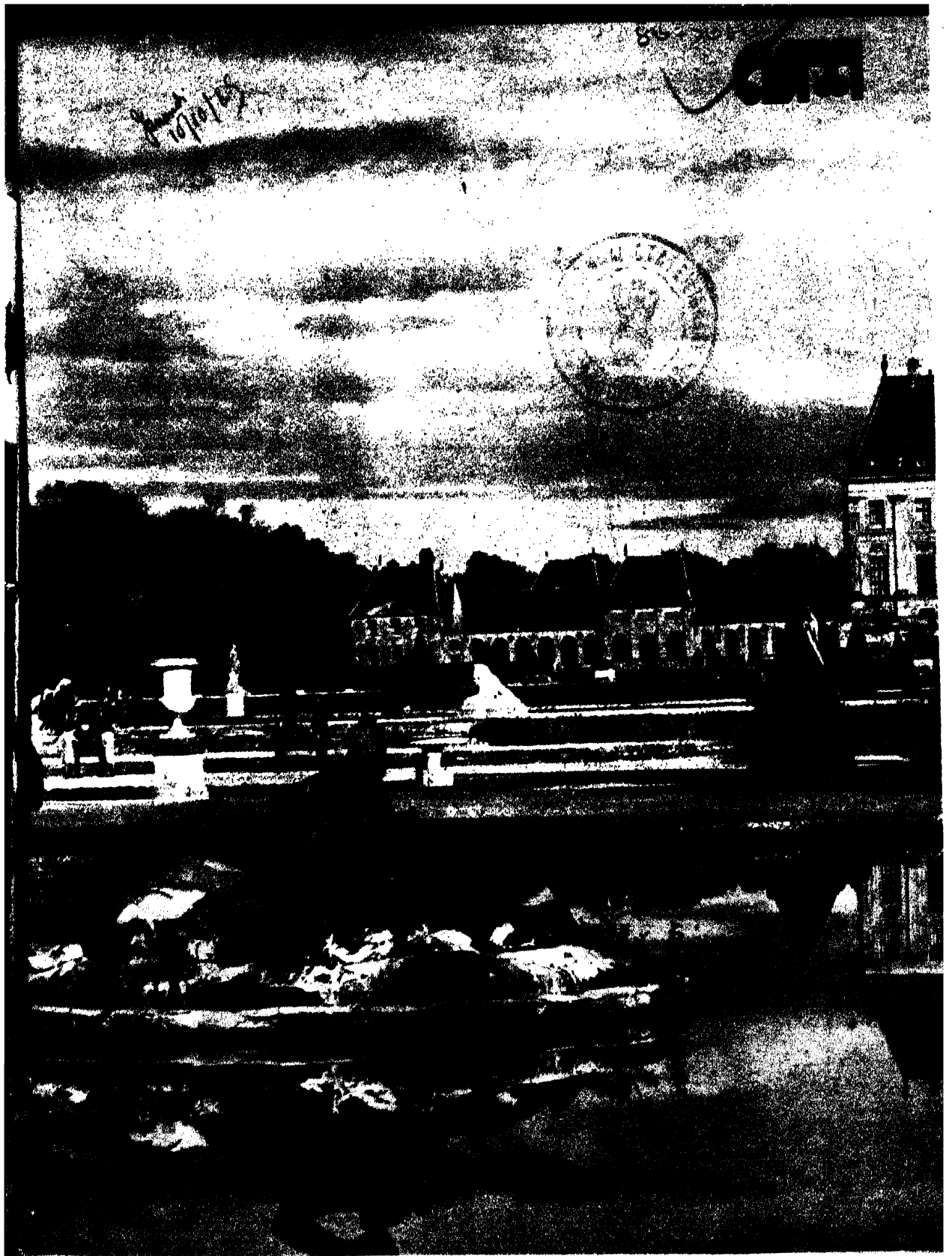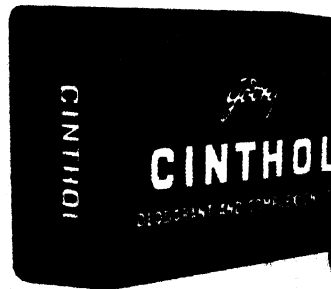
যুগল মিলন
ভারতের একমাত্র শারীরিক দুর্গন্ধনাশক
সাবান ও ট্যাল্‌ক
দু'ভাবে দুর্গন্ধ প্রতিরোধের জন্য একেবারে সঠিক
যুগল মিলন...সিন্থল সাবান মেখে পরিষ্কার স্নান...
আর তারপর সুগন্ধ পাউডার মাখা...
যার ফলে আপনি ঝরঝরে তাজা
বোধ করবেন।
গোদরেজ-এর
নিবেদন—সিন্থল
CINTHOL
CINTHOL
DEODORANT
LUXURY
TOILET POWDER
BY
Interpub/CTS/1/79 BN

আমূল মিল্ক—
আপনার পরিবারের জন্যে

RADEUS/AMP-5
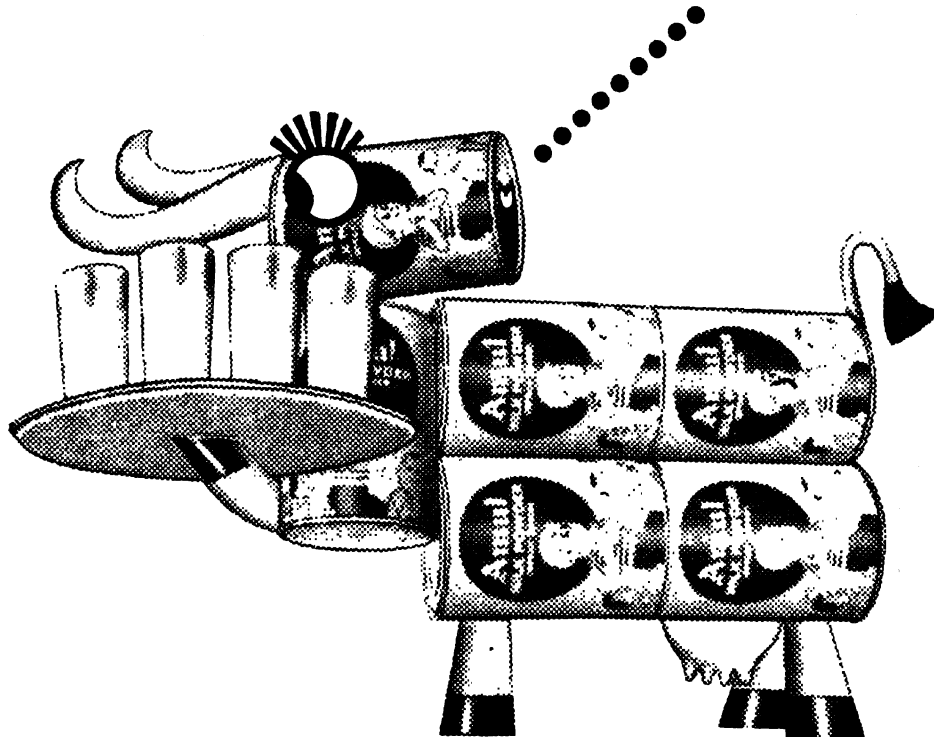
একটি ½ লিটার পরিমাণের গেলাসে বড় চামচের উঁচু উঁচু ২½ চামচ আমূল মিল্ক পাউডার ঢালুন। তারপর অল্প গরম জলে গুলে মসৃণ লেই-এর মত তৈরী ক'রে নাড়াতে থাকুন। এরপর গেলাসটিতে কানায় কানায় গরম জল ভরে আরও নাড়াতে থাকুন। এই নিন—খাওয়ার জন্যে দুধ তৈরী! এটি চা, কফির জন্যে আর দই আর পুডিং ইত্যাদির জন্যে উপযোগী। আর তৈরী করাও এত সহজ যে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ—এ একেবারে গ্যারান্টী!

আমূল
মিল্ক পাউডার
ঘরে সবসময়ে দুধের ভাণ্ডার

Amul
MILK POWDER
(SPRAY DRIED)
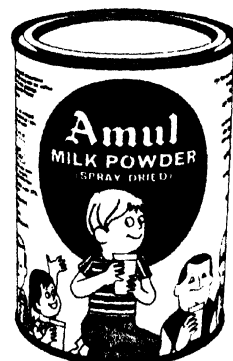
বিতরণ: গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, আনন্দ।

চিঠিপত্র

রবীন্দ্র রচনায় অসংগতি

গত ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৮৬ (ইং ১২ই অগাস্ট, ১৯৭৯) তারিখের দেশ পত্রিকায় আমার লেখা 'রবীন্দ্র-রচনায় অসংগতি' শীর্ষক নিবন্ধটির মধ্যে কয়েক স্থানে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে।

একেবারে প্রথম স্তম্ভের প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে 'আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।' এর বদলে 'আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।' হবে। প্রথম স্তম্ভের অষ্টম পরিচ্ছেদের চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে 'মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, ...' এর স্থানে 'মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে...' পড়তে হবে। প্রথম স্তম্ভের দশম পরিচ্ছেদের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'অন্নদাবাবু পাশের ঘরে গিয়ে বসিলেন।' এর জায়গায় 'অন্নদাবাবু পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন।' পড়তে হবে। দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'যোগেন্দ্র সেখানে বলছে,' এর জায়গায় 'যোগেন্দ্র যেখানে বলছে,' পড়তে হবে। এ ছাড়া তৃতীয় স্তম্ভের তৃতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ পঙ্‌ক্তিতে 'তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন প্রাণপ্রণ চেষ্টা করিয়াছি...' এর স্থানে 'তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি,' পড়তে হবে।

বিশ্বজ্যোতি দাশগুপ্ত
বেহালা।

নজরুলের নিষিদ্ধ নানা গ্রন্থ

'দেশ' পত্রিকায় ১১ই ও ১৮ই জ্যৈষ্ঠের সংখ্যাদ্বয়ে 'নজরুলের নিষিদ্ধ নানা গ্রন্থ' শিরোলেখায় যে তথ্যগর্ভ নিবন্ধটি বেরিয়েছে, তার জন্যে শ্রীশিশির কর নজরুল-সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করবেন।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটির "একটি কপি নজরুলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে" শ্রীনলিনীকান্ত সরকার তা শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে ছেপেছিলেন, এ তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। ১৯২১ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নজরুল যখন তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখেন, তখন তিনি আমার শ্বশুর পরলোকগত মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে কলকাতার ৩/৪সি, তালতলা লেনের বাড়িতে নীচের তলার পুব-দিকের ঘরটিতে থাকতেন। মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন: "এই ঘরেই কাজী নজরুল ইসলাম তার 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখেছিল। সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রিতে। ...আসলে অবিনাশবাবু (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য: আলীপুর বোমার মামলার সহকর্মী) নজরুলের আপন হাতের কপি-করা 'বিদ্রোহী' কবিতা 'বিজলী'তে ছাপতে নিয়ে গিয়েছিলেন।" এবং ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারী শুক্রবারের 'বিজলী'তে প্রথম ছাপা হয়েছিল। (কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৩০—২৩৮ পৃঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার এ ধরনের প্রকাশিত "নজরুলের 'আগমনী' কবিতার" জন্যই "বিচারে জেল হলো নজরুলের।" (কবিতা, বিশেষ নজরুল-সংখ্যা কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১ সন; ২৯ পৃষ্ঠা।) এবং আলোচ্য নিবন্ধে লেখা হয়েছে: "কবির কারাদণ্ড হয়েছিল প্রথমে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আগমনী' কবিতাটির জন্য।" (দেশ, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ৪৭ পৃষ্ঠা।) কিন্তু কবিতাটির নাম 'আগমনী' নয়, তার শিরোনাম ছিল 'আনন্দময়ীর আগমনে', —১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৯ই আশ্বিন মুতাবিক ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর তারিখে ১ম বর্ষের ১২শ সংখ্যক অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'তে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'আনন্দময়ীর আগমনে' পদটি আছে নিম্নোদ্ধৃত দুটি কবিতায়—

শারী শুক মনোসুখে
শিব দুর্গা ব'লে ডাকে
হয়ে মন রাগ-আলাপনে।
অকালে কোকিল সব
করিছে আনন্দ-রব
আনন্দময়ীর আগমনে॥
—(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সারদা-মঙ্গল)

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে,
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
—(রবীন্দ্রনাথ, কড়ি ও কোমল)

কিন্তু নজরুল ইসলাম এই পদটিকে ব্যবহার করেন রাজনৈতিক পটভূমিকায়: ফলে তা হ'লো নূতন তাৎপর্যবহ।

নজরুলের 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থের "নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ-পিয়া" গজলটি ঢাকার রমনা গ্রীনের ঝিলের ধারে বসে রচিত এবং ১৩৩৪ চৈত্রের 'প্রগতি'তে প্রকাশিত হয়। নজরুলের "এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে" গজলটি কবি-কৃত স্বরলিপি-সমেত ১৩৩৫ বৈশাখের 'প্রগতি'তে প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখেছেন: "সে-বারে (১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে) ঢাকায় যে-সব গান তিনি (নজরুল) লিখেছিলেন, সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি-সমেত 'প্রগতি'তে বেরিয়েছিল। 'আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী', 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে', 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ-পিয়া', এ-সব গান ঢাকাতে লিখেছিলেন বলে আমার মনে পড়ে।" (কবিতা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১ সন; ২০ পৃষ্ঠা।) নজরুলের 'আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী' গজলটি ১৩৩৬ আশ্বিনের 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয়। 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ-পিয়া' গজলটি সম্বন্ধে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন:

"নজরুল হুগলীতে যখন ছিলেন, সেই সময় কলকাতায় ৩৭ নং হ্যারিসন রোড থেকে 'লাঙল' প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় নজরুল রয়েছেন একদিন আমার বাড়িতে। আমার বৈঠকখানায়... নজরুল বসলেন গান লিখতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন, 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ-পিয়া' গানটি। তাঁর গজল-গান লেখার শুরু এইখান

পরিবেশিত এ-সকল তথ্যও অভ্রান্ত নয়। নজরুলের 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' ১৩৩৩ সালের 'কল্লোল'-এ এবং 'আসে বসন্ত ফুলবনে' ১৩৩৩ পৌষের 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয়; এগুলি রচনার স্থান ও তারিখ যথাক্রমে কৃষ্ণনগর ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ এবং কৃষ্ণনগর ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩। তখন থেকেই নজরুলের গজল-গান রচনার শুরু, ১৩৩৪ চৈত্রের 'প্রগতি'তে প্রকাশিত নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ-পিয়া' রচনার প্রায় এক বছর আগে। নজরুলের গজল-গান লেখা শুরুর অনেক আগে, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ১৫ শ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর, 'লাঙল' বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীশিশির কর লিখেছেন যে, নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্যে "ঠিকানা আছে ৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা; সম্ভবত কবি তখন ওই ঠিকানায় থাকতেন।" আসলে সেই ঠিকানায় ছিল 'লাঙল' পত্রিকার কার্যালয়; নজরুল সে-সময়ে সপরিবারে বাস করতেন কৃষ্ণনগরে, হুগলীতে নয়। নজরুল সম্বন্ধে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার অনেক ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন; তাঁর কথার উপর নির্ভর করে শ্রীশিশির কর ভুল করেছেন।

নজরুলের 'যুগবাণী' সম্বন্ধে শ্রীশিশির কর লিখেছেন : "এটি একটি নিবন্ধের বই। 'নবযুগ' পত্রিকায় লেখা নজরুলের কয়েকটি নিবন্ধের একটি সংকলন।" —১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে 'যুগবাণী' প্রথম সংস্করণ বের হয়। এই বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ এবং তৃতীয় মুদ্রণ : ১৩৬৪। 'যুগবাণী'র শেষ নিবন্ধ : 'জাগরণী' ১৩২৭ আষাঢ়ের 'বকুল' পত্রিকায় 'উদ্বোধন' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। অবশিষ্ট নিবন্ধগুলি সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগে' (প্রথম প্রকাশ : ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই) প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ।

নজরুলের 'চন্দ্রবিন্দু' সম্বন্ধে শ্রীশিশির কর লিখেছেন : "এটি মূলত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা। এই গ্রন্থের লেখাগুলি দেশাত্মবোধক তীব্র ব্যঙ্গে ভরপুর।" কিন্তু 'চন্দ্রবিন্দু' বইটির প্রথম ভাগে আছে দেবদেবীর স্তুতিগান, প্রেমগীতি, বাউল-গীতি, ইসলামী-গান প্রভৃতি ৪৩টি গান। তার দ্বিতীয় ভাগে আছে ১৭টি দেশাত্মবোধক 'কমিক গান'। তন্মধ্যে 'শ্রীচরণভরসা', 'প্যাক্ট' এবং 'সাহেব ও মোসাহেব' অতুলনীয়। এগুলি ছাড়া 'চন্দ্রবিন্দু' প্রথম সংস্করণে লবণ-আইন-ভঙ্গ বিষয়ক একটি রাজনৈতিক গান ছিল; সেটি অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক মরহুম মৌলভী মঈনউদ্দীন হোসয়নকে নিষেধ করা হয়েছিল। সেই গানটি গ্রন্থ-ভুক্তির আগে নজরুল আমাকে দিয়েছিলেন আমার "জয়তী" পত্রিকায় প্রকাশ করতে; কিন্তু আমি তা ছাপতে সাহস পাইনি। নজরুলের হাতের লেখা সেই গানটি আজ আর খুঁজে পাচ্ছি নে। যদি পেতাম, তা হলে আমার সম্পাদিত 'নজরুল - রচনাবলী'তে অন্তর্ভুক্ত করতাম।

উপসংহারে একটি অনুরোধ রাখছি। নজরুলের 'রুদ্র-মঙ্গল' বেরুবার আগে 'দুর্দিনের যাত্রী' নামে হয়েছিল। সেটি 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত সাতটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের সংকলন। তার প্রকাশক, নজরুল ইসলাম; প্রিন্টার —শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪ নং বৃন্দাবন পাল বাই লেন, কলিকাতা। পুস্তকখানিতে প্রকাশ কালের উল্লেখ নেই। নজরুলের পরিচালিত সাপ্তাহিক 'লাঙল' (১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ থেকে ১৫ এপ্রিল ১৯২৬) পত্রিকায় তাঁর রচিত পুস্তকাবলীর যে বিজ্ঞাপন বের হয়, তাতে 'দুর্দিনের যাত্রী' অন্তর্ভুক্ত আছে; তাই অনুমিত হয় যে, 'দুর্দিনের যাত্রী' ১৯২৫ ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে বের হয়েছিল। 'লাঙলে' বিজ্ঞাপিত নজরুলের গ্রন্থ-তালিকায় 'রুদ্র-মঙ্গল' নেই। মনে হয়, 'রুদ্র-মঙ্গল' ১৯২৬ সালের শেষ অথবা ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়েছিল। 'দুর্দিনের যাত্রী' ছিল ৫৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকা, দাম ছয় আনা; 'রুদ্র-মঙ্গল' ৭৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা, দাম আট আনা। এই দুটি পুস্তিকা 'নজরুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ডে (প্রথম সংস্করণ : ২৫ মে ১৯৬৬ এবং পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম মুদ্রণের পরে ৪৫ বৎসরের মধ্যে এই পুস্তিকাদ্বয় আর ছাপা হয়নি। এ-সম্পর্কে নজরুল আমাকে বলেছিলেন যে, এই দুইখানি পুস্তিকার প্রচারই সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল। শ্রীশিশির কর লিখেছেন যে, 'রুদ্র-মঙ্গল' পুস্তকের আর কোনো কপি না ছাপবার জন্যে "নবাবীর এস পি-র মাধ্যমে নজরুলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।" নজরুলের 'দুর্দিনের যাত্রী' সম্বন্ধেও অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল কি না, তা শিশিরবাবু অনুসন্ধান করে দেখলে তিনি নিঃসন্দেহে নজরুল-অনুরাগীদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

আবদুল কাদির

ঢাকা-৯

মার্কসবাদ তত্ত্বে ও প্রয়োগে

কোন মতবাদের মধ্যে বিজ্ঞানের উপাদান থাকতে পারে কিন্তু কোন মতবাদ (ism) কখনো বিজ্ঞান হতে পারে না। অমল চট্টোপাধ্যায় (দেশ ৯ই জুন '৭৯, সংখ্যা) এই দৃষ্টিভঙ্গীতে মার্কসবাদ যে বিজ্ঞান নয় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি। অমলবাবুর দীর্ঘ চিঠির মূল বক্তব্য হল রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা মার্কসবাদীদের দ্বারা পরিচালিত এবং তারা পুঁজিবাদী দেশের মত ব্যবহার করছে, অতএব "মার্কসবাদ ভ্রান্ত, অবৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিহীন।" ধর্মীয় ব্যক্তিদের অধার্মিক আচরণ কোন ধর্মকে ভুল প্রমাণ করে না। রাশিয়া, চীন কি করছে তা দেখিয়ে মার্কসবাদকেও ভুল প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম সম্পর্কে মার্কস কি বলেছিলেন এবং বাস্তবে কি ঘটছে মার্কসবাদীরা তা কখনো মিলিয়ে দেখেন না। অমলবাবুও তা দেখাবার চেষ্টা করেননি। তা ছাড়া

নৈতিক সিদ্ধান্তগুলিকে বোঝায় না, মার্কসের অর্থনৈতিক এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিকেও বোঝায়। কিন্তু অমলবাবু মার্কসের অর্থনৈতিক এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। এমন কি মার্কসের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কেও অমলবাবুর ধারণা ভাসা ভাসা এবং মনগড়া। অমলবাবুর ধারণা মার্কস নাকি বলেছেন যে, "দুই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে কখনই যুদ্ধ বাধতে পারে না।" না, একথা মার্কস বলতেই পারেন না। কারণ কমিউনিজমে কোন রাষ্ট্র থাকবে না, এটাই ছিল মার্কসের অনুমান। ফলে "কমিউনিস্ট রাষ্ট্র" বলে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মার্কসের চিন্তায় থাকতে পারে না। মার্কসবাদকে ভুল প্রমাণ করার পূর্বে অমলবাবুর উচিত মার্কসের বক্তব্যের সঙ্গে যথাযথভাবে পরিচিত হওয়া।

পঙ্কজ চৌধুরী
কলকাতা-৬০

সুধাসাগরতীরে

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী লিখিত "সুধাসাগরতীরে" নিবন্ধে ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের জীবনী প্রকাশিত হওয়াতে সংগীতের এই মহাগুণী সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু তথ্য জানতে পেরেছি। এ কারণে 'দেশ'কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ প্রসঙ্গে ২৩শে জুন '৭১ সংখ্যায় লেখক স্বর্গত সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী সম্বন্ধে যে তথ্য লিখেছেন সে বিষয়ে আমি কিছু নিবেদন করতে চাই।

সুরেশবাবু লিখেছেন, তিনি (গিরিজাশংকর) ধ্রুপদ-ধামারও শিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর খ্যাল শিক্ষা মূলত বদল খাঁ সাহেবের কাছেই। পরে তিনি লেখেন—কিন্তু একটা কথা এখানে বলতে চাই যে, খ্যাল গানের যে সংগ্রহ এঁরা (গিরিজাবাবুর শিষ্য-শিষ্যারা) করেছেন তা প্রধানত বদল খাঁ সাহেবের তালিম থেকে—ভায়া গিরিজাবাবু। অতি বিনয়ের সঙ্গে জানাই, লেখকের এই উক্তিগুলি সবটা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণটা একটু তলিয়ে দেখতে হবে।

গিরিজাশংকর বহরমপুরে থাকাকালীন বিখ্যাত গুণী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট ধ্রুপদ-ধামার শেখার সঙ্গে সঙ্গে কিছু খ্যাল গান শেখেন। তবে তা ছোট খ্যাল। পরে তিনি দিল্লিতে গিয়ে বিখ্যাত খ্যাল গায়ক ওস্তাদ মজঃফর খাঁর কাছে নাড়া বাঁধেন ও কিছু কাল তাঁর নিকট খ্যাল গান শিক্ষা করেন। মজঃফর খাঁর কাছে তিনি তান-কর্তব ও বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আহরণ করেন। ১৯১২-১৩ সাল নাগাদ গিরিজাশংকর সংগীতের পীঠস্থান রামপুরে যান ও সেখানে গোয়ালিয়র ঘরানার গায়ক ওস্তাদ হদ্দু খাঁর জামাতা বিখ্যাত খ্যাল গায়ক ওস্তাদ এনায়েত হোসেন খাঁর কাছেও তালিম নেন ও বেশ কিছু 'চীজ' পান। ১৯১৬ সালে গিরিজাশংকর কলকাতায় ফিরে উদীয়মান খ্যাল গায়ক হিসাবে লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ কাল তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করে খ্যাল গানের জটিল কলাকৌশলগুলি তিনি আয়ত্ত করেন। বাস্তবিক গিরিজাশংকরের খ্যাল গানের সংগ্রহ ছিল বিরাট। একদিকে তিনি যেমন ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ ও ওস্তাদ তসদ্দুক হোসেন সাহেবের সাথে বহু রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে আলোচনা করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন, অন্য দিকে তিনি ওস্তাদ বড়ে মুন্নে খাঁর নিকট খ্যাল গান শেখেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে কি বিচিত্র ছিল তাঁর গানের সংগ্রহ। এ সকল বিভিন্ন ঘরানার গান একত্র সমাবেশ করে তিনি সংগীতের আসরে তা গাইতেন। গিরিজাশংকরের গানের স্টাইল ছিল সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। শিষ্য-শিষ্যাদের শিক্ষাদানেও গিরিজাশংকরের এই লক্ষণই প্রকাশ পায়। সুতরাং দেখা যায়, একদিকে তিনি যেমন ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের নিকট খ্যাল শিক্ষালাভ করেন, অপর দিকে অন্যান্য বিভিন্ন গুণীদের গানও তিনি শিখে আত্মস্থ করেন।

প্রসঙ্গত, সুরেশবাবু গিরিজাশংকরের যে শিষ্য-শিষ্যাদের তালিকা দিয়েছেন, তা থেকে কয়েক জন বিখ্যাত গুণীর নাম বাদ পড়েছে। যেমন—তারাপদ চক্রবর্তী, এ কানন, সুনীল বসু, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, নুটু মুখোপাধ্যায়, নয়না দেবী প্রভৃতি। এঁরা সকলেই গিরিজাশংকরের কাছে তালিম পেয়েছেন।

সুপ্রিয় বাগচী
কলকাতা-১৯

বেতারের স্মৃতি

'দেশ' (২৩-৬-৭১)-এ প্রকাশিত শ্রীঅমলকুমার গুপ্ত মহাশয়ের পত্রের উত্তরে দেশ (৪-৮-৭১)-এ শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের 'বেতারের স্মৃতি' : লেখকের বক্তব্য' শিরোনামায় যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু নিবেদন করতে চাই :

সরকার মহাশয় বলেছেন—'এটা তাঁর স্বহস্তলিখিত রচনা নয়। রোগজীর্ণ অবস্থায় শয্যাগত থেকে তাঁর আত্মকথা তিনি বলে গেছেন আর একজন অনুলেখক সেই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। অনুলেখক বলেন—তখন 'তাঁর মানসিক শক্তিও ক্ষীয়মাণ'। এ অবস্থায় তাঁর স্মৃতি-বিভ্রম ঘটাও অসম্ভব নয়।'। আমার নিবেদন, শ্রদ্ধেয় মহাশয় কি করে জানলেন যে 'রোগজীর্ণ অবস্থায় শয্যাগত থেকে তাঁর আত্মকথা তিনি বলে গেছেন?' একথা 'অনুলেখকের কথায় আমি বলিনি এবং তার চাইতে বড় কথা পঙ্কজকুমার রোগজীর্ণ অবস্থায় শয্যাগত থেকে তাঁর আত্মকথা বলেননি। এই স্মৃতিকথা রচনাকালে এর প্রতিটি বিষয় তিনি তাঁর পাঠকক্ষের চেয়ার টেবিলে বসে বলে গেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন, প্রতিটি লিপিবদ্ধ শব্দকে যাচাই করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করেছেন। তাঁর সেই

...ে হয়ে ছড়িয়ে আছে।

১৯৭৬-এ যখন 'মহিষাসুর-...র্দনী' অনুষ্ঠানের কুশীলবদের ...রিবর্তনের সংবাদ ঘোষিত হয় তার ...ব্যবহিত পরে তিনি অসুস্থ হয়ে-...লেন এবং সপ্তাহখানেক শয্যাগত ...লেন। এরপর তাঁকে শয্যাগত হতে ...খেছি পরলোকগমনের পূর্বে সাত-...টি দিনের জন্য ১৯৭৮-এ। এই ...ই ঘটনার মাঝেই এই স্মৃতিকথার ...ত্তর অংশ রচিত হয়। এ সময় ...নি দুর্বল ছিলেন ঠিকই তথাপি ...র স্বভাবসিদ্ধ নিয়মনিষ্ঠায় সঙ্গীত-...য়ক কর্ম, লেখাপড়া, পারিবারিক সামাজিক কর্তব্য সমূহ যথারীতি ...লন করতেন। এমন কি বেশ ...কটি অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছেন। ...্যাগত' দূরের কথা শয়নকক্ষে ...ওয়া, আধশোওয়া বা বসা ...স্থাতেও কোন লেখাপড়ার কাজ ...কে করতে দেখিনি। তাঁর পাঠ-...কক্ষর (যাকে তিনি অফিসঘর ...তেন) চেয়ার টেবিলই ছিল তাঁর ...াপড়ার একমাত্র স্থান। শারীরিক ...লতা-হেতু লেখাপড়ার কাজে ...াভাবিক অবস্থার চাইতে বেশি সময় ...তেন ঠিকই, কিন্তু খুঁটিনাটির প্রতি ... স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ম্লান ... দেখিনি কখনো। সুতরাং 'স্বহস্ত-...লিখিত রচনা নয়'—সরকার মহাশয়ের ... উক্তি এক্ষেত্রে একেবারেই ...অর্থহীন।

'অনুলেখকের কথা' থেকে গ্রন্থের ...রকার মহাশয় মানসিক শক্তিও ...ক্ষীয়মাণ' এই বাক্যাংশটিকে উদ্ধৃত ...রেছেন এবং পঙ্কজকুমারের স্মৃতি-...বিভ্রম ঘটা অসম্ভব নয়, এমন এক ...সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ব্যবহার করেছেন। ...প্রসঙ্গে সবিনয়ে বলতে চাই যে, ...ক্ষীয়মাণ মানসিক শক্তি' মানেই ...স্মৃতিবিভ্রম নয় এবং সে-অর্থে উক্ত ...বাক্যাংশটি আমি ব্যবহার করিনি। ...পঙ্কজকুমারের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ...মানুষ শেষ জীবনে নানা কারণেই ...বদমেজাজী/খিটখিটে হয়ে পড়ে-...ছিলেন—সহজেই উৎকণ্ঠিত হতেন, ...স্মৃতিরোমন্থন করতে বসে যে সব ...বিশিষ্ট মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন ...তাঁদের কথা বলতে গিয়ে অথবা ...দৈনন্দিক জীবনে কারুর দুঃখ-কষ্টের ...কথা শুনলে অশ্রু সংবরণ করতে ...পারতেন না। এগুলিই ছিল তাঁর ...ক্ষীয়মাণ মানসিক শক্তির লক্ষণ।

তাঁর পত্রে একটি বিশেষ ...প্রসঙ্গে সরকার মহাশয় উক্তি করেছেন ...'পঙ্কজকুমার মৌন থেকেই সম্মতি-...জ্ঞাপন করেছিলেন।' কিন্তু মৌন ...থাকাই কি সব সময় সম্মতি ...লক্ষণ? বাদানুবাদের মধ্যে জড়িয়ে ...পড়া পঙ্কজকুমারের স্বভাববিরুদ্ধ ...ছিল। একথাও সুবিদিত যে শুধু ...পঙ্কজকুমার কেন তাঁর চাইতে অনেক ...ড় বা অনেক ছোট বহু মানুষ ...সম্মতির কারণ সত্ত্বেও বাদানুবাদ ...ড়ানোর জন্য কিংবা রুচি-বিরুদ্ধ ...লেই মৌন থাকার পন্থা বেছে নেন। ...না পরে কা কথা, স্বয়ং রবীন্দ্র-সম্পর্কে প্রতিবাদযোগ্য বহু মুদ্রিত উক্তির উত্তরে তিনি মৌন থেকে গেছেন। প্রবাদ বাক্যটি তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারে এ আশঙ্কা তাঁর মৌন-ভঙ্গ করতে পারেনি।

অরুণাভ সেনগুপ্ত কলকাতা-৯

॥ ২ ॥

১১ শ্রাবণের দেশ পত্রিকায় 'বেতারের স্মৃতি' প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের চিঠিখানি পড়লাম। ডাঃ রামস্বামী আয়েঙ্গার পঙ্কজকুমারকে বেতারে নিয়ে আসেন, অথবা, চিত্রা সংসদ থেকে এসে তিনি বেতারে যোগদান করেন, এ দুটি তথ্য আপাতবিরোধী হলেও, মনে হয় দুটিই সত্য। ডাঃ আয়েঙ্গার কেবলমাত্র একজন সাধারণ কণ্ঠশিল্পী হিসাবেই পঙ্কজকুমারকে বেতারে নিয়ে আসেন। কিন্তু যে সুনিবিড় একাত্ম-বন্ধনে পঙ্কজকুমার পরবর্তীকালে বেতারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন, তার সূচনা হয়েছিল চিত্রা সংসদের একজন সদস্য রূপেই। কলকাতা বেতারের প্রথম নাট্যানুষ্ঠান পরশু-রামের 'চিকিৎসা সংকট', চিত্রা সংসদ কর্তৃক অভিনীত হবার পরেই বোধ হয় এটি ঘটে। এই নাটকটি শ্রোতা-দের এতই ভাল লাগে যে কয়েকবার পুনরাভিনয়ের আয়োজন করতে হয়। নলিনীবাবু লিখেছেন—'বেতারের নিয়মিত প্রোগ্রামের উদ্বোধনের জন্য প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ মজুম-দার এই চিত্রা সংসদের কয়েকজনকে বেছে নিলেন।' পঙ্কজকুমার এঁদের অন্যতম।

পঙ্কজকুমারের আত্মকথা প্রসঙ্গে নলিনীবাবু লিখেছেন—'রোগজীর্ণ অবস্থায় শয্যাগত থেকে তাঁর আত্ম-কথা তিনি বলে গেছেন, আর, একজন অনুলেখক সেই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন।' বাস্তবিক পক্ষে পঙ্কজকুমার কিন্তু এ সময়ে মোটেই শয্যাগত ছিলেন না, কারণ সেপটেমবর ১৯৭৬-এর হৃদরোগের প্রথম আক্রমণটি তিনি অল্পেই কাটিয়ে উঠেছিলেন। ১৯৭৭ সালে একাধিকবার তাঁকে আমরা দূরদর্শনের পর্দায় দেখেছি। রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত বেতারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে তিনি যোগদান করেছিলেন এবং ঐ উপলক্ষে একটি বৃন্দগান রিহার্সালের জন্য তাঁকে বেতার কেন্দ্রেও যেতে হয়েছিল। উত্তর কলকাতায় সারদেশ্বরী আশ্রমের একটি অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্বেও ১৯৭৮ এর জানুয়ারিতে, 'ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো' গানটির রিহার্সাল ও রেকর্ডিং-এর জন্য বেশ কয়েক বার তাঁকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে যেতে হয়েছিল। 'শয্যাগত' হলে তাঁর পক্ষে এগুলির কোনটিই সম্ভব হোতো না। আসলে, অনুলেখকের প্রয়োজন হয়ে-ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। আরথ্রাইটিসের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। ডান হাতটি নিয়ে কোন কাজ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল।

প্রকাশিত হল

আশাপূর্ণা দেবীর

রসাল রহস্য-কাহিনী

গজ উকিলের হত্যা-রহস্য

দাম ৮.০০

কথায় বলে, হাসতে হাসতে খুন। আশাপূর্ণা দেবীর এই নতুন কিশোর-উপন্যাসে হাসতে হাসতে খুনের কিনারা। রহস্য-উপন্যাসের যাবতীয় উপকরণ এই লেখাতে রয়েছে, খুন, পুলিশী জেরা, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, কৌতূহল, উদ্বেগ, অনুসরণ—সব কিছু। আর একটি বাড়তি উপাদান রয়েছে, সচরাচর রহস্য-উপন্যাসে যা দুর্লভ, তা হল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দারুণ মজাদার সব পরিস্থিতির রসাল বর্ণনা। দুই বন্ধু। গজপতি উকিল আর গুপি মোক্তার। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকেন দু-জনে। দাবা খেলে সময় কাটে। দুম করে পাশের ফ্ল্যাটে ঘটল এক ভয়াবহ খুন। কে খুন হয়েছে? না, গজপতি। কীভাবে খুন হয়েছে? না, গলায় গামছা পেঁচিয়ে। অবাক কান্ড, নিজের গামছাখানা সেই মুহূর্তে খুঁজে পেলেন না গুপি মোক্তার। গামছার কথা ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়লেন গুপি মোক্তার। তবে কি ওই গামছাখানা পেঁচিয়েই খুন করা হয়েছে গজ-উকিলকে? সাত-পাঁচ ভেবে নিজের ফ্ল্যাট থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন গুপি মোক্তার। এদিকে দুই মূর্তিমান তাঁকে একই অনুসরণ করে চলেছে। গুপি মোক্তারের অন্তর্ধান এবং দুই মূর্তিমানের পিছু-ধাওয়া—

সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত

সুকুমার রায়ের

অভিনব রচনা-সংকলন

জীবজন্তু

দাম ৮.০০

জানোয়ারদের মধ্যেও দক্ষ এনজিনিয়র আছে! পশু-পাখিদের মধ্যে কেউ কেউ হাওয়া বদল করতে বিদেশ যায়! বিদ্যুৎ-মৎস্য কি? গরিলা কিরকমভাবে লড়াই করে? সমুদ্রের ঘোড়া কাকে বলে? সেকালের বাঘ বা সেকালের বাদুড় কিরকম ছিল? শামুক কত বড় হয়? ফড়িং কেন লাফাতে পারে? আমাদের চারপাশের অত্যন্ত জানা এবং অজানা জন্তু-জানোয়ারদের সম্বন্ধে বিচিত্র সব খবর বিশদভাবে দেওয়া আছে এ বইয়ে। আবোল তাবোল, হ য ব র ল, লক্ষ্মণের শক্তিশেল-এর লেখক সুকুমার রায়ের এ এক নতুনতম পরিচয়। সাইত্রিশটি লেখার সঙ্গে আছে সমধিক পরিমাণ

ছবি। এই রচনাগুলি 'জীবজন্তু'তেই সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে॥

এই লেখকের অন্যান্য বই:

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড) ২৫.০০ (দ্বিতীয় খণ্ড) ৩০.০০ সমগ্র শিশু-সাহিত্য ১০.০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

হাসির গল্পের সংকলন

সোফা-কাম-বেড

৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

এই ঠিকানায় খোলা হয়েছে ছোটদের বইয়ের দোকান

এই নতুন বিক্রয়কেন্দ্রে আনন্দ পাবলিশার্স-এর যাবতীয় ছোটদের বই পাওয়া যাচ্ছে।

ছোটদের মনের মতো করে সাজানো, রঙীন, ঝকমকে এই বিক্রয়-বিপণিতে ছোটরা নিজেরা পছন্দ করে যাতে বই কিনতে পারে তার সব-রকম ব্যবস্থা রয়েছে। হাত বাড়ালেই লোভনীয় ক্যাটলগ, হাত বাড়ালেই ঘুম-কেড়ে-নেওয়া সব বই।

শুধু তাই নয়, এই দোকান থেকে ছোটদের যে-কোনো বই কিনলে ক্রেতাদের শতকরা পনের টাকা কমিশন।

সুকুমার রায়ের সমগ্র শিশু সাহিত্যে ১০% কমিশন

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে এই কমিশন দেওয়া হচ্ছে একটি বিশেষ সময়কালের জন্য। যাঁরা বাইরে থাকেন তাঁরাও শতকরা পনের টাকা কমিশন পেতে পারেন ছোটদের বইয়ের ওপর। সেক্ষেত্রে অর্ডারের সঙ্গে অগ্রিম টাকা পাঠাতে হবে।

সুতরাং দেরি নয়, চটপট চলে এসো সব্বাই। এক্ষুনি। পুজোর

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

মনোজ বসুর

অনুপম উপন্যাস

সেতুবন্ধ দাম ২০.০০

এক রক্ষণশীল পরিবারের ভীরু মেয়ে সংসারের আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে বহু কষ্টে অনুমতি আদায় করে বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে কীভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল সে, তারই অনুপম উপাখ্যান 'সেতুবন্ধ।'

অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশিত হল

গৌরকিশোর ঘোষের

অসামান্য কাহিনী-সংকলন

সাগিনা মাহাতো

দাম ৮.০০

শুধু চলচ্চিত্রে আলোড়ন-জাগানো বলেই নয়, সাগিনা মাহাতো চরিত্রটি গৌরকিশোর ঘোষের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। রাজনীতির ভিতরের গ্লানি এবং দ্বন্দ্ব, কুটিলতা এবং নোংরামি, ব্যক্তি মানুষের অসহায়তা এবং পরিণতি—এক অসামান্য নৈপুণ্যে চিত্রিত করেছেন লেখক কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

প্রকাশিত হল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

নতুন স্বাদের কিশোর-উপন্যাস

ডুংগা দাম ৭.০০

সুজয়কে মনে আছে? সেই সুজয়, যাকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুর্ধর্ষ উপন্যাস—'তিন নম্বর চোখ'। সেই সুজয়, যে চোখ বুজলে হঠাৎ দেখতে পায় বহু দূরের কোনো দৃশ্য অথবা ঘটনা। সেই সুজয়, যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল গ্রহান্তরের দুই অধিবাসীর। সেই সুজয় আর অন্য গ্রহের লোকদের নিয়েই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন এই কিশোর-উপন্যাস। শখ করে একটি কুকুর পুষে ছিল সুজয়। আদর করে সেই কুকুরটাকে সে ডুংগা নামে ডাকত। ডুংগা কিন্তু মোটেই আজেবাজে কুকুর নয়, দস্তুরমতো ডালমাশিয়ান।
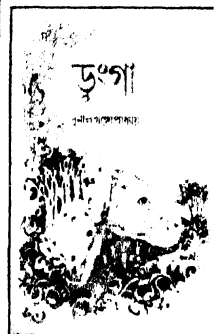
অথচ সেই ডুংগাই কীভাবে যেন খেপে গেল একদিন। বাড়ির অতিথি হারুমামাকে কামড়ে দিল হঠাৎ। তারপর বাড়ি ছেড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। ডুংগার খোঁজ করতে বেরুল সুজয়। বহু দূরে চলে গেল একলা একলা। সুজয় আর ফেরে না। এদিকে ডুংগা ফিরে এসেছে। সুজয়ের কথা কী যেন বলতে চায় সে। কী বলতে চায় ডুংগা? কোথায় বা হারিয়ে গেল সুজয়? ডুংগার পিছন পিছন বাড়িসুদ্ধ সব্বাই বেরিয়ে পড়ল সুজয়ের খোঁজে। ডুংগা কি পারবে ঠিকমতো রাস্তা চিনে সবাইকে নিয়ে যেতে? সুজয়কে কি ফিরে পাওয়া যাবে আবার? উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় ভরা এক দুরন্ত

দেশ ৪৬ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা
২১ ভাদ্র ১৩৮৬

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ 'তো-ল—ভিকোৎ সাঁ তো'

পরবর্তী আকর্ষণ

অমিয়া সেনের প্রবন্ধ
নারী, তুমি শুধু নারী
কমল সরকারের প্রবন্ধ
ভারতীয় প্রচ্ছদ
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রচনা
দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী
বাণীব্রত চক্রবর্তীর গল্প
আমার যা আছে

সম্পাদক ঃ সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদ্বাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল ঃ ত্রিপুরা ১৫ পয়সা

ভারতের আগামী লোকগণনা

অতীতের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ঘটনা হিসাবে স্মরণ করা চলে যে, কাশ্মীর ও সিকিমে একাধিকবার লোকগণনার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়নি। সন্দেহ করা চলে যে, বাইরের বিশেষ একটি বা দুইটি ভ্রূকুটির মানরক্ষা করবার জন্যে ভারত সরকার ওই দুই রাজ্যের লোকগণনার কোন প্রয়াসই সঞ্চালিত করেননি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও এই দুই রাজ্যে লোকগণনা উদ্‌যাপিত না করবার কোন কারণ প্রদর্শিত করেননি। সুতরাং, অনুমান করতে হয় গূঢ়তর কোন রাজনৈতিক কারণে ওই দুই রাজ্যের লোকগণনার অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিদেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা ঘটনার এই তাৎপর্য বুঝেছিলেন যে, কাশ্মীর ও সিকিম ভারতের সঙ্গে প্রকৃত প্রকারে অঙ্গীভূত ও অন্তর্গত রাজ্য নয় বলেই সেখানে লোকগণনার অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া হয়েছে। উপলব্ধি করতে হয় যে, ভারত সরকারের ইচ্ছা ও চিন্তার ভুলে কাশ্মীর এবং সিকিমের লোকগণনা অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণে ভারতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক একটি রাজনৈতিক অপবাদ প্রচারিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। জানি না এখনও লোকগণনা সম্বন্ধে ভারত সরকারের মনে কোন ভীরু-ভীরু রাজনৈতিক কুণ্ঠার ক্রিয়া আছে কিনা। ভারত সরকার এবং দেশের জনমত, উভয়েরই পক্ষে কিন্তু এই উপলব্ধির প্রয়োজন আছে যে, লোকগণনা নিতান্ত অর্থনৈতিক তথ্যের পরিসংখ্যান সঙ্কলিত করবার অধ্যবসায় নয়। লোকগণনা জনজীবনে বিপুল রকমের উদ্দীপনা সঞ্চার করবে, এমনতর জাতীয় ব্রত হিসাবে লোকগণনাকে গ্রহণ করবার কর্তব্য আছে। ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে যে, ১৯৮১ সালে ভারতের লোকগণনা সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করতে হবে।

লক্ষ করতে হয় যে, লোকগণনার আসন্নতার সংবাদ জনচিত্তে বিশেষ কোন আগ্রহের সৃষ্টি করেনি। লোকগণনা যেন আর দুই-দশটা সরকারী সমীক্ষার মতো একটা কর্তব্যের বিষয়। এ জন্য জনসাধারণের চেতনাকে নিদ্রালস একটি সাড়াবিহীন অস্তিত্ব বলে অভিযুক্ত করবার কোন অর্থ হয় না। ভারতের সরকারী উদ্যোগে এ যাবৎ যে পদ্ধতিতে লোকগণনা অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে, সেটা জাতীয় আগ্রহ উদ্দীপিত করবার মতো কোন পদ্ধতি নয়। একটা প্রশ্ন রূঢ় শোনালেও অযৌক্তিক নয়। ভারত সরকারের চিন্তাতে কি সত্যই লোকগণনার লক্ষ্যীভূত কোন আদর্শের নির্ণয় আছে? সংক্ষেপে ও খুব সরল করে বলা যায়, সমৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থা নির্ণয় অথবা আবিষ্কার করাই লোকগণনার আদর্শিক কর্তব্য। প্রকৃত অবস্থার প্রকৃত তথ্যের সঙ্কলন জাতীয় সমৃদ্ধির পরিকল্পনাকে নির্ভুল করে রচনা করবার একটি প্রধান সহায়ক সম্বল। কথিত আছে যে, গ্রাম্য চৌকিদার তার যথেচ্ছিত যে-সব কৃষি-তথ্য থানা অফিসারকে জানিয়ে যেত, তারই উপর নির্ভর করে দেশের কৃষিগত ভালমন্দর হিসাব লোকগণনার বিবরণে সঙ্কলিত হতো। এ অতি ভয়ানক পদ্ধতি, যার প্রকোপ ভারতীয় কৃষির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, কিংবা উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ সম্বন্ধে নিতান্ত বিকৃত ও উদ্‌ভ্রান্তিকর হিসাব লোকগোচর হয়ে অনর্থের উৎপাত বাড়িয়ে তুলতো। অনুমান করা চলে এতটা তামাশাপ্রায় কোন পদ্ধতি এখন আর প্রচলিত নেই। কিন্তু জাতির জীবনের সামগ্রিক পরিচয়ের তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য যে বিশেষ অনুসন্ধানীয় উদ্যোগের প্রয়োজন হয়, সেটা এখনও সরকারী আচরণের অভ্যস্ত কোন সংস্কারে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয় না। আবার বিপরীত ব্যাপারও দেখা যায়। অজস্র সামান্য গুরুত্বের এত সব সংখ্যাতথ্য সঙ্কলিত হয় যে, সেটা জাতীয় প্রয়োজনের কোন কাজেই আসে না। সেগুলি বস্তুত অবান্তর আড়ম্বর বলেই মনে হয়। ইংলন্ডের নৃপতি প্রথম উইলিয়ম যে 'ডুমস ডে বুক' রচনা করিয়েছিলেন, অনেকের মতে এই ডুমস ডে বুক হলো লোকগণনার আদি নিদর্শন। হতে পারে, কিন্তু লোকগণনার চিরন্তন একটি পদ্ধতির নিদর্শন নিশ্চয়ই নয়।

ভারতের অতীতের কয়েকটি লোকগণনার অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক সংখ্যা পরিস্ফীত করবার কারচুপি খুবই জটিল এক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। মাইনরিটি জনসমাজের এবং তপশীলের অন্তর্ভুক্ত হরিজন ও গিরিজনের সংখ্যা সংরক্ষিত সুবিধা ও বিশেষ অধিকারের মাত্রাবিধান করবার সহায়ক তথ্য বলে বিবেচিত হবে। সরকার আরও দশ বৎসরের জন্য হরিজনের ও গিরিজনের বিশেষ সংরক্ষার সাংবিধানিক মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। সুতরাং তপশীলের অন্তর্ভুক্ত এই দুই জনসমাজের প্রকৃত ও নির্ভুল সংখ্যা সংগৃহীত ও সঙ্কলিত করবার প্রয়োজন আছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যের আরও প্রশস্ত সঙ্কলন চাই। অভিযোগ আছে যে, ভারতের বিভিন্ন সমীক্ষা বিভাগের, যথা নৃতাত্ত্বিক ভূতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার কৃতিত্বে আবিষ্কৃত নূতন তথ্যসমূহের উপযুক্ত উল্লেখযুক্ত পরিবেষণ লোকগণনার রিপোর্টে সাধারণত দেখা যায় না। ব্রিটিশ শাসনকালে লোকগণনার প্রধান কমিশনার হাটন সাহেব, যিনি প্রশাসনিক অফিসার হয়েও সমাজতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তিনি ভারতীয় লোকগণনার রিপোর্টকে প্রথম একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ বিবরণরূপে প্রকাশ করেছিলেন। সেই আদর্শের প্রয়োজন [illegible] আরও বেড়েছে।

অশান্ত মিজোরাম

ধ্রুব মজুমদার

গত জুন মাস থেকে মিজোরামে আবার হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই হাঙ্গামা থামাবার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছেন—সেনাবাহিনীকে ডেকে আনা হয়েছে, প্রভূত পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—কিন্তু হাঙ্গামা তবুও থামেনি। অদূর ভবিষ্যতে এই হাঙ্গামা থামবে—মিজোরামে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসবে—এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

মিজোরামের এই অতি-সাম্প্রতিক হাঙ্গামার খবরাখবর আমাদের সকলেরই মোটামুটি জানা আছে। বিচ্ছিন্নতাকামী বৈরীদের মুখে 'কুইট মিজোরাম' স্লোগানটি আমাদের অনেকের কাছেই অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ মনে হয়েছে। 'কুইট ইণ্ডিয়া' কথাটির সঙ্গে একটু মিল আছে বলেই হয়তো স্লোগানটি আমাদের কাছে একটু বেশি স্পর্ধাপূর্ণ মনে হয়। সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, মহাত্মাজীর স্মৃতি-বিজড়িত কুইট ইণ্ডিয়া বা ভারত ছাড় আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গৌরবময় অধ্যায়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের প্রতি ভারতের শেষ হুং[illegible] ভারত ছাড়। সিকি-শতাব্দী ঘুরতে না ঘুরতে আজ কিনা সেই ভারতব[illegible] বলা হচ্ছে—মিজোরাম ছাড়! বলছেন কারা? —না, কতিপয় বিচ্ছিন্নতা[illegible] বিপথগামী, উগ্রপন্থী মিজো! অনেক মাত্রাজ্ঞান এমন উৎকট তাদের দ্বারা[illegible] কিছুই সম্ভব—মিজোরামের পরবর্তী বীভৎস ঘটনাবলী তাই আর আ[illegible] কাছে তেমন বিস্ময়কর মনে হয়নি—ক্ষ্যাপারা তো ক্ষ্যাপামি করবেই।

তবে আমরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ তুলতে পা[illegible] —এমন একটা কুৎসিত ঘটনা যে ঘটতে চলেছে তা কি আমাদের অতন্দ্র নির[illegible] বাহিনী আদৌ আন্দাজ করতে পেরেছিল? হাঙ্গামাটাই বা এতদিন চলতে [illegible] হচ্ছে কেন, নিরাপত্তা বাহিনী কি আরেকটু তৎপর হতে পারে না, বা প্র[illegible] হলে আরও একটু নিষ্ঠুর! সীমান্ত অঞ্চলে এসব চলতে থাকা তো ঠিক [illegible]

সময়ে এই হাঙ্গামা থেমে যাবে—এর আগেও প্রত্যেকবারই থেমেছে, এ[illegible] থামবে। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টকে অবৈধ ঘোষণা করে[illegible] লালডেঙ্গাকে বন্দী করা হয়েছে। মিজোরামে সর্ববিধ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ[illegible]

হয়েছে। বিদ্রোহীদের নিঃশেষে ছেঁকে তুলবার জন্য ব্যাপকভাবে ছাঁকনি অভিযান চালানো হচ্ছে। এই অবস্থায় আরও কিছু ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু সময়ে এই হাঙ্গামা ঠিক থেমে যাবে। তবে মিজোরামে শান্তি ঠিক ততদিনই স্থায়ী হয় যতদিন পর্যন্ত পরবর্তী বিস্ফোরণটি না ঘটে। উগ্রপন্থীদের উন্মাদনা থেকে থেকেই ক্ষেপে ওঠে।

গত ১৯৬৬ সন থেকে—দেড় দশক হতে চলল—এমনি ধারা চলে আসছে। বহুবার সগৌরবে ঘোষণা করা হয়েছে যে—মিজোরামে এরপর স্থায়ী শান্তি। বৈরী মিজোরা দফায় দফায়, ফটোগ্রাফার ও সংবাদদাতাদের উপস্থিতিতে, তাদের অস্ত্রসম্ভার নিঃশেষে সমর্পণ করেছে। কিন্তু প্রতিবারই আসর যখন বেশ জমে ওঠবার মতো হয় তখনই হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাক্রম আবার পরিচিত পথটি ধরে গড়াতে শুরু করে। আবার সেই নরহত্যা, থানা আক্রমণ, নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা এবং আবারও সেই বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা, ছাঁকনি অভিযান, সুসংরক্ষিত গ্রাম ইত্যাদি।

এই একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা এবং সংবাদপত্রগুলিও—মাঝে মাঝে বলে থাকেন যে, মিজো সমস্যার একটা ভিন্ন রকম সমাধান প্রয়োজন। ভিন্ন রকম সমাধান মানে রাজনৈতিক সমাধান। কিন্তু রাজনৈতিক শব্দটি উচ্চারণ করবার অসুবিধা এই যে, বিষয়টিকে তাতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা ছাড়া সংবিধানগত অসুবিধাও আছে। সে যাই হোক, নেতারা কিন্তু এই কথাটি এতদিন পর্যন্ত কেবল বক্তৃতামঞ্চ থেকেই, বড় জোর সাংবাদিক বৈঠকে ব্যক্ত করেছেন। ঘটনাক্রম যেমন ধারায় গড়াবার তেমনই গড়িয়েছে।

কিন্তু তবুও এই কথাটির একটু গুরুত্ব আছে। এই কথায় অন্তত এইটুকু স্বীকৃত হয়েছে যে এতকাল সেই পন্থায় তল্লাস চালানো হয়েছে যে পন্থায় মিজোরাম সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। নেতারা এই পর্যন্ত বলেই থেমে যান—এর পরে তাঁদের আর কিছু বলতে মানা—কেননা, স্বীকৃতিটুকু ব্যাখ্যা করতে গেলেই একরাশ অপ্রীতিকর প্রশ্ন নিষ্পত্তি করতে হয়। গত দেড় দশকের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে মানে গত দেড় দশক ধরে মিজোরামে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ড, ধর্ষণকাণ্ড এবং আরও অজস্র যত সব অসামাজিক ও অমানবিক কাণ্ড ঘটেছে তার সব কিছুই অর্থহীন হয়েছে? গত দেড় দশকে মিজোরামে উভয়পক্ষের মোট কতজন লোক নিহত হয়েছে? কতজন আহত হয়েছে? ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে কয়টি? কতগুলো গ্রাম কতবার করে উচ্ছেদ করা হয়েছে? একের পর এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কিন্তু পালিত হয়নি কেন? বৈরীরা কথা দিয়ে কথা রাখে না? তা হলে বারংবার ওদের সঙ্গে চুক্তি করতে যাওয়া কেন? চুক্তি লঙ্ঘন করবার সাহসই বা ওদের হয় কেমন করে? ভারতের অন্য কোথাও সামান্য একটু কিছু ঘটলেই বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করা হয়, অথচ মিজোরামে গত প্রায় দেড় দশক ধরে থেকে থেকে গুলিগোলা চলছে কিন্তু সেজন্য কারও এতটুকু উদ্বেগ নেই কেন? ভারতের একটি রাজ্যের আইন-শৃংখলা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর উপর ন্যস্ত রয়েছে; ওঁরাই আক্রমণ করছেন এবং আক্রান্ত হচ্ছেন মারছেন এবং মরছেন; বিভিন্ন খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং হচ্ছে; কিন্তু হাঙ্গামা কিছুতেই থামছে না, আরও ছড়িয়ে পড়ছে;—এমন নিষ্ঠুর, দীর্ঘস্থায়ী ও মহার্ঘ একটি ব্যর্থতা নিয়ে আজও কোন একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হল না কেন?

আরও একপ্রস্থ প্রশ্ন আছে। গত দেড় দশকে মিজো সমস্যার কোন সমাধান হয়নি মানে মিজো সমস্যা তন্মধ্যে আরও জটিল এবং দুরূহ হয়েছে। সমস্যা কখনো স্থির থাকে না, সমাধানের দিকে না গেলেই জটিলতার দিকে যায়। ভুল ঔষধ দেওয়া হলে রোগ ভালো হবার বদলে আরও খারাপ হয়, অনেক সময় রোগী মারা যায়। বিনা বিতর্কে, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র আমলাতন্ত্র ও নিরাপত্তা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে, গত দেড় দশক ধরে মিজোরামে যে ভুল চিকিৎসা চালানো হয়েছে তারপর রোগীর আজ কেমন অবস্থা? দৃশ্যতই, বিকারগ্রস্ত। কিন্তু ভ্রান্তি স্বীকারের পরেও সেই একই চিকিৎসা-পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? শোনা যায়, কোন কোন নীতিভ্রষ্ট ডাক্তার নাকি রয়ে-সয়ে ধনবান রোগীর চিকিৎসা করে,—রোগী যাতে হাতছাড়া না হয়। মিজোরামেও কি তাই ঘটছে? ভারতের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল মিজোরামের উপজাতি জীবন-ধারাটিকে ভারতীয় মূল ধারার (মেনস্ট্রীম:) সঙ্গে এক করে দেওয়া। গত দেড় দশকের হানাহানির পর সেই সুমহৎ উদ্দেশ্য থেকে কতদূরে সরে আসা হয়েছে? উভয়ের মধ্যে আজ আর এতটুকু আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই—শিলচরে অথবা সাইতুলে—বেসরকারী নিরপরাধরাও আজ আর নিরাপদ নয়। ঘটনাচক্র যেদিকে গড়াচ্ছে তার শেষ কোথায়? পরিণাম কি?

এই পর্যায়েরই আরেকটা জরুরী প্রশ্ন : এরা এখনো টিকে আছে এবং হাঙ্গামা চালিয়ে যাচ্ছে কেমন করে? বারংবার বলা হয়েছে যে বৈরী মিজোরা সংখ্যায় নেহাৎই নগণ্য। বলা হয়েছে যে মিজোরামের জনগণ এমনিতে ভারতের প্রতি খুব অনুগত—শতকরা সত্তর আশী জন নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে—এবং বৈরীদের উৎপাতে তারা অতিষ্ঠ। আমাদের সংবাদপত্রগুলিতেও এসব কথা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে মাঝে মাঝেই ছাপানো হয়ে থাকে। তার উপরে আবার কিছু কিছু বৈরী মিজো মাঝে মাঝে বেশ সাড়ম্বরে অস্ত্রসমর্পণ করে। কিন্তু এই সবের মধ্যে যদি কণামাত্রও সত্য থাকত তা হলে—বৈরী মিজোরা আজো টিকে আছে, পরাক্রমে বাড়ছে এবং লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে কেমন করে? সমাজের সর্বস্তরে—শিরায় উপশিরায়—লড়াই ছড়িয়ে না পড়লে এ-ধরনের লড়াই—গেরিলা লড়াই—দীর্ঘকাল চলতেই পারে না। জন না হলে
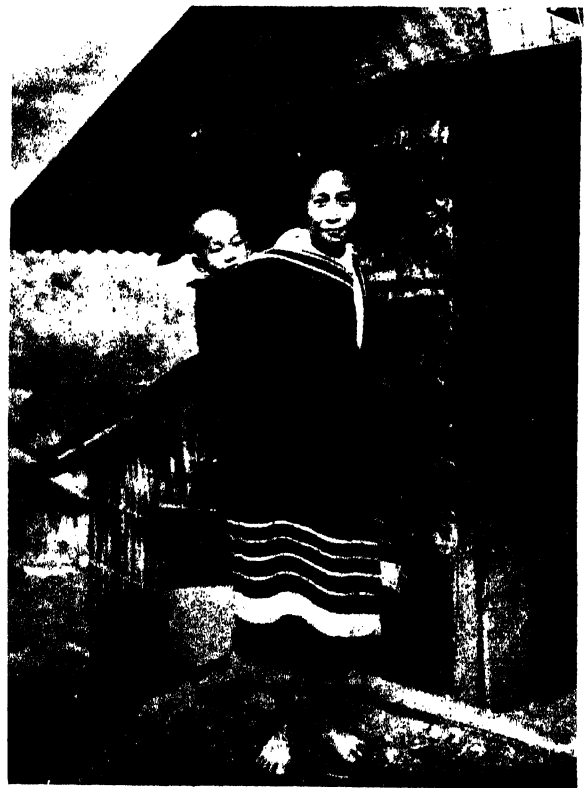
মালা রমণী

অনুগত মিজো কর্মচারীরাও কথায় কথায় বলে—তোমরা ভারতীয়রা! কথাগুলোই প্রমাণ হয়ে যায় যে মিজোরা নিজেদের আদৌ ভারতীয় বলে মনে করে না। প্রায় দেড় দশক ধরে, সব রকম উপায়ে, মিজোরামকে ভারতের পরিবারভুক্ত করবার চেষ্টা করে এই পরিণতি!

এই সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে হাঙ্গামা ও আগুনের ধর্মই হল ছড়িয়ে পড়া। শোনা যায়, বৈরী মিজোরা নাকি বিক্ষুব্ধ ত্রিপুরীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। খুবই স্বাভাবিক। কর্তৃপক্ষ ভালো করেই জানেন যে বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গেও এদের যোগাযোগ আছে। বস্তুত, এ-ব্যাপারে নাগাল্যাণ্ডই পথিকৃৎ ও পথপ্রদর্শক—এবং নাগাল্যাণ্ডের চিত্রনাট্য সামনে রেখেই মিজোরামের ঘটনাক্রম এগিয়ে চলেছে। মণিপুরেও শান্তি নেই—সামরিক বাহিনীকে সেখানেও মারতে হয়, মরতে হয় এবং ছাঁকনি অভিযান চালাতে হয়—ঘটনার গতি-প্রকৃতি হুবহু একরকম। খানিকটা পিছিয়ে আছে, কিন্তু মেঘালয়েও বিক্ষোভ দানা বাঁধছে এবং যে-কোন দিন তা ফেটে পড়বে। অরুণাচলেও জোর কদমে উন্নয়নের কাজ চালু হয়েছে—হাঙ্গামার বীজ বপন করা হচ্ছে—যথা সময়ে ফসলও তুলতে হবে। এইসব ছোট-বড় বিক্ষোভ ও অশান্তি যদি কখনো জোটবদ্ধ হয়—একদিন তা হবেই—তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? মিজোরামের অতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আরও একবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যার আজও কোন সমাধান হয়নি এবং যে কোন দিন এইটে একটা জাতীয় সংকট হয়ে উঠতে পারে। ইতিহাস সব সময়ই আগে থাকতে হুঁশিয়ার করে দেয়, তা উপেক্ষিত হলে তখন আঘাত হানে। তখন আর কোন ক্ষমা নেই।

এ-ব্যাপারে আমাদের গলদ একেবারে গোড়া থেকে। ন্যাজ তুলে এই উপজাতি সমস্যার চেহারা-চরিত্রটা বুঝবার কোন চেষ্টাই আমরা কোনদিন করিনি। স্বাধীনতার পরে অন্য দশটা বিষয়ে আমরা যেমন 'বিজিনেস্ অ্যাজ উসুয়াল' চালিয়ে গেছি—ব্রিটিশদের চলে যাওয়াটা যেন একটা ব্যাপারই নয়। —এই উপজাতিদের বিষয়েও ঠিক তাইই হয়েছে। অন্য দশটা বিষয়ে যেমন জট পাকিয়েছে, উপজাতিদের বিষয়েও তার অন্যথা হয়নি।

অজ্ঞতাবশতই হোক অথবা শঠতাবশতই হোক, আমরা গোড়া থেকেই এই ঐতিহাসিক সত্যটি মনে রাখিনি—এবং এখনও ভুলে আছি—যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত এই পার্বত্য এলাকাটি ব্রিটিশ আমলের আগে কোনদিনই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই এলাকাগুলো ম্যাপে আনবার জন্য ব্রিটিশদের পৃথকভাবে কোন লড়াইও করতে হয়নি—ব্রহ্মদেশ পৃথক হবার সময় নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরাম ভারতের ভাগে পড়ে যায়। এর পিছনে কোন প্রশাসনিক কারণ থেকে থাকলে তা নেহাৎই প্রশাসনিক ছিল। এইসব [illegible] ব্রিটিশ [illegible] চেষ্টা করা হয়নি কারণ তার কোন

ব্রিটিশদের ছিল। কেবল নজর রাখা যাতে ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকার চা-বাগিচাগুলোর উপর উপজাতিরা এসে হামলা করতে না পারে। এলাকাগুলো যখন যেমন এল সেগুলোকে তখন তেমনভাবেই এক একটি জেলা হিসাবে আসামের মানচিত্রের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হল। জেলার সীমারেখা টানবার সময়, সঙ্গত কারণেই, উপজাতি এলাকার দিকে একটু মেরে তা টানা হয়ে থাকবে—চা-বাগিচার নিরাপত্তার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু। আসাম ও নাগাল্যাণ্ডের সীমানা বিরোধ এইখানে শুরু। এসব ঘটনা একরকম স্থানীয় উপজাতিদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে গেল—প্রশাসনের ঘোরপ্যাঁচ অর্ধ সভ্য উপজাতিরা তখন কতটুকু আর বুঝত!

ঔপনিবেশিক যুক্তিতেই ব্রিটিশরা আরেকটি কাজ করেছিল : উপজাতিদের সঙ্গে সমতলের লোকদের কোনরকমেই মেলামেশা করতে দেয়নি। এ-ব্যাপারে যে আমাদের খুব একটা উৎসাহ ছিল তা নয়, তবুও দেশ-বিদেশের নৃতাত্ত্বিকদের দিয়ে বই লিখিয়ে আমাদের বোঝান হয়েছে যে, এইসব এলাকার অসভ্য উপজাতিরা স্বভাবতই হিংস্র—সুযোগ পেলেই গলা থেকে মাথা কেটে নেয়। আর পাহাড়ের অপরদিকে বিদেশী মিশনারিরা ওদের বুঝিয়েছে, যে সমতলের লোকেরা সত্য কথা বলতে জানে না, কথা দিয়ে কথা রাখে না, স্বভাবতই শঠ। পাহাড়ের দুই ধারে এই মনোভাব দুটি আজও অক্ষুণ্ণ আছে এবং অবিরত ইন্ধন পেয়ে আরও জোরদার হয়েছে।

সে যাই হোক, ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট আসাম নামে এই প্যাণ্ডোরার প্যাটরাটি স্বাধীন ভারতের হাতে এল। বিদেশী বণিকের ছেড়ে যাওয়া প্যাটরা গোড়া থেকেই একটু বুঝে-শুনে নাড়াচাড়া করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা তখন 'বিজিনেস অ্যাজ উসুয়াল' চালিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র; ব্রিটিশের তৈরী ভিৎ-কাঠামোর ভিতরেই স্বাধীন ভারতের সৌধ গড়ে তুলবার কাজে মেতে আছি। উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি সমস্যাটি আসলে কি বস্তু—সাপ না ব্যাং? —তা জানতে হলে অনেক মেহনত করতে হয়, ত্যাগ স্বীকারের কথাও উঠতে পারে। আমরা অতএব ধরে নিলাম যে নব-ভারতের স্বতই উদার পলিসিগুলো একবার চালু করে দিলেই কালক্রমে সব জাতের সব রকম সমস্যা আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যাবে।

উপজাতিরা আপত্তি করেছিল। বলেছিল, দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় সব ব্যাপারেই আমরা বহুদূরে পেছনে পড়ে আছি, এই নতুন ব্যবস্থায় আমাদের উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বিপন্ন হবে, উপজাতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, কালক্রমে আমাদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে। দিল্লির তরফ থেকে তখন আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে, তেমন দুর্বিপাক যাতে না ঘটে সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হবে। উন্নয়নের কাজ এমনভাবে হবে যে উপজাতি সমাজে বা ঐতিহ্যে তার আঁচড়টুকুও লাগবে না। দিল্লির এই ডিম না ভেঙে ওমলেট খাওয়াবার প্রস্তাবের পরেও ওরা যখন গাঁইগুঁই করতেই থাকল তখন আমরা নিশ্চিন্ত হলাম যে এর পেছনে নিশ্চয়ই বিদেশী মিশনারিদের উসকানি আছে।

এই মিশনারিদের সম্পর্কে এখানে দু-কথা বলা প্রয়োজন। একথা সবাই জানে এবং স্থানীয় উপজাতিরাও অস্বীকার করে না যে, মিশনারিদের সম্পর্কে এদের একটা বিশেষ রকম দুর্বলতা আছে। না থাকলে অকৃতজ্ঞতা হত। কেন না, এই মিশনারিরা সুদূর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বিনামূল্যে এদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে, শিশু ও দুস্থদের দুধ দিয়েছে—দয়া নয়, সেবার মনোভাব নিয়ে। মিশনারিদের সঙ্গে সহবৎ করে এরা নিজেদেরকে মানুষ বলে ভাবতে শিখেছে; উদ্দেশ্য যাই হোক, মিশনারিরা এদের ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ করে দিয়েছে। উপজাতিদের এই সর্বাত্মক কৃতজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা যদি ওদের কাছে আমাদের নামে দশকথা লাগিয়ে গিয়ে থাকে তবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই—প্রত্যাখ্যাত হলে মিশনারি-মাত্রেই দারুণ ক্ষেপে যায়। এক্ষেত্রে তার উপর আরও অনেক জোরদার ঔপনিবেশিক যুক্তিও ছিল। কিন্তু এই সব কিছু মেনে নিলেও এমন কথা কিছুতেই মান্যনীয় নয়, যে কেবল মিশনারিদের প্ররোচনায়ই প্রথমে নাগারা, তারপরে একে একে মিজোরা, ত্রিপুরীরা, মণিপুরীরা সবাই লাইন দিয়ে বিদ্রোহ করতে লেগে গেছে। এমন জিনিস হয় না, কেবল বাইরের প্ররোচনায় কোন দেশে একাদিক্রমে তিরিশ বছর ধরে বিদ্রোহ চলতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিকাণ্ড হতে পারে, কিন্তু কেবল স্ফুলিঙ্গ সম্বল করেই অগ্নিকাণ্ড স্থায়ী হয় না। এইসব অনির্বাণ জ্বালামুখীর আসল ইন্ধনটা তবে কে অবিরাম যোগান দিয়ে যায়? এইটি অবশ্যই একটা কঠিন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সঠিক জবাব খুঁজে বার করতে হলে সেজন্য অনেক রকমের প্রস্তুতির প্রয়োজন—আমাদের বর্তমান মেক-আপে সেসব সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্বাধীনতারও অনেক আগে থেকেই, বলতে গেলে কংগ্রেসী আন্দোলনের সূত্রপাত থেকেই, জাতীয় স্তরে আমরা স্থির করে নিয়েছি যে সব ব্যাপারে সদাসর্বদা আমরা সবচাইতে সহজ পথটি অনুসরণ করব। —সেই পথে যদি অনন্তকাল গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হয়—তবুও।

অতএব একের পর এক নাগারা এবং অন্যান্য উপজাতিরা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করল, ভারত থেকে বিযুক্ত হতে চাইল, তখন আমরা প্রথম পুরো দোষটা বিদেশী মিশনারিদের উপর চাপিয়ে দিলাম। তাতে যখন আর কুলোয় না তখন নিজেদের দায়মুক্ত রাখতে কিছু বিদেশী রাষ্ট্রকেও টানতে হয়েছে—কিন্তু সেজন্য আমাদের নন-অ্যালাইনমেণ্ট পলিসি কলঙ্কিত করা হয়নি—আমরা একই সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ও চীনকে এই হীন কাজের জন্য দায়ী করেছি। কিন্তু এক ভৌগোলিক যুক্তিতেই এইসব গুরুতর অভিযোগ একেবারে নস্যাৎ হয়ে যায়। পূর্ব-পশ্চিম কোন পথ দিয়েই সরাসরি নাগাল্যাণ্ডে এমন কিছু পাচার করা সম্ভব

কেবল টাকার বিনিময়ে যেখানে বিদ্রোহ বাধানো যায়, সেখানে টাকার বিনিময়ে আনুগত্যও খরিদ করা যায়। কিন্তু এই বিদ্রোহ বা আনুগত্য কখনোই স্থায়ী হয় না, স্থায়ী হতে পারে না। প্রমাণ নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয় প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহের স্থায়িত্ব এবং সরকারসমূহের ক্ষণিক অনিশ্চয়তা।

কিন্তু এইসব গূঢ় কথা বিবেচনা করে দেখবার তখন আমাদের অবকাশ কোথায়! দেশের সুদূর এক কোণে গুটিয়ে অসভ্য-অর্ধসভ্য উপজাতি কয়েকটি অসম্ভব দাবি তুলে একের পর এক আত্মধ্বংসী কাণ্ড করে চলেছে—দিল্লির অন্য দশটা দুশ্চিন্তার তুলনায় এসব নিতান্তই তুচ্ছ। এক্ষেত্রে সব চাইতে সহজ পথ হল : দায়টা মিশনারি ও বিদেশী চক্রান্তের উপর চাপিয়ে দিয়ে দায়িত্বটা আমলাতন্ত্রের উপর সঁপে দেওয়া। ব্রিটিশদের গড়া আমলাতন্ত্র, এসব কাজে সিদ্ধহস্ত।

কিন্তু এইসব অকাট্য যুক্তি ও সুন্দর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও উপজাতিদের আতঙ্ক তবু কাটে না—তখন অগত্যা ওদের স্বকীয়তা রক্ষা করবার জন্য সংবিধানে ষষ্ঠ সিড্যুল নামে একটা পরিশিষ্ট জুড়ে দেওয়া হল। এই সিড্যুলে উপজাতিদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখবার ভার ওদের উপরই ন্যস্ত হল—তবে সরকারী তত্ত্বাবধানে। সেই সঙ্গে আয়কর থেকেও ওদের ঢালাওভাবে রেহাই দেওয়া হল। মিশনারি প্রেরণায় এই আয়কর মকুবের ব্যাখ্যা দাঁড়াল : কৃত্রিম উপায়ে কতিপয় ধনী ব্যক্তি অথবা পরিবার তৈরি করে উপজাতি সমাজে ভাঙন ধরাবার দুরভিসন্ধি। এই তরফে তেমন কোন অভিসন্ধি ছিল কি না বলা শক্ত, তবে গত ত্রিশ বছরে উপজাতি সমাজে সত্যই কতিপয় ধনী ব্যক্তি তথা পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে, এবং ওদের সমাজও আর আগেকার মতো শ্রেণীহীন নেই।

সে যাই হোক, উপজাতি সমস্যা সমাধানের সেই সাংবিধানিক প্রয়াস সফল হয়নি। —তার প্রমাণ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল এরা সবাই আসাম রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং এদের কেউ কেউ আজ ভারত রাষ্ট্রের মানচিত্র থেকেও বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ভারত সরকার আজও তবু এই ব্যর্থতাটির কথা অকপটে বা মুক্ত কণ্ঠে মেনে নেয়নি। তার অনেক দায়। তারচাইতে এই ব্যর্থতার জন্যও সেই মিশনারিদের উপরই দোষ চাপিয়ে দেওয়া অনেক সহজ কাজ। পরবর্তী ঝামেলা সামলাবার জন্য আমলাতন্ত্র তো সর্বদাই এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। সংবিধানের ষষ্ঠ সিড্যুলটি—ব্যর্থ হোক আর সার্থক হোক—সেটিও এই আমলাতন্ত্রের হাত দিয়েই প্রয়োগ করা হয়েছিল। লোকেরা কথায় কথায় ফরাসী আমলাতন্ত্রের গুণগান করে থাকে, কিন্তু আমাদের আমলাতন্ত্রই বা কীসে কম যায়! ত্রিশ বছর ধরে ভারতের মতো দুরূহ একটি রাষ্ট্রযন্ত্র চালু রাখা চাট্টিখানি কথা নয়—ইংরেজ-ফরাসী হন্দ হয়ে যেত!

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যা সামলাবার ব্যাপারেও কতবার কত বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে হয়েছে—কিন্তু আমাদের আমলাতন্ত্র অকুতোভয়। আমলাতন্ত্রের সবচাইতে বড় সুবিধা এই যে, নতুন কিছু উদ্ভাবন করবার কোন অধিকার একে দেওয়া হয়নি। কেবল প্রিসিডেন্স দেখে, মানে আগে যেমন যেমন করা হয়েছে ঠিক তেমন তেমন চালিয়ে যাওয়া। আইন ও শৃঙ্খলা কেমন করে রক্ষা করতে হয় সংশ্লিষ্ট ফাইলে তার সবিস্তার নির্দেশ দেওয়া আছে। একটা ব্যবস্থায় কাজ না হলে তখন আর কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে, সব লেখা আছে. ফাইল অনুসরণ করলেই হল। আরও একটা কথা সকলের স্মরণ রাখা প্রয়োজন —কোন সমস্যার সমাধান করা আমলাতন্ত্রের কাজ নয়; আমলাতন্ত্রের কাজ হল সমস্যাকে সামাল দেওয়া। অর্থাৎ, সমস্যা থাকলেই তবে আমলাতন্ত্রের আবশ্যকতা। সমস্যা জীইয়ে রাখতে পারলে তাতে আমলাতন্ত্রেরই লাভ। সমস্যা যদি ছড়িয়ে যায় তবে সেটা উপরি। অতএব পেশাগত কায়েমী স্বার্থের খাতিরেই আমলাতন্ত্রকে দিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

গত তিরিশ বছরে এই উপজাতি সমস্যার যে কোন সমাধান হয়নি তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অতএব আমাদের আমলাতন্ত্রের। প্রয়োজন মত অন্য সবাইও যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। আমলাতন্ত্রের ডাক পেলেই দিল্লির রাজনৈতিক নেতারা কালবিলম্ব না করে ভাষণ দিয়েছেন, উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেছেন, শান্তি কমিটি বসিয়েছেন, বিদ্রোহীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, বৈঠক ভেঙেছেন, এ.কর পর এক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, ভয় দেখিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন—আমলাতন্ত্রের চিত্রনাট্য যখন যেমন করতে বলেছে তখন তেমন করেছেন। সংবাদপত্রগুলিও কোনরকম বাগড়া দেয় নি। সমতলে কোথায়ও পান থেকে একটু চুন খসালে এরা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে, তদন্ত দাবি করে, অবুঝ বুঝে নরম-গরম পরামর্শ দেয়। কিন্তু ত্রিশ বছরের উর্ধ্বকাল ধরে, উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্রমবর্ধমান একটা এলাকায়, এমন বীভৎস একটা হাঙ্গামা থেকে থেকে ঘটেই চলেছে—অথচ তা নিয়ে এদের মধ্যে তেমন কোন উদ্বেগ নেই। এখানেও সেই একই চিত্রনাট্য—দর্শক ভোলাবার জন্য কখনো উষ্মা, কখনো ঘৃণা, কখনো বিস্ময়, কখনো হতাশা, কখনো প্রতিহিংসা এই সব ভাব প্রকাশ করা হয়। একেবারে বাঁধা-ধরা গৎ।

মাঝে মধ্যে তবুও একটু-আধটু গোলমাল হয়ে যায়। অতি আদর্শবান কেউ কেউ হঠাৎ উৎসাহের আধিক্যে চিত্রনাট্যের সীমা লংঘন করে ফেলেন। কিছুদিন আগে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই যেমন নাগা নেতা ও ফিজোর সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত আলাপ-আলোচনার সূত্রপাতেই এক তিড়িং-বিড়িং কাণ্ড করে বসলেন! নাগা নেতা ফিজো এবং মিজো নেতা লালডেঙ্গা সম্পর্কে দিল্লির সুচিন্তিত পলিসি হল : নিজ নিজ এলাকায় এদের প্রকৃত কোন প্রভাব নেই—কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখলে এরা আপনা থেকেই খসে পড়বে। তার আগে

পর্যন্ত কেবল দেখিয়ে যেতে হবে যে ভারত এইসব বিপথগামীদের সম্পর্কে সব আশা একেবারে ছাড়েনি। কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লা সম্পর্কেও দিল্লির এক সময়ে ঠিক এই পলিসি ছিল। শের নাকি শেয়াল হয়ে গেছে! ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরাও কংগ্রেসী নেতাদের সম্পর্কে এই একই পলিসি অনুসরণ করেছিল। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, দিল্লি এখনো গোঁ ধরে আছে—ফিজো বা লালডেঙার সঙ্গে কোন রফা নয়। দিল্লির দাবি : কোন রকম আলাপ-আলোচনার আগে নিঃশর্তভাবে ভারতের সংবিধান সর্বাংশে মেনে নিতে হবে। দাবিটা একটু হাস্যকর। কেননা, সংবিধানটা যদি সর্বাংশে মেনে নেওয়াই হল, তা হলে আর, ওদের দিক থেকে, আলাপ-আলোচনার বাকি রইলটা কী?

এই অবাস্তব দাবিটির সঙ্গে সমান অবাস্তব একটা অভিযোগও আছে। এরা চুক্তি করে তার শর্ত পালন করে না, অস্ত্র সমর্পণ করবার বদলে অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলে। শর্ত লঙ্ঘনের ব্যাপারে কে কতটা আগুয়ান তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আসল প্রশ্ন হল—এইসব শান্তিচুক্তি কি যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশে সম্পাদিত হয়? উভয় পক্ষ স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর দিলে তবেই তাকে বলে চুক্তি। অধিকতর প্রতাপশালী প্রতিপক্ষের সৈন্যশিবিরে যা ঘটে তা চুক্তিপত্র নয়, বড় জোর সন্ধিপত্র। এহেন সন্ধিপত্র কখনোই স্থায়ী হয় না, স্থায়ী হতে পারে না, স্থায়ী হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু এতসব সূক্ষ্ম তর্কে যাবার কোন প্রয়োজন নেই—আসলে সমস্যাটি সমাধান করবার কোন অভিপ্রায়ই আমাদের আমলাতন্ত্রের কোনকালে ছিল না, থাকবার কথাও নয়। তা ছাড়া, চুক্তিপত্রে ঢেরা-সই করে বড় জোর সাময়িক সহাবস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে, স্থায়ী সখ্যতা কদাচ নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যার সমাধান করতে হলে সকলের আগে যা দরকার তা হল উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। আমরা ওদের বন্য, অর্ধ-সভ্য বলে অবজ্ঞা করতে থাকব, ওরা আমাদের শঠ, ধান্দাবাজ বলে ঘৃণা করতে থাকবে এবং তারমধ্যেই একটা চুক্তিপত্র সম্পাদন করে উভয়ের মধ্যে স্থায়ী আত্মীয়তা গড়ে উঠবে—এমন আশা করাই কপটতা। স্থায়ী সখ্যতার জন্য উভয়পক্ষকেই এগিয়ে আসতে হয়—উভয়পক্ষেরই এগিয়ে আসবার সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকা চাই। জটিলতম সমস্যারও সমাধান সম্ভব হয় যদি উভয়পক্ষই সে-ব্যাপারে উৎসুক হয়—যদি উভয়পক্ষেরই উৎসুক হবার সুযোগ ও আকর্ষণ থাকে। তা নয়তো, ঘোড়াকে টানা-হ্যাঁচড়া করে জলের কিনারে টেনে নিয়ে যাবার মতোই সবকিছু পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়ায়।

এ ক্ষেত্রে, ভারত যেহেতু প্রবল পক্ষ অতএব ভারতকেই উদ্যোগী হতে হবে। এমন পরিবেশ ভারতকেই সৃষ্টি করতে হবে যেখানে উভয় পক্ষই নির্ভয়ে এবং অকপটে—সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে—সবকিছু আদ্যোপান্ত বিচার করে দেখতে পারে। যে পরিবেশে, মিয়া-বিবি রাজি থাকলে, হৃদয়ের লেন-দেন হয়। এমন পরিবেশ গড়ে তোলা কেবল ভারতের পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু গোড়াতেই প্রশ্ন উঠবে, ওরা যে মোটে আমাদের সঙ্গে থাকতেই চায় না—ভারত ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর—ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য আবার পরিবেশ সৃষ্টির কথা ওঠে কেন? প্রশ্নটায় একটু ত্রুটি আছে। কেন না, ভারত থেকে পৃথক হয়ে যাবার দাবিটা নিয়ে ওরা খুব একরোখা ভাব দেখালেও, দাবিটা যে একেবারে অনড় নয় তার প্রমাণ—ওরা বারংবার আলোচনায় বসছে, ভারত থেকে গণ্যমান্য কেউ লণ্ডনে গেলে ফিজো তাঁদের সঙ্গে নিজে থেকে এসে দেখা করেন।

উপজাতিরা আসলে নিতান্ত মূঢ় নয়। ওরা ভালো করেই জানে যে ভূগোলের
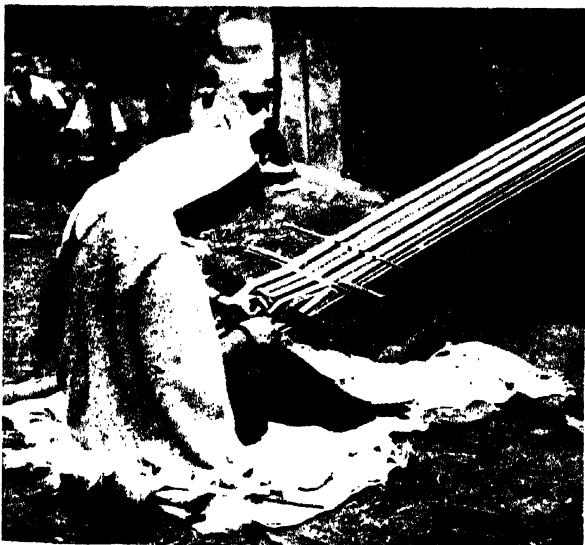
মিজোরামের বাসিন্দা

বিধান লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা ওদের নেই। ওরা জানে, ভারতের সঙ্গেই ওদের থাকতে হবে, এবং ভারতও চিরদিনই আকারে ও প্রতাপে বিরাট-বিশাল থাকবে। ওদের ওই দাবিটার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে আমরা আসলে নিজেদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করি, নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার চেষ্টা করি। এই ভৌগোলিক নিদানটির কথা মনে রাখলে আমরাও আরেকটু সহনশীল হতে পারতাম। সে যাই হোক, ওদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে যখন আলোচনায় বসছি, ওরাও যখন আসছে, তখন পরিবেশটাকে একটু অনুকূল করে নিলে তা আমাদের সততার ও সদিচ্ছার প্রমাণ হবে। আর ওরা যখন গোঁ ধরেছে, ওরা যখন দুর্বল পক্ষ, তখন ফিজো অথবা লালডেঙার সঙ্গে বৈঠক করলেই বা ক্ষতি কি। জঘন্যতম লোকের সঙ্গেও তো আমরা সৌহার্দ্য বিনিময় করে থাকি!

অতএব সুনির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য যদি নাগাল্যাণ্ডে অথবা মিজোরামে ভারতীয় সেনা-বাহিনীর কার্য-কলাপ কঠোরভাবে স্থগিত রাখা যায়, কিংবা সেনা বাহিনীকে তুলেই নেওয়া যায়, তা হলে ক্ষতি কি? সবাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাতে সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে যাবে না। চীন এত বোকা নয় যে উত্তর ব্রহ্মের দুস্তর ও দুর্ভেদ্য অরণ্য-পর্বত অতিক্রম করে ঐ অঞ্চল দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে—ভারতকে আবারও কাবু করতে হলে চীন থেকে আরও অনেক সহজ পথ আছে। অপর দিকে, নাগারা বা মিজোরা, সংখ্যায় নেহাতই মুষ্টিমেয়, যদি তেমন কোন বাঁদরামো করেই বসে, তবে আগে থাকতেই তাদের বলে দেওয়া হোক, যে তার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। ভারতীয় সেনা বাহিনীর পক্ষে তা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

এমনিভাবে পরিবেশটাকে সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত করে আলোচনায় বসলে হয়তো কিছু সুফল পাওয়া যেতেও পারে। চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? তারপরে আমরা অন্তত এইটুকু জোর দিয়ে বলতে পারব, যে আমাদের দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি ঘটেনি। ভয়মুক্ত পরিবেশে খোলা মন নিয়ে আলোচনায় বসলে বোঝা যাবে, যে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অটুট রেখে ভারতের পক্ষে কতটুকু ছাড় দেওয়া সম্ভব, আর ওদের পক্ষেই বা নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষত রেখে সার্বভৌমত্বের দাবিটার কতটুকু কাট-ছাট করা যায়। তার পরেও উভয়পক্ষ একমত না হতে পারে—কিন্তু তার সম্ভাবনা কম। আসল কথা হল, সততা ও সদিচ্ছার যদি অভাব না ঘটে তবে এমন আলোচনায় সুফল হতে বাধ্য। পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা নেই সদিচ্ছা থাকলে যার সমাধান হয় না। প্রথম বৈঠকেই হয়তো সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে না, সমস্যাটি দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং এর জট ছাড়াতেও সময় লাগবে, কিন্তু আস্তে আস্তে বরফ গলবেই।

উপরের প্রস্তাবটিকে নিছক কল্পনা-বিলাস বলে খারিজ করে দেবার আগে আমাদের মনে রাখা দরকার যে ত্রিশ বছরের উর্ধ্বকাল ধরে লড়াইটা চলছে। একদিকে সুবিশাল ভারতীয় সেনা বাহিনী এবং আরেক দিকে কতিপয় বৈরী মিজো-নাগা—লড়াইয়ের তবু কোন নিষ্পত্তি হয় না। ত্রিশ বছর ধরে চলেছে, হয়তো আরও ত্রিশ বছর ধরে চলবে। অন্যান্য উপজাতিরাও একে একে ক্ষেপে উঠছে, অস্ত্র ধারণ করছে। আসামের সমতলে এবং উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী এলাকায়ও আগুনের স্ফুলিঙ্গ এসে পড়ছে। এই সুবিস্তৃত এলাকাটাই হয়তো অদূরভবিষ্যতে ভিয়েতনামের চেহারা নেবে। ভারতের ভিয়েতনাম।

... একবার পরখ করে দেখলে ক্ষতি কি?

পুনশ্চ পারী

নীরদ মজুমদার

জ্যাঁ রাসীন ১৪শ লুইকে নিজের নাটক পড়ে শোনাচ্ছেন।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

শহরের আশেপাশে যেসব শহরতলী বিরাজ করে, তাদের চেহারা স্বভাবত বেশ দুঃস্থ, বেশ দুঃখী ভাব থাকে। আবার "বাঁলিও" বা শহরতলী যদি অনন্যসাধারণ অনবদ্য শহর পারীর আশেপাশে হয়, তাদের চেহারা আরো করুণ। পারীর বাঁলিও-গুলোর অবস্থা এমনিতে ভাল হওয়া সত্ত্বেও, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেও, ইচ্ছে করবে ওখান থেকে দূরে গ্রামে জঙ্গলে পালাতে।

আমাদের ইস্কুলটা ছিল এমনি এক বাঁলিওর ব্যাথায় ঘেরা পরিবেশে। বিরাট বড়। শাতোর মত বাড়ি। মস্ত বাগান। বড় বড় অনেক ঘর। একদিন সচ্ছলতায় আলোকিত ছিল। সব ঘর মনে হয় মানুষজন দাসদাসীতে মুখর ছিল। বড় বড় ঘর। কোনটা বিলিয়ার্ড খেলার, খাবার ঘর, শয়ন-কক্ষ, সুন্দর পালঙ্ক, বড় ঝাড়লণ্ঠন যা আজ আর জ্বলে না। মস্ত মস্ত আয়নার সোনার ফ্রেমে ধুলোর ঘনত্ব। আর ঘিরে ধরে না সেদিনকার সুন্দর সুন্দরীদের প্রতিবিম্ব। অনেক ঘরই বন্ধ ভূতের ঘরের মত। তারপর জানালার বাইরে প্রাচীর-ঘেরা মস্ত উদ্যান। দূরে এক কোণে, একটি মন্দির জাতীয় কিছু। হয় কাল অতিবাহিত করার জন্য, নয় তো বিহারের জন্য। সমস্ত বাড়ির মধ্যে একটা বিগত দিনের কথা জড়িত। পাথর খসে যাওয়া আংটির মত। একটা বাঁধান হতাশা।

খুব ভাল লাগতো না। প্রায় পালাতাম পারীতে। যেতাম হয় জাঁর বাড়ি নয়তো মারিলিনের ফ্ল্যাটে। রাত কাটিয়ে পর দিন ফিরতাম। জাঁর বাড়িতে জাঁ, বুভিয়ে এবং আমি—খাওয়া দাওয়া ছবির কথায় খুব জমতো। ভাল ঘুম হতো। মারিলিনের বাড়িতে অবারিত দ্বার। ওর ঘরের এক প্রস্থ চাবি আমার কাছেই থাকতো। ওখানে গিয়ে উঠতাম ও না থাকলেও। মারিলিন গান গেয়ে বাড়িতে ফিরতো মধ্যরাত্রের বেশ কয়েক ঘণ্টা পর। রোজ রাতে ওর হাতে থাকতো হুইস্কির বোতল।

আমাকে জাগাতো কাম অন লেটস হ্যাভ সাম ড্রিঙ্কস।

অত রাতে খালি পেটে মদ্যপান আর ওর সুখ-দুঃখের কাহিনী শোনা। ঘুম ভাল হতো না।

[illegible]

পোয়াতিয়ে। ওখানেই মার্গারিট আসবে। ট্রেনে যাব বর্দো অবধি, তারপর সাইকেল ভাবু করতে করতে নামা যাবে। অর্থের প্রয়োজনে কিছু ড্রইং এনগ্রেভিং মারিলিনকে দিয়েছিলাম যাতে একটা সুরাহা হয়। কিন্তু মারিলিনের ওখানে রাত কাটালে তার পরদিন ছবি আঁকা আর হোতো না। অথচ খুব ইচ্ছে ক্যাথরীনকে নিয়ে করব কিছু ড্রইং।

ফোনে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

কবে? কোথায়? ক্যাথরীনের স্বর ওদিক থেকে ভেসে এল।

পারী থেকে একটু দূরে ধর ভো ল ভিকোৎ! জায়গাটা কেমন লাগে তোমার?

ভারি সুন্দর! বেশ রাজকীয় পরিবেশ! গ্রীক না হলেও তাদের অধস্তনদের কথা মনে করিয়ে দেবে। ক্যাথরীন খুশি হলো, তারপর সে জানালো লাঞ্চের ব্যবস্থা আমি করে নিয়ে যাব—

কিন্তু কোন নাটক তুমি তো বললে না?

উত্তর করলাম,—"ফেদ্র" তোমার পছন্দ?

অবশ্যই! বই আমি নিয়ে যাব এবং ড্রেস।

বেশ চল কাল, আমার বইও আমি নিয়ে যাব

বেশ চল আমি সানন্দে সম্মতি জানালাম।

ক্যাথরীনের উৎসাহ আনন্দ সত্যই সংক্রামক।

আমি কাগজ কলম, জলরঙ, তুলি, নিলাম, কেবল ইজেল এসব কিছুই নিয়ে যাইনি। কারণ মাঠে বসে বোর্ডে ছবি আঁকিবো।

ভো ল ভিকোৎ-এর শাতো ভারি সুন্দর। ভারি খোলামেলা। কেয়ারি করা বাগান। বাগানের মধ্যে জলাশয়, ফোয়ারা, মনোরম পাথরের মূর্তি বাগানে ছড়ান। সব মিলিয়ে বেশ রাজকীয় পরিবেশ।

ক্যাথরীন বললে, চল প্রথম আমরা কফি পান করি, তারপর আমরা কাজে লেগে যাব।

বেশ তাই চল।

একটি একান্ত কোণ আমরা খুঁজে বার করলাম। সেখানে একটি শ্বেতপাথরের মূর্তি শ্বেত-পাথরের পাদানিতে দণ্ডায়মান। পাশে ঝাউ—মাটিতে বড় গাছের ছায় আলো। আমি মাটিতে বসে বোর্ডে কাগজ আটকাতে ব্যস্ত। ও তখন ফ্লাস্ক থেকে কফি ও কিছু গাতো পরিবেশন করতে ব্যস্ত।

ক্যাথরীন ভিতরে একটি সাদা মসলিন জাতীয় পোশাক পরেছে, কোমরে একটি ধাতুর কোমর-বন্ধনী। বুকে একটা ব্রোচের মত অলংকার। মাথায় একটা হাল্কা ক্রীপের মত পরেছে। তাই মনে হচ্ছে মাথা ঘিরে রয়েছে যেন মুকুট। আর সব ঢাকা পড়েছে ওর বড় গাবার্ডিনের ঘি রঙের একটা কোট। কফি পান করতে করতে পরিবেশের আশপাশ সব দেখলে।

দেখে নিয়ে ক্যাথরীন বলল, সুন্দর এ দৃশ্যপটে তোমার হবে?

আমি রাসীনের বিয়োগান্ত ন্যাটক "ফেদ্র" বইটা পাশে রাখলাম।

ক্যাথরীনও ওর বই বার করে বললে, কেন জান?

কেন?

এই কারণে বলছি যে, এই ফেদ্রের মঞ্চদৃশ্য পরিকল্পনার কথায় খ্যাতনামা অভিনেতা ও প্রযোজক মহাশয় জাঁ লুই বারো মন্তব্য করেছেন, দুটি বিপরীত উপাদানের কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। সেই বৈষম্য বজায় রেখে দৃশ্যপট গঠন করা উচিত। প্রথমত এক দিকে আলোকে সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত, তাতে থাকবে সমুদ্রের বাতাস। অন্য দিকে রহস্যময় নিবিড় ছায়া অন্ধকার থাম খিলানে বিরচিত করা যাতে সর্বদা সূর্যের উপস্থিতির সাক্ষ্য থাকবে। ঘটনা শুরু হবে ঊষায় এবং শেষ হবে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। একটি দিনমানের বিয়োগান্ত ঘটনা। সূর্য কিরণ রঙ্গমঞ্চ উদ্ভাসিত করতে থাকবে প্রহর অনুযায়ী, কিয়দংশ ভিন্ন ভিন্নভাবে তীর্যক আলোকে, ক্রমান্বয়ে। দৃশ্যপটের অন্ধকারের অংশ ছায়াময় হলেও হওয়া চাই উষ্ণ। আর এক খণ্ড আকাশ মঞ্চের ওপরে জায়গা করে থাকবে।

ক্যাথরীনের কথা শুনে আমি বললাম, বাঃ। সুন্দর পরিকল্পনা। তবে কমেদি ফ্রাঁসেজে অনেকটা

গ্যাস আর বদ্‌হজম। অতিমাত্রায় কোলোস্‌ট্রোল। গাঁটে গাঁটে ব্যথা।

ত্রিশ বছর বয়সের পরে এই সব সমস্যা নিয়ে আপনি কী বাঁচতে পারেন?

হ্যাঁ, বাঁচবেন।

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্লসের মাহাত্ম্যে।

আপনার শরীরে রোগের মোকাবিলা করার শক্তি এখন আর ততখানি নেই, যতটা কিছুদিন আগেও ছিল। এখন আপনার নিজের শরীরের প্রতি একটু বেশী যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসুন প্রয়োগে রোগ নিরাময়ের সুপ্রাচীন পদ্ধতিকে আবার প্রমাণ করেছে।

অতি আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে পরীক্ষার দ্বারা রসুন ঔষধির নিরোধক ও নিরাময়ের গুণ সুপ্রমাণিত হয়েছে।

- গ্যাস ও বদ্‌হজম দূর করে, বুকের জ্বালা আরাম করে
- কোলোস্‌ট্রোলের বেশী মাত্রা কমিয়ে আনে
- গাঁটের ব্যথা প্রশমনে সাহায্য করে
- বার-বার কাশি ও সর্দ্দি রোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করে

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্লস্‌—গন্ধ নেই, তবু কাঁচা রসুনের সব গুণই পাবেন এতে।

কাঁচা রসুন একবার রাঁধ্‌লে এর নিরাময় ক্ষমতা নষ্ট হয়।

কিন্তু, র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্লস্‌ এ শুদ্ধ, কাঁচা রসুনের ঘন নির্য্যাস গন্ধহীন সহজলভ্য মুক্তাদানার আকারে পাওয়া যায়।

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্ল'স্‌ নিয়মিত সেবনে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান হয়।

র‍্যানব্যাক্সি—যে নামে ডাক্তারদের আস্থা রয়েছে।

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্ল'স্‌ হ'ল র‍্যানব্যাক্সির লেবরেটরীজের উৎপাদন—যে নামটিতে চিকিৎসকগণ বিশ্বাস রাখছেন।

নিজের প্রতি খেয়াল রাখুন।

GP-5661 BEN
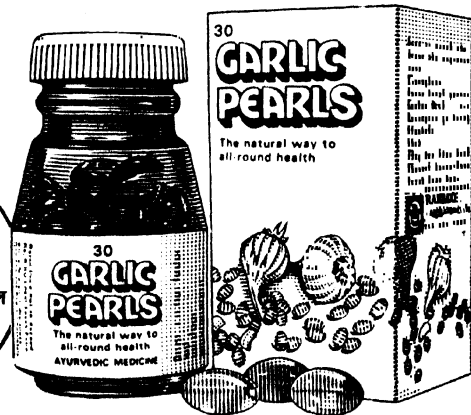
র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্লস্‌ সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য লাভের প্রাকৃতিক পন্থা।

বেরেনিস—আতিমুস ও তিতুস।"

এই ধরনেরই পরিকল্পনা হয়, তাই না ?

ও বললে, হ্যাঁ অনেকটা।

কিন্তু এই নাটক আমি অনেকবার দেখেছি।

প্রতিবারই মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসবে।

আমি বললাম, আঁদ্রে জিদের কথা সত্য। মনুষ্যলোকের কোন ভাষাতেই ফেদ্রের মত এমন উচ্চাঙ্গের নাটক রচনা কোনদিন হয়নি। সত্যই রাসীন এক মহান ও অতুলনীয় প্রতিভা। পল ভালেরী বলেছেন, উপাত্ত তুমি যতই নাও, যত দিক থেকে নাও না কেন, তবুও তুমি বলতে পারবে না 'রাসীন কেন রাসীনই'। তবে ঐ সময়টাও ফরাসী ইতিহাসের মধ্য আকাশে প্রতিভার নক্ষত্রপুঞ্জের সমাবেশ—গ্যালাক্সিবৎ। সপ্তদশ শতাব্দী। ধরো না, ঐ সময়ই লুই ক্যাতর্জ, যাকে বলা হয় সূর্যরাজ, ঐ সময় কর্নেই, মলিয়ের, পাস্কাল। তখনও জীবিত দ্যকার্ত, লা ফঁতেইন, মহান শিল্পী চিত্রকর নিকোলা পুসাঁ, বোয়ালো, বোসুয়ে, দার্শনিক মেলব্রাঁস। আবার ঐ শতকেই রামোর জন্ম, চিত্রকর ভাতোর জন্ম। ইয়োরোপের অন্যত্র একালেই দিয়েছে অনবদ্য সাক্ষ্য স্পীনোজা, নিউটন, লাইবনীৎস। ঐ শতাব্দীতেই জন্ম সঙ্গীতজ্ঞ বাখ ও হ্যাণ্ডেলের। ঐ শতাব্দীতেই রচিত হয়েছে বিয়োগান্তিকা ফেদ্র, বেরেনীস, ব্রীটেনীকাস, আঁদ্রমাক ইত্যাদি।

ক্যাথরীন বললে, তুমি দেখবে বিয়োগান্তের যত নাটক রচনা হয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ নায়কই নাটকের কেন্দ্র। কিন্তু রাসীনের নাটকে মুখ্যত নারীচরিত্র ঘিরেই বিয়োগান্ত। পরিস্থিতি নয়, রাসীন পরন্তু মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটোতেই নারী রূপকে প্রাধান্য দিয়েছেন—যেমন ধর আঁদ্রমাক, বেরেনিস, ইফিজেনী, ফেদ্র ইত্যাদি।

আঁদ্রমাক রাসীন লিখেছেন ১৬৬৭, প্রথম হতেও বেশী প্রভাবান্বিত করেছে রাসীনকে ভির্জিল (এনিড), আঁদ্রমাক হেক্টরের বিধবা স্ত্রী, পিরুশের বন্দী "উদ্বিগ্ন মনস্তত্ত্বের ভাবাবেগ ; প্রায় উচ্চারিত হয়ে থাকে :—"জ নে লে পোয়াতাকর অম্ব্রাসে দ' উজুন্দুই ভা, কুর, মে ক্লাজাকর দী ক্রুডে এরমিয়ন পুরকোয়া লাসাসীনে ? কাত্রল কে আকেলাতিতর ? কি ত লা দি ?"

অর্থ, "আজ অবধি আমি তাকে (পেরুশ)কে চুম্বন করিনি,

যাও দৌড়ও দেখ ধরতে পারবে কিনা এরমিয়নকে (পেরুশের ঈর্ষান্বিত বাগদত্তা, যে তার হত্যার কারণ) কেন হত্যা ? কোন অপরাধ ? বিচারের কোন শিরনামায় ? কে বলেছে তোমায় হত্যা করতে ?" বেরেনিস ; রাসীনের তিরিশ বছর বয়েসে লেখা ; পাঁচ অঙ্কের ছন্দোবন্ধ রচনা ; বলা হয় আরিয়েৎ ইংল্যাণ্ডের যিনি ছিলেন ডাচেস অফ অর্লেয়াঁ তাঁর অনুরোধে রচনা করেন ; সত্যই অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক, এলেগেন্স রীতিবদ্ধ রচনা ও তার ভাবাবেগ অদ্বিতীয়। এবং ১৬৭৭ সালে রাসীন তাঁর শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত ফেদ্র রচনা করেন মাত্র ৩৭ বছর বয়েসে, ফেদ্র, বংশানুক্রমে, স্বর্গ বা ঔরানসের বংশোদ্ভব, অতঃপর জুপিটার এলিওস বা সূর্য এবং এদের দুই দিক থেকে মিনস ক্রিটের রাজ-ঔরসে ও অন্য দিক থেকে পোসিপেয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ফেদ্র ও তার ভগিনী আরিয়ান,—

অন্যদিকে থেজে যিনি এথেন্স ও (এজেনের রাজা ধরিত্রির বংশানুক্রমে প্রথম পুত্র হয় ইপোলিত আঁতিয়োপ বা আমাজোনস-এর গর্ভে যিনি বিগত হওয়ার পর থেজে বিবাহ করেন ফেদ্রকে অর্থাৎ ইপোলিতের বিমাতা, থেজের কল্যাণে দুই পুত্র হয় কিন্তু, রাজা থেজের অবর্তমানে পুত্রবৎ ইপোলিতের [illegible] অনুচর থেরামেনের ভাষায়,

....মরণোন্মুখ এক নারী খুঁজে মরছে তার মৃত্যু।

কফি পানের পর ক্যাথরীন ওর গাবার্ডিন কোট খুলে দাঁড়াল। "ফেদ্র" বই হাতে নিয়ে বললে, তুমি তো আগেও দেখেছো। তবু আর একবার বিয়োগান্ত নাটকের ছকটা আমরা দেখে নিই, কী বল ?

ঠিক তাই।

প্রথম অঙ্ক : ১। রাজপুত্র ইপোলিত ও গৃহশিক্ষক থেরামেনের কথোপকথন। নিরুদ্দেশ পিতা রাজা থেজের অনুসন্ধানে ইপোলিতের ত্রেজেন ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত এবং আর ঐ সঙ্গেই রাজপুত্রের প্রেমিকা আরিসীর হতে দূরে যাবার মনস্কামনা।

২। ফেদ্র, (থেজের স্ত্রী ইপোলিতের বিমাতা) এনন, ফেদ্রর বিশ্বস্ত সহচরী ও ধাত্রী অন্যান্য সকলকে নিষ্ক্রান্ত করে একাকী ফেদ্রের সান্নিধ্যে।

৩। ফেদ্র, আত্মাহুতি দেবার মনস্কামনা. হতাশায় ভারাক্রান্ত, অবশেষে তার রহস্যময় যাতনা এননকে খুলে বলতে স্বীকৃত হল, মারাত্মক কথা যে পুত্র ইপোলিতের প্রেমে ফেদ্র জর্জরিত।

৪। থেজের মৃত্যুবার্তা ছড়িয়ে গেল, অতএব ত্রেজেন ও এথেন্স-এর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী-সূত্রে সমস্যা দেখা দিল।

৫। এনন ফেদ্রকে তার ন্যায্য অধিকার দাবি করতে প্ররোচিত করলো। কারণ তার (দুই পুত্র) রাজা থেজের ঔরসে বর্তমান। ফেদ্র সম্মত হল এবং সাক্ষাৎ করতে গেল ইপোলিতের সঙ্গে—এইখানে প্রথম দৃশ্যের শেষ।

তোমার সামনে, নীরদ, এননকে ফেদ্রের লজ্জাকর মনোযাতনার কথা উন্মুক্ত করার অংশ অভিনয় করবো। তারপর আমরা যাব দ্বিতীয় দৃশ্যে যেখানে ইপোলিত ও আরীসি পরস্পর প্রেম নিবেদন করবে, এবং আরীসি ফেদ্রকে জানাবে ইপোলিতের প্রতি তার প্রেম। ঐ অঙ্কেই ফেদ্র ঘোষণা করবে তার দুর্বার কামনা-বাসনা প্রেমাস্পদ পুত্র ইপোলিতের প্রতি। প্রত্যুত্তরে ইপোলিত মাতার এই ভয়ঙ্কর জঘন্য উক্তি শ্রবণগোচর হতেই ঘৃণায় পেছপা হলো। তৎক্ষণাৎ ফেদ্র ইপোলিতের কোমরবন্ধ হতে অসি নিষ্কাশন করেও আপন মূঢ়তার জন্য আত্মঘাতী হতে উদ্যত হল। কিন্তু কোনমতে এনন ফেদ্রকে বাধা দিয়ে শান্ত করলো।

ক্যাথরীন বললে, এই অংশে আমরা পরে আসবো—আরীসি ও ফেদ্রর নাটকীয় উত্থানপতনে।

শোন—

প্রথম অঙ্কের, তৃতীয় পর্যায়—

ফেদ্র এছাড়া কি ফল তুমি আশা কর ? (আত্মহুতি) এতই হিংস্রতা ?

"[illegible] জাবসি ও [illegible]।

এস্তের আস্যুয়েরুসের সাক্ষাতে—জাঁকোপি আরিগোনির আঁকা ছবি

এনন : তুমি কি বলতে চাও। হে ঈশ্বর, এই চোখে দেখতে হবে তোমার ভয়ঙ্কর অন্তিম ? মুখ বুজে ?

ফেদ্র : যখন তুমি আমার পাপের কথা জানতে পারবে, যখন জানবে আমার ভাগ্য কিভাবে আমায় গ্রাস করছে, মৃত্যুতে তাতেও আমার মরণ কম হবে না। আমি মরবো আরো বেশী দোষী সাব্যস্ত হয়ে।

এনন : মাদাম, তোমার জন্য যত অশ্রু আমি বিসর্জন করেছি। তোমার এই কম্পমান দুর্বল পদদ্বয় আমি আঁকড়ে ধরছি, দয়া করে এই দুর্বিষহ ভয়ঙ্কর সন্দেহ হতে আমাকে মুক্তি দাও।

ফেদ্র : তুমি চাও শুনতে ? বেশ ওঠো। (ফেদ্র এননকে তুলে ধরলো। সে নতজানু হয়েছিল ফেদ্রের পায়ে।)

এনন : বল আমি শুনছি।

ফেদ্র : ভগবান! কি ওকে বলবো ? এবং শুরু করবোই বা কোথায় ?

এনন : মিথ্যাই তুমি আমাকে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করাচ্ছো।

ফেদ্র : ওঃ হেনাস তোমার ঘৃণা ওঃ দুর্ভাগ্য ক্রোধ! কিভাবে নিমজ্জিত করেছিলে, কি কলুষিত

প্রেমে আমার মাতাকে। (যার কাহিনী উদ্ধৃত করার সূত্র হল, কথিত আছে যে, ফেদ্রের মা পেসিপে নাকি একটি ষাঁড়ের প্রতি প্রেমাসক্ত হন। হয়তো কথাটি রূপক জাতীয় কথা।'

এনন : ও সব কথা ভুলে যাও মাদাম, এবং সকল স্মৃতি জেনো, সমস্ত বিগত দুঃস্বপ্ন ভবিষ্যতে একটি অনন্ত স্তব্ধতায় হারিয়ে যাবে।

ফেদ্র : আরিয়েন আমার ভগিনী, কি প্রেমে তাকে আঘাত করেছে সেই তীরে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়েছে যে তীরের ওপর সে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

টীকাভাষ্য : ফেদ্রের ভগিনী রাজা থেজেকে (ইংরেজী : থিসিয়ুস) ভালবাসতো। থেজে যখন নাক্সোস দ্বীপের গোলকধাঁধায় দানব হত্যার প্রয়াসে প্রবেশ করছে—হত্যাও করেছিল থেজে মহিষাসুরকে—কিন্তু গোলকধাঁধা বা লাবিরাত হতে উদ্ধার হওয়া প্রায় অসম্ভব। অবশেষে আরিয়েন দেওয়া সূত্র প্রান্ত ধরে বার হয়ে এসেছিল থেজে লাবিরাত হতে এবং বেঁচেছিল। পরিবর্তে থেজে প্রেমমুগ্ধ আরিয়েনকে অবহেলা করে ফেলে চলে আসে।

এনন : কি করছো, মাদাম। কি মরণোন্মুখ বীতরাগ আজ তোমাকে গ্রাস করেছে তোমার রক্তের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলেছে ?

ফেদ্র : হয়তো দেবী হেনাস চান, এই ঘৃণ্য অকৃতজ্ঞ ধারার আমি শেষ বলি হবো।

এনন : তুমি প্রেমে পড়েছ ?

ফেদ্র : প্রেম হতেই আমার সমস্ত উন্মাদনা।

এনন : কার জন্য ?

ফেদ্র : তুমি শুনবে পরিপূর্ণ ভয়ংকর কথা, আমি ভালবাসি....ভাগ্যচক্রের সে নামে, আমি কম্পিত, আমি শিহরিত, আমি ভালবাসি....।

এনন : কাকে ?

ফেদ্র : তুমি জান সেই আমাজোনের পুত্র ? সেই রাজকুমার ? তার জন্য বহু দিন হতে, আমি নিপীড়িত—আমি নিষ্পেষিত।

এনন : ইপোলিত! ও সর্বেশ্বর ঈশ্বর!

ফেদ্র : তুমি! তার নাম উচ্চারণ করেছ!

এনন : ওঃ ভগবান, আমার সমস্ত রুধির আমার শিরায় শিরায় হিমায়িত। ওঃ! হতাশা, ওঃ পাপ, ওঃ। ঘৃণিত, দুর্ভাগা অভিযান! [illegible]খবিষাদের তীর, সেখানে কি পৌঁছতে [illegible]—ঐ ভীষণ কিনারায় ? মৃত্যুর তটে ?

আমি এ পর্যন্ত শুনে ক্যাথরীনকে বললাম, তুমি এই অংশ আবার অভিনয় কর, আমি আঁকি।

কিছু ভাব নানা রূপে অভিনয় করলো। ক্যাথরীন সত্যই জাত অভিনেত্রী!

ক্যাথরীনকে বললাম, ফেদ্রের ভূমিকা সত্যই সাংঘাতিক, তাই না ?

এ কথা সত্য যে, কোন বিয়োগান্তে এ মত রূপ এ মত চরিত্র দেখা যায় না। আর তা ছাড়া ফেদ্রের বিয়োগান্তে, রাসীন সব কিছু এঁকেছেন নানা বর্ণে নানা প্রেমের ভাঁজ নানা চরিত্রে, সব নাটকের নায়করাই প্রথম প্রেমে নিমগ্ন। প্রেমের অনুসন্ধানেই হয়তো রাজা থেজের নিরুদ্দেশ যাত্রা। আরীসি, সহজ সুলভ প্রেমের প্রতি যার বীতরাগ এবং তাকেই জয় করতে চাইছিল যে বিদ্রোহ করতে আগ্রহী সেই ইপোলিত। পরিবর্তে সে কিন্তু প্রেমের দুর্বলতায় বীতশ্রদ্ধ। আরীসির সৌন্দর্য তাকে বশীভূত করতে পারেনি। অবশেষে ফেদ্র ইপোলিতের প্রেমোন্মাদনায় কাতর। দেবী হেনাসের বধ্য শিকার। প্রেমিকা নিষ্ঠুর ও ঈর্ষায় প্রজ্বলিত। প্রেম জ্বর ফেদ্রকে হায়া শূন্য করে টেনে নিয়ে যায় নিয়তির নির্মম কবলে....।

সবই ফেদ্রের কুলোদ্ভব পাপ। রক্তের-দোষ সম্বন্ধে যে কারণে বহু কথা ফেদ্রের ওষ্ঠে উচ্চারিত, "মোঁ মাল ভিয়াঁ দ্য প্লু লোঁয়া...." আমার যাতনা (পাপ) এসেছে বহু দূর থেকে, একথা বলে, ক্যাথরীন বললে, আরীসির কিছু অংশ করি, তুমি আঁক—।

আমি নতুন কাগজ আমি নাম নিয়ে তৈরি হয়ে

কেন যাওয়া

সমীর মুখোপাধ্যায়

মিসেস সোম, মাঝে মাঝে এরকম হয়। একটা প্রশ্ন ঘুরে ফিরে পিছু নেয়, নির্জন অলিন্দে দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্চিন্ত মনে যখন সিগারেট ধরাই তখনই সেই প্রশ্ন আমার কাঁধে অজানা বন্ধুর মত টোকা দেয়, সিগারেটের ছাই এর মত তাকে ঝেড়ে ফেলা তখন সহজ হয় না। হঠাৎ যেন মনে করতে খুব ইচ্ছে হয় এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতেই যেন এতোদিন বেঁচে থাকা।

কেন আপনার কাছে যাই, আপনি ঠিক সরাসরি এ প্রশ্ন কোনদিনই করেননি, করবার মত মানুষও আপনি নন, কিন্তু আপনার সঙ্গে টুকরো টুকরো আলাপে আপনি বিচিত্র হেসে এইদিকে ইঙ্গিত করেছেন, কেন যাই আপনার কাছে, এই শীতার্ত চল্লিশে. কেন এই যাওয়া?

কাল সারারাত অবিস্মরণীয় সেই গানটি মস্তিষ্কে নখের আঁচড়ে আগুনের রেখা এঁকে গেছে পুরনো সুখের কথা ভেবে কিন্তু অসম্ভব দুঃখ নিয়ে আজ সকালেও দেখছি সেই নিষ্ঠুর লাইন ক'টি মনে বিচিত্র দাহ সৃষ্টি করে চলেছে। গানটি আপনারও খুব প্রিয় মিসেস সোম, সেই সুখের খোঁজে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরে আসার গানটি, আহা, 'লবণ পারাবারের পারে প্রখর তাপে পুড়ি, মরিলি পিপাসায়'—এই অমর পিপাসাটি আমার, সে নয় বেশ বোঝা গেল, কিন্তু লক্ষ্য কি আপনি, না উপলক্ষ্য? জানি না ভাগ্যে আমার কি আছে, আর আমার ভাগ্য যা নিয়তি যাই বলুন মিসেস, সে বড় নির্মম। এই চল্লিশে দুই সন্তানের জনক আমি, ঘোর সংসারী মানুষ, মজ্জায় মজ্জায় সেঁটে আছেন স্ত্রী, পরবর্তী দরজায় বাবা, মা, আরো পরবর্তী দরজায় আত্মীয় স্বজন, লক্ষ্য করেছেন কি, আমি শুধু দরজার কথা লিখছি, ক্রমাগত একটার পর একটা অপেক্ষমান দরজা, হ্যাঁ তাই মিসেস, আমাদের চল্লিশের এই ঋতুতে সকলেরই দরজা আছে, বাড়ি নেই, এইরকম বাড়িহীন দরজায় কতোদিন যেন দাঁড়িয়ে থেকেছি, এমন সময় আপনি ডাক দিলেন, ভাবলাম পরাজয় তো নিশ্চিত, তবু শেষ বিষণ্ণতা আমাকে ঘিরে ধরবার আগে আমার সর্বস্ব যার কাছে গচ্ছিত আছে তার কাছে একবার যাই, খুব শান্ত সন্ন্যাসীর মত। কিন্তু কেন এই যাওয়া তবু...কেন এই শীতার্ত চল্লিশে বন্ধু সুদীপ তার নিজের অফিসিয়াল কাজে ধনাঢ্য, বর্ণাঢ্য, রূপবান আপনার স্বামী মিঃ সোমের ফ্ল্যাটে সেই প্রথম কে জানে কেন, আমাকে তার সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলো। দৈবক্রমে সেই বাতিজ্বলা সন্ধ্যায় আমি মর্মান্তিকভাবে 'খালি' ছিলাম, ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না আজ কোথায় যাই, আজ কোন দরজায়, আর একটু একটু করে মন খারাপ হয়ে যাওয়ার সেই ভয়ংকর অসুখটার কবজায় পড়ে যাচ্ছিলাম, সে খুব চতুর টান দিচ্ছিলো আর আমি সেদিনের সেই অস্পষ্ট নীল কুয়াশায় চোরা গর্তটার দিকেই উদভ্রান্তের মত চলছিলাম এমন সময় বন্ধু সুদীপ আমাকে উদ্ধার করলো। আমি যেন তখনকার মত বেঁচে গেলাম। অন্তত আজ সন্ধ্যায় আমি কোথাও যেন যেতে পারছি, অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে মনখারাপের সেই ভয়ংকর চতুর অসুখটার হাতে পড়ছি না, আজ কয়েক ঘন্টার জন্যে বোধ হয় বেঁচে গেলাম, এই মনে হল।

একরকম উৎফুল্ল হলেও মুখে কিন্তু দ্বিধা, একটু ইতস্তত ভাব ফুটে উঠলো। তাই দেখে বন্ধু সুদীপ দুর্লভ হাসিতে মুখ ভরিয়ে, চাপা, রহস্যময় গলায় অনেক প্রেম ঢেলে বলেছিলো, 'চলোই না। গেলে ঠকবে না।' জানি না তখন, কি ছিল সুদীপের মনে, তখন বুঝিনি সেই বাতিজ্বলা 'শূন্য' সন্ধ্যায়, কিন্তু সুদীপের সেই কথাটি, 'চলোই না। গেলে ঠকবে না', তাতে চুম্বক ছিল, চুম্বকের মত চেনা টান ছিল, সেই অদৃশ্য টান একটা অলৌকিক চোরের মত আমাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল, একজন সম্বিতহারা মানুষ যেমন সর্বনাশের পথে যায় শেষ জুয়ায় একেবারে ফতুর হওয়ার জন্যে, তখন, সেই সন্ধ্যায় আমারও সেই দশা হয়েছিলো। সেই জাহান্নামের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুদীপ আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো বিরাট কম্পাউন্ড ঘেরা অতি প্রশস্ত, প্রাসাদোপম আপনাদের সেই সুবিশাল হর্ম্যের ভিতর, যেখানে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নিয়ে ফ্যাকটরীর সিনিয়র অফিসাররা সব মৌচাক বেঁধে রয়েছেন। আমি ওই রকমই। বোধ হয় মিঃ সোম অথবা আপনি মিসেস সোম আমাকে ইনভাইট করেননি বলেই (প্রশ্নই ওঠে না। কেননা তখনো পর্যন্ত আপনারা ত' আমাকে চিনতেনই না।) অসংকোচে সুদীপের সঙ্গে যেতে পেরেছিলাম। যদিও অসম্ভব লাজুক আমি, ঠিক মেয়েলী লজ্জা এ নয়, এ লজ্জা ব্যাখ্যাতীত, বরং নিমন্ত্রিত হলেই যেন বিশেষ অসুবিধে আমার, মনে হয় কড়া, তীব্র, স্ফটিকের মত অতি উজ্জ্বল আলোর নীচে দাঁড়িয়ে বড় বেশী অনাবৃত, আমার কিছুই আর গোপন রইলো না। সব কোণ, সব খাঁজ, শরীরের এমনকি মনেরও সব দরজা যেন হাট করে খুলে গেল। মুখ লুকোবার জন্যে একটু অন্ধকারও আর অবশিষ্ট রইলো না। এ যেন সর্বকাম কোন দুর্ধর্ষ কামুক, লম্পটের হাতে আমি রমণী বিবস্ত্রা হচ্ছি। যেখানে জীবন ফেনিলোচ্ছল সুরার মত রক্তিম গেলাসে টলটল করছে সেখানে আমার লজ্জা! এমনকি একটি সুশ্রী ল্যান্ডস্কেপের স্বর্গীয় সুষমার কাছে দাঁড়াতেও আমার সংকোচ! এ সংকোচ, এ লজ্জা, এই ভয়ের কি কোন ব্যাখ্যা আছে!

কেন যাচ্ছি মিঃ সোমের ফ্ল্যাটে, আমার তো নিজের কোন কাজ নেই, কেবল এই সন্ধ্যায় 'খালি' আছি বলে তাই আমার যাওয়া? আমি একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে সুদীপকে অনুসরণ করছিলাম, একটা ব্যথা আচ্ছন্ন ভাব, কার জন্যে এই সংসার সাজালাম কার জন্যে আমার দুটি সন্তান কার জন্যে আমার এই স্ত্রী,

সবটাই কি বোগায় দিলাম? কেন এদের জন্যে এতো করলাম? তবু কেন এদের কাছে তিলমাত্র মূল্য নেই আমার? কোথায় আছে আমার মূল্য? এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সেই বিরাট কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করলাম। রক্ষী দুজন স্যালুট দিলেন চাকা লাগানো গেট খুলে দিয়ে। ঢুকতেই বিশাল গঙ্গার উজানী হাওয়া এসে চুল অবিন্যস্ত করে দিলো। ছাঁটা কেয়ারীকরা দুধারের মরসুমী ফুলের বাগানের ভেতর পায়ে চলা কালোর আয়না মত ঝকঝকে পিচের রাস্তা ধরে অনেকটা গিয়ে সামনেই দেখলাম বড় বড় শ্বেত পাথরের লম্বা লম্বা সিঁড়ি।

মাথার ওপর তাকিয়ে দেখি সুউচ্চ প্রাসাদের একতল, দ্বিতল, ত্রিতল ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে রঙীন কাঁচের সুদৃশ্য, বিশাল বিশাল জানালা, তখন সন্ধ্যা তাই ভিতরে নিয়ন জ্বলছে, এদিকে গঙ্গার পশ্চিম পার থেকে শেষ শীতের অস্তগামী সূর্যের রক্তিম বর্ণচ্ছটা একটি অলৌকিক বিভ্রমের মত জানালার কাঁচে অদ্ভুত মোহ সৃষ্টি করেছে, আমরা কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

সবুজ গালিচা মাড়িয়ে, দেওয়ালের বিচিত্র কারুকার্য দেখতে দেখতে, চমৎকার ফায়ার প্লেসটিকে পিছনে রেখে প্রায় ঘরজোড়া প্রকাণ্ড একটি সোফায় ভৃত্যের নির্দেশে সম্মোহিতের মত এসে বসলাম। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ চলে গেল বড় একটি পিতলের টবে রাখা একটি কাটছাঁট করা উদ্ভিদের দিকে, উদ্ভিদটি যতো সুদৃশ্যই হোক চোখ যেতো না, চোখ গেল কেন না ঠিক তার পাশেই সেই সুবিশাল ঘরের মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড, ঝালরযুক্ত দীপাধার, সেখান থেকে মৃদু আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর তার ঠিক তলায় বসে আছেন ফ্ল্যাটের কর্ত্রী, আপনি মিসেস সোম, রাঙানো দীর্ঘ নখগুলির ওপর একটি ফিল্ম জার্নাল। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে, আপনার অভিজাত চেহারাটি ঈষৎ আনত করে আপনি বিনীত জানালেন আর অপাঙ্গে আমার দিকে অসীম দয়ায় একটু তাকিয়ে আমার ভেতরকার সেই পরম তৃষ্ণাটিকে জাগিয়ে দিলেন অকস্মাৎ।

'আসুন, আসুন। উনি নেই। আপনাদের অফিস থেকে ছাড়া পেয়েই এই ঘণ্টা দেড়েক হল ছুটেছেন টেনিসকোর্টে। বড় সাহেবের মেয়ে মার্গারিটা আজ খেলবেন। তাঁকে সঙ্গ দিতে হবে।' বলে মুখে অদ্ভুত জাদুতে বঙ্কিম একটি হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ফুল্ল মুখে আমাদের দিকে তাকালেন।

'তাহলে যাই আরেকদিন না হয়'—

'বারে, তা হবে কেন? আপনাদের বসই একমাত্র কথা বলার লোক! আমরা কি কিছু নই?' বলে আমার দিকে একটু চোরা চোখে চাইলেন। এতোক্ষণে বুঝলাম কেন সুদীপ বলেছিলো, 'চলোই না। গেলে ঠকবে না।'

'কি যে বলেন! আপনি এমন না—'

সুদীপ অদ্ভুত বিনয়ে একেবারে বিগলিত হল। ছটফটে চটির আওয়াজ তুলে আপনি উঠে পড়লেন, পিছনে আমরা উঠে দাঁড়ালাম, আপনি চলতে লাগলেন, বোধ হয় ভিতরে আরো মনোহর, আরো সুদৃশ্য অ্যান্টি চেম্বারে আমাদের নিয়ে যেতে চান, পিছন পিছন চলতে চলতে অবিকল মনে হচ্ছিলো চার্লস ডিকেন্সের কপারফিল্ড উপন্যাসের সেই বিস্ময়কর ডোরা যেন আপনি, বয়স্কা একটু, তবে সে সামান্যই, একটি অদ্ভুত মেলোডি যেন, মাজ খাম্বাজে ঠুংরী অঙ্গের ব্যঞ্জনা। নারী এই জন্যেই মোহময়ী, আমার এই জীর্ণ চল্লিশেও। আপনি হাঁটছিলেন দ্রুত পায়ে কিন্তু অনবদ্য ভঙ্গীতে। সচরাচর সুন্দরীরা একটু ঢেউ তুলে তুলে চলেন। তবে আপনার চলা কেবল আপনাকেই মানায়। এ চলা হাওয়ার মতন, প্রতি স্টেপিং এই এক একটি করে সুষমা, প্রত্যেকটি স্টেপিং প্রত্যেকটি স্টেপিং-এর থেকে আলাদা।

নারীর এতোও থাকে, এতোও হয়। একটি সেণ্টার টেবিলকে মাঝখানে রেখে আপনি একা একদিকে বসলেন, আমরা দুজন অন্যদিকে আপনার মুখোমুখি। সুদীপ আর আপনি কথা বলছিলেন। কি কথা বলছিলেন সেই সন্ধ্যায় আজ আর আমার মনে নেই, কেবল এইটুকু মনে আছে, আমার সঙ্গে একটু কথা না বলেও আমাকে উপেক্ষা করছিলেন না, তাতে আমার ভালোই হচ্ছিলো, আমি শুধু আপনাকেই লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম। আশ্চর্য, এতে কিন্তু লজ্জা পাচ্ছিলাম না। আপনার হাত দুখানি আমি দেখছিলাম। ব্লাউজের হাতায় যতোখানি ঢাকা ছিল, তার থেকে অনাবৃত ছিলো অনেকখানি। আহা, এই দুখানি হাতই যদি আমাকে শুধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতে দেওয়া হত। হাত দুখানি যে খুব নরম তা নয়। হাতে মিহি আখের মত সোনালী রোম। বাঁ হাতে একটি সোনার ব্যাণ্ডের দামী ঘড়ি। ডান হাতে মোটা সোনার কাঁকন। আপনার সামনের চুল ছোট করে কাটা। মাথার চুলও খুব বিন্যস্ত নয়। চুলে রঙ হাল্কা সোনালী। কানের দুপাশে সেই সোনালী চুলের ঢাল ঘন হয়ে নেবে পিঠে ভাঙাখোঁপার মত ভেঙে পড়েছিলো। আমি অনেক নারীর অনেক নরম মুখ দেখেছি। আপনার মুখ দেখে মনে হয়েছিলো এমনকি এই পত্র লিখতে লিখতে এখনো আপনার অসাধারণ কমনীয় মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই মুখ এমনি যে, যে কোন বয়সী পুরুষের সুপ্ত ইচ্ছেকে আপনি জাগিয়ে তুলতে পারেন, তার ইচ্ছে হবে আপনার কমনীয় মুখ...

চিবুকটি অনবদ্য। খাঁজকাটা থুতনিতে একটি দুর্লভ টোল। হ্যাঁ, একেই বলা যায় ঈশ্বরের নিজের হাতের রচনা। নাকটি টিকোলো। ভুরু দুটি আঁকা নয় কিন্তু যেন আঁকা। কপালটি ছোট। আপনি যতো ফর্সা ততো লাল। ঠোঁট দুটি আপনি লিপস্টিকরঞ্জিত করেননি। একদিন ঘনিষ্ঠ হলে জিজ্ঞাসা করেছি আর আপনি ঈষৎ কুপিত হয়ে বলেছিলেন, 'আমার ঠোঁট এমনিতেই লাল। রঙ লাগাবার দরকার হয় না।' ঠিক, অতি সত্য। দুই কানে হীরা জ্বলজ্বল করছে। নাকেও হীরার কুচি। ঘাড় ফেরালেন। পলকে সম্পূর্ণ নোতুন ধরনের একটি অংশে কয়েকটি অসামান্য খাঁজ। এই মুহূর্তে সেদিনের সেই আশ্চর্য সন্ধ্যার সম্পূর্ণ নোতুন ধরনের কুহকের কথা ভেবে এই পত্র লিখতে লিখতে আমার শরীরের সমস্ত তার আবার ঝংকার দিয়ে উঠছে। সামনে ফিরে তাকালেন। স্পষ্টই মনে হল আপনার সামনে, পিছনে, পাশে কোথায় কোথায় লুকোনো আর্ক লাইটের মত, গোপন সৌন্দর্য আছে, সুরসিক আমি, আমার সামনে সম্পূর্ণ রুচিসম্মতভাবে আপনি সে সবের সন্ধানসংকেত দিচ্ছেন। শরীরটি ছিপছিপে। তবে রোগা আপনি মোটেই নন। তিনটি অদ্ভুত রেখা টানা গলার নীচে সাদা মার্বেলের মত বুকের খানিকটা মসৃণ অংশ। একটু নীচু হয়ে বেশ নিমগ্ন হয়ে সুদীপের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ফলে ব্লাউজের ঊর্ধ্বাংশের ফাঁক দিয়ে রমণীর এই জীবনের সবচেয়ে রমণীয় জিনিসের আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো, আর বেশ মনে পড়ে অপারবিস্ময়ে সেই যুগল স্তনের আভাসমাত্র নিরীক্ষণ করে অস্ফুটে যেন বলে উঠেছিলাম, পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে তবে এই। পৃথিবীতে যদি আনন্দ থাকে তবে এই। পৃথিবীতে যদি রোমাঞ্চ থাকে তবে তা এই। ঠিক সেই সময় আমার অবচেতনায় যে আরেক আমি আছে সে হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠলো। এমনটা আমি কখনোই করি না বলেই অভিভূত হই, অথচ আজ এখন এই নারীর সামনে আমি মনে মনে নতজানু হলাম, আমার হাত আমার বাধা মানলো না, নিসপিস করে উঠলো সম্পূর্ণ যেন আমার অজান্তে, সামনেই ছিল লেখার প্যাড ও পেন, আমি স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে অবলীলাক্রমে টেনে নিলাম প্যাডটি। তারপর দ্রুক্ষেপহীন পরপর কয়েকটি স্থূল, সূক্ষ্ম রেখায় একটি নারীর রহস্যময় শরীর রচনা করে ফেললাম। পটের শূন্যস্থানটি ভরাট করতে যাচ্ছি আপনি হঠাৎ আমার মুখের দিকে গভীর আগ্রহে তাকালেন। নিশ্বাস নিশ্চল করে বললেন, 'আপনি, আপনি ছবি আঁকেন?'

'না। তেমন নিয়ম করে—'

কথা শেষই করতে দিলেন না। ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, 'হতেই পারে না। সুপ্লেনডিড রচনা। ফাঁকি দেবেন না। আমি কিছুদিন আর্ট স্কুলের ছাত্রী ছিলাম। আঁকতে জানি না কিন্তু আঁকা কাকে বলে জানি।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার কান দুটি বেশ গরম হয়ে উঠলো। আর আমার মাথায় তখন পুষ্প খুব ঝরতে লাগলো।

আপনি ত' জানেন আমি 'গীতবিতান' কিরকম ভালোবাসি। পরে আলাপ গাঢ় হলে কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে আমি বলেছি। এমন অনেক বিনিদ্র রাত কেটে যায় আমার, গানের চূর্ণ এক একটি লাইন মাথার মধ্যে সারারাত টুং টাং করে বেজে যায়। ঘুমঘোরে আপনি সুন্দর, আপনি মনোহর আমার কাছে আসেন। সজল নয়নে চেয়ে সেই আশ্চর্য বিভ্রম সৃষ্টি করেন যাতে মনে হয় আপনি কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ আপনি কত সুদূরে। এক একদিন বর্ষার ঘনঘোর রাতে হঠাৎ মনে পড়ে সেই অনাস্বাদিত পুলকে ভরা লাইনটি। 'রাতে কখন মনে হল যেন ঘা দিলে আমার দ্বারে হায়', সেসব আপনাকে ভেবেই মনে হওয়া অথচ কতো অসম্ভব—তাই নয় কি? হাসছেন? ভাবছেন এই চল্লিশে একি পাগলামি! পাগলামিই বটে। তবে এই পাগলামির সূত্রপাত সেই প্রথম দিন থেকে, সেই বাতিজ্বলা সন্ধ্যায় বন্ধু সুদীপের সঙ্গে যেদিন আমি আপনার সুসজ্জিত হর্ম্যে গিয়ে অনির্বচনীয়া, আপনাকে প্রথম দেখি। আপনার রূপের কাছে আমি নতজানু সেদিন থেকেই। বৈদগ্ধ্যের কাছেও।

কিন্তু যে কথা আমি বলতে বলতে থেমেছি। মুহূর্তের জন্যে সম্বিত হারালেও আবার আমি আত্মস্থ হলাম। ছিঃ ছিঃ, একি আমি করলাম! আমি যে একটু আঁকতে জানি, একসময় আঁকাটা যে আমার বিশেষ প্যাশন ছিলো এ কথাটি এই মহিলাকে কেন জানাতে গেলাম? আপনি তো আমার পরিচয় জানার জন্যে আগ্রহী হননি অথবা বন্ধু সুদীপও তো আমার পরিচয় আপনাকে দেয়নি। আপনি আমার পরিচয় না জানতে চেয়ে আর সুদীপ আমার পরিচয় আপনাকে না দিয়ে আমাকে কেউ কোন অপমান করেননি। কেননা আমাদের এই পরিচয় জানাজানি ব্যাপারটাই বেশ কদর্য। আমি দেখেছি যখন কোন লোক সম্বন্ধে লোকে জানতে চায় তখন তাকে আর একটি লোক বলে, 'ও অমুকের কথা বলছেন? উনি, উনি তো সি পি এম করেন। বা উনি তো কংগ্রেস করেন। অথবা ওঁর কথা বলছেন মানে যিনি লেখক? অথবা সেই চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টেণ্ট ভদ্রলোকটির কথা বলছেন?' ইদানীং আবার মফস্বলে আর একটি ব্যাপার বেশ সগৌরবে চলছে আপনি অমুকের কথা বলছেন তো. ওই যাঁর বাড়ির ছাদে এ্যাণ্টিনা খাটানো আছে?' আচ্ছা মিসেস সোম, সত্যি করে বলুন তো এটা কি একটা মানুষের পরিচয় জানানোর উৎকৃষ্ট পন্থা? একজন ব্যক্তি লেখক, কি রাজনীতিবিদ, কি উচ্চপদস্থ বড় অফিসার, কি ইঞ্জিনীয়ার অমুক ফার্মের, এটা কি একটা পরিচয়? আমি ছবি আঁকতে পারি। মোটামুটি ভালোই আঁকি—এই পরিচয়টা কেন দিতে গেলাম? এটা কি কোন পরিচয় দেওয়া? পরিচয় দেওয়া নেওয়া ব্যাপারটা খুব সোজা নাকি? একি এক মুহূর্তে একদিনে হয়? আমার পরিচয় যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি তাকে বলি, 'আমার পরিচয় এই যা আমাকে দেখছেন।' বা কৌতুক করে বলতে পারি, দেখতেই তো পাচ্ছেন আমি নারী নই।' ব্যস হয়ে গেল আমার পরিচয় দেওয়া। বাকিটুকু দিনে দিনে সৌহার্দ্য বাড়লে জানা যাবে। সে জানাও ওসব জানা নয়। আমরা যেভাবে একটা মানুষের পরিচয় চাই সেটা বড় ভালগার, বড় কুৎসিত, সভ্য সমাজে একেবারে অচল অথচ এই অচল মুদ্রাটিই এখনো টং টং করে বাজছে মিসেস। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় আমি কোনদিন আপনার পরিচয় সেভাবে জানতে চাইনি, আপনার ছেলেরও না, আপনার স্বামীরও না। আপনার পরিচয় আপনি, এই আপনাকে যেমন দেখছি, সেই পরিচয় আপনার [illegible] অপরূপ ভঙ্গিমায় আপনার প্রতিটি স্টেপিং-এ

এমনকি আপনার সুডৌল আঙুলে, আপনার আশ্চর্য শান্ত হয়ে চুপচাপ অন্যের অসহ্য বিরক্তিকর কথা ধৈর্য ধরে হেসে হেসে শোনার মধ্যে, কথার মাঝখানে হঠাৎ উঠে গিয়ে সুদৃশ্য পেয়ালায় উষ্ণ, ধোঁয়াচ্ছন্ন কফি আনার মধ্যে! আপনার পরিচয় এতে কি আরো ভালোভাবে, আরো সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না? যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যাতেই এর সবটাই মনে হয়েছিলো এমন কথা আমি বলি না। মনে হওয়ার উপায়ও ছিলো না। এমন পরপর নাটকীয় ঘটনা ঘটছিলো যে আমার মত স্নায়ু দুর্বল মানুষের পক্ষে তাল রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছিলো।

আমরা উঠতে যাচ্ছি এমনসময় আপনার স্বামী এলেন হাতে টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে, সর্টস্ আর টাইট ফিটিং গেঞ্জিতে কোনরকমে ধরে রাখা একটি যেন ডোরা-কাটা ব্যাঘ্র মহারাজ, অস্থির অধীর অতি উজ্জ্বল দুটি চোখ, বেশ ফুটন্ত, টগবগে চেহারা, অনেক বর্ণনা দেওয়া যায়, আমি সেসবের ধারেকাছেও যাবো না, শুধু একটি মোক্ষম বিশেষণ দেব, 'টেরিফিক'। হ্যাঁ, এই পুরুষ যে রমণীর দিকে একবার অপলক চোখে তাকাবে, তার রূপ, সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ যতো বড়ই হোক, আমি নিশ্চিত যে সেই রমণীকে এই পুরুষটির পিছন পিছন চলতে হবে সারাজীবন, তার আর কোনভাবেই নিস্তার নেই। সে পতঙ্গ এই আগুনে পুড়ে মরবেই।

একে ত' আপনি আমাকে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করে বাণবিদ্ধ করেছেন তার ওপর আপনার 'রজা'টি সামান্য একটু অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে আমাকে শায়িত করলেন শরশয্যায়। আরো যে কিস্ময় আমার জন্যে সেই আশ্চর্য অঘটন ঘটন-পটীয়সী সন্ধ্যায় অপেক্ষা করছিলো তাও সম্পূর্ণ হল মুহূর্তের মধ্যে যখন তরুণ দেবতার মত এক যুবক ঢুকে পড়লো ঝোড়ো বাতাসের মত অ্যান্টি চেম্বারে। আমাকে বলে দিতে হল না সে কে। মা ও বাবার আদলে তৈরী সেও একটি যেন সুকুমার স্থাপত্য। চোখ দুটিতে যেন হীরা বসানো আছে। একেবারে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে নিয়নের আলোয়। যুবকটি আমাদের আশা করেনি, সে একনজর আমাদের দিকে তাকিয়ে বেশ সম্ভ্রান্ত ভঙ্গীতে মায়ের পিছনে এসে দাঁড়ালো' আপনার স্বামী আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সন্দীপের উদ্দেশ্যেই যেন সহাস্যে পরিচয় করিয়ে দিলেন যুবকটির সঙ্গে। আমি তখন প্রায় কিছুই শুনিনি। সবিস্ময়ে শুধু তখন ভাবছিলাম যুবকটির যা বয়েস দেখা যাচ্ছে তাতে অনুমান করি সে সতেরো আঠারোয় উত্তীর্ণ হয়েছে। তা যদি হয় তবে আপনার কত বয়েস ভদ্রমহিলা? ঊনচল্লিশ, চল্লিশ? কিন্তু আপনাকে দেখে কি তাই মনে হয়? মহিলা, আপনার দিকে আবার আমি তাকালাম, পূর্বে আপনার সম্বন্ধে যা মনে হয়েছিলো সেই কথা আবার নির্দ্বিধায় মনে হল, আপনি ডেভিড কপারফিল্ড উপন্যাসের সেই বিস্ময়কর ডোরা, ডোরা কিন্তু একটু বয়স্কা, তাতে বরং আপনার রমণীয়তা আরো একটু বেড়েছে, সেই ছটফটে চিরন্তনী নারী, ওই অতোবড়ো সন্তানও আপনার শরীরে, মুখে বয়সের কোন দাগ রেখে যেতে পারেনি, একেই বলে 'এজলেস বিউটি'। মিসেস সোম, আপনার এতোখানি বয়েস আপনি হজম করলেন কোন জাদুতে? গৃহস্বামী মিঃ সোম আর দাঁড়ালেন না, তাঁর সঙ্গে সন্দীপও আর বিশেষ কোন কথা খুঁজে পেলো না, আমার প্রশ্নই ওঠে না, কেননা ততোক্ষণে আমি জেনে গেছি আমি এসেছি মিসেস সোম আপনার জন্যেই, ওটাই বিধি-নির্দিষ্ট, আপনার যুবক পুত্রের জন্যেও নয়, আপনার স্বামীর জন্যেও না। তিনি আমাকে গ্রাহ্যই করলেন না তাতে আমি মোটেই অপমানিত বোধ করলাম না. আমি বরং বেঁচে গেলাম, এই ধরনের আত্মসর্বস্ব পুরুষদের সঙ্গে কথা বলাটাই একটা বিড়ম্বনা, সে আমার অনেক অভিজ্ঞতা, তার ওপর পুরুষটির আবার দৈহিক সৌন্দর্য অসাধারণ, রূপ অহংকার, পদমর্যাদা দিয়ে ঢাকা একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আর তলায় আসল মানুষটির হদিশ খুঁজে পাওয়াই দায়। আর আসল মানুষটিই যদি ধরা না পড়ে তবে ওপরের খড়ের মানুষটি নিয়ে আমার কি লাভ?

এর পর যতবার আমি আপনার হর্ম্যে গেছি ততবারই আপনি বিলক্ষণ জানেন কেবলমাত্র আপনার জন্যেই গিয়েছি। এইটাই আমার স্বভাব। আপনি স্বাভাবিক ভাবেই আপনার যুবক পুত্রটিকে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। আপনার স্বামীকেও সামনে এনেছেন। আমি খুব সাধারণভাবে যেটুকু না বললে নয় সেটুকু কথা তাদের সঙ্গে বলেছি, অনেকদিন যাতায়াতেও তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, এটা তাঁরাও বোঝেন, ফলে আমি গেলে ওঁরা দুজন ভদ্রতাসূচক দু'একটি কথা বলে সরে পড়েন আমি স্বস্তির নিঃশব্দ ফেলি, যাক, বাঁচা গেল, অনর্থক পাঁচটা বাজে কথা বলতে হল না। আমি ওই রকমই। এটা আপনি রমণী বলেই নয় বা সুন্দরী বলেই নয়, প্রথম দৃষ্টিতে আপনাকে যে বড় ভালো লেগে গেল' আপনার মত সুন্দরী না হোক, এমন অনেক রমণীর বাড়ি আমি যাই তাঁরাও অনেকেই এমন কিছু আহা মরি না হতে পারেন, কিন্তু যাকে বলে রূপ বা চটক তা তাঁদেরও আছে। তবু যেহেতু তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে বা পুত্রদের সঙ্গে আমি প্রথম আলাপেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছি, ভালো লেগে গেছে, অতএব তাঁদের রমণীরা সেখানে খারিজ, তাঁদের উপস্থিতি বিরক্তিকর, এই আমার স্বভাব, এই আমার ধর্ম।

মিঃ সোম চলে যেতে না যেতে আমরাও উঠে পড়লাম।

'আবার আসবেন। বেশ লাগলো।' অলৌকিক চোখ দুটি তুলে আপনি একটি অসামান্য বিভ্রম সৃষ্টি করলেন। কাকে বললেন? আমাকেই কি? আমাকেই, আমাকেই, আর কাউকে নয়। রাস্তায় চলতে চলতে আমার আচ্ছন্ন অবস্থা দেখে বন্ধু সন্দীপ সহাস্যে বলল, 'কি হে, তুমি যে আউট হয়ে গেলে! এতো তাড়াতাড়ি!'

যখন হবার হয় তখন তাড়াতাড়িই হয়, না হলে কোনদিনই হয় না, এ কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বলে কি হবে, বললে এই বন্ধু নেশাটি আমার কেটে

গুনমান চোখে
দেখেই বোঝা যাবে...
এই হ'লো অরবিন্দ। সুতী, পলিয়েষ্টার আর
ব্লেণ্ডস ফ্যাশানের খেলার সবাই বিজয়ী।
গবেষণা ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ
তাল মিলিয়ে চলেছে—আর গুনমাণ তো
সর্বদাই অপরাজিত।
নরোত্তম লালভাই রিসার্চ সেণ্টার
যে গবেষণাগারে টেকসটাইল টেকনলজিকে
অরবিন্দ এর সুন্দর বস্ত্রসম্ভার করে
উৎকৃষ্টতা...
অরবিন্দ
...অনুসন্ধান জাত

যাবে। আত্মমাতালের মতো একটু মধুর হেসে সুদীপকে গাঢ় গলায় বললাম, 'যা মনে কর।'

ম্যাডাম, তারপরের দিন সকাল শুরু হল আমার সকাল যেমনভাবে শুরু হয় প্রতিদিন। ফলে, সাত রাজার ধন একটি মানিক, কাল সন্ধ্যায় পাওয়া আমার সেই দুর্লভ, ভূত-পাওয়া নেশার স্বাদ সুবাদে না ঘুমিয়েও স্রেফ জাগরণে, জমাট তৃপ্তিতে কেটে গেছে বিভাবরী, সেটি এক মুহূর্তে ছুটে গেল। সংসারের এই ছবির দেখে মনে হল, এ শালা এলেম কোথায়? কোন খানায় পড়লেম? অথচ পনেরো বছর ধরে এর ঘানিই তো টানছি, কোনদিন কোন কিছু কখনো মনে হয় নি, এমন কথা বলি না, কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, ম্যাডাম এমন করে এখান থেকে কেটে পড়ার ইচ্ছে হয়নি। এ তো ভয়ংকর জঙ্গল, এখানকার আইনকানুন জঙ্গলের, আমরা সকলেই জন্তু জানোয়ার, সম্পর্ক অবিকল জঙ্গলের মত, খাদ্য খাদকের সম্পর্ক। অন্য অন্য দিন আমিও একজন জানোয়ার হয়ে যাই, পরস্পরের এই স্থূল, কুটিল, অকরুণ লড়াইয়ে আমিও একজন অংশীদার, আমিও কম যাই না, আমারও নখে, থাবায় রক্ত লেগে আছে, আমারও দাঁতে লেগে আছে অন্যের গা থেকে কামড়ে ছিঁড়ে আনা মাংসের টুকরো, কেউ কাউকে এক টুকরো খয়রাত করি না, শুধু জঙ্গলের আইন অনুসারে ওত পেতে থাকি, তারপর সুযোগ খুঁজি সম্পূর্ণ বেকায়দায় পেয়ে কখন ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে মাংস ছিঁড়ে নেবো, চোখ উপড়ে নেবো। বুঝতে পারছেন আর একজন কে? অবশ্য প্রতিনিয়ত এই স্থূল, সূক্ষ্ম লড়াই চললেও, লড়াই চালাতে চালাতে চামড়া এতো পুরু হয়ে যায় যে, কঠিন বর্মের মত একটা উদাসীনতা গায়ে একেবারে লেপ্টে বসে। তখন আমার পনেরো বছরের সিংহশাবকটি কারবাইডের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে নেশার ঝোঁকে দেওয়াল মাপতে মাপতে বাড়ি ঢুকলেও অনায়াসে ক্ষমা করে দিতে পারি। শুধু মনে হয়, যেমন করে হোক দিন চলে যাক, দিনটা যেন আটকে থাকে না, আর কিংবা কদাচিৎ একটা অদ্ভুত দার্শনিক চিন্তা কামড়ে বসে জোঁকের মত, এ আমি করছি কি, এ আমি করছি কি, যদিও এ সংসারে আমার ঠিক কি করবার আছে কি করবার ছিলো জানি না, বুঝে উঠতে পারি না। এক একদিন মধ্য রাত্রে একা একা কেমন করে যেন ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম থেকে নিঃশব্দে উঠে বসি, স্পষ্ট টের পাই চোখে জল, তখন ভীষণ ভয় পেয়ে যাই, তাহলে কি আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদছিলাম! এতো কান্না আমার বুকে, এতো কান্না!

কেন আমি এতো কাঁদি? কি হয়েছে আমার? কেন আমার সব থেকেও এসংসারে কেউ নেই? ত্রিসংসারে কেন আমি একা?

কিন্তু আর কান্না নয় ম্যাডাম। আমার সামনে পিছনে যে যুদ্ধই চলুক সে যুদ্ধে এখন থেকে, আজ সকাল থেকে আমার কোন ভূমিকা নেই। আমি কোনক্রমে ভূতের মত চোখ বুজে সকাল বিকেলটা কাটিয়ে যদি দিতে পারি, শুধু এইটুকু সময়, তারপর তো সন্ধ্যে থেকে আমি রাজা, আমার অন্য রাজত্ব। কিন্তু এ কথা ভাবতেই একটু বেশ আতঙ্ক হয়ে গেলাম। মাত্র এক সন্ধ্যার পরিচয়, তাও একজনের সুবাদে, অবশ্য আপনার চোখে সমর্থনের মত একটা কিছু ছিলো, কিন্তু মাঝখানে বাধাও অনেক, আপনি কি ভাববেন! আপনার ছেলের কথা আমি ভাবি না। আপনার স্বামীর কথাও না। উনি মানে মিঃ সোমকে যেমন দেখলাম উঁর উচ্চ পদমর্যাদা, গ্রীক অ্যাথলেটদের মত সুন্দর, দীপ্ত চেহারা, চোখ ধাঁধানো ব্যক্তিত্ব এ সব নিয়ে ভদ্রলোক এতোই ব্যস্ত ও নিশ্চিন্ত যে আমার মত একটা ইমপোটেন্ট ইগোকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় ওঁর যে নেই তা দৃষ্টিকটু ভাবে স্পষ্ট, তা ছাড়া ম্যাডাম, আপনার বঙ্কিম হাসিতে যা ছিল অস্ফুট, সেই ভাষা আমি পড়েছি, আমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি টেনিস কোর্টে র‍্যাকেট হাতে একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন অহংকার আর নির্জনতা নিয়ে মিঃ সোম আর অন্যদিকে মুখে অলীক হাসি নিয়ে তাঁর সখী মার্গারিটা, ওঁরা নিষ্ঠুরভাবে খেলে যাচ্ছেন আর আপনি মিসেস সোম, আপাতত যদিও আপনাকে নিরুপায় মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনার সুদৃশ্য ম্যাক্সির লম্বা হাতের মধ্যেই লুকোনো আছে বিষাক্ত ছুরি, মুখে নির্লিপ্ত হাসি, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কোর্টের বাইরে, মাঝে মাঝে হাততালি দিয়ে তারিফও করছেন এই নিষ্ঠুর খেলা, অভিমান, কৌতুক, ছলনায় কখনো গোপন কখনো উলঙ্গ এক আশ্চর্য ভূমিকায় আপনার অভিনয়। কিন্তু আপনার বন্দী ফ্ল্যাটে যাবার এটা কি একটা ছাড়পত্র হতে পারে! অথচ আপনার কাছে যাওয়া যে আমার খুব প্রয়োজন। বলে দিন তো, কেমন করে যাই। আপনি হঠাৎ চোখ তুলে তাকালেন, আপনার চোখে সেই আশ্চর্য বিভ্রম, সেই অলৌকিক দৃষ্টি, মুখে ধূসর হাসি, 'আসবেন আবার', সেই কণ্ঠ, এ কি শুধু ভদ্রতা না আরো কিছু? কোন গভীর জলের আহ্বান? যাই তা হলে, কি বলেন? সেদিন বন্ধু প্রদীপ আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, আজ আর প্রদীপের কাছে গিয়ে বললাম, 'আজ সন্ধ্যেতে তুমি খালি আছো?' প্রদীপ আমারই বয়সী, 'খালি আছো' কথাটা ইচ্ছে করে বুঝলো না। বোকা সেজে তাকিয়ে রইলো। আমি হেসে জানতে চাইলাম আজ সন্ধ্যায় তার কোন কাজ আছে কিনা। প্রদীপ বলল, তার কাজ কোনদিনই থাকে না। সে নাকি সব সময় অন্যের কাজই করে দিচ্ছে। বাড়ির কাজ, স্ত্রীর কাজ, তার একজন প্রণয়িনী আছে তার কাজ, তার মেয়ের কাজ। এই সব ফিরিস্তি দিয়ে প্রদীপ বেশ স্বচ্ছন্দ হেসে বললে, 'আমার নিজের কোন কাজ নেই।' আমি একটু রেগে গিয়ে বললাম, 'ওসব ঢং আমিও জানি, শালা। দরকারের সময় যতো বুজরুকি। যখন সোজাসুজি কথা বলা দরকার চিরকালই দেখেছি প্রদীপ, তুমি তখন ঘুরিয়ে কথা বলো। আর যখন ঘুরিয়ে কথা বলা দরকার তখন কিন্তু তুমি খুব সোজাসুজি, স্কাউন্ড্রেল!

প্রদীপ মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

'তাহলে আজ সন্ধ্যায়, ঠিক আছে?'

'শ্যাম্পেন। তবে আমি নয়। আর একজন। তার দিকে শুধু একনজর তাকা হবে, তাহলেই—' সন্ধ্যের সময় নিজে থেকে সেই আমার প্রথম যাওয়া ম্যাড আপনার কাছে। কিন্তু তার আগে সকালের একটা ব্যাপার বলি। তাতে আমা আপনি খানিকটা চিনতে পারবেন। মা সকাল আটটায় গলি দিয়ে যাচ্ছিলো আজকাল আর তেমন খোঁজও রাখি না মায়ের। দোতলা বাড়ির ওপরের ঘ আমরা থাকি। মা, বাবা থাকে নীচের ঘরে। সকালটা অবশ্য আমি খুবই ব্য থাকি। বলতে গেলে নিঃশ্বাস ফেলার টাইম থাকে না। বিকেল বেলা অফিস থে এসেই বেরিয়ে পড়ি বাইরে, মুখ হাত পা ধোওয়া, একটু কিছু খাওয়া সে স নেই, কেননা দাঁড়ালেই আমার কনিষ্ঠ ছেলেটি হঠাৎ পেছন দিক থেকে এ ঝাপটে ধরে বলবে, 'আজ আর বাবাকে যেতে দেব না। মা যে বলে, সন্ধ্যে হলে তোর বাবাকে ভূতে পায়, আজ তোমাতে আমাতে সেই ভূত দেখবো সন্ধ্যেবেলা ওর কামড় কচ্ছপের কামড়। ছাড়াবার উপায় নেই। একটিই উপায়, ও বিকেলে আলো হাওয়ায় মাঠে যেমন খেলছে খেলুক, ওকে দেখা না দিলেই হল। তারপ আমাকে আর পায় কে। সেই রাত এগারোটায় যখন বাড়ি আসবো তখন ও নী মশারির নীচে ঘুমের ঘোরে শয়তানের মত মিটিমিটি হাসছে। যা হোক, মায়ের কথা বলি। মায়ের পা কেটে গেল, ডাক্তার এলো, মা এক মাস ধরে ভুগলো, যেন অন্য লোকের মা আমার কেউ নয়, এই রকমভাবেই দেখছি সমস্ত ঘটনাটাকে। আমার সময়ের সত্যিই অভাব তবু মা বলে ফিলিং যদি থাকে তবে কি একটুও সময় করে নিয়ে মায়ের কাছে পাঁচ মিনিটের জন্যে বসা যায় না? যতোই কাজ থাক আমি পাঁচ মিনিট কেন ঘণ্টাখানেক সময় চুরি করে নিয়ে অশোকের রেস্টুরেণ্ট প্রায় প্রত্যেকদিনই তো একা একা চায়ের কাপ সামনে রেখে কাটিয়ে দি। আমাদের সব আত্মীয়স্বজন কাছাকাছিই আছেন। আমার জ্যাঠামশাই, এক সময় আমাকে কি ভালোই বাসতেন, গম্ভীর, রাশভারী সদাচারী মানুষ, তাঁর কঠিন অসুখ বাড়ি সুদ্ধ সবাই গেল, আমার অন্য ভাইরা সময় পেল, কি জানি কেন আমি যাবার জেঠামশাইকে দেখবার সময় করেই উঠতে পারলাম না। অথচ আমি খারাপ লোক নয়। এরকম ফিরিস্তি সাজাতে গেলে পাতার পর পাতা ভরে যাবে। সে সবে কাজ নেই। বরং মায়ের কথা যা বলছিলাম সেটুকু বলেনি।

মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। একেবারে সামনাসামনি। মায়ের চোখে চালশে পড়েছে, ছানি অপারেশন হবে, কলকাতায় যাতায়াত করছে তবু আমার বিশ্বাস মা আমাকে ছানিপড়া চোখেও স্পষ্ট দেখতে পায়। আমি, কি আর করবো, লজ্জা আর সঙ্কোচজড়ানো গলায় বললাম, 'কোথায় যাচ্ছো'। মা তোবড়ানো মুখখানাকে কঠিন করে বলল, 'কোথায় আর ভাগাড়ে। একটু শোন দয়া করে। বাড়িতে জল আসে না। তোমার বউদি পাতকুয়ার কথা তুলেছে।' এই রে সেরেছে, মায়ের অনেক সময়, মা এখন আমাকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে পাতকুয়ার জন্ম কাহিনী, তার ইতিহাস সমস্ত একে একে বলে যাবে, রাস্তার লোকজন কৌতূহলী ও সন্দিগ্ধ চোখে তাকাতে তাকাতে যাবে, এদিকে আমারও সময়াভাব, আমি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'একটু তাড়াতাড়ি করো। আমার অফিস আছে।'

'হ্যাঁ, বাবা। তাড়াতাড়ি করি। তোমাদের কতো তাড়া, আমার কোন তাড়া নেই।'

এসব কথাতে অস্বস্তি বোধ করতেই হয়। একটি সংসারের শুধু হাক্লান্ত কাতর বৃদ্ধার গভীর মনস্তাপ, আশাভঙ্গ, বেদনা এর সঙ্গে জড়ানো আর সে ব্যাপারে নীরব দর্শক ও শ্রোতা হওয়া ছাড়া আমার অন্য কো. উপায়ও নেই। মায়ের মুখের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে গেল। মায়ের চোখের পাতা এই প্রথম দেখলাম সব পেকে গেছে।

'তোমার বউদি হঠাৎ কিছুক্ষণ আগে বলল, পাতকুয়ো করতে কতো খরচ? আমি শান্তভাবে বললাম, আজকাল সব কথা শান্তভাবেই বলি, যেটুকু না বললে নয় সেটুকু। জানি যে ক'দিন বেঁচে থাকবো সে ক'দিন নিজের বাড়িতে চোরের মত বেঁচে থাকতে হবে। খরচ তা ধরো হাজার খানেক।' এইভাবে মা অনেক কথা বলে গেল। আর মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে আমি শুনছি কিনা পরখ করবার জন্যে বলতে লাগলো, 'তুমি শুনছো না অন্য কিছু ভাবছো তোমার বাবার মত! তুমি শুনছো তো! হ্যাঁ, একটু দয়া করে শোন।' সবটা আর বলবো না। বলার দরকারও নেই। কিছু বুঝলেন আমাকে?

মায়ের কাছে যা জীবনমরণের প্রশ্ন আমার কাছে তা কিছুই না। মায়ের কথা আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। মা ঠিকই সন্দেহ করেছে, আমি শুনছি না একদম।

কিছু বুঝলেন? বুঝলেন না? আমিও বুঝতাম না। এখন লিখতে লিখতে নিজের কাছে নিজে একটু একটু স্বচ্ছ হয়ে উঠছি। বুঝতে পারছি কেন অন্যের কথা মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। ......কানে ঢোকে না। সেই সন্ধ্যায় প্রদীপাকে নিয়ে যখন কম্পাউণ্ডে ঢুকছি মিঃ সোম তখন দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন, আমি ওঁকে ঠিকই দেখেছি, কিন্তু হাত তুলে নমস্কার জানানোর কোন ইচ্ছেই ছিলো না, উনি যখন আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না তখন আমারই বা এতো কি দায় যে ওঁকে আমার চেনা দিতেই হবে? তা ছাড়া আমি তো আর ওঁর জন্যে ওঁর ফ্ল্যাটে যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি আপনার জন্যে. সে যাক পাশ কাটাতেও উনি দেখলাম ফিরে তাকালেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'বড়সাহেব ডেকেছেন দেখছেন তো এই আমাদের জীবন। একটু অবসর নেই। মারোয়াড়ী কম্পানী। ডিউটির কোন সময় নেই। বিশেষ করে আমাদের।' তারপর একটু থেমে চলতে চলতে বললেন, 'যান, মীনাক্ষী আছে। ওকে একটু কম্পানী দিন।' শুনলাম,

কম্পাউন্ড পার হয়ে গেলেন বড় বড় পা ফেলে। এইসব পুরুষেরও চলার একটা সৌন্দর্য আছে, এদের চলাটাকে অলীক মনে হয় না যা এদের চলা কোন বিভ্রম সৃষ্টি করে না এটা ঠিক, কিন্তু দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, পৌরুষের যদি কোন সৌন্দর্য থাকে মিঃ সোমের প্রতি পদক্ষেপে তা ফুটে উঠছিল। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর বিস্ময়কর চলে যাওয়া দেখছিলাম।

সেই বিশাল হর্ম্য, তার নানা রঙের রঙীন জানালার কাচ, গঙ্গার গর্ভ থেকে উঠে আসা দস্যু হাওয়া, ভিতরে মার্কারী-লাইটের অলৌকিক মায়াবী আলো, তার নীচে সেই বিখ্যাত উদ্ভিদটি আর তার সংলগ্ন হয়ে আপনার অভিজাত বসার ধরন, অবিকল প্রথম দিন যেমন দেখেছিলাম আজও তাই, একচুল এদিক ওদিক হয়নি।

আপনি বললেন, যেন জনান্তিকে, 'আসুন।' আমি শুনলাম 'জানতাম'।

এইভাবেই তারপর যাওয়া আরম্ভ হল আপনার কাছে। কথা আপনিই বলতেন বেশী, আমি শুনতাম কেননা আমি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম এ সংসারে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। তা ছাড়া সুন্দরী নারী যদি বিদগ্ধা হন তবে তার তুলনা পাওয়া ভার। অ্যাকোয়ারিয়ামে রঙীন মাছ যেমন নিয়নের আলোয় খেলে বেড়ায় তেমনি আপনার স্বচ্ছন্দ বিহার এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে। আমি কিছুই করতাম না, শুধু মুগ্ধ হয়ে শুনতাম, মনে হত কখনো মৃদু, কখনো দ্রুত লয়ে ইলেকট্রিক গীটার বাজছে। মাঝে মাঝে মিঃ সোম আসতেন পর্দা ঠেলে ঘরের মধ্যে। সকৌতুকে একবার আমার দিকে তাকাতেন, দু একটি সরস, লঘু মন্তব্য করতেন, তারপর ব্যস্ত পায়ে চলে যেতেন, আমার কিছুই মনে হত না। অবশ্য এক একবার মনে হত উনি রাগ করছেন না কেন আমার ওপর? আমি যে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলছি একটু ঈর্ষাও তো হতে পারে? অবাক হয়ে দেখছি, ঈর্ষা জিনিসটাই যেন ওঁর নেই। পরে আরো আবিষ্কার করেছি উনি পাশের চেম্বারেই আছেন, গভীর মনোযোগের সঙ্গে অফিসের কাজকর্ম করছেন, কখনো টেবিলে ব্ল্যাক কফিকে জুড়োতে দিয়ে একমনে পেসেন্স খেলছেন, কিন্তু এ ঘরে আসছেন না। পরে কেমন করে যেন বুঝেছি উনি মোটেই আমার ওপর অপ্রসন্ন নন, বরং সন্তুষ্টই, কেননা আমার দৌলতে উনি ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দেড়েক সময় নিজের কাছে রাখতে পারছেন। আমার সামনেই আপনি কতো-দিন বলেছেন, 'তোমার সেই মার্গারিটা, তার খবর কি?'

উনি সহাস্যে বিলিতী ম্যাগাজিন দেখতে দেখতে বলেছেন, 'আর বল কেন? নারী যে ছলনাময়ী তা আবার নতুন করে জানতে হল।'

'তুমি এখনো জানতে পাও, তুমি খুব ভাগ্যবান।'

'দূর, এই বয়সে আর কি ওসব পারি।'

'মার্গারিটার স্বাদ মিটে গেছে? এখন আবার তোমার কুঞ্জে কোন রাধিকা।' এই ধরনের সরস কথাবার্তার মধ্যে আপনি কৌতুককে বড় করে নিষ্ঠুরতাকে আড়াল করছিলেন। আপনাদের ভেতরকার নিষ্ঠুরতা।

কেবল একদিন ম্যাডাম, আপনি খুব সতর্ক থাকলেও ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। আপনি আমার আঁকার খুব প্রশংসা করছিলেন এতোদিনের মেলামেশার মধ্যে আপনার একটা জিনিস আমার খুব আশ্চর্য লাগে, আপনার উদার সৌজন্যজ্ঞান। এই সৌজন্যবোধ, এই প্রসন্নতা আপনি পেলেন কোথায়? আমি আপনার কাছে আসি কেন তার একটা স্থূল কারণ আছেই, যদিও ঠিক জানি না এখনো কেন যাই আপনার কাছে, কিন্তু আপনি আমার কাছে কি পান, কি চান, আজো তা আমার কাছে কুয়াশার মত অস্পষ্ট, দিশেহারা হয়ে আঁতিপাতি খুঁজেছি, পাইনি, অথচ এটা বিলক্ষণ জেনেছি, আমার আসাতে আপনি খুশীই হন, কিন্তু কেন এই খুশী?

সেদিন যখন আমাকে আরো ছবি আঁকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তখন আমি বললাম, 'আপনার যখন এতো ঝোঁক তখন আঁকুন না কেন ছবি?'

আপনি খুব সীরিয়াস মুখে বললেন, 'তা হলে ওর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।' সেদিনই আমি বুঝলাম ওপর থেকে যাকে ঐশ্বর্যবান, ফলবান বৃক্ষ বলে মনে হয়, তাকে উপড়ে ফেলার জন্যে আশ্বিনের ঝড় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না, উই পোকা অনেকদিন আগেই তার ভেতর পর্যন্ত ফোঁপরা করে দিয়েছে। এখন শুধু একটা সামান্য ধাক্কা দেওয়া দরকার, তা হলেই নাটকের ক্লাইম্যাকস ও ক্যাটাস-ট্রফি একসঙ্গে। হুররে, এই আমাদের দাম্পত্য জীবন! এমন চোরাবালির ওপর আমরা সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, কি চমৎকার!

তারপর বেশ কিছুদিন আপনিই আমার ভ্রমণ, আপনি আমার বিশ্রাম, আপনি আমার একমাত্র বিনোদন। আপনিই আলোক এবং আপনিই মোক্ষ। আপনি প্রতিক্রিয়া আবার আপনিই প্রশ্ন ও উত্তর। সোজা কথায় আপনি আমার ঈশ্বরী হলেন। একটা অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠলো আপনার সঙ্গে, আপনার স্বামী, আপনার পুত্র বা আপনার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে নয়। কেবল আপনার সঙ্গে। সে কি প্রণয়? অন্তত আমার দিক দিয়ে। আপনার দিক দিয়ে? বোধ হয় নয়। বেশ কিছুদিন আপনি ছাড়া আমার আর অন্য কোন ভাবনাও ছিল না। আপনি কি ভাবছেন আমার সম্বন্ধে এ-ও ভেবেছি কতোদিন। এক এক সময় মনে হয় আপনি আমার ওপর খুব একটা অসন্তুষ্ট নন। আবার কখনো মনে হত আপনি আমাকে একেবারেই পছন্দ করেন না। এটা মনে হবার কারণ, একদিন আপনি বেশ একটু বিকেল বিকেল আসতে বলেছিলেন কি যেন দরকার ছিল আপনার। আমি ঠিক সে সময় যেতে পারিনি। কোন একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম। তারপর প্রায় রোজ যেমন সন্ধ্যায় যাই তেমনিই গিয়েছিলাম। আপনি আমার দেরিতে আসার জন্যে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি। জিজ্ঞেস করলে আমার উত্তর তৈরী ছিল। [illegible] না। শুধু অদ্ভুত একটু হাসলেন

Interpub/S/4/79 BN

মনপছন্দ ১০১ টি নানান ধরনের ডিজাইন, সুপার কটন ও ব্লেণ্ডেড ড্রেস মেটিরিয়াল,
স্যুটিং, শার্টিং ও শাড়ী

নীচেকার ঠোঁট দিয়ে। সে হাসি এক নিমেষের জন্যেই। কিন্তু সেই এক নিমেষেই আমার গোটা জীবন আমি দেখেছিলাম। কঠিন বিদ্রূপে ভরা সেই হাসি, সেই হাসি যেন সম্রাজ্ঞীর অহংকার নিয়ে আমাকে তিরস্কার করছিলো, ওই তো পুরুষ, না চেহারায়, না ব্যক্তিত্বে, না গুণে কোনদিক দিয়েই আমার জর্মকালো স্বামীর ধারে কাছেও দাঁড়াতে পারে না যে, তার অন্তত আর কিছু না থাক, নিখুঁত সময়জ্ঞান থাকা উচিত, একেবারে কিছুই নেই যার, তার হীনতা ও দীনতাই তাকে আমার পায়ের তলায় পোষা কুকুরের মত নতজানু করুক।

হ্যাঁ, ম্যাডাম, আমি সেদিন ঠিকই দেখেছিলাম। আমার এসব ব্যাপারে ভুল হয় না। পরক্ষণেই আপনি সৌজন্যে, উদারতায় ভরপুর হয়েছিলেন।

আমার সমস্ত জীবনটা ম্যাডাম, একটা অদ্ভুত প্রহেলিকার মত। আমার আরম্ভ তা সব ব্যাপারেই বেশ ভালো কিন্তু বাকি সবটাই কেমন বিষাদময়। এমন কি আমার স্বপ্নও কোনদিন সুখের হয় না। গভীর, গভীর কষ্ট নিয়ে আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়। শুধু একদিনের কথা বলি। তখনো সংসারের ছবি আমার হাত থেকে পড়ে ভেঙে খান খান হয়নি রঙীন কাগজ ছিঁড়ে যায়নি। এখন যেমন দরজা আছে বাড়ী নেই, আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন দরজাও ছিল বাড়িও ছিল, গানের ভাষায় হ্যাঁ গানের ভাষা ছাড়া আমি নিজেকে ব্যক্তই করতে পারি না, হয়তো কবিত্ব হচ্ছে আর আমাকে তা মোটেই মানায় না, তবু কি করবো বলুন এই চাঁদ্রপে যখন আর মানুষ নেই আমি, শহীদ হয়ে গেছি, আমার গা থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে বর্ম, আমার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তীর, তখন ওই গানগুলিই আমার দুঃখের বকুল, সুন্দর, মসৃণ সেই সব দিনের কথা বলি যখন 'অরুণ ছিল তরুণ আলো পথটি ছিল কুসুমাকীর্ণ, বসন্ত সে রঙীন বেশে ধরায় সেদিন অবতীর্ণ', (আমার স্ত্রী স্বপ্না কি সুন্দর করে যে গাইতো। ওই দেখুন স্ত্রীর কথা এসে গেল!) ঠিক এই সময় শুধু একবারের জন্যে একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলাম।

আকাশের অতল থেকে যেন নীল আভা বিকীর্ণ হচ্ছে। ভোরের গঙ্গায় ধুয়ে, সম্পূর্ণ টাটকা হয়ে সূর্য উঠেছে দিগন্তে। কোথাকার এক বনের মধ্যে, গভীর নির্জনতার মধ্যে, আমি দাঁড়িয়ে আছি। একটু দূরে অনির্বাচনীয় এক শিল্পকর্মের মত নগ্নবক্ষ এক নারী বসে আছে একটি বেদীর ওপর। নতুন রোদ এসে পড়েছে তার নক্ষত্রের মত চোখে, মুখের অলৌকিক রেখায়, সম্পূর্ণ শঙ্কাহীন, নরম মাটির মতন দুটি রক্তাভ, ঈষৎ উন্নত স্তনে, সাদা কোমল মার্বেলের মত নাভির উপত্যকায়, আমি সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে সেই দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছি। শুধু এই ছবি, সেই শুধু একবার, শুধু একবারের জন্যেই, ব্যস, তাকে আর স্বপ্নের পৃথিবীতে কখনো পাইনি, অনেকবার অনেক সংশয়ে, সংসারের অনেক কোলাহলের ভেতর সেই মাধুরী আমি প্রার্থনা করেছি, কিন্তু ছলনাময়ী সেই দিব্যকান্তি স্বপ্ন আর কখনো আমাকে ধরা দেয়নি। দেখুন সেদিনের সেই স্বপ্নের কথা লিখতে লিখতে রমণী, আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠছে, এমনকি উপভোগের একটি গভীর তৃপ্তির সান্নিধ্যে আমি এসে গেছি, সেই নারীর মুখ আমার মনে আছে, সেই মুখ পৃথিবীতে আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু তাকে কোথাও দেখিনি, সেই দর্শনীয় স্বপ্ন আমাকে তারপর থেকে ক্রমাগত প্রবঞ্চনা করে গেছে। কি স্বপ্নে, কি জাগরণে সেই নারীকে যখন আর পেলাম না, তখন আমার চেষ্টা হল, আপনার মধ্যে সেই নারীকে ফুটিয়ে তোলা। আমার নিশ্চিত ধারণা, সেদিনের সেই একবার দেখা স্বপ্ন, এই পথেই আমার অভীষ্ট লাভ হবে, এই ইঙ্গিতই করছিলো। একদা আমার স্ত্রী, স্বপ্নার মধ্যে আমি সেই নারীকে খুঁজেছিলাম। তাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। আমার যত্নের কোন ত্রুটি ছিলো না। স্বপ্নাও যতোটা পেরেছিলো প্রাণপণে আমাকে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু অবহেলায়, অবজ্ঞায়, ক্রোধে, অভিমানে, ঘৃণায় তাকে আমি হারিয়েছি। সংসারে প্রণয় বড় ক্ষণস্থায়ী। সে থাকে না থাকবে না—এই যেন তার স্বভাব। সে সুখী জীবও নয়। সুখেও তো সে বাঁচবে না। এক ধরনের ক্ষণজীবী পতঙ্গের মত, তার বর্ণচ্ছটায় মোহিত করে জলবিন্দুর মত দ্রুত মুছে যায়। সে যাই হোক, আমি যখন বদ্ধপরিকর যে আপনার মধ্যে সেই নারীকে আমি দেখবোই, তখন আপনি আমাকে অবজ্ঞা করলেন কি করলেন না সে প্রশ্ন স্বতই অবান্তর। কিন্তু কদিন ধরে দেখছি আপনি একটু অন্য রকম গাইছেন। আপনার কথার মধ্যে অবিকল আগেকার উক্ততা আছে ঠিকই, আপনি জায়গাও বদল করেননি, আপনার আর আমার মধ্যে এখনো যথেষ্ট টাটকা বাতাস, তবু ইঁদুর বা উইপোকারা ইতিমধ্যে কিন্তু এসে গেছে, গোপন দর্পণে আমি যেন দেখেছি, যেমন তারা আসে সন্দেহে, সংশয়ে। এবার তাঁবু আর খুঁটি বোধ হয় তুলে নিতে হবে, ম্যাডাম। হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, ইঁদুর আর উইপোকারা এসে গেছে। ইঁদুর আর উইপোকা...ধানক্ষেতে..
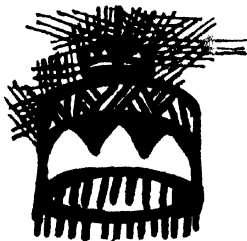
আমার মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট তথাপি আপনি সেদিন প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বেশ আছেন। যেখানে ইচ্ছে যখন তখন ঘুরে বেড়াতে পারেন। বিয়ে টিয়ে ত' আর

আমি বিয়ে করেছি আর দুই সন্তানের পিতা আমি—একথা আমি বলতেই গিয়েছিলাম কেননা না বলবার তো কোন কারণই নেই। তবুও সেই প্রথম দিনের বিবাহিত পুরুষের লজ্জা আমাকে আচ্ছন্ন করলো। যেন বিয়ে করেছি, আমার ছেলেপুলেও আছে একথা স্বীকার করার মধ্যে অনেক ত্রুটি, অনেক অক্ষমতা। উত্তর দিতে গিয়েও আমি তাই মাথা নীচু করেছিলাম।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেন। বেশ আছেন। হিংসে হয়।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দি? আপনি জানেন না মিসেস কি কঠিন চরকিবাজী করে আমাকে সংসার চালাতে হয়। আমার মাথার ওপর কতো যে দায়, কতো দায়িত্ব শুনলে আপনি অবাক হতেন। আর বেশ আছি? এবার হাসালেন। এ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলবো না। আবার 'বেশ থাকা' কি আমার শান্ত, নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকার মধ্যেই কি তা প্রকট নয়? হিংসে হয়? কি আছে আমার রমণী যে তুমি হিংসে করছো? যদি হিংসে হয় তা হলে সেজা তোমার গাড়ি হাঁকিয়ে আমার স্ত্রীর কাছে চলে যাও, জিগ্যেস কর, সে আমাকে তোমার হাতে তুলে দিতে রাজী কিনা। স্বপ্না হেসে কুল পাবে না। বলবে, 'যমের অরুচি। নিয়ে যান না একদিন জঞ্জালটাকে। আপদ গেলেই বাঁচি। সংসারে একটা পাপোশেরও মূল্য আছে। ওর কোন মূল্য নেই। ওকে আপনি নিয়ে নিলে আমার হাড় জুড়োয়। হাড়ে বাতাস লাগে। পোড়া কপাল, আর লোক পেলেন না?'

'এখান থেকে তো সোজা বাড়ি যাবেন না, না?'

'বাড়ি? না।' বাড়ি বলতে যে উষ্ণতাটুকু বোঝায়, যে উষ্ণতা স্ত্রী বা ছেলে-মেয়ে দেয়, দিতে পারে, এতোদিন পার হবার পর আজ সেই উনুনের আঁচ উনো। স্ত্রী বলতে এখন একজন স্ত্রীলোক বোঝায়। বোঝায় কি? তাও না। লোকে রক্ষিতা রাখলে তার সঙ্গেও একটা সম্পর্ক হয়। এখন সে সম্পর্কও ঘুচে গেছে আমার। আমি এখন সর্বাংশে ঝাড়া হাত পা। ছেলেমেয়ে? তারা তো আছে। হ্যাঁ আছে বইকি, বেশ পাকাপোক্তভাবে বেঁচেবর্তে আছে। কিন্তু আছে এই পর্যন্ত, এতেই শান্তি, আহা তারা বেঁচে থাক। সুখে থাকবার কপাল করলে যেন সুখে থাকে, এই মাত্র।

'কোথায় যাবেন এখন?' আপনার চোখে অপার কৌতূহল। অনন্ত জিজ্ঞাসা।

'দেখি কোন চায়ের দোকান ঢোকান।'

'চায়ের দোকান?' আপনি যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকালেন আমার দিকে। যেন কি একটা দুর্লভ জিনিস আমি পেয়ে গেছি অথচ, যা থেকে আপনি চিরকালের জন্যে বঞ্চিত। চায়ের দোকানের কথা শুনে আপনি খঞ্জন পাখির মতন নেচে উঠলেন। তারপর কিন্তু বুক শূন্য করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সেই দীর্ঘশ্বাস এমনি যে তা মর্মে বিঁধে যায়। দীর্ঘশ্বাসের ভেতর আমি তাকিয়ে দেখি, স্পষ্ট আপনার মুখ ভেঙে গেছে। আপনার চোখে আর আগের মত জ্যোতি নেই। যেন এই জীবনের ভ্রমণ আপনার পক্ষে এখন বড়ই কষ্টসাধ্য, আপনি যেন আর বইতে পারছেন না। সেই প্রথম ভালো করে বুঝলাম ম্যাডাম, আপনারও, এমন কি আপনারও দরজা আছে কিন্তু কোন বাড়ি নেই।

'আমি কতোদিন চায়ের দোকানে আড্ডা দিইনি। ইস্, আপনি কি ভাগ্যবান!' আমি আপনার সরলতায়, পবিত্রতায় হাসি। সত্যিই আপনি ডেভিড কপারফিল্ড উপন্যাস থেকে নেমে এসেছেন, সেই সরলা অবলা বালিকা, ডোরা, যদিও একটু লঙ্কা, তবু ডোরা, তা না হলে এমন উচ্চ বাড়ি যাঁর, এমন পরিপাটি, নিখুঁত, কেতাদুরস্ত স্বামী যাঁর, এমন একটি দুধকুমার, সবাই নিশ্চই বাধ্য, সম্রাজ্ঞীর মত যা হুকুম করেন, মুখের কথা খসাতে না খসাতেই তা প্রতিপালিত হয়, এমন যে আপনি, ঈশ্বর যাঁকে দু হাত ভরে দিয়েছেন, শুধুই দিয়েই গেছেন, অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী আপনি, আপনারও কিনা দীর্ঘশ্বাস, আপনারও কিনা হাহাকার আবার তাও কোথাকার কোন এক হতচ্ছাড়া চায়ের দোকানের জন্যে! চায়ের দোকানের জন্যে সেদিনকার দুঃখ বা বিষাদ আমার ভারি আশ্চর্য লেগে-ছিলো! ভারি নোতুন লেগেছিলো। অথচ একটা শঙ্কা নিয়েও আমি আপনার বিশাল হর্ম্য ছেড়ে সেদিন উঠে এসেছিলাম। শঙ্কা বা অস্বস্তি যাই বলুন। কিন্তু কি সেটা, কিসের উদ্বেগ, কিসের অশান্তি, সেদিন বুঝিনি।...

আর একদিন এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ আপনি ঝরনাধারার মত হেসে উঠলেন। আপনার এই প্রাণখোলা হাসি যে কি জিনিস জনে জনে ধরে এনে তা দেখাতে হয়। কি সুন্দর হাসেন আপনি। ভেতরে অনন্ত শূন্য থাকলেও শুধু এই হাসি দেখবার জন্যে বেঁচে থাকার মত অভিশাপও স্বচ্ছন্দে বহন করা যায়।

হাসি থামিয়ে আপনি যেন গোপন চাবি দিয়ে পুরনো তোরঙ্গ খুললেন। কেমন এক ধরনের ভঙ্গী করে বললেন, 'খুব যে মশাই! ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে। আপনি একটা বর্ণচোরা।'

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে আপনার কথা সবিস্ময়ে রিপিট করলাম, 'বর্ণচোরা!' আপনি যেন একটা লুকোনো শমন ধরিয়ে দিলেন। অপরূপ মাধুরী রচনা করে, চোখে ছলনা নিয়ে বললেন, 'আপনি যে বিয়ে করেছেন তা বলেননি কেন?'

আমি যেন ভয়ানক কোন অপরাধ করেছি এই ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেলাম। তবু যতোটা সম্ভব সরলভাবে বললাম, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি এসব বলতে হয়।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। হি—হি—হি' আপনি একেবারে উদোম হাসতে লাগলেন। 'আমি ঠিক'—আমার কথাটা বারেবারে বলবার চেষ্টা করছেন, হাসির

কাঁপিয়ে দেওয়া হাসিতে আপনি একেবারে লুটিয়ে পড়লেন ডানলোপিলোর সুন্দর, মসৃণ গদীর ওপর। সেদিন ফেরার পথে অন্ধকারে একা একা হাটতে হাটতে আমি শুধু এই কথাই ভেবেছি কেন আমি আমার স্ত্রীর কথা, আমার দুই পুত্রের কথা বলতে পারিনি। লোকে নিশ্চয়ই তাই বলে। আগে থেকে অন্য কথার ফাঁকে ফাঁক গুঁজে দেয় স্ত্রী ও পুত্রের কথা। অথবা এমনি স্বাভাবিকভাবেই তাদের এসে যায় ঘর, সংসার, গৃহস্থলির কথা। আমার এসব আসে না কেন? এলো না কেন আপনার সামনে? আবার সেই উদ্বেগ আর অশান্তি, আবার সেই শংকা দেখা দিলো। আর আমি বারে বারে বলতে থাকলাম, খুঁজতে থাকলাম, তাই তো, তাই তো, কেন, কেন?...

এরও বেশ কিছুদিন পর যাতায়াতের ফাঁকে আপনি হঠাৎ আর একদিন আর একটা প্রশ্ন করে বসলেন।

'এটা কিন্তু অন্যায়। আপনি আপনার স্ত্রীকে আনেন না কেন? আনবেন একদিন।'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আপনার কাছে আমি আসি। যদি বলেন আর আসবেন না, যদিও তা হবে খুব দুঃখের, তবুও আসবো না আর। কিন্তু এর মধ্যে স্ত্রীর কথা কেন? আপনার সঙ্গে যেদিন আমার পরিচয় হয়েছিলো সেদিন তো আমার স্ত্রী সঙ্গে ছিলো না? কিন্তু এইটাই হয়তো সাংসারিক রীতি। কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি বয়স্ক একজন পুরুষের পিছু পিছু আঁচলে গিঁট দিয়ে একজন স্ত্রী এসে যান। না এলে নাকি সামাজিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। না এলে প্রাণ-খুলে ভালো করে মেশা যায় না বোধ হয়। আমি দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে আপনার মুখের দিকে তাকালাম। আমার মনের মধ্যে এ মুহূর্তে যা সব হচ্ছে সে সব বলা যায় কিনা ভাবলাম। কিন্তু আপনাকে দেখলাম আপনি খুব নির্লিপ্ত, খুব নিরপেক্ষ হয়ে গেছেন মুহূর্তেই। সুতরাং কি আর বলি, বললাম, 'আনবো একদিন। নিশ্চই আনবো।'

তারপর অন্য অন্য দিন যেমন আপনার সঙ্গে জমে উঠি, স্নিগ্ধতায় প্রবেশ করি, আপনার রূপ, রসের মদিরা পান করে আত্মমাতালের মত বাড়ি ফিরি সেদিন আর তেমন হল না, স্পষ্ট মনে হল, নেশা কেটে গেছে আমার। ঘোর কেটে গেছে।

সেদিন মধ্যরাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম পূর্ব আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ ঝুলেছে তালশাঁসের মত। আর নক্ষত্রগুলো আপনার অসংখ্য কূট প্রশ্নের মত দপ দপ করে জ্বলছে। সেদিন সেই ছায়া অন্ধকারে আমার একলা ঘরে আমি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলাম। আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে আমি অনেকদিন ধরে একটা প্রাইভেট লাইফ চালিয়ে যাচ্ছি। আমি স্পষ্ট বুঝলাম, কেন আমি আপনার কাছে আমার স্ত্রী, আমার পুত্রের কথা বলিনি বা তাদের নিয়ে যাইনি। আমি আরোও বুঝলাম, স্থূল কারণ যাই হোক, সূক্ষ্ম কারণ কেন আমি আপনার কাছে যাই। সে কি প্রেম? সে কি প্রণয়? না রমণী, তা নয়। আমার মনে পড়ে গেল, দুদিন আগে পথে আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে বলল, কি রে কেমন আছিস? এই নিউ কলোনীতে বাড়ি করেছি। আসিস না একদিন।'

আমি যেন বেঁচে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে বললাম, যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।' এ শুধু কথার কথা নয়। যাক, পেয়ে গেলাম একটি 'ঠেক'—যাকে বলে আশ্রয়। এ বন্ধুটি আমাকে যেতে বলেছে। তবে যদি বন্ধুটি কোনদিন আমার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সম্বন্ধে যদি জানতে চায় তা হলে সেইখানেই ইতি, ম্যাডাম। তখন আবার অন্য কোথাও অন্য কোনখানে যদি কিছু জোটে কিনা দেখতে হবে। আপনার কাছে এই মুহূর্তে খুব যেতে ইচ্ছে করছে ম্যাডাম। এই বাতি-জ্বলা সন্ধ্যায়। কয়েকটি শ্বেত পাথরের ওপর স্থাপিত আপনাদের সেই গর্জাস হর্ম্য, তার সুবিশাল, রঙীন জানালায় শেষ শীতের সূর্য কি এখনো বিভ্রম সৃষ্টি করছে? সবুজ গালিচা মাড়িয়ে ভৃত্যের নির্দেশে এতোদিন যেখানে সম্মোহিতের মত গিয়েছিলাম সেইখানে পেতলের টবে সেই সযত্ন লালিত উদ্ভিদটি এখনো কি বেঁচেবর্তে আছে? আর সেই সুবিশাল ঘরের মাঝখানে ঝালরযুক্ত প্রকাণ্ড দীপাধার—তা থেকে কি সেদিনের মত আজো আলো বিচ্ছুরিত হয়? তার তলাতেই একান্ত সংলগ্ন হয়ে আপনি আজো, এখনো কি আপনার অভিজাত চেহারাটি ঈষৎ আনত করে বসে আছেন? আমি জানি আপনার মুখের সে মদিরা কোনদিন ম্লান হবে না, হয় না। আপার চোখে অবিকল সেই বিভ্রম, সেই অলৌকিক মায়া থেকে যায়, থাকে। আপনার সকল কথা রূপকথা হয়ে আজো, অনবরত ঝরে। ম্যাডাম, তবু কিন্তু আপনার কাছে এ জীবনে আর যাচ্ছি না। আপনিই যে ধরিয়ে দিলেন, আমি জানতাম না কোন-দিনও, শুধু অস্পষ্টভাবে মাঝে মাঝে অনুভব করতাম, আমি ভেতরে ভেতরে সম্পূর্ণ গোপন একটি জীবন, যাকে খুব ব্যক্তিগত বলা চলে, যেখানে স্ত্রীও নেই, পুত্রও নেই, সংসারও নেই, সেই জীবন, সেই গোপন জীবন আমি যাপন করে যাচ্ছি নিশিদিন। আপনি। প্রথম যিনি ধরিয়ে দিলেন আর আপনিই প্রথম যিনি সেই প্রাইভেসি নষ্ট করে দিলেন। আপনার লালিত্যময়, অপরূপ শরীর ও মনের কাছে আমি আজো নতজানু, আপনার বৈদগ্ধ্যে আমি মুগ্ধ, আপনার অসাধারণ সৌজন্য-জ্ঞান ভদ্রতাজ্ঞানের কাছে আমি সম্পূর্ণ পরাজিত তথাপি আমি আর আপনার কাছে যাচ্ছি না।

আপনি বুঝতে পারলেন কেন আপনার কাছে আর যাবো না? আপনিও তো কই এলেন না আমার বাড়ি? আপনি মহিলা, তাই বাধা? না। আমার তা মনে হয় না। আমি তো একদিন বিনা নিমন্ত্রণেই গিয়েছিলাম আপনার বাড়ি। আমি জানি আপনি আমার বাড়ি আসবেন না বলেই আসেননি। কিন্তু আপনিও কি কোথাও যান না? যান যদি একা কেন যান? আমরা কেন যাই, এই চাঁদশে, এই অপরাহ্নে, কিসের টানে, একা একা? আপনি কি তা বোঝেন না?

১০০% টেরিন, কটন ও ব্লেণ্ডস্-এর শার্টিং, স্যুটিং, ড্রেস মেটেরিয়াল ও শাড়ীর অপূর্ব সম্ভার ! আপনার জীবন গৌরবমণ্ডিত ক'রে তোলার ফ্যাব্রিক্স !

তোমার জন্যই আরো একবার

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

গ্রন্থের ভাষায় কিছু বিঘ্ন ঘটেছিল।
পড়ে জেনে নাও ঠিক কোন শব্দে আজো বাকী আছো তুমি?
কতদিন তোমাকে দেখিনা, তবু লিখি তোমার তুমুল অহংকার;
প্রতিদিন দশটা-পাঁচ অন্ধকারে
আকাশঘোষণা শুনি, চব্বিশঘণ্টায় দেশ কতটা এগুলো
শুনতে শুনতে ভাবি এ সব নতুন মিথ্যা তুমিও শুনেছো!
তুমিও তো জানো কারা রোজ নিউজপ্রিণ্টের পাতায়
লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ভোরে, তারা কি কখনো
আমাকে বা তোমাকে পড়বে?
এখন কোথায় তুমি অভিমানে অপমানে
নির্বাসন করেছো নির্বাচন!
আমি তবু তোমাকেই অনুবাদ করি,
ভাষামেশিনের ঘট ঘটাং ঘট ঘটাং ধ্বনির ঘটনা থেমে গেলে
কাগজের যত সাদা কালো হয়, তারা ঐ দ্যাখো
মুদ্রণপ্রমাদে শুধু ভরে দিচ্ছে দেশ।
কবে বুক জুড়ে ছিলে তুমি, জানুসন্ধি ও ক্ষরণে
শরীরেই লেখা হয়েছিল টাটকা কিছু ভারতী অক্ষর!

এখন কোথায় তুমি, ইতিহাস ভূগোল সব খিলখিল হাসে
যেন হাসি নয় তারা বাসী কিছু বৃদ্ধের উদ্গার
যারা সফল সোফায় বসে বন্যায় খরায় কাঁদে
ক্যামেরায় হাসে ঠিকঠাক!
আমি শুধু প্রাচীন রচনা নিয়ে গ্রন্থ হয়ে থাকি

তোমার ওই স্বদেশশরীরে শোয়া এ জন্মে কি আর কখনো হবে?

"শকুন্তলা"—শৈবাল ঘোষের জলরঙের মণ্ডনধর্মী কাজ। জন্ম ১৯৫১। সরকারী চারু-কারু মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক (১৯৭৪)। জলরঙে আকাদমী অব ফাইন আর্টস্

প্রতীক

বিজয়কুমার দত্ত

নাম রেখেছি আলো
লোডশেডিং-এর অন্ধকারে
দু'চোখ ভরে যখন শুধু কালো,
নাম রেখেছি অনেক ভেবে
আলো।

অথচ সে আলোর রেখা-রঙ্
সৌর-চন্দ্র গ্রহ-তারার, জ্যোতির মধ্যে নেই
এ যেন সেই
অবনীন্দ্রনাথের লেখা, ছবির মত ভাষায়
অচেনা এক আলোর আলো তার
শরীর থেকে ঠিকরে চলে যায়

নাম রেখেছি তার—
অন্ধকারের রাজ্য জুড়ে
সমস্বরে যখন ওঠে, আলোর হাহাকার।

স্মৃতির কিশোরী

দীপংকর বিশ্বাস

স্কুলের ঘণ্টা বাজে। মনে পড়ে কৈশোরের স্মৃতি
ফেলে আসা নষ্ট ছবি অকারণ ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা
তোমার নরম মুখ প্রজাপতি কিশোরী আঁচল
কাঁটার আঁকশি দিয়ে লুটে আনা হাত-ফসকা ঘুড়ি,
কাঁচা মিঠে ভালবাসা গল্পের মতন বোধ হয়।

হিসেবের খাতা খুলে মুখ ফেরায় কঠিন সংসার
পৃথিবীর সিংদরোজা মুখের ওপর বন্ধ আজ
আমি পরাজিত ব্যর্থ ভাঙাচোরা একটি মানুষ
তুমি দগ্ধ স্মৃতি তুমি দগদগে স্বপ্নের যন্ত্রণা
গহীন কবিতা আর গোপন আঘাত তুমি নারী।

স্কুলের ঘন্টার সঙ্গে এসে গেছে ছুটির নোটিস।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ঐতিহাসিক তথ্য

সুহাস মজুমদার

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ইতিহাস-চর্চাকে এক অত্যন্ত বড় নৈতিক সাধনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর বাঙলা বইগুলিতে এমন একটা কথা প্রায় "চ্যালেঞ্জ"-এর সুরে ঘোষণা করা হয়ে থাকে যে : সত্যের অনুসন্ধানই ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্তব্য,—তার জন্য যদি লোকের বিরাগভাজনও হতে হয়, তবু যেন, ইতিহাস-গবেষক কখনো সত্য সন্ধান ও সত্য প্রচার থেকে বিরত না হন। রমেশবাবু এই মহৎনীতিবাক্যকে কেবল উপদেশের আকারে বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থমালার নীরব সত্যপ্রচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হননি, সাময়িকপত্রের বাদানুবাদ, এমন কি অনেক সময় ব্যক্তিগত স্তরের বিতণ্ডা করেও ঐতিহাসিক জগতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং আপন জীবনে এই নীতিবাক্যের সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। অনেকেই জানেন, তাঁর এই সত্যঘটিত সংগ্রাম তাঁর দীর্ঘজীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। এইজন্য নব্বই বছর বয়সে রমেশবাবু যে আত্মজীবনী* প্রকাশ করেছেন, তার গুরুত্ব কেবল একজন স্বনামধন্য ঐতিহাসিকের জীবন-কাহিনী রূপেই নয়, সত্যসন্ধানের এক বিচিত্র ইতিহাসরূপেও তা আমাদের মনোযোগ দাবি করতে পারে। রমেশবাবুর সব মতামত যাঁরা গ্রহণ করেন না, তাঁরাও হয়তো স্বীকার করবেন, আমাদের দেশে ইতিহাস আজকাল সত্যের লিপিদূত না হয়ে অনেক স্থলেই রাজনৈতিক মতামতের ভৃত্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। এ অবস্থার প্রতিকার খুঁজতে হলেও রমেশবাবুর আত্মজীবনী এবং তাঁর সত্যসন্ধান-পদ্ধতির বিস্তারিত সমালোচনার দরকার আছে।

২

রমেশবাবুর জীবনকাহিনী ঘটনাবহুল, কিন্তু জটিল নয়। তিনি ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার এক অতি অখ্যাত পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের দিক থেকে তিনি রাজা রাজবল্লভের বংশধর, বাপের দিক থেকে রাজা হরিনাথের। কালক্রমে তাঁদের অবস্থা খুব পড়ে এসেছিল—রমেশবাবুর বাবা ত্রিপুরার রাজ এস্টেটে উকিলের কাজ করতে করতে গ্রামের অতি বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করতেন—তাঁর যৎসামান্য জমির বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। রমেশবাবু কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বাল্যজীবন শেষ করে কটকের র‍্যাভেনশ স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পাশ করেন (১৯০৫)। তার পরে মাস দুই বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে পড়ে তিনি কলকাতার রিপন কলেজে যোগ দেন। রিপন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি এফ এ (১৯০৭), বি এ (১৯০৯) এবং এম এ (১৯১১) পাশ করেন। তাঁর ছাত্রজীবন মোটামুটি গৌরবোজ্জ্বল। এফ এ পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান এবং এম এ-তে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কেবল বি এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্স পেয়েছিলেন, যদিও বৃত্তি পাবার মতো ভালো ফল তাঁর ছিল। সম্ভবত স্বদেশী আন্দোলনের উগ্র রাজনৈতিক উদ্দীপনা তাঁর বি এ পরীক্ষার ফলকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে, যদিও রমেশবাবু নিজে সেকথা স্পষ্ট করে লেখেন নি। কিন্তু ঐ রাজনৈতিক উদ্দীপনা সম্বন্ধে আত্মজীবনীতে তিনি একটা কথা লিখেছেন যা তাঁর সারা জীবনের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। হিন্দু হোস্টেলে থাকার সময় তিনি স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিতে প্রলুব্ধ হন——কিন্তু ভালো ছাত্র হয়ে পরিবারের দুঃখ-কষ্ট মোচন করতে হবে, এই শৈশব সংকল্পের জন্য তিনি

* "জীবনের স্মৃতিদীপে"—১৯৭৮, জেনারেল প্রিন্টার্স

সে প্রলোভন সংবরণ করেন। কিন্তু এই প্রলোভন এবং ঐ শৈশবসংকল্প—দুইই যে তাঁর কর্মজীবনের ধারা নির্দেশ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। শৈশবসংকল্প তাঁকে ঐতিহাসিক হবার অনুপ্রেরণা জোগায়নি, বরং ভালো ছাত্র হয়ে, যথাকালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবেন, এই ছিল তাঁর এবং তাঁর পরিবারের উচ্চাভিলাষ—ঘটনাচক্রে সে উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ হয়নি। পক্ষান্তরে ঐ প্রলোভন তাঁর মনে স্বদেশী আন্দোলনের গৌরববোধ সম্বন্ধে একটা প্রবল অনুভব সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী হয়ে পুলিসের লক্ষ্যস্থলরূপে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার মতো উন্মাদনা জোগায় নি। রমেশবাবুর সারা জীবনের ইতিহাসকে ঐ গৌরববোধ এবং ঐ বাস্তববুদ্ধির যোগসাধনের একটা সার্থক প্রচেষ্টার ইতিহাস বললে অন্যায় হয় না।

সে যাই হোক ১৯১১ সালে এম এ পাশ করে ১৯১২ সালে তিনি 'অন্ধ্র কুষাণ আমল' সম্বন্ধে গবেষণা করে পি আর এস উপাধি পান—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতো প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর কাছে হেরে যান। ঘটনাচক্রে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবার সংকল্পে বাধা পড়লে তিনি ঢাকা ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকরূপে যোগ দিতে বাধ্য হন। ১৯১৪ সালে আশুতোষ তাঁকে নিজে আমন্ত্রণ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। আশুতোষের উৎসাহে তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা শুরু করে পি এইচ ডি পান, তাঁর থিসিস করপোরেট লাইফ ইন এনসেন্ট ইণ্ডিয়া নামে বই-এর আকারে ছাপা হয়। কলকাতায় সাত বছর ধরে পরম যোগ্যতার সঙ্গে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ চালিয়ে তিনি কতকটা নিজের কৃতিত্বে, কতকটা আশুতোষের আনুকূল্যে নবস্থাপিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, পরে ভাইস-চ্যান্সেলার হয়ে অবসর গ্রহণ করেন (১৯৪২)। ঢাকা প্রবাসের পর্বেই তিনি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও যদুনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন—তাঁদেরকে তিনি আমন্ত্রণ করে এনে নিজের বাড়িতে আতিথ্য দান করেন। ইতিমধ্যে তাঁর হাত দিয়ে বা তাঁর সম্পাদনায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (এনসেন্ট ইন্ডিয়া), প্রাচীন বাঙলার প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস, চম্পা-সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাস প্রভৃতি বই ছাপা হতে শুরু করেছে—কয়েকটি বেরিয়েও গেছে। আর্থিক জীবনেও তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন—আত্মজীবনীতে এদিকটার কয়েকটা সার্থক দৃষ্টান্ত আছে। অন্যদিকে এই ঢাকাপ্রবাস পর্বেই তাঁকে ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়। সত্যের খাতিরে তিনি ঐ পর্বেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রভৃতি নামজাদা ঐতিহাসিকের মতামতের প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্তে বোঝা যায়, তাঁর সত্যনিষ্ঠার তীব্রতা তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পর্বেই প্রকাশ পেয়েছিল, যদিও তার থেকে কোনো বড় রকম বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়নি।

বিতণ্ডার সূত্রপাত হল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বে। মনে রাখতে হবে, তাঁর জীবনের এই দ্বিতীয় পর্ব সাধারণ বাঙালী জীবনের সায়াহ্ন পর্ব, —বাঙালী এ বয়সে চাকরির সঙ্গে সঙ্গে কর্মজীবন থেকেও অবসর নেয়। রমেশবাবু অবসর তো নেননি, বরং যে উদ্যমে তিনি নূতনতর কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। প্রথমে তিনি ঐতিহাসিক বই লেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা নিতান্ত অনৈতিহাসিক ব্যবসায় কাজে লিপ্ত হন। রমেশবাবু যে বিবরণ লিখেছেন তাতে মনে হয় ব্যবসার কাজে তিনি বিশেষ লাভবান হননি, কিন্তু এর মধ্যেও তাঁর বিষয়বুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এ কাজে লিপ্ত থাকতে থাকতেই তিনি 'ভারতীয় বিদ্যাভবন' সিরিজের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস গ্রন্থমালার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন (১৯৪৫)। সেই মস্তবড় কাজের প্রায় শুরুতেই ব্যবসা থেকে বিদায় নিয়ে তিনি বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডোলজি বিভাগের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। কর্তব্যবুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠা এখানেও তাঁকে মদনমোহন মালব্যের পুত্র ও তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার গোবিন্দ মালব্যের যথেচ্ছাচারের সঙ্গে লড়াই করতে প্রবৃত্ত করে, তার ফলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে তিনি 'টার্ম' শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিতে বাধ্য হন। কিন্তু অচিরেই ভারত গভর্নমেন্টের তদারকে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস লেখার কাজে তাঁকে ব্যাপৃত হতে হয়। বিদ্যাভবনের কাজ তখন পুরোদমে চলছেই। কিন্তু রমেশবাবু এখানেও ক্ষান্ত না হয়ে ১৯৫৫ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডোলজি বিভাগের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। এর আগেই অবশ্য ভারত সরকারের সঙ্গে, ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাঘটিত হাঙ্গামা করার ফলে সরকার পরিচালিত জাতীয় ইতিহাস রচনার কাজ থেকে তাঁকে অপসৃত হতে হয়েছে। কিন্তু তাতে কেবল এটুকুই ফল হয়েছে যে, রমেশবাবু সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে এবং সম্পূর্ণ একলার অধ্যবসায়ে সেই বিরাট ইতিহাস রচনার কাজে লিপ্ত হয়েছেন। এদিকে আবার ইউনেস্কোর প্রকাশিত ইতিহাসে পাশ্চাত্য লেখকের লেখা বৈদিক সভ্যতা বিষয়ক বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদেও তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। সেখানেও তিনি একটা কমিটির সদস্য হয়ে, একদিকে জাতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ভারত সরকারের ঔদাসীন্য, আরেকদিকে অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্য লেখকের উক্তি-প্রত্যুক্তি—এই দুই প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই শুরু করেছেন। যে বাঙালীর বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি, তাঁর পক্ষে একই সঙ্গে এতগুলি গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করার আর কোনো নজির আছে কিনা সন্দেহ।

রমেশবাবুর এই কাজগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে। বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কে এম মুন্সী। এই মহানুভব ব্যক্তি ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এবং সাম্প্রতিকতম গবেষণার ফলাফল অঙ্গীভূত করে আদিযুগ থেকে অতি-আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতের সমগ্র ইতিহাস লেখা হোক—এই সংকল্পসিদ্ধির জন্য তাঁর প্রয়াসের সীমা ছিল না। রমেশবাবুর বিবরণ পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, জাতীয় গৌরবের অনুপ্রেরণাই মুন্সীজীকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী করেছিল। কিন্তু রমেশবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তাঁর সঙ্গে শর্ত করিয়ে নেন, লেখা ও লেখক নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর নিজের মতামতই হবে চূড়ান্ত এবং ঐতিহাসিক রচনায় তাঁর সিদ্ধান্তের উপর কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না। মুন্সীজী এই

For the freshest feeling in the world

Old Spice

Cool, refreshing.
As the spray
of the sea.
The brisk freshness
and fragrance.
Of Old Spice.

Also in the Lime range

Old Spice
AFTER SHAVE LOTION

Old Spice
HAIR CREAM

Old Spice
AFTER SHAVE LOTION

Old Spice
FOR MEN

LATHER SHAVING CREAM

Old Spice the mark

ITRA-OS-37

অরণ্যদেব

দশম অরণ্যদেব এক ডুবন্ত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান জাহাজের যাত্রীদের রক্ষা করেন। পরে.....

সেই জাহাজের ক্যাপটেনের মেয়ের সঙ্গে তাঁর...
...বিয়ে হয়।

একাদশ অরণ্যদেব এক মহারাজের কন্যাকে বিয়ে করেন। সে-বিবাহে কন্যার পিতার সম্মতি ছিল না।

সপ্তদশ অরণ্যদেব বিবাহ করেন রোমের এক অপেরার গায়িকাকে।
11/26
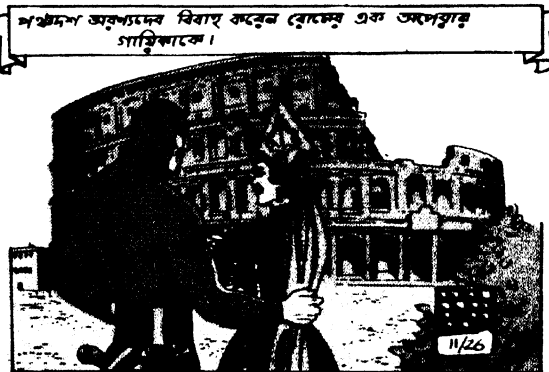
ঊনবিংশ অরণ্যদেব এক অভিযাত্রীর কন্যাকে বিবাহ করেন.....
...অরণ্যদেব তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন.....

বিংশ অরণ্যদেব বিবাহ করেন পাহাড়ী রাজার এক বন্দিনীকে!

বর্তমান অরণ্যদেব এক বছর আগে ডায়ানা পামারকে বিয়ে করেছেন.....
আমি খুশি
আমিও

প্রতিটি অরণ্যদেবের পত্নীই একটি করে পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছেন! ডায়ানাও কি দেবে?
ক্রমশঃ ৩

শর্ত মেনে নেন, যদিও রমেশবাবুর আত্মজীবনী এবং বিদ্যাভবনের ইতিহাসের নানা খণ্ডের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়লে বোঝা যায়, মুন্সীজীর সংকল্পিত জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির সংগে রমেশবাবুর জাতীয় গৌরব-অগৌরব নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠার ধারণার সম্পূর্ণ মিল ছিল না। এ ব্যাপারে মুন্সীজীর যে মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছিল, রমেশবাবু তার যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু যে কথাটা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি সে এই যে, এই রকম একটা শর্তের ফলে এগারো খণ্ডে সমাপ্ত এই প্রকাণ্ড গ্রন্থমালার অনেকখানি লিখতে বাধ্য হয়েছেন তিনি নিজে, বাকি অংশের প্রায় প্রত্যেকটি বাক্যই তাঁকে পরীক্ষা করতে হয়েছে পরম যত্নে, এবং সব মিলিয়ে তাঁকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছে তা প্রায় অমানুষিক। রমেশবাবু 'সংকোচের সংগে' লিখেছেন তাঁর বত্রিশ বছরের প্রায় একক প্রচেষ্টায় এই যে প্রকাণ্ড গ্রন্থমালা সমাপ্ত হল (১৯৪৫-১৯৭৭) ভারতীয় ঐতিহাসিক সমাজে এর আর কোনো নজির নেই, ইতিপূর্বে এ রকম আর যে কয়েকটি যৌথ প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছিল সেগুলি সবই কমিটি ইত্যাদির উৎপাতে বানচাল হয়ে গেছে। অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাস জগতে রমেশবাবুর এ কাজটি অভূতপূর্ব।

রমেশবাবুর জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা যায়। এক হিসাবে, এ বই তাঁর কর্তব্যবুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠার আরো বড় অগ্নিপরীক্ষা। রমেশবাবুই এ ব্যাপারে ভারত গভর্নমেন্টকে ১৯৪৮ সাল থেকে অনবরত উত্তেজনা জোগাতে শুরু করেন। প্রথম লেখেন জওহরলাল নেহরুকে। নেহরুর সচিব তাঁকে তথ্যমন্ত্রক এবং তথ্যমন্ত্রীর দিকে ঘুরিয়ে দেন। তথ্যমন্ত্রী তাঁকে উপেক্ষা করেন। তখন তিনি লেখেন রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এবং সেই সংগে দুজন পশ্চিমবঙ্গীয় মন্ত্রীকেও অনুরোধ করেন। এ দুইজন তাঁকে ঘুরিয়ে দেন পরলোকগত হরেন রায়চৌধুরীর দপ্তরে (১৯৪৮; ডিসেম্বর)। হরেনবাবুও তাঁকে উপেক্ষা করেন। ইতিমধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর কথায় সায় দিয়ে শিক্ষামন্ত্রক এবং মৌলানা আজাদকে এ বিষয়ে তৎপর হতে আদেশ দেন। আজাদ একটা দায়সারা জবাব দিয়ে তাঁর কাজ শেষ করেন। তারপরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ উদ্যোগী হয়ে শিক্ষামন্ত্রককে একটা ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের সমিতি গড়তে বাধ্য করেন—রমেশবাবুকে করা হয় তার সদস্য (১৯৪৯, আগস্ট)। এই সমিতির প্রাথমিক প্রস্তাবরাজীও মৌলানা আজাদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়। আজাদের সেক্রেটারি ছিলেন ডঃ তারাচাঁদ। তিনি তখন একটা নূতন প্রস্তাব এনে বললেন, বই লেখার দায়িত্ব দেওয়া হোক হিস্ট্রি কংগ্রেস অথবা দিল্লি বিশ্ব-বিদ্যালয়কে। রমেশবাবু এ প্রস্তাবে প্রচণ্ড বাধা দেন—তাঁর বিশ্বাস দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ডঃ তারাচাঁদের অনুগামী, তাঁদের হাতে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে না। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার নিজেই এক সম্পাদক সমিতি (বোর্ড অফ এডিটরস) বসালেন, রমেশবাবু হলেন তাঁর ডিরেক্টর (১৯৫০)—সম্পাদক করা হল একজন রাজনীতিজ্ঞকে। রাজনীতিজ্ঞ মহোদয় ইতিহাস বিশেষজ্ঞ না হয়েও নির্দেশ দিলেন, সিপাহী বিদ্রোহকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পর্ব হিসাবে গণ্য করতে হবে। তিনি রমেশবাবুর রিসার্চ স্কলারদের বললেন, এই মতের সমর্থনসূচক প্রমাণপত্র আহরণ করাই হবে তাঁদের একমাত্র কর্তব্য। এর থেকে যে বিতণ্ডা শুরু হল তা এক কথায় ভয়ংকর।

সম্পাদক সমিতির ডিরেক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সম্পাদকীয় নির্দেশ নাকচ করে দিলেন। সম্পাদক কিছুকাল পরে নানাসাহেবের সহচর আজিমুল্লার লেখা এক ডায়েরি উপস্থিত করলেন। রমেশবাবু দেখালেন, সে ডায়েরি জাল। সম্পাদক একে একে তাঁর ঝুলির ভিতর থেকে ঝাঁসির রানীর চিঠি, তাঁতিয়া টোপির উইল এবং পত্নীশ্রাদ্ধে নানা-সাহেবের উপস্থিতির প্রমাণপত্র বের করতে লাগলেন। রমেশবাবু একে একে দেখাতে লাগলেন সেগুলিও জাল। রমেশবাবু স্বাধীনভাবে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসের প্রথম পর্বের একটা খসড়া লিখলেন ১৯৫৪ সালের শেষ দিকে। সম্পাদক সমিতির সভায় সেটা অনুমোদিত হল, কিন্তু তারপরে দেখা গেল ঐতিহাসিক সত্য রাজনৈতিক চক্রান্তের হাঁড়িকাঠে বলি হতে বসেছে।

কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পাদক সমিতির সভায় (১৯৫৫ মার্চ) অপ্রত্যাশিত অনুপ্রবেশ ঘটল শিক্ষা-মন্ত্রকের সেক্রেটারি হুমায়ুন কবির এবং পূর্বতন সেক্রেটারি ডঃ তারাচাঁদের। এঁরা কেউ সম্পাদক সমিতির সদস্য ছিলেন না,—কিন্তু সদস্য হোন বা না হোন তারাচাঁদ হঠাৎ জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসের এক নূতন পরিকল্পনা নিয়ে বসলেন। রমেশবাবুর পূর্বানুমোদিত খসড়া সরাসরি বাতিল হল না বটে, কিন্তু এই নূতন পরিকল্পনাটাও গৃহীত হল একই সংগে। এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। রমেশবাবু স্পষ্ট করে লেখেন নি, কিন্তু তাঁর কথার আভাসে বোঝা যায়, সম্পাদক তাঁকে অপমান করলেন এবং সম্পাদক সমিতি থেকে তিনি বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। পরে দেখা গেল গভর্নমেন্ট হঠাৎ সম্পাদক সমিতি তুলে দিয়ে ডঃ তারাচাঁদকে দিয়েই জাতীয় সংগ্রামের সরকারী ইতিহাস লেখাবার নির্দেশ দিয়েছেন। রমেশবাবু ঠিক করলেন তিনি অতঃপর স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবেই সে ইতিহাস লেখবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। অচিরেই সে কাজ তিনি সমাধাও করলেন। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস এবং জাতীয় সংগ্রামের তিন খণ্ডের ইতিহাস স্বাধীনভাবে লিখে তিনি প্রমাণ করলেন : লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারী অর্থব্যয়ে যে কাজ বিশ বছরেও সিদ্ধ হয় না—স্বাধীন ও স্বল্পবিত্ত ঐতিহাসিক কেবল সত্যনিষ্ঠা ও বিবেক-বুদ্ধির জোরে সে কাজ অবলীলাক্রমে সমাধা করতে পারেন।

৩

এইটুকু হচ্ছে রমেশবাবুর আত্মজীবনীর ঐতিহাসিক অংশ। অবশ্য রমেশবাবুর এই বিবরণ একতরফা, প্রতিপক্ষের বক্তব্য না শুনে এই বিতর্কিত বিষয় সম্বন্ধে কোনো চূড়ান্ত মতামত দেওয়া আমাদের পক্ষে অশোভন হবে। কিন্তু সারা জীবন তিনি যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছেন, সে বিষয়ে এইটুকু হচ্ছে তাঁর আত্মজীবনীবিধৃত বিবরণের সারমর্ম। একটা বড় বিতণ্ডার কথা তিনি আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেননি, কিন্তু সেটারও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি আরেকটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। রামমোহনের দ্বারা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মত এবং আরো অনেক সুপ্রচলিত মতামতকে তিনি অমূলক প্রমাণ করতে প্রয়াস পান। এক্ষেত্রেও তাঁর মতামত সকলের স্বীকৃতি পায়নি, কিন্তু যে মানুষ সম্পূর্ণ একা একা সরকারী বেসরকারী সমস্ত রকম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করে নিজের বিশ্বাস ও গবেষণা-লব্ধ সত্যকে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁর চরিত্রবলকে সম্মান না করে পারা যায় না। বিশেষ করে, ঐতিহাসিক সত্য সরকারী নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, এই ভয়ংকর নজিরকে উপেক্ষা করে তিনি যেভাবে বিদ্বানের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করলেন তার যথোপযুক্ত সাধুবাদ নিশ্চয় গোটা দেশের মঙ্গলের দিক থেকেই কর্তব্য। রমেশবাবুর এ কীর্তির গুরুত্ব খুবই বেশি।

৪

কিন্তু এত কথার পরেও একটা কথা বাকি থেকে যায়। রমেশবাবুর আত্মজীবনী পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁর ঐতিহাসিক জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অবিশ্রান্ত বিতণ্ডার ইতিহাস। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, এত বেশি বিতণ্ডার দ্বারা সত্যের রূপ কি খানিকটা ম্লান হয়ে যায় না। এর দ্বারা ইতিহাস-লেখকের চরিত্রই কি সময় সময় ঐতিহাসিক সত্যকে ছাপিয়ে ওঠে না? রমেশবাবু যে ধারার ঐতিহাসিক, সে ধারার একজন নামজাদা ফরাসী প্রবক্তার একটি উক্তি সুপ্রসিদ্ধ। ....তিনি লিখেছেন : "আমার বই-এর জন্য আমাকে প্রশংসা কোরো না। আমার বই-এর বক্তা তো আমি নই, ইতিহাসই সেখানে তার আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছে।" রমেশবাবুর আত্মজীবনী এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী পড়ে মনে হয়, তাঁর লেখায় এই নৈর্ব্যক্তিকতা সব সময় বজায় থাকেনি, বিতণ্ডাপ্রবণ লেখকের চরিত্র তাতে একটু প্রবলভাবেই বিদ্যমান।

তাঁর আত্মজীবনী থেকে এ কথার একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। তিনি এ বই-এ হঠাৎ একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবে একজন বয়ঃকনিষ্ঠ লেখকের সংগে বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিতণ্ডার বিষয়টাকে ঠিক ঐতিহাসিক বিষয় বলা যায় না, কিন্তু এটাকে উপলক্ষ করে রমেশবাবু ঐতিহাসিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য করেছেন, কাজেই এই বিতণ্ডাকে তাঁর অনুসৃত ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার একটা প্রয়োগস্থল হিসাবেই পরীক্ষা করা উচিত। রমেশবাবুর বক্তব্য : ঐ বয়ঃকনিষ্ঠ লেখক "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ" নামে একটা বই লিখে, রবীন্দ্রনাথ যে ঢাকায় গিয়ে তাঁরই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। রমেশবাবু বলেন : ঐ লেখক আগে তাঁর কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে ওই একই বিষয় নিয়ে একটা প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলেন। তাতে, রবীন্দ্রনাথ যে তাঁরই অতিথি হয়েছিলেন সে কথাটার স্পষ্টা-স্পষ্টি উল্লেখ ছিল, অথচ বই লেখবার সময় অন্য রকম লিখে তিনি রমেশবাবুকে 'মিথ্যাবাদী' প্রতিপন্ন করলেন। অবশ্য এ সিদ্ধান্তটা রমেশবাবুর নিজের, লেখকের বই থেকে তিনি যে সমস্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার কোনোটাতেই এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে তাঁর দেওয়া তথ্যের সত্যমিথ্যা নিয়ে লেখক কোনো বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বরং রমেশবাবু যেভাবে লেখকের উক্তি বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা দেখিয়ে দিয়েছেন, তাতে ঐ লেখকের সত্যবাদিতা সম্বন্ধেই আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। 'সত্যনিষ্ঠ' রমেশচন্দ্র কিন্তু ওটুকু অপরাধের জন্যই ক্রোধে অধীর হয়ে আত্মজীবনী পুস্তকের একটি অধ্যায়ে ঐ লেখককে শুধু তীব্র-ভাষায় তিরস্কার করেই ক্ষান্ত হননি, বই-এর শেষে একটা বৃহৎ পরিশিষ্ট যোগ করে লেখকের ভুলভ্রান্তির একটা মস্ত বড় ফিরিস্তি দিয়ে ঘোষণা করেছেন, অমুকবাবুর সব বই-ই ভুল—কেবল "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ" বইটা নয়, তাঁর "শরৎচন্দ্র বিষয়ক" বইটাও ভুলে ভরা—তিনি অসাধু সাহিত্যিক—তিনি ঐতি-হাসিক পদ্ধতির কিছুই জানেন না—তিনি বাঙলা সাহিত্যের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট করেছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এমন একটা সামান্য বিষয় নিয়ে রমেশবাবুর ক্রোধের অত্যাধিক্য দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। রবীন্দ্রনাথের ঢাকা প্রকাশ ব্যাপারের সত্যাসত্য নির্ণয় সম্বন্ধে লেখকের অসাবধানতা নিশ্চয় প্রশংসার যোগ্য নয়, কিন্তু ঘটনাটা এতই সামান্য যে রমেশবাবু যদি ঐ লেখকের নাম উল্লেখ না করে কেবল বইটির উল্লেখ করে বলতেন, ও বই-এ কিছু তথ্যের ভুল আছে, তবে তা দিয়েই তাঁর নিজের রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার ঘটনা সুপ্রতিষ্ঠিত হত, বর্ষীয়ান মানুষ হিসেবে বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি যেটুকু সহিষ্ণুতা সংগত ও সুভদ্র সেটুকুও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্ত হত। এমন কি তিনি যদি বইটির কথাও উত্থাপন না করতেন, তাতেও দোষ হত না। কেন না রবীন্দ্রনাথের ঢাকা প্রবাস সম্বন্ধে তাঁর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করে ঐ লেখকের পরস্পরবিরোধী কথা নিশ্চয় কেউ গ্রাহ্য করত না। কিন্তু সত্য প্রচারের উৎসাহে রমেশবাবু ওটুকু সহিষ্ণুতা দেখাতেও কুণ্ঠিত হয়েছেন। তার চেয়ে বড় কথা, সম্পূর্ণ বিনা তথ্যপ্রমাণে তিনি যেভাবে লেখকের অন্যান্য গবেষণাকেও ধিক্কৃত করেছেন, সেটাকে বোধ হয় সত্যনিষ্ঠারও পরাকাষ্ঠা বলা যায় না। রমেশবাবুর লেখা ইতিহাসের মূল্য বিচার করতে হলে এই তথ্যটা আমাদের কাজে লাগতে পারে।

আমি এমন বলছি না যে, বিতন্ডা প্রবণতার বশে রমেশবাবু তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে নানা ধরনের অসত্য প্রচার করেছেন। কিন্তু যে সত্যবিচার ব্যক্তিগত বিতন্ডাকে পরিহার করতে শেখায় না, বরং প্রতি পদক্ষেপেই বিতন্ডায় প্রবৃত্ত করে তার খাঁটিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মন কখনো সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে পারে না। আমি কেবল তথ্যসংক্রান্ত খাঁটিত্বের কথাই বলছি না। রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে কবে কার বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, 'গান্ধীজী ঠিক কবে ও কটার সময় সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে একটা বিরূপ মন্তব্য লিখে কাগজে ছাপিয়েছিলেন'—এ রকম তথ্যের ভুল নিশ্চয় রমেশবাবু লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থে চেষ্টাচরিত্র করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রত্যেকেই জানেন, কেবলমাত্র তথ্যের সত্য দিয়ে ইতিহাস হয় না। তথ্য সমষ্টি বিশ্লেষণ করে জাতীয় জীবনের ভালোমন্দ বিচার করাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য। এই ভালোমন্দের ধারণায় বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের মনেই কতকগুলি ব্যক্তিগত পূর্বসংস্কার ক্রিয়া করে—রমেশবাবুর ক্ষেত্রেও নিশ্চয় করেছে। তাতেও দোষ নেই, কেননা ঐতিহাসিক হোন বা যিনিই হোন, সম্পূর্ণরূপে পূর্বসংস্কারমুক্ত হওয়া প্রায় ভগবান হওয়া বা শয়তান হওয়ার সামিল। আমি এমনও বলছি কেউ যদি তথ্যনিষ্ঠ হয়ে এবং দু-একটা বিতন্ডাহীন পূর্বসংস্কারের দ্বারা চালিত হয়ে ইতিহাস লেখে—মার্ক্সিস্টদের মতো ইতিহাসের উপর গোটা একটা পূর্বকল্পিত থিয়োরি না চাপায়—তবে তার দ্বারা ইতিহাসের বিকৃতি অনিবার্য নয়। রমেশবাবুর পূর্বসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, সেগুলি একেবারেই বিতন্ডাহীন নয়।

রমেশবাবুর আত্মজীবনী এবং তাঁর ইতিহাস গ্রন্থমালা খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায়—তাঁর মধ্যে দুটো প্রবল পূর্বসংস্কারের ক্রিয়া আছে। একদিকে তিনি বাঙালী 'পেট্রিয়ট', আরেকদিকে তিনি 'প্রোগ্রেসিভ' হিন্দু। তাতেও দোষ নেই—কোনো ঐতিহাসিক যদি তথ্যের বিকৃতি না ঘটিয়ে বাঙালীর সত্যমূলক গৌরব কাহিনী প্রচার করতে চায়, তবে নিতান্ত বাঙালী-বিদ্বেষী ছাড়া আর কেউ বোধ হয় রুষ্ট হবে না। কিন্তু রমেশবাবুর আত্মজীবনীতে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসঘটিত তর্কবিতর্কের মধ্যে একটা জিনিস টের পাওয়া যায়,—সুভাষচন্দ্র ও বাঙালী স্বদেশপ্রেমিকদের প্রতি দিল্লিওয়ালা ঐতিহাসিকদের মনোভাব নিয়ে তাঁর মন বোধ হয় গোড়া থেকেই খানিকটা বিতন্ডা-প্রবণ। এ সন্দেহ যথার্থ কিনা জানি না, কিন্তু গান্ধীজী ও গান্ধীপন্থা সম্পর্কে তাঁর মন যে বিতণ্ডাপ্রবণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কথার সব চেয়ে বড় প্রমাণ, জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি প্রতিপদে গান্ধীজীর দোষত্রুটির কথা পাঁচ কাহন করে বলেছেন, কিন্তু বাঙালী সন্ত্রাসবাদীদের ক্রিয়া-কলাপকে দেখিয়েছেন খুব বড় করে। রমেশবাবু যে সন্ত্রাসবাদীদের ক্রিয়াকলাপের অসাহসিকতার দিকটা ভুলে গিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে 'হিন্দু-সাম্প্রদায়িক' ইত্যাদি কটুভাষা ব্যবহার করে 'আর্মচেয়ার' বুদ্ধি-জীবীসুলভ অতিবুদ্ধির পরিচয় দেননি, তার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু একথাও না বলে পারা যায় না যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্ত্রাস-বাদীদের ভূমিকা বিচার করতে গিয়ে গুপ্তহত্যার রাজনীতির মারাত্মক সামাজিক ও নৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। গান্ধীপন্থার সংগে বিতণ্ডা করবার জন্যই তিনি সন্ত্রাসবাদীদের বড় করে দেখিয়েছেন, এমন কথা বলতে চাই না, কিন্তু এই বিতণ্ডার মনোভাব যদি তাঁর মনে এতটুকুও বিদ্যমান না থাকত তবে নিশ্চয় সন্ত্রাস-পন্থার সব দিকগুলোও তিনি ধীরভাবে পর্যালোচনা করতেন। আমরা বেশ জানি, স্বাধীনতালাভের এতকাল পরেও গুপ্তহত্যামূলক রাজনীতির কালো ছায়া বাঙালী জীবন থেকে অপসারিত হয়নি, আমরা আজো তার বিষময় ফলভোগ করছি। যে ঐতিহাসিক [illegible] সার্থকতা-

অসার্থকতার দিক থেকেই বিচার করেন, তিনি নিশ্চয়ই সবটুকু সত্য প্রকাশ করেন না।

রমেশবাবুর 'প্রোগ্রেসিভ' হিন্দুত্ব সম্বন্ধেও একইরকম আপত্তি চলতে পারে। আত্মজীবনীতে তিনি রামমোহনঘটিত বিতণ্ডার উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর 'On Rammohan Roy' পুস্তিকায় এই 'প্রোগ্রেসিভ' হিন্দুসুলভ বিতণ্ডার দিকটাই দৃশ্যমান। রামমোহন রায় কেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন পাসের কথা নিয়ে প্রথম দিকে একটু আধটু ইতস্তত করলেন, এর জন্য তাঁকে তিনি তিরস্কার করেছেন এবং এমন কথাও বলতে কুণ্ঠিত হননি যে, রামমোহন আদৌ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। এই মতের মধ্যে খানিকটা অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নেই, কেননা গোঁড়া হিন্দুরা সেযুগে সতীদাহবিদ্বেষী ('সতীদ্বেষী') বলেই রামমোহনের বিরুদ্ধে হুলুস্থূল বাধিয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় রমেশবাবু গোঁড়া হিন্দু নন, তিনি প্রোগেসিভ হিন্দু বা 'রিফর্মড হিন্দু'। তাঁর বক্তব্যের আরো বেশি মৌলিকতা এই যে, বেশির ভাগ 'প্রোগেসিভ হিন্দুর' মতো রামমোহনকেই তিনি সংস্কারের অগ্রদূত হিসাবে নেননি—সে গৌরব দিয়েছেন উগ্রপন্থী আইনী সংস্কারকদের। কিন্তু রমেশবাবু বলতে ভুলে গেছেন, উগ্রপন্থী আইনী সংস্কারক না হয়েও দেশের অনেক সংস্কারসাধন করা যায়। হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ নিবারণ, সমুদ্রযাত্রা প্রবর্তন প্রভৃতি ঘটনা তার দৃষ্টান্ত। রমেশবাবুর বিতণ্ডাপ্রবণতার আরো একটা প্রমাণ, ডিরোজিওকে তিনি 'পেট্রিয়ট' হিসাবে রামমোহনের চেয়েও বড় স্থান দিয়েছেন—এর মধ্যেও নিশ্চয় তাঁর উগ্রপন্থী সংস্কারকের মনোভাব ক্রিয়া করেছে। তিনি ভুলে-গেছেন, ডিরোজিওর 'পেট্রিয়টিজম' যত বড় জিনিসই হোক না কেন, সে জিনিসটা ছিল হিন্দু সমাজের সংহারক—পক্ষান্তরে রামমোহনের পেট্রিয়টিজ্‌ম-এর অনুগ্রহতার কারণ, তিনি মৃদু-সংস্কারের সহায়ক-রূপেই তিনি ইংরেজের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছিলেন। রমেশবাবুর সমাজ-সংস্কারঘটিত পূর্বসংস্কার কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু উগ্র সংস্কারের প্রতি অনুরাগের আধিক্য 'মৃদু সংস্কারক' রামমোহনের বিরুদ্ধে এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে দেশের প্রত্যেকটি রামমোহন-ভক্তের বিবরণ তাঁর বিতণ্ডা-প্রবণতা ঐতিহাসিক সত্যকে কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত করেছে বলেই মনে হয়।

৫

এসব কথার সারমর্ম এই যে : রমেশবাবুর অনুসৃত সত্যসাধনায় খানিকটা অসম্পূর্ণতা আছে। এক জোড়া প্রবল পূর্ব সংস্কার এবং চরিত্রগত বিতণ্ডাপ্রবণতার সংযোগে তাঁর ঐতিহাসিক সত্যদৃষ্টি সময় সময় আচ্ছন্ন হয়েছে। কিন্তু এরকম সমালোচনার উদ্দেশ্য রমেশবাবুর ছিদ্রান্বেষণ নয়। তাঁর কর্মশক্তি ও চরিত্রবল, সকলের উপর তাঁর সত্যানুরাগের কথা এ প্রবন্ধে বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু এই সত্যানুরাগও যদি কিয়ৎ পরিমাণে রাহুগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে তার জন্য শুধু তাঁর উপর দোষারোপ না করে, উগ্র-রাজনৈতিকতা এবং উগ্র-প্রগতিবাদে সমাচ্ছন্ন আধুনিক ভারতের মানসিক পরিমণ্ডলকেই দায়ী করা উচিত। একথা মানি, রমেশবাবুর রাজনৈতিক পূর্ব সংস্কারের সংগে আজকের ভারতের অন্যান্য ঐতিহাসিকদের রাজনৈতিক পূর্বসংস্কারের তফাত আছে। তিনি যেখানে 'বাঙালী পেট্রিয়ট' সেখানে আরেকজন ঐতিহাসিক হয়তো 'কমিউনিস্ট', ইন্টারন্যাশনালিস্ট' কিংবা 'ইংরেজবিদ্বেষী জাতীয়তা-বাদী'। কিন্তু ঐ সমস্ত পূর্বসংস্কারের উগ্রতা কি আমরা প্রতি মুহূর্তেই আরো তীব্রতর আকারে অভিব্যক্ত দেখতে পাই না? রমেশবাবুর সমাজ-সংস্কারঘটিত পূর্বসংস্কার সম্বন্ধে একথা আরো বেশি প্রযোজ্য। আজকালকার বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রাচীন হিন্দু সমাজের প্রতি এমন বিতৃষ্ণা এবং ডিরোজিও ভক্তির এমন আতিশয্য দেখা যায়—যাকে কোনোমতেই সুস্থ ও সত্যমূলক ইতিহাস রচনার অনুকূল বলা যায় না। এ ব্যাপারে রমেশবাবু শুধু তাঁর যুগের ধারাই অনুসরণ করেছেন—সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী সাক্ষ্যকে প্রায় চোখের উপর দেখেও অন্ধের মত উপেক্ষা করেছেন। আত্মজীবনীতে তিনি সতীদাহের ব্যাপারে নিজের বংশসংক্রান্ত এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যার সঙ্গে তাঁর উগ্রপন্থী রামমোহন সমালোচনাকে একেবারেই মেলানো যায় না। রমেশবাবু বর্ণিত সেই ঘটনার উল্লেখ করলেই আধুনিক ভারতে ঐতিহাসিক সত্যসাধনার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকের একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

রমেশবাবু লিখেছেন : সতীদাহ নিবারণের আইন পাশ হওয়ার কয়েক বছর আগে ১৮২৪-২৫ সালে তাঁর পিতৃবংশের একটি মহিলা মৃত স্বামীর মৃত্যুতে স্বেচ্ছামৃতা হন। ইংরেজ রাজত্ব তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন পাশ না হলেও অনিচ্ছাকৃত সতীদাহ নিবারণ ব্যাপারে পুলিসের মধ্যে খানিকটা তৎপরতার সৃষ্টি হয়েছে। ঐ মহিলা সতী হতে চান শুনে ঘটনাস্থলে যথারীতি একজন দারোগার আবির্ভাব হল। দারোগা প্রশ্ন করলেন : কে আপনাকে সতী হবার জন্য জবরদস্তি করছে? মহিলা বললেন : কেউ না, আমি সম্পূর্ণ স্বইচ্ছায় পুড়ে মরতে চাই। মহিলা শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না। দারোগার সামনে আগুন জ্বালিয়ে, নিজের একটা আঙুল তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। দারোগা এ দৃশ্য দেখে সসম্ভ্রমে অপসৃত হলেন—মহিলা অবলীলাক্রমে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

রমেশবাবু বর্ণিত এই কাহিনী এখানে পুনরুক্ত করবার অর্থ এ নয় যে, আমার মতে সতীদাহপরায়ণ হিন্দু সমাজের প্রত্যাবর্তন এ যুগেও একটা বাঞ্ছনীয় জিনিস—
a consummation devoutly to be wished for
মহিলাটির সংস্কারান্ধতার প্রশংসাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য কেবল এই যে, যে সমাজে এককালে এমনধারা স্বেচ্ছামৃতারও সাক্ষাৎ মিলত, সেই সমাজের মানুষ হয়ে রামমোহন রায় যে অনিচ্ছাকৃত সহমরণ বন্ধ করবার জন্য পুলিসী ব্যবস্থার তৎপরতা বৃদ্ধিতেই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলেন—রাজকীয় আইনের নাগপাশ দিয়ে সমাজের শক্তিটুকু বিলুপ্ত করে দিতে অত্যুৎসাহী ছিলেন না, এ জিনিসটাকে বোধ হয় কিঞ্চিৎ সমবেদনার দৃষ্টিতেও দেখা যায়। আমার আরো বক্তব্য, এরকম সমবেদনা কেবল 'মৃদু'সংস্কারকদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, হিন্দু সমাজ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দুঃখের বিষয়, এরকম সমবেদনা আজকের দিনের প্রায় কোনো ঐতিহাসিকের মধ্যেই নেই, সেই অসহিষ্ণু যুগধর্মের সঙ্গে সুর মেলানো ঐতিহাসিকতার অনুবর্তী ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মধ্যেও নেই। তবে রমেশবাবুর ক্ষেত্রে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পূর্বোক্ত ঘটনাটা তাঁর আপন বংশেই ঘটেছিল এবং তিনি স্বহস্তে সেটার বিবরণ লিখেছেন।

রোমাঞ্চকারী নতুন ফ্যাব্রিক্স

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১১ ॥

ঈশ্বরচন্দ্রের আবেদনের প্রতিবাদ করে রাজা রাধাকান্ত দেব সরকার সমীপে পাঠালেন এক পাল্টা আবেদনপত্র। ঈশ্বরচন্দ্রের আবেদনে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও কম। আর বিধবা-বিবাহ আইনের প্রতিবাদ করে রাজা রাধাকান্ত দেবের আবেদনে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা তেত্রিশ হাজার! শোভাবাজারের রাজা বাহাদুরে নিজের বেতনভুক কর্মচারীদের গ্রাম-গ্রামান্তরে পাঠিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে এনেছেন।

এর পর এই প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে বোম্বাই, পুণা, ত্রিপুরা, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আরও বহু স্বাক্ষরসম্বলিত আবেদনপত্র জমা পড়তে লাগলো। গণনা করলে দেখা যাবে যে, বিধবা বিবাহের সমর্থকদের চেয়ে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদকারীর সংখ্যা বহু গুণ বেশী। বিপক্ষীয়রা যে ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তি খণ্ডন করতে পেরেছে তা নয়, তাদের মূল বক্তব্য এই যে, বিধবা বিবাহ হবে কি হবে না, সেটা হিন্দু সমাজের ব্যাপার, এ ব্যাপারে বৈদেশিক রাজশক্তির হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই।

রাজশক্তি অবশ্য এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত রইলো না। তিন তিনবার বিবেচনার পর হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার বিবাহিত নারীর সন্তান তার পিতার সম্পত্তির বৈধ অধিকারী হবে।

বিধবা বিবাহের পক্ষে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা কম হলেও সরকার মনে করলেন যে এই ধরনের সমাজ সংস্কারের কাজে শুধু সাহসী লোকেরাই এগিয়ে আসে এবং সব দেশেই তাদের সংখ্যা কম হয়।

আইনটি পাশ হবার পর কয়েকদিন খুব উল্লাসের মাতামাতি হলো বটে, কিন্তু অল্পকাল পরেই বোঝা গেল, এটি একটি পর্বতের মূষিক প্রসব! এবার বিপক্ষীয়দের উল্লাসের পালা।

অনেকেই ভেবেছিল যে, আইনটি পাশ হওয়া মাত্রই দেশে বিধবা বিবাহের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। অল্প বয়সী বিধবা বালিকার সংখ্যা অজস্র, তাদের দুঃখে অনেকেই সংবাদপত্রে কেঁদে ভাসিয়েছে। কিন্তু আইন পাশ হবার পর কয়েক মাসের মধ্যেও একজনও কেউ বিধবা বিবাহ করার জন্য এগিয়ে এলো না।

জগমোহন সরকারের বৈঠকখানায় এই নিয়ে আমোদ আহ্লাদ হতে লাগলো খুব। জুটুর জুটুর ...

প্রধান মোসাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে ফটিকচাঁদ তোমাদের বিদ্যেসাগর কী কল্লে গো? এ যে শুধু মুধু মল খসিয়ে লোক হাসালে?

ফটিকচাঁদ বললো, আজ্ঞে হুজুর, কবি ধীরাজ কী গান বেঁধেছে, শুনবেন?

—কই শুনি শুনি, গাও তো!

ফটিকচাঁদ গান ধরলো:

বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েচে
পরাশরের ইয়ে মেরে দিয়েচে!

উপস্থিত পঞ্চজন বিরাট হাসির হুল্লোড় তুলে দিল।

জগমোহন বললো, আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা। বিদ্যেসাগরের সাগরেদরা এত করে তোল্লা দিয়ে, শেষমেষ সব ন্যাজ তুলে পালালো। কেউ একটা বিধবা বে করলে তবু আমরা খানিকটে তামাসা দেকতুম!

আর একজন বললো, হুজুর, সেই যে কতায় আচে না, "বড় বড় বানরের বড় পেট, লংকায় যাইতে করে মাথা হেঁট", এ হলো গে সেই ব্যাপার!

—তা বিদ্যেসাগর নিজেই একখানা বিধবাকে বে করে তো দেকাতে পারে সব্বাইকে!

—তিনি তো বুদ্ধি করে আগেভাগেই নিজের বেটি সেরে রেকেচেন। ওঁর সাগরেদরাও সবাই নিজেরা ঠিকঠাক জাত-কুল মিলিয়ে বিবাহ টিবাহ সেরে এখন বড় বড় বুলি কপচাচ্ছে! বুইলেন না, নিজের বেলা আঁটি শুটি, পরের বেলা দাঁত কপাটি!

—তা থাকলোই বা বিদ্যেসাগরের আগে একটি বিয়ে। আর একটিতে দোষ কী? বেধবা মানেই তো দু নম্বুরী! সেকেন্ডহ্যান্ড মেয়েছেলে যাকে বলে!

—হে—হে—হে—হে! এ কতাটি বড় ভালো বলেচেন, হুজুর! সেকেন্ডহ্যান্ড মেয়েছেলে! দোকানে গিয়ে সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিস কেনার মত লোকে সেকেন্ড হ্যান্ড বিয়ে করবে!

—ভাড়া করা মাগ্ আর রাকতে হবে না কারকে। সরকার অতি উত্তম ব্যবস্থা করেচেন। বাড়িতে যার যার বউ রইলো, আর বাইরে বেধবা রাঁড়ের সঙ্গে একটু মন্ত্রর পড়ে নিলেই সস্তায় কেল্লা ফতে! নেড়া-নেড়িদের কণ্ঠি বদলের মতন!

—হুজুর, আর এক কেচ্ছা শুনেচেন? বিদ্যেসাগরের এক চ্যালা কী কাণ্ড করেচে!

—কী, কী, শুনি?

—সে ব্যাটার নাম শ্রীশচন্দ্র। এখন সকলে বলচে ছিছিচন্দ্র!

—আরে বাপু, সবটা খুলে বলো না! কে শ্রীশচন্দ্র

—সে যে-সে লোক নয় কো! শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মুর্শিদাবাদের জজকোর্টের পণ্ডিত! মুকে তার কত বারফাট্টাই! আইন পাশ হবার আগে থেকেই সে চিগ্গেচে, বিধবা বে কর্বো, বিধবা বে কর্বো! যানো ব্যাটা এক মস্ত বড় রিফর্মার!

—তারও আগে একটা ঠিকঠাক বউ রয়েচে বুঝি?

—তা জানি না, শুনিচি তো ব্যাচিলর! কেমনধারা ব্যাচিলর তা মা ভগাই জানেন!

—এখন সেও পিচিয়ে গ্যাচে, এই তো? এতে আর কেচ্ছা কী আচে?

—আরও আচে, হুজুর! শুধু বে কর্বো বলে চাঁচায় নি। আগে থেকেই সে শান্তিপুর থেকে এক বেধবা মাগীকে ভাগিয়ে এনেচে!

—অ্যাঁ? ভাগিয়ে এনেচে? ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়ে? কোতায় এনেচে?

—এই কলকেতাতেই কোতাও রেকেচে, কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গাতে রেকেচে, তা জানি না।

—আ মোলো যা! তোদের নিয়ে আর পারি নে! তোদের এত খাওয়াই দাওয়াই, ফুর্তির খর্চা দি, আর তোরা একটু ভালো করে খপরও আনতে পারিস নি। লোক লাগা, লোক লাগা, ভালো করে খপর নে, সে মাগী কোতায় আচে! খোলাখুলি রাঁড় রাকবার মুরোদ নেই, বে করার নাম করে ভদ্রবংশের বাড়ি থেকে মেয়ে ভাগিয়ে আনা! সমাজ কি একেবারে রসাতলে গেল? আমরা বেঁচে নেই! এর একটা বিহিত কত্তেই হবে। বিদ্যেসাগর সব বাড়ি থেকে কচি কচি বেধবাদের টেনে করবো! মেয়েটা কোতায় আচে খুঁজে বার কর আগে আর সেই শ্রীশচন্দ্র কোতায় গেল?

—সেই ছিছিচন্দ্র এখন কোতায় ঘাপটি মে লুকিয়েচে। কেউ তার পাত্তাই পাচ্চে না!

—তাকেও খুঁজে বার কর। জেলের ঘানি ঘোরাবো ব্যাটাকে দিয়ে। ভদ্রপরিবারের মেয়েদের নিয়ে এ কাণ্ড!

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জগমোহন সরকার বলতে লাগলেন, কালই আমি এ বৃত্তান্ত রাজা রাধাকান্ত দেবের কানে তুলবো, এর একটা বিহিত করতেই হবে। মামলায় ফাঁসাবো ওদের সক্কলকে।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রোগে পড়লেন।

মানুষের কর্ম-ক্ষমতার একটা সীমা আছে। একদিকে তিনি বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন, অন্যদিকে রাত্রি জেগে রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করে সমাজ সংস্কারের পক্ষে যুক্তির তীক্ষ্ন শর প্রস্তুত করছেন। বিধবা বিবাহের সমর্থন আদায়ের জন্য ঘুরেছেন লোকের বাড়ি বাড়ি।

তিনি পাঁচ শত টাকা বেতন পান, পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তার থেকেও যথেষ্ট উপার্জন করেন, তাঁকে একজন ধনী ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য করা উচিত। কিন্তু নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য অর্থ ব্যয় করছেন অকাতরে। এত ঘোরাঘুরির সময় সব জায়গায় পালকি ভাড়া করারও সামর্থ্য থাকে না, পা দুখানিই সম্বল। চটিতে তাঁর ক্লান্তি নেই।

এবার আর পারলেন না। অসুখের কারণ তাঁর শরীর নয়, মন। এতদিন পর এই অনমনীয় গোঁয়ার পুরুষটিও ভেঙে পড়লেন।

শান্তিপুরের তাঁতীরা শাড়ির পাড়ে তাঁর প্রশস্তিতে একটা গান ছেপে ছিল; সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে/সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।

সেই গান-ছাপা শাড়ি এক সময় লোক কিনেছে বেশী দাম দিয়ে। খোল কর্তাল বাজিয়ে অনেকে তাঁর বাড়ি বয়ে এসে সেই গান শুনিয়ে গেছে। এখন আবার একটি প্যারডি হয়েছে সেই গানের।

তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে বিদ্যাসাগর রোগশয্যায় শায়িত। তাঁর শরীর জর্জর হয়েছে, ছটফট করছেন সারা পালংক জুড়ে, কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। শত দুঃখ কষ্টেও যে মানুষ কখনো টুঁ শব্দটি করেন নি, এখন তার বুকের একেবারে ভেতর থেকে একটা মোচড়ানো কাতর আওয়াজ ভেসে আসছে, আঃ! আঃ!

রাজকৃষ্ণ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে নীরব হয়ে বসে থাকেন শিয়রের কাছে। ডাক্তার বৈদ্য দেখানো হয়েছে, সব ওষুধই বুঝি ব্যর্থ।

বাইরে থেকে একটা গানের আওয়াজ আসছে, রাজকৃষ্ণ সচকিত হয়ে জানালা বন্ধ করতে গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, থাক, থাক, বন্ধ করো না। ওরা গাইছে গাক। ওদের মনোবাসনাই পূর্ণ হবে!

বাইরে একদল ইয়ার গোছের লোক নেচেকুঁদে গাইছে সেই প্যারডি গান:

শুয়ে থাক বিদ্যেসাগর চিররোগী হয়ে।
শুয়ে থাক বিদ্যেসাগর চিররোগী হয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র সেই গান শুনতে শুনতে বললেন, ওরে আমি চিররোগী হয়ে শুয়ে থাকতে চাই না। এখন মরলেই আমার জ্বালা জুড়োয়। আমি শীঘ্র শীঘ্র মরে ওদের খুশী করবো!

রাজকৃষ্ণ জানালা বন্ধ করে নিজে সেটা চেপে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছেন শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্নের ব্যবহারে। তিনি তাঁকে একজন তেজস্বী আদর্শবাদী যুবক হিসেবে জানতেন। মুর্শিদাবাদে জজ কোর্টে তার চাকরি পাওয়ার ব্যাপারেও ঈশ্বরচন্দ্র সুপারিশ করেছিলেন। সেই লোক এমন ব্যবহার করলো?

ইয়ং বেঙ্গলের দল ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝিয়ে ছিলেন যে, তাঁরা সব সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পাশে থাকবেন।

দেখেছেন কটস্‌উল কেমন বড় হয়ে উঠেছে !

আইন পাশ হলেই তাঁরা দেশ জুড়ে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করবেন। দেশ জুড়ে দূরে থাক একটি বিবাহও হলো না। ইয়ং বেঙ্গলের দলই বলেছিল, প্রথম বিবাহ করবে শ্রীশচন্দ্র।

শান্তিপুরের একটি মেয়েকে পছন্দও করে রেখেছিল শ্রীশচন্দ্র। মেয়েটির নাম কালীমতী, বয়েস এগারো বছর। মেয়েটির বাড়ির কেউই বিধবা বিবাহে সম্মত নয়, তবু ইয়ং বেঙ্গলের দল বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনোক্রমে কন্যার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবীকে রাজি করালেন। মাতা সমেত কন্যাকে নিয়েও আসা হলো কলকাতায়।

বিবাহের তারিখ ঠিক। এই সময় বেঁকে বসলো শ্রীশচন্দ্র।

শ্রীশচন্দ্রের জননী নাকি বুকের সামনে একটি ছুরি ধরে বসে আছেন, তাঁর পুত্র বিধবা বিবাহ করলেই তিনি আত্মঘাতিনী হবেন। তাতেই মাতৃবাধ্য, সুপুত্র সেজে গেল শ্রীশচন্দ্র।

প্রথমে এ খবর শুনে রাগে জ্বলে উঠেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কোন্ মা কবে পুত্রকে ইহ সংসারে রেখে আত্মঘাতী হয়? এ সমস্তই তো ভয়-দেখানো কথার কথা! উপযুক্ত শিক্ষিত ছেলে যদি কোনো কাজকে ন্যায় বলে জানে, এবং তার মা যদি বিপরীত কথা বলে, তা হলে সেই ছেলে তার মায়ের ভুল বোঝাতে পারবে না? তা হলে কিসের সুপুত্র সে? কিসের জন্য তবে বিদ্যাশিক্ষা? শিক্ষিত হয়েও যে পিতা মাতার কুসংস্কার মেনে নেয়, সে আসলে মূর্খ।

কিন্তু শ্রীশচন্দ্র যখন সমস্ত রকম কথার খেলাপ করে একেবারে গা-ঢাকা দিল, তখন একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লেন ঈশ্বরচন্দ্র। রোগশয্যায় শুয়ে এখন আর তিনি বিধবা বিবাহের নাম-উচ্চারণও সহ্য করতে পারেন না। চুলোয় যাক বিধবারা! যার যা খুশী করুক। তাঁর আর কোনো দায় নেই। তিনি আর বাইরে বেরুবেন না, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না।

এই সুযোগে রাজা রাধাকান্ত দেব বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আর একটি আবেদনপত্র পাঠালেন সরকারের কাছে। তাঁর বক্তব্য হলো, বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলেও সে আইন রদ করে দেওয়া হোক। সরকারের আইন যদি কার্যে পরিণত না হয়, তা হলে সরকার হাস্যাস্পদ হবেন। এ দেশে কত লোক দুটি একটি বিধবা মেয়ে যদি বা পুনর্বিবাহের জন্য এগিয়ে আসতে চায়, কিন্তু তাদের বিবাহ করবার জন্য একটিও পুরুষ এগিয়ে আসবে না। এতদিনে তাই তো দেখা গেল। সুতরাং, এমন আইন রাখার মানে কী হয়!

কালীমতীর মা লক্ষ্মীমণিকেও একদল লোক বশ করে ফেললো। তারা বোঝালো যে, বিবাহের নামে যে মেয়ে একবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, সে কোনোদিন আর ঘরে ফিরতে পারবে? সমাজে আর তার স্থান হবে না, সে কলঙ্কিনী হিসেবে গণ্য হবে।

তাদেরই প্ররোচনায় ও সাহায্যে লক্ষ্মীমণি এক মামলা দায়ের করলো আদালতে। শ্রীশচন্দ্র মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে কালীমতীকে শান্তিপুর থেকে কলকাতায় এনে কলঙ্কের ভাগী করেছে, এখন সে হয় কালীমতীকে বিবাহ করুক, অথবা চল্লিশ হাজার টাকা খোরপোষ দিক।

দেশের বহু সংবাদপত্র এই সময় তার ব্যঙ্গবিদ্রূপে মেতে উঠলো। সাহেবরা লিখলো, এই তো দেখা যাচ্ছে ইয়ং বেঙ্গলের সমাজ সংস্কারের দৌড়। কেউ লিখলো, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না যে শ্রীশচন্দ্র, সে আবার জজ কোর্টের পণ্ডিত? এর কাছ থেকে কে সুবিচারের আশা করবে? এর চাকরি যাওয়া উচিত এবং কালীমতীর কাছে কান মলে ক্ষমা চেয়ে চল্লিশ হাজার টাকা দণ্ড দেওয়া উচিত!

রোগশয্যায় শুয়ে যথাসময়ে এই মামলার কথাও ঈশ্বরচন্দ্রের কানে এলো। তিনি বললেন, বেশ হয়েছে!

রাজকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দু'চারজন বন্ধু সেদিন এসেছেন ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। ঈশ্বরচন্দ্র দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন।

রাজকৃষ্ণ বললেন, তুমি অ্যাত ভেঙে পড়চো কেন, ঈশ্বর। এক জায়গায় ব্যর্থ হয়েচি, আমরা অন্য বিধবা মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করবো।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, ছাই করবে! আর আমার কাছে ওসব কথা বলতে এসো না।

উপস্থিতদের মধ্যে একজন একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক। তিনি বললেন, আমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করচি। সার্থক হবো নিশ্চয়!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, সে আপনাদের যা খুশী করুন গে! আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না। অনেক পণ্ডশ্রম করেছি। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে!

সম্পাদকটি বললেন, এ কথা বললে চলবে কী করে। আপনি আমাদের সেনাপতি!

ঈশ্বরচন্দ্র মুখ ফিরিয়ে বললেন, আপনাদের এই সেনাপতি অসুস্থ, মুমূর্ষু, একে দিয়ে আর আপনাদের কাজ হবে না। আপনারা অন্য সেনাপতি ধরুন।

—না, না, আপনি এমন কিছু অসুস্থ নন। আপনার কী-ই বা বয়েস?

—দেখছেন না, চলৎশক্তি পর্যন্ত নেই। কানা খোঁড়া সেনাপতি দিয়ে কি কোনো কাজ হয়? বয়েস ছত্রিশ হলো, এমন কিছু কম কী?

—সেনাপতি অসুস্থ হলেও যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন। সব সময় কি আর সেনাপতিকে সমরক্ষেত্রে যেতে হয়। তাঁবুতে বসেই নির্দেশ দেন। এই দেখুন না, মুলতানের যুদ্ধের সময় জেনারেল হুইকের দারুণ জ্বর বিকার হয়েছিল, তবু শুধু শিবিরে শুয়ে শুয়েই কেমনভাবে পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধ জয় করলেন। আপনি শুয়ে থাকুন, শুধু কলকাতা ছেড়ে যাবেন না, তাতেই আমাদের জয় হবে।

—শুধু কলকাতা কেন, আমার এখন ইহলোক ছাড়বার সময় হয়েছে!

এর দু' দিন পর একদিন দ্বিপ্রহরে ঈশ্বরচন্দ্র

নিদ্রিত রয়েছেন, ঘরে আর কেউ নেই, এমন সময় একজন ব্যক্তি চুপি চুপি সে ঘরে প্রবেশ করে ঈশ্বরচন্দ্রের পা চেপে ধরলো।

চোখ মেলে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কে রে?

লোকটি বললো, আজ্ঞে আমি শ্রীশচন্দ্র।

ঈশ্বরচন্দ্র এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যুবক শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পা সরিয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে বললেন, আমার মরতে যেটুকু বাকি আছে, তুই বুঝি সেটুকুও শেষ করে দিতে এসেছিস?

—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

—আমি তোকে ক্ষমা করবার কে! যা করবার করবে আদালত।

—আজ্ঞে, আদালতে সব মিটে গেছে। কিন্তু আপনার কাছেই আমি সবচেয়ে বেশী অপরাধী। আপনি ক্ষমা না করলে আমি সারা জীবনে শান্তি পাবো না।

—দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে!

—বিয়ের সব ঠিকঠাক। আপনি প্রসন্ন না হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

ঈশ্বরচন্দ্র একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন, ও বিয়ের সব ঠিকঠাক। হঠাৎ রাজি হবার কারণটা কী? চাকরি যাবার ভয়, না চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা দেবার ভয়?

শ্রীশচন্দ্র আবার ঈশ্বরচন্দ্রের পা চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বললো, আপনি যদি আমায় অবিশ্বাস করেন, তা হলে আমি বিবাগী হয়ে চলে যাবো। আপনি এতকাল আমায় দেখেছেন, সত্যভঙ্গ করা কি আমার স্বভাব? আমার মা অবুঝ হয়েছিলেন, সন্তান হয়ে মায়ের ওপর জোর করা যায় না, তাই দিবারাত্র তাঁর পাশে বসে থেকে বুঝিয়েছি, সেই জন্যই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। মা আজ সকালে সম্মতি দিয়েছেন, তারপরই ছুটে এসেছি আপনার কাছে।

—শুধু আমার কাছে এলে কী হবে? আগে পাত্রীর মায়ের কাছে ক্ষমা চাই গে যা!

—আজ্ঞে সেখানেও গেসলুম। তারা সব বুঝেছেন। লক্ষ্মীমণি দেবীকে আমি বারবার বলে পাঠিয়েছি যে, এ বিবাহ হবেই, শুধু কিছু বিলম্ব হচ্ছে এই যা। কিছু কু-লোকের মন্ত্রণায় তিনি মামলা দায়ের করেছিলেন। আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমি কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রণপত্রের মুসাবিদা পর্যন্ত সঙ্গে করে এনেছি।

শ্রীশচন্দ্র ফতুয়ার পকেট থেকে একটি কাগজ বার করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, বালিশটা আমার মাথার কাছে তুলে দে।

খানিকটা উঠে তিনি বালিশে মাথা হেলান দিয়ে বসলেন। তারপর চিঠিখানি মেলে ধরলেন চোখের সামনে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যাঃ বিনয়ং নিবেদনম্

২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক, মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার সুকেস্ স্ট্রিটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ, শকাব্দ ১৭৭৮।

চিঠিখানি দু'বার পড়লেন ঈশ্বরচন্দ্র। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "কন্যার শুভবিবাহ" শুধু লিখেছে কেন? লিখতে বল্ 'বিধবা কন্যার শুভবিবাহ'। আমি কোনো লুকোচাপা পছন্দ করি না। যারা আসবে, তারা যেন বিধবা বিবাহের কথা জেনেই আসে।

—আজ্ঞে তাই হবে।

—এ বাড়িতেই বিবাহ হবার কথা লিখেছিস, সে বিষয়ে আগে রাজকৃষ্ণের মত লওয়া প্রয়োজন নয়? রাজকৃষ্ণকে ডাক্।

—আজ্ঞে রাজকৃষ্ণবাবুকেও আগেই বলা হয়েছে। তিনি সাগ্রহে রাজি হয়েছেন।

অর্থাৎ সকল কাজ পাকা করে তারপরই শ্রীশচন্দ্র এসেছে বিদ্যাসাগরের কাছে।

পক্ষকালের মধ্যেই সংঘটিত হলো কলকাতায় প্রথম হিন্দু সমাজে, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ। ঈশ্বরচন্দ্র তখনও পুরোপুরি সুস্থ নন, কিন্তু তবু তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন তদারকির জন্য। যেন কোনো অনুষ্ঠানের ত্রুটি না হয়।

প্রায় দু' হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে বিদ্যাসাগর নিজে গেছেন কয়েকটি বাড়িতে। এ যেন তাঁরই কন্যাদায়। সুকিয়া স্ট্রিটে তিনি যে বাড়িতে থাকেন, সে বাড়িতেই বিবাহ হবে, সুতরাং তিনি কন্যাকর্তা তো বটেই।

নিমন্ত্রণ করতে গিয়েও এক জায়গায় দারুণ আঘাত পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র। যেখান থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার আশা করেছিলেন, আঘাত এলো সেখান থেকেই। তিনি গিয়েছিলেন রামমোহন রায়ের গৃহে, রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়কে বিয়ের সময় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করবার জন্য। সমাজের শীর্ষ ব্যক্তিগণ যত বেশী উপস্থিত থাকবেন, তত বেশী এরূপ বিবাহ সম্পর্কে লোকের বিরূপতা দূর হবে।

রমাপ্রসাদ রায় একটু যেন আমতা আমতা করতে লাগলেন। বিধবা বিবাহ প্রস্তাবের আবেদনে তিনি স্বাক্ষরও দিয়েছিলেন, মুখে সমর্থনও জানিয়েছিলেন; কিন্তু বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকার কথায় তিনি বললেন, আমাকে আর এর মধ্যে টানা কেন? আমি না হয় না-ই গেলাম।

মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল ঈশ্বরচন্দ্রের। তাঁর চোখ গেল দেয়ালের দিকে। সেখানে রামমোহনের একটি আবক্ষ ছবি ঝুলছে।

সতীদাহ নিবারণের জন্য যে পুরুষ সিংহ সমাজের বিরুদ্ধে এত লড়েছেন, আজ বিধবা বিবাহ উপলক্ষে তাঁর পুত্রের মুখে এ রকম কথা! উঠে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, তবে আর ঐ ছবিটা ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন? টান মেরে মাটিতে ফেলে দিন! আপনি না গেলেও এ অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি হবে না।

কালীমতীকে আগে থেকেই এনে রাখা হয়েছে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বর আসবে রামগোপাল ঘোষের বাড়ি থেকে।

বিবাহের লগ্ন রাত্রি দ্বিপ্রহরে। কিন্তু যদি কোনো গোলযোগ হয়, সেই জন্য সন্ধ্যাকালেই আনা হবে বরকে। রামগোপাল ঘোষের গৃহ থেকে বিবাহের মণ্ডপ পর্যন্ত পথের দু'পাশে দু'হাত অন্তর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিস। পথ একেবারে লোকে লোকারণ্য। এর মধ্যে কত লোক হুজুকখোর, কত লোক স্বপক্ষের আর কত যে বিপক্ষীয় তা বোঝা দুষ্কর।

রামগোপাল ঘোষের সুসজ্জিত জুড়ি গাড়ির মধ্যে বসে আছে বরবেশে শ্রীশচন্দ্র, তার সঙ্গে রয়েছেন রামগোপাল নিজে, তাঁর বন্ধু হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও দ্বারকানাথ মিত্র।

এক সময় মনুষ্যের ভিড়ে অশ্ববাহিত গাড়ি আর অগ্রসর হতে পারে না। কারা যেন তুমুলভাবে চিৎকার করছে। তা স্বপক্ষের জয়ধ্বনি না বিপক্ষের বিদ্রূপ, তা বোঝা গেল না। হঠাৎ বিকট শব্দে একটা পটকা ফাটলো। শ্রীশচন্দ্র রামগোপালের হাত চেপে ধরলো।

শোনা গিয়েছিল যে, বিপক্ষীয় লোকেরা লাঠিয়াল এনে বরের শোভাযাত্রার জন্য হামলা করবে। সেই জন্যই এত পুলিসের ব্যবস্থা।

রামগোপাল শ্রীশচন্দ্রকে বললেন, ভয় নেই।

তারপর বন্ধুদের নিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লেন পথে। তাঁরা জুড়ি গাড়ির দু'পাশে হাঁটতে লাগলেন। এবং পৌঁছে গেলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানেই বিবাহ হলো। দু'পক্ষের দু'জন বিশিষ্ট পুরোহিত উপস্থিত। এ ছাড়া এসেছেন বিদ্যাসাগরের পক্ষপাতী সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা। ইয়ং বেঙ্গলের দল রয়েছেন, রাজা দিগম্বর মিত্র থেকে শুরু করে বাবু নবীনকুমার সিংহ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ধনীরাও প্রথম থেকে সর্বক্ষণ বসে আছেন। রমাপ্রসাদ রায়ও শেষ পর্যন্ত চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে না এসে পারেন নি। এবং এসেছেন অনেক মহিলা।

সমস্ত মন্ত্র পাঠ, কন্যা সম্প্রদান, নানাবিধ অলঙ্কার ও দান সামগ্রী, উলুধ্বনি, আরষষ্ঠী বাটাকে প্রণাম, স্ত্রী আচার নাক-মলা, কান-মলা, কড়ি দে কিনলেম দড়ি দে বাঁধলেম, হাতে দিলাম মাকু, একবার ভ্যা করো তো বাপু ইত্যাদি কিছুই বাদ রইলো না। তারপর ভূরিভোজ।

পরম আনন্দে এবং বিনা বাধায় অনুষ্ঠান সাঙ্গ হলো। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, উৎকণ্ঠার শেষে অবসন্ন কিন্তু পরিতৃপ্ত মুখে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র। বিদায় নেবার জন্য তাঁর কাছে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলো নবীনকুমার।

তারপর সে বললো, আপনাকে একটি কথা নিবেদন করবো?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কী কথা বলো তো, বাপু?

নবীনকুমার বললো, এখন থেকে আমি আপনার সকল কার্যে সহায়ক হতে চাই। আমি জানি, এ বিবাহের জন্য আপনার প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে! এর পর থেকে প্রত্যেক বিধবার বিবাহে আমি এক হাজার টাকা দিতে চাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্মিতভাবে এই সদ্য যুবাটির দিকে চেয়ে রইলেন। (ক্রমশ)

কণ্টকল্পিত

অতুল্য ঘোষ

(নবপর্যায়)

॥ ১০ ॥
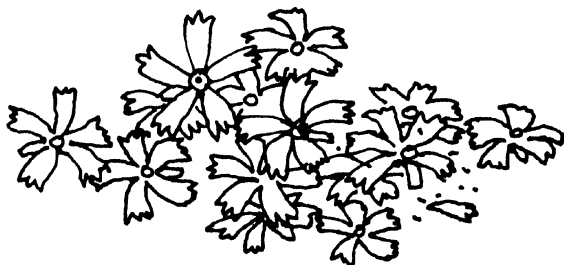
'এবারে স্বাধীনতা-দিবসে বিশেষ কোন বাড়িতে জাতীয় পতাকা উঠতে দেখিনি।'

'তোমার নিজের বাড়িতে তুলেছ? আমি তো তুলতে দেখিনি!'

'দিল্লীতে যা হচ্ছে সব, তাতে আর কিছু ভাল লাগে না।'

'তোমরা তো চাও স্থিতিশীল গভর্নমেণ্ট, যাতে তোমাদের গায়ে কোন আঁচ না লাগে। আর তোমাদের আলোচনা তা সবই হয় চা খেতে খেতে, না হয় কফির পেয়ালায়। আর তারপর সব তো নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।'

'আমরা কি করব বল! আমরা আর কতটুকু পারি!'

'এই তো বিপদ! তোমরা উচ্চ মধ্যবিত্ত আর মধ্যবিত্তরা সরবও নও, নীরবও নও; অথচ চায়ের পেয়ালায় তুফান তোল। দেশটা কি তোমাদের নয়? তোমরাও তো স্বাধীন হয়েছ। স্বাধীনতার সুখটা তোমরা পুরো মাত্রায় ভোগ কর, কিন্তু তার জন্য কোন ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে চাও না।'

কথাগুলি আমার ঘরেই হচ্ছিল মা ও মেয়ের মধ্যে। মা উচ্চশিক্ষিতা, মেয়েও এবারে এম এ দেবে। আমি নির্বাক শ্রোতা। কিছু বাদেই একটি ছেলে এল। সে এবারে এম কম দিয়েছে এবং ল-এর ইণ্টারমিডিয়েট পাস করেছে। সে হঠাৎ আমায় জিজ্ঞেস করল যে, কেন্দ্রে যেরকম অনিশ্চয়তা, ভারতবর্ষে কি মিলিটারী রুল হবে? এরকম প্রশ্ন আরও অনেকেই করেছে এবং সকলেই উচ্চশিক্ষিত। আমিও খুব আস্তে আস্তে বললুম, 'তুমি তো শুনেছি ইতিহাস পড়। ফরাসী দেশে ১৮৭০-এর পর অর্থাৎ নেপোলিয়ান দা থার্ড-এর সাম্রাজ্যের অবসানের পর থেকে দ্য গল শাসনক্ষমতায় আসা অবধি এই সত্তর বছর ছ' সপ্তাহ, আট সপ্তাহ, দশ সপ্তাহ মিনিস্ট্রি টিঁকত। সেখানে সব সময়েই অনিশ্চয়তা ছিল। ফরাসী দেশে একটা ঠাট্টার চলন আছে, যদি কেউ কোন বইয়ের দোকানে ফরাসী দেশের কনস্টিটিউশন কিনতে যায়, তা হলে দোকানদার সবিনয়ে উত্তর দেয়, আজ্ঞে না, আমরা পিরিয়ডিক্যাল বিক্রি করি না। কই, ফরাসী দেশে তো আজ অবধি সামরিক শাসন হয়নি।'

কেবলমাত্র কয়েকজন শিক্ষিতের কথা বলে কোন লাভ নেই। আমাদের দেশে যাঁরা একটু স্থিতিশীল, তাঁরা সকলেই যেন দর্শক। অবশ্য মূক দর্শক—যে দর্শক ধিক্কার বা হাততালি দিতেও জানে না। ১৭ আগস্ট তারিখের কলকাতার দুটি দৈনিক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-দিবসের সংবাদের শিরোনামায় আছে—'১৫ আগস্ট বুঝি শিশুদেরই'; আর একটিতে আছে—'স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব'। অন্যান্যদের কথাই বা বলছি কেন! বা মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই কিছু দিন হল তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ করে দিয়েছেন যে, গত তিরিশ বছরে প্রায় কিছুই হয়নি। এ একটা অদ্ভুত অবস্থা। হওয়া না-হওয়ার দায়িত্ব যাঁদের ছিল, তাঁরাই বলতে আরম্ভ করেছেন যে, তাঁরা এমন অপদার্থ যে, গত তিরিশ বছরে তাঁরা কিছুই পারেননি। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, তা হলে তাঁরা এতদিন কেন ছিলেন বা এখনও কেন তাঁরা নির্বাচনে দাঁড়ান? অদ্ভুত অবস্থা। এঁদের মধ্যে অনেক স্বাধীনতা-সংগ্রামীও আছেন। তা হলে কি তাঁরা সগৌরবে ঘোষণা করছেন যে, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে? যাঁরা বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁরা স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই বলতে আরম্ভ করেছিলেন—'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'। তাঁরা যদি বলেন, তাঁদের কথা বোঝা যায়। কিন্তু যাঁরা তিরিশ বছরের উপর দেশের শাসনক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরা কি সত্যিই ভণ্ড ও প্রতারক? তাঁরা কি সত্যিই জানেন না যে, ভারতবর্ষ আজ খাদ্য উৎপাদনে, শিল্প সৃষ্টিতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায়, স্বাস্থ্যে, পথঘাটের ব্যাপারে, জাহাজ রেল প্লেন প্রভৃতি নির্মাণে, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে? এটা সত্য যে, আরও অনেক দূর যেতে হবে। কিন্তু তার মানে তো এ নয় যে, কিছুই হয়নি। যতদিন মন্ত্রিত্ব বা শাসন-ক্ষমতায় রইলেন, ততদিন বেশ। যেমনি সেখান থেকে সরে গেলেন বা অন্য মন্ত্রিসভায় গেলেন, অমনি সেখানকার সব ভুয়ো হয়ে গেল—এ একটা অদ্ভুত মনোভাব। আর যদি তাঁরা ভণ্ড না হন, যদি সত্যিই মনে করেন যে, কিছু হয়নি—তা হলে অনুগ্রহ করে পথ ছেড়ে সরে যান না! ভারতবর্ষে বহু দায়িত্বশীল নাগরিক আছেন। তাঁরা এঁদের সরে যাবার পর অনায়াসেই কর্তব্য-ভার কাঁধে তুলে নিতে পারবেন। মনে যাঁরা নখ-দন্তহীন, স্খলিত চর্ম, অক্ষম, অকেজো অপটু হয়েছেন, তাঁরা এখনও পথ জুড়ে রয়েছেন। এবং এমন কোলাহল শুরু করেছেন যাতে জনসাধারণের কাছে স্বাধীনতার সম্যক অর্থটাও গুলিয়ে যাচ্ছে। সর্বপ্রকার বিশেষণবর্জিত 'স্বাধীনতা' শব্দটা এখনও অধিকাংশের মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। আর তা ছাড়া যে দেশ দেশের অধিকাংশ লোককে নির্যাতনের মুখে ঠেলে না দিয়ে অল্প আয়াসে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীন হতে পারে সে দেশের স্বাধীনতা ঠুনকো নয়; সে দেশের স্বাধীনতা মহামর্যাদাময় ও স্বমহিমায় উজ্জ্বল ভাস্বর। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছিল দেশের অধিকাংশ দরিদ্র, নিরন্ন এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে যাদের বাস, তাদের চেষ্টায়। ধনী, উচ্চমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তদের অতি সামান্য অংশ স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। কেউ ফাঁসি গেছলেন, কারো দ্বীপান্তর হয়েছিল, কারো অঙ্গহানি হয়েছিল, কেউ কেউ দীর্ঘজীবন কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন, কেউ কেউ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। এ সবই সত্য। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তুলনায় এদের সংখ্যা তো মুষ্টিমেয়! আর যাঁরা গণ-আন্দোলনে তিলে তিলে বছরের পর বছর স্বাধীনতা-সংগ্রা[ম] করে গেছেন অসীম নির্যাতন সহ্য করে এ[…] তাকে ব্যর্থ করে দিয়ে। এঁরাই তো ছিলেন ল[…] লক্ষ—যাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এঁদে[র] খাবার যুগিয়েছেন, আবাস যুগিয়েছেন। সংখ্যা[র] তুলনা করলে ধনী, উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবি[ত্ত] সম্প্রদায় থেকে এসেছেন যে মুষ্টিমে[য়] তাঁদের দামও কম নয়; কিন্তু তুল[না] করলে দেখা যাবে কুঁড়েঘর থেকে যারা এসেছে[ন] ঝুপড়ি থেকে যারা এসেছে, তাদের সংখ্যা অনে[ক] লক্ষগুণ বেশী। এই বাংলাদেশেই বিভি[ন্ন] জেলায় মধ্যে মধ্যে যেসব আন্দোলন হয়েছে, যেমন পটুয়াখালি, যেমন চরমানাইর, যেম[ন] বন্দবিলা, যেমন কাঁথি, আরামবাগ, বর্ধমা[ন] বীরকুৎসা—আরও অনেক নাম করা যায়—এ[ই] সব আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন ঐ কুটির থেকে আসা লোক। চম্পারণ, বড়দোলী, পেশোয়ার—এসব জায়গার আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন, তার শতকরা কতজন লোক ছিলেন ধনী, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত? ভারতবর্ষের বহু জায়গাতেই রক্তের আখরে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লেখা হয়ে আছে। এই ইতিহা[স] যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ভারতবর্ষের দরিদ্রতম জন[-] সাধারণ, আর এইসব আন্দোলনে যাঁরা বাধ[া] দিয়েছিলেন, তা সে সহিংসই হোক বা অহিংসই হোক, তাঁদের শতকরা এক শো জনই এসেছিলেন ঐ ধনী, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা যোগদান করে[-] ছিলেন, তাঁদের কাউকেই ছোট করা হচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে স্বাধীনতার মর্যাদা খর্ব করার জন্য যেন ঐ ধনী, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণী উঠে পড়ে লেগেছেন। স্বাধীনতা-দিবস পালনও এঁদের কাছে অহেতুক, অসঙ্গত ও অনাবশ্যক বলে মনে হয়। দেশ যে স্বাধীন, তার যে উৎসব করবার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে, এ ভাবও মন থেকে মুছে ফেলবার প্রচেষ্টা। উৎসব করব স্বাধীন হয়েছি বলে। স্বাধীনতার পর যতটা যাওয়া উচিত ছিল, ততটা যদি না যেতে পেরে থাকি, তা হলে তার কঠোর সমালোচনা করব; কিন্তু তা বলে স্বাধীন হয়েছি বলে উৎসব করব না? যতদিন পরাধীন ছিলুম, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবার সব পথ আমাদের বন্ধ হয়ে ছিল। আজ সে বাধা অপসারিত হয়েছে বলে উৎসব করব।

আমাদের দেশের অন্দরে-কন্দরে, পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে যে সম্পদ এতদিন আমাদের অজানা ছিল, তা জানবার, ব্যবহার করবার, দেশকে সমৃদ্ধ করবার সুযোগ পেয়েছি বলে উৎসব করব। আমি নিজেকে স্বাধীন দেশের নাগরিক বলে অভিহিত করবার সুযোগ পেয়েছি বলে উৎসব করব। 'বনফুল'-এর একটা গল্প মনে পড়ছে। 'পণ্ডিতমশাই ছাত্রদের স্বাধীনতার অর্থ বোঝাচ্ছেন। তিনি এক কথায় বললেন যে, স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে ভাল কাজ করবার অধিকার। পণ্ডিতমশাইয়ের একটি ছাত্রের মা ছাত্রটিকে বললেন, বাড়িতে

হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে

—মায়ের যত্নের কথাই তুলে ধরে

আপনার ছেলে যদি জামাকাপড় ময়লা করায় চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহলে সেই ময়লার সঙ্গে লড়াই করার জন্যেও দরকার এক চ্যাম্পিয়নেরই—হাই পাওয়ার সার্ফ।

হাই পাওয়ার সার্ফের শক্তিশালী ফরমূলায় আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধুলোময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা!

সার্ফে কাচা রঙীন জামাকাপড়ও কত সুন্দর হয়—কত পরিষ্কার আর ঝলমলে! সার্ফ আপনার পুরো পরিবারের জামাকাপড়কে দেয় এক বাড়তি শুভ্রতা আর ঔজ্জ্বল্য!

সার্ফে কাচা কাপড় দেখে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন, আর লোকেও তা তাকিয়ে দেখবে। সেজন্যেই বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SU.221-2415 BG

হল বাড়ির একটি আশ্রিত। ছাত্রটি দেখে দুটি আমের মধ্যে একটি পচা। হঠাৎ তার পণ্ডিত-মশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। সে ভাবল আমি তো স্বাধীন দেশের নাগরিক, আমায় ভাল কাজ করতে হবে। সে পচা আমটি নিজে খেয়ে ভাল আমটি আশ্রিতকে দিল। ছাত্রটি মনে করেছিল স্বাধীন দেশের নাগরিকের এইটিই কর্তব্য।' [মর্মার্থ দেওয়া হল—ভাষাটি আমার।] কম কথায় স্বাধীনতার এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর দেওয়া যায় না। এই মনোভাবের জন্যই উৎসব করব। একসময় ছিল ভারতবর্ষের একটি রাজনৈতিক দল স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতীয় পতাকার অম্নুৎসব করত। আজ তারা আর তা করে না। আজ দেখা যাবে যে, শিক্ষিত, ধনী, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তদের মধ্যে অনেকেই জাতীয় পতাকার মর্যাদা সম্বন্ধে উদাসীন ও জাতীয় পতাকা তাদের কাছে অনাদৃত, অবহেলিত। এর জন্য দায়ী যাঁরা এতদিন বিরোধী দলে ছিলেন তাঁরা নন। দায়ী যাঁরা এই তিরিশ বছর ধরে কোন-না-কোনভাবে শাসনক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা।

এখানে স্বাধীনতার জয়গান করা হচ্ছে না; দুঃখ প্রকাশ করছি যে, যাঁদের বোঝবার-জানবার এবং বোঝাবার ও জানাবার ক্ষমতা আছে তাঁদের ঔদাসীন্য আজ ক্রমাগত দেশকে পেছন দিকে টানছে। আর ঐসব তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে এমন কথাবার্তাও হয় যা অশ্লীলতার নামান্তর মাত্র। চায়ের টেবিলে এঁরা বলেন যে, এর চেয়ে ইংরাজের অধীন থাকা ভাল ছিল। অর্থাৎ স্বাধীনতা কথাটা এবং দেশ স্বাধীন হওয়াটা এঁদের কাছে নিছক, অহেতুক ভাবপ্রবণতা মাত্র। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, এঁরা এই দেশেরই নাগরিক। স্বাধীনতা একটা ভাবপ্রবণতা যে নয়, পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি যে কখনও নিছক ভাবপ্রবণতা হতে পারে না, এ সত্য এঁদের জানা নেই। স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভাব-প্রবণতার স্থান আছে; কিন্তু স্বাধীন হওয়া ভাবপ্রবণতা নয়। পরাধীনতার গভীর কলঙ্ক থেকে মুক্তির নাম স্বাধীনতা। ভারতবাসী আমরা মুক্তিস্নান করে শুদ্ধ হয়েছি। এইবার মাথা উঁচু করে দৃঢ় পদক্ষেপে দেশকে সমৃদ্ধ করার কাজে এগিয়ে যেতে হবে। কতটা এগিয়ে যেতে পেরেছি, তার সঙ্গে স্বাধীনতা-উৎসবের কোন সম্পর্ক নেই। যতটা এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, ততটা যদি না এগোনো হয়ে থাকে, তা হলে সেটা ব্যর্থতা। কিন্তু সে ব্যর্থতা স্বাধীন হওয়ার চরিতার্থতাকে ক্ষুণ্ন বা ম্লান করতে পারে না। সেইজন্যই স্বাধীনতা-দিবসের উৎসবকে কোন দেনা-পাওনা বা হিসাববুদ্ধি ম্লান করতে পারে না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যাঁরা এই প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছেন, তাঁদের শুভবুদ্ধির উন্মেষ হোক। তাঁরা যদি মনে করেন, যাঁরা বর্তমানে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করছেন তাঁদের সরিয়ে দিন। সে অধিকার এবং সে দায়িত্ব তাঁদের আছে। কোন দল বা কোন ব্যক্তির অপকার্যের জন্য দেশের জাতীয় পতাকা বা স্বাধীনতার মর্যাদা ম্লান হতে পাবে না। যারা অপকার্য করে তাদের অপসারণের জন্য যদি সরব ও সক্রিয় প্রচেষ্টা না হয়, তাতেই স্বাধীন দেশের নাগরিকের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। আমার বাড়ি আমার পরিবার, আমার সংসার, আমার অর্থোপার্জন, আমার বংশধর—এ সবের জন্য যেমন সময় দিতে হয়, সেইরকম স্বাধীন দেশের নাগরিকের দেশের প্রতিও কর্তব্য আছে। কোন দল বা কোন নীতিকে কেবলমাত্র মনে মনে সমর্থন জানালেই দায়িত্ব পালন হয় না। দেশের সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে জানা ও জানানো এবং তার মধ্যে নিজের কিছু করণীয় আছে, এই বোধ থেকেই স্বাধীন নাগরিকের কর্তব্য পালন করা হয়। যদি কোথাও ভুল হয়, প্রতিবাদ করুন, সক্রিয় হোন, বাঙ্ময় হোন। আলোচনা, সমালোচনা—সবই ভাল; কিন্তু সে যদি কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের জন্য হয় তা হলে শুধু যে অপরাধ করা হবে তা নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও অপরাধী মনে করবে। মনে রাখতে হবে যে, দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে অন্য কোন বিষয়ের তুলনা করা চলে না। তিরিশ বছর কোন-না-কোনরকমে শাসনক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থেকেও যাঁরা বলছেন কিছু হয়নি, মনে রাখতে হবে যে, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই তাঁরা এ কথা বলতে পারছেন। কেবল অধিকারই থাকবে, আর দায়িত্ব থাকবে না—এ মনোভাব সমাজে ও দেশে বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করতে পারে।

॥ [illegible] ॥

রবিবার দিনটা দীপনাথের নিরঙ্কুশ ছুটি থাকে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো, আড্ডা, বিকেলের দিকে প্রীতম বা সোমনাথের বাড়িতে যাওয়া কিংবা আর্ট এক্জিবিশন, ভাল নাটক, বিচিত্র কোনো অনুষ্ঠান দেখে বেড়ানোর প্রোগ্রাম থাকে তার।

কিন্তু এই রবিবার ছুটি পেল না সে। বোস সাহেব বিরাট দল নিয়ে শিকারে যাচ্ছেন। মিঠাপুকুরের বাগানবাড়ি ছেড়ে দিয়েছে একজন বড় মহাজন। সেখানে কেটারারের এলাহি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

দীপনাথের এইসব আমোদ-ফূর্তিতে কোনো সম্মানজনক ভূমিকা নেই। তাই সে আনন্দ পায় না, বরং যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত থাকে। তবু এবার তার কোথায় একটু উত্তেজনাময় আনন্দের অনুভূতি হচ্ছিল। তার কারণ, অন্যান্য মহিলাকুলের সঙ্গে মণিদীপাও যাচ্ছেন।

নিজের মনের এই সাম্প্রতিক পাপবোধ দীপনাথকে যথেষ্ট খোঁচা দেয়। কিন্তু সে যেন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ, জ্বলে গাল না যায় ত্যাজন।

মিঠাপুকুরের মস্ত ঝিলে যে বালিহাঁস থাকবেই এমন কোনো কথা নেই। তবে ঝোপ-জঙ্গল বাঁশঝাড়ে বিস্তর নিরীহ পাখি-টাখি এসে বসবে। তাদের দু-চারটে মারা পড়লেও পড়তে পারে। কারণ সঙ্গে যাচ্ছে তিন তিনটে বন্দুক।

অ্যামবাসাডারে ড্রাইভারের কনুইয়ের গুঁতো আর অ্যালবার্ট টমসনের চীফ অ্যাকাউনট্যান্ট মিস্টার গুহর ভারী ঊরুর পার্শ্বচাপ সহ্য করতে করতে সেই তিনটে খাপে ভরা ভারী বন্দুক খাড়া করে ধরে থাকতে হচ্ছে তাকে আগাগোড়া। লাগেজ বুটে জায়গা হয়নি, সেখানে বিস্তর জিনিস। আর দীপনাথ থাকতে অন্য কোথাও জায়গা হওয়ার দরকারই বা কি?

তবে দৃশ্যটা মণিদীপা দেখছে না। মেয়েরা দুটো গাড়ি বোঝাই হয়ে আগে আগে যাচ্ছে। পিছনে আর দুটো গাড়িতে পুরুষমানুষের দল। মণিদীপা দেখলে একটু অস্বস্তি বোধ করত দীপ। ভদ্রমহিলা মনে করেন, দীপনাথ বোস সাহেবের চামচা। কথাটা হয়তো তেমন মিথ্যাও নয়।

সকালের নরম রোদে শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা রাস্তা আর দু ধারে প্রাকৃতিক সবুজের মধ্যে পড়ে দীপনাথের ভাল লাগার কথা। বন্দুকগুলোর জন্য তেমন লাগছে না। মুখের সামনে তিনটে খাপে ঢাকা নল উঁচু হয়ে তার চোখ আড়াল করে আছে। এই বন্দুকে পাখি মারা পড়বে ভাবতেই তার বুকে কষ্ট হয়। খুনখারাপি—তা সে পাখিই হোক আর বাঘই হোক—সাফ। মাথা ঠাণ্ডা, আর বুকে ছিল যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা। এক্জিকিউটিভ ইনজিনিয়ার হিসেবে কিছুদিন উত্তর বাংলায় ছিল মল্লিনাথ। তখন বনে জঙ্গলে তার সঙ্গে ঘুরে দীপনাথ তালিম নিয়েছিল। কিন্তু আজও সে বন্দুক জিনিসটাকে পছন্দ করে উঠতে পারেনি।

গুহ সাহেব পিছনে একটু ঘুরে ব্যাক সীটে বসা বোস সাহেব এবং আর তিন কোম্পানিব তিন বড় মেজো কর্তার সঙ্গে অফিস নিয়ে কথা বলছিলেন। ফলে ঊরুর চাপে দীপনাথ আরো চ্যাপটা হয়ে গেল। শীতকালেও তার অল্প ঘাম হচ্ছে। দমফোট লাগছে।

হাওড়া ছেড়ে উনিশ কুড়ি মাইল দূরে মিঠাপুকুর। ইতিমধ্যেই গাছ-গাছালি ঘন হয়ে উঠেছে। বসতির ঘনত্ব কমে এসেছে। চাষের মাঠ দেখা যাচ্ছে। বন্দুকের নল সরিয়ে দেখতে থাকে দীপনাথ। সামনেব একটা গাড়িও খুব তৃষিত চোখে দেখে নেয় সে। সবুজ একটা ফিয়াট গাড়ি। ওতে মণিদীপা রয়েছে। মণিদীপা আজও শাড়ি পরেনি। জিনস আর টি শার্ট। তার ওপর একটা কাশ্মীরী কোট। বড্ড বেশী চমকি দেখাচ্ছিল।

গাড়িটা ডাইনে বাঁক নিল। আর দেখা গেল না।

বিশুদ্ধ মার্কিন ইংরিজীতে এ-গাড়ির সাহেবরা অফিস বিজনেস আর বিভিন্ন এক্জিকিউটিভেব দোষত্রুটি নিয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। দীপনাথ বিন্দুমাত্র কৌতূহল বোধ করে না। চোখ বুজে, সে মনের চোখটি খোলে। অমনি নীল আকাশের গায়ে স্বর্গের সমান উঁচু মহান পর্বতের দৃশ্য ভেসে ওঠে।

সব তুচ্ছতা ছেড়ে একদিন কি সে পাহাড়ে যাবে না?

গাড়ি ডাইনে বাঁক নিয়ে একটা গাছপালায় নিবিড় শুঁড়িপথে ঢোকে। কাঁচা রাস্তা। গাড়ি হোঁচট খাচ্ছে। খুব আস্তে চলছে। প্রচণ্ড ধুলো উড়ছে চাকার ঘবড়ানিতে। চারদিকের গাছপালার ডাল আর পাতা ছটাছট আছড়ে পড়ছে গাড়ির গায়ে। বাঁশের একটা ডগা গুহ সাহেবের গালে চুমু খেয়ে গেল। উনি একটু সরে এলেন। ঊরুর চাপে দীপনাথ আরো সরু হল এবং ড্রাইভারের কনুই তার পেটে খোঁত করে বসে গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা এই যন্ত্রণা সহ্য করে বাগানবাড়িতে পৌঁছোলো দীপনাথ।

ধূলিধূসর দুটো গাড়ি থেকে মহিলারা নেমেছেন। বাগানময় অজস্র সুন্দর নিবিড় গাছপালা, কুঞ্জবন, পুকুর, বাড়িটাও বিশাল। চারদিকে উঁচু দেয়ালের প্রতিরোধ। চারদিক ম ম করছে কফির গন্ধে। বাগানে পুকুরের ধারে মস্ত গার্ডেন আমব্রেলার নিচে টেবিল সাজানো। এখুনি হালকা জলখাবার দেওয়া হবে। ড্রিংকস চাইলে ড্রিংকসও। কেটারারের বেয়ারারা ট্রে নিয়ে তৈরী হচ্ছে।

বন্দুকগুলো ঘাসে শুইয়ে রেখে দীপনাথ হাত পা টান টান করল। পুলওভার গায়ে রাখা যাচ্ছে না এই তেজী রোদে। সেটা খুলে পিঠে ঝুলিয়ে হাতা দুটো গলায় ফাঁস দিয়ে রাখল। একটা ফাঁকা টেবিলে বসে কফিতে চুমুক দিয়ে হাঁফ ছাড়ল সে।

কিছুক্ষণ সে হাঁফ ছাড়তে পারবেও। শিকারের প্রোগ্রামে সে সাহেবদের সঙ্গে যাবে না, এ কথা বোসকে সে আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

বোস শুনে একটু হেসে বলেছেন, রক্ত দেখলে ভয় পান নাকি?

এসব আমার ঠিক সহ্য হয় না।

ঠিক আছে। মিসেসরাও কেউই নাকি যাবেন না। আপনি না হয় ওঁদের সঙ্গে সময়টা কাটাবেন।

কথাটায় খোঁচা আছে। কিন্তু সারা দিন কত খোঁচাই তাকে হজম করতে হয়।

শিকারের পর লানচ। এবং লানচের পর কলকাতা থেকে আসা এক ম্যাজিসিয়ান ম্যাজিক দেখাবেন। এক গায়িকা গান শোনাবেন। তারপর মিস্টার এবং

সুতরাং দীপনাথের খুব একটা কাজ নেই। অনেকটা সময় সে একা কাটাতে পারবে।

কফির কাপের কানার ওপর দিয়ে তার চো[illegible] খুব আলতোভাবে লক্ষ করছিল, কিন্তু মণিদীপাকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। রাই মাখিয়ে গোটা দু[illegible] ভেজিটেবল স্যানডউইচ খেয়ে ফেলল সে। তারপর আবার বসে বসেই খুঁজতে লাগল চোখ দিয়ে। অবাধ্য চোখ বশ মানছে না। বড় জ্বালা।

অনেকটা দূরে একটা লিচু গাছের আড়ালে ক্যামবিসের চেয়ারে ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে মণিদীপা বসে আছে, এটা আবিষ্কার করতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। মণিদীপার সঙ্গে জনা দুই মহিলা [illegible] জনা তিনেক পুরুষ রয়েছে। হাত পা নেড়ে প্রচণ্ড কথা বলছে তারা।

দীপনাথ উঠল এবং একটু লক্ষ্যহীন পা[illegible] এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে লিচুতলার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। মণিদীপার চোখে পড়ার জন্য [illegible] ইচ্ছে করেই ওর মুখোমুখি উল্টো দিক থেকে খানিকটা হেঁটে কাছাকাছি চলে গেল প্রায়।

কিন্তু মণিদীপা একদমই পাত্তা দিল না তাকে। ডাকল না, তাকালও না।

দীপনাথের কাছে এটুকুই যথেষ্ট অপমান। মণিদীপা সম্পর্কে যত বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে সে, তত বেশী অভিমান আর অপমানবোধ বেড়ে যাচ্ছে তার।

দীপনাথও স্পষ্ট করে তাকাল না। উদাস মুখে হাঁটা অব্যাহত রেখে সে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির পশ্চিম দিকে একটা পরিচ্ছন্ন ঘাসজমিতে চলে এল। খুঁজে পেতে একটা পছন্দসই গাছের ছায়ায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে, হাতে মাথা রেখে। চোখ জ্বালা করছে রোদের তেজে। তাই চোখ বুজল। তারপর পাহাড়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল হঠাৎ।

কিন্তু ঘুমোলেও দীপনাথের ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ু সব সময়ে সজাগ থাকে। সামান্য শব্দ বা সামান্য চলাফেরাও সে টের পায়। ঘুমের চটকার মধ্যেই সে একটা ভারী সুন্দর গন্ধ পেল। ঘুম ভাঙলে চোখ চাইল না সে, কে এসেছে তা সে জানে।

বড় অভিমান হল তার। পাশ ফিরে শুল।

মণিদীপা আস্তে করে ডাকল, দীপনাথবাবু!

প্রথমে উত্তর দিল না দীপনাথ।

আরো দুবার ডাক শুনে হঠাৎ উঠে বসল।

মণিদীপা হাসছিল। বলল, কুম্ভকর্ণ।

দীপনাথ হাইটা চেপে দিয়ে বলল, কিছু কাজ নেই, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিছু বলছেন?

তেমন কিছু নয়। আমার ভাল লাগছে না।

কেন?

এরা কেউ তো আমাদের ক্লাসের লোক নয়। আপনি যেরকম মধ্যবিত্ত পরিবারের, আমিও তাই। আই হেট দেম। বলতে বলতে মণিদীপা একটু জ্বলে ওঠে।

দীপনাথ গম্ভীর হয়ে বলে, তা বললে হবে কেন? একজন এক্জিকিউটিভের বউকে এই সমাজে মিশতেই হবে। অন্য উপায় তো নেই।

খুব জেদের গলায় মণিদীপা বলে আমার যা ভাল লাগে না তা মানিয়ে নিতে আমি রাজী নই।

তা হলে কি করবেন?

আমি এখানে সারা দিন থাকতে পারব না।

একটু আগে তো লিচুতলায় হাই সোসাইটির লোকদের সঙ্গে দিব্যি আড্ডা দিচ্ছিলেন।

ওঃ! আই ওয়াজ প্রিচিং কমিউনিজম।

কি সর্বনাশ!

মণিদীপা মৃদু হেসে বলে, খুবই সর্বনাশ। মিস্টার বোস শুনলে মূর্ছা যাবেন। উনি কমিউনিজমকে সাংঘাতিক ভয় পান। আমাদের বাড়িতে লাল মলাটের কোনো বই ঢুকতে পারে না। তা বলে ভাববেন না হাই সোসাইটিতে কমিউনিস্ট নেই। বরং অনেক আছে। আমি যাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম

কানে পরুন রত্ন। কাঁকন পরা হাতের
কিন্তু ঝলমলে সুন্দর চুলের জন্যে ব্যবহার
রেশমী কোমল, উজ্জ্বল কেশভার। সানসিল্ক শুধু শ্যাম্পুই নয়—আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রসাধনী। কারণ, একমাত্র সানসিল্ক শ্যাম্পুর যত্নই আপনাকে দিতে পারে সেরা সৌন্দর্য, আর সৌন্দর্য সাধনে তৃপ্ত এক অভিনব অনুভূতি।
আর এখন, 'নতুন-রূপের' সানসিল্ক শ্যাম্পুতে পাবেন আরো কিছুঃ প্রাকৃতিক উপাদান—যা চুলের জন্যে উপকারী বলে আপনার জানা আছে।
যতই সাজগোজ করুন না কেন, সানসিল্ক ব্যবহার করলে তবেই আপনার রূপ সত্যিসত্যি ফুটে উঠবে। এখনই ব্যবহার করতে শুরু করুন।
সান
সিল্ক*
মেয়েদের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রসাধনী
'নতুন—রূপের' সানসিল্কের ভাণ্ডারে পাবেন প্রত্যেক রকমের চুলের উপযুক্ত রকমারি শ্যাম্পু।
স্বাভাবিক চুলের জন্যে আমণ্ড। তেলা চুলের জন্যে লেমন।
শুকনো চুলের জন্যে আমলা। নিষ্প্রভ প্রাণহীন চুলের জন্যে এগ

হচ্ছেও। কমিউনিজম ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে সব ক্লাসের মধ্যে।

খুব ভাল। দীপনাথ আবার হাই তোলে। মণিদীপার এই একটা ব্যাপারেই তার যা একটু না-পছন্দ। সে জিজ্ঞেস করল, বসরা সব কোথায়?

মণিদীপা ঘাসে বসে বলল, শিকার শিকার খেলা করতে গেল সব। প্রত্যেকটাই মাতাল। কারো হাতে টিপ নেই।

না থাকলেই ভাল। পাখি মারা আমার একদম ভাল লাগে না।

মণিদীপা হাসে। বলে, আপনাকে দেখেই মনে হয়, আপনি ভীষণ সফট হার্টেড।

মণিদীপার হাসিটা এতই ঝকমকে এবং হাসলে বয়সটা এতই কম দেখায় যে, দীপনাথের চোখ আঠা-জালে পড়া পাখির মতো মণিদীপার মুখে আটকে থেকে ছটফট করছিল।

মণিদীপা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে, দি ড্রামবাগস আর অ্যাওয়ে। চলুন আমরা একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবেন?

যে-কোনো জায়গায়। জাস্ট টু কিপ ডিসট্যানস ফ্রম দি হবুচন্দ্র কিংস অ্যান্ড গবুচন্দ্র মিনিস্টারস। কোনো চাষার বাড়িতে গেলে কেমন হয়?

দীপ শঙ্কিত হয়ে বলে, ও বাবা।

ভয় পাচ্ছেন কেন? চলুন। রিয়্যাল হিউম্যান বিয়িং-এর কাছে গেলে অনেক ভাল লাগবে।

চাষা বলতেই যে রিয়্যাল হিউম্যান বিয়িং নয় এ কথাটা বোঝানোর বৃথা চেষ্টা করল না দীপ। তবে উঠল।

মণিদীপা হাঁটতে হাঁটতে বলে, ধারেকাছে দেখার মতো কোনো জায়গা নেই?

দীপ মাথা নেড়ে বলে, জানি না, তবে কয়েক মাইলের মধ্যে রতনপুর নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে আমার মেজদা থাকে।

মণিদীপা ভ্রূ তুলে বলে, উনি কি বড়লোক?

না। তবে একটা খামার মতো আছে ওদের। গেরস্থ।

আমি যদি যেতে চাই আপনার কোনো অসুবিধে নেই তো?

থাকলে তো কথাটা বলতামই না। চেপে যেতাম।

মণিদীপা ঘড়ি দেখে বলে, এখন মোটে সাড়ে নটা বাজে। গিয়ে লানচের আগে ফেরা যাবে তো?

তা যাবে।

তবে গাড়ি যোগাড় করি? বলে প্রায় দৌড়ে চলে যায় মণিদীপা।

বেশ খুশী ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল মণিদীপাকে। দীপনাথ স্পষ্ট টের পায়, একা সে নয়। মণিদীপাও তার প্রতি টানে টানে একটু একটু এগিয়ে আসছে। বেশ আগ্রহী। হয়তো সেটা প্রেম নয়। কারণ মণিদীপার সত্যিকারের ভালবাসার লোক একজন বয়স্ক স্কুলমাস্টার, যার নাম স্নিগ্ধদেব এবং যে সাংঘাতিক বিপ্লবী। কিন্তু মণিদীপার মন উপচে যে বাড়তি লাবণ্যটুকু ঝরে পড়ছে তার কিছু ভাগ অবশ্যই দীপেরও। আপাতত এই রবিবারটার যাবতীয় কষ্ট, কাজ ও অপমানকে ভুলিয়ে দেওয়ার পক্ষে সেটুকুই ঢের।

মণিদীপা ফিরেই গাড়িটা যোগাড় করেছে। দীপ সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল, মণিদীপা বলল ও কি? পাশাপাশি না বসলে কথা বলব কার সংগে?

দীপ লজ্জা পেয়ে মণিদীপার পাশে উঠে বসে।

মণিদীপা বলে, আপনি ড্রাইভিং জানেন?

না, একটু শিখেছিলাম, ভুলে গেছি।

জানলে ড্রাইভারটাকে কষ্ট দিতাম না।

আপনি তো জানেন।

মণিদীপা মাথা নেড়ে বলে, জানলে কি হবে, এসব অচেনা জায়গায় কি পারব? ঠিক সাহস পা[ই] না।

পারবেন। দৃঢ় স্বরে বলে দীপনাথ।

পারব? মণিদীপা উজ্জ্বল চোখে তাকায়।

নিশ্চয়ই। বেচারাকে খামকা কেন ক[ষ্ট] দেবেন? ছেড়ে দিন। দীপনাথ এ কথা বলার সময়ে টের পাচ্ছিল, তার বুক কাঁপছে। নির্জন গাঁ-গঞ্জে রাস্তায় এই অ্যাডভেঞ্চারে ড্রাইভার না থাকলে মণিদীপা অনেক খোলামেলা হবে না কি? মুখ-ফস্কে দু একটা কথা ঠিক বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর একটু ভেবে মণিদীপা বলে, না, থাক। আমি যে আপনার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছি না ড্রাইভারটা তার সাক্ষী থাকবে।

ভীষণ লাল হয়ে গেল দীপ। বলল, কী বলেন!

রতনপুর কোন দিকে এবং কত দূরে তার স্প[ষ্ট] ধারণা ছিল না দীপের। খুব দূরে যে নয় তার এক ধারণা হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ম[াত্র] পনেরো মিনিটে পৌঁছে গিয়ে সে নিজেও অবাক। মণিদীপা মেজদার বাড়িতে কে কে আছে এবং তা[রা] কেমন লোক তা জানতে চেয়েছিল। সেই স[ব] প্রশ্নের জবাবও ভাল করে দেওয়া হল না।

ফটকের কাছে গাড়ি থেকে মণিদীপাকে সঙ্গে নিয়ে নামবার সময় দীপনাথ একটু লজ্জা বো[ধ] করছিল। এই পোশাকে একজন সধবাকে দেখে মেজো বউদি আবার কি ভাববে।

ঢুকতেই ডান ধারে শ্রীনাথের বাগান।

মণিদীপা দাঁড়ায় এবং বাগান থেকে মাটিমাখা হাতপায়ে উঠে আসে শ্রীনাথ।

কাকে চাইছেন?

সুপার৭৭৭
ময়লার বিরোধী, শুভ্রতার শক্তি
SUPER 777
সুপার 777
ভারতের লক্ষ লক্ষ গৃহিণীর পছন্দ
সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোওয়ার বার
পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

দীপনাথ হাতের ইশারা করে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে মেজদাকে। তার পর এগিয়ে গিয়ে বলে, মেজদা, ইনি মিসেস বোস। আমার বসের স্ত্রী।

শ্রীনাথ একটু অবাক। বলে, ও, তুই! আসুন! আসুন!

শ্রীনাথ আর তাদের মধ্যে বেড়ার বাধা। শ্রীনাথ বেড়া বরাবর এগিয়ে যেতে যেতে বলে, ঐ সামনের ঘর। আসুন।

বোঝাই যাচ্ছিল, মেজদা একটু ঘাবড়ে গেছে। তটস্থ হয়ে পড়েছে। হবেই। কী একখানা মেয়ে! সঙ্গে নিয়ে বেরোলে বাজারে প্রেস্টিজ বেড়ে যায়।

মণিদীপা মুখ ফিরিয়ে দীপনাথকে বলে, ঘরে নয়। আমি বাগানটা দেখব। দারুণ সুন্দর বাগান।

শ্রীনাথ কথাটা শুনে মুখ ফিরিয়ে বলে, বাগান দেখবেন? খুব খুশী হলাম। তা হলে ঐ সামনের ফটক ঠেলে চলে আসুন।

বাস্তবিকই দেখার মতো বাগান করেছে শ্রীনাথ। সাজানো গোছানো নয়। বরং জংলা, এলোপাথাড়ি সব গাছপালা গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু তার বিচিত্র রকমফের মানুষকে হতভম্ব করে দেয়। প্রাইজ জেতার মতো বড় বড় আকারের মরসুমী ফুল থেকে পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ভাষায় রাক্ষুসে ফুলকপি পর্যন্ত সবই ফলেছে। সবচেয়ে বড় কথা, বাগানের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালে নিবিড় গাছপালার আবডালে বাইরের পৃথিবী একদম আড়াল পড়ে যায়।

আপনি বাগান করতে খুব ভালবাসেন, না? মণিদীপা শ্রীনাথকে জিজ্ঞেস করে।

শ্রীনাথ একটা চার-রঙা তারাফুল তুলে মণিদীপার হাতে দিয়ে বলে, আচার্য জগদীশ বোস গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন, জানেন তো! আমি নতুন করে সেই প্রাণটার সন্ধান করছি।

রোদচশমার ওপর দিয়ে মণিদীপার ভ্রূতে একটু কুঞ্চন দেখা দেয়। সে বলে, অনেক বাঙালী এ-কথাটা বলে বেড়ায়। কিন্তু আচার্য জগদীশ গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন, এ-কথাটা মোটেই ঠিক নয়।

শ্রীনাথ একটু যেন ভয় খেয়ে তাকায়। বলে, তা হলে?

মণিদীপা এবার সুন্দর করে হাসে। বলে, গাছের প্রাণের কথা লোকে তো বহু দিন ধরে জানে। জগদীশ বোস বোধ হয় গাছের সেনসিটিভিটি প্রমাণ করেছিলেন। ডিটেলস জানি না। তবে ওরকমই কিছু।

শ্রীনাথ একটু নিবে গিয়ে বলে, তাই হবে।

মণিদীপা খুব সমবেদনার সঙ্গে বলে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। গাছের প্রাণ আপনিই আবিষ্কার করেছেন। এত বড় আর লাইভলি ফুল আমি আগে দেখিনি। প্রত্যেকটা গাছই এত হেলদি!

আপনি গাছ ভালবাসেন?

কে না বাসে?

শ্রীনাথের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে যায়। সে বলে আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিচি দেখে গাছ চিনতে পারে না। লেখাপড়া শিখে তা হলে কি লাভ?

ঠিকই তো!

বলতে বলতেই গাছপালা এবং বাগানের ওপর মণিদীপার কৌতূহল শেষ হয়ে যায় এবং দীপনাথ সেটা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে।

দীপ বলে, চলুন, আমার বউদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

মণিদীপার চোখ চারদিকটা গিলে খাচ্ছে। বলল, বাঃ, বেশ তো জায়গা। এরকম একটা জায়গায় থাকতে পারলে কলকাতার ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে আমি এক্ষুনি রাজী।

ভাবনঘর থেকে ভিতরবাড়ি যাওয়ার পথেই খবর রটে গিয়েছিল। ছেলে-মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের ধারে। তৃষা এগিয়ে এসে মণিদীপার হাত ধরে বলল, আসুন! আপনার জন্যই বোধ হয় আমার একজন হারানো দেওরেরও খোঁজ পাওয়া গেল।

বাকি সময়টুকু দীপনাথ আর মণিদীপার নাগালও পেল না। মেয়েমহলে গিয়ে ঘুরঘুর করা তার স্বভাব নয়। মণিদীপাকে এগিয়ে দিয়ে সে ফিরে এল ভাবনঘরে।

শ্রীনাথ হাত-মুখ ধুয়ে এসে বলল, কোথায় এসেছিলি?

মিঠাপুকুর। তোমার আস্তানাটা যে এত কাছে কে জানত?

শ্রীনাথকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বলল, আমি ভাবলাম বুঝি সোমনাথ তোকে খবর দিয়ে আনিয়েছে।

না তো! সোমনাথ আনাবে কেন?

আজ বাবাকে নিয়ে ওরও এখানে আসার কথা।

দীপনাথ ভারী লজ্জিত হয়। বাবা যে সোমনাথের কাছে সেটা সে মাঝে মাঝে ভুলেই যায়। বাবাকে দেখেওনি বহুদিন।

সে বলল, বাবা আসছে কখন?

কে জানে?

দীপনাথ ঘড়ি দেখে বলে, বেলা বারোটা পর্যন্ত থাকতে পারি। তারপর লানচে যেতে হবে। এর মধ্যে যদি বাবা এসে যায় তবে দেখাটা হতে পারে।

এখানে দুপুরে খাবি না?

উপায় নেই। একা হলে কথা ছিল। বসের বউ সঙ্গে রয়েছে।

মেয়েটা একটু ক্ষ্যাপা নাকি?

কেন?

কেমন যেন অন্যরকম।

দীপনাথ হাসে, বলে, ক্ষ্যাপা নয়। আজকালকার মেয়েরা এরকমই। সজলকে ডাকো তো। বহুকাল ওকে দেখি না।

শ্রীনাথ বারান্দায় বেরিয়ে ক্ষ্যাপা নিতাইকে ডেকে সজলকে পাঠিয়ে দিতে বলে। (ক্রমশঃ)

ও এখন বড় হয়েছে সব সত্য জানতে চায়... কেবল মায়ের স্নেহ সব জানাবে।

বড় হওয়ার নিগূঢ় সত্য ওকে জানান। মাসের সেই সময়ের সত্য বলুন। স্যানিটারি ন্যাপকিনস্ এর বিষয়ে সত্য ঘটনা জানান। কমফিট...

কমফিট...বিশেষ এবসরবেন্ট, বিশেষ হাল্কা, বিশেষ নরম আর কোন বিরক্তিকরভাবে ফুলে থাকে না। ভারতের অত্যাধুনিক অটোমেটিক প্লান্ট এ চিকিৎসকের নির্ধারিত প্রথায় কমফিট তৈরী হয় যাতে আপনাকে রক্ষা করবে, অন্য স্যানিটারি টাওয়েলে রোগবীজাণু থাকে বলে পারে না। সম্পুর্ণ শোষা যায়। কমফিট ব্যবহার করুন, সুইডেনের ক্রিসটাইন হোডেন এর আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন নাম। কমফিট ব্যবহার করুন আর ভুলে যান যে সম্পুর্ণ রক্ষা ব্যবহার পাবার জন্য করছেন।

যৌবনের প্রথম পরিচয় কমফিট

বিজ্ঞান

শিশু বাবা মা এবং আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ

'বাবু, পালিশ।' বলেই ছেলেটি আমার একটি পা খপ্ করে চেপে ধরলো।

একবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। পারি নি। ওর মুখের দিকে চেয়েই সেটা সম্ভব হলো না।

কত আর বয়েস, বছর দশ? ফুটফুটে সুন্দর মুখ। সারল্যের প্রতীক। খালি গা। পরনে একটি ছেঁড়া প্যান্ট। দারিদ্র্য ওর সর্বাঙ্গে। ওর গভীর দুটি চোখে হিমালয়ের মত ক্লান্তি।

ওর পাশে বসেছিল আরও একটি ছেলে। বয়েসে ওর থেকে ছোট।

'ও আমার ছোট ভাই'। বললো পালিশওয়ালা ছেলেটি। তারপর আমার একটি পা তুলে নিলো তার পালিশ-বাক্সের ওপর। আর ছোট ভাই কারোর ফেলে দেওয়া একটি পুরনো টুথব্রাস দিয়ে আমার আর এক পায়ের জুতোটি পরিষ্কার করতে লাগলো।

ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে পাঁচটা।

হাওড়া স্টেশনে শুরু হয়েছে যাত্রীদের ভিড়। কেউ যাবেন হিমগিরি এক্সপ্রেসে। কেউ যাবেন ব্ল্যাক ডায়ামণ্ডে। অথবা কেউ নিত্যযাত্রী।

বড় ভাই বললো, 'সংসারে আমরা চারজন মানুষ। বাবা, মা এবং আমরা দুই ভাই। বাবা ছোট্ট একটি কারখানার দিনমজুর। কিছুদিন ধরে কারখানা বন্ধ। বাবা বেকার, এখন আবার অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। মা বাড়িতে বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে। আর আমরা দুই ভাই জুতো পালিশ করি।'

'তা এত ভোরে এসেছো কেন? তোমার ভাইটির চোখ এখনও তো ঘুমে ঢুলছে।' আমি বললাম।

'ভোরে এলে একটু বেশী রোজগার হয়। ভোরের গাড়ি ধরার জন্যে অনেক বাবুকে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরোতে হয় কি-না? তাই বাড়িতে জুতো পালিশ করার সময় পান না। এই হাওড়া স্টেশনে এসে হাতে সময় থাকলে তাদের কেউ কেউ জুতো পালিশ করে নেন।'

শুনলাম এর জন্যেই দুই ভাই খুব ভোরে হাওড়া স্টেশনে চলে আসে। জুতো পালিশ করে সকাল ন'টা পর্যন্ত। তারপর বাড়ি ফিরে যায়। বাড়ি কাছেই, এক বস্তিতে। বাড়ি গিয়ে স্নান সেরে দুমুঠো মুড়ি খেয়ে যায় স্কুলে। বড় ভাই চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। ছোটটি পড়ে প্রথম শ্রেণীতে। স্কুল থেকে ফিরে বিকেলে ভাত খায়। তারপর আবার চলে আসে এই হাওড়া স্টেশনে জুতো পালিশের বাক্স হাতে নিয়ে। কাজ চলে রাত আটটা, কখনও বা রাত নটা পর্যন্ত।

সম্প্রতি সরকারী ব্যবস্থাপনায় হাওড়া স্টেশনের প্রাঙ্গিনা থেকে সমস্ত হকার এবং ভিক্ষুককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার জন্যে এটার দরকার ছিল। কিন্তু প্রশ্ন এই, স্টেশনের চত্বরে ওই বুটপালিশওয়ালা শিশুর মত শত শত আরও যে সব শিশু অবস্থান করতো তারা গেল কোথায়? তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্যে কতটুকু কাজ করেছেন আন্তর্জাতিক শিশু-বর্ষ উপলক্ষে শিশু কল্যাণের দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত, তাঁরা?

শুধু জুতো পালিশ নয়। কলকাতা এবং কলকাতার শহরতলিতেই দেখতে পাবেন হাজার হাজার শিশু। যাদের বয়েস আট থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে। ওদের কাউকে দেখতে পাবেন ভোরের ট্রেনে, বাসে অথবা ট্রামে। শীর্ণ চেহারা। জীর্ণ পোশাক। হাতে একটি করে ছোট্ট থলি। থলির মধ্যে শুকনো দু টুকরো রুটি এবং যৎসামান্য গুড়। বেলুড়, শ্রীরামপুর, সোদপুর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে। ওদের কেউ কেউ কাজ করে ছোট ছোট কারখানায়। কেউ কাজ করে দড়ির কলে অথবা চায়ের দোকানে। কারোর কাজ ফাউণ্ড্রি বা লেদমেশিন শপের সাহায্যকারীর। ওরা কেউ আসে সকাল ছ'টায়। কেউ আট অথবা ন'টায়। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নিয়মমাফিক কাজ। তারপর কেউ কেউ করে ওভারটাইম। ওভারটাইমের পর বাড়ি ফেরে রাত আটটা, ন'টায়। কেউ বা রাত দশটায়।

কয়েক দিন আগে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের রাত সোয়া ন'টার একটি ট্রেনে পরিচয় হলো কয়েকটি ছেলের সঙ্গে। হাওড়ার একটি লেদমেশিন শপে কাজ করে। ওই ট্রেনে বাড়ি ফিরছে। ছেলেগুলির বয়েস দশ থেকে চোদ্দর মধ্যে। বাড়ি কারোর বেগমপুর, কারোর বারুইপাড়া। জন তিনেক বললো, তাদের বাড়ি কামারকুণ্ডু।

মাছি শিশুরোগের অন্যতম কারণ

জিজ্ঞেস করেছিলাম ওদের, 'কি কাজ করো তোমরা?'

একজন বললো, সে টার্নারকে সাহায্য করে। আর একজন বললো, সে সবে কাজে লেগেছে। এখন তার কাজ মেশিনম্যানদের ফাইফরমাশ খাটা, চা আনা থেকে শুরু করে মেশিন পরিষ্কার, উৎপাদিত সামগ্রী গুছিয়ে রাখা এমন ধরনের কাজই আপাতত তাকে করতে হয়। শুনলাম, কেউ কেউ সেমি-টেকনিক্যাল কাজও করে ওদের মধ্যে।

প্রশ্ন করেছিলাম, এসব করে কত মাইনে পাও তোমরা?

তিনটি ছেলে জানালো, তাদের কোনও মাইনে নেই। কোম্পানি (মালিককে ওরা কোম্পানি নামেই ডাকে) ট্রেনে যাতায়াতের জন্যে মাসিক টিকিটের দামটি দেয়। আর দেয় দুপুরের টিফিন স্বরূপ কোয়ার্টার পাউণ্ডের একটি পাঁউরুটি এবং চা। কোম্পানি ওদের বলেছে, বছরখানেক যাক, আগে ওরা কাজ শিখুক, তারপর মাইনের ব্যবস্থাটা বিবেচনা করা হবে।

অবশিষ্ট ছেলেদের মাইনে কারোর তিরিশ টাকা, কারোর পঞ্চাশ, কারোর বা সত্তর।

কিছুটা লেখাপড়া ওরা করেছে। তবে ওই ক্লাশ থ্রি বা ফোর পর্যন্ত।

অনেক সমাজবিজ্ঞানীর বক্তব্য, এ এক বিপর্যয়কর অবস্থা। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু দিনমজুরের কাজে যোগ দেয়। কেউ কেউ কাজ করে দুমুঠো খাবারের আশায়, কেউ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে। মালিকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের ঠকায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সেটা তারা বুঝতে পারে, তখন তাদের অনেকেই হয়ে পড়ে 'ডেলিংকুয়েন্ট'। চুরি, রাহাজানি এবং নানারকম অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়।

'কখনও এসব কাজে পুলিসও তাদের ইন্ধন যোগায়।' মন্তব্য করেছেন আর একজন সমাজ-বিজ্ঞানী। 'বিশ্বাস না হয় একটু লক্ষ রাখলে নিজেই দেখতে পারেন। শহর বা শহরতলীর জনবহুল মোড়ে গিয়ে দাঁড়ান। দেখবেন, হিমালয়ের মত একটি ট্রাক আসছে মাল বোঝাই করে। মোড়ের কাছে আসতেই ট্রাকটির গতি অস্বাভাবিকভাবে কমে গেল। ওই সময় দেখবেন, ছোট্ট একটি ছেলে গিয়ে হাজির হলো ট্রাক ড্রাইভারের সামনে। ভেতর থেকে ড্রাইভারের একটি হাত নেমে এলো ছেলেটির মুঠোর মধ্যে। আর তার পরক্ষণেই ট্রাকটি সবেগে চলে গেল। এবং ছেলেটি এসে দাঁড়ালো মোড়ের কর্তব্যরত পুলিসটির পাশে। অর্থাৎ এক কথায় ঘুষ নেওয়ার ব্যাপারে ছেলেটি পুলিসকে সাহায্য করলো।'

*

সমাজের দরিদ্র শ্রেণীদের নিয়ে যেমন, তেমনি যারা কিছুটা বিত্তবান অথবা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উঁচুতলার মানুষ, তাদের ক্ষেত্রেও শিশুদের যথাযথ লালন পালন এখন একটি বড় রকমের সমস্যা।

যেমন ধরুন, অনেক পরিবারে বাবা-মা দুজনেই চাকরি করেন। তাঁদের কাছে সন্তানপালন তখন কখনও কখনও রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় এ ধরনের দম্পতিদের নির্ভর করতে হয় আয়া অথবা ভৃত্যের ওপর। ওই আয়া অথবা ভৃত্যের উপর আরোপিত হয় তাঁদের শিশুপালনের দায়িত্ব। এতে সমস্যা দাঁড়ায় এই: এক, বাবা এবং মা'র একান্ত সান্নিধ্য লাভে শিশুরা বঞ্চিত হয়। অনেক সময় এই বঞ্চনা শিশুদের মধ্যে বিরূপ মানসিকতা সৃষ্টি করে। যা পরবর্তী জীবনে তাদের করে তোলে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর এবং অসামাজিক। দুই, ওই ধরনের শিশুদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে যথাযথ মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে না। তিন, কখনও কখনও ওই ধরনের শিশু অপরাধপ্রবণ হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক এবং পারিপার্শ্বিক সুযোগ-সুবিধের দরুন, হয়তো তারা পেশাগত জীবনে সফলও হয়। কিন্তু তাদের মানসিকতার মধ্যে শেষ পর্যন্ত এমন ধরনের ত্রুটি থেকে যায়, যা দেশ এবং দশের বৃহত্তর স্বার্থে নিতান্তই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যাঁরা বেশী সমর্থ, ইদানীং দেখা যাচ্ছে, তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই যৌন অপরাধ এবং উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক বেশী। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এর জন্যে দায়ি ওই সব ছেলেমেয়েদের বাবা মা। কারণ তথাকথিত কেরিয়ার, স্ট্যাটাস, স্থূল সম্ভোগ এবং অর্থহীন সামাজিকতার নামে ছেলে-মেয়েদের সামনে দিনের পর দিন তাঁরা এমন ধরনের আচরণ দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরেন যা সন্তানের মধ্যে বলিষ্ঠ মানসিকতা এবং নির্ভরযোগ্য চরিত্র স্ফুরনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে শিশু-বয়েস থেকেই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে গড়ে ওঠে অপরকে অশ্রদ্ধা করার প্রবণতা, মানবিক-বৃত্তির প্রতি অনীহা।

*

বলা বাহুল্য, শিশুকল্যাণ পৃথিবীর সব দেশেই একটা বড় রকমের সমস্যা। এবং এই সমস্যা, দেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম, সামাজিক এবং পারিবারিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। সামগ্রিকভাবে এই সমস্যার মোকাবিলার জন্যে সারা বছর ধরে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সুখের কথা, এর উদ্যোক্তা স্বয়ং ইউনেসকো। ভারত সরকার ইউনেসকোর সহযোগিতায় এই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু প্রকল্পও হাতে নিয়েছেন। যার মূল লক্ষ্য, ভারতীয় শিশুদের কল্যাণ, যার

করা যার দ্বারা এ দেশের শিশুরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানসিকতায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

সন্দেহ নেই, উদ্দেশ্যটি মহৎ। কিন্তু দেখতে দেখতে শিশুবর্ষের বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলো। ইতিমধ্যে শিশুবর্ষ উদ্‌যাপনের নামে কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে আড়ম্বরের সঙ্গে কিছু কিছু অনুষ্ঠানও হয়ে গেল। এদেশে সচরাচর যা হয়, তাই। মন্ত্রীর বাণী, প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করে নাটক, খেলাধুলা, রাজভবনে রাজকীয় সাজসজ্জায় সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীর শিশুদের নিয়ে উৎসব—ব্যস। শিশুদের মানসিক উন্মেষের জন্যে বই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাদের মধ্যে বিজ্ঞানের বইও আছে। সেই সব বই রচনার মধ্যে সুষ্ঠু কোন পরিকল্পনা নেই।

সম্প্রতি রাঁচি থেকে নেতারহাটে গিয়েছিলাম। পথে জনৈক শিক্ষকের সঙ্গে কথা হলো। ভদ্রলোক ঘাঘরার কাছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ান। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে আপনারা কী করছেন?

ভদ্রলোক বললেন, আমাদের গরীব স্কুল। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা পড়ে। এখন তো বর্ষাকাল, আসুন না আমার স্কুলে। দেখবেন ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ছে। বেশির ভাগ ছাত্র রোগের আকর। হুকওয়ার্মের শিকার। ওরা দূরে পাহাড়ে গ্রাম থেকে পড়তে আসে। খালি পায়ে। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ তো শুধু কাগজে পড়ি, আর রেডিওতে শুনি। ওঁদের বলুন না, আমাদের বাচ্চাদের এই স্বাস্থ্য সমস্যাটার একটা প্রতিবিধান করে যান।

গত কয়েক সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের কয়েকটি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল ঘুরে এসেছি। সর্বত্রই একই কথা: আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের মূল লক্ষ্য কি, অনেকেই তা জানেন না।

এদিকে খবরে দেখছি, দেশের কয়েকজন শিশুকে জাপানের আন্তর্জাতিক শিশু উৎসবে যোগদানের জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনুমান করা শক্ত নয়, ওই সব শিশু সমাজে সবচেয়ে বেশী সুযোগ পান যাঁরা, তাঁদের সন্তান। শুনছি, শিশুবর্ষ উপলক্ষে শিশুচলচ্চিত্র তোলা হবে। আরও অনেক পরিকল্পনাই নেওয়া হয়েছে, যাদের সঙ্গে দেশের শতকরা ৯০ শতাংশ শিশুর সত্যিকারের কল্যাণের যোগ আছে কি-না, বলা শক্ত। আন্তর্জাতিক অনুদান এবং আংশিক সরকারী সাহায্যের অর্থহীন ব্যয় এবং কিছু সুযোগসন্ধানীর স্বার্থসিদ্ধি—এই যা।

*

ইউনেসকোর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের লক্ষ্য কিন্তু পরিষ্কার। শিশুদের কল্যাণসাধন। এবং এই উদ্দেশ্যে, বর্তমান বছরে এমন কিছু কিছু প্রকল্প চালু করার কথা যার দ্বারা দেশের বেশীর ভাগ শিশু উপকৃত হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই প্রকল্পের লক্ষ্য, শুধু এক বছর ধরে শিশুদের স্বার্থে কিছু বিক্ষিপ্ত কাজকর্ম করেই থেমে যাওয়া নয়, সেই সব কাজকর্ম ভবিষ্যতেও যাতে নিয়মিত চালু থাকে সে দিকটা দেখা।

তাই যদি হয়, তা হলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কিছু কার্যক্রম এখনও চোখে পড়ছে না কেন?

যেমন:

এক। শিশু স্বাস্থ্য। শহরের অনুন্নত অঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে শিশুস্বাস্থ্য এখনও পর্যন্ত একটি বড় রকমের সমস্যা। বহু শিশু জন্মের পর থেকেই অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে। ভিটামিন-এ'র অভাবে অনেক শিশু অন্ধ। অনেকে অন্ধত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া আমাশয়, ক্রিমি, উদরাময়জনিত শিশু রোগীর সংখ্যাও প্রচুর। শিশুবর্ষে আমরা আশা

একটু সচেষ্ট হলে এ ধরনের উদ্যোগ কি নেওয়া যায় না? এ কাজটি হয়তো এইভাবে করা যায়। দেশের সর্বত্র কোনও না কোনও রকম বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছেই। যেমন পাঠাগার, খেলার ক্লাব, প্রভৃতি। ওদের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় চিকিৎসকের সাহায্যে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলের ছেলে-মেয়েদের এবং বিভিন্ন পরিবারের ছেলে-মেয়েদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ কাজে দেশের মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী অথবা নতুন পাস করা চিকিৎসকরাও সাহায্য করতে পারেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মত প্রতিষ্ঠানও উপযুক্ত সহযোগিতার মাধ্যমে এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

দুই। শিশুদের অপুষ্টি। উপযুক্ত পরিমাণ খাবারের অভাবই অপুষ্টির একমাত্র কারণ নয়, অনেক সময় খাবারের খাদ্যগুণ সম্পর্কে অবহিত না থাকার দরুনও শিশুদের মধ্যে পুষ্টি-সমস্যা দেখা দেয়। এর জন্যে শিশুদের যেমন উপযুক্ত শিক্ষা দরকার, সেই সঙ্গে তাদের বাবা-মা'রও জানা দরকার সুষম খাদ্য কাকে বলে। নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে থেকেও ছেলে-মেয়েদের কীভাবে সুষম খাদ্য যোগানো যায়। এ ধরনের উদ্যোগেও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য করতে পারেন। ছেলে-মেয়ে এবং তাদের বাবা-মা'দের মধ্যে পুষ্টি শিক্ষা প্রচারের জন্যে গ্রীষ্ম অথবা পুজোর ছুটির সময় কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও দলবদ্ধভাবে গ্রামে গিয়ে কাজ করতে পারেন।

তিন। অনুন্নত অঞ্চলের প্রতিটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী যাতে স্কুলে টিফিন পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। 'কেয়ার', সরকারী ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় অধিবাসীরা এ ব্যাপারে যাতে সচেষ্ট হন, দেখা দরকার।

চার। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত খেলাধুলার ব্যবস্থা করা দরকার। এ ব্যাপারেও স্থানীয় খেলার ক্লাব দায়িত্ব নিতে পারেন।

পাঁচ। শিশু মজুর প্রথা লোপ করার জন্যে আইন প্রণয়ন করা দরকার। পৃথিবীর অনেক দেশে ষোল বছরের কম বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের চাকুরিতে নিয়োগ করা আইনানুযায়ী নিষিদ্ধ।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, অভাবে পড়লে কোন বাবা-মাই বা তাদের ছেলে-মেয়েদের কম বয়েসে চাকুরিতে পাঠায়? কথাটা ঠিক। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যা, অনেক পরিবার ছোট ছেলে-মেয়েদের একান্ত নিরুপায় হয়েই কাজে পাঠান। এ ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে ওই শিশুকে তার কর্মকর্তা না ঠকাতে পারেন। তিনি শিশু মজুরদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবেন।

ছয়। অনিবার্য কারণে যে সব শিশু দিনে লেখাপড়ার সুযোগ পায় না, তাদের জন্যে নৈশ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা তো করা যায়?

সাত। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাবা-মা অসমর্থ হলে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে পুরোপুরি সরকারী দায়িত্বের প্রয়োজন।

আট। শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্যে নানা রকম বই প্রকাশের প্রয়োজন আছে। ইতিমধ্যে প্রকাশিতও হয়েছে অনেক। কিছু কিছু বই-এ উপস্থাপনাগত অসঙ্গতি এবং তথ্যগত ত্রুটি চোখে পড়ছে। এ ব্যাপারে আমরা কিছু কিছু অভিযোগও পেয়েছি। এসব দেখে মনে হয়, একটি নিরপেক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য সংস্থা থাকা দরকার। যার কাজ হবে প্রকাশ করার আগে পাণ্ডুলিপিগুলি একবার পরীক্ষা করা।

আসলে ঘটা করে সভাসমিতি না করে, আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের উদ্যোক্তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা এমন কিছু করুন, যা শিশু কল্যাণে একটা স্থায়ী কর্মসূচী হয়ে থাকুক। শিশুর মুখে

বাংলায় ভাগচাষের বিবর্তন ঃ ১৮৮৫-১৯৫০

চিত্তব্রত পালিত

ভাগচাষের স্থিতাবস্থা এতই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয় যে, তার বিবর্তনের কথা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভাগচাষের অর্থনীতি স্থাবর, অপরিবর্তনীয়, গতিহীন—এই মতই প্রচলিত। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে বাংলায় ভাগচাষের ক্রমবিবর্তনের পর্যায়গুলি অবশ্যই ধরা পড়ে।

বুকানান-হ্যামিলটন উনিশ শতকের শুরুতে দিনাজপুরে যে ব্যাপক ভাগচাষের কথা উল্লেখ করেছেন (তাঁর হিসেবে ঐ সময়ে দিনাজপুরে ১,৫০,০০০ জন আধিয়ার বা ভাগচাষী ছিল) তার অন্য ব্যাখ্যা সম্ভব। যেমন মুদ্রার অপ্রতুলতার জন্য শস্যকর বা সাঁজা দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বন কেটে বসত বসাবার জন্য যখন কোন ভ্রাম্যমাণ চাষীর দলকে নিয়োগ করা হত, তখন তাদের মাঝি বা দলপতি সঙ্গীসাথীদের নিয়ে যজমানী প্রথায় গ্রাম বসাত। এই দুই ক্ষেত্রে সম্পন্ন চাষী দলপতি, মাঝি, মোড়ল বা পরামানিক প্রজার কাছ থেকে ফসলের ভাগ বা অর্ধেক নিলেও তার চরিত্র ছিল ভিন্ন। হ্যামিলটন যে বিপুলসংখ্যক ভাগচাষীর কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে সাঁজা-চাষী বা আবাদী দলপতির অনুচরেরাও অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়। তা সত্ত্বেও, ভাগচাষের প্রকৃত স্বরূপও এই সময়েই প্রকটিত হয়। জমির মালিক নিজে না চাষ করে ভাগচাষীকে ফসলের অর্ধেক ভাগাভাগির চুক্তিতে জমিতে বসাচ্ছেন, এই তথ্য হ্যামিলটন বিশদভাবে দিয়েছেন। তিনি ধান-চালের ব্যাপক ব্যবসার কথা উল্লেখ করেছেন যার ফলে অর্থকরের ফসলের অর্ধেক জমির মালিকের কাছে অনেক বেশী লাভের ছিল।

আমাদের আলোচ্য সময়ে ভাগচাষের এই রূপটিই ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। কারণ ঃ

(ক) জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং বাড়তি ও শিল্পচ্যুত লোকের কৃষিনির্ভরতা; (খ) কৃষির বাণিজ্যায়ন; (গ) কৃষিপণ্যের যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি; (ঘ) ১৮৮৫ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে জমির উপর মালিকের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাবার আশঙ্কায় জমিদার এবং জোতদারদের বর্গাপ্রথায় জমি বিলি-বন্দোবস্তের প্রতি আসক্তি—দিনাজপুর, ঢাকা, যশোর, বাখরগঞ্জ, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার সেটলমেণ্ট রিপোর্টে এর প্রমাণ মেলে। (ঙ) এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় জমিতে অনুপস্থিত ভদ্রলোক মালিকের বর্গা-নির্ভরতা।

এই সমস্ত চাপের ফলে ভাগচাষের ব্যাপক বৃদ্ধি না হয়ে একেবারে ধনতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার প্রচলন না হবার পিছনে কারণ ছিল।

(ক) কৃষিপণ্যের বাজারে দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপক চাহিদা গড়ে ওঠেনি;

(খ) বাজারদরও ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার উপযুক্ত লাভের পক্ষে অনুকূল ছিল না;

(গ) দিনমজুরের মজুরী দিয়ে নিজের খরচে চাষের ব্যবস্থা করা ১০০ বিঘার নীচের জোতদারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মজুর পাওয়াও দুষ্কর ছিল;

(ঘ) চাষের জমি ছোট ছোট খণ্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় দিনমজুর রেখে চাষের দেখাশোনা করার অসুবিধে ছিল;

(ঙ) ভদ্রলোক এবং জমিতে অনুপস্থিত জমিদার-জোতদারদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ভাগচাষই আয়-বৃদ্ধির চূড়ান্ত বলে তারা মেনে নেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাগচাষ অনেক বেশী কাম্য ছিল। মজুরের, অর্থবিনিয়োগের, চাষ দেখাশোনার কোন দায়িত্বই এই ব্যবস্থায় জোতদারের নেই। ফসলের অর্ধেকের বাজারদরে মূল্য অর্থকরের চেয়ে অনেক বেশী। এর উপরে টাকা বা ধান কর্জ দিয়ে বা বীজ ও সার সরবরাহ করে বা পরবর্তীকালে (১৯৩০-৩৫ থেকে) ধানভানাই [illegible] ভাগচাষীকে ঋণের বোঝায় বাঁধা রেখে তার প্রাপ্য ফসলের অর্ধেক থেকে সুদ হিসেবে প্রায় অনেকটাই উশুল করা সম্ভব ছিল। ফলত তার অবস্থা খোরাকির বিনিময়ে ভূমিদাসের মতো হয়ে পড়েছিল। দিনমজুরের চেয়েও সস্তায় এই শ্রমজীবীকে ব্যবহার করে নামমাত্র খরচে জোতদার অনেক বেশী বাণিজ্যপণ্য বাজারে সরবরাহ করে ধনী হতে থাকল।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আমাদের আলোচ্য সময়ে বর্গাদারের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরা প্রায়শই নতুন চুক্তিবদ্ধ প্রজা ছিল না। ছোট চাষীরা দেনার দায়ে জমি বন্ধক রাখার ফলে বা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হওয়ায় তারাই নিজ নিজ জমিতে বর্গাদারে রূপান্তরিত হয়। ফ্লাউড কমিশনের (১৯৪০) বিবৃতিতে দেখা যায় ১৯২৮-৪০ সময়ের মধ্যে ৩৫,৪৭০·০৪ একর তদন্তাধীন জমির মধ্যে ৫,৯২৩·৩৫ একর জমি হস্তান্তরিত হয়, তার মধ্যে ৩৮% চাষীপরিবার কেনে, ৩১·৭% বর্গায় যায়, এবং মাত্র ৫·৭% ক্ষেতমজুর দিয়ে চাষের আওতায় পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে একই জমিতে চাষ করতে থাকায় ছোট চাষীর এই অবস্থান্তর তৎকালীন আমলাদের ভালোভাবে চোখে পড়েনি। ভূমির স্বত্ব থেকে ছোট চাষীর ভূমিহীনতাতে নেমে যাওয়া এক তীব্র অধোগতি, যেটা বহু ঐতিহাসিকেরই অগোচরে থেকে গেছে। এটা একটা গুণগত পরিবর্তন বলে আমি মনে করি। এ ছাড়া নতুন চুক্তিতে যারা বর্গাদার হল তারাও দিনমজুরের খোরাকি-মজুরীর মতোই সামান্য ফসল খোরাকি-মজুরী হিসেবে পেতে থাকল। ভাগচাষীর কিঞ্চিৎ সচ্ছলতাও এদের জুটল না। কারণ ভাগচাষ উনিশ শতকের গোড়ায় বা মধ্যে যা ছিল, বিশ শতকে আর তা ছিল না। এই অবস্থা সামন্ততান্ত্রিক স্থিতাবস্থার পুনরাবৃত্তি নয়। ব্রিটিশ শাসনে গ্রামীণ অর্থনীতি একই কাঠামোয় স্থাণু হয়ে রইল, এই মত সমর্থন করা যায় না। ভাগচাষের অন্তরালে গ্রামীণ সমাজের এক ধরনের অধোগতি আত্মগোপন করেছে। ভূমির ধারাবাহিক হস্তান্তর, ছোট চাষীর বর্গাদারে রূপান্তর এবং বর্গাদারের ভূমিদাসে পরিণতির ঘটনা ভাগচাষের আপাতস্থিতিস্থাপকতার আড়ালে ঘটে গেছে।

বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে ধরলে বর্গায় দুটি পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যায়।

(ক) যদি কৃষিপণ্যের বাজারদর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, তবে জোতদার বর্গাদার উচ্ছেদ করে দিনমজুর দিয়ে জমি চাষের দিকে নজর দেবে। এন এস এস-এর আধুনিক খতিয়ানে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের বৃদ্ধি লক্ষণীয়;

(খ) বর্গাদারেরা একজোট হয়ে এবং রাজনৈতিক দল প্রভাবিত হয়ে কৃষক আন্দোলনের জন্ম দিতে পারে।

১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনই প্রমাণ। এ[র] ফলে পঞ্চাশের দশকে নানান বর্গাদারী আইন হয় এব[ং] বর্গাদারের বিনিয়োগ অনুযায়ী ফসলে অধিকার, জমিতে লিপ্ত থাকার অধিকার প্রভৃতি স্বীকৃতি পায়।

বর্তমানে সরকার বর্গাদারদের ভূমিভিত্তি[ক] অধিকারের যে খতিয়ান তৈরি করেছেন তার ফলে বর্গা[-] দারদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে সন্দেহ নেই। হয়তো খোরাকি-মজুরীর দীন অবস্থা থেকে বর্গাদার আবা[র] সামান্য ফসল-কর দেবার বিনিময়ে জোতদারের জ[মি] ভোগদখল করার স্বত্ব পাবে। কিন্তু জমির পূ[র্ণ] সদ্ব্যবহার বা ফলন হয়তো এভাবে সম্ভব হবে না। জোতদার বিনিয়োগের ঝুঁকি নেবে না [...] বর্গাদারের লগ্নী করার মতো মূলধনই থাকবে না, ভাগের মা গঙ্গা পায় না। জোতদারের স্বত্বও বজা[য়] থাকলে শ্রেণী-সংঘাত চলতে থাকবে। কারণ, এ[ই] ব্যবস্থায় জোতদারের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে।

যদি ভূমিসংস্কার করে বাড়তি জমি ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করে তাকে ছোট চাষীতে পরিণত করা যায় বা গ্রামাঞ্চলে শ্রমনিবিড় শিল্প তৈরি করে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা যায়, বর্গাদার কায়েম করার চেয়ে হয়তো সেসব ব্যবস্থা শ্রেয় বলে বিবেচিত হবে। বিলির জমি চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ভূমিসংস্কার চরমে পৌঁছলে শুধু ছোট চাষীই থাকবে। এই অবস্থায় শিল্পায়ন সম্ভব না হলে, একই জমিতে দুনো ফসলের মতো জোতদার এবং বর্গাদার দুইয়ের অধিকার মানতেই হয়। নচেৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভরণ-পোষণ সম্ভব নয়। বর্গাদারী প্রথায় অধিক ফসল ফলাও নীতি কতটা কার্যকর করা যায়, সরকার সেই ব্যবস্থাই নেবেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। বুকানান-হ্যামিলটন—দিনাজপুর, ১৮০৮।
২। বেল—দিনাজপুর সেটলমেণ্ট রিপোর্ট।
   বেল—ট্যুর ডায়েরী (অপ্রকাশিত)।
৩। অ্যাসকোলি—ঢাকা সেটলমেণ্ট রিপোর্ট।
৪। জ্যাক—বাখরগঞ্জ সেটলমেণ্ট রিপোর্ট।
৫। রবার্টসন—বাঁকুড়া সেটলমেণ্ট রিপোর্ট।
৬। হিল—বর্ধমান সেটলমেণ্ট রিপোর্ট।
৭। কার্টার—মালদা সেটলমেণ্ট রিপোর্ট।
৮। রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্ট—টুয়েণ্টি ইয়ারস স্ট্যাটিস্টিক্স ১৮৮০—১৯০০।
৯। রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্ট—ট্রায়েনিয়াল রিপোর্ট।
১০। বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং ইনকোয়ারী কমিটি—১৯৩০-৩৫।
১১। কে এল দত্ত—অ্যান এনকোয়ারী ইনটু দি ইমপ্যাক্ট অফ দি রাইজ অফ প্রাইসেস।
১২। ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট, ১৯৪০।
১৩। সেনসাস—১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১।

মাজা-র এই রাজসিক স্বাদের অনুভূতি....কোনো বড় শহরে বাস করার অনুভূতির মত... স্ট্রবেরী, আনারস আর কমলালেবুর স্বাদে! ঠাণ্ডা জলে গুলে নেড়ে নিন! তাহলেই এই সুস্বাদু পানীয় তৈরী—আর তা কত চটপট! সফ্‌ট্‌স্ লস্‌সী ককটেল ইত্যাদিতেও এ বেশ ভালভাবে গুলে যায়।

মাজা-র এমনই মজা, যে এর প্রতিবার পরিবেশনের ক্ষণটিই মনে হবে এক বিশেষ ক্ষণ! আর আপনার ছেলেমেয়ে, অতিথি সবাই পছন্দ করবে এর রসালো স্বাদ!

মাজা-তে আছে পুষ্টিদায়ক—ভিটামিন এ, সি ও ডি আর ক্যালসিয়াম। এক গ্লাস মাজা একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রতিদিনের ৭৫%-এর বেশী ভিটামিন সি-র প্রয়োজন পূরণ করে। আজই এক বোতল মাজা আপনার বাড়ীতে রাখুন।

—আপনার আর আপনার অতিথিদের জন্যে— যাঁরা সারাজীবন শুধু ভাল জিনিষ ব্যবহারেই অভ্যস্ত!

FREE! Write for Maaza Recipe Book which tells you all about the many delicacies you can prepare with Maaza, to Parle Beverages Pvt. Ltd., MID Department, Western Express Highway, Chakala, Andheri (E), Bombay 400 093

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট অধিনায়ক কিম হিউয়েজ

পঁচিশ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার নতুন অধিনায়কের মুখের আদল যেমন পনেরো বছরের একটি বাচ্চা ছেলের মতো, তেমন মুখে বড় বড় বুলি নেই। মাথার কোঁকড়া চুলের মতো মুখের কথায় নেই তেমন প্যাঁচঘোচ। মনে যা ভাবেন মুখেও তাই বলে ফেলেন। ভারতে এসে তাই বলেছেন—"বাম্পার আমরা দেব। বাম্পার ফাস্ট বোলারদের আইনসিদ্ধ অস্ত্র। টেল-এণ্ডার ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধেও বাম্পার দেব, যদি ওই টেল-এণ্ডার স্বীকৃত ব্যাটসম্যানের মতো ব্যাট করে।"

কোনো নতুন কথা নয়। তবে এই কথাগুলোই অন্য অধিনায়করা বলে থাকেন শর্ট পিচ বল বা বাম্পার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হবার পর। জন কিম্বার্লি হিউয়েজ আগেই বলে ফেললেন।

নিজের সম্পর্কে হিউয়েজের কথায় মধ্যেও কোনো মারপ্যাঁচ নেই। কথাগুলো সরল বালকের মতোই।

"আমি নিজেই আমার বড় শত্রু। কেননা প্রায়ই আউট হয়ে যাই ঝুঁকি নিয়ে স্ট্রোক করতে গিয়ে। অনেক কোচই আমাকে ধীরে চলার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু আমার রানের ক্ষুধা এবং স্ট্রোক করে খেলার প্রবণতা সেহেতু ঝুঁকি নেওয়ার ঝোঁকও সহজাত।"

এই রান স্ট্রোকের জন্যই ভারতে আসার আগে ১১টি টেস্টের কুড়ি ইনিংসের মধ্যে হিউয়েজ একবার ছাড়া সেঞ্চুরি করতে পারেননি। বড় রানের ইনিংসও বেশি নেই। হয় সূচনার মুখে ব্যর্থ হয়েছেন, না হয় সুন্দর সূচনায় উপর যবনিকা টেনেছেন দায়িত্বহীন স্ট্রোক করে। কখনো অফ স্পিনন বল ব্যাককাট করতে গিয়েছেন, কখনো আউট সুইং বল কভার ড্রাইভ করতে চেষ্টা করেছেন, কখনো বা অফস্টাম্পের বাইরের বল খোঁচা মেরে ক্যাচ দিয়েছেন।

৭৮-৭৯-র অ্যাসেজ সিরিজের কথাই ধরা যাক। ব্রিসবেন মাঠের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ইনিংসে ধস নামছে। চার উইকেটে মাত্র বাইশ রান। ওই বিপর্যয় সত্ত্বেও হিউয়েজ বথামের আউট সুইংগারে কভার ড্রাইভ করার লোভ সামলাতে পারলেন না। ফলে অস্ট্রেলিয়া এসে দাঁড়াল ৫—২৪ রানে। অনুশোচনায় নিজেকে অভিসম্পাত করে বলেছিলেন, "এর পর থেকে আর হঠকারিতা নয়। ধীরে চলব। চ্যাপেল, বয়কট সিম্পসনরা যদি দশটি সেঞ্চুরির মধ্যে নয়টি করে থাকেন চার ঘণ্টার মতো সময় নিয়ে আমি কেন দেড়শো মিনিটে সেঞ্চুরি চাইব?"

ফল ফলল হাতেনাতে। ওই ব্রিসবেন টেস্টেরই দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৯ রান করলেন। ৪৭৬ মিনিটে। চার মেরেছিলেন মাত্র আটটি, ছয় দুটি। যদিও অস্ট্রেলিয়া হার এড়াতে পারেনি, তবু সংযম ও সৌন্দর্যের সহযোগে সৃষ্ট হিউয়েজের সেঞ্চুরিটির কথা অনেকেরই স্মরণে আছে। ক্রিকেট সমাজের সম্মানীয় শুভানুধ্যায়ীরা সেদিন হিউয়েজের পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, শীল্ড ইজ দ্যা টেস্ট টেম্পারামেন্ট।"

কিন্তু ক্ষুধা যার প্রচণ্ড এবং ঘন ঘন উপাদেয় আহারে প্রবৃত্তি ডাক্তারের নীতিকথা তার পক্ষে কতদিন পালনীয়? রানের ক্ষুধাতেই ঝুঁকি নিয়ে খেলার লোভ বেশি দিন সংবরণ করতে পারেন নি কিম হিউয়েজ। ফলে দ্বিতীয় টেস্টে আবার ব্যর্থতা।

হিউয়েজের এগারটি টেস্টের স্কোরগুলি যদি ব্যাটিংয়ের নজির নেই। যেমন : সাতাত্তরে ইংল্যাণ্ড সফরের জীবনের প্রথম টেস্টে মাত্র এক রান। বৃষ্টির জন্য দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সুযোগ মেলেনি। সাতাত্তরে-আটাত্তরে ভারতের বিরুদ্ধে হোম সিরিজের দুটি টেস্টের রান ২৮ ও ০ এবং ১৭ ও ১১। ফলে ৭৮-এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যেয়ে একটি টেস্ট খেলারও সুযোগ পাননি। অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যেয়েই অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের জন্য হাসপাতালে শয্যা নিতে হয়েছিল। আটাত্তর-উনআশীর হোম সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ছয়টি টেস্টের রান—৪ ও ১২৯; ১৬ ও ১২; ০ ও ৪৮; ৪৮ ও ১৫; ৪ ও ৪৬ এবং ১৬ ও ৭। এই বছরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি টেস্টে ১৯ ও ৮৪ এবং ৯ ও ০।

টেস্টের বাইরে কিন্তু ধারাবাহিক সাফল্যের পরিচয় আছে। সাতাত্তরে ইংল্যাণ্ডের শেষ টেস্টে অভিষেক হওয়ার আগে কেণ্টের বিরুদ্ধে করেন ৮০, গ্লস্টারের বিরুদ্ধে ৫১, এম সি সির বিরুদ্ধে ৬০, নটিংহামশায়ারের বিরুদ্ধে ৯৫, ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে ৯২ এবং ৮৯ রান করেছিলেন ল্যাংকাশায়ারের বিরুদ্ধে।

টেস্টে ভারতের বিরুদ্ধে মোটেই ভাল খেলতে পারেননি। চার ইনিংসে তিনবার আউট হয়েছিলেন বেদির বলে, মদনলালের বলে একবার। কিন্তু ভারতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে তাঁকে চোখ জুড়নো ৯৯ ও ৩৮ রান করতে দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিল—কেন হিউয়েজকে প্রথম টেস্টে মাঠে শুধু জল ও তোয়ালে বয়ে নেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল? বলা বাহুল্য, প্রধানত হিউয়েজের জন্যই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ওই ম্যাচে ভারতীয় দলকে হারিয়েছিল ১৫০ রানে এবং ওই ম্যাচে ভাল ব্যাটিংয়ের সুবাদেই হিউয়েজ দ্বিতীয় টেস্টে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর নিজের জীবনেরও দ্বিতীয় টেস্ট। কিন্তু আগেই লিখেছি, ইংল্যাণ্ডে প্রথম টেস্টে এক রান এবং স্বদেশে দ্বিতীয় টেস্টে ২৮ ও শূন্য। অ্যালান বর্ডারের পাঁচ টেস্টে ৪৪২, গ্রেম উডের ১০ টেস্টে ৮৭০, রিক ডার্লিংয়ের ৯ টেস্টে ৫৩৯ এবং বাতিল অধিনায়ক গ্রাহাম ইয়ালোপের ১৫ টেস্টে ১০৬৫ রানের পাশে অধিনায়ক হিউয়েজের ১১ টেস্টে ৫২২ রান নিশ্চয়ই দৃষ্টি-সুখকর স্কোর নয়। তবু কেন হিউয়েজ অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়কের সম্মান পেয়েছেন? কারণ, অধিনায়ক হিসাবে ইয়ালোপ ক্রিকেট জ্ঞান ও গরিমার পরিচয় দিতে পারেননি এবং অস্ট্রেলিয়া দলের হাল পারতেন তাঁরা প্যাকারের ওয়ার্লর্ড সিরিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। প্যাকারের সঙ্গে অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট বোর্ডের মিটমাট চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তাঁরা কেউ ভারত সফরকারী দলে স্থান পাননি।

হিউয়েজের উপর নির্বাচকদের আস্থা স্থাপনে আর একটি কারণ, হিউয়েজ ভাগ্যবান অধিনায়ক। বছর পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথম টেস্টের পর দ্বিতীয় টেস্টের আগে ইয়ালোপের পেশীতে যদি টান না ধরত তবে হিউয়েজ এত তাড়াতাড়ি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মুকুট মাথায় পরতে পারতেন কিনা সন্দেহ। হিউয়েজের অধিনায়কত্বেই প্যাকারের খেলোয়াড় বিহীন শক্তিহীন অস্ট্রেলিয়া দল ৭ উইকেটে হারায় প্যাকারের খেলোয়াড়পুষ্ট শক্তিশালী পাকিস্তানকে। প্রুডেন্সিয়াল বিশ্বকাপেও হিউয়েজ অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক হন, যদিও বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া তেমন ভাল খেলতে পারেনি। অধিনায়কেরও নেই কোনো গৌরবময় ভূমিকা।

ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটে প্রতিষ্ঠা অর্জনের একটা রোখ হিউয়েজের মনে চেপে বসে। বাবা ছিলেন মোটামুটি ধরনের একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়। স্কুল ও কলেজে খেলেছেন। কিন্তু গ্রেড ক্রিকেটে নয়। বাবার কাছ থেকেই খেলার নেশার ধরে। ১৩ বছর বয়সে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে পাকাপাকিভাবে ঘাঁটি বাঁধার পর ক্লাবে ফ্র্যাংক প্যারী নামে একজন দরদী ক্রিকেট কোচকে পেয়ে যান।

হিউয়েজ নিজে বলেছেন, "ফ্র্যাংক প্যারী কখনো আমার খেলার ধারা বদলের পরামর্শ দেননি। খুশিমতো স্ট্রোক করার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন।"

সম্ভবত তার ফলই স্ট্রোকের দিকে সহজাত প্রবণতা। ছোট বেলার অভ্যাস সহজে ছাড়া শক্ত। বড় ক্রিকেটে হিউয়েজের প্রবেশ মাত্র তিন বছর আগে। নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে গ্রেড ক্রিকেটের প্রথম খেলাতেই করেন উপভোগ্য ১১৯ রান। তারপর ৭৬-৭৭-এ সফরকারী পাকিস্তান একাদশের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৩৭ রানের আর এক প্রশংসিত ইনিংস। স্বাভাবিকভাবেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় এবং একটা বড় বাসনা মনের কোণে বাসা বাঁধে। সে বাসনা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হওয়া। কিন্তু যে দেশের অধিনায়ক হয়েছেন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ডন ব্র্যাডম্যান এবং লিণ্ডসে হ্যাসেট, রিচি বেনো, ববি সিম্পসন, ইয়ান চ্যাপেলের মতো সব ধুরন্দর ক্রিকেটার, সে দেশের অধিনায়ক হতে হলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। সাধনা অবশ্যই করেছেন। ছোটবেলায় তো পাড়ার রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের বিরুদ্ধে টেনিস বল পিটিয়ে মারের ডিরেকশন নিখুঁত করার চেষ্টা করতেন। পড়াশুনোর সঙ্গে ক্রিকেটের সাধনা করে গেছেন নিবিড়ভাবে। প্রাইমারি স্কুলে ও হাই স্কুলে যেমন ফার্স্ট বয় ছিলেন, তেমন ক্রিকেটেও ছিলেন সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ব্যাটসম্যান। পরে শিক্ষকের জীবনের সঙ্গে ক্রিকেটকেও জড়িয়ে ফেলেন। এখন অবশ্য একটি আবাসন সংস্থার ডেভেলপমেণ্ট অফিসার।

সাদাসিধে জীবনযাপন, খোলামেলা কথা এবং উঁচু চিন্তা হিউয়েজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সাতাত্তরে ইংল্যাণ্ডে যাঁরা টেস্ট খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন বাদে বাকি সবাই যোগ দিয়েছিলেন প্যাকারের ওয়ার্লড সিরিজে। তিন জনের মধ্যে একজন কিম হিউয়েজ।

কেন তখন প্যাকারের দলে নাম লেখাননি? এই প্রশ্নের উত্তরে হিউয়েজ বলেছেন, "প্রথমে আমার ডাক আসেনি। পরে না যেয়ে ভালই করেছি। যদি যেতাম তা হলে কি আজ অধিনায়ক হয়ে ভারতে আসতে পারতাম? নাকি গ্রেড ক্রিকেটে মাত্র দশটি খেলায় অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা নিয়ে অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক হতে পারতাম?"

ভারতে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে হিউয়েজ পূর্ণ সচেতন। ভালভাবেই জানেন এই সফরে সাফল্য-অসাফল্যের উপর নির্ভর করছে তাঁর ভবিষ্যৎ ক্রিকেট-জীবন।

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

সুভাষচন্দ্র ও ব্রহ্মদেশ। অশোক মুস্তাফি। সুভাষ স্কুল অব সোস্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল স্টাডিজ। পরিবেশক : দে বুক সেণ্টার, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-৭৩। আট টাকা।

বইটিতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বর্মার যোগাযোগের একটি সামগ্রিক এবং আনুপূর্বিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত বিষয়টি ছিল স্বল্পালোচিত অথবা বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত। সুভাষচন্দ্রের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের সার্থক মূল্যায়নে এই বর্মী সংসর্গের বিষয়টি মূল্যবান, কেননা তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল মান্দালয় জেলে আর তাঁর বিচিত্র রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিণতি লক্ষ করা যায় বর্মী রণাঙ্গনে। সুভাষচন্দ্রের নেতাজী সুভাষচন্দ্রে পরিণতিতে মান্দালয় জেল-জীবনে এবং ইউরোপ প্রবাসের একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনবৃত্তের বিভিন্ন পর্বের সার্থক মূল্যায়নেও এই বর্মী সংসর্গের বিষয়টি কম মূল্যবান নয়। তাঁর একটি প্রামাণিক জীবনী রচনার অথবা তাঁর সমগ্র চিন্তাভাবনার তাত্ত্বিক অনুশীলনের কথা মনে রেখে সেই সংসর্গের প্রসঙ্গটিকে এখানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অথবা স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিবৃত্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে, সুভাষের নেতৃত্বে বর্মায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। এ ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঔপনিবেশিক জাগরণের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ও নেতৃত্ব নূতন মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। সে প্রচেষ্টাও এই বইতে করা হয়েছে। সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণার স্বার্থে ব্রহ্মদেশ প্রসঙ্গে নেতাজীর যাবতীয় বক্তব্যের একটি আনুপূর্বিক সুবিন্যস্ত ও স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়ার একান্ত প্রয়োজন বলেই লেখক মনে করেন। কেননা এর ফলে সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস বিষয়ে উৎসুক পাঠকের অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ হবে।

ভারতবর্ষকে ব্রহ্মদেশ থেকে স্বাধীন করবার ধারাবাহিক বিবরণও লেখক এই বইতে দিয়েছেন। তা ছাড়া বর্মার স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের যোগসূত্রটি আবিষ্কারের চেষ্টাও লেখক করেছেন। এবং রাজনৈতিক স্তরে ত্রিশের দশকে উভয় দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের যোগাযোগ এবং সাংবিধানিক স্তরে ভারত - ব্রহ্ম বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে উভয় দেশে একযোগে আন্দোলনের ওপরেও তিনি আলোকপাত করেছেন। এ ছাড়াও ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরে আজাদ হিন্দের কী

আজাদ হিন্দ আন্দোলনে নেতাজীর নেতৃত্ব সম্পর্কে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ কিছু কাল পরেও বর্মী জাতীয়তাবাদীদের কীরকম ধারণা ছিল, তাও সমকালীন তথ্যের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন।

বলতে গেলে এশিয়া ভূখণ্ডে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দের প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হলেও এর পরোক্ষ প্রভাব হয়েছিল বহুবিস্তারী। ভারতের বাইরে নেতাজীসৃষ্ট এই আন্দোলনের প্রকৃত প্রভাব পরিমাপের চেষ্টাই লেখক করেছেন। তা ছাড়া মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্রের কারাজীবন সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র আলোচনাও এই বইতে আছে।

এই প্রসঙ্গে মোটামুটি প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য একটি বিস্তৃত সহায়ক পঞ্জীও বইটির শেষে সংযোজিত হয়েছে। এই সুখপাঠ্য ছোট বইটিতে অধ্যাপক মুস্তাফি এমন কিছু তথ্য সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে উপস্থাপিত করেছেন যা মোটেই সহজলভ্য নয়, এবং সেই কারণেই বইটি পড়ে বিষয়টি সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল বাড়বে বলেই আমার ধারণা।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

মিলিন্দ প্রশ্ন। ধর্মাধার মহাস্থবির। বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী। ১ বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। কুড়ি টাকা।

মিলিন্দপঞ্হো পালি ভাষায় লেখা একখানি প্রাচীন সাহিত্য এবং বেশির ভাগ প্রাচীন ভারতীয় সারস্বত কীর্তির মত এই গ্রন্থের অর্ধেক নীতিকথা অর্ধেক সুখপাঠ্য জীবনকথা। যেমন একজন মুণ্ডিত কেশশ্মশ্রু প্রব্রজিত ব্যক্তিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল তার কেশকর্তনের কারণ তখন সে ষোলটি কারণ দর্শালো। কেশ রাখলে (১) অলংকৃত করতে হয় (২) সাজাতে হয় (৩) তেল মাখাতে হয় (৪) ধুতে হয় (৫) মালা পরতে হয় (৬) সুগন্ধ মাখতে হয় (৭) সুবাসিত রাখতে হয় (৮) হরিতকী মাখতে হয় (৯) আমলকী মাখতে হয় (১০) রঞ্জিত করতে হয় (১১) বাঁধতে হয় (১২) চিরুনি দিতে হয় (১৩) নাপিতের দরকার হয় (১৪)

উঠে গেলে মানুষ শোক করে, দুঃখ করে ক্রন্দন করে, বক্ষে করাঘাত করে ও মূর্ছিত হয়। এরই নাম ভারতীয় সাহিত্য। অনুপ্রেমময়, সংকিত্তারিত ও জীবনধর্মী।

এই গ্রন্থবর্ণিত মিলিন্দ হলেন ইতিহাস উল্লিখিত যবন রাজা Menander। যাঁর রাজ্যসীমা এককালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাবুল ও তার চারপাশে এবং এমনকি গান্ধার ও তক্ষশিলাতেও পরিব্যাপ্ত ছিল। তাঁর রাজত্বকাল সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ। তাঁর রাজধানী ছিল সাগল অর্থাৎ বর্তমানের শিয়ালকোট। বিদ্যোৎসাহী ও জিজ্ঞাসু রাজার নানা প্রশ্ন এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে এবং ভদন্ত নাগসেন তার উত্তর দিয়েছেন। বোঝা যায় নাগসেন চরিত্রটি সম্ভবত অনৈতিহাসিক। আক্ষেপের বিষয় এই অভিনব সুন্দর গ্রন্থখানির রচয়িতা ও রচনাকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত তথ্য নেই। বৌদ্ধ ত্রিপিটক আশ্রিত এই গ্রন্থ নানা গূঢ় অন্বেষা ও বুদ্ধিবিন্যাসের উজ্জ্বল উদাহরণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থে খুঁজে পেয়েছেন প্লেটোর অনুচিন্তা। কারো মতে এই গ্রন্থ প্রাচীন ভারতীয় গদ্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা। গ্রন্থটির প্রচার ব্যাপকতা ও গুরুত্বের আরেক নমুনা দেশে দেশে অনুবাদের পর্যাপ্ততা। ১৮৮০ সালে এই গ্রন্থ রোমান হরফে ছাপা হয়। সিংহলের স্থানীয় হরফেও ছাপা হয়। ১৮৯০ ও ১৮৯৪ সালে গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদ বেরোয়। চীনা ভাষা, অসমীয়া ও হিন্দি ভাষাতেও মিলিন্দপঞ্‌হো সম্পূর্ণত অনূদিত। বাংলা ভাষায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এ গ্রন্থের প্রথম আংশিক অনুবাদক। ১৯৩১ সালে প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এই গ্রন্থের সম্পূর্ণাংশ বঙ্গানুবাদক। সে বই বহুদিন দুষ্প্রাপ্য। তাই ধর্মাধার মহাস্থবির ১৯৫৮ সাল থেকে নতুন বঙ্গানুবাদ শুরু করেন। সেই মহৎ প্রয়াসের সার্থক উপস্থাপন প্রস্তুত সংস্করণ। আমরা গর্বিত যে, এ অনুবাদ এক বঙ্গসন্তানেরই আয়াসলব্ধ এবং এই গ্রন্থ অনুবাদের অধিকার ও যোগ্যতা তাঁর ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত। আমরা সশ্রদ্ধভাবে তাঁকে বাংলার সারস্বতক্ষেত্রে প্রত্যুদ্গমন করছি।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এ বই কঠিন এবং নিশ্চয়ই সর্বজনবোধ্য নয়। কারণ এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য তাত্ত্বিক ও পারমার্থিক। যাঁরা বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত তথা অনাত্মবাদ, জন্মবাদ, কর্মবাদ, নির্বাণ ও অর্হত্বের স্বরূপ বিষয়ে জিজ্ঞাসু তাঁদের এ গ্রন্থ শিরোধার্য হবে। আমাদের মত সাধারণ পাঠকের জন্য ছড়িয়ে আছে নানা মণিমুক্তা; আহরণের ক্লেশ নিলে পরিণামে আনন্দ মিলবে। এই অনুবাদের দরকার ছিল নিশ্চয়ই তবে অনুবাদের কৃত্রিমতা অনেক সময়ই পীড়াদায়ক। উদাহরণ,

নির্বাণ পরম সুখ আর নিরয়ের ভয়ত্রাস উভয় তুলনা করে যোগী করিবেন

সুপ্রকাশ

কিংবা,

গতস্থ-সন্ন্যাসী [illegible]

অনাগারিক নিস্পৃহ তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

এটি কেমন বাংলা? এটি কোন্ ছন্দ?

সুধীর চক্রবর্তী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

চারুপন্থী আদিনাথ

শিল্পীর মগজ, হৃদয় এবং হাত যখন সমান সক্রিয়, তখন মানুষের মনের ভেতর ভয়ংকর সুন্দর এক বোধের জন্ম হয়। একথা জানতেন আদিনাথ মুখোপাধ্যায়। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। কিন্তু পরবর্তীকালের শিল্পী সোমনাথ হোড় এবং বিজন চৌধুরীকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আদিনাথ অবিভক্ত সাম্যবাদী দলের সদস্য ছিলেন। পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে তিনি আত্মগোপন করে কাটিয়েছিলেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর 'সুন্দরমে' সম্পাদক সুভো ঠাকুর লিখেছিলেন "গত নবমী পুজার দিন বেলা দুটোর সময় আমাদের তরুণ শিল্পী বন্ধু শ্রীআদিনাথ মুখার্জি সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ পরলোক গমন করেন। এই মৃত্যু আমাদের কাছে আত্মীয় বিয়োগেরই মতো।"

সরকারী চারুকলা বিদ্যালয় থেকে আদিনাথ প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন ('৪৩)। ইটালী সরকারের বৃত্তি পেয়ে তিনি বিশিষ্ট শিল্পী জেনথিলীনীর কাছে ছবি আঁকার উন্নততর কলাকৌশল শেখেন। বহুকাল পর তাঁর মরণোত্তর প্রদর্শনী হল কলকাতার ইনফরমেশন সেণ্টারে (১৮-২৪শে জুন)। আদিনাথ ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। দেওয়াল নোংরা করে এমন শ্লোগানধর্মী ছবির সঙ্গে শিল্পকলার পার্থক্য তিনি বুঝতেন। কুড়ি বছর পর তাঁর ছবি দেখে পুরোনো মনে হলো না।

প্রথমেই বলব তাঁর চোখ মাতানো রঙের কথা। ঘন, মোলায়েম, কখনো উষ্ণ, কখনো ঠান্ডা। বাঙালী শিল্পীরা রঙ ব্যবহারে আটপৌরে স্নিগ্ধ বিবর্ণতাকে পছন্দ করেন। সেখানে আদিনাথের বর্ণ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আমাদের মুগ্ধ করে। আদিনাথ তাঁর আঁকার মধ্যে জীবনের প্রতি আসক্তি, অনুরাগ, আনুগত্য প্রকাশ করেছেন প্রেমিকের মতো। অথচ আবেগে তিনি ভেসে যাননি এমনই পরিমিত প্রাঞ্জল তাঁর তুলি। সাম্যবাদী হয়েও "অপসংস্কৃতির" কালো জুজু তিনি দেখেননি আজকের বামাচারী অক্ষম আঁকিয়েদের মতো। নারীর দেহ তিনি যত্নে অধ্যবসায় ক্যানভাসে ফেলে তুলি বুলিয়েছেন ভালবাসায়। তিনি আসল শিল্পী তাই তাঁর হৃদয়ে অপ্রেম ছিল না। ছিল না রাজা-ভিক্টোরীয় বা বিধবাসুলভ বা তথাকথিত জনদরদীদের ব্যাজারমুখ শুচিবাই।

দ্বিতীয়ত তাঁর রচনা এবং নির্মিতির জোর। পটের ভূমি বিভাজন করে কোথায় বর্ণের কোথায় রেখার কোথায় বুনোটের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মসলিন দিয়ে শেষ পর্যন্ত গোটা রচনা গড়তে হবে তা ছিল তাঁর আঙুলের আয়ত্তে।। অঙ্কনও স্থাবর্তো। কিন্ত

“রেখাচিত্র” আদিনাথ মুখোপাধ্যায়
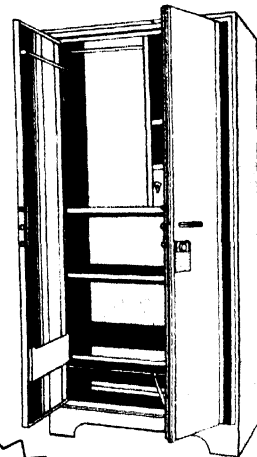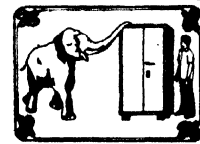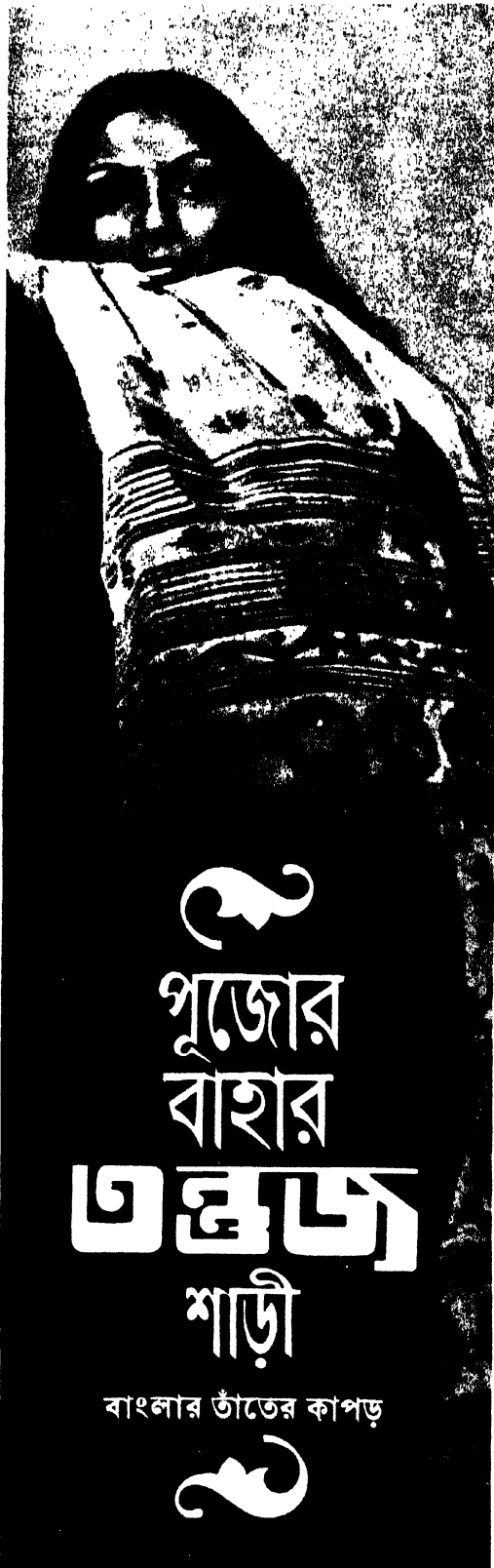
বাঁকিয়ে চুরিয়ে যাদুকরের মতো কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর কলেজ জীবনে করা “খিদিরপুর বাজার”-এর দৃশ্যের যে বিন্যাস এবং বর্ণিকাভঙ্গ, বা গ্রামের গারুর গাড়িতে ধান ওঠানোর দৃশ্যের যে চারুল শিল্পীর ভঙ্গী তার থেকে কতদূরে চলে এসেছিলেন শেষে। প্রমাণ “খুকু”। নীল জমজমাট প্রতিবেশে হলুদ পুতুল নিয়ে বসে আছে খাটে একটি ছোট মেয়ে—আলতো হলুদের স্পর্শ, অন্য দু-একটি রঙ, কোলে পুতুল, পাশে রথের মেলায় কেনা খেলনা হাতি। যেন আত্মজা সম্বন্ধে সব বাবার ভালবাসা, তুলির আগায় এসেছে ফোটা ফোটা। অন্য একটা ছবিতে “মা আর মেয়ে” খাটে বসে তন্ময় হয়ে পড়ছেন বই। জানলায় বাইরের ছবি। কোন গল্প নেই কিন্তু হৃদয় মোচড় দিয়ে ওঠে। এর মধ্যে উবু হয়ে বসে থাকা একটি বিহারী ভিখারীর মুখ আছে—সমানুভূতিতে এই ধূসর ছবি আপ্লুত। কিন্তু আবেগের রাশ আলগা করতে দেননি। চারটে নগ্নিকা পর্যবেক্ষণের তৈলচিত্র আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। নারীদেহের সম্বন্ধে আমাদের অনুরাগ তাঁর ছবিতে রূপান্তরিত হয়েছে স্তুতিতে। এগুলি সব ইটালীতে আঁকা। কিউবিক ছবি থেকে ভিন্নতর উত্তরণ। কারণ দেহের আয়তন এবং বস্তুপুঞ্জ জোরদার রেখায় বেঁধে রঙের ঘনত্বে অভিব্যক্ত করেছেন। বর্ণের জোয়ার বিকিরণে চোখ আমেজে বন্ধ হয়ে যায়। দুটি আছে বসা—একটি চেয়ারে অন্যটি জলচৌকিতে। অন্য দুটি অস্থায়ী শয়নে শায়িত। এই হাওয়া বাতাসে সংবেদ সবই শিল্পীর অলজ্জ ভালবাসার অভিব্যক্তি। এখানে লালসার “ল” নেই। বরং আশ্চর্য এক কাব্যগুণ। রচনা-সৌকর্যের জন্যে ভাল লেগেছে একটা—যে ছবিটায় খাটের ওপর একটি উলঙ্গ মেয়ে শুয়ে আছে পেছন ফিরে। সাদা আর নীল চৌখুপি কাটা সুজনীর ওপর ভাস্কর্যের ঢেলার মতো শুয়ে আছে মেয়েটি। এক পাশে চেস্টার ড্রয়ারের ওপর প্রসাধনের টুকিটাকি। দেওয়ালের ওয়ালপেপারেও রঙের চৌখুপি। দেওয়ালে টানান ক্যানভাসে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা মেয়ের ছবি। ছবিটির জ্যামিতিক নির্মাণের পরিমিতিবোধের তুলনা নেই।

রেখাচিত্র, জলরঙ, ছাপাই ছবি ছিল। তার মধ্যে কালিকলমে আঁকা দোকানঘরের খড়ের চালের তলায় দোকানীদের শোবার বন্দোবস্ত করার দৃশ্যটা এসেছে ভাল। জলরঙের দুটি ছবি সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের

একটা ছোট্ট শহর—আলতো স্পর্শের পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা বজায় রেখে আঁকা—জমি ছেড়ে। খোলা নীল আকাশ আর হাওয়া বাতাসে ছবিটা জমেছে।

আদিনাথ মারা গিয়েছিলেন হঠাৎ। সুতরাং তাঁর ছবি দেখতে দেখতে “আত্মীয় বিয়োগেরই” বেদনা অনুভব করলাম। বেরিয়ে আসতে আসতে মনে মনে বললাম, কমরাদ শিল্পী, তোমাকে অজস্র লাল সেলাম, নীল সেলাম এবং হলুদ সেলাম।

সন্দীপ সরকার

তিনজন প্রতিশ্রুতিময় তরুণ শিল্পী

তিনজন প্রতিশ্রুতিময় তরুণ শিল্পী—তাপস সরকার, মনোজ মিত্র এবং রথীন রায়—তাঁদের ড্রইং-এর প্রদর্শনী করেছিলেন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। তাপস সরকারের ভাস্কর্য এবং ড্রইং বিষয়ে এর আগে একাধিকবার আমি এই পত্রিকায় আলোচনা করেছি, এবং এবারও লক্ষ করে ভালো লাগলো যে তাপস প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ড্রইং-ই টাঙিয়েছেন এই প্রদর্শনীতে। ষোল এবং সতের নম্বর ছাড়া যে দুটি ড্রইং-এ তাপস সরকার তাঁর পূর্বপ্রদর্শিত ড্রইং-এর বিমূর্ত রেখার ঘেরাটোপ ও আলো-আঁধারির ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি) অন্যান্য সমস্ত ড্রইং-এই মানুষের আঁকার নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাপস কখনই পুরোপুরি বাস্তবানুগভাবে মানুষকে আঁকেননি, প্রয়োজনমতো ডিসটর্শনকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন—এবং আরো একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র হলো, সাদা কাগজের ওপরে কালি দিয়ে আঁকা এই মানুষ-মানুষী পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন, কিন্তু সম্পৃক্ত বা সুখী নয়। এক ধরনের রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তা, উচ্চকিত আবেগ ও যন্ত্রণা এই মানুষদের আবয়বিক আয়তনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে—এবং এই যন্ত্রণার অন্তঃস্পন্দ রেখার ঘূর্ণিতে সার্থকভাবে আভাসিত হয়েছে কখনও কখনও।

ছয় নম্বর ড্রইং-এ একটি বিলাপের দৃশ্য বিধৃত হয়েছে মনে হলো। পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ে কয়েকজন মানুষ-মানুষী যেন কোনো সদ্য-পরলোকগত ব্যক্তির জন্যে দুঃখ করছে—একটি ছাতা ধরে আছে একজন, ছাতাটির কালো রঙের সঙ্গে ছাদের প্রায় চতুষ্কোণ জমাট কৃষ্ণবর্ণের সামঞ্জস্য চোখে না পড়ে পারে না। একটি ড্রইং-এ তিনজন মানুষের মাঝখানে একটি যন্ত্রকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং যন্ত্রটিকে ঘিরে মানুষ তিনটি যেন রেখাবিভঙ্গে আবর্তিত হয়ে উঠছে। খুব সুন্দর ড্রইং। দু-একটি ড্রইং-এ তাপস অতর্কিতে বাস্তবানুগভাবে মানুষের চোখ মুখ আঁকতে গিয়েছেন, এবং সেখানেই তিনি পুরোপুরি সার্থক হননি মনে হলো। বিশেষত একটি ড্রইং-এ শ্মশ্রুময় একটি মুখ উঁকি দিয়েছে, যেটি না থাকলে বা অন্যভাবে থাকলে ড্রইংটি আরো আকর্ষণীয় হতো।

কিংবা একই সঙ্গে ভাস্কর ও চিত্রকর বলে—ভাস্কর্যের কয়েকটি সূত্রে তাঁর ড্রইংকেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে মনে হলো, এবং তাতে তাঁর ড্রইং-এ অন্য একটি আয়তন সুন্দরভাবে আভাসিত হয়েছে। যেমন, রেখার কন্টুর ও রেখাগ্রভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃত্তাকার বলে মনে হয়েছে আমার, যা ভাস্কর্যের একটি অন্যতম চরিত্রলক্ষণ। তাঁর অধিকাংশ ড্রইংই খুব স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, এবং একই সঙ্গে রুক্ষ এবং পৌরুষব্যঞ্জক।

তাপস সরকারের ড্রইংগুলিতে যেমন একটি বিশেষ চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রথীন রায় ও মনোজ মিত্রের ছবিতে তেমন কোনো 'একটি' চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না—যদিও শিল্পী হিসেবে দুজনেই খুব দক্ষ এবং প্রতিশ্রুতিময়। রথীন রায়ের "স্টার অফ এ হার্ট" জননী ও শিশুর একটি সাদামাটা ড্রইং, যদিও "নেগলেক্টেড খ্রাইস্ট"-এ তিনি যীশুকে যেভাবে আভাসিত করেছেন, এবং কর্ষিপ্তং ভারতীয় পরিবেশে বিধৃত করেছেন তা আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়েছে। "পাওয়ার একজিবিশন"-ও আরেকটি শক্তিশালী ড্রইং—একটি কালো কাদুড়ের বিস্তৃত পক্ষপুটে যেন কালি-দিয়ে-আঁকা জগজ্জীবনের প্রতিযোগিতা প্রকীর্ণ হয়ে আছে। আরো একটি সার্থক ড্রইং "থটস অফ এ নাইট"—প্রায় সমান্তরাল জমি বিভাজনের মধ্যে ক্লান্ত পশু ও মানুষের ঘরে ফেরার দৃশ্য। 'মীডস ডিমান্ড' রেখাকীর্ণতা ও কম্পোজি-

শিল্পী রথীন রায়
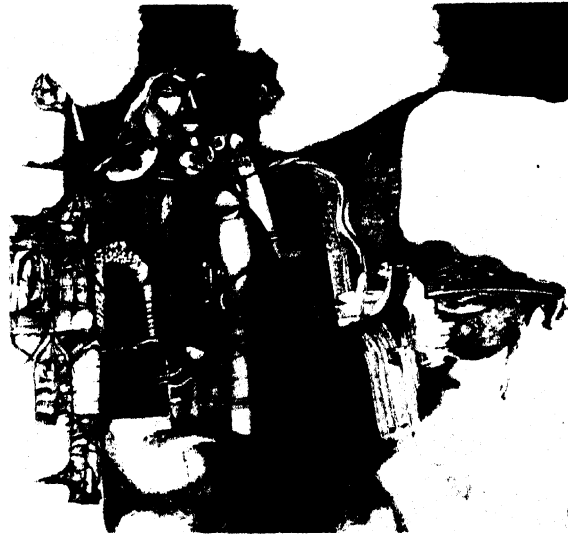
শনের কারুকার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনোজ মিত্র নানা মাধ্যমে, নানা রকমের ড্রইং করেছেন। 'ভার্মিলিয়ন', 'ভার্জিন', 'স্কুল মাস্টার' এবং 'ওভারটেইনিং' বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিকৃতি—যদি "ভার্জিন" ছবিটিতে এমন এক ধরনের বিষাদের ব্যঞ্জনা আছে যা ছবিটিতে অন্য একটি আয়তন সংযোজন করেছে।

"ওয়াইল্ড বিউটি" একটি অর্ধশায়িত রোমান্টিক রমণীর ছবি; "হারমোনাইজে" কৃশ ও স্থূলকায় দুটি ব্যক্তি যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে তাতে কিছুটা কার্টুনের চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে; অপর পক্ষে "হোল্ডিং অফ লাইফে" একটি রুগ্ন ভিখিরি বালকের পঞ্জরসার শরীর থেকে যেভাবে একটি পাখি বেরিয়ে আসছে (যখন ওপরে টাঙানো খাঁচায় একটি মৃত পাখির শরীর চোখে পড়ে) তখন ড্রইংটির প্রতীকতা ও শিল্পীর কল্পনাশক্তি আমাদের অন্য কারণে মুগ্ধ করে। আমি বলতে চাইছি যে মনোজ মিত্র নিঃসন্দেহে ছবি আঁকতে জানেন, তাঁর লাইন অত্যন্ত সাবলীল (সাপ ও সন্ন্যাসীদের ড্রইং-এ তা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে); তাঁর কম্পোজিশনের ধারণাও প্রশংসনীয়, কিন্তু তিনি এখনও কোনো বিশিষ্ট বিষয়ভূমি খুঁজে পাননি। শিল্পী যদিও অত্যন্ত তরুণ, সুতরাং এ-বয়সে তা আশা করাও সম্ভবত অন্যায়।

যাই হোক, এই তিনজন তরুণ শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনী সর্বতোভাবে প্রতিশ্রুতিময়।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

সুরক্ষা

শক্তি মানেই অর্থ—এই নীতিতে বিশ্বাসী অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ডাঃ শিব তাঁর নিজের নামে এমন এক রশ্মি আবিষ্কার করেন যা মুহূর্তেই মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করতে পারে। তাঁর গোপন ঘাঁটিটির সন্ধান এবং তাঁর ভয়ংকর বিধ্বংসী আবিষ্কারটি নিষ্ফল করায় নিয়োজিত হয় সি বি আই-এর বিশেষ এজেন্ট জি-৯—যার প্রকৃত নাম গোপী (মিঠুন চক্রবর্তী)। ডাঃ শিবের অনুচরদের প্রধান হীরালাল আর তার এক সঙ্গিনী (অরুণা ইরাণী)।

মিঠুন ও রঞ্জিতা

এরা দুজনে জি-৯-এর অভিপ্রায় সিদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। কার্বোদ্ধারের পথে গোপী হীরালালের নির্দেশে নিহত এক ব্যক্তির ভগিনী রূপাকে (রঞ্জিতা) তার সহকারিনী করে নেয়। সমুদ্রের মাঝখানে একটি দ্বীপের নীচে জলগর্ভে নির্মিত ডাঃ শিবের অদ্ভুত বিচিত্র ঘাঁটিতে জি-৯ ও রূপা দলবল সহ কিভাবে পৌঁছাল এবং শেষে ডাঃ শিব সহ সেই ঘাঁটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে গোপী ও তার প্রেমিকা অক্ষত কিভাবে বেরিয়ে এল—সেই রোমাঞ্চকর অভিযান নিয়েই এই কাহিনী (কাহিনী পরিকল্পনা : রাজবংশ)।

বিদেশী ছবি যাঁরা দেখেন তাঁরা সহজেই ধরতে পারবেন কেমন করে অনেকগুলি 'সায়ান্স ফিকশন' জাতীয় ছবি থেকে টুকরো টুকরো আহরণ করে এই চিত্রনাট্যটির রূপদান করেছেন পরিচালক রবিকান্ত নাগাইচ। ছবির ভাষা হিন্দী না হলে চরিত্রাবলীর ক্রিয়াকলাপ, আচার-আচরণ ও পোশাক দেখে কোন অংশে ভারতীয় বলে মনে হয় না। এতে রোমাঞ্চ আছে, অদ্ভুত আকৃতির গৃহ, ক্যারাট, বর্কসিং, অসিযুদ্ধ (রিভলবার ও মেসিনগান নিয়ে লড়াই অবশ্যই)—এ সব তো আছেই, সেই সঙ্গে শক্তির (!) পরীক্ষা আছে ডাঃ শিবের নির্দেশে গোপী ও হীরালালের মধ্যে কাওয়ালী গানের প্রতিদ্বন্দ্বীতায়। এমন বহুবিধ রোমাঞ্চে চার্টান হিসেবে পাওয়া যায় বেশবাস, ভঙ্গী ও ভাষার দিক থেকে আদি রসাত্মক নাচ ও গান (সংগীত পরিচালনা : বাপি লাহিড়ি) চমকপ্রদ ইলেকট্রনিকসের ভেল্কিবাজি, দৃশ্যসজ্জা (শিল্পনির্দেশন : বি নাগরাজান), ঘটনার দ্রুতগতি (সম্পাদনা : শ্যাম মুখার্জী) এবং সর্বোপরি মিঠুন চক্রবর্তীর 'স্মার্টনেস' যা দেখে মাস্তানরা তাদের নতুন 'গুরু' পাবে। ছবিখানির অদ্ভুতত্ব রোমাঞ্চপ্রিয় দর্শকদের দৃষ্টি অবশ্যই নিবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু ছবি শেষ হতে 'কি পেলাম' ভাবলে বিমূঢ় হতে হয়। মনে করিয়ে দেয় পল ট্যাবারি রচিত 'ডুমসডে ব্রেইন'-এর ইলেক্টনিকসের সহায়তায় পৃথিবী জয়ের ব্যর্থ কাহিনীর কথা।

রাধা ঔর সীতা

আত্মপরিচয় গোপন করে বিরাট শিল্পপতির একমাত্র পুত্র শেখর (অরুণ গোবিল) পিতৃবন্ধুর কারখানায় যোগ দিল হাতেকলমে দক্ষতা অর্জনের সীতার (আজা ধূলিয়া) প্রেমে পড়ল। 'ভালোবাসা সহ—শেখর' কার্ড লিখে একটি শাড়ি সীতাকে উপহার দেবার মনস্থ করে শেখর। ঘটনা এমন সাজানো যাতে দেখা গেল শাড়িখানি পৌঁছেছে সীতারই অভিন্নহৃদয় বান্ধবী এবং শেখরেরই কারখানা-মালিকের একমাত্র কন্যা রাধার (রীতা ভাদুড়ি) হাতে। দুই বান্ধবীর প্রেমিক যে একই ব্যক্তি সেটা ওরা জানতে পারে না। কিন্তু এই অজ্ঞতাকে কাহিনীকার মধুসূদন কালেলকর বা পরিচালক বিজয় কাপুর কোন বুদ্ধিদীপ্ত ঘটনার সহায়তায় বিশ্বাস্য করে তুলতে পারেননি। বরং গল্পকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁরা সে-পথ পরিহার করে গিয়েছেন। নচেৎ—তার প্রতি রাধা ক্রমেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে জেনেও শেখর রাধার সঙ্গে তার বিবাহ প্রস্তাব না-আসা পর্যন্ত কেনই বা সীতার প্রতি তার অ্যাকর্ষণ-এর ব্যাপার সম্পর্কে একেবারে নিশ্চুপ থাকে! বলা বাহুল্য, প্রাণাধিক প্রিয় বান্ধবীর সুখ-চিন্তায় রাধা শেখরকে স্বামীরূপে না-পাওয়ার বেদনা হাসিমুখে বরণ করে নিল।

হিন্দী ছবির পরিপ্রেক্ষিতে পরিচয় গোপন রেখে দরিদ্র সুন্দরীর প্রেমে পড়া এবং সেই প্রেম নিয়ে জটিলতাও বৈচিত্র্য-বিহীন একটি গতানুগতিক ঘটনাক্লিষ্ট কাহিনীই পাওয়া যায় এ ছবিতে। কিন্তু তবুও 'রাধা ঔর সীতা' আর পাঁচটা হিন্দী ছবির পাশে একটু বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে চরিত্রগুলির বেশবাস ও আচরণে সংযম, হাসি-মস্করার সৃষ্টিতে স্থূলতার পরিহার, মারপিটের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং সর্বোপরি চর্বিতচর্বণ ব্যাপার হলেও দর্শকের ঠাট্টা থেকে রেহাই পায় প্রধান চরিত্র তিনটি মনোজ্ঞ অভিনয়সৌকর্যের জন্য। রবীন্দ্র জৈন সুরারোপিত আবহ সংগীত ছবির 'মুড'-এর প্রয়োজন যথাযথ মিটিয়েছে। গানও ভাল লাগবে, যদিও রাধার জন্ম দিনে শেখরের মুখে যেসুদাসের গানটিই একমাত্র সুপ্রযুক্ত। বাকিগুলি নিতান্তই গান না থাকলেই নয় তাই পরিবেশন—যার ফলে তাতে ঘটনার গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। রাজি কাশ্মিরির ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়। কাহিনী পরিকল্পনায় ও বিন্যাসে শিল্পচমৎকার আভাস অতীব অস্পষ্ট। তবে একটি পরিচ্ছন্ন প্রমোদ বলে স্বীকৃতি পাবে।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি সংগীত

যুগ্ম সঙ্গীত সম্মেলন

এ বছর ক্যালকাটা মিউজিক সারকেল ও আমীর খাঁ কলাকেন্দ্র স্বর্গীয় ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ স্মরণে এক চারদিনব্যাপী যুগ্ম সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করেন (কলা-মন্দির, জুন ৭-১০)। এই সম্মেলনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল শেষ দিনের সকাল এবং সন্ধ্যায় দুই বৈঠক। সকালের বৈঠকে ছিলেন বীণাবাদক ওস্তাদ আসাদ আলী খাঁ এবং খেয়াল-গায়ক ওস্তাদ লতাফৎ

কুর্দিকর—যিনি এখন বৃদ্ধা এবং প্রায় পঁচিশ বছর হল গানের জগৎ থেকে অবসর নিয়েছেন। সান্ধ্য বৈঠকের প্রথম শিল্পী ছিলেন এসরাজ বাদক রণধীর রায়।

মগুবাঈ-এর গান শুনে বোঝা গেল যে উদ্যোক্তাদের কোন মতেই তাঁকে অবসর থেকে শ্রোতৃবর্গের সামনে টেনে আনা উচিত হয়নি। তাঁর গলা এখন সব সময়ে কাঁপে এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে—অর্থাৎ তাঁর গানে খাঁটি সুর কম লাগে না, বেসুরও এসে পড়ে এবং শুদ্ধ-নট্ খেয়াল দুটিতে আগন্তুক স্বর কোমল-গান্ধার বার বার লেগে যাচ্ছিল। এ ছাড়া মগুবাঈ শাঙনি-নট্ ও সম্পূর্ণ মালকোষ রাগে খেয়াল গেয়ে ছিলেন। তাঁর কন্যা এবং নামকরা গায়িকা কিশোরী আমোনকর কণ্ঠ-সহযোগিতা করেন।

রণধীর রায়ের হাত সুরেলা ও অলংকার-সমৃদ্ধ তবে তাঁর হংসধ্বনি রাগে অওচারটি বড় বেশি ঢিলেঢালা হয়েছিল। এরপরে তিনি হংসধ্বনি ও ইমন মিশ্রিত একটি সিতারখানি বন্দেশ যার নাম তিনি 'ইন্‌কোয়েস্ট' দিয়েছেন, তা বাজিয়ে শোনান। শুনতে মন্দ লাগলো না। ইমন রাগে রূপক তাল ও দ্রুত তিনতাল গৎ দুটির লক্ষণীয় বস্তু ছিল দক্ষ তানকারি। মিশ্রকাফিতে মাধুর্যপূর্ণ আওচার ও গৎ বাজিয়ে তিনি তাঁর বৈঠক শেষ করেন।

আসাদ আলী খাঁ টোড়ি রাগে আলাপটি কাঠামোর দিক থেকে সুঠাম ও মীড়-আশে ভরাট হলেও রাগরূপ বিকৃত করে ফেলে। শিল্পী পঞ্চম স্বরটিকে প্রায় ব্যবহার করতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং এই কারণে রাগটি বেশির ভাগ সময় আজকালকার গুর্জরী টোড়ি বা আগেকার ফিরোজখানী টোড়ির মতই শোনাচ্ছিল। আবার একবার শিল্পীকে ন দ ক্ষ প স্বর-বিন্যাস ব্যবহার করতে শুনলাম। টোড়ি রাগে ক্ষ প সংগতি একেবারেই অচল। জোড় ও চৌতাল বন্দেশটিও একই দোষে দুষ্ট হয়েছিল।

এক সময় বীণকারদের রাগ-রূপের শুদ্ধতার ধারক ও বাহক বলে মনে করা হত। এই বৈঠক শুনে মনে হল এখন সে মতামত আর খাটে না—যদি এই বীণকারের রাগ রূপায়ণের নমুনা হয় তা হলে তরুণ সেতারী বা সরোদিয়াদের কাছে আমরা কি প্রত্যাশা করবো?

ওস্তাদ লতাফৎ হুসেন খাঁ দেশী টোড়ি রাগে আলাপ ও দুই খেয়াল ভাল হয়নি। আলাপ খালি একঘেয়ে হয়নি—বার বার নিষিদ্ধ স্বর শুদ্ধ নিষাদও লেগে যাচ্ছিল। আবার প র জ্ঞ ও র প র জ্ঞ প্রায় না ব্যবহারিত হওয়ায় জৌনপুরির ছায়াও এসে পড়ছিল (ওস্তাদ আশাবরী ঠাটের দেশী-টোড়ী গাইছিলেন)। অন্তরায় যাওয়ার পথে বারোয়ার ম প ধ ন স্বরবিন্যাসের আবির্ভাব আরেকটি বিরক্তিকর ব্যাপার ছিল। বিলম্বিত খেয়ালটিতে আলাপের নকশাগুলিরই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল, কাজেই এটি বেশ ক্লান্তিকর হয়েছিল। ছোট দ্রুত খেয়ালটিতে কিছু মোটামুটি উপভোগ্য দুনি তান ছিল।

সুরদাসী-মল্লারে দ্রুত খেয়াল দুটি তুলনায় অনেক ভাল হয়েছিল। মিঁয়াকী-সারং রাগে মধ্যলয় খেয়ালটি শিল্পীর শ্রেষ্ঠ নিবেদন ছিল এবং এটির তান ও বিস্তারের কাজ দুই ভাল হয়েছিল। বৃন্দাবনী-সারং রাগে একটি ছোট দ্রুত খেয়াল ও ভৈরবীতে তিনটি বন্দেশ গেয়ে শিল্পী তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠান অনিবার্য কারণে শুনতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এদিনের দুই শিল্পী ছিলেন কেসরবাঈ কেরকরের একমাত্র শিষ্যা ধন্দুতাই কুলকার্ণি এবং প্রখ্যাত বেহালা-বাদক এম এস গোপাল কৃষ্ণন্।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান খান-বন্ধু নামে খ্যাত সইয়দ খাঁ ও রসিদ খাঁর যুগল খেয়াল গান দিয়ে শুরু হয়। এঁদের পিতা মজিদ খাঁ কেসরবাঈ-এর বাঁধা সারেঙ্গি-বাদক ছিলেন। প্রথম মধ্য-বিলম্বিত খেয়ালটি ইমন-কল্যাণ ঘোষিত হলেও আসলে ইমনে ছিল। এঁদের আকার ভিত্তিক বিস্তারের কাজে সুর, আকর্ষণীয়তা ও পরিচ্ছন্নতা ছিল এবং দুই শিল্পীই অসামান্য কণ্ঠ-সাধনায় পরিচয় দেন। তানের কাজ অসামান্য হয়েছিল এবং এতে বৈচিত্র্য দক্ষতা ও সুপরিকল্পনা সবই ছিল। এই রাগে শিল্পীরা একটি মধ্যদ্রুত তিনতাল খেয়াল ও দ্রুত একতাল তারানাও গান এবং দ্বিতীয়টিতে উচ্চাঙ্গের তানকারি ছিল। গৌড় মল্লার রাগে মধ্য-বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল খেয়াল ও তারানাটিও ভাল হয়েছিল। তবে এরপরে শিল্পীরা যে কয়টি মল্লার-ঘেঁষা রচনা গেয়েছিলেন সেগুলির সুর রাগের চেয়ে ধুন উপাধিরই বেশি যোগ্য।

এদিনের দ্বিতীয় ও শেষ শিল্পী ছিলেন তরুণ সেতার-বাদক কল্যাণি মুখোপাধ্যায় এবং ইনি ঝিঁঝোটি রাগে আলাপ, জোড়, বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল গৎ বাজিয়ে শোনান। প্রথমার্ধের স্বরবিস্তার সুপরিকল্পিত ও নিষ্ঠাপূর্ণ হয়েছিল তবে দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পীকে একটু তাড়া-হুড়ো করতে দেখা যায়। অন্তরাগামী স্বরবিস্তার ও অন্তরার বিস্তার ওই কিন্তু উচ্চাঙ্গের হয়েছিল।

শিল্পী দু-তিন বার ঝিঁঝোটির অন্যতম মুখ্য র ম প ধ ম গ বিন্যাসটির রেশ ষড়জ অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ায় এটি দেশ রাগের র ম প ধ ম গ র বিন্যাস হয়ে পড়ে—এইটিই ছিল তার রাগ-রূপায়ণের একমাত্র খুঁত।

বিলায়েৎ খাঁ ঢঙের জোড়টি ভাল হয়েছিল এবং এটির দ্বিতীয়ার্ধে

উচ্চাঙ্গের তান-তোড়া ছিল। বিলম্বিত গৎটিতেও ভাল তান-তোড়া ছিল। দ্রুত গৎটি কিছু ভাল দুনি তান দিয়ে শুরু হয় এবং এরপরে শোনা যায় তবলাবাদক স্বপন চৌধুরীর সঙ্গে কিছু বোলের আদান-প্রদান ও পরিষ্কার, সুরেলা ঝালার কাজ। স্বপন চৌধুরীর তবলা সংগত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান সেতার বাদক দীপক চৌধুরীর পূরবী রাগে আলাপ, জোড় ও দুই গৎ দিয়ে শুরু হয়। আলাপ ও জোড়টি শোনা সম্ভব হয়নি। রূপক তালে নিবদ্ধ গৎটির লয়কারি ও দ্রুত তিনতাল গৎটির তান-তোড়া ও ঝালা সবই সুপরিকল্পিত ও সুরেলা হয়েছিল।

এদিনের প্রধান শিল্পী ছিলেন প্রবীণ গায়ক নিবৃত্তিবুয়া সারনায়েক। ইনি, আশা করি কলকাতার সকল রসিকই জানেন, আল্লাদিয়া খাঁ, রাজাবালি খাঁ ও সওয়াই গন্ধর্বের শিষ্য। এঁর শুদ্ধ-কল্যাণ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল খেয়াল দুটি বিদগ্ধ রাগ-বিশ্লেষণের এক আদর্শ-নিদর্শন ছিল। বিস্তারের কাজে মল্লিকার্জুন মনসুরের মত রসবোধ ও আভিজাত্য না থাকলেও রাগের গণ্ডির মধ্যে থেকেও কত নতুনত্ব আনা যায় তা বোঝা গেল। গ ধ প ক্ষ গ অঙ্গে কিছু অসামান্য নকশা শোনা যায়। তবে সব চেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল শিল্পীর আশ্চর্য কাঠামোর লম্বা তানকারি যার ছন্দ-বৈচিত্র্য ও মুখড়ায় পৌঁছানোর বিবিধ প্রণালী সত্যই সকলকে চমৎকৃত করেছিল। পরের বিলম্বিত খেয়ালটির রাগ ঠিক ঠিক বোঝা গেল না কারণ শিল্পীর নিজস্ব ঘোষণা অপরিস্কার হয়েছিল। তবে এটি যে রাগ নয় ধুন তা বুঝতে বাকি রইল না কারণ শিল্পী ইচ্ছে মত জায়গায় জায়গায় গৌড়মল্লার ও জায়গায় জায়গায় বাহার গেয়ে চলেছিলেন। দ্রুত খেয়ালটি তো প্রায় পুরোপুরি বাহারে ছিল। এরপরে যে রাগটি শোনা গেল সেটিকে মালবী বলে ঘোষণা করা হলেও এ রাগের যে কটি রূপ প্রচলিত আছে তার সঙ্গে নিবৃত্তিবুয়ার গানের কোন সামঞ্জস্য পাওয়া গেল না। তা ছাড়া তিনি আরোহণে স ম প ধ ন ও ঋ গ প দ দুই-ই ব্যবহার করেছিলেন যা কোন রাগেই সম্ভব নয়। শিল্পীর শেষ খেয়াল দুটি কাফি-কানাড়া রাগে ছিল কিন্তু তিনি কানাড়া অঙ্গের কোন বিন্যাস ব্যবহার না করায় রাগটি কাফির মতই শোনাচ্ছিল।

মীনাক্ষ গুপ্ত

হারা মরুনদী

সুরসপ্তক নিবেদিত তিনটি সন্ধ্যা শুধুমাত্র জলসা নয়। রবীন্দ্র-সদনে তাঁদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে কয়েক দশক আগের গান নিজেদের স্মৃতিকে যেমন উতলা করে, তেমনি পুনর্মূল্যায়নে সহায়তা করে। তিন দিনের অনুষ্ঠানের পিছনে প্রণোদনায়

জগন্ময় মিত্র

দাশগুপ্ত স্মরণ-সন্ধ্যায় কমল দাশগুপ্ত সুরারোপিত গান গেয়ে শোনান জগন্ময় মিত্র ও ফিরোজা বেগম। ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে বাংলা গানের জগতে যিনি সবচেয়ে আদৃত সুরকার ছিলেন, তাঁর গান গেয়ে শোনালেন সেই শিল্পী —যিনি ঐ সময় জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থান করেছিলেন। ● সমকালীন অনেক শিল্পী এখনও সঙ্গীত-জগতে নায়ক, কিন্তু জগন্ময় মিত্র দীর্ঘদিন বাংলা গানের আসরে অনুপস্থিত। সুতরাং গান শোনার আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল, তাঁর নাম শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের অতিরিক্ত মর্যাদা, কিন্তু গান শোনার পর মনে হল, তাঁর অনুপস্থিতিকে স্বেচ্ছানির্বাসন বলা যায়। কারণ তাঁর কণ্ঠ এখনও অনেকের থেকে সতেজ, যদিও নিয়মিত গান না করার জন্য তিনি অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং গায়নভঙ্গী অনেক ক্ষেত্রে যেমন চমকিত করে—অনেক ক্ষেত্রে তেমনি অচল হয়ে গেছে। যেমন "চিঠি" গানের [illegible] খোলা গলায় গাইবার পর মৃদু কণ্ঠে সুর উচ্চারণ শুনে বোঝা যায়, আজকের অনেক শিল্পীর পূর্বসূরী তিনি। জগন্ময় মিত্র "সুবল দাশগুপ্তে"র সুরেও কয়েকটি গান করেছিলেন। প্রথম গান "ভুলেছে কি শ্রীরাধিকা প্রেম অভিসার" গানে তিনি অবলীলায় খাদের শেষ পর্দা পর্যন্ত নেমে গেলেন আবার গান করতে করতে এক সময় অতি তার-সপ্তকে স্বর ছুঁয়ে এলেন, অর্থাৎ আসরে বসেই রেওয়াজ করে নেওয়াও গেল এবং বহু দিন বাদে কলকাতার শ্রোতাকে নিজের সক্ষমতাকেও জানানো গেল। জগন্ময় মিত্র বেশীক্ষণ গান করেননি। শ্রোতাদের অতৃপ্ত রেখেই তিনি উঠে পড়লেন, কিন্তু আর বেশী গাইলেই কি তিনি তৃপ্ত করতে পারতেন? এই প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করছি। জগন্ময় মিত্রের পর আসরে এলেন ফিরোজা বেগম।

ফিরোজা বেগম সেদিনকার আসরে সকলকে কমল দাশগুপ্তের সুরের ব্যাপ্তিকে সঠিকভাবে ধরিয়ে দিলেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রসের গান তিনি গেয়েছেন প্রাণ দিয়ে—তাই 'শতেক বরষ পরে', 'পৃথিবী আমারে চায়', 'ঘুমের ছায়া', 'হারা মরুনদী',

ফিরোজা বেগম

যাঁরা বয়স্ক লোক ছিলেন তাঁরা নস্ট্যালজিয়ায় ভারাক্রান্ত হলেন এবং যাঁরা এইসব গানের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হলেন তাঁরা বিস্ময়ে আক্রান্ত হলেন।

এখনকার সুরকারদের তুলনায় কমল দাশগুপ্তের সময়ের তফাত অনেকখানি। এখনকার অনেক সুরকারের রাগ-সঙ্গীতের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ। তাঁরা যখন রাগভিত্তিক গান করেন, তখন সেটা খেয়াল বা ঠুংরীর অনুবাদ হয়ে রাগপ্রধান হয়। কিন্তু কমল দাশগুপ্ত রাগকে অবলম্বন করে যে সাজ-কাঠামোর মধ্যে এনে লোককে চঞ্চল করেন, সেই চাবিকাঠিটি অনেকের হাতেই নেই।

এই যুগে যন্ত্র-সঙ্গীতের অসম্ভব উন্নতি হয়েছে। এখন যেরকম প্রিলিউড বা ইনটারলিউডে সুরকারের বা অ্যারেঞ্জারের সৃজনী ক্ষমতা বিকাশ পায়, সেই যুগে সেটা প্রায় অকল্পনীয় ছিল। একটি আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ করার মত। সেদিনকার সব গানই সহজ দাদরা বা কাহারবায় নিবদ্ধ। অন্য তাল তো দূরের কথা, দাদরা, কার্ফারও যে বিচিত্র চলন এ যুগে লক্ষ করা যায়, সেই যুগে সেটা খুব কম দেখা যায় (রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের অনেক উদাহরণ সত্ত্বেও)। এটা কি শুধুই সহজভাবে লোকরঞ্জনী প্রক্রিয়া? অথচ নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তখনকার শিল্পীদের সঙ্গীতশিক্ষা ছিল আন্তরিক—পরিশ্রম ছিল অমানুষিক, যার জন্য তিন বা চার দশক ধরে তাঁদেরই রাজত্ব অব্যাহত রইল: পরবর্তী অনেকেই "আব্‌দুল হোসেন"। জগন্ময় মিত্র আধুনিক গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত "প্রথম আদি তব শক্তি" রেকর্ড করেছেন। এ যুগের খুব কম আধুনিক শিল্পী সুর ফাঁকতালে গাইতে পারবেন। ফিরোজা বেগম যেভাবে অন্যের গাওয়া গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান, তাতে পার্সোনালিটি ইমেজ নয়, সুরের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। "পৃথিবী আমারে চায়", "এই কি গো শেষ দান", "ছায়া মরুনদী" এখনও বহু যুগের ওপার থেকে সকলকে সচকিত করে গেল। "আলুক দোলা"

জবাব-এর "এ্যায় চাঁদ ছুপ না জানা" গানে যে ছন্দ, তার সঙ্গে আজকের বিদেশী ছন্দের কোন মিল নেই—একান্তভাবেই ভারতীয় অথচ চূড়ান্তভাবে কমার্শিয়াল। দ্বিতীয়ত, প্রণব রায় মাঝে মাঝেই বাংলা গান লিখেছেন এবং হিন্দীতে ফৈয়াজ হাসানি রূপান্তরিত করেছেন—এইভাবেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'হেমন্তকুমার' হয়েছেন, জগন্ময় মিত্র 'জগমোহন' হয়েছেন এবং তালাত মামুদ হয়েছেন 'তপনকুমার'—এই উদাহরণ এ যুগে দেওয়া যাবে না (ফিল্মের গানের রূপান্তর ছাড়া)। এইরকম একটি গজল ভাঙার সুর শোনা গেল ফিরোজা বেগমের কণ্ঠে 'ঘুমের ছায়া চাঁদের চোখে' এবং হিন্দী রূপান্তর 'সোয়ে হুয়ে হ্যায়'। গানের কথার দিক দিয়ে তখনকার নিশ্চিতভাবেই এখনকার তুলনায় অনেক গভীর, যদিও অনেক শব্দ ও প্রতীক এখন অচল। আর একটি লক্ষণীয় ঘটনা : পৃথিবীতে প্রেম বিরহ ছাড়া (বিরহই বেশী) অন্য কিছু গানের বিষয়ভুক্ত নয়। এই বিরহের একাধিপত্যই কি জগন্ময় মিত্রকে একঘেয়ে করেছিল? গানগুলির রচনাকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে। দেশ তখন উত্তাল, অথচ তখনকার আধুনিক গানে তার ছায়া পড়েনি। তখনকার সিনেমায় অনেক সময় আচমকা দেশাত্মবোধের কথা এসে পড়ত। এবং জনতা হাততালি দিতেন। কমল দাশগুপ্ত স্মরণ-সন্ধ্যায় মাত্র দুটি সমাজ-সচেতন গান শোনা গেল—"আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়" এবং "পৃথিবী আমারে চায়"। এখানেও আচমকা দু শো বছরের নিষ্ঠুর শাসনের কথা এসে পড়েছে—এবং দুটি গানই অদ্ভুত জনপ্রিয় হয়েছিল (কৃষ্ণচন্দ্র দের 'মুক্তির মন্দির-সোপানতলে' অনেক পরে গাওয়া)। আসলে রেকর্ড কোম্পানী ব্যবসায়িক সাফল্যটাই বোঝেন, তাই কাউকে ক্রমাগত বিরহের গান, কাউকে একের পর এক ছোটদের ছড়া গাইতে গাইতে নেপথ্যে চলে যেতে হয়। পরবর্তীকালে "গাঁয়ের বধূ" সুপারহিট হওয়ার পর 'রিকশার গান', 'মাঝির গান' পর পর অনেক গান শোনা গেল, যাতে ব্যবসাই প্রমাণিত হয়—রেকর্ড কোম্পানীর গণসচেতনতা নয়। রেকর্ড-সংগীতে একসপেরিমেন্ট অর্থই হল ব্যবসায়িক একসপেরিমেন্ট।

রবীন চট্টোপাধ্যায় স্মরণ-সন্ধ্যায় গাইলেন শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। এবং তাঁর সুরে যন্ত্রসঙ্গীতে বাজালেন মিলন গুপ্ত। রবীন চট্টোপাধ্যায় কমল দাশগুপ্তের পরবর্তী কালের সুরকার—যদিও তিনি ফিল্মের জগতেই বেশী ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই যুগে প্রিলিউড বা ইনটারলিউডের বৈচিত্র্য লক্ষণীয় গানের ছন্দবৈচিত্র্যও নিঃসন্দেহে এখনকার দিনে নতুনত্ব আনল। গানের কথাও শুধুমাত্র বিরহ-সর্বস্ব নয়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আসরে যখন গান করেন, তখন তিনি অনন্যা। সেদিনও তাঁর গান শুনে সুরকারের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা গেল। শৈলেন রায়ের কথায় 'মানুষের মনে

কথায় বলে
"বাপ কা বেটা!"

"এখন এর নাম হয়েছে মলটোভা।
কিন্তু এতো আজকের নয়, সেই যখন থেকে
টেনিস খেলতে শুরু করেছি,
তখন থেকেই সঙ্গী..."

বলেন প্রেমজিৎ লাল,
ডেভিস কাপের অন্যতম প্রাক্তন নায়ক।
ভারতের এক অগ্রণী টেনিস খেলোয়াড়.

"মলটোভা আর টেনিস —
আমাদের পরিবারে
রক্তের সঙ্গে মিশে আছে.."

বলে ওঠে দেব লাল
প্রেমজিৎ-তনয়,
ভারতের টেনিস জগতের উদীয়মান তারা।
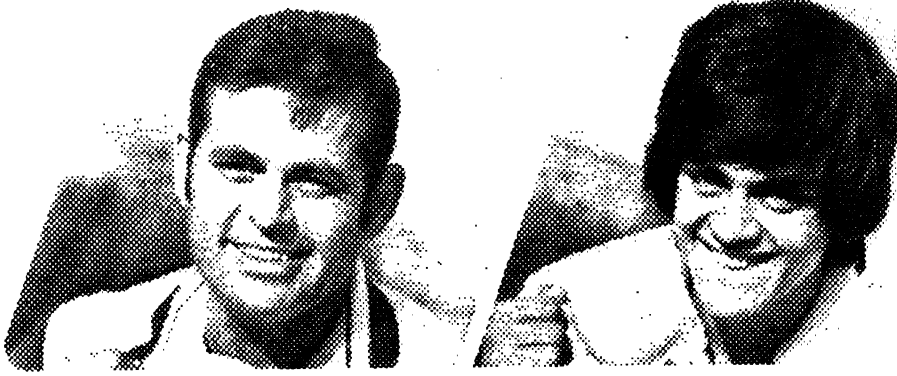
মলটোভা
কর্মচঞ্চল জীবনে স্ফূর্তি আনার মতো সুস্বাদু শক্তিদায়ক পানীয়

প্রেমজিত লাল দেব লাল।
খ্যাতনামা পিতা খ্যাতনামা পুত্র।
বংশানুক্রমে এদের টেনিস্ প্রীতি ও কর্মচঞ্চলতার প্রতি আকর্ষণ।
বংশানুক্রমে এরা শক্তি ও স্ফূর্তির জন্য খেয়ে আসছেন সুস্বাদু পানীয় যার নতুন নাম মলটোভা।
আর প্রেমজিৎ এর মতে, দেবও জানেন মলটোভার শক্তিদায়ক প্রোটীন ও স্বাস্থ্যবর্ধক ভিটামিন ও খনিজ উপাদান কতটা কর্মশক্তি যোগায়। সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেবার জন্য বাড়তি শক্তিটুকু নিন। জয় হবেই। বাস্তবিক প্রেমজিতের ১৭ বছরের ডেভিস কাপ রেকর্ড ঈর্ষনীয়। এখন দেবও তো এক উজ্জ্বল আগামী কালের নায়ক।

৫০০ গ্রাম
১৩.৯৯ টাকা
স্থানীয় কর
অতিরিক্ত

ASP/JIL-10-20.3 A

JIL জগৎজিত ইণ্ডাস্ট্রীজ্ লিমিটেড
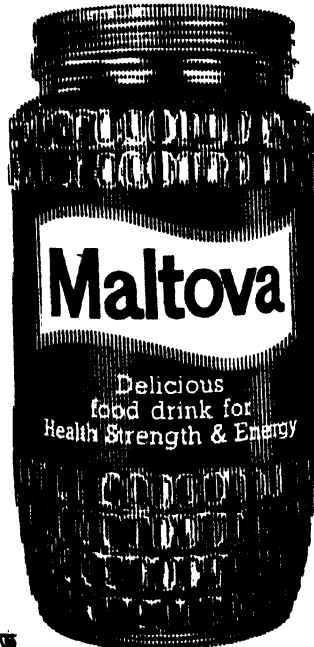
মলটোভা
সাফল্যের সেই বিশেষ স্বাদের জন্য

রাত কাঁদে' (জলজপাল) গানে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরের ব্যাপ্তি বোঝা যায়। যদিও এগুলি ফিল্মের প্রয়োজনে গড়া। কিন্তু ফিল্মের বাইরেও প্রণব রায়ের কথায় 'আর জনমে তোমায় হয় গো পাওয়া', 'মধুমালতী ডাকে আয়' অথবা ওগো মোর গীতিময়', 'মরমী গো আজ মনের কথা কইব' গানগুলি আজও আধুনিক—কথা ও সুরে। 'ভরা গাঙে ভয় করি না'—গানের চলন রাধাকান্ত নন্দীর তবলা সহযোগিতায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। রাগাভিত্তিক গানও যে সুরকারের শিল্প-ভাবনায় স্বতন্ত্র রূপ নেয়, তার উজ্জ্বল উদাহরণ প্রণব রায়ের কথা, 'আমি শুধু ভাঙি, জানি না তো গড়িতে' (দেবী মালিনী)। আবার পাশ্চাত্য সুর-প্রভাবে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় 'ঘুম ঘুম চাঁদ, ঝিকিমিকি তারা' (সবার উপরে) কিংবা অন্য ধরনের এ শুধু গানের দিন (পথে হল দেরি) গানের সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কেও স্মরণীয় করে রাখবে। শ্যামল মিত্র 'সাগরিকা', 'মায়ার সংসার', 'আকাশ-প্রদীপ' প্রভৃতি অনেক হিট ছবির গান শোনান। কিন্তু স্মৃতি তুমি বেদনার। কণ্ঠের ঔজ্জ্বল্য এখন ম্রিয়মান। সব গানের স্কেল এক হওয়ার এবং সেটা নীচু হওয়ার জন্য পুরনো দিন শুধু উঁকি মেরেই ফিরে যায়।

সুরসঞ্চয়ন আর একটি সন্ধ্যায় প্রযোজিত হল নৃত্যনাট্য শ্যামা, এইদিন সন্তোষ সেনগুপ্তকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন ফিরোজা বেগম। কলকাতার আজ নৃত্যনাট্যের যে প্রসার, তার মূলে সন্তোষ সেনগুপ্তের অবদান অনস্বীকার্য। সেই দিক দিয়ে এই সংবর্ধনায় একটি কর্তব্য পালন করা গেল। এই দিনের শ্যামা নৃত্যনাট্য যা সচরাচর হয়ে থাকে, তার ব্যতিক্রম নয়। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে বজ্রসেনের ভূমিকায় সাগর সেন বেশ ভালই গাইলেন এবং শ্যামার ভূমিকায় দেখা গেল তপতী রায়কে—একটি রেখাপাত করার মত নতুন নাম। ভাল লাগেনি উত্তীয়ের ভূমিকায় গোরা সর্বাধিকারীকে। আর শ্যামার গানে ছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি একই সঙ্গে ব্যতিক্রম ও উদাহরণ।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

ফটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

অঙ্কের নিয়মে

'অবলম্বন' শব্দটির বদলে বাংলা নাটকের 'আবহাওয়ায়' শব্দটির প্রচলনে ক্ষতি কি? বহু রূপান্তরিত নাটক দেশজ পটভূমিতে বাধিক্ষু হয়েছে—আর রামায়ণ মহাভারতের নানারকম স্মরণীয় ব্যাখ্যা আমাদের হাতের কাছেই আছে। কিন্তু রূপান্তর করতে বাংলা নাটকের প্রচলিত (যদিও দীর্ঘদিন সেই ফ্যানাও অচল হয়ে গেছে) প্যাঁচগুলি বিদেশী নামাবলী গায়ে জড়িয়ে হাজির

শিশির মঞ্চে 'রূপারোপ' সংস্থার দুটি একাঙ্কের মধ্যে প্রথম একাঙ্ক ছিল ম্যাক্সিম গর্কীর 'চেলকাশ'। রূপারোপ সংস্থা একেবারেই নবজাতক কিন্তু বিষয় নির্বাচনে এবং প্রয়োগ পরিকল্পনায় সম্ভাবনাময়। ম্যাক্সিম গর্কীর 'চেলকাশে' চরিত্রগুলির নাম বিদেশী—কিন্তু সোজা বাংলায় চললে প্রধানুযায়ী শোষিত মানুষের 'আর্গ-মার্ক' হয় না তাই চেলকাশ কথা বলে সম্পূর্ণ "দুই মহলের" লালুদার ভঙ্গিতে। এই ডায়ালেক্ট এখন বিগত যুগে বাংলা নাটকে সাহেবদের ভাঙা উচ্চারণের মত নিয়মানুগত্য। অভিনয়ে অবশ্য শান্তিরঞ্জন সিংহ যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে আদর্শকে অনুসরণ করেছেন। খুব ভাল লাগে গাব্রিলার ভূমিকায় চয়ন রায়চৌধুরীকে। যদিও তীব্র আবেগের মুহূর্তে তিনি বিধি ও ব্যতিক্রমের দোলায় দ্বিধাগ্রস্ত। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অনেক কষ্টের কথা এবং ফেলে আসা সুখস্মৃতি, পরিণতিতে দীর্ঘস্থায়ী আবেগের অসংযম প্রযোজনাকে পঙ্গু করে দেয়। পোর্ট কনস্টেবলের ভূমিকায় গোপাল চক্রবর্তীর টাইপ অভিনয় কিছুক্ষণ বাদেই একঘেয়ে হয়ে যায়—কারণ তাঁকে বিস্তারিতভাবে পুলিসের ঘুষ নেওয়ায় বাংলা নাটকের দীর্ঘস্থায়ী আবর্তে পড়তে হয়। সকলেই প্রায় এক লাইনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, আপার ডায়াস ব্যবহৃত হয় খুব কম, যার জন্য কম্পোজিশনে ডাইমেনশন আনে না। এর মধ্যে অজিত ভট্টাচার্য সর্বক্ষণ উইংসের ধারে ঘোরাঘুরি করেন, কারণটি অস্পষ্ট হয় যখন প্রম্পটারদের গলা দূরশ্রাব্য হয়ে ওঠে। জোছন দস্তিদারের মঞ্চ পরিকল্পনা প্রায় মঞ্চটাকে ফাঁকা রেখে করা হয়েছে—ডাইমেনশন দিয়েছে পিন্টু বসুর আলো এবং সময়ান্তরে কিছু স্লাইড। মঞ্চ পরিকল্পনায় একবারও ভাবা হয়নি—আপার ডায়াসের পিছনে বসে দুজন লোক নৌকো চালালে তাঁদের কতটা দেখা যাবে। দীর্ঘক্ষণ সংলাপে তাঁদের মাথার সামান্য অংশ এই লাইনে দোলে—যা নৌকায় বসে সমুদ্রের দোলায় অসম্ভব। এই সময় লোকে যে আপত্তি করে না, সেটি আলো ও শব্দের জন্য। এই একাংকে শ্রীপতি দাসের ধ্বনি অসম্ভব ভাল কাজ করেছে। বিভিন্ন জায়গায় মিক্সিং এবং সব সময় আবহ কতটা জোরে বাজালে সংলাপও মার খায় না, অথচ পরিবেশ স্পষ্ট হয়, তার উদাহরণ হয়ে থাকবে। আমাদের নাটকে প্রায়শই টেপ উচ্চকণ্ঠ—অনেক সময় পরিচালকের নির্দেশে খুব আস্তে আস্তে বাজে, যাতে লক্ষ্য অব্যর্থ হয় না—মৃদুভাষিণী সব সময় কমপ্লিমেন্ট নয়।

দ্বিতীয় একাংক জোছন দস্তিদারের একাংক 'তাই হবে"—এই নাটকেও পুনরাবৃত্তি। বেকারদের একমাত্র অবলম্বন মাস্তান পকেটমার হওয়া—কিছু মাস্তানী সংলাপ এখনও লোককে হাসায়, ভাবায় না। মূল নাটকের বক্তব্য একটা থিয়োরীর উপরে প্রতিষ্ঠিত—যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৌঁছনো যায়

ব্যাগ বিত্তিম লোকের পকেট থেকে খোয়া যায়। অভিনয়ে দীপেন রুদ্র ও গোপাল চক্রবর্তীকে সবচেয়ে ভাল লাগে। সবশেষে ছোটার দৃশ্যটি বাংলা নাটকে সবচেয়ে ভাল জানা 'মাইম'।

রূপারোপ প্রথম অভিনয়েই তাঁদের ক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন, কিন্তু শুধুই পিছন দিকে হাঁটলে তাঁদের ছোটাটা এই মাইমের মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছোটার মত "এই হবে!"

দেবাশিস দাশগুপ্ত

'আমি মদন বলছি'

বাঁকুড়ার একটি গ্রাম তেঁতুলে বিষ্ণুপুরের এক যুবক মদন মণ্ডল, চাষীর সন্তান কিন্তু শৌখিন, গ্রামের অনুন্নত পারিজন ও পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে শহর কলকাতায় চলে আসে, উদ্দেশ্য ভদ্র জীবিকা। কিন্তু চারিত্রিক যে শুচিতা ও শৌখিনতা রক্ষার জন্য সে গ্রাম ছেড়েছে, দেখা গেল এই শহরে তা আরো বিপর্যস্ত। মনের মতো একজন 'বাবু' খুঁজতে গিয়ে সে বিভ্রান্ত ও সর্বহারা।

মনোজ মিত্রর 'আমি মদন বলছি' আসলে এক স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী, যে স্বপ্ন আপাতসুন্দর কিন্তু মিথ্যা, যার আকর্ষণে এই দেশের অনেক মানুষই তার আপন ঐতিহ্য ও গৌরব থেকে সরে এসে বিনিময়ে পেয়েছে শুধু লাঞ্ছনা। মদন মণ্ডলের আত্মবিলাপের মধ্য দিয়ে মনোজ মিত্র এই সত্যই উদ্‌ঘাটন করেছেন বর্তমান রচনায়। সমীর ঘোষের দৃশ্য সংযোজন ও সুভাষ দে-র নির্দেশনায় সম্প্রতি তপন থিয়েটারে নাটকটি মোটামুটিভাবে সাফল্যের সঙ্গেই মঞ্চস্থ করলেন 'সুরীনা'। মদনের চরিত্রস্রষ্টা নির্দেশক স্বয়ং, আপাতহাসির পটভূমিকায় চরিত্রটির নিগূঢ় কান্না তিনি তাঁর অভিনয়ে মূর্ত করতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-

যোগ্য অসিত ব্যানার্জী (রেলের বড়বাবু), সুধাংশু সরকার (কালীনাথ), স্বপন সেন (কপালফাটা), দীপক গাঙ্গুলী (রেলুড়ে যুবক), অরুণ দাস (মাতাল) প্রমুখ।

রাজা দাস ফোটো : শীতল দাস

ওড়িশী নৃত্যে রত্না

মহাপাত্র, যিনি সংযুক্তা পাণিগ্রাহীরও গুরুজী, নৃত্যামোদীদের সামনে অনেক প্রতিভাকে তুলে ধরলেন। কলকাতায় রত্নার এই প্রথম অনুষ্ঠান। নিরলস সাধনা ও সহজাত দক্ষতা—দুয়ে মিলে এক সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল শিল্পজীবন তাঁর সামনে।

রত্নার সাফল্যের মূল কারণ সহজেই অনুমেয়। অন্য যে কোনও ভারতীয় ধ্রুপদী নাচের মধ্যে ওড়িশী অনেক বেশী জীবন্ত। বলা যায়, এ-শিল্প কাব্যকে শরীর দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস। অঙ্গ-চালনের ও মুখভঙ্গিমার গুণে ওড়িশীতে চরমে পৌঁছেছে। জয়দেবের গীত-গোবিন্দমের কিংবা ওড়িশার ভক্ত কবি বনমালীর রাধাকৃষ্ণ বন্দনা গানের ভাব শুধু অভিনয়ের মাধ্যমে নয়, প্রতি অঙ্গের সঞ্চালনের, বা কখনও দ্রুত পরিবর্তিত আবার কখনও মূর্তিবৎ স্থির—এই অভিব্যক্তির সাহায্যে প্রকাশ হওয়ার দাবি রাখে। বিশুদ্ধ নাচ ও অভিনয়ের এমন সমন্বয় অন্য ধারায় বিরল।

শুরুতে মঙ্গলাচরণ আর পল্লবীতে রত্নার পটুত্ব যেমন অনায়াস তেমনি সাবলীল। পল্লবীর শেষের দ্রুতলয়ে 'তরিঝাম' খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। অভিনয়ে রত্নার কুশলতা পরিলক্ষিত হয় প্রথমেই বনমালীর 'তো লাগি গোপমণ্ড দণ্ড মানয়ে' গানের নৃত্য রূপান্তরণে —আরও লক্ষণীয়ভাবে গীতগোবিন্দমের পরিবেশনায়। 'ধীর সমীরে যমুনা তীরে' নৃত্যাংশে দেখাল যে নাটকাভিনয় ও নৃত্য ভঙ্গির সংকেতপূর্ণ বিস্তার—এই দুই ক্ষেত্রেও শিল্পীর দক্ষতা যথেষ্ট। আরেকটি প্রশংসনীয় দিক ছিল 'ইরটিক' আবেদনের রুচিসম্মত পরিচালনা।

এই প্রতিভাবান তরুণী শিল্পীকে কলকাতার নৃত্যকলারসিকদের সামনে

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সেপ্টেম্বর এক টাকা

দেশ
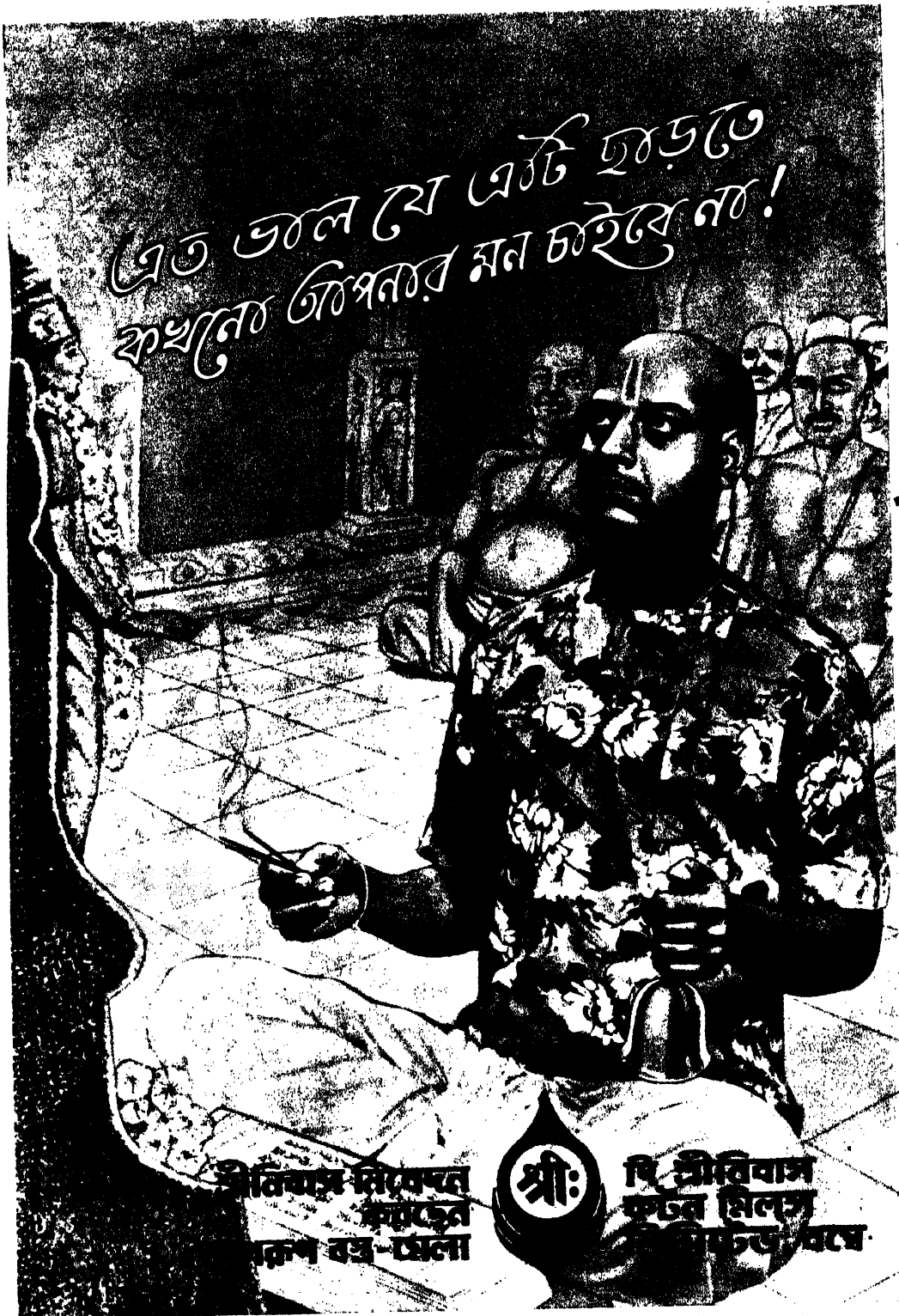
এত ভাল যে এটি ছাড়তে
কখনো আপনার মন চাইবে না!
করছেন
বস্ত্র-মেলা
শ্রীঃ
কটন মিলস

কোনো মেক-আপই
আপনার চেহারার পক্ষে
ভালো নয়, যদি না তা আপনা
ত্বকের পক্ষে ভালো হয়!

প্রকাশিত হয়েছে

এতাবৎকালের দীর্ঘতম নতুন উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

হাওয়া গাড়ি ৩০৲

এই লেখকের আরও দু'খানি উপন্যাস

অর্জুনের অজ্ঞাতবাস ১৫৲ ঈশ্বরীতলার রূপোকথা ১৪৲

প্রকাশিত হয়েছে

সুবিখ্যাত লেখক প্রফুল্ল রায়ের

যশস্বী লেখক দিব্যেন্দু পালিতের

সাধ-আহ্লাদ ও অহঙ্কার

প্রফুল্ল রায়ের গল্প বয়নের আশ্চর্য ক্ষমতা এই উপন্যাসে প্রত্যক্ষ মূল্য-দশ টাকা।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে শুধু পড়বার নয় ভাববার কথাও যথেষ্ট থাকে। আট টাকা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

সেই অত্যাশ্চর্য সুমহান্ উপন্যাস

পাঞ্চজন্য

প্রথম খণ্ড—ষোল টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড—ষোল টাকা

সদ্য প্রকাশিত নতুন উপন্যাস

সমরেশ মজুমদারের

উত্তরাধিকার ৩০৲

বিমল মিত্রের

বাংলা সাহিত্যের একটি মহান উপন্যাস

কড়ি দিয়ে কিনলাম

১ম খণ্ড—৪৩৲ ২য় খণ্ড—৩২৲

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

নফর সংকীর্তন ৭৲ যে যেমন ৩৲ আসামী হাজির (১/২) ৪৫৲ বেনারসী ৮৲ কুমারীব্রত ৬৲ চলতে চলতে ১৬৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৮৲ ফুলফুটুক ৩৲ সাহেব বিবি গোলাম (পে. ব্যা.) ১২·৫০ স্ত্রী ৮৲ একক দশক শতক ৩০৲ জন গণ মন ১৬৲ সখী সমাচার ৮৲ যে অঙ্ক মেলেনি ১২৲ তিন নম্বর সাক্ষী ১০৲ কলকাতা থেকে বলছি ৮৲

'ঠাকুরমা'র ঝুলি' ও 'ঠাকুরদার ঝুলি'-র

অমর স্রষ্টা শিশু সাহিত্য সম্রাট

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র

॥ প্রথম খণ্ড ঃ মূল্য—পনেরো টাকা ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

॥ কিশোর পাঠোপযোগী সমগ্র গ্রন্থের সংকলন ॥

কিশোরসাহিত্য-সমগ্র

মূল্য—১ম খণ্ড সাড়ে বারো টাকা

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

তামসী ১৪৲ চলতি মেঘের ছায়া ৮৲ তৃতীয় নয়ন ৬৲ নিশানা ৮৲ ছবি ৪৲ ছায়াতীর ৭৲ লৌহকপাট (৪র্থ) ৭৲

জরাসন্ধের

নিঃসঙ্গ পথিক

প্রথম খণ্ড-১৮৲

দ্বিতীয় খণ্ড-১৮৲

লৌহকপাট

(চারটি খণ্ড একত্রে) পঁয়ত্রিশ টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ৩৪-৮৭৯১

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ৩৪-৩৪৯২

চিঠিপত্র

বরাবর যাত্রা

দেশ ১৯ মে ১৯৭৯ সংখ্যায় "বরাবর যাত্রায় ভীষণ বিপদ" এবং এই বিষয়ে দেশ ৭ জুলাই, ১১ ও ১৮ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত চিঠি-গুলি আগ্রহ সহকারে পড়লাম। পরিপূরক হিসেবে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। ত্রিপুররাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা লিখিত 'ভারতীয় স্মৃতিকথা ও চিত্র' গ্রন্থের গয়া জিলা অধ্যায়ে বরাবর পর্বত সম্বন্ধে আলোকচিত্র সহ একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। এই লেখায় সমরেন্দ্রচন্দ্র বরাবরের ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে প্রচলিত প্রবাদ এবং কিংবদন্তীও পাঠকের কাছে পেশ করেছেন, যার কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি, "কর্ণচোকার গুহার প্রবেশ পথের পশ্চিম কোণে মৃত্তিকায় প্রোথিত এক শিলাখন্ডস্থ উৎকীর্ণ লিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গুহাটি খনিত হইয়া খ্যাতনামা সম্রাট অশোকের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ....অশোকের নামে উৎসৃষ্ট সুদামা গুহার পূর্ব-দিকে লোমশ ঋষির কন্দর নামে যে আর একটি গুহা অবস্থিত....তাহার দ্বারের ঊর্ধ্বভাগে শ্রেণীবদ্ধ বহু সংখ্যক হস্তিমূর্তি খোদিত আছে। উক্ত হস্তিমূর্তি সমূহের নিম্নদেশস্থ গুপ্ত নৃপতিগণের শাসনকালীন প্রচলিত অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অনন্তবর্মা নামক মৌক্ষরী বংশীয় মধ্যদেশের (যুক্তপ্রদেশ) জনৈক হিন্দুধর্মাবলম্বী নৃপতি কর্তৃক উল্লিখিত গুহা-মধ্যে এক কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গুহা এত আধুনিক নহে, প্রাগুক্ত সুদামা গুহারই সমকালীন—জেনারল ক্যানিংহেমের এইরূপ মত।"

এই পর্বতের বরাবর নাম হওয়া সম্বন্ধে সমরেন্দ্রচন্দ্র যে প্রবাদটির উল্লেখ করেছেন তা হল দৈত্যরাজ "বাণ" এখানেই বসে মহাদেবের কঠোর তপস্যা করেন এবং ভক্তের ক্লেশ, সহিষ্ণুতা ও ভক্তি দেখে মহাদেব খুশি হয়ে দৈত্যরাজ বাণকে বর দেন। সেই থেকে পর্বতটির নাম 'বাণবর' হয় এবং কালক্রমে অপভ্রষ্ট হয়ে "বরাবর" নামে পরিচিত হয়।

ভারতীয় স্মৃতিকথা ও চিত্র প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দে (ইংরাজী— ১৯২৬ সন)। আমাদের জানা নেই যে মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকায় ১৩২১ সালে প্রকাশিত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-সঙ্গমে" প্রবন্ধটি সমরেন্দ্রচন্দ্রকে বরাবর ভ্রমণে অনুপ্রাণিত করেছিল কিনা। তবে "ভারতীয় স্মৃতি"র অবতরণিকা থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করিলাম—কয়েকটি প্রদেশ পরিভ্রমণকালে আমি সেই সমস্ত স্থানে অবস্থিত প্রাচীন কীর্তি-চিহ্ন-নিচয়ের যে সমুদয় আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে কোন পুস্তক যে প্রকাশ করাব এইরূপ ভরসা কিংবা ধারণা আমার মনে কখনও উদিত হয় নাই। কেবল—সুহৃদ্বর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি এই কার্যে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি। বিশেষত—আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জীবদ্দশায় অনেক দিন হইতেই আমাকে এই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পুস্তকখানি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না এইজন্য চিরদিনের তরে দুঃখ রহিয়া গেল।"

এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট কিছু প্রমাণ না হলেও, একথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, গ্রন্থকারের বরাবর যাত্রার পিছনে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের উৎসাহ হয়তো ছিল।

পরিমল রায়
কলিকাতা

বরাবর যাত্রায় ভীষণ বিপদ

'বরাবর যাত্রায় ভীষণ বিপদ' প্রবন্ধটি নিয়ে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত যে প্রবন্ধ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে রচিত, এবং যে প্রবন্ধ উপলক্ষে বিদুষী লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায় অনুগ্রহ করে ওঁর কিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন—সে সম্বন্ধে আর অযথা বাদানুবাদ না বাড়ানোই বাঞ্ছনীয়। এ জন্যে এই চিঠি।

(এক) পত্রলেখক নীহারকান্তি সেনগুপ্তের চিঠি (দেশ, ১১ আগস্ট সংখ্যা) পড়ে ভাল লাগল। তিনি খুব তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, "পাঠক হিসেবে ভাল লাগাকেই বড় করে দেখব।" এবং "চৌষট্টি বছর আগে প্রকাশিত কোনো রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাবই বা কি করে?"

নিতান্ত সত্যি কথা। বিগত যুগের খ্যাত-অখ্যাত নানান সাময়িক-পত্রের মধ্যে রবীন্দ্র-জীবনীর বহু উপকরণ ছড়ানো। এমন এমন বৃত্তান্ত আছে যা শুধু গবেষকবে নয়, সাধারণ পাঠককে পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক অথবা আনন্দ-বেদনায় আপ্লুত করে দিতে পারে।

মুশকিল এই যে, পুরনো সাময়িকপত্রগুলি সাধারণ পাঠকের নাগালের প্রায় বাইরে। কচিৎ দু-দশ জনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে কিছু সাময়িকপত্র রয়েছে বড়জোর। ভাগ্য-বানদের সংখ্যা আঙুলে গুণে বলা যায়।

অল্প কয়েকটি প্রাচীন লাইব্রেরিতে পুরনো সাময়িকপত্র থাকলেও সেগুলি পড়ার ব্যাপারে গুরুতর অসুবিধে। আমি নিজে একটি প্রাচীন লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত। অভিজ্ঞতায় জানি পুরনো সাময়িকপত্র কোনো মতেই মেম্বারদের বাড়িতে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। অন্যান্য যাবতীয় প্রাচীন লাইব্রেরিতেও একই নিয়ম কঠোরভাবে বলবৎ। নিয়মটি অবশ্য খুব ন্যায্য। পুরনো সাময়িকপত্র বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কোনো পাঠক যদি তা ফেরত না দেন তবে যে

তা চিরকালের মতো বেহাত হয়ে গেল। মেম্বারের ডিপোজিট টাকা বাজেয়াপ্ত করে কর্তৃপক্ষের হবেটা কি? পুরনো সাময়িকপত্র তো আর ঐ টাকা ফেলে বাজারে মিলবে না। সুতরাং কেবলমাত্র লাইব্রেরির নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে, লাইব্রেরি ঘরে বসে সেগুলি পড়বার অনুমতি পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন—কট্টর গবেষক ছাড়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুঁজে প্রাচীন লাইব্রেরির সন্ধান নিয়ে এবং সেখানে গিয়ে দিনের পর দিন বসে নিয়মিত পুরনো সাময়িকপত্র ঘাঁটা এবং পড়া সম্ভব? আমি মনে করি অসম্ভব। আমার কাজ তাই পুরনো দিনের অসাধারণ ঘটনাগুলি এযুগের পাঠকের উপযোগী ভাষায় ধরে দেওয়া—ব্যস এইমাত্র। একাজে নেমে সব সময়ে মনে রাখি, সাহিত্যে উৎসাহী অসংখ্য সাধারণ পাঠক ও গবেষক পাঠক এক নন। অতএব সাধারণ পাঠকের উপযোগী সহজ সরল একালের ভাষা ব্যবহার না করলে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

যে সব সহৃদয় পাঠক আমার লেখার বিষয়বস্তু এবং লেখার ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন, আমি নিজে 'ক্রিয়েটিভ রাইটার' বা সৃষ্টিশীল লেখক বলে কখনোই দাবি করি না। অপর পক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অসাধারণ গবেষকের ধারে কাছে দাঁড়াবার মতো দুঃসাহসও আমার নেই। আসলে আমার কাজ একজন 'মালী'র। বিগত যুগে বাংলা সাহিত্যের ফুলবাগানে যে অসংখ্য নানা রঙের ফুল আপন মহিমায় ফুটেছিল, সেগুলির কিছু কিছু সংগ্রহ করে এ যুগের পাঠকের কাছে তোড়া বেঁধে দেওয়া—এইটুকু শুধু।

শ্রীমতী বাণী রায়ের অভিযোগটি কি? তিনি বলেন, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া বিবরণ বেমালুম আত্মসাৎ করে সুজিতবাবু তা নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। মূল লেখক সতীশচন্দ্রকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে লুকিয়ে রেখে সুজিতবাবু নিজেকেই মূল বিবরণ তথা কাহিনীর লেখক বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছেন।

মারাত্মক অভিযোগটি একটু নেড়ে চেড়ে দেখা যাক। প্রথমেই আমি জানতে ইচ্ছুক—কিভাবে তা আমার পক্ষে করা সম্ভব? প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগের ঘটনা কিভাবে আমি নিজের নামে বা নিজে দেখেছি বলে চালাবো? বরাবর পাহাড়ে ও ঘটনা যখন ঘটছে, তখন আমার পিতৃদেবও যে জন্মগ্রহণ করেননি!

'বরাবর যাত্রায় ভীষণ বিপদ' প্রবন্ধ মন দিয়ে পড়লে সহজেই বোঝা যায়—গয়া স্টেশন থেকে বরাবর পাহাড়ে রওনা হওয়া ও যাত্রা ভণ্ডুল হবার পর সন্ধ্যেতে ফের গয়া স্টেশন ফিরে আসা—এই পুরো একটি দিনের চিত্তাকর্ষক ঘটনাগুলির আংশিক সাক্ষী বেশ কয়েকজন ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ঘটনা নিজের চোখে প্রায় আগাগোড়া দেখার পূর্ণাঙ্গ সাক্ষী একজনই মাত্র।

কে তিনি? অবশ্যই তিনি শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ যদি ওদিনের নায়ক হন, তবে প্রত্যক্ষদর্শী রিপোর্টার তো সতীশচন্দ্রই। 'বরাবর যাত্রায় ভীষণ বিপদ!' প্রবন্ধটি আমিও তো আগাগোড়া সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণ অনুসারেই উপস্থাপিত করেছি। শুধু দৃষ্টিকোণেই নয়, এমন কি স্বয়ং সতীশচন্দ্রের জবানীতে। যেখানে সতীশচন্দ্র যা মন্তব্য করেছেন, তা আমি তাঁর মুখেই বসিয়েছি। অনুরূপভাবে, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, বসন্তবাবু যে যা বলেছেন তা-ও আমি যথাযথভাবে তাঁদের সংলাপ হিসেবে রেখেছি। তাঁরা যা বলেননি, এমন কোনো সংলাপ বা যা ঘটেনি এমন কোনো ঘটনা বানিয়ে বানিয়ে লিখে দেবার অধিকার তো আমার নেই। সতীশচন্দ্র যা দেখার সুযোগ পাননি এমন কোনো কোনো সত্য ঘটনার অংশ আমি যুক্ত করেছি। কিন্তু সতীশচন্দ্রকে বাদ দিলাম কোথায়? এ কাহিনীর প্রথম পাতাতেই সতীশচন্দ্রের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করেছি। এবং কাহিনীও ধাপে ধাপে এগিয়েছে ওঁর জবানীতেই। যথা—'সতীশচন্দ্র তখন বললেন', 'সতীশচন্দ্র তখন দেখলেন', 'সতীশচন্দ্র তখন অনুভব করলেন', 'সতীশচন্দ্র তো মুগ্ধ ও বিস্মিত', 'সতীশচন্দ্রের তখন খিদেয় পেট জ্বলছে', আমি গুণে দেখতে পাচ্ছি চুয়াত্তরবার সতীশচন্দ্রের নাম আমি উল্লেখ করেছি এ প্রবন্ধে। অতএব সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উপেক্ষা করে আমি তাঁর দেওয়া তথ্য নিজের নামে চালাতে চেষ্টা করেছি, বা ওঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে লুকিয়ে রেখে আমি মূল লেখক বলে নিজেকে জাহির করেছি বা সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঋণ অকৃতজ্ঞের মতো অস্বীকার করেছি—এ অভিযোগ কিভাবে উঠতে পারে তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। তবে, একথা স্বীকার করে নেওয়াই উচিত যে মূল কাহিনীর উৎস যে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা তা আমার প্রবন্ধের শেষে নির্দেশিত হলে অধিকতর সঙ্গত হতো।

(দুই) এবার অন্য কথা। বরাবর পাহাড়ের ঘটনা সে যুগে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়ে তো বটেই, কিছু পরবর্তীকালেও কোনো কোনো স্মৃতিকথায় বা কারুর মন্তব্যে ঘটনাটির উল্লেখ দেখা যায়। এই ভ্রমণ ভণ্ডুল হওয়ার জন্য যে ভদ্রলোকটি সম্পূর্ণ দায়ী, তাঁর আসল নামটির কিন্তু কোথাও উল্লেখ নেই। 'ক' বাবু, 'অ বাবু', '—বাবু' ইত্যাদির আড়ালে আসল নাম ঢাকা। কেন? আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথ যেহেতু ঐ ভদ্রলোককে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে ঘটনাটি নিয়ে মাতামাতি করতে বারণ ক'রে দিয়েছিলেন অন্য সবাইকে, তাই তৎকালীন কোনো লেখক বা সম্পাদক—ওঁর নাম জানলেও নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। আরো একটি কারণও হয় তো আছে। ওঁর নাম সরাসরি উল্লেখ করে ব্যঙ্গবিদ্রূপ চালালে উনি কি সহ্য করতেন? এবং

...আনবার মানহানি মোকদ্দমার হুমকিতো। ও সব নিজেদের ঘাড়ে কেউ টেনে আনতে চাননি আর কি।

সংজিতকুমার সেনগুপ্ত
কলকাতা-৭

ছবির সেই লোকটা

একবার দেশ-এ অথবা আনন্দবাজারে শ্রীযুক্ত কুট্টির একটি ব্যঙ্গচিত্রে দাবার ছক আঁকা হয়েছিল। কিন্তু ছকটি আঁকায় একটু ভুল হয়েছিল। সম্ভবত কারণেই ভুলটি শুধরে চিঠি দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামী।

গত ১৪ আগস্ট ১৯৭৯-র দেশ-এ শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। নাম—কার্জন-সুরেন্দ্রনাথ পার্কের সেই লোকটা। গল্পের প্রথম পাতায় এক বৃদ্ধের চরিত্র বর্ণনায় বলা হয়েছে,—লোকটি দাঁড়িয়ে উঠে তার ডান হাতের কড়ে

আঙুলটা বাঁ কানের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেন নাচতে লাগল ...'। গল্পের শেষেও এই একই বর্ণনা আছে। গল্পের প্রথম পাতায় লেখকের আঁকা চিত্রটিতে এই দৃশ্যই বর্ণিত। তবে চিত্রটিতে একটু ভুল থেকে গেছে, তা হলো,— চিত্রের বৃদ্ধের বাম হাতের আঙুল ডান কানে প্রবিষ্ট, ডান হাতের আঙুল বাম কানে নয়। তা ছাড়া বৃদ্ধের পোশাকের বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'আবার গলায় একটা চাদরও আছে।' কিন্তু তপরই আঁকা বৃদ্ধের গলায় চাদরের অস্তিত্ব নেই। অবিশ্যি এতে গল্পের কিছু এসে যায়নি। নেহাত এই অসামঞ্জস্য চোখে পড়ল, তাই জানালাম।

পরিশেষে গল্পটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

নারায়ণ ঘোষ
কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ

কার্টুন: অহিভূষণ মল্লিক

লেখকের উত্তর : ছবির সেই লোকটা

আমার গল্পের সঙ্গে ছবির মিল নেই—আঁকবার সময় খেয়াল না থাকায় এই বিপত্তি। আসলে ডান দিকের কানে বাঁ হাতের আঙুল রয়েছে—আমার লেখায় রয়েছে বাঁ কানের মধ্যে ডান হাতের আঙুল....ইত্যাদি। এই ভুলের জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু গলার চাদরটি গল্পে যেমন রয়েছে ছবিতেও তাই রয়েছে—অন্তত আমি যখন এঁকে-ছিলাম তখন চাদর মনে করেই এঁকেছিলাম। ছবি আঁকার ঐ এক বিপদ আমি লক্ষ করছি। যা মনে করে আঁকি শেষ পর্যন্ত প্রায়ই তা হয় না। একবার আমি একটা গরু আঁকার পর কয়েকজন সেটাকে গণ্ডার বলে প্রশংসা করেছিলেন।

হিমানীশ গোস্বামী

রবীন্দ্ররচনায় অসঙ্গতি

১১ আগস্টের দেশে শ্রীবিশ্বজ্যোতি দাশগুপ্ত সাহিত্য-শীর্ষক নিবন্ধে 'রবীন্দ্র রচনায় অসংগতি' বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেছেন। তার ভেতরে একটি রয়েছে সুচরিতার পিতার পদবী হালদার কিন্তু তার সহোদর ভ্রাতার নাম সতীশ মুখোপাধ্যায় এই গরমিলের কথা।

হালদার ব্যক্তিগত এবং মুখোপাধ্যায় কুল-পরিচায়ক পদবী। পূর্বপুরুষের ব্যক্তিগত পদবী ত্যাগ করে অনেকে কৌলিক উপাধিতে ফিরে যান, এর বহু দৃষ্টান্ত মিলবে। তাই লেখকের বর্ণনায় কোন অসংগতি রয়েছে একথা বলা যায় না।

জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বহরমপুর

শালবীথি : লেখকের বক্তব্য

১৮ আগস্টের দেশে শ্রীশ্যামলকুমার দত্তর পত্রের উত্তরে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

সারাণ্ডার শাল বনাঞ্চলের জীবন-চক্রের আলোচনা প্রসঙ্গে 'রিজুভেনেট স্টেজের' কথা উঠেছে, সেই সঙ্গে 'বয়ঃপ্রাপ্ত গাছের' রক্ষণের কথা। তাই 'পোল-স্টেজ', 'এস্টাবলিশড্ স্টেজ' বা 'ডরিং ব্যাক স্টেজ' ইত্যাদির স্থান হয়নি। লেখায় স্পষ্টই উল্লেখ হয়েছে, শুধু ওই অঞ্চলের জঙ্গলে শালের পূর্ণ-বয়স্ক হতে সাধারণত ১২০ বছর লাগে। তাই সেটাই ওখানকার পক্ষে 'রোটেশন এজ'। এ কথা তো শ্যামলবাবুও নিজেই স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া অন্য পরি-মণ্ডলে, অন্য বনে, কোথায় কি হবে,—সে বিষয় আলোচনার স্থান স্বভাবতই এ রচনায় হয়নি। এই বিপুলা বসুধার বিভিন্ন অঞ্চলের বনে খুবই স্বাভাবিক-ভাবে অসংখ্য ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টর থাকতে পারে,—ও সেই মত সেখানকার 'রোটেশন এজ' স্থির হবে।

দিলীপ ভট্টাচার্য
কলিকাতা-১৫

প্রকাশিত হল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

নতুন গল্প-সংকলন

সোফা-কাম-বেড

দাম ১০·০০

শ্বেতপাথরের টেবিলের পর সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ঠিক ওইরকম আর-একটি গল্প সংগ্রহ, 'সোফা-কাম-বেড'। সমালোচকদের মতে, সঞ্জীব নিছক হাসির গল্প লেখেন না। ভাঁড়ামির হাসিতে হাসি থাকে না, থাকে খেলো সস্তা রসিকতা। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় জীবনকে এমন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে এমনভাবে দেখেছেন, যেখানে মানুষকে হাসতে গেলে কাঁদতে হয়, কাঁদার আগে হাসতে হয়। এক বিদগ্ধ

সমালোচকের দৃষ্টিতে, আজকের প্রণয়-পরিশ্রান্ত, বিচ্ছিন্নতাবিমূঢ় এবং বিপ্লব-প্লাবিত বাংলা সাহিত্যের স্বেদরক্ত-মাখা শরীরে অনেকদিন পরে সঞ্জীব দক্ষিণের বাতাস এনে দিয়েছেন। খাঁটি বাস্তবের পরিধির মধ্যে থেকেই সঞ্জীব জীবনের আজগুবি দিকটি আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি শুধুই 'হাসির লেখক' নন। মানুষের মনের সূক্ষ্মতম খেলাগুলি তাঁর গল্পকে তীব্র মমতারসে উজ্জীবিত করে রাখে। এই সংকলনে স্থান পেয়েছে সেই সব অসাধারণ গল্প— মৃতদার, প্যান্টের বোতাম, সোফা-কাম-বেড, বত্রিশ পাটি দাঁত, ঢেঁকি, ট্রিটমেন্ট, ডেলিভারি প্রভৃতি—যেগুলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ামাত্রই বিপুল অভিনন্দনময় স্বীকৃতি পেয়েছে পাঠককুলের কাছ থেকে।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

শ্বেতপাথরের টেবিল ৭·০০

পায়রা ৬·০০

নেতাজী-কন্যা অনীতা-কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত

শিশিরকুমার বসু ও বীরেন্দ্রনাথ সিংহের

যুগ্ম সম্পাদনা-ঋদ্ধ চিত্রময় নেতাজী-জীবনী

NETAJI

A Pictorial Biography

দাম ৫০·০০

যে জীবন ছিল অক্লান্তরূপে কর্মশীল এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত সেই মহাজীবনের এক আশ্চর্য কৌতূহলকর রূপ-রেখা তুলে ধরা হয়েছে এই বইতে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম থেকে অন্তর্ধান পর্যন্ত এবং তারও পরে বিদেশে অতিবাহিত জীবনের প্রতিটি পর্যায় এই বইতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অসংখ্য আলোকচিত্র এবং বহু মূল্যবান প্রতিলিপির সন্নিবেশ ঘটিয়ে। সঙ্গে সুললিত ইংরেজী ভাষায় সংযোজিত হয়েছে প্রতিটি চিত্র ও প্রতিলিপির পরিচয়। চিত্রশোভিত এই বড়ো মাপের অ্যালবাম আগাগোড়া অফসেটে এবং দামী কার্টিজ কাগজে ছাপা। নেতাজী-কন্যা অনীতা এই বইখানির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করতে এসে সম্প্রতি কলকাতায় বলেছেন, এ-ধরনের চিত্রজীবনী একশো বছর আগে ছিল কল্পনারও অতীত। বাবার জীবনের অমূল্য ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থাকবে এই বইটি। সমস্ত দিক থেকে প্রবলভাবে আকর্ষণীয় এই বইটি রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠানো হবে অগ্রিম ৫০ টাকা পাঠালে। সেক্ষেত্রে আলাদা-ভাবে ডাকমাশুল লাগবে না।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বিমল মিত্রের

চমক-জাগানো রূপকথা

রাজা হওয়ার ঝকমারি

দাম ৮·০০

বোম্বাগড়ের রাজা ঠিক করলেন যে, তাঁর দুই ছেলের মধ্যে যে-ছেলে ছ-মাসের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে বোকা লোকটিকে খুঁজে আনতে পারবে, তাকেই সিংহাসন দান

করবেন। দুই ছেলে দেশ-দেশান্তরে বেরুল বিশ্ব-বোকাকে খুঁজে বার করতে। অদ্ভুত ঝকমারিময় তাদের অভিজ্ঞতারই এক রূপকথা এই উপন্যাস

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

ছোটদের ভূতের গল্প

পাঁচ মুণ্ডীর আসর

দাম ৭·০০

ভূত থাক আর নাই থাক, ভূত মিথ্যেই হোক অথবা সত্যি, ভূতের গল্পের একটা আলাদা আকর্ষণ চিরকাল ছিল এবং আজও রয়েছে। 'পাঁচ মুণ্ডীর আসর'-এর অবিশ্বাস্য নানা কীর্তি-কাহিনীর নায়ক ভূতেরা সেই আকর্ষণের খোরাক যোগাবে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমর রচনাসংগ্রহ

শরদিন্দু অম্নিবাস

॥ আট খণ্ডে প্রকাশিত ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—এই নামটি সর্বশ্রেণীর বাঙালী পাঠকের কাছে আজ এক আশ্চর্য প্রিয় নাম। জীবন এবং শিল্প এক হয়ে মিশে গিয়েছে তাঁর অমর রচনা-বলীতে। একটি বিশেষ রস নয়, সব-রকম রসেরই বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডার তাঁর সাহিত্যকীর্তি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সৃষ্টিসম্ভার কয়েক খণ্ড অম্নিবাসে প্রকাশিত হচ্ছে। এ-যাবৎকাল বেরিয়েছে আটটি খণ্ড। প্রথম দুটি খণ্ডে ব্যোমকেশের যাবতীয় গোয়েন্দাকাহিনী, তৃতীয় খণ্ডে ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস, চতুর্থ খণ্ডে সমুদয় কিশোর-সাহিত্য, পঞ্চম থেকে সপ্তম খণ্ডে সমস্ত ছোট গল্প এবং অষ্টম খণ্ডে 'বিষের ধোঁয়া' নামক আলোড়ন-তোলা উপন্যাসসহ কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রনাট্য, কৌতুকনাট্য ও 'ছায়াপথিক' উপন্যাস সংগ্রথিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত সংগ্রহকে মূল্যবান করে তুলবে এই অসামান্য রচনাসংগ্রহ।

দাম : প্রথম খণ্ড ২৫·০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৩০·০০ তৃতীয় খণ্ড ৩০·০০ চতুর্থ খণ্ড ২০·০০ পঞ্চম খণ্ড ২৫·০০ ষষ্ঠ খণ্ড ২৫·০০ সপ্তম খণ্ড ৩০·০০ অষ্টম খণ্ড ২৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

আশাপূর্ণা দেবীর

রসাল রহস্য-কাহিনী

গজ উকিলের হত্যা-রহস্য

দাম ৮·০

কথায় বলে, হাসতে হাসতে খুন। আশাপূর্ণা দেবীর এই নতুন কিশোর-উপন্যাসে হাসতে হাসতে খুনের কিনারা। রহস্য-উপন্যাসের যাবতীয় উপকরণ এই লেখাতে রয়েছে, খুন, পুলিশী জেরা, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, কৌতূহল উদ্বেগ, অনুসরণ—সব কিছু। আর একটি বাড়তি উপাদান রয়েছে, সচরাচর রহস্য-উপন্যাসে যা দুর্লভ,ত হল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দারুণ মজাদার সব পরিস্থিতির রসাল বর্ণনা। দুই বন্ধু। গজপতি উকিল আর গুপি মোক্তার। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকেন দুজনে। দাবা খেলে সময় কাটে। দুম করে পাশের ফ্ল্যাটে ঘটল এক ভয়াবহ খুন। কে খুন হয়েছে?

না, গজপতি। কীভাবে খুন হয়েছে? না, গলায় গামছা পেঁচিয়ে। অবাক কাণ্ড, নিজের গামছাখানা সেই মুহূর্তে খুঁজে পেলেন না গুপি মোক্তার। গামছার কথা ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়লেন গুপি মোক্তার। তবে কি ওই গামছাখানা পেঁচিয়ে খুন করা হয়েছে গজ-উকিলকে? সাত-পাঁচ ভেবে নিজের ফ্ল্যাট থেকে নিরুদ্দে হয়ে গেলেন গুপি মোক্তার। এদিকে দুই মূর্তিমান তাঁ ঠিকই অনুসরণ করে চলেছে। গুপি মোক্তারের অন্তর্ধান এবং দুই মূর্তিমানের পিছু-ধাওয়া— সব মিলিয়ে এক দারুণ সরস পরিণতিতে শেষ হয়ে গজ উকিলের হত্যা-রহস্য।

দেশ ৪৬ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা
৫ আশ্বিন ১৩৮৬

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

তারণকুমার বিশ্বাসের প্রবন্ধ
প্রাচীন পোড়ামাটির দুর্গামূর্তি
কমল সরকারের প্রবন্ধ
ভারতীয় প্রচ্ছদ
চিত্তরঞ্জন দেবের প্রবন্ধ
অপ্রচারিত রবীন্দ্র-বাণীর উৎস
অমল আচার্যের গল্প
জিৎ

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

অনুন্নতজনের বিশেষ স্বার্থাধিকার

কোম্পানির কালে লর্ড কর্নওয়ালিস ভূমি ও রাজস্ব শাসনের যে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা বিহিত করেছিলেন, সে প্রথার অন্তর্ধান ঐতিহাসিক নিয়মে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষা এমন একটি ঘটনার দৃশ্যে চিহ্নিত হয়েছে, যেটা বস্তুত বিপরীত ক্রিয়ার একটি সৃষ্টি। এক্ষেত্রে লক্ষ করতে হয় যে, নিতান্ত একটি অস্থায়ী প্রথা যেন চিরস্থায়িতার অঙ্গীকার লাভ করতে চাইছে। সংবিধানের অনুগত নির্দেশ অনুযায়ী আগামী জানুয়ারী (১৯৮০) মাসে তপশীলের অন্তর্ভুক্ত হরিজন ও আদিবাসী জনসমাজের স্বার্থ-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা ও সংরক্ষার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দেশের সরকার বুঝেছেন, আবার আরও দশ বছরের জন্য ওই দুই অনগ্রসর জনসমাজের বিশেষ সুবিধার অধিকার বিহিত করবার প্রয়োজন আছে। বিগত জুলাই মাসে সরকারের সংকল্প ছিল এবং সেই সংকল্পের ঘোষণা করাও হয়েছিল যে, আগামী জানুয়ারীর আগেই, অর্থাৎ সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে হরিজন ও আদিবাসীদের জন্য ওই বিশেষ সুবিধার সাংবিধানিক অঙ্গীকারের মেয়াদ আরও দশ বছর বাড়িয়ে দেবার জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সংশোধিত করা হবে।

সংবিধানে নির্দেশিত হয়েছিল যে, দশ বৎসরের জন্য অনগ্রসর দুই তপশীলভুক্ত জনসমাজের (এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের) জন্য বিশেষ সুবিধার অধিকার বিহিত থাকবে। প্রস্তাবিত নতুন সংশোধন সম্পন্ন হয়ে গেলে বাস্তবতার চিত্রে সংশোধনী উদ্যমের যে মোট হিসাব অঙ্কিত হবে, সেটা ভারতের জাতীয় জীবনের পক্ষে গৌরবের কোন পরিচয় নয়। বার বার তিনবার সাংবিধানিক নির্দেশের সংশোধন করে, পর-পর তিন দফায় দশ বৎসর মেয়াদ-বৃদ্ধির একঘেয়ে উদ্যোগের দ্বারা তপশীলভুক্ত অনগ্রসর জনসমাজকে মোট চল্লিশ বৎসর ধরে বিশেষ সুবিধার অধিকারে প্রতিপালিত করা, জাতীয় কিংবা সরকারী যোগ্যতার মানোন্নতি প্রমাণিত করে না। বরং বলা চলে যে, সরকারী যোগ্যতা ত্রিশ বছর আগে যে-তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই পড়ে আছে। তাই আবার ওই বিশেষ সুবিধার বিধান দশ বৎসর বাড়িয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করতে হয়েছে। কিন্তু দুর্মর এই জিজ্ঞাসা থেকেই যাচ্ছে—আরও দশ বৎসর ওই বিশেষ সুবিধার নীতি ও প্রথাকে জাগ্রত রাখবার গুণে ও পুণ্যে কি সত্যই হরিজন ও আদিবাসীর নাগরিক যোগ্যতার মান উন্নত হয়ে বুঝিয়ে দেবে যে, সাংবিধানিক মানত সফল হয়েছে?

ভারতে সকল রাজ্যের বিধানসভায় মোট ৮২০টি, এবং সংসদীয় ১১৬টি সংরক্ষিত আসনে আদিবাসী ও হরিজন প্রতিনিধিকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে দেখা যায়। হরিজনের সমুদয় জনসংখ্যা ৯ কোটি, আদিবাসীর সমুদয় জনসংখ্যা ৪ কোটি ১০ লক্ষ। প্রশ্ন করা চলে, বিগত ত্রিশ বছর ধরে তপশীলভুক্ত জনসমাজের এই সংরক্ষিত প্রতিনিধিত্বের বাস্তব ও নৈতিক সুফল-প্রসূতার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কি? অর্থাৎ, এরকম প্রশস্ত একটি সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠার বনিয়াদে সুস্থিত হয়ে অনুন্নতজনের প্রতিনিধিরা তাঁদের সমাজের জন্য কোন শুভ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করতে পেরেছেন কি? ভারতের সামাজিক জীবনের সত্য পরিচয় যাঁর জানা আছে তিনিই দুঃখবোধ করবেন যে, দুই অনুন্নত জনসমাজের সামগ্রিক ও সার্বিক কল্যাণের চিত্রটি আগের তুলনায় উজ্জ্বলতর হয়েছে বলে ধারণা করবার মতো কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়াই যায় না। কিন্তু হ্যাঁ, ওই দুই অনুন্নত জনসমাজের যাঁরা সত্যিই 'উন্নত' হয়েছেন আর্থিক সাহায্যকর বৃত্তি, শিক্ষা চাকুরি, ভূমি ও সরকারী ঋণের উদার উপহার গ্রহণ করবার ও উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা সমষ্টির সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গিয়েছেন যোগ হারিয়েছেন এবং ভিন্নতর একটি শ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন। সামাজিক তথ্যের বিশ্লেষণে এই অবাঞ্ছিত সত্যের পরিচয় ধরা পড়ে যায় যে, এ'রা এ'দের অভ্যস্ত নতুন জীবনবৃত্তির গুণে ও প্রভাবে বস্তুত একটি তথাকথিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর অনুরূপ একটি শ্রেণী। প্রশ্ন করতে হয় এইরকম কয়েকটি নতুন শ্রেণী সৃষ্টি করবার জন্যেই কি অনুন্নতের জন্য বিশেষ সুবিধার অধিকার সংবিধানে নির্দেশিত করা হয়েছিল? তপশীল-ভুক্ত আদিবাসী ও হরিজনের অবস্থা সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণের কর্তব্য নিয়ে যে কমিশন নিযুক্ত আছেন, তাঁদের কোন রিপোর্টে এমন তথ্যের পরিচয় আভাসিত কখনও হয়নি যে অনুন্নত জনসমাজের সার্বিক উন্নতির মান বেড়েছে। অপরদিকে বহু বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, অনুন্নতের জন্য বিশেষ সুবিধার অধিকার কার্যত একটা কায়েমী স্বার্থের রূপ গ্রহণ করে ফেলেছে। 'অনুন্নত' বলে চিহ্নিত ও স্বীকৃত হয়ে থাকা যেন বিশেষ স্বার্থ সংগ্রহ ও উপভোগ করবার একটি উপজীবিকা। শ্রীজগজীবন রাম বলেছেন সংবিধানে অনুন্নতের জন্য বিশেষ সুবিধা ও সংরক্ষার নির্দেশ চিরস্থায়ী কোন পরিদৃশ্য হতে পারে না। অন্য অভিমত এই যে বিশেষ সুবিধা সংরক্ষিত করবার নীতি ও পদ্ধতি দুইই ব্যর্থ হয়েছে।

ব্যঙ্গচিত্র

কণ্টকল্লিত

অতুল্য ঘোষ

(নবপর্যায়)

॥ ১১ ॥

বহু দিন আগে একটা গল্পে পড়েছিলুম যে, বিহারে সৌরাট নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা আছে —রাস্তা থেকে দেখতে পাওয়া যায়, বড় বড় গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ গ্রামে যেরকম 'হাটতলা' থাকে, ঠিক সেইরকম। পাশে একটি মন্দিরও আছে। সেদিন একটি ইংরেজী পাক্ষিকে আবার সেই গ্রামের কথা, ঐরকম একটি হাটতলার কথা পড়লুম। পড়তে পড়তে দ্বারভাঙ্গা জেলার কথা মনে হল। বেশ কয়েক বছর আগে সেখানে সারা দিনের কাজকর্ম সেরে গল্পগুজব হচ্ছে —সেই সময়ে সৌরাট গ্রামের কথা শুনেছিলুম। যা শুনলুম তা এমন অভিনব যে, মনে হয় না সত্যি শুনছি। ঐ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গাটিতে হাট বসে। আমরা তরি-তরকারি, মাছ, ফল-মূল — এসবের হাট দেখেছি। আবার গরু, ছাগল, ভেড়া, মোষ— এসবের হাটও দেখা যায়। আবার শোনপুরের 'হরিহর ছত্রের' মেলাতে গরু, ছাগল, হাতি ঘোড়া, উট প্রভৃতি বিক্রি হয়। কিন্তু সৌরাটে বসে 'বর'-এর হাট। এই ১৯৭৯তে হয়তো অনেকে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু সত্যিই ঐ জায়গায় বর কেনাবেচা হয়। ওরা হাট বলে না, বলে 'সভাগাছি'। শিক্ষিত, মধ্যশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত, ভালো চাকুরে, বেকার, চাষী, ধনী, মধ্যবিত্ত—সব শ্রেণীর বরই আসে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে। আর আসে আচার্য বামুন। তারা ঐসব বরেদের চোদ্দপুরুষের 'কুলজি', মানে বংশতালিকা, নিয়ে আসে। অবশ্য বর কেনবার যারা, অর্থাৎ মেয়ের বাপেরা—তারাও দলে দলে আসে। প্রথমে বরের বংশতালিকা এবং মেয়ের বংশতালিকা নিয়ে বিচার হয়। তারপর বরের চেহারা, আর্থিক সঙ্গতি, বয়স এবং জমিজায়গার আলোচনা। সব শেষ হবার পর তখন দর কষাকষি আরম্ভ হয়। যেমন বাজারে আলু, পটল, মাছ নিয়ে দর কষাকষি হয়, ঠিক সেইরকম। শুনেছি পাঁচ শ' থেকে পঞ্চাশ হাজার অবধি দাম ওঠে। অবশ্য ঠিক নিলামে যেমন ডাক ওঠাউঠি হয়, তা নয়—আলোচনা করেই দাম সাব্যস্ত হয়। এতটা অবধি পড়ে অনেকের হয়তো মনে হবে এটা গল্প। কিন্তু সত্যি এটা গল্প নয়—এটা আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি। ঐ 'সভাগাছি'তে যেমন ধনী-নির্ধন, উচ্চ-শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ভিড় হয়, ঠিক সেইরকম মধুবনীর কাছে একটা গ্রামে নাকি বিবাহ-যোগ্যা মেয়েও বেচা-কেনা হয়। অবশ্য এ কাহিনী আমার পড়াও নয়, দেখাও নয়— সবটাই শোনা।

'সভাগাছি'তে যেসমস্ত বর ঠিকমত দাম পেল, তারা অজানা, অচেনা মেয়েকে বিয়ে করতে যায় অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে। কুলজি ও দাম ঠিক হলেই সব মিটে যায়। এও পড়লুম যে, এই বেচা-কেনা বিহারের এক বিশেষ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঠিকই তো। আমাদের হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণরাই বর্ণশ্রেষ্ঠ। সব ধর্মাচরণে এবং সামাজিক কাজে তাঁদের শরণাপন্ন হতে হয়। বিয়েতে তাঁদের লাগে, শ্রাদ্ধেও তাঁদের প্রয়োজন, উপনয়ন তাঁরা না হলে হবে না, অন্নপ্রাশনেও তাঁদের থাকা চাই। এমন অনেক কাহিনী শুনতে পাওয়া যায় যে, অদেখা অচেনা মেয়ের সঙ্গে বিয়ের পর তাঁরা অনেকেই স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন। বর ঠিক সময়মত ভুলে যায় যে, কন্যাপক্ষ তাকে অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছে এবং বরের কাছে নববধূও যেমন ছিল অদেখা, কন্যার কাছে তেমনি বরও ছিল অদেখা। যাঁরা এখনও বর্তমান হিন্দু সমাজের প্রশংসা করে বেড়ান, তাঁদের মনে এসব ঘটনা কোনও রেখাপাতও করতে পারে না। অদ্ভুত মনোভাব। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মানুষদের এইরকম মনোভাব আঁকড়ে পড়ে থাকাই স্বাভাবিক। দেশের কত দিকে কত পরিবর্তন হয়ে গেল, কিন্তু এইসব কুপ্রথা ও কুসংস্কারের পরিবর্তনের কোন প্রচেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। রাষ্ট্রধুরন্ধররা মাঝে মাঝে সামাজিক কুপ্রথার উল্লেখ করেন। কিন্তু ব্যস। সেখানেই দায়িত্ব শেষ হয়। বধূ-দাহ, পত্নীদাহের উল্লেখ আগে করেছি। এইসব স্বামী-পরিত্যক্তা বধূদের যদিও জীবনান্ত হয় না, কিন্তু যা হয় তা মৃত্যুর চেয়েও অনেক খারাপ। অসীম নির্যাতন, লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে সারা জীবন পরানুগৃহীত হয়ে বাস করতে হয়। এই সামাজিক ব্যাধি রাষ্ট্রকর্ণধারদের দিয়ে দূর হতে পারে না। দূর হতে পারে সামাজিক অনুশাসনে। কিন্তু আমাদের দেশে যে সমাজ আছে, সে তো সমাজের একটা কঙ্কাল মাত্র। চিরাচরিত প্রথাগুলি প্রতিপালন করতে না পারলে সমাজের চক্ষে হেয় হতে হয় এবং দুর্নাম হয়। অবশ্য সেখানেও তারতম্য আছে। কোন অবস্থাপন্ন মানুষ যদি কোন অবিবাহিতা যুবতীর সঙ্গে গ্রামে বাস করে, তা হলে কাঞ্চনকৌলীন্যে সব অপরাধ মুছে যায়। কিন্তু কোন গরীব যদি এ কাজ করার দুঃসাহস দেখায়, তা হলে সে হয় ধিক্কৃত এবং অনেক সময়ে বিতাড়িত। এ অবস্থার কথা সকলের জানা আছে। জানা থাকলেও যে সুনাম নেই, সেই সুনাম রক্ষার জন্যে সকলে বোবা: কারো মুখ দিয়ে কোন অস্ফুট প্রতিবাদও বেরোয় না। একটা সাধারণ ছবি সকলের সামনেই আছে। বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কোন প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে যদি দুর্বৃত্তদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, তা হলে তার পিতৃগৃহে বা পতিগৃহে স্থান হয় না। অভিভাবকদের অক্ষমতার জন্যই যে ঐ মেয়েদের অমর্যাদা হয়েছে, এই সাধারণ সত্য সকলেই ভুলে যায়। রক্ষা করার দায়িত্ব যাদের হাতে—অর্থাৎ বাপ, দাদা, স্বামী, শ্বশুর ও অন্যান্য অভিভাবক— অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাপুরুষতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতা—এসবের জন্য তাদের কোন সাজা পেতে হয় না। সাজা পায় মেয়েরা, যাদের রক্ষার সম্পূর্ণ ভার ও দায়িত্ব

তালপাতার 'কুলজি' বা বংশতালিকা নিয়ে একজন পঞ্জীকার। এঁরা বর ও কনের 'কুলজি' দেখে জানিয়ে দেন যে তাদের [illegible]

সমাজ পুরুষদের উপর দিয়ে রেখেছে। অদ্ভুত এই সব সামাজিক বিধান !

হিন্দু সমাজের মধ্যেই কতরকমের প্রথা আছে। পশ্চিমবঙ্গে বোনের মেয়ে অর্থাৎ ভাগনীর সঙ্গে বিয়ে হয় না—নিষিদ্ধ। এখানে যদি এরকম বিয়ে হয়, তা হলে সে দম্পতি হবে পতিত। এই ভারতবর্ষেরই দক্ষিণাঞ্চলে কতগুলি জায়গা আছে, যেখানে ভাগনী হল সবচেয়ে সুপাত্রী এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে হিন্দু ধর্মাচরণের মধ্য দিয়েই ভাগনীর সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন হয়। আবার উত্তর ভারতের অনেক জায়গা আছে, যেখানে স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরকে বিবাহ করা হিন্দু সামাজিক প্রথা ও ধর্মাচরণ অনুযায়ী হিন্দু-শাস্ত্রসম্মত। এখন ভারতবর্ষে বিবাহবিচ্ছেদ আইনসম্মত। কিন্তু সমাজে এখনও বিশেষ প্রচলন হয়নি। আবার ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে খৃষ্টানদের এক শ্রেণীর মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ আইনসম্মত তো বটেই, আবার ধর্মসম্মতও বটে। আর এক শ্রেণীর পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসঙ্গত হলেও ধর্মাচরণের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ। একই ধর্মাচরণের মধ্যে এরকম বিভিন্ন প্রথা দেখতে পাওয়া যায়—তাতে সামাজিকতা ক্ষুন্ন হয় না। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, প্রয়োজনমত ধর্মাচরণ ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার অদলবদল করে নেওয়া যায়। বাইরেকার কথা বাদ দিচ্ছি, আমার মতে সব সমাজই ক্ষয়িষ্ণু এবং সর্বত্রই আমূল পরিবর্তন দরকার। আমি বিশেষ করে আমরা যে দেশে বাস করি, সে দেশের অধিকাংশের আচরিত সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা আরম্ভ করেছি। বহু বছর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে ও বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে এইটেই ধারণা হয়েছে যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে আমাদের সমাজের কোন পরিবর্তন হবে না। এখনও অধিকাংশ সময়েই জোর দেওয়া হয় অর্থনীতি ও রাজনীতির উপরে। কিন্তু যে দেশের সমাজের ধারা ছন্দ-তালের সমতা হারিয়ে ফেলে ক্ষীয়মাণ শক্তি নিয়ে কোনক্রমে টিঁকে আছে, সেই দেশে কেবলমাত্র রাজনীতি ও অর্থনীতির পরিবর্তনে দেশের সমগ্র জনসাধারণের কখনও উন্নতি হতে পারে না। এখানে কোন কল্যাণকর্মের কথা ভেবে 'উন্নতি' শব্দ ব্যবহার হচ্ছে না। এখানে উন্নতি অর্থে যেমন অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক স্বৈরাচার হতে মুক্তি, তেমনি মানুষের মত বাস করার অবাধ অধিকার।

ব্যভিচারদুষ্ট সমাজের মেয়ে এবং পুরুষ অধিকার ও দায়িত্ব পালন কখনও পুরোপুরি-ভাবে পালন করতে পারে না। ঘুণ-ধরা কাঠ বা বাঁশে যতই রঙ বা আলকাতরা লাগানো হোক, তার স্থায়িত্ব যেমন বাড়ানো যায় না, ঠিক তেমনি ঘুণ-ধরা সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সেই সমাজের মানুষরা কখনও অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে পারে না; দায়িত্ব পালনেও তেমনি অক্ষম হয়।

'বরের হাটে' নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম।

বিহারের মধুবনী জেলার সৌরাটে একজন মৈথিলী ব্রাহ্মণ বর

হাটে দাঁড়ায়। খালি বরেদের কথা বলছি না, অভিভাবকদের কথাও বলছি। এমন শিক্ষাই তাঁরা পেয়েছেন যাতে ইউনিয়নের দাবি-দাওয়া, চাকরির সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক আনন্দ-অনুষ্ঠান—এসবই তাঁরা শিখেছেন, কিন্তু তাঁদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়নি। এমন শিক্ষা পাননি, যে শিক্ষা নিজেদের মর্যাদা এনে দেয়, যে শিক্ষা হাটে গিয়ে বিক্রীত হওয়া গভীর কলঙ্কজনক মনে করে, যে শিক্ষা মেয়েদের মানুষ বলে মর্যাদা দিতে পারে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, তা হলে এ শিক্ষার প্রয়োজন কি? কিন্তু এই মামুলী শিক্ষা-পদ্ধতির তো পরিবর্তন করা যাবে না, উন্নতিও করা যাবে না! এর একমাত্র প্রতিষেধক হল—যে সমাজ স্থবির, জড়পিণ্ডের মত দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, পুরুষদের দ্বারা বোধ হয় এ কাজ সম্ভব হবে না। কারণ, হাজার হাজার বছর ধরে তারা যে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে তাকে ভাঙা দূরের কথা, সেই আসন থেকে সরে যাওয়াও খুব শক্ত। ভারতবর্ষের যা আছে, সামাজিক প্রথা ও ধর্মাচরণের নামে যা হয়, সবই খারাপ, আর অন্যান্য দেশে যা হয় সবই ভাল — এ মনোভাবও অসত্য ও কাল্পনিক। কুসংস্কার, কুপ্রথা ও কলঙ্কজনক আচরণ কোন দেশ বা সমাজের একচেটিয়া নয়, বৃহত্তর বিশ্বের কথা না ভেবে যদি খালি নিজেদের দেশের মধ্যেই আমাদের কাজ, চিন্তা ও শক্তি রেখে দিই, তা হলেও বিশ্বেরই মঙ্গল হবে—আমাদের তো হবেই। প্রায়ই বিপ্লব ও বিপ্লবীর কথা শুনি। সমাজতত্ত্ববিদদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইয়ে কি এই কথা লেখে যে, সমাজকে বাদ দিয়ে বিপ্লব হতে পারে? অর্ধমৃত, মৃত, পঙ্গু, জড় ও স্থবির সামাজিক প্রথা ও সমাজ তার সমস্ত অসদাচরণ, অপকীর্তি ও ব্যভিচার নিয়ে সগৌরবে বিরাজ করবে আর দেশে বিপ্লব হয়ে যাবে— এ কি কখনও হয়? আর বিপ্লবের নায়ক তো তাঁরাই, যাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা বিবাহের পণ নিতে পরাঙ্মুখ নন, নিজেরা হাটে গিয়ে বিক্রীত হতে পারেন, স্ত্রীদাহ ও পত্নীদাহে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। এই সামগ্রিক ছবিটা যাঁরা চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন, জীবনে গ্রহণ করতে পারবেন, তাঁদের দ্বারাই ভারতবর্ষের মুক্তির সংগ্রাম সফল হবে। আমরা স্বাধীন দেশ। স্বাধীন হয়েছি, এখন আমাদের কাছে সব দিক খোলা হয়ে গেছে। অত্যাচারের সংজ্ঞা কি দরিদ্রের উপর ধনীর অত্যাচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নাকি যে-কোনরকম নির্যাতনকেই অত্যাচার বলে অভিহিত করা হবে? শোষণ অর্থে কি কেবলমাত্র বোঝাবে মহাজন কর্তৃক ঋণদায়গ্রস্তকে শোষণ অথবা মালিক কর্তৃক শ্রমিককে শোষণ? এর মধ্যে কি বরপক্ষ কর্তৃক কন্যাপক্ষকে শোষণ বোঝাবে না? স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা নিগৃহীতা স্ত্রীর কথা বোঝাবে না? তা যদি না বোঝায় তা হলে শোষণ কথাটি কেবলমাত্র বাগাড়ম্বর মাত্র। গরীব, দারিদ্র্যসীমার নীচে যারা, তারা নিশ্চয়ই শোষিত। কিন্তু যে কন্যা-পক্ষকে সর্বস্ব বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে দিতে হচ্ছে, সে শোষিত নয়? আর যে মেয়েকে দেখতে এসে বরপক্ষ অপছন্দ করে ফিরে যাচ্ছে, সে মেয়ে শোষিত নয়? সেদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি শিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ, দেশহিতৈষী এবং সংস্কৃতিবান। বিনা দ্বিধায় পরিষ্কার বললেন, 'শিগগিরই ছেলেদের নামে উইল করে দেব। নয়তো মেয়েরা এসে সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে।' আমি একজনের কথাই বললুম। মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার যেদিন থেকে আইনসম্মতভাবে স্বীকৃত হয়েছে, সেদিন থেকে এইসব কথা ধনী, উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তদের কাছে প্রায়ই শোনা যায়। এঁদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের হয় দুই কংগ্রেসের এক কংগ্রেসে, দুই কম্যুনিস্ট পার্টির এক কম্যুনিস্ট পার্টিতে অথবা জনতা দলে অথবা অন্য কোন দলে দেখতে পাওয়া যাবে। মুখে বিপ্লবের বুলি, মনে মেয়েদের বঞ্চিত করার চিন্তা। এই অবস্থার পরিবর্তন আসতে পারে, যদি কিছু ছেলে আর মেয়ে সব বন্ধনের কথা ভুলে গিয়ে সর্বনাশের পথকে বেছে নিতে পারে, যে সর্বনাশের পথে এগিয়ে গিয়ে দেশ গভীর কলঙ্কমুক্ত হতে পারে। যেদিন তা ঘটবে, সেদিন দেশ মুক্তিস্নান করে আবার পৃথিবীর মধ্যে উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে

দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥
দুর্গা, দুর্গপারা, সারা, সকলকারিণী।
খ্যাতি, কৃষ্ণা, ধূম্রা তুমি, কৃতি তুমি দেবী॥

সেই দেবী শোভিনী হয়ে উঠছেন ভাঙা আট-চালায়। শরতের মেঘ ভাঙা তেরছা রোদে খড়ের কাঠামোর গায়ে মাটির প্রলেপ শুকিয়ে চুলফাটা হচ্ছে। এক-মেটে, দো-মেটে, ফিনিশ, পালিশ। শিল্পীদের এখন নাইবার খাবার সময় নেই। সিংহের গায়ে তোয়ালের রোঁয়া ওঠা চামড়া। নতুন টেকনিক। সিংহকে আরও সিংহ করে তুলতে হবে। মহিষাসুরকে আরও পলোয়ান। মায়ের মুখে আনতে হবে নামকরা সিনেমা অভিনেত্রীর আদল। মা এখনও খন্ড খন্ড হয়ে ছড়িয়ে আছেন। পরিবারের অন্য সদস্যরাও ধীরে ধীরে সেজে উঠছেন।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

সর্বদেবতার শরীর থেকে জ্বলে উঠল তেজ। সেই তেজের মিলনে অতুল তাপে ত্রিভুবন তপ্ত। সেই তেজ বলয় থেকে বেরিয়ে এলেন এক নারী। শম্ভু তেজে তৈরী হল তাঁর চারু মুখদেশ। বিষ্ণুর তেজে বাহু, যমের তেজে সুচারু কেশ, চন্দ্রের তেজে যুগ্মপয়োধর, ইন্দ্রের তেজে শরীরের মধ্যদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা আর উরু, পৃথিবীর তেজে গুরু নিতম্ব, ব্রহ্মা আর সূর্যের তেজে পদপদাঙ্গুলি, বসুর তেজে করাঙ্গুলি, অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা।

গরান কাঠ এল নিমতলার গোলা থেকে। মার কাঠামো তৈরি হবে। বিচালি এল বাগবাজারের গোলা থেকে। দেবতা এলেন না। এলেন বৃত্তিজীবী মানুষের দল মা দুর্গার অ্যাসেমব্লি লাইনে। মা আসছেন একা নয় সপরিবারে মহারণে। ভাঙা আট-চালায় ঘর্মাক্ত মানুষের সমবেত চেষ্টায় একটু একটু করে সেজে উঠবেন অসুরনাশিনী। মুখে বিড়ি। ছাই ঝরছে। হাঁটুর ওপর তোলা কাপড়। মনে মায়ের চিন্তা, আচ্ছন্ন করে আছে চমৎকারা অন্ন চিন্তা, অর্থচিন্তা। টাকা চাই। কাঁচামালের টাকা। সারা বছরের এই তো মরশুম। ভাদ্র থেকে আশ্বিন পেরিয়ে কার্তিক হয়ে মাঘ। তারপরই তো সব ভোঁ ভোঁ। তখন শুধু পাওনাদার। দেনা মেটাবার কাল। মহাজনের সুদ, ব্যাঙ্কের কিস্তি। আটচালার অন্ধকার কোণে অসমাপ্ত কাঠামোর কঙ্কাল। একমেটে হয়ে পড়ে থাকা কবন্ধ দেবীর উত্তোলিত হাতের বরাভয়—অসুর নাশ করেছি কিনা জানিনা তবে দারিদ্র্য নাশ করার ক্ষমতা আমার দশভুজে নেই, আছে যাদের হাতে তারা রাজনীতির কন্দুক-ক্রীড়ায় বড়ই ব্যস্ত।

হুকে ঝুলছে একটি মাত্র জামা। ফ্যামিলি শার্ট। বড় ভাই, মেজ ভাই, সেজ ভাই যার যখন বাইরে যাবার প্রয়োজন জামাটি গলিয়ে বেরিয়ে গেল। তেমার কাছে ভক্তের আকৃতি, ধনং দেহি, রূপং দেহি, তার ছিটে ফোঁটাও যদি তোমার রূপকারদে[র] ঘরে আসত।

তবু বৈশাখের শুভদিনে প্রথামত কাঠে[র] কারিগর বসে গেলেন গরানের কাঠামো বানাতে। মা[কে] দাঁড় করাতে হবে ডঙ্কর দাপটে। কাঠামো শুরু[র] আগেও কিছু প্রথা আছে, পুজো অর্চনার ব্যাপা[র] আছে। কাঠামোর তিনবার ঘা মারতে হবে, রামদা[র] তিন ঘা। ঘটনাটা জন্মাষ্টমীর দিনও হতে পারে[।] মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নেই, নেই সেইসব মহামা[ন্য] জেন্টুরা—রাজা মুনশী নবকৃষ্ণ, আন্দুলের রা[জা] দেওয়ান রামচাঁদ রায়, ভূকৈলাসের রাজা দেওয়া[ন] গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ[,] প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, কেষ্টচাঁদ মিত্র, নারায়ণ মিত্র, রামহ[রি] ঠাকুর, বারাণসী ঘোষ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর। ক্লাই[ভ] নেই, হেস্টিংস নেই, হলওয়েল সাহেব নেই, শ্রীমত[ী] ফ্যানি পার্কস নেই। আমরা আছি। আমরা বা[রো] ইয়ারে মিলে বারোয়ারি করেছি—সাতের পল্লী, আটে[র] পল্লী। সভাপতি পাঁচুগোপাল থামরুই, সম্পাদ[ক] গোপাল সাধুখাঁ, কোষাধ্যক্ষ গজেন হালুই[।] এইটটিনথ সেনচুরির ঐতিহ্যকে হারাই কেমন করে[?] গামছা আছে, গলাও আছে, চাঁদা, টাকা, প্যান্ডে[ল] প্রতিমা, বোধন, নিরঞ্জন। রাজা রামমোহন রায়ে[র] হলঘরে মিকি আর নাচবে না, গান্টার আর হুপা[র] কোমপানি চপ, কাটলেট, ক্ল্যারেট সাপ্লাই করবে না[।] আরাম কেদারায় আড় হয়ে বসে হেস্টিংস সাহে[ব] হুঁকো খাবেন না। সব গেছে? জেন্টু প্ল্যামার ফু[স] হয়ে গেলেও পুজোয় এখন নতুন মেজাজ এসেছে[।] ছত্তলা উঁচু দশ হাজারী প্যান্ডেলে জি পালে[র] বরানার মানবী দেবীমূর্তি,' রবি ভার্মার ছবি থেকে

যেন উঠে এসেছেন। চারপাশের চোঙা থেকে ঝরে পড়ছে লতা মঙ্গেশকার, কিশোরকুমার, হো মুকদ্দর হো সিকন্দর, রমপম পমপম। নামাবলি গায়ে পুরোহিত সেই ডিন অ্যান্ড ব্যাস্টলের মধ্যে বসে তারস্বরে মন্ত্র পড়ছেন :

ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায়চ।

অকালে ব্রহ্মণা:বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা।

কর্মকর্তারা এদিকে তখন ভীষণ ব্যস্ত। একজন কেবলই প্রশ্ন করছেন, বিশাখা এসেছিল, বিশাখা! কি জানি গুরু, লক্ষ করিনি, একটা সিগারেট ছাড় এদিকে।

বায়নার সময় শিল্পী তাই উদ্যোক্তাদের বায়নাটা জেনে নেন।

কি ঢঙের ঠাকুর চান? বাংলা, দোভাষী না জিপাল?

বাংলা ঢং হল কৃষ্ণনগরের ঢং। মতভেদ থাকলেও, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই বোধহয় সাড়ম্বরে এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। বাংলা ঢঙে দেবীর মুখ হবে বেশ রাগী রাগী। স্টিফ। বাঁশপাতার মত চোখ, ঈগলের মত নাক, পানপাতার মত মুখ, আম আঁটির মত চিবুক।

দোভাষীতে একটু মানবী মানবী ভাব থাকবে। মুখে হাসি, চোখে করুণা। মা যেন বলছেন, ধরা আজ পাপে ভরা, আমি এসেছি রে, আয় কাছে আয়, জন্মে বড় কষ্ট পাচ্ছিস তো, বাছা আমার!

জি পালের ঢঙে, দেবী পুরোপুরি মানবী। ছবিয়ানা ঢং। অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক দেবী নয়, একেবারে স্টেজের অভিনেত্রী, দুর্গার ভূমিকায়। বিদেশীরা বলবেন, আরে এ ত বাংলার ব্যাপার নয়, এ চেহারায় যে গ্রীক আদল খুঁজে পাচ্ছি—

The images of the goddess Durga and that of Minerva have been supposed to be in one or two instances, to exhibit a pretty strong resemblance. Both are described as being fond of arms, and both obtained their names from slaying a giant. Minerva being called Pallar, from destroying the giant of that name.

পার্বতী আর জুনোর মধ্যেও মিল খুঁজে পেলেন স্যার উইলিয়াম জোনস :

She has many properties of the Olympian Juno: her majestic deportment, high spirit and general attributes are the same.

কোন ঘরানার ঠাকুর হবে পছন্দ হলেই বায়নার টাকা ধরে দিতে হবে। ব্যবসা ব্যবসা। বারোয়ারিকে বিশ্বাস কি? মূর্তির দামের এক তৃতীয়াংশ বায়না, তবেই কাঠামোয় হাত পড়বে, একমেটে, দোমেটে ফিনিশ। ঠাকুর অনুসারে দাম। হাইট বলে দিতে হবে। প্রতিমা পাড়ায় মাপ ঠিক হয় পোয়ার হিসেবে। দিশী মাপ, ফুটটুট অচল। সব চেয়ে বড় ঠাকুরের উচ্চতা ১৮ ফুটও হতে পারে। ঘর হিসেবে দাম। রমেশ পালের তৈরী প্রতিমা দশ হাজারেও বিক্রি হয়েছে। আসলী মডার্ন ঠাকুর তৈরি করতেন জি পাল। সেই ধারা ধরে রেখেছেন নারায়ণ চন্দ্র পাল।

কৃষ্ণনগরের পড়তির যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছু শিল্পী চলে এসেছিলেন এই মহানগরীতে। চিৎপুরে সেই ঘরের শিল্পীরা এখনও জমজমাট। গোপেশ্বর পাল, কমল পাল, নন্দ পাল, লক্ষ্মীকান্ত পাল, নিরঞ্জন পাল প্রমুখেরা এক ডাকে চিনে নেবার মত নাম। দেশ বিভাগের পর যাঁরা এলেন তাঁদের ঘরও সমান বিখ্যাত—রমেশ পাল, রাখাল পাল, গোরাচাঁদ পাল, শ্রীকৃষ্ণ পাল, এন সি পালের শিষ্য কালী পাল।

শিল্পী পাড়ার কাজ ওঠে বিভিন্ন হাতে, সুষ্ঠু-ধারায়। কথাটা এইভাবেই সত্য বহু দেবতার দানে মায়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সাজসজ্জা। কাঠামো খাড়া করে দিলেন কাঠের কাজ যাঁরা জানেন তাঁরা। রোজ হিসেবে কাজ, সাত টাকা থেকে দশ টাকা। কাঠামোয় খড় চাপালেন আর একদল। সাত থেকে দশ টাকা রোজ।

[illegible] কাঠামো

[illegible] মৃত্তিকা মিহি হচ্ছে

ছাঁচের খেলা; হাতের আঙুলে, মুখে

এরপর আসরে নামলেন একমেটের কারিগর। এঁটেল মাটির ডাঁই পড়ে আছে আটচালার কোণে। পালকে থেকে নৌকো চেপে মাটি এসেছে। তুষের পাহাড় আর এক কোণে। মাটির সঙ্গে তুষ মিশিয়ে শুরু হবে একমেটের কাজ। দশভুজার আদল এ যদিও দৃষ্টি সুখকর নয়। একমেটের কারিগরের রোজ দশ থেকে বার টাকা।

একমেটের পরে এলেন অভিজ্ঞ শিল্পীরা। শুরু হল দোমেটের কাজ। ফেটে ফেটে যাওয়া প্রতিমার অবয়বে বেলেমাটি আর পাটের প্রলেপ। কাজের রোজ বেশী, পনেরো থেকে কুড়ি টাকা। মা মূল শরীর-কান্ড যখন এইভাবে ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে জলে, রোদে, খোদ শিল্পীরা তখন ব্যস্ত হয়ে আছেন অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে। ছাঁচে ঢালাই হয়ে আসছে মুখের পর মুখ, হাতের আঙুল আসছে ঝুড়ি ঝুড়ি। দেবীর নিজের দশটি হাতেই লাগবে পঞ্চাশটি আঙুল। দোমেটের সময় শরীরে মুখ ফিট হয়ে গেছে। এখন তাকান যায় তবে বলা যায় না :

অতসী পুষ্প বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং
নব যৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম।
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নত পয়োধরাম॥

এখনও ল্যাতা মারতে হবে, ন্যাকড়া মারতে হবে মাটির সাজ হলে, বসাতে হবে। শরীরের অ্যানাটমি বুঝে একে একে আঙুল জুড়তে হবে। মহিষাসুর-মর্দিনীর দশটি হাতের দশ রকম ভঙ্গি। বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ধরাতে হবে এক এক হাতে। ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়াং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ। তীক্ষ্ম বাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।

এঁটেল মাটি মিহি করে ছেঁকে জলে গোলা হয়েছে। মায়ের আষ্টেপৃষ্ঠে বসেছে ন্যাকড়ার স্কিন। এইবার ফিনিশের কাজ পাকা হাতে উঠেছে। মাটি গোলা তুলি দিয়ে লাগালেই ভাল হয় নয়ত নরম ন্যাকড়া দিয়ে মসৃণ করে।

আতসীপুষ্প বর্ণাভাং। আগে সারা গায়ে খড়িমাটির ওয়াশ। তারপর কণাইবিচির আঠায় শক্ত কামড়ে নানারকম আর্থকলার, পিউড়ি অ্যালামাটি, ভীমসেন, হিঙুল, ভুসো। ভাল দিন দেখে হয়ত মহালয়ার দিন, চোখ আঁকার কাজ শুরু হবে। লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ হাতে তুলি ধরার আগে শিল্পীকে চোখ বুজিয়ে বসতে হবে স্থির হয়ে। যাঁর চোখ তিনিই আঁকিয়ে নেবেন এবার। শিল্পী ত উপলক্ষ মাত্র।

৪৫ থেকে ৬০ দিনের একটু একটু কাজ, একদল মানুষের পরিশ্রমে দশভুজা সিংহের পিঠে হেলে আছেন। মহিষাসুর যেন জিমনাসিয়াম থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছেন বারবেলা রেখে। মাথায় অ্যালবার্ট চুল। কার্তিক ময়ূর নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি। নিউকাট জুতোর ওপর কোঁচা লুটোচ্ছে। ধনুকের প্রয়োজন নেই, একটা তীরই যথেষ্ট। মায়ের হাতেই ত অসুর নাকাল। পাশ থেকে একটু খোঁচাখুঁচি করে দিলেই যথেষ্ট। সরস্বতী মা আমার রণক্ষেত্রেই বীণা বাজিয়ে এফেক্ট মিউজিক দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন। গণেশ পৈতে সামলাচ্ছেন। এই ডামাডোলে ছিঁড়ে না যায়। ইঁদুর ভাবছে একবার ছাড়া পেলে হয়। ভক্তের আলমারিতে ঢুকে শেকসপিয়ার চিবোব। মা লক্ষ্মী উদগ্রীব হয়ে খুঁজছেন, কার ওপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করব। সিংহে [illegible] অ্যালসেসিয়ান কামড়েছে কিন্তু দাঁত [illegible] অসুর বাঁ হাত দিয়ে পিঠ থাবড়াতে [illegible]—বাঃ তোয়ালে মুড়ে তোর গাটা অ [illegible] উর্দ্ধে মায়ের মুখে কঠোরে করুণে, প্রশ্রয়ে [illegible] হালফিল ভাব, চলছে চলবে।

বারোয়ারির টাঁক বুঝে মায়ের সাজ। সে যুগের রহিস জেণ্টুরা জার্মানী থেকে বুলেনের সাজ আমদানি করতেন। মালাকার, স্বর্ণকারেরা বসে যেতেন হাতের কাজ দেখাতে। শোলা, বুলেন, পশম

।মার রূপে শরস্থ

রূপ হবে টানা টানা যেন বাঁশপাতা

শলমা, চুমকি সব মিলিয়ে মা যেন হেসে উঠতেন নক্ষত্রের সাজে।

Mr Ward computes that half a million sterling was in his time expended yearly on her festival in Calcutta alone.

এখনই বা কম কি! সমস্ত বারোয়ারির খরচের টাকা যোগ করলে রাসেল বলতেন, তিনটে হাসপাতাল হতে পারত, সিকিখানা অ্যাটমিক রি-অ্যাকটার, গোটা একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট, দশ হাজার বেকারের চাকরি।

মাটির সাজে খরচ কম। বুলেনের সাজ প্রায় অচল। ডাকের সাজ আবার ফিরে এসেছে। মাকে সাজাবেন মালাকার, কিছু উৎখাত স্বর্ণকারও এই দায়িত্ব নিয়েছেন। শোলা, রাঙতা বা ফয়েল কেটে কেটে ডিজাইন করে মাকে যেন জড়োয়ার সাজে ঝলমলে করা হয়। শাড়ি সস্তার হলে শাটিনের নয়ত ব্রোকেড, ১২ টাকা মিটার। চুলেরও কম দাম, বেশী দাম আছে। শন থেকে হতে পারে। ১০০ গ্রামের দাম ৭৫ পয়সা। হরীতকীর কষে কালো রং গুলে শন ভিজিয়ে রেখে তৈরি হবে মার এলো চুল। ৭০ সাল থেকে শুরু হয়েছে পাটের ব্যবহার। দাম একটু বেশী। প্রায় পাঁচ টাকা প্যাকেট। দশ প্যাকেটের মত লাগবে। এলো চুলেই রণরঙ্গিনী মূর্তি খোলে ভাল। তবে বীরকৃষ্ণ দাঁ মশাইয়ের বাড়িতে মায়ের চুল বেণী পাকান। তা হলেও মা আসলে,

উগ্রচন্ডা প্রচন্ডা চ চন্ডোগ্রা চন্ডনায়িকা।
চন্ড চন্ডবতী চৈব চন্ডরূপাতি চন্ডিকা॥

গর্জন তেল মেখে চকচকে হয়ে দেবী এবার শিল্পীর ঘর ছেড়ে চলে যাবেন পুজামণ্ডপে। বোধনের বাজনা বাজবে। ঢাকীরা এসেছেন সপরিবারে। এইত্ত রুজি রোজগারের সময়। ঢাকের পেছনে নাচছে ময়ূর পালকের শিখা। যেমন পুজোই হোক শাস্ত্র মানতে হবে। সায়ংসময়ে বিল্বতরুর নিকটে গিয়া বোধন করিবে। বোধনের পর অধিবাস। এসে যাবে সপ্তমী। 'ওং ছিন্ধি ছিন্ধি ফটফট স্বাহা' মন্ত্রে ফলযুগল—সম্পন্না শাখা ছেদন পূর্বক বাদ্যবাদন সহকারে বিল্বশাখা আনিয়া নবপত্রিকা বন্ধনাদি সকল কর্ম করিয়া নদ্যাদিতে স্নান।

রাজপথে কলাবউ চলেছেন নাচতে নাচতে। ঢাকের আওয়াজে বাতাস চিড় খেয়ে যাচ্ছে। পুজো কাঁপছে শহরের অলিতে গলিতে। পুজো হবে হয় দেবীপুরাণ বিহিতে না হয় কালিকাপুরাণ মতে। পঞ্জিকা যুদ্ধে নির্ঘণ্টের এদিক সেদিক হবে।

দেবীকে আবাহন করে আনা হল। কটি গৃহেই বা পুজো হয়। মা তুমি প্যান্ডেলে এস। দেখ পছন্দ হয় কিনা। আয়োজনের অভাব নেই। কোনারকের মত প্যান্ডেল, কুতুবমিনার, ফ্রানস থেকে এসেছে এফেল টাওয়ার, সার্কুলার রোডের মোড় থেকে সেন্টপলস ক্যাথিড্রাল উপড়ে এনেছি।

ওঁ আগচ্ছ মদ্ প্যান্ডেলে দেবি অষ্টাভিঃসহ
শক্তিভিঃ

আবাহনান্তে চক্ষুর্দান। প্রথমে ডান চোখ তারপর বাঁ চোখ। তারপর প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এইভাবেই মহাষ্টমী, সন্ধিপুজো। কুমারী পুজো। যাঃ পুজো শেষ হয়ে গেল।

মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুর ঘাতনাম।
কীর্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্ বধং শুম্ভ নিশুম্ভয়োঃ॥

অষ্টমী নবমী আর তিথি চতুর্দশী ইহাতে মানব যেই ভক্তিভাবে বসি, শুনিবে আমার এই মাহাত্মকীর্তন, হইবে না কভু তার দুরিত ঘটন, হবে না দারিদ্র্য কভু বাড়িবে সম্পদ।

কিছু দুর্গা আবার 'ছুট দুর্গা' হয়ে চলে যাবেন চিৎপুরের গঙ্গার ধারে। বায়না ফেল করে প্যান্ডেলে উঠতে পারেননি।

আবাহন করে মাকে যেমন আনা হয়েছে তেমনি আবার রেখে আসতে হবে কৈলাস শিখরে দশমীর দিন।

গচ্ছন্তু দেবতাঃ সর্বা দত্ত্বা তু বাঞ্ছিতং বরম্॥
কৈলাস শিখরে রম্যে সংস্থিতা ভবসন্নিধৌ।

হাবিয়ানা চণ্ড

অসুর এলেন কারাগারের থেকে

এস মা

উৎকণ্ঠা নজরী ঝিলিক
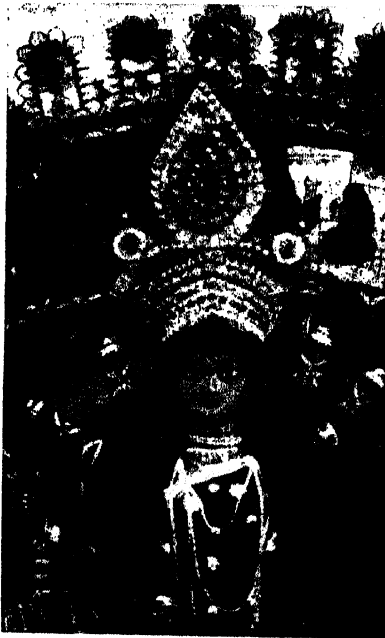
সর্বত খেয়ে দিবাকর নিশাকরের সঙ্গে কোলাকুলি করতে গিয়ে কটাস করে কান কামড়ে দিয়েছে। তা দিক। এর চেয়ে আরও বেশী কুকাণ্ড ঘটত প্রাচীন কলকাতায়। ১৭৯২ সালে মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ির দুর্গোৎসব দেখে কেরী সাহেব লিখেছিলেন—

The majority of company crowded to Raja Naba Kissen's where several mimics attempted to imitate the manners of different nations.

হিন্দুস্থানী গান বিলিতী ঢঙে গাওয়া হয়েছিল। বাবুরা গোলাপী নেশায় চুর হয়ে কেয়াবৎ, কেয়াবৎ করে যে পরিবেশ তৈরি করেছিলেন তাতে 'ন্যাশনাল ফেস্টিভাল' বিকৃত হয়েছিল 'গ্র্যান্ড ফীস্টে'।

দুর্গোৎসব আমাদের প্রাচীনতম উৎসব না হলেও শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব। ইতিহাসের পথ ধরে পেছোতে শুরু করলে ষোড়শ শতাব্দীতেই থেমে পড়তে হবে। বাংলার প্রান্তরে তখন মোগল ঘোড়া ছুটেছে। ইংরেজ তখনও এসে পৌঁছয়নি। তখনই শুরু হয়েছিল শারদীয় ও বাসন্তী দুর্গোৎসব। অনেকের মতে, রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দেশে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা খরচ করে প্রথম শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রচলন করলেন। পাল্লা দিতে এলেন রাজশাহীর ভাদুড়িয়ার রাজা জগৎনারায়ণ। আটলক্ষ টাকা খরচ করলেন বাসন্তী দুর্গোৎসবে।

বাসন্তী পুজো তেমন পপুলার হল না। তিনি এখন অন্নপূর্ণা হয়ে অল্প স্বল্প গৃহ আলো করতে আসেন। শরতের রানীরই জয় জয়কার—ওয়ারশিপ অফ দি গ্রিন হারবেজ। ইংরেজের কলকাতার নতুন বড়লোকেরা গ্রাম বাংলার উৎসবকে শহরে টেনে নিয়ে এলেন। এখন গ্রামের পুজো টিং টিং করছে। মানুষ ছুটেছে শহরের দিকে। রাজপথে লোক ধরে না। প্যান্ডেলে মাইক ফুঁকছে, কৃষ্ণ গোস্বামী তুমি যেখানেই থাক আমাদের অফিসে চলে এস, তোমার মেসোমশাই অপেক্ষা করছেন। আধুনিক কলকাতার হালফেশানের পুজো অনেক সংস্কার মুক্ত। দর্শকরা সাহেব না হলেও সাহেবী পোশাকে সজ্জিত। ঢুলীরা নীল মাখান কোরা কাপড় পরেন না, তবে ঢাকের বোল সেই একই আছে—কাইনানা, কাইনানা, গিজদা গিজোর, গিজোড় গিজোড়। শিশুরা এখনও নাচতে ভোলে নি। সেই বোলটিও আছে—দাদা গো দিদি গো গাবতলাতে গরু, দেখসে গরু গরু গরু গরু তার দেখব কি আর। গ্রামে সেই গানটিও আছে, অই দেখ মা দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী গণেশেরে কোলৎ কইর‍্যা বইস্যা জননী। আবার নেই অনেক কিছুই। কোথায় সেই ভক্ত, যিনি সন্ধিপুজোর সময় নিজের বুক চিরে, সোনার বা রুপোর বাটিতে রক্ত ধরে মাকে পুজো দেবেন। সেই খাওয়াও নেই। দশজনে পাত পেড়ে লুচি মন্ডা খাবে।

বারোয়ারি আছে বলে উৎসব বেঁচে আছে। একের বোঝা দশের লাঠি। হাজার হাজার মানুষ করে খাচ্ছে। টেলারিং শপে মেয়ের মা কাটারের পায়ে ধরে বলছেন—ষষ্ঠীর দিন ফ্রকটা ডেলিভারি না দিলে মেয়ে আমার আত্মঘাতী হবে। কাঁপজীবী মানুষ ধাক্কা খেয়ে দোকানের বাইরে ছিটকে এসে বলছেন— আগে বোনাসের বাবুদের দাপট শেষ হোক তারপর দেখা যাবে।

মা ফিরে যেতে যেতে বলছেন—অসুরকে ভয় পাই না, সে ত মারা পড়বেই, অনেক কালের চুক্তি। এবার দেখছি ট্রেড ইউনিয়নই আমাকে ঘায়েল করে দেবে। আসছে বার, আর কি কৈলাস থেকে নামা যাবে।

শিল্পীর অন্ধকার আটচালায় একটি মাত্র দুর্গা পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে আছেন দৃষ্টিহীন চোখে। গণেশের ইঁদুর পিঁড়ির গামলায় পাট নিয়ে খেলছে। শান্তের কলকাতায় এইবার আর এক মা আসবেন সশব্দে।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্ত কেশীং চতুর্ভুজাম।

বিসর্জন মত বাজনা বাজে

যাও মা কৈলাসে

Greater Power
Extra Lather
Fresher Perfume
New Formula White Det
det
det

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১২ ॥

কাল প্রবাহে কমলাসুন্দরীর জীবনের অনেক পরিবর্তন এসেছে কিন্তু তার রূপের বিশেষ হেরফের হয়নি। তার বর্ণ কালো, কিন্তু সেই বর্ণই তার বৈশিষ্ট্য। এ দেশে সৌন্দর্যের প্রথম লক্ষণই হলো গাত্রবর্ণ কতখানি গৌর, তবু সকলে এক কথায় স্বীকার করে যে কমলাসুন্দরীর মতন রূপসী ক্বচিৎ দেখা যায়। তার চিক্কণ কালো মুখখানি যেন পাথরে খোদা, এবং এমনই মসৃণ যে মনে হয় মাছি বসলে পিছলে যাবে।

কৈশোরোদ্গমের পর রামকমল সিংহের নজরে পড়ায় তার ভাগ্য ফেরে। সামান্য অবস্থা থেকে তুলে এনে রামকমল সিংহ তাকে বারবণিতা সমাজের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রামকমল সিংহ তাকে এত বড় বাড়ি দিয়েছেন, দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়ে এনেছেন এবং পশ্চিমাঞ্চল থেকে শিক্ষক আনিয়ে তাকে নৃত্যে পটিয়সী করিয়েছেন।

কমলাসুন্দরী সত্যিই তার দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিল রামকমল সিংহকে। সেই আমোদ-প্রিয়, বিলাসী পুরুষটির হৃদয় ছিল বড় নরম, কখনো কারুর মনে আঘাত দিয়ে কথা কননি। রামকমল সিংহের মৃত্যুর পর দশদিক শূন্য দেখেছিল কমলাসুন্দরী এবং প্রকৃত বৈধব্য যাপন করেছিল কিছুদিন। এমনটি আর কেউ কখনো দেখেনি কিংবা শোনেনি। কিন্তু সব কিছুতেই একটা মাত্রা আছে। এক সুন্দরী, নর্তকী, বারাঙ্গনা কতদিন আর লোকচক্ষের আড়ালে থাকবে? সে নিজে চাইলেও লোকে তাকে থাকতে দেবে কেন?

কমলাসুন্দরী এখন শহরের সব চেয়ে নামকরা অবিদ্যা।

তার বয়েস এখন পঞ্চতিরিশ, কিন্তু নর্তকী বলেই বোধ হয় তার শরীরের চমৎকার গড়ন এখনো অটুট আছে। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য সে খানিকটা স্ফীতোদরা হয়েছিল, আবার সচেতন হয়ে, পরিশ্রম করে মেদ ঝরিয়ে ফেলেছে। এখনও সে এক একদিন নাচের আসরে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

হীরা বুলবুলের নাম রসিক ব্যক্তিরা এরই মধ্যে ভুলে যেতে বসেছে। হীরার নাম আর শোনা যায় না। বরং কিছু নতুন নাম এখন সদ্য হাওয়ায় ভাসছে। যেমন, রওশানকুমারী, শারদা মনজিলওয়ালী, রেশমা ঘুংঘটওয়ালী। লক্ষ্ণৌয়ের রাজ্যচ্যুত নবাব কলকাতায় এসে বসতি নেবার পর লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বারানসী থেকে কিছু কিছু ভাগ্যসন্ধানী নর্তকী-গায়িকা-গণিকারাও কলকাতায় আসছে। নবাবের সঙ্গে দলটিও কম বড় নয়।

এই লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের প্রসঙ্গেই একটা বেশ কৌতুক হয়েছিল।

রামকমল সিংহের সেই গৃহ কমলাসুন্দরী কিছুতেই ছাড়েনি। তার এখন পয়সা হয়েছে। এ রকম দু তিনখানা বাড়ি সে অনায়াসেই কলকাতায় হাঁকাতে পারে। কিন্তু এই গৃহ থেকেই তার সৌভাগ্যের উদয়, এখানেই রামকমল সিংহ তার কোলে মাথা রেখে দেহরক্ষা করেছেন, এ গৃহ সে কোনো ক্রমেই পরিত্যাগ করবে না।

বিধুশেখর মুখুজ্যে এবং মুনশী আমীর আলীর মতন দুই ধুরন্ধর উকিল মিলেও হটাতে পারেনি তাকে। মোকদ্দমা চলেছিল টানা চার বৎসর, তারপর ওঁরাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কমলাসুন্দরী নিজে যথেষ্ট বুদ্ধিশালিনী, তা ছাড়া তাকে মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্যও আছে তার দু জন অনুরাগী। একজনের নাম ফটিকচাঁদ মল্লিক, লোকে তার নাম দিয়েছে ফুটে মল্লিক। অন্যজন নুটুবিহারী সরকার, লোকের মুখে মুখে তার নাম ছোট নুটু, যদিও বড় নুটুটি যে কে, তা ঠিক জানা যায় না। ফুটে মল্লিক আর ছোট নুটু পালা করে নিয়মিত আসে কমলাসুন্দরীর কাছে। চপলা, তরঙ্গিনী আর চন্দনবিলাসী নামে তিনটি মেয়েও থাকে এখানে, কমলাসুন্দরী তাদের নাচ-গান শিখিয়ে তৈরি করে নিয়েছে।

একদিন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের কাছ থেকে এক দূত এলো তার কাছে। নবাব এত্তেলা পাঠিয়েছেন। এর মধ্যেই কমলাসুন্দরীর নৃত্যকলার খ্যাতি তাঁর কানে পৌঁছেছে। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই শহর। জন্ম থেকেই যার কোনো রাজা-বাদশা নেই। আছে বিদেশী সরকার, সেই শহরের লোকজনও যে খানদানী নৃত্য বা সংগীত বোঝে, এ সম্পর্কে নবাবের কোনো ধারণাই ছিল না। তাই নবাব দেখতে চান কলকাত্তাওয়ালীর নাচ।

নবাবের দূতের চেহারা, পোশাক, কথাবার্তা সবই অন্য প্রকারের। কমলাসুন্দরী প্রথমে বুঝতেই পারেনি প্রস্তাবটা। যখন বুঝলো, তার বুক কেঁপে উঠলো। এ যে বিরাট সম্মান। অতবড় একজন নবাব তাকে দেখতে চেয়েছেন। এ কোনো উটকো নবাব কিংবা হঠাৎ বাদশা নয়, কত বড় বংশের মানুষ ইনি। হিন্দুস্তানের বুকের মণি যে আওধ, সেখানকার শেষ স্বাধীন নবাব।

কমলাসুন্দরী শুধু তো দেহপসারিণী নয়, সে শিল্পীও বটে। শিল্পী সব সময় খোঁজে শিল্প-রসিককে। টাকা পয়সা ছড়িয়ে অনেকেই এসে কমলাসুন্দরীর নাচ দেখে যায়। তার মধ্যে প্রকৃত সমঝদার কজন? সকলেই জানে, সারা হিন্দুস্তানে নৃত্য-গীতের শ্রেষ্ঠ সমঝদার ঐ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ। তিনি ডেকেছেন কমলাসুন্দরীকে।

বিকেলে ফুটে মল্লিক আসতেই কমলা সুন্দরী চোখ মুখ উদ্ভাসিত করে বললো, আজ কী হয়েছে, জানো? বলো দিকিনি আজ কে এয়েচেন?

ফুটে মল্লিকের মুখ শুকিয়ে গেল। আবার কে উৎপাত করতে এসেছিল কে জানে! কোনো নামকরা লোক, সমাজের মাথা? নাকি তার চেয়েও আট দশ গুণ বড় কোনো নির্বোধ ধনী? বাঙাল দেশ থেকে অনেক উটকো জমিদার আসে, তারা আটকুড়ে রাতের বাতাসার মতন মুঠো মুঠো টাকা ছড়ায়, সেগুলোর সঙ্গে পারা যায় না।

ফুটে মল্লিক বললো, সকালে এয়েছেল সে আবার কেমন ধারা মানুষ? নিশ্চয়ই কেতা জানে না। রাতের চিড়িয়ার কাছে সকালে কেউ আসে? আর তুই অমনি দেকা দিলি? তখনে তোর চুলে কিলিপ ছেল? চোকে সুর্মা দিইচিলি?

কমলা বললো, ওগো, যো এয়েছেল, সে আসল ন গো, আসল নয়। সে দূত। আমায় শনিবার যেতে বলেচে। কার দূত বলো দিকিনি?

চপলা, তরঙ্গিণী, চন্দনবিলাসীরাও কমল সুন্দরীকে ঘিরে বসে আছে মজলিশ ঘরে। এখনো অদের সাজ-পোশাক, প্রসাধন হয়নি। আসর বসবে রাত আটটার আগে নয়।

ফুটে মল্লিক প্রায়ই আগে আগে আসে গল্প-গুজব করতে। ফুটে মল্লিক মধ্য বয়েসী, বেঁটে খাটো গোল-গাল ধরনের মানুষ, মাথায় সুবৃহৎ টাক, গায়ের রং টুকটুকে ফর্সা এবং তার টাকটিকে আরও বেশী ফর্সা দেখায়। সে সব সময় সাদা রঙের পোশাক পরিধান করে বলে একটু দূর থেকে তাকে মনে হয় একটি রসগোল্লার মতন। মানুষটি গল্প-গুজব এবং হাস্য পরিহাস ভালোবাসে এবং অই নিয়েই সময় কাটায়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে সেও একজন নিষ্কর্মা ধনী। তার পিতামহ উত্তরবঙ্গে একটি জমিদারি ক্রয় করেছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে সে ঐ জমিদারির দুই-তৃতীয়াংশের মালিক। নিজের দেখাশুনো করারও প্রয়োজন হয় না। গত দশ বৎসরের মধ্যে সে নিজের জমিদারিতে একবারও স্বশরীরে উপস্থিত হয়নি। নায়েব-গোমস্তা মারফৎ নিয়মিত তার কাছে টাকা আসে।

ফুটে মল্লিক বললো, কার দূত রে বাবা? আমি আমি তো কিচুই বুঝেচিনি।

অনেক রঙ্গ-রহস্যের পর কমলাসুন্দরী নবাবের কথা জানালো।

সে কথা শুনে ফুটে মল্লিকের চোখ এমনই বিস্ফারিত হয়ে গেল যে মনে হলো যেন ভিতরের গোলক দুটি ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

আর্তনাদ করে সে বলে উঠলো, তোর কি মরবার সাধ হয়েচে নাকি রে, কমলা? অ্যাঁ? তুই সাধ করে ঐ নবাবের গড্ডরে পা দিবি!

কমলাসুন্দরী কিছুই বুঝতে পারলো না। সে সরল বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলো, কেন, কী হয়েচে?

—তুই শুনিসনি কিচুই। নবাবের কীর্ত্তি-কাহিনীর খবরে যে শহর একেবারে ম ম কচ্চে! নবাবটি যে একেবারে কাঁচাখেগো দেবতা, মেয়েমানুষ পেলেই একেবারে চিবিয়ে খেয়ে ফ্যালে।

—যাঃ, অতবড় একটা মানী লোক।

—মানী লোকেরা কি মেয়েমানুষের মাতা খায় না? মেটেবুরুজের চত্বরেও এদানি কোনো মেয়েমানুষ যায় না!

—কী যে বলো আশ কতা পাশ কতা। আমার তবলা বাজনদার বললে যে নবাব খুব নাচ গান ভালোবাসেন। ভালো নাচ দেকলে ভাবের ঘোরে উনি নিজেও উঠে নাচতে শুরু করেন।

—নাচ ভালোবাসেন তো বটেই। নাচ দেকে একেবারে মোহিত হয়ে যান, তোর নাচও একবার দেকবেন, তারপর তোকে খেয়ে একেবারে হজম করে ফেলবেন।

—এমন অদ্ভুত কতা কখুনো শুনিনিকো। নবাব পাগল, না তুমি পাগল?

—এসব কতা আমি স্বকর্ণে শুনিচি।

ফুটে মল্লিক আরও নানারকম ভয়াবহ গল্প শুনিয়ে কমলাসুন্দরীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু কমলাসুন্দরীর ঠিক বিশ্বাস হলো না। ফুটে মল্লিক হিংসেতেও একথা বলতে পারে।

পরদিন সে নুটুবিহারীকে খবর পাঠালো।

নুটুবিহারী কমলাসুন্দরীর চেয়ে বয়েসে কিছু ছোটো। সম্প্রতি তার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় হাতে অঢেল পয়সা এসেছে। ফুটে মল্লিকের মতন সে একেবারে নিষ্কর্মা নয়, সে আইন শিক্ষা করে কিছুদিন ওকালতি শুরু করেছিল তা [illegible]

... তার পিতা অতি কড়া ধাতুর লোক ছিলেন, সেই জন্য পিতা ধরাধাম ত্যাগ করার পর স্বাধীন হয়ে সে কিছুদিন শরীরের আড়মোড়া ভেঙে নিচ্ছে।

নটুবিহারী বেশ লম্বা ও সুদেহী। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, অনেকটা সেনাপতি সেনাপতি ধরনের চেহারা। কিন্তু শরীরের তুলনায় তার কণ্ঠস্বরটি অস্বাভাবিক রকমের মিনমিনে। পিতার ধমক খেয়েই বোধহয় সে তার কণ্ঠস্বর কখনো উচ্চগ্রামে তুলতে পারেনি।

ফটে মল্লিকের তুলনায় ইদানীং নটুবিহারীই কমলাসুন্দরীর বেশী ঘনিষ্ঠ। নাগর হলেও ছোট নটুকে সে যেন খানিকটা স্নেহের চক্ষেও দেখে।

ছোট নটু ফটে মল্লিকের ঠিক বিপরীত। নবাবের কাছ থেকে আহ্বান এসেছে শুনে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো। কমলাসুন্দরীর সম্মান যেন তার নিজেরই সম্মান। সে স্বয়ং কমলাসুন্দরীকে মেটেবুরুজে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তখন কমলাসুন্দরী বললো, নবাব কেমন ধারা মানুষ গো? ফটিকচাঁদ কেমন ধারা সব উলটো কথা বলছিল।

ফটিক চাঁদের নাম শুনেই জ্বলে উঠলো নটুবিহারী।

—ঐ ফটে মল্লিকটা কী জানে? ওটা একটা ছাঁচি কুমড়ো! ও ব্যাটা নবাবীর কী জানে? লক্ষ্ণৌ-এর নবাব, নাম শুনলেই মাতা হেঁট হয়ে যায়। হাতি দয়ে পড়লেও হাতি। নবাব দয়ে পড়েচেন বটে কিন্তু নবাবী মেজাজ একটুও নষ্ট হয়নিকো! রহিসী কায়দা পুরো-পুরি বজায় রেকেচেন।

—তবু বাপু তুমি একটু খপর নেও না। শুনলে কেমন ভয় ভয় করে। নবাব ডেকেচেন, সে ডাক উপিক্ষেও কত্তে পারি না, আবার চাল-চলন-সহবতে যদি কিছু ভুল হয়, নবাব যদি হাতে মাতা কাটার হুকুম দেন—

—যেতে হবে তো শনিবার? এখনো চারদিন রয়েচে। আমি সব খোঁজ এনে দিচ্চি তোমায়। লক্ষ্ণৌ-এর নবাব কলকেতায় এসে আর কারুকে ডাকে নি, শুধু তোমায়, তার মানে বুঝলে কমলা, এক ডাকে তোমায় সবাই চেনে! ঐ ফটে মল্লিকটার হিংসেয় বুক ফাটচে!

দু' দিন বাদে ছোট নটু সব খোঁজ খবর নিয়ে এলো। কথা বলার বদলে সে ক্রন্দন করতে শুরু করলো কমলাসুন্দরীর হাত চেপে ধরে।

কমলাসুন্দরী হতভম্ব হয়ে বললো, ও মা, এ কী? এ কী?

ছোট নটু হাপুস নয়নে থেমে থেমে বললো, কমলা, কতা দাও, তুমি কিছুতেই মেটেবুরুজে যাবে না! নবাব তোমায় যতই হীরে-মোতির মালার লোভ দেখাক!

—কেন গো? সত্যিই কি নবাব বাহাদুর মেয়ে-মানুষদের ধরে ধরে মেরে ফেলেন নাকি?

—না গো, তা নয়! ব্যাপার আরও ভয়ংকর। নবাবী প্রাসাদে কেউ ঢুকলে আর বেরুতে পারে না। নবাব সবাইকে শাদী করে ফেলে!

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ গো, আমি সব খপর এনিচি!

—এসব কতা কে শোনালে তোমায়!

—মেটেবুরুজে সব্বাই বলাবলি কচ্চে যে! সেখেনে কত মানুষের ভিড়, যত সব ফড়ে আর দালাল, গুড়ের লোভে লোভে যেমন পিঁপড়ে আসে। আর জুটেচে যত রাজ্যের পাখিওলা। নবাবের খুব পাখি কেনার শক, আর ঐ শক বিয়ে করার।

—কী বলচো গো তুমি? কতা নেই, বার্তা নেই, যাকে দেকবে, তাকেই ধরে শাদী করবে? এ কি মগের মুলুক নাকি রে বাবা!

—নবাব ধম্মে হলেন গে শিয়া। ওরা যত খুশী মুত্-আ কত্তে পারে।

—মুত-আ, কী গো?

—ঐ যে বললুম, বিয়ে বল, শাদী বল, নিকে বল, সবই ঐ মুত্-আ। নবাবের যাকে পছন্দ হয়, অমনি তাকে মুত-আ করে ফেলে। একজন কী বললো জানো? এক কম্ বয়েসী ভিশতিনী মাগী অন্দর মহলে জল দিতে যেত, তাকে হঠাৎ নবাবের চোখে লেগে গেল। আর অমনি তাকে মুত্-আ করে ফেললেন নবাব। সে ভিশতিনী এখন বেগম!

ছোট নটুর গলা কাঁদো কাঁদো, কিন্তু কমলাসুন্দরী হেসে গড়িয়ে পড়লো একেবারে। এ যেন রূপকথা, নবাবের নেক নজরে পড়ে এক ভিশতিনী রাতারাতি হয়ে গেল বেগম!

ছোট নটু বললো, শুধু কি ভিশতিনী নাকি, এক ঝাড়ুদারনীকেও অমনি মুত্-আ করে বেগম বানিয়েচেন নবাব। তার নাম আবার মুসফ্‌ফা বেগম।

—তার মানে কী?

—কে জানে? শুনিচি নবাব রোজই একটা করে শাদী কচ্চেন, অ্যাদ্দিনে প্রায় শ' খানেক বেগম হয়ে গ্যাচে। আগে আরও কত ছেল কে জানে! তোমার মতন আগুনের খাপ্‌রাকে দেকলে নবাব কী আর ছাড়তো! জোর জার করে অমনি মুত্-আ করে নিত।

কমলাসুন্দরী ঠোঁট টিপে হেসে বললো, তা একবার নবাবের বেগম হয়ে দেকলে মন্দ হয় না!

ছোট নটু হাত জোড় করে বললো, কমলা, তুমি এমন কতা বললে? জাত-ধম্মো বিসজ্জন দেবে?

—আমাদের আবার জাত কী?

—ওঃ, এই তোমার মনে ছেল? তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে চাও? আমরা কি তোমার পায়ে পড়ে থাকিনি? এখুনে তোমার পায়ে মাতা কুটবো কমল।

—আরে, আরে করে কী, করে কী মিনসেটা! সত্যি সত্যি কি আমি ধেই ধেই করে নবাবের বেগম হতে যাচ্ছি নাকি? আর গেলেই বা কি। অমনি জোর করে মুত্-আ করবে? এ কি মগের মুলুক নাকি রে বাবা!

—হ্যাঁ, সেই কতাই তো সবাই বলচে! সুন্দরপানা কোনো মাগ্‌ নবাবের প্রাসাদে একবার ঢুকলে আর বেরুতে পারে না। মুতু-আ করার পর বেগম বানাবে। সে ঐ নামেই বেগম, সে আর কোনোদিন দেকতে পাবে না বাইরের আলো বাতাস, বুঝলে?

কমলাসুন্দরী ডাকলো চপলা, তরঙ্গিনী আর চন্দনবিলাসীকে। সব বৃত্তান্ত শুনিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী লো, তোরা কেউ নবাবের বেগম হতে চাস নাকি? এমন সুযোগ আর কখনো পাবিনি!

তিনজনেই সমস্বরে বলে উঠলো, ও মা গো, রক্ষে করো!

ছোট নটু বললো, ঠিক বলিচিস! কেন নবাব-মহলে গিয়ে বন্দিনী হবি? আমরা কি তোদের কম খাতির করি?

কমলাসুন্দরী বললো, তা হলেও বেগম বলে কতা!

চপলা বললো, ওফ্‌, ভাবলেও বুক কাঁপে! প্যাঁজ রসুনের গন্ধ, আর নবাবের নাকি হুমদো হুমদো কাফ্রি খোজা রয়েচে।

নবাব সম্পর্কে এই সব চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর গল্প চলতে লাগলো দু-তিন দিন ধরে। আমন্ত্রণ পেয়েও কমলাসুন্দরী যাবে না বলে নবাব যদি রাগ করেন এবং জোর করে ধরে নিয়ে যান, সেই ভয়ে ছোট নটু একটা বজরা ভাড়া করে ওদের সকলকে নিয়ে কয়েক-দিনের জন্য গঙ্গাবক্ষে বিহারের প্রস্তাব দিল।

অতি উত্তম কথা, কমলাসুন্দরী সানন্দে রাজি।

কিন্তু যাত্রার আগের দিন সন্ধে থেকে তরঙ্গিনীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পরদিনও সন্ধান মিললো না তার। কমলাসুন্দরীর বজরা ভ্রমণে বেরিয়ে গেল। এবং ফিরে আসার পর শুনতে পেল, তরঙ্গিনী ঝাড়ুদারনীর ছদ্মবেশে নবাবের মহলে ঢুকেছিল এবং নবাবও তাকে মুত্-আ করে বেগম বানিয়ে ফেলেছেন।

অবশ্য এটা ঘটনা না রটনা, তার সত্য মিথ্যে জানার কোনো উপায় নেই। (ক্রমশ)

নারী—তুমি শুধু নারী

অমিয়া সেন

দু জনের ঝগড়ার ফলে উনুনে হাঁড়ি চড়ল না। মাঠ থেকে খেটে-খুটে এসে খিদের সময় ভাত না পেয়ে স্বামীর হাতে বড় বউ খুন হয়ে গেল। গাঁয়ের লোকের যুক্তিতে ছোট ভাই দাদাকে বাঁচাবার জন্য খুনের দায়টা চাপিয়ে দিল ছোট বউয়ের ঘাড়ে। কারণ বউ গেলে বউ তো অঢেল পাওয়া যাবে। কিন্তু ভাই গেলে ভাই তো পাওয়া যাবে না। মায়ের পেটের ভাই। পরিবার, বংশধারা সব কিছুই যে ভাইয়ের সঙ্গে জড়িত। ছোট বউ তো তার প্রেমময় স্বামীর ভালোবাসার বহর দেখে গোটা দুনিয়ার উপরেই এমন বিতৃষ্ণ হয়ে গেল যে, বিনা প্রতিবাদে ফাঁসিকাঠের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'শাস্তি' নামক ছোট গল্পটির মোটামুটি সারাংশ এই।

আজ নারীবর্ষের ভাবনা ভাবতে বসে সর্বাগ্রে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের ঐ গল্পটি।

ঐ একটি মাত্র ছোট গল্পের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের সমাজ পরিবার এবং সেই সমাজ পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু নারীর দশাটা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সে-কাল এ-কাল সর্বকাল মিলিয়েও তার সমতুল্য আর একটা ছবি কোথাও মিলবে না।

প্রাক্ আর্যযুগে এই উপমহাদেশে সমাজ-ব্যবস্থা কি রকম ছিল, নর এবং নারী—মানবজাতির এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সে সমাজে পারস্পরিক সম্বন্ধটা কি রকম ছিল, জানি না।

আর্য যুগের আদিপর্বে সমাজে নারীর স্থান কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ। মনে হয় পৌরাণিক যুগের চেয়ে খুব বেশী উন্নত ছিল না। কারণ, ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়, রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানী রৈক্কের কাছে প্রথম যখন 'ছয়শত গাভী, স্বর্ণময় কণ্ঠহার এবং অশ্বতরীযুক্ত রথ' নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, রৈক্ক তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অনন্তর রাজা পুনরায় সহস্র গাভী, স্বর্ণময় হার, অশ্বতরীযুক্ত রথ এবং নিজ দুহিতাকে উপঢৌকন স্বরূপ রৈক্ককে দিলে, প্রসন্ন হয়ে রৈক্ক রাজাকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

এতে মনে হয় দান উপহার উপঢৌকন ইত্যাদি-রূপে অন্যান্য মূল্যবান বস্তুর সঙ্গে নারী সংযুক্ত করার প্রথা পৌরাণিক যুগের আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। তা হলেও নারীদের সম্বন্ধে বেশী আগড়-নিগড়ের ঝোঁক প্রথম দিকে আর্যদের মধ্যে সম্ভবত ছিল না, কারণ মূলে ভারতীয় বিতাড়নকারী আর্যেরা বহু দিন পর্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে, পরে জ্ঞানের তপস্যায়।

শস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় আর্যনারীদের কৃতিত্বের কথা ইতিহাসে স্বীকৃত। সুতরাং ভোজ্য সংগ্রহের চিন্তা থেকে অধিকতরভাবে বিমুক্ত না থাকতে পারলে সে যুগে আর্যেরা আকাশে বাতাসে অত দেবতা আবিষ্কার করতে পারতেন না বা জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে অত গভীর জ্ঞানের পরিচয়ও রেখে যেতে পারতেন না। তা ছাড়া আর্যেতর আদি ভারতীয়রা আশে-পাশেই ছিল। বেশী বাড়াবাড়ি করলে আর্য-রমণীরা সেদিকেও ধাবিত হতে পারতেন।

যে পুরাণ সমূহকে আধার করে পৌরাণিক যুগ চিহ্নিত, সে পুরাণগুলিকে তৎকালীন ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস বলা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে। তা হলেও দেশ এবং সমাজের একটা সর্বাঙ্গীণ চিত্র ওতেই পাওয়া যায়। দেশের তৎকালীন জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত একটা সুনির্দিষ্ট আচার পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে হলে পুরাণগুলিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। মনে হয় বহুযুগের ভাঙা গড়া এবং চেষ্টা চরিত্রের ফলে তখনই প্রথম একটা বিধিবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থা দেশে গড়ে উঠেছিল, যার ভিতরে আর্য অনার্য উভয় সংস্কৃতিরই সংমিশ্রণ ঘটেছে। নিয়োগ-প্রথা, রাক্ষস বিবাহ, এক নারীর একাধিক বিধিসম্মত পতিপ্রথা সেই দিকেই ইঙ্গিত করে।

এ দেশে আসার আগে বহিরাগত আর্যদের শিক্ষা-দীক্ষা রীতিনীতি কি রকম ছিল কে জানে।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা ঔপন্যাসিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। পরলোকগত হিন্দী সাহিত্যিক আচার্য চতুর সেনের রামায়ণের উপরে লেখা একখানা উপন্যাস আছে। নাম 'বয়ং রক্ষাম'। তাতে বেদ উপনিষদ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি থেকে প্রচুর প্রমাণ উদাহরণ উধৃত করে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, আর্যেরা আদপেই বহিরাগত ছিলেন না। বরং তাঁদেরই দুই শাখা সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করে ইরান ইউরোপ সহ আরো অনেক দেশে নিজেদের শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তার করেছিলেন।

আচার্য চতুর সেনের মতে, তৎকালীন পৃথিবী-ব্যাপী মানবসমাজ দেব, দানব, দৈত্য এবং রাক্ষস—এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতির বাহক ছিলেন দেবতারা এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট সংস্কৃতি ছিল রাক্ষসদের। দানব এবং দৈত্যেরা ছিল এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী। দানবদের দৈহিক সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ। হিন্দুদের তিন প্রধান দেবতার অন্যতম শিবঠাকুর ছিলেন সৃষ্টিছাড়া—চার শ্রেণী নিয়েই তাঁর কারবার এবং দলবল। আধুনিক ভাষায় সেদিক দিয়ে তাঁকে নির্ভেজাল সমাজতন্ত্রী বলা যায়। যদিও তাঁর এই স্বভাবের জন্য দেব সমাজ তাঁকে দু' চক্ষে দেখতে পারতেন না। কিন্তু প্রচণ্ড জনসমর্থন এবং শক্তি সামর্থ্যের জন্য তাঁকে অবজ্ঞা করার সাহসও দেবতাদের ছিল না, যার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণুর সঙ্গে শিবকেও একাসনে স্থান দিতে হয়েছে। খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবেই লেখক এ-সমস্ত তথ্য তাঁর উপন্যাসে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

আমার মনে হয় এটা ঐতিহাসিক সত্য হলেও হতে পারে। হিন্দুদের বর্ণপ্রথা হয়তো এভাবেই এসেছে। নইলে বিশ্বের সমস্ত মানবদের যাঁরা 'অমৃতের সন্তান' বলে ডাক দেন, সেই মহাপ্রাণ আর্যদের চিন্তায় নারী তার মানবমূল্য হারিয়ে কি করে কেবল বস্তু সামগ্রীর সমতুল্য বলে পরিগণিত হল?

সমস্ত পুরাণগুলিতে নারী সম্বন্ধে যে সাধারণ চিত্র পাওয়া যায়, তাতে নারীরাও যে মানুষ, এই সাধারণ সত্যটাই সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। ঘটি বাটি তৈজস-পত্রাদির মতই তারা সমাজ-সংসারের কিছু আবশ্যক বস্তু মাত্র, যা প্রয়োজনবোধে বিক্রি করা যায়, দান করা যায়, ফেলে দেওয়া যায় বা ধ্বংস করে ফেলা যায়। অবশ্য এই প্রয়োজন বোধটারও কোন গভীর ভিত্তি নেই। হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী বিক্রয়, পরশুরামের মাতৃহত্যা, যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী-পণ, অন্যান্য অনেক রাজা-মহারাজার মুনি-ঋষিদের কাছে স্ত্রী কন্যা দান ইত্যাদির মূলে একটা মাত্র প্রয়োজনই নজরে পড়ে—ধর্মরক্ষা। তা হলে দেখা যাচ্ছে, পুরুষ রচিত এবং রক্ষিত সেই 'ধর্ম' বস্তুটির সঙ্গে তখন সমাজের নারী শ্রেণীর কোনো সম্পর্কই ছিল না। শক্তি পুজার সময় দেবীর সামনে পাঁঠা মোষ ইত্যাদি বলি দেওয়া হয় (দেবতার সামনে ধর্মের নামে এই বলিদান প্রথা ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নানাভাবে প্রচলিত। কেবল পশু নয়, পাখিও বলি দেওয়া হয়।) তাও যেমন ধর্মের নামেই করা হয়, এও একটা তেমনি ব্যাপার আর কি। বোবা পশুরা বুঝতেই পারে না যে, এর দ্বারা অদের কী ঘোরতর পুণ্য লাভ হচ্ছে।

কিন্তু মজা এই, এমন যে মূল্যহীন নারীবস্তু, তার সম্বন্ধে আবার তখন সমাজকর্তাদের আইন-কানুন, বিধি নিষেধের অন্ত ছিল না। এই আইন-কানুনের প্রধানতমটি হল পাতিব্রত্য। এটিকে অনু-করণ করা প্রত্যেক নারীর অবশ্য কর্তব্য।

আবার এই পাতিব্রত্যেরও কোন সহজ সরল আদর্শ পৌরাণিক সমাজে পাওয়া যায় না। পতির আদেশে নিয়োগ প্রথা মেনে নিলে সেটাকেও না হয় ওই পাতিব্রত্য ধর্মের অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যায়, কিন্তু শাশুড়ীর আদেশে যখন বিধবা পুত্রবধূরা ঐ নিয়োগপ্রথা মেনে নেয়, তখন তাদের পাতিব্রত্য থাকে কোথায়?

আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী। এঁরা প্রত্যেকেই একাধিক পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন, তবু এঁরা প্রচণ্ড সতী এবং সেই হেতু প্রাতঃস্মরণীয়া। মনে হয়, এঁরা প্রত্যেকেই নির্বিবাদে এবং সানন্দে পতি এবং অন্য পুরুষের চাহিদা মিটিয়ে সমাজে বশ্যতার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন বলে সমাজ-কর্তারা এঁদের এইভাবে পুরস্কৃত করেছেন।

এত করেও শেষরক্ষা অর্থাৎ গার্হস্থ্যরক্ষা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণও ছিল। নারীদের তৈজসপত্র তুল্য করে রেখেও পুরুষেরা সুখনিদ্রা যেতে পারেনি পুরুষদেরই ভয়ে। তারা সম্পর্কীয়া নিঃসম্পর্কীয়া যে-কোন নারীকেই বাঞ্ছা হলে টেনে নিয়ে আসতে পারতো এবং আনতোও। দেবগুরু বৃহস্পতি অন্তঃসত্ত্বা ভ্রাতৃ-বধূর কাকুতি মিনতিতে কর্ণপাত না করে তার উপরেও হামলা করে ছেড়েছিলেন।

এজন্য পুরুষদের ছাড়পত্র হিসাবে নিয়োগপ্রথা, গুরু-দক্ষিণা, অতিথিসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে যথেচ্ছ-রূপে অন্য নারী উপভোগের বিধান দেওয়া ছিল। আর মজা এই, এসবই করা হতো ধর্মের নামে। আর এই ধর্মের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ একতরফা, কেবল মাত্র পুরুষদের জন্য। মেয়েদের ধর্ম কেবল পুরুষদের আদেশ পালন। কর্ম তাদের মনোরঞ্জন। ব্যক্তিসত্তার কণামাত্র উন্মেষ তাদের মধ্যে দেখা দিলেই সমাজের সর্বনাশ। তবুও মাঝে মাঝে অঘটন ঘটত আর তেমন ঘটলেই তাদের অহল্যা-গতি।

অতএব ঘর সামলাবার জন্য তখন কিছু করা দরকার হয়ে পড়ে। এই কিছু করার তাগিদেই কর্তা শাস্ত্রকারেরা বেদ উপনিষদের গণ্ডী ভেঙে সমাজে দেবীদের আমদানি করলেন।

এতদিন অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল দেবতাদেরই আধিপত্য ছিল। এবার সে স্থানে আবির্ভূতা হলেন দেবীরা। বিশ্বের যাবতীয় শক্তিকে কল্পনা করা হল দেবীরূপে—যাদের সামনে দেবতারাও জোড়হস্ত।

বাস্তবের নারীরা যখন সকল মর্যাদা হারিয়ে ধূল্যবলুণ্ঠিতা, দেবী নারীরা তখন প্রবল প্রতাপে নিয়ন্ত্রণ করছেন ভারতের ধর্মক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র। সেই নিয়ম অদ্যাবধি চলে আসছে।

কে না জানে এদেশে ডাকাতেরাও ডাকাতি করতে বেরুত (এখনও বেরোয়) মা কালী বা কালিকা মায়ের পায়ে রক্ত জবা চড়িয়ে।

রামের আগে সীতা, কৃষ্ণের আগে রাধা, নারায়ণের আগে লক্ষ্মী—সর্বত্রই ঈশ্বর বা ঈশ্বর-প্রেরিতেরা পশ্চাদ্‌বর্তী। অন্নপূর্ণা কুপিতা হলে দেবাদিদেবের অন্ন মেলে না। তাই শঙ্করের আগে গৌরী।

উদ্দেশ্য স্পষ্ট। পুরুষের পক্ষে যে সমাজে আত্মসংযম একেবারেই অনাবশ্যক এবং অবাধ পরস্ত্রী-গমনের ঢালাও সুযোগ, সে সমাজে গার্হস্থ্য শুচিতা রক্ষার জন্য যাতে নারীরাই দেবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের রক্ষা করে, সে জন্যই সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ইত্যাদিকে সম্মুখে স্থাপন এবং রক্তমাংসের নারীদের উপর দেবীত্বের আরোপ।

পৃথিবীর আর কোন ধর্মে, কোন দেশে এমন দেবীর ছড়াছড়ি নেই। বিপরীতে আর কোন দেশের ধর্মশাস্ত্রে বা সমাজশাস্ত্রে নারী অবমাননার এমন জঘন্য দৃষ্টান্তও নেই।

অনেক পরবর্তীকালে বৌদ্ধসঙ্ঘেও নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধধর্মের পতন কিন্তু তাতেও এড়ানো গেল না। এড়ানো গেল না ঈশ্বর-বিহীন পূর্ণ সদাচারের সেই উজ্জ্বল দুর্গে ক্লেদাক্ত কদাচারের ছড়াছড়ি।

বর্তমান যুগটাকে বিশ্বহিতৈষীরা নারীযুগ (women decade) বলে চিহ্নিত করেছেন। সেজন্য ভাবতে ভাবতে বিগত যুগের কিছু কথা প্রাসঙ্গিকভাবে মনে এল।

এখন আমরা সেসব দিনকে বহু পিছনে ফেলে বর্তমান যুগে এসে পৌঁছেছি। ভাবছি, অন্ধকার থেকে কতখানি আলোতে আমরা এসেছি। এসেছি কি?

এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু লেখালেখি হয়ে গেছে। বিদগ্ধদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিদগ্ধারাও অনেক লিখেছেন। বিখ্যাতদের লেখা সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই, কারণ তাঁরা নারী নন। কিন্তু কোন বিদুষী যখন লেখেন যেহেতু এদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত, সুতরাং এদেশে আলাদা করে নারীমুক্তি আন্দোলনের কোন অর্থ হয় না বা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সভ্যদেশের চেয়ে ভারতে মেয়েরা যথেষ্ট সম্মানিত জীবন যাপন করে তখন বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

"শাস্তি" গল্পের ছোট বউ ছিল সমাজের নীচুতলার লোক। সেই নীচুতলা থেকেই আরম্ভ করা যাক।

হিন্দুশাস্ত্র মেয়েদের তৈজসপত্রাদির মত গৃহস্থালির একটা অত্যাবশ্যক বস্তু হিসেবে গণ্য করেও পিতা পতি এবং পুত্রের উপর একটা দায়িত্বও অর্পণ করেছিল, নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করার,—অন্তত ভাত কাপড় দিয়ে পোষার। সে দায়িত্ব এখনকার দরিদ্র বা দরিদ্রতম ভারত পালন করে, একথা আদপেই বলা যায় না। হাড়ি, ডোম, মেথর, ধোপা, চাষী মজুর থেকে কল-কারখানা, খনি শ্রমিকদের মধ্যেও এখন পরিবারের ভাত কাপড় যোগাড়ের দায়টা কেবল পুরুষের নয়।

আধাআধি বা তারও বেশি দায় এখন মেয়েদের ঘাড়ে। এটাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কোনক্রমেই বলা যায় না। কারণ, ঘাটে বাটে মাঠে বাগানে খনিতে কলকারখানায় খেটেই মেয়েদের দায়িত্ব শেষ হয় না। ঘর গেরস্থালির ষোল আনা বোঝা বয়ে স্বামীর কাছে আইনসম্মত বেশ্যাবৃত্তি করে, সন্তান ধারণ পালন করেও এই শ্রেণীর মেয়েরা পুরুষের কাছে যে ব্যবহার পায় তাকে মনুষ্যসুলভ বলা যায় কি? কষ্টার্জিত পয়সা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের তুলে দিতে হয় পুরুষ অভিভাবকদের হাতে তাদের নেশার খরচ যোগাবার জন্য। এ কারণে এবং সন্তানের ক্ষিধের অন্ন যোগাবার জন্য অনেক সময় এরই মধ্যে এদের দেহ খাটাতেও নামতে হয়। নামতে হয় ছোটখাটো স্মাগলিং-এর ধান্দায়। তবু মারধর একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। খুন খারাপি সাধারণ ঘটনা। ঘর থেকে বের করে দেওয়া বা অন্য নারী নিয়ে অন্যত্র ঘর বাঁধা একটা জলভাত গোছের ব্যাপার এ সমাজে।

অবশ্য এদের মধ্যে মেয়েরাও অনেক সময় ছেলেমেয়ে সংসার ফেলে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালায়। কিন্তু এমনটা ঘটে শতকরা নিরানব্বুইটা ক্ষেত্রে শুধু দারিদ্র্য বা অত্যাচার অসহ্য হলে। অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনের লোভেই এরা পালায়।

মদের পয়সা জোটাবার জন্য এত মহা অভিমানী আর্যভারতে বাপ ভাই মারধর করে ঘরের মেয়েকে বেশ্যা পাড়ায় ভাড়া খাটতে পাঠায়—এমন ঘটনাও জানা আছে। আর এটা যে কেবল সমাজের নীচের তলাতেই ঘটে তা নয়। তথাকথিত উপর তলায় বরং বেশী প্রচলিত, তবে অন্যভাবে। নারীদেহকে মূলধন করে কতভাবে যে পুরুষেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে, দেশময় একটা সমীক্ষা চালালে তার সম্পূর্ণ চিত্রটা হয়তো পাওয়া যাবে।

পৌরাণিক ইতিহাসে এবং হিন্দুশাস্ত্রেও কোথাও কোথাও মেয়েদের বিবিধ দোষাবলীর মধ্যে একটা মুখ্য দোষ বলা হয়েছে আগ্রাসী কামপ্রবণতা। এ ব্যাপারে সত্যিই কি মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে? শরীর তত্ত্বজ্ঞেরা কি বলেন? নারী—সে যতই কেন না রম্ভা উর্বশী টাইপের হোক, তার যৌন তৃষ্ণা বা ক্ষমতার একটা বয়স আছে। পুরুষের এই তৃষ্ণার কোন বয়স নেই। ক্ষমতা আমৃত্যু। তবু দেবীপ্রধান হিন্দুধর্মে নারীকে বলা হয়েছে নরকের দ্বার। মুক্ত মন নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে সেই আদিযুগ থেকে এই আধুনিক কাল পর্যন্ত এই নরকের উদ্ভাবক প্রবাসক পরিচালক পুরুষেরাই। নারীদের ভূমিকা এখানে নগণ্য। শতকরা একশো জন মেয়ে ক্রমে ক্রমে নারী হয়ে ওঠে একটা নির্মল স্বপ্নের মধ্য দিয়ে—স্বামী সন্তান এবং একটি নিরাপদ গৃহগণ্ডী।

কলগার্ল বা মার্কামারা দেহ পসারিনীদের পেশা বা ব্যবসা পুরুষের আপন প্রয়োজনে—পুরুষ দ্বারা সৃষ্ট।

একো গেল সমাজের একটা দিক—যে দিকটা সর্বতোভাবে কলুষিত, অশিক্ষার কারণেই হোক বা দারিদ্র্যের জন্যই হোক। এর বাইরে রয়েছে আপাত নিষ্কলুষ একটা বৃহৎ সমাজ—যে সমাজ চলছে মোটামুটি একটা বিধিবদ্ধ ধারায় তা হিন্দু, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ খৃষ্টান যে-কোন ধর্মের ছত্রছায়াই হোক না কেন।

সেই বৃহৎ বিস্তৃত সমাজে মেয়েদের অবস্থাটা কি? যাঁরা বলেন, পৃথিবীর যে-কোন দেশের তুলনায় এ দেশে মেয়েদের অবস্থা এখনো যথেষ্ট উন্নত, তাঁরা কি সমাজের সর্বস্তরে সমীক্ষা চালিয়ে এ কথা প্রমাণ করতে পারবেন, গার্গী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী থেকে সরোজিনী নাইডু ইন্দিরা গান্ধী ইত্যাদির দৃষ্টান্ত ঘরের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও?

মেয়েরা যে এদেশে এখনো সেই পৌরাণিক যুগের মত ঘটি-বাটি তৈজসপত্রের বেশী উপরে উঠতে পারেনি, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ তো বহু-চর্চিত পণপ্রথা বা ডাউরী সিস্টেম। এই ডাউরী সিস্টেম ভারতে—বিশেষ করে বিশাল উত্তর ভারতে কন্যা জন্ম যে কী দুর্ভাগ্যপূর্ণ করে রেখেছে, অতি সম্প্রতি প্রকাশিত দিল্লীর একটি ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদকীয় থেকে কয়েকটা মাত্র লাইন তুলে দিলেই সকলের বোধগম্য হবে—

"Public apathy and legislative loopholes have been abeting in making marriage a death trap for an incrpasing number of women, whose dowry is not big enough to please the husband's family. In Delhi alone over 200 such brides last year were either murdered by the in-laws or driven to suicide."

ভারত শাসনের মহাপীঠ খাস রাজধানীর বুকেই যদি এই হয়, তাহলে এই উপমহাদেশের কোথায় কোথায় আরো যে কত হত্যা নির্যাতন হয়, তার খবর কে রাখে?

ধর্মপ্রাণ (?) ভারতের অনেক পাহাড়ী অঞ্চলে (এরা কিন্তু ট্রাইবাল নয়) এখনো এক নারীর একাধিক পতিপ্রথা ধর্ম এবং সমাজসম্মত। বড়ো ভাই যে মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনবে, বাকী সব ভাইয়েরই সে হবে ধর্মসঙ্গত শয্যাসঙ্গিনী। এমন কি যদি কোন ভাই ঐ বিয়ের সময় নাবালকও থাকে, পূর্ণবয়স্ক হলে সে ভাইও ঐ নারীতে উপগত হবার অধিকারী।

দক্ষিণে একাধিক রাজ্যে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটা ভারী ধর্মসঙ্গত প্রথা আছে। একাধিক ভাইয়ের মধ্যে অসময়ে কোন ভাইয়ের মৃত্যু হলে অন্য ভাইদের মধ্যে ঐ বিধবাকে দখল করা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সেই ভাই জয়ী হয়, যে সর্বাগ্রে মৃত ব্যক্তির ঘরে গিয়ে পৌঁছতে পারে। এভাবে বিজয়ী ব্যক্তির বিবাহিতা পত্নী সংসার জীবনে দ্বিতীয় বা অকিঞ্চিৎকর স্থানে নেমে যায়। জয়লব্ধ বিধবা হয় প্রথম স্থানাধিকারিণী।

এই যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রত্যন্তে মেয়েদের সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত সব নিয়মকানুন, জানি না কবে থেকে চলে আসছে, এ সবই চলছে ধর্মের নামে। এ ধর্ম কবে কারা সৃষ্টি করেছিল তাও জানিনা, তবে যারাই সৃষ্টি করে থাকুক, এর ভিতরে নারী সম্বন্ধে

ভারতের সনাতন চিন্তাধারারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

আর একটা ব্যাপারে দেবী-পূজারী ভারত নিঃসংশয়ে বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী, স্ত্রী-হত্যা বা স্ত্রী নির্যাতনে।

হিন্দুস্থান টাইমস-এর সম্পাদকীয় থেকে যে কয়েক লাইন উদ্ধৃতি দিয়েছি, তাতে শুধু পণ-প্রথার ব্যাপারটাই আছে। এ ছাড়া আরো বহু কারণে প্রায় অকারণে কত যে স্ত্রী হত্যা এদেশে হয় তার হিসেব কোথাও লেখা নেই—না থানার রেজিস্টারে না খবরের কাগজের পাতায়।

যদি কেউ বলেন, এ দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত, সুতরাং পশ্চিমের উইমেন লিব-এর মত আন্দোলন এখানে নিষ্প্রয়োজন বা অচল তার অর্থ তা হলে এই ধরে নিতে হয় যে দেশের শিক্ষিত সমাজের মেয়েরা বেশ সুখে সম্মানেই আছে।

ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই উল্টো। নারী-নির্যাতন বা স্ত্রী-হত্যার ঘটনাগুলি কিন্তু শিক্ষিত সমাজে অল্পশিক্ষিত সমাজের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, হয় তো বা বেশী।

নির্যাতনের ঘটনাগুলি একেবারেই ঘরোয়া ব্যাপার বলে কোনদিনই দিনের মুখ দেখে না—অর্থাৎ সমাজ-সভায় বা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এগুলি কোনদিন খবর হিসেবেই স্থান পায় না।

খুনের খবরগুলি যা বেরোয় খুনের সংখ্যা তার চেয়ে দশগুণ বেশী। আমার যে দুজন আত্মীয়ার এ ভাবে মৃত্যু হয়েছে, (একজন গ্রামে, একজন খাস কলকাতায় এক অভিজাত পরিবারে) সংবাদপত্রে তা খবর হিসেবে প্রকাশিত হয়নি। কারণ কেস কোর্টেই ওঠেনি।

বিদ্যাসাগরী যুগে এক বা একাধিক পত্নী থাকা সত্ত্বেও ষাট সত্তর বছরের বৃদ্ধেরা যখন আট দশ বছরের শিশু মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনত, তখন সেই সব নারী-মাংস-লোলুপ কদাচারীদেরও যেমন সমাজ বয়কট করেনি আধুনিক যুগের এইসব খুনীদের সম্বন্ধেও আধুনিক সমাজ তেমনি নির্বিকার বা সম্ভ্রম পরায়ণ। কারণ এতে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কোন হানি হয় না।

খুব বেশী মাত্রায় না হলেও গত ত্রিশ বছরে দেশে শিক্ষিতের মাত্রা বেশ বেড়েছে—স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীতেই। স্ত্রী হত্যার সংখ্যা কিন্তু কমেনি। বরং বহুগুণ বেড়েছে এবং বেশী বেড়েছে ঐ তথা-কথিত আলোকপ্রাপ্ত মহলেই। তা হলে অশিক্ষার দোহাই দিয়ে লাভ কি? একজন দিন মজুর বা একজন খনিশ্রমিক অথবা একজন ছেলে চাষী যখন মদ খেয়ে নেশার ঝোঁকে বা সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে ঘরে ফিরে কোন কারণে রেগে গিয়ে বউকে ধরে ঠেঙায়, তখন আমরা শিক্ষিতজনেরা দূরে থেকে সে দৃশ্য দেখে 'ছোটলোকের ব্যাপার' বলে পাশ কাটাই বা ঐরকম পরিবেশে সপরিবারে থাকার চিন্তাতেও শিউরে উঠি। কিন্তু ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপ্ত একজন প্রতিবেশী যখন তার লেকচারার স্ত্রীকে ধরে প্রায় প্রতিরাত্রেই ঠেঙান তখন পরদিন সকালে সেই প্রতিবেশীকেই হাসিমুখে সুপ্রভাত বলতে ইতস্তত করি না।

হিন্দু ধর্ম বলে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। হাঁকডাকে ভারতীয় নারী মাতৃ গরিমায় মহীয়সী বটে। পথে ঘাটে অপরিচিত লোকেরা বয়স্কা মহিলাদের যেমন মা বা মাতাজী অথবা মাইজী বলে সম্বোধন করে তেমনি কিশোরী তরুণীদেরও বয়স্ক লোকেরা 'মা' বলে ডেকে থাকে।

পথ ছেড়ে ঘরে ঢুকলে কিন্তু চিত্রটা অন্যরকম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এদেশে যৌথ পরিবার প্রথা যেমন ভেঙে গেছে, তেমনি স্বাধীনতার পরে এদেশে সমাজে সংসারে সর্বত্র একটা পরিবর্তন এসেছে, যে পরিবর্তনের স্রোত মূলত পশ্চিমমুখী। পরিবারে মায়ের স্থান আর যে বিদ্যাসাগরী যুগের মত নেই এটা সুবিদিত সত্য। এদেশের পুরুষেরা কেবল যে বউকে ধরে ঠেঙায় তা নয়, তারা মাকেও ঠেঙায়—হাতে, ভাতে, সম্মানে, নানাভাবে। সুতরাং মুখের মা শব্দ আর কেতাবী উত্তম শব্দসম্ভারের সাহায্যেও এ ক্ষেত্রে নারীর সম্মানকে একটা স্থির ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা গেল না।

পাশ্চাত্যে মেয়েরা দশ বারো বছর বয়স থেকেই 'ডেট'-এ অভ্যস্ত হয়। যৌন সম্পর্কে ওসব দেশে আরো অনেক কিছু খোলাখুলি চলে। ভারতীয় সংস্কারানুযায়ী এই অবারিত যৌন ভোগ আমাদের দেশে নীতিবহির্ভূত হলেও ওসব দেশে এটা কোন দুর্নীতিই নয়। আমরা সংযমকে প্রাধান্য দিই এবং বিবাহবহির্ভূত যে-কোনরকম যৌন সম্পর্ককেই নিন্দনীয় বলে মনে করি। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, ওরা যা কিছু করে স্বাধীন ইচ্ছাতেই করে—হয়তো বা শারীরধর্মের সাধারণ বৃত্তিগুলিকে শুচি-অশুচিতার ঊর্ধ্বে রেখেই এমনটা করে।

কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েরা ধর্মীয় বলিদানের পশু। নিকট অতীতের কুলীন প্রথা স্মরণ করুন। স্মরণ করুন বিদ্যাসাগরী যুগে শিশু বিধবাদের প্রতি সমাজের পাশব আচরণ।

এতো গেল পর্দার বাইরের দিকটা, যে দিকটা খুবই উন্মুক্ত এবং প্রকাশ্য। কিন্তু পর্দার পেছনেও একটা দিক আছে। সেদিকটাকে অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে।

নরনারী দুই শ্রেণী নিয়ে যে মনুষ্য সমাজ, সেই সমাজে একটা শ্রেণী যখন অপর শ্রেণী দ্বারা অত্যাচারিত, বঞ্চিত বা অপমানিত হয় তখন তার সবটা দায় অত্যাচারী শ্রেণীর ঘাড়ে ফেলা যায় না, এতে অত্যাচারিত শ্রেণীরও বিশেষ সহযোগ থাকে।

পৌরাণিক যুগে নারী-নিন্দা বা কুৎসার অনেক প্রবক্তারা নিজেরাই ছিলেন নারী।

এ যুগে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে যত স্ত্রী-হত্যার ব্যাপারগুলি দেশে ঘটে, তাতে খুনীদের প্রধান সাহায্যকারিণী বা প্ররোচনাদায়িনীরা সর্বদাই নারী-তা সে পারিবারিক জীবনেই হোক বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই হোক।

স্বামী কর্তৃক মারধরের সময়ও পরিবারের অন্য নারীদের বা পাড়া প্রতিবেশিনীদের ভূমিকা নির্বাক দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়।

পক্ষী-জগতে অনেক পুরুষ-পক্ষীকে সৃষ্টি-কর্তা অকৃপণ হাতে নারী পক্ষীর চেয়ে অধিক সৌন্দর্যের অধিকারী করেছেন। পক্ষিতত্ত্ববিদেরা বলেন ওর দ্বারা পুরুষ পক্ষীরা তাদের প্রণয়িনীকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে।

মনুষ্যজগতে বিধাতা নারীজাতিকে পুরুষের মত সাদামাটা না করে কিছু অধিক দৈহিক পারিপাট্য দিয়েছেন। আবহমানকাল ধরে নারীরা তার উপরে প্রসাধনের নামে আরো অনেক কারুকার্য করে আসছে, যা পুরুষেরা প্রায় করেই না। এই যে অন্যের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার একটা গোপন ইচ্ছা, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে আপন অস্তিত্বের প্রতি চরম অবমাননা।

সৃষ্টি মাহাত্ম্যে শারীরিকভাবে মেয়েরা দুর্বল। কিন্তু এই দুর্বল জাতিকে বাদ দিয়ে বিশ্ব জীবন প্রবাহ সচল থাকতে পারে না। প্রাণ একটা হলেও সেই প্রাণকে মানুষ ধারণ পোষণ করে দ্বৈত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। মানুষের শরীরে সব কিছুই ডবল—হাত, পা, চোখ, কান, দাঁত, নাসিকাছিদ্র ইত্যাদি। তেমনি মানব জাতিও বেঁচে আছে দুরকম সেক্স-এর সাহায্যে (সমস্ত প্রাণিজগৎই তাই)। প্রত্যেকের জায়গায় প্রত্যেকে অপরিহার্য। তবু যে পুরুষেরা এ সত্যকে স্বীকার করে না বা মেয়েদের হীন দৃষ্টিতে দেখে তার কারণ মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের মনে করে পুরুষের খেলার পুতুল।

কিছুদিন আগে লন্ডন ভ্রমণকারী এক লেখকের লেখায় পড়েছিলাম, "এ দেশে মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদ যতই সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হচ্ছে, পুরুষদের পোশাক ততই জবরজং আকার নিচ্ছে।"

কসমেটিকস থেকে আরম্ভ করে এই পোশাক পরিচ্ছদ সবকিছুরই আবিষ্কারক পুরুষেরা। ফ্যাশনের মূল প্রবাহটাই নিয়ন্ত্রণ করছে তারা। এখানে মেয়েদের ভূমিকা কেবল সোৎসাহী সমর্থকের। পাকিস্তান যখন মেয়েদের টাইট পোশাকের বিরুদ্ধে প্রায় আইন জারি করে ফেলেছিল মেয়েরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় উদ্যত হয়েছিল। মুসলিম বিধিনির্দিষ্ট চার পত্নীর বিরুদ্ধে এমন বিদ্রোহের কথা তাদের মগজে আসে না কেন?

সরকারও ডাউরী সিস্টেমের বিরুদ্ধে আইন জারী করেছেন। কিন্তু যেহেতু এটাকে বাস্তবে কার্যকরী করার দায়িত্ব পুরুষের হাতে, অতএব ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং হচ্ছেও তাই। আইন এখানে পঙ্গু। কারণ দেশের ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত সব শ্রেণীই এই ডাউরী সিস্টেমের পেছনে সমর্থনবদ্ধ। এর বিরুদ্ধে মেয়েরা কোথায়? পারবে তারা দেশের কোনায় কোনায় চিরকুমারী সঙ্ঘ স্থাপন করে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে?

"বেশীর ভাগ অশিক্ষিত" এটা একটা খোঁড়া অজুহাত। পুরুষদের মধ্যেও শিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য। তবু বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য নানা রকম আন্দোলনও তাদের মধ্যে চলছে। চালাচ্ছে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকেরাই।

একমাত্র সৈন্যবাহিনী ছাড়া সমাজের কোন্ কর্মক্ষেত্রে শিল্পক্ষেত্রে মেয়েরা এখন নেই? কী করছেন তাঁরা স্ব-সমাজের উন্নতি বা মুক্তির জন্য?

মেয়েদের অধিকার মর্যাদা ইত্যাদি রক্ষার জন্য এ যাবৎ দেশে দেশে যত আইন কানুন, সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদি হয়েছে, সব কিছুরই উদ্যোক্তা প্রবক্তা পুরুষেরা। মেয়েদের এতে কোন অংশই নেই। আগ্রহও যেন নেই বা ছিল না।

এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আজ যাঁরা এই পুতুল গোষ্ঠীকে মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অগ্রণী হয়েছেন (নারীযুগ) তাঁরাও পুরুষ।

হিন্দুশাস্ত্রে একটা মোক্ষম কথা আছে—আত্মানং বিদ্ধি। আধ্যাত্মিক অর্থে নয়, স্থূল জাগতিক অর্থেই এটাকে ধরছি—নিজেকে জানো। যতদিন না নারীরা তাদের নিজেদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবে, তাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার নয়। কেউ করুণা করে দিলেও তারা তা রাখতে পারবে না। সম্মান অধিকার এসব দানের বস্তু নয়, স্বকীয় কৃতিত্বে অর্জন করতে হয়।

আজ যখন সব দিক দিয়েই পুরানো মূল্যবোধ-গুলি সমাজ জীবন থেকে ভেঙে পড়ছে, দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে ভক্তি, শ্রদ্ধা, কর্তব্য, দায়িত্বের সাবেক ধারণাগুলি, তখন দেশের বিপুল নারীগোষ্ঠী কেন নিজেরাই অগ্রণী হোক না নিজেদের সম্বন্ধে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে।

দুটো কাপড়েই তো পলিয়েষ্টার স্ট্যাম্প মারা !

কম পরিমাণ পলিয়েষ্টার মিশ্রিত কাপড়। 'টেরিন' স্ট্যাম্পের কাপড়।

'টেরিন' ট্রেড মার্কই তফাৎটা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

আজকাল নিকৃষ্টমানের মিশ্রিত পলিয়েষ্টার কাপড়ে বাজার ছেয়ে গেছে, যার দরুন কোনটা খাঁটি পলিয়েষ্টার আপনি বুঝে উঠতে পারেন না। পলিয়েষ্টার বলতে যে ভাল জাতের কাপড় বোঝায়, এগুলি সে জাতের নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ পলিয়েষ্টার উপাদান না থাকার দরুন কয়েকবার ধোওয়ার পরই এগুলির ভাজ নষ্ট হয়ে কুঁচকে খাটো হয়ে যায়, আর দেখতেও বিশ্রী হয়ে যায়।

মিলের সেই সমস্ত কাপড়েই একমাত্র 'টেরিন' ট্রেডমার্কের ছাপ পড়ে, যেগুলি ভাঁজ না পড়ার ও কুঁচকে খাটো না হওয়ার জন্য ক্যাফি'র কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। 'টেরিন ব্র্যাণ্ডের কাপড়েই সঠিক পরিমাণ পলিয়েষ্টার উপাদানের নিখুঁত মিশ্রণ থাকে, যার ফলে বার বার ধোওয়ার পরও এই কাপড়গুলি একবারে নতুনের মত ঝকঝকে দেখায়।

কোনোরকম ঝুঁকি নেবেন না। সঠিক মিশ্রণের পলিয়েষ্টার কিনতে পুরো ১০০% ভাগ সুনিশ্চিত হোন। একমাত্র 'টেরিন' ট্রেডমার্ক দেওয়া কাপড়ই কিনুন—কারণ এগুলি আপনার পয়সার পুরো দাম উশুল করে।

'টেরিন' ছাপের অর্থই হ'ল সঠিক মিশ্রণের কাপড়—আর তা সবসময়েই !

CHAITRA-CAFI-592 BLN

আমার যা আছে

বাণীব্রত চক্রবর্ত্তী

॥ ১ ॥

একে উদ্যান বলা যাবে না। বলতে গেলে উঠোনই বলতে হবে। দু চারটে গাছ আর বাড়ির গোয়ালা সতীশের গরুটি বাঁধা থাকে। গরুর গলায় ঘণ্টা। বাছুরটি মায়ের আদর পাওয়ার জন্যে পাগল। এখানকারই কোন একটা গাছে একবার মৌমাছিরা বাসা বেঁধেছিল। মৌচাকটি ঠিক যেন একটা জমাট বুক পাথরের চাঁই। এখন মৌচাকহীন বৃক্ষ এবং অনাদৃত ঘাসের মধ্যে দু' চারটে বুনোফুল আর সতীশের গরু নিয়ে উঠোনটি স্বর্গীয় রাখালচাঁদের বাড়িটিকে আগলাচ্ছে। দোতলায় নিজের ঘরে বসে আছেন স্বর্গীয় রাখালচাঁদের মধ্যম পুত্রবধূ হিরণ্ময়ী। গতকাল তাঁর জন্মদিন ছিল। ছেলেমেয়ে বউ নাতি নাতনীরা বার্থডে কেকের ভেতর পঁয়ষট্টিটা মোমবাতি গেঁথে ফুৎকারে তা নিবিয়ে দেবার ইচ্ছে জানিয়েছিল। উনি বলেছিলেন, "শেষ পর্যন্ত তোরা আমাকে স্লেচ্ছ করে ছাড়বি দেখছি।" এর আগে সৌখিনতার এ অনুষ্ঠান করে পালিত হয়নি হঠাৎ কেন আজ তা ঘটল এর কারণ হিরণ্ময়ী জানেন। খোকার জ্যোতিষে অবিচল বিশ্বাস। মনুর ডাক্তারি শাস্ত্রে। জন্মপত্রিকায় মায়ের আয়ু অবসানের মুখে। খোকার স্থির বিশ্বাস এইবার মা চলে যাবেন। ডাক্তারেরা মনুকে স্পষ্ট করে কিছু বলেছে নাকি? খোকা, মনু ও তাদের বউয়েরা এবং হিরণ্ময়ীর একমাত্র মেয়ে অন্তরা একজোট হয়ে তাই বুঝি মায়ের শেষ জন্মদিনটি পালন করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। জানলা দিয়ে তিনি যে আকাশটা দেখতে পেলেন সেই আকাশের নীচে এতোকালের চেনা কলকাতাটা। এবং আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে তালতলার এই স্বর্গ মর্ত নামক বাড়িটা। এই বাড়ির ইট চুণ কাঠ সিঁড়ি দরজা উঠোন হিরণ্ময়ীর বিগত পঞ্চাশ বছরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে।

নতুন ঠাকুরপোর পন্টিয়াক গাড়িটি ছিল ছাই রঙের। নতুন ঠাকুরপো বরাবর নিজেই গাড়ি চালাতেন। বিকেল বেলায় শ্বশুরমশাই শেষের দিকে নিয়ম করে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতেন। তালতলা থেকে পায়ে হেঁটে গড়ের মাঠ। ফেরার পথে হগ মার্কেট থেকে কিছু না কিছু কিনে আনতেন। মাছটাছ আলু টমেটো এইসব আর কি। বড়োবাবুর সঙ্গে যেতো রামসরণ। অযোধ্যার রামচরণ হিন্দী কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। এক সময় শ্বশুরমশাই পাটনা কলেজে ইংরিজীর অধ্যাপক ছিলেন। খুবই সাত্ত্বিক ধর্মভীরু মানুষ, নিয়ম করে রোজ দু'বেলা পুজো। পঞ্চাশ বছর ধরে না হোক একটানা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে হিরণ্ময়ী এ পরিবারের কুলদেবতা বাণেশ্বরের পুজো করে আসছেন। আজ যদি খোকা মনুর বাবা বেঁচে থাকতেন তবে ওঁর বয়েস হতো পঁচাত্তর। মোটে বিয়াল্লিশেই উনি চলে গেলেন। বড়ো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন। মাথার কোঁকড়ানো চুলে সিঁথি কাটতেন। আজকাল কি ছেলেরা চুল কাটার সময় ক্লিপ ব্যবহার করে? দীনবন্ধু নাপিত এঁদের চুল কাটতো। ঘাড়ের চুল ছেঁটে ক্লিপ চালাতো। জলফি বলতে কিছুই ছিল না। উনি এইরকম চুল কাটা পছন্দ করতেন। সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। খুব নিচু স্বরে আস্তে আস্তে কথা বলতেন। নেশাটেশা বলতে তো কিছুই ছিল না। তবে শখ ছিল। পাখি লালনীল মাছ ফুলের গাছটাছ পছন্দ করতেন। উনি কি নাস্তিক ছিলেন? কোনোদিন কোনো ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করতে দেখিনি। মঠে মন্দিরেও যেতেন না। পুজোপার্বণে অঞ্জলি দেয়া, মাদুলি তাবিজে বিশ্বাস কিংবা পুজোআর্চা করা এসব ওঁর ধাতে ছিল না। অথচ উদ্ধত ছিলেন না, বেপরোয়াও নন, প্রকৃতিটা ছিল শান্ত। বই পড়তেন খুব, এমনকি ধর্মের বইটইও।

॥ ২ ॥

তালতলার এই বাড়িটা বহুকালের। শ্বশুর মশায়ের বাবার আমলের। তাঁরই দেয়া এই নাম—স্বর্গ মর্ত। হিরণ্ময়ী আপনমনে হাসলেন। কেন হাসলেন তিনি? আগাগোড়া সমস্তটা ভেবেই তাঁর হাসি পেল। এই সৌখিনতা বয়স, পৃথিবী এবং এই বাড়ির বাহারী নাম স্বর্গ মর্তের কথা ভেবে। গড়ের মাঠের জলরেখার মতন অতীতটা স্মৃতি বিস্মৃতিকে উন্মোচিত করে তাঁকে হাসাল। আবার যখন ভাবতে চাইলেন ঠিক কি কারণে হাসলেন, হাসিটা সত্যিই কি অনিবার্য ছিল, তখন থই পেলেন না। প্রবৃত্তির কোনো একটা নিয়মেই হয়তো তিনি হেসেছেন। ভূতপূর্ব সময়ের খাঁচা থেকে বলবন্ধ পায়রার মতন স্মৃতিরা আবার আকাশে ওড়ে। উড়ন্ত সেইসব পায়রাদের ডানার শব্দ তখন আকাশের আরাই নষ্ট হয় নাকি? পেট থেকে যে ছেলে দুটো আর মেয়েটা বেরিয়ে কেঁদে উঠেছে সুন্দর লাথি ছুঁড়েছে আর যখন তখন যাদের কাঁথা কাচাতে হয়েছে তারাও আজ বিগত যৌবনে। তাদের বংশধরেরা কি ধরনের নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে তা হিরণ্ময়ী বুঝতে পারেন না। খোকার ছেলে মন্টু ও মেয়ে শম্পী। এদের এঁটোকাঁটার বিচার নেই, ঠাকুরদেবতার কথায় হাসি, সব আচারই

এদের কাছে কুসংস্কার। স্বাতী হাতে বড়ো বড়ো নখ রাখে, ক্ষুরের পরিচর্যা করে, রেকর্ডপ্লেয়ার চালিয়ে ধিঙ্গি মেয়ের মতন তুড়ি দিয়ে ঝাঁকায়, স্বাতী কুকুর পোষে, কুকুরের নাম টম, টমের কতো আদর, বিছানায় পড়ে টম, স্বাতীর ছেলেবন্ধুরা অবলীলায় বাড়িতে আসে, টেলিফোন করে বাপের এতটুকু শাসন নেই। এরা দল বেঁধে রাত্তিরের শো-এ সিনেমা এদের কারোর সঙ্গে কারোর মনের মিল নেই। খোকা মনুর মধ্যে সম্পর্ক। এসবের কারণটা কি তা হিরণ্ময়ী বুঝতে পারেন না। নাতি মনে করে ঠাম্মার পুরনো কাসুন্দে ঘাঁটাটা এক ধরনের অসুখ। ব্রত পুজোপাঠ অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফলাফল। এ শুধু রুটু আর স্বাত ধারণাই নয়, এমনকি ওদের কাকা মনুরও। মনুর বয়েস চল্লিশের কাছা হিরণ্ময়ী জানেন তাঁর বিশ্বাস কুসংস্কার নয়। মানুষের দুটোর বেশি চোখ তো থাকে না। তবে কেন দেখার মধ্যে এত তফাৎ। মানুষের হ মস্তিষ্ক তো মোটামুটি একই নিয়মে কাজ করে তবে বিচারের কেন এত পা আজকাল হিরণ্ময়ী এইসব ভাবেন। এইসব কথা তাঁকে থেকে থেক ভ পুরনো দিনগুলির কথা সত্যি ভোলা যায় না। আজকের এই পৃথিবী হির পছন্দ নয়। খোকা মনুর এই নিরুত্তাপ সম্পর্ক, বউমাদের স্বার্থপরতা, স্বাতীদের অদ্ভুত আচরণের মধ্যে খানখান হয়ে যাচ্ছে সংসার, ধ্বংস স্বর্গ মর্ত। সেই একই তো বাড়ি, সেই দেওয়াল, সেই ইট, সাবেক অন্ধকার চওড়া চওড়া খাড়া সিঁড়ি, উন্মুক্ত উঠোন, খোলা ছাদ, ঠা শাশুড়ীর কুলদেবতা বাণেশ্বর, সবই তো সেই। এখানেই তো স্বর্গীয় চাঁদ তাঁর পুত্র পুত্রবধূদের নিয়ে বাস করতেন। দুপুরবেলায় কলকাতার রাস্তা দিয়ে কতোরকম ফেরিঅলা যেত। এই বাড়িতে আমি আর আমার প্রভাবতী দুই বোনের মতন সংসার করেছি, শাশুড়ীর জন্যে বাটা বাটা সেজেছি। ভাসুরঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনদিন কথা বলিনি। শা আমাদের পুজো-আর্চা যেমন শিখিয়েছিলেন তেমন রান্নাবান্না ঘরকন্নার কাজ আমরা তো এটা আমার, এটা তোমার, এতো কাজ আমি একা করব কেন, স সঙ্গে যখন তখন বেড়াতে যাওয়া এসব শিখিনি।

॥ ৩ ॥

আজ যদি খোকা মনুর বাবা বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর বয়েস হতো পঁচ ওনাকে এখন কেমন দেখতে হতো? মোটে বিয়াল্লিশে উনি চলে গেলেন। শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মৃত্যুর মুখোমুখি থেকেও মানুষটা কি শান্ত ছিলেন। রোগা মানুষ হাজারীবাগ থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলেন। ডিসে কনকনে ঠান্ডা বুকে জমে গিয়েছিল। সেই থেকে নিউমোনিয়া। হঠাৎ মা চলে গেলেন। অন্তরার তখন মোটে চার মাস বয়েস। সেই কঠিন পর দিনগুলির কথা হিরণ্ময়ী ভুলতে পারেন নি। তারকেশ্বরে হত্যে দিতে দিদি শুকনো মুখে ফিরে এসেছিলেন। তবে কি উনি থাকবেন না? মানুষটাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি। দিদি তারকেশ্বরে। ক'দিন পর দ দেখে ভয় পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। শেষপর্যন্ত সাহেব ডাক্তারও দিয়ে দিল। এসব বাবাকে জানানো হয়নি। বাবা অভ্যেস মতো তখনো করে গড়ের মাঠে যাচ্ছেন। সঙ্গে রামচরণ। ফেরার পথে হগ মার্কেট। শা ঠাকুর-ঘরে পড়ে ছিলেন। বাণেশ্বরের কাছে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করেছি বাড়িতে এতবড়ো কাণ্ড অথচ বাবা তার একটুও টের পেলেন না? হির তা বিশ্বাস করেন না। রাখালচাঁদের পাণ্ডিত্য পাটনা কলেজকে বিখ্যাত করে বয়স তখন তাঁর আশি পেরিয়েছে। একটু ভীমরতি ধরেছিল ঠিকই। পুত্রকে নিয়ে যে যমে মানুষে টানাটানি চলছে তা কি তিনি ঘুণাক্ষরেও পাননি? বাড়ির মানুষগুলোর মুখে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ কি তিনি লক্ষ নি? বুঝতে পারেন নি কি ডাক্তারদের এত আসা যাওয়া? হতে পারে থাকতেন চারতলার একপ্রান্তে পাথরের ঘরটিতে। তিনি নির্জনতা পছন্দ কর সব সময় কাছাকাছি থাকতো রামচরণ।

ঠাকুরদেবতা ডাক্তারবদ্যি বিফল হল। উনি চলে গেলেন। সেদিন হির মনে হয়েছিল ভগবান মিথ্যে। চিকিৎসাবিজ্ঞান কতো তুচ্ছ। ভগবান কে পাথরের কিংবা মাটির পুতুল বা ছবি। ডাক্তারদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীম পাপ পুণ্য সব গুলিয়ে গিয়েছিল। নিয়তির দিকে তিনি ফ্যালফ্যাল তাকিয়েছিলেন। নিয়তি খিলখিল করে হেসে তাঁকে এক সীমাহীন ভেতর টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর চোখ থেকে জল পড়েনি, বুকের যে ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার অথচ কোনো হাহাকার প্রকাশ করতে পারেন নি, একটি জড় পদার্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

চারদিকে ছড়ানো স্বামী ব্রজগোপালের স্মৃতিচিহ্ন। ওঁর পড়ার বই, চিঠি, চিরুনি, জামাকাপড়, চশমা, কিছু ফোটোগ্রাফ। আর রইল খোকা ও চার মাসের মেয়েটি। মেয়ের নাম উনিই শখ করে রেখেছিলেন। ঠিক এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে হিরণ্ময়ীকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল।

ঘরে ঢুকল স্বাতী। স্বাতী অবাক। হিরণ্ময়ীর কোলের কাছে নাতনীর মতন বসে পড়ে। জিজ্ঞেস করে, "একি ঠাম্মা, তোমার চোখে কেন?" চমকে উঠলেন হিরণ্ময়ী, চোখের কোলে আঙুল দিতেই আঙুল গেল। কোলের কাছে বসে আছে স্বাতী। ফুটফুটে মেয়ে। কিন্তু চুল কেটে ক্ষুর চর্চা করে মেয়েটা সঙ সেজেছে। স্বাতীর চুলে তেল নেই, করেছে। হিরণ্ময়ীরা ছেলেবেলায় বেসন দিয়ে মাথা ঘষতেন। পুরনো তাদের জোড়াসাঁকোর মাথাঘষা গলিতে মাথাঘষার মশলা পাওয়া যেত। প

কলকাতার চুল বাঁধার কত্তো রীতিই না ছিল। সধবারা মাথার মাঝখানে সিঁথি কেটে চুল বাঁধতো, বিধবারা সিঁথি না কেটে মাথার পেছনে চুলটার একটা গাঁট বাঁধতো। আর ছিল বেনে খোঁপা, এলো খোঁপা, ফিরিঙ্গী খোঁপা। ছোট মেয়েদের অল্পস্বল্প চুলেতে একটা চ্যাঁচারির ছোট বিঁড়ে করে তাতে চুল গলিয়ে ময়ূটিক বাঁধতো। আর স্বাতী? স্বাতীটা সঙ সেজেছে। বড়োদের মুখে হিরণ্ময়ী শুনেছেন চড়কের নীলের দিনে কাঁসারীপাড়ায় সঙ হতো। স্বাতী হিরণ্ময়ীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি আজ খুব কষ্ট হচ্ছে ঠাম্মা? আজ তো মনে হচ্ছে জ্বর নেই।" হিরণ্ময়ী নাতনীর চিবুক তুলে ধরে বললেন, "না দিদা, কষ্ট কোথায়, বুড়ো বয়সে চোখের জোর থাকে না, যখন তখন অমনিই জল পড়ে।" বারান্দায় ফোনটা বেজে উঠল। স্বাতী ছুটল ফোন ধরতে।

সেদিন কিন্তু চোখে এককণাও জল ছিল না। আমার শরীরটা যেন রক্ত মাংস মেদ মজ্জা দিয়ে তৈরী নয়, আমি পাথরের। আমার চোখ পাথরের, আমার চোখে পল্লব নেই। আমার হৃৎপিণ্ডটাও পাথরের হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরমশাই আমাকে দেখে উদ্বেগ বোধ করেছিলেন। আকুলভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ব্রজ কেমন আছে?" আমার মনে হয়েছিল পড়ে যাবো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল, তবু বলেছিলুম "ভালো।" উনি বেড়িয়ে এসে রোজকারের মতন ইজি-চেয়ারে বসেছিলেন। আমার অবগুণ্ঠিত মাথাটা যতোদূর সম্ভব নুইয়ে ওনার জুতো খুলে দিচ্ছিলুম। আর তখনি উনি ঐ কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আশ্চর্য, চোখ থেকে এক ফোঁটাও জল বেরোয়নি। ওনার জুতো খুলতে খুলতে আমার মনে হয়েছিল আমি আর আমার মধ্যে নেই। সেদিন সে শক্তি কোথা থেকে পেয়েছিলুম? ভগবানই জুগিয়েছিলেন। খোকা মনুর বাবা ভগবানে বিশ্বাস করতেন কি? আমার নাতি নাতনীরা ভগবানে বিশ্বাস করে না। পাটনা কলেজের অমন দাঁদে ডাকসাইটে অধ্যাপক রাখালচাঁদ ভগবানে বিশ্বাস করতেন।

খোকা মনুর বাবার কাছে যাবার ডাক এসেছে। এই আমার শেষ জন্মদিনটি চলে গেল। আমি মূর্খ হতে পারি, অন্ধ নই, বোকা নই। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট কেমন করে হারায়? জ্বরটা একেবারে ছাড়ছে না। তেমনি অরুচি, যা খাই তাতেই পেট জ্বালা করে। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছি। সেকাল আর একালের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। শ্বশুরমশাই নেই, শাশুড়ী নেই, উনি নেই, ব্রজগোপালের দাদা কৃষ্ণগোপাল নেই, দিদি প্রভাবতী নেই। নতুন ঠাকুরপো বেনারসের আশ্রমে। রামচরণও মারা গেছে। সোনার সংসার খান খান।

স্বাতী টেলিফোনে এত কথা কার সঙ্গে বলছে? জানলা দিয়ে ভেতরের বারান্দা দেখা যায়। কোণে টেলিফোন। স্বাতীকেও দেখা যাচ্ছিল। স্বাতী খিলখিল করে হাসছে। কথা বলছে। মাঝে মাঝে কাঁধটা ঝাঁকাচ্ছে। এ কি অসভ্যতা। কই হিরণ্ময়ীরা তো কোনো কালে এত বেআব্রু ছিলেন না।

॥ ৪ ॥

হিরণ্ময়ীর জন্মদিনে অন্তরা গান গেয়েছিল। হিরণ্ময়ীর ঘরে বাড়ির সবাই জড়ো হয়েছিল। ব্রজগোপালের ছবিতে মালা দেওয়া হয়েছিল। ঘর জুড়ে রণ্টু, স্বাতী খোকা মনু আর দুই বউ, নীলিমা ও পদ্মা। একটি গান খোকা মনুর বাবার বড়ো প্রিয় ছিল। তাই যখন অন্তরা জিজ্ঞেস করেছিল, "বলো মা, কি গান গাইব।" হিরণ্ময়ী ঐ গানটির কথা বলেছিলেন। সেদিন অন্তরা তড়াতাড়ি স্কুল থেকে ফিরেছিল। জন্মদিন উদ্‌যাপনে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ হিরণ্ময়ীকে অবাক করেছিল। অন্তরার গলাটা আর আগেকার মতো নেই।

'আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ' শুনতে শুনতে হিরণ্ময়ী ব্রজগোপালের কথা ভাবছিলেন। উনি এই গানটি বড়ো ভালোবাসতেন। এই গানে কি ঈশ্বরের কথা বলা হয়নি? উনি কি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন? অন্তরা গানটি গাইছিল। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময়ীর চিত্ত উতল হয়ে উঠেছিল। মেয়েটার সিঁদুর-মোছা খাঁ খাঁ সিঁথি, মেয়েটার নিঃসন্তান কোলটির কাছে কবেকার পুরনো হারমোনিয়ামটা রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নির্ভুল সুর ধ্বনিত করেছিল। স্মৃতিরা জলস্রোতের মতন ছুটে এসে হিরণ্ময়ীকে টলিয়ে দিচ্ছে। স্বর্গীয় রাখালচাঁদ, অযোধ্যার রামচরণ, স্বামী ব্রজগোপাল, ভাসুর কৃষ্ণগোপাল, ননদ প্রভাবতী, নতুন ঠাকুরপো, স্বর্গমর্তের প্রাচীনকালের আবহাওয়া, আগেকার কলকাতা, নতুন ঠাকুরপোর পণ্টিয়াক গাড়িটি এবং ব্রজগোপালের মৃত্যু। সময়ের ঢেউ হিরণ্ময়ীকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। অন্তরার অকাল বৈধব্য, অন্তরার স্কুলমাস্টারী, খোকা মনুর নিরুত্তাপ সম্পর্ক, বউমাদের স্বার্থপরতা ইত্যাদির মধ্যে হিরণ্ময়ীর বিদায়বেলা আসন্ন। দেখতে দেখতে চৌরাশিটা বছর ফুরিয়ে গেল।

সন্ধে এসে গেছে। হিরণ্ময়ী দেখলেন ছোট বউ পদ্ম বারান্দা পেরিয়ে এই ঘরের দিকে আসছে। আজকালকার মেয়েরা কথায় কথায় ঘোমটা দিতে শেখেনি। বাড়িতেও ওদের পায়ে চটি থাকে। নিশ্চয়ই ডাক্তার আসছে। আমাদের বাড়ির ডাক্তার ছিলেন সুধীরবাবু। শ্বশুরমশায়ের আমলের ডাক্তার। ধর্মতলায় তাঁর ডিসপেন্সারী ছিল। সুধীরবাবুও আজ নেই। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনুও এদিকে আসছে। মনু, পদ্ম আর ডাক্তার সরকার ঘরের ভেতর ঢুকল।

॥ ৫ ॥

টালিগঞ্জের পার্কের কাছে রণ্টু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। মঞ্জুর পাঁচটা থেকে সওয়া পাঁচটার মধ্যে আসার কথা। কিন্তু এখন পাঁচটা আটত্রিশ। ডিসেম্বর ফুরোতে চলল তবু শীত এখনো তেমন করে পড়েনি। আজ সকাল থেকে তাপমাত্রা শরীরটা আবার খারাপ চলছে।

চাক্ষুষ প্রমাণ ক'রে নিন ঃ

সুপার রিন-এর শুভ্রতার চমক অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী

সবসময়ে সুপার রিন ব্যবহার করুন আর স্বচক্ষে দেখুন কেমন শ্বেতশুভ্র হয় জামাকাপড় ঃ অন্য যেকোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে কত বেশী ঝকঝকে সাদা হয়। এমন হয়, কেননা, সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার বেশী শক্তি। চাক্ষুষ প্রমাণ ক'রে নিন।

অন্য যেকোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে এতে আছে শুভ্রতা আনার বেশী শক্তি

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.34.2415 BG ৭(RR)

ঠাম্মাকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যাপার নিয়ে। যদিও বাবার ধারণা নিয়তিকে মানুষ রুখতে পারে না। ঠাম্মার হরোস্কোপে নাকি এইখানেই আয়ুর ইতি। বোগাস। নিজের মনে কথাটা বলে খুব বিরক্তির সঙ্গে রন্টু সিগারেটটা রাস্তার নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। মেডিকেল সায়েন্সে যথেষ্ট বিশ্বাস থাকলেও এখন কাকা অনেকটা নিরুৎসাহী। ঠাম্মা আসলে আস্তে আস্তে বাড়ির সকলের কাছে বার্ডেন হয়ে উঠছে। তাই হাসপাতালের কথা ভাবা হচ্ছে। ঠাম্মা কিন্তু হাসপাতালে যেতে একেবারেই রাজি নয়। ঠাম্মার সেই এক কথা, "চোখ যদি বুজি তো এখানেই বুজবো। এটা আমার শ্বশুরের ভিটে।"

রন্টু আপন মনে হেসে ওঠে। সে হাসিতে তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গ একাকার। শ্বশুরের ভিটে মানে স্বর্গমর্ত। তালতলার পাঁচিলঘেরা আদ্যিকালের বাড়ি। রন্টুর মনে হয় স্বর্গমর্তের আবহাওয়াটা পুরোপুরি মধ্যযুগীয়। এই সংসারের মজ্জায় মজ্জায় কুসংস্কার গোঁড়ামি আর অশিক্ষা গেঁথে আছে।

ট্রাম লাইন পেরিয়ে মঞ্জু আসছে। অপরাধীর মতন মুখ করে সে এগিয়ে আসছে। রন্টু মনে মনে ভাবে কে জানে ঠাম্মা এখন কেমন আছে। মঞ্জু এসে জিজ্ঞেস করল, "অনেক দেরি হয়ে গেল, না? কি করবো বলো, অনেকক্ষণ বাসের জন্যে ওয়েট করতে হলো।" ততোক্ষণে রন্টু আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। মঞ্জু রন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এ কি তুমি দাড়ি কামাওনি কেন? দ্যাখো তো কি বিচ্ছিরি লাগছে।" রন্টু আপন মনে নিজের গালে হাত বুলোতে থাকে। মঞ্জু দেখল রন্টুকে কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতন লাগছে। কলার্ড স্ট্রাইপ শার্ট আর জিনের রঙ-জ্বলা বেলবটস পরা রন্টুকে ভিনদেশী পর্যটকের মতন লাগছিল। এরপর মঞ্জু জিজ্ঞেস করল, "টিকিট পেয়েছো?" রন্টু বলল, "না, টিকিট কাটিনি। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। ঠাম্মার শরীরটা খুব খারাপ।" মঞ্জু চুপ করে থাকে। বিরক্তিতে মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। সমস্ত প্ল্যানটা ভেস্তে গেল। গানের স্কুলে যাওয়া হল না। গানের স্কুলের পর মন্টিদের বাড়ি যাবে এইরকম কথা বাড়িতে বলে এসেছিল। গানের স্কুলের সময় ও মন্টিদের বাড়িতে যাবার সময়টা জোড়া লাগিয়ে কতো কৌশলেই না সিনেমা দেখার সময়টা তৈরি করেছিল। সব ভেস্তে গেল। বুড়ো মানুষগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না। মঞ্জু রুক্ষ স্বরে বলল, "কেন, তাঁর আবার নতুন করে কি হলো?" ঠাম্মার অনেক ব্যাপারই রন্টু পছন্দ করে না। ঠাম্মার প্রাচীন ধ্যানধারণা, আচার বিচার, পুরোনো কাসুন্দে ঘাঁটা ইত্যাদি রন্টুর কাছে যথেষ্ট অপছন্দের। তবু এখন মঞ্জুর এই রকম একটা প্রশ্নে রন্টু বিরক্ত হল, অসন্তুষ্ট গলায় বলল, "মঞ্জু, ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো।" মঞ্জু তীক্ষ্ন চোখে রন্টুর দিকে তাকায়। তার দৃষ্টিতে বিস্ময়ও কম ছিল না। রন্টু দূরের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর বলল, "চলো, হাঁটি।"

মঞ্জু হিরণ্ময়ীকে দেখেনি। তবে রন্টুর মুখে যা শুনেছে তাতে তার আকর্ষণ বোধ করার কিছু থাকে না। মঞ্জু জয়েন্ট ফ্যামিলির কথা ভাবতে পারে না। হিরণ্ময়ীর পুজো আর্চা, এঁটো কাঁটার বিচার, সংরক্ষণশীলতা নিয়ে রন্টু আর মঞ্জু কতদিন নিজেদের মধ্যে মজা করেছে। ঠাম্মাকে রন্টু কতোদিন বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে ঠাম্মা যেটাকে ধর্ম বলছে সেটা আসলে গোঁড়ামি আর কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু নয়। ঠাম্মার তো বই টই পড়ার বেশ একটা ঝোঁকও আছে অথচ তিনি মানুষের যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক মত দৃষ্টিভঙ্গির কথা শুনতে রাজি নন। কিন্তু এখন রন্টুর মনটা কেমন করে উঠল। বুকটা টনটন করে ওঠে। ঠাম্মার আর বেশিদিন নেই। পিতামহ ব্রজগোপালের মধ্যে কনট্রাডিকশন ছিল। তিনি বিয়াল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। নতুন দাদুকে এসকেপিস্ট ছাড়া আর কি বলা যায়! ভাগ্যিস উনি বিয়ে টিয়ে করেননি। বিয়ে করেননি সত্যি। তা বলে সন্ন্যাসী হতে হবে? বাবা জ্যোতিষে ঘোর বিশ্বাসী। কাকার ভগবানে টগবানে বিশ্বাস নেই। কিন্তু কাকার মধ্যে সামাজিক সচেতনতা কোথায়? পিসির জন্যে রন্টুর রাগ হয়। পিসেমশাই বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই মারা যান। তারপর থেকে পিসি এ বাড়িতে। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। স্কুলের চাকরি আর গানের চর্চা নিয়ে পিসি দিব্যি আছে। কিন্তু এই কি জীবন? একে কি দিব্যি বেঁচে থাকা বলে?

রন্টুর মনে হয় স্বর্গমর্তের কেউই ঠিক পথে যাচ্ছে না। জীবনটাকে নিয়ে হয় কেউ ছিনিমিনি খেলছে, নয় কেউ ভুল রাস্তা ধরে হাঁটছে। এই যে মঞ্জু। এই মঞ্জুই কি ঠিক পথে চলছে? মঞ্জুর অনেক ব্যাপারই রন্টু পছন্দ করে না। তবে মঞ্জুকে সে ভালোবাসে। সে আশা করে মঞ্জুকে আস্তে আস্তে নিজের মতাদর্শে গড়ে তুলতে পারবে। আসলে রন্টু একটা টোটাল চেঞ্জের কথা ভাবে। স্বাতীর জন্যে রন্টু করুণা বোধ করে। মেয়েটা এক অদ্ভুত মোহের রাজ্যে বেঁচে আছে। ওর সাজগোজ, কুকুর পোষা, পপ সঙের দিকে দুর্বার আকর্ষণ, ফিল্মের প্রতি ঝোঁক ইত্যাদি রন্টুর কাছে ওকে করুণার পাত্রী করে তোলে। রন্টুর ইচ্ছে করে এদের সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে সে দেখিয়ে দেয় এদের ভুলগুলো।

মঞ্জুর কি সর্দি হয়েছে? কিন্তু একটু পরই রন্টু বুঝতে পারল মঞ্জু কাঁদছে। এটা মঞ্জুর স্বভাব। কথায় কথায় একটুতেই মঞ্জু কেঁদে ফেলে। হিরণ্ময়ীর সম্পর্কে রন্টুর যা ধারণাই থাকুক না কেন অন্য কেউ ঠাম্মাকে কটাক্ষ করলে তার লাগবে বইকি। ঠাম্মার কথা ধার করে বলতে হয় রক্তের টান। নিশ্চয়ই এর একটা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। আর মঞ্জুর এই মুহূর্তে ফোঁস ফোঁস করে কান্নাটা রন্টুকে ব্যাকুল করে না। রন্টু বিরক্ত হয়। বাড়িতে এখন সাতটা। ঠাম্মা কেমন আছে কে জানে। আজ ভোরে ...ার বাড়ির পুরুতমশাই এসে ঠাম্মাকে চণ্ডীর স্তোত্র শুনিয়েছেন। রন্টুর ভীষণ বিচ্ছিরি লেগেছে। এ কোন ধরনের পাগলামি। ঠাম্মারই ইচ্ছে হয়েছিল ভট্টাচার্যি মশায়ের মুখে চণ্ডীর স্তোত্র শুনবে। রোগা বৃদ্ধ দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য হাস্যকর উচ্চারণে চণ্ডীপাঠ করছিলেন আর ঠাম্মা বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় তা চোখ বুজে শুনছিলো, মা কাকিমারা ঘরের মেঝেতে। পিসি দরজার চৌকাঠে। বাবা বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। তিনতলার ঘরে কাকা চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ঠিক নিচের উঠোনে সতীশের গরুটাকে উত্যক্ত করছিল। তখনো স্বাতীর ঘুম ভাঙেনি। এখন রন্টুর চোখের সামনে সকাল-বেলাকার স্বর্গমর্তের ছবিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠল। এই মুহূর্তে মঞ্জুকে সান্ত্বনা জানাতে হবে। নইলে মঞ্জুর ন্যাকামো থামবে না। দেশপ্রিয় পার্কের এই বেঞ্চে বসে মঞ্জুকে তথাকথিত সান্ত্বনা জানাতে জানাতে রন্টুর মনে উষ্মা জমা হচ্ছিল। ঠাম্মা এখন কেমন আছে? আজ সকালের চণ্ডীপাঠের মতন সেদিন বাড়ির বড়োরা মিলে ঠাম্মার বার্থডেটাকে সেলিব্রেট করেছিল। এই সব আদিখ্যেতা দেখলে রন্টুর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। তার ওপর পিসি গানও গেয়েছিল। ঐ যে কি যেন গানটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—আমার যা আছে আমি সকল তোমারে দিতে পারিনি নাথ। বার্থডে কেকের কথা কে বলেছিল? স্বাতী ছাড়া অমন বুদ্ধি কার? আশ্চর্য, বড়োদেরও আপত্তি ছিল না। ভাগ্যিস তখন ঠাম্মার কুসংস্কারী মনটা রুখে উঠেছিল। ঠাম্মা বলেছিল, "শেষ পর্যন্ত তোরা আমাকে ম্লেচ্ছ করে তুলবি দেখছি।"

॥ ৬ ॥

ব্রজগোপাল বলতেন ত্যাগেই সুখ। তিনি পাখি লাল নীল মাছ আর ফুল গাছ ভালোবাসতেন। রোগা চেহারা। পরিষ্কার করে দাড়ি গোঁফ কামানো মুখ। ঘাড় তুলে চুল ছাঁটা। মাথায় ঘনকালো কোঁকড়ানো চুলে সিঁথি। হাত পায়ের নখ বাড়তে দিতেন না। হাত এমন কি পায়ের নখও পরিষ্কার ঝকঝকে, কোথাও একবিন্দু ময়লা নেই। মুক্তোর মতন ঝকঝকে দাঁত। খুব আস্তে আস্তে কথা বলতেন। যে কাজটি করতেন মন দিয়ে। চিঠি লেখা কিংবা পাখি বা মাছেদের খাওয়ানো, গাছের পরিচর্যা করা, বই পড়া, ভাত খাওয়া, কারোর কথা শোনা বা কোনো কিছু দেখা ইত্যাদি যখন যে কাজটি করতেন তখন তাতে সমস্ত মনটুকু ঢেলে দিতেন। মানুষটা চিরকালই কম কথা বলতেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে হইচই করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। তবে ঘুমন্ত খোকা মনু এমনকি কয়েক মাসের মেয়েটাকেও চুপি চুপি আদর করছেন তা হিরণ্ময়ী দেখেছেন। ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের কপালে উনি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, কপালের এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দিচ্ছেন, গায়ের কাপড় ঠিক করে দিচ্ছেন তা হিরণ্ময়ী অনেক দিন দেখেছেন। ঐ ছিল ওঁর আদরের রীতি। শিয়রের কাছে মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছিল। মৃত্যুকেও উনি কতো শান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন। চিৎকার নেই, আর্তনাদ নেই। অতীব রোগ যন্ত্রণায় একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন, "উফ্‌, বড়ো কষ্ট", একবার, মাত্র ঐ একবার। যে মানুষটা বাড়িতে থাকলে একটা মানুষ বাড়িতে আছে বলে বোঝা যেত না সেই মানুষ যখন চলে গেলেন তখন হিরণ্ময়ীর মনে হয়েছিল সব শূন্য, রিক্ত, খাঁ খাঁ। শূন্যপুরীর মতন স্বর্গমর্ত শব্দহীন। পুজো আর্চা, মন্দির মঠে যাওয়া, ঠাকুর দেবতার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রণত হওয়া ওঁর ধাতে ছিল না। অথচ ব্রজগোপালের গলায় পৈতেটি ছিল। আর তিনিই পত্নীকে শিখিয়েছিলেন ত্যাগেই সুখ।

ব্রজগোপাল আগ্রহের সঙ্গে গীতা পড়তেন। স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পড়তেন। আবার দেশদেশ দেখারও শখ ছিল। নতুন ঠাকুরপোর পীড়িয়াকে হাজারিবাগ বেড়াতে গিয়েছিলেন। ছাই রঙের পেল্লাই গাড়ি। দরজা খুললে ভেতরে আলো জ্বলে উঠতো। হাজারিবাগ থেকে ফিরলেন জ্বর নিয়ে। ছোড়দার মৃত্যুর পর নতুন ঠাকুরপো একেবারে পাল্টে গেলেন। চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নিলেন। রাখালচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণগোপাল আগাগোড়া সংসার করে বছর দশেক আগে মারা গেছেন। দিদি পরের বছর। ওঁদের ছেলেপুলে হল না, নইলে স্বর্গমর্ত ভরে যেতো।

আজ সকালে ভটচার্যি মশাই চণ্ডীপাঠ করছিলেন। শ্বশুরমশাই বলতেন শাস্ত্রের ধর্ম সবটাই কুসংস্কারের পাহাড় যারা মনে করে তারা মূর্খ শুধু নয়, অন্ধও। এই কথাটা মনে পড়তে হিরণ্ময়ীর রন্টু স্বাতীদের কথা মনে পড়ল। ওদের দাদুরও তো ভগবানে মতি ছিল না। কই উনি তো এমন বেপরোয়া ছিলেন না, উদ্ধত ছিলেন না। সেই রন্টু। স্বর্গমর্তের বারান্দায় যে ছেলেটা বেতের দোলনায় শুয়ে খিলখিল করে হাসতো কাঁদতো, কখনো পা ছুঁড়ে চিল চিৎকার জুড়ে দিতো, সেই রন্টু আজ এই। বুড়োদাদু বুড়ো ঠাম্মার নয়নের মণি ছিল। কোথায় আজ কৃষ্ণগোপাল, প্রভাবতী। রন্টু বড়ো হয়েছে। আমরা ওদের কাছে বাতিল হয়ে গেছি।

॥ ৭ ॥

মঞ্জুকে বাসে তুলে দিয়ে রন্টু হাত নেড়েছিল। মঞ্জুর অভিমান ভেঙে গিয়ে-ছিল। জানলা দিয়ে মাথাটি বাড়িয়ে একটু ঝুঁকে মঞ্জু হেসেছিল। তার মানে দেখা হবে। আবার দেখা হবে। মঞ্জুর বাস চলে যাবার পর রন্টু কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। আজ তার নিজেকে অনেকখানি যান্ত্রিক মনে হয়েছে। মঞ্জুও যান্ত্রিক। তাদের পরস্পরের ভালোবাসা অনেকাংশে নিষ্প্রাণও বোধ হয়েছে। আসলে ভেতরে ভেতরে তারা ভীষণ ইমোশন্যাল। যাকে বাতিলের পর্যায়ে ফেলে দিয়েছিল সেই পিতামহী হিরণ্ময়ীর জন্য মনে মনে রন্টু অত্যন্ত আকুলতা অনুভব করে। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। কিছুদিন আগেও সে ভেবেছে বাড়ির ট্রাডিশনকে ভেঙে নতুন করে চেহারা দিতে হবে। ঠাম্মা একটা পুরনো দেওয়াল। এই দেওয়ালটি অপসারিত হলে মুক্তির হাওয়া বইবে। নতুন কালের হাওয়া। ঠাম্মার পুরনো শরীর অকেজো ছিল না। ব্রতপার্বণ পুজো আর্চা আর স্বর্গমর্তের সংসার নিয়ে ঠাম্মা বেশ শক্তপোক্তই তো ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে দুরারোগ্য অসুখটা এল। প্রথমে ঘুসঘুসে জ্বর, অরুচি, পেট জ্বালা এই সব আর কি। অবশেষে ক্রমশ শরীর ভাঙতে থেকেছে। শেষ পর্যন্ত ব্লাড রিপোর্টে চূড়ান্ত মারাত্মক কিছু এল।

বাবা কাকা মা কাকিমা ও পিসির সেই স্তব্ধ ভাবে বসে থাকা এবং স্বাতীর হঠা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার মাঝখানে রন্টু একা একা চলে গিয়েছিল ছাদে। একট সিগারেট ধরিয়েছিল। ঠাম্মা চলে যাচ্ছে। রাত্রির আকাশের নীচে স্বর্গমর্তের উঠোন। সতীশের গারুটি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। সব ঠিক আছে। ঠাম্মাকে কড় ঘুমের ওষুধে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। যুক্তি-বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করে রন্টুর মনট ছেলেমানুষের মতন ঠাম্মার জন্য গভীর গভীরতর কষ্টে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল।

মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করে সেদিন সে বাড়ি ফিরেছিল চোরের মতন। ভিতু পায়ে স্বর্গমর্তের দরজা ঠেলে বাড়ি ঢুকেছিল। ওপরের ঘরে আলো জ্বলছিল। ঠাম্ম আধশোয়া অবস্থায় কিছু একটা শুনছিল। পিসি বই পড়ছিল। ধর্মের বই টই হয়তো।

॥ ৮ ॥

হিরণ্ময়ী এর মধ্যে একদিন হাজরা রোডের জগৎ ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠালেন। জগৎবাবু সোজা কোর্ট থেকে চলে এসেছিলেন। হিরণ্ময়ীর অবস্থা দেখে খোক মনদের একচোট ধমক দিলেন আর বার বার তাদের আক্কেলকে ধিক্কার দিলেন।

মা আর জগৎকাকাকে মুখোমুখি রেখে ছেলেরা আর বউয়েরা যে যার ঘ চলে গেল। স্বাতী কিংবা রন্টু বাড়িতে ছিল না। অন্তরা তখনো স্কুল থেকে ফেরেনি। ঘর ফাঁকা হতে জগৎবাবু আবার বললেন, "বউদি, তোমার ছেলেমেয়েদে আক্কেলটা কি রকম! আর তা ছাড়া রন্টুও তো ছিল। ছিঃ ছিঃ, তোমার এ চেহারা হয়েছে?" বিষণ্ণভাবে উনি নস্যি নিলেন। হিরণ্ময়ী ম্লান হাসলেন "আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে জগৎ ঠাকুরপো।" জগৎবাবু চুপ করে বসে রইলেন হিরণ্ময়ী একটু সোজা হয়ে বসলেন, "যা কিছু আছে তার একটা বিলি ব্যবস্থ করতে চাই। এই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি।"

দেশপ্রিয় পার্কের বেঞ্চে রন্টু আর মঞ্জু পাশাপাশি বসেছিল। রন্টু বলল "আচ্ছা মঞ্জু, তোমাদের গানের স্কুলে কি রবীন্দ্রনাথের 'আমার যা আছে আ সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ' গানটা শিখিয়েছে?" মঞ্জু খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, "কি ব্যাপার, হঠাৎ তুমি রবীন্দ্র সংগীতে ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠ যে? তাও আবার এখানে ঈশ্বর টিশ্বরের কথা আছে।"

রন্টু সিগারেট খেতে খেতে অন্যমনস্কের মতন বলল, "পার্টিকুলার এ গানটাই একজন পছন্দ করেন। কেন জানো? তাঁর স্বামীর এটি খুব প্রিয় গা ছিল। আমি ঠাম্মার কথা বলছি।"

মঞ্জু বলল, "ক'দিন ধরেই দেখছি তুমি ঠাম্মা ঠাম্মা করে পাগল। কই, আগে তো এমন ছিলে না। বরং তাঁর কতো ব্যাপার নিয়ে সমালোচনা করেছো, ঠা করেছো।" রন্টুর হাতে সিগারেট পুড়ে যায়। এখনো সে অন্যমনস্ক। সে আস্তে আস্তে বলে, "মঞ্জু, ঠাম্মা আর বেশিদিন নেই। ঠাম্মা চোখ বুজলেই আমাদে সংসারটা ছারখার হয়ে যাবে। এখনই দেখতে পাচ্ছি উইলের ব্যাপার নিয়ে বাবা কাকার মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়েছে। একদিকে যেমন ঠাম্মাকে হাসপাতালে ভর্তি করে বাবা-কাকারা একটু রিলিফ চাইছেন, আবার অন্য দিকে মা-কাকিমার মধ্যে তো রীতিমত কম্পিটিশান শুরু হয়ে গেছে শাশুড়ীকে কে কতোটা সেব করতে পারেন। এই সব দেখে আমার আর ভালো লাগছে না।" রন্টু থামল। মঞ্জু অবাক চোখে রন্টুর দিকে তাকিয়ে থাকে। এই কি সেই রন্টু? রন্টু তো কোনোদি ফ্যামিলির এমন খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ভাবেনি। বরং সে সব ব্যাপারে তা মাথাব্যথা বড়ো একটা ছিলই না। তার ভাবনাটা ছিল অন্য রকম। আর পাঁচ ছেলেদের থেকে রন্টুকে একটু আলাদাই মনে হয়। যদিও তার সব ভাবনাটাবনা গুলো মঞ্জুর মাথায় ঢোকে না। রন্টু যেমন মধ্যে মধ্যে বলে থাকে "চেঞ্জ চাই মঞ্জু, চেঞ্জ চাই। এই সোস্যাল স্ট্রাকচারটার চেঞ্জ।" এই সব কথা বলার সময় রন্টু উদ্দীপনা মঞ্জু লক্ষ করেছে, কিন্তু সে তো উদ্দীপ্ত হতে পারেনি। সে স্বপ্ন দেখেছে অন্যরকম। রন্টুর এসব পাগলামি একদিন কেটে যাবে এটা মঞ্জু মনে প্রা লালন করেছে। কিন্তু আজ রন্টুকে অন্যরকম লাগছে। সংসারের খুঁটিনা ব্যাপারটার দিকে বিজ্ঞ মানুষের মতন চোখ রাখতে শিখেছে। আবার এরই পাশ পাশি রন্টুর ছেলেমানুষ চেহারাটাও মঞ্জু দেখতে পাচ্ছে। সে ঠাম্মার আদরে রন্টু। একটা মানুষের কতো রকমই না চেহারা থাকে। বাড়িতে এক রকম, বাইে আর এক রকম। গুরুজনদের কাছে এক রকম আবার প্রিয়জনদের কাছে বন্ধু কাছে অন্য রকম। মঞ্জুর মনে চকিতে একটি প্রশ্নও জেগে ওঠে। রন্টু কি পাল্টে গেল? রন্টু কি পাল্টে যাচ্ছে? রাতারাতি কি মানুষ পাল্টে যায়? পাল্টাতে পারে

রন্টু আবার কথা শুরু করল, "ঠাম্মার কাছে পুরনো দিনের অনেক গ শুনেছি। বলতে হাসি পায় আমাদের বাড়িটার নাম স্বর্গমর্ত। ঠাম্মা পুরনো দিনে গল্প করতে খুব ভালোবাসে। বুড়ো মানুষরা অবশ্য একালের চেয়ে সেকাল কত ভালো ছিল, সুখের ছিল এটা প্রমাণ করতে পারলে খুব খুশি হয়। আমি পুরনো দিনের সব ব্যাপার ট্যাপারকে সাপোর্ট করি না। তবে কি মনে হয় জানো? আ আমরা খুব বেশি আর্টিফিসিয়াল খুব বেশি মেকানাইজড হয়ে যাচ্ছি। মাঝে মা তো খুব হতাশাই বোধ করি। সত্যিই কি একটা টোটাল চেঞ্জ আসবে?" ম হঠাৎ বলল, "আমি গানটা জানি।"

রন্টু সোজা হয়ে বসল, উৎসাহী গলায় বলল, "তবে গাও মঞ্জু।" মঞ্জু রন্টু উৎসাহ দেখে ঠোঁট টিপে হাসল, বলল, "কিন্তু এখানে যে ভগবানের ক আছে।" রন্টু বিরক্ত হল, "আঃ। জ্বালাচ্ছো কেন। গাওনা।"

পার্কের আবছা অন্ধকারে ওরা পাশাপাশি বসে আছে। মঞ্জু নিচু গলা গান শুরু করল। সে মাঝে মাঝে তাল হারিয়ে ফেলছিল। গলা ছেড়ে আবার ধরছিল : 'আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ'।
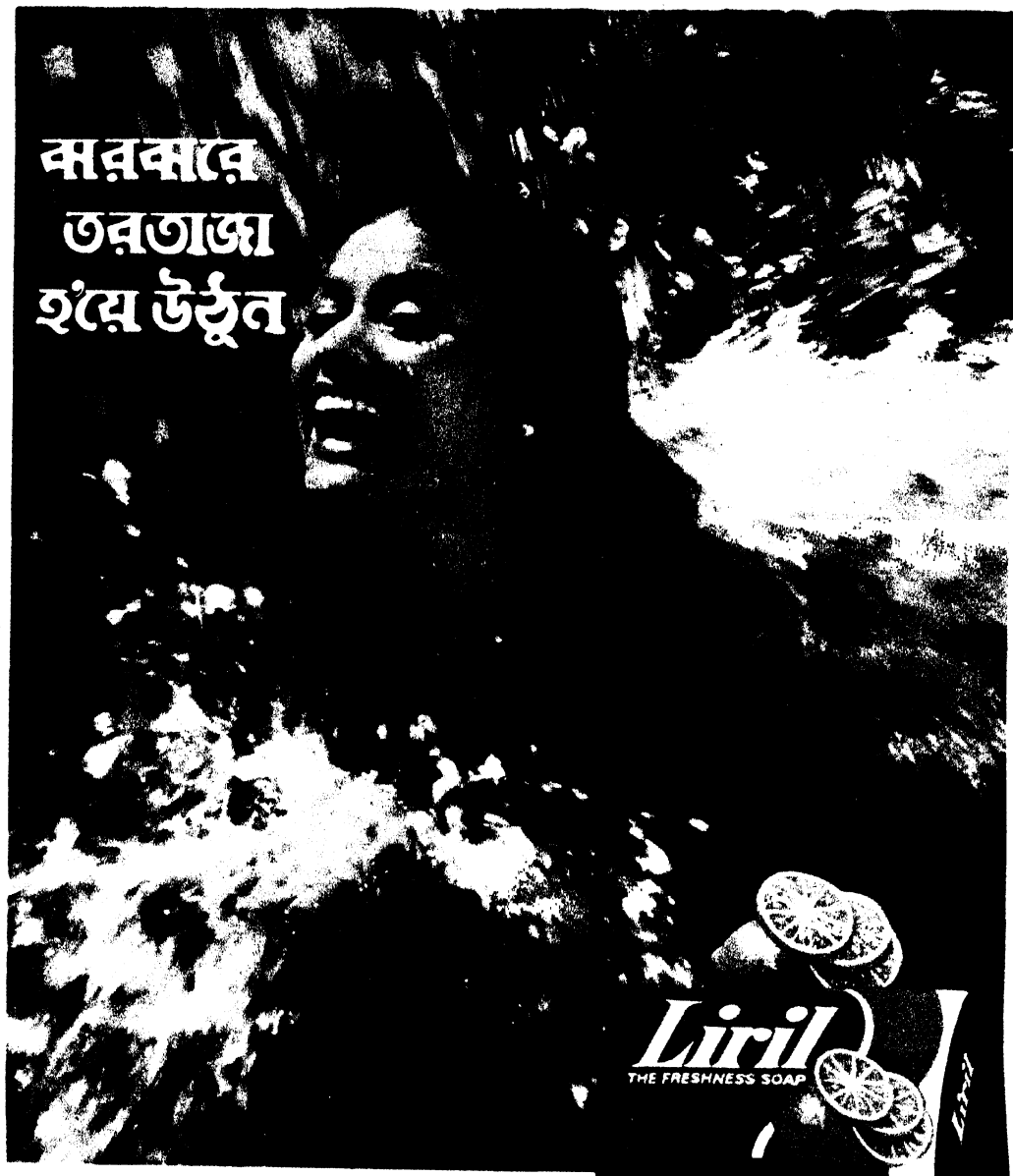
ঝরঝরে
তরতাজা
হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল…
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা

পুনশ্চ পারী

ীরদ মজুমদার

॥ [illegible] ॥

কমেদী [illegible] রাসীনের নাটক মঞ্চস্থ করা [illegible] আনকভাবেই আইন-কানুন মেনে। তাতে করে [illegible]শ্য আলেকসাঁদ্রী ছন্দের ও ভাষার ভাবরূপ প্রকটিত [illegible] অত্যন্ত উচ্চমানে। আমি ক্যাথরীনকে হাবভাব, [illegible]ভিনয় ভঙ্গীতে বেশ কিছু স্বাধীনতা নিয়ে [illegible]পোয়িত করতে অনুরোধ করেছি যাতে করে আমার [illegible]শিও মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। ওকে বলেছি, [illegible]লবার ঢঙ যেমন হয় তাই রেখো ঠিক সেইভাবেই [illegible]্যাথরীন অঙ্গভঙ্গী করে টুকরো টুকরো অভিনয় [illegible]রতে থাকলো। একবার এনন ও একবার ফেদ্রের [illegible]ূমিকায় অভিনয় করল সে। আমি যতটা সম্ভব [illegible]াগজ-কলমে, রঙ-তুলিতে তার ছবি এঁকে যেতে [illegible]কলাম। মোঁ মাল ভিয়ী দ্য প্রু লেণায়, প্রায় [illegible]ঁয়তিরিশ লাইন আবৃত্তি করে ক্যাথরীন তার সুর-[illegible]ঞ্জনায়, ফেদ্রের কামনা-বাসনা, আবেগ, পরিবেশ [illegible]রিস্থিতির অসংগতির বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ বেদনা প্রকাশিত করে মুগ্ধ করলো। ফেদ্র এমন একজন দুর্ভাগা, যার হৃদয় যন্ত্রণার চাইতে সে নিজে এবং তার কলেবর অতিরিক্ত। নিয়তির নির্মম চাবুক মৃত্যুর বাহন, অভিনয়রূপে রচনা করে ক্যাথরীন প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের শেষে এলো।

আমি বললাম অপূর্ব ক্যাথরীন, সত্যই অনবদ্য তোমার চোখ-মুখ, দেহভার, আঙুল সবই পূর্ণভাবে বাঙ্ময়। তারপর আমি ওকে বললাম, প্রথমে মনে হবে ফেদ্র বেশ খারাপ চরিত্রের মেয়ে। কিন্তু পরে বোঝা যায় যে, রাজা থেজে খুব যে ভাল লোক তা মোটেই নন!

ক্যাথরীন বললে, ওরে বাবা! গ্রীক আমলে যার যত গায়ে জোর সে তত পাজী। রাজা উজিরের তো কথাই নেই!

যা বলেছো, ক্যাথরীন!

সায় দিয়ে বললো সে, দুর্ভাগা ফেদ্র! অনবদ্য রাসীনের জাঁসেনীজম। অপার্থিব অনুগ্রহই তার কামনা-বাসনা মৃত্যুমুখী করেছে। এবং ফেদ্রই অনাগত সব মৃত্যুর নিদান। এখানে সব চরিত্রকেই এমনভাবে আঁকা যে তা হয়ে উঠেছে প্রেম ও প্রেমাস্পদের ছবি। নাটক শেষ হয় পরিপূর্ণ হতাশায়। রাজা থেজের অন্তর রানী ফেদ্রের জন্য প্রেমের পরিবর্তে ঘৃণাই উদ্রিক্ত হয়। ফেদ্রের হিপোলিতের প্রতি প্রেমোন্মাদনার সমাপ্তি। আরিশির অবস্থা আরও শোচনীয়—বিবাহের পূর্বেই বৈধব্য। তার হিপলিতের প্রতি প্রেম-যাতনা, যাতনায়ই শেষ। সবই, এমন কী সব প্রেম ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে পরিসমাপ্তি। চরিত্রমাত্রই এক্ষেত্রে অপার্থিব অনুগ্রহহীন সব দুস্থ, নিঃস্ব। আর কি ভয়ঙ্কর তাদের পরিণতি—নির্মম বিয়োগান্ত।

তারপর বই খুলে নাটকের নকশার ছক বলতে থাকলো : রাজা থেজের মৃত্যুবার্তা ঘোষিত হল। সমস্যা হল সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে। এথেন্স ও ত্রেজেনের, এনন ফেদ্রকে মন্ত্রণা দিল যেন সে তার পুত্রের অধিকার দাবি করে। হিপলিতের সাক্ষাতে একথায় ফেদ্র রাজী হয়ে গেল।

দ্বিতীয় অঙ্কে আরিশি সহচরী ইশমেনের কাছে হিপলিতের প্রতি তার প্রেম আর আসক্তির কথা ঘোষণা করলো এবং এথেন্সের রাজা বলে হিপলিতকে মেনে নেবার কথা। তার পরিবর্তে হিপলিতও আরিশির শিরে এথেন্সের রাজমুকুট মুকুটিত করার সঙ্গে সঙ্গেই আরিশির প্রতি তার তীব্র আবেগ আর প্রেমের কথা নিবেদন করল।

এদিকে ফেদ্র হিপলিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করার বাসনা জানাল। ওদিকে হিপলিতের কাছে

[illegible]র মনে; পর্দাবন্দিতে [illegible] হচ্ছেন প্রেম; [illegible] [illegible] মত; [illegible] [illegible] অবস্থা চিত্রিত এক অংশ।

ফেদ্র; হিপোলিত ও [illegible] (এনগ্রেভিং : [illegible])

আরাধ্য প্রেম নিবেদন সাঙ্গ হয়েছে—তারপর সব ঠিকঠাক হল। দু-জনেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত। ঠিক এই সময় ফেদ্র ব্যক্ত করলো তার অকুণ্ঠিত প্রেম। শ্রবণমাত্র হিপলিত ঘৃণায় মুখ ফেরাল। সঙ্গে সঙ্গে ফেদ্র হিপলিতের কটিবন্ধ থেকে অসি নিষ্কাশন করে আত্মাহুতি দিতে উদ্যত এমন সময় এনন তাতে বাধা দিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনল।

এইখানে ক্যাথরীন বললে কটা লাইন আমি অভিনয় করে শোনাই। হিপলিতকে উদ্দেশ করে ফেদ্র....ফেদ্র ঘূর্ণিপথে তোমার সঙ্গে সুতো ধরে নেমে যেতাম। তোমার সঙ্গেই হয় সে আমাকে ফিরে পেতো নয় তোমার সঙ্গেই হারাতাম।

হিপলিত : ঈশ্বর এ কি কথা শুনছি? মাদাম, তুমি কি ভুলে গেছ যে, রাজা থেজে আমার পিতা এবং তুমি তার সহধর্মিণী?

ফেদ্র : কি কারণে তুমি ভাবছো যে আমি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছি? হে রাজপুত্র তুমি কি মনে করো আমি সব সম্ভ্রমের বহির্ভূত?

হিপলিত : মাদাম, আমায় ক্ষমা কর, আমি লজ্জায় আরক্ত, হয়তো মিথ্যাই আমি দোষারোপ করছি। হয়তো এ তোমার নিষ্পাপ অভিব্যক্তি। আমার এ লজ্জাকর দৃষ্টি আর তোমার দিকে তাকাতে পারে না, আমি চলি.......

ফেদ্র : আঃ! নিষ্ঠুর, তুমি আমার অনেক কিছুই শুনে ফেললে। অনেক কথাই বলে ফেলেছি। নিজেকে উদ্ঘাটন করার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণক কথা। বেশ জান, ভালভাবে জান, ফেদ্রের সাংঘাতিক প্রেমোন্মাদনা। হ্যাঁ, আমি ভালবাসি। জেনো আমি সচেতন। এ নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ প্রেম নয়! আমি বুঝি। এ নয় যে আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছি। আমার ভীরু সুখাস্পদ অলসতা আমাকে বিব্রত করে তুলেছে। হায় হতভাগ্য কাহিনী। দৈব প্রতিহিংসা দরুণ আমি ঘৃণিত, তোমার ঘৃণার থেকেও আমার তীব্র ঘৃণা আমার নিজের প্রতি। ভগবান সাক্ষী, তিনিই জানেন কিভাবে প্রজ্বলিত করেছেন আমার মধ্যে হোমানল।

এইটুকু ক্যাথরীন অভিনয় করলো কি সুন্দর ভাষার সুরতরঙ্গ আলেক্সাঁদ্রী ছন্দে উদ্বেগ ব্যঞ্জ উদাত্ত, দ্রুত এবং স্বরিতে মুখর রাসীনের আর্ট।

সত্যিই বাংলায় তার রূপান্তর প্রচেষ্টা অতীব ধৃষ্টতা।

তবু সাহস করে চেষ্টা করছি, বেঁকাচোরা দোমড়ান আমার বাংলা ভাষায় যদি সক্ষম হই বিন্দু-মাত্র, নাটকের মর্ম কথা বলতে। বিকৃত না করে।

তারপর ক্যাথরীন দু হাত তুলে অনেকটা অভিনেত্রী ভেরা কোরেনের ভাবাবেগ এনে মন্ত্রবৎ উচ্চারণ করতে থাকলে সামনে দাঁড়ানো বিমুখ হিপলিতের কানে, ভেবে দেখ তোমার ইতি-কথা, তোমার দৃষ্টি থেকে সর্বদা দূরে থেকেছি, আরো আমার প্ররোচনায় তোমাকে পাঠান হয়েছিল অলক্ষ্যে আরো দূরে। তোমার ঘৃণার উদ্রেক করতে করেছি, করছি প্রতিরোধকল্পে। হায় তার পুরস্কার-স্বরূপ তুমি আমাকে যত ঘৃণা করেছ, আমি পক্ষান্তরে কিন্তু তত কম ভালবাসিনি তোমাকে। আমার প্রতি তোমার যত বীতরাগ তা তোমাকে ততোই করেছে সৌন্দর্যে মণ্ডিত। তুমি যদি ফিরে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর তা হলে তুমি বুঝবে আমি আমার প্রেমাগ্নি ও অশ্রুতে কিভাবে বিদগ্ধ হয়েছি—যদি ফিরে দেখ একবার!........

শাস্তি দাও! প্রতিশোধ নাও! আমাকে আঘাত কর আমার ঘৃণাহীন প্রেমের জন্য। তুমি সম্ভ্রান্ত। তোমাকে জন্ম দিয়েছে বীর পিতা। এ দানবীর কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত কর, হে বীর পুত্র।

দানবী নয়, রাজা থেজের বিধবা স্ত্রী, মাতৃ-স্থানীয়া ভালবাসে তোমাকে হিপোলিতকে বিশ্বাস কর আমি পাপী, দানবী, অপরাধিনী, ক্ষমা কোর না আমাকে। আমি অক্ষমণীয়।

এই এখানে আমার হৃদয়ে এখানে আঘাত কর, যদি মনে কর এ হৃদয় আঘাতের যোগ্য নয়, তোমার

মন্তব্য :—নকশাগুলি আঁকা হয়েছে কোন কিছুর [illegible] প্রয়োজনে নয়; পূর্ব [illegible] চিত্র [illegible] [illegible] 'ফেদ্রা' অভিনয়ের্ত কথাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

[illegible] : প্রভু [illegible] তিরোহিত হয়েছেন। ফেদ্র : [illegible]

১০০%
পলিয়েস্টার
ও
জর্জেট
শাড়ী
আলোড়ন জাগানো

আঘাতও আমার কাছে কোমল, আমার মনে হয় যদি এ রক্তে রক্তাক্ত করার অর্থ তোমার হাত কলঙ্কিত করা, তোমার হাত যদি তোমাকে অবজ্ঞা করে—দাও,

দাও তোমার অসি দাও আমার হাতে, আমাকে।

(আত্মাহুতির জন্য হিপোলিতের কটিবন্ধ হতে ফেদ্র অসি নিষ্কাষণ করলো)

তাতে বাধা দিয়ে এনন বললে—কি করছো মাদাম!....

এইখানে নাটকটি চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে। রাজা থেজের মৃত্যুসংবাদই অবস্থায় বিসদৃশ রূপ নিল।

ফেদ্রের এই কলঙ্কিত প্রেমাভিলাষ, তার কামনা-বাসনা তাকে, নির্লজ্জতায় পৌঁছে দিল, —অবস্থা দম বন্ধ হয়ে আসার মত, এদিকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়েও নতুন সমস্যা দেখা দিল। এমন এক জাতীয় বিবেক—যা মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয় তার কুমন্ত্রণাই পরের গেরো।

তারপর আবার নাটকের ছকের কথায় আসা যাক :

ফেদ্রের পুত্র এথেন্সের রাজা ঘোষিত হবার কালেই লোকমুখে প্রচারিত হল থেজে মারা যায়নি, থেজে জীবিত।

তৃতীয় অঙ্ক : ফেদ্র কিন্তু হতাশ না হয়ে এথেন্সের মুকুট হিপোলিতকে দেবার অভিলাষ জ্ঞাপন করলো হিপোলিতের হৃদয় জয়ের আকাঙ্ক্ষায়।

লজ্জায় ভরাডুবি হয়েও সে দেবী ভেনাসের প্রসন্নতা প্রার্থনা করলো। ঠিক এই সময় নাটক চূড়ান্ত নাটকীয়তায় উপস্থিত যখন শোনা গেল থেজে ত্রেজেনে উপস্থিত। ফেদ্র এবার আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু এনন মন্ত্রণা দিল; হিপোলিতকে দোষী সাব্যস্ত কর বলে যে ও তোমাকে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করাতে ওকে বনবাসে বিতাড়িত করা হয়েছে। ফেদ্র রাজী হল।

পরে প্রেমাস্পদ থেজেকে ফেদ্র অগ্রাহ্য করতে থাকলো।

পরে থেজে বিস্ময়াভিভূত হল, শুনে হিপোলিতের ত্রেজেন থেকে চলে যবার মনস্কামনায় সন্দেহ পোষণ করলো। এদিকে হিপোলিত ভয়ানক-ভাবে উৎকণ্ঠিত হল দু কারণে। প্রথমত তার প্রতি ফেদ্রের প্রবলতা দেখে। দ্বিতীয়ত অনাদর তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা।

চতুর্থ অঙ্ক : এমন মিথ্যা দোষারোপ আনলো হিপোলিতের উপর তাতে থেজে ক্রুদ্ধ হয়ে নেপচুনকে প্রার্থনা করলো যাতে তার পুত্রের মৃত্যু হয়।

তারপর হিপোলিত কিন্তু ফেদ্র-র বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা উত্থাপন করলো না। পিতাকে জানাল সে সত্যিই আরিশিকে ভালবাসে। রাজা থেজে কিন্তু বিশ্বাস করলো না।

রাজা থেজের মনোযাতনা। ফেদ্র এলো থেজেকে অনুনয়-বিনয় করে পুত্রর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিতে। ঠিক সেই সময় ফেদ্র জানতে পারলো হিপোলিতের প্রেমাস্পদ হল আরিশি।

ফেদ্রর মনস্তাপ।

ফেদ্র-র ঈর্ষা মতিভ্রান্তির কারণ হল। আত্মহত্যার সঙ্কল্প নিল সে। এনন সমর্থন করলো তার কর্ত্রী ফেদ্রের বেআইনী প্রেম। তাতে ফেদ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ওকে অভিশাপ দিল।

পঞ্চম অঙ্ক : আরিশি ও হিপোলিত পলাতক। পলাতক হবার আগে তারা দেবতার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হল যে তারা চিরকাল পরস্পর সত্যবদ্ধ থাকবে।

থেজে একত্রে আরিশি ও হিপোলিতকে দেখতে পেল। কিন্তু তাতেও তার সন্দেহ গেল না। যদিও আরিশি থেজেকে বলল যে, হিপোলিতের প্রতিই তার প্রেম। পুত্রের প্রতি সন্দেহবশত থেজে আক্রমণ করলো। তা শুনে আরিশি বললে, তুমি অনেক দৈত্য-দানব হত্যা করেছ—কিন্তু এখনও আর একজন বাকী (উদ্দেশ্য দানবী ফেদ্রর উল্লেখ করে)। কোন স্তব্ধতা ভাঙব না আমি, আমি যাচ্ছি। আরিশি থেজের থেকে দূরে চলে গেল রহস্যময় এক স্তব্ধতা পিছনে ফেলে।

ষষ্ঠ তিরিশ হিপোলিতের শেষ অবস্থা, হিপোলিত পরিচালিত ঘোড়ার পায়ের তলায়; জলদানব।

সন্দেহ ক্রমবর্ধিত হল থেজের মনে। থেজে এননকে ডেকে পাঠাল। তখন সে জানতে পারলো এনন জলে ডুবে মৃত।

ফেদ্র আত্মহত্যা করার জন্য উদ্যোগী হলো এবং থেজে তখন হিপোলিতকে ডেকে আনতে বলার পর, হিপোলিতের পরিবাররা থেরামেন থেজেকে হিপোলিতের মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করলো।

অবশেষে ফেদ্র সব সত্য স্বীকারোক্তির পরে বিষ পান করে তার জীবনের অবসান ঘটাল।

থেজে কন্যারূপে আরিশিকে গ্রহণ করলো। যবনিকা।

এর থেকে কয়েকটি অংশ আমি আঁকলাম। আমার খুব ভাল লাগছিল। ক্যাথরীন নানা ভূমিকায় অভিনয় করল। কখনও সে হল এনন কখনো ইশমেন, কখনও ফেদ্র, কখনও আরিশি—আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করছিল। ড্রইং করতে, রঙ দিতে, অভিনয় রেখাবদ্ধ করতে উৎসাহিত হচ্ছিলুম খুব।

ক্যাথরীন প্রশ্ন করলো, ছবিতে এ সবের কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?

উত্তরে ওকে বললাম, অবশ্যই' অন্তত আমার কাছে। এখানকার আর্টিস্ট-এর ... হয়তো কোন মূল্য নেই। ক্যাথরীন, তুমি যদি ভারতীয় শিল্প-কলার সঙ্গে পরিচিত হও তুমি যদি ভারতীয় মন্দির বা গুহার কোন ছবি বা মূর্তি দেখ তো দেখবে কোন একটিতেই সমগ্র নান্দনিক অভিব্যক্তি—নাচ, সঙ্গীত, অভিনয় ভাব ভাষা সবই একত্রিত। সত্যকার বাক্যালাপ আর্টের সঙ্গে আর্টের। ভেব না ক্যাথরীন-যে আমি সরাসরি ফেদ্রের ছবি আঁকবো, তবে ঐসব ড্রইং থেকে অন্যান্য অনেক ছবি বার হতে পারে, এ শিক্ষা আমি আমাদের পুরাতন মন্দির মূর্তি ছবি থেকেই গ্রহণ করেছি। বস্তুত সব কিছুই সংস্কার। তার বাইরে স্বতঃসিদ্ধ কিছু নেই। সব কথাই সিদ্ধি নিয়ে। মূল শেষ কথা, আর্টিস্ট।

ক্যাথরীনকে খুব ভাল লাগছিল দেখতে, আরো আঁকার ইচ্ছে ছিল, হঠাৎ আলো গেল ভয়ানকভাবে নেমে। ওর পরণে খুব পাতলা মসলিনের মত লম্বা পা অবধি ড্রেস, হাওয়ায় এলোমেলো কোমরে বন্ধনী ও মাথায় মুকুট জাতীয় ক্লীপ। এবং সমগ্র পরি-বেশের দরুন মনে হল, আমরা ইতিহাসের অন্য এক অধ্যায়ে চলে গেছি।

ওকে বললাম, আমার ইচ্ছে আছে একদিন, ব্রীটেনিকাস নাটকের জুনীর ভূমিকা ও বেরেনিস নাটকে-র বেরেনিস-এর ভূমিকায় তোমাকে আঁকবো—সময় করতে পারবে তো একদিন?

ও বললে, অবশ্যই—একদিন অভিনয় করবো।

(ক্রমশ)

■

বিজয়বিমুখ

শিবশম্ভু পাল

অনতিদূরেই ছিল তিনটি আঁধার কিংবা তিন দুঃস্থ
উপত্যকাভূমি :
পিতার অকালমৃত্যু, অহেতুক ছিন্নপ্রেম, অঙ্কে-কাঁচা মেয়ের সন্ত্রাস
সুযোগ পেলেই ওরা হাত পেতে ত্রাণ চায়, ত্রাণ।
এইসব শরণার্থী যৌথ বা একক ক্ষোভে নিহিতার্থময়
শব্দপুঞ্জ চেয়ে থাকে, চেয়ে থাকে রূপান্তর, নির্বনীকরণ।
এইসব বজ্রাঘাত নশ্বর বিলাপ থেকে শিল্পায়িত ছাদ ও দেয়াল
দেয়ালের মধ্যে দু'টো সমান্তর জানালার নিয়ন্ত্রিত বায়ুচলাচল
এবং বায়ুর মধ্যে স্পর্শকাতরতাম্মেশা জনসমর্থন
চেয়ে থাকে, স্বাভাবিক, অর্ধোন্মাদ প্রতিভার মৌলিক বিধানে।

তবু এরা লোক চিনতে ভুল করেছিল।
অথবা, আমিই ভ্রান্ত, স্বার্থপর, বিষয়বিমুখ
বারবার ঝোঁকে যায় সোজারাস্তা, ভাষাগৃহ, মহাবোধিদ্রুম
পুনর্বাসনের চিন্তা ভুলে গিয়ে চলে যাই গ্রামান্তের ধানক্ষেত ফেলে
নিরাসক্তি-আসক্তির অস্পষ্ঠাসা দুর্গপ্রাসাদের
অস্পষ্ট সন্ধ্যায়, স্থির মৌলিক কাঁটার গুল্মে, নাই রস নাই
দারুণ দাহনবেলা, বারবার চলে যাই, এইভাবে নিজের দুরূহ
অস্ফুট পদ্যের কষ্টে, আত্মসার, চুপিসারে রাত কাটে
নির্জলা উপোসে।

অথচ অনতিদূরে তিনটি আঁধার ছিল ; অনায়াসে তিনটি সনেট।

অভিজ্ঞান

প্রদ্যুম্ন মিত্র

কেউ কেউ চিরদিনই হিসেবে সঠিক
কেউ আছে আবেগসুরস্ত
কে আর তোমার মত স্বার্থবৈষয়িক
অলীক আঙুলে মোছে যত জৈবরক্ত;
এভাবেই এসেছিল পরিধিবিহীন
চন্দনবীজের শেষে প্রতিশ্রুত লাল
এভাবে বৃষ্টির পরে রামধনু দিন
অনবধানতাবশে রহস্যরুমাল;
চারিদিকে ফিসফাস অজ্ঞান সংশয়
বিষয়বস্তুর দেনা ভিটেই বিকোয়
কেবল তোমার বুকে বেড়ে ওঠে আগাছা কঙ্কর
কেবল তোমার পথে পড়ে থাকে বর্ণহীন ইঁট
আজন্ম দাসত্বকল্প কেটে গেলে তবু স্বপ্নকীট
এখনও বল্মীকস্তূপে ঢেকে রাখে রক্তে রত্নাকর!

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা

মুকুল গুহ

অনাহত ধ্বনির সংগীতে পৃথিবীর আরো কাছে চলে আসে চাঁদ,
সৃষ্টি চরাচরে অংকুরোদ্গমের বাদ্য বাজে। বীজ ওড়ে বাতাসে, হাওয়ায়—
ডানহাতে চন্দ্রচিহ্ন নিয়ে ঘুমের গভীর রাত্রে কে শিশু আত্মজ
উদ্যানে নেমেছে একা, না কি অন্য শিশুরাও র'য়েছে, স্তব্ধ জ্যোৎস্নায়
তৃষ্ণা নিবিড় হয় সুসময়ে, অন্তঃসত্ত্বা রমনীর পরিতৃপ্ত মুখের
সিল হোটে, বীজ আর লাঙলের ফলার মধ্যেই জীবন প্রবহমান—

উদ্যানে লেগেছে আগুন ; যে শিশু আত্মজ, যার জন্য আমাদের
ডানহাতে চন্দ্রচিহ্ন আর সদরদরোজায় ফুলগন্ধ, কররেখায় লক্ষ্মীর
পাঁচালী পড়ছেন মা, পিতার অদূরে অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন বিষ্ণুদেব
ওই মুক্তি ওই লুণ্ঠনের জন্যই কি পৃথিবীর আরো কাছে নেমে আসে মেঘ
রুখাসুখা পৃথিবীতে বৃষ্টি হয়, ঝিলিমিলি শালের জঙ্গলে, কোলাহলে ;
হলুদের টুকরো, নিমপাতা, লোহা ছুঁয়ে বহমান জীবনে চল নামে—

ভ্রূসংগমে হৃদয়ের শব্দ শুনে পৃথিবীর আরো কাছে চলে আসে চাঁদ
সৃষ্টি চরাচরে অংকুরোদ্গমের ধ্বনি বাজে, বীজ ওড়ে বাতাসে হাওয়ায়।

"[illegible]"—শক্তি চক্রবর্তীর তৈলচিত্র। জন্ম ১৯৪৪। সরকারী চারু-কারু মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক (১৯৬৮)। ক্যালকাটা আর্টিস্ট সার্কেলের সদস্য। বর্তমানে একটা স্কুলের চিত্র-শিক্ষক।

না, হব না!
ব্যাপার কী? তোমরা ঝগড়া করছ কেন?
ওকেই জিজ্ঞেস করুন!

টম বলছে, ডায়ানার বাচ্চা হলে আমি তার কাকা হব! কিন্তু আমি যে বড্ড ছোট...
... বেশ, তাহলে দাদা হবি!
সেই ভাল!

অরণ্যদেবের বিয়ে...!
12/3
এক বছর আগে মহা ধুমধামের সঙ্গে অরণ্যদেবের বিয়ে হয়েছিল...!

অসংখ্য মান্য অতিথি এসেছিলেন সেই বিয়েতে...

এসেছিলেন লুয়াগা আর গোরাপুর রাষ্ট্রপতিরা!
... আজ থেকে তোমরা স্বামী-স্ত্রী হলে।

অরণ্যদেব, আপনার ছেলে কোথায় হবে?
ও-সব কথা এখনও ভাবিনি, মস্।
ঐতিহ্য অনুযায়ী এই গুহাতেই হবে তো?

এই গুহার মধ্যে বাচ্চার হাসি কবে শুনব?
লেডি ডায়ানার বাচ্চা এখানেই হোক। আমি হব ধাই-মা।
বেশ তো...
বাচ্চা! ভাবতেই তো অদ্ভুত লাগে!
?!
চলবে ● ৪

মানবজমিন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

॥ সজল ॥

সজল এসে প্রণাম করে হাসিমুখে দাঁড়াতেই মনটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল দীপনাথের। সজলের মুখখানা ভারী মিষ্টি হয়েছে। দুখানা বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় চোখ, জড়তাহীন ভাবভঙ্গী। চেহারাখানাও বেশ লম্বা এবং কাঠামোটাও মজবুত।

আমাকে চিনতে পারিস, সজল।

হুঁ-উ। বড় কাকা।

এখানে আসব বলে ঠিক ছিল না। তাই তোর জন্য কিছু আনতে পারিনি। বলে মানিব্যাগটা হিপ পকেট থেকে বের করে কুড়িটা টাকা সজলের হাতে দেয় দীপনাথ। বলে, জামাটামা কিছু একটা কিনে নিস।

শ্রীনাথ ধমক দিয়ে বলে, কেন, কোন পাল-পার্বণ পড়েছে এখন। কিচ্ছু দিতে হবে না।

সজলও হাত গুটিয়ে নিয়ে বলে, না না, আমার এখন জামার দরকার নেই, কাকু। তুমি টাকা রাখো।

দীপনাথ শ্রীনাথকে ধমক দিয়ে বলে, তুমি থামো তো। সজল কি আমার কুটুম নাকি? বলে সজলের দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, কাকার সঙ্গে ভদ্রতা হচ্ছে? এক চড় খাবি। নে!

সজল টাকাটা নেয়। খুব লজ্জার সঙ্গে হাসে।

দীপনাথ মানিব্যাগ পকেটে পুরতে পুরতে বলে, আজেবাজে ব্যাপারে খরচ করিস না। জামা কিনে নিস। লেখাপড়ায় কেমন হয়েছিস? ক্লাসে ফার্স্ট হোস নাকি?

শ্রীনাথ-বলে ওঠে, আরে না না। কোনো রকমে পাসটাস করে যায় আর কি। লেখাপড়ায় মনই নেই। অতি বাঁদর।

দীপনাথের নিকট আত্মীয় বলতে এরাই। বড়দা মল্লিনাথ বিয়েই করেনি। তবে দীপনাথ একবার এক গোপনসূত্রে খবর পেয়েছিল বৈধ সন্তান না থাকলেও নাকি এই রতনপুরেই মল্লিনাথের একজন বাঁধা মেয়েমানুষ ছিল এবং তার গর্ভে মল্লিনাথের এক অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। মল্লিনাথকে বাদ দিলে আর থাকে সে নিজে আর সোমনাথ। সোমনাথের এখনো ছেলেপুলে হয়নি। এখনো পর্যন্ত শ্রীনাথই যা বংশরক্ষা করছে।

বংশরক্ষা কথাটা এ যুগে প্রায় তামাদি হয়ে গেছে। তবু দীপনাথ এই কথাটার মধ্যে এক গভীর মায়া ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করে।

সে উঠে পড়ে বলল, চল, তোদের বাড়িটা ঘুরে দেখি।

সজল খুব রাজী। বলল, চল।

কাকাকে সজলের খুব পছন্দ হয়ে গেছে। সে শুনেছে এই কাকা নাকি খুব উদাস ধরনের। সংসারে মন নেই। আত্মীয়দের সঙ্গে তেমন সম্পর্কও নেই। ছোটো কাকার মতো এই কাকা কোনোদিন জেঠুর সম্পত্তি দাবি করতে আসেনি।

সজল মুখ তুলে সকালের রোদে দীপনাথের মুখখানা ভাল করে দেখল। উদাস একরকম চোখ। একটু যেন ছটফটে ভঙ্গী। মুখখানা লম্বা ধরনের এবং খুবই সুশ্রী। সব মিলিয়ে কাকাটিকে তার ভীষণ পছন্দ হয়ে যায়।

ক্ষ্যাপা নিতাইয়ের খোপড়াটা দেখিয়ে দীপনাথ বলে, ওটা কি রে?

নিতাই ক্ষ্যাপার ঘর।

কোন নিতাই? সেই যে তান্ত্রিক?

সজল অবাক হয়ে বলে, তুমি চেনো?

চিনব না কেন? বহুকাল আগে বড়দার ফাইফরমাশ খাটত। তখন দেখেছি। তখন অবশ্য তান্ত্রিক হয়নি। এখন কী করে?

ওঃ সে অনেক কিছু করে। বাণ মারে।

সর্বনাশ! কাকে বাণ মারে?

হি হি করে হাসে সজল, বলে, সবাইকেই মারে। যার ওপর যখন ক্ষেপে যায়। একদিন সরিৎ মামাকেও বাণ মেরেছিল।

সরিৎ! কোন সরিৎ? বউদির এক ভাই ছিল সরিৎ, সেই নাকি?

হুঁ, সরিৎমামা এখন আমাদের এখানে থাকে।

ওকে বাণ মারল কেন?

সরিৎমামা ওকে মেরেছিল যে! মার নামে কি যেন সব বলেছিল, তাই মেরেছিল।

বউদির নামে? ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে দীপনাথ বলে, তবে বউদি ওকে এখানে রেখেছে কেন? তাড়িয়ে দিলেই তো হয়।

সজল মাথা নেড়ে বলে, মা ওকে তাড়াবে না।

কেন?

নিতাইদাকে মা খুব ভয় পায়।

পুকুরধারে বিস্ময়ে প্রায় থেমে যায় দীপনাথ। বলল, বউদি ওকে ভয় পায়, বলিস কি রে? ওকে ভয় পাবে কেন?

বাণ মারে যে!

কথাটা দীপনাথ হেসেই উড়িয়ে দেয়। তবু বউদি ক্ষ্যাপা নিতাইয়ের বাণকে ভয় খাওয়ার মেয়ে নয়।

পুকুরের গভীর ছায়াচ্ছন্ন জলের দিকে চেয়ে ছিল দীপনাথ। চারদিকে গাছপালার নিবিড়তা। এত সুন্দর ছায়া আর গভীর জল যেন বহুকাল দেখেনি দীপনাথ। কী নির্জনতা এখানে! বলল, এ পুকুরে বড়দা অনেক মাছ ছেড়েছিল।

এখনো অনেক মাছ। সজল আগ্রহের সঙ্গে জবাব দেয়।

মাছগুলো তোরা কি করিস?

মাঝে মাঝে ধরা হয়। ধরবে কাকা? আমার হুইল আছে।

না রে, আজ সময় নেই।

তবে কবে আসবে বলো, সেদিন দুজনে মিলে ধরব।

আসবখন একদিন।

তুমি রবিবারে রবিবারে আসতে পারো না?

ভারী স্নেহের হাতে সজলের মাথার এক ঢোকা চুল একটু নেড়ে দেয় দীপনাথ। বলে, তোর বুঝি খুব মাছ ধরার শখ?

খুব। তবে মাছ খাই না।

তা হলে ধরিস কেন?

ভাল লাগে। তুমি কখনো মুরগীর গলা কেটেছো কাকু?

দীপনাথ ভ্রূ কুঁচকোয় আবার। বলে, না তো! কেন রে?

মুরগী কাটতে খুব ভাল লাগে, না?

দীপনাথ একটু দুশ্চিন্তার দৃষ্টিতে ভাইপোর দিকে তাকায়। মুরগী কাটার মধ্যে ভাল লাগার কী আছে বুঝতে না পেরে মাথা নেড়ে বলে, আমার ভাল লাগে না। অবোলা জীবকে কাটতে ভাল লাগবে কেন? তুই কাটিস নাকি?

লুকিয়ে কেটেছিলাম। মা টের পেয়ে দিন ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।

কাটতেই বা গেলি কেন?

নিতাই কাটে, সরিৎ মামা কাটে, লক্ষ্মণ ক

তবে আমি কাটলে কী দোষ?

ইতস্তত করে দীপনাথ বলে, দোষ নে

তবে তোর বয়সে সবাই তো রক্ত দেখলে ভয় পায়

আমিও পেতাম। এখন পাই না। জানো ব

বাবার কাছে একটা দারুণ জার্মান ক্ষুর আছে। সে

দিয়ে কাটতে যা ভাল না!

সর্বনাশ! ক্ষুরে হাত দিস নাকি? ভী

ধার যে, কখন হাতফাত কেটেকুটে ফেলবি।

কাটবে কেন? বাবা তো নিজেই ক্ষু

আমাকে দিতে চেয়েছিল। মা দিতে দিল না। ত

নিয়ে দুজনের কী ঝগড়া! জানো, মা আর বা

মধ্যে খুব ঝগড়া। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে ন

দীপনাথ একটু মুশকিলে পড়ে যায়। কা

হাঁড়ির খবরে তার তেমন আগ্রহ নেই। তার ও

এই বাচ্চা ভাইপোটার মুখ থেকে পাকা পাকা ক

শুনতে তার ভাল লাগে না। কিন্তু এ বাড়ি

আবহাওয়া যে খুব পরিশ্রুত নয় তা সে জানে। য

এদের জন্য কিছু করা যেত।

দীপ বলল, ঝগড়া নয়। মা বাবার মধ্যে ওরক

একটু আধটু হয়েই থাকে।

সজল মাথা নেড়ে বলে, আমার বন্ধুদের

বাবার মধ্যে ওরকম হয় না তো।

কী নিয়ে তোর মা বাবার এত ঝগড়া?

মুখে মুখে ঝগড়া হয় না। কিন্তু দুজনে

সম্পর্ক ভাল না। সবাই জানে। বাবা তো এ বাড়ি

ছেড়ে চলে যাবে।

তোকে কে বলল?

আমরা জানি। বদ্রীকাকু আছে না, ঐ যে

লাইনের ওধারে থাকে, সে-ই বলেছে।

বদ্রীটা আবার কে? যা হোক, হবে কেউ।

ভাবে দীপ।

সজল বলে, মা একদিন বদ্রীকাকুকে ডাকিয়ে এনে খুব ধমকাল। বদ্রীকাকু নাকি বাবার জন্য চারদিকে জমি খুঁজছিল। জমি পেলেই বাবা চলে যাবে।

ও।

মা অবশ্য বদ্রীকাকুকে এমন ভয় দেখিয়েছে যে আর এদিকে আসে না। ছোটোকাকুর মতোই অবস্থা।

কেন, ছোটোকাকুর আবার কী হয়েছিল?

বাঃ, ছোটোকাকুকে দুটো লোক মিলে মারল না? এখনো কেস চলছে তাই নিয়ে।

সে জানি। তার সঙ্গে তোর মায়ের সম্পর্ক কি?

সেই লোক দুটোকে যে আমি চিনি!

তারা কারা? কী নাম?

বললে মা আমাকে মেরে ফেলবে।

বিরক্তি চেপে দীপ বলে তাহলে বলিস না।

সজল একটু দ্বিধায় পড়ে। আসলে এই বড়কাকুকে অর ভীষণ ভাল লেগে গেছে। একে সে সব কথা বলতে চায়। সে তাই চুপি চুপি বলল, এর পরের বার যখন তুমি আসবে তখন চিনিয়ে দেবো। ঐ ইটখোলার দিকে থাকে।

দীপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, চিনেই বা কি করব? তুই বরং ওসব কাউকে বলিস না। সেই লোক দুটো কি তোর মায়ের লোক?

না তো কি? মদনজোঠর লোক। মদনজ্যাঠুকে

মনের সাধ ডিলাইটের সুস্বাদ

কমলার সুগন্ধে
ব্রিটানিয়া ডিলাইট মজাদার খাস্তা, মুচমুচে বিস্কুট

BRITANNIA

বলে মা ওদের কাজে লাগিয়েছিল।

পুকুর পাড় ছেড়ে সবজিবাগানের ধার ঘেঁষে একটা কুলগাছের ছায়ায় এসে পড়েছিল দুজন। সবজিবাগানে মুনীষ খাটছে। ভারী সুন্দর ফুলকপি বাঁধাকপি হয়ে আছে। এক ফালি জমি ঘন সবুজ ধনেপাতায় ছাওয়া। কাঁঠালের ডালে মস্ত মৌচাকে গানা গুনা শব্দ।

কিন্তু এই সুন্দর দৃশ্যের ওপর যেন এক বিষন্নতার পর্দা ঠেলে দিয়েছে কে। দীপ আধখানা চোখে দেখছে। মন অন্যত্র।

সে জিজ্ঞেস করল, তুই খেলাধুলো করিস না?

খুব করি।

কি খেলিস?

ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, সিজনের সময় ফুটবল।

আবার যখন আসব তখন তোর জন্য কি নিয়ে আসব বল তো?

একটা এয়ারগান আনবে? যা দিয়ে পাখি মারা যায়?

পাখি মারবি কেন? টারগেট প্র্যাকটিস করবি।

সরিৎমামা বলেছে আর কিছুদিন পরেই আমাকে আসল বন্দুক চালাতে শিখিয়ে দেবে।

আসল বন্দুক পাবি কোথায়?

জেঠুর বন্দুক থানায় জমা আছে না? মা সেইটে আনাচ্ছে।

বন্দুক দিয়ে তোর মা কি করবে?

আমাদের নাকি অনেক শত্রু।

দীপনাথ হেসে ফেলে। বলে তাই নাকি?

সজল হাসে না, গম্ভীর মুখ করে বলে, এ জায়গায় কেউ আমাদের দু চোখে দেখতে পারে না। বিশেষ করে মাকে।

কেন?

সবাই বলে মা নাকি ভাল নয়।

দীপ গম্ভীর হয়ে বলে, ছিঃ সজল, ওসব কখনো মনে ভাববে না। বলবেও না কাউকে। তোমার মাকে আমি বহুকাল চিনি। উনি খুব ভাল।

আমি তো খারাপ বলিনি। লোকে বলে।

লোকে যা খুশি বলুক, কান দিও না।

তুমি এখানে এসে থাকবে, কাকু? থাকো না, খুব মজা হবে তা হলে। এখানে একটাও ভাল লোক নেই।

আমি যে ভাল তা তোকে কে বলল?

আমি জানি। মাও বলে।

মা কি বলে?

বলে ভাইয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হল বড় ঠাকুরপো। সাতে পাঁচে থাকে না, নিজের মনে আছে।

বলে বুঝি?

তুমি থাকলে এখানকার লোকেরা আমাদের পিছনে লাগবে না।

এখন লাগে বুঝি?

ভীষণ। ইস্কুলেও আলোচনা হয়। সবাই বলে আমরা নাকি জেঠুকে ঠকিয়ে সব সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছি। এমনও বলে, মা নাকি জেঠুকে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

যাঃ। বলতে বলতে তারা একটা ভাঙা জমিতে উঠল।

সামনেই মেহেদীর বেড়া। তারপর উঠোন। অন্তঃপুরে।

আগড় ঠেলে উঠোনে পা দেওয়ার আগে সজল মুখ ফিরিয়ে বলল, আজ দাদুর আসার কথা, জানো?

জানি।

দাদু এলে খুব মজা হবে। আমি দাদুকে যা ক্ষ্যাপাই না!

ক্ষ্যাপাবি কেন? দাদু বুঝি বন্ধু?

তা নয়। ভাল লাগে। দাদু যে একটুতেই রেগে যায়।

রাগলেই বুঝি রাগাতে হবে?

কথা কইতে কইতে তারা উঠানে ঢোকে।

মজু ছুটে এসে দীপনাথের হাত ধরে বলে, উঃ কাকু, ভদ্রমহিলা যা স্মার্ট না!

দীপ একটু হাসে। বলে, তা তো বুঝতেই পারছি। ভদ্রমহিলাকে পেয়ে কাকাকে একদম ভুলে গেছিস। একবার কাছেও গেলি না।

বড় বড় চোখে চেয়ে মজু বলে, আহা, তুমি তো আসবেই। উনি তো আর আসবেন না। এত সুন্দর কথা বলেন না, কী বলব।

খুব ভাব হয়ে গেছে তোদের?

ভীষণ। আর একটু থাকবে, কাকু?

উপায় নেই রে। লান্চ ফিরে যেতে হবে।

আর কতক্ষণ?

দীপ ঘড়ি দেখে বলে, বড় জোর ঘণ্টাখানেক।

উনি কিন্তু যেতে চাইছেন না।

সে কি?

হ্যাঁ গো। বার বার বলছেন, তোমাদের বাড়িটা আমার খুব ভাল লেগে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছে সারা দিনটা এখানেই কাটিয়ে যাই। থাকবে কাকু সারাদিন?

তাই হয় নাকি? চারদিকে খোঁজ পড়ে যাবে। শোন, গাড়ির ড্রাইভারটা বসে আছে, ওকে একটু চা-টা পাঠিয়ে দিস তো।

ওঃ, সে কখন দিয়ে এসেছে মংলু। চা, পরোটা, ডিমভাজা। তোমাদের জন্য মা তাড়াতাড়ি কিমাকারি তৈরি করছে।

ওরে বাবা এখন ওসব খেলে লান্চ খাবো কোন পেটে?

পারবে। এসো না আমাদের ঘরে। মণিদি কিরকম গল্প করছে দেখে যাও।

দীপনাথ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, দূর পাগলী। মেয়েমহলে পুরুষদের যেতে নেই। তুই বরং ওঁকে গিয়ে বল, হাতের ঘড়িটার দিকে যেন একটু নজর রাখে।

দাদুর সঙ্গে দেখা করে যাবে না? ও ছোটকাকা দাদুকে নিয়ে আসবে যে।

আজ যদি দেখা না হয় তবে অন্য দিন আস[illegible]

সজল গেল না। মজু দৌড়ে চলে গেল মণি[illegible] দীপার গল্প শুনতে। দীপ আনমনে চিন্তা কর[illegible] মণিদীপা ওদেরও কমিউনিজম বোঝাচ্ছে না তো।

রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দীপনাথ ডাক[illegible] বউদি!

তৃষা দারুণ সুন্দর গন্ধ ছড়িয়ে কিমা রা[illegible] করছিল। দুটো বিশাল চোখে ফিরে তাকিয়ে মৃ[illegible] হেসে বলল, অন্যের বউ নিয়ে টানাটানি না করে নিজে[illegible] একটা বউ জুটিয়ে নিলেই তো হয়।

ভীষণ বিব্রত বোধ করে লাল হয়ে গে[illegible] দীপনাথ। বলল, যাঃ, কী যে বলো?

অন্যের বউটি অবশ্য সাংঘাতিক স্মার্ট[illegible] সুন্দরীও।

তাতেই বা আমার কি?

তৃষা রান্নার ভার বৃন্দার হাতে ছেড়ে বেরিয়ে আসে। বলে, এসো, আমার ঘরে বসবে।

দীপনাথ তৃষার পিছু পিছু এসে যে ঘরটা[illegible] ঢোকে সেটাতেই এক সময় বড়দা মল্লিনাথ থাকত। চমৎকার পাকা ঘর। আবলুস কাঠের দেয়াল[illegible] আলমারি, বন্দুকের স্ট্যান্ড থেকে এইচ এম ভি-র[illegible] বাক্স গ্রামোফোনটি পর্যন্ত এখনো সযত্নে সাজানো। বিশাল একখানা চিত্র-বিচিত্র খাট। এক পাশে[illegible] টেবিল। হল্যান্ডের ফিলিপস রেডিও।

দীপনাথ বহুকাল বাদে এই ঘরে এল।

তৃষা বলল, অবশ্য রঙটা আমার মতোই।

কার রঙ? দীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

মণিদীপার। তোমার বন্ধুর বউ নাকি?

বন্ধু নয়। বস্। ওপরওয়ালা।

বস্ মানে জানি মশাই, বাংলা করে বলতে হবে না।

দীপ হাসে। বলে, আমি আনিনি। উনিই আসতে চাইলেন।

আজকালকার মেয়েদের কোনো জড়তা নেই। লজ্জা-টজ্জাও কম। আমরা হলে পাঁচটা কথা উঠে পড়ত।

কথা ওঠার ব্যাপার নয় বউদি। দিনের বেলার সামান্য আউটিং। দোষের কিছু দেখলে নাকি?

তৃষা মাথা নেড়ে বলে, দোষের কি দেখব আবার, তবে একটা জিনিস দেখে একটু মজা পেয়েছি।

কি সেটা?

মেয়েটা দু-পাঁচ মিনিট পর পরই তোমার খোঁজ করছে। উনি কোথায় গেলেন? দূরে যাননি তো? উনি যদি চা খান তা হলে আমিও খাবো।

দীপনাথ আবার লাল হয়। বুকের মধ্যে এমন একটা সিরসিরানি ওঠে যে গায়ে কাঁটা দিতে থাকে। (ক্রমশ)

বিজ্ঞান

মেরুর উল্কা এখন বড় রকমের রহস্য

পৃথিবীর অন্য কোথাও নয়, শুধু কুমেরু অঞ্চলেই এত উল্কাপিণ্ডের বর্ষণ ঘটে কেন? প্রশ্নটি তুলেছেন বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক ডঃ ডেরেক সিয়ারস (নিউ সায়েন্টিস্ট : ২২ মার্চ, ১৯৭৯। পৃষ্ঠা ৯৫৯)।

অদ্ভুত ব্যাপার। ইদানীংকালে উল্কাপিণ্ড নিয়ে যে সব বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন, তাঁরাও কম অবাক হননি। কুমেরু মহাদেশের তুষার অধ্যুষিত এলাকায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ইয়ামাতো পর্বতমালা। দেখে শুনে মনে হয় এই অঞ্চলটি উল্কাপিণ্ডের যেন স্বর্গরাজ্য। এছাড়া কুমেরু মহাদেশে আরও কয়েকটি অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে উল্কাপিণ্ডের বর্ষণ দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। এতদিন অনেকের ধারণা ছিল, মার্কিন দেশের প্রেইরি প্রদেশে উল্কার বর্ষণ ঘটে সবচেয়ে বেশী। প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে বছরে একটি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এ ব্যাপারে প্রেইরিকে ম্লান করে দিয়েছে কুমেরু মহাদেশ। সেখানে বছরে প্রতি ১০ বর্গ কিলোমিটারে উল্কাপিণ্ডের পতন ঘটে এক থেকে দুইটি। গত কয়েক বছরে ওই অঞ্চল থেকে বিজ্ঞানীরা মোট ১৩০০টি উল্কাপিণ্ডের নমুনা সংগ্রহ করেছেন। বলা বাহুল্য, সংখ্যাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, গত ২০০ বছরে পৃথিবীর তাবৎ সংগ্রহশালায় মোট যতগুলি উল্কাপিণ্ড সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা ২০০০-এর মত। উল্লেখ্য, এক একটি উল্কার ওজন পৃথিবীর বুকে নেমে আসার পর কয়েক গ্রাম থেকে কয়েক টন পর্যন্তও হতে দেখা গেছে। মানুষ এ পর্যন্ত বৃহত্তম যে উল্কা পিণ্ডটির সন্ধান পেয়েছে সেটি আবিষ্কৃত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রুটফনটাইন নামে একটি জায়গায়। ওই উল্কাপিণ্ডটির ওজন ৬৪ টনের মত।

প্রশ্ন : পৃথিবীর সর্বত্রই যখন উল্কা বর্ষণের সম্ভাবনা, তখন কুমেরু অঞ্চলেও যে তেমনটি ঘটবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

উত্তর : ব্যাপারটা উল্কাবর্ষণ নয়, উল্কা সংগ্রহ। একমাত্র পৃথিবীর স্থলভাগের ওপর যে সব উল্কা এসে পড়ে আমরা তাদেরকেই সংগ্রহ করতে পারি। তুলনায় কুমেরু মহাদেশের কথাটা একবার ভাবুন। কুমেরু মহাদেশ পৃথিবীর শীতলতম, উচ্চতম এবং সবচেয়ে বেশি ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অঞ্চল। এখানকার গড় উচ্চতা ৭০০০ ফুট। এখানকার বাতাসের গড় গতি ঘণ্টায় ১৫ থেকে ৫০ মাইল। সেই গতি কখনও বা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ঘণ্টায় ২০০ মাইলের মত। কুমেরু মহাদেশের ৬,০০০,০০০ বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকে বরফ আর বরফ। এত বরফ সত্ত্বেও ওই অঞ্চল আর্দ্রতার সাহারা মরুভূমিকেও যেন হার মানায়। অমন রাক্ষসী পরিবেশে মানুষই যেখানে সহজে চলাফেরা করতে পারে না, নিয়মিত রুটিন ধরে সেখানে উল্কার সন্ধান করা খুবই শক্ত কাজ। এ ছাড়া আরও দুটি বাধা আছে। কুমেরুর মাটির বুক সব সময় বরফে ঢাকা থাকে। সেই বরফ কোথাও কয়েক ফুট গভীর। কোথাও বা তার গভীরতা এক মাইলেরও বেশি। এমন জায়গায় কোন উল্কাপিণ্ড যদিও বা এসে পড়ে, সেই উল্কা ধীরে ধীরে এক সময় বরফ-স্তরের গভীরে গিয়ে হাজির হয়। সেখান থেকে তাদের খুঁজে বের করা শক্ত। এ ছাড়া, সেখানে প্রতি বছর নতুন করে বরফ জমে। আর সেই বরফের বড় একটি অংশ ধীর গতিতে প্রবাহিত হয় সমুদ্রের দিকে। তখন বরফ-স্তরের মধ্যে সঞ্চিত উল্কাও পরিবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। ফলে কোথাও উল্কাপাত ঘটলেও সেই উল্কা যে সেখানে পাওয়া যাবে এমন কোন কথা নয়।

এমন প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ১৯১২ সালে কুমেরু অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে 'অস্ট্রেলিয়ান অ্যানটারকটিক এক্সপিডিশন' দলের কয়েকজন সদস্য একটি উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। এটিই কুমেরু অঞ্চল থেকে সংগৃহীত প্রথম উল্কাপিণ্ড। 'দ্য হোম অফ দ্য ব্লিজারড'

গ্রহাণু থেকে উল্কাপিণ্ডের জন্ম। উপরের ছবি : ১। উল্কাপিণ্ড উত্তপ্ত হয়েছে। ২। ফলে বিগলন। তখন ভারী ধাতু-সমূহ গ্রহাণুর কেন্দ্রে গিয়ে জমে। উপরের স্তরে থাকে পাথরের স্তর। ৩। আভ্যন্তরীণ পরিবর্তিত এবং প্রচণ্ড ঘর্ষণ-বেগের দরুন জমের উপরের স্তর ভেঙে টুকরো হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ৪। অথবা অপর কোন বস্তুকণার সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষের দরুন পুরো গ্রহাণুটি সম্পূর্ণভাবে টুকরো হয়ে যায়। নিচের ছবি : ১। উল্কাপিণ্ড। ২। উত্তাপ নয় এবার শুধু প্রলয়ঙ্কর সংঘর্ষ। ৩। জন্ম উল্কাপিণ্ডের জন্ম।

বিধৃত করেছেন স্যার ডগলাস মাউসন। মাউসন লিখেছেন, ডেনিসন অন্তরীপের তিরিশ কিলোমিটার পশ্চিমে বরফের উপর উল্কাপিণ্ডটি পড়ে ছিল। এটি লম্বায় ১২·৫ সেন্টিমিটার, চওড়ায় ৭·৫ সেন্টিমিটার এবং পুরু ৯ সেন্টিমিটারের মত। প্রথম দর্শনেই আমরা বুঝতে পারি, এটি পৃথিবীর কোন নুড়ি পাথর নয়, উল্কাপিণ্ড। এটি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আদেলেইদের সংগ্রহশালায় রেখে দেওয়া হয়। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে কুমেরু মহাদেশ থেকে আর কোন উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

এর পর ১৯৬০এর দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কুমেরু অভিযানে মেতে উঠলো। এই অভিযানের ফলে সেখানে আরও তিনটি উল্কাপিণ্ড আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা। প্রথমটি ১৯৬১ সালে লাজারেভ-এ। দ্বিতীয়টি ১৯৬২ সালে থিয়েল পর্বতমালার কাছে পাওয়া গেল। আর তৃতীয়টি পাওয়া গেল ১৯৬৪ সালে নেপচুন পর্বতমালার সানুদেশে।

তবে এহ বাহ্য। কুমেরু মহাদেশে উল্কাপিণ্ড আবিষ্কারের ব্যাপারে এর পর ইতিহাস সৃষ্টি করে বসলেন জাপানী অনুসন্ধানীরা। ১৯৬৯ সালে এক দল জাপানী বিজ্ঞানী তাদের মূল ঘাঁটি সিওয়া স্টেশন থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে একটি একটি জায়গায় কাজ করছিলেন। সেখানে তাঁরা আবিষ্কার করলেন ৯টি স্টোনি উল্কাপিণ্ড। এই উল্কাপিণ্ড-গুলি ১০ কিলোমিটার ব্যাসের একটি অঞ্চলের মধ্যে পড়েছিল। এর চার বছর পর ওই দলটি কুমেরু মহাদেশ থেকে আরও ১২টি উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

এই ঘটনা উল্কা-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করে। অনেকে অবাকও হয়েছিলেন। মাটির বুকে উল্কার পতন এমন কোন প্রাত্যহিক ঘটনা নয়। যদি তাই হয়, তা হলে এত স্বল্প পরিসর স্থানে এত কম সময়ে এতগুলি উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করাটা একটা খবর বটেই!

[illegible] জাপানী অভিযাত্রীদের একটি দল ১৯৭৪-৭৫ সালে কুমেরুর বরফ-পরিব্যাপ্ত অঞ্চলে আবিষ্কার করলেন ৬৬৩টি উল্কাপিণ্ড। এবং এর পরের বছর পেলেন আরও ৩০৭টি। মজার ব্যাপার, এসব উল্কাপিণ্ডেরও প্রায় সবগুলিই পাওয়া গিয়েছিল একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে। যার ক্ষেত্রফল মাত্র ৪০০০ বর্গকিলোমিটার। এতে করে অনেকেই মনে করেন, ওই জাপানী অভিযাত্রীদল পৃথিবীর সব চেয়ে বেশি উল্কা বর্ষণ অধ্যুষিত এলাকা আবিষ্কার করেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দূর মহাশূন্য থেকে উল্কা-পিণ্ডেরা যখন পৃথিবীর গভীর বায়ুস্তরে এসে হাজির হয়, তখন বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে তারা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এবং অবশেষে হয়ে ওঠে ভাস্বর। তখন মনে হয় যেন একটি নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হয়ে প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। এই প্রজ্বলনের কাজটি শুরু হয় ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৫ মাইল ঊর্ধ্বাকাশে। কোন কোন উল্কাপিণ্ড জ্বলতে জ্বলতে একক পিণ্ড হিসেবেই পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে। তবে এ ধরনের ঘটনা তুলনামূলক ভাবে কম। বেশির ভাগ সময় ধাবমান উল্কাপিণ্ড বাতাসের অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই বিস্ফোরণে তারা খণ্ডে খণ্ডে চূর্ণ হয়ে যায়। তারপর জ্বলন্ত ফুলঝুরির মত তাদের বিচূর্ণ কণাগুলি চার-দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, চূর্ণ হওয়ার ঘটনাটি কিন্তু ঘটে ঊর্ধ্বাকাশে।

জাপানী বিশেষজ্ঞরা আবিষ্কার করেন, কুমেরু মহাদেশের ইয়ামাতো পার্বত্য অঞ্চলে উল্কা বর্ষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশী। পরে ১৯৭৬-৭৭ সালে মার্কিন এবং জাপানী দলের যুগ্ম উদ্যোগে অ্যালেন হিলস এবং মাউন্ট বালড্রু থেকে মোট ১১টি উল্কাপিণ্ড সংগৃহীত হয়। এদের মধ্যে একটির ওজন ৪০৮ কিলোগ্রাম। পরের বছর ওই একই এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁরা আরও ৩০০টি উল্কা পিণ্ড আবিষ্কার করেন।

এই অনুসন্ধানে একটি অদ্ভুত ব্যাপার ধরা পড়েছে অভিযাত্রীদের চোখে। তাঁরা দেখেছেন,
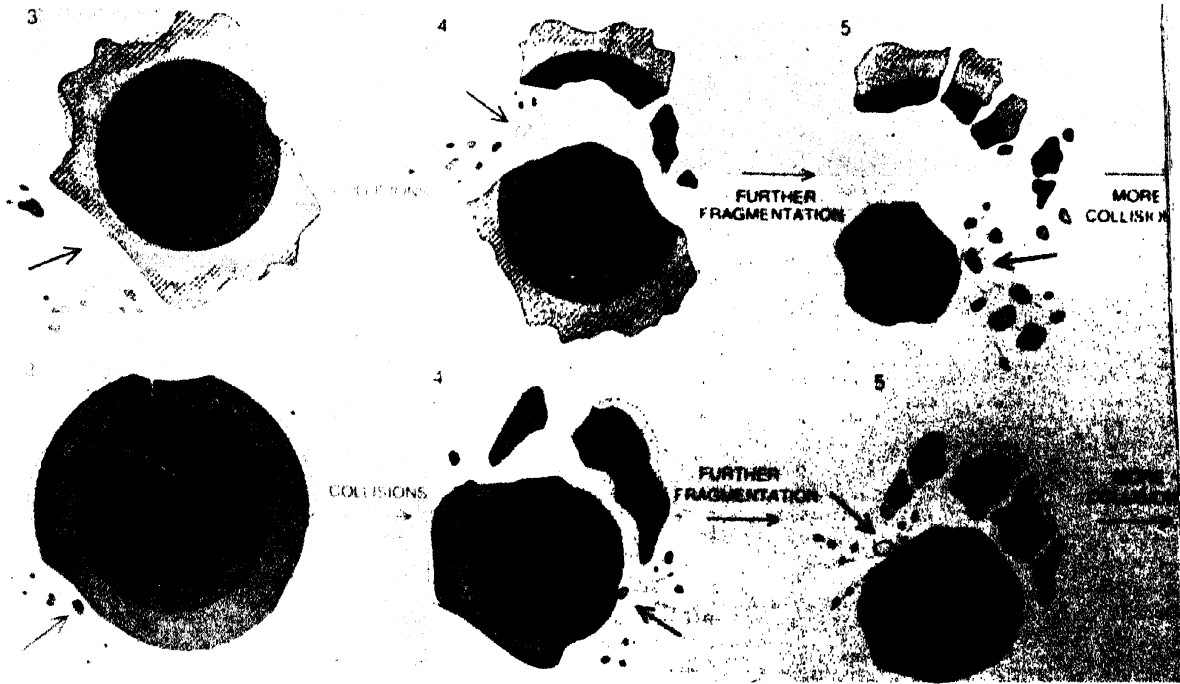
ইয়ামাতো থেকে যে সব উল্কাণু সংগৃহীত হয়েছে তারা আয়তনে খুবই ছোট। তুলনায় অ্যালেন হিলস এবং মাউন্ট বালডুর-এ পাওয়া উল্কাণুদের আয়তন বড়। ইয়ামাতো থেকে যতগুলি উল্কাণু পাওয়া গেছে তাদের মোট ওজন মাত্র ১০০ কিলোগ্রাম। যার অর্থ, ওই সব উল্কাণুর এক-একটির গড় ওজন ১০০ গ্রাম। কিন্তু অ্যালেন হিলস এবং মাউন্ট বালডুর-এ যে সব উল্কাণু পাওয়া গেছে তাদের প্রত্যেকটির গড় ওজন ৫ কিলোগ্রামের মত। এ থেকে মনে হয়, ইয়ামাতো অঞ্চলে যে সব উল্কাণু পাওয়া গেছে তাদের জন্ম হয়েছিল অত্যধিক বিস্ফোরণের দরুন। অর্থাৎ এক-একটি উল্কা ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর প্রচণ্ডভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ফুলঝুরির মত ঝরে পড়ে বলেই তারা অমন ছোট ছোট কণার মত হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। যারা আয়তনে বড়, অর্থাৎ অ্যালেন হিলস এবং মাউন্ট বালডুর-এ যাদের পাওয়া গেছে, তারা আসলে এক-একটি মূল উল্কাপিণ্ডই। তাদের ভাগ্যে বাতাসের ঘর্ষণে ক্ষয় হয়ে যাওয়া ছাড়া, বিস্ফোরণের মাধ্যমে চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার মত কোন ঘটনা ঘটেনি।

ইয়ামাতো এবং অপর দুইটি অঞ্চলে কেন এই ব্যতিক্রম, বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও তা অজানাই রয়ে গেছে।

উল্কা পিণ্ডকে মুখ্যত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক, আয়রন মিটিওরাইটস। যার মূল উপাদান লোহা এবং নিকেলের ধাতু সংকর। দুই, স্টোনি মিটিওরাইটস। এরা আসলে সাধারণ পাথর বলতে যা বোঝায়, তাই। কোন কোন স্টোনি মিটিওরাইটের মধ্যে যৎসামান্য ধাতুও থাকে। ভূতাত্ত্বিকরা বেশির ভাগ স্টোনি মিটিওরাইটকে বলেন কনড্রাইটস। এদের মধ্যে ধাতু থাকে ছোট ছোট দানার আকারে। এই বিশেষ চরিত্রটির জন্যেই কোনটি উল্কা, কোনটি পৃথিবীর পাথরমাত্র সেটা আমরা ধরতে পারি। যে সব স্টোনি মিটিওরাইটের মধ্যে ধাতু থাকে না, তাদের বলা হয় আকনড্রাইটস। অত্যন্ত দুর্লভ বলে এ ধরনের উল্কাপিণ্ড খুবই মূল্যবান।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই, কুমেরু অঞ্চলের ওই সব উল্কাণুর মধ্যে এমন কিছু কিছু উল্কাণু পাওয়া গেছে, যাদের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু পরিমাণ কার্বন, দুই থেকে তিন শতাংশের মত। উল্কাণুর মধ্যে এই কার্বন নানা রকম রাসায়নিক যৌগ ...

করে অবস্থান করছে। যাদের মধ্যে অন্যতম অ্যামাইনো অ্যাসিড। উল্লেখ্য, বিভিন্ন রকম অ্যামাইনো অ্যাসিড রাসায়নিক সংযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করে নানা ধরনের প্রোটিন অণু। আর এই প্রোটিনই জীবন সৃষ্টির মুখ্য স্মারক।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কুমেরু অঞ্চলে যে সব উল্কাণু পাওয়া গেছে একদিন হয়ত তারা সৃষ্টি রহস্যের অনেক অনালোকিত পটভূমিকে উন্মীলিত করতে সক্ষম হবে।

জীবন-সৃষ্টির জন্যে দরকার মুখ্যত কার্বন পরমাণু। অনেকে মনে করেন, মহাকাশে পারমাণবিক বিক্রিয়ার দরুন তৈরি হয় তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু কার্বন-১৪। এই কার্বন-১৪ই নিজের শক্তির প্রভাবে তৈরি করে জীবন সৃষ্টির জন্যে যে সব প্রাথমিক রাসায়নিক যৌগ দরকার, যেমন কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড, ফেনলস, পিউরিনস, পরফিরিনস, নানা রকম চিনি, অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রভৃতি তাদের। ১৯৬৪ সালে জাপানী বিজ্ঞানী রিওইচি হাইয়াতস, এক ধরনের উল্কার মধ্যে অ্যাডেনাইন এবং গুয়োনাইন নামে দু রকম রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করেছেন, যারা জীবন সৃষ্টির চাবিকাঠি ডি এন এ এবং আর এন এ'র মূল উপাদান। অনেকের ধারণা এ সব বস্তু মহাকাশেই তৈরি হয়। পরে উল্কা বা অন্য কোন উপায়ে তারা পৃথিবীর পরিবেশে পরিবাহিত হয়ে এসে বিবর্তনের মাধ্যমে একদা জীবন সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছিল।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, কুমেরু মহাদেশে কার্বনঘটিত এক শ্রেণীর উল্কাণু পাওয়া গেছে। যারা আসলে কনড্রাইট। মধ্যে আছে উদ্বায়ী সামগ্রী। বরফের গভীর স্তরে চাপা পড়ে থাকায়, ওদের মধ্যে আবদ্ধ উদ্বায়ী সামগ্রী বাষ্পীভূত হয়ে চলে যেতে পারেনি, উল্কাণুর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থাতেই থেকে গেছে। অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে পতনের পর নৈসর্গিক প্রভাবে উল্কাণুরা সচরাচর তাদের অনেক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যই হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের মৌলিক স্বরূপ উদ্ধার করা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বরফের আস্তরণ তাদের মৌলিকত্ব রক্ষা করতে সাহায্য করে বলে, সত্যিই জীবনের মূল উপাদান বহির্পৃথিবী থেকে এসেছিল কী না আমরা তা জানতে পারবো।

উল্কার জন্মবৃত্তান্তের ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত বহু প্রশ্নই অসমাধিত অবস্থায় থেকে গেছে। ...

৪৬০ কোটি বছর আগে মহাজাগতিক কণা এবং ...
পুঞ্জীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছিল আমাদের সূর্য ...
সৌরমণ্ডলের গ্রহ, উপগ্রহ, ইত্যাদি। ওই সময় গ্র...
মত আরও কিছু কিছু বস্তুও তৈরি হয়েছিল। য...
আয়তন ছিল অনেক ছোট। গ্রহের মত এরাও সূ...
প্রদক্ষিণ করে। এদের বলা হয় গ্রহাণু। গ্রহ...
আকৃতিতে গোল। এই গ্রহাণুদেরই কোন কোনটি ...
ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়ে তৈরি করে উল্কা পিণ্ড।

ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারটাই যা ঘটলো কী তা...
সৌর ঝটিকার দরুন সৌরমণ্ডলে শক্তিশালী চৌম্...
ক্ষেত্র এবং বিদ্যুৎক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। এদের যু...
প্রভাবে গ্রহাণুগুলিতে সৃষ্ট হয় তড়িৎ প্রবাহ। ...
তড়িৎপ্রবাহ কোন কোন গ্রহাণুকে তীব্রভাবে উত্...
করে তোলে। সৌর ঝড়ের মধ্যে পড়ে তা...
আবর্তন বেগও যায় বেড়ে। উত্তপ্ত গ্রহাণুরা ভে...
যায়। গ্রহাণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের দরু...
ভাঙার কাজটি সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এমনও হ...
পারে, এক সময় কোন কোন গ্রহাণু গ্রহগুলির কা...
কাছি এসেছিল। তখন গ্রহ এবং গ্রহাণুর মধ্যে প্র...
মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে গ্রহাণুদের কোন কোনটি ভে...
টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তৈরি করে উল্কা পিণ্...
যে সব উল্কাপিণ্ডের মধ্যে নিকেল, লোহা প্রভৃতি ভা...
ধাতু থাকে, তারা ওই সব গ্রহাণুর কেন্দ্রাঞ্চলে...
টুকরো। আর কনড্রাইট প্রভৃতি তাদের উপরের স্তরে...
অংশ। কারণ পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহের অভ্যন্...
ভাগে যেমন থাকে বেশির ভাগ ভারি ধাতু এবং তাদে...
পৃষ্ঠতলের স্তরে থাকে পাথরের স্তর, উল্কাণু...
ক্ষেত্রেও তেমনটি হওয়া স্বাভাবিক।

কুমেরু বিশেষজ্ঞরা কুমেরু থেকে পাওয়া উল্কাণু...
মধ্যে এক ধরনের সাদা রঙের বস্তু আবিষ্কার করেছেন...
তাদের ধারণা, ওই বস্তু সৌরমণ্ডলের সৃষ্টির গোড়া...
দিকে তৈরি হয়ে থাকবে। এমনও অনুমান করা হচ্ছে...
সৌরমণ্ডলের বাইরের জগতের বস্তুকণাও তাদের মধ্যে...
থাকতে পারে।

আশার কথা এই, কুমেরুর কঠিন শীতল বরফে...
স্তরে ওই সব উল্কাণু যেন এক একটি মমি। উল্কাণু...
পৃথিবীর অবক্ষয় তাদের তেমন স্পর্শ করতে পারেনি...

কুমেরু মহাদেশ থেকে সংগৃহীত উল্কা হয়তো...
জীবন সৃষ্টি এবং সৌরমণ্ডলের বহু রহস্য উদ্ঘাটনে...
সাহায্য করবে।

আজকের স্থন্দরতম-ফ্যাসান বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আপনি ফ্যাসান বিপ্লবের পুরোগামী হোন।
● "ট্রিপল ক্রাউন" এবং "ভেনাস স্থপ্রিম" স্থটিংস
● পলিফিল এবং পলিকট সারটিংস ৪৮/৫২, ৬৭/৩৩ ও ৮০/২০ অনুপাতের মিশ্রবোনট
● "স্থপারষ্টার" ১০০% পলিয়েষ্টার প্রিণ্টস
● "রাজেশ্বরী" শাড়ী এবং পরমানন্দ ধুতি।
● লিজেণ্ডারি এম ৭ এ্যাণ্ড এম ১১ মূলস্
● একাক্রু সিভ এম ২৪ এ্যাণ্ড S ৬ লং ক্লথ
একই সঙ্গে সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যকে আড়ম্বর উনমুখতায় মিলিয়ে কোঠারীর তৈরী বস্ত্র যে কোন ব্যাপারে যে কোন জায়গায় এবং যে কোন সময়ে আপনাকে আদর্শ সাজে সাজাবে। আজকের ফ্যাসানের ঘুর্ণাবর্ত্তে আপনাকে রাখবে সকলের আগে।
তাই আস্থণ কোঠারীর বস্ত্রের রংগীন জগতে ঢুকে ফ্যাসান তুনিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটান।
KOTHARI'S FABRICS
কোঠারী (মাদ্রাজ) লিমিটেড
কোঠারী বিলডিংস ১১৪/১১৭, নুংগমবাককম হাই রোড, মাদ্রাজ-৬০০ ০৩৪
কোঠারী ভবনের উৎকৃষ্ট বস্ত্র
কোঠারীর বস্ত্রে পরুন
ফ্যাসানে উৎফুল্লিত হয়ে উঠুন
national 639 BN

দোমিনিক লাপিয়ের

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

প্যারিস, ২৯ আগস্ট :

[গান্ধীজী এবং জওহরলাল নেহরুর পর আর যাঁদের মাধ্যমে আমরা লরড মাউন্টব্যাটেনের কাছাকাছি এসেছি, কাছে ছিলাম, তাঁদের সবার আগে নাম নিতে হবে 'ফ্রীডম অ্যাট মিডনাইট'-এর লেখক-যুগল দোমিনিক লাপিয়ের এবং ল্যারি কালিনসের। গান্ধী-হত্যা এবং ভারতীয় স্বাধীনতার প্রাক্-মুহূর্তের বিচিত্র রাজনীতির পটভূমিকায় লেখা 'ফ্রীডম অ্যাট মিডনাইট' বিশ্বজোড়া বেসট সেলার। এই লেখার পিছনে ছিল লরড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে লেখকদের ৪২ দিন ধরে রেকরড করা ১৬০ ঘণ্টার কথোপকথন। অনেকে এক সময় বলেওছিলেন বইটার অনেকখানি যেন মাউন্টব্যাটেনের চোখে দেখে লেখা। অনেকের ধারণাও হয়েছিল এক বিশেষ অর্থে বইটার নায়ক লরড মাউন্টব্যাটেনও। কিন্তু সে সব অন্য কথা। আই আর এ-র বোমায় মাউন্টব্যাটেন নিহত জেনে এক অমোঘ কারণে আমার মনে পড়েছিল দোমিনিক লাপিয়েরকে। হয়ত মনে পড়েছিল ক্যামবেল জনসনকেও (যাঁর অমোঘ ডায়েরি-গোত্রের 'লাসট ডেজ অফ দি ব্রিটিশ রাজ'-এর মাধ্যমে আমরা ভারতে বৃটিশ রাজত্বের গোধূলিবেলার একটা বিষণ্ণ চিত্রনাট্য পেয়েছিলাম), কিন্তু তিনি কোথায় আমি জানি না। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম দোমিনি লাপিয়ের প্যারিসেই আছেন, দু'দিন পর লরডের ফিউন্যারাল দেখতে লন্ডন যাবেন। আমি ফোনে ওঁর স্ত্রীকে বললাম, আমি লরডের শেষ দিনগুলোর একটা বর্ণনা পেতে চাই দোমিনিকের কাছে, দোমিনিকের ভাষায়। পরের দিন দোমিনিক নিজেই আমায় ফোন করে বললেন, আপনি আজ বিকেল পাঁচটাতেই আসুন। আমি অপেক্ষা করব।

সাঁজেলিজে-র চত্বরে, লারক দ্য ত্রিয়োফের থেকে ৯০০ গজ দূরে, অ্যাভেন্যু ক্লেবের-এর এক চমৎকার দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন দোমিনিক লাপিয়ের। ওঁর ফ্ল্যাটের দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন দোমিনিক। আনন্দবাজার পত্রিকাকে সরাসরি নামে চেনেন। খুশি হলেন শুনে যে আমি বাংলাতেই লিখব। বললেন, আপনি যা মনে আসে প্রশ্ন করে যান। লরডের সম্পর্কে আমি সারাদিন ধরে বলতে পারি। আমি যেন এখনও চোখের সামনে লোকটাকে জ্যান্ত দেখতে পাচ্ছি। আমি এবং ল্যারি 'ইজ প্যারিস বারনিং?' এবং 'ও, জেরুজালেম' লেখার সময় আইজেনহাওয়ার, বেন গুরিয়ন এবং গোলডা মায়ারের মতন চাঁই চাঁই লোকের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু মুগ্ধ যদি সত্যিকারের হয়ে থাকি তবে তা' মাউন্টব্যাটেনের দ্বারাই। এক রাজকীয়, দীর্ঘাঙ্গ, সুপুরুষ, ৭২ বছরের জোয়ান পুরুষ হিসেবেই ওঁকে দেখলে ভুল হবে। না হলে এত গভীর, প্রান্তিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উনি গান্ধীকে ভালবাসলেন কেন? নেহরুকে ভালবাসলেন কেন, সেটা বোঝা যায়। কিন্তু গান্ধী?

এরপর অসংখ্য কথা বলে গেলেন দোমিনিক। আমাকে এবং আমার প্রশ্নগুলো পেয়ে যেন ১৯৭২ সাল থেকে চেনা সদ্য প্রয়াত রাজকীয় পুরুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর এক বাঞ্ছিত সুযোগ পেলেন। শেষে নিজের কথার বিস্তার দেখে নিজেই অবাক হয়ে বললেন, আপনি এর থেকে নিজের মতন করে লিখে দেবেন। আমি বললাম, আপনার কথা যখন তখন আপনার মতই লিখব। তখন হেসে বললেন তাহলে দুজনের মতন করেই লিখবেন।]

আমি ১৯৭২-এ যখন লরড মাউন্টব্যাটেনকে দেখি তখন উনি বৃদ্ধ ঠিকই, কিন্তু বার্ধক্যের কিছুই ওঁর শরীরে কিংবা মনের মধ্যে ছিল না। উনি তখনও সুপুরুষ। এবং বর্ণনাতীতভাবে রিগ্যাল...রাজকীয়। এবং মনের কথা যদি বলেন...ওঃফ্! তাঁর জীবনের সমস্ত বছর ধরে যা যা উনি করেছেন, ভেবেছেন, লিখেছেন সব ছিল ওঁর নখদর্পণে। ওঁর ব্রডল্যান্ডসের গ্রামের বাড়ির বেসমেনটে আমাকে একে একে দেখালেন জীবনের সমস্ত কাজের, সমস্ত প্রয়োজনের এবং অপ্রয়োজনের কাগজপত্র। আমি একটা চিঠি কুড়িয়ে দেখলাম সাল লেখা আছে ১৯১৪। চিঠিটা লিখেছেন জার দ্বিতীয় নিকোলাস। কিশোর মাউন্টব্যাটেনকে রাশিয়ায় গিয়ে ছুটি কাটিয়ে আসার জন্য সস্নেহ নিমন্ত্রণ। পাশেরই এক দেরাজে দেখলাম ছোট্ট ছোট্ট অসংখ্য চিরকুট। ওগুলো, লরড বললেন, মহাত্মা গান্ধীর। গান্ধী মঙ্গলবার-মঙ্গলবার মৌন অবলম্বন করতেন। তখন লরডের সঙ্গে গুরুতর কথা থাকলে চিরকুট লিখে দিতেন। এবং আশ্চর্য! লরড গান্ধীজীর সেই অসংখ্য চিরকুট এনে যত্ন করে রেখেছেন ওঁর নিজের কাছে। চার্চিলের ভাষায় সেই অর্ধ-উলঙ্গ ফকিরকেই মন দিয়ে ফেলেছিলেন ব্রিটিশ রাজপরিবারের এই অমূল্য রত্নটি।

লরড মাউন্টব্যাটেনকে একজন গতানুগতিক রাজপুরুষ বলে আমার বা ল্যারি কারোরই মনে হয়নি। স্বভাবসিদ্ধ রাজকীয়তার সঙ্গে উনি একটা রাজনৈতিক চেতনা এবং বাস্তববোধ মেশাতে পেরেছিলেন। তাই সদ্য জেল থেকে ছাড়া পাওয়া জওহরলাল নেহরু যখন সিঙ্গাপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান তখন একশ' একটা লোকের বাধানিষেধ অমান্য করে মাউন্টব্যাটেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তখন নেহরুর জুতোতে পারতপক্ষে ব্রিটিশ জেলের ধুলো লেপটে আছে। জনান্তিকে মাউন্টব্যাটেন সেদিন বলেছিলেন, এরা কি চোখ থাকলেও দেখতে শেখেনি? এই নেহরু লোকটাই তো ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। মাউন্টব্যাটেন নিজের প্রকাণ্ড গাড়িতে করে নেহরুকে সেদিন তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁদের বন্ধুত্বের বাস্তবিক সূত্রপাত ওইখানেই। ভারতে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিঁকবে না, টেঁকার নয়, মাউন্টব্যাটেন সেটা ভাইসরয় হবার বহু

ই জানতেন। আমার বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই ন আর্টালর সংগে মাউণ্টব্যাটেন দেখা করতে ন সেখানে এই ভাবনাগুলোই তাঁর মনের আকাশটা আছে।

মাউণ্টব্যাটেনের জীবনটা বেশ কতকগুলো ভাগে । প্রথমত তিনি টিপিক্যাল মেমম্বার অফ দি দটি। সুপুরুষ, নিজের বংশ, রক্ত এবং কৃতিত্বে ত। কিন্তু এটা কেবল শুরু। এর পর তিনি ন, অত্যন্ত বিচক্ষণ, সার্থক যোদ্ধা। তারপর নীতিক। আমি জানি না ব্রিটিশরা ঠিক কতখানি রাজনীতির কদর করবে। সেটা আপনারা, তাঁরা বেশি জানেন। সেটা বুঝতেন মহাত্মাজী, বুঝতেন নেহরু। আমার নিজের ধারণা আমরা সীমা বর্তে যেতাম যদি ইন্দোচীন কিংবা আল-রিয়ায় মাউণ্টব্যাটেন গোত্রের একটা মানুষ আমরা সম। দুটো বিবাদী পক্ষের মন বোঝার মতন তা ছিল মাউণ্টব্যাটেনের। নাহলে ইংল্যাণ্ডে যা না তাই তো হল আপনাদের ভারতে! ওঁর তিতে এক সপ্তাহ শোক পালন! লরড নিজেও কিন্তু ধিক ভালবাসতেন ভারতকে। ব্রিটেনের সাহেবরা ক ঈর্ষা করত। এতখানি সাফল্য ব্রিটিশরা হজম তে পারে না। ওদের ধারণা মাউণ্টব্যাটেন বড্ড বেশি ম পেয়েছিলেন জীবনে। কিন্তু সে কথা থাক, যা ছিলাম। লরডের শেষ দিকটা বুঝি তাঁর মানবতার ক। তাঁর ভালবাসা তিনি তাঁর রাজপরিব্যারের মধ্যেই ম করে দেননি। জীবনের শেষ অধ্যায় অবধি তিনি ন দশ বারোটা চিঠি পেতেন ভারত থেকে। তিনি র প্রত্যেকটি মন দিয়ে পড়ে উত্তর পাঠাতেন। আমি খছি অত্যন্ত সাধারণ ভারতীয়রাও নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা লিখে ওঁকে চিঠি দিতেন। এছাড়া ওঁর গুগ্রাহীরা তো ছিলেনই। আমার ধারণা লরড ওঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতের সংগে ওঁর সম্পর্কটা চিরে রাখতে চেয়েছিলেন।

আমি ভাবতে পারি না লরড মাউণ্টব্যাটেন যে নৃশংস পদ্ধতিতে তাঁকে হত্যা করা হল তার কত নিন্দে করব? নিন্দের শেষ নেই। কিন্তু আমার ধারণা ওরকম কিংবদন্তীর মানুষ যে অথর্ব হয়ে মারা গেলেন না সেটাও সুখের। লরড নিজেও ঘৃণা করতেন একটা জরাগ্রস্ত, অথর্ব জীবন। দুই মাস আগে ওঁকে ঘোড়ায় চেপে পোলো খেলতে দেখে এসেছি। তাঁকে কোনদিন হুইলচেয়ারে দেখার ইচ্ছে আমার ছিল না। সেটাই হলো, তিনি কিংবদন্তীর নায়কের মতন প্রস্থান করলেন।

দ্য গল এবং মাউণ্টব্যাটেনের জীবনী লেখার মধ্যে পছন্দ করতে হলে আমি হয়ত দ্য গলের জীবনীই লিখব। কিন্তু আমি জানি ফ্রান্সের ক্ষেত্রে দ্য গল যতখানি অনিবার্য, ওয়েস্টার্ন কমাণ্ডের উপাখ্যান রচনায় আইজেনহাওয়ার যতখানি অনিবার্য, ভারতের এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ে মাউণ্টব্যাটেনের ভূমিকা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম না। ভারতের দেশ বিভাগের ওপর আমার এবং ল্যারির চার ভল্যুমের ইতিহাস যা লেখা হচ্ছে তার প্রথম খণ্ডে লরডের কথাই পুরোপুরি। সে খণ্ড আপাতত ছাপাখানায়।

মাউণ্টব্যা[illegible]নের সংগে গান্ধীর বোঝাপড়ার পিছনে কাজ করেছিল গান্ধীর স্নেহ এবং লরডের উদারপন্থা। উনি গান্ধীর কার্যকলাপকে বুজরুকি মনে করতেন না। উনি জানতেন এই মানুষটা কীভাবে ভারতের কোটি কোটি মানুষের অন্তরে দোলা দিতে পারেন। তবে উনি একেবারেই উৎসাহ পেতেন না জিন্নার সংগে সাক্ষাৎ-কারে। উনি এও জানতেন জিন্না এক বিশেষ অর্থে এক-জন অসাধারণ পুরুষ। গোঁয়ার...যেমন ছিলেন আমাদের দ্য গল...এবং কট্টর। ওঁর বেশ কিছু দারুণ ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন ওঁকে সহ্য করতে পারতেন না। আমাকে বলেছিলেন যে জিন্না ক্রমাগত ওঁর কাছে একটা [illegible] উঠেছিলেন। [illegible]

[illegible] মাউণ্টব্যাটেনের [illegible] আমার কথা হয়েছিল। ব্রিটিশের অফিসিয়াল লাইন ছিল বোস দেশদ্রোহী। তবে প্রত্যক্ষভাবে বোসের সংগে তাঁর আলাপ না থাকায় তাঁর সম্পর্কে কোন ভালো-খারাপ মন্তব্য কখনো করেননি। তবে ওঁর কাছে নানান মজার মজার কথা শুনেছিলাম ভারতের রাজা মহারাজা-দের ব্যাপারে।

শেষ জীবনেও বেশ সুখী মানুষ ছিলেন লরড মাউণ্টব্যাটেন। ১৯৬৪ কি ৬৫তে সমস্ত কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েও তিনি অসংখ্য (অন্তত ২০০) প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্মানীয় ভাবে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া আজ এখানে বক্তৃতা, কাল ওখানে বক্তৃতা, পরশু সেখানে সেমিনার...এসব তো ছিলই। এরকম একটা ব্যস্ত প্রবীণ লোক আমি কমই দেখেছি জীবনে। সাধারণভাবে ওঁর একটা ইণ্টারভিউ পেতে অন্তত দুই বছর অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু যুদ্ধের সময়কার ওঁরই এক ফরাসী বন্ধু ১৯৭২ সালে ব্রিটেনে ফরাসী অ্যামবাসাডর ছিলেন। আমরা তাঁকে ধরে এক ডিনারে লরডের সংগে প্রথম আলাপ করি। আর সেই আলাপেই আমাদের সাত বছরের সম্পর্কের সূত্রপাত। মনে আছে সেই ডিনারের শেষে লরডই তাঁর গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে গেলেন ওঁর ক্যাসলে। তারপর ওই বইয়ের কারণে দেখা হয়েছিল ৪২ বার। আমাদের বই পড়ে উনি যার পর নেই খুশি হয়েছিলেন। ওঁর ধারণা হয়ে-ছিল আমরা ওঁকে ওঁর প্রাপ্য সম্মান এবং সহানুভূতিটুকু দিতে পেরেছি।

আর কিছুদিন পর প্রিন্স চার্লস ভারতে যাচ্ছেন। লরডের ইচ্ছে ছিল ওঁর সংগে যাবার। বহুদিন পর ভারতে যাবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। ওঁকে একজন ইণ্ডোফিল (Indophile) বললে ভুল হয় না। আপনাদের কবি টেগোরের লেখার সংগে ইংরেজীর মাধ্যমে ওঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাছাড়া আরো বহু লেখক, আমি অবশ্য হ্যানড নাম বলতে পারছি না। ওঁকে ভারতবাসীরাও যে কতখানি ভালবাসা দিয়েছিল তা কাগজ পড়েই বুঝতে পারছি।

এবারের অমরনাথ যাত্রা

সীতারাম বেহাণী

বহুকালের একটা প্রচলিত প্রবাদ হলো, 'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।' কিন্তু এবারে অমরনাথ যাত্রায় আমার যে অভিজ্ঞতা হলো, তাতে নিঃসন্দেহে প্রবাদটি হওয়া উচিত ছিল, 'সব তীর্থ বার বার, অমরনাথ একবার।' আসলে গঙ্গাসাগর সম্পর্কে এ-প্রবাদ যখন চালু হয় তখন গঙ্গাসাগর যাত্রার দুরূহ অবস্থার দরুন বয়স্ক তীর্থযাত্রীরা তো তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আসতেন। অর্থাৎ 'এ-দেখা শেষ দেখা' ভেবেই গঙ্গাসাগরের যাত্রা তখনকার দিনে শুরু হতো। কিন্তু আজ আর সেদিনের বিপদসংকুল পথঘাট ও যানবাহন ও যাত্রার ঝক্কি নেই। এখন গঙ্গাসাগর মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার যাত্রা। আর তাছাড়া সেকালে অমরনাথ যাত্রা এতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। অমরনাথ মানস সরোবরের দলে পড়ে যেত, তাই এ তীর্থ নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামাতেন না। সেদিনের প্রাধান্য-না-পাওয়া তীর্থ আজ কিন্তু আর সে-তীর্থ নেই। অমরনাথ যাত্রা নানা সংকটে পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও আজ এ-তীর্থ ভ্রমণে অজস্র লোকের বিরাট আগ্রহ। আজকের দিনেও এটিই সব চাইতে দুর্গম তীর্থ। এখান থেকে নিশ্চিন্তে ফিরে আসতে পারবেন এ কথা কেউই জোর দিয়ে বলতে পারবেন না। অমরনাথ যাত্রা কিছুটা জুয়া খেলার মতো। হয় জিৎ নয় হার, তা না হলে সমান সমান। অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত না হয়ে বেঁচেবর্তে ভালভাবে ফিরে এলেই জিৎ, কাউকে ওখানে চিরতরে ফেলে এলে হার এবং দুঃখকষ্ট ও বিপদে মরণবাঁচন সমস্যায় পড়েও ঘরে ফিরে আসা মানে হার-জিৎ কিছুই নয়। অমরনাথ যাত্রায় প্রকৃতি সদয় থাকলে যাত্রীরা এক অনাবিল আনন্দ ও অনুভূতি নিয়ে ফিরে আসেন। আর সেই প্রকৃতিদেবী বিরূপ হলে অজস্র দুঃখকষ্টে যাত্রীদের ফিরতে হয়—যায় পথে অতি প্রিয়জনকেও হারিয়ে আসতে হয়। এই যাত্রায় বিরাট ঝুঁকি, মনের জোর ও সর্বোপরি সেই সর্বশক্তিমানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই পথ চলতে হয়। আমার জীবনে প্রথম অমরনাথ দর্শনে গিয়ে অদ্ভুত এক মিশ্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার কথাই আমার এই লেখায় বিশদভাবে বর্ণনা করতে চাই।

প্রতি বছর শ্রাবণী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী পবিত্র অমরগঙ্গার কাছে বিশাল গুহায় আপনা থেকে বরফে নির্মিত শিবলিঙ্গ দর্শনে যান। এই তীর্থ সবারই কাছে অমরনাথ তীর্থ নামে পরিচিত। হিন্দুদের দৃঢ় বিশ্বাস অমরগঙ্গার এই পুণ্য-তিথিতে মাত্র একটি বার ডুব দিতে পারলে এবং বাবা অমরনাথের একবার দর্শনেই সব পাপের বোঝা লাঘব, নিশ্চিত মোক্ষলাভ এবং পুনর্জন্মের আবর্তন থেকে নিঃসন্দেহে চিরতরে মুক্তি। এ-কথাও ভক্তরা বিশ্বাস করেন, এই সেই গুহা, যে-গুহায় বসে শিব পার্বতীকে ঐতিহাসিক অমরকথা শোনান। আর এই অমরকথা শোনবার পর শুকদেব অমরত্ব লাভ করেন। অমরকথার এই বর্ণনা ভৃগুসংহিতা, নীলমত পুরাণ, তীর্থসংগ্রহ আদি গ্রন্থেও উল্লেখ পাওয়া যায়। যা-হোক, এখানে মানুষ কিছু সময়ের জন্য পার্থিব অনুভূতি থেকে নিস্তার পেয়ে যান। ইহলোককে অস্বীকার করে পরলোকের চিন্তায় সবাই মশগুল হয়ে পড়েন। এমন ভক্ত আজও আছেন যাঁরা সেই সুদূর ভাগীরথীর উৎস গোমুখ থেকে অমরনাথ হেঁটে পৌঁছোন। অনেক সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি এঁরা আরও দূর দূর প্রান্ত থেকে এখানে খালি পায়ে হেঁটে আসেন। এঁরা ধর্মের প্রেরণায় ভুলে যান পথের ক্লান্তি ও দুঃখকষ্ট। এঁরা যেন সব সংহতির দূত।

আপনা থেকে নির্মিত অমরনাথের বরফের আট ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ

যুগযুগান্তর থেকে এঁরা ছড়িয়ে চলেছেন সংহতির বাণী। এক প্রান্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন অন্য অপরিচিত প্রান্তের। সবাই বুঝেছেন—ভৌগোলিক এবং ভাষা-বর্ণের বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক বোঝাপড়ায় কিন্তু এঁরা একাত্ম। মোক্ষই যেখানে মুখ্য আকর্ষণ সেখানে পার্থিব ব্যবধান ত শুধুই মায়ার খেলা—শীতের ভোরের কুয়াশা এবং তা জ্ঞানের আলোকে নিমেষেই কেটে যেতে বাধ্য।

এই সুপ্ত তুষারতীর্থ বিশেষ শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন ছাড়াও ফি বছর কয়েকটি সপ্তাহের জন্য আনন্দ-কলরবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এ-কথা মোটেই ঠিক নয় যে, শিবলিঙ্গ অমবস্যার দিনে ও বছরের অন্যান্য সময়ে গলে যায়। তবে শ্রাবণীপূর্ণিমার দিনে বরফের শিবলিঙ্গ পূর্ণ ও সর্বোচ্চ আকার ধারণ করে বলে এই দিনটিতে দর্শনেরই মাহাত্ম্য সর্বাধিক এবং এই দিনেই পুণ্যার্থীদের সর্বাধিক ভীড় হয়। এ-ছাড়া আষাঢ় মাসে গুরুপূর্ণিমার দিনও প্রচুর যাত্রী দর্শনে আসেন। গ্রীষ্মকালে বাকি কিছু দিনের জন্য যাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে এই তীর্থদর্শনে যান। এই সুপ্রাচীন তীর্থে বেশীর ভাগ তীর্থযাত্রীই আসেন জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান ও হরিয়ানা রাজ্য থেকে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অল্পসংখ্যক তীর্থযাত্রী ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুরসংখ্যক বিদেশীদেরও ভীড় হয় অমরনাথের পথে। এঁরা হয়ত স্বচক্ষে দেখতে চান বা দেখে বিশ্বাস করতে চান কী দুর্নিবার আকর্ষণে সহস্র সহস্র হিন্দু তীর্থযাত্রীর দল ছুটে চলে অজস্র দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁদের দেবদেব দর্শনে। বহু বিদেশীর (যার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাও প্রচুর) সঙ্গে কথা বলে আমার এ-ধারণাই হয়েছে। এঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন যখন পথে সম্মিলিত কণ্ঠে থেকে থেকেই উচ্চারিত হতে থাকে 'বাবা অমরনাথকী জয়', 'ভোলে শংকরকী জয়'। প্রতিটি জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই যেন যাত্রীরা নতুন উদ্যম পেয়ে হাঁটতে শুরু করেন। আর সেই জয়ধ্বনিতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ললিতাগিরি প্রবন্ধের একটি লাইন আমারও বার বার মনে পড়ে, 'হিন্দু-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি।'

আসলে পহলগাম থেকে অমরনাথ যাত্রা শুরু। এখান থেকে গুহা পর্যন্ত যাত্রীদের পায়ে হেঁটে যেতে হয়। তবে দুর্বল বা বয়স্ক যাত্রীদের জন্য

গুহাদ্বারে যাত্রীরা লাইনে দাঁড়িয়ে

Interpub/AM/4/79-BN.

ঘোড়ার পিঠে বা ডান্ডীতে যাওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। এবারে ঘোড়া পিছু সরকারী ভাড়া ধার্য হয়েছিল দু'শ তিরিশ টাকা আর ডান্ডী পিছু সতের শ টাকা। ডান্ডীতে ছয় জন লোক যাত্রীকে বয়ে নিয়ে যায়। এদের অমানুষিক পরিশ্রমের তুলনায় এতোগুলো টাকা কিন্তু কিছুই নয়। সঙ্গে মালপত্র বইবার জন্য প্রায় সব যাত্রীকেই কুলি ভাড়া করতে হয়। তিরিশ কিলো মাল বইবার জন্য প্রতি কুলির ভাড়া একশ পনেরো টাকা। এ-সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য পহলগাম থেকে মাইলখানেক দূরে একটি অফিস সাময়িকভাবে খোলা হয়। অফিসটি শহরের ভেতরে কোথাও না করে এত দূরে করবার যথার্থতা বুঝতে পারিনি। এ-বছর মুখ্য দর্শনের পুণ্যতিথি পড়েছিল আটই আগস্ট আর পহলগাম থেকে যাত্রা শুরুর দিন ছিল পাঁচই আগস্ট। যাত্রার দু'দিন আগে থেকে যাত্রীদের জন্য রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই দু'দিন কোন মতেই কাউকে এগোতে দেওয়া হয় না। চিরপ্রথানুসারে শ্রীনগরের মোহন্ত দশনামী আখড়ার তরফ থেকে 'ছড়ি' প্রস্থানের পরই যাত্রার শুরু। এই ছড়ির সঙ্গে অজস্র সাধুসন্ন্যাসীও রওনা হন। নাগা সন্ন্যাসীরও বিরাট এক অংশ এদের মধ্যে থাকেন। নাগাদের সঙ্গে বিদেশীদের খুব মাখামাখি দেখেছি। আসলে নাগাদের কাছে নেশাটেশা করবার অনেক প্রকরণ থাকায় এঁদের প্রতি বিদেশীদের এত বেশী আকর্ষণ। বলাই বাহুল্য সেই ছড়ির ৫ তারিখ রাত্তির দুটোর সময় প্রস্থানের পর আমি, আমার মা, দাদা ও বউদি যাত্রা শুরু করলাম। অবশ্য যাত্রার দু'দিন আগেই আমরা পহলগাম পৌঁছে যাই ও একটা তাঁবু ভাড়া করে খোলা আকাশের নীচেই তাঁবু খাটিয়ে দু'দিন কাটাই। যাত্রীদের বিরাট ভীড়ের দরুন হোটেলেরও খাবারদাবারের দর এ-সময় ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে-সমস্ত হোটেলে অন্যান্য সময়ে ছোট কামরা কুড়ি টাকায় পাওয়া যায় তারই দর এ সময় হয় একশ টাকার কাছাকাছি। এই অস্বাভাবিক বর্ধিত হার নিয়ে কোথাও কোন প্রশ্ন করা চলে না। অতএব যাত্রীদের করবার কিছুই থাকে না। আসলে এ-দিকটা রাজ্য সরকারেরই নজর দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু সরকারী তরফে এ-ব্যাপারে সামান্যতম ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে আমার মনে হলো না। কোন পুলিস বা সরকারী কর্মচারীর কাছে কোন অভিযোগ করলে তাঁরা কাঁধ উঁচু করে হাত দেখিয়ে ওঁদের কিছুই করার নেই বলে সোজাসুজি জানিয়ে দেন। আমরা পহলগামে তাঁবুতে থাকতে পেরেছি বলে ভাগ্যবানই বলতে হবে। হাজার হাজার যাত্রী জলে রাস্তার ওপরেই রাত কাটিয়েছেন। ফলে কিছু কিছু যাত্রীকে নিউমোনিয়া নিয়েই যাত্রা শুরু করতে হয়েছে। সরকারের তরফে কর্তব্যে গাফিলতি ও অবহেলা সম্পর্কে পরে আসছি।

যা হোক পহলগাম থেকে ষোল কিমি পথ হেঁটে আমরা প্রথম বিশ্রামস্থল চন্দনবাড়ি পৌঁছলাম। আমাদের মধ্যে একমাত্র মায়ের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। চন্দনবাড়ি পৌঁছে বিরাট এক সমস্যায় পড়া গেল। জায়গাটির সর্বত্রই তাঁবুতে পরিপূর্ণ। কোথাও তাঁবু খাটানোর জায়গা অবশিষ্ট নেই। এর মধ্যে নানা ভ্রমণ প্রতিষ্ঠানের তাঁবু আর বাকিগুলো সব ব্যবসার খাতিরে ভাড়ার তাঁবু লাগানো হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু সরকারী তাঁবু। আর এক বিরাট সমস্যা জল ও শৌচ ব্যবস্থার। অথচ হাজার হাজার যাত্রীর আগমন অব্যাহত। কোন মতে এক টুকরো জায়গা খুঁজে পেতে তাঁবু খাটালাম। রাতটা তো কাটাতেই হবে। চন্দনবাড়ি সমুদ্রতট থেকে সাড়ে ন' হাজার ফুট উচ্চে। অর্থাৎ পহলগাম থেকে আরও দু হাজার তিনশ ফুট উঁচুতে। আবার সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আসলে এখান থেকে অমরনাথ যাত্রার কঠিন চড়াই-উৎরাই শুরু হয়। পহলগাম থেকে চন্দনবাড়ি পর্যন্ত মোটরের রাস্তা। রাস্তাও সহজ। যাত্রীদের মোটরে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিলে পুরো একদিনের পথশ্রান্তি কমে যায়। চন্দনবাড়ি

গুহাভ্যন্তরে নাগা সন্ন্যাসীর দল

থেকে বেরিয়েই বিখ্যাত পিসু ঘাঁটি পর্যন্ত রাস্তা শুধু চড়াইয়ের। চড়াইয়ের আগে ওপরের দিকে তাকালে যাত্রীদের পিঁপড়ের সারির মতন মনে হয়। অত উচ্চতায় এঁকেবেঁকে সরু রাস্তা ধরে উঠতে হবে ভাবলেই গা ছমছম করে। এবড়ো-খেবড়ো এই দু মাইলের চড়াই সত্যিই খুব কঠিন। একটু একটু এগিয়েই দম ফুরোতে থাকে। ঘোড়াগুলোকে দেখে বার বার মনে হয় এই উল্টে গেল বুঝি। কথিত আছে প্রাচীন যুগে শিবের দর্শন হেতু দেবতা ও রাক্ষসরা পিসু ঘাঁটির ওপরে কারা প্রথম উঠবে, এই নিয়ে বিবাদ বাধে। অতঃপর পিসু ঘাঁটির উপরে দেবতা ও রাক্ষসদের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়।

যাক সে-সব কথা। ছয় তারিখে বার কিমি হেঁটে দ্বিতীয় বিশ্রামতট শেষনাগে পৌঁছোনো গেল। শেষনাগ সমুদ্রতট থেকে এগার হাজার সাতশ তিরিশ ফুট উচ্চে এবং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব রমণীয়। এখানকার সৌন্দর্য অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে শেষনাগ হ্রদ। সর্পিল বহু নদী ও ঝরনা এসে মিশেছে এই হ্রদে। উঁচু থেকে হ্রদের পারপাশে সাপের লেজের মতো অসংখ্য জলধারা চোখে পড়ে। তাই বুঝি এর নাম শেষনাগ। হ্রদের সবুজ জলরাশির দিকে তাকালে যাত্রার শ্রান্তির অনেকখানি উপশম ঘটে। শীতকালে হ্রদটি পুরু বরফের চাদরে ঢাকা থাকে। শেষনাগে তাঁবু খাটাবার জায়গা পেতে বিশেষ কোন কষ্ট হল না। তবে পানীয় জল ও খাবার-দাবারের অবস্থা ও ব্যবস্থা শোচনীয়। সরকারী সব রকম সাহায্যের ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। একটা ছোট্ট তাঁবুর ধারে ঘোষণা করবার একটা মাইকের ব্যবস্থা দেখলাম। যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে বা কুলিদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে এখান থেকে ঘোষণা করা যেতে পারে। এই ছোট্ট জায়গায় যাত্রীদের অনবরত প্রচণ্ড ভীড়। তাঁবুর ধারেই দুটি চোঙ্গা লাগানো। এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকায় কয়েক সহস্র যাত্রীর জন্য সামান্য দুটি চোঙ্গা কতখানিই বা সাহায্য করতে পারে! তাই কাছের কিছু লোক ছাড়া মাইকের আওয়াজ কারুর কানে আসেনি। অমরনাথের রাস্তায় প্রতিটি বিশ্রামস্থলে এই নীচুমানের ঘোষণার ব্যবস্থা। এই ধরনের অন্যান্য বহু মেলায় দেখেছি চতুর্দিকে প্রচুর অ্যামপ্লিফায়ার ছড়ান থাকে যাতে ঘোষকের কণ্ঠস্বর কাছে দূরে সবাইর কানে পৌঁছোয়। কিন্তু এখানে বিরাট ব্যতিক্রম মনে হলো। আর খাবারের দোকানে ত দামের কোন সমতাই নেই। যে যা খুশি মতন দাম আদায় করে। রাজ্য সরকারী যন্ত্র অমরনাথের জন্য এত অচল কেন

সেটা আমার মতো অনেক যাত্রীরই বোধগম্য ন[illegible] যেখানে প্রতি বছর হাজার হাজার যাত্রীর সমা[illegible] ঘটে সেখানে আরও একটি মজার ঘটনা হল এ[illegible] বিশ্রামস্থল থেকে অন্য বিশ্রামস্থলের দীর্ঘ যাত্[illegible] রাস্তায় কোন কারণে হঠাৎ আটকে পড়লে থাকবার কো[illegible] ব্যবস্থাই নেই। আর এই দীর্ঘ পথে না আ[illegible] পর্যাপ্ত চা-খাবারের দোকান। এটা আমার খু[illegible] অদ্ভুত লেগেছে। যে যাত্রীরা প্রতি বছর স্থানী[illegible] সরকারকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে আসে[illegible] ও স্থানীয় লোকেদের মুখে অন্ততপক্ষে করে[illegible] দিনের জন্য হাসি ফুটিয়ে তোলেন, তাঁদের প্রতি[illegible] সরকারের এ-হেন অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ভ[illegible] খুবই বেদনাদায়ক। এদিককার স্থানীয় লোকের[illegible] ভীষণ গরীব। এদের শতছিন্ন পরিধানেই এদে[illegible] দুঃখদৈন্য ফুটে ওঠে। অথচ বদ্রী-কেদার-গাঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর রাস্তায় এই অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। ওখানে পুরো রাস্তায় পায়ে পায়ে খাবারদাবারের দোকান ও থাকবার জন্য রয়েছে চটি ও ধর্মশালা। সেখানে আবার লেপতোশক পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। যে গোমুখে যাত্রীদের খুব অল্পসংখ্যকই যান, সেখানেও রাস্তায় এক সাধুবাবার চটিতেও থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে দেখেছি। যা-হোক, শেষনাগে রাত কাটিয়ে ৭ তারিখ সকালে আমরা আবার রওনা দিলাম পরবর্তী বিশ্রামস্থল পঞ্চতরণীর উদ্দেশ্যে।

পঞ্চতরণী যাওয়ার পথে বেশ কয়েকটি উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হয়। অতএব রাস্তা বিপুল চড়াই-উৎরাইয়ের, সেটা বলাই বাহুল্য। এর মধ্যে সর্বোচ্চ যে চূড়ায় উঠতে হয় সেটির নাম হলো মহাগুণা টপ। এস্থান সমুদ্রতট থেকে সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চে। এখানে অক্সিজেনের অভাব থাকায় অনেকেই শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন। বিশেষ করে বয়স্ক, হৃদরোগী ও যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাঁদের পক্ষে জায়গাটি সময় বিশেষ মারাত্মক। অমরনাথের রাস্তায় যাত্রার এই কটা দিনে অনেক জায়গাতেই ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে দেখলাম। এদিনকার আবহাওয়া এত চমৎকার ছিল যে, তুলনামূলকভাবে যাত্রীদের শ্বাসপ্রশ্বাসে অনেক কম কষ্ট হয়েছে। সূর্যদেবও এতই সুপ্রসন্ন ছিলেন যে, শুধু একটা শার্ট গায়ে আমার হাঁটতে এতটুকুও কষ্ট হয়নি। শেষনাগ থেকে তের কিমি পথ হেঁটে বার হাজার ফুট উঁচুতে ভৈরব পর্বতের কোলে অবস্থিত পঞ্চতরণী পৌঁছুনো গেল। পাশ দিয়ে পাঁচটি ধারা মিশে একটি নদীর আকার নিয়ে পঞ্চতরণীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। এখান থেকেই মন্দিরাভিমুখে যাত্রা। কয়েকদিন ধরেই

এতে আছে,
স্বাস্থ্যবর্ধক উচ্চ-প্রোটিন
শরীর গঠনের উপযোগী সংগুণ ও
অতি প্রয়োজনীয় পৌষ্টিক গুণ!
যে স্বাদ আপনার পরিবারের
সবার মনের মত...

নতুন

মিলমেকার

ব্যবহার ক'রে দেখুন—আজই।

স্বাস্থ্যের উন্নতি করুন!

সোয়া প্রোটিন সমৃদ্ধ এই মিলমেকার, শরীরে ভেজিটেবল প্রোটিন যোগানোর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। সাধারণ ভারতীয় আহারে এটি প্রয়োজনীয় প্রোটিনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

৩.৯ লিটার দুধে অথবা ১ কিলো মাংসে অথবা ২৪টি ডিমে যতখানি প্রোটিন থাকে ২৫০ গ্রাঃ মিলমেকার-এ ততখানিই প্রোটিন থাকে। শুধুমাত্র মিলমেকার-এই আপনাকে এত কম খরচে এত বেশী পুষ্টি যোগাবে।

এতে ফ্যাট খুব কম থাকে! মিলমেকার-এ স্নেহপদার্থ, বা ফ্যাট বলতে গেলে একেবারেই থাকে না। কিন্তু এতে কোলেস্টেরোল বা স্যাকারাইডস্ থাকে ব'লেই এটি সারা পরিবারের আদর্শ আহার রূপে পরিগণিত হয়েছে।

এটি সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার!

মিলমেকার শতকরা ১০০ ভাগই নিরামিষ। এটি উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত হয় ব'লে যে কোনো খাবারে এটি মেশালে সেই খাবার অত্যন্ত পুষ্টিকর হয়ে ওঠে। মিলমেকার-এ শরীর সুগঠিত করা ও স্বাস্থ্যে ঝলমল ক'রে তোলার গুণ আছে ব'লেই, এর জুড়ি মেলা ভার।

আমিষভোজীদের জন্যেও এটি একেবারে উপযুক্ত!

মিলমেকার নিরামিষ আহার হলেও, মাংসের সঙ্গেও এটি সুন্দরভাবে মিশে যায়। রান্না করা মাংসের মধ্যে এটি মেশান আর প্রতিদিন সবার পাতে পরিবেশন করুন—কোনো রকম বাড়তি খরচ ছাড়াই।

...এর স্বাদ? একেবারে অতুলনীয়!

মিলমেকারের স্বাদ আপনার পরিবারের সবার খুব পছন্দ হবে। সর্বগুণসম্পন্ন অসাধারণ এই মিলমেকার সব ধরনের রান্নার ভেতর থেকেই মসলার ঝাঁঝ শুষে নিতে পারে। নিরামিষ বা আমিষ যে কোনো ধরনের রান্নাই হোক বা মিষ্টিই হোক, মিলমেকার সবকিছুতেই মুখরোচক স্বাদের বিভিন্নতা আনতে পারে। প্রত্যেক প্যাকের সঙ্গে দেওয়া রান্নার প্রণালীর পুস্তিকা আছে কিনা দেখে নেবেন।

অপূর্ব স্বাদ ও পুষ্টির জন্যে—নিয়ে আসুন

মিলমেকার

খাওয়া-দাওয়া বিশেষ একটা হচ্ছিল না। কয়েকটি খাবারের দোকানে গিয়ে বিস্মিত হয়ে গেলাম। দেখি সর্বত্রই নিম্নমানের ভাত-রুটি-তরকারি ছাড়াও ডিম, অমলেট ও লস্যি। আমরা যেহেতু পুরোপুরি নিরামিষাশী, তাই এ সমস্ত দোকানে খেতে রুচি হল না। তা ছাড়া দোকানগুলিতে এঁটোকাটার তো বাছবিচারই নেই। এঁটো গ্লাস বা বাসনকোসন ধোয়ার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই নেই। বহু তীর্থ-স্থানেই গিয়েছি। মন্দিরের কাছাকাছি বা তীর্থ এলাকার মধ্যে নিরামিষের সঙ্গে আমিষের এ-হেন সহাবস্থান কোনদিন চোখে পড়েনি। কলকাতার তিন-চারজন দিদিমা, পিসীমাদের সঙ্গে খাবারের সমস্যা নিয়ে দুঃখবেদনা আদান-প্রদান করে যথারীতি সরকার মহোদয়ের শ্রাদ্ধ করে মনে কিছুটা শান্তি এলো। ওঁদেরও কিছুটা নিবৃত্তি হল বলে মনে হয়। যাক, শেষমেষ একটি লঙ্গরখানায় প্রসাদ পেলাম। প্রসাদ পাওয়ার আগে উপস্থিত ক্ষুধার্ত সাধুসন্তদের সঙ্গে মিনিট দশেক ধরে ভজনকীর্তন করতে হল।

আট তারিখে ছড়ি প্রস্থানের পর আমরা রাত দুটোয় মন্দিরাভিমুখে পা বাড়ালাম। মালপত্র ও ঘোড়া পঞ্চতরণীতে রেখে আমরা সবাই ৬ কিমি পথ হেঁটে রওনা দিলাম। এখান থেকে মন্দিরের রাস্তা খুব সরু ও কঠিন বলে রাত্রে ঘোড়া বা ডান্ডি যাওয়ার নিয়ম নেই। বেরিয়েই অনেকটা পথ বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হল। কেড্‌স ভিজে গিয়ে প্রচন্ড ঠান্ডায় সারা শরীরে মাঝে মাঝেই বৈদ্যুতিক শকের মতো লাগছিল। তবুও উপচে পড়া জ্যোৎস্না রাতে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম। চার কিমি প্রচুর শক্ত রাস্তা পেরিয়ে অমরগঙ্গার ধারে পৌঁছলাম। অমরগঙ্গা গুহার পাশ দিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় পুরো রাস্তাই জমা বরফের তলা দিয়ে প্রবাহিত হয়। এখানে স্নান করতে নেমে মনে হল শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে শরীর একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। অমরগঙ্গায় স্নান করাকালীন বহু যাত্রীর টাকাপয়সা ও মূল্যবান জিনিসপত্র খোয়া যাওয়ার কান্নাকাটি করতে দেখলাম। সর্বস্ব খুইয়ে কিছু যাত্রীর তো মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম। অথচ এদের কান্না শুনে প্রতিকার করবার কোন লোকের দেখা মিলল না। এত শত যাত্রীর মধ্যে গুটি দুয়েক পুলিসকে নিশ্চিন্ত ভাবে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখলাম মাত্র। পুরো রাস্তাতেই যখন তখন চোর-বাটপাড়ের উপদ্রব চোখে পড়েছে। ইতিমধ্যে সকাল হয়ে এল। এর পর দেড় কিমি, পুরো বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে আধ কিমি দুর্গম সিঁড়ি ভেঙে ১৩,৫০০ ফুট উচ্চ বাবা অমরনাথের সেই প্রাকৃতিক গুহায় প্রবেশ করলাম। জুতো ছাড়া, লাঠি একজনের জিম্মায় রেখে আসা হল। ষাট ফুট লম্বা ও চল্লিশ ফুট চওড়া বিশাল গুহায় ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রার পরিশ্রান্তি, দুঃখকষ্ট, যাবতীয় ক্ষোভ হঠাৎ মিলিয়ে গেল। রহস্যময় আট ফুট উঁচু বরফের শিবলিঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। আবার সেই লাইনটি—হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি—মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিতে লাগল। বুঝলাম কত শত দুর্গমতাকে তুচ্ছ করে সহস্র সহস্র যাত্রী পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই স্থানে কেন যুগযুগান্তর ধরে ছুটে আসেন। হ্যাঁ, ঈপ্সিত অভিলাষকে চরিতার্থ করতে, কালজয়ী শিবের এই অপূর্ব রূপকে প্রত্যক্ষ করতেই মানুষ শত বাধা অতিক্রম করে পাগলের মতো ছোটেন এখানে। সত্যম, শিবম, সুন্দরম—শিবের এই রূপটি একমাত্র এখানেই জীবন্তরূপ ধারণ করেছে।

গুহার মধ্যে দেখলাম প্রচুর নাগা সন্ন্যাসীর দল গায়ে ছাইভস্ম মেখে ধুনি জ্বালিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে দানদক্ষিণা চাইছেন। দানে খুশী করলে যাত্রীরা পেয়েছেন অজস্র আশীর্বাদ। আর দান মন মতো না হলে অনেকের ভাগ্যে গালিগালাজ জুটেছে। এঁদের ছবি তুলতে গিয়ে বহু ফটো-গ্রাফারকে প্রচন্ড রকম লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। এঁরা ক্যামেরা নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতেও ছাড়েননি। আমি অনেকক্ষণ সেই বরফের উপর দাঁড়িয়ে থেকে সুযোগ বুঝে দুরু দুরু বুকে চার-পাঁচ বার আমার ক্যামেরা ক্লিক করতে পেরেছি। মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে দেখি সবাইয়ের দৃষ্টি আকাশের দিকে। বে পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট ছোট্ট প্রস্তরখন্ড দেখে কেউ বা 'ওই হোথা' বলে শিবপার্বতী রূপে জো পায়রা দেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন। বাকী যাত্রী 'কোথা কোথা' বলে কিছুই দেখতে না পেয়ে নিজে পাপাত্মাদের দলভুক্ত করে অনুতাপ করছেন। আমি সেই দলেই পড়ে গেলাম। বহু চেষ্টা করেও 'হো হোথা'দের দলে ভিড়তে না পেরে আমার দৃষ্টি নিশ্চয়ই সম্প্রতি খুব অবনতি ঘটেছে বলে দুঃখ পে লাগলাম। হঠাৎ বিরাট আনন্দ-করতালির মধ্যে স সমস্যার অবসান ঘটলো। একটি দুটি নয়—পাঁচ ছ তুষারশুভ্র পায়রা ডানা নাড়তে নাড়তে ভক্তদে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে গুহার দিকে উড়ে গেল। অতএ পায়রাবৃত্তান্ত শেষ হল। এবারে দেখি আর এক নতুন সমস্যা। আমাদের নতুন জুতো ও লাঠি কে বা কার নিয়ে গিয়ে আমাদের খুব বিপদে ফেলেছে। অথচ জুতো-ছড়ি ছাড়া পথ চলা একেবারেই অসম্ভব। যার জিম্মায় জুতো রাখা হয়েছিল সে আমাদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তার অসহায় অবস্থা বোঝা গেল। অতঃ কিম। আমরাও সময় নষ্ট না করে ওর জিম্মায় রাখা আমাদের পায়ের মাপ অনুযায়ী অন্য কারুর জুতো পায়ে দিয়ে ফেরবার জন্য তৈরি হলাম। এভাবেই লাঠিও যোগাড় করা গেল। শেষ-মেশ জুতো ও লাঠির কী হিসেব দাঁড়িয়েছিল সেটা জানবার কৌতূহল থাকলেও কৌতূহলনিবৃত্তি হয়নি।

স্নিগ্ধ নীল আকাশে প্রখর সূর্যকিরণে পঞ্চতরণী ফিরে চললাম। আমার মতন সব যাত্রীরই চোখেমুখে বিরাট এক প্রশান্তির ছাপ। অমরগঙ্গা পেরিয়ে কিছু দূরে আসতেই চোখে পড়লো আর একটি রাস্তা দিয়েও প্রচুর যাত্রীর আনাগোনা চলছে। অমরনাথ আসবার এ আর এক রাস্তা। শ্রীনগর থেকে শোনমার্গ হয়ে বালতাল থেকে এ পথের শুরু। মাত্র ১৪ কিঃ মিঃ রাস্তা। ঘোড়ায় করে একই দিনে দর্শন করে বালতাল ফেরা যায়। প্রতি ঘোড়ার আনাগোনায় দর মাত্র তিরিশ টাকা।

গুহার ভেতরে শিবলিঙ্গ দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ

তু এ রাস্তা খুবই সংকীর্ণ ও পিচ্ছিল থাকার দরুন জায়গায় খুবই বিপজ্জনক। তা ছাড়া, বালতাল ল বর্ডার এলাকা বলে মিলিটারি দিয়ে ভর্তি। তাই রাস্তায় চলতে সরকারী তরফ থেকে নিরুৎসাহ করা
।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ চমকে উঠলাম। মনে হল ণ মধ্যস্থলে আকাশের চেহারা নিমেষে বদলে গেল। মে চোখে পড়লো ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। এর াই গাঢ় কালো মেঘ দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করে শনৈ ন মাথা তুলে উঠতে লাগলো। যাত্রীদের মুখেচোখে তঙ্ক ও চঞ্চলতার ছায়া ও ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা ল। সূর্যদেব পরিপূর্ণভাবে গা ঢাকা দিলেন। চুর্দিক অন্ধকার হয়ে এল। এর পরই গুঁড়ি গুঁড়ি ষ্টির সঙ্গে ছোট ছোট শিলাপাত। মাথা গুঁজবার ায়গাও কোন ঠাঁই নেই। এদিকে বৃষ্টির তোড়ও বাড়তে াগল। যাত্রীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে চলতে লাগলেন। কিন্তু কে নিয়ে আমাদের ধীর পদক্ষেপেই চলতে হল। রফের রাস্তা খুবই পিচ্ছল হওয়াতে অত্যন্ত সাবধানে া ফেলতে লাগলাম। সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে শীতে কাঁপতে াঁপতে কোনক্রমে পঞ্চতরণী পোঁছলাম। ইতিমধ্যে ুনলাম মন্দিরের কাছে বৃষ্টির সঙ্গে বড় বড় শলাপাতে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটেছে। গুহার মধ্যেই শীতে দুজন যাত্রী মারা গিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব কিছু কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল। হবিষ ষাদ নেমে এলো। পঞ্চতরণী পোঁছেই মাইকের ঘোষণা কানে আসতে লাগলো—'যাঁরা দর্শন করে ফিরে এসেছেন, তাঁরা যথাশীঘ্র পঞ্চতরণী ত্যাগ করুন। পরবর্তী বিশ্রামস্থলের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার খাতিরে বেরিয়ে পড়ুন। পঞ্চতরণীতে থাকবার চেষ্টা করবেন না। আবহাওয়ার অবস্থা ভয়াবহ। রাত্রিরের দিকে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে।' এ ধরনের ঘোষণা মাইকে অনবরত ধ্বনিত হতে লাগলো। মনে পড়লো, এই সেই পঞ্চতরণী যেখানে মাত্র কয়েক বছর আগে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বরফের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে শয়ে শয়ে যাত্রী ও ঘোড়া বরফের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছিল। অতএব প্রমাদ গুনলাম। শেষমেশ পাততাড়ি গুটিয়ে বৃষ্টি ও হাওয়ার তোড় একসময় বন্ধ হলে রওনা হলাম শেষনাগ উদ্দেশে। ভিজে পিচ্ছল রাস্তায় ভীষণ কষ্টে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললাম আর মাঝে-মাঝেই শুনতে লাগলাম মেঘের গর্জন। কিছু দূরে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে একতালে চলবার পর আমরা চারজন কুলিদের মধ্যে এগিয়ে-পেছিয়ে পাড়ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম। রাস্তার দুর্গমতা ছাড়াও আর এক ধরনের বিপদ জুটলো। আবার বৃষ্টি শুরু হওয়ায় শুধু যে জলের ছাট ছুঁচের মতো গায়ে বিঁধতে লাগল তাই নয়, সমস্ত জামাকাপড় জলে ভিজে সেই প্রচণ্ড হিমেল বাতাসে এমন শীত করতে লাগলো যে, দাঁতে দাঁতে ঠকাঠক আওয়াজ হতে লাগল। সারা শরীরে প্রচণ্ড রকম অসাড়তা বোধ হতে লাগল। সেই সঙ্গে রোমাঞ্চের সঙ্গী ভীতিটাই বড় হতে লাগল মনে-প্রাণে। এ রকমটি আরও কিছুক্ষণ চললে যে অবস্থা ভয়াবহ হবে সে আশঙ্কাই ক্রমশ দানা বাঁধতে লাগল। অন্তত পক্ষে জলের ছাট যেন বল্লমের ফলার মতো গায়ে না বেঁধে সেজন্য একটুখানি আশ্রয়ের প্রয়োজন। কিন্তু কোন আশ্রয়ই চোখে পড়ল না। আবার অন্যান্য সঙ্গীদের জন্যও চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

এভাবেই পাঁচমিশেলি মনের অবস্থা নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠছি। আবার সেই মহাগুণা টপ। সেদিনের মহাগুণার সঙ্গে আজকের মহাগুণার আকাশ-পাতাল তফাত। টপে উঠে একটা শেডে দাঁড়িয়ে ভাবলাম অন্যান্যদের জন্য একটু অপেক্ষা করা যাক। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে হঠাৎ দেখি আমার দাদা ও বউদি ঘোড়ার পিঠে এসে পোঁছোলেন। হাঁটতে অপারগ হয়ে এঁরা মাঝ পথে ঘোড়া ভাড়া করে এসেছেন। কিন্তু বউদির অবস্থা খুবই শোচনীয়। প্রায় বাকরুদ্ধ। সর্বাঙ্গ ভিজে, শুধু কাঁপুনি। শরীর নীলবর্ণ। চোখের চাউনি শংকাজনক। এ-হেন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমার যাবতীয় কষ্ট ভুলে ও'র পরিচর্যায় লেগে গেলাম। আমার গরম কাপড় খুলে ও'র গায়ে চাপালাম। ডাক্তারের খোঁজ করলাম। কিন্তু কোথায় ডাক্তার! ওঁরা সবাই ইতিমধ্যে নীচে নেমে গিয়েছেন। প্রতি কাপ দেড় টাকা দরে মোটামুটি এক কাপ চা ও'কে খাওয়ান হল। লবঙ্গ, এলাচ মুখে দিয়ে ও'কে চিবোতে বললাম। কিন্তু ও'র মুখ নাড়ানোর শক্তিটুকুও হারিয়ে গিয়েছে। ও'কে নাড়িয়ে চাড়িয়ে শক্ত করবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে লাগলাম। কিন্তু ও'র বাঁচবার সম্ভাবনা ক্রমশই যেন ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। এরই মধ্যে দেখি এক ভদ্রলোকের কী কাকুতি-মিনতি। জীবনে এখনও ও'র বহু কাজ বাকী তাই ও'কে বাঁচাতেই হবে। ফরুকাবাদ না কোথায় যেন ভেলামল, ফ্যাক্টরি ও [illegible] ব্যবসাপত্তর আছে। কিন্তু আজকের দিনে এই শেডে ও'র অজস্র টাকা পয়সা কিছুই কাজে লাগলো না। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। চোখের সামনে এ অবস্থা দেখতে কষ্ট হচ্ছিল। ভদ্রলোক আমার কাছে একটা বিড়ি ভিক্ষা করলেন। আমি একটি সিগারেট ওর ঠোঁটে দিয়ে বউদির ব্যবস্থা করতে শেডের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

শেডের মধ্যে পড়ে পড়ে মরার চাইতে ঠিক করলাম এই বৃষ্টিতেই বউদিকে ঘোড়ায় চাপিয়ে বাবা অমরনাথের জিম্মায় শেষনাগের পথে ছেড়েদি। সব আশা ত্যাগ করে অতঃপর চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সেই ব্যবস্থাই করা গেল। আমি ও দাদা পিছু নিলাম। এত সময় অপেক্ষা করেও মার দেখা পেলাম না। মা কোথায় ও কী অবস্থায় রয়েছেন—এ চিন্তাতে মন আরও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। বউদির সঙ্গে সামান্য কিছুটা পথ একসঙ্গে হাঁটার পর ও'র ঘোড়া এগিয়ে গেল। এই দেখাই হয়ত শেষ দেখা! আমার তখন চিন্তা করবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। সেই অঝোর বৃষ্টিতে সামান্য একটি জামা গায়ে এগোতে থাকলাম। হঠাৎ বিকট এক আর্তনাদে সম্বিৎ ফিরে এলো। দেখি জল-কাদার মধ্যে পড়ে থাকা এক বৃদ্ধা থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠছেন। 'ওগো আমাকে কেউ বাঁচাও, আমাকে শেষনাগে আমার স্বামীর কাছে পোঁছে দাও; ...বাঁচতে চাই' ইত্যাদি। যাত্রীরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানর তাগিদে সবাই যে যার মতো ছুটে চলেছেন। বৃদ্ধার প্রতি কারুর ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই। আমার পা হঠাৎ যেন আটকে গেল। থমকে দাঁড়ালাম। মৃত্যুভয়ে মানুষের বাঁচবার তাগিদ কী পরিমাণ বেড়ে যায় এই বৃদ্ধার কণ্ঠে বিলাপ শুনে আমি সেকথা ভালমতন অনুভব করলাম। সন্তর্পনে সেই পিচ্ছল রাস্তা থেকে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে কলকাতার এই মহিলাটির পাশে এসে দাঁড়ালাম। সর্বশক্তি দিয়ে বৃদ্ধাকে তুলতে গিয়ে দেখি ও'র শরীরে শক্তিসামর্থ্য বলে কোন বস্তুই আর অবশিষ্ট নেই। একেও হয়ত ঠাকুর নিজের পায়ে আশ্রয় দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ও'কে আমার এক কাঁধে ভর দিতে বলে পিঁপড়ের গতিতে এগোচ্ছি। আর অন্য কাঁধে আমার ক্যামেরার ব্যাগ ঝুলেছে। আমার স্পন্ডিলাইটিস-এর একটা ছ্যাঁচড়া অসুখ আছে। তাই

গুহাভিমুখে তীর্থ যাত্রীদের ভীড়

শেষনাগের কাছে মেষচারণ ভূমি

জর্জরিত কাঁধ কিছুক্ষণের মধ্যেই টনটন করে উঠলো। রাস্তায় অনেক যাত্রীকে ওই বৃদ্ধার ভার নিতে বললাম। কেউ আমার কথা শুধু একটু শুনল এই যা—অনেকে কোন কিছু না শুনেই নিজের কথা চিন্তা করতে করতে এগিয়ে গেল। আমিও বৃদ্ধার একটা দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছি। তাই দায়িত্ব এড়াতে পারলাম না। পুলিসগোছের একজনকে বৃদ্ধাটিকে সাহায্য করতে বললাম। বদলে সেও দেখাল তার কোলে একটি চার-পাঁচ বছরের বাচ্চা। বাচ্চাটিকে ও রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়ে চলেছে শেষনাগের দিকে যদি সেই বাচ্চাটির কাউকে পাওয়া যায়। বাচ্চাটির তখনও নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে দেখলাম। ভাবলাম মা'টি নিশ্চয়ই কোথাও রাস্তায় মারা গিয়েছে। নইলে এই কোলের বাচ্চা রাস্তায় পড়ে থাকে কি করে। ইতিমধ্যে ছটা বাজল। আলো অবশ্য প্রচুর। এ-এলাকায় দেখেছি রাত ৮টা পর্যন্ত দিনের আলো থাকে। এবারে রাস্তায় বিভিন্ন বয়সের বেশ কিছু মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেতে লাগল। আর ঘোড়ার মৃতদেহ ত সেই বহু আগে থেকেই যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখছি। রাস্তায় নানা জনের মুখে আরও নানা মৃত্যুসংবাদ শুনতে পেলাম। আমাকেও কয়েকটি জায়গায় মৃতদেহ ডিঙিয়ে আসতে হয়েছে।

ঘণ্টা দেড়েক অতি ধীরে বৃদ্ধার সঙ্গে পথ চলবার পর একটা ছোটখাট শেডের কাছাকাছি এসে একজন পুলিসের দেখা মিলল। বৃদ্ধাকে শেষনাগ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলায় ওর কাছে জানলাম ওর সঙ্গীদের একজন একটি লাশ নিয়ে ও অন্যজন একটি মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে শেষনাগ গিয়েছে। তার পক্ষে আপাতত ওই স্থান ত্যাগ করা তাই সম্ভব নয়। অতঃপর সেই বৃদ্ধাকে সেই শেডে একটু আগুনের ধারে বসিয়ে রেখে পুলিসটিকে সকালে ওঁর ব্যবস্থা করতে বলে আমি আবার বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার শেষ পর্যন্ত কি গতি হয়েছিল জানি না।

ধীরে ধীরে নিকষ অন্ধকার নেমে এল। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছেই। পথ আরও দু' মাইলের। বৃদ্ধার জন্য আমার অনেক দেরি হয়ে গেল। বউদি ও মায়ের জন্য ভাবনা এবার আরও জাঁকিয়ে বসল। সেই কর্দমাক্ত পাথুরে রাস্তায় কী যেন এক শক্তির জোরে চলছি আর চলছি। কিন্তু পথ তো শেষ হতে চায় না। হঠাৎ বিরাট এক আছাড় খেলাম। ক্যামেরার ব্যাগটি ছিটকে পড়ল। ভাবলাম জড়পদার্থটিরও হয়ত মৃত্যু ঘটে গেল। যাত্রীর সংখ্যা রাস্তায় প্রায় নেই বললেই চলে। হঠাৎ চোখে পড়ল সামনে খুব সম্ভব কোনো সাধু-বাবার লাশ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম। এভাবে কতক্ষণ চলেছি খেয়াল নেই। হঠাৎ শেষনাগের আলো চোখে পড়ল। ইতিমধ্যে চলতে চলতে আরও বার কয়েক পিছলে পড়ে আছাড় খেয়েছি। পথচলার গতি বাড়িয়ে দিলাম। শেষনাগের মধ্যে ঢুকি ঢুকি করছি, কানে এল, একটি দশ বছরের ছেলের লাশ পাওয়া গিয়েছে। ওর কোন আত্মীয়স্বজন থাকলে ঘোষকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। একটি আঠাশ-ত্রিশ বছরের যুবক ও একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ এই মাত্র এখানে এসে পৌঁছেছে। যোগাযোগ করুন, ইত্যাদি। সেই পঞ্চতরণী থেকে এখনও পর্যন্ত মার কোন খবরই জানি না। কত উলটো-পালটা কথাই না মনে আসছে। হঠাৎ বউদির গলা। আমাদের নাম ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় কিছু বলছেন। ঘোষকের তাঁবুর ধারে ছুটে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি বিরাট ভিড়। কেউ কাঁদছেন, কেউ আপন প্রিয়জনকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে হাসছেন আবার কেউবা এরই মধ্যে কুলি কেন দেরি করলো, কেন সে সঙ্গে সঙ্গে থাকেনি বলে হম্বিতম্বি করছেন। হঠাৎ এক হই চই। এক যুবক তাঁর মাকে নিয়ে তীর্থ করতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি আর মাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন না। কারণ ঘোড়ার পিঠের ওপরেই তাঁর মা কখন মারা গিয়েছেন, শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছে। তাঁর মৃতদেহ ঘোড়ার পিঠ থেকে নামানর চেষ্টা চলছে। আমার আর ওমুখো হতে সাহস হল না। আবার ঘোষণা, সিধার্থ কামারকার নামে এক যুবকের খুব সঙ্কটজনক অবস্থা। তার সঙ্গী-সাথী কেউ কোথাও থাকলে তাড়াতাড়ি চলে আসুন। রোগীর কথাবার্তাও ভালরকম বোঝা যাচ্ছে না। বাংলা-ভাষী কোন ভাই কাছেপিঠে থাকলে শীঘ্র যোগাযোগ করুন। এগিয়ে গেলাম। একটি তাঁবুতে গিয়ে দেখি সিদ্ধার্থ কর্মকারের অবস্থা সত্যিই খুব সিরিয়াস। দেহ প্রায় অসাড় হয়ে আসছে। জড়িয়ে জড়িয়ে ধীরে কথা বলছেন। ওঁর কাছে ওঁর বন্ধুদের নাম জেনে বাংলাতে ঘোষণা করলাম। জানি না বন্ধুরা এসে সিদ্ধার্থকে বাঁচাতে পেরেছিলেন কি না।

এদিকে বউদি বউদি বলে অনেকক্ষণ চেঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি টেন্টে জড়সড় অবস্থায় বউদির দেখা পেলাম। বউদির অবস্থা আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল দেখলাম। মনে মনে বাবা অমরনাথকে প্রণাম জানালাম।

ঘণ্টাখানেক বাদে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দাদাও এসে পৌঁছুলেন। কিন্তু মা কোথায়? বহুবার ঘোষণা করেও ওঁর কোন হদিশ না পেয়ে বুকের ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠলো। বউদিকে একটা তাঁবুতে রেখে আমরা মাকে খুঁজতে বেরোলাম। বহু জায়গায় তন্নতন্ন আর হাঁকডাক করে রাত বারটা নাগাদ ছোট্ট এক চায়ের দোকানে মায়ের দেখা মিলল। ঝড়ে জলে ভিজে সেই একই করুণ অবস্থা বেচারির। উঠে দাঁড়াবার বা কথাটি বলবার সামর্থ্যটুকু নেই। সেই কখন ঘোড়ার পিঠে শেষনাগে পৌঁছে আমাদের জন্য কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে শক্তিক্ষয় করে ফেলেছেন।

আমার এই লেখা পড়ে অনেকেই হয়তবা অমরনাথ যাত্রা বাতিল করবার কথা চিন্তা করবেন। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। মৃত্যু এবং অমৃতের যুগল আধার অমরনাথ যাওয়া কষ্টকর ত বটেই, তবে এ যাত্রায় রোমাঞ্চ ও মানসিক প্রাপ্তিও কিছু কম নেই। তা ছাড়া আগেই বলেছি এ-যাত্রার ভালমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে প্রকৃতির খেয়ালের উপর। অতএব এরকম দুর্যোগে আগামী বছরেও পড়তে হবে এ কথা ভাববার কোন কারণ নেই। আসলে এ-যাত্রায় মনের জোর ও সেই সর্বশক্তিমানের উপর অকৃত্রিম আস্থা রাখাটাও সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

সেই রাতটুকু কোনমতে একটা তাঁবুতে কাটিয়ে, বেশ কিছু মৃত্যুর স্মৃতি ও বিরাট এক ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ভোরবেলা শেষনাগ ত্যাগ করলাম। যাঁরা মারা গেলেন তাঁরা হয়ত বা শিবলোকে প্রস্থান করলেন কিন্তু ইহলোকের আত্মীয়স্বজনরা তাঁদের প্রিয়জনের মৃত্যুশোক ভুলবেন কী প্রকারে, আমার জানা নেই।

ল্যাকমে ক্যালামাইন
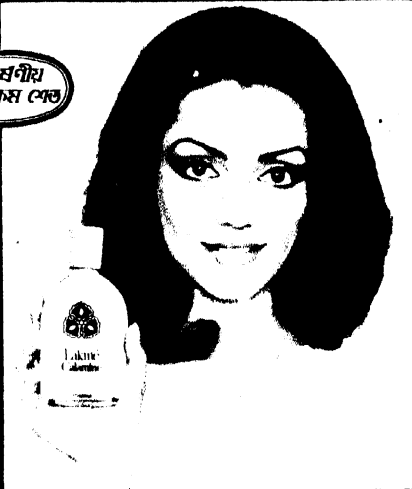
সৌন্দর্যের জগতে নতুন আলোড়ন

যা এর আগে আপনি কখনো ব্যবহার করেন নি।

ল্যাকমে ক্যালামাইন ওষধি গুণসম্পন্ন—যা আপনার ত্বককে ক্রুটিহীন লাবন্যে ভরে তোলার জন্য যত্ন নেবে।

একমাত্র ল্যাকমে ক্যালামাইন-এ পাবেন নানান শেড যা আপনার রূপে ফুটিয়ে তুলবে ঝলমলে জৌলুষ। সুগন্ধে ভরা ল্যাকমে ক্যালামাইন বেছে নেবার জন্য দুরকম সুবিধাজনক সাইজ-এ পাবেন। ১২০ মিঃলিঃ আর ৬০ মিঃলিঃ

ত্বকের সম্পূর্ণ পরিচর্য্যার জন্য ল্যাকমে ক্যালামাইন !

ত্বকের পরিচর্য্যায় যাঁরা
সবার সেরা

ল্যাকমে

daCunha/L/C/3 Ben

সিরিজে হারলেও ইংল্যাণ্ডে ভারতীয়রা ভাল খেলেছে

এবার ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে যে ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রুডেন্সিয়াল বিশ্ব কাপের গ্রুপ লীগের তিনটি খেলাতেই হেরে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার কাছে—এজবাসটন মাঠের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের কাছে ইনিংস ও ৮৩ রানে হেরে যাবার পর যে দলটিকে অতীতের বিশ্বখ্যাত ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান "ছেঁড়া পোশাক পরা ছন্নছাড়া একটি দল" বলে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই ভারতীয় দল কিন্তু প্রশংসার পতাকা উড্ডীন রেখে দেশে ফিরে এসেছে। পরবর্তী খেলাগুলিতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও দিয়েছে অসাধারণ ব্যাটিং শক্তির পরিচয়, যে শক্তি ও যে শৌর্যের পরিচয়ে টেস্ট খেলাগুলি স্মরণীয় হয়ে থাকে। ভাগ্য একটু সহায় থাকলে হয়তো ওভালের শেষ টেস্টম্যাচ জিতে এবং সিরিজ সমান রেখে ভারতীয়রা দেশে ফিরতে পারতেন। পারেননি একটু সময়ের অভাবে এবং মাত্র ৯টি রানের জন্য। ফলে প্রথম টেস্ট জয়ের সুবাদে 'রাবার' রয়ে গেছে ইংল্যান্ডের হাতে। বাকি তিনটি ড্র টেস্টে সম্মান থেকে গেছে সমান সমান। তবে প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রামী শক্তিতে ভারতের ভূমিকাই একটু বড় হয়ে ফুটে উঠেছে।

"দেশ" পত্রিকায় এজবাসটন টেস্ট এবং লর্ডস টেস্ট সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। হেডিংলের লীডস মাঠে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচটি তো প্রায় বৃষ্টিতে পণ্ড হয়ে গিয়েছে। পাঁচ দিনে ৩০ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ১৮ ঘণ্টাই খেলা হয়নি বৃষ্টির ও মন্দ আলোর জন্য। ফলে দুই দলের প্রথম ইনিংসই শেষ হয়নি। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২৭০ রানে শেষ হবার পর ভারত করেছিল ৬ উইকেটে ২২৩ রান। সুতরাং ওই টেস্টে ভারত সিরিজ ড্র করার সুযোগ পায়নি। ওভালের শেষ টেস্টেই ছিল শেষ সুযোগ। কিন্তু টসে জিতে

[illegible]

গাভাসকর

ইংল্যান্ড প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে যখন প্রথম ইনিংসে ৩০৫ রান করে এবং তার উত্তরে ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ২০২ রানে তখন জয় সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই উবে যায়। তারপর প্রথম ইনিংসের বাড়তি ১০৩ রান নিয়ে ইংল্যান্ড ৪৩৭ রানে এগিয়ে যাবার পর দান ছেড়ে দিলে ভারতের পরাজয় আশঙ্কাই বড় হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় জয়ের জন্য চতুর্থ ইনিংসে ৫০০ মিনিটে ৪৩৮ রান করার ঝুঁকি নেওয়ার অর্থ অসম্ভবের পেছনে ছুটে পরাজয়কে ত্বরান্বিত করা। সাধারণত সব দলই এ অবস্থায় পরাজয় এড়ানোর জন্য নেতিমূলক ক্রিকেটের আশ্রয় নিয়ে থাকে। কিন্তু ওভালে ভারত একেবারেই নেতিমূলক ক্রিকেট খেলেনি। চ্যালেঞ্জ নিয়ে খেলে এবং যে জন্য ক্রিকেটের গরিমা ও আকর্ষণ সেটা পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখে জয়ের দিকে এগোতে চেষ্টা করেছে। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা এবং ব্যাট-বলের নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে ক্রমে আরও বড় হয়ে উঠেছে এক ভারতীয় ক্রিকেটারের অসাধারণত্ব, যার নাম সুনীল গাভাসকর। শৌর্য ও শিল্পের সংমিশ্রণে ওভাল টেস্টে গাভাসকরের ২২১ রানের ইনিংসটি টেস্টের স্মরণীয় ইনিংসগুলির অন্যতম। বিশ্ব ক্রিকেটে বহু গৌরবের অধিকারী ভারতীয় ব্যাটসম্যানের আর এক নতুন কীর্তিও বটে।

সে কথায় পরে আসছি। তার আগে বলে নিই এবারের সিরিজে ভারতীয় দলের সামগ্রিক ভূমিকার কথা। ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেটারদের অবশ্যই বেশ কিছু গৌরব গরিমা আছে। একটি টেস্ট ম্যাচ জয়ের সুবাদে ১৯৭১ সিরিজে রাবারও পেয়েছে। কিন্তু আগের ১০টি সফরে কি ভারতীয়রা এমন সংগ্রামী শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছে? কোনোবার কি ড্র রাখতে পেরেছে ৩টি টেস্ট? বাহান্নর সিরিজে চারটির মধ্যে তিনটিতে হেরেছিল, একটি ড্র হয়েছিল। উনষাটে হেরে গিয়েছিল পাঁচটি টেস্টেই। সাতষট্টিতে তিনটির মধ্যে তিনটিতে এবং চুয়াত্তরেও তিনটির মধ্যে তিনটিতে হেরে গিয়েছিল। ইংল্যান্ড সফরের সামগ্রিক ফল খতিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাব মোট ২৯টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে আমরা জিতেছি মাত্র একটি টেস্টে, হেরেছি ১৯টি টেস্টে। অপর দিকে ভারতের মাঠে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ২৮টি টেস্টের মধ্যে আমরা জিতেছি ছয়টি টেস্টে, ইংল্যান্ড সাতটিতে।

দুই দেশের মাঠে খেলায় ফলের কিন্তর পার্থক্যের কারণ কি? কারণ ইংল্যান্ডের আবহাওয়া ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার পক্ষে অনুকূল নয় এবং ওই আবহাওয়ায় সুইং বলের কার্যকারিতা বেশি। পেস ও সুইং বলের বিরুদ্ধে বেশির ভাগ ভারতীয় ব্যাটসম্যানের দুর্বলতাও সহজাত। এই সিরিজেও চারটি টেস্টের ৭ ইনিংসে রান আউট বাদে ইংল্যান্ডের বোলাররা যে ৫৫টি উইকেট পেয়েছেন তার মধ্যে ৪৬টি উইকেটই পেয়েছেন সুইং বোলাররা, মাত্র ৯টি পেয়েছেন স্পিনাররা।

ইংল্যান্ডের আবহাওয়ায় সুইং বলের কার্যকারিতা অন্যভাবেও প্রমাণ করা যেতে পারে। গত মরসুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে দলটি ভারত সফরে এসেছিল সেই দলের ক্লার্ক ফিলিপ এবং হোল্ডারও ছিলেন পেস ও সুইং বোলার। কিন্তু তাঁদের বলের বিরুদ্ধেও আমাদের কপিলদেব সিরিজে করেছিলেন ৩২৯ রান। এবার ইংল্যান্ডে সেই কপিলদেব কত রান করেছেন? মাত্র ৪৫ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অংশুমান গায়কোয়াড় ৭ ইনিংসে করেছিলেন ২৯৩ রান, চৌহান ৬ ইনিংসে ৩৩১। কিন্তু ইংল্যান্ডে অংশুমান ৪ ইনিংসে করেছেন মাত্র ৫৪ রান, চৌহান ৭ ইনিংসে ১৭৯।

ইংল্যান্ডের প্রতিকূল আবহাওয়ায় শক্তিশালী ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে এবার ভারতীয়দের ক্রীড়াভূমিকা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। চারটি টেস্টের মধ্যে শুধু দ্বিতীয় টেস্টেই টসে জিতে ভারত প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পায়। ইংল্যান্ড তিনটি টেস্টে প্রথম ব্যাট করে টসে জিতে। স্বীকৃত মাত্র ছয়জন বোলারকে ইংল্যান্ড পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে মহীন্দার অমরনাথের চোট লাগায় দুটি টেস্ট খেলতেই পারেননি। প্রথম টেস্টে আবার কয়েক ওভার বল করেই বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। ঘাড়ের ব্যথার জন্য বিষেণ সিং বেদিও খেলতে পারেননি প্রথম টেস্ট। ওই একমাত্র টেস্টেই খেলানো হয়েছে চন্দ্রশেখরকে। স্বাভাবিক কারণেই আক্রমণ ছিল সীমায়িত। দলে আর একজন পেস বোলার থাকলে ফল হয়তো আর একটু ভাল হত। এবং আগেই লিখেছি, ভাগ্য ভাল থাকলে হয়তো ওভাল টেস্ট জিততে পারত, যে ওভালে জিতে একাত্তর সিরিজে রাবার পেয়েছিল।

জয়ের চেষ্টা করা প্রথমে অবশ্যই মনে হয়েছিল সোনার হরিণের পেছনে ছোটা। কিন্তু ওপেনার গাভাসকর ও চেতন চৌহান এবং দিলীপ বেঙ্গসরকার ব্যাটের বানে সেই স্বর্ণ মৃগকেই নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন। শেষদিন শেষ ঘণ্টায় যখন ম্যান্ডেটরি ওভার শুরু হয় তখন ভারতের রান ১ উইকেটে ৩২৮। জয়ের জন্য দরকার আর ১১০ রান। হাতে ৯টি উইকেট এবং ১২০টি বল। তার আগে গাভাসকর ও চৌহান প্রথম জুড়িতে ২১৩ রান করে ৪৩ বছর আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে করা বিজয় মার্চেন্ট ও মুস্তাক আলীর প্রথম উইকেটের ২০৩ রানের রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছেন। ইংল্যান্ডের মাঠে ১৯৫২
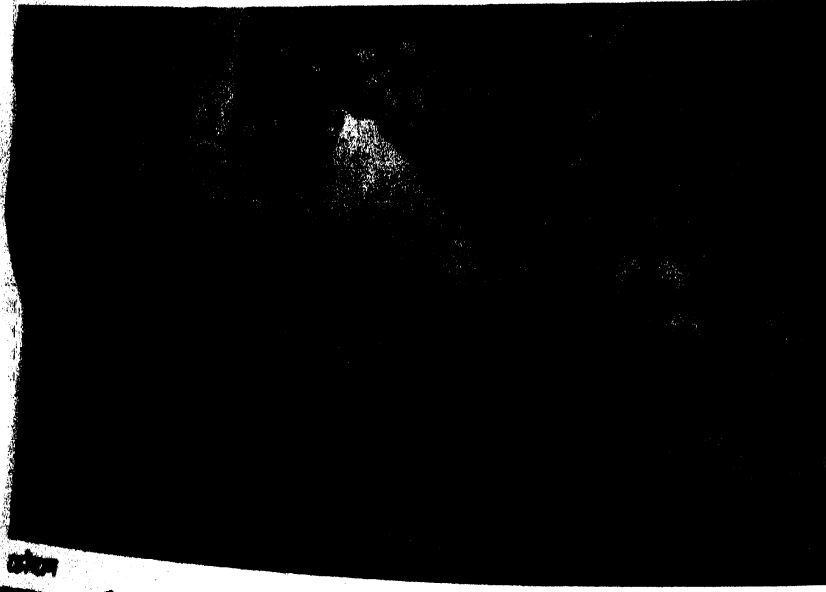
চৌহান

... রেকর্ডটি ভেঙে দিয়ে গাভাসকর দাঁড়িয়ে আছেন ২০০ রানের স্তম্ভের উপর। তিনি আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর। বেঙ্গসরকারও খেলছেন আস্থার সঙ্গে। বথামের প্রথম ম্যান্ডেটরি ওভার থেকে সংগৃহীত হল ১০ রান। উইলিসের দ্বিতীয় ওভার থেকে ৯ রান। ইংল্যান্ডের তখন পরাজয়-ভীতি। ভারতের সামনে জয়ের হাতছানি। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তুলছেন ভারতীয়রা। অপরদিকে রান আটকাবার জন্য ইংল্যান্ড কোন চেষ্টারই কসুর করছে না। ভারতীয়দের কাছে তখন উইকেট মূল্যহীন, রানই মূল্যবান। দুই একটি উইকেট পড়লেও কিছু যায় আসে না। দ্রুত রান করাই প্রয়োজন। নাটকীয় উত্তেজনার মধ্যে দ্রুত রান করতে গিয়েই ঘন ঘন উইকেট পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৯টি রান আর করা সম্ভব হয় না। ৮ উইকেটে ৪২৯ রান ওঠার পর শেষ হয়ে যায় কুড়িতম ম্যান্ডেটরি ওভারের শেষ বলটি।

গাভাসকর যদি আর কয়েক মিনিট টিকে থাকতেন, কিংবা যাদের হাতে জোরালো মার আছে—যেমন কপিল দেব, যশপাল শর্মা যদি একটি ওভার বাউন্ডারি পেতেন তাহলেও জয় আটকে থাকত না। কেউ একটিও ওভার বাউন্ডারি পাননি।

জয় ফস্কে যাওয়ার জন্য বিশেষ কাউকে দায়ী না করেও বলা যায় ম্যান্ডেটরি ওভার শুরু হবার আগে বেঙ্গসরকারের একটু হাত খুলে মারা উচিত ছিল।

চায়ের পর এবং ম্যান্ডেটরি ওভার শুরু হবার আগের আধ ঘণ্টায় যোগ হয় ২৪ রান। তার মধ্যে গাভাসকর করেন ১৯ রান, বেঙ্গসরকর মাত্র ২ রান। ৩ রান আসে এক্সট্রা থেকে। ওই সময়ে বেঙ্গসরকার আর ৯টি রান করলেই তো জয় হাতের মধ্যে এসে যেত। রান করার মত অবস্থাও ছিল। যাই হোক জয় ফস্কে গেলেও ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা যা করেছেন জয়ের চেয়ে তার মূল্য কিছু কম নয়।

১৯৭৬-এ ভারত পোর্ট অফ স্পেন টেস্ট ৬ উইকেটে জিতেছিল চতুর্থ ইনিংসে ৪ উইকেটে ৪০৬ রান করে। ৭৮-এ কিন্তু এডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ ইনিংসে ৪৪৫ রান করেও জিততে পারেনি, আর ৪৮ রানের অভাবে। ওভালে ৪২৯ রান করার পর ৯ রান কম থেকে গেল।

সম্ভবত কারণে এবং কতগুলি রেকর্ডের নজিরে গাভাসকর পেয়েছেন ওভাল টেস্টে "ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ"-এর সম্মান। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ৪৯০ ব্যাটিংয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তেমন ওই ২২১ রান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত বড় রান। গাভাসকরের নিজেরও বড় রান। চৌহানের সঙ্গে প্রথম জুড়ির রেকর্ডের কথা আগেই লিখেছি। এটি নিয়ে গাভাসকর তিনবার ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন। ভারতের আর কেউ তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি করতে পারেননি। দুটি করে আছে পরলোকগত ভিনু মানকড় এবং দিলীপ সারদেশাইয়ের। একটি করে আছে উমরিগড় ও মনসুর আলি খাঁ পাতাউদির।

তবে হাঁচির পর হ্যাটট্রিক এবং কাশির পর ক্যাচ মিস-এর মতো রেকর্ড নয়, সত্যিই গাভাসকর একদিক দিয়ে একটি বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। সেটি হচ্ছে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে ২০টি সেঞ্চুরি করার রেকর্ড। এতদিন ১৯টি সেঞ্চুরির কৃতিত্বে এই রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ওপেনার স্যার লেন হাটন।

এই টেস্ট সিরিজে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাটিং গড়ে গাভাসকরই পেয়েছেন শীর্ষস্থান। মোট রান ৫৪২—গড় ৭৭·৪২। এখন ৫০ টেস্টে তাঁর রান ৪১৪৭—গড় ৫৭·৫২।

"ম্যান অফ দ্যা সিরিজের" সম্মান পেয়েছেন ইংল্যান্ডের ইয়ান বথাম, ২০·৮০ গড়ে ২০টি উইকেট এবং ৪৮·৮০ গড়ে ২৪৪ রান করে। বথামের গৌরব-গরিমা অবশ্য এই সিরিজে রিচার্ড ডাবল-এর সম্মানে। ভারতের ভিনু মানকড় ১০০ উইকেট ও হাজার রান করে ডাবল পেয়েছিলেন ২৩টি টেস্টে। দ্রুততম অবলোর এই রেকর্ডটি বথাম ভেঙে দিলেন ২১টি টেস্টে। তাঁর শত উইকেট এবং হাজার রান পূরে গেল এই সিরিজেই।

লীডস টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড—প্রথম ইনিংসে—২৭০ (ইয়ান বথাম ১৩৭, জিওফ বয়কট ৩১, জিওফ মিলার ২৭; কপিলদেব ৩—৮৪, বেদি ২—২৬, মহীন্দর অমরনাথ ২—৫৩, ঘাউড়ি ১—৬০)

ভারত—প্রথম ইনিংসে—৬ উইঃ ২২৩ (গাভাসকর ৭৮, বেঙ্গসরকর নট আউট ৬৫, যশপাল শর্মা ৪০, ঘাউড়ি নট আউট ২০; বব উইলিস ২—৪২, জিওফ মিলার ২—৫২, মাইক হেন্ড্রিক ১—১৩, ফিল এডমন্ডস ১—৫৯)

(খেলা ড্র)

ওভাল টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড—প্রথম ইনিংসে ৩০৫ (গ্রাহাম গুচ ৭৯, পিটার উইলি ৫২, ইয়ান বথাম ৩৮, জিওফ বয়কট ৩৫, মাইক ব্রিয়ার্লি ৩৪ ; কপিলদেব ৩—৮৩, ঘাউড়ি ২—৬১, ভেঙ্কটরাঘবন ৩—৫৯, বেদি ২—৬১)

ভারত—প্রথম ইনিংসে ২০২ (বিশ্বনাথ ৬২, যজুর্বেন্দ্র ৪৩, যশপাল ২৭; বথাম ৪—৬৫, হেন্ড্রিক ৩—৩৮, উইলিস ৩—৫৩)

ইংল্যান্ড—দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইঃ ডিঃ ৩৩৪ (বয়কট ১২৫, বেয়ার স্টো ৫৯, উইলি ৩১, গুচ ৩১ এডমন্ডস নট আউট ২৭; ঘাউড়ি ৩—৭৬, কপিলদে[illegible] ২—৮৯)

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংসে ৮উইঃ ৪২৯ (গাভাসক[illegible] ২২১, চৌহান ৮০, বেঙ্গসরকার ৫২, যশপাল ১৯ বথাম ৩—৯৭, উইলি ২—৯৬, উইলিস ১—৮৯ এডমন্ডস ১—৮৭)

(খেলা ড্র)

ব্যাটিং

	এজবাস্টন টেস্ট	লর্ডস টেস্ট	লীডস টেস্ট	ওভাল টেস্ট	মোট রান
গাভাসকর	৬১ : ৬৮	৪২ : ৫৯	৭৮ : X	১৩ : ২২১	৫৪২
বিশ্বনাথ	৭৮ : ৫১	২১ : ১১৩	১ : X	৬২ : ১৫	৩৪১
বেঙ্গসরকর	২২ : ৭	০ : ১০৩	৬৫* : X	০ : ৫২	২৪৯
চৌহান	৪ : ৫৬	২ : ৩১	০ : X	৬ : ৮০	১৭৯
যশপাল	খেলেনি	১১ : ৫*	৪০ : X	২৭ : ১৯	১০২
অংশুমান	২৫ : ১৫	১৩ : ১*	খেলেনি	খেলেনি	৫৪
ঘাউড়ি	৬ : ৪	৩* : X	২০* : X	৭ : ৩*	৪৩
মহীন্দার	৩১ : ১০	খেলেনি	০ : X	খেলেনি	৪১
রেড্ডি	২১ : ০	০ : X	X : X	১২ : ৫*	৩৮
কপিলদেব	১ : ২১	৪ : X	৩ : X	১৬ : ০	৪৫
বেঙ্কট	২৮ : ০	০ : X	X : X	২ : ৬	৩৬
যজুর্বেন্দ্র	খেলেনি	খেলেনি	খেলেনি	৪৩* : ১	৪৪
বেদি	খেলেনি	০ : X	X : X	১ : X	১
চন্দ্রশেখর	০* : ০*	খেলেনি	খেলেনি	খেলেনি	০

বোলিং

	এজবাস্টন টেস্ট	লর্ডস টেস্ট	লীডস টেস্ট	ওভাল টেস্ট	
কপিলদেব	৫-১৪৬ : X	৩-৯৩ : X	৩-৮৪ : X	৩-৮৩ : ২-৮৯	১৬
বেদি	খেলেনি	২-৮৭ : X	২-২৬ : X	২-৬৯ : ১-৬৭	৭
ঘাউড়ি	০-১২৯ : X	২-১২২ : X	১-৬০ : X	২-৬১ : ৩-৭৬	৮
বেঙ্কট	০-১০৭ : X	১-৭৯ : X	১-২৫ : X	৩-৫৯ : ১-৭৫	৬
মহীন্দার	০-৪৭ : X	খেলেনি	২-৫৩ : X	খেলেনি	২
যজুর্বেন্দ্র	খেলেনি	খেলেনি	খেলেনি	০-১৫ : ০-৪	০
চন্দ্রশেখর	০-১১৩ : X	খেলেনি	খেলেনি	খেলেনি	০

মকল

[illegible] : [illegible] বাঁড়ু

বয়সের বাধা উপেক্ষা করে যাঁরা খেলে যাচ্ছেন

জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র

মাঠের মাঝখানে চলেছে সবুজ-মেরুন কিংবা লাল-হলুদ কিংবা সাদা-কালো জার্সির এগারটি খেলোয়াড়ের সঙ্গে একটি ছোট ক্লাবের এগারোটি ছেলের মরণপণ লড়াই। গ্যালারির ত্রিশ হাজার জোড়া চোখে হয়তো তখন উদ্বেগের ছোঁয়া। মনে একটা অস্বস্তি। তাদের প্রিয় দলের আক্রমণের ঢেউগুলো একটা পুরনো দেওয়ালে মাথা কুটে মরছে। দেওয়ালটা মাঝে মাঝে টলে উঠলেও ক্রমশ হয়ে উঠছে এভারেস্টের মত উঁচু। অথবা প্রিয় দলের অভিমন্যুর ব্যূহে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ন আক্রমণগুলো। হয়তো কারুর বুকের মধ্যে একটা ছোট্ট অব্যক্ত যন্ত্রণা গুমরে উঠছে। তারপরই পাশ থেকে কেউ বলে উঠল তার পাশের কোন জনকে, 'দেখছ এই হচ্ছে অশোকলাল অথবা শঙ্কর কিংবা তন্ময় না হয় নিমাই কিংবা কাঞ্চন বা তপন। এখন ওদের জন্যে হয় না হরিপুজো। ওদের জন্যে এখন ব্যয়িত হয় তিনকারণ হস্তের করতালি। কিন্তু অনেকের মুখে লুকিয়ে আঁকা থাকে আলাদা একটা সম্ভ্রম, একটা ভালবাসা।'

অশোকলাল ব্যানার্জি, শঙ্কর ব্যানার্জি, পুষ্পব্রত লাল, তন্ময় দত্ত, তপন দাস, নিমাই গোস্বামীরা আজ বয়সের ভারে প্রায় নিষ্পেষিত। তা সত্ত্বেও ওঁরা খেলা ছাড়েননি। কারণ ওঁরা চান ওদের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে কিছু দিয়ে ছোটদের সঞ্চয়ের ডালি ভরে দিতে। এঁদের পরিণত অভিজ্ঞতার সক্রিয় ভূমিকা চোখের সামনে দেখে তরুণ ফুটবলাররা নিজেদের অনুপ্রাণিত করছে। এর প্রয়োজন আছে আমাদের নবীন ফুটবলারদের কাছে। তাই সাবাস এদের ভূমিকাকে।

মনে পড়ে '৭১ থেকে '৭৬-এর ইস্টবেঙ্গল কলতাগের সেই অশোকলাল নামের প্রাচীরটাকে। শ্যামনগরের ছেলে অশোকলাল একদিন ইস্টবেঙ্গলে এসেছিলেন ফুটবলার বিশেষজ্ঞ জ্যোতিষ গুহর হাত ধরে। সেই জ্যোতিষ গুহর কাছেই হাত জোড় করে অনুমতি নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ছেড়েছিলেন ১৯৭৭-এ ক্লাব থেকে সাসপেনশন নোটিশ পেয়ে। এ সাসপেনশনের ডিসিশনটা ছিল খেলার সময় অশোকলালের জার্সিতে কাদার ছোপ পড়ার মতই আশ্চর্য। জল কাদার মাঠেও ওঁর জার্সি থাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জ্যোতিষ গুহ বলেছিলেন, 'সত্যি তুমি ক্লাব ছাড়তে চাও?' অশোকলাল জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ আপনি অনুমতি দিন, আমি ক্লাব ছেড়ে দেব। জ্যোতিষবাবু সম্মতি দিয়েছিলেন—বলেছিলেন, 'ঠিক আছে তুমি ক্লাব ছাড়তে পার। আশীর্বাদ করি অন্য জায়গায় গিয়ে ভাল খেলবে।'

অশোকলাল গড়ের মাঠে খেলা শুরু করেন ১৯৬৫ সালে গ্রীয়ার স্পোর্টিং-এর হয়ে। তারপর ১৯৬৬-৬৭-তে বালী প্রতিভার হয়ে খেলার পর ১৯৬৮-তে ইস্টবেঙ্গল ঘুরে ১৯৬৯-৭০-এর খিদিরপুর ক্লাবে চলে এসেছিলেন। সেই পুরনো ক্লাব খিদিরপুরেই এবছর খেলছেন অশোকলাল। ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার পর অবশ্য অশোকলাল এক বছর (১৯৭৭) মহামেডানেও খেলেছেন।

৩৩ বছর বয়সী সেন্ট্রাল ব্যাংকের চাকুরে অশোকলাল দীর্ঘ ১৫ বছর কলকাতা মাঠে খেলছেন। ছোটখাট কিছু অভিযোগের কথা বাদ দিলে ফুটবল মাঠ থেকে অশোকলাল জীবনের সমস্ত আশাই পূর্ণ করতে পেরেছেন। সাতবার বাংলা রাজ্যদলে

শঙ্কর ব্যানার্জী

ফটো : নিখিল ভট্টাচার্য

আর খেলেছেন সিনিয়র ভারতীয় দলে। অধিনায়ক হয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের (১৯৭৫) বাংলা রাজ্য দলেরও (১৯৭৪)।

অশোকলালকে প্রশ্ন করেছিলাম, "অনেকদিন বড় ক্লাবে খেলার পর ছোট ক্লাবে খেলতে এসে আপনার কেমন লাগছে?" হেসে জবাব দিয়েছেন, "কেন, ভালই। আর খিদিরপুর তো আমার পুরনো ক্লাব। তাছাড়া যাদের সঙ্গে খেলছি সেই জুনিয়র ছেলেরা আমাকে শ্রদ্ধা করে। আমার কথা শোনে। খেলার ব্যাপারে যখন যা অ্যাডভাইস করি সকলে তো দেখি মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। জানি না সেটা নেবার চেষ্টা করে কিনা। এখনকার ছেলেদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও ওদের মানসিক প্রস্তুতিটা ভীষণ কম। দৈহিক পরিশ্রম ওরা করছে কিন্তু মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে 'আমি বড় হব' এই জোরটা আসবে কোথা থেকে।"

এখনকার জুনিয়র খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে শঙ্কর ব্যানার্জির অভিমত, 'ওরা ভাল গাইডেন্স পাচ্ছে না, ওরাও অনুপ্রাণিত হয়ে প্র্যাকটিস করছে না। ভাল খেলতে হলে একজন খেলোয়াড়ের যতক্ষণ প্র্যাকটিস করা উচিত তার থেকে অনেক কম সময় ওরা প্র্যাকটিস করছে। একজন খেলোয়াড় এখন মনে করে হাজার দেড় হাজার টাকা পেলে সে অনেক বড় খেলোয়াড় হয়ে গেছে। শুরু হয়ে যায় প্র্যাকটিসে গাফিলতি। এর ওপর আছে ভাল উপদেশ দেবার লোকের অভাব। আমি একটি বড় টিমের একজন উঠতি খেলোয়াড়কে সবসময় বলছেন তুমি অমুকের চেয়ে ভাল খেল, তুমি অমুকের চেয়ে বড় প্লেয়ার। ওই প্লেয়ার যদি দুদিন পরে খেলার মাঠ থেকে হারিয়ে যায় তাহলে কে দায়ী?'

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্মী, ৩৪ বছর বয়সী শঙ্কর ব্যানার্জি বাটানগর থেকে কলকাতা মাঠে খেলতে আসেন ১৯৬৫ সালে। প্রথম বছর বাটাতে কাটিয়ে ১৯৬৬ সালে হাওড়া ইউনিয়নের নিয়মিত খেলোয়াড়। ১৯৬৭-তে স্পোর্টিং ইউনিয়ন আর ১৯৬৮-৬৯-এ ইস্টার্ন রেল ঘুরে ১৯৭০-এ ইস্টবেঙ্গলে। তারপর ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ টানা ৭ বছর মোহনবাগানে খেলার পর সাত বছর থেকে টালিগঞ্জ অগ্রগামীতে।

শঙ্কর ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করেছিলাম, বড় টিমের হয়ে খেলে এসে ছোট টিমে খেলতে অসুবিধে হচ্ছে না? ওঁর জবাব, শুরুতে মনে হয়েছিল নতুন পরিবেশের সঙ্গে কি মানিয়ে নিতে পারব। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হত। কিন্তু এখন কোন অসুবিধে নেই। তাছাড়া আমার কথামত ক্লাব টিম করেছেন। জুনিয়র ছেলেরাও প্র্যাকটিসের সময় আমার কথা মন দিয়েই শোনে। এই যে খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষকের ভূমিকা এখন আমি পালন করছি, এতে আমি নিজে তৃপ্ত।

এখন শঙ্কর ব্যানার্জি খেলছেন এবং খেলাচ্ছেন। কিন্তু ১৯৭৩ সালের ১৪ই আগস্ট ইস্টবেঙ্গলের

খেলোয়াড় মাঠ থেকে হয়তো হারিয়ে যাবেন। কিন্তু প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে উনি সকলের ধ্যান ধারণা পালটে দিয়ে আবার মাঠে ফিরে এসেছিলেন। শুধু ফিরেই আসেননি। এরপর ১৯৭৪ সালে বাংলা দলের হয়ে খেলেছেন। খেলেছেন ভারতীয় দলের হয়েও। তার আগে ১৯৭২-এও শংকর খেলেছেন বাংলা দলে এবং প্রি-অলিম্পিকে ভারতীয় দলের হয়ে।

বড় ক্লাবে অর্থাৎ মোহনবাগান, ইস্টবেংগল, মহামেডানে খেলেননি অথচ কলকাতা ময়দানে সকলের মনে লেখা আছে যাঁদের নাম, এমন নাম খুঁজতে গেলে প্রথমেই মনে আসবে স্টপার তন্ময় দত্ত আর ছোটাখোটো চেহারার লেফটইন তপন দাসের নাম।

তপন, তন্ময় বড় ক্লাবের জার্সি পরেননি কতকটা ভাগ্যের পরিহাসে। ওঁদের থেকে কম যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক খেলোয়াড় বড় ক্লাবগুলোর জার্সি গায়ে চড়িয়েছেন। যখন ওঁদের কাছে হাজির হয়েছিলাম, আমার এই লেখার জন্যে, ওঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। দু'জনেই বলেছিলেন, 'আমাকে নিয়ে লিখবেন! কিন্তু আমি তো মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলে খেলিনি।'

হ্যাঁ ও'রা ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডানে খেলেননি। তন্ময় কিন্তু ডাক পেয়েছিলেন মহামেডান থেকে ৬০-এর দশকের শেষাশেষি। নানা কারণে যাননি। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল উভয় তরফ থেকেই আহ্বান এসেছিল তপনের কাছে ৬০-এর দশকের শেষে আর ৭০-এর গোড়ায়।

প্রশ্ন করেছিলাম, 'যাননি কেন ?'

তপন বলেছিলেন, 'আমি গরীবের ছেলে। ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছি। তাই চাকরির প্রশ্নটা আমার কাছে বড় ছিল। যখন বড় ক্লাব থেকে ডাক এল তখন স্রেফ চাকরির চিন্তায় পিছিয়ে এলাম। এখনকার মতো যদি মোটা টাকার ব্যাপার থাকত, তাহলে হয়তো রিস্ক নিতাম। কেননা বড় ক্লাবে না খেললে একজন খেলোয়াড় কখনো পরিপূর্ণ হতে পারে না। এখনকার জুনিয়র খেলোয়াড়দেরও উচিত এইরকম একটা চিন্তাভাবনা নিয়ে এগোনো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনকার ছেলেদের বেশির ভাগেরই সহজাত স্কিলের ঘাটতি আছে। সেই ঘাটতি মেটাতে যে পরিশ্রম দরকার, তা তারা করছে না। এর ওপর আছে যোগ্য অভিভাবকের অভাব। আমি দেখতে পাচ্ছি এখনকার প্রশিক্ষকরা খেলোয়াড়দের স্বাভাবিক খেলা খেলতে দিচ্ছেন না।

পোর্ট ট্রাস্টের কর্মী ৩১ বছর বয়স্ক তপন দাস কলকাতা মাঠে এসেছিলেন ১৯৬৫ সালে। খিদিরপুর ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার ভূতনাথ বিশ্বাস খড়াপুর থেকে তপনকে নিয়ে আসেন খিদিরপুর ক্লাবে। '৬৫ আর '৬৬-তে খিদিরপুর ক্লাবে কাটিয়ে '৬৭-তে তপন এরিয়ানে যান। তারপর ১৯৬৮ থেকে এখন পর্যন্ত পোর্ট ট্রাস্টে। ১৯৬৮-তে পোর্টের দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হবার মূলে মুখ্য ভূমিকা ছিল তপনের। ১২ বছর পোর্টের হয়ে খেলে ক্লাবের জন্যে অনেক কিছু করেছেন তপন। ১৯৭১-এ জাতীয় ফুটবলে (রেলওয়ের হয়ে) ভাল খেলা সত্ত্বেও কোন অজ্ঞাত কারণে তপন জাতীয় দলে নির্বাচিত হতে পারেননি।

"বড় ক্লাবগুলোর সঙ্গে খেলায় ছোট ক্লাবগুলো আজকাল যে ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে তাতে ছোট ক্লাবের খেলোয়াড়রা কি করে ভাল খেলবে বলুন তো ?' কাস্টমসের খেলোয়াড় আর সেন্ট্রাল এক্সাইজের কর্মী তন্ময় দত্ত (তেত্রিশ) আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি উত্তর দিতে পারিনি। আমার সপ্রশ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে তন্ময় আবার বলেছেন, 'আমার ১৬ বছরের (কলকাতা মাঠে তন্ময় দত্তই সবচেয়ে বেশি বছর খেলেছেন) ফুটবল কেরিয়ারের পুরোটাই আমি ছোট ক্লাবের হয়ে খেলেছি। ছোট ক্লাবগুলো আজকাল কি ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। [illegible] দ্বিতীয়

তপন দাস

ডিভিশনে নেমে যায়। ঐ বছরে একটি বড় ক্লাবের সঙ্গে খেলায় (ততদিনে আমাদের নামা কনফার্মড হয়ে গেছে) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফলাফল ছিল (১-১)। খেলার মধ্যে আমাদের ডিফেন্সের একজন সেই বড় ক্লাবের একজনকে ফাউল করে। খেলা প্রায় শেষ হবার মুখে বড় ক্লাবটি জয়সূচক গোল করে। এক সমর্থক মাঠে ঢুকে বড় ক্লাবের সেই খেলোয়াড়টিকে (যে খেলোয়াড়টিকে আমাদের একজন ফাউল করেছিল) মালা পরিয়ে দেয়। খেলোয়াড়টি মালাটি নিয়ে আমাদের ডিফেন্সের সেই ছেলেটির গলায় পরিয়ে দেয়। ছেলেটি মালাটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। ফলস্বরূপ আমাদের সেদিন মাঠের আর একটি টেন্টে রাত আটটা পর্যন্ত থাকতে হয়েছিল।'

তন্ময় দত্ত ১৯৬৪ থেকে '৬৭ পর্যন্ত খেলেছেন জর্জে। '৬৮-তে খিদিরপুর, '৬৯-এ এরিয়ান, ৭০-এ বি এন আর, ৭১ থেকে ৭৬ বাটাতে, ৭৭-এ কাস্টমস, ৭৮-এ ইস্টার্ন রেলওয়ে, ৭৯-তে আবার কাস্টমস। খেলেছেন ১৯৬৮-তে বাংলার হয়ে জাতীয় ফুটবলে। চিরদিন ছোট ক্লাবগুলোর হয়ে খেলেও তন্ময় ফুটবল মাঠ থেকে যা পেয়েছেন তাতে খুশী। অবশ্য অভিযোগও আছে।

"আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার বাদ দিয়ে ময়দান-মহলের বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগও আছে। তার একটি হচ্ছে খেলোয়াড়দের আর অফিসিয়ালদের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। ওঁরা যদি রাজনীতি না বন্ধ করেন তাহলে যোগ্য খেলোয়াড় কোনদিন সুযোগ পাবে না। ফুটবলেরও উন্নতি হবে না। দর্শকরা তো আজকাল একচক্ষু হরিণ। তাই ছোট দলগুলোর মান বাঁচাতে অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখতে বহু অসুবিধা সত্ত্বেও রেফারীদের হতে হবে বলিষ্ঠ।"

কিছু কিছু ছোট ক্লাবও মোটামুটি ভাল টিম করেও কেন শেষ পর্যন্ত রেলিগেশনের ভ্রূকুটির সামনে পড়ে প্রশ্ন করেছিলাম কাননকে। কানন '৭৭ সাল থেকে হাওড়া ইউনিয়নে খেলছেন।

কানন জবাব দিয়েছিলেন, 'অন্য ক্লাবের কথা জানি না, তবে আমার ক্লাব সম্বন্ধে বলছি আমার ক্লাবে দেখছি যে সব ছেলে প্র্যাকটিশে আসে না তারা চান্স পায়। কোচের কোন ভয়ে নেই। ক্লাব অফিসিয়ালরা সব সময় খেলা দেখতে আসেন না। এরকম করলে টিম কি করে দাঁড়াবে অন্য ছেলেরা যারা প্রথম প্রথম প্র্যাকটিসে আসত তারা দেখল যারা প্র্যাকটিশে আসে না তারাই চান্স পায়। তখন প্র্যাকটিসে আসার সংখ্যা আস্তে আস্তে কমতে আরম্ভ করল। প্র্যাকটিস না করলে খেলা কি করে ? ঐভাবে আর যাই হোক ফুটবল খেল হতে পারে না।

এখনকার জুনিয়র ফুটবলারদের সম্পর্কে কাননের ধারণা, ওদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব। সেই জন্যে মানও নিম্নমুখী। আমি দেখেছি কোন এ ছোট ক্লাবের এক অফিসিয়াল তার খেলোয়াড়কে বলছে বড় ক্লাবের এক খেলোয়াড়কে না আটকাতে যাতে সে গোল পায়। এ রকম হলে ঐ জুনিয়র প্লেয়ারটি কি কোনদিন পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারবে ? বড় ক্লাবের সঙ্গে খেলার সময়ই যে খেলোয়াড়দের অ্যাসিড টেস্ট হয়। তা না হলে কাননরা কোনদিন বড় ক্লাবে আসতে পারতেন ?

কানন কলকাতায় এসেছিলেন ১৯৬৬ সালে ১৯৬৫ সালে ডুরান্ড প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালোরে সি আই এল মোহনবাগানের সঙ্গে দারুণ লড়েছিল পুশাব কানন নামের মিসকালো রঙের পেটেন্ট ই ছেলেটা রহমান, জার্নেল, দেবনাথ আর মৃত্যুঞ্জয়ে গড়া ডিফেন্স লাইনটাকে বার বার চুরমার ক দিচ্ছিল। প্রথম দিন ড্রয়ের পর দ্বিতীয় দিনের হাফ টাইমেই ড্রেসিং রুমে পেলেন মান্নার কাছ থে ছেলেটি ডাক পেয়েছিল মোহনবাগানে খেলার ১৯৬৬ থেকে ৭৬-এর মধ্যে, ৬৯-এ ইস্টবেঙ্গল ৭০-এ বি এন আর আর ৭২-এ মহমেডান বা আট বছর খেলেছেন মোহনবাগানে। দুঃখ, এতদি মোহনবাগানে খেলেও অধিনায়ক হতে পারেননি জুনিয়র সিনিয়র মিলিয়ে জাতীয় দলে খেলেছে দশবার। জাতীয় ফুটবলে বাংলার হয়ে তিনবার অ রেলওয়ের হয়ে একবার। শ্যালকোনেটের চাকুরে এ বছরের কানন এখনও ফুটবল খেলেছেন খে ভালোবাসেন বলে। আশা, যদি ছোটরা ঐ দে কিছু শিখতে পারে।

কলকাতা মাঠের আর এক প্রবীণ খেলোয় নিমাই গোস্বামী। বরোদা ব্যাংকের কর্মী। ব ত্রিশ বছর। খোকন বসু মল্লিকের হাত ধরে কলকা মাঠে আসেন ১৯৬৮ সালে। '৬৮-'৬৯-এ স্পোর্টি ইউনিয়নে, ৭০-এ কালীঘাট, ৭১ থেকে ৭৬ মোহন বাগান। তারপর ১৯৭৭ থেকে জর্জ টেলিগ্রাফে ১৯৭৪ ও ৭৫-এ মোহনবাগানের অধিনায়ক। জাত ফুটবলে বাংলার হয়ে খেলেছেন তিনবার। ভারতে জাতীয় দলেও তিনবার। ক্রীড়া সাংবাদিকদের বিচা বছরের সেরা ফুটবলারের সম্মান পেয়েছেন।

এখনও কেন খেলছেন প্রশ্ন করাতে নিমাই জবাব, "আমি এখনও খেলতে চাই। দেখাতে ফুটবল খেলোয়াড়দের কাছে বয়স কোন বাধা ন ছোট ক্লাবে জুনিয়র খেলোয়াড়দের মাঝে এখনও আমি খেলছি এতে আমি খুশি। শুধু মনে থে রয়ে গেছে ১৯৭৬-এর একটা ঘটনায়, যেদিন মোহ বাগান ক্লাব আমার ক্লাবে থাকার ব্যাপারে কোনর কথা বলারও প্রয়োজন বোধ করলেন না।

এই খেলোয়াড়রা ছাড়াও কলকাতা মাঠে প্রব ফুটবলার আছেন হাওড়া ইউনিয়নের কানু মজুম (খেলছেন ১৪ বছর), পুলিশের দীপক (খেলছেন ১৩ বছর) প্রভৃতি। ওঁরা একদিন ছেড়ে চলে যাবেন। ওঁদের বিদায় হবে নিঃশব্দ। স্বেদবিন্দু ওঁরা মাঠে ঝরিয়েছেন তার মধ্যে অ সংগ্রামের ইতিহাস। মাঠে ওঁদের সবুট বি ক্রীড়ানুরাগীদের আর কোনদিন মনোরঞ্জন না কর নিঃসন্দেহে আগামী দিনের কুঁড়ি ফুটবলারদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন।

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

সতী। স্বপন বসু। পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। পনর টাকা।

নারী-নির্যাতন যুগে যুগে ও দেশে দেশে ছিল। আমাদের দেশ তথা হিন্দু সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। শাস্ত্রে নারীকে দেবী বলায় হিন্দু তা স্বীকার করত, তবে অন্তর থেকে তেমন নয়। তাই এই স্বীকৃতির পাশাপাশি সমাজ নারী-নির্যাতনও মেনে নিত। চিন্তায় ও আচরণে এই স্ববিরোধিতা কম-বেশি হিন্দু সমাজে এখনও বর্তমান। সতীদাহ প্রথা এই নারী-নির্যাতনের একটি উগ্র রূপ বা একটি উপসর্গ মাত্র। এই প্রথা সুস্থতার লক্ষণ নয় বরং তা মনুষ্য-ধর্মবিরোধী বিশ্বাস করলেও এর প্রতিবিধানের জন্য সে রকম উল্লেখ-যোগ্য প্রচেষ্টা ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে হয়নি। ১৮২৯ সালে বেনটিংকের আমলে আইন বলে এই কুৎসিত ও নিষ্ঠুর প্রথার অবসান ঘটে।

লেখক স্বপন বসু আমাদের দেশে সতী প্রথার উদ্ভব, বিকাশ ও বিলোপের আনুপূর্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে বারোটি অধ্যায়ে লেখক এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বোঝবার এবং আলোচনার সুবিধার জন্য বেশ কিছু সারণী বা টেবলের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এই গ্রন্থপাঠে জানা যাবে : ইতিহাসে কবে থেকে এই প্রথার কথা পাওয়া যায় : ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে সতী-বিরোধী বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথা. এই প্রথা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে আলোচনা হয়েছিল তার বিবরণ; কোন্ শ্রেণীর মধ্যে এবং কোন্ বয়সী মেয়েদের মধ্যে সতী হবার প্রবণতা ছিল বেশী; সতী স্বেচ্ছায় হত, না জোর করে করা হত : কোথায় এর প্রচলন ছিল বেশী এবং কেন : ইত্যাদি।

লেখক জানিয়েছেন যে, কাশী অঞ্চলে এবং বঙ্গভূমে সহমরণের ঘটনা বেশী হত। আবার, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই প্রথাকে ধর্মীয় বিধান বলে যেমন নিষ্ঠার সংগে পালন করা হত, বাংলার অন্যত্র তেমনটি পরিলক্ষিত হত না। সিলেট, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই প্রথার চল ছিল না। আবার ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্বতন বোম্বাই প্রদেশে (অবশ্য কোঙ্কন জেলা বাদে) সতী প্রথা নামে মাত্র ছিল।

গ্রন্থটিতে শুধু সহমরণের কথাই নয়, হিন্দু নারীর সহসমাধির কথাও আছে। অনেক সময়ে মুসলমান মেয়েরাও সতী হতেন। এ ছাড়া কৌতুককর খবরও আছে। যেমন, ধর্মপত্নীই নয় ক্ষেত্র বিশেষে রক্ষিতারাও সহমরণে যেতেন। অন্যদিকে স্বামীর চোখের সামনে উপপতির চিতায় উঠে কেউ কেউ [illegible]

খবরও আছে। পাঁচ-ছয় বছরের ছেলের দায়িত্ব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ নিতে রাজী না হওয়ায় সেই পুত্র সমেত মায়ের চিতায় আরোহণ। তিন দিনের ছেলের মা সতী হচ্ছেন। ভাবী স্বামীর চিতায় কেউ কেউ সতী হতেন। আট বছরের মেয়ের সতী হবার কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। এতেও অবাক হবার কিছু নেই, কারণ চার-পাঁচ-ছয় বছরের মেয়ের সতী হওয়ার ঘটনা নাকি বিরল নয়। এই জাতীয় বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য ঘটনায় গ্রন্থটি পরিপূর্ণ।

বইটি থেকে বিশেষ কোন ঘটনা উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকলাম কারণ সম্পূর্ণ বইটি উদ্ধৃতিযোগ্য। বইটিতে কোন অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর কথা নেই। বিষয়টি গুরুগম্ভীর হওয়া সত্ত্বেও লেখকের প্রকাশভঙ্গী ও রচনাশৈলীর প্রসাদগুণে বইটি সমাদরযোগ্য। ধর্মগ্রন্থপাঠে পুণ্য সঞ্চয় সম্ভব কিনা জানা নেই, তবে স্বপন বসুর 'সতী' গ্রন্থ পাঠের দ্বারা পূর্বপুরুষদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয় হবে। গ্রন্থটি প্রতিটি বাঙালী হিন্দুর অবশ্যপাঠ্য। কেবল অজস্র ঘটনাই নয়, লেখক গুটি কয়েক দুর্লভ ছবিও বইটিতে দিয়েছেন।

"কেন মেয়েরা সতী হত?" অধ্যায়টি উল্লেখযোগ্য। লেখক চোদ্দটি কারণ দর্শিয়েছেন যে জন্য মেয়েরা সহমরণে যেতেন। কারণ হিসেবে তিনি প্রেম-ভালোবাসার কথাও উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তা তেমন জোরালো নয়—তা মনকে নাড়া দেয় না। প্রেম-ভালোবাসা যদি যুক্তিই হতো তবে পতিদেবতারাও তো রেহাই পেতেন না। তা ছাড়া "......স্বামীকে ভালোবাসিতে হইবে, ইহা কোন কালেই হিন্দু সমাজ কর্তৃক নারীধর্মের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। হিন্দু-ললনার ধর্ম, পতিভক্তি—পতিপ্রেম নহে।" (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮৪) মূল কারণ সংস্কার আর অসহায় অবস্থা। অর্থনৈতিক কারণই তাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিত। এসব কথাও অবশ্য লেখক উল্লেখ করেছেন এবং তা বিশদভাবে আলোচনাও করেছেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বহু নজির ও তথ্যের সাহায্যে লেখক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বেচ্ছায় সতী হত। লেখকের এই সিদ্ধান্ত এক অর্থে ঠিক। এই জাতীয় প্রথাকে অমানবিক, নিষ্ঠুর বা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে তাঁরা গণ্য করতেন না। এবং গণ্য করতেন না বলেই মাতৃজাতি তাঁদের গর্ভের সন্তানকে ধর্মের নামে স্বেচ্ছায় জলে ভাসিয়ে দিতে পারতেন। তবে প্রশ্ন, লোকভয়, ধর্মভয় ইত্যাদি নারীর এই স্বেচ্ছাকে কতখানি প্রভাবিত করত। একটা সিদ্ধান্ত অনায়াসে করা যায়—সতী হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস যদি দৃঢ়-মূল হত তবে এক বিধর্মী বিদেশী সরকারের আইনের বলে তা রাতারাতি বন্ধ হত না। কিছু পাটোয়ারি বুদ্ধি-সম্পন্ন ফন্দিবাজ ব্যক্তি ছাড়া সর্বস্তরের মানুষ এই আচারকে অন্তর থেকে ঘৃণা করত বলেই তা আইনের দ্বারা বিলোপ করা সম্ভব হয়েছে। আইন একটা অজুহাত মাত্র। আইন করে চুরি করা, আত্মহত্যা করা যায় বিবাহে পণ নেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে; কই, এসব অনাচার তো বন্ধ হয়নি।

সতী প্রথার অবসান হয়েছে ঠিকই কিন্তু হিন্দু বিধবার, বিশেষ করে আর্থিক কারণে পরনির্ভরশীল বিধবার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অবসান হয়েছে কি? কতিপয় যথার্থ শিক্ষিত পরিবারের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এই স্বাধীনতা-উত্তর কালেও সেই পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। আজ থেকে প্রায় এক শ বছর আগে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় "বঙ্গদর্শনে" বড় আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, "সহমরণ উঠাইয়া দেওয়ায় হিন্দু বিধবার কি লাভ হইয়াছে?—তাহাদের দুর্দশায় কি তারতম্য হইয়াছে? এইমাত্র যে তখন একদিন পুড়িত। এখন সমস্ত জীবন পুড়িতে থাকে। তখন পুড়িয়া মরিতে পাইত, —এখনও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে পায় না।" কথাটা আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পার হয়ে এসে এই ১৯৭৯ সালেও মর্মান্তিকভাবে সত্য।

অশোক দাস

প্রিয়জনোচিত। সত্যেন্দ্র আচার্য। ত্রয়ী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। বারো টাকা।

লীলা অভিনয়। সত্যেন্দ্র আচার্য। জয়দীপ পাবলিকেশনস্, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা বারো। সাত টাকা ॥

সত্যেন্দ্র আচার্য একালের অন্যতম বিশিষ্ট গল্পকার। দুই দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেল তিনি নিরলসভাবে ছোট গল্প লিখে চলেছেন। বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর তেরোটি উল্লেখযোগ্য গল্পের সংকলন 'প্রিয়জনোচিত'। যে চতুরঙ্গ আয়োজন ছোটগল্পের সার্থকতার ইঙ্গিত বহন করে তার সবকটি উপাদানই লেখকের রচনায় উপস্থিত। বিষয়-বৈচিত্র্য তাঁর গল্পের প্রধান আকর্ষণ। তিনি অনায়াসেই বিচিত্র রসের অভিজ্ঞতাকে যথাযথ পরিবেশে বিশ্বস্ত-ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। যে কারণে তাঁর রচনায় একঘেয়েমি বা পুনরাবৃত্তি-দোষ নেই। 'কান্ডারী' গল্পে আদি-বাসী জীবন ও আদিম সংস্কারের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ মানুষের সংগ্রামের টানাপোড়েন, 'রাজপুত্র, কোটালপুত্র' গল্পে পাহাড়ী প্রতিবেশে কর্মকামলিন দুই বন্ধুর প্রেমিক সত্তা, 'দিনের শেষে' গল্পে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত দুই নরনারীর বেঁচে থাকার ইচ্ছা, 'সমুদ্রকন্যা' গল্পে সমুদ্রের পটভূমিকায় প্রেমের বিচিত্র জটিল প্রকাশ, 'কণ্ব মুনির আশ্রম' গল্পে পতিতা জীবনের অসহায়তা ও আকুতি, 'প্রিয়জনোচিত' গল্পে মফস্বলী বৃত্তান্তের পটভূমিকায় মিউনিসিপ্যালিটির শ্মশান-ডাক্তারের অন্তর্দ্বন্দ্ব—বহুবর্ণ অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর প্রতিটি গল্প প্রাতিস্বিক মহিমা পায়। আবার কোথাও কোথাও তিনি ছোটখাট নসটালজিক অভিজ্ঞতার সূত্রকে অনায়াসে পৌঁছে দেন এক স্বপ্নপ্রতিম প্রতীক-সংকেতের [illegible]

[illegible] 'ক্রীতদাস' এই পর্যায়ের গল্প। গ্রন্থনাতেও লেখকের চাতুর্য প্রশংসনীয়। ডিটেলস্-এর ব্যবহার তিনি কম করেন। কিন্তু যেটুকু করেন তা অব্যর্থভাবেই করেন। নাটকীয়তা এড়াবার জন্য তিনি চমৎকারভাবে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে পারেন। গল্পের শেষে তিনি মোটা দাগের স্ট্যান্টের আশ্রয় না নিয়ে একটা সূক্ষ্ম চমকের সাহায্যে নিজের ভাবনাকে পাঠকের মনে প্রশ্নের আকারে সঞ্চারিত করে দেন। গদ্যভাষাকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতেও তিনি পারদর্শী। প্রয়োজনবোধে ভাষাকে তিনি চিত্রকল্পময় করে তুলতে পারেন; আবার খরখরে কিংবা তির্যকভাবেও পরিবেশন করতে পারেন। তবে অতিরিক্ত কাব্যময়তা তাঁর গল্পবস্তুকে কখনো সখনো ধূসর করে তোলে। এ বিষয়ে লেখকের কিছুটা সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় কথা, সত্যেন্দ্র আচার্যর গল্পগুলি আমাদের আলোড়িত করে। লোভ-পাপ ইত্যাদি প্রবৃত্তির তাড়না, অসহায়তা-ভঙ্গুরতা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি পরিণামে আমাদের এক সদর্থক বোধের রাজ্যে পৌঁছে দেয়। আর এইখানেই লেখকের সাধনা ও সিদ্ধির চূড়ান্ত সাফল্য। প্রতিটি গল্পের রচনাকাল উল্লিখিত হলে সংকলনগ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

'লীলা অভিনব' উপন্যাসের বিন্যাস-রীতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রায় এক যুগ বাদে হাসপাতালে কনকের সঙ্গে আকস্মিকভাবে দেখা হয় লীলার। অপারেশনের পর রোগশয্যায় কনক লীলার বর্ণবহুল অতীতজীবনের কথা ভেবে দীর্ঘ রাত্রি বিনিদ্র অতিবাহিত করে। এই স্মৃতিরোমন্থনেই পূর্ণ হয়ে ওঠে উপন্যাসের কাহিনী। নিয়তি তাড়িত লীলার ব্যক্তিজীবনের সূত্রে উপন্যাসে একে একে ভিড় জমায় তার চার পুরুষবন্ধু—হিমানীশ, কিনয়, সন্দীপ এবং কনক। এরা সবাই নিজস্ব স্বভাব এবং অভিজ্ঞতায় লীলাকে ঘিরে এক একটি চমকপ্রদ আখ্যান গড়ে তোলে। আলাদা আলাদাভাবে এদের প্রত্যেকের জীবনের নানা প্রশ্ন-প্রসঙ্গ-পরিণাম সম্পর্কেও লেখক চমৎকার কয়েকটি খণ্ডচিত্র এঁকেছেন। যেগুলি স্বতন্ত্রভাবেও পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করে। এছাড়াও প্রসঙ্গত আরো কিছু চরিত্রকে লেখক উপস্থিত করেছেন উপন্যাসে। সব মিলিয়ে সত্যেন্দ্র আচার্যের চরিত্র-চিত্রণ দক্ষতা প্রশংসার দাবি রাখে। একালের প্রেম প্রেমহীনতা নিষ্ঠুরতা উন্মার্গগামিতা অবিশ্বাস অস্থিরতা অসহায়তা নানাভাবে ফুটে উঠেছে চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। রকমারি ঘটনা ও পরিবেশগত বৈচিত্র্য এনে কাহিনীকে সজীব রাখার ব্যাপারে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু স্মৃতিচারণ দীর্ঘ হওয়ায় এবং পরিচ্ছেদ-ক্রমের মধ্যে সঙ্গতির অভাব থাকায় উপন্যাসের নকশী কাঁথা কোথাও কোথাও অমসৃণ থেকে গেছে। তা ছাড়া মাত্রাতিরিক্ত ঘটনার অস্বস্তিকর চাপে পড়েও বিষয়বস্তু সঠিকভাবে পরিণামের দিকে এগুতে পারে নি। তবে সর্বশেষ পরিচ্ছেদে লেখক লীলার বিড়ম্বিত জীবনকে এক প্রতীকী পরিশুদ্ধির স্তরে নিয়ে গিয়ে নিজেকে কিছুটা পরিমাণে দ্বিধামুক্ত করতে পেরেছেন।

প্রণয় সেন

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

গ্রীষ্মকালীন চিত্রপ্রদর্শনী

গত ১২ অগাস্ট থেকে ১৫ দিনের জন্য আকাদমী অব ফাইন আর্টসের গ্রীষ্মকালীন প্রদর্শনী হয়ে গেল। ক্যাথিড্রাল রোডে আকাদমী ভবনের পুরো সামনের দিক জুড়ে অতি সাধারণ মানের এই প্রদর্শনীটি সাজান হয়।

যেহেতু প্রদর্শনীটির নাম দেওয়া হয়েছে "মিড্ সামার একজিবিশন অফ আর্টিস্টস অব ওয়েস্ট বেংগল"—সেখানে প্রবেশ করলে যে কোনও শিল্প রসিকের মনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের সম্বন্ধে একটি দারুণ নৈরাশ্য জাগবে। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও শিল্পীদের সংগে পরিচিত তাঁরা অবশ্য বুঝতে পারবেন যে এটি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী নয়। কারণ সামান্য দু'চার জন ছাড়া এ রাজ্যের প্রবীণ বা নবীন শিল্পী যাঁরাই শিল্পের ক্ষেত্রে কিছু দাগ কাটতে পেরেছেন তাঁদের কাজ এই প্রদর্শনীতে অনুপস্থিত। দু'চারটি ভাল কাজ যা আছে সেগুলি নিম্নমানের ছবির সমুদ্রে এমনভাবে মিশে আছে যে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রদর্শনীতে ভাস্কর্যের সংখ্যা খুবই কম—যে ক'টি নিদর্শন আছে সেগুলিও উপযুক্ত প্রদর্শনের অভাবে দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আকাদমী কর্তৃপক্ষ কোনও নির্বাচন ছাড়াই প্রদর্শনী উপস্থাপনা করেছেন কিনা জানি না। ৮৮নং কাজটি "জীবন একটি দেশলায়ের কাঠি ছাড়া কিছু নয়" কি করে প্রদর্শনীতে স্থান পায় বোঝা মুশকিল। ছবিটি রুচিহীন অশ্লীল এবং কোনো মতেই রসোত্তীর্ণ নয়।

যে কটি ভাল কাজ প্রদর্শনীতে চোখে পড়লো তাদের ভেতর বাঁ[illegible] ব্যানার্জির 'গুরাশ'-এর ঢঙে আঁকা তেলরঙের ছবি 'নির্জনতা' (১[illegible]) রসোত্তীর্ণ মিষ্টি ছবি। রং এবং রেখা[illegible] বিন্যস্ত ব্যবহারে সবল। অসিত মণ্ডলে[র] 'প্যাঁচা' (৮২) টেম্পারা মাধ্যমে ক[illegible] একটি আলংকারিক ভাল ছবি। শ্রীম[তী] সন্তোষ রোহাতগী (মৈত্র)-র তেল[illegible] 'ধূসর গায়কেরা' (৯৬) রং, রেখা আকারের সহজ ও সংযত ব্যবহারের জ[ন্য] দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবীণ শিল্প[ী] শ্রীমতী করুণা সাহা তাঁর জলরঙের ছ[বি] "রচনা" (১১০)-তে বলিষ্ঠ রেখার খে[লা] দেখিয়েছেন।

হেমন্ত মিশ্র কলকাতার আর একজ[ন] প্রবীণ শিল্পী। দু'টি ছবি নি[য়ে] প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ছ[বি] দুটিতে তাঁর রং লাগাবার কৌশলে পরিবর্তন দেখা গেল। এক[illegible] দ্যোতক।

তাঁর কাজগুলিতে এবার তুলি মোটা টানটোন। শ্রীইন্দ্র দুগারে[র] 'শিবতলা ঘাটের গঙ্গা ও শ্রীমতী চিত্র

(৪৬,৪৭) এই প্রদর্শনীতে অন্য মেজাজের সংবেদী কাজ।

প্রদর্শনীটিতে বহু নবীন শিল্পী কাজ দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের অনেকের ভেতরই হয়তো সৃজনশীলতার বীজ সুপ্ত আছে যা সুবাতাসে অঙ্কুরিত হ'তে পারে। প্রদর্শনীর সুযোগও একটি সুবাতাস। আকাদমী অব ফাইন আর্টস এই সুযোগ শুধু কিছু নবীন শিল্পীদের জন্য করে দিলেও তার জন্য ধন্যবাদ পেতে পারেন।
প্রজাপ সেন

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু

ডলটেন হাফ স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব—যা তারাতলার ইউনিয়ান কারবাইডের কর্মচারীদের সংগঠন—৭-১৪ এক সপ্তাহব্যাপী শিশু উৎসবের আয়োজন করেছেন। এ ছাড়াও ১৪ই অগাস্ট কাশ্রীতে দরিদ্র অবহেলিত শিশুদের খাবার নিমন্ত্রণসহ আনন্দ করার জন্য ডাকা হয়েছিল। তারাতলার শিশুরা এখানে লোকনৃত্য করেছিল আর বাড়তি আনন্দ হল শিশু-চলচ্চিত্র "জয়"।

চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল বিড়লা আকাদমী ৭—১২ অগাস্ট। ছবি ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ। বেশ ভাল ছবি কয়েকটা ছিল অবশ্য। এর মধ্যে জন্মদিনের পার্টির ছবি এঁকেছে একটি বাচ্চা মেয়ে স্নিগ্ধা চৌধুরী। রেশমী গুপ্ত এই একই বিষয় নিয়ে এঁকেছে একেবারে অন্য ধরনের ছবি। শিশুদের আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি ছবিতেই অদ্ভুত পরিণত রচনাভঙ্গী। রেশমী বোতলে সূর্যমুখী ছবিটার মধ্যে বোতলের জল আর হালকা ফুলের তফাতটা করতে পেরেছে। আর একটি ছোট্ট মেয়ে সুপ্রিয়া ভারমা একটা ফলের পাত্রে এঁকেছে লাল আপেলসহ অন্য অনেক ফল—স্থিরবস্তু চিত্র হিসাবে সাজাবার মধ্যে যে সহজ বুদ্ধি আর দক্ষতা দেখিয়েছে তা মনে রাখার মত। প্রসাদ নায়ার মাত্র তিন বছর বয়সে খেলনা গাড়ি আর টেডী ভালুক মজাদার করে এঁকেছে। রোহিণী মধুনাথন পুকুরের পদ্মপাতার মধ্যে মাছের লুকোচুরি রূপারোপের কায়দায় দারুণ। নন্দিনী বসুর ছবির নদীর এক কূলে শহর, অন্য পারে পিটার নামে কোনো লোকের পশুশালা। ঋতুপর্ণা চৌধুরী

সুপ্রিয়া ভার্মার "স্থিরবস্তু চিত্র"

... আর কিছু এঁকে—কাগজের চারপাশে আঁচলা টেনে মেঘগুলোকে তার বাইরে এঁকেছে। মেঘগুলো যে ওপর দিয়ে ভেসে যায়, তাকে ধরা যায় না—তার বক্তব্য চমৎকার ধরা যায়। সুমিত দেবভৌমিক নদী সূর্য এসব এঁকে রোপওয়ের তার সামান্য বেঁকিয়ে ঝুলিয়েছে। বুঝতে পারা গেছে সমস্ত ব্যাপারটা অনেক ওপর থেকে দেখা। সংগীতা বসু হলুদ প্রতিবেশে একটা কালো গাছ এঁকেছে জমাট করে।

কে যেন বলেছেন, "শৈশবে কৈশোরে বড়দের বই লুকিয়ে-চুরিয়ে পড়তাম। বড় হয়ে সটান লাইব্রেরীর ছোটদের বিভাগে ঢুকে পড়ি নতুন কি জানার আছে তা শেখার জন্য।"
সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

যামিনীনাথ-সংবর্ধনা

'গান্ধর্বী' শিক্ষায়তনের সপ্তদশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হল গত ১১ আগস্ট সকালে, অহীন্দ্রমঞ্চে। দুই অর্ধে বিভক্ত এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল বিস্তারিত ও মিশ্র অনুষ্ঠান। বৃন্দ তালবাদ্য, কত্থক নৃত্য, নৃত্য-সহযোগ গান, মণিপুরী নৃত্য, 'সাত ভাই চম্পা' নামে শিক্ষায়তনের ছাত্রীবৃন্দের নৃত্যনাট্য, ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও হিন্দুস্থানী খেয়াল সঙ্গীতের পরিবেশন—দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান সূচিত হল বেদগান (যেদমি প্রস্ফুরিব) দিয়ে। সম্মেলক কণ্ঠের এই গানের পর গান্ধর্বীর সভাপতি সুবিনয় রায় তাঁর স্বাগত ভাষণে বললেন, ভারতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বলেই রবীন্দ্রনাথের গান শিক্ষা ও অনুশীলন করতে হবে ভারতীয় সঙ্গীতেরই ভিত্তির উপরে। সঙ্গে থাকবে প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব ও তথ্যের মোটামুটি জ্ঞান। তাহলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ সাঙ্গীতিক মূল্য ও উৎকর্ষ সম্যক উপলব্ধি করতে পারব আমরা।

কর্মসচিবের ভাষণে সন্তোষ ঠাকুর গান্ধর্বীর বহুমুখী কার্যকলাপের উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কিছু ইঙ্গিত তুলে ধরলেন। তাঁর ভাষণশেষে সম্মেলক কণ্ঠে 'নবজীবনের যাত্রাপথে' গানটি শোনালেন গান্ধর্বীর শিক্ষকমণ্ডলী। এর পর সমাবর্তন। সমাবর্তনের আচার্য তারাপদ ভট্টাচার্য-এর ভাষণ ছিল সুললিত শ্লোকের মতো ঘনবদ্ধ ও মধুর। আচার্যের ভাষণের পর পরিবেশিত হল সম্মেলক কণ্ঠের আরেকটি গান—'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন'। এই গানটির পরেই ছিল এদিনের অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট পর্ব—হিন্দুস্থানী সংগীত জগতের বর্ষীয়ান বরেণ্য শিল্পী সঙ্গীতাচার্য ডঃ যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা-উৎসব।

গান্ধর্বীর পক্ষ থেকে সুবিনয় রায় মানপত্র ও উপহার তুলে দিলেন সঙ্গীতাচার্যের হাতে। সংবর্ধনার

সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়

প্রত্যুত্তরে খুব অল্প কথায় যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সংগীতজীবনের আরম্ভের ইতিহাস বর্ণনা করলেন। তিনি জানালেন, তাঁর বড়ো ভাই দিনুদার কাছে (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) গান শিখতেন। তাঁর নিজের গানের প্রেরণাও রবীন্দ্রনাথ। তখন তিনি লুকিয়ে গাইতেন রবীন্দ্রনাথের গান। তাঁর পরবর্তী প্রেরণাদাতা গিরিজাশঙ্কর।

ভাষণের পর সঙ্গীতাচার্য যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দ ভৈরী রাগে একটি খেয়াল (জাগে যোগী) ও একটি ভৈরবী দাদরা (না যাইয়ো রাধে যমুনা কা তীর) গেয়ে শোনালেন বয়স-জয়করা অম্লান কণ্ঠে।
প্রণব মুখোপাধ্যায়
ফোটো : কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অণিমা-স্মৃতি সংগীত-সম্মেলন

এ টি কানন ও করুণ সরোদবাদক নরেন্দ্রনাথ ধর গত ১১শে আগস্ট-এ ভারতীয় ভাষা পরিষদের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত অণিমা স্মৃতি সংগীত সম্মেলনের দুই মুখ্য শিল্পী ছিলেন। এই সংগীত সম্মেলন বাংলার সাঁতারু ও সঙ্গীত অনুরাগী স্বর্গীয়া শ্রীমতী অণিমা সাউর স্মৃতির উদ্দেশে আয়োজিত হয়েছিল। নির্ধারিত সভাপতি ডঃ রমা চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে শ্রীরাইচাঁদ বড়াল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ভাষণ দেন।

নরেন্দ্রনাথ ধরের ইমন রাগে আলাপ, জোড় ও দুই গৎ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আলাপের প্রথমার্ধ সুরেলা ও মীড়-আশে পরিপূর্ণ হলেও শিল্পী রাগের যথাযথ বিস্তারের দিকে মন দেননি। দ্বিতীয়ার্ধে তিনি এইদিকে মন দেন, ফলে খাদের কাজ ও অন্তরাগামী পর্দা তুলনায় অনেক ভাল হয়।

হঠাৎ মাইক্রোফোন আস্তে করে দেওয়ায় জোড় অংশের স্বরমাধুর্য ও প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। বিলম্বিত ও দ্রুত গৎগুলিও শিল্পী নিজ মানে বাজাতে পারেননি।

শেষের ঝিঁঝোটি রাগে দ্রু গৎটি আনন্দদায়ক হয়েছিল এবং এ মনোগ্রাহী বিস্তারের কাজ, তানকা ও ঝালার কাজ ছিল। এই অং মাইক্রোফোনের ঘাটতিটি দূর ক হয়েছিল। শিল্পীর সঙ্গে তব সহযোগিতা করেন স্বপন কুমার শি

এ টি কাননের প্রধান নিবেদ ছিল মারোয়া রাগে বিলম্বিত ও দ্রু খেয়াল। তাঁর গুছিয়ে গাও বিস্তারের কাজ অতি অল্প সম বিশুদ্ধ রাগরূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষ হয়েছিল। সরগমের কাজেরও প্রধা গুণ এটিই ছিল। বিলম্বিত খেয়াল টির শেষাংশে ও দ্রুত খেয়ালটিতে জোরালো, সুরেলা ও সুপরিকল্পি তানকারি ছিল।

এরপরে শিল্পী বেহাগ রাগে দুই দ্রুত খেয়াল গেয়ে শোনান দুটিতেই উচ্চাঙ্গের তানকারি ছিল তাঁর সকল বৈঠকে এক অনিবার্য ও আনন্দদায়ক গান—'লাগি লগন (হংসধ্বনি, দ্রুত)—ও একটি পিলু ঠুংরী গেয়ে কানন তাঁর বৈঠক শেষ করেন।

সম্মেলনের শেষ বৈঠকটিতে ছিলেন রণেন দাশগুপ্ত ও সন্ধ্যা দাশগুপ্ত। এঁদের যুগল সেতার বাদন অনিবার্য কারণে শোনা সম্ভব হয়নি।

নরেন্দ্রনাথ ধরের একক আসর

'মজলিস' নামক এক নতুন সঙ্গীত সংস্থা তরুণ সরোদবাদক নরেন্দ্রনাথ ধরের একক আসরের আয়োজন করেছিলেন কুমারসিং হলে গত ১৪ জুলাই। অনুষ্ঠানের সভাপতি রাইচাঁদ বড়াল ও প্রধান অতিথি কানাইলাল বসু ভাষণ দেন।

শিল্পীর প্রথম নিবেদন ছিল পূরিয়া-ধানেশ্রী রাগে আলাপ, জোড় ও গৎ। আলাপটি মিড় আশে পরিপূর্ণ ছিল এবং খাদের কাজ হয়েছিল অতি উচ্চাঙ্গের, তবে শিল্পী কিছু স্বরসমষ্টির পূর্ণাঙ্গবিস্তার করতে নারাজ হওয়ায় জায়গায় জায়গায় শুষ্কতার আবির্ভাব হয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথ ধর

Parryware is among the finest sanitaryware in the world. The best architects will agree with us.
AVAILABLE IN GLEAMING WHITE AND IN SIX GENTLE PASTEL SHADES.
E.I.D.- Parry (India) Limited
Ceramics Division
Dare House
MADRAS 600 001
Parryware
VITREOUS
Superfine
Sanitaryware
EID 2389

এই দিক থেকে জোড়াটি কিন্তু অনেক ভাল ছিল এবং লম্বা মিড়ে শেষ হওয়া গমক লপেটের কাজগুলি যথাযথরূপে আনন্দ দিয়েছিল। তান ও গমক-একহারা নকশাগুলিও উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং এগুলির ছন্দোবৈচিত্র্য ছিল দেখবার মত। শিল্পীর বলিষ্ঠ ঝাড়গুথাওয়ের কাজও অতি প্রশংসনীয় হয়েছিল এবং বোল বৈচিত্র্য ও সুর-ছন্দের ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছিল দক্ষতার সঙ্গে।

বিলম্বিত গৎটিতে বিস্তারের কাজ, চৌগুণী গমক, বোলে ভরপুর ছন্দের কাজ ও তান-তোড়া সবই ভাল হয়েছিল। স্বর্গীয় কেরামৎউল্লা খাঁ সাহেবের পুত্র সবীর খাঁর তবলা সঙ্গত আনন্দদায়ক হয়েছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর লয় বাড়িয়ে ফেলার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। দ্রুত তিনতাল গৎটিতে তান ও ঝালার কাজ দুইই ভাল হয়েছিল।

নরেন ধরের দ্বিতীয়ার্ধের বাজনা আরো উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। এই অংশে তিনি বাজিয়েছিলেন মালকোষ রাগে আওচার, বিলম্বিত তিনতাল গৎ ও দ্রুত তিনতাল গৎ। আওচার ও বিস্তারের কাজ সুরেলা ও মেজাজী হয়েছিল এবং দীর্ঘ রেশের স্রোত একটি আশ্চর্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। ছন্দের কাজ, লয়কারি ও তানকারি সবেরই পরিকল্পনার মধ্যে যে মৌলিকত্ব ও পরিপক্কতার পরিচয় পাওয়া গেল তা সাধারণত কোন তরুণ শিল্পীর কাছ থেকে আশা করা হয় না। দ্রুত গৎকারির পরিকল্পনা একই শ্রেণীর না হলেও এই অংশে শিল্পী ভাল দুনি তান ও উচ্চাঙ্গের ঝালার কাজ বাজিয়েছিলেন। খাম্বাজ রাগে একটি দ্রুত গৎ বাজিয়ে শিল্পী তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন।

নীলাক্ষ গুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

পঁচানব্বই মিনিটের বিপ্লব

আসলে প্রস্তাবনাতেই সব কিছু বলা হয়ে গিয়েছিল—'সেই একই প্রতিচ্ছবি—যন্ত্রণা আর জীবনের স্তব—নিরবধি সুরে অনুরণিত...নটতীর্থ সেই বহমানতায়...শাশ্বত ধ্বনির বাহক' ...আর সেই জন্যই সম্ভবত গত বারই আগস্টের সন্ধ্যায় বারাকপুরের 'নটতীর্থ' একঘেয়ে গণ্ডী কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম নাটক 'ইজ্জত' বা দ্বিতীয় নাটক 'বিপ্লবের গান'—উভয় ক্ষেত্রেই নাট্যকার অমল রায় তাঁর সেই প্রথাসিদ্ধ 'গেরিলা পেরী'-বাহী বিপ্লব-বিন্যাস অব্যাহত রেখেছেন। সেই একই অনুসরণ, একই গতিভঙ্গী আর একই বক্তব্য শেষ পর্যন্ত পরিসমাপ্তি রেখা টেনেছে। বৈচিত্র্য আনার চেষ্টায় 'ইজ্জত'-এর জাইডেল চরিত্রে পরিচালক-অভিনেতা শ্রীকুমার ঘোষ কথায় কথায় অযথা উচ্চহাস্যে অথবা যাত্রাঢঙে শরীরটিকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মঞ্চে আধুনিক যাত্রারও অভাব মেটাতে সাহায্য করেছেন। সেই সঙ্গে, বিদেশী কোন কুট বা ছল চরিত্রাভিনয়ে পায়ের টো-এর ওপর ব্যালান্স রেখে সবাক ব্যালে ড্যান্সের প্রয়োজনীয়তা কতদূর আবশ্যিক, তাতে ভাববার অবকাশ থেকেই যাচ্ছে। নায়িকা স্বপ্না মুখার্জীর জেরোনিকা প্রথম কিছু মিনিট একেবারেই অস্বস্তিকর অগোছাল। শেষ পর্যায়ে তাঁর অভিনয় স-প্রাণ। দুই গেস্টাপোরূপী সাধন চৌধুরী ও প্রতাপ সেনগুপ্ত ভাঁড় বিশেষ। সুব্রত মুখার্জীর সিমনের হাত দুটো তাঁর পক্ষে বাড়তি বোঝা বলে মনে হয়েছিল। সমীর সেনগুপ্তর উইলি (চেঁচামেচি কমালে) মন্দের ভাল আর অমল দাসগুপ্তর রোলফ্-এ অভিনয়ের অবকাশ যথেষ্টই কম। একমাত্র রান্ডলার রূপী আলোক ধর আরও দৃঢ়, মনস্ক ও গতিসম্পন্ন হতে পারলে নিজের চরিত্রের প্রতি সুবিচার করতে পারতেন। সুতরাং 'ইজ্জত'-এর ইজ্জত রক্ষিত হয়নি। কারণ 'ইজ্জত লোটার' একটি সুকৌশলী প্যাঁচের স্থির চিত্র দেখানোকে ঘিরেই বাকি সমস্ত কাণ্ডকারখানা। সেক্ষেত্রে 'বিপ্লবের গান' কিছুটা (সমবেত চেঁচামেচি এবং বহু নাটকে ব্যবহৃত কয়েকটি ঘটনার নিদর্শনের বক্তৃতাধর্মী উল্লেখকে চোখ এড়িয়ে যেতে পারলে) সফল। 'টিমওয়ার্ক' যথেষ্ট ভাল। পশুপতি চরিত্রের হরেন রায়ের অভিনয়কে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে। বাকি তিন চরিত্রে অমল দাসগুপ্ত, সমীর সেনগুপ্ত এবং শ্রীকুমার ঘোষ থেমে থাকেননি। কিন্তু একটা কথা, নাটক অনুযায়ী সংগ্রামস্থল এবং চরিত্রগুলো যেহেতু এ দেশের, সেখানে সংলাপ উচ্চারণে এবং অভিনয়ে ইউরোপীয় ভাবধারার অনুসরণ কেন? ডিটেল্স্-এর কাজও সময় সময় হাসির খোরাক জুগিয়েছে। 'ইজ্জত'-এ ইজ্জতহানির আগে চক্রাকারে মঞ্চ পরিক্রমণ এবং খাটের অবস্থান দেখে নিয়ে বন্য চালিতের মত শুয়ে পড়া অথবা 'বিপ্লবের গান'-এ কিশোর কাছ থেকে টর্চ চেয়ে অসীমের ছুরি হাতে পাওয়া মনে রাখবার মত। মিনু চৌধুরী ও সুখেন্দু দাসগুপ্তর আলো উল্লেখযোগ্য না হলেও চলনসই। কিন্তু সংগীতে সুব্রত মুখার্জীকে সফল বললে অন্যায় হবে। টেপ রেকর্ডে সংগৃহীত আবহ-ধ্বনিগুলো সর্বত্র সু-প্রযুক্ত হয়নি। শব্দ নিয়ন্ত্রণও ব্যর্থ। শ্রোতাদের অনেক অশ্রাব্য ধ্বনি শুনতে হয়েছে। সমীর সেনগুপ্তর মেক্-আপ মোটামুটি। মঞ্চসজ্জায় অমল দাসগুপ্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও অমনোযোগ দৃষ্টি এড়ায় না। একেবারে সামনের ছেঁড়া ন্যাকড়া তিনটেকে গাছ বলে ভাবতে কষ্ট হয়। সবসুদ্ধ পঁচানব্বই মিনিটের এই বিপ্লব (মাঝের প্রস্তুতির দীর্ঘায়িত বিলম্ব বাদ দিলে) আমন্ত্রিত 'ছড়ানো ছিটানো গোষ্ঠীবদ্ধ স-পরিবার' দর্শকের হাততালি কুড়িয়েছে নিঃশেষে।

স্মারক মিত্র

সমাধান

সমস্যাটা যেখানে একটি আশ্রিতা অনূঢ়া কন্যাকে বিয়ের টোপর পরানোর

ভয়ংকরভাবে ঘটনা দিয়ে ঘটবে, এটা আগে ভাগেই ধারণা করা গিয়েছিল। অন্যথা হয়নি। শেষ পর্যন্ত দেবরাজ রায় ও ঝুমা মুখার্জীকে বরকনে বেশে মঞ্চে আসতেই হল। বাংলা অভিনয়ে বাড়ল আরেকটি নবদম্পতির সংখ্যা।

মামুলী কাহিনীর বুদ্ধিহীন ঘটনাকে আবেগসর্বস্ব নাট্যরসে চুবিয়ে যে গোল্লা তৈরী করা হয়, আমাদের নাট্যামোদী দর্শকের এক শ্রেণীর কাছে যতদিন তা উপাদেয় ঠেকবে, ততদিন এই ধরনের সাজানো নবদম্পতিকে আশীর্বাদপুষ্ট করতে অভিনয়-ব্যবসায়ীদের কোনো বেগ পেতে হবে না—বর্তমান প্রযোজনায় স্টার থিয়েটারের মূল ভরসা যেমন এদিক থেকে, তেমনি কয়েকজন শিল্পীর অভিনয় গুণ এই ভরসাকে বেশ পোক্ত করেছে। এসব ক্ষেত্রে কাহিনীটা (অমিত গাঙ্গুলী) আসলে উপলক্ষ মাত্র, পরতে পরতে আবেগ সৃষ্টি করাই প্রধান কথা। এই উদ্দেশে সমাধান নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা নির্দেশক রঞ্জিতমল কাংকারিয়ার দাবি মত সাড়া দিতে পেরেছেন, এই দাবি আগাগোড়া বুদ্ধিগ্রাহ্য না-হলেও মোটামুটিভাবে পরিচ্ছন্ন, এই যা।

সরলমতী নায়িকা আরতির ভূমিকায় ঝুমা মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিনয়ে নাটকের সেন্টিমেন্টাল পয়েন্টগুলোকে আন্তরিকভাবে ব্যবহার করেছেন, যদিও তাঁর প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি জাগার মূলে মঞ্জু চক্রবর্তী রচিত রেখা চরিত্রের 'আত্মাভিমান' পরোক্ষভাবে কিছুটা সাহায্য করেছে। সেদিক থেকে সমাধানের নাট্যক্রিয়ায় এই দুই শিল্পীর অভিনয়ের বিপরীত-ধর্মিতা প্রশংসার সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের দুজনের অভিনয়েই কিছুটা একঘেয়েমি রয়েছে। নাটককে গতিসম্পন্ন করার মূলে রয়েছেন মহেন্দ্র গুপ্ত। প্রথাবদ্ধ হলেও দাদু চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের অভিজ্ঞতা সম্ভ্রম জাগায়। এবং পেশাদারী মঞ্চের মেলোড্রামায় যাঁরা সহজেই জমে যান তাঁদের পক্ষে এই শিল্পীর অভিনয় নিশ্চিত-ভাব জরুরী। কালী ব্যানার্জীর অভিনয়ে হারাণ মুখার্জী মূর্তিমান, একবার অভিনয়ের ভেতর অভিনয় করে তিনি একটি উজ্জ্বল নাট্যমুহূর্ত দর্শকদের উপহার দেন। মনোজ ডাক্তারের ভূমিকায় দেবরাজ রায় একই সঙ্গে সুপ্রতিভ ও সংযমী। মঞ্জু ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের যথাক্রমে কমলা ও বিনোদও উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি। সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের চরিত্রটি নাটকের কোন কাজে লাগে না, কিন্তু রিলিফ হিসেবে বেশ তৃপ্তিকর। হরিধন মুখোপাধ্যায়কে দুদিক থেকেই বাহুল্য বোধ হয়। গোপাল রূপে তপন বসু আগাগোড়া বিরক্তিকর, এজন্য তিনি নন, নির্দেশনাই দায়ী। সুযোগ বিশেষ না-থাকা সত্ত্বেও দুটি আন্তরিক চরিত্র রচনা চন্দ্রলেখা মুখার্জী ও অজন্তা চৌধুরীর।

[illegible] হেতু (?) সমাধান নাটকে নাচ ও গান দুই-ই রয়েছে। রেখা এই নাটকের এমন একটি চরিত্র যার মধ্যে রয়েছে উগ্র আধুনিকতা। ফলে একটি সুবিধে হয়েছে এই যে নাটকে নাচ রাখার জন্য তথাকথিত কোনো 'মিস'-কে ব্যবহার করতে হয়নি। যদিও রেখার চাচা-চা নাচ 'নমুনা' হিসেবে মঞ্চে এসে, অন্তত সময়ের দিক থেকে আসলকে ছাড়িয়ে যায়, তবু এর পরিকল্পনায় দর্শকদের মনের স্যানিটি নষ্ট হয় না। নাটকে ব্যবহৃত গান সম্পর্কেও একই কথা, প্রয়োগের দিক থেকে অবাস্তব হলেও শোভন। তিমিরবরণের সুরারোপে এই গান শুনতে ভালোই লাগে।

রানা দাস

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

সতীদেবী

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১১।

মৃত্যু : ১৪ আগস্ট, ১৯৭৯।

আটষট্টি বছর বয়সে শ্রীযুক্তা সতী দেবী পরলোকগমন করলেন কলকাতায় তাঁর একমাত্র কন্যাসন্তান প্রথিতযশা অভিনেত্রী এবং সংগীতশিল্পী রুমা গুহঠাকুরতার দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে। পুরোনো দিনের ঐতিহ্যবাদী শিল্পীর প্রয়াণে এ যুগের সঙ্গে আগের যুগের সংস্কৃতিজগতের গৌরবময় যোগসূত্রটি ক্ষীণতর হবার মুখে। এ যুগের অনেকেরই সতী দেবীর কণ্ঠে গান শোনার অভিজ্ঞতা নেই, তবু এ কথা সত্য যে তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে যে-সব মহিলা শিল্পী বাংলা গানের বিভিন্ন ধারার গান গেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সতী দেবীর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল।

১৯১১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম ময়মনসিংহের বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবারে। পিতা চারুচন্দ্র দাস ছিলেন নাম-করা ব্যারিস্টার। স্ত্রী ও চারটি শিশুকন্যা সহ চারুচন্দ্র বিহারের পাটনা শহরে কার্যব্যপদেশে চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর চার কন্যার মধ্যে সতী দেবী ছিলেন দ্বিতীয়। প্রথমা শ্রীমতী গৌরী নাগ, তৃতীয় শ্রীমতী জয়া দাস এবং সর্বকনিষ্ঠা বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী এবং এককালের স্বনামধন্যা গায়িকা বিজয়া রায়। চারুচন্দ্রের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না।

শিশুকাল থেকেই চার ভগিনী অন্য সব ব্রাহ্ম পরিবারের মতো সঙ্গীতের আবহাওয়াতেই বেড়ে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে সতী দেবী ও বিজয়া দেবীর ছিল সহজাত প্রতিভা, অনুরাগ ও প্রীতি। তাই যখনই সুযোগ হয়েছে নানা ধরনের গান শিক্ষা করেছেন তাঁরা। খুব অল্প বয়সেই সতী দেবীর দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতাবশত নিয়মিত স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। পরিবারে শিশুকাল থেকেই ইংরেজীতে কথা বলার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী কালে নিজের চেষ্টায় অবশ্য যথেষ্ট পড়াশোনা করেছিলেন তিনি। পাটনা থেকে কলকাতায় যাতায়াত চলে নিয়মিত। কলকাতায় যখনই এসেছেন, পিসীমা, এককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়িকা কনক বিশ্বাস (দাশ)-এর কাছে গান শেখার সুযোগ হয়েছে তাঁর। সেই সূত্রেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে যাতায়াত এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ করবার সুযোগ তাঁর জীবনে আসে। দিনেন্দ্রনাথের কাছে গান শেখাও তাঁর এই সুবাদে।

১৯২৭ সালে অর্থাৎ বিবাহের এক বৎসর পূর্বে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' অভিনীত হয় সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবীর পরিচালনায়। এই অভিনয়ে শান্তার ভূমিকায় অভিনয় করে ও গান গেয়ে তিনি প্রভূত প্রশংসার অধিকারিণী হন। উল্লেখযোগ্য এই নাট্যাভিনয়ে শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুর 'প্রমদা'র চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন। 'মায়ার খেলা'র শান্তা চরিত্রের গানগুলি সতী দেবীর কণ্ঠে এতই উপভোগ্য হয় যে, গ্রামোফোন কোম্পানি 'মায়ার খেলা'র চারটি গান তাঁকে দিয়ে রেকর্ড করান। গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। 'পরিচয়' বাংলা চলচ্চিত্রে এবং বোম্বাইয়ের হিন্দী চলচ্চিত্র 'জোয়ার ভাটা'য় অনিল বিশ্বাসের সংগীত পরিচালনায় তিনি আমীর বাঈ কর্ণাটকীর সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে একটি হিন্দী ভজন গান করেন। ১৯২৮ সালে সতেরো বছর বয়সে কারাসতের জমিদার-পুত্র শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ (যিনি মণ্টি ঘোষ নামে অধিক খ্যাত)-এর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি ছিলেন জার্নালিস্ট। একাদিক্রমে অনেকদিন তিনি "ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট"-এ অমল হোমের সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। এক সময়ে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট সম্পাদনাও করেন। পরবর্তী কালে আমৃত্যু তিনি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত ছিলেন।। বিবাহের পর বেশ কিছুদিন এঁরা পাটনাতেই ছিলেন। ১৯৩২-এ স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডের তখন সতী দেবী একজন নাম-করা শিল্পী-রূপে চিহ্নিত। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীত, অতুল-

প্রসাদের গান, হিমাংশু দত্তের সুরারোপিত গানগুলি তখন বেশ জনাদৃত হয়েছিল। এ ছাড়াও তাঁর কণ্ঠের হিন্দী ভজন গানগুলি সর্বভারতে সসম্মানে প্রচারিত হয়েছিল। গুণগত বিচারে এই গানগুলি যে কতখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছিল তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে দুষ্প্রাপ্য এই রেকর্ডগুলি। যাঁদের এ গানগুলি শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরাই এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

পারিবারিক কারণে বেশ কিছুদিন তিনি এলাহাবাদ-প্রবাসী হয়েছিলেন—এর পর আবার ১৯৩৪-এ কলকাতায় ফিরে আসেন। এই বছরেই তাঁর একমাত্র সন্তান রুমা গুহঠাকুরতার জন্ম। এই সময় তিনি কলকাতায় ইন্দ্র রায় রোডে রবীন্দ্র-সংগীত, অতুলপ্রসাদের গান, ভজন প্রভৃতি শিক্ষাদানের জন্য 'স্বরবিতান' নামে একটি সংগীত-শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। আলমোড়া যাবার আগে তিনি কমলা গার্লস স্কুলে সংগীত-শিক্ষক-রূপে কিছুদিন ছিলেন। পরবর্তী কালে উদয়শঙ্করের আহ্বানে তাঁর 'আলমোড়া কালচার সেণ্টার'-এর সংগীত-শিক্ষকের পদে যোগদান করেন এবং যোগ্যতার সঙ্গে শিক্ষকতাকার্য পরিচালনা করেন। এই সময়ে শিশুকন্যা রুমাদেবীর বোম্বে টকীজ-এ একটি কাজের সুযোগ হওয়ায় তিনি কন্যাসহ বোম্বাইয়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। এখানেই তিনি পৃথ্বীরাজ কাপুরের বিখ্যাত পৃথ্বী থিয়েটার্সে নিয়মিতভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

তিনি যেখানেই গিয়েছেন তাঁর সংগীতে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অমায়িক ব্যবহার। এই ব্যবহারের জন্য তিনি অতি সহজেই সকলের প্রিয় পাত্রী হয়ে উঠতেন। সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর গানের একজন বিশেষ ভক্ত। তাঁরই অনুরোধে বিখ্যাত হরিপুরা কংগ্রেসে'র উদ্বোধন সংগীত করেন সতী দেবী এবং পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের রামগড় কংগ্রেসেও তিনি বন্দেমাতরম্ গান করেন। প্রসঙ্গত শ্রীযুক্তা সাহানা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়—মাত্র ১১ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯২২ সালে 'গয়া কংগ্রেসে' সতী দেবী তাঁদের সঙ্গে একত্রে 'বন্দেমাতরম্' গান করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁর রেকর্ডে গাওয়া গানগুলি প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অনুমোদন ছিল।

বোম্বাই থেকে রুমা দেবী যখন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাসের জন্য চলে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে তিনিও কলকাতাবাসী হন। 'ক্যালকাটা ইউথ কয়্যারের' তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য।

সতী দেবী গীত যে রেকর্ডগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে :

রবীন্দ্রসংগীত : 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' ও 'এতো খেলা নয়' (P 11763), 'ওলো রেখে দে সখী' ও 'পথহারা তুমি পথিক যেন গো' (P 11780), কনক বিশ্বাস ও অজয় বিশ্বাসের সঙ্গে 'জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়' এবং 'দেশ দেশ নন্দিত
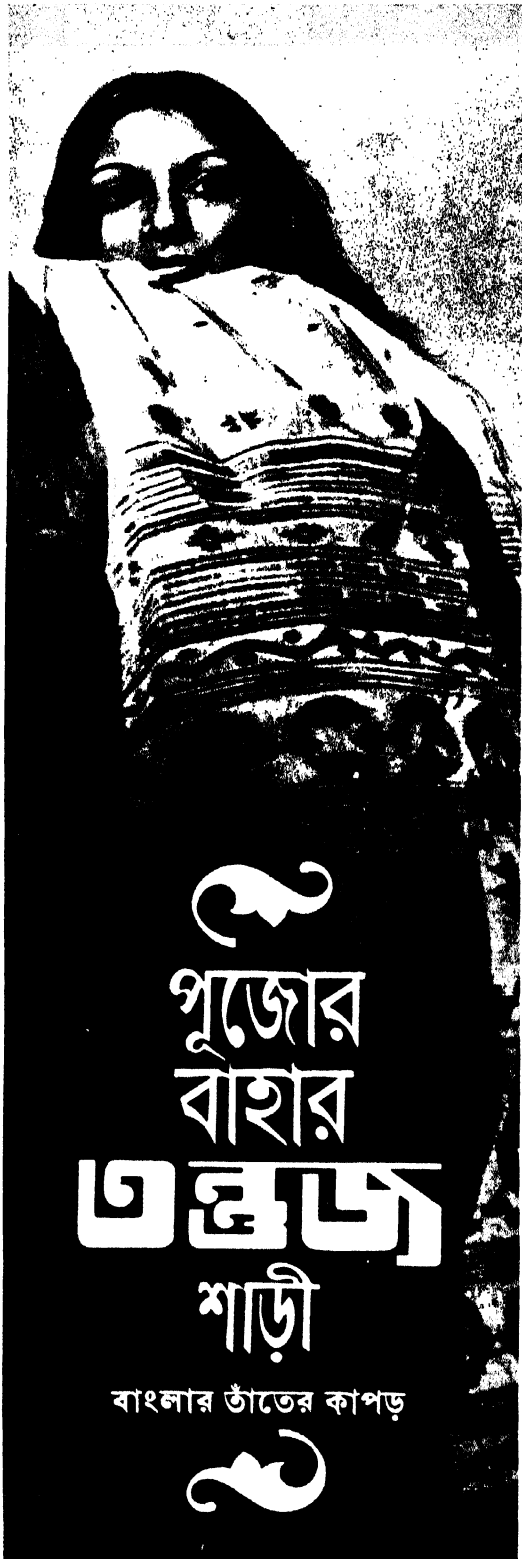
কার' (N 17002), [illegible]
'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে' ও 'ফিরবে না তা জানি' (H 987), 'বাদলধারা হল সারা' ও 'হে ক্ষণিকের অতিথি' (P 8907), 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' (P 11841), 'হায় রে ওরে যায় না কি জানা' (P 11796), 'আনমনা আনমনা' ও 'এসো নীপবনে' প্রভৃতি।

ভজন : তুমহারে কারণ সবসুখ ছোড়া, ম্যয়নে চাকর রাখো জী, মেরো তো গিরিধর গোপাল, বরসে বদারিয়া শাওনকে, পিয়ারে দরশন দিজো আয়ে প্রভৃতি।

অতুলপ্রসাদের গান : চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে!

হিমাংশু দত্তের সুরে গীত : যেন একটি মানে, সাগরপারের বন্ধু আমার প্রভৃতি।

অন্যান্য বাংলা গান : বন্ধু কেন এল না এ ভিজা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে (N 17358) এবং ওহে মাধব কি কহব ও মন্দির তাজি যবে (N 17005) প্রভৃতি।

সুভাষ চৌধুরী

নতুন প্রাণের চর

প্রথামত সানাই বাজেছিল। কিন্তু একত্রিশ জুলাই বিজন থিয়েটারের উদ্বোধন লগ্নে প্রথাসিদ্ধ সানাই ঠিক মানায় না। বিজন ভট্টাচার্য যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তারপর অনেকেরই অভিযোগ ছিল নাট্যকর্মীরা ক্রমশ সংগ্রামবিমুখ হয়ে যাচ্ছেন—ঠিক সেই সময় সায়ক গোষ্ঠী আবার প্রমাণ রাখলেন অক্লান্ত সংগ্রামের এবং সংগ্রামে জয়লাভের। সুতরাং সানাই নয় দুন্দুভি—পাঞ্চজন্যই উপযুক্ত সংগীত পরিমন্ডল গড়ে তুলতে পারত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীর্ঘসূত্র পরিকল্পনা যে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি—একটি অখ্যাত গোষ্ঠীর কয়েক জন তরুণ সেই কাজ করে দিলেন, সংগ্রামী বিজন ভট্টাচার্যের স্মৃতি এতখানি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে ভাবা যায়নি। খ্যাত-নামা অনেকেই বিরাট আকারে মঞ্চ-স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন কিন্তু পাত্রী এবং পাত্রীর রং পছন্দ করতে করতে ফুলশয্যা পর্যন্ত পৌঁছয়নি। সায়ক সম্প্রদায় নটরাজ এনটারপ্রাইজের সহযোগিতায় যে মঞ্চ নির্মাণ করেছেন তা হয়তো বিরাট নয়, কিন্তু বিরাট সংখ্যক নাট্যগোষ্ঠীকে সুযোগ করে দেওয়া এবং নাটকের পরিধিকে বিস্তৃততর করার কাজে ঐতিহাসিক অবদান হয়ে রইল। এই থিয়েটারের স্বপ্নকে বাস্তব করার জন্য কয়েকজন তরুণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মঞ্চের চিন্তায়, সমস্যায় পুরোধাপুরুষ গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন এবং অভাবনীয়ভাবে বিভিন্নজন সহযোগিতা করেছেন অকৃপণ সখ্যে, অকৃত্রিম দরদে—যার ফলে তৈরী হয়েছে পাঁচশো কুড়ি আসনের বিজন থিয়েটার—ভাড়া ধার্য হয়েছে সর্বসমেত মাত্র চারশো তিরিশ টাকা। মঞ্চ যখন তৈরী হচ্ছিল, তখন সায়ক গোষ্ঠী হয়তো [illegible] ছিলেন, আজ তাঁরা অর্জুন। সব্য-সাচীর মত দুই হাতে তাঁরা সমস্ত বাধা সরিয়ে বিজয়ী—কিন্তু রণক্লান্ত নয়। বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক অভিনয় করেন 'নবান্ন' গোষ্ঠী। নির্দেশনায় ছিলেন বিজন ভট্টাচার্যের পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্য। নটরাজ এন-টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রিনি বসু এবং সায়ক সংস্থার পক্ষ থেকে মেঘনাদ ভট্টাচার্য এই মঞ্চ তৈরীর ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, বিজন ভট্টাচার্যের নাম যেখানে জড়িত, সেখানে কোনদিন পেশাদারী প্রলোভনের অনুপ্রবেশ ঘটলে অপরাধ হবে। মঞ্চের উদ্বোধনের পর এখানে বারদিন ব্যাপী একটি নাট্যোৎসব হয়। প্রায় সকলেই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় করেন। প্রতিদিন অভিনয়ের আগে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন আজকের থিয়েটারের নাট্যকর্মীরা এবং প্রতিদিন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আরও কিছু নাট্যকর্মী। নাট্য প্রদর্শনীটি খুবই ছোট। সায়কের কয়েক জন মঞ্চ নির্মিতির জন্য সদা ব্যস্ত থাকলেও শেষ পর্বে কলকাতার প্রায়

সমস্ত নাট্য সংস্থা তাদে[র] পাশে দাঁড়িয়ে সর্বরকম সাহায্য করেছেন—এই প্রদর্শনীটিকে আরও ব্যাপক করার জন্য তাঁদের চেষ্টা করা উচিত ছিল। আর একটি কথা, উদ্বোধন দিবসে কোন পেশাদারী মঞ্চকে মালা পাঠাতে দেখিনি—শুভেচ্ছাও নয়—এমনকি যাঁরা প্রগতিবাদী বলে দাবী করেন, সেই সব মঞ্চেরও কাউকে দেখিনি। সব থেকে বড় কথা হল, উদ্বোধক ছিলেন সেদিনের সমাগত দর্শকবৃন্দ। হাতে একটি করে গোলাপ ফুল নিয়ে আমরা অনেকেই সেদিন নবাব-বাদশার মেজাজ নিয়ে শুঁকছিলাম, হঠাৎ মাইকে ধ্বনিত হল, 'খুলে যাচ্ছে বিজন থিয়েটারের পর্দা—আপনারা সকলে হাতের ফুল মঞ্চে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মঞ্চের শুভেচ্ছা জানিয়ে পর্দা খুলে দিন।' আমরা সচকিত হলাম। ঐ কয়েক জন তরুণের অক্লান্ত পরিশ্রমের পাশাপাশি আমাদের বাদশাহী বিলাসে ফুল শোঁকা মানায় না। তাই শুভেচ্ছা নিয়ে, ছুঁড়ে দিলাম ঐ মঞ্চে। উদ্বোধন লগ্নে হয়ত অনেক ক্লান্ত আয়েসী নাট্যকর্মীও উদ্বোধিত হলেন।

দেবাশিস দাশগুপ্ত ছবি : অজয় দত্তগুপ্ত

কি অপূর্ব স্বাদ

সরস-
সুস্বাদু

মিল্কমেড

মিল্কমেড দিয়ে চা ও কফি করলে
স্বাদ যে কতো অপূর্ব হয় — তা আর
বলার নয়। ফল বা পুডিং-এর উপর
ঢেলে দিন — এমনকি রুটিতে একটু
মাখিয়ে নিন, দেখবেন খেতে কতো
সুস্বাদু হয়েছে।

Nestlé®

মেয়েদের নিজস্ব
মহিলা আসরের পর

তৃষ্ণা যখন বক্ষ জুড়ে
লিম্‌কায় তখন মনটি ভরে!

চিঠিপত্র

মুসলিম রচিত বাংলা উপন্যাস

রশীদ-আল ফারুকীর "মুসলিম রচিত বাংলা উপন্যাসের আদিপর্ব (১৮৬৯-১৯০০)" (দেশ, ২৫ জুলাই, ১৯৭৯) একটি চমৎকার প্রবন্ধ। লেখককে অজস্র ধন্যবাদ তিনি বাঙালী মুসলমান লেখকের উপন্যাস রচনার আদিতম পর্বের উপরে গবেষণা করে বাঙালী পাঠক সাধারণের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন এক প্রায় অজানা তথ্যের প্রতি।

সত্যি বটে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সাহিত্যিকদের তুলনায় মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদান নিষ্প্রভ (বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারটাও তো অনেক পরের) এবং এমন একজন মুসলিম সাহিত্যিকও দেখানো যাবে না যিনি তাঁর রচনায় কোনো হিন্দু সাহিত্যিকের সমকক্ষ। তবু, আদিপর্বে মুসলিম সাহিত্যিকদের উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যে আন্তরিক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়—মীর মশাররফ হোসেন যার কেন্দ্রবিন্দুতে—তার সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। লেখকের প্রয়াস তাই ধন্যবাদার্হ।

মীর মশাররফ হোসেন যে কেবল 'বিষাদ-সিন্ধুর' লেখকই নন, তাঁর অন্যান্য উপন্যাসও আছে এবং "উদাসীন পথিকের মনের কথা" ও "গাজী মিঞার বস্তানী" পুস্তক দুখানি যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে, রশীদ-আল ফারুকী, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও বিশ্লেষণী আলোচনায় তার পরিচয় দিয়েছেন। "উদাসীন পথিকের মনের কথা" বিস্তৃত আলোচনার দাবী রাখে। কজন এ-বই পাঠ করেছেন জানি না (বহুকাল এ-পুস্তক দুষ্প্রাপ্য)। কিন্তু পড়লেই দেখা যাবে এ-পুস্তকে কেবল উপন্যাসের লক্ষণই নয়, তৎকালের মধ্যবঙ্গীয় সমাজের এক বড়ো মাপের চিত্রও এ-পুস্তকে পাওয়া যাবে। মীর সাহেবের পারিবারিক কাহিনী যদি বাদও দিই, তবু কেনিয়ার নীলকর টি আই কেনী এবং ঐ জমিদার প্যারীসুন্দরী ও ভৈরব-বাবু—এই তিন চরিত্রে কেন্দ্রায়িত কাহিনীবলী পাঠকের মনোযোগ কেড়ে নেবে এবং পাঠান্তে তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের এক নিখুঁত চরিত্র প্রতিভাত হবে পাঠকের মানসপটে। মধ্যবঙ্গের ঐ মধ্য অঞ্চল— পদ্মা-গোরাই-চন্দনা নদী-বিধৌত অঞ্চল—নদীয়া, পাবনা, যশোর ও ফরিদপুরের সঙ্গমস্থল.... তার অধিবাসী, তাদের জীবনযাত্রা, নীলকরের অত্যাচার, জমিদারদের বিভব, চরিত্র, উপচিকীর্ষা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির এক চমৎকার হার্দ্য বিবরণ আছে। "নীলদর্পণ" নাটকে মুখ্যত নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে সংঘর্ষের বর্ণনা; কিন্তু নীলকর সাহেবদের সঙ্গে দেশী জমিদারদের সংঘর্ষের বর্ণনা পাই "উদাসীন পথিকের মনের কথায়"। ঘটনাটি ঐতিহাসিক।

প্রবন্ধ লেখক বলেছেন, "ধরে নিতে পারি যে তিনি (মীর মশাররফ হোসেন) সত্য বিকৃত করেননি। এই কারণেই গ্রন্থটি একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হতে পারেনি। আমি 'বিষাদ-সিন্ধু'কেই মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মনে করি। কিন্তু শৈল্পিক দৃষ্টিতে বিষাদ-সিন্ধুর তুলনায় উদাসীন পথিকের মনের কথায় উপন্যাসের লক্ষণ অনেক বেশী" কথাগুলি অভ্রান্ত। "উদাসীন পথিকের মনের কথায়" সত্য অবিকৃতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভৈরববাবুর সঙ্গে কেনীর বুদ্ধির লড়াই। তাঁর লাটের খাজনা লুটের ব্যাপার ও কেনীকে জব্দ করার কাহিনী সর্বৈব সত্য। এসব ঘটনা ঐ অঞ্চলের লোকেদের মুখে মুখে ফিরতো এক-কালে এবং ভৈরববাবুর যে কোনো বংশধর এ-সব কাহিনী জানেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভৈরবচন্দ্র মজুমদার ছিলেন পাংশার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার, খ্যাতকীর্তি, বিরাট সংগীতজ্ঞ এবং দেবোপম চরিত্রের লোক। (সতীনাথ ভাদুড়ি তাঁর "জাগরী"তে" পাবনা জেলার জমিদার যে ভৈরব ভূঁইয়ার নাম করেছেন, যাঁর নামে মনস কবাল দন্ধ্যা গাছে ফল ফলতো, তিনি এই ভৈরব মজুমদারই।)

কিন্তু সত্য ঘটনাও যে উপন্যাসোপম এবং "উদাসীন পথিকের মনের কথার" বহু আখ্যান বঙ্কিমচন্দ্র ও স্কট উভয়ের রচনার খুব কাছাকাছি, পুস্তকখানি পাঠ করলে তা সহজেই বোঝা যাবে। আর বিভিন্ন চরিত্র, সামাজিক পটভূমি, সরস ঘটনার বর্ণনা, সরল, অনাড়ম্বর ভাষা, সূক্ষ্ম হিউমার —সব কিছুই পাওয়া যাবে প্রায় একশো বছর আগের লেখা এই পুস্তকে। যার ঘটনাকাল আবার তারও পঞ্চাশ বছর আগের। সরল, পরিচ্ছন্ন ভাষার একটুখানি নমুনা উদ্ধৃত করছি।

"পাংশা স্টেশনের নিকটেই ভৈরববাবুর বাড়ী। ভৈরববাবু বুনিয়াদি বাবু। যে সময়ের কথা, সে সময়ে বাবুর সংখ্যা বড়ই কম ছিল। বাবু বলিতে ভৈরববাবু। বিশেষ মান্যগণ্য, বনিয়াদে, ঘরানা, সচ্চরিত্র, সৎ স্বভাব, সকলের প্রিয় যিনি, তিনিই বাবু নামে পরিচিত হইতেন। শুধু আলবার্ট কেতায় চুল কাটাইয়া, সিঁথির বাহার উড়াইলে সে সময় বাবু হওয়া যাইত না। বাবুর বাজার বড়ই কড়া ছিল। ভৈরববাবু যথার্থ বাবু।"

"ভৈরববাবুর বৈঠকখানা অতি পরিষ্কার। ফরাসের চাদর, বড় বড় তাকিয়ার খোল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাবু বড় একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। সোনা বান্ধান, রূপা বান্ধান হুঁকাগুলি ধুতুরাফুলে কলকি, রূপার সরপোস মাথায় করিয়া বৈঠকের উপরে বসিয়া আছে। গড়গড়িও মজলিসে স্থান পাইয়াছে। শ্যামাদানে বাতি জ্বলিতেছে, দুই একটি দেয়াল-গিরীও নারিকেল তৈলে জ্বলিতেছে। ভৈরববাবু বড় সৌখিন। সঙ্গীত বিদ্যায় মহাপণ্ডিত। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা হয়। অন্যও

হইতেছে। প্রধান শিষ্য মাধবচন্দ্র রায় তানপুরা লইয়া সুরট মল্লার খেয়াল ধরিয়াছেন। বাবুর মধ্যম পুত্র দেব-বাবু পাখওয়াজ বাজাইতেছেন। পিতার নিকটেই শিক্ষা। অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা পাখওয়াজ তবলায় দেববাবুর হাত খুব খুলিয়াছে। চমৎকার বোল উৎরিয়াছে। অশ্লীলতা, শ্রুতিদোষ, দোষভাবাপন্ন কোন প্রকার গান তাঁহার বৈঠকখানায় স্থান পাইবার অধিকার ছিল না।...

"সেদিন বড় জাঁকাল মজলিস। প্রাচীন নগর দিল্লী হইতে বিখ্যাত কালওয়াত খাজা খাঁ আসিয়াছেন।...... খাজা খাঁ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় সাদা পাগড়ী, দাড়িগুলিও সম্পূর্ণ সাদা. —পাগড়ী, দাড়ি আর দন্ত এই তিনটি সাদা জিনিসেই সকলের দৃষ্টি পড়িতেছে। তানপুরার আড়াল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের চেহারায় খাজার সাদা জিনিস কয়েকটি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছে না..."

ভৈরববাবুর সঙ্গে নীলকর কেনীর দ্বন্দ্বের কাহিনী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়বার মতো। যশোরের পথে ভৈরববাবুর লাটের খাজানা লুঠ করার চক্রান্ত এবং সে চক্রান্ত ভণ্ডুল করার ব্যাপারে ভৈরববাবুর কূট চাল, গোয়েন্দা কাহিনীর মতো লোমহর্ষক। ভৈরববাবুর উদারতা ও মহত্বও মীর সাহেবের রচনায় ভাস্বর।

"উদাসীন পথিকের মনের কথা" পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য। দুষ্প্রাপ্য "গাজী মিঞার বস্তানী"ও। আমি বাল্যকালে বছর চল্লিশ আগে পারিবারিক সংগ্রহ থেকে এ-পুস্তক প্রথম পাঠ করি। বছর বারো আগে, একটি প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারে ঐ পুস্তকখানি জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে পুনরায় পাঠ করি। সে সময় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই দুখানি পুস্তক নিয়ে আলোচনাও করি। "গাজী মিঞার বস্তানী" কিন্তু যোগাড় করে উঠতে পারিনি। সম্প্রতি দেখলাম কোন এক প্রকাশন সংস্থা মীরের সমুদয় রচনাবলী প্রকাশ করার ব্যবস্থা করছেন।

প্রণব মজুমদার
কলকাতা-৭২

বিজ্ঞান

গত ২রা জুন 'দেশ'এর বিজ্ঞান বিভাগে আলোচিত কলকাতার সেনট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্‌টিটিউটের তৈরী কম খরচায় পরিস্রুত জলের সরঞ্জামটি মনোজ্ঞ ও উপযোগী হয়েছে। কলকাতার উক্ত সংস্থা প্রদত্ত কারিগরী জ্ঞান নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ফিলটার ক্যানডেল তৈরী করে বাজারে চালু করেছেন। এই জন্য ঐ সংস্থা ধন্যবাদার্হ।

১৯৭৮-এর জানুয়ারীতে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের সময় গুজরাট রাজ্য আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে গুজরাট জন স্বাস্থ্য বিভাগের স্টলে 'দেশ'-এ আলোচিত সরঞ্জামটির অনুরূপ একটি সরঞ্জাম প্রদর্শিত হয়েছিল। ঐ সময়ই 'অল ইনডিয়া হ্যান্ডিক্র্যাফ্‌ট বোর্ডে'র কলকাতাস্থিত (৯-১২ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট) [illegible] ও টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার'-এ পোড়ামাটিতে তৈরী সুদৃশ্য নকশা করা একটি প্রোটোটাইপ সরঞ্জাম দেখেছিলাম। এর সৌন্দর্য সহজ গঠন শৈলী ও কার্যকারিতা অতীব চিত্তাকর্ষক। ঐ সংস্থার সিরামিকস বিভাগের টেকনিক্যাল সুপারভাইজার শ্রীএম কে চক্রবর্তী এটি তৈরী করেছেন। ঐ সংস্থা এটিকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরী করে বাজারে চালু করার জন্য সচেষ্ট তবে এই প্রচেষ্টা এখনও সফল হয়নি। আসামের জোড়হাটস্থ সি এস আই আর-এর রিজিওনাল রিসার্চ ইনসটিটিউটের জনৈক বিজ্ঞানী বর্তমানে আলোচিত সরঞ্জামটির অনুরূপ একটি জল পরিস্রুতকরণের কম খরচার ব্যবস্থা আলোচনা করেছেন 'সায়েন্স টুডে' পত্রিকার সেপটেম্বর ৭৮ সংখ্যায়। এতে বলা হয়েছে যে এই সংস্থার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে একটি ফিলটার ক্যানডেল তৈরী করতে মোট খরচ হয় ৭·৫০ টাকা।

বর্তমানে আলোচিত সরঞ্জামটির অনুরূপ একটি ব্যবস্থা নিজে তৈরী করে বাড়ীতে ব্যবহার করছি এক বছরেরও বেশি সময় যাবৎ। মোট খরচ হয়েছিল ৩০ টাকা; ফিলটার ক্যানডেল একটি ২০ টাকা, কলসী দুইটি সাত টাকা ও পলিইথিলিন ট্যাপ একটি ৩ টাকা। ফিলটার ক্যানডেলটির দৈর্ঘ্য ১৮ সেন্টিমিটার। কলসীতে লাগানোর পর ক্যানডেলটির উপর আরও এগার সেন্টিমিটার মত জল রাখা যায়। এর ফলে প্রতি ঘণ্টায় মাত্র ৫০০ ঘন সেন্টিমিটার পরিস্রুত জল পাওয়া যায়। এই পরিমাণ জল গরমের দিনে ৫।৬ জনের একটি পরিবারের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই ২টি ক্যানডেল সহ একটি সরঞ্জামের কথা ভাবতে হচ্ছে।

এই সরঞ্জাম তৈরী ও ব্যবহারের সমস্যাগুলি হলো (১) নির্ভরযোগ্য ফিলটার ক্যানডেল [illegible]—বাজারে চালু ক্যানডেলগুলির মান নির্ণায়ক ছাপ না থাকায় তাদের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা করা শক্ত হয়। (২) কলসীর তলা সাধারণত অসমান থাকায় ক্যানডেলটিকে জলনিরোধক ভাবে আটকানো (২টি রবার ওয়াশার থাকা সত্ত্বেও) দুরূহ হয়। (৩) কলসীর গা তির্যক বলে ট্যাপ সুষ্ঠুভাবে আটকানো শক্ত হয়। (৪) কলসী দুটির জোড়মুখ ও উপরের কলসীর মুখটি ধুলোনিরোধকভাবে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা কষ্ট সাধ্য হয়। (৫) কিছুদিন ব্যবহারের পর ক্যানডেলটির গায়ে জল পরিবাহিত সূক্ষ্ম ময়লার আবরণ পড়ে ওর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এই সমস্যাগুলির ২য় ও ৩য়টির মোকাবিলা করেছি "অ্যারেলডাইট" নামে সিবা কোম্পানীর তৈরী এপোক্সি রেজিন আঠার সাহায্যে। এই আঠার কোন বিষক্রিয়া নেই বলে শুনেছি। ৪র্থটি সমাধান করা যায় দুটি কলসীকে পলিইথিলিন বা পলিভিনিল ক্লোরাইড-এর তৈরী একটি বড় থলি দিয়ে ঢেকে। ৫মটির সমাধান করতে প্রতি সপ্তাহে ২বার করে

ক্যানডেলাটির গা নমনীয় বুরুশ দিয়ে হালকা করে পরিষ্কার করা দরকার।

এই সরঞ্জামটির ব্যবহার ব্যাপক হারে জনসাধারণের মধ্যে চালু করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সেগুলি হলো (১) ফিলটার ক্যানডেলের বর্তমান বাজার দর কমানো —এটি সেনট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনসটিটিউট ও অন্যান্য কারিগরী গবেষণা সংস্থার সহযোগিতা ও নির্ভরযোগ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (যারা কম লাভে বেশী বিক্রী করবেন)-এর মাধ্যমে সম্ভব। (২) কলকাতার ডিজাইন সেনটারের পোড়ামাটির সরঞ্জামটি গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা ও বাজারে চালু করা। এছাড়া এই সরঞ্জামটির উপর গবেষণা করে কম খরচে এর আরও উন্নতি বিধান করে বেশী কর্মক্ষম ও উপযোগী করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রামীণ ও কুটির শিল্প উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামের কুমোরদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে এই সরঞ্জাম তৈরীর কাজে লাগানো যেতে পারে। (৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে এর উপযোগিতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে বেতার ও টেলিভিসন যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। (৪) এই রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষা সূচীতে এই সরঞ্জাম তৈরী, ব্যবহার ও যত্ন করার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এর ফলে গ্রামের ও শহরের ছেলেমেয়েরা সরঞ্জামটি কারিগরী ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হবে। (৫) পরিবারের লোকসংখ্যা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিস্রুত জল পেতে হলে কটি ক্যানডেল সহ সরঞ্জাম ব্যবহার করা দরকার তার নির্দেশ গবেষণা সংস্থাগুলি তৈরী করবেন।। এই সরঞ্জামটির ব্যাপক ব্যবহার আমাদের দেশে জল পরিবাহিত হেলমিনথ (অ্যামিবা ও জিয়ারডিয়া) সংক্রামণ অনেকাংশে রোধ করতে পারবে।

সুকুমার দানা
কল্যাণী, নদীয়া

অল-ইন-কুস্তি

দেশ পত্রিকার ২৩ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'ফ্রি স্টাইল কুস্তি, না ক্রাউন কুস্তি' শীর্ষক চিত্তাকর্ষক রচনাটি দেরিতে হলেও আমার নজরে এসেছে। 'প্রথম অল ইন আমদানি' অংশটি আমার মনে হয়েছে অসম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বোম্বাই ও কলকাতা ছাড়াও নাগপুর ও উত্তর ভারতের—সম্ভবত লাহোরে 'অল-ইন-কুস্তি' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। আমার তখন বছর দশেক বয়েস। পর পর দুটো শীতের মরসুমে আমি বাবার সঙ্গে নাগপুরে জিবিস্কো (পোল্যান্ড), কিং কং (হাঙ্গেরি—একে ম্যান মাউনটেন বলা হত, ওজন নাকি ৩৭৫ পাউন্ড), ফেরোসেংকো (চেকোশ্লোভাকিয়া) প্রোঃ গোল্ডস্টিন (প্যালেস্তিন), শের আফগান (আফগানিস্তান), টাইগার (?) লমেরো (নিউজিল্যান্ড) এবং ওয়েবারের মত বিদেশী কুস্তিগীরদের অল-ইন-কুস্তির আসরে হরবন সিং, অর্জুন দাস, গন্ডা সিং, মাখন সিং এবং মেহের সিংয়ের মত ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়তে দেখেছি। প্রোঃ গোল্ডস্টিন ও মেহের সিং প্রায়ই রেফারিগিরি করতেন। এই সব আসর সব সময় ভারতীয় পদ্ধতির লড়াই দিয়ে শুরু হত এবং কখনও কখনও মাঝে মাঝে 'গ্রিকো-রোমান' বা 'ক্যাচ অ্যাজ ক্যাচ ক্যান' পদ্ধতি চলত এবং সব ক্ষেত্রেই 'অল-ইন-কুস্তি'তে শেষ হত। এই রকম এক গ্রিক-রোম প্রদর্শনী কুস্তির আসরে প্রখ্যাত কুস্তিগীর গামার ভাই ইমামবক্সের লড়াই দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। গামাকেও আমি একবার ভি আই পি আসনে বসে থাকতে দেখেছি। প্রবন্ধকার কলকাতায় গ্লোব থিয়েটারে যে লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি হয়েছিল কিং কং ও গন্ডা সিংয়ের মধ্যে। ঐ লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বড় বড় ছবি পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে ঐ সময়ে ভারতীয় পদ্ধতিতে গ্লোব থিয়েটারে লড়েছিলেন এক ভারতীয় যার মস্ত বড় ছবিও আনন্দবাজারে ছাপা হয়েছিল—তিনি হলেন ভারতের চমকপ্রদ মহিলা কুস্তিগীর হামিদা বানু। সে সময় হামিদ ও গুঙ্গা ছিলেন ভারতীয় পদ্ধতিতে লড়াইয়ে দুই উঠতি কুস্তিগীর। হামিদা বানু ছিলেন ঐ হামিদ পালোয়ানের বোন এবং গামার সঙ্গেও নাকি তাদের আত্মীয় সম্পর্ক ছিল। ঐ সময় একবার হামিদা বানুকে এলাহাবাদের ফতে পালোয়ানের বিরুদ্ধে ভারতীয় পদ্ধতিতে লড়ে জয়ী হতে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। যুদ্ধের জন্য এবং বেশ কয়েকজন বিদেশী কুস্তিগীরকে গৃহবন্দী করে রাখার ফলে অল-ইন-কুস্তি বন্ধ হয়ে যায়।

'এই সব লড়াই সাজানো' বলে প্রাচীনদের মন্তব্য সেই সময় আমার কানে যায় এবং পরে আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারি। সেই কারণেই বাল্যাবধি কুস্তির প্রতি আকর্ষণ থাকলেও পরে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম এবং নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত অল-ইন-ফ্রি স্টাইল কুস্তির আসরে লড়াই দেখতে যাবার ইচ্ছা আর আমার হয়নি।

বসন্ত চৌধুরী
কলকাতা

দেশ ৪৬ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা
১১ আশ্বিন ১৩৮৬

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : অনিমেষ নন্দী
প্রচ্ছদশিল্পী পরিচিতি শেষপৃষ্ঠায়

পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা ও কৃতিত্ব

প্রশ্ন করা চলে, বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের কৃতিত্বে অতীতকালীন ঐতিহাসিক নিদর্শনের এমন কোন্ স্মৃতিচিহ্ন অথবা আধার আবিষ্কৃত হয়েছে কি, যার পরিচয় ভারতীয় অতীতের কোন ইতিবৃত্তের তাথ্যিক পুনর্নির্মাণ সম্ভব করতে সাহায্য করেছে? একথা সত্য যে, ইচ্ছা করলে অথবা চেষ্টা করলেই ঐতিহাসিক অতীতের দুচারটে নতুন নিদর্শন আবিষ্কার করে ফেলা দক্ষতম অনুসন্ধানী বিজ্ঞের পক্ষেও সম্ভব নয়। এবং প্রচলিত ধারণার সমূহ পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবে, এমনতর নিদর্শনের আবিষ্কারও অজস্র সংখ্যায় সম্ভাবিত হবার নয়। পুরাতাত্ত্বিকের অনুসন্ধান বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাগ্যের আকস্মিক অনুগ্রহের দান বলে মনে করা চলে। দুর্গম আরণ্য অঞ্চলের কোন নিভৃতে অবস্থিত একটি গিরিগুহার মধ্যে অতিপ্রাচীন কিংবা আদিম শিল্পীর সুসাধিত চিত্রকলার আবিষ্কার যদিও দুর্লভ বিস্ময়ের উপহার, তবু ভারতে বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে গুহানিহিত আদিম চিত্রকলার একাধিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। অশোকের শিলালিপির নতুন নিদর্শনও নিবিড় বনভাগের ভিতরে ও নিরালা একান্তে পাওয়া গিয়েছে। লক্ষ করতে হয়, এ ধরনের আবিষ্কারের বেশির ভাগই আকস্মিক, কোন পরিকল্পিত অধ্যবসায়ের দ্বারা অধিগত কোন প্রাপ্তি নয়। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের একটি মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিতরে দেয়ালে মালিন্য অপসারিত করতে গিয়ে একটি বিস্ময়ের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে, যদিও বিস্ময়ের বয়সটা খুব প্রাচীন নয়। দেয়ালের গায়ে আঁকা রঙীন চিত্রাবলীর উপর কে এবং কবে কেন যে পুরু চুনের প্রলেপ আস্তীর্ণ করে দিয়েছিল, সে প্রশ্নের সদুত্তর এখনও কোন গবেষকের মন্তব্যে উচ্চারিত হয়নি। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, মন্দিরের ভিতরের গাত্রলগ্ন এই চিত্রাবলী কি বিশেষ কোন ঘটনার আধিপত্যে নিতান্ত একটা অপরাধের সৃষ্টি বলে নিন্দাক্রান্ত হয়েছিল?

এই জিজ্ঞাসার জবাব সত্যই একদিন পাওয়া যাবে, পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার উৎসাহ ও কর্মিষ্ঠতার অভ্যস্ত দৈন্য লক্ষ করলে এমন আশার জোর আর থাকে না। গুজরাটের লোথাল, যেখানে হরপ্পা সভ্যতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন সতেরো বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সংরক্ষা সম্বন্ধে যথোচিত প্রযত্ন সরকারের কৃতিত্বে আজও বাস্তবায়িত হয়নি। প্রযত্ন যেটুকু হয়েছে, সেটুকু চার হাজার বছর আগের ঐতিহাসিক জীবনের স্মৃতিচিহ্নকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে সম্মানিত করবার ব্যাপার বলে মনে করা চলে না। বরং অভিযোগ করা চলে যে লোথালে 'বিশ্বের প্রথম ডকইয়ার্ড' (চার হাজার বছর আগে) সংরক্ষাকর প্রযত্নের অভাবে তার নিদর্শনীয় রূপের অনেকখানি হারিয়ে ফেলবার দুর্ভাগ্যকর সম্ভাবনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পুরা-কীর্তির সংরক্ষার কর্তব্যে সমীক্ষা-বিভাগ প্রধানত এই ত্রিশ বছর ধরে যা করে আসছেন, সেটা সাধারণ শ্রেণীর প্রাচীন স্থাপত্যের ফাটলধরা শরীরের মেরামতী কাজ, যেটা পুরাতাত্ত্বিক গবেষকের পক্ষে বড় রকমের কোন গুণপনা অথবা কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। একটি খুবই অবান্তর কর্তব্যে পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগকে উৎসাহিত হতে দেখা যায়। গুপ্তধন অনু-সন্ধানের সরকারী পরিকল্পনায় পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার পক্ষে সহযোগী হবার নৈতিক দায়িত্ব খুবই সামান্য, নেই বললেই চলে। কিন্তু লক্ষ করতে হয়েছে যে পুরাতাত্ত্বিক গবেষক মহাশয়ই গুপ্তধনের অবস্থান সম্বন্ধে নির্ণায়ক উপদেশ প্রদান করেছেন, এবং গুপ্তধন অনুসন্ধানের সরকারী ব্যস্ততার সহযোগী হয়েছেন। চার বছর আগে জয়পুরের জয়গড় দুর্গের ভিতরে গুপ্তধনের উদ্ধারকার্যে পুরাতাত্ত্বিকও সহযোগিতা করেছিলেন। আবার এই সেদিন ফয়জাবাদে নবাব সুজাউদ্দৌলার গুপ্তধনের সন্ধানে সরকারী চেষ্টার সঙ্গে পুরাতাত্ত্বিকের চেষ্টাও যুক্ত হতে দেখা গিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সরকার এবং বিজ্ঞ পুরাতাত্ত্বিক উভয়েই একটি রহস্যময় বস্তুর ছলনাকে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্কেত বলে বিশ্বাস করেছেন। জয়গড়ে একটি প্রাচীন পুঁথির হেঁয়ালিময় ভাষার তাৎপর্য নিষ্কাষণ করে জয়গড়ের দুর্গের ভিতরে গুপ্তধনের অবস্থানের সাঙ্কেতিক পরিচয় লাভ করেছিলেন, সরকারী বিজ্ঞ এবং পুরাতাত্ত্বিক বিজ্ঞ। ফয়জাবাদ বাজারের এক দর্জির কাছ থেকে প্রাপ্ত একটা তাম্রপটের লেখা থেকে নবাব সুজাউদ্দৌলার গুপ্তধনের অস্তিত্ব ও অবস্থানের সঙ্কেত এঁরা পেয়েছেন। কিন্তু কি দুঃসহ কৌতুক, উভয়ক্ষেত্রে সরকারী বিজ্ঞ এবং পুরাতাত্ত্বিক তাঁদের চিন্তার একটা শোচনীয় প্রগলভতারই পরিচয় প্রকট করেছেন।

সংবাদপত্রের পাঠকদের অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন যে, গত কয়েক বছর ধরে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার কাছাকাছি অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে 'রামায়ণ যুগের স্মৃতিচিহ্ন' আবিষ্কার করবার জন্য খননের কাজ চলছে। শোনা যায়, পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহাশয়ই 'রামায়ণ যুগের প্রত্যক্ষ নিদর্শন' আবিষ্কার করতে উৎসাহিত হয়েছেন। প্রশ্ন করতে হয়, বিগত চার-পাঁচ বছরের এই অনুসন্ধান ও খননের ফলে কী এবং কতটুকু প্রত্যক্ষ বস্তুসত্যের প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে, যেটা নিঃসংশয়ে রামায়ণী রূপে ও প্রকারে অলংকৃত বলে বোধ করতে পারা যায়? পুরাতাত্ত্বিক সন্ধানের কাজে কল্পনার কিছু প্রশ্রয় অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু কল্পনাবাজির প্রশ্রয় কখনই নহে।

পরবর্তী আকর্ষণ

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সাহিত্য বৃত্তি, তত্ত্বে গল্পে
পূরবী সান্যালের প্রবন্ধ
আজকের নাইজেরিয়া
অঞ্জন রায়ের রচনা
ইয়ুথ হস্টেলিং : একটি যুব আন্দোলন
সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ
ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ এক
স্মরণীয় চরিত্র
রতন ভট্টাচার্যের গল্প
সমুদ্র

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
বাদ্রাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

ইন্দিরা নাট্যকোম্পানী
কখন স্টেজে ঢুকতে হবে বলে দিও কিন্তু।
তক্ত-এ-তাউস

অপ্রচারিত রবীন্দ্র-বাণীর উৎস সন্ধানে

চিত্তরঞ্জন দেব

একটি পাণ্ডুলিপির মলাটে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা নিম্নোক্ত ছন্দোবন্ধটি দেখা যায় :

"স্বজাতির সিংহাসন উচ্চ করি গড়ো
এই কথা মনে রেখো সত্য আরো বড়ো।
স্বদেশেরে চাও যদি তারো ঊর্ধ্বে ওঠো
কোরো না দেশের লাগি মানুষেরে ছোটো।
তোমার লেখনী যেন ন্যায়দণ্ড ধরে
নির্বিচারে শত্রুমিত্র সকলের পরে।"

রচনার স্থান, তারিখ, শিরোনাম-বিরহিত উক্ত ছন্দোবন্ধটি কবির কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে বলে জানা যায় না। রচনার উপলক্ষ্যও অজ্ঞাত। চৌদ্দো মাত্রায় লেখা ছ পঙক্তির এই ছন্দোবন্ধকে 'কবিতা' না বলে 'বাণী' বলাই বোধহয় সংগত। কারণ, কবি বলেছেন,

"বাণী তাকেই বলি যা মানুষের অন্তরতম পরম অব্যক্তকে বাহিরে অভিব্যক্তির দিকে আহ্বান করে আনে, যা উপস্থিত প্রত্যক্ষের চেয়ে অনাগত পূর্ণতাকে বাস্তবতর সত্য বলে প্রমাণ করে।"

কিন্তু কোন্ ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় কবি উক্ত বাণী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে কথা জানতে আমাদের কৌতূহল, এবং সে তথ্য উদ্ধারের প্রয়াসও আমরা করবো। তার আগে জানা দরকার, যে সত্যকে কবি আরো বড়ো বলেছেন, সেই সত্য কবির মনে কিভাবে আবির্ভূত হয়েছে। এ সম্পর্কে কবির নিম্নোদ্ধৃত উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তাতে তিনি বলেছেন,

"আপন সত্তার পরিসরে মানুষের ভাষায় দুটি নাম আছে। একটি অহং আর একটি আত্মা।.... মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা, তখন ছোটো হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহংকার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা। সেই যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ। জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, ভাবের যোগে অহংকার, কর্মের যোগে লোভ, স্বার্থপরতা ; ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্বব্যাপক ঐক্য প্রমাণ করে।"

মনে পড়ে যায় কবির সেই গানটি—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

আবার কবি বলেন,

"সেই ঐক্য উপলব্ধিতে আনন্দিত হয় বৈজ্ঞানিক। তেমন আত্মার আনন্দ আত্মিক ঐক্যকে উপলব্ধি দ্বারা যে-আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ বলেছেন,

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্

সেই আত্মাকে জানো, সেই এককে, যাকে সকল আত্মার মধ্যে এক করে মানলে সত্যকে জানা হয়। প্রার্থনামন্ত্রে আছে,

য একঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু

যিনি এক, শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন। যে বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলি সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার—

যথেবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা।

আপনার মতো করে পরকে দেখার ইচ্ছাকেই বলে শুভ ইচ্ছা, সিদ্ধিলোভেও শুভ নয়, পুণ্যলোভেও শুভ নয়। পরের মধ্যে আপন চৈতন্যের প্রসারণেই শুভ, কেন না, পরম মানবাত্মার মধ্যেই আত্মা সত্য।"

এই সত্যকে কেন্দ্র করেই কবির যা কিছু সৃষ্টি। তিনি বলেছেন,

সব কিছু জড়ো করে সব কিছু পাই
যারই মাঝে সত্য আছে সব যে সেথাই।

বলেছেন,

"মানুষেরে করিবারে স্তব
সত্যেরে করো না পরাভব।"

গেয়েছেন,

"আমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে
সত্য হবে
ওগো সত্য, আমার এমন সুদিন
ঘটবে কবে।
সত্য সত্য সত্য জপি
সকল বুদ্ধি সত্যে সঁপি
সীমার বাঁধন পেরিয়ে যাব
নিখিল ভবে—
সত্য, তোমার পূর্ণ প্রকাশ দেখব কবে।"

জন্মসূত্রে সত্যের উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেব সত্যাশ্রয়ী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। সেই থেকে জীবনাবসানের আগে পর্যন্ত সত্য থেকে কবি বিচ্যুত যে হননি তার প্রমাণ আছে তাঁর 'শেষ লেখায়'। কবি বলেছেন,

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

এই কঠিন সত্যের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে রচিত উদ্ধৃত রবীন্দ্র-বাণীর উৎস সন্ধানে, অতএব, আমাদের যাত্রা অনিবার্য হয়ে পড়ে। উক্ত বাণী-সংকলিত পাণ্ডুলিপির পাতায় লেখা আছে কবির একটি বক্তৃতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৩ খ্রীঃ ১৬, ১৮, ২০ জানুয়ারি) 'মানুষের ধর্ম' নামে প্রদত্ত কমলা-বক্তৃতার খসড়া-লিপির একাংশ। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কবির চিঠির অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। কবি লিখেছেন,

'কমলা লেকচার নিয়ে পড়েছি। বিষয়টা মানবের ধর্ম। সহজ করে সরস করে গৌড়ীয় ভাষায় লেখা দুঃসাধ্য কাজ'....।

উক্ত পত্র লেখার তারিখ ১৯৩২ খ্রীঃ ১৫ই নভেম্বর। এতদ্বারা অনুমান করা সহজ হয়, উক্ত তারিখের পূর্বেই কোনো সময়ে কবি মানুষের ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা লেখার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত মানুষের ধর্মগ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলেছেন,

'মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়। কিন্তু, মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি, তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা।....সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে বড়ো যে-জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।'

অতঃপর কবির প্রশ্ন—

'কোন্ মানুষের ধর্ম—এতে পাই কার পরিচয়?'

উত্তরে বলেছেন,

"এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়। তাহলে এর জন্য সাধনা করতে হত না। আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।.....সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে,

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা।"

'মানুষের ধর্ম'-বিষয়ে বক্তৃতা লেখার অব্যবহিত পূর্বে যে-এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল, এ-প্রসঙ্গে তার উল্লেখ অপরিহার্য। ভারতে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাকে মূলধন করে বিদেশী শাসক এদেশের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনে যে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার প্রতিবাদে পুণার যারবেদা জেলে বন্দী মহাত্মা গান্ধী যেদিন (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২) মরণপণ অনশন শুরু করলেন, কবিগুরুর বিশ্বভারতী সেদিন কাজকর্ম বন্ধ করে দিল মহাত্মাজীর সত্যব্রত উদ্‌যাপনের সমর্থনে। মহাত্মার শুভকামনায় মন্দিরে উপাসনা হল। মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সমবেত সকলকে উদ্দেশ করে কবি বললেন,

"যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাইনে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য।....যিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন তিনি অত্যন্ত উঁচু, অত্যন্ত মহৎ। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চনীচের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমানভাবে তাঁর ভালোবাসা।

....তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়-সুখের জন্য নয়, স্বার্থের জন্য নয়, সকলের ভালোর জন্য। এই যে এত মার খেয়েছেন, উল্টে কিছু বলেননি, রাগ করেননি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন। শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে গেছে তাঁর ধৈর্য দেখে, মহত্ত্ব দেখে।....সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের বোঝা নিজের দুঃখের বেগে ঠেলবার জন্য দেখা দিয়েছেন।"

কবি আরও বলেছেন,

"সবাই জানো, সমস্ত ভারতবর্ষ কী রকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে, একটি নাম দিয়েছে মহাত্মা। আশ্চর্য! কেমন করে চিনলে! মহাত্মা তিনিই সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন। কেন না, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, [এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা] মর্ত্যলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা, সেই প্রেমের ঐশ্বর্য দৈবাৎ মেলে।"

কবি জানতেন যে, মহাত্মাজীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন আমরা করেছি, কিন্তু তাঁর জীবনের সত্যকে গ্রহণ করিনি। তাই তিনি বেদনা প্রকাশ করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়,

"তাঁকে আমরা ভোটের উপর এই বলে বুঝেছি যে তিনি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালোবাসেন ; কিন্তু সম্পূর্ণে বুঝতে পারিনি।....সত্যকে স্বীকার করতে ভীরুতা দ্বিধা সংশয় আমাদের জাগে বিনা ক্লেশে যা মানতে পারি, অই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সত্যটাকে নিতে পারলুম না।"

কবি বলেছেন,

"যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয়, তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতে পারে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন।"

কবি কথিত সামাজিক পাপ—জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা। মনে পড়ে কবির বেদনার সেই অভিব্যক্তি—

> 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'
> 'মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
> সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু
> কোলে দাও নাই স্থান।'

কবি বলেছেন,

"ইচ্ছে করেই আমরা যাদের হারিয়েছি, ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকবো, অপরাধের অবসান হোক, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক। মানুষকে গৌরব দান করে মনুষ্যত্বের সগৌরব অধিকার লাভ করি।....

"জয় হোক সেই তপস্বীর, যিনি এই মুহূর্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে। তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছুক তাঁর আসনের কাছে, বলো, তোমাকে গ্রহণ করলুম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলুম।"

শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর ভাষণ-শেষে আশ্রম ও গ্রামবাসীর অনুষ্ঠানবর্তী হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর প্রভৃতি তথাকথিত অনুন্নত অস্পৃশ্যদের হাতে জলগ্রহণ করলেন কবির সত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। আচারনিষ্ঠ হিন্দু বিধবারাও সেদিন তাঁদের দীর্ঘকালের সংস্কার ভঙ্গ করে অচ্ছুতদের হাতে জল পান করেছিলেন। ভারতের সমাজ থেকে অন্যায় উৎখাত করার জন্য মহাত্মাজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মেলালেন কবিগুরু। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত করলেন নিজেকে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানকে। অস্পৃশ্যতা নিবারণ যাতে একদিনের অনুষ্ঠান মাত্রেই পর্যবসিত না হয়, সেজন্য শান্তিনিকেতনে স্থাপন করলেন 'সংস্কার সমিতি'। তাঁর নামে প্রচারিত হল উক্ত সমিতির নিম্নোক্ত কার্যক্রম :

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জলচল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভাসমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা থাকিবে না।

সমিতির সম্পাদক ও সহঃসম্পাদক নিযুক্ত হলেন যথাক্রমে কবির অন্তরঙ্গ পল্লীসেবা-সহচর কালীমোহন ঘোষ ও কবির লেখার ভাণ্ডারী সুধীরচন্দ্র কর।

সত্যব্রত-উদ্‌যাপনরত মৃত্যুপথযাত্রী মহাত্মাকে দেখার জন্য কবি পুণা গিয়ে পৌঁছলেন (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২)। ঐ দিনই, ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে, খবর এল যে বিদেশী শাসক ভারতীয়দের প্রতিবাদ মেনে নিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিধিবদ্ধ করা হয়নি। মহাত্মাজী অনশন ভঙ্গ করলেন। অনশন ভঙ্গকালে সেদিনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল সত্যব্রত উদ্‌যাপনে সফলকাম মহাত্মার শয্যাপার্শে কবিগুরুর উপস্থিতি। মহাত্মাকে স্বরচিত গান স্বকণ্ঠে গেয়ে শোনালেন কবি—

'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো'....

সত্যকেই আহ্বান করলেন সত্যাগ্রহীর কাছে।

অনুমান করা অসংগত হয় না যে, ভারতের জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি পাপ দূর করে স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধিকার রক্ষার জন্য স্বদেশে ও বিদেশে বিস্তৃত মহাত্মাজীর আত্মোৎসর্গের সংগ্রাম কবির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আবাল্য সত্যাগ্রহী কবি মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে যা বলেছিলেন, তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতায়। উক্ত বক্তৃতার পাণ্ডুলিপির মলাটে কবির যে-বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে তার সৃষ্টিমূলে, মানব কল্যাণে নিত্যনিয়োজিত কবিমানসের অভিব্যক্তির সঙ্গে, উল্লিখিত ঘটনাবলীর প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়।

যেখানে সত্য, সেখানেই মানুষ এবং মানুষের ধর্ম রক্ষিত হচ্ছে। এমনই আরেকজন সত্যাগ্রহী মানুষ অরবিন্দ ঘোষ। কবি তাঁকে 'স্বদেশ-আত্মার বাণী মূর্তিরূপে' নমস্কার জানিয়েছেন দীর্ঘ প্রশস্তিতে। 'নমস্কার'-অন্তে একটি নূতন স্তবকে লিখেছেন আবার,

> তারপর তাঁরে নমি, যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
> গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে...
> যিনি নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাসে
> সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে
> সকল চরম লাভে দুঃখ কিছু নয়—
> ক্ষত মিথ্যা ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়। ...

অর্থাৎ সত্যাগ্রহীর কাছে ভয় বলে কিছু নেই। সত্যস্বীকারে সত্যসাধনে তবুও যারা অগ্রসর হতে চায় না তাদের উদ্দেশে কবি রেখে গেছেন তাঁর অভয়বাণী—

> আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।
> ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির

পাণ্ডুলিপিচিত্র সহ অপ্রচারিত রবীন্দ্র-বাণী প্রকাশের অনুমতি দানের জন্য লেখক বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ।
১১-৮-৭৯

কণ্টকল্পিত

অতুল্য ঘোষ

(নবপর্যায়)

॥ ১২ ॥

ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'ফুল সার্কল', অর্থাৎ এক বিন্দু থেকে চক্রাকারে এসে সেই বিন্দুতেই পৌঁছানো। সেদিনের সংবাদপত্রে পড়লুম যে, রাষ্ট্রপতি তিরুপতিতে বলেছেন, 'আমার বিবেক অনুযায়ী আমি কাজ করেছি।' পড়ে চমকে উঠলুম। এ কথা তো শোনা। অবশ্য পথে-ঘাটে-মাঠে অনেকেই বলে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির মত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখ থেকে এ কথাটি বেরিয়েছে—তখন এর গুরুত্ব অসীম। স্মৃতির রাজ্যে রোমন্থন করতে করতে মনে পড়ে গেল যে, ১৯৬৯ সালে ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঠিক এই কথা বলেছিলেন। উপলক্ষ ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। কংগ্রেস পক্ষীয় প্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী, যাঁর নাম সরকারীভাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁকে হারাবার জন্য পার্লামেণ্টে কংগ্রেস দলের দলনেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বিবেকের প্রশ্ন তুলে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। ঠিক দশ বছরের ব্যবধানে রাষ্ট্রপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী ঠিক সেই বিবেকের প্রশ্ন তুলে যেন কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ১৯৬৯এর সঙ্গে এখন পার্থক্য এই যে, শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস পার্টিতে থেকেও কংগ্রেস পার্টির সংবিধান ভঙ্গ করেন। আর রাষ্ট্রপতি তো কোন পার্টির লোক নন—কোন পার্টির সংবিধান দ্বারা তিনি পরিচালিত নন। তাঁকে পরিচালিত হতে হয় ভারতের সংবিধান দ্বারা। এবং ভারতবর্ষের সংবিধান ক্ষুণ্ণ করার অর্থ হল ভারতবর্ষের অমর্যাদা করা। রাষ্ট্রপতি ১৪ আগস্ট প্রাক্-স্বাধীনতাদিবসের বক্তৃতায় সংবিধান পরিবর্তন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন। সে তো পরিবর্তনের কথা। আর বিবেকের প্রশ্নে তিনি যদি সংবিধান লঙ্ঘন করে থাকেন, বা সংবিধানে যা নেই এমন কিছু করে থাকেন, তা হলে বিবেকের প্রশ্নে সেটা এড়িয়ে যাওয়া তো যায় না। রাষ্ট্রপতির কাছে সংবিধানসম্মত কাজ করাই একমাত্র কর্তব্য। এখানে বিবেক অনুযায়ী কাজ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তিনি যখন রাষ্ট্রপতি হন, তখন শপথ গ্রহণ করেন যে, তিনি যা কিছু করবেন, সবই সংবিধানের কাঠামোর মধ্য দিয়ে। সংবিধানে যা লেখা নেই, তার অন্যথা করবার অধিকার যেমন ভারতবর্ষের কোন নাগরিকের নেই, তেমনি রাষ্ট্রপতিরও নেই। যদি তাঁর মনেও হয়ে থাকে কখনও যে, সংবিধানের কোন ধারা 'ইণ্টারপ্রিট' করা উচিত, তা হলে তার অধিকারী একমাত্র সুপ্রীম কোর্ট। সেইজন্যই মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে দশ বছরের ব্যবধানে একটা 'ফুল সার্কল' ঘটে গেল। ১৯৬৯এ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা (প্লেজ) ভঙ্গ করার সময়ে বিবেকের প্রশ্ন তুলেছিলেন, আর ঠিক দশ

ভারতীয় রাজনৈতিক দলের বিভাজন

স্বর্ণ সিং (কং)

ইন্দিরা গান্ধী (কং ই)

রাজেশ্বর রাও (সি পি আই)

নাম্বুদ্রিপাদ (সি পি এম)

চন্দ্রশেখর (জনতা)

রাজনারায়ণ (জনতা এস)
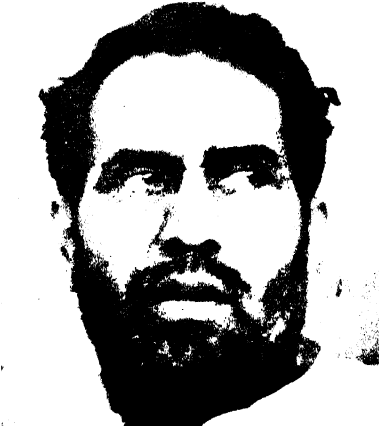
বছরের ব্যবধানে রাষ্ট্রপতিও সেই বিবেকের প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি হবার সময়ে যে শপথ নিয়েছিলেন, তা ভঙ্গ করেছেন কিনা, আমার পক্ষে তা বলা শোভন ও সঙ্গত নয়, তবে সংবিধানে নেই এমন দুটি নির্দেশ তিনি শ্রীচরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী করার উপলক্ষে দিয়েছেন। একটি হল—শ্রীচরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী হবার সময়ে আস্থা-ভোটের নির্দেশ; অন্যটি হল—বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীকে তদারকী সরকার গঠন করতে না দিয়ে, লোকসভার আস্থাভাজন নন এমন একজনকে তদারকী সরকার গঠন করতে বলা। আস্থাভাজন নয় এই জন্যই বলছি যে, সুযোগ পেয়েও শ্রীচরণ সিং লোকসভায় আস্থা-ভোটের সম্মুখীন হতে

পারেননি। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের সময়ে আস্থা-ভোট নেওয়ার কথা সংবিধানে কোথাও নেই, আর যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না তাকে তদারকী সরকার গঠন করতে দেওয়ার কথাও সংবিধানে নেই। রাষ্ট্রপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী শ্রীচরণ সিংকে ২৬-৭-৭৯ তারিখে যে চিঠি দিয়েছেন তার শেষ প্যারায় আছে—
'I trust that in accordance with and in the interest of establishing healthy convention you would seek a vote of confidence in the Lok Sabha at the earliest possible opportunity, say, by the third week of August 1979.'

আমি খালি বিবেকের কথা রাষ্ট্রপতি তুলেছেন বলেই এতগুলি কথা লিখলুম। তা নইলে বর্তমান রাজনীতিতে বিবেক, ন্যায়, আনুগত্য, শপথ—এসবের কোন স্থান আছে বলে মনে হচ্ছে না। যাঁর যখন ইচ্ছে যে-কোন দলে ঢুকছেন এবং বেরিয়ে যাচ্ছেন। কোন কোন জায়গায় আবার সমষ্টিগতভাবেও হচ্ছে। যেমন সিকিমে হয়েছে। আর এই সঙ্গে যেসব কান্ড হচ্ছে, তা অনেকের পক্ষে বেদনাদায়ক যেমন—উড়িষ্যায় জনতা পার্টির অফিসে জনতা পার্টির এম এল এ-রা সভা করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন। উড়িষ্যার জনতা মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রিত সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করায় ঐসব এম এল এ-রা গ্রেপ্তার হন। বিচিত্র ঘটনা। আবার জনতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে যাঁরা জনতা (এস) গড়েছেন তাঁদের দলপতির বাড়িতে সব বিদেশী দূতেরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এও একটা ভারী বিচিত্র ঘটনা। এত বছর কংগ্রেসী শাসনের মধ্যে কোন কংগ্রেস সভাপতি সমষ্টিগতভাবে বিদেশী দূতদের আমন্ত্রণ জানাবার দুঃসাহস (!) দেখাতে পারেননি। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো কোন বিদেশী দূত কখনও কারো বাড়িতে এসেছেন। এত বছর আমাদের ধারণা ছিল যে, গণতন্ত্রে কোন পার্টির সভাপতির এরকম আমন্ত্রণ জানানো অশোভন এবং অসঙ্গত। এটাও একটা দৃষ্টান্ত। আরও দৃষ্টান্ত আছে। তদারকী সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনিয়াম বিবৃতি দিয়েছেন যে, 'জাগুয়ার' কেনার ব্যাপারে কোন গলদ নেই। আর সেই তদারকী সরকারের দলপতি শ্রীরাজনারায়ণ বলছেন, 'তদারকী সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভুল বলছেন। শ্রীসুব্রহ্মনিয়াম ভাল করে ফাইল পড়েননি।' বিচিত্র ঘটনা। বিরোধী দলের কেউ যদি এ কথা বলতেন, তা হলে ঘটনার বিচার হত লোকসভায়। কিন্তু তার উপায় নেই। কারণ, শ্রীচরণ সিং সরকারের মন্ত্রিসভা কোন দিন লোকসভার সম্মুখীন হননি। আর লোকসভার অবলুপ্তি ঘটিয়েই তদারকী সরকার গঠন হয়েছে।

কয়েকটি কথা বর্তমানে বেশ শোনা যাচ্ছে। স্বৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা। অদ্ভুত সব অজুহাত। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি স্বৈর তান্ত্রিক ছিলেন। বেশ। তখন এমারজেন্সী ও মিসায় যাঁরা সই করেছিলেন, সেই ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী ও [illegible] কি করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিন্দা করছেন? যাঁরা ইন্দিরা ক্যাবিনেটের সদস্য ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা তদারকী সরকারে আছেন তাঁরা কি করে তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন? শুধু যে তাঁরা ইন্দিরা ক্যাবিনেটের সদস্য ছিলেন তা নয়, ১৯৭৭এর নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছিলেন। তা হলে এঁদের দায়িত্বও বা কম কিসে? আর এঁরা তো কেউ নির্বাক, নির্বোধ বা নতুন নন। শ্রীযশোবন্তরাও চৌহান ১৯৭৭ অবধি হয় কেন্দ্রে নতুবা রাজ্যে বরাবরই মন্ত্রী ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। ব্রাহ্মানন্দ রেড্ডী, হিতেন্দ্র দেশাই—এঁরাও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। সুব্রহ্মনিয়ামও বরাবরই কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। করণ সিং রাজ্যপালও ছিলেন, মন্ত্রীও ছিলেন। আর কত নাম করব? এঁরা তো কেউই বোবা, কালা বা নিরক্ষর নন। বহু বছর শাসনকার্যের অভিজ্ঞতা নিয়েই এঁরা মন্ত্রী হয়েছিলেন। তা হলে? এঁদের দায়িত্ব তো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে একটুও কম ছিল না। অর্থাৎ চেষ্টা হচ্ছে যাতে সব ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে ও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়। আর বর্তমান রাজনীতিতে সকলেই তো 'ইচ্ছাতন্ত্রী'। যাঁর যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাচ্ছেন। পেপসুর ব্যাপার নিয়ে একসময়ে 'আয়ারাম গয়ারাম' কথাটি উঠেছিল। এখন তো অনেকেই আয়ারাম গয়ারাম। আবার শর্তাধীনে সমর্থন করা, সে কৌশলও বেশ ভালভাবে অনুসৃত হচ্ছে। শর্তগুলি অবশ্য সবই লোকলোচনের অন্তরালে করবার মত শর্ত।

আবার সাম্প্রদায়িকতার ধুয়াও বেশ উঠেছে। যে জনসঙ্ঘ নিজেদের নাম লোপ করে জনতা দলের সৃষ্টিতে অংশীদার হয়েছিলেন, এখন তাঁদের সম্বন্ধে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক বলে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অদ্ভুত ঘটনা। ১৯৭৭ লোকসভা নির্বাচনে তাঁদের সঙ্গে সাথী হয়ে, দাঁড়ানোয় এসব প্রশ্ন ওঠেনি। এখন অনেকেই লুপ্ত জনসঙ্ঘের প্রশ্ন তুলে সরব ও সোচ্চার হয়েছেন ও দলত্যাগ করেছেন। আবার কোন কোন রাজনৈতিক দল যাঁরা সেই পঞ্চাশের দশকেও মুসলিম লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে কোনও ইতস্তত করেননি, তাঁরাও এখন এই 'সাম্প্রদায়িক' শব্দ উচ্চারণে মুখর হয়ে উঠেছেন। মনোনয়ন দেবার সময়ে সকলেই দেখেন কোথায় জাঠ, ব্রাহ্মণ রাজপুত, কায়স্থ বা মাহিষ্য সংখ্যা বেশী এবং সেই অনুযায়ী মনোনয়ন দেন, তখন সেটা শুধু হসনীয় হয় না, মর্মান্তিকভাবে অ-সাম্প্রদায়িক নীতিকে ঠাট্টাও করা হয়। আবার যখন আঞ্চলিক দলগুলির সাথে মিতালি করা হয়, তখন নির্বাচনে জয়লাভটাই সবচেয়ে বড় আদর্শ বলে পরিগণিত হয়। কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া এমারজেন্সী ও মিসার সময়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁরা কিন্তু এখন আর অচ্ছুত নন। বামপন্থীরা সি পি আই-কে তাঁদের জোটে নিতে আর কোন আপত্তির কারণ দেখতে পাচ্ছেন না। সমর্থকরা এখন আর অচ্ছুত নন, অচ্ছুত শুধু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দল। অদ্ভুত আদর্শ। তাঁরাও আবার মাঝে মাঝে অচ্ছুত নন। জনতা দলের প্রার্থীরূপে যাঁরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতেও কোন কুণ্ঠা করেননি তাঁরাও এখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দলের সমর্থন চান—অবশ্য যদি গোপন শর্ত পরস্পর মেনে নেওয়া হয়। বিচিত্র আদর্শ, বিচিত্র নীতি। যাঁরা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিলেন শ্রীমতী গান্ধীর নিন্দাবাদে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ্যে, বা চোরা পথে শ্রীমতী গান্ধীর কৃপা-প্রার্থী।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে এবারে খরচ হবে মাত্র তিরিশ কোটি টাকা। অবশ্য এ অঙ্কটি ইলেকশন কমিশনারের দেওয়া। তা ছাড়া প্রার্থীরা কত খরচ করবেন, তার হিসেব কোন দিন পাওয়া যাবে না। সব টাকাটাই খরচ হবে ভারতবর্ষের মাটিতে। সরকারী টাকা যেটা খরচ হবে, সেটা জনসাধারণের দেওয়া অর্থভান্ডার থেকেই খরচ হবে। গণতন্ত্রে নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে এবং নির্বাচনে খরচও হয়। কিন্তু যে নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলই আদর্শ, নীতি ও কার্যক্রম অনুকরণ করেন না, সেই নির্বাচন গণতন্ত্রের আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ।

কেন্দ্রের অনিশ্চয়তা রাজ্যে রাজ্যেও প্রতিফলিত হচ্ছে। এ প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। আসামে মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে। অরুণাচলের অবস্থাও সঙ্গীন। অবশ্য আসামে যখন প্রথম জনতা সরকার গঠিত হয়, সেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে হয়নি। পরস্পরবিরোধী কতগুলি রাজনৈতিক দলের সমর্থনের ওপরেই এই সরকার এতদিন টিঁকে ছিল। আসামে জনতা দল আইনসভায় কোন দিনই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। সেইজন্য সে সরকারের পতনে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই। কিন্তু এইবার। এখনও তো সেই জোড়াতালি দিয়েই সরকার গঠনের চেষ্টা চলছে। অর্থাৎ ছোটখাট, বড়, সব দলকে সন্তুষ্ট করে আবার যদি সরকার গঠিত হয় তবে সে সরকার গঠিত হবে বটে, কিন্তু কোন কার্যক্রম অনুসরণ করতে পারবে না। বিহারে সরকার টিঁকে গেছে। টিঁকে গেছে, যাদের সঙ্গে মিল নেই এমন দলের সমর্থনে। সেইজন্য স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এভাবে টিঁকে যাবার দাম কি? যে-কোন দিন মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যেতে পারে, এই ভয়ে সরকার কোন কাজই করতে পারবেন না। কারণ, সব সময়েই মনে হবে যাঁদের সমর্থনে সরকার টিঁকে আছে, তাঁরা বিরোধী ভাবাপন্ন। বরং এ কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সব কাজ বন্ধ। মহারাষ্ট্রে যে সরকার চলছে এখনও, তাদেরও অবস্থা একই। জনতা দলের ক্ষমতালিপ্সার ফলেই এই সরকার গঠিত হতে পেরেছিল। এখন সেই সরকারেরও সংকটজনক পরিস্থিতি, সর্বত্রই অনিশ্চয়তা। যেখানে কোন আদর্শ নেই নীতি নেই, কার্যক্রম নেই—কেবলমাত্র ক্ষমতার জন্য জোট বাঁধা—সেখানে এই পরিস্থিতি হতে বাধ্য। সেইজন্যই যখন নির্বাচনী আঁতাত করবার সময়ে আদর্শ, নীতি, কার্যক্রমের কথা ওঠে, তখন মনে হয় এইসব রাজনৈতিক দলগুলি তো খুব দুঃসাহসী।

প্রাচীন পোড়ামাটির দুর্গামূর্তি

তারণকুমার বিশ্বাস

কয়েক বছর আগে জনৈক মুসলমান যুবক কৌশাম্বী থেকে পাওয়া কয়েকটি সুপ্রাচীন পোড়ামাটির মূর্তি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা সংগ্রহালয় ভারত কলা ভবনে বিক্রয়ার্থে এসেছিলেন। কয়েকটি উচিত মূল্যে এবং কালের নির্মম প্রহারে ক্ষয়প্রাপ্ত, ভগ্ন কিছু মূর্তি অত্যন্ত অল্প মূল্যে সেদিন ক্রয় করা হয়েছিল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সুপ্রাচীন, দুর্লভ এবং অত্যন্ত মূল্যবান একটি মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তি ছিল। এই মূর্তিটির সঠিক পরিচয় উপরোক্ত যুবকটির জানা ছিল না। জানা থাকলে মূর্তিটি সেদিন সমুচ্চ মূল্যে বিক্রয় করতে তাঁর কোন অসুবিধে হত না। নির্মাণ-কৌশল ও সৌন্দর্যসুষমা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় মূর্তিটি সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষার্ধে অথবা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কোন এক সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

ভারতের ধর্মীয় সাহিত্যে অবশ্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই দুর্গার ভিন্ন ভিন্ন রূপচর্চার ইতিবৃত্ত পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেছেন। বাজসনেয়ী সংহিতা, কেন উপনিষদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত, হরিবংশ ও কয়েকটি পুরাণে অম্বিকা, উমা, হৈমবতী, ভদ্রকালী, যোগনিদ্রা একনাংশা মহিষাসুরমর্দিনী প্রভৃতি দুর্গার বিভিন্ন রূপের স্তুতিগান করা হয়েছে। কিন্তু ভারতশিল্পে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার প্রকাশ সাহিত্যে প্রকাশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। এমন এক সময় ছিল যখন মধ্যপ্রদেশে ভুমরায় প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটিই প্রাচীনতম মূর্তি বলে মনে করা হত। স্যার জন মার্শাল ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে ভিটা উৎখননের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করলেন এবং সেই বিবরণীতে একটি গুপ্তযুগীয় ও একটি গুপ্তোত্তর যুগের মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেল। অতঃপর বেশ কিছুদিন ভিটা উৎখননে প্রাপ্ত গুপ্ত যুগীয় মূর্তিটিকে প্রাচীনতম মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে প্রখ্যাত কলা রসিক অধ্যাপক বাসুদেবসরণ আগ্রাওয়ালা অহিচ্ছত্র উৎখননে আবিষ্কৃত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে গুপ্তোত্তরকালে নির্মিত প্রায় কুড়িটি মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি আবিষ্কারের সংবাদ রসিকমহলে পরিবেশন করলেন। পরবর্তীকালে শ্রী এইচ এন দ্বিবেদী তাঁর 'গোয়ালিয়র রাজ্যে মে মূর্তিকলা' শীর্ষক পুস্তকে মধ্যভারতের বেসনগরে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির সন্ধান দিলেন। এই মূর্তিগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হল যে গুপ্তযুগে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিপূজা বিশেষভাবেই জনপ্রিয় হয়েছিল। ভারত শিল্পে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার সর্বপ্রথম প্রকাশ গুপ্তযুগেই হয়েছিল বলে যখন একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল, ঠিক সেই সময় শ্রী ডি বি দিসলকর ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টার্লি' শীর্ষক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন যে কুষাণ আমল থেকেই অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যেই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তি প্রচলিত হয়েছিল। অধ্যাপক বাসুদেবসরণ আগ্রাওয়ালা ১৯৪৯ সালে 'উত্তর প্রদেশ হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি' শীর্ষক পত্রিকায় মথুরার সন্নিকটে পালিখোরা ও অর্জুনপুরাতে প্রাপ্ত কুষাণ যুগীয় কয়েকটি মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তির তথ্য প্রচার করে দিসলকর মশাইয়ের সংবাদটিকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।
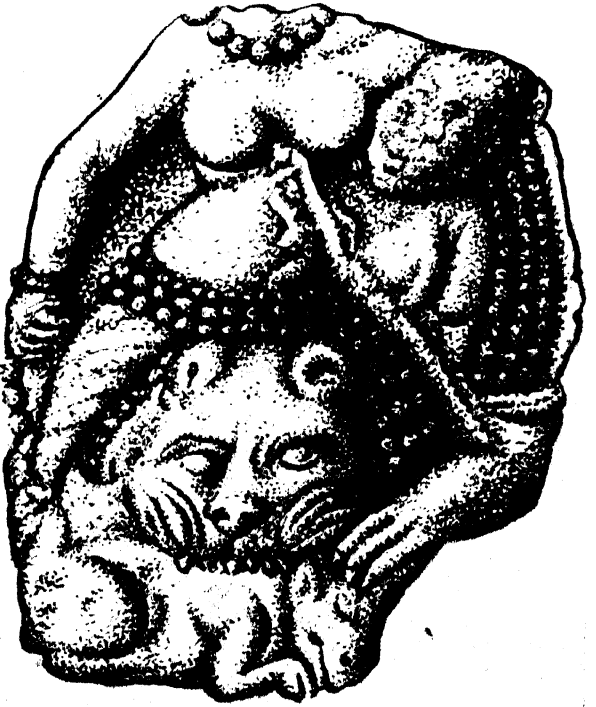
ঐতিহাসিকেরা যখন প্রায় মেনে নিতে চলেছিলেন যে, প্রাচীনতম মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তিটি কুষাণ আমলেই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল, ঠিক সেই সময় 'ললিত কলা' শীর্ষক পত্রিকায় ১৯৫৬ সালে ডঃ রতনচাঁদ আগ্রাওয়ালা জয়পুরের অনতিদূরে আমেরের পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ একটি সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গামূর্তির প্রতি কলা-ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'নাগর' নামক স্থান থেকে পাওয়া এই মূর্তিটিকে ডঃ আগ্রাওয়ালা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কোন এক মুহূর্তে নির্মিত বলে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। তাঁর মতে, এই মূর্তিটিতে সিংহবাহনের সংযোজন সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং ভারত শিল্পে প্রকাশিত মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার এইটিই প্রাচীনতম রূপ। কথিত আছে যে, সিংহবাহিনী দেবীর পূজার প্রচলন নাকি হিটাইট ও অ্যাসিরিয়ানদের মধ্যে বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খ্রীষ্টপূর্ব দশম-নবম শতকে নির্মিত একটি স্বর্ণপাত্র কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে 'হোসানলু' নামক স্থানে পাওয়া গিয়েছে। পাত্রটির উপরে দ্বিভুজা সিংহবাহিনী একটি দেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। দেবীর বাম হাতে একটি দর্পণ ও ডান হাতে একটি গদা দেখা যায়। সম্ভবত সিংহবাহিনী দেবীর পরিকল্পনা বিদেশ থেকেই ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল।

ভারত কলাভবনে সম্প্রতি সংগৃহীত কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তিটি মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির উদ্ভব ও বিকাশের একটি বিশেষ অধ্যায়ের সূচক বললে বোধ করি অত্যুক্তি করা হবে না। ছাঁচে নির্মিত এই মূর্তিটি ভগ্ন এবং কালের নির্যাতনে সবিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত। দেবী দ্বিভুজা, সিংহবাহনা। সিংহের পৃষ্ঠদেশে বসে দেবী সিংহ শরীরের দুপাশে পা দুটি ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে বসবার ভঙ্গীটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং যুদ্ধ করবার পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত। এই ধরনের সিংহবাহনাসীন দুর্গা মূর্তি পরবর্তীকালে মহাবলীপুরমের মহিষমণ্ডপে দেখা যায়। দেবী তাঁর ডান হাতে সম্ভবত মহিষের লেজটি ধরে আছেন, বাম হাতটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত নয়। দেবীর নিম্নাংশ দিব্যবস্ত্রে আবৃত, উর্ধাংশ অনাবৃত। অনাবৃত শরীরের গঠননৈপুণ্য, স্তনযুগলের মণ্ডনরীতি কুষাণকালীন মথুরায় পাষাণ যক্ষিণী মূর্তিগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দেবীর বাহন সিংহের ভয়ংকর মুখটি দৃশ্যমান। সিংহটির মুখ এবং সামনের দুটি থাবা দিয়ে অসহায় মহিষটির দেহ কামড়ে ধরেছে। এই অসহায় মহিষের মুখটির আকৃতি কেন জানি না খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ ভারহুতের পাষাণ প্রাচীরে 'চন্দা যখী'র বাহনের মুখাবয়বটির কথা মনে করিয়ে দেয়। কলাভবনে সংগৃহীত এই পোড়ামাটির মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটিতে দেবীর বাম দিকে, হাতের নীচে একটি মানব শিশুমূর্তির সংযোজন অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কে এই শিশু? এই মূর্তিটি কি মহিষের শরীর থেকে উদ্গত সদ্যোজাত মহিষাসুরের?

মূর্তিটির নির্মাণকাল অনুমানের জন্য দুটি জিনিস অনুধাবনযোগ্য। প্রথমত, মহিষের চেহারাটি শুঙ্গকালীন চন্দা যখীর বাহনের সঙ্গে তুলনীয় এবং দ্বিতীয়ত, দেবীর অনাবৃত উর্ধাংগ কুষাণ যুগীয় যক্ষিণী মূর্তিগুলির দেহ-লাবণ্যের সমপর্যায়ভুক্ত। তা হলে কি অনুমান করা যেতে পারে যে, নাগরে প্রাপ্ত আমেরের পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত প্রাচীনতম মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটির মতন এই মূর্তিটিও খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক ও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে নির্মিত হয়েছিল? পরিশেষে এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি করা হবে না যে, আজ পর্যন্ত যে কয়েকটি প্রাচীন মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্যে, দেবীর দৈহিক সৌন্দর্যসুষমায়, বাহন সিংহের বিপুল বিক্রমের এবং অসহায় মহিষের চিত্রণে ভারত কলাভবনে সংগৃহীত মূর্তিটি এক কথায় অনুপম।

মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা (কৌশাম্বী)

এখন এই ১০০০ টাকা চুরি যাবার সম্ভাবনাই নেই!
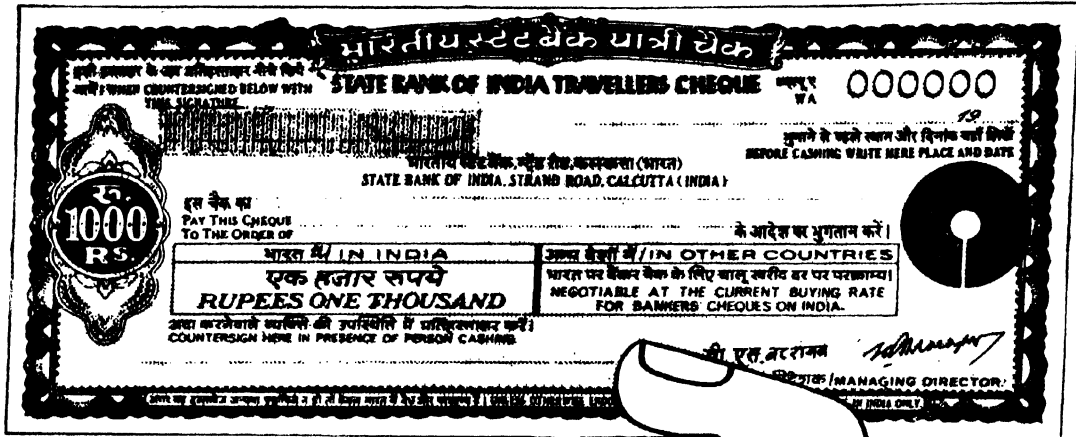
স্টেট ব্যাঙ্ক
আসুন, একসাথে এগোই!

সব মেট্রোপলিটান নগরীর ও শহরাঞ্চলের আমাদের শাখাগুলিতে রাজাজী জন্ম-শত-বর্ষ জয়ন্তীর কুপন পাবেন।

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১৩ ॥

বিধুশেখরের নাতি প্রাণগোপালের উপনয়ন উপলক্ষে নবীনকুমার অনেকদিন পর এলো এ বাড়িতে। অতি শৈশবে সে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের হাত ধরে এখানে অনেকবার এসেছে। তখন তাকে আদর করার জন্য নারীগণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে নবীনকুমার এখন বাইরের পৃথিবীকে চিনতে শুরু করেছে, মাসী-পিসী দিদি-খুড়ো-জ্যাঠাদের সঙ্গে অহেতুক বিশ্রম্ভালাপ আর সে পছন্দ করে না। নিমন্ত্রণাদি ছাড়া আর আসা হয় না এখানে।

একমাত্র দৌহিত্রর উপনয়নে বিধুশেখর ধুমধামের আয়োজন করেছেন বিস্তর। প্রাণগোপালকে নিয়ে তাঁকে বিস্তর ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। প্রাণগোপালের পিতামহ শিবলোচন কিছুতেই দাবি ছাড়তে চান না, তিনি তাঁর পৌত্রের ওপর অধিকার বজায় রাখতে চান। প্রাণ-গোপাল যেমন বিধুশেখরের একমাত্র নাতি, তেমনি শিবলোচনেরও ঐ একটিই নাতি বৈ আর নেই।

গরীব ব্রাহ্মণের এই স্পর্ধা বিধুশেখরের কিছুতেই সহ্য হয় না! শিবলোচনের পুত্রকে বিধুশেখর ঘরজামাই করেছিলেন, তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহই হয়েছিল ঐ শর্তে। ঘর-জামাইয়ের মৃত্যু হলে তার সন্তান তো অত্রালয়েই থাকবে স্বাভাবিকভাবে! ঐ পূজুরী ব্রাহ্মণ শিবলোচনের কতখানি সামর্থ্য আছে প্রাণগোপালকে মানুষ করার? বিধুশেখর এরই মধ্যে ঐ অষ্টমবর্ষীয় বালকের জন্য তিনজন শিক্ষক রেখেছেন।

শিবলোচন মামলা করার আস্ফালন করেছিলেন তাতে অবশ্য হেসেছিলেন বিধুশেখর। ঐ মূর্খটা জানে না যে, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের ওপরেই শুধু হার-জিত নির্ভর করে না। ধনীর সঙ্গে মামলা করে কখনো জয়ী হতে পারে না কোনো দরিদ্র। আর কিছু না. শুধু মামলাটিকে চার-পাঁচ-ছয় বৎসর ধরে চালিয়েই বিধুশেখর ওঁকে সর্বস্বান্ত করে দিতে পারেন।

শেষ পর্যন্ত মামলা-মোকদ্দমার দিকে যান নি শিবলোচন। কিন্তু হালও ছাড়েন নি। প্রতি মাসে একবার দুবার করে এসে আর্জি জানিয়ে যান। অন্তত একবার সামান্য কয়েক দিনের জন্যও তিনি প্রাণ-গোপালকে নিয়ে যেতে চান স্বগৃহে। ও ছেলে কি তার পিতার ভিটেয় একবারও পা দেবে না? ওর পিতামহী যে একবারও ওকে চক্ষেও দেখলেন না। পুত্রের শ্বশুরালয়ে কখনো জননীকে আসতে নেই, নইলে তিনি নিজেই এসে দেখে যেতে পারতেন।

কিন্তু বিধুশেখর এ ব্যাপারেও অত্যন্ত কঠোর। তাঁর মুখের বাক্য অনড়। একবারের জন্যও তিনি প্রাণগোপালকে প্রেরণ করতে রাজি নন। তাঁর মতে, দরিদ্র মাত্রেই কুটিল ও লোভী। অভাব মানুষকে নীচে নামায়। নিজের পুত্রকে ঘর-জামাই হতে দিতে রাজি হয়েছিলেন কেন শিবলোচন, অর্থলোভেই তো। নাতিকে নিয়ে যাবার আবেদনের পশ্চাতেও নিশ্চয়ই কোনো কু-মতলব আছে।

শিবলোচনকে ইদানীং আর এ গৃহে প্রবেশ করতেই দেওয়া হয় না। তবু তিনি আসেন এবং দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। যদি একবার দূর থেকেও নাতির মুখ দেখা যায়।

প্রাণগোপালের উপনয়নের দিনেও তার পিতৃকুলের কারুর নিমন্ত্রণ হয় নি। শিবলোচন সম্পর্কটা এমনই তিক্ত করে ফেলেছেন যে, ওঁদের কারুর মুখদর্শন করতেও আর ইচ্ছে হয় না বিধুশেখরের। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর কন্যা সুহাসিনীর মতামত জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—ওদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না, মা। পাগলো বামুন পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে বসে কোন্ কতা বলবে, তার ঠিক কী! হয়তো নাকে কান্না শুরু করবে! তারচে ওদের না ডাকাই ভালো! তুই কী বলিস?

সুহাসিনী আর পিতার কথার ওপর কোন্ কথা বলবে! তা ছাড়া, শ্বশুরকুলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই স্থাপিত হয়নি। বিবাহের পর মাত্র সাতদিন সে শ্বশুরালয়ে ছিল একবার, তাঁদের কারুর মুখই তার ঠিক মতন স্মরণ হয় না।

—সে আপনি যা ভালো বুঝবেন, বাবা!

নির্লজ্জ শিবলোচন তবু কোথা থেকে খবর পেয়ে আজও দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন দিনে তিনি নাতিকে একবার আশীর্বাদ করতে চান। বিধুশেখরের তুলনায় শিবলোচন আরও বেশী বৃদ্ধ। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস, শরীরটা ভাঙা-চোরা। একটি বহু ব্যবহৃত কাষায় বস্ত্র ও উত্তমাঙ্গে নামাবলী, এ ছাড়া অন্য কোনো পোশাক তিনি কখনো ব্যবহার করেন না।

সুহাসিনীর বিবাহের সময় অতিথি আপ্যায়নের ভার ছিল গঙ্গানারায়ণের ওপর। সুহাসিনীর পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় সেই ভার নবীনকুমারের ওপর বর্তেছে। নবীনকুমারকে দেখে সুহাসিনীর বার বার মনে পড়ছে তার গঙ্গাদাদার কথা। নবীনকুমারের এখন যা বয়েস, তার বিবাহের সময় গঙ্গানারায়ণেরও প্রায় এই বয়েসই ছিল। অথচ দুই ভ্রাতার কত প্রভেদ। গঙ্গানারায়ণ ছিল লাজুক, নম্র স্বভাবের। বেশী লোকজনের মধ্যে সে অস্বস্তি অনুভব করতো, অন্দর মহলে এসে সে নারীদের চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারতো না। সেই তুলনায় নবীনকুমার একেবারে বিপরীত। এত অল্প বয়েসেই কত সপ্রতিভ, চঞ্চল এবং সামান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সে হুকুমের সুরে কথা বলে। ধুতির ফুল-কোঁচাটি এক হাতে ধরে সে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে পূর্ণ বয়স্কদের মতন ব্যবহার করছে মাননীয় অভ্যাগতদের সঙ্গে। তার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি সে সোজা অপরের মুখের দিকে তুলে ধরে।

বিন্দুবাসিনীর কথাও এদিনে কয়েকবার চকিতে মনে পড়ে সুহাসিনীর। কিন্তু দিদির মুখচ্ছবিখানি সে মন থেকে মুছে দিতে চায়। দিদি বড় মন্দভাগিনী ছিল, সুহাসিনীর মতন একটি সন্তানও সে পায়নি। বৈধব্যজীবনের নিষ্ঠাও রক্ষা করতে পারলো না সে. সবাই জানে দিদি গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে কলঙ্কিনী হয়েছিল। সে মরে বেঁচেছে। এ গৃহে তার স্মৃতিরও কোনো স্থান নেই, বিশেষত আজকের মতন শুভদিনে।

অতিথিদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় নবীনকুমার একবার অন্দরমহলে এলো জল পান করবার জন্য। লোকজনের সঙ্গে অনবরত কথা বলতে বলতে কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে যায়।

সুহাসিনী তাকে দেখে বললো, এই ছোটকু, শোন্!

সুহাসিনী এখন বাইশ বছরের যুবতী। তার শরীর একটু ভারির দিকে, একখানা নতুন গরদের শাড়ি পরিহিত অবস্থায় তাকে বেশ মা-মা দেখায়।

নবীনকুমার কাছে এগিয়ে যেতেই সুহাসিনী তার কপালে একটি চুম্বন দিয়ে শুধু বললো, ছোটকু—। তারপরই তার দুই চক্ষু দিয়ে দরদর ধারে অশ্রু বর্ষিত হতে লাগলো।

নবীনকুমার বিস্মিত হয়ে বললো, এ কি, সুহাসিনীদিদি!

সুহাসিনী বললো, ছোটকু, আজ বড় গঙ্গাদাদার কতা মনে পড়চে রে! আমায় কত ভালোবাসতেন! আমি গঙ্গাদার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠে কিল মারতুম। গঙ্গাদাদা আমাদের ছেড়ে কোতায় চলে গেল রে!

নবীনকুমার নির্বাক হয়ে রইলো। গঙ্গাদাদাকে সেও খুব ভালোবাসতো। করুর কারুর উপস্থিতিতেই ভালোবাসার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। গঙ্গাদাদা কাছে এলেই সে রকম লাগতো। একটি দিনের কথা তার এখনো মনে আছে। পিতার মৃত্যুর পর তাদের সম্পত্তি ভাগাভাগি হচ্ছিল, প্রায় সবই নবীনকুমারের ভাগে, গঙ্গানারায়ণকে বিশেষ কিছুই দেওয়া হয়নি। তাই নিয়ে বিম্ববতী আপত্তি তোলায় গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, মা, ছোটকুর পাওয়া আর আমার পাওয়া তো একই কথা, তুমি অমন কেন বলচো? তখন নবীনকুমারের অনেক কম বয়েস, অতশত বোঝার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু আজও স্মরণে এলে সে বুঝতে পারে, গঙ্গানারায়ণের ঐ কথার মধ্যে ঈর্ষার লেশমাত্র ছিল না। তবে, গঙ্গানারায়ণ নিরুদ্দিষ্ট বা মৃত বলে ঘোষিত হবার পর আর বেশী দিন নবীনকুমার তার দাদার স্মৃতি ধরে রাখতে পারে নি।

আজ সুহাসিনীর কান্না তার কাছে এমনই আকস্মিক মনে হলো যে সে কোনো উত্তরই দিতে পারলো না।

সেখানে অন্য একজন স্ত্রীলোক এসে পড়ে বললো, ওমা, সুহাসিনী, তুই কাঁদচিস? কী হলো গা?

সুহাসিনী তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছে বললো, না, না, কিছু না!

তারপর সে নবীনকুমারের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললো, আমাদের সেই ছোটকু, কত বড়টি হয়েচে, কেমন সুন্দর, কেমন বুদ্ধিমান, দেকে এত ভালো লাগলো—

সেই স্ত্রীলোকটি সুহাসিনীর প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্যই যেন চক্ষে আঁচল দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আহা, আজ যদি গোপালের বাবা বেঁচে থাকতেন ...ওগো তিনি থাকলে যে সর্বাঙ্গসোন্দর হতো—

এই সময় নবীনকুমার বার-বাড়ির দিকে সরে পড়লো। স্ত্রীলোকের কান্নার সামনে দাঁড়াতে তার বিষম অস্বস্তি লাগে।

বিধুশেখর আর আগেকার মতন উৎসব গৃহের সমস্ত স্থল ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতে পারেন না। বহুমূত্র ব্যাধিটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, ইদানীং দ্বিতীয় চক্ষুটির দৃষ্টিও যেন কিছুটা ম্লান লাগে। তিনি বাইরে একটি আরাম কেদারায় বসে সব রকম খবরাখবর নিচ্ছেন। তাঁর বাড়িতে ভৃত্য-পরিচারক এবং আশ্রিত আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই তাদের

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেস্‌কাফে®
NESCAFÉ
instant coffee
বিশ্বের সর্বাধিক
বিক্রীত কফি
শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইন্‌স্ট্যান্ট কফি
NS/CAS-1/79 BEN

প্রত্যেকের ওপরেই নির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া আছে। তবু তিনি মাঝে মাঝেই নবীনকুমারকে ডেকে জানতে চান সব কিছু।

ব্রাহ্মণদের দান ও নিমন্ত্রিতদের ভোজনাদি শুরু হয়েছিল দ্বিপ্রহর থেকে, শেষ হলো প্রায় রাত দশটার তোপ দাগার সময়। বিধুশেখরের জ্যেষ্ঠা কন্যা নারায়ণী এ বাড়ির কর্ত্রী, তিনি বলে রেখেছিলেন যে নবীনকুমারকে তিনি তাঁর সামনে বসিয়ে খাওয়াবেন। বৃহৎ একটি রুপোর থালায় ষোড়শ ব্যঞ্জন সাজিয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন নবীনকুমারকে।

সারাদিন ধরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ও অনেকবার ছাদে-নিচে ওঠা-নামা করে নবীনকুমার ক্লান্ত, তার আর আহারে রুচি নেই। নারায়ণী তবু জোর করে তাকে খেতে বসালেন। অনেক আত্মীয়া-অনাত্মীয়া নারী উপস্থিত সেখানে। বিম্ববতীও রয়েছেন। যারা নবীনকুমারের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা এবং অনেকদিন পর তাকে দেখছে, তারা সকলেই নবীনকুমারের হঠাৎ যৌবনে উপনীত হওয়ায় মুগ্ধ ও বিস্মিত। সবাই বলছে, ওমা, এই তো ক'দিন আগেও একেবারে ছেলেমানুষটি ছেল, এখুন দিব্যি বাবু হয়ে উঠেচে যে গো! আর কত কাজের ছেলে, সব দিকে নজর!

আর যারা বয়সে ছোট, তারাও বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে নবীনকুমারকে, কেউ অন্য একজনের কানে কানে বলছে, ওমা, দ্যাক্, দ্যাক, গোঁপ আচে! গোঁপ আচে!

কিছুদিন আগে স্বগৃহে মঞ্চ বেঁধে নবীনকুমার নাটকের অভিনয় করেছিল এবং তাতে সে রাজকুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল বলে সে অনেকের কাছে বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। চিকের আড়ালে বসে অনেক নারী ও বালিকা দেখেছিল সেই নাটক। নবীনকুমারের অভিনয়-কলা নৈপুণ্যের সুখ্যাতিও বেরিয়েছিল সংবাদ-পত্রে। সেই সময় নবীনকুমারের সবে সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা উঠেছিল মাত্র, কিন্তু রাজকুমারীর গোঁফ থাকা কোনোক্রমেই উচিত নয় বলে পরামাণিক দিয়ে চেঁছে ফেলা হয়েছিল ওষ্ঠ। তার ফলে এখন তার বেশ কালচে রঙের গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।

সামান্য একটু খেয়েই নবীনকুমার উঠে পড়তে যাচ্ছিল, নারায়ণী বললেন, ওমা, উঠচিস কী! খা, খা, আর একটু খা, একটু পায়েস মুখে দে অন্তত—

নবীনকুমার ততক্ষণে জলের গেলাসে হাত ঢুকিয়েছে। বিম্ববতী বললেন, ঐ ওর স্বভাব, এই এইটুকুনি পাখির আহার যেন!

নবীনকুমার বললো, সারা দিন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শিরদাঁড়া ব্যথা হয়ে গ্যাচে। এবার গিয়ে ঘুমুবো! একবার গোপালের সঙ্গে দেকা করে যাই।

এই কথা শুনে নারায়ণী তাকালেন সুহাসিনীর মুখের দিকে। ওরা কিছু বলবার আগেই বিম্ববতী বললেন, আজ আর গোপালের সঙ্গে দেকা করতে হবে না। যা শুয়ে পড়গে!

নবীনকুমার কৌতুকের সঙ্গে বললো, একবার দেকে আসি, নেড়ু মাতার গোপালটাকে কেমন দেকাচ্চে!

নারায়ণী বললেন, গোপাল এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েচে!

—এই তো একটু আগেই তার গলা পেলুম! বসে বসে টাকা গুণছেল! খুব টাকা চিনেচে ছেলেটা!

নারীরা চুপ করে রইলো।

যজ্ঞ সমাপ্ত হলে উপবীত গলায় দেবার পর প্রাণগোপালকে দ্বিতলের একটি কক্ষে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন সে তিনদিন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোনো জাতের মানুষের মুখ দর্শন করবে না।

নবীনকুমার উঠোনে এসে দাঁড়াতেই এক ভৃত্য এলো তার হাতে জল ঢেলে দিতে। হাত মুখ প্রক্ষালন করে নবীনকুমার বললো, গোপালকে একবার দেকেই আমি চলে যাবো।

বিম্ববতী বললেন, থাক না, এখুন আর যাস্ নি?

—কেন?

—এখুন ওর কাচে যেতে নেই!

ঠিক তখনই ও বাড়ির এক আশ্রিত যাবক এসে নারায়ণীকে জিজ্ঞেস করলো, ও বড়দিদি, গোপাল দুধ খেতে চাইচে। এখুনে কি কিছু দেওয়া যায়?

নবীনকুমারের এবারে খট্‌কা লাগলো। সে তাকালো সবার মুখের দিকে। তারপর ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? তোমরা আমায় নিষেধ কচ্চো কেন? এই তো এ গেল্‌লো গোপালের ঘরে। আমি একবার গেলে কী দোষ?

নারায়ণী বললেন, ও তো বামুন।

বিম্ববতী তার সঙ্গে যোগ করলেন, বামুন ছাড়া আর কারুর যেতে নেই।

নবীনকুমারের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে এই প্রথার কথা বিন্দু বিসর্গ জানতো না। সে ব্রাহ্মণ নয় বলে প্রাণগোপালের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না? আজ সারাদিন সে প্রাণগোপালের পৈতের জন্য খাটলো, আজ সকালেও প্রাণগোপাল তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল, ছোট্‌কুমামা, তুমি আমায় ইস্‌প্রিং-এর হাতি দিচ্চো তো, তোমায় বলেচিলুম... সেই প্রাণগোপালের মুখ দেখা তার এখন নিষেধ? এতদিন সবাই বলেছে, সে এ বাড়িরও ছেলেরই মতন, কিন্তু আসলে তা নয়, সে অব্রাহ্মণ, সে এদের চেয়ে ছোট!

আর একটিও কথা না বলে নবীনকুমার হনহন করে এগিয়ে গেল দ্বারের দিকে। সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি তার ক্রোধ উদ্দীপিত হলো। সে যখন আরও অনেক ছোট ছিল, একবার কৌতুক ও গোঁয়ার্তুমি করে টিকি কেটে নিয়েছিল এক ব্রাহ্মণের। সেই কথা মনে পড়ে গেল তার।

দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় সে দেখলো, নামাবলী গায়ে জড়ানো এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারবানদের কাছে কী বলে যেন কাকুতি-মিনতি করছে। নবীনকুমার প্রাণগোপালের ঠাকুর্দাদা শিবলোচনকে চেনে না, তার বৃত্তান্তও জানে না। শিবলোচনকে সে মনে করলো কোনো ভিখারী।

তাকে দেখে নবীনকুমারের আরও রাগ জাগ্রত হলো। সে মনে মনে বললো, এই তো ব্রাহ্মণের দশা! অনাহূত হয়েও এখানে সুখাদ্যের লোভে ছোঁক ছোঁক করচে। অথচ, এর মাতায় একটা বৃহৎ টিকি আর গলায় কালীঘাটের পাণ্ডাদের মতন একটা মোটা পৈতে আচে বলে এরও অধিকার রয়েচে প্রাণগোপালের মুখ দেকার!

সে দ্বারবানদের এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই বুড়োটা এখেনে কী চায়? বলে দিস্‌নি যে বামুন-বিদায় দুপুরে হয়ে গ্যাচে!

শিবলোচন নবীনকুমারের দিকে এগিয়ে এসে বলতে গেল, বাবা আমি শুধু একটিবার—

নবীনকুমার সে কথায় কর্ণপাত না করে দ্বারবান-দেরই আবার হুকুম দিল। লুচি মণ্ডা দু' চারখানা এনে একে দিয়ে বিদায় কর।

তারপর সে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো নিজের গৃহের উদ্দেশ্যে।

এদিকে সুহাসিনী কেঁদে ফেললো আবার।

নারায়ণীকে জড়িয়ে ধরে সে বললো, দিদি, কী অলক্ষুণে ব্যাপার হলো, ছোট্‌কু রাগ করে চলে গ্যালো।

নারায়ণী বললেন, আমি কী করি বল! ছোট্‌কু হঠাৎ না জেনে এ রকম বললো—

বিম্ববতী সুহাসিনীর পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুই এমন উতলা হচ্ছিস কেন মা? অলক্ষণ কেন হবে? ছোট্‌কু ওরকম অবুঝের মতন হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে যায়। আবার কাল দেকিস, একেবারে ঠাণ্ডা জল হয়ে গ্যাচে।

সুহাসিনী মুখ ফিরিয়ে বললো, ছোটমা, ছোট্‌কু একবার দেখতে গেলেই বা কী দোষ হতো?

বিম্ববতী বললেন, ওমা, তা আবার হয় নাকি শাস্তরের নিয়ম...তিন দিন পরেই তো ও আবার গোপালকে দেকতে পাবে।

—শাস্তরের এমন নিয়ম কেন?

—সে কতা কী আমরা জানি?

—ছোট্‌কু আমার ছোট ভাই, আমাদের আর কোনো ভাই নেই, ছোটকুই আমাদের একমাত্র ভাই, সে আবার বামুন-অবামুন কি, ছাট মা?

—তা বললে কী চলে?

নারায়ণী বললেন, আর ও নিয়ে মাতা ঘামাস নি ছোট্‌কুকে পরে আমি ডেকে সব বুঝিয়ে বলবো খন। এখুন চল, ভাঁড়ার বন্ধ কত্তে হবে, ছিষ্টির কাজ বাকি রয়েচে।

এই সামান্য ঘটনাতেও কিন্তু নবীনকুমারের মনে খুব তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। পরের দিন সে আর ও বাড়িতে গেলই না।

বিম্ববতী তাকে বোঝাতে এলে সে বললো, আমি আর কোনোদিন জ্যাঠাবাবুদের বাড়ি যাবো না। তুমি আমায় অনুরোধ করো না, মা। যে-বাড়িতে গেলে আমার পদে পদে ভেবে চলতে হবে যে কোথায় আমার যাওয়া উচিত, আর কোথায় আমার যাওয়া উচিত নয়, সেখানে আমার যাবার দরকারটা কী! এখুন মনে পড়েচে, ছেলেবেলা খেলতে খেলতে একদিন আমি ওঁদের ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়িচিলুম, তখুন জ্যাঠাইমা আমায় বকুনি দিয়েচিলেন!

—তা বলে কি তুই জাত-ধম্মো মানবি না নাকি ছোট্‌কু? বামুনেরা হলো সবচে ওপরে, ওনারা যা পারেন, সব কি আমরা পারি?

তোমার সঙ্গে আমি তক্কো করবো না, মা! তুমি শুধু আমায় ও বাড়িতে আর যেতে বলো না?

—অদ্ভুত কতা বলিস তুই ছোট্‌কু। ওরা আমাদের কত আপন। গোপালের পৈতে হয়ে গেল, ঐ পৈতের সময়েই যা একটু...অন্য সময় তুই ও বাড়ির যেখেনে খুশী সেখেনে যেতে পারিস।

—ঠাকুর ঘরে ছাড়া।

যথাসময়ে এ কথা বিধুশেখরেরও কানে উঠলো। তাঁর চলৎ-শক্তি কমে গেছে বটে, তবু সেকালের রাজাদের মতন তিনি চক্ষু দিয়ে শোনেন এবং কান দিয়ে দেখেন।

সংবাদটি শুনে বিধুশেখর দোদুল্যমান হলেন। লোকাচার অনুযায়ী সদ্য উপবীতধারী ব্রহ্মচারীর মুখ দর্শন করার অধিকার নেই নবীনকুমারের। সেই হিসেবে তাঁর কন্যারা নবীনকুমারকে বাধা দিয়ে ঠিক কাজই করেছে। কিন্তু নবীনকুমার তো আসলে ব্রাহ্মণই। মহাভারতে সূতপুত্র নামে পরিচিত কর্ণ যেমন আসলে ক্ষত্রিয়।

বিধুশেখর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। ছোট্‌কু বলেছে, সে আর কখনো এ বাড়িতে আসবে না। বয়েস কম, মস্তিষ্ক উষ্ণ, হয়তো এই মনোভাব তার বেশী দিন থাকবে না। ছোট্‌কু এ বাড়িতে আর কখনো আসবে না, এ কখনো হয়? তাঁর সব কিছুই তো ছোট্‌কুর। আজ যদি তিনি হঠাৎ মারা যান, তা হলে ছোট্‌কুই হবে প্রাণগোপালের অভিভাবক। এক সময় ছোট্‌কুকে সব সত্য কথা বলতে হবে, অন্তত মৃত্যুর আগে...অথচ বিম্ববতীর কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

(ক্রমশ)

ভ্রম সংশোধন :

'সেই সময়' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০ম পরিচ্ছেদে মুন্সী আমীর আলীর মুখে এই রকম একটি বাক্য ছাপা হয়েছে : "একজন সিপাহীও দেশ রক্ষার জন্য রাজী হয়নি"। এর মধ্যে একটি গুরুতর মুদ্রণ প্রমাদ আছে। মূল বাক্যটি এই রকম : "একজন সিপাহীও দেশ রক্ষার জন্য গাজী হয়নি।"

—লেখক

যুগল মিলন
ভারতের একমাত্র শারীরিক দুর্গন্ধনাশক
সাবান ও ট্যাল্‌ক
দু'ভাবে দুর্গন্ধ প্রতিরোধের জন্য একেবারে সঠিক
যুগল মিলন...সিন্থল সাবান মেখে পরিষ্কার স্নান...
আর তারপর সুগন্ধ পাউডার মাখা...
যার ফলে আপনি ঝরঝরে তাজা
বোধ করবেন।
গোদরেজ্‌-এর
নিবেদন—সিন্থল
CINTHOL
Godrej
CINTHOL
DEODORANT AND COMPLEXION SOAP
CINTHOL
DEODORANT
LUXURY
TOILET POWDER
BY
Godrej
Interpub/CTS/1/79 BN

বিজ্ঞান
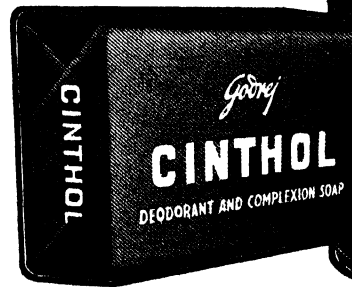
পরিবেশ, আপনি এবং আমরা সবাই

১৯৭২ সালে স্টকহোম কনফারেন্সের পর পৃথিবীর সর্বত্র পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলী নিয়ে একটা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সেই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল : এক, মানুষের নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দরুন প্রাকৃতিক পরিবেশ—যেমন জল, বাতাস, স্থলভাগ, যার প্রাণী এবং উদ্ভিদজগৎ ভারসাম্য হারাচ্ছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। দুই, এই ভারসাম্য হারানোর ফলে মানুষ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপদের সম্মুখীন সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা। তিন, আমাদের চারপাশের পরিবেশ যাতে দূষিত না হয়, তার ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৯৭২ সালের পর দেখতে দেখতে প্রায় সাত বছর অতিক্রান্ত হলো। প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নানা রকম ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে নানা রকম আইন। তাতে কোনও কোনও দেশের মানুষ যে লাভবানও হয়েছেন—বলাই বাহুল্য। পিটসবার্গের আকাশ মাত্র বছর দশেক আগেও রাত দিন ঢাকা থাকতো কয়লার ধোঁয়ায়। সে আকাশ এখন স্বচ্ছ। শিল্প-সভ্যতা শুরু হওয়ার পর গোটা লন্ডন শহরটাই আগ্রাসী ধোঁয়াশায় কবলিত হয়েছিল। ব্রনকাইটিস, হাঁপানি প্রভৃতি বুকের রোগ তো বটেই, ওই ধোঁয়াশার রাক্ষসী-গ্রাসে কবলিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা ইংলণ্ডের অনেককেই চিন্তিত করে তোলে। একদিকে শিল্প। শিল্প মানে বড় বড় চিমনি, ট্রাক ইত্যাদি। বড় বড় চিমনি থেকে বেরিয়ে আসছে ঝুড়ি ঝুড়ি কয়লার ধোঁয়া। যার প্রধান উপাদান কয়লার কণা, কার্বন-ডাইঅকসাইড, কার্বন-মনোকসাইড, গন্ধক কণা অথবা সালফার ডাই-অকসাইড। ট্রাক, প্রাইভেট কার প্রভৃতি থেকেও অনুরূপ উপাদান বেরিয়ে এসে পথঘাট আচ্ছন্ন করছে। পেট্রোলের ধোঁয়ার মধ্যে থাকে অতিরিক্ত আরও নানা রকম কণা। যেমন ধরুন, সিসে। এই সিসে শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এক ধরনের স্নায়বিক রোগের কারণ বলে। পেট্রোলের ধোঁয়ায় থাকে নানা রকম হাইড্রোকারবন, যা ক্যানসার রোগের অন্যতম কারণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

হ্যাঁ, লণ্ডন শহর মানেই যেন মৃত্যুর হাতছানি। আর সেখানকার টেমস নদী নরককুণ্ডের নালা। লক্ষ লক্ষ মানুষের শহর লণ্ডনের নালা-নর্দমার ক্লেদে অতীতের কাব্যময় টেমস সত্যিই নরক।

ভাবিত হলেন শিল্পপতিরা। জনস্বাস্থ্যের কল্যাণ দেখতে গেলে তো চিমনির ধোঁয়া বন্ধ করতে হয়, পথঘাট থেকে পেট্রোলচালিত যানবাহন তুলে নিতে হয়। যার অর্থ শিল্পকেই গুটিয়ে নেওয়া। সেটা বাস্তবে কি সম্ভব ? সরকার এবং সমাজসেবীরাও দেখলেন, শিল্প পরিবেশকে দূষিত করে ঠিকই কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক চাহিদা, কর্মসংস্থান শিল্প না থাকলে এদেরও তো কোন অস্তিত্ব থাকে না।

একত্রিত হলেন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তারা, সরকারী এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। তৈরী হলো বিধিনিষেধ। মুক্ত বাতাসে অমনভাবে দূষিত সামগ্রী ঢেলে দেওয়া চলবে না। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিত্যক্ত ধোয়ানি টেমস অথবা অন্য কোন জলাশয়ে ফেলা নিষিদ্ধ হলো। সেই সঙ্গে বন্ধ করা হলো শহরের ঘরে ঘরে এতদিন যেসব কয়লার চুল্লি জ্বলতো তাদের। সোচ্চারিত হলো স্লোগান। সর্বত্র। লণ্ডন শহরের বাতাস, লণ্ডন শহরের জল এবং লণ্ডন শহরের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখুন। চাই সুন্দর পরিবেশ। যেখানে শরীর এবং মন সুস্থ থাকবে।

বলা বাহুল্য, জনসাধারণের চাপে পড়ে
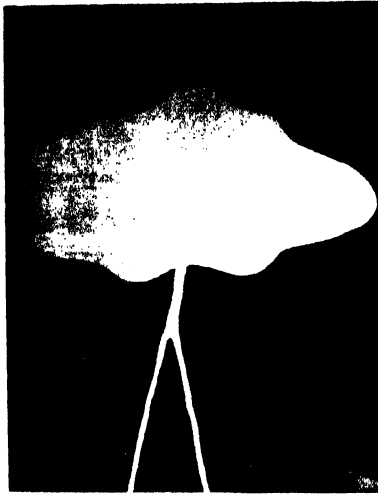
পরিবেশকে ক্লেদমুক্ত অবস্থায় রাখতে বাধ্য হলেন শিল্পপতিরা। গত দশ বছরে শুধু লণ্ডন শহরেই কী অভাবিত কাণ্ড ঘটে গেল। সেই পুরনো দিনের বড় বড় কারখানা সেখানে এখনও আছে। সেই সঙ্গে বসছে কত নতুন কারখানা। কিন্তু চিমনির সেই ধোঁয়া আর নেই। পথে গাড়ি চলে। কিন্তু তাদের পেট্রোল এবং ডিজেলের ধোঁয়া চোখে পড়ে না। গৃহস্থালির কাজকর্মে কয়লা পোড়ানো বন্ধ। জৈবিক এবং অজৈবিক রাসায়নিক বস্তু যা পয়ঃপ্রণালীর ভেতর দিয়ে টেমসের জলে এসে তার জলকে বিষাক্ত করতো, তারা যাতে আর নদীতে এসে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'লণ্ডন শহরে এখন আমরা সূর্য দেখতে পাই। টেমস নদীতে এখন মাছের আনাগোনা বেড়েছে। লণ্ডন এখন স্বচ্ছ। লণ্ডনের বাতাস ফুসফুসকে আর ভারাক্রান্ত করে তোলে না।' কয়েকদিন আগে দিল্লিতে এ মন্তব্য করেছেন জনৈক লণ্ডনবাসী।

*

'দূষণ'—এই শব্দটি আমরা ব্যবহার করি সঙ্কীর্ণ অর্থে। বরং বলি ভারসাম্যহীনতা ?

প্রশ্ন এই : আমাদের পরিবেশকে ভারসাম্যহীন করার ব্যাপারে মানুষেরও যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, সে সম্পর্কে জনসাধারণ কতটা অবহিত ? যে পরিবেশে আমরা বাস করি সেখানকার বাতাস, জল এবং মাটি সম্পর্কে কতটুকু খবর রাখি আমরা ? যদিও বা খবর রাখি, পরিবেশকে কলুষমুক্ত রাখার ব্যাপারে আমরা কতটা সচেষ্ট ? পরিবেশকে কলুষ-মুক্ত রাখার ব্যাপারে জনসাধারণ যাতে ব্যাপকভাবে সচেষ্ট হয়, তার জন্যে গণমাধ্যম, যেমন সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি কতটা দক্ষ এবং তৎপর ? বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ? জনসাধারণের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া কোন বিষয়ে ব্যাপক সংস্কার সাধন শুধু সরকার অথবা গুটিকয় মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর জনসাধারণকে সক্রিয় করে তোলার পেছনে পৃথিবীতে সর্বযুগে এবং সর্বক্ষেত্রে যারা অর্থবহ ভূমিকা নিয়ে এসেছে, লক্ষ করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। ইংরেজীতে ইদানীং যাদের বলা হচ্ছে 'নন-গভার্নমেণ্টাল অরগ্যানাইজেশনস' বা সংক্ষেপে 'এন জি ও'। প্রশ্ন এই, পরিবেশ-সংক্রান্ত সমস্যাবলীর মোকাবিলা করার ব্যাপারে এই 'এন জি ও'গুলি কতটা সক্রিয় আমাদের দেশে ?

এই সব প্রশ্নই সামনে রেখে গত ৫ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হলো। ইনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেণ্ট প্রোগ্রাম (ইউ এন ই পি)-এর উদ্যোগে এই আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছিল প্রেস ইনস্টিটিউট অভ্ ইনডিয়া। এতে উপস্থিত ছিলেন আমাদের দেশের পরিবেশ বিষয়ক কয়েকজন কৃতী বিজ্ঞানী, পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন এমন কয়েকজন সমাজকর্মী এবং কয়েকজন বিজ্ঞান লেখক এবং সাংবাদিক যাঁরা গত কয়েক বছর ধরে পরিবেশ সংক্রান্ত নানা রকম সমস্যা নিয়ে লিখে আসছেন। এই আলোচনা-চক্রে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন কবি নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, কে কুনিকৃষ্ণণ, এম কে প্রসাদ, রাজেন্দ্র মাথুর, ভি সি ভিদে, জয়চন্দ্রন, রবি ভেলুর, ফাল্গুনী চক্রবর্তী, বিমান বসু এবং বর্তমান লেখক। আর ছিলেন বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকার আতামুস সামাদ, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার গিয়াস কামাল চৌধুরী, করাচীর মর্নিং নিউজ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রফিক জাবির, নেপালের রাষ্ট্রীয় সমাচার সমিতির কৃষ্ণ পি সিগ্‌দয়াল এবং শ্রীলঙ্কার বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট ডব্লু আর ভিজয়াসামা এবং সাংবাদিক রিতা সেবাস্টেইন। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন 'ইউ এন ই পি'র ব্যাঙ্কক আঞ্চলিক কেন্দ্রের রিজিওন্যাল ইনফরমেশন অফিসার এ বি এম মুসা।

ধোঁয়া রোধ করার জন্যে আপনি কী করছেন?

মানুষের স্পর্শে বহু অরণ্য এখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে

আলোচনা-চক্র প্রসঙ্গে প্রেস ইনস্টিটিউট অভ্ ইন্ডিয়ার পরিচালক চঞ্চল সরকারের বক্তব্য : জনসাধারণকে পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে আরও ভালভাবে অবহিত করানোই এই আলোচনা-চক্রের মূল লক্ষ্য। গণমাধ্যম নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন, কী ধরনের প্রয়োগ-পদ্ধতি গ্রহণ করলে এ কাজকে আরও বলিষ্ঠ এবং ফলপ্রসূ করে তোলা যায় সে দিকটাও আমাদের খতিয়ে দেখা দরকার।

মুশা বলেন, পরিবেশ বিষয়ক চিন্তাভাবনা এবং কাজকর্ম এখন আর কোন দেশের নিজস্ব গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পরিবেশগত সমস্যা স্থানিক এবং আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে যাতে জন-সাধারণের কাছে প্রতিভাত হয়, যাঁরা পরিবেশ নিয়ে লিখছেন, রেডিওতে বলছেন অথবা টেলিভিশনে তুলে ধরছেন, সে দিকেও তাঁদের নজর দেওয়া দরকার।

*

সত্যি বলতে কী, পরিবেশ সংক্রান্ত লেখক এবং সাংবাদিকরা এই অনুষ্ঠানে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও এমন কিছু কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন, অনেকের কাছেই যা অজানা।

যেমন, বাংলাদেশের আতানুস সামাদ এবং গিয়াস চৌধুরী বাংলাদেশের জনৈক আবহাওয়া বিজ্ঞানীর মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, সেখানকার বরেন্দ্র অঞ্চলের আবহাওয়ায় ইদানীং বেশ বড় রকমের একটি পরিবর্তন চোখে পড়ছে। বছরের বেশির ভাগ সময় সেখানে দিনের দিকে এখন তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে বাড়ছে বেশী, রাতের তাপমাত্রা কমছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে যেন ক্রমেই প্রায় মরুভূমি বা সেমি অ্যারিড জোনের মত পরিবেশ গড়ে উঠছে। যদিও, বৃষ্টির পরিমাণ সেখানে আগেও যেমন ছিল, এখনও প্রায় তেমনিই রয়েছে।

গিয়াস বললেন, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন অধ্যুষিত এলাকা এখন বিনষ্ট প্রায়। বাংলাদেশের বড় শত্রু সামুদ্রিক ঝড় এবং সাইক্লোন। আর যখন তারা আসে তখন ধ্বংস এবং মহামারীকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। এমন পরিস্থিতিতে পরি-বেশে ভারসাম্য রাখা একটা বড় রকমের সমস্যা। এ সমস্যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মোকাবিলা করা দরকার।

হ্যাঁ, ভারত এবং বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয়ের কোলে অবস্থান করছে নেপাল। সেখানেও এখন একটি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বললেন কৃষ্ণ সিগদয়াল। 'যেমন ধরুন, আমাদের দিক থেকে প্রচুর পার্বত্য নদী এবং তাদের শাখা-প্রশাখা নেমে আসছে সমতলের দিকে। এই সমতলের কোন অংশ ভারত, কোন অংশ বাংলাদেশ। ইদানীং নানা কারণে নেপালের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে। পাহাড়ী দেশ নেপাল। সেখানকার মানুষকে জ্বালানির জন্য নির্ভর করতে হয় কাঠের ওপর। ইদানীং সেখানে জনসংখ্যা বেড়েছে। তাই কাঠ সংগ্রহের উপরও চাপ পড়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশী। চাপ পড়েছে পশু-খাদ্য, জমির উপরও। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে নেপালে মাথাপিছু বছরে কাঠ লাগে প্রায় পাঁচ টন। এই কাঠের কিছু অংশ খরচ হয় ঘর-বাড়ি তৈরি করার কাজে। আর বেশির ভাগটাই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়। তা হলে অবস্থাটা একবার অনুমান করুন। এত কাঠের জোগান দিতে গিয়ে পার্বত্য জমির বহু অংশ এখন আলগা হয়ে আসছে। বর্ষায় সেই আলগা জমির মাটি আরও আলগা হয়। তারপর ধোয়ানির সঙ্গে পরিবাহিত হয়ে পলি হিসেবে জমতে থাকে সমতলভূমির নদীতে। এর ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। কখনও সৃষ্টি করছে বন্যা।

শুধু নেপাল নয়। এ ঘটনা পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটছে। ঘটছে শ্রীলংকায়। ভারতের হিমালয় অধ্যুষিত এলাকাতেও। দিনে দিনে পার্বত্য অঞ্চলে লোক সমাগম ঘটছে প্রচুর। বাড়ছে সামরিক গতায়াত অথবা ভ্রমণকারীর সংখ্যা। এর জন্যে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পথঘাট তৈরী হয়েছে বিস্তর। আরও তৈরি হচ্ছে। পথঘাট তৈরি করার ফলে পার্বত্য অঞ্চলের কঠিন শিলাস্তর বহু জায়গায় শিথিল হচ্ছে। যার ফলশ্রুতি ধস। বনজঙ্গলে নানা রকম খাবারদাবার ছড়ান ভ্রমণকারীরা। সেই খাবার উদারসাৎ করে বহু প্রাণী অসুস্থ হয়ে পড়ে। নিষ্ঠুরভাবে পশুপাখি হত্যা, সংবেদনশীল গাছ-পালায় হস্তক্ষেপ, এমন সব কাজের দরুন ভারতের বহু বনভূমির আদি অধিবাসীরা এখন বিপর্যস্ত। যদি এইভাবে চলে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এমন দিন আসবে, যখন সবুজ বনভূমি হবে নৃতাত্ত্বিক কাহিনী, পশুর ডাক অথবা পাখির কলরব স্তব্ধতায় ডুবে যাবে। আর তেমন পরিবেশে মানুষ নামক প্রাণী সত্যিই টিঁকে থাকবে কী না সন্দেহ।

হ্যাঁ, উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শ্রীলংকার বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট বিজয় সোমে। বিজয় সোমে শ্রীলংকার বনাঞ্চল সংরক্ষণের ব্যাপারে শ্রীলংকার মানুষের মনে ইতিমধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছেন যথেষ্ট। বিজয় বললেন, শ্রীলংকায় মোট জমির পরিমাণ ১৬·২৫ মিলিয়ন একর। তার মধ্যে সাত মিলিয়ন একর বনভূমি। এখানে আছে বিখ্যাত সিংহরাজ অরণ্য—দক্ষিণ-পূর্বে। বাইশ হাজার একর এই আদিম বনভূমির দু পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কালগঙ্গা এবং ভীমগঙ্গা নদী। দীর্ঘকাল এই বনভূমি প্রকৃতির আশ্রয়ে শান্তিতেই বাস করছিল। এখন সেখানকার গাছ কেটে শুরু হয়েছে প্লাইউড তৈরির কারখানা। ফলে সিংহরাজ এখন বিপর্যস্ত। এ ধরনের বন বিপর্যস্ত হলে, বলাই বাহুল্য, ওই অঞ্চলের প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাবে। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা দিতে পারে ভূমির অবক্ষয়, শস্যের ক্ষয়ক্ষতি, নানা রকম ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের উপদ্রব।

কেরালার 'রেইন ফরেস্ট' আরও একটি উদা-হরণ। কেরালার অধিবাসীরা এর নাম দিয়েছেন 'সাইলেন্ট ভ্যালি' বা শান্ত উপত্যকা। গত বছর থেকে এই অরণ্যকে রক্ষা করার জন্যে জনসাধারণের তরফ থেকে জোর আন্দোলন শুরু হয়েছে। ইদানীং এখানে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সরকার। বিক্ষোভ তারই বিরুদ্ধে। কেরালা হাইকোর্টে একটি মামলাও দায়ের করেছেন স্থানীয় একটি গোষ্ঠী।

ডঃ এম কে প্রসাদ এই গোষ্ঠীরই অন্যতম উদ্যোক্তা। তিনি বললেন, অদ্ভুত ব্যাপার। প্রায় পাঁচ কোটি বছর প্রাচীন এই বনের কেন্দ্রাংশ আজও পর্যন্ত মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এখানে বাস করে এক ধরনের প্রাচীনতম বানর। লায়ন টেইলড মাংকি। ওদের জন্ম, জীবনযাপন এবং মৃত্যু সমস্তই গাছের উপর। এরা কখনও মাটিতে পদার্পণ করে না। এ ধরনের বানর পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। প্রজনন বিজ্ঞানীদের কাছে এই প্রজাতির বানর তাই বড় রকমের সম্পদ।

জনৈক পর্যবেক্ষক আফসোসের সুরে বললেন, অনেক সময় ইঞ্জিনিয়ার এবং পরিকল্পকরা বুঝতে চান না। তাঁরা বলেন, 'ছেড়ে দিন মশাই, হাজার-খানিক বানর বা পাখির জন্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তো বসে থাকতে পারে না।' ওঁরা শুধু তাৎক্ষণিক দিকটাই দেখেন। এর ফলে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা নষ্ট করছি। প্রকৃতিকে সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং মৌলিক বিজ্ঞান-গবেষণায় যাদের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী।

*

আলোচনা-চক্রে একাধিক বিশেষজ্ঞ প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত নানা রকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। ওই সব আলোচনার মূল বক্তব্য ছিলো : এক, মানুষের অদূরদর্শিতার জন্যে আমাদের জল, হাওয়া এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে এবং কোথায় ভারসাম্য হারাচ্ছে, পরিকল্পনাকারী থেকে শুরু করে জনসাধারণের মনে সে সব সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু ধারণা সৃষ্টি করা দরকার। দুই, এর জন্যে প্রচার মাধ্যমগুলিকে আরও সরব হতে হবে। তিন, প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে প্রতিটি মানুষ যাতে সচেতন এবং সক্রিয় হয় তার জন্যে এক একটি সমস্যাকে নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

আলোচনা-চক্রে স্থির হয়েছে, প্রেস ইনস-টিটিউট অভ ইনডিয়া পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলী যথাযথ অবহিত করার ব্যাপারে একটি কার্যক্রম তৈরি করবেন। এই কার্যক্রমের মধ্যে থাকবেন সাংবাদিক গণমাধ্যম নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা এবং বিশেষজ্ঞবৃন্দ। ওঁরা পারস্পরিক আলোচনা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কীভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলী আরও বলিষ্ঠভাবে পরিবেশন করা যায় সে নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। আশা করা যায়, এ ধরনের উদ্যোগে সর্বসাধারণের সামনে পরি-বেশগত সমস্যাবলী উপস্থাপন করার কাজ সহজতর হবে।

সমরজিৎ কর

জিৎ

অমল আচার্য

ভোর ভোর আলসেমি অন্ধকারে কালোদীঘির কালো জলে ডুব মারল পুবপাড়ার ছকাই নাথ। ডুব মারায় মরা জলে ঢেউ খেলল। ঢেউয়ের চাকা বড় হতে হতে ছুঁয়ে নিল দীঘির চার পাড়। দীঘির জল আগের মত আবার মরে গেল। তার গহীন পেটে একটা বিশালদেহী মানুষ শ্বাস বন্ধ করে ডুবে আছে বোঝার জো থাকল না।

শুধু দক্ষিণপাড়ার পশু দুলের যুবতী মেয়ে কুমু জামরুল গাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কান্ডটা দেখে বসল। সেও এসেছিল কালোদীঘির জলে লুকিয়ে চান করতে। কিন্তু তার আগেই কালোদীঘির কালো জলে ছকাইয়ের ডুব।

ছকাইয়ের মুন্ডুটা কিছুক্ষণের মধ্যেই জলের ওপর ভুস করে ভেসে উঠল। তার সামান্য চাপা নাকের 'পর জল ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা। আবার ডুব মারছে, ঘাই মেরে ডুবে যাচ্ছে বরাবর। আবার উঠছে। এ রকম বহুক্ষণ করার পর ছকাই কোমরজলে দাঁড়িয়ে মুঠো করে দু'হাত চোখের সামনে তুলে ধরল। দুহাতের শিরা গোখরোর মতন ফুঁসে উঠল। গোখরোর বিষঠোঁটে ধাঁ করে চুমু খেয়ে ছকাই বলল : ইবার জিতবোই।

ছকাই চলে গেলে কুমু জলে নামল। বুক কাঁপছে ভয়ে। বিশাল দীঘির পাড় ছুঁয়ে, চাপ চাপ অন্ধকার ঘন রহস্য হয়ে তার দিকেই তাকিয়ে আছে যেন। সেই অন্ধকারে অশরীরী আত্মার দাঁড়িয়ে থাকাও বিচিত্র নয়। জলের গভীরে মারাত্মক ভয় আরো। কুমু তাড়াতাড়ি ডুব মারল।

ভেজা শরীরে উঠে এলো জল থেকে। পেছন ফিরে তাকাল। কালোদীঘির পান্নারঙ জল এরই মধ্যে জমে গেছে আশ্চর্য দ্রুততায়।

কুমু হাঁটছিল।

গাঁয়ের চোখে জলকাটা ঘুম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাঙবে। তার আগেই বাবার থান থেকে তাকে ফিরতে হবে বাড়ি। হাতে অনেক কাজ। সে তাড়াতাড়ি হাঁটছিল।

পাখির ডানা ঝাপটানি শুরু হয়ে গেছে বাসায়। বাতাসে ফুলের গন্ধ। থিরথির করে কাঁপছে গাছের পাতা। পথের ওপর সদ্য খসেপড়া কাঠচাঁপা, কলকে আর টগর। মানুষের পায়ের শব্দে ঘুম থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে কুকুর। দমকা হাওয়ায় বাঁশের ঝাড়ে ফটফট শব্দ হচ্ছে ভয়ংকর, আচমকা থেমে যাচ্ছে আবার। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না কুমুর।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। দরজা খুলতে দেরি অনেক। কুমু দরজায় মাথা রাখল। যেন জিত হয় ঠাকুর। কুমু মাথা ঠুকতে লাগল। ঠুকতে ঠুকতে তার কপাল ফুলে উঠল। কপালের চামড়া ফেটে রক্ত বেরুলো। কুমু বাবার কাছে জিত হওয়ার প্রার্থনা জানাল।

ঠিক তখনি দূর থেকে তার কানে ভেসে আসতে লাগল ডগরের একটানা ডুগডুগ শব্দ।

॥ ২ ॥

পথে ডগর নামল চড়া রোদ মাথায় নিয়ে। ডগরের শব্দ গাঁয়ের হৃৎপিন্ডে ঘা মারল। আজ পয়লা বোশেখ। বারুদ পুড়বে রাতভর, বাবার থানে বাবার বারুদ। গাঁটার বুকের ওপর মন্দির। প্রায় পাঁচশো বছর আগে এক সাধু প্রতিষ্ঠা করেছিল বাবার মূর্তি। একই সময়ে রামাই পন্ডিত গাঁয়ের মাটিতে পা দেয়। সে ছিল সিদ্ধাই। সেও প্রতিষ্ঠা করল বিষ্ণুমূর্তি। গোপেশ্বর আর বিষ্ণুর সেই থেকে একই মন্দিরে পাশাপাশি অবস্থান। মূল মন্দিরের বাইরে দোলমঞ্চ। তার সামনে বাজার। বাজারের তিনদিকে রাস্তা, যা চলে গেছে পুবপাড়া পশ্চিমপাড়া আর দক্ষিণপাড়া অব্দি। মধ্যিখানে মাঝেরপাড়া। এই চার পাড়া নিয়ে গ্রাম। গ্রামের বড় উৎসব বারুদ পোড়ানো। বারুদে আগুন পড়বে রাত সাড়ে এগারোটায়। চার পাড়ার মধ্যে চলবে তুবড়ির লড়াই সকাল পর্যন্ত।

বাড়িতে ঢোকামাত্র কুমু দেখতে পেল ঝমর বাগদী দাওয়ায় বসে হাঁই তুলছে। গত রাত্তিরে বদমেজাজী চোলাই খাওয়ার ঢুলুনি চোখে। চওড়া বুকের পাটায় কোপের দাগ, ছকাই বসিয়েছিল ধানকাটার মরসুমে গেল সন। জোতদারের লেঠেল ঝমর বাগদী, জাতব্যবসায় ক্ষেতমজুর। রাজার দোসর হাওয়ায় দেমাকি মেজাজ তার, যা-নাকি ছকাইয়ের কাছে অসহ্য। শুধু ছকাই কেন, অনেকের কাছেই। ধানকাটা মরসুমে জোতদারের নোটের গরমে ভাগ-চাষীর মাথায় লাঠি মারাই তার কাজ। গেল সন একচোট হয়ে গিয়েছিল ছকাইয়ের সংগে। ছকাইও গোঁয়ার গোবিন্দ। তার মাথার ওপর লাঠি তুলতেই হাতের ধারালো টাঙ্গি দিয়ে সে কোপ বসিয়েছিল ঝমরের বুকে, ঝমরের হাতের লাঠি খসে পড়েছিল তৎক্ষণাৎ।

তারও বছর চারেক আগ থেকে ঝমরের সংগে ছকাইয়ের বিরোধ।

কাকভোরে ভেজা জামাকাপড়ে কুমুকে দেখে ঝমর অবাক হল।

জিজ্ঞেস করল : এত সকাল সকাল চান করার কি ঠেকাটা পড়ল তোর ?

কুমু জবাব না দিয়ে শাড়ি নিঙড়লো। আঁচল দিয়ে চুল মুছল। ঝমর দাওয়ায় বসে থেকেই একটা পা উঠোনে নামিয়ে দিয়ে বলল : জবাব লাই কিনো মুখে ?

ঝমরের পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল কুমু। কুমুর শাড়ি টেনে ধরল ঝমর। ঝমরের মুখে নোংরা হাসি দেখে গাপিত্তি জ্বলে গেল তার।

কুমু বলল : কাজে হাত দাও। পরপর দু-সন তো চোরামি করি জিতিছ।

কুমু কি বোঝাতে চাইছে ঝমরের বুঝতে একটুও দেরি হয় না। তাই তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

বিশ্রী মুখভঙ্গি করে বলল : জলুনি ধরিছে বুঝি ?

—না ধরনের কি আছে ? শাড়ি বদলাতে বদলাতে ঘর থেকে বলল কুমু।

—তোর কামড় একদিন সিধা করি দিব। ঝমর তেড়ে গেল। কিন্তু কঠিন মুখে কুমুর চোখে আগুনের হলকানি দেখে তাকে সমঝাতে হয়।

কুমু ঘর-উঠোন ঝাঁট দিয়ে গোবরজল ছেটালো। ছোটো ঘরটা ভালো করে নিকোল। আর কিছুক্ষণ পর ঝমর ওই ঘরে ঢুকে ঝাঁপ বন্ধ করে দেবে। তুবড়ির ভাগ দেবে। দক্ষিণপাড়ার বড় ভাগীদার ঝমর। পরপর দু বছর বাজী মেরে আসছে। আগে ছিল পুবপাড়ার ছকাইনাথের বাহাদুরি। তার একমণি মশলার তুবড়ি সোনার পাহাড় হয়ে জ্বলতে থাকত। আকাশ থেকে মিহিদানার মত গুটি গুটি সোনার ফুল মুষলধারা বৃষ্টির আদলে ঝরত মাটিতে। আগুন লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই তুবড়ির মুখ দিয়ে সমুদ্র ডাক ছাড়ত। সেই ভীষণ শব্দে মনে হত, পৃথিবীর তলপেট থেকে যেন অবরুদ্ধ লাভাস্রোত লাফিয়ে উঠছে অসহ্য যন্ত্রণায়।

কিন্তু ঝমর ছকাইকে মেরে দিল।

গাঁয়ের লোক তো হতভম্ব! এই অবাক কান্ডকারখানার অনেক কারণও খুঁজে বার করল তারা। ছকাই কয়েক বছর চুল্লু খেয়ে সব সময় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। অত্যধিক নেশা করার দরুন তার স্মরণশক্তি ভোঁতা হয়ে গেছে নির্ঘাৎ, ভাগ মনে রাখতে পারছে না। কেউ বলে ডাইন মেয়েছেলেটাই ওর সর্বনাশ করল। কেউ বলে, ছিল নাথ সম্প্রদায়ের লোক, এখন রাধা প্রেমে বিভোর দিন নেই রাত নেই। এ রকম নানা কথা।

চুল্লুর বোতল গলায় উপুড় করে ধরল ছকাই।

মোষের মত অন্ধকার উঠে এলো বনজঙ্গল থেকে গাঁটার ওপর। আকাশ খালি তারা নেই। আকাশ জুড়ে মেঘের সর। যে-কোনো সময় লাফিয়ে পড়তে পারে ঝড়বৃষ্টি। ভ্যাপসা গুমোট চারদিক। কামরাঙা গাছতলায় জঙ্গলে ঝিঁঝিঁর ডাক। ছকাই আমগাছতলা মাচার ওপর বসল। গাছে মুকুল ধরেছিল খুব। সব ঝরে গেছে, দু-একটা ফল হয়েছে মাত্র। কচুপাতায় নিমফুল, নিমফুল খসে পড়ছে টুপটাপ। শুকনো আমপাতায় কোনো সাবধানী খাটাসের পায়ের ছাপ, মনে হল ছকাইয়ের। হাতের কাছেই বল্লম, এক ঝোপে সাবাড় করে দেবে জন্তুটা। বিদ্যুৎগতিতে তার হাতের মুঠোয় বল্লম শান-শান করে ওঠামাত্র গাঢ় অন্ধকার থেকে, আমগাছের আড়াল থেকে আঁৎকে ওঠা কুমু খসখসে গলায় বলল : হাতের অস্তরটা নামাও।

ছকাইয়ের চোখে টুলু বাউরির চুল্লুর রঙ। পাকস্থলীতে বিজবিজ করছে কারবাইডের বিষ, বিষ থেকে উপচানো গ্যাস মস্তিষ্কে চালান হওয়ায় ঝিমঝিম করছে মাথা, মাথা থেকে তরল বিষ স্নায়ুর চোরা গলি-ঘুপচিতে পাক খাচ্ছে, সেই পাকে ছকাইয়ের বিশাল শরীর ঝড়ে তালগাছের মত দুলায়মান, এমন অবস্থায় তার প্রায় মুখোমুখি কুমু। কুমুর আগদ আর রূপোর প্লাবণ। যে কুমু তার হৃৎপিন্ডে কাঁটা হয়ে বিঁধে রয়েছে সারাক্ষণ।

—তু ইখানে কি চাস ?

ঠমকে ঠমকে তার সামনে এসে দাঁড়ায় কুমু।

—বল কি চাস ? চাপা গলায় জানতে চায় ছকাই।

—তোমারে চাই, দিবা ?

কুমু বলে শেষ করে উঠতে পারে না, ঠাস করে গালে প্রচন্ড চড় কষায় ছকাই।

কুমুর গাল ঝাঁঝাঁ করে ওঠে, মাথা ঘুরে যায়।

—বেইমান। ছকাই ফুঁসতে থাকে।

কুমুর চোখ ফেটে জল গড়ায়।

বলে : আমি তুমাকে ঠকাতি চাইনি।

—উ-সব ধানাইপানাই পিচ্ছাপ করি দেয় ছকাইনাথ।

কুমু ছকাইয়ের হাত ধরার চেষ্টা করে। সরে যায় ছকাই। মাটিতে একরাশ থুথু ফেলে বলে : তোর শরীল ছুঁলি ঘিন্না হয়। তুই চলি যা।

ধকধক করে উঠল কুমুর চোখ। তার ভেতরে কালনাগিণী ফণা তুলল। গাঁয়ের মরদরা আমার জন্যি হন্দ। এটু হাসি দিলি গলি যায়। আমার শরীলের বাতাস লাগানির জন্যি দোড়ঝাঁপ কত। আর ছকায়ের এত গুমর ? ঘিন্না করে ? তাড়ায়ে দেয় ? জোতদার বাদলারাতে ঝমরকে দিয়া আমারে চুরি করাল। বাপ পশু দুলে আর পুবপাড়ার তুমরা বাঁধ তুলি জমি আগলাইছিল সারা রাত। ইদিকে আমার সব্বোনাশ হয়ি গেল। কথাটা যাতে ঝমর চাউর করি না দেয়, তাই ঝমরের সাথ আমার বিয়া করাল। একে জোতদার, তার আবার পাঁচ কুড়ি টেকা। বাপ হেলেদুলে একশা। আমার দোষ কি তয় ? কিন্তুক আমারে কেউ ঘিন্না করলি তারে আমি ছাড়ি লাই।....

এ ঘটনার পর থেকেই ঝমর বাজি জিতে আসছে পর পর দু বছর। ছকাইয়ের প্রথম হার হলে কুমু চুল্লু খেয়ে গাঁ দাপিয়ে বেড়াল। হাঁস মারল চারটে। মাংস আর পচাই। ভারী নিতম্ব দুলিয়ে নাচল সারা রাত। সঙ্গে টপ্পা। এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঝমরের বুকে লুটিয়ে পড়ল। কামড়ে আঁচড়ে ঝমরের বুকের পাটাতন দাগড়া দাগড়া করে ছাড়ল। ঝমর হাড় চিবোতে চিবোতে নরম মাংসে বসিয়ে দিল তার ধারালো দাঁত, নোনতা মাংসের রস তার দাঁত গলে জিভের ওপর রক্তর স্বাদ ভাসিয়ে দিল।
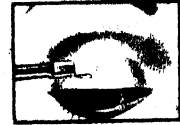
পরের বছর ছকাই আবার হারল।

শিশুর প্রথম শক্ত আহার যাতে রয়েছে সহজপাচ্য চালের সঙ্গে ১১ রকম পুষ্টিকর ভিটামিন ও লৌহ উপাদানের সুষম সমন্বয়!

নেস্টাম

বেবী সিরিয়েল
ক্রীম অফ রাইস

আপনার শিশুর প্রথম শক্ত আহার শুরু করার সময় তাকে এমন খাবার দিন যা হবে পুষ্টিগুণে ভরপুর অথচ শিশুর কোমল হজমশক্তির পক্ষে সহজপাচ্য খাবার। ডাক্তাররা সকলেই স্বীকার করেন যে শস্যের মধ্যে ভাত সবচেয়ে সহজে হজম হয়। সেই কারণেই আমরা শিশুদের জন্য নেস্টাম ক্রীম অফ রাইস তৈরী করেছি। এতে রয়েছে সঠিক সুষমমাত্রায় ভিটামিন ও লৌহ উপাদান যা বাচ্চার বাড়ের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আপনার বাচ্চার বাড়ের জন্য আপনি এটি তার ৩ মাস বয়েস থেকেই দিতে শুরু করতে পারেন। এবং বাচ্চা যত বড় হতে থাকবে, নেস্টাম ক্রীম অফ রাইস ফল, আনাজ, ডাল এবং শাকসব্জীর সঙ্গে মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়ান, যার ফলে বাচ্চা আনন্দের সঙ্গে নতুন নতুন স্বাদের খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। বাচ্চা বড় করার কি ভালো উপায়, তাই নয় কি?
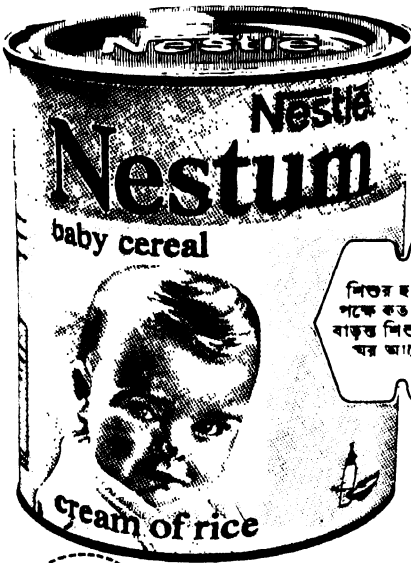
দুধের সঙ্গে মিশিয়ে এক পুরোপুরি সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর শিশু আহার বানান

ফোটানো দুধে ঢেলে নিন

দুধে নেস্টাম মিশিয়ে নিন

এবার খেতে দিন

NESTLÉ

কুমু সারাদিন দাওয়ায় বসে একজোড়া কিঙের খুনসুটি দেখে গেল চুপচাপ। বিকেলে ঝড় উঠল। কালোদীঘির জলে শরীর ডুবিয়ে জ্বালা জুড়োলো। তারপর বাড়ি ফিরে তুলসীতলায় প্রদীপ ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল বহুক্ষণ।

হেরো ছকাই প্রথম বছর চুক্তিতে বন্দ থেকে সারাদিন নিজের মনেই বলল: বিশ্বাসঘাতক, পাল্টিবাজ। আবার নিজেকে ধমকে বলল: বিশ্বাস হয় না। আমারি ভুল। মিছে সন্দ।

পরের বছর সে জোরে ঘুড়ি ওড়াল আকাশে। সুতো বেঁধে রাখল আমগাছের ডালে।

সারা রাত ঘুড়ি উড়ল। গ্রামটার মাথার বহু শূন্যে জোরে ঘুড়ির বাঁশি হাওয়ায় হাওয়ায় বেজে চলল। আমগাছের নীচে মাচায় শুয়ে বিনিদ্র ছকাই কান খাড়া করে শুনল সেই বাঁশি। বাঁশির সুর তার অন্তর্লীন গোপনে তোলপাড় করে চলল আহত অভিমান।

॥ ৩ ॥

ঝমর জিজ্ঞেস করল: তোর কপালে অস্ত কিনো?

—অস্ত? চমকাল কুমু।

ঝমর সন্দিগ্ধ হয়। কিছুদিন ধরিই দেখতিছি তোর মন উচাটা।

কুমু কথা বলে না। মাঝেমধ্যে ঝমরের সঙ্গে তার একদম কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। লোকটা টইটই করে বেড়ায় সমস্ত দিন, শেয়ালের মত ছোঁক ছোঁক। সন্ধ্যেয় পচাই গিলে মধ্য রাতে বাড়ি। বাড়ি ফিরেই হামলে পড়ে কুমুর শরীরের ওপর। কুমু বাপকে শাপশাপান্ত করে তখন, জোতদারের মরণ কামনা করে, ঝমরের হাত থেকে রেহাই চায়। আর উদাসীন ছকাইয়ের চুলের মুঠি ধরে পাথরে মাথা ঠুকে দিতে প্রবল ইচ্ছে করে।

চান সেরে এলো ঝমর। নেংটি ছাড়তে ছাড়তে বলল সে: সবাই বলতিছে ছকাই ভাগ বদলাইছে ইবার। ওতয়ালে তো গিছি।

—নিজের মুরোদ লাই? খোঁচা মারে কুমু।

ঝমর হাসে। কোনো কাজ হাসিল করার আগে ও এভাবেই হাসে।

বলল: তু যা না ছকাই নাথের বাড়ি?

—কিনো?

—উর কাছ থিকে ভাগটা লিয়ে আয়।

—উ আমারে দিবে কিনো?

—আগে দিছিলো তো?

—উ তখন আমারে পীরিত করত।

—অখনো করে। উ তোকে ভুলতি পারে লাই।

—মিছে কথা। কুমু মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—যায়েই দিখ্। ঝমরের চোখের তারা শয়তানের মত হাসে।

—উ মাগনা দিবে কিনো?

—যদি চায়, দিবি! ঝমর ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে আলবোট কাটে।

—কি দিব? কুমুর মুখ কঠিন হয়।

—উই যে বললি, যদি চায়! হি হি করে হাসে ঝমর।

কুমু ফুঁসে ওঠে শঙ্খচূড় সাপের হিংস্রতায়।

বলে: টেকার লোভে জোতদারের ঘরে মাগকে পাঠাতি চাও, আর ভাগের মাশায় ছকাইয়ের ঘরে। তোর মরণ লাই?

ঝমর মাচার তল থেকে চুল্লুর বোতল বার করে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। লবুতলা বেজি ইতিউতি চোখ মারছে। বুড়ো তেঁতুলগাছের মগডালে নিঝুম চিল। খটখট করছে উঠোন। মানকচুর পাতায় হলদে ছোপ। একচালা রান্নাঘরে নিগনে উনুনে ফুটন্ত ভাত। ফাটো ফাটো রোদ্দুরের তাপে লকলক করছে কুমু।

ঝমর চুল্লু চড়ায়।

কুমুকে উদ্দেশ করে বলে: তুই ছকাইয়ের ভাগ আনি আসবি লাই?

—উর ভাগ আনেই তো দুইসন জিতিছ।

—ইবারো জিতবো।

—জিতব লাই।

—কিনো?

—উর ভাগ আনতি যাব লাই।

ঝমর হেঁচকি তুলে নেমে এলো উঠোনে। দাঁড়াল কুমুর সামনে।

—কিনো?

—আমার খুশ।

কুমুর চোখে নিজের চোখ বেশিক্ষণ রাখতে পারল না ঝমর। চোখ সরিয়ে নিয়ে হুট ঘরের দিকে এগোতে লাগল। যেতে যেতে হাসল প্রচণ্ড। হাসি থামিয়ে বলল: তার কপালে অস্ত কিনো রে, কুমু? তোর অস্ত দেখলি আমার কষ্ট লাগে।

ছোটঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

কুমু বৈশাখী সূর্যের নিচে ছায়াকাঠি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ৪ ॥

ঝকঝকে রোদ্দুরে মিশেছে গাছের ছায়া। পাড়ায় পাড়ায় ডগর নেমেছে। ডগর বাজিয়ে দল দল লোক টহল দিয়ে ফিরছে গাঁ। ছড়া কাটছে। হুল্লোড় করে চাচ্ছে। বাতাসে চোলাই-এর গন্ধ, বারুদের গন্ধ। বাজার থানে শুরু হয়েছে তোড়জোড়। বাজারের তেকোণা সীমানা জুড়ে সাজো সাজো রব।

মাঝের পাড়ার গাঙ্গুলী বসে আছেন গাছের ছায়ায়। সামনে খেজুরপাতার চাটাই। চাটাইয়ের ওপর সোরা গন্ধক ইস্পাতগুঁড়ো আকন্দগাছের কাঠকয়লা মিশেল গুঁড়ো মশলা বিছানো। রোদ্দুর খাচ্ছে। কিছুটা দূরে আধমণী, দশসেরী মাটির খোল গোটা দশেক। খোলগুলোর আদল ডুগি বা ঢাকের মত। খোলের চারপাশে কাঁচা বাঁশের বাকারি খেজুরপাতার দড়ি দিয়ে কষে বাঁধা। গাঙ্গুলীকে ঘিরে মাঝের পাড়ার মানুষ। গাঙ্গুলীবংশ কয়েক যুগ ধরে মাঝেরপাড়ার ভাগীদার।

তিনি বলছিলেন: তোরা এখন আর কি দেখছিস। আমাদের ঠাকুরদাদের সময়ে দেড়মণি, দুমণি, মশলার তুবড়ি পুড়ত। সে দিনকাল নেই। মানুষের রুচি আর ক্ষমতা দুই-ই বদলেছে। জিনিসপত্রের দামও চড়া। সোরা, ইস্পাত আট টাকা কেজি। গন্ধক সাত। আধমণি একটা খোলের দাম চার টাকা থেকে পনেরো টাকা। এখন যা হয় তা প্রথা রক্ষে।

একজন জিজ্ঞেস করল: ইবার কি বানাইলেন কত্তা?

গাঙ্গুলী হাসলেন: ঝাড় হবে কাঁচা সোনারঙ। ফুল হবে জিহিদানার গুটি।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন: অন্য পাড়ার কি খবর শুনলি?

বলল লোকটা: ছকাই খেপি গিছে।

গাঙ্গুলী গম্ভীর হয়ে বললেন: হুঁ। আমিও তাই শুনেছি।

পশ্চিম পাড়ার নেমক দুলে ঢুলছিল নেশায়। বারুদ তার এক চোখ খুবলে নিয়েছে গত বছর। তার গা বাঁচিয়ে দূরে স্যাঙাতের দল। সবে ভাগ দিয়েছে। ভাগ দেবার আগ পর্যন্ত ভাগীদাররা পবিত্র পুরুষ। নেমকের মশলা শুকোচ্ছে, পাহারা দিচ্ছে একদল। আরেক মাত্রা চড়িয়ে বলল নেমক: ইবার দেখিয়ে দিব পুবপাড়া, দক্ষিণপাড়াকে। তুবড়ির ঝাড় হবি গলায়ুপো, ফুল হবি নিমফুল।

নেমক দুলের বড় সাকরেদ জানাল: সর্দার, ছকাই ইবার ঝমরের পাঞ্জা ছেঁদা করি দিবে, জোর গুলতানি।

নেমক আরেক ঢোক গিলে বলল: ঝমর শালার হার হওয়া উচিত। উ শালাকে আমিই কাত করি দিব ইবার।

পশ্চিমপাড়ার লোকেরা ডগরের চামড়ায় কাঠি মেরে চেঁচিয়ে উঠল: জয় বাবা গোপেশ্বর........

দক্ষিণ পাড়ার ঝমর বাগদীর বাড়ির উঠোন লোকে গমগম। ঝমর নেশায় টং। পাড়ার লোকরাও।

—মশলা তুখোড় হয়েছে। ঝমর জানাল।

ঝমরের চোখ করমচা রঙ।

—শালা! জড়িয়ে জড়িয়ে বলল সে: ঝাড় হবি রজনীগন্ধার ডাঁটির মত নীলপদ্ম সবুজ, ফুল হবি ময়নার ঠোঁটের মত হলুদ।

ঝমর ঢোক গিলল। ছকাই তার তুবড়ির খেলায় এই কাজ দেখাত। এখন ঝমর দেখায়। ঝমরের হাতে ছকাইয়ের কাজ দেখে গাঁসুদ্ধ লোক প্রথম বছর

মুখ চাওয়াচায়ি করেছিল। ঝমরের সে কি লজ্জা! ছকাই দূরে দাঁড়িয়ে ফুক ফুক করে বিড়ি টানত। আর হাসত। তার হাসিতে বিদ্রূপ খেলত। ঝমরকে বলত : বেড়ে বানাইচিস মাইরি!

কুমুকে দেখে বলত : বাগদী বউয়ের হাতযশ আছে দেখতিছি।

কুমুর চোখে অভিসন্ধি ঝিলিক মারত।

বলত : কাপুরুষ।

—বেইমান! পাল্টা আক্রমণ করত ছকাই।

—ভয় পায়। টুকরো করে বলে কুমু।

—চোরা! কথা পৃষ্ঠে কথা বসিয়ে দেয় ছকাই।

দুঃখে কুমুর চোখে জল আসে। লোকটা আজ পর্যন্ত জানতে চাইল না কেন এমন হল? বলতে গেলেও শুনতে চায় না। তাচ্ছিল্য করে। কুমু তাচ্ছিল্য সহ্য করতে পারছে না আর। এবার সে ছকাইয়ের গুমোর গুঁড়ো করে দেবে, ছকাইয়ের অহংকার দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, ছকাইয়ের উপেক্ষা পায়ের তলায় থেঁতলে যাবে। ছকায়ের সামগ্রিক অস্তিত্বেও আগুন ধরিয়ে দেবে। ছকাই পুড়বে, পুড়ে পুড়ে ছাই হবে।

—বেইমানী করিছি, বেশ করিছি। কালনাগিনী ফণা ধরে।

—দালালের বউ দালাল। ছকাই ছাড়ে না।

—সোয়ামির দালাল হব লয় তো তুমার হব? সুনার চাঁদ আমার! কুথায় ছিলে সেই ঝড়জলের আন্ধারে? হিম্মত হয় লাই পশু দুলের মেয়েটারে নিজের ঘরে তুলি নিতে? মরদ! থু!

—তু তো ঠুকরানো মাল। কদিন পরেই পচায়ে যাবি। ছকাই কুমুকে দংশাতে চায়।

বুক ভেঙে যায় কুমুর। সেখান থেকে ছুটে পালায়। বাড়ি ফিরে দেখে ঝমর দাওয়ায় বসে আছে একা। বড় নিঃসঙ্গ। হু-হু করে ওঠে ভেতরটা। ঝমরের বুকের কাটা দাগে আলতো করে নাক ঘষে বলে : ইখানে ব্যথা আছে অখনো?

দক্ষিণ পাড়ার লোকেরা মনমরা হয়ে বসে ছিল এতক্ষণ। ঝমরের কথায় জোস পায়। ছকাই নাকি এবার রামাই সিন্ধাইয়ের ভোজবাজি দেখাবে। রক্তের ফোয়ারা ছোটাবে আকাশে। আকাশ ছোঁবে তুবড়ির ফুল। ফুল পলাশ হয়ে ঝরে পড়বে মাটিতে।

তাদের মধ্যে একজনকে কাছে ডেকে কানে কানে বলল ঝমর : কাজটা হইছে তো?

সে উত্তর দিল : হ্যাঁ। ছকাই যাওয়ার আগেই জোতদার লোক পাঠাইছিল। ফাঁস হয় লাই তো?

—উঁহু। জোতদারের ভয়, যাবি কুথায়? তা ছাড়া অত টেকা? এক বছরের পয়সা মফতে কামায়ে নিছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ঝমর। সে নিশ্চিন্ত।

—জয় বাবা গোপেশ্বর, তুমার কিরে লাগে, ইবারটা সামাল দিয়ে দাও বাবা। লোকে বলে বার বার তিনবার। জয় বাবা গোপেশ্বর—। ঝমর নেশার ধুমকিতে নাচ আরম্ভ করল। দেখাদেখি অন্য সকলে। ডগর বাজতে লাগল। অন্ধকারে বাবার চেলাচামুণ্ডারা ভূতনৃত্য নেচে চলল।

পুবপাড়ার লোকজন ছকাইকে আগে থেকেই ধরে বসেছে। তুই মাইরি আমাদের মান বাঁচা। ঝমরের বুকে যেমন টাঙির কোপ বসাইছিলি, ইবার উর মাথায় ডাণ্ডাস মার। যত পয়সা লাগে দিব। আলুর চাষ ভালো হইছে, কারেণ্টো ফেল মারায় হিমঘর মরা বটেক, তবু ঘটিবাটি বেচে পয়সা ফেলাব। বাবুদের কাছ থিকে চাঁদা তুলিছি। তিনাদেরও এক কথা, ছকাইকে ইবার ভালো করে মশলা ঠসতে বল্, মজবুত খোল কিনতে ক। ঝমর বাগদীর হেক্কার ঠাণ্ডা করি দে। তোর খেমতা আছে। হাত লাগা দিকিন। আর ওই কুমুডারে, কি আর কই ক—রূপখান যেন্ গুলাপ, দিনিরাতি উয়ার পিছনে ফেউ, উডারে বাতাস লাগাতি দিস না কয়ডা দিন। মাগীটার ছিনালি মরদদের তলপেটে টাটানি ধরায়।

ছকাই রুখে ওঠে। কুমুর সম্পর্কে কেউ মন্তব্য করলে তার মাথায় খুন চেপে যায়।

অসুর খেপিছে। ষাড়ের মত শিঙ নিচু করে ছুটে আসবি অখনি। ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল সেদিন। শেষ পর্যন্ত ছকাই মনস্থির করেছে সে ভাগ দেবে। এবং বাজি জিতবে।

খোলের চারপাশে কাঁচা বাঁশের বাকারি বাঁধছিল ছকাইয়ের সাকরেদ। ছকাই টোকা মেরে পরখ করল আধমনী খোলের আওয়াজ। কি ভেবে খোলের কাছে কান নিয়ে গিয়ে আবার টোকা মারল।

সাকরেদ বলল : হরিকুমোর ভালো মাল দিছে ইবার।

ছকাই কিছু না বলে হাসল একটু। তারপর গলায় চুল্লু ঢালল।

পুবপাড়ার দল মুখে হাতের চেটো দিয়ে অবো অবো অবো শব্দ তুলে চেঁচিয়ে উঠল :

> তেরশ ছিয়াশি সাল পুবপাড়া করবি কামাল।
> পুবপাড়া, দেখাবি ঝাড় ঝমর বাগদি চিৎপটাং।

আরেকজন ছড়া কেটে উঠল :

> দক্ষিণপাড়া পশ্চিমপাড়া তুরা যারে মাঝেরপাড়া।
> ঠকুদাদা গাপ্পুলীদাদা বসি আছে ফোকলা হাঁ।

অন্যজন লাফিয়ে উঠে বলল :

> বন্ধ্যার ছেলে বাপ বলে না বাপ বলাব ইবার
> পশ্চিমপাড়া দক্ষিণপাড়া দেখবি কিমন কহার।

তাদের থামাল ছকাই। ঘণ্টাখানিকের মদ্যি তুরা তৈরি হই আর। আমার বাড়ি জমা হবি। ইখান থিকে একসাথ যাব।

ওরা চলে গেলে ছকাই আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে পাতলা জোছনা। আমগাছের পাতায় বাতাসের শব্দ। ছকাই অন্যমনস্কভাবে আড় বাঁশিটা তুলে নিয়ে সুর তুলল। সুর ধরল না। এমন সময় কুমু একপা একপা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। কুমু সেজেছে বেশ। লাল হলুদ ডুরে শাড়ি তার শরীরে দাঁত বসিয়ে আছে। চুড়োর মত খোঁপায় বেলফুলের মালা। কপালে লাল টিপ। ছোটো জামার ফাঁসে বুক আঁটাইটাই। দু হাতে কাচের লাল চুড়ি। চোখে গভীরটান কাজল।

কুমুর আগুনে রূপ দেখে ছকাইয়ের বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল।

কুমু হিসেবী চতুর। সে ছকাইয়ের মধ্যে লোভ জাগাতেই চায়।

বলল : তুমার ঠাঁই এট্টু বসতি পারি?

—বস।

কুমু বসল। ছকাইয়ের চোখের দিকে চোখ রেখে হাসল।

—তুমার বুকে এট্টু মাথা রাখতি দিবা? কতকাল রাখি না!

ছকাই পাথর। নিরেট পাথরের তলায় হৃৎপিণ্ড দাপাচ্ছিল কাটা পশু যেমন দাপায়।

কুমু বুকে মাথা রাখল। ছকাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরল দু হাতে।

—এট্টা চুমু দিবা?

ছকাইয়ের মাথাটা ঝুঁকে আসে। হঠাৎ কি ভেবে তুলে নেয় মুখ। মনে সন্দেহ ঘনায়। কুমুকে আগে সন্দেহ করত না, আজকাল করে। কুমুর উষ্ণ হাত ছাড়িয়ে নিজেকে মুক্ত করে ছকাই। দাওয়া থেকে নেমে উঠোনে দাঁড়ায়। টাল খেয়ে পড়তে গিয়ে সামলে নেয় নিজেকে। কুমুর দিকে পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করে : তুই আসিস কিনো?

—কষ্ট হয়।

—তোর তো মরদ আছে?

—আমি মরদের আছি, আমার মরদ তুমি।

—ছিলাম।

—অখনো।

—আসিস লাই আর। তু কাছে আসলি আমার শরীলে বল থাকে না।

—আমারে চাও না?

ছকাই চুপ।

—বল, চাও না?

—না।

—কিনো?

—তুই আমার লয় আর।

কুমু চুপ।

—তুই যা কুমু।

কুমু খানিকক্ষণ চুপ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—এট্টা কথা।

—কি? ছকাই কুমুর মুখোমুখি হয়।

—বাবার থানে সাবধান।

—কিনো?

—ঝমর ঘোট পাকাইছে।

ছকাই হাউ হাউ করে হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে দেখে কুমু নেই।

॥ ৫ ॥

বাবার থানে তিলধারণের জায়গা নেই। প্রায় গাঁ উজাড় হাজার দেড়েক লোক। দাঁড়িয়ে, বসে, ঠেসান দিয়ে। রাস্তার মুখে পশ্চিমপাড়া পুবপাড়ার অপেক্ষমান খেলোয়াড়েরর দল। দক্ষিণপাড়ার রাস্তার মাথায় দক্ষিণপাড়া মাঝের পাড়ার প্রস্তুত বাহিনী।

মন্দিরের প্রধান ফটকের কাছে ঘণ্টা। পাশে রবি গোসাঁই। আজ রাত্রের প্রভু। তিনিই চালাবেন বারুদ উৎসব। তাঁর রায়ই চূড়ান্ত। এ সম্মান বরাবর গোঁসাই পরিবারের প্রাপ্য। গাঁয়ের প্রচলিত ধর্মীয় রীতি।

রবি গোঁসাইয়ের ডান হাতে ঘণ্টাপেটাই হাতুড়ি, বাঁ হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছেন। সাড়ে এগারোটা বাজলেই ঘণ্টা পেটাবেন। মাঝেরপাড়া আসরে নামবে প্রথম। তারপর পশ্চিমপাড়া, দক্ষিণপাড়া। সবশেষে পুবপাড়া। প্রত্যেক পাড়াকে বাজি পোড়ানোর সময় ভাগ করে দেয়া আছে আগে থেকেই। ওই সময়ের মধ্যে দেখাতে হবে যা কিছু। সময় হয়ে গেলে আবার ঘণ্টা বাজবে। একদল চলে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ঢুকবে অন্য দল। এরকম পর পর।

চারিদিক উসখুসে মানুষ, আর মানুষ। বাবার থান অন্ধকার, বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছে সবরকম। না হলে তুবড়ির রঙ খুলবে না। আকাশে টুকরো চাঁদ মায়াময় নীরবতার দর্শক। সেই আলোআঁধারিতে হাজার হাজার অস্থির মুখ।

ঘণ্টা বেজে উঠল।

খাঁচা থেকে হঠাৎ ছাড়া পাওয়া একদল বাঘ মুহূর্তে ছুটে এলো আসরে। ঢুকতেই কালীর থান। ওখানে প্রথমে ছোটখাটো একটা তুবড়ি জ্বালিয়ে উৎসর্গ করা হল ভোগ। আরেকটা মন্দিরের ভেতর বাবার সামনে। তারপর বড়োরা ছুটে

গেল দোলমঞ্চের সম্মুখভাগ। বসল দশসেরী তুবড়ি। এদিকে ডগর বাজছে, সংগে কাঁসি—যুদ্ধের ঘোরতর বাজনা। লোক গৌরাংগ ঢঙে নাচছে তালে তাল ঠুকে। আর ছড়া কাটছে দু' লাইন তিন লাইন। আঞ্চলিক ছড়া। তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে উঠে এসেছে যা। অজস্র ছড়া আর নাচ। মদে টং সকলে। বাপ ছেলে, বন্ধু ভাই বাছবিচার নেই। আজ আদিমতার দিন।

তুবড়ি জ্বলে উঠল। যেন পৃথিবীর বুক চিরে গলাসোনার অগ্ন্যুৎপাত ঘটছে। কোটি কোটি মিহিদানা ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। মন্দিরের চূড়ো ছাপিয়ে উঠল সেই ঝাড়। একটার পর একটা। আধমনী বসল। সোনার পাহাড় জ্বলতে লাগল দাউ দাউ। মাঝেরপাড়া হল্লা করে উঠল : জয় বাবার জয়। জয় গাংগুলী খুড়োর জয়! ঘণ্টা বাজল।

আসর থেকে মাঝেরপাড়া চলে যেতেই এলো পশ্চিমপাড়া। শুরু হল তাদের কালোয়াতি। তুবড়ির মুখ পোড়ালো নেমক দুলে। দেখতে দেখতে তুবড়ির মুখ দিয়ে গলা রুপো হু-হু উঠতে লাগল ওপরে, আরো ওপরে, তার ভেতর থেকে ছড়াতে লাগল নিমফুল, প্রবল ঘূর্ণিতে নিমফুল আছড়াতে থাকল মাটিতে।

অবো. অবো. অবো. অবো....। নৈশফাটানো চিৎকারে বাসুকির চাঁদিতে স্থিত পৃথিবী যেন টলে উঠল।

সময় শেষ।

ঢুকল দক্ষিণপাড়া। ডগর বাজছে, কাঁসি বাজছে, তালে তালে পা ফেলছে ঝমর, ঝমরের পিছু পিছু দক্ষিণপপাড়া। কুমু ঝমরের পাশে না থেকে সবার শেষে এবং দল থেকে ছিটকে গিয়ে দোলমঞ্চর কাছাকাছি ভিড়ের মধ্যে ডুবে থাকল।

ঝমর ঝরুদে আগুন দিল। তুবড়ি জ্বলে উঠল। হিসহিস করে আগুনের নীলচে সবুজ অজস্র জিভ লকলকিয়ে উঠতে লাগল। প্রথমে দোলমঞ্চ, তারপর মন্দির, মন্দিরের চূড়ো নস্যাৎ করে শূন্যে উঁচুতে উঠে গেল ঝড়ের গতিতে। ময়নার ঠোঁটের মত হলুদ ফুল ঝরতে লাগল অনর্গল।

বল ভাই গোপেশ্বর নাথ, শিবো শিবো। ঝমর বাগদী যুগ যুগ জিও। দক্ষিণপাড়া চিৎকারে আকাশ ফাটাল।

কুমু লজ্জায় ক্ষোভে মাথা নিচু করল। দাঁতের ফাঁকে শাড়ির আঁচল ছিঁড়তে লাগল ক্রোধে। তার দু চোখ জ্বলতে থাকল।

আর ঠোঁটে চাপা হাসি খেলিয়ে চুল্লুতে শেষ চুমুক দিল ছকাই।

গোঁসাই ঘণ্টা পিটিয়ে দিলেন।

দর্শকরা নড়েচড়ে বসল বা দাঁড়াল। পুবপাড়া আসছে। ঢুকছে ছকাই নাথ। ডগরে বোল উঠছে ডুগ ডুগ। ছকাইয়ের বিশাল দেহ সিংহের ক্ষিপ্রতায় জায়গা দখল করছে। তার চওড়া কাঁধে রুক্ষ চুল, যেন সিংহকেশর। খালি গা। বুকের পাটায় মা কালীর লকেট। পায়ের কাবে মাংসের ডেলা তালে তালে উঠছে নামছে। নেশায় চুর পাহাড় টলছে। চোখে অংগার। ছকাই নাথ তেরশ' ছিয়াশি সালে বাবার থানে পরাক্রমে পা রাখছে।

পেছনে পুবপাড়া।

হাজার হাজার চোখ ছকাইকে মাপছে। তীব্র উত্তেজনায় তাদের শ্বাস রুদ্ধ। ঝমরের নেশা ছুটে গেছে আতঙ্কে। এ কোন্ ছকাই?

ভিড়ের মধ্যে কুমু ছকাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ। তার সর্বাংগে জোয়ার খেলছে ছলাৎ ছলাৎ। তুবড়ির মুখে আগুন গাঁথল ছকাই।

প্রবল কালবৈশাখী মাটি দু ফাঁক করে সশব্দে ওপরে উঠতে লাগল ঝড়ের মত। দেখতে দেখতে প্রায় আড়াইশো ফুট। এবার ঝাড়ের স্তম্ভ। পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড ফুসফুস নিঙড়ে লাল টকটকে তাজা রক্ত হাজারটা হোসপাইপের গলা চিরে ভিসুভিয়াসের প্রচণ্ড লাভাস্রোতের মত উৎক্ষিপ্ত হতে থাকল মহাশূন্যে। মহাশূন্য থেকে সেই তরল রক্ত অজস্র পলাশফুলের আকৃতি নিয়ে বিচ্যুত উল্কার মত ঝরতে লাগল নিচে অবিরাম। দর্শকদের রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল ভয়ে, আতংকে।

ঠাকুর মানত রাখছে। কুমুর চোখ চকচক করে উঠল। তার ইচ্ছে করছিল ওই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরে।

ঝমর ক্ষিপ্ত পশু। দু হাতে চুল ছিঁড়ে নিজের। শালা হরিকুমোর, তুমার জিভ আমি টানি বার করব। টেকা খাইছে, তবু মাটিতে বালি মেশাও লাই....।

অবো. অবো অবো অবো অবো........।

দেখি যারে সব পাড়া আর দেখি যা ঝমর বাগদী
ছকাই নাথের তুবড়ি বলে তোদের আমি মাথায় লাচি।
অবো, অবো, অবো.....অবো....

তুমুল শব্দে প্রকাণ্ড একটা আগুনের পিণ্ড ঝলসে উঠল তখনি।

—গেল, গেল। লোক ছুটে যায়।

বিস্ফারণে ছকাইয়ের একটা হাত উড়ে গেছে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ছকাই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তপ্ত মাটি। গ্রামবাসী ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ়।

রিকশায় তোলা হয়েছে অর্ধচৈতনা ছকাইকে। তার শরীর থেকে খসে পড়েছে ডান হাত। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। অস্থির বিবর্ণ কুমু ছকাইয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে আছে, মৃত্যুর দিকে তার পিঠের দেয়াল। ছকাই দেখছে কুমুকে। ইবারও তুকে জিতাই দিলাম। কিন্তুক আর লয়। নিয়তিতুল্য বাঁ হাতটার উত্থান ঘটিয়ে কুমুকে বলল ছকাই : ইটা ঠিক আছে। দেখে লিস।

কিন্তু কুমু বলতে পারল না, সে হারতেই চেয়েছিল।

ছবি : সুধীর মৈত্র

'মৃত্যু পরাহত'

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

একা, খুব একা অবিরল ভ্রাম্যমাণ!
পথের ফেনিল ক্লান্তি, উদগ্র অস্থিরতা ধাবমান মানুষের পায়ে
নিঃসৃত কষ্টের মত লেগে আছে।
ব্যথার গভীরে লব্ধ সে বেদনা তবু মানুষের কাছে
চিরন্তন, অমৃতরূপিণী।
কেননা স্থবির মৃত্যুর চেয়ে জীবন মহান্—
যেন শেষ বিকেলের দিগন্ত আপ্লুত লাল সন্ধ্যা,
যেন মসৃণ-ঢেউ-তোলা রাত্রির নরম হলুদ বাঁকা চাঁদ।

এরই জন্যে মানুষের একটানা সচ্ছল প্রার্থনা, উজ্জ্বল
পরমায়ুর জন্যে কী জ্বলন্ত প্রয়াস!
নদীর ওপরে ঝুঁকে-থাকা অলস আকাশ চকিতে সৌন্দর্য আনে
বিষণ্ণ মানুষের চোখে.
একখানা জলভাঙা মেঘ আর হাওয়ায় ফুলের গন্ধ—
তার আশ্চর্য আভাসে মানুষেরা ঠিকঠাক প্রণয়িনী নির্বাচন করে:
সোনালী চোখের রঙে প্রতিদিন মৃত্যুহীন অমল প্রাসাদ গড়ে,
গান গায়—
মানুষের এইসব স্বপ্নাতুর ঐশ্বর্যের পাশে—মৃত্যুর দীপ্র এসে
তুচ্ছ ছোঁয়ে যায়!

এই যে নক্ষত্রমালা

অনিরুদ্ধ কর

এই যে নক্ষত্রমালা ভুলে গেছ ফেলে
তাকে আমি ভুলেও দেখি না।

তুমি কি প্রেমিকা, নাকি তুমিই সাক্ষাৎ প্রেম ছিলে
তাই নিয়ে ভেতরে ভেতরে বড়ো কথা কাটাকাটি
হয়, দেখি। হোক—
আমি আর কী করতে বা
পারি?

সেই পাহাড়েও তোমাকে দেখি নি, তাই না?
অথচ সেখানে সেই চিহ্নগুলি ছিল
যা দেখে সবাই বোঝে—তুমি সেইমাত্র
চলে গেছে। আর—
সমুদ্রের কথা আজ প্রত্যেকেই জানে—
সাবানের সুগন্ধ-জড়ানো তোমার গায়ের ফেনা,
সমুদ্র-তরঙ্গ তার মাথার মুকুটে নিয়ে
ছুটে আসে সৈকত-বিজয়ে।

এসব ঘটনা দেখে মনে হয়, হয়ত
আমার অনেক কিছু জেনে নেওয়া দরকার ছিল,
হয়ত অনেক কিছু বোঝা বাকী ছিল......!
কিন্তু, সব কাজ যদি আমি একা করতেই পারতাম
কেন তবে নিঃশব্দের দেশে ভেঙে পড়ে সব অবরোধ।

অবিশ্বাস

প্রদীপচন্দ্র বসু

আমি বিশ্বাস করি না পৃথিবীর সব শস্য
চুরি করে খেয়ে যায় ইঁদুরের পাল,
আমাকে বোঝানো হয় তবু, আমাকে তোমাকে।
ত্রাণশিবিরের তাঁবু ভরে যায়,
ফসলের শূন্য গোলা অন্ধকার
আরো খাঁ খাঁ করে, আরো ফাঁকা লাগে আকাশ বাতাস
হাহাকার ঢেকে ফেলে যা কিছু সুন্দর—এইসব দৃশ্য দেখে মনে হয়
কোথাও চক্রান্ত আছে, নাহলে চাষীর গোলা
কেন শূন্য আজ! একই সঙ্গে
বৃষ্টি নেই, প্রকৃতিও চক্রান্তের শরিক হয়েছে—কার পাপে
কালো হয়ে গেছে মাটি, গাছপালা? কবে ফলবে ফসল?
দিন যায়, মাস যায়
আমি বিশ্বাস করি না এভাবে পৃথিবী চিরদিন বন্ধ্যা থেকে যাবে,
আমাকে বোঝানো হয় তবু, আমাকে তোমাকে
আর, ত্রাণশিবিরের তাঁবু ঘিরে তৈরী হয় উদ্ধত কাঁটাতারের বেড়া।

জন্মান্ধ

সুনীল ভট্টাচার্য

দেখামাত্র জন্মান্ধ হয়ে গেলাম
এতরূপ যে দু'চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।
আমি তাই চোখ বন্ধ করে সেই গান্ধার-নারীকে দেখি
দেখি তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য। তার চোখ মুখ নাক
তার গর্বিত গ্রীবা, বিষণ্ণ চিবুক, উত্তাল ওষ্ঠ
খরজিহ্বা, ত্বক

তার করুণ কুন্তল, নুন, অনুষ্টুপ স্তন।
আলোর উল্লাস থেকে আমি তাকে নিয়ে আসি
এক কিংবদন্তী গন্ধ-অন্ধকারে

হতকুচ্ছিত, স্তম্ভিত, গরল।
দেখি সেই অন্ধকারের অস্ত-সিংহাসন থেকে
ঠিকরে পড়ছে এক কোহিনুর
লুণ্ঠিত, রক্তশূন্য, রানী সুদর্শনা।

পুনশ্চ পারা

নীরদ মজুমদার

॥ সাঁইত্রিশ ॥

প্রথম প্রথম ব্যালে, অপেরা, অপেরাকমিক দেখে, শুনে, বেশ অসুবিধা হতো রস উপলব্ধি করতে। অথচ ঐ সব শৈল্পিক অভিব্যক্তিই নানারকম শৈল্পিক মাধ্যমের মিশ্রণে বেশ সমৃদ্ধ,—সংগীত, অভিনয়, নৃত্য, চিত্র, দৃশ্য সব মিলিয়েই তো ব্যালে আর অপেরা। অথচ নৃত্য উপলব্ধি করতে আমার অনেক সময় নিয়েছে। যদিচ রোদাঁর মূর্তি ও তার অঙ্গ-ভঙ্গী ও অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে, যদিচ দেগার, ব্যালেরিনাদের নিয়ে রচিত মূর্তি এবং চিত্র আমাকে সর্বদা আকর্ষণ করেছে, তবু এমন কী ও দেশীয় নাচের ভিতরে কোনদিন ভালভাবে প্রবেশ করতে পারিনি। অথচ এদিকে আমাদের দেশের মার্গ সংগীত শুনে ও উচ্চ ধ্রুপদী নৃত্য দেখে পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করেছি। কারণ, এসব কিছুতেই আমাদের ঐতিহ্যে পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী ধারার সংগম। অতএব স্থাপত্য মূর্তি চিত্র সংগীত নৃত্যের মূল নান্দনিক আবেদন আমাদের অন্তরে সরাসরি প্রবেশ করে।

তবে পারীতে একটা সুবিধা ছিল, মার্গারীটের মা—আমি যাকে মামি বলি—প্রায়, আমাদের অপেরা ব্যালে দেখাতে নিয়ে যেতেন। প্রায়শ অপেরার সব গান, সব নাটক ও সব ব্যালের রসাত্মক দিকের কথা আমাদের গেয়ে বোঝাতেন। গল্প করে বোঝাতেন। সারা মাস হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর, মাঝে মাঝে ব্যালে অপেরা দেখাই ছিল ওঁর বিলাস এবং আনন্দ। মহা মহা রথীদের উনি স্বচক্ষে নাচতে দেখেছেন, যেমন, নিজিনস্কি, আনা পাভলোভা, ইডা রুবিনস্টাইন, কর্সাভিনা, তা ছাড়া অলগা স্পেসিভা ও তামারা তুমানোভা। এদের কথা উঠলেই মামির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। আর সংগীতের কথায় ছিল প্রচুর উৎসাহ। সংগীত-রচয়িতা ইমানুয়েল দা ফায়া, রিমস্‌কি কর্সাকফ স্ট্রাভিনস্কি ইত্যাদির সংগীতানুষ্ঠানের সার্জ ডিয়াগিলভ-কৃত সব প্রযোজনাই দেখে মামি উচ্ছ্বসিত। এখনও ভুলতে পারেন নি রুশ ব্যালে। লে সিলফিডেস, শপ্যার সংগীতের সংগে লোয়াজো দা ফো এবং স্ট্রাভিনস্কির সংগীতের বিষয়ে ওঁর কথা ফুরাতে চায় না। আবার থিওফিল গোতিয়ের "স্পাঁক্তাসিও আলা ভাল্‌জ"এর কবিতায় পূর্ণ স্পেক্ত্র "দ্য লা রোজ ভেবর" যার সুরারোপ করেছিলেন স্বয়ং বেরলিওজ—তা না কি বারবার দেখেও আশা মেটে না। তা ছাড়া লাপ্রেমিদি দ্যা ফোন্‌ ক্লোদ দ্যবুসি রচিত সুরের কথায় মামি পঞ্চমুখ। এছাড়া তাঁর ভাল লেগেছিল জাঁ কোকতোর এবং মাদ্রাজোর এক অংকের ব্যালে, "ল দিও ব্লো" বা শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য-অভিনয়। সংগীত রেনাল্ডো হান্‌। সাঁতলে থিয়েটারে দেখেছেন পারীতে। দিনক্ষণও মামির মনে আছে। ১৩ মে ১৯১২ সালে। তখন মামি সদ্য যুবতী। নিজিনস্কির প্রশংসায় কি উচ্ছ্বাস মামির। ওঁর পুরাতন ছবির অ্যালবাম খুলে দেখাতেন নাচের কথা উঠলেই।

ছবি দেখিয়ে বলতেন, এই হল পেরোর বিরচিত রূপকথা "লা বেল ও বোয়া দরমাঁ" সুরারোপ চাইকোভস্কি। এই সেই স্পেসিভা। আবার ১৯১৭ সালের ১১ই মে-তে দেখেছিলেন, থিয়েতর দ্য সাঁতলে দ্য পারীতে "লে কোঁত রুশ"।

এসব দেখার সৌভাগ্য অবশ্য আমাদের হয়নি। তবে আমরা আমাদের কালের বহু ব্যালে দেখেছি। এখনও ভুলতে পারিনি সে কথা।

মার্গারীটের সংগে দেখা প্রথম ব্যালে, "ল জন অম এ লা মর", জাঁ সেবাস্তিয়াঁ বাখ-এর সংগীত সংগতে নাথালি ফিলিপার ও বাবিয়ের অনবদ্য নাচ, আর দেখেছি "লা পোয়েট দ্য দ্যকিসোট" (ডন কুইকস টের প্রতিকৃতি)। তা ছাড়া রলা পতির রেজ দাঁস, যার পোশাক ও দৃশ্যপট পরিকল্পনা করেছিলেন খ্যাতনামা
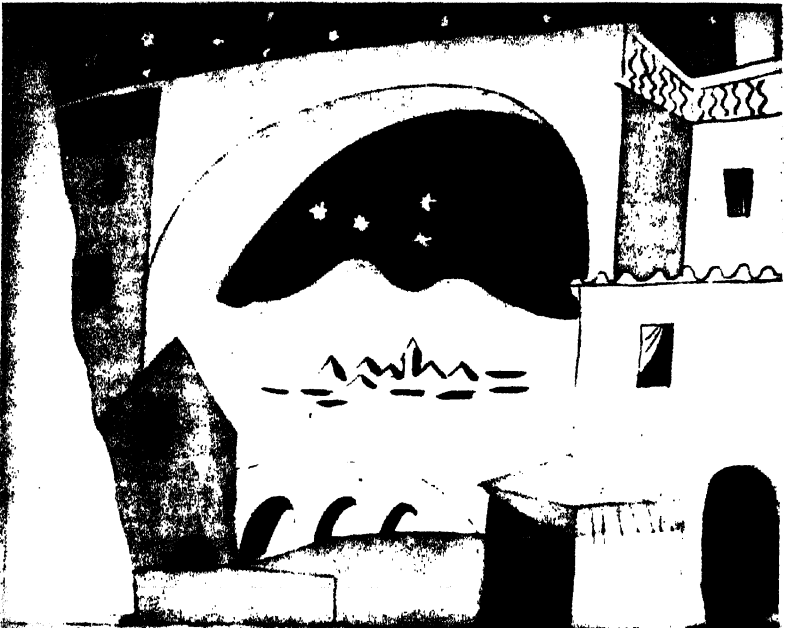
লে বীশ্‌ মারি লরাঁসার ছবি

চিত্রকর্ম; পিকাসোর ডেকর

VIMAL
A RELIANCE PRODUCT
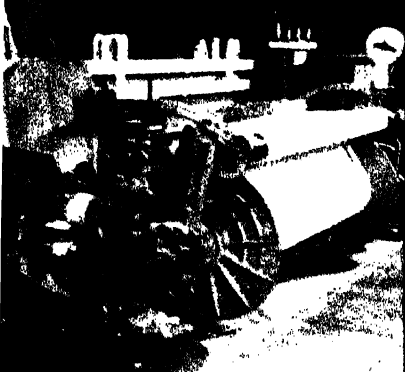
® is the Registered trademark of Reliance Textile Industrie

রুশ নীজিনস্কি

দ্য মোয়াজেল দ্য নুই ব্যালে মার্গো ফন্‌তেইন রলা পতি

ক্রিশ্চিয়ান দিওর। আবার লা রাঁকোতর অথবা ওদিপ এবং স্ফ্যাংকস (ইডিপাস এবং স্ফিংক্স) ব্যালেটি। সংগীতে হ্যারী সোগে। এবারও দৃশ্যপট এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা অনন্যসাধারণ ক্রিশ্চিয়ান বেরার। নামভূমিকায় লেজলী কারোঁ। অন্যান্য অংশে হেলেন সাদোভস্কা, নেলী গাইয়েরম, আলেক্সান্দার রিস্টার—এবং জাঁ বাবিয়ে।

সুন্দর ব্যালে "কারমেন"—নামভূমিকায় ছিলেন রেনে জাঁমের—ভারি ভাল লেগেছিল। "লে দ্যমোয়াজেল দ্য লা নুই"-তে অংশ গ্রহণ করেছিলেন খ্যাতনাম্নী ইংরেজ ব্যালেরীনা দাম মার্গো ফন্তেইন। বিপরীতে ছিলেন রলা পতি—এই সমস্ত ব্যালেতে এক নতুন রস ও নতুন গন্ধ ছিল। শুনেছি মামির কাছে যে, রোম্যান্টিক অধ্যায়ে ব্যালে ছিল গতানুগতিক। হ্যাকনীড অংগভংগী। ডিয়াঘিলফ এসে সমস্ত প্রতিভার সমন্বয়ে নতুন জীবন নতুন রসাস্বাদনের সৃষ্টি করেন। একই সংগে চিত্রে সাহিত্যে, সংগীতে সব খ্যাতনামার একই কালে আবির্ভাব এবং স্ফূর্ত রচনা ব্যালের ধমনী শিরায় নতুন রক্তের জোয়ার আনলো। সে ধারা মামির মতে এখনও বহমান। একই সময় শিল্পকলায় পিকাশো, মাতিশ, দরাঁ, মারিলরাসণ, সংগীতে স্ট্রাভিনস্কি, ইমানুয়েল দ্য ফাইয়া, ক্লোদ দ্য বুসী, হনেগের, এদিকে সাহিত্যক্ষেত্রে তখন কোকতো, জিদ, ভ্যালেরী ইত্যাদি ধনুর্ধর সর্বমুখী প্রতিভার বিস্ময় মথিত করেছিলেন রঙ্গমঞ্চ। প্রযোজনায় নিয়োজিত ছিল ডিয়াঘিলফ ক্রিশ্চিয়া বেরার অনন্যসাধারণ মস্তিষ্ক। সমস্ত আবার নতুন করে তুলে ধরলো আমাদের সামনে।

অবশ্য ব্যালের গভীরতর দেশে প্রবেশ না করতে পারলে আমাদের মত বিদেশীর কাছে অনেক কথাই অব্যক্ত থেকে যায়—আমি ব্যালের লাবণ্যময় হাত পা ও দেহের বিন্যাসভংগী দেখে প্রায়শ কার্গো, রোদাঁ ও দেগার রূপলোকের ঠিকানায় পৌঁছতে পারতাম। নর্তক-নর্তকী অনেক ক্ষেত্রে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ঊর্ধ্বে হাওয়ায় বিচরণ করে ছন্দোবদ্ধভাবে আবার জমি ছোঁয়। রূপলাবণ্যের কি সুন্দর ছন্দোময় প্রকাশ। বড় ভাল লাগতো দেখতে। যখন তারা ভূস্পর্শ করে প্রায় উড়ে আসে তখন মনে হয় পাখির পালক জমি ছুঁলো। কি হালকা নর্তার দেহ। অনেক সময় এক একটা অংগভংগী মনে হয় অকপোলকল্পিত। ব্যালেরীনার নৃত্যরূপ ...খ আমি এখন অন্তত বলতে পারি মালার্মের উক্তি: ওরা মেয়ে নয়। বস্তুত তাই। খসে পড়া ফুলের মত, শূন্যে বুক ভাসিয়ে দেওয়া পাখির মত, যখন উঠে গিয়ে আবার পড়ে তখন মনে হয় যেন বহু আকাঙ্ক্ষিত একটি স্বপ্নের টুকরো। এ কারণে দেগা কত না ছবি এবং মূর্তি সৃষ্টি করেছেন ব্যালের ঐ মেয়েদের নিয়ে—যেন তাদের উদ্দেশে রচিত স্তুতি গান। যেন বা এক একটি নিটোল সুদৃশ্য মহান কবিতা—সত্যই সুন্দর! দেগার চোদ্দ বছরের নর্তকীর ব্রোঞ্জের মূর্তিটি অনন্যসাধারণ। তিনি সত্যই ছবি ও নৃত্য এক করেছেন। এবং চিত্রসংস্থান, ভংগীর লাবণ্য ও নারীদেহের সৌন্দর্য তাঁর তুলি, প্যাস্টেল ও মূর্তি রচনা যেন পেয়েছে অমরার স্পর্শ। দেগার গুণমুগ্ধ ছিলেন কবি পল ভ্যালেরী। পল ভ্যালেরী দেগা, লিওনার্দো ও মালার্মেকে একই উচ্চ মার্গের ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকার করতেন। ভালবাসতেন। তার চেয়েও বড় কথা দেগা ছিলেন, অ্যাংগ্রর ভক্ত। অতএব নারীদেহের সুষমা সৌন্দর্য ওঁর চোখে ছাপ না ফেলে থাকতে পারে না। এ কারণেই হয়তো ভ্যালেরী "দাঁস দেগা, দেসাঁ" পুস্তকে একটা কথা বলেছেন যা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, যারা মাতাল তারা মদের "কনোয়সর" (রসিক) নন এবং যারা নারী সমভিব্যাহারে নারী জীবন ভোগ করেন তারা নারীর কনোয়সর নন। ওর মতে, প্রয়োজন ও প্রজননের তাগিদেই শুধু নারীরা তাদের ভোগ্য। এ মরজগতে কেবল মাত্র দুই ধরনের জীব নারীর মহিমা বোঝেন তারা হলেন—শিল্পী (যারা নারীর সৌন্দর্যে মোহিত) ও ডাক্তার (এরা নারীর স্বাস্থ্যের খবর রাখেন)। কথাটা মিথ্যা নয়। আমার স্টুডিওতে যখন নগ্নিকা নারী মডেল থাকে আর আমি, আমার ছেলেমেয়ে ছবি আঁকতে ব্যস্ত থাকি তখন মা ওদের গৃহকর্মে লিপ্ত থাকেন, যেন কিছুই না আমাদের সামনে রেখা রঙ অংগভংগী ইত্যাদি—কিন্তু সে চিত্র দেখে অস্মদ্দেশীয় খুব শিক্ষিত, নীতিবাগীশ পুরুষেরা এবং তাদের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ হতচেতন হন। একথা ঠিক এই দুই ধরনের চোখই—শিল্পী আর অশিল্পীদের চোখ—জাগতিক চোখ, অতএব নিরুপায়। অথচ এদেশেরও কোনারক, পুরী, খাজুরাহর মন্দির ভাস্কর্য মনোমুগ্ধকর অভিব্যক্তি দুনিয়ায় আমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছে—তা ছাড়া আছেন বাৎসায়ন। বিপরীতপক্ষে সাগর সংগমে নাগা সন্ন্যাসীদের প্রতি মহিলাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত তো স্বাভাবিক কথা। কী আশ্চর্য আমাদের স্ববৈপরীত্য।

এই সূত্রে আমার ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতার কথা এখানে টেনে আনলে হয়তো অপ্রাসংগিক হবে না। আমার তখন বয়স সতের আঠার হবে। একবার এক বন্ধুর সংগে উড়িষ্যায় গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোনারক মন্দির-ভাস্কর্যের রসাস্বাদন। ঘটনার স্থান কোনারক। সেই সময় এক মঠ ছিল। ওখানেই আমরা আস্তানা গাড়লাম। মঠাধ্যক্ষ এক বৃদ্ধ। অপূর্ব তাঁর চেহারা। শ্বেত শ্মশ্রু ও গুম্ফ দেখে মনে হয় ঋষি। খাওয়া দাওয়া হতো নামমাত্র। সারাদিন মন্দিরে নানা মূর্তির ছবি পেন্সিলে এঁকে সময় কাটতো। কোনরূপ ভণ্ডামো না করে বলবো, মূর্তির ঐসব আবেদন মুগ্ধ করতো। নান্দনিক আবেদন ছাড়াও বন্ধ চিত্র বা সংগমরত নারীপুরুষ মূর্তি আমাদের মোহাচ্ছন্ন করে তুলতো। বয়স আমাদের কম। প্রথম যৌনবোধে আমাদের ড্রইং জোরদার হয়ে উঠল। একটা কথা খুব ভালভাবে অনুভব করলাম যে সংগম, মৈথুনও এক জাতীয় আর্ট। একারণে হয়তো বেশ কিছুটা পার্ভাসান (বিকার) আসতে বাধ্য। যেমন সত্যই আর্টে ডিস্টর্শন (বিকৃতিকরণ) না এলে আর্টের তুল্যমূল্য হতে দূরে থেকে যায়। কে যেন বলেছিলেন (যত দূর মনে হয় অস্কার ওয়াইলড), "প্রকৃতি থেকে দূরে যত যাবে, ততই শিল্প হবে।" কথাটা ঠিক। প্রকৃতি, নিছক প্রকৃতি গরু ছাগলদের জন্য, মানুষে বস্তুত রহস্যময় সূক্ষ্ম পদার্থ।

কিন্তু এ গল্পের আসল কথা হলো সেইখানে যা সেই সময় মন্দিরের চূড়া যখন সূর্যের কিরণের বিদায় ব্যথায় আকুল, আমরা তখন নেমে পড়লাম। ফিরে এলাম। মঠে এসে উপস্থিত।

মঠাধ্যক্ষ প্রশ্ন করলেন, কি কাজ করলে দেখি?

এতক্ষণ আমরা বেশ ছিলাম! ড্রইংগুলো খুলে ধরতেই কান আমাদের লাল। এতক্ষণ আমরা নিজেদের মধ্যে ছিলাম মশগুল। এবার সমাজের চক্ষে পড়েছি। মনে মনে প্রমাদ গুনছি আর ভাবছি, ভগবান জানেন কি ভাববেন! কারণ সব ড্রইং নিখুঁত করে আঁকা। সুস্মিত মুখ, পরিপূর্ণ স্তন। স্তনভার। নিটোল কোমর এবং জঘন। মনে হবে সব কিছু বেকীং পাউডার উত্তুংগ। রোমহীন যোনিদেশ। ওদিকে পুরুষ। তার উদ্ধত লিংগ, গোঁয়ার,—বন্ধ চিত্র। তা ছাড়া এঁকেছি নানান বিকৃতির নানা রূপ। সত্যই লজ্জা করছিল বৃদ্ধের সামনে ধরতে। কিন্তু বৃদ্ধের কাছে যেন কিছুই না নকশামাত্র। পাতার পর পাতা উলটে ড্রইং দেখলেন। আমরা আড়ষ্ট এবং ক্লান্ত।

উনি কিন্তু হাঁকলেন, বিনোদিনী ও সুরো।

এরা দুজন ওঁর দুই কন্যা, প্রথম . বিধবা দ্বিতীয়টি কুমারী।

এসো দেখবে এসো কি সুন্দর ছবি এঁকেছে।

এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থা, অনেকটা বলির পাঁঠার মত। ছিঃ ছিঃ কি ভাববে মহিলারা। পরস্পর চোখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমরা আড়ষ্ট। জবুথবু।

দুটি মেয়েই এলো। দুজনেই এলো উড়িষ্যার পরিপূর্ণ যৌবন উজ্জ্বল দেহে। পিতার পাশে বসে এক এক করে সমস্ত ছবি দেখলে—এবং মুহুর্মুহু রেখা, ভংগী ও ধরনের তারিফ করতে থাকলো।

আমরা দুজনেই হতবাক। কি মনোযোগ সহকারে ছবি দেখা। বিন্দুমাত্র গাল আরক্ত না করে। আমরা আমাদের শিকড়ে যেন নাড়া খেলাম। আমাদের জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে গেল। ওরা যেন জানিয়ে গেল তোমরা দুজনেই দুই বাঙ্গালী বুদ্ধু।

সেদিন ছিল চাঁদনী রাত। বেশ গরম পড়েছিল। আমি, আমার বন্ধু ও মঠাধ্যক্ষ খাওয়াদাওয়া করে বাগানে চেয়ারে বসে অনেক গল্প করছিলাম।

এক ফাঁকেই আমি মঠাধ্যক্ষকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা এই সব ভগবৎ মন্দিরে এই সব যৌন সংক্রান্ত বন্ধচিত্র প্রতিফলিত করার কারণ কি? আমাদের নৈতিক বিবেচনায় ভয়ানক ধাক্কা দেয়, একটু বুঝিয়ে দেবেন?

বৃদ্ধের মাথায় অনাদিকালের চাঁদের আলো। দুধের মত চুলদাড়িতে ঘেরা মুখের উচ্চারিত কথাগুলি এই এখনও আমি ভুলিনি।

তিনি বললেন, খুব সহজ। তোমরা তো মন্দির প্রদক্ষিণ করে দেখেছ। ভগবান আছেন গর্ভগৃহে। কিন্দুবং প্রতিষ্ঠিত। ধীরে তা প্রকাশিত। পুরুষ প্রকৃতি বিজড়িত নিষ্ক্রিয়তার পর সক্রিয়তঃ গতিশীল চালক, ফুলের মত ফুটতে থাকে শেষ চক্রে। অস্থায়ী পরিবর্তনশীল গতি মূর্ত। তুমি জান, সবই শিব সবই নারায়ণ সবই ব্রহ্মা—তাদের বিভূতিই হল গুণবাচক শক্তি, শক্তি, লক্ষ্মী, ও সরস্বতী, এঁদেরই খেলা। এখানে, শয়তান, বা ভগবৎ-বিরুদ্ধ অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই। সেই জন্য তুমি দেখবে মন্দিরগাত্রে সংসার ধর্ম, বাজার-হাট, হাঁড়িকুঁড়ি সবই রূপায়িত, কেবলমাত্র যৌন-সংক্রান্ত কথা তা নয়। অর্থাৎ ভাল মন্দ সবই এক কর্তার কর্তৃত্বাধীন। অতএব নীট কথা হলো নিছক জাগতিকতা বা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক নেই। এসব কথা তালগোল পাকিয়েই পণ্ডিতরা নিজেদের মূর্খতা প্রমাণ করেন। তবে হ্যাঁ, যৌন সংক্রান্ত কথা আমাদের নিকটতম বিষয়। এক্ষেত্রে নিজেরাই এক রহস্যে হাবুডুবু খাই। নিজেরাই নিজেদের কাছে চূড়ান্ত রহস্য।

ওঁর কথা আমরা মন দিয়ে শুনেছিলাম। উনি থেমে বললেন, বস্তুত পাপপুণ্য বলে কিছু নেই। তার পর উনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ওঁর হাতের পাঁচ পাঁচ আঙ্গুল বিজড়িত দশ করে বললেন, শোন একটা গল্প। সরল গল্প।

একদা, জগন্নাথভক্ত দুই বন্ধু আসছিল দূর দেশ থেকে। প্রভু জগন্নাথ দর্শন ওদের বহুদিনের স্বপ্ন, বহুদিনের কল্পনা। বহু পথ অতিক্রম করেছে পদ-যাত্রায়। মন্দির আর বেশী দূরে নেই—হয়তো কয়েক ক্রোশ, ইতিমধ্যে পথে এক ক্ষুদ্র নগর পার হবার কালে সন্ধ্যায় ওরা দেখল একটি গলি। গলিটি বেশ্যালয়ের গলি। আশেপাশে দরজায়, অলিন্দে, নানা বেশভূষায়, সুন্দরী বেশ্যারা, আকর্ষণীয় রূপ নিয়ে প্রলোভন প্রদীপ্ত চিত্তাকর্ষকভাবে, পথ আলোকিত করে আছে। তা ছাড়া আশপাশে নানা ঘর থেকে নানা সঙ্গীত বাদ্য নাচের ঝঙ্কারে গলিটা মুখরিত। দুই বন্ধু পার হচ্ছিল ঐ গলি। তাছাড়া আর রাস্তা নেই। এক বন্ধু, ঐ পরিবেশ ও উচ্চকিত যৌবন উচ্ছ্বাসের রঙ্গশালায় যেন হারিয়ে গেল। বন্ধুকে সে বললে, বন্ধু, আমি আজ রাতটা এখানে কাটাই। তুমি এগোও, আমি পরে আসছি। এতে পবিত্র বন্ধু বিস্ময়ে হতবাক—এ কি কথা, ভগবৎ-দর্শন পথে, এই নিম্ন শ্রেণীর পরিবেশে, থেকে যাওয়া সত্যই ভগবৎ-বিরুদ্ধ কথা। ভাল মানুষটি বন্ধুকে নরকে রেখে এগিয়ে গেল প্রভু জগন্নাথের দর্শন অভিলাষে। আর ভ্রষ্ট তীর্থযাত্রী বন্ধু, এক সুন্দরী যুবতীর অঙ্কে নিজেকে ঢেলে দিল। নাচ গান, বাদ্য, ও কোমল স্পর্শে তলিয়ে গেল সে। কিন্তু মজা হল

[illegible] ম্যাদেস দমাস ও রাজাগোপাল

ওদীপ ও স্ফিংস্‌ জেজলী কারো. জাঁ বাবিয়ে

তারপর। ভাল মানুষ প্রভু জগন্নাথ সম্মুখে উপস্থিত। সমস্ত পথ সে এসেছে একটা কথাই ভাবতে ভাবতে। কি নিকৃষ্ট আত্মা ওর বন্ধুটি। ভগবদ্দর্শনপথে জঘন্য বেশ্যালয়ে রাত্রি যাপন করা! এ পাপের শেষ নেই। আর অন্যদিকে পাপী বন্ধু সারা রাত অঙ্কশায়িনীর মধুরতায় অবশ। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। অলস, আবেশ গিলেছে সুন্দরীর দেহের বন্ধনে। কিন্তু মাঝে মাঝে চেতনায় আসছিল সে। ভাবছিল আমি কত অধম। এই দেহে আমি নিমজ্জিত। সত্যই এইসব তো ক্ষণভঙ্গুর মোহাবেশ। এই মেয়েটি তার দীঘল চোখ, প্রস্ফুটিত স্তন, ঋজু কটি, গুরু নিতম্ব, বিকশিত জঘন, উরু, গুরুর সংস্পর্শ আমাকে কীভাবে মোহিত করেছে যে আমি প্রভু জগন্নাথকে ভুলেছি। সে ভাবলো, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমি মানি, এ আর এক আকর্ষণ—এই নারী—নারীদেহ। এর ঊর্ধ্বে আর এক আকর্ষণ—তা হল প্রভু জগন্নাথ। তা হলে, আমি সত্যই নিমগ্ন, পাপের পাঁকে। আমার ভাল মানুষ বন্ধু কত সৎ, কত ধার্মিক, কত নিষ্কলুষ নিষ্পাপ। আর আমি কোথায়— দুই বন্ধু দুদিকে তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্বে তাদের মনোযন্ত্রণায় নিগৃহীত হতে থাকলো। "কি করে সম্ভব ভগবৎ-দর্শন যাত্রার কালে, একজনের নিজেকে নিমজ্জিত করা, ঘৃণ্য বেশ্যালয়ে, জঘন্য নরকে?" একজনের প্রশ্ন। আর একজনের জিজ্ঞাসা, "আমি কত নিকৃষ্ট জাতের মানুষ, পঙ্কিলতায় ক্ষণিক কামনা বাসনায় এ পঙ্কিলতায়—নিকৃষ্ট পঙ্কে ডুবে গেলাম। আর আমার বন্ধু কত কত পুণ্যবান, কি ভগবৎ ভক্তি, ভগবৎ পাদপদ্মে পৌঁছতে অবহেলায় ফেলে গেল এ নরক।—আমার উদ্ধার নেই।" মঠাধ্যক্ষ গল্পের শেষে বললেন, অবশেষে যখন দুজনে মন্দিরে উপস্থিত তখন দেবতা আবির্ভূত হয়ে আশীর্বাদ করলেন পাপী বন্ধুকে, বললেন তুমি বাপু নরকে থেকেও আমাকে ভোলোনি, তোমার মঙ্গল হবে। আর তোমার পুণ্যবান বন্ধু আমার দর্শনপথে সারাক্ষণই আমার পরিবর্তে নরকের কথা ভেবেছে। অতএব, আমি দুঃখিত তোমার বন্ধুর জন্য।

গল্পটি বলে, মঠাধ্যক্ষ বললেন, বস্তুত, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের শাস্ত্রে তাই বলে। নৈতিকতা নিছক জাগতিক শর্ত। প্রসঙ্গত আমরা বহু দূরে চলে এসেছি।

কারণ উচ্চাঙ্গের আর্টের কথায়ও অনেকটা ঐ ধরনের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়; যে কারণে, ব্যালেরিনা-দের রূপ-লাবণ্য-বিন্যাসেই মুগ্ধ হয়েই মালার্মে উচ্চারণ করেন "ওয়া মেয়ে নয়", অন্য কিছু অর্থাৎ আর্টের নির্যাস।

ব্যালের বহু ছবি বহু দৃশ্য এখনও স্মৃতিসম্ভব। ভাবলেই চোখের সামনে মঞ্চের যবনিকা উঠে যায়—রহস্যময় দৃশ্য, আলোর বর্ণনাতীত প্রহেলিকার পায়ে পায়ে সৌন্দর্যের টুকরো, তুতু পরিহিত, যেন কোমল ফুলের পাপড়ি থেকে লীলায়িত উত্তমাঙ্গ, সুন্দর নিটোল নিষ্কলঙ্ক দুটি পা। পায়ে পায়ে ঘুরে ঘুরে আসে। কখনও ভাবে কখনও ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত হয়ে। কখনো আবার উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আকাশে। সঙ্গীতের মিড় মূর্ছনায়। তরঙ্গে তরঙ্গে।

যখন এক দল তুতু পরিহিত মেয়ে সারা মঞ্চে ছড়িয়ে পড়ে মনে হয় যেনের সাদা শালুক ফুল পরস্পর গায়ে হেলাহেলি করে জলে ভাসছে।

তা ছাড়া নানা গোষ্ঠীর নানা আবেদন, ব্যালে রুশ, মন্তিকার্লোর, ব্যালে দ্য মন্তিকার্লো, ব্যালে দ্য স্যাঁজেলিজে, স্যাডলার ওয়েলস ব্যালে, ব্যালে দ্য পারী রলাঁ পতীর ব্যালে আমেরিকান, পারী অপেরার স্টুটগার্ট ব্যালে, লণ্ডন ফেস্টিভাল ব্যালে, সুইডেন, হল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া, কানাডাতে আছেই। তা ছাড়া নিউ ইয়র্ক ব্যালে। তবে একথা ঠিক যে সর্বত্র যে সুখকর প্রযোজনা হয় তা নয়, উগ্র আধুনিকদের প্রযোজনা বেশ গদ্যময়—নান্দনিকে রসাভাব বহু ক্ষেত্রেই। মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে। তবে এ চর্চা প্রাণপূর্ণ কিছুকাল আগে মিনিস্টার অফ ফাইন আর্টস প্রয়াত মহাশয় আঁদ্রে মালরো, অভূতপূর্ব এক পরিকল্পনার রূপ দেন, ফ্রান্সের সমস্ত ফরাসী প্রভিন্সে, "মেজোঁ দ্য লা কুলতুর" শিরোনামায় যেখানে, থিয়েটার, আবৃত্তির ঘর, গ্রন্থশালা, প্রদর্শনীর গৃহ সব ব্যবস্থাই রয়েছে। এতে করে নিকটস্থ সকলেই এই সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ব্যালে থিয়েটার কঁতেম্পোরেন, আমিয়া দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় মালরোর কল্যাণে। অতি আধুনিক প্রতিষ্ঠান। ডিরেক্টর জাঁ-অলবোর কার্তিয়ে। তিনি খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রকর সহযোগিতায় এবং অনেক ভিন দেশীয় করেওগ্রাফার নৃত্য-পরিকল্পক যাঁরা, বহুখ্যাত নামকরা বিজ্ঞ এতে যোগ দেন, ১৯৭২ সালে ঐ প্রতিষ্ঠান আজেতে উঠে যায়নি এবং জাতীয় নৃত্যও অপেরার আজ তা কেন্দ্র বিশেষ। (ক্রমশ)

রোমাঞ্চকারী নতুন ফ্যাব্রিক্স

গতানুগতিক থেকে স্বতন্ত্র ফ্যাশন

মানবজমিন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

॥ আঠারো ॥

তৃষা দীপনাথকে বসিয়ে রেখে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্তই করতে গেল বোধ হয়।

মল্লিনাথের এই ঘরখানায় বসে হারানো বহু স্মৃতিই মনে পড়ার কথা। আশ্চর্য, দীপনাথ একবারও মল্লিনাথের কথা ভাবল না। তার শরীর বার বার কাঁটা দিল এক শিহরনে। মণিদীপা তার খোঁজ করছে!

সত্য বটে দীপনাথের ভিতরে এক সময়ে ইস্পাত ছিল। তাদের সব ভাইবোনের মধ্যেই কিছুটা করে আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে মেজদা শ্রীনাথ। কিন্তু দীপনাথের সেই ইস্পাতই বা কোথায় গেল?

ভিতর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্য এক দীপনাথ বলল, জং ধরে গেছে হে!

দীপনাথ বলল, অত সস্তা নয়। আমি সহজে হার মানি না।

হার মেনেছো কে বলল? বরং তথ্য বিশ্লেষণ করে একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, তুমি জয় করেছো। হার মেনেছে অন্য পক্ষ।

ইয়ার্কি নয়। আমি কারো প্রেমে পড়িনি।

তাও বলা হচ্ছে না। ঘুরিয়ে বলতে গেলে অন্য পক্ষই পড়েছে। তাতে তো তোমার দোষ ধরা যায় না।

অন্য পক্ষের দায়-দায়িত্ব তো আমি নিতে পারি না। কে কবে কার প্রেমে পড়বে আর দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাবে—

ধীরে বন্ধু, ধীরে। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। মণিদীপার বয়স কত বলো তো?

কে জানে? কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে বোধ হয়।

তাই এ বয়সে আজকালকার মেয়েদের খুকীই বলা যায়।

যত খুকী ভাবছো তত নয়।

তবু বলছি ততটা পাকেনি এখনো। মনটা কাঁচা আছে। জাম্বুবান স্বামীটার জন্য একটা আনহ্যাপী লাইফ লীড করতে হচ্ছে বলে রাগে আক্রোশে প্রতি-হিংসায় মাথাটাও ঠিক নেই কি না।

মিস্টার বোসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই মহিলাও যে সাঙ্ঘাতিক বিপ্লবী।

স্বামী সিমপ্যাথিটিক হলে বিপ্লবটা এমন চাগিয়ে উঠত না মাথার মধ্যে। যাকগে যা বলছিলাম, মিসেস বোসের কাঁচা মাথাটা খাওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। তুমি ছাড়া অন্য কেউ হলেও খেতে পারত।

এই কথায় দীপের একটু অভিমান হল। বলল, তা হতে পারে। তবে মাথাটা আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই।

একেবারেই নেই কি?

মোটেই নেই।

তা হলে বাপু তুমি মস্ত পুরুষ। অত লজ্জা সরম পাচ্ছো কেন?

আমি মস্ত পুরুষই।

তবু বলছি, ভিতরকার মরচে-পড়া ইস্পাতে একটু শান দাও। শক্ত হও। নইলে আমও যাবে, ছালাও যাবে। চাকরিও নট, মণিদীপাও নট।

যায় যাক। পরোয়া করি না।

চাকরির পরোয়া করো না করো, মণিদীপার পরোয়া একটু আধটু করছ কিন্তু উনিও করছেন। বউদির চোখে ধরাও পড়ে গেছ। এখন বেশ সাবধানে পা ফেলো।

আমার কোনো দুর্বলতা নেই। এই মুহূর্তে সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিলাম।

বলে দীপনাথ খুব বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর সেই মুহূর্তেই মল্লিনাথের বার্মা সেগুনের বিশাল আলমারির গায়ে লাগানো খাঁটি বেলজিয়াম আয়নায় তার আপাদমস্তক প্রতিবিম্ব সামনে দাঁড়াল।

ব্যায়াম ট্যায়াম করে এবং দৌড়ঝাঁপের মধ্যে থেকে থেকে তার চেহারাটা হয়েছে গুণ্ডা শ্রেণীর। খুবই শক্তপোক্ত। লম্বাটে আখাম্বা। মুখশ্রীতে কিছু রুক্ষতা সত্ত্বেও বংশগত লাবণ্য কিছু রয়ে গেছে। চেহারাটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সে। বেশ খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে মন থেকে এক বিচারপতি রায় দিল, এই চেহারার পুরুষ মানুষের প্রেমে পড়তে কোনো মেয়েরই বাধা নেই।

ভালই গো ভালই। অত দেখতে হয় না নিজেকে! বলে তৃষা পিছন দিকে একটা টুলের ওপর খাবারের রেকাবি রাখল।

খুবই চমকে গিয়েছিল দীপনাথ। হেসে ফেলে বলল, চেহারা নয়। আয়নাটা দেখছিলাম। খাঁটি বেল-জিয়াম গ্লাস।

তৃষা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ, আজকাল আর এসব জিনিস পাওয়া যায় না।

দীপনাথ আবার একটু অস্বস্তিতে পড়ে জিনিসটা বড়দার। বউদি আবার ভাবল না তো, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসব জিনিসের ওপর দাবি দাওয়া রাখছি?

সে তাড়াতাড়ি বলল, অত সব কী এনেছো? লানচ আছে যে!

তৃষা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, এসে থেকেই তো বাপু কেবল শুনছি লানচ আর লানচ। ওসব সাহেবী কেতার লানচ কি রকম হয় তা একটু আধটু জানি বাপু। ওখানে তুমি কম খেলে না বেশী খেলে, ফেললে না রাখলে তা কেউ খেয়ালও করবে না। এসব আমাকে শিখিও না।

কথাটা ঠিক। দীপনাথ যদি বুফে লানচে একটা পদ নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে তা হলেও কেউ লক্ষ্য করবে না। তা ছাড়া লানচের আগেই সকাল নিরাপদ রকমের মাতাল হয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। তাই সে প্লেটের সামনে বসে বলল, তা বটে। খেয়াল ছিল না।

তৃষা মুখ টিপে হেসে বলে, ভেবো না, উনিও পেট ভরে খেয়েছেন। লানচ নিয়ে মণিদীপার একটুও মাথা-ব্যথা নেই। এমন কি যেতে চাইছেন না।

সর্বনাশ! না গেলে পরস্ত্রী হরণের দায়ে পড়ে যাবো, বউদি!

পড়ে যাবে কেন ভাই? পড়ে অলরেডি গেছ।

তার মানে?

ভাল চাও তো এদের কনসার্নে চাকরি আর কোরো না।

দীপনাথ আবার লাল হয়ে একটা লুচি ছিঁড়ে দুই টুকরো করে বলে, তুমি না একদম বাজে!

তৃষা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, তুমিই বা কেন এরকম কিম্ভূত? দেশে কুমারী মেয়ের তো অভাব নেই, তবে এই কচি বউটার মাথা খেয়ে বসে আছো কেন?

দীপনাথ এবার স্পষ্টতই একটু বিরক্ত হয়। তেতো গলায় বলে, এ যুগটা তোমাদের যুগের মতো নয় বউদি। এখনকার মেয়েরা অত সহজে প্রেমে পড়ে না। মণিদীপার তুমি কি বোহেড অবস্থা দেখলে?

তৃষা হেসে ফেলে বলে, ঠাট্টা বোঝো না, তুমি কেমন হয়ে গেছ বলো তো!

ঠাট্টা! হতেও তো পারে। দীপনাথ আবার লাল হয়, বলে, বসের বউ নিয়ে ইয়ার্কি নয়। কানে গেলে সর্বনাশ!

তৃষা নীরবে একটু হাসে। বলে, প্রেমে পড়েছে এমন কথা কিন্তু একবারও বলিনি। বরং বলছিলাম বসের বউকে ভাল জপিয়ে নিয়েছো। টক করে প্রোমোশন পেয়ে যাবে।

জপিয়েছি তাই বা বলছ কি করে?

ওসব বোঝা যায়।

তবে তুমিই বোঝগে যাও!

রাগ করলে নাকি গো! বলে তৃষা আবার গা জ্বালানো হাসি হাসে। বস্তুত একমাত্র এই দেওরটির কাছেই সে বরাবর একটু তরল। শ্বশুরবাড়ি বা বাপের বাড়ির আর কারো সঙ্গে তার কোনো ঠাট্টা বা ইয়ার্কির সম্পর্ক নেই। দীপনাথকে বরাবরই তার ভাল লাগে। এই এক সংসার-উদাসী মানুষ। বড় ভাল মানুষ। কখনো কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলে না, কারো কাছে কোনো প্রত্যাশাও নেই তার। বিয়ের পর হয়তো বদলে যাবে। বেশীর ভাগ ভাল পুরুষই বিয়ের পর সেয়ানা হয়। দীপনাথ যতদিন বিয়ে না করছে ততদিন তৃষার ওকে বোধ হয় এরকমই ভাল লাগবে।

দীপনাথ বলল, না, রাগ করব কেন? অনুরাগের কথাই তো বলছ। তবে তুমি বরাবরই ফাজিল।

তৃষা স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে বলে আমি যে ফাজিল সে শুধু দুনিয়ায় একমাত্র তুমিই বললে! আর কেউই কিন্তু বলে না।

আর সবাই কী বলে তোমাকে? খেতে খেতে চোখ তুলে দীপনাথ ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

সে অনেক কথা। সোমবাবু তো নাকি বলে, আমি দেবী চৌধুরানী হওয়ার চেষ্টা করছি। এখানকার লোকেও বলে, আমি মেয়ে গুণ্ডা, নারী ডাকাত।

বলে নাকি?

শুনি তো।

ঠিকই বলে। দীপনাথ গম্ভীর মুখে বলল।

তৃষা মৃদু হাসল। বলল, কেন, তোমারও কি তাই মনে হয়?

ডাকাত না হলে ভিলেজ পলিটিকসের সঙ্গে লড়াই করে টিঁকে থাকতে পারতে না, বউদি। ডাকাত তো তুমি বটেই।

তোমার মেজদাও আমাকে খুব ভাল চোখে দেখেন না। ওঁর ধারণা আমি ইচ্ছে করে এখানকার লোকেদের সঙ্গে পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করছি।

করছো নাকি? সর্বনাশ। লোক্যাল লোকদের খুব সমীহ করে চলবে। এরা গ্রাম্য হোক, অশিক্ষিত হোক, ক্ষেপলে কিন্তু নাজেহাল করে ছাড়বে।

কঠিন হয়ে গেল তৃষার মুখ। ঠাট্টা ইয়ার্কির ভাবটা একদম রইল না আর। বলল, সহজে আপস করি না। করবোও না।

দীপনাথ চোখ তুলে বউদির মুখটা একবার দেখে নিয়ে বলল, মামলা মোকদ্দমা চলছে নাকি?

চলছে।

আচমকাই দীপনাথের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল, সোমনাথকে কারা মেরেছিল জানো?

তৃষা এক ঝলক তাকিয়ে বলল, না। জানলে চুপ করে থাকতাম নাকি?

তা বলিনি। এইটুকু ছোটো একটা জায়গায় ক্রিমিন্যাল ধরতে পুলিশের এত দেরী হচ্ছে কেন সেইটেই বুঝতে পারছি না।

সে পুলিশ জানে।

সে তো ঠিকই। দীপনাথ আবার মাথা নীচু করে। তারপর একটু ধীর গলায় বলে, সজলকে কি এখানেই বরাবর রাখবে?

তৃষা অবাক হয়ে বলে, কেন বলো তো। এখানে রাখব নাই বা কেন?

দীপনাথ বিজ্ঞের মতো বলে, এই পরিবেশটা হয়তো তেমন ভাল নয়, বউদি।

তা তো নয়ই।

তাহলে সজলকে কোনো ভাল স্কুলে দিয়ে দাও। হোস্টেল বা বোর্ডিং-এ রাখো।

তৃষা বোকা নয়। সে স্থির দৃষ্টিতে দীপনাথের

দিকে চেয়ে ছিল। বলল, সজলের সংগে তোমার কথা হল বুঝি?

হুঁ।

কি বুঝলে?

বুঝলাম সজল এখানে খুব হ্যাপী নয়। ওকে বাইরে পাঠনোই ভাল।

হ্যাপী নয় কেন? কিছু বলল?

অনেক কিছু বলল। সেগুলো কিছু খারাপ কথাও নয়। তবে বুঝতে পারলাম, ওর একটা অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি গ্রো করছে।

তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সেটা আমিও মাঝে মাঝে টের পাই, আগে আমাকে যমের মতো ভয় পেত। আজকাল কেমন যেন ভয়ডর কমে যাচ্ছে।

বাইরে পাঠিয়ে দাও। ঠিক হয়ে যাবে।

দেখব।

যদি বলো তো আমিও ভাল বোর্ডিং স্কুল দেখতে পারি।

তৃষা খুবই অন্যমনস্ক ছিল। জবাব দিল না।

রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত সোমনাথ বাবাকে নিয়ে এল না। একটা বেজে গেল। রওনা না হলেও নয়।

বিদায়ের সময় বড় ফটকের কাছে বাড়ির সবাই জড়ো হল। সমস্বরে বলল, আবার আসবেন।

খুব অকপট মণিদীপা ঘাড় হেলিয়ে বলল, আসবই। ঠিক আসব। আমার এরকম একটা স্পট দেখার খুব ইচ্ছে ছিল।

গাড়ি চলতে শুরু করার বেশ খানিকক্ষণ পর দীপনাথ সাবধানে বলল, একটু দেরী করে ফেললাম আমরা। মিস্টার বোস ভাবছেন।

একটু ভাবুক না। রোজ তো ভাবে না, আজ ভাবুক।

আপনার যা মানায়, আমাকে তো তা মানায় না। দোষটা বোধ হয় আমার ঘাড়েই এসে পড়বে।

কেন? আপনার দোষ কিসের? আমিই তো আসতে চেয়েছিলাম।

দীপনাথ একটা শ্বাস ফেলল। সব কথা মণি-দীপা বুঝবে না। বোঝানো যাবেও না।

মণিদীপা আবার তার স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষের হাসি হেসে বলে, ইউ আর এ স্লেভ। বণ্ডেড লেবারার। বোসের মতো একজন কাকতাড়ুয়াকেও ভয় পান।

আমিই যে সেই কাক।

মণিদীপা সামান্য ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, কথাটা মিথ্যে নয়। একটা কথা মনে রাখবেন, দীপনাথবাবু, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারো কাছে দাসখৎ লিখে দিইনি, দেবোও না। আমি কোথায় যাবো না যাবো সেটা আমিই ঠিক করতে ভালবাসি এবং তার জন্য কোনো জবাবদিহি করতে ভালবাসি না।

মণিদীপা যে মোটেই তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েনি সেটা হঠাৎ চোখের দৃষ্টির খর বিদ্যুৎ এবং স্বরের কঠিন শীতলতায় হাড়ে হাড়ে টের পেল দীপনাথ। তার ভিতরে যে প্রত্যাশা, লোভ ও তরল একরকমের আবেগ তৈরি হয়েছিল তা চোখের পলকে কেটে গেল। সে সচেতন হয়ে নড়ে চড়ে বসল। তার পাশে যে মেয়েটা বসে আছে সে মোটেই মেয়েছেলেই নয়। একজন দুর্ধর্ষ কমরেড, একজন নির্বিকার বিপ্লবী। যদি কারো প্রেমে কখনো পড়ে থাকে মণিদীপা তবে সে দীপনাথ নয়। সেই ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা একজন স্কুলমাস্টার, স্নিগ্ধদেব।

দীপনাথ কথার তোড়ে একটু কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ বাদে বলতে পারল, আমার দাদা-বউদি একটু সেকেলে। আপনার বোধহয়—

মণিদীপা কথাটার জবাব দিল না। বাইরের দিকে চেয়ে শিথিল শরীরে বসে ছিল। মুখ গম্ভীর।

দীপনাথ আর কিছু বলার সাহস পেল না।

বাগানবাড়িতে তাদের অনুপ্রবেশ বিন্দুমাত্র আলোড়ন তুলল না। কেউ জিজ্ঞেস করল না কিছু। শিকারের পার্টি এখনো ফিরেই আসেনি।

দীপনাথ এতক্ষণ মনে মনে এই একটা ভয়ই পাচ্ছিল। বোস সাহেব ফিরে এসে যদি শোনেন—

দীপনাথ নিশ্চিন্ত হল। মণিদীপা গাড়ি থেকে নেমে তাকে কোনো কথা না বলে সেই যে গটগট করে হেঁটে কোথায় চলে গেল তাকে আর দেখতে পেল না সে। খুঁজতেও সাহস হল না। মুহুর্মুহু মেয়েটার মেজাজ পাল্টে যায়।

দীপনাথ চারদিকে চেয়ে দেখল, দুপুরের রোদে উঁচু সমাজের গৃহিণীরা গাছতলায় টেবিল চেয়ারে শ্লথ ভঙ্গিতে বসে আছেন। দুটো তাসের আড্ডা বসেছে। কয়েকজন পুরুষ আনাড়ির মতো ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করছেন। বেয়ারারা বিয়ারের ট্রে নিয়ে ঘুরছে।

দীপনাথ একটা নিরিবিলি গাছতলা বেছে নিয়ে মাথার ওপর হাত রেখে শুয়ে পড়ল। বউদি অঢেল খাইয়েছে। লানচে সে আজ আর কিছু খাবে না। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছিল সে।

স্বপ্নের মধ্যে মণিদীপা এসে সামনে দাঁড়াল। পিছনে চাবুক হাতে বোস সাহেব। বোস সাহেবের ব্যাকগ্রাউণ্ডে মণিদীপাকে আরো কঠিন ও সাংঘাতিক দেখাচ্ছে।

মণিদীপা বলল, দীপনাথবাবু!

দীপনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলল, জানি।

ঝরঝরে
তরতাজা
হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল...
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
লিনটাস-LR.28-2416 BG
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

কি জানেন ?

আপনি আমাকে অপমান করবেন এইবার। অপমানটা আমি সবার আগে টের পাই।

কি করে বুঝলেন ?

কারণ আমি সবসময়েই অপমানই প্রত্যাশা করি বলে। জীবনে আমি এতবার এত মানুষের অপমান সহ্য করেছি যে, আমাকে আর অপমান করার দরকারই নেই কারো। প্লীজ, আপনিও করবেন না।

যারা কাপুরুষ তারাই অপমানিত হয়। কই স্কুলমাস্টার স্নিগ্ধদেবকে কেউ অপমান। এমন বুকে উঠবে যে যত বড় লোকই হোক না কেন, ওর চোখের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না।

জানি।

স্নিগ্ধর আপনি কতটুকু জানেন ?

স্নিগ্ধদেবকে জানি না। কিন্তু চরিত্রবান মানুষদের জানি। তাদের কেউ অপমান করতে সাহস পায় না। ব্যক্তিত্বওলা, লোকদের চেনা শক্ত নয়। আপনার চোখের দৃষ্টি দেখেই আমি স্নিগ্ধদেবকে অনুমান করতে পারি। আমি তার চেয়ে বোধহয় অনেক বেশী স্বাস্থ্যবান, কিন্তু তার জোর অন্য জায়গায়। আমি জানি।

মণিদীপা হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল স্নিগ্ধদেবের জোরটা কোথায় জানেন ?

না, বলুন শুনি।

স্নিগ্ধদেব কখনো আমাকে কামনা করেনি। আর করেনি বলেই সে আমাকে কিনে রেখেছে। আর আপনি ?

আমি করেছি। চোখ নামিয়ে দীপ বলল।

আর কি জানেন ?

কি ?

স্নিগ্ধদেব কখনো তার বসকে খুশি করে জীবনে উন্নতি করতে চায়নি। স্নিগ্ধদেব কখনো টাকা পয়সায় বড়লোক হতে চায় না। স্নিগ্ধদেব একা বড় হতে চায় না। তাই স্নিগ্ধ অত বড়।

মানছি। আমি বড় নই।

কেন বড় নন ?

সারা জীবন আমার কেটেছে বড় ভয়ে ভয়ে। আতঙ্কে। নৈরাশ্যে। অনিশ্চয়তায়।

স্নিগ্ধরও কি তার চেয়ে বেশী ভয়, আতঙ্ক, নৈরাশ্য বা অনিশ্চয়তার কারণ নেই।

আছে। মানুষ যত বড় হয় তার সমস্যার বহরও তত বাড়ে।

তাহলে ? স্নিগ্ধদেব পারলে আপনি পারবেন না কেন ?

আমি যে বড় নই।

ওটাও কাপুরুষের মত কথা। আমার যে স্নিগ্ধদেবের ট্রেনিংটা নেই। পারপাস নেই। আমার জীবনের তেমন কোনো লক্ষ্যও নেই।

হতাশ হয়ে মণিদীপা বলে, কোনো লক্ষ্যই নেই ?

দীপ একটু ভেবে বলে, একটা লক্ষ্য আছে হয়তো। কিন্তু বললে আপনি হাসবেন। আমার জীবনের একটাই লক্ষ্য। একদিন স্বর্গের সমান উঁচু মহান এক পাহাড়ে উঠব। উঠব, কিন্তু চূড়ায় পৌঁছোবো না কোনোদিন। পাহাড়ের ওপরে উঠলে তাকে ছোটো করে দেওয়া হয়। আমি পাহাড়ের চেয়ে উঁচু নই। আমি চাই উঠতে উঠতে একদিন সেই পাহাড়ের কোলেই ঢলে পড়ব।

রোমান্টিক ইডিয়ট। সেন্টিমেন্টাল ফুল।

শুনুন মিসেস বোস, আমার কথাটা একটু শুনুন। যখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি তখন একটা হারমাদ ছেলের সঙ্গে আমার লড়াই বাধে। খুবই সাংঘাতিক ছেলে। তার নাম ছিল সুকু। সে অসম্ভব ভাল সাইকেল চালাত, ছিল খুবই ভাল স্পোর্টসম্যান। তার গায়ে ছিল আমার দ্বিগুণ জোর। কি নিয়ে তার সঙ্গে আমার প্রথম লেগেছিল মনে নেই। বোধহয় বেঞ্চে জায়গা দখল করা নিয়ে। প্রথমে ছোটোখাটো তর্কাতর্কি। একদিন মনে আছে, সে সামনের বেঞ্চে বসে পিছনের ডেস্কে আমার বইয়ের ওপর ইচ্ছে করে কনুই তুলে দিয়ে ভর রেখেছিল। আমি তার কনুই ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। সে নির্বিকারভাবে পিছনে ফিরে আমার বইগুলো টান মেরে নীচে ফেলে দিল। ক্লাসে তখন মাস্টারমশাইও ছিলেন। কিন্তু আমি তার বেপরোয়া নির্ভীক হাবভাব দেখে নালিশ করারও সাহস পেলাম না। কিন্তু ঝগড়াটার শেষ সেখানেও হল না। আমার মধ্যে অপমানবোধ বড় তীব্র কাজ করছিল। পরদিন আমি সকলের আগে ইস্কুলে পৌঁছে সুকুর সামনের বেঞ্চে বসলাম এবং মাস্টারমশাই ক্লাসে আসার পর ইচ্ছে করেই সুকুর বইয়ের ওপর কনুই তুলে দিলাম: কি হল জানেন ? সুকু তার বইগুলো এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল। আমি পিছনে হেলে ধড়াস করে ডেস্কে ধাক্কা খেলাম। ডেস্কের তলা দিয়ে সুকু একটা লাথিও মেরেছিল কোমরে। সেদিনও কিছু বলিনি ভয়ে। কিন্তু ক্লাসে সবাই সুকুর আর আমার ঝগড়ার কথা জেনে গেল। সবাই তাকাত, হাসত, মজা পেত। বলা বাহুল্য নামকরা স্পোর্টসম্যান বলে সবাই ছিল সুকুরই পক্ষে। এরপর থেকে ক্লাসে প্রায়ই সুকু আর তার কয়েকজন চেলাচামুণ্ডা আমাকে হাবা বলে ডাকতে শুরু করেছিল। অঙ্ক কষছি, ট্র্যানশ্লেশন করছি, ফাঁকে ফাঁকে শ্বাসবায়ুর শব্দের সঙ্গে কানে আসত, এই হাবা। এমন কিছু খারাপ কথা নয়, এখন বুঝি। কিন্তু তখন পিত্তি জ্বলে যেত শুনে। উল্টে কিছু বলতে হয় বলে আমিও গালাগাল দেওয়া শুরু করি। প্রথম বলতাম শালা, গাধা, গরু, এইসব। পরে একদিন বেশী রাগ হওয়ায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল শুয়োরের বাচ্চা। হেডস্যারের ক্লাস ছিল। উনি চলে যেতেই রাগে টকটকে রাঙা মুখে উঠে এল সুকু। কোনো কথা না বলে আমার জামা ধরে এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে কী জোর এক চড় মারল যে তা বলে বোঝানো যাবে না। মাথা ঘুরে গেল চড় খেয়ে। আর চড় খেয়ে যখন আমার বুদ্ধি-নাশ হয়ে গেছে তখনই সুকুর স্যাঙাৎরা এসে আমার পরনের হাফ প্যান্ট খুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে এল। সম্পূর্ণ গাড়লের মতো হতবুদ্ধি হয়ে আমি বসে ছিলাম। গায়ে শুধু শার্ট, পরনে আর কিছু নেই। ক্লাসসুদ্ধ ছেলে হাততালি দিয়ে চেঁচাচ্ছে। পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশী যেন আর অপমান নেই। দুহাতে লজ্জা ঢেকে আমি হতভম্বের মতো তখন জানালা দিয়ে বাইরে চাইলাম। সেই প্রথম যেন আবিষ্কার করলাম উত্তরের হিমালয়কে। দেখলাম পৃথিবীর সব তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে কত উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐ মহান পর্বত। জানালা দিয়ে সে যেন হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। বিড়বিড় করে বড় অভিমানে আমি বললাম, এরা তো কেউ আমার নয়। এরা বড় যন্ত্রণা দেয় আমাকে। আমি একদিন তোমার কাছে চলে যাবো। সেই থেকে, মিসেস বোস, সেই থেকে ঐ পাহাড় আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কেউ অপমান করলেই আমি পাহাড়ের কথা ভাবি। কেবলই মনে হয়, আমি একদিন সব কুন্ত্রও ত্যাগ করে পাহাড়ে চলে যাবো। যখন যাবো তখন আর কোনো অপমানই আমার গায়ে লেগে থাকবে না।

ঘুমের মধ্যেও দীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিকই কাজ করছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে কলের পুতুলের মতো সোজা হয়ে বসল সে। সূর্যের শেষ একটু আলো গাছের গায়ে ছায়া ভেদ করে ঘোলা জলের মতো ছড়িয়ে আছে এখনো। লানচ কখন শেষ হয়ে গেছে!

যে জায়গায় দীপ শুয়ে ছিল সেটা বাগানের শেষ প্রান্তে, একটা পুকুর পেরিয়ে। এখান থেকে কিছুই দেখা যায় না।

প্রচণ্ড শীত করছিল তার। মাটির ওপর শুয়ে থাকায় জামা কাপড়ে একটা ভেজা-ভেজা ভাব। শুকনো মরা ঘাস লেগে আছে গায়ে।

উঠে সে দ্রুত পায়ে বাড়ির সামনের চাতালে চলে আসে।

দেখে কোনো লোক নেই। একটা গাড়িও নেই। সবাই চলে গেছে।

দীপনাথ একটু হতবুদ্ধি হয়ে যায়। পার্টি সন্ধে পর্যন্ত চলার কথা ছিল। তবে কি সাহেবরা মদ খেয়ে বেশী মাত্রায় বেচাল হয়ে পড়েছিল ?

তাই হবে।

রাস্তার এসে সে দেখতে পায়, একটা ভ্যান-গাড়িতে কেটারারের লোকেরা মালপত্র তুলছে।

সে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, পার্টি ভেঙে গেল, ভাই ?

একটা ছেলে খুব সুন্দর করে হেসে বলে হ্যাঁ। সাহেবরা মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন।

দীপনাথ মনে মনে হিসেব কষছিল। তাকে ফিরতে হবে। কেউ তাকে ফেলে গেছে বলেই তো সে আর পড়ে থাকতে পারে না।

সে বলল আমি বোস সাহেবের সেক্রেটারি। একটা জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলাম। তোমাদের গাড়িতে আমাকে একটু পৌঁছে দাও।

কেটারারের লোকেরা রাজি হচ্ছিল না। সন্দেহ করছে।

পাঁচটা টাকা কবুল করে এবং প্রায় হাতে পায়ে ধরে অবশেষে জায়গা পেয়ে গেল দীপ। ড্রাইভারের পাশেই। খুব ঠাসাঠাসি চাপাচাপির মধ্যে বসে সে বন্দুকগুলোর কথা ভাবছিল। বন্দুকগুলো ঠিক-ঠাকমতো ওরা নিয়ে গেছে তো ? ফেরার সময়ে বন্দুকগুলো ধরে বসে ছিলই বা কে ? (ক্রমশ)
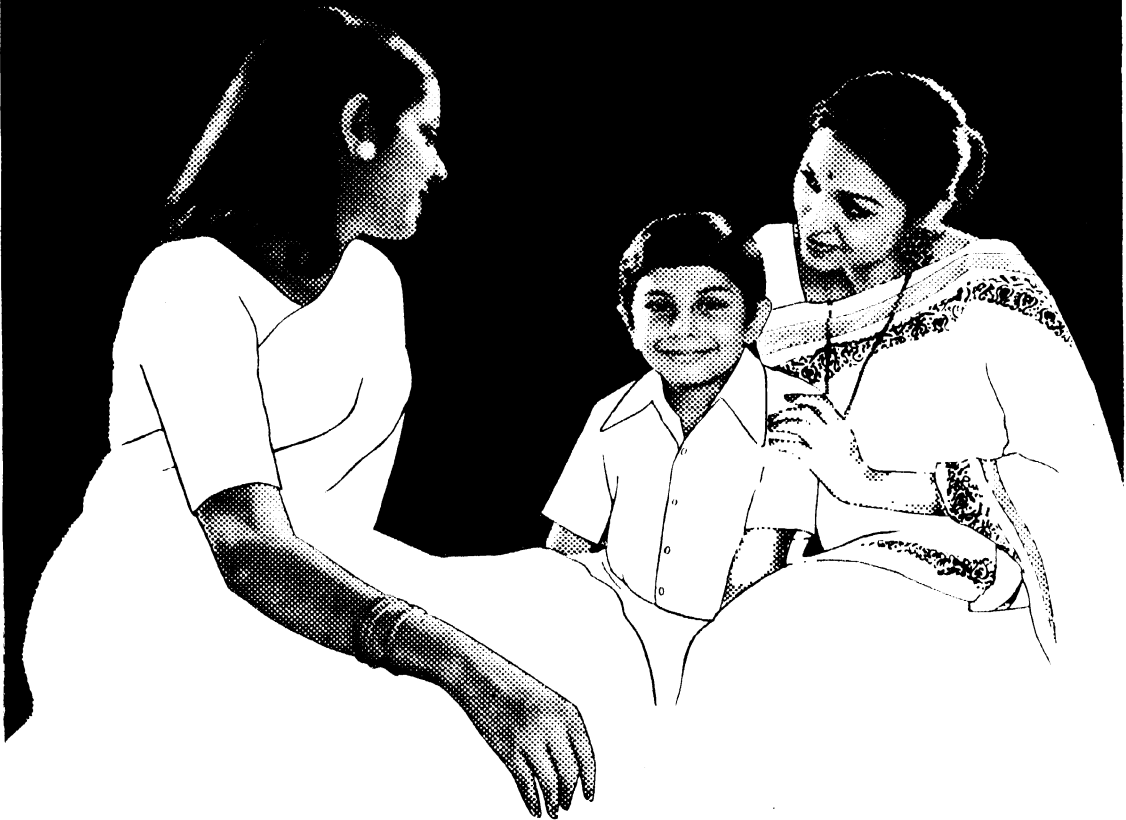
সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য

গোপাল চন্দ্র রায়

॥ ১ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের একটি ছোট্ট অথচ অতি সুন্দর জীবনী লিখে গেছেন। সেইটিই সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র জীবনী। এই জীবনী থেকে জানা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র Bengal Ryot নামে একটি তথ্যবহুল মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করলে, বাঙ্গলার তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গবর্নর সাহেব সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি উপহার দিয়েছিলেন।

তখনকার দিনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে স্থায়ী হতে হলে দুটো করে পরীক্ষা দিতে হত। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম পরীক্ষায় পাস করেছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষার ফেল করেন।

সঞ্জীবচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, তিনি দ্বিতীয় পরীক্ষায়ও পাস করেছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা করে তাঁকে ফেল করানো হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল আপিসের কোন কর্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে একথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম। জানানোও হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।...গবর্নমেণ্ট এ কথার আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দুইদিক রাখা রকমের। সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটীগিরি আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটি চাকরি দিলেন। বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সাব রেজিস্ট্রার থাকিত। গবর্নমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।"

সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবেশী এবং উভয়েরই স্নেহভাজন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি চলে যাওয়া সম্বন্ধে একটা কাহিনী লিখে গেছেন। শাস্ত্রী মশায়ের সেই লেখাটি এই—

"সঞ্জীবচন্দ্র খুব রসিক লোক ছিলেন। একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটীগিরিটি যায়। সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে ডিষ্ট্রিক্ট টাউন্‌স অ্যাক্ট পাস হইল। ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজ সাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে। টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে। সংকল্প হইল ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজ সাহেব বলিলেন—"আরও ৭৫ টাকা চাই. কারণ বাঙ্গালা নামগুলো কে বুঝিবে? ও গুলো ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া দিতে হইবে। 'বৌমার গলি' বলিলে কেহই চিনিবে না, Daughter-in-Law's Lane বলিতে হইবে।" জজ সাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছেন না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন—"৭৫ টাকায় হইবে না, আমি প্রস্তাব করি আরও ৩০০ টাকা দেওয়া দরকার।' জজ সাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন? কেন?' সঞ্জীববাবু বলিলেন—'আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জমা করিতে হইবে। মনে করুন, কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে? উঁহাকে Black-footed friend বলিয়া তর্জমা করিতে হইবে।' সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জজ সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপি লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন—সঞ্জীব, ভাল কাজ করিলে না। বাড়ি গিয়া উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস। সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জজ সাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন। সাহেব দেখা করিলেন না।

"সপ্তাহ খানেক পরে খবর আসিল জজ সাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন চারবার পরীক্ষা দিলেন কিছুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজ সাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাস করিতে না পারিবার কার্য কারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন আছে।

"তখন দিন কতক তিনি সাব রেজিস্ট্রার থাকিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিবার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র এবং শাস্ত্রী মশায় উভয়েরই লেখায় দেখা যাচ্ছে যে, সঞ্জীবচন্দ্রের মতে তাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিটি যাওয়ার পিছনে একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের রসিকতার কাহিনীটি বা জজ সাহেবের সেক্রেটারী হওয়া ও সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করানোর কথা নেই, তবুও তিনি বেঙ্গল অফিসের কর্মচারীটির ইচ্ছাপূর্বক ফেল করানোর যে কথাটি বলেছেন, সেই কথাটিকেই, সেক্রেটারী সাহেবের নির্দেশে ঐ কর্মচারীটি ঐরূপ করেছিল বলেও অনুমান করা যেতে পারে।

পরীক্ষায় পাস মার্ক থাকা সত্ত্বেও ঠিক ভুল করে ইচ্ছাপূর্বক সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করানো হয়েছে, একথা সঞ্জীবচন্দ্রের মুখে শুনে বঙ্কিমচন্দ্র বড় সাহেবদের সে কথা জানাবার জন্য সঞ্জীবচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আরও

সঞ্জীবচন্দ্র

লিখেছেন—"কোন কেরাণি যদি কৌশল করে, তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাগুলি থেকে যেন মনে হয়, সঞ্জীবচন্দ্রের চাকরি যাওয়ার ব্যাপারে তিনি সাহেবদিগকে নির্দোষ বলেই জানতেন। তাই সেক্রেটারী সাহেবের চক্রান্তের কথা ও সঞ্জীবচন্দ্রের রসিকতার কাহিনীটি তাঁর জানা ছিল না, এমনও হতে পারে। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাঁর রসিকতার কাহিনীটি গোপন করলে, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তা না জানবারই কথা। কিন্তু একটা প্রশ্ন ওঠে, সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট একথা গোপন করবেনই বা কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেও এজন্য কথা শুনবার ভয়ে তিনি গোপন করতেও পারেন।

যে কর্মচারীটি ঠিক ভুল করে ইচ্ছাপূর্বক সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করিয়েছিল, সেই কর্মচারীটি থেকে সেক্রেটারী সাহেব পর্যন্ত মাঝে নিশ্চয়ই আরও অনেক সাহেব কর্মচারী ছিল। বড় সাহেবদের জানানোর কথায় বঙ্কিমচন্দ্র যদি কেবল তাঁদেরই বুঝিয়ে থাকেন, তা হলে অবশ্য সেক্রেটারী সাহেবের কথা বাদ পড়ে এবং সঞ্জীবচন্দ্রের রসিকতার কাহিনীটি তাঁর জানা ছিল, এমন অনুমান করাও যেতে পারে। কিন্তু ঘটনাটি জানা থাকলে, তিনি উল্লেখ করবেনই না বা কেন? এরও উত্তরে বলা যেতে পারে, হয়তো বা অনাবশ্যক বোধেই উল্লেখ করেননি।

যাই হোক, রসিকতার কাহিনীটি বঙ্কিমচন্দ্রের জানা থাকুক আর নাই থাকুক, ইচ্ছাপূর্বক যে সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করানো হয়েছিল, একথা বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের মুখেই শুনেছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এবং শাস্ত্রী মশায় উভয়েরই লেখায় সঞ্জীবচন্দ্রের পরীক্ষায় ফেল হওয়ার পিছনে একটি চক্রান্তের সামঞ্জস্য দেখে শাস্ত্রী মশায় বর্ণিত সঞ্জীবচন্দ্রের রসিকতার কাহিনীটিকে সত্য বলেই মনে হয়।

পরীক্ষায় পাস মার্ক থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্বক সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করানো হয়েছিল, এ কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের মুখে যেমন শুনেছিলেন, তেমনি শাস্ত্রী মশায় তাঁর বর্ণিত সঞ্জীবচন্দ্রের রসিকতার কাহিনীটি সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের মুখে শুনেছিলেন কিনা তার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। উল্লেখ না থাকলেও সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে শাস্ত্রী মশায়ের যথেষ্ট হৃদ্যতা ও মেলামেশা ছিল বলেই এটি তিনি সঞ্জীবচন্দ্রেরই মুখে শুনেছিলেন বলে ধরা যেতে পারে।

প্রতিটি মুহূর্তই
খুশী আনন্দে ভরা
সঙ্গে যদি থাকে
আগ্‌ফা-ক্লিক
ক্যামেরা !
পিকনিক, পার্টি জন্মদিন, ছুটিতে ভ্রমণ. সবেরই আনন্দঘন মুহূর্তগুলি আগ্‌ফা-ক্লিক ক্যামেরায় ধরে রাখুন । এত কম দামে এত অপার আনন্দ, আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না ।
এই আনন্দদায়ক সুবিধেজনক 'ক্লিক' সর্বদা সঙ্গে রাখুন । আপনার নিকটতম আগফা-গেভার্ট ডীলারের কাছে এখনই চলে আসুন ।
পরিবেশক ঃ
আগ্‌ফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড,
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ
মার্চেণ্ট চেম্বার,
৪১, নিউ মেরিন লাইন্‌স.
বম্বে ৪০০ ০২০
লেখামাত্রই ছবি তোলা যায়
ক্লিক III আর ক্লিক IV
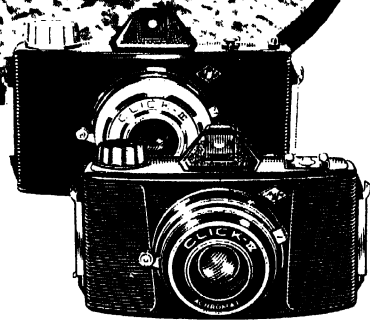
No.

Fort William, the 1869.

Sir,

I am directed to inform you that the Lieutenant-Governor has

I have the honor to be

Sir,
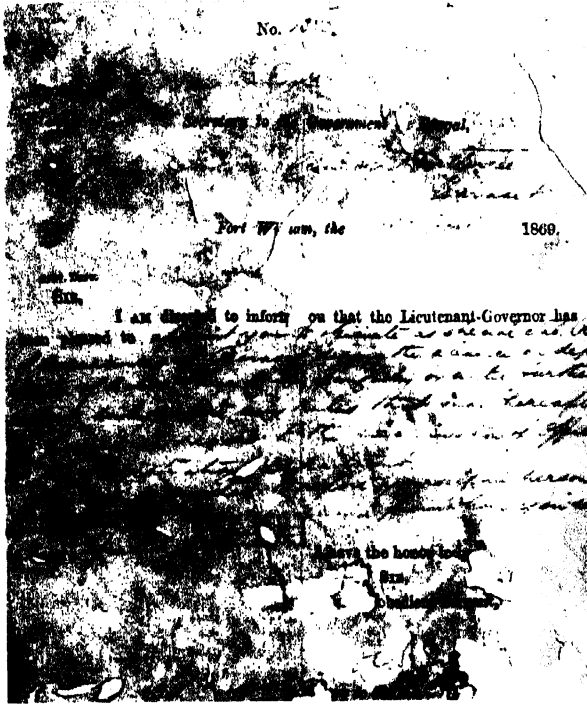
সঞ্জীবচন্দ্রের স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রার চাকরির নিয়োগপত্র

সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে। আর শাস্ত্রী মশায় সঞ্জীবচন্দ্রের এই রসিকতার কাহিনীটি লেখেন ১৩২২ সালে বৈশাখ মাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায়, অর্থাৎ সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর ২৬।২৭ বৎসর পরে। শাস্ত্রী মশায় অনেকদিন পরে কাহিনীটি লেখেন বলেই হোক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাঁর বর্ণিত সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ রসিকতার কাহিনীটির মধ্যে দু-একটা ছোটখাট ভুল থেকে গেছে। এইবার সেইগুলিরই আলোচনা করছি। যেমন—শাস্ত্রী মশায়ের লেখায় আছে, ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে 'ডিস্ট্রিক্ট টাউন্স অ্যাক্ট' পাস হওয়ার পর কমিটির এক দিনকার সভায় সঞ্জীবচন্দ্র রসিকতা করেছিলেন এবং তারই ফলে জজ সাহেব সেক্রেটারী হয়ে সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করিয়ে ছিলেন। কিন্তু কাটালপাড়ায় বঙ্কিম ভবনে প্রতিষ্ঠিত ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত সঞ্জীবচন্দ্র সংক্রান্ত কাগজপত্র থেকে জানা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়েছিলেন ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এবং তাঁর ঐ চাকরি যায় ১৮৬৯-এর ৫ই জুলাই।

এখন কথা হচ্ছে, তা হলে শাস্ত্রী মশায় বর্ণিত ডিস্ট্রিক্ট টাউনস অ্যাক্ট পাসের তারিখটি কি ছাপার ভুল, না তাঁর নিজেরই লেখার ভুল? এই তারিখটি ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ না হয়ে আরও কয়েক বছর পিছিয়ে একটা তারিখ হলে হয়তো সমস্ত দিকেই একটা মিল হতে পারে। এইটাই ঠিক। কারণ, অনুসন্ধান করে জেনেছি, ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ডিস্ট্রিক্ট টাউনাস অ্যাক্ট পাস হয়েছিল। তা হলে, ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ডিস্ট্রিক্ট টাউনস অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর কোন এক সময়ে রাস্তার নামকরণ সংক্রান্ত সেই সভা (যাতে সঞ্জীবচন্দ্র রসিকতা করেছিলেন), তারপর সঞ্জীবচন্দ্রের পরীক্ষা এবং পরীক্ষায় ফেল হওয়া, সব দিক থেকে তারিখের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

এই তারিখের ভুল ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সঙ্গে শাস্ত্রী মশায়ের বর্ণিত কাহিনীর আরও একটু অমিল রয়েছে। যেমন শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন—সঞ্জীবচন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিটি হারাইয়া দিন কতক সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিবার পর সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়।

শাস্ত্রী মশায়ের এই লেখাটা পড়লে মনে হবে—সঞ্জীবচন্দ্র 'দিন কতক' অর্থাৎ অল্প কয়েক দিন মাত্র সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন। আর ঐ চাকরিতে তিনি সুবিধা করতে পারেন নি। ফলে, হয় তিনি নিজে ঐ চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন, নয় তো ঐ চাকরিটিও হারিয়ে বন্ধ বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নিয়ে ছিলেন।

শাস্ত্রী মশায়ের কথাগুলি ঠিক নয়। কারণ, আমরা জানি সঞ্জীবচন্দ্র 'দিন কতক' নয়, দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি করেছিলেন। এবং বেশ দক্ষতার সঙ্গেই এ চাকরি করেছিলেন। আর এই সাব রেজিস্ট্রার থাকা কালেই নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি সাহিত্যিক বন্ধুদের অনুরোধে এবং বঙ্কিমচন্দ্রেরও ইচ্ছায় ১২৮৪ সালে বা ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন।

আমি যে বলেছি, সঞ্জীবচন্দ্র দীর্ঘ ১২ বছর সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি করেছিলেন, তার প্রমাণ হিসাবে বারাসতে তাঁর স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রারের চাকরির নিয়োগপত্র এবং তাঁর নিজের ডায়রি থেকে তাঁর এই চাকরি ছেড়ে দেওয়ার তারিখটিও এখানে পর পর উদ্ধৃত করছি—

No—R|1372

From—illegible
Secretary to the Government of Bengal
To—Baboo Sunjeeb Chunder Chatterjee,
Baraset

Fort William, the 18th Octr 1869

Appt. Dept.

Sir,

I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to officiate as special Sub-Regr. of assurances of Baraset during the absence on deputation of Baboo Uma Charan Gangooly or until further order, subject to any rules that may hereafter be passed in regard to the examination of Officers of the Registration Department.

2. You are requested to report yourself in person or by letter to the Registrar General from whom you will receive further instruction.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient servant
illegible
Secretary to the Government of Bengal

এই নিয়োগপত্র সঞ্জীবচন্দ্রের ঠিকানা কাটালপাড়ার বদলে বারাসত লেখা হয়েছে। তাই প্রশ্ন জাগে, তা হলে কি সঞ্জীবচন্দ্র ১৮ই অক্টোবর (১৮৬৯)-এর আগেই মুখের কথায় ঐ চাকরিতে ঢুকে তখন বারাসতবাসী হয়েছিলেন?

যাই হোক, দেখা গেল সঞ্জীবচন্দ্র জুলাই মাসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি হারিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই সাব রেজিস্ট্রারের চাকরিটি পেয়েছিলেন। এরও প্রায় দেড় মাস পরে তিনি ঐ বারাসতেরই স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রার পদে অস্থায়ী থেকে স্থায়ী হন।

তখনকার সেই নিয়োগপত্রটি ছিল এই—

No—G|369

From—H. S. Beadon Esq
Offg. Under-Secretary to the Government of Bengal
To—Babu Sunjeeb Chunder Chatterjee,
Offg. Sub Registrar of Baraset.

Fort William, the 5th Decr 1870

Appt. Dept.

Sir,

I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be special Sub-Registrar of Assurances of Baraset.

I have the honor to be
Sir,
Your most obedient Servant
H. S. Beadon
Offg. Under-Secretary to the Government of Bengal

এবার সঞ্জীবচন্দ্রের ডায়রি থেকে তাঁর স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার লেখাটি উদ্ধৃত করছি—

15th April '81

From this date I am no longer in the service; my leave expired yesterday and I sent in my resignation on that day.

অতএব দেখা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬৯ থেকে ১৮৮১ পর্যন্ত স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন।

সাব রেজিস্ট্রার থাকাকালে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে উপরওয়ালাদের মন্তব্যগুলি রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে সংগ্রহ করে একটি কাগজে লিখে রেখে ছিলেন। তিনি যে দক্ষ সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন, তার প্রমাণ হিসাবে সেই লেখা থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃত করছি—

Registration Dept.

1. Extract from a letter from P. Diskins Esq

Interpub/S/5/79 BN

মনপছন্দ ১০১ টি নানান ধরনের ডিজাইন, সুপার কটন ও ব্লেণ্ডেড স্যুটিং, শার্টিং, ড্রেস মেটিরিয়াল ও শাড়ী।

Registrar of Presidency District No. 94 of the 7th May 1870

'I desire to notice among Special Sub Registrars Babus . . . . . and Sunjeeb Chunder Chatterjee for the energy and care they have displayed.'

2. Extract from a letter from the Registrar General, No 2120 of the 9th July 1870 Para 9 to the Registrar of the Presidency District.

'Babu Sunjeeb Chunder Chatterjee deserves great credit for his lucid and able report upon the state of the Satkhira office.'

3. Extract from a letter from the Registrar General to Babu Sunjeeb Chunder Chatterjee Special Sub Registrar No. 3364 dated 25th November 1870

'I have to thank you for the suggestions you have offered in regard to the Registration Bill.'

4. Administration Report of the Registration Department for 1871-72, para 46 makes mention that Babu Sunjeeb Chunder Chatterjee deserves credit for the manner in which he supervised his office.

5. Govt. Resolution dated 25th October 1872 para 27 noticed with pleasure the praise bestowed by the Inspector General upon Babu Sunjeeb Chunder Chatterjee

6. Govt. Resolution dated 11 January 1875 para 18 notices with pleasure the favourable testimony borne to the work done by Babu Sunjeeb Chunder Chatterjee.

7. Extract from the Administration Report of the District of Jessore No 1287 dated 18th May 1880

'The special Sub Registrar Babu Sunjeeb Chunder Chatterjee has been of the most material assistance to me. He takes a thoroughly intelligent interest in the work.'

এখানে এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে ২য় উদ্ধৃতিটিতে সাতক্ষীরার কথা আছে। মনে হয়, তখন সাতক্ষীরা বারাসতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সাতক্ষীরা বারাসত থেকে খুব বেশী দূরেও নয়।) কেন না, সঞ্জীবচন্দ্র বারাসতের স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রার থাকাকালেই ১৮৭১-এর জুলাই মাসে ওখান থেকে হুগলীতে বদলি

Extracts from annual reports by Magistrates, Collectors, and Commissione[rs] relating to the official character of BABOO SUNJEEB CHUNDER CHATTERJEE.

Mr. E. Grey, Magistrate of Nuddea, in his Police Report for 1864.	"A very good officer. He is painstaking intelligent, his natural self-reliance and in[de]pendence of character ought to make h[im a] valuable judicial officer."
Lord Ullick Browne, Magistrate of Nuddea, Police Report for 1865	"He is very willing and quick, and it will [be] seen that there were no appeals from his d[eci]sions. He promises to turn out a very g[ood] officer."
Lord Ullicke Browne, Collector of Nuddea, Revenue Report for 1865 1866	"An officer of good ability and acquiremen[ts]"
Mr. H. L. Dampier, Commissioner of Presidency Division, Revenue Report, the year	"Very able."
Mr. H. L. Dampier, Police Report for 1865.	(In allusion to my transfer from Nud[dea]) "His loss is very much regretted in the Distr[ict]."
Colonel Dalton, Commissioner of Chota Nagpore, Revenue Report 1865-1866.	"Zealous and intelligent officer."
Mr. J. Monro, Collector of Jessore, Revenue Report 1867-1868.	"An officer of ability and promise, intellig[ent] and willing."
Mr. P. A. Humphrey, Magistrate of Pubna, Police Report for 1868	"Very intelligent; works hard, and does work satisfactorily."
Mr. P. A. Humphrey, Collector of Pubna, Revenue Report for 1868-1869.	"An excellent executive officer and an effic[ient] Abkaree Deputy Collector: his decisions have been good, and he takes pains in his wo[rk]"

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চাকরিতে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রশংসা

হয়ে আসেন। এ সম্পর্কে তাঁকে লেখা তখনকার সরকারী চিঠিটি এই—

No—G|619
From R. H. Wilson Esq.
Offg. Under-Secretary to the Government of Bengal
To Baboo Sunjeeb Chunder Chatterjee
Special Sub Registrar at Baraset
Dated Fort William, the 26th June 1871
Appointment Dept.

Sir,

I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be Special Sub Registrar of Hooghly, with effect from 1st July 1871.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient servant
R. H. Wilson
Offg. Under-Secretary to the Government of Bengal.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্ত্রী মশায় বর্ণিত সঞ্জীবচন্দ্রের 'ব্ল্যাক ফুটেট ফ্রেন্ড' রসিকতাটি নিয়ে তাঁর সম্পাদিত 'সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

'কুখ্যাত জজ সাহেবের প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টার ফলে পরীক্ষায় ভালো লিখেও সঞ্জীবচন্দ্র অকৃতকার্য হলেন।* ছুটি নিয়ে বাড়ি বসে রইলেন। ইতিমধ্যে পিতা যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হ'ল। সঞ্জীবচন্দ্রও চাকরির দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। পিতার ভয়েই তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজে কর্মে লিপ্ত ছিলেন। এবার সে ভয়ও ঘুচে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাস উঠিয়ে কলকাতায় চলে এলেন, সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটির চাকরি ত্যাগ করে কাঁটালপাড়ায় অলসভাবে দিন গুজরান করতে লাগলেন।

* এই গল্পটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন। দ্রষ্টব্য—হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪ পাদটীকা। বার্টন নামে একজন নরাধম ইংরেজ কালেক্টারের (সঞ্জীবনী সুধা) দ্বারা অপমানিত হয়েই তিনি চাকরি ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন।'

দেখা যাচ্ছে, অসিতবাবু বঙ্কিমচন্দ্র এবং শাস্ত্রী মশায় উভয়েরই লেখা পড়ে এই কথাগুলি লিখেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি হারিয়ে সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি করেছিলেন—এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র তো অতি বিস্তৃতভাবেই এবং শাস্ত্রী মশায়ও সংক্ষেপে লিখলেও, অসিতবাবু সঞ্জীবচন্দ্রের এই চাকরির কথা আদৌ উল্লেখ করেননি।

পিতার মৃত্যুর পর সঞ্জীবচন্দ্র স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি ত্যাগ করেন, এ কথা না বলে, ডেপুটির চাকরি ত্যাগ করেন বলে অসিতবাবু যেমন ভুল করেছেন, তেমনি, সঞ্জীবচন্দ্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে রইলেন, একথা বলেও ভুল করেছেন। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি থেকে অপসারিতই করা হয়েছিল। তাই ছুটি নেওয়ার কোন কথাই উঠতে পারে না। আর রাস্তা সংক্রান্ত সভায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সভাপতি না লিখে, জজ সাহেব সভাপতি লিখেও অসিতবাবু ভুল করেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটির চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাঁটালপাড়ায় অলসভাবে দিন গুজরান করতে লাগলেন বলে, এরপরে অসিতবাবু আবার যা যা বলেছেন, সেগুলোও ভুল। তিনি লিখেছেন—সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশের প্রথম দিকে খুব উৎসাহের সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদনা ও অন্যান্য কাজে যোগ দিলেন, কিন্তু দু-এক বছরের পর তাঁর পুরাতন আলস্য, কর্মে অনিচ্ছা ও অনুৎসাহ আবার ফিরে এল। তাঁর অসহযোগিতার জন্য পত্রিকা আর নিয়মিত প্রকাশিত হয় না। ইত্যাদি।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের শুধু প্রথম দিকে কেন, এই পত্রিকার প্রথম চারটা বছরই সম্পাদনার কাজে সঞ্জীবচন্দ্রের যোগ দেওয়ার কোন কথাই আসতে পারে না। কারণ ঐ সময় তিনি দূরে তাঁর স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি নিয়ে ব্যস্ত, আর স্বয়ং সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর ডেপুটির চাকরি নিয়ে অন্যত্র ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র 'অন্যান্য কাজের' মধ্যে বঙ্গদর্শন প্রকাশের দ্বিতীয় বছরে বাড়িতে যে 'বঙ্গদর্শন প্রেস' করেছিলেন, সেটা মূলত তাঁর উপার্জনহীন পুত্রের একটা উপায় করে দেবার জন্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনাকালে বঙ্গদর্শন ঠিক সময়েই প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি এক বছর বন্ধ থাকার পর, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালেও প্রথম দু বছরের অর্থাৎ ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষের বঙ্গদর্শনও যথাসময়েই বেরিয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র তখনও পরাক্রমে এবং সুখ্যাতির সঙ্গেই দূরে তাঁর চাকরিতে ব্যাপৃত ছিলেন।

অসিতবাবু বলেছেন—ক্রমে বঙ্গদর্শনের ও ছাপাখানার অপমৃত্যু হ'ল। এরপর কর্মহীন, উৎসাহহীন, অলস সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বসে তাকিয়া আশ্রয় করে কেবল উৎসাহ সহকারে ফুলবাগান পাহারা দিতেন।

আগে বঙ্গদর্শন নয়। আগে ছাপাখানা যায়। ছাপাখানা গেলে তখন বঙ্গদর্শন

শীত যেই আসে
মডেলার
কথাই মনে ভাসে।
আপনার আদরের
ছোট্ট মেয়ের চাই...
স্নেহ-ভালবাসা আর
মডেলার উষ্ণতা-ভরা আরাম।
modella
কম্বল, রাগ, বোনার উল
মডেলা টেক্সটাইল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাঃ লিমিটেড
মডেলাগ্রাম, থানে, মহারাষ্ট্র।
CONCEPT-MTI-3851 BEN

জনসন প্রেসে' ছাপা হত। ছাপাখানা যাওয়ার অন্তত বছর দুই পরে বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়। আর ছাপাখানা ও বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার অনেক আগেই বাড়ির ফুল-বাগানে পিতা যাদবচন্দ্রের শিবমন্দির তৈরী হয়েছিল।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে কিভাবে সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়েছিল, আর সঞ্জীবচন্দ্রও এই হারানো চাকরি আবার ফিরে পাওয়ার জন্য কত যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন, সে সব সম্বন্ধে. খণ্ডিত হলেও কিছু কাগজপত্র কাঁটালপাড়ায় 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহ-শালায় রয়েছে। এখানে এখন সেই সব কাগজপত্র থেকে কিছু বলছি—

সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬৯-এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায়, পরীক্ষার ফল বেরোবার পর ৫ই জুলাই তারিখে বেঙ্গল গবর্নমেণ্ট এক প্রস্তাব করে তাঁকে চাকরি থেকে অপসারিত করেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি হারিয়ে ১৮ই আগস্ট (১৮৬৯) তারিখে বেঙ্গল গবর্ন-মেণ্টের সেক্রেটারীর কাছে এই নিয়ে এক দীর্ঘ দরখাস্ত করেছিলেন। তাতে তিনি প্রধানত যে যে কথা বলেছিলেন, সেগুলো হল—

জুডিসিয়াল পেপারে আমাকে ২৩ নম্বর দিয়ে ফেল করানো হয়েছে। সেণ্ট্রাল কমিটি থেকে জেনেছি, ২৩ নয়, আমি ৭৩ পেয়েছি। আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে ঐ বিভাগে খোঁজ নিতে পারেন।

পরীক্ষায় আমি একটা বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার মত যাঁরা একটা বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন, আমার সেই সব সহকর্মীদের সকলেরই চাকরি আছে। তাই আমাকেও একটা বিভাগে উত্তীর্ণ ঘোষণা করে, চাকরিতে বহাল রাখা হোক।

সঞ্জীবচন্দ্র এইভাবে তাঁকে চাকরিতে রাখার জন্য অনেকগুলি যুক্তি দেখিয়ে তাঁর দরখাস্তের শেষে এ কথাও লিখেছিলেন—মাননীয় লেফটেনাণ্ট গবর্নর বাহাদুর যদি একান্তই আমাকে আর আমার কাজে পুনর্বহাল করতে না পারেন, তবে যেন আমার চাকরির সমান বেতনের এবং সমান উন্নতির একটি চাকরি দেন।

বেঙ্গল গবর্নমেণ্ট সঞ্জীবচন্দ্রকে আর তাঁর আগের চাকরিটি না দিয়ে বারাসতে তাঁকে সমান বেতনের একটি স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি দিয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর শেষ প্রার্থনা মত সমান বেতনেরই একটা চাকরি পেলেও তিনি কিন্তু তাঁর ডেপুটির চাকরির কথা ভুলতে পারলেন না। তাই তিনি বারাসতে নতুন চাকরিতে লেগে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে এই নিয়ে 'ভাইসরয় অ্যাণ্ড গভর্নর জেনারেল' বা বড়লাটের কাছেও একটি দরখাস্ত করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন—আমি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে আমার উপরওয়ালারা আমার কাজের যে সব সুখ্যাতি করেছিলেন, তার ভিত্তিতেও অন্তত আমাকে কাজে পুনর্বহাল করা হোক।—এই বলে তিনি দরখাস্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে তাঁর উপরওয়ালাদের লেখা প্রশংসার কথাগুলিও দিয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র বড়লাটের কাছে দরখাস্তে এও বলেছিলেন—আমাকে অন্তত আর একবার পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক।

বড়লাট, লেফটেনাণ্ট গবর্নর বা ছোটলাটের সিদ্ধান্তের উপর কোনও মত প্রকাশে অনিচ্ছুক হন। তাই সঞ্জীবচন্দ্র বড়লাটের কাছে আবেদন করেও ব্যর্থ হন।

এরপর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে সঞ্জীবচন্দ্র বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারীর কাছেও আবেদন জানান, তাঁকে আর একবার পরীক্ষায় বসতে দেবার অনুমতি দেওয়া হোক।

এ আবেদনও ব্যর্থ হয়।

কয়েক বছর কেটে গেল। সঞ্জীবচন্দ্র এবার তাঁর এই নতুন চাকরিতেই বর্ধমানে বদলি হয়ে এলেন। এই সময় ১৮৭৮-এর নভেম্বর মাসে তিনি আর একবার চেষ্টা করলেন।

তখনকার দিনে অনেক অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত সরকারী কর্মচারীকে নীচু পদ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত করার নিয়ম ছিল। সেই হিসাবে তিনি এবার বর্ধমানের রেজিস্ট্রারকে দিয়ে তখনকার রেজিস্ট্রী ডিপার্টমেণ্টের ইনসপেকটর জেনারেলকে এক চিঠি লেখান। তাতে বর্ধমানের রেজিস্ট্রার ইনসপেকটর জেনারেলকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন সঞ্জীবচন্দ্রকে দক্ষ কর্মচারী ঘোষণা করে বেঙ্গল গবর্নমেণ্টকে বলেন—তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত করা হোক।

ইনসপেকটর জেনারেল তখন বর্ধমানের রেজিস্ট্রারের চিঠির উত্তরে তাঁকে লিখেছিলেন—লেফটেনাণ্ট গবর্নর একবার যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বলে অপসারিত করেছেন, পুনরায় তাঁকে সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দিতে চান না। ইত্যাদি

সঞ্জীবচন্দ্র এই সময় বর্ধমান থেকে যশোহরে বদলি হন। সেখানে বার্টন নামা এক 'নরাধম' ইংরাজের অত্যাচারে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর চাকরি ছেড়ে দেন সেকথা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী থেকে জানা যায়।

সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি হারিয়ে পুনরায় সেই চাকরি পাওয়ার আশায় তাঁর সম্বন্ধে তাঁর উপরওয়ালাদের মন্তব্য সহ বড়লাটের কাছে যে দরখাস্ত করেছিলেন, এখানে উপরওয়ালাদের সেই মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করছি। এ থেকে দেখা যাবে, সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবেও বেশ সুদক্ষ ছিলেন। উপরওয়ালা ও তাঁদের মন্তব্যগুলি এই—

Mr. E. Grey, Magistrate of Nuddea, in his Police Report for 1864.

'A very good officer. He is painstaking and intelligent; his natural self-reliance and independence of character ought to make him a valuable judicial officer.'

Lord Ullicke Browne, Magistrate of Nuddea, Police Report for 1865

'He is very willing and quick, and it will be seen that there were no appeals from his decisions. He promises to turn out a very good officer.'

Lord Ullicke Browne, Collector of Nuddea, Revenue Report for 1865-1866.

'An officer of good ability and acquirements.'

Mr. H. L. Dampier, Commissioner of Presidency Division, Report, same year.

'Very able.'

Mr. H. L. Dampier, Police Report for 1865.

(In allusion to my transfer from Nuddea)

'His loss is very much regretted in the District.'

Colonel Dalton, Commissioner of Chota Nagpore, Revenue Report, 1865-1866

'Zealous and intelligent officer.'

Mr. J. Monro, Collector of Jessore, Revenue Report 1867-1868

'An officer of ability and promise, intelligent and willing.'

Mr. P. A. Humphrey, Magistrate of Pubna, Police Report for 1868.

'Very intelligent; works hard, and does his work satisfactorily.'

Mr. P. A. Humphrey, Collector of Pubna, Revenue Report for 1868-1869

'An excellent executive officer and an efficient Abkaree Deputy Collector : 'his decisions also have been good, and he takes pains in his work.'

সঞ্জীবচন্দ্র এত ভাল অফিসার হয়েও, এক সাহেবের সঙ্গে সামান্য একটা রসিকতা করতে গিয়েই নিজের অমন চাকরিটি হারিয়ে ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র যে কথাবার্তায় অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁর সমসাময়িক অনেকের লেখা থেকেও জানা যায়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র তো নিজেই লিখেছেন—'সঞ্জীবচন্দ্র কথোপকথনে অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন।'

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত।'

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—'একদিন বঙ্কিমবাবুর বাড়ি গিয়া দেখি তাঁহার নিকট হেমবাবু, চন্দ্রনাথবাবু এবং সঞ্জীববাবু বসিয়া আছেন। আমি আসিবার আগে ইঁহাদের ভারি একটা তর্ক চলিতেছিল। তর্কের বিষয় ইউনিভারসিটিতে মেয়েদের বি এ উপাধি লাভ উপলক্ষে হেমবাবুর অভিনন্দন কবিতাটি। হেমবাবু ইংরাজীতে বলিতেছিলেন—তোমাদের কোন উৎসাহ নাই, জীবন নাই।

সঞ্জীববাবু বলিলেন—ইহাতে বুঝা যাইতেছে তুমি সকলের ছোট।

হেমবাবু সঞ্জীববাবুর বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন। দুজনে একটু রহস্য চলিল।

শ্রীশবাবু অন্যত্র এ সম্পর্কে আরও লিখেছেন—'সঞ্জীববাবুর তামাসার মাত্রা কিছু বেশী বেশী, বঙ্কিমবাবুর ততটা নহে।'

॥ ২ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'আমাদের খুল্ল পিতামহ এক শত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি আমার পিতামহের মধ্যম ভ্রাতা। তাঁহাকে আমরা মেজ ঠাকুরদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম, তাহা বাংলার ইতিহাসের অন্তর্গত। উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসান কালের কথা। ইনি গল্প করিতে ভালবাসিতেন ও গল্প করিতে জানিতেন। আধুনিক কোনও কোনও বিদেশী গল্প-লেখকেরা যেমন নায়ককে মিস্টার ও নায়িকাকে মিস্ লিখিয়া থাকেন, এই বর্ষীয়ান তেমনই তাঁহার নায়ককে মির্জা ও নায়িকাকে বিবি বলিতেন। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিয়া ছিলেন। যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহা বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজ ঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম, জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজ ঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন এবং মান্দারণের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া ছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা

Interpub/AM/2/79-BN

রিটেল বিক্রেতা : কলিকাতা : গঙ্গাদিন গুপ্তা, ৩২ নিউ মার্কেট ● সুনিট, এফ-২৯/৩৮ নিউ মার্কেট ● মধুকুঞ্জ, মেন বাজার, বেগুসরাই ● পাটনা : চন্দুলাল দুর্গাপ্রসাদ, বাঁকীপুর ● সেলস রিপ্রেসেনটেটিভস ● আগ্রা : অরোরা টেকসটাইল ট্রেডিং করপোরেশন, ৪২/১৬৪ বিলোচপুর, মোতিকুঞ্জ রোড ● কানপুর : গনেশপ্রসাদ হীরালাল, ৪৯/২৬ জেনোরল গঞ্জ ● কলিকাতা : গিরধরীলাল রামনারায়ন, পি/১০ নিউ হাওরা ব্রীজ, এ্যাপ্রোচ রোড। আসাম : জয়শ্রী টেকসটাইলস, অশোক ভবন, এস আর সি বী রোড, গোহাটি ● ওরিষ্যা : আগরওয়াল টেকসটাইল এজেন্ট, জোনালিয়াপট্টি, কটক।

আরামবাগের আদালত গৃহ

হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। রাজপুতকুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়া ছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র অঠারো উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়া ছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল।

সরকারী কার্যোপলক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন। তিনিও ঐ ঘটনাটি সেখানে শুনিয়া আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। তখন বোধ হয় দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইয়াছিল।'

হুগলী জেলার আরামবাগ শহরের আগে নাম ছিল জাহানাবাদ।

সঞ্জীবচন্দ্র সরকারী কার্য উপলক্ষে কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন—পূর্ণবাবু এ কথা লিখলেও, সঞ্জীবচন্দ্র কি কাজ নিয়ে জাহানাবাদে গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতেও কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ নেই, যে, সঞ্জীবচন্দ্র কিছুদিন জাহানাবাদে ছিলেন।

আর একটা কথা। সঞ্জীবচন্দ্র কোন্ সময়ে জাহানাবাদে ছিলেন, সে সম্বন্ধেও পূর্ণবাবু কোন কথা বলেন নি। তবে তিনি যে বলেছেন—তখন বোধ হয় 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়েছিল—এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মার্চের পরে জাহানাবাদে গিয়েছিলেন। কারণ, আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী বই হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮৬৫র মার্চে।

পূর্ণবাবু 'বোধ হয়' বলে স্মৃতি থেকে বলতে গিয়ে সময়টা ভুল বলেছেন। কেননা, সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চের পরে আরও অনেক দিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের জাহানাবাদে থাকার কথায় 'নবজীবন' ও 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'পিতা-পুত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'৬০।৬১ (১৮৬০।৬১) সালে পিতা (রায়বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার) যখন জাহানাবাদে মুন্সেফ, বঙ্কিমবাবুর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র তখন জাহানাবাদে সাব রেজিস্ট্রার হইয়া গেলেন।'

সঞ্জীবচন্দ্র কোথায় কোথায় সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে সে কথা স্পষ্ট করে বলে গেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র জাহানাবাদের সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নি। তা ছাড়া, সঞ্জীবচন্দ্র তো সাব রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি হারিয়ে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। অতএব ১৮৬০।৬১তে তাঁর সাব রেজিস্ট্রার হওয়ার কোন কথাই আসতে পারে না।

আগে দেখেছি, সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়েছিলেন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পাওয়ার আগে সঞ্জীবচন্দ্র যে সরকারী চাকরি করেছিলেন, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

'তখন উইলসন সাহেব নূতন ইনকাম ট্যাক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতেছিল। পিতাঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াই শত টাকা বেতনে একটি আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র এই যে লিখেছেন—সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় আসেসর নিযুক্ত হয়েছিলেন—এই আসেসরের কাজেই সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬১।৬২ খৃষ্টাব্দে জাহানাবাদে ছিলেন।

পূর্ণবাবু ও অক্ষয়বাবুর কথা নাকচ করে দিয়ে, এই কথাটা এত জোর দিয়ে আমি যে স্পষ্ট করে বলছি, তার কারণ, কাঁটালপাড়ার ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার এ সম্পর্কে একটা ছোট কাগজ পেয়েছি। ঐ কাগজে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী আসেসর জীবনের কাজ সম্বন্ধে তাঁর উপরওয়ালা হুগলীর কালেকটর সাহেবের মন্তব্যগুলির নকল রেখে গেছেন। সেই মন্তব্যগুলি এই—

Extracts from the remarks made by the Collector Mr. A. V. Palmer of Hooghly on the revised abstract of the increase of the Income Tax establishmen' and in the annual Business statement for 1861|62, —

I strongly recommend that the native assessor Baboo Sunjib Chunder Chatterjee now entertained be continued on his present salary or if that is impossibble that he may be allowed 200 Rs pr menseum.

Baboo Sunjib Chunder Chatterjee assessor have acquitted himself creditably.

Sd. A. V. Palmer
Collector

Extract from the Diary of the Collector Mr. A. V. Palmer into his annual tour into the interior of the District in February 1862 —

I visited the assessor's office at Jehanabad. Found he had not very much work to do, but sufficient to occupy him. His office was clear, neat and orderly.

Sd. A. V. Palmer
Collector

এই কাগজটি পাওয়ায় কয়েকটা বিষয়ে বেশ পরিষ্কার আলো পাওয়া গেল। যেমন—(১) এই লেখাটা না পেলে, অনেকে, অনেকেই বা বলি কেন, হয়তো সকলেই অক্ষয়বাবুর কথাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে ভাবতেন, সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬০/৬১ খৃষ্টাব্দে জাহানাবাদের সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন। আর এই সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ভুল রয়েছে বলেও মনে করতেন। কিন্তু এখন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাই যে নির্ভুল তা দেখা গেল। (২) পূর্ণবাবুর লেখা পড়েও আবার কেউ কেউ অন্য সিদ্ধান্ত করতে পারতেন। তাঁদের সে সিদ্ধান্তেরও আর অবকাশ রইল না।

দুর্গেশনন্দিনীর রচনাকাল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) শচীশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে আরম্ভ করেন এবং পর বৎসর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে রচনা শেষ করেন।'

বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মী কালীনাথ দত্তর লেখা থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে এসে দুর্গেশনন্দিনী রচনা শেষ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে বদলি হয়ে এসেছিলেন ১৮৬৪র মার্চে।

শচীশবাবুর এবং কালীনাথবাবুর লেখায় দুর্গেশনন্দিনীর রচনাকাল নিয়ে সামান্য তারতম্য থাকলেও, উভয়েরই লেখা থেকে এটা দেখা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৩তেই দুর্গেশনন্দিনী লিখছিলেন।

আমরা জেনেছি, সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬২তে জাহানাবাদে ছিলেন। তাই পূর্ণবাবুর কথা অনুযায়ী এখন বলা যেতে পারে, সঞ্জীবচন্দ্র ঐ সময় কোন একদিন জাহানাবাদ থেকে বাড়ি এসে পূর্ণচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গড়মান্দারণের গল্প বলেছিলেন। আরও বলা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮/১৯ বছর বয়সে তাঁর মেজঠাকুরদার কাছে প্রথম গড়মান্দারণের কাহিনী শুনলেও ৬/৭ বছর পরে সে কাহিনীর অনেকটাই ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। এবার আবার সঞ্জীবচন্দ্রের মুখে গড়মান্দারণের গল্প শুনে অল্প দিন পরেই দুর্গেশনন্দিনী লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রকে দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনীর উপাদান সরবরাহের ব্যাপারে সঞ্জীবচন্দ্রের অবদান বা কৃতিত্ব যে অনেকখানি তা স্বীকার করতেই হবে।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও গড়মান্দারণ নিয়ে একটা দীর্ঘ দিনের প্রচলিত ভুলও সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। যেমন—আরামবাগের আদালত গৃহে আজও একটা শ্বেতপ্রস্তর ফলকে লেখা রয়েছে—

MANDARAN FORT IS THE SCENE OF THE STORY
'DURGESH NANDINI'
BY
BANKIM CHANDRA CHATTERJEE
WHO WAS SUB-DIVISIONAL OFFICER OF
JAHANABAD
(ARAMBAGH) ABOUT 1892

বলা হয়, বঙ্কিমচন্দ্র জাহানাবাদে (আরামবাগে) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে এই আদালত গৃহে বসেই বিচার করতেন। ঐ আদালত গৃহ এবং গৃহগাত্রের প্রস্তর ফলকটির আলোকচিত্রও এই সঙ্গে দেওয়া গেল। (ফটো—সুধীরকুমার মিত্র।) শুনেছি, আরামবাগের ইতিকথা গ্রন্থেও নাকি লেখা রয়েছে—বঙ্কিমচন্দ্র যখন আরামবাগের মহকুমা শাসক ছিলেন, তখন তিনি পদাধিকার বলে একাধিকবার আরামবাগ পৌরসভার সভাপতি হয়েছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার গ্রন্থেও লেখা রয়েছে:

This fort is the secne of the story 'Durgesh

15th April 81

Morning — arranged papers for one hour ... } 2 hrs

Noon — Wrote 7 letters private ... for 2 hours } 5 hrs
Superintendent Talked for 3 hours

Evening — felt exhaustion. was very sleepy — 7 hrs

There was a great hail storm just before candle light ... has blown down, a part of the great ... gave way.

From this date I ... in the service; my leave expired yesterday and I sent in my resignation on that day.

On the suggestion of Kopali Prosanna drew out a notification for ... This day I saw its proof.

ডায়রির একটি পাতা

Nandini' by the celebrated Bengali novelist Bankim Chandra Chatterjee, who was Sub-Divisional officer of Jahanabad about 20 years ago.

এগুলি সবই ভুল। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবনের ইতিহাস দেখলে জানা যায়, তিনি কোনদিনই জাহানাবাদে যান নি। আর তিনি চাকরি থেকে অবসরই তো নেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে। অবসর নেওয়ার আগে তিনি আলিপুরের মহকুমা শাসক ছিলেন ৩ বৎসর ৫ মাস॥

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমদিকের রচনা 'দুর্গেশনন্দিনী'র ন্যায় সঞ্জীবচন্দ্রেরও প্রথম জীবনের কয়েকটা রচনার কথা বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের যে জীবনী লিখেছেন, তা থেকে জানা যায়, বাল্যকাল থেকেই সঞ্জীবচন্দ্রের বাংলা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্তু বাল্যকালে তিনি কিছু লিখলেও সে সব লেখা কখনও কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আর আজ সে সবের পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে আরও জানা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র কৈশোরে কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত 'শশধর' পত্রিকায় দু-একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং লিখে প্রশংসাও পেয়েছিলেন।

বহু খোঁজ করেও 'শশধর' পত্রিকা কোথাও পাওয়া গেল না। আর পেলেও তখনকার একটা প্রথা মত ঐ শশধরে যদি লেখার সঙ্গে লেখকের নাম না থাকতো, তাহলে কোন্ কোন্ লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের তা আজ আর ঠিক করা যেত না।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম জীবনের এই সব রচনার কথাই বা কেন, তাঁর পরবর্তী জীবনের বহু লেখাও আজ আর বার করা যাচ্ছে না॥ এ সম্পর্কে এখন দু-একটা কথা বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা সম্বন্ধে বলেছেন—'সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনে দুইএকটা প্রবন্ধ লিখিলেন॥'

বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা লিখলেও, সঞ্জীবচন্দ্র যে বঙ্গদর্শনে কি কি প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন, সে সব প্রবন্ধের কোনটারই নাম উল্লেখ করেন নি॥ এদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত চার বছরের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত লেখাসমূহের মধ্যে কোন লেখার সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের নামও নেই। তাই কোন্ কোন্‌টা যে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা তা বার করা আজ একেবারেই অসম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ১২৭৯ সালের পৌষ সংখ্যায় এবং ১২৮০ সালের কার্তিক সংখ্যায় 'যাত্রা' নামে যে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই প্রবন্ধ দুটি দেখা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্রের 'যাত্রা সমালোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে॥ এতেই বোঝা যাচ্ছে, বঙ্গদর্শনের যাত্রা প্রবন্ধ দুটি ছিল সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা॥ এ ছাড়া, আর কোন রচনাই সুস্পষ্টভাবে সঞ্জীবচন্দ্রের বলে বার করা যাচ্ছে না।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'যাত্রা সমালোচনা' বইয়ে বঙ্গদর্শনের এই দুটি প্রবন্ধ ছাড়া তাঁর নিজের সম্পাদিত 'ভ্রমর' পত্রিকায় ১২৮২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত যাত্রা প্রবন্ধটিও যোগ করা হয়েছিল। ভ্রমরে প্রকাশিত ঐ যাত্রার সঙ্গেও লেখকের নাম ছিল না॥

'যাত্রা সমালোচনা' বইয়েও সঞ্জীবচন্দ্রের নাম ছিল না। ছিল কাঁটালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। হারানবাবু ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রেসের তখনকার ম্যানেজার॥

এই 'যাত্রা'র প্রসঙ্গেই আর একটা কথা॥ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত সঞ্জীব রচনাবলীর ভূমিকায় লিখেছেন—সঞ্জীবচন্দ্র যাত্রা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন একখানি ইংরেজী গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে। ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত যাত্রার উপরে লেখা 'দি যাত্রাস অর দি পপুলার ড্রামাস অব বেঙ্গল' বইটি সমালোচনার জন্য বঙ্গদর্শনে প্রেরিত হলে সঞ্জীবচন্দ্র সমালোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণযাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সম্বন্ধে বেশ তথ্যবহুল আলোচনা করেন।

কিন্তু কই? বঙ্গদর্শন ও ভ্রমরে তিন কিস্তিতে প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্রের এই যাত্রা প্রবন্ধের কোথাও তো ডঃ নিশিকান্ত বা তাঁর বইয়ের নামগন্ধও নেই॥ এই এই 'যাত্রা' প্রবন্ধ তিনটি যে কেউ পড়লে অতি সহজেই বুঝতে পারবেন এ প্রবন্ধ আদৌ কোন বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা নয়। মূলে একটা যোগসূত্র থাকলেও প্রবন্ধ তিনটির প্রতিটিই যাত্রা নিয়ে লেখা একরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা। আর নিশিকান্তবাবুর বই বেরোবার অনেক আগের তো এ লেখা॥

সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে তাঁর লেখা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—এতে সঞ্জীবচন্দ্র জালপ্রতাপচাঁদ, বৈদিকতত্ত্ব, পালামৌ প্রভৃতি লিখে-ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বলা এই 'প্রভৃতি'র মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের আর কি কি রচনা ছিল, তাও আজ খুঁজে বার করা খুবই কষ্টকর॥

অসিতবাবু তাঁর সম্পাদিত সঞ্জীব রচনাবলীতে লিখেছেন—'বঙ্গদর্শনে ও ভ্রমরে স্বনামে ও বেনামে তাঁর (সঞ্জীবচন্দ্রের) অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।'

অসিতবাবুর এ কথাও ঠিক নয়। কারণ, বঙ্গদর্শনে প্রমথনাথ বসু কাল্পনিক নামের প্র না ব অক্ষরগুলো নিয়ে এই ছদ্মনামে এক পালামৌ লেখা ছাড়া বঙ্গদর্শনে বা ভ্রমরে তিনি বেনামে আর কোন লেখাই লেখেননি। আর কি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে, কি নিজের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে এবং ভ্রমরেও সঞ্জীবচন্দ্র স্বনামে একটি লেখাও প্রকাশ করেন নি॥

বঙ্গদর্শনে বহু রচনায় বিশেষ করে উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক হিসাবে নিজের নাম দিয়েছিলেন॥ বঙ্গদর্শনে এবং ভ্রমরেও লেখার সঙ্গে অনেক লেখকের পুরো নাম বা নামের আদ্যাক্ষর ছাপা হয়েছে॥ বঙ্গদর্শনে ও ভ্রমরে সঞ্জীবচন্দ্র বহু প্রবন্ধ লিখলেও কোনটাতেই কিন্তু তিনি নিজের নাম দেননি। আসলে নামের লোভ তাঁর ছিলই না॥

এই নাম না থাকায় বঙ্গদর্শন ও ভ্রমর থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাগুলি আবিষ্কার করা রীতিমতই কষ্টকর ব্যাপার। তবে বহু পরিশ্রমে প্রমাণ সহ আমি বঙ্গদর্শন ও ভ্রমর থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ অজ্ঞাত রচনাগুলির কয়েকটা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। সেগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করব। তার আগে সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের লেখা থেকেই এমন একটা রচনা বা বইয়ের কথা বলছি, যা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়ে পৃথক বই হয়েই প্রকাশিত হয়েছিল; অথচ সে বই আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না॥

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তারিখে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের ডায়েরির একটি পাতা কাঁটালপাড়ার ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় রয়েছে। ডায়েরির ঐ পাতায় সঞ্জীবচন্দ্রের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার তারিখটির কথা যেমন পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, তেমনি ঐ পাতা থেকে আরও অনেক কথার সঙ্গে তাঁর একটি ...তক ও পুস্তিকা রচনার কথাও জানা যায়।

ডায়েরির ঐ পাতার শেষে সঞ্জীবচন্দ্র লিখে গেছেন—

— On the suggestion of Kopali Prosanna drew out a notification for আইন প্রকাশিকা। This dayI saw its proof

কপালীপ্রসন্ন বা কপালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্রের বড়দা শ্যামা-চরণের জ্যেষ্ঠ জামাতা। ইনি কর্মজীবনে ঐ সময় সাবজজ ছিলেন॥

ডায়েরির ঐ লেখায় দেখা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'আইন প্রকাশিকা'য় কপালী-প্রসন্নর কথায় আইনের আর একটি বিষয় যুক্ত করেছিলেন।

ডায়েরির লেখা পড়ে মনে হয়, 'আইন প্রকাশিকা' ছোট একটা প্রবন্ধ ছিল না। এটা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা একটা পুস্তক বা পুস্তিকাই ছিল॥

ডায়েরির ঐ ১৮৮১র এপ্রিল থেকে 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকা খুঁজে দেখেছি, কোথাও আইন প্রকাশিকা নামে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। তাই আইন প্রকাশিকা একটি বই-ই ছিল বলে আমার ধারণা। আর সঞ্জীবচন্দ্র যখন লিখেছেন, তিনি প্রুফ দেখেছিলেন, তখন এই বই ছেপে প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অনেক খোঁজ করেও এই 'আইন প্রকাশিকা' বইয়ের কোথাও কোন হদিসই পাচ্ছি না।

সঞ্জীবচন্দ্র বাংলা দেশের প্রজাদের সুখসুবিধার কথা নিয়ে যেমন Bengal . Ryots, their rights and liabilities নামে ইংরাজীতে একটি বিখ্যাত বই লিখেছিলেন, তেমনি বাংলাতে মনে হয়, এই বইটা লিখেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় আমরা দেখি, তিনি সহজ সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্যকে পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরেছেন॥ এই 'আইন প্রকাশিকা' বইটি পেলেও দেখা যেত, তিনি হয়তো আইনের জটিল কথাগুলিকে সহজ করে লিখে গেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র বি এল পাস না করলেও, তিনি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শেষ পরীক্ষার ফি জমা দিয়েছিলেন তার রসিদটি দেখেছি॥ জন-হিতৈষী সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর এই আইনের অধীত বিদ্যাকেই লোকের প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রকাশিকায় লিখে দেশবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। (ক্রমশ)

'ভারতী'-র প্রচ্ছদ

কমল সরকার

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'ভারতী' এক অবিস্মরণীয় নাম। ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অল্পদিনের মধ্যে বাংলার এক প্রধান সাহিত্যপত্রের মর্যাদা লাভ করেছিল এটি। 'ভারতী'-র পরিকল্পনাকারী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবারের প্রায় সব কৃতী মানুষই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এ সাময়িকীটির সঙ্গে। জন্মের সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া ঠাকুর পরিবারেরই কোনো না কোনো সাহিত্যসেবীর সম্পাদনায় পঞ্চাশ বছর প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী'। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'ভারতী'র আত্মপ্রকাশ। ভারতীর প্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শুধু কৃতী লেখকদের সাহিত্যসম্ভারেই নয়, সমসাময়িক শিল্পকলার দৃষ্টান্তও উপস্থাপিত করার পরিকল্পনা ছিল 'ভারতী'র প্রকাশনার নেপথ্যে। ফলে, একমাত্র সাহিত্যকর্মেই নয়, সমকালীন চিত্রকলার নিদর্শনও অঙ্গে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল পত্রিকাটি।

পত্রিকার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'ভারতী'র প্রচ্ছদে মুদ্রিত হয়েছিল দেবী সরস্বতীর এক পূর্ণ পৃষ্ঠা চিত্র। শিল্প ও সাহিত্যের আরাধ্য দেবী সরস্বতীর চিন্তামগ্ন সে চিত্রটি যে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কারণ, 'ভারতী'র জন্মের প্রাক্কালীন যে তথ্য পাওয়া যায় সেখানেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এ পরিকল্পনার ইতিবৃত্ত। এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও শরৎকুমারী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের আলোচনায় প্রচ্ছদ-প্রসঙ্গ থাকলেও প্রচ্ছদ অংকনের নেপথ্য কাহিনীটি কিন্তু প্রাপ্তব্য নয়। পত্রিকাটিকে মনোজ্ঞ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথও প্রচ্ছদের এক পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা রূপায়িত না হওয়ায় খেদের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "মলাটের উপরে একটি ছবি ডিজাইন আমি দিয়াছিলাম; কিন্তু সে ছবি ওরা দিতে পারিল না।"(১)

'ভারতী'র প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে সামান্য কিছু আলোকপাত করেছেন শরৎকুমারী দেবী। কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী দেবীর এ আলোচনায় নির্দিষ্টভাবে শিল্পীর নামের উল্লেখ না থাকলেও এ বিষয়ে তিনি যা লিখে গিয়েছেন সেখানে প্রচ্ছদ অংকনের উৎসের সন্ধান আছে। শরৎকুমারী দেবী তাঁর সে রচনায় লিখেছেন:

"দেখিতে দেখিতে শ্রাবণ মাসে একদিন 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। অনেক গবেষণার পর আর্ট স্টুডিয়োর দেবী সরস্বতীর ছবির অনুকরণে ভারতীর মলাটের ব্লক প্রস্তুত হয় এবং তখনকার পক্ষে ছবিখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সকলে মানিয়া লইয়াছিলেন।"(২)

শরৎকুমারী চৌধুরানীর মন্তব্যের সাহায্যে প্রচ্ছদ রচনার সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেলেও কোন্ শিল্পী কর্তৃক রচিত হয়েছিল প্রচ্ছদটি তা কিন্তু জানা যায় না। দ্বিতীয়ত, যে আর্ট স্টুডিওর সরস্বতীর ছবির অনুকরণে রচিত হয়েছিল মলাটের ব্লক সে স্টুডিয়োটির ইতিবৃত্তও আজ বিস্মৃত। তৃতীয়ত, হাফ-টোন ব্লক প্রচলনের আগের যুগের এ মলাটের ব্লকটিই বা ছিল কিসের—ধাতু না কাঠের—সে কথাও জানা যাচ্ছে না এ মন্তব্যের সাহায্যে। অথচ প্রচ্ছদ চিত্রের রহস্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমে জানা যেতে পারে, বিগতকালের বিস্মৃত এক কৃতী শিল্পীর পরিচয়। শিল্পীর সে পরিচিতির সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলার 'গ্র্যাফিক'-শিল্পকলা আন্দোলন সম্পর্কেও অবহিত হবার প্রচুর সুযোগ আছে কলারসিকদের।

॥ ২ ॥

সেকালের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি কাঠখোদাই-এর মাধ্যমেই রচিত হয়েছিল 'ভারতী'র প্রচ্ছদ। যদিও তখন লিথোগ্রাফির সাহায্যে চিত্রকলার রূপারোপ ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল কলকাতায় তবুও প্রচ্ছদের জন্যে কাঠখোদাই চিত্রকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন ভারতীর পরিচালকেরা।

শরৎকুমারী দেবীর মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, সে যুগের এক আর্ট স্টুডিওর সরস্বতীর ছবির অনুকরণে রচিত হয়েছিল প্রচ্ছদটি। অর্থাৎ আর্ট স্টুডিও প্রকাশিত সরস্বতীর এক চিত্রই ভারতীর প্রচ্ছদের অনুপ্রেরণার উৎস।

উনিশ শতকের কলকাতায় শিল্পকলার ফরমায়েসী কাজ করে দেবার জন্যে গড়ে উঠেছিল কয়েকটি চিত্রশালা। বঙ্গ শিল্পীদের পরিচালিত এ চিত্রশালাগুলির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কাজকর্মের জন্যে খ্যাত ছিল বউবাজারের 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'। এই 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'-কেই সংক্ষেপে শুধু বলা হত আর্ট স্টুডিও। এ প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি এতটা ব্যাপক ছিল যে, শুধু আর্ট স্টুডিও বললে সকলেই বুঝে নিতেন 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'-কেই বলা হচ্ছে। অতএব শরৎকুমারী দেবী উল্লিখিত আর্ট স্টুডিওটি যে 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও' সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আর্ট স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে একটু বিতর্ক আছে। স্বনামধন্য শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এ চিত্রশালার অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠাতারা হলেন নবকুমার বিশ্বাস, ফণীভূষণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র পাল প্রমুখ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্ররা।(৩)

তেল ও জল রঙে প্রতিকৃতি অথবা দৃশ্যচিত্র অঙ্কন থেকে নানা রকমের শিল্পসামগ্রী রচনা করা হত এ স্টুডিওতে। এ ছাড়া, কাঠখোদাই এবং লিথোগ্রাফিক চিত্ররচনায় এই স্টুডিওর শিল্পীদের প্রভূত নৈপুণ্য ছিল। উনিশ শতকে প্রকাশিত এঁদের পৌরাণিক লিথো চিত্রগুলি ছিল অসম্ভব জনপ্রিয়। বাংলা, হিন্দী এবং ইংরেজী পরিচিতি সম্বলিত এঁদের পৌরাণিক লিথো চিত্রগুলি ছড়িয়েও পড়েছিল দেশে-বিদেশে।
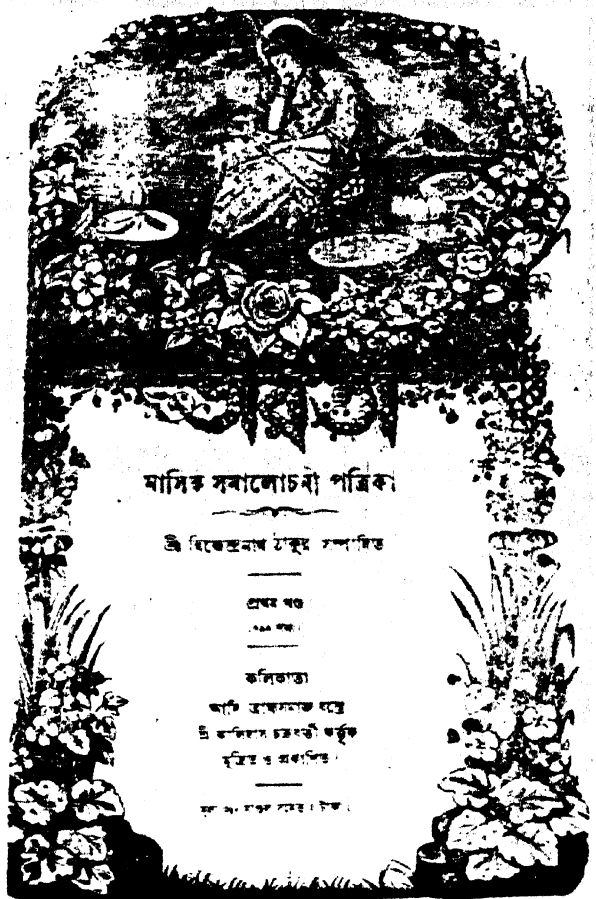
ভারতী-র প্রচ্ছদ (শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে)

প্রমথ চৌধুরীর 'আত্ম-কথা'য় (১৩৫৩) আর্ট স্টুডিওর পৌরাণিক চিত্রের জনপ্রিয়তার উল্লেখ আছে। আর্ট স্টুডিওর অন্যতম শিল্পী ফণীভূষণ সেন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

"কিন্তু ফণী সেন বলে কৃষ্ণনগরে একটি যুবক ছিলেন। তিনি কলকাতার আর্ট স্কুলের ছাত্র। তিনি এবং আরও তিন-চারজন আর্ট স্কুলের ছোকরা মিলে সরস্বতী, চৈতন্য প্রভৃতির ছবি এঁকে আর ছাপিয়ে বাংলা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে রকম ছাপানো ছবি আমি বহু লোকের ঘরে দেখেছি।"

পৌরাণিক চিত্রের সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষের লিথো চিত্রও প্রকাশ করেছিল আর্ট স্টুডিও। আবার লিথোগ্রাফির মাধ্যমে বহু বিখ্যাত গ্রন্থ, এনসাইক্লোপিডিয়া এবং সাময়িকপত্র চিত্রণ অথবা অলংকরণের কাজও করা হয়েছে এ স্টুডিওতে। নিরক্ষর ও শিশুদের জন্যে লিথোগ্রাফির সাহায্যে বাংলা ও ইংরেজী অ্যালফাবেট বোর্ড, হাতের লেখা অনুশীলনের উপযোগী 'কপিবুক' এবং বহু ক্যালেণ্ডারও প্রকাশ করেছিল এ স্টুডিওটি।

বিবিধ অথচ মনোজ্ঞ শিল্পকর্ম রচনার জন্যে প্রতিষ্ঠার খুব অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এ প্রতিষ্ঠানটি এবং এঁদের প্রকাশিত পৌরাণিক লিথো চিত্র সিরিজের মধ্যে ছিল অনিন্দ্যসুন্দর এক সরস্বতীর চিত্র। কিন্তু সরস্বতীর এ চিত্রটি সঠিক কবে প্রকাশিত হয়েছিল বলা সম্ভব নয়। তবে এ চিত্রটি যে ১৮৫ নম্বর বউবাজার স্ট্রীটের 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'তে রচিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, সরস্বতীর এ চিত্রে আর্ট স্টুডিওর নাম ও ঠিকানা মুদ্রিত রয়েছে।

সম্ভবত দেবী সরস্বতীর এ চিত্রের অনুসরণে রচিত হয়েছিল 'ভারতী'-র প্রচ্ছদ। কারণ, আর্ট স্টুডিওর সরস্বতীর এই লিথো চিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে 'ভারতী'র মলাটের।

তবুও শরৎকুমারী দেবীর মন্তব্যকে অবলম্বন করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, বিরাট এক প্রশ্ন এসে শরৎকুমারী দেবী পরিবেশিত

তথ্যটির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ বাধাটি আর কিছু নয়—সাল তারিখের পরস্পরবিরোধী এক সংঘাত।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী'। কিন্তু 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'র জন্মসাল বলা হয় ১৮৭৮। অর্থাৎ আর্ট স্টুডিওর জন্মের এক বছর আগেই আত্মপ্রকাশ করেছিল 'ভারতী'। স্বভাবতই ভারতীর থেকে বয়সে এক বছরের ছোট আর্ট স্টুডিও প্রকাশিত দেবী সরস্বতীর চিত্রের অনুকরণে প্রচ্ছদ রচনার কথা বিশ্বাস হয় না। কারণ, যে চিত্রশালার তখন জন্মই হয়নি সে প্রতিষ্ঠান থেকে তখন চিত্র প্রকাশিত হবে কী করে?

অতএব এ সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে প্রশ্ন ওঠে তবে কি ১৮৭৮-এর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর্ট স্টুডিওটি। তাই আর্ট স্টুডিওর জন্ম প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হবে এক পুরনো সূত্রে।

আর্ট স্টুডিওর জন্মকথার আলোচনা আছে 'অন্নদা-জীবনী' গ্রন্থে (১৩১৪)। শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর জীবনকাহিনী 'অন্নদা-জীবনী'তে এ স্টুডিওর জন্ম প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে:

"১৮৭৭ অব্দের কয়েক মাস তাঁহাকে গয়ায় অবস্থানপূর্বক রাজেন্দ্রবাবুর অভিমত চিত্রাবলী প্রস্তুত কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক খ্রীঃ ১৮৭৮ অব্দে বাবু ফণীভূষণ সেন প্রভৃতি কয়েকটি সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া তিনি কলিকাতা আর্ট স্টুডিও স্থাপন করিলেন। স্বাধীনভাবে দেশীয় চিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং দেশীয় জনগণের চিত্র বিষয়ক রুচির সংশোধন ঐ উদ্যমের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ স্টুডিও সে সময় হইতে এ পর্যন্ত বাঙ্গালীর গৃহ-সজ্জার উপযোগী বহু চিত্র প্রকাশিত করিয়াছে। এবং ঐ স্টুডিওর অনুকরণে বঙ্গদেশে বহু চিত্র শিল্পশালাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

'অন্নদা-জীবনী'র উপরিউক্ত উদ্ধৃতির রাজেন্দ্রবাবু হলেন ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত 'বুদ্ধগয়া দি হার্মিটেজ অব শাক্যমুনি' গ্রন্থটির জন্যে গ্রন্থকারের সঙ্গে বৌদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন অন্নদাপ্রসাদ। কারণ, বৌদ্ধগয়ার বুদ্ধমন্দিরের ভগ্নাবশেষের চিত্র অঙ্কনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। রাজেন্দ্রলালের ওই 'বুদ্ধগয়া' গ্রন্থটিতে (১৮৭৮) অন্নদাপ্রসাদ অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রকাশিত হয়। অতএব 'অন্নদা-জীবনী' সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গয়া থেকে ফিরে আসার পর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও' প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

অন্নদাপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর সোদরপ্রতিম শিল্পী ও শিল্পরসিকদের

'ভারতী'-র প্রচ্ছদশিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ দেব (১৮৪৭-১৯২৮)

ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওর সরস্বতী (লিথোগ্রাফ)

উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল 'অন্নদা-জীবনী' গ্রন্থটি। এ কারণে আর্ট স্টুডিওর প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে যে সময় পরিবেশিত হয়েছে তা উপেক্ষণীয় নয়। তবুও মনে হয়, আর্ট স্টুডিওর জন্ম প্রসঙ্গে 'অন্নদা-জীবনী'তে সঠিক সময় পরিবেশিত হয়নি।

কারণ, এ গ্রন্থে পরিবেশিত সময় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হলেও তৎকালীন সংবাদ-পত্রে আর্ট স্টুডিও সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং 'বেঙ্গলি'তে স্টুডিও প্রতিষ্ঠার সংবাদ ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম। স্টুডিওটির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে 'প্রসপেক্টাস' প্রকাশ করা হয় তা পাঠানো হয়েছিল সংবাদপত্রে। আর্ট স্টুডিও প্রেরিত ওই 'প্রসপেক্টাস'কে অবলম্বন করেই উল্লিখিত সংবাদপত্র দুটিতে পরিবেশিত হয়েছিল আর্ট স্টুডিওর প্রতিষ্ঠা সংবাদ। স্বভাবতই সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ সংবাদ দুটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, 'অন্নদা-জীবনী'তে সঠিক তথ্য পরিবেশিত হয়নি।

সম্ভবত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে গয়া যাবার আগেই জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্যে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এককভাবে আর্ট স্টুডিওটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অন্নদাপ্রসাদ। স্টুডিও প্রতিষ্ঠার পর এ প্রতিষ্ঠান থেকে লিথো প্রক্রিয়ায় যে চিত্রগুলি প্রকাশ করা হয় তার মধ্যে ছিল দেবী সরস্বতীর এক চিত্র এবং সে চিত্রটির অনুকরণে রচিত হয়েছিল 'ভারতী'র মলাট। অতঃপর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চারজন সহযোগীর সঙ্গে যৌথভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন স্টুডিওর দায়িত্ব এবং ঐ বছরেই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় এক 'প্রসপেক্টাস'-এর মাধ্যমে। ফলে, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দেই ঘোষিত হয় 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'র জন্ম কথা।

॥ ৩ ॥

'ভারতী' নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রচ্ছদের উপযোগী চিত্র নির্বাচনে কোন্ মানুষটি সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন তা আজ জানার উপায় না থাকলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই অভিমত ছিল শেষ কথা। কারণ, "কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর" ছিল। (৪)

তা ছাড়া, শুধু লেখক হিসেবেই নয়, চিত্রাঙ্কনেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তখন প্রচণ্ড উৎসাহ। পরিচিত নারী-পুরুষের মুখচ্ছবি অঙ্কন তখন তাঁর এক বিশেষ নেশা। স্বভাবতই, মনে হয় প্রচ্ছদ রচনার নেপথ্যেও ছিল তাঁরই নির্দেশ।

দ্বিতীয়ত, কলকাতার শিল্পীসমাজে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী তখন সুপরিচিত মানুষ। তাঁর স্টুডিও প্রকাশিত সরস্বতীর চিত্রটিও নিশ্চয় দেখেছিলেন কলারসিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। নচেৎ, আর্ট স্টুডিওর চিত্রটিকে নির্বাচন করা হবে কেন?

তৃতীয়ত, 'ভারতী'-র জন্মের আগে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' (১৮৭৫) অবলম্বনে এক চিত্রও রচনা করেছিলেন অন্নদাপ্রসাদ। "শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয় সরোজিনীর শেষ দৃশ্যের একখানি চিত্র পর্যন্ত অঙ্কন করিয়াছিলেন। সে চিত্রখানি পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্রের সঙ্গে বাজারে বহুদিন যাবৎ বিক্রীত হইয়াছিল"। (৫)

'সরোজিনী'-র ওই চিত্রের জনপ্রিয়তাও হয়েছিল খুব। অন্নদাপ্রসাদের আর্ট স্টুডিও প্রকাশিত 'সরোজিনী'-র ওই চিত্রের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও বলেছেন যে, "জ্যোতিকাকা মশায়ের সরোজিনী নাটকের পদ্মিনীর অগ্নিপ্রবেশের ছবি আর্ট স্টুডিও থেকে লিথোগ্রাফ প্রিন্ট হয়ে বেরিয়েছিল, ঘরে ঘরে সেই ছবি থাকত।" (৬)

অতএব অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, 'ভারতী'-র প্রচ্ছদের জন্যে আর্ট স্টুডিওর সরস্বতীকে নির্বাচন করেছিলেন স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। অবশ্য এ অনুমান সঠিক নাও হতে পারে। তবুও একথা বলা চলে যে বিগত শতকে ওই প্রচ্ছদ নিয়ে যখন 'ভারতী'-র আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে তা মুগ্ধ করেছিল সকলকে। শরৎকুমারী চৌধুরানী তো বলেই রেখেছেন "তখনকার পক্ষে ছবিখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সকলে মানিয়া লইয়াছিলেন।"

পরিণত বয়সেও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের মনে অটুট ছিল 'ভারতী'-র প্রচ্ছদের স্মৃতি। কিশোর অবনীন্দ্রনাথকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল প্রচ্ছদটি। অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতী'-র আলোচনায় তাই অন্য কোনো প্রসঙ্গ নেই একমাত্র প্রচ্ছদ ছাড়া। 'ভারতী'-র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

"কেবল একটি দিন—বছরে একটিবার মাত্র মা আমাদের হাতে আলমারির চাবি ছাড়িয়া দিতেন—সে ভাদ্র মাসের রৌদ্রোজ্জ্বল একটি প্রভাত। ভারতীকে কাঁধে তুলিয়া আমরা ছাদের উপর রোদ পোহাইতে চলিতাম। সেইদিন ক্ষণিকের জন্য ভারতী আমাদের কাছে আসিত। আমরা দেখিতাম—সে পদ্মের উপরে পা-খানি রাখিয়া গালে হাত দিয়া সুদূরে চাহিয়া আছে;—কোলে তার অনাহত বীণা। এই ছবিটি মাত্র—এছাড়া তখনকার ভারতীর আর কোনো ছবি আমার মনে আসে না।" (৭)

আর্ট স্টুডিওর সরস্বতীর মত 'ভারতী'-র মলাটের সরস্বতীর পিছনেও আছে পাহাড়। পাহাড়ের পিছনে উদিত সূর্যের রশ্মি। তবে 'ভারতী'-র সরস্বতীর বসার ভঙ্গিটি আর্ট স্টুডিওর ছবির মত নয়। প্রচ্ছদে গালে হাত রেখে মুদ্রিতনেত্র দেবী সরস্বতী সমাসীন একটি বড় পদ্মের ওপর।

দেবী মূর্তির মাথায় আছে ছটা; বীণাটি তাঁর কোলে। চিন্তামগ্ন সরস্বতীর পায়ের কাছে আর্ট স্টুডিওর চিত্রের মত দেখানো হয়েছে কয়েকটি পদ্মফুল আর পদ্মপাতা। লক্ষণীয়, প্রচ্ছদে একটি জিনিস অনুপস্থিত। সেটি হচ্ছে সরস্বতীর বাহন। প্রচ্ছদে সরস্বতীর হাঁসটিকে দেওয়া হয়নি। এছাড়া প্রচ্ছদে অতিরিক্ত হিসেবে নিখুঁতভাবে রচনা করা হয়েছে লতা-পাতা আর ফুলের অলংকরণ। পত্রিকার নামটিও তুলে ধরা হয়েছে ফুলের পাপড়ি দিয়ে।

কিন্তু ওই শেষ। একমাত্র শরৎকুমারী দেবীর মন্তব্যের মাধ্যমে প্রচ্ছদ রচনার প্রেক্ষাপট জানা গেলেও কোন্ শিল্পী কর্তৃক রচিত হয়েছিল এটি তা আজও অজ্ঞাত। কারণ, এ বিষয়ে আর কোনো তথ্যই 'ভারতী'-র পরিচালকেরা পরিবেশন করে যাননি।

তবুও এক প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল 'ভারতী'-র প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে। ফলে, উদগ্র অনুসন্ধিৎসার বশবর্তী হয়ে নানা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার অনুসন্ধানের সঙ্গে বার বার খুঁটিয়েও দেখেছি প্রচ্ছদটিকে। কিন্তু শতবর্ষেরও বেশি পুরনো সে প্রচ্ছদে শিল্পীর স্বাক্ষর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে প্রচ্ছদের রচয়িতার নাম অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছিল এতকাল।

খোঁজাখুঁজির অসাফল্যের এমন এক মুহূর্তে হঠাৎ হাতে এল 'ভারতী'-র প্রথম বর্ষের প্রথম নয় মাসের (শ্রাবণ-চৈত্র) বাঁধানো একটি খণ্ড। মলাট থেকে মলাট অটুট 'ভারতী'-র সে খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের সংগ্রহ থেকে আনা হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার দুশ বছর পূর্তি প্রদর্শনীর জন্যে সংগৃহীত সে খণ্ডটি হাতে তুলে দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দুই তরুণ বন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলীর দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল ছোট্ট কয়েকটি ইংরেজি শব্দ-সংক্ষেপ। প্রচ্ছদের নীচে ডানদিকে খোদিত শব্দ-সংক্ষেপগুলি হলো 'টি এন দেব'। বলা বাহুল্য, এক মুহূর্তে এই শব্দ-সংক্ষেপগুলিই জানিয়ে দিল 'ভারতী'-র প্রচ্ছদ রচয়িতার নাম ত্রৈলোক্যনাথ দেব। আর্ট স্টুডিওর দেবী সরস্বতীর চিত্রের অনুসরণে 'টি এন দেব' অর্থাৎ ত্রৈলোক্যনাথ দেবই কাঠ খোদাই করে রচনা করেছিলেন সাড়া জাগানো সাহিত্যপত্র 'ভারতী'-র প্রচ্ছদ।

॥ ২ ॥

টি এন দেব বা টি এন ডি এ যুগে বিস্মৃত হলেও বিগত শতকের খোদাই চিত্রকলার তিনি এক দিকপাল শিল্পী। রামচাঁদ রায়, মন্মথ স্বর্ণকার, বিশ্বম্ভর আচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার প্রমুখ খোদাই শিল্পীর উত্তরসূরী ত্রৈলোক্যনাথ দেবও এই একই শিল্পকলার মাধ্যমে নানা গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র চিত্রাঙ্কিত করেন। তবে তাঁর পূর্বসূরীদের মত বংশপরম্পরায় নয়—আধুনিক শিক্ষায়তনে অর্জিত হয়েছিল তাঁর খোদাই শিল্পকলাবিদ্যা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই কাঠখোদাই প্রতিকৃতিটির রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ দেব
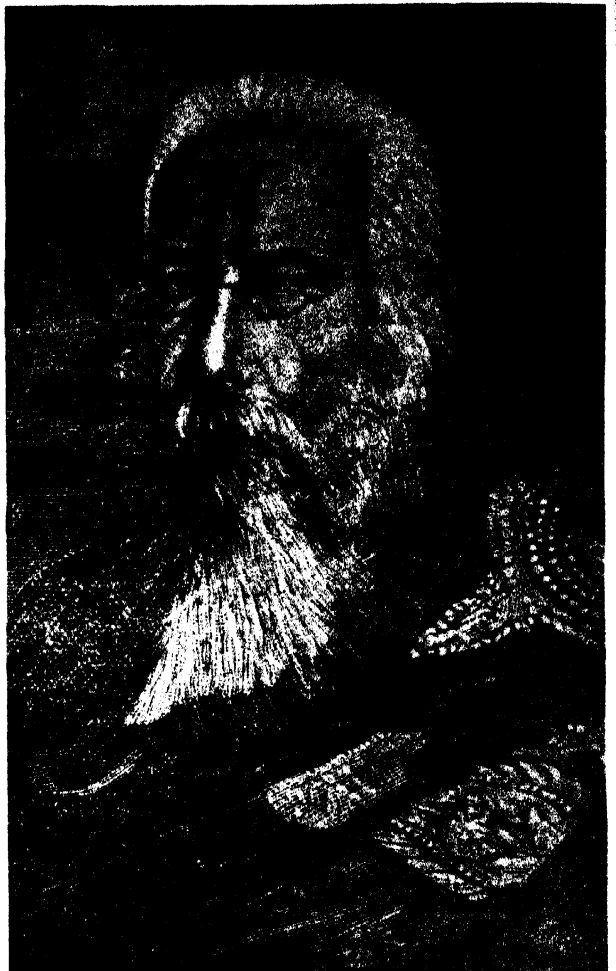
১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার বারুইপুরে তাঁর জন্ম হয়। মায়ের নির্দেশে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে বালক বয়সেই ত্রৈলোক্যনাথকে পাঠানো হয়েছিল হরিনাভির স্কুলে। সেই থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও ব্রাহ্মনেতা উমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪০-১৯০৭) তত্ত্বাবধানে হরিনাভির স্কুলে ত্রৈলোক্যনাথের লেখাপড়া শুরু হয়। কিশোর বয়সে উমেশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর জীবনাদর্শ ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণায় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তিনি। পরিণামে, উমেশচন্দ্রের উৎসাহে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কাছে ব্রাহ্ম মতাদর্শে দীক্ষিত হন ত্রৈলোক্যনাথ এবং আজীবন এক নিষ্ঠাবান কর্মী রূপে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। লোকচরিত্রের বহু দুর্লভ গুণে গুণান্বিত ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে ঊনিশ শতকের একাধিক সাধক ও মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পরিচয়ও ছিল। তাঁর সরল ও সাধু প্রকৃতির জন্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরও প্রিয়পাত্রে পরিণত হন তিনি। কেশবচন্দ্র সেনের বেলঘরিয়ার বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয়ের সূত্রপাত পরে তা অন্তরঙ্গতায় পর্যবসিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণদেব তাঁকে "বড়ই স্নেহ করিতেন।" (৮)

হরিনাভি থেকে কলকাতায় আসার পর গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে খোদাই শিল্পকলা অনুশীলন করেন তিনি। তবে সঠিক কোন্ সময়ে আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ তা নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তথাপি সরকারী আর্ট স্কুলেই যে তিনি খোদাই শিল্পকলা আরম্ভ করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, তাঁর কাঠখোদাই চিত্রে চিত্রিত এক গ্রন্থে তিনি যে গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন তার উল্লেখ আছে।

ত্রৈলোক্যনাথের কাঠখোদাই চিত্রে চিত্রিত এ গ্রন্থটির নাম 'উদ্ভিদ-বিচার'। গ্রন্থটির গ্রন্থকর্তা ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের এ গ্রন্থটির কয়েকটি সংস্করণও হয়েছিল এবং পঞ্চম সংস্করণ থেকে (১২৮৩) কাঠখোদাই চিত্রে চিত্রাঙ্কিত করা শুরু হয় গ্রন্থটিকে।

আর্ট স্কুলের আর এক কৃতী ছাত্র উদয়চাঁদ সামন্ত 'উদ্ভিদ-বিচার' গ্রন্থের জন্যে যে ৪০২টি গাছপালা ও ফলফুলের চিত্র অংকন করেন সেগুলিকে কাঠ-

বলুনযাত্রীরা এই কাঠখোদাই ছবিটিরও শিল্পী টি এন দেব
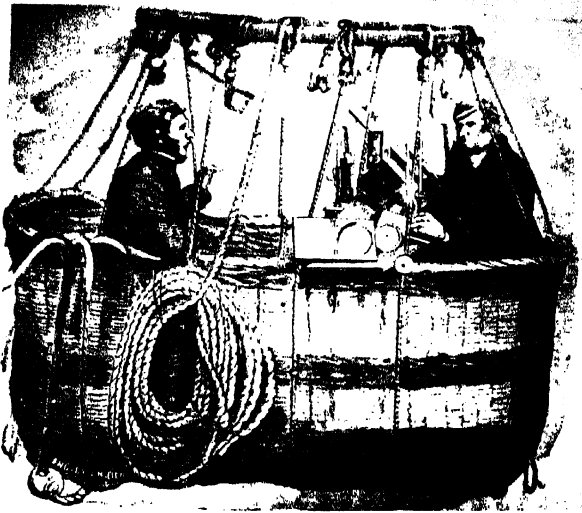
(সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে)

খোদাইতে রূপান্তরিত করেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। উদয়চাঁদ ও ত্রৈলোক্যনাথের এ সহযোগিতা প্রসঙ্গে 'উদ্ভিদ-বিচার' গ্রন্থে গ্রন্থকার যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সেখানেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ত্রৈলোক্যনাথের গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে অনুশীলনের কথা। অতএব 'উদ্ভিদ-বিচার' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হলো সে পরিচ্ছেদটি :

"পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, কলিকাতাস্থ গবর্নমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্তবাবু উদয়চাঁদ সামন্ত অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন এবং অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক সজীব বৃক্ষলতাদির চিত্র করিয়া না দিলে, এবং সেইরূপ দক্ষতা, যত্ন, এবং পরিশ্রম সহকারে উক্ত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্তবাবু ত্রৈলোক্যনাথ দেব সেই সমস্ত চিত্র কাষ্ঠফলকে খুদিয়া না দিলে, আমি এত অল্প সময়ের (চারি মাসের) মধ্যে দ্বাত্রিংশাধিক চতুঃশত উৎকৃষ্ট চিত্র দ্বারা উদ্ভিদ বিচার কখনই সুশোভিত করিতে পারিতাম না"। (৯)

আর্ট স্কুলের অনুশীলন শেষে খোদাই শিল্পে তাঁর আত্মনিয়োগ। ১১ নম্বর কলেজ স্কোয়ারে তাঁর শিল্পশালা অবস্থিত ছিল। 'ভারতী'-র আত্মপ্রকাশের অনেক আগেই এ শিল্পকলার জন্যে পরিচিত ছিলেন তিনি। উনিশ শতকের নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর খোদাই শিল্পকলার বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ত্রৈলোক্যনাথের খোদাই সম্পর্কিত এমন এক বিজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো :

"যাঁহারা অল্পমূল্যে উত্তম পরিষ্কার ছবি (উড এনগ্রেভিং) পুস্তক বা পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতা ১১নং কলেজ স্কোয়ার বামাবোধিনী কার্যাধ্যক্ষের নিকট তত্ত্ব করিলে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব

উডএনগ্রেভার।"(১০)

ত্রৈলোক্যনাথের খোদাই শিল্পকলার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে নানা পত্র-পত্রিকায়। বামাবোধিনী, বান্ধব প্রভৃতি সাময়িকে যে কাঠ খোদাইগুলি প্রকাশিত হয় সেগুলির রচয়িতা তিনি। প্রমদাচরণ সেন প্রতিষ্ঠিত 'সখা' সাময়িকপত্রেও প্রকাশিত হয় তাঁর অজস্র কাঠখোদাই। ফল-ফুল, লতা-পাতা মন্দির-মসজিদ, পাখি, জন্তু-জানোয়ার এবং নানা বিখ্যাত মানুষের কাঠখোদাই রচনা করেন তিনি।

গ্রন্থকাররূপেও তাঁর আর এক পরিচয় আছে। জীবন-সায়াহ্নে রচিত ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থটির নাম 'অতীতের ব্রাহ্মসমাজ' (১৯২১)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণদেব, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ আরও কয়েকজন বরেণ্য মানুষ ও ব্রাহ্ম সমাজের এক অন্তরঙ্গ কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এ গ্রন্থে। আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র মজুমদার এ গ্রন্থটির মুদ্রাকর।

কেশবচন্দ্র সেন ও উমেশচন্দ্র দত্তের অনুগামী হওয়ায় এঁদের সঙ্গে মহর্ষি ভবনেও যাতায়াত ছিল ত্রৈলোক্যনাথের। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যসুন্দরদেবকে দীক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ব্যক্তিগতভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় ছিল ত্রৈলোক্যনাথের। এছাড়া, উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত সাময়িক 'বামাবোধিনী' এবং সংবাদপত্র 'ভারত সংস্কারক'-এর কার্যাধ্যক্ষও ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। ফলে, ব্রাহ্ম সমাজের এক কর্মী হিসেবেই নয় শিল্পীরূপেও তিনি পরিচিত ছিলেন ঠাকুর পরিবারের কাছে। স্বভাবতই 'ভারতী'-র প্রকাশনার পরিকল্পনা যখন চূড়ান্ত রূপ নেয় তখন অতি পরিচিত শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথকেই দেওয়া হয়েছিল প্রচ্ছদ রচনার দায়িত্ব একথা সহজেই অনুমান করা যায়।

ত্রৈলোক্যনাথ দীর্ঘজীবনের অধিকারী ছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর প্রায় একাশি বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। (১১)

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন

"নয় দশ বৎসর বয়সে বাঁকুড়ার বাংলা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উদ্ভিদবিদ্যা আমাকে পড়িতে হইয়াছিল। ইহাতে নানাবিধ গাছপালা ফুলফলের কাষ্ঠফলকে খোদিত সুন্দর সুন্দর ছবি ছিল। তখন হাফটোনের ছবির প্রচলন এদেশে হয় নাই। সেই সব ছবির কোন একটা জায়গায় ইংরেজী টি এন ডি এই তিনটি অক্ষর খোদিত আছে। যখন উদ্ভিদবিদ্যা পড়িতাম তখন ইংরেজী না জানায় ঐ অক্ষরগুলি পড়িতে পারিতাম না। পরে পড়িয়াছিলাম। ঐ অক্ষরগুলি কাষ্ঠফলকে চিত্রখোদক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেব মহাশয়ের ছবি। সম্প্রতি একাশি বৎসর বয়সে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কাষ্ঠফলকে ছবি খোদাই যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে তাঁর পেশা ছিল। তিনি সদালাপী অমায়িক বিনয়ী লোক ছিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্ম বলিয়া সেকালের ব্রাহ্মসমাজের অনেক গল্প গোলদীঘিতে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার মুখে শুনিতাম। 'অতীতের ব্রাহ্মসমাজ' নামক একখানি বহিও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা চিত্রিত উদ্ভিদবিদ্যা পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়াছিলাম তাঁহাকে বলায় তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন। চীনে মাটির পাত্র, পুতুল, টেলিগ্রাফের সরঞ্জাম প্রভৃতি নির্মাণে দক্ষ শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব তাঁহার পুত্র।"(১২)

তথ্যসূত্র :

(১) পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত (দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৩০);
(২) 'ভারতীর ভিটা', শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরানী, বিশ্বভারতী পত্রিকা (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১);
(৩) Advertisement : The Calcutta Art Studio, The Bengalee, November 8, 1879;
(৪) পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত (দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৩০);
(৫) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৩২৬);
(৬) ঘরোয়া, অবনীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড (২য় প্রকাশ ১৯৭৫);
(৭) 'ভারতীর ছবি' ঐ ঐ ঐ
(৮) অতীতের ব্রাহ্মসমাজ, ত্রৈলোক্যনাথ দেব (১৯২১);
(৯) 'পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন', উদ্ভিদ-বিচার, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল এম এস, (১২৮৮);
(১০) ভারত-সংস্কারক, ২৯ জানুয়ারি ১৮৭৬;
(১১) শোক সংবাদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮;
(১২) বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৫।

হগের হাতে লাল বল যেন আলাদীনের হাতে প্রদীপ

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের বড় আকর্ষণ হবে সুনীল গাভাসকর ও রডনি হগের মধ্যে ব্যাট-বলের লড়াই। কেননা, বর্তমান ফর্ম অনুযায়ী একজন পৃথিবীর সবচেয়ে সফল ব্যাটসম্যান, আর একজন পৃথিবীর সফল ফাস্টবোলার। একজন ব্যাট হাতে ইনিংস শুরু করবেন, আর একজন শুরু করবেন লাল বলে আক্রমণ। ব্যাট-বলের এই লড়াইয়ে কে কাকে কতটা কাবু করলেন আমরা তার হিসাব করব সিরিজ শেষে। আপাতত দেখছি বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য আংশিক মিলে গেছে। মাদরাজে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিন যখন এই লেখাটা তৈরি করছি তখনই—টেস্ট ক্রিকেটে গাভাসকরের পাঁচ হাজার রান পূর্ণ হতে তিন রান বাকি থাকতে হগ তাঁকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠালেন ভয়ঙ্কর একটি বলে। হগের পরের ভূমিকা সিরিজ শেষে আলোচনা করা যাবে। এখন তাঁর সাম্প্রতিক ভূমিকাটি খতিয়ে দেখা যাক।

সাম্প্রতিক কথাটিতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে আগেরও ভূমিকা আছে। কিন্তু না, রডনি ম্যালকম হগ নামের ২৮ বছর বয়সী ডান হাতের ফাস্টবোলার ক্রিকেট জগতের নতুন তারকা। টেস্ট ক্রিকেট মাঠে বিচরণ এক বছরও পূর্ণ হয়নি। টেস্ট অঙ্গনে আগমন মাত্র মাস দশেক আগে, আটাত্তরের পয়লা ডিসেম্বর তারিখে।

সাহেবদের প্রবাদ অনুযায়ী ১৩ সংখ্যাটি দুর্ভাগ্য-দ্যোতক—'আনলাকি থার্টিন'। কিন্তু হগের ক্ষেত্রে ১৩ সংখ্যাটি বার বার তাঁর সৌভাগ্য এনেছে। অপরদিকে ওই ১৩ সংখ্যাই হয়েছে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাটসম্যানের দুর্ভাগ্যের কারণ। হ্যাঁ, ব্রিসবেন মাঠে জীবনের প্রথম টেস্টে হগ প্রথম উইকেটটি পেয়েছিলেন ত্রয়োদশ বলে। ১৩ রানের মাথায় আউট হয়েছিলেন, ডিফেন্স যাঁর অসাধারণ ইংল্যান্ডের সেই ওপেনিং ব্যাটসম্যান জিওফ বয়কট। ওই প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসেই হগের ৬টি উইকেট দখলের কৃতিত্ব। তাও মাত্র ৭০ রানের বিনিময়ে।

মাসখানেকের মধ্যে আবার ১৩ বলের মধ্যে দুটি উইকেট। মেলবোর্ন মাঠে তৃতীয় টেস্টে তাঁর একাদশ বলে বয়কট বোল্ড, ত্রয়োদশ বলে এল বি ডব্লিউ আউট অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলি। কিছু পরে তাঁর বলেই লেগ-বিফোর হয়ে ১৩ রান নিয়ে ডেরেক র‍্যান্ডলের বিদায়। শেষ পর্যন্ত ওই মেলবোর্ন টেস্টে মাত্র ৬·৬ গড়ে হগের ১০টি উইকেট দখল, যার ফলে প্যাকারের খেলোয়াড় বর্জিত শক্তিহীন অস্ট্রেলিয়া দলের ১১৩ রানে জয়। পার্থে দ্বিতীয় টেস্টেও হগ পেয়েছিলেন ১০টি উইকেট এবং শেষ পর্যন্ত ছয় টেস্ট সিরিজে পেয়েছিলেন ৪১টি উইকেট। নানা রেকর্ডের সম্ভারে অত্যুজ্জ্বল কীর্তি।

কী কী রেকর্ড? যে কোনো অস্ট্রেলীয় বোলারের পক্ষে অ্যাশেজ সিরিজে হাইয়েস্ট এগ্রিগেট। ১২·৮৫ গড়ে ৪১টি উইকেট। ১৯২০-২১ মরসুমে হোম সিরিজে রেকর্ড ছিল ২৬·২৭ গড়ে আর্থার মেইলির ৩৬ উইকেট, এবং ১৯৭২এ অ্যাওয়ে সিরিজে ডেনিস লিলির রেকর্ড ছিল ১৭·৬৭ গড়ে ৩১ উইকেট। কোনো দেশের কোনো বোলারই জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে হগের মত এত বেশী উইকেট পাননি। অস্ট্রেলিয়ার মাঠেও কোনো সিরিজে এত বেশী উইকেট পাননি অন্য কোনো বোলার। ৬৮ বছর আগে অর্থাৎ ১৯১০-১১ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার জে হুইটির ৩৭ উইকেট ছিল অস্ট্রেলিয়ার মাঠে বেশী উইকেট দখলের রেকর্ড। সে রেকর্ডও ভেঙে দেন রডনি হগ। শুধু একটি অস্ট্রেলীয় রেকর্ডই হগ

ভাঙতে পারেননি। সেটি হচ্ছে, সিরিজে ক্লারি গ্রিমেটের ৪৪টি উইকেট দখলের রেকর্ড। গ্রিমেট ৪৪ উইকেট পেয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, ১৯৩৫-৩৬ সিরিজে। পাঁচ টেস্টে গ্রিমেটের ৪৪ উইকেট যেমন বড় কৃতিত্ব, তেমন ছয় টেস্টে গ্রিমেটের চেয়ে গড় ভাল রাখা হগের আর এক গৌরব। গ্রিমেটের গড় ছিল ১৪·৫৯ —আগেই লিখেছি, হগের গড় দাঁড়ায় ১২·৮৫।

এক সিরিজে অবশ্য বেশী উইকেট লাভের কৃতিত্ব আছে ইংল্যান্ডের সিড বার্নেস ও জিম লেকারের। ১৯১৩-১৪ মরসুমে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঁচটি টেস্টে বার্নেস পেয়েছিলেন ৪৯টি উইকেট, ১০·৯৩ গড়ে। আরও কম গড়ে, প্রতি উইকেটের জন্য ৯·৬০ রানে ৪৬টি উইকেট পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের স্পিনার জিম লেকার ১৯৫৬য় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হোম সিরিজে।

কিন্তু জীবনের প্রথম সিরিজে হগের মত কেউই চমক সৃষ্টি করতে পারেননি। এই চমক সৃষ্টির বড় বৈশিষ্ট্য, তাঁর শিকারের দুই-তৃতীয়াংশই এক নম্বর থেকে ছয় নম্বর ব্যাটসম্যান, এক-তৃতীয়াংশ টেল-এন্ডার। লক্ষ এবং নিশানাও যে নিখুঁত তার প্রমাণ, ২১জনই আউট হয়েছেন বোল্ড বা লেগ-বিফোর উইকেট হয়ে, ২০ জন ক্যাচ তুলে। এই ২০টি ক্যাচের ১৯টিই হয় স্লিপ ফিল্ডারের হাতে, না হয় উইকেট-কিপারের হাতে পড়েছে।

যাঁর বদলে হগের টেস্ট খেলার সুযোগ মিলেছিল অস্ট্রেলিয়ার সেই 'ডেমন' বোলার জেফ টমসনের কৃতিত্বও ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৪-৭৫এ হোম সিরিজে টমসন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার টেস্ট পেয়েছিলেন ৩৩টি উইকেট, ৫৯২ রানে। ৭৮-৭৯-এতে হগ চারটি টেস্টের মধ্যেই ওই ৩৩ উইকেট পান ঠিক ৪০০ রান দিয়ে এবং টমসনের চেয়ে ১১১টি বল কম করে। অথচ টমসন বিশ্বের নামী ব্যাটসম্যানদের কাছেও বুক কাঁপানো বোলার।

টমসন বা ডেনিস লিলির তুলনায় অবশ্যই হগের বলের গতি কম। ক্রিকেটের কবি নেভিল কার্ডাস লিখে গেছেন—'ফাস্ট বোলারের শক্তি ও গতির চমক ক্রিকেট খেলার এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য'। সেদিক দিয়ে হগের গতির নিশ্চয়ই কিছু চমক আছে। কিন্তু নামী পেসারদের তুলনায় পিছিয়ে আছেন। গত বছর পার্থে পৃথিবীর ১২ জন ফাস্ট বোলারের বলের গতির পরিমাপ করা হয় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ফ্র্যাঙ্ক পাইক গবেষণালব্ধ জ্ঞানে এমন ফিল্ম ক্যামেরা আবিষ্কার করেন যার গতি সাধারণ ক্যামেরার চেয়ে কুড়ি গুণ বেশী। সেই ক্যামেরায় ১২ জন বোলারের বলের গতি প্রতি ঘণ্টায় ধরা পড়ে নিম্নভাবে। জেফ টমসন (অস্ট্রেলিয়া) ৯১·৮৬ মাইল। মাইকেল হোল্ডিং

পরেশ ঘোষ ২০ সেপটেমবর ৮নং

(ওয়েস্টইণ্ডিজ) ৮৭·৭৬ মাইল। ইমরান খাঁ (পাকিস্তান) ৮৬·৭৭ মাইল। গার্থ লি রোক্স (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৮৬·৫৮ মাইল। কলিন ক্রফট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ৮৬·৪৫ মাইল। অ্যান্ডি রবার্টস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ৮৬·০৮ মাইল। ডেনিস লিলি (অস্ট্রেলিয়া) ৮৪·৭২ মাইল। ওয়েন ডেনিয়েল (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ৮২·৯১ মাইল। লেন প্যাসকো (অস্ট্রেলিয়া) ৮১·৭৩ মাইল। রিচার্ড হ্যাডলি (নিউজিল্যান্ড) ৮০·৬০ মাইল। মাইক প্রোক্টার (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৭৯·৮৭ মাইল। এবং সরফরাজ নওয়াজ (পাকিস্তান) ৭৮·৮৮ মাইল। ইংল্যান্ডের বব উইলিসকেও এই স্পিড কনটেস্টে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি যোগ দেননি।

রডনি হগের বলের গতি এখনো পরিমাপ করা হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা দ্বাদশ রথীর মাঝেই তিনি স্থান পেতে পারেন এবং তাঁর বলের জন্য স্লিপে চারজন ও গালিতে একজন ফিল্ডার রাখারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

টমসনের মতই দেহকাণ্ড। ছয় ফুট মাথায় উঁচু। ওজন ১৯০ পাউন্ড। সাধারণত ২১ পা দৌড়ে এসে বল করেন। দৌড়ের পাল্লা সতীর্থ পেসবোলার অ্যালান হার্স্টের চেয়ে দুই গজ বেশী এবং ইংল্যান্ডের পেস-বোলার বব উইলিসের চেয়ে পাঁচ গজ কম। ৮ বলের ওভারের জন্য সময় নেন গড়ে সাড়ে পাঁচ মিনিট করে। বল হাতে যখন দৌড় শুরু করেন দেহের ঝোঁক থাকে সামনের দিকে, বল ডেলিভারির সময় দেহটা চিতিয়ে পড়ে, যেভাবে চিতিয়ে পড়তো আমাদের পটু চৌধুরীর দেহ।

ছাত্র-জীবনে বিষয় ছিল বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক গণিত এবং ইকোনমিকস। ক্রিকেট জীবনের সঙ্গে ছাত্র-জীবনের মিল আছে। গাণিতিক হিসাবেই বলের লেংথ এবং নিজের রান আপ-এর হেরফের ঘটিয়ে বিভ্রান্ত করেন ব্যাটসম্যানকে। না হলে কি জিওফ বয়কটের মত ব্যাটসম্যান এক সিরিজে চারবার বোল্ড ও একবার এল বি ডবলিউ আউট হন হগের হাতে?

হগ এখন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। চার বছর কাটিয়েছেন ভিক্টোরিয়ার বাচ্চা দলে। কিন্তু বড়দের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাননি। ২৩ বছর বয়সে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলে যাবার পরও হতাশায় ভুগতে শুরু করেন। প্রতি খেলার দিন মেলবোর্ন মাঠে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসে লিলি ও টমসনের বোলিং দেখতেন আর লিলি উইকেট পেলেই সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোরাস সুরে লিল্লি-লিল্লি-ই বলে চিৎকার করতেন। ৭৬-৭৭-এ সফরকারী পাকিস্তান দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলেও স্থান পেলেন না। অথচ মনের মধ্যে উগ্র বাসনা লিলি বা টমসন হবেন, নিদেন পক্ষে লেন প্যাসকো। সবাই বলে শক্তি আছে। কিন্তু সুযোগ মিলছে না। ফলে শুরু করলেন কঠিন অনুশীলন। বিয়ার পান কমিয়ে দিলেন। জীবনধারাও পাল্টে গেল। শুধু ক্রিকেট নিয়ে চিন্তা। এমন সময়ে ৭৭-৭৮-এ সুযোগ এল ভারতের বিরুদ্ধে খেলার। লেংথ ও নিশানা ঠিক রেখে অবশ্যই ভাল বল করেছিলেন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে। কিন্তু দুটির বেশী উইকেট পাননি। দুই ইনিংসে পেয়েছিলেন শুধু বেঙ্গসরকারকে। পরের মরসুমে ডাক পেলেন টেস্ট খেলার। মেলবোর্ন মাঠে তিন কাঠির উপর থেকে তাঁর বলে বেল ছিটকে যাবার শব্দের সঙ্গে যখন শুনলেন হগ্গি-ই হগ্গি-ই কোরাস সুর—রডনি হগ স্বীকার করেছেন—তার চেয়ে ভাল কিছু জীবনে শোনেননি। মাত্র তিন মাসের মধ্যে সারা অস্ট্রেলিয়ায় সাড়া পড়ে গেল। সারা বিশ্ব জেনে গেল রডনি ম্যালকম হগের নাম।

ইংল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজের পর পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট খেলাতেও কম চমক সৃষ্টি করেননি। মেলবোর্ন মাঠের প্রথম টেস্টে পাকিস্তান ৪টি উইকেট হারায় মাত্র ৪০ রানে। প্রথম ৪ জন মজিদ খাঁ (১), মহসিন খাঁ (১৪), জাহির আব্বাস (১১) ও জাভেদ মিয়াঁদাদ (১৯) আউট হন হগের বলে। ক্রিকেট লিখিয়ে রে রবিনসন কবিত্ব করে লিখেছেন—হগের হাতে লাল বল আলাদীনের হাতে প্রদীপের মতই।

মুকুল

অরণ্যদেব

কবে বাচ্চা হবে?
কবে?
তাড়াতাড়ি হোক!
এখানেই যেন হয়!
যখন হবে, তোমরাই আগে জানবে!

ডায়ানার বাচ্চা হবে নাকি?
কবে?
তাড়াতাড়ি?
কখন?
কী জানি!
সকলের মুখে এক প্রশ্ন ......

কবে হবে ডায়ানা?
বাচ্চা!
কী হবে?
OFFICE
ডঃ
আপনাকে ডাকছেন!
12/10
ডায়ানাকেও সবাই একই প্রশ্ন করছে!

ডায়ানা, বাচ্চা হলে পুরো দু'মাস সবেতন ছুটি পাবে!
কিন্তু..... ও, আচ্ছা, ঠিক আছে।
কী খবর ডায়না?

লাঞ্চের সময়ও ঠিক একই কথা...
আমি একজন ডাক্তারকে জানি.....
সেরা হাসপাতালের খবর শুনবে?
কিন্তু হচ্ছে কবে?
দুর, দুর, যত সব বাজে কথা!

ডায়ানা, বিয়ের পর এক বছর তো কাটল। এবারে আমি দিদিমা হচ্ছি তো?
আমি হব দাদামশায়!
ধ্যাৎ!

তা একটা বাচ্চা হলে মন্দ হয় না.....
আশা করি, তারও ভালই লাগবে....!

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বই**

NETAJI—A Pictorial Biography সম্পাদনায় : শিশিরকুমার বসু এবং বীরেন্দ্রনাথ সিংহ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। পঞ্চাশ টাকা।

প্রায় পৌনে তিন শত পৃষ্ঠার এই অ্যালবামটি মূল্যবান অফসেট কার্টিজে অফসেট পদ্ধতিতে ছাপা। আকারে ডবল ডিমাই অকটাভো। অসংখ্য ছবি এবং তা প্রয়োজনমতো ছবির পরিবেশ ও প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিবরণীর দ্বারা গ্রথিত। ছবি ছাড়াও সমসাময়িক মূল্যবান দলিল ও চিঠিপত্রের অংশ-বিশেষ সংযোজিত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য "মাই পারসোন্যাল টেসটামেন্ট"-এর অংশটি। বলা বাহুল্য, ছবিগুলি কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সংগৃহীত অসংখ্য ছবি ইত্যাদি থেকে বর্তমান অ্যালবামের উপাদান নির্বাচন করা হয়েছে। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, সম্পাদকদ্বয় এবং শিল্পীরা তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন—যার ফলশ্রুতি এই সুদৃশ্য অ্যালবামটি। নেতাজী-দুহিতা অনীতা এই অ্যালবামটি জনসাধারণের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন।

ভারতের অন্যান্য অনেক মনীষীর এই জাতীয় অ্যালবাম ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এবার পেলাম নেতাজীর। যথেষ্ট দেরি হয়ে গেলেও, শেষ অবধি যে আমরা পেলাম তার জন্য সম্পাদকদ্বয়, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। অবশ্য নেতাজী সম্পর্কে অ্যালবাম ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি কিন্তু তা নেতাজীর কর্মজীবনের খণ্ডিত আলেখ্য। এর ভেতর উল্লেখযোগ্য হল নেতাজীর পঞ্চাশতম জন্মদিবসে প্রকাশিত আই-এন-এ এনকোয়ারি অ্যান্ড রিলিফ কমিটির স্যুভেনীর এবং বোম্বাই থেকে প্রকাশিত "ফ্রীডম্স ব্যাটল—আই-এন-এ ইন অ্যাকশন" (১৯৪৭)। আলোচ্য অ্যালবামটি কেবল চিত্রে পূর্ণাঙ্গ জীবনীই নয়, তা প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। উদাহরণ হিসেবে ৮২ পৃষ্ঠার বর্ণিত সুভাষচন্দ্রের ছবিটির ("এ পোরট্রেট, ১৯৩৮") উল্লেখ করা যায়। "ভারত পথিক" (সিগনেট সংস্করণ) গ্রন্থ অনুযায়ী আমরা ছবিটিকে জেনের সুভাষচন্দ্র (১৯৩০)-এর বলে জানতাম।

নির্ভরযোগ্য জীবনীর জন্য ইতিহাস-চেতনাসম্পন্ন জীবনীকারের প্রয়োজন, আবার অন্তরঙ্গ জীবনীর জন্য চাই বসওয়েল বা গ্রীম-কে। এক সম্পাদকের ইতিহাস-চেতনা, বস্তুগত-ভাবে নেতাজীর কর্মজীবনের শেষ দিককার ঘটনার সঙ্গে যোগাযোগ এবং সর্বোপরি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কর্ণধাররূপে বহু দিনের সাধনা, আর অন্য সম্পাদকের বসওয়েলীয় ভক্তি-সিঞ্চিত নিষ্ঠা তাঁদের উপর ন্যস্ত গুরু দায়িত্ব যোগ্যতাসহকারে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

নেতাজীর লেখা আত্মজীবনীর দুইটি পর্ব আমরা পেয়েছি—"ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম" আর "ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল"। প্রথম পর্ব আই-সি-এস থেকে পদত্যাগ দিয়ে শেষ এবং দ্বিতীয় পর্ব ১৯৩৮-এ শেষ, অর্থাৎ হরিপুরা কংগ্রেসের ঠিক আগে এর যবনিকা টানা হয়েছে। কিন্তু নেতাজী তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ এবং বর্ণাঢ্য পর্বের কথা লিপিবদ্ধ করে যেতে পারেননি। অ্যালবামটিতে প্রথম বারো পৃষ্ঠায় "ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম" পর্ব এবং "ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল" ১৩ পৃষ্ঠা থেকে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। নেতাজী যে পর্বের কথা বলে যেতে পারেননি, স্বাভাবিক কারণে সম্পাদকদ্বয় সেই পর্বের জন্য—অর্থাৎ কংগ্রেস সভাপতি থেকে অন্তর্ধান পর্যন্ত—গ্রন্থটির বাকি ২১৪ পৃষ্ঠা (৫৯—২৭২) সদ্ব্যবহার করেছেন।

বইটি আগাগোড়া দেখলে বোঝা যায় প্রত্যেকটি পর্ব যোগ্যতার সঙ্গে করা হয়েছে। অসংখ্য চিত্র থেকে নির্বাচন প্রশংসাতীত। শুরুতে পিতা জানকীনাথ ও মাতা প্রভাবতীর ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে ছবি দুটি অ্যালবামের সুর বেঁধে দিয়েছে। নেতাজী সম্পর্কীয় বিভিন্ন ছবির প্রদর্শনীতে এই অ্যালবামের প্রায় সব ছবি আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি; কিন্তু দুই মলাটের মধ্যে সেই ছবিগুলিই এখানে এক অন্য দ্যোতনা এনেছে। প্রদর্শনীতে দেখা ছবিগুলি আকারে বড় হলেও তা খণ্ড খণ্ড চিত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছে। এখানে কিন্তু তা একই সূত্রে গাঁথা একটি অখণ্ড চিত্ররূপে ধরা দিয়েছে। এ এক অন্য অনুভূতি—এক অন্য অভিজ্ঞতা। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য যে সফল আন্দোলন তিনি করেছিলেন সে ইতিহাস পুরনো ইতিহাস, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এখানে ঐ আন্দোলন সম্পর্কিত পাঁচটি চিত্র পর পর হাজির করায় (পৃষ্ঠা ১১৭—১১৯) তার ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ আলাদা এবং তার প্রভাব পুরোপুরি ভিন্ন ধরনের হয়েছে। সে-দিনের সেই আন্দোলনের তীব্রতা ও উন্মত্ততা আমরাও অনুভব করি, তা আমাদের মনকে সরাসরি স্পর্শ করে। আমরাও সমসাময়িক যুগের দর্শক হয়ে সেখানে উপস্থিত হই। লেখার কারুকুরি দিয়ে পাঠককে মাত করার চাইতে ছবি দিয়ে মাতানো অনেক সহজ।

সুভাষচন্দ্র থেকে নেতাজীতে উত্তরণের ইতিহাস এখানে কত সহজ-ভাবে পাই। পাতা ওলটালে তার চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা পাই। ৮২ পৃষ্ঠার পাশাপাশি ১৭৭ পৃষ্ঠা—রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র থেকে রাষ্ট্রপ্রধান নেতাজী; বা ৭১ পৃষ্ঠার পাশাপাশি ১৬৩ পৃষ্ঠা—সুভাষ থেকে সুপ্রীম কম্যান্ডার। সুভাষচন্দ্র কেবল স্বপ্নই দেখতেন না (পৃষ্ঠা ১৭), অসাধারণ সংগঠন-ক্ষমতা ছিল তাঁর।

এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি এই অ্যালবাম থেকে যত স্বাভাবিকভাবে ধরা পড়ে তা কিন্তু ছবির প্রদর্শনী বার-বার দেখেও মনে আসে না। গ্রন্থটির সার্থকতা এখানেই। "নেতাজী ফিরে এস" বলে আরাধনার চাইতে এই সব চিত্রের দ্বারা স্বপ্নবিলাসী বাঙালী

নিজেকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে, এই সব ছবি আমাদের প্রেরণা যোগাবে।

নেতাজীরা ভাইবোন মিলিয়ে চোদ্দ জন—আট ভাই, ছয় বোন। নেতাজী ছিলেন পিতামাতার ষষ্ঠ পুত্র তথা নবম সন্তান। নেতাজী তাঁর আত্মজীবনীর এক স্থানে লিখছেন, "ইউজেনিকস-এর দিক থেকে বিচার করে দেখলে একটা জিনিস একটু অদ্ভুত ঠেকবে। বাবার দিকে আমাদের বড় পরিবার খুবই কম। মায়ের দিকে আবার এর ঠিক উল্টো। আমার মাতামহের নয় ছেলে ও ছয় মেয়ে। এদের মধ্যে ছেলেদের সন্তান-সন্ততি বেশী নয়, কিন্তু মেয়েদের প্রায় সকলেরই সন্তানসংখ্যা অনেক—আমরাই তো ছিলাম আট ভাই, ছয় বোন......" (ভারত পথিক, পৃষ্ঠা ১৩)। চতুর্থ পৃষ্ঠার গ্রুপ ফটোটি দেখার সময়ে নেতাজীর এই কথাগুলি আপনিই স্মরণে আসে।

এই অ্যালবামের প্রায় সব ছবি দেখে থাকলেও গুটি কয়েক ছবি ইতিপূর্বে কোন প্রদর্শনী বা গ্রন্থে দেখেছি বলে মনে হয় না। যেমন ৬ পৃষ্ঠার উপরের ডান দিকের ছবিটি—কোন এক বাগানে বন্ধুদের সঙ্গে বালক সুভাষচন্দ্র বা ১৩১ পৃষ্ঠার ছবিটি ("বার্লিন, ১৯৪১")। দুটোই খুব উল্লেখযোগ্য ছবি।

সুভাষচন্দ্র যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে কেবল গুরু বলে স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেননি, পোশাক-পরিচ্ছদে হুবহু গুরুকে নকল করতেন তা ১৪ পৃষ্ঠার নিচের সারির ডান দিকের ছবিটি দেখলে বোঝা যায়—মায় চশমা তথা বসবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত গুরুর! এরই পাশাপাশি গুরু দেশবন্ধুর ছবিটি থাকায় শিষ্যের "নকলনবিসপনা" ভালভাবে ধরা পড়ে। প্রাসঙ্গিকভাবে একটি কথা মনে উদয় হয়, গুরুশিষ্যের এক সঙ্গে ছবি কি সত্যই পাওয়া যাবে না। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয়ও তা যোগাড় করতে পারেননি, পারলে নিশ্চয়ই তা দিতেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, গুরু মেয়র আর শিষ্য চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অথচ তাঁদেরকে কোন ছবিতে আজ অবধি একই সঙ্গে পাওয়া যায়নি।

সাম্প্রদায়িকতার বিষ আমাদের রাজনীতি তথা সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। নেতারা এর বিরুদ্ধে অনেক কিছুই বলেন কিন্তু কার্যত দেখা যায় এই বিষ তার শাখা-প্রশাখা আরও বেশী করে বিস্তার করছে। এই ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দেও কলকাতা মহানগরীতে ছাত্রদের হোস্টেলগুলি ধর্মের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা আছে—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদিদের জন্য সব পৃথক পৃথক ছাত্রাবাস আজও কলকাতার বুকে বিরাজ করছে। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে আজাদ হিন্দ ফৌজের জওয়ানরা যাঁরা প্রধানত রক্ষণশীল গ্রামীণ কৃষিপরিবার থেকে এসেছিলেন তাঁরাও কিন্তু নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অক্লেশে এই সব নীচতা-হীনতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তাই একই রন্ধনশালা থেকে আহার্য গ্রহণে তাঁরা কোন বিরূপতা প্রকাশ করতেন না। ১৮৯ পৃষ্ঠার ছবিতে দেখা যাচ্ছে পক্কেশী পাকাইয়া শিরেন্দ্র পাশাপাশি শিখাধারীকে—হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সব পঙ্‌ক্তিভোজনে বসে গেছেন। জাত-পাতের প্রশ্ন তাঁদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক।

প্রীচার্স সে ডু অ্যাজ আই সে, নেভার ডু অ্যাজ আই ডু—নেতাজীর কাছে এ ভাষা ছিল অজ্ঞাত। তিনি ভাবের ঘরে চুরি করতে জানতেন না। তিনি নিজে যা ভাল বলে বিশ্বাস করতেন তাই তিনি স্বয়ং করতেন এবং অপরকে করতে বলতেন; যা আমাদের দেশের খুব কম নেতাই পারেন। জার্মানী থেকে সাবমেরিনে করে পূর্ব এশিয়া অভিমুখে যখন যাত্রা করলেন তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন মেজর আবিদ হাসান; অনুরূপে, ১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর ব্যাংকক থেকে যখন যাত্রা করলেন তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন কর্নেল হবিবুর রহমান। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছিলেন—ধর্মের প্রশ্ন তাঁর কাছে ছিল অবান্তর। "আপনি আচরি ধর্ম" তিনি তাঁর অনুচরদেরও উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

পিছন থেকে অনেক নেতা "মারো বাহাদুর" "লড়ো বাহাদুর" বলে চেঁচাতে ওস্তাদ। এগিয়ে এসে মাথা দিতে কেউ প্রস্তুত নন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "শিরদার ত সরদার; মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই, তাইতে কিছুই হয় না, কেউ মানে না।" (পরিব্রাজক) নেতাজী ব্যতিক্রমের অন্যতম। একজন সাধারণ সৈনিকের মত শির দেবার জন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতেন (পৃষ্ঠা ২৩৩, ২৩৮, ২৪৭ ইত্যাদি)। তাই তিনি অন্যদের উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন।

অ্যালবামটি সর্ব অর্থে সুন্দর—নিঃসন্দেহে সুন্দর। তবে "ভাল হত আরও ভাল হলে"। কিছু গ্রুপ ফটোয় নেতাজীর সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিদের পরিচয় দেওয়া আছে। বাকি গুলি ফটোগুলোতেও তা দেওয়া থাকলে ভাল হত—বিশেষত ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে তোলা ছবিগুলির ক্ষেত্রে। এই সব ছবির অন্যান্য ব্যক্তিদের পরিচয় জানার জন্য খুব ইচ্ছে হয়। দ্বিতীয়ত, "নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণের পথ"-এর নকশায় পরিচিতি বাংলায় দেওয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা ১২৪)। অবাঙালীদের কথা স্মরণে রেখে রাস্তার নামগুলি ইংরেজীতে দিলে শোভন হত।

এই সামান্য ত্রুটির কথা বাদ দিলে অ্যালবামটি অনিন্দ্যসুন্দর। ছবির নির্বাচন, সাজানো, কাগজ, বাঁধাই—সবই নিখুঁত। এই ধরনের রত্নরাজি হাতের কাছে পাওয়া ভাগ্যের কথা। সবচেয়ে বড় কথা তুলনায় অ্যালবামটির দাম প্রকাশকরা যথেষ্ট কম ধার্য করেছেন।

অশোক দাস

আলোচনা : শিল্প সংক্রান্ত **চিত্রকলা**

এতটুকু বাসা

হয় একটা জমি কিনে তার ওপর একটা ছিমছাম বাড়ি, না হয় বহুতল অট্টালিকায় একটা ফ্ল্যাট— ইদানীং শহরে মধ্য এবং উচ্চ মধ্যবিত্তদের এই-

লিওনার্ড
ঠাণ্ডা রাখে কোকোনাট
কলম্বো-তে

লিওনার্ড
সুরক্ষিত রাখে টোম্যাটো
ত্রিবান্দ্রাম-এ

লিওনার্ড
হাসিখুশী রাখে
কুণালকে কলকাতা-তে

লিওনার্ড রেফ্রিজারেটর সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ ঘরের সঙ্গদাতা। এর নির্ভরযোগ্য কমপ্রেসার আর নতুন কুশল ডিফ্রস্ট পদ্ধতি বছরবছর পর্যান্ত ত্রুটিহীনভাবে আপনাকে সেবা করার জন্যেই তৈরী হয়েছে।

লিওনার্ড ব্যবহারকারীদের সঙ্গে তাঁদের লিওনার্ড সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে গেলে, তাঁরা শুধু অল্প একটু হাসেন। বাস্তবিক, পরিবারের বন্ধু সম্বন্ধে রঙ চড়িয়ে এর চেয়ে বেশী কিইবা বলতে পারি।

Leonard

১৮৮১ সাল থেকে সারা দুনিয়ার বিশ্বাসপাত্র

Another quality product from

BLUE STAR

Leaders in refrigeration

SIMOES/BS/5A/79

বোম্বাই • নিউ দিল্লি • ক'লকাতা • মাদ্রাজ • আমেদাবাদ • পুনা • কানপুর • ইন্দোর • চণ্ডীগড় • জামসেদপুর • বাঙ্গালোর • কোচিন • সেকেন্দ্রাবাদ • বিশাখাপটনম্।

ই স্বপ্ন। আমার এক শিল্পী বন্ধু
ার নাম দিয়েছেন সুখী গৃহকোণ
্রামোফোন'-এর মানসিকতা।
ধু গ্রামাফোনের বদলে বাথরুম
িটিং, স্টিরিওগ্রাম, নানা রকম গ্যাজেট,
জ, টি ভি ইত্যাদি কার্পেট মোড়া
্র দেখা যাবে। সাধারণ মধ্যবিত্ত
কবে বাড়িওয়ালার প্রশ্রয়ে, অন্যরা
ুটপাথে বস্তিতে। সপ্তাহান্তে দেশে
লে দেখি কৃষ্ণনগরের পৌর ব্যবস্থা
মনি আদিম। বস্তুত মফস্বল-
লোকে স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি এবং
াধুনিক সব প্রয়োজনের কেন্দ্ররূপে না
ড়লে কলকাতায় লোক ছুটবেই এবং
াকসংখ্যার চাপেই শত উন্নয়নও কাজে
বে না। সুতরাং স্থপতি এবং নগর
রিকল্পকদের এদেশের প্রয়োজনের
থা মনে রেখে শহর বাড়ি ঘরদোর
র্মাণ করতে হবে।

আমাদের স্থপতি আর নগর পরি-
কল্পকদের সম্মুখে সমস্যাটি যে বিরাট
সটা অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানার
থা নয়। তিনি বর্তমানে কানাডায়
য়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্যের
ধ্যাপক। 'আধুনিক এবং আধুনি-
কাত্তর মার্কিনী স্থাপত্য' বিষয়ে
ামেরিকান সেন্টার (পূর্বাশ্রমের নাম ঃ
উ এস আই এস) বক্তৃতা দিলেন।
জুলাই ৩০; ১৯৭৯) এর সঙ্গে ছিল
উত্তর আমেরিকায় তাঁর করা স্থাপত্যের
ফাটোগ্রাফের প্রদর্শনী। তাঁর বক্তৃতার
ুটো দিক। একটা দিক খুবই সুন্দর
সেখানে তিনি আধুনিক স্থাপত্যের
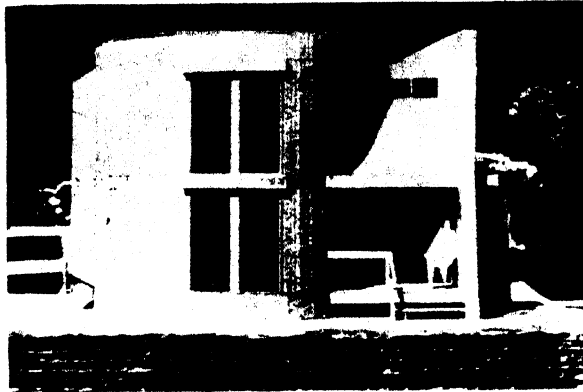
স্থাপত্য ঃ অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয় বলেছেন। অন্য দিকটা তাঁর মার্কিনীদের প্রশংসা— আমার ভাল লাগল না। কারণ, তাঁর মতো বুদ্ধিমান লোকদের যেসব দেশ আমাদের কাছ থেকে প্যাঁচ কষে ছিনিয়ে নিচ্ছে, তাদের কি করে ভাল বলব: আধুনিক টেকনোলজি? তার ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে ভবিষ্যবিদরা যে ছবি আঁকছেন, তার সিকি ভাগ সত্যি হলেই ভাবনার বিষয়।

আধুনিক স্থাপত্যের যে রূপরেখা তিনি আঁকলেন সেটা খুবই মনোজ্ঞ। বক্তৃতা বিশেষত স্লাইড সহযোগে, তাই জমেছিল। নতুন কথা যেটা জানলাম সেটা হলো—এখন না কী স্থাপত্যে 'আধুনিকোত্তর' যুগ আরম্ভ হয়েছে। এটা 'যন্ত্র নন্দনতত্ত্ব' (মেসিন এসথেটিক্স) এবং 'রূপবন্ধ কার্যকারিতার অনুগামী' এমন সব তত্ত্বের বিরোধী। বাড়ি যে বাসোপযোগিতার চেয়ে মানুষের আবাস এবং ব্যবহার্য এই চিন্তাটাই না-কি অত্যাধুনিক (বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে 'আধুনিকত্তোর') স্থাপত্যের ধর্ম। কিন্তু সওয়ালের দুর্বল অংশ হল ফ্র্যাংক লয়েড রাইটের স্থাপত্যকে উদাহরণ হিসাবে দেখাতে হয়েছে—কারণ রাইট তো আর হাল-ফিলের স্থপতি নন। অন্য একটি দিক ভববার আছে। সম্প্রতি আমেরিকায় মাই ভেনডার রো, ওয়ালটার গ্রোপিয়াস প্রমুখ যেসব স্থপতি ইউরোপ থেকে গিয়ে মার্কিন মুলুকে কাজ করেছিলেন তাঁদের ভাবমূর্তি পদস্থল (পেডেস্টেল) থেকে খুলে ফেলে, মার্কিন স্থাপত্য যে আন্তর্জাতিক (অনুবাদ ঃ ইউরোপীয়) স্থাপত্য থেকে স্বতন্ত্র, এটা প্রমাণের চেষ্টা হচ্ছে। বন্দ্যোপাধ্যায় কি ভেবে দেখেছেন যে সেই একই রীতিতে তিনি স্থাপত্যে রূপরীতি নিয়ে যেসব পরীক্ষা চালাচ্ছেন, উত্তরকালে মার্কিনী প্রচারযন্ত্র তাতে ভারতীয় পুরাস্থাপত্যের গন্ধ পেয়ে নকচ করতে পারে। আমি নিজে চিরদিন কাচ আর ইস্পাত কংক্রীটে গড়া দেশলাই বাক্সর ওপর দেশলাই বাক্সের নৈর্ব্যক্তিক কেজো স্থাপত্যের বিরোধী। শহর মানেই কংক্রীট, ইস্পাত আর কাচের জংগল নয়। তিনি 'আধুনিকোত্তর' স্থাপত্যে মজা (হিউমার) আছে বললেন। আমার মনে হয় সেটা আগেও ছিল—যেমন বাকমিনস্টার ফুলারের 'ইউনিয়ন ট্যাংক কার কোম্পানীর সংরক্ষণ ও সারাই বিভাগের' জন্য করা অনেকটা মৌচাকের মতো দেখতে গম্বুজটার কথা (১৯৫৮) একবার ভাবুন। বা লয়েড রাইটের গুগেনহাইম মিউজিয়মের উদাহরণ (পরিকল্পনা '৪৩-৪৬) তো তিনি নিজেই দিয়েছেন। কুর্বুসিয়ের 'নর্থে দাম দু হুট' গির্জার 'বাইরেটা চিন্তা করুন (১৯৫৫)। সব মিলিয়ে 'আধুনিকোত্তর' এবং 'মজার' যুক্তি ধোপে খুব একটা টেঁকে না।

তবু একথা বলব, তাঁর প্রদর্শিত বাড়িঘর এবং গাড়ীর পরিকল্পনায় যে বেশ অন্য রকম রস আছে, পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে। ছিমছছাম খোলামেলা পরিবেশকে সুন্দর ভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা প্রশংসনীয়। খাঁজ, ছায়া, বক্ররেখা, ঘনক, বেলন, কর্ণ দ্বিতল কোণ নিয়ে নানা রকম ঘরোয়া কারিকুরি আছে—যা বেশ অভিনব। ইতিমধ্যে নকশা করে আন্তর্জাতিক কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর সৃজনীশক্তি পূর্ণতর স্বীকৃতি পাক—বাঙালী হিসাবে এই কামনা করি।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

নবদিগন্ত

যেহেতু ছবির শুরুতে ১৮৯০-এর প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে "আজ থেকে দশ বছর আগে", ধরে নেওয়া যাক কাহিনীকালের আরম্ভ ১৯০০ সালে। বীরভুমের এক গ্রামে ব্রাহ্মণ পন্ডিতের ছেলে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেধাবী ছাত্র—সে, ধরে নিতে হবে, গ্রামের স্কুলে এবং টোলে একই সঙ্গে সংস্কৃতচর্চা করেছে এবং আধুনিক বাংলা গান শিখছে আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। সংস্কৃতবিদ্যা তার পরবর্তী জীবনে কোনো কাজেই আসেনি—কিন্তু পন্ডিত হরিচরণের দূরদৃষ্টি ছিল! ভাগ্যিস সে ছেলেবেলায় আধুনিক বাংলা গান শিখে রেখেছিল, তাই তো পরবর্তী জীবনে মাতাল অবস্থায় সুযোগ বুঝে সে অমন একটি গান ছাড়তে পারলো। এসব বস্তু অবশ্যই তারাশংকরের মূল কাহিনীতে নেই। টালিগঞ্জের হাতে পড়ে মূল কাহিনীর কি দশা হয়েছে এবং কি পর্যায়ের সিনেমা সেই কাহিনী থেকে তৈরি হয়েছে সেইটাই আমাদের বিচার্য।

ছবির প্রধান চরিত্রে অবশ্যই উত্তমকুমার। এবং সমগ্র ছবিটাই প্রায় তাঁর একক অভিনয়ও বলা যেতে পারে। এবং অপটু পরিচালকের হাতে তাঁর এই নিরন্তর নির্যাতন সত্যিই বেদনাদায়ক। ছবিতে যখন তাঁকে প্রথমবার আমরা দেখি, কাহিনীর কালানুসারে তখন তাঁর বয়েস হওয়া উচিত ২৬ কিংবা ২৭। এইখানেই এমন জোরে হোঁচট খাই আমরা, যে টাল সামলাতে পারি না কিছুতেই। এর আগে ছবিতে দেখানো হয়েছে হরিচরণের ছেলেবেলা এবং জমিদার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ। এবং তার বালিকা বধূর কণ্ঠে শোনানো হয়েছে ১৯০০ সালে লেখা একটি আধুনিক বাংলা গান। পরবর্তী জীবনে হরিচরণ আদর্শবাদী সংস্কৃতপন্ডিত। টোলে পড়িয়ে তার কোনোরকমে দিন কাটে। কি পড়ায় হরিচরণ, কেমন তার ছাত্ররা, যেমন তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা এবং ১৯১৫-২০-র পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃত এবং ইংরেজী ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আদানপ্রদানের কিছু জানতে পারি না আমরা। অর্থাৎ বিশের দশক এবং সেই দশকের ব্যক্তি এবং সমাজ—কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয় না। শুধু ভ্যাপসা গরম এবং ঝুলন্ত সময়—এই দ্বৈত অত্যাচারে পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে এনে অন্ধকারে বারবার ঘড়ি দেখার চেষ্টা করি আমরা। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটে কিছু উল্লেখ্য ঘটনা।

এক, ছবির টাইটেল সিকোয়েনসটি সম্ভবত তৈরি হয়েছিল ১৯২০ সাল নাগাদ! এই ধরনের সূচনা বাংলা ছবিতেও গত পঞ্চাশ বছর ধরে অচল। উহা সিনেমার প্রাচীন এবং অচল ভাষা লইয়া কোনো প্রচার পরীক্ষা কি না বুঝিলাম না।

দুই, টাইটেল সিকোয়েনস-এ বানান-ভুল টালিগঞ্জের বহুদিনের ঐতিহ্য। কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বীকারে যখন দেখলাম শ্রীদুর্গাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের প্রারম্ভে "দু" (দ-য়ে দীর্ঘ "ঊ"), তখন তা দুঃসহ মনে হলো।

তিন, গলায় দাড় দেওয়ার দৃশ্যটি কুৎসিত। চিতা জ্বালানোর দৃশ্যটি অতিনাটকীয়। বারবার ঐ দুটি দৃশ্যকে চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরার কি তাৎপর্য? গলায় দাড় দিয়ে কেউ মারা গেলে জিব বেরিয়ে পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু ঠিক কোন অ্যাংগেলে বেরোবে, কতটা বেরোবে এবং জিব-ভ্যাঙাবার মতো বেরোবে কি না—সেসব ডিটেলস-এ পরিচালক না গেলেই পারতেন।

চার, বহুদিন না-দেখা এবং অসুস্থ স্ত্রীর খবর আনতে পাঠিয়ে হরিচরণ (খৃষ্টান হবার পর হ্যারি ব্যান্ডো) হঠাৎ একটি প্লেটে চারটি রাজভোগ নিয়ে কপাকপ খেতে থাকে কেন? সেটা কি

উত্তমকুমার ও পূর্ণিমা রায়

অহেতুক বোঝাবার জন্যে যে সব ভাবনা-চিন্তা সত্ত্বেও হরিচরণের দেহ অটুট, তাকে ডাইবিটিস রোগে ধরেনি?

পাঁচ, হ্যারি ব্যাণ্ডোর চুল পাকলো অথচ দাড়ি পাকলো না কেন? হ্যারি কি দাড়িতে কলপ লাগাতো?

শেষ পর্যন্ত সত্যিই বুঝতে পারি না কেন তৈরি হলো এ ছবিটি—কোন শ্রেণীর দর্শকের মুখ পানে চেয়ে। ছবিটির পরিচালনা করেছেন পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংলাপ, চিত্রনাট্য সবই তাঁর—এবং এ ছবির সম্পূর্ণ দায়িত্বও তাঁকেই বইতে হবে।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

ভাঙা গানের ভাঙা আসর

'রবিমঞ্জরী' সংস্থার উদ্যোগে গত এগার আগস্ট শনিবার সন্ধ্যায় শিশির-মঞ্চে যে-অনুষ্ঠানটি নিবেদিত হল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল—'রবীন্দ্র-নাথের ভাঙা গান'। নাম শুনে যে-কৌতূহল ও প্রত্যাশা জেগে ওঠে, অনুষ্ঠান শুনে তা বিন্দুমাত্র মেটেনি—এ-কথা বলা যদি বা অতিশয়োক্তি হয়, তা হলে বলা ভাল, বিন্দুমাত্রই মিটেছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানের সংখ্যা প্রায় আড়াই শো। কখনো তিনি পরের সুরে নিজের কথা বসিয়েছেন, কখনো পরের কথায় বসিয়েছেন নিজের সুর। প্রথমটিরই দৃষ্টান্ত বেশী, তবু এই দু ধরনের গানই 'ভাঙা গান'। এর মধ্যে হিন্দী ভাষা থেকে ভাঙা গানের সংখ্যাই আবার সর্বাধিক। প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে যে, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' গ্রন্থে হিন্দী থেকে ভাঙা গানের 'আলাদা বিভাগ' এবং 'বিস্তারিত আলোচনা' রাখবেন ভেবেও পুঁথির কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পালটান। তিনি লিখছেন, 'সেগুলি এতই সংখ্যাবহুল যে আমি এই সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে তার অবতারণা করা সংগত মনে করলুম না।'

'রবিমঞ্জরী' কিন্তু সংগত মনে করেছেন। তাঁরা হিন্দী-ভাঙা গানই কেবল শোনালেন, কিন্তু তার সংখ্যা মাত্রই আট। তাঁরা অবশ্যই বলে নিয়েছিলেন, 'সাধ্যমত কিছুটা পরিবেশন' করবেন। কিন্তু সাধ্য যে এত কম, অনুমান করা যায়নি। তথ্য-বহুল কৌতূহলকর ভাষ্য লিখেছিলেন অমিয় চট্টোপাধ্যায় ও বীরেন চক্রবর্তী। অমিয় চট্টোপাধ্যায় পড়ছিলেনও অতি সুন্দর ভঙ্গিতে। কিন্তু কৌতূহল জাগল মাত্র, তৃপ্ত হল না। তার আগেই ঘটল আসরের পরিসমাপ্তি।

গানও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৃপ্তিকর পরিবেশন নয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম মূল শিল্পী রাজেশ্বর ভট্টাচার্য মূল হিন্দী গানের ক্ষেত্রে যদি-বা চলনসই, রবীন্দ্রসংগীতে অসার্থক। দুষ্ট উচ্চারণ, ত্রুটিপূর্ণ স্বরক্ষেপ, সর্বোপরি রাবীন্দ্রিক গায়কীর অনুপস্থিতি তাঁর নিবেদনকে পঙ্গু করে দিয়েছে। রবিমঞ্জরী-এর শিল্পীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্মেলক কণ্ঠে যোগ দিয়েছিলেন মূল গানে, তবু যেখানে আলাদা কণ্ঠ শোনা গেছে সেখানে আলাদাভাবে একমাত্র নাম করতে হয় শিবানী রায়ের। রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে এ-দিনের একমাত্র উল্লেখ্য নাম গীতা ঘটক। এই অনুষ্ঠানের নানান অপূর্ণতার ত্রুটি তিনি একাই ঢেকে রেখেছিলেন। অবিস্মরণীয় দক্ষতায় ও স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়ে থাকবে তাঁর প্রতিটি গান। শুধু আক্ষেপ, সংখ্যায় বড়োই অল্প ছিল তাঁর কণ্ঠের একক গানগুলি। 'কোথা যে উধাও', 'মন্দিরে মম কে', 'কার মিলন চাও বিরহী' এবং 'হৃদয়নন্দন বনে'—তাঁর একক কণ্ঠে এই চারটি মাত্র গান নির্দিষ্ট ছিল। লয় ঈষৎ বিলম্বিত করে 'হৃদয়নন্দন বনে' গানটির অন্তর্লীন বিষাদ যে কীভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, তার নতুন এক পরিচয় উদ্ভাসিত করলেন তিনি। নব জনমের ব্যর্থতা, সর্বময় দুঃখ, বিরহ-কাতরতপ্ত-চিত্ত এক নতুন মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হল গীতা ঘটকের গানে। দ্বৈত কণ্ঠে রাজেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে দুটি গান গাইলেন গীতা ঘটক—'রাখো রাখো রে' এবং 'তিমির বিভাবরী'। যেখানে তিনি একা—অসামান্য শোনাচ্ছিল, বিশেষত শেষোক্ত গানে 'জীর্ণ' 'শূন্য' শব্দগুলিতে আলাদা রকমের ঔজ্জ্বল্য যুক্ত করেছিলেন তিনি, কিন্তু যখনই দ্বৈত-কণ্ঠের মিশ্রণ ঘটেছে, তখনই উচ্চকিত হয়ে উঠেছে বিষমতা। রাজেশ্বর ভট্টাচার্য-এর উচ্চারণে 'রাখো রাখো রে' ধাক্কা খেয়ে শোনাচ্ছিল 'রাখ্‌খো রাখ্‌খো রে'। অন্য একটি গানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল অনিবার্যভাবে—'সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে ঘুচাবে কে!'

শ্রাবণসন্ধ্যা

রবিরশ্মির 'শ্রাবণসন্ধ্যা' (রবীন্দ্র-সদন, ৫ আগস্ট, সন্ধ্যা) সম্পর্কে প্রথমেই যে-কথা বলতে হয়, তা হল, এমন ঘড়ির কাঁটা ধরে সচরাচর কোনো অনুষ্ঠান শুরু এবং শেষ হতে দেখা যায় না। ঠিক সাড়ে ছ'টায় শুরু হয়েছে, এবং যখন যবনিকা পড়ল—তখন কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে আটটা। এই সময়ানুবর্তিতা যে শৃঙ্খলার দ্যোতক, সেই আভ্যন্তর শৃঙ্খলার পরিচয় মূল অনুষ্ঠানেও অনেকখানি ফুটে উঠেছিল। ভাস্কর বসুর চমৎকার একটি পূর্বকথা, চিত্তরঞ্জন শিল্পীর কণ্ঠের অনুশীলিত সম্মেলক গান, পিছনে সাইক্লোরামায় ঘনায়মান কালো ছায়া ও বনের আভাস (নামিল শ্রাবণসন্ধ্যা, কালো ছায়া ঘনায় বনে বনে), সম্মেলক ও একক গানের একান্তর প্রয়োগ, পার্থ ও গৌরী ঘোষের এবং মৈত্রেয়ী সেনগুপ্তের সুললিত কণ্ঠের পাঠ ও আবৃত্তি, হেমন্ত-সুচিত্রা-কণিকা-সুবিনয় প্রমুখ তারকাচিহ্নিত অতিথি-শিল্পী সমন্বয়, সর্বোপরি সাগর সেনের নিজস্ব কণ্ঠের গান ও পরিচালনা—রবিরশ্মির শ্রাবণসন্ধ্যার উজ্জ্বলতম স্মৃতি। বিশেষত, এই অনুষ্ঠান আরেকটি যে-কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তা হল সাগর সেনের কণ্ঠে

বন্ধ, রহো রহো সাথের মতো দুরূহ গান শোনার দুর্লভ অভিজ্ঞতামর অনুষ্ঠান। অত্যন্তই ঋতুকিম্বর প্রয়াস স্বচ্ছায় নির্বাচিত করেছিলেন এই শিল্পী, কিন্তু সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ সার্থকতায় যে উত্তীর্ণ তাঁর নিবেদন, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য।

সাধারণভাবে সে দিনের অনুষ্ঠানে গানের মান বেশ উঁচু মাপের। সম্মেলক গানগুলি অনবদ্য। এ ছাড়া, সুবিনয় রায়ের কণ্ঠে 'শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে', কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'নীলাঞ্জন ছায়া', সুচিত্রা মিত্রের 'ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের' এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-এর কণ্ঠে 'যেতে দাও গেল যারা' বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। অতিথি-শিল্পীদের মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটালেন বাণী ঠাকুর। তাঁর কণ্ঠ পুরোপুরি বিপর্যস্ত ছিল সেদিন। দমহীনতা ও অনুনাসিক উচ্চারণের প্রাবল্যে তাঁর কোনো গানই গান হয়ে উঠল না। সবিনয় নিবেদন করি আর দুটি আপত্তি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গোধূলি গগনে মেঘেতে গাইলেন 'আকাশ মুখর', স্বরলিপির নির্দেশ কিন্তু স্বরান্ত। সাগর সেন গাইলেন—'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' চঞ্চলতা শোনালো 'চঞ্চলোতা'।

রবিরশ্মির শ্রাবণসন্ধ্যার সম্মেলক গানগুলির সঙ্গে নাচও ছিল। ছিল সাগর সেনের 'কেন পান্থ এ', গানের সঙ্গেও। শেষোক্ত নাচটি ভাল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাচ ছিল কথার সঙ্গে সম্পর্কহীন ও অসমঞ্জস অভিব্যক্তিমণ্ডিত।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

গণদেবতা

তারাশঙ্করের সুদীর্ঘ কাহিনীর উপন্যাস নাট্যরূপ দেওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। লোকরঙ্গ নিবেদিত গণদেবতার নাট্যরূপকার ও নির্দেশক রতনকুমার ঘোষ সেই দুরূহ কাজটি বিশেষ নৈপুণ্যে সমাধা করেছেন।

লোকরঙ্গের নাটকে শিল্পীদের অভিনয়ে আন্তরিকতা যথেষ্ট থাকলেও—সকলের ক্ষমতা সমান নয়—তাই অনেক সময় প্রযোজনা বিপথগামী হয়। দীপক ভট্টাচার্য, সুশান্ত চৌধুরীর অভিনয় চরিত্রানুযায়ী। ছিরা পাল-এর ভূমিকায় পবিত্র ব্যানার্জী অসম্ভব ক্যাজুয়াল। ভিলেন বলতেই যে-সব আজন্ম লালিত ধারণা আছে সেগুলি বর্জন করে তিনি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি অনিকামারের ভূমিকায় অরুণ ঘোষ সম্পূর্ণ অসংযমী, সামান্য কয়েক জায়গায় তাঁর অভিনয় জীবনের কাছাকাছি, বেশির ভাগ সময়ই তিনি 'মেলোড্রামা'কে অবলম্বন করেছেন। অথচ এই অতি অভিনয়কে একটি অসামান্য টাইপ করে তুলেছেন দারোগার ভূমিকায় প্রণব ব্যানার্জী। জগন ডাক্তারের ভূমিকায় জয়ন্ত চৌধুরী বক্তার ঢঙকে কাজে লাগিয়েছেন। তরুণ দে বা নকুলেশ্বর চ্যাটার্জী সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ। গণদেবতায় দুর্গার ভূমিকায়

পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা চট্টোপাধ্যায়

মমতা চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য অভিনয় দীর্ঘদিন মনে রাখার মত। মমতা চট্টোপাধ্যায় একালের একজন অগ্রণী শিল্পী বহুদিন পরে তাঁকে আবার একটি গ্রুপের নাটকে জটিল চরিত্র-সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে দেখা গেল—স্বাগত প্রত্যাবর্তন। সামান্য অবকাশে মণিদীপা রায়ও বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব আনতে পেরেছেন, কিন্তু মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সর্বত্র সুষম নয়। সাধারণত অন্য নাটকে যা বিশৃঙ্খল হয়ে থাকে এই প্রযোজনায় সেটি সুনিয়ন্ত্রিত। গ্রামবাসীদের অভিনয় অনেক জায়গায় নাটকীয়তাকে সাহায্য করেছে।

নাটকটিতে প্রয়োগবিধিতে নতুনত্ব কিছু নেই, মোটামুটি সোজাসুজি কাহিনী বলা হয়েছে, যেখানে কিছু 'সাজেশন' আনতে চাওয়া হয়েছে—সেগুলি অতিশয়োক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন—নাটকে বেশ কয়েকটি 'ফ্রিজ' আছে কিন্তু সেগুলি বেশ খানিকটা সময় নেওয়ায় চমকের থেকে হাসির জোগান দেয় বেশি। শেষ দৃশ্যের মিছিল আজকের দিনে পাঠ্যপুস্তকে গল্পের শেষে উপদেশের মত শোনায়। 'মাইম' অংশগুলি অত দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার মত প্রয়োজনীয় নয়। সংগীতাংশ বেশ ভাল কিন্তু প্রায়শই ভুল সময়ে বাজে অথবা এত ক্ষণস্থায়ী যে দৃশ্যান্তরের সময় নির্বাক থাকে। মেক-আপ সম্পূর্ণ প্রথাগত, কয়েকবার প্রায় দৃষ্টিকটু। মঞ্চ নিরাভরণ হয়েও সব কিছু বোঝাতে পেরেছে। স্টেজের ডানদিকে ঘরের সাজেশনটি খুব কম ব্যবহৃত—প্রায় অকেজো বললেই চলে। আলো নতুনভাবে কিছু বলেনি। সর্বোপরি নাট্য ঘটনায় যে সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত সেটা 'মিউজিক' বা মঞ্চের কোন সাজেশনে অনায়াস শিল্প শোভন-ভাবে আনা যায়নি। 'মেকআপ' যখন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় সকলের বয়স একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্গা শাড়ি বদলায়। পুরুষ চরিত্র একই জামা-কাপড় পরেই দীর্ঘদিন কাটিয়ে দেয়। গ্রামবাসীদের কোমরে গামছা বাঁধাটাই মিলিটারি ইউনিফর্ম হয়ে থাকে। সব চেয়ে বড় কথা এত নেপথ্য ভাষণ এই নাটকে ততটা জরুরী ছিল না, যতটা জরুরী ছিল একটি বিরতি।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

অনিমেষ নন্দী (১৯৪০—)

এ লেখা যখন প্রকাশিত হবে ততদিনে অনিমেষ নন্দী আবার ফিরে গেছেন বেলগ্রেডে। অনিমেষ ভারতবর্ষের নাগরিক কিন্তু ১৯৬৫ থেকে মোটামুটি ইউগোশ্লাভিয়ায় আছেন। মাঝে মধ্যে দেশে ফেরেন। চাকরির চেষ্টা করেন। একবার আমলারা সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে চাকরি করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত বাদ সাধলেন অধ্যক্ষ। বীতশ্রদ্ধ অনিমেষ বেলগ্রেডে ফিরে গেলেন। সে দেশে ছবি বিক্রি করে তাঁর দিন খুবই ভাল কাটে।

অনিমেষ সরকারী চারুকলার স্নাতক (১৯৬১)। ইউগোশ্লাভিয়া সরকারের ছাত্রবৃত্তি পেয়ে ১৯৬৫তে চলে যান। বেলগ্রেডের আকাদমী অব ফাইন আর্টস থেকে (১৯৬৫-৬৬) ফ্রেসকো এবং মোজাইক চিত্রবিদ্যায় এম এ পাশ

করেন, এবং চিত্রকলায় এম এ ডিগ্রী পান (১৯৬৭-৬৮)।

অনিমেষ বছর আঠারো থেকে একক এবং যৌথ প্রদর্শনী করছেন ঘরে বাইরে এবং ঘরের চেয়ে বাইরে বেশী। যৌথ প্রদর্শনী গ্যাংটক (১৯৫৮) কলকাতা (১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ গোটা চারেক)। দিল্লি (১৯৬৫), পঁচিজন ভারতীয় চিত্রকর (বেলগ্রেড ১৯৬৬), দুজন ভারতীয় চিত্রকর (বেলগ্রেড ১৯৬৭), দলীয় প্রদর্শনী বেলগ্রেড (১৯৬৯), স্টকহোম (১৯৭৩)। নানা দেশে একক প্রদর্শনী করেছেন অনেক, যথা বেলগ্রেড (১৯৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৩, ৭৬, ৭৮ প্রথম ফুটপাত প্রদর্শনী)। সারজেভো (১৯৬৯), জেংরাজানি ন (১৯৭২) নভিসাদ (১৯৭২, ১৯৭৪), স্কপলজে (১৯৭৩), কুমানোভো (১৯৭৩), বিটোলা (১৯৭৩), স্মেডারেভো (১৯৭৪), বুধবা (১৯৭৬), টিভাট (১৯৭৬)—এ সব ইউগোশ্লাভিয়ার শহর। এ ছাড়া, একক প্রদর্শনী করেছেন স্টকহোম (১৯৭৩), পশ্চিম বার্লিন (১৯৭৫), ভিয়েনা (১৯৭৬), এন্টুয়ার্প (১৯৭৬)। আপাতত শেষ একক প্রদর্শনী কলকাতা (আগস্ট-সেপটেমবর ১৯৭৯)।

ইউগোশ্লাভিয়ার শিল্পীদের আমন্ত্রণে যোগ দিয়েছেন একবার (১৯৭১) এবং ইদিরিজায় (১৯৭৩) শিল্পী উপনিবেশে। ১৯৭৩-এ মেসেডোনিয়ার সরকারের স্কলারশিপ পেয়েছিলেন মধ্যযুগের মঠ গির্জার ফ্রেসকোর বিষয় গবেষণার জন্য। বস্তুত মধ্যযুগের ইউগোশ্লাভিয়ার চিত্রকলার প্রবন্ধের সঙ্গে প্রচ্ছদ ব্যবহৃত মেরী মাতার আইকনের স্লাইড অনিমেষ নন্দীর দান।

অনিমেষ নন্দীর ছবি প্রথমে ছিল বাস্তবের ধারঘেঁষা। বিশেষত, সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের তৈলচিত্রের প্রধানদের ধারার ছাপ। মানুষ, পুষ্প, নিসর্গ, চিড়িয়াখানা, আস্তাবল, খাটাল, স্টেশন পর্যবেক্ষণ এবং নগ্ন নগ্নিকার ছবি আঁকা কাঠকয়লা, জলরঙ, তৈল-খড়ি, তৈলরঙে। এর মধ্যেই তিনি একটা দূরের ইশারা আনতে পেরেছিলেন। এই জন্যে তাঁর ছবি দেখে ইউগোশ্লাভিয়ার সরকারের নির্বাচকমণ্ডলী ছাত্রবৃত্তি দিতে মোটেও দ্বিধা করেনি। তারপর নানা দেশ ঘুরে তাঁর অভিজ্ঞতা বেড়েছে। ইউগোশ্লাভিয়ার সুন্দরীর সঙ্গে প্রেম, বিবাহ, সন্তান এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহবিচ্ছেদ। নানারকম টানা-পোড়েন, উত্থানপতন। দেশ-বিদেশে হাহাকার নিয়ে ভ্রমণ আর নিয়মিত ছবি আঁকা। মাঝে মাঝে ছুটিতে দেশে ফিরে চাকরির ব্যর্থ চেষ্টা এবং ফেরা। ইদানীং সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন। ও দেশ তাঁর রুটিরুজির জায়গা—দ্বিতীয় স্বদেশ। নিজেকে কর্ণের সঙ্গে তুলনা করেন। এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব, দহনজ্বালা, ভালবাসা আর পূরবী চিত্রকলার ঐতিহ্য এবং ভারতীয় বোধ মিলিয়ে অনিমেষ তাঁর নিজস্ব শৈলী রচনা করেছেন।

প্রচ্ছদের চিত্রটির নাম "বাক্তিহীন বাক্তি" (তৈলচিত্র, ৬৫×৮৫ সি এম)। পটের নীচের দিকে মোমবাতি—যা আসলে মানুষের প্রতীক। এর শিখা মানুষের জ্ঞানবাঞ্ছাশক্তির দ্যোতক। মোম বাতি ঝরে ঝরে গলে পড়ে আর শিখাটা সূর্যকে জ্বালাতে চেষ্টা করে। মানুষের সাধনা এমনই দুঃসাহসী আর অলৌকিক। প্রসীম নীল, অতি সামুদ্রিক নীল, হালকা প্রায় গোলাপী কমলা রঙে আঁকা স্বপ্নসম্ভব চিত্র।

Regd No. WB/CC/184/74

পিকনিক, পার্টি, জন্মদিন, ছুটিতে ভ্রমণ, সবেরই আনন্দঘন মুহূর্তগুলি আগ্ফা-ক্লিক ক্যামেরায় ধরে রাখুন। এত কম দামে এত অপার আনন্দ, আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না।
এই আনন্দদায়ক সুবিধেজনক 'ক্লিক' সর্বদা সঙ্গে রাখুন। আপনার নিকটতম আগফা-গেভার্ট ডীলারের কাছে এখনই চলে আসুন।
পরিবেশক ঃ
আগ্ফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড,
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ
মার্চেণ্ট চেম্বার,
৩১, নিউ মেরিন লাইন্স,
বম্বে ৪০০ ০২০
লেখামাত্রই ছবি তোলা যায়
ক্লিক III আর ক্লিক IV
SIMOES/AG/6/79 BEN

প্রমথনাথ বিশীর

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা রাজনৈতিক উপন্যাস

বঙ্গভঙ্গ ১৪৲

১৯০৫ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জনের মর্জিতে বঙ্গভঙ্গ হল, পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। উদ্দেশ্য বাঙালীর প্রাধান্য ও গৌরব খর্ব করা। বঙ্গভঙ্গের ফলে যে দারুণ বিপ্লবের সূত্রপাত হল ভারতের ইতিহাসে তার নাম স্বদেশী আন্দোলন। ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁসের যে স্থান ভারতের ইতিহাসে সেই-স্থান স্বদেশী আন্দোলনের। বাঙালী সেদিন কার্জনী দম্ভ নীরবে স্বীকার করে নেয়নি, বঙ্গভঙ্গের প্রতি-ক্রিয়ায় আরম্ভ হল বিলিতি মাল বয়কট। দেশের সমস্ত গুণী, জ্ঞানী রাজ-নীতিক কবি কর্ম্মী আন্দোলনকে জোরদার করে তুললেন। আবিষ্কৃত হল বন্দেমাতরম সঙ্গীত তথা আনন্দমঠের গূঢ়ার্থ, আবিষ্কার করলো নিজে-দের মধ্যে আনন্দমঠের সন্তানগণকে, আবির্ভূত হল মৃণ্ময়ী বঙ্গভূমি চিন্ময়ী মাতৃমূর্তি রূপে। একদিকে সঙ্গীতে কাব্যে মনীষায় বাঙ্ময় প্রকাশ—অন্যদিকে বোমা - পিস্তলবাহী আত্মোৎসর্গ। ১৯১২ সালে রদ হল বঙ্গভঙ্গ। স্থায়ী-লাভ হল এই যে সমস্ত ভারতবর্ষ পেলো রাজ-নীতির দীক্ষা, পেলো বন্দেমাতরম মন্ত্রটি। এই পটভূমিতে লিখিত বঙ্গভঙ্গ—ইহা রাজনীতি বা ইতিহাস নয়—সেদিনকার সুখে-দুঃখে আশা ভরসায় গ্রথিত উপন্যাস।

—— সদ্যপ্রকাশিত নতুন বই ——

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের	সমরেশ মজুমদারের	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের
পাঞ্চজন্য	**উত্তরাধিকার**	**হাওয়া গাড়ি**
১ম ১৬·০০, ২য় ১৬·০০	৩০·০০	২৫·০০
দিব্যেন্দু পালিতের	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের	প্রফুল্ল রায়ের
অহঙ্কার	**স্রোতের সঙ্গে**	**সাধ-আহ্লাদ**
৮·০০	১২·৫০	১০·০০

—— শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে ——

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সোনার হরিণ নেই ৩০৲

★

একালের বিখ্যাত জ্যোতিষী ভৃগুজাতকের

১৯৮০ কেমন যাবে ও ভৃগুজাতক পঞ্জিকা

সাড়ে চার টাকা

—— প্রবন্ধ ——

প্রবোধচন্দ্র সেন-এর

ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৭৲

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

ফিরে ফিরে চাই ১৬৲

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের

মহৎস্মৃতি ৫৲

প্রমথনাথ বিশীর

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ৩৲

বঙ্কিম সরণী ১৫৲

রবীন্দ্র সরণী ১৫৲

—ঃ রাধাকৃষ্ণণের দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ-

ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৭৲
(East and West In Religion এর বঙ্গানুবাদ)

ধর্ম ও সমাজ ১৬৲
(Religion And Society এর বঙ্গানুবাদ)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সবশেষ ও বৃহত্তম উপন্যাস

কীর্তিহাটের কড়চা

তারাশঙ্কর বাংলা কথা-সাহিত্যে তাঁর প্রধান স্থানটি অনায়াসে পান নি। কঠোর পরিশ্রমে, বহু লিখে এবং বহু ভাল লিখে তা উপার্জন করেছেন, নেপো-লিয়নের মুকুটের মতো তা কেড়ে নিয়েছেন বলাই উচিত। সেই অবিশ্বাস্য শক্তিধর লেখকের পরিণত বয়সের রচনা—তাঁর বৃহত্তম ও মহত্তম উপন্যাস "কীর্তিহাটের কড়চা"। জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি কূটবুদ্ধি ইংরেজ শাসকদের কুটিলতম চাল। দুশো বছর ধরে এই এক আশ্চর্য মানব-শ্রেণী লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে মাথা কেটেছেন, খুশীমতো খেয়ালমতো। 'কীর্তিহাটের কড়চা' সেই দুশো বছরের বাঙালীদের জীবন-যাত্রার চলচ্চিত্র বিধৃত ; এটিকে ঐতিক শিক দলিল বলা চলে। একটি বংশের উত্থান-পতনের এই রুদ্ধশ্বাস-পাঠ্য জীবন-উপন্যাসে সমগ্র বাংলা দেশ তথা কলকাতার পটভূমিকায় এই জমিদার সমাজের সুকীর্তি এবং কুকীর্তি দুইই প্রতিচিত্রিত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যেই এমন ঔপন্যাসিক পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত বিরল।

তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড ৩৫৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
৩৪-৮৭৯১ ৩৪-৩৪৯২

চিঠিপত্র

কণ্টকল্পিত

গত ২৮-৭-৭১ তারিখের 'দেশ'এ প্রকাশিত শ্রীবেদব্যাস দেবশর্মার চিঠি পড়লাম। অতুল্যবাবু 'কণ্টকল্পিত'তে মহারাজ নন্দকুমার সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা শ্রীযুক্ত দেবশর্মা মহাশয় মানতে পারছেন না।

অধুনা প্রকাশিত ইতিহাস পুস্তকে নন্দকুমার সম্পর্কে যা বলা হয় তাতে বোঝা যায় যে নবাবের ফৌজদার হিসাবে চন্দননগর রক্ষা না করে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছিলেন, এবং এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ইংরাজদের যোগসাজস ছিল বলেই মনে হয়। সম্ভবত নন্দকুমার ইংরাজদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিলেন।

বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের An Advanced History of India, Third Edition p 653 -তে যা লিখেছেন তা তুলে দিলাম :

"It is admitted by the English themselves that the Nawab had a large force near Chandernagore under Nanda Kumar, the Faujdar of Hugli, and if he had not moved away they could not have conquered the French city. **It is almost certain that Nanda Kumar was bribed** but it does not appear that the Nawab had given any definite orders to Nanda Kumar to resist the English".

নন্দকুমারের ফাঁসিকে হয়তো ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। কিন্তু তিনি যে দেশভক্ত বা প্রভুভক্ত ছিলেন এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। প্রথম দিকে তিনি যে ইংরাজভক্ত ছিলেন সেটা বোঝা যায় পলাশীর পর তাঁর উচ্চ পদ লাভে।

এ সমস্ত প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে মহারাজ নন্দকুমার আঠার শতকের আরও অনেকের মত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন মত নীতি বিসর্জন দিয়েছিলেন। সেই জন্য ইংরাজ-নন্দকুমার বিরোধ কোন আদর্শগত বিরোধ ছিল না।

এ আহ্‌মেদ
কোচবিহার

॥ ২ ॥

৮ সেপ্টেম্বরের দেশ পত্রিকার 'কণ্টকল্পিত'তে শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় বর্তমান বাংলার পূজা উৎসব সম্পর্কে খাঁটি কথা লিখেছেন। দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি দেখানোর নামে আমরা মানবিকতার প্রতি যে অভক্তি দেখিয়ে থাকি তা সত্যিই পরিতাপের বিষয়। তিনি দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও কাঙালী ভোজনের কথা লিখেছেন। আর এক রকম 'ভোজন' আছে যা আমরা দিল্লীতে করে থাকি। এর নাম 'পঙ্‌ক্তি-ভোজন'। এ ভোজনের উদ্দেশ্য নিছক শুধু সকলে এক সঙ্গে বসে খাওয়ার আনন্দ নয়। সামাজিকতার দিক থেকে এর যা উদ্দেশ্য এতে করে তার কতটুকু সাধিত হয়? ধনী-দরিদ্রে, উচ্চ-নীচে কতটা মিলন ঘটে?

অজিতেন্দ্র সিংহ
নতুনদিল্লী-৩।

পর্বতারোহন স্পোর্ট : পশ্চিমবঙ্গে

: লেখকের বক্তব্য

২৫ আগস্টের 'দেশ' পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত শ্রীসুধীর গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আমার লেখা সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ হচ্ছে আমি কেন বেসরকারী পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শ্রীঅশোককুমার সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামও নাকি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত ছিল।

সুধীরবাবু যদি আমার লেখাটি একটু যত্নসহকারে পড়তেন তা হলে দেখতে পেতেন আমি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের প্রথম বেসরকারী নন্দাঘুণ্টি অভিযান কার পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত হয়েছিল সেই কথা বলতে গিয়েই অশোকবাবুর নাম উল্লেখ করেছি। সুতরাং এ ব্যাপারে ডাঃ রায়ের নাম উল্লেখ করাটা কি অপ্রাসঙ্গিক হত না? তিনি এইচ এম আই প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু নন্দাঘুণ্টি অভিযানকে বাস্তবায়িত করতে সেদিন অশোকবাবুই তাঁর সাহায্যের প্রশস্ত হাত নিয়ে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। অন্তত নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রীদের কাছে আমি তাই-ই শুনেছি।

সুধীরবাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ—আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মানা-কামেট অভিযানের কথা আমার লেখা থেকে বাদ দিয়েছি। 'ভুলটা ইচ্ছাকৃত' বলে তিনি আমার প্রতি একটু অবিচার করেছেন। কেননা ইচ্ছাকৃতই যদি হবে তাহলে আমি 'মানা-কামেট অভিযানের অন্যতম সদস্য কৃষ্ণচন্দ্র দে...' ইত্যাদি কথাগুলি অনায়াসে আমার লেখা থেকে বাদ দিতে পারতাম (পৃষ্ঠা ৫৩)। আসলে অনবধানতাবশতই মানা-কামেট অভিযানের নামটা তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। শুধু তাই-ই নয় আরো একটি অভিযানের কথাও বাদ পড়েছে। লেখা প্রকাশের পরবর্তীকালে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছি গত বছর আরো একটি অভিযান হয়েছিল। সেটি হচ্ছে আডভেঞ্চারকৃত 'রুবলকাঙ' অভিযান (নেতৃত্বে ছিলেন অসিত মৈত্র)। আমি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত ও দুঃখিত। কিন্তু একটা কথা ভেবে খুবই আশ্চর্য লাগছে সুধীরবাবু কিন্তু এই অভিযানের কথা উল্লেখ করেননি তাঁর চিঠিতে।

পত্র-লেখকের তৃতীয় অভিযোগটি হচ্ছে—১৪টি অভিযানে প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে—একথা নাকি তিনি জানতে পারেন না। তাঁর মতে ২৫ থেকে ৩০ দিনের অভিযানে সদস্যপ্রতি খরচ পড়ে ২ হাজার টাকা। এর দ্বারা তিনি কি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন

...ক বোঝা গেল না। তিনি কি বলতে চেয়েছেন ১০ জনের একটি দল যদি ...মাস ধরে কোন পর্বতশৃঙ্গে (তা আঠারো হাজারেরই হোক কিংবা ...বশ বা তারও উপরের শিখর ...ক) অভিযান চালায় তাহলে ৪০ ...র টাকা খরচ হবে? এবং অনুরূপ ...টি দল এভারেস্টে গেলেও খরচ ...বে ঐ সমপরিমাণ টাকা? কিন্তু ...তবক্ষেত্রে এটা কি মোটেই বিশ্বাস-...গ্য? সুবীরবাবু অভিযানের এক-...ন উদ্যোক্তা হয়ে এই থিয়োরীটি ...ভাবে আবিষ্কার করলেন অ...ধগম্য হল না। আর সম্ভবত তাঁর ...য়োরীর বশবর্তী হয়েই আমার ...তথ্য টাকার অংকটাকে তিনি মেনে ...তে পারেননি। কিন্তু আমি যে এ ...য়ে নাচার! অভিযাত্রীদলের অডিটেড ...কাউণ্টসকে তো আর অবিশ্বাস ...রা যায় না।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় সুবীরবাবুর ...গতির জন্য জানাচ্ছি আমার লেখার ...ধিকাংশ তথ্য ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনি-...রিং ফাউণ্ডেশান এবং অভিযানে ...শগ্রহণকারী অভিযাত্রীদের অনেকের ...ছ থেকে সংগৃহীত।

...ণেশ চক্রবর্তী
...কালী, হুগলী।

...জরুলের নিষিদ্ধ নানাগ্রন্থ : ...খকের বক্তব্য

'নজরুলের নিষিদ্ধ নানা গ্রন্থ' ...র্ষক আমার নিবন্ধটি মনোযোগের ...গ পাঠের জন্য প্রথমেই আমি ...মানস দাসকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ...ব 'ফণিমনসা'র প্রথম সংস্করণ ...ম্পর্কে তিনি যে সন্দেহ প্রকাশ করে-...ন, তা ঠিক নয়। 'ফণিমনসা'র প্রথম ...কাশ ১৩৩৪ সালের শ্রাবণে। ...কাশক : কাজী নজরুল ইসলাম, ...ন পাবলিশিং হাউস। প্রিণ্টার : ...কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, প্রকাশ প্রেস, ৬৬নং ...নিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য--...সিকা। যদিও প্রথম সংস্করণের ...টি আমার হাতে আসেনি, তথাপি ...তথ্য আমি নির্ভুল বলেই মনে করি। ...রা সরকারের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) ...গের গোপন ফাইল থেকে আমি ...তথ্য পেয়েছি। এবং এই ফাইলেই ...স্কার বলা হয়েছে যে, 'সব্যসাচী' ...বতাটি ফণিমনসায় আছে। সন্দেহ ...সনের জন্য আমি কিছু উদ্ধৃতি ...লাম :

Review of the book 'Fani ...nasha" by Nazrul Islam.
This book of poems is ...itten by Nazrul Islam and ...blished by the author from ...Burman Publishing House, ... Cornwallis Street, Cal...ta. It is printed by ...ishna Prasad Ghose, Pra...Press, 66, Maniktala St., ...lcutta in Sraban, 1334 B.S. ...ly, 1927). The title of the ...k means 'cactus' as will ... evident from the last ...nza on page 37 under the ...ding 'Sabyashachi' the first ...m is written. In its third ...nza the author says, 'In ...ry age the wicked and sin-... army of the Kurus die but again revive—they lick the feet of Durjodhan and are bond-stakes of Dus-Sashan. They are ever known in the destruction of Lanka, in the Kurukshetra battlefield, in the hungry eyes of the lustful demons, in the gallows, and whipping in the prison house. Do you think that none would question this debt of oppression?"

এ থেকে পরিষ্কার 'ফণিমনসা'র প্রথম সংস্করণে 'সব্যসাচী' কবিতাটি ছিল। এবং আমার নিবন্ধের প্রথম উদ্ধৃতিটি ওই কবিতারই। 'সব্যসাচী' কবিতার প্রথমেই ওই দুটি ('ওরে ভয় নাই...জাগিছে সব্যসাচী'॥) লাইন আছে আর আমার নিবন্ধের অন্য উদ্ধৃতিটি ('যে লাঠিতে আজ...স্বর্ণলঙ্কা গাড়া!') 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' শীর্ষক কবিতার সর্বশেষ অনুচ্ছেদ। এই কবিতাটিও ফণিমনসার প্রথম সংস্করণে ছিল। কারণ উল্লিখিত review-এর এক স্থানে আছে :

"Under the heading—'Hindu-Muslim Fight', the author writes a few stanzas in which he assures that the Hindu-Muslim fight was simply strengthening the hands of both in augmenting warlike propensities amongst themselves.

In the last stanza, the author says that the lathis which have been used today in demolishing the turrets of mosques and temples will be used tomorrow morning in razing down the fort of the enemy.

If your tail has caught fire, let it burn down the golden Lankas."

(Ref.: 'Fani-Manasha' Fl No. 424|1-2, Home (Political)|confidential).

এই review থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ওই উদ্ধৃতি দুটি 'ফণিমনসার' প্রথম সংস্করণ থেকে নেওয়া। আমার বক্তব্যের সমর্থনে আর একটি তথ্য নিবেদন করছি।

ডি এম লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত নজরুলের কবিতা ও গানের সংকলন গ্রন্থ 'সঞ্চিতা' আমার হাতে আছে। সূচীতে লেখা আছে 'সব্যসাচী' ও 'হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ' কবিতা দুটি 'ফণিমনসা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এবং আমি যে দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছি, তা যথাক্রমে "সঞ্চিতা"র ১০৫ ও ১২০ পৃষ্ঠায় আছে। মানসবাবু দেখে নিতে পারেন। এটি "সঞ্চিতা"র দ্বাদশ সংস্করণের গ্রন্থ। তারিখ : ফাল্গুন ১৩৬৯।

"ফণিমনসা"র প্রথম সংস্করণের বইয়ে কী কী কবিতা আছে, আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। কারণ, ওই বইটি আমি পাইনি। তবে বইয়ের উপর সরকারী আমলার রিভিউ আমি দেখেছি! এই রিভিউতে "সব্যসাচী" ও "হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ" শীর্ষক কবিতা দুটি ছাড়া এই কবিতাগুলি সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে : "দ্বীপান্তর", "বন্দিনী", "মাতৃকায়" "বিদায়", "যা শত্রু পরে পরে"। তবে এখানে সব কবিতার কথা নেই--আছে কেবল আপত্তিকর কবিতাগুলিই। চিঠির জবাব সুদীর্ঘ হয়ে যাবে বলে

"আমার পরিবারের জন্যে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয়ই চাই!"

একমাত্র কমপ্লান-ই হল প্রত্যেকের দরকারী ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণে ভরপুর সম্পূর্ণ আহার!

একমাত্র কমপ্লানেই আছে স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ধারিত অনুপাতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন ও অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ যা প্রত্যেকের··· প্রতিদিন দরকার!

মনে রাখবেন, সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্যে ডাক্তাররাই বেশী করে কমপ্লান খেতে বলেন।

কমপ্লান পাওয়া যায়—প্লেন আর চকলেট, এলাচ-জাফরানের মুখরোচক স্বাদগন্ধেও এবং স্ট্রবেরীর এক নতুন স্বাদগন্ধে—যা বাচ্চারা দারুণ ভালোবাসে!

কমপ্লান

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয়

CASGC-38-234 BEN

আমার নিবন্ধের কোথাও আমি বলিনি যে, 'নব-যৌবন-জল-তরঙ্গ' কবিতাটি 'ফণিমনসা'য় আছে। আর ঐ নামে কবির কোন কবিতাও নেই। আছে 'নব-যৌবন-জল-তরঙ্গ' নামে কবিতা এবং সেটি কবির 'সন্ধ্যা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। আমি লিখেছিলাম : "নব-যৌবন-জল-তরঙ্গ'র 'সব্যসাচী'র কবিতাগ্রন্থ ফণি-মনসা যে সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্যের কী?" 'নব-যৌবন-জলতরঙ্গ' শব্দটি 'সব্যসাচী' কবিতারই একটি লাইনে আছে। তা হল : 'নব-যৌবন-জলতরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী।' 'সব্যসাচী' কবিতার প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তি এটি। (দ্রষ্টব্য : সঞ্চিতা, পৃঃ ১০৫) এই ভুল বোঝার জন্য আমি দুঃখিত। আমার মনে হয় প্রথম সংস্করণের 'ফণি-মনসা'র সঙ্গে পরবর্তী সংস্করণের তফাতের কারণ, আপত্তিকর কবিতাগুলি পরে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আমার নিবন্ধের বিষয় নয় বলেই কবির অসুস্থতা সম্পর্কে বিস্তৃত করিনি। তবুও মানসবাবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, কবি অত্যন্ত গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ১৯৪২ সাল থেকেই। তবে আগে থেকেই তার আভাস দেখা দেয়। এ সম্পর্কে জুলফিকার হায়দার তাঁর 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' গ্রন্থে লিখেছেন : "১৯৪২ সালের ১০ই জুলাই তারিখে কাজীদা আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং তাঁর অসুস্থ অবস্থার সংবাদ চিঠিতে আমায় জানান।

প্রিয় হায়দার, ৭-১০-৪২

তুমি এখনই চলে এস। অমলেন্দুকে আজ পুলিস arrest করেছে। আমি কাল থেকে অসুস্থ।

ইতি
নজরুল'

এ সময় অমলেন্দু দাসগুপ্ত দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন এবং কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রধান সম্পাদক। অমলেন্দুবাবু তখন গ্রেফতার হননি। রোগাক্রান্ত হয়ে বুদ্ধিভ্রষ্টতার জন্য হয়তো নজরুল ওই কথা লেখেন। আর চিঠিতে উল্লিখিত তারিখটিও প্রমাদপূর্ণ। কেননা সেটা ৭-১০-৪২ এর স্থলে ১০-৭-৪২ হবে। এটাও কাজীর অসুস্থতারই লক্ষণ। আসলে এর অনেক আগে থেকেই কাজীর শরীর ভাল যাচ্ছিল না।

শিশির কর
হাওড়া

উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের 'ঝুম' চাষ

গত ১৮ অগাস্ট দেশ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের "উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের 'ঝুম' চাষ" রচনার 'ঝুম' শব্দটি 'জুম' হবে। লেখক খুব সম্ভবত অল্প কয়দিনের ভ্রমণে তাদের উচ্চারিত 'জুম' শব্দটি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। তবে নাগাল্যাণ্ড বা অরুণাচলে গৃহীত উপজাতিদের বিভিন্ন উৎসব এবং জুম চাষ-পদ্ধতির ফটোগ্রাফ সহ মূল্যবান। কিন্তু ঐ প্রবন্ধে [illegible] অমিল থেকে গেছে। ত্রিপুরায় যে কটি উপজাতি আছে তাদের মধ্যে—ত্রিপুরী, রিয়াং, মগ, হালাম, গারো, জমাতিয়া, লুসাই, দার্লং প্রভৃতিকে একই পদ্ধতিতে চাষ করতে দেখি। লেখক ফটোগ্রাফের মাধ্যমে যেভাবে বীজ বপনের দৃশ্য অবতারণা করেছেন তা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মেলে না। ত্রিপুরার কোন উপজাতিই গাছের ডাল চেঁচে সরু করে তার সাহায্যে মাটিতে গর্ত করে না। এখানের উপজাতিরা—আমাদের ব্যবহৃত খুন্তির মতো এক প্রকার দা ব্যবহার করে—লোহার তৈরী একেবারে সোজা, অগ্রভাগ পাতলা চেপ্টা ও গোড়ার দিক সরু। মজবুত করে ধরার জন্য গাছের ডালে বিদ্ধ করা থাকে। এর অগ্রভাগ এবং কিনারার একদিক ধারালো। লেখক প্রচারিত ৫নং ফটোগ্রাফে উপজাতিরা যে অস্ত্র দিয়ে ডাল কাটছে ঠিক তারই মতো তবে অত লম্বা নয়। এই অস্ত্রের নাম ওরা বলে—'টাক্কাল' বা 'টাকল'। তা ছাড়া ত্রিপুরা বহু উপজাতির বাস, এখানকার কোন উৎসবের ছবি বা বর্ণনা লেখক প্রকাশ করেননি। সর্বোপরি লেখকের রচনাশৈলী যে ধারায় প্রকাশ পেয়েছে তাতে প্রবন্ধের নাম 'উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের ঝুম চাষ' না দিয়ে এলাকা ভিত্তিক—প্রদেশগুলির নাম দিয়ে জুম চাষ পদ্ধতির উল্লেখ করলেই সুন্দর হতো। কারণ লেখক প্রচারিত জুম চাষের সঙ্গে ত্রিপুরার জুম চাষ-পদ্ধতি আংশিক মিললেও সম্পূর্ণ নয়।

তারিণী দেব
মাছলীবাজার, উত্তর ত্রিপুরা

পৌরাণিক মনে স্ত্রী বিদ্বেষ : লেখকের বক্তব্য

আমার পৌরাণিক মনে স্ত্রীবিদ্বেষ নামক দেশে প্রকাশিত প্রবন্ধের উল্লেখ করে শ্রীকমান গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "দুইটি মহাকাব্য ও কয়েকটি তথাকথিত শাস্ত্রের বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃত এবং কাহিনী থেকে সমাজতত্ত্বের একটি জটিল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্মত হবে?" এই প্রসঙ্গে তিনি কিছু ইংরেজ কবির উক্ত উদ্ধৃত করে প্রশ্ন করেছেন, তাদের থেকে কি কিছু প্রমাণিত হয়? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে আমি কেন মহাকাব্য ও পুরাণ সাহিত্যকে ভিত্তি করেছি এবং অন্যান্য প্রবন্ধ যা লিখব তাতেও করব তার কারণ আলোচনা করব। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলির কোনটি একজন কবির একক প্রচেষ্টার ফল নয়। শেক্সপীয়র বা পোপ জাতীয় কবিদের উদ্ধৃতির সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের থেকে উদ্ধৃতির কোন তুলনাই হতে পারে না। যুগ যুগ ধরে কতজন কবির কত পরম্পরের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে এদের বর্তমান আকার গ্রহণ করেছে তা কারও সঠিক জানা নেই। কিন্তু একথা নিশ্চয় সকলেই মানবেন যে যুগ যুগ ধরে কাব্য, সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ এদের যাই বলা হোক না কেন এরাই ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের মনকে গড়ন দিয়েছে।

আমার প্রবন্ধটির মূল ভিত্তি এই ধারণা যে এই হিন্দু মন যুগ যুগ ধরে যেভাবে গড়ে উঠেছে তা এক দিকে এই রচনাগুলিকে প্রভাবান্বিত করেছে, আবার একই কালে অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। বস্তুত প্রাচীনকালের হিন্দু মন আমার অনুসন্ধানের বিষয় নয়। আমার অনুসন্ধানের বিষয় হচ্ছে আজকের দিনের আমাদের হিন্দু মনকে যেভাবে যে আকারে পাচ্ছি, তার উৎসের সন্ধান করা। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় আমার উদ্ধৃতিগুলিকে পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যের সমর্থনে যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছি ঠিক সেই ধরনের উদ্ধৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই শত সহস্র করে পাওয়া যাবে। আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করার মতো উদ্ধৃতি খুঁজে খুবই কম পাওয়া যাবে। পাঠকেরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

অন্য আর দু-একজন পত্রলেখক অন্যান্য দেশ ও ভাষা থেকে উদাহরণ দিয়ে যুক্তি দিয়েছেন যে স্ত্রী-বিদ্বেষ ঘটনাটি একমাত্র হিন্দু ঐতিহ্যের ব্যাপার নয়। এই কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। পুরুষদের এই মনোভাবটা যে সর্বকালেই সর্বদেশেই সর্বধর্মেই ছিল এবং আছে তা নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে না। কিন্তু "এই দুর্ভাগা দেশে মানুষ দ্বারা মানুষের অপমানের পর্যায় যে অতল গভীর স্পর্শ করেছে তার তুলনা বোধ হয় বিশ্বের ইতিহাসে নেই।" আমার এই বক্তব্যে আমি অচল থাকব। শ্রীশুভেন্দুকুমার মিত্র যেসব উদাহরণ দিয়েছেন তা সকলেরই জানা। কিছু লোককে পায়ের নীচে চেপে রাখার ঘটনা তো সব দেশের ইতিহাসেই ছিল এবং আছে। কিন্তু ঐ পদতলে স্থান পাওয়াটাতেই পরম গৌরব—হিন্দুনারীর সতী ধর্ম তা ছাড়া আর কি? এই পর্যায়ের মর্যাদাহানি আর কোন সমাজে করা হয়নি। দাসেদের উপরে যত শারীরিক অত্যাচারই করা হয়ে থাকুক আমাদের দেশে নারীদের এবং নীচু জাতের লোকেদের শরীরকে নয় মনকে যেভাবে থেঁতলে বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে তার নজির অন্য কোন দেশে পাওয়া যাবে না বলে মনে করি।

আমার পূর্বেকার প্রবন্ধ 'পৌরাণিক মনে কাম' প্রসঙ্গে অনেক পত্রলেখক যেসব যুক্তি প্রদান করেছেন তাদের প্রত্যেকটিকেই আমি আমার প্রবন্ধে আলোচনা করে খণ্ডন করেছি বলে বিশ্বাস করি। সুতরাং তাদের উত্তর দিতে গেলে আমাকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে মাত্র। আমি শুধু শ্রীদেবেন্দ্র গুপ্তের পত্রের এই একটি বাক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। "খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্য চিত্রকলার মিথুন ভাস্কর্যের সংখ্যা শতকরা একেরও কম।" এ তো তথ্যের ব্যাপার। পাঠকদের মধ্যে অনেকেরই নিশ্চয়ই চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আছে। তাঁরাই বিচার করুন কথাটা কতটা সত্য-নির্ভর।

অশোক রুদ্র

বিষয় উপভোগ্য, সামাজিক স্বাধীনতা

শ্রীঅশীন দাশগুপ্তর দীর্ঘ

এল। শ্রীদাশগুপ্ত ক্ষমা করবেন যদি আমি তাঁকে ভুল বুঝে থাকি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ভারতীয় সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলার আমদানিতে তিনি যেন খুশী হয়েছেন। তিনি আশাবাদী। তাই মনে করছেন, এই ক্রান্তিকাল পেরিয়ে জনতা প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পাবে।

কিন্তু স্বাধীনতার স্বরূপ এবং সমাজ বিশেষে তার সম্ভাবনা যাচাই করতে হলে প্রথমেই ভিন্ন দুটি দৃষ্টিকোণ মেনে নেওয়া দরকার। একটি রিয়ালিস্টিক কিংবা ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ, অন্যটি আইডিয়ালিস্টিক কিংবা আদর্শবাদী দৃষ্টিকোণ। এভাবে দেখলে স্বাধীনতারও দুটি পৃথক রূপ ফুটে উঠবে। (এক) চিন্তার স্বাধীনতা: (দুই) কর্মের স্বাধীনতা।

চিন্তার স্বাধীনতা আদর্শবাদী এবং অবাধ। প্রাচীন কিংবা অর্বাচীন সকলেই এ বিষয়ে একমত হবেন। কিন্তু কর্মের স্বাধীনতা অবাধ হতেই পারে না। কারণ একের কর্ম অন্যের ব্যবহারিক জীবনকে প্রভাবিত করবেই। সুতরাং এই প্রভাব প্রভাবিতের ইচ্ছানুরূপ না হলেই সে বাধা দেবে এবং যদি বাধাদানকারী ও বাধাপ্রাপ্ত, দুজনেই যথেষ্ট শক্তিশালী তথা আপনাপন বিভিন্ন মতবাদে অটল হন তা হলেই সংঘাত অনিবার্য। ভালমন্দের দ্বৈতবাদের বিশ্বাস অটল রাখতে গেলে এই সংঘাত চলতেই থাকবে যতদিন না একপক্ষ, নিতান্ত শক্তিহীনতার জন্যই, অন্য পক্ষের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। ওই পরিস্থিতিতে সমাজে স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাবই অবশ্যম্ভাবী।

সভ্য সমাজ এই সংঘাত এবং তার ফলশ্রুতিরূপে স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাবকে এড়িয়ে চলতে চায়; তাই conformity-র অনিচ্ছাকে উগ্র আকার নিতে দেয় না। আলোচনার মাধ্যমে সে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে—এমন কি তার আদর্শকে কিছুটা অবনমিত করেও। সমাজজীবনে আদর্শ ইউটোপিয়া হতে বাধ্য। কারণ প্রতিবাদীদের ব্যবহারিক অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের কিছু কিছু মতামত মেনে না নিলে সমঝোতাই তো হবে না। এইভাবে দ্বৈতবাদের (ব্রহ্ম কিংবা পরম সত্য সম্পর্কিত নয়। সামাজিক ভাল-মন্দ বিষয়ক) অবসান ঘটিয়ে সামাজিক শুভ সম্পর্কিত অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে। এবং এটা অনস্বীকার্য, আদর্শের এই অদ্বৈতবাদ সৃষ্টি হলে তবেই সুস্থ, সবল, প্রগতিশীল সমাজ-জীবন সম্ভব, অন্যথায় নয়। এটাকে সুস্থ, সামাজিক মানুষ কখনও স্বাধীনতার ব্যত্যয় বলে মনে করে না। সামাজিক স্বাধীনতার প্রখ্যাত প্রবক্তারা এ জন্যেই বলেছেন—Liberty is not licence, কিংবা Duties precede rights. ভালমন্দ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি, তবু "আদাগো দাদা দেখছি ভেবে অনেক দূর/এই দুনিয়ার সকল ভাল/তুমিও ভাল আমিও ভাল/" ইত্যাদি অনেক দীর্ঘ আলোচনার পরে হলেও, "কিন্তু সবার চাইতে ভাল" যে কি তা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে এবং বিনা দ্বিধায় তাকে গ্রহণ করতেই হবে। এই অদ্বৈতবাদী আবহাওয়ায়

গুপ্ত যা বলেছেন তার সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, শিশুর ব্যক্তিত্বকে তথাকথিত সম্মানদানের বাড়াবাড়ি কিংবা পুরোনো আদর্শকে হেনস্তা করার বাড়াবাড়িও স্বাধীনতার পরিপোষক হতেই পারে না। মনে রাখা দরকার, সম্মানীয় ব্যবহারের সীমা ছাড়ালেই, শিশু হোক বৃদ্ধ হোক, কাউকেই আর সম্মান করা যাবে না। উদাহরণ দিয়ে বলি। যে শিশু স্বার্থপর, ভাই বা বোনের অধিকার অগ্রাহ্য করে সবটুকু খাওয়াদাওয়া, আদর যত্ন একচেটিয়া করতে চায় কিংবা যে শিশু বাবার ঠ্যাঙানির ভয়ে কাবু হয়ে থাকলেও ঝিকে লাথি মেরে বায়না আদায় করে তাকে কি সংশোধন করা উচিত নাকি সম্মান করা উচিত? অনেকেই বাবার কিংবা পরিবারের বড়দের চরিত্র সংশোধনের দাওয়াই হাকড়াচ্ছেন, শুনতেই পাচ্ছি। সে প্রয়োজন অস্বীকার করি না। কিন্তু তাতেই শিশুর সংশোধন অপ্রয়োজন হয়ে পড়ে না। আসলে বয়সের ভিত্তিতে নয়, সম্মান দেওয়া উচিত আদর্শবাদিতার ভিত্তিতে। ঘুরে ফিরে আবার সেই অদ্বৈতবাদ—কারণ আদর্শ কোনদিনই দ্বৈত হতে পারে না।

পুরোনো ধারণাগুলি সম্পর্কেও সেই একই কথা। রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি ভাল কি মন্দ জানি না কিন্তু তার জনহিত বা প্রজারঞ্জনের আদর্শ! সেও কি পরিত্যাজ্য? যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা কিংবা হনুমানের বিশ্বস্ততার আদর্শ বাদ না দিলেই কি স্বাধীন সমাজ তৈরী হবে না? কিংবা তাদের বাদ দিলেই কি স্বাধীন মানুষ তৈরি করা অতি সহজ হয়ে যাবে? তা কোনদিনই নয়। বরং বলব নীতিশিক্ষা বাদ দিয়ে কোন দিনই ব্যবহারিক অর্থে স্বাধীন সমাজ গঠন করা যাবে না। বর্তমান নেতারা কিংবা মা-বাবারা স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে কিংবা অবস্থার চাপে পড়ে নীতিহীন জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন বলেই যে সমাজে নীতিশিক্ষা তুলে দিতে হবে শ্রীদাশগুপ্তের এই কথাও গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না। অবশ্য নেতাদের কাছ থেকে চাক্ষুষ উদাহরণ পেলে জনতা আরও সহজে আদর্শবাদ শিখতে পারত সন্দেহ নেই। তবুও, বর্তমান নেতারা যদি আমাদের নিরাশও করেন প্রাচীন উদাহরণগুলি পর্যালোচনা করলেই আমরা মনে বাঞ্ছিত বল পাব।

একথা মনে রাখলে আমাদের উপকারই হবে: প্রকৃত মানুষ পরিস্থিতির ফসল হিসেবে যতটা না উদ্ভূত হন তার চাইতেও অনেক বেশী পরিমাণেই পরিস্থিতির প্রতিবাদ রূপেই আবির্ভূত হন। রামচন্দ্র কিংবা যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাতি-পরিজনদের মধ্যেই ছিল তাঁদের আদর্শের পরিপন্থী জীব। হরিশ্চন্দ্র নাটক বহু যুগ পেরিয়েও গান্ধীজীকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল বর্তমান যুগের হৃদয়হীন, সত্যভ্রষ্টতার ভূরি ভূরি উদাহরণ সত্ত্বেও। সমসাময়িক সমাজের মেরুদণ্ডহীন ভীরুতাই বীরসিংহ গ্রামের সেই মহাপ্রাণ শিশুটিকে কালে সিংহের মতই তেজী করে তুলেছিল। উদাহরণের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ

আলোচনা করলেই হয়তো এটা দেখা যাবে।

পরিশেষে মনে হচ্ছে, সমাজের যে বিকার শ্রীদাশগুপ্তকে স্বাধীনতার স্বরূপ দেখাবার আশায় উদ্বুদ্ধ করেছে তা মোটেই শুভংকর নয়। এ সম্পর্কিত বাড়াবাড়ি আমাদের নিঃসন্দেহে ভুলের বিনাশের পথেই নিয়ে যাবে। নয়তো বড়জোর, মন্দের ভাল, স্বৈরতন্ত্র—জীয়ন্তে মরে থাকা। কিন্তু উপভোগ্য, বাস্তব, ব্যবহারিক, সামাজিক। স্বাধীনতা কিছুতেই স্বল্পপ্রয়াসী, দ্বৈতবাদী আবহাওয়ায় মিলতে পারে না। শ্রীদাশগুপ্ত নিজেও মাঝেমাঝেই এই ভয়ে আঁতকে উঠেছেন। তবুও তিনি অসম্ভবের আশায় আমাদের বাস্তবকে ভুলে থাকতে বলেন—এই আশ্চর্য। কিছুতেই স্বীকার করেন না, বলেন না, এই দ্বন্দ্ব এড়িয়ে আদর্শ সম্পর্কিত অদ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তবেই পাব বাস্তব আর উপভোগ্য সামাজিক স্বাধীনতা, অন্যথায় নৈব নৈব চ।

দীপকরঞ্জন চৌধুরী
কলিকাতা-৪৫

প্রচ্ছদশিল্পী পরিচিতি

'দেশ' পত্রিকায় (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯), আমাদের পারিবারিক বন্ধু সুরজিৎ দাসের পরিচিতি পড়ে ভাল

লাগল। এ সম্পর্কে দু একটা কথা জানাতে চাই।

সুরজিৎ তেলকল মালিকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করলে হয়ত কলকাতার থেকে চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে পড়াশুনো করতে পারতেন না। সুরজিতের জীবনে তেলকল মালিকের অবদান অনস্বীকার্য।

জিওলজিক্যাল সার্ভের চাকরী সূত্রে যুগ্মভাবে দেবব্রত চক্রবর্তীর সঙ্গে হায়দ্রাবাদ ছাড়াও হিমাচল প্রদেশেও সুরজিতের কাজ আছে। যতদূর জানি ওই একই সূত্রে বর্তমানেও সুরজিতের হাতে এ জাতীয় আরও দু একটা কাজ আছে।

প্রচ্ছদশিল্পী পরিচিতিতে একটা ভুল আছে। হয়ত বা এটা মুদ্রণ প্রমাদ। সুরজিৎ হায়দ্রাবাদে প্রদর্শনী করেন ১৯৬৫ ও ৬৬ সালে, ১৯৫৫, ৫৬ সালে নয়।

চিত্রা ভট্টাচার্য

প্রকাশিত হল

গিরিধারী কুন্ডুর

নতুন কিশোর-উপন্যাস

রাত একটা

দাম ৪.০০

'টংসা চু' যারা পড়েছ তারা নিশ্চয়ই টুমপুকে মনে রেখেছ। আর যারা পড়োনি তারা এই বইতে টুমপুর নতুন অভিজ্ঞতার এক আশ্চর্য কাহিনীর মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে পরিচিত হবে। 'টংসা চু' ছিল ভুটানের পটভূমিকায়, আর 'রাত একটার' কাহিনী শুরু হচ্ছে দার্জিলিঙ যাবার পথে, ট্রেন থেকে। হ্যাঁ, ট্রেন থেকেই শুরু এই দুরন্ত কৌতূহলকর রহস্যকাহিনীর। সে-রহস্যের অবসান দার্জিলিঙে পৌঁছে, অনেক গা-ছমছম-করা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে।

দার্জিলিঙ যাচ্ছিল টুমপুরা। কলকাতার মস্ত শিকারী টিংলুবাবু এসে জুটলেন শিলিগুড়ি স্টেশনে। একেবারে টুমপুদেরই কামরায়। হঠাৎ ঘুম স্টেশনে নেমে চা খেতে গিয়ে বেমালুম উধাও হয়ে গেলেন টিংলুবাবু। কামরার আরেকজন রহস্যময় মানুষ শশাংকবাবুও বেপাত্তা। এই দুজন হারানো মানুষের খোঁজ পেতে গিয়ে রক্ত হিম-করা যে-অভিজ্ঞতা হল টুমপুর, তাই নিয়েই গড়ে উঠেছে এই অনবদ্য হত্যা-রহস্য অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী। সেই সঙ্গে দারুণ দারুণ সব ছবি।

প্রচ্ছদ বিপুল গুহ, আর ভেতরের ছবি এঁকেছেন দেবাশিস দেব।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতা-গ্রন্থ

উলঙ্গ রাজা দাম ৫.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা পড়লেই বোঝা যায়, তিনি এই রুগ্‌ণ সমাজের ব্যাখ্যাতা, এই দুঃস্থ দিবসের ভাষ্যকার। তাঁর কবিতা যেন সন্ধানী আলোর মতো, দেশ ও কালের নানা গোপন যন্ত্রণাকে যা নিমেষে উদ্‌ঘাটিত করে। সর্বকালের যোগ-সম্পর্কে আস্থাশীল হয়েও তিনি সমকালের সঙ্গী, ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তিনি প্রতি মুহূর্তেই আবার নতুন কলেবরে দীপ্তিমান। তাঁর সাম্প্রতিক যেসব বিখ্যাত কবিতার পংক্তি আজ পাঠকদের মুখে মুখে ফেরে, তারই সংকলন এই গ্রন্থ—'উলঙ্গ রাজা।'

এই লেখকের অন্যান্য বই:

আজ সকালে (কাব্যগ্রন্থ) ৫.০০ পিতৃপুরুষ (উপন্যাস) ৭.০০ সাদা বাঘ (ছোটদের ছড়া) ১০.০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

নতুন কিশোর উপন্যাস
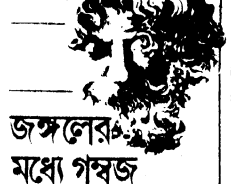
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

মতি নন্দীর

ক্রিকেটের পটভূমিকায় উপন্যাস

ননীদা নট আউট

দাম ৫.০০

কিছু নিরলস ও নিঃস্বার্থ মানুষের অসামান্য ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের জন্যই এ-দেশের বহু ছোট ক্লাব টিকে রয়েছে। এমনই একজন মানুষকে নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে ক্রিকেট-জগতের অন্দরমহলের এক অনবদ্য ও

অন্তরঙ্গ ছবি উপহার দিয়েছেন মতি নন্দী। দীর্ঘদিন বাদে নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হল।

ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

ইন্দ্রমিত্রের

প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থ

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা দাম ৬.০০

বালক বিদ্যাসাগরের জীবনের মজাদার বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে আশ্চর্য এক জীবনচিত্র উপহার দিয়েছেন ইন্দ্রমিত্র। পাঠক জানেন, অধ্যবসায়ী গবেষক ইন্দ্রমিত্র যাচাই না করে কোনো তথ্য কখনো ব্যবহার করেন না। ছোটদের হাতে তাই নির্ভাবনায় তুলে দেবার যোগ্য তাঁর বই।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

প্রথম উপন্যাস

ঘুণপোকা দাম ৬.০০

আজকের সফল, খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের যে-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, সেই উপন্যাসের নাম 'ঘুণপোকা।' প্রথম উপন্যাসেই তিনি যে প্রতিষ্ঠার মহত্তম সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, বিষয়ে ও ভঙ্গিতে রেখেছিলেন তুমুল স্বাতন্ত্র্যের স্পষ্ট ও প্রবল চিহ্ন—সেই ঐতিহাসিক মূল্যের দিক থেকে 'ঘুণপোকা' চিরকালের একটি অবশ্যপাঠ্য রচনা হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। অখণ্ড অবসরসম্পন্ন, বেকার, টেরিলিন-টাইয়ের নির্মোক থেকে মুক্ত, সদ্য একত্রিশ-পূর্ণ-হওয়া এক মানুষ, অল্প কিছুদিন আগেও যে ছিল উচ্চাশাসম্পন্ন এক বড় চাকুরে, কেরিয়ার এবং ভোগই ছিল যার জীবনের স্থির এবং একমাত্র লক্ষ্য, কেমন করে নৈরাশ্য এবং নির্বেদের অন্ধকার অতলে ডুবতে-ডুবতে ধীরে-ধীরে লক্ষ্যান্তরিত হল জীবনচর্যা এবং ভালবাসায়, উত্তীর্ণ হল এক নতুন জীবনে—তরুণ লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর এই প্রথম উপন্যাসে এক প্রবীণ ঔপন্যাসিকের নৈপুণ্য নিয়ে তা চিত্রিত করেছেন।

লেখকের অন্যান্য বই:

শ্যাওলা ৮.০০ কাগজের বউ ৮.০০ যাও পাখি ২৫.০০ আশ্চর্য ভ্রমণ ৬.০০ দিন যায় ৮.০০ পারাপার ২০.০০ মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুর্ধর্ষ কিশোর-উপন্যাস

সত্যি রাজপুত্র

দাম ৬.০০

টাকার লোভে ছোট্ট ছেলে মলয়কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এক ডাকাতের দল। রূপকথার গল্পের বীর রাজপুত্রের মতোই মলয় কীভাবে সেই চক্রান্তজাল

ছিন্ন করে বিজয়ীর বেশে ফিরে এল তারই বুক-তোলপাড়-করা দুর্ধর্ষ কাহিনী 'সত্যি রাজপুত্র।'

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভয়ংকর সুন্দর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

ভয়ংকর সুন্দর

দাম ৬.০০

সন্তু আর কাকাবাবুর—যাঁদের নিয়ে পরবর্তীকালে 'সবুজ দ্বীপের রাজা' ও অন্যান্য উপন্যাস—প্রথম দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী 'ভয়ংকর সুন্দর।'

সম্রাট কনিষ্কের কাটা মুণ্ডুর খোঁজে কাশ্মীরে গিয়ে সন্তু আর কাকাবাবুর যে-রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা

দেশ ৪৬ বর্ষ ৫০ সংখ্যা
৩ কার্তিক ১৩৮৬

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

কেতকী কুশারী ডাইসনের প্রবন্ধ
অনুবাদ-কবিতা
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প
নেশা

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

চিকিৎসায় 'বহুজনহিতায়' নীতি

ভারতের গ্রামীণ জীবনের অনেক অভাবের মধ্যে চিকিৎসার সুযোগের অভাবও একটি বড় রকমের দুঃখজনক বঞ্চনা। আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির ক্ষেত্রে যাঁরা কৃতবিদ্য ও শিক্ষিত তথা মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটের অধিকাংশ, অর্থাৎ শতকরা প্রায় নব্বই জন শহরের মধ্যে তাদের কর্তব্যের এবং আর্থিক উপার্জনের ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন। গ্রাম এঁদের কোন দিনও আকর্ষণ করেনি, আজও করতে পারছে না। এই অবস্থার সব চেয়ে বড় হেতু এই যে, মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটরা গ্রামাঞ্চলকে আর্থিক উপার্জনের পক্ষে নিতান্ত সীমিত রকমের ক্ষেত্র বলে মনে করেন। এটা যুক্তিহীন অথবা নিতান্ত অহৈতুকী ধারণা নয়। তাঁরা শহরের মধ্যে আর্থিক উপার্জনের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশস্ততার প্রতিশ্রুতিযুক্ত সম্ভাবনার সঙ্কেত লক্ষ করেছেন, এবং তাঁদের উপলব্ধি এই যে শহরে থেকে 'প্র্যাকটিস' করে তাঁদের বিত্তবত্তা সহজে পরিস্ফীত করা সম্ভব। গ্রামে থাকলে সেটা সম্ভব নয়, যদিও পরিমিত প্রকারের উপার্জন খুবই সম্ভব। কোন সন্দেহ নেই যে, ডাক্তারদের আকাঙ্ক্ষার চোখে গ্রামীণ আকাশের রামধনুটি তেমন কিছু বর্ণাঢ্য বলে বোধ হয় না। তা ছাড়া প্র্যাকটিসের স্বাচ্ছন্দ্য কুণ্ঠিত করে দেবার মতো নানা অবস্থা-ব্যবস্থা এবং উপকরণেরও অভাব গ্রামজীবনের একটি রিক্ততা বলে তাঁরা অভিযোগ করে থাকেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সরকারের কাছে অনেকবার অনেকরকমের অভিযোগমূলক বক্তব্য পরিবেষণ করা হয়েছে।

বেশ তো, মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদের পক্ষে এইসব স্বার্থ সংক্রান্ত বক্তব্য উচ্চভাষিত হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কেউকোন মন্তব্য মুখরিত করবে না। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত তিন বছরের মেডিক্যাল শিক্ষা কোর্স, তথা এল-এম-সি কোর্স পুনরায় প্রবর্তন করে গ্রামীণ জীবনের পক্ষে আধুনিক চিকিৎসার প্রসন্নতা সুলভ করে তোলবার উদ্যোগ সম্বন্ধে এত বিরুদ্ধতা প্রকাশ করবার কোন যুক্তি থাকতে পারে? সরকার ভাবছেন বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কথা। এর মধ্যে এল-এম-সি'র শিক্ষাগত যোগ্যতার মান সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত করবার প্রত্যক্ষ কোন যৌক্তিক প্রয়োজন নেই। অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য বিশ্লেষিত করলে এই শোচনীয় সত্যের সঙ্কেত স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে বৃহত্তর সামাজিক জীবনের বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণের তুলনায় বিদ্যার ও শিক্ষার একটা উন্নত উৎকর্ষের সেবকতা করাই সবার আগের কাম্য আদর্শ। এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোবৃত্তিকেই বস্তুত একটি অকাম্য রিক্ততা বলে বিবেচনা করা চলে, যেটা অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংস্থার অথবা বড়-ডাক্তারবাবুদের চিন্তারীতির মর্যাদা অবনমিত না করে পারে না। সমালোচক বলবেন, এটা একরকমের আভিজাতিক অহমিকার কথা।

ভারতে প্রতি পাঁচ হাজার ব্যক্তির জন্য একজন ডাক্তার আছেন, এটা নিতান্ত একটা আঙ্কিক পরিচয়। প্রতি পাঁচ হাজার ব্যক্তির প্রত্যেকেরই পক্ষে একজন ডাক্তারের সহায়তা পাওয়া যায়, এই মর্মের ধারণা ওই আঙ্কিক হিসাবে প্রতিফলিত হয় না। কয়েক মাস আগে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারিত হিসাবে উল্লেখ ছিল যে, ১৯৭৮ সালে ভারতে প্রতি ৩১৩৫ ব্যক্তির জন্য একজন ডাক্তার নিয়োজিত ছিল। এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, গ্রামীণ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রতি এক লক্ষ ব্যক্তির জন্য একজনও বড়-ডাক্তার আছে কিনা সন্দেহ। সারা ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে মোট ষাট হাজার ডাক্তার বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেই অনুপাতে হিসাব করলে ওই বিষণ্ণ বাস্তব সত্যটিরই পরিচয় প্রকট হয়। গ্রামের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ অধিবাসীর ভাগ্যে ডাক্তারের সাহায্যে চিকিৎসিত হবার সুযোগ তথা সৌভাগ্য নেই।

তিন বছরের শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করবেন যাঁরা, তাঁদের বিদ্যাবত্তার মান সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত করবার দরকার হয় না। এ ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণের নীতিই বৃহত্তর সার্থকতার এবং মর্যাদার গৌরব লাভ করবে। যাদের ভাগ্যে কোন চিকিৎসাই জোটে না তাঁরা না-হয় কিছুটা নিম্নতর মানের কৃতী ও গুণী চিকিৎসকের সাহায্য পেলেন। এর ফলে চিকিৎসা-বিদ্যার সারস্বত রূপ বিকৃত হয়ে যাবে না। কর্তব্যের সর্ব ক্ষেত্রে দক্ষতার একাধিক পর্যায় থাকে। অতীতের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে যদি ঘটনার দৃষ্টান্ত আহরণ করা হয়, তবে দেখা যাবে যে শহর অঞ্চলের অনেক ক্ষেত্রে একজন এল-এম-সি একজন উচ্চতর মানের শিক্ষিত ডাক্তারের (এল-এম-এস অথবা এম-বি-বি-এস) তুলনায় বেশী অর্থকরী পসার লাভ করেছেন, যেটা এল-এম-সি ডাক্তারের যোগ্যতর কৃতিত্বের প্রমাণ। মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটরা গ্রামাঞ্চলে কার্যপদ গ্রহণ করবার শর্ত হিসাবে সরকারের কাছ থেকে বিশেষ ও অতিরিক্ত কোন আর্থিক ভাতা দাবি করবেন কেন? গ্রামে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার-গ্র্যাজুয়েট তো অতিরিক্ত কোন ভাতা উপভোগ করেন না। কীভাবে, স্বচ্ছন্দতর কোন উপায়ে গ্রামের মানুষের শারীর আর্তিমোচনের জন্য আধুনিক চিকিৎসা সুপ্রযুক্ত হতে পারে অ্যাসোসিয়েশন যেন সেই উপায় উদ্ভাবিত করবার কর্তব্য গ্রহণ করেন। তিন বছর শিক্ষা কোর্সের নিম্নতা সম্বন্ধে হা-হুতাশ করবার কোন অর্থ হয় না।

প্রধানমন্ত্রিত্ব
বাঁচাও!
বাঁচাও!
Kutty

জয়প্রকাশ নারায়ণ স্মরণে

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, জয়প্রকাশ নারায়ণের রাজনীতিক জীবন, তাঁর চিন্তা ও চর্চা অসঙ্গতি ও ব্যর্থতার এক দীর্ঘ করুণ কাহিনী। তিরিশ দশকের গোড়াতে লক্ষ্য অর্জনের অবশ্যম্ভাবী সফলতায় গভীর আস্থা নিয়ে যে অভিযান শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটেছে সংশয়, দ্বিধা ও সন্দেহে ভারাক্রান্ত পরিবেশে। সত্য বটে, ১৯৭৭-এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সংসদীয় নির্বাচনের পরিণাম যখন স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের কঠিনতম রাজনীতিক সংকটের অবসান ঘোষণা করল, সেটা যথার্থই জয়প্রকাশের সুদীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের সব চেয়ে সার্থক মুহূর্ত। রাহুগ্রস্ত গণতন্ত্রের পরিত্রাতারূপে তিনি সেদিন সংবর্ধিত। সমগ্র জাতির সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায় স্তুত। শরতের শিশিরবিন্দুর মতোই কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ছিল সে মুহূর্তটি। সূর্যোদয়ের সঙ্গেই তা অন্তর্হিত হল। পরিবর্তে দেখা দিল অবিশ্বাস ও আদর্শচ্যুতি, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বিরোধ ও দ্বন্দ্ব। ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাত। ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপ থেকে যাদের উঠিয়ে এনে তিনি ক্ষমতার গদীতে বসিয়েছিলেন তাঁদের উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও অবহেলা, তাঁর আদর্শের প্রতি তাদের সম্পূর্ণ অনাস্থা জয়প্রকাশকে নিয়ত ব্যথিত করেছে। তাঁর সাবধানবাণী, জনগণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের আবেদন-নিবেদনে দৃকপাত করেনি শাসকগোষ্ঠী। বরং তাঁর ধ্যান-ধারণাকে নিয়ে তারা উৎকট পরিহাস করেছে, ব্যবহারিক বুদ্ধিহীন ভাববিলাসী বলে আখ্যাত করেছে তাঁকে। সত্যই কী জয়প্রকাশের জীবন ও সাধনা নিছক ব্যর্থতার তুলি দিয়ে লেখা এক অবসাদদায়ক আলেখ্য? বায়বীয় চিন্তারাজ্যেই কী তিনি আজীবন বিচরণ করেছেন?

যে প্রশ্ন ওপরে রেখেছি সেখানে ফিরে আসব অন্য একটি বিষয় ছুঁয়ে। অনস্বীকার্য, বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ দেশের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে জয়প্রকাশের এক বিশিষ্ট ভূমিকা থেকেছে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও জওহরলাল নেহরু বাদে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের জনজীবনকে তাঁর মতো এমন গভীরভাবে অন্য কেউ আলোড়িত করেনি। এটা যেমন সত্য, তেমন সত্য আর একটা তথ্য—তাঁর মতো বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব বিশ শতকের ভারতবর্ষে খুব বেশি দেখা যায়নি। অবশ্য তিনি 'ম্যান অফ ডেসটিনি' ছিলেন কিনা অথবা দেশের সকল সমস্যার সমাধানের সূত্র তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে কিনা, বলতে পারব না। হয় তো ডায়ালেকটিকসের সাহায্যে নস্যাৎ করা যেতে পারে তাঁর টোটাল রেভল্যুশনের ধারণাকে। এটাও বলা যেতে পারে যে, তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির ফলে প্রায়ই তিনি নৌকা বদল করেছেন মাঝ-দরিয়ায়, বিশেষ মুহূর্তে যা ছিল চরম সত্য পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ অবান্তর বলে তা পরিত্যাগ করেছেন।

তথাপি এটা নিশ্চিত যে, জয়প্রকাশ সম্পর্কে আপনার বা আমার মতামত যাই হোক না, তাঁর ধ্যানধারণা বিরোধ-বিতর্ক সৃষ্টি করতে থাকবে, মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করবে। বিশ শতকের সেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিত্বদের একজন বলেই তিনি পরিগণিত হবেন, যাঁদের জায়গা থাকবে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, পাদটীকায় নয়।

জয়প্রকাশের পক্ষে অথবা বিপক্ষে ওকালতির কোনও বাসনা নেই। সে কাজ অন্যেরা করুক। যে আবেগ, উন্মাদনা ও বিতর্কের তিনি ছিলেন কেন্দ্রবিন্দু, আজ তা অবসিতপ্রায় চৈত্রের ঝরাপাতার মতোই কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। তাঁর পরাজয়ের বেদনা ও সাফল্যের গৌরবে আর কোনও দিন কারো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। জয়প্রকাশ প্রয়াত, গতকালের ইতিহাসস্রষ্টা নিজেই এখন ইতিহাস। সম্ভব কী শনাক্ত করা কেন, কোন্ আদর্শের জন্য দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবৎ তিনি নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও সংগ্রাম করেছেন? কী ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য?

এখানে স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে আসছে সমকালীন ভারতবর্ষের দীর্ঘতম রাত্রির অভিজ্ঞতা, সহস্র মধ্যরাত্রির চাইতে অন্ধকার ছিল যে রাত্রি।

১৯৭৫-এর ২৫শে জুন যে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের জীবনে এক জলবিভাজিকা তা নিয়ে বোধ হয়ে তর্কের অবকাশ নেহাৎ কম। ভারত সরকার ও বিরোধী শক্তি সেদিন একটা এসপার-ওসপার মনোভাব নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—জয়প্রকাশ ডাক দিয়েছেন সর্বাত্মক বিপ্লবের আর যারা তাতে সাড়া দেবে তাদের সমুচিত শিক্ষা দেবার সংকল্প ঘোষণা করেছেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

ভারতবাসী সেদিন এক অভূতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এখানে বজায় থাকবে কিনা সে বিষয়ে গভীর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অবশ্য সে অনিশ্চয়তা কেটে গিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রের মতো এখানেও যাতে গণতন্ত্রের মৃত্যু না হয় সেটা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর ছিল ভারতবর্ষের জনসাধারণ ও জয়প্রকাশ। ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ রাজনীতিক ফাটকাবাজদের মর্জির ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু দিল্লিতে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠা করাই যে জয়প্রকাশের সংগ্রামের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না তিনি সেটা খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন। তাঁর কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি এটা উপলব্ধি করতে যে, তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে আরও কঠিন ও ব্যাপক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হবে, আরও অনেক দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হতে হবে।

তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত জনতা পার্টি, তিনি ছিলেন যার অবিসংবাদী স্থপতি, যখন উদ্দেশ্যহীন রাজনীতির আবর্তে ঘূরপাক খেয়েছে তিনি তখন নীরব থাকেন নি। বারংবার সতর্ক করে দিয়েছেন, শাসক দলের নীতিভ্রষ্ট রাজনীতি দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে, প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে অবহেলা জনগণ কখনও ক্ষমা করবে না। জয়প্রকাশ জানতেন যে, তাঁর শারীরিক অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে চতুর ও স্বার্থপরায়ণ রাজনীতিকেরা তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর স্বপ্নের সমাধি রচনা করবে। জনতা পার্টির কর্ণধারহীন নৌকার মতো অবস্থা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, আঘাত পেয়েছেন লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজনীতির উচ্ছৃঙ্খলতায়। প্রকাশ্যে বাস্তও

শীত যেই আসে
মডেলার
কথাই মনে ভাসে।
আপনার আদরের
ছোট্ট মেয়ের চাই...
স্নেহ-ভালবাসা আর
মডেলার উষ্ণতা-ভরা আরাম।
modella
কম্বল, রাগ, বোনার উল
মডেলা টেক্সটাইল ইণ্ডাস্ট্রীজ় প্রাঃ লিমিটেড
মডেলাগ্রাম, থানে, মহারাষ্ট্র।
CONCEPT-MTI-3861 BEN

করেছেন তাঁর মানসিক অশান্তির কথা। ১৯৭৮-এর ছয়ই জুলাই আমার সঙ্গে টেপরেকর্ডে সংরক্ষিত এক সাক্ষাৎকারে সেটা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। কণামাত্র ঢাকঢাক-গুড়গুড় না করে বলেছেন যে, কোনও ব্যক্তিগত কারণে তাঁর মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। তা হয়েছে একান্ত সমষ্টিগত কারণে। তাঁর নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে করেছে বিষণ্ণ, আশাহত।

এই ব্যক্তিই কী সেই জয়প্রকাশ যিনি স্বল্পকাল আগে স্বৈরাচারী শক্তির মোকাবিলায় রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন? যিনি 'দেশজ একনায়কত্বের' শৃঙ্খলে আবদ্ধ জাতির মুক্তি সংগ্রামের পুরোধা ছিলেন?—জিজ্ঞাসা করেছেন অনেকে। হ্যাঁ, ঠিক তাই, বহুজনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জবাব দিলেন এম সি চাগলা। সেই অভিমতের পুনরাবৃত্তি করলেন আরও অনেক জ্ঞানীগুণীজন। জনতা পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর আমার সঙ্গে কথোপকথনে (টেপ-রেকর্ড করা) পরিষ্কার ভাষায় বললেন, ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিয়েছেন গান্ধী, গণতান্ত্রিক জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার সংকল্প দিয়েছেন তাকে জয়প্রকাশ। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই খোলাখুলি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন না। ১৯৭৮-এর ১৪ই জুলাই আমার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (টেপ-রেকর্ড করা) কেবল এটুকু স্বীকার করলেন যে, স্বেচ্ছাচারী শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে ভারতীয় গণতন্ত্রকে উদ্ধারের কর্মকাণ্ডে জয়প্রকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

দিল্লিতে জনতারাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বেশী দিন কাটল না, জয়প্রকাশ প্রশস্তিতে অকস্মাৎ ভাঁটা পড়ল। বলা চলে, তাঁর রাজনীতিক জীবনে অতীতে যা ঘটেছে সেটাই যেন পুনরাবৃত্ত হল—তাঁকে ঘিরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল পরস্পরবিরোধী অভিমতের তীব্র দ্বন্দ্ব। কারো মতে, জয়প্রকাশ নির্দেশিত পথেই সমাজ নবনির্মাণের বিপ্লব সাধিত হতে পারে। কেউ বা বললেন, জয়প্রকাশের চিন্তাধারা অসঙ্গতিতে ছয়লাপ, আবেগের প্রাবল্য বরাবর তাঁর যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ওটাই ছিল ১৯৭৮-এর ছয়ই জুলাই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের (আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম। তাঁর বক্তব্য, কেবল পাটিগণিতের হিসাব অনুযায়ী তাঁর রাজনীতিক জীবনের গতিপথ নির্ধারিত হয়নি। তবে এ অভিযোগ যথার্থ হবে না যে, তাঁর চিন্তা ও কাজ সতত সর্পিল পথে চালিত হয়েছে। নিঃসন্দেহ, দীর্ঘ যাত্রাপথে তাঁর মত ও পথ বদলে গিয়েছে একবার নয়, অনেকবার। সেটা অবশ্য খামখেয়ালীর অভিব্যক্তি নয়। পরিবর্তনশীল সময় ও সমাজের চাহিদার দ্বারাই তা স্থিরীকৃত হয়েছে। এ সবের মূলে থেকেছে এক অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য—ন্যায়, নীতি, সমতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এমন এক সমাজ রচনা করা যেখানে মানুষ প্রকৃতই মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

মার্কসিজম, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র, ভূদান-সর্বোদয় ও দলবিহীন গণতন্ত্র—এগুলি নিয়ে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু কোনওটি আকাঙ্ক্ষিত সমাজ পরিবর্তনের উপযুক্ত হাতিয়ার বলে বিবেচিত হয়নি। জীবনের অপরাহ্ন-বেলায় নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন সর্বাত্মক বিপ্লবের দর্শন ও পদ্ধতি নিয়ে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সমাজ নবনির্মাণের সমস্ত উপকরণ গান্ধী দর্শনের মধ্যেই আছে। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, গান্ধী অভিপ্রেত সমাজ কেবল রাজনীতি (অর্থাৎ পার্টি ও ক্ষমতার রাজনীতি) ও রাজশক্তির (অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা) মাধ্যমে গঠন করা সম্ভব নয়। সেজন্য আবশ্যক লোকনীতির (অর্থাৎ জনগণের রাজনীতি) অনুশীলন ও লোকশক্তির (অর্থাৎ জনগণের শক্তি)

করতে হবে। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ করে তুলতে হবে তাদের।

কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে তা করা সম্ভব নয়। গান্ধী সেটা ভালভাবে জানতেন বলেই তিনি কখনও রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেননি। এটা প্রকৃতই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার, জয়প্রকাশের মতে। ইতিহাসে অজস্র নজির আছে যখন বিপ্লবের সফল পরিণতিতে এর সর্বাধিনায়ক নিজের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতার লাগাম উঠিয়ে নিয়েছেন—আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসানে জর্জ ওয়াশিংটন সেখানকার প্রথম রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পরে লেনিন সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু গান্ধী না হয়েছেন স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি, না প্রধানমন্ত্রী। কারণ খুঁজতে বেশী দূরে যাওয়ার দরকার নেই। গান্ধীর আরাধ্য ছিল যথার্থ গণতন্ত্র। তিনি চেয়েছিলেন জনসাধারণের কাছে গিয়ে তাদের সচেতন করতে, দেখিয়ে দিতে কেমন করে তাদের রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক দায়দায়িত্ব তারা নিজেরাই পালন করতে পারে, জয়প্রকাশের ভাষায়।

কথাগুলি হয়তো অনেকেরই কানে বাজবে। যে ব্যক্তির রাজনীতিক জীবন শুরু হয়েছিল মার্কস-বাদে অকুণ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে, যিনি একদা গান্ধীকে কায়েমীস্বার্থের প্রতিভূ মনে করতেন, পরবর্তীকালে মার্কসবাদ পরিত্যাগ করে যিনি কোনও বিশেষ বিন্দুতে তাঁর রাজনীতিক চিন্তাকে স্থিতিশীল হতে দেননি, মত ও পথ যাঁর জীবনে বহুবার পালটে

মান্টার কী'—সকল বন্ধনমুক্তির যোগ্যতম চাবিকাঠি? নাকি গান্ধীদর্শন নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠেছিলেন, অতীতে যা বারংবার করেছেন বিভিন্ন রাজনীতিক তত্ত্ব ও চিন্তা নিয়ে।

এ বিষয়ে একটা যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে জয়প্রকাশের সুদীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের, তাঁর চিন্তা ও চর্যার যে ধরনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন, তার উপযুক্ত সময় এটা নয়। তবে তাঁর রাজনীতিক চিন্তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে নজর দিলে একটা অপেক্ষাকৃত বোধগম্য চিত্রের আভাস পাওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী আন্দোলনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর থেকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন লোকনীতি ও লোকশক্তির সম্প্রসারণ ও সংগঠনের ওপর। তাঁর প্রধান লক্ষ্য তখন একটা সুসম্বদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা, দল নয়। কেন না, দলীয় রাজনীতির সাহায্যে নির্বাচন লড়া যায়, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায়, কিন্তু তার দ্বারা সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন আনা যায় না। সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করতে হলে প্রথম প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের সহায়তাপুষ্ট সর্বব্যাপী গণআন্দোলন। সেজন্যই তাঁর সুদীর্ঘ রাজনীতিক জীবনে জয়প্রকাশ বারবার রাষ্ট্রক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন কি, জনতা সরকারের মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণপর্ব শেষ হবার আগেই তিনি ফিরে গিয়েছেন জনগণের কাছে। ফিরে গিয়েছেন তাদের কাছে সর্বাত্মক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কর্তব্য সমাপনের আহ্বান জানাতে। এখানেই তিনি গান্ধী

Manufacturers :
bm BHARAT MOTORS
37, Greams Road, Madras-600 006.
Phone : 86204

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১৫ ॥

এখনো আইনত সাবালক হয়নি নবীনকুমার, তবু সে বিপুল অর্থ খরচ করে। সে এখনও অর্থের মূল্য বোঝে না। অর্থসম্পদ যে মানুষকে উপার্জন করতে হয়, এ জ্ঞানই যেন তার নেই, তার ধারণা, ও জিনিসটি চাইলেই পাওয়া যায়, এবং বরাবরই সে পেয়ে এসেছে।

বিধুশেখরের বিচক্ষণতায় নবীনকুমারের পিতৃ সম্পত্তি ক্রমশই বর্ধিত হয়েছে এবং অর্থনীতির এক বিচিত্র নিয়মে তা বিনা আয়াসেই এখন এ রকম বর্ধিত হতেই থাকবে। এক হিসেবে অর্থ জিনিসটা নবীন-কুমারের কাছে মূল্যহীন, কারণ জল বা বাতাসের মতন চাওয়া মাত্র পাওয়া যায়।

নবীনকুমার এখন প্রায় প্রতিদিনই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গী। এই বয়সেই সে অনেক জায়গায় ঘুরে, অনেক ব্যক্তিকে দেখে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর-চন্দ্রকেই সে তার সবচেয়ে বেশী আদর্শস্থানীয় মনে করেছে এবং মনে মনে তাঁকে বরণ করেছে গুরুর পদে। অন্যান্য ষোড়শ বৎসর বয়স্ক সদ্য যুবকদের মতন সেও দুঃসাহসের অনুরাগী, ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বেশী দুঃসাহসী মানুষ সে আর কারুকে দেখেনি। ঈশ্বর-চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে থেকে সে বুঝেছে যে, এ দেশে বিধবা বালিকার পুনর্বিবাহ দেওয়া কত কঠিন কাজ। সরকারী আইন পাশ হলেও দেশের অধিকাংশ মানুষই এর ভয়ংকর বিরোধী, এমনকি মুখে যারা সমর্থন জানায়, তারাও অনেকেই কার্যকালে পশ্চাদপদ হয়। ইতিমধ্যে কয়েকটি বিধবার বিবাহ হয়ে গেলেও এখনো নানারকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এরই মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র জেদ ধরে আছেন, যদি কোনো বিধবা বালিকা পুনর্বিবাহ চায় এবং তার জন্য উপযুক্ত কোনো পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সে বিবাহ দেবেনই। নবীনকুমারেরও সেই একই জেদ। ঈশ্বরচন্দ্র যেমন নিজের অর্থ ব্যয় করেন, সেই রকম নবীনকুমারও প্রত্যেক বিবাহে এক সহস্র মুদ্রা দিয়ে চলেছেন।

নিজের স্বাক্ষর করার অধিকার জন্মায়নি, তাই নবীনকুমার অর্থের জন্য যখন তখন দাবি জানায় তার জননী বিম্ববতীর কাছে। বিম্ববতী একবারও প্রত্যাখ্যান করেন না। যদিও পরলোকগত রামকমল সিংহের এস্টেটের আয়-ব্যয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখেন নিয়মিত, তবু তিনিও নবীনকুমারের এই খেয়ালী-খরচের প্রতিবাদ করেন না।

নবীনকুমারের বদান্যতার সংবাদ রটে গেছে সারা দেশে। প্রায় প্রতিদিন সকালেই নবীনকুমারের কাছে একাধিক প্রার্থী আসে। প্রথম প্রথম নবীনকুমার প্রত্যেককেই টাকা দিয়ে দিত বিনা বাক্যব্যয়ে। একদিন ঈশ্বরচন্দ্র তাকে ডেকে সাবধান করে দিলেন। গুড়ের সন্ধান পেলেই যেমন পিঁপড়ে ছুটে আসে, তেমনি টাকার লোভে অনেক দুষ্ট প্রবঞ্চক কিংবা হা-ঘরে হা-ভাতে বিধবা বিবাহের হুজুগে মেতেছে। অনেক সময় তারা কোনো বিধবা বালিকার সঙ্গে কোনোক্রমে নমো নমো করে বিবাহ সাঙ্গ করার পর দু' দশ দিন বাদেই পত্নীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালায়। টাকাটি আত্মসাৎ করাই তাদের উদ্দেশ্য। কেউ কেউ আবার টাকা নেয় কিন্তু বিবাহও করে না। সুতরাং, ঠিকঠাক অনুসন্ধান না করেই অর্থ দান করা কোনো কাজের কথা নয়। অপাত্রে ব্যয় করলে মূল উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

এক সকালে রাইমোহন এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো নবীনকুমারের কাছে।

লম্বা শরীরটিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে রাইমোহন বললো, হুজুর, পঞ্চাশ পূর্ণ কত্তে এলুম!

নবীনকুমার বুঝতে পারলো না। সে সকৌতুক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো।

রাইমোহনের সঙ্গীটির বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, পরনে মলিন ধুতি ও সাদা মেরজাই, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখখানি চতুষ্কোণ ধরনের। সে একেবারে ঢিপ করে নবীনকুমারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেললো। ধরা গলায় বললো, হুজুর অতি মহান, অতি বিপদে পড়ে আপনার কাচে এয়িচি, আপনি না তরালে আর কোনো ভরসা নেই।

নিজের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বয়েসী একজন লোক পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেও নবীনকুমার বিচলিত হলো না। এই বয়েসেই সে বুঝে গেছে যে, চতুষ্পার্শ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে আনুগত্য ও সম্মান পাবার জন্যই সে জন্মেছে।

রাইমোহন তার সঙ্গীকে ধমক দিয়ে বললো, ইংলিশে বলু, ইংলিশে বলু।

তারপর নবীনকুমারের দিকে চেয়ে বিগলিতভাবে হেসে সে বললো, হুজুর, এ অতি বিদ্যমন্ত লোক। ইংলিশ জানে।

লোকটি বললো, মোস্ট নোবল সার, মী এ ভেরি আম্বল্ ম্যান, আই প্রে টু ইয়োর বেনাভোলেন্স।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপারটা কী?

রাইমোহন বললো, হুজুর, বেধবাদের জন্য এর মনে বড় দুঃখু! ধনুকভাঙা পণ কচ্চেছে যে, বেধবা ছাড়া বে করবে না। ওর বাপ দাদারা ওর ওপর খড়্গহস্ত, তাই আমি বললুম, চ, হুজুরের কাচে চ একটিবার

নবীনকুমার বললো, বিধবা বিয়ে করবে? বেশ ভালো কতা। পাত্রী কোথায়? ঠিক হয়েচে?

লোকটি বললো, পাত্রী রেডি, সার। আমাদের নেবারের ডটার, সার। অ্যাট জয়নগর-মজিলপুর, মাই বার্থ প্লেস, সার!

রাইমোহন বললো, সব কথা শুনলে দুঃখে আপনার বুক ফেটে যাবে, হুজুর। সে মেয়েটির বে হয়েছেল মাত্র তিন বচর বয়েসে, আর মাত্র ছ' মাস যেতে না যেতেই তার কপাল পোড়ে, সে হতভাগী নিজের সোয়ামীকে চিনলোই না।

নবীনকুমার অস্ফুটভাবে বললো, বিধবার বিয়ের চেয়েও বেশী প্রয়োজন বাল্য বিবাহ বন্ধ করা।

তারপর আবার বললো, বেশ তো, বিদ্যাসাগর মশাইকে বলবো অখন। আজ বিকেলে তোমরাও এসো সেখেনে।

নবীনকুমারের পাশে দাঁড়ানো দুলাল বললো, তিনি মেদিনীপুরে গ্যাচেন। কলকেতায় নেই এখন।

নবীনকুমার বললো, তা হলে একটু রসো, তিনি ফিরে আসুন।

রাইমোহন পকেট থেকে একটি কাগজ বার করে বললো, অপিক্ষে করার আর উপায় নেই, হুজুর। পত্তর ছাপানো হয়ে গ্যাচে। জানাজানি হয়ে গ্যাচে তো, আর অপিক্ষে করলে মেয়ের বাপ ও বেটাকে কাশী পাঠিয়ে দেবে।

—কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই নেই, এখুনি বিয়ে হবে কী করে?

—সেই জন্যই তো বললুম, হুজুর, আপনি নিজেই পঞ্চাশ পূর্ণ করুন।

—তার মানে?

—গুনে দেকিচি, এ যাবৎ মোট উনপঞ্চাশটি বেধবার বে হয়েচে এ দেশে। এই বেটি হলে পঞ্চাশ হবে। কাগজে কাগজে ফলাও করে আপনাদের জয়জয়কার বেরুবে। সাগর এখেনে নেই, আপনি নিজেই উদ্যুগ করে বেটা দিলে তিনি ফিরে এসে কত খুশী হবেন!

—পঞ্চাশ পূর্ণ হবে? তুমি হিসেব করে দেকেচো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খপরের কাগজেই তো হিসেব বেরিয়েছেল কদিন আগে!

নবীনকুমারের তরুণ হৃদয় এই পঞ্চাশ পূর্ণ হবার সংবাদে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ইদানীং ইংরেজী ফ্যাসানে সিলভার জুবিলি, গোল্ডেন জুবিলির কথা প্রায়ই শোনা যায়, এও তো সেই রকমই একটা কিছু ব্যাপার। সে আগ্রহের সঙ্গে পড়ে দেখতে লাগলো নিমন্ত্রণ পত্রটি।

বিবাহ হবে কড়াহনগর গ্রামে। বর্ষাকাল, পথঘাটের অবস্থা অতি শোচনীয়, নবীনকুমার নিজে বিবাহ-বাসরে যেতে পারবে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু অনুষ্ঠানের যাতে কোনো ত্রুটি না হয়, সে জন্য সব বন্দোবস্তের ভার সে অর্পণ করলো রাইমোহনের ওপর। টাকা পয়সার ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য হবে না।

এর কয়েক দিন পর রাইমোহনকে ডেকে পাঠালেন বিধুশেখর। সিংহ বাড়িতে নয়, নিজের ভবনে। চলা ফেরার শক্তি আবার আজকাল অনেকখানি কমে গেছে তাঁর, সহজে গৃহ থেকে নির্গত হন না।

বাহির-বাড়ির বসবার কক্ষে আরাম কেদারায় শুয়ে আছেন বিধুশেখর, হাতে আলবোলার নল। রাইমোহন এসে বসলো তাঁর সামনে, মাটিতে।

কোনো রকম ভূমিকা না করে বিধুশেখর বললেন, তোর হাত-পা বেঁধে, চাবকে পিঠের ছাল-মাংস তুলে দেবো!

রাইমোহন একটুও চমকিত না হয়ে, বরং ঈষৎ হেসে বললো, ছাল-মাংস আর কোতায় হুজুর, আমার শরীরে তো শুধু কয়েকখানা হাড়। মেরে সুখ হবে না!

—তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো! ডালকুত্তারা শুকনো হাড় পছন্দ করে!

—হুজুর ডালকুত্তা পুষেচেন বুঝি? শুনিনি তো! তা সে কুত্তাগুলোর তো শুনিচি বকরাক্ষসের মতন খিদে, এই কখানা হাড়ে কি তাদের খিদে মিটবে?

—নিমকহারাম! আমার ঠেঙে মাস মাস পাঁচসিকে করে টাকা পাচ্চিস, আবার আমারই সঙ্গেই বেল্লেল্লাজি?

—হুজুর, আর যাই করি, ঐ নেমকহারামি কখুনো আমার কচে পাবেন না। নুন খাই যার, গুণ গাই তার!

—তোকে বলিচি ছোটকুর ওপর চোক রাখতে, আর তুই উল্টে তার মাতায় কাঁটাল ভাংচিস?

—আপনি নিজেই বলেছেলেন, হুজুর, বেধবার বে'তে আপনার আপত্তি নেই, ও ব্যাপারে আপনার মন নরম।

—তা বলে তুই গাণ্ডার গণ্ডার লোক এনে টাকা-পয়সা একেবারে নয়ছয় করাবি! ছোটকু ছেলেমানুষ, তাকে যা বোঝাবি সে তাই বুঝবে! কিন্তু আমি কি মরে গেচি! তুই কত করে ভাগ পাচ্চিস এক-একটা কেসে?

—একটা পয়সাও না। মা কালীর দিব্যি গেলে বলচি! আমার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, এখন আর আমার টাকা-পয়সার প্রয়োজন কী?

—ঐ যে বরানগরের বিয়েটা

—সে জন্য কম ঝক্কি পোহাতে হয়েচে আমার? ও বাড়ির ছোট হুজুরকে তুষ্ট করার জন্যেই তো... বেধবা বে'র গোল্ডেন জুবিলি পূর্ণ হলো, কত হৈ-চৈ, বিদ্যেসাগরও খুশী হয়ে নবীনকুমারকে আশীর্বাদ করেচেন॥

—তুই বিদ্যেসাগরকে পর্যন্ত ঠকিয়েচিস! অ্যাতখানি স্পর্ধা তোর! সে বামুন কলকেতায় ছেল না, তাই ফেরেব্বাজি ধত্তে পারেনি। বারানগরেরা ওটাকে কি বিয়ে বলে?

রাইমোহন জিহ্বা কেটে, চোখ বিস্ফারিত করে বললো, বিয়ে নয়? আপনি কী বলচেন, হুজুর? কত লোক দেকেচে! দুশো আড়াইশো লোক—নবীনকুমার নিজে যেতে পারেননি কো, কিন্তু দুলাল গেসলো, সে দেকেচে...খাটতে খাটতে আমার জান কালি

—চোপ!

—আপনি বিশ্বেস কচ্চেন না, হুজুর॥ সত্যি ধুমধাম করে বে হয়েচে, কিসের কিরে কেটে বলবো, বলুন?

—হ্যাঁ, বিয়ে হয়েচে! পাত্রী এক বেশ্যার মেয়ে, তার এই নিয়ে কতবার বিয়ে হলো অর ঠিক নেই। আর পাত্র এক নামকরা মাতাল॥ তোরই বাড়িতে আশ্রিত! এর নাম বিয়ে না ফুর্তির খচা বাগানো? অ্যাঁ?

রাইমোহন স্তম্ভিত হয়ে গেল। গুণীর প্রতি সম্মান দেখানো উচিত॥ বিধুশেখরের মতন এত বড় গুণী সে দেখেনি আর। এ বৃদ্ধের এক চক্ষের দৃষ্টি শক্তি নেই, অন্য চক্ষুটিও নিষ্প্রভ, পা অশক্ত, তবু ঘরে বসে বসে এই বৃদ্ধ অতখানি সংবাদ রাখে? এ যে বিস্ময়কর ক্ষমতা!

সে বিধুশেখরের পা চেপে ধরে বললো, হুজুর, আমার জাত-কুল মান-জ্ঞান কবেই ঘুচে গ্যাচে! বেশ্যার মেয়ে কিংবা চাঁড়ালের ছেলে আমার কাচে সব সমান। দুঃখী মানুষের জাত নেই। আপনি যা বললেন, ওরা তাই, ওরা জাত ভাঁড়িয়েচে, নাম ভাঁড়িয়েচে, কিন্তু ওরা সত্যি বে করতে চেয়েছেল, তাই আমি ওদের বে দিয়িচি।

—পা ছাড়, হারামজাদা! বেশ্যার মেয়ের আবার বিয়ে কী রে? অমন কত বেশ্যা আর তাদের দালালরাই তো স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকে। অর জন্য তুই পুরুত ডাকিয়ে ধর্ম রসাতলে দিলি? ওফ্!

—হুজুর, ওদেরও তো একটু সাধ হয় ভদ্দর-লোকেদের মতন ধুমধাম করে, পাঁচজনকে ডেকে, মন্তর পড়ে বে করার!

—আর বলিস নি, শুনে আমার গা জ্বলে যাচ্চে তোকে আমি পুলিসে ধরিয়ে দিচ্চি নি, কেন জানিস? এই বিয়ের কতা বেশী জানাজানি হলে বিদ্যেসাগরের মান যাবে। তাকে লোকে আরও বেশী করে টিটকিরি দেবে, তাতে আমাদের ছোটকুও দুঃখু পাবে। সেই জন্যে! নাকে খৎ দে! নাকে খৎ দে॥

—দিচ্চি হুজুর।

—ঐ দরজার চৌকাঠ থেকে এই আমার পা পর্যন্ত। পাঁচবার!

বিনা প্রতিবাদে রাইমোহন শুয়ে পড়ে নাকে খৎ দিতে লাগলো। বিধুশেখর দেখতে লাগলেন স্থির দৃষ্টিতে॥ পাঁচবার হবার পর তিনি কঠোরভাবে বললেন, ফের যদি কখুনো তোকে আমার ওপর চালাকি করতে দেকি, তা হলে তোর ভবলীলে তখুনি সাঙ্গ হবে! আর একটা কতা! বিধবার বে নিয়ে ঢলাঢলি যথেষ্ট হয়েচে, আর দরকার নেই! তুই ছাড়াও আরও অনেকে ঠকাচ্চে আর ঠকাবে ছোটকুকে। তুই এবার ওর মন অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা কর।

—বেধবা বে'র হুজুর একেবারে বন্ধ করে দেবো, হুজুর?

—তুই তা পারবিনি! অতশত দরকার নেই, চলচে চলুক, তুই সুধু ছোটকুর মন অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা কর!

—দেখুন না আমি কত কী পারি আর না পারি।

কয়েকদিনের মধ্যেই এক দারুণ গুজবে সারা শহর ম ম করতে লাগলো। সকলের মুখে মুখে ঐ এক কথা, অচিরেই এর নাম হলো, মড়া ফেরার হুজুক।

নদীয়ার রাম শর্মা নামে কে এক পণ্ডিত নাকি গুণে বলেছেন যে, আগামী ১৫ই কার্তিক মড়া ফেরার দিন। অর্থাৎ গত দশ বছরের মধ্যে যে সব মানুষের মৃত্যু হয়েছে তারা সকলেই সশরীরে ফিরে আসবে।

বড় বড় উৎসব উপলক্ষে রাজা-মহারাজারা যেমন কিছু কয়েদীকে খালাস করে দেন, সেই রকমই স্বর্গের এক দেবতার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে যমালয় থেকে কিছু অতৃপ্ত আত্মাকে ফেরত পাঠানো হবে পৃথিবীতে।

তুষের মণ্ডের মতন, এই সব গুজব যত গড়াতে থাকে তত বড় হয়॥ সকলের মুখে মুখে ঐ এক কথা! ১৫ই কার্তিক রবিবার মড়া ফিরে আসবে। নদীয়ার পণ্ডিত যখন বলেছেন, তখন তো আর মিথ্যে হতে পারে না। অনেক শোকসন্তপ্ত পরিবার সত্যি সত্যি আশায় আশায় রইলো। যে জননীর সন্তান অকাল মৃত, কিংবা যে নারীর স্বামী গেছে, এই সংবাদ শোনার পর তাদের আর রাত্রে ঘুম আসে না॥ তবে, কোনো এক রহস্যময় কারণে, পুরুষ মড়ারাই শুধু ফিরে আসবে বলে শোনা যাচ্ছে, মেয়েদের কথা কেউ বলে না। মৃত নারীরা ফিরে আসুক, তা বোধ হয় কেউ চায়ও না॥

নবীনকুমার এই গুজবের কথা নিয়ে হাস্য পরিহাস করছিল, এমন সময় রাইমোহন সে ঘরে প্রবিষ্ট হয়ে বললো, আপনি হাসচেন হুজুর, কিন্তু এদিকে যে

[illegible]
তুষ্টি নাশ কচ্চে।

নবীনকুমার দারুণ অবাক হয়ে বললো, সে কি! এর সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সম্পর্ক কী?

—আপনি বুজলেন না? বিদ্যেসাগরের কতায় মেতে বে অ্যাত লোক বেধবা বে কল্লে, এখন মড়া ফিরলে কী হবে?

—তার মানে?

—এক নারীর দুই স্বামী হবে? বেধবা ফের একজনকে বে কল্লে, তারপর আগের স্বামীও ফিরে এলো, তখন ধুন্দুমার কাণ্ড হবে না? ধর্মই বা কোতায় থাকবে? সব নারী অসতী হয়ে যাবে না!

—দূর, অদ্ভুত কতা যত সব! মড়া কখনো ফেরে? শ্মশানে যাকে দাহ করা হয়েচে, সে আবার ফিরতে পারে!

—আপনি বিশ্বেস না কল্লে কী হবে হুজুর, পথে-ঘাটে লোকে এই কতাই বলচে! ধরুন, যদি মড়া ফিরেই আসে

—ধরো যদি কখনো মাসীর গোঁপ গজায়, তা হলে মেসোর কী হবে? এ যে সেই ধারার কতা!

—হুজুর আপনি পথেঘাটে একটু সাবধানে বেরুবেন। লোকে আপনাকেও বেধবা বে'র একজন মুরুব্বি বলে জানে! কী জানি কেউ যদি রাগের বশে আপনাকে হুট করে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারে।

বিকেলবেলা নবীনকুমার সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখলো, ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত, বিরস মুখে বসে আছেন। পথে কিছু লোক সেদিনই তাঁকে টিটকিরি দিয়েছে। এমন সব গালিগালাজ করেছে যে, তা কানে একেবারে আগুনের মত লাগে। মড়া-ফেরার মতন একটা হাস্যকর, ছেলেমানুষী গুজবও যে এত সংখ্যক বয়স্ক মানুষ সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে পারে, তা কিছুতেই যেন বিশ্বাস করা যায় না।

আগামী সপ্তাহেই আর একটি বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানের কথা ছিল, লোকজনকে নিমন্ত্রণও করা হয়ে গেছে, কিন্তু হাঙ্গামার ভয়ে তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। দল বেঁধে লোকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আর মুণ্ডপাত করছে বিদ্যাসাগরের।

ঈশ্বরচন্দ্র নিরাশভাবে বললেন, হবে না, এ দেশের কিছু হবে না! এমনিতে সবাই নিষ্কর্মার ঢেঁকি, কিন্তু তুমি কোনো সৎ কর্ম করতে যাও, অমনি বাধা দিতে ছুটে আসবে! অনেকে বলছেন, বিধবা বিবাহের ব্যাপার থেকে আমার নাকি এবার সরে দাঁড়ানো উচিত। লোকে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করে তো করবে!

রাজকৃষ্ণবাবু বললেন, আগে দরকার শিক্ষা বিস্তারের। যতদিন সাধারণ মানুষ নিজের ভালো না বুঝবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, সেই জন্যই তো আমি ইস্কুল খোলার জন্য গ্রামে গ্রামে দৌড়ে মরছি। কিন্তু তাও বা ক'টি? সমুদ্রের তুলনায় এক গণ্ডূষ জল মাত্র!

উপস্থিত অন্য একজন বললো, এই যে বিধবা বিবাহের একটা উল্টো হাওয়া বইলো, আর লোকে সহজে বিধবা বিবাহ করতে চাইবে না।

আর একজন লোক বললো, কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় নিজে গিয়ে গিয়ে বিবাহ দেবেন, তবে লোকে বিধবা বিবাহ করবে, এটাই বা কেমন রকম কথা? এমনভাবে উনি ক'টি বিয়েই বা দিতে পারবেন!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আমি সারা দেশ ঘুরে ঘুরে বিবাহ দিতে পারবো না তা জানি! আমি বেশী দিন বেঁচেও থাকবো না। কিন্তু আমাদের কয়েকজনের উদ্যোগে পরপর অনেকগুলি বিবাহ সংঘটিত হওয়ালে তারপর লোকের ভয় ভেঙে যাবে, স্বাভাবিকভাবেই বিধবা বিবাহের প্রচলন হবে—এটাই আমি চেয়েছিলাম

নবীনকুমার বললো, কিন্তু ১৫ই কার্তিকের আর তো বেশী দিন দেরি নেইকো! সে দিনটি কেটে গেলেই লোকে বুজবে যে, ও কতা কত ভুয়ো! একটাও মড়া ফিরবে না!

রাজকৃষ্ণবাবু হাসতে হাসতে বললেন, তা বলা যায় না। দু'চারটি মড়া ফিরতেও পারে!

নবীনকুমার বললো, অ্যাঁ?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, তা ঠিক বলেছো, রাজকৃষ্ণ ভায়া। গোছালো গোছালো জায়গায় কিছু ফন্দিবাজ, বুজরুগ প্রাক্তন মড়া সেজে যাবে, দেখো, তাই নিয়ে অনেক শোরগোল হবে। আর সস্তার কাগজওয়ালারা এই সব ঘটনা নিয়ে নাচবে!

নবীনকুমার তখনই মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।

১৫ই কার্তিক দিনটি এক রবিবার। সেদিন সকাল থেকেই নবীনকুমারের নেতৃত্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভার তরুণ সদস্যরা ঘুরতে লাগলো কলকাতার পথে। শহরের বহু লোক সেদিন পথে নেমে এসেছে, উৎসুক চোখ মুখ, মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে সমবেত চিৎকার ও হাস্যরোল। কোনো কোনো বাড়ির সামনে 'মড়া ফিরেচে', 'মড়া ফিরেচে' বলেও ধ্বনি উঠলো।

নবীনকুমার তার দলবল নিয়ে অমনি ঢুকে পড়ে সেই বাড়িতে। সঙ্গে আরও চার ছ'জন পেয়াদা এবং একজন উকিল। সিমুলিয়ার এক বাড়িতে এক মুস্কো জোয়ান এক বিধবা নারীর মৃত পতি সেজে ফিরে এসেছে, নবীনকুমারের উকিল তাকে জেরা করতে শুরু করলো। বেশীক্ষণ লাগলো না, আধ ঘণ্টার জেরার মুখে পড়েই জাল মড়া হঠাৎ এক সময় মুক্তকচ্ছ হয়ে পলায়ন করলো।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে এরকম ন'টি জাল মড়াকে সনাক্ত করা হলো। তাদের মধ্যে তিনজনকে সমর্পণ করা হলো পুলিসের হাতে। তখন দেখা গেল, হুজুগে কলকাতার নাগরিকগণ অনেকে আবার নবীনকুমারকেই সমর্থন করছে। তারা নবীনকুমারের দলটির পিছু পিছু যায়, আর ভুয়ো মড়া দেখলেই দুয়ো দেয়।

১৫ই কার্তিকের রাত নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল, কোনো পুনর্বিবাহিতা নারীরই মৃত প্রথম স্বামী ফিরে এলো না।

এর কয়েকদিন পর নবীনকুমার অসুখে পড়লো।

শীতে শহরের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, কিন্তু এ বৎসর শীত বিলম্বিত। অঘ্রাণ মাস এসে গেল, তবু রোদ্দুরের দাহ কমে না যেন। সেই কারণেই বোধ হয় এক উৎকট উদরাময় ছড়াতে লাগলো পল্লীতে পল্লীতে। এবং টপাটপ মানুষ মরতে লাগলো সেই রোগে।

নবীনকুমারও আক্রান্ত হলো ঐ উদরাময়ে। যা কিছু আহার করে, সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যায়। আর বমির পরই উদরে অসহ্য যন্ত্রণা। তিনদিনের মধ্যেই যেন নবীনকুমারের দেহ একেবারে মিশে গেল শয্যার সঙ্গে।

কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের আনা হয়েছে নবীনকুমারের চিকিৎসার জন্য। সারাদিনের মধ্যে সর্বক্ষণই পালা করে একজন না একজন চিকিৎসক থাকলেনই গৃহে। তবু দুশ্চিন্তার শেষ নেই। চিকিৎসা ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে পরিচালনা করবার জন্য বিধুশেখর এসে রইলেন বিম্ববতীর পাশের কক্ষে। বিম্ববতীকে সান্ত্বনা দেওয়াও তাঁর প্রধান কাজ। তিনি ছাড়া আর কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবে না।

মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে নবীনকুমার দেখলো, তার শিয়রের পাশে তার বালিকা পত্নী সরোজিনী স্থির হয়ে বসে আছে। দ্বারের কাছে বসে ঢুলছে দুজন দাসী। বাইরে চেয়ারের ওপর উপবিষ্ট মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্র।

তৃষ্ণায় কণ্ঠ এমনই শুষ্ক যে, নবীনকুমার কোনো কথা বলতে পারছে না। হাতের ইঙ্গিতে সে জল চাইলো। সরোজিনী অমনি কাচের জার থেকে মিছরির ভেজানো জল ছোট পাথরের গেলাসে ঢেলে এনে দিল স্বামীকে।

সেই জল পান করে নবীনকুমার সভয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এখুনি বুঝি বমি হবে। জল পেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথা শুরু হয়ে গেছে।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও বমি হলো না, পেটের মধ্যে ব্যথাটা অবশ্য চলতেই লাগলো। আরও একটু জল পান করলো নবীনকুমার। বমি হয় হোক, তবু এই তৃষ্ণা সহ্য করা যায় না।

তারপর মাথাটা একটু উঁচু করে বললো, সরোজ, তুমি শুয়ে পড়ো। আর কত রাত জাগবে?

সরোজিনী বললো, না, না আমি ঠিক আচি। আপনি ঘুমোন।

—তুমি কতক্ষণ ঠায় বসে থাকবে? তুমি আমার পাশে শুয়ে পড়ো।

—না, না, আমি ঘুমোবো না। আপনার কষ্ট হচ্চে?

—খুব! পেটে অসহ্য ব্যথা।

—পেটে হাত বুলিয়ে দিই?

সরোজিনী এগিয়ে এসে তার কচি, নরম হাত নবীনকুমারের বুকে-পেটে বুলিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু এ এমনই ব্যথা যে, ওপর থেকে সেবা-যত্ন করলেও তার কোনো হেরফের হয় না। জাগরণের বদলে নিদ্রাই নবীনকুমারের ভালো ছিল। জেগে উঠলেই তৃষ্ণা, তারপর তৃষ্ণা-নিবৃত্তির জন্য জল পান করলেই এই ব্যথা। এই জন্য নবীনকুমারের আর জাগতেই ইচ্ছে করে না।

এক সময় সে সরোজিনীর হাতটা চেপে ধরে বললো, সরোজ, তোমায় একটা কতা বলবো?

—কী?

—তুমি শুনবে?

—ওমা, আপনার কতা শুনবো না?

—শুধু শোনা নয়। আমি একটা অনুরোধ করবো, তুমি রাখবে?

—নিশ্চয়ই।

—তুমি আমার গা ছুঁয়ে শপথ করো।

—এই তো, আপনার হাত ছুঁয়েই তো রয়িচি। আপনার সব কতা রাখবো—

ব্যথার মধ্যে ঈষৎ হাঁপাতে হাঁপাতে নবীনকুমার বললো, সরোজ, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই তুমি সারা জীবন বিধবা হয়ে থেকো না। তুমি আবার বে করো। এই আমার দিব্যি রইলো। আমি যদি মরেই যাই, তা হলে তুমি আবার বে কল্লে আমার আত্মা তৃপ্তি পাবে!

(ক্রমশ)
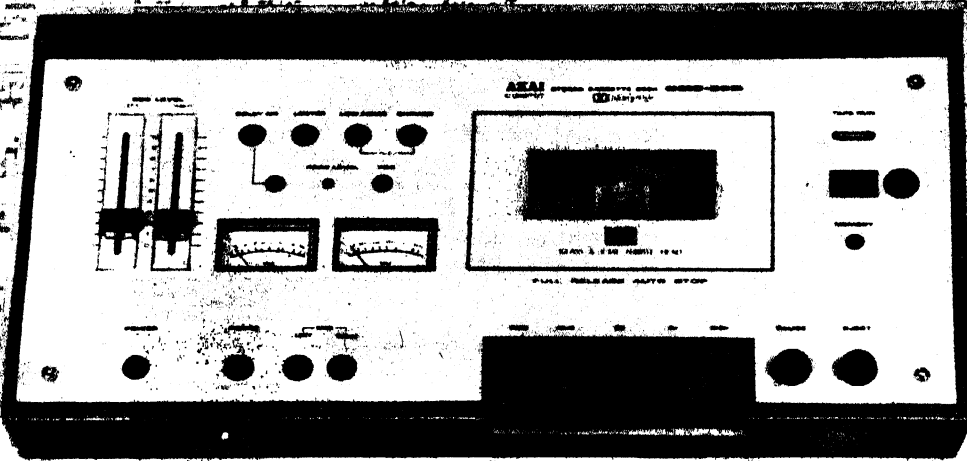
BRINGS YOU GLASS & X'TAL FERRITE HEAD CASSETTE STEREO DECK

গ্লাস এণ্ড এক্স-ট্যাল ফেরাইট হেড

• কোনো হিস্ হিস্ আওয়াজ রিডাকসন সিস্টেম নেই
• যেকোনো ধরনের টেপে ব্যবহার করা যায় • নীচু আওয়া আওয়াজে সি আর-৪২ অথবা ফি-সি আর • সুপিরিওর এস/এন রেসিও আর ওয়াইড ডায়নামিক রেঞ্জের জি এক্স হেড • মেমরি রিওয়াইণ্ডের বাড়তি সুবিধা • পিক লেভেল ইণ্ডিকেটর ইনপুটে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় • টেপ-রান্ ইণ্ডিকেটর ল্যাম্প
• টেপের প্রান্তে সেফটি ফিটার আর পুরো রিলিজের পর স্বয়ংক্রিয় বন্ধ করার ব্যবস্থা • সেল্‌ফ-লক পজ-বাটন
• লিমিটার সারকিট ওভারলেভেল রেকর্ডিং রোধ করে।

টেপ স্পীড ১ এল পি ফ্রিকোয়েন্সিরেসপন্স ৩০ এইচ২ থেকে ১৬,০০০ এইচ২ (+৩ ডি বি) নীচু আওয়াজের টেপ ব্যবহার করার সময় ৩০ এইচ২ থেকে ১৬,০০০ এইচ২ (+৩ ডি বি) সি আর ও২ টেপ ব্যবহার করার সময় ৩০ এইচ২ থেকে ১৭,০০০ এইচ২ (+৩ ডি বি) ফি-সি আর টেপ ব্যবহার করে। ডব্লু ও ডব্লু এবং ফ্লাটার ০.১৯% এর কম (ভি আই এন ৪৫৫০০০) ০.০৭% এর কম।
ডব্লু আর এম এস (এন্ এ বি) বিকৃতি ১.৫% এরও কম (১,০০০ এইচ২ 'ও' ভি ইউ) নীচু আওয়াজের টেপ ব্যবহার করে. হেডস্ (২) একটি জি. এক্স রেকর্ডিং প্লেব্যাক হেড. একটি ইরেজ হেড।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনি পুনরুৎপাদনের জন্য

COSMIC
AKAI
GXC-39D
STEREO CASSETTE
TAPE DECK

প্রস্তুতকারী: **কস্‌মিক রেডিও**
বোম্বে-৪০০ ০৯৩ টেলি: ৫৭৩৩৬১/৬২ গ্রাম: সলিডস্টেট

পরিবেশক: **কস্‌ট্রোনিক্‌স**
পোঃ বঃ নং ৯৪০২ বোম্বে-৪০০ ০৯৩

ট্রেড রিপ্রেসেণ্টেটিভ এণ্ড সার্ভিস সেণ্টার ইষ্টার্ন রিজিয়ান

ডিউনিক্‌স ১১৩/৪, হাজরা রোড কলিকাতা-৭০০ ০২৬. ফোন: ৪৮-১৩৩৮

ADVERTS/CR/16/19

প্রকৃতির লীলানিকেতন ত্রিপুরা

দিলীপ ভট্টাচার্য

'কোমল প্রাণের পাতে পাতে লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে/আমার গানের সুরে সুরে রইল আঁকা সে॥'

কলকাতা থেকে প্রায় সতেরো শ' কিলোমিটার দূরে ত্রিপুরায় বসে কবিগুরু গানের এ ক'টা পঙ্‌ক্তি লিখেছিলেন। তখন পার্বত্য ত্রিপুরা স্বাধীন দেশ, আজ সে ত্রিপুরা ভারতের অঙ্গীভূত। ভারতভুক্তি হয় ১৫ই অক্টোবর ১৯৪৯।

অতীতের সুন্দর এক পার্বত্য স্বাধীন দেশ। যেখানকার রাজভাষা বাংলা, মুদ্রায় বাংলা লিপি, রাজাদেশ বাংলায়। নিজস্ব জাতীয় পতাকা। রীতিনীতি, আইন কানুন সব নিজস্ব—স্বাধীন। মহারাজা, মহারানী, মন্ত্রী, উজীর, দেওয়ান-খাজাঞ্চী, হাতীশাল, ঘোড়াশাল—এ সব ভাবতেই যেন কেমন রোমাঞ্চ লাগে। পুরানো ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে-আসা দেবদেবী, পুজাপাঠ, রাজারানীর দেশ—আদি অকৃত্রিম প্রেমময় স্বাধীন রাজ্য ত্রিপুরা।

সেদিন রবি ঠকুরের কাছে ত্রিপুরার পথ ছিল না দূরের,—কারণ সে যুগে ছিল না পূর্ব-পাকিস্তান বা আজকের বাংলা দেশ। আজ সড়ক পথে কলকাতা থেকে ত্রিপুরা যেতে—নিউ জলপাইগুড়ি, গৌহাটি হয়ে আসামের কাছাড় জেলার ভেতর দিয়ে প্রবেশ পথ, ত্রিপুরার তিন দিকেই বাংলা দেশ। শুধু পূবে ১০৯ কিঃ মিটার সীমানা মিজোরাম ও বাকী প্রবেশ দ্বারে ৫৩ কিলোমিটার আসাম।

গৌহাটি থেকে ত্রিপুরা যাবার ট্রেন, বরাট ভ্যালী এক্সপ্রেস। দূরত্ব ত্রিপুরার শেষ স্টেশান ধর্মনগর অবধি ৫৯৭ কিলোমিটার। সময় নেয় পনের ঘণ্টার মত। দেশের ভেতর মাত্র বারো কিলোমিটার রেলপথ (এন এফ রেলওয়ে মিটার গেজ) সীমান্তে কলকলিঘাট থেকে উত্তর ত্রিপুরার মহকুমা সদর ধর্মনগর অবধি। এখান থেকে সড়ক পথে যোগ রয়েছে রাজধানী আগরতলার। দূরত্ব ১৯৫ কিলোমিটার। সরকারী দূর পাল্লায় ভাল বাস-সার্ভিস রয়েছে। পথে ক্রমান্বয়ে জনপদ—বংগ বাসা, রাম-নগর, পানী সাগর, পাচারথাল, কুমারঘাট, দুপুর করমচারা মনু, সিন্ধু, কুমার, পারা, গাঙ্গারাচেরা, ধলু বাড়ী, তেগীরামুড়া ও তারপরেই রাজধানী আগরতলা।

তবে ত্রিপুরায় কলকাতা থেকে সহজ প্রবেশ পথ বিমানে। কলকাতা থেকে আগরতলা প্রত্যহ তিনটে ফ্লাইট রয়েছে। মাত্র আধ ঘণ্টার পথ—বাংলা দেশের ওপর দিয়ে পাড়ি।

রবি ঠাকুরের রাজর্ষি, বিসর্জন, মুকুটের কথা ত্রিপুরাকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। সবই ত্রিপুরা ভিত্তিক রচনা। তা ছাড়া, 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ—যার অনেকগুলো গান ও কবিতা লেখা এই প্রকৃতি ধনে ধন্যা পার্বত্য রাজ্যে—তা তিনি ত্রিপুরাধিশ রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুরকে উৎসর্গ করেছিলেন। পার্বত্য সুন্দরী ত্রিপুরার আকর্ষণে বিশ্বকবি বার বার—সাত বার এসেছিলেন এখানে। প্রথম বঙ্গাব্দ ১৩০৬; ও শেষ ১৩৩১, ১০ই ফাল্গুন। এই ত্রিপুরাতেই তিনি জীবনে প্রথম কবি হিসাবে স্বীকৃতি স্বরূপে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি পান। ত্রিপুরা ছিল তাঁর আত্মার আত্মীয়—রাজন্যবর্গের তিন পুরুষের (মহারাজা বীরচন্দ্র, রাধা-কিশোর ও শেষ মহারাজা বীরবিক্রম) সঙ্গে ছিল তাঁর নিকট সম্বন্ধ।

ত্রিপুরা সেই 'রাজর্ষি' গোবিন্দ মাণিক্যের দেশ। যেখানে গোমতীর তীরে শ্যামল অরণ্য নিকেতন, স্বপ্নময় জনপদ, ইতিহাস বিজড়িত ভগ্নপ্রায় রাজপ্রাসাদ, জংগলাকীর্ণ মন্দির, ভগ্ন দুর্গ, নরবলির রক্তে রঞ্জিত ভুবনেশ্বরী মন্দিরের শ্বেত পাথরের ঘাটের পাটা—যেখানে রাজর্ষির ধ্রুব ছিল, ছিল হাসি। ছিল চোন্তাই পুরোহিত রঘুপতি, রাজদ্রোহী রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়। উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ জয়সিংহ, রাজমহিষী
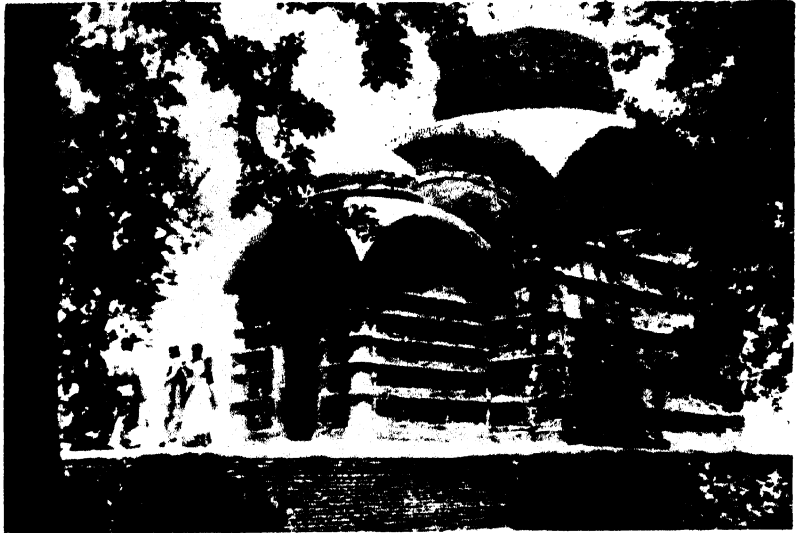
'রাজর্ষি' খ্যাত ভুবনেশ্বরী মন্দির, উদয়পুর

গুণবতী। ছিল ইতিহাসে,—অতীতে। আজও আছে ওরা—কাব্যে, স্মৃতিতে, উপলব্ধির উপনিষদে, অনুভূতির অণুতে, পরিব্রাজকের ঔৎসুক্যভরা দৃষ্টিতে। কবির প্রেমময় কাব্যগাথায়, পাখির কাকলিতে, অরণ্য মর্মরে, বিবরের অন্ধকারে, উপত্যকার শ্যামলিমায়, পাহাড়ের কাঠিন্যে, গোমতীর গৈরিক জলে।

রেল ও সেই সঙ্গে সড়ক পথে ত্রিপুরা যাবার বাড়তি একটা আকর্ষণও রয়েছে। গৌহাটি থেকে মিকির হিলসের মাঝ দিয়ে অরণ্য-পর্বত উপত্যকা-নির্ঝরিণীর নয়নাভিরাম পথে যেতে বড় ভাল লাগে। বন সেখানে রামধনুর সপ্তরঙ দেহে মেখে রঙ্গিন, বৈচিত্র্যময় ও কোথাও বা রহস্যময়, সেই বনো উপত্যকায় কাছাড়, মিকির, লুসাই, নাগা ও চাকমা আদিবাসীদের বাস। নিবিড় অরণ্যের রূপসাগরের মধ্যে জাটিঙ্গা নদীতে হাসুয়া বাঁকের ঝলক, শ্যামলিমায় সবুজে উপল ছড়ান উপত্যকা, তার মধ্যে স্বচ্ছ সলিলা প্রাণস্বরূপা পার্বত্য নদী, নদীর পাড় ধরে রেলপথ চলেছে অসাম পথে পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে রেলের সিটি তুলছে প্রতিধ্বনি। রেলপথে রয়েছে ৩৭টি ট্যানেল। পথে রঙ বেরঙের ফুল, ফল, পশু, পাখি, গাছ-গাছালি ঝরনা, নদী। রেলপথে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে চলা—বড় চিত্তাকর্ষক, বড় সুন্দর।

ধর্মনগর হয়ে ত্রিপুরা গেলে, কাছের ঊনকোটী (ত্রিপুরার অজন্তা) দেখে যাওয়া ভাল। আরণ্যক পরি-মণ্ডলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যুগ সন্ধি-ক্ষণে (সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী) পঁয়ত্রিশ মিটার উঁচু পাহাড়ের গায়ে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি খোদিত। রয়েছে ৮×৬ মিটার মহাভীম আকারের ত্রিনয়ন ঊনকোটীশ্বর কালভৈরব-এর মূর্তি। তাছাড়া রয়েছে বিশালাকায় ত্রিশূল, কয়েকটি সুদৃশ্য চক্র, নরকপোল, গরুড়, বৃষ, কিন্নরী, হনুমান, গণেশ বিষ্ণুর পদচিহ্ন ও এক মিটার ব্যাসের শিলা-মস্তক। রয়েছে ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ, রাবণ-মন্দোদরী, গঙ্গা-বাহী ভগীরথ, লব-কুশ,—সবই শিলামূর্তি। বড় বড় রিলিফের কাজ।

ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই ঊনকোটী কেই পাল পর্বের শৈবতীর্থ বলে উল্লেখ করেছেন। বারাণসীর কোটী দেবতার স্থান শ্রীতীর্থের পরেই এই ঊনকোটীর (এক কম কোটী) স্থান। গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে অজন্তা ইলোরার মত

ত্রিপুরার আদিবাসীদের টংঘর, বড়মুড়া

এই শিলাচিত্রগুলো দেখে বিস্ময় লাগে। ইতিহাস জানতে ইচ্ছা জাগে। দেহে জাগে শিহরণ।

উনকোটীর কাছের শহর কৈলাশহর। দশ কিলো-মিটার মাত্র। কৈলাশহরে হোটেল, রেস্তোরাঁ, ডাক-বাংলো সবই রয়েছে। ধর্মনগর ও কৈলাশহর থেকে বাসের যোগও রয়েছে। তাছাড়া ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। আগরতলা থেকে উনকোটী ১৭৫ কিলো মিটার।

ধর্মনগর থেকে বেশ সকাল করেই সরকারী বাস পর পর ছাড়ে আগরতলার উদ্দেশে। ১৭৫ কিঃ মিটার পাহাড়ী অসম পথ। ভাড়া মাত্র বারো টাকা। যেতে সময় লাগে ঘণ্টা ছয়েক মত। পথে কুমার-ঘাটে জলযোগ ও তেলিয়ামুড়াতে দুপুরের খাওয়া সারা যায়। পানী সাগরের কাছে 'দেও' ও 'মানু' জনপদের কাছে মানু নদীর উপত্যকা দুটি বড় সুন্দর। নদী ও সড়ককে কেন্দ্র করে জনপদ।

পথে সাকান, আঠার-মুড়া ও বড়-মুড়ার (মুড়া অর্থ পাহাড়, আঞ্চলিক ভাষা) আরণ্যক উপত্যকার মধ্যে গাছের মাথায় ও বাঁশের খুঁটির ওপর আদিবাসীদের ঘরগুলো দেখবার মত। এগুলোকে বলে টঙ-ঘর। ত্রিপুরার ১৮ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে চার লক্ষ আদিবাসী। ত্রিপুরী, রিয়াং, লুসাই, গারো, মগ চাকমা, জামাতিয়া, নোয়াতিয়া ও হালামের বাস। রিয়াংরা অতীতে যুদ্ধে পারদর্শী ছিল ও সেই গুণেই ত্রিপুরার সেনা বাহিনীতে স্থান পায়। লুসাইরা বেশীর ভাগ খৃস্টান ও চাকমারা বৌদ্ধ। রিয়াং আদি-বাসীদের মাদল ও বাঁশি সহযোগে মেয়েদের ঘড়ার ওপরে অদ্ভুত নিপুণতায় দাঁড়িয়ে, মাথায় দীপশিখা নিয়ে নাচ দেখার মতই। গানে রয়েছে যেমন রক্ত চঞ্চল করা মাদলের ছন্দ, তেমন মন কাঁদান বিরহ-গাথা বাঁশির সুরে সুরে।

আদিবাসীদের বিষয়ে কৌতূহলী পর্যটক কয়েক-দিন এই মনোরম অরণ্য নিকেতনে মনের সুখে কাটাতে পারেন, এ ধনে ত্রিপুরা সত্যিই ধনী। ত্রিপুরার মোট ২৬, ৩৪, ৪২০ একর জমির মধ্যে ৬৩ শতাংশই

রিয়াং' আদিবাসী—দেবতাদের

অরণ্যভূমি, ও এই আদিবাসীদের লীলা নিকেতন। সেই সঙ্গে এখানকার অরণ্যানীতে রয়েছে নানা প্রজাতির হরিণ, হাতী, নীল গাই, ভাল্লুক, ময়ূর, চিতা বাঘ পাইথন আরও কত প্রজাতির পাখি।

পশ্চিম ত্রিপুরায় হাওড়া নদীর তীরে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা। মহারাজা কৃষ্ণ মাণিক্য (১৭৬০-৬৩ খৃঃ) রাজধানী পুরনো আগরতলায় পত্তন করেন। নতুন রাজধানীতে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ (রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম) মহারাজা রাধিকা কিশোর (১৮৯৬—১৯০৯) নির্মাণ করেন ১৮৯৭ সালে। এখানে দুষ্প্রাপ্য হস্তশিল্প সামগ্রী প্রাচীন পুঁথি (রাজমালার পাণ্ডু-লিপি) ও মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যকে সুলতান সুজা পদ ও তরবারি 'নামচা' ইত্যাদি সংরক্ষিত।

এ ছাড়া আগরতলার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো হল—(ক) কুঞ্জবন প্রাসাদ (বীরেন্দ্র কিশোর—১৯১৭তে নির্মাণ করান), (খ) বীরবিক্রম কলেজ সংলগ্ন ঝিল, (গ) চতুর্দশ দেবতার মন্দির (অষ্ট ধাতুর মূর্তি) আষাঢ় পূর্ণিমায় খারচী পুজো ও সেই সঙ্গে আদি-বাসীদের মেলা ও বলি দেওয়া, (ঘ) উমা-মহেশ্বর মন্দির, (ঙ) লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, (চ) বুদ্ধ মন্দির—(কুঞ্জবন), (ছ) যাদুঘর, (জ) জগন্নাথ মন্দির, (ঝ) কুঞ্জবন ঝিল, (ঞ) গান্ধীঘাট, (ট) রামকৃষ্ণ আশ্রম, (ঠ) চম্পক নগর, (ড) লেম্বুছেরা ইত্যাদি।

আগরতলায় হোটেল ও আবাস গৃহ—রয়েল গেস্ট হাউস, মীনাক্ষী হোটেল, ও কে হোটেল, রাজ হোটেল, সৌরাষ্ট্র হোটেল, আগরতলা ক্লাব কাম গেস্ট হাউস। তা ছাড়া রয়েছে, সরকারী আবাস—সার্কিট হাউস (কুঞ্জবন ও ডাকবাংলো)।

আগরতলা থেকে সরকারী পর্যটন বিভাগের কোচে দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আগরতলা থেকে সিপাহীজলা (৩৫ কিলোমিটার) সেখান থেকে মাতাবাড়ী ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির (৩৫ কিলোমিটার)। মাতাবাড়ী থেকে অতীতের রাজপ্রাসাদ নীরমহল (৩০ কিঃ মিঃ) ও সেখানে থেকে আগরতলা ফেরা (৫০ কিঃ মিঃ)।

রাজর্ষি গোবিন্দ মাণিক্যের রাজধানী উদয়পুর—আগরতলা থেকে ৫৬ কিলোমিটার।

সিপাহীজলার পথে বিশালগড়—এক ঘণ্টার পথ। এই বিশালগড়েই মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহোদর সুজাকে প্রতিহত করেন।

শালবীথির মধ্য দিয়ে ছায়ামাখা সর্পিল পথ। চার বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে সিপাহীজলার গভীর অরণ্যানী। রয়েছে জারুল, মিঠা-জারুল, কাঞ্চন, চামল ও সেই সঙ্গে কাজু বাদাম, কফি ও রবারের চাষ। গভীর জঙ্গলের ভেতর রয়েছে মুগ্ধকর, সুন্দর সাজান চিড়িয়াখানা, (আছে তাতে নীল গাই, চিতল হরিণ,

বার্কিং ডিয়ার, শম্বর, ভাল্লুক, লজ্জাবতী বাঁদর, ময়ূর, চিতাবাঘ, পাইথন ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ও পাখী। বন বিভাগের সুপরিকল্পিত কাজ দেখে ভাল লাগে।

চিড়িয়াখানা থেকে আধ কিলোমিটার দূরেই সুন্দর আরণ্যক পরিমণ্ডলের মধ্যে বনবিভাগের দ্বিতল বাংলো অবসারিকা ও সংলগ্ন প্রশস্ত ঝিল, সেখানে রয়েছে অনেকগুলো রঙিন প্যাডেল-বোট, এই বোটে প্যাডেল করে টুরিস্ট নিজেই ঝিলে অবসর বিনোদন করতে পারেন। চার্জ খুবই সামান্য। আগরতলায় বন বিভাগ থেকে আগাম আসন সংগ্রহ করতে পারা যায়—অবসারিকাতে রাত্রিবাসের জন্যে, কয়েকদিন প্রকৃতিকে আপন করে থাকবার মত জায়গা।

ফেরার পথে বিশ্রাম নেওয়া যায়—'বিশ্রামগঞ্জে'। মহারাজা বীরবিক্রম সোনামুড়া, রুদ্রসাগর ও মেলাঘরের সড়ক তদারকির কাজে এসে এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন—তাই এ নামকরণ।

এর পরের জনপদ বিখ্যাত 'উদয়পুর'। অতীতে গোবিন্দমাণিক্য ও পরবর্তী রাজাদের রাজধানী। আগের নাম ছিল রাঙামাটি। ত্রিপুরার ঐতিহাসিক প্রাচীন পুঁথি রাজমালার—'উদয়মাণিক্য খণ্ডে' লেখা রয়েছে :

'রাঙামাটি নাম রাজ্য পূর্বাবধি ছিল
উদয়মাণিক্যবধি উদয়পুর হৈল ॥'

এই উদয়পুরেই রয়েছে রাজর্ষি বর্ণিত রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ভগ্ন প্রসাদ গোমতীর তীরে। রয়েছে গুণবতীর মন্দির, ভুবনেশ্বরী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ (কিংবদন্তী—এখানে নরবলি হতো) মহাদেব ও গোপীনাথ মন্দির, দুত্যার বাড়ি ও জগন্নাথের দোল, লক্ষ্মীপুর ও বিরাট আয়তনের দীঘি। পুরনো দেবদেউল ও রাজপ্রাসাদগুলো দেখলে মনে হয়—ইতিহাস যেন এখানে কথা কইছে। উৎসাহী পর্যটক জ্যোৎস্না রাতে এই স্মৃতিচিহ্নগুলো ঘুরে দেখতে পারেন। আবিষ্কার করতে পারেন বিশ্বকবির রাজর্ষিকে, শিশু ধ্রুবকে, তার ছোট্ট দিদি হাসিকে, ভয়াল রক্ত কাঙাল পুরোহিত রঘুপতিকে॥ আত্মঘাতী উৎসর্গীকৃত রাজপুরুষ জয়সিংহ ও রাজদ্রোহী রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে। চিনে নিতে পারেন বর্তমানের মাঝে অতীতের ত্রিপুরাকে।

'দেবতা-মুড়া' অর্থ দেবতাদের পাহাড়। ত্রিপুরায় উত্তর সীমান্তে একশ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার লম্বা পর্বতশ্রেণীর নাম বড়-মুড়া। এই পর্বতের উদয়পুর ও অমরপুরের মধ্যবর্তী অংশটি দেবতা-মুড়া নামে প্রসিদ্ধ॥ 'দেবতা-মুড়া' পাহাড়ের গিরিখাদে বয়ে চলেছে এক স্রোতস্বিনী। ঢালু পাহাড়ের গায়ে পর পর দেবদেবীর মূর্তি। মহাবল্লিপুরমের 'অর্জুনের তপস্যা'র মত বড় বড় রিলিফের কাজ। তাতে রয়েছে পঞ্চ-পাণ্ডবের মূর্তি। রয়েছে লক্ষ্মী, সরস্বতী, চামুণ্ডা, মহিষমর্দিনী রূপে দেবী দুর্গা। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রাজা হিমতী (যুঝরু ফা) স্থানীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজাকে পরাজিত করে তাঁর এই বিজয়ের সাক্ষ্য হিসাবে পাহাড়ের গায়ে ভাস্কর্যগুলো করান। ভাস্কর্যের প্রকার ও দেহভঙ্গিমা দেখলে মনে হয় বৌদ্ধ-শৈলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে এখানে। 'দেবতা মুড়ার' সমকালের ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায় ত্রিপুরা জেলায় (অধুনা কুমিল্লা—বাংলাদেশ) বাখাউরার বিষ্ণুমূর্তিতে, চাঁদিনার নারায়ণ ও বরকামতার সূর্যমূর্তির ভাস্কর্যে।

নীরমহল আগরতলা থেকে ছাপ্পান্ন কিঃমিঃ দূরে। ভাল সড়ক পথে যোগ রয়েছে। টুরিস্টবাস যায়। নীরমহলের চারদিকের বিস্তৃত ঝিলের নামই রুদ্রসাগর। উদয়পুর থেকে নীরমহল মাত্র সাতাশ কিলো মিটার। নীরমহলের অবস্থান বাংলাদেশ সীমান্তে।

জলের মধ্যে এই প্রাসাদ গড়ে উঠেছে বলেই এ নামকরণ। রুদ্রসাগরের ঝিলের মধ্যে এক দ্বীপের ওপরে এই সুদৃশ্য বিরাট রাজপ্রাসাদ। মহারাজা বীরবিক্রম ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সাজান প্রাসাদটি

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির

উদয়মাণিক্যের রাজপ্রসাদ কালের গর্ভে

দৈত্যনারায়ণ নির্মিত জগন্নাথ দেবের মন্দির

প্রধানত অবসর বিনোদনের জন্যে তৈরি করান। তৈরি করতে সময় লেগেছিল বছর দুয়েরও বেশী। এর স্থাপত্য মোগল ও সেই সঙ্গে হিন্দুয়ানীর প্রভাবও রয়েছে। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন অনেকটা শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি সংস্কারের কাজ সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে॥ আগে ছিল 'মটর লঞ্চের' ব্যবস্থা। এখন নৌযোগে রুদ্রসাগর পাড়ি দিয়ে নীরমহলে যাওয়া যায়।

রুদ্রসাগরের বিস্তৃত জলাধারে শীত ও বসন্ত ঋতুতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা দেখার মত। টুরিস্টের অবসর বিনোদনের সুন্দর জায়গা। সম্প্রতি সুপরিকল্পিতভাবে মাছের চাষও হাতে নেওয়া হয়েছে এই রুদ্রসাগরে। টুরিস্টদের সেটাও একটা বাড়তি আকর্ষণ।

মেলা গড় থেকেই 'মেলা ঘর'। লোকমুখে ক্রমে ক্রমে নাম পালটেছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের সময়ে, ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার সুলতান হুসেন শাহ ত্রিপুরা আক্রমণ করলে এই মেলা গড়েই তাঁর সৈন্য প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। সে যুদ্ধে করায়ত্ত একটি কামান রাজধানী আগরতলায় 'কামান—চৌমুহনী'তে আজও রয়েছে।

অমরপুর ত্রিপুরার অতীত দিনের রাজধানী। উদয়পুর থেকে দূরত্ব মাত্র পঁচিশ কিলো মিটার। ত্রিপুরাধিপতি রামদাস 'অমর মাণিক্য' নামধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। ত্রিপুরার নতুন রাজধানী স্থাপন করেন 'বড় মুড়া' পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তে—গোমতী নদীতীরে। নিজের নামানুসারে তাঁর রাজধানীর নাম রাখেন 'অমরপুর'।

এখন অমরপুর একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেই সঙ্গে দক্ষিণ ত্রিপুরার সদর মহকুমা। শীতে ও বসন্তে অমরপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি উপভোগ্য।

অমরপুর থেকে ঊনত্রিশ কিলো মিটার পূর্বে ও আগরতলা থেকে একশ দশ কিলোমিটার পূব দক্ষিণে সুন্দর জলাধার আছে। নাম ডম্বরু লেক। চল্লিশ বর্গ কিলোমিটার জলাশয়টির চারদিকে সবুজ শ্যামলিমায় এক অপূর্ব প্রাকৃতিক লীলানিকেতন। 'কোজাগরী' কিংবা বুদ্ধ পূর্ণিমার রাতে বা হেমন্তের কোন কনে দেখা রোদ্দুরের মিহি আলোয় এই ঝিলটি বড় মনোরম হয়ে ওঠে। 'দেবতা মুড়ার' তেইশ কিলো মিটার পূবে দুটি পার্বত্য নির্ঝরিণী সাইম ও রাইমা একসঙ্গে মিশেছে। তার পরেই সৃষ্টি হয়েছে ডম্বরু জলপ্রপাত। এটাই ত্রিপুরার সব চেয়ে বড় নদী গোমতীর উৎসমুখ। তীর্থযাত্রীদের কাছে 'তীর্থমুখ', এখান থেকেই পশ্চিমবাহিনী গোমতী অমরপুরে, উদয়পুরে, সোনামুড়া বাংলাদেশের কুমিল্লা, মুরাদনগর, দাউদকান্দি হয়ে মিশেছে মেঘনায়।

'তীর্থমুখ' আদিবাসীদের (রিয়াং, মগ ও চাকমা) পবিত্র তীর্থস্থান। পৌষ সংক্রান্তিতে 'উত্তরণ মেলা' হয় এখানে। সমবেত হয় আদিবাসীরা নানান রঙের পোশাক পরে। অন্যান্য উপত্যকা থেকেও নরনারীরা আসে পুজো দিতে, নাচে গানে স্থানটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিশেষত 'কারচী', কের ও গঙ্গা পুজোর সময় ধুম পড়ে যায়। পুণ্যার্থীরা স্নান করে গোমতীর উৎসমুখে।

ডম্বরু জলপ্রপাতের ওপরে পাহাড়ের মাথায় প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে॥ কোন্ রাজার সময়কার তা সঠিক জানা যায়নি এখনও। ত্রিপুরার সর্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এই ডম্বরু জলপ্রপাতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে। চার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এখানে। সেই সঙ্গে আবদ্ধ জলাধার থেকে সেচের নালা কেটে সুবন্দোবস্ত হবে জলসেচের।

আগরতলা থেকে একশ কিলোমিটার দক্ষিণে বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি নিদর্শন রয়েছে পিলাকে। উদয়পুর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার। অবস্থান বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে। সমপর্যায়ের বৌদ্ধ স্থাপত্যের সাক্ষ্য অবিভক্ত ত্রিপুরার ময়নামতী অঞ্চলেও পাওয়া গেছে। অতীতে এই অংশটি ছিল পাল বংশীয় রাজাদের শাসনে। অনুমিত হয় পিলাকের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ ও বৌদ্ধ

মূর্তিগুলো সেই সময়ের। ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার ঘটে গুপ্তযুগে ও তার পরে। কিন্তু এর আগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত আর্যাবর্তে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণে যখন বৌদ্ধধর্ম মৃতপ্রায়—সে সময় ত্রিপুরায় তা সমাদৃত। পরিব্রাজক হুয়েন সাঙের বিবরণে 'সমতট' সংলগ্ন এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির কথা জানা যায়। পরবর্তীকালে পরিব্রাজক সেঙ-চীর লেখাতেও সে কথার স্বীকৃতি রয়েছে।

পিলাকের দেবদারু জঙ্গলে অর্ধপ্রোথিত অন্টভুজা এক মিটার দীর্ঘ নৃসিংহ ও তিন মিটার দীর্ঘ নারায়ণ মূর্তিগুলো সে সময়কার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ধারা ও গঠনশৈলীর পরিচায়ক। এগুলো বুদ্ধমূর্তি ও সংশ্লিষ্ট স্থাপত্য ছাড়াও হিন্দুধর্মের প্রসারতার চিহ্নও বহন করে। তাছাড়া পিলাকে মাটির নীচ থেকে পাওয়া গেছে সপ্তম-অন্টম শতাব্দীর টেরাকোটার মূর্তি—কিন্নরী, মানব, মানবী, জীবজন্তু ইত্যাদি। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদদের বিশ্লেষণের অপেক্ষায় আজ ত্রিপুরার পিলাক অরণ্যের লীলানিকেতনে করছে শবরীর উদ্ধার প্রতীক্ষা।

ত্রিপুরার সব চেয়ে উঁচু পাহাড় জাম্পুই। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নয় শ' পনেরো মিটার। পার্বত্য ত্রিপুরার একশ নয় কিলোমিটার জুড়ে মিজোরামের সীমান্ত—অর বেশির ভাগ নিয়েই এই জাম্পুই পাহাড়। পাহাড়ের নীচেই ত্রিপুরার পূর্ব সীমান্ত। বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী—লঙ্গাই রাজধানী আগরতলা থেকে জাম্পুই আনুমানিক আড়াই শ কিলোমিটার দূরে। আকর্ষণীয় 'টুরিস্ট স্পট'।

আদিবাসীদের বৃক্ষচূড়ায় 'টঙঘর', মাঝে মাঝে সবুজ ছোট ছোট সমতল উপত্যকা, এরা বলে 'লুঙ্গা'। বর্ণময় প্রাকৃতিক সম্ভারে ঐশ্বর্যশালী অবণ্যানী। তার মধ্যে প্রকৃতির আদিম সন্তান আদিবাসীদের জীবনলীলা বড় সুন্দর। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত

রাধানগরে রাধামাধব মন্দির

আনন্দের উচ্ছ্বাসের প্রকাশ নাচে, গানে। সামাজিক প্রথায়, শিকার অভিযানে, ধর্মীয় বিশ্বাসে। আদিবাসীদের হাতে বোনা তাঁতের 'রীয়া' (কাঁচুলী) পাছড়া, দুবড়া বড় সুন্দর। সুন্দর তাদের হাতের বাঁশ ও বেতের কাজ। আর সুন্দর তাদের এই লীলানিকেতন চিরবসন্তের দেশ জাম্পুই

জাম্পুই শ্যামলিমায় সতেজ। বর্ণ-সুষমায় বিহ্বল। ফলে, ফুলে, পাখির ডাকে, লতা বিতানের ঝোপে ঝাড়ে, সমস্ত প্রকৃতি অপরূপা তিলোত্তমা হয়ে সেখানে দেয় ধরা। অকবিকেও করে তোলে কবি, আদিবাসীকে শিল্পী। অপরূপার রূপ ধরা পড়ে অরণ্যপ্রেমিক পর্যটকের সুন্দর পিপাসু চোখে, শিল্পীর তুলিতে, লেখকের কলমে, কবির কাব্যে, তাই বোধ হয় বিশ্বকবরেণ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বার বার, সাত বার ত্রিপুরায় ছুটে গিয়েছিলেন।

গাছে গাছে রসে স্বাদে ভরপুর গুচ্ছ গুচ্ছ কমলা, পীচ, আম। কত রকমের গাছ। শাল, সেগুন, গোমা, গর্জন, কুসুম, নাগেশ্বর চাম্বল গাম্ভারী, ছাতিম—আরও কত কি। স্রোতস্বিনীর সিক্ত জমিতে দোদুল ছন্দে দোলা লাগা বেণুবন। বনে রংবেরঙের পাখির মেলা—টিয়া, ভৃঙ্গরাজ, ধনেশ, 'বউ কথা কও', মৌচুষী পাখির জটলা। গভীর জঙ্গলে চলে বন্য জন্তুর নির্ভর বিচরণ ও দাপাদাপি।

জাম্পুই পাহাড়ে রয়েছে আদিবাসী রিয়াংদের বাস। রয়েছে রিয়াং অধ্যুষিত পাহাড়ী গ্রাম 'সিমলুং'। হাজার পাঁচেক লোকের বাস এই জাম্পুই-এ। চল্লিশ ভাগ রিয়াং বাদবাকী মিজো। সব কিছু একটি মাত্র থানার অধীন। থানার নাম 'ডাংমুন'।

কোন জ্যোৎস্নাস্নাত রাতে রিয়াং গ্রামে গেলে হয়তো পরদেশী টুরিস্ট আজও শুনতে পাবে পার্বত্য তরুণীর বিরহ গীতি। আকাশ, বাতাস, বন জঙ্গলের প্রতিটি অভিভূত করে সে গাইছে :

তুই গেরেং গেরেং গতি চাক জাগাই
রিহিনই খনালিয়া যাদু রিচুনই খনালিয়া॥
(কলকল্লোলিনী স্রোতস্বিনীর ধারে দাঁড়িয়ে
আকুল হয়ে ডাক দিলাম তারে
তবু তার সাড়া পাইলাম নারে॥)

এই আদিবাসীদের ত্রিপুরা, বিশ্বকবির ত্রিপুরা, পার্বত্য নয়নাভিরাম প্রকৃতির লীলানিকেতন ত্রিপুরা থেকে ডাকছে পরদেশীকে। পর্যটককে। কবিকে। শিল্পীকে। ডাকছে ওই গানের সুরে আপনাকে আমাকে।

কণ্টকাকীর্ণ
অতুল্য ঘোষ

(নবপর্যায়)

॥ ১৪ ॥

১৩ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য বিধানসভায় উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল এমন ঘটনায়, যার সঙ্গে বিধানসভার কার্যক্রমের কোন সম্পর্ক নেই। সাধারণত উত্তেজনা সৃষ্টি হয় আইন-শৃংখলা, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, দ্রব্যমূল্য—এইসব ব্যাপারে। সেদিন কিন্তু উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সি পি আই (এম)-এর একজন এম এল এ-র অশালীন উক্তির জন্য। আবার বিরোধীদের পক্ষ থেকে মার্ক্স এবং লেনিন-এর সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক উক্তি করা হয়। এইসব ব্যাপারে যাঁরা বিধানসভার সদস্য এবং বিধানসভার স্পীকার—তাঁরাই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমরা যারা বিধানসভার বাইরের লোক, তারা একটু অস্বস্তি অনুভব করছি। মহাত্মা গান্ধীর জীবিতকালে তিনি যখন সক্রিয় ছিলেন তখন অনেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন। অনেক অযৌক্তিক, অহেতুক ও অসত্য উক্তিও ছিল। এতে কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কাজ করবার কোনও অসুবিধে হয়নি। মত ও পথের পার্থক্য থাকলে নিশ্চয়ই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। সমালোচনা এক জিনিস, আর ব্যক্তিগত আক্রমণ করে অশালীন উক্তি অন্য এক মনোভাবের পরিচয় দেয়। সাধারণত মত বা পথের মধ্যে যাঁরা কোন ভুল দেখতে পান না, তাঁরাই ব্যক্তিগত আক্রমণের পথ নেন। অন্য কারণেও ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়। নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লোকচক্ষে ছোট করবার জন্যে। ক্রমাগত যদি অসত্য প্রচার হয়, তাহলে কিছু লোকের বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। ফলে শ্রদ্ধাহীনতা এসে পড়ে। এক সময় অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি এই শ্রদ্ধাহীনতা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। মানুষকে যে একটা নিম্নতম মান বজায় রেখে বাস করতে হয় এ বোধ যদি প্রচারকদের মধ্য থেকে সরে যায়, তাহলে শ্রদ্ধাহীনতা ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক। কোন একজন রাগে বা মনের ভুলে বা ক্ষণিকের জন্য মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফলে কোন অশালীন কাজ বা উক্তি করতে পারে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে সেই কাজের নিন্দা যে পার্টিতে এই ব্যক্তিটি ছিল, সেই পার্টিগুলো করছেন না, তখনই সেটা হয়ে ওঠে ভাবনার কথা। ৩০-এর দশকে শ্রীরামপুর রেলওয়ে স্টেশনে কম্যুনিস্ট পার্টির এক কর্মী গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়েছিল। যে ছুঁড়েছিল, সে একজন ব্যক্তি। সে হয়ত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে এই কাজ করেছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে কম্যুনিস্ট পার্টি এই কাজের নিন্দা করলেন না, তখনই সাধারণের মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, এইরকম কাজে কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন আছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর একটি ভাষণ ১৭ই সেপ্টেম্বরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সেই ভাষণে পরিষ্কার অভিযোগ করেছেন যে ত্রিশ বছর কংগ্রেসী শাসনে জাতীয় নীতিবোধ ক্ষুণ্ণ ও খর্ব হয়েছে এবং তার জন্য কংগ্রেসই দায়ী। অদ্ভুত অভিযোগ। স্বাধীনতার পরই কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ক্রমাগত জাতীয় পতাকা পোড়ান হয়েছিল। এতে কি জাতীয় নীতিবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল? পঞ্চাশ দশকে জাতীয় সঙ্গীতের সময় কম্যুনিস্ট পার্টির অনেক সদস্য তার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাতেন না। ২৬শে জানুয়ারী ও ১৫ই আগস্ট তাঁদের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উঠত না। জাতীয় নীতিবোধ সম্বন্ধে দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এরকম অভিযোগ শোভন হয়নি। কোন্ কোন্ কাজে জাতীয় নীতিবোধ ক্ষুণ্ণ হয়, তা বিচার সাপেক্ষ। যদি একটা নিম্নতম মানও ধরা যায়, তাহলে এমন অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাবে, যাতে প্রমাণিত হবে কংগ্রেস দলের চেয়ে বিরোধী দল এই অপরাধে অনেক বেশী অপরাধী, সেইজন্যই গত কথা বাদ দিয়ে ক্রমাগত সব কিছু অপরাধের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী না করে নতুন ভাবে আরম্ভ করাই তো সঙ্গত ও সমীচীন। আর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু সেই চেষ্টাই তো করছেন। বিধানসভায় যে দিন সি পি আই (এম) দলের একজন এম এল এ গান্ধী সম্বন্ধে অশালীন উক্তি করছিলেন, ঠিক সেই দিনই সি পি আই (এম) দলের আইনসভার নেতা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু গান্ধীজীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন পথিকৃৎ বলে অভিহিত করেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সি পি আই (এম) দলের ঐ সদস্যের সঙ্গে আইনসভার সি পি আই (এম) দলের নেতার অনেক মতপার্থক্য।

রুশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বকোষে গান্ধীজী সম্বন্ধে যে অশালীন মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক সেই কথাগুলিই সেদিন বিধানসভায় ঐ সি পি আই (এম) সদস্য গান্ধীজী সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছিলেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে বিশ দশকের পর ঐ সি পি আই (এম) সদস্য আর বিশেষ পড়াশুনা করেননি। আর সেই সময় ছিল অবিভক্ত সি পি আই দল। রুশদেশের বিশ্বকোষে গান্ধীজী সম্বন্ধে যা বেরিয়েছিল, তিনি তাই ধরে বসে আছেন। কারণ সি পি আই দলের অনেকেরই তখন ধারণা ছিল যে রুশ দেশে যা বলা হয়, যা লেখা হয়, তা অভ্রান্ত সত্য। তারপর অনেক অনেক বছর কেটে গেছে। রুশদেশের দৃষ্টিভঙ্গীও পাল্টেছে। গান্ধীজী আজ রুশ দেশের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় নন, কিন্তু আমাদের ঐ সি পি আই (এম) সদস্যটি এসব খবর রাখেন না বা রাখা প্রয়োজন মনে করেন না। তিনি বিশ শতকেই দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ তাঁর আইনসভার নেতার অন্য ধারণা। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে সি পি আই (এম) দলের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। আরও নজীর আছে। বাম ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ২রা অক্টোবর সকলকে গান্ধীঘাটে যাবার আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রিত অনেকে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু যে সরকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেই সরকারের একজন মন্ত্রীও উপস্থিত হননি। এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার, যা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। কিন্তু ভাষ্যকারদের কাছে এর অর্থ অতি সোজা। মন্ত্রীরা তখনও প্রকাশ্যে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। পরে অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁদের মত বদলেছে। সেই জন্যই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ও অন্যান্য নেতাদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন মনে রাখেন কেবলমাত্র পূর্বতনদের প্রতি দোষারোপ করলেই জাতীয় নীতি রক্ষিত হয় না বা জাতীয় নীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয় না। আবার ১৭ই সেপ্টেম্বর এক মন্ত্রীও নাকি বিধানসভার অভ্যন্তরে গান্ধীজীর প্রতি অশালীন মন্তব্য করেছেন। মন্ত্রী মহোদয় বোধ হয় ভুলে গেছেন যে সাধারণ সদস্যদের চেয়েও মন্ত্রীদের দায়িত্ব অনেক বেশী। তাঁদের কথা সবসময়ই সংযত হওয়া উচিত। আরও অভিনব ব্যাপার হল যে মন্ত্রী মহোদয় ফরওয়ার্ড ব্লক দলভুক্ত। ফরওয়ার্ড ব্লকের স্রষ্টা নেতাজী ভারতবর্ষের যখন বাইরে ছিলেন, তখন বার বার করে সকলকে ভারতবর্ষের মধ্যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কাজ করবার নির্দেশ দিতেন। ফরওয়ার্ড ব্লক দলভুক্ত এই মন্ত্রীর কথায় অনেকে হয়ত ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন—কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যার যেখানে যা ইচ্ছে বলাই এখন জাতীয় নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সরকারী দল অসমীচীন উক্তিতে বিরোধী দলের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করছেন। সরকারী দল ও মন্ত্রীরা ভুলে যান যে বিধানসভার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব তাঁদের উপর সবচাইতে বেশী। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই বিরোধী দলের কথাও এসে পড়ে। ঐদিন বিরোধী দল থেকেও নাকি মার্ক্স এবং লেনিন মহোদয় সম্পর্কে অশালীন উক্তি করা হয়েছে। যাঁরা শ্রদ্ধেয় তাঁদের সঙ্গে মতপার্থক্য থাকলেও অশালীন উক্তি সবসময়ই অসঙ্গত, অশোভন এবং অন্যায়। মার্ক্সের পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান আছে। মার্ক্সের পূর্বে বহু বছর ধরে পৃথিবীর বহু দার্শনিক, চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদেরা যে মত ও চিন্তাধারা অস্ফুটভাবে প্রকাশ করছিলেন, মার্ক্স সেই চিন্তাধারাকে সংহত করে প্রকাশ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নূতন দিগন্তের আভাস পাওয়া যায়। সেইজন্য মার্ক্স পৃথিবীর ইতিহাসে এক পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর প্রতি কোন অশালীন উক্তি যাঁরা করেন, তাঁরা যে শুধু অসঙ্গত কাজ করেন, তা নয়, তাঁরা নিজেদের অনভিজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। লেনিন মহোদয় মার্ক্সপন্থী চিন্তানায়কদের চিন্তাধারা শুধু যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা নয়, সেই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এই অনুশীলনে অসীম ধৈর্য ও সাহসের প্রয়োজন। সমাজ সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতাও

এই অনুশীলনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাঁর মত ও পথ সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে তাঁর মত এবং পথ ধরে পৃথিবীর বহু কোটি লোক আজ মনুষ্য-সমাজকে একটি বিশেষ রূপ দেবার চেষ্টা করছে। এই পরম সত্যকে যাঁরা অস্বীকার করে মার্ক্স ও লেনিনের প্রতি অসমীচীন উক্তি করেছেন, তা হয়েছে অত্যন্ত অশোভন অসংগত ও অন্যায়।

এসব ছাড়াও একটা কথা মনে পড়ে। বিধানসভা হল প্রাপ্তবয়স্কদের জায়গা। সেখানে তো এক অশালীন উক্তির উত্তরে আর এক অশালীন উক্তি করে শ্রদ্ধেয়ের প্রতি সম্মান দেখান যায় না। পাড়ার রাস্তায় ছোট ছেলে-মেয়েরা যখন ঝগড়া করে পরস্পরের প্রতি কটূক্তি করে, তখন তার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বিধানসভার মধ্যে জন-প্রতিনিধিরা যখন নিজেদের মধ্যে এইরকম উত্তর-প্রত্যুত্তর করেন, তখন সব নীতিবোধেরই অমর্যাদা করা হয়। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যাঁদের সম্বন্ধে এই উক্তি হয়েছে, তাঁরা পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা স্থান করে নিয়েছেন, যা খর্ব করা দুঃসাধ্য ও অসাধ্য। যাঁরা কটূক্তি করেন, তাঁরাই লোকচক্ষে হেয় হন, ঐসব উক্তি শ্রদ্ধেয়দের স্পর্শ করতেও পারে না।

বিধানসভার অভ্যন্তরে যা ঘটেছে, তা নিয়ে মাননীয় স্পীকার এবং সদস্যরা যথোচিত ব্যবস্থা করবেন। এটা হল ব্যবস্থার কথা। কিন্তু এই উত্তর প্রত্যুত্তরের ফলে সাধারণের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে জাতীয় নীতি-বোধ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। আর জাতীয় নীতি-বোধ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মর্যাদা খর্ব হয় ও জাতীয় সমৃদ্ধির কাজ ব্যাহত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় নীতিবোধ নিয়ে বলেছেন। কোন কোন রাজনৈতিক দল আগে 'জাতীয়তা' শব্দের প্রতিই বিমুখ ছিলেন। এবং জাতীয় ভাবধারা যে আন্ত-র্জাতিক সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর, তাও তাঁরা মনে করতেন। পূর্বে অনেক সময় দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত, সেই রাজনৈতিক দল জাতীয়তাবোধকে অশ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অস্বীকার করারও চেষ্টা করেছেন। জাতীয়তাবোধ না থাকলে জাতীয় নীতি কিভাবে থাকতে পারে? রুশদেশ ও চীনদেশে কম্যুনিজমের মতাবলম্বী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় কোথাও দেখা যায়নি রুশ ও চীন দেশের জাতীয় স্বার্থ বলি দিয়ে তাঁরা আন্তর্জাতিক ভাবধারার দিকে ঝুঁকেছেন। ১৯৬২-তে চীন-ভারত সীমানা নিয়ে যে সংঘর্ষ হয়, তার অনেকে অনেক ব্যাখ্যা করেছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিতপ্রবর টয়েনবী সাহেব ভারতকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, আবার অনেকে চীনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এ হল পণ্ডিতদের মতবিনি-ময়ের কথা। কিন্তু ভারতের মাটিতে যখন চীনের আক্রমণকে স্বাগত জানিয়ে পোস্টার পড়েছিল, সেই কাজের নিন্দা যেসব তৎকালীন রাজনৈতিক দল করেননি, তাঁরা কি জাতীয়তা বোধ বা জাতীয় নীতিতে বিশ্বাসী? আন্ত-র্জাতিক চিন্তাধারার সঙ্গে কি জাতীয় চিন্তা-ধারা খাপ খায় না? পৃথিবীর সব দেশের সমৃদ্ধির উপরেই সুস্থ আন্তর্জাতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা হতে পারে। বর্তমানে ইউনাইটেড নেশনস রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশই তার সদস্য। কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস-এ গৃহীত প্রস্তাব কি সবসময় প্রতিপালিত হয়? বহু দেশ তো তা উপেক্ষা করেও ইউনাইটেড নেশনস-এর সভ্য হয়ে আছে। যে জাতীয়তা-বোধ চারদিকে গণ্ডীর সৃষ্টি করে সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে তো জাতীয়তাবোধ বলা যায় না। যে জাতীয়তাবোধ নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করতে চায়, অন্য সব সমৃদ্ধ জাতির সমকক্ষ হবার জন্য, এবং অন্যান্য উন্নতিশীল জাতিকে প্রেরণা যোগাবার জন্য, সেই জাতীয়তাবোধই তো সব সমাজের পক্ষে কাম্য। কিন্তু এই বোধ আনতে গেলে জাতীয়তাবোধের সম্যক বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। কোন একটি বিশষে আদর্শকে সামনে রেখে যদি জাতীয়তাবোধকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হয়, তাহলে জাতীয় নীতি কখনো রূপগ্রহণ করতে পারে না।

বিজ্ঞান

ধাতু যখন বিষ

সুইস অ্যালকেমিস্ট এবং চিকিৎসক ফিলিপাস অরেওলাস প্যারাসেলসুস (১৪৯৩-১৫৪১) একবার মন্তব্য করেছিলেন, বস্তুমাত্রই বিষাক্ত। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যার বিষক্রিয়া নেই। তবে হ্যাঁ, এই বিষক্রিয়ার ব্যাপারটা নির্ভর করে বস্তুর পরিমাণের ওপর।

প্রসঙ্গ ধাতু।

প্রশ্ন হলো, মানুষের শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মে ধাতুর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, শরীরকে পরিপুষ্ট রাখার জন্যে যেমন দরকার কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট এবং নানা রকম ভিটামিন, ঠিক তেমনই দরকার একাধিক ধাতু। খাবারে ওই সব ধাতু যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে না থাকে, শরীর ভেঙে পড়তে পারে। শরীর হয়ে ওঠে তখন নানা রকম রোগের আকর।

যেমন, ক্যালসিয়ামের কথাই ধরুন। শরীরে ক্যালসিয়ামের ভূমিকা প্রধানত দুই রকম। ক্যালসিয়াম দাঁত এবং অস্থির মুখ্য উপাদান। এবং এই ধাতুটি পেশী এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, হৃৎপিণ্ডের পেশীর মধ্যে যদি কৃত্রিম উপায়ে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং সোডিয়ামের দ্রবণ সঞ্চালিত করা যায়, সে ক্ষেত্রে তার পর্যায়ক্রমিক সংকোচন এবং সম্প্রসারণের কাজটি অব্যাহত থাকে। কিন্তু ওই দ্রবণ থেকে যে মুহূর্তে ক্যালসিয়ামঘটিত লবণকে সরিয়ে নেওয়া হয়, হৃৎপিণ্ডের পেশী আর সঙ্কুচিত হতে পারে না। এ ছাড়া ক্যালসিয়াম রক্তকে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

লোহা রক্তের হিমোগ্লোবিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এখানে লোহার ভূমিকা শরীরে অক্সিজেন লেনদেনের ব্যাপারে সাহায্য করা। এ ছাড়া পেশীকোষের মধ্যেও লোহার অবস্থিতি অত্যন্ত জরুরী। লোহাকে সেখানে পাওয়া যায় মুখ্যত দুই ভাবে। এক, মাইওগ্লোবিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগে। দুই, বিভিন্ন ধরনের 'এনজাইম' বা উৎসেচক রসের অন্যতম উপাদান হিসেবে। উল্লেখ্য, পেশীর সংকোচন চালানোর জন্যে দরকার অক্সিজেন। এই অক্সিজেন সরবরাহ করার দায়িত্ব মাইওগ্লোবিনের উপর ন্যস্ত। আর যে সব এনজাইমের কথা বললাম, তাদের মধ্যে আছে সাইটোক্রোমস, ক্যাটালেজেস এবং পারঅকসাইডেজ। এদের কাজ পেশী-কোষে সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট এবং প্রোটিন, এই সব উপাদানগুলিকে জারিত করা। অর্থাৎ এক কথায়, পেশীর স্বাভাবিক কাজকর্ম চালানোর জন্যে লোহা দরকার।

হ্যাঁ, দরকার আরও নানা রকম ধাতু। যেমন ম্যাগনেসিয়াম। ম্যাগনেসিয়াম কোন কোন এনজাইমের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস বিপাক এবং কোনও কোনও হরমোনের কার্যকারিতা স্বাভাবিকভাবে বজায় রাখে। তামা, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, কোবল্ট, মলিবডেনাম, সেলেনিয়াম, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতুর অভাব ঘটলে শরীরের পুষ্টি বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এক নম্বর সারণীতে কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করলাম :

১ নম্বর সারণী : পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ধাতু	স্বাভাবিক পরিমাণ শতাংশ	অভাবে যে রোগ হয়
লোহা	০·০০৪	রক্তাল্পতা
তামা	০·০০০১৫	রক্তাল্পতা, শুষ্ক ফ্যাকাসে ভাব
দস্তা	খুব কম	বৃদ্ধি কম, হাইপো-গ্যানাডিয়াম হাইপোগেসিয়া
কোবল্ট	খুব কম	ভিটামিন বি-১২এর অভাব
সেলেনিয়াম	খুব কম	রক্তাল্পতা
ক্রোমিয়াম	খুব কম	গ্লুকোজ ব্যবহারে ব্যাঘাত

*

'আসল ব্যাপার এই, সুস্বাস্থ্যের জন্যে, কোনও কোন ধাতু অবশ্যই আমাদের দরকার। ওই সব ধাতু আমরা পেয়ে থাকি আমাদের খাবার, জল এবং বাতাস থেকে। বাতাস বলছি এই কারণে, বহু ধাতুর সূক্ষ্মতম কণা বাতাসে ভেসে থাকে এবং নিশ্বাসের সঙ্গে তাদের আমরা শরীরের মধ্যে নিয়ে থাকি। শারীরবৃত্তীয় কারণে নিশ্চয় কোনও কোনও ধাতুর প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু মুশকিল এই, ইদানীং মানুষ এমন কিছু কিছু ধাতু পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে, যাদের ভূমিকা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এই সব ধাতুর মূল উৎস শিল্প কারখানা। বিভিন্ন কারখানা জঞ্জাল হিসেবে তাদের পরিত্যাগ করে। তারা নিক্ষিপ্ত হয় আমাদের পরিবেশে—নদী নালায় বাতাসে অথবা স্থলভাগে। জমি থেকে তাদের কেউ কেউ গাছপালায় আশ্রয় নেয়। আশ্রয় নেয় শস্য এবং ফলমূলে। সেই শস্য বা ফলমূল যখন আমরা খাই —বুঝতেই পারছেন তাদের গন্তব্যস্থল তখন আমাদের শরীর ছাড়া আর কিছুই নয়। আর শরীরে আসার পর শুরু হয় তাদের বিষক্রিয়া। বলা বাহুল্য, এই ভাবে নিশ্বাসের সঙ্গেও অনেক ক্ষতিকর ধাতু আমরা আমাদের শরীরের মধ্যে নিয়ে থাকি। হ্যাঁ, আমরা উদ্বিগ্ন। বেশ কিছু বিষাক্ত ধাতু ইতিমধ্যেই আমাদের পরিবেশ দূষিত করেছে।' সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে এক সাক্ষাৎকারে এই ভাবেই আমার কাছে সমস্যাটি তুলে ধরলেন ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব সায়ান্স অ্যান্ড টেকনলজির পরিবেশ বিভাগের ডাইরেকটর ডঃ এন এস রামনাথন।

ডঃ রামনাথন বললেন, পাঁচটি ধাতু সম্পর্কে আমরা বেশি উদ্বিগ্ন। এই ধাতুগুলি হলো ভ্যানাডিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল এবং আরসেনিক। এ ক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিজের কথা আরও বেশি করে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। কারণ ভারত ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম সারির মধ্যে পড়ে। সন্দেহ করা হচ্ছে, নিকেল, আরসেনিক এবং ক্রোমিয়াম ক্যানসার রোগের অন্যতম কারণ। যদি তাই হয়, যে সব কারখানায় এই সব ধাতু ব্যবহার করা হচ্ছে, দেখতে হবে তারা যেন কোন বিপত্তি না ঘটায়।

কথা হচ্ছিল ভারী ধাতু সম্পর্কে।

প্রশ্ন : মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে ভারী ধাতুর সম্পর্ক কতটা ?

উত্তর : বিষাক্ত ধাতু বলতে আমরা তাদেরই বলি যাদের পারমাণবিক সংখ্যা ২০ অথবা তার বেশী। দেখা গেছে ওই সব ধাতু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাণী এবং মানুষের ক্ষতি করে। (২ নম্বর সারণী)

২ নম্বর সারণী : স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধাতুকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

এক। যে সব ধাতু একান্ত আবশ্যক :
তামা, দস্তা, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, কোবল্ট, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি

দুই। শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মে যারা নিষ্ক্রিয় বলে অনুমান করা হচ্ছে :
বেরিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সেলেনিয়াম, লিথিয়াম, জারকোনিয়াম প্রভৃতি

তিন। যে সব ধাতুর কম বেশি বিষক্রিয়া দেখা গেছে :
টিন, আরসেনিক, অ্যান্টিমনি, ভ্যানাডিয়াম, বিসমাথ, নিকেল প্রভৃতি

চার। যারা খুবই বিষাক্ত :
ক্যাডমিয়াম, পারদ, সিসে, থ্যালিয়াম, ইউরেনিয়াম।

ছোট বড় নানান কারখানায় প্রচুর শ্রমিককে কাজ করতে হয় নানা রকম ধাতু নিয়ে। কেউ কেউ ছাপা-কারখানায় কাজ করেন। তখন তাঁদের নাড়াচাড়া করতে হয় সিসে। কেউ কেউ ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর কারখানায় কাজ করেন। তখন তাঁদের ঘাঁটতে হয় নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু। এই ভাবে বিভিন্ন কারখানায় নানান ধাতুর সংস্পর্শে আসতে হয় শ্রমিকদের। ওই সব ধাতুর কোন কোনটির গ্যাস অথবা চূর্ণ বাতাস, জল এবং খাবারের মাধ্যমে তাঁদের শরীরে আশ্রয় নেয়। কখনও কখনও ওই সব বস্তু ধোয়ানি হিসেবে পরিত্যক্ত হয় কারখানা থেকে। তখন তারা নালা নর্দমার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে গিয়ে সঞ্চিত হয় নদী অথবা হ্রদের জলে। সেই জল পান করে জনসাধারণও নানারকম রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বাতাসে মিশে থাকা ধাতুকণাও নিশ্বাসের সঙ্গে দিনের পর দিন গ্রহণ করেও অসুস্থ হতে পারে অনেকে।

উদাহরণ :

এক। ভ্যানাডিয়াম। কয়লা এবং খনিজ তেলের মধ্যে থাকে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে ১৬ থেকে ১৭০ ভাগ ভ্যানাডিয়াম। শক্তি উৎপাদনের জন্যে আমরা প্রচুর তেল কয়লা জ্বালাচ্ছি। এর ফলে বেশ কিছু পরিমাণ ভ্যানাডিয়াম পরিবেশে ছড়িয়ে থাকে। কারণ কয়লা এবং তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার পর ছাই হিসেবে যা পরিত্যক্ত হয়, তার মধ্যে থাকে প্রচুর ভ্যানাডিয়াম। ইস্পাত কারখানা এবং সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্টেও ব্যবহার করা হয় ভ্যানাডিয়াম। শিল্পাঞ্চলের জল, মাটি এবং বাতাসে তাই ভ্যানাডিয়ামের পরিমাণ বাড়ছে। ভ্যানাডিয়াম পশু এবং মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। মাত্রা বেশি হলে ভ্যানাডিয়াম, বিশেষ করে ভ্যানাডিয়াম

শিল্প নগরীর আশপাশে নিক্ষেপ করা হচ্ছে ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া টিনের ক্যান; জঞ্জাল হিসেবে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সেলেনিয়াম; নিকেল এবং ক্যাডমিয়াম প্রলেপিত অব্যবহার্য সাজসরঞ্জাম; মোটরগাড়ির পুড়লে সিসে, আর্সেনিক ব্যাটারির ইত্যাদি। এর ফলে গ্রামগুলোর চাষের জমিতে বিষাক্ত ধাতুর পরিমাণ বাড়ছে। তার সেই ধাতু শস্যের জলে পরিবাহিত হয়ে গৃহস্থের স্বাস্থ্যের উপর [illegible]

প্রেসিপিটোক্সাইড শ্বাসনালীতে জ্বালা সৃষ্টি করে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল করে তোলে এবং শরীরে কোলিনেস্টারেজ নামক এক ধরনের এনজাইম উৎপাদন ব্যাহত করে। এই এনজাইম ভিটামিন-বি উৎপাদনে সহায়ক।

দুই। ক্রোমিয়াম। অত্যন্ত বিষাক্ত। নাসারন্ধ্রে ক্ষত সৃষ্টি করে। ক্রোমিয়াম চর্মরোগও ঘটায়। ক্রোমিয়াম পরিবেশে এসে আশ্রয় নেয় মুখ্যত ইলেকট্রোপ্লেটিং কারখানা থেকে, ক্রোম-লেদার কারখানা এবং ক্রোম-ইস্পাত কারখানা থেকে।

তিন। ম্যাঙ্গানিজ। ভারতে ম্যাঙ্গানিজ খনি এবং ম্যাঙ্গানিজ কারখানা এলাকায় অনেকেই নিউমোনিয়া এবং স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

চার। কোবল্ট। মাত্রা বেশি হলে এই ধাতুটি চর্মরোগ সৃষ্টি করতে পারে।

পাঁচ। নিকেল। পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে নিকেলের মূল উৎসের নাম করতে গেলে বলতে হয় কয়লা এবং খনিজ তেল। এ ছাড়া ইলেকট্রোপ্লেটিং কারখানা থেকেও নিকেল পরিবেশে ছড়ায়। দেখা গেছে নিকেলের কোনও কোনও রাসায়নিক যৌগ ক্যানসার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে নাকের ভেতরে।

ছয়। তামা। তামার লবণ শরীরের পক্ষে জ্বালাকর।

সাত। দস্তা। দস্তার ধুঁয়ো এবং ক্লোরাইড মারাত্মক। কখনও কখনও মৃত্যুও ঘটায়।

আট। ক্যাডমিয়াম। ক্যাডমিয়াম কিডনি, ফুসফুস এবং অস্থির পক্ষে বিপজ্জনক। কখনও কখনও হৃদরোগও ঘটায়। তামাকের ধোঁয়ায় ক্যাডমিয়াম থাকে। এ ছাড়া প্রায় বারো রকম অজৈব সারের অন্যতম উৎপাদন ক্যাডমিয়াম।

নয়। টিন। চোখের পক্ষে ক্ষতিকর।

দশ। অ্যানটিমনি। হৃদয়ের রোগ ঘটায়।

এগার। পারদ। স্নায়বিক রোগ সৃষ্টি করে।

বার। থ্যালিয়াম। অত্যন্ত বিষাক্ত। সিসের মতই ক্ষতিকর।

তের। সিসে। সিসের বিষক্রিয়ায় মস্তিষ্কে রক্ত সংবহনজনিত রোগ এবং নেফরাইটিস হতে পারে।

ডঃ রামনাথন বলেন, বেরিলিয়াম, অ্যানটিমনি বিসমাথ, টিন, সিসে, ক্যাডমিয়াম এবং নিকেলের যে বিষক্রিয়া আছে এখন এটা প্রমাণিত সত্য। এদের মধ্যে প্রথম চারটি ধাতু পরিবেশে পরিবাহিত হয় প্রধানত বাতাসের মাধ্যমে। সিসে নিকেল এবং কোবল্ট সম্পর্কেও আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। এবং বিশেষ করে সাবধান হতে হবে পারদের ব্যাপারে।

*

ইদানীং প্রায়শই আমরা একটি নতুন কথা শুনতে পাই—অক্যুপেশনাল হ্যাজার্ড বা পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যা। পেশার দরুন যাঁরা নিয়মিত স্বাস্থ্যহানিকর পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন কথাটি একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ব্যাপারটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানর প্রয়োজন নেই। কলকাতা, হাওড়া, দিল্লি, কানপুর, আমেদাবাদ বোম্বাই প্রভৃতি শহর এবং ওই সব শহরের উপকন্ঠে পরিস্থিতিটি পথচারীদের নজরেও পড়ে। দেখা যাবে গলিতে গলিতে ছোট বড় ঝাঁপ তুলে বসানো হয়েছে নানা রকম কারখানা। সেই সব কারখানায় কোথাও চলছে লেদ মেশিনের কাজ। এই সব মেশিনে লোহা, দস্তা, তামা, এমন নানা রকম ধাতুর সাজসরঞ্জাম তৈরি হয়। যাঁরা সেখানে কাজ করেন তাঁদের চোখে মুখে পড়ছে ওই সব ধাতুর কণা। আর বাতাস, জল বা খাবারের মধ্যে ওই কণা গিয়ে ঢুকছে কর্মীদের শরীরে। খরচ কমানোর জন্যে ইলেকট্রোপ্লেটিং কারখানায় স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার দিকে অনেক মালিক নজরই দেন না। অনেক সময় বড় বড় পাথরের চাঁই ভাঙতে হয় শ্রমিকদের। সেই পাথরের মধ্যেও কখনও কখনও থাকে ক্ষতিকর ধাতু-কণা। নিশ্বাসের সঙ্গে সেই কণা শ্রমিকরা দেহস্থ করেন। অনেক সময় এমনও হয়, কারখানার পাশে গৃহস্থের বাড়ি। বর্ষার সময় জলের ধোয়ানির সঙ্গে কারখানার পরিত্যক্ত ধাতুকণা সেই বাড়ির অন্দরে গিয়ে ঢোকে। তার সংস্পর্শে এসে বড়রা তো বটেই, শিশুরাও নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়। এ সমস্যা দিনে দিনে আরও বাড়ছে।

এই ধরনের পরিবেশ দূষণ সমস্যা সম্পর্কে এখনই কয়েকটি বলিষ্ঠ কর্মসূচী নেওয়া দরকার। এক, যে সব ধাতু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর শ্রমিকদের তাদের সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। দুই, কারখানার কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কতটা প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যদি তৎপর হন, আরও ভালো হয়। এর জন্যে ওঁরা একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা তৈরি করতে পারেন। যে সংস্থার মধ্যে থাকবেন সমাজবিজ্ঞানী এবং চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরা। এই সংস্থা নিয়মিত কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন। লক্ষ রাখবেন, ধাতুজনিত বিষক্রিয়ায় কোন শ্রমিক আক্রান্ত হয়েছেন কী না। এটা বিশেষ করে দরকার ছোট ছোট কারখানার বেলায়। কারণ এ ব্যাপারে ছোট কারখানাগুলিই সব চেয়ে বেশি উপেক্ষিত। দরকার হলে ওই সংস্থা মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেবেন। এবং সেই সঙ্গে দেখবেন কারখানার পরিত্যক্ত ধাতু আশপাশে ছড়িয়ে জনসাধারণের স্বাস্থ্য যাতে না বিঘ্নিত করে সেদিকটাও।

বলা বাহুল্য, এ ধরনের উদ্যোগ যত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় ততই ভালো।

সমরজিৎ কর

STANROSE

বিদ্যুতের চিৎপুর ও ধর্মাধর্ম

শিবশম্ভু পাল

সেদিন শেষদুপুরে, তিনটে নাগাদ, ঊর্মিলাকে শ্যামবাজারের মোড়ে কালীতলার উল্টোদিকে দাঁড়াতে বলেছিল বিদ্যুৎ। এর আগেও এ রকম প্রস্তাব বার কয়েক দিয়েছিল সে, নাকচ হয়ে গেছে। এক-একদিন এক-এক রকম কারণ। যেমন, পম্পা ইসকুল থেকে ফিরবে, ওকে সময় মত ওষুধ খাওয়ানো আছে, পড়াশুনো করিয়ে দিতে হবে। কিংবা, দুপুরবেলা একটু না ঘুমোলে কি চলে, এমন একটা বাজে অভ্যেস হয়ে গেছে না। কিংবা, সিনেমার টিকিট কাটা আছে, লক্ষ্মীটি, আর একদিন, কেমন?—শেষোক্ত প্রত্যাখ্যানের উত্তরে বিদ্যুৎ ঝট করে পম্পার ওষুধ খাওয়ার প্রসঙ্গটা উকিলী কায়দায় উত্থাপন করলে ঊর্মিলা বলেছিল, 'ও ম্যানেজ করে নিয়েছি। মামার বাড়ি ওষুধটষুধ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাল মা এসেছিল।' 'সিনেমার জন্যে নিজে টিচার হয়ে মেয়েকে স্কুল কামাই করালে? ছিঃ—' 'শনিবার ওর ছুটি থাকে না? ন্যাকামি হচ্ছে?' 'বেশ। কিন্তু স্বপনবাবু অফিস থেকে ফিরবেন তো?' 'বয়ে গেছে।' ওর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। তাছাড়া ও কোনদিনই দশটার আগে ফেরে না।' বয়ে গেছে—শব্দ দুটো বিদ্যুৎ মনে মনে লাল কালিতে দেগে নিয়েছিল। স্বপন দত্ত রায়ের যে-কোন প্রসঙ্গেই ঊর্মিলার ওই ঠোঁট বাঁকানো শব্দ দুটো; ওর টকটকে লাল সিঁথির ঠিক নিচেই কি মসৃণভাবে বেরিয়ে আসে। বিদ্যুৎ অবাক হয়ে যেত। কিন্তু অবাক হবার কীইবা আছে। ভদ্রমহিলা যেভাবে ওর সঙ্গে লিপ্ত হয়ে গেছেন তার চাপে ওঁর স্বামী নামক হিন্দুয়ানি কর্তব্য ও মমত্ব বেশ টাল খেয়েছে। সঙ্গত না অসঙ্গত? উত্তর না দিলেও চলে। তবু এই শৌখিন প্রশ্নে বিদ্যুৎ বেশ ঘেমে যেত ভেতরে ভেতরে। ঊর্মিলার চিবুকে, প্লাক করা ভুরু, ব্লাউজের গলায়, ঝকঝকে দাঁত বিদ্যুতের যে-কোন অবসরে বিস্তর প্রাধান্য ছড়িয়ে থাকছে। বছর দেড়েক আগে চন্দননগরে একটা শিক্ষক সম্মেলনে নেতাজী বিদ্যাপীঠের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা। ডাইনিং হলে কোনো একজনের মধ্যস্থতায় আলাপ। এবং তারপর কী থেকে কী হয়ে গেল। কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে গেল। গড়াতে গড়াতে ঊর্মিলার ইসকুল ছুটির পর একদিন ও তারপর প্রায়ই সকাল এগারটায় দমদমের এয়ারপোর্ট ঘেঁষা চালাও জনহীনতায় বিদ্যুতের সঙ্গে একেবারে একা হয়ে যাওয়া, গড়াতে গড়াতে ঊর্মিলার শোবার ঘর, ব্লাউজের বোতাম, গড়াতে গড়াতে ঊর্মিলা দত্ত রায়ের সমস্ত শব্দ খুইয়ে শুধু 'জানি না' 'বেশ করব' 'অসভ্য' ও 'মিথ্যুক'—এই চারটি বহু-মাত্রিক শব্দে কুঁকড়ে যাওয়া বা ভয়ে ওঠা আর এভাবেই একদিন শ্যামবাজারে ঊর্মিলাকে দাঁড়ানোর জন্যে—

ওবারে আর আপত্তি জানায়নি ঊর্মিলা। বেশ কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় বিদ্যুৎকে সমীক্ষা করার জন্যে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল কাগজের ফরমাশে। সুতরাং দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। ঊর্মিলা পম্পা-ইসকুল-বাপের বাড়ি-মামাতুতো ভাই-বন্ধু-বান্ধব আর স্বপনের সঙ্গে বৈধ সহশয্যার ধারাবাহিক গায়ে নিজেকে তলিয়ে দিয়েছিল। মাস দেড়েক। কলকাতায় এসেই বিদ্যুৎ ওর ইসকুলে ফোন করে। রিসিভার কানে নিয়ে বিদ্যুতের গলা শনাক্ত করতেই বুকের ভেতর দড়াম করে দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার ক্রমিক জোড়া শব্দ। সেই ঝড়ে পম্পার 'মা খেতে দাও' আর স্বপন দত্ত রায়ের আয়াসী স্বামিত্ব ছিটকে উড়ে যায় এঁটো শালপাতার মতো। 'আচ্ছা ঠিক আছে।' ঊর্মিলা রেখে দেয়। পম্পাকে রেখে দেবে সামনের ফ্ল্যাটের সুধাদির জিম্মায়।

কিন্তু বিদ্যুৎ এল না। সাড়ে তিনটে বেজে গেলে ভেঙে চুরমার হয়ে স বাসে উঠে পড়ল।

না আসার কারণ অবশ্যই ছিল। বিদ্যুৎ সেদিনই রাত্রে ঊর্মিলার ফ্ল্যাটে তা জানাতে ও মার্জনা পেতে গিয়েছিল। কিন্তু বলতে পারেনি। একঘর লোক-জন। কোথা থেকে কারা সব ঘর জুড়ে হৈ-চৈ করছে, গোটা দুই বাচ্চার সঙ্গে পম্পা এঘর-ওঘর ছুটোছুটি করছে, চায়ের কাপ, সিগারেটের ধোঁয়া, এরই মধ্যে একপাশে বসে ঊর্মিলা বকে চলেছে অনর্গল, ঘাড় কাত করে শুনে চলেছে মেজোর বাজে কথা। 'জামাইবাবু, গোঁফটা একেবারে ফেলেই দিলেন, তার মানে পুরোপুরি বুড়ো হয়ে গেছেন। ইস, কী জঘন্য দেখতে লাগছে।' —ঊর্মিলা। 'যৌবন গোঁফে নেই হে ম্যাডাম, এইখানে—' বলে নিজের বুকে তর্জনীর টোকা

মারলেন ভদ্রলোক। 'তাই নাকি? সে খবর অবশ্য আমার জানার কথা নয়, কি বলিস?' প্রশ্নটি ঊর্মিলা যাকে করেছিল সে নিশ্চয়ই ওর নিজের কিংবা মাসতুতো-পিসতুতো-জ্যাঠতুতো কোনো বোন। 'পারে, আজিও জানি না—।' হাসির বিস্ফোরণ।

এবং এই সমস্ত হুল্লোড়ের মধ্যেই বিদ্যুৎ ঢুকে পড়েছিল। ঊর্মিলা ওকে দেখে এক মুহূর্ত ভেভো ও কুণ্ঠিত হয়ে উঠে সাদা স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আসুন।'

সবাই চুপ করে গিয়েছিল। ঊর্মিলা আলাপ করিয়ে দিল, 'ইনি বিদ্যুৎ সেন, রিপোর্টার। নাম শুনেছেন হয় তো জামাইবাবু।' 'ও, সিওর। বসুন, বসুন। বনগাঁর ওপর আপনার লেখাটা নিয়ে দারুণ কনট্রোভারসি চলছে বুঝলেন। মানে, আমি ওখানকারই রেসিডেনট।' 'খুবই স্বাভাবিক', বিদ্যুৎ কথা বলার সুযোগ পেয়ে প্রাথমিক আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলতে পারল, 'দুদিন ছিলাম আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। ওরই সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যেটুকু জানতে পেরেছি—' 'বুঝতে পারছি। কিন্তু ওখানকার কালচারাল সাইডটা আপনার ভালোভাবে কভার করা উচিত ছিল।' 'করেছি যতটা পেরেছি। ওখান থেকে অনেকগুলো লিটল ম্যাগ বেরোয়।' 'লিটল ম্যাগ মানে?' অতঃপর বিদ্যুৎ থেমে যায়। ঊর্মিলা অবশ্য ভদ্রলোককে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেয় আর প্রসঙ্গত বলে, বিদ্যুৎবাবু তো এই সব লিটল ম্যাগাজিনে প্রায়ই লেখেন-টেখেন। 'ও, আপনি তা হলে একজন অথর। কিছু মনে করবেন না ও লাইনে আমি একেবারে—' অসহ্য। বিদ্যুৎ ছটফট করছিল ঊর্মিলাকে কথাগুলো বলার জন্যে। কিন্তু সে ওইদিকেই মশগুল, বিদ্যুতের দিকে ফিরেও চাইছে না। কথায় কথায় শুধু একবার জামাইবাবুকে জানিয়েছিল ওদের ইসকুলের গোলমাল নিয়ে বিদ্যুৎবাবু খোঁজ-খবর করতে এসেছেন। অসম্ভব উপস্থিতবুদ্ধি; নিপুণতম অভিনয়! তীব্রতম উপেক্ষা। বালক ব্রহ্মচারীর ছবি, স্টিলের আলমারি, টাইমপিস, শূন্য কাপ-ডিস, জামাইবাবু আর ঊর্মিলার বোনের গেরস্ত চেহারা দেখতে দেখতে বিধ্বস্ত বিদ্যুৎ এক সময় 'আচ্ছা, আপনার ইসকুলেই আমি যাচ্ছি একদিন, কাগজপত্র সব দেখাবেন, কেমন?' বলে উঠে পড়ল। ঊর্মিলা ঘাড় হেঁট করে সম্মতি জানাল। এগিয়ে দিতে আসবে, বিদ্যুৎ ভেবেছিল, আর তখনই—কিন্তু হোল না।

অতএব পরদিন আসতে হোল তাকে। সৌভাগ্য, ঊর্মিলাকে ফাঁকায় পাওয়া গেল। পম্পাকে পড়াচ্ছিল, সন্ধে হয়ে গেছে, পাশে পড়েছিল উলের বল আর কাঁটা। বিদ্যুৎ পম্পার হাতে গুঁজে দিল ক্যাডবেরির বার। অন্য আর একটা একটু আড়াল করে ঊর্মিলার চেটোয় দিতে গেলে ও সরিয়ে নিল, 'থাক, খুব হয়েছে—'

'প্লিজ', বিদ্যুৎ প্রায় নতজানু, 'রাগ কোর না। আসতে পারিনি যখন, বুঝতেই পারছ বিশ্রী একটা ঝামেলায় আটকে গিয়েছিলুম। একেবারেই পারিবারিক।'

'আমার সেটা জানার দরকার নেই।'

'জানানোর তো দরকার আছে।' ঊর্মিলার পেরেকওলা শব্দপ্রহারের জন্যে বিদ্যুৎ প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। গলায় ফুটিয়ে তুলল মুষ্টিভিক্ষার অনুনয়, 'হঠাৎ খবর পেলুম বড় জামাইবাবু বাস থেকে নামতে গিয়ে বিশ্রীভাবে পড়ে গেছেন। বাঁ দিকের হিপজয়েন্টে বেশ চোট লেগেছে।

কেমন আছেন তিনি?'

'প্লাস্টার করা হয়েছে। পরে এক্স-রে হবে। আমাদের বাড়িতেই ধরা-ধরি করে আনা হয়েছে। তারপর জুড়ে দিল, 'মানে, ওখানে তো দেখাশুনো করার কেউ নেই, তাই—'

এবার বিদ্যুতের কাহিল মুখের দিকে তাকাল ঊর্মিলা। পাঞ্জাবির ঘাড়-পিঠ ঘামে জবজবে। সিঁথির পেছনের দিকে পাতলা চুলগুলো এলোমেলো। চশমায় গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো। খুব ছোটাছুটি করেছে। পম্পা ক্যাডবেরির মোড়ক খুলে কামড় বসাতে যাচ্ছে, ঊর্মিলা বারণ করল, 'না, এখন খেয়ো না। এইমাত্র ওষুধ খেয়েছ না? কাল স্কুলে নিয়ে যেও।' তারপর বিদ্যুতের দিকে: 'চা চলবে তো?'

'অবশ্যই। তা তোমার খুব খারাপ লেগেছে না এইভাবে দাঁড়াতে?'

'বাজে কথা পছন্দ করি না।' পম্পা খাটে বসে 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ' মুখস্থ করছে দুলে দুলে। সেদিকে নজর দিয়ে ঊর্মিলা যাচাই করল, 'তোদের নামতা তৈরি হয়েছে তো? নইলে বাবা এসে পিঠের ছাল তুলবে কিন্তু।'

'কিছু মনে কোর না, ঊর্মিলার নামতা তুমি বলতে পারবে?' বিদ্যুৎ মুখ করে বলে ফেলল। ঊর্মিলার শর্তটির মুখোমুখি জবাব দেবার জন্যে সে নানান ভাবে প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। উপযুক্ত খেই পাচ্ছিল না এতক্ষণ, এবার সুযোগ আসতেই তার সদ্ব্যবহার করল।

ঊর্মিলা বলেছিল, 'বাজে কথা পছন্দ করি না।'

'বলতে চাইছ, কথা কম কাজ বেশি। অলরাইট, তাই হবে—' বলে ক্যাডবেরির রঙিন মোড়কটা গুঁজে দিতে এল বিদ্যুৎ।

'ঘুষ দিচ্ছ নাকি?'

'ছি, ঘুষ কেন হবে, উপহার। আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান, হোক ফুল হোক তাহা—এই বললে, ফুলের মাক, অভিজ্ঞাবকেই বাঁশ, হোক ক্যাডবেরি।'

১০০%
পলিয়েস্টার
ও
জর্জেট
শাড়ী
বোম্বে
আলোড়ন জাগানো

'কেন, মেলাতে পারলে না? জানের সঙ্গে মিল মেলার ক্ষমতা নেই? ছেড়ে দাও, পদ্যটদ্য ছেড়ে দাও। বললেই পারতে, হোক কুল হোক অপমান।'

'দারুণ দারুণ', হাততালি দিল বিদ্যুৎ। শুনে এবং ওর দেখাদেখি পম্পাও: 'মা ছড়া বানিয়েছে, মা ছড়া বানিয়েছে—'

'নিজের কাজ করো। যাও, ভেতরে যাও, সামতা পড় গে।'

চুপসে গিয়ে পম্পা ধারাপাতে মন দিল। বিদ্যুৎ ঊর্মিলার দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ওর ছোট কপাল, লিপস্টিকের টিপ, হীরের নাকছাবি, পুরু ঠোঁট আর থুতনির অসামান্যতা আস্বাদ করল। আশ্চর্য, কিছুতেই ওকে নরম করা যাচ্ছে না। এবার একটু তীক্ষ্ণ হোল সে 'প্রথমত, ওটা, তুমি যা শোনালে এইমাত্র, কবিতা হয়নি। তোমার মেয়ের মুখেই শুনলে, ছড়া। এসব আমাদের দিদিমা-ঠাকুমারা বানাত। দ্বিতীয়ত, মেনেই নিচ্ছি আমার পদ্য লেখা ছেড়ে দেওয়া উচিত, ইন ফ্যাক্ট, এক রকম ছেড়েই দিয়েছি। কিন্তু ঊর্মিলা, তোমার অপমানটা কোথায় করলুম?'

'বলতে লজ্জা হচ্ছে না? তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা, রাজ্যের লোক তাকিয়ে দেখছে, একজন ছাত্রীর সঙ্গে দেখা, ওর সঙ্গে গার্জিয়ান, তাকে কৈফিয়ত দেওয়া, আবার কিছুক্ষণ পর ওদের সঙ্গে দেখা—হরিবল, ভাবতে পারছ তুমি?'

'আমি সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু কারণটা তো শুনলে—,

'সেইজন্যেই বলছি, চুপ কর। যাই, চা করি।'

'প্লিজ, অ্যাকসেপ্ট দিস', পম্পার দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে নিচু গলায় অনুনয় করল, 'ডোনট ক্রিয়েট এ সিন।'

'না।' উঠে গেল ঊর্মিলা। বিদ্যুতের পাঁজরার নিচে খুব নরম জায়গায় সে গোড়ালির বর্গিত দাগ বসিয়ে দিয়েছে। সেখানে রক্ত আর ঊর্মিলার আলতা তফাত করা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ বলতে যাচ্ছিল, চায়ের দরকার নেই, আমি উঠি। পারল না। ওর ক্ষোভ, বিচূর্ণ প্রত্যাশার এক একটা টুকরোর পা থেকে, গা থেকে স্পর্শকাতর মুহুর্মুহু রক্তক্ষরণ কখন যেন ওকে ভাসিয়ে দিয়েছে চূড়ান্ত সর্বকামিতায়। যাবতীয় রুক্ষতাসমেত ঊর্মিলার প্ররোচনাময় শরীর বিদ্যুতের চোখের সামনে ঝলসে উঠছিল।

তুমি তা হলে ফালতু কথা পছন্দ কর না? তাই নাকি?

বিদ্যুৎ জিজ্ঞাসা করল ঊর্মিলাকে যে এখন দেয়ালের সাদায়, পাখার ঘূর্ণমান ব্লেডে, বিছানার রাজস্থানী চাদরে মধ্যরাতের নৈঃশব্দ্য ঝোপে বিদ্যুতের মুখোমুখি। বাড়ি ফিরেছে রাত নটা হবে। যৎসামান্য খাওয়া-দাওয়া সেরে দিদিকে 'না, ভয়ের কিছু নেই, তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন বল তো? হ্যাঁ, অফিসে খবর দিয়েছি। সাহেব নিজে দেখতে আসবেন—' সান্ত্বনা দিয়ে ভগ্নীকে আদর-টাদর করে এখন ঘরের ভেতর শুয়ে আছে চুপচাপ। চুপচাপ আর কই? নৈঃশব্দ্যের আড়ালে যে এত শব্দ গিজগিজ করছে, নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি কাটাকাটি বাধিয়ে দিয়েছে তা কে জানত। ভিড়, রীতিমত ভিড়। আর এই ভিড়ের মধ্যে আচমকা বেলফুলের গন্ধ। মেছোবাজার। চিৎপুরের ট্রামে বিদ্যুৎকে যেতে যেতে বড়বাজারে একটা মারোয়াড়ি ছেলেকে ইংরিজি পড়াতে, ভিড়, ট্রামের হাঁটি-হ্যাঁটি পা-পা, কাদা, সারবন্দী লরি, ট্যাক্সি ঠেলাগাড়ি অ্যাটাচি হাতে হন্তদন্ত কেরো মানুষের টাই, ব্রিফকেস, কামানো মুখ, জটলা, দোকানপাট—নরক নরক, অবিকল ঊর্মিলা, তোমার অকৃপণ সৌজন্যের মতো। সৌজন্য প্রায়ই এখান-ওখান থেকে ছেলেপুলে নিয়ে তোমার ঘরে আসে আত্মীয়-স্বজন, স্বপন দত্ত রায়ের বন্ধুবান্ধব, সামনের ফ্ল্যাটের সুধাদিরা, আর সেই সময়ই এক-একদিন গিয়ে পড়ি আমি, এই তো কালই গিয়েছিলুম, হাঁপিয়ে যাই, জবুলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাই, একেবারে চিৎপুর। আর এরই মধ্যে, প্রাণ কাটিয়ে যেতে যেতে তুমি ইচ্ছে করে পা মাড়িয়ে দাও, পিঠে কেটে দাও চোরাচিমটি, আহ্, বেলফুল, বেলফুল। কী জলপ্রপাত। মেছোবাজারেই ফুলপট্টি। ঊর্মিলা, এত লোকজন কেন? তাড়িয়ে দিতে পার না ওই সব জঞ্জাল? তুমি বল, সে হয় না, মানুষকে ওভাবে তাড়াতে আমি পারি না।' খুবই ভালো কথা। কিন্তু আমার বেলায়? আমি মানুষ নই? স্যাডিস্ট, পয়লা নম্বরের স্যাডিস্ট তুমি। আবার এই তো সেদিন, 'মস ছবেক হবে, দুপুরে, ট্যাক্সিতে আমার কাঁধে মাথা রেখে হাত গলার নিচে চেপে ধরে—হ্যাঁ, এও তুমি, এও তোমার পছন্দ। কাল সন্ধেবেলা তোমার ওখানে যখন গেলাম, কী করছিলে তুমি? কার বাচ্চা হয়েছে, কে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিল না মরেছে, সুধাদি কী সুন্দর বাটিটি গড়িয়েছে, কাণকাদির ভাই একটা ক্যাসেট রেকর্ডার পাঠিয়েছে ওয়েস্ট জার্মানি থেকে, মার্কেটিং কমিটি মেম্বারকে শো-কজ নোটিশ দিয়েছে—কথা, কথা কথা আমাকে তুমি আর মাফ করে দিলে, ফালতু কথা পছন্দ করি না। আসলে কী যে চাও তুমি বুঝতে পারি না। অথবা যেটুকু বুঝি সবই তো নিজের মতো করে, ব্যক্তিগত মাধুরীর ভেজালে এক কিম্ভূত জগাখিচুড়ি। জানি স্বপন দত্ত রায় অত্যন্ত ভদ্রলোক, তোমাকে নিয়ে তাঁর গর্ব আর আহ্লাদের অবধি ছিল না। তোমার ব্লাউজের হাতা যে বাহুতে চেপে বসেছে, চোখের নিচে যে চমৎকার স্বাস্থ্যল ছায়া, হাসির মধ্যে যে উজ্জ্বল—সব, সবই স্বপনবাবুর পার্স থেকে পাওয়া। তুমি চাকরি কর অভাবে নয়, এমনিই, আমায় বলেছিলে। 'এমনিই' বলতে কী মিন করতে চাইছ বলনি। আমি ধরতে পেরেছি। স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার একটা আলাদা নিরাপদ ক্ষেত্র দখল করে রাখাই তোমার অভিসন্ধি, তাই না? স্বপনবাবুর আপত্তি ছিল। তিনি মাইনে পান মোটা টাকার, আপত্তি করবেনই। কিন্তু তোমার মুখ দেখেই তিনি তা

তুলে দিয়েছিলেন। এবং এখন তোমার মুখ চেয়েই হয় তো ইদানীং ভোরের মুখ চাওয়া এক রকম বন্ধই করে দিয়েছেন তিনি। তাসের আড্ডা তাঁর বিয়ের আগেই ছিল। এ ব্যাপারে তোমার সায় ছিল না। এই নিয়ে খিটিমিটি কম ছিল না তোমাদের আর সেটাই তোমাদের সম্পর্কের মধ্যে ছোট্ট একটা ফাটল তৈরি করেছিল; তো, সেটা বুজিয়ে দিতে পারত একটা সান্ত্বনা, হয়েও যেত হয় তো। কিন্তু কী যে হয়ে গেল। চন্দননগরে কেন যে তোমার সঙ্গে আলাপ হোল, আর হোলই যদি, শেষ হয়ে গেল না কেন সঙ্গে সঙ্গেই। ....এক সন্ধেবেলায় তোমরা তিনজনে লাইট হাউসের সামনে কি সব হাবিজাবি খাচ্ছিলে, আমি তখন নিউ এম্পায়ার থেকে জেন ফন্ডার একটা দুর্দান্ত ছবি দেখে ফিরছি, হ্যাঁ, মনে পড়ছে, দি গার্ল অন এ মোটর সাইকেল—তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। উনি বললেন, একদিন আসুন না, ভালো করে গল্প করা যাবে। তুমিও জিভ দিলে। এ রকমই বলতে হয়। শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম হল। তোমার বাসায় হানা দেবার মতো ছুতো জুটে গেল। তোমাদের কাছাকাছি আমার অগ্রজার বাড়ি। তাঁর ছোট মেয়েটিকে তোমাদের ইসকুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি করে দেবার দায়িত্ব ভদ্রলোক আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কাজটা খুব সহজ নয়। মেয়েটি ক্লাস এইটে অঙ্কের জন্যে ফেল করেছিলেন। ওর দ্বারা লেখাপড়া কিসসু হবে না, আঠা বলেছিলেন, এক বছর বসিয়ে রেখে যে উন্নতি হবে সে-গুড়ে বালি। ওই ফেল করে করে ফাইনাল অব্দি পৌঁছক, বয়েসটাও তো বাড়ছে, মেয়েছেলে—তুই একটু চেষ্টাচরিত্তির করে দেখ না বাবা, ইত্যাকার শুনেটুনে চলে গেলাম এক-দিন সকালে তোমাদের নেতাজী বিদ্যাপীঠে। আর সেখানে আচমকা আমাকে দেখতে পেয়ে—এভাবেই, তৈরি হয়ে গেল ব্যাপারটা। আমি এসে গেলুম। ভারিক্কি দিদিমণি হওয়া সত্ত্বেও মেয়েলী কথাবার্তা, বেতারঘোষিকার মত ঠাণ্ডা সরবত-সরবত কণ্ঠস্বর, শাড়ির আঁচল, কপালের রং-মানানো টিপ, মোটকথা বেশ বড় ধরনের প্ররোচনা ছিল তোমার সর্বাঙ্গে। তারই বাতাসে আমার সমস্ত ডালপালা বোকার মতো উতলা হয়ে উঠল। কোন দরকার ছিল না। এবং দরকারনিরপেক্ষভাবেই ফাটলটা বেড়ে গেল। স্বপনবাবু বুঝলেন। তাসের আড্ডা আরও লম্বা হয়ে গেল। আর কিইবা করতে পারতেন তিনি। হেসে উঠল বিদ্যুৎ। তোমার সঙ্গে কতদূরই বা আমি যেতে পারি ঊর্মিলা। দুশোত গান্ধীঘাট কি হর্টিকালচারাল সোসাইটি পর্যন্ত। কিন্তু যাওয়াটা তো আর দু পায়ের শারীরিক ব্যবহার নয়, এর সঙ্গে অভিপ্রায়ের একটা ব্যাপার রয়েছে যে। আর অভিপ্রায়, সে তো ঊর্মিলা, তোমার কাছে এলেই আমূল বদলে যায়, এমনই তোমার প্রভাব। কী ধরনের সেটা ভাবতে পারছি না। আসলে যাওয়া-না-যাওয়া যতটা দুশোত, ততটা বা তার চেয়ে অনেক বেশি, শরীরের ভেতরকার গোলমাল, কারচুপি। এ খবর নিশ্চয়ই স্বপন দত্তরায়ের জানার কথা নয়।

না, অনেকদিন পদ্যটদ্য লেখালেখি হয়নি। কাল সকালে একবার বসব।

রোদ্দুরের হলকা আসছিল ঘরে। জানলা দুটো বন্ধ করে দিল ঊর্মিলা। ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে পম্পার পাশে শুয়ে পড়ল। সত্যিই বিদ্যুৎকে বড় বেশি আঘাত দিয়েছি আমি। বড় আশা নিয়ে এসেছিল বেচারি। কিন্তু ওর রাগী শুকনো মুখখানা দেখতে বেশ মজা লাগে যে। অথচ কিইবা দেখতে। লম্বাটে মুখ, কপাল বেড়ে গেছে এই বয়েসেই। 'আচ্ছা বিদ্যুৎ, বিয়ে-থা করনি কেন?' 'দূর ঝামেলা। বেশ তো আছি।' 'কোথায় আর বেশ।' 'কেন, খাচ্ছি-দাচ্ছি, কাজ করছি, অ্যান্ড অ্যাবভ অল, ঠাকুরমশাই স্বয়ং আমায় বাকআপ করে গেছেন তোমায় আমার রিলেশন দেখে?' 'ঠাকুরমশাইটা আবার কে? পুরুত-টুরুতে বিশ্বাস আছে নাকি?' 'ঠাকুরমশাই—রবীন্দ্রনাথ, সেই রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং বলে গেছেন না, কিছু নাহি ভয় জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি। তুমি থাকলেই আমি আছি, এবং দারুণ আছি।' 'আমি আর আছি কোথায়?' কেন, সর্বভূতে। যা দেবী সর্বভূতেষু ঊর্মিলারূপেণ—' 'থামো থামো, আর চণ্ডীপাঠ করতে হবে না, বাচাল কোথাকার। আচ্ছা, এত চ্যাংড়া তো দেখলে মনে হয় না। একসময় তো স্কুলে পড়াতে। কি করে পড়াতে।' 'খুব খারাপ পড়াতাম না দিদিমণি, নেহাত ছেড়ে দিলাম, তাই। এ নিয়ে তুমি একটা তদন্ত কমিশন বসাতে পার।' 'বয়ে গেছে। কে আমার এলেন, একেবারে তদন্ত কমিশন বসাতে হবে।' 'ইয়েস, বিদ্যুৎ সেন। বড়লে স্টেটসম্যানে অবিচুয়ারি বেরবে, বুঝলে? একটু খাতিরটাতির কোর, নইলে আপসোস হবে—'

তা একটু আপসোস হচ্ছে। আশা করেছিল নিশ্চয়ই, কাল রাত্তিরে লোকজনের ভিড় হটিয়ে ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাব স্বপন না আসা অব্দি। স্বপন এলেও অবশ্য কিছুই হোত না। ভদ্রলোক তো। বরং বলতো, 'বিদ্যুৎ-বাবুকে চা-টা দিয়েছ তো? আচ্ছা, আর এক রাউন্ড হয়ে যাক, কি বলুন।' এক-একদিন এরকম দেখাও হয়ে যেত। না, লোকটাকে একদিন ভালো করে, কি যেন বলে, খাতির করতে হবে। একটা মৃদু একটা হাসি ঊর্মিলার ঠোঁটে। খাতির মানে তো বিদ্যুতের বুকের কাছে এসে মুখটা উঁচু করে পেতে দেওয়া। কী পাও এতে তুমি, কী পাও? স্বপনের সঙ্গে আমার অন্য ব্যাপার। সামাজিক চুক্তি। দোকানদারিও বলা যেতে পারে। স্বামী হিসেবে ওকে ভালোবাসা—ভালোবাসা না দেখাশোনা—আইনমোতাবেক একটা সুশৃংখল বন্দোবস্ত। অ্যারেঞ্জমেন্ট। খুব দরকারি জিনিস। আমাকে অবশ্যই দরকার মেটাতে হবে। স্বপনের সঙ্গে রবিবার বিকেলে কোথাও বেরোনোর প্রস্তাব আজ রাত্রেই তুলতে হবে আমায়। পা দোলে উঠিয়েছে কি আমার জেকের জানলা দিয়ে বসা, এটা-সেটা কথা, আর এই দেখাদেখির উত্তাপটাই বেশ গাঢ় করে 'ওগো' বলার সাবলীল অধিকারটাই দাম্পত্যপ্রেমের সংজ্ঞা। কথাটা স্বপনের নয়, বিদ্যুতের। স্বপন এত কথা জানে না। ও বাড়িতে এসে ধ্যাড়ধ্যাড়ে খুলে কলকল, পাজামা-গেঞ্জি চড়িয়ে খবরের কাগজ, বাসুর মাকে দিয়ে দাশু থেকে জলখাবার আনানো হয়েছে কি-না, রেশনে লোক চলে দিচ্ছে কালই তুলিয়ে নিও, এক চামচে আলুভাজা দিলে দাও তো, পেটটা ভার হয়ে রয়েছে—এইসব করতে করতে খান চার পাঁচ রুটি খেয়েই ঘুম। তো, সেও আমার ব্যবহার করেছে নিয়মমাফিক, করেও। সেই একই উত্তাপ, হাঁপ, মাতামাতি। কিন্তু তোমার আর আমার মধ্যে ভয়ের যে রসিকতা তার কোন বর্ণনা হয় না। ভয় আমার, ভয় তোমার। ভয়ের সঙ্গে ভয়ের ধাক্কায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে থাকে আহ্লাদের কুচি। আমরা সেই কুচি-গুলোকে পায়ে করে ঠেলব, ওড়াব। খেলা। খেলা ছাড়া আর কি।

বস্তুত শুয়ে শুয়ে ঊর্মিলা যা করছিল তা বিদ্যুতেরই অর্ধোন্মাদ অথচ সম্মোহক উক্তিরই বিচ্ছিন্ন ও শিথিল আবৃত্তি মাত্র। এভাবেই এক শরীর পাপ ও অধর্মের মধ্যে তলিয়ে দিয়ে সে দুপুরটাকে ফুরিয়ে দিল।

সন্ধে সাতটা পর্যন্ত টেবিলে একটানা কাজ করে বিদ্যুৎ উঠে পড়ল। একটা প্রেস কনফারেন্স আছে। ঝোলার মধ্যে প্যাড, কয়েকটা পত্রিকা, বিদেশী দূতা-বাসের প্রেস রিলিজের কাগজপত্র, বুকপকেটে একটা টাটকা লেখা কবিতা। আজ সকালে লিখেছে। ঊর্মিলাকে শোনাতে হবে। ও অবশ্য কিছু বুঝবে না, হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। আসলে এম-এ পাশ করলেও ঊর্মিলা গড়পড়তা বাঙালী মেয়ের মতই হালকা, বিস্ময়প্রবণ ও বোকা। তবুও তারই কাছে কবিতা শোনাতে হবে। ভস্মে ঘি ঢালা। কিন্তু ঊর্মিলা। কেন যে এই কিন্তুটা, কে জানে। না জানাই ভালো।

প্রেস কনফারেন্স হয়নি অফিস থেকে বেরতেই ঝট করে সব আলো নিভে গেল। সমস্ত মধ্যকলকাতা কালো হয়ে গেছে। অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের ধাক্কা। চারদিকে, দোকানে দোকানে মোমবাতি, রাস্তার আলোও গেছে। মানুষের ছায়ামূর্তি। পৃথিবীটা পিছিয়ে গেছে কয়েক শতাব্দী। বিদ্যুৎ আবার ঊর্মিলার কাছে যাবার তাড়না বোধ করল। এবং এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে সে ভেতরে-ভেতরে তলিয়ে গেল সেই প্রাথমিক অন্ধকারের হাঁয়ের ভেতর।

দরজা খুলে দিল ঊর্মিলা। অন্ধকার এখানেও। পম্পা সুধাদির ফ্ল্যাটে বাম্পার সঙ্গে খেলছে।

'তারপর কি মনে করে?' হাসতে হাসতে বিদ্যুৎকে সোফায় বসাল ঊর্মিলা, 'আমি তো ভাবলাম, আর এমুখো হবে না তুমি।'

ড্রেসিং টেবিলে একটা ম্যাটের ওপর কেরোসিনের চিমনি। ঘরের অনেক-খানিই আবছা অন্ধকার। ঊর্মিলার নাকছাবিটা ঝিলকোচ্ছে। অন্যধার ও বেশ অস্পষ্ট।

'এরকম ভাবার কারণ?' বিদ্যুৎ রুমাল দিয়ে ঘাড় মুখ মুছে নিল।

'সে তুমিই জানো। কাল যেভাবে চলে গেলে—উঃ, দারুণ লাগছিল কিন্তু তোমায়!'

'তাই নাকি? হবে। এক গ্লাস জল দাও তো।'

'দিচ্ছি।' জল আনতে উঠল ঊর্মিলা যাবার সময় বিদ্যুতের পায়ে স্যাণ্ডালটা মাড়িয়ে চলে গেল। বিদ্যুৎ উপভোগ করল।

জল নিয়ে এলে গ্লাসটা হাতে নিল বিদ্যুৎ। নামিয়ে রেখে বলল, ঊর্মিলা, চিমনিটা একটু এগিয়ে দাও তো।'

'কি ব্যাপার?'

'একটা কবিতা লিখেছি। তোমাকে শোনাব। আর সেজন্যেই এসেছি।'

'মিথ্যে কথা।'

'রিয়েলি। কবিতার ব্যাপারটা কিন্তু বিশ্বাস কর।'

'অনেকদিন পর লিখলে, না?'

'হ্যাঁ। কই, আলোটা আনো?'

চিমনিটা এখন বিদ্যুতের পাশেই। ঘরে ছায়ার সংস্থানটা বেশ বদলে গেল। ঊর্মিলাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। এমনিতর একটা চটুল আর ষড়যন্ত্রী অন্ধ-কারের দখলে দেড় বছর ধরে স্বেচ্ছাপরাজিত অথচ স্বাধীনতাবিলাসী ঊর্মিলা অদ্ভুতভাবে বেঁচে রয়েছে। সেই তমিস্রার মধ্যে যেটুকু আলো ওর ঘরে পড়ে থাকে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তার কিছুটা এখন বিদ্যুৎ বা তার কবিতার ওপর বাকিটা ঊর্মিলার ঝাপসা।

এবং কবিতাটা পড়া শেষ হয়ে গেল। মাত্র বাইশ লাইন। আড়াই মিনিট ধরে বিদ্যুতের কণ্ঠ, যা অত্যন্ত আটপৌরে, অন্যরকম ধ্বনিবিস্তার করছিল। অন্ধকার ঘরের কোণে কোণে দেয়ালে শব্দগুলো বিদ্যুতের ভূতগ্রস্ত স্বরাঘাতে মন্দ্রিত হয়ে উঠল।

শেষ হবার পর সে অনুমোদন প্রত্যাশার ভঙ্গিতে ঊর্মিলার দিকে তাকাতেই ও হো-হো করে হেসে উঠল: বাব্বা, কী লেখাই লিখেছ! মেছোবাজারের গন্ধে ভিজে যায় তোমার খোঁপার বেলফুল—এর মানে কী? বলোনা গো, কী বলতে চাইছ—' ঊর্মিলা হাসতে হাসতে বেঁকে গেল।

আর সেই অর্থসম্বিৎশূন্য ওর চওড়া হাসির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর সব আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল।

ছবি সুধীর মৈত্র

॥ কুড়ি ॥

হাসিমুখে, স্নিগ্ধ মনো কিছুক্ষণ দীপনাথের দিকে চেয়ে থাকে প্রীতম। বাইরের ঘরে কোনো বাচ্চা বুঝি কচি গলায় ইংরিজি গান গাইছে। বেশ সাহেবী উচ্চারণ। সঙ্গে বোঙ্গো আর মাউথ অর্গান। মন দিয়ে শোনে প্রীতম। তারপর বলে, ও ঘরে কী হচ্ছে তা আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

দীপনাথ জিজ্ঞেস করল, যাবি?

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, না। থাকগে।

দীপনাথ বলল, নতুন কিছু হচ্ছে না। সেই কেক কাটা, মোমবাতি নেভানো, সাহেবরা যা সব করত আর কি।

বলে একটু হাসে দীপ।

প্রীতমও হাসে। বলে, সাহেবরা দেশ ছেড়ে গেলেও সাহেবদের ভূত তো আর আমাদের ছেড়ে যায় না মেজদা। আমার জন্মদিনে মা পুজো দিত, পায়েস বাঁধত। আজও তাই করে শুনেছি, আমি কাছে না থাকলেও করে।

থাকগে। তুই এ নিয়ে বিলুকে কিছু বলতে যাস না। তোদের সম্পর্কটা একটু ভাল যাচ্ছে দেখছি। সেটা যেন বজায় থাকে।

ও নিয়ে ভেবো না। আমি কখনো ঝগড়া করি না। তাছাড়া, বিলু যা করে আনন্দ পায় তাই করুক।

বলে প্রীতম ছাদের দিকে চেয়ে একরকম উদাস অভিমানী মুখ করে শুয়ে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে, তোমার কথা বলো মেজদা, শুনি।

আমার আর কী কথা! নাথিং নিউ।

আমি তোমার কথা মাঝে মাঝেই ভাবি। মনে হয়, তোমার সত্যিই আরও ওপরে ওঠার কথা ছিল। এতদিনে একটা বেশ হোমরা চোমড়া হতে পারতে তুমি। একজন সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করতে পারতে। কিছুই করলে না। কেমন যেন উদাস হয়ে থাকো।

দীপ হাসছিল মৃদু মৃদু। বলল, দুনিয়াটা যে সস্তা নয় তা কি নিজে এতদিনেও বুঝিসনি প্রীতম?

দুনিয়া সস্তা নয় জানি। কিন্তু তোমার যে ভীষণ রোখ ছিল। ইস্কুলে তুমি কত ভাল ছাত্র ছিলে!

বিলু খুব দ্রুত পায়ে এসে প্রীতমের বিছানায় একটা প্লাস্টিক ফেলে তার ওপর চীনামাটির বড় প্লেট রেখে বলল, লাগলে বোলো, বিন্দু দেবে।

বলেই বাইরের ঘরের দিকে চলে গেল বিলু। ঐ ঘর থেকে হট্টগোল আর গানবাজনার শব্দ আসছিল কিছুক্ষণ ধরে। বিলু সাবধানে মাঝখানের দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

প্রীতম প্লেটের দিকে তাকাল, কিন্তু নড়ল না।

খা। দীপনাথ সস্নেহে বলে।

ইচ্ছে করছে না।

এই তো বলছিলি খিদে পেয়েছে!

এইমাত্র খিদেটা চলে গেল।

দীপনাথ মৃদু হেসে বলে, আসলে বোধ হয় কিছু একটা ভেবে তোর মনটা খারাপ হয়েছে।

প্রীতম ক্লিষ্ট একটু হাসে। বলে, তোমার মতো এত ভাল করে আমাকে কেউ চেনে না মেজদা। তুমি খুব সহজেই আমাকে বুঝতে পারো। কি করে পারো বলো তো?

দূর পাগলা! দীপনাথ উদাস মুখ করে বলে, আসলে তোকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি তো!

তাই হবে। বলে প্রীতম আবার ছাদের দিকে চেয়ে থাকে। বলে, তোমার কথা ভেবেই আমার মনটা খারাপ লাগছে মেজদা। তোমাকে এত আনসাকসেসফুল দেখব বলে কোনোদিন ভাবিনি।

তবে তুই কী ভেবেছিলি? এয়ার কণ্ডিশনড চেম্বার? চার হাজার টাকা মাইনে? ফ্লুয়েণ্ট ইংরিজি বলিয়ে বাঙালী-মেম বউ নিয়ে পার্টিতে যাওয়া?

প্রীতম উদাস গলায় বলে, হলেই বা দোষ কি ছিল?

দোষ কিছু নয়। তবে সেরকম হলে এই যেমন তোর কাছটিতে এসে বসে আছি এরকম বসতে পারতাম না। বাইরের ঘর থেকেই হয়তো বিদায় নিতাম। নয়তো লাবুর জন্মদিনে আসতামই না। হয়তো লাবুর জন্মদিনের চেয়েও ইমপর্ট্যাণ্ট কোনো পার্টি থাকত।

তাও মেনে নিতে রাজি আছি মেজদা। আমার কাছে এসে তোমাকে বসতে হবে না, লাবুর জন্মদিনের কথাও না হয় ভুলে গেলে, তবু সাকসেসফুল হও।

এসব কথায় ঠিক হাসি আসে না দীপনাথের। একটু বিষণ্ণ স্বরে সে বলে, তুই আমাকে খামোকা হাঁদা বানাচ্ছিস। এর চেয়ে বড় কিছু হওয়ার যোগ্যতাই আমার ছিল না। আমি এই বেশ আছি। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, তাই কম্পিটিশনও নেই কারো সঙ্গে, আর তাই অযথা উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই। এই একরকম কেটে যাচ্ছে তো।

প্রীতম দীপনাথের মুখের দিকে চেয়ে বুঝল, প্রসঙ্গটা আর বাড়ানো ঠিক হবে না। দীপনাথ সত্যিকারের অস্বস্তি বোধ করছে। সে আবার ছাদের দিকে চেয়ে রইল। তারপর যেন দীপনাথকে নয়, খুব দূরের কাউকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমার মনে আছে মেজদা, একবার আমার দশ বারো বছর বয়সের সময় তুমি আমাকে হাকিমপাড়ার রাস্তায় খুব মেরেছিলে!

দীপনাথ প্রথম জবাব দিল না। স্থির হয়ে বসে রইল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, হুঁ, তখন তো ছেলেমানুষ ছিলাম।

আমি জানি মেজদা, সে কথা ভাবলে তুমি আজও দুঃখ পাবে। কিন্তু মজা কি জানো?

কি?

মজা হল, তুমি আমাকে মেরে অদ্ভুত এক উপকার করেছিলে। বোধ হয় মার্বেলের জেতাল নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া লাগে। তারপর তুমি আমাকে হঠাৎ দুম দাম প্রচণ্ড মারতে শুরু করে দিলে। আশ্চর্য এই যে, তার আগে বা পরে জীবনে আমি কারো হাতে মার খাইনি। ইস্কুলে নিরীহ ভাল ছেলে, বাড়িতে চূড়ান্ত আদরে, বড় হয়েও ল আবাইডিং সিটিজেন, তাই আমাকে কেউ কখনো মারধর করার স্কোপ পায়নি। একমাত্র তুমি মেরেছিলে। জীবনে ঐ একবারই আমি মার খাই।

দীপনাথ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সে কথা ভাবলে আজও আমার খারাপ লাগে। তুই-ই বা কেন ওসব ভাবিস? কোন ছেলেবেলার কথা!

প্রীতম হাত তুলে দীপনাথকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ভাবলে আমার দুঃখ হয় না। বরং খুব আনন্দ পাই। ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝবে না। সেই বয়সে তুমি পাড়ায় পাড়ায় মারপিট করে বেড়াতে, ওসব ছিল তোমার জলভাত। আমার কাছে তো তা ছিল না। কেউ আমাকে ধরে চড় লাথি মারবে, ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেবে এমন ঘটনা কল্পনাও করতে পারতাম না কোনোদিন। আমার গায়ে ফুলের টোকাটিও লাগেনি তখনো। তুমি যখন মারলে তখন ভয় বা ব্যথার চেয়েও বেশী হয়েছিল বিস্ময়। একজন, আমাকে মারছে! ভীষণ মারছে! বীভৎস রকমের মারছে! আমি মার খাচ্ছি! আমার নাক আর দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে! আমি নোংরা ড্রেনের মধ্যে পড়ে আছি! এইসব ভেবে আমি ভীষণ ভীষণ অবাক হয়ে গেছি তখন। আর চোখের সামনে চেনা পৃথিবীটাই তখন হঠাৎ বদলে যাচ্ছে। ঠিক যেন পুনর্জন্মের মতো একটা ব্যাপার। মার খেয়ে প্যাণ্টে পেচ্ছাপ করে ফেলেছিলাম। সবাই তাই দেখে হেসেছিল। অপমানে তখন মাথা পাগল-পাগল। পারলে তোমাকে তখন খুন করি। কিন্তু কি হল জানো? অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসে গেল আমার মধ্যে। তুমি জানো না, সেই বড়সড় বয়সেও মাঝে মধ্যে আমি রাতে ঘুমের মধ্যে বিছানায় পেচ্ছাপ করে ফেলতাম। তোমার হাতে মার খাওয়ার পরই সেই বদ অভ্যাসটা একদম চলে গেল। সেই সঙ্গে আমার যে সাংঘাতিক ভূতের ভয় ছিল সেটা অর্ধেকের বেশী কমে এল। খেতে শুতে জামা জুতো পরতে আমি সবসময়ে মা বা দিদিদের ওপর নির্ভর করতাম। সেই থেকে সেই নির্ভরশীলতা আর একদম রইল না। মনে মনে ভাবতাম, যে রাস্তার ছেলের হাতে মার খায় তার বাড়ির আদর খাওয়া মানায় না। তার ভূতের ভয় হলেও চলে না। এইভাবে নিজের ওপর আধিপত্য এল। তোমার ওপর শোধ নেবো বলে আমি একটা ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়ে বহুদিন ব্যায়াম ট্যায়াম করে মাসলও ফুলিয়েছিলাম। কিন্তু ততদিনে তোমার সঙ্গে আমার গভীর ভাব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই মার খাওয়াটা কোনোদিন ভুলিনি। আজ যে আমি একটা অসুখের সঙ্গে লড়াই করতে পারছি তা কি করে পারছি জানো? তোমার সেই মারের জন্য। তোমার হাতের মার আজও আমাকে চাবকে চালায়। বাইরের ঘরে যে বেলুনের থোপা ঝুলছে, দরজায় যে রঙিন কাগজের শিকলি তা আজ আমি নিজে তৈরি করলাম। সেই যে তুমি আমাকে দুনিয়ার সব বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে লড়াই করার দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলে, সেই দমে আমি আজও বহাল আছি মেজদা। নইলে কবে রোগের কথা ভেবে ভেবে শুকিয়ে মরে থাকতাম।

দীপনাথ ম্লান হেসে বলল, কোনোদিন তো বলিসনি এসব!

আজ মনে হল তাই বললাম।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বুঝলাম। কিন্তু এখনো তোর বেলুন টেলুন ফোলাতে যাওয়া উচিত নয়। বিলু আমাকে বলছিল, তুই নাকি কিছু মানতে চাস না। চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিলি নাকি আজ!

খুব অকপটে বাচ্চা ছেলের মতো হাসে প্রীতম। বলে, ও কিছু নয়। ব্যালানসটা রাখতে পারিনি।

একটু সাবধান হওয়া ভাল। বেশী বাড়াবাড়ি নাই করলি।

প্রীতম করুণ মুখ করে বলে, কিন্তু আমি যে ভাল আছি মেজদা। খুব ভাল আছি।

তাই থাকিস।

কিন্তু তুমি কেন ভাল নেই?

আমি! অবাক হয়ে দীপনাথ বলে, আমি কি খারাপ আছি? বেশ আছি তো! ভালই আছি।

তোমার মুখ দেখে তা মনে হয় না।

দীপনাথ বেখেয়ালে নিজের গালে হাত বোলালো, তারপর খুব বোকার মতো একটু হাসল। বলল, কেন, আজ তো দাড়িটাড়ি কামিয়ে এসেছি। মুখ দেখে খারাপ লাগার কথা তো নয়।

ইয়ার্কি মেরো না মেজদা। মনে রেখো, রোগে ভুগলে মানুষের অনুভূতি ভীষণ বেড়ে যায়। তুমি স্নো পাউডার মেখে এসে হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ করতে থাকলেও আমি ঠিক বুঝতে পারতাম যে, তুমি আসলে ভাল নেই।

তখন থেকে কেন যে তুই কেবল টিকটিক করছিস! এমন পিছনে লাগলে আর ঘন ঘন আসব না দেখিস। বহুদিন বাদে বাদে আসব।

প্রীতম একটু অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল, তারপর একেবারে আপাদমস্তক দীপনাথকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করল, তুমি কারো প্রেমে টেমে পড়োনি তো?

"নিখুঁত পরিষ্কার"

আগেকার দিনে বাড়ীর সকলের কাপড়চোপড় সাবান দিয়েই ধুতাম। কিন্তু কাপড় যেন কিছুতেই তেমন পরিষ্কার হত না।

তারপর, সাবানের দামে যে সব ডিটারজেন্ট বার পাওয়া যায় তাই ব্যবহার করে দেখলাম তাতেও ভাল পরিষ্কার হল না।

এখন আমি হুইল পেয়েছি। সবুজ ডিটারজেন্ট বার। এতে দারুণ ফেনা হয়···আর টেকেও বেশী···আর সাবানের চেয়ে কত বেশী কাপড় যে ধোয়···তাও নিখুঁত পরিষ্কার ক'রে।

হুইল

দারুন ধোলাই শক্তি– চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.5-2415 BG (AR)

এত চমকে গিয়েছিল দীপনাথ যে, বুকটা ধুকপুক করে উঠল ভীষণভাবে। আর ঠিক সেই সময়ে বাইরের ঘরের ভেজানো দরজাটা কে যেন খুলে ধরল। উন্মত্ত বোঙ্গো, ব্যানজো আর মাউথ অর্গানের সঙ্গে মার্কিনী গানের দুর্দান্ত শব্দ এসে তছনছ করতে লাগল ঘর। দীপনাথ কোনোকালেই ভাল অভিনেতা নয়। তার ধারণা, সে যা ভাবছে তা আশেপাশের সবাই টের পেয়ে যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোনো গোপন কথাই ঠিকমতো গোপন করতে পারেনি দীপনাথ।

বাইরের ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। রান্নাঘরের দিকে চলে যাওয়ার পর দীপনাথ মৃদু স্বরে বলল, দূর দূর!

প্রীতম কথাটা বিশ্বাস করল না। কিন্তু তেমনি অদ্ভুত গোয়েন্দার মতো দৃষ্টিতে চেয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল দীপনাথকে। বাস্তবিক তার অনুভূতি আজকাল প্রখর থেকে প্রখরতর হয়েছে। এমন কি সে আজকাল বাতাসে অশরীরীদেরও বুঝি টের পায়। দীপনাথের চোখে মুখে সে আজ একটা হালকা ছায়া দেখতে পাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি বড্ড চঞ্চল, চোখে চোখ রাখতে চাইছে না। প্রীতম আজকাল উকিলের মতো সওয়াল করতে পারে। তাই সে সহজ সরল পথে গেল না। বলল, তোমার কি আজকাল বকুলের কথা খুব মনে পড়ে?

বকুলের কথা! একটু যেন অবাক হয় দীপনাথ। বকুলের কথা একসময়ে ভুলে যাওয়া শক্ত ছিল বটে। কিন্তু এখন তো একদম মনে পড়ে না। সে মাথা নেড়ে বলল, কী যে বলিস পাগলের মতো। কোন ছেলেবেলার কথা সব! কবে ভুলে গেছি!

একটুও মনে নেই?

তা মনে থাকবে না কেন? মনে করতে চাইলে মনে পড়ে। এমনিতে পড়ে না।

বকুল কিন্তু দেখতে ভারী সুন্দর ছিল। একদম রবি ঠাকুরের কোনো উপন্যাসের নায়িকার মতো।

দীপনাথ ম্লান হাসল। বলল, তা হবে। তোর মতো চোখ তো সকলের নেই। আমার অত সুন্দর লাগত না।

তবে ওর সঙ্গে ঝুলেছিলে কেন?

তা সে বয়সে কি আর বাছাবাছি থাকে!

তোমার আর সব ভাল, কিন্তু বরাবরই তুমি একটু চরিত্রহীন ছিলে কিন্তু মেজদা।

বহুক্ষণ বাদে হঠাৎ খুব হোঃ হোঃ করে হাসে দীপনাথ। বলে, চরিত্রহীন! বলিস কি?

একটু ছিলে। হাসলে কি হবে, আমি তো জানি।

কি জানিস?

সাইকেল নিয়ে বাবুপাড়ায় একসময়ে শীলাদের বাড়ির কাছে টহল মারতে। অরপর নজর দিলে রেল কোয়ার্টারের লাবণ্যর ওপর। তোমাকে সবচেয়ে জব্দ করেছিল কলেজপাড়ার বকুল।

স্মিত হাসছিল দীপনাথ। একটা শ্বাস ফেলল।

প্রীতম বলল, অবশ্য জব্দ করতে গিয়ে বকুল নিজেই জব্দ হয়ে গেল শেষ অবধি।

পাশের ঘরে উৎসব চলছে। এই ঘরে দুজন মানুষ নিস্তব্ধ হয়ে আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছিল উজানে।

বকুলকে কে যেন শিখিয়েছিল, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে নেই। তার বিষণ্ণ, গম্ভীর, সুন্দর মুখে সবসময়ে একটা অদৃশ্য নোটিশ ঝুলত : আমার দিকে কেউ তাকাবে না, একদম তাকাবে না, খবরদার তাকাবে না।

বকুল নিজেও বোধ হয় কোনো ছেলের দিকে তাকায়নি কোনোদিন।

বকুল এমনিতে বাড়ি থেকে বেরোতো না কখনো। তবু ইস্কুলের পথে বা এবাড়ি ওবাড়ি কখনো যেতে হলে ছেলেরা তো টিটকিরি দিতে ছাড়ত না। কিন্তু বকুল উদ্দাস অহংকারে রাণীর মতো হেঁটে চলে যেত। যখন কলেজে ভর্তি হল তখন কো-এডুকেশনেও তাকে কাবু করতে পারেনি। দীপনাথ তখন কলেজের শেষ ক্লাসে। সে বকুলের হাবভাব দেখে বলত, হাতি চলে বাজারে, কুত্তা ভুখে হাজারে।

দীপনাথ বকুলের প্রেমে পড়েছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে। তখন সে ছিল শিলিগুড়ির চালু মস্তান টাইপের ছেলে। দল পাকাত, ইউনিয়ন করত, মেয়েছেলে নিয়ে দেয়ালা করার সময় পেত না।

তবু বকুলকে নজরে পড়েছিল দীপনাথের। ভারী সুন্দরী, ভীষণ শান্ত, অদ্ভুত অহংকারী। কাউকে পাত্তা দিত না। কারো দিকে তাকাত না। এমন কি পাছে তার দিকে কেউ তাকায় সেই ভয়েই বোধ হয় ভাল করে সাজগোজও করত না সে। অত্যন্ত সাদামাটা শাড়ি পরে আসত, মুখে কোনো রূপটান মাখত না, আঁচল জড়িয়ে শরীরটাকে খুব ভাল করে মমীর মতো ঢেকে রাখত। নজর থাকত সবসময়েই মাটির দিকে। সাহস করে দুচারজন ফাজিল ছেলে তার সঙ্গে নানা ছুতোয় কথা বলার চেষ্টা করেছে, বকুল জবাব দেয়নি।

এই বকুলের সঙ্গে দীপনাথের সেবার লেগে গেল হঠাৎ। ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্লাস চিহ্ন দিয়ে কোনো ছেলের নাম লেখাটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সর্বত্রই হয়ে থাকে। বকুলের নামও বহুবার ব্ল্যাকবোর্ডে কেউ কোনো ছেলের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে লিখেছে। একদিন সংস্কৃত ক্লাসে প্রফেসর এসে দেখলেন গোটা গোটা অক্ষরে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা : বকুল, তোমাকে আমি ভালবাসি—দীপনাথ চট্টোপাধ্যায়। লেখাটা ডাস্টার দিয়ে মুছবার আগে রসিক অধ্যাপক একটা ছোটো রসিকতা করেছিলেন। লেখাটার জন্য বকুল হয়তো কিছু মনে করত না, কিন্তু রসিকতাটার জন্যই বোধ হয় হঠাৎ ফুঁসে উঠেছিল মনে মনে।

পরদিন ঘটনাটা আর একটু গড়ায়। বকুল দীপনাথের লেখা একটা কুৎসিৎ প্রেমপত্র পায়। সেই চিঠিতে আদিরসের ছড়াছড়ি। বকুল এমনিতেও বোধ হয় কিছু প্রেমপত্র পেত। সেগুলোকে পাত্তা দিত না। এই চিঠিটাকে একটু বেশী পাত্তা দিল।

সেদিন সোজা প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে চিঠিটা তাঁর হাতে দিয়ে ভীষণভাবে কেঁদে ফেলল বকুল, দেখুন স্যর, কিসব লিখেছে!

প্রিন্সিপাল অপ্রস্তুতের একশেষ। চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে সরিয়ে রাখলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন দীপনাথকে।

ইউনিয়নের পাণ্ডা হিসেবে দীপনাথকে ভাল করেই চিনতেন তিনি এবং অপছন্দও করতেন।

দীপনাথ এলে জিজ্ঞেস করলেন, এই চিঠি তোমার লেখা?

দীপনাথ চিঠিটা পড়ল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল পলকে। এ চিঠি সে লেখেনি। তার রুচিবোধ কখনো অত নীচে নামতে পারে না। তবু হাতের লেখাটা তার চেনা-চেনা ঠেকেছিল বলে চিঠিটা পকেটে রেখে সে অকপটে বলল, না। কিন্তু কে লিখেছে তা খুঁজে বের করতে পারব। বলে সে বকুলের দিকে ইঙ্গিত করে প্রিন্সিপালকে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই মহিলার প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা নেই।

এই কথাটা দীপনাথ তেমন কিছু ভেবে বলেনি, শুধু আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ছাড়া। প্রকৃতপক্ষেও বকুলের প্রতি তার কোনো দুর্বলতা তো ছিলও না। মেয়েটিকে সে আর পাঁচজনের মতোই সুন্দরী বলে লক্ষ্য করেছিল মাত্র। তার বেশী কিছু নয়।

কিন্তু শান্ত, লাজুক স্বভাবের লাজুক ও অহংকারী বকুল কথাটার মধ্যে কোন সাংঘাতিক অপমান খুঁজে পেল সেই জানে। হঠাৎ সে দিশাহারার মতো দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, মিথ্যে কথা। আপনি মিথ্যে কথা বলছেন!

দীপনাথ অবাক হয়ে বলল, কোনটা মিথ্যে কথা?

এ চিঠি আপনার লেখা। কাল ব্ল্যাকবোর্ডে আপনি যা তা লিখে রেখেছিলেন। আপনি অনেকদিন আমার পিছু নিয়েছেন। আপনি মিথ্যেবাদী স্কাউন্ড্রেল!

বলতে বলতে রাগে বুদ্ধিবিভ্রমে, আক্রোশে বকুল হঠাৎ নিজের পায়ের চটি খুলে ছুঁড়ে মারল দীপনাথের দিকে।

দীপনাথেরও কপাল খারাপ। চটিটা এদিক ওদিক না গিয়ে সোজা এসে লাগল তার কপালে।

প্রিন্সিপালের চোখের সামনে এই ঘটনা।

দীপনাথ তেমন কিছু বলেনি। পকেট থেকে চিঠিটা বের করে প্রিন্সিপালকে ফেরৎ দিয়ে বলেছিল আমি একাজ করিনি। আপনি এনকোয়ারি করে দেখতে পারেন। যদি আমার কথা সত্যি হয় তবে এ মেয়েটির পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করবেন কি? আমি বিচার চাই।

ব্যাপারটা নিয়ে সারা কলেজ এবং শহরেও বেশ একটা হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। ফয়সালা হতেও অবশ্য দেরী হয়নি। চিঠির হাতের লেখা দীপনাথের ছিল না, সুব্রত নামে একটি মিটমিটে ডান ছেলে ঐ কাজটি করে দীপনাথকে ফাঁসায়। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাটা কার তা অবশ্য ধরা পড়েনি।

প্রিন্সিপাল একদিন ইউনিয়নের পাণ্ডা সমেত দীপনাথকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও। আফটার অল একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ বলে একটা কথা আছে। তাকে তোমরা পাবলিকলি অপমান করলে তোমাদের পৌরুষ বলে কিছু থাকে না।

কিন্তু ইউনিয়নের নেতারা বলল, না জেনে যখন অন্যায় কাজ করেছে তখন পানিশমেন্টও তাকে নিতেই হবে। একজন নির্দোষ ছেলেকে আপনার সামনেই ও চটি ছুঁড়ে মেরেছে। একাজ কোনো ছেলে করলে তো আপনি ছেড়ে দিতেন না।

এই নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা, তর্কাতর্কি হল।

অবশেষে প্রিন্সিপাল বললেন, বকুলের কি শাস্তি হবে তা লেট হারসেলফ ডিসাইড। মেয়েটির স্বভাব চমৎকার। আমার মনে হয় ওকে সেলফ ইমপোজড পানিশমেণ্ট নেওয়ার স্বাধীনতা তোমাদের দেওয়া উচিত।

এতে দীপনাথ ও তার বন্ধুরা আপত্তি করেনি।

বিকেলের দিকে জানা গেল বকুল নিজের শাস্তি নিজেই ঠিক করে নিয়েছে। সে ছ মাস খালি পায়ে কলেজে আসবে।

এ পর্যন্ত ঘটনাটা ছিল অপমান, আক্রোশ, বিবাদে ভরা।

কিন্তু বকুল যখন পরদিন থেকে খালি পায়ে কলেজে আসতে লাগল তখন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল ভারী করুণ।

বকুলের মাথা আরো হেঁট, চোখেমুখে অহংকারের বদলে নিরন্ধ্র কান্না। মেয়েটাকে প্রায় ভিখিরি করে ছেড়ে দিয়েছিল দীপনাথ। আর তখনই তাকে গভীর-ভাবে ভালবেসে ফেলেছিল।

কিন্তু মফঃস্বল শহরে তখনকার দিনে মেলামেশা বা ভাব করা অত সহজ ছিল না।

মাসখানেক বাদে ভরা বর্ষার একটি দিনে যখন কলেজে ভীড় খুব কম, তখন বারান্দায় হঠাৎ বকুলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল দীপনাথের।

দীপনাথ বলল, বকুল, একটা কথা বলব?

মাথা নত করে বকুল মৃদু স্বরে বলল, বলুন।

আমি ব্যাপারটা মনে রাখিনি। আপনি কাল থেকে আর খালি পায়ে কলেজে আসবেন না। তার দরকার নেই।

বকুল বিনীত এবং দৃঢ়স্বরে বলেছিল, আপনার

কথায় তো হবে না।

কেন হবে না! ভিকটিম তো আমিই। আমিই সব অভিযোগ তুলে নিচ্ছি।

তা নিলেও হয় না। পানিশমেন্টটা তো আমি নিজেই নিয়েছি। ডিসিশনটা আমার। সেখানে অন্যের কথায় কিছু যায় আসে না।

দীপনাথ উদ্বেগের সঙ্গে বলল, খালি পায়ে হেঁটে অভ্যাস নেই, শেষে যদি পেরেক টেরেক ফুটে ভাল মন্দ কিছু হয় তো লোকে আমাকেই দায়ী করবে যে!

করবে না। এতে আপনার কোনো হাত ছিল না।

শান্ত স্বভাবের আড়ালে বকুলের যে একটি জেদী, একগুঁয়ে, নিজস্ব মন আছে তা হাড়ে হাড়ে টের পেল দীপনাথ। এও বুঝল, এ মেয়েটির সঙ্গে জমানো ততটা সহজ হবে না। বরফ এখনো গলেনি।

বরফ অবশ্য কোনোদিনই তেমন করে গলল না। তবে বকুলের সঙ্গে একটু মাখামাখি করার রাস্তা দীপনাথ অনেক চেষ্টায় করে নিয়েছিল। প্রায়ই দেখা হত তাদের। কথাবার্তা হত।

শেষ পর্যন্ত বুঝি দীপনাথের ওপর একটু টান এসেছিল বকুলের। একদিন বলল, আপনি কি চাকরি-বাকরি করবেন না? বি-এ পাশ করে ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছেন যে বড়!

চাকরি করলে কি হবে?

হবে একটা কিছু। আপনি একটা চাকরি জোগাড় করুন তো আগে।

মনে মনে তখন বকুলকে প্রশ্ন করেছিল দীপনাথ আমাকে বিয়ে করবে বকুল?

মনে মনে বকুলের জবাব এল, হ্যাঁ।

পিসেমশাইয়ের এক চেনা লোকের সূত্র ধরে স্কাটোর কারখানায় চাকরি পেয়ে গেল দীপনাথ। কলকাতায় চলে এল।

তারপর যা হয়। চাকরি বাঁচাতে আর কাজ শিখতে হিমসিম খেতে খেতে একদিন বকুল তার মন থেকে বেরিয়ে গেল। বকুলের কি হয়েছিল কে বলবে! সে দীপনাথকে কোনোদিন মনের কথা তেমন করে জানায়নি তো! তবে একজন মিলিটারি অফিসারকে বিয়ে করে সে ইউ পি-বাসিনী হয় বলে খবর পেয়েছিল দীপনাথ। খুব একটা দুঃখ পায়নি তার জন্য।

এখন প্রীতমদের এই ঘরে অনেকখানি উজিয়ে দৃশ্যটা দেখে আবার বর্তমানে ফিরে আসে দীপনাথ। একটা বড় করে শ্বাস ছাড়ে।

প্রীতম বলে, তাহলে বকুল নয়।

দীপনাথ মৃদু ম্লান হেসে বলে, না বকুল নয়।

তবে কে মেজদা?

কেউ নয়।

আজ নয়, তবে কোনোদিন ইচ্ছে হলে বোলো।

বলার কিছু নেই রে। আজ চলি।

বলে উঠল দীপনাথ।

আবার এসো। তুমি এলে ভাল লাগে।

আসব। তুই ভাল থাকিস।

আমি ভাল আছি মেজদা। খুব ভাল আছি।

দীপনাথ চলে গেলে প্রীতম খানিকক্ষণ চোখ বুজে থাকে। সে কিছু ভোলে না, সে অনেক কিছু দেখতে পায়, অনেক বেশী অনুভব করে। বিড়বিড় করে সে বলল, তোমার কিছু হয়েছে মেজদা। তুমি ভাল নেই। তুমি কি এমন কারো প্রেমে পড়েছো যে তোমাকে ভালবাসে না?

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই স্কুলে যেতে শুরু করল লাবু। ফেব্রুয়ারিতে বিলু যোগ দিল চাকরিতে। আড়াইশো টাকা মাইনে আর খাওয়া দাওয়া কবুল করে একজন বেবী সিটার রাখা হয়েছে লাবুর জন্য।

এইসব ঘটনাগুলো বাইরে থেকে দেখতে কিছুই নয়। কিন্তু প্রীতমকে এইসব ছোটোখাটো পরিবর্তন বড় গভীরভাবে স্পর্শ করে। বিলু বাড়িতে না থাকলে তার কাছে ভীষণ একঘেয়ে আর ফাঁকা লাগে বাড়িটা। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। লাবু যতক্ষণ ইস্কুলে থাকে ততক্ষণ সে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে থাকে। সবচেয়ে খারাপ লাগে বেবীসিটার মেয়েটিকে। বয়স বেশী নয়, লেখাপড়া জানে, চেহারারও খানিকটা চটক আছে। কিন্তু মেয়েটা খুব অবাক চোখে প্রীতমকে বারবার তাকিয়ে দেখে। কী দেখে মেয়েটি? প্রীতমের অস্বাভাবিক রোগা, শুকিয়ে যাওয়া হাত পা? প্রীতমের নিরন্তর শুয়ে থাকা? ও কি ভাবে, এ লোকটা আর বেশীদিন বাঁচবে না?

যদি সবসময়ে একজন লোক প্রীতমকে লক্ষ করে তাহলে প্রীতম কিভাবে তার লড়াই করবে? বারবার যে সে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। চমকে যায় মাঝে মাঝে। অস্বস্তি বোধ করে?

সে একদিন বলেই ফেলল, বিলু, ওকে তাড়াও।

কাকে?

অচলাকে।

কেন? ও কি করেছে?

কিছু করেনি। কিন্তু বাইরের অচেনা একজন সবসময়ে ঘরে থাকলে আমার ভারী অস্বস্তি হয়।

ও মা! তাহলে লাবুকে দেখবে কে?

কেন, বিন্দু।

বিন্দুর যে ট্রেনিং নেই! অচলা ট্রেইনড নার্স ভাল বেবীসিটার। অরুণের চেনা বলে কম নিচ্ছে নইলে ট্রেইনড বেবীসিটারের মাইনে কম করেও তিনশো।

প্রীতম জানে, বলে লাভ নেই। সে যত ঘ্যানঘ্যান করবে তত বিলু তাকে খুব ভদ্রভাবে বোঝাবে, রাজি করানোর চেষ্টা করবে। কিছুতেই তবু ছাড়বে না অচলাকে। বিলু ঐরকম। খুব ঠান্ডা আর কঠিন ওর প্রতিরোধ।

প্রীতম তাই হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু তবু তো তাকে বাঁচতেই হবে। সব বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধেই তো তার লড়াই। তাই সে অচলার বিস্ময়কে সহ্য করার নতুন শিক্ষণ নিতে চেষ্টা করে।

শোনো অচলা।

বলুন।

পাখাটা একটু আস্তে করে খুলে দাও। গরম লাগছে।

দিচ্ছি।

তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

স্বামী, একটা ছেলে।

তোমার ছেলেকে কে দেখাশোনা করে?

সে এখন বড় হয়েছে। দশে পড়ল। কাউকে দেখতে হয় না।

তোমার যে দশ বছরের ছেলে আছে তা তো মনে হয় না। কত বয়স তোমার?

কত আর হবে! আমার খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল।

স্বামী কি করে?

বিজনেস।

এবার একটু শীত-শীত করছে। পাখাটা আর একটু কমিয়ে দাও বরং।

পাখা তো এক-এ আছে, আর তো কমবে না। তাহলে বন্ধ করে দিই?

দাও। এখন কি গরম পড়ছে?

তা একটু পড়েছে।

তাই বলো, আমারও আজকাল গরমই লাগে।

শীত তো চলে গেল।

বিন্দুকে একটু চা করতে বলবে?

বিন্দু বাড়ি নেই, আজ বেলা ছুটি নিয়েছে।

ও। তাহলে থাক।

ও মা! থাকবে কেন? আমি করে দিচ্ছি।

এইভাবে লড়াইটা লড়তে থাকে প্রীতম। বেশ ভালই লড়ে। একদিন অচলার চোখ থেকে কৌতূহল খসে যায়। সে প্রীতমের দিকে আর আড়ে আড়ে তাকায় না।

(ক্রমশ)

পুনশ্চ পারী

নীরদ মজুমদার

॥ ঊনচল্লিশ ॥

ব্যক্তিগত কারণে ফ্রান্স আমার ভয়ানক ভাল লাগে। বিশেষ করে এরাও আমাদের বাঙালীদের মতই শক্তির উপাসক। আমাদের মতই এ দেশ দেবীর দেশ। এ কথা হয়তো প্রযোজ্য অন্যান্য ক্যাথলিক-প্রধান দেশগুলির ক্ষেত্রেও। কিন্তু সব থেকে আমি বেশী নাড়া খেয়েছিলাম একটি দিন। সেদিন আমাদের তাতিএঙু স্পেন থেকে আমাদের জন্য একটি ছোট্ট কুমারী মাতার মূর্তি এনেছিল। ছোট মূর্তি। প্লাস্টারে গড়া। সিংহাসনে বসে আছেন মা মেরী, কোলে শিশু যীশু। যেন রাজরাজেশ্বরী। কিন্তু বর্ণ কৃষ্ণ। আমাদের মা কালীকে স্মরণ করায়। ফ্রান্সেও ঐ ধরনের কৃষ্ণকুমারী মায়ের অনেক অঞ্চলে লোকপ্রসিদ্ধ আছে। সেখানে উনি পূজিত।

এই ধরনের প্রতিমার দেখা মেলে সমুদ্রতট ও দেশের ভিতরে।

এইরকম একটি দেবীমূর্তি আছে অপূর্ব একটি জায়গায়। জায়গাটার নাম রকামাদুর। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ফরাসী রানীর ইষ্টদেবী ছিলেন। এখান থেকে এই ধরনের মূর্তির কল্পনা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত স্পেনে। ওলেরঁাতে এমনি প্রতিমা আছে। এঁকে জোয়ান অফ আর্ক পূজায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। সার্ত্রএর এমন এক মূর্তি আছে। কিংবদন্তী অনুসারে তৃতীয় এডোয়ার্ড এই দেবীমাহাত্ম্যে রীতিমতো ভীত হয়েছিলেন।

শুধু সেকালেই লোকে যে দেবীকে পূজা করতেন তা কিন্তু নয়। কথিত আছে, আধুনিক জগতের দর্শনচিন্তার পুরোধা রনে দেকার্ৎ নোতর দাম দ্য লরেতের কৃষ্ণকুমারী মাতাকে তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন যে রাত্রে তিনি তাঁর "মেথড" সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

এই ধরনের মূর্তিকে বলা হয় ভিয়েজ নোয়ার। কারণ, এইগুলি নানা পদার্থে রচিত হয়েছে। পারীর নতর দাম দ্য লরেৎ-এর মাতৃমূর্তি যদিচ শ্বেত প্রস্তরে রচিত তবু সর্বত্র তিনি কৃষ্ণকুমারী রূপে পরিচিত।

বহুকাল থেকে ভিয়েজ নোয়া মূর্তি পূজিত হয়ে আসছে নানান মন্দিরে। তার সংখ্যা কিন্তু নগণ্য নয়। প্রায় এক শত নব্বুইটি মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিয়েজ নোয়া, ষোড়শ শতাব্দী থেকে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। বেশির ভাগ মূর্তিই ভাস্কর্যরূপে রূপায়িত। অনেক ক্ষেত্রে তা আবার রঙ করা পুরাকালের রীতি অনুযায়ী। ছবিতে কিন্তু তেমন "কৃষ্ণকুমারী" দেখা যায় না। খুব বড় মূর্তি স্বভাবত নয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার বেশ ছোট্ট। প্রায় ঢাকনার মত পোশাকে ভূষিতা দেবী। কোলে শিশু যীশু।

আগেই বলেছি নানান পদার্থে নির্মিত কৃষ্ণকুমারী দেখা যায়। সেদর বা জেনেভ্রিয়ের কাঠের তৈরী ফিনিসিয়ান বা লেবানীজ মূর্তি অনেকেই দেখেছেন। অলিভ কাঠেরও অবশ্য দেখা যায় গ্রাঁ-সার্ত্রোজ এবং মুরায়। তা ছাড়া মাইয়ান কাঠের কাজ মার্সেইতে বহুল প্রচলিত। এবং বার্নেইতে স্যাপা কাঠ, মানাস্ক তুরনু, বায়ু, পেজেনাস এবং সাঁ-রোমনা-দেই ও মোপেলিয়েতে সেদর কাঠের মূর্তি নির্মিত হয়েছে। এমন অনেক ভিয়েজ নোয়ার দেখা যায় যা প্রস্তর-নির্মিত। কিন্তু কি প্রস্তর বলা শক্ত।

দুটি মাত্র ধাতুনির্মিত মূর্তি দেখা যায়। একটি আছে তুইরে। টিন ও সীসে সংমিশ্রণে গঠিত। আর একটা আছে ব্রোঞ্জের তারাস্কো-সুর-ওয়াজ। তবে সব মূর্তিই এক ধরনের নয়। কোথাও কোথাও বৈষম্য লক্ষণীয়। যেমন, কোথাও কোথাও মায়ের কোলে যীশুর মূর্তি নেই। একা ভিয়েজ নোয়ার, আপন মহিমায় বিরাজিত। এই বিষয়বস্তুর উপর সুন্দর একটি পুস্তক আছে। তাতে যুক্তিতর্ক সাজিয়ে দেখানো হয়েছে যে, যদি ফরাসী দেশেই মানচিত্রে একটি তির্যক রেখা টানা যায় ন্যোনসি থেকে বর্দো অবধি, তা হলে দেখা যাবে দেশটি ভাগ হয়েছে প্রায় অর্ধেক অংশে। এই দুই অংশের এক ভাগে একশো ঊনষাটটি মূর্তি এবং অন্য ভাগে পড়বে একত্রিশটি মূর্তি। কেবলমাত্র মাসিভ স্যাঁত্রালেই ষাটটি মূর্তি আছে। প্রায় সবই রয়েছে কিন্তু ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগে। এতে বেশ বোঝা যায় হয়তো অন্য কোন দেশের প্রভাবে এই ধরনের দেবীপ্রতিমার প্রচলন হয়। তবে জোর করে তো কিছু বলা যায় না। অনেকে মনে করেন মিশর থেকে ইসিস বা সীবেল, অথবা এফেজের ডায়না হতে প্রভাবিত। অন্যদের অবশ্য ধারণা, যাযাবর বা জিপসী মারফত আমাদের মা কালীরই বিকল্প ভিয়েজ নোয়ার। তবে সবাই জানে, কৃষ্ণবর্ণ, মূলত আদি-প্রকৃতির পরিকল্পনায় পরিকল্পিত রঙ। আমরা যাকে বলি মায়া—মহামায়া ইত্যাদি। কৌতূহলবশত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে অনেকের ধারণা যে, মায়া ও মেরী একই কথা। ইনিই অবতারের মাতা। এইসব ধ্যানধারণা কিভাবে গঠিত হয় বলা বড় শক্ত। এ সবের কালনির্ণয়ও বুদ্ধির বাইরে। শেষ নিওলিথিক পর্বে যেমন দেখা গেছে "ম্যাডোনা" হিসাবে তাকে সনাক্ত করলেও তার আগে পরে অনেক ভেদাভেদ দেখা যায়। বংশপরম্পরা ক্রমরূপায়িত হতে থাকে। এ সব প্রতীকই এক সাংস্কৃতিক মান অভিব্যক্ত করে। আমাদের বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে, যন্ত্র ও মন্ত্র দেখলে বেশ অনুভব করা যায় হাজার হাজার বছরের ক্রমপরিণতি। যেমন থামের আগে গাছ, চক্রের আগে স্বস্তিকা, লাঙলের আগে রোপণষণ্ট ইত্যাদি মানুষ কাজে লাগিয়েছে।

এই হিসাবে খ্রীস্টধর্মানুসারী শিল্পকলার জাগরণ, বিস্তার ও পরিণতির আলোচনায় অনেক জটিল ও গভীর কথা এসে পড়ে। তবে খুব অল্প কথায় তার একটা কাজ-চলা গোছের ছক আমরা করে নিতে পারি। ইতিহাসে এসবই পরিচিত ল'আর রোমা রূপে। তারপর প্রসঙ্গত আমরা "শক্তি" রূপায়ণের কথায় আসবো। দুই আর্ট, যথা গ্রেকো-রোমান ও রোমান-এর অন্তর্বর্তী এক দীর্ঘ অধ্যায় আছে যা চতুর্থ হতে দশম শতাব্দী অবধি গড়িয়েছিল। এর মধ্যে প্রাচ্যের আদি খ্রীস্টীয় শিল্পকলা এবং তারপর পাশ্চাত্যের আদি খ্রীস্টীয় শিল্পকলা পড়ে। এই অধ্যায়কে বলা হয় মেরোভাঁজীয়েন এবং ক্যারোলীনিয়েন। প্রাক-রোমান আর্ট। প্রাচ্যের খ্রীস্টীয় শিল্পকলারই ক্রমপরিণতি-রূপে প্রাথমিক বাইজানটাইন শিল্পকলার স্বর্ণ অধ্যায়। এই সময় বহু মন্দির রচনা হয়েছে মিশর, সিরিয়া এবং এসিয়া মাইনরে (বর্তমান তুরস্ক এবং ইউগোস্লাভিয়ায়)। পঞ্চম শতকে দেখা যায় আর্মেনিয়ান মন্দির নক্স, এবং বাকোতে, ভুং ও কেরসা আর্ক দুব্রো এবং ত্রোম্প-এর উপর গম্বুজ। এই গম্বুজ—যা অনেক সময় ওলটানো পেঁয়াজের মতো দেখতে—মুসলমানী স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল।

মর্তাজ দ্য বোজার্তে রাজকীয় মেরী আজ—১২শ শতাব্দী।

পোয়াতিয়ের নতর দাম লা গ্রঁদ—১২শ শতাব্দী

আবার ষষ্ঠ শতকে সিরিয়াতে দেখা গেল দেয়ালের পরিবর্তে থামের প্রয়োগ, নক্স অনুযায়ী যেমন কালাব-লজে এবং স্যাঁ সিমেয়ন। রোমা বা রোমানেস্ক আর্ট সব ধরনের স্থাপত্য, গঠনভঙ্গী এবং অলঙ্করণ। তা ছাড়া মটিফ—যেমন, দুই পাখি ক্রুশের দুই দিকে বা ঘটের দুই দিকে—নকশা সমস্তই প্রাচ্যদেশ থেকে ধার করা। আরো—যেমন, তারা, বিজড়িত রেখা, ভেঙে যাওয়া কাঠের লাঠি—এই ধরনের বহু প্রতীক ব্যবহার হয়েছে। এগুলি সরাসরি পারস্য, মেসোপটেমিয়া থেকে সিরিয়া মারফত আমদানি করা। প্রথম খ্রীস্টানুসারীরা জাতে ইহুদী ছিল। সুতরাং, জেরুসালেমের মন্দির স্থাপত্য তাদের প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়ই।

বাজিলিকার স্থাপত্য অবশ্য রোম থেকে নেওয়া। মন্দির স্থাপত্যে যত ক্যারলিনিয়ান অধ্যায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায় ক্যাথেড্রাল-ক্লেরমোঁ-ফেরাঁ, এবং এক্স লা স্যাপেল। সেখানে দেখা যায়, স্যাঁ-ভিতাল রাভেনা-এর অনুকরণ।

এপকা মেরোভোঁজিয়ান স্মৃতিবিজড়িত দেখা যায় পোয়াতিয়ের মন্দিরের বাতিস্তের ধারে এবং জ্রেজুসে। প্রাক-রোমান আর্ট-এর অঞ্চল ছিল কাটালন এবং লোম্বার্ডি, ইয়োরোপের বেশ খানিকটা জায়গা ঘিরে। ল'আর রোমা দশম শতকের শেষে শুরু, এবং চলতে থাকে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি।

সব খ্রীস্টীয় মন্দিরের ভিতর নকশা একটি ক্রুশের মত। ঐ মন্দিরের মধ্য-বিন্দুর মত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্রুশ এবং উপরে গম্বুজ। মূল তোরণ-দ্বারের মাথায় থাকে খোদিত যীশু, রাজকীয় পরিবেশে ও রাজকীয়রূপে প্রায়শ স্বর্গনরকের মধ্যবর্তী দেশে। আর কুমারী মেরী থাকেন অন্যান্য দেয়ালে। অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ঐ দেয়ালেই বাইবেলের নানা কাহিনী রূপান্তরিত করে। তা ছাড়া অন্যান্য পবিত্র পর্ণ্যাত্মর ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি। এই সব মন্দিরই যেন ধর্মতত্ত্বের লক্ষণগত মহাগ্রন্থ। এই সমস্ত মন্দিরের নামকরণ করা হয় যীশুমাতার নামে নতর দাম বা আওয়ার লেডি (পূজনীয়া মহিলা)।

নতর দাম-এর প্রতিমা ফ্রান্সের সর্বত্র সব বড় ক্যাথেড্রালেই দেখতে পাওয়া যায়। পারীতে, রাঁসে, আমিয়া, সাঁর্ত, লাওঁ, স্যাঁলিস্ পরন্তু আর্লো, মোয়াস্যাক, ভেজলে, ওতাঁয়। তোরণের উপর সাধারণত দেখা যায় যীশুর ও সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্যদের মূর্তি। কুমারী মেরীর মূর্তির প্রচুর বহুল দেখা যায় দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। খ্রীস্টজগৎ তার সব মন্দিরেই এঞ্জেলুস (সকাল বিকাল সন্ধ্যার উপাসনা)-এর ঘণ্টা বাজতে থাকে এবং [illegible] তাকে উপাসনা করা চালু হয়। মেরী মাতাং জাতক কন্যা বা আওয়ার লেডী অব দ্য

নীরদ মজুমদার অঙ্কিত মধ্যযুগীয় যীশু

কনসেপশন, বা অমল ধারণার প্রতীক এমন একটা ধারণা লোকমুখে প্রচারিত হতে শুরু করে এবং দ্বাদশ শতকে লিওঁতে তার উৎসব হয়। ক্রমে প্রচারিত হয় এই নতুন ধর্মমত। ফ্রান্সিসকানে ও দমিনিকায় মঠবাসী সন্ন্যাসীরা নিজেদের কল্পনা করতেন কুমারী মাতা মেরীর নাইট বা মধ্যযুগীয় মর্যাদাসম্পন্ন বীর এঁরাই তাঁর মহিমা সাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। তখনকার যথার্থ ছবি পেতে হলে সেন্ট বের্নারের উপদেশামৃত পড়তে হয়। সেন্ট বের্নার রচনা করেন দীর্ঘ গাথা "গানের গান"—কুমারী মেরীকে উপলক্ষ করে তাঁর রূপক। বাইবেলে যত বাছাই বাছাই লাবণ্যময়, সুন্দর নাম যা কিনা একই কালে রহস্যময়, মেরীর উদ্দেশে প্রয়োগ করেন। মেরী মাতার অষ্টোত্তর শত নাম বললেও অত্যুক্তি হয় না। তার কিছু নমুনা দিলাম। মেরী মাতা বুইশোঁ আর্দা বা প্রজ্বলিত গুল্ম বা ঝোপ (স্মর্তব্য মিশর দেশ থেকে পলাতক মুসা তাঁর ইষ্টদেব জিহোভাকে দেখেছিলেন প্রজ্বলিত এক ঝোপ—সন্ত বের্নারের মতে ইনি ভগবানের শক্তিরূপিণী মেরী মাতা)। মুক্তির নৌযান, তরুকা, কুসুমাকারাঙ্কিত পথ, পদ্ম, বধূবাসর, সকালের তারকা, সমুদ্রের তারকা, দুয়ার, উদ্যান, ঊষা, জ্যাকবের সোপান ইত্যাদি। মহাগ্রন্থ রচনা করেন সেন্ট বের্নার শুধু দুটি কথার উপর "আভে মারিয়া" বা প্রণাম মারিয়া, গীতিধর্মী কাব্যকথায় উনি উচ্চারণ করেছেন, "মেরী হলেন ঊষা, ইনি সুখদূতী, সত্যের আলোক, প্রতিভাত হন দীর্ঘ রাত্রির শেষে পুরাতন দিনের মতো, এবং আমরা অন্ধকার অতিক্রম করে পূর্ণ আলোকে উপস্থিত হই, উপনীত হই পাপ হতে পুণ্যে তাঁরই প্রসাদে। তিনি হলেন ভগবান ও মানুষের মধ্যস্থিতা দেবী, 'মারী' আমাদের প্রভাত"...

এই সব কথা মধ্যযুগের মন্দিরে মনোমুগ্ধকর রচনায় সর্বত্র পাথরে চিত্রে ধাতুতে কথিত হয়েছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্যের বিষয় যে, মধ্যযুগ থেকে পরবর্তী রোমানেস্ক থেকে গথিক আর্টে কারুকার্যের প্রগতি বহুলভাবে উন্নত হলেও আসলে মূলে এসেছে অবক্ষয়। মহাশয় এমিল মাল তাঁর গথিক আর্টের বিষয় গ্রন্থে দেখিয়েছেন ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে কারুকর্ম অনেক উন্নত ও জটিল হয়েছে বটে কিন্তু পরিবর্তে আধ্যাত্মিক আত্মন্যাস ক্রমশ অদৃশ্য হতে থাকে। নাটকীয়তা বাড়লেও দৈবিক সংক্রান্ত ব্যঞ্জনা প্রায় নিশ্চিহ্ন।

এই সব ক্যাথেড্রালের মধ্যে অনেক বস্তুত অনবদ্য, যেমন ওর্তা, ভেজলে, মোয়াজ্যাক ইত্যাদি এবং আমিয়া রাস ও পারী, বুর্জের ক্যাথেড্রাল। অভূতপূর্ব স্থাপত্য—অনন্যসাধারণ উপস্থিতি, সবই ভারি সুন্দর পাথরে গঠিত।

প্রায় সবই ঘুরে ঘুরে দেখেছি। অনেক কিছুই আমাকে মোহিত করেছে। কিন্তু, আমি স্বীকার করবো, একটি ক্যাথেড্রালের প্রতি আমার অসাধারণ দুর্বলতা। তা হল "নাতর দাম-দ্য-লা গ্রাঁদ" পোয়াতিয়ে, কতবার গিয়েছি। মেরী মাতাকে কতবার মোমবাতি দান করেছি—যাঁকে বলা হয় মহান নানা কারণে। মন্দিরটা কিন্তু খুব বড় নয়। লম্বায় ৫৭ মিটার, প্রস্থে ১৩ মিটার মাত্র। কিন্তু কি বা কত অন্তরঙ্গ, কত ঘনিষ্ঠ, কত সুন্দর, যেন আমাদের দেশের মন্দিরের মত। ভালবাসতে ইচ্ছে করবে। মন্দিরটি বস্তুত 'রোমানেস্ক'। সুন্দর তার স্থাপত্যের ভারসাম্য। আবার বেশ সরল ও পরিষ্কার। একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। কিছু অন্ধ খিলান, ও পর্চ দেখা যায় পঞ্চদশ শতকের ফ্লাম্বয়েন্ট গথিক রীতির।

ফাসাদ বা সম্মুখের আদল স্থাপত্যের এক চূড়ান্ত রূপরাগ। মুগ্ধ করে। মনে হবে যেন হাতির দাঁতের কারুকার্য করা শিল্প-নিদর্শন—তোরণের উপর তিন তলায় ভাগ করা। সমস্তটাতে যীশুর মুক্তির কাহিনী বর্ণিত। বাঁ দিক থেকে দেখতে হয়, এগোতে হয় ডান দিকে।

প্রথম তলায় আদম ও এভ—নেবুসাদানেজার, চার নবী—দানিয়েল, জেরেমিয়া, আইজায়া ও মোসেস (মুসা)—তারপর দেবদূত গেব্রিয়েলের বার্তা : মেরী অবতারের গর্ভধারিণী (এনানসিয়েশনের) নতোন্নত (রিলিফ) ভাস্কর্য—জেশের বৃক্ষ। ডান দিকে অন্তঃসত্ত্বা মেরীর তাঁর দিদি এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করার ঘটনা (ভিজিটেশন)। এবং অবতার-শিশুর জন্মকাহিনী (নাটিভিটি)—শিশু যীশুর স্নান, তাঁর পালক পিতা সেন্ট যোসেফ, নীচে দুই কলেবর বাহুবন্ধনে, এক শান্তি ও অন্যটি ন্যায়-বিচার। পাপকে দেখানো হয়েছে পলাতক হিসাবে।

দ্বিতীয় তলায়, চোদ্দটি মূর্তি খিলানে বিজড়িত, অলঙ্কৃত—এঁরা যীশুর মন্ত্রশিষ্য এপোসেল। দুদিকে দুইজন রয়েছেন, দুই স্থানীয় সেন্ট। সেন্ট হিলেয়ার এবং সেন্ট মার্টিন। এঁরাই গল দেশে খ্রীস্টের মন্ত্রশিষ্য।

ভিতরে, ঝাড়ির মত খিলানের পাশ থেকে আছে আলো। দূরে, মধ্যখানে সুন্দর ভাবগাম্ভীর ও রহস্য-ময় পরিবেশে, "নাতর দাম লা গ্রাঁদ"। এই গ্রাঁদ কথাটা মহান অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাতে চাবিকাঠি ও ফ্লর দ্য লীস, ভারী সুন্দর মূর্তি এবং এঁকে ঘিরে এক জাগ্রত দেবী হিসাবে অত্যাশ্চর্য কাহিনী প্রচারিত। ফ্লর দ্য লীস পবিত্রতার প্রতীক এবং ঐ চাবিকাঠিই মিরাক্লের স্মারক।

কথিত আছে, ১২০২ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ রাজা জন লাকলেন্ড, এবং পোতু বা পোয়াতিয়ের কাউন্ট পোয়াতি শহর দখল করতে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হন। একেবারে দাঁতে দাঁত সংঘর্ষ। এক বিশ্বাসঘাতক সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ইংরেজ রাজাকে নগরের চাবি লুকিয়ে এনে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। এনে দেবে সেটা ইস্টারের আগের দিন। তখন নাগরিকরা পুজো-আচ্চায় ব্যস্ত থাকবে। ঠিক দিনে হারিয়ে গেল নগরের দরজার চাবিকাঠি। অত্যাশ্চর্যভাবে। ভয়ে ভাবনায় নগরাধ্যক্ষ সরাসরি নাতর দ্য লা গ্রাঁদের কাছে নিবেদন করেন

নতর দাম দ্য লা গ্রাঁদের মেরী মাতার প্রতিমা

নগর রক্ষার জন্য। কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হলেন দেখে যে, নগরতোরণের দরজায় চাবিকাঠি কুমারী মারীর হাতে দোদুল্যমান! ইতিমধ্যে ইংরেজ সৈন্যরা দরজার বাইরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়নরত। যারা, যে সব সৈন্য বন্দী হয় তাদের মুখে শোনে যে, অবরোধের রাত্রে তারা দেখেছে তোরণের উপর একটি রানী (ইনি মাতা মেরী), একজন বিশপ সেণ্ট হিলেরী এবং একজন মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী (সেণ্ট রাদেগোন্দ*)। এইভাবে মেরী পোয়াতিয়ে নগর শত্রুকবলমুক্ত করে রক্ষা করেন।

এ কথা কত সত্য ওখানকার মানুষে তা জানে।

আমি প্রতিবার নত্র দাম লা গ্রাঁদের কাছে আমার আন্তরিক প্রণাম জানিয়েছি—যেমন আমাদের মা কালীকে জানাই। জাগ্রত দেবীদের, কত শতবার প্রণাম জানিয়েছি তা আমার মনে নেই। মনে না থাকাই ভালো। প্রতিবারই ওরা নতুন—নতুন আশ্বাস।

প্রসঙ্গত, শক্তির কথা ফিরে ভাবলে বেশ বোঝা যায় এ এক অনন্ত কালের বিশ্বাস, তার বিভূতি সর্ব দেশকাল জুড়ে রয়েছে। যাঁরা অলৌকিক অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ তাঁরা পুণ্যবান কিন্তু যাঁরা তাঁর মহিমার সাক্ষ্য দেখেছেন—ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র পূজায় ব্যবহৃত পদার্থ হতে মহা স্থাপত্য, সঙ্গীত, কাব্য-কবিতা, চিত্রে—তাঁরা উপলব্ধি করেছেন কত না ভাবেই তাঁর বিকাশ; মধ্যযুগের স্থাপত্যে ফ্রান্সে ও সর্বত্র। তার পরের ধাপ নর্মান স্থাপত্য এবং পরেই গথিক গীর্জার প্রসার দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে। সাধারণ মানুষ, তার অস্তিত্বের ক্ষতে শান্তির প্রলেপ এনেছে, পেয়েছে, সে কথা কত না সেণ্টের কত স্মারক রেলিকের রূপে বর্তমান। এক অনন্য-সাধারণ মনের আধার : যেন স্বর্ণ মণি মাণিক্য এবং কারিগরি দিয়ে সম্প্রসারিত। যে কারণে নত্র দাম, জগন্মাতার ঘরেই সব—হল-এও অন্য স্মারক, যীশুর কাঁটার মুকুট, সেণ্টদের কিছু স্মারক সযত্নে সংগৃহীত। যা আজ অনন্ত কালের মহান সম্পদ। শক্তির ঘরে ঘরে। নত্র দাম লা গ্রাঁদের একটা ছবি পোয়াতিয়ে মন্দিরে কিনেছিলাম, তাতে কয়েকটা লাইন লেখা ছিল—"যদি পাস। কাটানর কালে প্রতিমার মূর্তি চোখে পড়ে, যদি তা তোমার অন্তরে দাগ কাটে, 'আভে' বলতে ভুল না।" অর্থাৎ প্রণাম জানিও।

বস্তুত যাদের চোখ আছে তারাই এই সব মন্দিরকারুর, যাগযোগের নানান আধার দেখলেই অলৌকিক দেখার সমকক্ষ অভিজ্ঞতা অনুভব করতে পারে—একটা বিশেষ মন দিয়ে কারিগরি, হৃদয়ের সমস্ত স্পন্দন যেখানে দ্রবীভূত হয়ে অলৌকিক প্রাণ প্রতিষ্ঠিত তার সংস্পর্শে আসে। চিরস্থির। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে এ কথা দিবপ্রাহরিক সূর্যের মত সত্য। বাহান্ন পীঠ, নদ-নদী, পাহাড়ে তাঁর বিভূতি ছড়িয়ে। সমস্ত দেশটাই শক্তির অঙ্গ। নিছক প্রকৃতি বলতে কিছু নেই, পুরুষ মিলিত শক্তির সত্তা, এক অনন্ত জগৎ; শিল্পকলা রচনার ক্ষেত্রে তা প্রকটিত হয়ে ওঠে। এমন কি তন্মাত হয়ে যে কাজটি করা যায় তাই তাঁর বিভূতি।

বাইবেলের ভিতরে "প্রজ্ঞার কথা" "হ্যাঁ, পরিপূর্ণভাবে মিথ্যা তারা যারা ভগবৎ-অজ্ঞ, এবং অক্ষম তারা যারা পরিষ্কারভাবে দেখতে জানে। কে সে—তারা মাত্র কারিগর কে তা জানে না, জানে তার কারিগরি; কিন্তু সে অগ্নি, বায়ু, সূক্ষ্ম হাওয়া, তারা-ভরা গম্বুজ,

সন্ত ফোয়ার মূর্তি—পঞ্চম শতাব্দী

কুকপুনায়া মেরী মাতা

উত্তাল জল, ও গগনের অগ্নি, যাদের তারা মনে করে জগৎকর্তা। যদিও প্রকৃতির সব সৌন্দর্য তারা ভোগ করে, কিন্তু যথার্থ কার্য, যথার্থ কারণ না জানায় জানে না একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই এ সব সৌন্দর্যের স্রষ্টা"—একক শিল্পীর স্পর্শ বিধাতার আর্ট। ঠিক এইভাবেই সব খুঁটিনাটি তন্মাত মনের পরিচয়; নানান বস্তু, নানান পাথর, নিছক পদার্থ পবিত্র স্পর্শে, অলৌকিক হয়ে ওঠে। মন্দিরের আসবাবপত্র। খুব ছোটখাট আকার-আকৃতিতে; যে কথা পরে সুযোগমত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

সব কথার আগে আরো আগের কথা থেকে যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বাদ দিলে নিকট পূর্ব ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ঘিরেই হাজার হাজার বৎসরের উন্মেষ। ঈজিপ্ত, মেসোপটামিয়া, ইরান, ক্রেট ও এজিয়েন, তারপর গ্রীস, তারপর পশ্চিম ভূমধ্যসাগর, রোম, তারপর শুরু প্রাথমিক খৃষ্টান আর্ট ও বাইজানটাইন, তারপর আর্ট রোমানেস্ক ও গথিক, যা চলে আসছে রেনেসাঁস অধ্যায় অবধি।

আমরা যদি খৃষ্টান আর্টের শুরুর কথায় আসি, দেখব প্রাচ্যের প্রভাব সর্বত্র, গথ, ফ্রাঙ্ক, ভান্দাল সত্ত্বেও বারবার-রা এনেছে বাইরে থেকে নতুন ও রহস্যময় প্রতীকের ব্যবহার; যদিচ ব্যাজিলিক নক্সার মন্দির ল্যাটিন ক্রুশ ধরনের—মনে করা হয় রোমান বিচারালয় হতে উদ্ভূত, তা কিন্তু অনেকেই মেনে নিতে পারেন না। তৃতীয় শতকের প্রস্তরমূর্তি, এক রাখাল কাঁধে ভেড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে, যা আছে লা ত্রাঁর মিউজিয়মে, রোমে, তা যদিও প্রতিপন্ন করে যীশুর ছবি কিন্তু তা হলেও গ্রীক আভিজাত্যে অত্যাশ্চর্য কথা বলে না। যে কথা সর্কোফাজ, অর্থাৎ মৃতের কফিনের আধার তার গায়ে যে সব কাজ তাতে প্রতীকের বহুল প্রচার আড়ম্ভ দেখা যায় যা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে নির্মিত হয়েছে। সত্যিই অত্যাশ্চর্য, পঞ্চম শতকে বারবেরিয়ান আর্টের ফিবুল মোটিফ, পারস্যের ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের সব কাজ, এবং বাইজান্টাইন, মোজেইক অকথিত কথা মধ্যযুগকে শিখিয়েছে; অন্যত্র সেল্টিক বা কেল্টিক আর্ট নতুন ভাবায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে—তার সঙ্গে বারবার, গ্রেকো-রোমান, ভূমধ্যসাগরীয় আত্মা প্রস্ফুটিত করেছে। খৃষ্টান আর্ট অনবদ্য আর্ট তার শুরু হয়তো আমরা শনাক্ত করতে পারবো কোঁকের সাঁত ফোয়া রেলিকের মূর্তিতে। যে পশ্চিম তার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে ও অদ্যাবধি যে আর্টের তুলনা পশ্চিমে নেই বা হয়নি। ঐ মূর্তিতেই ঘুম ভেঙেছে। জাগরণের শুরু, অব্যক্ত কথা ব্যক্ত হতে চলেছে। (ক্রমশ)

"রেফ্রিজারেটরের
সম্বন্ধে আমি বিশেষ
কিছুই জানিনা!
সেই কারণেই আমি
গোদরেজ কেনা
ঠিক করেছি!"
"ওফ. এইসব সেল্‌সম্যানেরা তাঁদের নিজের নিজের
কোম্পানীর রেফ্রিজারেটরের ব্যাপারে কত গুণগানই না করেন।
হয়তো বা হতে পারে। আমি কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নিতে
চাই না। আমার সব বন্ধু-বান্ধবদের মতে গোদরেজই হ'ল সবার সেরা।
সেইজন্যেই আমার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হ'ল গোদরেজ কেনা।"
সকলের আস্থাভাজন গোদরেজ
Godrej
®
GB. 4934
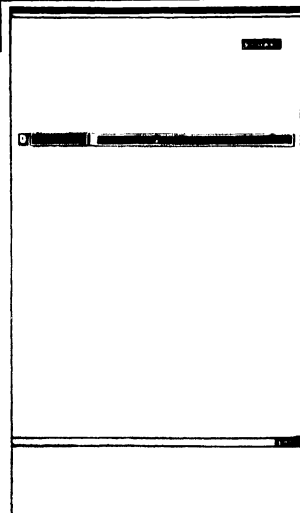
ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ

এক স্মরণীয় চরিত্র

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃতির ভাণ্ডারে সব কিছু জমিয়ে রাখা যায় না। বিস্মৃতির টানে অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির উজ্জ্বল পরিচয় যদি বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায় ক্ষতি সেখানেই। সে-ক্ষতি আমাদের জাতীয় বা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অপূর্ণতার ফাঁক রেখে যায়।

স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীকেও আজ আমরা ভুলে গেছি। অথচ এমন একজন সত্যনিষ্ঠ কর্মী, শিক্ষাবিদ, স্বদেশভক্ত ও জ্ঞানী-গুণী মানুষকে আমাদের তো মনে রাখার কথা ছিল। এই সেদিনও—এই শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকেও শিক্ষিত বাঙালী সমাজের অনেকের কাছেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথের এই পরিচয় কিছু সামাজিক সৎ-কর্মজনিত ব্যক্তিপরিচয় নয়। তিনি যদি শুধু কলেজের অধ্যাপক অথবা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন সাধারণ কর্মী মাত্র হতেন তাহলে তাঁকে বিশেষভাবে মনে রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের আধারে অনেকগুলি গুণের বিকাশ ঘটেছিল; আর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার প্রভাবে তাঁর চরিত্রে এনে দিয়েছিল এক অসাধারণ বলিষ্ঠতা। এই জাতীয় চেতনাই সে যুগে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ও কর্মীদের এক নতুন প্রেরণায় প্রবুদ্ধ করেছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন পরাধীন ভারতের শোষণক্লিষ্ট জনমানসে নিছক ধর্ম-আন্দোলন সার্থক সাড়া জাগাতে পারবে না। তাই তাঁরা ধর্ম-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন সক্রিয় স্বদেশচর্যার আদর্শ। ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন আদর্শ শিক্ষাব্রতী, সংস্কৃত ইতিহাস ও দর্শনে সুপণ্ডিত, যুক্তিধর্মী প্রগতিশীল চিন্তাধারার ধারক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন অসাধারণ কর্মী, প্রচারক ও নেতা, সমালোচক প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার, এবং সর্বোপরি নির্ভীক স্বদেশভক্ত। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করলেও স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি অকুণ্ঠ ও সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—বিশেষ করে প্রবাসী, নব্যভারত ও বঙ্গদর্শনে (নব পর্যায়) তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলি পড়লে বোঝা যাবে ধীরেন্দ্রনাথ সেদিন কী নির্ভীকভাবে শাসক ইংরেজ সরকারের মুখোশ খুলে দিয়ে তার নিষ্ঠুর শোষক-স্বরূপকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে সমর্থন জানিয়েছিলেন পরাধীন স্বদেশবাসীর বৈপ্লবিক মুক্তি সংগ্রামকে। তাঁর এই ধরনের অনেক রচনাতেই প্রখর যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে মিশে আছে সংগ্রামী উদ্দীপনা। প্রকাশিত ছ-খানি গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আজো অসংকলিত অবস্থায় বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠাতে আত্মগোপন করে আছে সে-যুগের জাতীয় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারে যেগুলি মূল্যবান উপাদান হিসাবে গৃহীত হতে পারে। (প্রায় উনিশ বছর আগে প্রকাশিত আমার "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে ধীরেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধগুলি নিয়ে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমি যথাসাধ্য আলোচনা করেছি।)

ময়মনসিংহ জেলার নাগরপুরের চৌধুরী পরিবারে ধীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১২৭৭ বঙ্গাব্দে। পিতা মাধবলাল ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। আচার-বিচারে রক্ষণশীল। পুত্র ধীরেন্দ্রনাথের মনে কৈশোরেই নানা দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ পরিজনদের বিস্ময় ও উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। আধ্যাত্মিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা তাঁকে পেয়ে বসে। "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি দার্শনিক চিন্তামূলক প্রবন্ধ যখন ছাপা হয় তখনো ধীরেন্দ্রনাথ স্কুলের গণ্ডির বাইরে আসেননি। ময়মনসিংহ থেকে ধীরেন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন ষোলো বছর বয়েসে। তাঁর দাদা কিছুকাল আগে থেকেই ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত শুরু করেছিলেন, এবং ধীরেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"I....used to go to the Samaj with him." (ধীরেন্দ্রনাথের 'In Search of Jesus Christ' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। শুধু ব্রাহ্ম সমাজেই নয়, এই সময় গীর্জায় গিয়েও তিনি খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা-সভাতে যোগ দিতেন। অবশ্য খ্রীষ্টধর্ম তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি, বরং মিশনারীদের গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতা তাঁকে দূরে সরিয়ে দেয়। কলেজে পড়বার সময় স্বাভাবিকভাবেই এইসব ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা তাঁর মধ্যে আরও দানা বেঁধে ওঠে। তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং একেশ্বরবাদের তত্ত্বানুভূত ধীরেন্দ্রনাথের মানসে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিল যা তার আত্মীয়স্বজনদের ভাবিয়ে তোলে। তিনি ব্রাহ্ম হয়ে যেতে পারেন এই সমূলক আশংকায় তাঁরা রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতেন। এবং তাঁদের এই অস্বস্তির মাত্রা বোধ হয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল যখন এম এ পাশ করার পর তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ব্রাহ্ম মতে বিবাহ করেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর সত্যানুভূতিকে কোনো কিছুর বিনিময়েই ত্যাগ করতে রাজী ছিলেন না। তাই তাঁর জীবনের এই ঘটনা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে তাঁকে বেশ দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

পিতা মাধবলাল চৌধুরী নিষ্ঠাবান ও রক্ষণশীল হলেও অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন না। কোনো মোহময় সংস্কারবুদ্ধিতে স্বধর্মনিষ্ঠাকে তিনি অন্ধ হতে দেন নি। তিনি মনে করতেন মানুষের স্বাধীনতা শুধু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও থাকা চাই। তাই স্বধর্মে মৃত্যুবরণ করা তাঁর কাছে শ্রেয় বলে মনে হলেও পরধর্মকে ভয়াবহ বলতে তিনি রাজী ছিলেন না। পরবর্তীকালে অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত মননের একটি ফসল 'সংস্কার ও সংরক্ষণ' গ্রন্থটি স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদ্দেশে অর্পণ করেন। এই সূত্রে একটি ঘটনার কথা তিনি উৎসর্গ-পত্রে উল্লেখ করেছেন যেটি তাঁর পিতার সত্যবুদ্ধি ও চরিত্রের উদারতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। ঘটনাটি তাঁর প্রথম যৌবনের। একদিন যখন মা-বাবার সঙ্গে তিনি কলকাতায় আসছিলেন তখন তাঁর মা হঠাৎ তাঁর বাবাকে বলেন—"উহাকে বারণ করিয়া দাও, ও যেন আর ব্রাহ্মসমাজে না যায়।" তখন তাঁর বাবা এক মুহূর্ত চিন্তা না করেই বলেছিলেন—"না, তা হয় না, কাহারও ধর্মবিশ্বাসে বাধা দিতে নাই; তবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করিতে নাই।"

ধীরেন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বেদান্তদর্শনের প্রতি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বেদান্তচর্চাকে অনেক গোঁড়া হিন্দু সুনজরে দেখতেন না। তাঁরা মনে করতেন এই বেদান্তচর্চার ফলেই একদল হিন্দু স্বধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে নতুন ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন শুরু করেছেন। তাঁদের কাছে ব্রাহ্মরা ছিলেন বিধর্মী। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের খ্যাতিমান ব্যক্তি হরকুমার ঠাকুরের বেদান্তচর্চার খবর পেয়ে তাঁর খুড়তুতো ভাই উমানন্দন ঠাকুর একবার তাঁকে বলেছিলেন—"তোমার বেদান্তচর্চার খবর আমাকে সত্যিই দুঃখ দিয়াছে।...আমরা তোমাকে নিষ্ঠাবান হিন্দু বলেই জানি; কিন্তু ভয় হচ্ছে, এই বেদান্তচর্চা তোমাকে নির্ঘাৎ বিধর্মী করবে।" (দ্রষ্টব্য :
—The Modern History of the Indian Rajas, Chiefs, Jamindars etc., by Loke Nath Ghosh. Part II. pp. 169-70)

'বিধর্মী' বলতে তিনি ব্রাহ্ম হবার কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। উমানন্দনের ধারণা যে ভিত্তিহীন এবং ভয় যে অমূলক এ কথা সেদিন হরকুমার তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন কয়েকজন মনীষী আবার নতুন করে বেদান্তচর্চা শুরু করেন তখনো গোঁড়া হিন্দুদের অনেকের মন থেকে এ ব্যাপারে ভয় কাটে নি। কিন্তু কে কি বলছে তার কোনো প্রতিক্রিয়া জাগতো না ধীরেন্দ্রনাথের মনে। বেদান্তই ছিল তাঁর আনন্দ; তাঁর প্রেরণা। উপাধিও পেয়েছিলেন বেদান্তবাগীশ, বিদ্যাভূষণ ও তত্ত্ববারিধি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম এ পাশ করে ধীরেন্দ্রনাথ কিছু দিন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে এবং কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। কয়েক বছর পরে একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ নিয়ে চলে যান কটকে। কিছুকাল পরে আবার সেখান থেকে যান দিল্লীতে। দিল্লীর হিন্দু কলেজে তিনি প্রথমে অধ্যাপক ও স্থানাপন্ন (officiating) অধ্যক্ষ হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং এক বছর পরেই স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এ সম্পর্কে ২৮ মার্চ ১৯৬৯ হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ বি এম ভাটিয়া আমাকে যা লিখেছিলেন এখানে তাঁর চিঠি থেকে সেই অংশটুকু উদ্ধার করছি—

"Mr. Dhirendranath Chowdhury was appointed as professor of Philosophy and officiating Principal on the 3rd April, 1308. He became Principal of the College on 2nd July, 1909 and he held that position up to 1st February, 1912. His salary per month was Rs. 150|-. All that we know is that he was a man of nationalist views. In fact, this was one of the reasons of his appointment as Principal of the College."

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকেই ধীরেন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীকে বলিষ্ঠ ও মোহমুক্ত স্বদেশ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। সে কথা পরে বলছি। এখানে দিল্লীর হিন্দু কলেজ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মমুহূর্ত থেকেই কলেজটি স্বদেশপ্রেমের চিন্তা-ধারণা প্রচার করতে থাকে। প্রথম বছরেই বক্তৃতা করার জন্যে নিমন্ত্রণ করে আনে লোকমান্য তিলককে। দেড় বছর ইংরেজের কারাগারে বন্দী থেকে তিনি তখন সবে মুক্তি পেয়েছেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে উত্তর ভারতের জনগণের সামনে এই প্রথম তাঁর বক্তৃতা। কলেজের এই দেশাত্মবোধমূলক কর্মপদ্ধতিকে সার্থক করে তোলার জন্যেই কয়েক বছর পরে স্বদেশভক্ত শিক্ষাব্রতী ধীরেন্দ্রনাথকে এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।

অবশ্য ধীরেন্দ্রনাথ এখানে বেশী দিন থাকেন নি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি চলে আসেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে এবং এখানে বারো বছর অধ্যাপনা করেন। এর পর তিনি কলকাতায় এসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এই সমাজের প্রচারক হিসাবে এবং বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। হাজারিবাগের ব্রাহ্মসমাজ তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টার নিদর্শন। ধীরেন্দ্রনাথ কিছু দিনের জন্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহক সভার সদস্য হয়েছিলেন।

কৃতী অধ্যাপক হিসাবেও ধীরেন্দ্রনাথের সুনাম ছিল। দার্শনিক পণ্ডিত। পড়াতেনও দর্শনশাস্ত্র। কিন্তু ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতিতেও তাঁর জ্ঞান ছিল সুগভীর। কলেজে মাঝে মাঝে ইতিহাসেরও ক্লাস নিতেন। তা ছাড়া, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। এ সম্পর্কে তাঁর বাস্তব দৃষ্টির স্বচ্ছতায় সেদিন একদিকে যেমন ধরা পড়েছিল অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের নানা অভিসন্ধি, তেমনি অপর দিকে সেই সরকারের কাছ থেকে শুধু কিছু ক্ষমতা পাওয়ার লোভে কংগ্রেস মডারেট দলের কাঙালপনা। তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ অনেক প্রবন্ধেই তিনি প্রকাশ করে গেছেন।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আন্দোলন ছিল

"মুখশ্রী আমার যদি
ফর্সা, নিখুঁত হতো!"

সত্যিই
হতে পারে!

এখন এই নতুন চার্মিস ভ্যানিশিং ক্রীম ব্যবহারে আপনার মুখশ্রী ফর্সা, নিখুঁত হতে পারে। আর, আপনার মেক্-আপ যেমন করবেন ঘন্টার পর ঘন্টা তেমনিই থাকবে।

মুখশ্রী নিখুঁত, ফর্সা

এখন এই নতুন চার্মিস ভ্যানিশিং ক্রীম মুখের ছোট ছোট দাগগুলো সহজেই মিলিয়ে দেয়, মেক্-আপ ছাড়াই মুখশ্রী নিখুঁত এবং ফর্সা করে।

মেক্-আপ যেমন করবেন তেমনিই থাকবে

মেক্-আপ করার সময় চার্মিস ভ্যানিশিং ক্রীম লাগালে সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলে। চার্মিস অত্যন্ত মিহি তাই পাউডার লাগালে সমানভাবে লেপে যায়, সেজন্য মেক্-আপ যেমনটি করবেন তেমনিই থাকবে।

আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলুন। নতুন চার্মিস ভ্যানিশিং ক্রীম ব্যবহার করুন। দিনকে দিন আপনার মুখশ্রী নিখুঁত সুন্দর হবে।

চার্মিস ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার মুখশ্রীর যত্ন নেয় যতখানি আপনি নিজে নিয়ে থাকেন।

CVC. G. 1. BEN

না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর স্বদেশচর্চার ধারা বদলে যায়, স্বদেশ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনারও পরিবর্তন ঘটে। আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা এবং আত্মসম্মান রক্ষা—বিশেষ করে এই দুটি উদ্দেশ্য আমাদের জাতীয় আন্দোলনে ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। এ ব্যাপারে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং ব্রাহ্মসমাজ গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পিছনে এই প্রগতিশীল জাতীয় মনোভাবই বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। কেশবচন্দ্র যতটা প্রগতিশীল মনোভাব নিয়ে ব্রাহ্মসমাজকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সে-ভাব তিনি বজায় রাখতে পারেন নি; অথবা বোধ হয় এই কথাই সত্য যে, তাঁর প্রত্যাশার চেয়ে নব্য ব্রাহ্মদের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশী। তাই নতুন ভাবনা-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যার কর্মকর্তাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন—"তিনিই আমাদের স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশচর্যার প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার নায়কত্বে আমরা ক'জন মিলিয়া একটি ছোট দল গড়িবার চেষ্টা করি। আমাদের প্রতিজ্ঞা-পত্রের প্রথম কথা ছিল—স্বায়ত্তশাসনই (তখনও স্বরাজ শব্দের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।...তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গভর্নমেন্টের আইন-কানুন মানিয়া চলিব—কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্নমেন্টের অধীনে দাসত্ব করিব না'।" (বিপিনচন্দ্র পাল—'নবযুগের বাংলা', পৃঃ ১২২-২৩)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রায় বাইশ বছর পরে 'প্রদীপ' পত্রিকায় শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম 'জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্য—দ্বিতীয় প্রস্তাব'। এতে তাঁর স্বদেশ-চিন্তার সে-পরিচয় স্পষ্ট হয়ে আছে সেই চিন্তাধারাই ছিল তখনকার ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা। কংগ্রেসের শুধু বক্তৃতা আর আবেদন-সর্বস্ব আন্দোলনে দেশের মঙ্গলের যে কোনো আশা নেই এ কথা বাঙালী চিন্তাশীল মনীষীদের বুঝতে বেশী সময় লাগে নি। তাই দেখা যায়, স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার কয়েক বছর আগেই শিবনাথ শাস্ত্রী এই প্রবন্ধে কংগ্রেসের কাজের সমালোচনা করে স্বদেশী যুগের আত্মনির্ভরতার আদর্শকে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন;—"লোকে দেখুক আমরা নিজের চেষ্টায়, নিজের ক্ষেত্রে নিজেরা কিছু করিতেছি, তবে তো আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে; নতুবা যদি দেখে ব্যাঘ্রের পশ্চাতে যেমন ফেউ লাগে তেমনি রাজাদের পশ্চাতে ফেউ ফেউ করা ভিন্ন এবং কংগ্রেসের সভায় ফাঁকা আওয়াজ করা ভিন্ন আমাদের আর কাজ নাই তবে তো ঘৃণার তলেই বাস করিব।" ('প্রদীপ'—শ্রাবণ, ১৩০৭)। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন আর শুধু সংস্কার-আন্দোলনের চেহারা নিয়ে চলেনি, সীমায়িত ক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে জাতির বৃহত্তর মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই জন্যেই আমরা দেখেছি এই সমাজের নেতা ও প্রচারকরা স্বদেশসাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত। সে যুগের বহু মনীষী নানাভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমন কি স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কিছুকাল আগে থেকেই ইংরেজ সরকারের অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার যে মানসিকতা বাংলার মাটিতে দানা বেঁধে উঠতে থাকে এবং অল্পকালের মধ্যেই যা বিপ্লব-আন্দোলনের রূপ নেয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা ছিলেন তার পূর্ণ সমর্থক, এমন কি সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকেও তাঁরা কেউ কেউ উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টাও তখন এই ব্রাহ্মসমাজের নেতারাই করেছিলেন, যদিও তা ঠিক মতো গড়ে তোলার কৌশল ও রীতি-পদ্ধতি জানা না থাকায় সার্থক হয় নি। আসামের বিভিন্ন চা-বাগানের শ্রমিকদের ওপর ইংরেজ মালিকদের অকথ্য অত্যাচারের খবর পেয়ে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে যখন তদানীন্তন কংগ্রেসের নেতারা শুধু সম্মেলন ডেকে বেদনাশ্রুমিশ্রিত প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, এমন কি মাদ্রাজ কংগ্রেসে প্রাদেশিক ব্যাপার বলে এ বিষয়ে আলোচনাও করতে দেওয়া হয় নি, তখন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসামের কয়েকটি চা-বাগানে কুলিদের সঙ্গে কুলি হয়ে কাজ করে মালিকদের সেই নির্মম নির্যাতনের পরিচয় নিজের দেহে-মনে বহে নিয়ে আসেন। কৃষ্ণকুমার তো চা-কে মনে করতেন কুলির রক্ত, তাই চা খাওয়াই ছেড়ে দেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার তাঁকেও ছাড়ে নি। দু বছর তাঁকেও জেলে আটকে রেখেছিল।

সুতরাং, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন একনিষ্ঠ কর্মী, নেতা ও প্রচারক হিসাবে ধীরেন্দ্রনাথও এই বলিষ্ঠ স্বদেশচর্যার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন—বিশেষ করে কৃষ্ণকুমারকে সহকর্মীরূপে পেয়ে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি যখন কিছুকালের জন্যে কটকে ছিলেন, জানা যায় তখন অনেক দেশব্রতী তাঁর বাড়িতে মিলিত হতেন। এই সময় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধের মধ্যে থেকে কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে, তাঁর স্বদেশচিন্তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এবং জানা যাবে কীভাবে তিনি সেদিন ইংরেজ সরকারের অপশাসনের অত্যন্ত ধারালো সমালোচনা করে স্বদেশবাসীর মনে নতুন চেতনার আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করেছিলেন।

১৩১১ বঙ্গাব্দে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার আগের বছরে 'নব্যভারত' পত্রিকায় 'ভারতের রাজা ও প্রজা' নামে ধীরেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। এতে ভারতের তৎকালীন অবস্থার একটি সত্যাশ্রয়ী পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে বাস্তব অবস্থার যথার্থ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে লেখক দেখিয়েছেন ইংরেজ রাজত্বে ভারতবাসী কিভাবে ক্রমশ দুর্গত ও অসহায় হয়ে পড়েছে। শোষণ ও নির্যাতনের ফলে দুর্ভিক্ষ ভারতবাসীর নিত্যসঙ্গী। এই প্রসঙ্গে আলোচনা-সূত্রে ধীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"একাদশ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্ত অষ্ট শতাব্দীতে ভারতে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে মোট ১৮বার, কিন্তু এক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রবল প্রতাপ ইংরাজ রাজ্যে মহাশান্তির সময়েও ১৮৭৬ হইতে ১৯০১ পর্যন্ত এই ২৫ বৎসরেই ভারতে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ১৮ বার। শেষের দিকে দুর্ভিক্ষ যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী সমর্থ নহে। এই শেষ দশ বৎসরে ইংরেজরাজ দুর্ভিক্ষযজ্ঞে প্রায় ২ কোটি প্রজার প্রাণ আহুতি প্রদান করিয়াছেন।" (নব্যভারত—পৌষ, ১৩১১।) এই প্রসঙ্গে একজন ভারতবাসী ও একজন ইংরেজের বার্ষিক আয় ও কর দানের হিসেব দিতে গিয়ে লিখেছেন—"প্রত্যেক ভারতবাসীর আয় বার্ষিক ৩০ টাকা। কিন্তু সে প্রতি ১৫ টাকায় ১·৭৫ কর দেয়। প্রত্যেক ইংরেজের আয় ৬৩০ টাকা, কিন্তু সে প্রতি ১৫ টাকায় ১·২৫ মাত্র কর দেয়। অর্থাৎ ইংলণ্ডবাসী ভারতবাসী হইতে ২১ গুণ ধনী। কিন্তু তাহার করভার ভারতবাসী অপেক্ষা প্রায় ⅓ অংশ কম। ভারতবাসী যেরূপ করভার নীরবে সহ্য করিয়া অনাহারে প্রাণ বিসর্জন করিতেছে ইংলণ্ডে সেরূপ ব্যাপার এক বৎসর হইলে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইত।" (নব্যভারত—পৌষ, ১৩১১)।

ধীরেন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক প্রবন্ধগুলির বেশীর ভাগ ছাপা হয়েছিল প্রবাসী এবং নব্যভারত পত্রিকায়। লেখাগুলি যেমন বিশ্লেষণধর্মী তেমনি অনেক ক্ষেত্রে চরমপন্থী মতবাদের দ্বারা চিহ্নিত। পড়লেই বোঝা যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি নরম সুরের গায়ক ছিলেন না। এ আন্দোলনকে তিনি প্রকৃতই মুক্তি-সংগ্রাম বলে মনে করতেন এবং ইংরেজ সরকারের শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে হলে শেষ পর্যন্ত যে আঘাত হানা অনিবার্য হয়ে উঠবে ধীরেন্দ্রনাথের এ মত তাঁর অনেক লেখাতেই সুস্পষ্ট। এখানে প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁর চারটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি—'ভারতের স্বরাজ্য' (বৈশাখ, ১৩১৪), 'স্বদেশী ও বহিষ্কার' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪), 'প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি' (আষাঢ়, ১৩১৪) এবং 'ভারতে বৃটিশ শান্তি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫)। চারটি প্রবন্ধেই ইংরেজের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও দার্শনিক পণ্ডিতের নিঃশঙ্ক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। মনে রাখা দরকার অত্যাচারীর শোষণ-যন্ত্রকে আঘাত দিয়ে স্তব্ধ করে দেবার রক্ত-শপথ নিয়ে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার গুপ্ত-সমিতির সভ্যরা তখন সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

দেশ শাসনের সুবিধার অজুহাতে ইংরেজ সরকার সেদিন যে অভিসন্ধিমূলক বিভেদ-নীতি (divide and rule policy) রচনা করেছিল গোড়া থেকেই তার কুটিল চেহারাটা অনেকের কাছেই ধরা পড়ে যায়। 'ভারতের স্বরাজ্য' প্রবন্ধে ধীরেন্দ্রনাথও দেশবাসীকে এ সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—"আর কেন ভাই, সোজা পথে ঘরে এসো, দুই ভাইয়ে মিলিয়া মায়ের কষ্ট দূর করি।" তারপর হিন্দুদের প্রেরণা দিয়ে বলেছেন—"আর রক্ত দেখিয়া মূর্ছা গেলে চলিতেছে না। জননীর, ভগিনীর সম্মান রক্ষার জন্যও তোমাকে অস্ত্র ধরিতে শিখিতে হইবে। সরকার যখন তোমার রক্ষার ভার লইতে নারাজ তখন তোমাকে আত্মরক্ষার ভার লইতে হইবে।...মনুষ্যত্ব লাভের জন্যই স্বরাজ্য চাই, অতএব স্বরাজ আমাদের অবশ্যপ্রাপ্তব্য।"

সে সময় আগে স্বদেশী না স্বরাজ এই বিষয়ে নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ধীরেন্দ্রনাথ মনে করতেন স্বদেশ বলে কোনো ভূখণ্ডকে দাবী করার অধিকার যদি আমাদের না থাকে তবে স্বদেশী গড়ে উঠবে কোথায়? তাই 'স্বদেশী ও বহিষ্কার' প্রবন্ধে লিখেছেন—"যাহার স্বদেশ বলিয়া দাবী করিবার কিছুই নাই, কোনো ভূমিখণ্ডকে স্বদেশ বলিয়া দাবী করিতে গেলেই অমনি বিদেশী আসিয়া চোখ রাঙাইয়া নাকের সম্মুখে তরবারি ঘুরায়, তাহার স্বদেশী—তাহা যতই কেন 'হনেস্ট্' হউক না—কবন্ধের শিরঃপীড়ার ন্যায় নিতান্তই অলীক। সুতরাং, স্বরাজ স্বদেশীর অপরিহার্য আশ্রয়।" লেখকের এই মতের যাথার্থ্য আমরা কিছুকাল পরেই উপলব্ধি করেছিলুম যখন ইংরেজ শাসনের কুনজরে পড়ে অনেক স্বদেশী প্রচেষ্টার অপমৃত্যু ঘটে।

'নব্যভারত'-এ ধীরেন্দ্রনাথের এই জাতীয় অনেক-গুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কোনো প্রবন্ধই পরে তাঁর কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের নাম করা হলো—'নব ভারতের স্বদেশপ্রীতি' (বৈশাখ ১৩১২), 'রাজভক্তের স্বদেশানুরক্তি' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১২), 'ভারতের রাজনীতি' (শ্রাবণ ১৩১২), 'ভারতের প্রজানীতি' (ভাদ্র ১৩১২), 'জয়কালে ক্ষয় নাই, মরণকালে ওষুধ নাই' (অগ্রহায়ণ ১৩১২), 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' (পৌষ ১৩১২), 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবাসী' (চৈত্র ১৩১২), 'ভারতের শিল্প-বাণিজ্য' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩), 'ভারতে ব্রিটিশ শান্তি' (ফাল্গুন ১৩১৩), 'বঙ্গে নব শক্তির অভ্যুত্থান' (আশ্বিন ১৩১৪), 'কংগ্রেস' (মাঘ ১৩১৪) এবং 'ভারত শাসনে ব্রিটিশ রাজশক্তির স্থান' (চৈত্র ১৩১৪)।

প্রবন্ধগুলির অনেক জায়গাতেই বিপ্লবী মতাদর্শের প্রতি লেখকের সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে। এবং সেই সঙ্গে আছে কংগ্রেসের নরম-নীতি ও ভিক্ষুক-মানসতার কঠোর সমালোচনা। মুক্তি-সংগ্রামকে সার্থক করতে হলে কৃষক মজুর প্রভৃতি অশিক্ষিত মেহনতী মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা কংগ্রেসের মডারেট নেতারা অনেক দেরিতে বুঝে-ছিলেন। 'ভারতে ব্রিটিশ শান্তি' প্রবন্ধে ধীরেন্দ্রনাথ ইংরেজরাজত্বে 'সুশাসন' ও 'শান্তির প্রকৃত "মহিমা"' উদ্ঘাটন করে গণ-সংযোগের একান্ত আবশ্যকতার কথাই ব্যক্ত করেছেন—

"ইংরাজের যে সুশাসন সে তো একটা মস্ত মিথ্যা কথা। কেননা, দেড় শত বৎসরের শাসনের পরেও যদি ইংরাজের এ দেশে থাকিবার এই মাত্রই অজুহাত হয় যে, সে চলিয়া গেলে আমরা পরস্পর মারামারি করিয়া উৎসন্ন যাইব তবে ইংরাজ এত দিন এ দেশের কি উপকার করিয়াছে? এর পরেও যদি আমাদের মারামারি কাটাকাটি করিয়াই শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে হয় তবে সে কাজটি আর এক মুহূর্তের জন্যও ফেলিয়া রাখা কর্তব্য নহে। আর দেরি করিলে ইংরাজের

যত দিন কংগ্রেস আবদ্ধ ততদিন বাক্যের স্বাধীনতা, কিন্তু আজ যদি কংগ্রেস গ্রামে প্রবেশ করিয়া অশিক্ষিত চাষাকে তাহার রাজনৈতিক অধিকারের কথা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে, যে কথা নৌরজী মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন এবং যাহা extremist মহোদয়েরা এই পাঁচ বৎসরাধিককাল বলিতেছেন তবে ইংরাজ রাজত্বের এই মহিমা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, তাহার চিহ্নও থাকিবে না।"

অন্য প্রবন্ধগুলি নিয়ে এখানে আর আলোচনা করলুম না। সেগুলিতেও লেখকের যুক্তিচিন্তাশ্রিত একই নির্ভীক মনোভঙ্গির পরিচয় সুস্পষ্ট। এগুলি ছাড়া ধীরেন্দ্রনাথের কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ ঐতিহাসিক ও দার্শনিক নিবন্ধও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ ছখানি বই লিখেছিলেন। একখানি বাংলা চরিতালোচনা—'মহাপুরুষ প্রসঙ্গ', দুখানি বাংলা তত্ত্বমূলক আলোচনা-গ্রন্থ—'সংস্কার ও সংরক্ষণ' এবং 'ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন' দুখানি তত্ত্বমূলক ইংরাজী গ্রন্থ— 'In Search of Jesus Christ' ও 'Theism in Life and Philosophy' এবং মৈত্র্যুপনিষদের সটীক বাংলা অনুবাদ।

রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মীয় জীবনের আলোচনা আছে 'মহাপুরুষ প্রসঙ্গ'-এ। এই তিনটি মহৎ চরিত্রের আলো কতটা এবং কীভাবে সমাজের গায়ে এসে পড়েছে এবং তার ফলে সমাজের কালো কতটা কেটেছে লেখক তা এই গ্রন্থে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

'সংস্কার ও সংরক্ষণ' এবং 'ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন' গ্রন্থ দুটিই ধীরেন্দ্রনাথের প্রগতিচেতনা, যুক্তিধর্মী বিশ্লেষণশক্তি এবং যথার্থ পাণ্ডিত্যের পরিচয়কে প্রকাশ করেছে। দুটি গ্রন্থেই লেখক গুরুত্বপূর্ণ ও তত্ত্বমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

'সংস্কার ও সংরক্ষণ' গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) ধীরেন্দ্রনাথ তখন দিল্লী হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন—"প্রবন্ধগুলো বিগত বারো-তেরো বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছে।" তাহলেও লেখক প্রতিটি প্রবন্ধকেই একটি আলোচনাসূত্রে অম্বিত করেছেন। প্রথমে দেখিয়েছেন, সংস্কারের সঙ্গে সংরক্ষণের সম্বন্ধ কি, সমাজে সংস্কারের প্রণালী কি হওয়া উচিত এবং সংস্কারের মধ্যে জাতীয় ও সার্বভৌমিক ভাব কিভাবে ও কতটা গুরুত্ব পেতে পারে। তারপর এসেছেন ব্রাহ্মসমাজ প্রসঙ্গে। নারীর অধিকার, একান্নবর্তী পরিবার প্রথা প্রভৃতি বিষয়েও এই অংশে আলোচনা রয়েছে; এবং শেষ অধ্যায়ের আলোচনাধারায় আছে জাতিভেদের মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রকৃতির প্রতিশোধ দেখা দেয়, নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব, বাংলায় উপজাতিসংকট কিভাবে তৈরি হয়েছে এবং পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় একান্নবর্তী পরিবারের গুরুত্ব কতটা।

সংস্কার মানে অতীতের সব-কিছু সমূলে উৎপাটন করা নয়। অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে কোনো জাতির বর্তমান গড়ে উঠতে পারে না, কিছু ধার-দেনা অতীতের কাছ থেকে করতেই হয়। তবে অতীতের রূপ বর্তমানের চেহারায় খাপ খায় না বলে তাকে একটু বদলে নেওয়া দরকার। কিন্তু সমাজের সবকিছুই শাশ্বত সনাতন অপরিবর্তনীয় এ কথা যদি দীর্ঘকাল ধরে শোনানো হয় এবং সেইভাবে সমাজকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করা হয়, তা হলে বিপ্লব অনিবার্য। লেখক তাই পরিষ্কার বললেন—"এরূপ হইলে বিপ্লব ছাড়া উন্নতি তো সম্ভবই নয়। কিন্তু বিপ্লব তো ঘটে, কেহ ইচ্ছা করিয়া ঘটায় না।" (পৃ ৪৩)। সমাজ যখন নতুন চেতনার আলোকে জেগে উঠতে চেষ্টা করে তখন নতুনের সঙ্গে পুরানোর একটা দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে সমাজে কিছুকালের জন্যে বিপর্যয় ও অশান্তি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ধীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য হলো—"এই অশান্তি ও বেদনার ভয়ে সত্যকে কিছুতেই পরিহার করিব না—সে সত্য যতই তীব্র ও কঠোর হউক না কেন।" (পৃঃ ৪৬)। অন্যত্র বলেছেন—"পরিবর্তন দেখিয়া ভয় পাইলে কি আর কখনো দেশের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে? প্রতি মুহূর্তে তিল তিল করিয়া আত্মবলিদান করিতে না পারিলে দেশের মঙ্গল হইবে না। তুমি যে বক্তৃতা দ্বারাই দেশ উদ্ধার করিবে বলিয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছ তাহা পরিত্যাগ কর।" (পৃঃ ৪৯) যে বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সে সময় মানুষকে কেরানী নামক জীবে পরিণত করে এই গ্রন্থে লেখক তার কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে 'স্বদেশী মানুষ' গড়ার কাজের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে—"যে শিক্ষায় আত্মশক্তির বিকাশ হয় না, যে শিক্ষায় আত্মশক্তি পরিচালনে মানুষকে দিন দিন সমর্থ করে না সে শিক্ষা কুশিক্ষা। তাহা সর্বথা পরিত্যাজ্য। একথা বুঝি, সকলেই মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিলে উপরওয়ালার পক্ষে সেটা সর্বথা সুবিধাজনক হয় না। (পৃঃ ১৯৮) ...স্বদেশী বস্তু প্রচারের উদ্যমের পূর্বে স্বদেশী মানুষ গঠনের চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত।" (পৃ ২০০)

'ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন' (১৯২৭) গ্রন্থে ধীরেন্দ্রনাথ প্রধানত বেদান্তদর্শন নিয়েই আলোচনা করেছেন। আপ্তবাক্য তত্ত্ব, অপৌরুষেয় বাণীবাদ, ব্রহ্মতত্ত্ব, মায়াবাদ, সর্বব্রহ্মবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্বজিজ্ঞাসার কথা প্রসঙ্গত এসে পড়েছে এবং লেখকের যুক্তিনিষ্ঠ গভীর মননশীলতাকে প্রকাশ করেছে। কিন্তু বইটি শুধু তত্ত্ব আলোচনাতেই শেষ হয়নি। এখানেই বইটির বিশেষত্ব। দুটি পৃথক স্কন্ধে লেখক সাধনপ্রসঙ্গ ও কর্মজীবন নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যেখানে ব্রহ্মসাধন ও ব্রহ্মোপাসনা থেকে শুরু করে বেদান্ত ও সেবাধর্ম, রামমোহন ও ইংরেজী শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা, লোকশিক্ষা প্রভৃতি প্রসঙ্গ আছে। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো রকম বিদেশী প্রভাব যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, আমরা যাতে কর্মে চিন্তায় এবং স্বপ্নে মোক্ষম স্বদেশীয়ানা গড়ে তুলতে পারি এমন একটা আত্মঘাতী রক্ষণশীলতা বা ভেদবুদ্ধি এক সময় আমাদের জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতিতে ফুটে উঠতে দেখা যায়। ধীরেন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে লেখেন—"আজ যে এক জাতীয় শিক্ষার কথা শুনিতেছি, তাহা খোল-নলচে বাদ একটি হুঁকো। তাহা না শিক্ষা, না জাতীয়। ইহা, পাছে বৈদেশিক হাওয়া ঘরে প্রবেশ করে এই ভয়ে ঘর ভাঙিয়া ফেলা। ইহা ভারতের আত্মধর্মের বিরোধী। ভারত কখনো বাহিরকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই—যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর তাহা সর্বত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্বত্র বিলাইয়াছেন। কিন্তু আজ এ কি দেখি! যাহাকে বলি বৈদেশিক শিক্ষা তাহারই শিক্ষাশালা হইতে জনকতক ছাত্র ভাগাইয়া লইয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলাম, আর নাম হইল জাতীয় বিদ্যাপীঠ। এ-যেন (উলটো দিকে অবশ্য) নামাবলী দিয়া পেন্টুলান গড়িয়া নাম দিলাম জাতীয় পরিচ্ছদ।" (পৃ—৩৪৪) এখানে লেখকের মোহমুক্ত প্রগতিশীল মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। এরপর লেখক বোলপুরে বিশ্বভারতীর শিক্ষাপ্রণালীর যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে আদর্শ শিক্ষার যথার্থ রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে বিশ্বভারতী যেখানে মনের কোনো অন্ধ সংস্কারের বন্ধ কপাটে প্রকৃত শিক্ষার আলো মাথা কোটে না।

এই গ্রন্থের ৪র্থ স্কন্ধের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হলো—'বিবেকানন্দ ও ব্রাহ্মসমাজ'। ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনায় আকৃষ্ট হয়ে এক সময় স্বামীজী সমাজে যেতে শুরু করেছিলেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর কর্ম ও সাধন-পথ আলাদা হয়ে গেলেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন আজীবন। তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শের কোথায় কোথায় মিল আছে লেখক এই প্রবন্ধে তাই দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

'In Search of Jesus Christ' বইটিও ধীরেন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত ধর্মজ্ঞান, গভীর পাণ্ডিত্য এবং যুক্তিনিষ্ঠ বিচারণার পরিচয় বহন করছে। এটি আসলে ইংরেজ মিশনারীদের গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। শুধু প্রতিবাদ ও তার সঙ্গে দু'একটি মন্তব্য প্রকাশ করেই যদি লেখক দায়িত্ব শেষ করতেন তা হলে এ বই নিয়ে আলোচনার কিছু থাকতো না। প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই প্রকাশ পেয়েছে লেখকের গভীর জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় যা বইটিকে বিশেষভাবে মূল্যবান করে তুলেছে। এতে ধীরেন্দ্রনাথ শুধু যে খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তাই নয়, হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর বিশিষ্ট প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার পরিচয় রেখে গেছেন। বইটির তিনটি অংশ। প্রথম অংশ—Jesus the Teacher, এতে আছে দশটি অধ্যায়; দ্বিতীয় অংশ—Jesus and Messiah, এতে অধ্যায়-সংখ্যা সাত; এবং তৃতীয় অংশ—Jesus the Saviour, এতে অধ্যায় তিনটি। বিশেষ করে এই তৃতীয় অংশের তিনটি অধ্যায়েই দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ধীরেন্দ্রনাথের সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। তাঁর মন্তব্য যে সবই সমীচীন এবং বক্তব্য যে সর্বাংশেই গ্রহণযোগ্য এ কথা মনে করার কারণ নেই; কিন্তু লেখকের সঙ্গে পাঠকের কোনো বিষয়ে কিছু মতপার্থক্য প্রমাণ করে না যে লেখকের চিন্তা ও পাণ্ডিত্য অগভীর।

'Theism in Life and Philosophy' নামে যে আর একখানি ইংরেজী বই তিনি লিখেছিলেন সেটি আমি আবিষ্কার করতে পারি নি, তাই বইটি সম্পর্কে আলোচনা করাও সম্ভব হলো না।

'মৈত্র্যুপনিষদ্'-এর সটীক বঙ্গানুবাদ ধীরেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের আর একটি নিদর্শন। তাঁর আগে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত E B Cowell এই উপনিষদটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্বানুভূতি ধীরেন্দ্রনাথকে যে কতটা সত্যানুসন্ধিৎসু করেছিল বইটির অনুবাদকর্মে তার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

শেষ জীবনে ধীরেন্দ্রনাথ পুরোপুরি ব্রাহ্মসমাজের কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত নেতাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল ধীরেন্দ্রনাথের ওপর। এঁদের মধ্যে শিবনাথ ও কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করারও সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর দেশাত্মবোধক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে কৃষ্ণকুমারের মনোভঙ্গি ও মতবাদকে আবিষ্কার করা শক্ত নয়। ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রবাসীতে (জৈষ্ঠ ১৩৪৫) স্পষ্টই লেখা হয়েছিল—"তাহার রাষ্ট্রনৈতিক মত অনেকটা চরমপন্থী নামে অভিহিত রাজনীতিকদের মত ছিল।" স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁর এই চরমপন্থী মতবাদ উগ্রপন্থীদেরও প্রেরণা দিয়েছিল।

নিঃসন্তান ধীরেন্দ্রনাথ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১৭ বৈশাখ পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী, প্রচারক ও উপাসকটাকে হারিয়েছেন তাই নয়, বাঙালী হারিয়েছে একজন আদর্শ শিক্ষাবিদকে, মোহমুক্ত চিন্তাধারার অধিকারী একজন দার্শনিক পণ্ডিত ও লেখককে এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক দেশপ্রেমিককে।

ডায়ানা, আমাকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে!
তার আগে একটা খবর শোনো!
পথে যেতে-যেতে শুনব!
না, এইখানে, এই বাগানেই বলব!

বেশ এইবারে বলো!
ডায়ানা, তোমাকে ডঃ হেনরি ফোন করেছেন!
এক্ষুনি যাচ্ছি, মা!
তুমি একটু বসো।

ডঃ হেনরি, কাগজপত্র আপনার ড্রয়ারেই আছে।
ডায়ানা, আমার চশমা কোথায় গেল?
ডায়ানা, খবরের কাগজটা দাও।

এই নাও তোমার চশমা।
পিঠের বোতামটা এঁটে দে তো।
ডায়ানা, পাইপটা দাও!
12/24

এই নাও!
চিঠিপত্র এসেছে?
আমার হারটা কোথায়?
দেখছি!
তোমার টেবিলেই তো!

ডায়ানা! ডায়ানা...
যাক, তুমি চলে যাওনি!
নাঃ, আর পারি না...

কী বলবে, বলে ফেলো!
এই কথাটা বলব যে তুমি এবারে বাবা হতে চলেছ!
?!

অশোক চট্টোপাধ্যায়

সকাল বেলায় একটা অচেনা বাড়ি একটা রেলস্টেশনের মত
একটা রেস্টুরেন্টের মত একটা পাহাড়ী স্টেশনের মত

কলিং-বেল টেপা দিয়ে সিনেমা শুরু হয়
দরজা খুলে দিয়ে কেউ দাঁড়ালেন পুলিসের মত
প্রশ্ন, আত্মপরিচয় তারপর সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে ওঠা

ঘর—ঘরের কিছু অনির্দিষ্ট চেয়ার, কিছু ছবি, ক্যালেন্ডার
বা দু-একটা জানলাও পাওয়া যেতে পারে,
ছবিতে কোন চন্দনচর্চিত বৈশিষ্ট্যহীন বৃদ্ধ চুপচাপ বসে আছেন
ছবি তোলার অপেক্ষায়
জানলা দিয়ে দেখা যায় কিছু ঘরবাড়ি ও আনুষঙ্গিক আকাশ
অ্যান্টেনার ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটা
নিচের উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকে
ঘরের মধ্যে ক্যালেন্ডার দুলে যায় তার গাছপালা নিয়ে
সব কুয়াশা আর অস্পষ্টতা নিয়ে সমস্ত হিমালয় নিয়ে

ইতিমধ্যে টোস্ট আর চায়ের কাপ সঙ্গে কিছু অসামান্য আঙুল
অচেনা ঠান্ডা হাওয়া আর ঝর্ণার শব্দ
চেয়ার টানার শব্দ, লজ্জিত কাশি, আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ

ঘন্টার ঢং ঢং, সবুজ আলো—বাঁশি বাজে
এখন অন্য নিসর্গ এখন রোদ উঠেছে

[illegible]

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে ফিরে যাবো রুগ্ন নদী রোদ্দুরের কাছে
গ্রামীণ বালক বেলা বাঁশবনের ভিতরে একাকী
শীতের রাত্রির মাঠে শরীরের পিপাসার গ্রীষ্মে বহুদূরে
অকারণ ক্রোধে জোরে খুব জোরে মা'র সঙ্গে কথা বলা
তাপিত বিকেলে

মাঝে মাঝে চলে যাবো
মিহি গেরু ধুলো পায়ে পথে
চুলে শুকনো হিমঝুরি ও মুখে রুক্ষ ধারালো হাওয়ায়
কাটাকুটি চোখে নিয়ে কালসিটে সজল
দাঁড়াবো কার্পেটে এসে

হুমড়ি খেয়ে পড়ব ফের, দ্রুত উর্ধশ্বাসে ভাঙবো সিঁড়ি
ভুলে থাকবো, ডুবে থাকবো
তীব্র আনুগত্যে যাবো বেজে
তোমার মসৃণ পথে তোমার নিরুদ্ধ পটে তোমার পায়ের তলে
একা

মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে হাত পা ছড়াবো
একটি নিখুঁত ঢিলে ধৃষ্টতা করব নির্দ্বিধায়
মাথা নেড়ে নেড়ে যেন আমাকে টিটকিরি দিচ্ছে
এরকম নিরীহ গিরগিটি।

বৃষ্টির আগে

প্রদীপ দাশগুপ্ত

ভর দুপুরে পথের মোড়ে হলুদ শাড়ি
ফর্সা কপোল বিজবিজে ঘাম—উত্তেজনা
একলা কালো তিলটি যেন নাকের ওপর অনন্যতা
হলুদ রঙই দুপুরবেলার প্রধান রঙ।

বরং তুমি এবার একটু জোরে হাঁটো
পায়ের নিচের পাথর পথও রূপান্ধ এক নটবালক
গ্রীষ্ম হয়ে ওড়ায় ধুলো, একটু পরেই বৃষ্টি আসবে
বৃষ্টি বড় মাংসলোলুপ
বৃষ্টি আসার আগেই তুমি পৌঁছে যেও!
হলুদ রঙের সঙ্গে কালো
স্থিরচিত্র ছাড়া তেমন মানায় না যে!

হাঁটো, আরকটু জোরে হাঁটো
তোমার সঙ্গে যাবে আমার দীর্ঘভিখারী একটি লাইন
শব্দ এবং ছন্দ এবং রক্তেভরা
একটি লাইন
শুধু তোমার, তোমার শুধু, শুধু তোমার।

প্রসাদ

বিনোদ বেরা

বিশাল গোধূলি বেলা পটুলকা ফুলের গাঢ় রং
অসীম শূন্যতা ভ'রে বাসনার কথা
আঁকে, আর স্তব্ধতা অবাক
গড়ে এক ঘোর শুভ্র সুন্দর প্রাসাদ,
ওখানে কে আছে! ওই শ্বেত অট্টালিকার ভিতর
কি রহস্য সংগোপন দেখার বাসনা জাগে মনে,
কি কথা রয়েছে ওই শুভ্র শব্দহীন সুনির্মিত
স্থির মায়া পুরীর আত্মায়।
সাধ যায় ঢুকে পড়ি ভিতর মহলে
কিন্তু সিংহ দরজায় ভীষণ গম্ভীর
দ্বার রক্ষী ভয় রক্ত চোখ মেলে কঠিন তাকায়,
সাহস পাইনে—দ্বিধা দ্বন্দ্বের ভিতর
ভীরুর মতন ঘুরি ফিরি॥

ফিরে এস আপন ঘরে

টু-টোনে ওঁর বিশ্বাস ফিরে আসার কারণ,
উনি দেখলেন টু-টোন'ই একমাত্র হেয়ার ডাই

যা' চুলের গভীরে চমৎকার
মিলিয়ে গিয়ে চুলের স্বাভাবিক চিকণ
কালো রূপ ফুটিয়ে তোলে

টু-টোন

গ্যারান্টী দিচ্ছেন হেলীন কার্টিস—গত ৫০ বছর ধরে যাঁরা চুলের যত্নের ব্যাপারে জগতে সবার অগ্রণী

everest/78/JKH/33-bn

সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য

গোপাল চন্দ্র রায়

॥ ৫ ॥

কাটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থাপিত 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায়' অতি জীর্ণ ও শতছিন্ন একটি পুরাতন খাতা আছে। এই খাতারই আবার প্রথমদিকের এবং শেষেরদিকেরও কয়েকটা করে পাতা নেই। খাতাটি সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের হাতের বাংলা ও ইংরাজী লেখায় ভরা।

এই জীর্ণ খাতাটির লেখাগুলির মধ্যে প্রথম সওয়া দু পাতা এবং শেষের আঠারো পাতা বাংলায়, বাকি মাঝের বাইশ পাতা ইংরাজীতে লেখা। ইংরাজী লেখাটার একটু পড়লেই বোঝা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র যে দীর্ঘ বারো বছর স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন, তাঁর সেই চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রেজিস্ট্রি বিভাগ সম্পর্কে কিছু লেখা। আর খাতার প্রথমের ও শেষের বাংলা লেখা দুটি পড়লে জানা যায়, এ দুটি কোন দুটি পৃথক প্রবন্ধের অংশবিশেষ। লেখার সঙ্গে অবশ্য কোথাও কোন প্রবন্ধের নাম নেই।

খাতার শেষের বাংলা লেখাটি পড়ে, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম, এই লেখাটি ১২৮৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা বঙ্গদর্শনের 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের কাটাকুটি করা প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি। বঙ্গদর্শনে 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে লেখক হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্রের নাম ছিল না। তবুও এই কাটাকুটি করা পাণ্ডুলিপির বলে এবং পুত্র জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের কটি চিঠির বলে, এই প্রবন্ধ যে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। এই প্রবন্ধের কথা 'দেশে' আগের সংখ্যার লেখার মধ্যে বলেছি।

'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্মে'র পাণ্ডুলিপিটির ন্যায় এই ছিন্ন খাতার প্রথম বাংলা লেখাটি পড়ে, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের কোন প্রবন্ধের অংশ হতে পারে, এই ভেবে তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলো পড়ে দেখি। পড়তে পড়তে দেখলাম, খাতার এই লেখাটি ১২৮৫ সালের চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'পদোন্নতির পন্থা' নামক একটি প্রবন্ধের শেষের দিকের একটা জায়গার অংশ। এই প্রবন্ধের সঙ্গেও লেখক হিসাবে কারও নাম নেই। নাম না থাকলেও এখন এই ছিন্ন খাতায় লেখাটা দেখেই আবিষ্কার করা গেল যে, এটা সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা। খাতার এই লেখাটি না পেলে কিছুতেই বলা যেত না যে, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা।

এখন এই লেখাটা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলছি। চাকরিতে 'পদোন্নতির পন্থা' নিয়ে কিছু লেখা মানে, একটা নিরস বিষয় নিয়ে লিখতে বসা। এরূপ একটা নিরস বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র একাধিক গল্প বলে বলে কী সরস করে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, তা না পড়লে বোঝা যাবে না। তা ছাড়া, প্রবন্ধের প্রথমে যেমন গল্প আছে, শেষে তেমনি অনেক জানার মত কথাও আছে। যাঁরা চাকরি করেন এবং চাকরিতে পদোন্নতি চান, তাঁদের কাছে এ কথাগুলো আজও জানবার মত।

আর একটা বড় কথা এই যে, সঞ্জীবচন্দ্রের এই 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধ পড়েই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ১২৮৫ সালের চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে, আর বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম প্রকাশিত হয় ১২৮৭র আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে। এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে ১২৮৬ সালে বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যাই বেরোয় নি।

আরও, প্রাচীন বঙ্গদর্শন পত্রিকা বর্তমানে যেমন দুষ্প্রাপ্য, তেমনি এই 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধটি আজও কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি। পুরাতন বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রবন্ধটি কিছুটা দীর্ঘ। মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে প্রবন্ধের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো এখানে উদ্ধৃত করছি—

পদোন্নতির পন্থা

(অসন্তোষ, অতৃপ্ত উন্নতির মূল ভিত্তি)

পদোন্নতির পন্থা সম্বন্ধে নানা মতান্তর দেখা যায়। সরলচিত্ত ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন যে, বিদ্যা থাকিলে পদের উন্নতি হয়। তাঁহারা বিদ্যাহীনের যদি কখন পদোন্নতি দেখেন, অদৃষ্টের গুণানুবাদ করিয়া আপনাদের ভ্রান্তি পুষ্টি করেন। বালকের মধ্যে 'কল' শব্দ যেমন সর্বব্যাপক, প্রয়োগমাত্রই হেতু বোধ হইয়া যায়, আমাদের বয়োধিকের মধ্যে অদৃষ্ট শব্দ সেইরূপ। ইহা কলে হইয়াছে, উহা কলে হয় বলিলে বালকেরা মনে করে বুঝিয়াছি, অদৃষ্টে হইয়াছে বা হইতেছে বলিলে বয়োধিকেরা মনে করেন বুঝিয়াছি। মাথামুণ্ডু কি বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

বিদ্যাহীনের পদোন্নতি, কিংবা অসার ব্যক্তির পদোন্নতি, অথবা দুশ্চরিত্রের পদোন্নতি সর্বদাই দেখা যায়। এ দেশের তো কথাই নাই, বিদেশী কর্তৃক উপযুক্ত পাত্র নির্বাচিত হইতে গেলে ভুল সহজেই সম্ভব। কিন্তু স্বদেশে ইংরেজের এরূপ

'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি

সঞ্জীবচন্দ্রের খাতার একটি পৃষ্ঠা

ভুল সর্বদাই ভুলিয়া থাকেন। কেবল ইংলণ্ডে বলিয়া নহে, সকল রাজ্যে সকল সময়েই এই ভুল হইয়া থাকে। হয়তো শত শত উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত থাকিতে অতি অনুপযুক্ত ব্যক্তি কোন বিশেষ পদে মনোনীত হয়। তাহার অতি গূঢ় কারণ আছে। তাহা অনুসন্ধান করিবার পূর্বে এইস্থলে একখানি পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইল। পত্রখানি বিশেষভাবে পরিপূর্ণ, সেইজন্য কিঞ্চিৎ রহস্যের প্রাধান্য আছে। কিন্তু তাহা থাকিলেও প্রকৃত কথার বড় ক্ষতি হয় নাই :—

যাঁহাদের বিশেষ পদোন্নতি হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে দুই একটির পরিচয় দিলে বোধ হয় সুচতুর চাকরেরা বুঝিতে পারিবেন। বহুকাল পূর্বে অগাদেব নামে একজন রাজকর্মচারী গঙ্গাপ্রহরী পদে নিযুক্ত ছিলেন। গঙ্গায় যে সকল নৌকা ডুবি হইত, তাহার দ্রব্যাদি উদ্ধার করা, তাহার অধিকারী থাকিলে সেই দ্রব্যাদি সমর্পণ করা ও অধিকারী না থাকিলে, তাহা রাজভাণ্ডারে প্রেরণ করা—এই সকল গঙ্গাপ্রহরীর কার্য ছিল। অগাদেব তাহা যথারীতি নির্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার আর পদোন্নতি হয় না দেখিয়া, বিশেষ মনোযোগপূর্বক কার্য করিবেন মনস্থ করিলেন। গঙ্গাপ্রহরীর যাহা প্রকৃতার্থে কর্তব্য, তাহা ক্রমে করিতে লাগিলেন। গঙ্গার জল চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়া, জলের অর ধরিতে লাগিলেন। গঙ্গাপ্রহরী হইয়া গঙ্গার জল চুরি দেখা মহাপাপ। যে সকল গরু গঙ্গায় জল খাইত, তাহাদের নামে ফৌজদারি চার্জ আনিতে লাগিলেন। যে সকল নৌকা অন্য নদী হইতে গঙ্গায় আসিয়াছিল, তাহাদের নামে অনধিকার প্রবেশ বলিয়া চার্জ করিতে লাগিলেন। নৌকা আর ডুবিবার অপেক্ষা রহিল না, তাহার সমুদায় মালামাল বিক্রীত হইয়া রাজভাণ্ডারে যাইতে লাগিল। রাজভাণ্ডার ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে রাজা জানিলেন যে, পূর্বের গঙ্গাপ্রহরীদের সময় অল্প আয় হইত, তাহারা অবশ্য অনুপযুক্ত ছিল। একণকার গঙ্গাপ্রহরী বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি, তাহাই এত আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। অগাদেবের পসার দাঁড়াইয়া গেল, সেই অবধি যখন কোন উচ্চপদ খালি হইত, অগাদেব সর্বাগ্রে পাইতেন।

বর্তমান সময়ের দুইএকটি পরিচয় দিই। রামধনদাদা নামে একজন সদরআলা ছিলেন, তিনি কয়েক বৎসর হইল রাজকার্য ত্যাগ করিয়াছেন, হয়তো পৃথিবীও ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কোন নিশ্চয় সংবাদ জানি না। রামধন দাদা যদি জীবিত থাকেন, কৃপাপূর্বক আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তাঁহার প্রকৃত উপাধি কি ছিল, আমি জানি না, তাঁহাকে সকলেই রামধনদাদা বলিত। তিনি সকলকেই দাদা বলিতেন। কাজেই সকলে তাঁহাকে দাদা না বলিয়া থাকিতে পারিত না। নিন্দুকেরা বলিত, তিনি পঞ্চম পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেইজন্য কনিষ্ঠদের দাদা বলিয়া আপনার বয়স কমাইতেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। তিনি পঞ্চম পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন সত্য, অথচ চুলে কলপ দিতেন না, কালাপেড়ে ধুতি পরিতেন না, টপ্পা গাইতেন না। তবে ভদ্রলোকমাত্রকেই তিনি যে দাদা বলিতেন, তাহার প্রকৃত কারণ নিন্দুকেরা জানিত না বলিয়া নানাপ্রকার উপহাস করিত। প্রথমত, তিনি একজন জজ সাহেবের সরকার ছিলেন, আবশ্যক মতে কুঠীর সমুদায় কার্য করিতেন, খানসামারা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। তিনি তাহারদের ভালবাসুন বা নাই বাসুন, সকলকেই ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সাহেবের সন্তানটিকে সর্বদাই ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতেন, তাহার সামান্য অসুখ হইলে, চক্ষের জল মুছিতেন। কাজেই মেমসাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বিশেষত বিজয়া দশমীর দিবস অতি ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ হইয়া মেমসাহেবকে প্রণাম করিতেন। প্রথমবার মেমসাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করায় রামধনদাদা আমাদের হিন্দু প্রথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মেমসাহেবের স্নেহ আরও বাড়িয়াছিল।

একবার বিজয়ার দিবস প্রণামান্তে রামধনদাদা মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, আমায় কি বলে আশীর্বাদ করিলেন?

মেমসাহেব আশীর্বাদের প্রথা পূর্বে শুনিয়াছিলেন, হাসিয়া উত্তর করিলেন—তুমি রাজা হও, এ আশীর্বাদ আমি করি নাই, কেননা ফলবান করা আমার ক্ষমতাতীত। সহস্র বৎসর পরমায়ু সম্বন্ধেও সেইরূপ। অতএব যাহা আমার আশীর্বাদে ফলিলে ফলিতে পারে, আমি তাহাই বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছি।

রামধনদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, সেটি কি?

মেমসাহেব আবার হাসিয়া বলিলেন—তুমি শীঘ্র হাকিম হও।

রামধনদাদা বলিলেন—যে আজ্ঞা মা, আমি তবে অদ্যই বাটীতে পত্র লিখি, আমি শীঘ্র মুন্সেফ হইব।

মেমসাহেব হাসিতে লাগিলেন। সেই দিবসেই আহারের সময় মেমসাহেব স্বজাতি কৌশল দ্বারা জজসাহেবকে আপনার আশীর্বাদের পরিচয় জানাইলেন।

আশীর্বাদ যাহাতে সফল হয়, তাহার চেষ্টা করিবার নিমিত্ত জজসাহেব হাসিতে হাসিতে স্বীকার করিলেন। একবার মাত্র বলিলেন—বিচারের কার্য অতি কঠিন। রামধন মূর্খ, তাহা পারিবে কি?

মেমসাহেব বলিলেন—বিচারে যাহা ত্রুটি হয়, আপীলে তাহা সংশোধন হইয়া যাইবে।

কিছুদিন পরে, রামধনদাদা মুন্সেফ হইলেন। ক্রমে সদর আমিন, সদরআলা হইয়া নানাবিধ বিবাদ ভঞ্জন করিলেন। বিচারে যত হউক বা না হউক, রফা দ্বারা অনেক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। রফায় কোন দোষ নাই, তবে যাহার দাবি মিথ্যা, তাহার কিছু লাভ হয়, অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয়। তাহা হউক, কিন্তু রামধনদাদা বিচারের দায় হইতে উদ্ধার হইতেন। বিশেষত বিচারে এক পক্ষের উকিল অসন্তোষ হইবার সম্ভব, রফায় সে সম্ভাবনা নাই।

রামধনদাদা ইংরেজী কিঞ্চিৎ জানিতেন। সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কহিতেন। তাঁহার সকল কথা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি যে

পুলিস দারোগা জারিনা সাহেবকে তিনি শতবার 'ইয়র অনার' বলিয়াছিলেন। যে অবধি তাঁহার মেম স্বকর্ণে তাহা শুনিয়াছিলেন, সেই পর্যন্ত স্বামীর পদগৌরব মেমের চক্ষে বিশেষ বাড়িয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে দাম্পত্য কলহও কমিয়াছিল। কাজেই রামধনদাদার নিকট ফিরিঙ্গি দারোগা বিশেষ বাধ্য ছিলেন।

জজ, মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি সকল সাহেবের খানসামাদের রামধনদাদা আদরে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। —ভাই রোমজান, তোমার সাহেব কি করিতেছেন, এখন কি সাক্ষাৎ হইতে পারে? —এইরূপ সম্বোধন একজন যুবা উকিল একদিন শুনিয়া বড় আক্ষেপ করাতে রামধনদাদা বলিলেন—দাসদাসীর মান্য সর্বাগ্রে। ইহারা সদয় থাকিলে মুনিব সদয় হন। সময় পাইলে ইহারা উপকার করিতে পারে, অপকারও করিতে পারে। আমাদের আপনার মধ্যে কি হইয়া থাকে? জান না যে, আমাদের অধিকাংশ ভ্রাতৃবিরোধ দাসদাসীর দ্বারা উৎপত্তি হয়। আমার ভ্রাতৃবধূ অপেক্ষা তাঁহার দাসীকে আমি পূজা করি। বাটী গিয়া অগ্রে তাহাকে ডাকিয়া কাপড় দিই। সেইজন্য আমার গৃহে অদ্যাপি বিরোধ আরম্ভ হয় নাই। যেদিন দেখিব, তাহার মুখভার, সেই দিন জানিব আমার কপাল ভাঙিয়াছে।'

এই উদ্ধৃত অংশ যথেষ্ট।...রামধনদাদা আপনার বিদ্যাবুদ্ধি নিজে জানিতেন, কাজেই তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেন। সকলকে আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা পাইতেন। ছোট, বড়, কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না, কেহ তাঁহার উন্নতির বিরোধী হইত না।... রামধনদাদা সকলের অনুগত ছিলেন, ক্ষমতাপন্নদের বিশেষত, এ অবস্থায় তাঁহার তাঁহার উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভব। অনুগত হওয়া সকলের সাধ্য নহে। নম্রতা আবশ্যক, স্নেহ বা তৈল আবশ্যক, অভিমান জয় করা আবশ্যক। বিশেষত অন্যের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ হওয়া আবশ্যক। নম্রতা বা স্নেহ সহজ, অনেকেরই আছে। অন্যের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ হওয়াও নিতান্ত কঠিন নহে। বাক্যের সতর্কতা থাকিলে সে গুণ উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু নিরভিমানী হওয়া অতি কঠিন। রামধনদাদা নিরভিমানী ছিলেন। তাহাই তাঁহার উন্নতি হইয়াছিল। উন্নতির অনেক হেতু আছে। নিরভিমানিতা তাহার মধ্যে একটি বিশেষ। যাহারা প্রতিভাশালী বা যাহাদের বিশেষ যোগ্যতা আছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাহাদের যোগ্যতা বিশেষরূপে নাই, তাহাদের পক্ষে রামধনদাদার পন্থা উন্নতিসাধক। বিশেষত কি সাহেব, কি বাঙ্গালী অনেকেই উপযুক্ত অনুপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করিতে পারেন না। অন্যের কথায় নির্ভর করিয়া মীমাংসা করেন। এ অবস্থায় অন্যকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাখা ভাল।

যাঁহাদের পদোন্নতি হয় না, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাঁহারা বড় অভিমানী। অতি সামান্য বিষয়ে অপমানিত বোধ করেন। কাজেই কাহারও অনুগত হইতে পারেন না। হয়ত আবার কেহ কেহ আপনাদের যোগ্যতা বিষয়ে অতিরিক্ত অভিমানী। যাঁহার অধীনে কর্ম করা যায়, যোগ্যতার অভিমান থাকিলে, কখন কখন তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে।...

বিদ্বান ও বুদ্ধিমানেরা অনেকে যে কৃতকার্য হইতে পারেন না, তাহার এক বিশেষ কারণ যে, তাঁহারা উচিত বা উপযুক্ত বিষয়ে নিযুক্ত না হইয়া হয়ত বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হন। যে ব্যক্তি বক্তৃতাশক্তিতে বঞ্চিত, তিনি হয়ত উকিল হইলেন। যিনি বক্তৃতাতে অদ্বিতীয় হইতেন, তিনি হয়ত যোদ্ধা হইলেন। যিনি মহাযোদ্ধা হইতেন তিনি হয়ত কেরানী হইলেন।...

সকল দেশেই এইরূপে সর্বদা হইয়া থাকে, বিশেষত হিন্দুসমাজে। তাহার বিশেষ কারণ, আমরা পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাকি। স্বজাতি ব্যবসায়ে আমাদের ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, তাহা অবলম্বন করিতে হয়। যে ব্যবসায়ে আমরা কৃতকার্য হইতে পারিতাম তাহা গ্রহণ করা হয় না।

তৎকালীন পুরাতন প্রথা পরিবর্তন হইতেছে। স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু ইচ্ছার ভ্রান্তি হয়। যে বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তি নাই, হয়ত কখন হইবেও না, সেই বিষয়ে সময় নষ্ট করিতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।...

স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া আপন আপন ক্ষমতা উপযোগী বৃত্তি অবলম্বন করিবার পক্ষে ইদানীং এক ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। (University) ইউনিভারসিটি তাহা ঘটাইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিজ বিধান স্বয়ং জানাইয়াছেন যে নানা শাস্ত্র তুল্যরূপে শিখিতে হইবে, যে তাহা না পারিবে, তাহাকে একেবারে কিছুই শিখিতে দিব না। ইউনিভারসিটিতে প্রবেশ করিতেও দিব না। সে যদি তথাপি এ দেশে থাকে, তাহাকে মূর্খ করিয়া রাখিব। সে ব্যক্তি প্রতিভাশালী হইলেও, তাহাকে কিছুই শিখিতে দিব না। রাজকার্যে বঞ্চিত করিব, তাহার উন্নতির ব্যাঘাত দিব। কাজেই অনেক বুদ্ধিমানকে মূর্খ হইয়া থাকিতে হইতেছে। যাহার সকল বিষয়ে কিছু কিছু বুদ্ধি আছে, কোন বিষয়ে তাহার বিশেষ বুদ্ধি না থাকিলেও সে ব্যক্তি বিদ্যোপার্জনে অধিকারী বলিয়া গৃহীত হইতেছে; কিন্তু যাহার বিষয় বিশেষে অসাধারণ বুদ্ধি আছে, কিন্তু সকল বিষয়ে সমান প্রবৃত্তি নাই, তাহাকে অনধিকারী বলিয়া তাহার শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করা হইতেছে। যে ব্যক্তি রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ হইয়া দেশের হিতসাধন করিতেন, তিনি সাহিত্যের লোক, শিখিতে অমনোযোগী বলিয়া তাঁহাকে রসায়ন শাস্ত্র শিখিতে বঞ্চিত করা হইতেছে। যিনি সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইতেন, তিনি জমি জরীপ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার সাহিত্য শিক্ষার পথরোধ করা হইতেছে। শিক্ষাদানের এরূপ পক্ষপাতিত্ব পঁচিশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ পক্ষপাতিত্ব দ্বারা দেশের কি বিশেষ ইষ্টসাধন হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি স্পষ্ট জানা যায় নাই। যাহা হইয়াছে, অপক্ষপাতী শিক্ষাদানে তাহা যে কেন হইত না, এমতও লক্ষণ পাওয়া যায় না। এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অনেকে বি-এ অনেকে এম-এ উপাধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ে যে বিখ্যাতনামা হইয়াছেন এমত আমরা জানি নাই। সকলেই লব্ধকর্মা হইয়াছেন এইমাত্র শুনা যায়। বরং তাঁহাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বোধ হয় নানা বিষয় তাঁহাদের শিখিতে হয় বলিয়া কোন বিষয় বিশেষ করিয়া তাঁহারা শিখিতে পারেন নাই। কাজেই খ্যাতিমানও হন নাই। নানা শাস্ত্র অল্প অল্প শিক্ষা ভাল, কি এক শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা ভাল, এ বিচার করিবার নিমিত্ত আমরা একথা তুলি নাই। আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে, এক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যদি বিশেষ বুদ্ধি বা প্রতিভা থাকে, তাঁহার সেই বিশেষ বুদ্ধির স্ফূর্তি হইবার পক্ষে আমাদের ইউনিভারসিটি বিশেষ বিরোধী। এতদূর পর্যন্ত বিরোধী যে, পাছে সে ব্যক্তি কোনরূপে আকাঙ্ক্ষিত অনুযায়ী শিক্ষা পায়, এই আশঙ্কায় সকল কলেজের দ্বার রুদ্ধ করা হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, যদি সে ব্যক্তি স্বচেষ্টায় আপনার উন্নতি সাধন করিতে যায়, ইউনিভারসিটি যেন বিমাতার ন্যায় তাহার উন্নতির পন্থা রোধ করে।..

আমাদের পণ্ডিত করিবার নিমিত্ত কলিকাতার ইউনিভারসিটি হয় নাই। সেই জন্য যাঁহারা পণ্ডিত হইতে পারিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষায় বঞ্চিত হইতেছেন। বিলাতে এ ভুল সংশোধিত হইবার অন্য উপায় আছে। আমাদের মোটে একটি ইউনিভারসিটি তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারিলে কোন কলেজে অধ্যয়নের উপায় নাই।

উন্নতির বিরোধী আর এক বিশেষ কারণ আছে—নিস্পৃহতা। আকাঙ্ক্ষাহীন হওয়া প্রশংসার বিষয় বটে, কিন্তু উন্নতি সম্বন্ধে নহে। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে বিশেষ চেষ্টা হয় না। উন্নতির ইচ্ছা অনেকের আছে সত্য, কিন্তু সে ইচ্ছা বিশেষ প্রবল নহে। নিজ নিজ অবস্থায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট অল্প লোকে, উন্নতি হইলে ভাল হয়, তাহা না হইলেও ক্ষতি নাই, ইহা অনেকের মনোগত ভাব। তাঁহাদের চেষ্টা বা উদ্যোগ কাজেই সামান্যরূপ হয়। তাহাই আমরা এ প্রবন্ধের শিরোভাগে বলিয়াছি —'অসন্তোষ, অতৃপ্তি উন্নতির মূল ভিত্তি'। নীতিজ্ঞেরা আমাদের এ কথায় খড়্গহস্ত হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা নীতি কথা বলি নাই, উন্নতির কথা বলিতেছি। তাঁহাদের আপত্তি থাকে, উন্নতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরুন। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যে নিয়ম, সমাজের পক্ষেও সেই নিয়ম। যেমন চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ চলিবে বলিয়া বসিয়া থাকিলে, একপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি হয় না, অপর পক্ষে সমাজেরও উন্নতি হয় না। যে সকল সমাজ বিশেষ উন্নত, সে সকল সমাজের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় অতৃপ্তিই উন্নতির মূল।...

এই যে 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধের অনেকটা এখানে উদ্ধৃত করলাম, এর শেষ বাক্যের 'সে সকল সমাজের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে' কথাটা থেকে পরিষ্কার জানা গেল, সঞ্জীবচন্দ্র বিভিন্ন দেশের সমাজের ইতিবৃত্ত অর্থাৎ Sociologyর

বইও পড়তেন। তাঁর এই Sociologyর বই পড়া সম্পর্কে আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

সঞ্জীবচন্দ্র পরিণত বয়সে কখন কখন নিজের জীবনের কোন কোন বিশেষ দিনের ঘটনা টুকরো কাগজে অথবা ছোট খাতায় লিখে রাখতেন। তাঁর এইরূপ তিনবারের কয়েক দিনের করে দিনলিপি পাওয়া গেছে। প্রথম বারের দিনলিপি একটা ছোট কাগজের দু'পিঠে দু'দিনের ঘটনার উল্লেখমাত্র। ঐ দু'দিন হল—১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ও ১৬ই এপ্রিল। ১৬ই এপ্রিলে লেখা দিনলিপিটা এই—

16th April '81

Morning — Read Sociology for 2 hours
.. Faust for ½ hour.
Noon — Read Sociology and Suptd.
Takeeds for 4 hours.
Evening — Talked away

There was rain and hail storm in the evening. Horoprosad came and read Madhabilata from Magh Bangadarsan.

এই দিনলিপির সুপারিনটেনডেণ্টকে তাগিদ বা তাগাদা দেওয়ার কথাটা মনে হয়, তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকার বা প্রেসে ম্যানেজারকে তাগাদা দেওয়া।

দিনলিপির হরপ্রসাদ হলেন, সঞ্জীবচন্দ্রর বাড়ির অদূরে নৈহাটী-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইনি সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।

'মাধবীলতা' সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা উপন্যাস। এই উপন্যাসটি তখন সঞ্জীবচন্দ্রের নিজেরই সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল।

যাই হোক, এই দিনলিপি থেকে দেখা গেল, তিনি তখন Sociology পড়ছেন।

'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধের প্রথমে সঞ্জীবচন্দ্র একখানি পত্রের কিছুটা উদ্ধৃত করছি বলেছেন। বলাবাহুল্য, ঐ পত্র তাঁর নিজেরই রচনা।

আগে বলেছি, আমার দৃঢ় ধারণা সঞ্জীবচন্দ্রের রামধনদাদার কাহিনী অবলম্বনেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' রচনা করেন। এখন সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামধন' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম' সম্বন্ধে দু একটা কথা বলছি—

সঞ্জীবচন্দ্রের এই 'পদোন্নতির পন্থা' একটি পরিচ্ছন্ন, অম্লমধুর, অথচ বেশ শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ। এর তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' অত্যন্ত তীব্র ও কঠোর ব্যঙ্গাত্মক রচনা।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধে গাঙ্গাপ্রহরী ও রামধনদাদার কাহিনীতে কিছুটা ব্যঙ্গ থাকলেও, তিনি এমন সহজ, সরল ও সাধারণভাবে গল্প দুটি বলেছেন যে, তাতে কারও রাগ করার বা জ্বালা অনুভব করার অবকাশ নেই। অথচ এর তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মুচিরাম' একেবারে শুরু থেকেই অনেকের রাগের কারণ হয়েছেন। যেমন—প্রথমত, মুচিরামকে যে সম্প্রদায় বা জাতির লোক বলে দেখানো হয়েছে কাহিনীর গোড়াতেই সেই সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিছু কিছু অশ্রদ্ধেয় কথা থাকায়, তারা স্বভাবতই এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ক্ষুব্ধ।

দ্বিতীয়ত, উকিল এবং ডেপুটিদের নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মুচিরামে বেশ কিছুটা বাড়াবাড়িই করেছেন। যেমন—'উকিলদের কাছেও গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়' লিখে একরূপ অহেতুক উকিলদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আর, মুচিরাম যে মূর্খ তাহাতে কিছু আসে যায় না। স্বরূপ অনেক ডেপুটি আছে। ডেপুটিগিরিতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না, একথা লিখেও তিনি ডেপুটিদের রীতিমতই হেয় করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে কিছু অযোগ্য ব্যক্তি যে ডেপুটির পদে আসীন ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে তারা কেউই মুচিরামের মত অতিবড় মূর্খ ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' লেখেন, তার কিছু দিন আগেই তাঁর মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে পরীক্ষায় ফেল হওয়ার অজুহাতে ডেপুটির চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও লিখেছেন—ডেপুটির চাকরিতে পাকা হতে হলে, তখন দুটি পরীক্ষায় পাস করতে হত। সঞ্জীবচন্দ্রের চাকরি যাওয়ার আলোচনায় আমরা আগে দেখেছি, ডেপুটির পরীক্ষা একেবারে সহজও ছিল না। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরামকে ডেপুটি খাড়া করে, ডেপুটিগিরিতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না বলে যাই লিখুন, অন্তত ডেপুটির পরীক্ষায় যে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন ছিল, তা স্বীকার করতেই হবে। অথচ ঐ বিদ্যাবুদ্ধির কণামাত্রও মুচিরামের মধ্যে ছিল না।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধে রামধনদাদার কাহিনীতে রামধনের হাকিম বা মুন্সেফ হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে এও লিখেছেন—'জজ সাহেব একবার মাত্র বলিলেন—বিচারের কার্য অতি কঠিন, রামধন মূর্খ তাহা পারিবে কি? মেমসাহেব বলিলেন—বিচারে যাহা ত্রুটি হয়, আপীলে তাহা সংশোধন হইয়া যাইবে।'

শুধু এই নয়, সঞ্জীবচন্দ্র আরও লেখেন—'রামধন বিচারে যত হউক বা না হউক রফা দ্বারা অনেক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন।'

এই সব কথা দ্বারা সঞ্জীবচন্দ্র মূর্খ রামধনকে হাকিম দেখিয়েও তার অক্ষমতার দিকটাও নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন বা দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মূর্খ মুচিরামকে ডেপুটি করে তার অক্ষমতার দিকটা নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের মত এমনভাবে দেখাতে পারেননি। আর সবচেয়ে বড় কথা, রামধনের কাহিনী পড়ে কারও ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই। তাই আমার মনে হয়, বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করলে, বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরামের চেয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের রামধন অধিকতর সার্থক সৃষ্টি। (ক্রমশ)

ভারতের 'রাবার' লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল

আমার আগের লেখায় আভাস ছিল—ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম রাবার পেতে পারে। মাদ্রাজ ও ব্যাঙ্গালোরে প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ ড্র হবার পর কানপুরে টেস্ট জিতে ভারত রাবার জয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

ছয় টেস্ট সিরিজে তিনটি টেস্ট হবার পর ক্রিকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী কিছুটা হঠকারী মন্তব্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তিনটি টেস্ট খেলার গতি-প্রকৃতি এবং দুই দেশের বোলার-ব্যাটসম্যানদের ভূমিকা খতিয়ে দেখলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, অবস্থা ভারতের অনুকূলে।

আধুনিককালে বেশির ভাগ টেস্ট ম্যাচে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয় মুখ্যত পেস বোলারদের কৃতিত্বে, কখনো বা স্পিনারের যাদুতে। পেস আক্রমণে ভারতের দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। দুর্বলতা ছিল পেসের মোকাবিলা করার ব্যাপারেও। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, ভারতের দুই পেসার কপিল দেব এবং কারসন ঘাউড়ি এখন যেটুকু সমীহ পাচ্ছেন রামকান্ত দেশাই টেস্ট খেলা থেকে অবসর নেবার পর ভারতের অন্য পেস বোলাররা তেমন সমীহ পাননি। আবার ফাস্ট বল খেলার টেকনিকেও ভারতের বর্তমান ব্যাটসম্যানরা আগের ব্যাটসম্যানদের চেয়ে বেশী দক্ষ। স্পিনারদের নিয়েই ভারতের গর্ব ছিল। এবং প্রধানত স্পিন বোলারদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করেই ভারতকে বেশ কয়েক বছর ধরে টেস্ট লড়াই চালাতে হয়েছে। বেদি, চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন এবং বেংকটরাঘবনের মতো স্পিনার একই সময়ে কোনো দেশেই দেখা যায়নি। বহু ব্যবহারে এবং বয়সের ভারে চারজনই এখন বিগত প্রতিভা বোলার। এঁরা যেমন টেস্ট-ক্রিকেট থেকে সরে গেছেন বা যাচ্ছেন, তেমন এঁদের শূন্য স্থান পূরণ করেছেন শিবলাল যাদব এবং দিলীপ দোশি। টেস্ট ক্রিকেটের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন রাজিন্দার সিং হন্স এবং আরো কিছু প্রতিশ্রুতিমান স্পিনার।

অপরদিকে ভারত সফরকারী এই অস্ট্রেলিয়া দলের যে পেস বোলারদের বলে ভারতের ইনিংস কুঁকড়ে যাবার আশঙ্কা ছিল তাঁরা নতুন জমি থেকে ফসল তুলতে পারছেন না। আমি দুই ফাস্ট বোলার রডনি হগ এবং অ্যালান হার্স্টের কথাই বলছি।

আমরা সবাই জানি, কী দারুণভাবে টেস্ট অঙ্গনে হগের প্রবেশ। বেশী দিনের কথা নয়, বছরখানেক আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েই হগ সিরিজে ৪১টি উইকেট পান মাত্র ১২·৮৫ গড় রানে। নানা রেকর্ড সৃষ্টির সুবাদে হয়ে ওঠেন বিশ্ব ক্রিকেটের নতুন তারকা। ইংল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজে অপর পেস বোলার অ্যালান হার্স্টও পেয়েছিলেন ২৫টি উইকেট। স্বদেশে ৮টি টেস্টে দুজনের সংগ্রহ ছিল ৯১ উইকেট। ব্যাটসম্যানের সমীহ আদায়কারী সেই হগ ও হার্স্ট ভারতে এসে কী পেয়েছেন? তিনটি টেস্টে ১০৯ ওভার বল করে হগ পেয়েছেন মাত্র ৬ উইকেট, দুটি টেস্টে ৫৭ ওভার বল করে হার্স্ট একটি উইকেটও না। প্রথম দুটি টেস্টে ব্যর্থতার ফলেই হার্স্টকে তৃতীয় টেস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়। তার বদলে খেলেন জিওফ ডিমক। অবশ্য কানপুরে তৃতীয় টেস্টে ডিমক যথেষ্ট ভাল বল করে দুই ইনিংসে পেয়েছেন ১২টি উইকেট। কিন্তু স্বদেশে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টে পেয়েছিলেন মাত্র ৭টি উইকেট। সুতরাং, কানপুরে ডিমকের সাফল্য অপ্রত্যাশিত। হগ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, তাঁর হাতে লাল বল আলাদীনের হাতের প্রদীপের মতো। কিন্তু ভারতে এসে হগ সমস্যায় পড়েছেন রান-আপ নিয়ে। মাদ্রাজ টেস্টে ও ব্যাঙ্গালোর টেস্টে ১৯টি করে নো-বল দিয়েছেন। কানপুর টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৩টি। তার আগে নাগপুরে মধ্যাঞ্চল দলের বিরুদ্ধে ১৪টি। নো-বল ডাকা নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে আম্পায়ারের সঙ্গে ঝগড়াও হয়ে গেছে। কিন্তু হগ কিছুতেই রান-আপ-এর ত্রুটি শোধরাতে পারছেন না। মনে খুঁত ধরলে কাজেও খুঁত থেকে যায়। মনে হয়, ভারতে এখনো পর্যন্ত হগের সাফল্য লাভ না করার ওটিই প্রধান কারণ। যাই হোক, অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণ ভারতের ব্যাটসম্যানদের মাথাব্যথার কারণ হয়নি। ব্যাটিং শক্তিও মধ্যবিত্তানার বাঁধা। ব্যাটসম্যান প্রধানত চারজন—বর্ডার, অধিনায়ক হিউজ, প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়ালপ এবং সহ-অধিনায়ক হিলডিচ। তিনটি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া করেছে মোট ১৩৫৯ রান। তার মধ্যে ওই চারজনেরই ৮৭২ রান, বাকি সবার ৪৮৭। অস্ট্রেলিয়ার ওই ১৩৫৯ রান আবার সংগৃহীত হয়েছে ৫০ উইকেটের বিনিময়ে। ভারত তিন টেস্টে ১৪১৫ রান করেছে ৪০ উইকেট হারিয়ে। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তো ব্যাট করার সুযোগই পায়নি। ওই দুই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও দুইবারই ভারত প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার রান পেরিয়ে এগিয়ে গেছে। যদি বৃষ্টিতে দুটি টেস্ট প্রায়পণ্ড না হত, তবে দ্বিতীয় টেস্টেও ভারতের জয়-সম্ভাবনা ছিল। তাই সব মিলিয়ে সিরিজে এখন পর্যন্ত ভারতেরই আধিপত্য।

সংক্ষেপে তিনটি টেস্টের আলোচনা করছি।

প্রথম টেস্ট—মাদ্রাজ

ইংল্যান্ড সফর থেকে দেশের মাটিতে প্রায় পা দিয়েই ভারতীয় দলকে মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম টেস্ট খেলতে হয়। ইতিমধ্যে কিছু পরিবর্তনও ঘটে যায়। শ্রীনিবাস বেংকটরাঘবনের বদলে অধিনায়ক নির্বাচিত হন সুনীল গাভাসকর। ওভাল টেস্টে অসাধারণ সংগ্রাম করে ভারতের যে দলটি একটু সময়ের অভাবে এবং মাত্র ৯ রানের জন্য জিততে পারেনি সেই দলেরও একটু পরিবর্তন ঘটে যায়। উইকেট-কিপার ভরত রেড্ডির বদলে আবার উইকেটকিপার হন কিরমানি। বিসেন সিং বেদির বদলে দলে আসেন দিলীপ দোশি।

টসে জিতে অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে শুরু করে মাত্র ৮ রানের মাথায় ওপেনার হিলডিচকে হারালেও উড, বর্ডার ও হিউজ অস্ট্রেলিয়া ইনিংসকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করান। বর্ডার ও হিউজের তৃতীয় উইকেট জুড়িতে ২২২ রান ভারতের বিরুদ্ধে নতুন রেকর্ড। ৫৯-৬০ সিরিজে বোম্বাই টেস্টে করা হার্ভে ও ওনীলের ২০৭ রানের রেকর্ডটি ভেঙে যায়। বাঁ-হাতী ব্যাটসম্যান অ্যালান বর্ডার ৭ ঘণ্টার ইনিংসে ২৫টি চার ও একটি ছয় সমেত ১৬২ রান করে রান-আউট হয়ে যান। অধিনায়ক হিউজ আউট হন সেঞ্চুরি পূর্ণ করে। তাঁর ১০০ রানের মধ্যে ছিল ১০টি চার ও একটি ছয়। কিন্তু ২ উইকেটে ২৯৭ রানের পর ৩৯০ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হওয়া একদিকে যেমন ব্যাটসম্যানদের রাশ আলগা করার ফল অন্যদিকে তেমন নয়টা স্পিনার দিলীপ দোশির যোগ্যতার পুরস্কার। সমশ্রেণীর বোলার বেদি পথ আগলে ছিলেন বলেই দোশি এতকাল টেস্ট খেলায় ডাক পাননি। কিন্তু জীবনের প্রথম টেস্টেই স্মরণীয় হয়ে রইলেন ৮টি উইকেট দখল করে। নিখুঁত লেংথ ও নিশানায় বল করে প্রথম ইনিংসে পান ১০৩ রানে ৬ উইকেট। এক আবিদ আলী ছাড়া ভারতের আর কোনো বোলার জীবনের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৬টি উইকেট পাননি। আবিদ আলী পেয়েছিলেন ৬৭ সিরিজে এডিলেডে।

অস্ট্রেলিয়ার ৩৯০ রানের উত্তরে ভারতীয় ইনিংসে ৪২৫ রানের মধ্যে চোখধাঁধানো ব্যাটিং করেন কপিল দেব। মাত্র ৭৭টি বল খেলে ৮৩ রান। তার মধ্যে ১৪টি মার মাঠের বাইরে। দিলীপের মতো বলে ভেল্কি দেখান লেগ স্পিনার জিম হিগস সাতটি উইকেট দখল করে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বোলিং। এক ইনিংসে ভারতের বিরুদ্ধে যারা ৭টি উইকেট পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অস্ট্রেলিয় ছিলেন ৪ জন—রে লিন্ডওয়াল, রিচি বেনো, অ্যালান ডেভিডসন ও গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি। হিগসও এঁদের পঙক্তিভুক্ত হলেন।

চতুর্থ দিন বৃষ্টির জন্য যদি ৫৫ মিনিট সময় নষ্ট না হত তবে অস্ট্রেলিয়া হয়তো চাপের মুখে পড়ত, যে চাপের মুখে পড়েছিল পঞ্চম দিনের সকালে।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংসে ৩৯০ (অ্যালান বর্ডার ১৬২, কিম হিউজ ১০০, গ্রেম উড ৩৩; দিলীপ দোশি ৬-১০৩, কপিল দেব ২-৯৫, বেঙ্কটরাঘবন ১-১০১)

ভারত—প্রথম ইনিংসে ৪২৫ (কপিল দেব ৮৩, বেঙ্গসরকার ৬৫, কিরমানি ৫৭, যশপাল শর্মা ৫২, গাভাসকর ৫০; জিম হিগস ৭-১৪৩, রডনি হগ ২-৮৫, গ্রাহাম ইয়ালপ ১-২১)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইঃ ২১২ (অ্যান্ড্রু হিলডিচ ৫৫, অ্যালান বর্ডার ৫০, কিম হিউজ ৩৬; বেঙ্কটরাঘবন ৩-৭৭, দিলীপ দোশি ২-৬৪, কপিল দেব ১-৩০)

(খেলা ড্র)

দ্বিতীয় টেস্ট—ব্যাঙ্গালোর

বৃষ্টি বাধা সৃষ্টি না করলেও প্রথম টেস্ট ড্র-ই হত। কিন্তু নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় টেস্টে বৃষ্টি অস্ট্রেলিয়ার সহায় হয়েছে। প্রথম ইনিংসে ১২৪ রানে ভারত এগিয়ে গিয়েছিল। শেষ দিন লাঞ্চের কিছু পরে অস্ট্রেলিয়া ৩টি উইকেট হারিয়েছিল ৭ রানে। অথচ আগে ২৫ মিনিট খেলা হয়নি বৃষ্টির জন্য এবং বৃষ্টির জন্যই বেলা আড়াইটায় আম্পায়াররা খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। প্রথম দিন খেলা শুরু হয় ৯৫ মিনিট পরে। এবং তৃতীয় দিন খেলা হয় মাত্র ১০০ মিনিট। বৃষ্টির জন্য এত সময় নষ্ট হলে খেলার ফল আশা করা যায় না।

এ টেস্টের উল্লেখ করার মতো ঘটনা বেঙ্গসরকর ও বিশ্বনাথের সেঞ্চুরি এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ উইকেট জুড়িতে দুজনের ১৫৯ রানের রেকর্ড। যেন লর্ডস টেস্টের খেলাই খেলেছেন দুজন। বিশ্বনাথের নট আউট ১৬১ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। আগের বড় রান ছিল বিজয় হাজারের ১৪৫। করেছিলেন ৪৭-৪৮ সিরিজে এডিলেডে।

বিশ্বনাথের এটি দশম টেস্ট সেঞ্চুরি, বেঙ্গসরকরের চতুর্থ—চারটিই এক বছরে করা। ছয় ঘণ্টার ইনিংসে বেঙ্গসরকারের ১১২ রানে চারের মার ছিল ১২টি, ছয়ের একটি। বিশ্বনাথ উইকেটে ছিলেন পৌনে সাত ঘণ্টা।

হায়দরাবাদের অফ স্পিনার শিবলাল যাদবের টেস্ট অভিষেক হয় এখানে। ৪৯ রানে ৪ উইকেট তাঁর প্রাপ্য লেগের বাঞ্ছিত কৌলিন্যের পুরস্কার।

গাভাসকর মাত্র ১০ রান করলেও এখানেই তাঁর পাঁচ হাজার টেস্ট রান পূর্ণ হয়। বেশী রান সংগ্রহে গাভাসকর হন পৃথিবীর পঞ্চদশ ব্যাটসম্যান, ৫২টি টেস্ট খেলে।

এই টেস্টেই হগকে বার বার নো-বল ডাকায় আম্পায়ারের উপর ক্ষেপে গিয়ে মিডল স্টাম্প লাথি মেরে উপড়ে ফেলেন। পরে অবশ্য তিনি ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটি মিটিয়ে নেন। অধিনায়ক হিউজও তাঁর খেলোয়াড়ের আচরণের জন্য আম্পায়ারের কাছে ক্ষমা চান। অস্ট্রেলিয়া দলের ম্যানেজার বব মেরিম্যানও সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন, ব্যাপারটি মিটে গেছে।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংসে ৩৩৩ (কিম হিউজ ৮৬ অ্যান্ড্রু হিলডিচ ৬২, অ্যালান বর্ডার ৪৪, ব্রুস ইয়ার্ডলি ৪৭; শিবলাল যাদব ৪-৪৯, কারসন ঘাউড়ি ২-৬৮, কপিল দেব ২-৮৯, বেঙ্কটরাঘবন ১-৬৩, দিলীপ দোশি ১-৪৩)।

ভারত—প্রথম ইনিংসে ৫ উইঃ ডিক্লেঃ ৪৫৭ (বিশ্বনাথ নট আউট ১৬১, বেঙ্গসরকার ১১২, কপিল দেব নট আউট ৩৮, যশপাল শর্মা ৩৭; ব্রুস ইয়ার্ডলি ৪-১০৭, জিম হিগস ১-৯৫)।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইঃ ৭৭ (গ্রেম উড ৩০; শিবলাল যাদব ৩-৩২)।

(খেলা ড্র)

তৃতীয় টেস্ট—কানপুরে

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত প্রথম টেস্ট ম্যাচ জিতেছিল কানপুরের মাঠে ২০ বছর আগে। রিচি বেনোর সেই শক্তিশালী দলকে পরাজিত করার প্রধান নায়ক ছিলেন স্পিনার জেসু প্যাটেল। পেয়েছিলেন ১২৪ রানে ১৪টি উইকেট। এবার ১৫৩ রানে জয়ের মূলে আছে কপিল দেবের পেস এবং নবাগত শিবলাল যাদবের স্পিন বোলিং। অবশ্যই তার সঙ্গে আছে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানদের দায়িত্বহীন ব্যাটিং। না হলে প্রথম ইনিংসের ব্যাটিংয়ে ৩৩ রানে এগিয়ে থেকে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৪৮ রানের মধ্যে ভারতের দুই শক্ত খুঁটি গাভাসকর ও বেঙ্গসরকারকে সরিয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার হারার কথা নয়। নিজেরা দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম দিকে বাজে স্ট্রোক করে উইকেট দিয়েছেন। পরে বাকি ব্যাটসম্যানরা আর রাশ টেনে রাখতে পারেননি।

কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, প্রথম দুটি টেস্টে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে গিয়েও ভারত জিততে পারল না, আর কানপুরে পেছনে থেকে এবং শেষ ৭ জন খেলোয়াড় প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫ রান যোগ করেও টেস্ট জিতে গেল। তবে এ জয়ের জন্য কপিল ও শিবলালের সঙ্গে অবশ্যই প্রশংসা প্রাপ্য চৌহান বিশ্বনাথ এবং কিরমানির। তিনজন দ্বিতীয় ইনিংসে অসাধারণ দৃঢ়তা না দেখালে ফল উল্টোও হতে পারত।

আমার ধারণা, যাঁদের উপর অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং শক্তি নির্ভরশীল তাঁদের অহেতুক হঠকারিতাই পরাজয়ের প্রধান কারণ। ম্যাচ জেতার জন্য অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল ২৭৯ রান। সময় ছিল ২৫২ মিনিট এবং ২০টি ম্যান্ডেটরি ওভার। ওই সময়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো তেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার না। হয়তো জয়ের চিন্তাই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দিকের ব্যাটসম্যানদের হঠকারী হতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। তার ফলে ডার্লিং (৪), ইয়ালপ (১৫), হিউজ (১) বর্ডার (৮), প্যাভিলিয়নে ফিরে যান অগৌরবের গ্লানি নিয়ে। বাকি খেলোয়াড়দের মনোবল এবং প্রতিরোধ শক্তিও ভেঙে পড়ে। কপিল দেব এবং শিবলাল যাদব অবশ্যই ভাল বল করেছেন। তবু বলব, ভারতের জয় সম্ভাবনা শেষ দিনের সকালেও খুব উজ্জ্বল ছিল না। পিচও ছিল প্রায় অক্ষত।

ভারত—প্রথম ইনিংসে ২৭১ (গাভাসকর ৭৬, চৌহান ৫৮, বেঙ্গসরকর ৫২, বিশ্বনাথ ৪৪; জিওফ ডিমক ৫-৯৯, রডনি হগ ৪-৬৬, অ্যালান বর্ডার ১-৩)।

অস্ট্রেলিয়া—৩০৪ (গ্রাহাম ইয়ালপ ৮৯, রিক ডার্লিং ৫৯, কিম হিউজ ৫০; ঘাউড়ি ৩-৬৫, শিবলাল যাদব ২-৬৫, বেঙ্কটরাঘবন ১-৫৬, দিলীপ দোশি ১-৩২)।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১১ (চৌহান ৮৪, বিশ্বনাথ ৫২, কিরমানি ৪৫; ডিমক ৭-৬৭, ইয়ার্ডলি ২-৮২, হগ ১-৪৯)।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৫ (হোয়াটমোর ৩৩, হিলডিচ ২৩; শিবলাল যাদব ৪-৩৫, কপিল দেব ৪-৩০, দিলীপ দোশি ১-১৪, ঘাউড়ি ১-২৮)।

(ভারত ১৫৩ রানে জয়ী)

মুকুল

ফটো : নিখিল ভট্টাচার্য

ফাস্ট বোলার তৈরির কী হল

শিবাজী দাশগুপ্ত

কিছুদিন আগে পংকজ রায়ের সংগে তাঁর বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। কথা প্রসংগে তিনি বললেন, "ভারতের হয়ে ওপেন করবার কাজটি দুরূহ। একথা সত্যি যে, সব ওপেনিং ব্যাটসম্যানকেই ফাস্ট বল ভালভাবে খেলতে হয়; এর মধ্যে বাম্পার টাম্পারও দু-চারটে থাকবে। কিন্তু এই বাম্পারের প্রয়োগ একটু বেশী মাত্রায় হয় যদি বিপক্ষের জানা থাকে অন্য দলে তেমন জুৎসই ফাস্ট বোলার নেই। যেহেতু ভারতে তেমন জোরদার ফাস্ট বোলার নেই সেই কারণে বাম্পারের প্রয়োগ ভারতের ওপেনারদের উপর একটু বেশী মাত্রায় হয়েছে।"

পংকজ রায় ভারতের হয়ে ৪৩টি টেস্ট খেলেছেন এবং পাঁচটি সেঞ্চুরী সমেত দু হাজারের কিছু বেশী রান করেছেন। সুতরাং তাঁর এই উপলব্ধির একটা মূল্য আছে। মোদ্দা কথা, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উপযুক্ত ফাস্ট বোলার ছাড়া লড়াই চালানো কষ্টকর।

এই প্রসংগে ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত ওপেনিং ব্যাটসম্যান লেন হাটনের মনোভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। তিনি টেস্ট খেলেছেন ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত। তাঁর সময় ইংল্যাণ্ড দলের নতুন বলে বোলিং-এর দায়িত্ব ছিল মিডিয়াম ফাস্ট বোলার আলেক বেডসারের উপর। স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের মতে বেডসারের মতন সুনিপুণ মিডিয়াম পেস বোলার তিনি তাঁর খেলোয়াড় জীবনে আর দেখেননি। তবুও বেডসারকে হাটনের তেমন মনঃপূত ছিল না। যে বোলার ২৩৬টি টেস্ট উইকেট নিয়ে উইকেট লাভের তালিকায় শীর্ষে ছিলেন বহুদিন, তাঁকে হাটনের এত অপছন্দ কেন? কারণ, বেডসার বাম্পার প্রায় দিতেন না বললেই চলে। আর ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে বিপক্ষ দলের বাম্পারগুলি হজম করতে হত হাটনকেই! খেলোয়াড় জীবনের শেষ দিকে হাটন তাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন উপযুক্ত ফাস্ট বোলার খুঁজে বার করতে। স্ট্যাথাম, টাইসন ও ট্রুম্যানকে পেয়ে তাই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

পংকজ রায়ের ধারণার সংগে হাটনের মনোভাব হুবহু মিলে যাচ্ছে। হাটনের দেশ ইংল্যাণ্ড উপযুক্ত প্রতিভা খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু আমরা আজও অন্ধকারে উপায় হাতড়াচ্ছি। শোনা যায়, মহম্মদ নিসার বা সুঁটে ব্যানার্জি দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার ছিলেন। আমরা যারা প্রাচীন নই, তারা এঁদের নাম ক্রিকেট ইতিহাসেই পেয়েছি, এঁদের ক্রীড়া প্রতিভা দেখার অবকাশ আমাদের হয়নি। তবে ঐ সময় যদি ভারতের মাটিতে ফাস্ট বোলার হয়ে থাকে আজই বা হবে না কেন?

বলব না আমাদের ক্রিকেট প্রশাসনের কর্তারা এই সমস্যাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। স্মরণ থাকতে পারে ১৯৬২-৬৩ মরসুমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে চার চারজন ফাস্ট বোলার নিয়ে এসে জোনাল ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। রয় গিলক্রিস্ট, লেস্টার কিং, চার্লি স্টেয়ার্স ও ওয়াটসন ফিরে যাওয়ার সংগেই কি ফাস্ট বোলার গড়বার কাজ শেষ? প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান যদি সরফরাজ, ইমরান বা সিকান্দার বখত-এর মতন ফাস্ট বোলারের মুখ দেখতে পায়, তবে আমরাই বা পাবো না কেন? পাকিস্তানে কিভাবে ফাস্ট বোলার তৈরী হয় তা আমাদের জানা নেই। আমাদের দেশে কেন ফাস্ট বোলার হচ্ছে না, সে সম্পর্কে মতামত নিলাম বাংলারই একজন নামজাদা পেসারের। দীর্ঘ পনেরো বছর তিনি ক্রিকেট খেলছেন

ফাস্ট বোলার হতে গেলে কাউকে আদর্শ রেখে এগোনো প্রয়োজন। আমাদের দেশে ইদানীংকালে তেমন ফাস্ট বোলার আর কে হয়েছেন? সুতরাং এ যুগের ছেলেরা জোরে বল করবার অনুপ্রেরণা পাচ্ছে না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে উইকেটের হাল। আমাদের দেশে দ্রুত বোলারদের সাহায্য করে এমন উইকেট পাওয়া যায় না। একথা অনস্বীকার্য যে, ফাস্ট বল করতে গেলে প্রচুর মেহনত করতে হয়। সে তুলনায় স্পিনারদের মেহনত অনেক কম অথচ একটি উদীয়মান ফাস্ট বোলার যদি অনেক পরিশ্রম করেও একটিও উইকেট না পায়, উপরন্তু দেখে যে স্পিনাররা অনায়াসে উইকেট তুলে নিচ্ছে তাতে কি তার মনোবল ভাঙবে না? ভারতীয় ক্রিকেটে বিগত ১৫-২০ বছর ধরে ঠিক এই নিয়মই চলে আসছে। কি অনুপ্রেরণা পাবে আমাদের দেশের উঠতি ফাস্ট বোলাররা? বরঞ্চ চন্দ্রশেখর, বেদী, প্রসন্ন, ভেংকটই আজকের তরুণদের আদর্শ। তারা দেখছে এঁরাই ঝুড়ি ঝুড়ি উইকেট পেয়েছেন বা পাচ্ছেন। এই অনুপ্রেরণাই ছোট ছোট ছেলেদের স্পিন বলের দিকে আকৃষ্ট করছে।

তবু এর মধ্যেই একটা চেষ্টা হয়েছে। একটি সরকারী ব্যাংকের পক্ষ থেকে অল্প বয়সী ছেলেদের বেছে নিয়ে ফাস্ট বোলার গড়বার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছিল। প্রশিক্ষণে ছিলেন দাতু ফাদকার, সুব্রত গুহ, টি জে ব্যানার্জী প্রভৃতি। কিন্তু প্রয়াস ব্যর্থ হয় মূলত উপযুক্ত মাঠের অভাবে।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ভাল মাঠের ব্যবস্থা হয়তো বা আছে, কিন্তু কলকাতায় এতদিন ছিল না। ক্রিকেটের জন্য মাঠ বরাদ্দ মাত্র মাস তিনেক। পরে সেই মাঠেই হকি এবং ফুটবল খেলা হয়। বলতে পারেন কেন ইডেন গার্ডেন? সকলেরই জানা আছে বৃষ্টির ফলে ইডেন গার্ডেন্স পুরো বর্ষাকাল (যা প্রায় পাঁচ মাস স্থায়ী) ক্রিকেটের অযোগ্য হয়। তবে সম্প্রতি যে ইনডোর নেট প্র্যাকটিস সেণ্টার গড়ে

একক প্রচেষ্টাতেও দু-চারজন প্রাক্তন ফাস্ট বোলার এগিয়ে এসেছেন ফাস্ট বোলার গড়বার কাজে। এক সময় তো দাতু ফাদকার বেশ কিছু তরুণকে হাতে নিয়েছিলেন তালিম দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু উত্তর-জীবনে অনেকখানি এগিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। এই ব্যর্থতা আমাদের নৈরাশ্যের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। এই অসফলতা অনেক কারণে আসতে পারে। মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেটে পিচ থেকে পেসাররা সাহায্য পান না। একথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয়ত শারীরিক অপটুতা থাকলে তেমন উঁচু মানের ফাস্ট বোলার হওয়া যায় না। কাঁধের ও পায়ের পেশী অতিরিক্ত শক্তিশালী হওয়া দরকার। বাছাই পর্বে এই দিকে নজর রাখতে হবে। তৃতীয়ত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অসাফল্যই কি ভবিষ্যতের কোন বড়সড় পরিকল্পনার পরিপন্থী?

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কোচিং-এর ব্যাপারে ইদানীং কিছুটা উৎসাহ দেখাচ্ছেন। বছর কয়েক আগে তাঁরা প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় হেমু অধিকারীকে প্রধান প্রশিক্ষক মনোনীত করেছিলেন। পরে জোনাল ভিত্তিতে ভাগ করে আরও পাঁচজন কোচ নিযুক্ত করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এঁদের পরিকল্পনা কতখানি জোরদার? ফাস্ট বোলার গড়বার দিকটাই বা তাঁরা কতখানি ভাবছেন।

ফাস্ট বোলার গড়বার ব্যাপারেও বোর্ড খুব সম্প্রতি একটি পৃথক ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা স্থির করেছেন উদীয়মান ফাস্ট বোলারদের অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হবে উপযুক্ত তালিমের জন্য। খুব অল্প বয়সের ছেলেদের যদি এই পরিকল্পনা মাফিক অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হয়, তবে সুফল পাওয়ার আশা অবশ্যই আছে। বাছাই পর্ব ও ফলো-আপ পদ্ধতি সুনিশ্চিতভাবে নিপুণ হাতে করা দরকার। এমন একজনকেও যেন পাঠানো না হয় যে প্রতিশ্রুতিবান নয়। অথবা ফিরে আসার পর এই ছেলেরা যেন ভীড়ের মাঝে হারিয়ে না যায়।

তবু মনে রাখতে হবে যে, আমাদের পীচগুলি ফাস্ট বোলিং এর উপযোগী করে তুলতে হবে। নিষ্প্রাণ উইকেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বল করিয়েও হয়তো বহু প্রতিভাবান ও নবীনদের কাছ থেকে ফাস্ট বোলিং-এর সুফল পাওয়া যাবে না। তখন কি এঁদের আবার খরচের খাতায় তুলে রাখতে হবে? ১৯৭৮-৭৯ সিরিজে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাদ্রাজ টেস্টের পর সুনীল গাভাসকর বলেছিলেন, এই ধরনের পীচই তাঁর পছন্দ। ফাস্ট বোলার সহায়ক এই উইকেটে তিনি রান করেছিলেন ৪ ও ১। তিনি আরও বলেছিলেন যে, হঠাৎ টেস্ট ম্যাচে ঐ ধরনের উইকেট গড়লেই চলবে না, রনজি ও দলীপ ট্রফিতেও এই ধাঁচের উইকেট প্রয়োজন।

সবশেষে বাংলা বর্তমানে যে সুযোগটুকু পাচ্ছে, তার দিকে চোখ ফেরানো যাক্। আগে আগে বেশ কয়বার বাংলার প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়দের প্রশ্ন করেছি, "কেন বাংলা ১৯৩৮ সালের পর রনজি ট্রফি আর পায় নি?" উত্তরে সবাই বলেছেন যে, এখানে ক্রিকেট মরসুম অল্পমেয়াদী এবং শুরু হয় অন্যান্য জায়গায় খেলা হয়ে যাওয়ার দুই-তিন মাস পরে। তা ছাড়া মরসুমের আগে বা পরেও কোন অনুশীলন হয় না। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় যে ইনডোর প্র্যাকটিস কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তা অবশ্যই এ অসুবিধা ঘোচাবে। তবে ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাব হয়তো পূরণ করা যাবে না।

এই কেন্দ্রে ফাস্ট বোলার তালিম দেওয়ার ব্যাপারটিও ভেবে দেখা যেতে পারে। যে সরকারী ব্যাংক সংস্থা এতদিন স্থানাভাবে তাঁদের প্রচেষ্টাকে পুরোপুরি সফলতা দিতে পারছিলেন না, তাঁরা হয়তো বা এই সুযোগ নিতে পারবেন। বাংলা থেকে সুঁটে ব্যানার্জী, পুটু চৌধুরী, দুর্গাশংকর মুখার্জী, সুব্রত গুহ, বরুণ বর্মন প্রভৃতি বেশ কিছু ভাল পেস বোলার বেরিয়েছে। এবার আশা করা আবার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

বিশ্বশিল্পের রূপরেখা। অলোক মুখোপাধ্যায়। একমাত্র পরিবেশক : দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। মূল্য ৭৫ টাকা।

বাংলা ভাষায় শিল্পকলার বই খুব বেশি নেই। তথ্যসমৃদ্ধ এবং সাহিত্যমূল্যে মূল্যবান গ্রন্থের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়। এর একটি কারণ হল, শিল্পকলা সম্বন্ধে শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তের সহ-জ অনীহা। অন্য কারণ হল, এ বিষয় বাঙালী প্রাবন্ধিকের অর্জিত অজ্ঞতা। অজন্তা, কোণারক, অবনীন্দ্রনাথ, বড় জোর যামিনী রায়, আর আংরেজী কেতা-দুরস্ত হলে বাইজেনটাইন, মাইকেল-এঞ্জেলো, গগ্যাঁ, গঘ এবং ইত্যাদি। বাঙালী অধ্যাপক বলতে পারেন চতুর হেসে নির্লজ্জের মতো "শিল্পকলা অ-ব-শ্য আমি তেমন বুঝি না"—তখন বুদ্ধি এবং নির্বুদ্ধিজীবি মহলে তার প্রতিধ্বনি হয় "বুঝি না সুঝি না।" সুতরাং অলোক মুখোপাধ্যায়ের এই সুন্দর প্রয়াসের প্রথমেই পঞ্চমুখে প্রশস্তি করব। একজন চার্টার্ড একাউন্টেণ্ট, পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে ইউরোপ আমেরিকায় যাদুঘরে, আস্ত এবং ভাঙ্গা প্রাসাদ আর মন্দির ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, তথ্য সংগ্রহ করলেন, সে বিষয় গ্রন্থ পড়লেন, রোজনামচা রাখলেন, এটা ভাবলেই রোমহর্ষ হয়।

বাংলা ভাষায় শিল্পকলার বই বেশি লেখা না হলেও যা লেখা হয়েছে তা বিদগ্ধ পাঠককে লক্ষ্য করে। অবনীন্দ্রনাথের "ভারতীশিল্পে ষড়ঙ্গ" 'শিল্পায়ন", "বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী" থেকে সিভিলিয়েন অশোক মিত্রের "পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা" এবং "ভারতের চিত্রকলা" থেকে সরসীকুমার সরস্বতীর "পালযুগের চিত্রকলা". নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে সুরেন দাশগুপ্তের "সৌন্দর্যতত্ত্ব" এবং হালে সত্যজিৎ চৌধুরীর 'অবনীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব' পর্যন্ত বইগুলির লক্ষ সারস্বত পাঠক। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ে সহজ ভাষায় গ্রন্থ রচিত হতে পারে বলে একদল চিন্তাবিদ মনে করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ী চৌহদ্দির বাইরে, সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মেটানো দরকার। একসময় জনশিক্ষার জন্য বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছে বিশ্ব-বিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা। অ্যাংলো স্যাকসন জগতে তেমনি সে সময় প্রকাশিত হয়েছে এইচ জি ওয়েলসের "সর্ট হিস্ট্রী অব দ্য ওয়ারলড", উইল ডুরাণ্টের "স্টোরি অব ফিলসফি"। এইসব গ্রন্থের লেখক জানতেন তাঁদের পাঠক কারা তাই সাধারণ পাঠককে মোহিত করে তাঁদের জানার ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। অলোক মুখোপাধ্যায়ের লক্ষ্য হল সাধারণ পাঠককে শিল্পকলা অনুরাগী করা এবং সে জন্যে তাঁর অনুসন্ধান-প্রবণতার আয়োজনে ত্রুটি নেই। অর্থাত বিদ্যা ব্যাপক বলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে কী সহজপাচ্য তা ভাবতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর মনে কখনো এ বিষয়ে দ্বিধা হয়েছে এবং কখনো কখনো বিদগ্ধ পাঠকের উপযোগী খাদ্য পরিবেশন করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু বিষয়টা এমন গভীর এবং জটিল যে এছাড়া অন্য কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। "সর্ট হিস্ট্রী" বা "স্টোরি অব ফিলসফি" পড়তে গেলে পাঠকের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা দরকার হয়।

তিনি এমন একটা বিষয় নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করতে বসেছেন যে "রূপরেখা" মধ্যযুগ পেরিয়ে এ পাশ আসেনি। আলোচনাকে স্থাপত্য ভাস্কর্যের মধ্যে সীমিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এই স্বেচ্ছা আরোপিত সীমার মধ্যে তাঁর রেখাচিত্র অঙ্কন মোটের ওপর সাবলীল এবং মনোজ্ঞ। যা তিনি সচক্ষে দেখেননি সে-বিষয় আলোচনা করেননি—এই সততাই তাঁর বইটিকে সুন্দর করেছে। স্থানাভাবে তাঁকে অনেক সময় খুবই সংক্ষেপে কাজ সারতে হয়েছে। গ্রন্থের স্থাপত্যকলার বেশ কিছুটা অংশে তিনি স্যার
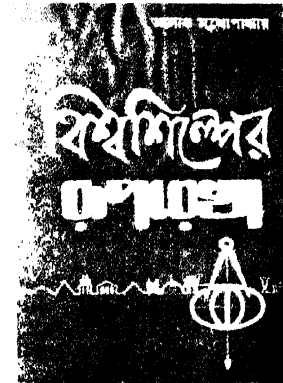
বেনিস্টার ফ্লেচারের "হিস্ট্রী অব আর্কিটেকচার অন দ্য কমপেরেটিভ মেথড"-এর অনুসরণ করেছেন এবং এইসব স্থানগুলো খুবই গভীর।

গ্রন্থের সম্পদ হল এর আলোকচিত্রগুলি। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের অমন এবং অতগুলো আলোকচিত্র দেওয়া বই ইতপূর্বে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। মালরো এমন গ্রন্থকে বলেছিলেন "দেওয়ালহীন যাদুঘর"। পাঠকের চোখের কাছে নন্দনবস্তু হাজির করার জন্য তিনি সাধুবাদের যোগ্য। চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া বা ইন্দোচীনের স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে তিনি আলোচনা টানা প্রয়োজন মনে করেননি, কারণ সচক্ষে কিছু না দেখে তিনি লেখেননি। এই নীতি গ্রন্থখানিতে অন্যতর স্বাদ এনেছে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য লেখক প্রতিটি অধ্যায় শেষে গ্রন্থসূচী দিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে জ্ঞানলাভের জন্য এমন একটি বই অলোক মুখোপাধ্যায় রচনা করেছেন সেজন্যে আমরা গর্বিত। এই গ্রন্থ যদি তাঁর পরবর্তী রচনাকার্যের সূচনার পূর্বাভাস হয়, তাহলে আমরা তাঁর পরবর্তী সাফল্যের বিষয় নিঃসন্দেহ।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ১০৯ তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ১ থেকে ৭ সেপটেমবর রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি ও অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের সহযোগিতায় অ্যাকাডেমি ভবনে একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল।

প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের ৫৭ খানি ছবি, গগনেন্দ্রনাথের ৫০ খানা এবং অন্যান্য শিল্পীদের ২৪ খানা ছবি দেখান হয়েছে। ওড়িশা ও রাজপুত শৈলীর কিছু রঙ্গীন ও রেখাচিত্র ছাড়া অন্যান্য যেসব শিল্পীদের কাজ প্রদর্শিত হয়েছে তাঁরা সবাই অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য প্রশিষ্য। যদিও ক্যাটালগে এঁদের "আর্টিস্ট আননোন" বলা হয়েছে, তাহলেও এই ছবিগুলির ভিতর নন্দলাল, বিনোদবিহারী, মুকুল দে এবং রানী চন্দ প্রভৃতির একাধিক স্বাক্ষরিত রঙ্গীন বা রেখাচিত্র এবং দে-মশাইয়ের ড্রাই-পয়েন্ট এচিং দেখা গেল। শিষ্য প্রশিষ্যদের কাজগুলির বেশীর ভাগই ছোটখাটো কাজ এবং এঁদের তরুণ বয়সের শিল্পকর্ম। অনেকের কাজেই নতুন পথে চলা তরতাজা ভাবনা চিন্তার আনন্দের আমেজটি প্রস্ফুটিত হয়েছে।

এ-প্রদর্শনী যাঁরা দেখতে এসেছেন তাঁরা অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখতেই প্রধানত এসেছেন। গগনেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের ছবি দেখতে পাওয়াটা তাঁদের উপরি পাওনা। গগনেন্দ্রনাথের ছবির সংগ্রহ রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির কাছে কিরকম আছে জানি না, কিন্তু প্রদর্শনীতে তাঁর অনেক ধরনের ছবির উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা গেল না।

অবনীন্দ্রনাথের বা গগনেন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের রসোপলব্ধি আজকের যুগে যথাযথভাবে করতে হলে তাঁদের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকে বোঝা দরকার। ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সংঘাতে আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠে জাতীয় নব জাগরণের আন্দোলন। দেশে সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের হল নব মূল্যায়ন। ইউরোপীয় সংস্কৃতির নবলব্ধ জ্ঞান সারা পৃথিবীর মানুষ ও তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অনুসন্ধিৎসু করে তুলল। দৃষ্টি ও মননের ক্ষেত্র করল প্রসারিত।

উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে দেশের নবজাগরণের পীঠস্থান ছিল বাঙলাদেশ কলকাতা শহর। সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় শিল্প আন্দোলনেরও জন্ম হয় এই শহরেই। বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ঠাকুর পরিবারের দান অসামান্য। এই পরিবার থেকেই অবনীন্দ্রনাথ রূপ দিলেন জাতীয় শিল্প আন্দোলনের।

গ্রামীণ শিল্পীদের সাধনা। কিন্তু নানা কারণে অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাত তার বহমানরূপটি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশের পশ্চিমী শিক্ষাপ্রাপ্ত নতুন শহুরে "এলিট", শিল্পের চর্চায় নিজেদের একটি স্থান করে নিলেন। শুরু হল শিল্প-বিদ্যালয় এবং পশ্চিমী করণকৌশল ও শিল্প রীতিনীতির চর্চা। অবনীন্দ্রনাথও ইউরোপীয় শিল্পরীতি ও করণকৌশল সযত্নে চর্চা করেছিলেন এবং তাতে কি অসাধারণ পটুতা অর্জন করেছিলেন তা তাঁর যৌবনকালে করা সূক্ষ্ম কালিকলমের চিত্রগুলি দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু বেশী দিন তিনি ইউরোপীয় রীতিনীতিতে আটকে থাকেন নি। কলকাতার নতুন সাংস্কৃতিক নব মূল্যায়নের আবহাওয়া অবনীন্দ্রনাথকে একটি আধুনিক জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করল। ঠাকুরবাড়ির অনবদ্য সাংস্কৃতিক আবহাওয়া, রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ এবং বড় ভাই মহৎশিল্পী গগনেন্দ্রনাথের সাহচর্য তাঁকে সাহায্য করল ধীরে ধীরে একটি শিল্পী-মণ্ডলী গড়ে তুলতে, যাঁরা নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় রত হলেন—দেশী বিদেশী শিল্পের নানা রীতি নীতি করণ কৌশল নিয়ে। ইউরোপের সঙ্গে দৃষ্টি পড়ল প্রাচ্যের চীন জাপানের শিল্প সংস্কৃতির প্রতি। আলোচনা চলল। নন্দনতত্ত্ব নিয়ে কুমারস্বামী, হ্যাভেল, ওকাকুরা ইত্যাদি দেশ বিদেশের তো ছিলেনই।

অবনীন্দ্রনাথ কোনো সংকীর্ণ নন্দনতত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন না। বারবার তিনি বলেছেন দেশী বা বিদেশী কোনও কিছুর অনুকরণ করা শিল্প নয়। রচনা যেখানে রচয়িতার স্মৃতি ও কল্পনার কাছে ঋণী সেখানেই সে "আর্ট"। রসের তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়েছে যখন রচয়িতার শিল্পরচনার মাধ্যমে—তখনই তা আর্ট। করণ কৌশল রীতি নীতি উপকরণ সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রকৃত শিল্প সৃষ্টির জন্য তার সামান্যই প্রয়োজন হয়। শিষ্যদের তিনি অনুকরণের পথে না গিয়ে শিল্পসিদ্ধ চক্ষু ও মন লাভ করবার চেষ্টা করতে বলেছেন নিজের দেশের মাটিতে পা রেখে।

প্রথম যৌবনে ইউরোপীয় শিল্প রীতি পদ্ধতি শেখবার পর অবনীন্দ্রনাথ মোগল শৈলীর করণকৌশল আয়ত্ত করেন আর আয়ত্ত করেন জাপানের জলরঙ-এ "ওয়াশ" দেওয়া ছবির পদ্ধতি। তাঁর শিষ্যেরা দেশের নানা প্রান্তের গ্রামীণ শিল্পী ও কারিগরদের সঙ্গ করে সংগ্রহ করেন নানা করণ-কৌশল এবং অবহেলিত গ্রামীণ শিল্পী ও কারিগরদের সম্বন্ধে নতুন সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রথম জীবনে করা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় পদ্ধতির ড্রইংগুলি ছাড়া অবনীন্দ্রনাথের প্যাস্টেলে করা মুখাবয়ব ও মুখোশগুলিতেও ইউরোপীয় পদ্ধতির অতি সুন্দর প্রয়োগ দেখা

অবনীন্দ্রনাথ (স্বপ্রতিকৃতি)

যায়। জল রং-এ করা পূর্ববঙ্গের অনবদ্য দৃশ্যচিত্রের কয়েকটি প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছে। দেখান হয়েছে "অ্যারাবিয়ান নাইটস্" গুচ্ছের কয়েকটি চিত্র। রং রস রূপরেখায় অনবদ্য ছবিগুলিতে তাঁর মোগল ও রাজপুত শৈলীর জ্ঞানের সঙ্গে জাপানী করণ-কৌশলের জ্ঞান অপূর্বভাবে ব্যবহার করেছেন। নিজের যুগ ও পরিবেশে বসে বক্তব্য, স্মৃতি ও কল্পনার প্রকাশ করতে যখন যে করণকৌশল তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন তার ব্যবহার করেছেন অকপটে। নানা করণ কৌশল ও ড্রইং-এর উপর অসাধারণ দখল তাঁর সব রকম কাজেই দেখা যায়। প্রদর্শনীতে তাঁর নানা সময়ে আঁকা তেল রঙ, জল রং, ওয়াশের কাজ, তুলি-কালি ও কালি-কলমের কাজ দেখানো হয়েছে। এমনকি বৃদ্ধ বয়সের মোটা আঁচড়ের কাজেও তাঁর রূপদক্ষ সাবলীল হাতের ও পরিণত শিল্পিমনের স্পর্শটুকু বর্তমান। 'লেডি অব দি কিংস'-এর মতো দু'একটি ছবি আছে যেগুলি অনুসরণ করে তাঁর কিছু শিষ্য প্রশিষ্য রোমান্টিক "ওরিয়েন্টাল আর্ট"-এর প্রবর্তন করেন। অন্য ছবি-গুলি তাঁর নিজস্ব মেজাজের অনবদ্য কাজ—নানা শিল্প রীতিনীতি, করণ-কৌশল নিয়ে আনন্দের খেলা।

দাদা গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছু ব্যঙ্গচিত্রও তিনি এঁকে-ছিলেন যার দু'একটি উদাহরণ প্রদর্শনীতে ছিল।

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ সে যুগে একটি অত্যন্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আকৃতি, রঙ, ভেঙেচুরে যে সব পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন তার কিছু নিদর্শন, দু-একটি ব্যঙ্গচিত্র এবং তাঁর তুলি কালি ও পেনসিলের অনেকগুলি ছোট কাজ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল অত্যন্ত ক্ষমতাবান শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ তাঁর যুগের বিস্ময়। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের আওতায় তাঁর শিল্প-কর্মের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি।

প্রদর্শনীর বহু ছবিই কোনওকালে অযত্নে পোকা কবলিত হয়েছিল, বর্তমানে সেগুলো শোধন করে নেওয়া হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে একটি চালু সমালোচনা আছে যে, তাঁর কাজ খুব 'ইলাসট্রেটিভ'—অর্থাৎ তাঁর ছবি প্রায়শই কিছু গল্প বলে। এই আলোচনা করবার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার—অবনীন্দ্রনাথের কাছে আজকের যুগের শিল্পীর দৃষ্টি-ভঙ্গি (যে দৃষ্টিভঙ্গিও ইউরোপ থেকে আমদানি করা) আশা করা অন্যায়। ঊনবিংশ শতব্দীর দ্বিতীয় পাদে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যলিউশন) পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পকর্মের ভেতর দিয়ে শিল্পীর নিজস্ব ভাবনা চিন্তার প্রকাশের বা সাহিত্যের আনুগত্য থেকে শিল্পকে বার করে আনবার প্রয়াস শুরু হয়।

কিন্তু আজকের জগতে যেখানে দূরত্বের কোনও মূল্যই নেই—সেখানেও যখন আমরা ইউরোপের শিল্প আন্দোলনকে সর্বদা অনুসরণ করবার চেষ্টা করেও তাদের ভাবনা চিন্তা থেকে ১৫/২০ বছর পিছিয়ে থাকছি—তখন সে যুগে ইউরোপের 'আভাঁগার্দ' শিল্পভাবনা অবনীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছবার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া, হয়তো তিনি এ সব নিয়ে কোনও তোয়াক্কাও করেন নি। নিজেদের মতো করে যখন শিল্প ভাবনা ভেবেছেন ও আলোচনা করেছেন তখন পশ্চিমের শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের সমস্যা তাঁদের সমস্যা ছিল না।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব সামাজিক পরিবেশে রসের স্রোতে রঙের খেলা করতে বসে যখন যা মন চেয়েছে বা মেজাজ চেয়েছে এঁকে গেছেন বা লিখে গেছেন। আরবের শাহজাদীর গল্পের ছবিগুলো ইলাসট্রেশন, গল্পের কোনো একটি মুহূর্তের; কিন্তু তার অনবদ্য রঙ, কম্পোজিশন, সূক্ষ্ম ড্রইং, চিত্রণের লাবণ্য ও মুনশীয়ানা বা শিল্পীর রচনার আনন্দ যা দর্শকের মনকেও ছুঁয়ে যায় সেগুলি তাঁর রচনাকে নিশ্চয়ই রসোত্তীর্ণ শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে।

তা ছাড়া, অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বযুগের একজন মহৎ গল্প বলিয়ে আর লিখিয়ে। তাঁর কথাশিল্পী আর চিত্রশিল্পী সত্ত্বা মিলেমিশে একই ভাষায় —কখনও তিনি কথা দিয়ে ছবি লিখতেন আর কখনও বা আঁকতেন রঙ দিয়ে গল্প।

প্রভাস সেন

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

খানদান

কলেজের ছুটি সুতরাং সহ-পাঠীদের নিয়ে গানের সঙ্গে ট্যুইস্ট চঙে নাচতে নাচতে পথে ছাত্রীদের সঙ্গে মস্করা ও তাদের হেনস্তা করে শহর পরিক্রমা—ছবির শুরুতেই এই-ভাবে নায়ক রবি (জিতেন্দ্র) অর্থাৎ পরিবারের ছোট ছেলের পরিচয় ঘটানো হল। পরিবারের কর্তা গোরীশংকর (জয়রাজ), কর্ত্রী (নিরূপা রায়), বড় ছেলে বিকাশ (সুজিতকুমার) এবং তার স্ত্রী নন্দা (বিন্দু)। রবি ডানপিটে প্রকৃতির বলেই মায়ের চোখের মণি। আবার গুণ্ডামীতে যেমন, তেমনি ফুটবল খেলাতেও তুখোড়—আর তাই গ্রামের
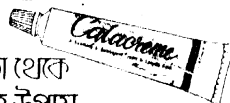
ভালবাসে। মা ছাড়া বাবা, দাদা যা বউদির 'চক্ষের বিষ' রবি। দাদার চাকরির বাবদে জামানতের পাঁচ হাজার টাকা তার বাবা চুরি করতে রবিই সেই দুষ্কৃতির দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে জেলে যায়। (ইতিমধ্যে গৌরীশংকরের মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রীকে জানিয়ে যায় যে প্রকৃতপক্ষে চোর সে নিজে। কিন্তু রবিকে বেশী স্নেহ করলেও মা কাহিনী শেষ হবার আগে পর্যন্ত এ সত্যটি চেপে যায়)। জেল থেকে ফিরতে স্বতই গৃহে বা সে গ্রামে রবির আর আশ্রয় মিলল না। বোম্বাই শহরে গিয়ে কোন চাকরি না পেতে ধনী কনট্রাকটরের শিশু সন্তানকে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে রবিকে ভাল চাকরি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়ে দেওয়া হল। এদিকে বিকাশ-নন্দা ও ওদের শিশু সন্তানকে নিয়ে কর্ম-স্থলের কাছে বাসা নিয়ে চলে গেল মাকে গ্রামের বাড়িতে রেখে। রবি মায়ের নামে মনিঅর্ডারে পাঁচশো, কখনো হাজার টাকা পাঠায়। খবর পেয়ে স্ত্রী নন্দার পরামর্শে বিকাশ মাকে নিজের কাছে আনল এবং পিওন টাকা আনলে নন্দাকে দিয়ে জাল সই করিয়ে রবির পাঠানো টাকা হস্তগত করত লাগল। নন্দা এর পর থেকে,

সুলক্ষণা পণ্ডিত

বলা বাহুল্য, শাশুড়ির প্রতি হল নির্মম। ফলে শাশুড়ি অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গৃহত্যাগিনী হল। অপরদিকে ঊষার বিয়ের ঠিক; বর রাকেশও (রাকেশ রোশন) হাজির। কিন্তু ঊষা রবির প্রতি তার ভালবাসা ভুলতে পারে না। সে-কথা রাকেশকে জানাল। রাকেশও এমন ভালমানুষ যে পাগলগামীর ভান করে বিয়ে ভন্ডুল করে দিল। এমনি ধারা শুরু থেকেই কষ্টকল্পিত কাকতালীয় ও অনমনো ঘটনার সমাবেশ। না আছে কোন চমক, না শিল্পসৌকর্য (কাহিনী ওমর খয়াম সাহারণপুরী)। অনিল গাঙ্গুলীর পরিচালনাও অত্যন্ত মামুলী পর্যায়ের—নিষ্প্রভ ঘটনা-বলীতে যুক্তি ও সঙ্গতি আরোপেও অক্ষমতার ছাপ ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। বসে থাকা যায় খয়ামের সুরারোপিত গানে এবং দিলীপ মুখো-পাধ্যায়ের আলোকচিত্রের গুণে

লোক পরলোক

সামাজিক ও রাজনীতিক দুর্নীতি, ক্ষমতালিপ্সা ও একনায়ক-তন্ত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই কাহিনীচিত্রের উদ্ভব রাও)। কাহিনীর নায়ক অমর (জিতেন্দ্র) দরিদ্রের ওপর শোষণের প্রতিকারে ব্রতী। সে-কারণ সে কালো-বাজারি ও মহাজন কালীচরণের (মদনপুরী) ঘোর শত্রু। অমরের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত কালীচরণ নিয়োগ করল রামশাস্ত্রী নামে এক ঘাতককে। ঘাতক তার কর্ম সমাধা করার পরই আরম্ভ হল 'ডেথ টেকস আ হলিডে' এবং 'কমালয়ে জীবন্ত মানুষ' প্রভাবিত একটানা অলৌকিক ঘটনার মিছিল। দেখা গেল অমর স্বর্গরাজ্যেও যমদূতদের ইউনিয়ন পাণ্ডা ছুটি এবং বোনাসের দাবিতে ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও ঘেরাওয়ের হুমকি দিয়ে কার্যোদ্ধারে সক্ষম হল। দেবরাজ ইন্দ্র ও যমরাজকে একনায়কতন্ত্রের জন্য ধিক্কার দিল। এমন কি যমরাজ ও চিত্রগুপ্তকে পৃথিবীর হালচাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য ওদের ভারত ভ্রমণে সম্মত করল। মর্তে পদার্পণ থেকে যমরাজ ও চিত্রগুপ্তকে দেখা গেল দুটি ভাঁড় সদৃশ চরিত্র। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সমগ্র ব্যাপারটাই অমরের স্বপ্ন। ইতিমধ্যে অমর নিখোঁজ হওয়ায় জনসাধারণ, এমন কি পুলিসেরও সন্দেহ এর জন্য দায়ী কালীচরণ। কালীচরণ অমরের 'মৃত-দেহ' লুকিয়ে রেখেছিল—কিন্তু সেই 'মৃত' অমরই তার স্বপ্ন শেষ হবার পরই জীবন্ত হয়ে কালীচরণকেই শায়েস্তা করতে উদ্যত হল। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা হচ্ছে ঘাতক, পুলিস—সবই অমরের সাজানো ব্যাপার। উদ্দেশ্য : কালীচরণের কন্যা সাবিত্রীর (জয়প্রদা) পাণিগ্রহণ। এবং কালীচরণ অমর-সাবিত্রী মিলনে দায়ে পড়ে সম্মত হল। অর্থাৎ শোষিত ও অত্যাচারিতের ত্রাতা রূপে যে অমরকে পরিচিত করানো হয় কাহিনীর শুরুতেই, সেই আদর্শবাদী যুবকই নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে সেই কালোবাজারির সঙ্গে হাত মেলাল। ভারতের বর্তমান রাজনীতিক পরিবেশ ও রাজনীতিকদের চালচলনের প্রতিক রূপেই হয়তো এই কাহিনীর পরি-কল্পনা। অমরের স্বর্গরাজ্যে গিয়ে তন্বী রম্ভা, মেনকা, উর্বশী প্রমুখ অপ্সরাদের রাম্বা, সাম্বা ও চা চা চা নাচে প্রবৃত্ত করা (অপ্সরাদের সাজ-পোশাক দেখতে অবিকল ক্যাবারে নাচিয়েদের মত) এবং যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের মর্তে নাজেহাল হওয়া দেখে কিছু আমোদ উপভোগ করা

জিতেন্দ্র ও জয়প্রদা

যায় এই যা। হাসির উদ্রেক করে কারণ সমগ্র প্রচেষ্টাটাই হাস্যকর।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

প্রেমের শিল্পায়ন : দুটি রবীন্দ্র সন্ধ্যা

'ইন্দিরা' আয়োজিত রবীন্দ্র-সংগীতের যুগ্ম অনুষ্ঠানের (৯-১০ সেপ্টেম্বর) বিষয় ছিল প্রেম। প্রেমের গান রচনায় অনতি-ঊনিশ কবিকিশোরের ভাবকল্পগুলি কীভাবে অশীতিপর মহাশিল্পীর বিভাব-পরম্পরায় ক্রম-বিবর্তিত হয়েছে তার সামগ্রিক মূর্তিটি আমাদের কাছে উদ্ঘাটন করে দিলেন বলে এই সংগীতসংস্থা নন্দিত হবার যোগ্য।

'আমাদের প্রতিটি প্রিয় বিষয় এক-একটি স্বর্গের কেন্দ্রকোরক,' বীজমন্ত্রের মতো নোভালিসের ওই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতের অন্যতম সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই সব সীমাস্বর্গে প্রিয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা অমর্ত্য উপস্থিতি : কখনো কোনো নারী, কখনো বা সর্বাতিশায়ী নারীশক্তি, এক-এক সময় কবিপুরুষের শিল্প সমস্যা। তাই একই পর্বে পাশাপাশি রচিত এই গানগুলিতে নববর্ষের সূচনায় সেই দেবতা জেনাসের মতো দ্বিরানন সঞ্চার। যেমন, প্রথম পর্যায়ের 'শুন নলিনী খোলো গো আঁখি' এবং 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' দুটি গানের প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ আমা তফাত। শেষ পর্যায়ের গীতিগুচ্ছে তেমনি প্রেমের উপযোগী শিল্পরূপের সন্ধান প্রেমের চেয়েও জরুরিতর প্রবর্তনা।

গান বাছাই করতে গিয়ে এঁরা এই ধ্যানধারণায় নিপুণ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এবং ধারাভাষ্য ও বর্ণিকা রচনার ক্ষেত্রেও। প্রথম সন্ধ্যায় মঞ্চপট উজ্জ্বল করে লাল গোলাপ এবং শাদা পদ্মের সংগত বিরোধাভাস ছিল, দ্বিতীয় দিনে শুধুই কীর্ণ শ্বেতপদ্ম। প্রথম দিনের পরিবেশনে স্বচ্ছ আবেগের আভিজাত্য ফুটেছে 'আমার পরাণ লয়ে,' (প্রসূন দাশগুপ্ত), 'আজি যে রজনী যায়' (সুপূর্ণা চৌধুরী) এবং 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ' (ঋতু গুহ) এই তিনটি গানেই। অন্যদিকে 'শুধু মনে রেখো' (সুচিত্রা মিত্র) গানের অনুভাবে যেন রসেটির Remember শীর্ষক সনেট এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা ও গায়কীতে তার তীব্র রূপান্তর এই দুয়েরই আর্ত দোলাচলের সৌন্দর্য আমরা পেয়েছি। তেমনি স্মরণযোগ্য 'সুখে আছি সুখে আছি' একক সংগীতের দ্বৈত (জয়শ্রী শীল/জয়ন্তী সেনগুপ্ত) তথা সম্মেলক পুনর্বিন্যাস। ১০ সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানে নারীকণ্ঠ ও পুরুষকণ্ঠের বিভাজিত এবং সমবেত স্বরক্ষেপে 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' একটি গভীর অথচ শ্রীহর্ষ উপহার। একক গীতায়নে দৃপ্ত সাবলীল অর্ঘ্য সেন ('কবে তুমি আসবে বলে') এবং এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ('সখি আঁধারে একেলা ঘরে')। বিশেষত দ্বিতীয় গানটির বিন্যাসে অন্যতর সুরভেদ

সত্ত্বেও শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাথমিক কুণ্ঠা ও পূর্ব সংস্কার বলিষ্ঠভাবে ভাঙা হয়েছে। উচ্চারণের সপ্রতিভতা ছিল অনেকেরই গলায়, কিন্তু বিভিন্ন অন্তর্মিলের মধ্যে রণিত পারস্পরিক সম্পর্ক (যেমন 'একদা তুমি প্রিয়ে' গানটিতে 'নদী'র রেশ এসে 'নিরবধি'কে ছুঁয়ে তার সংকেতমূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে) সৃষ্টি করেছেন অমর বসু। অতিপরিচিত ও বহু ব্যবহৃত 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' কৃষ্ণা হাজরার কণ্ঠে নতুন প্রাণ পেল অবিকৃত বেদনার সৌজন্যে। নবমেঘদূত 'নীলাঞ্জন ছায়া' গানে আমাদের কবি উত্তরমেঘকে আগে এনেছেন, পূর্বমেঘকে পরে। নির্জনতম শিল্পী নীলিমা সেন বিপ্রলম্ভের উপর স্বতন্ত্র জোর দিয়ে বৈচিত্র্য এনেছেন। অনুষ্ঠানের শেষ গান 'আজি কোন সুরে বাঁধিব' (সুচিত্রা মিত্র) বিরহ ও মিলন ছাপিয়ে শিল্পী জীবনের প্রকাশবেদনা মূর্ত করে তুলল নিজস্ব প্রস্বরে।

যা পেলাম তার অভিঘাত অপরিমাণ। কিন্তু 'ইন্দিরা'র স্বোপার্জিত ভারসাম্য এখানে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকেনি। সবচেয়ে বিবিক্ত মনে হয়েছে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অনেকদিন ধরেই আমরা আঁচ করতে পারছি সচেতন এই রূপকার একটি নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব খাড়া করে নিতে চাইছেন। তার প্রবৃত্তি কি ওই সুরম্য বিহ্বলতায় ধরা পড়ছে? তাঁর অন্য মেরুর জনপ্রিয় গায়ক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'হৈমন্তিক' মুদ্রা-দোষ নিয়ে এ ধরনের বিবেকী আয়োজনে কেমন যেন বেমানান। নাটকীয়তার গায়কে জয়শ্রী রায় 'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়' গানের সঞ্চারীতে 'তার আভরণের শেষ অংশে কোমল নিখাদ ছুঁয়ে ধৈবত/পঞ্চমের জটিলতাকে শুধুমাত্র প্রান্তবর্তী তার-সপ্তকের ষড়জের প্রবলতর তরল ভাষণেরই দৃষ্টান্ত রেখেছেন। এমনকি, সুচিত্রা মিত্রও 'আমার স্মরণ করে' (এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে') পর্যায়ের বিবাগী মর্যাদা কড়ি মধ্যম/পঞ্চমের মোটানকে ঘুচিয়ে দিয়ে ঈষৎ শিথিল করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সম্মেলক সংগীতে চূড়ান্ত দক্ষতার যে নজির আমরা আগে পেয়েছি শেষ সন্ধ্যার প্রথম দিকে ছিল তার অভাব। অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধের সমবেত 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে' পেলাম স্মৃতিধার্য কতিপুরণের আনন্দ। অরুণেন্দ্রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিরূপ গুহঠাকুরতা, প্রমিতা মল্লিক ও শ্রীনন্দা চৌধুরীর স্বরায়ণে মিলল নতুন প্রতিশ্রুতি।

দীর্ঘ প্রস্তুতি ও প্রাণ-চেতনার সহায়তায় শাশ্বত সুন্দরকে প্রাত্যহিকের প্রাসঙ্গিকতায় আবার প্রমাণ করে দিল 'ইন্দিরা'।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাত

"সব্যসাচী" নিবেদিত রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাতের (রবীন্দ্রসদন, ২৯ জুলাই, সকাল) নিবেদনে পূর্ব-প্রস্তুতির অভাব ছিল। সাড়ে নটায় নির্ধারিত অনুষ্ঠান তাই প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পার করে শুরু হল। অতিথি ছিলেন সুরকার কালীপদ সেন ও অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজনেই অনুপস্থিত। কালীপদ সেনের অনুপস্থিতি যে আকস্মিক, সে কথা ঘোষণা করে, তাঁর পাঠানো একটি পত্র পাঠের পর শুরু হল সেদিনের গানের মূল অনুষ্ঠান।

নবীন শিল্পী সুধাংশু রায় ও রিক্তা রায় ছিলেন যথাক্রমে নজরুল-গীতি ও রবীন্দ্রসংগীতে। রিক্তা রায়কে আসরে ভুল জায়গায় নির্ধারিত করা হয়েছিল। সুচিত্রা মিত্র ও ধীরেন বসুর মধ্যবর্তী অবসরে এক নতুন শিল্পীকে বসালে যা হয় তাই হল। সম্পূর্ণ নার্ভাস হয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় রিক্তা রায় যে-চারটি গান শোনালেন তা ঘরোয়া আসরের পক্ষেও অনুপযুক্ত। সুধাংশু রায় বরং প্রতিশ্রুতিময়। চারটি গান গাইলেন তিনি, প্রথমটি খুবই ভাল শুনিয়েছে ওঁর গলায় ('ভোরের হাওয়া এলে')। রেওয়াজ যে করেন, বোঝা যায়।

মূল আসরের প্রথম শিল্পী সুচিত্রা মিত্র। তিনি শুরু করলেন 'আমি কী গান গাব যে' দিয়ে। মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসেই বোধহয় সত্যি অন্বেষণ ছিল তাঁর, পরপর শোনালেন আরও চারখানি বর্ষার গান। চারখানি কেন, দুখানি বলাই ভাল। 'মেঘের কোলে কোলে' এবং 'ঝরঝর বরিষে'র মধ্যবর্তী 'কৃষ্ণকলি'ও সেদিন পুরোপুরি মেঘলা দিনের গান হয়ে উঠেছিল—নির্বাচনের বেড়া ভেঙে। বর্ষার গানই তিনি হয়তো আরও শোনাতেন। কিন্তু এরপর একটির পর একটি অনুরোধের স্লিপে চোখ রেখে গাইতে হল তাঁকে। নানা ধরনের অনুরোধ। শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে শোনানো এই গানগুলির মধ্যে স্মরণীয় নিবেদন পরজ ত্রিতালে 'তব প্রেমসুধা-রসে' এবং মিশ্র ভৈরবীতে 'অন্ধজনে দেহো আলো'।

ধীরেন বসুর জনপ্রিয়তাও এখন শিখরস্পর্শী। নজরুলগীতির আসরে একক কণ্ঠের এগারটি গান শোনালেন তিনি। সুস্থির নির্বাচনের কোনো অবকাশ তাঁর ছিল না। অনুরোধের স্লিপ জড়ো হতে লাগল একটির পর একটি। তাঁর কণ্ঠে নজরুলের আধুনিকধর্মী গানই যে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর পছন্দ বেশী, অনুরোধের নমুনায় এবং অনুরুদ্ধ গান শেষ করার অব্যবহিত পরবর্তী করতালির মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'নই চিনিলে আমায় তুমি', 'জানি জানি প্রিয়', 'সবার কথা কইলে', 'আগুন জ্বাতে যদি', 'মোর প্রিয় হবে' 'ছাড়িতে পরান নাহি চায়'—গানগুলি ধীরেন বসুর কণ্ঠে সেদিনের বিশিষ্ট নিবেদন।

ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি

বাংলা দেশাত্মবোধক গানের উৎস থেকে মোহানায় প্রবাহিত হবার ছবিটি স্পষ্ট করে দেখাতে চেয়েছেন প্রতিধ্বনি গোষ্ঠী। স্বদেশসংগীত কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে গণসংগীতে, দুটি পর্বে বিভক্ত এক জমাটি সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই চিত্রটি সম্প্রতি তুলে ধরলেন তাঁরা বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত এক নিবেদনে।

প্রথম পর্বের শুরু বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" দিয়ে। ভাষ্যে অবশ্য স্বদেশচেতনার উন্মেষকাল বলতে ডিরোজিয়োর কবিতাকে চিহ্নিত করা হল, প্রসঙ্গত চর্যাপদেরও উল্লেখ রয়েছে। আরেকটু পিছোলে দেখা যেত, দশম শতাব্দীতেই কবি শ্রীধর দাস তাঁর "সদুক্তি কর্ণামৃত" গ্রন্থে পবিত্র বাংলা ভাষাকে কীভাবে তুলনা করেছিলেন গঙ্গার স্রোতোধারার সঙ্গে। ভাষ্যে ও গান নির্বাচনে আরেকটু সতর্ক হলে, নাম মনে পড়ত নিধুবাবুর এবং মধুসূদন দত্তের, বাদ যেতেন না জীবনানন্দ, বঙ্গ-বিভাগ অন্তর্ভুক্ত হলে, অন্তর্ভুক্ত হতেন অচিন্ত্যকুমারও। এর জন্য বেশি শ্রম ব্যয়েরও প্রয়োজন ছিল না, হাতের কাছেই লভ্য ছিল কৃষ্ণ ধর সম্পাদিত "স্বদেশ আমার স্বদেশ" নামের সমভাবাপন্ন সংকলনটি। ভাষ্যে অসম্পূর্ণতা থাকলেও এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অভিনব, প্রয়োগও সামগ্রিকভাবে প্রশংসার যোগ্য।

জমজমাট গান ছিল, সুপরিকল্পিত নাচ ছিল, আর ছিল পিছনে সাইক্লোরামায় কিছু কাচা মনের প্রতিফলন। "কারার ওই লৌহকপাট"-এ মুষ্টিবদ্ধ হাতের পরই ভেসে এল একটি অদ্ভুত মোটরগাড়ির ছবি। মনে হতে পারে বুঝি সুকান্তের সেই "পুরনো ধাঁধা" কবিতার উদ্যত জিজ্ঞাসা—বলতে পারো, বড়ো মানুষ মোটর কেন চড়বে? কিন্তু হায়, সেই কবিতাটি কোথাও ছিল না। "বিদায় দাও মা" গানটিতে ফাঁসিকাঠ ও রাজভবন-এর ছবি যদি-বা মেনে নেওয়া যায়, হাইকোর্ট দেখানোর চেষ্টা স্থূল রসিকতার মতো মর্মান্তিক। বরং "অবাক পৃথিবী"র ক্ষুব্ধ মানুষের ছায়া যখন দীর্ঘতর হয়ে পড়েছে সাদা পরদায়, ব্যঞ্জনার মূল্যে তখন অনেক মহার্ঘ হয়ে উঠেছে মঞ্চের পরিবেশ।

আসলে সাইক্লোরামায় ছবি ফেলার কোনো দরকারই ছিল না। "প্রতিধ্বনি" গোষ্ঠীর গানের গরিমা প্রশ্নাতীত। চমৎকারভাবে হার্মোনাইজ করেছেন তাঁরা। একক কণ্ঠের বহু গানই দারুণ দক্ষ কণ্ঠে পরিবেশিত, বিশেষত পার্থ সেনগুপ্ত যে-বলিষ্ঠ এবং লাবণ্যময় ভঙ্গিতে শোনালেন "আমায় বোলো না গাহিতে"। অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে তুলে ধরলেন গানটির অন্তর্লীন ক্ষোভ। অশোক দত্তের কণ্ঠটিও সুন্দর। দ্বিতীয়ার্ধের "তোমার বুকের খুনের চিহ্ন" (সলিল চৌধুরীর) মনে গেঁথে দিয়েছেন তিনি। গান দু-অর্থেই সংগীত, তবু তুলনামূলক বিচারে গণ-সংগীতে যেন স্ফূর্তি বেশী প্রকাশিত। নতুন করে দেওয়া সুরের চিহ্ন তেমন ছিল না, অথচ সেখানে ছিল—যেমন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর আমার ভারতবর্ষ কবিতায় সুরারোপে—সেখানে এঁরা প্রত্যাশা জাগান। আরও কিছু নমুনা নেই। কেন, এ-আক্ষেপ হয়।

শিশির মঞ্চে শর্মিলা বসু

এ বছর আগস্টে কলকাতায় ছুটি কাটাতে এসেছেন শর্মিলা বসু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শর্মিলা গত বছর আগস্টে একক সংগীতের আসরের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ছুটি কাটাতে এসে। এ বছর তাঁর দ্বিতীয় আসর শোনা গেল গত তেইশ আগস্ট, শিশির মঞ্চে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আসর, শুরু হল মিনিট পনের বাদে। কৈফিয়ৎ হিসেবে চমৎকার একটি কথা বলে শুরু করলেন শর্মিলা। বললেন, দুদিন ধরে তাঁর গলা খুব খারাপ। পূর্ব-নির্ধারিত অনুষ্ঠান ভেঙে দেবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু সেভাবে বাতিল করাটা পাছে পার্লামেন্টের মুখোমুখি না হয়েই পদত্যাগ করার নজিরের মতো দেখায়, তাই তিনি অসুস্থ কণ্ঠ নিয়েই আসরে এসেছেন।

কণ্ঠ যে তাঁর পুরো সুস্থ নয়, প্রথম দিকের গানে তার ঈষৎ আভাস ফুটে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু সে আভাস ঈষন্মাত্রই। দ্বিতীয়ার্ধে তিনি সম্পূর্ণ সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিলেন। অতুলপ্রসাদের নয়টি, দ্বিজেন্দ্রগীতি পাঁচটি এবং রজনী-কান্তের চারটি—মোট আঠারটি গান বেছেছিলেন শর্মিলা। প্রথম পর্বে ছিল অতুলপ্রসাদের গান। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'এত হাসি আছে', এবং 'কত গান তো হল গাওয়া।' দ্বিতীয়ার্ধের গানের মধ্যে স্মরণীয় নিবেদন 'বরষ আইল ওই', 'তুমি বাঁধিবে কী দিয়ে', 'হরি প্রেমগগনে'।

দরাজ এবং সুরেলা কণ্ঠের অধি-কারিণী শর্মিলা বসু রবীন্দ্রসংগীতের তালিম নিচ্ছেন সুচিত্রা মিত্রের কাছে। এছাড়া গীতবিতানের 'গীতভারতী' পরীক্ষায় তিনি সব মিলিয়ে দ্বিতীয়, কণ্ঠসংগীতে প্রথম। তাঁর গত বছরের আসরেও যে আক্ষেপ ছিল, এবারেও তা রইল, অন্তত একটি রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে শুরু করলেন না কেন তিনি তাঁর একক আসর?

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

জয় মা কালী বোর্ডিং

অনুদা,

জয় মা কালী বোর্ডিং দেইখ্যা আইলাম। এইডা যদি যাত্রা অয়—তা অইলে আমার কোনো কথা নাই:—যদি নাটক অয় তইলে দুইখান কথা আছে। আইজ-কাইল পাড়ায় পোলাপানেও দুই-আড়াই ঘণ্টার বেশী থিয়াট্যার করে না—তিন ঘণ্টার যাত্রা উবাইশ্য হইতেই পারে। আজইর‍্যা অনেক কথাই তহন ব্যাবাক লোকে শুইন্যা থাকে। আপনেব কেরামতি—আপনে তিনগণ্টার নাটকে হগগল লোকেরে দম ফ্যালতেও দ্যান নাই—বহাইয়া রাখছেন। হলের থনে বাইরাইয়া উনারা যাই কন না ক্যান, আপনে যতক্ষণ স্টেইজে আছিলেন, ততক্ষণ অইন্য দিগে চউখ ফিরাইবো কোন হালায়? অনেক সিনারি আছে, কিন্তু হগগলডিই যাত্রার লাহান। বুড়াগুলান মাঝে মইধ্যে চেয়ারে বইয়া থাকে (যাত্রায় য্যামন রাজা-রাজড়ার সিংহাসন), আর বাদবাকি মাইয়া-মদ্দ হগগলে একই থানে খাড়াইয়া খাড়াইয়া কতা কয়। এইডারে ক্যাম্বায় থিয়াট্যার-কওন যায়?

হায় কপাল! আমি বায়ুস্কুপ-যাত্রা কোনডাই দেহি নাই—শৈলেন দের গল্পটাও পড়ি নাই। হাসির নাটক যহন—তহন, আকথা-কুকথা না অইলেও অনেক কথা আইয়া পড়ছে—যেগুলি আসল গল্পেরে জোরদার করতে পারে নাই; হেইডা নাটকের কাম না। অইন্য জায়গায় কি করছেন জানা নাই, অইন্য রকম কিসু কইর‍্যা থাকলে আমার কোন কথা নাই—তয় নাটক যদি অয়, তইলে দুইখান কতা আছে। মঞ্চরূপ দিছেন উপদেষ্টা দেবনারায়ণ গুপ্ত। উনি তো আইজগার লোক না—আইজ-কাইলকার ছ্যামড়াগো উনি জন্ম-থিইক্যা দ্যাখতে আছেন। ছ্যামড়ারা সিগরেট খাইলে উনি অইন্য দিগে চাইয়া থাকতে পারেন, কিন্তু ছ্যামড়াগো থিয়াট্যার গুলান মাঝে মাঝে তাঁর দ্যাখন উচিত, ভুল-ভ্রান্তি কিছু থাকলে তিনি কানমলা দিতে পারেন, আবার পুরান ধারাডাও বদলাইবার কথা ভাবতে পারেন, দশ বিশ বছর পরে পোশাকডাও যখন হালায় পুরান অইয়া হাসনের খোরাক জোগায় তখন থিয়াট্যার একই জায়গায় বইস্যা রঙ্গ তামাশা করতে পারে? জয় মা কালী বোর্ডিং-এর মালিকের পোলাডারে মাইয়া যে ধর্মের ভয় দ্যাখানো হইছে, হেইডা হাসির নাটকে কাউরে আলাদা কইরা ভাবাইতে পারে না কিন্তু নাটকটারে ডুবাইয়া দ্যায়। সরোজ নামে যে শয়তানডার আমদানি করছেন, তার সব শয়তানী কলাকাল পাত্রাপাত্রের ধার ধারে না—গল্পের গরু গাছে চইড়্যা বইস্যা থাকে—শেফালীর মন ঘুরাইবার লাইগ্যা বাপের অসুখডাই অনেক আছিল—হঠাৎ বিলাতী বা হিন্দী কালেস্কোপের মত পুরাপুরি শয়তান বানাইবার কোন প্রয়োজন আছিল না। তয় যেই সিনে সরোজরে হগগলে মিইল্যা রাম ঘাপান ঘাপাইতাছে—হেইডা তাপস সেনের 'স্টোভ লাইটে' জমছিল খুব। অথচ অনুদা, আপনে পার্টের মাঝে মাঝে যে আইজ-কাইলকার সমস্যা লইয়া রসিকতা করছেন, হেইগুলি বাড়তি অইলেও লোকের মুখে মুখে ফিরবো। কারণ, কথাগুলান ফটাস কইর‍্যা মনের মইধ্যে বিইনধ্যা গ্যাছে গা। যাত্রায় আপনে কি করছেন, তা যহন আমার জানা নাই—কোন কথাও নাই, কিন্তু নাটকের পরিচালক হিসাবে আপনের কাছে দুইখান কতা আছে। আইজ-কাইল থিয়াটারের মূল কথা অইল টিম-ওয়ার্ক। আপনে কি লক্ষ করছেন, আপনে যখন স্টেইজে নাই, তখন লোক কি রকম হাসফাস করতে থাকে! হেইডা অইত না যদি সকলে সমানতালে না হউক মুটামুটি কিছু একটা করতেন। রবীন মুখোপাধ্যায়, মঙ্গল মুখোপাধ্যায় খুবই সুন্দর। অগ্রু ভটচাইজ, জ্যোতির্ময় লাহিড়ী কাজ চালাইয়া গেছেন, কিন্তু সুধীন মুখোপাধ্যায় কিছুই করতে পারেন নাই। বাঙাল ভাষা জানা না

থাকলেও খালি অভিজ্ঞতার জোরে সরযূবালা লোকেরে ধইরা রাখছেন। বাপে হগ্‌গল্‌ সময় খট্টাশে কইয়া থাকে —মায়েরে খাড়ইয়া না হয় দুই পা আউগাইয়া পার্ট করতে হয়—বড় বেকায়দায় ফ্যাল্‌ছেন আমাগো হগ্‌লের নমইস্যা শিল্পীরে। উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, কালী চক্রবর্তী—তানাগো যা যা করনের, সবই করছেন (কেলী চক্রবর্তী বৌঠাইন না কইয়া বৌদি কইলেন কেনো বোঝবার পারলাম না।)—কিন্তু নাটকে তানাগো এমন কোন করণীয় নাই, যাতে তেনারা মন জুইড়া থাকতে পারেন। শিপ্রা মিত্র সুন্দর মানাইয়া লইছেন। কিন্তু একেরে হতাশ করছেন নায়িকা মঞ্জুলা। সুযুগ পাইয়া অনেকরে ট্যাকা মারছেন শাশ্বতী রায়। আপনে স্টেইজে না থাকলেও আর দুইজন বেবাক দর্শকরে নাচাইয়া দিছেন —তেনাগো নাম অইল সত্য রায় আর রঞ্জিত ঘোষ। অজিত চট্টোপাধ্যায় খালি গানের সময় পুরানা মেজাজে চলেন। হের লাইগাই আবারও কই, যাত্রা অইলে কোন কতা থাকতো না, নাটক বইল্যাই আপনেরে দুইখান কতা শুনাতেই অইব। সুরেশ দত্তর মামুলি স্টেইজ ভাঙা দাঁতের মতন সব সময় নড়ে ক্যান। স্টেইজ যহন ঘুরি যায়, তখন পিছনে শিফটারগো টর্চ বাত্তি দেখা যায়। তাপস সেনের আলো হ্যাজাক বাত্তির লাখান—অবশ্য এই নাটকে আলোর কাম দ্যাখানোর জায়গা প্রায় নাই কইলেই চলে। আরম্ভের কন্‌সার্ট টা বড় মিষ্ট। তারপরে হোটেলে ঠাকুরগো ডাক

শুইন্যা থিয়াট্যারের মেজাজ আসে—বাকি সবই যাত্রার লাখান। স্টেইজ পাক খাওয়ার সময় আর ঠ্যাকায় পড়লে জায়গা মতন নানান সুর গাইজ্যা দেওয়া হইছে। নীলিমা ব্যানার্জির সুরে এক্‌খান্‌ গান কম্মে লাগছে। কালী চক্রবর্তীর গানটা খালি সময় বাড়াইয়া দ্যায়। গাওনের সময় উনি আবার উইংসের বাজনদারগো দিগে কট্‌মটাইয়া তাকান—আমরা পাঙ্‌ কিপারে—এইডা যাত্রা না থিয়াট্যার!

লোকে আপনেরে ভালবাস্‌ছে প্রথম থিক্‌কাই। আপনে তো খালি হাসান না—'নতুন ইহুদী'তে লোকেরে কান্দাইতেও ছাড়েন নাই। জয় মা কালী বোর্ডিং যে আপনে চুটাইয়া অভিনয় করছেন, অনেক জায়গায় সাড়ে চুয়াত্তরের মতন—অনেক কাজ নতুন হইয়া হগ্‌গলেরে পাগল কইরা দ্যায়। আপনের নাম দিয়া বায়োস্কোপ তৈরি অয়—এ হেন্‌ সৌভাগ্য গোনাগুন্‌তি কয়দেশের মাত্র কয়েকজনের ভাগ্যে ঘটছে। এখনও রঙ্গনায় হাউসফুল্‌ যায় আপনেরে দেখনের লাইগ্যা—আমার হাজার পাপী মন খুং খুং করে। কিছু কইবার পারি না। তয় আপনের লগে তো আমার ঠাট্টার সম্পরক—সম্বোধনেই আপনে গালাগালি দিতে পারেন—সেই সুবাদে দুইখান কতা কই,—১৯৭৯ সালে আপনের মতন জনপ্রিয় প্রতিভা ক্যান্‌ একখান পুরান জিনিস বাছলেন? আপনে মাথা ঘামাইলে হয়তো নতুন কিছু অইত। ভাইব্যা দ্যাখছেন, বাংলার হাসির নাটক মানেই ছদ্মবেশের উপরে খাড়াইয়া রইছে? 'কমেডি অব এররস্‌'-র কথা না—হাসি শুধু ছদ্মবেশের উপর—রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' থেইক্যা বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা' সবখানেই ছদ্মবেশই নায়ক হইয়া আছে—আপনের এই নাটকে উঠছে চরমে—ফন্দয় মাইয়ালোক সাইজ্জ্যা যে মোটা দাগের হাসি আনে—হেইডাতো হাসির আদিম অবস্থা।—আপনে পয়েরপুরি [illegible] দরকার আছিলো কিছু? আপনের নাটকের মতন 'পচা ছানা দিয়া ছানার ডালনা' আপনের মতন কারিগরে বানাইবেন—ভাবতেও কষ্ট পাই—আউচ্ছি।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

যা নয় তাই

রমেশ মেহতার 'আণ্ডার সেক্রেটারী' অবলম্বনে নিবেদিতা দাসের 'যা নয় তাই' শৌভনিকের পূর্বে প্রযোজিত নাটক, আবার নবপর্যায়ে অভিনীত হচ্ছে। প্রথম প্রযোজনার কালটা ষাট দশকের শুরুর দিকে, বর্তমান প্রযোজনার সময় সত্তর দশকের প্রায় শেষ। মধ্যখানের ব্যবধানটা নেহাত কম নয়। এবং এই সময়টাতে বাংলা নাটক ভিন্ন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, এটা যদি তর্কের খাতিরে এড়িয়েও যাওয়া হয়, তবু, এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকে না যে, নেহাত কালান্তরের সঙ্গেই দর্শকরুচি পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক রয়েছে। আক্ষেপের কথা, শৌভনিকের বর্তমান প্রযোজনায় এই পরিবর্তনের দিকটা আদৌ বিবেচিত হয়নি। হলে, সাম্প্রতিককালে 'কেন্দ্রবিন্দু' মঞ্চস্থ করে শৌভনিক তাঁর দর্শকদের যে সমসাময়িকতায় পৌঁছে দেন, সেখান থেকে তাদের আবার পরিত্যক্ত আবাসে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টায় আত্মঘাতী আঘাত হানতেন না। এই বিপর্যয় কিন্তু কখনোই হাসির নাটক মঞ্চায়নে নয়,

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়; পান্নালাল মৈত্র ও [illegible] চট্টোপাধ্যায়
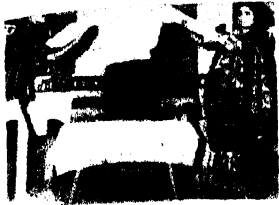
হাসির নাটকেরও যে একটা অগ্রগতি থাকতে পারে, এই বোধের অভাবে। স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনযাপনে পর্যাপ্ত জল ও বিদ্যুতের মতোই হাসির যোগান দেওয়াটা জরুরী বোধ করি; যে কথাটা বলার তা হল, অন্যান্য নাটকের মতোই বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা, অন্বেষা ও অভিনবত্ব সংযোজনের দাবি হাসির নাটকেরও রয়েছে। এবং এই দাবি কোনো পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ বা অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের কাছে নয়, শৌভনিকের মতো মর্যাদাসম্পন্ন একটি থিয়েটারি সংস্থার কাছে, সে অনায়াসেই করতে পারে। বর্তমান প্রযোজনায় শৌভনিক এই দাবির প্রতি কোনোরকম দায়িত্ব বোধ করেননি, বরং সাফল্যের অন্তরালে বসে ঝিমিয়ে নেবার অবকাশ খুঁজেছেন।

কেননা মানুষ

এথেন্সে বিষপানে বাধ্য হলেন জ্ঞানী সক্রেটিস। জেরুজালেমে ক্রুশবিদ্ধ হলেন যীশু। ভার্জিনীয়ার এক কৃষি শ্রমিকের পিঠে শ্বেতাঙ্গ প্রভুর চাবুকের দাগ। ভিয়েতনামে ধর্ষিতা তরুণী কন্যার ক্ষতবিক্ষত দেহে একই শত্রুর নখের আঁচড়। তবুও মানুষ বস্তুজগতের জীবনের ঐতিহাসিক স্তরগুলোর অসংখ্য অপমৃত্যুর ফাঁদ এড়িয়ে আজও জীবিত। কেননা মানুষ চিরদিন বাঁচতে চেয়েছে সচেতনভাবে। কেননা মানুষ বুঝতে পেরেছে বাঁচতে গেলে—প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়তে হবে।

দক্ষিণেশ্বরের শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র প্রযোজিত অমল রায়ের 'কেননা মানুষ' নাটকটি দেখতে গিয়ে (নেতাজী মঞ্চে) এই কথাগুলো বড় তাৎপর্যময় মনে হয় আমার কাছে। ভালো নাটক করার সমস্যা নিশ্চিত ভাবে বহুবিধ। তবু সচেতনভাবে নিষ্ঠাসহকারে কাজ করলে মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং শিল্পের প্রতি দায়িত্ববোধ একই সঙ্গে নিষ্কলঙ্ক এবং মোহমুক্ত যে রাখা যায় তার প্রমাণ আলোচ্য প্রযোজনা। এই প্রযোজনার সাফল্যের মূলে রয়েছে নাট্যরচয়িতার নির্ভরযোগ্য সাহিত্যগুণ ও নির্দেশকের অনুপম প্রয়োগ চাতুর্য। সাম্প্রতিক কালের বাংলা নাটকে মার-খাওয়া অসহায় মানুষকে উদ্দীপিত করার অনেক কাহিনীই আমরা পাচ্ছি। কিন্তু বিন্যাস বৈগুণ্যে তার অধিকাংশই শিল্পের বাস্তবতা স্পর্শ করে না। অমল রায়ের 'কেননা মানুষ' সেদিক থেকে যেমন ব্যতিক্রম রচনা, তেমনি সানন্ঠ এবং বুঝদারী।

স্বাধীনতাপ্রিয় দুটি মানুষ বিজয়দেব ও চন্দ্রকেতু একই কারগারে বন্দী। বিজয়দেব প্রৌঢ়। তিনি তাঁর আদর্শকে নিয়ে যেতে পেরেছেন মিথ্যা আবেগের ঊর্ধ্বে। নির্বাসনের যন্ত্রণা তাঁকে ব্রতভ্রষ্ট করতে পারে না। অন্যদিকে চন্দ্রকেতু তরুণ। আপাত ব্যর্থতায় সে বিভ্রান্ত। ফলত সহবস্থানে সহমর্মী হয়েও তাঁরা দ্বন্দ্বমুখর। আর এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নাটকের বিস্তার। বিকাশের শিল্পিক ক্রম নাট্যকারের বক্তব্যকে শ্লোগানধর্মিতা থেকে অনেক দূরে রাখে। বিজয়দেবের ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিশ্বাসযোগ্য পরিণতিতে চন্দ্রকেতুর যে চৈতন্যোদয় হয় দর্শকদের

'কেননা মানুষ' নাটকের একটি দৃশ্য

কাছে সেটা নিছক দ্রষ্টব্য থাকে না, তাদের অনুভূতি স্পর্শ করে। আলোচ্য প্রযোজনায় শৌভিকের চূড়ান্ত সার্থকতা সেখানেই। বিজয়দেব ও চন্দ্রকেতুর ভূমিকায় যথাক্রমে মুরারী মুখোপাধ্যায় গৌতম মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র রচনা বেশ বলিষ্ঠ। নাটকের কোরাস অংশের প্রয়োগ যেমন বুদ্ধিগ্রাহ্য অভিনয়ও তেমনি মর্মানুসারী।

সম্ভবামি যুগে যুগে

বর্তমান নাটকে গ্রামজীবনে মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচার বেশ ফলাও করে দেখানো হয়েছে, কিন্তু এটাই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ দিক নয়, নাটকের মূল সমস্যাটা অন্যত্র। সেটা হল, সংহার মাত্রই পাপ কিনা, এই প্রশ্নে। মহাজন হারাধন মন্ডলের বাড়ি আগুন লাগলে তার নাবালক সন্তানকে উদ্ধার

সেটা ইচ্ছাকৃত। যে গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটে যুবক বিশ্বজিৎ সে গ্রামেরই শোষিত মানুষের প্রতিনিধি, যেহেতু হারাধন অত্যাচারী মহাজন, সেই হেতু তার মৃত্যুতে বিশ্বজিতের খুশী হবারই কথা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশ্বজিতরা তা হয় না। বরং এই ধরনের মৃত্যুতে তারা কাতরতা বোধ করে। এই কাতরতার উৎস কি? একটা প্রচলিত পাপবোধ। কি সেই পাপবোধ? মানুষ হয়ে মানুষকে সংহার করায়। কিন্তু সংহার মাত্রই কি পাপ? এর উত্তর রয়েছে আমাদের ঐতিহ্যে, যেখানে মানুষরূপী দুরাচারকে স্বয়ং ঈশ্বর সংহার করেছেন যুগে যুগে। আলোচ্য নাটকে সেই ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আয়োজনের প্রায় সবকিছুই অক্ষমতা দ্বারা আক্রান্ত। তা যেমন নাটকের দিক থেকে, তেমনি অভিনয় ও পরিবেশনের দিক থেকেও। প্রযোজনাটি যে খুব একটা বাস্তবিক নয় সেটা টের পাওয়া গেল প্রথম দৃশ্যেই, যখন, মাস্টারমশাই গ্রামের চাষীকে ইংরেজীতে শেকসপীয়র শোনান। কেউ হয়তো বলবেন, আরে মশাই, চাষীটা তো উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য আসল দর্শক। তাই যদি হয় সেক্ষেত্রে বলি, দর্শককে এতটা অনভিজ্ঞ ভাবা কেন? অপেশাদারী বাংলা মঞ্চের বাস্তবতা বা আধুনিকতায় দর্শকের যে বিশ্বাস জন্মেছে, তাকে সম্প্রসারিত না-করে কেন সংকুচিত করতে চাওয়া? আধুনিক নাট্যচর্চার শরিক হতে গিয়ে কেন নির্দেশনা ও অভিনয়কে এতটা অনাধুনিক করে রাখা?

এসব কথা আর কিছুর জন্য নয় যেহেতু 'কালপুরুষ' একটি নতুন প্রযোজনার গৌরব নিতে গিয়ে প্রস্তুতিতে অনেকটা ঘাটতি রেখেছেন। সমর মুখোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত আলোচ্য নাটকটির সংলাপ আগাগোড়া যেমন দুর্বল, বিন্যাস যেমন শ্লথ, তেমনি অভিনয়ও যথেষ্ট ক্লান্তিকর। রাজকুমার ঘোষ এই অভিনয় অনুষ্ঠানের (শিশির মঞ্চে) একমাত্র ব্যতিক্রম শিল্পী, মাস্টারের ভূমিকায় সেটা তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর মুভমেন্ট ও সংলাপ উচ্চারণ গুণে। কিন্তু আলাদা ভাবে তাঁকে ভালোলাগার সত্যি তো কোনো অর্থ হয় না।

[illegible] দাস

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

করনির ভারত নাট্যম

কলকাতা শহরে ভারত নাট্যমের ক্রমবর্ধমান চাহিদার এও একটা নিদর্শন যে এই মরসুমের নবাগত নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে একজন হলেন বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্রী করনি ব্যানার্জী। সম্প্রতি বিদ্যা মন্দির প্রেক্ষাগৃহে করনির নৃত্য পরিবেশন দেখে মনে হল ভারত নাট্যম শিল্পী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে। কলকাতার নৃত্যশিক্ষকদের মধ্যে খ্যাতনামা শ্রীপান্ডিরনাথনের কাছে

করনি ভারত নাট্যমের 'অড়ভু'গুলি ও বিশুদ্ধ নৃত্যের ভঙ্গিগুলি ভালোভাবেই রপ্ত করে নিয়েছেন। যদিও তাঁর জাতিস্বরম নৃত্যাংশে দেহসুষমার ব্যবহার চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠেনি আশানুরূপ। মনে হয় অঙ্গচালনায় কিছুটা আড়ষ্টতা এখনও থেকে গেছে যা অবশ্য অনুশীলনের মাধ্যমে অপসারিত করা যায়। তবে, তাঁর পদম 'কৃষ্ণা নী বেগনে ওয়ারা' অভিনয়নৈপুণ্য, বিশুদ্ধ নৃত্যভঙ্গির সদ্ব্যবহারে ও নাট্যরসের সুন্দর পরিস্ফুরণে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল।

করনি কোন কারণে তাঁর নৃত্য প্রদর্শনের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত নাট্যমের পরই কয়েকটি লোকনৃত্য পরিবেশন করায় কতকটা গুরুচণ্ডালী দোষে পরিণত হয়েছিল।

যে মেজাজ ও পরিবেশ ভারতের সেরা ধ্রুপদ নৃত্য ভারত নাট্যমের আস্বাদনে প্রয়োজন, তা থেকে কলারসিকদের ধাক্কা দিয়ে সাঁওতালী নাচ বা বিহু নাচের দিকে ঠেলে দেওয়া সমীচীন হয়নি। দুর্ভাগ্যের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এই লোকনৃত্য পরিবেশনের 'অ্যামেচারিজম'। আসামের বিহু নাচ আর রাজস্থানের 'পনঘট' বহুলাংশে করনির নৃত্যশিক্ষক শ্রীপটপালের নিজ মস্তিষ্কপ্রসূত তা সহজেই অনুমেয় ছিল। সাঁওতালী নাচের নূন্যতম অঙ্গভঙ্গি আর তালপরিবর্তনের ফলে দর্শকরা

কোনারক ভঙ্গিমা

এক ধরনের রবীন্দ্রনৃত্য দেখতে বাধ্য হলেন। সর্বোপরি, লোকনৃত্যের একক পরিবেশনা বিরক্তিজনক হওয়া স্বাভাবিক, এই কথাও শিল্পীর হয়তো মনে ছিল না।

ওড়িশি নৃত্য-কেন্দ্রের কৃতিত্ব

ইদানীং মনে হয় কলকাতার প্রিয় ধ্রুপদী নৃত্য হয়ে উঠেছে—বাংলার প্রতিবেশী দেশের নিজস্ব নৃত্য ওড়িশি। সম্প্রতি সম্ভাবনাপূর্ণ বেশ কয়েকজন ওড়িশি শিল্পীর নৃত্য পরিবেশনা আমরা দেখতে পেয়েছি এই শহরে। আনন্দের বিষয় যে গুরু মুরলীধর মাঝির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ওড়িশি নৃত্য-কেন্দ্র তার প্রথম বৎসর পূর্ণ করল এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশির মঞ্চে। বলতে দ্বিধা নেই যে এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানের গতানুগতিক কার্যক্রমের মধ্যেও দু-একটি প্রতিভাবান শিল্পীর উজ্জ্বল পরিণতির আভাস পাওয়া গেছে।

ওড়িশি নৃত্যের দেব-বন্দনা—মঙ্গলাচরণ প্রদর্শন করল অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা ঝুমা বসাক। অল্প বয়সের স্বাভাবিক অপটুত্ব সত্ত্বেও ঝুমা মঙ্গলাচরণের স্বকীয় ভঙ্গিগুলি চমৎকার আয়ত্ত করেছে দেখা গেল। কেন্দ্রের ছাত্রীদের গোষ্ঠীনৃত্য 'কোনারক ভঙ্গিমা' সুকল্পিত কোরিওগ্রাফি ও নৃত্যের সাবলীল ভঙ্গির দরুন খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল। তবে অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠা শিল্পীর প্রশংসা সহজেই প্রাপ্য সুতপা দত্তগুপ্তের, যার জয়দেব কাব্যের নৃত্য-রূপায়ণ বিশুদ্ধ নৃত্যের ভঙ্গিগুলির সুষমায় ও অভিনয়ের মনোহারিত্বে এক অপরূপ লোকে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল। সুতপা অনতিদূর ভবিষ্যতে এক স্বনামধন্যা শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে আশা করা যায়। শ্রাবণী আরেক শিল্পী যার নৃত্য-প্রদর্শন দর্শনীয় হয়েছিল। তার দশবৎসর ভাবস্ফুরণ অঙ্গচালনের কমনীয়তার জন্য রসোত্তীর্ণ হয়েছিল যথেষ্ট। এই দুই বালিকা শিল্পীর নৃত্য প্রদর্শনে ওড়িশি নাচের স্থায়ী অবমূর্তি 'ত্রিভঙ্গ'র যথোচিত ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে তৃপ্ত হয়েছি।

আশা করি, ওড়িশি কলাকেন্দ্র প্রাচীন মন্দিরের 'মহারি'দের উদ্ভাবিত ও পরবর্তীকালে 'গোটেপুওয়া' শিল্পী-দের দ্বারা বিকশিত এক মহান নৃত্যধারাকে কলকাতার বালিকাদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলবে।

বিক্রম নায়ার

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

(জলাশ্রিত নৃত্যকল্প)

ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্য-নাট্য জলাশ্রিত নৃত্যকল্প (ওয়াটার ব্যালে) অভিনীত হল ২৩—২৫ সেপ্টেম্বর (মোট পাঁচটি প্রদর্শনী)। সাঁতারের বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে চিত্রাঙ্গদার মতো নৃত্যনাট্যকে উপস্থাপিত করা বড়ো সহজ কাজ নয়। দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে সেই দুরূহ কর্মের সার্থক রূপায়ণে তাঁরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে নৃত্যশিল্পীদের অবয়বের ঊর্ধ্বাংশ কেবলমাত্র জলের উপর দৃশ্যমান সে ক্ষেত্রে তাঁদের যা কিছু [illegible] প্রধানত মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমেই সীমায়িত রাখতে হয়েছে ; অবশ্য বাহুযুগলের আন্দোলন ও মুদ্রা প্রদর্শনের সহায়তা তাঁরা পেয়েছেন। এই সীমাবদ্ধ সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন প্রতিটি শিল্পী। নৃত্যাংশে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের অধিকাংশই সাঁতারের কলাকৌশলে পারদর্শিতার সঙ্গে নৃত্যপটুত্বও অর্জন করেছেন তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা গেল —তাই সমস্ত অনুষ্ঠান এমন প্রাণবন্ত হতে পেরেছে। আরো একটি প্রধান বাধা গানের লয় : বিশেষ করে দ্রুত লয়ের গানের সঙ্গে মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শনের যে অবকাশ—এ ক্ষেত্রে সেটিই প্রধান বাধা। এখানে কোথাও কোথাও গানের দ্রুত ছন্দের দোলাকে আড়াল করে নৃত্যাংশে এক-একটি রূপবন্ধ (প্যাটার্ন) প্রয়োগের প্রবর্তনা তাই লক্ষ করা গেল।

অর্জুনের ভূমিকায় নৃত্য-নির্দেশক ও পরিকল্পক শান্তি বসু সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর নিজের ভূমিকা ছাড়াও যেভাবে সমস্ত দলটিকে তিনি প্রস্তুত করে তুলেছেন তা চমৎকৃতিজনক—মার্জিত রুচিবোধ, সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সনিষ্ঠ প্রস্তুতিতেই সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। দুই চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় প্রতিমা দত্ত (কুরূপা) ও রীনা চক্রবর্তী (সুরূপা) নৃত্যকুশলতায় ও অভি-ব্যক্তিতে চরিত্র দুটিকে মূর্ত করে তুলেছেন। মদনের ভূমিকায় গায়ত্রী লাহিড়ীও সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। সমবেত নৃত্যগুলিতে সনিষ্ঠ প্রস্তুতির ছাপ। নৃত্যাংশের মতো গীতাংশও এই নৃত্যনাট্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সংগীত-পরিচালক অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে অর্জুন এবং শ্রীনন্দা চৌধুরী ও গীতা ঘটকের কণ্ঠে যথাক্রমে কুরূপা ও সুরূপা চিত্রাঙ্গদার গানগুলি গীত হয়। মদনের গান গেয়েছিলেন দিবাকর ভট্টাচার্য। বিশেষ করে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার গানগুলি অত্যন্ত শ্রুতি-নন্দন। তাঁদের কণ্ঠে নাট্যরসসিঞ্চিত গানগুলি যথার্থরূপে বিকশিত। সম্মেলক কণ্ঠের গানগুলি সুগীত। পাঠের অংশে কৌশিকী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ভি বালসারার যন্ত্রসংগীত পরিচালনা ও পিয়ানো-[illegible] যোজনা করে। কনিষ্ক সেনের আলোক-সম্পাতে সর্বত্র অবহেলার চিহ্ন হতাশ করেছে। অনায়াসেই তা আরো বর্ণাঢ্য করা চলত। পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে বহন করেছেন সুধীরঞ্জন (মানিক) ঘোষ।

সুভাষ চৌধুরী

শান্তি বসু ও রীনা চক্রবর্তী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

তুষারকণা

মহিলাদের দ্বারা রচিত ও পরি-চালিত পঁয়ত্রিশ বছরের একটি সংস্থা 'রাণী ব্রজসুন্দরী মহিলা সমিতি'। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যারা আজ অনেকেই গত হয়েছেন, কিন্তু সমিতির অকালমৃত্যু ঘটেনি, বলা বাহুল্য, তা নতুন নতুন সদস্যাদের আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্যমের ফলেই। প্রতি বছরই এঁরা কিছু-না-কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এবার শিশুবর্ষ উপলক্ষে আলোচ্য সমিতি তিন থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্র-ভারতীর রথীন্দ্রমঞ্চে নিবেদন করলেন

মনোরম এক বিচিত্রানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ছিল নাচ, গান ও আবৃত্তি। সবশেষে শেফালি মল্লিকের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হল ইংরেজী কাহিনী 'স্নো হোয়াইট' অবলম্বনে শিশুনাটিকা 'তুষারকণা'।

ফুটফুটে সুন্দর ছোট্ট একটি মেয়ের নাম তুষারকণা। [illegible] নিজের মা ছিল না। সৎমাটি [illegible] সুন্দরী কিন্তু ভারী হিংসুটে। তুষারকণা অবহেলার মধ্যেই বড় হয় আর তার সৌন্দর্যের কথাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে সৎমার খুব রাগ হল। তুষারকণাকে মেরে ফেলতে চাইলো সে। কিন্তু এই পৃথিবীতে হিংসুটেদেরই যে মৃত্যু হয় সবার আগে। কারণ কেউ তাদের ভালোবাসে না। শেষ পর্যন্ত সৎমাটির তাই অকালেই মৃত্যু হল, আর তুষারকণার বিয়ে হল সুন্দর এক রাজপুত্তুরের সঙ্গে।

তুষারকণার এই গল্পটা যেমন আকর্ষণী, তেমনি এর উপস্থাপনাও আগাগোড়া চমৎকার। নৃত্য পরিকল্পনা অরুন্ধতী মল্লিকের, কণ্ঠ সংগীতে ছিল সুতপা দত্ত ও মল্লিকা ধর। দু-একজন বাদে নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে সকলেই যথার্থ শিশু। অনেক ভুলভ্রান্তি এদের অভিনয়ে মজাদারী অনুষঙ্গ হয়ে ছিল, এটা যেমন ঠিক, তেমনি সৎমা ও তুষারকণার ভূমিকায় যথাক্রমে সঞ্চিতা দে ও টুম্পা শীল তাদের অভিনয়ে করুণাহীন প্রশংসার দাবি রাখে।

রানা দাস
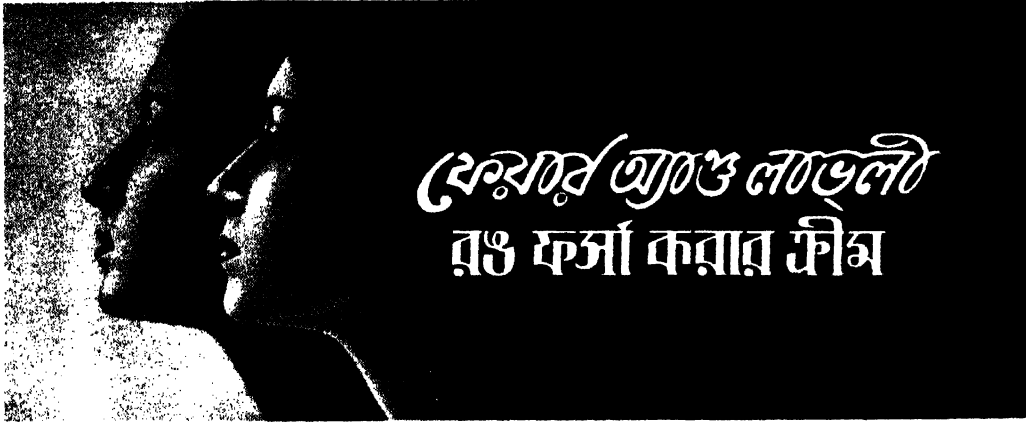
Regd No. WB/CC/184/74

ল্যাক্মে নিবেদন করছে
তার সর্বাধুনিক আহরণ
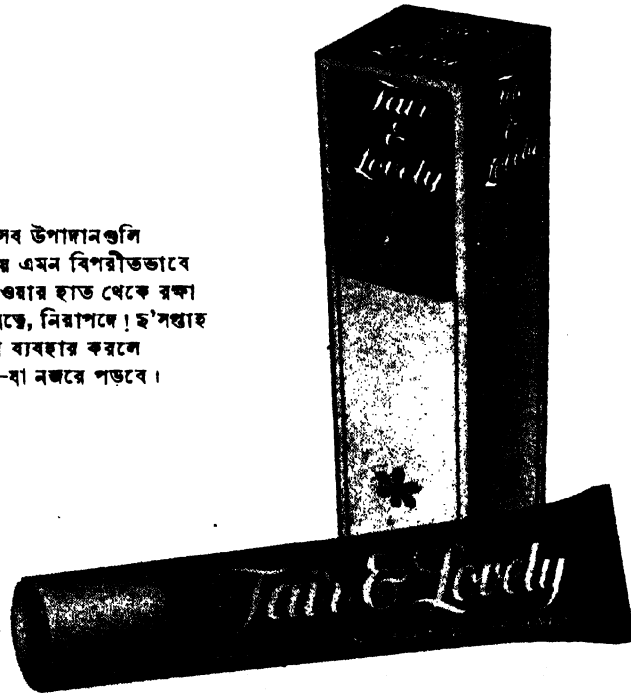
দি আর্দি রেড

**যে রঙ নিউ ইয়র্ক, প্যারীস আর
লণ্ডনে এনেছে ফ্যাশান!**

ল্যাকমে এনেছে দি আর্দি রেড়-টকটকে রঙের
ঝলমলে নানান শেড!
আন্তর্জাতিক ফ্যাশান আজ আপনার দোরগোড়ায়!
নতুন, স্যাটিনের মত মসৃণ এই মনলোভা রঙ-
আপনার ঠোঁট আর নখে আনে দীপ্ত প্রাণের ছোঁয়া!
আপনার রূপসজ্জায় আনুন আজকের রঙ!
দি আর্দি রেড-তৈরী করেছে ল্যাক্মে, ফ্যাশানের
মোড় ঘোরায় যারা!

- টেরা রেড
- ফ্রেক্ক মারণ
- প্যাপ্রিকা রেড
- রেড পেপ্পারপট
- তাবাস্কো
- রেড উড

নেল এনামেল আর লিপস্টিক দুয়েতেই
পাওয়া যায়।

ল্যাক্মে

ঝরঝরে
তরতাজা
হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরল—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল...
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিনটাস-LR.28-2416 BG

চিঠিপত্র

ারী, তুমি শুধু নারী

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "নারী, ুমি শুধু নারী" নিবন্ধে লেখিকা ংক্ষিপ্ত , অবকাশে এ দেশের নারী-মাজের অবহেলিত ও নির্যাতিত াস্তত্বের সব দিকই সুন্দরভাবে ুছিয়ে বলেছেন। যুক্তিসহ সত্যটিকে ারয়ে দিয়েছেন। এর পিছনে যে সব াস্তব দৃষ্টান্ত রয়েছে তা দেখাতে লে নিঃসন্দেহে ভল্যুমের পর ভল্যুম য়ে যায়। লেখিকার এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে ধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে আজও এই ্যাপার সমানে চলেছে, রামমোহন বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্র-শরতের পরও লছে এবং আরও বিস্ময়ের বিষয় এই য স্বাধীনতার পরও চলছে ুরোদমে। তবে ধর্ম ও শাস্ত্র সুবিধা-ভোগীদের এখন আর তেমন হাতিয়ার নেই, হাতিয়ার হয়েছে দৈহিক বল এবং অর্থসম্পদ, আর অন্যপক্ষে 'অবোলা'-দের অতিরিক্ত সহনশীলতা ও কোমলতা। আমরা স্বাধীন সরকার ও ভোট পেয়েছি মাত্র, স্বাধীন বিবেক ও চরিত্র পাইনি, শক্তিমত্তা যেটুকু বা ছিল তা হারিয়েছি। এখন কথা এই যে, এর প্রতিকার কী? এদেশে নারীর মমর্যাদা, অর্থনীতিক অসাম্য ও জাতি-বর্ণভেদের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ একটা ব্যাপার। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে-সব দেশ সংগঠিত সেখানকার পুরুষেরা নারীশক্তিকে শ্রদ্ধা করেছে, সম্ভ্রম দিয়েছে। এদেশে তা হবে না, আমাদের অধঃপতন এতটাই মৌলিক। গণতান্ত্রিক সরকারের উপরেও ব্যাপক সমাজ-সংস্কার বিষয়ে আমরা নির্ভরশীল হতে পারছি না, কারণ, ভোটায়াতধর্মী সরকারগুলি নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই সব শক্তি নিয়োগ করে আসছে। এর দ্বারা কখনও কখনও জোড়াতালি একটা চলছে হয়ত বা কিন্তু সামূহিক গোত্রান্তর ঘটবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মৌখিক আদর্শের বুলিতেও কোনো কাজ কোথাও হয়নি, এখানেও হবে না। কায়েমী সুবিধাভোগীরা চিরকাল দুষ্ট-শয়তান হয়ে থাকে, তাদের অত্যাচার বলপ্রয়োগেই বন্ধ করতে হয়। রাষ্ট্র যেক্ষেত্রে উদাসীন, সমাজ-শক্তি বলে যেখানে কিছু নেই, বরং যা আছে তা সুবিধাবাদেরই সপক্ষে, সেক্ষেত্রে এরকম নারীনিগ্রহরূপ জঘন্যতা দূর করতে হলে আজ নারীদেরই সংহত সংগঠিত হতে হবে। আমি আকাশ-কুসুম দেখছি না, যদি বলি, বর্তমান জেনারেশনের অবিবাহিত মেয়েরা যদি এমন পণ করেন যে পুরুষদের হীনতম আচরণের প্রতিবাদ হিসেবে আমরা বিবাহ করব না, বরং না-খেয়ে না-পরে মরতেও রাজি আছি, তাহলে বোধ হয় এর সংশোধন হতে পারে।

ক্ষুদিরাম দাশ
কলকাতা

দুখানা গানও তো ...

মহাসমুদ্রের বীচিবিক্ষোভ এখন সমাপ্ত; কিন্তু লেখকের কাছে কিছু রসিক পাঠকের কৈফিয়ৎ পাওনা আছে —এবার ঋণ শোধের প্রয়াস করছি।

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও অযাচিত-ভাবে বহু লিপি আমার কাছে এসেছে —অনেকেই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন আর আমাকে আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ দিয়েছেন। যাঁরা সরাসরি আমাকে লিখেছেন বা "দেশ" যাঁদের চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের আমি আমার সাধ্যমত ও জ্ঞান-মত উত্তর দিয়েছি—রাগ-রাগিণীর রাস্তা বা তালিমের তরীকা দেখানো চিঠিপত্রের মধ্যে সম্ভব নয়, এবং আমার জ্ঞানও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—তবু যথাসাধ্য লিখতে চেষ্টা করেছি। তাঁরা ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ করবেন, এই ভরসা দিয়েছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধনীয় হয়ে রইল।

যাঁদের চিঠি "দেশ" প্রকাশ করেছেন, তাঁরা সংখ্যায় অনেক মুষ্টি-মেয়, তবুও তাঁদের মতামতকে তো আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না, তাই সকলের সামনেই আমার বক্তব্য নিবেদন করছি।

প্রথম পত্র : দেশ (৭/৮) : শ্রীযুত সোমশংকর চৌধুরী।

আপনি আমার ৩০শে জুনের লেখায় রবীন্দ্রনাথকে তুচ্ছ করার প্রয়াস দেখেছেন এবং সামান্য তিরস্কার করে আমার কী কর্তব্য, তা বলে দিয়েছেন। আমার মনে হয়, আমার বক্তব্য আমি যথাযথ স্পষ্ট করে বলতে পারিনি বলে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমরা খণ্ড মেরু নিয়ে যে আলোচনা করতাম, তা সম্পূর্ণ স্ট্যাটিসটিকেল অর্থাৎ, রস, ভাব, গ্রন্থনা কিছুই সেই আলোচনায় আসে না, শুধু একটা ফ্রেম ওয়ার্ক দাঁড় করিয়ে অন্যান্য রাগের কাঠামোর সঙ্গে তুলনামূলক বিচার হত। স্পষ্টতঃই আপনি এক-স্থানের কথা বা ব্যাখ্যা অন্য স্থানে নিয়ে আমাকে ভুল বুঝেছেন। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী-বরেণ্য কবি ও সংগীত রচয়িতা, তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করব, এত বড় আস্পর্ধা আমার নেই। ইংরেজীতে বলতে পারি—এটা হয়েছে mis-carriage of facts.

কিন্তু অকস্মাৎ আপনার লিপির পুচ্ছদেশে রবিশংকর এলেন কী ভাবে? রবিশংকর আমারও বন্ধু,— কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁকে টেনে আনা শুধু অবান্তর নয়, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আপনি বলেছেন রবি-শংকরের লেখায় যে বিশ্বপ্রেম ও সকলকে দু হাত বাড়িয়ে বুকে নেওয়ার সৌজন্য আছে, আমারও সেই পথ নেওয়া উচিত ছিল। রবিশংকর সকলকে শুধু প্রশংসাই করেছেন কিনা, সেটা পাঠক সমাজের বিচার্য, কিন্তু আমি তো কোলে বা বুকে তুলে নেবার উপদেশটা অনেক বিলম্বে পেলাম। এখন আর সেই বয়স, রুচি ও প্রবৃত্তি নেই—তবে আশা করছি আপনারা এই বিশ্ব প্রেমের তরুমূলে রস সিঞ্চন

[illegible] তুলবেন।

দ্বিতীয় পত্র : দেশ (৪/৮) : শ্রীযুক্ত মণি সেন।

আপনার অকুণ্ঠিত প্রশংসায় আমি অভিভূত ; আপনাদের সকলের শুভ-কামনা আমার পথের সম্বল হয়ে থাকবে।
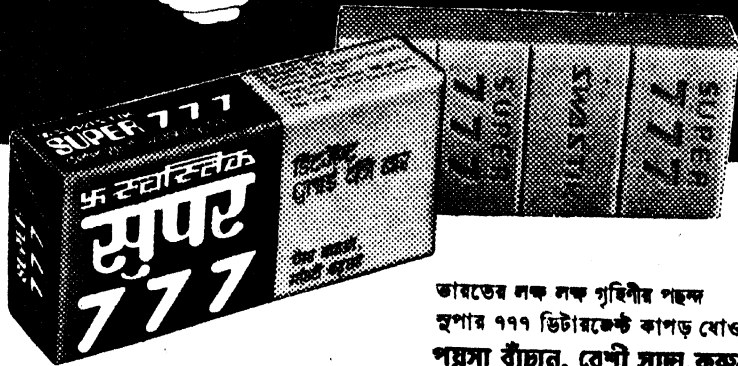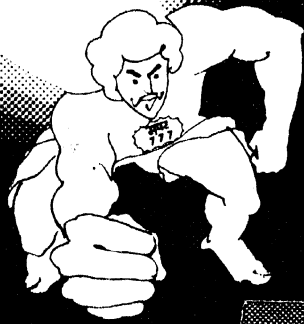
বদল খাঁ, ভীষ্মদেব ও ফৈয়াজ খাঁ সম্বন্ধে বিস্তৃত লেখায় এখনো কিছু অসুবিধা আছে,—তবে ভীষ্মদেব কখনো ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছে গান্ডা বাঁধেননি,—এটা সম্পূর্ণ সত্য। কী কারণে, ভীষ্মদেব সংগীত-সমাজ পরিত্যাগ করে পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন, প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কীভাবে তাঁর সংগীত সাধনা চলছিল, তার বিস্তৃত ইতিহাস আজো লিখবার সময় হয়নি।

অবশ্য আমাকে অনুরোধ করে আপনি সম্মানিত করেছেন, কিন্তু যাঁরা ভীষ্মদেবের Ace-pupil বলে কাগজে বিজ্ঞাপিত, তাঁদের একবার অনুরোধ করুন না, যাতে খানিকটা গুরুর ঋণ শোধ হয়। আমার মনে হয় তাঁরা স্বচ্ছন্দেই এ কাজে ব্রতী হতে পারেন।

এ কানন সম্বন্ধে কোনও কথা আমি লিখিনি, কারণ আমার মূল মহীরুহ ছিলেন ওস্তাদ বদল খাঁ ; তাঁর প্রধান শিকড়গুলোর সন্ধান দেবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি,—আরো গভীরতর প্রশিকড়ের ব্যাপারে লিখতে গেলে স্থান সংকুলান হত না। তাছাড়া গিরিজাবাবুর শিষ্যরা নিশ্চয়ই কোনদিন তাঁদের গুরুর জীবনচরিত লিখবেন তাতে এঁরা যথাসময়ে স্থান লাভ করবেন।

এ প্রসঙ্গে দেশ (১/৯) পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিঠির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তৃতীয় পত্র : দেশ (৪/৮) : শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু

সুশীল বসুর নাম লিখতে আমি ভুল করিনি,—ছাপার ভুলও হয়নি। সুশীলবাবু গিরিজাবাবুর কাছেই বহুদিন শিখতেন, পরে কোনও কারণে ছেড়ে দিয়ে ভীষ্মদেবের কাছে গান্ডা বাঁধেন। সুশীলবাবু আমহার্স্ট স্ট্রীট আমাদের বাড়ির সামনেই থাকতেন, একসঙ্গে বহুদিন সংগীত আলোচনা করেছি।

বেতারের শ্রীযুক্ত সুনীল বসুর সঙ্গেও আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল; যে কারণে কানন সাহেবের নাম উল্লেখ করা হয়নি, এখানেও সেই কারণ, স্থানাভাব।

চতুর্থ পত্র : দেশ (১১/৮) : শ্রীযুক্ত গোপাল বসু।

হীরুদার পিতার স্মৃতি বাসরের যথার্থ নাম উল্লেখ করিনি বটে, কিন্তু তাঁর পিতার সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানের কথা আমি অত্যন্ত সম্ভ্রম-সহকারে লিখেছি। নাম-উল্লেখের ত্রুটি মার্জনীয়।

পঞ্চম পত্র : দেশ (২৫/৮) : শ্রীকরুণাপ্রসাদ দে।

আপনার অপূর্ব প্রশংসা ও রস-নিষিক্ত চিঠির জন্য বহু ধন্যবাদ। আপনি [illegible]-র মত প্রকাশ করে আমার লেখাকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন—এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

ষষ্ঠ পত্র : দেশ (১/৯) : শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এ কানন ও গিরিজাবাবু সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত সংবাদ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন। আমি আর এর বেশি কিছু বলতে পারি না।

গিরিজাবাবু সম্বন্ধে শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী নিশ্চয়ই বিশদ বিবরণ দিতে

পারেন, কিন্তু এ কানন সম্পর্কে তো আপনারা সোজাসুজি কাননকেই লিখতে পারেন—এটা তাহলে হবে সব চাইতে সহজ ও নির্ভরযোগ্য, যাকে ইংরেজীতে বলে "From the horse's mouth.

সপ্তম পত্র : দেশ (১৫/৯) : শ্রীযুক্ত সুপ্রিয় বাগচী।

গিরিজাবাবু সম্বন্ধে আমি কেন বিস্তৃততর লেখা দিইনি, সেই অভিযোগ শুধু আপনি করেননি,—আমার অন্য বন্ধুরাও করেছেন। কিন্তু আমি প্রথমেই বলেছি—আমার মূল মহীরুহ হলেন বদল খাঁ, সুতরাং তাঁর প্রধান শিষ্যদের কথা বলাই ঠিক, আরো শিকড়ের ব্যাপ্তিতে নামলে থই পাওয়া যাবে না। আমি তো আমার গুরু ভীষ্মদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যদের নামও দিইনি, কারণ ভীষ্মদেবের বিস্তৃত জীবনী লেখা হলে তাঁদের যথাযোগ্য স্থান দিতে হবে। তেমনি আপনারা সকলে মিলে গিরিজাবাবুর একটা প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশ করুন না, আমরাও সাহায্য করতে রাজী আছি।

গিরিজাবাবুর শিক্ষার পরিধি নিয়ে আলোচনা হয়নি আমার লেখায়, কারণ ওটা হত অপ্রাসঙ্গিক। তিনি ধ্রুপদ-ধামারও গাইতেন কিন্তু আমরা তাঁকে প্রায় সব আসরেই খেয়ালী ও ঠুংরী গায়ক হিসেবেই শুনেছি ও দেখেছি।

ইনায়েৎ হোসেন খাঁ ও মুজফ্‌ফর খাঁয়ের কাছে শিখেছিলেন বলে আমরাও শুনেছি, তবে জীবনের শেষ ১৫-১৬ বৎসর তাঁকে বদল খাঁ সাহেবের গানই গাইতে দেখেছি। আপনারা যখন গিরিজাবাবুর জীবনী আলোচনা করবেন, তখন কোন কোন চীজ তিনি ঐ সব ঘরানার কাছে পেয়েছিলেন, সেটা জানলে আমরাও কৌতূহল তৃপ্ত করতে পারব।

গিরিজাবাবুর শিষ্যবর্গের পুরো তালিকা আমি দিইনি, কারণ আবার বলি—স্থানাভাব ও অপ্রাসঙ্গিক। তারাপদ চক্রবর্তী ও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীও তাঁর কাছে গান্ডা বেঁধেছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের যা জানা আছে, তা প্রকাশ করা সঙ্গত বিবেচনা করি না।

অষ্টম পত্র : দেশ (১০/১০) : শ্রীমতী উমা দেবী।

এই চিঠিখানি নানারকম সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আমি যে অত্যন্ত ভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হয়েছি তাই নিয়ে লেখা। মনে হয় আমি এমন স্বর্গে পদক্ষেপ করেছি, যেখানে দেবদূতেরাও প্রবেশ করতে আতঙ্কিত হয়।

প্রথমতঃ সবিনয়ে জানাই—আমি অলংকার শাস্ত্র নিয়ে নিবন্ধ লিখতে বসিনি—কান্তি বিদ্যার প্রসঙ্গেই একজন বিদগ্ধ পুরুষের রচনা থেকে সাহায্য নিয়েছিলাম। অলংকার শাস্ত্রের জটিলতার মধ্যে অবতরণ করার মত দুঃসাহস আমার নেই, সেই অধিকার শ্রীমতী উমা দেবীরাই ভোগ করুন, নিরবচ্ছিন্নভাবে।

একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে, কেননা আমি মূক হয়ে থাকলে আমার দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে, সেই অখ্যাতি অযথা কেন মাথা পেতে নেব ?

আমি লিখেছি "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" (বামন ২/৬) ; রীতি হল পদ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি। বিশিষ্টা পদ রচনা রীতিঃ (বামন ২/৭)। অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন—কাব্যের আত্মা হল স্টাইল। সুতরাং রীতি ও স্টাইল সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

"ধ্বন্যালোক" আনন্দ বর্ধনের রচনা, এটা ঠিক, কিন্তু আনন্দ বর্ধন "ধ্বন্যালোক" গ্রন্থের 'বৃত্তি' অংশের লেখক; 'কারিকা' তাঁর লেখা কিনা এটা এখনো স্থির হয়নি। অতুলবাবু ধ্বন্যালোকের লোচন নামে টীকা থেকেই অভিনব গুপ্তের মত ও লেখা তুলেছেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করেছি মাত্র।

উমা দেবীর মতে আনন্দ বর্ধনের স্থানে আমি অভিনব গুপ্ত বলেছি—এটা আমার "মারাত্মক" অপরাধ হয়েছে। অভিধানে দেখছি—'মারাত্মক' শব্দের অর্থ 'প্রাণ-সংহারক'। মনে হচ্ছে অল্পের জন্য আমার প্রাণ বিনষ্ট হয়নি।

আমি কখনো এ কথা বলিনি যে, রসবাদের স্রষ্টা আনন্দ বর্ধন বা অভিনব গুপ্ত। কিন্তু অতুলবাবু বলেছেন—"যে রসবাদ সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যজিজ্ঞাসার চরম মীমাংসা, অভিনব গুপ্ত তার সর্বপ্রধান আচার্য।" অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত ভারতকোষের ১ম খণ্ডে লিখেছেন :

"যদিও আনন্দ বর্ধন ধ্বন্যালোকে ভরত মুনির রসপ্রস্থানের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন ও সাহিত্যক্ষেত্রে রস-ধ্বনির সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য খ্যাপন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা অনুভব করেন নাই, তথাপি রসতত্ত্বকে একটি সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বকালের জন্য উহাকে সাহিত্য বিচারের কেন্দ্রীয় তত্ত্বরূপে প্রচার করার গৌরব অভিনব গুপ্তেরই।"

উমা দেবী শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্তকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন—পঞ্চাশ বছরের ওপর যে কাব্যজিজ্ঞাসা নন্দন তত্ত্বের বিশিষ্ট বিচারগ্রন্থ হিসেবে গুণীজনের স্বীকৃতি পেয়েছে, সেটা যে "ভুলে ভুলে আজ ভুলময়" তা আগে জানলে কখনো এই অপরাধ করতাম না। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত এই ভারতকোষের ১ম খণ্ডে অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে বলেছেন, "অতুলচন্দ্রের রচনার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত স্বল্প হইলেও বৈদগ্ধ্য ও দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ে বাংলা মনন সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সম্পদ বলিয়া সেইগুলি সমাদৃত।"

এই ভারতকোষের প্রথম খণ্ডেই শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আছে, "অলংকার শাস্ত্র" নিয়ে; তার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য গ্রন্থ হিসেবে প্রথমেই নাম আছে—"কাব্যজিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত।"

"মধুঃ দ্বিরেফঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যখন অতুলবাবুই ভুল করেছেন, তার পরে আমার কিছু বলা নিরর্থক। কিন্তু এই বিশ্বনাথ কবিরাজের প্রসঙ্গেই শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য বলেছেন—"সাহিত্যদর্পণ ... সংস্কৃত কাব্যবিচার সম্পর্কে ইহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অতি উপাদেয় গ্রন্থরূপে পরিগণিত, যদিও চিন্তার মৌলিকতা ইহার মধ্যে নিতান্তই স্বল্প।" পরস্পরবিরোধী মত ও বিতর্কে আলংকারিকেরাই প্রসিদ্ধ, আমরা তাঁদের কাছেই যেতে পারব না।

"তরঙ্গানিকরোন্নীত" শ্লোকে অতুলবাবু দু জায়গাতেই "তরুণী" শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন—"এ বাক্যের শব্দে ও অর্থে অনুপ্রাস ও রূপকালংকার রয়েছে।" পরক্ষণেই বলেছেন—"অলংকারবাদীরা বলবে ম. এখানেও অলংকার আছে, যার নাম স্বভাবোক্তি অলংকার।" তবে উমা দেবী অমরকোষ থেকে 'কল্লোল' শব্দের অর্থ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন—এ অর্থ আমাদের তো জানা ছিল না।

"রস" অধ্যায়ে অতুলবাবু প্রেম ও প্রেমিকের সম্বন্ধ নিয়েই বলেছেন, এটা তো সর্ববাদিসম্মত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ কোন প্রেম কোথায় কখন, কার [illegible]-গহনে আক্রান্ত করবে, তার ঠিকানা কে জানতে পারে? প্রেম যে "সর্ববাদিসম্মত" রাস্তায় আসা-যাওয়া করে এই [illegible] আমরা এতদিনে প্রথম জেনে ধন্য [illegible]।

শ্রীমতী উমা দেবী অসন্তুষ্টা হলেও আমি আবার অতুলবাবুর কথাই বলব—"[illegible] প্রতি-বিষয়ে নানা আলংকারিকের [illegible] মত; কিন্তু এই গ্রন্থ কেবল সেই সব মত ও কথা উদ্ধৃত ও আলোচনা করেছি, যা আমার মনে লেগেছে।"

"পাত্রাধার তৈল" এবং "তৈলাধার পাত্র" নিয়ে যুগ-যুগান্ত ধরে বিতর্ক চলেছে এবং চলবে—এই বিতর্কে নামবার মত সময় ও রুচি আমার নেই। যাঁরা "ন বাধতে তথা স্কন্ধে যথা বাধতি বাধতে" বা কোন শ্লোক কার লেখা এই কূটতর্ক নিয়ে মত্ত হবেন, আমি সেই দলে নেই। যাঁরা অন্যান্য সহস্র সহস্র রসপিপাসুর মত মাধুর্য ও রসনিঃস্যন্দের সন্ধানে ভৃঙ্গের মত ব্যাকুল হবেন, আমি তাঁদেরই সঙ্গলিপ্সু—অলংকার ও ব্যাকরণের স্কন্ধে আমরা পরম রসানুভূতির ক্ষেত্র থেকে বহু দূরে নির্বাসিত হব।

সুরেশ চক্রবর্তী

প্রকাশিত হল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

নতুন কিশোর-উপন্যাস

জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ দাম ৮·০০

'হলদে বাড়ির রহস্য' ও 'দিনে ডাকাতি' যাদের পড়া বিমান আর স্বপনের নাম তাদের অপরিচিত নয়। সেই বিমান এবং স্বপনের নতুন অভিজ্ঞতাময় অ্যাডভেনচার কাহিনী 'জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ।' এ- কাহিনী গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের পটভূমিকায়

কলসের জঙ্গল পিছনে রেখে সোনাঠিকরি খালের উপর দিয়ে একটা মাছের ভেড়িতে যাচ্ছিল ওরা কয়েকজন। সেই খাল থেকেই চোখে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে এক বিশাল রহস্যময় গম্বুজ। কেউ বলে, এ-গম্বুজ এক রাজার বানানো। কেউ বলে, পর্তুগীজ ডাকাতদের ঘাঁটি ছিল একসময় এই জঙ্গলে, গম্বুজটা নাকি তারাই বানিয়েছিলো।

গম্বুজের মাথায় এক সময় নাকি ছিল একটি সোনার কলস। পর্তুগীজদের কামানের গোলায় ভেঙে পড়েছে খালের জলে, তারপর হারিয়ে গিয়েছে। সেই কলসি নিয়েও এখন কিংবদন্তী। জঙ্গলের মধ্যের এই রহস্যময় গম্বুজটাকে দেখতে গিয়ে কী প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল বিমানদের আর সেই পরিস্থিতি থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে বেঁচে ফিরল ওরা, তাই নিয়েই লেখা এই দারুণ আকর্ষণীয় অ্যাডভেনচার কাহিনী।

আশাপূর্ণা দেবীর

বিশিষ্ট উপন্যাস

লোহার গরাদের ছায়া দাম ৬·০০

মিরাকল-এর মতোই ঘটে গেল ব্যাপারটা। আকস্মিক এবং অবিশ্বাস্য। সুনীল রায়ের মতো নির্মল চরিত্রের মানুষটার জেল হয়ে গেল আড়াই বছরের। কথাটা যার কানেই গেল, সেই বিস্মিত, এবং কিছুটা যেন বিমূঢ়ও। সুনীল রায়ের স্ত্রী চন্দ্রার কাছেও বিস্ময়কর এবং হতবুদ্ধিকর ঘটনাটা। তবু ভাগ্যকে না মেনে উপায় কী। চন্দ্রাকেও মেনে নিতে হল। মাথায় লজ্জা এবং অমর্যাদার বোঝা, বুকে তবু দৃঢ় অমলিন একটি বিশ্বাসের শিখা জ্বালিয়ে চন্দ্রা অপেক্ষা করতে লাগল সেই দিনটির জন্য, যেদিন রাহুমুক্ত চাঁদ আবার স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করবে। প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি অবশেষে এলোও, কিন্তু কী চেহারায়, কেমন বেশে? আশাপূর্ণা দেবীর এই উপন্যাসে এমন একটি কাহিনী যা প্রতি মুহূর্তে আলোড়িত ও ব্যথিত করবে পাঠকের হৃদয়।

লেখকের অন্যান্য বই :

চাঁদের জনালা ৭·০০ গাছের পাতা নীল ১০·০০ দর্শকের ভূমিকায় ৮·০০ সময়ের স্তর৩·০০ সেই রাত্রি এই দিন ৭·০০ রাতের পাখি ৪·০০ দোলনা ৫·০০ কিশোর সাহিত্য : গজ উকিলের হত্যা রহস্য ৮·০০ রাজকুমারের পোশাকে ৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সন্তোষকুমার ঘোষের

মহত্তম উপন্যাস

জল দাও দাম ৬·০০

'জল দাও' সন্তোষকুমার ঘোষের এমন একটি উপন্যাস যা একইসঙ্গে লেখককে করে মহিমময়, পাঠককে করে তোলে দীক্ষিত। প্রখর এর আঙ্গিক, গভীর এর জীবনবোধ, প্রবল এর অন্বেষণ। এই উপন্যাস একাধারে এক ব্যক্তিমানুষের তথা এই সমকালেরই যেন স্বীকারোক্তি। সেই মানুষ,

যে জেনেছে গোটা জীবনটাই খুনের শিক্ষানবিশি। অনায়াসে বাল্যসখীকে তার বাবার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের পিঠ বাঁচায় যে-আত্মপর বালক, বন্ধুদের উসকে দিয়ে নিজে চুরি করে পাস করে যে-কাপুরুষ কিশোর, হাত-সাফাই করে জুয়ায় জিততে চায় যে-যুবক, প্রথমাকে হৃদয় দান করে শুধু লালসার ঘোরে যে আকৃষ্ট হয় দ্বিতীয়ায়, আবার দ্বিতীয়ারও ইজ্জত নিজের চাকরির তদ্বিরে কাজে লাগায় যে, জীবনভোর তার যাবতীয় গর্হিত কাজ আর লজ্জাকর আপসের পরম্পরা বস্তুত খুনেরই রকমফের। জীবনের চরম মূল্য দিয়ে কেনা তার অভিজ্ঞতার দর্পণে আসলে আমরা আমাদের মুখই দেখতে পাই। দেখি, আর চমকে উঠি। তারই মতো এই উপলব্ধিতে পৌঁছে যাই— মানবজীবনের মহত্তম ট্র্যাজেডি বোধহয় এইটেই যে, কী-ভাবে বাঁচা উচিত শিখতে শিখতেই একটা জীবন যায়, শেখা বিদ্যা কাজে লাগাবার মতো আর একটা নির্ভুল জীবনে বাঁচা আর হয় না।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

সন্ধ্যা-সকাল ১০·০০ সময়, আমার সময় ৫·০০

সত্যজিৎ রায়ের

বিজ্ঞানভিত্তিক আজব কাহিনী

সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু দাম ৬.০০

শুধুমাত্র বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর দৌলতেই পাঠককুলের কাছে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, বাংলা সাহিত্যে এমন চরিত্র মাত্র একটিই। অনন্য সেই চরিত্রের নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। এহেন প্রোফেসর শঙ্কুর পাঁচ-পাঁচটি দুর্ধর্ষ অ্যাডভেনচার-কাহিনী সংগ্রথিত হয়েছে 'সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু' গ্রন্থে। প্রত্যেকটি কাহিনীই দারুণ কৌতূহলকর আর রোমহর্ষক। অবশ্য প্রোফেসর শঙ্কুর যে-কোনো কাহিনীই তাই। তাঁর কান্ড এবং কারখানা যে কোনো সেরা বিদেশী সায়েন্স ফিকশনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

এই বইয়ের গল্পগুলি পড়ার পর একটি কথাই বলতে ইচ্ছে করে, সেই কথাতেই অবশ্য এ-বইয়ের নাম, কথাটি হল—সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

গোরস্থানে সাবধান ৮.০০ মহাশঙ্কটে শঙ্কু ৬.০০ ফেলুদা এণ্ড কোং ৮.০০ ফটিক চাঁদ ৮.০০ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬.০০ আরো এক ডজন ১০.০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬.০০ বাক্স রহস্য ৬.০০ সোনার কেল্লা ৬.০০ গ্যাংটকে গন্ডগোল ৬ ০০ প্রোফেসর শঙ্কুর কান্ডকারখানা ৭.০০ এক ডজন গপ্পো ১০.০০ বাদশাহী আংটি ৬.০০ বিষয় চলচ্চিত্র ১০.০০

প্রকাশিত হল

গিরিধারী কুন্ডুর

নতুন কিশোর-উপন্যাস

রাত একটা দাম ৪.০০

'টংসা চু' যারা পড়েছে তারা নিশ্চয়ই টুমপুকে মনে রেখেছে। আর যারা পড়োনি তারা এই বইতে টুমপুর নতুন অভিজ্ঞতার এক আশ্চর্য কাহিনীর মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে পরিচিত হবে।

'টংসা চু' ছিল ভুটানের পটভূমিকায়, আর 'রাত একটার' কাহিনী শুরু হচ্ছে দার্জিলিঙ যাবার পথে, ট্রেন থেকে। হ্যাঁ, ট্রেন থেকেই শুরু এই দুরন্ত কৌতূহলকর রহস্যকাহিনীর। সে-রহস্যের অবসান দার্জিলিঙে পৌঁছে, অনেক গা-ছমছম-করা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে। দার্জিলিঙ যাচ্ছিল টুমপুরা। কলকাতার মস্ত শিকারী টিংলুবাবু এসে জুটলেন শিলিগুড়ি স্টেশনে। একেবারে টুমপুদেরই কামরায়। হঠাৎ ঘুম স্টেশনে নেমে চা খেতে গিয়ে বেমালুম উধাও হয়ে গেলেন টিংলুবাবু। কামরার আরেকজন রহস্যময় মানুষ শশাংকবাবুও বেপাত্তা। এই দুজন হারানো মানুষের খোঁজ পেতে গিয়ে রক্ত-হিম-করা যে-অভিজ্ঞতা হল টুমপুর, তাই নিয়েই গড়ে উঠেছে এই অনবদ্য কাহিনী। প্রচ্ছদ—বিপুল গুহ, আর ভেতরের ছবি এঁকেছেন দেবাশিস দেব।

এই লেখকের আরেকটি গ্রন্থ :

টংসা চু ৫.০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

শিবরাম চক্রবর্তীর

নতুন সরস গল্পের সংকলন

লাভের বেলায় ঘন্টা

দেশ ৪৬ বর্ষ ৫১ সংখ্যা
১০ কার্তিক ১৩৮৬

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

দিলীপ সিনহার সচিত্র প্রবন্ধ
পুষ্কর মেলা

তিব্বততীর্থে

চীন কর্তৃক তিব্বত অধিকারের পর প্রথম যে তিনজন বিদেশী সেখানে যাবার অনুমতি পান তাঁদের দুজনই হলেন আনন্দবাজার পত্রিকার দুই সাংবাদিক—বরুণ সেনগুপ্ত ও অভীক সরকার। বর্তমান তিব্বতের সামগ্রিক রূপটি অভীক সরকারের ছবি এবং বরুণ সেনগুপ্তের লেখায় বিধৃত হয়েছে 'তিব্বততীর্থে'। আগামী সংখ্যা থেকে এই রচনাটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে।

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদ্মাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সম্পাদকীয়

মহিমময়ী মাদার টেরেসা

মাদার টেরেসাকে এই বছরের (১৯৭৯) নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তিনি ঘোষণা করতে দেরি করেননি যে, পুরস্কারের সমুদয় অর্থ (প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা) তিনি জনসেবার কাজে উৎসর্গ করে দেবেন। মহিমময়ী মানবসেবিকা, মাদার টেরেসার পক্ষে এটা তাঁর জীবনের স্বভাবজ আগ্রহের এবং পবিত্র সুকৃতির প্রকাশ। নোবেল শান্তি পুরস্কার তথা সম্মান তাঁর প্রতি নিবেদিত হয়ে স্বয়ং সম্মানিত হয়েছে। ভক্তিমতী খৃষ্টান ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসে সুপ্রীত তাঁর জীবন বর্তমান কালের ও সারা বিশ্বের পক্ষে যেন স্নিগ্ধ এক আলোকের প্রদীপ, পরম আশার সম্বল। বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কোথায় আমার ঘর? এবং আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কে মোর আত্মপর? কবি কথিত এই জিজ্ঞাসা মাদার টেরেসার জীবনে সবচেয়ে মহান্ ও সার্থক সদুত্তর লাভ করেছে। তাঁর দেশ ও জাতিত্বের পরিচয় সন্ধান করলে অবশ্য জানা যাবে যে, তিনি আলবানিয়ার মানুষ, যুগোস্লাভিয়াতে জন্ম। কিন্তু তাঁর পূর্বাশ্রমের এই ভৌগোলিক ও জাতিক পরিচয় তাঁর জীবনের অফুরান মানবপ্রেমের কাছে সুদূরের একটি ছায়ার স্মৃতি মাত্র। মানবসেবা ও ঈশ্বরবিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন ঐশ্বর্য তাঁর জীবনের কাছে প্রয়োজনহীন বাহুল্যের মতো অবান্তর হয়ে গিয়েছে। এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যে, তিনি মানবসেবিকা। অনাথ ও আতুরের কাছে তিনি মাতৃত্বে অভিষিক্ত এক দিব্য সান্ত্বনা।

কলকাতায় ও অন্যত্র, এবং ভারতের বাইরেও কয়েকটি স্থানে মাদার টেরেসার চেষ্টায় ও কৃতিত্বে স্থাপিত সেবাশীল কয়েকটি সংস্থা আছে। কিন্তু আমাদের এই কলকাতা যেন মাদার টেরেসার সেবার কাজের সবচেয়ে বৃহৎ পীঠভূমি। কৃতজ্ঞ কলকাতার মানুষ এই কারণে যেমন তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে, তেমনই বিশেষ একটি আন্তরিক পরিতৃপ্তিও লাভ করেছে। সহজ যুক্তির সূত্রে সারা ভারতের মনও এই সংগত গর্বে পরিশীলিত হতে পেরেছে যে, মাদার টেরেসা ভারতের সবারই কাছে বিশেষ এক আপনজন। মাদার আজ ভারতীয় চিত্তের নেপথ্যে নয়, চিত্তের অন্তরতম কক্ষের মুক্তকপাট অভ্যর্থনার ও শ্রদ্ধার আস্পদ। লক্ষ করতে হয়েছে, ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি বিশুদ্ধ ও নৈষ্ঠিক খৃষ্টান হয়েও তাঁর সেবার কাজের আয়তন কোন ধর্মগত বিচারভেদের সামান্যতম প্রশ্রয় হয়ে ওঠেনি। মাদার টেরেসার সেবা নিতান্তই সেবা। তাঁর সেবার রীতি-নীতির কাছে খৃষ্টান ও অখৃষ্টান নামে কোন ভিন্নতার দাবি সামান্য স্বীকৃতিও পায় না। মাদার টেরেসার সেবাশীল ক্রিয়াচারের এটাই একটি বিশেষ মহত্ত্ব। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হয় যে বহু খৃষ্টান মিশনারী ভারতের নানা স্থানে সেবার পবিত্র কর্মে ব্রতী হয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অখৃষ্টান ব্যক্তিকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার কর্তব্যও পালন করেন। মাদার টেরেসা কিন্তু একটি মহান্ ব্যতিক্রম, তাঁর সেবার কাজের সঙ্গে ধর্মদীক্ষার কোন কর্তব্য সংযুক্ত নয়। তিনি শুধু সেবা করেই পরিতৃপ্ত। এ হেন আদর্শিক সাধনার মানুষকে বিশ্ব জীবনের সকল সুখের পক্ষে মহিমান্বিত এক প্রেরণার সম্বল বলে মনে করা চলে।

ঠিক প্রাসঙ্গিক বিষয় না হলেও ঘটনার কথাটা এসে পড়ে। কিছুদিন আগে লোকসভাতে উপস্থাপিত একটি বেসরকারী বিল, যার নাম ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা বিল, তার সম্বন্ধে ভারতীয় জনমতের একাংশে, বিশেষ করে খৃষ্টান সমাজের এক বৃহৎ অংশের চিন্তায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ আলোড়িত হয়েছিল। সেই বিলটি শেষ পর্যন্ত সরকারের ইচ্ছায় বর্জিত হয়েছে। মাদার টেরেসাও সেই বিলের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। ধর্মীয় আচরণ এবং ধর্মাধিকারের ক্ষেত্রে তিনি বিশুদ্ধ শান্তির পক্ষে তাঁর অভিমত প্রদান করেছিলেন। কোন সন্দেহ নেই, ধর্ম ধর্মাচরণ ও ধর্মাধিকারের ক্ষেত্রে শান্তির নীতি অনুসরণ করাই ভারতের মতো দেশের পক্ষে বস্তুত তার দীর্ঘকালীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুগত আচরণ। এই সত্যটি খৃষ্টীয় ধর্মের প্রচারক মিশনারীর পক্ষে উপলব্ধি করবার প্রয়োজন আছে। এবং মাদার টেরেসার মতো ভক্তিমতী খৃষ্টধর্মানুরাগিণী মানবসেবিকার পক্ষে উপলব্ধি করবার কোন প্রশ্নই নেই। তিনি এবং তাঁর জীবনই বস্তুত ওই উপলব্ধির পবিত্র বিগ্রহ। ধর্ম ও সংস্কৃতির সার্থক সদাচার সম্পর্কে সুদূরাতীত ভারতীয় জীবনের ইতিহাসে যে মনোভাবের একটি উদাত্ত নির্ণয় এক মহান্ প্রেমধর্মী ব্যক্তির ধর্মবোধেরই প্রেরণাতে প্রচারিত হয়েছিল, তারই প্রেরণার উপচার নিয়ে আমরা আজ মাদার টেরেসাকে অভিনন্দিত করতে পারি। দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজের একটি শিলালিপিতে এই অনুজ্ঞা অক্ষরে অঙ্কিত হয়ে আজও চরম এক উদারতার তত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। পূজেতিয়েব চ পরপষণ্ড পরের ধর্ম-সংস্কৃতিকে শুধু অবিদ্বেষী মনের ভাব-অনুভাব দিয়ে সহ্য করা নয়, অনুরাগ দিয়ে তাকে অভ্যর্থিত করাও মানবতাধর্মী সাংস্কৃতিকতার একটি নিয়ম ও নিদর্শন। ভক্তিমতী খৃষ্টান মাদার টেরেসার জীবনে অনুরূপ উদারতার দ্বারা সমন্বিত মানবধর্মের পকাশ লক্ষ করা যায়।
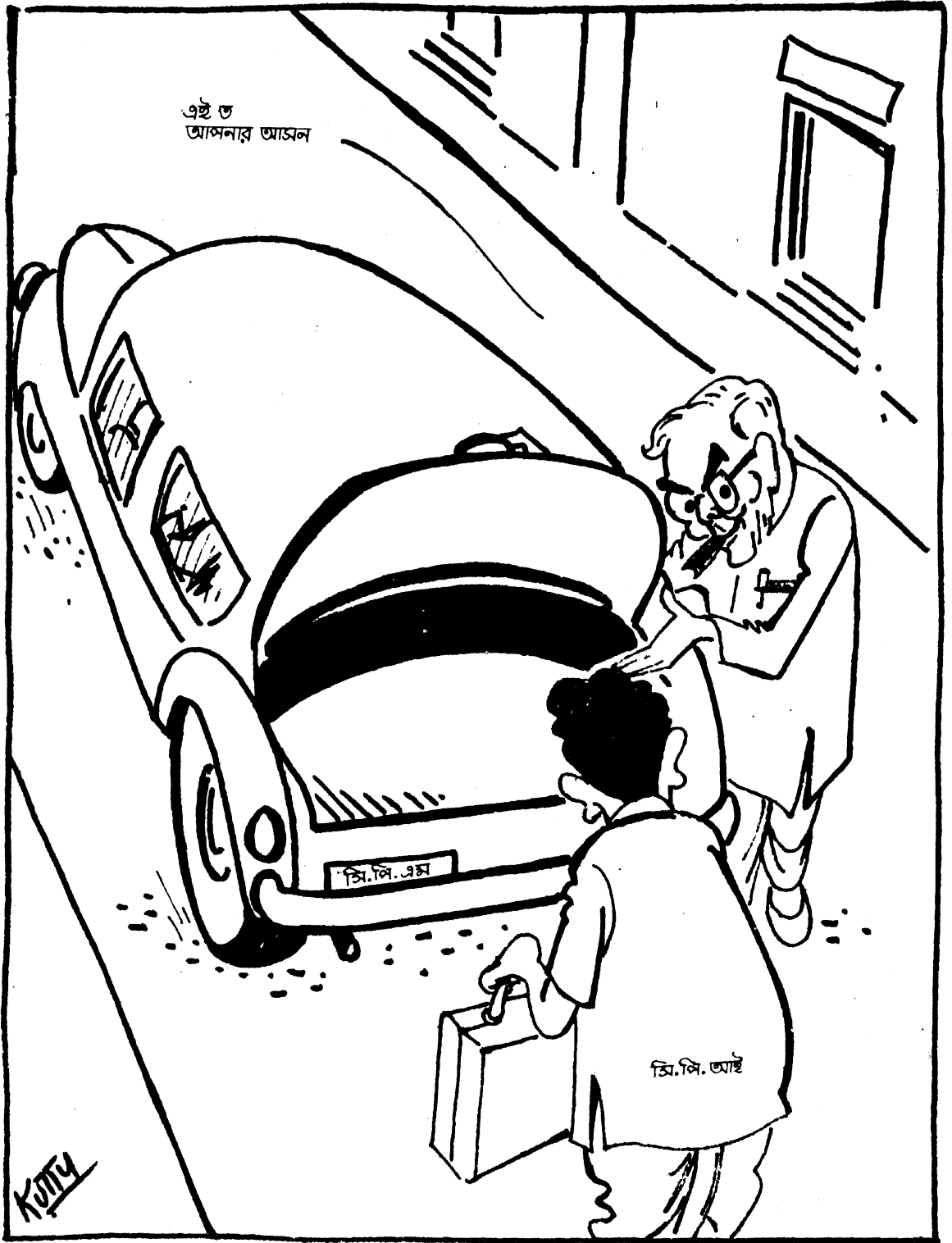
এই ত
আপনার আসন
সি.পি.এম
সি.পি.আই
Kutty

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

উৎসবে ব্যসনে চৈব

স্ফুরদ্দশনদংষ্ট্রাভা ভীমরূপা ভয়ঙ্করী

সশব্দে ভয়ঙ্করীর পুজো। শিবকাশী থেকে ক্যানিং স্ট্রীটে এসেছে দোদমা, চকোলেট বোমা, লঙ্কা পটকা। সন্ধ্যার দীপমালা, লাউড স্পীকারের গমগম গম গম, সারা শহরের আকাশে বাতাসে দুমদাম, ঝমঝম, চটপট। মিনিটে হাজার টাকা পুড়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মহাকালীর আবির্ভাব, ওড়াতে আর পোড়াতে। শব্দে বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠছে, হার্টের রুগী ভাবছেন এ যাত্রা রক্ষে পেলে হয়। দু আউন্স তুলো কানে গুঁজে সমীরবাবু, বালিশে হেলান দিয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে রক্ষাকালীকে স্মরণ করছেন। দু দুবার হার্ট থমকে গিয়েছিল তিনে নির্ঘাত মৃত্যু। প্রবাদেই তো বলছে, একে পক্ষ, দুয়ে নেত্র, তিনে বাণ। শব্দ বাণেই না ঘায়েল হয়ে যান!

শিবেনবাবুর প্রবলেম হার্ট নয় কুকুর। কুকুর নিয়ে

দুমদাম; ঝমঝম; চটপট

মহা সমস্যা। ভেটিনারি ডাক্তার বলেছেন, কুকুরের কান মশাই ভীষণ সেনসিটিভ। মানুষের চেয়ে একশ গুণ বেশী শুনতে পায় স্ত্রীলোকের কানকেও হার মানায়। যত শোনে তত ঘেউ ঘেউ করে। স্ত্রী আবার ঘেউ ঘেউ সহ্য করতে পারেন না, ভিটামিন ডেফিসিয়েনসি। কালী পুজোর এক মাস আগে থেকেই কড়া ডোজে ভিটামিন চিকিৎসা শুরু করেন। মহা পুজোর দিন ডবল ঘুমের বড়ি। এ বছর তিনি কুকুর কালে বৈকুণ্ঠের দেশে চলেছেন। স্ত্রী এবং কুকুর দু জনকেই শান্তিতে রেখে নিজে শান্ত থাকতে চান।

গত বছর হরেনবাবুর বড় ছেলের ডান হাতের চেটোটা মাইনাস হয়ে গেছে। পলতে বেয়ে আগুন আসার সময়ের হিসেব ঠিক রাখতে পারেনি, চকোলেট হাতেই ফেটেছে। অবশ্য বাঁ হাতটা এখনও আছে। মায়ের জন্যে জীবন পর্যন্ত দিতে পারি, দুটো হাত তো জীবনের সামান্য ভগ্নাংশ। কাপালিকের পুজোয় এক সময় নরবলি হত, তবে! হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে আধুনিক কাপালিকরা এই রাতে রেডি হয়েই আছেন। ভয় কি! চালিয়ে যাও শাক্তের বাচ্চারা। কনুইয়ের কাছ থেকে হাত বাদ দিয়ে দেব নিমেষে, ঠ্যাং ছেঁটে দেব, ভুঁড়ির মালমশলা বেরিয়ে পড়েছে? আবার প্যাক করে দেব। মুখ পুড়ে ঝলসে গেছে!! নেভার মাইন্ড। হনুমানকে স্মরণ কর। মহাবীর যদি সারা জীবন পোড়ামুখে ঘুরতে পারেন, তুমিও পারবে। চোখ গেছে! ভালই তো। অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাবে। মহাপুরুষ বলে গেছেন—বল জন্ম হইতেই আমরা মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।

রামবাবু বললেন, মিথ্যে বলব না, মহামায়ার পুজোর দিন আমি বোতল দুছিপি মেরে টং হয়ে ঘরে বসে থাকি। আহা মা তুই এলি! হৃদিপদ্ম উঠল ফুটে মনের আঁধার গেল টুটে। মা তোর কি রূপ! এলোকেশী, বিবসনা, লকলকে জিভ, এক হাতে খড়্গ, আর এক হাতে কাটা মুণ্ডু, অন্য হাতে বরাভয়, পায়ের তলায় শিব সারেন্ডার করে পড়ে আছেন। কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা রে আলোর নাচন। বুকে বসে ভাব এসে যায়। মা আমি মহাদেব হব। তুমি আমার বুকে উঠে নাচবে। গুনো গুনো করে গাই— ধ্যার ব্যাটা, সুরাপান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।

পাড়ার কুকুর ভুলো সন্ধ্যে থেকেই বড় ভয়ে ভয়ে আছে। এখুনি তার ন্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে আগুন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। ভয়ে দৌড়তে থাকবে ভুলো। সমঝদারেরা তারিফ করে তালি বাজাবেন—বহুত আচ্ছা। পুলিস কর্তৃপক্ষ যথারীতি বাজির নিষিদ্ধ

নর্দমার জল এবং গঙ্গার জল এক

তালিকা প্রকাশ করবেন। প্রতি বছরই তো করেন। তাতে কার কি এসে যায়! দিশী 'গাইফকস ডে'। বড় রাস্তার মাঝখানে বোমার পলতেয় আগুন, নিব নিব হয়ে আছে। ফাটবে কি ফাটবে না, মহা সাসপেনস! পথচারীরা থমকে আছেন দু পাশে। সুন্দরী রমণী কানে আঙুল দিয়ে শব্দের অপেক্ষায়। সঙ্গী বলছেন, তখনই বলেছিলুম আজ আর বেরিও না, তায় আবার সিনথেটিক শাড়ি পরে বসে আছ! কবে যে কাণ্ডজ্ঞান হবে! পলতে ফেল করেছে। সাহসী দু-চারজন এরই মধ্যে এদিক ওদিক করে নিলেন। থমকে থাকা জনস্রোত যা থাকে বরাতে বলে সচল হল। বোমবাজ নিজেই ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে একটি লাথি কষিয়ে বললে, দেড় টাকা লস। স্যাঙাত সান্ত্বনা দিয়ে বললে, গরু লস বলছ কেন, কি সব জিনিস আটকে গিয়েছিল। বল একবার।

পুজো কমিটির মাতব্বররা শিল্পীকে ফরমাশ করলেন, প্রতিমায় সব থাকবে, থাকবে না দুটো চোখ আর জিভ। চোখের জায়গায় শুধু দুটো গর্ত। সে কি স্যার, মাকে অন্ধ করে রাখব? অন্ধ করে রাখবে কেন চোখ ফোটাবেন আলোক শিল্পী, বিদ্যুৎবরণ পাল। দুটো চোখে লাল দুটো টুনি ফিট করা হবে, জিভ হবে ইলেকট্রিকের। দাঁতের ফাঁকে একই সংগে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝিলিক বেরোবে, জিভ দিয়ে টসটস করে গড়াবে রক্তের ফোঁটা, দুটো চোখ জবাফুলের মত লাল। মাঝে মাঝে জ্বলছে আর নিবছে।

এ পুজোর কেরদানি দেখাবার অনেক স্কোপ। মায়ের সাঙ্গোপাঙ্গ অনেক। ডাকিনী যোগিনী। শ্মশানচারী প্রেত আর পিশাচের দল। উটমুখো শৃগাল। মহাদেবের মাথার কাছে ফণা তোলা সাপ। চিতার আগুন। মৃন্ময়ী আসবেন কুমোরপাড়া থেকে। এসে উঠবেন সাজান মঞ্চে। যেন থিয়েটারের স্টেজ। পেছনে চট আঁকা রাতের ঘন নীল-কালো আকাশ, ঝাঁকড়া বটগাছ, শীর্ণ একটা নদী একপাশ দিয়ে বয়ে যেতে পারে, বৈদ্যুতিক চিতায় আগুন জ্বলছে লকলক করে। স্টিরিয়ো টেপ রেকর্ডারে ঝড়ের শব্দ, মেঘের ডাক, প্রেতের হাসি, শেয়ালের হুক্কাহুয়া। মঞ্চ সজ্জায় একই সংগে তারাপীঠ, কেওড়াতলা, আদি যুগ, আণবিক যুগ সবই মিকস আপ করা হয়েছে। চোঙায় বোমবাই গান ঝরছে, হো মুকদ্দর, হো সিকন্দর। মাঝে মাঝে বাঙলা শাক্ত সংগীত, নইলে মান থাকে না, মা আমায় ঘুরাবি কত, এমন চোখ বাঁধা কলুর বলদের মত।

উদ্বোধনের দিন মন্ত্রী আসতে পারেন সপার্ষদ হাইকোর্টের মহামান্য বিচারক, কোনও সাহিত্যিক, অথবা শাস্ত্রজ্ঞ জেট-এজ-পণ্ডিত। চিত্র তারকা হলে তো

শক্তি সাধনা

মার দিয়া কেল্লা মা গো। উদ্বোধন অনুষ্ঠান তিন দিন আগেই হবে। এত কেরামতি আর ঘোর ঘনঘটায় মাকে সহজে কি নিরঞ্জন দেওয়া যায়। স্টেজে দাঁড়িয়ে মা এক মাস ধরে অ্যাকটিং করবেন। মাঝরাতে ভোঁতা প্যান্ডেলে মহাদেবের পায়ের কাছে নেড়ী কুকুর শুতে আসবে গুটিশুটি মেরে। মহাদেব হয় তো একলাথি মেরে বলবেন—বেল্লিক, যুধিষ্ঠিরের পেছন পেছন স্বর্গে গিয়ে সাহস খুব বেড়ে গেছে তাই না। জানিস আমি কে!

কুকুর বলবে, তুমি কে মালেক। আমি তো ভেবেছিলুম কোন হিপিটিপি হবে। রোজই তো আমি ফুটপাথে কারুর না কারুর কোলের কাছে এই ভাবেই শুয়ে আসছি মহারাজ লাস্ট সেভেন ইয়ার্স। কই তারা তো কিছু বলে না।

বৎস, তারা মা কালী মেরে মরে পড়ে থাকে, তাই বলে না, আর আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ বুকের ওপর মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন লাস্ট ওয়ান মানথ। না পারছি উঠতে, না পারছি বসতে, না পারছি পাশ ফিরতে! তার ওপর তুই ব্যাটা এসেছিস আমার ঠ্যাঙের ফাঁকে শুতে। সেক্রেটারিকো বোলাও!

কোথায় পাবেন তাঁকে। বারোয়ারির হাল জানেন না! তিনি এখন শক্তি সাধনা করছেন।

মা বললেন, মহেশ্বর! কেন খেপে যাচ্ছ! তুমি না নীলকণ্ঠ! সমুদ্র মন্থনের সমস্ত হলাহল তোমার কণ্ঠে, আর একটুও না হয় ধারণ করলে। ঘুম কর, আমিও তো ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, এক পা সামনে হাঁটুর কাছে ভাঙা, আর এক পা পেছনে ভরত নাট্যমের কায়দায়।

বিষে বিষে আমি স্যাচুরেটেড। আর কিন্তু আমি পান করতে পারব না, পারব না। আমার ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চলবে না, চলবে না। মশা কামড়ে ছিঁড়ে দিল, জ্বালিয়ে দিলে। আবর্জনার গন্ধে সারা শরীর ঘুলোচ্ছে, ঘুলোচ্ছে।

মরেছে! তোমার গায়েও কলকাতার হাওয়া লাগল! ওহে এটা এসপ্ল্যানেড ইস্ট নয়। তখন থেকে স্লোগান ঝাড়ছ! চুপ করে শোও। আমার এক ভক্ত কি লিখেছিলেন মনে আছে :

Who dares misery love and hug the form of death/dance in destruction's dance, to him the Mother comes.

এই শহরের মত দুঃখ আর কোন শহরে আছে? হ্যাঁ গো! পাতাল রেলের আকু পাঙ্চার, অমাবস্যার অন্ধকার, বুজে যাওয়া পয়ঃপ্রণালী, এক ডজন পল্যুউশান, পয়সাঅলাদের সাকশান, গরীবের স্টারভেশান, পরিকল্পনার অ্যাবরশান, সংস্কৃতির ইনডাইজেশান, জনসংখ্যার সাফোকেশান, নেতাদের সাজেশান, লক্ষপ্রকার ইনফেকশান, তাণ্ডবে পাণ্ডবরা নাচছে, মৃত্যুকে জননী বলে জাপটে ধরছে, তাই তো আমি আসি, ভক্তদের আমি বলে যাই, কপালের লেখন কে খণ্ডাবে! কপালে লিখিতং ধাঁতা, কোন শালা কিংকরিস্যতি।

কিন্তু জননী, উন্মোচনের দিনে কত ভাল ভাল বক্তৃতা হল, নিশ্চয় শুনেছ : মা হলেন আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি। বরদায়িনী। শক্তির জন্য সাধনা চাই। যার হাতে পেটো তাকে পেটো নিয়েই সাধতে হবে। প্লেটো নয় পেটো। যার গেঞ্জিতে চাকু, তাকে চাকুর পথেই এগোতে হবে। জগৎটা কারুর একার মামার বাড়ি নয়। গাদা যার জগৎ তার। সোর্ড ইজ মাইটিয়ার দ্যান পেন। কাজের চেয়ে প্রতিশ্রুতি বড়। সবসে বড়া রাজনীতি। নীতি মানে নিয়ম বা নিষ্ঠা নয়, ক্ষমতা অধিকারের শক্তি। সেই শক্তি হল বক্তৃতা। বক্তৃতা হল শব্দের সমষ্টি। শব্দই ব্রহ্ম। আমি বলে যাই তোমরা শুনে যাও। আমি মেরে যাই তোমরা দেখ আর বাহবা দিয়ে যাও। বিশ্বাস রাখ—মা যা করেন ভালর জন্যেই করেন। শক্তি সকলের মধ্যে নামে না। যার মধ্যে নামে সেই হয় নেতা। নেতারাই দেবতা। সেই দেবতাকে নৈবেদ্য দাও। কিসের নৈবেদ্য! কলা নয় মুলো নয়। ভোট। ভোট দাও ভোট দাও। এম এল এ দাও। এম পি দাও। ওই দেখুন ছেলেরা মাটির রামপ্রসাদ বসিয়েছে মায়ের সামনে। তিনি বলেছিলেন মনকে কৃষিকাজ শেখাতে। তার মানে মনকে কর্ষণ কর। কর্ষণ মানে ধর্ষণ। মনকে কোপাও। কলকাতাকে যেভাবে কুপিয়ে কোফ্‌তা বানান হচ্ছে সেই ভাবে মনকেও কাবাব করে ফেল। তা হলে কোনও আক্ষেপ থাকবে না। চিরকালই দেশের জন্যে প্রয়োজন রাশি রাশি উদাসীন দার্শনিক। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন নর্দমার জল আর গঙ্গার জলকে এক মনে করতে হবে। মনটনের কোনও ব্যাপার নেই। আমরা এক করে দিয়েছি। হোলসেল নর্দমা। তিনি বলেছিলেন, টাকা মাটি। ইয়েস টাকাকে আমরা মাটি বানিয়ে দিয়েছি। নো ভ্যাল খোলামকুচি সদৃশ। তাকিয়ে দেখুন মা আমাদের উলঙ্গ। বিবসনা, লজ্জাহীনা। তার মানে কি, বিভবের কোন প্রয়োজন নেই। কাঞ্চন লোষ্ট্রবৎ। লেংটি পরে ঘুরে বেড়াও শ্মশানে মশানে। চিতার কাছাকাছি থাক বার্থ ডে স্যুট। সকলেরই এক গতি। মরণকালে ধুনি ছাড়া রবে না তোর কিছুই পাশে। মা আর কি বলছেন, নির্লজ্জ হও। শক্তিমানের চক্ষুলজ্জা থাকবে না। নেইও। দেশ নেতারাই তার প্রমাণ। একবার এ দল, একবার ও দল। দলবাজ, বোমবাজ, দাঙ্গাবাজ ধাপ্পাবাজ, ধান্দাবাজ, চালবাজ, বাজেরাই বেঁচে থাকবে তারাই শক্তিশালী। পক্ষীকুলে বাজই দুর্দান্ত পাখি। বসুন্ধরা বীর ভোগ্যা।

তুমি দেখি মুখভার করে শুয়ে আছ।

তবে! তুমি ভাব গাঁজা খাই বলে আমার মেধা কম। বয়েস কত হল হিসেব করেছ!

সে হিসেব আমার পরমভক্ত পার্থ জানে।

সে আবার কে গো!

ওই দেখ শেষ রাতে ধুন্নো খেলে টলতে টলতে ফিরছে। পাহারাঅলা পাকড়েছে, কে যায়!

আমি পার্থ। দিলুম শালা অলক্ষ্মী বিদেয় করে উৎপাতের ধন চিৎপাতে দিয়ে এলুম। হে আইনের প্রভু জেনে রাখ, অর্থই অনর্থের মূল। চার কিলো কাদা তেলের টিনে রাতারাতি কুড়ি টাকা কেজি প্রফিট। নদীতে জল বাড়ছে, শহরে লোক বাড়ছে, মন্দিরে ধম বাড়ছে, তোমার ভুঁড়ি বাড়ছে, গিন্নির বয়েস বাড়ছে দাদুদের নাতি-নাতনী বাড়ছে, আমাদের কালো টাক বাড়ছে, কালো জগৎ আলো। শুনবে নাকি এক লাইন রামপ্রসাদী, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, শ্যামা মা কি 'আমার কালো, কালো রূপে দিগম্বরী...।

আমার সেই ভক্ত পার্থ, পাড়ার পার্থদা, পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে। ছেলেরা বলে মায়ের চেলা পার্থ, চাকু শো করে চাঁদা আদায় করতে হয় না, হাত ঝাড়লেই হাজার। জান তো, চাকু আর চাঁদা, যেমন তুমি আর আমি। সেই পার্থই সেদিন মালের ঘোরে আসল সত্য ফাঁস করে দিয়েছে : মা, জানি তুমি নেই তবু তোমাকে ডাকি, সেইটেই আমার মাহাত্ম্য।

শিশু ভোলানাথ এদিকে ধেই ধেই করে নাচছে, 'জয় মা কালী পাঁঠাবলি' ভোলানাথ বাবা ম্যাদামেরে বসে আছেন, ক্যানিং স্ট্রীটে বাজি কিনতে গিয়ে পকেট মার। দু দিন পরেই ভাই ফোঁটা। বউয়ের চার ভাই। চার শ্যালকই এবার গর্দান নামিয়ে দেবে। বউ ঘাড়ে খুব করে তেল মালিশ করছে। তা হলে একটা গান গাই শ্মশানে জাগিছে জননী সন্তানে দিতে কোল।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মা টেরেসা

সুদেব রায়চৌধুরী

'এ তো তাঁরই দান।' —নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এই তিনটি শব্দই মা টেরেসার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল।

বুধবার (সতের অকটোবর) সন্ধ্যা ছটা চল্লিশ মিনিটে নরওয়ে থেকে টেলিপ্রিন্টারে দু লাইনের একটি খবর এল : নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক জন সানেস ১৯৭৯ সনে শান্তির জন্য সেবা, প্রেম ও করুণার প্রতিমূর্তি মাদার টেরেসাকে নোবেল পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যাঁর জন্য এই ঘোষণা, তিনি তখন মৌলালির কাছে জোড়াগীর্জার বিপরীত দিকে ৫৪এ, আচার্য জগদীশ বসু রোডে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজ' ভবনের এক তলার ছোট ঘরখানিতে বসে দীন-দুঃখীদের ভাবনা-চিন্তায় রত। এরই মধ্যে অভিনন্দনের পর অভিনন্দনের জবাব দিতে ব্যস্ত।

কলকাতায় সবার আগে যিনি নোবেল পুরস্কার পান তিনি হলেন, রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৩ সনে, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে', গীতাঞ্জলির এই নিবেদন মা টেরেসার জীবনেও যেন মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। একজন সাহিত্যে কাব্যে। অপর জন সেবায়। পরম-করুণাময়ের ভাবনায় এই দুই-এর মধ্যে কি অপূর্ব মিল। রবীন্দ্রনাথের পর ১৯৩০ সনে নোবেল পুরস্কার পান অধ্যাপক সি ভি রমন, পদার্থ-বিদ্যায়। বিজ্ঞানী রমনের গবেষণাস্থল ছিল এই কলকাতায়। অবশেষে সুদূর মার্কিন মুলুকে থেকেও একজন ভারতের মান বাড়ালেন। ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা শারীরবিদ্যা ও ঔষধ নিয়ে গবেষণার জন্য ১৯৬৮ সনে নোবেল পুরস্কার পান। জন্মসূত্রে ভারতীয় হলেও খোরানা পরে অবশ্য মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। আর দিন কয়েক আগে ঘোষিত পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কারের জন্য পাকিস্তানের আবদুস সালামের জন্ম ভারতে। দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার পর আলবানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেও ভারতীয় নাগরিক কলকাতার মা টেরেসা শান্তি, প্রেম ও সেবার জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন। পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ নব্বই হাজার মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ষোল লক্ষ টাকা। ১৯০১ সন থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। তারপর থেকে যুগোস্লাভিয়া বা ভারত কোন দেশই নোবেল শান্তি পুরস্কার পাননি। গান্ধীজী, নেহরু থেকে শুরু করে আরও কয়েক জনের নাম এই পুরস্কারের জন্য শোনা গিয়েছিল, কিন্তু তা শোনাই থেকে গিয়েছে। ভগিনী নিবেদিতার সেবার কথা কি ভোলবার মত। তিনিও তো পাননি এই পুরস্কার।

মা টেরেসার জন্ম ১৯১০ সনের ২৭ আগস্ট যুগোস্লাভিয়ার স্কপেজে শহরে। তখন নাম ছিল অ্যাগনেস গোনক্সা বেজাকসহিউ। পরবর্তীকালে মাদার টেরেসা। বাবামার পৈতৃক ভিটা আলবানিয়ায়। এক ভাই, দু বোন। মা ও বোন জীবিত থাককালে মা টেরেসা আলবেনিয়ায় যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই কম্যুনিস্ট দেশটি তাঁকে যেতে দিতে অস্বীকার করে। তাঁর বোন আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানা বেতারে ঘোষকের কাজ করতেন। বাবার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর পরিবার তিরানায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। স্কপজে শহরের সরকারী স্কুলেই শিক্ষার হাতেখড়ি মায়ের। স্কুলে থাকাকালেই তিনি সোডালিটির সদস্য হন। ওই সময় যুগোস্লাভিয়ার জেসুইটরা কলকাতায় আসেন। কেউ কেউ যান কার্শিয়াংয়ে। সেটা ১৯২৫ সনের ৩০ ডিসেম্বরের কথা। কার্শিয়াং থেকে একজন জেসুইট বেঙ্গল মিশন ফিল্ড সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক, একাধিক চিঠি পাঠান যুগোস্লাভিয়ায়। চিঠিগুলি স্কুলে সোডালিস্টদের কাছে নিয়মিত পড়ে শোনানো হতো। তরুণী

প্রকাশ করলেন। আয়ারল্যান্ডে লরেটো সন্ন্যাসিনীদের সহযোগিতায় তরুণী অ্যাগনেস কলকাতায় এলেন ১৯২৮ সনের ডিসেম্বরে। কলকাতা থেকে সরাসরি দার্জিলিং। বড় দিনের আগে এই দার্জিলিংয়ে ট্রেনে যাবার পথে তাঁর মন ওলটপালট হয়ে গেল। আড্রিয়াটিকের বিশালতা ও হিমালয়ের বিরাটত্ব—এই দুই-এর সংমিশ্রণ তাঁর দেহ-মনে পরিবর্তনের জোয়ার নিয়ে এল। মায়ের কথায় : কে যেন আমায় আহ্বান জানায়। ট্রেন ছুটে চলেছে। চারিদিককার মনোরম পর্বতমালাকে পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। এরই ভিতর অন্তরের অন্তঃস্থলে সেই আহ্বান বাণী শুনতে পেলাম।

'I heard the call to give up all and follow Him to the slums to serve Him amongst the poorest of the poor.'

আহ্বান-এ সাড়া দিয়ে মা টেরেসা ১৯৪৮ সনের মাঝামাঝি লরেটোর নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে চলে আসেন। শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে লরেটো স্কুলের চার দেওয়ালে ঘেরা সুন্দর উদ্যান, শান্তিময় পরিবেশ তাঁকে মুক্তির স্বাদ দিতে পারল না। ভগবানের নাম করে শুধু নিজেকে, নিজের জীবনকে পবিত্র করা মানুষের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কলকাতার জনজীবন, বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র বস্তিবাসীর দুঃখ, দুর্দশা তাঁর কোমল হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করল।

ফ্লোরেন্স নাইটেংগলকে আমরা চিনেছি ইতিহাসের পাতা থেকে। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য সেবা-ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর এক উত্তরসূরীকে সমসাময়িককালে আমরা কাছে পেয়েছি। ভাবতে অবাক লাগে তিনি আমাদের দেশের মেয়ে না হয়েও আমাদের 'মা'। ফ্লোরেন্স নাইটেংগল যে বছর দেহত্যাগ করেন সেই বছরেই অর্থাৎ ১৯১০ সনেই মা টেরেসা জন্মগ্রহণ করেন। আর মাত্র আঠার বছর বয়সে মিশনারিদের কাজে চলে আসেন গঙ্গাতীরে প্রায় তিনশো বছরের পুরোনো জব চার্নকের এই শহরে। অনাহারে, অনাদরে, দারিদ্র্যের অসহ্য যন্ত্রণায় যারা কুরে কুরে মরছে তাঁরাই হল মায়ের

ভারত হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর স্বদেশ, স্বভূমি। মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আপনি কি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন? —নিশ্চয়ই গ্রহণ করেছি। আই অ্যাম অ্যান ইন্ডিয়ান বাই চয়েজ অ্যান্ড ইউ আর অ্যান ইন্ডিয়ান বাই অ্যাকসিডেন্ট'—মায়ের সপ্রতিভ জবাব।

অস্পৃশ্য, অশুচি বলে যে মেথরাণীকে আমাদের মধ্যে অনেকেই এড়িয়ে যেতে অভ্যস্ত, মা টেরেসা সেই মেথরাণীর পরিধেয় নীলপাড়ের সাদা শাড়ি নিজের অঙ্গে ধারণ করলেন। ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতীয় নারীর পরিধেয় বস্ত্র শাড়িকেই তাঁর মিশনের সিসটারদের পোশাক হিসাবে গ্রহণ করলেন। মাত্র পাঁচ টাকা ট্যাঁকে গুঁজে কিভাবে মা টেরেসা ত্রিশ বছরের মধ্যে মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজের শাখা-প্রশাখা গড়ে তুলেছেন তা এক বিস্ময়কর কাহিনী। কালীঘাটের 'নির্মল হৃদয়', মৌলালিতে 'শিশুভবন', সোদপুরে প্রেম নিবাস কুষ্ঠাশ্রম, দমদমে নির্মলা কেনেডি সেন্টার—সবই মায়ের সৃষ্টি। আবার এই মাই বলেছেন : সবই তাঁর ইচ্ছা।

সন্তানগর্ভে আসার আগে যে-কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী মা। কিন্তু গর্ভপাত আর হত্যার মধ্যে কোন ফারাক নেই। কিন্তু মায়ের কথা : মেয়েরা কেন সংযমী হবে না? পদ্মশ্রী থেকে শুরু করে মা অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। যার অর্থমূল্য কোটির কাছাকাছি হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নোবেল পুরস্কারের টাকাও কুষ্ঠ রোগীদের আশ্রম ও দুঃস্থ পরিবারের বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হবে। যে আগ্রহ নিয়ে রুগ্ন শিশু বা মুমূর্ষু কোন লোককে বুকে জড়িয়ে ধরেন মা, পুরস্কার (সে যে পুরস্কারই হোক না কেন) হাত বাড়িয়ে নিতে তার চেয়ে বেশি কোন আগ্রহ প্রকাশ পায় না মায়ের মধ্যে। মাদার টেরেসা সম্পর্কে লরেটোর সেই সন্ন্যাসিনীর সরল প্রকাশভঙ্গী হৃদয়কে স্পর্শ করে খুব সহজে। মা টেরেসার জীবনের সর্বোচ্চ বিস্ময়কর বস্তুটি হল যে তিনি সাধারণ। তাঁর জীবন বা জীবনী সম্পর্কে কোন কাহিনী নেই। 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর [illegible] নেই।

অনুবাদ-কবিতা কেতকী কুশারী ডাইসন

The Orient is a Western fiction, a shorthand term for Asia and those parts of the Mediterranean world inhabited by peoples regarded as neither European nor African.

এই বিনীত স্বীকৃতি দিয়ে যে বইটির প্রস্তাবনার শুরু, তা একটি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রচেষ্টা : তথাকথিত 'প্রাচ্য' কবিতার ইংরেজী অনুবাদের একটি তিনশতাধিক পৃষ্ঠার সংকলন।১ যে প্রাচ্য জগতের সন্তোষজনক সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন, সেই বিশাল দুনিয়ার তেত্রিশটি ভাষা থেকে কবিতার নিদর্শন এখানে সংকলিত হয়েছে। সময়ের বিস্তারও বিরাট : প্রাচীনতম কাব্যের অংশ থেকে একেবারে হাল আমলের রচনাও স্থান পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এ-জাতীয় কাজ একজনের চেষ্টায় হয় না, এবং এ সংকলনটিও সম্ভব হয়েছে অনেকজন অনুবাদক, বেশ কয়েকজন বিভাগীয় সম্পাদক, এবং একজন প্রধান সম্পাদকের সহযোগিতায়। একেকটি ভাষা একেকটি বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, এবং প্রত্যেকটি বিভাগকে এক বা একাধিক বিভাগীয় সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। কদাচিৎ অন্য সহযোগিতার অভাবে প্রধান সম্পাদক, যিনি নিজে কবি এবং কবিতার অনুবাদক, নিজেই বিভাগীয় দায়িত্বও পালন করেছেন। প্রত্যেকটি বিভাগের সূত্রপাতে একটি ছোট ভূমিকা দেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনাটির ক্ষেত্র যেহেতু এত সুদূরপ্রসারী, তার স্থানকালের পরিধি যেহেতু এত ব্যাপ্ত, সেহেতু বিভিন্ন ঐতিহ্যের কবিতার কিছু সীমায়িত নিদর্শন তুলে ধরা ছাড়া আর কোনো পন্থা পরিবেশকদের ছিল না। প্রধান সম্পাদক কীথ্ বস্‌লি জানিয়েছেন যে চীনা, জাপানী, ভারতীয়, ফার্সী, আরবী, হিব্রু—এই নাম-করা ঐতিহ্যগুলি থেকে কবিতার সংখ্যা যথাসম্ভব কম রেখে, কোনো ভাষা তথা ঐতিহ্য পাশ্চাত্য জগতে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত বা সাধারণ পাঠকদের কাছে একেবারেই অপরিচিত তাদের কবিতার কিছু নমুনার জন্য জায়গা করা। উদাহরণ-স্বরূপ, আবখাজ নামে উত্তর-পশ্চিম ককেশীয় গোষ্ঠীর একটি ভাষার কবিতা নাকি ইংরেজীতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করছে এই বইটিতে।

অথচ সম্পাদকীয় নীতির মধ্যে কিছু কিছু অন্তর্বিরোধ থেকে গেছে, কিংবা বলা চলে বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকেরা নির্বাচনের ভিন্ন ভিন্ন নিরিখ মেনেছেন এবং প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে আলাদা-আলাদা বোঝাপড়া করেছেন, যার ফলে সমগ্রত একটা অসমতা এসেছে। নাহলে যেখানে আইনু, কিরগিজ, কামাসিয়ান, ভোগল, আবখাজ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ঐতিহ্যের জন্য জায়গা করা হয়েছে, এবং যেখানে ঐ জায়গা করার খাতিরে ভারতীয় উপমহাদেশের অনেকগুলি সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে মাত্র চারটি ভাষার জন্য জায়গা করা সম্ভব হয়েছে, সেখানে বাইবেলের অনুবাদ দশ পাতা জুড়ে কেন তা বোঝা যায় না। বিশেষত যে বিখ্যাত 'অথরাইজড্ ভার্সন' ইংরেজীভাষী পাঠকদের অচেনা এলাকা হবার কথা নয় তা থেকে সাতটি উদ্ধৃতি সংকলিত হয়েছে, অথচ যে কোরান তাদের নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত কম-জানা তার কাব্যাংশ থেকে কোনো উদ্ধৃতি নেই। এর কারণ হয়তো এই যে হিব্রু বিভাগের সম্পাদক তাঁর প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং প্রধান সম্পাদককে বুঝিয়েছেন যে বাইবেলের অতখানি অনুবাদ ছাড়া সে ঐতিহ্যের প্রতি সুবিচার করা যাবে না, এ দিকে আরবী বিভাগের সম্পাদকেরা ঐশ্বরিক বিষয়বস্তুকে প্রায় পাশ কাটিয়ে মানবিক বিষয়-বস্তুর দিকেই ঝুঁকেছেন। এতে কবিতার রসাস্বাদনে কোনো ব্যাঘাত নিশ্চয়ই হয় না, তবে এ ধরনের বই থেকে 'প্রাচ্য' কবিতা সম্পর্কে কোনো সপরিপ্রেক্ষিত মানচিত্র উদ্ধার করা অসম্ভব। এবং তেমন কোনো মানচিত্র সরবরাহ করাটা যদিও স্পষ্টতই সম্পাদকদের উদ্দেশ্য নয়, কাব্যরসনিবেদনই উদ্দেশ্য, তবুও, তাঁরা না চাইলেও তিনশো পাতার সংকলনগ্রন্থে পাঠকরা সেটা খুঁজবেনই, অন্তত তাঁদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষত যেখানে বিষয়বস্তু একটি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত জগৎ। প্রাচ্য দুনিয়া সম্বন্ধে পশ্চিমে যেহেতু আবহমান কাল থেকে নানা রকমের ভুল ধারণা বর্তমান সেহেতু ভুল ধারণা বৃদ্ধির কোনো নতুন সুযোগ পাঠকদের হাতে আদৌ তুলে দেওয়া উচিত নয়। উদ্বেগ আরও এ কারণে যে পৃথিবীর কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষত আমেরিকায় বা অস্ট্রেলিয়ায়, 'বিশ্বসাহিত্য' বা 'তুলনামূলক সাহিত্য' চিহ্নিত পাঠক্রমের পাঠ্যসূচীতে এ জাতীয় বইয়ের ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা স্পষ্টত বর্তমান; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হলেই কবিতার সংকলন আর শুধু কবিতার থাকে না, অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় সাহিত্যেতিহাসের মানচিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। বিপদটা সেখানেই।

উদাহরণস্বরূপ, বইটিতে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতি সত্যিই সুবিচার করা হয় নি। এ অঞ্চলের মাত্র চারটি ভাষা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে : সংস্কৃত, বাংলা, তামিল, এবং উর্দু। এটা ঠিকই যে পাশ্চাত্য পাঠক যেখানে আবখাজ, কিরগিজ, বা কামাসিয়ানের নামও শোনেন নি, সেখানে সংস্কৃত বা বাংলার নামটা অন্তত (আশা করা যায়) শুনেছেন; তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের পরিচয় ঐ নাম-শোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গড়পড়তা ইংরেজীভাষী পাঠকের কাছে হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তেলেগু, কানাড়া ইত্যাদি আবখাজ বা কিরগিজের মতই অপরিচিত, এবং এ বইটি পড়বার পর ঐ অন্ধকার এলাকাগুলি আদৌ আলোকিত হবে না, সেখানেও যে কত রত্ন বর্তমান তা অজানা থেকে যাবে। যে-সংকলনে মীরা, কবীর, তুলসীদাস, বা তুকারাম নেই সে-সংকলন ভারতীয় কবিতার প্রতিনিধি হিসেবে স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ।

[illegible] যেখানে কোনো সেখানে সংস্কৃত দীর্ঘ কাব্য প্রায় অনুপস্থিত। রামায়ণকে কি সতেরো লাইনে চেনা যায়? তা ছাড়া, ঐ নির্বাচিত সতেরো লাইনে সীতা স্পষ্টত রামের সঙ্গে বনবাসে যেতে চাইছেন, অথচ লাইনগুলির সূচনায় বলা হয়েছে : 'King Rama courts Sita; she replies—পণ্ডিতী সম্পাদনায় এরকম ভুল কি করে সম্ভব হলো কে জানে।

এটা প্রায় অবিশ্বাস্য যে মহাভারতের এক লাইনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। মেঘদূতের তিন জায়গা থেকে তিনটে শ্লোক অনূদিত হয়েছে : বস্, কালিদাস এখানেই শেষ। ঐটুকু তর্জমার মাধ্যমে কালিদাসের দীর্ঘায়িত অবকাশ্বন্ধ বা অনন্য ধ্বনি-ঝংকারের প্রতিধ্বনি বিদেশী পাঠকদের কাছে ধরা পড়বে না। অন্তত একপৃষ্ঠা-ব্যাপী টানা উদ্ধৃতি না থাকলে দীর্ঘ কবিতার স্বাদটা পাওয়া মুশকিল, আর দীর্ঘ কাব্যকে খণ্ডিত বানালে পাঠকদের ঠকানোই হয়।

বাংলাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিত্ব করছে তাঁর একেবারে শেষ পর্যায়ের তিনটি কবিতা। এ ক্ষেত্রেও বলতে হয় যে মাত্র ঐ তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে বিদেশীরা তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে কোনো যথার্থ ধারণা করতে পারবেন না। তা ছাড়া আমাদের দিক থেকে বলা যে যেখানে অন্যান্য কোনো কোনো ঐতিহ্যের একেবারে সাম্প্রতিক কবিতাও স্থান পেয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের তুলনীয় পর্যায়ের কবিতার কোনো নমুনা নেই। আধুনিকদের মধ্যে আছেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, এবং বুদ্ধদেব বসু; তার পর পূর্ববঙ্গের শামসুর রহমান এবং সৈয়দ শামসুল হক্। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশের বা ষাটের দশকের কবিদের দু'-একটি পরীক্ষানিরীক্ষা যুক্ত হলে আমাদের, বলা বাহুল্য, ভালো লাগতো।

স্পষ্টত, আলোচ্য বইটিতে স্থান আর কাল মিলিয়ে পরিধিটা বড় বিরাট হয়ে গেছে। হয় স্থানের, নয় কালের, কিংবা দুয়েরই ক্ষেত্রটা আরও ছোট ক'রে নিলে মানচিত্রটাকে আরও আনুপূর্বিক করে তোলা যেতো। খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর কবিতাও পাচ্ছি, আবার ১৯৪৫ সালে জন্মেছেন এমন কবির কবিতাও পাচ্ছি। ভৌগোলিক বিস্তৃতিটা যখন ইউরেশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা ব্যেপে তখন সময়ের সীমারেখাটা দুড় হাতে এঁকে নেওয়া যেতো। কিংবা ভৌগোলিক ক্ষেত্রটাকেও আরেকটু ছোট করে নেওয়া যেতো, তাহলে কাজটা মানানসই হতো। 'দ্য ওরিয়েন্ট' একটা দানবীয় ব্যাপার। কীথ্ বস্‌লি যদিও গোড়াতেই মেনে নিয়েছেন যে 'দ্য ওরিয়েন্ট' একটি ভৌগোলিক সত্তা নয়, বরং একটি 'Western fiction', তবু ঐ পৌরাণিক সত্তাটিকে কোনো চ্যালেঞ্জ জানানোর দরকার উনি অনুভব করেন নি। গতানুগতিক বিচারে উত্তর আফ্রিকার আরবরা 'প্রাচ্য' মানুষ, অথচ একই দ্রাঘিমায় বসবাসকারী ভূমধ্যসাগরীয় ইয়োরোপীয়রা 'পাশ্চাত্য' মানুষ। মরক্কো গ্রীসের চেয়ে পশ্চিমে, কিন্তু মরক্কোর আরবী কবিতাকে বলা হবে 'প্রাচ্য', আর গ্রীক কবিতাকে বলা হবে 'পাশ্চাত্য'—এ জাতীয় নামকরণ মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা। আলোচ্য সংকলনে প্রাচীন মিশরীয়, উগারিতিক, মেসোপটেমীয়, তুর্কী, আরবী, হিব্রু, আর্মানী প্রভৃতি স্থান পেয়েছে, কিন্তু গ্রীক, বলা বাহুল্য, স্থান পায়নি। অথচ এই চিরচরিত পৃথকীকরণের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। সত্যি, পূব কাকে বলে, পশ্চিম কাকে? মানব-সভ্যতার ইতিহাসের গোড়ার দিকে এই ভেদরেখা কতখানি প্রাসঙ্গিক? বরং সংস্কৃতিগতভাবে সম্পৃক্ত এলাকার ভাগ করে নিলে, ভাষাগোষ্ঠীগত বিচারে দেখলে নীতির একটা সমতা আসে। প্রাচীন হিব্রু আর প্রাচীন আরবী পাশাপাশি থাকতে পারে। আন্দালুসিয়ার আরবী কবিতা যেখানে, আন্দালুসিয়ার স্পেনীয় কবিতাও সেখানে ঠাঁই পেতে পারে। প্রাচীন ফার্সী আর সংস্কৃত কবিতা যেখানে প্রাচীন গ্রীক বা ল্যাটিন কবিতার স্থানও সেখানে। চীনা, জাপানী, কোরিয়ান নিশ্চয়ই একটি স্বতন্ত্র, সংশ্লিষ্ট জগৎ। আজকের ইতিহাসচেতনা এই ধরনের নতুন গ্রুপিংই দাবি করছে, পুরনো জাতিভেদের শাশ্বতীকরণ নয়। যদি মনে করা হয় যে যেহেতু গ্রীক সাহিত্য ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে, রূপ দিয়েছে, অতএব তা 'পাশ্চাত্য', 'প্রাচ্য' নয়, তা হলে মানতে হয় যে হিব্রু সাহিত্যও খ্রীষ্ট-ধর্মের মাধ্যমে ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে, রূপ দিয়েছে, অতএব তাও আজকের বিচারে 'পাশ্চাত্য'। আজকের ইজরায়েল বা তুরস্ক নিজেদের প্রতীচ্য দুনিয়ার অন্তর্গত হিসেবেই ভাবে, 'ইয়োরোভিশন' গীতি প্রতিযোগিতায় অনায়াসে অংশ নেয়। এই নতুন 'রি-গ্রুপিং' মেনে নিলে এশিয়ার যে দেশগুলি নিঃসন্দেহে 'প্রাচ্য' তাদের কাব্যসম্ভারের জন্য আরও খানিকটা জায়গা করা যেতো।

এত কথার অবতারণা করছি এ কারণে যে এই ১৯৭৯ সালেও Oriental Verse বলে একটা শ্রেণী মেনে নেওয়া হচ্ছে। আমরা কি অনুরূপ কোনো Western Verse-এর তিনশো পাতার সংকলন প্রকাশ করার কথা ভাবতে পারি যাতে স্থান পাবে ইয়োরোপ, দুই আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এমন কি আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের প্রাচীনতম পর্যায় থেকে সাম্প্রতিকতম কবিতা? 'দ্য ওরিয়েন্ট'-এর মত 'দ্য ওয়েস্ট'-ও একটি দানবীয় সত্তা, শ্বেতাঙ্গ জাতিদের সভ্যতা যার অন্তর্গত।

যাই হোক, এসব আপত্তি তোলার পরে মানতেই হয় যে অনূদিত কবিতার সংকলন হিসেবে বইটি খুবই উপভোগ্য এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছে। এক সঙ্গে অনেক-গুলি ভাল কবিতা পড়ে ফেলা যায়; নানান দেশের, নানান কালের বিচিত্র কাব্য-সম্ভারের অন্তত কিছু কিছু টুকরো চেখে চেখে দেখা যায়—সেটা মস্ত লাভ বই কি। সম্পাদকমণ্ডলী এমন সব তর্জমা পেশ করতে চেয়েছেন যেগুলি তর্জমাতেও কবিতার মাত্রা লাভ করতে পেরেছে। ফলে কখনও কখনও একেকটি অনুবাদের পিছনে [illegible] : একজন [illegible] বিশেষজ্ঞ অন্য জন ইংরেজী

ইংরেজীতে নয়; দ্বিতীয়জন তা থেকে তৈরি করেছেন একটি ইংরেজী কবিতা। আবশ্যজয় বেলায় তিনজন অনুবাদকের প্রয়োজন হয়েছে : প্রথমজন আবখাজ থেকে রাশিয়ান ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, দ্বিতীয়জন সেটাকে ইংরেজীতে করেছেন, তৃতীয়জন তা থেকে ইংরেজী কবিতা সৃষ্টি করেছেন। কবিতার অনুবাদে এই জাতীয় সহযোগিতা আজকাল বেড়ে চলেছে, যার ফলে কবিতা-অনুবাদের মানও বেড়ে গেছে স্বীকার করতে হয়।

কবিতার অনুবাদে বোটা কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব তা হচ্ছে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং নতুন ভাষায় প্রাণশক্তি—এ দুটোর মধ্যে বোঝাপড়া করা। উপরন্তু বিশ্বস্ততা বলতে শুধু অর্থের প্রতি বিশ্বস্ততা বোঝায় না, অঙ্গের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রশ্নও আছে। মূল কবিতার আঙ্গিক অর্থকে যেভাবে নির্ভর জোগায় নূতন সৃষ্টিতেও তুলনীয় কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কীথ বসুলি জানিয়েছেন যে accuracy এবং liveliness-এর দ্বন্দ্বে তাঁরা দ্বিতীয় গুণকেই বেছে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কতখানি সফল হয়েছেন সে প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে।

সাফল্য নির্ভর করছে অনেক কিছুর উপরে। যে কবিতা যত বেশি আঙ্গিক-নির্ভর, বিশেষত ধ্বনির কারুকার্যের উপর নির্ভরশীল, নিজস্ব বিশিষ্ট সংস্কৃতি-জগতে যত বেশি গভীরভাবে প্রোথিত, তার রূপান্তর তত দুরূহ হবে। হয়তো বা সে কারণেই সংস্কৃত কবিতার সংখ্যা এ বইটিতে এত কম রাখা হয়েছে। সংস্কৃত কবিতা থেকে আধুনিক ইংরেজীতে কবিতা তৈরি করা—এমন কবিতা যা মূলের কিছুটা স্বাদও খানিকটা বহন করবে, আবার আজকের ইংরেজীতেও প্রাণিত কবিতা হবে—যে কতখানি দুরূহ তা তাঁরাই বুঝবেন যাঁরা এই দুই ভাষার ভিন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। এ বিষয়ে অধ্যাপক ড্যানিয়েল ইনগোলস্-এর সুচিন্তিত ও আনুপূর্বিক আলোচনা২ অনুসন্ধিৎসুদের অবশ্যপাঠ্য। ঐ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বইটির অনুবাদকের চেষ্টা সম্বন্ধে কোনো কড়া কথা বলা শোভা পায় না।

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈরাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
দগ্ধারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি
মার্গম্॥

Seeing the golden-tawny nipa,
stamens yet half-formed,
and plantains showing off new buds
along the banks,
scenting the fresh earth-fragrance
lifting clear of bone-dry woods,
the antelope will map a trail
where you may loose your rain.

এখানে কন্দলীকে কলা মনানো হয়েছে। আমি এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট মত দিতে পারি না, যদিও ব্যক্তিগতভাবে 'অনুকচ্ছম্'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্ষাজাত অন্য কোনো ফুলের কথাই আমার বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়, এবং মনিয়ার-উইলিয়ম্‌সের অভিধানেও তার সমর্থন মেলে। অক্সফোর্ডের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বারো-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম; উনিও বললেন যে কলা বোঝাতে চাইলে কালিদাস কদলী লিখতেন। সে যাই হোক, সেটা গৌণ ব্যাপার। আমি বলবো যে কবিতার রূপান্তর হিসেবে অনুবাদটি সংপ্রচেষ্টা,—রমণীয় একটি ছন্দ বেজে উঠছে; তবু—কিংবা সে কারণেই—আক্ষেপও থাক যে মৌলিক ভঙ্গিমাটির কাছে এসেও কাছে আসা যাচ্ছে না, সেটি অধরা থেকে যাচ্ছে। মৌলিক শব্দগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম অন্যোন্যসম্পর্ক, যে জটিল সৌকুমার্যের হাতছানি, ভরতনাট্যের মত অলংকৃত অথচ লীলায়িত সেই সমগ্র ভঙ্গিটিকে আধুনিক ইংরেজীর পদক্ষেপে এবং মুদ্রায় বন্দী করা কি কঠিন—কি অসম্ভব কঠিন!

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈর্বন্ধুপ্রীত্যা
ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথা লক্ষ্মীং পশ্যন্
ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু॥

Your form will swell with incense rising
from the open windows ...
where women dress their hair,
Royal peacocks will dance in your honour,
come to welcome you as friend.
If your heart is travel-worn, then spend
the night high on the palace roofs,
where flowers are fragrant and paths printed
by the red-dyed feet of lovely girls.

এখানে 'ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু'-র রূপান্তরটি মনোজ্ঞ হয়েছে, কিন্তু অন্যত্র মূলের জটিলতা খানিকটা বিসর্জন দিতে হয়েছে। জালোদ্গীর্ণ ধোঁয়া যে কেশসংস্কারের ধূপ এই তথ্যটির প্রতিষ্ঠা হয়নি : 'incense rising' এবং 'where women dress their hair' এ দুয়ের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়ায় ব্যাপারটা আলগা-আলগা হয়ে গেছে। অথচ শ্লোকটি কবিতার দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মেঘ বিরহী যক্ষেরই প্রতিভূ সত্তা; সে পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের কেশধূপের সঙ্গে মেঘের প্রত্যক্ষ সংযোগ, তা থেকে তার শরীরের পুষ্টি strong erotic overtones বহন করে, যে সংকেত উজ্জয়িনী

বনে যাওয়ার গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে তাদের হৃদ্য যোগটি—স্বগৃহ থেকে নির্বাসিত যক্ষের পক্ষে যা মূল্যবান—যথাযথ স্বীকৃতি পায় নি। তাদের নৃত্য যে তাদের দেওয়া প্রীতি-উপহার, ইঙ্গিতের চাবির এই আদরণীয়, বিশেষ মোচড়টি 'in your honour' ও 'welcome'-এর সাধারণত্বে আপলা হয়ে গেছে।

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং
বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্ হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে
চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥

I see your form in the creeping vine,
your look in a deer's startled eyes ;
your cheek gleams with the moon, your hair
there in long peacock plumes.
Those sidelong glances show each time
the river gently purls . . .
Alas my sweet, not one place found
affording you complete.

তিনটি শ্লোকের মধ্যে এখানেই বোধহয় সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। 'creeping vine', 'deer's startled eyes', 'sidelong glances', 'the river gently purls' ; এগুলো ইংরেজীতে ক্লিশের মত শোনায়। 'long peacock plumes'-এ বর্হভারের ভার দ্যোতিত হয় না; 'চণ্ডি' সম্বোধনের মিঠে-কড়া ভাবটি 'my sweet'-এ বড় বেশি মিষ্টি হয়ে যায়, চিনির রসে জড়িয়ে যায়।

এই উদাহরণগুলির সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখে সংস্কৃত কবিতা থেকে ইংরেজী কবিতা সৃষ্টি করা কতখানি কঠিন। অনুবাদকরা যতটুকু সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন ততটুকুর জন্যই কবিতাবিলাসীদের ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য।

সে তুলনায় আধুনিক বাংলা কবিতা থেকে আধুনিক ইংরেজী কবিতা সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং আলোচ্য বইটিতেও তার সাক্ষ্য মেলে। 'উটপাখী' কবিতাটির রূপান্তর সুধীন্দ্রনাথ নিজেই ক'রে গেছিলেন এবং সেটিই ব্যবহৃত হয়েছে। বুদ্ধদেবের ইকারুস-বিষয়ক কবিতাটির মূল এ মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নেই, যদিও এককালে পড়েছি : শুধুমাত্র অনুবাদটির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যে বেশ অনুবাদ হয়েছে, অর্থাৎ রূপান্তরটি নতুন সৃষ্টি হিসেবে সার্থক হয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দের 'নাবিক' মূল আমার কাছে আছে, এবং মূলের সঙ্গে তর্জমা যেই মিলিয়ে দেখি অমনি নানান ছোটখাট খুঁতখুঁতে ভাব আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। 'পামু সারি' কেন 'a row of pines' হয়ে গেছে? অনায়াসে 'a row of palms'-ই হতে পারতো। 'জীবাণুরা' কেন 'atoms'? বোলতারা তর্জমায় কেন মৌমাছি হয়ে গেলো? রাঙা রোদ 'pink sun' কেন, 'red sun' নয় কেন?

তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূরে চক্রবাল হৃদয়ে পাবার প্রয়োজন রয়ে গেছে—

for they are also
shores. Yet they will not do. Their wonders urge you away.
So must it be—

জীবনানন্দ দুটো আলাদা জিনিসের কথা বলছেন; তর্জমায় সে দুটো এক হয়ে গেছে। 'Their wonders urge you away'— এ কথা বলছেন না কবি, বলছেন : 'Further horizons urge you away'। বিশেষ ক্ষোভ হয় যখন একটি আশ্চর্য ছবিকে অপ্রয়োজনে বদলে দেওয়া হয়।

উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি—নাবিক—অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।

. . . bright hourglass, sailor, endless water remains.

তর্জমাটির বহিরঙ্গের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যে দু' লাইন আগেকার 'planes'-এর সঙ্গে মিলের খাতিরে 'remains' ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ মূল কবিতাটিতে মিল আদৌ তত জরুরী নয়; মিলের খাতিরে একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ চূড়ান্ত চিত্রকে ভোঁতা করে দেওয়া ঠিক হলো কি না সে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। 'অনন্ত' বিশেষণটি দুটো কাজ করছে : জলের পরিমাণ বোঝাচ্ছে, ঢেউদের অন্তহীন গড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতও দিচ্ছে। উজ্জ্বল সময়-ঘড়ির মত অনন্ত নীর অনবরত এগিয়ে চলেছে; সময় যেভাবে বয়ে যায় ঢেউগুলোও সেভাবে অনিবার্য গতিতে এগোচ্ছে—endless irresistible forward rolling motion-এ; সমুদ্রের গতি সময়ের গতিকে মাপছে। এখানে অনুবাদকদ্বয় যে কী ভেবে 'remains' করলেন তা ভেবে পাই না। এর ফলে মূলের সর্বশেষ ধাক্কাটা—একেবারে মাঠে মারা।

অনুবাদকদের কাজকে এভাবে সূক্ষ্ম বিচারের অধীনস্থ করা হয়তো অন্যায়। কারণ আসলে মূলে আর তর্জমা মিলিয়ে দেখতে বসলেই এ জাতীয় ত্রুটি চোখে পড়তে থাকে। মূল জানা থাকলেই মন খচখচ করে, জানা না থাকলে অনুসৃষ্টিতে যা পাচ্ছি তা নিয়েই তৃপ্ত থাকা যায়। মূলের শরীরের অবিকল নকলের মরীচিকা নয়, তার আত্মার স্পন্দনই অনুসৃষ্টাকে তাড়িত, উত্তেজিত করে। অবশ্য সেটা ঠিক কিভাবে করা হবে তা নিয়েই যত তর্ক আর সমস্যা।

আলোচ্য গ্রন্থে যেখানে মূল কবিতার ভাষা আমার একেবারেই অজানা সেখানে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে : বাং, [illegible], চমৎকার কাজ, ঝরঝরে এবং সাবলীল অনুবাদ হয়েছে। চীনা আর জাপানি কবিতার অনুবাদগুলি বিশেষ তৃপ্তি দেয়। আন্দাজ করলাম যে মিতবাক্ প্রকৃতির কবিতা বলে ইংরেজী তর্জমায় ভালো খুলেছে, তবুও অক্সফোর্ডের অধ্যাপক মার্ক এলভিনকে আমার ভালো

ছোট খুঁত বার করতে লাগলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, 'মূল জানা থাকলেই কাঁক অনুবাদ বিষয়ে অন্তহীন আপত্তি উঠতে থাকে, তাই না?' উনি হেসে বললে 'ঠিক তাই, এবং এই মানসিক অবস্থার নাম দেওয়া যাক আপনার নামে, Dys syndrome।' কিন্তু উনিও এ কথা বলে ক্ষান্ত হলেন না, ইংরেজীতে যাকে : হয় 'মর্বিড' কৌতূহল তা নিয়ে—এবং বলা চলে তাঁর নিজস্ব 'এলা সিনড্রোম'-এর বশবর্তী হয়ে—মূল জাপানী হাইকুর সঙ্গে ইংরেজী তর্জমাগ মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। ও'র আলোচিত দুটি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা বইটিতে পাচ্ছি একটি প্রসিদ্ধ হাইকুর নিম্নলিখিত রূপ :

There is no speech :
a host, a guest,
one white chrysanthemum.

অধ্যাপক এলস্তিন বললেন : 'এ ঠিক হয়নি; ব্লাইথের অনুবাদ আরও মূল্যবান আরও সার্থক।' ব্লাইথের বই৩ খুলে দেখালেন :

They sroke no word,
The host, the guest,
And the white chrysanthemum.

আলোচ্য সংকলনে আরেকটি বিখ্যাত হাইকু-র নিম্নলিখিত রূপ এইরকম

Life is as drops of dew
ah yes
as drops of dew
ah yet

এবারে এলস্তিন সাহেব বেশ খেপে গেলেন। বললেন : 'এ যা-তা হয়ে হাইকু হচ্ছে তিন লাইনের কবিতা, কক্ষনো তিন লাইনের বেশি হবে না; ধর্মটা নষ্ট করে ফেললে হাইকুর আর কী থাকে?' আবার সপ্রশংস দৃষ্টি ব্লাইথের অনুবাদ দেখালেন :

This dewdrop world—
It may be a dewdrop,
And yet—and yet—

অর্থাৎ ভুলচুক খুঁজতে গেলে তার আর কোনো শেষ থাকে না, এবং উনি এ স্বীকার করলেন যে কবিতার অনুবাদ এমন একটা ব্যাপার যার বিচার সম্বন্ধে অ থাকতে কোনো নিয়মকানুন খাড়া করা যায় না, কী করা গেছে তার ভিত্তিতে আলোচনা চালাতে হয়। যিনি পারেন তিনি পারেন,—ছোটখাট আনুপূর্বিক বিচ্যু সত্ত্বেও মূলের আত্মার পাখিকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন, যেমন এজরা পাউ যাঁর কিছু অনুবাদ এ বইটিতে গৃহীত হয়েছে। এ-ও জানলাম যে ভাষার প্রকৃতি কারণে বিশেষত জাপানী কবিতা নাকি ইংরেজীতে ভালো খোলে। 'জাপানী হ টেলিগ্রামের ইংরেজীর মত, অই মনোসিলাবিক ইংরেজীতে তার রূপদান অপেক্ষ কৃত সহজ বললেন তিনি, 'আজকালকার তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত ইংরেজী বাচনভঙ্গি সঙ্গে জাপানী কবিতার ভঙ্গিটা বেশ মিলে যায়।' সাহস করে বলি যে নিম্নলিখি অনুসৃষ্টিগুলিকে নিছক কবিতা হিসেবে আমার তো বেশ ভালোই লাগে,—তা বিশ্বস্ততা যেমনই হোক না কেন :

Daybreak
and white spring frost
on the barley leaves.

Purple hibiscus by the road—
but my horse
cropped it.

Red hint of dawn—
cockcrow
among peach-flowers.

অর্থাৎ কবিতার অনুবাদ যখন শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক উদ্দেশ্যে নয়, অ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, তখন কবিতা হিসেবে মনকে দোলা দিতে পারার ক্ষমতা তার থা চাই। সালংকার আড়ষ্ট কাষ্ঠপুত্তলী হয়ে বসে থাকলে চলবে না, তাকে নাচ হবে। এখানে বলি যে কোনো কবিতার বই ভালো না খারাপ তা যাচাই করার এব ব্যক্তিগত নিরিখ আমার আছে : বইটি পড়ে আমার নিজের মধ্যে কবিতার লা চাড়া দিয়ে ওঠে কি না। উঠলে বইটি ভালো, নয়তো নয়। আমার এ ব্যক্তি পরীক্ষার আলোয় বইটি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। অনেক ক'টি কবিতা আমাকে না দেয়; উদ্বোধিত, অনুপ্রেরিত করে। চীন আর জাপান ছাড়াও কোরিয়া, মাল শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং বর্মার কবিতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পে আনন্দিত হলাম। মহাবিশ্বের সৃষ্টিবিষয়ক একটি ব্যাবিলনীয় উদ্ধৃতির সা ঋগ্বেদের সৃষ্টিবিষয়ক ধ্যানের সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। তা ছাড়া আমাকে বিশে ভাবে স্পর্শ করেছে জর্জিয়ান, আরমানী, আর আরবী কবিতা। ১৯১৫ সা তুর্কীদের হাতে আরমানীদের গণহত্যার সময়ে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন হয় নিহত মানুষদের অন্যতম দুজন কবির উল্লেখযোগ্য কবিতা জায়গা পেয়েছে। একজ মধ্যযুগীয় জর্জিয়ান কবি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান যে যিনি দীর্ঘ কবিত মাধ্যমে ভাবনাকে বুনতে না পারেন তিনি মহৎ কবি নন। একজন আধুনি জর্জিয়ান কবির মতে :

I don't write poems...it's me they write
my life and the poem's unfold alike,
I call a poem a torrent, a landslide
that sweeps you off and buries you alive.

মানতেই হয়, সার্থক নতুন সৃষ্টি হয়েছে। আর যেহেতু সৃষ্টি করার লে লেখকের পক্ষে সামলানো দায় তাই একটি আধুনিক আরবী কবিতা এখা

আল-খাম্ত; ইংরেজীতে সরাসরি অনুবাদ করেছেন আকাজ্জা আল-উধারি। দ্বিতীয় কবার আমি বাংলাতে তর্জমা করলাম :

॥ ডাক-পিওনের আশঙ্কা ॥

বন্দীরা, যে যেখানে আছো,
তোমাদের যা কিছু আছে সব আমাকে পাঠাও :
আতঙ্ক, আর্তনাদ, বিরক্তি।

সব সৈকতের জেলেরা,
তোমাদের যা কিছু আছে সব আমাকে পাঠাও :
শূন্য জাল আর সমুদ্রপীড়া।

সব দেশের চাষীরা,
তোমাদের যা কিছু আছে সব আমাকে পাঠাও :
ফুল, ন্যাকড়া,
কাটা স্তন,
ফাটা পেট,
উপড়ানো নখ, —
আমার ঠিকানায় পাঠাও, যে-কোনো কাঁথার দোকানে,
দুনিয়ার যে-কোনো রাস্তায়।
মানুষের দুঃখ বিষয়ে
আমি একটা বিরাট দলিল তৈরি করছি, —
ঈশ্বরের কাছে পেশ করবো;
ক্ষুধার্তদের ঠোঁট
আর অপেক্ষমানদের চোখের পাতা দিয়ে
সই করিয়ে নেবো; —
হায় দুনিয়ার সর্বহারার দল,
আমার আশঙ্কা হয়
ঈশ্বর নিরক্ষর হতে পারেন॥

কীথ বস্‌লি-সম্পাদিত প্রাচ্য কবিতার অনুবাদের সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে য়েহুদা আমিখাই নামে একজন ইজরায়েলী কবির একটি কবিতা। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজ কবি টেড হিউজের চোখে উক্ত কবি প্রাচ্য কবি নন। তাঁর মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে য়েহুদা আমিখাই পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ার কবি, আজকের ইজরায়েলের একজন বিশিষ্ট কবি। টেড হিউজের সহযোগিতায় আমিখাই তাঁর নিজের কবিতা হিব্রু থেকে ইংরেজীতে তর্জমা করেছেন, এবং ভূমিকা লিখেছেন টেড হিউজ। ৪

১৯২৪ সালে জার্মানীতে য়েহুদা আমিখাই-এর জন্ম। ১৯৩৬ সালে পরিবারের সঙ্গে প্যালেস্টাইনে থাকতে আসেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে ইহুদীদের বিশিষ্ট ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মত একজন সাধারণ ইজরায়েলী নাগরিকের ব্যক্তি-জীবনের নাট্য। তাঁর জাতির সম্পদ এক বিরাট আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার, সমস্যা বাঁচা-মরার, মুখের সামনেই প্রত্যক্ষ বাস্তব চ্যালেঞ্জ। এই বিচিত্র ভাগ্যের সঙ্গে মোকাবিলা করার দায়িত্ব পড়েছে গড়পড়তা নাগরিকের ঘাড়ে : যে মানুষ লড়াইয়ে যায়, রোজগার করে, প্রেমেও পড়ে। টেড হিউজ বলছেন যে কবিতাগুলি মূলত কবিই অনুবাদ করেছেন, তিনি শুধু নামমাত্র সংশোধন করেছেন, এদিক ওদিক ব্যাকরণ-ইডিয়ম-শব্দবন্ধ ঠিকঠাক করে দিয়েছেন। আমিখাই নিজে যখন ইংরেজীতে কথা বলেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বর এবং বাচন-ছন্দ যেমনটি শোনায় সেই ভাবটিই বজায় রাখতে চেয়েছেন হিউজ। অনুবাদগুলি নাকি অত্যন্ত আক্ষরিক, মূলানুগ, এবং কবির নিজস্ব ইংরেজী কবিতাই বলা চলে এগুলিকে।

আমিখাই-এর কবিতা নাকি হিব্রু ভাষার বিশেষীকৃত চারিত্র্যের উপর ততটা নির্ভর করে না যতটা করে চিন্তার, চিত্রকল্পের নগ্ন স্বরূপের উপর। তাই তার রূপান্তর অপেক্ষাকৃত সহজ। চলতি বছরের বসন্তে আমিখাই অক্সফোর্ডে কবিতা-পাঠ করতে এবং নিজের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে এসেছিলেন। মূল কবিতা পড়ে শোনালেন, অনুবাদও নিজেই পড়ে শোনালেন। নিজে বেশ ভালো ইংরেজী জানেন তিনি। বোঝা গেলো যে তাঁর কবিতার এফেক্ট বিশেষ ধ্বনি-সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল নয়; তাই অনুবাদেও তার জোর বেশ বর্তমান। যেন তিনি কোনো সর্বজনীন ভাষায় লেখেন, যে-কোনো ভাষাতেই তাঁর বক্তব্যকে রূপ দেওয়া যায়। তবু মানতে হয় যে আধুনিক ইংরেজী কবিতার রিক্ত অস্থি-অন্বেষী শৈলীর সঙ্গে আমিখাই-এর উচ্চারণ চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যায়।

বিদেশী কবিতার রসাস্বাদনের এ এক বিরল সুযোগ : একজন বিশিষ্ট কবির নিজের অনুমোদিত, অপর একজন বিশিষ্ট কবির দ্বারা সংশোধিত অনুবাদ ; সংহত, ঋজু, মিতরেখ, অল্প কথায় অনেক কিছু বলার লক্ষ্যভেদী শিল্প। জাতির যন্ত্রণা এবং ব্যক্তির কল্পনার নির্ভুল মরন।

Our baby was weaned in the first days
of the war. And I ran out to stare
at the terrible desert.

The war broke out in autumn at the empty border
between sweet grapes and oranges.

October sun warms our dead.
Sorrow is a heavy wooden board.
Tears are nails.

I give up, like a desert
which has given up all water.

The sun is circling round the earth. Yes.
The earth is flat, like a lost, floating board. Yes.
God is in Heaven. Yes.

Perhaps Jerusalem is a dead city
in which people
move and wriggle like worms.

বিভিন্ন কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিলাম, এবং আশা করি স্পষ্ট করতে পারলাম যে উক্তিগুলি আধুনিক ইংরেজীতে লক্ষণীয়ভাবে শক্তিশালী হয়েছে। ইজরায়েলের ইতিহাস-ভূগোলের পরিপ্রেক্ষিত ব্যক্তির প্রেমকে যে বিশেষ মাত্রা দেয় তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

You are beautiful, like prophecies,
And sad, like those which come true,
Calm, with the calmness afterward.

In this burning country
Words have to be shade.

He goes out into the streets
To fight for the law
Of immunity for lovers.

To start love like this : with the shot of a gun
Like Ramadan.

Even my loves are measured by wars :

And love—those few nights
like rare stamps.

জীবন আর মৃত্যু সম্বন্ধে আমিখাই-এর সাক্ষ্য একাধারে ট্র্যাজিক এবং বিস্ময়করভাবে শান্ত : তাঁর উক্তির পারিপাট্য অনন্য সংযম অন্তত আমার মত পাঠককে দুর্লভ চিত্তশুদ্ধির স্বাদ জোগায় :

Yet I wanted to be calm, like a mound with all its
cities destroyed,
and tranquil, like a full cemetery.

To live is to build a ship and a harbor
at the same time. And to complete the harbor
long after the ship was drowned.

অথচ আমিখাই যখন অক্সফোর্ডের ব্রিটিশ কাউন্সিল কক্ষে কবিতা পড়তে এসেছিলেন তখন শহরময় 'আধুনিক ইজরায়েলের বিশিষ্ট কবির অক্সফোর্ডে পদার্পণ' ইত্যাদি পোস্টার পড়া সত্ত্বেও শ্রোতার সংখ্যা আঙুলে গোনা গেছিলো। চোদ্দ-পনেরো জনের বেশি শ্রোতা জমায়েত হননি। অবশ্য তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি চলছিলো, কলেজগুলি বন্ধ ছিলো; তা ছাড়া সে রাত্রে বৃষ্টিও পড়ছিলো। তবুও একজন প্রকৃত কবির এই অনাদরে মর্মাহত হয়ে আমিখাইকে যেচে বলে এসেছিলাম : 'আপনি কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিলে পড়তে এলে অন্তত একশো লোক হতো।' উনি হেসে বলেছিলেন : 'তাই নাকি? তা হলে তো আমাকে আপনাদের কলকাতায় পড়তে আসতে হয়।'

দুজন অনুবাদক মিলে নতুন কবিতা সৃষ্টির আরেকটি উজ্জ্বল উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করছি। ম্যাসিডোনিয়া নামটি শুনলেই আমাদের মনে পড়বে আলেক্‌-সান্দার দ্য গ্রেটের কথা : সুদূর অঞ্চলটির সঙ্গে ভারতের ঐ একটি অবিস্মরণীয় সংযোগ। ম্যাসিডোনিয়ার মানুষ স্লাভোনিক ভাষাও স্লাভোনিক গোষ্ঠীর। এখানে আলবেনীয়, রুমানীয়, এবং তুর্কী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও রয়েছে। ম্যাসিডনীয় মানুষ নবম এবং দশম শতাব্দীতে প্রাচ্য খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে অঞ্চলটি অটোমান তুর্কীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং প্রচুর বিদ্রোহ সত্ত্বেও ম্যাসিডোনিয়া বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত তুর্কী শাসনের অধীন থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ম্যাসিডোনিয়া যুগোস্লাভ রাষ্ট্রমেলের অন্তর্গত স্বশাসিত রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

শুকনো এবং নগ্ন দেশ ম্যাসিডোনিয়া : তার লোকগীতিকাতেও ছায়া পড়েছে এই কাঠিন্যের তথা দেশটির ট্র্যাজিক ইতিহাসের। এই লোকগীতিকার ঐতিহ্য নাকি মরে যায়নি, এখনও রীতিমত জীবিত আছে। সেই ঐতিহ্যের উদ্দেশে প্রশস্তি হিসেবে কতগুলি গান ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন অ্যান পেনিংটন এবং অ্যান্ড্রু হার্ভে। ৫ অ্যান পেনিংটন অক্সফোর্ডে স্লাভোনিক ভাষায় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপিকা; তা ছাড়া যুগোস্লাভীয় কবিতা অনুবাদের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা তাঁর : বেলগ্রাদের বিশিষ্ট আধুনিক কবি ভাস্কো পপা-র কবিতা মূল সার্বো-ক্রোয়াট থেকে ইংরেজীতে

অনুবাদ করেছেন ইনি।৬ অ্যান পেনিংটন মূল ম্যাসিডনীয় গানগুলির আক্ষরিক তর্জমা প্রস্তুত করেছেন এবং মূল গানগুলি অপর অনুবাদককে জোরে জোরে পড়ে শুনিয়েছেন। টেপ-রেকর্ডারে ধরা গান দুজনে মিলে শুনেছেন। অ্যান্ড্রু হার্ভে একজন তরুণ কবি। ইনি ঐ আক্ষরিক তর্জমা থেকে এবং মূলের ধ্বনি দ্বারা আবিষ্ট অবস্থায় ইংরেজীতে নতুন কবিতা সৃষ্টি করেছেন। ভূমিকায় তাঁরা জানিয়েছেন : 'এই গানগুলির পক্ষে উপযুক্ত যথেষ্ট রিক্ত ভাষা খুঁজে পাওয়া সহজ হয়নি। আমরা সব সময় চেষ্টা করেছি যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষতা এবং তীব্রতা আনতে। স্লাভোনিক লোকগীতিকায় প্রাপ্তব্য অনেক ধুয়া, পুনরাবৃত্তি এবং বিবাদী গঠন বাদ দিতে হয়েছে। আমরা শুধু ম্যাসিডনীয় মূলগুলি থেকে বিশ্বস্ত অনুবাদ পরিকল্পনা করতে চাইনি, চেয়েছি তাদের নতুন করে সৃষ্টি করতে, যাতে আধুনিক ইংরেজীতেও তাদের জীবন সমমাত্রায় তেজী এবং শুদ্ধ হয়ে ওঠে। আমাদের শ্রম প্রত্নতাত্ত্বিক খনকের শ্রম নয়, বরং আমাদেরই ভাষা এবং কাব্যাদর্শকে উত্তেজক এবং বিস্ময়করভাবে নতুন করে তোলার একটা উদ্যম।' অর্থাৎ বিদেশী কবিতার পুনঃসৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের মাতৃভাষাকে, তার কবিতার ভাষাকে ঋদ্ধতর করা এঁদের একটি জরুরী লক্ষ্য।

আমিখাই-এর কবিতায় যেমন ম্যাসিডোনিয়ার লোকগীতিকাতেও তেমন ট্র্যাজেডির স্বরটি সর্বদা শ্রুতিগম্য। প্রেম আর বিবাহের চিরাচরিত থীমের মধ্যেও ঘনীভূত হয়ে আছে একটি কৃষক সমাজের শতাব্দীর পর শতাব্দী লড়াইয়ের ইতিহাস : কঠোর প্রকৃতির বিরুদ্ধে, বিদেশী শাসনের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে। লড়ে যাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে, বাঁচবার অভীপ্সা স্বীকৃত হয়েছে। স্পষ্টত, এই উক্তির নগ্নতা ও কঠিনতা থেকে কিছু শিখে নিতে চেয়েছেন অনুবাদকদ্বয়ের মধ্যে অন্তত একজন—অ্যান্ড্রু হার্ভে, যিনি তাঁর নিজের কবিতাতেও হাড়ের শুদ্ধিতে পৌঁছতে উন্মুখ। তুকারামের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে ইনি কিছু আশ্চর্য কবিতা লিখেছেন, কিছু অনুসৃষ্টি, কিছু স্বকীয় রচনা, যেগুলির পাণ্ডুলিপি আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। 'আমি হাড়ের কাছাকাছি পৌঁছতে চাই', ইনি বললেন আমাকে, যেটা এখানকার অনেক কবিরই সাধনা, কিন্তু অন্য অনেকে যেমন সংরাগকে বাদ দিতে চান, ইনি তা চান না। আইরিশ কবি শেমাস্ হীনির অস্থি-অবসেশন সম্পর্কে এঁকে প্রশ্ন করি। ইনি বলেন, 'হীনির কবিতায় অস্থি-অবসেশন এবং দুর্দান্ত আঙ্গিক দুটোই আছে, কিন্তু সত্যিকারের সংরাগ বড় কম; আমি বিশ্বাস করি যে সংরাগ ছাড়া মহৎ কবিতা হয় না।' ইনি যে সংরক্ত স্বচ্ছ অন্ধকারকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ম্যাসিডনীয় সংকলনটির প্রথম অনুবাদটিতেই তার স্বাদ মেলে :

Black raven on the rock
Why are you croaking ?
It is meat you want ?
Go to Kosovo
There's meat
Sweet meat
From white faces
Is it water you want ?
Go to Kosovo
There's water
Cold water
From dark eyes

জানা দরকার যে ম্যাসিডোনিয়ার মানুষ ১৩৮৯ সালে কোসোভোর যুদ্ধে তুর্কীদের হাতে রক্তাক্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

সংকলনটি থেকে তিনটি নমুনা বাংলায় রূপান্তরিত করলাম। প্রথমে পেশ করি প্রেমের উন্মেষের একটি চিত্র :

কিলুয়ানা
কাপড় কাচে
অথুরিদ্-এর ঝর্ণাধারায়।
বেলগ্রাদের সুবর্ণকরা
পথে যায়।
'সামলে চলুন!
আমার কাপড় মাড়াবেন না—
বিয়েতে দেওয়া হবে এসব কাপড়!'
'কিলুয়ানা,
যদি কাপড় মাড়াই
তো মদে দাম দিই।'
'রাখুন আপনাদের মদ!
ঐ ছোঁড়াটাকে চাই,
ঐ যেজন সামনে বসে
চোখের উপর টুপি টেনে
আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে।'

এবারে বিবাহোৎসব : কনের সখীদের সঙ্গে বরের সংলাপ :

'স্বাগত!
তুমি কেন এসেছো?
আমাদের সঙ্গে মাল টানতে?'

'তোমাদের বান্ধবীটিকে নিয়ে যেতে।'

'সে তো বনে পালিয়ে গেছে,
তিতির হয়ে গেছে।'

'আমি দুটো ধূসর বাজপাখি সঙ্গে এনেছি,
তারা তাকে ধরে আনবে!'

বিবাহিত নারীর জীবনের একটি চিত্র দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি :

'তুমি তখন যেমন ছিলে এখন কেন তেমন না?
সেই প্রথম গ্রীষ্মের বিকশিত ফুল...
প্রথম শীতের রক্তগোলাপ...'
'কী করে তা হয়?
শাশুড়ী চান আমি ঘর ঝাঁট দিই,
শ্বশুর চান উত্তম খানা,
ননদ বলে তার চুল বেঁধে দিতে,
স্বামী চায় সুখের বিছানা,
কোলের বাচ্চা মাই-দুধ চায়—'

'তোমায় বাঁদী কিনে দেবো—'

'যৌবন কী দিয়ে কিনে দেবে'

১। **The Elek Book of Oriental Verse,** General Editor Ke Bosley, Paul Elek, London, 1979.
২। **Sanskrit Poetry, from Vidyakara's "Treasury",** translated Daniel H. H. Ingalls, Harvard University Press, 1972.
৩। **Haiku,** translated with a commentary by R. H. Blyth, 4 vo Hokuseido Press, Tokyo, 1960.
৪। Yehuda Amichai, **Amen,** translated from the Hebrew by t author and Ted Hughes, with an Introduction by T Hughes, Oxford University Press, Oxford and Melbour 1978.
৫। **Songs from Macedonia,** translated by Andrew Harvey a Anne Pennington, Mid-Day Publications, Oxford, 1978.
৬। Vasko Popa, **Earth Erect,** translated by Anne Penningt Anvil Press Poetry associated with Routledge & Kegal Pa London, 1973. Vasko Popa, **Collected Poems, 1943-1976,** tra slated by Anne Pennington, with an Introduction by T Hughes, Careanet, Manchester, 1978.

সুরভিমাখা
সময়...
ফুলের মত
সময়ের
এইচ এম টি
ঘড়ি
এইচ এম টি
এইচ এম টি
এইচ এম টি ঘড়ি
• ১৭ ও ২১ জুয়েল
• অ্যান্টি ম্যাগনেটিক
hmt
আপনার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১৬ ॥

কলুটোলায় কেশবদের বাড়ির সভা থেকে বেরিয়ে যদুপতি গাঙ্গুলী এবং তার বন্ধু অম্বিকাচরণ সান্যাল দুজনে বাড়ি ফিরতে লাগলো। উভয়েই থাকে নিকটস্থ এক পল্লীতে। যদুপতি সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতার কাজ পেয়েছে, অম্বিকাচরণ শিক্ষকতা করে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে।

বৃষ্টি পড়ছে অল্প অল্প, পৌষ মাসের অকাল বৃষ্টি, বেশীক্ষণ থাকার সম্ভাবনা কম। এ বৎসর শীত খুব তেমন জাঁকিয়ে পড়লো না, বৃষ্টির মধ্যে ফিনফিনে বাতাসে তবু কিছুটা শীতের ধার আছে, সেই বাতাস ও বৃষ্টিকে উপভোগ করতে করতে দুই বন্ধুতে হাঁটতে লাগলো। দুজনেরই গায়ে র‍্যাপার, অম্বিকাচরণ এক সময় তার র‍্যাপার দিয়ে মাথায় মুড়ি দিয়ে নিল। রাত্রি বেশী নয়, তবু পথ প্রায় জনশূন্য।

দুই বন্ধুরই জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, কিন্তু নিছক গ্রন্থপাঠে যেন ঠিক তৃপ্তি হয় না, বুকের মধ্যে একটা আকুতি থেকে যায়। সে আকুতি যে কিসের জন্য, তাও স্পষ্ট নয়। আসলে, ভিত টলে গেছে। এতকাল ধরে শেখানো হয়েছিল যে মানুষের জীবনকে যা ধারণ করে থাকে, তার নামই ধর্ম। যারা ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে মত্ত, যারা যারা সাকার কিংবা নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তিভরে মান্য করে, তাঁর উদ্দেশ্যে কাঁদে কিংবা প্রার্থনা জানায়, তারা কখনো একাকী নয়, তাদের জীবনে সংশয় নেই। তারা প্রশ্ন করে না, তারা শুধু বিশ্বাস করে, এবং বিশ্বাসের মধ্যেই শান্তি। যদুপতি আর অম্বিকাচরণ নতুন কালের শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে বিনা প্রশ্নে কোনো কিছুই বিশ্বাস করতে বা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তাদের ধর্মের নাম যুক্তি। এবং যুক্তির আক্রমণে প্রচলিত কোনো ধর্মই তাদের কাছে টেঁকে না। কিন্তু যুক্তির যত বড় ক্ষমতাই থাক, সে কখনো মানুষের বন্ধু কিংবা সর্বক্ষণের হৃদয়-সঙ্গী হতে পারে না, যুক্তি মানুষকে বড় নিরালা করে দেয়।

শহরের যেখানে যেখানে জ্ঞান, বুদ্ধির চর্চা হয় এই দুই বন্ধু সেখানে নিয়মিত যায়। এক সময় তারা দুজনেই ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতো। কিন্তু কিছুদিন হলো ব্রাহ্মদের সম্পর্কে এই বন্ধুদ্বয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। হিন্দু ধর্মের আড়ম্বর পরিত্যাগ করার নামে ব্রাহ্মরাও যেন এক নতুন ধরনের আড়ম্বরের প্রচলন করাতে চলেছে। যুক্তির বদলে ভক্তির অনুপ্রবেশ ঘটছে তাঁদের মধ্যে। ইদানীং ব্রাহ্মদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে মতবিরোধ, বিশৃঙ্খলা, তাঁদের মূল আচার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাগে ও অভিমানে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন হিমালয় পাহাড়ে।

যদুপতি ও অম্বিকাচরণ নবীন সিংহের বাড়ির বিদ্যোৎসাহিনী সভায় যায়, আবার তরুণ ব্রাহ্মী কেশবের বাড়ির আলোচনা সভাতেও আসে। তবু যেন ঠিক মন ভরে না।

যদুপতির স্ত্রী থাকে তাদের দেশের বাড়িতে। ইদানীং শহরে সব দ্রব্যই অগ্নিমূল্য, বেতনের টাকায় সংসার চালনা করা রীতিমতন কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। কলকাতার জনসংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে, জীবিকার সন্ধানে দেশের নানান অঞ্চল থেকে মানুষ ধেয়ে আসছে এখানে। জলা জমি ভরাট করে ব্যাঙের ছাতার মতন নিত্য নতুন গজিয়ে উঠছে ঘর-বাড়ি। যদুপতি এই অবস্থায় স্ত্রীকে এনে কলকাতায় সংসার পাতবার ভরসা পাচ্ছে না। সে থাকে একটি মেস বাড়িতে।

অম্বিকাচরণ বিপত্নীক। দু বৎসর আগে তার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, আত্মীয় বন্ধুদের অনেক পীড়াপীড়িতেও সে আর দার পরিগ্রহ করেনি। বিগতা স্ত্রীর স্মৃতি তার মনে প্রবলভাবে জাগরূক। অম্বিকাচরণের মূল বাড়ি কুষ্টিয়ায়, কলকাতাতেও তার পিতা একটি ছোট বসত বাড়ি বানিয়েছিলেন, সেখানে অম্বিকাচরণ এখন একা থাকে।

ভদ্র গৃহস্থেরা এই শীতের বৃষ্টির রাতে সবাই এর মধ্যে পথ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে ঘরে। যে দু চারজনকে দেখা যায়, তারা প্রায় সবাই ফূর্তিখোর মাতাল। যদিও বেশী মাতাল হয়ে পথের ওপর দৌরাত্ম্য করলে তাদের গ্রেফতার করে কোতোয়ালিতে আটক করার হুকুম জারি হয়েছে। তবু তাতে মদ্যপদের হুটোপাটি কমেনি কিছুমাত্র। পুলিসের উৎকোচ পাবার আর একটি উপায় হয়েছে শুধু। বারবণিতাদের সঙ্গে বেলেল্লা করতে করতে লম্পটরা সন্ধ্যা-রাত্রি থেকেই রাজপথের ওপর ঘুরে বেড়ায়। আজ অবশ্য তাদের সংখ্যাও কম।

দুজনে কিছুক্ষণ হাঁটলো নিঃশব্দে। আজ একটা গাড়ি নিতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু এমন রাতে গাড়ি পাওয়াও দুষ্কর। কেরাঞ্চি গাড়িগুলি সন্ধ্যার পরই উধাও হয়ে যায়। পাল্কি-বেহারারা এমন বৃষ্টি-বাদল দেখে নিশ্চয়ই কোথাও গাঁজা টানতে বসে গেছে। পথে গাড়ি-ঘোড়াও দেখা যাচ্ছে না বড় একটা। বৃষ্টি বেশ জোরে আসছে।

অম্বিকাচরণ হঠাৎ বললো, আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না।

যদুপতি চমকে উঠে বললো, সে কি কথা? কেন ভাই?

অম্বিকাচরণ বললো, কেন বেঁচে থাকবো তার একটি, বেশী নয় একটি মাত্র সুসংগত যুক্তি দেখাতে পারো?

—বাঃ, একটি কেন, অসংখ্য যুক্তি রয়েছে। সবচে বড় যুক্তি তো এই যে বেঁচে থাকবো বেঁচে থাকারই জন্য।

—তোমার কথাটি একটু ব্যাখ্যা করে বলো ভাই যদুপতি।

—এ কী উপনিষদের শ্লোক যে ব্যাখ্যা করতে হবে? এ তো অতি সাধারণ কথা।

—এমন সাধারণ কথার উপর নির্ভর করে, এমন সাধারণ ভাবে আমি বাঁচতে ইচ্ছে করি না। এ কি পশুর জীবন যে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রাণ ধারণ করবো?

—তোমার এমন শ্মশান বৈরাগ্য হঠাৎ জাগলো কেন ভাই, অম্বিকা! একবার তো শ্মশানে গিয়ে নাকাল হয়েছিলে। কয়েকটা ডোম ছোঁড়া তোমায় আচমকা ধাক্কিয়ে জলে ফেলে দিলো না?

—এর নাম কী শ্মশান বৈরাগ্য? কিন্তু উদ্দেশ্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা মানে কি নিছক বসুমতীর ভার বৃদ্ধি করা নয়?

—তুমি তোমার পত্নীকে নিয়ে আর কোনো নতুন কবিতা রচেছো?

—আমি আর কবিতা লিখি না। কবিতা রচনা করাও অর্থহীন। কবিতা জিনিসটা সম্পূর্ণ একটা যুক্তিহীন ব্যাপার নয়?

—হা—হা—হা

—তুমি হাসছো, যদুপতি?

—অম্বিকা, তোমার রোগটি বেশ কঠিন মনে হচ্ছে। কোনো কবি যদি কখনো কবিতাকে যুক্তিহীন, অর্থহীন বলে, তখন বুঝতে হবে, হি হ্যাজ ক্রসড দি বাউণ্ডারি লাইন।

—তুমি আমার প্রশ্ন কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছো, ভাই যদুপতি।

—ঐ দ্যাখো।

—কী?

—ওকে দ্যাখো। ও কেন বেঁচে রয়েছে বা বেঁচে থাকতে চাইছে তা বলতে পারো?

বহুবাজারে পথের মোড়ে এক ইঁটের পাঁজার ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লাল শাড়ী পরা যুবতী। বয়স সতেরো-আঠারোর বেশী মনে হয় না। হাতের একটি লাল রুমাল সে ঘুরিয়ে চলেছে, বৃষ্টিতে যে ভিজে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ সে খেয়াল নেই। এই রাত্রে সে পথের ওপর কী জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তা এক নিমেষ তাকালেই বোঝা যায়।

অম্বিকাচরণ সে দিকে একবার চেয়েই বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল।

যদুপতি বললো, দ্যাখো, নারীকে সবাই বলে অবলা। অথচ ওর কোনো ভয় নেই, এমন দুর্যোগের মধ্যে পথের ওপর একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। একেই বলে শুধু বাঁচার জন্য বাঁচা। বাঁচতে তো হবেই, কেন না, মৃত্যুর পর যে আর কিছু নেই। তুমি যুক্তির কথা বলছিলে, মৃত্যুর পর সবই যুক্তিহীন।

মেয়েটি ওদের দেখে একটু এগিয়ে এসে বললো, এই!

দুই বন্ধু কর্ণপাত করলো না। তারা যুক্তি বিষয়ে আলোচনা করতে করতে এগোতে লাগলো।

মেয়েটি আবার বললো, এই, আমায় নেবে? নাও না, তোমাদের যেখানে খুশী, যতক্ষণ খুশী, আমায় নাও না!

যদুপতি ধমক দিয়ে বললো, যাঃ! বিরক্ত করিস নি!

মেয়েটি পিছু পিছু আসতে আসতে বললো, দু' জনে মিলে নাও! দুটো টাকা দিও!

যদুপতি বললো, যা, যাঃ! বলছি, এখেনে সুবিধে হবে না।

—একটা টাকা দিও, আর জলে ভিজতে পারি নি? দুজনে আট আনা, আট আনা!

যদুপতি একটা আধলা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, এই নে, আমাদের পিছু ছাড়!

মেয়েটি এবার রেগে গিয়ে গালাগাল শুরু করলো। অ মর মিনসে, আমায় ভিকিরি পেইচিস? আকরা, ছুঁচো, আট আনা পয়সা দেবার মুরোদ নেই, আবার কোঁচার পত্তন? আমি কি ঘাটের মড়া? বয়স মা আমার মাত্তর দুখানা, দু টাকার কমে যাই না—

যদুপতি অম্বিকাচরণের হাত ধরে টেনে দ্রুত এগিয়ে গেল।

প্রথমে যদুপতির বাসস্থান পড়ে। সে দ্বারের সামনে এসে বললো, এবার তোমায় শুভাশিস জানাই ভাই, অম্বিকা। বেঁচে থাকার যুক্তি বিষয়ে চিন্তাটা আজ রাতের জন্য মুলতুবী রেখো। আমাদের স্বর্গপিতা বোঠানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েই বলছি, এবার তোমার আর একটি বিবাহ করার সময় হয়েছে। বিবাহ করলে

পড়ে কলেরে যব ভরে গেলে মরবে, বেঁচে থাকার আর একটি যুক্তিও রয়েচে।

অম্বিকাচরণ গম্ভীর ভবে জিজ্ঞেস করলো, অর্থাৎ?

যদুপতি বললো, অর্থাৎ, তখন মরবে, অপরের জন্য বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। পতির প্রতি প্রেম, সন্তানের জন্য স্নেহ, এগুলোও তো বেঁচে থাকার উপকরণ।

অম্বিকাচরণের আর তর্ক করার দিকে মন নেই। সে হাত তুলে বিদায় জানিয়ে হাঁটতে শুরু করলো।

কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। কী ভেবে আবার পিছনে ফিরলো। যদুপতির গৃহের সামনে এসে দেখলো, দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। সে যদুপতিকে আর ডাকলো না, চলতে লাগলো উল্টো দিকে।

বহুবাজারের মোড়ে সেই যুবতীটি আবার ইঁটের পাঁজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল ঘোরাচ্ছে। অম্বিকাচরণ একেবারে তার মুখোমুখি এসে থেমে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো তার দিকে।

যুবতীটির মুখে ছড়িয়ে গেল খুশীর হাস্য। সে বললো, এসচো? নকশী-সোনা আমার, মানিক আমার, এসচো? ভালো করে দ্যাখো, আমি ময়না নই, বোগা শালিক পক্ষীটি নই

অম্বিকাচরণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, তুমি কত রাত এখেনে দাঁড়িয়ে থাকবে?

যুবতীটি বললো, আর ভাঁড়াবো না! তুমি এসচো, আর আমার চিন্তা নেই। তুমি আমায় নেবে। আজ কেউ আমায় নেয়নি গো!

—এসো আমার সঙ্গে।

আমায় একটা টাকা দিও অন্তত?

—এসো।

যুবতীটিকে নিয়ে অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলো নিজের গৃহে। দ্বার খুলে দেবার পর বাড়ির ভৃত্যটির প্রায় বাকরহিত হবার মতন অবস্থা। তার বাবুটি অতি বিশুদ্ধ চরিত্রের, কখনো বাড়িতে ভিখারিণী এলেও তার সঙ্গে কথা বলে না। রাত্রিবেলা এরকম একজন স্ত্রীলোককে নিয়ে তার বাবু ফিরবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। স্ত্রীলোকটি কী জাতীয়, তা ভৃত্যটিও বোঝে।

অম্বিকাচরণ কিছুই গ্রাহ্য করলো না। ভৃত্যকে সংক্ষিপ্ত আদেশ দিল, তুই দোর লাগিয়ে শুয়ে পড়। তারপর যুবতীকে নিয়ে উঠে এলো দ্বিতলে।

দ্বিতলের এক কক্ষের চৌকাঠে পা দিয়ে যুবতীটি অনুনয়ের সুরে বললো, ওগো, একটা টাকা ঠিক দেবে তো? যদি দুটো টাকা দিতে পারো, তা হলে বড্ড ভালো হয়।

অম্বিকাচরণ বললো, আমি তোমায় স্বর্ণালঙ্কার দেবো!

সত্যিই সে দেরাজ খুলে দুটি সোনার অঙ্গুরীয় বার করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললো, এই নাও, আরও দেবো।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে অম্বিকাচরণ একটা গামছা নিয়ে এলো। যুবতীটিকে বললো, অনেক ভিজেচো, মাথা মুছে নাও। তোমার নাম কী?

—আমার একটা নাম বসন্তকুমারী, আর একটা নাম ক্ষেমী।

—তোমার খিদে পেয়েচে?

—খুব। অতে কিছু হবে নাকো। আমি বাড়ি গিয়ে খাবো। আংটি দিলে, একটা টাকা দেবে না?

অম্বিকাচরণ আবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার রাত্রির আহার ঢাকা দেওয়া থাকে। তার নিজের একটুও আহারের বাসনা নেই। সে এক বাটি ক্ষীর নিয়ে ফিরে এসে বললো, বসন্তকুমারী, তুমি এটা খাও, আমি দেখি।

ক্ষেমী বললো, ওমা এখুনি খাবো কী? না, না, এখুনি না, আগে তুমি আমায় নাও।

অম্বিকাচরণ জোর করে ক্ষীরের বাটিটা তুলে দিল ওর হাতে। তারপর একটা জলচৌকি দেখিয়ে বললো, তুমি বসো ওটার ওপর।

মেয়েটি হতভম্বের মতন বসলো সেখানে। অম্বিকাচরণ বসলো ওর সামনে মেঝের ওপর। তারপর হাত দুটি জোড় করে বললো, তুমি আমার মা!

ক্ষেমীর চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল। ওর এই কচি জীবনেই অনেক রকম উন্মাদ দেখেছে, কিন্তু এটি আবার কী রকম?

অম্বিকাচরণ বললো, শুধু দুটি খেতে পাওয়ার জন্য তুমি বেঁচে রয়েচো, তোমার খাওয়া আমি দেখি। হে জননী, দুটি আহারের জন্য তোমায় পথে দাঁড়াতে হয়?

ক্ষেমী বললো, কী করবো, বাড়িতে যে লোক আসে না রোজ। সাধে কি আর রাস্তায় ডাঁড়াই। রাস্তায় ডাঁড়িয়েছিলুম বলেই তো তোমায় পেলুম। ওরী গো, তুমি মা মা কচ্চো কেন? আমি তোমার মা হতে যাবো কেন, তুমি ভদ্রলোক

—তুমি যে মাতৃজাতি! লজ্জা-লজ্জা-ধর্ম সব বিসর্জন দেবে শুধু দুটি আহারের জন্য? এর চে কি মরণ ভালো নয়? এসো মা, তোমাতে আমাতে দু জনে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরি। আমরা সন্তান হয়ে যদি মায়ের দুঃখ ঘোচাতে না পারি—

—এসব কী বলচো গো। আমার ভয় কচ্চে! আমি মরতে যাবো কোন্ আহ্লাদে? বাড়িতে যে এক গাদা মুখ হাঁ করে রয়েচে, তাদের গুষ্টির পিণ্ডি কে জোগাবে?

—তোমার রোজগারে আরও লোক খায়?

—তবে তাদের কে খাওয়াবে? ভগবান? এঃ!

—তুমি ওদের জন্যই বেঁচে রয়েচো?

—কে জানে বাবা অত কতা? তুমি আমায় নেবে তো নাও, নইলে আমি বাড়ি যাই। মরণের কতা! তুমি আমায় মেরে ফেলবে নাকি?

—না, মা, আমি তোমার পুজো করবো।

—শোনো কতা! কেন, আমায় পুজো কর্বে কেন? আমি কি ওলাইচণ্ডী ঠাকুর? অ্যাই মাঃ! কী বলে ফেললুম! নমো, নমো

—তুমি সব ঠাকুরের চেয়ে বড়। তুমি মা। তোমার পুজো করবো। সন্তানের কাচ থেকে পুজো পেয়েও কি তুমি আর কোনো দিন মান খুইয়ে পথে দাঁড়াবে? এর চে যে ভিক্ষে করাও ভালো।

—কে অমনি অমনি আমায় ভিক্কে দেবে? কটা আধলাই বা পাবো?

—তুমি মা, তোমার পাপে সন্তানের পাপ, তোমরা যদি এত নীচে নামো, তবে সন্তানরা যে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতেই পারবে না।

—আমি তোমার কতা কিছুই বুঝিচিনি! আমায় তবে বাড়ি যেতে দাও। অম্বিকাচরণ ক্ষেমীর পায়ের পাতা দু হাতে চেপে ধরলো।

ক্ষেমী আঁতকে উঠে বললো, ওমা, ওমা, ভদ্দর-লোকের ছেলে, আমার পা ধরলে, আমার একেই এত পাপ...ছাড়ো, ছাড়ো।

যদিপতি ব্যাকুলভাবে বললো, আমি শুধু মুখের কথা বলিনি। আমি সত্যিই তোমার পুজো করবো। ফুল-দূর্বা দিয়ে। এতদিন লোকে তোমায় যত অপমান করেচে, সব ধুয়ে যাবে, তুমি আবার মঙ্গলময়ী মা হবে।

ক্ষেমী কেঁদে ফেলে বললো, ওগো, আমরা দুঃখী, কেন আরও দাগা দিচ্চো আমায়? সাধ করে কেউ পাপের পথে নামে!

—আবার পুণ্যের পথে উঠে যাও!

—ওগো ছাড়ো, পা ছাড়ো। কেন, কাল থেকে ভিক্কে কর্বো, পা ছাড়ো, আর পাপ বাড়িও না।

অম্বিকাচরণও কেঁদে ফেলে বললো, তোমার যখন যা দরকার আমার কাচ থেকে চেয়ে নিও, কিন্তু আজ থেকে তুমি মহিয়সী হও। তুমি সন্তানের নিকট আদর্শ হও!

অম্বিকাচরণের আবেগের স্পর্শে ক্ষেমীও আপ্লুত হয়ে গেল। এবং এক সঙ্গে কাঁদতে লাগলো দুজনে।

(ক্রমশ)

মনে রাখবেন

মায়ের দুধ সবচেয়ে উত্তম

প্রকৃতির এই মহান দানের কোনো বিকল্প নেই। সেইজন্য যত দিন পর্যন্ত সম্ভব আপনার বাচ্চাকে নিজের দুধ খাওয়ান। তবে যদি আপনার বুকের দুধ যথেষ্ট না হয়, তা হলে ওকে আমূলস্প্রে খাওয়াতে শুরু করুন।

শুরু থেকেই আমূলস্প্রে দিন সবচেয়ে জনপ্রিয় দুগ্ধ-আহার

আমূলস্প্রে'র নিজস্ব বিশেষত্ব-সমূহ :

- পুরোমাত্রায় সুষম
- ভিটামিনে ভরপুর
- সহজে হজম হয়
- সহজে গুলে মিশে যায়

আমূলস্প্রে বিকাশের শুভারম্ভ করে আর বালআমূল সেই বিকাশকে পরিপূর্ণ করে

বাচ্চার ৩ মাস বয়সে

বালআমূলও খাওয়ান —

অত্যন্ত পুষ্টিকর, দুধ-মিশ্রিত শস্যাহার

৩ মাস বয়স থেকে বাচ্চা এত তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে, যে, ৬ মাস বয়সে ওর জন্ম-সময়ের ওজন দু'গুণ হয়ে যায় আর ৩ বছর বয়স পর্যন্ত ওর মস্তিষ্কের বিকাশ হয় ৮০% ভাগ। এই কারণে তখন ওর জন্যে শুধু দুধই যথেষ্ট নয়। ওর প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সম্বলিত সুষম মাত্রার আহারের প্রয়োজন। যা একমাত্র বালআমূলেই ঠিকমত পাওয়া যায়।

বালআমূল—আমাদের দেশের শিশুদের জন্য এক বিশেষ অবদান

বালআমূল সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের সহায়তায় বিশেষ ধরনে তৈরী করা হয়েছে। আর এটি ভেলোরের খ্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজে বিশেষভাবে পরীক্ষিত।

বালআমূল—বেশী পুষ্টি-মূল্য

- অন্যান্য ব্রাণ্ডের শস্য-আহারের ও শক্ত-আহারের তুলনায় অন্ততঃ ২৫% বেশী প্রোটিন
- বেশী ক্যালসিয়াম, ভিটামিন 'এ' এবং 'সি'
- স্নেহ-পদার্থ, আয়রণ ও ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সে বেশী সমৃদ্ধ
- আগে থেকে দুধে রান্না করা, সুপাচ্য ও সুস্বাদু
- অন্যান্য আহার—যেমন, ডাল, পিষে নেওয়া ফল ও পুডিং প্রভৃতির সঙ্গে সহজে মিশে যায়।

বালআমূলে আপনার দ্বিগুণ দাম উশুল হয়

ASP-AB-5/79

বিনামূল্যে! বিশদ বিবরণ সম্বলিত 'আমূল বেবি বুক' ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় এবং বালআমূল গ্রোথ রেকর্ড বুকলেট' শুধু ইংরাজীতে পাবেন। আপনার পুরো নাম ঠিকানা লিখে ১ টাকার ডাকটিকিটের সঙ্গে এই ঠিকানায় লিখুন : পোস্ট ব্যাগ নম্বর : ১০১২৪, বম্বে ৪০০ ০০১

বিক্রী-ব্যবস্থায় :
গুজরাত কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, আনন্দ।

জলচিহ্ন

ফণিভূষণ আচার্য

তুমি কিছু জলচিহ্ন ফেলে গেছ
স্নানের সিঁড়িতে
আকাশ জারুল গাছের অপ্রতিভ ছায়া
কলাঝাড়ে রোদ   সব
নিসর্গের স্থিরচিত্র হয়ে আছে
শান্তির অক্ষরে

তার অন্তরালে কে কোথায় গলা ছিঁড়ে
বকুল বকুল নামে ডাকে
সমস্ত পৃথিবীটাই দুলে ওঠে
ছত্রাকার এলোকেশী ঝড়ে

মনে পড়ে   বহুদিন পৃথিবীতে
বকুল আসেনি

দূরযান

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি দেখছিলাম :

ঝকঝকে রোদ উঠেছে সকালবেলায়, আকাশে
হালকা সাদা মেঘ, এই যে ক-দিন
অবিরাম বৃষ্টি হয়ে গেলো তার কোনো চিহ্ন নেই।
আর আমরা ব'সে আছি, তুমি আর আমি,
সকালবেলার দ্বিতীয় দফার কফির সামনে,
কেন যেন খবরকাগজে আজ
কোনো দেশ পুড়ে যায়নি, অথবা ভেসে যায়নি প্লাবনে।
তোমার মনে পড়ে তুমি কত খুঁজে পছন্দ করেছিলে
এই পেয়ালাগুলো?
এখন এই পেয়ালার কবেকার কোন্ ঝাউবনের সরসর।
কী একটা কথা হ'লো, আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম,
এক সঙ্গে, কোনো স্নেহাতুর কৌতুক হয়তো,
শুধু দৃশ্যটা, সবসুদ্ধু, কোনো শব্দ নেই তার সঙ্গে,
শব্দ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে—

আর আমার বুকের মধ্যটায় কেমন ক'রে উঠলো।

বিশ্বপিতা : ৮৪

শামসুল হক

মনের ঘরে, মনের বহুরূপীটা
যখন মায়াবী বাতাসে বাসগৃহ গড়ে তোলার
সংকল্প ত্যাগ করে স্থির হয়
ঠিক তখনই, অঙ্কের খাতা-পেন্সিল হাতে
তুমি এগিয়ে আস সুদক্ষ গাণিতিকের মতো!

খুনের রক্তে রঞ্জিত খাতা
তোমার স্বাক্ষরে স্পষ্ট হয়ে উঠল তখনই
যখন বহুরূপীটা তোমার আসার অপেক্ষায় ছিল না।

তুমি কত বছর পরে আবার এলে?
সরল কথায় তোমার কোন ভুল-ত্রুটি নেই
তবুও তুমি ভুল করলে
বহুরূপীটাকে অকারণে মুক্তি দিয়ে:
না কি এ তোমার ভুল নয়?
হয়তো বা বহুরূপীটাই   মুক্তি চেয়েছিল!

দিশী ছড়া : ইস্টিশন

সামসুল হক

ইস্টিশনে এসে গেছেন তিনি
ট্রেন আসুক বা না

সঙ্গে আছেন বোরকা-পরা অজানা সঙ্গিনী
কিছু না-হোক পা দুটি রাঙা

বিষপিঁপড়ে কৃষ্ণচূড়ার তলায়
রাধাচূড়ার তলায় শুয়োর বাঁধা

বৈঠিক ট্রেনের ইস্টিশনের এপিক শিল্পকলায়
খোঁজেন তিনি ভারতবর্ষের অজেয় আর্মাডা

কী বললে ?... বাবা হতে চলেছি ? তার মানে.....?
মানে এই যে, আমাদের বাচ্চা হবে!

হুররেরে!

ডায়ানা, তাহলে তুমিও আমার সঙ্গে চলো.....
কাজ ফেলে যাব কী করে?

স্বর্গোদ্যানের দিনগুলি মনে পড়ে ?
ডায়ানা, আমাকে বিয়ে করবে?
কী বললে ?
বললুম, হ্যাঁ!
হু-ই-ই!

ডায়ানা, অরণ্যদেবের স্ত্রীকে কিন্তু খুলি-গুহাতেই থাকতে হয়!
কী চুক্তি হয়েছিল তখন, মনে আছে?
কিন্তু যুগ যে পাল্টে গেছে!

'স্বর্গোদ্যানে তুমি কথা দিয়েছিলে...'
বাব্বা, বাঁচলুম!
ঠিক আছে, তোমার কথাই রইল।
গররর....

চাইলেই কি আর ছুটি পাব ? শিগগির পাব না!
কিন্তু এখন আমাদের একসঙ্গে থাকা দরকার।

সুযোগ পেলেই আমি তোমার কাছে চলে যাব !
12/31
চলবে • ৮

॥ একুশ ॥

আপনি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন কেন? এখন তো আর শীতকাল নেই।

শীতকাল নেই? তবে এটা কি কাল?

ফাল্গুনের শেষ। এখন আর শীত কোথায়?

তাই বলো। আমারও কেমন হাঁসফাঁস লাগে আজকাল। চোখে ভাল দেখি না, বাইরে কি রোদের খুব তেজ?

খুব তেজ। কিন্তু চোখে ভাল দেখেন না কেন? ছোটো ছেলে তো ছানিটা কাটিয়ে দিতে পারত।

চেয়েছিল কাটাতে। আমিই ভাবলাম, সে ছা-পোষা মানুষ। চোখ কাটাতে খরচ তো কম নয়। আর এ বয়সে চোখ নিয়ে আমি করবটাই বা কি?

চোখ কাটানোর নাম করে টাকা নিয়েছিল সেই গেলবার। শুনি দীপু ঠাকুরপোও টাকা দিয়েছিল। তা হলে কাটাল না কেন?

সে টাকা কি আর রেখেছে? গরীবের সংসার, কবে বোধ হয় ভেঙে খেয়ে ফেলেছে।

খুব গরীব নয়। মাইনে তো খারাপ পায় না যত দূর জানি। থাকে অবিশ্যি গরীবের মতো। কিন্তু তা বলে নিজের বাবার চোখের ছানিটা পর্যন্ত কাটাতে নেই? অমন ছেলের কাছে ছিলেন কি করে এতদিন?

না, এমনিতে অযত্ন করত না। ডাক-খোঁজও করত খুব। বউমাটিও ভাল।

ভাল হলেই ভাল। কিন্তু চোখ যখন কাটায়নি, তখন টাকাটা আমাদের ফেরত দিয়ে দিক।

সে কি আর দিতে পারবে? পাবে কোথায়? ওদের সংসারে সারাদিন হা-টাকা যো-টাকা।

আপনার নিজেরও তো কিছু টাকাপয়সা ছিল শুনেছি। সেটাও খুব কম হবে না। সেটাও কি গিয়েছে নাকি?

আমার টাকা!

তা নয় তো কি? কিছু টাকা তো আপনার ছিল। অন্তত পনেরো বিশ হাজার তো হবেই।

কে জানে! কোথাও আছে বোধ হয়। ডাকঘরে বা ব্যাংকে।

আছে ঠিক জানেন?

মনে নেই। আজকাল ভুলে যাই বড্ড।

শাশুড়ীর মায়ের কিছু গয়নাও ছোট কর্তার কাছে ছিল।

বুলুর কাছে? না, না, বুলুর কাছে থাকবে কেন? গয়না ছিল আমার কাছে।

ছিল মানে? এখন কি নেই?

কথাটা তা নয়। আসলে গয়নাগুলো আমি বউমাকে দিয়েছিলাম তার লকারে রাখতে।

তবেই হয়েছে। বউমা তার লকার বোধ হয় আর জীবনেও খুলবে না।

মটরমালা একটা হার কিন্তু দিইনি।

সেটা তবে কোথায়?

সেটা বউমা স্যাকরাকে দেখাতে চেয়ে নিয়েছিল। বেশী দিনের কথা নয়। বলল, ওরকম একটা হার গড়াবে। স্যাকরা প্যাটার্নটা দেখতে চেয়েছে।

ফেরত দিয়েছিল?

দিয়েছে বোধ হয়। আমার বাক্সটা খুলে দেখ তো! বাঁ দিকে একটা বহু পুরোনো সিগারেটের কৌটো আছে। ওপরে কয়েকটা পইতে, তার তলায়।

দেখতে হবে না। ধরেই নিচ্ছি ওটাও নেই।

না, না, দেখই না ভাল করে। আমি লুকিয়েই রেখেছিলাম।

লুকিয়ে রাখতে গেলেন কেন? চোর-ডাকাত না ছেলের ভয়ে?

ভয়ে ঠিক নয়। তোমার শাশুড়ী যখন মারা যান তখন গলায় এঁটে ছিল। আমি খুলতে চাইনি। ভাবলাম যার জিনিস তার সঙ্গে যাক। সুরবালাকে মনে আছে তোমার?

ও মা! নিজের পিসশাশুড়ীকে মনে থাকবে না কেন!

তা সেই সুরবালাই ওটা গলা থেকে খুলে আমার হাতে দিল। বলল, এটা কাউকে দিও না। এখনো রাঙা বউঠানের গায়ের তাপ এতে লেগে আছে। সেই থেকে হারটা ছিল। তোমার শাশুড়ীর কথা খুব মনে পড়তো বলে হারটা দেখতাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কি যেন বলছিলাম!

বলছিলেন, হারটা লুকিয়ে রেখেছিলেন।

ঠিক তাই। পাছে কেউ চুরি করে সেই ভয়ে। ভেবেছিলাম একেবারে শেষ সময়ে যে সেবা করবে তাকে দিয়ে যাবো। সময় করে একবার খুঁজে দেখো তো!

আমি দেখব কেন? আপনার জিনিস আপনিই খুঁজুন। আমার ওতে লোভ নেই। তবে এও জানি, খুঁজলেও পাবেন না।

তবে কি ফেরত দিতে ছোটো বউমা ভুলে গেল?

ভুলে যাবে কেন? অত ভুলো মন তো ওর নয়।

তা হলে?

তা হলে আর কি? মনে মনে ওটা ছোটো বউমাকেই দান করে দিন।

দান করাই যায়। ছোটো বউমা আমার সেবা কিছু কম করেনি।

সেটা করেছে নিজের গরজেই। আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই মাসে মাসে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল যে! আমরা পাঠাতাম। দীপু ঠাকুরপো পাঠাত।

দীপু! বহুকাল দীপনাথকে দেখি না। সে কি তোমাদের এখানে মাঝে মাঝেই আসে?

না, বহুকাল বাদে ঐ সেদিন এসেছিল, যেদিন আপনাকে সোমনাথ পৌঁছে দিয়ে গেল এখানে। তাড়া ছিল বলে চলে গেল একটু আগে। সঙ্গে ওর বসের বউ ছিল।

কি করছে এখন?

চাকরিই করছে।

ভাল আছে তো! বহুদিন দেখিনি।

দেখবেন। আসতে লিখে দেবো।

তোমাদের এই বাড়িটা খুব ভাল। বেশ খোলা-মেলা, হাওয়া বাতাস আছে। আগেরবার দেখে গেছি, তখন এত দালান-কোঠা ওঠেনি।

এ সব ঘর পরে হয়েছে।

মল্লিনাথের কি অনেক সম্পত্তি, বউমা?

খুব কম নয়।

আমার ছেলেদের মধ্যে মল্লিনাথই ছিল সব চেয়ে সাকসেসফুল। অথচ দেখ, তারই ভোগ করার কেউ নেই।

কেউ নেই কেন? এই তো আমরা ভোগ করছি।

সে ঠিক কথা। তবে তার নিজের তো কেউ নেই। পাঁচ ভূতে লুটে খাচ্ছে।

আমরা কি ভূত, বাবা?

তোমাদের কথা নয়। কী মুশকিল! আমার কি বুড়ো বয়সে সব কথা ঠিকঠাক আসে?

বললেন বলেই জিজ্ঞেস করলাম। সোমনাথ কি বলে? আমরাই সেই পঞ্চভূত?

বুলুকে তোমরা দেখতে পারো না কেন বলো তো? সে কিন্তু তার মায়ের খুব আদরের সন্তান ছিল।

বেশী আদর দিয়েছেন বলেই তো এরকম।

ছেলেপুলেরা তো বাপ-মায়ের আদরেরই হয়। তুমি কি আদর দাও না?

দেবো না কেন? তবে অন্যায় আদর দিই না।

দীননাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিবিড় চুলে ভরা মাথাটা নাড়ালেন। বললেন, সবাই সে কথা বলে।

কি বলে?

বলে মেজো বউ খুব কড়া ধাতের। তা ভাল আমরা সে আমলে সত্যিকারের ছেলেপুলে মানুষ করতে জানতাম না। ছেলেরা নিজেরাই যে যার মানুষ হত। এখনকার দিনের মা-বাবারা অনেক বেশী ছেলেপুলের যত্ন করে। তবে শাসনটা তেমন করে না। তুমি অবশ্য করো।

আপনারাও যদি ছেলেপুলেকে শাসন করতেন তবে এরকম হত না।

দীননাথ শঙ্কিত চোখ তুলে বলেন, কিরকম বলো তো? আমার ছেলেপুলেরা কি খুব খারাপ?

ভালও কিছু নয়।

কেউ নয়?

ভাশুর ঠাকুরকে ধরছি না।

দীননাথ খুশী হয়ে আবার মাথা নেড়ে বললেন, মল্লিনাথ ছিল ব্রিলিয়ান্ট। ওরকম ছেলে হয় না।

দীপুও বড় ভাল। আপনার ছেলেপুলেদের মধ্যে এই দুজন অন্যরকম।

শ্রীনাথ কি খুব সৃষ্টিছাড়া? তাকে এখানে এসে অবধি ভাল করে দেখলামই না।

কখন দেখবেন? সেই সকালে বেরোন, রাত করে ফেরেন। কখনো ফেরেনই না।

ফেরে না? তবে রাতে কোথায় থাকে?

তা কে বলবে?

দীননাথ একটু ভাবেন। বলেন, ওর কি চরিত্র খারাপ?

খোঁজ নিয়ে দেখিনি।

খারাপ হতে দিও না। এখনো আটকাও। স্বামী ছাড়া মেয়েদের কিছু নেই।

আমি ও সব মানি না।

আজকালকার মেয়েরা অবশ্য মানে না। পুরুষগুলোও তো যাচ্ছে তাই। একটা কথা বলব, বউমা?

বলুন।

আমি মরে গেলে বুলুকে একটু দেখো। যত খারাপ ভাবো ও তত খারাপ নয়।

দেখব কি, দেখার আছেই বা কি? সোমনাথ তো আর কচি খোকা নয়। বয়স হয়েছে, বিয়ে করেছে, নিজের এবং অন্যের ভালমন্দ ভালই বুঝতে শিখেছে।

ও ওর মায়ের খুব আদরের ছিল।

তাতে আমার কি? আমি তো মায়ের আদর দিতে পারব না।

তা বলিনি। বলছি, ওর বড় অভাব। ওকে একটু দেখো।

আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝেছি। বোধ হয় সোমনাথই আপনাকে এ সব বলতে শিখিয়ে দিয়েছে।

দীননাথ একটু লজ্জা পেয়ে বলেন, যত যাই

REX
JELLY CRYSTALS
ARTIFICIALLY FLAVOURED
RASPBERRY

রেক্স
জেলী
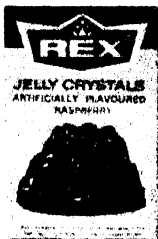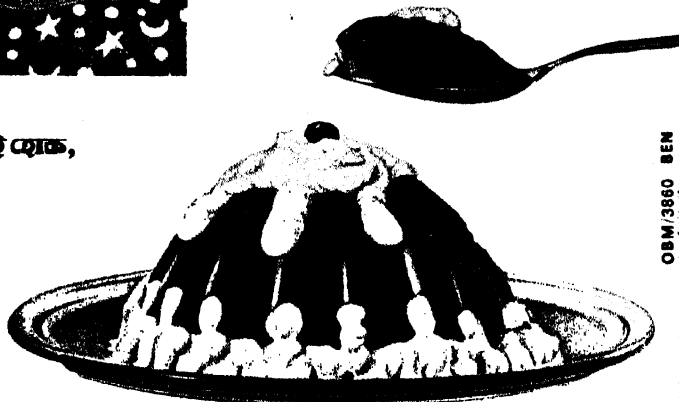
হোক, ওর দাদারই তো সম্পত্তি।

সেটা দাদা বেঁচে থাকতে বুঝে নিল না কেন?

তুমি কি ওকে খুব অপছন্দ করো?

করলেই বা। ওর তাতে কি যায় আসে?

ও তোমারই দেওর।

তা হলেই বা কি? আমাকে তো বউদি বলে ভাবে না। ভাবলে এখানকার লোকদের আমার ওপর ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করত না।

ও কি তাই করছে?

হ্যাঁ।

দীননাথ তাঁর এই বয়সেও প্রচুর কালো চুলে ভরতি মাথাটা চুলকোন দু হাতে। তারপর বলেন, ওকে কি তুমি লোক দিয়ে মার খাইয়েছিলে?

ও তাই বলে নাকি?

ঠিক তা বলে না। তবে আন্দাজ করে। মরতে মরতে বেঁচে গেছে।

তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

দীননাথ তৃষার দিকে গভীরভাবে চেয়ে দেখছিলেন। ভাল দেখতে পান না বলে ভ্রু কোচকানো। বললেন, তবে এই কম্বলটা আর গায়ে দেবো না বলছো?

না। শীত করলে প্যাতলা সুতির চাদর গায়ে দেবেন।

চাদর তো নেই।

আপনার যে কিছুই নেই তা আমি জানি। ও সব নিয়ে ভাববেন না। চাদর বিছানায় ঠিক থাকবে।

আচ্ছা। খুব ভাল। তোমার বেশ চারদিকে চোখ।

চোখ ছিল বলে বেঁচে আছি। নইলে চিল-শকুনে খেয়ে যেত। কম্বলটা দিন, রোদে দিয়ে তুলে রাখব।

থাক না, বিছানাতে আছে থাক। এ কম্বল বিলেতে তৈরী। মল্লিনাথ দিয়েছিল। একটা স্মৃতির মতো।

ভয় নেই বাবা। আমি শমিতা নই যে, নিয়ে ফেরত দেবো না।

ঐ দেখ, কী কথা থেকে কী কথা।

কম্বলটা দিন। শীত এলে ফেরত পাবেন।

আর শীত কি আসবে আমার জীবনে? এটাই শেষ শীত বোধ হয়।

তৃষা কম্বলটা নিয়ে চলে যায়। বিছানাটা একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে দীননাথের। কম্বলটার জন্য বড় উদ্বেগ। নিয়ে গেল, আবার দেবে তো। ঠেকে ঠেকে শিখেছেন, একবার নিলে লোকে আজকাল আর কিছু ফিরিয়ে দেয় না।

দীননাথ আর শুয়ে রইলেন না। বসে বসে নিজের ছেলেপুলেদের কথা ভাবতে লাগলেন। দীপনাথ মানুষ হয়েছিল বেদবালার কাছে। বেদবালার প্রথম সন্তান বাঁচেনি। তাই দীপুকে নিয়ে গেল। পরে আরো ছেলেপুলে হয়েছিল বটে, কিন্তু দীপুকে খুব বুক দিয়ে মানুষ করেছিল। বলত, দীপ হল আমার মেজো ছেলে।....বিলুর বড় বিপদ চলছে। জামাইয়ের নাকি বাড়াবাড়ি অসুখ।... শ্রীনাথ রাতে ফেরে না মাঝে মাঝে, এ ভাল কথা নয়। ....ওদিকে ছোটো বউমা কি করছে কে জানে। সোমনাথ বলেছিল, রবিবারে রবিবারে আসবে। তা কত রবিবার চলে গেল। এল না তো। বউমার কি কিছু হল-টল?

খবর দেওয়া সত্ত্বেও বদ্রী এল না দেখে এক ছুটির দিনে বিকেলে নিজেই তার খোঁজে বেরিয়েছে শ্রীনাথ।

তাড়া নেই। বাজারের কাছটায় মাদারির খেল হচ্ছে, তাই দাঁড়িয়ে দেখল খানিক।

আবার রওনা হওয়ার মুখে পিছন থেকে রঘু স্যাকরা ডাকল, কে, শ্রীনাথদা নাকি?

আরে রঘুবাবু, খবর কি?

কোন দিকে চললেন?

যাই একটু ঘুর-টুরে আসি।

খবরটা শুনেছেন নাকি?

কি খবর?

আপনার শালাবাবুর নামে যে শচীন সরকারের ভিটেটা কেনা হয়ে গেল।

সরিতের নামে? কে কিনল?

কোনো খবরই রাখছেন না আজকাল।

শ্রীনাথ বিরক্ত হয়ে বলে, ওসব খবরে আমার ইন্টারেস্ট নেই, রঘুবাবু।

রঘু শ্রীনাথের বিরক্তিটা গায়ে মাখল না। খুব জরুরী গলায় বলল, পুকুর আর বাঁশবন সমেত বিঘে সাতেক জায়গা। টাকাও নেহাত কম লাগেনি। বিঘেতে তিন হাজার, তার ওপর পাকা একতলা বাড়িটার জন্য আরো হাজার আষ্টেক। আপনার শালা কি ব্ল্যাক-ট্যাক করে নাকি?

কে জানে কি করে?

সবাই এ নিয়ে খুব গরম। শচীন সরকারের বউয়ের সঙ্গে বিনোদ কুণ্ডুর ব্যবস্থা হয়েছিল বিঘেতে দুই হাজার আর বাড়ির বাবদ পাঁচ। আপনার শালা চড়া দাম হেঁকে কিনে নিল।

তার আমি কি করব?

বিনোদ সহজে ছাড়বে না। টাকাটা কোত্থেকে এল তার খোঁজ নিচ্ছে। বাগে পেলে জেলে ভরে দেবে। বিনোদের এক ভায়রাভাই সার্কেল অফিসার।

দিক। আমি ওসবের মধ্যে নেই।

তা আমরা জানি।

আপনারা মানে?

এ অঞ্চলের সবাই। আমরা বলি, শ্রীনাথ চাটুজ্জে কখনো কারো পাকা ধানে মই দিতে আসে না।

বলে থেমে গিয়ে রঘু গেলাসের ইঙ্গিত করে বলল, চলবে নাকি? এই কাছেই খালধারে আমার একটা ঠেক আছে।

না। কাজে যাচ্ছি।

আপনার বাবা এলেন শুনেছি। ক'দিন থাকবেন?

তা জানি না। আছেন তো এখন।

বাপমায়ের মতো জিনিস হয় না। গৃহদেবতা। যত্ন-আত্তি করবেন। ওঁদের আশীর্বাদেই সব।

তা বটে।

সোমনাথবাবু বাবাকে মাথায় করে রেখেছিলেন। ঐ হল ছেলের কাজ।

ঠিকই তো।

যাই তা হলে। ডান দিকে এই কাছেই রাম লাখন সিং-এর ঘর। চেনেন তো?

না। আসিনি কখনো।

ভাল জায়গা। সব ব্যবস্থা আছে।

কি ব্যবস্থা?

যা চান। সবই চলে ওখানে। দরকার হলে বলবেন।

রঘু খালধারের ধুলোভরতি রাস্তায় নেমে গেলে অনেকক্ষণ ভাবনাভরতি মাথা নিয়ে আনমনে হাঁটে শ্রীনাথ। বাজার পেরিয়ে রেল-লাইনের ধারে উঠে হাঁটা পথ ধরে। হাঁটতে হাঁটতে একটু হাসে শ্রীনাথ। এরা তৃষাকে চেনে না।

তার মায়া হয়। ভাবে রঘু স্যাকরাকে ডেকে বলে দিয়ে আসে, শুনুন মশাই, তৃষা আপনাদের একদিন এখান থেকে উচ্ছেদ করে ছাড়বে। কোন দিক থেকে ওর মার আসবে তা টেরও পাবেন না।

বদ্রী ঘরে ছিল। ডাকতেই বেরিয়ে এসে খাতির করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

ঘরটা পাকা হলেও ছোটো আর গরম। প[...] দিকে খোলা বলে রোদে তেতে আছে।

বদ্রী একটা হাতপাখা নাড়তে নাড়তে ব[...] ক'দিন খুব ঝামেলায় ছিলাম বলে যেতে পা[...] যাবো-যাবো করছিলাম।

তুই তো গিয়েছিলি শুনলাম।

কোথায়? বদ্রী আকাশ থেকে পড়ে।

তৃষা তোকে ডেকে পাঠিয়েছিল না?

বদ্রী হেসে বলে, ওঃ, সে বহুদিন হল।

কেন ডেকেছিল?

রায়পাড়ার একটা জমি বেচতে চাইছেন।

তৃষা জমি বেচতে চাইছে? শ্রীনাথ খুব অ[...] হয়।

তাই তো বললেন।

মিথ্যে বলিস না, বদ্রী। তৃষাকে আমি জা[...] সে কোনো কালে এক ইঞ্চি জমিও বেচবে না। পা[...] সে গোটা অঞ্চল, গোটা দেশ, মায় গোটা দু[...] কিনে নেবে।

বদ্রী ফাঁপরে পড়ে বলে, আজ্ঞে, আমি যা জ[...] তাই বললাম।

তুই চেপে যাচ্ছিস। তৃষা তোকে অন্য ক[...] ডেকেছিল।

আজ্ঞে না।

আর তারপর থেকেই তুই আমার সঙ্গে দেখ[া] সাক্ষাৎ বন্ধ করেছিস।

বললাম তো, ঝামেলায় ছিলাম খুব। আম[...] সম্বন্ধীর অসুখ গেল। ছোটাছুটি, ডাক্তারবা[...] হাসপাতাল অবধি হয়ে গেল।

তৃষা তোকে কী বলেছে?

আপনার ব্যাপারে কিছু নয়। জমি নিয়ে কথা ছিল।

আমার জন্য যে জমির খোঁজ এনেছিলি তার [...] হল?

যেরকম চাইছেন সেরকম পাচ্ছি না।

বলেছিলি দূরের দিকে পাওয়া যাবে।

শেষতক হয়নি। সব জায়গায় হুড়োহুড়ি কা[...] বর্গা রেজিস্ট্রি হয়ে যাচ্ছে।

ভাল দাম পেলে বর্গা ছাড়া জমিও লোক বেচবে। আমি তো টাকায় পিছোচ্ছি না।

দেখব। কয়েকদিনের মধ্যেই খবর পেয়ে যাবেন

না বদ্রী, খবর পাবো না। খবর তুই দিবিও না

আমার তাতে কি লাভ বলুন। খবর দিয়েই তো দু পয়সা ঘরে তুলি।

তৃষা কি তোকে ঘুষ দিয়েছে?

কি যে বলেন! বদ্রী জিব কাটে।

লুকোস না। তৃষা কি চায় না যে আমি কোথাও জমি কিনি, চাষবাস করি?

কোন স্ত্রীই বা চায় বলুন। কিন্তু কথাটা ত[া] নয়।

তবে কি?

কথাটা হল, আপনি অন্য জায়গায় যেতে চাইছেন কেন? এদিকে তো আপনার জমিজায়গার অভাব নেই।

জমি কি আমার?

বদ্রী চোখ লুকিয়ে বলে, আপনার ছাড়া আর কার? বউঠান তো আর আপনার পর-মানুষ নন।

এসব কথা তোকে শেখাল কে? তৃষা?

না, না। কি যে বলেন।

বদ্রী, আমি জানি তৃষা তোকে হয় ভয় দেখিয়েছে, নয় তো ঘুষ দিয়েছে।

বদ্রীর মুখটা আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছিল। কেমন অসহায়, ফ্যাকাশে, ভয়ে ভরা।

হাতপাখাটা রেখে বদ্রী নীচু স্বরে বলে, দোষ ধরবেন না তো? তা হলে বলি।

বল, বদ্রী। আমি কাউকে কিছু বলব না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার জেনে রাখা দরকার।

বউদিকে আমরা ভয় খাই। উনি চোখ রাঙালে সে কাজ করতে ভরসা হয় না।

তা হলে তৃষা তোকে চোখই রাঙিয়েছে ?

ঠিক চোখ রাঙানো নয়। বরং ডেকে পাঠিয়ে নক মিষ্টি মিষ্টি কথাই বললেন। শেষে জিজ্ঞেস লেন, আমি আপনাকে জমির খোঁজ দিতে পেরেছি না।

তুই কি গাড়লের মতো সব বলে দিলি ?

না বললেও উনি ঠিকই খোঁজ রাখেন। দি'কে ওনার চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রমথবাবুর জমি নতে চেয়েছিলাম সে কথা প্রমথবাবুই বলে সছেন বউদিকে।

তোকে কী বলল তৃষা ?

আমার কাছ থেকে সব কথা বের করে নিয়ে লেন, উনি এখন অন্য জায়গায় জমি-টমি কিনলে ানকার সব দেখাশোনার অসুবিধে হবে।

বাজে কথা। আমি এখানকার কিছুই দেখা-না করি না।

সে আমি জানি। বউদি যা বললেন তাই লাম আপনাকে।

তারপর কি হল ?

উনি বললেন, আর জমি-টমি তোমাকে দেখতে ব না। নিজের কাজ নিয়ে থাকো। জমির যদি মন কোনো খবর পাও তা হলে আমাকে জানিও। ছেপিঠে হলে আমরা কিনব।

শ্রীনাথ একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর বামীর কে চেয়ে বলল, তুই আমার নিজের লোক ছিলি রে, া। তৃষা তোকেও হাত করল।

বামী কাঁচুমাচু হয়ে বলে, আমার দোষ নেই ন, ছা-পোষা মানুষ।

শচীন সরকারের ভিটে কেনা হচ্ছে, সে খবর খিস ?

রাখি। আপনার শালার নামে।

কেন ?

ল্যান্ড সিলিং আছে না? জমি কিনে গেলেই া আর চলবে না। আপনার নামেও বিস্তর জমি না হয়েছে, আপনি কি জানেন ?

না তো। খুব অবাক হয়ে শ্রীনাথ বলে।

হয়েছে।

কিনলেই হল ? আমার সইসাবুদ লাগবে না ?

আপনার ওকালতনামায় অন্য লোক কিনছে।

ওকালতনামা আমি কাউকে দিইনি তো।

তার আমি কি বলব বলুন। যা জানি তাই লছি।

জানিস যদি তবে খোলসা করে বল। আমার কালতনামা অন্যে পায় কি করে ?

পেয়েছে। আমি ভাল করে জানি।

তবে কি বলছিস আমার সইও জাল হচ্ছে াজকাল ?

আমি তাই বললাম নাকি ? হয়তো কোনো ময়ে দিয়েছেন, এখন মনে নেই।

বাজে কথা বলিস না। আমার এখনো ভীমরতি রোন।

বামী জবাব দিল না। আস্তে আস্তে হাতপাখা াড়তে লাগল। খুব আস্তে করে বলল, শুধু আপনি নয়। বৃন্দা, মংলু, এমন কি ক্যাপা নিতাইয়ের নামেও বিস্তর জমি কেনা হয়েছে।

সেই যে সেজোকাকা এসে গেছে তারপর থেকে সজলের প্রায়ই খুব সেজোকাকার কথা মনে পড়ে। সজলের হাত ধরেছিল সেজোকাকা। হাতটা দারুণ শক্ত। ধরলেই বোঝা যায় সেজোকাকার গায়ে খুব জোর। অত চওড়া কবজি আর কারো দেখেনি সে।

ইস্কুলে সে একদিন বন্ধুদের বলল, আমার সেজোকাকা একবার খালি হাতে বাঘ মেরেছিল।

খালি হাতে ? হাঁঃ।

সেজোকাকার গায়ের জোর তো জানিস না। ঘুঁষি মেরে পাথর ফাটিয়ে দেবে।

তোর সেজোকাকা কুংফু জানে ? কারাটে ?

ফুঃ। সেজোকাকা যখন শিলিগুড়িতে ছিল তখন একবার সিনেমা হলে মারপিট লাগে। একা পঞ্চাশজনকে মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল।

গুল ঝাড়িস না।

আচ্ছা, আবার এলে তোদের দেখাবো সেজো-কাকাকে।

কিরকম দেখতে ?

ইয়া লম্বা, অ্যারসা গুন্দু গুন্দু মাসল।

বুকের ছাতি কত ?

ছেচল্লিশ।

আমার দাদারই তো বাহান্ন।

তোর দাদাকে আমি দেখেছি রে, কমল। মোটেই বাহান্ন হবে না।

তবে কত ?

বিয়াল্লিশ হবে বড় জোর।

দাদা কার কাছে ব্যায়াম শেখে জানিস ? বিষ্টু ঘোষের আখড়ায়।

জানি। সেজোকাকা আমাকে কুংফু শিখিয়ে দেবে বলেছে। কারাটেও।'

আমার দাদাও কারাটে জানে।

আমার সেজোকাকার মতো নয়।

তোর সেজোকাকা যে বাঘটা মেরেছিল সেটা কত বড় ?

দশ ফুট। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। দেখিসনি ?

আমাদের বাড়িতে খবরের কাগজ রাখাই হয় না।

বেরিয়েছিল। আসল রয়েল বেঙ্গল।

তোর বাবার গায়ে কিন্তু একদম জোর নেই।

সজল ফুঁসে উঠে বলে, কি করে বুঝলি ?

একদিন দেখি স্টেশনের দিক থেকে আসছে তোর বাবা। চায়ের দোকানে কতকগুলো লোক বসে থাকে না সব সময় ! সেই লোকদের একজন চেঁচিয়ে তোর বাবাকে আওয়াজ দিল, ঐ যে শ্রীচরণনাথ যাচ্ছে দেখ দেখ।

বাবা কি করল ?

তোর বাবা মাইরি সব শুনতে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালও। তখন সেই লোকটা না—হিঃ হিঃ-

সেই লোকটা কি ?

সে যা অসভ্য কাণ্ড না।

বল না।

সেই লোকটা দু হাতের আঙুল দিয়ে তোর বাবাকে খুব অসভ্য একটা জিনিস দেখিয়ে বলল যাও যাও, এইটে করো গে।

লোকটা কে ?

নাম জানি না। খুব মস্তানের মতো দেখতে।

বাবা কিছু বলল না ?

কিছু না। মাথা নীচু করে চলে এল ভেড়ুয়ার মতো।

সজলের গা রি রি করে রাগে। সে বলে, ঠিক আছে, মামাকে বলে দেবো।

তোর মামা কি করবে ?

মামাকে তো চেনো না। কী করবে দেখো।

যাঃ যাঃ, তোর মামাকে জানি। ঐ তো মহাদেবের দোকানে বসে থাকে বিকেলের দিকে। লোকে বলে বেকার।

মালদায় মস্তান ছিল, জানো না তো।

বাড়িতে ফিরে সজলের নানা সময়ে বারবার কথাটা মনে পড়ে। স্টেশনের কাছে একটা লোক তার বাবাকে আওয়াজ দিয়েছিল।

বাবা যে কেন এরকম তা বোঝে না সজল। সে অবশ্য বাবাকে ভয় পায়। ভীষণ ভয় পায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানে, বাবাকে সে ছাড়া আর কেউ ভয় পায় না। পাত্তাও দেয় না কেউ।

বাবার জায়গায় সেজোকাকু হলে নিশ্চয়ই অন্যরকম হত। যেই মস্তানটা আওয়াজ দিত অমনি সেজোকাকু গিয়ে দুই চটকানে লোকটাকে মাটিতে ফেলে মুখ দিয়ে রক্ত বার করে ছেড়ে দিত। বাবা কেন সেজোকাকুর মতো নয় !

দাদু এসে সজলের কথা বলার আর একটা লোক হয়েছে। নইলে মা, দিদিদের বা বাবাকে সে নাগালে পায় না কখনো। দাদুকে পায়।

দাদু !

বলো, ভাই।

তুমি সেজোকাকুর ঠিকানাটা জানো

না। তবে তোমার বাবা বোধ হয় জানে। ঠিকানা দিয়ে কি করবে ?

চিঠি লিখব। কাকু আমাকে একটা এয়ারগান দেবে বলেছিল।

এয়ারগান দিয়ে কি করবে ?

লোককে ভয় দেখাবো। আচ্ছা দাদু, সেজোকাকু কি কুংফু জানে ?

কি ফু বলছিস ? বলে দীননাথ কানের পিছনে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়েন।

হি হি করে হেসে ফেলে সজল। দাদু এসব জানে না।
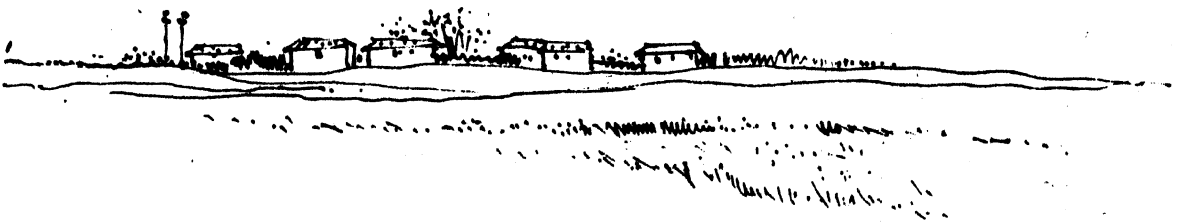
(ক্রমশ)

নেশা   শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বামীর ছত্রছায়ায় যে-মেয়েরা নিত্যনিয়ত থাকে, বাস করে, সুব্রত লক্ষ্য করেছে, তারা ক্রমশ বোকা হয়ে যায়। মেয়েরা স্বভাবতই একটু বোকা, এইরকম একটা মত প্রথম যৌবনে ও চালু করেছিল বান্ধবীদের ক্ষ্যাপাবার জন্যে, কিন্তু পুরোপুরি সে-মত ও নিজে বিশ্বাস করতো না। ওরা তাড়াতাড়ি পূর্ণত হয়ে ওঠে, পুরুষদের ছাপিয়ে যায়। তারপর একটা বয়েস অবধি ওদের আকর্ষণশক্তি এত তীব্র থাকে যে বুদ্ধিসুদ্ধি মাপার প্রশ্ন তোলে না কেউ। হাসলে মধুর, কাঁদলেও মধুর, মিষ্টি করে কথা বললে মন গলে যায়, ঝগড়া করলে সুন্দর দেখায়। সেটা ওদের শিকার ধরার বয়েস।

ল' অফ ডিমিনিশিং ইউটিলিটি কাজ করতে শুরু করে তার পরে। এবং দ্রুত।

এখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে বলে না, আসলে নতুন ফ্ল্যাটবাড়িতে উঠে আসার পর ওর মত বদলেছে। বহুতল বাড়ির কন্দরে কন্দরে এক-একটি পরিবার। ছোট, সুখী অসুখী দুরকমই। বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত; এদের অনেক সমস্যা—যেমন জল, বিদ্যুৎ, ভৃত্য, বাজার, এমন কি ছোটখাটো অসুখবিসুখ—এজমালি ধরনের। অনেক কাছ থেকে দেখা যায় এইসব লোকজন। তিরিশ চল্লিশ বছর আগে বাঙালীদের যৌথ পরিবার ভেঙে ভেঙে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতার, অন্যান্য শহরে। সুব্রতর মনে হয়, তাদের ক্লান্ত বংশধরেরা আবার অন্য একরকম যৌথ পরিবার গড়বার চেষ্টা করছে এইসব বহুতল ফ্ল্যাটবাড়িতে। মধ্যবয়স্ক পুরুষ, মহিলা, অল্পসংখ্যক তরুণ-তরুণী এবং একগাছা ছুতালালিত শিশু—এরা সবাই পোড়-খাওয়া মানুষ। এদের মধ্যে যে-মেয়েরা—য মহিলারা বলাই উচিত—স্বামীর ছত্রছায়ায় থাকে না, অন্যদের তুলনায় তারা বে[শি] সপ্রতিভ, স্মার্ট, আত্মসচেতন।

পুরোনো পাড়ায় গা বাঁচিয়ে এসেছ এতকাল, এবার তুমি ধরা পড়ে যা[বে], মিতা বলেছিল।

—কারুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না, ধরা পড়ার কী আছে।

—গাড়ি থেকে নামার সময় দেখবে, লিফটে ওঠার সময় দেখবে, সিঁড়িতে, গেটের মুখে, কোথাও না কোথাও। চোখ দেখে বুঝবে, গন্ধ নাকে কা[ন] দেবে ওরা।

শিফটিং-এর তোড়জোড় চলছিল। দশ বছরের ছেলে বাবলু, তার বই-[টই] এগিয়ে দিচ্ছিল মাকে। বাকস বোঝাই করছে মিতা। জিনিসপত্র কষতায় বাঁধ[ছে] যাতে সব কিছু এক ট্রিপেই চলে যায়।

বাবলু তখন বলে কী, বাবা, নতুন বাড়িতে গিয়ে তুমি না ড্রিংক করা ছে[ড়ে] দিও। কী দরকার।

সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশি। সুব্রত বিরক্ত হয়।

—চুপ কর। নিজের পয়সায় কিনে খাই। লোকের কী?

—বদ নিন্দে হয়।

উড়িয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু একেবারে সাবধান যে হয়নি তা নয়। এক[সঙ্গে] ফ্ল্যাটের বাড়ি, প্রথম প্রথম অনেকেই আলাপ পরিচয় করতে এসেছে। সংবাদপত্রে সুব্রতর আর্টিকেল বেরোয় মাঝে-মাঝে, সেই সূত্র ধরে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে কে[উ] কেউ। ও ঘেঁষতে দেয়নি কাউকে। তা ছাড়া, পুরোনো পাড়ায় ঘুপচি একতলা বদলে এখানে তিন তলার দক্ষিণ-খোলা বারান্দা। বসে-বসে লোকজন দেখে সম[য়] কেটে যায়। সুব্রত বাইরে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যেবেলা স্নানটান করে, লুঙ্গি পরে, নিজের বারান্দায় বসে নিজের পানীয় নিজে খায়। কোনো ঝামেলা নেই। বন্ধুবান্ধব এলে আড্ডা হয়, না এলে বই-টই পড়ে, পত্র-পত্রিকা। এ-বয়েসে আর ছুটোছুটি ভালো লাগে না। এই সময়ট[া] মিতা ঘুরঘুর করে আশেপাশে।

মাস ছয়েকের মধ্যেই অবশ্য সুব্রত দেখেছে, এই ফ্ল্যাটবাড়ির অনেকেই মদ্যপ। চোখের নিচে থলি, ফোলা-ফোলা মুখ, ভাসা দৃষ্টি দেখে বোঝা যায়। আমি যে স্বভাব। মদ্যপ হলেই লম্পট হবে, স্ত্রীপুত্রপরিবার টিনের বাটি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে—এইরকম একটা ধারণা ছোটবেলায় দেওয়া হয়েছিল, সুব্রত তা ভুল প্রমাণ করেছে। এরাও করেছে। সচ্ছলতার একটা পর্যায়ে অপচয়স্পৃহা জাগে, আয়ত্তের মধ্যে রাখলে খুব একটা ক্ষতি হয় না কারো। কতটুকুই বা জীবন। একদিন ধড়ফড় করতে করতে মরে যাবে। ধনী বিধবা বা অকর্মণ্য পুত্র রেখে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

ছোট ছেলেপুলে যেখানে যাবে, খেলার সঙ্গী জুটিয়ে নেবে, জানা কথা। বাবলুও নিয়েছে। পুরোনো পাড়ায় খেলার জায়গা ছিল পিচের রাস্তা, এখানে নিচের তলার পার্কিং স্পেস। সন্ধ্যার আগে বাবারা ফেরেন না, সুতরাং সারা বিকেল বাচ্চারা এক বিরাট মাঠের মতো জায়গায় খেলতে পারে। গাড়িঘোড়ার ভয় নেই, নিরাপদ। বাবলু এমন মজেছে যে পুরোনো পাড়ার প্রাণাধিক বন্ধু জয় বা সম্রাটকে ওর আর মনে পড়ে না।

অবাক করেছে মিতা নিজে। বিয়ের আগে কলেজে পড়াতো। বাচ্চা হবার সময় চাকরি ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে সংসারের ন্যানজারি নিয়ে বেচারি নাকাল। একতলায় ফ্ল্যাটে একা থেকে থেকে প্রায় নিউরোটিক হয়ে গিয়েছিল। এখানে একটু খোলা আকাশ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে যেন। আর চেয়ে বড়ো কথা, নানান ফ্ল্যাটে ওর এখন অনেক সখী। প্রথম দিকে বলতো মিসেস চৌধুরী, মিসেস রায়, মিসেস নাগ, মিস দত্ত। দু-মাসের মধ্যে ওরা হয়ে গেছে শ্রীলতা, শম্পাদি, বৌদি, মাসিমা। এরা একে অন্যকে সাহায্য করে কাজে-কর্মে। দুপুরের দিকে কোনো এক ফ্ল্যাটে জড়ো হয়ে আড্ডা দেয়। বিশেষ কিছু রান্না হলে এক বাটি হয়তো চাখতে পাঠানো হল। অন্য এক সুস্বাদু ব্যঞ্জনে পূর্ণ হয়ে বাটিটা ফেরত পাঠিয়ে দিন। নিঃসন্তান মাসিমা অনেক ওষুধবিষুধের খবর রাখেন, টোটকা, হোমিওপ্যাথিক। ছেলেমানুষ তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, ঘরকন্নায় মন নেই, মাসিমা বলেন। এরা তাঁর বিচারবুদ্ধির সুযোগ নিতে পারে। পুরোনো আমলের মানুষ।

সন্ধেবেলা থেকে পরের দিন আপিস যাওয়া পর্যন্ত এদের টিকি দেখা যাবে না। মিতার কাছে খবর পায় সুব্রত, উপচে-পড়া কিছু গল্পের ভগ্নাংশ, ঘটে-যাওয়া কোনো ঘটনার সারাংশ বা। রবিবারে এদের হাবভাব দেখলে মনে হয়, এরা পরস্পরের মতো—পরস্পরের সঙ্গে অস্পষ্ট পরিচিত। দেখা হলে চোখাচোখি, মৃদু হাস্যবিনিময়। যে-যার নিজের পরিবারে সাঁটা।

সেদিন সকাল থেকে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল সুব্রতর। ক্লান্তি। আগের দিন একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া মোটা টাকার একটা প্রবন্ধের ফরমাশ আছে। আপিস গেল না।

স্নান করার বেলায় টাইপরাইটার নিয়ে বসেছে। বাবলু স্কুলে। মিতা উসখুস করছে, ছটফট করে ঝাড়ন পেটাচ্ছে ফার্নিচারে, মুখে অনর্গল মৃদু নালিশ। রান্নাঘরে ফুটছে ভেটকি মাছের ঝোল। এর মধ্যেই খটখট শব্দে এগিয়ে চলেছে সুব্রতর চিন্তা কাগজের ওপর। অভ্যেস।

ডিং ডং বেল পড়লো দরোজায়।

—মিতা, মিতাদি, শিগগির এসো, দেখে যাও। এ সুযোগ আর পাবে না। ঢাকা থেকে স্মাগলড। কী পাড়, কী খোল! কালোর ওপর লাল বুটি, দুটোমাত্র আছে, একটা তুমি নিতে পারো।

বাজিকরদের
জীবনধারণের
পন্থা ছিল
বিপজ্জনক!
পাঞ্জাবের থাম্মার বাজিকররা
ছিল পেশাদার ব্যায়ামবিদ।
জীবন ধারনের জন্যে তারা জীবন
আর শরীরকে ক্রমাগত বিপদের মুখে ঠেলে দিত।
আজ দুধ দুইবার সময় বড় জোর তাদের গরুর
সামান্য লাথি খেতে হয়, তার চেয়ে বিপজ্জনক কিছু
করতে হয় না। কারণ, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া দুগ্ধবতী পশু
কেনবার জন্যে এই বাজিকরদের অর্থসাহায্য করেছে।
আজ তারা কো-অপারেটিভ ডেয়ারী ফার্মের
কলোনীর মত পাকা বাড়ীতে বাস করে। ডেয়ারী
ফার্ম-এর আয় থেকে তারা এমন উন্নতি লাভ করেছে—
যা তাদের আজানা ছিল।
অনুন্নতদের জন্যে ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া যে ভাবে...
এ কেবল তার আরেকটি দৃষ্টান্ত।
ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাঙ্কের সাহায্যে
আপনার ভবিষ্যত নিরাপদ করে তুলুন।
ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
সেবায় ও সহৃদয়তায় অদ্বিতীয়
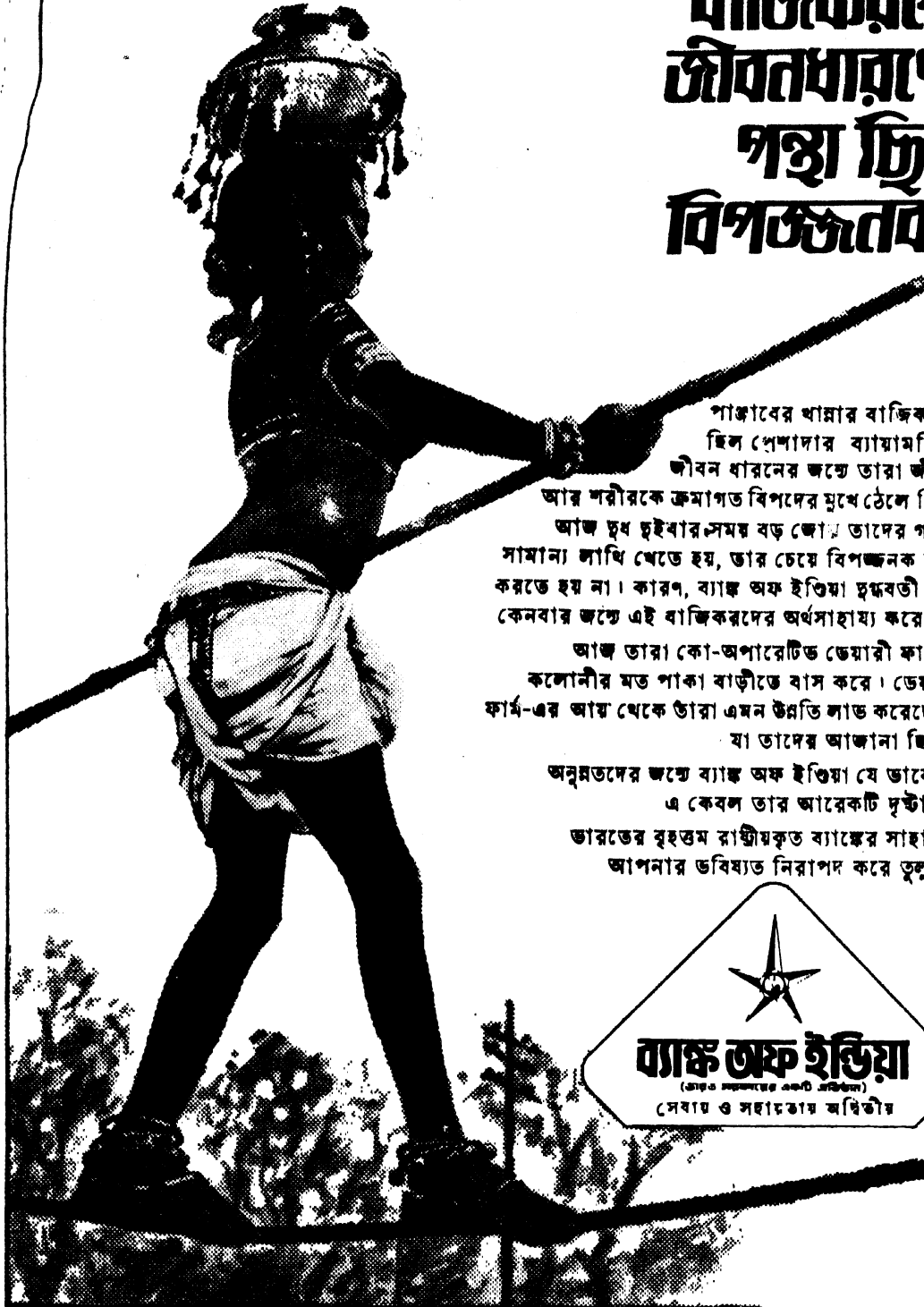
বাইরের ঘরে প্রগলভ দুজন মহিলার কণ্ঠস্বর। মিতার আকস্মিক অস্বস্তি। অনুমান করতে পারছে সুব্রত। নিশ্চিত আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল, আজ আপিসটা কামাই করার ফলে ভেস্তে গেছে। হঠাৎ ভাবে সুব্রত, আচ্ছা, কোন্ জীবনটা মিতার আসল? প্রতিবেশীদের সঙ্গে যে-জীবন, সেটা, না ওর সঙ্গে যে অংশটুকু, সেটা? অন্যটা কি অভিনয়? এত টান যাদের সঙ্গে, কারা তারা? লিফটে যেতে-আসতে এদের দেখেছে কি?

খালি গায়ের ওপর আধময়লা জামাটা চড়িয়ে নেয়। টাইপরাইটার থামিয়ে উঠে-পড়ে সুব্রত। সিগারেট টানতে টানতে বেরিয়ে আসে।

মুখচেনা দুজন মহিলা মিতার সমবয়সী হবে, বিবাহিত। মুখে প্রসাধন নেই। সাদাসিধে শাড়ি পরনে, কোমরে আঁচল গোঁজা। একজনের চোখে চশমা। সোফায় বসে ওর ভাঁজ খুলে খুলে নতুন শাড়ি দেখছে প্রচণ্ড উৎসাহে। মিতাও।

—এত শাড়ি কে দিল? সুব্রত প্রশ্ন করে।

আগন্তুক দুজন চমকে তাকায়। এক মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত।

চশমা-পরা মেয়েটি ফিসফিস করে জিগ্যেস করে, তোমার কর্তা বুঝি আপিস যাননি? বলবে তো!

অপরজন অপেক্ষাকৃত কালো। অপেক্ষাকৃত রোগা। লম্বাটে মুখ, চোখ-দুটি বড়ো-বড়ো। ছোট কপালে ছোট খয়েরী রঙের টিপ। সে-ই কথা বললো, একটা শাড়ি কিনে দিন না বউকে। দোকানে এ-শাড়ি পাবেন না।

—আমার টাকা কোথায়। সুব্রত হাসতে হাসতে বলে।

চশমার পেছন থেকে ফরসা মেয়েটির চোখ কৌতুকে ঝলকে ওঠে, ইস, আপনার টাকা নেই একটা শাড়ি কেনার, তাও শুনতে হবে? বিশ্বাস করতে হবে?

—আসল টাঙ্গাইল, মিতা গম্ভীরস্বরে বললো, তুমি না দাও, আমি নিজের টাকায় কিনবো।

কালো মেয়েটি ছ'তলা বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের মিসেস নাগ। অন্যজন মিসেস চৌধুরী, দশতলা আটত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট। মিতা পরিচয় করিয়ে দিল।

শাড়িগুলো বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ায় দুজন।

মিসেস নাগ বলে, আমরা মাসিমার ফ্ল্যাটে; আসবে তো এসো। ভদ্রলোক বশীকরণ থাকবেন না কিন্তু।

ওরা চলে যাচ্ছিল, খপ করে ধরে ফেললো মিতা। কোলে নিয়ে যে-শাড়িটাকে আদর করছিল একটু আগে সেটা কেড়ে নিল টান দিয়ে। বেরুবার মুখে তিনজন মহিলার ঈষৎ অস্বাভাবিক চঞ্চলতা সিগারেট খেতে খেতে উপভোগ করছিল সুব্রত।

মিতা ফিরে আসে। ওরা লিফটের দিকে এগিয়ে যায়। সবাই এখন মাসিমার ফ্ল্যাটে জমায়েত হবে।

মিতা চেঁচিয়ে ওঠে, এই পাখি, বোলো আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।

শাড়িটা হাতে নিয়ে সটান সুব্রতর সামনে এসে দাঁড়াল। বলো, টাকা দাও।

সুব্রত বলে, পাখি কার নাম?

—ওদের একজনের, বুঝতেই পারছো। দাও শিগগির।

—কত টাকা?

—দুশো তো দাও। তারপর দেখি।

—অত টাকা এখুনি পাবো কোথায়? তুমি সংসার থেকে নিয়ে নাও না।

—কালকেই শোধ করে দেবে।

ঝমঝম করে গোদরেজের আলমারি খোলার শব্দ হয়। ঝমঝম করে আলমারি বন্ধ করার শব্দ হয়। খসখস করে শব্দ হয় মিতার ব্যস্ততায়। নতলায় মাসিমা অর্থাৎ রিটায়ার্ড চিফ ইঞ্জিনীয়ার-এর স্ত্রী মিসেস রায়ের ফ্ল্যাট। ক্লিং ক্লিং, লিফট, লিফট।

সুব্রত ফিরে আসে টাইপরাইটারের কাছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রবন্ধটার খেই ধরে ফেলে আবার। কাজ চলতে থাকে খট খট, খট খট। বাইরে রাস্তার মিনিবাসের চিল-চিৎকার এখন কমে এসেছে। রান্নাঘরে বোধ হয় নিমপাতা ভাজছে কাজের ছেলেটা। মাস তিনেক হলো এসেছে, বেশ চুপচাপ। কতদিন টেকে দেখা যাক। এখন এদের যা চাহিদা, এক ফ্ল্যাটের কাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনো ফ্ল্যাটে পাঁচ-দশ টাকা বেশি দিয়ে ডেকে নেবে।

এত বড়ো অট্টালিকা। কত লোক গেট দিয়ে আসে যায়। কতরকম হাঁটার ভঙ্গি। লিফটে একসঙ্গে ওঠে, নামে। সিঁড়িতে দেখা হয়। বিশেষ করে কাউকে মনে থাকে না। একবার আলাপ পরিচয় হয়ে গেলে অবশ্য অন্য কথা। এই যেমন মিসেস নাগ। যার ডাক নাম পাখি। বারান্দা থেকে দেখা যায়, কালো ছোট একটি মেয়ের হাত ধরে স্কুলে চলেছে। সরু সিঁথি। হাতে টিফিনের বাক্স, জলের বোতল। বিকেলের দিকে সন্ধ্যের পরে প্রায়ই ওকে যেতে-আসতে দেখা যায়। কখনো একা, কখনো সঙ্গে কেউ। মিতার কাছে শোনা: পাখির স্বামী মিস্টার অরুণ নাগ, যার নাম নিচের লেটার বক্সে জ্বলজ্বল করে, কলকাতায় থাকে না। বোম্বাই না দিল্লী কোথায় এক ওষুধ কোম্পানীর রিজিওনাল ম্যানেজার। কলকাতায় বদলির চেষ্টা করছে। ভবানীপুরে ওর বাপের বাড়ি। বাবা না মা কে যেন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় পাখি কলকাতায় চলে আসে। তারপর ফ্ল্যাটটা হঠাৎ পেয়ে গেল কপাল জোরে। ওর দাদা কাজ করে পূর্ত দপ্তরে, সে বললো, পুরো টাকা একসঙ্গে যদি দিতে পারিস, একটা দারুণ ফ্ল্যাট পাইয়ে দিতে পারি। হাজার স্কোয়ার ফুট, একলাখ টাকা। অরুণকে লেখ না। অনেকে লাইন দিয়ে আছে তবে আমি বললে ওরা রাখবে। ফ্ল্যাট পেয়ে পাখি আর ফিরে যায়নি।

পিছনে এইরকম ছোট ছোট ইতিকথা আছে। ছাপোষা মানুষ সবাই, সঞ্চয় সবস্ব দিয়ে একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। কত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কত পরামর্শ আলোচনা, ধার-দেনা করে অর্থসংগ্রহ। সুব্রতর নিজেরই জমি ছিল বোধপুর পার্কে, বেচে দিতে হল। ঠিকেদার লাগিয়ে রোদ্দুরে ছাতা-মাথায় দাঁড়িয়ে দেয়াল তোলা, ছাদ জমানো ওর কর্ম নয়। দিনকাল যা পড়ছে, ছোট-ছোট ইউনিটের মুড় কলকাতায় আর বেশিদিন হাওয়া-বাতাস পাবে না।

অনেকদিন বেরোয়নি, মুখ বদলের জন্যে সুব্রত কনসুলেটের পার্টিতে আসতে রাজি হয়েছিল। আর গোল বাধলো সেইদিনই। বিনা পয়সায় মদ খাওয়াটা বড়ো আকর্ষণ না, সত্যি কথা বলতে কী, বিদেশীদের ককটেলে সোডা থাকে বড়ো বেশি। এক জলা গিললে তবে একটু নেশা হয়। অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, মতামত বিনিময় হয়, সেইটাই আসল। লেখার পয়েন্ট পাওয়া যায়। জানা যায়, হাওয়া কোন্ দিকে বইছে।

লনের আলো-আঁধার আবছায়ায় ছড়ানো জটলা। গুচ্ছে গুচ্ছে মেয়েপুরুষ। ট্রে-হাতে উর্দি-পরা বেয়ারা ঘোরাফেরা করছে। ক্লিং ক্লিং শব্দ হচ্ছে কাচের গ্লাসে।

হঠাৎ ফণী পালের আবির্ভাব। আরে দাদা, আমাদের ভুলেই গেছ একেবারে—পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো।

সুব্রত তাকিয়ে দেখলো, ফণী একটু মোটা হয়েছে। ছোকরাকে একসময় পছন্দ করতো ও। ধারালো ভাষা ছিল কলমে, পরিচ্ছন্ন চিন্তা ছিল মাথায়। এখন গেঁজে গেছে। একটা কেচ্ছাকাগজের সম্পাদনা করে আর কালো টাকায় কেনা মদ খায়।

—কেমন আছো জিগ্যেস করে সুব্রত।

—ফাস্ট্ ক্লাস। কিন্তু তুমি দাদা অফ হয়ে গেলে? শরীর টরীর ভালো তো?

—ভালো। বিশেষ বেরোই না আজকাল।

—সেই ভালো। নিজের মনে থাকো, সেই ভালো। মোটা ফ্রেমের চশমার পেছনে ফণী পালের বড়ো বড়ো চোখদুটো যেন মতলব ভাঁজতে থাকে। ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটরের মতো নানান রকম অঙ্ক ছুটোছুটি করতে দেখা যায়।

—পাজি লোক ভরে গেছে, জানো। ফণী সুব্রতর বাহুতে টোকা দিয়ে বলে, ওই দেখছো, হেঁহে করে হাসছে, ফ্যাটি শ্যুই।

সুব্রত উদ্দিষ্ট লোকটিকে চিনলো না।

—তোমার লিভারের কমপ্লেইন এখন নেই তো? ফণী একটু পরে আবার কথা তোলে।

এই প্রসঙ্গে একটু অস্বস্তি বোধ করে সুব্রত। ও ব্যথা কি কমবার? ওষুধ বিষুধ খেয়ে চাপা দিয়ে রাখা। সুব্রত উত্তর দেয় না।

—আমার কাগজে একটা লেখা দাও না দাদা। দেবে?

—কী লেখা? সুব্রত ফণীর দিকে তাকায়। সময় পাই না ভাই। হাতে এত কাজ জমে গেছে, নিজের লেখা ভাবতে পারি না।

—আমার কাগজ বলে ঘেন্না করছো সুব্রতদা? ফণীর কণ্ঠস্বর গাঢ় শোনায়। —ইচ্ছে হলে অন্য নামে লিখো। টাকা দেবো আমি। কোনোদিন ঠকিয়েছি তোমায় বলো?

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। সুব্রত দু-চার পা এগিয়ে—অন্য একজনের সঙ্গে আলাপ জমায়। ফণীকে বেশিক্ষণ সহ্য করা মুশকিল।

ঘুরতে ঘুরতে, কথা বলতে বলতে লনের ওই প্রান্তে গিয়ে হাজির হয়েছে কখন, টের পায়নি সুব্রত। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কেউ কেউ চেয়ারে বসে পড়েছে, দেখা যায়। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব। সুব্রত একটা খালি চেয়ার খুঁজছিল।

কোথা থেকে ফণী পাল আবার।

—চলো, কেটে পড়ি দাদা।

অনিচ্ছা ছিল না সুব্রতর। তবে, ফণীর সঙ্গে বাইরে কোথাও বসে গেলে ঝুঁকি নেওয়া হবে। গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে ওকে। মনে পড়লো মিতার সাবধানবাণী। এক বাড়ি লোক, বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। সুব্রত নামলো—টলছে। দারোয়ান চাবি নিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল—টলছে। সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করলো—টলছে। লিফটের দিকে এগোলো টলতে টলতে।

এখনো আটটা বাজেনি। দোকান থেকে একটা শিশি কিনে বাড়িতে বসে খাওয়াই ভালো। লোডশেডিং-এর উৎপাত কিছুদিন হল কমেছে।

ফিরে এসে দেখে ফ্ল্যাটে তালা বন্ধ। মিতা ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছে কোথাও। চাকরটাও নেই। সুব্রত দেরিতে ফিরবে, সুতরাং সংগ্রন্থকোলাই ওদের ছুটি।

ফণী বললো, এই বাড়িতে অন্য ফ্ল্যাটে আমার চেনা একজন থাকে। চলো, সেখানেই বসি।

অগত্যা। আবার লিফটে উঠে ওপরের দিকে চললো।

দরোজা খুললো পাখি। কুণ্ঠিতভাবে সুব্রত জানাল, ওর স্ত্রী অন্য দিকে বেরিয়েছে সুতরাং—, খুব অসুবিধে হবে কিনা।

পাখি বললো, আপনি তো কারুর বাড়ি যান না। কতদিন মিতাদিকে বলেছি নিয়ে আসতে। বসুন।

বোকার মতো সুব্রত বললো, এই তো এলাম।

—বসা হোক।

—ফ্ল্যাটটা চিনে গেলাম, এরপর যাতায়াত হয়ে যাবে। মেয়েকে দেখছি না?

—পাশের ফ্ল্যাটে টি-ভি দেখছে।

এতক্ষণ পর যেন চোখে পড়েছে, পাখি ফণীর দিকে তাকিয়ে হাসলো।

উত্তর দেবার আগেই ফণী নিজে কথা বললো।

—ককটেল পার্টিতে দেখা। আমিই তো নিয়ে এলাম। বললাম, চেনা একজন থাকে, কী রকম চেনা তা অবশ্য বলিনি। একটু থেমে ফণী বললো, দুটো গেলাস দেবে?

বলে প্যান্টের পকেট থেকে কন্টেসুন্টে শিশিটা টেনে বার করে।

সুব্রত পাখির চোখে কৌতুক লক্ষ্য করে।

—আর ঠাণ্ডা জল? অ্যাশট্রে? তারপর মিউজিক?

—অপমান করছো? ফণী গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো।

ওরা বেতের সোফায় বসেছিল। স্বাভাবিক, পাখি উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে গ্লাস, ফ্রিজ থেকে জলের বোতল, আড়াল থেকে ছাইদান এনে দেয়।

বলে, চোখ দেখে বুঝেছি বেশ তো খেয়েছ। আর না খেলে হয় না?

—দূর। স্রেফ জল। ব্যাটাদের শিক্ষা দিতে হবে। ভেবেছে কী?

পাখি জিগ্যেস করলো, একটু আলু ভেজে দেবো? না না, ঠাট্টা করছি না চুপ করেছিল, সুব্রত কথা বলে এবার। —দরকার নেই, আপনাকে অকারণ বিব্রত করা। বরং এখানে এসে বসুন। কথা বলি।

পাখি সুব্রতর কাছে এসে বসে। ফণীর সামনাসামনি।

কথায় কথায় ফণী বলল, কীরকম চেনা জানো? এই যে পাখি আমার কী রকম চেনা, বলেছি? বলিনি? তবে শোনো—

—সেই ধানাইপানাই শুরু করবে তো? পাখি বাধা দেয়।

—না, না, ধানাইপানাই কেন? দু-কথায় সেরে দেবো। ফুললো আর মরলো। পাখি খুব ভালো মেয়ে, জানো। ওকে ভালোটালো বাসতাম। অনেকদিন আগে অবশ্য। চাকরি না পেলে তো বিয়ে করা যায় না, তাই বিয়ে হচ্ছিল না চাকরি আমার হলই না কোনোদিন, আর এদিকে চাকরিওলা একজন এসে পাখিকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

ফণী বলতে থাকে, তা বলে কোনোদিন আমি বলবো না, পাখি বিট্রে করেছে খুব ভালো মেয়ে ও। আমি যে মাঝে-মাঝে আসি এখানে, ও আমায় একদিনও তাড়িয়ে দেয় না।

পাখি সুব্রতর দিকে তাকায়। সপ্রতিভভাবে পা মেলে বসে। সুব্রতকে জিগ্যেস করে, শুনলেন তো। এরকম সাংঘাতিক মেয়ে আপনি দেখেছেন

খেতে খেতে মাথার মধ্যে নেশাটা গুন-গুন করে উঠেছে বেশ। স্রেফ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে পাখির মুখের দিকে।

বলে, আপনি ওকে ভালোবাসেন।

—না।

—দেখছি আমি, ভালোবাসেন। আচ্ছা, পছন্দ করেন বলতে দোষ নেই?

—বাজে কথা। কিছুই দেখছেন না। চোখ লাল করে তাকিয়ে আছেন ব্যাপার কী জানেন, অনেকদিন আগে ওর সঙ্গে আমার একটা মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, সেই, সম্পর্কের স্মৃতিকে আমি অসম্মান করতে পারি না। পাখি বললো, ভালো আমি কাউকে বাসি না। বলতে পারলাম না, এই জিনিসের জন্যে।

গ্লাসের দিকে আঙুলে দেখাল পাখি।

একজন বিবাহিতা মহিলার মুখে এরকম মারাত্মক কথা শুনবে সুব্রত ধারণা করতে পারেনি।

—বলেন কি মিসেস নাগ? এই নির্জীব, ব্যক্তিত্বহীন জিনিসটার ওপর এত রাগ। সত্যি বলছেন?

—নির্জীব? হ্যাঁ জিনিসটা সত্যি তাই। আমার আপত্তি হচ্ছে। আসক্তিতে রাগের কথা তুলছেন কেন? রাগ করলে শুনছে কে? এত কথা আমি বলতাম না। বলা উচিত না আমার। ফণী যে তুললো।

এরা কথা বলছে, ফাঁকতালে ফণী পাল ঢালছে আর খাচ্ছে। এখন আর কথা বলছে না। মোটা চশমার পেছনে চোখদুটো পিটপিট করছে ওর।

পাখি বলছে, স্বাভাবিক জীবনে মানুষের সব কিছুই আছে। কষ্ট আছে, গ্লানি আছে, অপমান আছে; কিছুই স্থায়ী নয়, কিছুই খাঁটি নয়—এই ধরনের ব্যর্থতাবোধ আছে। তাই না? ব্যক্তিগতভাবে আমি দেখি তার মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার। তবেই অতিক্রম করা যাবে। নেশা করলে সমস্যাটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়, আমি মনে করি।

এত কথা পাখি বললো। বেশ গুছিয়ে বললো। মিতা কোনোদিন সুব্রতকে বলে নি। মিতার বোধ সম্ভবত এত প্রখর নয়।

শিশির জিনিস খতম হলে পর ঘড়ি দেখলো ফণী। নটা বেজে গেছে। এরপর আর কোনো টাক্সি হাসকপার যাবে না।

উঠে দাঁড়িয়ে ফণী বলে, নেশা করা ছেড়ে দেবো সুব্রতদা। বড়ো ক্ষতি হয়। কোনো মানে হয় না। পাখি, তুমি ঠিকই বলেছ।

মনে হয় ফণী অনুতপ্ত। উৎসাহিত হয়ে পাখি ওর হাত ধরে। সত্যি বলছ?

—সত্যি।

—ছেড়ে দাও। একমাস না খেয়ে দেখ, আর খেতে ইচ্ছে করবে না। নেশা ছাড়া জীবন সুন্দর লাগবে।

জড়ানো গলায় ফণী বলে, তুমি আমায় বিট্রে করেছ, কোনোদিন বলবো না। আমি ছোটলোক বলে কেউ ভালোবাসেনি আমায়। আমি মাতাল, ছোটলোক।

পাখির চোখ ছলছল করে ওঠে। ওর সুন্দর কপালে শ্যামবর্ণ মুখখানি পাখির মতোই একটুখানি তুলে বললো, আমি তোমায় ভালোবাসবো ফণী। তুমি আমার কথা রাখবে?

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কথা কয় না সুব্রত। ফণী দুবার ঢেঁকুর তোলে
র গড়্‌গড়্‌ করে হাসে।
হলে, যতদিন পারা যায় এইভাবে চলুক, কী বলো দাদা।
তিনতলায় নেমে সুব্রত পিছন ফিরলো। আমি আর নামলাম না। যেতে
হ তো।
ফণী পাল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো একবার। বললো, আমার লেখাটার কথা
থাকে যেন। যেমন করবো।
তারপর আবার নামতে থাকে। দুলতে দুলতে নামতে থাকে।
প্রথম দিন লক্ষ করেনি মিতা। দ্বিতীয় দিন লক্ষ করলো, কিছু বললো না।
য় দিন সন্ধ্যেবেলা, আটটা নাগাদ, বাবলুকে বললো, বাবাকে জিগ্যেস
, ঠান্ডা জল লাগবে কিনা।
বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে সুব্রত বই পড়ছিল। ইংরেজী পেপার ব্যাক।
না, লাগবে না।
রাত্রে শোবার সময় জানতে চাইল মিতা, তোমার শরীর খারাপ নাকি?
—না তো।
—কদিন ধরে ড্রিংক করছো না, কী ব্যাপার?
—ছেড়ে দেবো ভাবছি। দেখি না চেষ্টা করে কিছুদিন।
মিতা অবাক হয়। বলে, সে তো খুব ভালো কথা। ভাবছি, এতদিনে আমার
সীরিয়াসলি নিলে।
সুব্রত একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে। মিতা লক্ষ করে, কিছুক্ষণ
স করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো সুব্রত।
ফ্ল্যাটবাড়ির নিচে একটা ক্লাবঘর তৈরী হয়েছে। বিকেলে ছেলেপুলেরা ক্যারম
গ। সন্ধ্যেবেলা বড়োরা তাস খেলে। বাংলা বইয়ের একটা ছোট লাইব্রেরি মতন
তোলার চেষ্টা করছে এরা। সুব্রত সেখানে যেতে শুরু করেছে মাঝে মাঝে।
লাগছে না। এরা সাধারণ সজ্জন মানুষ। সুব্রতকে প্রতিভাবান জ্ঞানে শ্রদ্ধা
ছ।
একদিন সিঁড়ির মুখে দেখা হল পাখির সঙ্গে।
সুব্রত বললো, ভালো?
পাখি বললো, ভালো?
আর কোনো কথা হল না।
আর একদিন ফেরার সময় মনোহরপুকুর রোড ধরে পাখিকে হেঁটে আসতে
লো। পাশে একজন বয়স্কা মহিলা। আস্তে আস্তে হাঁটছেন।
কী মনে হল, গাড়ি থামালো সুব্রত।
—মিসেস নাগ কি বাড়ির দিকে?
হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ওরা।
সুব্রত নেমে দাঁড়ায়। আবার বলে, যদি বাড়ির দিকে যান, একটা লিফট
ত পারি।
ওরা কৃতজ্ঞ হয়ে পিছনের সীটে ওঠে। পাখি ধন্যবাদ দেয়। সঙ্গিনী মাকে
ব্রতর পরিচয় দেয়। তিনতলায় দশ নম্বর ফ্ল্যাট। নামকরা সাংবাদিক।
আর কোনো কথা হল না। সুব্রতর মনে হল, একা থাকলে পাখি পিছনের
টে না বসে ওর পাশে বসতো। ফণী রাসকেলটা আর কোনোদিন এসেছিল
না জিগ্যেস করতো তা হলে।
স্বীকার করা ভালো, সন্ধ্যার দিকে এক-একদিন খেতে খুব ইচ্ছে করে।
ষ্টা পায়। মেজাজ খারাপ হয়। বাড়িতে বোতল রাখছে না আজকাল তাই ইচ্ছে
লও উপায় থাকে না। মনে হয়, কোনো বন্ধুর আস্তানায় একবার ঢুঁ মারলে
পাত্র জুটে যাবে। অসুবিধে কি। ভয় কাকে?
ভয় সুব্রতর নিজেকেই।
এর আগে কখনো চেষ্টা করে দেখেনি। দেখাই যাক না। একমাস পেরিয়ে গেলে
তো একেবারে ছেড়ে দিতে পারবে। এই সুযোগে অসুস্থ লিভারের বিশ্রাম
হচ্ছে।
মিতা একদিন জিগ্যেস করে বসলো, পাখির ফ্ল্যাটে তুমি গিয়েছিলে নাকি?
লা নি তো।
বলবো আবার কি? দরোজা বন্ধ দেখে চলে গেলাম। আমার সঙ্গে ফণী
ল, ফণী পাল। ওকে চেনো। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে এলাম।
—কথাবার্তা? না, উৎপাত করেছ তোমরা? মিতা জেরা করতে থাকে।
থানে বসে ড্রিংক করেছ। একা থাকে বেচারা। দুজন পুরুষ মানুষ গিয়ে
তলামো করলে তাকে উৎপাত করা বলে না তো কী বলে?
—মিসেস নাগ তোমায় রিপোর্ট করেছে এইভাবে? সুব্রত রেগে যায়।
—অত্যন্ত অন্যায়। দেখা হলে আমি কৈফিয়ৎ চাইবো।
মিতার কণ্ঠস্বর থেকে লাবণ্য ঝরে যায় এবার? সূঁচের মতো ফুঁড়ে
কে শব্দ।
আর লজ্জা বাড়িয়ো না। যথেষ্ট হয়েছে। আগেই বলেছিলাম, বুদ্ধিভ্রংশ হয়
খেলে, তা খাওয়া কেন। গায়ে-গায়ে ফ্ল্যাট, এক কথা থেকে এক শো কথা
ড়াবে।
—কী যা-তা বকছো? সুব্রত চেঁচিয়ে ওঠে। —তোমার বান্ধবীর সঙ্গে প্রেম
করার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। ও যদি মনে
করে থাকে—
মিতা লুফে নেয় কথাটা। —ও কেন মনে করবে? ওর তো ভালোই লাগবে। নামকরা লোকেরা ওর ফ্ল্যাটে যাওয়া-আসা করছে, ওর কত গর্ব।
এবার অবাক হয় সুব্রত।
—এ-ভাবে কথা বলছো কেন? তোমার সঙ্গে কি ওর ঝগড়া হয়ে গেছে?
—এখনো হয় নি। দরকার হলে হবে। আমার সংসারের দিকে হাত বাড়ালে, আমি সহ্য করবো না যে যত বন্ধুই হোক।
সুব্রত না হেসে পারলো না। —অনেক দূর ভেবে ফেলেছ!
বিস্ফোরণ, প্রতিদিন হয় না, কিন্তু মন কষাকষি চলতে থাকে। খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে প্রায় একমাস হল, সুব্রত ভেবেছিল, মিতা খুশী হয়ে উঠবে, উৎসাহ দেবে : চেষ্টা করলে মানুষ কী না পারে! তার বদলে ওর না খাওয়া নিয়ে খোঁটা দিচ্ছে! কত দিন পারো দেখি! মাসিমা বলছিলেন, একেবারে ছেড়ে দিলে স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে। মাথা ঘুরবে। অনেক দিনের অভ্যেস, কম-অভ্যেস, কমিয়ে ফেলা উচিত। একেবারে ছেড়ে দেওয়া ঠিক না। তোমার ইনসমনিয়া হচ্ছে, আমি তো দেখছি।
—এই মাসটা থাক। তারপর একটু একটু খাবো। সুব্রত আশ্বস্ত করলো মিতাকে শেষ পর্যন্ত।
কনসুলেটে কাজ করে মিহির বসু। সুব্রত বলে, হামবাগ। মিতা তাকে টেলিফোন করলো একদিন দুপুরবেলা।
—কতদিন আসেন না। কেমন আছেন?
—চলছে একরকম। আপনারা ভালো? সুব্রতদার খবর কী? কিছুদিন আগে আমাদের ককটেল পার্টিতে এক নিমেষের জন্যে দেখা হয়েছিল। হঠাৎ কখন কেটে পড়লেন, জানতে পারিনি।
—ড্রিংক করা ছেড়ে দিয়েছে।
—ছেড়ে দিয়েছে? বলেন কি বউদি, সুব্রতদা—কল্পনা করা যায় না। ডাক্তারের বারণ না কি?
—না, না, নিজেই। কী মনে হয়েছে কে জানে। ভালোই তো।
—সে তো বটেই। ছাড়তে পারলে তো খুবই ভালো। একদিন গিয়ে কংগ্রাচুলেট করে আসবো।
—আসবেন। আর বুঝিয়ে বলবেন, কোনো ব্যাপারেই একগুঁয়েমি ভালো না। খিদে হচ্ছে না, ঘুম হচ্ছে না, সবসময়ে মেজাজ খারাপ। ভয় করে, বড়ো একটা অসুখ বিসুখ না বাধিয়ে বসে। ওর নার্ভ তো দুর্বল।
—আসবো, আসবো। এই শনিবারেই আসবো। বাড়িতে থাকবেন তো।
—থাকবো আমরা। ফোন করেছি, আপনি যেন বলবেন না।
সুব্রত জানতো না কিছুই। নিচের তলায় ক্লাবঘরে বসে দাবা খেলছিল পাঁচ তলার বিশ্বাসের সঙ্গে। কাজের ছেলেটা গিয়ে ডেকে আনলো।
ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখে মিহির বসু। তার বউ আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। বিদেশী পারফিউমের গন্ধে ঘর ভরপুর। ক্যাবিনেটের ওপর একটা জ্বলজ্যান্ত স্কচের বোতল। মিহির বিদেশী সিগারেট খায়।
—ব্যাপার কী?
—একটা ভালো জিনিস পেয়ে গেলাম। ভাবলাম তোমাকে প্রেজেন্ট করি। সমঝদার লোককে খাঁটি জিনিস দিয়ে সুখ।
আর দুদিন পরে এক মাস পূর্ণ হোত। সুব্রত একবার মিতার দিকে কাতর চোখে তাকায়।
মিহির বললো, বেশি না খেলেই হল। একেবারে ছেড়ে দেওয়া মোটে কাজের কথা নয়। ব্রেকডাউন হয়ে যাবে সুব্রতদা।
হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলো সুব্রত।
—মাথা খারাপ। অমৃত বলে কথা! যে একবার এর স্বাদ পেয়েছে, সে কি ছাড়তে পারে। যে কদিন বাঁচি, ফুর্তি করে যাই, কী বলো?
তারপর মিতাকে বললো, ভালো জিনিসের সঙ্গে ভালো খাবার চাই। চীজ আর টম্যাটো দিয়ে অমলেট করে দাও। আর শোনো, ছেলেটাকে বলো, ঠাণ্ডা সোডা নিয়ে আসুক। জল দিয়ে এ জিনিস জমবে না।
খানিক পরে হাসাহাসির শব্দ শুনে বাবলু পড়ার ঘর থেকে বাইরে উঁকি মেরে দেখে, বাবা অনেকদিন পরে আবার মদ খাচ্ছে।
গেটের মুখে পাখির সঙ্গে দেখা।
ওরা একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে লিফটের কাছে আসে। এসে দাঁড়ায়, অপেক্ষা করে। ইনডিকেটরের তীর ওপর দিকে উঠছে।
সুব্রত বললো, এক মাস বলেছিলেন, চেষ্টা করলাম। পারলাম না।
পাখি বললো, শুনেছি।
ওর কালো এবং সুন্দর মুখের ওপর আরো কালো অসুন্দর একটা ছায়া পড়লো যেন।
—মিতা বলেছে বুঝি?
—হ্যাঁ, —আস্তে আস্তে পাখি বললো, —মিতাদি বলছিল, চেষ্টা তো করলে, পারলে?

বিজ্ঞান

লেজার রশ্মি এবং ইলেকট্রনের দুটি অসামান্য ভূমিকা

খবর, সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির ভৌত-গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি লেজার রশ্মির সাহায্যে আইসোটোপ পৃথক করতে সমর্থ হয়েছেন। আইসোটোপের বাংলা পরিভাষা সমস্থানিক পদার্থ। একই মৌলিক পদার্থকে যখন বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়, তখন দেখা যায় তাদের পারমাণবিক ওজনে কখনও কখনও তারতম্য ঘটে, যদিও রাসায়নিক ধর্মের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনও রকম বৈসাদৃশ্য থাকে না। এদেরই বলা হয়, আইসোটোপ। উদাহরণ স্বরূপ, সীসের কথাই ধরুন। ইউরেনিয়াম আকরিকের সান্নিধ্যে সীসে পাওয়া পাওয়া যায়। ওই সীসের পারমাণবিক ওজন ২০৬। আবার থোরিয়ামের সান্নিধ্যেও পাওয়া যায় সীসে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এ ক্ষেত্রে ওই সীসের পারমাণবিক ওজন দাঁড়ায় কখনও কখনও ২০৮। মজার ব্যাপার এই, উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত সীসের রাসায়নিক গুণাগুণ কিন্তু একই রকম, পার্থক্য যা, তা হলো তাদের ওই পারমাণবিক গুরুত্ব। এ ধরনের মৌলিক পদার্থই আইসোটোপ। সীসের আইসোটোপ চারটি। তাদের পারমাণবিক ওজন যথাক্রমে ২০৪; ২০৬, ২০৭, ২০৮।

কোনও কোনও মৌলিক পদার্থের কেবলমাত্র একটি আইসোটোপ আছে। যেমন, সোনা, ট্যানটালাম, বেরিলিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি। কারুর বা আইসোটোপ থাকে দশটি। বলা বাহুল্য, ওই সব আইসোটোপের কেউ কেউ মোটেই তেজস্ক্রিয় নয়। কেউ কেউ আকরিকের মধ্যেই তেজস্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করে। যেমন, ইউরেনিয়াম-২৩৫, রেডিয়াম, প্রভৃতি। আবার এমন অনেক আইসোটোপ আছে, যাদের প্রকৃতিতে বড় একটা পাওয়া যায় না, তাদের তৈরি করতে হয় কৃত্রিম উপায়ে। সাইক্লোট্রন, বিটাট্রন প্রভৃতি পারমাণবিক-ত্বারক যন্ত্রের সাহায্যে। অনেক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পারমাণবিক চুল্লি থেকে এবং পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের দরুনও তৈরি হয়ে থাকে। যেমন ধরুন, নাইট্রোজেন-১৩। এটি একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, তৈরি করতে হয় কৃত্রিম উপায়ে। বোরন-১০ পরমাণুকে একটি আলফা কণা বা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস দিয়ে আঘাত করলে তৈরি হয় একটি নাইট্রোজেন-১৩ পরমাণু। আবার প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন পরমাণু নাইট্রোজেন-১৪কে যদি আলফা কণা দিয়ে আঘাত করা হয় তা হলে আমরা পেয়ে থাকি অক্সিজেন-১৭ নামক এক ধরনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। সোনা-১৯৭কে একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী নিউট্রন কণা আঘাত করলে তৈরি হয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সোনা-১৯৮। আঘাতের কাজটি করা হয় সাইক্লোট্রন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্য।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রয়োগিক ক্ষেত্রে ইদানীং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার দারুণভাবে বেড়ে গেছে। ভূ-স্তরের নীচে জলের গতিবিধি জানার জন্যে হাইড্রোলজিস্টরা ব্যবহার করছেন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। কোথাও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থাকলে যন্ত্রের সাহায্যে তার উপস্থিতি জানা যায়। তার বিকিরণ ধরা পড়ে যন্ত্রে। অতএব জলের উৎসে যদি যৎসামান্য আইসোটোপ মিশিয়ে দেওয়া যায়, সেই আইসোটোপ জলের স্রোতে পরিবাহিত হতে থাকে। স্রোত যে পথে এগিয়ে চলে, আইসোটোপও সেই পথে এগিয়ে যায়, স্রোত যে দূরত্ব অতিক্রম করে আইসোটোপও অতিক্রম করে সেই দূরত্ব। একটি গাইগার কাউন্টার (তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র) নিয়ে সন্ধান করলে যেখানে তেজস্ক্রিয়তার উপস্থিতি ধরা পড়বে, বুঝতে হবে, স্রোত ততদূর এগিয়ে গেছে। এইভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে বিজ্ঞানীরা
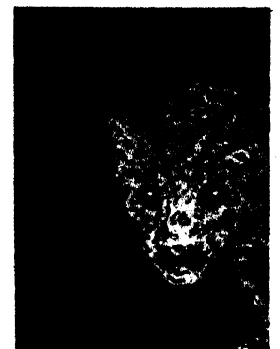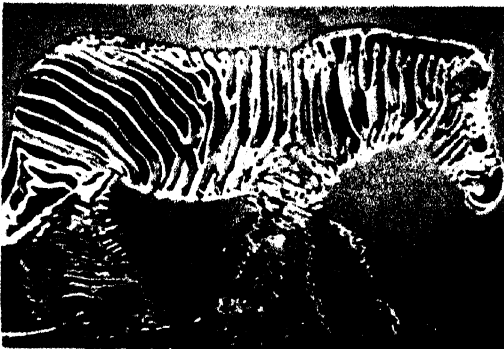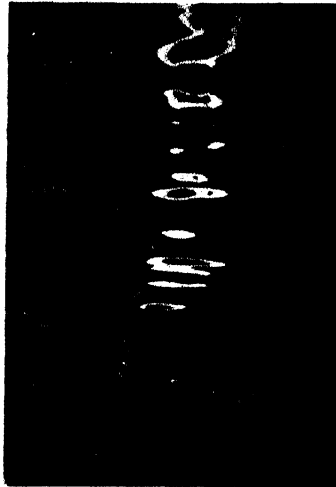
যে পদ্ধতিতে অ্যাপলো-প্রোগ্রামের নভোচরেরা চাঁদের পিঠের ছবি তুলেছিলেন সেই একই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে নিউইয়র্কের একজন শিল্পী, নাম হাওয়ার্ড সোচুরেক উপরের ছবিগুলি তৈরি করেছেন। উপরে বাঁ পাশ থেকে : মেশাচুসেটস শহর এবং মিশিগানহ্রদে নৌবিহার। নিচে বাঁ দিকে থেকে : জেব্রা এবং বাঘের মুখ।

ভূগর্ভস্থ জলের গতিবিধি জানতে পারেন।

শস্য উৎপাদনের জন্যে কাজে লাগানো হচ্ছে নানা রকম অজৈব সার। ওই সব সার গাছপালার শরীরে প্রবেশ করে তাদের শারীরবৃত্তীয় ক্ষেত্রে কোথায় কী ধরনের কাজ করছে সে সব খবর জানার জন্যেও ব্যবহার করা হচ্ছে নানা রকম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, পটাশিয়াম-৪০। বাতাসের গতিবিধি জানার জন্যে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরাও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্য নিয়ে থাকেন। কোনও ওষুধ তৈরি করা হলো। ওষুধ খাওয়ার পর সেই ওষুধ শরীরের ঠিক কোন অঞ্চলে গিয়ে সবচেয়ে বেশী সক্রিয় হয়, সেই ওষুধ রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কতটা সক্রিয় অথবা রোগ নিরাময় করতে গিয়ে পাশাপাশি শরীরের কোনো ক্ষতি করছে কী না, সে সব খবর জানার জন্যেও ইদানীং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, যেমন কার্বন-১৪, আইওডিন-১৩১ প্রভৃতির ব্যবহার প্রচুর বেড়েছে। বিভিন্ন রোগ, বিশেষ করে ক্যানসার রোগ চিকিৎসা এবং নির্ণয়ের জন্যেও ইদানীং ব্যবহার করা হচ্ছে নানা রকম আইসোটোপ।

পারমাণবিক চুল্লির আয়ুষ্কাল জানার জন্যে ইদানীং কাজে লাগানো হচ্ছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ টাইটানিয়াম-৫০।

সমস্যা এই, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের চাহিদা বাড়লেও, তাদের উৎপাদন ব্যয় কমানোর ব্যাপারটা এখনও পর্যন্ত বড় রকমের একটি সমস্যা। কৃত্রিম অথবা প্রাকৃতিক—আইসোটোপের উৎস যাই হোক না কেন, উৎস থেকে আইসোটোপকে পৃথক করা খুবই শক্ত কাজ। সবাই জানেন, লোহা, তামা প্রভৃতি পদার্থ প্রকৃতিতে মুখ্যত পাওয়া যায় আকরিক হিসেবে; সেই আকরিকের অনাকাঙ্ক্ষিত সামগ্রীগুলি তাড়িয়ে আকাঙ্ক্ষিত মৌলিক পদার্থগুলি উদ্ধার করা কতটা ব্যয়সাপেক্ষ। আইসোটোপ পৃথকীকরণ সে তুলনায় আরও বেশী ব্যয়সাপেক্ষ। প্রথমত, এর জন্যে দরকার বিশেষ ধরনের প্রযুক্তিগত উদ্যোগ এবং পদ্ধতি। হয়তো পেলেন এক তাল সীসে। সেই সীসের মধ্যে কোটি ভাগের একভাগ রয়েছে হয়তো আকাঙ্ক্ষিত আইসোটোপ। তাকে শনাক্ত করে পৃথক করা একটা বড় রকমের সমস্যা।

*

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মনে করেন, লেজার রশ্মির সাহায্যে এই সমস্যা অনেকটা দূর করা যাবে।

পরীক্ষাটি চালিয়েছেন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির ভৌত-গবেষণাগারের ইনস্টিটিউট অব অসিলেশন ল্যাবোরেটোরির বিজ্ঞানীরা। ওই বিজ্ঞানীরা ডঃ বি ক্লিনেভস্কির নেতৃত্বে এ নিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

যেমন ধরুন, ইউরোপিয়াম নামক ধাতুটির কথা। এই মৌলিক পদার্থটির আইসোটোপ দুইটি। আইসোটোপ দুটি পরস্পর পৃথক করার জন্যে প্রথমে ওঁরা এক তাল ইউরোপিয়াম নিয়ে তাকে ১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত গরম করে নেন তাপসহ বস্তু দিয়ে তৈরি (রিফ্র্যাকটারি মেটিরিয়ালস) একটি পাত্রে। ওই তাপমাত্রায় ইউরোপিয়ামের পুরো তালটি বাষ্পে পরিণত হয়।

এর পর ইউরোপিয়াম বাষ্পকে নিয়ে আসা হয়

আর একটি কক্ষ। ইউরোপিয়ামের মধ্যে থাকে দুই রকম আইসোটোপ। ইউরোপিয়াম-১৫১ এবং ইউরোপিয়াম-১৫৩। এবার কক্ষটির দুপাশ থেকে কক্ষের মধ্যে সংগৃহীত ওই ইউরোপিয়াম গ্যাসের উপর নিক্ষেপ করা হয় লেজার রশ্মি। উল্লেখ্য, এই রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অবশ্য বিশেষ মাপের। দেখা গেছে, বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লেজার রশ্মি শুধুমাত্র ইউরোপিয়াম-১৫১কে উদ্দীপ্ত করে। এর ফলে অবস্থাটা দাঁড়ায় এই, শুধুমাত্র ইউরোপিয়াম-১৫১ পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন কণা বেরিয়ে যায়, এবং আইসোটোপটি আয়নিত হয়। ধনাত্মক আয়ন। এবার মিশ্রিত গ্যাসকে আনা হয় ঋণাত্মক তড়িৎক্ষেত্রের সান্নিধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ধনাত্মক ইউরোপিয়াম-১৫১ ওই তাড়িৎক্ষেত্রের দিকে ছুটে যায়। এবং এইভাবে ইউরোপিয়াম-১৫৩-এর সমাবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তখন সংগ্রাহক কক্ষে ওই ইউরোপিয়াম-১৫১ জমা পড়ে। ইউরোপিয়াম-১৫৩ এই প্রক্রিয়ায় উদ্দীপ্ত হয় না। এই বস্তুটিকে গ্যাসীয় অবস্থায় অপর একটি কক্ষে সংগ্রহ করা হয়।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের লেজার রশ্মি নির্দিষ্ট আইসোটোপের পরমাণুকেই উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা রাখে। এখন ধরা যাক, খানিকটা ধাতুপিণ্ড নেওয়া গেল। ওই ধাতুপিণ্ডের মধ্যে রয়েছে একাধিক আইসোটোপ। ধরা যাক, ধাতুপিণ্ডের মধ্যে অবস্থিত নির্দিষ্ট কোন আইসোটোপকে পৃথক করতে হবে। সে ক্ষেত্রে প্রথম কাজটি হবে এই: জেনে নিন ঠিক কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেজার রশ্মি ওই বিশেষ আইসোটোপের গ্যাসীয় পরমাণুকে উদ্দীপ্ত করে আয়নিত করতে পারে। এবার মূল ধাতুপিণ্ডটিকে উত্তপ্ত করে গ্যাসে রূপান্তরিত করুন। তারপর ওই গ্যাসের মধ্যে নিক্ষেপ করুন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওই লেজার রশ্মি। তখন আকাঙ্ক্ষিত আইসোটোপটি রূপান্তরিত হবে আয়নে। অবশিষ্ট সামগ্রী আয়নিত হবে না। এবার বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাবে আইসোটোপটি পৃথক করে নিন।

নাম 'রিগো'। প্রায় তিন মাস আগে অস্ত্রোপচার করে এই বাছুরটির দেহে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড বসিয়েছিলেন। পেনসিলভেনিয়ার হারশে মেডিক্যাল সেন্টারের শল্য-চিকিৎসক ডঃ উইলিয়াম পায়ার্স। হৃৎপিণ্ডটি এখনও সচল। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করা গেলে ভবিষ্যতে মানুষের দেহেও কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড বসানো হয়ত সম্ভব হবে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ধারণা, এইভাবে আইসোটোপ পৃথকীকরণের কাজটি সহজতর করা যাবে। এতে খরচও পড়বে কম।

লেজার রশ্মির সাহায্যে আইসোটোপ পৃথক করার মত সম্প্রতি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের কথা জানিয়েছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা।

ব্যাপারটা এই। সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির সাইবেরিয়ায় অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকসের বিজ্ঞানীরা নিলেন দুটি বোতল। বোতল দুটি গমের দানা দিয়ে বোঝাই করা হলো। তারপর তাদের মুখ দুটি পুরোপুরি সিল করে রেখে দেওয়া হলো কয়েক সপ্তাহ ধরে।

বোতল দুটির মুখ খোলার পর বিজ্ঞানীরা অবাক। একটি বোতলের মধ্যে গমের দানা নিশ্চিহ্ন। পরিবর্তে তার মধ্যে পড়ে রয়েছে শুধু গমের খোসা। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, এই কাজটির জন্যে দায়ী এক ধরনের দানা-খেকো পোকা। দ্বিতীয় বোতলের গমের দানা কিন্তু চমৎকার রয়েছে। একটি দানাও নষ্ট হয়নি।

গবেষকরা বলেছেন, দ্বিতীয় বোতলের দানা ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে শোধন করা হয়েছিল বলেই তাদের কিছু হয়নি।

ইনস্টিটিউটের জনৈক গবেষক মন্তব্য করেছেন, শস্য সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহার করা হয় কীটনাশক ওষুধ। তার দাম কত, ভাবুন একবার। অনেক সময় ওই ওষুধে বিষক্রিয়াও দেখা যায়। অথচ, শস্য সংরক্ষণের আগে যদি তাদের ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে শোধন করা হয়, তা হলে কীটরা ওই শস্যের কোন ক্ষতিই করতে পারে না।

সাইবেরিয়ার ওই গবেষণাগার প্রথম পর্যায়ে ৪৩০ টন শস্যদানা ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে শোধন করেন। প্রতি ১০০ টন শোধন করতে সময় লাগে এক ঘণ্টা। এতে খরচ কম। এবং ফলও চমৎকার।

সমরজিৎ কর

ইয়ুথ হস্টেলিং ঃ একটি যুব আন্দোলন

অঞ্জন রায়

"চরন্ বৈ মধ্বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্
পশ্য সূর্যস্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্।
চরৈবেতি চরৈবেতি॥"

(চলাটাই পরম মধু লাভ, চলাটাই স্বাদু ফল।
ঐ দেখো সূর্যের আলোক সম্পদ যা
(যুগ যুগ ধরে) চলতে চলতে
কখনও ক্লান্ত হয় না।
(অতএব) এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।),
—(ঐতরেয়)

ইয়ুথ হস্টেলিং হল এগিয়ে চলার, ছুটির অবকাশে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার আন্দোলন। এটা একটা অভ্যাস। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শ্রমিক-কর্মচারী যিনিই অভ্যস্ত ছুটির অবসরে স্লিপিং ব্যাগ বা কম্বল রুক স্যাক্-এ ভরে রুক স্যাকটি পিঠে তুলে বেরিয়ে পড়বেন। হেঁটে, সাইকেলে চড়ে বা অন্য যে কোন সস্তা উপায়ে দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবেন। দিনশেষে ক্লান্ত পা যখন আর চলতে চাইবে না, তখনকার জন্য, শুধুমাত্র রাত কাটাবার জন্য থাকবে একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয়, ইয়ুথ হস্টেল বা যুব আবাস। টুকটাক কিছু রান্না করুন, খাবার খান, জিনিসপত্র ধুয়ে গুছিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ুন। পরদিন রাত ভোর ভোর রুক স্যাকটা পিঠে তুলে আবার বেরিয়ে পড়ুন—সারা দিনের চলার পথের কত বিস্ময়, কত অভিজ্ঞতা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে!

ইয়ুথ হস্টেলিং-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জগন্নাথ বিশ্বাস চমৎকার লিখেছেন:—

"সকাল থেকে হাঁটছি। সোনালী সবুজ প্রান্তর পেরিয়ে পাহাড়তলীতে এক ঝোরার ধারে বসে দুপুরের খাওয়া সেরেছি। ক্রমাগত চড়াই উৎরাই করতে করতে বিকেল গড়িয়ে এসেছে। ভয়ানক পরিশ্রান্ত। পিঠঝুলিটার ফিতের ভেতর হাত চালিয়ে বুক কাঁধ আল্গা করে একটু দম নিচ্ছি। অসম্ভব ভারী মনে হচ্ছে পিঠঝুলিটা। আর খানিকটা হাঁটলেই আমাদের রাতের আস্তানা একটা কুটির। যুথ হস্টেল। খড় বিচালির তোষক, দু'টো চাদর, একটা কম্বল। ওখানে পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে সাদাসিধে কিছু রান্না। খাওয়া। একটু গল্প-গুজব। ঘুম। পরদিন নতুন উৎসাহে আর তাজা মন নিয়ে আবার যাত্রা শুরু। এই হচ্ছে যুথ হস্টেলিং। এর কোন যুৎসই বাংলা প্রতিশব্দ নেই।"

ইয়ুথ হস্টেলিং আন্দোলনের স্রষ্টা রিচার্ড শারমান-এর জন্ম হয়েছিল ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জারমানীর পূর্ব প্রাশিয়া রাজ্যে। পেশায় শিক্ষক শারমান চাকরি করতেন ওয়েস্টফালিয়া রাজ্যের আলটেনায় এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আলটেনা ছিল বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল রুহ্‌র-এর বাইরে—অপার সৌন্দর্যের অধিকারী পাহাড়-বন ছাওয়া সাউয়ের-ল্যান্ড-এর পাশে। শারমান ছাত্রদের পড়াতেন ক্লাশ-রুম-এর বাইরে। বেশিরভাগ সময়েই পাহাড়বনের পথে চলতে চলতে পড়াশুনো হত। কখনও কখনও টানা সাত-আটদিন হেঁটে বেড়াতেন—চলতে চলতে পেরিয়ে যেতেন দু'-তিনশ' কিলোমিটার পথ।

কিন্তু চলার পথে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল রাত্রি-বাসের। সেবার 'ব্রোল' উপত্যকা দিয়ে চলেছিলেন শারমান, একটা পরিত্যক্ত স্কুল বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর মনে হল এই রকম খালি স্কুল বাড়ি তো বহু পাওয়া যায়! আর স্কুল যদি ছুটি থাকে তবে তো কথাই নেই। দু'টো ঘর পাওয়া গেলেই চলবে, একটা ঘরে থাকবে ছেলেরা আর অন্যটায় থাকবে মেয়েরা।

শারমান লিখেছেন:—

"প্রত্যেকটি শহরে এবং গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ঐ সমস্ত স্কুল-বাড়িগুলো ছুটির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের শোয়ার এবং খাবার ঘরে রূপান্তরিত হবার অপেক্ষায় আছে। দু'টো ক্লাশ-ঘর পাওয়া গেলেই চলবে যার একটায় হবে ছেলেদের আর অন্যটায় হবে মেয়েদের থাকবার ব্যবস্থা। ঘরের বেঞ্চগুলোকে এক কোণে জড় করে গোটা ১৫ বিছানা পাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে (কোন শিক্ষকই একটি দলে ১৫ থেকে ২০-র বেশি ছাত্র-ছাত্রী নেবেন না)। প্রতিটি বিছানা হবে খড়-ভরা তোষক-বালিশ, দু'টো চাদর একখানা কম্বল। ব্যবহারকারী ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের বিছানা সুন্দর করে গুটিয়ে রেখে তবে যাবে আর স্কুলের পাহারাদার চাদরগুলি ভালো করে ধুয়ে রাখবার ব্যবস্থা করবেন। প্রতিটি স্কুলে একজন উৎসাহী শিক্ষক স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে সব দেখাশোনা করবেন। তিনি হস্টেলটি আগাম সংরক্ষণ করবেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন করবেন, হস্টেলের রেজিস্টার এবং সংগৃহীত অর্থের হিসাব রাখবেন।"

'ব্রোল'-এর উপত্যকার সেই পরিত্যক্ত স্কুল-বাড়িটি একটি যুগান্তকারী ধারণার জন্ম দিল। ইয়ুথ হস্টেল বা যুব আবাস। সেই দিনটি ছিল আগস্ট ২৬, ১৯০৯। ১৯০৯ সালেই পৃথিবীর প্রথম

ইয়ুথ হস্টেলিং আন্দোলনের স্রষ্টা রিচার্ড শারমান

ইয়ুথ হস্টেলটির জন্ম হয়েছিল আলটেনায়। শারমান-এর নিজের স্কুল "IN DER NETTE"-এ। পরে এটি উঠে যায় আলটেনার দুর্গে। এটিই বিশ্বের প্রথম স্থায়ী যুব আবাস। 'ক্যাস্‌ল অব আলটেনা' আজও একটি ইয়ুথ হস্টেল।

শারমান আরো একটি কাজ করেন। ১৯১০ সালে হিবল্‌হল্‌ম মানুকের নামক একজন তরুণ শিল্পপতির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় পর পর যুব আবাস প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে জার্মানিতে। পাঁচ বছরের মধ্যে ৮৩টি যুব আবাসের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা হয় জারমান ইয়ুথ হস্টেলস অ্যাসোসিয়েশন-এর। এর সভাপতি হলেন শারমান নিজে আর মানুকের হলেন সাধারণ সম্পাদক। ১৯২৫ সালে সুইশ ইয়ুথ হস্টেল্‌স অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২৭ সালে হল পোলিশ। ১৯২০ দশকের শেষের দিকে ইওরোপের নিম্নলিখিত দেশগুলিতে অ্যাসোসিয়েশন সংগঠিত হল:—ডেনমারক, নেদারল্যান্ডস (হল্যান্ড), স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ওয়েল্‌স এবং ১৯৩০-এ হল ফ্রান্স-এ। দুজন মার্কিনী মোনরো এবং ইসাবেল স্মিথ ইওরোপে বেড়াতে এসেছিলেন ১৯৩৩ সালে। তাঁরা দেশে ফিরে মার্কিন মুলুকের প্রথম যুব আবাসের প্রতিষ্ঠা করেন ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের নর্থ ফিল্ড-এ ১৯৩৪ সালে। হল্যান্ড-এর আমস্টারডাম শহরে বিভিন্ন দেশের ইয়ুথ হস্টেল অ্যাসোসিয়েশনগুলির একটি সভা হয়। জন্ম হয় আন্তর্জাতিক যুব আবাস ফেডারেশন-এর। সেই-দিনটি হল অক্টোবর ২০, ১৯৩২ সাল। আর ইয়ুথ হস্টেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার জন্ম তারিখ জুলাই ১৪, ১৯৪৯। এই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

যুব আবাসের [illegible]

একটি যুব আবাস হল এমন একটি বাড়ি যা কম খরচে কোন যুবক বা যুবতীর রাতের আশ্রয় দেবে—যা অতি সাধারণ, পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যবোচিত হবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যুব আবাস সংস্থাগুলির নিয়মানুযায়ী এই যুব আবাসগুলি পরিচালিত হবে।

নিম্নলিখিত প্রয়োজনগুলি যুব আবাস পরি-কল্পনার সময় অবশ্যই বিবেচিত হবে:—

(১) ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা ডরমিটরি।

(২) সভা ইত্যাদির জন্য একটি কমনরুম।

(৩) একজন ওয়ারডেন কর্তৃক স্থায়ী পরি-দর্শনের ব্যবস্থা।

(৪) আবাসিকবৃন্দ কর্তৃক যাবতীয় গৃহ-স্থালির কাজে অংশগ্রহণ।

(৫) আবাসিকদের খাবার তৈরীর জন্য একটি রান্নাঘর এবং

(৬) মালপত্র, সাইকেল ইত্যাদি রাখবার জন্য একটি ভাঁড়ার ঘর।

যুব আবাসগুলিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়। (১) পথচলতি আবাস (Transit Hostel) এবং (২) ছুটির আবাস (Holiday Hostel) পথচলতি আবাস হল সেইগুলি যেগুলো ভ্রমণের সময় শুধু একবার ব্যবহৃত হয় এবং শুধু শুধুমাত্র রাত কাটাবার জন্য। এর সুযোগসুবিধাগুলি নিম্ন-লিখিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেই চলে:—

(১) দু'টো আলাদা ডরমিটরি।

(২) দু'টো আলাদা কলঘর।

(৩) দু'টো আলাদা পায়খানা (সম্ভব হলে)।

(৪) একটি সাদামাটা কমনরুম, যার সঙ্গে থাকবে খাওয়ার জায়গা।

(৫) আবাসিকদের নিজ খাবার তৈরির ব্যবস্থা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওয়ারডেন কর্তৃক সস্তা খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা।

(৬) ওয়ারডেন-এর বাসগৃহ।

এই ধরনের আবাসগুলিতে গোটা ৫০ শয্যা হলেই চলে। আবার ছুটির আবাসগুলি ভিন্নতর উদ্দেশ্য সাধন করে। কাজেই ছুটির আবাসগুলি নিম্নলিখিত ধরনের হতে পারে:—

(১) গ্রীষ্মকালীন ছুটির আবাস। এই ধরনের আবাসগুলি সমুদ্রসৈকতে বা পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত হতে পারে। এ ধরনের আবাস-গুলিতে নৌ-বিহার, সাঁতার অথবা পর্বতারোহণ বা ট্রেকিং-এর সাজসরঞ্জাম মজুত রাখা যেতে পারে।

(২) শীতকালীন ছুটির আবাস। স্কীয়িং, স্কেটিং ইত্যাদি ক্রীড়া যেখানে হতে পারে সে সব স্থানে এই ধরনের যুব আবাসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে (যেমন মানালী বা গুলমার্গ-এ)। এই ধরনের আবাসে গরম জল সরবরাহ করা, কক্ষের উষ্ণতা বজায় রাখা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

(৩) সাপ্তাহান্তিক যুব আবাস। বড় বড় শহরের কাছাকাছি কোন নির্জন মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে (কলকাতার কাছে ফলতায়, বকখালি বা ক্যানিং-এ মাতলার তীরে) এই ধরনের আবাস তৈরি করা যেতে পারে।

(৪) খুব বড় যুব আবাস। বড় বড় শহরে বড় করে তৈরি যুব আবাস। মফস্বলের এবং বিদেশী যুবকদের মাথা গোঁজবার স্থান হিসাবে এগুলি চমৎকার কাজ করতে পারে।

আলটেনার দুর্গ। পৃথিবীর প্রথম স্থায়ী ইয়ুথ হস্টেল

ছুটির দিনের আবাসগুলিতে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা থাকা চাই:—

(১) ছোট ছোট ডরমিটরি।

(২) জিনিসপত্র বা জামাকাপড় রাখবার জন্য ভাঁড়ার ঘর।

(৩) ভালো জাতের বিছানার সামগ্রী যা বেশি ব্যবহারেও নষ্ট হয়ে যাবে না।

(৪) আলাদা আলাদা শৌচাগার এবং জলের যথেষ্ট ব্যবস্থা (পাহাড় অঞ্চলের আবাসগুলিতে ঝরনার প্রবাহ ঘুরিয়ে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে)।

(৫) দুটোর বেশী কমনা এবং ডাইনিং রুম।

(৬) একটি বড় রান্নাঘর।

(৭) ওয়ারডেন কর্তৃক খাবার তৈরির এবং পরিবেশনের ব্যবস্থা।

(৮) আবাসিক পুরো সময়ের একজন দায়িত্বশীল ওয়ারডেন।

(৯) কয়েকটি ছোট আলাদা ঘর যেখানে দলনেতা, প্রশিক্ষকেরা বা প্রয়োজন হলে কোন অসুস্থ সদস্য থাকতে পারেন।

(১০) এ ছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে, যেমন—সাইকেল স্ট্যাণ্ড, নৌ-বিহারের ব্যবস্থা, স্কী, স্কেটিং এবং পর্বতারোহণের সরঞ্জামাদি, জামা কাপড় শুকোবার জন্য জায়গা, খেলার মাঠ, খেলার সামগ্রী যেমন টেবিল টেনিস বোরড, ক্যারাম বোরড, কিছু সাময়িক পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি।

যুব আবাসের জন্য স্থান নির্বাচন

যুব আবাস তৈরির সময় মনে রাখতে হবে যে পথ চলতি যুব আবাসগুলি যেন একদিনের হাঁটা পথের বেশী দূরত্বে অবস্থিত না হয়। তা না হলে ট্রেকারদের রাত কাটাতে অসুবিধা হবে। একদিনের পথ মোটামুটি এই ধরনের হতে পারে:—

ট্রেকারদের

(১) সমতলে—৩০ কিঃ মিঃ (১৯ মাইল)

(২) পাহাড়ী পথে—১৫-২০ কিঃ মিঃ (৯ থেকে ১৩ মাইল)

সাইকেল চালকদের

(১) সমতলে—৮০ কিঃ মিঃ (৫০ মাইল)

[illegible]

এবং খুব বেশী চড়াই না হয়) ৪০—৫০ কিঃ মিঃ (২৫ থেকে ৩১ মাইল)

অবশ্য উপরিউক্ত দূরত্বটুকু একদিনে অতিক্রম করতে হলে কতকগুলি দিক ভেবে দেখতে হবে:—

(১) পাহাড়ী পথ যদি অতি উচ্চতায় হয় তবে অসুবিধা হতে পারে।

(২) যদি পথ না থাকে অর্থাৎ পথ খুঁজে বার করে তবে এগুতে হবে, তাই যদি হয়, তবে হাঁটা পথের দূরত্বও সংক্ষিপ্ততর হতে পারে।

(৩) সাইকেল চালনার পাহাড়ী রাস্তা যদি বেশী চড়াই-উৎরাই হয় এবং

(৪) পথের মাঝে যদি কোন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যশালী জায়গা পড়ে তবেও উপরিউক্ত দূরত্বের মাঝেও রাত কাটাতে হতে পারে।

যুব আবাসগুলি লোকালয় থেকে দূরে নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয় (শহরের আবাসগুলি ছাড়া)। স্থান নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখা দরকার:—

(১) বিদ্যুৎ সরবরাহ (সম্ভব হলে),

(২) জল সরবরাহ (অতি অবশ্য),

(৩) মলমূত্র আবর্জনাদি পরিষ্কারের ব্যবস্থা,

(৪) আবাস-স্থলে পৌঁছুবার সহজ সুগম পথ। এবং

(৫) প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মনানসই দৃষ্টি নন্দন, রুচি সম্মত আবাসগৃহ।

যুব আবাসগৃহের ধরন

তিন ধরনের যুব আবাসগৃহ হতে পারে:—

(১) অধিগ্রহণ না করেই বর্তমান কোন স্কুল বাড়ি বা কোন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে।

(২) প্রাক্তন স্কুলবাড়ি, প্রাক্তন ফৌজি ব্যারাক, পরিত্যক্ত দুর্গ বা বাসগৃহ অধিগ্রহণ পূর্বক।

(৩) আর, প্রয়োজন এবং পরিবেশ অনুযায়ী রুচিসম্মত আবাসগৃহ নির্মাণ করে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে হাসিমারার কাছে বড়দাবাড়ি যুব আবাসগৃহের কথা। অনেক টাকা খরচ করে একটা পাকাবাড়ি তৈরি করলেই মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বড়দাবাড়ি যুব আবাস-গৃহটি দেখে যে কেউ ওটাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা সেচ দফতরের কার্যালয় বলে ভুল করতে পারেন।

ইয়ুথ হস্টেল ওয়ারডেন

যুব আবাসগুলির সুষ্ঠু পরিচালনায় ওয়ারডেনদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। তরুণ-তরুণীদের বাস্তব এবং মানসিক চাহিদাগুলি মেটাতে তাঁকে সজাগ থাকতে হবে। কোন কোন দেশে অবশ্য মানসিক চাহিদাগুলিকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। বলা যেতে পারে যে যুব আবাসগুলি ইওরোপের 'আলপাইন কুটির'-এর বৃহৎ সংস্করণ এবং একটি 'সীমার' উত্তরণের মাধ্যম। 'সীমাটি' হল যুবক-যুবতীদের অনাবিল প্রাকৃতিক পরিবেশের কাছে পৌঁছে দেওয়া। অন্যদিকে বলা যায়, যুব আবাস একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং তা যুব মানসের সুস্থ শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইয়ুথ হস্টেলিং একটি বিশেষ শিক্ষামূলক জীবনযাত্রা প্রণালী। যা কঠোর শ্রমসাধ্য, নিয়মানুবর্তী, স্বয়ং সম্পূর্ণ—যা ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে শেখায়, ভালোবাসতে শেখায় পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানুষদের। ওয়ারডেন-এর কর্তব্য এবং দায়িত্বও তাই উপরোক্ত দৃষ্টিকোণগুলি থেকেই নির্ধারিত হওয়া উচিত।

ওয়ারডেন-এর কর্তব্য ও দায়িত্ব

(১) আবাসগৃহের দেখাশোনা করা, বিশেষত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সংরক্ষণতা। মাঝে মধ্যে ছোটখাটো মেরামতীর কাজও তিনি তদারকী করবেন।

(২) আবাসের নিয়মাবলী রক্ষা করা এবং করানো তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। বড় বড় বিশেষ করে যে সব আবাসে ছেলে ও মেয়েরা একসঙ্গে থাকবে সেই সব আবাসে নৈতিকতার মান বজায় রাখতে দৃঢ় শৃঙ্খলা রক্ষা করা তাঁর একটি বিরাট কর্তব্য।

(৩) একাধারে কঠোরতা, অন্যদিকে বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা এবং ধৈর্য—এ সকল গুণাবলী ওয়ারডেনের থাকা চাই। আবাসিকেরা যেন 'বাড়ির পরিবেশ' (হোমলি অ্যাটমসফিয়ার) পান সেদিকে তাঁকে সদাসর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৪) ওয়ারডেন-কে স্থানীয় এবং পারিপার্শ্বিক অঞ্চল সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে হবে যাতে আবাসিকেরা চলবার পথনির্দেশ, দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পান।

(৫) আবাসগুলিতে সান্ধ্য-মজলিশের ব্যবস্থা রাখলে আবাসিকেরা উপভোগ করবেন, লোকগীতি এবং লোকনৃত্য, ক্যাম্পের দেশী-বিদেশী গান সকল ইত্যাদি সহযোগে আবাসিকদের সান্ধ্য মজলিশ বেশ জমজমাট হয়ে উঠতে পারে। ওয়ারডেন নিজে যদি কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে জানেন বা সংগীত নৃত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে তো কথাই নেই। এই সকল মজলিশের সময় কক্ষটিকে ফুল ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে একটি সুরুচিময় পরিবেশের সৃষ্টি করা যেতে পারে।

(৬) ওয়ারডেন-এর একটি কার্যালয় থাকবে। তিনি কাগজপত্র গুছিয়ে রাখবেন। টাকা পয়সার হিসাব রাখবেন এবং সেই হিসাব যথাযোগ্য স্থানে (রাজ্য বা জাতীয় কার্যালয়ে) নিয়মিত পাঠাবেন।

(৭) যে সকল আবাসে খাদ্য পরিবেশিত হবে, সে সকল স্থানে খাদ্য দ্রব্যাদি কেনবার এবং তা রান্না করবার দায়িত্বও ওয়ারডেনকে নিতে হবে।

ওয়ারডেনের যোগ্যতা

১৯৫২ সালে ইণ্টারন্যাশনাল ইয়ুথ হস্টেল ফেডারেশনের রোম অধিবেশনে ওয়ারডেনদের আবশ্যিক যোগ্যতার যে তালিকা নির্ধারিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ:—

(১) দয়ালু, মিষ্ট স্বভাব এবং মানবতার প্রতি মমত্বশীল।

(২) স্বাস্থ্যবান এবং কঠোর শ্রমে আগ্রহী।

(৩) সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী এবং আবাসিকদের দিয়ে কাজ আদায় করে নেওয়ায় সক্ষম।

(৪) নিজের এবং পরিবেশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে যত্নবান।

(৫) দেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং তা প্রকাশে সক্ষম।

(৬) রান্না করা, ছোটখাটো মেরামতি কাজ জানা, বাগান করা, ঘর সাজানো ইত্যাদি কাজের সক্ষমতা।

(৭) সুশিক্ষিত এবং আগ্রহের বৈচিত্র্য সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক (গান বাজনা, শিল্প-কলা, লোকশিল্প ইত্যাদি) বিষয়ে অসীম আগ্রহ ও আদর্শবান।

(৮) ইয়ুথ হস্টেলিং বা এ জাতীয় কোন মুক্তাঙ্গন সংস্থা সম্পর্কে ধ্যান ধারণা।

(৯) ওয়ারডেন হিসাবে সমধর্মী কোন সংস্থায় পূর্ব অভিজ্ঞতা।

(১০) আবাসটিকে প্রীতিপ্রদ বাসস্থানে পরিণত করায় সক্ষম।

(১১) বিদেশী ভাষায় জ্ঞান।

ভারতবর্ষে ইয়ুথ হস্টেলিং

ইয়ুথ হস্টেলস অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার ইতিহাস-এর জাতীয় সম্পাদক ৫৫ বছর বয়েসী কানাড়ী 'তরুণ' রামচন্দ্র জি পার্ডাকির অনলস সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৭২ সালে নয়াদিল্লির করোলবাগের কাছে জঙ্গলময় ভোলি ভাটিয়ারী কা মহল'-এর তাঁবুর হস্টেল-এ পার্ডাকির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন চোখে মুখে ছিল প্রত্যয়। ১৯৭৯ সালে নয়াদিল্লির অভিজাত পাড়া চাণক্যপুরীতে আবার যখন দেখা হল—চোখে মুখে ওর তখন অনেক পরিতৃপ্তি। অ্যাসোসিয়েশন-এর নবনির্মিত সুদৃশ্য ইয়ুথ হস্টেল সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। 'ঐ শান্ত-সুন্দর কানাড়ী ভদ্রলোককে ভালো না বেসে পারা যায় না। এমন চমৎকার মানুষ....' বললেন অ্যাসোসিয়েশন-এর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী শ্রীমতী লীলা সেনগুপ্তা। মারাঠী মেয়ে লীলা সুখতানকার শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন। স্মৃতিচারণ করলেন আন্তরিকভাবে। শান্তিনিকেতনের জীবন—'সুখতানকার' 'সেনগুপ্তা' হলেন—বিলেত গেলেন—অবশেষে পার্ডাকিজীর পাল্লায়। তাঁর কাছেই পাওয়া গেল অ্যাসোসিয়েশন-এর কার্যবিবরণী :—

১৪ জুলাই, ১৯৪৯ : মহীশূরে ইয়ুথ হস্টেলস অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার (ই-হ-এ-ই) জন্ম হল। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান মিলল ৫০০ টাকা।

১৯৫১ : ই-হ-এ-ই ইণ্টারন্যাশনাল ইয়ুথ হস্টেল ফেডারেশন-এর সাময়িক সদস্যপদ লাভ করল।

১৯৫২—৫৫ : স্যার জ্যাক ক্যাচপোল ই-হ-এ-ই-র অবৈতনিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে যুক্ত থাকেন।

১৯৫৪ : ই-হ-এ-ই-র সাধারণ সম্পাদক ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ইয়ুথ হস্টেলিং আন্দোলন পর্যবেক্ষণের ভ্রমণ অনুদান পান। সে বছরই স্যার ডোরাবজি টাটা ট্রাস্ট থেকে মিললো ৩০০০ টাকার অনুদান। অর্থ মেলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকেও।

১৯৫৫ : নতুন করে কমিটি গঠিত হল। শ্রীমতী শান্তি কবীর নতুন এড-হক কমিটির সভাপতি হলেন।

১৯৫৬ : সংস্থা রেজিস্ট্রীকৃত হল এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এর প্রধান পৃষ্ঠপোষকের পদ গ্রহণ করলেন।

ন্যাশনাল ইয়ুথ হস্টেল-এর প্রথম জাতীয় সম্মেলন নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল (সেই থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪টি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে)।

ই-হ-এ-ই আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের পুরো সদস্যপদ পায়।

১৯৫৮ : জাপানে অনুষ্ঠিত এশিয় আঞ্চলিক ইয়ুথ হস্টেল সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীমতী শান্তি কবীর।
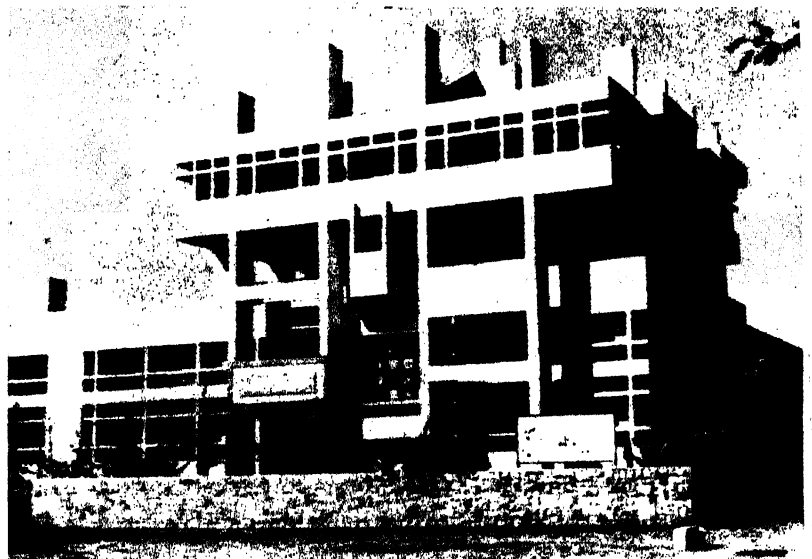
নয়াদিল্লির চাণক্যপুরীতে নব নির্মিত ইয়ুথ হস্টেল

১৯৫৯ : ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ হলেন প্রথম সভাপতি। ভারতে অনুষ্ঠিত হল এশিয় আঞ্চলিক দ্বিতীয় সম্মেলন।

১৯৬০ : সিমলা পাহাড়ের প্রগতিনগরে সংস্থা আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক যুব শিবির অনুষ্ঠিত হল।

১৯৬১ : দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যুব শিবির অনুষ্ঠিত হল ওড়িষার গোপালপুর-অন-সী-তে।

ইয়ুথ হস্টেল সংক্রান্ত প্রথম সেমিনার অনুষ্ঠিত হল নয়াদিল্লিতে।

১৯৬৩ : শ্রীমতী শান্তি কবীর সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

১৯৬৪ : ইংল্যাণ্ড-এর এচ-এল-ন্যাপ্-এর তত্ত্বাবধানে ভারতে প্রথম ইয়ুথ-হস্টেল ওয়ারডেন ট্রেনিং কোর্স শুরু হল।

দিল্লির করোলবাগ-এর কাছে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ 'ভোলি ভাটিয়ারী কা মহল'—অঞ্চলটি সংস্থা ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড হিসাবে ব্যবহার করবার অনুমতি পায়।

সে বছরই কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয় ইয়ুথ হস্টেলিং-এর ওপর তথ্যমূলক চিত্র তোলেন 'ওয়ানডারার্স হানি'।

১৯৬৯ : শ্রীরাম নিওয়াস মির্ধা সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

১৯৭০ : ৪৫০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে প্রথম ন্যাশনাল হিমালয়ান ট্রেকিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হল কুলু-মানালী (সেই থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের বহু অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে)।

ডঃ এন এন ঝার সভাপতিত্বে ন্যাশনাল ইয়ুথ হস্টেল ট্রাস্ট গঠিত হল।

নয়াদিল্লির ইয়ুথ হস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন শ্রী ভি ভি গিরি।

১৯৭২ : বম্বে থেকে গোয়া—প্রথম জাতীয় সাইকেল 'ট্রেল' অনুষ্ঠিত হল।

১৯৭৪ : এশিয় আঞ্চলিক সেক্রেটারীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল দিল্লিতে।

সংস্থার 'ভারত-অভিজ্ঞতা' কর্মসূচীর সূচনা হল—এখন এটি একটি বাৎসরিক কর্মসূচী।

শ্রীপার্ডাকি আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যকরী সমিতির সদস্য মনোনীত হলেন।

'ব্যাক-বক্স' কর্মসূচীর সূচনা হল শ্রীবেন সোয়ান-এর নেতৃত্বে।

১৯৭৫ : সংস্থার সভাপতি এবং সম্পাদক উভয়েই জার্মান সংস্থার সম্মানীয় রিচারড শারমান পদক পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৭৬ : শ্রীপার্ডাকি আন্তর্জাতিক ইয়ুথ হস্টেল ফেডারেশন-এর সহ-সভাপতি মনোনীত হন।

১৯৭৭ : ইয়ুথ হস্টেল ওয়ারডেন-দের একটি ওয়ার্কশপ আয়োজিত হল দিল্লির নব-নির্মিত হস্টেল-এ।

প্রথম আন্তর্জাতিক হিমালয়ান ট্রেকিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হল।

স্যার এডমণ্ড হিলারীকে তাঁর 'সমুদ্র থেকে আকাশ' অভিযানের জন্য অভিনন্দিত করা হয়।

নয়াদিল্লির ইয়ুথ হস্টেল-এর উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি শ্রীনীলাম সঞ্জীবা রেড্ডি।

১৯৭৮ : ভারতের প্রথম এভারেস্ট অভিযানের নেতা ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং ই হ এ ই র ট্রেকিং প্রোগ্রামগুলির অবৈতনিক ফিল্ড ডাইরেকটরের পদ গ্রহণ করেন।

১৯৭৯ : সংস্থার সাউথ জোন কাউন্সিলের উদ্বোধন হল ফেব্রুয়ারিতে।

দিল্লিতে উঠে আসা থেকেই ইয়ুথ হস্টেলিং আন্দোলন ভারতবর্ষে দানা বাঁধতে থাকে। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যুব আবাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের নির্বাচিত বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ১৪টি যুব আবাস কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। সেই স্থানগুলি হল :—মাদ্রাজ, অমৃতসর, নৈনিতাল, ডালহৌসী, পাঁচকুলা, দার্জিলিং, গান্ধীনগর, পুরী সেকেন্দ্রাবাদ, জয়পুর, পানাজী, ভূপাল, পার্টনিটপ এবং ঔরঙ্গাবাদ।

এ ছাড়া ন্যাশনাল ইয়ুথ হস্টেল ট্রাস্ট পরিচালিত একটি সুদৃশ্য যুব আবাস নয়াদিল্লির চাণক্যপুরীতে নির্মিত হয়েছে।

কেন্দ্রশাসিত দিল্লি ছাড়া ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত রাজ্যগুলিতে যুব আবাস আছে :—(১) অন্ধ্রপ্রদেশ, (২) গুজরাট, (৩) হরিয়ানা, (৪) হিমাচল প্রদেশ, (৫) জম্মু ও কাশ্মীর, (৬) কর্ণাটক, (৭) কেরালা, (৮) মধ্যপ্রদেশ, (৯) মহারাষ্ট্র, (১০) উড়িষ্যা, (১১) পাঞ্জাব, (১২) রাজস্থান, (১৩) টামিলনাড়ু, (১৪) ত্রিপুরা, (১৫) উত্তর প্রদেশ, এবং (১৬) পশ্চিম বাংলায়। এই যুব আবাসগুলির কোন কোনটা কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত, আবার কিছু

...র্লের জয়ন্তী। প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গ

...ছে যা রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক নির্মিত এবং ...রিচালিত।

পশ্চিমবঙ্গ ইয়ুথ হস্টেলিং

ইয়ুথ হস্টেলস্ এ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার ...শ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার দফতর হল রুম নং ৪, ...—জেড রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, কলকাতা-০০০২৯। এ ছাড়াও পশ্চিম বাংলার আটটি ...লায় অ্যাসোসিয়েশন-এর জেলা শাখা আছে। সেই ...জেলাগুলি হল—(১) হাওড়া, (২) হুগলী, (৩) ...দীয়া, (৪) ২৪ পরগণা এবং (৫) উত্তর কলকাতা, (৬) দক্ষিণ কলকাতা, (৭) পূর্ব কলকাতা ও (৮) ...ধ্য কলকাতা জেলা।

...যে পশ্চিম বাংলায় ইয়ুথ হস্টেল আছে হাওড়ায় ...র দার্জিলিং-এ (ম্যাল-এর কাছে। কেন্দ্রীয় পর্য-...টন মন্ত্রনালয় কর্তৃক নির্মিত)। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ...রকারের উৎসাহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা ...বিভাগ রাজ্যের কয়েকটি নির্বাচিত স্থানে যুব ...আবাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৫৪ সালে। পরে ১৯৭৩ সালে এই যুব আবাসগুলি রাজ্য যুব কল্যাণ ...বিভাগের আওতায় আসে। এই বিভাগের অধীন ...এখন মোট ১৮টি যুব আবাস আছে। সেগুলি ...ল :— (১) মাইথন (বিহার), (২) মেসাঞ্জোর ...বিহার), (৩) দুর্গাপুর (বাঁধ-এর কাছে, ...বর্ধমান), (৪) বোলপুর (বীরভূম), (৫) মুকুট-মণিপুর (বাঁকুড়া), (৬) কার্শিয়াং, (৭) ডাওহিল ...(৮) দার্জিলিং (নর্থ পয়েন্ট, লেবং রোড), (৯) ...টানিভনজং, (১০) টংলু, (১১) সান্দাকফু, ...(১২) ফালুট, (১৩) রামাম, (১৪) রিমবিক, ...(১৫) বাগোরা, (১৬) ভনজং, (১৭) বক্সাদুয়ার ...(জলপাইগুড়ি) এবং (১৮) বড়দাবাড়ি (হাসি-...মারার কাছে)।

উপরোক্ত যুব আবাসগুলি ছাড়াও কয়েকটি ...প্রস্তাবিত যুব আবাস হল :—(১) লালবাগ (মুর্শিদাবাদ), (২) শুশুনিয়া (বাঁকুড়া), (৩) ...রাজগীর এবং (৪) দীঘা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব আবাসগুলি মূলত ছাত্র ...এবং শিক্ষকদের জন্য। তবে যদি ছাত্রদের তরফ থেকে ...কোন চাহিদা না থাকে তবে ক্লাব এবং অন্যান্য ...সংস্থার প্রতিনিধিদেরও থাকবার অনুমতি দেওয়া ...হয়। পাহাড়-অঞ্চলের আবাসগুলিতে ছাত্র এবং ...শিক্ষকদের প্রতি ২৪ ঘন্টার জন্য মাথা পিছু ২৫ পয়সা এবং সমতলের আবাসগুলিতে ৫০ পয়সা ...দিতে হয়। উভয়ক্ষেত্রে সাধারণের ভাড়া মাথা পিছু ...২ টাকা হিসাবে।

পশ্চিমবাংলার বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে যুব আবাসের অবস্থিতি এই রকম :—

অন্ধ্রপ্রদেশ : ১। মদনপল্লী, ২। ঋষিভ্যালী এবং ৩। সেকেন্দ্রাবাদ।

দিল্লি : ন্যায় মার্গ। চাণক্যপুরী।

গুজরাট : ১। আহ্‌মেদাবাদ (৫টি) ২। গান্ধীনগর।

গোয়া : পানাজী।

হরিয়ানা : ১। আম্‌বালা সিটি, ২। পাঁচকুলা।

হিমাচল প্রদেশ : ১। ডলহৌসী ২। জগজীৎ-নগর ৩। খজিয়ার ৪। মানালী ৫। সুবাতু ৬। তারাদেবী।

জম্মু ও কাশ্মীর : ১। গুলমার্গ ২। জম্মু ৩। শ্রীনগর ৪। পাটনিটপ।

কর্ণাটক : ১। ব্যাঙ্গালোর (২টি), ২। বেলগাঁও ৩। বেল্লারী, ৪। ধর্মশালা, ৫। ধারওয়াড়, ৬। দোড্ডবল্লাপুরা ৭। ম্যাঙ্গালোর ৮। মহীশূর (২টি), ৯। তল কাবেরী এবং ১০। তুমকুর।

কেরালা : ১। মন্নারঘাট, ২। ভেল্লানাড।

মধ্যপ্রদেশ : ১। ভূপাল, ২। রায়পুর।

মহারাষ্ট্র : ১। আহ্‌মেদনগর ২। ঔরাঙ্গাবাদ ৩। বম্বে (২টি), ৪। বুলডানা ৫। জলগাঁও ৬। কোলাপুর ৭। নাগপুর (৩টি), ৮। পুনা ৯। সাংগলী, ১০। শোলাপুর, ১১। ওয়ার্ধা।

উড়িষ্যা : ১। ভদ্রক, ২। ঢেনকানল, ৩। গোপালপুর-অন-সী, ৪। খণ্ডগিরি, ৫। পুরী, ৬। তপ্তপানী (গঞ্জাম)।

পাঞ্জাব : পাটিয়ালা।

রাজস্থান : ১। আজমের, ২। বিকানের (২টি), ৩। জয়পুর, ৪। যোধপুর (২টি), ৫। পিলানী, ৬। উদয়পুর।

তামিলনাড়ু : ১। গান্ধীগ্রাম, ২। লাভডেল, ৩। মাদ্রাজ, এবং ৪। তিরুপতুর।

ত্রিপুরা : ১। মেলাঘর।

উত্তরপ্রদেশ : ১। আলীগড়, ২। কৌসানী, ৩। মথুরা, ৪। মীরাট, ৫। মোরাদাবাদ, ৬। মুসৌরী, ৭। নৈনিতাল, ৮। ফুলচট্টী, ৯। বারানসী।

পশ্চিমবাংলা : ১। হাওড়া, ২। দার্জিলিং (এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্বোল্লিখিত হস্টেলগুলি)।

ভারতবর্ষে ইয়ুথ হস্টেল নিয়ে যে কোন আলোচনায় অন্তত সরকারী উদ্‌যোগ-এর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বাংলার প্রয়াস প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু সারা ভারতে যেমন পশ্চিম বাংলাতেও তেমনি ইয়ুথ হস্টেলিং একটি 'আন্দোলন' হিসাবে দানা বাঁধতে পারেনি।

হস্টেল নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল, কলেজ, অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসহ ইয়ুথ ক্লাবগুলিতেও একটি প্রচার অভিযানের প্রয়োজন ছিল। তা হল 'আউটডোর অ্যাডভেঞ্চার'। দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ার কর্মসূচী। যা কিশোর-কিশোরীদের পরিশ্রমী হতে উৎসাহ দেবে, নিয়ম-শৃংখলা শেখাবে, করবে আত্ম-নির্ভর। তারা জানবে দেশের ইতিহাস আর সংস্কৃতিকে —ভালোবাসবে পরিবেশ, প্রকৃতি আর মানুষদের।

ভারতবর্ষে ইয়ুথ হস্টেল-এর সবচাইতে ভালো নেট-ওয়ার্ক হল পশ্চিমবাংলায়—রানিভনজং থেকে সান্দাকফু —ফালুট হয়ে রিমবিক। কিন্তু বাংলো প্রায় নেই। রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতির কারণে হস্টেলগুলির অবস্থাও শোচনীয়। এগুলির যথাযথ মেরামতি এবং অপেক্ষাকৃত ভালো সংরক্ষণ ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন।

রাজ্য-ইয়ুথ হস্টেলগুলির বেশির ভাগই অশিক্ষিত চৌকিদার কর্তৃক পরিচালিত। ছাত্র-ছাত্রীরা স্বভাবতই শিক্ষামূলক কোন কিছুই জানতে পারে না। যুব আবাস-এর ওয়ার্ডেন-এর যে ভূমিকা তা পালিত হয় না। ফলে আবাসিকেরা প্রয়োজনীয় অনেককিছু থেকে বঞ্চিত হন।

ইয়ুথ হস্টেলস অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল হিমালয়ান ট্রেকিং প্রোগ্রাম চালু করায় উত্তর ভারতের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশ সাড়া জেগেছে। এ বছর কাশ্মীরের কিস্‌তওয়ার ছাড়াও সিকিমের জোরথাং/নামচিতেও ন্যাশনাল ট্রেকিং অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

পশ্চিম বাংলার স্কুলে স্কুলে কর্মশিক্ষা অবশ্যিক হওয়ায় 'নেচার স্টাডি', 'ট্রেকিং', 'ক্যাম্পিং' ইত্যাদি আউটডোর অ্যাডভেঞ্চার-এর সুযোগ এখনো পর্যাপ্ত। তাছাড়াও বর্তমান সরকারী নীতিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণের অনুদান পাওয়া মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলির কাছে আরো সহজ-লভ্য হয়েছে। একটু প্রচার এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা উৎসাহ পেলে কিশোর-কিশোরীরা অ্যাডভেঞ্চার-এর অনাবিল আনন্দের স্বাদ অনায়াসেই পেতে পারে। ডুয়ার্সে যারা থাকেন—দার্জিলিং জেলা ছাড়াও জয়ন্তী-বক্সার পাহাড়ী বনের পরিবেশে তাদের জন্য আছে অনেক সুন্দর সুন্দর ট্রেকিং রুট, রক ক্লাইম্বিং বা নেচার স্টাডির ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। বক্সা থেকে রূপং উপত্যকা, ওদিকে চিন্চুলা বা চুনাভাটি—নেমে আসুন ভুটিয়াগ্রাম লাপচাকা হয়ে সুন্দর পাহাড়ী পথ বেয়ে জয়ন্তী। কত গাছ-গাছড়া পশু-পাখী প্রকৃতিতত্ত্ববিদদের স্বর্গ! আবার জয়ন্তী থেকে চলে যান 'স্ট্যালাগমাইট' বা 'স্ট্যালাগটাইট' দেখতে মহাকাল বাবার গুহা মন্দির। যেতে পারেন পাহাড়ী-চুনা পাথরের পাহাড়। আর ডলোমাইট-খনি তো আছেই।

এদিকে দক্ষিণে আছে শুশুনিয়া, মাঠাবুরু, জয়-চণ্ডীর পাহাড়। পুরুলিয়া থেকে বাসে সিরকাবাদ গিয়ে তারপর 'ট্রেক'-করে অযোধ্যা পাহাড়ে উঠে সেখানে বাংলোয় রাত কাটিয়ে পরদিন পাহাড়ী পথ বেয়ে বাঘমুণ্ডি নেমে আসার ... ট্রেকিং রুট আছে। ওদিকে আছে বকখালী বা দীঘার সমুদ্র সৈকত। ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের মুখোমুখি হওয়ার কত সুযোগ!

পরিশেষে—ইয়ুথ হস্টেলিং-কে জনপ্রিয় করতে এবং সত্যিকারের 'আন্দোলনে' পরিণত করতে—(১) উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে পশ্চিম বাংলায় একটি সরকারী অ্যাড-ভাইসরী কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যাঁরা অভিজ্ঞ এবং দীর্ঘদিন আউটডোর অ্যাডভেঞ্চারে অভ্যস্ত তারা এই কমিটিতে থাকবেন। কমিটি নতুন নতুন ইয়ুথ হস্টেলগুলি তৈরির ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে, রক্ষণা-বেক্ষণ তদারকি করতে পারে এবং প্রচার অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। (২) শিক্ষামূলক ভ্রমণগুলির অনুদান শর্তাধীন হতে পারে যে নিছক প্রমোদ-ভ্রমণ না হয়ে তা যেন প্রকৃতই 'শিক্ষামূলক' হয়। বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক অনুদান-ভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে ইয়ুথ হস্টেল-গুলিকে কাজে লাগায় তা আবশ্যিক করা যেতে পারে। (৩) কর্মশিক্ষায় 'অ্যাডভেঞ্চার' বা 'নেচার স্টাডির' সঠিক সিলেবাস নির্ধারিত করা যেতে পারে। (৪) ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হবেন আগ্রহী এবং উৎসাহী। সেই জন্য তাকে প্রাত্যহিক ক্লাশ-রুটিন থেকে কিছুটা অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। এবং (৫) অশিক্ষিত চৌকিদার-এর বদলে সুশিক্ষিত ওয়ার্ডেন নিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে।

ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গেও ইয়ুথ হস্টেলিং-এর সম্ভাবনা প্রচুর। সে সুযোগ আমাদের কাজে লাগাতেই হবে।

তন্ত্রাভিলাষী প্রমোদকুমার

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

—এই ছবিটা আমায় দেবে গৌরী ?

ছবি মানে আঁকা ছবি নয়। আমার তোলা ফোটোগ্রাফ। যে সময়ের কথা বলছি তখন আমি হরদম ফোটো তুলে বেড়াই। আর বাড়িতে কেউ এলেই ধরে ছবি দেখাই। নেশা। অবশ্য কেউ কেউ ব্যতিক্রমও ছিলেন। আমি প্রস্তাব করার আগেই যিনি আগিদ দিতেন তিনি প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি আসতেন এবং সাগ্রহে আমার তোলা সব ফোটো দেখতেন। এমন অনেক ছবি ছিল যেগুলি নিজের অক্ষমতার পরিচয়। সেগুলি লুকোবার চেষ্টা করেও রেহাই ছিল না। তিনি টেনে নিয়ে নিবিষ্ট মনে দেখবেন এবং তার ভেতর থেকে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে খোঁড়া-কানা সন্তানের মাকে সান্ত্বনা দেবেন, কেন বেশ ত হয়েছে। তুমি কিছু বোঝ না। তাঁর আর একটি বুলি ছিল—'এটা আমায় দাও না।'

—কি হবে ?

—আমি আঁকবো। এই যে কম্পোজিশন এটা সত্যি সুন্দর। কোথায় পেলে এই গাছের গুঁড়িটা ?

এমনি ভাবেই তিনি বয়স ও শিল্প সমঝদারির পার্থক্যটুকু ঘুচিয়ে দিতেন। তিনি চলে যাবার পর খুব বিস্মিত হয়ে ভাবতাম, সত্যিই কি ফোটোকে তিনি উঁচুতে স্থান দিতেন ?

একথা মনে করার কারণ যে কিছুই ছিল না তা নয়। আর একজন বড় শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী ফোটোগ্রাফীকে শিল্পের ক্ষেত্রে অপাংক্তেয় গণ্য করতেন এবং এ নিয়ে একদা অনেক কথা বলে-ছিলেন। অবশ্য আমাদের ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলে একবার টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং দেবীপ্রসাদ অকপটে নিজের মত পরিবর্তন করে-ছিলেন।

প্রমোদকুমার হঠাৎ হাজির হলেন সকালবেলায়। টালিগঞ্জ থেকে টালা-পাইকপাড়া কম দূর নয়। এমন সময়ে এলে স্বভাবতই দুপুরে খেয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ কর্তব্য। কিন্তু সে সুযোগও মিলত না। বাড়িতে পা দিয়েই বলবেন—কই গো বউমা কোথায় ?

সুরূপা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে প্রণাম করতে গেলে বাধা দিতেন, —ও মা। তুমি যে জননী। দ্যাখো বউমা, দুটি মাছঝোল ভাত খাবো।

চোখের সামনে ভাসছে ডান হাতের সবকটি আঙুল এক জায়গায় জড়ো করে তুলি ধরার মত তাঁর বিশেষ ভঙ্গীটি। আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখের তারা, সে তারার গভীরতা প্রতিভাত হ'ত হাল্কা কৌশল স্বাচ্ছন্দ্যে। সরল আত্মপ্রকাশের অনাবিল অকুণ্ঠ প্রতীক যেন। তাঁর যে ছবি তুলেছি তাতে এর কিছু ধরা পড়েছে মনে হয়।

প্রমোদকুমারের পোশাক বলতে মোটা ধুতি আর মোটা শাদা কাপড়ের বিশেষ ধরনের পাঞ্জাবি। কখনো বা তাও নয় বৈরাগীর মত এক বস্ত্র তবে মাথায় টুপি সব সময়েই থাকত।

প্রমোদকুমার আর দেবীপ্রসাদ দুই দিক্‌পাল শিল্পীকেই খুব কাছাকাছি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। মানুষ হিসেবে দুজনেই বিচিত্র কিন্তু দুজনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একজন উদ্দাম তরঙ্গ ভঙ্গে সতত উচ্ছ্বসিত, অপরজন গভীর ধ্যানলোকের প্রশান্ত স্থির সমুদ্র। আমি শিল্পী নই তাঁদের শিল্প সম্পর্কে বলার অধিকারও দাবি করি না। নানা কারণে দেবীপ্রসাদ বর্তমান কালের রসিক সমাজে যতখানি পরিচিত প্রমোদকুমার ততটা নন। কথাটা ঠিক বলা হল না। আসলে প্রমোদকুমারের সাধনা ভারতের সাধারণ জীবনের আর সাধারণ মানুষের লৌকিক ও অলৌকিক ধ্যান ধারণা বিষয়ে অনু-প্রবেশের/অনুসন্ধানের চেষ্টা আর দেবীপ্রসাদ সাধারণ ও অসাধারণ মানুষের বিশেষ বিশেষ দিককে নিজের নির্বাচনী মননশীলতায় জারিত করে' বলিষ্ঠ/বাস্তব প্রকাশে প্রয়াসী। প্রমোদকুমার নিজেকে তন্ত্রাভিলাষী আখ্যা দিয়েছেন অপর জন তান্ত্রিক। একজনের ছিল অজস্র বিনয় অপরজনের অপরিমেয় অহমিকা। তবে শক্তি দুজনেরই অতুলনীয়।

আপাতত ওসব বাদ দিয়ে বর্তমান নিবন্ধে সদ্য-প্রয়াত প্রমোদকুমারকেই আমরা দেখব। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে 'কথা সাহিত্য' পত্রিকা তথা মিত্র ও ঘোষের আড্ডায়। শিল্পীর কৌতূহল সম্পর্কে ধারণার জন্য ওই পত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'নটরাজ মূর্তির উৎপত্তি' সম্বন্ধে প্রবন্ধটির (অগ্রহায়ণ ১৩৫৮) কিছু কিছু অংশ এখানে সন্নিবেশ করা ভাল: সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সকল সভ্য দেশেই, যেখানে ভাস্কর্যকলার সৃষ্টি এবং প্রসার হয়েছে সেইখানেই নটরাজ মূর্তির গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের এক নবীন বন্ধু, ভাস্কর্যকলা বিদ্যার্থী ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। জগৎপ্রসিদ্ধ রোঁদার প্রধান শিষ্য বোরদেলের কাছেই শিক্ষা নেবে এই সংকল্প করে তাঁর কাছে গেলেন। এঁকে ভারতবাসী জানতে পেরে মশিয়ে বললেন—যে দেশে নটরাজ মূর্তির স্রষ্টা জন্মগ্রহণ করে সেখানকার ছেলে তুমি, এখানে এসেছ আমার কাছে ভাস্কর্যকলা শিখতে ? এ ত বড়ই আশ্চর্য কথা।....

এই মূর্তির উৎপত্তিকাল অনির্ণীত, অনেকের ধারণা এর পরিকল্পনা বিশ্বকর্মার। প্রমোদকুমার ত্রিবেন্দ্রামের আমন্ত্রণ সেরে (১১৪৫ সালে) ফিরতি পথে মাদুরাতে সুন্দর শর্মার অতিথি হন। সুন্দর শর্মা চিত্রকর ও ভাস্কর। দুই বন্ধুতে শিল্প নিয়ে আলোচনা খুবই স্বাভাবিক। প্রমোদকুমারের সঙ্গে নিজের আঁকা অনেকগুলি ছবির মধ্যে ছিল একটি নটরাজের মূর্তি (সেকের উপর চিত্রিত) ছবিটি দেখে সুন্দর শর্মা বলেন: এই মূর্তি কোনো শিল্পীর মাথা থেকে বেরোয় নি।

তা হলে ? ও ত আছেই। তার মানে ? আছে ছিল, থাকবে—দেখতে পারলেই হল।

বন্ধুর অকভঙ্গীতে প্রত্যয় ধ্রুব দেখে প্রমোদকুমার সুন্দর শর্মাকে তিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কালী দর্শনের গল্প শোনালেন। একদিন ভোর-বেলায় আগমবাগীশ মশাই বাইরে বেরিয়ে একটি মেয়েকে দুই পা ফাঁক করে দুই হাতে গোবরের তাল নিয়ে এক হাতে দেওয়ালে চাপড় মেরে ঘুঁটে দিতে দেখেন—অসংবৃত মেয়েটি তাকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটে। আগমবাগীশের তৎক্ষণাৎ মনে হল এই তো তাঁর সামনে মা কালী দাঁড়িয়ে। কালীমূর্তির পরি-কল্পনার এটাই উৎস। সেইরকম কোনো দেখার কথা বলছেন নাকি শর্মা ?

সুন্দর শর্মা জবাব দিয়েছিলেন: নটরাজের মূর্তি আবহমানকাল সবাই দেখে না আসুক আমরা চেনে তারা এবং দেশের জ্যোতির্বিদেরা দেখে আসছেন—তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমি আজই তোমায় দেখিয়ে দিতে পারি। আসলে একদল নক্ষত্র সংস্থান থেকেই নটরাজ মূর্তির উৎপত্তি, এটা তোমরা জানো না কিন্তু দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা সবাই জানে।

প্রমোদকুমার বলছেন: আমার আগ্রহের সীমা নেই—রাত দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত সময়ে ঠিক মাথার উপর নটরাজকে দেখে তবে শান্তি। আমাদের 'কালপুরুষ'ই দক্ষিণের ওই নটরাজ মূর্তি।....আমি কালপুরুষ তথা নাটরাজের সংস্থানটি ছকে নিলাম—তারপর বাড়িতে ফিরে এসে কালি দিয়ে ভাল করে যাতে সহজে বোঝা যায় এমন ভাবেই করে নিলাম।.... ওই কালপুরুষ বা নটরাজের মাথা হাত পা ও নীচেকার এক বামনমূর্তির অবনমিত ভাব, তারপর চালচিত্রের মত মণ্ডল আকার (জ্যোতির্মণ্ডল) ঠিক

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
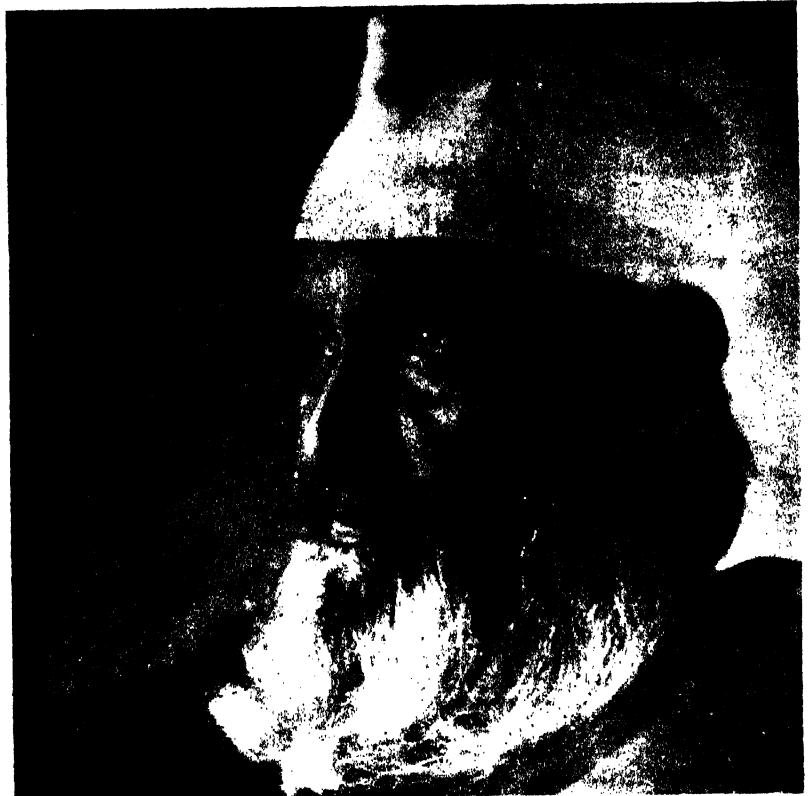
মোদকুমারের আঁকা 'কালপুরুষ' নক্ষত্র সংস্থান থেকে ভাবিত নটরাজ মূর্তি

…ক যেমন আকাশে দেখা যায় তেমনিই নটরাজ মূর্তির ভাস্কর্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

…প্রমোদকুমার যে বড় মাপের একটি মানুষ এটা …র শিশুসুলভ সরল ও সহজ আচরণ থেকে …খনোই প্রকাশ পেত না। সব ব্যাপারেই একটি …তূহলী জিজ্ঞাসু মন ও রসগ্রহণের অনন্যসুলভ …মতা ছিল তাঁর। সম্ভবত সেইজন্যই অতি সাধারণ … সামান্য স্তরের মানুষেরা তাঁকে অল্পজ্ঞানী বলে …ল করে বসত। আমার নিজেরও প্রথমে এই ভুল …য়েছিল এবং তা টের পেয়ে পরে লজ্জিতও হয়েছি। … কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের (বর্তমান …র্ট কলেজ) বিশিষ্ট ছাত্র হিসেবে প্রমোদকুমার …াতি অর্জন করেন এবং বিশ শতকের দ্বিতীয় …কে বরোদা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত …রেন। পরে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার (মসলিপত্তম) …ঠনি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হন। প্রমোদকুমার ষোল-…না সনাতন ভারতীয় পদ্ধতির প্রতি অনুরক্ত …হলেন। তাঁর বিখ্যাত ছবি ঊষা ও বরুণের মূল …র্তমানে ইতালীতে এবং চন্দ্রশেখরের মূল চিত্র-…ানিও বর্তমানে রাশিয়াতে রয়েছে। এ ছাড়া হর-…ার্বতী (অর্ধনারীশ্বর), আম্রপালী, নটরাজ শিব …থেষ্ট সমাদর পেয়েছে। রামকৃষ্ণ ও অরবিন্দের …তিকৃতি তাঁর শেষ বয়সের কাজ।

প্রমোদকুমার নিজের শক্তি ও কৃতিত্বকে কোনো …নই সমুচিত গুরুত্ব দিতেন না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে …াই তিনি যথোচিত মূল্য পান নি। তা ছাড়া …র্থিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তার ওপর …অল্পবয়সে পত্নী বিয়োগের ফলে মুক্তপুরুষ হয়ে …লোটাকম্বল সম্বল করে পথে বেরিয়ে পড়লেন। …ন্ত্রতন্ত্রের রহস্য তাঁকে বরাবরই আকর্ষণ করত, এবার …হমালয়ের অন্তরে কন্দরে সাধুসন্ন্যাসীদের রহস্যময় …ীবন ও আচার-আচরণের পরিচয় পাওয়ার কোন …াধাই রইল না। কত ভৈরবী, অবধূত, মহারাজ, …ামা, ফকীরের সংগ করলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার …স সব বিবরণ তাঁর গ্রন্থরাজিতে লেখা ও রেখায় …রে রেখেছেন। প্রমোদকুমারের পদব্রজে এই ভারত …রিক্রমা সত্যিই বিচিত্র ও বিস্ময়কর। আরও …াকর্ষণীয় তাঁর বলার সাবলীল ধরন: "এখানে …ামি একেবারেই নিঃসংগ ছিলাম না—কাল বৈকাল …ইতেই আমার সঙ্গী ছিল এই শ্মশানভূমির কয়েকটি কুকুর। এই যে আমার বর্তমান আশ্রয়, এই বটবৃক্ষের গোড়ায় ছোট-বড় কতকগুলি শিলাখণ্ড—তাহাতে কোন সময়ে প্রচুর সিন্দুর লিপ্ত ছিল, এখন অতীব অস্পষ্ট ছাপ আছে কোন কোনটার অংশে। বিশাল গাছটির মূল যেখানে অনেকটা স্থান জুড়িয়াই মোটা মোটা শিকড়গুলি শিবের জটার মত একটির সংগে আর একটি জড়াজড়ি করিয়া আছে—তাহাও অনেকটা উঁচু, এক সময় বাঁধানো ছিল, এখন উহা ফাটিয়া চটিয়া ঘাস জন্মাইয়া এক প্রকার সমতল আশ্রয়ের মত হইয়াছে বটে কিন্তু দেখিতে শ্রীহীন হইয়াছে।...." দেড় দিন এমনই একটি জায়গায় কয়েকটি কুকুরের সংগ আর হঠাৎ জুটে যাওয়া শব-দাহ ও শবযাত্রীদের দেখে একটি মানুষ কি করে কাটাতে পারে, কেনই বা কাটায় তার উত্তর ওই ভবঘুরে লেখকের নিশ্চিত • জানা নেই। লেখক নিশ্চিন্ত মনে অনাহারে কাটাচ্ছেন এবং জাগতিক অন্যান্য ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো সংজ্ঞা পর্যন্ত নেই তাঁর চেতনারাজ্যে। জায়গাটা ভালো লেগেছে, এখন এখানেই অবস্থান করা স্থির। এমনভাবে হয়ত সারা রাত কেটে যেত। হঠাৎ একটি মানুষের আবির্ভাব ঘটল। চাঁদের আলোয় এক রমণী মূর্তি উপস্থিত। মাথায় চূড়ো করে চুল বাঁধা। তাঁকে দেখে মনে হল 'হিমালয়ের পার্বতী'। "এই দেবী মূর্তির আবির্ভাবে স্থানটি যেন মধুময় হইয়া উঠিল। ভৈরবী তো আমি ইতিপূর্বে অনেকই দেখিয়াছি কিন্তু এমন অদ্ভুত রূপহীন আকর্ষণের বস্তু ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখি নাই।" তারপর ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণের লড়াই। ভৈরবীর সংগে পরিচয় এবং ক্রমে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক জগতের বিস্ময়কর উদ্ঘাটন।

এমনি ভাবেই পায়ে হেঁটে তিনি আসমুদ্র হিমাচল পর্যটন করেছেন এবং যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁর সাহিত্যে তা পরিবেশন করেছেন। বহু পর্যটন ও ভূয়োদর্শনে সুসমৃদ্ধ জ্ঞান নিয়ে আবার এই সংসারেই ফিরে এসেছিলেন।

বার বার ফিরেছেন আর বাইরে দূরের আকর্ষণে বেরিয়ে গেছেন। এ এক বিচিত্র মানুষ। যখনই মনে হয়েছে বাঁধা পড়ে যাচ্ছেন জগৎটিকে ভুলে কেবল ক্ষুদ্র স্বার্থ ঘেরা জীবন তাঁকে বন্দী করছে—ভূমা/অধ্যাত্মলোক থেকে বিচ্ছিন্ন করছে তখনই তিনি চরণৈবে মধু বিন্দতি বলে পা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ (দুই খণ্ডে) প্রাণ-

প্রমোদকুমারের আঁকা টিপিক্যাল পর্যটক

হর-পার্বতী শিল্পী—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

কুমার, হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর, হিমালয়ের পথে পথে, যমুনোত্রী হতে গংগোত্রী ও গোমুখ, হিমালয়ের মহাতীর্থে, অতীত স্বপন ইতিহাসাশ্রিত, মুক্তপুরুষ প্রসংগ। যদিও তাঁর বেশির ভাগ লেখাই অভিজ্ঞতা সঞ্জাত তবু বিশেষ করে 'প্রাণকুমার'কে আত্মজীবনীমূলক বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রাণকুমারের কিয়দংশ কথাসাহিত্যে তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ তৃতীয় খণ্ড হিসেবে গ্রন্থস্থ হয়েছিল। এইসব রচনা তাঁর আঁকা চিত্র-বিচিত্রিত।

এখানে একটা কথা বোধ হয় প্রসংগবহির্ভূত হবে না। তিনি 'হরি যাকে রাখেন' নামে একটি উপন্যাস-ধর্মী বইয়ের 'কপিরাইট' মিত্রালয়কে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করেছিলেন, সম্প্রতি সেটি অন্য এক প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হ… দেখে খুব বিস্মিত হয়েছি। তবে তাঁকে খুব ভালোভাবে জানি তাই অন্য ক্ষেত্রে যা করা বা ভাবা স্বাভাবিক ছিল আমি সেটা পরিহার করেছি। এই মানুষটি ভাবের জগতে বাস করতেন সংসারের আইনকানুনের জটিলতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাই হয় তো ছিল না।

পর্যটন-পরিক্রমা সমাপনান্তে প্রমোদকুমার দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং টালিগঞ্জে রূপবাণী সিনেমার কাছে বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন। দ্বিতীয়বারের দাম্পত্যজীবনও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ১৯৫৮ সালে পণ্ডীচেরী আশ্রমে চলে যান, সেখান থেকে ১৯৭৫ সালে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বৎসর (১৮৮৫ সালে কলকাতাতেই জন্ম)। ১৯৭৯ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তিন কন্যাকে রেখে প্রমোদকুমার দেহরক্ষা করেন। পশ্চিমবঙ্গ নৃত্যনাট্য সংগীত ও কলা আকাদমী তাঁর শিল্পকৃতীকে সম্মানিত করে-ছিলেন। তবে দীর্ঘকাল সরকারী/বেসরকারী মহলের তো বটেই এমন কি কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাংগণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার ফলে এই সাধক পুরুষটির কথা অনেকেই ভুলে গিয়েছেন। আধুনিক কালের শিল্পকলা পেশায় উঠতি তরুণেরা তাঁর নাম শুনে থাকলেও কীর্তির সংগে পরিচিত নন এমন নজীরও পেয়েছি। আর কিছু না হোক প্রমোদকুমারের লেখা বইগুলি উল্টে পাল্টে দেখলেও তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলবে। আমাকে ওইরকম স্কেচও কিছু উপহার দিয়েছিলেন তারই একখানি নমুনাস্বরূপ দেওয়া গেল।
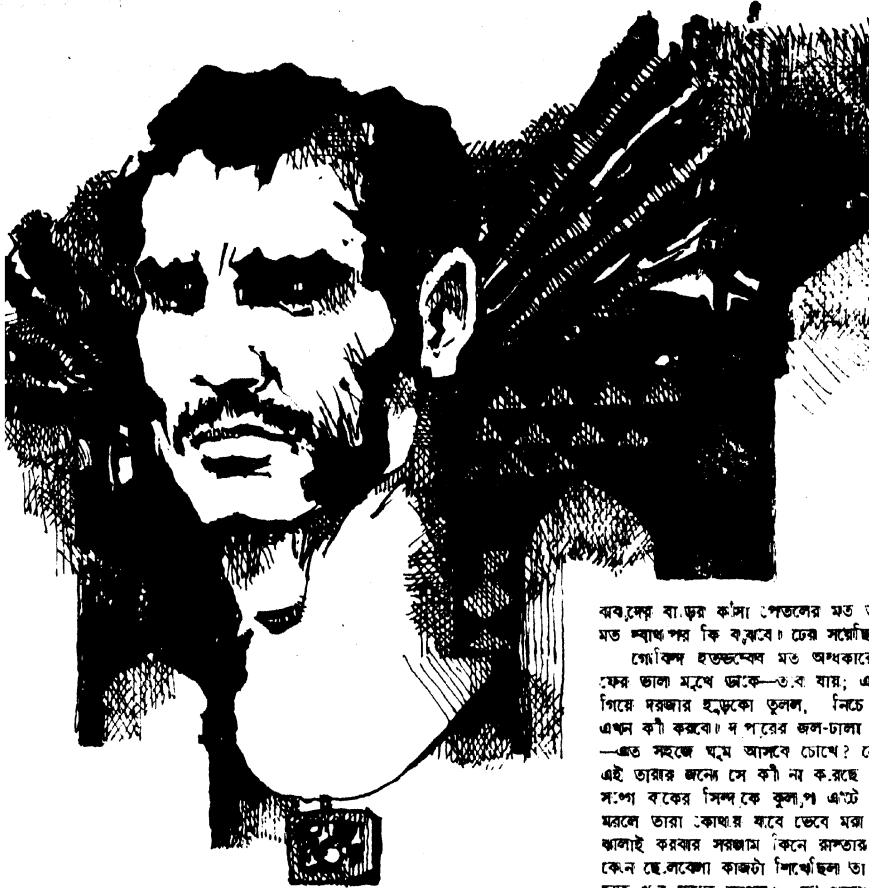
টেরাকোটা

সমীরণ দাশগুপ্ত

উঠোনে পা দিতে ওপরের ঝুলবারান্দা থেকে ছিটকে আসা ভাঙা কাঁসির মত খ্যানখেনে গলা শুনতে পায় গোবিন্দ। 'সারাদিন যে চুলোয় ছিলে সেখানে বুঝি জায়গা হল নি? গেলবার কত্তা খ্যাল হয়েছে আর অমনি বাড়ির কত্তাও মনে হয়েছে। মরে না তো অমন পুরুষ মানুষেরা—'

মাথার ওপরে রাজবাড়ির সিং-দরজার শত থাম-ঠেকান ইটের ভাঙাচোরা খিলেন। চ্যাপটা ছোট ইট—এরকমটা এখন আর দেখা যায় না। নোনা ধরে নড়বড়ে হয়ে গেছে, তাই বাঁশের ঠেকনো দিয়ে খাড়া করা। বাঁশ গলিয়ে সাবধানে ঢুকতে হয়। গোবিন্দ ভেবেছিল চুপ চুপি ভেতরে ঢুকে মেজাজ আঁচ করে তবে দোতলায় যাবে। তারা যে অন্ধকারে দু' সলা টর্চ বাতির মত চোখ জেলে দরজার দিকে চেয়ে আছে—কে জানত।

ল্যাম্প পোস্টের বাতি ঠিক দরজার মুখে। তারা নিশ্চয় পা টিপে ঢোকা দেখেই ধরতে পারে, এ আর কেউ নয়। এমন চোরের মত মাথা হেঁট করে এ বাড়ির কোন ভাড়াটে নিজের ঘরে ঢোকে না—গোবিন্দ ছাড়া।

রাস্তার আলোয় অশথের কালচে চারা সমেত সিং-দরজার হাড়গোড় দাঁত ভেংচানির মত গোবিন্দকে নিঃশব্দ তাড়া করে। একবার চোখ পিটপিট করে ঝুলবারান্দার দিকে তাকায়। তার হঠাৎ বিশ্বাস করতে যেন কষ্ট হয় তারা এ-সব ঘেন্নার কথা অন্য কারো উদ্দেশে বলছে না। সে চোখ নামিয়ে বাইরের দরজার দিকে তাকায়। তারা বুঝি আজ আর তাকে ক্ষমা করবে না। জোর করে নিজের ঘরে ঢোকে তার সাধ্য কি। তারা তাকে মুখে মুখে লাথি মারছে—জোর করলে হয়ত সত্যি মেরে বসবে। আরো যে কথা তারা না বললেও বলছে তা বুঝি এই: এসো নি, এলে আজ আমি অনথ বাধাব। যেন বলতে চায়: তুমি তো পুরুষ নও, কেঁচো কেন্নো—তোমার ঘর কিসের—খাওয়ার ভাবনা কি, তারার মুখের দিকে তাকাবার লালসা জাগে কোত্থেকে। তুমি পাঁচ বছরের ক্ষয়-কাশের রোগী—এত মাদুলি, কবচ, শেকড় খুঁটি—কিছুতেই কিছু হল না। কেন হল না? ভেবেছ, তারার গতর লেজা, নেয়ে ওঠার নামটি না করে পিঁপড়ের মত কামড়ে পড়ে থাকবে। বাবুদের বাড়ির কাঁসা পেতলের মত তার গতরে যে ক্ষয় লেগেছে তা তোমার মত স্বার্থপর কি বুঝবে। ঢের সয়েছি, আর নয়কো।

গোবিন্দ হতভম্বের মত অন্ধকারে আরো খানিক দাঁড়িয়ে থাকে। তারা যদি ফের ভাল মুখে ডাকে—তবে যায়; এই যেন ইচ্ছে। নিজেই হেঁকে অন্য ঘরে গিয়ে দরজার হুড়কো তুলল, নিচে থেকে স্পষ্ট শুনতে পায় গোবিন্দ। তারা এখন কী করবে। দুপুরের জল-ঢালা ভাত খেয়ে পাটি পেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে—এত সহজে ঘুম আসবে চোখে? নেমকহারাম মেয়েমানুষ—কিন্তু অসম্ভব নয়। এই তারার জন্যে সে কী না করেছে এই সেদিনও। চটকলের বদলী কাজটা গেল, সঙ্গে বুকের সিন্দুকে কুলুপ এঁটে বসল এই রোগ। ভেবেছিল মরে যাবে। সে মরলে তারা কোথায় যাবে ভেবে মরা আর হল না। পাঁজিপাটা ভেঙে ঘটিবাটি ঝালাই করবার সরঞ্জাম কিনে রাস্তার এক ধারে একটা খুপরি নিয়ে বসে পড়ল। কোন ছেলেবেলা কাজটা শিখেছিল তা যেন এত বয়সে একটুও ভোলেনি। দু দিনে হাত খুব সরতে লাগল। দু' পয়সা বেশ এলো কিছু দিন। তারা তখনও তার কাশ-ফেলা ডাবর ধোয়, ভাড়াটেরা তার অসুখের ব্যাপারে নাক গলাতে এলে শিরা ফুলিয়ে বলে, 'এ আর কি দেখছ? আমার এক পিসের গলা দে ঘড়া ঘড়া রক্ত উঠত। ডাক্তার বললে বুকের দোষ নয় কো, ও তোমার লিবার থে আসছে। এ-ও, সিধু ডাক্তার তাই বললে, লিবারের দোষ।'

এই ডাহা মিথ্যেটা কে বলত—সে কি এই তারা—যে কিনা তাকে রাত সাড়ে দশটার সময় শেয়াল-কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে নিজে ভর-পেট খেয়ে দরজায় হুড়কো দিয়ে শুল। সে তাকে পাঁচ বছর আগে কেন মরতে দেয়নি, কেন মনে করেছিল ক্ষয়-কাশ জানতে পারলে ভাড়াটেরা ভয়ে ছায়া মাড়াবে না, বাড়ি থেকে জোর করে তুলে দেবে তাদের। পাঁজিপাটা ভেঙে বেঁচে থাকতে বলেছিল—সে কি এই তারা নয়? সে বাঁচলে বাঁচবে কথাটা আজ কেমন মিথ্যা করে দিতে চায় মেয়েমানুষটা। আজ সে যখন মরতে বসেছে, তখন তারা কেমন নিশ্চিন্তে খাচ্ছে দাচ্ছে, হুড়কো তুলে দিয়ে ঘুমোতে যাচ্ছে শেতলপাটি বিছিয়ে।

গোবিন্দর চোখ জ্বলজ্বলে হয়ে এলো। হাতের কাছে তারাকে পেলে যেন চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে গঙ্গার জলে নিয়ে ভাসিয়ে দিত। লোকের বাড়ি বাসন মেজে নগদ টাকা আর পাবণীর শাড়ি-জামা পেয়ে এত দেমাক তোর—গোবিন্দ মনে মনে গজরায়। ইদানীং তার যখন তখন রাগ চেপে যায় মাথায়, খালি পেটে থাকলে সে রাগ যেন আরো চণ্ডালের মত পেটের মধ্যে হুড়োতে থাকে, বুকে অবাধ ঠেলে উঠে ফুস ফুস কামড়ে ছিঁড়ে নিতে চায়। সে একটা বুনো জানোয়ারের মত দাপাতে থাকে খিদের জ্বালায়, রোগের তাড়সে, বাঁধ-না-মানা রাগের এলোপাথাড়ি মারের চোটে। এই অন্ধকার উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অভুক্ত গোবিন্দ সেই মারটাই যেন আবার টের পাচ্ছিল নতুন করে। তার গলার কাছে চিৎকার ঠেলে আসছিল, 'বড় মানষের এঁটো-মাজা হারামজাদী, শিগগির ভাত বেড়ে নে আয়, খিদেয় আমার নাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে।' কিন্তু বলতে গিয়ে গলার শিরায় যে টান ধরল তাতে চিৎকারের আগে কাশির দমক উঠে গেল। কাশতে কাশতে হড়হড়ে খানিকটা কি উঠে এলো গলা চিরে। টোকো-কষা স্বাদ জড়িয়ে গেল জিভের মধ্যে, সারা মুখে। থু থু করে ছড়িয়ে দিল উঠোনে। গোবিন্দ বুঝতে পারছিল কি উঠেছে, তার বুক ফেটে কান্না আসছিল। চোখে অন্ধকার লাগছিল, মাথার মধ্যে এমন পাক দিচ্ছে যেন দাঁড়াতে দেবে না। তবু বিকৃত গলায় দুবার 'মর, তুই মর—' বলতে বলতে সে কোন রকমে ঠেকনার বাঁশ আঁকড়ে ধরে বসে হাঁপাতে লাগল।

একটু কাল বসে থাকার ফলে ছটফটানি ভাবটা কম হল। বুকের মধ্যে নোলা বেঁধার মত যন্ত্রণা আর নেই টের পেয়ে গোবিন্দ উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় নেমে মনে হল এখানে কত না বাতাস অথচ একটু আগে তার বুকের মধ্যে বসে কেউ যেন

"আমি গোদরেজ
পছন্দ করেছি কেন?
—আমি নিজে
ইঞ্জিনীয়ার—
রেফ্রিজারেটরের
খুঁটিনাটি সবকিছুই
আমি জানি!"

গলার টুঁটি টিপে ধরেছিল। কে অন্ধকার, ওই তারা হারামজাদী—তাকে সে জ্যান্তে মারতে চায়, নিঃশ্বাস নেবার বিনিমাগনা বাতাসটুকু অবধি সে পায় তা-ও তার সহ্য হচ্ছে না। এঁটো-চাটা পাতকুড়ুনি নচ্ছার মেয়েছেলেটা তা বলে পারবে কেন, যত তার রোজগার হতে পারে, বাতাস কারো কেনা নয়। এটুকু সে আপনা আপনি পাবে যত দিন না মরছে। এখানে ওদের মত দেবাগি আরেকজন থাকলে সে কবে মরে যেত।
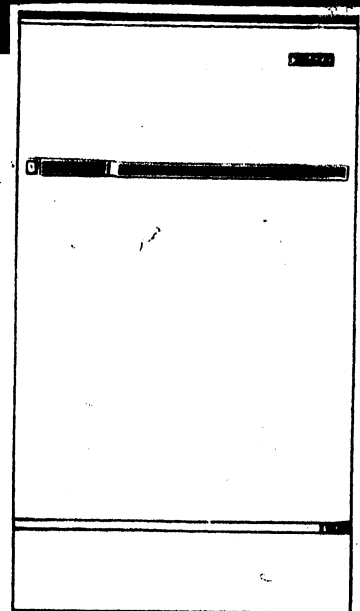
হাঁপরের মত লম্বা শ্বাস টানতে টানতে থমকে দাঁড়ায় গোবিন্দ। ঘরে ফিরবে না সে বিষয়ে নিশ্চিত কিন্তু যাবে কোথায়। নিম্ নিম্, আলোর নলটা সে একবার ভাল করে জরিপ করে নেয়। রাতটুকু কাণা রকে কি বারান্দার পাড় থেকে কাল ভোরবেলা এই গলি ছেড়ে, তারার চোখের আওতা ছেড়ে যেখানে হোক যাবে মনে ভেবে গোবিন্দ আপাতত যেমন তেমন একটা ছাউনি খোঁজে। গলির মধ্যে কতগুলো রক আছে, কোন কোন রকের মাথায় ছাউনি আছে, কোনটায় কজন ভিখিরি মরা-রাতে কুকুরের পাল লাঠি-পেটা করে ঘুমোর জায়গা ছিনিয়ে নেয় নিত্য দিন, এসব ভাবতে ভাবতে ঠান্ডা দত্তর বুড়ো-সড়ো রকটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ওটরের লাথ-ঝাঁটা খাওয়া, জন্মকালে ছাউনির মুখ না-দেখা দু' দশটা জাতভিখিরি বাউন্ডুলে সোখানে বারো মাস রাতের বেলা পড়ে থাকে। বিরাট এলাকা নিয়ে দোতলা বাড়ি। ঠান্ডা দত্ত কবেই মরে গেছে, তার ছেলেপুলেরা কলকাতা শহরে থাকে। দোল-দুর্গোৎসবে ঝাঁক বেঁধে আসা শুরু করলে ভিখিরিদের হয়ে যায় বিপদ। রকের দখল ছেড়ে দিতে হয়, এমন কি কুকুরগুলো অবধি ঠেঙানির চোটে রকের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। অন্য সময় এক অতি বুড়ো হেঁপো কেশো রুগী বাড়ি পাহারা দেয়। গোবিন্দ কবার ঘরে টিঁকতে না পেরে এই রকে এসে রাত কাটিয়ে গেছে।

দূর থেকে গোবিন্দ শুনতে পায় বাতাসে শানাইয়ের সুর ভেসে আসছে। এটা কি মাস—আষাঢ়, না শ্রাবণ? শানাই শুনে মনে হয় কোথাও বিয়ে-টিয়ে হচ্ছে, খুব খাওয়াদাওয়া চলছে—লুচি মাংস পোলাও। এলোমেলো বাতাস, মেঘও জমেছে খুব। বাতাসে যেন বাস আসছে মাংসের, গরম লুচি ভাজার। খিদের নাড়ি চনমনা হয়ে ওঠে, জিভে রস কাটতে থাকে আঠার মত। গোবিন্দ পা চালিয়ে বাঁ হাতি গলিতে ঢুকে পড়ে। গলি না রাজপুরীর অন্দর কোথায় এসেছে কিছু সময় লাগে সেই ধন্দ কাটতে। কোথায় রক, কোথায় কি—সেই জায়গায় পেল্লায় উঁচু মহকুতর তৈরি হয়েছে। মানুষ নেই, অতেও পোঁ পোঁ সানাই বেজে চলেছে। দুখানা গাড়ি থেকে কারা নামল। জায়গাটা চমকে উঠল তাদের গায়ের গন্ধে। এঁটো পাতার বালতি দেখে গোটা তিন চার খেঁকি-নেড়ি ঘেউ ঘেউ করে পেছু পেছু ছুটল। হুড়ুৎ করে বালতির মলনা সব ঢেলে দিয়ে মেয়েলোকটা ফিরে যাচ্ছিল। ল্যাম্প-পোস্টের তলা থেকে কে যেন বলে উঠল, 'কি গো দিদি, বাবুরা সব কেমন খাচ্ছে? সেই কোন কালে ঘ্যাটানেটা কাঁই আর একখানা করে লুচি দিয়ে গেলে, আর কে আমাদের দেখতেই পাচ্ছ না—'

মেয়েমানুষটির হাতে বালতি। ভিড়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ঢুকে যেতে যেতে ঝামটা মেরে বলল, 'বলে কিনা দেখতে পাচ্ছি না—ওরে আমার কেরে? না থাকলে কি দাঁড়িয়ে এনে দেবো?'

চলে যেতে এক ছোকরা খিঁক খিঁক করে হেসে উঠল পেছন থেকে। 'মাসী বলেছে ভালো, গাইড়ে এনে দেবো।'

আরেক জন বলল, 'মাগী ধুর্ত্ত আছে খুব। দাখনে উঠনে ওর মরদটা থালা নিয়ে বসে আছে, মাছ মিষ্টি সিখেনে ঢেলে এসে আমাদের কাঁই খাওয়াচ্ছে।'

'ও তো বেধবা গো—'

'রাখো তোমার বেধবা। বেপাড়ার অমন সবাই বেধবা। আপন পাড়ায় দেখলে তবে না বোঝা যায়।'

কে যেন দেখতে পেয়ে গোবিন্দকে ডাকল ল্যাম্প পোস্টের তলা থেকে। 'খাবো দাবো শুতে আলে নাকি গো গবাদা? না কি বউ খেদায়ে দেলো? কি গো, কথা বলতিছ না কেন?'

কি বলবে গোবিন্দ। বলার কী আছে তার। শোওয়ার জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছে তা যেমন সত্যি, খাওয়া জোটেনি সে কথাও মিথ্যে নয়। আর তাড়িয়ে দেওয়া—সেও ষোল আনা সত্যি। লোকটাকে গোবিন্দ দেখতে পেল না। কিন্তু মনে হল ওদের স্বভাব চরিত্র সব সে জানে। তারা যে মাঝে মাঝে তাকে খেতে দেয় না, না দিয়ে নয় ছয় গালি দিয়ে ঘরের বার করে দেয়—তাও তার অজানা নয়। এও কি জানে অসুখ শরীরে খিদে আজকাল সে একেবারে সইতে পারে না, খাওয়ার সময় খাওয়া না পেলে তার মাথা বিগড়ে যায়, অসুখের তাড়না বেড়ে বেড়ে তাকে পাগলের মত ক্ষ্যাপা করে তোলে। তখন মনে হয় ওই নচ্ছার মেয়েছেলেটা তার শত্তুর, সেই তাকে ঘরে থাকতে না দিয়ে, খেতে না দিয়ে মারবার তাল করেছে। সে মরলেও ওটার সধবা নাম ঘুচবে না।

মেয়েমানুষটি ছোট চাঙারী হাতে ফিরে এসেছিল। 'কি গো মাসী, কি গো দিদি, কি এনেছ—' বলতে বলতে দলটা চনমন করে উঠল। ঠমক চালে ল্যাম্প-পোস্টের নিচে এসে নাক নেড়ে মেয়েমানুষটা বলল, 'তোরা তো ছাড়বি নে—যত সব হাড়-হাভাতের দল। তোরা কজন আছিস?'

'আগে ছিলাম পাঁচ এখন ছজনা হয়েছি।'

'তবে আর কি—মাথা কিনে নিয়েচ। আর দু' চারজন ডাকতে পারনি?'

খিঁক খিঁক হাসি আবার শোনা গেল। 'দেরি করলে তা-ও পারি গো মাসী। তাই বলি যা দেবার দিয়ে দাও, ঝটপট চলে যাই।'

চাঙারীতে কলাপাতায় জড়ানো অনেক ছেঁড়া আস্ত লুচি কুমড়োর ছক্কা ঝোল সমেত মাংসের টুকরো বোঁদে। সবাই গোগ্রাসে গিলতে লাগল, সঙ্গে গোবিন্দ। দু টুকরো পেটে যেতে হা হা করে জ্বলে উঠল পেটের ভেতরটা। বুকে ব্যথা নামল, চোখ জাসিয়ে জল এসে গেল। তারার মুখটা মনে পড়ল। সেই তারা যে তাকে মিলের চাকরে যাবার পরে হাতের এক গাছা চুড়ি বেচে কটা টাকা এনে দিয়ে বলেছিল 'না খেয়ে মরবে কেন গো, বেটাছেলে না তুমি—' আর কান্না-কাটা কথাটা বেমালুম চেপে গিয়ে লিখতের দোষ বলে মানুষের মনের সন্দেহ চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল। রোগা শরীরও প্রথম দিক কত আদর সোহাগ। 'সেরে উঠবে বলে কত ওষুধ মাদুলী, মেলায় হত্যে দেওয়া। এ সবই ছলচাতুরি, নচ্ছার মেয়েমানুষের পেটের কথা কে বুঝতে পারে সময় থাকতে। বুঝতে পারলে গোবিন্দ মরতে মরতে সেদিনই সাবধান হয়ে যেত, ঢুকে পড়ত কোন চায়ের দোকানে কাপ ধোয়ার কাজে—তারার ওপরে ভরসা করে হাল ছেড়ে থাকত না এমন করে। এখন তো সে একটা রোগা দুবল কাকুতি সার মানুষ আর এখনই সে নিজের মূর্তি ধরে গোবিন্দকে তাড়াল। তার মুখ ফিরিয়ে নিল বলে না সে এখন রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের তলায় পাঁচটা জাত ভিখিরির সঙ্গে খেতে বসেছে। সে বুঝি আর চায় না গোবিন্দ বেঁচে থাকে, বেঁচে থেকে তার সুখের পথের কাঁটা হয়। রাগ জ্বালা খুঁইয়ে ওঠে বুকের মধ্যে। বারবার থু থু করে। যেন মুখের মধ্যে পোকা উড়ে এসে পড়েছে। চোখ মুছে হাত বাড়িয়ে গোবিন্দ একটা লুচির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পোরে।

রজনী বুড়ি খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন। তখন বোধ হয় গাছের পাখিটিও জাগে না। মন্দিরের ছোট এক ফালি উঠোনের শ্যাওলা কালচে সবুজ ফিকে হয় আরো খানিক পরে যখন গলির মধ্যে গুনগুনে সুরে 'জয় গৌরাঙ্গ—' গেয়ে সমবয়সিনীরা ঘিয়ে-ঘাটে গঙ্গাস্নানে যায়। তাঁর স্নান তার অনেক আগেই সারা। আগে পিছে চারখানা মন্দিরের মাঝখানটায় আলো নামতে দেরি হয়। প্রথমে পশ্চিম দিকের মন্দিরের পুতুলগুলি হাসে, চূড়ায় অশত্থের পাতা ঝলমল করে। পুরানের রথের চাকার ঘর্ঘর শোনা যায়। তারপর রোদ চাকার ওপর দিয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে। পর্তুগীজ শিকারীর বর্শার ডগা ছুঁয়ে, নোনা-ধরা হাড়োল গর্তে থমকে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ রোদ থাকে না ওখানটায়। তারপর হুহু করে নামতে থাকে ক্রমেই নিচের দিকে। তখন উল্টো দিকের মন্দির আলো পেয়েছে। ফুল লতা পৌরাণিক দেব দেবীর মূর্তি, জলদস্যুর হাতে বন্দী মেয়েপুরুষ সব এক সঙ্গে কোলাহল করে জেগে ওঠে। রোদ তখন টগর গাছের মাথায় ভিড় করেছে। অনেক ফুল ফুটেছে আজ গাছটায়—পাতা প্রায় দেখাই যায় না। রাধামাধবের শয়নের বেদী, মেঝে ঢাকা পড়ে যাবে—এত ফুল। ভারী আনন্দ হয়। গুনে গুনে ফুল রজনী তোলেন। ভাবেন, এই হয়। মাধব যেদিন ভাসাতে চায়, রোখে সাধ্যি কার। কেবল এক দুঃখ, মাধব তাঁকে ভুলে গেছে

পশ্চিমের মন্দির তাঁর শোবার ঘরও বটে। কুলীন বামুন আবার বিয়ে করল, আর শ্বশুরে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কও চুকে গেল। নিঃসন্তান অবস্থায় বাপের বাড়ি আসার দেড় বছরের মধ্যে বিধবা হন। সবাই বলল, রজনী মাধবের সেবার ভার নিক। পূর্বপুরুষের মন্দিরে মাধবের প্রতিষ্ঠা হল, তিনি মন্দিরে উঠে এলেন। আজ প্রায় চল্লিশ বছর। এসে দেখলেন মন্দিরের গায়ে নানা পোড়ামাটির অলংকার। ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধের ছবি, জগদ্ধাত্রী পঞ্চানন—কত না দেবদেবী। মাধব এক মুঠো পায় তো পুতুলগুলি অন্তত একটি করে ফুলও পায় তাঁর হাতে।

কিন্তু দিন যেতে টের পান একটি দুটি করে পুতুল কারা সরাচ্ছে। চোরের হাত লেগেছে মন্দিরের গায়ে। খুবলে নিয়ে যাচ্ছে ওরা মূর্তিগুলো। এই করে পশ্চিমের মন্দির ফাঁকা হয়ে গেল। তিনি কত আর ঠেকাবেন। বাদবাকি যা ছিল নোনা ধরে খসে খসে পড়ছে। তাঁর তিন গুণ বয়েস পাওয়া মন্দির, তার পুতুলগুলো তাঁরই মত দিন গুণছে।

বাংচিতার বেড়ার ওধার থেকে গলা আসে। 'ও দিদা, মা তোমার সিধের চাল আর গাইয়ের দুধ পাঠিয়েছে, কোথায় রাখব?'

বাঁ হাতে অ্যালুমিনিয়ামের দুধ-পাত্র, ডান হাতের তেলোয় একটি বেতের ধামি নিয়ে শ্যামবর্ণ মেয়েটি অবাক হয়ে মন্দিরের গায়ে চেয়ে রয়েছে। রজনী বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ওগুলো রাখ না সিঁড়ির ওপর। কেবল কি পেটে খেলেই হবে? তোর বাপকে যে বললাম এ মাসে আমায় যেন একখানা থান দেয়—তার কি হল? আমি কি ন্যাংটো হয়ে থাকব?'

কর্কশ ধমকের মুখে মেয়েটা চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকে।

সাজি ভরে এসেছিল ফুলে। পশ্চিমের মন্দিরটার পাশে আরেকটা মন্দির। তার খোড়লে কিছু ভাঙাচোরা ইট, বিরাট শিবলিঙ্গ ভেঙে পড়ে আছে। সেদিকে চোখ যেতে রজনী চমকে ওঠেন। দুটি পা—শোথ নামা, কাঠ—শিবলিঙ্গের পাথর ঠেলে হাতখানেক বাইরে বেরিয়ে এসেছে। একদম মনে হল ভুল দেখছেন। বর্ষার দিনে খোড়লের মধ্যে সাপের বাসা, বড় বড় বিছে বেরিয়ে আসে ইটের ফাঁক দিয়ে। নাকি কোন মূর্তি-চোর সাপের বিষে মরে পড়ে আছে। একই সঙ্গে রজনী ভয়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কে রে এখানে মরতে এলি? মরবার আর জায়গা পেলি না?'

মেয়েটি মূর্তি থেকে চোখ সরিয়ে নিল। হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'সকাল বেলা কাকে অমন করে গাল দিচ্ছ দিদা?'

রজনী আঙুল তুলে দেখালেন। 'আমি কি সাধ করে গাল দিচ্ছি? দেখ না, নিজের চোখে দেখ—'

মন্দিরের পুতুলির মতই পা দুটো মেয়েটির মাটির সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেল। সে দ্বিতীয়বার সেদিকে তাকাতে পারছিল না। মরা মানুষের পা এ রকম হয়? ফ্যাকফেকে সাদা, ফাটা-ফাটা ভয়ংকর। চোখ নামিয়ে মেয়েটি নিজের পা দুটি দেখতে লাগল।

তখনো রজনী সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন। 'তুই কাদের মড়া রে? মরবি যদি চোখের মাথা খেয়ে এখানে ঢুকতে গেলি কেন? আর কি কোন জায়গা ছিল না, নাকি রাস্তা চোখে দেখিসনি? চোরের মরণ এমনি হয়।'

খোড়লের মধ্যে একটা গোটা রাত কাবার করে গোবিন্দর চটক ভাঙে এত বেলায়। পা টেনে নিতে আরেক ঝাঁক চেঁচামেচি ওঠে, সে শুয়ে শুয়েই শুনতে পায়। ঘাড় উঁচু করে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করে। ঝাঁজালো রোদে প্রথমবারে বিশেষ কিছু দেখতে পায় না। কেবল আবছা দুটি মুখ নজরে এলো, তার দিকে ঝুঁকে পড়ে কিছু বলাবলি করছে। কোথায় আছে বুঝবার জন্য গোবিন্দ ওপর দিকে তাকাল। দুড়ুঙ্গের মত ফাঁপা ভেতরের গড়ন, অন্ধকারে ছাদ চোখে পড়ল না। বাইরে চোখ ফেরাল। কচি মুখটি এবার আর দেখতে পেলো না, পাকা মাথাটি হাত নেড়ে অনেক কথা বলে চলেছে, গোবিন্দ বুঝতে পারল। তখন কাল রাতের কথা তার মনে পড়ে। খাওয়া শেষ না হতে ঝমঝম বৃষ্টি নেমে গেল। যে যেদিক পারে ছুটল, গোবিন্দ মাথা বাঁচাতে গলি দিয়ে দৌড়তে লাগল। এত ভালমন্দ খাওয়া আর দামদে পেট নিয়ে ছুটতে আর পারে না। মেঘ চমকাতে সেই আলোয় দেখতে পেলো পথের পাশে মন্দিরের চুড়ো। শুনেছিল এক বুড়ী মন্দিরগুলো আগলায়। রাতটা মন্দিরে কাটালে মন্দির অপবিত্র হবে কিনা বোঝার মত মনের অবস্থা তার তখন ছিল না। সে বেড়া ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

গোবিন্দ শুনতে পায়, বুড়ী আবার বলছে, 'এখনো যে কালে মরিস নি, তোর মরার আর বাকি নেই। তোর কুষ্ঠ হবে অঙ্গ খসে খসে পড়বে। তুই শিবের মাথায় পা দিয়েছিস?'

গোবিন্দ দেখল তার পায়ের কাছে কেলাবজিলশের গড়ন সাদা পাথরের টুকরো —শিব কোথায়? মরার কথায় দাঁত বের করে হাসল।

রজনী ভেংচে বললেন, বেহায়ার মত হাসছে দেখ। বেরো, বেরো মন্দির থেকে—'

রাতটা যেমন করে হোক কাটল, এবার বেরোতে হয়। এখানেও তার থাকা হবে না। বড় জোর দুটো গলির পরে তারা থাকে। আসতে যেতে চোখে পড়বেই। দেখতে পেলে মনে করবে কোনদিন যদি ঘরে ফিরতে পারে, আবার তার গতরে পিঁপড়ে-লাগার মত যদি কামড়ে থাকতে পায় সেই জন্যে চোখের সামনে ঘাঁটি নিয়েছে। যেখানে তাদের ছায়া অবধি পড়ে না এমন জায়গায় যাবে বলে না ঘর থেকে বেরলো গোবিন্দ। তার আরো ভয় বেইমান মেয়েমানুষটা ভাত তো দেবেই না, পারলে তার নিশ্বাস নেবার বাতাসটুকু অবধি আটকে রেখে দেবে। ভিখিরিদের সঙ্গে বসে লুচি মাংস খেতেও তার লজ্জা করেনি। ভেবেছিল, ভিখিরি হয়ে কেউ জন্মায় না, তাদের মত স্বার্থপর বজ্জাত সুখ-সোহাগী মাগী বেড়ালগুলোই সংসারে ভিখিরিকুলের জন্ম দিচ্ছে। লজ্জা ওদের পাওয়া উচিত।

এ-ও ঠিক গোবিন্দ আর এ তল্লাটে থাকতে চায় না। দত্তবাড়ির রক খালি পেলে সেখানে থাকত, তা না হয়ে খাওয়া জুটে গেল। ঘুম ভেঙে খাবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়বার কথা তার মনে হয়েছিল। বুড়ীর তাড়া খেয়ে উঠতে গিয়ে দেখল কোমরের নিচের অংশে কোন সাড় নেই। কেমন ঠান্ডা মেরে গেছে। পেটে কেন ভিস্তির জল। পেটের মধ্যে কল কল করে বায়ু সরছে। গোবিন্দ চাড় মেরে উঠবার চেষ্টা করল। পাছার দিক খানিকটা উঠে খসে পড়ার মত থপ করে বসে গেল। জাং টান করে মেলে দিল সামনের দিকে। বসে হাঁপাতে লাগল।

ঘাড় ফিরিয়ে কুঁকড়ে গোবিন্দ বাইরে চাইল। দরজার সামনে বুড়ী নেই। লোকজন ডাকতে গেল কি যারা তাকে ঘাড় ধরে বাইরে বের করে দেবে। সে যে দু পায়ে দাঁড়াতে পারবে, ভরসা হয় না। তাড়ালে যাবে কোথায়, সে কেমন করে যাবে?

গোবিন্দ গলা বের করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সব। ফাঁকে ফাঁকে নজর রাখল কেউ আসে কিনা। পুব দিকের মন্দির থেকে ঘণ্টা বাজার ঠুনঠুন ঠুনঠুন আওয়াজ আসছে। ভারি মিঠে শব্দ। ভেতরে যে জ্বলুনি আছে—রোগের, লাঞ্ছনা, অপমানের—সব যেন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে মন্দিরের পুতুলগুলি ঝাপসা দেখা যায়, গা বেয়ে গর্জন তেলের মত রোদ গড়াচ্ছে। সে শুনেছে এ মন্দির অনেক কালের পুরনো। তার গায়ে যে পুতুলগুলি আছে সেগুলো নাকি এক একটাই দশ বিশ টাকা দাম ওঠে কলকাতার পার্টিতে নিয়ে যেতে পারলে। তার চেনাশোনা দু-একজন এই করে বেশ কিছু কামিয়েছে এক সময়, এখন বুড়ীর গালাগালের চোটে ধারে ঘেঁষতে ভয় পায়। কোনদিন জানবার ইচ্ছে হয়নি পুতুলগুলি কোন কুমোরের বানানো, কোন ভাষা লেখা আছে পুতুলগুলির গায়ে। সে তো দেখে আসছে কুমোর মূর্তি গড়ে, পুজোআচ্চা করে গঙ্গার জলে টান মেরে ফেলে দেয়। এগুলো কেন ভেবে গেঁথে রাখার দরকার হল। তারা যখন তার রোগ সারাবার জন্য মেলায়-মন্দিরে হত্যে দিয়ে ফিরছে, তখন একদিন এসে বলেছিল, ভারি জাগ্রত দেবতা রাধামাধব, কত মানুষ ভাল করে দিয়েছেন—সাহেবকাবো পাইকবরকন্দাজ—সবার ফটক টাঙান আছে দেয়ালে। তাঁরা মরে গিয়ে ঠাকুরের অংশ হয়েছেন। তোমার নামে তাদের কাছেও মানসিক করে এলাম—' তার আরোগ্য কামনার মানস করা পুতুলগুলির সামনে মাথা যেন ঝুঁকে এল গোবিন্দর। আবার যদি কোনদিন ভাল হয়ে ওঠে, পেট ভরে খেতে পায়—এরকম রাস্তার ধারে লাইটপোস্টের তলায় বসে খাওয়া নয়, নিজের রোজ-গারের ডাল-ভাত-তরকারি—তাহলে সেদিন গিয়ে তারা বুঝবে মানস করে সে কত ভুল করেছিল।

দুজন কোট প্যান্ট পরা বাবুগোছের মানুষ এ সময় বেড়া ঠেলে ভেতরে ঢোকে। বুড়ী তো এখানে, এদের খবর করল কে। গোবিন্দ মাথাটা স্যাঁৎ করে ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। তার বুকের মধ্যে দুব দুব শব্দে দুর্বল হৃৎপিণ্ড বাজে। ঘাড়ে কার হাতের স্পর্শ পায়। কেউ যেন তাকে মন্দির ছেড়ে চলে যাবার হুকুম দিচ্ছে, অসাড় শোথ-নামা পায়ে হাঁটতে গিয়ে ধড়াস করে আছড়ে পড়ে মন্দিরের উঠোনে। কখন কাতর শব্দ করে গোবিন্দ খোড়লের আরো অন্ধকার কোণে সরে বসে।

কান তবু সজাগ থাকে। ভাঙা ইটের ফাঁক দিয়ে নজর ছড়ানো থাকে উঠোনে। একটা লোক ব্যাগ থেকে টেপ-ফিতে বের করে পুবের মন্দিরটার মাপ নেয়। ফিতে গুটিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্দিরের গায়ের পুতুলগুলো বেছে বেছে মাপে। নোটবই বের করে কি সব লেখে। অন্য লোকটি ক্যামেরা চোখে ফেলে ছবি নেয় দশ মিনিট। বুড়ী এবার বেরিয়ে আসে। লোক দুটিকে দেখে একটুও যেন অবাক হয় না। বরং বিরক্ত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ ছেলো, তোদের গরমেন্টের কাজ বুঝি খালি ফিতে মাপা আর ছবি তোলা?'

ফিতে-হাতে লোকটি সম্ভবত জানে বুড়ীর ভাব-চরিত্র, মেজাজ। রগড় করে বলে, 'কেন, পিসীমা?'

'যখনি আসিস, দেখি তো খালি ছবি তুলিস আর ফিতে মাপিস। মন্দিরটা কি বছর বছর বাড়ে কমে?'

'ওসব মাপজোক আপনি বুঝবেন না।'

'আমি বুঝব না, যত বোঝনদার হয়েছিস তোরা?' বুড়ী মুখ করে ওঠে, 'আমার মন্দির, চল্লিশ বছর নিত্যি দুবেলা চোখের সামনে দেখছি, বলে কিনা আমি বুঝব না। লিখে নে এক বছরে সাতখানা মূর্তি চুরি গেছে। আমার ঘাটের মুখো পা হয়েছে, কত আর চোর-পাহারা করব বল দেখি। তোদের গরমেন্টকে বলিস, নিতে হলে যেন এখনো নেয়, আমি গঙ্গায় গেলে ইটখানাও এসে পেতে হবে না।'

ফিতে ক্যামেরা ঝোলায় পুরে সিগ্রেট মুখে লোক দুটি চলে যায় হাসতে হাসতে।

ওরা যাবার পর গোবিন্দ দেখে, বুড়ী আবার এদিকে আসছে। সে কোণ বদল করে ইটের ফাঁকে লুকোতে চায়। মাথা আড়াল পড়ে। কাঠি-কাঠি পা দুটো, ঢাকের মত পেট ছড়ানোই থাকে পাথরের খাঁজে খাঁজে।

'ওরে ডাকরা মিনসে—তুই এখনো যাসনি? ভালয় ভালয় যাবি, না লোক ডাকতে হবে?'

গোবিন্দ এবার বেরিয়ে আসে আত্মসমর্পণ করার মত ধরা দেয়। ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করে বেরিয়ে কোথাও যাবার তার সাধ্য নেই। পেটে হাত বুলিয়ে যন্ত্রণার কথা বলতে চায়। কথা ফোটে না। তার বদলে কাতর একরকম ধ্বনি বের হয় মুখ দিয়ে। অথচ পেটের মধ্যে কত কথা টগবগ করে ফুটছে। সেই বলতে না পারা কথাগুলোই কালো চাপ-বাঁধা রক্ত হয়ে হড়াৎ করে গোবিন্দর গলা চিরে বেরিয়ে আসে। খোড়লের দরজা, ঘাস সব কালো হয়ে যায়।

'ওমা, তোর গলা দিয়ে দেখি রক্ত উঠল? তুই আমার মন্দির অপবিত্র করে দিলি?' বুড়ী ছুটে গিয়ে মালসায় করে গোবরজল গুলে আনি। চোখের সামনে ছিটোতে ছিটোতে বলে, 'বলেছি না তোর আর রক্ষে নেই, তুই শিবের মাথায় পা ঠেকিয়েছিস। ওরে দেবতা আছেন রে, দেবতা আছেন—'

গোবিন্দ ঘোলা চোখে বুড়ীর পরিপাটি করে গোবর-ছড়া ছিটনো দেখে। মাথাটি খোড়লের ইটের গায় এলিয়ে বিস্ফারিত চোখে যেন পরমাশ্চর্য কোন দৃশ্যের দিকে চেয়ে থাকে।

হাতের কাজ শেষ হলে বুড়ী দূরে থেকে জিগেস করে, 'হ্যাঁ ছেলে, অনেক তো বেলা হল—খিদে পেয়েছে? কিছু খাবি?'

গোবিন্দ পেটে হাত বোলায়। চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে নামে।

বুড়ী চলে যেতে গোবিন্দ একা বসে থাকে। মাথার মধ্যে শান, হাত পা কেমন যেন অসাড়-অসাড় লাগে। কত ছবি হুড়োহুড়ি করে ভিড় করে আসে চোখের পর্দায়। বাপের সঙ্গে চড়কতলার মেলায় কাঙালী ভোজনের আসরে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া, মাছ-মারার জাত-ব্যবসা হারিয়ে কল-খাটতে যাওয়া—তাও হারিয়ে শেষমেষ পথের ভিখিরি। মাঝখানে আছে এক নির্দয় নিষ্ঠুর রমণী—তার মুখখানাও একবার যেন শেষ চোখের দেখা দেখতে আসে। গোবিন্দ মুখ ঘুরিয়ে নেয়। চোখ বুজে আসে। যখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারে তারা দেমাক দেখিয়ে চলে গেছে—আবার চোখের পাতা আপনা হতে খুলে যায়। আকাশে কি বিকেল ঘনালো—একটু পরে বুঝি রাত নামবে। মন্দিরের গা বেয়ে চূড়া, ছাড়িয়ে আকাশের দিকে চোখ উঠে গেল। ওগুলো কি ভাসছে পাখির মত—মন্দিরের পুতুল? রথের চাকা, পাইক বরকন্দাজ—যারা এখন দেবতার অংশ হয়েছে—তার রোগমুক্তির মানস নিয়ে তাদের হাতে ফুল পেয়েছিল—সেই লজ্জায় দেয়াল থেকে খসে খসে পড়ছে। তারা মানুষের অপমানে লজ্জায় মানুষের হৃৎপিণ্ডের মতই গলছে। কানের পাশে কোথাও যেন গুন গুন শব্দে মেঘ ডেকে উঠল, আর বাতাসের বিশাল একটি ঢেউ গর্জে উঠল, একদিন যেমন করে খাড়ির মুখে জোয়ার কটালে জল গর্জাতো, আর একটি ছোট ডিঙির ভেতর বাপবেটাকে ঘাট থেকে অঘাটায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত, তেমনি গর্জনে তার কান ফেটে যেতে লাগল। শ্বাসনালীতে পাথর-পোরা তার। খাবি-খাওয়া মাছের মত হাঁ করে বড় বড় নিশ্বাস নিতে লাগল।

রজনীর সিধের রান্না শেষ হয়েছিল। কলাপাতায় করে দু হাতা পায়েস নিয়ে খোড়লের মুখে এসে দাঁড়ালেন। ছেলে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল। নিচু হয়ে কলাপাতায় মোড়া পায়েসটুকু মুখের সামনে নামিয়ে দিলেন। 'ও ছেলে খা, ভাল লাগলে আরো দেবখুনি। খা—।'

জলের ঘটি নিয়ে এসে দেখেন লোকটা কলাপাতার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ডাকলেন। সাড়া মিলল না। রজনী বুঝলেন। আঁচল দিয়ে মুখ-খানি চেপে ধরে বসে পড়লেন এক পাশে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডাকলেন, 'ও মুরারী, ও মাধব, ও গোবিন্দ—এই জন্যে তোকে আমি পায়েস রেঁধে খাওয়ালুম—তুই মরবি বলে?'

মন্দির-দেয়ালে কত শতাব্দীর পুতুলগুলি জেগে উঠে রজনীর কান্না শোনে।

সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ৬ ॥

১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় পুস্তক পরিচয় বিভাগে সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সমালোচনার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

'সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্যমন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা, ১৯৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কাগজ ও ছাপা ভাল নয়, কিন্তু গ্রন্থখানির যাহা উপাদান, তাহা সাহিত্যের স্থায়ী ভাণ্ডারের বিশেষ সম্পত্তি। এই মন্তব্য-লেখককে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার বিশেষ অনুরাগী জানিয়াই সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাহাকে এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। একালের যুবকেরা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার সহিত খুব পরিচিত নহেন, সেটা দুর্ভাগ্যের কথা। সকল দেশেই এক একবার প্রাচীন লেখকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হয়; সঞ্জীবচন্দ্রকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিবার অনেক কারণ আছে।...

সঞ্জীবচন্দ্র নাম ও যশ খোঁজেন নাই,—অপ্রাকৃতিক উপায়ে ত নহেই।... সঞ্জীবচন্দ্র কখনও কাহারও অনুকরণে কিছু লেখেন নাই। সাহিত্যে উপহার দিবার মত বিষয়গুলি তাঁহার মনে ঠিক বিকশিত হইলেই তিনি কলম ধরিতেন। এবং তাঁহার নিজের মনের ভাবগুলি তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়া ফুটাইতেন। তাঁহার নিজের একটা রচনারীতি বা একরং বা স্টাইল ছিল।...

তিনি অযথা কথা ফেনাইয়া রচনা বাড়াইতেন না। তিনি অতি অল্প কথায় তাঁহার 'গৃহ-সন্ন্যাস' প্রবন্ধে অনেক ভাব জমাইয়াছেন। একজন সাহিত্যিক কৌশলওয়ালা উহা লিখিলে প্রবন্ধটার আয়তন দশগুণ বাড়িত। সমালোচিত গ্রন্থাবলীতে এই 'গৃহ-সন্ন্যাস'টি নাই। আরও কয়েকটি সুরচিত প্রবন্ধ নাই। এটা ত্রুটি।...'

এখানে এই উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল, সঞ্জীবচন্দ্র একসময় 'গৃহ-সন্ন্যাস' নামে একটি ভাল প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আরও জানা গেল, বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রকাশিত 'সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'তে সঞ্জীবচন্দ্রের আরও অনেকগুলি সুরচিত প্রবন্ধ দেননি।

বঙ্গবাণীর সমালোচনা থেকে এও জানা গেল যে, সমালোচক সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। মনে হয়, বসুমতীর কর্তৃপক্ষ সঞ্জীব রচনাবলীতে সঞ্জীবচন্দ্রের গৃহ-সন্ন্যাস সহ সুরচিত প্রবন্ধগুলি বাদ দেওয়ায় জ্যোতিশ ক্ষুব্ধ হয়েই এ কথা সমালোচককে জানিয়েছিলেন। অবশ্য সমালোচক নিজেও অন্য কোন সূত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ রচনাগুলি জেনে থাকতে পারেন। তবে জ্যোতিশই জানিয়েছিলেন বলে আমার ধারণা। কারণ, ভ্রমরে বা বঙ্গদর্শনে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার সঙ্গে তাঁর নাম না থাকলেও জ্যোতিশ তাঁর পিতার সমস্ত রচনারই খবর রাখতেন।

জ্যোতিশ যখন 'বসুমতী অফিস'এর (তখন বসুমতী সাহিত্য মন্দির নাম হয়নি) মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলীর সর্বস্বত্ব বিক্রয় করেন, তখন তিনি সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিও বিক্রয় করেছিলেন, এবং আশা করেছিলেন, সেগুলিও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে। জ্যোতিশ কর্তৃক উপেনবাবুকে সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের একটা বায়নাপত্র 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় ছিন্নাবস্থায় রয়েছে। সেই বায়না পত্রটি এই—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়—

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়

বসুমতী অফিস বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পিতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া, থানা নৈহাটী জেলা ২৪ পরগণা কস্য বায়না পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমার পূজনীয় উক্ত পিতৃদেবের প্রণীত (১) কণ্ঠমালা (২) মাধবীলতা (৩) জালপ্রতাপচাঁদ (৪) সঞ্জীবনী সুধা (৫) যাত্রা সমালোচনা ও প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের কপি রাইট ৫৫১ পাঁচশ একান্ন টাকায় আপনাকে বিক্রয় করিবার চুক্তিতে অদ্য আপনার নিকট ঊনিশ টাকা অগ্রিম বায়নার স্বরূপ লইলাম। উক্ত ঊনিশ টাকা বাদে চলিত ইংরাজী সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে একাই কিস্তিতে বাকি ৫৩২ পাঁচশত বত্রিশ টাকা গ্রহণ করিয়া বিক্রয়পত্র রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব। রেজিস্ট্রী করার সম্বন্ধে যাহা কিছু খরচ হয়, তাহা আপনাকে দিতে হইবে। যদি উক্ত তারিখে বেবাক টাকা না পাই তাহা হইলে, বায়নার এই টাকা ফেরৎ পাইবার দাবী করিতে পারিবেন না এবং আমার ঐ সকল প্রবন্ধ ও পুস্তক অন্য কাহাকেও বিক্রয় করিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। প্রকাশ থাকে যে, ঐ সকল পুস্তক ও প্রবন্ধের একমাত্র স্বত্বাধিকারী আমিই। আমি যদি আমার পক্ষের এই বায়না পত্রের লিখিত চুক্তি ভঙ্গ করি তাহা হইলে মাফিক আইন আমলে আসিবে। এতদর্থে নগদ ১৯ ঊনিশ টাকা বায়না স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই বায়না পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি—সন ১৯০৪ সালের তারিখ ২৮শে মার্চ

ইসাদী শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রীদেবেন্দ্র...সাং...

বায়নাপত্রের শেষের '...' চিহ্নিত অংশ ছিন্ন।

বায়নাপত্র দেখা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে দেবার জন্য তাঁর 'প্রবন্ধসমূহের' কথাও জ্যোতিশ বলেছিলেন। কিন্তু বসুমতীর মালিক উপেনবাবু জ্যোতিশের কথিত ঐ প্রবন্ধসমূহের একটিও গ্রন্থাবলীতে দেননি। অথচ এই

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাবলী প্রকাশের বহু পূর্বেই যাত্রা সমালোচনা'র ন্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের 'সংস্কার' ও 'বাল্য বিবাহ' প্রবন্ধ—দুটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। উপেনবাবু যখন গ্রন্থাবলীতে 'সংস্কার' ও 'বাল্য বিবাহ'ই দিলেন না; তখন সঞ্জীবচন্দ্রের অন্য প্রবন্ধগুলি, সেগুলি যত ভালই হোক, সেগুলির কথা আর চিন্তাই করলেন না। তার ফল এই যে, সঞ্জীবচন্দ্রের অনেক সুরচিত রচনা চিরতরেই অজানার গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। সেই অজানার অন্ধকার থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের কিছু রচনা নানা সূত্রে বহু কষ্টে হাতড়ে হাতড়ে আজ আলোয় আনার চেষ্টা করছি।

জ্যোতিশ কর্তৃক বসুমতীর উপেনবাবুকে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলীর বিক্রয় নিয়ে আরও কয়েকটা চিঠি ও কাগজপত্র কাঁটালপাড়ায় 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় রয়েছে। ঐসব চিঠি ও কাগজপত্র থেকে জানা যায়, অনেক দরাদরি করে উপেনবাবু ৫৫১ টাকায় সঞ্জীবের রচনাবলীর সর্বস্বত্ব নিয়েছিলেন। আর বায়নাপত্রে লেখা থাকলেও উপেনবাবু বায়নার টাকা বাদে বাকি টাকাও একবারে এবং ঠিক সময়ে দেননি। এ সম্পর্কে উপেনবাবুর বসুমতী অফিসের তৎকালীন কর্মচারী জলধর সেন কর্তৃক জ্যোতিশকে লেখা একাধিক চিঠি রয়েছে।

অনেকে বলে থাকেন, বসুমতী সাহিত্য মন্দির বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলী সুলভ মূল্যে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের প্রচারে যথেষ্ট উপকার করেছেন। তা করেছেন, কিন্তু এই সঞ্জীবচন্দ্রের ক্ষেত্রের মত বহু সাহিত্যিকের তথা সাহিত্যের ক্ষতিও করেছেন প্রচুর। তাছাড়া গ্রন্থাবলীতে ছাড় ও বিকৃত পাঠ তো থাকতই।

যাক্। এখন আবার সঞ্জীবচন্দ্রের কথাতেই ফিরে আসি। বঙ্গবাণীতে ঐ বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা থেকে একটা বড় কথা জানা গেল যে, সঞ্জীবচন্দ্র এক সময় 'গৃহ-সন্ন্যাস' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং তা প্রকাশিতও হয়েছিল।

বঙ্গবাণীর এই লেখা পড়ে খোঁজ করতে থাকি, কোথায় কবে সঞ্জীবচন্দ্রের 'গৃহ-সন্ন্যাস' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনেই ১২৮৭ সালের চৈত্র সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের নাম নেই।

বঙ্গবাণীর ঐ সমালোচনাটি চোখে না পড়লে কিছুতেই বলা যেত না যে, 'গৃহ-সন্ন্যাস' সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা। সমালোচক যে বলেছেন, সঞ্জীবচন্দ্র 'গৃহ-সন্ন্যাস' প্রবন্ধে অল্প কথায় অনেক ভাব জমিয়েছেন, এখন প্রবন্ধটি আবিষ্কার করে পড়ে দেখা গেল, সেকথা খুবই সত্য। এখানে ঐ প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি।

গৃহ-সন্ন্যাস

যে স্বাধীন, নিশ্চয়ই সে সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা ছিল, সেইজন্য সন্ন্যাসীও ছিল। সন্ন্যাসীরা অনেকেই গৃহী। জনকরাজা ভারতের প্রথম সন্ন্যাসী।

স্বাধীনতা ভারতবর্ষের ধন। জর্মনীরা ইদানীং স্বাধীনতার অর্থ কতকাংশে বুঝিয়াছে, এইজন্য জার্মানীতে সন্ন্যাসী সম্ভব হইয়াছে। ইউরোপীয় আর আর জাতিরা অসার, অনেকে আবার বাচাল; তাহাদের স্বাধীনতা অতি দূরে।

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

লিনটাস-BBC.MB-3-2416 BG

ইংরেজদের কেবল দাম্ভিকতা, ফরাসীদের কেবল বাগাড়ম্বর। অদ্যাপি তাহারা অধীনতা স্বাধীনতা কেবল রাজ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। যে বধির সে কেবল নৃত্যকেই সংগীত বলে; গীত বাদ্য, তাল, তখন তাহার কর্ণকুহরে যায় নাই। যখন ভারতআকাশ হইতে স্বাধীনতা খসিয়া পড়ে, পতনে তাহা শতধা হইয়াছিল। ম্লেচ্ছরা তাহারই দুই এক খণ্ড কুড়াইয়া লয়। সেই ভগ্ন খণ্ড তাহাদের এখন পূর্ণখণ্ড। আমরা তাই হাসি। ভগ্নখণ্ডের দুই চারিটি অদ্যাপি ভারতবর্ষে পড়িয়া আছে। সেগুলি এক্ষণে মহাপীঠ। এইজন্য ভারতবর্ষ অদ্যাপি স্বাধীন; সকল দেশ অপেক্ষা স্বাধীন। ক্ষুদ্রেরা এ কথায় হাসিবে; রাজা দেশী কি বিদেশী এই লইয়া তাহারা স্বাধীনতার মীমাংসা করে।...

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অতি ভয়ানক ও অদ্ভুত হইয়াছিল। জড়-জঙ্গমের অধীন হইব না, জরার অধীন হইব না, ক্ষুধার অধীন হইব না, মায়ার অধীন হইব না, দেবতার অধীন হইব না, বরং ঈশ্বরের সমান হইয়া তাঁহার শরীরে মিশিয়া যাইব।' এই আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় স্বাধীনতার বীজ।

ভারতীয় স্বাধীনতা অতি কর্কশ, অতি ভয়ানক; কিন্তু সম্পূর্ণ। ভারতবাসী মৃত্যুরও অধীন হইতে চাহিত না। স্বাধীনতার এরূপ মূর্তি আর কোথাও অনুমিত হয় নাই। মৃত্যু আইসে, পার্শ্বে দাঁড়ায়, জোড়হাত করে অনুমতি চায়, অনুমতি কখন পায়—কখন পায় না। এই চিত্র কেবল স্বাধীনতার সংস্করণ। অদ্যাপি অনেক পরমহংস গোপনে আহার করে, পাছে ক্ষুৎপিপাসার বশবর্তী দেখিয়া লোকে পরাধীন মনে করে। অনেকে উলঙ্গ বেড়ায় পাছে সমাজপ্রথার অধীন ভাবিয়া লোকে অশ্রদ্ধা করে, অনেকে দারাপুত্র ত্যাগ করে, পাছে লোকে মায়ার অধীন মনে করে। এই সকল ব্যবহার অনর্থক নহে। প্রতিধ্বনি পূর্বধ্বনির পরিচয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা একেবারে লোপ পায় নাই। এখনও ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী আছে। আমি ভস্মমাখা ভিক্ষুকদের কথা বলিতেছি না, মহাপুরুষদের কথা বলিতেছি।...

ভারতীয় স্বাধীনতায় মনকে দমন করিতে হয়, শাসন করিতে হয়, পীড়িত করিতে হয়, অনেক সুখ প্রবৃত্তির স্ফূর্তিরোধ করিতে হয় মনকে একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলিতে হয়; কিন্তু when you regulate a man, you narrow him. এই স্বাধীনতার আর এক বিশেষ দোষ যে, এতদ্দ্বারা সমাজের সর্বনাশ হয়। যে সকল মনোবৃত্তির প্রাবল্যে সমাজের উন্নতি, সে সকল মনোবৃত্তি একেবারে থাকে না। এইজন্য এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সমাজের উন্নতি লোপ হইয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিগত গুণে সমাজ গুণবন্ত হয়; কিন্তু এই স্থলে সে নিয়ম খাটে নাই। সমাজের পরাধীনতা ব্যক্তিগত পরাধীনতা নহে; যাঁহারা স্বাধীন তাঁহারা সমাজ হইতে স্বাতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই লোকে তাঁহাদের স্বতন্ত্র নাম দিয়াছিল—সন্ন্যাসী।...'

১২৮৮ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্র নিজে তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। এই 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' প্রবন্ধের সংগে লেখকের নাম ছিল না। নাম না থাকলেও আমার অনুমান ঐ প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা। কারণ—

(১) ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীন হওয়া সত্ত্বেও সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'গৃহ-সন্ন্যাস' প্রবন্ধে যেভাবে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'ভারতবর্ষ অদ্যাপি স্বাধীন। সকল দেশের অপেক্ষা স্বাধীন। ক্ষুদ্রেরা এ কথায় হাসিবে, রাজা দেশী কি বিদেশী এই লইয়া তাহারা স্বাধীনতার মীমাংসা করে।'—তেমনি 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' প্রবন্ধেও দেখছি, এই প্রবন্ধের লেখক বিদেশী রাজার অধীনতাকে দেশের পরাধীনতা না বলে, দেশের আভ্যন্তরীণ দৈনন্দিন ব্যাপারের পরাধীনতাকেই দেশের পরাধীনতা বলেছেন। এই কারণে, 'গৃহ-সন্ন্যাস' ও 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' একই লেখকের লেখা বলে মনে হয়।

(২) সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ' প্রবন্ধে তাঁর পালামৌয়ে থাকার অভিজ্ঞতা যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' প্রবন্ধেও দেখছি, এই প্রবন্ধের লেখক এক জায়গায় তাঁর সাতক্ষীরায় অবস্থানকালের কথা উল্লেখ করে, তাঁর সেখানকার একটা অভিজ্ঞতার কাহিনী এই প্রবন্ধে বলেছেন। আমরা আগে দেখেছি, সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি হারিয়ে কিছুদিন সাতক্ষীরায় স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন। প্রবন্ধে বর্ণিত সাতক্ষীরার কাহিনীটি সঞ্জীবচন্দ্রের নিজেরই অভিজ্ঞতার কাহিনী বলে মনে হয় এবং সেই সূত্রে মূল প্রবন্ধটিও সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা বলে মনে করি। এখন এই 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' প্রবন্ধটি থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

বঙ্গদেশের পরাধীনতা

পাঠশালায় ছেলেরা শিখিয়াছে যে, সাত শত বৎসর হইল বখতিয়ার খিলিজির সময় হইতে বঙ্গদেশের পরাধীনতা আরম্ভ হইয়াছে। ছেলেদের বয়স হয়, কিন্তু পাঠশালার কুশিক্ষা তাহাদের অন্তরে থাকিয়া যায়। এখনও আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, বঙ্গদেশের পরাধীনতা বহুদিনের। পাঠশালার পুস্তক প্রণেতা মহাশয়গণ দীর্ঘায়ু হউন, সি এস আই হউন, কিন্তু একবার তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, একবার বুঝিবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, বখতিয়ার খিলিজির সময়ে বাঙ্গলা পরাধীন হয় নাই। কোন মুসলমানের সময়ে বাঙ্গলা পরাধীন হয় নাই। ইংরেজেরা যখন দেওয়ানী লন, তখনও বাঙ্গলা স্বাধীন। তাঁহারা যখন শাসনের ভার নেন, তখনও বাঙ্গলা আপনার খায়, আপনার পরে। তাহার পর কপাল ফাটিয়াছে। এই সম্প্রতি—এই আমাদের সময় বাঙ্গলা পরাধীন হইয়াছে।..

যে ব্যক্তি আপনার অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত অন্যের মুখাপেক্ষী হয়—অন্যের প্রতি নির্ভর করে, সে ব্যক্তি পরাধীন। সেইরূপ যে দেশ অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত বা সাংসারিক কোন সামগ্রীর নিমিত্ত অন্য দেশের প্রতি নির্ভর করে সে দেশও পরাধীন। এখনও আমাদের অন্ন জোটে সত্য, কিন্তু বস্ত্রের নিমিত্ত বঙ্গদেশ পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে—ম্যানচেস্টারের অধীন হইয়াছে।......

বস্ত্র সম্বন্ধে বাঙ্গলার পরাধীনতা ঘটিয়াছে।...লবণ সম্বন্ধে বাঙ্গলা পরাধীন। সহস্র সহস্র বৎসর অবধি বাঙ্গালীরা সমুদ্রের জল হইতে লবণ বাহির করিয়া লইত। সমুদ্র তাহাতে রাগ করিত না। কেহ কথা কহিত না। এখন কথা কহিবার লোক দাঁড়াইয়াছে।

এই সম্বন্ধে সাতক্ষীরা অঞ্চলের একজন দরিদ্র ব্যক্তির গল্প বলি। লেখক সেই সময় সাতক্ষীরায় উপস্থিত ছিলেন। সকল দিন সে ব্যক্তি আপনার বালক-বালিকাদের উদর পুরিয়া অন্ন দিতে পারিত না। যেদিন সে অন্ন-সংগ্রহ করে, সেদিন হয়ত ব্যঞ্জন জুটে না। একদিন দেখিল সন্তানেরা শুধু অন্ন খাইতে পারিতেছে না, অন্ন মেজেতে ফেলিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছে; একটু লবণ পাইলে তাহারা অন্ন খাইতে পারে, কিন্তু লবণের পয়সা নাই।

সন্তানদের চক্ষের জল মুছাইয়া সে ব্যক্তি বাহির হইল। কলাগাছের কতকগুলো শুষ্ক বাসনা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিল, তাহার ভস্ম এক প্রকার ক্ষার—শেষ তাহাই আনিয়া লবণ বলিয়া সন্তানদের দিল। তাহা কতক মৃত্তিকা, কতক ভস্ম, কিন্তু লবণাক্ত। সন্তানেরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইল।

কিছুদিন পরে পুলিশ এ সম্বাদ পাইয়া দরিদ্রকে গ্রেপ্তার করিল। সকলে বলিতে লাগিল—'আহা! কেন তোর এ বুদ্ধি ঘটিল? কেন তুই কলার বাসনা পোড়ালি? কেন তুই লবণ করিলি?

একটি বালিকা ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল—বাবাকে ছেড়ে দেও, আমরা নুন আর খাব না।

পুলিশ সে ক্রন্দনে কর্ণ দিল না। অপরাধী সাতক্ষীরার মেজেস্টরীতে আনীত হইল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নেমকহারাম নন। তিনি দুঃখীকে শক্ত দণ্ড দিলেন। লবণ ক্রয় করিতে যাহার পয়সা ছিল না, তাহার জরিমানা করিলেন, আবার কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন। কত দিনের নিমিত্ত তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। বালক-বালিকারা লবণ পাইত না, এই হুকুমের পর হয়ত আর তাহারা অন্নও পাইল না।...'

১২৮৭ সালের পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'চাকুরির পরীক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের সংগে লেখকের নাম না থাকলেও এটি সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা বলে আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ, প্রথমত এই প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে—'এক্ষণকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটেরা অপেক্ষাকৃত অযোগ্য, অথবা এক্ষণকার উকিলেরা যে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ পুরাতন লোক, এই প্রস্তাবলেখক তাহার মধ্যে একজন।'

প্রস্তাবলেখক বা লেখক তাহার মধ্যে একজন বলে, সঞ্জীবচন্দ্র নিজেরই কথা বলেছেন। কেননা, তিনি নিজেও আগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং ডেপুটির চাকরির পরীক্ষা নিয়েই তাঁর ঐ চাকরিটি যায়।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখেছি, সঞ্জীবচন্দ্রকে আইনের পরীক্ষায় কম নম্বর দিয়ে ফেল করিয়ে তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। এজন্য তাঁর মনে যে ক্ষোভ ছিল, চাকরির পরীক্ষা' প্রবন্ধের এই কথাগুলোয় তাঁর মনের সেই ক্ষোভটা প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয়—

'বিচারকদিগের পক্ষে আইন জানার আবশ্যকতা আছে সত্য, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট-গণ কেবল বিচারক নহেন, তাঁহাদের অন্য কার্যের নিমিত্ত অন্য গুণ আবশ্যক। কেবল আইনের পরীক্ষায় সে সকল গুণের পরীক্ষা হয় না। বিশেষত আইনের নিত্য পরিবর্তন হয়।...বিচারপতিদের নানা গুণ আবশ্যক, গবর্নমেন্ট তাহার একটিও পরীক্ষা করেন না, বোধ হয় করিতেও পারেন না। অপক্ষপাতিতা বিচারপতির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, এক্ষণে তাহার কোন পরীক্ষা নাই, এইরূপ শত শত বিষয়ের কোনটিরই পরীক্ষা হয় না, কেবল আইনের পরীক্ষা হয়। অধিক কি যেটি সর্বপ্রধান, সেই চরিত্রের পরীক্ষাই নাই। তাহাই বলিতেছিলাম গবর্নমেন্টের পরীক্ষা অতি অসম্পূর্ণ।'

তৃতীয়ত, সঞ্জীবচন্দ্র যেমন ঘটনা বা ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে সহজ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতেন, এই প্রবন্ধে তা পুরো মাত্রায় আছে।

চতুর্থত, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের একেবারে শেষ বাক্যে যেমন কোন উপদেশ-মূলক বা সুচিন্তিত কথা বলে থাকেন, এই প্রবন্ধেও তাই আছে।

পঞ্চমত, সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যবহৃত 'এক্ষণকার' ইত্যাদি কয়েকটা শব্দ যেমন এই প্রবন্ধে রয়েছে, তেমনি এই প্রবন্ধের ভাষার সরলতা, বক্তব্যের স্পষ্টতা, এবং নানা উদাহরণ, সবই সঞ্জীবচন্দ্রের রচনারই অনুরূপ।

এই সকল কারণে, 'চাকরির পরীক্ষা' প্রবন্ধটিকে সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা বলে আমি মনে করি।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ'য়ে লিখেছেন—'সাধুদের গৃহিণীরা নাকি সাধুভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন সাধুভাষা অতি অসম্পন্ন, এই ভাষায় গালি চলে না, ঝগড়া চলে না, মনের অনেক কথা বলা হয় না।'

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'বিবাহের ঘটকালি' প্রবন্ধেও লিখেছেন—'গৃহিণীরা ইদানীং সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন।...বিবাহের সম্বন্ধেও তাঁহারা কর্তা। কেবল পাস করা পাত্র অনুসন্ধান করিলে বিবাহ সুবিবাহ হইবে, এরূপ বিবেচনা গৃহিণীরা যদ করিলে ভাল হয়।'

এখানে এই দ্বিতীয় উক্তির মধ্যেকার শেষ বাক্যটি 'বিবাহের ঘটকালি' প্রবন্ধের শেষ বাক্য।

সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত ১২৮৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'ভূতের জাতি' নামে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ প্রবন্ধের ন্যায় এই প্রবন্ধের সঙ্গেও লেখকের নাম নেই। তবে 'ভূতের জাতি' প্রবন্ধের শেষে এই কথাগুলো আছে—একক্ষণে আমাদের কেবল আপনাদের নিজের প্রতি দৃষ্টি। তাহার মূল কারণ, এখনকার গৃহিণীরা স্বার্থপর হইয়াছেন।.

পালামৌ এবং বিবাহের ঘটকালি প্রবন্ধ দুটির ন্যায় 'ভূতের জাতি' প্রবন্ধেও 'গৃহিণী'র কথা দেখে মনে হচ্ছে, এই প্রবন্ধটিও সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা। 'গৃহিণীর কথা ছাড়াও আমার এরূপে মনে করার আরও কারণ হল—

১। সঞ্জীবচন্দ্র সাধারণত যেরূপে পড়াশুনা করে ও নানা তথ্য দিয়ে নতুন নতুন ধরনের প্রবন্ধ লিখতেন, এই 'ভূতের জাতি' প্রবন্ধটিও সেই রকমের। গল্প, উদাহরণ ও তথ্যে ভরা সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত সংস্কার প্রবন্ধের ন্যায়ই এই 'ভূতের জাতি' প্রবন্ধটি।

২। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর রচনায় সাধারণত 'এখন' বা 'এখনকার' শব্দ ব্যবহার না করে 'একক্ষণে' বা 'এক্ষণকার' শব্দ ব্যবহার করতেন। সেই একক্ষণে ও এক্ষণকার শব্দ দুটি এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। সঞ্জীবচন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধেই মাঝে মাঝে যে একটা হালকা কৌতুক বা রহস্য থাকে, এই প্রবন্ধে তাও আছে।

৪। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর সব প্রবন্ধের শেষেই যেমন নিজস্ব একটা মতামত বা বক্তব্য রাখেন, এই প্রবন্ধেও তা আছে।

৫। অথায় ও বক্তব্যের সরলতা ও সহজবোধ্যতা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার যেটা প্রধান গুণ, সেই গুণ এই প্রবন্ধে পুরোপুরি বর্তমান।

৬। আমরা দেখেছি, সঞ্জীবচন্দ্র দেশ-বিদেশের সমাজতত্ত্বের বই পড়তেন। এই প্রবন্ধে তাঁর সেই পড়ার যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

৭। সঞ্জীবচন্দ্রের নানা প্রবন্ধে বাঙালী জাতির জন্য তাঁর যে দরদ ও আন্তরিকতা থাকে এই প্রবন্ধেও তা আছে।

এই সকল কারণে 'ভূতের জাতি'কে আমি সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলেই মনে করি। এই প্রবন্ধটির কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

ভূতের জাতি

ভূতের জাতি বলিলে কাহাদের বুঝায়, তাহা বাংলায় বড় বলিয়া দিতে হয় না। বুদ্ধিমান বাঙালীরা তাহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কাফ্রি ও অন্যান্য দেশে ভূতের জাতি সাহেবদের বলে। মঙ্গোপার্ক আফ্রিকার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া দুইজন কাফ্রি রুদ্ধশ্বাসে পলায়, প্রায় অর্ধক্রোশ গিয়া দুইচারিজন স্বদেশীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের ভয় যায়। কৃষ্ণকায় কাফ্রিরা মঙ্গোপার্ক সাহেবকে যে ভূত মনে করিয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহার বর্ণের দোষে। কাফ্রিরা মনে করে মনুষ্যের কখন শ্বেতবর্ণ হইতে পারে না; শ্বেতবর্ণ ভূতের। অনেক স্থানে ভূত আর শ্বেতমানুষে উভয় অর্থে এক শব্দেই প্রয়োগ হয়।

কেবল কাফ্রিরা কেন, দক্ষিণ সমুদ্রের উপদ্বীপে যত কৃষ্ণবর্ণ জাতি বাস করে, সকলেরই বিশ্বাস মনুষ্য মরিলে ভূত হয়। কিন্তু ভূত হইলে বর্ণ ভিন্ন আর কিছুরই পরিবর্তন হয় না। মনুষ্য অবস্থায় যে আকার, যে প্রকার যে বয়স ছিল তাহা সকলই থাকে কেবল বর্ণ পরিবর্তন হয়। সাহেবদের মধ্যে কাহাকে তাহারা দেখিলে কাজেই মনে করে, এই ব্যক্তি পূর্বে আমাদের মধ্যে একজন ছিল; মরিয়া এই দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ ভূত হইয়াছে। (Krumen call European the ghost-tribe.—Burton).

তাহাদের মধ্যে কেহ একজন মরিল, অমনি তাহারা নিশ্চয় বুঝিল যে, সাহেবদের মধ্যে একজন বাড়িল। সাহেবদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ইহা তাহারা অনেকে বিশ্বাস করে না। ভূত ত জন্মে না, তাহারা বলে মনুষ্য যে বয়সে মরে, প্রেতদশায় সেই বয়স প্রাপ্ত হয়। কাজেই সাহেবদের জন্ম হয় না। যদি তাহারা সাহেবদের শিশু দেখে, তাহা হইলে মনে করে অবশ্য তাহাদের কাহারো শিশু মরিয়াছিল। বৃদ্ধ সাহেব দেখিলে সেইরূপ মনে করে বুড়ার ভূত।

একবার অস্ট্রেলিয়া দেশে পুত্রশোকাকুলা একজন বৃদ্ধা (Sir George Grey) সর্ জর্জ গ্রেকে দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হয়। তাহার নিশ্চয় ধারণা হয় যে, তাহার মৃত পুত্র আসিয়াছে। অতএব সর্ জর্জ গ্রেকে বৃদ্ধা কতই আদর করিয়াছিল।

একবার টমসন সাহেবের মেমকে দেখিয়া অস্ট্রেলিয়ার একাংশের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই চিনিয়াছিল যে, কিছুদিন পূর্বে মেমসাহেব তাহাদের মধ্যে একজন ছিল, তখন মনুষ্য ছিল, জীবিত ছিল। একক্ষণে বেচারা আর মনুষ্যও নাই, জীবিতও নাই। খাঁটি ভূত হইয়াছে। বাস্তবিক তাহারা মনে করিতে পারে যে, শ্বেতকায় পুরুষেরা যদি ভূত না হবে, তবে তাহাদের এত ক্ষমতা, এত বৈভব কিরূপে হইল?

বন্যজাতিরা সাহেবদের কেন ভূত বলে তাহার কারণ (Bonwick) বনউক সাহেব এই অনুভব করেন যে, বন্যরা মৃত মনুষ্য আহারের পূর্বে ছাল ছাড়াইবার সময় দেখে যে, তাহার ভিতর সাদা। অতএব সাদাই যে ভূতের বর্ণ, ইহা তাহাদের নিশ্চয় বোধ হইয়া পড়ে।

আমাদের ভূতের শ্বেতবর্ণ কি কৃষ্ণবর্ণ তাহার নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু আমাদের মনুষ্য মরিলেই যে ভূত হয়, ইহার নিশ্চয়তা আছে। তাহারা দৌরাত্ম্য করে, গাছ ভাঙে, ছেলেপিলের ঘাড় ভাঙে। তবে বন্যজাতির ভূতের ন্যায় তাহারা রীতিমত সংসার করে না। বরং কিছু স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। বোধ হয় কিছু অন্নাভাব, পয়সা কড়ির বড় সংস্থান থাকে না। মৎস্য তাহারা বড় ভালবাসে অথচ তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না। কেহ কোথায় মৎস্য লইয়া যাইতেছে দেখি[...] তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 'দেনা দেনা' বলিয়া ছুটিতে থাকে। তদ্ভিন্ন আমাদের ভূ[...] গড়ন বড় সুন্দর নহে; ভাল ভাল লোকের মুখে শোনা যায়, তাহাদের পা দু[...] বাঁকা, আর তাহাদের হাসি বড় বিকট। কিন্তু এ সকল বিষয়ে সাহেব ভূতের [...] আছে; সুগঠন আবার অর্থেরও অভাব নাই। তাহাই বন্যরা বলে যে মরি[...]
They will jump up white men with plenty of six-pence [...] their pocket. (Spencer).

বিলাতী ভূত এখন সকল দেশেই ব্যাপিয়াছে, তাহাদের এখন জয়জয়কার। ইহ[...] কারণ আর কিছুই নহে, কেবল মাত্র তাহাদের বর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ অপকৃষ্টতার পরিচায়[...] কখনই কৃষ্ণবর্ণের জাতি পৃথিবীতে প্রধান হয় নাই। যাহারা চিরকাল এ পৃথিব[...] জয়ী, তাহাদের মধ্যে কোন জাতিই কৃষ্ণবর্ণ ছিল না। মিশর দেশে যাহারা [...] স্থাপন করিয়া কীর্তিপতাকা তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন না। আফ্রি[...] দেশে সকল জাতিই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু মিশরবাসীদের বর্ণ সুন্দর ছিল। তা[...] তাহাদের এত প্রতিপত্তি হইয়াছিল। আর্যেরা সাবেক আমলের প্রধান ছিলে[...] তাঁহারা সমুদায় ভারতবর্ষ ও ইউরোপ ব্যাপিয়া ছিলেন, সেই আর্যেরা শ্বেতব[...] ছিলেন। তাতার জাতিরা চীন রাজ্য জয় করিয়া তথায় বাস আরম্ভ করিয়া[...] তাতারীয়েরা কৃষ্ণবর্ণ নহে। কাফ্রিদের মধ্যে ডেংকা জাতির বিষয়ে সুইনফোর্ড সা[...] বলেন যে, তাহারা কৃষ্ণবর্ণ বটে, কিন্তু তাহাদের যাহারা পর্বতে বাস করে, তা[...] বড় কালো নহে, ডেংকা জাতির মধ্যে সেই পার্বতীয়েরাই প্রধান।

লিবিংস্টোন সাহেব বলেন যে, কেবল সূর্যের তাপে লোকে কালো হয় [...] সূর্যের উত্তাপ আর ভিজে হাওয়া এই দুই একত্রে মানুষকে কালো করে।...

বাংলায় উল্লেখ করিতে বড় কষ্ট হয়। সূর্যতাপ আর জলসম্পৃক্ত বায়ু বাং[...] যেরূপ ভয়ানক, সেরূপ অন্য দেশের দুর্ভাগ্যে কোথাও ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ[...]

বাংলার বায়ু কস্মিনকালে যে সংশোধিত হইবে না, এ মত ঠিক বলা যায়[...] দেখা যাইতেছে, কোন কোন দেশের বায়ু কৌশল দ্বারা কতকাংশে সংশো[...] হইতেছে।...

॥ ৭ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের স্নেহভাজন 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' পত্রি[...] সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাহিত্যসেবা এবং দেশসেবার কাজ ছাড়া [...] অভিনয়ের ব্যাপারেও খুব উৎসাহী ছিলেন। তাঁর প্রযোজনায় ও পরিচা[...] চুঁচুড়ায় তাঁর বাড়ির আশপাশে বহুবার বহু নাটকের অভিনয় হয়েছে। এ[...] দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'পি[...] পুত্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"পিতা যখন যশোহরে তখনই 'বঙ্গদর্শন' প্রচারিত হয়, 'সাধারণী' প্রকা[...] হয়।...পিতার যশোহরে থাকার সময়ের মধ্যে আরও দুই চারটি ঘটনা[...] তাহার মধ্যে একটির সাহিত্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখযোগ্য, দীন[...] প্রণীত 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয়। বঙ্কিমবাবুতে আমাতে লীলাবতীর এব[...] পরিবর্তন করি।... টুকরা-টাকরা পরিবর্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীন[...] বাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে, না হইয়াছে, না জানিয়া বলিয়াছিলেন—এক [...] শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঁ[...] ভাই, আর অক্ষয় ছেলে—ইহাদের ভালবাসি বলিয়া আমার শরীরে জ্বালা [...] নাই।

এই অভিনয় রঙ্গে ৭।৮টি গান ছিল। দুই একটি [...] কৃত, আর অ[...] গুলি সঞ্জীববাবুর রচিত। তাহার একটি উল্লেখ করা আবশ্যক, এক সময়[...] গানটি আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুরে, নাটোর, কলিকাতা এবং আমাদের [...] সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।

ঝিঁঝিট, খং

'আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার।
যত পেলে আঁখি-জল, তত সে হ'ল প্রবল,
এখন লতা-ভরে তরু মরে, কে করে বিহিত তার?'

এরপর অক্ষয়চন্দ্র এই প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন, অভিনয় রজনীতে দীনবন্ধু, নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং নাট্যা[...] দেখে প্রশংসা করেছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের এই লেখা থেকে একটা কথা ভালভাবে জানা গেল যে, সঞ্জী[...] গান রচনা করতেও পারতেন। সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত সেই গান নিয়েই এখন আলোচনা করছি—

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থাপিত 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থ[...] ও সংগ্রহশালায় একটি খামের মধ্যে একটি অতি ছিন্ন ও জীর্ণ ছোট্ট [...] আছে। এতে কয়েকটা গান রয়েছে। খাতায় গানের রচয়িতার কোন নাম [...] শুধু খামের উপরে বড় বড় করে লেখা রয়েছে—ঠাকুরদাদার লিখিত কীর্তন [...] আছি।

ঠাকুরদাদা এবং তাঁর এই নাতি, কারও নাম খাতায় না থাকলেও ঋষি ব[...] সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ হিসাবে আমি জানি, খামের উপরের লেখাটি সঞ্জীব[...] পৌত্র শতজীবচন্দ্রের। শতজীববাবু তাঁর পিতামহের স্বহস্ত লিখিত এই [...] খাতাটি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন এবং পরে তিনি অনেক জিনিসের সঙ্গে খাতাটিও সংগ্রহশালায় দান করেছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের যে লেখা আগে উদ্ধৃত করেছি, তাতে যে, 'আগে জানিতাম...' গানটির কথা আছে, সেই গানটিও শতজীববাবুর প্রদত্ত ঐ [...]

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

রয়েছে। তবে পাণ্ডুলিপিতে শেষ পংক্তির শেষটা—'কে করে, বিহিত তার' এর জায়গায় রয়েছে 'কে করে উদ্ধার'।

দেখছি, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসেও এক জায়গায় এই গানটি ব্যবহার করেছেন। সেখানেও তিনি এই গানের শেষটা আবার পরিবর্তন করে 'কে করে প্রতিকার' লিখেছিলেন।

'কণ্ঠমালা'র এই 'আগে যদি জানিতেম'... গানটির সঙ্গে আর একটি গান আছে। সেই গানটি এই—

প্রণয় আমার সাগর-জল, সে কি অনাদরে শুকাবার।
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি, না ভাতয়ে সাগর মাঝার॥
সখি! কত দূরে ভানু রয়, সাগর তাতে কাতর নয়।
পসারি সে অগাধ হৃদয়, তবু তারে দেয় উপহার॥

এই গানটিও শতজীববাবু প্রদত্ত সঞ্জীবচন্দ্রের গানের খাতায় রয়েছে। খাতার এই পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে গানটি সামান্য একটু অন্যরকম করে লিখেছিলেন। আগেই বলেছি, খাতাটি খুবই ছিন্ন। তবুও খাতা থেকে এই গানটির যতটা উদ্ধার করতে পেরেছি, তা এখানে উদ্ধৃত করছি—

প্রণয় মোর সাগর-তুল্য, সে কি অনাদরে শুখাবার।
বর্ষয়ে...অনল যদি, না তাতয়ে সাগর মাঝ
আমার হিয়ে সাগর সম, সে কি সহজে যায়
ভানু থাকে কত দূরে, তবু সিন্ধু মাঝে প্র...
তেমনি নাথ মূরতি সদা বিরাজছে হৃদয়ে আমার।

পাণ্ডুলিপির এই গানের সঙ্গে 'কণ্ঠমালা'র ঐ গান মিলিয়ে দেখলে, মনে হয়—পাণ্ডুলিপির গানটিই আসল গান। এই গানকে নিয়ে তিনি প্রসঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী সামান্য বদল করে কণ্ঠমালায় দিয়েছিলেন।

'কণ্ঠমালা'র এই গান দুটি ছাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের খাতায় আর যে সব গান দেখছি, সেগুলির কোনটিই তাঁর কোনও গ্রন্থে নেই। এসব গান তিনি রচনা করেছিলেন, প্রধানত নিজের খেয়ালেই, কারণ, তিনি নিজে গান জানতেন এবং গান ভালও বাসতেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ ছিন্ন গানের খাতাটি থেকে তাঁর রচিত যে কটি গান উদ্ধার করতে পেরেছি, সেগুলি এখানে দিচ্ছি—

প্রবল শক্তির মদ
না জেনে মজের কাজ
হৃদে তারে ধরিল মণি আদরে।

উচ্চ হাসি সৌদামিনী
ফাড়িল সে হৃদিখানি
ত্যজিল তুচ্ছ করে জলধরে।

গভীর গর্জি ঘন
কত কাঁদি পুনঃ পুনঃ
জানালে মরম জ্বালা সকাতরে।

* * *

মন সদা কি চায়,
অথচ জানে না তায়,
তবু ধায় না শুনে বারণ।

* * *

দেখিলে সোহাগী চাঁদে
মন যেন আমার কাঁদে
না জানি এ কিসের কারণ।

* * *

ফুলবালা তরু সাথে
গলাগলি করি থাকে,
বায় দোলায়ে যদি যায়।

অমনি নয়ন ঝরে
কেন কাঁদি কার তরে ঃ
কেন এত কুসুমে জ্বালায়।

* * *

ধীরে ধীরে মেঘ আসি
অতি আদরে সম্ভাষি
চাঁদেরে কি যেন বলে যায়।

লাজে হাসি যে প্রয়াসী
বদন ঢাকিয়া
ফিরিয়া ফিরিয়া কত চায়।

* * *

অন্তর আঁধার যার, জনম মরণ,
কেন বিধি দিল তার মরমে চেতন।
কেন মিছে কাঁদে হৃদি, সুখের আভাসে
আঁধারে আলোক ছায়া, আঁধারি প্রকাশে।

* * *

কাঁদিতে হইল যারে আজন্ম মরণ
আশা তারে কেন আর করে জ্বালাতন,
সুখের আভাষ পেলে
যন্ত্রণা আরও উথলে।
অভাগীর অভিমান সাথী সর্বক্ষণ।

* * *

আমি শয়ন সাজিব
মুরলি বাজাব ঃ
সকলে কাঁদাব
কাঁদিব না আর।

যাব চলি একা,
কারে দিব দেখা!
কে আছে রাধার!

সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত বহু অজ্ঞাত প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ এবং তাঁর রচিত গানও আবিষ্কার করে এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে দেওয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রের কয়েকটা অপ্রকাশিত পত্র এখানে দিচ্ছি—

কাঁটালপাড়ার ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের চারটি অপ্রকাশিত চিঠি আছে। চারটি চিঠিই ছিন্ন। তবে দুটি একটু ভাল, বাকি দুটি একেবারে শতছিন্ন। সেই চারটি চিঠিই এখানে উদ্ধৃত করছি। উদ্ধৃত করার আগে চিঠিগুলি বোঝার জন্য কয়েকটা কথা বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চাকরির যে বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়—সঞ্জীবচন্দ্র এই চাকরি পেয়ে প্রথমে কৃষ্ণনগরে যান। কৃষ্ণনগর থেকে যান পালামৌ। পালামৌ থেকে যশোহর, তারপর আলিপুর, শেষে পাবনা।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত একটি গান

বঙ্কিমচন্দ্র এও লিখেছেন, যশোহর জায়গাটা বড় অস্বাস্থ্যকর ছিল। সেখানে সঞ্জীবচন্দ্র সপরিবারে পীড়িত হয়ে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আসেন।

সঞ্জীবচন্দ্র পাবনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে সেখানে কিছু জমিজায়গাসহ একটা বসত বাড়ি কেনার মনস্থ করেছিলেন। এবং পুত্র জ্যোতিশের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য তাঁকে নিজের কাছে পাবনায় নিয়ে যাবেন কিনা, সে বিষয়েও চিন্তা করেছিলেন।

এই পাবনায় থাকাকালেই সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে স্থায়ী হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, তাতে অকৃতকার্যতার কারণ দেখিয়ে তাঁকে এই চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়।

এখানে পিতাকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের যে চারটি চিঠি উদ্ধৃত করছি, সেগুলি সবই পাবনা থেকে লেখা। চিঠিগুলি এই—

শ্রীচরণ কমলেষু,

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ,

কয়েক দিবস হইল এক পত্র পাইয়াছি। অদ্য আর একখানি পাইলাম। প্রত্যুত্তর লিখিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবার বিশেষ তাৎপর্য কিছুই নাই। কয়েক দিবস সর্দি হইয়া বড় অলস করিয়াছে। পাবনা যশোহরের ন্যায় মন্দ স্থান নহে। হাওয়া ভাল। কিঞ্চিৎ সাঁতসেঁতে স্থান মাত্র। যে বাসা লইয়াছি ইহার ভাড়া ১৭ টাকা। ইহা...মেরামত করিতে হইবেক। এ...৭৫ টাকা খরচ করিলে...অগত্যা তাহাই আরম্ভ করিয়াছি। এপ্রিল মাসের পরীক্ষা দিতে যাইয়া জ্যোতিশকে আনিব। কিন্তু সে আমাকে বলিয়াছিল, গত সন রথ তাহার দেখা হয় নাই। এই সন রথ না দেখিয়া আসিবেক না। গুরুন কি লক্ষ্মীর ন্যায় কোন মজবুত লোক না আসিলে জ্যোতিশকে এখানে আনিব না। অতএব গুরুনা...যদি কাশী যাত্রা নিতান্ত...তবে ইত্যবসরে তাহা সম্পন্ন করিয়া আইসে। জ্যোতিশের গরু আনা হইবেক না। কেননা, আনিতে বিস্তর খরচ পড়িবেক। রাধানাথ এক্ষণে আসিবার কি প্রয়োজন। জ্যোতিশ আসিলে আত্মীয় কাহাকে আনিবার প্রয়োজন বটে, অতএব সেই সময় আনা যাইতে পারে।

ধোপা কিঞ্চিৎ দয় যাহা বৃদ্ধির নিমিত্ত বলিয়াছিল। যতদিন জ্যোতিশের অপক্ক কা... ততদিন আমার হি... আট আনা বেশী কর মাহর দিলে... হইবেক।

এখানে চাউল ও মৎস্য বড় সস্তা, নতুবা সমুদয় মহার্ঘ।

এখানে ইংরাজি স্কুল আছে, কিন্তু আমার বাসা হইতে অনেক দূরে। তথায় জ্যোতিশকে পড়াইতে গেলে ১৮ কি ২০ টাকা দিয়ে বিহারা রাখিতে হইবেক। যদি জ্যোতিশকে আনা হয়...এক মাসের নিমিত্ত...বকে রাখা আবশ্যক হইবে। ১লা মার্চ, রবিবার

সেবক শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র

শ্রীচরণ কমলেষু,

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ,

আমি শারীরিক ভাল আছি। ২১শে মার্চ এখান হইতে রওনা হইব। বাসা অদ্যাপি খরিদ হয় নাই। ২০০ টাকা দর বলিয়াছে। মেটে প্রাচীর, দরমাহায় বেড়া, কিন্তক আম গাছ ও বেল ও খেজুর ও জমি আছে। তদ্ভিন্ন একটি পুষ্করিণীও আছে। জমি আন্দাজ ১০ বিঘা, মালগুজারি ২১ টাকা। মেরামত করিতে অন্ততঃ পক্ষে ৮০ টাকা পড়িবেক।

কাশী যাত্রা রহিত হওয়ায় বড় আপ্যায়িত হইলাম। ইতি ২০ মার্চ

সেবক শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র

শ্রীচরণ কমলেষু,

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ,

পূর্ব পত্রে নিবেদন......যে আগত ২৯... শনিবার বাটী যাইব।... হইল না।... পরীক্ষা দিতে...যাইবার 'গোষ্ঠযাত্রা...বাটী পৌঁছিব, এমত স্থির করিয়াছি। নিবেদন ইতি—২৪ মার্চ ১৮৬৮

সেবক শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র

শ্রীচরণ কমলেষু,

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ,

আমি শারীরিক...বাসায় আসিয়াছি।...না করিলে ইহাতে থাকা না। মেরামত ৬০/৭০ টাকা...না। ইহা কাইজন...মেরামত করিয়া...পালাতো গত দিবস...বিরল করেন উত্তম, নতুবা বাস করিতে...করিতে হইয়াছে এবং কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। পরিশ্রমের সীমা নেই।...

বলা বাহুল্য যে এখানে উদ্ধৃত চিঠি চারটির মধ্যেকার '...' চিহ্নিত অংশগুলি ছিন্ন। ছিন্ন হলেও চিঠির, এমন কি শেষের চিঠি দুটিরও বিষয় বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না।

প্রথম চিঠিতে যে রথের কথা আছে, সে রথ হল সঞ্জীবচন্দ্রদের গৃহ-দেবতা রাধাবল্লভের রথ। সঞ্জীবচন্দ্ররা চার ভাই মিলে তাঁদের মায়ের নামে এই রাধাবল্লভের রথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই রথ এবং রথযাত্রা উপলক্ষে রথের ৭ দিনের মেলা আজও সঞ্জীবচন্দ্রদের কাঁঠালপাড়ার বাড়ির সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় হয়ে থাকে।

তৃতীয় চিঠিতে যে গোষ্ঠযাত্রার কথা আছে, এই গোষ্ঠযাত্রাও রাধাবল্লভের একটি উৎসব। এই উৎসব আজও প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ তারিখে হয়।

কাঁঠালপাড়ার ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় পুত্র জ্যোতিশকে লেখাও সঞ্জীবচন্দ্রের অনেক চিঠি আছে। এই চিঠিগুলিতে পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশ, তিরস্কার, স্নেহমমতা প্রভৃতি সবই রয়েছে।

জ্যোতিশ একটু বেশি বয়সে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। তাঁর ছিল পুলিশ ইন্‌সপেক্টরের চাকরি। তিনি চাকরি নিয়ে প্রথমে গিয়েছিলেন নদীয়া জেলার মেহেরপুর শহরে।

জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের যে চিঠিগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি প্রায় সবই হয় জ্যোতিশের চাকরি পাওয়ার অল্প দিন আগের, নয়ত চাকরি পাওয়ার পরের সময়কার। এখন জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের কিছু চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

প্রাণাধিকেষু,

তোমার দুই পত্র পাইয়াছি। আমার বড় জ্বর হইয়াছিল। অদ্য কাছারি আসিয়াছি। বড় ক্লান্ত। কল্য তোমার ও তোমার ঠাকুরদাদার চিঠির অনুপূর্বিক জবাব দিব। মূল কথা আমার একেবারে ইচ্ছা নহে যে তুমি প্রথম চাকরিতে দেশের লোকের গালি খাইতে যাও। আ...র ন্যায় দুষ্কার্য আর নাই। লোকে গালি দেয়, গবর্নমেন্ট গালি দেয়। তোমার ছোট কাকার সহিত এ বিষয়ের কথা কহিলে জানিতে পারিবা। তোমার ঠাকুরদাদাকে বলিবা যে জেঠকাকার পরামর্শ লন। ইতি ১০ ডিসেম্বর

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির '...' অংশটি ছিন্ন হওয়ায়, জ্যোতিশ যে প্রথম কি চাকরি নিতে চেয়েছিলেন বা পেয়েছিলেন, তা জানা গেল না। জ্যোতিশের পুলিশ ইন্‌সপেক্টরের চাকরিটা যে নয়, সেটা ঠিক। কারণ, জ্যোতিশ এই চাকরি পেলে সঞ্জীবচন্দ্র খুশী হয়েই তখন জ্যোতিশকে চিঠি লিখেছিলেন।

জ্যোতিশ প্রথম কি চাকরি নিতে চেয়েছিলেন, আলোচ্য চিঠি থেকে সে কথা জানা না গেলেও, সঞ্জীবচন্দ্র যে ঐ চাকরি নিতে জ্যোতিশকে নিষেধ করেছিলেন, তা থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রের একটা উজ্জ্বল দিকেরই পরিচয় পাওয়া গেল।

প্রাণাধিকেষু,

তোমার অধ্যয়নের স্টেটমেন্ট পাই নাই।

ডাক্তার কানাইলালবাবুর নিকট একদিন দেখা করিয়া আসিবে।

যখন কলিকাতায় গিয়া থাক, তখন সুবিধা মত রাজকৃষ্ণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বঙ্গদর্শনের কথাবার্তা কহিবা। রবিবার ভিন্ন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

যদি বাবু সুরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ থাকে...মধ্যে গিয়া দেখা করিবে। ...মত লোকের সহিত আলাপ...progress সম্ভব থ...progress সম্ভব ত...বঙ্গদর্শনের উপর...তোমার গর্ভধারিণী নিত্য ঔষধ খাইতেছে কিনা লিখিবে। ঔষধ ফুরাইলে ঔষধ আনিতে ত্রুটি না হয়। ইতি ২২ ফেব্রুয়ারি—

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির '...' অংশগুলি ছিন্ন।

রাজকৃষ্ণবাবু হলেন সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইনি বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন এবং বঙ্গদর্শনে নিয়মিত লিখতেন। সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর বাড়ি ছিল কাঁঠালপাড়ার অদূরে ব্যারাকপুরের মণিরামপুরে।

জ্যোতিশ এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন; কিন্তু পাস করার পর দীর্ঘদিন কোন

চাকরি পান নি। চাকরির জন্যই মনে হয়, সঞ্জীবচন্দ্র জ্যোতিশকে সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।

জ্যোতিশ কর্মহীন অবস্থায় বাড়িতে বসে থাকার সময় সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর উপর বঙ্গদর্শন পত্রিকা দেখাশুনোর কিছুটা ভার দিয়েছিলেন। আর নিজের কর্মস্থল থেকেই জ্যোতিশকে বাড়িতে বসে পড়াশুনো করবার জন্য নির্দেশ দিতেন, কি কি বই পড়বেন, তাও বলে দিতেন।

প্রাণাধিকেষু,

অদ্য তোমার এক পত্র পাইলাম। কুইনাইন পাঠাইয়াছ লিখিয়াছ, কিন্তু পত্রে কুইনাইন ছিল না। যখন কুইনাইন পাঠাইবে শিশি সমস্ত বাটীতে আনিও না। অন্দর হইতে পুরিয়া বাঁধিয়া আনিবে। সদরে আনিলে চুরি যায়। তদ্ব্যতীত আবার অন্দরে পাঠাইবার নিমিত্ত লোক ডাকিতে হয়। সময়ও নষ্ট হয়।

Rollinর ancient Historyর কত পাঠ পড়িয়াছ লিখিবে। কিরূপ কঠিন বোধ হইতেছে তাহাও লিখিবে। তুমি প্রতি সপ্তাহে কতটা পড় তাহার এক তালিকা সহ আমায় লিখিয়া পাঠাইবে। কদাচ অন্যথা করিও না। যে সপ্তাহে কিছুই না পড়িতে পার তাহাও আমাকে লিখিবে।.....

প্রাণাধিকেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। হিসাব পাঠাও নাই। তোমার ঔষধের নিমিত্ত কদাচ তোমার ঠাকুরমহাশয়কে বলিবে না। সংসার খরচের যে টাকা পাঠাইব তাহা হইতে খরচ করিবে। অধিক টাকা পাঠাইতে পারিব না। মিরর আপিসে ১৬ টাকা, মেটকাফ হলে ৬ টাকা মোট ২২ টাকা অতি অবশ্য পাঠাইতে হইবে। বাকি ৮ টাকা... ও অন্যান্য খরচে যাইবে। কাজেই ১০০ টাকার অধিক পাঠাইতে পারিব না। এবার জন্মাষ্টমীর সময় বাটী যাইব স্থির করিয়াছিলাম, তাহাও হইবে না।... খরচ হাতে থাকিবে না। একশত টাকা পাঠাইব......

...সরকারী কার্য অতিশয় বাড়িয়াছে। দুবার করিয়া কাছারি যাইতে হইতেছে। একবার... হইতে সাড়ে নটা পর্যন্ত, আবার সাড়ে এগারটা হইতে সাড়ে ছটা পর্যন্ত। কাজেই আর আমি অন্য কিছু পড়িতে বা লিখিতে পারিতেছি না। কিন্তু বোধ হয় শীঘ্রই সাবকাশ হইতে পারে। ঘড়ির চাবি পাইয়াছি। ইতি ২৯ জুলাই ১৮৭৯

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র

উপরে উদ্ধৃত দুটি চিঠিরই '...' অংশগুলি ছিন্ন।
সঞ্জীবচন্দ্র এই সময় যাশোহরে স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন।

জ্যোতিশ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ নদীয়া জেলার মেহেরপুরে পুলিশ ইনস্পেকটরের চাকরি পান। এর কয়েক বছর আগে সঞ্জীবচন্দ্র নিজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং কাটালপাড়ার বাড়িতেই বসে থাকতেন। বঙ্গদর্শনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ঐ সময় সঞ্জীবচন্দ্র বাড়ি থেকে জ্যোতিশকে তাঁর চাকরির ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে যে সব চিঠি দিয়েছিলেন, তার কয়েকটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

প্রাণাধিকেষু,

তোমার পত্র পাইয়া চিন্তা দূর হইল। জ্বরের সংবাদ নিত্য লিখিতেছিলে, হঠাৎ কল্য পত্র বন্ধ হওয়ায় বড়ই ভাবিত হইয়াছিলাম।

কৃষ্ণ নামক যে ব্যক্তির দ্বারা তোমার নিকট দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলাম, তাহার বাটী আলমডাঙ্গার এলাকায়। পৌষ পার্বণ উপলক্ষে সে বাটী যাইতেছিল, তাহাই উহার দ্বারা দ্রব্য পাঠাইয়াছিলাম। সে এখানে আইসে নাই, সোমবারের পূর্বে আসিবার কথাও নহে। সে এখানে আসিবে নিশ্চয়, কেননা সে এখানে খাটিয়া খায়। কাহার কাহার নিকট তাহার পাওনাও আছে। তাহাকে আমি ৯ই জানুয়ারি পাঠাই নাই, ১০ই জানুয়ারি পাঠাইয়াছিলাম। পরে তারিখ লিখিতে আমার ভুল হয়, এইজন্য বারও লিখিয়া দিয়া থাকি। পরে মঙ্গলবার লিখিয়াছিলাম, পাঁজিকা দেখিলাম মঙ্গলবার ১০ই ছিল। সুতরাং সে ১১ই পৌঁছিয়াছে। তাহার জলপানি, পারানি সকলই দিয়াছিলাম। তবে যে সে কেন সাড়ে চারি আনা লইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় মোটটা গাড়ি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাই এই অতিরিক্ত খরচ পড়িয়াছে। সে ব্যক্তি জুয়াচোর নহে, ভাল মানুষ। তবে পাছে তাহার বাটী যাইবার ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়ে সে তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছে।

তেহাটা এলাকায় গিয়া যে লাস তদারক করার পরিচয় লিখিয়াছ, তাহা অতি ভয়ানক। কিন্তু তথাকার সাবইনসপেক্টর লাস ময়না করিয়া পোস্টমর্টেন একজামিন জন্য পূর্বে পাঠায় নাই কেন? চারি দিন ফেলিয়া রাখায় লাস পচিয়া গিয়াছিল। পোস্ট মর্টেম একজামিনেশন তো আর হইবে না। তবে এখনকার প্রথা কি, বিধি কি তাহা জানি না। তোমার ঐ পচা লাস দেখিয়া যত ঘৃণা হইয়াছিল, সকলের তত হয় না। ডাক্তারবাবুরা যাঁহারা আমাদের সঙ্গে সেক হ্যাণ্ড করেন, একত্রে বসেন, আহার করেন অথবা আহার করান, তাঁহারা ঐ পচা মড়া কেবল দেখেন এমন নহে, দুই হাতে ঘাটেন। সকলই অভ্যাসের কার্য। ডাক্তারদের নিকট শুনিয়াছি যে, মেডিকেল কলেজে নাম লেখাইয়া অনেকে প্রথম প্রথম 'ডেড হাউস' প্রবেশ করিতে সাহস করে না। টেবিলের লাস কতকগুলো পড়িয়া আছে দেখিয়া দ্বার হইতে পলায়ন করে। তাহার পর ক্রমে ঘরে প্রবেশ করে, ক্রমে মৃতুকায় স্পর্শ করে, তাহার পর শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় মড়া টানাটানি করে অর্থাৎ
they quarrel with each other for their 'subject' which is

সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত একটি গান

generally a part of the body—a limb for instance, in which subject they are to be lectured on the next morning.

এখন পুলিশ স্বতন্ত্র হওয়ায় কেবল তোমাদেরই এই কষ্ট পাইতে হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগণ অব্যাহতি পাইয়াছেন। পূর্বে তোমার ন্যায় কষ্ট সাবেক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা পাইতেন। আমাদের পরম বন্ধু শ্রীনাথ ঘোষ গল্প করিতেন যে, তিনি যখন উড়িষ্যার জজকে থাকিতেন, তাঁহার মাতা শ্রীক্ষেত্র যাইবার উপলক্ষে তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। সেই সময় এক পচা লাস তাঁহার কুঠিতে চালান আসিল। পচা গন্ধে কমপাউণ্ড ভরিয়া গেল। স্ত্রীলোকের জানালায় জানালায় ছুটোছুটি করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মাছি সেই জানালার পথ দিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। শ্রীনাথ বাহিরে গিয়া দেখেন—পচা মড়া। তাহা তাহাকে ময়না করিতে হইল। তাঁহার মাতা এই ব্যাপার জানিয়া চাকরি ছাড়িবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। কুঠীতে তুলসী দিলেন।

তুমি প্রথমেই পচা মড়া দেখিয়াছ, তাহাই তোমার এত যন্ত্রণা হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে দেখিলে এত ভয় হইত না। উহা ভয় নহে নারভাসনেস, আর অনভ্যস্ত কুদৃশ্য দর্শনজনিত ঘৃণা। কখন মন্দ জিনিস দেখ নাই, তাহাই এত যন্ত্রণা হইয়াছিল। মাঠে ঘাটে পচা গরু পচা কুকুর দেখিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা সামান্যক্ষণের নিমিত্ত। তাহাও দূরে হইতে দেখিয়াছ। বিশেষত সে দেখা ইচ্ছাধীন। দেখিতে ইচ্ছা না হইলে না দেখিতে পার। তাহাই তাহাতে এত ঘৃণা হয় না। ইহার কথা স্বতন্ত্র। তুমি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছ, তাহাতে আমারই যন্ত্রণা হইয়াছিল। না জানি তোমারই কত যন্ত্রণা হইয়া থাকিবে। এই যন্ত্রণা পাইয়াও যে তুমি তোমার কর্তব্য কার্যের ত্রুটি কর নাই, এই আমার পরম সুখ।

ভয় পাইও না। ভয় থাকিবে না। যে স্পিরিচুয়াল ইনটারফিয়ারেন্স দ্বারা তুমি চাকরি পাইয়াছ, সেই সোর্স হইতে তোমার এই সকল শিক্ষা ও অভ্যাস আরম্ভ হইয়াছে। তোমার ছোট কাকার বিদেশ যাওয়া এইরূপ ইনটারফিয়ারেন্স। কাটালপাড়া ছাড়িয়া তিনি কখনই বিদেশে যাইতে পারিবেন না, তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল। সর্বদাই তাঁহার রুগ্ন দেহ, বৈঠকখানায় পড়িয়া থাকিতেন। এক মুখ নিষ্ঠিবন আর কর্ণের গুজ বাহির করিবার জন্য হস্তে কাগজের পলিতা থাকিত। রঙ্গপুর দিনাজপুরে গিয়া লোকে কিরূপে বাঁচে ইহা সর্বদাই বলিতেন। যে স্পিরিচুয়াল ইনটারফিয়ারেন্স দ্বারা তাঁহার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইল, সেই ইনটারফিয়ারেন্স দ্বারা তাঁহাকে কাটালপাড়া ত্যাগ করিয়া এ পর্যন্ত থাকিতে হইয়াছে। এখন তাঁহার শরীর স্বচ্ছন্দ, যেখানে গবর্নমেণ্ট পাঠান সেইখানে যান, বিদেশে আর তাঁহার ভয় নাই। তোমারও সেই শিক্ষা হইতেছে। যাহাতে তোমার বিশেষ ভয়, তাহাই ঘটাইয়া তোমায় ভয় ভাঙ্গা করা হইতেছে। তুমি রাত্রিতে বৈঠকখানা হইতে অন্দরে যাইতে সর্প ভয়ে লণ্ঠন ধরিয়া যাইতে। এখন তোমার একা অন্ধকারে জেল দেখিতে যাইতে হয়। পীড়ার সময় সামান্যতে ভয় পাইতে আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হয়া থাকিতে, এখন তোমার নিকট পীড়ায় সময় কে থাকে? দুই একজন বিদেশী। এইরূপ তোমার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাই বলিতে ছিলাম ভয় পাইও না, ভয় থাকিবে না।

অ্যাডমিনিসট্রেশন রিপোর্টে তোমার সুখ্যাতির কথা বিশেষ রূপে আছে দেখিয়া বড় তুষ্ট লাভ করিলাম। তুমি সর্বদা থানা তদারক কর নাই বলিয়া একটু অখ্যাতি লিখিয়াছে। আর বোধ হয় তুমি ঘোড়ায় যাতায়াত কর না, একথা সুপারিনটেনডেণ্ট শুনিয়া থাকিবে কিন্তু what works he performs is unusually good এই রিমার্ক সত্য সত্যই আশার অতীত। unusually good লিখিতে গেলে হয়ত তোমার পক্ষপাতী বলিয়া উপরওয়ালার সন্দেহ হইতে পারে, এই জন্য একটু নিরপেক্ষতা দেখান হইয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক তুমি এই দুই মাস বিশেষ মনোযোগী হইয়া সকল থানাগুলি দেখিয়া বেড়াও, তাহা হইলে সকল দোষ খণ্ডিবে। অ্যাডমিনিসট্রেশন রিপোর্ট সম্বন্ধে ধরিয়ারক মঙ্গলবার দিন গিয়া দেখাইব। তিনি যাহা বলেন পরে লিখিব। ইতি ১৪ জানুয়ারি, শনিবার

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাণাধিকেষু,

চাকরির স্থান মনের মত হয় না।...তুমি সুন্দর স্থান পাইয়াছ। এরূপ লোকে পায় না। সর্প ভয় কোথায় না আছে? দুই মাস কি এক মাস পরে সে ভয় একেবারে থাকিবে না। ব্যাঘ্র ভয় গ্রাহের মধ্যেই নহে। কয়টি ভদ্রলোককে বাঘে লইয়াছে? তুমি কখন মাতৃক্রোড় ছাড় নাই, তাহাই ভয় পাইয়াছ। দুই তিন মাস পরে দেখিবে তোমার কোন ভয় থাকিবে না। তোমার ভয় তোমার Subordinateরা জানিতে না পারে, জানিলে তাহারা advantage লইবে ও তোমার prestige যাইবে।...

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাণাধিকেষু,

যেখানেই যাও ভয় ভূতা আছেই, তাহাতে ভয় পাইও না। যিনি অভাবনীয় কৌশলে তোমায় চাকরি দেওয়াইয়াছেন, তিনি অচিন্তনীয় কৌশলে তোমায় রক্ষা করিবেন। তিনি এখন তোমার সহায়, কাজেই এখন তোমার কোন ভাবনা করিবার কারণ নাই। তোমার বড় ভয়, এই জন্য তোমায় ভয়ানক স্থানে লইয়া গিয়াছেন। সেইখানে তোমার ভয় ছাড়াইবেন। তোমার ছোট কাকার বড় ভয় ছিল। কাঁটাল-পাড়ার বাহিরে একদিনের জন্য বাস করিতে তাঁহার সাহস হইত না। তাহার পর যখন উপরোক্ত লিখিত unknown mysterious agency তোমার ছোট কাকার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, তখন এক ডেপুটি মেজেস্টারি দিয়া তোমার ছোট কাকাকে দিনাজপুরে রঙ্গপুরে লইয়া গিয়া এরূপ train up করিলেন যে আর পূর্বে কাঁটাল-পাড়ার নাম করে না। যেখানে সেখানে পরিবার লইয়া থাকে।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। কুষ্টিয়া তোমায় যাইতে হইবে বুঝিতেছি। ওজর করিলে কিছু হইবে না। লাভের মধ্যে ওজর করিলে সাহেব বিরক্ত হইবে এবং তাহার ধারণা থাকিবে লোকটা বড় ওজরি। এই জন্য ঈশ্বরবাবু তোমায় উপদেশ দিয়াছিলেন never contradictnor controvert। ছোট মহকুমা হউক, বা বড় মহকুমা হউক উভয়ের মধ্যে কেবল পরিশ্রমের প্রভেদ। নতুবা কার্যের জাতি একই প্রকার। এখন পরিশ্রম করিতে কেন্দ্রী ভয় পাইবে। অতএব কুষ্টিয়া স্বচ্ছন্দে যাইবে। মেহেরপুর অতি কুস্থান আমি বিশেষ জানি। রাসবিহারীবাবু অতি...লোক, তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিবে। তিনি কি শিখাইলেন, না শিখাইলেন সে বিষয় কিছু মনে করিবে না। এ সকল কার্য কেহ শেখায় না। লোকে আপনি শিখে। লোকের কাছে যাহা শিখিতে হয়, তাহা কার্য প্রণালী। তাহা manual ও আইনে পাইবে। তদ্ব্যতীত যাহা জানা আবশ্যক তাহা experience। ...ইতি বৃহস্পতিবার ১৬ ভাদ্র, ১২৯৪

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

p s তোমার সেজকাকার এক পত্র পাইয়াছি, অত্র পত্র মধ্যে পাঠাইলাম।

চিঠির 'তোমার সেজকাকা' হলেন—জ্যোতিশের সেজকাকা বঙ্কিমচন্দ্র।

এই চিঠির এবং আগের চিঠি দুটির '...' অংশগুলি ছিন্ন।

প্রাণাধিকেষু,

তোমার রেজেস্টারি পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। কখন অন্য অন্যের ঘোড়া চড়িও না। কোন ঘোড়া লাগাম টানিলে থামে, কোন ঘোড়া লাগাম ছাড়িলে থামে, কোন ঘোড়া তোপের শব্দে ভয় পায় না, আবার কোন ঘোড়া হাত-তালির শব্দে ভড়কিয়া পলাইতে যায়। কোন ঘোড়া ভয়ানক দৃশ্য দেখিলে ভয় পায় না, কোন ঘোড়া পথে গোবরের তাল দেখিলে ভড়কিয়া উঠে। সুতরাং বিশেষ পরিচিত ঘোড়া না হইলে চড়িও না। যদি একান্ত ঘোড়া চড়িতে হয়, তবে নিজে একটি ঘোড়া কিনিয়া চড়িবে। কিনিতে গেলে লোকদ্বারা বিচার করিয়া কিনিতে হইবে। আমি তাহার চেষ্টায় থাকিলাম।

...অতি ভয়ানক নির্বোধ। আমি বহু কাল অবধি জানি। তাহার নিকট কার্যও করিয়াছি। আমায় কে ভয় করে না, কে গ্রাহ্য করে না, এই সতত তাহার অনুসন্ধান। কিরূপে অনিষ্ট করিব এই সতত ভাবনা। অনিষ্ট করিবার জন্য যদি সত্যমিথ্যা কথা রচনা করিতে হয়, সে তাহা করিবে। আবার তেমনি হালকা সকলের কাছে সকল পরিচয় দিবে। অদ্য শত্রু, কল্য মিত্র। তাহার পর আবার শত্রু, অব্যবস্থিত চিত্ত। উহার অনুগ্রহও ভয়ানক। উহাকে বিশ্বাস নাই, সতর্ক থাকিবে। আমি তাহাকে গ্রাহ্য করিতাম না বলিয়া সে আমার অতিশয় অনিষ্ট করিয়াছিল, বোধ হয় এখন তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কৈফিয়তের উত্তর সন্তোষ না হইলেও আপাতত কোন দোষ হইবে না। ড্রাফ্‌ট কল্য পাঠাইব। যদি কোন গতিকে বিলম্ব হয়, তবে নিজে একটা জবাব দিও। কিন্তু সাবধান, ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট যে একটা ইনসপেকসন রিপোর্ট কুষ্টিয়ায় লইয়া গিয়াছিলেন, একথা তাহাতে যেন কদাচ না থাকে।

মুর্শিদাবাদে কেন যাইতে হইবে? Co-operation meeting System কি? যদি মুর্শিদাবাদ যাইতে হয়, তবে এই পথ দিয়া গেলে সুবিধা হয় না।... থানা শুনিয়াছি, চুয়াডাঙ্গা হইতে তিন ক্রোশ। তাহা যদি হয়, তবে ঐ থানা Inspect করিয়া চুয়াডাঙ্গা হইতে নৈহাটী আসিয়া, আবার নৈহাটী হইতে হুগলী দিয়া নলহাটী স্টেশন পৌঁছিয়া, তথা হইতে Branch line দিয়া আজিমগঞ্জ পৌঁছান যায়। আজিমগঞ্জ হইতে ক্ষুদ্র গঙ্গা পার হইয়া জিয়াগঞ্জ হইতে ঘোড়ার গাড়িতে অথবা নৌকাতে মুর্শিদাবাদ অল্প সময়ে পৌঁছান যায়। সময় আর অর্থ দুই বিবেচনা করিতে হইবে। যদি এই পথ অপেক্ষা মেহেরপুর হইতে ... গরুর গাড়ির পথ সুবিধা ও সত্বর হয়, তবে সেই পথেই যাইবে। আমি একবার অপরাহ্নে বেলা ৫টার সময় বাটীতে বাহির হইয়া হুগলীর গাড়িতে উঠিয়া পর দিবস বেলা ১০টার সময় মুর্শিদাবাদ পৌঁছাই অর্থাৎ ১৬ কি ১৭ ঘণ্টায়। ইহার উপর মেহেরপুর হইতে নৈহাটী আসার আর ১৬ কি ১৭ ঘণ্টা যোগ দিতে হইবে। এই ৩৪ ঘণ্টায় তুমি direct পথে পৌঁছিতে পারিবে? তাহা বিশেষ হিসাব করিতে হইবে, যেন আবার কৈফিয়ত না দিতে হয়। তোমার নিকট টাইম টেবিল আছে, দেখিয়া হিসাব করিবে।

অপরাহ্নে প্রত্যহ একটু করিয়া মাথা ধরিত লিখিয়াছিলে, তাহা গিয়াছে কিনা লিখিবে। শরতের একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। প্রসব সময়ে শরৎ মরণাপন্ন হইয়াছিল। শচীর একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। ভাল আছে। আমার আর উদরাময় নাই। বালক-বালিকারা সকলেই ভাল আছে। ইতি ৩রা ফেব্রুয়ারি

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির '...' চিহ্নিত অংশগুলি ছিন্ন। চিঠিতে সঞ্জীবচন্দ্র জ্যোতিশকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার জন্য হুগলী দিয়ে নলহাটী হয়ে যাওয়ার কথা যে বলেছেন, তার কারণ তখন শিয়ালদহ থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত মাত্র ট্রেন ছিল। মুর্শিদাবাদ বা লালগোলা পর্যন্ত ট্রেন পরে হয়।

চিঠির শরৎ হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবী, আর শচী হলেন সঞ্জীবচন্দ্রের বড়দা শ্যামাচরণের পুত্র।

14 Sept '87

My dear Jyotish,

I intend to take your old mother to N. W. as soon as she gets over the curbuncle. She absolutely requires the change, at least such is the opinion of the doctors. So you had better come down and take your family to Meherpur......I think if you can obtain an indulgence of a casual leave for four or five days during the vacation it would be all right, as in that case you might meet your uncles. Bankim and Purna who have not seen you long since. Children are doing well.

Sanjib Chunder Chatterjee

প্রাণাধিকেষু,

পৈত্তিক জ্বর বলিয়া তাচ্ছিল্য করিও না। উহা হইতে সকল জ্বরই হইতে পারে। আপাতত একটু করিয়া প্রাতে চিরতার জল খাইলে ভাল হয়; কিন্তু তাহাতে অরুচি জন্মে। বিপিনের উপাধি কুণ্ডার। ঠিকানা কলেজ স্ট্রীট। বাটীর নম্বর আমার স্মরণ নাই। পরে জানিয়া লিখিব। কিন্তু তুমি যদি পত্র লিখিয়া লেফাফা আঁটিয়া আমার পত্রের মধ্যে পাঠাইয়া দেও, তাহা হইলে আমি নিজে গিয়া বা আর কাহাকে পাঠাইয়া প্রেসক্রিপশন লেখাইয়া বা ঔষধ লইয়া ডাকে পাঠাইয়া দিই।

রঙ্গপুরের এলাকা অধীন কাকিনার জমিদার মহিমারঞ্জনবাবুর মেনেজারি বড়বাবু পাইয়াছেন। তিনি একজন পুরাতন বিজ্ঞ ডিপুটি কালেকটর বলিয়া মহিমারঞ্জন তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়াছিল। অদ্যাপি রওনা হয়েন নাই।

এখন বদলির জন্য কদাচ দরখাস্ত করিও না। প্রথমে Confirmed হও, তাহার পর দরখাস্ত করিও। তোমাদের...সাহেব ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন। ১৮ মাস ছুটি লইবেন। কে তাঁহার স্থানে হয় তাহার এখনও ঠিকানা হয় নাই।

করিমপুর হইয়া মুর্শিদাবাদ যাও, ক্ষতি নাই। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় নলহাটী হইয়া এই পথে আসিলে ভাল হয়। এত দিনের পর তোমায় দুই ঘণ্টার জন্যও যদি তোমার গর্ভধারিণী একবার দেখিতে পান তাহা তিনি স্বর্গ বোধ করিবেন। কিন্তু তাঁহাকে একবার দেখা দিবার জন্য যেন সরকারী কাজে কোন ত্রুটি না হয়, বা অধীন লোকেরা কিছু যেন কথা কহিবার না পায়।

গত পরশ্ব লোক পাঠাইয়াছি। কল্য পৌঁছিয়া থাকিবে। ইতি ২৭ ফাল্গুন

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিপিন কুণ্ডার সেকালে কলকাতার একজন নামকরা চিকিৎসক ছিলেন। ইনি কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। চিঠির 'বড়বাবু' হলেন সঞ্জীবচন্দ্রের বড়দা শ্যামাচরণবাবু।

প্রাণাধিকেষু,

অদ্য তোমার এক পত্র পাইলাম। পূর্বে গোষ্ঠ বিহারের দিন আর একখানি পাইয়াছিলাম। তাহার পূর্বদিন রাত্রে অমাবস্যার জ্বরে অভিভূত হইয়াছিলাম সুতরাং গোষ্ঠ বিহারের দিন যে পত্র পৌঁছে আমি তাহা পড়িতে পারি নাই। সেদিন বঙ্কিম উপস্থিত ছিলেন, তিনি পড়িয়াছিলেন। তিনি সময়ান্তরে বলেন যে, কোন বিষয় Post Cardয়ে লিখিতে হয় জ্যোতিশ অদ্যাপি তাহা শিখে নাই। যাহা জগতের যে কেহ শুনিলে ও জানিলে ক্ষতি নাই, তাহাই Post Cardয়ে লিখিলে হানি নাই। কিন্তু যে বিষয় জ্যোতিশ Cardয়ে লিখিয়াছে, তাহা ভিতরের কথা। তাহা অতি গোপন রাখিতে হইবে। জ্যোতিশ তাহা বালকের মত Post Cardয় রাষ্ট্র করিয়াছে। এত কাঁচা এত হালকা যে, সে কখনই ভাল Police officer হইতে পারিবে না।

তোমার জ্যাঠামশায় অদ্যাপি এখানে। বোধহয় সে চাকরি তাঁহার হয় নাই। আমার পালিক জ্বর কিছুতেই ভাল হইবার নহে। ডাক্তারিতে তাহার ঔষধ নাই। কিন্তু এ জ্বর ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল থাকে না।

তোমার permanent হওয়ার এখনও কোন সংবাদ নাই কেন? বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তোমার transfer cancel হওয়ায় বড় আনন্দিত হইলাম।

সকলে ভাল আছি। অনিল ও কিরণ উত্তম লেখাপড়া করিতেছে। ইতি ৪ বৈশাখ

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির অনিল হলেন জ্যোতিশের কন্যা অনিলা সুন্দরী, আর কিরণ জ্যোতিশের পুত্র চিরঞ্জীবচন্দ্র।

প্রাণাধিকেষু,

সকলে ভাল আছি। অনিল ও কিরণ উত্তম লেখাপড়া করিতেছে।

গত কল্যর পত্রে তোমার permanent হওয়ার বার্তা জানিয়া সকলে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আহ্লাদে তোমার প্রসূতি অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছেন। এতদিনে স্থির হইল, তুমি আর অন্নকষ্ট পাইবে না। তোমার uncles-দের রূঢ় কথা শুনিতে হইবে না।

তোমার ছুটির পরামর্শ পরে হইবে। এখন সকলে দুই দিন আহ্লাদ করুক। নিত্য আমার পীড়ার কথা কেন লেখ বুঝিতে পারি না। যখন যেমন থাকি, তাহা লিখিয়া থাকি। পীড়াই বা কি? বুড়া বয়সের পীড়া মাত্র: কখন থাকে, কখন যায়। ছেলেরা সকলেই ভাল আছে।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(ক্রমশ)

Dipy's
MIXED FRUIT JAM
HERBERTSONS LIMITED
ডিপি'র জ্যাম
কি দিয়ে তৈরী?
পাঞ্চগনির স্ট্রবেরী, রত্নগিরির আম,
এলাহাবাদের পেয়ারা, ত্রিচুরের আনারস,
দাজাপুরের পেঁপে আর জলগাঁও-এর কলা।
সূর্য্য-কিরণে পরিপক্ক পুষ্টিতে ভরপুর প্রতিটি ফল
বাছাই করে এনে তৈরী হয়— ডিপি'র
মিক্সড ফ্রুট জ্যাম।
ডিপি'র মানেই সেরা জিনিষ!
ডিপি'র রকমারি জ্যাম: এপ্রিকট, ম্যাংগো, মিক্সড ফ্রুট,
পাইনঅ্যাপল, রাস্পবেরী, স্ট্রবেরী, অরেঞ্জ মামালেড
আর গোয়াভা জেলি।
ডিপি'র জ্যাম- এক রসালো অভিজ্ঞতা!
daCunha/DIP/19 BEN

পুনশ্চ পারী

নীরদ মজুমদার

॥ চৌত্রিশ ॥

সেটা ছিল একটি উইকএন্ড। আমরা সপরিবারে গিয়েছিলাম বুলারে। বাগান-ঘেরা বাড়ি। মামীদের পৈত্রিক সম্পত্তি। এদিকে ওদিকে বন-বাদাড়। আশেপাশে ছোট ছোট গ্রাম। বেশ উঁচুনিচু পাহাড়ী গ্রামের মত। জায়গাটা পারী থেকে বেশি দূরে নয়, প্রায় আশি কিলোমিটারের মত হবে। ইদানীং ওখানে ট্রেন যায় না। স্টেশন বলতে একটি হল্ট মাত্র। নামটা মিষ্টি—তুলি বুলার। আমরা সকলে নেমে মেঠো পথে হাঁটা দিতে শুরু করলাম। দানিল, রবের, মার্গারীট, ফ্রাঁসওয়া, মামী ভাভিএভ ও ভাক্তার লুসিয়া। কোলে দমিক। সবার হাতে ঝুড়ি খাবার-দাবার, জল, ওয়াইন ইত্যাদি। পথ কিন্তু বেশ ওঠানামা। চড়াই-উৎরাই, ঝোপঝাড় পার হয়ে চলে গেছে। কোথাও কোথাও পাখি দেখা যায়। নজরে পড়ে কখনো বা ভীত ত্রস্ত দুই-একটা খরগোশ। তাদের তুলতুলে দেহ লাফাতে লাফাতে ঝোপঝাড়ে অন্তর্হিত হচ্ছে।

এ গ্রামের বাড়িটা মামী আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। বলে গেলেন পুরাতন স্মৃতি-বিজড়িত ঘটনার কথা।

তখনও বেশ শীত। আমরা গাছতলায় টেবিল পাতলাম। খাওয়াদাওয়া অপর্যাপ্ত। খোলা সূর্যালোকিত আলোছায়া তলায় খুব আনন্দদায়ক মনে হয়েছিল। মামী অবশেষে গরম কফি পরিবেশন করলেন। খুব একটা ভাল খাওয়াদাওয়ার পর সব থেকে তৃপ্তিদায়ক হল গল্প শোনা। সবাই ধরে বসলাম মামীকে তাঁর বাল্যকথা বলতে।

এই একটা বিষয়ে মামীর কোনদিন কোন ক্লান্তিবোধ নেই। বাল্যের কথায় মামীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আসলে মামী 'বেল এপক' বা সুন্দর কাল বা অধ্যায়-এরই মেয়ে। এই অধ্যায়ের শেষ ১৯১৪ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

মহাযুদ্ধ হলেও তখনও বেশ কিছুটা মানব-মনের ছাপ রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে বর্তমান ছিল—১৯১৬ সালে অন্য সব যোদ্ধাদের মত প্রাপ্য ছুটির 'পারমিসিও' পেয়ে চীন রণাঙ্গন থেকে মহাশয় মুরুঝেল দেশে ফিরে এলেন। পনের দিনের ছুটি মাত্র। মামীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন সেই ছুটিতে। মামীর বয়স তখন একুশ-বাইশ হবে। সব জেনেই অতএব মামীর মানসিক উচ্ছ্বাস উস্কেলতা বেল এপকের কালের মানুষজনের মতো।

ঐ অধ্যায় ফরাসী সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সূর্যকরোজ্জ্বল। বহু কিছু মহান অবদান ফরাসীদের ঐ কালে। ঐ সময়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা ইতিহাসে বিরল প্রতিভা। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর প্রতিভা বলতে যা বুঝি তা ঐ বেল এপকের সময়-কার। পরবর্তী কালে আকাশে এমন জ্যোতিষ্কের সমাবেশ প্রায় বিরল। মামীর মুখের ভাষায় জীবন্ত হয়ে উঠল সেকাল। মানুষ 'হাই-লাইফ' কাতর।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পারীতেই প্রথম সার্বিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তারপর 'পোঁ-আলেক্সান্দ্র' তৃতীয় সেতু নির্মাণ, যা এখনও সেন নদীর উপর এক অভিনব সৌন্দর্য। এই সময়েই লুই দ্য সাপাঁভিয়ের রচনা, গীতধর্মী অপেরা 'কমিক ক্রোদিন আ লেকোল' উন্মোচন করেছিল পারীকে।

দ্বিতীয় অলিম্পিক সূচিত হয় পারীতেই। ঐ কালেই কবি শার্ল পেগী প্রকাশ করেন তাঁর খ্যাতনামা পত্রিকা 'ক্যাইয়ে দ্য লা ক্যাঁজেন'। ঐ কালেই ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বগত স্বপ্নের বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়। আবার এদিকে ইতালির রাজা হুম্বের-প্রথমকে এক অ্যানার্কিস্টের হাতে প্রাণ হারাতে হয়।

১৯০১ সালে তদানীন্তন ইয়োরোপের মাতৃ-তুল্য রমণী রানী ভিক্টোরিয়ার পর ষাট বছরের নবীন সপ্তম এডোয়ার্ড সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ফ্রান্সে সেইবারই প্রথম, সাড়ে তিন মাস কয়লাখনির মজুররা হরতাল করে সরকারকে নাস্তানাবুদ করে। বাধ্য করেছিল তারা কর্মসময় দৈনিক আট ঘন্টায় নিয়ন্ত্রিত করতে।

সেই বারে গ্রাঁ পালেতে 'সালোঁ দ্য লোতো' মোটরগাড়ির প্রদর্শনী বাজার মাত করে দেয়, গাড়ির দৌড়ে পারী-বার্লিন জিতে ফরাসী ফুর্নীয়ে গৌরব অর্জন করেন। ধন্য করেন ফরাসীদের। ওদিকে ইংরেজরা বোয়ার যুদ্ধে ভালভাবে সামাল দিতে না পেরে নির্মম ও নির্দয় 'স্কচ আর্ত' বা ফসল জ্বলাতে শুরু করলো। এবং ঐকালেই ম্যাকিনলে নিহত হন ইস্ট এসে এক অ্যানার্কিস্ট দ্বারা।

কফিতে চুমুক দিয়ে মামী বললেন, অত্যাশ্চর্য ঘটনা সেইদিন ঘটল। যেদিন মার্কনীর প্রথম বেতার-বার্তা টেলিগ্রাফ আটলান্টিক সমুদ্র পারে হয়ে পৌঁছল আমেরিকায়।

মামী বললেন, আমি সংক্ষেপে তোমাদের কাছে এ সব কথা বলছি, যাতে বুঝতে পারবে বেল এপকের উত্তেজনা কতখানি। কি ধরনের আবহাওয়া তখন ছিল সেটা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছ।

পরের বছর উত্তেজনা, সুরকার দ্য বুসি বিরচিত পেলেয়াস ও মিলিসাঁদ নিয়ে। 'ক্যাম্রদ'র ও অপেরা কমিক এটার প্রযোজনার জন্য খন্ডযুদ্ধের মতো হয়ে যায়। তার পরেই ঘটে নির্বাচন সংক্রান্ত মল্লযুদ্ধ। এই সব ১৯০২এর কথা। অবশ্য এ সবের বিবরণ বহু পুস্তকে তোমরা পাবে।

আমরা কিন্তু উৎসাহিত হয়ে আবেদন করলাম, তোমার মুখে শুনি, তুমি বল, বইয়ে পড়ার থেকে অনেক অন্তরঙ্গ তোমার কথা, বল মামী। তোমার কথা অনেক বেশী জীবন্ত।

একটু থেমে মামী শুরু করলেন, ঠিক এই সময়ে খ্যাতনামা থেরেজ অঁবের-এর রহস্যময় সিন্দুকের উন্মোচন। এক হিসাবে বলতে পার সেটা হল বেল এপকের চাঞ্চল্যকর অধ্যায়ের শুরু। শোন, এই থেরেজের গল্প। তার আগে বলে রাখি যে, বেল এপক শেষ হয় আর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায়। ঘটনাটা এক 'মাদাম' পোঁপাদুর দ্য লা বেল এপক নিয়ে। এক, রহস্যময় চাঞ্চল্যকর ফরাসী স্ক্যান্ডাল উন্মোচন করা ঘটনায়।

তারপর মামী আমাদের বললেন, ঐ আপপাস-রেপাস যেখানে তোমাদের রাস্কুল্লী, তোমার আতেলিয়ে, ওরই গায়ে ছিল শিল্পী স্টেনহেলের আতেলিয়ে, ছয় নম্বর বিশ অ্যাপাসরোসার। যেখানে এক রাত্রে দুটি হত্যায় সমস্ত ফ্রান্সকে বিশেহারা করেছিল। সমস্ত ফ্রান্স ঐ অ্যাপাসিয়োসার দিকে চেয়ে ছিল। তাকেই বলতে পার বেল এপকের আকর্ষণীয় দৃষ্টি। ঘটনাটি ১৯০৮এর চূড়ান্ত শীর্ষে বলবৎ। থেরেজের ঘটনা, মামী বললেন, একই ক্ষেত্রে মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক বটে। সে এক দীর্ঘ ঘটনা। তুমি জান নীরদ, তখনকার দিনে সাধারণ মানুষও ছিল বেশ সচ্ছল।

সব দেশের মতই সামান্য পয়সাই ছিল অনেক। এইকালে আমাদের পনের পয়সায় এক কাপ কফি দুধ দিয়ে হত। এখন শুধু কাল কফিই আমাদের দশ টাকা।

মামী বললেন, অতএব বুঝতেই পারছো, তখনকার দিন হেসে খেলে ছড়িয়ে-গড়িয়েই আনন্দে চলতো। তবে টাকা টাকা,—তার মহিমা মানুষকে স্বর্গ মর্ত্য সব ঘুরিয়ে আনতে পারে।

ইতিমধ্যে আর এক দফা কফি এলো। মামী এক চুমুক দিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছে বললেন, শোনো, তুলুজে, মন্দির, নতর দাম দলা গার্দে জনৈক শিশু কুড়িয়ে পাওয়া যায়। তাকে ধর্মযাজকরা প্রতিপালিত করে তোলে স্থানীয় মিউনিসিপালের সহযোগে। আরি মজার ব্যাপার। এইভাবে শিশুটির আটত্রিশ বছর কেটে গেল। জনৈক দারিনিয়াক এক ঘড়িওয়ালা তাঁর স্ত্রী ফেলে পাওয়া ঐ আটত্রিশ বছরের পুরুষটিকে তাঁরই গর্ভের সন্তান বলে সনাক্ত করলেন। মহাশয় বাজারে অগুস্ত দারিনিয়াক বলে পরিচিত হলেন। কিন্তু মহাশয় অগুস্ত মনে মনে এ কথা স্বীকার করতেন না। উপরন্তু ভাবতেন, বা ওঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে, কোনও এক সম্ভ্রান্ত মহিলার গর্ভজাত তিনি। এ সব কথা বলছি, মামী বললেন, এ কারণে যে, তুমি তো জান, একটা গাছের কথা আরো গভীরভাবে ব্যক্ত করে তার শেকড়। আবার নিয়তির নিয়মে তাকে নিয়েই দশ দশার রকমারি কল চলতে থাকে।

যাই হোক, এই মহাশয় অগুস্ত দারিনিয়াক বিবাহ করেন এক ধনবান চাষীর মেয়েকে, যার আর দুই ভগিনী বর্তমান। বিস্ময়করভাবে মহাশয় দারিনিয়াক দেখেন শ্বশুরের [illegible] যাবার পর তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তির কোন বখেরা ভাগ উইলে নেই। খালি একটি মেয়ের নামে সব সম্পত্তি দানপত্র করে গেছেন সেই গেরস্থ চাষী।

ভগিনীটি কিন্তু দয়াশীলা ছিলেন। দশ হাজার ফ্রাঙ্ক দুই ভগিনীর প্রত্যেককে অর্থাৎ মোট বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক ভাগ করে দেন।

যদিও ঐ অর্থ তেমন কিছু নয়, তবু তাই দিয়ে ছোটখাট একটা স্যাতো কিনে বিবাহ দফতর খুলে ব্যবসা শুরু করেন। মহাশয় দারিনিয়াক কিছু অর্থ হতেই নিজের নাম ভেঙে মহাশয় দ্য আরিনিয়াক, অর্থাৎ কাউন্ট অফ আরিনিয়াক বলে ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ জনগণকে বলেন, তিনি মহাসম্ভ্রান্ত বংশ-উদ্ভূত মহাশয়। ঐ স্যাতোতেই তিনি মানুষ করেন চার সন্তানকে, বড় কন্যাই হলেন স্বনামধন্য থেরেজ। ইতিমধ্যে মহাশয়ের ব্যবসা ক্রমশ শিথিল ও পান্ডুবর্ণ ধারণ করলো। পাওনাদার বাড়তে থাকলো। তাগাদার বহরে প্রায় নাজেহাল। ঘরে অর্থ বাড়ন্ত হলেও দুশ্চিন্তা বাড়ন্ত কোনদিন হয়নি। ঘরে একটা মস্ত সিন্দুক ছিল। যেটা পাওনাদারদের দেখিয়ে কাউন্ট দ্য আরিনিয়াক বলেন, আর বেশি দিন নেই, আমার সন্তানরা মিলিওনেয়ার হতে যাবে। ঐ সিন্দুকে পার্চমেন্টের সব দলিলপত্তর সীল করা রয়েছে। ওর জ্যাঠা এক অ্যামেরিকান—অর্থের কুবের। তার সব কিছুর আইনসম্মত উত্তরাধিকারী হবে আমার সন্তানরা। তোমাদের কোন ভয় নেই।

মাদাম [illegible]

এ কাহিনী সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেল। পরে যোগাযোগ করে মহাশয় কাউন্ট অগুস্ত থেরেজের বিবাহ দিলেন এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ঘরের ছেলের সঙ্গে। নাম ফ্রেদেরিক আঁবের। বিচারমন্ত্রীর সন্তান। মন্ত্রী মশাই প্রভাবশালী, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ। পারীতে সর্বত্র নামডাক প্রচুর। ফ্রেদেরিক নিজে আইনজ্ঞ। ছবি ও কবিতার ভক্ত। থেরেজ-এর চেহারা বেশ কুৎসিত। বোকার মত কথাবার্তা। বুদ্ধিহীন মনে হতো, তবু তাকে বিবাহ করলো। হয়তো সিন্দুকটাই মুখ্য আকর্ষণ.

ছেলেটিকে বিবাহ করে থেরেজ উচ্চ সামাজিক মানমর্যাদার অভিভাবে সব জেনেশুনেই করেছিল। সে জানত ওদের নাম থাকলেও তেমন অর্থের সম্পত্তি নেই। তা ছাড়া, ভালভাবে কথা না বলতে পারলেও থেরেজ তার স্বামীকে বুঝিয়েছে যে, স্যাভোনিবাসী আসন্ন মৃত্যুমুখী এক মহিলা আছেন। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী সেই হবে। স্বামী আইনজ্ঞ হলেও এ সব নিয়ে কোন তদন্ত করার প্রয়োজন মনে করেনি। সমস্ত আশা, ভবিষ্যৎ ঐ সিন্দুকে নিদ্রিত। যে কারণেই ওদের বিবাহবন্ধন। অবশেষে ছেলেটি জানতে পারলো স্যাভোর মহিলার সম্পত্তির অস্তিত্ব কোন দিন ছিল না। আজও নেই। নিছক ফাঁপা থেরেজের গালগল্প। এ সব নিয়ে নিকট সমাজে কানাকানি হয়। সকলেই ভেবেছিল যে, এদের বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চিত।

বস্তুত দেখা গেল কোন কিছুই ঘটল না। পরন্তু পরস্পর স্বামী-স্ত্রী আগের থেকে আরো বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে মিলিত হল। বিচারমন্ত্রী মহাশয় শ্বশুর, এ বিষয়ে বাক্যব্যয় করলেন না।

মনে হয় একই চক্রান্তে শুধু মন্ত্রীমশাই নন, পরিবারের সবাই জড়িয়ে পড়তে থাকলেন।

পারীতে একটা সাধারণ ফ্ল্যাট নিলেন। ওদের সৌভাগ্যের কথা ধীরে ধীরে প্রচারিত হল। থেরেজের স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা লোকমুখে ছড়ালো ডিনারে, সমাজের সভায়, নাচঘরে, সর্বত্র থেরেজের অর্থের কুমির হবার আলোচনা চলতো। তাতে নানা ব্যাঙ্ক ঐ সিন্দুকের স্বপ্নে অজস্র ফ্রাঙ্ক ভাসাতে থাকলো। জ্যাঠার মৃত্যু হলে থেরেজ মহা মহা আইনজ্ঞের পরামর্শ নিতে থাকলো। সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা কিভাবে করা যেতে পারে। তারই মামলা শুরু হল। তা ছাড়া শেয়ারবাজারের নানান পুরাতন নথিপত্র সীল করে থান থান সিন্দুক ভরিয়েছে থেরেজ। মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য ঐ সব পত্র কেনা। উপরে সীল করা এবং সাকল্যে কত লক্ষ টাকা অঙ্ক জাল করেছে দুই-এক শূন্য সুন্দরভাবে এদিক ওদিক করে। অনেকে অঙ্কের হার দেখেছে। তারপর বড় বাড়িতে নাচগান খাওয়াদাওয়া পুরোদমে চলতে থাকলো, উন্নত সমাজের ধর্মাধিকরণের আনাগোনা শুরু করলো। থেরেজের একটি মেয়ে ছিল। বয়স চৌদ্দ, কিন্তু দেখতে বয়সের কম নয়। কিন্তু বিবাহসম্বন্ধের উৎপাত বেড়েই চললো। চলবেই তো। হাজার হোক, বিচারমন্ত্রীর নাতনী। তাছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে কোটি কোটি টাকার মালিক।

ব্যাঙ্কের কর্তা, অ্যাটর্নী ও নানান উচ্চাংশের এক্সপার্টরা দেখেছে সিন্দুকের ভিতরের সব কাগজপত্র। নিপুণভাবে সব স্ট্যাম্প ও সীল করা। বড় বড় দলিল ও শেয়ার মার্কেটের কাগজপত্র। কিন্তু সকলেই দেখেছে প্রথম পাতা। তার তলায় যেসব প্রত্যেক পাতা, সব ফাইলেই বন্ধ ধু ধু-করা মরুর মতই শূন্য। সাদা। আইনও থেরেজের দিকপাতে এগোলো।

ইতিমধ্যে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আর এক উইল আবিষ্কার হল। যেদিন থেরেজকে দানপত্তর করা হয় সেই দিনেরই স্ট্যাম্প। ওর জ্যাঠতুত দুই ভাইও সম্পত্তির কিছুটা অংশীদার। এখন মামলাটা শুরু হল ভাইদের পক্ষে। আমেরিকার থেকে এল রেকোর্ড দুই ভাই। অর্থাৎ অন্যদের সম্পত্তির বিচারবিভাগীয়

পারী ১৯০০ শতক বুলভার

সমাধান চাইল তারা। মামলা নতুন করে বাঁক নিল। এইটাই চেয়েছিল থেরেজ। আসলে সমস্ত সম্পত্তিই অস্তিত্বহীন। এবং এই দীর্ঘ সূত্রে থেরেজ আবার ব্যাঙ্ক ও নানা সূত্রে লাখ লাখ টাকার লেনদেন চালাল। সমস্ত ব্যাপারটাই হাওয়ায় কেল্লা বাঁধার মত। থেরেজ বেঁধে ফেললে সকলকে। এমন কি, থেরেজের কাছে লোকে টাকা খাটাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। হুড় হুড় করে অর্থের সমাগম। ঘটনাটা গড়িয়ে গেল অনেক দূরে। এমন কি, থেরেজের খুড়তুতো দুই ভাই এলো অ্যামেরিকা থেকে। অ্যামেরিকান সাজগোজ তো বটেই, এমন কি ব্রডওয়ে অ্যাকসেন্টে কথাবার্তায় ওরা মাত করে দিল। আসলে অবশ্য তুলুজঅ্যাক্সেন্ট হাউহাউ যোগ করে কথা বলত ওরা। ফলে লোকের বিশ্বাস জন্মাল। বস্তুত ওরা থেরেজের আপন দুই ভাই। গণ্যমান্যরা সবাই মেনে নিল। যাদের কিছুমাত্র সন্দেহ হয়েছিল তারাও নিঃসন্দেহ হলেন। ফয়সালা হল ওরা দুই ভাই ছ মিলিয়ান ছ মিলিয়ান করে টাকা পাবে। সেই শর্তে সব থেরেজের নামে দলিল হবে। একদিন এক ভোজনপর্বের পর দেখা গেল স্ত্রেপ্রিক আর এক মুহুরী নিয়ে সিন্দুক খুলে সব দলিলের, দলিলপ্রতি উপরের অঙ্ক কত টাকার হিসাব করে যোগ করছে। একটাতে আশি মিলিয়ান, অন্যটাতে নব্বুই ইত্যাদি। সে এক বিরাট অঙ্কের সমাবেশ। ঘর ঘুরিয়ে থেরেজ দেখালে মহা মহা আইনজ্ঞদের। অতএব ব্যাপারটা সন্দেহাতীত। আড়ে আড়ে সবাই লক্ষ করলো।

আর এক সান্ধ্যভোজের আসরে মহা মূল্যবান চৈনিক ফুলদান এলো। চীন থেকে পাঠিয়েছে থেরেজের আমেরিকান ভাই। সবাই চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখলে। এই ঘটনা মুখে মুখে ক্রমে ছড়িয়ে গেল বড় ঘরের মহিলা সমাজের মধ্যে।

সুতরাং ঐ সিন্দুকের সূত্রে অঢেল টাকা আসতে শুরু করে দিল। তারপর জানা গেল ভাইরা ঐ ছ মিলিয়ানের সূত্রটি মেনে নিতে রাজী নয়। কেস শুরু হয়ে গেল দুই খুড়তুতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে। কাগজে কাগজে হুলুস্থুল। আইনজ্ঞরা গোঁফে তা দিচ্ছে। এবং ফরাসী আইন-প্রতীকের ভদ্রমহিলা তাঁর দাঁড়িপাল্লা নিত্তি যেমতি তেমতি অনুযায়ী স্থির। আসলে সবই পাথরের, পাথরের আদর্শ। স্পন্দনহীন। তবে সবাই তো বোকা নয়, দুই-একজনের এ সব কথায় রাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হত। এক ব্যাঙ্কের কর্তা অ্যামেরিকান ভাইয়ের সাক্ষাৎকারের জন্য পারী থেকে কিছু দূরে যাত্রা করেন। সেই সময়ে থেরেজ থাকতো একটি গ্রামে কিছুদিনের জন্য। উনি জেনেছিলেন ও'র ভাই ওখানে থেরেজের সঙ্গে কয়েক দিনের জন্য সময় কাটাবেন। যখন উপস্থিত হলেন বিচক্ষণ ব্যাঙ্কার, শুনলেন এইমাত্র তার ভাই রওনা হয়ে গেছেন এক টেলিগ্রাম পেয়ে অ্যামেরিকায়। খাওয়াদাওয়ার পর থেরেজ বেশ দুঃখিত হল মহাশয়ের কষ্টের জন্য। যেহেতু অত রাতে আর ট্রেন নেই, অনুনয় বিনয় করে রাত্রিযাপন করে যেতে অনুরোধ করলেন ব্যাঙ্কারকে। তা ছাড়া ভাইয়ের ঘরটাও খালি। অগত্যা মহাশয়কে সেই রাত্রে থেকে যেতে হল থেরেজের ভাইয়ের ঘরে। শোবার আগে পরিপাটি ঘর দেখে মহাশয় খুশি হলেন। শয়নের পূর্বে নজরে পড়লো ঘরের এক কোণে একটি কাগজ মোড়া পড়ে আছে। প্রমাদ গুণলেন আর হতাশ হলেন ভেবে যে, আজকালকার চাকরবাকররা কতই অপদার্থ।

কাগজটা তুলে নিজেই খুলে দেখলেন যে, একটা টেলিগ্রাম অ্যামেরিকা থেকে এসেছে থেরেজের ভায়ের নামে। দু ছত্র লেখা—'পত্রপাঠ ফিরে এস।'

এই ব্যাপারে থেরেজের কথায় সমস্ত আস্থা ফিরে এলো। মহাশয় নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলেন। এটি অবশ্য একটি জাল টেলিগ্রাম। এইসব ঘটনা চললো দীর্ঘদিন ধরে। প্রায় বিশ বছর। ইতিমধ্যে এক লেনদার নিঃস্ব হয়ে আত্মহত্যা করে তাঁর শেষ এনেছেন।

একদিন হঠাৎ এক ব্যাঙ্ক ফেল করায় দক্ষ হিসেবীরা ব্যাঙ্কের খাতা পরীক্ষাকালে দেখতে পেল ক্রফোর্ড নামে জনৈক ভদ্রলোককে ব্যাঙ্ক ষাট লক্ষ ফ্রাঙ্ক কর্জ দিয়েছে যার পাকা কোন ঠিকানা খাতায় নেই। এই প্রশ্নে থেরেজ একটা আমেরিকার ঠিকানা দেয়, এবং ওখানে টেলিগ্রাম করে জানা গেল উক্ত ব্যক্তির নাম-ধামের কোন অস্তিত্ব নেই। কেউ কিছুই জানে না। কোন দিন ছিল না। অতএব ধীরে ধীরে বিড়াল ব্যাগ থেকে বার হল। থেরেজ পরিবার পালাল স্পেনে। এক ঝিয়ের হাতে বাড়ি ও বহুবিদিত সিন্দুক রেখে।

পুলিস এসে অবশ্যই তালাওয়ালাকে দিয়ে সিন্দুক খুলে বিস্ময় সহকারে দেখলে সিন্দুক শূন্য। যে সিন্দুক এই বিশ বছর কোটি কোটি টাকা আমদানি করেছে বিরাট একটা জগৎকে বোকা বানিয়ে। হাঃ হাঃ।

মামী বললেন, এক সেন্ট পরিষ্কার। সিন্দুকে পাওয়া গিয়েছিল একটি মাত্র প্যান্টুলুনের বোতাম। হা হা কি মজার। এই ব্যাপার ধরা পড়া ও জেল হবার পূর্বে প্রায় ন বছর আগে মহাশয় বিচারমন্ত্রী গত হয়েছেন। ঐ সিন্দুকের মধ্যে ওঁর বুদ্ধিও যে ছিল কিনা তা কেউ বলতে পারল না। সেটা হিসাবের বাইরে।

এজলাসে জানা গেল ক্রফোর্ড বলে কেউ নেই। এ সব নেহাতই থেরেজের এক মিথ্যাসূত্রের কথা, স্বকপোলকল্পিত ঘটনা। এজলাস যখন এ সব ঘোষণা করলো সমস্ত কোর্ট হাস্যমুখরিত হয়ে উঠল। এক সস্তার মিথ্যে কথা। কি করে সম্ভব হল। বিশ বছর ধরে একজন সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আসছে? এমন একটা কাঁচা ধাপ্পায়। (ক্রমশ)

ত্বক বলে মৃদু স্বরে, ‘তোমায় ভালোবাসি’...

ল্যাক্‌মে ভ্যানিশিং ক্রীম। মেক-আপ আর পাউডারের নিখুঁত আধার। আপনার মুখে লাগায় কোমল পরশ···যেন ভালোবাসার পরশ···আগলে রাখে সোহাগ ভরে, সযতনে! সকল মরশুমে···সকল সময়ে! যাতে আপনার রঙরূপ থাকে— ফর্সা, তাজা, নিখুঁত সুন্দর!

যখন ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে আসি।

যারা সুন্দর ত্বকের মর্ম বোঝে

ল্যাকমে

ত্বকের মৃদু সৌরভ জানায় ভালোবাসা... সার্থক ল্যাকমে ল্যাভেণ্ডার ট্যাল্‌ক মেখে আসা!

শান্ত শীতল শ্যামলিমা। সারাবে[illegible]তেজতা। আপনার বয়েস কম, তবু জানেন ফরাসী ল্যাভেণ্ডারের সুরুচিপূর্ণতার মর্ম, চেনেন এর সৌখিন সুরভি! আপনি উপভোগ করেন শীতল মৃদুলতা—ল্যাক্‌মে ল্যাভেণ্ডার ট্যাল্‌ক!

সৌন্দর্য্য নির্মাতা

ল্যাকমে

কণ্টককল্পিত
অতুল্য ঘোষ

(নব পর্যায়)

॥ ১৫ ॥

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সি পি আই (এম) বিরোধী একটি মোর্চা গঠন করতে চান। এই মোর্চার উদ্দেশ্য হবে যাতে পশ্চিমবঙ্গেব মধ্যে কোন লোকসভা কেন্দ্রে সি পি আই (এম) বিরোধী একটির বেশী প্রার্থী না দাঁড়ায়। প্রফুল্লবাবুর মোর্চা গঠনের চেষ্টার কথা শুনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একটু শ্লেষভরে বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের লোক তো পাগল নয়। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মোর্চা গঠনের চেষ্টা তো এখন সব দলই করছেন। আর এতে কোন নীতি বা আদর্শের বালাই নেই। যার যেখানে খুশি যে-কোন দলে—এক-আধটি দল ছাড়া—ঢোকার পথ যেমন প্রশস্ত হয়েছে, মোর্চা গঠনও তাই। জনতা পার্টি থেকে যাঁরা বেরিয়ে গিয়ে আলাদা জনতা (এস) বলে দল করেছেন, তাঁদের সহযোগী কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই (এম)-বিরোধী মোর্চা গঠন করা প্রফুল্লবাবুর মতে সম্ভব। আমরা তো বুঝতে পারি না, কি করে সম্ভব। জনতা দল নিশ্চয়ই জনতা দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে যাঁরা জনতা (এস) দল করেছেন, আসন্ন নির্বাচনে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং বেরিয়ে এসে দল করা যে অন্যায় হয়েছে, তাও বলবেন; তা হলে সেই বেরিয়ে আসা দলের সঙ্গে যাঁরা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, সেই কংগ্রেস দলের সঙ্গে কি করে কোন বোঝাপড়া হবে, তা ভেবে পাওয়া যায় না। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে—জনতা, জনতা (এস) ও তার সহযোগী দলগুলি এবং কংগ্রেস (আই)। কাজে কাজেই জনতা জনতা (এস)-এর সঙ্গীদের সঙ্গে কোন সমঝোতা তো একেবারে সম্ভব নয়! আবার, সি পি আই (এম)দল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনতা (এস)-এর সঙ্গে যুক্ত। এটাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এমার্জেন্সী, মিসা প্রভৃতির জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দল স্বৈরাচারী বলে অভিহিত হচ্ছেন। কিন্তু সেই মিসা ও এমার্জেন্সী যিনি সই করেছিলেন, ভারতবর্ষের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডী যে দলে, সি পি আই (এম) সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেই দলের সঙ্গে সমঝোতা করে ফেলেছে। এটা বোঝা খুবই শক্ত যে, যে কারণে ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরাচারী ঠিক সেই কারণে শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডী স্বৈরাচারী নন কেন? আর শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডীও তো কোন অজানা-অচেনা লোক নন যে, হঠাৎ এসে 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে নেতা হয়েছিলেন। উনি তো বহু বছর এ আই সি সি-র সদস্য, তারপর রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন। অন্ধ্রের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল। তিনি যে না বুঝে, না জেনে এমার্জেন্সী-মিসায় সই করে দিয়েছিলেন, তা তো হতে পারে না। উনি তো কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন! তবু উনি অচ্ছুত হননি। আর ঐ অপরাধের জন্যই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অস্পৃশ্য ও স্বৈরাচারী। অদ্ভুত যুক্তি! কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের অপসারণ থেকে বর্তমান কেরল মন্ত্রিসভা গঠন অবধি সি পি আই (এম) দলের সঙ্গে কংগ্রেস দলের বরাবরই বিরোধিতা চলে এসেছে। আর ১৯৭৯-র সেপ্টেম্বরে সেই সি পি আই (এম) দল ও কংগ্রেস দল একসঙ্গে ত্রিবান্দ্রম মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কাজে-কাজেই কে কখন কোন দিকে যায়, তা বর্তমান রাজনীতিতে বলা খুবই শক্ত। সেইজনাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর প্রফুল্লবাবুর মোর্চা গড়া সম্বন্ধে শ্লেষোক্তি সমীচীন হয়েছে বলে মনে হয় না। আর এই ১৯৭৯-র জুলাই-এ যখন মোরারজী সরকারের পতন হয় তখন রাষ্ট্রপতিকে যে যে রাজনৈতিক দল জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা শ্রীচরণ সিংকে সমর্থন করবেন, তাঁদের মধ্যে সি পি আই (এম) দল এবং ইন্দিরা কংগ্রেস দল উভয়েই ছিলেন। একেই তো মোর্চা বলে। আরও নজির আছে। যে সি পি আই দল এমার্জেন্সী ও মিসা করা সত্ত্বেও ইন্দিরা সরকারের সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন সেই সি পি আই দলের সঙ্গে সি পি আই(এম)-এর বোঝাপড়া একরকম সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেস তো এখন কোন স্বৈরাচার করেন না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার যেসব কাজ করেছিলেন, সেইসব কাজের জন্যই ইন্দিরা গান্ধীকে স্বৈরাচারী বলা হয়। অথচ সেই সরকারের যাঁরা বিশিষ্ট মন্ত্রী ছিলেন—ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী, যশোবন্তরাও চৌহান, সুব্রহ্মনিয়াম, ডঃ করণ সিং, কৃষ্ণচন্দ্র পন্থ প্রভৃতি—স্বৈরাচারীও নন, অস্পৃশ্যও নন। অতএব তাঁরা যে দলে আছেন, সেই দলের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসা যায়। সি পি আই (এম) দলের এই যুক্তি, এই কথা যুক্তিগ্রাহ্যও নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়; তবু বোঝাপড়া হয়েছে।

জনসঙ্ঘ প্রভৃতি পাঁচটি দল লোপ হয়ে জনতা পার্টি সৃষ্টি হয়েছিল। লোপ হবার দু মাসের মধ্যেই ভূতপূর্ব জনসঙ্ঘীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াতে সেই সময় যাঁদের কোন অসুবিধে হয়নি, দু বছর বাদে হঠাৎ তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে, আর একসঙ্গে থাকা যায় না। সি পি আই (এম) দলও ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে জনতা দলের সাথী ছিলেন। তখন তাঁরা কোনও সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ো তোলেননি। জনসঙ্ঘ থেকে তখন যাঁরা জনতা দলে এসেছিলেন, এখনও তাঁরাই জনতা দলে আছেন। জনসঙ্ঘ লোপ করবার দু মাসের মধ্যে সি পি আই (এম) দল তাঁদের মধ্যে কি গুণ দেখেছিলেন যে, তখন তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কথা মনেও ওঠেনি? অনেকেরই মনে হয় যে, তখন দেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে যে আবহাওয়া তৈরী হয়েছিল, সি পি আই (এম) সহ সব দলই তার সুযোগ নিয়েছিলেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে বলেই তখন সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ো তোলবার প্রয়োজন হয়নি। এখন যখন আবহাওয়া একটু থিতিয়ে গেছে, এখন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য স্বৈরাচারী, সাম্প্রদায়িক—এইসব কথাবার্তার উৎপত্তি হচ্ছে। এ জিনিস পূর্বেও বহুবার হয়েছে। তখন সুযোগ-সুবিধে নেবার জন্য কোন দলকে বলা হত প্রতিক্রিয়াপন্থী, আবার কোন কোন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীকেও বলা হত যে, ইংরাজের সঙ্গে যোগসাজশ আছে। আর শিল্পপতি ও ধনীদের দালাল—এ কথা তো ছিলই।

প্রফুল্লবাবু যাঁদের নিয়ে মোর্চা গড়বার চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে যেমন আদর্শগত অনেক বিভেদ আছে, সেইরকমই সি পি আই (এম) যাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় মোর্চা করেছেন বা মোর্চা গড়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যেও আদর্শগত মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরও বহু নজির দেওয়া যায়। যাঁদের অন্য সব দল সাম্প্রদায়িক বলত অবিভক্ত সি পি আই দল তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিত্ব গঠন করতে দ্বিধা করেননি। এই পশ্চিমবঙ্গেই সি পি আই (এম) দল ও সি পি আই দল এমন লোককে মুখ্যমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন, যে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বয়ং তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অনশন করতে হয়েছিল। এও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ দেখেছেন। পাগল যদি হতে হয়, তা হলে তাঁরা অনেক আগেই হয়েছেন; এখন আর নতুন করে হবার প্রয়োজন নেই। যেখানে সবচেয়ে বড় আদর্শ হল 'সুবিধাবাদ', সেখানে স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা—এসব ধুয়ো ওঠানোর কারণ পরিষ্কারই বোঝা যায়। নির্বাচনে সাফল্যই এখন বড় কথা: নীতি, আদর্শ—এসব কথা এখন প্রয়োজনমত ব্যবহারের জন্য। এর আগেও কিছু নেই, পরেও কিছু নেই। ভারতবর্ষের প্রায় সব সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলই বর্তমানে যে-কোন আঞ্চলিক দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবার জন্য খুবই উৎসুক ও আগ্রহী। এইসব আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই অসাম্প্রদায়িক নন। স্বৈরাচার কথাটি সেখানে ব্যাপকভাবে খাটে না। কারণ, ব্যাপকভাবে কাজ করবার সুযোগ তাদের অনেক কম।

যদি গত দশ-পনের বছরের ভারতবর্ষের ইতিহাস ভালভাবে মন্থন করা যায়, তা হলে দেখা যাবে নীতি বা আদর্শের কোন দলই বিশেষ মর্যাদা দেননি। তদারকী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর যে দল, সেই দলের ইন্দিরা সরকারের দায়িত্বশীল পদে যেসব মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের তদারকী সরকারের অন্তর্ভুক্ত করতে কোনও কুণ্ঠা হয়নি। কারণ একটাই—এঁদের অন্তর্ভুক্ত না করলে যে মোরারজী সরকারের পতন হওয়া সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রপতির কাছে তদারকী সরকারের প্রধানমন্ত্রী যে তালিকা দিয়েছিলেন তাতে ইন্দিরা সরকারের এইসব দায়িত্বশীল মন্ত্রীর নাম ছিল

বলেই রাষ্ট্রপতির কাছে সংখ্যাধিক্য দেখানোর সুযোগ হয়েছিল। যদিও সংবিধানে তদারকী সরকার গঠনের কোন বিধান নেই তবুও রাষ্ট্রপতি তা করলেন এবং সেই তদারকী সরকারই এখন দেশে শাসনকার্য চালাচ্ছেন। অবশ্য তদারকী সরকার গঠনের নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে এই প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে না। এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য—মোর্চা গঠন সম্পর্কে নীতি ও আদর্শের ধুয়ো তোলা যে কত অবাস্তব, তাই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। মহারাষ্ট্রে কি হচ্ছে—তাও একটা নজির। যাঁরা একদা কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন তাঁরা ভেঙে গিয়ে প্যারালাল কংগ্রেস করলেন। এখন তাঁরাই আবার কংগ্রেসের মধ্যে ঢোকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কারণ একটাই। তদারকী সরকারে কংগ্রেস দল একটি বৃহৎ অংশীদার। সেইজন্যই কোন ন্যায়-নীতি-আদর্শের প্রশ্ন তোলবার কোন প্রয়োজন হচ্ছে না। মাঝে মাঝে যেসব যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে সেগুলো উক্তি মাত্র—তার পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বিহারে জনতা দল ইন্দিরা কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখলেন। সেখানে স্বৈরাচারের কোন প্রশ্ন উঠল না। আবার রামলীলা ময়দানে যখন সভা হয়, তখন স্বৈরাচারের কথা সব বক্তার মুখ থেকেই শুনতে পাওয়া যায়। এই সেদিন চাঁদরাম নামক হরিয়ানার এক নেতা, যিনি পূর্বে জনতা দলের একজন মন্ত্রী ছিলেন তিনি জনতা দল ছেড়ে দিয়ে জনতা (এস) দলে যোগদান করেছেন। কারণ, সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে কারো কোন দ্বিধা হয়নি। অর্থাৎ যখন মন্ত্রিত্ব অদলবদলের সুযোগ হয়েছে এবং শ্রীচাঁদরামেরও মন্ত্রী হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন কেন তিনি দল ছাড়বেন না? এই হল ভারতবর্ষের পটভূমিকা। কাজেই এই পটভূমিকায় যে-কোন নেতা, উপনেতা, অর্ধ-নেতা হবু নেতা অনায়াসেই যে-কোন দলের সঙ্গে মোর্চা গঠনের কথা ভাবতে পারেন। তার সঙ্গে পাগলামির সম্পর্কটা কোথায়?

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের রাজনৈতিক মতাদর্শ কার্যক্রম প্রায় সব রাজনৈতিক দল ও নেতার কাছে সুবিদিত। তা সত্ত্বেও ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম) সহ বাম ফ্রন্ট দলের প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন জনতা দলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে আসন ভাগাভাগি করতে কোন অসুবিধা হয়নি। আজ তাঁর চেষ্টাকে পাগলামি যাঁরা বলছেন তাঁরা সেদিন এইরকম এক পাগলামির সঙ্গী-সাথী হতে কোন দ্বিধা করেননি। তখন প্রফুল্লবাবু তুলেছিলেন ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ; এখন তুলেছেন বাম ফ্রন্ট সরকারের প্রধানতম দল সি পি আই (এম) দলের বিরুদ্ধে জেহাদ। তফাতটা কোথায়? ন্যায়-নীতি ও আদর্শের কথা তুলতে গেলে দেখা যাবে কোন দলের সঙ্গেই কোন দলের মোর্চা হতে পারে না। তা যখন হতে পারে না, অতএব সুবিধাবাদই সবচেয়ে বড় আদর্শ। এবং এ আদর্শ কমবেশী সকলেই গ্রহণ করেন। সেইজন্যই স্বৈরাচার স্বেচ্ছাতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক — এসব কথার সাধারণে আর কোন মূল্য দেন না। কারণ দেখা যাচ্ছে রাজনীতির প্রাঙ্গণে যাঁরা স্বৈরাচারী ও সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত হন, তাঁরা আবার বিশেষ বিশেষ দলের অঙ্গনে যখন প্রবেশ করেন, তখন আর অস্পৃশ্য থাকেন না। চৈতন্যদেব বলতেন 'প্রাঙ্গণ ও অঙ্গন'; আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আসর ও বাসর'। একজন বলেছেন ধর্মের ব্যাপারে, আর একজন বলেছেন সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে। রাজনীতির ব্যাপারী যাঁরা, তাঁরা মাঠ আর উঠনের মধ্যে পার্থক্য নিজেদের সুবিধামতই ঠিক করে নেন—কোন নজির বা আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে করেন না। সেইজন্যই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর মোর্চা গড়ার বিষয় নিয়ে যে উক্তি করেছেন, তা বর্তমান পটভূমিকার সঙ্গে খাপ খায় না। নির্বাচনে সাফল্যই যখন একমাত্র নীতি ও আদর্শ, তখন যে-কোন দল যে-কোন পথ খুঁজে বার করলে তাই তো গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। রাজনীতির এই পাঠে যে দল যত বেশী দক্ষতা দেখাতে পারবেন, তাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে তত বেশী সফল হবেন।

৭৩২টি টেস্ট উইকেটের চার স্পিনার

অশোক রায়

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কানপুরে টেস্টেই প্রাক্তন ভারত-অধিনায়ক বেঙ্কটরাঘবন সম্ভবত তাঁর টেস্ট জীবনের শেষ বলটি করলেন। সহযোগী প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর, বেদি আগেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে গিয়েছিলেন। ভারতীয় স্পিনের সমস্ত গৌরব আর অহংকার নিয়ে টিম্-টিম্ করে জ্বলছিলেন একা বেঙ্কট। নতুন মুখকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে এবার বেঙ্কটকেও সরে দাঁড়াতে হয়েছে।

টেস্ট ক্রিকেটের সাজানো আসরে প্রসন্ন, বেদি, চন্দ্রশেখর কিংবা বেঙ্কটরাঘবনকে আর হয়তো দেখা যাবে না, কিন্তু ক্রিকেটকে তাঁরা দু হাত ভরে যা দিয়েছেন তার মূল্য অপরিসীম। ক্রিকেট নিয়ে আমাদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনা উৎসাহ কলরব আর সেই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন গর্বের মূল উৎসই তো ছিলেন ওঁরা চারজন। ওঁদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগের অবসান হল। একদা ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরবের সেই রূপকাররা হারিয়ে গেলেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে এক অনাড়ম্বর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দিয়ে। এক দশক কিংবা হয়তো আরও বেশী সময় ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের বোলিং মেরুদণ্ডে শক্তিসঞ্চারী বিশ্বখ্যাত চার স্পিনার এবার ছুটি নিলেন ক্রিকেট থেকে অনেক প্রয়োজন আর কার্যকারিতার তাগিদ মিটিয়ে।

কিন্তু ফুরিয়ে যাওয়ারও একটা ইতিহাস থাকে। ক্যালেণ্ডারের ঝরা পাতাগুলোর মধ্যে যেমন থাকে হারিয়ে যাওয়া সারা বছরের একটা ইতিহাস। যাঁদের মুখের দিকে চেয়ে ভারতীয় ক্রিকেট পরম আগ্রহভরে জয়ের স্বপ্ন দেখেছে, যাঁরা ভারতীয় ক্রিকেটকে বিশ্ব-দরবারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাঁদের সমস্ত ক্রীড়াজীবনকে অল্প অবসরে একটু দেখে নেওয়া যাক।

সংখ্যায় ওঁরা চার জন। নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই আলাদা। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের স্বার্থ-রক্ষায় সকলেই এক ও অভিন্ন।

এরাপল্লী অনন্তরাও শ্রীনিবাস প্রসন্ন টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম অবতীর্ণ হন ১৯৬২ সালের ১০ জানুয়ারি মাদ্রাজে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। '৭৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলার মধ্যবর্তী সময়ে দাপটের সঙ্গে বল করেছেন, যদিও ক্রিকেটীয় রাজনীতির অবিচার আর দুর্নীতির যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে টেস্ট ক্রিকেট থেকে বাদও পড়েছেন বহুবার। বিভিন্ন দেশের নানা মাপের ব্যাটসম্যানকে অফ্ স্পিনের ফাঁদে আটকে ঝুলিয়ে পেরেছেন ১৮৯ বার। সবচেয়ে কম সময়ে টেস্টে ১০০ উইকেট পাওয়ার ভারতীয় নজীরটি (মাত্র ২০টি টেস্টে) প্রসন্নর। প্রসঙ্গত বলা যায় ক্রিকেটের অন্যতম দুই শ্রেষ্ঠ অফ স্পিনার জিম লেকার (২৭টি টেস্ট) এবং ল্যান্স গিবসের (২৫টি টেস্ট) তুলনায় তাঁর এ নজীর অপেক্ষাকৃত উন্নত। প্রসন্ন সবসমেত টেস্ট খেলেছেন ৪৯টি।

ভাগবৎ সুব্রহ্মণিয়াম চন্দ্রশেখর (মোট ৫৮টি টেস্ট) তার পোলিও রোগাক্রান্ত ডান হাতের ভেল্কি দেখাতে শুরু করেন ১৯৬৪ সালের ২১ জানুয়ারি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, বোম্বাইতে। ১৯৭৯ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট (এসবাস্টন) তাঁর ক্রিকেট জীবনের শেষ টেস্ট। ভারতীয় ক্রিকেটের এই বিস্ময়-বোলার ২৪২ জন ক্রিকেটারের টেস্ট ইনিংসে ছেদ টেনেছেন। প্রায় মিডিয়াম পেসে তাঁর দুর্বোধ্য লেগ স্পিন এবং গুগলি সমসাময়িক ব্যাটসম্যানদের প্রতি-নিয়ত বিব্রত এবং বিভ্রান্ত করতো। তিনিই একমাত্র ভারতীয় বোলার যিনি এক মরসুমে ৩৫টি উইকেট পেয়েছেন (১৯৭২-৭৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে)। এক ইনিংসে সর্বাধিকবার (১৬ বার) পাঁচটি উইকেট পাওয়ার ভারতীয় নজীরটিও তাঁর দখলে। ১৯৭১ সালে ওভালে ইংল্যাণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১০১

বেদি

চন্দ্রশেখর

জয়ের পথ দেখান এই দুর্ধর্ষ রিস্ক স্পিনার।

শ্রীনিবাস বেঙ্কটরাঘবন (মোট ৫৭টি টেস্ট) নামটি টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে ১৯৬৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে। ভারতীয় ক্রিকেটে তিনিই একমাত্র বোলার যিনি আবির্ভাবের মরসুমেই ২১টি উইকেট সংগ্রহ করেন। চারজন স্পিনারের মধ্যে বেঙ্কটরাঘবনের স্পিনিং টেকনিক ছিল অধিকতর পরিপাটি। টেস্টে তাঁর মোট সংগ্রহ ৭৩২ রান আর অফস্পিনের প্যাঁচে জড়িয়েছেন অন্যূন ১৪৫ জন ব্যাটসম্যানকে। বেঙ্কট ভারতের অধিনায়কত্বও করেছেন।

প্রয়াত প্রখ্যাত ক্রিকেট অলরাউণ্ডার ভিনু মানকড়ের বাঁ-হাতী স্লো স্পিন আক্রমণের প্রায় কার্বন কপি বিষেণ সিং বেদি। টেস্ট ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে, ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর কলকাতায়।

পৃথিবীর ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বকালের সেরা উইকেট সংগ্রহকারীদের মধ্যে বেদির (২৬৬টি উইকেট) স্থান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ল্যান্স গিবস (৩০৯টি উইকেট) ও ইংল্যাণ্ডের ফ্রেডি ট্রুম্যানের (৩০৭টি উইকেট) পর। বেদির আরেকটি কৃতিত্ব, তিনি ভারতের পক্ষে সর্বাধিকবার (৬৭টি টেস্টে) টেস্ট আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং ভারতীয় দলকে পরিচালনা করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছেন ২২ বার, যা একমাত্র মনসুর আলির (৪০টি টেস্ট) থেকে কম। তিনিই একমাত্র বোলার যিনি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত ক্রিকেট-খেলিয়ে দেশের বিরুদ্ধেই ৫০টি উইকেট পেয়েছেন।

সিনিয়রিটির দিক দিয়ে চার স্পিনারের মধ্যে প্রসন্ন ভারতীয় ক্রিকেটে প্রথম। তবে ১৯৬৬-৬৭ সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ভারত সফরের সময় থেকে কমপক্ষে দু' জন স্পিনার একত্রে ভারতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হন। এই ট্রাডিশন কখনও ভাঙে নি। কখনো একত্রে তিনজন, আবার ১৯৬৭ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এগবাস্টন টেস্টে চারজন স্পিনার একবারের জন্যে একত্রে ভারতীয় দলে খেলেছিলেন।

১৯৬৮ সালে পাতৌদির অধিনায়কত্বে নিউজি-ল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারত সিরিজ জেতে। বিদেশের মাঠে সিরিজ জয় ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে সেই প্রথম। সেই থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত (১৯৭৪-এর ইংল্যাণ্ড সফর এবং ১৯৭৮-এর পাকিস্তান সফর বাদে) ভারত প্রতি টেস্ট সিরিজেই অন্তত একটি টেস্টে জিতেছেই। মোট ১৮টি টেস্ট জয়ের মধ্যে ৯টি ভারতের মাঠে ৪টি নিউজিল্যাণ্ডে দুটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজে দুটি অস্ট্রে-লিয়ায় এবং একটি ইংল্যাণ্ডে। এই জয়ের পিছনে স্পিনারদের ভূমিকা কি ছিল তা নীচের তালিকা দেখলে বোঝা যাবে।

১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে ১৯৭৮-এর পাকিস্তান সফর পর্যন্ত দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যবর্তী ১৭টি সিরিজে ভারতীয় বোলারদের দ্বারা সংগৃহীত সব সমেত ৯৫৩টি উইকেটের মধ্যে ৭৩২টি উইকেট পেয়েছেন স্পিনাররা। কী একচ্ছত্র আধিপত্য! অথচ বিশ্ব ক্রিকেট কিন্তু 'স্পিন' শব্দটাকে একরকম জোর করেই ভুলে যেতে চাইছে। সারা পৃথিবীর সমস্ত ক্রিকেট প্লেয়িং কাণ্ট্রির মধ্যে এখন প্রতিযোগিতা চলছে পেস বোলিংয়ে কে কাকে কতটা কাবু করতে পারে। ক্রিকেট এখন প্রায় যুদ্ধের পর্যায়ে। সাম্প্রতিক ক্রিকেট আসরে চোখ ফেরালেই এ' কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

প্রথম সুপার টেস্টের স্কোরার জে টমসন জানিয়ে-ছেন, অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেলকে সাদর আপ্যায়ন করেছে অ্যাণ্ডি রবার্টস এবং মাইকেল হোল্ডিং তাদের প্রথম কয়েকটা বলের নাচা বাম্পার দিয়ে। সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ব্যাপারটাকে উপলব্ধির মধ্যে আনার আগেই ক্রিকেট মাঠে অনেক অঘটন ঘটে গিয়েছে। ইমরান খাঁর বাম্পারে মাথায় চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়েছেন অ্যাসলে ম্যালেট। লিলির বাম্পার পরীক্ষা করেছে টনি গ্রেগের মাথার খুলি শক্ত কি না। রবার্টসের বাম্পার পিটার টুহির হাতের বুড়ো আঙুল থেঁতলে দিয়েছে। কলিন

বেঙ্কটরাঘবন

দুনিয়ার ক্রিকেট এখন এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। ভাবতে অবাক লাগে, সারা পৃথিবীর সমস্ত ক্রিকেট খেলিং দেশের পাওয়ার ক্রিকেটের সমস্ত আস্ফালনের বিরুদ্ধে ভারত দীর্ঘদিন স্পিনের আক্রমণ শানিয়ে সেই যুদ্ধের মোকাবিলা করেছে। জোর বলে ভয় পাইয়ে নয়, বুদ্ধির কৌশলে ব্যাটসম্যানদের পরাস্ত করাই হল স্পিনের উদ্দেশ্য, তার সার্থকতা। সে উদ্দেশ্য সাধনে স্পিনার চতুষ্টয় যে অবিস্মরণীয় ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন সে কথা তো স্বীকৃত তথ্য। ভারতের সাম্প্রতিক সমস্ত জয়ের যা কিছু দৃষ্টান্ত তা ওই স্পিনারদেরই সৌজন্যে।

রমাকান্ত দেশাই স্বীকৃত ভারতীয় পেস বোলারদের মধ্যে সর্বশেষ জন। তার পরে যাঁরা নতুন বলে ভারতীয় বোলিং আক্রমণের সূচনা করেছেন তাঁদের মান 'মাঝারিয়ানা' শব্দটির নীচে। তাই আক্রমণ রচনার দায়-দায়িত্ব পড়েছিল স্পিনারদের ওপর। এমনও দেখা গেছে চকচকে নতুন বলের পালিশ ওঠার আগেই পেস সহায়ক উইকেটে স্পিনারদের হাত ঘোরাতে হয়েছে ভারতীয় পেস অ্যাটাকের চিরাচরিত দুর্বলতাকে ঢাকতে। দলের প্রয়োজনে বুদ্ধিদীপ্ত স্পিনাররা অসুবিধার বিরাট পাহাড়গুলো ডিঙিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট উত্তীর্ণ হয়েছে কঠিনতর পরিস্থিতি।

কিন্তু কোনো কিছুই চিরদিনের নয়। সম্ভবত সেই কারণেই চার স্পিনার তাঁদের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের দিনকে একটু একটু করে পিছনে ফেলে এলেন। ভারতের চার স্পিনার মুঠো মুঠো অন্যের ঐশ্বর্য ছড়িয়ে একটু একটু করে নিঃশেষ হয়ে গেলেন। ফুরিয়ে গেলেন সকলের সামনে দিয়ে একান্ত অনিবার্যভাবেই। টেস্ট ক্রিকেট থেকে ওঁরা হয়তো সরে গেলেন কিন্তু তাঁদের সাফল্যের রমণীয় মুহূর্তগুলো ভারতীয় ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ের পাতায় লেখা হয়ে রইল।

জানি না টেস্ট ক্রিকেটে ওঁদের কাউকে আর কোনো-দিন ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে কিনা।

সাল	বিপক্ষ দেশ	ভারতীয় খেলোয়াড়দের অধিকৃত মোট উইকেট	চার স্পিনারের সংগ্রহ	চার স্পিনারে শতকরা সংগ্রহ
১৯৬৬-৬৭	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৩৯	৩২	৮২.০৫ *
১৯৬৭	ইংল্যান্ড	৩৬	৩৩	৯১.৬৬ *
১৯৬৭-৬৮	অস্ট্রেলিয়া	৬২	৩০	৪৮.৩৮
১৯৬৮	নিউজিল্যান্ড	৬৯	৪০	৫৭.৯৭
১৯৬৯	,,	৫৫	৪৬	৮৩.৬৩ *
১৯৬৯	অস্ট্রেলিয়া	৬৯	৫৯	৮৫.৫০ *
১৯৭১	ওঃ ইন্ডিজ	৬৮	৪৮	৭০.৫৮
১৯৭১	ইংল্যান্ড	৪৮	৩৭	৭৭.০৮
১৯৭২-৭৩	,,	৭৫	৭১	৯৪.৬৬ *
১৯৭৪	,,	২৪	১৫	৬২.৫০
১৯৭৪-৭৫	ওঃ ইন্ডিজ	৬৮	৫১	৭৫.০০
১৯৭৬	নিউজিল্যান্ড	৪০	২৭	৬৭.৫০
১৯৭৬	ওঃ ইন্ডিজ	৫০	৪৬	৯২.০০ *
১৯৭৬	নিউজিল্যান্ড	৫৫	৫০	৯০.৯০ *
১৯৭৬-৭৭	ইংল্যান্ড	৭৩	৬৪	৮৭.৬৭
১৯৭৭-৭৮	অস্ট্রেলিয়া	৯৪	৬৭	৭১.২৭
১৯৭৭-৭৮	পাকিস্তান	২৮	১৬	৫৭.১৪
১৭টি সিরিজ		৯৫৩	৭৩২	৭৬.৮১

* অবিশ্বাস্য স্পিন আধিপত্য।

উপেক্ষিত বোলারের উপযুক্ত উত্তর

বাঁ-হাতি স্পিনার দিলীপ রসিকলাল দোশির জন্মই শুধু গুজরাটের রাজকোটে। বাংলার জল-হাওয়ায় মানুষ। শিক্ষা-দীক্ষা, ক্রিকেট খেলা শিক্ষা এবং ক্রিকেটে প্রতিষ্ঠা সবই বাংলায়। বিদ্যা শিক্ষা ভবানীপুর এডুকেশনাল সোসাইটি ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। স্কুলের দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ছিল তৃতীয় পাঠ্য ভাষা। তবু যদি বলি, দিলীপ দোশি টেস্ট ক্রিকেটে নবম বাঙালী তা হলে নিশ্চয়ই আপত্তি উঠবে। বাংলার ক্রিকেটার বললে সবাই মেনে নেবে।

সার্ভিসেসের খেলোয়াড় এ কে সেনগুপ্তকে বাঙালী টেস্ট ক্রিকেটার বলে মেনে নিতে কিন্তু কারো আপত্তি নেই, যদিও তিনি বাংলার কোনো দলই খেলেননি, বাংলার জল-হাওয়ায়ও বেড়ে ওঠেননি।

হ্যাঁ, এ কে সেনগুপ্তকে নিয়েই দিলীপ দোশির আগে ৮ জন বাঙালী টেস্ট ক্রিকেট খেলেছেন। যেমন প সেন (১৪টি), সুটে ব্যানার্জী (একটি), মন্টু ব্যানার্জী (একটি), পুটু চৌধুরী (একটি), পঙ্কজ রায় (৪৩টি), অম্বর রায় (৪টি), সুব্রত গুহ (৪টি) ও এ কে সেনগুপ্ত (একটি)।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চলতি সিরিজে দিলীপ দোশির টেস্ট অভিষেক হয় মাদ্রাজে। প্রথম টেস্টেই অসাধারণ সাফল্যের সুবাদে দলে স্থান প্রায় পাকা করে নিয়েছেন।

ক্রিকেট খেলায়, বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করা ব্যাটসম্যানের যেমন বিশেষ কৃতিত্ব, তেমনি ইনিংসে পাঁচটি উইকেট দখলও বোলারের বিশেষ যোগ্যতার পরিচয়। প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে কেউ যদি সেঞ্চুরি করেন বা কোনো বোলার যদি ইনিংসে পাঁচটি উইকেট পান তবে ধরে নেওয়া হয় সেটা চমক জাগানো কৃতিত্ব। ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ের বিশেষ ব্যাপার।

দিলীপের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি ঘটে গেছে এবং দীর্ঘকাল উপেক্ষিত থেকেও চমক সৃষ্টির নায়ক হয়েছেন প্রথম ইনিংসে ছয়টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দুটি—মোট আটটি উইকেট দখল করে।

ভারতের কোনো বোলার এখন পর্যন্ত টেস্ট আবির্ভাবে আটটি উইকেট দখল করতে পারেননি। এক ইনিংসে ছয়টি অবশ্য পেয়েছিলেন আবিদ আলী তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টে, ৬৭-৬৮ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড মাঠে। আবিদের অ্যাভারেজও ভাল ছিল—৫৫ রানে ৬টি। দিলীপ পান ১০৩ রানে ৬টি। তবে আবিদ দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন একটি উইকেট। দিলীপ দুটি পেয়ে আবিদের রেকর্ড ম্লান করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, ৬০-৬১ সিরিজে টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগে তামিলনাড়ুর লেগ স্পিনার ভি ভি কুমারও দুই ইনিংসে ৭টি উইকেট পেয়েছিলেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। কিন্তু পরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর একটি টেস্ট খেলার পরই নির্বাচকরা তাঁর নামটি ভুলে যান।

বারবার সাড়া জাগানো সাফল্য সত্ত্বেও ভুলে ছিলেন দিলীপ দোশির নামও। কিংবা বলা যায়, নামটি নির্বাচকদের মনে থাকলেও তাঁর টেস্ট অঙ্গনে প্রবেশের পথ আগলে রেখেছিলেন সমগোত্রীয় বাঁ-হাতি স্পিনার বিষেণ সিং বেদি।

কিন্তু দিলীপকে চিনতে ভুল করেননি উপমহাদেশের ক্রিকেটার মনসুর আলী খান পাতাউদি। তবু তো পাতাউদির এক চোখে দৃষ্টি নেই। দশ বছর আগে ১৯৬৯ সালে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে হোম সিরিজে বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্ট খেলার আগে নেটে বল করার জন্য কলকাতার এই ছেলেটিকে ডেকে নিয়েছিলেন পাতাউদি। প্রতিশ্রুতিবান তিনটি ছেলেকে অবিলম্বে টেস্ট দলভুক্ত করার জন্য মনসুর আলী তখন প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে যাঁদের নাম করেছিলেন দিলীপ দোশি তাঁদের অন্যতম। অন্য দুজন গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ এবং একনাথ সোলকার। [illegible]

দোশি। দিলীপের বয়স তখন ২২ বছর। ১০ বছর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ৩২ বছর বয়সে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেলেন। এবং দিলেন উপেক্ষার উপযুক্ত উত্তর। যদিও বেশি বয়স স্পিনারদের দক্ষতা দেখানোর ক্ষেত্রে খুব বড় বাধা নয় তবুও কিছুটা বাধা তো বটেই। তা ছাড়া হতাশায় ভুগতে ভুগতে মনের উপর চাপ পড়ে, আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। মাদ্রাজ টেস্টের পর ব্যাঙ্গালোর ও কানপুরে টেস্টে দিলীপ বেশি উইকেট না পেলেও নিখুঁত লেংথ ও নিশানায় বল করে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানদের সমীহ আদায় করেছেন। জানি না পরবর্তী টেস্ট জীবনে তিনি কতখানি সফল হবেন। যদি সফল না হন তবে ধরে নিতে হবে সময়ে সুযোগ পেলে প্রসন্ন-বেঙ্কট-চন্দ্র-বেদির সঙ্গে বিশ্ব ক্রিকেটের টেস্ট স্পিনারদের সঙ্গে দোশির নামটিও যুক্ত হত।

কারো চেয়ে কি দোশির বাঁ-হাতের ঘূর্ণি বলে জাদু কম ছিল? ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের ১৯৭৮-এর বর্ষপঞ্জীতে রঞ্জি ট্রফির খেলায় বোলারদের কৃতিত্বের খতিয়ানে দোশির নামটিই আছে সবার উপরে। অবশ্যই অ্যাভারেজের হিসাবে। ১৩·২০ গড়ে মোট ২০৪টি উইকেট। এখন হিসাব ১৫·৪৪ গড়ে ২৩৬টি উইকেট

রঞ্জির ৪৯টি খেলায়। অনেক কৃতিত্বই রেকর্ড বইয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। যেমন ৬৮ সালে ১২·৭৮ গড়ে ২৮টি উইকেট, ৭০ সালেও ২৮টি। অ্যাভারেজ আরও ভাল। মাত্র ১১·৪৮। ৭৪-এ আছে এক বিরল কৃতিত্বের নজির। আসামের বিরুদ্ধে মাত্র ৬ রানে ৬টি উইকেট দখল।

প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট শুরু ১৯৬৪ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়। ৬৭-তে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে প্রতিষ্ঠা। সে বছরে রোহিন্টন বারিয়া ট্রফির খেলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই স্পিনার পান ৩২টি উইকেট। এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পায় রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি। ১৯৬৮ থেকে দোশি রঞ্জিতে বাংলা দলের নিয়মিত খেলোয়াড়। আগেই লিখেছি প্রথম বছরেই পেয়েছিলেন ২৮ উইকেট। ৬৯-এ ইডেনে দলীপ ট্রফির খেলায় দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে পান ৭টি উইকেট। ওই মরসুম থেকে সফরকারী বিদেশী দলের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতি [illegible]

হয়নি। ৬৯-এ অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে পান ৭টি উইকেট, ৭৪-৭৫-এ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দলের বিরুদ্ধে ৪টি এবং টনি গ্রেগের ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে ৩টি। গ্রেগ দুই ইনিংসেই ফিরে যান দোশির বলে বিভ্রান্ত হয়ে যথাক্রমে ১ ও ৬ রান করে। দিলীপ ইংল্যান্ডে সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ এবং কাউন্টি ক্রিকেট খেলেও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

চশমা পরা সুদর্শন, মৃদুভাষী এই মার্জিত ক্রিকেটার হই-চই ও আড্ডা থেকে দূরে থাকতেই ভালবাসেন। ফুটবল খেলায় আগ্রহ নেই। ক্রিকেটই ধ্যানজ্ঞান। আজ পর্যন্ত কটি সিনেমা দেখেছেন আঙুলে গুণে বলে দিতে পারেন। বাবা রসিকলাল দোশির কাগজ-বোর্ডের ব্যবসায়ে এবং বাড়িতেই তাকে পাওয়া যায়। অবশ্যই ক্রিকেট সিজনে ক্রিকেট মাঠে।

চিন্তাপ্রবণ বোলার। ব্যাটসম্যানকে অধ্যয়ন করে তাকে বিভ্রান্তির জালে জড়াবার জন্য মস্তিষ্ক সর্বদা কাজ করতে থাকে। কারো কাছ থেকে ক্রিকেটের তালিম নেননি, যদিও মনে মনে গুরু বলে মেনে নিয়েছেন ভিনু মানকড়কে। আর অসীম কৃতজ্ঞতা আছে পাতাউদির প্রতি।

পাতাউদির কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম আমার ফ্লাইট করানো উচিত কি না। পাতাউদির পরামর্শ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

দিলীপের মতে : পিচ যখন স্পিন নেবে আমি তখন স্পিনের জাদুতেই ব্যাটসম্যানকে বিভ্রান্ত করব। যখন স্পিন নেবে না তখনই ব্যাটসম্যানকে বিচারে ভুল করানোর জন্য, তাকে এগিয়ে এসে বা পিছিয়ে গিয়ে খেলতে বাধ্য করার জন্য ফ্লাইট করাবো। আমার যে হাইট তাতে স্বাভাবিক ফ্লাইট আমার বলে আছেই। এই ফ্লাইট এবং স্পিনের বলেই দিলীপ টেস্ট আবির্ভাবে স্মরণীয় হয়ে রইল।

জীবনের প্রথম টেস্টে যেসব বোলার ইনিংসে ৬টি বা বেশি উইকেট পেয়েছেন তাদের নাম নীচে দেওয়া হল।

বব ম্যাসি (অস্ট্রেলিয়া) ৮—৫৩ ও ৮—৮৪; ১৯৭২-এ লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে।

এ এল ভ্যালেন্টাইন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ৮—১০৪; ১৯৫০-এ ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে।

জি বি ফেরিস (ইংল্যান্ড) ৭—৩৭; ১৮৯১-৯২ সিরিজে কেপটাউনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে।

জন লিভার (ইংল্যান্ড) ৭—৪৬; ১৯৭৬-৭৭ সিরিজে দিল্লীতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে।

অ্যালেক বেডসার (ইংল্যান্ড) ৭—৪৯; ১৯৪৬-এ লর্ডসে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে।

জে ল্যাটিজ (ইংল্যান্ড) ৭—৫৬; ১৯৩৩-এ ম্যাঞ্চেস্টারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে।

এ ই হল (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৭—৬৩; ১৯২২-২৩ সিরিজে কেপটাউনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে।

চার্লস এইচ অ্যাশলে (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৭—৯৫; ১৮৮৮-৮৯ সিরিজে কেপটাউনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে।

মহম্মদ নাজির (পাকিস্তান) ৭—৯৯; ১৯৬৯-৭০ সিরিজে করাচিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে।

জে সি লেকার (ইংল্যান্ড) ৭—১০৩; ১৯৪৭-৪৮-এ ব্রিজটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে।

সৈয়দ আবিদ আলী (ভারত) ৬—৫৫; ১৯৬৭-৬৮ সিরিজে এডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে।

দিলীপ দোশি (ভারত) ৬—১০৩; ১৯৭৯-৮০ সিরিজে মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে।

এ এম মস (নিউজিল্যান্ড) ৬—১৫৫; ১৯৫০-৫১ সিরিজে ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে।

চোখ ধাঁধানো সাদা
যে
দেখে সেই বলে...
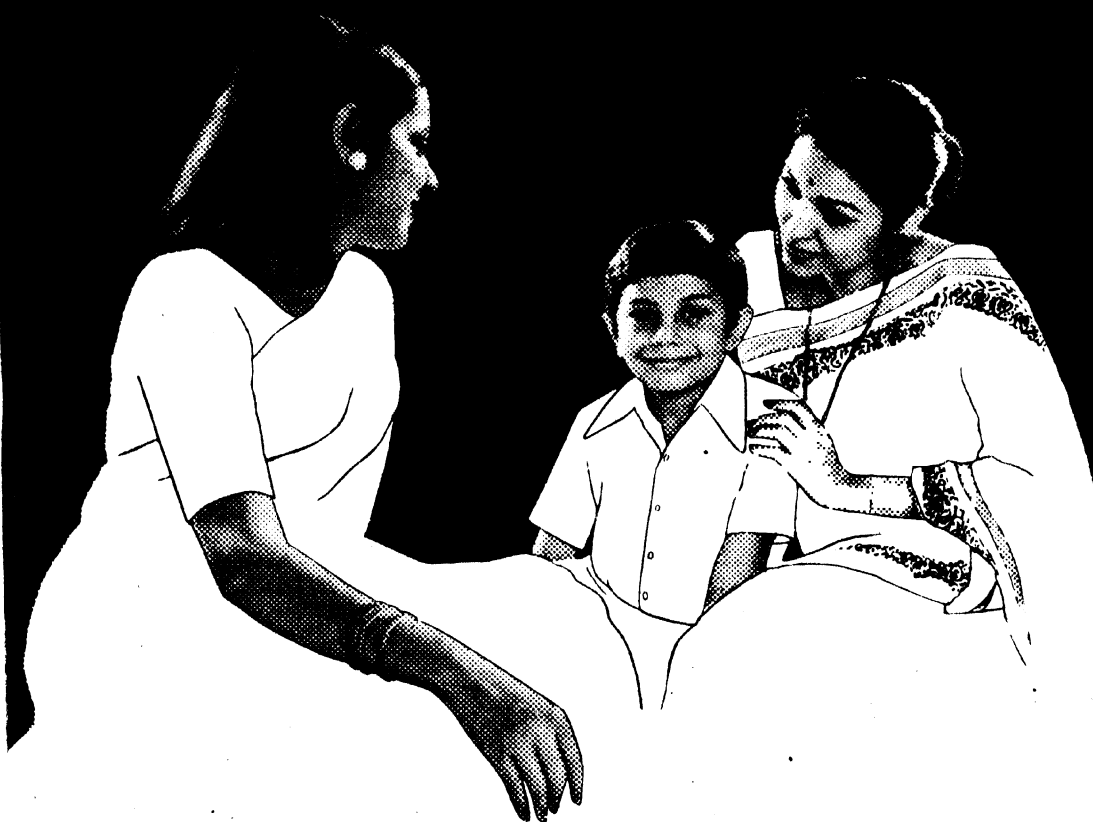
এ হচ্ছে

ডেট

ডিটারজেন্ট কেক
দিয়ে ধোওয়া

Shilpi DM 35A/78 Ben

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

রাঢ় পরিকল্পনা ও বিশ্বভারতী সমাজ—সুরজিৎ সিংহ। প্রকাশক—বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, শান্তিনিকেতন। মূল্য উল্লেখ নেই।

বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য শ্রীসুরজিৎ সিংহ এই পুস্তিকাটির প্রথমেই পূজনীয় গুরুদেবের লিখিত যে উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন তা হল, 'আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও বিশেষ উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে।' গুরুদেবের এই উক্তিটির মূল তাৎপর্য হল, পুঁথিকে মনের রাজা করলে স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না।' কিন্তু, পুস্তিকার পৃষ্ঠা কটি পাঠ করে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পুঁথিকে মনের রাজা করেই লেখক তাঁর রাঢ় দেশের গ্রাম-উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এবং সেই কারণেই বোধ হয় বিনা দ্বিধায় তিনি বলতে পারলেন, 'রবীন্দ্রনাথ বহু বছর আগে বাংলার সুধীজন ও ছাত্রসমাজের কাছে যে আবেদন করেছিলেন এতকাল পরেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে তা প্রধানত কল্পনার পর্যায়েই রয়ে গেছে। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্রদের চেষ্টায় পারিপার্শ্বিক পল্লী অঞ্চলকে জানার কাজ খুবই ক্ষীণভাবে অগ্রসর হয়েছে।' এই উক্তিটির দ্বারা লেখক বিশ্বভারতী বা শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ সম্পর্কিত অজ্ঞতা কিভাবে প্রকাশ করেছেন তা বলি।

শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা কালে গুরুদেবের নির্দেশ মতই কাজ শুরু হয়। যে পথে তা হয়েছিল, তা হল : শ্রীনিকেতনের পল্লী-সেবা বিভাগের পরিচালক, কর্মী ও ছাত্রদের নিকটবর্তী গ্রামের মানুষের সঙ্গে আপনজনের মত সম্বন্ধ স্থাপনের পর তাদের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় প্রথমে জানতে হত। পরে, সেই পরিচয়লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে গ্রামের আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আনন্দের নিম্নগামী অবস্থার উন্নয়ন কিভাবে করা যায় তার পথ নির্ধারণ করে তাদের মধ্যেই তাকে প্রয়োগ করতেন। লেনার্ড এলমহার্স্ট এবং কালীমোহন ঘোষ, একত্রে এই পথে অতি নিপুণতার সঙ্গে কাজ শুরু করেছিলেন। কয়েক বছর পর এলমহার্স্ট যখন ইংলন্ডে নিজের দেশে ফিরে যান তখন ঐ কাজটি ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত অতি নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে গিয়েছিলেন কালীমোহন ঘোষ। তিনি এবং তাঁর সহকারী কর্মীরা কিভাবে তখনকার গ্রামসমাজের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় লাভের চেষ্টা করে গিয়েছিলেন তার পরিচয় মুদ্রিত আছে সে যুগের বল্লভপুর ও রায়পুর নামক গ্রাম সম্পর্কিত, সুপরিকল্পিত ও নানা তথ্য সম্বলিত দুটি গ্রন্থে। এইরূপ তথ্যকে ভিত্তি করেই সে যুগের শ্রীনিকেতনে দরিদ্র গ্রামবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নমূলক শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছিল। এই কারণেই গ্রামসমাজের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মিক সম্পর্ক তখন গড়ে উঠেছিল যে, শ্রীনিকেতনকে দরিদ্র গ্রামবাসীরা আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা ও তার প্রতি নির্ভর না করে থাকতে পারেনি।

গ্রামের নিদারুণ সামাজিক ভেদাভেদ, অর্থনৈতিক দুর্দশা, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি নানা প্রকার বেদনাদায়ক পরিবেশের মধ্যে শ্রীনিকেতনকে তখন কাজে নামতে হয়েছিল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। সর্বাপেক্ষা বড় বাধা ছিল সেযুগের ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধতা ও অসহযোগিতা। এইরূপ প্রতিকূল পরিবেশের কথা চিন্তা করে গুরুদেব শ্রীনিকেতনের পরিচালক ও কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, শ্রীনিকেতনের পার্শ্ববর্তী দু-একটি গ্রামের সঙ্গে প্রথমে আন্তরিক যোগ স্থাপন করে সেখানে তাঁরা যেন তাঁদের কাজ প্রথম শুরু করেন। তাঁরা আরম্ভে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে কাজ শুরু করে, তার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গ্রামোন্নয়নের কাজের পরিধি পরে বৃদ্ধি করেছিলেন। সুতরাং সুরজিৎবাবু যে লিখেছেন, 'তাঁর (গুরুদেবের) প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে তা প্রধানত কল্পনার পর্যায়েই রয়ে গেছে।' বা 'পারিপার্শ্বিক পল্লী অঞ্চলকে জানার কাজ খুবই ক্ষীণভাবে অগ্রসর হয়েছে' তা তাঁর শ্রীনিকেতনের প্রথম সতের-আঠার বছরের কার্যক্রমের সঠিক পরিচয়ের অভাব থেকেই ঘটেছে। শ্রীনিকেতনের সঠিক ইতিহাস জানা থাকলে এইরূপ ভ্রান্ত মতামত লিখিতভাবে তিনি প্রকাশ করতে পারতেন না।

সুরজিৎবাবু, তাঁর প্রবন্ধে বারে বারেই লিখে গেছেন রাঢ় অঞ্চলের গ্রামজীবনের অজৈব ও জৈব পরিবেশ, উৎপাদন ব্যবস্থা, জনসংখ্যা ও জনবিন্যাস, সামাজিক গঠন ও সংস্কৃতির ধারা নিয়ে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের কথা। কিন্তু তথ্যানুসন্ধানের পর তাকে পল্লী উন্নয়নের কাজে কিভাবে প্রয়োগ করা হবে সে কথা পরিষ্কার করে কোথাও বললেন না। শেষ দিকে এ বিষয়ে যা বলেছেন, তা পরে বোঝা গেল যে, তা তাঁর নিজস্ব কল্পনা-প্রসূত প্রস্তাব। তিনি নিজে গ্রামোন্নয়নের কাজে হাত দিয়ে, তার ফলাফল দেখে, এই প্রস্তাবগুলি রচনা করেননি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিতের মত পুঁথিকেই মনের রাজা করে এই প্রস্তাব কটি রচনা করেছেন।

শহরের বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত ও গবেষকগণ পল্লী অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করেন পত্রপত্রিকা, গ্রন্থ, সেনসাসের রিপোর্ট ও নানা প্রকার সরকারী বেসরকারী রিপোর্ট থেকে। কখনো কখনো একই উদ্দেশ্যে দু-একজন স্বল্প সময়ের জন্য কয়েকটি গ্রামও ঘুরে আসেন সামান্য কিছু তথ্য সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথ ও এলমহার্স্ট

করে। পরে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে গবেষণা গ্রন্থ রচনা করে উপাধিও পান। কিন্তু তাঁদের সেই জ্ঞানকে গ্রামে বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা নিজের হাতে তাঁরা কি করেছেন ? এই গবেষকরা আর কখনো গ্রামের পথে পা বাড়িয়েছেন বলেও শোনা যায় না। তাঁরা ইউ জি সির কাছ থেকে বহু টাকা সংগ্রহ করে সেমিনার করেন, কনফারেন্স করেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বসে। সেখানে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠের পর খাওয়া-দাওয়া ও চিত্তবিনোদনে সময় কাটিয়ে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে খুশি মনে তাঁরা ফিরে যান। গুরুদেব কিন্তু গ্রামবাসীদের সশ্রম ত্যাগ করা এইরূপ সেমিনার বা কনফারেন্স কখনো চানান। তিনি চেয়েছিলেন শ্রীনিকেতনে, আলোচনা বা পরীক্ষা, যা কিছুই হোক না কেন তাতে যেন গ্রামবাসীরা সর্বদাই যুক্ত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ব্যয়বহুল সভা-সমিতির পথ যেন ত্যাগ করা হয়।

পুস্তিকাটির প্রথম পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে লেনার্ড এলমহার্স্ট, কালীমোহন ঘোষ, সুধীর সেন প্রভৃতি পথিকৃৎদের চেষ্টায় (গ্রামের পরিচয়ের) কাজ শুরু হয়েছিল।' সুধীর সেনকে অন্যতম পথিকৃৎরূপে এই দলে স্থান দিয়ে লেখক খুবই ভুল করেছেন। সুধীর সেন ছিলেন এমন একজন গবেষক, তথ্য সংগ্রাহক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী বুদ্ধিজীবী, যিনি পুঁথিকেই মনের রাজারূপে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি গ্রামের তথ্যানুসন্ধানের কাজ করেছিলেন শ্রীনিকেতনের পল্লীউন্নয়ন বিভাগের প্রথম যুগের কর্ম সংক্রান্ত কাগজপত্র ঘেঁটে গুরুদেব ও কালীমোহন ঘোষের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে। শ্রীনিকেতনের নিকটবর্তী কোন গ্রামে গিয়ে পূর্ব যুগের মত তথ্য সংগ্রহের কাজ তিনি একেবারেই করেন নি। শ্রীনিকেতনে রক্ষিত গ্রাম সংক্রান্ত তথ্যগুলিই ছিল তাঁর গ্রন্থ রচনার মূল সহায়। এছাড়া তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা গ্রামোন্নয়নের কাজের চেষ্টা নিজের হাতে কখনো করেন নি। সুতরাং গুরুদেবের পল্লীউন্নয়নের আদর্শে অনুপ্রাণিত এলমহার্স্ট ও কালীমোহন ঘোষের সঙ্গে সুধীর সেনকে পথিকৃৎরূপে এক দলে স্থান দিয়ে প্রবন্ধকার আর একটি গুরুতর ভুল করেছেন।

শ্রীনিকেতন, গুরুদেবের পল্লী-উন্নয়ন কর্মের আদর্শ পথ থেকে ভিন্ন পথে চলতে শুরু করে গুরুদেব ও কালীমোহন ঘোষের মৃত্যুর পর। কলিকাতাবাসী একজন অধ্যাপক যখন থেকে শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন তখন থেকেই এই পরিবর্তনের শুরু।

অধ্যাপকটি ছিলেন কলিকাতার বুদ্ধিজীবী নাগরিক। কলিকাতার একটি সরকারী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চপদের অধ্যাপকরূপে অধ্যাপনার জীবন শেষ করে অবসর নেবার পর, তিনি শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। গুরুদেবের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সেই কারণে, তাঁর পরিচালনাধীনে শ্রীনিকেতন তার কর্মের আদর্শ পথ থেকে প্রথম সরে যেতে শুরু করে। তাকে ঠেকাবার মত ব্যক্তি তখন আর কেউই ছিলেন না। ১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী যখন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে চলে গেল তখন এই পরিবর্তনের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানের শ্রীনিকেতন এইরূপ বিস্তীর্ণ এক জটিল গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছে। বিশ্বভারতী বা শ্রীনিকেতন প্রথম যুগে গ্রামবাসী বা গ্রামসমাজকে ভালবাসার দ্বারা আন্তরিকভাবে জেনেছিলেন, সেখানে উন্নয়নমূলক কাজ করে আশানুরূপ সাফল্যও লাভ করেছিলেন, কিন্তু তার খবর না রেখে লেখক বললেন, 'বিশ্বভারতী বা শ্রীনিকেতন গুরুদেবের একটি কল্পনা মাত্র।

প্রবন্ধের ১৩ এবং ১৪ পৃষ্ঠায় লেখক জানাচ্ছেন ; "কিছু কাজ এখানকার অধ্যাপক, গবেষক ও আশ্রমিকগণ নিজেরাই ইতিমধ্যে করেছেন বা শুরু করেছেন"। সঙ্গে

কলের নাম, তাঁদের কাজের উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁদের কাছে নানারূপ সংগৃহীত তথ্য থাকলেও যাদের নিয়ে গবেষণা করা হল তাঁদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের কোন প্রস্তাব কোথাও আছে কি? এই তালিকার শেষে আমার নামটিও যুক্ত হয়েছে দেখলাম। কিন্তু আমি তাঁদের মত কেবল সাধারণ তথ্য সম্বলিত কোন গ্রন্থ রচনা করিনি। আমার সে উদ্দেশ্য ছিল না, এখনো নেই। আমি মূলত গ্রাম-সংস্কৃতির কয়েকটি দিক নিয়ে খোঁজ খবর করেছি, সংগ্রহ করেছি, তা নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে তাকে নানাভাবে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার ব্যবস্থায় প্রয়োগ করেছি যুগোপযোগী উন্নতির দিক চিন্তা করে। কারণ, আমি জেনেছি, গুরুদেব নিজেও তা করেছিলেন। তিনি গ্রাম সমাজকে আন্তরিক ভাবে ভালবেসে, সেখান থেকে অনেক কিছু সংগ্রহ করে নিজের সৃষ্টি মূলক কাজে তাকে প্রয়োগ করে গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশের নতুন নতুন পথ খুলে দিয়েছিলেন। আমি কেবল মাত্র সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট ছিলাম না। গুরুদেবের নির্দিষ্ট পথে আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য মত কাজ করবার চেষ্টা করে কিছুটা সফলও হয়েছিলাম।

১৮ পৃষ্ঠায় লেখক বলছেন, "নন্দলাল, বিনোদবিহারী ও রামকিংকরের শিল্পকর্মে রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতিতে অবস্থিত আদিবাসী, কৃষক ও বাউলের জীবনচর্যার ছন্দ ও শক্তির আভাস পাই।" এদিক থেকে কথাটি সত্য। কিন্তু, শিল্পাচার্য নন্দলালের সংগে বিনোদবিহারী ও রামকিংকরের কাজের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেদিকটির কথাও তাঁকে জানতে হবে। তা না হলে তাঁর এই উক্তিতে মনে হবে তিনজন একই পর্যায়ের শিল্পী।

নন্দলালের শিল্পকর্মে কেবলমাত্র গ্রাম জীবনের ছন্দ ও শক্তি পরিস্ফুট হয়নি, তিনি গ্রামপ্রচলিত নানা প্রকার শিল্পকর্মকে আন্তরিক আগ্রহে সংগ্রহ করে, তার প্রকৃত স্বরূপটি নির্ধারণের পর, নব পর্যায়ে, ব্যাপকভাবে তাকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন আমাদের মধ্যে। একাজ বিনোদবিহারী ও রামকিংকর কোনদিনই করেন নি। কারণ তাঁদের সে ক্ষমতা ছিল না। তাঁদের শিল্প সাধারণ মানুষের শিল্পোন্নয়নের পথে কার্যকরী হয়নি। তাঁদের শিল্পকর্ম ছিল খুবই ব্যক্তি কেন্দ্রিক।

প্রবন্ধের শেষ অংশে প্রবন্ধকার বলেছেন;—"অনেকে তাই প্রস্তাব করেছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রম উঠিয়ে দিয়ে পূর্বের মতো শুধু বিদ্যালয় বিভাগ, বিদ্যাভবনের গবেষণা বিভাগ, কলাভবন, সংগীতভবন এবং পল্লীসংগঠন বিভাগকে আদর্শগতভাবে রাখা হোক। যতদূর মনে হয় এই ধরনের প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব বা যুক্তিসংগত নয়।"

এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য হল এই 'অনেক' বলতে লেখক কাদের কথা বলছেন, এবং সেই অনেক-এর প্রস্তাবের উপর এতখানি গুরুত্ব তিনি দিতে গেলেনই বা কেন? বরঞ্চ তা না করে গুরুদেব নিজে সঠিক কোন পথে বিশ্বভারতী বা শ্রীনিকেতনকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সে দিকটির সঠিক পরিচয় জেনে, তার পরে ঐ কথাটি যদি তিনি বলতেন তাহলে তা সঙ্গত হতো। এমনও তো হতে পারে যে, 'অনেকে' যা বলেছেন গুরুদেব ঠিক ঐভাবে তা কোনদিনই বলেন নি। তথ্য, যুক্তির দ্বারা এই বাক্যটির ব্যাখ্যা ছাড়া ধরে নিতে হবে যে, পুঁথিকে যাঁরা মনের রাজা রূপে গ্রহণ করেছেন, এ হল তাঁদের কথা।

গ্রাম অধ্যুসিত রাঢ় অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের কথা চিন্তা করে আলোচ্য গ্রন্থটিতে বহু রকমের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়ের প্রতি প্রবন্ধকারের দৃষ্টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়ার কারণ বোঝা গেল না।

লেখক নিশ্চয়ই জানেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রারম্ভে ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে 'স্বদেশী সমাজ' নামক একটি প্রবন্ধের দ্বারা গুরুদেব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিতদের কিভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন গ্রামোন্নয়নের কাজে 'মেলা'র প্রয়োজনীয়তার কথা। তিনি বলেছিলেন: 'আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লী হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।'

গুরুদেব বলছেন, 'মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে।'

'প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নব-ভাবে জাগ্রত, নব প্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোন প্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলায় যে সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।'

গুরুদেব তাঁর জীবিতকালে মেলা সম্পর্কীয় এই চিন্তাকে কার্যকরীরূপে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক মেলাতে প্রয়োগ করে আশানুরূপ ফল পেয়েছিলেন। তাঁর
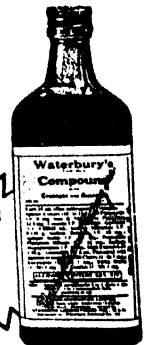
দেখুন...
সবচেয়ে সাদা করার জন্যে রানীপাল®

কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের ঝকঝকে সাদা ! রানীপালের সাদা ! সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সুতী, সিন্থেটিক আর ব্লেণ্ডেড-রানীপাল ব্যবহারে ঝকঝকে হয়ে উঠবেই।

নিয়মিত রানীপাল লাগান...আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান

সুতীর কাপড়ের জন্য **রানীপাল®**
সিন্থেটিক ও ব্লেণ্ডেড কাপড়ের জন্য **রানীপাল®-এস**

Shilpi SG-2A/78 Ben

ক্ষা ছিল, গ্রামবাসীর সঙ্গে শহরবাসী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, মেলাকে কেন্দ্র করে নানা বিজ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের আদান প্রদান হোক। কিন্তু লেখকের পরিকল্পনাটিতে সেইরূপ সাফল্যজনক একটি প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। পরিবর্তে তিনি প্রস্তাব দিলেন ;— বিশ্বভারতীর রাঢ় গবেষণা গোষ্ঠী "আগামী দু বছর প্রতিমাসে দু দিন মিলিত হয়ে রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন গবেষণার বিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রতি অধিবেশনে আলোচনার ধারাবিবরণী লিপিবদ্ধ করা হবে।"

১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসের মধ্যেই এই গোষ্ঠীর প্রথম অধিবেশন বসতে পারে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এই পুস্তিকার বিভিন্ন প্রস্তাবের ভিত্তিতে দু-তিন দিনের একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে। এই আলোচনা সভায় রাঢ় গবেষণা-গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের গবেষণার ভিত্তিতে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করবেন। এই আলোচনা সভায় রাঢ় অঞ্চল বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষকগণকে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ করা হবে, এবং বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান ও উৎসাহী অধ্যাপক, গবেষক, ছাত্র, কর্মী ও আশ্রমিকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। আশা করা যায় আলোচনা সভায় রাঢ় অঞ্চল সম্পর্কিত গবেষণা বিষয়ে আমাদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি সুস্পষ্ট হবে। আর আলোচনা সভার বিবরণ যতদূর সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে প্রকাশ করা হবে।"

কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে বসে আলোচনার দ্বারা কি গবেষকদের জ্ঞানকে পল্লীসমাজে কার্যকরীভাবে রূপ দেওয়া সম্ভব ? এ ছাড়া এই আলোচনা সভা বা সেমিনারে গ্রামবাসীদের অচ্ছুতের মত কেন দূরে রাখা হল, তা বোঝা গেল না। এই সব প্রস্তাবিত সভাসমিতিগুলিকে লেখক মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রমোদের ক্ষেত্ররূপে পরিণত করতে উৎসাহী হয়েছেন বলে মনে হল। তাঁর সমগ্র প্রস্তাবটি পড়ে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তিনি "পুঁথিকে মনের রাজা" রূপ বিশ্বাসেরই একান্ত উপাসক। মেলাকে কেন্দ্র করে গুরুদেব যা করতে বলেছিলেন এবং বিশ্বভারতীতে এখনো যা বহুপরিমাণে চলছে, তার প্রতি কোন শ্রদ্ধা তাঁর নেই। তা না হলে গ্রামোন্নয়নের আলোচনাকালে মেলাকে তিনি এভাবে উপেক্ষা করতে পারতেন না। তর্কাতীত নয়, এমন আরও কিছু বিষয় লেখকের এই পুস্তিকায় আছে, স্থানাভাবে তা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হল না।

শান্তিদেব ঘোষ:

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

নাগর পট

পটচিত্র ভারতের পরিজ্ঞাত ইতিহাসের গোড়া থেকেই আছে। তার বংশলতিকা খুঁজতে গিয়ে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রে পৌঁছানো বিচিত্র নয়। বুদ্ধদেব "চরণচিত্র" দেখতেন এমন উল্লেখ পাওয়া গেছে। বর্ণনায় বোঝা যায় বুদ্ধদেব যা দেখেছিলেন তা 'যমপট' ব্যতীত কিছু না। যমালয়ে পাপীর জন্য কী শাস্তি তোলা রয়েছে সেটা দেখানো হয়েছে। এখনও আমরা পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় এমন জড়ানো পট দেখি। এর আকার দুরকম হয়। এক রকম পট খাড়া। আর অন্য রকম চওড়া অর্থাৎ অনুভূমিক। একপাশে পটটা খুলে অন্য পাশে গোটানো হয়। লোকচিত্রের এই ধারা যে খুবই প্রাচীন বুদ্ধদেবের চরণচিত্র দেখার বর্ণনা এ-কথা সমর্থন করে। অজন্তার গুহাচিত্র বা সাঁচীর নতোন্নত ভাস্কর্যচিত্র (রিলিফ ফ্রিজ) দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, খাড়াই হোক বা পাশেই হোক, পর পর চৌকো পটে (ফ্রেম) গল্পটা সাজানোর মধ্যে লৌকিক এই পটচিত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। দর্শকের পরিচিত গল্প— পুরাণ থেকে হোক বা জাতক থেকে হোক—চিত্রভাষায় রূপায়ণ করতেন পটুশিল্পী এবং দক্ষ পটুয়া। পটুয়ার লোকরীতি যে রূপেশী-অঙ্গের শিল্পীকে প্রভাবিত করত তা ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে।

কালীঘাট পট এই পটচিত্রের শেষ ফুল। কালীঘাট পটুয়াদের ওপর সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ কাজ আমার চোখে পড়েনি। বন্ধুবর আই এন বশীর, ডি সি ডি ডি হয়েও যিনি কলকাতার মুসলমান সমাজের ওপর একটি তথ্যচিত্র তুলছেন, বলছিলেন যে কালীঘাটের পটুয়ার অন্যান্য পটুয়াদের মতই একাধারে হিন্দু এবং মুসলমান। কালীঘাটের পটুয়াদের নাম আমরা জানি, তথাপি একথার সমর্থন আমি জানতে পাইনি। তা হলেও অনুমান যে পটুয়ারা কালী মন্দিরের পাড়ায় ঘর বাঁধলেন তাঁরা আশপাশের জেলা থেকে পটচিত্রের পরম্পরাকে সঙ্গে এনেছিলেন। তাই হয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস।

সাহেবরা সব সময় দেখাবার চেষ্টা করে সব কিছু আমরা ওদের কাছ থেকে ধার করেছি। বুদ্ধমূর্তির প্রতিমা-চিত্রণ রীতি (আইকোনোগ্রাফি) না-কি গ্রীকদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি গান্ধার হয়ে। আপোলো থেকে বুদ্ধ—আঁদ্রে মালরো "মৌনতার কণ্ঠস্বর" এমন কথা বলেছেন। তেমনি ব্রিটিশ জলরঙ থেকে এসেছে কালীঘাট—বিল আর্চার বলেছেন। আমরা কিন্তু এসব কথা মেনে নিই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব শিল্প-ঐতিহাসিক কাজ করেন মোটামুটি দেখা গেছে—শহীদ সুরাবর্দী ইত্যাদি দু-একজন ব্যতিক্রম — সকলেই ইতিহাসের ছাত্র। শিল্পকলা বোঝেন না বলে এঁরা সাধারণত সাহেবদের লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে বড় বড় করে নিজেদের "পেপারে" দেন। কিন্তু এমন বিরাট বিচিত্র ভারতবর্ষ, তার উপজাতি, জনপদ, ভূগোল, ধর্ম—বিরাটে গভীর। ব্যাপ্তি। চারিদিকে বিস্তৃত শিকড়। সুতরাং সাহিত্য শিল্পকলা যে কোথা থেকে রস টানছে তা বলা দুরূহ। একথা অবশ্য ঠিক, কালীঘাট ঔপনিবেশিক আমলের পট। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় থাকার সময় আঁকা বেশির ভাগ পট। কলকাতা থেকে রাজধানী

দেখেছেন কটস্উল কেমন বড় হয়ে উঠেছে!

রাজতে উঠে যাবার সংগে সংগে নাগর পটের কপালে দুর্দিন ঘনিয়ে এল। তেলরঙ এবং বিলিতী কাগজে আঁকা হলেও ব্রিটিশ জলচিত্রের সংগে কালীঘাটের পটে আকাশ পাতাল তফাত। সমান্তরেখা (কনট্যুর লাইন) দিয়ে ভেতরে ছায়াসুষমা (শেডিং) দেবার যুক্তিতেও বলা চলে না যে কালীঘাট পটে ব্রিটিশদের প্রভাব পড়েছে। কারণ গ্রীক থেকে ইম্প্রেসেনিজমের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত দেহসংস্থান (অ্যানাটমি) সম্বন্ধে পশ্চিমা ইউরোপীয়দের বাড়াবাড়ির সংগে তুলনা করলে কালীঘাটের পট রূপারোপিত (স্টাইলাইজড) কাজ বলে দেখা যাবে। দেহ-আয়তন, বস্তুপুঞ্জ (মাস এবং ভ্যলুম) এবং পৌত্তলিক গড়ন (মডেলিং) তার সংগে সূত্র টানতে গেলে বাংলার পোড়ামাটির মন্দির ভাস্কর্যের কাছে পৌঁছনো যায় সহজেই। উভয়ের রূপারোপের কায়দায় যে মিল তা দেখলে চমকে উঠতে হয়। আর্চার সাহেবের পাহাড়ী অনুচিত্রের ওপর কাজ সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেও কালীঘাটের ওপর কাজটা নস্যাৎ করা খুবই সহজ। অন্য আরও বিষয় জয়া আপ্পাস্বামীর সংগে তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘোরার সময় এ-বছরের গোড়ায় জানতে পেরেছি। কিন্তু তার জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লেখা দরকার। ইণ্ডিয়ান মু্যজিয়াম সুন্দর একটা প্রদর্শনীতে (সেপটেম্বর ১—৯) যাদুঘরের সংগ্রহ এবং আর পি গুপ্তের সংগ্রহ একত্রে দেখিয়েছেন। মাকস মুলার ভবনের সংগে যোগাযোগ করে কর্তৃপক্ষ আনা ডালা পিকোলাকে এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আনেন। তাঁর বক্তৃতায় স্লাইডে পশ্চিমী সংগ্রহের কালীঘাট পটের নমুনো দেখালাম—সুন্দর সব কাজ। ও'র বক্তব্য যথারীতি আর্চারের প্রতিধ্বনি। ওঁদের দেশের সুবিধা হলো ইচ্ছা করলেই গবেষণার জন্য সুযোগ এবং অর্থ জুটে যায়। এদেশে সুযোগ কম। অনেক সময়ই যোগ্য লোকে সুযোগ পায় না। ডালা পিকোলার আনা স্লাইডের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

কালীর রাণী। এই পটের রেখা এবং লেখনরেখ (ক্যালিগ্রাফিক) দ্রষ্টব্য। রূপারোপ রীতি থেকে কি ব্রিটিশ জলরঙের কথা মনে হয়? [illegible] মধ্যে [illegible] উৎস থাকতে পারে।

মোট ছবির সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ। কালীঘাট পটের কৈশোর যৌবন থেকে বার্ধক্য সব দেখানো হয়েছে। নামমাত্র মূল্যে তীর্থযাত্রীর জন্য দেবদেবী আর মহাকাব্য পুরাণের কাহিনী থেকে শহর কলকাতার বাবু আর বিবিদের কেচ্ছা কাহিনী আঁকতো কালীঘাটের পটুয়ারা। ওঁরা সমাজ-জীবন সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য করত। কিন্তু জড়ানো পটেও সামাজিক এবং ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে। এমন কী পোড়ামাটির মন্দিরে সমাজ জীবনের ছায়া পড়েছে। জাহাজে করে সাহেবদের আসা বা হাতি জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া এসব পোড়ামাটির মন্দিরে চিত্রিত। হংসেশ্বরী বা আঁটপুর ঘুরে এলেই এটা দেখা যায়। সুতরাং কালীঘাট এই বৃহত্তর লৌকিক ঐতিহ্যের আলোকে বিচার্য। তার বিশেষত্বটুকু হলো সে নাগর পরিবেশে ডাগর হয়ে রয়েছে। সুতরাং কালীঘাটের পট শহুরে লোকশিল্প ছোট করে বলতে গেলে—নাগর পট।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

মাদার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাগুলো একটু পালটে নিয়ে বলা যায়, "আমরা কেমন ছবি বানাচ্ছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ—এই কি সিনেমা?" এত খরচ করে, বম্বে থেকে শর্মিলা ঠাকুরকে আমদানি করে, মূল্যবান রঙিন ফিল্ম নিয়ে এমনি নয়-ছয় করে এ কি জিনিস তৈরি করেছেন পরিচালক নারায়ণ চক্রবর্তী? যদি বলেন, শিল্প নয়, নিছক ব্যবসার তাগিদে এই ধরনের ছবি করতে হচ্ছে, তা হলে আমার প্রশ্ন, কমার্শিয়াল ছবিতে যে-মাপের প্রোফেশনাল কমপিটেনস বা মুনশিয়ানার প্রত্যাশা আমরা, সেটা এখানে কোথায়? আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূল কাহিনীটি আমার পড়া নেই। শুধু ছবিটি থেকে যে বক্তব্যটুকু আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলো, তাতে ছবিটি তৈরি না-হলো বাংলা সিনেমার বিশেষ ক্ষতি হতো বলে মনে হয় না। শীলা বিয়ের আগেই মা হয়েছিল। আঠেরো বছর পরে সে তার সন্তানকে ফিরে পেল। এই হচ্ছে এ ছবির মূল কথা। অবৈধ সন্তান নিশ্চয় একটা সামাজিক সমস্যা। এই সামাজিক সমস্যা নিয়ে একাধিক বাংলা ছবি তৈরি হয়েছে। পর্ণিমা নামের একটি অসমীয়া ছবিও দেখলাম এই একই বিষয় নিয়ে। কিন্তু প্রতিটি ছবিতে এই সমস্যার ওপর শুধু কাঁড়ি-কাঁড়ি সেন্টিমেন্ট বর্ষণ করা হয়েছে—যাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের ছিচ্‌কাদুনে রোমান্টিক ন্যাকামি। এত সেন্টিমেন্টালিটি নিয়ে আমরা কি করবো, যেখানে বলিষ্ঠ বক্তব্যের প্রয়োজন? মাদার আবার এক কাঠি বাড়া—কর্ণ-কুন্তীকে পর্যন্ত সেখানে যাত্রার মাধ্যমে আনা হয়েছে। কিন্তু অবিবাহিত মা এবং অবৈধ সন্তান বিষয়ে সবচেয়ে জরুরী প্রশ্নগুলি হলো—আমেরিকা
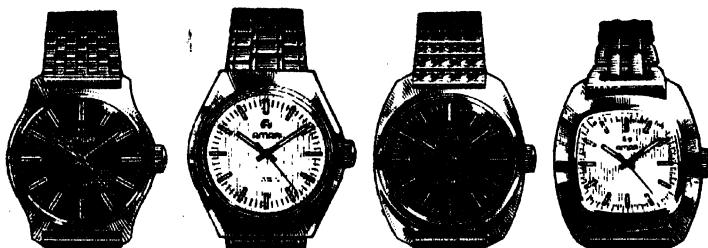
'ওর শার্টই ওর পরিচয়'
—জীনত

পুরুষের পছন্দ নারীর প্রশংসালাভে ধন্য হয়...
মোদী শার্টিং-এর বৈশিষ্ট্য এখানেই

পুরুষের শার্টই হল তার ব্যাক্তিত্বের পরিচয়। যে কোন অনুষ্ঠান, বা যে কোন মৌসমই হোক না কেন, সে চায় তার অসাধারণত্বকে ফুটিয়ে তুলতে।
এই রকম পুরুষদের জন্য মোদী শার্টিংস্ প্রতি মাসে তৈরী করছে চল্লিশ রকমের কাপড়—'টেরিন/ ভিস্কোস্ ও'টেরিন'/উল ব্লেণ্ডস্—যা রঙে আর ডিজাইনে অতুলনীয়

OBM/4450

মোদী
শার্টিং

এবং ইয়োরোপীয় দেশগুলির মতো অবৈধ সন্তান এবং অবিবাহিত মায়েদের আমরা সামাজিক স্বীকৃতি দেব কি না? এবং নারী-পুরুষের সহবাসের জন্যে কি এখনো আমরা বিবাহকে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করবো? মাদার কিংবা জাতীয় ছবিতে এসব প্রশ্নের কোনো বলিষ্ঠ সাহসী উত্তর খুঁজতে যাওয়াই বৃথা। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ, প্যাচপেচে সেন্টিমেন্ট, প্রাগৈতিহাসিক ইনহিবিশনস, ভোঁতা ব্যবসায়িক বুদ্ধি এবং সিনেমা-বিষয়ক খোকামি—এই হচ্ছে মাদার ছবিটির উপচার। ভালো কথা, এ সবের সঙ্গে চপের গায়ে ডিম মাখিয়ে নেবার মতো ন্যাবড়ানো হয়েছে বৌদ্ধ দর্শনের কোটিং।

ছবিটির ঘটনাকাল ১৮ বছর ধরে ব্যাপ্ত। ছবির শুরুতে কোনো এক পঁচিশে ডিসেম্বর সকালে শর্মিলা ঠাকুরের (শীলা) ঘুম ভাঙছে। পাশে তখনো ঘুমোচ্ছেন প্রৌঢ় স্বামী দীপঙ্কর দে। খাট থেকে তিড়িং করে নেমেই তিনি ক্যালেন্ডারের তারিখ পালটাচ্ছেন ঘরে ঘরে। জানি না কিভাবে শর্মিলা তাঁর ঐ অসাধারণ ঘুমের টেকনিকটি আয়ত্তে এনেছেন। সকালবেলার বাসী মুখেও তাঁর মেক-আপ একেবারে অটুট—নাকের ডগাটুকু পর্যন্ত চকচক করছে না। মাদার ছবির রূপসজ্জার ভারবহন

করেছেন গোপাল হালদার। বলাই বাহুল্য, ঘুমের দৃশ্যেও তিনি মেক-আপ বাকস উজাড় করে নায়ক-নায়িকাকে সাজিয়ে দিয়েছেন। আসলে, বাংলা ছবির অধিকাংশ পরিচালক এবং মেক-আপ-ম্যান জানেন না যে রঙিন ছবিতে কি ধরনের রঙ এবং রূপসজ্জা ব্যবহার করা উচিত। রঙিন ছবি, অতএব গাদ্দের রঙ ব্যবহার কর—এ ফরমুলা কবে বাংলা ছবি থেকে যাবে? এই মুহূর্তে কলকাতায় শ্যাম বেনেগাল-এর জুনুন হচ্ছে। এই ছবিটি থেকে বোঝা যায়, রঙিন ছবিতে রঙ কত ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হয়। মননহীন রূপসজ্জার আর একটি উদাহরণ দিই মাদার থেকে। ১৮ বছরের ব্যবধানে দীপঙ্করের চুল কতখানি পাকাবেন সেটাই ঠিক করতে পারেননি পরিচালক। দীপঙ্কর একটি দৃশ্যে টেলিফোন করছেন—সামনের চুল একেবারে পাকা। ঠিক পরের দৃশ্যেই খাটের কাছে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে জিগেস করছেন, "তুমি কাঁদছো?" কোথায় গেল সেই সব সযত্নে রক্ষিত শুভ্র কেশগুচ্ছ?

মাদার ছবিটিকে যে-কারণে বহুদিন ভুলতে পারবো না তা হলো গানের বাড়াবাড়ি, অপপ্রয়োগ এবং নির্বাচন। অমল পালেকর—এ ছবির দ্বিতীয় নায়ক—চৌরঙ্গী দিয়ে লাফাতে লাফাতে গান গাইতে গাইতে চলেছেন। ভাবা যায়? কিংবা শর্মিলা নেমন্তন্ন বাড়িতে যাবার জন্যে সাজলে অমল গাইছেন—আহা কি দারুণ দেখতে, চোখ দুটি টানাটানা ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা সংলাপ বলতে তাঁর অতি কষ্ট—জিব দুমড়ে-মুচড়ে একাকার কাণ্ড। গানের বেলা তাঁর উচ্চারণ একেবারে স্বাভাবিক—কিভাবে তা সম্ভব শুধু পরিচালক মশাই জানেন। যারা অবশ্য শাড়ির পাড় এবং লিপস্টিকের রঙ দেখার জন্য রঙিন সিনেমা দেখতে যান তাঁদের পক্ষে মাদার উপভোগ্য হতে পারে।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

শান্তিদেব ঘোষ ও সুচিত্রা মিত্রের গানের আসর

ভারতীয় রাগসংগীতে 'ঘরানা' শব্দটি বিশেষ অর্থবাহী। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রেও তা সমান প্রযোজ্য এ কথা মানতে যাঁরা রাজি নন তাঁদের জন্য অনায়াসেই উপস্থাপিত করা চলত নয় সেপটেমবর সকালে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত শান্তিদেব ঘোষ এবং সুচিত্রা মিত্রের গানের আসর। অনুষ্ঠানে বারে বারেই প্রমাণিত হয়েছে ভারতীয় অন্যান্য সংগীতের মতো রবীন্দ্রনাথের গান মূলত কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে সঞ্চারিত—স্বরলিপি, বেতার, রেকর্ড প্রভৃতি মাধ্যমে যতই থাক-না কেন। শান্তিদেব ঘোষ যে প্রকৃত অর্থেই সুচিত্রা মিত্রের গুরু সে কথা সেদিনের গানে বারে বারেই প্রতিভাত হয়েছে। অথচ সুচিত্রা মিত্রের গান যা কোনো সময়েই অনুকরণজাত নয়—গুরুর গায়কী কণ্ঠে ধারণ করেও শিল্পীসত্তার অনন্যতায় পূর্ণ ভাস্বর। ভারতীয় সংগীতের এই হল আবহমান পরম্পরা।

অনুষ্ঠানের দুই অর্ধেই প্রথম গান শোনান সুচিত্রা মিত্র, পরে শান্তিদেব ঘোষ। গান নির্বাচনে উভয় শিল্পীই যথেষ্ট সচেতন ও যত্নবান ছিলেন। সুচিত্রা মিত্র ললিতরাগের 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে' গানটি দিয়ে অনুষ্ঠানের উদবোধন করেন। একের পর এক গান গেয়ে যান প্রভাতী সুরে 'পান্থ এখনো কেন অলসিত অঙ্গ', 'তুমি আপনি জাগাও মোরে', 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল', 'নমি নমি চরণে' প্রভৃতি গানগুলি যা প্রভাতের আলোর মতোই পবিত্র মধুর। 'পান্থ এখনো কেন', গানটিতে যোগিয়া রাগের কোমল ঋষভের মোল প্রয়োগ যেমন শান্ত স্নিগ্ধ তেমনই তাৎপর্যবহ। আবার ভৈরবী সুরে বাঁধা 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল' গানের গভীর কাতর করুণ মূর্ছনা যে আবেগ সঞ্চারিত করে তাও তেমনি বিস্ময়কর। দ্বিতীয়ার্ধের 'তোমারে জানি নে' গানের আবেদন অথবা 'আমার একটি কথা' গানে 'পাইনি আমার জাগার সাথী'র যে আর্তি, যে ব্যাকুলতা তা কি কেবলই সুর কেবলই বাণী? এখানেই শিল্পীর সার্থকতা। আর সব শেষে 'কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে' জানি না রবীন্দ্রনাথের আগে অন্ধকারের বিশেষণে

শান্তিদেব ও সুচিত্রা

'বিপুল' শব্দের প্রয়োগ কোথাও আছে কিনা। এই আশ্চর্য শব্দ প্রয়োগ এবং সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে তার ব্যঞ্জনা দুইই সমান চমৎকৃতিজনক।

শান্তিদেব ঘোষও প্রভাতী সুরের গান নির্বাচন করেন। অনুষ্ঠান শুরু করেন 'স্বপন যদি ভাঙিলে' গানটি দিয়ে। অননুকরণীয় দৃপ্ত তাঁর গায়ন-ভঙ্গি, বয়সের ভারে আজো ভারাক্রান্ত নয় কণ্ঠ। তাঁর গাওয়া কোনো গান তাই স্তিমিত নয়, পক্ষান্তরে উজ্জ্বল বিভায় বিভাসিত। ছন্দের দোলার দিকেই তাঁর সর্বাধিক দৃষ্টি এবং ছন্দোবৈচিত্র্যই তিনি গানগুলির ভাব-প্রকাশে এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় অধিকতর যত্নবান। তাঁর নিজের ভাষায় 'বিভিন্ন ছন্দের দোলা যে মনে বিভিন্ন রসের সঞ্চার করে' এ ছাড়াও লক্ষ করার মতো গানের লয় নির্বাচন। 'মনোমোহন গহন', অথবা 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুন-গুনিয়ে,' 'ক্ষত যত ক্ষতি যত' প্রভৃতি গানগুলিতে লয়প্রয়োগ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ঈষৎ দ্রুত লয়ের দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি কিন্তু তাতে গান অনেক ক্ষেত্রেই নতুন ডাইমেনশন পায়। আবার 'নিশা অবসানে', 'এদিন কোন্ ঘরে গো' গানটিতে যে মধ্যলয়ের ব্যবহার করেন তাতে গানে যে রসবেদনার সঞ্চার হয় তা অন্য কোনো লয়ে কি সম্ভব ছিল? লোকসংগীতের ছাঁদে 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' বা 'আজ ধানের ক্ষেতে' গান দুটিতে কোমল নিষাদের শ্রুতির ব্যবহার তাঁর কণ্ঠে আশ্চর্য রূপ পরিগ্রহ করে। এ সব গানের ছন্দের দোলায় স্বাচ্ছন্দ্যে গানের ছন্দের দোলায় স্বাচ্ছন্দ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় দুলিয়ে দেন। আর যখন এই গানেই 'নেব রে লুঠে করে' অংশের কথাগুলি উচ্চারণে বলিষ্ঠ স্বরপ্রক্ষেপে মূর্ত হয়ে ওঠে তখন মানতেই হয় তিনি বারে বারেই নতুন ফিরে ফিরে নতুন। 'ক্ষত যত ক্ষতি যত' গানে এমন নাটকীয়তা থাকতে পারে তা শান্তিদেব ঘোষের গান না শুনলে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না। এ গানের প্রতিটি ছত্র নাট্যরসে সিঞ্চিত করে তোলেন তিনি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে।

শান্তিদেব ঘোষ ও সুচিত্রা মিত্রের গানের অমিলের চেয়ে মিলই বেশি। প্রথমত দৃপ্ত ভঙ্গি, স্বরপ্রক্ষেপণের বলিষ্ঠতা, দ্বিতীয়ত শব্দকে অর্থবাহী করে শ্রোতৃহৃদয়ে সঞ্চারিত করা, তৃতীয় স্থির লয়ে ছন্দের দোলা। সর্বোপরি গানের কাব্যাংশে নাটকীয়তায় নতুন ব্যঞ্জনা প্রয়োগ। শান্তিদেবের বিন্যাসে যা সহজাত, সুচিত্রা মিত্রের অনুশীলনে তাই 'সফিস্টিকেটেড' এখানেই যা রূপভেদ।

যন্ত্রানুষঙ্গ যথাযথ। মঞ্চসজ্জায় রঙের ব্যবহার পীড়াদায়ক। এমন একটি প্রভাতী অনুষ্ঠানের জন্য ক্যালকাটা ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

সুভাষ চৌধুরী

হরষে জাগো আজি

পারমিতা বিশ্বনাথন ও হিরণ্ময় চৌধুরীর উদ্যোগে, 'সাঙ্গীতিক' সংস্থার আয়োজনে ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে রবীন্দ্রসদনে যে সঙ্গীতানুষ্ঠান নিবেদিত হল, তার নামেই ছিল এক স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ—'হরষে জাগো আজি'। সে-আমন্ত্রণ যাঁর সঙ্গে জেগে ওঠার, সেই শিল্পীর নাম যেহেতু সুবিনয় রায়, তাই সহজেই প্রীতিযোগে জাগরণের একটি দুর্লভ স্বাদ ছড়িয়ে পড়ল পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ রবীন্দ্রসদনে। আড়াই ঘণ্টার অনুষ্ঠান, মধ্যে দশ মিনিটের বিরতি। প্রথমার্ধের দশটি গান। দশটিই 'পূজা' পর্যায়ের। দ্বিতীয়ার্ধে ছিল 'বিচিত্র' পর্যায়ের প্রাধান্য। পূর্ব নির্ধারিত নটি গানের মধ্যে পাঁচটিই বিচিত্র-পর্যায় থেকে নির্বাচিত। প্রেমের গান ছিল তিনটি (এর মধ্যে একটিকে নৃত্যনাট্যের গানও বলা যায়), অনুরোধে যুক্ত হল প্রেম পর্যায়ের আরো একটি—'আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে'। একটি ছিল 'প্রকৃতি'র।

হরষ ছিল সর্বত্র। ছিল

সুবিনয় রায়

বারীন মজুমদারের অসামান্য মঞ্চ-সজ্জায়, ছিল সেই মঞ্চে আসীন শিল্পীর অনবদ্য নিবেদনে। সুবিনয় রায় প্রথমে গাইলেন ললিত আড়াঠেকায় 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে'। কোনো ব্যস্ততা ছিল না সেদিনের গানের পরিবেশনে। প্রত্যেকটি গান দীর্ঘ সময় নিয়ে শান্ত সংহত সুস্থির ভঙ্গিতে শোনালেন সুবিনয়বাবু। পুরোপুরি আসরের মেজাজে। আসরের প্রাণের প্রাণ তাই প্রথম গানে না হোক, পরবর্তী গানে ঠিকই উঠল জেগে। মিশ্র যোগিয়ায় ঝাঁপতালে নিবন্ধ 'একি সুগন্ধ হিল্লোল' ধরলেন যখন শিল্পী, প্রাণ পূর্ণ করে সেই সুরভিসুধা দানের এবং পানের এক অনন্য জগৎ রচিত হল শিল্পী ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমশ আনন্দ মূর্তি ধরে জেগে উঠল 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে' গানে। স্বীকারোক্তির মত শোনালো 'প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে', আহ্বানের মতো শোনালো 'সবে আনন্দ করো' কিংবা 'হে মন তাঁরে দেখো', মধুময় মন্দ্রে অপরূপ তন্দ্রে মহা মধুরিমা হয়ে ঝরে পড়ল 'হৃদয়শশী হৃদি-গগনে'। সেই মাধুর্যের রেশ প্রথমার্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত একইভাবে বজায় ছিল, ছিল কাফি চৌতালে 'আছ অন্তরে' এবং হাম্বীর রাগে নিবন্ধ ধামার 'হরষে জাগো আজি'তে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই যেন আরেক সুবিনয় রায়কে পাওয়া গেল। নতুন করে ধরা পড়ল, প্রথমার্ধের ধ্রুপদী গানের গাম্ভীর্যে যিনি অনন্যতন্ত্র ও স্বমহিম, দ্বিতীয়ার্ধের নানা রসের গানেও তিনি অবিকল, অনায়াস নিপুণ এবং অপরূপ লাবণ্যময়। 'হৃদয়ে ছিলে জেগে' দিয়ে শুরু করলেন তিনি। দারুণ মেজাজী পরিবেশন পরপর শোনালেন, 'বিরস দিন বিরল কাজ', 'তুমি উষার সোনার বিন্দু', 'দুয়ার মোর পথপাশে, সে কোন পাগল যায়', 'মাটির প্রদীপখানি', 'কেমন সে ঝড়ের ভুলা', 'হাটের ধুলো সয় না', 'আমার প্রাণের পরে' এবং শেষ করলেন 'এরা পরকে আপন করে' দিয়ে। শেষ গানটি তালে শোনাতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সঙ্গতে তবলার প্রারম্ভিক অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁকেও বেশ অস্বাচ্ছন্দ্যে ফেলে ছিল, বোঝা যায়। এই পর্বের গানে সেদিন সুবিনয় রায়কে অন্যতর স্ফূর্তিতে যেন পাওয়া গেল। বিশেষত, 'মাটির প্রদীপখানি' বা 'হাটের ধুলো সয় না'-তে যে জাতীয় অভিব্যক্তি যুক্ত করলেন তিনি, তা সচরাচর তাঁর গানেও যেন পাওয়া যায় না। স্বরলিপির যথার্থ অনুসরণে গান যে নিষ্প্রাণ হয় না, সুর-লয়-তাল অক্ষুণ্ণ রেখেই অকৃত্রিম মাধুর্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জারিত করা যে সম্ভব এ-কথার মূর্ত উদাহরণ সুবিনয় রায়ের গান। কিন্তু অনেক সময়েই এই দেখে অবাক লাগে যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেন অনেকটা রেখটের থিয়োরির সমর্থক, নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেই যেন আপ্লুত করেন তিনি। কিন্তু সেদিন দ্বিতীয় পর্বে এ-ধারণা যেন বারবার ভুল মনে হচ্ছি[l]… নিজেকে সম্পূর্ণ একাত্ম … দিয়েছিলেন তিনি। অই নতুন ঘো… লাগিয়ে দিয়েছিল তাঁর 'ঘোর' উচ্চারণ (আমার প্রাণের 'পরে), কোন … ঝড়ের ভুল-এর 'হায় রে' হয়ে উঠেছি… এক বুক নিঙরানো হাহাকার, 'প্রাণ… ব্যাকুল চাওয়া' বা 'মায়ের প্রাণের ভয়' সম্পূর্ণ পৃথক উপমেয় হয়ে ধর… পড়েছিল 'মাটির প্রদীপখানি'তে। 'হাটের ধুলো সয় না'তে শিল্পীর … কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করছিল—'তোমার গানের পদ্মবনে আবার ডাকো নিমন্ত্রণে—তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান।'

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

দক্ষিণীর সমাবর্তন-উৎসব

দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে এ বছর স্নাতকদের যোগ্যতা-পত্র বিতরণ করলেন শ্রীমতী মালতী ঘোষাল। পুরনো দিনের এই বরেণ্য শিল্পীর উপস্থিতি, সংক্ষিপ্ত তবু প্রয়োজনীয় ভাষণ এবং সর্বোপরি অনুরোধে-শোনানো দুখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত এই উৎসবকে অবিস্মরণীয় অনুষঙ্গে জড়িত করল।

ভাষণ ঠিক নয়, স্মৃতিচারণা। সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কাছে গান শেখার হাতেখড়ি তাঁর। ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম মালতী ঘোষাল পেয়েছেন শ্যামসুন্দর মিত্রের কাছে। রাগপ্রধান রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমাদর বাড়ছে দিনে দিনে। এর জন্য তিনি পরামর্শ দিলেন নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। বললেন, ছেলেবেলায় হিন্দি গান শেখা উচিত, তা হলে বড়ো হয়ে রাগপ্রধান রবীন্দ্রসঙ্গীত সর্বাঙ্গ-সুন্দরভাবে গাওয়া সম্ভব হবে। নিজের সঙ্গীতজীবন সম্পর্কে নম্র ও বিনয়-বিজড়িত মন্তব্য তাঁর, 'সুধাসাগর-তীরে দু-একটি নুড়ি কুড়িয়েছি মাত্র।'

কথাটা যে কত বড়ো বিনয় তার পরিচয় ফুটে উঠল পরবর্তী অধ্যায়েই। অনুরোধে দুখানি গান শোনালেন মালতী ঘোষাল। প্রথমে শোনালেন, 'আমায় দু-জনায় মিলে পথ দেখায় বলে।' এত বয়েস, তবু সুর এখনো কত তীব্রভাবে মিশে আছে কণ্ঠে। এত অনভ্যাস, তবু কী অনায়াসে সুরেলা মূর্ছনায় গলা ওঠানামা করে। তাঁর কণ্ঠের দ্বিতীয় গান—'যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার।' তারই রেকর্ডের গান। তবু সেদিন তাঁর কণ্ঠে শোনার অভিজ্ঞতা দুর্লভ স্মৃতি হয়ে থাকবে। দক্ষিণীর পক্ষ থেকে নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক অনুষ্ঠানও নিবেদিত হল এই উৎসবে। সম্মেলক গানগুলি জমজমাট ভঙ্গিতে পরিবেশিত। একক কণ্ঠের গানের মধ্যে সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়ের 'সকল ফুরালো স্বপন প্রায়' সবল কণ্ঠের নিবেদন।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়